আর্থিক উন্নতি

ধনবিজ্ঞানবিষয়ক মাসিক পত্র

শ্রীবিনয়কুমার সরকার
সম্পাদিত

১ম বর্ষ—১৩৩৩

কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস
১০৭, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

সূচিপত্র

বাংলার সম্পদ্

অ

আ

ই

এ

ও

ক

খ

গ

ঘ

চ

আর্থিক ভারত

দুনিয়ার ধনদৌলত

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ

মোলাকাৎ

গ্রন্থপঞ্জী

সমালোচনা

প্রবন্ধাবলী

ভ

ম

য

র

ল

শ

তর্ক-প্রশ্ন

১ম বর্ষ—১ম সংখ্যা

বৈশাখ—১৩৩৩

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্ ।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি ॥

অথর্ব্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জন্ম আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

শেয়ার-মার্কেট

অনেক উচ্চশিক্ষিত ভারতসন্তানের কানেও "শেয়ার-মার্কেট" শব্দটা প্রবেশ করিয়াছে কিনা সন্দেহ। শেয়ারের বাজারে কেনা-বেচা হয় কি? কোম্পানীর "শেয়ার" বা অংশ। এই বাজারের সওদাগরেরা হয় কোনো না কোনো কোম্পানীর অংশী, না হয় কোনো না কোনো কোম্পানীর অংশী হইবার জন্য চেষ্টিত। কোম্পানীগুলার "অংশ" কেনা-বেচা করাই বর্ত্তমান জগতে আর্থিক জীবনের একটা গোড়ার কথা। এইরূপ গোড়ার কথাগুলা যাহাদের জানা নাই, তাঁহারা আজকালকার জীবনযাত্রা-প্রণালী সম্বন্ধে প্রায় আনাড়ি থাকিতে বাধ্য।

হাজারখানেক কোম্পানী

শেয়ারের বাজারের চড়াই-উৎরাই সম্বন্ধে একখানা মাসিক পত্র প্রকাশ করিতেছেন এন্, এল্, রায় অ্যাণ্ড কোম্পানী (২, রয়্যাল এক্স্চেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা)। পত্রিকার আগাগোড়া কেবল অঙ্কে ভরা। কোনো প্রকার প্রবন্ধ, সংবাদ বা বক্তৃতা এই পত্রিকার মাল নয়। গোটা পচিশেক বিভিন্ন শ্রেণীতে "অংশ"-বিক্রেতা কোম্পানী-গুলাকে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রায় এক হাজার বিভিন্ন কোম্পানী এই সব শ্রেণীর অন্তর্গত।

বাঙালীর ভাগ্যনিয়ন্তা

প্রথমেই আলোচিত হয় সরকারী "সিকিউরিটি"র (অর্থাৎ গবর্মেণ্টের লওয়া ঋণের) সুদের উঠা-নামা। তাহার পর কলিকাতা কর্পোরেশনের "ডিবেঞ্চার" বা বন্ধকি-ঋণ। বড় বড় ব্যাঙ্ক এবং বীমা-কোম্পানীর অংশের দর আর এক শ্রেণীতে পড়ে। বাংলাদেশের কোনো কোনো জমিদারি বিদেশী ম্যানেজারের কর্তৃত্বে ব্যবসা-কোম্পানীর নিয়মে পরিচালিত হয়। সেই সব জমিদারি-ব্যবসার শেয়ারও এই পত্রিকায় উঠে। পাটের কলসমূহ এক প্রকাণ্ড

তালিকার অন্তর্গত। কয়লার কোম্পানী এবং চায়ের কোম্পানী ও তদ্রূপ। তুলার কল, ময়দার কল, কাগজের কল ইত্যাদির "অংশ", বলা বাহুল্য, এই পত্রিকার আলোচ্য বিষয়। রেল, ট্রাম, মোটর ও জাহাজ কোম্পানীগুলা এই পঁচিশ শ্রেণীরই সামিল। অধিকন্তু, সিমেণ্ট, চুন, চীনা বাসন, রাসায়নিক দ্রব্য, ধাতুজ পদার্থ, এঞ্জিনিয়ারিং-ঘটিত মাল, তেল, কাঠ, চিনি, মদ ইত্যাদি বিষয়ক কোম্পানীর বাজার-দর ও এই পত্রিকার অঙ্কে সহজেই বুঝিতে পারি।

এই হাজারখানেক কোম্পানীর ঠিকুজি যে সকল বাঙালী নিজ নিজ নখ-দর্পণে রাখিতে পারিবেন তাঁহারা বাংলা-দেশের হাড় মাস হাতের মুঠায় পাইবেন। তাঁহাদের পক্ষে বাঙালী সমাজ, বাংলার "আদর্শ" ইত্যাদি বিষয়ে আবল তাবল বকা অসম্ভব হইবে।

মোটের উপর ধরিয়া লইতে হইবে যে, এই এক হাজার প্রতিষ্ঠান বা কর্ম্মকেন্দ্রই বাঙালী জাতির আর্থিক ভাগ্য অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। এই বিষয়ে গোজামিল রাখিতে গেলে আহাম্মুকি করিয়া বসা হইবে।

মাল বনাম শেয়ার

তেল-কোম্পানীর "অংশের" দর যে চিজ বাজারে তেলের দর সেই চিজ নয়। সেইরূপ কয়লার কোম্পানীর শেয়ার কেনা-বেচা আর কয়লার বাজারে দরদস্তুর করা দুই ভিন্ন ভিন্ন কাজ। এই দুই শ্রেণীর কাজের জন্য দুই বিভিন্ন প্রকারের অভিজ্ঞতা এবং কর্ম্মদক্ষতা আবশ্যক হয়। শেয়ার-মার্কেটে মালের দর আলোচিত হয় না, হয় মালগুলা যে-যে ফ্যাক্টরিতে বা খনিতে বা বনজঙ্গলে পয়দা হইতেছে সেই সব ফ্যাক্টরি-খনি-বনজঙ্গলের বাজার-দর। এই প্রভেদটা মনে রাখা আবশ্যক।

আলমডাঙায় পাট-বেচার সমবায়

নদীয়া জেলার আলমডাঙা পাটের ব্যবসার এক বড় কেন্দ্র। এইখানে "সমবায়ের" নিয়মে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে পাট বেচিবার জন্য একটা "কোঅপারেটিভ্ বিক্রয়-সমিতি" কায়েম হইয়াছে। চাষীরা যাহাতে কোনো ব্যবসায়ীর সাহায্য না লইয়া সোজাসুজি ক্রেতাদের নিকট মাল বেচিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা এই সমিতির উদ্দেশ্য।

বিগত ফেব্রুয়ারি মাসে আলমডাঙায় এই বিষয় লইয়া একটা সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য জেলা হইতে কয়েক জন বিশেষজ্ঞকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল।

কৃষি শিল্প-পশু-প্রদর্শনী

বাংলাদেশের অনেক জেলায়ই,—সদরে বা মফঃস্বলে, কৃষি প্রদর্শনী, শিল্প-প্রদর্শনী, অথবা পশু-প্রদর্শনী ঘটিয়া গেল। কোনো কোনো প্রদর্শনীতে নাকি ত্রিশ-চল্লিশ হাজার নরনারীও জিনিষপত্র বা গো-ছাগল দেখিয়া গিয়াছে। এই সকল প্রদর্শনীর সাহায্যে আমাদের জেলায় জেলায় চাষী—কারিগর—গোয়ালা—মুদীদের আর্থিক অবস্থা কতটা পরিবর্ত্তিত হইতেছে সেই বিষয়ে মফঃস্বলের কোনো কাগজে আলোচনা হয় না কেন? কলিকাতার বা অন্যান্য কেন্দ্রের কোনো কোনো গবেষক এই সকল তথ্যের আলোচনায় সময় দিলে বাঙালী সমাজের অনেক ভিতরকার কথা টানিয়া বাহির করিতে পারিবেন।

চাটগাঁয় ব্যাঙ্ক

অন্যান্য জেলার মতন চাটগাঁয়ও একটা ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অংশী এবং কর্ম্মকর্ত্তাদের ভিতর হিন্দু এবং মুসলমান দুয়েরই নাম দেখিতেছি। ব্যবসা-বাণিজ্যে অভিজ্ঞতা-বিশিষ্ট লোকেরা কর্তৃত্ব করিতেছেন। বাংলা এবং ব্রহ্ম এই দুই দেশের টাকা চলাচলের কাজে "চিটাগং ব্যাঙ্ক" হইতে সাহায্য পাওয়া যায়।

বঙ্গলক্ষ্মী কটনমিলের ঠিকুজি

১৯০৬ সনে "বঙ্গলক্ষ্মী"র মূলধন ছিল ১২ লাখ টাকা। ১৯২৫ সনের ডিসেম্বর মাসে মূলধন দাঁড়াইয়াছে ১৭,৭৮,২০০৲।

জমি এবং বাড়ীর মূল্য ছিল কোম্পানী প্রতিষ্ঠার সময় ৩,৬৩,০০০৲। গত বৎসরের শেষে ৮ লক্ষের উপরে উঠিয়াছে এই সমুদয়ের দাম।

বিশ বৎসর পূর্ব্বে যন্ত্রপাতির দাম ছিল ৩ লাখ ৮০ হাজার টাকা। আজ তাহার দাম ১৫,৫৫,৩০০৲।

জমির চৌহদ্দি ৩০ বিঘা হইতে ১০০ বিঘায় আসিয়া ঠেকিয়াছে।

পল্লী-সংস্কারের খতিয়ান

"দেশবন্ধু"-পল্লী-সংস্কার-সমিতির ত্রৈমাসিক কার্য্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে প্রকাশ এ পর্য্যন্ত উক্ত সমিতি বাংলার বিভিন্ন জেলায় ২০টী গ্রামে কর্ম্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ঐ কুড়িটী কেন্দ্রে ১০৯ খানি গ্রামের সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে। ইতিমধ্যে ১০২টী পুষ্করিণী পরিষ্কার করা হইয়াছে, ৪৬টি দিবা ও ৩৩টি নৈশ বিদ্যালয়, ১৬টী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে। ঔষধ-বিতরণ, জঙ্গল-পরিষ্কার, সালিশী আদালত পরিচালন এবং সূতা-কাটার কাজও চলিতেছে। প্রচার-কার্য্য, কথকতা, আলাপ এবং স্বদেশী ও কৃষি-শিল্প-বিষয়ক আলোচনাও কিছু কিছু হইতেছে।

হাবড়া জেলার মুসলমান

হাবড়া হইতে তারকেশ্বর পর্য্যন্ত ই, আই রেলের যে লাইন গিয়াছে সেই লাইনে হরিপাল ষ্টেশনে নামিয়া কৈঝালা ও জেজুর গ্রামে যাওয়া যায়। এই দুই গ্রামে অনেক মুসলমানের বাস। তাঁহাদের অনেকের ঘরেই মেয়েরা কলিকাতা হইতে সিল্ক্ আনাইয়া উহা দ্বারা রুমাল, টেবিল-ঢাকনি ইত্যাদি তৈয়ারি করেন। রুমালগুলিতে নানারকম কারুকার্য্য থাকে এবং দেখিতেও মনোরম। আর বাড়ীর পুরুষেরা আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানে ঐ সব রুমাল ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করেন। এক এক জন পুরুষ শুধু এই ভাবে অর্থোপার্জ্জন করিয়া আমেরিকার মত দেশে নিজের খাই-খরচা ও সরঞ্জামি খরচ বাদে বাড়ীতে মাসে ৬০৲—১০০৲ টাকা পাঠাইতে পারেন।

বাংলার মজুর-জীবন

বজবজ হইতে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত গঙ্গার উভয় পার্শ্বের চটকলগুলিতে যে সকল শ্রমিক কাজ করে তাহাদের আর্থিক অবস্থা বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়া জনসন্ ও সাইম নামক দুইজন শ্রমিক নেতা এক পুস্তিকা বাহির করিয়াছেন। স্কটল্যাণ্ডের ডাণ্ডী সহরে যে সকল চটকল আছে, তাহাদের শ্রমিক সঙ্ঘের প্রতিনিধিরূপে তাঁহারা এদেশে আসিয়াছিলেন। প্রথমেই তাঁহারা দেখিলেন যে একদিকে চটকলের অংশিগণ গত কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রভূত পরিমাণে ডিভিডেণ্ড পাইতেছেন—কোনো কোনো কোম্পানিতে তাহা শতকরা ৩০০৲, এমন কি, ৪০০৲ টাকায় উঠিয়াছে; অথচ অপর দিকে বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকদের গড় পড়তা সাপ্তাহিক আয়ের হিসাব করিলে দেখা যায় যে তাহাতে গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান হয় না। শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য যে সকল হিতকর অনুষ্ঠান সভ্য দেশসমূহে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহার কিছুই এখানে দৃষ্ট হয় না। সরদার কুলীদের কয়েকটী ছেলেকে বেঞ্চে বসাইয়া কোথাও কোথাও পাঠশালা খোলা সুরু হইয়াছে বটে, কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোক এমন আছে, যাহারা শিক্ষার ব্যবস্থা কি তাহা জানে না। যে সকল ঘরে বা চালায় তাহারা বসবাস করে সেখানে স্বাস্থ্য বজায় থাকাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

কচুরী-পানার ছাউনি

কচুরী-পানা শুকাইয়া তাহার দ্বারা ঘর ছাওয়া যায়। মার্চ মাসে ঢাকায় যে শিল্প-প্রদর্শনী বসিয়াছিল তাহাতে কচুরী বা টাগইয়ের ঘর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। কচুরীর ছাউনি নাকি এক সঙ্গে জলকেও কলা দেখায় আর আগুনেরও তোয়াক্কা রাখে না। "পঞ্চায়েৎ" (ঢাকা) বলিতেছেন:—"দেশে বর্ত্তমানে যেরূপ ছনের অভাব এবং টিনের মূল্য যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে গরিব লোকের মাথা বাঁচাইবার উপায় হইয়াছে।"

বাঙালীর প্রথম পাটের কল

কুমিল্লা এবং চট্টগ্রামের কয়েক জন ব্যাঙ্কার ও ব্যবসায়ীর উদ্যোগে চট্টগ্রামে কর্ণফুলি জুট মিল্‌স্ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এই জন্য শেয়ার-বেচা সুরু হইয়াছে। প্রত্যেক শেয়ারের দাম পঁচিশ টাকা। সম্প্রতি বিশ লাখ টাকার শেয়ার বেচা হইবে। বাঙালীর তাঁবে বোধ হয় আজ পর্য্যন্ত আর কোনো পাটের কল নাই। এই কলের টাকা গচ্ছিত থাকিবে কুমিল্লার ইউনিয়ান ব্যাঙ্কে, আর কলিকাতার বিলাতী লয়েড্‌স্ ব্যাঙ্কে।

চায়ের ব্যবসায়ে লাভ

কোনো বাঙালী কোম্পানীর "উদ্বর্ত্তপত্র" (ব্যালান্স শীট) খতাইয়া দেখিতেছি যে, ১৯২৫ সনের ফেব্রুয়ারি

মাসে শত করা ১০০৲ হারে একবার এবং সেপ্টেম্বর মাসে শতকরা ৩০৲ হারে আর একবার লভ্যাংশ বিতরণ করা হইয়াছে। এই ব্যবসা চায়ের। বাগানে চা তৈয়ারি করিতে খরচ পড়িয়াছিল পাউণ্ড প্রতি পনর পয়সা। কলিকাতায় চা বিক্রী হইত প্রায় এক টাকা পাউণ্ড হিসাবে।

ময়মনসিংহে চাউল ও তেলের কল

তুষের আগুনে এঞ্জিন চলিবে আর এই এঞ্জিনের সাহায্যে এক সঙ্গে চাউলের কল এবং তেলের কল চালানো হইবে। এইরূপ প্রস্তাব লইয়া ময়মনসিংহ জেলার ভৈরব অঞ্চলে একটা "লিমিটেড কোম্পানী" খাড়া হইতেছে। মূলধন থাকিবে পাঁচ লাখ টাকা। প্রতি অংশের মূল্য দশ টাকা,—চার কিস্তিতে দেয়।

চীনের বাসন

আজকাল কলিকাতায় এবং মফঃস্বলের বাজারে বাজারে বিলাতী এবং জাপানী "চীনের বাসন" চলিতেছে খুব বেশী। এই সকল বিদেশী মালের সঙ্গে টক্কর দিতে যাইয়া "বেঙ্গল পটারিজ লিমিটেড কোম্পানী" নামক বাঙালী কোম্পানীকে বেগ পাইতে হইতেছে। যথাসম্ভব কম খরচে মাল তৈয়ারি করিবার জন্য ডিরেক্টররা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। কোম্পানীর মূলধন প্রায় দশ লাখ টাকা।

বাঙালী ব্যাঙ্কের হিসাব পরীক্ষা

বাংলা দেশের কোনো কোনো ব্যাঙ্কের হিসাব কুমিল্লার "বাণিজ্যবার্ত্তা" মাসিকে বিজ্ঞাপনের আকারে ছাপা হইয়াছে (জানুয়ারি ১৯২৬)। ১৯২৫ সনে চট্টগ্রামের "মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক" জনগণের নিকট হইতে আমানত পাইয়াছেন ৪৬৭,১৪০৲ অর্থাৎ ৪৷৷০ লাখ টাকার কিছু উপরে। আর জনগণকে কর্জ্জ দেওয়া হইয়াছে ৪২০,৩৯৯৵, অর্থাৎ ৪৷০ লাখ টাকার কিছু কম। সকল প্রকার দেনা-পাওনার হিসাব ধরিলে এই ব্যাঙ্কের কারবারের কিম্মৎ ছিল ৬৯৯,৬৩৫৷৴৫ অর্থাৎ প্রায় সাত লাখ টাকা। এক লাখ সতের হাজার পঞ্চাশ টাকা মূলধনে সাত লাখ টাকার কারবার চলিয়াছে। ডিরেক্টররা অংশীদিগকে শতকরা ১৫৲ টাকা হারে আয়কর-মুক্ত লভ্যাংশ বিতরণ করিয়াছেন।

ছাপাখানার শ্রমিক

ছাপাখানার শ্রমিকদের অবস্থা কিছু কিছু উন্নত হইয়াছে। এই বিষয়ে "ভারতী"তে (ফাল্গুন ১৩৩২) শ্রীমতী সরলা দেবী লিখিতেছেন:—

"শুনেছি নাকি ৬০,০০০ কম্পোজিটর আছে এই কলকাতা সহরে। ১৯১৯ সনের ডিসেম্বরে তিনটি কম্পোজিটর মেম্বর ক'রে এই সমিতি খোলা হয়। এরই মধ্যে পাঁচ সাত হাজার মেম্বর নিয়ে সঙ্ঘ বাঁধতে না বাঁধতে তোমরা হাতে হাতে কত ফল পেয়েছ দেখ:—

(১) গবর্মেণ্ট প্রেসে, যেখানে একদিনও ছুটি পেতে না সেখানে, বছরে ১৬ দিনের ছুটি মঞ্জুর হয়েছে।

(২) প্রাইভেট প্রেসে সর্ব্বত্র মাইনে বেড়েছে।

(৩) অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর জায়গায় বসে কাজ করবার ব্যবস্থা হয়েছে।

(৪) গবর্মেণ্ট প্রেসে কোনো কোনো স্থলে অন্যায়ভাবে কর্ম্মচ্যুত কর্ম্মচারী তার কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েছে।"

কাপড় বনাম লোহা

জাপানে ভারতে বাণিজ্য-লড়াই বেশ পাকিয়া উঠিতেছে। ভারতের বোম্বাইওয়ালারা চাহেন জাপানী কাপড়ের উপর উঁচু হারে সরকারী শুল্ক। তাহার পাল্টা জবাব দিয়া জাপানী ব্যবসায়ীরা বলিতেছেন :—"বহুত আচ্ছা! আমরা ভারতীয় লোহার বিরুদ্ধে আন্দোলন রুজু করিতেছি।" আন্দোলন গিয়া ঠেকিয়াছে জাপানী ক্যাবিনেট পর্য্যন্ত। জাপানে বিস্তর ভারতীয় লোহা বিক্রী হয়। এই লোহার উপর কড়া শুল্ক বসিলে ভারতীয় লোহাওয়ালাদের বিশেষ ক্ষতি। রগড় চলিতেছে,—কাপড় বনাম লোহা।

সরকারী কৃষি-কমিশন

ভারতের চাষবাস সম্বন্ধে তথ্য-সংগ্রহ করিবার মতলবে গবর্মেণ্ট একটা "কমিশন" কায়েম করিয়াছেন। এই কমিশনের বিরুদ্ধে আমাদের জন-নায়কেরা কড়া মত প্রচার করিতেছেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় কমিশনের বিরুদ্ধে মাথা গরম করিবার বিশেষ কোনো দরকার নাই।

ভারতীয় আর্থিক ও রাষ্ট্রিক নানা অনুষ্ঠান সম্বন্ধেই নানা সরকারী অনুসন্ধান ঘটিয়া গিয়াছে। কৃষি সম্বন্ধে ও এইবার একটা কিছু হইবে। তাহাতে এমন ক্ষতি কি?

অনেকে বলিতেছেন যে,—"চাষীদের আর্থিক উন্নতি নির্ভর করে জমিজমার আইন-কানুনের উপর। অতএব সেই বিষয়েই অনুসন্ধানটা আগে হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান কমিশনে এই আইন-কানুন লইয়া কোনো আলোচনা হইতে পারিবে না।"

কৃষিকর্ম্ম বনাম জমিজমার আইন

আমরা বলি যে তাহাতেই বা আপত্তি কি? জমি সংক্রান্ত আইন-কানুনই চাষীদের একমাত্র ভাগ্যনিয়ন্তা নয়। এই কথাটা সর্ব্বদা মাথায় রাখা দরকার। অপর দিকে চাষ বস্তুটা টেক্‌নিক্যাল চিজ্। ইহাতে লাগে রসায়ন, ইহাতে লাগে যন্ত্রপাতি, ইহাতে লাগে যাতায়াতের গাড়ী-নৌকা-জাহাজ, ইহাতে লাগে টাকার চলাচলের কারবার। নেহাৎ আদিম ধরণের চাষবাসেও এই সব দরকার হয়,—আবার নবীনতম মার্কিণ রীতির কৃষিকর্ম্মেও এই সব বিদ্যা, কারবার ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগে।

কাজেই, যদি কোনো লোক জমিজমার আইন-কানুন অথবা রায়ত-চাষীদের স্বত্বের কথাটা ধামাচাপা রাখিয়া তাহাদের গো-ছাগলের কথা, তাহাদের সার ব্যবহারের কথা, তাহাদের শস্যের পরিমাণ ও "দ্রব্যগুণ" বাড়াইবার কথা, তাহাদের হাট-বাজারের কথা, তাহাদের কর্জ্জ পাইবার সুযোগ-সুবিধার কথা আলোচনা করিতে অগ্রসর হয় তাহাতে ভারতীয় চাষি-কুলের সর্ব্বনাশ ঘটিবার সম্ভাবনা ত দেখিনা। এমন কি, এই শেষোক্ত দফাগুলার কোনো এক-আধ দফা লইয়া ও যদি জেলায় জেলায় বা প্রদেশে প্রদেশে ছোট-বড়-মাঝারি অনুসন্ধান চলিতে থাকে তাহাতে ও আমাদের মতে ভারতীয় নরনারীর আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান জন্মিবারই সম্ভাবনা আছে প্রচুর। তাহাতে ভারতের লাভ ছাড়া লোকসান নাই।

ইন্দো-জাপানী সন্ধির বিরুদ্ধে বোম্বাই

জাপানীদের সঙ্গে ভারতবাসীর যে আমদানি-রপ্তানি চলিয়া আসিতেছে তাহার পশ্চাতে একটা বাণিজ্য-সমঝোতা আছে। ১৯০৫ সনে এই বিষয় লইয়া জাপান সরকার বৃটিশ গবর্মেণ্টের সঙ্গে একটা "কন্‌ভেন্‌শান" বা সন্ধি-জাতীয়

বন্দোবস্ত পাতাইয়াছিলেন। আজ কাল জাপানীদের বিরুদ্ধে বোম্বাইয়ের কলওয়ালারা যে আন্দোলন চালাইতেছেন তাহাতে সেই "কন্‌ভেন্‌শ্যন" রদ করিয়া দিবার কথা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। ভারতের নরনারী বোধ হয় সাধারণতঃ এই "ইন্দো-জাপানীজ কন্‌ভেন্‌শ্যনের" তথ্য অবগত নহেন। আমরা "অ্যাংগ্লো-জাপানীজ অ্যালায়্যান্স" অর্থাৎ ইংরেজ-জাপানী রাষ্ট্রীয় মিত্রতা-সন্ধির কথাই বেশী জানি।

১৯০৫ সনের ইন্দো-জাপানী সমঝৌতা

ইন্দো-জাপানী বাণিজ্য-সমঝৌতার ভিতর আছে মাত্র চার কথা। (১) জাপানসাম্রাজ্যের যে-কোনো মাল ভারতে প্রবেশ করিতে পারিবে,—অন্যান্য বিদেশী মালের উপর ভারতে যে হারে শুল্ক উঠানো হয়, জাপানী মালের উপর তাহার চেয়ে উঁচু হারে শুল্ক বসানো হইবে না। সব চেয়ে নীচু হারটাই কায়েম করা হইবে। (২) ভারতে প্রস্তুত যে-কোনো মাল জাপানে প্রবেশ করিতে পারিবে। বিদেশী মালের উপর জাপানে যে হারে শুল্ক উঠানো হয় ভারতীয় মালের উপর তাহার চেয়ে উঁচু হারে শুল্ক বসানো হইবে না। সব চেয়ে নীচু হারটাই কায়েম করা হইবে। (৩) ভারতীয় রাষ্ট্রপুঞ্জ সম্বন্ধেও এই ইন্দো-জাপানী বাণিজ্য-সন্ধির উভয় তরফের কথাই খাটিবে। (৪) এই কন্‌ভেনশ্যন রদ করিতে হইলে একপক্ষ অপর পক্ষকে যথাসময়ে খবর দিবেন। এই খবরাখবরের পরও অন্ততঃ ছয় মাস ধরিয়া সমঝৌতার সর্ত্তগুলা বজায় থাকিবে।

ইতালিতে ভারতবাসীর বাজার

বিলাতী "টাইমস" পত্রিকার সাপ্তাহিক "ট্রেড এবং এঞ্জিনিয়ারিং সাপ্লিমেণ্ট" (১৬ জানুয়ারি ১৯২৬) কাগজে দেখিতেছি যে,—১৯২৫ সনের প্রথম আট মাসে ভারতবাসী ইতালিতে ১,১৮৭,০০০,০০০ লিয়ারের (১৲টাকায় ৭ লিয়ার) মাল পাঠাইয়াছে। ইতালি হইতে ভারতে আসিয়াছে মাত্র ১৭৯,০০০,০০০ লিয়ারের মাল। বুঝিতে হইবে যে, ইতালি ভারত-সন্তানের পক্ষে এক বিশেষ লাভজনক বাজার। ঐ কয় মাসে ভারতবাসীরা বেচিয়াছে প্রায় ১৫ কোটী টাকার মাল।

ইতালিয়ানরা আমাদের তূলা কিনিয়াছিল ৪৪,৮০০ টন (কিম্মৎ ৪৭৩,০০০,০০০ লি)। ভারতের তেলের বীজ গিয়াছিল ১২৮,৮০০ টন (১৪৫,৫০০,০০০ লি)। ইতালিতে যত ভারতীয় শস্য রপ্তানি হইয়াছিল তাহার দাম ৪১,০০০,০০০ লি। মাত্র এই তিন দফায়ই ইতালি হইতে ভারতের চাষীরা পাইয়াছিল প্রায় এক কোটি টাকা। ভারতীয় সওদাগরেরা কর্ম্মদক্ষ হইলে ইতালির বাজার হইতে আরও অনেক লাভ উসুল করিতে পারেন।

ভারতে ইতালিয়ান মাল

ইতালি হইতে ভারতবাসীরা কোন্ কোন্ দ্রব্য খরিদ করিয়া আনিয়াছে? মিলানের সংবাদ-দাতা জানাইয়াছেন যে, তূলার তৈয়ারি কলের জিনিষ ছিল ১,৩০০ টন (দাম ৪১,৫০০,০০০ লি)। ইতালিয়ান পশমী জিনিষ ভারতবর্ষ খরিদ করিয়াছে ৮০০ টন (দাম ২৩,০০০,০০০ লি)। রবারের চাকা ইতালি হইতে আসিয়াছে ৫০০ টন (১৭,৫০০,০০০ লি)। কৃত্রিম রেশমের বাজারে ও ইতালি বেচিয়াছে ৩০০ টন (১৭,৫০০,০০০ লি)। অন্যান্য জিনিষ ও আছে। তবে ইতালির পক্ষে ভারতের বাজার এখনো নেহাৎ নগণ্য। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ইতালি বেচিয়াছিল মাত্র ১৭৯,০০০,০০০ লি (প্রায় ২॥০ কোটি টাকা)। যাহা হউক, ইতালিয়ানরা ভারতীয় বাজারের দিকে জোরের সহিত ধাওয়া করিতেছে। এই একটা কথা জানিয়া রাখা দরকার।

ভারতীয় বীমা-আইন

ভারতবর্ষে যে বীমাবিষয়ক আইন চলিতেছে তাহার সংস্কার করা দরকার হইয়া পড়িয়াছে। গবর্মেণ্টের তরফ হইতে সংস্কারমূলক একটা আইনের খসড়া ও প্রস্তুত হইয়াছে। বাঙালীরা বীমা-বিদ্যায় নেহাৎ অপটু। এই আইনের সু-কু সম্বন্ধে বিচক্ষণরূপে আলোচনা করিবার ক্ষমতা বাঙালীরা কেন, প্রায় কোনো ভারতবাসীই এখনো দেখান নাই। অথচ বীমা-প্রতিষ্ঠানের উপর লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত নরনারীর আর্থিক ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। গবর্মেণ্ট যে আইনটা পুনর্গঠিত করিয়া চালাইবার চেষ্টা করিতেছেন তাহার ধারাগুলা সম্বন্ধে আমাদের দৈনিক-সাপ্তাহিক-মাসিকে আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই বিষয়ে একমাত্র রাষ্ট্র-

নৈতিক মতামতের দ্বারা চালিত হইলে দেশের ক্ষতি সাধিত হইতে পারে।

রেল-কেরাণীদের উপর অবিচার

গবর্মেণ্টের আইন আছে (১ জানুয়ারি ১৯২১ এর গেজেটে প্রকাশিত ৩ নং হুকুম) যে, হেড্ আফিসের কোনো রেল-কেরাণীকে মাসিক ৩৩৲টাকার কম বেতন্ দেওয়া হইতে পারিবে না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ২৮৲, ২৪৲ ইত্যাদি বেতনে রেলকোম্পানী অনেক কেরাণী বাহাল করিতেছে। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে "বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে ইণ্ডিয়ান লেবার ইউনিয়ন" নামক মজুর-সমিতি ঘোরতর প্রতিবাদ পেশ করিয়াছে।

সভা হইয়াছিল বিগত মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী গার্ডেন রীচ পল্লীতে। ঐ সভায় অন্যান্য বিষয় ও আলোচিত হয়। তাহার ভিতর প্রধান স্থান অধিকার করে হেজেলটাইন-কর্ত্তৃক প্রকাশিত রেল-কেরাণী-দের অবস্থা সম্বন্ধীয় রিপোর্ট। এই রিপোর্ট ছাপা হয় নাই। কিন্তু কেরাণীদের সন্দেহ হইতেছে যে, তাহার ফলে বহু সংখ্যক কেরাণীকে বরখাস্ত করা হইবে। ভাতে মারা পড়িবে অনেক ভারতীয় পরিবার।

অথচ অপর দিকে অ-ভারতীয় কেরাণী এবং উচ্চতর কর্ম্মচারীদের বেতন-বৃদ্ধির আয়োজন চলিতেছে পুরা-দস্তুর। রেল বিভাগে লী সাহেবের প্রস্তাব মাফিক খরচ চলিবামাত্র তাহাদের "পোয়া বার"।

এক সঙ্গে দুই দিকে অবিচার চলিতেছে। তাহার বিরুদ্ধে রেল-মজুর সমিতি এবং ভারতীয় ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেস দেশের লোকের মত গঠন করিয়া রাখিতেছে।

রাঁচির মুসলমান তাঁতী

রাঁচির তাঁতীদের বিষম দুরবস্থা ছিল। কাপড় তৈয়ারি করার ব্যবসায়ে তাহাদের কোনো লাভ হইত না। আদিম তাঁতের সাহায্যে তাহারা যে সব ধুতী চাদর প্রস্তুত করিতে পারিত তাহার খরিদ্দার জুটিত কম। কাজেই তাহারা একে একে মজুরে পরিণত হইতেছিল। এই সকল তাঁতীদের অধিকাংশই মুসলমান।

কিন্তু কয়েক বৎসর ধরিয়া তাহাদের অবস্থায় কথঞ্চিৎ উন্নতি লক্ষ করা যাইতেছে। ১৯১৭ সনে তাঁতীদের জন্য একটা সমবায়-প্রণালীর কর্ম্মকেন্দ্র গঠন করা হয়। নাম "রাঁচি হ্বীভার্স্ কোঅপারেটিহ্ব ষ্টোর্স্"। এই "ষ্টোর্-সের" সমবেত শক্তির সাহায্যে তাঁতীরা আজকাল লম্বায় চৌড়ায় বড় বড় সাড়ী, চাদর, টেব্‌ল-ক্লথ, জামার কাপড় ইত্যাদি বস্ত্র বুনিতে পারিতেছে। রেশমী এবং পশমী কাজ ও করা হইতেছে। ষ্টোর্সের জন্য নতুন মূলধন চাই। তাহার ব্যবস্থা হইতেছে।

সিন্ধুদেশে চাষের উন্নতি

কৃত্রিম খাল না থাকিলে সিন্ধুদেশে চাষ চলিতেই পারে না। আজ পর্য্যন্ত মাত্র ৬৭ লাখ বিঘা জমিতে চাষ চলিতেছে। খাল কাটার উত্তম ব্যবস্থা থাকিলে এই দেশে কম সে কম ৪।।০ কোটি বিঘায় চাষের ব্যবস্থা হইতে পারে।

সাক্কারাজ খাল খোলা হইতে আর অল্প দেরী আছে। কিন্তু খোলা হইবামাত্র ৪৫ লাখ বিঘা নতুন জমিতে আবাদ সুরু হইতে পারিবে। তাহার ফলে সিন্ধু দেশের ফসল নাকি দামে আজ-কালকার তিনগুণ হইয়া পড়িবে।

ইন্দোরের কারিগর

কাশীর "আজ" দৈনিকে এক লেখক বলিতেছেন যে, ইন্দোর রাজ্যে ৫৫৯২ জন কারিগর আছে। তাহার ভিতর শতকরা ১৭ জন তাঁতী, ১৫ জন ছুতার, ১৪ জন সোনার ইত্যাদি। এই অঞ্চলের তাঁতীরা নাকি খুব "ওন্দা" কাজ করিয়া থাকে।

আয় সম্বন্ধে দেখিতেছি যে, গড় পড়তা মাসিক পড়ে ১৫।০ হইতে ৫২।।০ পর্য্যন্ত। সাধারণতঃ ৭।০ হইতে ৯।০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত রোজ কাজ করিবার অভ্যাস বিবৃত হইয়াছে।

আধুনিক শিল্পে ইন্দোর

অতি অল্পকালের ভিতর ইন্দোর রাজ্য আধুনিক শিল্প-কারখানায় ভরিয়া উঠিয়াছে। ১৯০৯-১০ সনে ইন্দোরে উল্লেখযোগ্য আধুনিক শিল্পের কারবার ("ঔদ্যোতিক কার-খানা") ছিল মাত্র ৫৮টা। তাহার ভিতর ৩৭ টা ছিল "জিনিং" ফ্যাকটরি আর ১১টা কটন্-প্রেস্।

কিন্তু চৌদ্দ-পনর বৎসরে ইন্দোরের রূপ বদলাইয়া

গিয়াছে। জিনিং ফ্যাক্টরিই এখন ৭৩টা এবং কটন প্রেস ২০ টা। তাহা ছাড়া, আটার কল, বরফ ফ্যাকটরি, তেলের কারখানা ইত্যাদি একাধিক মাথা তুলিয়াছে। কাঁচ, রেশম, মোজা, গেঞ্জী, ইট ইত্যাদি লইয়াও নয়া "উদ্যোগ ধন্ধা" উন্নত অবস্থায় খাড়া আছে। গবর্মেণ্ট এই সকল কারবারের অর্থসাহায্য করিয়া থাকেন।

মোজা বানাইবার কলওয়ালারা গবর্মেন্টের নিকট ৫০০০৲ সাহায্য পাইয়াছে। ২০,০০০৲ পাইয়াছে টালি বানাইবার জন্য গঠিত এক কোম্পানী। ইমারত বানাইবার জন্য কোনো কোম্পানীকে দেওয়া হইয়াছে ৫০,০০০৲। গবর্মেন্টের নিকট হইতে কাগজের ফ্যাকটরি সাহায্য পাইয়াছে ৯০,০০০৲। কাচের কারবারকে সাহায্য করিবার জন্য গবর্মেন্টের তহবিল হইতে গিয়াছে ২০,০০০৲।

বোম্বাইয়ের ওরিয়েণ্ট্যাল জীবন-বীমা কোম্পানী

"ওরিয়েণ্ট্যাল লাইফ অ্যাশিওর‍্যান্স কোম্পানী" নামক জীবন-বীমা বিষয়ক ব্যবসায়-সমিতি ভারতবাসীদের অধীন সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠান। ১৮৭৪ সনে এই কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। বিগত ৫০ বৎসরে এই কোম্পানী হইতে ৮ কোটি টাকা বীমাকারী নরনারীকে বিতরণ করা হইয়াছে। কোম্পানীর হাতে যত টাকা আসে তাহার শতকরা ৮০ অংশ গবর্মেন্টের নিযুক্ত কর্ম্মচারীর তাঁবে "সরকারী কাগজে" গচ্ছিত থাকে। কাজেই টাকা মারা পড়িবার সম্ভাবনা নাই।

পঞ্জাবে জমি-বন্ধক ব্যাঙ্ক

পঞ্জাবে এক নয়া ধরণের ব্যাঙ্ক কায়েম হইয়াছে। ছোট খাট জমিজমার মালিকেরা তাহার সাহায্যে নিজ নিজ সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া কর্জ্জ লইতেছে। এই ধরণের ব্যাঙ্ককে ল্যাণ্ড-মর্টগেজ ব্যাঙ্ক বলে। জার্ম্মাণরা এই প্রতিষ্ঠানের জন্মদাতা। আসল জার্ম্মাণ নাম "লাণ্ড্-শাফ্‌ট্"।

১৯২০ সনের জুন মাসে ঝাঙ্ জেলায় ভারতের সর্ব্বপ্রথম জমি-বন্ধক ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। তাহার পর ১৯২৪ সনে মিয়ানোয়ালি এবং সোনপাত এই দুই কেন্দ্রে আর দুইটা ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে।

ঝাঙ্-ব্যাঙ্কের ক্রমোন্নতি

"বেঙ্গল কো-অপারেটিভ্ জার্ণাল" নামক বঙ্গীয় সমবায় পরিষদের ত্রৈমাসিক পত্রিকায় (অক্টোবর ১৯২৫) দেখিতেছি যে, পাঁচ বৎসরের ভিতর ঝাঙের ব্যাঙ্ক ১৩৬০৮ বিঘা জমির জন্য টাকা খরচ করিতে অর্থাৎ কর্জ্জ দিতে পারিয়াছে। ব্যাঙ্ক পরিচালিত হয় সমবায়ের নিয়মে। কাজেই সভ্য এবং অংশী এ ক্ষেত্রে একার্থক। ৩৩১ জন সভ্য ছিল কয়েক মাস আগে পর্য্যন্ত। ২ লাখ ২৪ হাজার ১১০ টাকা ব্যাঙ্কের তহবিল হইতে সভ্যগণকে কর্জ্জ দেওয়া হইয়াছিল।

জমির আয়ের ১৫ গুণ পর্য্যন্ত কর্জ্জ দেওয়া হয়। তাহার বেশী দিবার নিয়ম নাই। ১০ বৎসরের বেশী মেয়াদে কাহাকেও টাকা ধার দেওয়া হয় নাই। বার্ষিক শতকরা ৮৲ হারে সুদ লওয়া হইতেছে।

জগতের বহির্ব্বাণিজ্য

প্রতিবৎসর গোটা দুনিয়ার আমদানি-রপ্তানি কত? ১৯২৪ সনের খতিয়ান করিয়া এক মার্কিণ ষ্ট্যাটিষ্টিশিয়ান বা তথ্য-তালিকায় বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে খানিকটা কল্পনা করা চলে। বৎসরে মোটের উপর ২৯ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ প্রায় ৮৮,০০০,০০০,০০০,০০০৲ টাকার মাল চলাচল হইয়াছিল। অঙ্কটা গণিতে চেষ্টা করিয়া লাভ নাই।

ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ে ইংরেজের লাভ

বিলাতী মিড্‌ল্যাণ্ড ব্যাঙ্কের মুনাফা হইয়াছে ১৯২৫ সনে ২,৫২২,০০০ পাউণ্ড।

বার্কলেজ ব্যাঙ্ক লাভ করিয়াছে ২,২৯০,০০০ এবং ন্যাশন্যাল প্রোভিন্সিয়াল ২,১৬২,০০০ পাউণ্ড। ল্যাঙ্কাশিয়ার অ্যাণ্ড ইয়র্কশিয়ার ব্যাঙ্কের লভ্যাংশ ছিল ২৪৫,০০০ পাউণ্ড। ইহার নাম "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী"। ইংরেজরা আছে সুখে।

এই সকল লভ্যাংশের নির্দ্দিষ্ট হিস্যা গিয়াছে কর্ম্মচারীদের বিধবা-ফাণ্ডে এবং অন্যান্য পেন্‌শ্যনের খাতে। কোনো ব্যাঙ্ক হইতে এই বাবদ গিয়াছে ৫,০০০, কোনো ব্যাঙ্ক হইতে ১৫০,০০০ পাউণ্ড ইত্যাদি।

জাপানের বীমা-আইন

জাপানেও ভারতের মতনই বিদেশী বীমা-কোম্পানীর পসার খুব বেশী। কিন্তু বিদেশী কোম্পানী সম্বন্ধে জাপান গবর্মেণ্টের আইন কিরূপ তাহা ভারতবর্ষে জানা নাই। একটা কথা বড় কাজের। বীমার "পলিসি"-বিষয়ক কাগজপত্র বিদেশী কোম্পানীরা জাপানী ভাষায় ছাপিতে বাধ্য। ইংরেজিতে বা অন্য কোনো ভাষায় ছাপিবার বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বীমাচুক্তির প্রত্যেক দফা জাপানী ভাষায় ছাপা হওয়া চাই ই চাই। ভারতে এইদিকে আন্দোলন আবশ্যক।

জাপানী তুলার কলের ক্রমিক বিকাশ

১৯০৩ সনে জাপানে যতগুলা তুলার কল ছিল তাহাদের সমবেত মূলধন ছিল ৩ কোটি ৪০ লক্ষ ইয়েন (১ ইয়েনে ১৸০ টাকা)। ১৯২৪ সনে এই পুঁজির পরিমাণ হইয়াছে ২১০ কোটি ৩০ লক্ষ ইয়েন। বিশ-একুশ বৎসরে কলগুলার ক্ষমতা বাড়িয়াছে প্রায় ৭ গুণ।

১৯০৩ সনে "স্পিণ্ড্‌ল্" ছিল গণতিতে ১,৩৮১,৩০৬। ১৯২৪ সনে তাহাদের সংখ্যা ৪,৮৭০,২৩২। তাঁতগুলাও সেইরূপ বাড়িয়াছে ৫,০৪৩ হইতে ৬৪,২২৫ পর্য্যন্ত।

১৯২৪ সনে জাপানী কলে কাজ করিয়াছে ২০৪,৫৫৭ মজুর। এই সংখ্যার ভিতর ১৬০,৩৬৩ জন ছিল নারী। অর্থাৎ মেয়ে-মজুরেরা শতকরা ৭০ জন।

মেয়েদের মজুরি ছিল গড়পড়তা দৈনিক প্রায় ১৵৫।

বিলাতী বীমার কুদৃষ্টান্ত

যুদ্ধের পর বিলাতে বহুসংখ্যক ইন্‌শিওর‍্যান্স কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছিল। তাহার অনেকগুলাই ফেল মারিয়াছে।

কলিকাতার "কমার্স" পত্রিকায় (২৩ জানুয়ারি ১৯২৬) লণ্ডনের "ইন্শিওর‍্যান্স রেকর্ডার" হইতে একটা প্রবন্ধ উদ্ধৃত হইয়াছে। লেখক বলিতেছেন যে, দুনিয়ার বাজারে বিলাতী বীমা-কোম্পানীর ইজ্জৎ কিছু কমিয়া আসিয়াছে। বীমা সম্বন্ধে গবর্মেণ্টের আইন কথঞ্চিৎ কড়া হওয়া আবশ্যক। এই বিলাতী পত্রিকার মতে "ভারত-সন্তানেরা যে সমুদয় বীমা-কোম্পানী গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছেন সেইগুলায় যেন ফেল-মারা ইংরেজদের কুদৃষ্টান্ত অনুসৃত না হয়।"

বিলাতে বেকার-বীমা

আজকাল বিলাতে কম সে কম পাঁচ কোটি পাউণ্ড (৭৫ কোটি টাকা) প্রতি বৎসর বেকার-বীমা-ফাণ্ডে আসিয়া জমে। ইহার চার ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ প্রায় ১৯ কোটি টাকা দেওয়া হয় মাসে গবর্মেণ্টের খাজাঞ্চিখানা হইতে। অবশিষ্ট টাকার খানিকটা আসে মজুরদের তহবিল হইতে আর খানিকটা আসে মনিবদের গাট হইতে। এই নিয়ম চলিতেছে ১৯১১ সন হইতে। সেই বৎসর ইংল্যাণ্ডে "বৃটিশ ইন্শিওর‍্যান্স অ্যাক্ট" জারি হয়। ১৯২০ সনে প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ নরনারী কর্ম্মহীন অবস্থায় এই বীমা-ভাণ্ডারের দৌলতে "ভাত-কাপড়" পাইয়াছে। বিগত পাঁচ বৎসরে বেকার ভাণ্ডার ইংরেজজাতির জন্য খরচ করিয়াছে ২৩ কোটি পাউণ্ড (৩৪৫ কোটি টাকা)।

জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কে মার্কিণ টাকা

বিদেশী মূলধন ছাড়া জার্ম্মাণদেরও চলে না। স্যাক্সনি প্রদেশের "ড্রেস্ড্নার বাঙ্ক" জার্ম্মাণির অন্যতম প্রধান ধন-কেন্দ্র। জার্ম্মাণদের চিন্তায় এইটা তাহাদের চতুর্থ ব্যাঙ্ক।

এই বৎসর জানুয়ারি মাসে "ড্রেস্ড্নার বাঙ্কের" নিকট হইতে নিউইয়র্কের দুইটা ব্যাঙ্ক প্রকাণ্ড এক তাড়া শেয়ারের দলিল পাইয়াছে। ব্যাঙ্ক দুইটার নাম হালগার্টেন অ্যাণ্ড কোম্পানী এবং লেমনে ব্রাদার্স। নামেই প্রকাশ এই দুই মার্কিণ কোম্পানীর কর্ত্তারা জাতিতে জার্ম্মাণ। ইহারা ড্রেস্ড্নার বাঙ্কের শেয়ারগুলা নিজে কিনিবে না। মার্কিণ সমাজের নানা বাঁটিতে এইগুলা বেচিবার ভার তাহাদের হাতে দেওয়া হইয়াছে মাত্র।

ডায়চে বাঙ্কের বিদেশী অংশীদার

অন্যান্য বড় বড় জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কেও বিদেশীদের টাকা খাটিতেছে। ১৯২৪ সনের নবেম্বর মাসে বার্লিনের "ডায়চে বাঙ্ক" বিলাতে ও আমেরিকায় ৪ কোটি মার্কের (১ মার্কে ১২ আনা) শেয়ার বেচিয়াছিল। বিলাতে শেয়ার বেচিবার ভার ছিল লণ্ডনের হেনরি শ্রয়ডার অ্যাণ্ড কোম্পানী নামক ব্যাঙ্কের হাতে। আমেরিকার ভার লইয়াছিল নিউ-ইয়র্কের স্পায়ার ব্যাঙ্ক। এই দুই কোম্পানীর প্রবর্ত্তকও জাতিতে জার্ম্মাণ। ডায়চে বাঙ্ক জার্ম্মাণদের সব চেয়ে নামজাদা টাকার প্রতিষ্ঠান। ইহার মোট শেয়ারের কিম্মৎ ১৫ কোটি মার্ক। দেখা যাইতেছে যে, আজকাল এই শেয়ার-ধনের চার আনার ও বেশী বিদেশী অংশীদের তাঁবে রহিয়াছে। তবে কোনো একটা বা দুইটা বিদেশী ব্যাঙ্ক ডায়চে বাঙ্কের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার সুযোগ পায় না। কেননা বিদেশী শেয়ারগুলা বহুসংখ্যক ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের নিজ নিজ সম্পত্তি।

ডিস্কোণ্টো বাঙ্কের মার্কিণ শেয়ার

কোন্ জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কের কত শেয়ার বিদেশীদের হাতে গিয়াছে তাহা পরিষ্কার রূপে জানা যায় না। কিন্তু আর একটা বড় ব্যাঙ্কের খবর কিছু কিছু জানা আছে। ১৯২৫ সনের বড়দিনের ছুটিতে নিউইয়র্ক হইতে সংবাদ আসে যে সেখানকার "ডিলন রীড কোম্পানী" নামক ব্যাঙ্ক এক জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কের জন্য ৪০ লাখ মার্কের শেয়ার বেচিবার ভার পাইয়াছে। সেই ব্যাঙ্কের নাম "ডিস্কোণ্টো গেজেল্শাফ্ট"। তবে আর কোন্ কোন্ আমেরিকান ব্যাঙ্কের হাতে ডিস্কো-ণ্টোর শেয়ার বেচিবার ভার ছিল বা আছে তাহা অজ্ঞাত।

বিদেশে শেয়ার-বেচার ইতিহাস

ব্যাঙ্কের শেয়ার বেচাবেচি কারবারটা দেশের লোকেরা অনেক সময়েই সোজা পথে জানিতে পায় না। ১৯২৪ সনে জার্ম্মাণির "কম্যার্ৎস্ উণ্ড প্রিফাট বাঙ্ক" বিলাতে শেয়ার বেচিবার ব্যবস্থা করে। বোধ হয় এই ঘটনাই জার্ম্মাণির বিদেশে টাকা তুলিবার প্রচেষ্টায় প্রথম বড় খুঁটা। কিন্তু এই খবরটা জার্ম্মাণরা প্রথমে পায়, জার্ম্মাণি হইতে নয়, বিলাত হইতে।

দেশী ব্যাঙ্কে বিদেশী মূলধন

যাহা হউক, জার্ম্মাণরা নিজেদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্কও বিদেশীদের নিকট শেয়ার বেচিতে ইতস্ততঃ করিতেছে না। কারবারটা দেশের পক্ষে ভাল না মন্দ? এই বিষয়ে জার্ম্মাণ সমাজে আলোচনা চলিতেছে। বার্লিনের "ড্যয়চে আলগেমাইনেৎসাইটুঙ" নামক দৈনিকে তাহার পরিচয় পাইতেছি।

একটা কথা সকলেই স্বীকার করিতেছে। বিদেশীরা জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কগুলার শেয়ার কিনিয়া প্রকারান্তরে জার্ম্মাণ ধন-সম্পদের দৃঢ়তা এবং রাষ্ট্রশাসনের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আন্তরিক বিশ্বাস দেখাইতেছে। বিদেশীদের এই সার্টিফিকেট আজকালকার জার্ম্মাণিতে নগণ্য নয়। সঙ্গে সঙ্গে আবার সকলেই বুঝিতেছে যে, বিদেশী ধনীরা জার্ম্মাণির ধন-সম্পদে হিস্যা লইবার সুযোগ পাইয়া বসিতেছে। আলোক ও আঁধার এক সঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে।

বিলাতী কয়লা

১৯১৩ সনে দুনিয়ায় যত কয়লা রপ্তানি হইয়াছিল তাহার ভিতর বিলাতের হিস্যা ছিল অর্দ্ধেকের কিছু কম। আজ ১৯২৬ সনে বিলাতের হিস্যা অর্দ্ধেকের কিছু বেশী। অতএব স্যার রিচার্ড রেডমেইন নামক একজন ইংরেজ কয়লা-বিশেষজ্ঞ স্বজাতিকে আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন:—"গোটা জগতেই একটা সঙ্কটের যুগ যাইতেছে বটে। কিন্তু অন্যান্য দেশের যে পরিমাণে লোকসান ঘটিয়াছে ইংরেজ জাতির লোকসান সেই পরিমাণে ঘটে নাই।"

রেড্‌মেইনের বিশ্বাস যে, পৃথিবীতে কয়লার ইজ্জৎ বড় শীঘ্র মারা যাইবার নয়। তেল এবং অন্যান্য ইন্ধনের পসার ক্রমেই বাড়িতেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু কয়লাকে কানা করিয়া ছাড়িবার ক্ষমতা ইহাদের এখনো দেখা যাইতেছে না।

আমেরিকায় সুদের হার

আমেরিকা আর সোনা চায় না। এই বস্তু জমিয়াছে ইয়াঙ্কি মুল্লুকে প্রচুর। বিদেশীরা যাহাতে আর আমেরিকার ব্যাঙ্কে ও কারবারে টাকা খাটাইতে না ঝুঁকে তাহার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ধনদক্ষেরা একটা সোজা কল আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহারা ব্যাঙ্কে সুদের হার কমাইয়া দিয়াছেন। কাজেই বিদেশীরা আর মার্কিণ ব্যাঙ্কে টাকা আমানত রাখিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র নয়। আমেরিকা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিতেছে।

রেশম শিল্পের নবীন যন্ত্র

ইতালিতে এক নয়া যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে। তাহার সাহায্যে রেশমশিল্পের অনেক উপকার সাধিত হইবার সম্ভাবনা। গুটিপোকা হইতে সুতা বাহির করিবার জন্য মান্ধাতার আমল হইতে আজ পর্য্যন্ত গরম জল ব্যবহার করিতে হইতেছে। এই নবীন যন্ত্রের আমলে গরম জল আর ব্যবহার করিতে হইবে না। কাজেই কারিগরদের কিছু খরচ বাঁচিয়া যাইবে। জল গরম করার বাবদ কয়লার খরচ ইতালিতে একটা বড়-কিছু। সে দেশে কয়লার খনি নাই। কয়লা আমদানি করিতে হয় বিদেশ হইতে। আরও শুনা যাইতেছে যে, রেশমশিল্পীদের সমাজে আজকাল ব্যাধি এবং মৃত্যু ঘটে অনেক। এই যন্ত্রের চল বাড়িলে তাহাদের স্বাস্থ্য-হানি ঘটিবার কারণ খানিকটা কমিয়া আসিবে।

জার্ম্মাণ সমাজে চিকিৎসক

জার্ম্মাণির ছোকরা-চিকিৎসকেরা সাম্রাজ্যের শ্রম সচিবের আফিসে (রাইখস-আর্বাইট্‌স-মিনিষ্টেরিয়ম) এক দরখাস্ত পেশ করিয়াছে। তাহাতে জার্ম্মাণ সমাজের শারীরিক স্বাস্থ্য বিষয়ক নানা তথ্য পাওয়া যায়। কয়েকটা অঙ্ক ভারত-বাসীর পক্ষে চিত্তাকর্ষক হইবে।

দেখিতেছি যে, কোনো কোনো জেলায় চিকিৎসকদের সংখ্যা যার পর নাই কম। আবার কোনো কোনো জেলায় লোক-সংখ্যার অনুপাতে চিকিৎসকের সংখ্যা খুবই বেশী। গোটা প্রুশিয়ায় (আমাদের বাংলা দেশের প্রায় সমান) প্রত্যেক ১৫০০ লোকের জন্য এক জন করিয়া চিকিৎসক ব্যবসা চালাইতেছেন। কিন্তু এই প্রদেশে এমন অনেক জনপদ আছে যেখানে মাত্র এক জন চিকিৎসক ৫০০০ নরনারীর কাজে আসিতে পারেন। আবার কোনো কোনো জনপদে মাত্র ৪০০ জন লোকের জন্যই একজন চিকিৎসক পাওয়া যায়।

সব চেয়ে বেশী অসুবিধায় পড়িয়াছে প্রুশিয়ার উত্তর-পশ্চিম জনপদ। সহজে তাহাকে হ্বেষ্টফেলিয়া জেলা বলিতে পারি। এই খানে দুই তিন হাজার নরনারীর জন্য গড়পড়তায় একজনের বেশী চিকিৎসক নাই।

জেলায় জেলায় বা পল্লীতে পল্লীতে চিকিৎসক-সংখ্যা সম্বন্ধে এইরূপ অসাম্য থাকা উচিত নয়। এই অসাম্য নিবারণ করিবার উপায় আলোচিত হইতেছে।

ইয়োরোপ বনাম আমেরিকা

বিশ্ববাণিজ্যে এক বিপুল সমস্যা উপস্থিত। ইয়োরোপের দেশগুলা মাল-স্রষ্টা হিসাবে আজও বিশেষ কর্ম্মদক্ষ নয়। কাজেই ইয়োরোপে আমেরিকার বাজার কায়েম হওয়া অতি স্বাভাবিক কথা। ইয়োরোপীয়ানরা মার্কিণ মাল কিনিতে ঝুঁকিবে, ইহা ত সহজেই বিশ্বাস-যোগ্য।

অপর দিকে,—ইয়োরোপীয়ান নরনারী মার্কিণ মাল খরিদ করিবে কোথা হইতে? তাহাদের যে টাকার অভাব। যে কারণে তাহারা স্বদেশে মাল তৈয়ারি করিয়া নিজ নিজ অভাব পূরণ করিতে অসমর্থ সেই কারণেই আবার তাহারা বিদেশী মাল খরিদ করিতে অপারগ।

অতএব উপায় কি? ইয়োরোপীয়ানদের বিদেশী মাল খরিদ করিবার ক্ষমতা বাড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু তাহাদের এই ক্ষমতা বাড়িবে কখন? যখন তাহারা দেশে নানাবিধ ধন সৃষ্টি করিবে। তৎক্ষণাৎ কিন্তু তাহারা আবার স্বদেশী আন্দোলন চালাইতে সমর্থ হইবে। আর স্বদেশী আন্দোলন একমাত্র দেশের চতুঃসীমার ভিতরই আবদ্ধ থাকিবে এমন নয়। ইয়োরোপের বাহিরেও ইয়োরোপীয়ান মাল দেখা দিবে। ফলতঃ, মার্কিণে ও ইয়োরোপীয়ানে টক্কর চলিতে থাকিবে দুনিয়ার সর্ব্বত্র।

তুর্কীর নয়া মজুর-বিধি

সুইটসার্ল্যাণ্ডের জেনেহ্বা হইতে খবর পাওয়া গেল যে, তুর্কীতে এক নয়া আর্থিক আইন জারি হইবার পথে অগ্রসর হইয়াছে। তাহার বিধানে কোনো কারখানায় ১২ বৎসরের কম বয়সের বালকবালিকা বাহাল হইতে পারিবে না। কিন্তু খনির কাজে ১৮ বৎসর বয়স হইল নিম্নতম সীমা। রাত্রিকালে যে সকল নরনারী কাজ করিবে তাহাদের কেহই ১৭ বৎসরের চেয়ে কম বয়সের থাকিতে পারিবে না।

১০ ঘণ্টার বেশী কাজ কোনো দিনই কোনো মজুরকে দেওয়া যাইতে পারিবে না। সপ্তাহে মোটের উপর ৬০ ঘণ্টা হইল উর্দ্ধতম সংখ্যা। প্রতিদিনই অন্ততঃ পক্ষে এক ঘণ্টা ছুটি থাকিবে। খনির কাজে প্রতিদিন ৮ ঘণ্টাই চরম। তাহার ভিতরও আবার এক ঘণ্টা ছুটি। কেহ যদি কখনো দৈনিক হারের চেয়ে বেশীক্ষণ খাটে তাহা হইলে সে প্রত্যেক বেশী ঘণ্টায় মামুলি মজুরির দেড়া পাইবে।

এই আইন চাষের কাজে খাটিবে না। ছোট খাট যন্ত্র-পাতিওয়ালা কারবারগুলা ও এই মজুর-বিধির বহির্ভূত। যে সকল কারখানায় ১৫ জনের চেয়ে কম মজুর কাজ করে সেই সকল কারখানায় এই আইনের একতিয়ার নাই। তাহা ছাড়া, ঘরে বসিয়া যে সকল লোক ফুরণ মাফিক কারখানার ঠিকা কাজ সারিয়া দেয় তাহাদের বেলায়ও এই আইন অচল।

ডেন্‌মার্কের অবিচার

এক ডেনিশ বেপারী জার্ম্মাণ অ্যাস্পিরিণ খরিদ করিয়া তাহার উপর এক নয়া ছাপ লাগাইয়া বেচিতেছিল। জাল করার অপরাধ থাকা সত্ত্বেও কোপেনহাগেনের আদালতে তাহাকে রেহাই দেওয়া হইয়াছে। অপর দিকে এক জার্ম্মাণ কোম্পানী কোপেনহাগেনে জার্ম্মাণ পোর্সলেনের কারবার করিত। কিন্তু তাহার সঙ্গে ডেনিশ পোর্সলেনের অদলবদল হওয়া সম্ভব এই অজুহাতে জার্ম্মাণ বেপারীর সাজা হইয়াছে। এই ধরণের অবিচার ঘটিতেছে দেখিয়া জার্ম্মাণরা জিজ্ঞাসা করিতেছে,—"ডেন্‌মার্কের কৃষিজ মাল জার্ম্মাণিতে বয়কট করা সুরু করিলে ডেনিশ চাষীদের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে?"

যাতায়াত-পরিষৎ

লণ্ডনের ইলেক্‌ট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারদের তত্ত্বাবধানে "ইনষ্টিটিউট অব ট্রান্‌স্‌পোর্ট" (যাতায়াত-পরিষৎ) নামক একটি আলোচনা-সভা আছে। এই সভায় জাপানী পণ্ডিত কোআজে "জাপানী রেলওয়ের সঙ্গে জাপান সরকারের সম্বন্ধ" লইয়া একটা বক্তৃতা করিয়াছেন (১৯ জানুয়ারি ১৯২৬)।

রয়্যাল ইনষ্টিটিউশ্যন

বিলাতের "রয়্যাল ইনষ্টিটিউশ্যন" পরিষদে শ্রীযুক্ত এইচ্‌, বালফোর "টাকাকড়ির ক্রমবিকাশ" সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন (২৩ জানুয়ারি ১৯২৬)।

ন্যাশন্যাল সিটি ব্যাঙ্ক

নিউ ইয়র্কের ন্যাশন্যাল সিটি ব্যাঙ্কের কর্ম্মকর্ত্তারা "ট্রেড্‌ রেকর্ড" (বাণিজ্য-হিসাব) নামক একখানা পত্রিকা বাহির করিয়া থাকেন। তাহাতে প্রকাশ যে, ১৮০০ সনে দুনিয়ার বহির্ব্বাণিজ্যে যুক্তরাষ্ট্রের হিস্যা ছিল শতকরা ৮ অংশ মাত্র। ১৯১৩ সনে সেই হিস্যা উঠিয়াছিল ১০½ এর কোঠায়। যুদ্ধের পর হইতে ১৯২৪ পর্য্যন্ত গড়ে প্রায় ১৪ % দেখা যাইতেছে।

ভারতীয় সংবাদপত্র-সেবি-সঙ্ঘ

গত ১০ই মাঘ রবিবার ভারতীয় সংবাদপত্র-সেবি-সঙ্ঘের উদ্যোগে অধ্যাপক শ্রীযুত বিনয়কুমার সরকার "সংবাদপত্র ও অর্থনীতি" সম্বন্ধে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্‌-গৃহে একটী বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন,—"ভারতবাসীরা পাশ্চাত্য জাতি অপেক্ষা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, একথা মনে করা ভুল। বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপ ও আমেরিকা সকল বিষয়ে ভারতবর্ষ হইতে শ্রেষ্ঠ। আজ ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া তথাকথিত দার্শনিক ভাবুকতার মোহে স্বপ্ন দেখিলে আর চলিবে না। নিরেট কঠোর সত্যের সমক্ষে উপস্থিত হইতে হইবে। আমাদের দেশের অর্থনীতিকেরা সংবাদপত্রের সেবায় মনোযোগ দেন নাই। সংবাদপত্র-পরিচালকেরাও অর্থ-নৈতিক সমস্যার বিশেষ কোন আলোচনা করেন নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি কলিকাতার নূতন সেণ্ট্রাল এভিনিউ রোড, পাটের বাজার, আমদানি-রপ্তানি, মাছের দর প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া বলেন যে ঐ সব বিষয়ে আমাদের দেশের সংবাদপত্রে কিছুই আলোচিত হয় নাই। এই সকল বিষয়ের অর্থ-নৈতিক মূল্য কতদূর তাহাও কোনো সংবাদপত্র বুঝিতে পারে না। এদেশের সংবাদপত্র সমাজের সকল স্তরের লোকের স্বার্থের প্রতিনিধি নহে। আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, বিদেশীয় মূলধনকে অবজ্ঞা করিলে চলিবে না। শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি-সাধনে দেশের ধনী ব্যক্তিরা যদি অগ্রসর না হন তবে বিদেশীয় মূলধন নিয়োজিত করিতে আপত্তি করা উচিত নহে।" (সঞ্জীবনী, কলিকাতা, ১৪ মাঘ, ১৩৩২)।

ব্যাঙ্কার ব্রাউনের শফর

"ব্রাউন ব্রাদার্স অ্যাণ্ড কোম্পানী" নামক ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান বিলাতের অন্যতম প্রভাবশালী ধনকেন্দ্র। এই প্রতিষ্ঠানের এক মালিক শ্রীযুক্ত জেম্‌স ব্রাউন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে

বৃটিশ সাম্রাজ্যের জন্য প্রতিষ্ঠিত "চেম্বার অব্ কমার্সের" (ব্যবসায়-সঙ্ঘের) সভাপতি। ছয় মাসের জন্য ইনি ইয়োরোপে শফর করিতে গিয়াছিলেন এবং জার্ম্মাণি, অষ্ট্রীয়া, সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড এই ছয় দেশ দেখিয়া নিউইয়র্কে ফিরিয়াছেন। লণ্ডনের "এক্‌সপোর্ট ওয়ার্ল্ড" (রপ্তানির দুনিয়া) মাসিকে ব্রাউনের মতামত প্রকাশিত হইয়াছে।

নারী-শিল্প-প্রদর্শনী

সম্প্রতি নারী-শিক্ষা-সমিতির উদ্যোগে কলিকাতা ব্রাহ্ম-বালিকা-বিদ্যালয়ে একটী নারী-শিল্প-প্রদর্শনী খোলা হয়। প্রথম দিন ৫০০শত মহিলা উপস্থিত ছিলেন। কুচবিহারের রাজমাতা সুনীতি দেবী, যাহাতে মহিলাদের শিল্প উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করিয়া ভারত-নারীর মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে, একটী পুরস্কার পাঠাইয়া দেন। শোনপুরের এবং বর্দ্ধমানের মহারাণীদ্বয়ও পুরস্কার পাঠাইয়াছিলেন।

প্রদর্শনীতে শ্রীমতী নির্ম্মলপ্রভা চালিহা নিজ তাঁতে বুনা একটী জরীপাড় রেশমী শাড়ী ও চাদর ১ম পুরস্কার পাইয়াছে। শ্রীমতী স্নেহলতা চক্রবর্ত্তী হাতের বুনা সুন্দর বিছানার ঢাক্‌না দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করে।

দার্জ্জিলিং হইতে শ্রীযুত পি, এন্, রায়ের তাঁতে বুনা ছোট ছোট গালিচা প্রেরিত হইয়াছিল। তাঁহারই ছাত্রী শ্রীমতী সুরবালা দেবী গালিচা বুনানের প্রথম পুরস্কার পাইয়াছে।

প্রদর্শনীতে ছোট ছোট বালিকাদের হস্তনির্ম্মিত সুন্দর সেলাই অনেক ছিল। গায়ের জামা, ফ্রক, হাতের ব্যাগ, মোমের ও কাগজের ফুল নানা রকমের ছিল। তাহা ছাড়া আসন, চটের আসন ও নানা প্রকার সুন্দর কাঁথা ছিল। ৬০ বৎসর পূর্ব্বের ২টি কাঁথা যশোহর ও পাবনার মেয়েদের হাতের নিপুণতা প্রকাশ করিয়াছে। ইহা দর্শনীয় জিনিষ। একটির কাজ শালের কাজের মতন সূক্ষ্ম।

ধাতু-পরিষৎ

"ইন্‌ষ্টিটিউট অব্ মেট্যাল্‌স্" (ধাতু-পরিষৎ) নামক রাসায়নিক ও এঞ্জিনিয়ারদের সঙ্ঘ বিলাতী পণ্ডিত মহলে প্রসিদ্ধ। বিগত ১১ জানুয়ারি এই সঙ্ঘের এক সভায় অধ্যাপক এফ্, সি, টম্‌সন তাপের মাত্রা বাড়াইলে লৌহ-বিহীন ধাতুর এবং খাদের শক্তি কিরূপ পরিবর্ত্তিত হয় সেই বিষয়ে আলোচনা চালাইয়াছেন।

ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা

"টাকার কথা"-প্রণেতা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায় লিখিতেছেন:—

"পরিভাষা সম্বন্ধে মতভেদই স্বাভাবিক। তবে উহা লইয়া আলোচনা সুরু করিলে যুক্তি-তর্কের ফলে কায়েমি পরিভাষা পাইবার ভরসা হয়। ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা সম্বন্ধে আমার মত এই যে, সংস্কৃত ধাতু-প্রত্যয়ের ভাণ্ডার লুট না করিয়া হাটে বাজারে যেমন শব্দ যে ভাবে চলিতেছে সেইগুলিই সংগ্রহ করিয়া ঘষিয়া মাজিয়া লইলে ভাল হয়। কলিকাতার ব্যবসাপাড়ার,—কি বাঙ্গালী, কি মাড়োয়ারী—কেহই, 'ক্রেডিট্'-শব্দটার কোনও দেশী প্রতিশব্দ চালান নাই। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে 'পসার' শব্দ চলিতেছে। তবে 'পসার' শব্দ চল্‌তি কথাবার্ত্তায় 'সুনাম ও অর্থ-উপার্জ্জনের ক্ষমতা' এই দুই ভাব প্রকাশ করে। কাজেই এই শব্দটাকে পাকড়াও করিয়া 'ক্রেডিট্' বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। শব্দটা 'ক্যাচ-ওয়ার্ড', সুতরাং চলিবে। কিন্তু 'বাজার-সম্ভ্রম' চলিবে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। পরিভাষা সৃষ্টি করিবার চেষ্টা সুরু করিয়া দেখিয়াছি কলিকাতার চেয়ে ঢাকার ব্যবসা-পাড়ায় সাহায্য পাওয়া যায় বেশী। বিশেষতঃ, যে সব সওদাগর মোটেই ইংরেজী জানেন না, তাঁহারাই এই বিষয়ে সাহায্য করিতে পারেন বেশী।"

রাজকীয় শিল্প-পরিষৎ

অন্যান্য জ্ঞানবিজ্ঞানের মতন শিল্প এবং বাণিজ্য সম্বন্ধেও বিলাতে একটা "রয়্যাল সোসাইটি" বা রাজকীয় পরিষৎ আছে। সংক্ষেপে ইহার নাম "রয়্যাল সোসাইটী অব্ আর্টস্" (রাজকীয় শিল্প-পরিষৎ)। সুকুমার শিল্পও এই শিল্প-বাণিজ্যের অন্তর্গত।

বর্ত্তমানে পরিষদের সভাসংখ্যা প্রায় ৩৫০০। পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে। বার্ষিক চাঁদা তিন গিনি (প্রায় ৪৮৲)। পরিষৎ হইতে প্রতি সপ্তাহে একখানা "জার্ণ্যাল" বা পত্রিকা বাহির করা হয়। সভ্যেরা বিনা

পয়সায় এই পত্রিকা পাইয়া থাকেন। প্রকাশক লণ্ডনের বেল অ্যাণ্ড সন্স্ কোম্পানী।

খদ্দি-প্রচারক নৃপেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কয়েক সপ্তাহ হইল কলিকাতার খাদি-প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপক নৃপেন্দ্র চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় প্রচারক রূপে ভর্ত্তি হইয়াছেন। তিনি এক্ষণে উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। ডক্টর প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ পূর্ব্ব হইতেই বরাবর নানা জেলায় খাদি ফেরিকরিয়া বেড়াইতেছেন।

তাঁহাদের অধ্যবসায় এবং কষ্ট-সহিষ্ণুতা দেখিয়া যুবক বাঙ্গালা নানা কর্ম্মক্ষেত্রে মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিতে শিখুক।

তেল ও রং-পরিষৎ

রসায়নের উন্নতি-বিধানের জন্য তেল এবং রংয়ের রাসায়নিকেরা বিলাতে একটা সঙ্ঘ কায়েম করিয়াছেন। নাম তাহার "অয়্যাল অ্যাণ্ড কালার কেমিষ্টস্ আসোসিয়েশ্যন"। এই সঙ্ঘে বিগত ১৩ই জানুয়ারি দুইটা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। চামড়ায় পালিশ ও রং ধরাণো ছিল এক আলোচ্য বিষয়। সেলুলোজ পদার্থ (যথা গাছ গাছড়া) হইতে লাকার নামে পরিচিত রং তৈয়ারি করিবার প্রণালী দ্বিতীয় আলোচনায় বিবৃত হইয়াছিল।

মেমারি ইন্‌ষ্টিটিউট

শারীরিক ব্যায়াম এবং খেলাধূলার জন্য বৰ্দ্ধমান জেলার মেমারিতে একটা ইন্‌ষ্টিটিউট কায়েম করা হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মকর্ত্তারা ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর ইত্যাদি রোগের আওতা হইতে পল্লীবাসীদের স্বাস্থ্য বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছেন। সঙ্গে একটা লাইব্রেরি ও আছে।

ধীবর-সম্মেলন

বাঙালী এবং আসামী জেলেদের একটা মহাসভা আছে, নাম তাহার "নিখিল বঙ্গ ও আসাম ধীবর আসোসিয়েশ্যন"। ফরিদপুর জেলার মাদারীপুরবাসী শ্রীযুক্ত রমণীমোহন বিশ্বাস এই সভার সম্পাদক।

বিগত মার্চ মাসে এই সভার উদ্যোগে গোটা বাংলার জেলেরা মাদারীপুরে সম্মেলনের অনুষ্ঠান করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক ছিলেন শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লবর্ম্মণ এবং জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মল্লবর্ম্মণ। সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন কৃষ্ণনগরের শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার।

ভাটপাড়ায় মজুর-পাঠশালা

হুগ্‌লি জেলার ভাটপাড়া গ্রামে দুইটা মজুর-পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে। একটা বসে সকালে ৭টা হইতে ১০টা, অপরটা রাত্রে ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত। বিদ্যাপীঠ দুইটা অবৈতনিক। চটের কলের মজুরদের ছেলেমেয়েরা এই দুই পাঠশালায় পড়িতে যায়। ইস্কুলের খরচপত্র আসে "বেঙ্গল জুট ওয়ার্কস আসোসিয়েশ্যানের" তহবিল হইতে।

ভবানীপুরে শিশুমঙ্গল-প্রদর্শনী

দৈনিক বসুমতীতে একজন সংবাদদাতা লিখিতেছেনঃ—

ভবানীপুর পোড়াবাজারে গতকল্য ৩ টায় শিশুস্বাস্থ্য-প্রদর্শনী দেখিতে গিয়াছিলাম। বিরাট জনসমাগম হইয়াছিল। প্রদর্শনী-ক্ষেত্রটি একটা শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। নানাভাবে জন-শিক্ষার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে দেখিলাম। প্রথমতঃ, বাস্তব-প্রায় চিত্র ও মডেলের সাহায্যে নানা বিভাগে বাঙ্গলার জন-স্বাস্থ্যের অবনতির কারণ দেখান হইয়াছে। প্রথমতঃ, শিশুমঙ্গলের দিক্‌টাই বলি। দেখান হইয়াছে যে, আমরা সর্ব্বপ্রকারে ধ্বংসোন্মুখ জাতি হইতে বসিয়াছি। গড় পরমায়ুর হার বিলাতে ৪৮, ভারতে মাত্র ২২ বৎসর। প্রতিদিন ৩১৯২টি শিশু জন্মগ্রহণ করে, তার মধ্যে ৮১৬টি মরে, অথচ নিউজিল্যাণ্ডে মাত্র ১৭৭ জন মরে। মাতৃ-মৃত্যু অথবা মাতৃ-হত্যার কথা আর কি বলিব? বিলাতে ১০০০ শিশুর জন্মকালে মাত্র ৪টী মাতৃমৃত্যু হয়—আমাদের দেশে সেখানে কতজন মা মরেন জানেন কি? ২০ জন।

প্রদর্শনীর দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য কুষ্ঠ ও যক্ষ্মা রোগীর কেন্দ্র। কি উপায়ে এই দুই দুষ্ট ব্যাধির নিরাকরণ করা যাইতে পারে তাহার চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে—বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিয়া দেখাইয়া দিতেছেন।

ইহা ছাড়া, বর্ত্তমানে যাঁহারা পল্লী-সংগঠন-কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন তাঁহারা বসন্ত ও কলেরার প্রতিষেধক বিধিব্যবস্থা দেখিয়া অনেক শিক্ষা পাইতে পারিবেন। ম্যালেরিয়ার প্রতীকারকল্পে কি ভাবে পুকুর ও ডোবা

পরিষ্কার করা যায়, কেরোসিন দেওয়া যায় ইত্যাদি বিষয়েও কর্তৃপক্ষ কার্য্য-প্রণালী দেখাইতেছেন।

পুস্তিকা প্রচার ও বিতরণ সর্ব্বদা চলিতেছে। বিশেষজ্ঞেরা বক্তৃতাও করিতেছেন। বায়স্কোপের সাহায্যেও বিরাট জনমণ্ডলীর সম্মুখে জনস্বাস্থ্য-বিষয়ক ছবি দেখান যাইতেছে।

শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন গুপ্তের মত

নিখিলবঙ্গ প্রজা-সম্মিলনের কৃষ্ণনগর অধিবেশনে (ফেব্রুয়ারি ১৯২৬) শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত বলিয়াছেন, "বাংলার ভূমিসংক্রান্ত বিধির আমূল পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট করিতেছেন কেবল তালিজোড়া এবং মেরামত। ইহার ফলে প্রজার অধিকার যেখানে একটুকু স্বীকার করা হইয়াছে সেখানে জমিদারের অধিকার বেশী স্বীকার করা হইয়াছে।"

ভারতীয় ব্যবসায়ী সমিতি

কলিকাতায় ভারতীয় ব্যবসায়িগণ মিলিয়া একটি ব্যবসায়ী সমিতি গঠন করিয়াছেন। তাহাতে নিম্নলিখিত রূপে কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হইয়াছেনঃ—

প্রেসিডেণ্ট—মিঃ জে, ডি, বিরলা ; সিনিয়র ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট—মিঃ আনন্দজী হরিদাস ; ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট—রায় এ, সি, ব্যানার্জ্জী বাহাদুর ; সদস্যগণ—মিঃ ডি, এস, ক্রুলকার, এন, হাজাবালী, কে, জে, পুরোহিত, নাগরমল বাজরিয়া, নন্দলাল পুরী, এ, এন, পালিত, রঙ্গলাল জাজোদিয়া, ডি, পি, খৈতান, ঘনশ্যামদাস জগনানী, রামকুমার পোদ্দার, এ, এল, ওঝা, জি, পি দত্তিয়া, ই, পি, গুজদার, ফজুল্লা-ভাই গাঙ্গজী এবং এন, সি, সরকার ; সেক্রেটারী—মিঃ কে, এম, পুরকায়স্থ।

সমিতির উদ্দেশ্য কলিকাতার ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মত কেন্দ্রীভূত করা এবং ভারতীয় ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষা করা।

ময়মনসিংহের জমিদার-সভা

গত ৯ই ফাল্গুন রবিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় ময়মনসিংহ নগরে "শশি লজে" এই জেলার ভূম্যধিকারিগণের এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় সুসঙ্গ, দুর্গাপুর, মুক্তাগাছা, গৌরীপুর, রামগোপালপুর, হেমনগর, ইটনা, কালীপুর, কৃষ্টপুর, নারায়ণ ডহর, পূর্ব্বধলা, ঘাগরা, গোলকপুর, সেরপুর, ধলা, অষ্টগ্রাম, সেনবাড়ী, কানীহারী, সালিটিয়া জয়কা, কুরাটী ইত্যাদি স্থানের প্রসিদ্ধ জমিদার এবং তালুকদারগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। যাঁহারা উপস্থিত হইতে পারেন নাই তাঁহাদের সহানুভূতি-জ্ঞাপক বহু টেলিগ্রাম ও চিঠি সভায় পাঠ করা হয়। মহারাজা শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী বাহাদুরের প্রস্তাবে এবং রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের সমর্থনে ইটনার দেওয়ান আবদুল আলিম সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সর্ব্বপ্রথমে এ জেলায় স্থায়ী একটী ভূম্যধিকারি-সভা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য সুসঙ্গের মহারাজা নীরদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর প্রস্তাব করেন এবং তাহা রায় প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী বাহাদুরের অনুমোদনে ও শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী এম, এ, বি, এল, মহাশয়ের সমর্থনে গৃহীত হয়। উক্ত সভা "ময়মনসিংহ ভূম্যধিকারি-সভা" নামে অভিহিত হইয়াছে। বাৎসরিক চাঁদা ছয় টাকা এবং প্রবেশ-ফি দুই টাকা ধার্য্য হইয়াছে। যাঁহারা ভূম্যধিকারী তাঁহারাই এই সভার সভ্যশ্রেণী-ভুক্ত হইতে পারিবেন।

মহারাজা শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী বাহাদুর এই সভার প্রেসিডেণ্ট, সুসঙ্গের মহারাজা, সন্তোষের রাজাবাহাদুর, ইটনার দেওয়ান সাহেব, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ও রায়বাহাদুর চারুচন্দ্র চৌধুরী ভাইস প্রেসিডেণ্ট, এবং শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন বি, এল, সেক্রেটারী, এবং শ্রীযুক্ত অঘোরবন্ধু গুহ বি, এল, মহাশয় ট্রেজারার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। প্রত্যেক উপবিভাগ হইতে সদস্য লইয়া ষোল জন সদস্যদ্বারা একটি কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে। অতঃপর একজন বেতনভোগী সেক্রেটারী নিযুক্ত হইবেন।

প্রজাস্বত্ব আইন ও জমিদার

তৎপর বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের যে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে তাহা ভূম্যধিকারী এবং প্রজা-সাধারণের হিতকর নহে এবং তাহা আইনে পরিণত হইলে প্রজা ও ভূম্যধিকারীর মধ্যে অসংখ্য মামলা-মোকদ্দমার সৃষ্টি হইবে এই জন্য এই বিল স্থগিত করা হউক, এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব সর্ব্ব-

সম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে এবং এই বিলের বিরুদ্ধে বিস্তারিত আলোচনা করার জন্য একটি কমিটীও গঠিত হইয়াছে।

(শান্তিবার্ত্তা, জামালপুর, ময়মনসিংহ, ১৮ ফাল্গুন ১৩৩২)।

জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ

বিগত জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে বঙ্গদেশস্থ জাতীয় শিক্ষাপরিষদের তত্ত্বাবধানে শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার "আর্থিক উন্নতির বনিয়াদ" (ইতালিয়ান, ফরাসী ও জার্ম্মাণ দলিল) সম্বন্ধে ছয়টা বক্তৃতা করিয়াছেন। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছিলঃ—(১) ব্যাঙ্ক-গঠন ও দেশোন্নতি, (২) ব্যাধি-বার্দ্ধক্য-দৈব বীমা, (৩) জমিজমার আইন-কানুন, (৪) শিল্প-কারখানায় মজুর-রাজ, (৫) ধনোৎপাদনের বিদ্যাপীঠ, (৬) আর্থিক জগতে আধুনিক নারী।

ইস্পাতের কারবারে বিপুল "ট্রাষ্ট"

"ফারাইনিগ্‌টে ষ্টাল্‌হ্বের্কে", (সংযুক্ত ইস্পাত ফ্যাক্টরি) নামে জার্ম্মাণিতে এক সঙ্ঘ কায়েম হইয়াছে (১৪ জানুয়ারি ১৯২৬)। সঙ্ঘের কর্ম্মকেন্দ্র রাইন ল্যাণ্ডের ডুস্‌সেলডোর্ফ শহরে অবস্থিত। "রাইন-এলবে-উনিয়োন," "টিস্‌সেন কোম্পানী," "ফোনিক্‌স" এবং "রাইনিশে ষ্টাল্‌হ্বের্কে" নামক চারটা বড় বড় ইস্পাতের কারবার এই সঙ্ঘে সম্মিলিত হইল। সকলগুলা এখন হইতে এক মাথার অধীনে এবং একই কৌশলে পরিচালিত হইতে থাকিবে। "আমেরিকার ষ্টীল কর্পোরেশ্যনের" মতন জার্ম্মাণির এই "সঙ্ঘের সঙ্ঘ" বা "ট্রাষ্ট"ও জগতের ইস্পাত-ব্যবসায়টা কেন্দ্রীকৃত করিয়া ছাড়িবে।

ইংরেজ এঞ্জিনিয়ার ব্রেম্নার

নৌশিল্প, পূর্ত্তকলা এবং যন্ত্রপাতির একটা বড় প্রদর্শনী লণ্ডনে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। তাহার এক ভোজ-সভায় এঞ্জিনিয়ার ব্রেম্নার বলিয়াছেন:—"১৯১৩ সনে ইংরেজরা যত জিনিষ বিদেশে রপ্তানি করিত তাহার শতকরা ৩৪ অংশ মাত্র ছিল পূর্ত্তকলার মাল। ১৯২৩ সনে এই সকল মাল ছিল সমগ্র বৃটিশ রপ্তানির শতকরা ৫২·২৮ অংশ। বিলাতী এঞ্জিনিয়ারিং কারখানাগুলা নানা বিপৎসত্ত্বেও জাঁকিয়াই আছে।"

মার্কিণ মাতব্বরদের বিশ্ব-সমালোচনা

ফরাসীরা "লা পোলিটিক একোনোমিক দেজ্‌ এতাজ উনি হ্বিজ্‌-আ-হ্বি দ' লোরোপ" অর্থাৎ ইয়োরোপ সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক নীতি আলোচনা করিতেছে। নিউ-ইয়র্কের ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর প্রেসিডেণ্ট এ, সি, বেড্‌ফোর্ড, মার্কিণ চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি জুলিয়াস বার্ণস্‌, পররাষ্ট্র-সচিবের সেক্রেটারি নরম্যান ডেহ্বিস্‌ এবং ডয়েস কমিটির দু'একজন সভ্য ইত্যাদি আর্থিক জগতের মাতব্বরদের মতামত আলোচিত হইতেছে।

এই সকল বিশেষজ্ঞেরা প্রত্যেকেই প্রায় এক পথের পথিক। সকলেই বলিতেছেন যে, "আমেরিকায় যত মাল তৈয়ারি হয় তত হজম করিবার ক্ষমতা নাই মার্কিণ জাতির। কাজেই,—যা ঘটে ঘটুক,—যত খরচই হউক, নানা প্রকার চেষ্টা করিয়া মার্কিণ মালের জন্য দুনিয়ার সকল দেশে বাজার সৃষ্টি করিতেই হইবে।"

ফরাসী শিক্ষা-সমালোচক মাইয়ার

ফ্রান্সের বিজ্ঞান-শিক্ষা এবং শিল্প-শিক্ষা সম্বন্ধে আঁরি মাইয়ার একখানা বই লিখিয়াছেন। নাম "লাঁসাইনমাঁ সুপেরিয়ার" (উচ্চশিক্ষা)। প্রকাশকের নাম "লা বন্‌ ইদে," প্যারিস।

মাইয়ার বলিতেছেনঃ—"ইয়োরোপের অন্যান্য দেশ ফ্রান্সকে পেছনে ফেলিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। আমরা আর কত দিন হাল ছাড়িয়া বসিয়া থাকিব? শীঘ্রই শিক্ষা-সংস্কার সাধিত হওয়া আবশ্যক।"

রাখালের কথা

গো-পালন সম্বন্ধে বাঙালী জাতির চেতনা জাগাইবার জন্য শ্রীদ্বিজদাস ঘোষ "রাখালের কথা" নামে একখানি পুস্তিকা বাহির করিতেছেন। সাপ্তাহিক রূপে বাহির হইবার কথা। দু'এক সংখ্যা আমরা দেখিয়াছি। মূল্য প্রতিকপি একআনা। "রাখালের কথা" ৩৫।১ নং ভবানীপুর এলগিন রোডে স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্রের নিকট এবং কলিকাতা ১১নং অপার

সার্কুলার রোডে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব-প্রচারিণী সভার সম্পাদক ও তড়িৎ-চিকিৎসক ডাক্তার পি, এন. নন্দীর নিকট এবং প্রকাশকের নিকট (১।১ সি নং দেবেন্দ্র ঘোষ রোড, ভবানীপুর) প্রাপ্তব্য।

বেঙ্গল ইকনমিক সোসাইটি

ভারতের কৃষি,শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালাইবার জন্য "বেঙ্গল ইকনমিক সোসাইটি" নামে একটি পরিষৎ স্থাপিত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ বন্দোপাধ্যায় এই পরিষদের কর্মকর্তা। এই সোসাইটির পক্ষে একটা মাসিক বা ত্রৈমাসিক ধনবিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা পরিচালনা করা যুক্তিসঙ্গত। সোসাইটির ঠিকানা,- বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা।

তিলক পাঠশালা

লাহোরে কয়েক বৎসর ধরিয়া লোকমান্য তিলকের নামে একটা "পাঠশালা" চলিতেছে। ১৯২১,সনের অক্টোবর মাসে এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত লাজপত রায় এই বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা। এখানে জগতের সমাজ, রাষ্ট্র ও ধনসম্পদ সম্বন্ধে পঠনপাঠন হইয়া থাকে। ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট। অধ্যাপকগণ ব্যারিষ্টার অথবা নানা কলেজের অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত সুধী। এই ধরণের পাঠশালা পঞ্জাবের বাহিরে ভারতের আর কোথাও আছে কিনা জানিনা। পুণায় গোখ্‌লেপ্রতিষ্ঠিত ভারতের সেবক সোসাইটির কর্মপ্রণালী ও উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। বাঙালীর কার্য্যতৎপরতা এই সকল দিকে দেখিতে পাওয়া যায় না কেন?

ভারতীয় বণিক-সঙ্ঘ

গত ৩০শে জানুয়ারি ১৩৫ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতায় একটা ভারতীয় বণিক-সঙ্ঘ "ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্স" স্থাপনের চেষ্টা হইয়াছে। আনন্দজী হরিদাস সভাপতিরূপে এরূপ একটা সঙ্ঘ স্থাপনের আবশ্যকতার বিষয় বুঝাইতে গিয়া বলেন যে যদিও কলিকাতায় এরূপ কয়েকটা সঙ্ঘ আছে তথাপি তাহাদের কার্য্য-প্রণালীর মধ্যে বিশেষ ঐক্য পরিদৃষ্ট হয় না। অথচ ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির পথে যে বিপুল বাধা-বিপত্তি চারিদিকে বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহা কাটাইয়া উঠিতে গেলে ঐক্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়।

"অ্যাসেমব্লী"তে রোজগারের পথ

গত ২৮ শে জানুয়ারি দিল্লীতে "অ্যাসেমব্লীর" এক অধিবেশনে বঙ্গস্বামী আয়াঙ্গার মহাশয় প্রস্তাব করেন যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবিকার্জ্জনের দুরূহতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও মীমাংসার ব্যবস্থা নিরূপণের জন্য এক কমিটি গঠিত হউক। স্যার শিবস্বামী আয়ার প্রস্তাবের স্বপক্ষে বলেন যে, এজন্য প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালীর পরিবর্ত্তন, শিল্পশিক্ষার বিশদ ব্যবস্থা, নূতন শিল্প প্রবর্ত্তন ইত্যাদি উপায় অবলম্বিত হইতে পারে। চমনলাল, যোশী ইত্যাদি শ্রমিক সম্প্রদায়ের নেতৃগণ বলেন যে, এই অনুসন্ধান কেবলমাত্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ না রাখিয়া দেশের সকল শ্রেণী সম্বন্ধেই চালানো হউক। শেষে লালা লাজপত রায় সেই মর্ম্মে এক সংশোধিত প্রস্তাব উপস্থিত করিলে তাহা অধিকাংশের মতে গৃহীত হয়।

সরকার পক্ষ প্রস্তাবের স্বপক্ষে ভোট দেন নাই, কিন্তু তাঁহারা বিষয়ের গুরুত্ব অস্বীকার করেন না; তবে বলেন যে এ সম্বন্ধে যাহা কিছু করা দরকার তাহা প্রাদেশিক মন্ত্রিগণ করিতে পারেন ও করিতেছেন। ভারত গবর্মেণ্টের এ সম্বন্ধে করিবার মত কিছু নাই।

রোজগার সম্বন্ধে কমিটি গঠন

প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গীয় রায় রাধাচরণ পাল বাহাদুরের উদ্যোগে বাংলার কাউন্সিলে এ বিষয়ে এক প্রস্তাব আলোচিত হইয়া বিশেষ অনুসন্ধানের জন্য এক কমিটি গঠিত হয়। বৎসরাধিক কাল হইল কমিটির রিপোর্ট বাহির হইয়াছে, কিন্তু তদ্বিষয়ে গবর্মেণ্টের মন্তব্য এখনও প্রকাশিত হয় নাই। মান্দ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ ও আসাম কাউন্সিলে অনুরূপ কমিটি করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। বিহার কাউন্সিলের সভ্য কুমার রাজীব রঞ্জন প্রসাদ এইরূপ এক কমিটি করিবার প্রস্তাব আনিতেছেন।

শিল্প-বাণিজ্য সম্মিলন

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারি দিল্লী সহরে ভারতীয় শিল্প বাণিজ্য সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশন হয়। বিবিধ কারণে,

বিশেষতঃ মহাযুদ্ধ-জনিত বৈদেশিক বাণিজ্যের অবস্থা-বিপর্য্যয়ে গত কয়েক বৎসর যাবৎ এই অধিবেশন বন্ধ ছিল।

ব্ল্যাকেটের বক্তৃতা

গত ১লা মার্চ দিল্লীতে আগামী বর্ষের জন্য বাজেট প্রস্তাব করিবার সময় রাজস্ব-সচিব স্যার বাজিল ব্ল্যাকেট মামুলী প্রথার অনুসরণ না করিয়া কয়েকটা নূতন কথা বলিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাহার মধ্যে দুইটা প্রণিধান-যোগ্য বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

তিনি বলেন, দেশের লোকে যদি তাহাদের সঞ্চিত অর্থ কোনো ব্যাঙ্কে দিতে অথবা কোন সুপরিচালিত ব্যবসায়ে নিয়োগ করিতে শিখে তাহা হইলে দেশের শিল্প-বাণিজ্যের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং শিক্ষিত যুবকদের অন্নসংস্থানের পথ অনেকটা সুগম হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বক্তৃতা দিবার সময় তিনি এই কথাই আরও বিশদভাবে বলিয়াছিলেন। এমন কি, তাঁহার বিশ্বাস যে, দেশের উদ্বৃত্ত টাকার যথাযথ ব্যবহার হইলে শিল্প-বাণিজ্যের জন্য আবশ্যক মূলধনের সঙ্কুলন ত হয় ই,—পরন্তু অন্যান্য দেশকেও টাকা ধার দেওয়া যাইতে পারে।

নাবিক-সমাজে বেকার

ভারতীয় নাবিক-সমাজে বেকার-সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। "ভারতীয় নাবিক-সম্মিলনে"র কর্ম্মকর্ত্তারা এই সমস্যার মীমাংসা করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। খিদিরপুরে এক সভা হইয়াছিল (ফেব্রুয়ারি ১৯২৬)।

বেসাঁস নগরে ঘড়ির ইস্কুল

ফ্রান্সের বেসাঁস নগরে ঘড়ির কাজ শিখাইবার জন্য ইস্কুল (একল নেশ্যন্যাল) আছে। এই "একল"এ বর্ত্তমান বর্ষে ১৭০ জন "অর্লজারি" (ঘড়ির কাজ) শিখিতেছে। অধিকাংশই বেসাঁস জনপদের লোক। পঞ্চাশ ষাট জন মাত্র বাহির হইতে আসিয়াছে। এই সংখ্যার ভিতর ৩০ জন ছাত্রী। ১৯০২ সনে ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ছিল মাত্র ১১৭। এই ইস্কুলে কাজ শিখিবার পর ঘড়ি-বিদ্যা সংক্রান্ত সকল প্রকার শিল্প এবং ব্যবসায় চালাইবার ক্ষমতা জন্মে।

ইতালিয়ান মন্ত্রী বেলুৎসোর বক্তৃতা

জার্ম্মাণির সঙ্গে ইতালির বাণিজ্য-সন্ধি কায়েম হইয়া গিয়াছে। ইতালিয়ান "কামেরায়" (পার্ল্যামেণ্টে) এই "ত্রাতাতো" (সন্ধি) সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে গিয়া "একোনোমিয়া নাৎসিওনালে"র (আর্থিক ব্যবস্থার) মন্ত্রী বেলুৎসো বলিয়াছেন :—

"আমাদিগকে কিছু কিছু স্বার্থত্যাগ করিতে হইয়াছে এই কথা ভুলিলে চলিবে না। কিন্তু কোনো কোনো বিষয়ে জার্ম্মাণ সরকার ইতালির জেদ ও রক্ষা করিয়াছেন।

"দক্ষিণ ইতালি এবং সিসিলি হইতে যে সকল কৃষিজাত দ্রব্য জার্ম্মাণিতে যাইত তাহার উপর জার্ম্মাণরা কড়া হারে শুল্ক আদায় করিত। আমরা অনেক বচসার ফলে শুল্কের হার অর্দ্ধেকেরও বেশী কমাইতে সমর্থ হইয়াছি।

"অপর দিকে, আমরা জার্ম্মাণির যন্ত্রপাতি আমদানি সম্বন্ধে শুল্কের হার কমাইতে বাধ্য হইয়াছি। ইহাতে মেক্যানিক্যাল শিল্পের ইতালিয়ান কারবারকে ইতালির বাজারে খানিকটা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে বিশ্বাস করি।

"কিন্তু জার্ম্মাণি আমাদের কৃষিজাত দ্রব্যের এত বড় ক্রেতা যে, সে দেশে ইতালিয়ান বাজার হাতে রাখিবার জন্য আমরা ইতালিতে জার্ম্মাণ বাজার কিছু কিছু ছাড়িয়া দেওয়া সুবিবেচনার কার্য্য সমঝিয়াছি।"

সুদের হার ও জমির কিম্মৎ

জার্ম্মাণির টিরিঙ্গেন (থুরিঙ্গিয়া) প্রদেশের "ষ্টাট্স্ বাঙ্ক" বা সরকারী ব্যাঙ্কের প্রেসিডেণ্ট য়োষ্ট স্যাক্সনির ড্রেসডেন শহরে বক্তৃতা করিবার জন্য আহূত হইয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার কিয়দংশ নিম্নরূপ :—

"১৯১৩-১৪ সনে জার্ম্মাণিতে কৃষিকর্ম্মে উৎপন্ন মালের কিম্মৎ ছিল বৎসরে ২ মিলিয়ার্ড মার্ক (১৫০ কোটি টাকা)। কিন্তু তখনকার দিনে ব্যাঙ্কে সুদের হার ছিল শত করা ৪৲। অর্থাৎ জমিজমার বার্ষিক আয়কে ২৫ দিয়া গুণ করিলেই গোটা সম্পত্তির কিম্মৎ বুঝা যাইত। এই হিসাবে তখনকার জার্ম্মাণির আবাদী জমির মূল্য ছিল ৫০ মিলিয়ার্ড মার্ক (৩,৭৫০ কোটি টাকা)।

"কিন্তু বর্ত্তমানে ব্যাঙ্কে সুদের হার চড়িয়াছে। শতকরা ১০৲ দিয়া ব্যাঙ্কে জনগণের নিকট হইতে টাকা জমা রাখা

হইতেছে। ইহার দ্বারা বুঝাযায় এই যে, জার্ম্মাণ-সমাজে সম্পত্তির মূল্য নেহাৎ কম। অন্য কোনো কথা না তুলিলে ও একমাত্র সুদের হার দেখিয়াই বলা যায় যে, আমাদের জমিজমার কিম্মৎ আজ মাত্র ২০ মিলিয়ার্ড (১,৫০০ কোটি টাকা)। যে সকল সম্পত্তির মূল্য ৩,৭৫০ কোটি টাকা ছিল তাহা বিকাইবে আজ ১,৫০০ কোটিতে।"

জার্ম্মাণির সরকারী ব্যাঙ্কের প্রেসিডেণ্ট

স্যাক্সনির সর্ব্বপ্রধান শিল্প-কেন্দ্রের নাম কেম্‌নিট্‌স্‌। এইখানে কিছু দিন হইল স্থানীয় শিল্প-পতি ও ব্যবসায়ীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহাতে সমগ্র জার্ম্মাণির সরকারী ব্যাঙ্কের (রাইখ্‌স্‌ বাঙ্ক) প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত শাখ্‌ট্‌ অন্যতম বক্তা ছিলেন। তাঁহার মতে জার্ম্মাণির অটোমোবিল তৈয়ারি করিবার কারখানাগুলা স্ব স্ব প্রধান ভাবে কাজ চালাইতে থাকিলে আর চলিবে না। বর্ত্তমানে ৮২টা কারখানা আছে। এইগুলাকে কয়েকটা বড় বড় সঙ্ঘের অধীনে কেন্দ্রীকৃত করা আবশ্যক।

টেক্‌নিক্যাল শিক্ষার ইতিহাস

"এ্যষ্টারাইখিশে বিশারাই" (অষ্ট্রিয়ান গ্রন্থমালা) নামক সিরিজের অন্তর্গত হইয়া "ডি টেক্‌নিশে হোখ্‌শুলে ইন্‌ হ্বীন ১৮১৫—১৯২৫" (হ্বিয়েনার টেক্‌নিক্যাল কলেজের ১৮১৫ হইতে ১৯২৫ সন পর্য্যন্ত ইতিহাস) প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক হইতেছেন হ্বিয়েনার শিল্প-ঐতিহাসিক যোসেফ নয়হ্বির্ট।

এই ধরণের আর একখানা বইয়ের নাম "ডি আন্‌ফ্যাঙ্গে ডেস্‌ টেক্‌নিশেন হোখশুল-হ্বেজেনস্‌" (উচ্চতর টেক্‌নিক্যাল শিক্ষাপদ্ধতির আরম্ভ-কথা)। ছাপা হইয়াছে জার্ম্মাণির কাল্‌স্রুহে নগরে। এই নগরের টেক্‌নিক্যাল কলেজ তাহার শতবর্ষ পূর্ণ করিল (১৯২৫)। সেই উপলক্ষ্যে গ্রন্থের প্রকাশ। লেখকের নাম অধ্যাপক শ্নাবেল।

মিউনিকে কৃষি-সপ্তাহ

ব্যাহ্বেরিয়ার মিউনিক নগরে জানুয়ারি মাসে এক সপ্তাহ ধরিয়া কৃষিপ্রদর্শনী চলিয়াছিল। নাম তাহার "ল্যাণ্ড্‌হ্বির্ট-শাফ্‌ট্‌ লিখে হ্বোখে" (অর্থাৎ কৃষি-সপ্তাহ)। তাহার উদ্যোগে নানা বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়। অন্যতম বক্তা ছিলেন অধ্যাপক আডোল্‌ফ হ্বেবার। তাঁহার বিবেচনায় ডয়েস-প্রবর্ত্তিত আন্তর্জ্জাতিক ব্যবস্থার ফলে জার্ম্মাণির আর্থিক অবস্থা ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে। দুনিয়ার টাকার বাজারের সঙ্গে জার্ম্মাণির টাকার বাজারের সুদৃঢ় যোগাযোগ কায়েম হইতে পারিয়াছে। অন্যান্য আর সব লাভের কথা ছাড়িয়া দিলেও ইহাই জার্ম্মাণদের পক্ষে এক মস্ত জিনিষ।

শর্টহ্যাণ্ডে বাংলা লেখা

এই সংখ্যার "মোলাকাৎ" অধ্যায়ে আমরা শ্রীমতী লেডী অবলা বসুর সঙ্গে একটা কথোপকথন প্রকাশ করিতেছি। আমরা যখন গল্প করিয়া যাইতেছিলাম তখন শ্রীযুক্ত ইন্দ্র কুমার চৌধুরী প্রশ্নোত্তরগুলা সাঙ্কেতিক চিহ্নের সাহায্যে টুকিয়া লইতেছিলেন। সেই চিহ্নসমূহ দেখিয়া পরে তিনি কথাবার্ত্তাটার পুনরুদ্ধার করিয়া দিয়াছেন। পড়িয়া মনে হইল যে, তিনি আমাদের প্রশ্নোত্তরে ব্যবহৃত মূল শব্দগুলার শতকরা অন্ততঃপক্ষে পঁচাত্তরটা ঠিক রাখিতে পারিয়াছেন। বাংলা ভাষায় "শর্টহ্যাণ্ড" অনেকদূর কৃতকার্য্য হইয়াছে বলিতে হইবে। ইন্দ্রবাবু এই লাইনে আরও বেশী কর্ম্মদক্ষতা দেখাইতে পারিলে বাঙালী সমাজে একটা নূতন বিদ্যা এবং নূতন ব্যবসা দাঁড় করাইয়া দিতে পারিবেন। বাংলা বক্তৃতা শুনিয়া তাহার শর্টহ্যাণ্ড নকল করিবার ক্ষমতাও ইন্দ্রবাবুর আছে। তাহাতেও তিনি বক্তার বাক্যসমূহের প্রায় দশ-বার আনা পুনরুদ্ধৃত করিবার শক্তি দেখাইয়াছেন।

বাঙালী মেয়ের আর্থিক অবস্থা

শ্রীমতী লেডী অবলা বসুর মতামত

বিগত মার্চ মাসে বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্রের পত্নী শ্রীমতী অবলা বসুর সঙ্গে আমাদের যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

প্রশ্ন—বিজ্ঞাপনে দেখেছি সেদিন এদিকে নারী-শিক্ষা-সমিতির একটি শিল্প-মেলা খোলা হোল।

উত্তর—হাঁ, নারী-শিক্ষা-সমিতির শিল্প-প্রদর্শনী হয়ে গেল। এই বৎসর আরম্ভ হল। অনেক দিন থেকে করবার ইচ্ছা ছিল, ঠিক কি রকম করলে মেয়েদের নিকট আদৃত হবে, না জানাতে এতদিন করি নি, তা ছাড়া, আমাদের অর্থের অভাব—টাকা নেই। টাকা ছাড়া এ সব জিনিষ হয় না; তবু সাহস করে' আরম্ভ করলুম বলে এতটা কৃতকার্য্য হয়েছি। মেয়েদের হাতের কাজ ভারি সুন্দর হয়েছে। এ রকম শিল্প-প্রদর্শনীতে বোঝা যায় কোন্ জিনিষটা মেয়েরা ব্যবসা-হিসাবে হাতে নিতে পারেন।

প্রঃ—সব একমাত্র কলকাতার মেয়ে?

উঃ—হাঁ, তবে ২।১টি বাইরেরও ছিল, যেমন বোলপুর, যশোর, পাবনা। এরাও আমাদের জানাশোনার ভিতর। এই শিল্প-প্রদর্শনীতে ৩ দিনে প্রায় ২ হাজার মেয়ে এসেছে, দেখে আশ্চর্য্য মনে হল। এর ঠিক ৭ দিন আগে গভর্ণমেণ্ট "বেবী উইক" করেছিলেন, সেখানে বেশী লোক হয় নি। ওদের অর্থের ছড়াছড়ি! আমাদের অর্থ ত নাই ই, সে রকম বিজ্ঞাপন ও হয় নি। খুব কম জানাশোনা হয়েছিল। এমন কি, শেষে পাশের বাড়ীর লোকেরা অনুযোগ করেছিল, কেন তাদের খবর দিই নি।

প্রঃ—বিজ্ঞাপন দিতে পয়সা লেগেছিল?

উঃ—হাঁ, সব কাগজেই পয়সা নেয়, অনেক কাগজে অর্দ্ধেক নেয়।

প্রঃ—সবাই কি স্কুল কলেজের মেয়ে?

উঃ—না, গৃহস্থ পরিবারের মেয়েই প্রায় সব। স্কুল কলেজের মেয়েও আছে, হাতের কাজ যা, তা স্কুল কলেজের নয়, বাড়ীর।

প্রঃ—অধিকাংশের বয়স স্কুল কলেজের বয়স পার হয়ে গেছে?

উঃ—হাঁ, তবে স্কুলের মেয়েরাও কাজ পাঠিয়েছে—যেমন মাড়োয়ারী গারল স্কুল, ক্রিশ্চিয়ান ডাফ স্কুল এবং ব্লাইণ্ড স্কুলের মেয়েরা। প্রদর্শনীর সঙ্গে আমরা কোন আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা রাখি নি, রাখলে আরও চিত্তাকর্ষক হত। বিলেতে তাই রাখে। আমোদ প্রমোদ ছিল না, এক নাগরদোলা ছিল। এ সব জিনিষে কত টাকা লাগে তা ত জানেন। আসছে বছর যখন করব তখন এর ভিতর শিক্ষা-প্রদ জিনিষও দেব। আমাদের বাড়ী নেই, ব্রাহ্ম গারল স্কুল কমপাউণ্ডের মত ছোট জায়গা, তবু মেয়েরা খুব আমোদ করেছে।

প্রঃ—খরচ কত হল?

উঃ—ঠিক বলতে পারি না, আমাদের সামান্য চেষ্টা। গেট-মনি চার পয়সা করেছি, তাতে ১০২৲ টাকা উঠেছে।

বাইরে কতকগুলি ষ্টল হয়েছিল। বিলিতী জিনিষ ছিল বলে খাদি-প্রতিষ্ঠান তাঁদের দোকান পাঠান নি। তবে খদ্দর-প্রচার-সমিতি এসেছিল ও বেশ বিক্রী করেছিল।

প্রঃ—দোকান যারা করেছিল তারা সব পুরুষ ?

উঃ—প্রায় সব পুরুষ। একটী দোকান ছিল মেয়ের। তার দোকানে সব চেয়ে বেশী বিক্রী হয়। যে মেয়েরা আপত্তি করবেন সে রকম কেহ আসেন নি। শোন-পুরের রাণী, বর্দ্ধমানের মহারাণী, কুচবিহারের মহারাণী—এঁরা প্রাইজ পাঠিয়েছিলেন। একজন মাত্র এসেছিলেন—জিজ্ঞাসা করেছিলেন—পুরুষ থাকবে না ত। বাড়ীর ভিতর পুরুষ ছিল না, বাগানে যে ষ্টল ছিল সেখানে পুরুষ ছিল।

প্রঃ—প্রদর্শনী যে হবে বাঙালী ঘরের মেয়েদের জানান হল কি করে ?

উঃ—দেয়ালে দেয়ালে বিজ্ঞাপন দিয়ে।

প্রঃ—যশোর, পাবনা থেকে যারা এসেছিলেন ?

উঃ—কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপাতে বলেছিলুম ? মফঃস্বলে ছাপান হয়েছে কি না জানি না। মফঃস্বল থেকে জিনিষ পত্র কিছু পাব সে আশা করি নি। কলকাতায় সকলেই জানে—ব্রাহ্ম গারল স্কুলে প্রদর্শনী হবে—জিনিষ হারাবে না। তাই পাঠিয়েছিল।

প্রঃ—যাঁরা দেখতে এসেছিলেন অথবা জিনিষ পত্র পাঠিয়েছিলেন তাঁরা সকলেই ব্রাহ্ম ?

উঃ—না-না, তা নয়, কয়েক জন ব্রাহ্ম ছিলেন বটে, খুব কম।

প্রঃ—এখন আপনাকে আর একটী বিষয়ে প্রশ্ন করতে চাই ; সেটী হচ্ছে বাঙালী মেয়েদের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে।

উঃ—তাদের আর্থিক অবস্থা অতিশয় হীন।

প্রঃ—কি রকম ?

উঃ—আমি বিধবাদের কথা বিশেষ ভাবে বলছি। সধবাও অনেক আছে, আমাদের দেশে সকলেরই বিয়ে হয়—অনেকে আছে, স্বামী পাগল, অনেকের স্বামী রোজগার করে না, ছেলেপুলে আছে। আমার কাছে যারা সাহায্য চাইতে এসেছিল তাদের কাছ থেকে যা জানি তা বলছি। একজন সাহায্যের জন্য এসেছিল তার স্বামী পাগল, ২টী সন্তান, এখন আছে ভাইয়ের কাছে ; ছেলেপিলে নিয়ে কতদিন তাদের কাছে থাকতে পারে ? সুবিধা হয় না। বল্লে—তার জন্য যেন একটা কিছু বন্দোবস্ত করে দিই। তখনো আমাদের বিধবা-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় নি। আমি বলেছিলুম নার্সিং (রোগীসেবা) শিখতে। সেখানে রাত্রিতে থাকতে হয়, স্বামীকে দেখবে কে ? সারাদিন থাকলে চলে এমন কোন কিছু করতে পারে কি না ? তাতে ভেবেছিলুম—ডাক্তার রেখে সে রকম একটা ক্লাস খোলা যায় কি না। তার যোগাড় করেছিলুম, কিন্তু গাড়ীর বন্দোবস্ত করতে পারি নি বলে ছাড়তে হল। বাঙ্গালী মেয়ে হেঁটে কেহ যায় না। লাহোরে সুবিধা দেখলুম। সেখানে পর্দ্দা থাকলেও মেয়েরা হেঁটে যায়। মুসলমানের ভিতর পর্দ্দা আছে, আমাদের মত নয়, ঘরের ভিতর পর্দ্দা, বাইরে নয়। লাহোরে কর্পোরেশনের একটী মস্ত স্কুল আছে। দেখলুম ১০০টী মেয়ে বসে নানা রকম শিল্প শিখছে। চুমকির কাজ, দরজির সেলাই, মোজা বোনা—সব শিখছে। কর্পোরেশন থেকে লোক রেখে শিখাচ্ছে। কিছু মাইনা দিতে হয় না। কলকাতায় মেয়েদের জন্য কোন কাজ করতে আরম্ভ করলেই গাড়ী ! সেজন্য এটা হল না। গাড়ীর টাকা কোথায় পাই ? অসুবিধা। নইলে সব বন্দোবস্ত করেছিলুম।

প্রঃ—আপনি বল্লেন—স্বামী পাগল।

উঃ—হাঁ, পাগল। স্বামি-পরিত্যক্তাও এত আছে, নিজে না দেখলে কেউ ভাবতে পারে না। বিয়ে করে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছে ! এই রকম অবস্থার মেয়ে কত আসছে।

প্রঃ—স্বামী বেঁচে আছে ?

উঃ—মরে গেছে এমন ত আর পাই নি। প্রায়ই বিয়ে করে' নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। কেহবা আবার ২।৩টী বিয়ে করে' আগের স্ত্রীকে ত্যাগ করেছে। বিধবা ছাড়া এই শ্রেণীর সধবাদের জন্যও আমাদের বন্দোবস্ত আছে।

প্রঃ—বিধবাদের আর্থিক দুরবস্থা আপনার নজরে পড়েছে কি ?

উঃ—এই আর্থিক দুর্গতির জন্যও অনেকে মুসলমান হয়ে গেছে। পল্লীগ্রামে এর সংখ্যা কত বেশী আমরা ভাবি না। আমি নিজেও ভাবতুম না, কাজের সংস্পর্শে না আসলে এ জ্ঞান হত না। দেখেছি বিধবার শ্বশুর বাড়ীর কেহ সাহায্য করে না, পড়ে' রয়েছে, বাপের বাড়ীরও কেহ খোঁজ করে না। প্রতিবেশী আছে মুসলমান, সে এসে দেখল শুনল, অবস্থা খারাপ হলে অর্থ দিয়ে সাহায্য করে। ছোট ছেলেপিলে আছে, মেয়ে-মানুষ একলা রয়েছে, ছেলে মানুষ করতে হবে সে ভাবনা রয়েছে, যে যত্ন দেখায় তার কাছেই যায়। এই ভাবে অনেকে মুসলমান হয়ে গেছে। আমাদের বিধবা-আশ্রমে এই যে ২০। ২২টী বিধবা রয়েছে সকলের অবস্থাই এই রকম খারাপ। আমাদের সমস্ত খরচ নির্ব্বাহ করতে হয়। জিজ্ঞাসা করতে পারেন—এখন কেন এমন হয়, আগে কেন হত না। আগে যে খরচে চলত এখন তার চাইতে খরচ অনেক বেড়ে গেছে। আগে লোকে পাঁচ জনকে সাহায্য করতে পারত, এখন পারে না।

প্রঃ—যৌথ পরিবার বলে যা কিছু আছে, তাতে সাহায্য হয় কতটা?

উঃ—ইচ্ছা থাকলেও তা সম্ভব হয় না, বিশেষতঃ বিধবাদের যদি ছেলেপুলে থাকে। আজ কাল খরচ ডবলের বেশী হয়েছে। ধরুন যার ৪টী ছেলেপুলে আছে তাদের স্কুলের খরচ, কলেজের খরচ, খাবার খরচ কত বেড়েছে। সে কি করে' বোনের ছেলেমেয়েকে সাহায্য করবে? আগে তা ছিল না। এখন বিধবাদের অবস্থা শোচনীয়। যাদের ছেলেপুলে আছে, এমন অনেক বিধবা আসে, যেন অর্থার্জ্জন করে' তাদের মানুষ করতে পারে।

প্রঃ—তাহলে আপনি বলতে চান যে,—বিধবাদের ছেলে মেয়ে মানুষ করবার জন্যই দেশের ভিতর একটা আন্দোলন হওয়া দরকার। কেবল মাত্র বিধবার নয়, তাদের ছেলেমেয়েরও সাহায্য দরকার?

উঃ—হাঁ, বালবিধবা ত অনেক আছে, তা ছাড়া, যাদের ছেলে পিলে আছে তাদের ত কথাই নাই। আমাদের দেশে বাড়ী ছেড়ে আসবার সাহস মেয়েদের কখনই ছিল না, কিন্তু এখন না ছেড়ে উপায় নাই। অধিকাংশই পূর্ব্ববঙ্গ থেকে আসে। পশ্চিম বঙ্গের সমাজ ভয়ানক গোঁড়া। এরা কিছুতেই বাড়ী ছেড়ে আসতে চায় না, না খেয়ে মরবে তবু আসবে না। তারা শুনে সবাই আশ্চর্য্য হয়—এত মেয়ে বাড়ী ছেড়ে এখানে এসেছে!

প্রঃ—এরা কোথা থেকে এসেছে?

উঃ—বিধবা-আশ্রমে যারা আছে তাদের অধিকাংশই কলকাতার বাইরের, অন্যান্য জেলা থেকে এসেছে। কলকাতার যে ২।৪টী আছে তারা বিবাহিতা, স্বামি-পরিত্যক্তা।

প্রঃ—অধিকাংশ মধ্যবিত্ত, গোঁড়া হিন্দু, ব্রাহ্ম নাই?

উঃ—ব্রাহ্মদের এখানে নিই না। তাদের দরকার হয় না। তারা আগেই অর্থকরী একটা কিছু শেখে, এটা খালি সনাতনীদের জন্য।

প্রঃ—আপনি বলছেন ব্রাহ্মদের মেয়েরা এমন কিছু শেখে যাতে তারা কিছু রোজগার করতে পারে। কি উপায়ে রোজগার করে?

উঃ—বাড়ীতে গিয়ে মেয়েদের শিখায়, শিক্ষয়িত্রীর কাজ করে, ছেলে-মেয়েদের অভিভাবিকার কাজ করে। আজ কাল দোকান পর্য্যন্ত করতে আরম্ভ করেছে।

প্রঃ—কিসের দোকান?

উঃ—সব জিনিসের—যাকে মনিহারী দোকান বলে। যে মেয়েটার কথা বলছি সেটা খুব করিৎকর্ম্মা। এই মেয়েটা স্বামি-পরিত্যক্তা। ব্রাহ্ম সমাজের মেয়ে, বিয়ে করেছিল একজন পাঞ্জাবীকে—আর্য্য সমাজের আইন অনুসারে।

প্রঃ—আচ্ছা, যদি সমাজের আরও নিম্ন স্তরে যাই, তাদের আর্থিক অবস্থা কি রকম মনে করেন?

উঃ—তাদের অবস্থাও খারাপ। নিম্ন শ্রেণীর ৪টী মেয়ে আছে, আমাদের শ্রেণীর মেয়েদের চেয়ে তারা বলিষ্ঠ। যে সমস্ত কাজ শিখাতে চাই তাতে তথা-কথিত নিম্ন শ্রেণীর মেয়েদেরই নিচ্ছি। "ভদ্রঘরের" মেয়েরা এত দুর্ব্বল যে তাদের দ্বারা পরিশ্রমের কাজ হয়ে ওঠে না। মনে করুন রং করার ও কাপড়ে ছাপ লাগানর কাজ শিখাচ্ছি, ২২টী মেয়ের মধ্যে ২টী নমশূদ্র মেয়েকে পছন্দ

করতে হল, স্বাস্থ্য ভাল বলে। গ্লাস ব্লোইং (কাচ-ফুলানো) শিখাতে চাই, জার্ম্মাণিতে নাকি মেয়েরা এ কাজ করে, আর এত সস্তায় দেয় কেউ বাজারে টক্কর দিতে পারে না। আমাদের দেশে কেন হবে না? সেজন্য ২।১টী মেয়েকে দিয়ে আরম্ভ করেছিলুম, কিন্তু আমাদের ছোট বাড়ী, বড় বাড়ী না হলে হয় না, গ্লাস-ব্লোয়িংএর যন্ত্রাদি রাখবার স্থান নাই। তারপর দেখেছি "এম্পিউল" তৈয়ারি শিখতে পারলে মেয়েরা বাড়ী বসে রোজগার করতে পারে। চেষ্টাও করেছিলুম, কিন্তু বাঙালী, ভদ্রঘরের মেয়েরা বড্ড দুর্ব্বল, খেতে পায়না, বিশেষ বিধবারা মাসের মধ্যে কত উপোস করে। তাই তারা যেন কোন শক্ত কাজই করতে পারে না। কাজের মেয়ে চাইলে নমশূদ্র মেয়ে ছাড়া হয় না।

প্রঃ—মুসলমানদের ভিতর কি রকম?

উঃ—লাহোরে সে কথা জিজ্ঞাসা করেছিলুম। বল্লে, তাদের ভিতর বিধবা-সমস্যা নাই, বিধবারা বিয়ে করে।

প্রঃ—বিধবা-সমস্যা না থাকতে পারে, আর্থিক সমস্যা ত আছে।

উঃ—আমি মুসলমানের আর্থিক অবস্থার কথা বলতে পারি না। তবে তাদের উত্তরাধিকার-বিষয়ক আইন স্বতন্ত্র জানি এবং পরদা থাকলেও তাদের বেশী তেজ মনে হয়।

প্রঃ—কোন লোক যদি জিজ্ঞাসা করে—মেয়েদের আর্থিক হিসাবে স্বাধীন করবার দরকার কি। পুরুষেরাই ত রয়েছে। ভাই, বাপ, স্বামী,—তারা যদি রোজগার করে তা হলেই ত হয়। তাতে আপনি কি বল্‌বেন?

উঃ—কি করে হবে? স্বামী চিরকাল থাকে না, এক ত স্বামী। আমার মনে হয় সব মেয়েদের আর্থিক স্বাধীনতা থাকা দরকার। তা নইলে আমরা আত্মসম্মান-ভ্রষ্ট হব। ছেলে-মেয়ে মানুষ করা, সমাজ-সেবা, দেশ-সেবা করা ইত্যাদি মেয়েদের অনেক কাজ আছে। করা না করা আলাদা কথা, ক্ষমতা থাকা দরকার, তা নইলে পুরুষেরা মেয়েদের সম্মান করবে কি?—এ আমার নিজের মত।

প্রঃ—মেয়েদের স্বাধীন ভাবে টাকা রোজগার করাটাকে আপনি নূতন আন্দোলন, নূতন একটা কিছু বলছেন কেন? আমি জিজ্ঞাসা করি—এটা কেবল মাত্র তথা-কথিত ভদ্রলোক সম্বন্ধেই খাটে কি না।

উঃ—হঁা, নিম্নশ্রেণীর মেয়েরাত স্বাধীন ভাবে রোজগার করছে, পেটে খাচ্ছে। মুটের কাজ, চাষের কাজ, কলের কাজ—যে সব কাজে পুরুষেরা যায় মেয়েরাও সঙ্গে সঙ্গে যায়। এ সব ক্লাসের লোকদের কথা বর্ত্তমানে আলোচনা করছি না। আমি মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের কথাই এতক্ষণ বলছিলাম।

"ডান্‌স্‌ ইন্টার্ণ্যাশন্যাল রিভিউ"
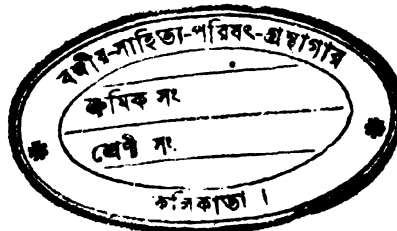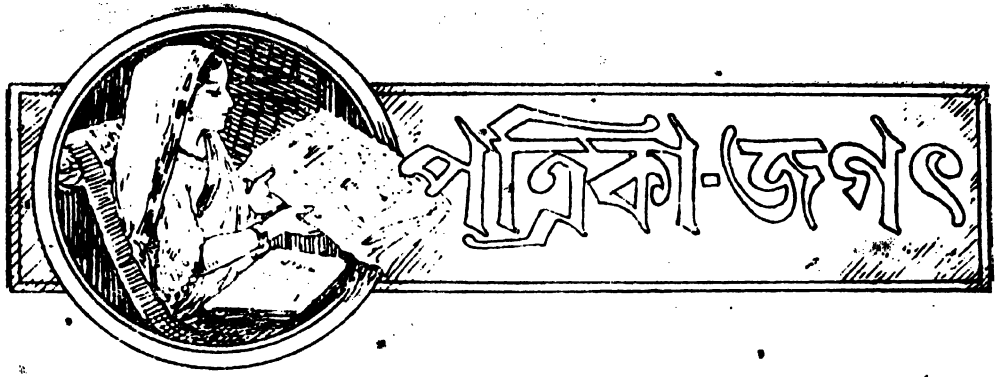
(আর, জি, ডান অ্যাণ্ড কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য-পত্রিকা), মাসিক, নিউইয়র্ক, অক্টোবর, ১৯২৫। উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ :—(১) নিউইয়র্কের বন্দরে আমদানি-রপ্তানির ব্যবসা কোন্ প্রণালীতে পরিচালিত হয়? লেখক শ্রীযুক্ত হ্যারি বার তাঁহার নিজের জাহাজ-কোম্পানীর প্রেসিডেণ্ট। (২) শস্য কাটার নবীন প্রণালী। যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়া মার্কিণ চাষীরা মেহনৎ এবং খরচ কমাইতে সমর্থ হইয়াছে সেই সমুদয়ের বিবরণ এই প্রবন্ধে আছে। (৩) পল্লীগ্রামের পথ-ঘাট উন্নত প্রণালীতে গড়িয়া তুলিবার কল-কব্জা ও যন্ত্রপাতি।

"জার্ণ্যাল অব্ দি রয়্যাল সোসাইটি অব্ আর্টস"

(রাজকীয় শিল্প-পরিষৎ পত্রিকা), সাপ্তাহিক, লণ্ডন, ১৫ জানুয়ারি ১৯২৬ :—"কয়লার ছাই এবং সাফা কয়লা" (রাসায়নিক এঞ্জিনিয়ার ডকটর লেসিঙ্), বিশেষজ্ঞদের পক্ষে টেকনিক্যাল তথ্যে পরিপূর্ণ মূল্যবান্ প্রবন্ধ।

"ইন্‌ভেষ্টার্স্ রিভিউ"

(টাকা খাটাবার কর্ম্মক্ষেত্র), সাপ্তাহিক, লণ্ডন, ২৩ জানুয়ারি ১৯২৬ :—বার্ক্‌লেজ্ ব্যাঙ্কের সভাপতি শ্রীযুক্ত গুডেনাফের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ ও বক্তৃতা প্রকাশিত হইয়াছে।

"নেশ্যন"

(স্বদেশ), সাপ্তাহিক, লণ্ডন, ৩০ জানুয়ারি ১৯২৬ :—(১) মিড্‌ল্যাণ্ড ব্যাঙ্কের সভাপতি শ্রীযুক্ত ম্যাক্‌কেনার বার্ষিক বক্তৃতা, (২) ওয়েষ্টমিনষ্টার ব্যাঙ্কের সভাপতি শ্রীযুক্ত লীফ এর বার্ষিক বক্তৃতা, (৩) ন্যাশন্যাল মিউচুয়্যাল লাইফ অ্যাশুওর‍্যান্স সোসাইটির বার্ষিক বিবরণ এবং সভাপতি অধ্যাপক কেইন্‌সের বক্তৃতা।

এই চারটা প্রবন্ধ মূলে পড়িয়া দেখা উচিত। তর্জ্জমা প্রকাশ করিবার ঠাঁই নাই। আমাদের দেশে যাঁহারা ব্যাঙ্কিং এবং ইন্‌শিওর‍্যান্স্ ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন তাঁহাদের নিকট এই সকল তথ্য এবং আলোচনা-প্রণালী অনেক সরস বাণী আনিয়া দিবে।

"প্রবাসী"

(কলিকাতা), ফাল্গুন; ১৩৩২। উল্লেখযোগ্য রচনাবলী:—(১) বর্গাজমির ভাগ-ব্যবস্থা (শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী)। (২) বস্ত্রশিল্পের হাতিয়ার (শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়)। (৩) পাট-চাষীদের সমবায় (শ্রীচারুচন্দ্র দাস গুপ্ত)।

"ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট"

(কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশ্যনের পত্রিকা), সাপ্তাহিক, সম্পাদক শ্রীঅমল হোম, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬ :—(১) ভারতীয় বাস্তুশিল্পের পুনরুদ্ধার সম্বন্ধে শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। (২) শ্রীযুক্ত সি, এস্, রঙ্গস্বামী নগর-শাসকদের সমবেত দায়িত্বে ব্যাঙ্ক পরিচালনার প্রস্তাব তুলিয়াছেন। এই বিষয়ের দিকে পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

"ওয়েলফেয়ার"

(হিতসাধন-বিষয়ক ইংরেজি মাসিক), কলিকাতা, ফেব্রুয়ারি ১৯২৬ :—(১) অ্যালুমিনিয়মের আর্থিক ব্যবহার (শ্রী ভি, এস্ চিন্নস্বামী)। (২) বাংলার টাকা কর্জ্জদেনেওয়ালা লোক (শ্রীসমরেন্দ্রনাথ গুহ)। মার্চ ১৯২৬:—

(১) তুলের বিভিন্ন ব্যবহার (শ্রী জগদীন্দ্র নাথ বাগ্‌চি)। (২) কৃষি-কমিশন এবং সমবায়-সমিতি (শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন)।

"ন্যাশন্যাল মেডিক্যাল ইনষ্টিটিউট জার্ণ্যাল"

(চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক ইংরেজি ত্রৈমাসিক), কলিকাতা, জানুয়ারি, ১৯২৬ :—(১) "বাঙালী ছাত্রের খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে নতুন বিধি-নিষেধ" (শ্রীঅমূল্যচরণ উকীল)। (২) খাদ্য দ্রব্যের ভিটামিন শক্তি সম্বন্ধে রাসায়নিক পরীক্ষা (শ্রী বাণেশ্বর দাস)।

"লেদার ট্রেড্‌স্‌ রিভিউ"

(চামড়ার ব্যবসার পত্রিকা), সাপ্তাহিক, লণ্ডন, ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬ :—"চামড়ার ব্যবসায়ে তেলের কাজ", ব্যবসার জন্য "কুমীর, হাঙ্গর, টিকটিকি, সাপ ইত্যাদির চামড়া তৈয়ারি করা," "চামড়া ট্যানিং করা" ইত্যাদি বিষয়ে কেজো লোকের দরকারী প্রবন্ধ আছে। এই শ্রেণীর পত্রিকার পাতা উল্টাইতে অভ্যস্ত হইলে বাঙালীর মাথায় একটা স্বর্গীয় অশান্তি ঘর করিয়া বসিতে পারিবে।

"মডার্ণ রিভিউ"

মাসিক, কলিকাতা, ডিসেম্বর ১৯২৫ :—বৃটিশ ভারতের সর্ব্বপ্রথম মুদ্রাবিষয়ক সরকারী অনুসন্ধান (১৭৮৭) (শ্রীযোগীশচন্দ্র সিংহ)। জানুয়ারি ১৯২৬ :—ভারতবর্ষে কি দুনিয়ার ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা কম সরকারী খাজনা উঠে? (অধ্যাপক বৃজনারায়ণ)। ফেব্রুয়ারি ১৯২৬ :—এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাপ্রণালী (শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ)।

"বঙ্গবাণী"

মাসিক, কলিকাতা, ফাল্গুন ১৩৩২:—ফরাসী কোম্পানীর ভাগীরথী-তীরে উপনিবেশ স্থাপন (শ্রীহরিহর শেঠ), এই ধরণের প্রবন্ধে "বর্ত্তমান" ভারতের আর্থিক ইতিহাসের কাঠাম কিছু কিছু পাওয়া যাইতে পারে।

"প্ল্যাণ্টার্স জার্ণ্যাল"

(চাষ-ব্যবসায়ীদের পত্রিকা), সাপ্তাহিক, কলিকাতা, সম্পাদক শ্রীযুক্ত কে, পি, রায়, বিদেশী কোম্পানীদের জন্য পরিচালিত, নানাবিধ প্রয়োজনীয় তথ্যে ও সংবাদে পরিপূর্ণ হইয়া প্রত্যেক সংখ্যা দেখা দেয়। ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬। উল্লেখ-যোগ্য :—(১) আসামের চিঠি, (২) চায়ের ব্যবসা।

"ভারতবর্ষ"

ভাদ্র ১৩৩২ :—ভারতের স্থাপত্য-শিল্প (শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)।

"একস্‌পোর্ট ওয়ার্ল্‌ড্‌"

(রপ্তানির দুনিয়া), মাসিক, লণ্ডন, ফেব্রুয়ারি ১৯২৬। উল্লেখযোগ্য :—(১) বিজ্ঞাপনের জন্য পুস্তিকা কেমন করিয়া লিখিতে হয় এই বিষয়ে ধারাবাহিক রচনা বাহির হইতেছে। (২) মোটরকারের ভবিষ্যৎ (লিয়েটেনাণ্ট কার্ণেল স্যার আলান বার্গয়েন)। (৩) ভারতের সঙ্গে রাসায়নিক দ্রব্যের বাণিজ্য। (৪) জাম্মাণির বহির্ব্বাণিজ্য।

"আনন্দবাজার পত্রিকা"

কলিকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি (দোল সংখ্যা), উল্লেখ যোগ্য :—(১) বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস লিমিটেড্‌ কোম্পানী। (২) কুষ্টিয়ার মোহিনী মিলস লিঃ কোম্পানী। রচনা দুইটি ঐতিহাসিক বিবরণ-মূলক প্রবন্ধ। (৩) বাঙালী মরণের পথে (আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের পল্লী-ভ্রমণে প্রতিষ্ঠিত মতামত)। (৪) ব্যাঙ্ক গঠন ও দেশোন্নতি (শ্রীবিনয় কুমার সরকার)।

"কমার্স"

(ব্যবসা), সাপ্তাহিক, কলিকাতা, ইংরেজ ব্যবসায়ীদের কর্ত্তৃত্বে পরিচালিত। প্রকাণ্ড কাগজ। এই পত্রিকা না পড়িলে কোনো ভারতবাসীর পক্ষেই আর্থিক ভারত সম্বন্ধে নিরেট জ্ঞান লাভকরা অসম্ভব। যাহারা কৃষি-কার্য্যে, শিল্পে বা বাণিজ্যে টাকা খাটাইতেছেন, তাঁহাদের পক্ষেও এই কাগজ বিশেষ দরকারী। বিদেশ-বিষয়ক তথ্যের ভিতর বিলাতী সংবাদই প্রধান ঠাঁই পায়।

"জার্ণ্যালে দেলি একনমিস্তি এ রিভিস্তা দি স্তাতিস্তিকা"

ইতালিয়ান ধন-বিজ্ঞান-সেবীদের মুখ-পত্র ও সংখ্যা-বিজ্ঞান-পত্রিকা, মাসিক, রোম, ফেব্রুয়ারি ১৯২৫। চল্লিশ বৎসর ধরিয়া এই কাগজ চলিতেছে। প্রত্যেক সংখ্যায় ৪০।৫০ পৃষ্ঠা থাকে।

এই সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধের নাম "লে ইলুজিওনি স্তাতিস্তিকে" (সংখ্যা-বিজ্ঞানের ভুলচুক)। তথ্য-তালিকা আর অঙ্কের শ্রেণী আজকালকার বিজ্ঞান-মুল্লুকে প্রবল রাজত্ব চালাইতেছে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, ফ্যাক্টরি-শাসনে, সমাজ-সেবায়, লোক-হিত-সাধনে, শিক্ষার আন্দোলনে, রাজস্ব-বিদ্যায়, রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে সর্ব্বত্রই সংখ্যা-বিজ্ঞানের পসার বাড়িয়া যাইতেছে। কাজেই সংখ্যা লইয়া যাঁহারা নাড়াচাড়া করিতে বাধ্য তাঁহাদের পক্ষে সাবধান হইয়া কাজ করা কর্ত্তব্য। অসাবধানতা কত ক্ষেত্রে ঘটিতে পারে সেইসবের আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। দক্ষিণ ইতালির বারি নগরের ব্যবসায় কলেজের অধ্যাপক ফেলিচে ভিঞ্চি এই প্রবন্ধ বক্তৃতার আকারে পাঠ করিয়াছিলেন। সংখ্যা-বিজ্ঞানের ভুলচুক ঘটিবার সম্ভাবনা প্রতিপদে, যথা, (১) তথ্যের প্রাথমিক বর্ণনায়, (২) শ্রেণী-বিভাগে, (৩) তুলনা-সাধনে; তাহা ছাড়া, (৪) জটিল তথ্যসমূহকে বিশ্লেষণ করিয়া "সরল" ভাবে দেখাইবার সময় দু'একটা দফা আলগা করিয়া আলোচনার রীতি আছে। তাহার বেলায়ও ভুল প্রবেশ করে খুব বেশী। (৫) শেষ পর্য্যন্ত, সাধারণ "নিয়ম" বা সূত্র আবিষ্কার করিবার কাজেও ভুলচুকের সুযোগ আছে যথেষ্ট।

দ্বিতীয় প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় "লা তেওরিয়া দেলি আকুমুলি" (আমানত-তত্ত্ব)। রোমের সরকারী বীমা-প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারী ইনাৎসিও মেসিনা এই রচনায় বীমা এবং ব্যাঙ্কিং ইত্যাদি ধন-কেন্দ্রের গণিতশাস্ত্র আলোচনা করিয়াছেন। ব্যাঙ্কের হাতে, বীমা-কোম্পানীর হাতে লোকজনের যে সব টাকা আসিয়া জমে, সেই সব টাকা ব্যবসা-বাণিজ্যে খাটান যাইতে পারে কত খানি? "অ্যাক্‌চুয়ারি" বিদ্যায় অভিজ্ঞতাবিশিষ্ট ব্যবসায়ীরা এই প্রশ্ন লইয়া মাথা ঘামাইয়া থাকেন। যতদূর জানি, ভারত-সন্তানের ভিতর এই বিদ্যার অধিকারী লোক বেশী নাই।

"শ্‌মোল্লার্স য়ার-বুখ"

(শ্‌মোল্লারের পঞ্জিকা) বিখ্যাত জার্ম্মাণ ধনবিজ্ঞান-বেত্তা শ্‌মোল্লার এই "পঞ্জিকা" স্থাপন করিয়া যান ১৮৭৬ সনে। তাঁহার নামে কাগজটা আজকাল পরিচিত। ত্রৈমাসিক, প্রকাশিত হয় ব্যাভেরিয়ার মিউনিক হইতে। রাইনল্যাণ্ডের বন-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্পীঠোফ বর্ত্তমান সম্পাদক। পত্রিকার উদ্দেশ্য জার্ম্মাণির আইন-কানুন, দেশ-শাসন এবং আর্থিক জীবন সম্বন্ধে (গেজেট্‌সগেবুঙ্‌, ফার্ভাল্টুঙ্‌, উণ্ড ফোল্‌কস্-হ্বির্ট শাফ্‌ট্‌ ইম্‌ ডায়চেন রাইখে) সকল প্রকার আলোচনা প্রকাশ করা। ১৯২৪ সনের ডিসেম্বর সংখ্যায় আছে :—(১) বিশ্বরাষ্ট্র-পরিষদের মূল সমস্যা,—আইনের তরফ হইতে তথ্য বিশ্লেষণ (কার্ল শ্মিট্‌), (২) ক্ষতিপূরণ সমিতির বিশেষজ্ঞ-প্রণীত রিপোর্টের সমালোচনা (হ্বাল্টার লট্‌স্‌), (৩) সমাজতত্ত্ববিৎ যোহান বেখার সপ্তদশ শতাব্দীর জার্ম্মাণ দার্শনিক (এমিল কাউডার), (৪) সুদের হার এবং মার্কের উত্থান-পতন নিবারণ (হ্বিলি প্রিয়োন); (৫) শস্যের দেশী ও বিদেশী বাজার দর (ফ্রিট্‌স্‌ বেখমান), (৬) আর্থিক সঙ্কটে গির্জ্জার অবস্থা (হ্বিল্‌হেল্ম মেন), (৭) সমাজ-বিজ্ঞানের আধুনিক ক্রমবিকাশ (মাক্‌স্‌ রুম্‌ফ), (৮) সার্ব্বজনীন লোকমত (লোরেন্‌ৎস ষ্টোল্টেনবার্গ), (৯) রাজস্ব-আইন বিষয়ক সাহিত্য (আলব্যর্ট হেন্‌জেল), (১০) জার্ম্মাণ লড়াই-ঋণের সমালোচনা।

রয়্যাল অক্টেভোর ২৮৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। প্রবন্ধ ২৩৪ পৃষ্ঠা অধিকার করিতেছে। ৪১ পৃষ্ঠায় ২৪ খানা গ্রন্থের ছোট বড় মাঝারি সমালোচনা আছে। এই সংখ্যায় একখানাও বিদেশী ভাষায় লিখিত বইয়ের বৃত্তান্ত নাই। তাহা ছাড়া, ১২৬ খানা বইয়ের তালিকা দেখিতেছি ভিন্ন ভিন্ন বিষয় অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে। এইগুলা সমালোচনার জন্য আসিয়াছে। দুই-একখানা ইংরেজি এবং ফরাসী বইয়ের নাম পাইতেছি।

"রেহ্বিয়্যে দেকোনোমি পোলিটিক"

(ধনবিজ্ঞান-পত্রিকা), দ্বৈমাসিক, প্যারিস। যুবক ভারতের পরিচিত ফরাসী অধ্যাপক শার্ল জিদ-কর্ত্তৃক সম্পাদিত, ১৮৮৬ সনে প্রতিষ্ঠিত। ১৯২৪ সনের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে নিম্ন লিখিত প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে :—(১) ১৯২৫ সনের সরকারী আয়ব্যয়ের হিসাব এবং দুনিয়ার বাজারে ফ্রান্সের ঠাঁই (অধ্যাপক শার্ল রিস্ত্‌), (২) পোলাণ্ডের মুদ্রা-সংস্কার (জর্জ নোহ্বাক), (৩) অষ্ট্রীয়ান মতের ধনবিজ্ঞানে নূতন ধারা (বুস্কে), (৪) ধনবিজ্ঞান-বিদ্যার পারিভাষিক (রবার্তো মিকেল্‌স্‌)। প্রবন্ধ বাদে ৪০।৫০ পৃষ্ঠা আছে। তাহার ভিতর দেখিতে পাই—(১) বৃটিশ-রুশ সন্ধি, (২) ফ্রান্সের

আর্থিক আইন-কানুন, (৩) গ্রন্থ-সমালোচনা এবং (৪) ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইংরেজি এবং ইতালিয়ান পত্রিকার খতিয়ান।

"হেবেল্ট্ গ্লিবর্ট্ শাফ্ট্ লিখেস আর্খিহ্ব্"

(দুনিয়ার ধনদৌলত বিষয়ক গ্রন্থালয়), ত্রৈমাসিক, য়েনা হইতে প্রকাশিত। উত্তর জার্ম্মাণির কীল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বার্ণার্ড হার্ম্স্ এই পত্রিকার প্রবর্ত্তক ও সম্পাদক। ১৯০৪ সনে স্থাপিত। ১৯২৪ সনের অক্টোবর সংখ্যায় আছে ৩৮৫ পৃষ্ঠা। তাহার ভিতর প্রবন্ধের পরিমাণ মাত্র ৬৫ পৃষ্ঠা। গ্রন্থ-সমালোচনায় গিয়াছে ৮৫ পৃষ্ঠা। আর্থিক ইতিহাস বিষয়ক দলিল আছে ১৫০ পৃষ্ঠারও বেশী। তাহার ভিতর দেখিতেছি:—(১) লুকসেম্বুর্গের কথা, (২) জুগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমেনিয়া, হাঙ্গারি ও অষ্ট্রিয়ার লোক-সংখ্যা-বিষয়ক আলোচনা, (৩) ইয়োরোপের দেশে দেশে মজুর-চলাচল সম্বন্ধে আন্তর্জ্জাতিক ব্যবস্থা, (৪) বিশ্ববাণিজ্যে জার্ম্মাণির তারহীন টেলিগ্রাফের ঠাঁই, (৫) দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিন এবং পারাগুয়ে দেশে তুলার চাষ, (৬) ইতালিতে বিদেশী টুরিষ্টদের খরচ-পত্র এবং ইতালিয়ান রাজস্বে তাহার প্রভাব, (৭) অষ্ট্রিয়ার শেয়ারের বাজারে আর্থিক সঙ্কট (১৯২৪), (৮) লোজানের সন্ধি। পরিশিষ্টে আছে দুনিয়ার টাকার বাজার এবং শেয়ার বাজার সম্বন্ধে তত্ত্ব (৫৬ পৃষ্ঠা)।

"ভাণ্ডার"

কলিকাতা, অগ্রহায়ণ ১৩৩২, বঙ্গীয় সমবায়-সংগঠন-সমিতির মাসিক পত্র:—"যুদ্ধের সময়ে সমবায়" (বেলজিয়ামের কথা) প্রবন্ধ লিখিয়াছেন শ্রীশিবনাথ বন্দোপাধ্যায়। পাটের চাষীদিগকে সমবায়ের নিয়মে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার জন্য এই লেখক আর একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

"মানসী ও মর্ম্মবাণী"

ফাল্গুন, ১৩৩২:—বঙ্গের শ্রমজীবী (শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য)।

উর্দু দৈনিক "হুবাকীল"

আওরঙ্গজেবের আমলের বাজার-দর

অমৃতসরের "হুবাকীল" উত্তর ভারতের অন্যতম নামজাদা দৈনিক। এই বৎসরের ১৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে মোগল ভারতের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে এক রচনা এই কাগজে বাহির হইয়াছে। লেখক বলিতেছেন,—

ভীমসেন বুরহানপুরী তাঁহার "দিলকুশা" নামক পুস্তকে সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের আর্থিক অবস্থার বর্ণনা-প্রসঙ্গে এক জায়গাতে এইরূপ লিখিয়াছেন:—"আওরঙ্গ-আবাদ অঞ্চলে এক টুকরা জমিও পতিত থাকিত না। মুরশিদকুলী খান তিন রকম হারে খাজনা লইতেন, যথা, (১) বারিপাতে যে সব জমি আবাদ হইত, তাহার অর্দ্ধেক অংশ, (২) কূপের জল দ্বারা যে সব জমি আবাদ হইত, তাহার ⅓ অংশ, (৩) নদী-খালের জল হইতে যে সব জমি আবাদ হইত, তাহার শস্যের অবস্থা অনুসারে অংশ। যদি কোনো বৎসর ভাল রকম শস্য উৎপন্ন না হইত তাহা হইলে কৃষকের দেয় সমুদয় অংশ মাপ করিয়া দেওয়া হইত। তখনকার বাজার দর এই ছিল:—গম ও ডাল প্রতি টাকায় ২॥০ মণ। জোয়ার বাজরা প্রতি টাকায় ৩॥০ মণ। ঘৃত প্রতি টাকায় ৵৮ সের। ফল কথা, যাহাতে প্রজারা সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে তাহার জন্য সম্রাট আওরঙ্গজেব প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। (দিলকুশা—২৫, ২৬, ৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

এই অধ্যায়ে উল্লিখিত রচনাবলীর কোনো কোনোটা সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

"সিঁদিকালিস্‌ম্ উভ্‌রিয়ে এ সিঁদিকালিস্‌ম্ আগ্রিকল" (মজুরদের সঙ্ঘ-নীতি আর চাষীদের সঙ্ঘ-নীতি); মাঁতা সাঁ-লেওঁ, প্যারিস; পেইয়ো কোম্পানী; ১৬০ পৃষ্ঠা; ৪ ফ্রাঁ; ১৯২০।

"লাপ্রে-গেআর এ লা পোলিটিক্ কোমার্সিয়াল" (লড়াইয়ের পরের বাণিজ্য-নীতি); ক্লোদ্-জোসেফ গিঞ্জ; প্যারিস; প্রকাশক লিব্রেরারি আর্মাঁ কোল্যাঁ; ২০০ পৃষ্ঠা; ৭ ফ্রাঁ; ১৯২৪।

"লে গ্রাঁ মার্শে ফিনাঁসিয়ে" (প্যারিস, লণ্ডন, বার্লিন ও নিউ ইয়র্কের 'বুর্স' বা টাকার বাজার সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ও বর্ত্তমান তথ্য-মূলক গ্রন্থ); জর্জ পেইয়ার; লোজান ও জেনেহ্বা (সুইটসাল্যাণ্ড), লিব্রেরারি পেইয়ো, ৪০ পৃষ্ঠা (ছোট হরপে রয়্যাল আট-পেজী; ৮ ফ্রাঁ (ফরাসী); ১৯২৪।

"ইণ্টার্ণ্যাশন্যাল মার্ক্যাণ্টাইল ডায়েরি অ্যাণ্ড ইয়ার-বুক" (আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসায়-পঞ্জিকা); সাইরেন অ্যাণ্ড শিপিং লিমিটেড্; লণ্ডন; ৭।০ শিলিঙ; ১৯২৬।

"টাউন-প্ল্যানিং ইন্ এনশ্যেণ্ট ইণ্ডিয়া" (প্রাচীন ভারতে নগর-নির্ম্মাণ); শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত; কলিকাতা; থ্যাকার স্পিঙ্ক; ৩৮০+৩২ পৃষ্ঠা; ৭।।; ১৯২৫।

"এলিমেণ্টারি ব্যাঙ্কিং" (ব্যাঙ্ক-ব্যবসা সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান); শ্রীরামচন্দ্র রাও, কলিকাতা; বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত; ১৯৮+৯ পৃষ্ঠা; ১৯২৫।

"ইকনমিক্স্ অব্ লেদার ইণ্ডাষ্ট্রি" (বাংলাদেশের চামড়া সম্বন্ধে আর্থিক আলোচনা); শ্রীরামচন্দ্র রাও; কলিকাতা; বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত; ১৮৪+৮ পৃষ্ঠা; ১৯২৫।

"রেলওয়ে অ্যাক্সিডেণ্টস" (রেলপথের দুর্দ্দৈব); রেণার উইলসন, লণ্ডন; উইলসন কোম্পানী; ৬ শিলিঙ; ১৯২৫।

"খাদি ম্যানুয়াল" (খাদি বিষয়ক ইংরেজী গ্রন্থ); শ্রীসতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত, কলিকাতা; খাদি-প্রতিষ্ঠান; ৯৬ পৃষ্ঠা; ২৲; ১৯২৪।

"কটন" (তুলা), উক্ত খাদি ম্যানুয়ালের দ্বিতীয় ভাগ; ৯৭+১৪৫ পৃষ্ঠা ১৲; ১৯২৫।

"লে কদ্ দ'লা রুস্যি সোভিয়েটিক্" (সোভিয়েট রুশিয়ার আইন-কানুন):—(১) "কদ্ দ'লা ফামিয়" (পরিবার-বিষয়ক আইন),—জুল পাতুইয়ে কর্ত্তৃক রুশ হইতে ফরাসী ভাষায় অনূদিত, (২) "কদ সিভিল" (সম্পত্তি ও ব্যবসায় বিষয়ক আইন),—পাতুইয়ে এবং রাউল ডুকুর কর্ত্তৃক অনূদিত। এদোআর ল্যাঁবেয়ার এবং জুল পাতুইয়ে লিখিত ভূমিকা সমেত। প্যারিস; প্রকাশক মার্সেল গিয়ার; ২৬০+১৬ পৃষ্ঠা; ১৫ ফ্রাঁ; ১৯২৩।

"লা ক্রিজি আগ্রারিয়া ইন ইতালিয়া" (ইতালির ভূমি-সঙ্কট); পিয়ের লুদোভিচো অখ্থিনি; ফ্লোরেন্স্

(ইতালি); প্রকাশক ভ্যালেথ্‌খি ; ২০৪ পৃষ্ঠা ; ৬ লিয়ার ; ১৯২১।

"লেজিস্‌লাৎসিয়োনে সোসিয়ালে" (সমাজ-বিষয়ক আইন-কানুন); ফাউস্তো আগ্রেয়ানি ; রোম ; প্রকাশক লা ভোচে ; ১২৮ পৃষ্ঠা ; ৪ লিয়ার ; ১৯২০।

"একস্‌প্লয়টেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া" (ভারতে মজুর-শোষণ); টমাস জনষ্টন এবং জন সাইম ; ডাণ্ডী (স্কটল্যাণ্ড); ডাণ্ডী জুট অ্যাণ্ড ফ্ল্যাক্‌স্‌-ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ; পুস্তিকা (১৯ পৃষ্ঠা) ; দুই পেন্স ; ১৯২৬।

"মডার্ণ বিজ্‌নেস ট্রেনিং" (বর্ত্তমান যুগের ব্যবসা-শিক্ষা); জন গ্রেবি এবং স্ক্রিভ্‌নার ; লণ্ডন :- ম্যাকডোন্থাল্ড অ্যাণ্ড এভান্‌স্‌ ; ৬০৭+৮ পৃষ্ঠা ; পাঁচ শিলিঙ্‌ ; ১৯২৫ (ত্রয়োদশ সংস্করণ)।

"ডি বোডেন-রেফোর্ম" (ভূমি-সংস্কার); আডোল্‌ফ্‌ ডামাশ্‌কে ; য়েনা (জার্ম্মাণি); প্রকাশক গুষ্টাভ ফিশার ; ৪৮৪+১৬ পৃষ্ঠা ; ১৯২৩ (বিংশ সংস্করণ)।

"লে সোসিয়েতে দ' ক্রেদি এ বাঁক্‌ আ সুর্সাল আঁ ফ্রাঁস" (ফ্রান্সের শাখা-সমন্বিত ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান); জিল্‌ নর্মাঁ ; প্যারিস ; পেরাঁ কোম্পানী ; ২১২ পৃষ্ঠা ; ৭ ফ্রাঁ ৫০ সাঁতিম ; ১৯২৪।

"দি ট্রুথ্‌ অ্যাবাউট জাপানীজ্‌ কম্পিটিশ্যন" (জাপানী প্রতিযোগিতার আসল কথা); এম্‌, আর, রাও ; বম্বে ; প্রকাশক টী, আর, পারাখ ; মিনার্ভা প্রিণ্টিং প্রেস ; ৫০ পৃষ্ঠা (পুস্তিকা) ; ১৯২৬।

"এ স্কীম অব্‌ ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট ফর ইয়ং ইণ্ডিয়া" (আর্থিক উন্নতির মোসাবিদা, যুবক ভারতের জন্য লিখিত); শ্রীবিনয়কুমার সরকার ; কলিকাতা ; ওরিয়েণ্টাল লাইব্রেরি ; ১৯২৬ ; ৪১+১২ পৃষ্ঠা ; চার আনা ; (পুস্তিকা)।

"কুর দ' মার্শাঁদিজ" (ব্যবসায়ের দ্রব্য-তত্ত্ব); গ্রন্থকার জরার ; প্যারিস ; ১৯২৬ ; ৪৪২ পৃষ্ঠা ; ১৫ ফ্রাঁ।

"লা রেপ্রেজাঁতাসিওঁ কমার্সিয়াল" (ব্যবসা-প্রতিনিধির কাজ); সাবাতিয়ে ; প্যারিস ; ১৯২৬ ; ২৯০ পৃষ্ঠা ; ১৭½ ফ্রাঁ।

"সোআ আর্তিফিস্যেল" (কৃত্রিম রেশম); শাপুলে ; প্যারিস ; ১৯২৬ ; ২৬৭ পৃষ্ঠা ; ৪০ ফ্রাঁ।

"ইস্তোআর জেনেরাল দ'লা কোঅপারাসিওঁ আঁ ফ্রাস" (ফ্রান্সে সমবারের ইতিহাস); গোমেঁ ; প্যারিস ; ১৯২৬ ; দুই খণ্ডে ১৩৬৫ পৃষ্ঠা ; ৮০ ফ্রাঁ।

"লে প্রোফেসিওঁ জাগ্রিকল" (চাষ-আবাদের ব্যবসা); পঁসার ; প্যারিস ; ১৯২৬ ; ৩৭২ পৃষ্ঠা ; ১২ ফ্রাঁ।

"এলিমেণ্ট্‌স্‌ অব্‌ রেলওয়ে "ইকনমিক্‌স্‌" (রেলওয়ের আর্থিক তত্ত্ব) অ্যাকওআর্থ্‌ ; অক্‌সফোর্ড ; ক্লারেণ্ডন প্রেস ; ১৯২৪ ; ৬+২১৬ পৃষ্ঠা ; ৫ শিলিঙ্‌।

"ইণ্ডিয়ান কারেন্সী" (ভারতীয় সিক্কা-তত্ত্ব); শ্রীঅক্ষয় কুমার সরকার ; কলিকাতা ; এক কোম্পানী ; ১৯২৬ ; ২+৬৭ পৃষ্ঠা ; ৬০ আনা।

"টাকার কথা," শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায় ; কলিকাতা ; গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স্‌ ; ১৯২৬ ; ৯০+২ পৃষ্ঠা ; এক টাকা।

"বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ" ; শ্রীবিনয়কুমার সরকার কলিকাতা ; ওরিয়েণ্টাল লাইব্রেরি ; ১৯২৬ ; ২৭ পৃষ্ঠা ; এক আনা ; (পুস্তিকা)।

"ইকনমিক লাইফ্‌ অ্যাণ্ড প্রোগ্রেস ইন এন্‌-শেণ্ট ইণ্ডিয়া" (প্রাচীন ভারতে আর্থিক জীবন ও ক্রমবিকাশ) শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ; আর, এন, শীল ; ১০৭ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ; ১৬+৩১৮ পৃষ্ঠা ; ১৯২৫ ; ৬৲।

"ডি ফ্রিড্‌রিশ-হ্বিল্‌হেল্ম্‌—উনি-ভার্সিটেট ৎস্যু বের্লিন" (বার্লিনের ফ্রিড্‌-রিশ হ্বিল্‌হেল্ম্‌ বিশ্ববিদ্যালয়); স্পায়ার উণ্ড্‌ পেটার্স কোং ; বার্লিন ; ৬+২১২ পৃষ্ঠা ; ১৯২৬।

"মধ্যযুগে বাঙ্গালা" শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়; গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স; কলিকাতা; ১৩৩০ সাল; ২৬+৪৮০ পৃষ্ঠা; ৩৲ টাকা।

"বাঁকুড়া জেলার বিবরণ", শ্রীরামনুজ কর (শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত); বাঁকুড়া হইতে গ্রন্থকার-কর্তৃক প্রকাশিত; ১৩৩২ সাল; ১০+১৮০ পৃষ্ঠা; ৸৹ আনা।

"ইতালিয়ান ভাষায় ভূমি ও কৃষি সাহিত্য"

নিম্নলিখিত রচনাবলী ১৯২১ সনে প্রকাশিত হইয়াছে:—

১। "ইল্ লাতিফন্দ সিচিলিয়ান" (সিসিলির জমিদার); রুফ্‌ফ দেল্লা স্কালেত্তা; মেস্‌সিনা; ধোরিয়েরা কোং; ৩৭ পৃষ্ঠা।

২। "লেজিস্‌লাৎসিয়োনে আগ্রারিয়া" (ভূমি জমার আইন); আচ্চার্দি; পালের্মো; লা কমার্চিয়ালে কোং; ৩৪ পৃষ্ঠা।

৩। "লা ক্রিজি আগ্রারিয়া ইন্ ইতালিয়া" (ইতালির ভূমি-সঙ্কট); অর্কৃথিনি; ফিরেন্‌ৎসে (ফ্লোরেন্স্); ভালেক্‌কি কোং; ২০১ পৃষ্ঠা।

৪। "গ্রান্দে এ পিক্‌কলা প্রোপ্রিয়েতা তের্‌রিয়েরা নেল্ আৎসিয়োনে পোলিতিকা দেলি আগ্রিকল্তুরি" (বড় ও ছোট ভূমি-সম্পত্তি, কিষাণদের রাষ্ট্র-নৈতিক আন্দোলনের তরফ হইতে সমালোচনা); দাৎস; রোম; কন্‌ফেদারাৎসিয়োনে জেনেরালে দেল্' আগ্রিকল্তুরা (নিখিল ইতালীয় কৃষি-পরিষৎ); ৫০ পৃষ্ঠা।

৫। "এমেন্দামেন্তি আল্ দিজেনো দি লেজ্‌জে সুল্লা ত্রান্স্‌ফর্মাৎসিয়োনে দেল্ লাতিফন্দ এ সুল্লা কলনিৎসাৎসিয়ানে ইনত্যার্না" (জমিদারির রূপান্তর এবং আন্তর্দেশিক উপনিবেশ-স্থাপন বিষয়ক আইনের খসড়ায় পরিবর্তনের জন্য প্রস্তাব); পালের্মো; সিসিলির কিষাণ-পরিষদের আর্থিক ও আইন-কানুন বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত; লা কমার্চিয়ালে কোং; ২৭ পৃষ্ঠা।

৬। "ই কন্ত্রাত্তি আগ্রারি" (কিষাণদের চুক্তি সম্বন্ধে ১৯২১ সনের আইনের ধারাগুলার বিশ্লেষণ); স্কাখ্‌খি; রোম; স্তাম্পা রেআলে কোং; ৬৫ পৃষ্ঠা।

৭। "লা মেৎসাদ্রিয়া নেল্ একনমিয়া আগ্রারিয়া" (কৃষি-ব্যবস্থায় আধিয়ারি প্রথার ঠাঁই); পালিয়া; বলঞা; নেরি কোং; ৪৬ পৃষ্ঠা।

৮। "ইল্ পাস্‌সাতে, ইল্ প্রেজেন্তে, এ লাৎবেনিরে দেল্লা মারেম্মা তস্কানা নেল সুও রিসর্জিমেন্ত আগ্রারিয়া" (ভূমি পুনর্গঠনের প্রভাবে মারেম্মা তস্কানা জনপদের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান); গুয়াস্‌কনি; পিসা; সিমঞ্চিনি কোং; ১৫ পৃষ্ঠা।

৯। "লা রিকন্‌স্ত্রুৎসিয়নে আগ্রারিয়া দিতালিয়া" (ইতালির ভূমি-পুনর্গঠন); দেল পিন; মিলান; কম্বি কোং; ২০ পৃষ্ঠা।

১০। "প্যর ল স্‌ভিলপ্‌প দেল একনমিয়া রুরালে দেল্লা নস্ত্রা মস্তাঞা" (ইতালিয়ান পার্ব্বত্য পল্লীর আর্থিক উন্নতি বিষয়ক প্রস্তাব); তাস্‌সিনারি; বলঞা; ৎসানিকেল্লি কোং; ১৪+১২২ পৃষ্ঠা।

১১। "ইফিয়েনি লোরো হ্বালুতাৎসিয়োনে একনমিকা এ কমার্চিয়ালে" (বিচালির আর্থিক ও ব্যবসায়িক মূল্য নিরূপণ); মান্ হ্বিল্লি; কাতানিয়া; বাত্তাত কোম্পানী; ৯ পৃষ্ঠা।

১২। "ইল মেৎসজ্যর্ণ আগ্রারিও কোআল এ" (দক্ষিণ ইতালির ভূমি ও কৃষি); আৎসিমন্তি; বারি; লাতাৎসা কোং; ১৬+২৫৪ পৃষ্ঠা।

১৩। "ইল্ প্রোব্‌লেমা দেল্লা তের্‌রা" (ভূমি-সমস্যা); চাস্কা; মিলান; ত্রেভ্‌স্ কোং; ৩১+২৮৭ পৃষ্ঠা।

১৪। "একনমিয়া রুরালে" (পল্লীর আর্থিক ব্যবস্থা); কৃষি-বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য লিখিত; বকিথ্য; কাতানিয়া; বাত্তাত কোং; ৪+৩১২ পৃষ্ঠা।

টাকার কথা

এই গ্রন্থের আলোচনা-প্রণালীর ভিতর জটিলতা নাই। ভাষাও বেশ সোজা। বিদেশী বইয়ের তথ্যগুলা নিজস্ব করিয়া লইবার ক্ষমতা প্রায় প্রত্যেক পৃষ্ঠায়ই দেখিতে পাইতেছি।

কতকগুলা পারিভাষিক শব্দ বেশ সরসই হইয়াছে। পরবর্ত্তী লেখকেরা এই বই ঘাঁটিলে কিছু কিছু সাহায্য পাইবেন বিশ্বাস করি।

"গ্রেশামের নিয়ম"টা সুবোধ্য হইয়াছে। টাকাকড়ির বিজ্ঞানে যতটুকু খাঁটি 'থিয়োরি' বা তত্ত্ব আছে তাহার আলোচনায়ও গোঁজামিল নাই। কম কথায় অনেক মাল পাইতেছি। তবে বইটা নেহাৎ ছোট, এই যা দোষ।

ভারতীয় মুদ্রাতত্ত্বের সেকাল ও একাল দুই-ই পাঠকেরা সংক্ষেপে পাইবেন। ইহাতে বইয়ের দাম বাড়িয়া গিয়াছে।

বি, এ পরীক্ষার জন্য যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধনবিজ্ঞান-বিদ্যার আলোচনা করেন তাঁহারা 'টাকার কথা' টেক্‌সট্‌ বুক স্বরূপ ব্যবহার করিলে লাভবান হইবেন। অন্যান্য পাঠকেরাও "মূল্য," "দাম," "বিনিময়ের হার," "কারেন্সি কমিশন" ইত্যাদি বস্তু সহজেই দখল করিতে পারিবেন।

এই বইয়ের রচনায় বস্তুনিষ্ঠা যতখানি দেখিতেছি ততখানি বস্তুনিষ্ঠা বাঙ্গালী লেখকমহলে বিরাজ করিতে থাকিলে আমাদের মাথা পরিষ্কার হইয়া আসিবে, এবং বাংলাদেশে ঝর-ঝরে চিন্তাপ্রণালী দেখা দিবে। মূল্যাদি সম্বন্ধে গ্রন্থপঞ্জী ৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ভারতীয় আর্থিক ইতিহাসের কয়েক অধ্যায়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধনবিজ্ঞানের লেক্‌চারার শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার সরকার, এ, বি (হার্ভার্ড) মহাশয় "ইনল্যাণ্ড ট্রান্সপোর্ট অ্যাণ্ড কমিউনিকেশন ইন্ মিডিভ্যাল ইণ্ডিয়া" (মধ্যযুগে ভারতের জল ও স্থল পথ এবং তৎসংক্রান্ত যান-বাহন) নামক একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯২৫ সনে উহা প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকে ৮২ খানি পৃষ্ঠা। দামের উল্লেখ নাই।

এই গ্রন্থে ভারতীয় আর্থিক ইতিহাসের কিছু কিছু উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে। ইয়োরোপ সম্বন্ধে এই ধরণের রচনা যত আছে ভারত সম্বন্ধে তাহার শতাংশও নাই। পুস্তকটি পাঠ করিতে করিতে আমাদের এই অসম্পূর্ণতার কথা বারে-বারে মনে হইয়াছে। আর্থিক ইতিহাসের দলিল ঘাঁটাঘাঁটি করিবার দিকে আমাদের দৃষ্টি এখনো পড়ে নাই বলিলেই চলে।

সংক্ষিপ্ত উপক্রমণিকা বাদে বইখানিতে তিনটি পরিচ্ছেদ লিখিত হইয়াছে। প্রথম পরিচ্ছেদে জলপথ, জলযান ও জলপথে যে সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য একাদশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে হইয়াছে তাহার বিবরণ। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে স্থলপথ এবং স্থলপথের যান-বাহন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিবরণ। তৃতীয় পরিচ্ছেদে ডাক-বিভাগের কথা লিখিত হইয়াছে। জলযান সম্বন্ধে মুঘল সম্রাট আকবরের নিয়মকানুন উল্লেখ-যোগ্য। তাঁহার সময়ে 'মীর বেহ্‌রি' নামক একটি নৌ-পরিচালক কার্য্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। সাম্রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বরকম নৌ-নির্ম্মাণ, নানারূপে দক্ষ নাবিক নিয়োগ, খেয়া সম্বন্ধে যাবতীয় বন্দোবস্ত এবং কোন্ নৌকা কতখানি ভার-বহনের যোগ্য ইত্যাদি বিষয়ের নির্দ্ধারণকল্পে উপযুক্ত কর্ম্মচারি-নিয়োগ, তারপর শুল্ক-স্থাপন, শুল্ক-সংগ্রহ এবং শুল্ক মাপ প্রভৃতি কার্য্য ঐ কার্য্যালয় দ্বারা সম্পন্ন হইত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে পার্ব্বত্য পথের বিষয়ে লেখক বেশী কিছু লেখেন নাই। উত্তরাখণ্ডে হিমালয়ের দিকে যাতায়াতের কি সুবিধা ছিল, সেখানকার ডাণ্ডী ও ছাগল প্রভৃতি যান-বাহন এখনকার মত আগেও ছিল কি না এই পুস্তক-পাঠে

তাহা জানিতে পারা গেল না। লেখক ডাক-বিভাগের কথা যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায়, আজকালকার মত তাহা সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ছিল না। রাজ্যরক্ষা বা রাজ্যশাসনের জন্যই সম্রাটগণ ব্যক্তিগতভাবে তাহা স্থাপন করিয়া সংবাদের আদান-প্রদান করিতেন।

পুস্তকের শেষে প্রামাণিক গ্রন্থকার ও গ্রন্থসমূহের একটি তালিকা এবং পুস্তকান্তর্গত বিশেষ-বিশেষ শব্দের একটি নির্ঘণ্ট-পত্র দেওয়া হইয়াছে।

ভারতের আর্থিক ইতিহাস সম্বন্ধে এই ধরণের বহু গ্রন্থ, পুস্তিকা বা প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। নিরেট তথ্য-বিশ্লেষণের দক্ষতা বর্ত্তমান গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন। সেই দক্ষতা বাঙালী পণ্ডিত-সমাজে আরও বেশী চাই।

"শুগার ইন রেলেশ্যান টু টারিফ"

(চিনি ও শুল্ক), রাইট্ ফ্রিলিপ, নিউ ইয়র্ক, ম্যাক-গ্রহিল বুক কোম্পানী, ১৯২৪, ৩১২ + ১৩ পৃষ্ঠা।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ২৭৫,০০০ লোক খাটে চিনির কারবারে। এক মিলিয়ার্ড ডলার (প্রায় ৩,০০০,০০০,০০০ টাকা) এই সকল কারবারের রুধির জোগাইয়া থাকে। আখের এবং বীটের এই দুই প্রকারের চিনিই উৎপন্ন হয়। গ্রন্থকার চিনি-শিল্প এবং চিনি-বাণিজ্য সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য সবই বিবৃত করিয়াছেন। মার্কিণ মুলুকে চিনির ফ্যাকটরি-গুলা দেশের লোকের পক্ষে খুব বড় জিনিষ সন্দেহ নাই। আর বুঝিতেছি যে,—পৃথিবীতে যত চিনি উৎপন্ন হয় তাহার তকরা ২৯ অংশ ভোগ করে ইয়াঙ্কি নরনারীরা (১৯২২ সনে)। বিদেশী চিনি আমেরিকায় আমদানি না হইলে চলে না। গ্রন্থকার চিনি-শুল্কের ইতিহাস বিবৃত করিতে করিতে বলিতেছেন যে, পাউণ্ড প্রতি ১,৭৬ সেণ্ট (অর্থাৎ সের প্রতি প্রায় সাত পয়সা) কিছু চড়া হার। পাঁচ পয়সাই যথেষ্ট।

মজুর-সাহিত্য

(১)

যুক্ত-রাষ্ট্রের ফেডার্যাল দরবার মজুর এবং মজুরি বিষয়ক সকল প্রকার তথ্য প্রকাশ করিবার জন্য বিশেষ যত্ন লইয়া থাকেন। যে শাসন-বিভাগ হইতে এই সকল তথ্য বাহির করা হয় তাহার নাম "বিউরো অব লেবার ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্।" এই বিউরোর প্রকাশিত গ্রন্থাবলী দুনিয়ার সর্ব্বত্র আর্থিক সাহিত্যের উৎকৃষ্ট নমুনারূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে।

এই "বিউরো"র অধীন "হ্বেজেস্ অ্যাণ্ড আওয়ার্স অব্ লেবার" (অর্থাৎ মেহনতের কিম্মৎ ও ঘণ্টাকাল) নামে এক পর্য্যায় রচনা প্রকাশিত হইয়া থাকে। এইগুলা সবই হ্বাশিংটন নগরের গবর্মেণ্ট প্রিণ্টিং আফিস হইতে ছাপা হইয়া বাহির হয়। প্রত্যেকটার দাম সাধারণতঃ ১০ বা ১৫ সেণ্ট অর্থাৎ পাঁচ হইতে আট আনা।

১৯২৫ সনে নিম্নলিখিত পুস্তিকাগুলি এই গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া বাহির হইয়াছে:—(১) ১৯২৩ সনের কাগজের ফ্যাকটরিতে মেহনতের কিম্মৎ ও ঘণ্টাকাল, (২) ১৯২৩ সনের কসাইখানার ব্যবসায়ে মেহনতের কিম্মৎ ইত্যাদি, (৩) ১৯০৭ হইতে ১৯২৪ পর্য্যন্ত জুতার ফ্যাক-টরিতে মেহনতের কিম্মৎ ইত্যাদি, (৪) ১৯০৭ হইতে ১৯২৪ পর্য্যন্ত মোজা ও গেঞ্জির কারখানায় মেহনতের কিম্মৎ ইত্যাদি, (৫) ১৯০৭ হইতে ১৯২৪ পর্য্যন্ত লোহা ও ইস্পাতের কারখানায় মেহনতের কিম্মৎ ইত্যাদি, (৬) ১৯১১ হইতে ১৯২৪ পর্য্যন্ত পুরুষের পোষাক তৈয়ারি করিবার কারখানায় মেহনতের কিম্মৎ ইত্যাদি।

এই সকল তথ্য-তালিকা সাধারণ পাঠকের নিকট নীরস বোধ হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু দেশ বলিলে যে লক্ষ লক্ষ মজুর নরনারী বুঝায় তাহাদের জীবনযাত্রা-প্রণালীর উঠা-নামা বুঝিবার পক্ষে এই সকল তালিকাই একমাত্র নিরেট যন্ত্র।

(২)

জেনেহ্বার "লীগ্ অব্ নেশ্যন্‌সের" (বিশ্বরাষ্ট্র-পরিষদের) সংশ্রবে একটা "ব্যুরো অঁ্যাতার্ণাসন্যাল দ্যু ত্রাহ্বাই" (মজুর বিষয়ক আন্তর্জাতিক কর্ম্মকেন্দ্র) আছে। এই কর্ম্মকেন্দ্রের প্রকাশিত গ্রন্থাবলীও মার্কিণ গ্রন্থাবলীর মতনই কার্য্যোপযোগী এবং বিচক্ষণতার সহিত সম্পাদিত।

বিশ্ব-রাষ্ট্র-পরিষদের মজুর-ব্যুরো একটা মাসিক বাহির করিয়া থাকেন। তাহার নাম "রেহ্বিয়্য অঁ্যাতার্ণ্যাসন্যাল দ্যু ত্রাহ্বাই"। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য তিন সুইস ফ্রাঁ (অর্থাৎ প্রায় ২৲)। ১৯২৫ সনের কয়েকটা উল্লেখ-যোগ্য রচনার নাম করিতেছি:—(১) চেকোশ্লোহ্বাকিয়ার ভূমি-সংস্কার

এবং সমাজের উপর তাহার প্রভাব, (২) হাঙ্গারিতে ধর্ম্মঘট, (৩) রুশিয়ায় কারিগরি শিক্ষা, (৪) বিভিন্ন দেশের মজুরি তুলনা করিবার প্রণালী, (৫) জাপানে মজুর সংগ্রহ করা হয় কি করিয়া? (৬) চীনা মজুরদের অবস্থা।

(৩)

বিলাতী গবর্মেণ্টের "মিনিষ্ট্রি অব্ লেবার" (মজুর-সচিবের আফিস) হইতে ১৯২৩, ১৯২৪ এই দুই সনের কার্য্য-বিবরণী বাহির হইয়াছে (২৮০ পৃষ্ঠা, ১৯২৫)। মজুরে-মনিবে লড়াইয়ের সন্ধি কি কি প্রকারে সাধিত হইয়াছে তাহার খবর পাইতেছি। বেকার বীমার বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থে আছে। কোনো কোনো শিল্পে মনিবেরা মজুরদিগকে আইনতঃ একটা নির্দ্দিষ্ট হারে মজুরি দিতে বাধ্য। তাহার নীচে মজুরি কোনো মতেই নামিতে পারে না। এই "মিনিমাম ওয়েজ" সম্বন্ধে ভারতবাসীর অনেক কথা শিখিবার আছে। তাহার বিস্তৃত বিবরণ জানিবার জন্য রিপোর্ট টা পড়িয়া দেখা দরকার।

(৪)

"ডি আরবাইট্" (মেহনৎ বা কাজ) নামক এক খানা মাসিক বাহির হয় জার্ম্মাণিতে। সকল জার্ম্মাণ "গেহ্বেক্‌শাফ্‌টস্ বণ্ড" (ট্রেড ইউনিয়ন পরিষৎ) এই পত্রিকা প্রকাশক। বার্লিন হইতে বাহির হয়। প্রতি সংখ্যার মূল্য ১ মার্ক (৸০ আনা)। ১৯২৫ সনে সংখ্যাগুলায় যে সব লেখা বাহির হইয়াছে তাহার কয়েকটা নিম্নরূপ:—(১) কৃষিজ দ্রব্যের মূল্যহ্রাস, (২) রুশিয়ায় কিষাণ বিপদ, (৩) চাষবাস ও পল্লীসমস্যা ... ট্রেড-ইউনিয়ন ও ... সমাজতন্ত্রিজ্‌ম।

ফরাসী বইয়ের ইতালিয়ান বিবরণ

ইতালিয়ান পত্রিকায় যে সকল দেশী-বিদেশী বইয়ের বৃত্তান্ত বাহির হইয়াছে, তাহার কোনো কোনোটা সম্বন্ধে দু'চার কথা প্রকাশ করা যাইতেছে। বইগুলা চোখে দেখিবার সুযোগ অনেকেরই জুটিবে না। তবে দুনিয়ার লোকের মাথায় আজ কাল কোন্ কোন্ বিষয়ে চিন্তা খেলিতেছে, এই বৃত্তান্তে তাহার কিছু আন্দাজ করিতে পারা যাইবে।

(১)

টাম,—"লা সোআ গ্রেজ্ দু জাপঁ" (জাপানের কাঁচা রেশম), হ্বাইনফেল্‌ডেন (সুইটসার্ল্যাণ্ড), নয়েনশোআণ্ডার কোম্পানী, ১৯২৩, ৭ ফ্রাঁ। (সুইস)।

সুইস গ্রন্থকার টাম জাপানের রেশম সম্বন্ধে ফরাসী ভাষায় এই কেতাব লিখিয়াছেন। জাপানের রেশম-ব্যবসা বিষয়ক সকল প্রকার তথ্য সঙ্কলিত হইয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে জাপানী রেশমের বাজার ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। বহির্বাণিজ্যের এই তথ্য সম্বন্ধে আলোচনা গ্রন্থের এক বিশেষত্ব। তাহা ছাড়া, জাপানী "পলুর চাষী"দের কর্ম্মপ্রণালী এবং রেশম-তাঁতীদের শিল্প সুবিস্তৃতরূপে বিবৃত হইয়াছে। জাপান সরকার এই ব্যবসাটাকে উন্নত করিবার জন্য যাহা কিছু করিতেছে তাহার বৃত্তান্তও আছে। জাপানের একটা বিভাগ এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে এইরূপ বলা যাইতে পারে।

(২)

ওলফে-গালিয়ার,—"ইস্তোআর একোনোমিক দ্য লা গের" (লড়াইয়ের আর্থিক ইতিহাস) প্যারিস, রিভিয়েরার কোম্পানী, ১৯২৫, ৫০০ পৃষ্ঠা, ৩০ফ্রাঁ।

এই ফরাসী গ্রন্থে খবর আছে প্রধানতঃ ফ্রান্স সম্বন্ধে। অন্যান্য দেশ বিষয়ক তথ্য নেহাৎ ভাসাভাসা। যুদ্ধের সময়কার বিলাতী কারখানাগুলার অবস্থা অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইতালিয়ান কৃষি সম্পদ সম্বন্ধে যাহা কিছু লেখা আছে তাহা ইতালিয়ানদের বিবেচনায় গ্রন্থকারের পক্ষে না লেখাই উচিত ছিল। এই রূপ সমালোচনা দেখিতেছি "জোর্ণালে দেলি একনমিস্তি" নামক রোম হইতে প্রকাশিত ইতালিয়ান ধনবিজ্ঞান-পত্রিকায় (আগষ্ট ১৯২৫)। বুঝিতে হইবে যে, কোনো লোকের পক্ষে বিদেশ সম্বন্ধে যথোচিত জ্ঞান দেখানো সহজ কথা নয়।

(৩)

"লা ফ্রাঁস্ একোনোমিক আঁ ১৯২৩," প্যারিস, সিরে কোম্পানী, ১৯২৪।

প্যারিসের "রেভিয়্যু দেকোনোমি পোলিটিক্" নামক দ্বৈমাসিক পত্রিকার এক সংখ্যা আগাগোড়া ১৯২৩ সনের আর্থিক ফ্রান্স সম্বন্ধে প্রবন্ধ লইয়া বাহির হইয়াছে। লোক সংখ্যা, মূল্য, টাকার বাজার, মজুরি ও মজুরজীবন, বহির্বাণিজ্য ইত্যাদি নানাবিষয়ক তথ্য আছে।

(৪)

মার্ভো,—"লাকৃসিঅঁ একোনোমিক ফ্রাঁসেজ আন্ এস্পাঞ্," প্যারিস, ১৯২২।

এই পুস্তিকার লেখক "লেস্পাঞ্ ও হ্ব্যাতিয়েম সিয়েক্ল্" (বিংশ শতাব্দীর স্পেন) নামক গ্রন্থের প্রণেতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। আজকাল স্পেনে ফরাসীদের মাল বিক্রী হইবার সুযোগ কোন্ কোন দিকে আছে সেই সকল আলোচনা করা এই পুস্তিকার উদ্দেশ্য।

(৫)

"স্তাতিস্তিক দ'লা প্রোডুকসিঅঁ দ' লা সোআ আঁ ফ্রাঁস এ আঁ লেত্রাঁজে" (ফ্রান্স এবং অন্যান্য দেশের রেশম উৎপত্তি বিষয়ক তথ্য-তালিকা), লিঅঁ, রে কোম্পানী, ১৯২৪।

ফ্রান্সের লিঅঁ সহর রেশম-শিল্পের কেন্দ্র। এখানকার রেশম-ব্যবসায়ীরা এক "উনিয়োঁ"য় সঙ্ঘবদ্ধ। বর্ত্তমান তথ্য-তালিকা এই সঙ্ঘের উদ্যোগে প্রকাশিত। ১৯২৩ সনে দুনিয়ায় কত রেশম উৎপন্ন হইয়াছে তাহারই হিসাব পাইতেছি এই বৃত্তান্তে। ১৯১১-১৫ সনে প্রতি বর্ষে গড় পড়তা ২ কোটি ৪৯ লাখ সের মাল উৎপন্ন হইত। আলোচ্য বর্ষে পরিমাণ বাড়িয়াছে ৫০ লাখেরও বেশী। এই বৃত্তান্ত আংশিক ভাবে সত্য। কেন না, চীন, জাপান ইত্যাদি দেশে লোকেরা যে পরিমাণে রেশম ব্যবহার করে তাহার সন্ধান ইহাতে পাওয়া যায় না।

(৬)

হ্বেইল,—"ইস্তোআর দ্য মুভ্‌মাঁ সোসিয়াল আঁ ফ্রাঁস (১৮৫২-১৯২৪) (ফ্রান্সে সামাজিক আন্দোলনের ইতিহাস), প্যারিস, আলকাঁ কোম্পানী, ১৯২৪, ২৫ ফ্রাঁ।

"সামাজিক আন্দোলন," "সামাজিক আইন" ইত্যাদি বলিলে ইয়োরামেরিকায় প্রধানতঃ "আর্থিক" আন্দোলন বা আর্থিক জীবন বিষয়ক আইন-কানুন সমঝিয়া থাকে। ভারতে সাধারণতঃ "সামাজিক" শব্দের যে অর্থ, সেই অর্থ এই খানে বুঝিতে হইবে না।

বিগত ৭০।৭৫ বৎসরের ভিতর ফরাসী সমাজে যত প্রকার আর্থিক আন্দোলন উঠিয়াছে নামিয়াছে হ্বেইল এই গ্রন্থে সেই সমুদয়ের ঐতিহাসিক আলোচনা করিয়াছেন। প্রকারান্তরে এই ধরণের রচনাকে মজুর-আন্দোলনের ইতিহাস বলিলেই চলে। ফ্রান্সের মজুর-সমাজে ছিল প্রধানতঃ দুই দল:—(১) সোশ্যালিষ্ট এবং (২) সিণ্ডিক্যালিষ্ট। ১৯২০ সনে তুর শহরে মজুর-কংগ্রেসের এক অধিবেশন বসে। সেখানে কমুনিষ্ট দল মামুলি সোশ্যালিষ্ট দলের সঙ্গে আড়ি করিয়া নতুন সঙ্ঘ কায়েম করিয়া বসিয়াছে। এই সকল দলাদলির কথা বর্ত্তমান গ্রন্থে বিবৃত আছে। অধিকন্তু সমবায় এবং অন্যান্য প্রথার পারস্পর্য্য বা সহযোগিতাও সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে।

ইতালিয়ান সমালোচক বলিতেছেন:—"পাঠকদের ঘাড়ে পাণ্ডিত্যের বোঝা না চাপাইয়া ফরাসীরা সুললিত ভাবে লিখিতে সিদ্ধহস্ত। সেই প্রাঞ্জল রচনা-প্রণালীর এক উৎকৃষ্ট নমুনা স্বরূপ বর্ত্তমান গ্রন্থ উল্লেখ-যোগ্য।"

"তথ্যের" ইতিহাস হিসাবে হ্বেইলের কেতাবকে যার পর নাই প্রশংসা করা চলে। কিন্তু "চিন্তার," "মতের" বা "তত্ত্বের" ইতিহাস-লেখক হ্বেইল মোটেই নন। ইনি সোশ্যালিষ্ট এবং সিণ্ডিক্যালিষ্ট দুই মতেরই বিরোধী, কমুনিজ্‌মের ত যম বটেই। আজকাল ফ্রান্সে এই সকল মত খণ্ডন করিবার জন্য এক নূতন মত দেখা দিয়াছে। নাম তাহার "সলিদারিস্‌ম্" (সংহতি-নিষ্ঠা)। এই মতের প্রবর্ত্তক লেঅঁ বুর্জোআ। হ্বেইল সংহতি-নিষ্ঠার ভক্ত।

সমালোচকের মতে—সংহতি-নিষ্ঠার ভক্ত হইয়াও হ্বেইল ইচ্ছা করিলে ঐতিহাসিক ভাবে সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম ইত্যাদির বস্তুনিষ্ঠ বৃত্তান্ত দিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি কমুনিষ্ট-পন্থী কার্ল মার্ক্‌স এবং বিপ্লব-পন্থী সোরেল—এই দুই জনের চিন্তার ভিতরকার নিরেট সত্যগুলা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ইহাতে হ্বেইলের বিজ্ঞান-নিষ্ঠা মলিন হইয়া পড়িয়াছে।

দেলেহ্ব্ স্কি,—"আঁতাগোনিস্‌ম্ সোসিও এ আঁতাগোনিস্‌ম্ প্রোলেতারিয়াঁ" (সমাজ-জীবনে বিরোধের ঠাঁই এবং মজুর-সমাজে পরস্পর বিরোধ), প্যারিস, আল্‌কাঁ কোম্পানী, ১৯২৪, ৩০ ফ্রাঁ।

এই গ্রন্থকে বিরোধ-বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা বলা যাইতে পারে। দুনিয়ার যত ক্ষেত্রে বিরোধ দেখা দিয়াছে বা দেখা দিতে পারে সবই গ্রন্থকারের আলোচ্য বিষয়। জাতে জাতে লড়াই, ধর্ম্মে ধর্ম্মে লড়াই, শ্রেণীতে শ্রেণীতে লড়াই, চিন্তায় চিন্তায় বা আদর্শে আদর্শে লড়াই, স্ত্রীপুরুষে লড়াই, যুবায় বুড়ায় লড়াই, "স্থাবরে জঙ্গমে" যত প্রকার লড়াই থাকা সম্ভব তাহার কোনোটাই বাদ পড়ে নাই। লড়াইগুলার কিম্মৎ স্বীকৃত ও হইয়াছে। সভ্যতার বিকাশে অর্থাৎ মানব-চরিত্রের গঠনে এই সমুদয় শক্তি-সংঘর্ষ অনেক-কিছু দান করিয়াছে। লড়াই না থাকিলে মানব-জীবন যার পর নাই দরিদ্র হইয়া পড়িত।

অনেকের বিশ্বাস যে,—বর্ত্তমান যুগে মজুরেরা দলবদ্ধ হইয়া দল-বদ্ধ ধনীদের বিরুদ্ধে লড়িতেছে। দেলেহ্ব্ স্কি বলিতেছেন,—এইরূপ চিন্তা করা ঠিক নয়। মজুরদের দল আর ধনীদের দল নামক দাগ দিয়া মার্কা-মারা দুইটা আলাদা দল নাই। প্রথম কথা এই যে, মজুরেরা নিজেই পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে কামড়া-কামড়ি করিয়া মরিতেছে। বিদেশী মজুরদিগকে স্বদেশের কারখানা হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য প্রত্যেক দেশের মজুরই বদ্ধপরিকর। দেশের ভিতরও মজুরেরা কোনো এক দলের অন্তর্গত নয়। প্রত্যেক দলেই মজুরদের "ছোটজাত," "বড় জাত" আছে। উচ্চ-নীচ ভেদ মানিয়া চলা মজুর-সমাজের স্বধর্ম্ম। মামুলি কারিগর আর শিল্প-দক্ষ বা বিশেষজ্ঞ কারিগর হিসাবে মজুরেরা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর সামিল। সঙ্গে সঙ্গে মজুরি লইয়া, কাজকর্ম্মের নিয়ম লইয়া এই সকল শ্রেণীর ভিতর বিবাদ চলে কম নয়। আবার মেয়ে-মজুরদের বিরুদ্ধে পুরুষ-মজুরদের ঘোঁটমঙ্গল অতি সনাতন।

অপর দিকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে একদল মজুর কোনো ধনীর দলের সঙ্গে মিশিয়া অপর কোনো মজুরের দলের বিরুদ্ধে কাজ করিতে অভ্যস্ত। যে-সকল কারখানায় মাল তৈয়ারি হয়, সেই সকল কারখানার মালিক এবং মজুরেরা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে ক্রেতাদের উপর জুলুম চালাইতে প্রস্তুত, এমন দৃষ্টান্ত অনেক আছে। যে-যে কর্ম্মকেন্দ্রে লাভের হিস্যায় মজুরদের হাত আছে সেই সকল কর্ম্মকেন্দ্রে ও মজুরে-মালিকে বিরোধ নাই, আছে সদ্ভাব। কাজেই কথায় কথায় মালিককে মজুরের শত্রু বিবেচনা না করাই যুক্তিসঙ্গত।

ধনবিজ্ঞানের জার্ম্মাণ-মূর্ত্তি

ফ্রান্‌ৎস্ ওপ্পেনহাইমার,—"ঠেওরী ড্যার রাইনেন উণ্ড্ পোলিটিশেন এ্যাকোনোমী" (অমিশ্র ও রাষ্ট্রীয় আর্থিক ব্যবস্থার দর্শন-কথা), য়েনা, গুস্টাহ্ব্ ফিশার কোম্পানী, প্রথম খণ্ড ২৫ + ৩৩৭ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩ + ৮০৯ পৃষ্ঠা, ১৯২৩-২৪, ২৫½ মার্ক।

ধনবিজ্ঞান-বিদ্যা বলিলে জার্ম্মাণরা সচরাচর যাহা বুঝিয়া থাকে ওপ্পেনহাইমার-প্রণীত এই গ্রন্থ তাহার এক সেরা নমুনা। লেখক ফ্রাঙ্কফুর্টের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। সমাজ-তত্ত্ববিৎ রূপে ওপ্পেনহাইমারের নামডাক বড়। বস্তুতঃ, বর্ত্তমান গ্রন্থ তাঁহার "সিস্টেম ড্যর সোৎসিওলোগী" (সমাজ-বিজ্ঞান) বিষয়ক বিপুল চিন্তা-সৌধের অন্যতম খুঁটা।

বিলাতে, ফ্রান্সে এবং ইতালিতে "ধনবিজ্ঞান" শব্দের জন্য "ইকনমি" "ইকনমিক্‌স্," "একনমিয়া" ইত্যাদি শব্দ কায়েম হইয়া থাকে। জার্ম্মাণরা সাধারণতঃ তাহার জন্য "ফোল্‌কস্-হ্বির্টশাফ্‌ট্‌স্-লেরে" (সার্ব্বজনীন আর্থিক ব্যবস্থা বিষয়ক বিদ্যা) নাম ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত। কোনো কোনো জার্ম্মাণ লেখক "এ্যাকোনোমী" শব্দও ব্যবহার করিয়াছেন। ওপ্পেনহাইমার তাঁহাদের অন্যতম।

কিন্তু ওপ্পেনহাইমারের বইয়ের নামে একটা বিশেষত্ব

আছে। জার্ম্মাণির আর্থিক সাহিত্য বুঝিবার জন্য এই বিশেষত্বটার দিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। ফরাসীরা "একোনোমি পোলিটিক" আর ইংরেজরা "পোলিটিক্যাল ইকনমি" নাম ব্যবহার করিবার সময় "পোলিটিক্যাল" (রাষ্ট্রীয়) বিশেষণটার ইজ্জৎ বড় বেশী দেয় না। "ইকনমিক্স্" আর "পোলিটিক্যাল ইকনমি" দুই-ই তাহাদের চিন্তায় প্রায় একরূপ। কিন্তু জার্ম্মাণরা "পোলিটিশেন" শব্দ ব্যবহার করিবামাত্র তাহা হইতে পৃথক অ-পোলিটিক্যাল (অ-রাষ্ট্রীয়) অতএব "রাইণ" (অর্থাৎ অমিশ্র) একটা কিছু খাড়া করিতে অভ্যস্ত। আর্থিক ব্যবস্থা ("হ্বিটশাফ্‌ট্") বিষয়ক "লেরে" বা বিদ্যাটা জার্ম্মাণ চিন্তায় দ্বিবিধ। প্রথমতঃ, ইহা অমিশ্র বা স্বতন্ত্র অর্থাৎ অন্য কোনো বিদ্যার আনুষঙ্গিক নয়। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রভাবে এই বিদ্যার অন্তর্গত বস্তুর রূপান্তর ঘটিয়া থাকে। অতএব সেই দিক হইতেও এই বিদ্যার আলাদা আলোচনা হওয়া কর্ত্তব্য। এই দুই ধরণের বিদ্যাই ওপ্পেনহাইমারের গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে।

প্রথম খণ্ডের আরম্ভেই গ্রন্থকার বিদ্যার "তত্ত্বাংশ" এবং "কলা" এই দুই বস্তুর প্রভেদ বিচার করিয়াছেন। "ধনবিজ্ঞানের তত্ত্বকথা" কি তাহার বিশ্লেষণ আছে। এই তত্ত্বের "সীমানা" কোথায় তাহাও জানান হইয়াছে। "সমাজ" কাহাকে বলে এবং "আর্থিক ব্যবস্থা" কাহাকে বলে তাহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। "আর্থিক ব্যবস্থার বহির্ভূত" সমাজ-জীবনে যাহা কিছু থাকিতে পারে তাহার উল্লেখ ও বাদ পড়ে নাই। পরে আলোচিত হইয়াছে আর্থিক উদ্দেশ্য সাধনের বিভিন্ন উপায়সমূহ। এইগুলা দুই শ্রেণীর অন্তর্গত:—(১) রাজনৈতিক, (২) অর্থনৈতিক।

এই গেল ভূমিকা। তাহার পর আলোচিত হইয়াছে আলোচনা-প্রণালী। ধনবিজ্ঞানের সমস্যাগুলা কোন্ কোন্ প্রণালীতে কিরূপ আলোচিত হয় তাহার পরিচয় পাইতেছি। আলোচনা-প্রণালীর ক্রমবিকাশ দেখান হইয়াছে। প্রথমেই আছে "ক্লাসিক্যাল" প্রণালীর কথা। তাহার পর আছে "ঐতিহাসিক" প্রণালীর কথা। "ঐতিহাসিক"-পন্থীরা "ক্লাসিক"-পন্থীদিগকে কিরূপ সমালোচনা করিয়া থাকে তাহার বৃত্তান্ত আছে। বিজ্ঞান-রাজ্যের এই "দ্বন্দ্ব" কেমন করিয়া সমন্বয়ের পথে অগ্রসর হইতে পারে তাহাও বিবৃত হইয়াছে।

"আর্থিক সমাজ-কেন্দ্র" অথবা আর্থিক ব্যবস্থার সমাজ কেমন করিয়া স্তরে স্তরে গড়িয়া উঠিয়াছে বা উঠিতেছে তাহার আলোচনা এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। "সমবায়"-প্রণালী বিবৃত হইয়াছে। শ্রম-বিভাগ, শ্রেণী-বিভাগ, কর্ম্ম-বিভাগ এক দিকে, আর অপর দিকে শৃঙ্খলা-বিধান, ঐক্য-বন্ধন, সামঞ্জস্য-স্থাপন ইত্যাদি সমাজ-জীবনের দুই তরফই যথোচিত উল্লেখ পাইয়াছে। এই ক্রমবিকাশের নিট্ ফল কি তাহাও বুঝান হইয়াছে। "সৃষ্টি"-প্রণালীর নিয়ম আর সৃষ্টি করিবার "শক্তিপুঞ্জ" এই উভয় দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে। সমাজে শেষ পর্য্যন্ত আর্থিক কেন্দ্র হিসাবে কি কি বস্তু দেখিতে পাই? প্রথমতঃ, ব্যক্তি এবং ক্ষুদ্র পরিবার, দ্বিতীয়তঃ, পরিবারবৃদ্ধি, এবং তৃতীয়তঃ, বাজার।

প্রথম খণ্ড এইখানেই খতম। এই সংক্ষিপ্ত সূচীপত্র হইতে অন্ততঃ এইটুকু আন্দাজ করা চলিবে যে, জার্ম্মাণির ছাত্র-ছাত্রীরা ধনবিজ্ঞান হিসাবে যে মাল হজম করিতে অভ্যস্ত ইংরেজ ও মার্কিণ পণ্ডিতদের ভারতীয় শিষ্যের তাহাকে সচরাচর ধনবিজ্ঞানের অন্তর্গত করিতে শিখে না।

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম ভাগে গ্রন্থকার ব্যক্তিগত আর্থিক ব্যবস্থার আলোচনা করিয়াছেন। এই সঙ্গে বিদেশী মজুর-কেরাণীর কথা আলোচিত হইয়াছে। আর্থিক সমাজের উচ্চতর কর্ম্মচারীদের কৃতিত্ব বিশ্লেষিত হইয়াছে। কর্ম্মকেন্দ্রের সকল প্রকার লোকজনের পরস্পর আইনগত সম্বন্ধ ও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তাহার পর আলোচিত হইয়াছে "গ্যিটার আর্‌সয়গুঙ্" (ধনোৎপাদন)। মানবীয় সৃষ্টি-কার্য্যে এই "ধনোৎপাদন"ই একমাত্র বস্তু নয় মাল-বিনিময় এবং যাতায়াত এই দুই প্রক্রিয়ার সাহায্যেও "সৃষ্টি" ঘটিয়া থাকে। ধন সৃষ্ট হইবার পর তাহার শাসন, স্বত্ব ইত্যাদি সংক্রান্ত নানা প্রকার প্রশ্ন উঠে। এই সম্পর্কে সম্পত্তি-বিষয়ক আইন, আয়ের নিয়ম, ধনদৌলতের ভাগাভাগি ইত্যাদি তথ্য সঙ্কলিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় ভাগের আলোচ্য বিষয় "নাট্সিওনাল এ্যকোনোমিক" (অর্থাৎ সঙ্ঘগত আর্থিক ব্যবস্থা)। পূর্ব্বের আলোচিত ব্যক্তিগত আর্থিক ব্যবস্থা হইতে এই

ব্যবস্থা পৃথক। এই আলোচনার গোড়ার কথা "বাজার"। বাজারের কথা,—বাজারে বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতিযোগিতা ইত্যাদি আলোচনা করা হইয়াছে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিযোগিতার বিঘ্নস্বরূপ যে সব শক্তি দেখা দেয়,—যথা একচেটিয়া প্রভুত্ব, তাহার বিশ্লেষণও দেখিতেছি। বাজার-বিশ্লেষণের প্রথম কথা প্রতিযোগী শক্তিসমূহের "সমতা"-বিধান। এই সমতার উপর আর্থিক কর্ম্মমণ্ডলের "স্থিতি" প্রতিষ্ঠিত। সমতা ও স্থিতির আলোচনাই "মূল্য" বিজ্ঞানের আসল কথা। সেই সকল কথা গ্রন্থে সুবিস্তৃতরূপে আলোচিত ও হইয়াছে।

মামুলি দ্রব্যের দাম বিশ্লেষণ করিবার পর ওপ্পেনহাইমার মূলধনের কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। প্রত্যেক দ্রব্যেরই এক একটা স্থিতিসমতার অবস্থা আছে সত্য। কিন্তু দ্রব্যগুলার ভিতর পরস্পর সম্বন্ধের ক্ষেত্রে আর একপ্রকার স্থিতিসমতার অবস্থা আসিয়া দেখা দেয়। এই তুলনামূলক এবং আপেক্ষিক স্থিতি-সমতার সম্বন্ধ আলোচনা না করিলে মূল্যবিজ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিতে বাধ্য। ওপ্পেনহাইমার সেই অসম্পূর্ণতা রাখেন নাই। আলোচনা প্রণালী নিম্নরূপ:—প্রথমে গ্রন্থকার ভিন্ন ভিন্ন মালের সঙ্গে তুলনায় প্রত্যেক মালের দাম-সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়াছেন। তাহার পর দেখান হইয়াছে টাকার হিসাবে মালের দাম এবং মালের হিসাবে টাকার দাম। সঙ্গে সঙ্গে টাকার বাজারে কর্জ্জ নেওয়া-দেওয়ার প্রভাব বিশ্লেষিত হইয়াছে। বাজার, তুলনামূলক স্থিতি, বিনিময় ও মূল্য ইত্যাদি যে দুনিয়ায় প্রভাবশালী সেই দুনিয়ার আর্থিক ব্যবস্থা শ্রমবিভাগ নীতির জন্মদাতা। ধনবিজ্ঞানে কাজেই শ্রমবিভাগের কথা এক বড় ঘর অধিকার করে। শ্রমবিভাগ দেখা যায় থাকে প্রধানতঃ দুই দফায়,—প্রথমতঃ, স্থান বা জনপদ হিসাবে, দ্বিতীয়তঃ, ব্যবসায় বা কর্ম্ম হিসাবে। বর্ত্তমান গ্রন্থে মাল সৃষ্টির কাণ্ডে এবং মাল-বিতরণের কাণ্ডে দুই দিকেই শ্রমবিভাগ-নীতির প্রভাব-বিশ্লেষণ অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

গ্রন্থের শেষ কথা "ক্যাপিটালিস্‌মুস" বা পুঁজি-নীতি। বর্ত্তমান জগতে আর্থিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে বড় বড় ধন-পুঁজির তাঁবে। তাহার প্রভাব বাজার-বিজ্ঞানের উপর অতি প্রবল। কি শ্রমবিভাগ, কি মূল্য, সর্ব্বত্রই কর্ত্তকগুলা আত্ম-শাসনের বিরোধী শক্তির উদ্ভব হইয়াছে। আর্থিক কর্ম্মকেন্দ্রের কোনো অনুষ্ঠানই একমাত্র নিজের প্রভাবে পরিচালিত হইতে পারে না। কাজেই পুঁজিপতিদের চিত্তে আর্থিক দুনিয়া সম্বন্ধে নতুন নতুন চিন্তা জাগিয়াছে। মাল কিনিবার ক্ষমতায় জটিলতা প্রবেশ করিয়াছে। কাজে কাজেই মাল-বিতরণের কাণ্ড নেহাৎ সহজ ও সরল নয়। লাভলোকসানের হিসাব করা আজকাল বড় কঠিন। কাজেই মাল সৃষ্টির কাণ্ড যার পর নাই গোলমেলে। মুদ্রাসমস্যা বর্ত্তমান যুগের এক বড়তথ্য। এই সমস্যা আর্থিক দুনিয়ার মাল চলাচল কাণ্ডকে বিশেষরূপেই দুর্ব্বোধ্য করিয়া তুলিয়াছে। তাহার উপর দুচার বৎসরের ভিতর একবার করিয়া জগতের সর্ব্বত্র এক একটা "হ্বির্টশাফ্‌ট্‌স্‌-ক্রিজে" (আর্থিক সঙ্কট দেখা দেয়। ফলতঃ, মাল-সৃষ্টির সঙ্গে মাল-বিতরণের এক বিরোধ আসিয়া পড়ে। "ক্যাপিটালিস্‌মুসের" এই সমস্ত লক্ষণ বিশ্লেষণ করা ওপ্পেনহাইমারের কতকগুলা উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব।

পুঁজিনীতির ক্রমবিকাশ দেখান হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ধনবিজ্ঞান-সেবীদের চিন্তার ধারা কিরূপ ছিল তাহা বুঝান হইয়াছে। ম্যাল্‌থাস, রিকার্ডো ইত্যাদি কেহই বাদ যান নাই। পরবর্ত্তী যুগের জন্য কার্ল মার্ক্‌সকে প্রধান স্তম্ভ বিবেচনা করা হইয়াছে। অবশেষে পুঁজিনীতির বর্ত্তমান স্বরূপ এবং ভবিষ্যৎ গতি সম্বন্ধেও আলোচনা আছে।

ওপ্পেনহাইমারের মতামত যতাইয়া দেখা হইল না। জার্ম্মাণ ধনবিজ্ঞানের কাঠামটা বুঝিবার জন্য সম্প্রতি এক খানা বইয়ের আলোচনা-রীতি ছুঁইয়া রাখা গেল মাত্র।

পাটের কুলী

স্কটল্যাণ্ডের কুলী-প্রতিনিধি

স্কটল্যাণ্ডের ডাণ্ডী নগরে বহুসংখ্যক পাটের ফ্যাক্টরি আছে। সেখানকার কুলীরা কতকগুলা "ট্রেড-ইউনিয়ন বা মজুর-সঙ্ঘে কেন্দ্রীকৃত। এই সঙ্ঘসমূহ সমবেতভাবে ভারতে দুই জন প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিল। তাঁহাদের একজনের নাম জনষ্টন। ইনি বিলাতী পার্ল্যামেন্টের মজুর-পন্থী সভ্য। অপর প্রতিনিধির নাম সাইম। ইনি ডাণ্ডী শহরেরই কতকগুলা কুলী সভার সম্পাদক।

জনষ্টন এবং সাইম ভারতের পাটকলগুলা দেখিতে গিয়াছিলেন। সম্প্রতি তাঁহাদের অনুসন্ধানের ফল প্রকাশিত হইয়াছে। ডাণ্ডীর পাটকুলীদের ট্রেড-ইউনিয়নসমূহের সমবেত সঙ্ঘ এই রিপোর্টের প্রকাশক। পুস্তিকার নাম "একস্‌প্লয়টেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া" অর্থাৎ ভারতে (মজুর) শোষণ (১৯২৬)।

এই রিপোর্টে ভারতীয় মজুরদের জীবনযাত্রা-প্রণালী আমাদের চোখের সম্মুখে খোলা হইয়া পড়িয়াছে। পুস্তিকায় বিবৃত তথ্যগুলা আমাদের ধনবিজ্ঞানসেবীদিগের নিকট বিশেষ মূল্যবান বিবেচিত হইবে। কোনো কোনো অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। কথাগুলা লেখকদের মুখের কথা হিসাবেই বিবৃত করা যাইতেছে।

অনুসন্ধান-প্রণালী

জনষ্টন এবং সাইম বলিতেছেন: "যে সব উৎস হইতে আমরা সাহায্য পাইতে পারি, তাহার কোনো স্থানই আমরা বাদ দেই নাই। একক ভাবে কুলীদের সহিত অথবা তাহাদের সমিতির সহিত আমরা সাক্ষাৎ করিয়াছি। আমরা অনেক গ্রামে গিয়া শ্রমিক সঙ্ঘের উদ্যোগে আহূত বৃহৎ বৃহৎ সভায় বক্তৃতা দিয়াছি। বহু ইয়োরোপীয় ম্যানেজার এবং তাঁহাদের সহকারীদের সহিতও আমরা আলাপ করিয়াছি। ইঁহাদের মধ্যে প্রায় নয় শত জন এক ডাণ্ডীরই লোক। আমরা বহু স্বত্বাধিকারী, ম্যানেজিং এজেণ্ট, খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারক, সমস্ত দলের রাজনৈতিক নেতা এবং গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি। ফ্যাক্টরির ইনস্পেক্টরদিগের পরিদর্শনের সময় আমরা তাহাদের সঙ্গে গিয়াছি। কোনো কোনো কলে আমরা নিজেরাও হঠাৎ গিয়া উপস্থিত হইয়াছি, তথাকার হিসাবপত্র, অংশীদারের তালিকা প্রভৃতিও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। ভারতীয় পাটকল সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত আর, এন, ব্যাণ্ড মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত মজুরদের বেতন বহি দৃষ্টে আমাদের সংগৃহীত অঙ্কগুলির সত্যতা নির্দ্ধারণ করিতেও আমরা সমর্থ হইয়াছি"।

প্রচুর লাভ

কলগুলা কিরূপ লাভ হয় এবং কিরূপ হারে সেখানে বেতন দেওয়া হয়, এই সব আলোচনা করিয়া তাঁহারা একটি হিসাব দিয়াছেন। পাঠকদিগের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে:—

কলের নাম ও বাৎসরিক শতকরা লভ্যাংশ

	ফোর্ট গ্লোষ্টার	গৌরীপুর	কেলভিন্	কিনিসন্
১৯১৬	১০৫	৯০	৮০	১১০
১৯১৭	[illegible]	১৯	১০০	২০০
১৯১৮	১৬০	১৫০	১৫০	২৫০
১৯১৯	[illegible]	২২০	২২৫	২৫০
১৯২০	২০০	২০০	৩০০	৪০০
১৯২১	৬২½	২০	১০২½	১৩৫
১৯২২	১২০	৭০	৭০	১৬০
১৯২৩	১২০	৮০	৮৫	১২০
১৯২৪	১৫৫	১২০	১১০	১৬০

মজুরির হার

	তলব (চারিদিনে সপ্তাহ খাটি ৩৮ ঘণ্টার কাজ)	ব্রিটিশ মুদ্রায় শি	পে
ব্যাকারস্	২।০ (রমণী ও বালক)	৩	৭
প্রিপেয়ারার্স	" "	"	"
রোভার্স	২৸০ (পুরুষ ও রমণী)	৬	[illegible]

তলব			ব্রিটিশ মুদ্রায়	
চারিদিনে সপ্তাহ,				
(খাঁটি ৩৮ ঘণ্টার কাজ)			শি	পে
স্পিনার্স	৪।০	(পুরুষ)	৬	৪
ওয়াইণ্ডার্স	৫৲	"	৭	৬
বিমার্স ও ড্রেসার্স	৪।০	"	৬	৪
উইভার্স	৬৲—১১৲	"	৯ শি—১৫শি	
হেমার্স ও				
সিউয়ার্স	৪৸০	(পুরুষ)	৭	০
বেলার্স	৫॥০		৮	২
জুটবেল				
ক্যারিয়ার্স	৬৲	"	৯	০
কুলী	৩৲	"	৪	৬
দরওয়ান	৪৲	"	৬	০
লাইন সর্দ্দার	৮৲	"	১২	০
রোভিং বিভাগে				
বালকবালিকা	১॥০	(বালক)	২	২
স্পিনিং বিভাগে				
বালকবালিকা	২॥০	(বালক)	৩	৮
টুইষ্টার	৩৶০	(পুরুষ)	৪	৩
সুতার নলী				
পরিষ্কারক (বৃদ্ধ)	১৷০	"	২.	২

মজুরদের দুর্দ্দশা

৩৮ ঘণ্টার খাঁটি কাজের জন্য এইরূপ হীন তলব দেওয়া হয়। আবার অনেক স্থলে ৩৮ ঘণ্টার অতিরিক্তও কাজ করাইয়া লওয়া হয়। আদতে সকালবেলা ৫-৩০ মিনিটের সময় কল খোলে এবং অব্যাহত-গতিতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত কাজ চলে। অর্থাৎ দৈনিক ১৩½ ঘণ্টা কলে কাজ হয়। অনেক কলেই কিন্তু "স্কেপ" হিসাবে ("শিফ্‌ট্") কাজ চলে। তাহা আবার এত গোলমেলে যে, তাহাতে আদত কাজ কতক্ষণ হয়, তাহা ধরা ফ্যাকটরি ইনস্পেক্টরের পক্ষেও বড়ই কষ্টকর। একে ত তলবের হার শোচনীয়, তাহা হইতে আবার সেলামী বাবদ, জরিমানা বাবদ এবং কাবুলীদের নিকট হইতে অগ্রিম প্রাপ্ত টাকার সুদ বাবদ অনেক টাকা কাটা যায়। সাধারণ শ্রমের অবস্থা চূড়ান্ত রকমেই শোচনীয়। অনুসন্ধানকারীরা সংক্ষেপে সমবায়-আন্দোলন, বাসগৃহ, শিক্ষা, শিশুশ্রম প্রভৃতি সমস্যা এবং শ্রমিক-সঙ্ঘ-আন্দোলন সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছেন।

বাঙালী পাট-চাষী ও স্কটল্যাণ্ডের পাট-কুলী

কৃষক অর্থাৎ পাটের চাষী তাহার ফসলের জন্য অতি অল্প মূল্যই পায়। তাহার এবং পাটশিল্পীর মধ্যে অনাবশ্যক কতকগুলি দালাল আছে। তাহারা কাঁচা মালের উপর শুল্ক লয়। কৃষক তাহার মাল বেচে ফড়ের কাছে। ফড়ে বেচে বেপারীর কাছে। বেপারী বেচে আড়তদারের কাছে এবং আড়তদার বেচে গাইটদারের কাছে। তাহার উপর আছে পাট লইয়া "জুয়া খেলা"। ফলে চাষীরা উপযুক্ত মূল্যের চেয়ে কম মূল্য পাইয়া থাকে। তাহাতে পরবর্ত্তী বৎসরে সে পাটের চাষ কমাইয়া অন্য অন্য ফসলের চাষ করিতে বাধ্য হয়। সঙ্গে সঙ্গে পাটের পরিমাণ কমিয়া যায় এবং দামও বাড়ে। অধিকন্তু, ন্যায্য দামে কাঁচা মালের যোগানও অনিশ্চিত হইয়া দাঁড়ায়।

পাটের দাম চড়িলেই ডাণ্ডীর শ্রমজীবীদের মাহিনাও কমাইয়া দিবার দিকে ফ্যাকটরির মালিকেরা ঝুঁকিয়া থাকেন। সুতরাং ন্যায্য ও স্থিরনির্দ্দিষ্ট দামে নিয়মিত পাট যোগানের প্রতি ডাণ্ডীর শ্রমজীবীদের বিশেষ ও প্রধান নজর থাকা আবশ্যক।

সিদ্ধান্ত এবং মতামত

উপসংহারে জনষ্টন এবং সাইম বলিতেছেন :—"ভারতবর্ষে পাটের কুলীদের অবস্থা সম্বন্ধে আমরা একটি বিশ্বাস-যোগ্য ও যথার্থ বিবরণ যথাসম্ভব সংক্ষেপে দিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি তাহার চুম্বক দিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব।

"১। ডাণ্ডীতে যে যে শ্রেণীর মাল তৈয়ারি হয়, তাহাদের অনেকগুলির সঙ্গে গৌণ ও মুখ্য ভাবে ভারতে প্রস্তুত পাটের কোনো প্রতিযোগিতা নাই।

"২। ভারতবর্ষে পাট-শিল্পে প্রচুর লাভ হয়। তথাপি শ্রমিকদের মাহিয়ানা ও জীবন-যাত্রা-প্রণালী শোচনীয়।

"৩। ব্রিটিশ ও বিদেশী মূলধনের অধিকারিগণ ভারতীয় শ্রমিকদের অল্প মাহিয়ানা ও অর্দ্ধ-কৃষি-দাসের অবস্থা দেখিয়া

ভাগীরথীর ধারে বিস্তৃত ও উন্নত, অবে পাট-শিল্পের ব্যবস্থা করিতে স্বভাবতঃই অগ্রসর হইয়াছেন।

"৪। সুতরাং শুধু ভারতীয় শ্রমিকদের দিক হইতে নহে, ডাণ্ডীর শ্রমিকদের স্বার্থের দিক হইতেও ভারতীয় শ্রমিকদের মাহিয়ানা এবং সামাজিক অবস্থা আর হীন ভাবে রাখিতে দেওয়া উচিত নহে। একদিন কিরূপ প্রতিযোগিতা উপস্থিত হইতে পারে জানি না। কিন্তু সেই প্রতিযোগিতায় কোনো দেশের শ্রমিকরা যাহাতে অনাহারে না মরে ও দুঃখকষ্টে না পড়ে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। পরলোকগত লর্ড কার্জ্জন হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক ভারতবাসীর গড়ে বাৎসরিক আয় দুই পাউণ্ড। তৎপরে সম্প্রতি যে হিসাব হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, তাহার আয় তিন পাউণ্ড পনের শিলিং হইতে পাঁচ পাউণ্ড পর্য্যন্ত। এই হিসাব বোম্বের শ্রমকার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। সম্ভবতঃ, যদি গড়ে পাঁচজন ব্যক্তি-বিশিষ্ট প্রত্যেক ভারতীয় পরিবারের আয় চারি পাউণ্ড ধরা যায়, তাহা হইলে অনেকটা ঠিক হয়। তাহার অর্থ বুঝায় এই যে, বৎসরে কুড়ি পাউণ্ড অথবা সপ্তাহে একটি পরিবারের আয় দাঁড়ায় আট শিলিং বা ছয় টাকা। অতি সাদাসিধা ভাবে জীবন-ধারণও যে ইহাতে অসম্ভব, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। শুনা যায় ভারতবর্ষে ন্যূনকল্পে প্রায় চল্লিশ লক্ষ লোক এক বেলা খাইয়া কোনো রকমে বাঁচিয়া আছে।

"৫। ভারতের মজুরদিগকে বাঁচাইবার জন্য এবং তাহার অবস্থার উন্নয়ন ও ক্রয়-ক্ষমতা বাড়াইবার উদ্দেশ্যে (তাহাতে ব্রিটেনের রপ্তানি মাল উৎপাদকদিগের উপকারই হইবে) একটি শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন গড়িয়া তোলা আবশ্যক। প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার আবশ্যক। সমবায় সমিতিগুলি প্রয়োজনীয়। এই তিন প্রধান বিষয়ে ভারতীয় মজুরদিগকে ব্রিটিশ মজুরদের যথার্থ সাহায্য করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই তাঁহাদের ভারতীয় ভাই-বোনেরা দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে পারিবে।

"৬। কাঁচা পাট লইয়া "জুয়াখেলা" দূর করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করা আবশ্যক। চাষীদের মধ্যে সমবায়-সমিতি-স্থাপন করাও বিশেষ দরকার। তাহা হইলেই অনর্থক দালালের দল উঠিয়া যাইবে এবং বাজার-দরও বাঁধা-বাঁধির ভিতর আসিয়া পড়িবে।"

বস্তুনিষ্ঠ অনুসন্ধান

জনষ্টন এবং সাইমের পুস্তিকা বাস্তব-তথ্যে ভরপুর। বাংলায় সমস্তটার তর্জ্জমা হইলে শিক্ষিত অশিক্ষিত এবং অর্দ্ধশিক্ষিত সকল বাঙালীরই উপকার হইবে। বিদেশী কুলীদের প্রতিনিধিরা আসিয়া আমাদের কুলীদের দুরবস্থা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। এই অনুসন্ধান-কার্য্যে তাঁহারা কলের মালিকদের নিকট হইতে যে সকল সুযোগ পাইয়াছেন তাহা ভারত-সন্তানের পক্ষে দুষ্প্রাপ্য। কাজেই আর্থিক ও সামাজিক তথ্য-সংগ্রহের তরফ হইতেও রিপোর্ট-টা যার পর নাই মূল্যবান।

নবযুগের নবীন বাণী

উপসংহারে লেখকেরা যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহার ভিতর অনেক দামী কথা আছে। ৪ ও ৫ নং দফায় উল্লিখিত কথাগুলির ভিতর নবযুগের এক নবীন বাণী শুনিতে পাইতেছি। মজুরেরা মজুরদের দরদ বুঝিয়াছে। সাদা লোকেরা কটা চামড়ার লোকের সুহৃৎ হইতে পারে,—ইহা অস্বাভাবিক নয়। ইহার ভিতর কোনো বুজরুকি বা জটিলতাময় কারচুপি সন্দেহ করিবার কারণ নাই। স্কটল্যাণ্ডের মজুরেরা ভারতীয় মজুরদের স্বপক্ষে স্কটল্যাণ্ডের পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইতে প্রস্তুত। ইহাই হইতেছে বর্ত্তমান পুস্তকের ভিতরকার কথা।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

জীবন-বীমা-বিজ্ঞান

শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র পাল, এম্-এ, বি-এল্, ইন্শিওর‍্যান্স এজেন্ট

বর্ত্তমান জগতে বীমার স্থান খুব বৃহৎ। বীমার মধ্যে জীবন-বীমাই প্রধান। পাশ্চাত্য সমাজে জীবন-বীমা এত সুখ-শান্তি আনয়ন করিয়াছে, সমাজের দুঃখ-দৈন্য লাঘব করিতে এতটা সহায়তা করিয়াছে যে, আজকাল ইহা অবিচ্ছিন্ন ভাবে পাশ্চাত্য সমাজের অঙ্গীভূত হইয়া রহিয়াছে। আমাদের সমাজেও শিক্ষিত মহলে ইহা ধীরে ধীরে প্রবেশ-লাভ করিতেছে। ইংরেজের আগমনের পর হইতে এদেশে আমরা একদিকে যেমন রেল, জাহাজ, কল-কারখানা প্রভৃতি বহু জিনিষ আমদানি করিতেছি, অপরদিকে সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের দেশীয় কতকগুলি সামাজিক অনুষ্ঠানও আমাদের সমাজে প্রবেশ করিতেছে। জীবন বীমা তাহাদের অন্যতম।

নূতন কোনো ভাব সমাজে প্রবেশ করিতে দিবার পূর্ব্বে সমাজ-হিতকামিগণ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া থাকেন— উহাদ্বারা সমাজের কি কি ইষ্ট সাধিত হইতে পারে, কোনো অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা আছে কি না ইত্যাদি। সুতরাং সমাজে জীবনবীমার অবাধ প্রবেশে অনুমতি দিবার পূর্ব্বে আমাদেরও ইহার সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করা কর্ত্তব্য। দুঃখের বিষয়, এই আলোচনা এদেশে বিশেষ কিছু হয় নাই। অথচ আমরা অনেকেই ইহার সম্বন্ধে অতি ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া ইহার প্রতি বড়ই অবিচার করিতেছি। জীবনবীমা বিষয়ে আলোচনা করিতে যাইয়া অনেক বি-এ, এম্-এ উপাধিধারী বন্ধুর মুখেও এমন সব অদ্ভুত উক্তি শুনিয়াছি যাহাতে হাস্য-সম্বরণ করা কঠিন হয়।

পাশ্চাত্যদেশে জীবনবীমা বিষয়ে এত আলোচনা হইতেছে যে, ইহা আজকাল একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞানে পরিণত হইয়াছে। আমাদের দেশে অতি অল্পলোকেই বোধ হয় অবগত আছেন যে, ইঞ্জিনিয়ারিং, জ্যোতিষ-বিদ্যা, নৌবিজ্ঞান প্রভৃতির ন্যায়, জীবনবীমা-বিজ্ঞান ও উচ্চ গণিতের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা অবগত নহি বলিয়াই, আমার মনে হয়, আমরা জীবনবীমার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি না। সুতরাং এই বীমা-বিজ্ঞানের আলোচনা হওয়া কর্ত্তব্য। অবশ্য ইহা শিক্ষা করিতে অনেক সময়, পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। আমরা এই প্রবন্ধে এবিষয়ে শুধু একটু আভাষ দিতে চেষ্টা করিব।

যখনই কেহ বীমা করেন তখন তাহার এবং বীমা কোম্পানীর মধ্যে একটা চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিপত্র মাত্রেই এক পক্ষ প্রতিপক্ষকে কিছু দিয়া থাকেন এবং প্রতিদানে প্রতিপক্ষ হইতে কিছু পাইয়া থাকেন। দেখা যাউক বীমাকারী এবং বীমা কোম্পানীতে কি আদান প্রদান হইয়া থাকে। একটা উদাহরণ দিতেছি। মনে করুন মাধব নামক ৩০ বৎসর বয়স্ক একজন যুবক কোনো বীমা-কোম্পানীতে বীমা করিল। সর্ত্ত এই নির্দ্দিষ্ট হইল যে, মাধব যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে ততদিন বার্ষিক ৩০৲ টাকা করিয়া কোম্পানীতে জমা দিবে। পক্ষান্তরে মাধব মরিবামাত্র তাহার উত্তরাধিকারী কোম্পানী হইতে ১০০০৲ পাইবে। এখানে মাধবের প্রদান এবং আদান কি? প্রদান—যতদিন বাঁচিবে বার্ষিক ৩০৲ করিয়া কোম্পানীকে দিবে। আদান—মরিবামাত্র মাধবের ওয়ারীস কোম্পানী হইতে ১০০০৲ পাইবে। মাধব যত বেশী দিন বাঁচিবে তাহাকে তত অধিক পরিমাণ টাকা চাঁদা দিতে হইবে এবং তাহার উত্তরাধিকারীরও ১০০০৲ টাকা পাইতে তত অধিক বিলম্ব হইবে। সুতরাং এই ব্যাপারে উভয় পক্ষের লাভ-লোকসান মাধবের মৃত্যুর উপর নির্ভর করিতেছে। কিন্তু মাধব কবে মরিবে তাহার কোনো স্থিরতা নাই। যে কার্য্যে লাভ-লোকসান সম্পূর্ণ অনিশ্চিত ঘটনার উপরে নির্ভর করে তাহাকে আমরা "ফুর্ত্তি" বা চলিত কথায় "জুয়াখেলা" বলিয়া থাকি। অনিশ্চয়তারও পরিমাণ আছে এবং ইহা ঘটনাভেদে কম-বেশী হইয়া থাকে। মনে করুন, আজ

দিনটা বেশ খট্‌খটে, উপরে নীল আকাশ রৌদ্রে উজ্জ্বল দেখাইতেছে। আগামী কল্য বৃষ্টি হইবে কি না জিজ্ঞাসা করিলে, পৌষ মাসে যেরূপ জোরের সহিত 'না' বলিতে পারিবেন, আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে সেরূপ পারিবেন কি? এখানে কিন্তু মাধব কবে মরিবে এ বিষয়ে অনিশ্চয়তা খুবই বেশী। সুতরাং মাধবের পক্ষে এই বীমা-কার্য্যটি জুয়াখেলার ন্যায়ই বোধ হইতেছে। বস্তুতঃ, আমার দুই এক জন ভক্তিভাজন বন্ধু, যাঁহারা সবিশেষ না ভাবিয়া কোনো উক্তি করেন না, এবং যাঁহাদের উক্তি আমি সর্ব্বদাই বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা করিয়া থাকি, তাঁহারা বীমা-ব্যাপারে "জুয়া"রই রূপ দেখিতে পান, এবং জুয়া নীতি-শাস্ত্রমতে সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য বলিয়া তাঁহারা বীমাকে আমাদের সমাজে সাদরে বরণ করিয়া লইতে অনিচ্ছুক।

আমি প্রথমেই বলিয়াছি বিলাতী সমাজে এই বীমা-প্রথা অশেষ সুখ-শান্তি আনয়ন করিয়াছে। আমাদের সমাজেও বীমা সেই রূপ সুখ শান্তি দিতে পারে। আজকাল আমাদের দেশনায়কগণ পল্লীসংগঠন-কার্য্যে মনোযোগ দিয়াছেন। সুতরাং এই পল্লীসমাজ-সংগঠনে বীমা কতটা সহায়তা করিতে পারে তাহা তাঁহাদিগকে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। জুয়াখেলার সহিত ইহার কতটুকু সামঞ্জস্য আছে এবং তাহা হইতে ইহার পার্থক্যই বা কোথায় তাহা ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে বারান্তরে বিশদভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

মাধবের দিক্ হইতে আলোচনা করিয়া দেখা গেল যে, ব্যাপারটা তাহার পক্ষে জুয়াখেলার ন্যায় দেখাইতেছে। আমি পরে দেখাইব যে, যদিও বাহ্যতঃ এরূপ দেখাইতেছে বটে, বস্তুতঃ, জুয়ার কোনো প্রকার কুভাব ইহার মধ্যে নাই। এক্ষণে বীমা কোম্পানীর দিক্ হইতে এই আদান-প্রদানের ব্যাপারটা আলোচনা করা যাউক। মাধব যাহা দিবে, কোম্পানী তাহা পাইবে, এবং মাধব যাহা পাইবে, কোম্পানীকে তাহা দিতে হইবে। মাধব বেশীদিন বাঁচিয়া থাকিলে বেচারীকে দিতেও হইবে বেশী টাকা, অথচ তাহার ওয়ারীস পাইবে কম। কেননা, যতই দিন যাইবে কোম্পানীর দেয় ১০০০৲ টাকার "বর্ত্তমান মূল্য" ততই কমিয়া যাইবে। এক্ষণে দেখিতে হইবে কোম্পানীও কি মাধবের সঙ্গে একপ্রকার মুর্ষি খেলায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। অথবা কোনো হিসাব আছে কি—যাহা অবলম্বন করিয়া চাঁদার পরিমাণ ৩০৲ নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে?

এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, কোম্পানীতে মাধব একাকী-ই বীমা করে নাই। এরূপ আরও সহস্র সহস্র লোক বীমা করিয়াছে এবং ভবিষ্যতে করিবে। ধরুন মাধবের ন্যায় ৩০ বৎসর বয়স্ক বীমাকারী যুবক এই কোম্পানীতে দশ হাজার আছে। যদিও আমাদের পূর্ব্বোক্ত মাধব আগামী বৎসর মরিবে কি না বলা চলে না, তবু এই দশ হাজার বীমাকারীর মধ্যে আগামী বৎসর মৃত্যু-সংখ্যা কত হইবার সম্ভাবনা তাহার একটা মোটামুটি অনুমান করা যাইতে পারে। কিরূপে? তাহা একটা উদাহরণ দিয়া দেখাইতেছি।

একটি মুদ্রাকে উর্দ্ধে নিক্ষেপ করিলে উহা ঘুরিতে ঘুরিতে পুনরায় মাটিতে পড়িবে। মুদ্রাটির কোন্ পিঠটা উপরে পড়িবে? মাথার দিক্‌টা (যে দিকে রাজার ছবি অঙ্কিত আছে) উপরে পড়িবার যতটুকু সম্ভাবনা আছে, পেছনের দিক্‌টার ও উপরে পড়িবার ততটুকু সম্ভাবনাই রহিয়াছে। তাহা হইলে কোন্ দিক্ উপরে পড়িবে তাহা কিরূপে বুঝিব? এখানেও দেখিতেছি অনিশ্চয়তা। আমাদের জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা হইতে এই অনিশ্চয়তা আসে। যদি জানিতাম কি রকম বেগে মুদ্রাটি উর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত হইবে, বায়ুর প্রতি-রোধক শক্তি কত ইত্যাদি, তাহা হইলে ঠিক বলা যাইত মুদ্রাটির কোন্ দিক্ উপরে পড়িবে। এই অনিশ্চয়তাকে আমরা চলিত ভাষায় বলি "দৈব"। দৈবক্রমে যে-কোনো এক দিক্ উপরে পড়িবেই।

কাজেই 'দৈব' বলিয়া একটা শক্তি মানিয়া লইতে হয়। ইহার প্রভাব বশতঃ আমাদের জ্ঞানে অসামঞ্জস্য দেখা দেয়। যদিও সাক্ষাৎভাবে এই শক্তিকে অতিক্রম করিতে পারি না, তবু কৌশলে ইহার হাত এড়াইতে পারি। মুদ্রাটি দুইবার উর্দ্ধে নিক্ষেপ করিলে একবার মাথার দিক্ এবং একবার পশ্চাদ্দিক্ উপরে পড়া উচিত। কিন্তু কার্য্যতঃ অনেক সময়ে তাহা হয় না। দুইবারই মাথার দিক্ অথবা দুই বারই পশ্চাদ্দিক্ উপরে পড়িতে পারে। এখানেও দৈব ক্রিয়া করিতেছে। কিন্তু দশ হাজার বার নিক্ষেপ করিয়া কত বার মাথা উপরে পড়ে এবং কত বার পশ্চাদ্দিক্ উপরে পড়ে তাহা গণনা করুন। দেখিবেন এই দুই

সংখ্যা অনেকটা কাছা-কাছি। এরূপে নিক্ষেপের সংখ্যা যতই বাড়ান যাইবে এই দুই সংখ্যা ততই অধিকতর কাছা-কাছি হইতে থাকিবে এবং দৈবশক্তির ক্রিয়া ততই কম পরিদৃষ্ট হইবে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, যে ঘটনার উপর "দৈব" ক্রিয়া করিতেছে বলিয়া কথিত হয়, তাহাই অনেকবার ঘটিতে দেখিলে তাহাতে দৈবের প্রভাব খুব অল্পই উপলব্ধি হয়।

এক্ষণে দেখা যাউক কি করিয়া মোট মৃত্যু-সংখ্যা অনুমান করিতে পারি। আমাদের মৃত্যু হয় কেন? ইহার দুইটি কারণ বর্ত্তমান। প্রথম কারণ এই যে, আমাদের অন্তর্নিহিত একটা নির্দিষ্ট শক্তি আছে। তাহার দ্বারা প্রতি মুহূর্ত্তেই আমরা বহির্জ্জগতের আক্রমণকে প্রতিরোধ করিতেছি। কাজেই প্রতিমুহূর্ত্তেই এই শক্তি অল্পে অল্পে ক্ষীণ হইতেছে। অবশেষে এত শক্তি কমিয়া যায় যে, আমরা বহির্জ্জগতের শক্তিকে নিরোধ করিতে অক্ষম হই।

দ্বিতীয় কারণ দৈব-প্রভাব। আমাদের মাধব হয়ত গাড়ী-চাপা পড়িয়া অথবা অন্য কোনোরূপ দুর্ঘটনা বশতঃ যখন তখন মরিয়া যাইতে পারে। এই দৈব-প্রভাব আছে বলিয়াই মাধবের মৃত্যুকাল এত অনিশ্চিত। কিন্তু দশ হাজার মাধবের মধ্যে এই দৈব-প্রভাব খুবই কম পরিলক্ষিত হইবে। কাজেই কোন্ ব্যক্তি বিশেষ কবে মরিবে তৎসম্বন্ধে নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী করিতে না পারিলেও জন-সাধারণের মৃত্যুর একটা হার নির্ণয় করিয়া লওয়া যাইতে পারে। সাধারণতঃ এই মৃত্যু-হারের বড় কিছু পরিবর্ত্তন ঘটে না। দেশব্যাপী মহামারী হইলে এই হারের ইতর-বিশেষ হয় বটে, কিন্তু আকাশ-পাতাল পরিবর্ত্তন প্রায় কখনই ঘটে না।

মৃত্যুর হার যদি পাওয়া যায়, এবং এই হারের যদি অত্যধিক হ্রাস-বৃদ্ধি না হয়, অর্থাৎ ভবিষ্যতে মৃত্যু সংখ্যা যদি অনেকটা এই হার অনুযায়ীই হয়, তাহা হইলে জীবন বীমা অফিসের হিসাব অনেকটা সহজ হইয়া পড়ে।

গরিবের সঞ্চয় ও ডাকঘরের সেভিংস্ ব্যাঙ্ক

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়, বি, এ

বাংলার গুটিকয়েক বড় বড় শহরের কথা যদি ছাড়িয়া দেই তাহা হইলে চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে হাজার হাজার গরিব বাঙ্গালী গৃহস্থ—হাড়ী, বাগদী, ধোপা, নাপিত, হাটুয়া, মজুর, ব্যবসায়ী, কৃষক, জেলে, জোলা, কামার, কুমার, চাকরে ইত্যাদি। তাঁহারা যার যার সংসারের খাইখরচ, অসুখ-বিসুখ ও পার্ব্বণাদির ন্যায্য খরচ করিয়া কিছু বাঁচাইতে পারেন না। অনেক সংসারই ঋণের দায়ে ডুবিয়া থাকে। অবশ্য কোনো কোনো সংসারে মাসে দুই চারি আনাও যে জমা হয় না তাহা নহে। প্রত্যেক সংসারের এই সামান্য সঞ্চয় একত্র করিলে এক একটা পল্লীগ্রামে বা ছোট ছোট শহরের মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ নেহাৎ কম হয় না। কিন্তু এই সঞ্চিত অর্থটা কোথায় থাকে? কিভাবে খাটে? ইহাদ্বারা টাকার মালিকের কোনও উপকার হয় কি? দেশের ধন বাড়ে কি?

যদি পল্লীগ্রামে কেহ সামান্য কিছুও জমাইতে পারে তাহা হইলেও উহা নিরাপদে রাখিয়া সকল প্রকারে লাভজনক উপায়ে খাটাইবার সুব্যবস্থা নাই। পল্লীগ্রামে (১) কেহ কেহ সঞ্চিত টাকা ঘরেই ফেলিয়া রাখেন, (২) কেহ কেহ উহা আত্মীয়স্বজন, পাড়া-পড়সীদের দুঃসময়ে বিনাসুদে ধার দেন, (৩) কোনো কোনো ব্যক্তি গ্রামেই অপরের নিকট সুদে লাগান, (৪) অনেকে ডাকঘরের সেভিংস্ ব্যাঙ্কে জমা রাখেন, অথবা "ক্যাশ সার্টিফিকেট" কিনিয়া থাকেন।

যাঁহারা টাকা ঘরে ফেলিয়া রাখেন তাঁহাদের নিজেদেরও কিছু লাভ হয় না এবং দেশেরও কোনো উপকার হয় না।

দুঃসময়ে বিনাসুদে আত্মীয়-স্বজনকে টাকা ধার দিলে অনেকের উপকার হয় বটে, কিন্তু মানুষের মন এখনো যেরূপ অবস্থায় আছে, তাহাতে টাকা খাটাইবার এই উপায় বেশী মানুষকে সঞ্চয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করিতে পারে না। মানুষের

স্বাভাবিক প্রবৃত্তি স্বার্থ-পূরণ। সে যে কষ্ট করিয়া, বর্ত্তমানে ভোগ্য বস্তু ভোগ না করিয়া তাহা ভবিষ্যতে ক্রয় করিবার জন্য অর্থ-সঞ্চয় করিয়া রাখিবে তাহাতে তাহার লাভ কি? কাজেই মানুষের স্বার্থের অনুকূল না হইলে সে যে ভোগে সংযত হইয়া সঞ্চয়ে মন দিবে তাহা বেশী আশা করা যায় না।

যাঁহারা গ্রামে সুদে টাকা লাগান, তাঁহারা সকলেই বলিয়া থাকেন—"সুদ তো দূরের কথা, আসল আদায় করাই ঝকমারি। উহাতে মেহনৎ ও তক্‌লিব্ যথেষ্ট এবং আসল মারা যাইবার যেরূপ ভয় তাহাতে বেশী সুদের লোভ থাকিলেও ঐরূপে টাকা লাগাইতে আর মন সরে না।" লোকে চায় একটা নিরাপদ লাভ-জনক ব্যবস্থা, যাহাতে ঝুঁকি বা ঝক্‌মারি কম।

এই জন্যই পল্লী-বাসীর মধ্যে ডাকঘরের সেভিংস্ ব্যাঙ্কে আমানতকারীর সংখ্যা বেশ বাড়িয়া যাইতেছে। তবে তাঁহাদের ঠিক কত টাকা ইহাতে থাকে তাহা বলা শক্ত। সমগ্র ভারতে এবং বাংলা ও আসাম প্রদেশে ডাকঘরের সেভিংস্ ব্যাঙ্কে গত তিন বৎসরে মোট আমানতের পরিমাণ নিম্নলিখিতরূপ :—

সমগ্র ভারত

	টাকা	আনা	পাই
১৯২১-২২	৪৩,৬৫,৩২১৯০	।০	৮
১৯২২-২৩	৪২,৪১,৩৫,৪২৩	/০	১১
*১৯২৪-২৫	৪৫,৩৪,২০,১৮৩	৸৶০	৮½

বাংলা ও আসাম প্রদেশ

	টাকা	আনা	পাই
১৯২১-২২	৯,৩২,৯১,৭৬৪	।০	৬
১৯২২-২৩	১০,২৯,৫৫,৩২০	।৶০	৯
১৯২৪-২৫	১১,৮৯,৩০,৪৩৮	৸০	৩

ইহার মধ্যে কতটা বড় বড় শহরে লোকের এবং কতটা মফস্বলীয়াদের তাহা বলা যায় না। যাঁহারা অভিজ্ঞ তাঁহারা কতকটা অনুমান করিয়া লইতে পারেন। আমার মনে হয় ইহাতে ১/৩ ভাগ গরিবের সঞ্চয়। ইহা ছাড়া, ক্যাশ্‌সার্টিফিকেটের মোট বিক্রয় নিম্নলিখিতরূপ :—

সমগ্র ভারত

১৯২১-২২	৪৭,৯৮,৪৫১।০	টাকা
১৯২২-২৩	৭০,০০০৮৩॥০	"
১৯২৪-২৫	৬,০৯,৯৪,৪৫৬॥৶০	"

বাংলা ও আসাম প্রদেশ

১৯২১-২২	১১,৪৪,৭৫২॥০	টাকা
১৯২২-২৩	১৯,৮৯,১৫৩৸০	"
১৯২৪-২৫	১,২৩,১৭,৬১৩৸০	"

ইহার খরিদ্দারের মধ্যে পল্লীবাসী কয়জন তাহা বলা শক্ত। আমার অভিজ্ঞতা হইতে মনে হয় আন্দাজ ১/৫ ভাগ টাকা তাঁহাদের আমানত।

পল্লীগ্রামে গরিবের সঞ্চিত অর্থের এই যে কতকটা খোঁজ পাওয়া গেল ইহার মোট পরিমাণ একেবারে হেলা করিবার নহে। পল্লীগ্রামে ছোট ছোট ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিয়া যদি এই টাকাটা এক করিতে পারা যায়, এবং তাহা সতর্ক ভাবে ব্যাঙ্কের রীতি অনুসারে খাটান যায়, তবে দেশের ধনাগমের ও সুবিধা হয় এবং গরিব আমানতকারীদিগেরও লাভ হয়। এই সকল ব্যাঙ্ক, আমানত লওয়া এবং ধার দেওয়া ছাড়াও বড় বড় শহর হইতে পল্লীগ্রামে আমদানি মালের ও পল্লীগ্রাম হইতে রপ্তানি মালের দাম শোধ দিবার ভার লইতে পারে। বর্ত্তমানে এই কাজের কতকটা হয় ডাকঘরের ইন্সিওর (বীমা) চিঠির সাহায্যে। হুণ্ডীও চলিতে পারে। এই সব ব্যাঙ্কের দৌলতে পল্লীগ্রামের লোকেরা চেকের সহিত ক্রমশঃ সুপরিচিত এবং তাহার ব্যবহারে অভ্যস্ত হইতে পারেন। পল্লীতে যথেষ্ট পুঁজি নাই বলিয়া যাঁহারা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ব্যবসা-বাণিজ্যে সুবিধা করিতে পারেন না, তাঁহারাও ইহাতে কতকটা সাহায্য করিতে পারেন। মোট কথা, ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠার যতগুলা সুবিধা তাহা সবই ভোগ করা যাইতে পারে। কিন্তু ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া "ব্যাঙ্ক" নামধারী মামুলী লোন্ আফিস্ খুলিলে চলিবে না।

আপাততঃ আমাদের দেশে পল্লীগ্রামে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার অসুবিধা আছে অনেক। যাঁহারা ব্যাঙ্কের রহস্য বুঝেন তাঁহারা জানেন যে, পরস্পর বিশ্বাসের উপরই উহার ভিত্তি। ব্যাঙ্কের কাজ বিশ্লেষণ করিলে উহার পরতে পরতে পাওয়া যাইবে কেবল বিশ্বাস। আমরা যতই উঁচু গলায় নিজেদের

* ভারতীয় ডাকবিভাগের বার্ষিক বিবরণী ১৯২১-২২, ১৯২২-২৩, ১৯২৪-২৫ খৃষ্টাব্দের। ১৯২৩-২৪ সনের বিবরণী হাতের সামনে নাই বলিয়া সংখ্যা দেখান গেল না।

উন্নত, সভ্য, ধার্ম্মিক, ও স্বরাজ-লাভের উপযুক্ত বলিয়া গলাবাজী করি না কেন, বর্ত্তমান কালে সকল প্রকার আর্থিক উন্নতির ভিত্তি—পরস্পর বিশ্বাস এবং সামাজিক "পসার" (ক্রেডিট)—আমাদের যথেষ্ট আছে বলিয়া বুকে হাত দিয়া বলিতে পারি কি? এমন অবস্থায় পাড়াগাঁয়ে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার কাজটা খুব সহজ নয়। পল্লীগ্রামে কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার অভিজ্ঞতা যাঁহাদের আছে, তাঁহারা এই কথা ভাল করিয়াই স্বীকার করিবেন।

এই সব অসুবিধা এড়াইয়া আর এক উপায়ে পল্লীবাসীদিগকে ব্যাঙ্কের আওতায় আনিয়া ফেলা যায়। তাহা ডাকঘরের সাহায্যে। ডাকঘরে সেভিংস্ ব্যাঙ্কের প্রথা সৃষ্টি করিয়া দিয়া সুদূর পল্লীর গরিবের মনেও ব্যাঙ্কের বীজ বপন করা হইয়াছে। তাহার পর "ক্যাশসার্টিফিকেটের" চলন হওয়াতে পল্লীবাসীরা মেয়াদি আমানতের আওতায়ও আসিয়াছেন। এখন আমাদের দেশের ডাকঘরের সেভিংস-ব্যাঙ্কের আইনটা বদলাইয়া লইলেই পাড়া-গাঁয়ে খুব কম খরচে ব্যাঙ্কের কাজ আরম্ভ হইতে পারে। লোকেরও আপন ভাইয়ের উপর যে বিশ্বাস তাহার চেয়ে বেশী বিশ্বাস আছে ডাকঘরের উপর। সুতরাং জামীন আছে ঠিক। এখন প্রশ্ন এই,—ডাকঘরের সেভিংসব্যাঙ্কের আইনটা কি ভাবে পরিবর্ত্তন করিলে পল্লীবাসীদিগকে ব্যাঙ্কের আওতায় আনা যায়?

আমার মনে হয় মোটামুটি নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করা যাইতে পারে:—

(১) ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কের সুদ বর্ত্তমান হারের চেয়ে কিছু বেশী করা উচিত।

(২) সপ্তাহে একদিনের বদলে অন্ততঃ দুইদিন টাকা উঠাইবার ক্ষমতা দেওয়া উচিত।

(৩) ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কের আমানতকারীদিগকে আমানতের উপর চেক্ কাটিবার ক্ষমতা দেওয়া উচিত। আপাততঃ, পুরা টাকার কমে চেক্ কাটা চলিবে না—এইরূপ আইন হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

(৪) ডাকঘরের উপরে উক্তপ্রকার চেক্ কাটিয়া আমানতকারীকে তাহার নিজ হিসাব হইতে অপরের হিসাবে টাকা চালান করিবার ক্ষমতা দেওয়া উচিত।

(৫) আপনার নামে যদি ডাকঘরের সেভিংস্ ব্যাঙ্কে হিসাব থাকে, তাহা হইলে ডাকঘরের সেভিংস্ ব্যাঙ্কে যাহাদের হিসাব আছে তাহাদের যে-কেহকে যে-কোনো ডাকঘরে আপনার নামে আপনার হিসাবে টাকা জমা দিবার ক্ষমতা দেওয়া উচিত।

(৬) "পাস"-বই আমানতকারীর মাতৃভাষায় লিখিত হওয়া উচিত। বর্ত্তমানেও এইরূপ আইন আছে বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা পালিত হয় না।

এইগুলি সবই যে আমার মন-গড়া, অসম্ভব কথা বলিলাম তাহা নহে। অষ্ট্রিয়া, সুইটসারল্যাণ্ড, জার্ম্মানি, ফ্রান্স ইত্যাদি দেশের ডাকবিভাগে এই প্রণালীর বন্দোবস্ত হইয়াছে এবং এখনো চলিতেছে। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, ডাকঘরের সেভিংসব্যাঙ্ক আইনের এই পরিবর্ত্তনদ্বারা দেশের আর্থিক উন্নতির একটা কত দৃঢ় ভিত্তি গাড়া যাইতে পারে।

বঙ্গের "সমবায়"-সাধক অম্বিকাচরণ উকীল

প্রায় আড়াই বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার সুসন্তান, কর্ম্মবীর অম্বিকাচরণ উকীল মহাশয়ের দেহত্যাগ হয়। তিনি দেশের জনসাধারণের নিকট বিশেষ পরিচিত না হইলেও সুধী-সমাজে প্রত্যেকের নিকট তাঁহার নাম আজও সমাদৃত ও সম্মানিত হইয়া থাকে। যে মূল মন্ত্র তাঁহার সমগ্র জীবনের [illegible]কে প্রবলভাবে প্রবাহিত করিয়াছিল, তাঁহার সমস্ত অর্থ, জ্ঞান ও শক্তি যে মন্ত্রের সাধনায় নিয়োজিত হইয়াছিল, আজ তাঁহাদের এই দুর্দ্দিনে সেই মন্ত্রই একমাত্র ইষ্টমন্ত্র জানিয়া অম্বিকাবাবুর কর্ম্মজীবনের দুই চারিটি কথা লিখিতে যাইতেছি।

অর্থনীতি-শাস্ত্রবিৎ অম্বিকাবাবু ছাত্রাবস্থা হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, দরিদ্রতাই দেশের দুরবস্থার প্রথম

ও প্রধান কারণ, এবং সমগ্রদেশ-গ্রাসী এই বিশালকায় দৈত্যের কবল হইতে মুক্তিলাভই দেশের যথার্থ মুক্তি ও উন্নতি। এই মুক্তিলাভের একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায় "কো-অপারেশ্যন" বা সমবায়। ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের বাণী, তাঁহার সর্ব্ব চিন্তার ও কর্ম্মের বিশেষ ধারা। ছাত্রজীবন হইতেই তিনি সমবায়-মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত ঐ মন্ত্রের একনিষ্ঠ সাধনায় কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন। ১৮৯০ সনে বিহার ন্যাশন্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত ভগবতীচরণ দাশ মহাশয়ের সহিত একত্র হইয়া অম্বিকাবাবু ছাত্রদের সুবিধার জন্য "কো-অপারেটিভ ষ্টোর" স্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠান-স্থাপন তাঁহার কর্ম্ম-জীবনের প্রথম প্রচেষ্টা। ইহার পর হইতে জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত সমবায়-নীতির বহু প্রতিষ্ঠান স্থাপনে তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য নিয়োগ করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতার "পাইওনিয়ার কোম্পানী," "ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশ্যন সোসাইটি", "কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন", "স্বদেশী ভাণ্ডার", "ধর্ম্ম সমবায়" এবং ঢাকার "উকীলস্ ইউনিয়ন" ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান সুপরিচিত।

এই প্রতিষ্ঠানগুলি তাঁহার কর্ম্মজীবনের একাংশের ক্ষুদ্র অসমাপ্ত তালিকা। তাঁহারই স্থাপিত কলিকাতার "হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্‌শিওর্যান্স সোসাইটি" ও মাদ্রাজের "ট্রিপ্লিকেন উদ্বান সোসাইটি" ভারতবাসীর গৌরবের বস্তু। ইহারা উত্তরোত্তর প্রসারের পথে অগ্রসর হইতেছে।

পরিবার প্রতিপালনের নিমিত্ত, দেশহিতকর কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে, অর্থ-উপার্জ্জনের জন্য নানা কলেজে তাঁহাকে অধ্যাপকের কার্য্য এবং কখনো কখনো ইন্‌শিওর্যান্স এজেন্টের কার্য্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু নিজ অন্ন-সংস্থানের চিন্তা কোনো দিনও তাঁহার কর্ম্মজীবনের বিঘ্নস্বরূপ হইয়া অম্বিকাবাবুকে স্বার্থের পথে চালিত করিতে পারে নাই। এই দেশ-কল্যাণ-কর কর্ম্মোন্মাদনাই সাংসারিক জীবনের আর্থিক উত্থান ও পতনকে তাঁহার জীবনের নিত্যসঙ্গী করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত কখনো তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। দেশহিতাকাঙ্ক্ষী অম্বিকাবাবু প্রকৃত বীরের ন্যায়, স্থির-প্রতিজ্ঞ, অসমসাহসী যোদ্ধার ন্যায়, মন্ত্র-সিদ্ধি-প্রয়াসী আসন-নিবদ্ধ যোগীর ন্যায় তাঁহার জীবনের "পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা" হাসিতে হাসিতে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। তিনি রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহার জীবনের একমাত্র মূলমন্ত্র 'কোঅপরেশ্যন'কে কার্য্যে সফল করিয়া তুলিবার গুরু দায়িত্ব।

অম্বিকাবাবুর প্রধান দুইটি আকাঙ্ক্ষা (১) সমগ্র দেশব্যাপী কেন্দ্রীকৃত ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান এবং (২) পল্লীসংস্কারের অনুকূল বঙ্গীয় ধনভাণ্ডার,—আজিও অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। জানিনা কবে কোন্ মহাপুরুষ আসিয়া দেশের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এই দুইটি বিষয় কার্য্যে পরিণত করিয়া তুলিবেন। মহাপুরুষের অপেক্ষায় না থাকিয়া আমরাই যদি অম্বিকাবাবুর পদানুসরণ করিয়া তাঁহার পরিত্যক্ত কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হই, তাহা হইলে তাঁহার অমর আত্মা তৃপ্ত হইবেন এবং পরলোক হইতে আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।

অম্বিকাবাবুর জীবনের বিস্তারিত আলোচনা ভবিষ্যতে করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রী সমবায়-পন্থী

ফ্রান্সে দুধের দরদ

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

দুধের দরদ বুঝে ফরাসীরাও। "খাই-খরচে"র ভিতর দুধের খরচ ফ্রান্সেও একটা বড় দফা। তথায় জীবন-ধারণের পক্ষে রুটির মতন দুধও অতিশয় দরকারী বিবেচিত হয়। কাজেই বাজারে দুধের দর বাড়িলে ফরাসীরা "ভাতে-কাপড়ে মারা" যাইবার অবস্থায় আসিয়া পড়ে। সেই অবস্থায় সম্প্রতি ফ্রান্সের নরনারী আসিয়া ঠেকিয়াছে। তাই দুগ্ধ-সমস্যার আলোচনায় ফরাসী পণ্ডিতেরা বেশ উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন।
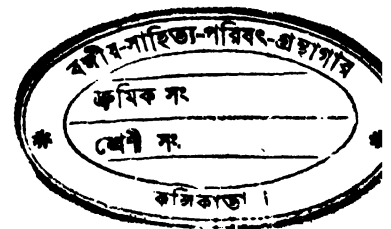
প্যারিসের "জুর্নে আঁদুস্ত্রিয়েল" (শিল্প-দৈনিক) নামক কাগজে এক লেখক এই আলোচনার উপলক্ষে আজকালকার ফরাসী জীবনের অনেক কথা খুলিয়া দিয়াছেন। সেই সকল কথায় দুনিয়ার অন্যান্য সমাজের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থাও অনেক পরিমাণে সহজ-বোধ্য হইয়া আসিয়াছে।

মূল্য-বৃদ্ধি বস্তুটা অন্যান্য দেশের মতন ফ্রান্সে ও নতুন-কিছু নয়। বিশেষতঃ, লড়াইয়ের পর হইতে "লা ছিব শেয়ার" (মাগ্‌গি জীবনযাত্রা) সর্ব্বত্রই মামুলি চিজ। সকল দেশেই কাপড়-চোপরের দর বাড়িয়াছে, টুপীর দর বাড়িয়াছে, জুতার দর বাড়িয়াছে। ফ্রান্সেও তদ্রূপ। তাহার উপর কয়লার দাম বাড়িয়া যাওয়া ফরাসীদের পক্ষে বিশেষ কষ্টজনক। ভারত-সন্তান গৃহস্থালীতে কয়লার কিম্মত সহজে বুঝিতে পারিবে না। কারণ তাহারা ঘরবাড়ী গরম রাখিবার মামলায় মাথা ঘামাইতে বাধ্য নয়। অধিকন্তু, রেল, ষ্টিমার, ট্রাম ইত্যাদিতে যাতায়াতের ভাড়া ফ্রান্সে প্রচুর চড়িয়াছে। ফরাসীদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বিপদ ফ্রাঁ মুদ্রার "পতন"। কাজেই আগে যেখানে ১ ফ্রাঁ দিয়া মাল খরিদ করা সম্ভব হইত আজকাল সেখানে কম সে কম ৫।৭ ফ্রাঁ দিতে হয়। মূল্যবৃদ্ধির কাণ্ডে এই মুদ্রা-সমস্যা ফরাসীজাতকে কাবু করিয়া রাখিয়াছে। ভারত-বাসীর পক্ষে এই দফাটা তত বেশী মারাত্মক আকার পায় নাই।

ফরাসী লেখক বলিতেছেন যে, এই সকলদিকে বাজার-দরের চড়তি লইয়া কাগজে বক্তৃতা এবং পার্ল্যামেণ্টে অনেক তর্ক-বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু দুধের দর সম্বন্ধে জনসাধারণ এখনো বেশী মনযোগী নয়। অথচ দুধের দর রুটির দরের সমানই ভাবনার বস্তু। এইরূপ অমনোযোগের কারণ কি? প্রধান কথা এই যে, শহুরে লোকেরা পাড়াগাঁয়ের কথা, চাষ-আবাদের কথা সম্বন্ধে নেহাৎ আনাড়ি। চাষবাস, গরুছাগল ইত্যাদির জীবন-কথা যাহারা বুঝে না, তাহারা দুধের বাজার সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিতে বাধ্য।

দেশের শিক্ষিত নরনারী দুধের দর সম্বন্ধে কোনো প্রকার সমালোচনা করিতে শিখে নাই। কাজেই দুধের ব্যবসাদারেরা "পাইয়া বসিয়াছে"। ইহারা যেমন খুসি তেমন ভাবে দুধের বাজারে জুলুম চালাইতেছে। লেখাপড়া-জানা লোকেরা যদি দুধের মূল্যবৃদ্ধি সম্বন্ধে কোনো প্রকার কথা বলিতে অনভ্যস্ত থাকে তাহা হইলে বেপারীরা সমাজকে ঠকাইয়া নিজ নিজ তহবিল মোটা করিতে থাকিবে না কেন? আর দুধের বেপারীদের সঙ্গে তাদের "চোরে চোরে মাসতুত ভাই"স্বরূপ কোনো কোনো রাষ্ট্রীয় দলের মহাত্মারাই বা ফুলিয়া উঠিবে না কেন? "দুধের রাষ্ট্রনীতি" কাজেই আজকালকার সমাজে একটা বিষময় বস্তু।

"মাগ্‌গি দুধ" কথাটা বড় সুখের জিনিষ নয়। এই কথার পশ্চাতে কতকগুলা শোচনীয় পদার্থ বিরাজ করিতেছে। এই কথা প্রয়োগ করিবামাত্রই প্রথমে নজরে আসে কতকগুলা আধ-মরা বুড়া-বুড়ী। তার পরেই দেখিতে পাই দেশ-ভরা রোগী অথবা শীর্ণ অকালবৃদ্ধ নরনারী। আর শিশুদের অস্বাস্থ্য ও দুর্ব্বলতা এবং অকাল-মৃত্যু "মাগ্‌গি দুধের"ই নামান্তর মাত্র।

দুধ সস্তা করিয়া দেওয়া আর দেশের লোকের আয়ু বাড়াইয়া দেওয়া একই কথা। সমাজের জীবনীশক্তিকে চাঙ্গা করিয়া তুলিতে হইলে দেশের দুধের সমস্যা মীমাংসা করা আবশ্যক। কিন্তু এই সোজা কথাটা অন্যান্য হুজুকের চাপে লোকের মাথায় বসিতে পারে নাই। যাহারা রাষ্ট্র-নৈতিক আন্দোলনে লিপ্ত আছেন তাঁহাদের পক্ষে দুধের দর, দুধের বাজার, দুধের দোকান আর দুধের বেপারী—এই সকল তথ্য লইয়া মাথা ঘামাইতে সুরু করা একান্ত কর্ত্তব্য। গোটা দেশকে কোনো এক স্বার্থপর দলের তাঁবে নিষ্পেষিত হইতে দেওয়া নেহাৎ আহাম্মুকি।

ফ্রান্সে রুটির দর লইয়া তুমুল লড়াই হইয়া গিয়াছে। তাহার প্রভাবে ফরাসী চাষীরা গমের আবাদে আজকাল বেশী জমি লাগাইতেছে। রুটির দাম কমিয়াছে। দুধের দাম লইয়াও এই ধরণের একটা লড়াই চালাইবার সময় আসিয়াছে। প্রতিবৎসরই শীতের প্রারম্ভে কি দেখিতে পাই? দুধ আর দুধের জিনিষপত্র সবই কমিয়া আসিতেছে। দুধ উৎপন্নই হয় দেশে কম, দুধ যোগাইবার খরচ-পত্র ক্রমে বাড়িয়া চলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বেপারীরা বাজারে চাহিতেছে বেশ চড়া দাম। আর পরিবারে পরিবারে শুনিতে পাই কেবল রোগীদের হাহাকার, শিশুর ক্রন্দন এবং গোয়ালাদের উপর জননীগণের অভিসম্পাত।

সমস্যা ক্রমশঃ জটিল হইয়া উঠিতেছে। শীঘ্রই এক

বিচিত্র ঠাঁইয়ে আসিয়া ফরাসী সমাজ পৌঁছিবে। "দুধ সস্তা কর", "দুধ সস্তা কর" বলিয়া চেঁচাইলেই ত আর দুধ সস্তায় দেওয়া সম্ভব নয়। যোগানদারেরা দুধ সস্তা করিবে কোথা হইতে? তাহা হয়ত ইহাদের ক্ষমতারই অতীত। লোকেরা যদি সস্তায় চাহিতে থাকে তাহা হইলে যোগানদারেরা দুধ-বেচা বন্ধ করিতে বাধ্য হইতে পারে। কারণ তাহারা বাজারে যে দুধ আনিবে তাহার খরচ পোষাণ চাই ত। অপর দিকে খরিদ্দারেরাই বা সুখে থাকিবে কোথা হইতে? দুধ যখন বাজারে আর দেখা-ই দিবে না তখন যোগানদারদের সঙ্গে লড়াইয়ের মামলা আর থাকিবে না বটে। কিন্তু ক্রেতা-সমাজের পক্ষে এইরূপ "হেস্ত-নেস্ত" বা "শান্তি" লাভের ফলে লোকসান ছাড়া লাভ-ই বা কই?

ফরাসীদের ভিতর যাঁহারা দুধের ধন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ তাঁহারা বেশ বুঝিতেছেন যে, বাস্তবিক পক্ষে আজ কাল দুধ উৎপন্ন করা একটা কঠিন কাণ্ড।" দুধ যোগাইয়া উঠা বেপারীদের পক্ষে ক্রমেই অসাধ্য-সাধনে দাঁড়াইয়া যাইতেছে। অনেকে বলিতেছেন:—"সরকারী সাহায্য আর তদ্বির ছাড়া 'ক্রিজ্ দু লে' (দুগ্ধ-সমস্যা) মীমাংসিত হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। গবর্মেন্ট বেশ ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা দুগ্ধ-নীতি কায়েম করুন। কয়েকজন বিচক্ষণ লোকের পরিচালনায় দুধের যোগান কাণ্ড পরিচালিত হইতে থাকুক। তাহা হইলে হয়ত সমগ্র সমাজের উপযোগী প্রচুর পরিমাণে মাল যথোচিত সস্তায় বাজারে হাজির করা সম্ভব হইবে।"

প্যারিসের বিপদই ফরাসী সমাজের একমাত্র বিপদ নয়। ফ্রান্সের প্রত্যেক বড় শহরেই "ক্রিজ্ দু লে" যার পর নাই প্যাকিয়া উঠিয়াছে। প্রতিদিন কোনো নির্দ্দিষ্ট সময়ে গোটা শহরের সকল পরিবারে দুধ যোগান অতিমাত্রায় কঠিন। একথা কাহারও অজানা নাই। তবে প্যারিসের দুর্দ্দশা খুব বেশী ইহা সহজেই বোধগম্য।

লড়াইয়ের পূর্ব্বে প্যারিসে দুধ আসিত শহরের ১৫০।২০০ কিলোমেতার (অর্থাৎ ৭৫।১০০ মাইল) দূরস্থিত পল্লী-শহর হইতে। আজ এই দুধ-যোগানের পরিধি গিয়া ঠেকিয়াছে ৩০০।৩৫০ মাইল পর্য্যন্ত।

প্যারিসের নরনারী দুধ খরচ করিত রোজ এগার লাখ লিতর (ফরাসী লিতর—বাংলার সওয়া সের)। লড়াইয়ের পূর্ব্বে যে সকল অঞ্চল হইতে দুধ আসিত তাহা হইতে আজ পাওয়া যায় কষ্টে-সৃষ্টে মাত্র পাঁচ ছয় লাখের কাছাকাছি। মফঃস্বলের দুধ যোগাইবার ক্ষমতা কমিয়া গিয়াছে প্রায় আধা-আধি। ১৯১৩ সনের তুলনায় সেইন-এ-মার্ন্ নামক জেলায় দুধের যোগান কমিয়াছে চার ভাগের এক ভাগ। সেইন-এ-ওআজ জেলার অবস্থাও ঐরূপ।

মফঃস্বল আর শহরের দুধ যোগাইয়া উঠিতে পারিতেছে না। কারণগুলা অতি সোজা। গোআলার ব্যবসায় মজুর পাওয়া দুষ্কর। ফরাসীরা দুধ দোহাইবার কাজে অথবা গরু-ছাগল চরাইবার কাজে ন্যায্য দরে মজুরি পাইতেছে না। কাজেই অন্যান্য কাজে লাগিয়া যাওয়া তাহাদের ভাত-কাপড়ের উপায়। কেন না খাই-খরচ অতিমাত্রায় চড়িয়া গিয়াছে। গোআলারা মজুরদিগকে এই চড়্তি মাফিক মজুরি দিতে অসমর্থ। গরু-ছাগলের দরও চড়িয়াছে। কাজেই বাথানওয়ালারা দুধের ব্যবসা চালাইবে কি করিয়া? লোকসান দিয়া ব্যবসা চালান কোনো কর্ম্মক্ষেত্রেরই দস্তুর নয়। ফলতঃ, ইল্-দ'-ফ্রাঁস, ব্রি, ব্যস্, ইত্যাদি জেলার গোশালাগুলার মালিকেরা অল্পবিস্তর হাত পা গুটাইতে লাগিয়া গিয়াছে। দুধের যোগান এই সকল জেলায়ই—প্যারিসের নিকটবর্ত্তী জনপদের ভিতর,—সব চেয়ে বেশী ছিল।

বড় বড় দুধের গোলা ক্রমে ক্রমে সংখ্যায় কমিয়া আসিতেছে। অপরদিকে ছোট ছোট বাথানের মালিকেরা তাজা দুধের ব্যবসায় দাঁ মারিবার ফিকির ঢুঁড়িতেছে। দশ পনর বৎসর পূর্ব্বে গোআলারা দুধের ব্যবসাকে ফাও-স্বরূপ বিবেচনা করিত। তখনকার দিনে ফ্রান্সে ছিল টাকায় প্রায় ষোল সের। তাহাদের চিন্তায় আসল ব্যবসা ছিল গো-মাংসের। কিন্তু আজকালকার গোআলারা দুধকে আর ব্যবসার জের মাত্র বিবেচনা করে না। মাগ্‌গি জীবনের অন্যতম খুঁটা মাগ্‌গি মাখন ও পনীর। কাজেই দুধের কিম্মৎ সকল গৃহস্থই সমঝিতেছে। গোআলারাও সকলকেই "দুধে মারিবার" পন্থা আবিষ্কার করিতেছে। মাখন ও পনীরের জন্য দুধ চাপিয়া রাখিয়া ইহারা তাজা দুধের বাজারে গৃহস্থদিগকে উত্তমপুত্তম করিয়া ছাড়িতেছে।

"জুর্নে দ্যু লে" (দুগ্ধ-দৈনিক) নামক দুধের পত্রিকায় শ্রীযুক্ত আঁরি জিরার দুধের দাম সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। ফরাসী দুধ-বিশেষজ্ঞদের ভিতর জিরার অন্যতম নামজাদা লোক। "কোঁফেদেরাসিঅঁ জেনেরাল দে প্রোদ্যুক্ত্যয়র দ' লে" অর্থাৎ দুধ-যোগানদারদের সঙ্ঘ নামক ফ্রান্স-ব্যাপী প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হিসাবে জিরার ১৯২২ সনে দুগ্ধ-দৈনিকে লিখিয়াছিলেন যে, সের প্রতি ৮৭ সাঁতিম গোআলাদের জুটে। প্যারিসের নিকটবর্ত্তী জনপদের কতকগুলা বড় বড় বাথানের হিসাব-পত্র আলোচনা করিয়া জিরার এই মন্তব্য প্রচার করিতে সমর্থ হন।

এই গেল অবশ্য তিন-চার বৎসর পূর্ব্বের কথা। তখনকার বিনিময়ের হারে ফরাসী দুধের সের ছিল চার আনা। অর্থাৎ লড়াইয়ের পূর্ব্বের তুলনায় তাজা দুধের দাম বাড়িয়াছে চারগুণ। কিন্তু এই পরিমাণ মূল্যবৃদ্ধিও গোআলাদের পক্ষে বিশেষরূপে চিত্তাকর্ষক নয়। কারণ, গোআলারা অন্যান্য আকারে দুধের ব্যবসা হইতে বেশী লাভবান হইতে পারে। কতকগুলা তথ্য জুটিয়াছে কৃষি-সচিবের দপ্তর হইতে। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বুলেঁজা এই দপ্তরে কতকগুলা বৃত্তান্ত পাঠাইয়াছেন। তাজা দুধের ব্যবসায় আর মাখন-পনীরের ব্যবসায় গোআলাদের লাভালাভে ফারাক কত বুলেঁজার অনুসন্ধানে তাহা বেশ পরিষ্কাররূপে জানা যায়। সওয়া সের তাজা দুধ বেচিয়া গোআলা পায় মাত্র ৬০ সাঁতিম। কিন্তু সেই সওয়া সের দুধ যদি মাখন তৈয়ারি করার কাজে লাগান যায় তাহা হইলে সে পায় ১৩৭ সাঁতিম। আবার যদি পনীর তৈয়ারি করিবার জন্য ঐ পরিমাণ দুধ লাগান যায় তাহা হইলে গোআলার জুটে ১৫০ সাঁতিম, ইত্যাদি। বুলেঁজা প্যারিস জনপদের "গোআলা-সমবায়ের" অন্যতম সভাপতি।

বিনিময়ের বাজারে সাঁতিমে আর আনায় আজকাল যে সম্বন্ধই থাকুক না কেন, দেখা যাইতেছে যে, গৃহস্থদের নিকট দুধ বেচার চেয়ে মাখন ও পনীর ব্যবসায়ীদের নিকট দুধ বেচা গোআলাদের পক্ষে ডবলেরও বেশী লাভজনক। অতএব সমস্যা দাঁড়াইতেছে—দুধ বনাম মাখন ও পনীর, অর্থাৎ দুধের "চাষ" বনাম দুধের "শিল্প"।

এই ধরণের অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া রোলাঁ বলিতেছেন :—"জেলায় জেলায় সরকারী পশু-চিকিৎসকদের সঙ্গে, ডাক্তারদের সঙ্গে এবং শিশু-জীবন বিষয়ক ওস্তাদগণের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাইয়া বুঝিয়াছি যে, তাজা দুধ বেচা গোআলা-দের পক্ষে আর সম্ভবপর নয়। চাষবাসের এঞ্জিনিয়ারগণও এইরূপই রায় দিয়াছেন।" রোলাঁ প্যারিস সহরের একজন নগর-শাসক ও সরকারী পরামর্শদাতা।

রোলাঁ একটা সমিতি কায়েম করিয়াছেন। নাম তাহার "লিগ দ্যু লে" (দুগ্ধ-সঙ্ঘ)। তাজা ও খাঁটি দুধের যোগান যাহাতে না কমিয়া যায়—তাহার সম্বন্ধে দেশের ভিতর আন্দোলন চালান এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য। "লিগ দ্যুলে" বহুবার বলিয়াছেন, "জোর জবরদস্তি করিয়া দুধের দাম কমাইবার দিকে আন্দোলন চালান বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এইরূপ আন্দোলনের ফল অশুভ হইতে বাধ্য। যথোচিত পরিমাণে তাজা দুধ যদি চাও তাহা হইলে মূল্যবৃদ্ধির জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।"

গোআলাগুলাকে গালাগালি করিলেই দেশে দুধের যোগান বাড়িবে না। তাহার জন্য চাই বিজ্ঞান-দক্ষ নরনারীদের সমবেত কর্ম্ম ও চিন্তা।

কোনো কোনো গোআলা-বিদ্বেষী ফরাসী বলিতেছেন :—"মাখনের উপর চড়া হারে কর বসান হউক। মাংসের উপর, পনীরের উপর চড়া কর বসান হউক, গোআলারা আপনাআপনিই ঢিট্ হইয়া আসিবে। তাজা দুধ না বেচিয়া তাহাদের আর উপায় থাকিবে না। সঙ্গে সঙ্গে বিদেশে মাখন-পনীর রপ্তানি করিবার পথ বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক। রপ্তানি শুল্কের মাত্রা চড়াইয়া দেওয়া হউক।"

কৃষি-বিষয়ক পত্রিকাগুলায় বহু ফরাসী গৃহস্থই এইরূপ মত ঝাড়িতেছেন। কিন্তু আসল আর্থিক তত্ত্বের তরফ হইতে বিষয়টা তলাইয়া দেখা হইতেছে না। তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, তাজা দুধের যোগান বাড়াইতে হইলে যোগানের খরচ পোষাণ চাই। নিজে ভাত-কাপড়ে মারা পড়িয়া কোনো ফরাসী গোআলা তথাকথিত সমাজ-সেবকের সাজে দেখা দিবে না।

অবশ্য এই সমস্যার যুগে গোআলাদের ভিতরও অনেকেই বজ্জাতি বুদ্ধি খাটাইতেছে সন্দেহ নাই। তাহারা দেশের লোকের উপর অত্যাচার চালাইতেছে। কতকগুলা রাষ্ট্রনৈতিক পাণ্ডা ইহাদের সঙ্গে যোঁট বাঁধিয়াছে। এই সব

লোককে আইনের দ্বারা জব্দ করিতেই হইবে। ইহার মধ্যে তুর জেলায় এইরূপ দু'চার-টা মোকদ্দমা ঘটিয়াছেও। তাহার ফলে গোআলারা আর গোআলাদের উকীল রাষ্ট্রকেরা খানিকটা নরম হইতে বাধ্য হইয়াছে।

সকল দিক্ হইতেই দুধের ব্যবসার উপর সরকারী তদবির ও শাসন কায়েম করা এক্ষণে সময়োচিত ও সমীচীন বোধ হইতেছে। গৃহস্থের দাবী আর গোআলাদের আর্থিক অবস্থা দুই-ই নিরপেক্ষ ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গবর্মেণ্টের পক্ষে অত্যাবশ্যক। এইরূপ মত আজকাল ফরাসী সমাজের মহলে মহলে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে।

বাঙ্গালীর আর্থিক স্বাধীনতা লাভের উপায়

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বসু, বি, এ

বাঙ্গালী যদি জগতে বাঁচিতে চায় তবে স্বরাজ, সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় স্বাধীনতা পাইবার পূর্ব্বে তাহাকে আর্থিক স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে। আর্থিক স্বাধীনতা পাইলে অন্যান্য বিষয়ে স্বাধীনতা করতলগত করা সুসাধ্য হইবে। আর্থিক স্বাধীনতা প্রাপ্তি ঘটিলে দেশের দারিদ্র্য দূর হইবে, বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে, ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের প্রকোপ কমিবে, শিশুর মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস হইবে, লোক-শিক্ষা বৃদ্ধি হইবে, রাস্তা-ঘাট, জঙ্গলাদি পরিষ্কৃত হইবে, এক কথায় বঙ্গীয় জন-সমাজের শক্তি বৃদ্ধি হইবে। "কর্ম্মফল" আর বাঙ্গালায় ফলিবে না, চোখের জলও আর পড়িবে না। দুঃখের বিষয় দেশবাসীর এ দিকে সম্যক রূপে দৃষ্টি পড়ে নাই। ১৯০৫ সন হইতে আমরা রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে যেরূপ অর্থ, সামর্থ্য ও সময় খরচ করিয়াছি এই দিকে তাহার কতক পরিমাণ করিলে আজ বাঙ্গালীর আর্থিক অবস্থা এরূপ থাকিত না! যাহা হউক, এখনও সময় আছে। একজন বাঙ্গালী মহাপুরুষ ছিলেন, যিনি এই বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন—তিনি আমাদের দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন।

আর্থিক স্বাধীনতা লাভের প্রধান ও একমাত্র উপায় ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্পে বাঙ্গালীর নিযুক্ত হওয়া। বাঙ্গালীকে এই সমস্ত সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে হইবে, নতুবা তাহার মৃত্যু অনিশ্চিত। কেরাণীর জাতি কয় দিন প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া বাঁচিতে পারে? অবশ্য, বাঙ্গালী যে বরাবর এইরূপ ছিল তাহা নহে। বাঙ্গালী যে অতি প্রাচীন কাল হইতে ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্পে অতি পটু ছিল ইতিহাস তাহার প্রমাণ দিতেছে। সুবর্ণগ্রাম ও তাম্রলিপ্তের গৌরব কে না অবগত আছেন? সময় ছিল যখন শত সহস্র "শ্রীমন্ত সওদাগর" বাঙ্গালা দেশেরই প্রস্তুত তরণীতে বিবিধ দ্রব্য-সম্ভার পূর্ণ করিয়া সমুদ্র-বক্ষে দেশ-বিদেশে বাণিজ্য করিতে বাহির হইতেন ও প্রচুর ধনরত্ন লইয়া গৃহে ফিরিতেন। সময় ছিল যখন এই বাঙ্গালী জাতি তিব্বত, চীন, জাপান, জাভা ও সিংহলদ্বীপে বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে সাময়িক সভ্যতার আলোকও লইয়া গিয়াছিল। মুসলমান আমলে বাঙ্গালীর বাণিজ্য ও শিল্পের কথা জগতে বিদিত ছিল। এমন কি, ইংরেজদের সঙ্গে প্রথম সংঘর্ষের সময়েও আমরা দেখিতে পাই যে বাঙ্গালী ব্যবসায়-ক্ষেত্রে, অন্ততঃ বাঙ্গালা দেশে, অদ্বিতীয় ছিল। বাঙ্গালার সমস্ত বাণিজ্য ও শিল্প বাঙ্গালীর হস্তেই ছিল। কেবল মাত্র গত পঞ্চাশ ষাট বা একশ বৎসরের ভিতর আমাদের এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে।

এ দুর্দ্দশার কারণ কি? কারণ এই যে ইংরেজ-রাজত্বের প্রারম্ভে বাঙ্গালী যখন ব্যবসা-বাণিজ্য ও মুৎসদ্দীগিরি করিয়া প্রচুর অর্থ লাভ করিল তখন তাহারা তাহাদের পুত্র-পৌত্রগণ ব্যবসাতে নিযুক্ত না করিয়া, বড় চাকুরী, ওকালতী, ডাক্তারী প্রভৃতিতে দিল। সে সময়ে অবশ্য সরকারের পক্ষে ইহাদের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। বাঙ্গালী উকীল, ডাক্তার, স্কুলমাষ্টার,

মুনসিফ, কণ্ট্রাক্টর, কেরাণী, ইংরেজ রাজত্বের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অধিক পরিমাণে প্রয়োজন হইয়াছিল। সেই সময়ে এই সমস্ত কার্য্যে প্রচুর অর্থ ও সম্মান লাভ হইত। ফলে এই দাঁড়াইল যে, সকলেই ব্যবসা-বাণিজ্য ত্যাগ করিয়া ইংরেজী শিক্ষিত হইয়া ওকালতী, ডাক্তারী ইত্যাদির দিকে ছুটিল। এবং তাহাদেরই ত্যক্ত পথ ইউরোপীয়, মাড়োয়ারী, ভাটীয়া ও অন্যান্য জাতি দখল করিল এবং এখনও উত্তরোত্তর দখল করিতেছে। এক্ষণে বাঙ্গালী এমনভাবে কোণ-ঠেসা হইয়াছে যেন সোনার বাংলা আর বাঙ্গালীর নয়! ভারতের বাণিজ্যের কেন্দ্র কলিকাতা নগরীতে তাহারা ভিন্নদেশীর কৃপার পাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে! গত যুদ্ধের পর যদি ব্যবসাতে মন্দা না পড়িত তাহা হইলে বোধ হয় গোটা কলিকাতা অ-বাঙ্গালীর হইয়া যাইত। মধ্যবিত্ত শ্রেণীই বাংলার মেরুদণ্ড-স্বরূপ। বাঙ্গালীর যা-কিছু গৌরবের ও আদরের, জিনিষ মধ্যবিত্ত শ্রেণীই তাহার মূল। সেই শ্রেণীই আজ ধ্বংসোন্মুখ। পাশ্চাত্য সভ্যতার দেখা-দেখি আমরা কৃষকের দল, শ্রমিকের দল প্রস্তুত করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছি, কিন্তু বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জন্য মাথা ঘামাই না! আজ সেই শ্রেণীর লোক উচ্চ-শিক্ষিত হইয়াও ৩০৲ টাকা মাহিয়ানায় স্কুল-মাষ্টারী ও কেরাণীগিরির জন্য দ্বারে দ্বারে উমেদারী করিয়া বেড়াইতেছে। বাঙ্গালার কিষাণ, কারিগর, জেলে, মুচী, মাঝী, তাঁতী প্রভৃতির দরিদ্রতা অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। বঙ্গীয় জনসমাজ যেন লোপ পাইতে বসিয়াছে।

তবে কি বাঙ্গালী ব্যবসা, বাণিজ্য ও শিল্প-কার্য্যের অযোগ্য? তাহাদের ভিতর কি এতটুকু সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই যাতে সে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে পারে? তাহা নহে। বাঙ্গালী ব্যবসা, বাণিজ্য স্ব-ইচ্ছায় অপরের হস্তে তুলিয়া দিয়াছে সেই জন্য তাহার এই দুর্গতি! সে ক্রমে ক্রমে তাহার এই বিষম ভুল বুঝিতে পারিতেছে। সেই জন্য আজ দেশের চতুর্দ্দিকে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে—কি উপায়ে আবার কমলাকে বাঙ্গালার মণ্ডপে প্রতিষ্ঠা করা যাইবে? সেই জন্য আজ শত শত বঙ্গীয় যুবক ওকালতী, ডাক্তারী ত্যাগ করিয়া এবং বি-এ, এম্-এ পাশের অভিমান মনে না রাখিয়া, কেহ আমদানির ব্যবসা, কেহ রপ্তানির ব্যবসা, কেহ দালালী কেহ ব্যাঙ্কিং, কেহ বীমা, কেহ কৃষি, কেহ গ্রাম্য শিল্প ইত্যাদি কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন। এমন কি, জুতার দোকান, ধোপার দোকান, চা, চপ্ কাটলেটের দোকান, যাহা কিছুদিন পূর্ব্বে অতি নিকৃষ্ট কার্য্য বলিয়া তাঁহাদের ধারণা ছিল, তাহাও আজ করিতেছেন।

ক্লাইভষ্ট্রীটে একটী বঙ্গীয় গ্রাজুয়েট যুবক পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকান করিয়া স্বাধীনভাবে প্রতি মাসে প্রায় ১০০।১৫০৲ টাকা উপায় করিতেছেন! কেহ কেহ অনভিজ্ঞতার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু কেহ কেহ লাভবানও হইতেছে। কেহ কেহ ক্ষতি স্বীকার করিয়াও আবার উঠিবার চেষ্টা করিতেছে—পশ্চাৎপদ হইতেছে না। এই সব দেখিয়া আশা করা যায় যে, আগামী দশ, বিশ কি পঁচিশ বৎসরের ভিতর বাঙ্গালী ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পে নাম করিতে সমর্থ হইবে।

যাহাতে বাঙ্গালী এই নবোদ্যমে সাফল্য লাভ করিতে পারে তাহার জন্য সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে এক মনঃপ্রাণে কতকগুলা কাজ করিতে হইবে। তাহার কয়েকটার ইঙ্গিত নিম্নে করিতেছি।

(ক) বঙ্গীয় বাণিজ্য-পরিষৎ

"সঙ্ঘশক্তিঃ কলৌ যুগে।" যে জাতি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া জনসমাজের উন্নতির জন্য কার্য্য না করিবে, এ যুগে তাহাকে পরাজয় স্বীকার করিতেই হইবে। সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতে হইলে ব্যবসা, বাণিজ্য ও শিল্পের একটি প্রধান জাতীয় কেন্দ্র আবশ্যক। প্রথমে শিক্ষিত বাঙ্গালী লইয়া এই কেন্দ্রটাকে গঠন করিতে হইবে। কলিকাতায় এই প্রধান কেন্দ্র থাকিবে, এবং বঙ্গদেশে প্রতি জেলার প্রত্যেক বাণিজ্য-স্থলে ইহার শাখা-কেন্দ্র থাকিবে। এক একটী শাখা-কেন্দ্র তৎপার্শ্বস্থিত গ্রামের সমষ্টি লইয়া কার্য্য করিবে। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ব্যবসা-বাণিজ্যে যাহার যতটুকু পরিমাণ অভিজ্ঞতা আছে সে ততটুকু ইহাতে দিবে। জাপানিতে যেমন প্রত্যেক বিভাগের এক একটী এসোসিয়েশন্ আছে ও তাহাদের সকলের উপর একটী প্রধান চেম্বার অব কমার্স আছে, আমাদেরও তেমন বাঙ্গালী আমদানি ব্যবসায়ীর এসোসিয়েশন, বাঙ্গালী রপ্তানি-ব্যবসায়ীর এসোসিয়েশন, বাঙ্গালী ম্যানুফ্যাকচারারস্ এসোসিয়েশন, বাঙ্গালী প্লান্টারস

ও চা ব্যবসায়ীর এসোসিয়েশন্, বাঙ্গালী কয়লার খনির মালিকদের এসোসিয়েশন্, বাঙ্গালী কয়লা ব্যবসায়ীর এসোসিয়েশন্, বাঙ্গালী দালালদের, বাঙ্গালী ইঞ্জিনিয়ারদের, বাঙ্গালী তাঁতী-শিল্পী-দোকানদারদের, বাঙ্গালী পাট-উৎপাদকের এসোসিয়েশন্ করিতে হইবে ও উহাদের উপর বঙ্গীয় বাণিজ্য পরিষৎ থাকিবে। এই সমস্ত এসোসিয়েশন্ দ্বারা বাঙ্গালী বাজার নিয়মিত করিতে পারিবে এবং ব্যবসা বাণিজ্যে কেহ তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়াইতে পারিবে না। ম্যানচেষ্টারকে আমেরিকা হইতে প্রতি বৎসর প্রভূত পরিমাণে তুলা কিনিতে হয়, কিন্তু যে বৎসর আমেরিকাতে তুলার চাষ বেশী হওয়ার জন্য বাজার দর নামিয়া যায় সেই বৎসর আমেরিকার তুলা উৎপাদকের এসোসিয়েশন্ একত্র হইয়া প্রচুর পরিমাণে তুলা চাপিয়া রাখিয়া তাহাদের লাভোপোযোগী চড়া দরে বাকী তুলা বিক্রয় করে।

আমাদের পরিষদের দুইটী প্রধান বিভাগ থাকিবে।

১। বিদেশের সহিত বাঙ্গালীর বাণিজ্য যাহাতে বৃদ্ধি হয়, ২। স্বদেশে বাঙ্গালী যাহাতে স্ব স্ব কেন্দ্রে অন্যান্য জাতির সমকক্ষ হইয়া ব্যবসা করিতে পারে—এই দুই দিকে লক্ষ রাখিয়া বিভাগ দুইটা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

(খ) জাতীয় আন্দোলন

সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া এইরূপ একটী কেন্দ্র স্থাপন করিবার পর যাহাতে বাঙ্গালাদেশের "হাওয়া" বদলাইয়া যায়, অর্থাৎ ওকালতী, কেরাণীগিরির মায়া ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালী ব্যবসায়ে নামে, সেইরূপ আন্দোলন এই কেন্দ্রের সাহায্যে করিতে হইবে। এই আন্দোলনের জন্য নিজস্ব খবরের কাগজ, বায়স্কোপ, প্রসিদ্ধ বক্তা প্রভৃতির প্রয়োজন। আর আবশ্যক কতকগুলি ধনবিজ্ঞান-দক্ষ পণ্ডিত, বাণিজ্যে অভিজ্ঞতা-বিশিষ্ট ব্যক্তি ও নিঃস্বার্থ স্বদেশ-প্রেমিক শিক্ষিত যুবক—যাহারা বাঙ্গালার ঘরে ঘরে নূতন ভাবের তরঙ্গ লইয়া যাইবে। এই আন্দোলনের জন্য বেগ পাইতে হইবে না। ইহার জন্য বেকার কমিশন্ বা রয়্যাল কৃষি-কমিশনের প্রয়োজন নাই। বাঙ্গালী বুঝিয়াছে ও দিন দিন মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছে যে, তাহার আর্থিক অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইতেছে। তাহার অবস্থা একজন দরওয়ান অপেক্ষাও হীন! একজন অশিক্ষিত দরওয়ানকে ২৪৲ টাকা মাহিয়ানা না দিলে সে চাকুরী করে না, একজন বাগানের মালীকে ২০৲ টাকা না দিলে সে চাকুরী করে না। কিন্তু ১৫।২০৲ টাকা মাহিয়ানায় ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করা বাঙ্গালী যুবক শত শত পাওয়া যায়! বাঙ্গালী তাহার ন্যায্য অধিকার ত্যাগ করিয়া ভয়ানক ভুল করিয়াছে। জমি তৈয়ারি করিয়া বীজ বপন করিতে হইবে।

(গ) দোকানদারী

শুদ্ধ কেন্দ্রগঠন ও আন্দোলন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। আমরা অনেক প্রকার হুজুগ করিয়াছি। এবার কাজের পালা! প্রত্যেক ব্যবসাতে বাঙ্গালীকে নামিতে হইবে, অর্থাৎ পান সিগারেট, খাবারের দোকান হইতে আরম্ভ করিয়া জাহাজ তৈয়ারি পর্য্যন্ত। সর্ব্বত্রই বাঙ্গালীর দেখা পাওয়া চাই। আর বাঙ্গালীকে একটী সহজ ও সত্য কথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। কথাটী এই—আমার গ্রামের উৎপন্ন দ্রব্যাদি, যাহা ভগ্ন গরুর গাড়ী করিয়া "আমার" বাটীর সম্মুখের রাস্তা দিয়া যায়, তাহারই আদান-প্রদান করিয়া বিদেশী বণিক কলিকাতায় পিতলের প্লেট সংযুক্ত প্রাসাদ-তুল্য অট্টালিকায় থাকিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা অর্জ্জন করে। এই সমস্ত জিনিষের ব্যবসা যাহাতে বাঙ্গালীর হাতে আসে এবং থাকে তাহার উপায় করিতে হইবে।

(ঘ) ব্যাঙ্ক

বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর নিজস্ব তেমন ব্যাঙ্ক নাই। যথার্থ অভাব না হইলে কোনো বিষয়ের সৃষ্টি হয় না। বাঙ্গালী যখন কোনো ব্যবসাতেই যথাযোগ্য ভাবে লিপ্ত নাই তখন তাহাদের ব্যাঙ্ক কেমন করিয়া হইবে? বাঙ্গালী ব্যবসাতে পুরাদমে নামিলে তাহাদের ব্যাঙ্কও হইবে। যাহাতে বাঙ্গালায় বাঙ্গালী-পরিচালিত বড় ব্যাঙ্ক হয় তাহা করিতে হইবে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় সারা-বাঙ্গালায় ছয় ক্রোটী বাঙ্গালীর জন্য একটীও একস্‌চেঞ্জ ব্যাঙ্ক নাই। বিনয়বাবুর কথায় বলি—যে মাত্র আড়াইটা ব্যাঙ্ক আছে তাহাও আবার বড় রকমের "পোদ্দারের দোকান"। তদ্বারা বিদেশের সহিত আমদানি-রপ্তানির বাণিজ্য করা যায় না।

অনেক সময়ে দেখা যায় যে ড্রাফ্‌ট আসিবার পূর্ব্বে জাহাজে করিয়া মাল বিদেশ হইতে আসিয়া পড়ে। কাস্টমস্‌

আইনানুযায়ী মাল যথাসময়ে খালাস না করিলে অত্যধিক "ডেমারেজ" দিতে হয়। কিন্তু যদি কোনও এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক ইহার জন্য "লেটার অফ্ গ্যারান্টি" দেয় তাহা হইলে শিপিং কোম্পানী "ডেলিভারি অর্ডার" দেয়, ও ইহার দ্বারা মাল খালাস করিয়া লওয়া যায়। এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক না হইলে শিপিং কোম্পানীরা তাহাদের "লেটার অফ্ গ্যারান্টি" মঞ্জুর করে না।

আবার বিদেশী বণিক যখন এই দেশ হইতে কাঁচা মাল ক্রয় করে তখন সচরাচর তাহারা ক্রীত দ্রব্যের মূল্যের জন্য "লেটার অফ্ ক্রেডিট্" দেয়। এ দেশের রপ্তানি ব্যবসায়ীরা জাহাজে মাল বোঝাই করিয়া মেট্রস বিসিট্ ব্যাঙ্কে দাখিল করিলে টাকা পায়। এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক না হইলে "লেটার অফ্ ক্রেডিট্" খোলা চলে না।

অতএব দেখা যাইতেছে, বর্ত্তমান বাঙ্গালী ব্যাঙ্কের দ্বারা বাণিজ্য করা সম্ভব হয় না। বাধ্য হইয়া ব্যবসায়ীদের বিদেশী ব্যাঙ্কে খাতা খুলিতে হয়। সুখের বিষয় সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক কয়বৎসর কলিকাতায় অফিস খুলিয়াছে। উহার দ্বারা ব্যবসায়ীদের অনেক সুবিধা হইয়াছে। উহা বাঙ্গালীর না হইলেও একটী খাঁটি ভারতীয় ব্যাঙ্ক।

বাঙ্গালীকে স্বাধীনভাবে ব্যবসা বাণিজ্য করিতে হইলে তাহাদের পরিচালিত তিন প্রকার ব্যাঙ্ক আবশ্যক:— (১) এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক, (২) ল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক। ইহা বাঙ্গালী কিষাণদের প্রধান সহায় হইবে। এই ব্যাঙ্কের সাহায্যে তাহারা জমি বন্ধক রাখিয়া অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ করিয়া কৃষি-কার্য্যাদি করিতে এবং তাহাদের উৎপাদিত পণ্য দ্রব্যাদি বাজার দরে বেচিতে পারিবে। এখন কৃষকদের অবস্থা অতি ভীষণ। দুই বেলা উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিতে পায় না। মহাজন বা বিদেশী কোম্পানীর নিকট হইতে দাদন লইয়া তাহারা কৃষি কার্য্য করিয়া থাকে। বাজারের উঠা নামা দেখিয়া অপেক্ষা করিয়া ফসল বিক্রয় করিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। কারণ মহাজনের আসল ও সুদের টাকা যথাসময়ে দিতে হয়। তাহার উপর অন্ন-চিন্তা ত আছেই। ইহার ভয়ঙ্কর পরিণাম গত মহাযুদ্ধের সময়ে দেখা গিয়াছিল। বাঙ্গালার কৃষক ১৩৲ টাকার উর্দ্ধে তাহার পাটের মূল্য পায় নাই। কিন্তু বিদেশী পাটের কলের ১০০৲ টাকার শেয়ারের মূল্য [illegible]৲ টাকার উপর উঠিয়াছিল।

আর একটী উপায় আছে যাহার দ্বারা বাঙ্গালার কৃষক ও জমিদার এই পাটের ব্যবসাতেই লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে। যদি জমিদারগণ তাঁহাদের জমিদারিতে জুট-এজেন্সী বা জুট-ব্যাঙ্ক স্থাপিত করেন এবং খাজানার বিনিময়ে তাঁহারা প্রজার নিকট হইতে বাজার-দরে পাট ক্রয় করেন, তাহা হইলে আর কৃষকদিগকে মহাজনের কবলে পতিত হইতে হয় না। এই পাট গুদামজাত করিয়া যদি কলিকাতার পাটের কলে বা বিদেশে রপ্তানির ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বের ন্যায় আবার লোকহিতৈষী প্রতাপশালী জমিদারে দেশ পূর্ণ হইতে পারিবে। অবশ্য সুদের টাকা ও অন্যান্য আবশ্যক খরচ বাদ দিয়া যে লাভ থাকিবে তাহাও সমানভাবে জমিদার ও প্রজা পাইবে। বঙ্গীয় কৃষকদের দেনা ও বঙ্গীয় জমিদারদের দেউলিয়া অবস্থা প্রবাদ-বাক্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পঞ্চাশ বৎসর পরে, বোধ হয়, দুই এক ঘর ব্যতীত আর বড় জমিদার থাকিবে না। বাঙ্গালী জমিদার কি এই দিকে মন দিবেন? এইরূপ পথ অবলম্বন করিলে কাহাকেও প্রজাস্বত্ব আইনের জ্বালা ভোগ করিতে হইবে না এবং মাড়োয়ারী মহাজনের নিকট হুণ্ডিতে টাকা কর্জ্জ করিতে হইবে না। জমিদারে ও প্রজায় যে সদ্ভাব ছিল তাহা ফিরিয়া আসিবে। "বল্‌শী" ভূত আপনা হইতেই পলাইবে।

৩। ট্রেড ব্যাঙ্ক। প্রত্যেক বাঙ্গালী ব্যবসায়ী জানেন যে অন্তর্বাণিজ্যের জন্যও বাঙ্গালীর নিজস্ব কোনো কায়েমী ট্রেড ব্যাঙ্ক নাই। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের শাখা অফিসের দ্বারা এই সমস্ত কার্য্য অনায়াসেই হইতে পারিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিদেশী ব্যাঙ্কারের দল প্রথমেই এই সর্ত্ত করিয়া লইয়াছেন যে, ইহা কোনো এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কিং করিতে পারিবে না। অথচ বাঙ্গালা-দেশের এই অন্তর্বাণিজ্য করিয়াই অ-বাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা ১৫।২০ ক্রোড় টাকা প্রতিবৎসর এই দেশ হইতে লইয়া যাইতেছে। ল্যাণ্ড-ব্যাঙ্ক ও ট্রেড্‌ব্যাঙ্কের উপকারিতার উদাহরণ স্বরূপ জার্ম্মাণিতে বিটচিনির উন্নতির বিষয় বলা যাইতে পারে। জার্ম্মাণিতে বিট চিনির চাষ যখন প্রথম আরম্ভ হয় তখন এই দুই প্রকার ব্যাঙ্ক কৃষকদের সাহায্য না করিলে ভারতীয় চিনির অপেক্ষা বিট চিনির দর কখনই সস্তা হইত না। প্রথমে কৃষকরা বিটের আবাদ করিতে সম্মত হয় নাই। ল্যাণ্ড-ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা কৃষকদের বুঝাইয়া অল্প সুদে বিট আবাদের জন্য টাকা

দিল এবং ট্রেড-ব্যাঙ্কের সহিত এই বন্দোবস্ত করা হইল যে, যেমন বিট চিনি তৈয়ারি হইয়া ব্যাঙ্কের গুদামে আসিয়া পৌছিবে তৎক্ষণাৎ এই ব্যাঙ্ক কৃষকদের নগদ টাকা দিয়া বাজার দরে চিনি ক্রয় করিয়া লইবে। অবশ্য জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্ট বিট চিনি রপ্তানির উপর স্পেশ্যাল রিবেটের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সে কথা স্বতন্ত্র।

(ক্রমশঃ)

মূল্য-তত্ত্ব*

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেন, এম, এ ও শ্রীসুধাকান্ত দে, এম, এ, বি, এল

[কোনো দ্রব্যের দাম অথবা তার বিনিময়ে প্রাপ্য অন্য কোনো দ্রব্যের পরিমাণ নির্ভর করে ঐ দ্রব্য প্রস্তুত করিতে যে শ্রমের প্রয়োজন হয়, তার আপেক্ষিক পরিমাণের উপর,— সেই শ্রমের জন্য যে বেশী বা কম ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়, তার উপর নহে।]

১। অ্যাডাম্ স্মিথ্ বলিয়াছেন, "দাম শব্দটার দুই অর্থ। ইহা দ্বারা কখনো কোনো বিশেষ জিনিষের অভাব পূরণ করিবার ক্ষমতা বা প্রয়োজনীয়তা বুঝায়, কখনো বা অপর কোনো জিনিষ কিনিবার ক্ষমতা বুঝায়। একটিকে প্রয়োজন-মূল্য অন্যটিকে বিনিময়-মূল্য বলা যাইতে পারে।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "যে সব জিনিষ দরকারে সব চেয়ে দামী, বিনিময়ে তারা অল্পদামী বা দামহীন হইতে পারে। আবার বিনিময়ে যে সব অত্যন্ত দামী, প্রয়োজনে তাদের দাম অল্প বা কিছু-না ও হইতে পারে।" জল ও বাতাস খুবই দরকারী। তাদের না হইলে জীবনধারণ অসম্ভব। তবুও সাধারণতঃ তাদের বিনিময়ে অন্য কোনো জিনিষই পাওয়া যায় না। পরন্তু, জল বা বাতাসের তুলনায়, সোনার প্রয়োজন কম হইলেও তাহার বিনিময়ে অন্যান্য জিনিষ অনেক পরিমাণে পাওয়া যায়।

২। সুতরাং, প্রয়োজনের মাপকাঠিতে বিনিময়-মূল্য ঠিক করা যায় না—যদিও প্রয়োজনীয়তা একটা বড় গুণ। যদি কোনো দ্রব্য কোনোরূপেই প্রয়োজনীয় না হয়, অর্থাৎ উহা যদি কোনো প্রকারেই আমাদের তুষ্টিবিধান না করে, তবে উহার বিনিময়-মূল্য একটুও থাকিবে না। উহা যত দুষ্প্রাপ্য বা বহু-শ্রম-লভ্যই হউক না কেন।

৩। দ্রব্যসমূহ আগে কাজে লাগা চাই, তারপর তাদের বিনিময়-মূল্য দুই কারণে উৎপন্ন হয়। প্রথমতঃ, তাদের দুষ্প্রাপ্যতা, এবং দ্বিতীয়তঃ, তাদের প্রস্তুত করিতে শ্রমের পরিমাণ।

৪। কতকগুলি দ্রব্য আছে যাদের দাম নির্দ্ধারিত হয় কেবল মাত্র দুষ্প্রাপ্যতার দ্বারা। শ্রম ইহাদের পরিমাণ বাড়াইতে পারে না। সুতরাং ইহাদের সরবরাহ যতই বাড়ুক না, দাম কমিবে না। দুষ্প্রাপ্য মূর্ত্তি, ছবি, পুস্তক মুদ্রা, অথবা স্থান-বিশেষের আঙ্গুরে প্রস্তুত মদ (যাহা পরিমাণে অল্প) সমস্তই এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এসব জিনিষের জন্য যে শ্রম দরকার হয়, সেই শ্রমের পরিমাণের উপর ইহাদের দাম নির্ভর করে না, দাম নির্ভর করে এসব দখল করিবার বাসনার উপর।

বাজারে যে সমস্ত পণ্যদ্রব্য দৈনিক ব্যবহৃত হয়, তাহার মধ্যে উক্তরূপ দ্রব্যের অংশ খুবই কম। বেশীর ভাগ পণ্যদ্রব্যই শ্রমদ্বারা পাওয়া যায়। প্রায় সব দেশেই এরূপ পণ্যদ্রব্য ইচ্ছামত বাড়ান যায়—অবশ্য যদি আমরা প্রয়োজনীয় শ্রম করিতে রাজী হই।

৫। যখনই পণ্যদ্রব্যাদি বা তাহাদের বিনিময়-মূল্য অথবা তাহাদের মূল্য নির্দ্ধারণের নিয়ম সম্বন্ধে কথা উঠে তখনই বুঝিতে হইবে যে, আমরা মনুষ্য-শ্রম-জাত দ্রব্যাদির কথা

* ইংরেজ পণ্ডিত ডেভিড রিকার্ডো (১৭৭২-১৮২৩) প্রণীত "প্রিন্সিপল্‌স্ অব পোলিটিক্যাল ইকনমি অ্যাণ্ড ট্যাক্সেশ্যান" (ধন-বিজ্ঞান এবং কর-বিজ্ঞান) নামক পুস্তকের এক অধ্যায়। এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮১৭ সনে। গ্রন্থকার বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছিল। (১৮২১)। সেই সংস্করণে পরিবর্ত্তন ছিল অনেক।

বলিতেছি। ইহাদের উৎপত্তিতে প্রতিযোগিতার ঠাঁই খুব বেশী।

৬। সভ্যতার গোড়ার অবস্থায় পণ্যদ্রব্যের বিনিময়-মূল্য বা তার নিয়ম সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে জিনিষ প্রস্তুত করিবার শ্রমের পরিমাণের উপর।

অ্যাডাম স্মিথ্ বলিয়াছেন—"প্রত্যেক জিনিষের ঠিক দাম হইতেছে সেই জিনিষ পাইবার জন্য শ্রম ও কষ্ট। যে জিনিষটা কোনো লোক দখল করিয়াছে অথবা দান বা অন্য কোনো জিনিষের সঙ্গে বিনিময় করিতে চায়, তাহার নিকট সেটার দাম নিরূপণ করিতে হইলে দেখিতে হইবে, কতটা শ্রম ও কষ্ট হইতে সে নিজকে রক্ষা করিতে পারে আর কতটাই বা সে পরের উপর ঠেলিয়া ফেলিতে সমর্থ। শ্রমই জগতের ইতিহাসে প্রথম মূল্য। যে-কোনো জিনিষ কিনিতে হইলেই মূল্য দিতে হইত শ্রম। সভ্যতার আদিম অবস্থায়, যখন ধন-সঞ্চয় বা ভূমি-দখল অজ্ঞাত থাকে তখন একমাত্র নানাবিধ দ্রব্য গড়িবার শ্রমের পরিমাণের দ্বারাই পরস্পর-বিনিময় নির্দ্ধারিত হইতে পারে। যদি এক শিকারী জাতের ভিতর, একটি বীবার মারিতে যে শ্রম লাগে, তাহার দ্বিগুণ লাগে দুইটি হরিণ মারিতে, তবে স্বভাবতই, একটি বীবারের বদলে বা দামস্বরূপ দুইটি হরিণ পাওয়া যাইবে। ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, যাহা দুইদিন বা দুই ঘণ্টার পরিশ্রমে পাওয়া যায় তার মূল্য, একদিন বা এক ঘণ্টার পরিশ্রমে যাহা পাওয়া যায় তাহার দ্বিগুণ।"

মানুষের পরিশ্রমদ্বারা যাহা বাড়ান যায় না সে সব জিনিষ বাদ দিলে দেখা যায় যে, ইহাই প্রত্যেক জিনিষের বিনিময়-দামের ভিত্তি। এই মতটি অর্থশাস্ত্রে অতীব প্রয়োজনীয়। দাম শব্দটার সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণা থাকাতে যতটা গলদ ও মতদ্বৈধের সৃষ্টি হইয়াছে, ততটা আর কোনো কারণে হয় নাই।

যদি পণ্যদ্রব্যে ব্যবহৃত শ্রমের পরিমাণই বিনিময়-দাম নির্দ্ধারণ করে, তাহা হইলে শ্রমের পরিমাণ বাড়াইলে সেই জিনিষের দাম বাড়িবে, এবং কমাইলে কমিবে।

৭। অ্যাডাম্‌স্মিথ্ বিনিময়-দামের মূল কারণের প্রকৃত সংজ্ঞা দিয়াছেন এবং এই মতের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে গিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, জিনিষ উৎপাদন করিতে যে পরিমাণ শ্রম লাগে সেই অনুপাতে জিনিষের দাম বাড়ে ও কমে। তিনিই আবার দামের জন্য একটি মাপকাঠি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন এবং সেই অনুসারে তিনি বলেন যে, জিনিষের দাম স্থির হয় তাহার বিনিময়ের অনুপাতে। কখনো তিনি শস্যকে এবং কখনো তিনি শ্রমকে দামের মাপকাঠিস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু জিনিষ উৎপাদনের শ্রমের পরিমাণকে তিনি গ্রহণ করেন নাই। বাজারে জিনিষের বিনিময়ে যে পরিমাণ শ্রম পাওয়া যায় তাহাই তাঁহার বিচারে দামের মাপকাঠি। এই দুটি কথাই যেন এক এবং শ্রমের গুণে দ্বিগুণ জিনিষ প্রস্তুত করিতে পারিলেই যেন কোনো লোক বিনিময়েও দ্বিগুণ পরিমাণ জিনিষ পাইবে।

যদি এ কথাই সত্য হইত—যদি শ্রমিকের শ্রমফল জিনিষ উৎপাদনের অনুপাতে স্থির হইত, তাহা হইলে জিনিষ উৎপাদনের শ্রম এবং বাজারে জিনিষের বিনিময়ে প্রাপ্য শ্রম দুই-ই সমান হইয়া দাঁড়াইত। আর উহাদের যে কোনো একটি অন্যান্য জিনিষের দামের ব্যতিক্রম নির্দ্ধারণ করিতে পারিত। বস্তুতঃ, উহারা সমান নহে। প্রথমটি অনেক সময়ই অপরিবর্ত্তনীয়, সুতরাং সহজেই অন্য জিনিষের "বাড়তি কম্‌তি" ঠিক নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ। কিন্তু শেষোক্তটির প্রায়ই পরিবর্ত্তন ঘটে। বস্তুতঃ, পণ্যদ্রব্যের "উঠ্‌তি পড়্‌তি"র মতনই এই দ্বিতীয় শ্রমের উঠা-নামা।

অ্যাডাম স্মিথের মতে অন্যান্য পণ্যের দামের পরিবর্ত্তন নির্দ্ধারণের জন্য সোনা ও রূপাকে মাপকাঠি হিসাবে ধরা যথেষ্ট নহে, কারণ এই ধাতু উঠে-পড়ে যথেষ্ট। এ জন্য তিনি নিজে শ্রম ও শস্যকে মাপকাঠিস্বরূপ দাঁড় করাইয়াছেন। কিন্তু এই মাপকাঠিও কম পরিবর্ত্তনশীল নয়।

৮। নয়া খনির আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সোনারূপার দামের অবশ্যই পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু এরূপ আবিষ্কার বিরল এবং ইহার প্রভাব যথেষ্ট হইলেও খুব বেশী দিন স্থায়ী হয় না। যে সব যন্ত্রপাতির সাহায্যে এই সব ধাতু খনি হইতে তোলা হয় তাহার উৎকর্ষের উপর দামের ব্যতিক্রম নির্ভর করে; কারণ উন্নততর যন্ত্রপাতিদ্বারা একই শ্রমে অধিক পরিমাণ ধাতু পাওয়া যাইতে পারে। ক্রমাগত কয়েকবৎসর ধরিয়া সরবরাহ করিবার পর খনিজ দ্রব্যের পরিমাণ কমিয়া আসে এবং তজ্জন্য উহার দাম বাড়িতেও পারে। সোনা-রূপার দামের উঠ্‌তি-পড়্‌তি সম্বন্ধে যাহা

খাটে, শস্যের বেলায়ই বা তাহা খাটিবে না কেন? চাষকার্য্যে উন্নত প্রণালী অনুসরণ করিলে, কিম্বা ভাল কল-কব্জা ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিলে উৎপন্ন শস্যের মূল্যের পরিবর্ত্তন হয় না কি? অথবা যদি অন্য কোনো দেশে কোনো নতুন উর্ব্বর জমির খোঁজ পাইয়া সেই দেশের লোক চাষের কাজে লাগিয়া যায়, আর যদি তাহাদের অবাধ বাণিজ্যের সুবিধা থাকে, তবে সেই আমদানি শস্যের উপরও কি দামের উঠ্‌তি-পড়্‌তি নির্ভর করে না? আমদানি বাধা পাইলে এবং দেশের ধন ও জন বাড়িতে থাকিলেও কি শস্যের দামের ব্যতিক্রম হয় না? আবার অপেক্ষাকৃত অনুর্ব্বর জমি চাষ করিতে অধিক শ্রম-ব্যয়ের দরুণ বাড়্‌তি শস্য পাইতে যে বেশী অসুবিধা হইবে, তাহাতেও কি শস্যের দাম বাড়িবে না?

৯। তেমনি, শ্রমের দামেরও কি ব্যতিক্রম হয় না? সামাজিক অবস্থার প্রত্যেক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমের চাহিদা ও যোগানের অনুপাতের ব্যতিক্রম ঘটে। আবার শ্রমজাত খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদার্থের দামের হ্রাসবৃদ্ধি হয়। ইহাদ্বারাও কি শ্রমের দাম অন্যান্য জিনিষের মতই পরিবর্ত্তিত হয় না?

কোনো দেশে এক সময়ে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপন্ন করিতে যতটুকু শ্রমের প্রয়োজন হয়, অন্য সময়ে তাহার দ্বিগুণ শ্রম দরকার হইতে পারে, অথচ পারিশ্রমিক হ্রাস না হইতেও পারে। শ্রমিকের মজুরি যদি কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য হয়, তাহা হইলে সেই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কমাইলে সে বাঁচিতে পারে না। এ স্থলে উৎপাদন-শ্রমের পরিমাণ দিয়া ধরিতে গেলে খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্যের দাম দ্বিগুণ হইয়া যাইত, কিন্তু বিনিময়ে পাওয়া শ্রমের মাপে ধরিতে গেলে তাহাদের দাম বাড়িতে পারে না।

এই কথা দুই তিন দেশ সম্বন্ধে খাটে। আমেরিকার ও পোলণ্ডের জমিতে একবৎসরে কোনো নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক লোক, ইংলণ্ডের সেইরূপ জমির চেয়ে বেশী শস্য উৎপাদন করিতে পারে। যদি মনে করা যায়, এই তিন দেশেই অন্যান্য জিনিষের দাম তুলনায় সমান সস্তা, তবুও উৎপাদনের উৎকর্ষের অনুপাতে শ্রমিকেরা শস্য পাইতেছে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা ভুল হইবে না কি?

শ্রমিকদের জুতা ও পোষাক-পরিচ্ছদাদি যদি যন্ত্রপাতির উন্নতির দরুণ এক-চতুর্থাংশ শ্রমদ্বারা প্রস্তুত করা যায়, তবে তাহাদের দাম শতকরা ৭৫ ভাগ কমিয়া যাইবে। ইহা কিছুতেই সত্য নহে যে, শ্রমিকেরা এই জন্য একটির স্থলে চারিটি কোট কিম্বা চারি জোড়া জুতা ব্যবহার করিতে সমর্থ হইবে। বরং ইহাই সম্ভব যে, তাহাদের মজুরি শীঘ্রই প্রতিযোগিতা ও নব জনশক্তির প্রভাবে, বা নতুন প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বর্ত্তমান দামের সঙ্গে, নিয়মিত হইয়া যাইবে। যদি শ্রমিকদের সমস্ত ব্যবহার্য্য জিনিষের নির্ম্মাণ-প্রণালী উন্নতিলাভ করে, তবুও আমরা সম্ভবতঃ কয়েক বৎসর পরে দেখিব যে, শ্রমিকদের ভোগের কোনো নতুন সামগ্রী বাড়িলেও অতি সামান্যই বাড়িয়াছে, যদিও, যে সমস্ত জিনিষের নির্ম্মাণ-প্রণালীর উন্নতি-সাধন ঘটে নাই, তাহাদের তুলনায় যাহাদের উহা ঘটিয়াছে তাহাদের দাম অনেক কমিয়া গিয়াছে, এবং যদিও তাহাদের প্রস্তুত করিতে অতি অল্প শ্রমই খরচ হইয়াছে।

১০। অ্যাডাম স্মিথ যখন বলেন, "একই শ্রম যখন কোনো সময়ে অল্প মাল ও কোনো সময়ে বেশী মাল ক্রয় করে তখন বুঝিতে হইবে যে, মালের দামেরই কম-বেশী হইতেছে—শ্রমের দামের নহে;—এবং শ্রমই একমাত্র পদার্থ, যার দামের ব্যতিক্রম ঘটে না। উহাই একমাত্র প্রকৃত মাপকাঠি, যাহাদ্বারা অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের দাম সব সময় এবং সব জায়গাতেই নির্দ্ধারিত হয়;"—তখন তাঁর সঙ্গে এক-মত হওয়া যায় না। বরঞ্চ তাঁর নিম্নোক্ত বাক্যই সত্য বলিয়া ধরা যায়,—"বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদন করিতে যে বিভিন্ন পরিমাণ শ্রম লাগে তাহার অনুপাতই বিনিময়-দাম নিরূপণের একমাত্র উপায়।" অর্থাৎ শ্রম-জাত পণ্যদ্রব্যের আপেক্ষিক পরিমাণই উহাদের বর্ত্তমান বা অতীত আপেক্ষিক মূল্য নির্দ্ধারণ করে, শ্রমিকদের শ্রমফল নয়।

* ১২। ধরা যাউক, দুইটি দ্রব্যের আপেক্ষিক দামের ব্যতিক্রম ঘটিল। আমরা জানিতে চাই কোন্‌টির পরিবর্ত্তনই আসল। একটি মালের বর্ত্তমান মূল্য যদি জুতা, মোজা, টুপী, লোহা, চিনি ইত্যাদি পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে তুলনা করি তাহা হইলে দেখি যে, পূর্ব্বের ন্যায় বিনিময়ে

* ১১নং দফা পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণের পরে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

সেই পরিমাণ জিনিষই পাইতেছি। আবার অপরটীর সঙ্গে যদি এই সকল জিনিষের তুলনা করি, তাহা হইলে দেখি যে, উহার দামের ব্যতিক্রম হয়। সুতরাং এই অনুমানই খুব সম্ভব বলিয়া মনে হইবে যে, যাহার তুলনা হইয়াছে, তাহারই দামের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে; যাহাদের সঙ্গে তুলনা হইয়াছে, তাহাদের নহে। আরও গভীরভাবে এই সমস্ত বিভিন্ন জিনিষের উৎপাদন সম্বন্ধীয় অবস্থাসমূহের আলোচনা করিলে যদি দেখিতে পাই যে, জুতা, মোজা, টুপী, লোহা, চিনি ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে ঠিক একই পরিমাণ শ্রম ও পুঁজির আবশ্যক হইতেছে,—কিন্তু, যে জিনিষের আপেক্ষিক মূল্যের পরিবর্ত্তন ঘটিল তাহা উৎপাদন করিতে পূর্ব্বের ন্যায় একই পরিমাণ শ্রম ও পুঁজির দরকার হইতেছে না, তাহা হইলে যাহা এতক্ষণ অনুমান মাত্র ছিল, তাহা এখন ধ্রুব সত্যে পরিণত হইল। ইহা এখন সুনিশ্চিত যে, এই ব্যতিক্রম ঐ একটি জিনিষের মধ্যেই নিবদ্ধ। অতএব আমরা ব্যতিক্রমের কারণও নির্ণয় করিতে পারি।

যদি আমরা দেখিতে পাই যে, এক আউন্স সোনার বিনিময়ে পূর্ব্বোক্ত অথবা অন্যান্য জিনিষ কম পরিমাণে পাই, অথবা কোনো নয়া এবং সমৃদ্ধিশালী খনি আবিষ্কার হওয়াতে কিম্বা যন্ত্রপাতির উৎকর্ষ-নিবন্ধন স্বল্পশ্রমব্যয়ে কোনো নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সোনা পাই, তাহা হইলে আমি সহজেই বলিতে পারি যে, অন্যান্য জিনিসের তুলনায় সোনার দামের পরিবর্ত্তনের কারণ উহার উৎপাদন-প্রণালীর উৎকর্ষ অথবা শ্রমের অল্পতা। এই রূপেই যদি অন্যান্য জিনিষের তুলনায় শ্রমের দাম অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়, এবং যদি দেখিতে পাই যে, এই কমিয়া যাওয়ার কারণ শস্য এবং শ্রমিকের অন্যান্য আবশ্যক জিনিষ উৎপাদনের অধিকতর সুবিধা-নিবন্ধন প্রচুর সরবরাহ, তাহা হইলে মনে হয় ইহা খুবই সত্য যে, উৎপাদনের জন্য শ্রমের পরিমাণ কম হওয়াতে এই শস্য ও অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্যের দাম নামিয়া গিয়াছে এবং শ্রমিকের জীবিকা-অর্জ্জনের সুবিধা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমের দামও কমিয়া গিয়াছে।

কিন্তু অ্যাডাম্ স্মিথ ও ম্যালথাস্ ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন,—"একথা বলাই সত্য হইবে, যে, সোনারই দামের হ্রাস হইয়াছে। কারণ, শস্য ও শ্রমের দামের পরিবর্ত্তন হয় নাই। এবং সোনার বিনিময়ে এ সকল জিনিষ পূর্ব্বের চেয়ে অল্প পরিমাণে পাওয়া যায় বলিয়া বুঝিতে হইবে যে, সকল জিনিষই এক অবস্থায় রহিয়াছে—শুধু সোনার দামেরই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কিন্তু যখন শস্য ও শ্রমের দাম কমে—যাহাদিগকে আমরা সকল প্রকার পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও আমাদের নির্দ্ধারিত মাপকাঠি স্বীকার করিয়া লইয়াছি,—তখন তাহাদের সম্বন্ধে একথা বলা ঠিক হইবে না। সত্য বলিতে হইলে বলিতে হইবে যে, শস্য ও শ্রমের দাম ঠিকই রহিয়াছে, শুধু অন্যান্য জিনিষের দামই কমিয়াছে।"

এই কথার বিরুদ্ধে আমার আপত্তি আছে। বস্তুতঃ, দেখিতে পাই যে, সোনার মত, উৎপাদনের জন্য আবশ্যক শ্রমের পরিমাণের অল্পতাই শস্য এবং অন্যান্য জিনিষের মধ্যে তারতম্যের কারণ। সুতরাং আমি শস্য ও শ্রমের এই তারতম্যকে তাদের মূল্যের হ্রাস বলিতে বাধ্য হইতেছি। এ ক্ষেত্রে যে সকল জিনিষের সহিত শস্য ও শ্রমের তুলনা করা হয় তাহাদের মূল্যের বৃদ্ধি বলা যাইতে পারে না। যদি আমি এক সপ্তাহের জন্য কোনো এক মজুরকে নিযুক্ত করি এবং তাহাকে ১০ শিলিঙের বদলে ৮ শিলিঙ দিয়া থাকি, তবে, শিলিঙের দামের কোনো পরিবর্ত্তন না ঘটিয়া থাকিলে, সেই মজুর ১০ শিলিঙ দিয়া যাহা পাইত, ৮ শিলিঙ দিয়া তদপেক্ষা অধিকতর খাদ্য দ্রব্য ও অন্যান্য দ্রব্য পাইতে পারে। ইহার কারণ ক্রীত বস্তুর দাম কমিয়া যাওয়া, শ্রমিকের শ্রমফলের দাম বাড়িয়া যাওয়া নয় (যাহা অ্যাডাম্ স্মিথ ও ম্যাল্থাস্ বলিয়াছেন)। এই দুই কথার মধ্যে অনেকটা পার্থক্য আছে। অথচ আমি এইরূপ বলি বলিয়া লোকেরা আমাকে স্বাভাবিক ও বিজ্ঞানসম্মত বাক্য প্রয়োগ না করার অপরাধে অপরাধী করে। আমার কিন্তু মনে হয় যে, আমার বিরুদ্ধ-বাদীরাই ঐ দোষে দুষ্ট।

মনে কর, যখন শস্যের দাম প্রতি কোয়ার্টারে ৮০ শিলিঙ তখন মজুরকে এক সপ্তাহের কাজের জন্য এক বুশেল শস্য দেওয়া হইল। আর যখন উহার দাম ৪০ শিলিঙ তখন তাকে সওয়া বুশেল দেওয়া হইল। এখন ধরা যাউক যে, সে এক সপ্তাহে আধ বুশেল শস্য তাহার নিজ পরিবারে খরচ করে এবং অবশিষ্ট অংশের বিনিময়ে জ্বালানি কাঠ, সাবান, মোমবাতি, চা, চিনি, লবণ ইত্যাদি ক্রয় করে। তাহা হইলে যখন সে এক সপ্তাহে এক বুশেল শস্য পাইত তখন আধ বুশেলের বিনিময়ে

সে যে পরিমাণ জিনিষ ক্রয় করিতে পারে ঠিক সেই পরিমাণ জিনিষ সে (যখন সপ্তাহে সওয়া বুশেল পায় তখন) নিজ পরিবারের আধ বুশেল খরচ বাদে অবশিষ্ট তিন-চতুর্থাংশ শস্যের বিনিময়ে কখনো পাইতে পারে না এবং পাইবে ও না। যদি ইহাই হয়, তাহা হইলে শ্রমের দাম কি বাড়িয়াছে, না কমিয়াছে? অ্যাডাম্ স্মিথ অবশ্য বলিবেন দাম বাড়িয়াছে। কারণ, তাঁহার মাপকাঠি হইল শস্য, এবং এক সপ্তাহের শ্রমের জন্য মজুর বেশী শস্য পায়। এই অ্যাডাম্ স্মিথই আবার বলিবেন যে, দাম কমিয়াছে। কারণ বিনিময়ে অন্যান্য জিনিষ ক্রয় করিবার ক্ষমতার উপরেই পণ্যদ্রব্যের দাম নির্ভর করে, এবং শ্রমের এইরূপ ক্ষমতা খব কম।

যুবক বঙ্গের পল্লীনিষ্ঠা

(১)

"পল্লী-সেবা"র অপর পিঠ

পল্লী-বাসী আবদুল কাদের ঢাকার "পঞ্চায়েৎ" সাপ্তাহিকে লিখিতেছেন :—

পাড়া গাঁ।

"স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় "ব্যাক্ টু ভিলেজেস্" (আবার চল পল্লীতে) বলিয়া চীৎকার করিতেছেন। কবিরা "তোরা ঘরের পানে তাকা" বলিয়া কান্নাকাটি করিতেছেন। "নেশ্যন ডোয়েলস্ ইন্ কটেজেস্" (কুঁড়েতেই বাস করে দেশের লোক) ইত্যাদি অনেক রকমের প্রবাদ-বাক্য পথে ঘাটে আওড়ান হইতেছে। কিন্তু বাঙলার জননায়ক ও তথাকথিক নেতৃস্থানীয় লোকেরা এই সকল যুক্তিকে আজিও খাটি এবং সমীচীন বলিয়া মানিতে পারেন নাই। যে দু' একজন ঠেকিয়া, ঘা' খাইয়া পাড়া-গাঁয়ের উন্নতি-বিধানকেই প্রথম করণীয় ভাবিয়াছেন, তাঁহারাও দেশের হিতকল্পে চাষীদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ আর সংস্কৃত করিতে অস্বাস্থ্যকর পল্লীতে যাইতে নারাজ! তাঁহারা কেবল সহরের প্রাসাদে বাস করিয়া তদ্বিষয়ে বক্তৃতা ঝাড়িতেছেন! বাঙলার হিতসাধন-মণ্ডলী, শ্রীনিকেতন, অভয়াশ্রম, প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ, এন্টিম্যালেরিয়াল কো-অপারেশন ইত্যাদি অনুষ্ঠানের ঋষি-কর্ম্মীরা বাস্তবিক পক্ষে পাড়াগাঁয়ের বিশ্রী পথে পদার্পণ করিয়া কতখানি কল্যাণ-সাধনে ব্রতী, সে বিষয়ে আমি অজ্ঞ। পুস্তিকা-প্রচার, উপদেশ আর উপায়-নির্দ্ধারণেই তাঁহাদের অনেকটা মূল্যবান সময় কাল্পনিক সফলতার আশায় নানা পথে ব্যয়িত হইতেছে।

সমাজ বা দেশের যারা যথার্থই মেরুদণ্ড, তাহাদের বাদ দিয়া কখনই দেশের মুক্তি আসিতে পারে না। পল্লীর পূর্ণ সংস্কার ব্যতিরেকে কখনই বাঙলার উদ্ধার নাই, ইহা নিছক সত্য।

এক্ষণে অনেক নেতা পল্লী-সংগঠন-কল্পে দলবল আর উপায়-অস্ত্র নিয়া দেশের অভ্যন্তরে উপস্থিত হইবেন বলিয়া আশ্বাস দিতেছেন। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও বলিতেছি, অনেক তথা-কথিত কর্ত্তারা, পরে কৃষাণদের মহামঙ্গল সাধন করিবেন এই আশ্বাস আর প্রতিশ্রুতিতে, বহু টাকা চাঁদা তুলিয়া কিম্বা সাহায্য-ভিক্ষা করিয়া কংগ্রেসের নামে আনিয়াছেন। পাড়া-গাঁ অনেকবার মুঠো-চাউল আর পরিশ্রমের পয়সা না খাইয়া দিয়াছে। দু'মাসের মধ্যেই রথে চড়িয়া স্বরাজ আসিতেছে শুনিয়া দেশের চাষীরা দু'হাতে দান করিয়াছিল, স্বেচ্ছাসেবকের হাতে নানা ভাবে নির্য্যাতিত হইয়াছিল। কিন্তু আসলে যাহা আসিল তাহা নানাদিকের শুল্ক-বৃদ্ধি, নতুন জীবন-ক্ষয়-কর আইনকানুন সব!

আমি পল্লী-গঠনাভিলাষী নেতৃগণকে অনুরোধ করি যে, তাঁহারা যদি বা পাড়া-গাঁর কর্দ্দম আর মশা সহ্য করিয়া তথায় অবস্থান করিতে প্রয়াসী হন, দুঃখী চাষীর পয়সা যেন মিথ্যা আশ্বাসে গ্রহণ না করেন। এই দান আর মুক্তির জন্য সাময়িক উত্তেজনা তাহাদের পীড়িত গুরুভার জীবনকে ভবিষ্যতে বরঞ্চ আরো দুঃস্থই করিয়া দেয়!"

মফঃস্বলের এই বাণী অগ্রাহ্য করিলে চলিবেনা। এই মত সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

(২)

বঙ্গে পল্লীসেবার ইতিহাস

১৯০৫-৬ সনের "স্বদেশী" যুগে অন্যান্য আন্দোলনের সঙ্গে পল্লীসেবার আন্দোলনও কথায় এবং কাজে কিছু কিছু সুরু হয়। বাংলাদেশের জেলায় জেলায় অল্পবিস্তর প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে থাকে। সেই আন্দোলনের চিন্তা ও কর্ম্মপ্রণালীর অন্যতম নিদর্শন মাসিক "গৃহস্থ" পত্রিকায় দেখিতে পাওয়া যায়। মালদহের শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী এবং মুর্শিদাবাদের শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি সুধীগণের কোনো কোনো রচনা ১৯১০-১১ সনের যুগ সম্বন্ধে সাক্ষী। কিন্তু পল্লীসেবার আন্দোলনে যত কর্ম্মী বাহাল করা আবশ্যক, তাহা সামলাইয়া উঠা তখনকার দিনে বাঙ্গালী জাতির পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই।"

লড়াইয়ের আমলে (১৯১৪-১৮) বাংলার পল্লীজীবনে আধ্যাত্মিক আলোড়ন তুমুলভাবে উপস্থিত হইয়াছিল। শহরে কাগজপত্রের প্রভাবে মফঃস্বলের প্রাণে এক অভিনব চেতনা আসিয়াছিল। অধিকন্তু, আর্থিক হিসাবে বাংলার পল্লী যে অতিদূর-বিদেশের,—দুনিয়ার পল্লীবাসীর ও শহরবাসীর,—জীবন-ধারার সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে গ্রথিত. তাহাও বাঙালী নরনারীমাত্রের চিন্তায় স্থায়ী স্থান অধিকার করিতে থাকে। জগতের উঠা-নামাকে বাদ দিয়া বঙ্গীয় পল্লীসমাজ উঠিতে নামিতে পারিবে না, এইরূপ ধারণা চিন্তাশীল লোকের মাথায় জন্মিতেছিল।

১৯২১-২২ সনের "অসহযোগ আন্দোলনে" পল্লীবাসীরা যে অল্পবিস্তর সাড়া দিয়াছিল, তাহা অনেক পরিমাণে এই লড়াইয়ের যুগের বিপুল বিশ্বশক্তির অন্যতম ফল। দুনিয়ায় যে বিরাট সাম্যমন্ত্র ও গণতন্ত্র এবং মজুর-চাষীর স্বরাজ দেখাদিয়াছে তাহাকে অস্বীকার করা বাঙালী পল্লীসমাজের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। শহরের সাহায্যে বাংলার পল্লী বর্ত্তমান জগতের কর্ম্ম ও জ্ঞানমণ্ডলের ভিতর জাগিয়া পড়িয়াছিল।

পল্লীর সঙ্গে শহরের এবং বিশ্বশক্তির নিবিড় সংযোগ স্থাপন করিবার জন্য কর্ম্মদক্ষ যন্ত্র আবশ্যক। তাহার অভাব এই বিশ বৎসরের ভিতর কেহই সম্যকরূপে ঘুচাইতে পারে নাই।

"দেশবন্ধু পল্লী-সংস্কার সমিতি" কলিকাতার কেন্দ্রস্থল হইতে বিগত পাঁচ-ছয় মাস ধরিয়া যাহা-কিছু করিতেছেন তাহাকেই যুবক বাংলার সর্ব্বপ্রথম ঐক্য-গ্রথিত এবং শৃঙ্খলীকৃত দেশব্যাপী পল্লী-গঠন-প্রয়াস বিবেচনা করা চলে। এই প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মকথা, পরিমাণে অল্প হইলেও, বাঙালীর ইতিহাসে এক বড় ঘর অধিকার করিবে বলিয়া বিশ্বাস হইতেছে।

(৩)

দেশবন্ধু পল্লীসংস্কার সমিতির কার্য্যপ্রণালী

এই সমিতি কোন্ প্রণালীতে কাজ করিতেছেন তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে :—

কেন্দ্র নির্ণয়

দেশবন্ধু পল্লী-সংস্কার ধনভাণ্ডারের আয়-ব্যয়-নির্দ্ধারণ সমিতি জিলা কংগ্রেস কমিটিকে প্রতি মহকুমায় এক একটী কেন্দ্র স্থাপন করিতে লিখেন। তাঁহারা স্থান নির্ণয় করিলে কলিকাতা হইতে একজন ইন্স্পেক্টর গিয়া ঐ নির্দ্ধারিত কেন্দ্র কাজ করা সম্ভব জানাইলেই উহা নির্ব্বাচিত হয়।

কর্ম্মি-সংগ্রহ

জিলা কংগ্রেস কমিটী ঐ কেন্দ্রের জন্য স্থানীয় এবং পরিচিত একটী উৎসাহী, কর্ম্মঠ, চরিত্রবান কর্ম্মী নিয়োগ করিবেন, যিনি তাঁহার পূর্ব্ব পরিচয়ের ফলে সকলের শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র হইয়া ঐ কেন্দ্রটীকে গ্রামবাসীর সহযোগে অনতিবিলম্বে গড়িয়া তুলিতে পারেন।

কাজ

ঐ কর্ম্মী নির্দ্ধারিত কেন্দ্রের সকল মাতব্বর ও বিশিষ্ট লোকদিগের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া "পল্লী-সংস্কার সমিতির" উদ্দেশ্য বুঝাইবেন এবং ঐ কেন্দ্রে কোন্ কাজটা সর্ব্বাগ্রে হওয়া উচিত তাহা পরামর্শ করিবেন। আগে স্বাস্থ্যের প্রতি, কি শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে তাহা স্থির করিবেন। যে কাজটি করিলে কেন্দ্রস্থ অধিকাংশ লোকের সুবিধা হয় বা অভাব-মোচন হয় এবং যদ্দ্বারা অল্প সময়ে সকলের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস লাভ করা যায়, এমন কাজ সর্ব্বাগ্রে আরম্ভ করিবেন। কেন্দ্রস্থ মাতব্বরদিগের দ্বারাই গ্রামবাসীদিগের ডাকাইয়া একটী সভা করিবেন। ঐ সভায়

মাতব্বরগণ এবং কর্ম্মী মহাশয় দেশবন্ধু পল্লী-সংস্কার সমিতির উদ্দেশ্য বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিবেন। গ্রামে যে কাজ হইবে উহা কেবল গ্রামবাসীদেরই উন্নতির এবং অভাব দূর করিবার জন্য। কি করিলে তাহাদের অভাব দূর হইবে তাহা গ্রামবাসীরাই নির্দ্ধারণ করিবেন। ঐ জনসভা অধিকাংশের মতে একটী পল্লী-সংস্কার সমিতি স্থাপন করিবেন এবং একটী কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা গঠন করিয়া কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন।

লক্ষ্য

গ্রামে কি কি কাজ করা যাইতে পারে এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে লক্ষ রাখা দরকার তাহার আভাস মাসিক 'রিপোর্ট ফর্‌মে' দেওয়া হইয়াছে। ঐ ফর্‌মে উল্লিখিত সকল কাজ দুই তিন মাসেই কোনও কেন্দ্রে করা সম্ভব হইবে না। আপাততঃ সকল কাজ করিতে না পারিলে নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। প্রত্যেক কর্ম্মী 'রিপোর্ট ফর্‌মে'র দিকে লক্ষ রাখিয়া ক্রমে ক্রমে কাজ গড়িয়া তুলিবেন এবং উন্নতির পথে সমগ্র কেন্দ্রকে লইয়া যাইবেন।

যোগাযোগ

সকল কেন্দ্রই "ইউনিয়ান বোর্ড,' 'লোকাল বোর্ড,' বা 'ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডে'র সাহায্য লইতে পারিবে। বাঙ্গালার বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত যোগ রাখিয়া কার্য্য চলিতে পারিবে, যদি সেই যোগের দ্বারা স্ব-বিরোধিতা না হয়। কেন্দ্র পরিচালনের যে সমিতি হইবে উহাতে 'ইউনিয়ান্ বোর্ডের' সভ্য লইতে পারিবেন এবং এই প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্টতা নষ্ট না করিয়া 'ইউনিয়ান বোর্ডে'র সহযোগে কাজ করিতে পারিবেন।

মাসিক হিসাব ও কার্য্যবিবরণী

প্রত্যেক কেন্দ্র, আয়-ব্যয়ের পরিষ্কার হিসাব রাখিবেন, এবং প্রতি মাসে 'রিপোর্ট ফর্‌মে' মোট আয়-ব্যয় লিখিয়া পাঠাইবেন। 'রিপোর্ট ফর্‌মে' চুম্বকে কেন্দ্রের সকল কথা জানাইবেন। হিসাব ও 'রিপোর্ট ফর্‌ম' না পাইলে মাসিক সাহায্য পাঠান হইবে না। মাসের শেষ তারিখে 'রিপোর্ট ফর্‌ম' পূরণ করিয়া পাঠাইতে হইবে। যে সব স্থলে কর্ম্মীকে সম্পাদকের কাজ করিতে হয়, সেখানে কেন্দ্র-সমিতির সভাপতি 'রিপোর্ট ফর্‌মে' স্বাক্ষর করিবেন। কেন্দ্র-সমিতির কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার আলোচ্য বিষয় এবং সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিয়মিত পাঠাইতে হইবে।

আশা

কয়েক মাস কিম্বা এক বৎসর কাজ এবং চেষ্টার দ্বারা যদি কেন্দ্রস্থ গ্রামবাসীদিগের মনে একটী নূতন সংজ্ঞা জাগে এবং সঙ্গে সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিবার প্রবৃত্তি ও শক্তি দ্বারা তাঁহারা আত্মশক্তিতে বিশ্বাসের পরিচয় দেন, তাহা হইলেই "দেশবন্ধু পল্লী-সংস্কার ধনভাণ্ডারের" চেষ্টা ও আশা অনেক পরিমাণে সফল হইবে।

ভবিষ্যৎ

কোনো প্রতিষ্ঠানকে স্থায়ী করিতে হইলে "নিত্য ভিক্ষা তনুরক্ষা" এই উপায়ে দিন কাটান চলে না। কলিকাতা ফণ্ড হইতে চিরকাল সাহায্য দেওয়া সম্ভব নয় এবং উচিতও নয়। যে সংজ্ঞা ও আত্মশক্তির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে উহা যে জাগিয়াছে তাহার প্রমাণ কেন্দ্রটীর স্বাবলম্বী হওয়াতে। তাই প্রত্যেক কেন্দ্র যাহাতে অচিরে স্বাবলম্বী হইয়া উঠে তাহাই করিতে হইবে। প্রত্যেক কর্ম্মী ও কাজের একটা মূল্য আছে। কাজেই প্রত্যেক কর্ম্মী ও কাজকে স্বাবলম্বী করিতে না পারিলে কোনও প্রতিষ্ঠান টিকিবে না। সেইজন্য "প্রবর্ত্তক সঙ্ঘে"র ছাঁচে কর্ম্মবহুল ও স্বাবলম্বী আশ্রম গড়িয়া কর্ম্মীদল ও সকল কাজ রক্ষা করিতে হইবে। পল্লী-সংস্কারের কাজ স্থায়ী এবং ক্রমোন্নতিশীল করিবার জন্য এই প্রকার আশ্রম প্রতিষ্ঠা একমাত্র সহজ উপায় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রত্যেক কেন্দ্র একটি করিয়া আশ্রম গড়িয়া তুলিতে লক্ষ রাখিবেন এবং প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন।

(৪)

দেশবন্ধু পল্লী-সমিতির মাসিক "রিপোর্ট ফর্‌ম"

যে-যে পল্লীতে এই সমিতির কাজ চলিতেছে সেই সকল পল্লী হইতে প্রতি মাসে কলিকাতার কর্ম্মকেন্দ্রে কাজের রিপোর্ট দেওয়া হয়। এই রিপোর্ট দিবার সময় কর্ম্মীদিগকে যে সকল নিয়ম পালন করিয়া চলিতে হয় নিম্নে তাহার পরিচয় দিতেছি :—

দেশবন্ধু পল্লীসংস্কার ধনভাণ্ডারের কার্য্যবিবরণী

কেন্দ্র······ ······　　মাস·················

নাম······ ·······························সন

স্বাস্থ্য

রোগীর সংখ্যা·········স্ত্রী·······পুরুষ······বালক······ ···

প্রধান প্রধান রোগের নাম (ক)………(খ)………… স্থানীয় বা নিকটবর্ত্তী কোন ডাক্তারের সাহায্য পাওয়া যায় কি?……কি কি প্রকারে?………………………… পুকুর পরিষ্কারের সংখ্যা……কি প্রণালীতে?……রিজার্ভ ট্যাঙ্ক হইয়াছে কি?…কতটা জঙ্গল পরিষ্কার হইয়াছে………? কি প্রণালীতে?……নূতন রাস্তা তৈয়ারি হইয়াছে?…… গ্রামের জল নিকাশের ব্যবস্থা হয়েছে কি?……স্বাস্থ্য বিষয় কি কি প্রচার কার্য্য হইয়াছে?……………………

শিক্ষা

দৈনিক বিদ্যালয়ে উপস্থিত ছাত্র সংখ্যা……কি কি জাতি পড়ে?……………………………………

গত মাসের ছাত্র সংখ্যা……মেয়েদের স্কুল হইয়াছে কি?……ছাত্রী সংখ্যা……নৈশ বিদ্যালয় কয়টী?…… উপস্থিত ছাত্র সংখ্যা……কি কি জাতি পড়ে……? ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে কি কি চেষ্টা হইয়াছে?……গত মাসের ছাত্র সংখ্যা……ব্রতীদল সংগঠিত হইয়াছে কি?… ব্রতীদলের সংখ্যা……ব্রতীদল কি কি কাজ করেন? (ক)… (খ)…………(গ)……খেলা ধূলার ব্যবস্থা……ব্যায়াম চর্চ্চা হয় কি?……কেন্দ্রে বা নিকটে পাঠাগার আছে কি?……কয়জন যুবক পড়ে?……রিডিং ক্লাব আছে কি?……ডিবেটিং ক্লাব আছে কি?………ট্রাভেলিং লাইব্রেরী আছে কি?……কয় জায়গায় ঘুরিয়াছে?…… কত লোক পড়িয়াছে?……কয় দিন রিডিং "মিটিং" হইয়াছিল?……কত লোক হইয়াছিল?………………

সামাজিক

সকলের মধ্যে সৌহৃদ্য স্থাপনের জন্য কি করা হইয়াছে?… মেলা-মেশা, আমোদ উৎসবের জন্য কিছু করা হইয়াছে কি?……বিবরণ……অস্পৃশ্যতার ভেদনীতি দূর করিতে নূতন সংজ্ঞা জাগাইবার জন্য কি কি করা হইয়াছে ও তাহার ফল………অনুন্নত জাতিদের সঙ্গে মেশা হয় কি? ………বাল্য-বিবাহ নিবারণ এবং প্রয়োজনীয় বিধবা-বিবাহগুলি সম্ভবপর করিতে কি কি করা হইয়াছে?……… গরিব বিধবাদের জন্য কি করা হইয়াছে?……………… মাদকতা নিবারণের জন্য কি কি করা হইয়াছে?……………… গ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলাদলি দূর করিতে কি কি করা হইয়াছে? ………………………মোকদ্দমার প্রবৃত্তি কমাইতে কি কি করা হইয়াছে?………কয়টী মামলা সালিশীতে নিষ্পত্তি হইয়াছে?………গ্রামবাসীদের সঙ্গে মিশিয়া কি কি কাজ হইয়াছে?……সংকীর্ত্তন হয় কি?………… কথকতা?……আবৃত্তি?……ভাগবত ও কোরাণ পাঠ? ……ভাল ভাল বই হইতে পড়িয়া শুনান হয় কি?……… এ সবের ফল কি?……গ্রামবাসীদের মধ্যে একতা আনিয়া সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজ করিবার চেষ্টা হইতেছে কি?……… কি কি কাজ সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে হইতেছে?………………… গ্রামবাসীদের লইয়া কয়টা সভা এমাসে হইয়াছিল?……… কি কি বিষয় আলোচনা হইয়াছিল?…………মহিলা সভা হইয়াছিল কি?……কি কি বিষয় আলোচনা হইয়াছিল?…

চরকা

কয়টী পরিবারে চরকা ঘুরে?……এই মাসে কত গজ সূতা হইয়াছে?……গত মাসে কত গজ হইয়াছিল?… চরকা ও খদ্দর প্রচারের জন্য কি কি করা হইতেছে?…… প্রতি মাসে চরকা প্রতিযোগিতা হয় কি?……তাহার বিবরণ……পরিবারে পরিবারে কয়টী করিয়া তুলার গাছ হইয়াছে?………খদ্দর বিক্রয়ের কোনও উপায় আছে কি?……গ্রামে প্রতিমাসে যে সূতা হয় তাহা কি করা হয়?…………………………………………

কৃষি ও শিল্প

কৃষির উন্নতির জন্য কিছু করা হইয়াছে কি?……… সার ও বীজ বিষয়ে তথ্য প্রচার হয় কি?……কৃষি সভা মধ্যে মধ্যে হয় কি?…………ফসল অদল-বদল (অলটারনেটিভ অ্যাণ্ড রোটেসন ক্রপ) করিয়া কৃষির উন্নতির ব্যবস্থা হইতেছে কি?…………ঐ অঞ্চলে নূতন ফসল কিছু প্রচলনের চেষ্টা হইতেছে কি?………সাইমালটেনিয়াস ক্রপ এর চেষ্টা কৃষকেরা করিতেছে কি?………………… পরিবারে পরিবারে শাকসবজীর বাগান করিয়া আয়-বৃদ্ধির ব্যবস্থা হইয়াছে কি?……………সমবায় প্রণালীতে তুলার চাষের ব্যবস্থা হইতেছি কি?……সমবায় প্রণালীতে বাঁধ তৈয়ারি করার চেষ্টা হইতেছে কি? ……………গো জাতির উন্নতিকল্পে কি করা হইয়াছে? ………সাধারণ গোচারণ ভূমির ব্যবস্থা করা হইয়াছে কি? …………সমবায় প্রণালীতে গ্রামের উৎপন্ন শস্য ও জিনিষ বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে কি?…………কুটীর শিল্পের

উন্নতির জন্য কি করা হইয়াছে?......গ্রামে বেকার অবস্থায় যাহারা বসিয়া আছে তাহাদের রোজগারের পথ করিয়া দিতে কি ব্যবস্থা হইয়াছে?......কুটীর-শিল্প-মঙ্গল তথ্য কিছু প্রচার করা হইয়াছে কি?.........এই প্রচারের ফলে কেহ কেহ রোজগার বাড়াইবার জন্য নূতন শিল্প শিখিয়াছে কি? কেমন লাভ করিতেছে?.........গরিব পরিবারে পাটের কি কি দ্রব্য তৈয়ারি করিতে উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে ও তাহার ফল কি?......বিধবা এবং অবসর মত পরিবারস্থ সবাই চরকা বা বেতের কাজ বা নারিকেলের ছোবড়া হইতে নানা প্রকারের দ্রব্য প্রস্তুত করে কি?... ...কাগজের, কাপড়ের স্যাটীন, গালার, রবারের এবং টিনের পুতুল তৈয়ারি করে কি? ......সূচীর কাজ প্রচলনের চেষ্টা হইতেছে কি?......ফল? .. ...চিকণ বোনা এবং কাঁথা সেলাইয়ের ব্যবস্থা আছে কি? ......শণের সূতলী বা দড়ি তৈয়ারি হয় কি? পাটী বোনা? ......চট ও রঙ্গীন কাপড়ের পাড় দিয়া আসন বোনা?...... ত্রিপুরার সস্তা ও সহজ হাত তাঁতের সাহায্যে গামছা, ছোট চাদর, টেবিল ক্লথ, লুঙ্গি বোনার ব্যবস্থা হইতেছে কি?...... নানারূপ আচার, মোরব্বা ও চাটনি তৈয়ারি হয় কি?...... গ্রামবাসীদের আরনিং ক্যাপাসিটী অর্থাৎ পারচেসিং ক্যাপাসিটী বাড়াইবার জন্য কি কি হইয়াছে?............ "সেল্‌ফ্‌ হেল্‌প" এবং "ডিগনিটি অব লেবার" তথ্য কি কি ভাবে প্রচার করা হইয়াছে এবং তাহার ফল?......গ্রামের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমবায় প্রণালীতে ক্রয় করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে কি?......গ্রামে দেশী জিনিসের দোকান আছে কি?.........পাটের চাষ ও তৎসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা হইয়াছে কি?......সমবায় প্রণালীতে গ্রামের পাট বিক্রয় ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইয়াছে কি?..

প্রচার

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, সমবায় এবং সমাজ সম্বন্ধে কি ভাবে প্রচার-কার্য্য হইয়াছে?............প্রচার ফলপ্রদ হইতেছে কি?..

আয়

ধর্ম্মগোলা স্থাপন করিয়াছেন কি?.........প্রত্যেক পরিবার হইতে যে সময় যে ফসল ও ফল হয়, ধর্ম্মগোলার জন্য উহা কিছু কিছু সংগ্রহ করার (যেমন ধানের সময় ধান, পাটের সময় পাট, ডালের সময় ডাল, তিলের সময় তিল, সরিষার সময় সরিষা এবং আম, কাঁটাল, কুমড়া, লাউ, সুপারি, ডাব প্রভৃতির বিক্রয়লব্ধ টাকা স্থানীয় পল্লী-শ্রী ফণ্ডের জন্য) ব্যবস্থা হইতেছে কি?... ...পূজা, বিবাহ, শুভানুষ্ঠান, সালিশী, মোকদ্দমা নিষ্পত্তি বা মোকদ্দমা জয় এবং শ্রাদ্ধ উপলক্ষে গ্রামভিটা আদায় হয় কি?...... ..কত হইয়াছে? ....মুষ্টি-ভিক্ষার ব্যবস্থা কি হইয়াছে?... . এখন কত চাউল সংগ্রহ হয়?... .... কত চাঁদা সংগ্রহ হয়?......পুকুর জমা লইয়া আয় করা হয় কি?.........কেন্দ্রের কাজ স্থায়ী ভাবে চালাইবার জন্য ভূমি সংগ্রহ ও আবাদ করার চেষ্টা হইতেছে কি?...... কো-অপারেটিভ ষ্টোর স্থাপন করিয়া আয় করা হয় কি?...

বাণিজ্য-লড়াইয়ে জাপান, ভারত ও ইংল্যাণ্ড

বোম্বাইয়ের ব্যবসাদারেরা জাপানের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন রুজু করিয়াছেন। জাপানকে ভারতীয় বাজার হইতে বয়কট করিবার প্রস্তাব পর্য্যন্ত আলোচিত হইতেছে।

জনসাধারণ এই আন্দোলনটার জটিলতা বোধ হয় সহজে বুঝিতে পারিতেছে না। ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রধানতঃ স্বদেশী কলওয়ালাদের স্বপক্ষীয় তথ্য ও মত প্রচারিত হইতেছে। কিন্তু কলওয়ালাদের আন্দোলনে কতটা যুক্তি ও সত্য আছে তাহার সমালোচনায় ও কোনো কোনো ভারতবাসী নজর দিয়াছেন।

দুই তরফের কথাই ধীরভাবে বুঝিয়া দেখা কর্ত্তব্য। কলওয়ালাদের স্বার্থ পুষ্ট হইলেই ভারতের স্বাদেশিকতা বাঁচিয়া গেল অথবা ভারতীয় স্বার্থ পুষ্ট হইল এরূপ না ভাবিবারও কারণ থাকিতে পারে।

ভারতে জাপানী কাপড়

জাপান যে ভাবে ভারতবর্ষে সূতা ও কাপড় প্রেরণ করিতেছে, তাহাতে বোম্বাইয়ের কলের মালিকেরা অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের আশঙ্কা যে একেবারে অমূলক নহে, তাহা গভর্ণমেণ্টও স্বীকার করেন। "ভারতের ব্যবসা-আলোচনা" (রিভিউ অব্ দি ট্রেড্ অব্ ইণ্ডিয়া) নামক সরকারী বাৎসরিক বিবরণ এবং ১৯২৪-২৫ সনের বোম্বে প্রেসিডেন্সীর 'সি বোর্ণ্ ট্রেড্ এণ্ড কাষ্টমস্ এড্মিনিষ্ট্রেশন্ রিপোর্টে' সরকার এ কথার আভাষ দিয়াছেন। ১৯১৪-১৫ সনে জাপানী সূতার আমদানি ছিল দশ লক্ষ পাউণ্ডের কিছু কম। আর প্রায় দশ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯২৪-২৫ সনে তাহা বাড়িয়াছে প্রায় বত্রিশ গুণেরও অধিক। ১৯১৪-১৫ সনে জাপানী কাপড় আমদানি হইয়াছে প্রায় ১৬,০০০,০০০ গজ এবং ১৯২৪-২৫ সনে আমদানি হইয়াছে তাহার প্রায় দশ গুণ বেশী।

গত পাঁচ বৎসরে জাপানী কাপড় কিরূপ আমদানি হইয়াছে, তাহার একটা তালিকা আমরা নিয়ে দিলাম :—

বৎসর	গজ	মূল্য
১৯২১-২২	৯০,২৭৫	৩৬,৭০২,০০০৲
১৯২২-২৩	১০৭,৭৭৮	৪২,৪৯০,০০০৲
১৯২৩-২৪	১২২,৯০২	৬৫,৯৪৫,০০০৲
১৯২৪-২৫	১৫৫,৩০২	৫৭,৪৬৩,০০০৲
১৯২৫-২৬ (৯ মাসে)	১৫৪,৯১০	৪৯,৯৮০,০০০৲

জাপানী কাপড়ের আমদানি যদি এইরূপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে দেশীয় কাপড় যে আর সহজে বিকাইবে না, তাহা সহজেই বুঝা যায়। জাপান আমাদের দেশ হইতে তুলা লইয়া যায়, সেই তুলায় কাপড় বানাইয়া সেই কাপড় অল্পমূল্যে আবার আমাদের দেশেই বিক্রী করে। কেমন করিয়া তাহা পারে, আমাদের দেশের অনেক লোকেই হয়ত তাহা জানেন না। জাপানের কলের মজুরেরা ভারতীয় মজুর অপেক্ষা বেশী কর্ম্মদক্ষ। সেখানে দিনরাত কলে কাজ চলে, ফ্যাক্টরি-আইন কঠোর হইলেও তাহার প্রয়োগ তত কড়াকড় নয়। বোধ হয় এই সব কারণেই প্রতিযোগিতায় জাপান এরূপ জয়ী হইতেছে। কিন্তু এখনই যদি তাহাকে বাধা দেওয়া না যায়, তবে দেশের বস্ত্রশিল্পের ভবিষ্যৎ বড়ই অন্ধকারময়। জাপান শুধু এই দিক্ দিয়াই এ দেশের ক্ষতি করিতেছে না, ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের পথও সে রুদ্ধ করিয়া দিতেছে। চীনের সহিত ভারতের সূতার কারবার ছিল। তাহাও জাপান দখল করিয়া লইয়াছে। চীনদেশে ভারতের কাপড় যাইত, তাহাও জাপানের কৃপায় আর যায় না। শুধু যে চীনের বাজার দখল করিয়াই সে ক্ষান্ত হইয়াছে, তাহা নহে। ভারতের অন্যান্য বিদেশী বাজার যথা—মিশর, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতিও সে দ্রুত গতিতে দখল করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

বর্ত্তমানে জাপান হইতে বিশেষ ভাবে শাদা জিন্, শাদা লংক্লথ এবং চাদর আমাদের দেশে আমদানি হয়। এই সব জিনিষ ভারতবর্ষে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং জাপান এই সব জিনিষ এখানে কম দরে দিয়া প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করিতেছে।

জাপান বনাম ল্যাঙ্কাশিয়ার

আমাদের দেশের কলের মালিকেরা এমন চতুর ভাবে প্রচার-কার্য্যে লাগিয়াছেন যে তাহাতে জাপানের প্রতিযোগিতা বিষয়ে আমরা উদ্বিগ্ন না হইয়া থাকিতে পারিতেছি না। কিন্তু বিদেশের আমদানি কাপড় এবং হাতের ও কলের তৈয়ারি ভারতীয় কাপড়ের তালিকা যদি আমরা গভীরভাবে আলোচনা করি, তবে দেখিতে পাই—(১) সমগ্র আমদানি কাপড়ের মধ্যে জাপানের আমাদানি কাপড় কেবলমাত্র শতকরা দশ ভাগ এবং (২) ভারতে জাপানী কাপড়ের কাট্‌তি (পুনর্ব্বার রপ্তানি বাদ দিবার পরে) সমগ্র কাট্‌তি কাপড়ের মধ্যে শতকরা প্রায় তিন-ভাগ মাত্র। জাপানের প্রতিযোগিতা কতখানি, তাহা ইহা হইতেই বুঝা যাইবে।

তার পর প্রতিযোগিতাটা কীদৃশ? আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে তাহা বেশী ক্ষতিকরও নহে। পুনর্ব্বার রপ্তানির কথা ধরিয়াও বলা যায়, সমষ্টির ⅔ অংশ কেবল জীন্ ও থান্ এবং বাকী অংশ ছিট্। যাঁহারা কারবারের ভিতরকার লোক, তাঁহারা বেশ জানেন যে, জাপানী জীন্ ও থানের ব্যবসা ইহার মধ্যেই অক্কা পাইতে বসিয়াছে। ভারতের এই সব জাতীয় কাপড়ের সঙ্গে জাপান আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। তাহার মালের দাম প্রায় সব

সময়েই শতকরা ৫ হইতে ৭ ভাগ চড়া। গুণে কিঞ্চিৎ ভাল বলিয়া এখনও সেগুলি চলিতেছে। কিন্তু দেশজ দ্রব্যের উপর মাশুল (একছাইজ ডিউটি) উঠিয়া যাওয়া হইতে জাপান এখন আহাম্মদাবাদ কলের থান অথবা বোম্বাইয়ের কলের জীনের সহিত প্রতিযোগিতায় পারিতেছে না।

ছিট্ কাপড়ের ও অংশের দিকে তাকাইলে আমরা কি দেখিতে পাই? দেখি যে, এ ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা একেবারেই নাই। এই কাপড়ের অধিকাংশই ৩৬ হইতে ৪২ নম্বরের সূতায় প্রস্তুত। কিন্তু ভারতীয় ছিট্ ও লংক্লথ বহুল পরিমাণে ২৪ অথবা তাহার নিম্ন নম্বরী সূতায় প্রস্তুত। যদি জাপানী ছিটের কোনো প্রতিযোগিতা চলিয়া থাকে, তবে তাহা চলিয়াছে ল্যাঙ্কাশিয়ারের মালের সঙ্গে এবং তাহাও কেবল শাদা ছিটের বেলায়। আবার জাপানী ছিটের বহর মাত্র ৪৪ ইঞ্চি। কারণ তদধিক বহরের তাঁত জাপানে নাই। সুতরাং ৪৪ ইঞ্চি হইতে ৬০ ইঞ্চি অথবা তদধিক বহরের মিহি কাপড়ে ল্যাঙ্কাশিয়ারেরই একচেটিয়া অধিকার। এই সব সামান্য বিষয় হইতে বেশ বুঝা যায়, জাপানের বিরুদ্ধে যে ক্ষতিজনক আন্দোলন চলিতেছে, তাহা কেবল তিলকে তাল করিবার প্রয়াস মাত্র।

জাপানের মাল এদেশে আসিতে থাকিলে এদেশের শিল্প-ব্যবসায় ধ্বংস হইয়া যাইবে এবং দরিদ্র রায়তদিগের অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইবে ইত্যাদি কথা আমাদের কলের মালিকদের মুখে প্রায়ই শুনিতে পাই। সেই কথাগুলি একবার ধীরভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাক। বিগত ইওরোপীয় যুদ্ধের পূর্ব্বে প্রত্যেক ভারতবাসী গড়ে তের গজের কিছু উপর কাপড় কিনিত। কিন্তু যুদ্ধের পর তাহার কেনার পরিমাণ অনেক কমিয়া গিয়াছে। গড়ে আট হইতে নয় গজের বেশী কাপড় সে এখন কিনিতে পারে না। ইহার একমাত্র কারণ মূল্যাধিক্য। ওরূপ মূল্যে কাপড়ের খরিদ্দার গড়পড়তায় এখানে নাই বলিলেই চলে।

এখন দেশহিতৈষী কলের মালিকদের কাছে প্রশ্ন এই— দেশের যে সমস্ত দুঃস্থ রায়তদিগের গাত্রাচ্ছাদনের জন্য প্রচুর বস্ত্র নাই, তাহাদের এই দুর্দ্দশা নিবারণের জন্য তাঁহারা কি উপায় অবলম্বন করিতে চাহেন? শুনা যায়, দাম সস্তা বলিয়াই তাঁহারা জাপানী মালকে বহিষ্কৃত করিয়া ল্যাঙ্কাশিয়ারের সহিত পবিত্র সম্পর্কে আবদ্ধ হইতে প্রস্তুত! কিন্তু উদ্দেশ্য কি? কাপড়ের দাম চড়াইয়া নিজেরা মোটা লাভ করিতে পারিবেন—এই-ই ত মতলব? তা মতলবটা মন্দ নয়!

সে দিন তাঁহাদের চেয়ারম্যান বলিয়াছেন যে, জাপানকে এই ব্যবসা-ক্ষেত্র হইতে সরাইয়া দিলে ভারতীয় মালের সহিত আর কাহারও প্রতিযোগিতা থাকিবে না। ল্যাঙ্কাশিয়ার যোগাইবে কেবল মিহি কাপড়। সুতরাং ভারতীয় মোটা কাপড়ের সঙ্গে তাহার কোনো বিরোধ নাই। তারপর ল্যাঙ্কাশিয়ার তাহার কাপড় সস্তায় দিতেও বাধ্য হইবে না (অবশ্য সেই ধরণের জাপানী কাপড় না আসিলে এবং সেই জন্য বাজারটা ল্যাঙ্কাশিয়ারের একচেটিয়া হইলে)। তখন ল্যাঙ্কাশিয়ার ও ভারতীয় কলওয়ালারা তাহাদের ইচ্ছামত কাপড়ের দাম ফেলিতে পাড়িবে।

সুযোগ্য চেয়ারম্যান বাহাদুর যে আশার বাণী শুনাইয়াছেন, তাহা কলের মালিকদের কাছে বিশেষভাবেই উপভোগ্য। কিন্তু আমাদের দেশের যে দরিদ্র রায়তদিগের জন্য তাঁহাদের ও ল্যাঙ্কাশিয়ারের এত দরদ, তাহাদের অবস্থাটা দাঁড়াইবে কি রূপ? ভারত ও ল্যাঙ্কাশিয়ারের এই ঘরোয়া বন্দোবস্তে কাপড়ের দাম যে বাড়িয়া যাইবে তাহা বেশ-ই বুঝা যায়। তাহার ফলে, রায়তরা এখন যতটা কাপড় খরিদ করিতে পারিতেছে, তাহাও আর পারিবে না। সুতরাং ব্যাপারটা তলাইয়া দেখিলে, 'অবস্থা' যে সঙ্গীন তাহা বুঝা কঠিন নয়। ভারতের প্রত্যেক রায়ত আজ মনে রাখুক, জাপানের বিরুদ্ধে এই যে মিথ্যা ও কৃত্রিম আন্দোলন, ইহা তাহাদেরই মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিবার উদ্দেশ্যে।

আমাদের নেতৃবৃন্দ ও কাউন্সিলের সদস্যগণ এই সময়ে এই ব্যাপারের গুরুত্বটা একবার ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করুন। তাঁহারা স্মরণ করুন সেই ১৯০৮ এবং ১৯২১-২২ সনের স্বদেশী আন্দোলন ও সেই সময়কার ভারতীয় শিল্প-ব্যবসায়ীদের ব্যবহার। যে সমস্ত কলের মালিকেরা আজ ভারতের দরিদ্রদিগের দিকে টান দেখাইবার ভাণ করিতেছেন, তাঁহাদেরই কেহ কেহ দরিদ্র লোকের কাছে তাহার স্বদেশানুরাগের পুরস্কারস্বরূপ চড়া দামে কাপড়

বেচিয়াছেন! স্বদেশী আন্দোলনের সুযোগ লইয়া তাঁহারা লোভে এতখানি আত্মহারা হইয়াছিলেন যে,রপ্তানি বাজারের দিকে আদৌ নজর দেন নাই। তারপর তাঁহাদেরই অত্যুগ্র লোভের জন্য স্বদেশী আন্দোলন যখন মন্দীভূত এবং খরিদ্দারগণ উৎপীড়িত, তখন তাঁহারা সেই সব বিদেশীদিগের প্রতি অতিমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন, যাঁহারা উদাসীন (নিউট্রাল) রপ্তানি বাজার ইহার মধ্যেই দখল করিয়া বসিয়াছিলেন।

দেশ আজ এই সব লোকের কথার কি মূল্য, তাহা বুঝুক। এবং তাহার স্পষ্ট জবাব দিয়া বলুক যে, জাপানের বিরুদ্ধে তাঁহারা যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা আদৌ নাই, এবং তাঁহারা নিজেরাই তাহার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না।

সহজ মীমাংসায় উপনীত হইবার পূর্ব্বে ভারতীয় খরিদ্দারদের একটা কথা খুব গভীরভাবে বুঝা উচিত। কলের মালিকদের সমিতির চেয়ারম্যান বাহাদুর আমাদিগকে বুঝাইতে চাহেন যে, ল্যাঙ্কাশিয়ার ও ভারতবর্ষের মধ্যে কোনো প্রতিযোগিতা নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবে না। কারণ, উভয়ের মালের বিভিন্নতা রহিয়াছে। এই ভদ্র-পুঙ্গবটি কি আমাদিগকে এতই নির্ব্বোধ মনে করিয়াছেন যে, আমরা তাঁহার এই বাজে কথাটা সহজেই হজম করিয়া ফেলিব? তিনি জাপানকে বহিষ্কৃত করিয়া ল্যাঙ্কাশিয়ারকে আনিতে চাহেন। কিন্তু তাহা করিতে গিয়া কি হইবে তাহা কি তিনি বুঝিতেছেন না? ছাগল তাড়াইয়া গরু ঢুকিতে দিলে বাগানের দশা যেরূপ হয়, এখন হইবে তদ্রূপ। জাপান সরিয়া গেলে, ভারতবর্ষের সহিত ল্যাঙ্কাশিয়ারের যে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিবে না, ল্যাঙ্কাশিয়ার যে এই দেশের শিল্প-ব্যবসায়কে মাটি করিয়া দিয়া এই দেশের কলগুলিকে নষ্ট করিবে না তাহার নিশ্চয়তা কি?"

যদি কেহ আমাদের এই আশঙ্কাগুলিকে বিদ্রূপ করিতে চাহেন, তবে ল্যাঙ্কাশিয়ারকে সম্প্রতি যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহাই তাঁহাকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ম্যাঞ্চেষ্টার বাণিজ্য-সমিতির ভূতপূর্ব্ব সভাপতি স্যর উইলিয়াম ক্লেয়ার লিড বিস্তৃতভাবে মোটাকাপড়-উৎপাদনের জন্য ল্যাঙ্কাশিয়ারকে তাগিদ দিয়া এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "ভারত ও চীনদেশে তুলার চাষের কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত প্রতীচ্য দেশবাসীরা সেই তুলায় প্রস্তুত কাপড়ের খরিদ্দার থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত এই ব্যবসায়ের অংশী থাকিবার জন্য গ্রেটব্রিটেনকে সচেষ্ট থাকিতে হইবে।" এই উপদেশটি কখন দেওয়া হইয়াছে জানেন? যে মুহূর্ত্তে ভারতের শ্রীযুক্ত ওয়াদিয়া ল্যাঙ্কাশিয়ার হইতে ফিরিয়া আসেন এবং তাহার সহিত ম্যাঞ্চেষ্টার চেম্বার অব কমার্সের কি জানি-কি একটা বুঝাপড়া হইয়া যায়, তাহারই ঠিক পরে! আমাদের আশঙ্কানুসারে যদি কার্য্য চলে (খুব বিশ্বাস—চলিবেও তাই), তাহা হইলে ভারতের ভাবী অবস্থা বর্ত্তমানাপেক্ষাও শোচনীয় হইবে এবং তাহার আর্থিক পরাধীনতা চিরকালের জন্য কায়েমী হইয়া যাইবে। জানিয়া-শুনিয়া ল্যাঙ্কাশিয়ারকে প্রভুত্বের পদে বরণ করিলে ভারতবর্ষের পক্ষে বোকামির চূড়ান্ত হইবে।

চাষীদের দাবী

চাষীদের মুখে বোল ফুটিয়াছে। প্রজাসম্মিলন, রায়ত-সভা, কিষাণসভা ইত্যাদি নামে নানা আলোচনা-কেন্দ্র কায়েম হইতেছে।

বিগত কয়েক মাসের ভিতর বাংলার বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলি প্রজা-সম্মিলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে বীরভূম প্রজা-সম্মিলন, হাওড়া জেলার প্রজা-সম্মিলন, পূর্ব্ববঙ্গ রায়ত-কনফারেন্স, ময়মনসিংহ শ্রমিক ও কৃষক সম্মিলন, রায়ত-কনফারেন্স প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেক সম্মিলনেই বহু কৃষক সমবেত হইয়াছিল।

নমুনাস্বরূপ একটা সম্মিলনের প্রস্তাব নিম্নে দেওয়া গেল।

প্রজাস্বত্ব আইনের প্রতিবাদ

ময়মনসিংহ জেলায় ফুলবাড়িয়া নামক স্থানে প্রজাস্বত্ব আইনের প্রতিবাদের জন্য এক জনসভার অধিবেশন হইয়াছিল। প্রায় ২ হাজার প্রজা সভায় সমবেত হইয়াছিল। মৌলবী নজিম উদ্দিন আমেদ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মৌলবী নায়েব উদ্দিন আমেদ এবং মোক্তার মৌলবী আবদুল হাকিম ময়মনসিংহ হইতে আগমন করিয়া সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে :—(১) বৃক্ষে প্রজাদের সম্পূর্ণ স্বত্ব আছে। উহা ছেদন করিতে হইলে জমিদারকে কর দেওয়ার আবশ্যক নাই। (২) প্রজাদিগের জমি হস্তান্তর করিবার অধিকার থাকিবে। (৩) বর্গাদাররা কোরফা প্রজা বলিয়া গণ্য হইবে না। (৪) বাকী খাজানার দায়ে কেবল প্রজার অংশটুকুই বিক্রী হইবে। (৫) কূপ-খনন এবং ইমারত-গঠনে প্রজাদের অবাধ স্বত্ব থাকিবে। (৬) সরকারী কাজের জন্য প্রজার জমির কতক অংশ গ্রহণ করা হইলে প্রজাকে গৃহীত জমির পরিমাণমত খাজনা মাপ দিতে হইবে। (৭) প্রজারা ইচ্ছা করিলে জমিদারের সেরেস্তায় কোনও জমার প্রত্যেক শরিকের নামে পৃথক্ হিসাব রাখিবার ব্যবস্থা জমিদারকে করিতে হইবে। (৮) ব্যবস্থাপক সভার যে সকল সদস্য সিলেক্ট কমিটীতে অধিক-সংখ্যক প্রজাপক্ষীয় সদস্য গ্রহণের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিলেন, এই সভা তাঁহাদের সেই কার্য্যের নিন্দা করিতেছেন।

চাষীরা কিরূপ আইন চায় ?

উপরের বৃত্তান্ত হইতেই চাষীদের দাবী মোটামুটি বুঝা যাইতেছে। কিরূপ আইন কায়েম হইলে কিষাণদের আর্থিক উন্নতি ঘটিবার সম্ভাবনা তাহার খসড়া নিম্নের তালিকায় দেখা যাইবে। বিভিন্ন রায়ত-সম্মিলনে এই সকল বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

(১) গবর্ণমেণ্ট প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধনের নিমিত্ত যে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা প্রজা-সাধারণের দিক্ হইতে সন্তোষজনক নহে। অতএব ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণ, বিশেষতঃ, সিলেক্ট কমিটীর সভ্যগণ যেন ইহা মঞ্জুর না করেন।

(২) কৃষকগণকে জমিতে কায়েমী স্বত্বক্রমে নিম্নলিখিত অধিকার দিতে হইবে।

(ক) স্বেচ্ছায় বিনা সেলামীতে হস্তান্তর করিবার অধিকার।

(খ) বিনা সেলামীতে কূপ ও পুষ্করিণী খনন এবং পাকা বাড়ী তৈয়ারি করিবার ও গাছ কাটিবার অধিকার।

(৩) বর্গাদার ও ভাগীদারদিগকে অধস্তন রায়ত বলিয়া স্বীকার করা হইবে না।

(৪) প্রজার খাজানা দেয় হউক বা না হউক, প্রজা তাহার বাকী খাজানা বা অগ্রিম খাজানা আদালতে আমানত করিতে বা মনিঅর্ডার যোগে পাঠাইতে পারিবেন, এই মর্ম্মে খাজানা আইনের ৬১ ধারা সংশোধন করা হয়।

(৫) জোতের স্বত্বাধিকারী সমুদয় প্রজাকে পক্ষ না করিয়া জমিদার বাকী খাজানার মোকদ্দমা করিতে পারিবেন না।

(৬) বর্ত্তমান খাজানা আইনের ৩ ধারার ২য় দফা বজায় রাখিয়া এবং সংশোধন আইনের ৩ ধারার ৩য় দফা উঠাইয়া দিয়া মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্ভুক্ত স্থানগুলিতেও খাজানা আইন প্রয়োগ করা হউক।

(৭) জমির খাজানা ছাড়া জমিদার কিম্বা তাঁহার আমলা কর্ত্তৃক যে কোন আবওয়াব, ভেট ইত্যাদি আদায় যেন বে-আইনী ও পুলিশ-চালানী অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হয়।

(৮) জমিদার-কর্ত্তৃক উপযুক্ত পরিমাণ নিষ্কর গোচর জমির ব্যবস্থা।

নিখিল বঙ্গীয় প্রজাসম্মিলন

এই গেল জেলায় জেলায় স্থানীয় কিষাণদের মতিগতি। গোটা বাংলার কিষাণ-সমাজ এবং তাহাদের বন্ধুগণ ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে কৃষিবিষয়ক আইনের উন্নতি-বিধান করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এই উদ্দেশ্যে "নিখিল বঙ্গীয় প্রজা-সম্মিলন" অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

১৯২৫ সনে বগুড়ায় "নিখিল বঙ্গীয় প্রজাসম্মিলনে"র প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। এই বৎসর ৬ই এবং ৭ই ফেব্রুয়ারি কৃষ্ণনগরে সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। মৌলবী সামসউদ্দীন আমেদ অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ও

শ্রীযুত হেমন্তকুমার সরকার সম্পাদক ছিলেন। সম্মিলনে অনেকগুলি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। তন্মধ্যে শ্রমিক এবং কৃষক সম্প্রদায়ের গঠন, বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আগামী নির্ব্বাচন-সম্বন্ধীয় প্রস্তাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বঙ্গীয় কৃষক ও রায়ত সভা

এই সকল প্রতিষ্ঠান ছাড়া বাংলা দেশে কিষাণদের স্বার্থ পুষ্ট করিবার জন্য আরও দু'একটা কর্ম্মকেন্দ্র আমাদের নজরে পড়িয়াছে। "বঙ্গীয় কৃষক ও রায়ত সভার" নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রধান কার্য্যালয় ১৩ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট কলিকাতা।

এই সভার অনুষ্ঠানপত্র হইতে নিম্নের অংশ তুলিয়া দিতেছি :—

এই সভা বহুদিন কৃষক ও রায়তের সুখ-দুঃখের এবং কৃষির উন্নতি-অবনতির চর্চ্চা ও প্রতিবিধানের চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। অবনত জাতির বন্ধু লেঃ কর্ণেল ডাঃ ইউ, এন, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে স্থাপিত বঙ্গীয় কৃষক-সমিতি ও রায়ত-বন্ধু স্বর্গীয় জে, এন, রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে স্থাপিত রায়ত-সভাকে একত্র করিয়া, উভয় সভার প্রধান প্রধান কার্য্য-নির্ব্বাহক সভ্যগণকে সমবেত করিয়া এই সভা গত বৎসর এলবার্ট ইন্‌ষ্টিটিউট ভবনে সাধারণ সভা করিয়া স্থাপিত হয়। ভারত-বন্ধু পল্লীসেবক শ্রীযুক্ত সার পি, সি, রায় মহাশয় এই সভার সভাপতি; শ্রীযুক্ত রায় সাহেব পঞ্চানন বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কুমার মিত্র, ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, মৌঃ ইয়াকুইদ্দিন আমেদ, মৌঃ ফজলল হক ও সা সৈয়দ এমদাদুল হক সহকারী সভাপতি; শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ বসু, এম, এ, বি, এল, ও বারিষ্টার সৈয়দ এরফান আলী, এম, এল, সি সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ঘোষ সংগঠনকারী সম্পাদক। ইঁহাদিগকে ও বঙ্গের বিভিন্ন জেলার প্রজাহিতৈষিগণকে লইয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত।

রায়তের অধিকার

সংবাদপত্রসেবীরা কিষাণদের অবস্থা উন্নত করিবার জন্যও কলম ধরিতেছেন। কলিকাতার সাপ্তাহিক "আত্মশক্তি" লিখিয়াছেন :—

"আমাদের দেশে জনসাধারণ বলতে গ্রামের চাষীদেরই বুঝি, কারণ বাঙলা দেশের শতকরা সাতাত্তর জনেরও অধিক লোক কৃষিজীবী। আর এই সাতাত্তর জন লোকেরই "স্বাধিকার" বলে যে কোনই জিনিষ নেই তা কি আর বুঝিয়ে বল্‌তে হবে? যে জমি সে চাষ করে, যে ভূমিখণ্ডের উপর তার পর্ণকুটীর—তা জমিদারের সম্পত্তি। যে কোনও সময় জমিদার ইচ্ছা করলে তাকে সে জমি বা গৃহ থেকে দূর করে দিতে পারেন। যে বলদ দু'টী তার জীবিকার একমাত্র অবলম্বন, যে হালের বলে বাঙলা মায়ের বুকচিরে সে সোণার শস্য সংগ্রহ করে' বাঙলার ছেলেমেয়েদের পেট পূরণ করে—হাল ও বলদজোড়ায় যে তার জীবন-মরণের অধিকার—তাও হয়ত মহাজনের প্রাপ্য ঋণের স্বীকৃতি হিসেবে বাঁধা পড়ে আছে—এ বারের ফসল আশানুরূপ না হলে হয়ত হাল-বলদ ও হারাতে হবে। ফসল ভাল হলেও নিষ্কৃতি নাই! অমনি জমিদারের নায়েবের ছেলেদের অন্নপ্রাশন বা মেয়ের বিবাহের আয়োজন হবে—সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্য খাজানার উপর নূতন দাবী উপস্থিত করা হবে। সে দাবী অনুসারে স্বার্থ বা ফসল না দিতে চাইলে—করো উচ্ছেদের মামলা, জমাবৃদ্ধির নালিশ, ফসল ক্রোকের দরখাস্ত, বা মায় ড্যামেজ বাকী খাজনার নালিশ—আর তার ভিটে মাটী উচ্ছন্ন করে দাও!

"শতকরা আশীজন লোকের যখন এই অবস্থা, তাদের প্রতি মুহূর্ত্ত যদি জমিদারের অত্যাচার এবং পাওনাদারের তাগাদার হাত থেকে সতর্ক থাকবার উপায় চিন্তা করতে করতেই অতিবাহিত হয়, তা হলে তাদের অধিকার কতখানি তা আর বুঝিয়ে বল্‌তে হবে না। আর দেশের এতগুলো লোকের অধিকার যদি এমনি ভূয়ো হয় তা হলে স্বরাজ আন্দোলনও যে কতদূর আন্তরিক তা বোঝাও শক্ত নয়।

"আজ তাই একথা জানা সকল লোকেরই প্রয়োজন যে, রাষ্ট্রীয় অধিকার-লাভ আমাদের জাতীয় সত্তার জন্য এত প্রয়োজন হলেও সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সত্তার সত্যতা প্রমাণের জন্য দেশের অধিকাংশ লোকেরও কিছু কিছু স্বাধিকার থাকা আবশ্যক—যে স্বাধিকার তাদের অর্পণ করবার অধিকার আমাদেরই কাহারও হাতে আছে। কৃষককে তার নিজের কুটীরে, নিজের জমিতে পরবাসী করে রাখবো, অথচ আমার স্বাধিকার-সংগ্রামে তাকে যোগদান করতে

বল্‌ব; কৃষকের কিছুমাত্র অর্থলাভের সম্ভাবনা দেখলে তার উপর চতুর্গুণ চতুর্প্রকার খাজানা আদায় করব, অথচ, ইংরেজ-শাসনের অত্যাচারে বা নূতন টেক্‌স বসানোয় সে যদি টুঁ শব্দ না করে তা হলে তার প্রতি বিরক্ত হব—এরূপ আচরণ যুক্তিযুক্ত নয়।

"যদি দেশ সত্যই স্বাধিকার-লাভে ব্যগ্র হ'য়ে থাকে তাহলে প্রত্যেক শ্রেণী বা সমাজকে তার প্রাপ্য অধিকার বা সম্মান, যা আমাদের হাতে আছে—তা দিতেই হবে। এই সকল সম্প্রদায় বা সমাজের অধিকারের সমন্বয় হ'লেই জাতীয় অধিকারের দাবী গ্রাহ্য হবে। এবং তার প্রতি কর্ত্তাদের অনাদর দেখ্‌লে জাতীয় সংগ্রাম করা সহজ হবে। প্রত্যেক দেশেই স্বদেশোদ্ধার অর্থই পতিতোদ্ধার। দেশের অত্যাচারিত, পদদলিতকে উদ্ধার করাই ত স্বদেশ-সেবার চরম উদ্দেশ্য। এইজন্যই বাংলার প্রাণ দেশের চৌদ্দ আনা অধিবাসী চাষীদের—অধিকার নির্দ্ধারিত করা এবং সে অনুসারে অবিলম্বে কাজ করাই সর্ব্বোচ্চ স্বদেশ-সেবা।"

রুশিয়ার আর্থিক অবস্থা

পারিসের রুশ রাষ্ট্র-দূত রাকোভ্‌স্‌কি-লিখিত

রুশিয়ার সোভিয়েট ইউনিয়ন ক্রমবিকাশের একটি নূতন ধারায় গিয়া দাঁড়াইতেছে। এই বিষয়ের দিকে কটাক্ষ করিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, রুশিয়া এখন মহাজন সাজিবার পায়তারা ভাঁজিতেছে। অচিরেই তাহার সোশ্যালিষ্ট ভিত্তির চিহ্নমাত্রও আর থাকিবে না। কিন্তু তাঁহাদের উক্তি ভ্রমাত্মক। যদি সোভিয়েট ইউনিয়ন দেশের অন্তর্ব্বাণিজ্যের স্বাধীনতা গ্রহণে স্বীকৃত থাকে, যদি উহা কেবলমাত্র নিজের দেশের ব্যক্তিগত মূলধন প্রাপ্তিরই আশা না করিয়া, বিদেশের মূলধনও পাইতে চায় (অবশ্য তাহা কেবল কিছু ত্যাগ স্বীকারের দ্বারাই লভ্য), এক কথায়, উহাকে যদি মূলধনাত্মক পদ্ধতির কাছেই মাথা নোয়াইতে হয়, তাহা হইলেও একথা কিছুতেই প্রমাণিত হয় না যে, আধুনিক ষ্টেট—ব্যক্তিগত মূলধন খাটানতেই যার গোড়াপত্তন—তাহার কাঠামোর দিকেই ইহার বিকাশের ধারা প্রবাহিত। অর্থ-নৈতিক দিক্ দিয়া রুশিয়া আজ মিশ্র গঠনের পরিচয় দিতেছে। কারণ সমবেত শিল্প উৎপাদন এবং ষ্টেটের উদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ব্যক্তিগত উৎপাদনও চলিতেছে।

ঐ সকল পৃথক পৃথক বিষয়ের অনুপাত-টা কি? ষ্টেট শিল্প এবং ষ্টেট রেলওয়ের হাতে যে মূলধন আছে, তাহার সংখ্যা প্রায় ১২,০০০,০০০,০০০ রুবল (এক রুবল প্রায় এক টাকার সমান)। ইহার মধ্যে রেলের অংশ ৫,৫০০,০০০,০০০ রুবল। সমবায় সমিতিগুলির মূলধন হইবে ৫০০,০০০,০০০ রুবল। বেসরকারী লোকদের হাতে, বিশেষতঃ, কৃষকদিগের হাতে যে মূলধন আছে তাহা ৭,৫০০,০০০,০০০, রুবলের বেশী হইবে না। জমির মূল্য এই অঙ্কের অন্তর্ভুক্ত করা হইল না, কারণ জমিটা জাতীয় সম্পত্তি এবং ধনাগমের প্রাকৃতিক মূল। তারপর সেই জমির উপর যে সমস্ত বাড়ী আছে, তাহাদের মূল্যও ঐ অঙ্কের মধ্যে ধরা হয় নাই। আবার ঐ সমষ্টির সঙ্গে ব্যক্তিগত যে সমস্ত মূলধন ৮৮ টি প্রতিষ্ঠানে খাটান হয়, তাহাও যোগ করা অবশ্যকর্ত্তব্য, কিন্তু তাহা করা হয় নাই। ঐ সব প্রতিষ্ঠান হইতে ষ্টেটের বাৎসরিক ১৫,০০০,০০০ রুবল রাজস্ব আদায় হয়। ১৯২৩-২৪ সনে ব্যক্তিগত শিল্প প্রতিষ্ঠান হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের হার ছিল সমষ্টির শতকরা ২৪ ভাগ এবং ষ্টেটের অধীন প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন ছিল শতকরা ৭৬ ভাগ। পরবর্ত্তী বৎসরে ষ্টেট শিল্প এবং সমবায়গুলির অংশ দাঁড়াইয়াছিল প্রায় শতকরা ৭৯ ভাগ এবং ব্যক্তিগত শিল্পের অংশ শতকরা ২১ ভাগের বেশী হয় নাই। বাস্তবিক পক্ষে ব্যক্তিগত-শিল্প-জাত দ্রব্য বাড়িয়াছে বই কমে নাই। ষ্টেট শিল্প দ্রব্য তদপেক্ষাও অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সব অঙ্ক হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ষ্টেটের

ব্যবসায়গুলির আর্থিক অবস্থা ক্রমশই উন্নতির দিকে যাইতেছে, অবনতির দিকে মোটেই নয়।

আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, বিগত সামান্য কয়েক বৎসরে বিদেশের মূলধন রুশিয়ায় যেরূপ কাজ করিয়াছে, ভবিষ্যতে তাহা অপেক্ষাও অধিক পরিমাণে কাজ করিবে। আর ব্যক্তিগত এবং ষ্টেটের প্রতিষ্ঠানগুলিরও উৎপাদন প্রভূত পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে একথাও নিশ্চয় করিয়া বলা যায়।

এই রূপেই সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্মিলিত উৎপাদনের ভিত্তিতে সোশ্যালিষ্ট ষ্টেটের ইমারত পাকা করিয়া গড়িয়া তুলিবে। এই দিকেই সোভিয়েট ইউনিয়নের আর্থিক বিকাশের গতি প্রধাবিত। রুশিয়ার আর্থিক জীবনের কল্যাণে ইহার নীতি কোনক্রমেই বিদেশের ক্রমবর্দ্ধিত মূলধন ও শিষ্যত্ব বর্জ্জন করিতে শিক্ষা দিবে না। সহরে এবং মফঃস্বলে ইহার ষ্টেট-শিল্প ও সমবায়গুলি যতই শক্তিমান হইতে থাকিবে, বিদেশের মহাজনেরা যে এদেশে থাকিয়া এ দেশের বিকাশ-ধারাকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন না সে সম্বন্ধে আমরা ততই নিঃশঙ্ক হইব।

অন্যত্র, বিশেষতঃ ইংলণ্ডে, একটা কুতর্ক বড়ই বাড়িয়া গিয়াছে। তাহাতে ক্ষতি হইতেছে সকলেরই। প্রায়ই শুনা যায়, ইওরোপ রুশিয়াকে চায় না, কিন্তু রুশিয়াই ইওরোপকে চায়। সুতরাং ইউরোপের দরকার পড়ে নাই যে, সে সোভিয়েট ইউনিয়নকে সাধিয়া আর্থিক সাহায্য করিতে যাইবে। রুশিয়া এবং অন্যান্য দেশের মধ্যে এখনও যে ঋণ-সমস্যা বর্ত্তমান তাহার মীমাংসার জন্যও ইওরোপের মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই, ইত্যাদি। যাঁহাদের মানসিক অবস্থা এইরূপ তাঁহারা যে দূরদর্শী নহেন, তাহা বেশ বুঝা যায়। তাঁহাদের কথার মধ্যে দুইটি ফাঁকি রহিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত মতাবলম্বীরা ভুলিয়া যান যে, ইওরোপের, বিশেষতঃ ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং জার্ম্মাণির শিল্প-ব্যবসায়, সস্তায় কাঁচা মাল না পাইলে, আটলাণ্টিকের অপর পারস্থিত দেশসমূহের, বিশেষতঃ, যুক্ত-রাষ্ট্রের, শিল্পব্যবসায়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কিছুতেই আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। আবার রুশ-কৃষির পুনরুদ্ধার ব্যতীত পেট্রল, কাঠ, আঁশ, কাগজ, তামা, প্ল্যাটিনাম্, চিনি প্রভৃতি কাঁচা মাল ও খাদ্য-দ্রব্যের মূল্য হ্রাস করা অসম্ভব।

রুশিয়াই কেবল তাহার বিরাট খনি, অন্তর্বিধ রত্ন, তাহার অসংখ্য বন-জঙ্গল এবং কৃষিজাত দ্রব্য, মাংস, দুধ, ডিম প্রভৃতির বলে ইওরোপীয় দেশসমূহের শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য হ্রাস করিয়া দিতে সমর্থ। সুতরাং অর্থের দিক্ দিয়া যাঁহারা রুশিয়াকে পুনর্জ্জীবিত করিতে অগ্রসর হইবেন, প্রকারান্তরে তাঁহারা নিজেদের দেশকেই সাহায্য করিবেন।

একমাত্র পাশ্চাত্য রাষ্ট্রমণ্ডলীর সাহায্যের উপরই রুশিয়ার আর্থিক উন্নতি নির্ভর করে, এই কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, বিগত চারি বৎসরে কৃষি ও শিল্পের পুনর্গঠনে রুশিয়া কতখানি অভাবনীয় উন্নতি করিয়াছে। যাহা বলা হইল, সেইরূপ কথাই আমি ১৯২২ সনে জেনোয়া সম্মিলনে বলিয়াছিলাম। তখন আবাদী জমির পরিমাণ বিগত যুদ্ধের পূর্ব্বাবস্থার সঙ্গে তুলনায় কেবল মাত্র ছিল অর্দ্ধেক, এবং তাহায় ফসল ছিল শত করা ৩০ অথবা ৪০ ভাগ। তখন রুশিয়ার শিল্পের অবস্থা ছিল আরো খারাপ। জেনোয়া সম্মিলনের ফিন্যান্স কমিশনে প্রদত্ত বিবরণীতে যে সমস্ত কথার উল্লেখ ছিল, তাহাতে উপস্থিত প্রতিনিধি-বর্গ ভীত হইয়া উঠেন। তন্মধ্য হইতে বর্ত্তমানে একটা অঙ্কের পুনরুল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। যুদ্ধের পূর্ব্বাবস্থার সহিত তুলনায় ১৯২০ সনে রুশিয়ার ঢালাই লোহা ছিল শতকরা ২½ ভাগ, কয়লা ছিল ২৭ ভাগ এবং মেটে তেল (ন্যাপ্থা) ছিল ২৩ ভাগ। অন্যান্য শিল্প সম্বন্ধে ও এইরূপ হার খাটে। পক্ষান্তরে, সেই সময় সোভিয়েট রুবলের দাম অত্যধিক পরিমাণে নামিয়া গিয়াছিল।

কিন্তু তাহার চারি বৎসর পরেই অবস্থা সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বকার অর্থাৎ ১৯১৩ সনের অঙ্কের তুলনায় কৃষিজাত দ্রব্য ১৯২৪-২৫ সনে দাঁড়াইয়াছে শতকরা ৭১ ভাগ (৯ শত কোটি রুবলের সঙ্গে ১২ শত কোটি রুবলের তুলনা) শিল্পজাত দ্রব্য ও বাড়িয়াছে ৭১ ভাগ। অনেকগুলি শিল্প যুদ্ধপূর্ব্বাবস্থার সমতা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং কোনো কোনো-গুলি—যেমন, তড়িৎ সম্বন্ধীয় শিল্প—সে অবস্থাও ছাড়াইয়া গিয়াছে। মুদ্রার মূল্যও স্থিরতায় দাঁড়াইয়াছে এবং রাজস্ব ও হয়ত বর্ত্তমান বৎসরে চারি শত কোটি রুবলে গিয়া পৌঁছিবে। যুদ্ধপূর্ব্বাবস্থার সহিত তুলনা করিলে তাহাও দাঁড়াইবে শতকরা ৭১ ভাগ। এই সঙ্গে বলা দরকার, ঐ রাজস্বে কৃষকদের দান যুদ্ধ-পূর্ব্ব দানের প্রায় অর্দ্ধাংশ।

আর একটি অঙ্কের উল্লেখ করিলেই বুঝা যাইবে যে, রুশিয়া তাহার নষ্ট স্বাস্থ্যের সম্পূর্ণ উন্নতি সাধনে সমর্থ। রুশ-শিল্পের পুনরুদ্ধার-কল্পে আগামী বৎসর যে মূলধন খাটান হইবে, তাহা দেশের ভিতরকার অর্থ হইতেই যোগাড় হইয়া যাইবে—তা শিল্প ব্যবসায়ের লাভ হইতেই হউক, ষ্টেটের কর্ত্তৃত্বেই হউক কিম্বা দেশের মধ্যে ঋণ করিয়াই হউক।

রুশিয়া ৯৩১,০০০,০০০ রুবল লইয়া প্রথম প্রোগ্রাম বা কার্য্য-তালিকা প্রস্তুত করে। তন্মধ্য হইতে ৬৬৫,০০০,০০০ রুবল যন্ত্র পাতির পুনর্গঠন-কল্পে, ৯৭,০০০,০০০ রুবল শ্রমিক দলের বাস-গৃহ নির্ম্মাণ কল্পে এবং ১৭০,০০০,০০০ রুবল নূতন নূতন ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠায় ব্যয়িত হইবে, এই কথা থাকে। কিন্তু পরে ঐ হিসাবের পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। কারণ, দেখা গিয়াছিল, কৃষি দ্রব্য আশানুরূপ না হইয়া তাহা অপেক্ষা ঢের কম হইবে। তাই খরচের অংশটা কমাইয়া ৭৪৬,০০০,০০০ রুবল ধরা হয়।

আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া এই কথা আজ জোর করিয়া বলা চলে যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন তাহার উন্নতির জন্য যেরূপ শক্তির পরিচয় দিয়াছে, পৃথিবীর আর কোনো দেশ সেরূপ দেয় নাই। একথা সত্য যে, বিদেশী মূলধনের আবশ্যকতা আজ সেখানে খুবই অনুভূত হইতেছে। তাহার কারণ এই যে, সে দেশ এখন অত্যধিক 'বিস্তৃতি'র যুগে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

আজ যদি বিদেশী মূলধন তাহার নাই জোটে, তবু তাহার বিকাশ, সম্পূর্ণরূপে অব্যাহত না হইলেও, অবশ্যম্ভাবী।

বাঁকুড়ায়

শ্রীসুবোধচন্দ্র দে, এম, এ, বি, এল

৩১শে মার্চ ... এখানে আসা গেল।

রাত্রে 'বিবেকানন্দের দিবস' উৎসব উপলক্ষে এখানকার মেডিকেল স্কুলের নিমন্ত্রণে যোগ দেওয়া গেল। মেডিকেল স্কুলের একটী ছাত্র হাসপাতাল ও স্কুল দেখাইতে দেখাইতে বলিল, "মফঃস্বলের স্কুল বলিয়া অবজ্ঞা করিবেন না। একুশ বিঘা জমি এই স্কুল পাইয়াছে। দরকার হইলে একসময়ে ইহাকে মেডিকেল কলেজে পরিণত করিতে বেগ পাইতে হইবে না। আগামী পরশ্ব (৩রা এপ্রিল, ১৯২৬) শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত 'ম্যাটারনিটি ওয়েলফেয়ার' হাসপাতাল খুলিতে আসিতেছেন।

"এই মেডিকেল স্কুল কার কীর্ত্তি জানেন? কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী নীলাম্বর মুখার্জির ভাই, জজ ঋষিবর মুখার্জির। এই সম্মুখে বাগান দেখিতেছেন, ইহা তিনি সর্ব্বদা সযত্নে রাখিতে বলিয়াছেন। তিনি থাকিতে ইহার কোনো ব্যতিক্রম হয়, তাহা তিনি সহিতে পারেন না। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের স্কুলটি এখনো এফিলিয়েটেড হয় নাই।

সহরের পক্ষেও আমাদের হাসপাতাল ছোট নহে, তবু আমরা কুলাইয়া উঠিতে পারি না। এই ৭টি হষ্টেল আর ২টা টেনিস গ্রাউণ্ড ছেলেদের জন্য। আপনি কি মনে করেন না এই দান বাঙ্গালীর পক্ষে গৌরব-জনক?"

আমি কহিলাম—"নিশ্চয়। এই দানে বাঙ্গালীর গৌরব বৃদ্ধি ও বাংলার ধনবৃদ্ধি হইয়াছে।"

(২)

এক ডাক্তার বলিলেন, "মহাশয়, আমার রোগীর সংখ্যা অনুসারে একটা তালিকা এইরূপ সাজাইতে পারি :—

(১) সিফিলিস্ ও গণোরিয়া

(২) কুষ্ঠ

(৩) যক্ষ্মা

"প্রথম পীড়াটার কথা ছাড়িয়া দিলে, অন্য প্রধান পীড়াগুলিকে এক নামে অভিহিত করা যাইতে পারে—

খাদ্যাভাব-জনিত পীড়া। বাস্তবিক, এখানকার লোক দুরন্ত জীবন যাপন করে। প্রায়ই দেখিবেন হাসপাতালে লোক আসিয়াছে—কাহাকেও শূয়ারে মারিয়াছে, কাহাকেও ভালুকে, কেহ বা গাছ হইতে পড়িয়া জখম হইয়াছে। এইরূপ ইহাদের জীবন! কিন্তু ইহারা যথেষ্ট খাইতে পায় না। সুতরাং ইহাদের যে যক্ষ্মা, কুষ্ঠ ইত্যাদি হইবে তাতে আশ্চর্য্য কি ?

"তবে প্রথম প্রধান রোগটা কেন এত বেশী হয় তাহা বলা কঠিন বটে। আর একটা রোগ এখানে খুব আছে—চোখের রোগ। তাহাও আশ্চর্য্য নহে। দেখিতেছেন ত কি গরম আর ধুলাবালির দেশ; সর্ব্বদাই চোখে ধূলা পড়িয়া চোখের দফা-রফা করিয়া দেয়। চক্ষু-পরীক্ষক ডাক্তারের পক্ষে অভিজ্ঞতার এমন স্থান বুঝি বেশী নাই।"

রাস্তা দিয়া লোকজনের চলাচল লক্ষ করিলে বুঝা যায়, অধিকাংশ পুরুষ-নারীর মুখ ও পা ফোলা-ফোলা।

(৩)

সেই ডাক্তারই বলিলেন, "প্রশ্নটা আপনার মনে জাগিয়াছে দেখিতেছি যে, এখানে পাকা বাড়ীর এত প্রাদুর্ভাব কি করিয়া হইল। আমি দেখি নাই, কিন্তু এখানকার লোকের নিকট শুনিয়াছি, দশ বৎসর আগে বাঁকুড়ায় এত পাকা বাড়ী ছিল না। অধিকাংশ ঘরই খড়ের ও মাঝে মাঝে টিনের বাড়ী ছিল। অথচ আজ ষ্টেশন হইতে এই একক্রোশ রাস্তা অবধি দেখিলেন ত সবই পাকা বাড়ী।

"আগে একবার আগুন লাগিলে পাড়াকে-পাড়া ধ্বংস হইয়া যাইত। আজ আর সে ভাবনা নাই। আজ লোকে আগুন সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত।

"দশ বছরে বাঁকুড়ার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বাঁকুড়া এখন উন্নতির পথে দ্রুত দৌড়াইতেছে। মাটি শক্ত হইলে কি হয়, চারিদিকে চাহিয়া দেখুন, ঐশ্বর্য্যের চিহ্ন দেখিতে পাইবেন।

(৪)

এখানে একটি প্রথমশ্রেণীর কলেজ চলিতেছে। একটা মেডিকেল স্কুল চলিতেছে। আপনি জানেন বোধ হয়, স্যাড্‌লার কমিশন বাঁকুড়ার অবস্থা দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, এখানে একটা বিশ্ববিদ্যালয় অল্পকাল মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে।

"এই ক্ষেত্রে বাঁকুড়ার প্রাণস্বরূপ মহামতি ব্রাউন সাহেবের কথা উল্লেখ না করিলে অন্যায় হইবে। শিক্ষা-বিভাগে তাঁর নাম কে না শুনিয়াছে? মেডিকেল স্কুলেরও উদ্ভব এবং স্থিতি তাঁরই জন্য। বাস্তবিক, এই ভদ্রলোক আদর্শ, নিষ্কাম জীবন দ্বারা কত বঙ্গ-যুবককে যে কর্ম্মপথে উৎসাহিত করিয়াছেন বলিতে পারি না। তিনি আমাদের সহিত একেবারে মিশিয়া গিয়াছেন।

(৫)

"এইমাত্র সাদাসিধা পোষাকে যিনি মোটর হাঁকাইয়া গেলেন, তিনি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন দেখিতেছি ইহাঁকে সহজ ভাবিবেন না। ইনি ব্যবসা করিয়া বহু লক্ষপতি হইয়াছেন। ইহাঁর কীর্ত্তি প্রশংসনীয়। ইহাঁর নাম শ্রীযুক্ত সাহানা।

"এই বাঁকুড়া সহরে অনেকগুলি 'মিল' চলিতেছে মহাশয়,—চাউলের কল, ময়দার কল ও তেলের কল ইহার মধ্যে চাউলের কল ও তেলের কল সম্পূর্ণ বাঙ্গালীদের তাঁবেই চলিতেছে বলিতে পারি, দু'একজন মাড়োয়ারী হয়ত থাকিলে পারেন। ময়দার কল প্রায় সবই মাড়োয়ারীদের হাতে।

"এই কলওয়ালারা প্রত্যেকেই প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। এই সাহানা বাবুর একটি কল আছে তাহাতেই তিনি এত ফাঁপিয়া উঠিয়াছেন। তা ছাড়া, গিরিডি ইত্যাদি অঞ্চলে তাঁর জায়গা-জমিও আছে।

(৬)

"ইহা ছাড়া, এই বাঁকুড়ার অনতিদূরে একটা বড় ব্যবসা চলিতেছে। গালার ব্যবসা। জায়গার নাম খাতড়া। গালার চাষ ঠিক গুটিপোকার চাষেরই মত। ওদিকে গেলেই দেখিবেন কুল অথবা পলাশ গাছের বন। তাদের-ই পাতায় এক প্রকার পোকা পালিত হইতেছে, যাহা হইতে গালা পাওয়া যাইবে। পুরুলিয়া প্রভৃতি স্থানেও গালার কমতি নাই। সময় সময় দাম বাড়িয়া ৪০৲ টাকা পর্য্যন্ত মণ দাঁড়ায়। তখন ব্যবসায়ীর 'পোয়া বারো'।"

(৭)

দেখিতেছি সারাদিন সারারাত রাস্তা দিয়া গরুর গাড়ীর পর গরুর গাড়ী যাওয়াআসা করিতেছে। এই গরুর গাড়ীই ছাতনা, খাতড়া ইত্যাদি দূরবর্ত্তী স্থানের সহিত এই স্থানকে

সংযুক্ত করিতেছে এবং ইহাই এখানকার ব্যবসা-বাণিজ্যের হ্রাস-বৃদ্ধির ব্যারোমিটার। কারণ, বাজার যখন খুব গরম, তখন হরদম গরুর গাড়ী যাওয়াআসা করে। বাজার মন্দা হইলে গাড়ীর সংখ্যাও কমে। সাধারণতঃ যখনই রাস্তার দিকে চোখ পড়িতেছে তখনই দেখিতেছি, গরুর গাড়ী চলিতেছে।

(৮)

কাল সন্ধ্যায় একটি যুবক আসিয়া সোৎসাহে বলিতেছিলেন, "মহাশয়, আজ ৪২৲ টাকার খদ্দর বিক্রী হইল। এইরূপ ঘটনা এখানে আর কখনো ঘটে নাই। এ পর্য্যন্ত সর্ব্বাপেক্ষা বেশী যে দিন বিক্রী হইয়াছে সেদিনও ৩০৲ টাকা ছাড়ায় নাই। শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায়ের এখানে আগমনের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক আছে কি না জানি না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, লোকে চাদর কিনিয়াছে কাপড়ের চেয়ে বেশী।

"শীঘ্রই এখানে একটা খদ্দর-উৎপাদনের কেন্দ্র খোলা হইবে। আপনারা শুনিয়া সুখী হইবেন খাদি বস্ত্রের দাম বেশ সস্তা হইয়াছে। বঙ্গলক্ষ্মীর সহিত আমাদের দামের তফাৎটা খুব বেশী নহে। আশা করিতেছি আরো সস্তায়—৪৲ টাকার মধ্যে—কাপড় যোগাইতে পারিব।"

(৯)

এক নাপিত চুল ছাটিতে ছাটিতে বলিল, "বাবু মহাশয়, আজ আমার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়াছে। কিন্তু এই নাপিতের ব্যবসা করিয়াই আমি একসময়ে ঢের টাকা জমাইয়াছিলাম, জমি কিনিয়াছিলাম এবং সুখেই ছিলাম। এখানকার যত বড়লোককে, এমন কি, ভিনসেন্ট সাহেবকে (সার, উইলিয়াম ভিনসেন্ট) পর্য্যন্ত আমি কামাইয়াছি। আজ ত্রিশ বৎসরের উপর আমার এইরূপ অনেক বাঁধা ঘর একচেটিয়া থাকায় উপার্জ্জন মন্দ করি নাই। কিন্তু আজকাল আর সেদিন নাই। আজকালকার সাহেব-সুবারা অনেকেই নিজে নিজে কামান।

"কিন্তু আমার টাকা ও জমির বেশীর ভাগই উড়িয়া গিয়াছে—গৃহ-বিবাদে ও মোকদ্দমায়। ভাইকে দ্বিতীয়বার বিবাহ দেওয়ার পর হইতেই আমাদের সংসারে অশান্তি ঢুকিয়াছে। ভাবিয়াছিলাম ছেলেটা লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইলে ভাবনা থাকিবে না। অন্ততঃ একটা ছোট খাট চাকুরী তো পাইবে। তা সে লেখাপড়া শিখিল না। আমিও বুড়া হইয়াছি। আমাদের আর পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া আসিবে না।"

(১০)

এখানকার মাটি লাল ও শক্ত। পাহাড়ে জায়গা বলিয়া গাছপালা বেশী দেখিতেছি না।

সড়কগুলিতে একহাঁটু করিয়া ধুলা। মোটর ও সাইকেলের উৎপাত বেশ আছে। ঘোড়ারগাড়ী চলিতেছে। রিক্সও দেখিলাম। রাতে বেড়াইতে বাহির হইয়া দেখিলাম কৃষ্ণপক্ষে পথচলা দুষ্কর। তেলের বাতি যা আছে, তাতে অন্ধকার দূর হয় না। এক একটা অনেক দূরে দূরে। বাঁকুড়ায় এ-বিষয়ে এখনো উনবিংশ শতাব্দী চলিতেছে। পথঘাট যথেষ্ট আছে কিন্তু অসংস্কৃত।

(১১)

'এখান হইতে কিছুদূরে তিলুড়ীতে একটা সভা হইয়া গেল। এক সাবডেপুটি বলিলেন, "মহাশয়! তিলুড়ীতে একটা ছোটখাট শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে বলা যাইতে পারে। তাহার উদ্বোধন-উৎসব হইতেছে। উদ্দেশ্য আপাততঃ আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দেওয়া ও সঙ্গে সঙ্গে যে কোনো একটা 'হেতে-হাতুড়ে' বিষয়ও কিছুটা সমঝাইয়া দেওয়া।

"এই প্রকারের প্রচেষ্টা ইহাই একমাত্র নহে। ঝাটীপাহাড়ীতে কয়েকজন ভদ্রসন্তান মিলিয়া চাঁদা তুলিয়া একটা লিমিটেড কোম্পানী করিয়াছেন। তারপর তাঁহারা দুইশ চারশ (ঠিক জানি না—কত) বিঘা জমি লইয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ আরম্ভ করিয়াছেন। ধনিয়া, সরিষা, আলু ও অন্যান্য জিনিষ ইঁহাদের খেয়ালের মধ্যে। ইঁহাদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য কয়েক ব্যক্তি আছেন।

"ইঁহারা যে জায়গাটা লইয়াছেন তাতে একটু অসুবিধায় পড়িয়াছেন। চুনট হওয়ায় শোধরাইতে কিছু সময় লইবে। ইঁহাদের অধ্যবসায় প্রশংসনীয়। এর মধ্যেই বেশ বড় বড় আলু উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।"

(১২)

সাবডেপুটি সাহেবকে কহিলাম, "মহাশয়, বাঁকুড়া সম্বন্ধে আমার ধারণা বদ্‌লাইয়া যাইতেছে। এ যে দেখিতেছি দশ বৎসরের মধ্যে বাঁকুড়া একটা বাণিজ্যের বড় জায়গা হইয়া উঠিবে! অনেক লোক আসিয়া অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতেছে।"

তিনি বিমর্ষ হইয়া বলিলেন, "কিন্তু তাহাতে স্থানীয় লোকের কি লাভ হইল? টাকা খাটাইতেছে, লাভ পাইতেছে, ব্যবসায়ে মোটা হইয়া যাইতেছে বাহিরের লোক। কিন্তু বাঁকুড়ার অধিবাসীরা চিরকালের জন্য "যে তিমিরে" ছিল "সেই তিমিরেই" পড়িয়া রহিয়াছে। ইহাদের ধন-সামর্থ্য একটুও ত বাড়িতেছে না।

"একটা কথা শুনিতে অদ্ভুত হইলেও সত্য। আপনি জানেন, বাঁকুড়া দরিদ্র দেশ। তার উপর আবার এখানে দুর্ভিক্ষ লাগিয়া-ই আছে। কিন্তু জানিবেন, যখনই দুর্ভিক্ষ হয় তখনই টাকাওয়ালা ব্যবসায়ীদের পোয়া বারো। কারণ, তাঁরা দুর্ভিক্ষ বলিয়া অত্যন্ত নীচু হারে শ্রমিক পান এবং কাজেই মুনাফা-টা পান মোটা রকম। শ্রমিকদের দুরবস্থার পুরাপুরি সুবিধাটা ইহাঁরা উপভোগ করেন। প্রমাণস্বরূপ বর্ত্তমান বৎসরটা দেখুন। এখন দুর্ভিক্ষ। এই সুযোগে কয়েকজন বাহিরের লোক ব্যবসা করিয়া ফাঁপিয়া উঠিতেছেন।"

(১৩)

জনৈক ডাক্তারের এসিষ্ট্যান্ট বলিলেন, "রাখাল গোয়ালার আজ মৃত্যু হইয়াছে। সে অনেকগুলি গরু রাখিয়া গিয়াছে তাই রক্ষা। নহিলে তার বৃদ্ধার যে কি অবস্থা হইত বলিতে পারি না। এই গরুগুলির লোভেই তার আত্মীয়-জ্ঞাতিরা তাকে ছাড়িয়া যাইতেছে না। কিন্তু এমন করিয়া কতদিন চলিবে বলিতে পারি না।

"রাখাল জীবনে উপার্জ্জন মন্দ করে নাই। দুধ বেচিয়া কম-সে-কম রোজ ৪৲।৫৲ টাকা সে উপার্জ্জন করিত অবশ্য জলো দুধ বেচিতে সে ওস্তাদ ছিল। মরিবার সময় গোটা ছ'শ টাকা (৬০০৲) তার রাখিয়া যাওয়া উচিত ছিল। মহাশয়, দুঃখের কথা কি বলিব? এই সমস্ত টাকাটা সে ধার দিয়া ফেলিয়াছিল। ধার অবশ্য সমস্তই মুখে মুখে, লেখাপড়া নাই। রাখাল ভিন্ন সকল খাতকদের নামও কেহ জানে না। মরিবার আগে অনেক করিয়া তাকে বলিলাম খাতকদের মোকাবিলা করিতে—যেন টাকাগুলি মারা না যায়। কিন্তু এযাত্রা মরিবে না মনে করিয়াছিল বলিয়াই হউক, কি আর যে জন্যই হউক, রাখাল কারো নাম বলে নাই। সুতরাং তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ টাকাই জলে গেল। কারণ, অধিকাংশ লোকই জানা নাই। আর এখন কে বা নিজে আসিয়া স্বীকার করিবে? এই টাকাগুলি পাইলে বিধবাটা বাঁচিয়া যাইত।"

(১৪)

এক অবসর-প্রাপ্ত বাঙালী জজসাহেব বলিলেন, "মহাশয়! বাঙালীর ব্যবসা-বুদ্ধির কথা বলিবেন না। ইহাদের ব্যবসায়ে সততা মোটেই নাই। ইহারা বুঝেনা যে, সততাই লাভের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

"আমি আজ ছয় বৎসর অবসর লইয়াছি। ওকালতী, মুনসেফী, সব-জজিয়তী ও জজিয়তীর সময়ে আমি বিস্তর বিলাতী কোম্পানীর শেয়ার কিনিয়াছি—তা চা-বাগানই বলুন, সিঙ্গাপুরের রবারের কারখানাই বলুন আর বাংলার পাটই বলুন। এদের দেখিতেছি সব খোলাখুলি। আগে থেকেই স্পষ্ট জবাব। পছন্দ হয় যোগ দাও। এদের কার্য্য-নির্ব্বাহের খরচ খুব বেশী। তা বলে লাভের অংশও বড় কম দেয় না।

"কিন্তু বাঙালীর কথা আর কি বলিব? আমার ভাই এক কয়লার কারবার খুলিলেন অন্য পাঁচজনের সঙ্গে মিলিয়া। তাতে আমার ঘর হইতে ১৮ হাজার টাকা গচ্চা গেল।

(১৫)

"পেন্সন লওয়া থেকে আমি এখানে সেখানে কর্ম্ম-কারবারে যোগ দিয়া আসিতেছি। ছয় বৎসর আগে এই বাঁকুড়ায় এক কো-অপারেটিভ ষ্টোর খোলা হইয়াছিল। আজ দুই বছর হইল তার চিহ্নও লুপ্ত হইয়াছে।

এই সেদিন অডিটার আসিয়া কোনো এক ইনস্পেক্টারকে ৫০০৲।৬০০৲ টাকার জন্য দায়ী করিয়াছেন।

(১৬)

যোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি মহাশয়ের পুত্র পটারি-ওয়ার্কস আরম্ভ করিয়াছেন। শুনিয়াছি মুর-কোম্পানী ২০ হাজার টাকা দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। ইহাও লিমিটেড কোম্পানী।

"এখানকার মাটি টাইলের উপযুক্ত। যোগেশবাবুর পুত্র (এম, এস্-সি) টাইল নির্ম্মাণে মনোযোগ দিয়াছেন। এতে স্থানীয় একটা অভাব দূর হইবে।

(১৭)

"এখানে ভেড়িয়ালেরা বেশ ব্যবসায় চালাইতেছে। তারা নিজেরা ভেড়া পালে, ভেড়া চরায়, ভেড়ার লোম

কাটে ও তাহা হইতে কম্বল তৈয়ারি করে। অন্য কাহারো সাহায্য তারা লয় না। সুতরাং তাদের যে লাভ হইবে তা, আর বিচিত্র কি? ইহারা মোটেই বাবুগিরি করে না। কিন্তু উপার্জ্জন মন্দ করে না।

(১৮)

"মহাশয়! বাঁকুড়া সহরে কল-কারখানা, দালান দেখিয়া ইহার ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে কোনো ধারণা করিবেন না যেন। তা করিলে অত্যন্ত ভুল করিবেন। বাস্তবিক পক্ষে বাঁকুড়ার অধিবাসীরা অতি দরিদ্র। এবং এই কল-কারখানা ইত্যাদি তাদের দারিদ্র্য আরো বাড়াইয়াছে।

"এই যে ধান-কলগুলি দেখিতেছেন ইহারা অনেক দরিদ্র গৃহস্থের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। ইহাদের জন্য আজ বাঁকুড়ার ঢেঁকিগুলি অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে। যাহারা ঢেঁকিতে চাল ছাঁটিয়া দুই পয়সা উপার্জ্জন করিত, তাহারা সেই উপার্জ্জনে বঞ্চিত হইয়াছে।

"ইহা কি ভাল বলিবেন? দু'একজন অর্থশালী হইয়া দেশের কি উপকার করিবে? আজ আমাদেরও কম অসুবিধা হয় নাই। কলের ছাঁটা চাল অপেক্ষা ঢেঁকিতে কোটা চাল অনেক উৎকৃষ্ট। তাহা আজ আর পাই না। কারণ, সমস্ত ধানই কলওয়ালারা কিনিয়া লয়।

শিল্প-সংগ্রামের নব নব রূপ

শ্রীহীরালাল রায়, এস, বি (হার্ভার্ড), পি-এইচ, ডি (বার্লিন)
অধ্যাপক, বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট, কলিকাতা

(১)

বৎসরখানেক পূর্ব্বে নিউইয়র্কে এক ভোজের পর বক্তৃতায় ইংরেজ দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড্ রাসেল বলেছিলেন যে, কালক্রমে সমস্ত পৃথিবী এক ইম্পীরিয়ালিজ্‌ম্ এর অধীনে আসবে এবং তা সাম্রাজ্যিক নয় বাণিজ্যিক। এই ইম্পীরিয়ালিজ্‌ম্ এর প্রধান উদ্যোক্তা হবে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র। বক্তার অভিপ্রায় ছিল এই যে, ভবিষ্যতের নূতন বিধানে বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা কমে যাবে এবং মজুরদের কম খাটুনি ও বেশী সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বন্দোবস্ত হবে। রাসেলের এই আদর্শ রাজ্য কবে স্থাপিত হবে তা কেউ বলতে পারে না। কিন্তু বর্ত্তমানে অর্থাৎ যুদ্ধের পরে বাণিজ্যে এবং শিল্পে প্রতিযোগিতার ফলে জগৎব্যাপী যে অনিশ্চয়তা এবং অস্থিরতা বিরাজ করচে, তার প্রতীকারের জন্য অনেক মনীষী তাঁদের চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করচেন।

মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে প্রত্যেক দেশ কতকগুলি বিশেষ বিশেষ শিল্পে এবং বাণিজ্যে আধিপত্য করছিল। কিন্তু যুদ্ধের সময় বহির্ব্বাণিজ্য বন্ধ হওয়ায় দেশীয় লোকের এবং সৈন্যদের আবশ্যক দ্রব্যাদি সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে সকলদেশই অল্প-বিস্তর সকল রকম শিল্প দ্রব্য প্রস্তুত করতে আরম্ভ করেছিল। যে সব দেশ শিল্প-বাণিজ্যে অনুন্নত ছিল, যথা, ভারতবর্ষ, চীন, দক্ষিণ আমেরিকা এবং যারা ইওরোপে ও মার্কিণ রাজ্যে তৈয়ারী জিনিষের উপর বেশী রকম নির্ভর করছিল, তারাও নূতন নূতন কারখানা স্থাপন করেছিল অথবা পুরাতন কারখানাগুলিকে সেই সুযোগে ভালকরে চালাতে আরম্ভ করেছিল। মহাযুদ্ধের অবসানে সকল পুরাণ শিল্প-প্রধান দেশই দেখচে তাদের বাজার পরহস্তগত হয়ে গেছে। অথচ যুদ্ধের সময় যে সমস্ত নূতন কারখানা স্থাপিত হয়েছিল সেগুলিও চালান দরকার। সবচেয়ে বড় গণ্ডগোল হয় রংএর কারখানা নিয়ে। যুদ্ধের সময় ইংল্যাণ্ড ও মার্কিণ দেশ রংএর কারখানা খুলেছিল। ইংল্যাণ্ডের রংএর কারখানায় গবর্ণমেণ্টেরও অংশ ছিল। এই কারখানাকে বাঁচাবার জন্য জার্ম্মাণ রংএর বিরুদ্ধে রক্ষণ-শুল্কও বসান হয়। তথাপি এই কারখানা লাভ দেখাতে পারছিল না। রংএর কারবারে জার্ম্মাণি জগতে অদ্বিতীয়। তার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা শক্ত। তার উপর গভর্ণমেণ্টের অংশ থাকায় ব্যবসা বাণিজ্যে যে সব গুপ্ত ফাঁকি, কৌশল এবং বন্দোবস্ত চলতে পারে তাও ভাল রকম চলছিল না। এই জন্য কিছু দিন হ'ল

গভর্ণমেন্ট তার নিজের অংশ কম দরে কোম্পানীকে বিক্রী করে দিয়েছে। এখন ইংরেজ কোম্পানী জার্ম্মাণির রংএর ব্যবসায়ীদের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করচে। আমেরিকার রংএর কোম্পানীর অবস্থা ইংরেজদের কোম্পানীর চেয়ে কিছু ভাল। কিন্তু তারাও এখন বলচে যে, এই বন্দোবস্তটী দ্বৈত না হয়ে ত্রয়ী হওয়া উচিত—এই বন্দোবস্তে আমেরিকাকেও অংশী করা দরকার। তা না হলে তাদের কারখানার সমূহ বিপদ ঘটতে পারে।

রবার নিয়ে ইংরেজে মার্কিণে বেশ গোলমাল চলচে। মার্কিণরা বলচে যে, তূলার দর বাড়িয়ে ইংরেজদের জব্দ করা যেতে পারে। এটা হ'ল ব্যবসায়ীদের কথা। আমেরিকান্ রাসায়নিকগণ পরামর্শ দিচ্ছেন যে, কৃত্রিম উপায়ে তৈয়ারী "সিন্থেটিক" রবারের একটা প্রকাণ্ড কারখানা খুললেই ইংরেজরা যখন-তখন ইচ্ছামত রবারের দর বাড়াতে কমাতে পারবেনা। এই রকম "সিন্থেটিক" কর্পূর তৈয়ারী করার ব্যবস্থা থাকাতেই (যদিও সে কারখানায় কোনো কাজ হয় না) জাপান ইচ্ছামত কর্পূরের দর বাড়াতে কমাতে পারচে না। ইংরেজও সুদানে তূলার চাষের বিপুল ব্যবস্থা করে আমেরিকাকে জব্দ করার চেষ্টা করচে। প্রত্যেক শিল্প-প্রধান দেশই, নিজেদের কাঁচা মালের জন্য অন্যের অধীন যাতে না হতে হয়, এখন তার চেষ্টা করচে। ইতালী গন্ধকের একচেটিয়া ব্যবসা করছিল। জাপানের সহিত জগতের পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে তা কতকটা কমেছিল। তারপর মার্কিণদেশে ফ্রাসের নিয়মে বালির স্তরের নীচে জমান গন্ধকের উদ্ধার করার ব্যবস্থা আবিষ্কারের পর ইতালীর একচেটিয়া ব্যবসার মূলে কুঠারাঘাত পড়েছে। চিলির ছিল সোডিয়াম্ নাইট্রেটের একচেটিয়া ব্যবসা। বাতাসের নাইট্রোজেন থেকে ইলেক্ট্রিসিটি দিয়ে নাইট্রেট্ তৈয়ারীর প্রণালী কার্য্যে পরিণত হওয়ায়, চিলির সে একচেটিয়া ব্যবসাও গেছে। জার্ম্মাণির ষ্টাসফুর্ট খনিতে মজুত পটাশই এখন পর্য্যন্তও কৃষিকার্য্যের অন্যতম সাররূপে ব্যবহৃত হয়। এ জিনিষের ব্যবসা জার্ম্মাণিরই একচেটিয়া। মার্কিণ দেশ এখন ফেল্‌স্‌পার থেকে পটাশ্ উদ্ধারের চেষ্টায় ব্যস্ত। যদি কৃতকার্য্য হয় তবে জার্ম্মাণির এই একচেটিয়া ব্যবসা উঠে যাবে।

আমাদের নিজেদের, বিশেষতঃ, বাংলাদেশেরই পৃথিবীতে পাটের একচেটিয়া ব্যবসা। যদিও তার বেশীর ভাগ লাভ স্কচ্ সাহেবদেরই পকেটে যায়। আশঙ্কা আছে দক্ষিণ আমেরিকার, বিশেষতঃ, আমাজন নদের দুইধারে পাটের চাষের ব্যবস্থা হলে বাংলাদেশকে দেখতে হবে যে, সেই সব জমি অন্য কোন্ কাজে লাগান যায়।

কাঁচা মাল সম্বন্ধে স্বাধীন হওয়ার জন্যই জার্ম্মাণি আবার তার আফ্রিকার উপনিবেশগুলি ফিরে পাওয়ার জন্য লীগ্ অব্ নেশানের কাছে দরখাস্ত পেশ করতে যাচ্ছে।

(২)

এই ত গেল একচেটিয়া ব্যবসাগুলির জন্য বাণিজ্য এবং শিল্পজগতে যে সব গোলমাল চলচে সেই কথা। তারপর, যুদ্ধের সময় এবং পরে চীনদেশে অনেক তূলার এবং কাপড়ের কলের সৃষ্টি হয়েচে। ভারতবর্ষে লোহা ও ইস্পাতের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েচে এবং তার জন্য এখন শুল্কও বসেচে। এই সময়ের মধ্যে ভারতে কাপড়ের কলের সংখ্যাও বেড়েচে। অন্যান্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানও বেড়ে চলেচে। দক্ষিণ আমেরিকায়, বিশেষতঃ, আর্জেন্টিন দেশে চামড়ার জিনিষ তৈয়ারী হচ্ছে। তথাকার লোকেরা আর এখন কাঁচা চামড়া বিদেশে পাঠিয়ে সেখান থেকেই আবার তৈয়ারী জিনিষ কিনতে চায় না। আমেরিকাতে বেশ জোরে কৃত্রিম উপায়ে নানা জিনিষ করিবার জন্য রাসায়নিক কারখানা চলচে। এ বিষয়ে জার্ম্মাণির একাধিপত্য চলে যাচ্ছে। আমেরিকার নূতন পাইরেক্স গ্লাস রাসায়নিক ল্যাবরেটরিতে জার্ম্মাণির গ্লাসকে হারিয়ে দিচ্ছে। কৃত্রিম রেশমের জন্য ইংল্যাণ্ড এতদিন জার্ম্মাণি, ফ্রান্স এবং ইতালীর মুখাপেক্ষী ছিল। রক্ষণ-শুল্ক বসাবার পর ইংল্যাণ্ডে উহার কারখানার সৃষ্টি হচ্ছে।

এইসব ব্যাপার দেখে রাসেলের বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যিক ইম্পীরিয়ালিজ্‌ম্ এর ভবিষ্যৎ সূচনা যেন ক্রমশঃ দূরেই চলে যাচ্ছে মনে হয়।

যুদ্ধের সময় নূতন নূতন কারখানা হওয়ায় জিনিষ তৈয়ারী হচ্ছে খুববেশী। অথচ তা বেচবার মত বাজার পাওয়া যাচ্ছে না।

তার উপরে আরও গোলমাল বাধিয়েচে যুদ্ধঋণ। ইওরোপের প্রায় প্রত্যেক দেশই আমেরিকার নিকট ঋণী। এই ঋণ শোধ করতে হলে সেই সব দেশের তৈয়ারী জিনিষ বিক্রী করার মত বাজার পাওয়া চাই।

এর ফল এই হবে যে, প্রতিযোগিতা ক্রমশই অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং তীব্র হয়ে উঠ্‌বে। যারা সবচেয়ে ভাল জিনিষ সবচেয়ে কম দরে দিতে পারবে, তারাই বেঁচে থাকবে, অন্য সবাইকে মরতে হবে। সকল দেশেই এবং আমাদের দেশেও রক্ষণ-শুল্কের জন্য তীব্র আন্দোলন চল্‌চে। এই ব্যবস্থায় হয়ত কিছুদিন সুবিধা হতে পারে, কিন্তু পরিণামে প্রতিযোগিতার হাত এড়ান শক্ত। কাজে কাজেই আমাদের দেশের শিল্পযোদ্ধাদের দেখতে হবে যে, কি করে খুব ভাল জিনিষ খুব কম দরে বিক্রী করতে পারেন। কর্ম্মদক্ষতার পরাকাষ্ঠা লাভ করতে হলে এখন আর মামুলি, সনাতন নিয়মে কারখানা স্থাপন করলে চলবে না। সকল বিষয়েই বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনিয়ারের সাহায্য নিয়ে আধুনিক প্রণালীতে কারখানা বসাতে এবং ধনবিজ্ঞানবেত্তাদের পরামর্শ নিয়ে ধার-কর্জ্জ এবং বেচা-কেনার ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের দেশের লোকের একটা ধারণা আছে যে, এদেশে মজুরি সস্তা বলে আমাদের পক্ষে পাশ্চাত্য দেশের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা সহজ হবে। এই আকাশকুসুম ও শীঘ্রই আকাশে মিলিয়ে যাবে। প্রথমতঃ, হয়ত এই ধারণাই ভুল। টাকাপ্রতি যে কাজ পাওয়া যায় তা বোধ হয় প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে প্রায় সমান—প্রত্যেক মজুরের মাইনে যা-ই হোক না কেন। দ্বিতীয়তঃ, পূর্ব্বোক্ত ধারণা যদি সত্যও হয়, তবু এ কথা জানা উচিত যে, এদেশের শ্রমিকরাও আর বেশীদিন এরকম কম মাইনেতে কাজ করবে না। এই বিদ্রোহের লক্ষণ এখন থেকেই দেখা যাচ্ছে।

সুতরাং আমাদের ভাবতে হবে যে, পাশ্চাত্যের শিল্প-প্রধান দেশগুলির সঙ্গে সমরক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আমাদের যুদ্ধ করতে হবে। এতে "বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী" এই উভয় পক্ষের পণ। এতে কেবল স্বদেশ-হিতৈষণা বা প্যাট্রিয়টিজ্‌ম্‌ এর দোহাই দিলে চলবে না। এখন একমাত্র মূলমন্ত্র কর্ম্ম-দক্ষতা। প্রথম 'স্বদেশী'র দিনে উচ্ছ্বাসের বশে এলাহাবাদ থেকে বালি, কাট্‌নি থেকে চূন এবং রাণীগঞ্জ থেকে কয়লা নিয়ে বোম্বাই প্রদেশে গ্লাসের কারখানা খোলা হয়ত হাস্যকর ব্যাপার ছিল না। কিন্তু এখন সে রকম ব্যবস্থা করলে সঙ্গে সঙ্গে সে কারখানার শ্মশান-যাত্রার ব্যবস্থাও করতে হবে।

এখন মনে রাখতে হবে যে, এই বিশ্বব্যাপী শিল্পবাণিজ্যের যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে আমাদের কোনরূপ সুযোগ সুবিধা নেই। তাদের সমস্ত প্রণালী নিয়ে, সম্ভব হলে তার উৎকর্ষ-সাধন করে, তাদের সঙ্গে লড়াই করতে হবে এ ছাড়া আর অন্য উপায় নাই।

"আর্থিক উন্নতি"র জন্মকথা

আমাদের দৌড়

"হ্যান করিব," "ত্যান করিব" ইত্যাদি প্রতিজ্ঞা করিয়া আমরা এই কাগজ বাহির করিতে ঝুঁকি নাই। আর্থিক ব্যবস্থা নরনারীর জীবনে এক বড় কাণ্ড। এই কাণ্ড সম্বন্ধে আমাদের বাংলাদেশে একসঙ্গে বহুসংখ্যক বাঙালীর সমবেত চিন্তা ফুটিয়া উঠা দরকার। বাস্। এইটুকুই আমাদের দর্শন।

আর চাই আমরা আর্থিক জীবনের সকল কথাই বাংলা ভাষায় চর্চ্চা করিতে ও চর্চ্চা করাইতে। ইহার বেশী দৌড় আমাদের নয়। বাংলাদেশের সর্ব্বত্রই আর্থিক জীবনের নানা বিভাগ সম্বন্ধে বিভিন্ন ঢঙের বাংলা পত্রিকা বাহির হইতেছে দেখিলে আমরা যার পর নাই সুখী হইব।

"বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ"

আর্থিক জীবনের চর্চ্চা কোন্ প্রণালীতে চলিলে বাংলাদেশে ধনবিজ্ঞান-বিদ্যা বেশ পাকা বনিয়াদের উপর গড়িয়া উঠিতে পারে তাহার আলোচনা বাহির হইয়াছে বর্ত্তমান সম্পাদকের "বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ" নামক প্রবন্ধে। লেখকের ইতালিতে অবস্থানকালে—১৩৩১ সালের ফাল্গুনের "প্রবাসী"তে রচনাটা প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে উহা স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রাপ্তব্য ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরি, ২৫।২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা)।

সেই প্রবন্ধে যে ধরণের "পরিষৎ" কায়েম করিবার কথা তোলা হইয়াছে, তাহা একদিন না একদিন বাঙালী জাতিকে গড়িয়া তুলিতেই হইবে। সম্প্রতি তাহা বোধ হয় সম্ভবপর নয়। যাহা হউক, তাহার কোনো কোনো উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য "আর্থিক উন্নতি"র সাহায্যে সিদ্ধ হইতে পারিবে।

ধনবিজ্ঞানের ত্রিধারা

তিন রকম মাথার এবং তিন রকম অভিজ্ঞতার মেশামেশি ধনবিজ্ঞান-বিদ্যার খোরাক। প্রথমতঃ চাই আমরা চাষী, শিল্পী, ব্যাপারী, ব্যাঙ্কার এঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক ইত্যাদি "ধনস্রষ্টা"দের কাজকর্ম্ম এবং চিন্তাপ্রণালী। আমাদের দ্বিতীয় কুদরতী মাল হইতেছে রেল, ডাক, বন, খনি, স্বাস্থ্য, শুল্ক ইত্যাদি সংক্রান্ত সরকারী ও নাগরিক শাসনবিভাগের কর্ম্মচারীদের সার্ব্বজনীন জীবন-কথা। আর তৃতীয় উপকরণের ভিতর পড়ে ধনবিজ্ঞানবিষয়ক কেতাব ঘাঁটাঘাঁটি করিতে অভ্যস্ত ইস্কুল-কলেজের মাষ্টার-ছাত্রদের পঠন-পাঠন এবং গবেষণা। "আর্থিক উন্নতির" নানা বিভাগে ধনবিজ্ঞানের এই ত্রিধারা মূর্ত্তি পাইতে থাকিবে।

নেহাৎ মামুলি আর্থিক সংবাদও আমাদের চিন্তায় তুচ্ছ নয়। আবার ভাত-কাপড় সম্বন্ধে উঁচু দার্শনিক তথ্য বিশ্লেষণকেও আমরা অতি-কিছু বিবেচনা করিব না। চাই সবই। বিজ্ঞানগড়িয়া তুলিবার জন্য সবেরই প্রয়োজন আছে।

দেশের নিকট প্রস্তাব পেশ

কাগজটার কথা প্রথমে আলোচিত হয় "অমৃতবাজার পত্রিকার" এক মোলাকাৎ-কাহিনীতে (২২ জানুয়ারি ১৯২৬)। তাহার পর দেশের সর্ব্বত্র নিম্নলিখিত অনুরোধ-পত্র পাঠান হয়:—

সবিনয় নিবেদন,

যে সকল উপায় অবলম্বন করিলে বাংলার নরনারী আর্থিক জীবনে উন্নতি লাভ করিতে পারে সেই সমুদয়ের কথা আলোচনা করিবার জন্য দেশে একটা আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে। সেই আকাঙ্ক্ষা খানিকটা পূরণ করিবার মতলবে কয়েকজনে মিলিয়া আমরা "আর্থিক উন্নতি" মাসিকপত্র বাহির করিতেছি।

আগামী বৈশাখে ইহার প্রথম সংখ্যা বাহির হইবে। সঙ্গে একটা অনুষ্ঠান-পত্র জুড়িয়া দিলাম। তাহাতে পত্রিকার উদ্দেশ্য, কার্য্যপ্রণালী দেখিতে পাইবেন।

আজকালকার দিনে দুনিয়ার অন্যান্য দেশে ধনবিজ্ঞান-চর্চ্চা এবং আর্থিক উন্নতির প্রচেষ্টা যে-যে প্রণালীতে চলিতেছে, সেই সকল দিকে বাঙালী জাতির নজর টানিয়া

আনা আমাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। ইতালিয়ান, ফরাসী, জার্মাণ ইত্যাদি ভাষায় প্রচারিত গ্রন্থ-পত্রিকাদির সঙ্গে আমরা বাংলার জনসাধারণের যোগাযোগ কায়েম করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিব।

আপনাদের পত্রিকায় এই চিঠি এবং বিজ্ঞাপন প্রকাশিত করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিতে পারিলে যারপরনাই উপকৃত ও বাধিত হইব। অবসর মত আমাদের পত্রিকা সম্বন্ধে আপনারা আলোচনা করিতে পারিলেও আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করা হইবে।

আপনাদের কাগজ আমরা নিয়মিতরূপে পাইলে অনেক সময়েই তাহা হইতে তথ্য, সংবাদ ও মন্তব্য উদ্ধৃত করিতে পারিব আশা করি। মফঃস্বলের সঙ্গে এবং দেশের সকল প্রকার লেখক-পাঠক-সাংবাদিকের সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা কামনা করিতেছি।

ভরসা করি, সকল উপায়ে আপনাদের আনুকূল্য লাভ করিতে পারিব। ইতি—

"আর্থিক উন্নতি"র অনুষ্ঠান-পত্র

ব্যাঙ্কিং, বহির্বাণিজ্য, টাকার বাজার, বীমা, দালালি, ফ্যাক্টরি, কৃষিকর্ম্ম, পশুপালন, খনি-শিল্প, বনসম্পদ, রেল-জাহাজ, সরকারী আয়ব্যয়, ধনদৌলত-বিষয়ক রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন, ধনাগমের উপায়-সম্পর্কিত শিক্ষা-প্রচার, পল্লী-সংগঠন, নরনারীর স্বাস্থ্য এবং নগর-শাসন ইত্যাদি বিষয়ের তথ্যমূলক মাসিক পত্র।

সম্পাদক শ্রীবিনয়কুমার সরকার

প্রথম আলোচ্য বিষয়,—বাংলার কিষাণ, কারিগর, জেলে, মুচী, মাঝী, তাঁতী, দোকানদার, হাটুয়া, আড়তদার, জোতদার, জমিদার, আমদানি-রপ্তানির ব্যবসায়ী, কেরাণী, মজুর, খালাসী, আধুনিক ব্যাঙ্ক-বাণিজ্য-শিল্পের প্রবর্ত্তক ইত্যাদি সকল শ্রেণীর বাঙালীর আর্থিক জীবনযাত্রা। (তথ্যসমূহ স্থানীয় সংবাদ-দাতার মারফৎ সংগৃহীত)।

দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়,—সমগ্র ভারতের এবং ভারতীয় রাষ্ট্রপুঞ্জের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য।

তৃতীয় আলোচ্য বিষয়,—দুনিয়ার ধন-দৌলত এবং বিদেশের সঙ্গে বাঙালীর ব্যবসা বাড়াইবার সুযোগ।

চতুর্থ আলোচ্য বিষয়,—দেশ-বিদেশের ব্যাঙ্কার, মহাজন, ইঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক, কারখানা-পরিচালক, ধনবিজ্ঞান-দক্ষ পণ্ডিত, রাজস্ব-সচিব, শিল্প-বাণিজ্য-কৃষি-শিক্ষার ধুরন্ধর ইত্যাদি ব্যক্তিগণের রীতিবিধি ও কথাবার্ত্তা।

পঞ্চম আলোচ্য বিষয়,—দেশী বিদেশী বিশেষজ্ঞ নরনারীর সঙ্গে সম্পাদকীয় "মোলাকাৎ" এবং মৌখিক কথোপকথন,—কৃষিশিল্পবাণিজ্য এবং ধনবিজ্ঞান-বিদ্যা সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত।

এই সকল বিষয় দৈনিক অথবা সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রণালীতে "সংবাদে"র আকারে পাঠকগণের প্রতিদিনকার জীবন স্পর্শ করিতে সমর্থ।

বিশেষত্ব,—

(১) ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইতালিয়ান, রুশ, জাপানী, তুর্ক, মার্কিণ ও ইংরেজি কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য-বিষয়ক এবং ধনবিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্রিকার সূচী ও সারাংশ।

(২) আর্থিক জীবনবিষয়ক দেশী-বিদেশী গ্রন্থের ধারাবাহিক তালিকা।

(৩) সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ-সমালোচনা।

তাহা ছাড়া,—

পত্রিকার অর্দ্ধাংশ মৌলিক প্রবন্ধে এবং বিদেশী আর্থিক সাহিত্য হইতে তর্জ্জমায় সংগঠিত। উচ্চতম ধনবিজ্ঞান-বিদ্যার সকল তত্ত্ব এবং সাময়িক আর্থিক সমস্যার নানা তর্কপ্রশ্ন দুই-ই এই অংশের প্রাণ।

আপাততঃ, "প্রবাসী", "ভারতবর্ষ", "বঙ্গবাণী" ইত্যাদির আকারের মাসিক ৮০ পৃষ্ঠা।

বার্ষিক মূল্য ৪৷৷০ সডাক।

পত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন।

১০৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পরিচালকবর্গ

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা (কলিকাতা)
„ নলিনীমোহন রায় চৌধুরী (রংপুর)
„ তুলসীচন্দ্র গোস্বামী (শ্রীরামপুর)
„ গোপালদাস চৌধুরী (ময়মনসিংহ)
„ সত্যচরণ লাহা (কলিকাতা)
„ তারকনাথ মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া)

লেখকগণের প্রতি নিবেদন

১। "আর্থিক উন্নতি"কে বাঙ্গালীর ধনবিজ্ঞান-চিন্তার কর্ম্মদক্ষ বাহনরূপে গড়িয়া তুলিবার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

২। এই মাসিক পত্রের লেখকগণ প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর অন্তর্গত :—(১) আর্থিক জীবন বিষয়ক সাংবাদিক বা তথ্য-সংগ্রাহক, (২) গ্রন্থ-পত্রিকাদির সূচী-সারাংশ-সঙ্কলন-কর্ত্তা ও সমালোচক, (৩) প্রবন্ধ-লেখক ও অনুবাদক।

৩। রচনাবলীর কোনো অংশে একটি মাত্র বিদেশী হরপও ব্যবহৃত হইবে না। যেখানে-যেখানে বিদেশী শব্দ ব্যবহার না করিলে চলিবে না সেই সকল স্থলেও শব্দগুলা বাংলা হরপে বসাইতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বাংলা তর্জ্জমা থাকিবেই। গ্রন্থ-পত্রিকাদির নাম এবং জনপদ বা নরনারীর নাম সম্বন্ধেও এই নিয়মই খাটিবে।

৪। পারিভাষিক শব্দ সম্বন্ধে আপাততঃ যাঁহার যেরূপ সুবিধা, তিনি সেইরূপই বাংলা তর্জ্জমা চালাইয়া দিবেন। প্রয়োজন হইলে "ফুটনোটে" এই সকল শব্দ লইয়া আলোচনা চলিতে পারিবে।

৫। বিদেশী শব্দের উচ্চারণ বাংলায় বসাইবার সময় গোলে পড়িবার সম্ভাবনা আছে। সম্প্রতি তাহার জন্যও উদ্বিগ্ন হইবার প্রয়োজন নাই। এ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে বিশেষ ব্যবস্থা করিবার ইচ্ছা আছে।

৬। কোনো মত বা ব্যক্তি-বিশেষের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোনো প্রকার আন্দোলন চালান এই কাগজে সম্ভবপর হইবে না। তথ্যের জোরে এবং যুক্তির জোরে তত্ত্ব বা মতামত প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

৭। যখনই কোনো গ্রন্থ বা পত্রিকা হইতে নজির উদ্ধৃত করা দরকার হইবে, তখনই সন, তারিখ, প্রকাশক ও লেখকের নাম উল্লেখ করিতে হইবে।

৮। সঙ্কলন-কর্ত্তা ও সমালোচকেরা প্রথমতঃ গ্রন্থ-পত্রিকাদির বক্তব্য কথাগুলা বস্তুনিষ্ঠরূপে বিবৃত করিতে সচেষ্ট হইবেন, তাহার পরে নিজ নিজ মতামত প্রকাশ করা চলিতে পারিবে। সমালোচকদের অনুভূতিই সমালোচনা বা সঙ্কলনের প্রধান অংশ হইবে না, বিবৃত সাহিত্যের যথাযথ চুম্বক প্রচার করাই মুখ্য উদ্দেশ্য থাকিবে।

৯। সমালোচকেরা নিম্নলিখিত আলোচনারীতির দিকে লক্ষ রাখিবেন :—প্রথমে গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ করিতে হইবে। তাহার পর থাকিবে গ্রন্থের নাম (বিদেশী বইয়ের নাম বাংলা হরপে প্রদত্ত হইবে, সঙ্গে সঙ্গে ব্র্যাকেটের ভিতর নামের বাংলা অনুবাদ থাকিবে), পরে সহর ও প্রকাশকের নাম, তৎপরে প্রকাশের তারিখ, তাহার পর পৃষ্ঠা-সংখ্যা, শেষে দাম।

১০। দেশী-বিদেশী যে-কোনো আর্থিক বিষয়ে রচনা প্রকাশিত হইতে পারিবে।

কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন

আমরা ইহার মধ্যে দেশের অনেক লোকের নিকট নানা ভাবে সাহায্য পাইয়াছি এবং ভবিষ্যতে সাহায্য পাইবার আশা পাইয়াছি।

পল্লীবার্ত্তা (বনগ্রাম, যশোহর), পঞ্চায়েৎ (ঢাকা) শান্তিবার্ত্তা (জামালপুর, ময়মনসিংহ), পল্লীবাসী (কালনা, বর্দ্ধমান), আনন্দবাজার পত্রিকা (কলিকাতা), প্রবাসী, বঙ্গবাণী, ভারতবর্ষ, ফরওয়ার্ড, আত্মশক্তি (কলিকাতা), ডায়মণ্ডহারবার হিতৈষী, মালদহ সমাচার, দেশের বাণী (নোয়াখালী), বার্ত্তা (রংপুর), টাঙ্গাইল হিতৈষী, দেশবন্ধু (শ্রীহট্ট), প্রকৃতি (কলিকাতা) কান্দীবান্ধব (কান্দী, মুর্শিদাবাদ), প্রান্তবাসী, (নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ), রাজবাড়ী পত্রিকা (ফরিদপুর), পরিচারিকা (কুচবিহার), নীহার (কাঁথি, মেদিনীপুর) ইত্যাদি পত্রিকার সম্পাদক ও পরিচালকবর্গ আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।

১০৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে শ্রীরঘুনাথ শীল বি, এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
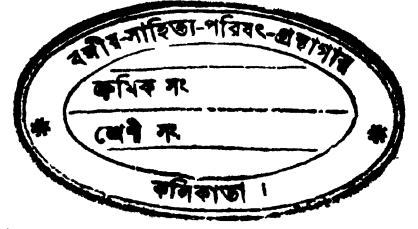
১ম বর্ষ—২য় সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৩

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি॥

—অথর্ব্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।
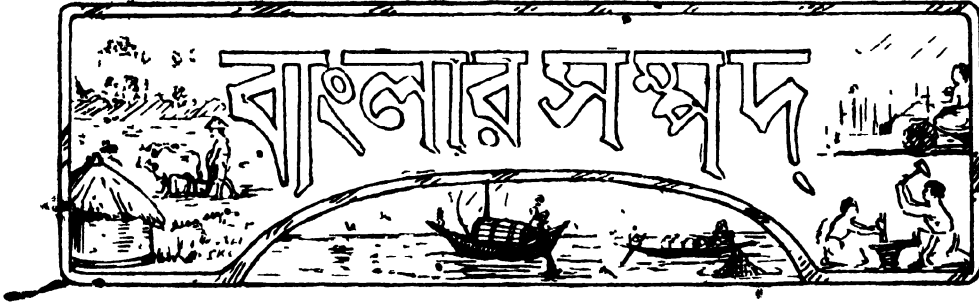
ব্যাঙ্কে বাঙালীর জমা

বাঙালীব তাঁবে যেকয়টা ব্যাঙ্ক এবং লোন আফিস লতেছে তাহাব ভিতব কোনো কোনোটায ১৯২৫ সনে শ লাখেব বেশী টাকা জনগণেব নিকট হইতে আমানত সাবে রক্ষিত হইয়াছিল। কলিকাতাব বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ্যাঙ্কেব ঘরে জমা হইযাছিল ৬৫,৮৪,০০০৲। তাহাব ।েহ দেখিতে পাই জলপাইগুড়ি ব্যাঙ্কেব ঠাঁই। ই ্যাঙ্কে ৫২,৩৮,৬৯৭৲ জনসাধাবণেব নামে মজুত ছিল।

৪৩,৭০,২২২৲ ছিল যশোহর লোন কোম্পানীব নিকট, এবং ৩৯,৯৮,০০০৲ ভবানীপুব ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশ্যনের নকট। ফরিদপুর লোন আফিসে লোকেবা জমা রাখিয়াছিল ৫,৩৮,১০৫৲। এবং বগুড়ার লোন আফিসে ১৫,৭৯, ১০৩৲ জমা। আর রংপুরেব আফিসে ছিল ১১,৩৪,৩৪৮৲ টাকা।

বঝিতে হইবে, মফঃস্বলেও বাংলাব নবনারী আজকাল পবেব হাতে নিজ টাকা খাটাইতে দিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে সুদ গণিতে শিখিতেছে। বাঙালীব চরিত্রে এই এক নূতনত্ব।

কুলীদের দাবী

নৈহাটিব গৌবীপুব জুট মিলে কোনো কর্ম্মচারীব হাতে জগনাবাযণ নামক কুলীব মৃত্যু ঘটিয়াছে।

পবীক্ষাব জন্য শব ব্যাবাকপুবে প্রেরিত হইবার পব গৌবীপুব মিলেব কুলীবা সমবেত হইয়া মিলের ম্যানেজারের নিকট নিম্নলিখিত দাবী উপস্থিত করে:—

(১) ইনস্পেক্টর স্কেনকে অবিলম্বে ডিসমিস করিতে হইবে।

(২) মৃত জগনাবাযণেব মাতাকে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

(৩) ভবিষ্যতে কোনো কর্ম্মচারী কোনো কুলীকে আঘাত করিলে ম্যানেজার অনুসন্ধান করিবেন।

(৪) কুলীদের গত সপ্তাহের বেতন অবিলম্বে দিতে হইবে।

উক্ত দাবীর শেষোক্ত দুই দফা ম্যানেজার মানিয়া লইতে রাজী হন, কিন্তু প্রথম দুই দফা মানিতে রাজী হন না।

নূতন রেলওয়ে লাইন

মৈনা সমবায় ঋণদান সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত ঈশ্বর চরণ চৌধুরী শ্রীহট্টের "জনশক্তি"তে লিখিয়াছেন :—

আসাম-বেঙ্গল রেল-লাইনের একটি শাখা লঙ্গাই ভেলীর দিকে বর্দ্ধিত হইবে শুনিতেছি। এই লাইনটি এদিকে বর্দ্ধিত হইলে এই দূরবর্ত্তী স্থানে ব্যবসায়ের বিশেষ উন্নতিই সাধিত হইবে। জল আটকাইয়া সাধারণের স্বাস্থ্যহানির অজুহাত অমূলক। লঙ্গাই ভেলীর জল দক্ষিণ দিক হইতে উত্তরাভিমুখে চলিয়া যায়। এই লাইনটিও দৈর্ঘ্যে উত্তর-দক্ষিণে থাকিবে। বরং প্রস্তাবিত রেল-লাইন হইলে এই বাঁধের কাজ উত্তমরূপে সাধিত হইবে। ফলতঃ, আমরা ইহাতে দেশের উপকারই দেখিতে পাই।

হিন্দু মিউচুয়্যাল লাইফ অ্যাশুওর‍্যান্স্ লিমিটেড

এই কোম্পানী ভারতে অতি প্রাচীন এবং বাংলায় সর্ব্বপ্রথম। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত। আজ পর্য্যন্ত প্রায় ৪,০০,০০০৲ টাকার উপর দাবী পরিশোধ হইয়াছে। এই কোম্পানী স্বেচ্ছায় দাবীর টাকা বাড়ীতে দিয়া থাকেন। স্বতন্ত্র শেয়ার-হোলডার বা অংশীদার না থাকার দরুণ কোম্পানীর লভ্যাংশের সমস্ত টাকাই বীমাকারীরা পাইতে অধিকারী। ইহার রিজার্ভ ফণ্ডের টাকা গভর্মেণ্টের অফিসিয়াল ট্রাষ্টীর নিকট গচ্ছিত থাকে এবং বীমাকারিগণই ইহার পরিচালন জন্য ডিরেক্টর নিয়োগ করিয়া থাকেন।

বেঙ্গল এনামেল ওয়ার্কস্

লিপ্টন কোম্পানী, বার্ড কোম্পানী, গিলাণ্ডার্স কোম্পানী, বটকৃষ্ণ পাল, ফ্রেণ্ডস্ সোসাইটি, বান্ধব বস্ত্রালয় ইত্যাদি স্বদেশী ও বিদেশী ব্যবসায়-ভবনে যে সমুদয় এনামেলের সাইনবোর্ড ব্যবহৃত হয়, সেই সবই বাঙালীর কারখানায় প্রস্তুত হইতেছে। বাংলা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, বোম্বে ইত্যাদি প্রদেশের পোষ্ট আফিসেও সেই কারখানার সাইনবোর্ডই চলিতেছে। এই কোম্পানীর নাম "বেঙ্গল এনামেল ওয়ার্কস"। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী পল্তা পল্লীতে (ই, বি, রেল) কারখানা অবস্থিত।

১৯২১ সনে এই কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মূলধন তিন লাখ টাকা।

এনামেলের বাসন

ভারতে এনামেলের বাসন কাটে বিস্তর। এতদিন এইসব জিনিষ বিদেশ হইতে আসিত। কিন্তু বেঙ্গল এনামেল ওয়ার্কসের বাসন আজকাল ভারতের বাজারে সুপরিচিত। সরকারী পল্টন-বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তারা এই কোম্পানীর বড় খরিদ্দার। মুর্গীহাটার আড়তে আড়তে ইহার চাহিদা খুব বেশী। এই কোম্পানীর ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ। বিশেষ কারণ এই যে, বিদেশী এনামেলের উপর শতকরা ১৫৲ হিসাবে শুল্ক বসান হইতেছে। কাজেই স্বদেশী এনামেল "সংরক্ষিত" হইবার কথা।

১১৫টা মিউনিসিপ্যালিটি

১৯২৪-২৫ সনে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি বাদে বঙ্গদেশে ১১৫টি মিউনিসিপ্যালিটি ছিল। এই বর্ষে ৬১টি মিউনিসিপ্যালিটিতে নূতন নির্ব্বাচন হইয়াছে। গাইবান্ধা মিউনিসিপ্যালিটিতে নির্ব্বাচন-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

শহরে করদাতার সংখ্যা

এই বৎসর সর্ব্বশুদ্ধ ৩,১৭,৮৯৫ জন করদাতা ছিল, অর্থাৎ অধিবাসীর সংখ্যানুপাতে শতকরা ১৫.৭ জন। প্রত্যেককে ৩৲টাকা ৪ পাই করিয়া কর দিতে হইয়াছে। ৪৯টি মিউনিসিপ্যালিটিতে নূতন করিয়া করের হার ধার্য্য করা হইয়াছে। তাহাতে ১লক্ষ ৭৫হাজার টাকা আয়-বৃদ্ধি ঘটিয়াছে।

মিউনিসিপ্যাল আয়

এই বৎসর মিউনিসিপ্যালিটিসমূহে ৫৯ লক্ষ টাকা কর আদায় হইয়াছে, অর্থাৎ যাহা আদায় হইবে আশা করা গিয়াছিল তাহার শতকরা ৯৫৩ টাকা আদায় হইয়াছে। ১৩টি মিউনিসিপ্যালিটিতে আদায় খুব ভাল হইয়াছে, কিন্তু ৮টি শহরে আদায় অতি শোচনীয় ভাবে কম হইয়াছে। সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটিতে ১৩ লক্ষ টাকা বিলাত বাকী আছে।

শহরের আয়-ব্যয়

গত বৎসরের জের সহ এই বৎসর ১,০৬,০৩,৩৮০৲ টাকা আয় এবং ৮৬,১৩,৭১৭৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে। প্রায় ২০ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক টাকা হাতে রহিয়াছে। ঢাকায় ৪,৬৮, ৪৮৯৲ টাকা, হাওড়ায় ৩,৮৩,৮৪৯৲ টাকা এবং দার্জ্জিলিংএ ১,৫৯,৬০০৲ টাকা হাতে মজুত আছে।

মিউনিসিপ্যালিটির শিক্ষা-তহবিল

শিক্ষার জন্য ২,৯৪,৩২১৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ৩৫,০০০৲ টাকা অধিক ব্যয় হইয়াছে।

জলের কল ও নলকূপ

৩৭টী মিউনিসিপ্যালিটিতে জলের কল আছে। এই কল হইতে ৯ লক্ষ লোককে দৈনিক ১ কোটী গ্যালন বিশুদ্ধ জল সরবরাহ করা হইয়াছে। কয়েকটী মিউনিসিপ্যালিটিতে নলকূপের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

শহরবাসীর সাধারণ স্বাস্থ্য

প্রায় প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটিতেই নালা-ডোবা পরিষ্কার করা হইয়াছে। মিউনিসিপ্যাল আইন অনুসারে লোকের উপর স্ব স্ব এলাকার জঙ্গল পরিষ্কার করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। যশোহর জেলায় এইরূপ ৭শত নোটীশ জারী করা হইয়াছে। সব নোটীশই মান্য করা হইয়াছে।

সংক্রামক রোগ রোধ করিবার জন্য প্রায় প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটিই সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিল। সব মিউনিসিপ্যালিটি হইতেই টাকা দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহাতে বিশেষ ফললাভ হইয়াছে।

কোনো কোনো মিউনিসিপ্যালিটিতে ম্যালেরিয়া ও কালা-জ্বরের প্রাদুর্ভাব ছিল। ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর নিবারণ সমিতি এই দুই রোগ নিবারণকল্পে মিউনিসিপ্যালিটিকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে।

সড়কে খরচ প্রায় সাড়ে এগার লাখ

রাস্তার জন্য এ বৎসর ১১,৩৯,৬০১৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটিসমূহ এই অভিযোগ করিয়াছিল যে, মোটর-গাড়ীসমূহের চলাচলে রাস্তার ক্ষতি হয়। ঐ ক্ষতিপূরণকল্পে মোটরের উপর তাহাদের কর ধার্য্য করার অধিকার নাই। এই অভিযোগ প্রকৃত, সুতরাং গভর্মেণ্ট মিউনিসিপ্যাল বিলে ঐ ক্ষমতা দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

শহরের সরকারী ঋণ

এই বৎসর মিউনিসিপ্যালিটিসমূহকে ১,২৫,০০০৲ ঋণ দেওয়া হইয়াছে। কুমিল্লাতে ৪৫০০০৲, শ্রীরামপুরে ৬০,০০০৲, বহরমপুর এবং যশোহরে ১০,০০০৲ করিয়া ঋণ দেওয়া হইয়াছে মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের সর্ব্বশুদ্ধ ৩৫ লক্ষ টাকা ঋণ আছে।

পাট-রপ্তানির কিম্মৎ ৮১ কোটী

কলিকাতা হইতে যেসকল ভারতীয় জিনিষ বিদেশে যায়, তাহার অর্দ্ধেক অংশ কাঁচা পাট এবং পাটের তৈয়ারী জিনিষ। ভারতের অন্যান্য স্থানের রপ্তানির সঙ্গে তুলন করিলেও কলিকাতার পাট-রপ্তানি দাঁড়ায় প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ।

১৯২২-২৩ সনে যে সমস্ত পাট ও পাটের জিনিষ ভারত হইতে গিয়াছে তাহার মূল্য ৬৩ কোটি টাকা। ১৯২৩-২৪ সনে ৬২½ কোটি। ১৯২৪-২৫ সনে ৮১ কোটি টাকা।

৮০টা পাটের কল

১৯০১ সন হইতে ১৯১৫ সনের মধ্যে কলিকাতার

পাটকলগুলিতে তাঁতের সংখ্যা বাড়িয়াছে ১৫,২১৩ হইতে ৩৮,৩৫৪। যুদ্ধের সময় ছয়টি কল স্থাপিত হয় এবং তাহার পরেই হইয়াছে আরো ছয়টি। শেষোক্ত ছয়টির মধ্যে দুইটি মাড়োয়ারী-কর্ত্তৃক স্থাপিত। পরে আবার আমেরিকানদের কর্ত্তৃত্বে দুইটা কল স্থাপিত হইয়াছে। আজকাল বাংলাদেশে মোটের উপর ৮০টি পাটকল এবং ৪৯,৩৯৯ খানি তাঁত চলিতেছে।

কলের কাজ হপ্তায় চারদিন

কল ও তাঁতের সংখ্যা-বৃদ্ধি হেতু উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ পৃথিবীর চাহিদা অপেক্ষা বেশী। এই কারণে ১৯২১ সনের এপ্রিল মাসে কলের মালিকেরা একসঙ্গে মিলিয়া ইহাই স্থির করিয়াছেন যে, সপ্তাহে মাত্র চারদিন কলের কাজ চলিবে। আজ পর্য্যন্ত এই নিয়ম অনুসারেই কাজ চলিতেছে। ১৯২৪ সনের মার্চ মাসে পাটকল সমিতি স্থির করিয়াছেন যে ভবিষ্যতে আর তাঁত প্রভৃতির সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে না।

পাটের নয়া খরিদ্দার জাভা

এ-যাবৎকাল জাভা এখান হইতে পাটের তৈয়ারী জিনিষ লইত। কিন্তু এখন সেথায় পাটকল স্থাপিত হওয়ায় পাটের জিনিষ সেইখানেই তৈয়ারী হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং অতঃপর সেখানে যাইবে কেবলমাত্র ভারতের কাঁচা পাট।

পাটের চাষ বাড়াইবার আন্দোলন

পাটের কল বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে পাটের চাষও যাহাতে বাড়ে সেই দিকে কলওয়ালাদের নজর পড়িয়াছে। কি উপায়ে পাটের চাষ বাড়ে, তাহা নির্দ্ধারণের জন্য পাটকল-সমিতির দিক্ হইতে বিশেষ আন্দোলন চলিতেছে। কলওয়ালারা চাষীদিগের দ্বারা উন্নত প্রণালীতে চাষ করাইবার জন্য নিজেদের গাঁট হইতে পয়সা খরচ করিতে রাজী আছে। একটা "সেণ্ট্রাল জুট কমিটি" গড়িয়া তুলিবার প্রস্তাব শুনিতে পাইতেছি। দুনিয়ার বাজারে আজকাল প্রায় এক কোটি গাঁইট কাঁচা পাটের চাহিদা আছে। অথচ উৎপন্ন হয় মাত্র ৮০।৮৫ লাখ গাঁইট। কাজেই পাটের চাষে বিশ্ব-সমস্যা।

মাছের ইজারা

ফরিদপুর জেলায় গোহাসীর খাল নামে একটা খাল আছে। এই খালে মাছ ধরিবার ইজারা পাইত জেলেরা। কিন্তু জমিদারেরা সম্প্রতি যে-সে লোককে ইজারা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। শুনা যাইতেছে যে, এই ব্যবস্থায় জমিদারের আয় নাকি বাড়িয়াছে। অপর পক্ষে খাঁটি মৎস্যজীবীদের ক্ষতি হইতেছে।

ক্যানাল অ্যাক্টের অপপ্রয়োগ

চূর্ণী, মাথাভাঙা, হাউলিয়া, ইছামতী, খরিয়া, ভাগীরথী ভৈরব, কুমার ইত্যাদি নদী সম্বন্ধে গবর্মেণ্টের "ক্যানাল অ্যাক্ট" (খাল-বিধি) জারী আছে। সরকারী "ইরিগেশন" (সেচ) বিভাগের নিম্নতম কর্ম্মচারীরা এই অ্যাক্টের অছিলায় নাকি মৎস্যজীবীদের সঙ্গে দুর্ব্ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। শুনা যাইতেছে যে, ঘুষ লওয়া তাহাদের এক বিষম ব্যাধিতে পরিণত হইয়াছে। নদীর কিনারায় চাষীরা বেড়া দিয়া আবাদ চালাইয়া থাকে। এইরূপ বেড়া লাগানো বে-আইনি। অথচ সরকারী কর্ম্মচারীদের সঙ্গে গোপনীয় বন্দোবস্তের সাহায্যে নাকি এইরূপ ঘটিতেছে। জেলেদের মতে এইরূপ বেড়ার ফলেই নদীগুলা বুজিয়া যাইতেছে। এই সকল দিকে জনসাধারণের এবং গবর্মেণ্টের নজর পড়া আবশ্যক।

জেলের উপর জুলুম

আজকাল মৎস্যজীবীরা যখন-তখন নাকি নানা অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া পড়ে। কোমর, ভাগ, পালা, বান্ধাল, পাটা, বাঁশ, জল ইত্যাদি বিভিন্ন ধারায় তাহাদিগকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। সরকারী সেচ-বিভাগের কর্ম্মচারীরা নাকি এই ধরণের মোকদ্দমা সৃষ্টি করিতে সুপটু। ফলতঃ, জেলেদের জীবনে অশান্তি বিরাজ করিতেছে। তাহাদের

আর্থিক উন্নতির জন্য এই সকল অন্তরায় নিবারিত হওয়া আবশ্যক।

রাজবাড়ী-কামারখালি লাইট রেলওয়ে

রাজবাড়ী হইতে চন্দনা নদীর ধার দিয়া গড়াই নদীর পারে অবস্থিত কামারখালি পর্য্যন্ত রেল-লাইন খুলিবার জন্য প্রবল চেষ্টা চলিতেছে। শীঘ্রই যে এই রেল হইবে এরূপ আশা করা অসঙ্গত নহে। এই রেল-লাইন মেসার্স মার্টিন কোং এবং টাটা কোম্পানীর সহায়তায় খুলিবার জন্য একটি কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কোম্পানী রেল-গঠনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। হয় গভর্মেণ্ট নিজে ঐ রেল গঠন করিবেন, নতুবা কোম্পানীকে করিতে দিবেন এবং করিতে সাহায্য করিবেন।

"রাজবাড়ী-পত্রিকা" বলিতেছেন,-"গড়াই নদীরতীরস্থিত যশোহরের অধিবাসিবৃন্দের ও মহকুমাবাসীর যাতায়াত, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে এই রেল-লাইনটী যেরূপ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে ইহার নির্ম্মাণে কালবিলম্ব অসহনীয়। ১৯১৩ সন হইতে এই রেল-লাইনটী খুলিবার জন্য জেলাবাসীরা গভর্ণমেণ্টের নিকট বহু আবেদন-নিবেদন করিয়াছেন। তখন গভর্ণমেণ্ট ষ্টেট ফাণ্ড হইতে টাকা খরচ করিয়া এ লাইন খুলিতে স্বীকৃত হন নাই। সম্প্রতি পুনরায় পরীক্ষা করিতেছেন। রাজবাড়ী-কামারখালি রেলওয়ে প্রধানতঃ দুই উদ্দেশ্য হইতেছে—প্রথমতঃ, যাতায়াত, বাণিজ্য, পল্লীসংস্কার প্রভৃতিতে সাহায্য করিয়া পল্লীর উন্নতি বিধান। দ্বিতীয়তঃ, রেলওয়ে দ্বারা উক্ত কোম্পানীর অংশীদারগণের প্রভূত অর্থসংস্থান। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস কোম্পানী শীঘ্রই সাফল্যে মণ্ডিত হইবেন।"

বাঙালী সমাজের আর্থিক ভিত্তি

আমাদের এই বাংলাদেশের ভূমির পরিমাণ ৭৬ হাজার ৮ শত ৪৩ বর্গ মাইল। ইহাতে ১ শত ৩০টি শহর এবং প্রায় ৮৫ হাজার পল্লীগ্রাম বিদ্যমান। ইহার লোক সংখ্যা ৪ কোটী ৬৬ লক্ষ ৯৫ হাজারের কিছু কম। ৩২ লক্ষ লোক শহরে, এবং ৪ কোটী ৩৬ লক্ষ লোক পল্লীগ্রামে বাস করিয়া থাকে। বাংলার শহরে যে সকল লোক বাস করে, তাহাদের মধ্যে বাঙালী ভিন্ন অন্য প্রদেশবাসী অনেক আছে। শহরের সন্নিহিত পল্লীগ্রামেও অনেক অন্য প্রদেশের লোক বাস করিয়া থাকে। এমন কি, দেখিতে পাই যে, সুদূর মফঃস্বলেও বহু বিদেশী লোক কাজ করিতে যাইয়া বাস করে। বিদেশ হইতে যাহারা বাংলায় আসিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে কৃষিকার্য্যে আত্মনিয়োগ করে অতি অল্প লোকই। সাঁওতাল পরগণা হইতে অনেক লোক আসিয়া পশ্চিম বঙ্গে কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে। কৃষি ছাড়া অন্যকার্য্যে অনেক ভিন্ন-প্রদেশবাসী নিযুক্ত হইয়া থাকে।

ভেজাল খাদ্যদ্রব্য

"শান্তিবার্ত্তা" বলেন :—

"কিছুদিন হইতে ময়মনসিংহের অন্তর্গত জামালপুরে ভেজাল ঘৃত, ও তৈল এবং তাহাতে তৈয়ারী খাদ্যদ্রব্য অবাধে বিক্রয় হইতেছে। বিশুদ্ধ গব্য ঘৃত একেবারেই পাওয়া যায় না। উদ্ভিজ্জ ঘৃতের আমদানি প্রায় এক বৎসর হইতে বেশী হইয়াছে। খাটি দুধও পাওয়া যায় না।" অন্যান্য জেলার খবরও বোধ হয় এইরূপ।

টিউবওয়েল

ব্রহ্মপুত্রের জল বিশুদ্ধ নহে। কলেরা প্রভৃতি মারাত্মক রোগের বীজাণুসকল ইহাতে পাওয়া যায়। অনেক দিন হইতে জলের কল স্থাপনের কথা শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু জামালপুরে এরূপ ধনী ব্যক্তি নাই যিনি ঐ ব্যয়ের অর্দ্ধাংশ বহন করিতে পারেন। কাজেই সেরূপ অনুষ্ঠান এবার হওয়া অসম্ভব। গত বৎসরে দুইটি টিউবওয়েল বসানো হইয়াছিল। তাহার একটির কাজ ভালই হইতেছে, অন্যটি একেবারে বন্ধ। এবারেও ৮।১০টী টিউব ওয়েল বসানোর প্রস্তাব চলিতেছে। দেখিয়া শুনিয়া বসাইতে পারিলে টিউবওয়েলের জল অতি বিশুদ্ধ হয়। রেলওয়ে ষ্টেশনের টিউবওয়েলটি বড়, এবং ইহার ব্যয় প্রায় ৫ হাজার টাকা হইয়াছিল। উহা দিন-রাত্রিতে ২২ খানা এঞ্জিনের জল এবং ষ্টেশন ষ্টাফের ও পাড়াপ্রতিবেশীর জল যোগাইতেছে। (শান্তিবার্ত্তা)।

আটিয়াবাড়ী চা-কোম্পানী

জলপাইগুড়ি জেলায় আটিয়াবাড়ী চা কোম্পানী ১৯২৫ সনে শতকরা ২০০১ লভ্যাংশ বিতরণ করিয়াছে। ১৯২৪ সনে লভ্যাংশ ছিল ৩৫০%, ১৯২৩ সনে ২৫০% এবং ১৯২১ সনে ১৩৫%। এই কোম্পানীর মূলধন ৭,৫০,০৯০১। প্রতি অংশের মূল্য ৫০১। কিন্তু বর্ত্তমানে এই পঞ্চাশ টাকার এক একটি শেয়ার কিনিতে হইলে ১৩০০১ টাকা লাগে।

চায়ের ব্যবসায়ে লাভের হিসাব

চায়ের ব্যবসায়ে জলপাইগুড়ির কোম্পানীগুলা বেশ মোটা লাভ উশুল করিতেছে। শতকরা ১২৪১, ১৫০১, ২০০১, ১৯২৫ সনের হার। কিন্তু এই সব কোম্পানীই ১৯২৪ সনে ২৪০%, ৩২৫, ৩৫০ লাভ দেখাইয়াছিল। ১৯২২ সনে আবার ইহাদেরই লভ্যাংশের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে শতকরা ১০০১, ১৫০১, ১৩৫১ টাকা। বৎসর বৎসর এইরূপ পাড়া উঠ নামা চায়ের ব্যবসাকে অতিমাত্রায় অনিশ্চয়তাপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। এই জুয়ায় শেষ রক্ষা করিতে হইলে পাকা খেলোয়াড় হওয়া আবশ্যক।

মাণিকগঞ্জ লোন আফিস

মফঃস্বলের লোন আফিসগুলার অবস্থা মাণিকগঞ্জ লোন আফিসের কাজকর্ম দেখিয়া খানিকটা বুঝা যায়। এই অফিসের আজকাল দ্বাদশ বৎসর চলিতেছে। মূলধন স্বরূপ আদায় হইয়াছে ১২,৫০০০। লোকজনের নিকট হইতে আমানত হিসাবে পাওয়া গিয়াছে ৩,৩২,৯৩৯১। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর হইতে এই বৎসরের আমানত ২৭,০৭৭।/০, বেশী। লোকজনকে ধার দেওয়া হইয়াছে ১,৩৪,০৩৭।/৩ পাই। শতকরা ৩০১ হারে লভ্যাংশ বিতরিত হইয়াছে।

একআনা রোজগারের জন্য ভিড়

"একজন কাটুনী তের তোলা সূতা কাটিয়া এক আনা মাত্র পয়সা উপার্জ্জন করে এবং এই এক আনা পয়সা উপার্জ্জন করিতে তাহাকে আট দশ ঘণ্টা খাটিতে হয়। কেবলমাত্র এই কাটুনী নহে—এই এক আনা পয়সার জন্য যাহারা সূতার বিনিময়-কেন্দ্রগুলিতে ভিড় জমায় তাহাদের অনেকে আট দশ মাইল দূরের অধিবাসী এই ভিড় সময় সময় এত বেশী হয় যে, তাহাদের কণ্ঠধ্বনি হাটের কল কোলাহলের মতই উদ্দাম হইয়া উঠে" (আনন্দ বাজার)

এই হইতেছে আমাদের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে খাদি প্রতিষ্ঠানের শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্তের চাক্ষুষ সাক্ষ্য।

পল্লীনারীর পোষাক

তুলা-বিনিময়ের কেন্দ্রে কেন্দ্রে সতীশ বাবু কি দেখিয়াছেন? তিনি বলিতেছেন,—

"সকল বয়সেরই রমণী সেখানে ছিল—জরাতুর বৃদ্ধা সুস্থ ও সবল যুবতী এবং আনন্দোজ্জ্বল ছোট ছোট বালিকা। কিন্তু বয়সের এই বৈষম্য থাকা সত্বেও তাহাদের পরিধেয় বসন সকলেরই এক রকমের ছিল। সকলেরই পরিধানে ছিল সেলাইকরা ছেঁড়া শাড়ী। কাহারও নীল শাড়ীতে একফুট চওড়া ময়লা সাদা কাপড়ের তালি দেওয়া, কাহারও শাড়ীতে প্রায় ডজনখানেক তালি লাগান হইয়াছে আবার কাহারও শাড়ী এত জীর্ণ হইয়া গিয়াছে যে, আর তালি দেওয়া চলে না, তাই সেগুলি ছিন্ন অবস্থাতেই রহিয়াছে।"

নমশূদ্র বনাম নাপিত

স্থানীয় নমশূদ্রগণ নাপিতদের সোয়ারী আর বহন করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে। কতিপয় নমশূদ্রের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় বুঝা গেল—তাহারা অন্ধ পঙ্গু নয়, ন্যায়ের পক্ষপাতী। সহযোগের প্রত্যুত্তরে তাহারা কেবলই অসহযোগ পাইয়া আসিয়াছে। তাই আজ মামুলি সমাজ বিধানের উপর তাহারা খড়্গহস্ত।

এই সংবাদ পাইতেছি "দেশবন্ধু"র মারফৎ শ্রীহট্ট জেলার নবপত্তি পল্লী হইতে।

শ্রীহট্টের তাঁতী ও কাটুনী

শ্রীহট্ট জেলায় পঞ্চখণ্ড এক সমৃদ্ধিসম্পন্ন পল্লী। এখানকার

"বিদ্যাশ্রম" প্রতিষ্ঠানে তাঁত ও চরকার কাজ চলিতেছে। ১৩৩১ সনের পৌষ মাসে ৩টা চরকা এবং ১টা তাঁত লইয়া কাজ আরম্ভ হয়। "দেশবন্ধু" (শ্রীহট্ট) বলিতেছেন, "আজকাল এখানে ৪০০ চরকায় এবং ৩২ খানি তাঁতে কাজ চলিয়া থাকে। সূতা মাসিক ./৩ সের হইতে ১১/০ মণ পর্য্যন্ত হইয়াছে। ইহাতে কাটুনীরা নাকি গড়ে মাসিক ২৫৲ ও তাঁতীরা ৩০৲ পাইতেছে। পঞ্চখণ্ডের ২১৩টি গ্রামে অবসর সময়ে সূতা কাটিয়া কাটুনীরা প্রায় ২,৫৯০৲ ও তাঁতীরা কাপড় বুনিয়া প্রায় ২,০০০৲ পাইয়াছে।"

খদ্দরের ধুতী

খদ্দরের ধুতী আজকাল বাজারে বেশ বিক্রী হইতেছে। ১৯২৪ সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কুমিল্লার "অভয়-আশ্রম" ১১,০১৩৷৵০ আনার খদ্দর প্রস্তুত এবং ২১,৮২২৸৶১ আনায় খদ্দর বিক্রী করিয়াছেন। কিন্তু ১৯২৫ সনে তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে ৯০,০০০৲ টাকার খদ্দর তৈয়ারী হইয়াছে। বিক্রী হইয়াছে ৭৪,৬২০৲। এক বৎসরে খদ্দরের চাহিদা সাড়েতিনগুণ বাড়িয়াছে। ধুতীর দামও কমিয়াছে। ১৯২১ সনে জোড়ার দাম ছিল ৭৷০-৮৲। আজ ৪৷৵০ আনায় জোড়া পাওয়া যায়।

দশ হাজার কাটুনীর অন্নসংস্থান

খদ্দর তৈয়ারি করিবার কাজে অনেক লোকের অন্নসংস্থান হইতেছে। এক "অভয় আশ্রমের" অধীনেই মোটের উপর ১০,০০০ কাটুনী সূতা-কাটার কাজে বাহাল আছে।

দাঙ্গা ও দেশ

এপ্রিল মাসের কলিকাতার দাঙ্গাগুলা নানা লোকে নানা চোখে দেখিতেছে। গবর্মেণ্ট ভাবিতেছেন—পুলিশের এক্তিয়ার বাড়িল কি কমিল? স্বদেশ-সেবকদের নিকট চিন্তার বিষয়,—"স্বরাজ" তাহা হইলে এখনো কত দূর? রাষ্ট্রনায়কেরা বুঝিতেছেন,—ইহাতে দেশের ক্ষতি বিশেষ কিছু হয় নাই, গবর্মেণ্টই শান্তিরক্ষায় অক্ষম অথবা অনিচ্ছুক এইটা হাতে কলমে ধরা পড়িল। এইরূপ কেহ বা সমাজের তরফ হইতে, কেহ বা ধর্ম্মের তরফ হইতে, কেহ বা রাষ্ট্রীয় দলাদলির তরফ হইতে ভিন্ন ভিন্ন দিক্ খুলিয়া ধরিতেছেন।

দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যাঁহার মাথা যেরূপ খেলে তিনি সেইরূপ মতামত প্রকাশ করিতেছেন।

দাঙ্গায় আর্থিক ক্ষতি

কিন্তু ভবিষ্যতের জল্পনা-কল্পনা না করিয়াও বর্ত্তমানের একটা তথ্য সকলেরই নজরে পড়িবার কথা। সে হইতেছে আর্থিক ক্ষতি। লোক মারা পড়িয়াছে,—অতএব গরিব-পরিবারের রোজগারকারীর সংখ্যা কমিয়াছে। ঘরবাড়ী জিনিষ-পত্র লুটপাট হইয়াছে। কাজেই সম্পত্তির কিছু কিছু নষ্ট গিয়াছে। তাহা ছাড়া আগুনে বরবাৎও হইয়াছে কিছু কিছু। এই সকল দফা একত্র করিলে লোকসানের পরিমাণ প্রচুর দাঁড়াইবে।

যাতায়াতের বিঘ্ন-সৃষ্টি

আর একটা কথা ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। যে-যে জায়গায় দাঙ্গা ঘটিয়াছে অথবা যেসব নরনারী জখম বা ঘায়েল হইয়াছে একমাত্র সেইসকল জায়গা এবং সেইসকল নরনারীই আর্থিক ক্ষতি ভুগিয়াছে এইরূপ বুঝিলে ঠিক হইবে না। ঘটনাস্থল হইতে বহুদূরবর্ত্তী অঞ্চলের লোকজনও নানা রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

এই দাঙ্গার প্রধান আর্থিক তথ্য হইতেছে যাতায়াতের বিঘ্নসৃষ্টি। প্রাণের ভয়ে লোকজন চলাফেরা করিতে পারে নাই। মাল-চলাচল স্থগিত ছিল। এমন কি ডাক-ঘরের আর তার-আফিসের কাজেও বাধা পড়িয়াছিল। কলিকাতার প্রায় প্রত্যেক আফিসে, বাজারে এবং দোকানেই এইসকল বিঘ্নের ফল দেখা গিয়াছে। বোধ হয় প্রত্যেক পরিবারেই কোনো না কোনো ক্ষতি ঘটিয়াছে। এই সকল ক্ষতি একত্র করিয়া দেখিলে বেশ মোটা অঙ্কের প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

মালকেনা-বেচায় ৪০ লাখ

প্রতিদিন বড়বাজারের আড়তে ও দোকানে প্রায় ৫০ লাখ টাকার মাল কেনা-বেচা হয়। দাঙ্গার ফলে এই

সব কারবার একদম বন্ধ ছিল। লোকসানের হিসাবে ধরিতে হইবে কয়েক ক্রোড়।

দাঙ্গায় মজুরদের ক্ষতি

দাঙ্গার হিড়িকে অনেক মজুর কাজে যোগ দিতে পারে নাই। ইহারা রোজ আনে রোজ খায়। অর্থাৎ যে দিন কাজ বন্ধ সেই দিন ইহাদের তলব মিলে না। এই শ্রেণীর মজুর নাকি লাখ পাচেক আছে কলিকাতায়। গড়ে ইহাদের মজুরি ১৲। সুতরাং রোজ ৫ লাখ টাকা করিয়া লোকসান ঘটিয়াছে মজুর সমাজে।

বড়বাজারে ব্যাঙ্কের ক্ষতি

কলিকাতার বড়বাজার অঞ্চলে যেসব আধুনিক ও সেকেলে ব্যাঙ্ক আছে সেইগুলার সাহায্যে নাকি রোজ ৯,৫০,০০,০০০৲ টাকার হাতফের হয়। দাঙ্গাহাঙ্গামার দরুণ যে-কয়দিন ব্যাঙ্কগুলা বন্ধ ছিল সেই কয়দিনে কত টাকার লোকসান হইয়াছে সহজেই অনুমেয়।

মালীজাতি বনাম হিন্দু-মুসলমান

শ্রীহট্টের দক্ষিণ ভাগে গাছের মালীরা কমিটি করিয়া হিন্দু-মুসলমানের পাকী বহন বন্ধ করিয়াছিল। কাজেই হিন্দু মুসলমান সমবেত ভাবে এক সভায় স্থির করিয়াছে যে, কেহ কোনো মালীর নিকট কোনো জিনিষ বিক্রী করিতে পারিবে না। কোনো মালীর নিকট হইতে মৎস্যাদি খরিদ করাও হইবে না।

চাষের পরীক্ষা-ক্ষেত্র

চাষ-আবাদের উন্নতি সাধনের জন্য দেশের নানা স্থানে কতকগুলা সরকারী পরীক্ষা-কেন্দ্র আছে। এই সমুদয়ের খবর চাষী মহলে ভাল করিয়া পৌঁছে কি না জানি না। কিন্তু পরীক্ষা-কেন্দ্রগুলার ফলাফল জানা থাকিলে বাঙালী কিষাণদের উপকার হইবার সম্ভাবনা। লেখাপড়া-জানা যেসব লোক পল্লীসেবায় ঝুঁকিতে চাহেন তাঁহাদের পক্ষে নিজ নিজ জেলার পরীক্ষা-কেন্দ্র হইতে নয়া নয়া চাষ প্রণালীর বৃত্তান্ত জানিয়া রাখা কর্তব্য। আর চাষ-ব্যবসায় লাগিবার জন্য যেসকল গৃহস্থ প্রস্তুত হইতেছেন তাঁহারাও এই সব পরীক্ষা-কেন্দ্রের ফলসমূহ না জানিয়া কাজ আরম্ভ করিলে কথঞ্চিৎ ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন।

(১) উত্তরবঙ্গে

রাজসাহী

রাজসাহী শহরের উত্তরে কৃষিক্ষেত্রটি অবস্থিত। নানা প্রকার আউশ ও আমন ধান আখ, গম, তামাক প্রভৃতি চাষের পরীক্ষা হইয়া থাকে।

বগুড়া

রেল ষ্টেশনের অনতি দূরে শহরের দিকে কৃষিক্ষেত্র অবস্থিত। ভাল বীজের উপকারিতা প্রদর্শন, নানা প্রকার সারের ব্যবহার প্রভৃতিই অন্যান্য কৃষিক্ষেত্রের ন্যায় এ ক্ষেত্রে ও উদ্দেশ্য। নানাপ্রকার ধান, আক, পাট, আলু, গম জোয়ার প্রভৃতি পশুর খাদ্য প্রভৃতির চাষ এখানে হয় বীজের জন্য ধৈঞ্চার চাষ, ময়দান, সরিষা, তুলা প্রভৃতির চাষ হয়।

[illegible]বন

শহরের উত্তরে এক মাইল দূরে কৃষিক্ষেত্রটি অবস্থিত ভাল ধান, পাট, বাদাম, গম ও আক চাষের উপকারিতা এখানে দেখান হয়। পশুর খাদ্যের ও আলুর চাষের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে।

কালীম্পং

কালীম্পং বাজারের নিম্নে কৃষিক্ষেত্রটি অবস্থিত। আমন ধান, গম, ভাল কলাই, আলু, আক, এরারুট প্রভৃতির চাষ তথায় হইয়া থাকে।

রংপুর

(ক) রংপুর পশুশালা। রংপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের সন্নিহিত এই পশুশালায় গবাদির নানাপ্রকার খাদ্য চাষ ও তাহার পরীক্ষা করা হয়।

(খ) রংপুর কৃষিক্ষেত্র। পাট, আউশ ও আমন ধান এবং আলুর চাষের পরীক্ষা এখানে হয়। ভাল বীজের

উপকারিতা-প্রদর্শন কৃষিক্ষেত্রের উদ্দেশ্য। ভাল গম, আলু, জোয়ার প্রভৃতি গবাদি পশুর খাদ্যও চাষ করা হয়।

(গ) বুড়ীর হাট। রংপুর শহর হইতে ৫ মাইল দূরে এই কৃষিক্ষেত্রে প্রধানতঃ তামাকের চাষ হইয়া থাকে। আউশ ধান, উদ্ভিজ্জ সার ও গবাদির খাদ্যের চাষ এখানে হইয়া থাকে।

(২) দক্ষিণ বঙ্গে

বহরমপুর

কোর্ট ও রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে এক মাইলের মধ্যে এই কৃষিক্ষেত্রটি অবস্থিত। সাধারণের নিকট ইহা কোম্পানীর বাগান নামে পরিচিত। সরকারী কৃষিক্ষেত্রে পরীক্ষিত ফসলের চাষই যে অধিক লাভজনক তাহা দেখান হয়। নূতন ফসল, নূতন সার ও নূতন কৃষিযন্ত্রের পরীক্ষা ও সেচের উপকারিতা-প্রদর্শন এই কৃষিক্ষেত্রের উদ্দেশ্য।

গোসবা, ২৪ পরগণা

ক্যানিং শহর হইতে জলপথে ২৮ মাইল দূরে, সুন্দরবন আবাদের মধ্যে এই কৃষিক্ষেত্রটি অবস্থিত। ইহার উদ্দেশ্য—পাট, আক, আলু প্রভৃতি লাভজনক ফসলের চাষ, সে জন্য পরীক্ষা, এবং উন্নত প্রণালীর কৃষি-কার্য্য দেখান। ধান, পাট, ধৈঞ্চা, অড়হর, তুলা, নানাবিধ ফসল ও শাকসব্জীর চাষ হইয়া থাকে। স্থানীয় মাইনর স্কুলের ছেলেদের এই কৃষিক্ষেত্রে কৃষি-শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

যশোহর

যশোহর রেলওয়ে ষ্টেশনের উত্তর-পশ্চিমে এক মাইল দূরে, কালেক্টরীর নিকটেই খাসমহলের এই কৃষিক্ষেত্রটী অবস্থিত। ধান, পাট, জোয়ার, মকাই, তুলা, আক, আলু, গম, সরিষা, ছোলা, মটর, মসুর ইত্যাদির চাষ হইয়া থাকে।

খুলনা

রূপসা নদীর তীরে পুলিস-সুপারিন্টেণ্ডেন্টের বাংলার নিকট জিলা কৃষি-সমিতির ছোট একটি বাগান আছে। কৃষি-বিভাগের পরীক্ষিত সার ও বীজের উৎকর্ষ-প্রদর্শন এই বাগানের উদ্দেশ্য।

(৩) পূর্ব্ববঙ্গে

ঢাকা

ঢাকা রেলওয়ে ষ্টেশনের উত্তরে প্রায় পাচ মাইল দূরে হাজার বিঘার উপর জায়গা লইয়া "ঢাকা সেন্ট্রাল ফার্ম্ম" নামে এই কৃষিক্ষেত্রটি অবস্থিত। অনুর্ব্বর জমির উর্ব্বরতা-বিধান, সারের পরীক্ষা, বিভিন্ন প্রকার ধান, আক, তামাক প্রভৃতির পরীক্ষা, সেচের উপকারিতা দেখান হইয়া থাকে। বীজের জন্য নির্দ্দিষ্ট ধান, আক প্রভৃতির চাষ হয়। ১০ প্রকার বিভিন্ন রকমের গবাদি গৃহপালিত পশুর খাদ্যের চাষও এখানে হইয়া থাকে। নানা বৈজ্ঞানিক কৃষিযন্ত্রের সাহায্য লওয়া হয়। ক্ষেত্রের সঙ্গে গো-শালা, বীজ-ভাণ্ডার ও ডাক্তারখানা আছে। একটি সেকেণ্ডারী কৃষি-বিদ্যালয়ও এখানে চলিতেছে।

জয়দেবপুর

ভাওয়াল কোর্ট অব ওয়ার্ডস এষ্টেট-কর্ত্তৃক পরিচালিত। পাট, আউশ ধান, আক, সরিষা, তামাক প্রভৃতির চাষ হয়।

ময়মনসিংহ

শহরের দক্ষিণে ৩ মাইল দূরে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের নিকট ক্ষেত্রটি অবস্থিত। নানাপ্রকার ধান, আক, আলু, খেসারী, ছোলা ইত্যাদি তথায় উৎপন্ন হইয়া থাকে।

করাতিয়া।

টাঙ্গাইল-সন্তোষ ছয় আনীর কোর্ট অব ওয়ার্ডস্-কর্ত্তৃক পরিচালিত। জমি উঁচু থাকায় এখানে কেবল আউশ ধান, পাট, আলু, তামাক প্রভৃতির চাষ হয়।

কিশোরগঞ্জ

এখানে বর্গা প্রথায় নানা প্রকার ধান, পাট, মুগ, সরিষা, তামাক, আলু, শাক-সব্জীর চাষ হইয়া থাকে।

ধানবাড়ী

সরিষাবাড়ী হইতে প্রায় ১০ মাইল দূরে টাঙ্গাইল মহকুমায় এই কৃষিক্ষেত্রটি অবস্থিত। উঁচু জায়গা বলিয়া এখানে কেবল আউশ ধান, পাট, আক, আলু, রেড়ি, তুলা,

তামাক, সরিষা, জোয়ার, গম, মটর ইত্যাদির চাষ হইয়া থাকে।

বরিশাল

বরিশাল শহরের ২ মাইল দক্ষিণে। এখানে ধানের চাষই বেশী হইয়া থাকে। পাট, আক, তুলা, বাদাম, তামাক, আলু ইত্যাদির চাষও আছে।

ফরিদপুর

শহর হইতে ৩ মাইল দূরে গোয়ালচামট নামক স্থানে কৃষিক্ষেত্রটি অবস্থিত।

কুমিল্লা

কুমিল্লা শহরের এক মাইল পশ্চিমে, রেল ষ্টেশনের নিকট কৃষিক্ষেত্রটি অবস্থিত। নানাপ্রকার ধান, পাট, আখ, ছোলা, গমের চাষ হয়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

সরাইল ওয়ার্ড এষ্টেট কর্ত্তৃক পরিচালিত। আউশ ধান, পাট, আমন ধান, আক প্রভৃতির চাষ তথায় হয়।

(৪) পশ্চিম বঙ্গ

চুঁচুড়া

ই, আই, রেলপথের চুঁচুড়া ষ্টেশনের নিকট এই ক্ষেত্র অবস্থিত। এখানে নানাপ্রকার ধান আক, পাট, তুলা, গম, ছোলা, অড়হর, ঘাস ও গরুর অন্যান্য খাদ্য, ধৈঞ্চা ইত্যাদি চাষের পরীক্ষা হয়। রেশম চাষেরও পরীক্ষা চলিতেছে। যেসব জাতীয় আক, ধান, পাট উৎকৃষ্ট বলিয়া সরকারী পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইয়াছে, সেসকল সরবরাহের জন্য চাষ করা হয়। বৈজ্ঞানিক কৃষি-যন্ত্রাদিরও পরীক্ষা সেখানে হইতেছে।

বর্দ্ধমান

বর্দ্ধমান রেল ষ্টেশনের দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে ৪ মাইল দূরে ইডেন খালের ধারে পালা গ্রামে অবস্থিত। ধান, পাট, আক, আলু ধৈঞ্চা, তুলা ইত্যাদির পরীক্ষা হইয়া থাকে।

বাকুড়া

বাঁকুড়া আদালত হইতে এক মাইল দূরে শহরের একটি প্রধান রাস্তার উপরে কৃষিক্ষেত্রটি অবস্থিত। জিলার বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন প্রকার জমীতে জন্মাইবার উপযুক্ত ধান নির্ব্বাচন করা, নূতন নূতন ফসলের প্রবর্ত্তন, নূতন নূতন সারের ও বৈজ্ঞানিক কৃষি প্রণালীর প্রবর্ত্তন এই কৃষিক্ষেত্রের উদ্দেশ্য।

সিউড়ী

ই, আই, রেলওয়ে লাইনে সিউড়ী রেল ষ্টেশনের নিকট এই কৃষিক্ষেত্র অবস্থিত। আউশ ও আমন ধান, ধৈঞ্চা, গম, ছোলা, আলু, তামাক, আখ, তুলা ইত্যাদির চাষ হইয়া থাকে।

বীমাকারীদের বাঁচোআ

১৯১২ সনের ভারতীয় বীমা-বিষয়ক আইনটা শোধরাইয়া নতুন আইন কায়েম করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। বিগত আগষ্ট মাস হইতে এই আইনের খসড়া ব্যবস্থাপক সভার নিকট পেশ আছে।

এই আইন পাশ হইলে কতকগুলা নতুন প্রণালীতে বীমা-ব্যবসায়ীরা কার্য্য চালাইতে বাধ্য হইবে। (১) নতুন কোনো কোম্পানী স্থাপিত হইবামাত্রই তাহাকে গবর্মেণ্টের নিকট মোটা হারে টাকা কড়ি আমানত রাখিতে হইবে। এখনও আমানত রাখিতে হয় বটে, কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য হার বাড়িয়া যাইবে। (২) আজকাল বিলাতী বীমা কোম্পানীর ভারতীয় শাখাসমূহ ভারতগবর্মেণ্টের নিকট টাকা জমা রাখিতে বাধ্য নয়, কিন্তু নতুন আইনে তাহারাও স্বদেশী কোম্পানীর মতনই বাধ্য থাকিবে। (৩) জীবনবীমা ছাড়া আগুন-বীমা, দৈববীমা বা অন্যান্য বীমা-ব্যবসায়ে যে-সকল কোম্পানী লিপ্ত, তাহাদিগকেও টাকা আমানত রাখিতে হইবে। আজকাল যে নিয়ম আছে তাহাতে একমাত্র জীবন-বীমাব্যবসায়ীরাই বাধ্য। (৪) বিলাতী বীমাকোম্পানীর ভারতীয় শাখাসমূহ এতদিন ভারত-সরকারের নিকট ভারতীয় ব্যবসা হইতে পাওয়া টাকার স্বতন্ত্র হিসাব দিত না। নতুন আইন তাহাদিগকে ভারতীয় বীমাকারীদের নিকট হইতে পাওয়া টাকার পৃথক হিসাব রাখিতে এবং তাহা প্রকাশ করিতে বাধ্য করিবে। (৫) জীবনবীমা এবং মজুরদের ক্ষতিপূরণ-বীমা এই দুই ব্যবসার জন্য প্রত্যেক কোম্পানী স্বতন্ত্র খাতা-পত্র রাখিতে এবং হিসাব প্রকাশ করিতে বাধ্য থাকিবে। (৬) কোনো বীমা কোম্পানীর কাজ-কর্ম্ম অসন্তোষজনক হইলে তাহার দুয়ার বন্ধ করাইবার ক্ষমতা বীমাকারীদের হাতে কিছু কিছু থাকিবে। অধিকন্তু, জনগণের স্বার্থ-রক্ষা করিবার জন্য গবর্মেণ্টের এক্তিয়ার বাড়িয়া যাইবে। (৭) কোনো বীমাকোম্পানীর নিকট হইতে তাহার ম্যানেজার, ম্যানেজিং এজেণ্ট বা অন্য কোনো উচ্চপদস্থ কিম্বা নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী কখনো কোনো কর্জ্জ লইতে পারিবে না। (৮) প্রত্যেক বীমা-কোম্পানী পাশ-করা "অ্যাকচুয়ারি" বা হিসাব-পরীক্ষককে দিয়া নিজ আর্থিক অবস্থা যাচাই করাইয়া লইতে বাধ্য থাকিবে।

বীমা-কোম্পানীর সরকারী আমানত

ভারত-গবর্মেণ্ট ইচ্ছা করিলে জীবনবীমা-ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে দুই লাখ টাকা পর্য্যন্ত আমানত আদায় করিতে অধিকারী থাকিবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বিদেশী কোম্পানীর শাখা সম্বন্ধেও এই নিয়ম খাটিবে। তবে যে-সকল কোম্পানী ভারতেই গঠিত হইবে,—সেইগুলা স্বদেশীই হউক বা বিদেশীই হউক,—এই দুই লাখ টাকা এক বৎসরের ভিতর পাঁচ কিস্তিতে দিতে পারিবে। কিন্তু প্রথম কিস্তিতে এক লাখ দিতেই হইবে। আজকাল যে নিয়ম আছে তাহাতে প্রথম কিস্তিতে পঁচিশ হাজার টাকা দিলেই চলে।

আগুন, সমুদ্র, মোটরকার অথবা অন্যান্য বিষয়ে যেসকল কোম্পানী বীমা-ব্যবসা চালায়, তাহাদের নিকট হইতে গবর্মেণ্ট প্রত্যেক দফায় আমানত দাবী করিতে অধিকারী। এইখানে জানিয়া রাখা মন্দ নয় যে, বিলাতে যে আইন আছে তাহাতে গবর্মেণ্ট যে-কোনো বীমা কোম্পানীর নিকট হইতে ২০,০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ আড়াই-তিন লাখ টাকা পর্য্যন্ত আমানত দাবী করিতে অধিকারী।

যাহা হউক, আমানতের নিয়মটা আমাদের দরিদ্র দেশে বেশ-কিছু কড়া মনে হইবে। অন্যান্য নিয়মগুলার বিরুদ্ধে বোধ হয় কোনো আপত্তি জুটিবে না। তবে আমানতের নিয়মটা জনগণকে "ভুয়া" কোম্পানীর আওতা হইতে বাঁচাইবার কল স্বরূপ হইবে। আমাদের স্বদেশী কোম্পানীগুলা এই নিয়ম হজম করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারিলে দেশের মঙ্গল।

বিকানীরে সাট্‌লেজ খাল

সাট্‌লেজ দরিয়া হইতে খাল কাটিয়া বিকানীর রাজ্যের মরুভূমিকে উর্ব্বরা করিবার ব্যবস্থা চলিতেছে। সরকারী তহবিল হইতে নাকি কোটি-কোটি টাকা খরচ করা হইবে। তবে এর মধ্যেই গরিব কিষাণদের জমি বিনা পয়সায় বাজেআপ্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে। এইসকল জমি খুঁদিয়াই খাল বসানো হইতেছে। আরও তিন চার বৎসর গেলে খালের বাঁধ সম্পূর্ণ হইবে।

চুঙ্গি-খাজনা

বিকানীর রাজ্যে চুঙ্গি-করের উৎপাত আজও খুব বেশী। মোসাফির রেলষ্টেশনে নামিবামাত্র গাটরি বোচকা খুলিতে বাধ্য হয়। খানাতল্লাশি চলে দস্তরমাফিক। বিছানা-মশারিও বাদ যায় না। পুরাতন মালও দামী হইলেই চুঙ্গি-খাজনার জুলুমে পড়ে। চুঙ্গি-অফিসের দৌরাত্ম্যে পর্য্যটকমাত্রকেই ভুগিতে হয়। কিন্তু বিকানীর সরকারের ইহাই এক বড় আয়ের পথ।

দেশী রাজ্যের রেল-ব্যবস্থা

সকল দেশী রাজ্যই "আধুনিকতায়" সমান উন্নত নয়। রেলের ব্যবস্থায় বিকানীর রাজ্য যারপরনাই পশ্চাৎপদ। ষ্টেশনে জলের আয়োজন নাই। গাড়ীতে গাড়ীতে আলোর অভাব যৎপরোনাস্তি। রেলপথের দুই ধারে তারের বেড়া নাই। গরু-ছাগল লাইনে পড়িয়া মারা যায় অহরহ। অধিকন্তু, মাশুল আদায় করা হয় চড়া হারে।

তৃতীয় শ্রেণীর রেল-মোসাফির

একমাত্র দেশী রাজ্যের রেল-দোষ দেখিতে গেলে সুবিচার করা হইবে না। তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীদের জন্য বৃটিশ ভারতের রেল-ব্যবস্থা ও নেহাৎ আপত্তিজনক। বৎসর পাঁচেক হইল এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালাইবার জন্য অ্যাকওয়ার্থ সাহেবের অধীনে এক কমিটি কায়েম হইয়াছিল। তাহার ফলে জানা যায় যে,—বৃটিশ ভারতের রেলগাড়ীতে অনেক সময় কামরার ভিতর নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার চেয়ে ডবলের বেশী লোককেও গাদাগাদি করিয়া ঠাসিয়া দেওয়া হয়। দূরদেশে যাইবার জন্য মোসাফিররা তৃতীয় শ্রেণীর কামরা একপ্রকার পায়ই না। আর যদিও বা পায়, তাহা একদম নোংড়া। অন্যান্য গাড়ীতেও তৃতীয় শ্রেণীর কামরাগুলা অস্বাস্থ্যকর এবং মানুষের পক্ষে অব্যবহার্য্য। ষ্টেশনে ষ্টেশনে মোসাফির খানার সংখ্যা এবং আয়তন খুবই কম। খাওয়া থাকার বন্দোবস্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। এমন কি, জলের অভাবও ঢের। আর টিকেট খরিদ করিবার জন্যও লোকজনকে যার পর নাই নাকাল হইতে হয়। টিকেট বেচিবার সুবন্দোবস্ত নাই।

রেল-শাসনে অবিচার

বৃটিশ ভারতে রেল-মোসাফিরদের ভিতর শতকরা ৯৭ জন চলে তৃতীয় শ্রেণীতে। অবশিষ্টের ভিতর দেড়া-ভাড়ার কামরায় চলে শতকরা ২·১২, "দুসরা দর্জ্জা"য় চলে ১·৬৯, আর প্রথম শ্রেণীর মোসাফির হইতেছে মাত্র ·১৯। কিন্তু রেলকোম্পানীগুলা গাড়ীতে কামরা ভাগাভাগি করিয়া থাকে কোন্ অনুপাতে?

পয়লা নম্বরের কামরাই থাকে শতকরা ৩·০২। অর্থাৎ মোসাফির যত চলে তার প্রায় ১৫ গুণ বেশী তাহাদের জন্য শোয়া-বসার ঠাঁই। দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাগুলা গুণতিতে শতকরা ৫.৯৫। অর্থাৎ প্যাসেঞ্জারদের যত দরকার তার প্রায় চারগুণ বেশী থাকে আরামের আয়োজন। দেড়া-ভাড়ার আরোহীরাও খানিকটা সুবিধা পায়। কেন না তাহাদের কামরাগুলা গুণতিতে শতকরা

৫·৬৭। অর্থাৎ প্রয়োজনের প্রায় তিন গুণ আয়োজন। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর কামরা থাকে ৮৬·৩%। অর্থাৎ প্রয়োজনের চেয়ে শতকরা ১০ খানা কম।

ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কের গৃহস্থালী

গোটা ভারতে এই ব্যাঙ্কের শাখাসমূহের সংখ্যা আজকাল ১০০। ১৯২১ সনে যখন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয় তখন গবর্মেণ্টের সঙ্গে চুক্তি ছিল যে, পাঁচ বৎসরের ভিতর একশ-টা শাখা কায়েম করিতে হইবে। চুক্তি অনুসারে কাজ করা হইয়াছে।

১৯২৫ সনে এই ব্যাঙ্কের লাভ দাঁড়াইয়াছে ৬০,২২,৯১৯৲ টাকা। শতকরা ১৬৲ হিসাবে অংশীদারদিগকে ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে গিয়াছে ৪৫,০০,০০০৲।

জীবন-বীমায় ভারতবর্ষ

ভারতীয় জীবনবীমা কোম্পানী বিষয়ক আইনের ব্যবস্থাধীনে ৭৫টি কোম্পানী ভারতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহার মধ্যে ২২টি কোম্পানী অ-ভারতীয়। ১৯১২ সনে যখন উক্ত আইন প্রচলিত হয়, তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত ভারতীয় কোম্পানীগুলির জীবনবীমার পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে।

বর্ত্তমানে কোম্পানীগুলার সম্পত্তির কিম্মৎ ১৫ কোটি টাকা।

"ইণ্ডিয়া ষ্টোর" ও রেল-শাসন

লণ্ডনের "ইণ্ডিয়া ষ্টোর"-বিভাগের ১৯২৪-২৫ সনের কর্ম্মসম্বন্ধে এক রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। তাহাতে সেক্রেটারী অব ষ্টেট ও হাই কমিশনের "পরামর্শদাতা এঞ্জিনিয়ারগণ" (কন্‌সাল্‌টিং এঞ্জিনিয়ার্স) কি কি কাজ করেন এবং কিরূপ হারে পারিশ্রমিক পান, সেইসব বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

পরামর্শদাতা এঞ্জিনিয়ারের কাজ করিয়াছেন মেসার্স রেণ্ডেল পামার অ্যাণ্ড ট্রিটন। ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানী সরকারের হাতে আসিয়াছে, তাহাতেও তাঁহারা অনেক কাজ করিয়াছেন। গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়ে এখন সরকারের অধীন। তাহাতে কাজ করিয়াছেন মেসার্স রবার্ট হোয়াইট অ্যাণ্ড পার্টনার্স।

কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট ও ষ্টেট সেক্রেটারী ভালরকমে বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, ঐ দুইটি রেলবিভাগের জন্য একটি মাত্র কোম্পানীকেই পরামর্শদাতারূপে নিয়োগ করা আবশ্যক। তাহা হইলে রেলের স্বার্থ প্রকৃষ্ট ভাবেই বজায় থাকিবে। মেসার্স রবার্ট হোয়াইট অ্যাণ্ড পার্টনার্সকে চুক্তি-শেষের নোটিশ দিয়া মেসার্স রেণ্ডেল পামার অ্যাণ্ড ট্রিটনের সঙ্গেই নূতন চুক্তি হইল। তাহাতে তাঁহাদের কার্য্যবৃদ্ধির অনুপাতে পারিশ্রমিকের হারও বাড়িয়া গেল।

ভারতীয় রেলের "কন্‌সাল্টিং এঞ্জিনিয়ার"

এই সব এঞ্জিনিয়ারগণ রেলের সাজ-সরঞ্জাম কি প্রকারের হইবে, তাহাদের দৈর্ঘ্য বা বিস্তারই বা কতটুকু হইবে, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া দেন এবং সেতু বা অন্য কোনো পূর্ত্ত-কার্য্যবিষয়ক পরিকল্পনাও স্থির করেন। তারপর ইয়োরোপ আমেরিকা ও গ্রেটব্রিটেনে যেসব মাল তাঁহাদের আদেশ ও উপদেশ মত তৈয়ারী হয়, তাহার পর্য্যবেক্ষণও তাঁহারাই করিয়া থাকেন। মাল সরবরাহের জন্য কণ্ট্রাক্টাররা যেসব "টেণ্ডার" দেয়, সেইসব টেণ্ডারও তাঁহাদিগকে বিচার করিয়া দেখিতে হয়। এতদর্থে ঐ কোম্পানী বহুতর এঞ্জিনিয়ার ইনস্পেক্টর, ড্রাফ্‌টস্‌ম্যান ও কেরাণী প্রভৃতি রাখিয়া থাকেন।

ভারতের দুই রেল-বিভাগের সঙ্গে যে নূতন বন্দোবস্ত হইয়াছে, তাহার ফলে মেসার্স রেণ্ডেল পামার অ্যাণ্ড ট্রিটন কোম্পানী বৎসরে ব্যক্তিগত ফী স্বরূপ ৭,০০০ পাউণ্ড করিয়া পাইবেন। সরকারের হাতে আসিবার পূর্ব্বে যে ফী তাঁহাদিগকে দেওয়া হইত, তাহার সমষ্টি হইতে ঐ টাকাটা বৎসরে ৫০০ পাউণ্ড কম। নূতন বন্দোবস্তে খরচ কিছু কম হইবার সম্ভাবনা।

জাহাজের বাস্তুশিল্পী

রেল-সম্বন্ধীয় কাজের জন্য এঞ্জিনিয়ারগণের পারিশ্রমিকের কথা বলা হইল। এখন জাহাজ-সম্বন্ধীয় কাজের জন্য

তাহার আর্কিটেক্ট (নির্ম্মাণ-বিশেষজ্ঞগণ) কি পান, তাহাই বলিতেছি। চুক্তির (কন্ট্রাক্ট্) জন্য যে টাকাটা ধার্য্য হয়, তাহার শতকরা হিসাবের উপর তাঁহাদের পারিশ্রমিক নির্ভর করে। ৫০০ পাউণ্ড অথবা তাহার কম টাকার চুক্তির শতকরা ৫ ভাগ, এবং ৩,০০০ পাউণ্ডের অধিক চুক্তির শতকরা ১ ভাগের মাঝামাঝি হারে ঐরূপ পারিশ্রমিক নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

রেল-জাহাজের বিজ্ঞানে ভারতসন্তানের ঠাঁই

বলা বাহুল্য, "ইণ্ডিয়া ষ্টোর"-বিভাগ তাহার বৈজ্ঞানিক কর্ম্মচারীদিগকে বৃটিশ এঞ্জিনিয়ারিং ষ্ট্যাণ্ডার্ড অ্যাসোসিয়েশনের সকল কমিটিতে প্রতিনিধি পাঠায় এবং বিজ্ঞান ও এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার আধুনিকতম ফলগুলি কাজে লাগাইতে চেষ্টা করে। বৈজ্ঞানিক কর্ম্মচারীদের মধ্যে অনেকেই আপন আপন কর্ম্ম সম্বন্ধে উচ্চ-ডিপ্লোমা-প্রাপ্ত লোক। ভারতসন্তানের পক্ষে এইরূপ বিশেষজ্ঞ এঞ্জিনিয়ার হওয়া সম্ভব কিনা আলোচনা আবশ্যক।

দক্ষিণ ভারতের চন্দন কাঠ

প্রধানতঃ মহীশূর রাজ্যেই এই কারবার চলিয়া থাকে। সেখানে বিস্তৃত চন্দন-বন রহিয়াছে। কৈয়ম্বাটোর ও কুর্গ জেলাতেও এই বনের পরিমাণ মন্দ নয়।

১৯১৬ সন পর্য্যন্ত মহীশূর রাজ্য মাদ্রাজ গবর্মেণ্টের সহিত একযোগে চন্দন কাঠ কাটিয়া বিদেশে পাঠাইত। দেশে আর সেগুলিকে "রিফাইন্" করা হইত না। পূর্ব্বোক্ত তিন জায়গার চন্দন কাঠ—মহীশূরে ২৫০০ টন, কৈয়ম্বাটোর ও কুর্গে ৫০০ টন—একুনে বৎসরে প্রায় ৩,০০০ টন হইত। তাহার মধ্য হইতে ৭৫০ টন স্বস্থানে এবং ২৫০ টন ভারতের অন্যান্য স্থানে ব্যবহৃত হইত। আর অবশিষ্ট ২,০০০ টন যাইত জার্ম্মাণিতে।

মহীশূরে চন্দনতেলের কারখানা

বিগত যুদ্ধের সময় মহীশূরের এই চন্দন কাঠ রপ্তানির ব্যবসা বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ, জার্ম্মাণি তখন পৃথিবীর মধ্যে একঘরে।

চন্দনতেল নির্ম্মাণের জন্য ১৯১৬ সনে মহীশূরে একটি এবং বাঙ্গালোরে আর একটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। ১৯১৭ সন হইতেই কারখানা দুইটির কাজ ভালমত আরম্ভ হয়। এখন প্রতি বৎসর এখানে ২,০০,০০০ পাউণ্ড তেল উৎপন্ন হয়। আরো বেশী হইতে পারে বলিয়া অনেকে আশা করেন। মহীশূর আজ যে অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে সে পৃথিবীর সর্ব্বত্র চন্দন তেল যোগাইতে পারে।

চন্দন তেলের বাণিজ্য-কথা

অষ্ট্রেলিয়া ও সুমাত্রা, জাভা ইত্যাদি দ্বীপে চন্দন তেল তৈয়ারি হয়। কিন্তু মহীশূরের তেল অপেক্ষা সে তেল নিকৃষ্ট। এই মাল প্রচুর পরিমাণে আমেরিকায় যায়। জাভা ও সুমাত্রার "মাকাশার তৈল" মহীশূরের নিকৃষ্ট শ্রেণীর তেলের সমান। তাহাও আমেরিকা এবং ইয়োরোপে যায়। মহীশূরের তেল প্রধানতঃ জাপানে গিয়া থাকে। সেখানে ঔষধের জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়।

গমের চাষে পাঞ্জাবীর দৌলত

গমের ক্ষেত পঞ্জাবে প্রচুর। সমস্ত ফসলের মধ্যে গমই সেদেশে সহজে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। আর বাণিজ্যের দিক্ দিয়া ইহার প্রয়োজন এত বেশী বাড়িয়াছে যে, ইহার তুলনায় অন্যান্য ফসল একেবারে কাণা হইয়া যাইবার উপক্রম। কেবলমাত্র বিক্রয়ের জন্যই নহে, ইহা পাঞ্জাবীদের প্রধান খাদ্য বলিয়াও, ইহার মূল্য এবং প্রভুত্ব এতখানি।

খাল ও গম

গত বিশ বৎসরে পঞ্জাবে খাল-কাটার কাজ বাড়িয়াছে। গমের ক্ষেতও তাই ঢের বাড়িয়া গিয়াছে। ফলে, ব্যবসায়ের বিস্তৃতি, ধনবৃদ্ধি এবং উন্নত ধরণের জীবন-যাপন দেখা যাইতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যায়, ১৮৭০ সনে কেবলমাত্র চারি লক্ষ টাকার গম বিদেশে রপ্তানি হয়। কিন্তু বিগত ৯ বৎসরে পঞ্জাব বিদেশের কাছে ৮০ কোটি টাকার গম বিক্রয় করিয়াছে।

গমের বিদেশী বাজার

শ্রীযুক্ত ক্যালভার্ট বলেন,—"এই বিপুল টাকাটা আসিয়াছে—খানিকটা শিল্পজাত দ্রব্যে, খানিকটা সোনা, রূপা প্রভৃতি মুদ্রায় এবং খানিকটা অন্যান্য বাণিজ্য-দ্রব্যে।" আমদানি ও রপ্তানি-বাণিজ্যের ব্যবসাদারেরা ইহাতে যে লাভটা করিতে পারিয়াছে, তাহা অন্যরূপে করিতে পারিত না। মোট কথা—পঞ্জাবের বর্ত্তমান আর্থিক উন্নতি গম-চাষ ও গম-ব্যবসায়ের বিস্তৃতিরই ফল।

ভারতীয় বনবিভাগের আয়

বৃটিশ ভারতের বনবিভাগের পঞ্চম বার্ষিক রিভিউতে ১৯২৪সনের বিবরণে জানা যায় যে, পাঁচ বৎসরে ২৪,৭৬,৮৪৯ টন কাঠ পাওয়া গিয়াছে এবং পূর্ব্বাপেক্ষা শতকরা ৪৪৲ হিসাবে আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯২১-২২ সনে ৬ লক্ষ টন সেগুন কাঠ পাওয়া গিয়াছিল। সেগুন কাঠের আয়ে বর্ম্মার রাজস্ব ঐ বৎসর ২,২১,১৬,৭৮৬ টাকা উঠিয়াছিল।

ঐ পঞ্চম বার্ষিক রিভিউতে জানা গিয়াছে যে, বৃটিশ ভারতের জঙ্গলের পরিসর ২,২৮,৮৫০ বর্গ মাইল।

শহর-ঘেঁসা পল্লী

শহর হইতে কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত গ্রামগুলিকেই আমরা পল্লীগ্রাম বলিয়া থাকি। এই পল্লীগ্রামগুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক শ্রেণীর পল্লীগ্রাম শহরের সহিত সংযুক্ত। শহরের আবহাওয়া, সুবিধা-অসুবিধা তথায় বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। ঐ গ্রামগুলি শহরের অভাব মোচন করিয়া থাকে, পল্লীজাত পণ্য শহরবাসীদিগকে যোগায়। এইসকল গ্রামে শহরের এবং মফঃস্বলের অসুবিধা বিশেষ ভাবে লক্ষিত হইয়া থাকে। শহরের টানে এইসকল গ্রামে জিনিষপত্র কতকটা দুর্ম্মূল্য হইয়া থাকে। মোটের উপর এরূপ পল্লীগ্রামের সংখ্যা আসল পল্লীগ্রামের তুলনায় অতি অল্প। সমগ্র ভারতে ৬ লক্ষ ৮৫ হাজার ৬ শত ৬টি পল্লীগ্রাম আছে; তন্মধ্যে এইরূপ পল্লীগ্রামের সংখ্যা ২০ কি ২৫ হাজারের অধিক হইবে না।

ভারতের শহর ও পল্লী

সমগ্র ভারতে শহরের সংখ্যা ২ হাজার ৩ শত ১৬টি। সকল শহর সমান নহে। অনেক শহর প্রায় পল্লীগ্রামের বা গণ্ডগ্রামের মত। সমগ্র ভারতের ভূমি-পরিমাণ ১৮ লক্ষ ৫ হাজার ৩ শত বর্গ মাইল এবং লোক-সংখ্যা ৩১ কোটি ৮৯ লক্ষ ৪২ হাজার ৪ শত ৮০ জন।

এই জনসমষ্টির মধ্যে শতকরা ১০ জন অর্থাৎ প্রায় ৩ কোটি ২৪ লক্ষ লোক শহরে বাস করে। অবশিষ্ট ২৮ কোটি সাড়ে ৬৪ লক্ষ লোক থাকে পল্লীগ্রামে।

ভারতবাসীর আয়ের পথ

সমগ্র ভারতের অধিবাসীদিগের মধ্যে ২৩ কোটি ৬ লক্ষ ৫২ হাজার ২ শত ৫০ জন কৃষিজীবী ও কৃষির উপর নির্ভর করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। আর ৩ কোটি ৩১ লক্ষ ৬৭ হাজার লোক শিল্পের সেবা করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই কুটির-শিল্পের সেবা করে। ইহাদের আনুমানিক হিসাব মোট অধিবাসীর মধ্যে শতকরা প্রায় সাড়ে দশ জন। ইহা ভিন্ন ১ কোটি ৮১ লক্ষ ১৪ হাজার ৬ শত ২২ জন অর্থাৎ সমগ্র ভারতের মোট অধিবাসি-সংখ্যার মধ্যে শতকরা পৌনে ৬ জনের কম লোক ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি করিয়া থাকে। সরকারী চাকুরী, পুলিস ও সেনাবিভাগে ৪৮ লক্ষ ২৫ হাজার ৪ শত ৭৯ জন। অর্থাৎ সমগ্র লোক-সংখ্যার মধ্যে শতকরা দেড় জনেরও কম লোক এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকে। ৫০ লক্ষ ২০ হাজার ৫ শত ৭১ জন উচ্চ অঙ্গের বৃত্তিসেবা এবং পৌরহিত্য প্রভৃতি কার্য্য করে। তন্মধ্যে ব্যবহারাজীবের সংখ্যা ৩ লক্ষ সাড়ে ৩৬ হাজার।

যুক্তপ্রদেশের জমিজমা

বর্ত্তমানে যে ব্যবস্থা আছে তাহা প্রজা ও জমিদার উভয়ের দিক্ হইতেই আপত্তিজনক। বিধিবিহিতভাবে উৎখাত করা এই ব্যবস্থায় বহু ব্যয়সাপেক্ষ সন্দেহ নাই, কিন্তু জাল-জুয়াচুরি চলে প্রচুর। দখলীস্বত্ব-বিহীন প্রজাকে যখন-তখন তুলিয়া দেওয়া যাইতে পারে, সুতরাং অত্যধিক

করের হাত হইতে তাহার রক্ষা পাইবার কোনো উপায় নাই। প্রজাদের পক্ষ হইতে এই আপত্তি। অপর পক্ষে দখলীস্বত্ব-বিশিষ্ট জমির খাজনা পার্শ্ববর্ত্তী জমির সহিত তুলনা করিয়া অথবা মূল্যবৃদ্ধির দরুণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে মাত্র। এই অবস্থার ফলে খাজনা-বৃদ্ধি অসম্ভব হইয়া পড়ে এবং জমিদারদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়।

ভারতে সোনারূপার আমদানি

গত বৎসর ভারতবাসী বিদেশে মাল বেচিয়াছে ৩০৫,০০০,০০০ পাউণ্ড। এই টাকা সবই সিক্কা হিসাবে ভারতে আসে নাই। দাম স্বরূপ ভারতবাসী বিদেশ হইতে পাইয়াছে মাত্র ১৬৯,০০০,০০০ পাউণ্ডের মাল। অর্থাৎ বিদেশের নিকট ভারতবাসীর বাকী-পাওনা ছিল ১৩৬,০০০,০০০ পাউণ্ড। এই টাকার কিয়দংশ উশুল করিবার জন্য ভারতবর্ষ আমদানি করিয়াছে ৪৬,০০০,০০০ পাউণ্ডের সোনা আর ১৫,০০০,০০০ পাউণ্ডের রূপা। অবশিষ্ট পাওনা ভারতবর্ষের বিলাতী তহবিলে মজুত আছে।

১৯১ ক্রোর নোট

১৯২৫ সনে ভারতবর্ষে ১৮০ কোটি টাকার নোট চলিতেছিল। ১৯২৬ সনের জানুয়ারি মাসে চল্‌তি নোটের পরিমাণ ১৯১ ক্রোর। অর্থাৎ বাজারে টাকা আজকাল প্রচুর।

ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্ক শতকরা ৬৲ টাকার বেশী সুদ দিয়া টাকা রাখিতে রাজি নয়। কিন্তু ১৯২৫ সনে ৭৲ ছিল হার। ১৯২৪ সনে এমন কি শতকরা ৯৲ সুদ দিয়াও এই ব্যাঙ্ক জনগণের নিকট হইতে টাকা আমানত রাখিত।

ভারতে ইতালীর পশার

আমাদের বাজারে অনেক বিদেশীয়ই এ পর্য্যন্ত স্থান পাইয়াছেন। কিন্তু ইতালীকে আমরা বড় বেশী চিনিতাম না। সম্প্রতি আমরা ইতালীকেও আমাদের বাজারে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছি।

১৯২৫ সনের এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এই ছয় মাসের হিসাব ১৯২৪ সনের ঐ ছয় মাসের হিসাবের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, ইতালীর আমদানি অনেক দিকেই বাড়িয়াছে। নিম্নের তালিকা হইতেই বিষয়টা পরিস্ফুট হইবে।

প্রকার	১৯২৪	১৯২৫
রঙীন বা নকসাকাটা কাপড়	৩,৯২৫,৭১২ গজ	৪,৯০১,৬১৬ গজ
পশমী কাপড়	৯১০,৫৮৪ গজ	১,৫৭৮,৮৩৮ গজ
কৃত্রিম রেশমী সূতা	১১৪,৪৬১ পাউণ্ড	৪৮২,২৬৯ পাউণ্ড

বিদেশীতে বিদেশীতে লড়াই

রঙীন ও নকসাকাটা কাপড়ের আমদানিতে জাপান এবং ওলন্দাজ দেশ বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। কিন্তু গ্রেট-ব্রিটেন তাহা দেখাইতে পারে নাই। ১৯২৪ সনে বিলাতী মাল ছিল ১৬৪,৫২৮,৫৪৯ গজ, কিন্তু ১৯২৬ সনে তাহা নামিয়াছে ১৩৬,৬৪৬,১৪৫ গজে। পশমী কাপড়েও বিলাত হইতে আমদানিতে অবনতি লক্ষ্য করা যায়। ১৯২৪ সন অপেক্ষা ১৯২৫ সনের আমদানির পরিমাণ অনেকটা কম। এ দ্রব্য শুধু ইতালী নহে, বেলজিয়ম, ফ্রান্স এবং জার্ম্মাণিও খুব পাঠাইয়াছে। ১৯২৪ সনে বিলাত হইতে কৃত্রিম রেশম ও তুলার কাপড় আসিয়াছিল ৩,৯৯৭,৫৯৯ গজ কিন্তু ১৯২৫ সনে আসিয়াছে ২,৭৩৮৭২৫ গজ। এ জিনিষটায় ইতালীর অংশও হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৯২৪ সনে তথা হইতে আসিয়াছে বিশ লক্ষ টাকার মাল কিন্তু ১৯২৫ সনে আসিয়াছে মাত্র ১৪ লক্ষ টাকার। সুইট্‌সাল্যাণ্ড এবং জার্ম্মাণিরও এক্ষেত্রে অবনতি ঘটিয়াছে। যাহা হউক ফলে বুঝা যাইতেছে ইতালীও অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতের বাজারে টক্কর দিতে আরম্ভ করিল।

ফ্রান্সে সন্তান-বৃদ্ধির উৎসাহ

ফরাসীদেশের "মিশলাঁ" কোম্পানীর যন্ত্রপাতি বিদেশেও পরিচিত। ক্ল্যার্মঁ-ফেঁরাঁ জনপদে এই কোম্পানীর প্রধান কারখানাগুলা অবস্থিত।

মজুরসমাজে সন্তানের সংখ্যা বাড়াইবার জন্য এই কোম্পানী হইতে সন্তান-"ভাতা" দেওয়া হয়। একটি সন্তানের জন্য মজুরেরা পায় বৎসরে ৯০০ফ্রাঁ (প্রায় ১১০৲); দুইটি সন্তানের জন্য ১৮০০ ফ্রাঁ; তিনটির জন্য ৩,৬০০ ফ্রাঁ; চারটির জন্য ৪,৮০০ ফ্রাঁ; আটটির জন্য ৯,৬০০ ফ্রাঁ। তৃতীয় সন্তানের পর হইতে প্রত্যেক সন্তানের জন্য মজুরেরা মিশলাঁ কোম্পানীর নিকট হইতে অতিরিক্ত ১০০ফ্রাঁ (প্রায় ১২৲) পাইয়া থাকে। এই অতিরিক্ত পাওনাকে "আলোকাসিঅঁ ফামিলিয়াল" বলে।

পারিবারিক "ভাতা" ও "পেন্‌শ্যন"

কিন্তু একমাত্র "ভাতা"র উপর নির্ভর করা চলিতে পারে না। মজুরেরা যখন মারা যাইবে তখন তাহাদের সন্তানদের অবস্থা কি হইবে? কোম্পানী তাহার ব্যবস্থাও করিয়া রাখিয়াছে। ১৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রত্যেক বালক-বালিকা পূর্ব্বোক্ত হারে "পেন্‌শ্যন" পাইতে থাকিবে।

এই ধরণের "আলোকাসিঅঁ ফামিলিয়াল"-নীতির প্রভাবে মিশলাঁ কোম্পানীর মজুরেরা ফ্রান্সের লোকসংখ্যা বাড়াইতে উৎসাহী হইয়াছে। প্রতি হাজারে ইহাদের সন্তান জন্মে আজকাল ২১·২০ হইতে ৫৮·৫০ পর্য্যন্ত। কিন্তু ফ্রান্সের যে-যে অঞ্চলে "ভাতা" এবং "পেন্‌শ্যনের" ব্যবস্থা নাই, সেইসকল অঞ্চলে জন্মের হার হাজারকরা মাত্র ৭·৩৪ হইতে ১৪·৮৬ পর্য্যন্ত।

জর্জ্জিয়ার মাঙ্গানীজ

ভারতের মধ্যপ্রদেশ ও মহীশূরের মতন রুশিয়ার জর্জ্জিয়া প্রদেশ মাঙ্গানীজ খনির জন্য প্রসিদ্ধ। ইস্পাতের কারবারে মাঙ্গানীজের ডাক পড়ে খুব জবর।

বিগত কয়েক বৎসর জর্জ্জিয়া হইতে ১০০,০০০টন মাঙ্গানীজ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে চালান হইয়াছে। ক্রেতা ছিল "বেথেল্‌হেম" লোহার কারখানা এবং "ইউনাইটেড ষ্টেটস্ ষ্টিল কর্পোরেশ্যন"। এই দুই কোম্পানী মাসে ৬০,০০০টন করিয়া জর্জ্জিয়া হইতে আমদানি করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে।

মাঙ্গানীজের বাজারে মার্কিণ, ইংরেজ ও জার্ম্মাণ

জর্জ্জিয়ার মাঙ্গানীজ ব্যবসায়ে আমেরিকার "হ্যারিম্যান" কোম্পানী শতকরা ৫৫ অংশ দখল করিয়া বসিয়া আছে। "বাল্‌ডুইন্‌স্" এবং অন্যান্য ইংরেজ কোম্পানীর হাতে আছে শতকরা ২০ অংশ। অবশিষ্ট ২৫ অংশ আছে জার্ম্মাণ এবং অন্যান্য ইয়োরোপীয়ানদের তাঁবে।

জর্জ্জিয়া ভারতবর্ষের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। কাজেই জর্জ্জিয়ার সংবাদ ভারতে অজানা থাকিলে চলিবে না। মাঙ্গানীজ লইয়া ভারতবাসী বিলাতে, জার্ম্মাণিতে এবং আমেরিকায় বড় কারবার চালাইতে পারে। কিন্তু মূলধনের অভাবে রুশিয়ার মতন ভারতেও বিদেশীদের একতিয়ার কায়েম হওয়া স্বাভাবিক।

ফরাসী-জার্ম্মাণ পটাশ সমঝৌতা

আলসাস জেলা আগে ছিল জার্ম্মাণির অন্তর্গত। ১৯১৮ সন হইতে এই জনপদে ফ্রান্সের এক্তিয়ার কায়েম হইয়াছে। আলসাস পটাশের খনির জন্য জগৎ-প্রসিদ্ধ। দুনিয়ার চাষ-আবাদে পটাশের চাহিদা প্রবল।

জার্ম্মাণরা আলসাসের পটাশ-ভূমি হইতে মাল বেশী তুলিত না। তাহাদের অন্যান্য জনপদেও পটাশ পাওয়া যাইত। কিন্তু ফরাসীরা আলসাস দখল করিবার মুহূর্ত্ত হইতেই পটাশ তুলিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছে। আজ ফরাসীরা পটাশে দুনিয়ার রাজা। তবে জার্ম্মাণরা এখনো এই মালে নেহাৎ নগণ্য নয়। বস্তুতঃ, জার্ম্মাণি এবং ফ্রান্স এই ব্যবসা লইয়া সম্প্রতি একটা সমঝৌতা কায়েম করিয়াছে।

আলসাসের পটাশ

১৯১৯ সনের জানুয়ারিতে, ফরাসী এক্তিয়ারের প্রথম অবস্থায়, রোজ মাত্র ১০০০ টন পটাশ উঠিত। কিন্তু পর বৎসর হইতে ২৯৪০ টন করিয়া রোজ উঠিতেছে।

জার্ম্মাণ আমলের চরম পরিমাণ ছিল বার্ষিক ৩৫০,০০০ টন। সে ১৯১৩ সনের কথা। কিন্তু ফরাসী আমলের প্রথম বৎসরই (১৯১৯ সনে) উৎপন্ন হয় ৫৯২,০০০টন। বৎসর বৎসর পরিমাণ বাড়িয়াই চলিয়াছে। ১৯২৪ সনে ১,৬৬৪, ৬০৬ টন।

১৯২৫ সনে পটাশের উৎপত্তি চরমে গিয়া ঠেকিয়াছে—১,৯২৫,৮৩৮ টন। অর্থাৎ ১৯১৩ সনের তুলনায় আলসাস আজ ৫½ গুণ মাল বেশী দিতেছে।

ফরাসী চাষীরা মাত্র ৩৫০,০০০টন কাজে লাগাইতে পারে। পটাশের ব্যবহার কিষাণ-মহলে বাড়াইবার আন্দোলন চলিতেছে। ফরাসী উপনিবেশেও এই বস্তু প্রচারের ব্যবস্থা হইতেছে।

মেসোপোটেমিয়ার আর্থিক অবস্থা

ভারতের মতন ইরাকে (মেসোপোটেমিয়ায়) ও চাষীরা চাতকের মতন বৃষ্টির দিকে তাকাইয়া থাকে। গত বৎসর জলাভাব ঘটিয়াছিল। ফসল ভাল উঠে নাই। কাজেই নরনারীর আমদানি-রপ্তানির ক্ষমতায় কিছু ভাঁটা দেখা দেয়।

মেসোপোটেমিয়ার আর একটা বড় আর্থিক তথ্য পারস্যের সঙ্গে যোগাযোগ। পারস্যের পথ হিসাবে ইরাক জনপদ আমদানি-রপ্তানির ব্যবসায়ে ইংরেজের নিকট খুব প্রিয়। কিন্তু এ-যাবৎ পারস্যের গবর্মেণ্ট মেসোপোটেমিয়ার মাল চলাচলের বিপক্ষে নানাপ্রকার কানুন চালাইয়া আসিতেছেন। এই কারণে গত বৎসর ল্যাঙ্কাশিয়ারের কাপড়চোপড় ইরাকের বাজারে বেশী আমদানি হইতে পারে নাই। বিদেশী চিনির কাটতি ও কমিয়া গিয়াছে।

রুশিয়া, পারশ্য ও ইরাক

অপর দিকে রুশিয়া পারস্যের বাজারে মাল ফেলিবার সুযোগ পাইয়া থাকে। ১৯২০ সনে পারস্যের সঙ্গে বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের যেসকল শুল্ক-সমঝৌতা কায়েম হইয়াছে সেগুলা বিদেশের পক্ষে সুবিধাজনক নয়। কিন্তু এই সমঝৌতার সম্মিলনে রুশিয়াকে ডাকা হয় নাই। রুশিয়ার সঙ্গে পারস্যের কারবার আজও ১৯০২ সনের কানুন অনুসারেই চলিতেছে। সেই কানুনটা ১৯২০ সনের কানুনের চেয়ে বিদেশীদের পক্ষে বেশী সুবিধাজনক।

মোটরকারের মার্কিণ সংখ্যা

১৯২৪ সনে আমেরিকার কারখানাগুলায় ৩৬,৪০,১০৮ মোটর গাড়ী তৈয়ারী হইয়াছিল। কিন্তু গত বৎসর প্রায় ৭ লাখ গাড়ী বেশী তৈয়ারী হইয়াছে। প্রতিমাসে প্রস্তুত হইয়াছে গড়পড়তা প্রায় ৩৭৬,২৫১ খানা করিয়া।

আফগান বাণিজ্যে রুশিয়া

বোলশেভিক রুশিয়া আফগানিস্থানে আর্থিক এবং বাণিজ্যবিষয়ক সম্বন্ধ স্থাপন করিতেছে এবং স্থানীয় লোকদিগের মধ্যে ব্যবসার সুবন্দোবস্ত ও উৎসাহ-প্রদান করিয়া তাহাদের সদিচ্ছা আকর্ষণ করিতেছে।

বিলাতী সাংবাদিকদের বিশ্বাস যে, সোভিয়েট রাষ্ট্র বর্ত্তমানে যে ভাবে কার্য্য চালাইতেছে, তাহাতে যদি কোনো

বিশেষ বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত না হয়, তবে হয়তো একদিন শুনা যাইবে যে, হিরাট প্রদেশে স্বাধীন সোভিয়েট গবর্মেণ্ট স্থাপিত হইয়াছে এবং পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য প্রাচ্য রাজ্যসমূহ তাহার নীতি অনুসরণ করিতেছে। রুশিয়ার সুদূর প্রান্ত হইতে এ বিষয়ে নিশ্চয়ই কোনো না কোনো প্রকার সাহায্য আসিবে এবং আফগান সরকার হয়তো একদিন ঘুম হইতে জাগিয়া দেখিবে যে, তাহাদের উত্তর সীমান্ত হস্তচ্যুত হইয়াছে এবং সোভিয়েট সরকার তাহাদের বুকের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

রুশিয়া আফগানিস্থানের উপর তাহার বাণিজ্য-প্রভুত্ব খাটাইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে এবং স্পষ্টভাবেই বৃটিশের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দিতা করিতেছে। ইংরেজের দুশ্চিন্তা উপস্থিত।

ইতালিয়ান মালের উপর মার্কিণ মাশুল

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সংরক্ষণ-নীতির প্রচলন বাড়িয়া যাওয়ায় ইতালির শিল্পকারদের কি ক্ষতি হইতেছে, তৎসম্বন্ধে 'আজান্‌ৎসিয়া দি রোমা' নামক ইতালির একখানি সংবাদ-পত্রে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইতালি হইতে—বিশেষতঃ, টস্কানি প্রদেশ হইতে—খড়ের প্রস্তুত শিল্পদ্রব্যগুলি প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র এইসব দ্রব্যের উপর শতকরা ৮০ ভাগ মূল্যানুরূপ মাশুল (অ্যাডভ্যালোরেম ডিউটি) বসাইয়াছেন। পূর্ব্বে ছিল শতকরা ৬০ ভাগ। কাজেই এই ব্যবসায়ের বিশেষ ক্ষতি।

যুক্তরাষ্ট্রে ইতালিয়ান মাক্‌কারোণি নিষিদ্ধ

ডিমের দ্বারা রঞ্জিত 'ম্যাক্‌কারোণি' এবং তৎসদৃশ খাদ্যদ্রব্য আমেরিকায় আর আসিতে দেওয়া হইবে না বলিয়া আর একটি নিয়ম জারীর কথা আছে। স্বাস্থ্য-রক্ষার দিক্ দিয়াই নাকি এইরূপ ব্যবস্থার অবতারণা। কিন্তু সে কথা কেহ বিশ্বাস করে না। আমেরিকায় যাহারা ঐ সব জিনিষ তৈয়ারী করে, তাহাদিগের সুবিধার জন্যই ঐ ব্যবস্থা।

ইতালির অর্থাভাব

এক দিকে ইতালির রপ্তানি-ব্যবসা বিড়ম্বিত, অপর দিকে কঠোর ইমিগ্রেশন (বাসার্থ দেশান্তরে গমন) আইন! উভয় কারণে ইতালি তাহার দেয় বাকী টাকা আমেরিকাকে শোধ দিতে অসমর্থ হইয়া পড়িতেছে। এদিকে আবার আমেরিকার মাল প্রচুর পরিমাণে ইতালিতে আসিতেছে, অথচ ইতালির মাল আমেরিকায় যাইতে পারিতেছে কম। তার উপর ওয়াশিংটনে যুদ্ধ-ঋণ সম্বন্ধে যে বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহার ফলে ইতালির ঘাড়ে চাপিয়াছে নূতন রকমের বাধাতা। তাই এখনই ইতালির টাকার পরিমাণে খাঁকৃতি দেখা দিয়াছে।

আমেরিকার নিকট ইতালির আবেদন

যদি ইতালির মাল আমেরিকায় যাইতে না দেওয়া হয়, তবে, তাহার আর্থিক অবস্থা যে বিষম শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইবে, সে কথাটা যুক্ত-রাষ্ট্রের বিজ্ঞদিগকে বুঝাইবার জন্য ইতালিয়ানরা আন্দোলন চালাইতেছে।

খড়ের দ্বারা যে সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহার মাশুল-বৃদ্ধির সম্বন্ধে এই শিল্পের কারখানাগুলি, বিশেষতঃ, ফ্লোরেন্স প্রদেশের কারখানাগুলি ইতালির যুক্তরাষ্ট্রস্থিত প্রতিনিধি-গণের নিকট হইতে এই সংবাদ পাইয়াছেন যে, আমেরিকার গবর্মেণ্ট যাহাতে আইন প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে কিছু সময় দেন, তাহার জন্য তাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন।

জার্ম্মাণদের ইস্পাত-সঙ্ঘ

জার্ম্মাণ "ষ্টীল ট্রাষ্ট" (ইস্পাত-সঙ্ঘ) সংগঠিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে একটা মীমাংসায় আসিবার জন্য এতাবৎকাল যে কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, তাহা এত দিনে পাকা হইয়া গেল। নিম্নলিখিত কোম্পানীগুলি এই বিপুল সঙ্ঘের অন্তর্গত :—

১। গেল্‌জেন্‌কির্খ্‌নার ব্যর্গ্‌-হ্বের্কে
২। ডায়েচ-লুক্‌সেম্‌বুর্গিশে ব্যর্গ্‌-হ্বের্কে
৩ ফোনিক্‌স্‌
৪। রাইণিশে ষ্টালহ্বের্কে
৫। টিস্‌সেন কন্‌ৎস্যর্ণ্‌

প্রথমতঃ, ক্রুপ কোম্পানী ও অন্যান্য বহু কারখানা এই ট্রাষ্টের বাহিরে থাকিতে চাহেন বলিয়া এই ট্রাষ্ট-গঠনে

গোড়ায় অনেক বাধা দেখা গিয়াছিল। এমন কি, অনেক দিন পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চালান কঠিন হয় এবং "ট্রাষ্ট" যে গড়িয়া উঠিবে সে বিষয়ে আর আশাই ছিল না।

ফ্রান্স বনাম ইংল্যণ্ড বনাম জার্ম্মাণি

যাহা হউক, সম্প্রতি বোধ হয় আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক ঘটনাগুলির জন্যই ট্রাষ্ট, গঠনে জার্ম্মাণরা একমত হইয়াছে। একদিকে ফ্রাঙ্কের মূল্য কমিয়া যাওয়ায় লৌহ ও ইস্পাতের বাজারে ফরাসীরা জার্ম্মাণ ব্যবসায়ীদিগকে হারাইতে পারিতেছে। অধিকন্তু, ইংরেজদের কয়লার কারবারে বৃটিশ গবর্মেণ্ট সরকারী সাহায্য করিতেছেন প্রচুর। তাহার ফলেও বিদেশী বাজারে জার্ম্মাণ লোহার কাটতি কমিতেছে। এই উভয় কারণে জার্ম্মাণ ইস্পাতওয়ালারা ঐক্যবদ্ধ হইতে বাধ্য হইয়াছে।

এই ট্রাষ্টের ভিতরকার গঠন ও প্রকৃতি কিরূপ তাহা আমরা এখনও অবগত নহি। তবে জার্ম্মাণির সমগ্র ইস্পাত-কারখানার অর্দ্ধেকাংশ ইহার মধ্যে আছে এবং রুর জেলায় উৎপন্ন ইস্পাতের সিকি অংশ ইহার অন্তর্গত। ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে—এই ট্রাষ্ট কত বিস্তৃত এবং ইহার শক্তি কতখানি।

দুনিয়ার মাপে ভারতীয় কৃষি

ভারতের জমিতে সচরাচর বিঘাপ্রতি ৪০ হইতে ৫০ মণ পর্য্যন্ত গোল আলু জন্মে। কুত্রাপি বিঘাপ্রতি ৮০ মণের অধিক হয় না। আর বিলাতের যে-কোনো জমিতে বিঘাপ্রতি অন্ততঃ ১ শত ৪০ মণ ঐ আলু জন্মে। অর্থাৎ তথায় বিঘাপ্রতি ৩ গুণের অধিক ফসল জন্মে। ইহাতে জাতীয় আয় কত বৃদ্ধি পায় তাহাই সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন। ভারতে এক বিঘা জমিতে ৪ বুশেল বা ১ মণ গম জন্মে। পক্ষান্তরে কানাডায় ৯ বুশেল, বিলাতে ১০॥০ বুশেল, জার্ম্মাণিতেও ঐরূপ, বেলজিয়ামে ১২॥০ বুশেল, এবং ডেনমার্কে ১২॥০ বুশেল গম উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং ভারতের জমিতে গড়ে যে পরিমাণে গম জন্মে বিলাতের ও ইয়োরোপের অন্যান্য স্থানের জমিতে তাহার ৩ গুণ কি সাড়ে তিন গুণ গম জন্মে। অতএব কৃষির উন্নতি হইলে যে ভারতের কতকটা উন্নতি হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

ইস্পাতের মার্কিণ ওস্তাদ ব্র্যাসার্ট

"রাইণ-এল্‌বে-উনিয়োন" নামক জার্ম্মাণির বিপুল ইস্পাত-সঙ্ঘকে আমেরিকা হইতে ২ কোটি ৫০ লাখ ডলার কর্জ্জ দেওয়া হইয়াছে। প্যারিসের "জুর্ণে আঁাদুস্ত্রিয়েল" দৈনিকে বুঝিতেছি যে, এই উপলক্ষ্যে ব্র্যাসার্ট সাহেবকে আমেরিকা হইতে পাঠান হইয়াছিল—জার্ম্মাণ সঙ্ঘের আর্থিক অবস্থা কষিয়া দেখিবার জন্য।

জার্ম্মাণ ইস্পাত-সঙ্ঘের সম্পত্তি

ব্র্যাসার্ট বলিতেছেন যে, সঙ্ঘের নিকট মজুত আছে পঞ্চাশ হাজার কোটি টন কয়লা। যে-যে খনিতে কাজ চলিতেছে সেইসকল স্থানে এখনি বৎসরে ২ কোটি টন উঠিতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমানে ততটা উঠান হয় না। ইচ্ছা করিলেই মালের পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব। কয়লা ব্যবহার করিবার জন্য খরচ ও বেশী পড়িবার সম্ভাবনা নাই। কেন না, কারখানা নিকটেই। আর কারখানাসমূহে ধাতু আসে জলপথে, অর্থাৎ অল্প খরচে, সুইডেন এবং নরওয়ে হইতে।

কোক কয়লা প্রস্তুত করিবার জন্য সঙ্ঘের অধীনে উনন আছে ২৬টা। তাহাতে মাল উৎপন্ন হয় বৎসরে ৫,৬৫০,০০০ টন। লোহা লক্কড়ের উননের সংখ্যা ২৫। মাল বাহির হয় ৩,১৪৭,০০০ টন। ইস্পাতের কারখানা ১১টা। তাহাতে মাল পাওয়া যায় ২,২২৫,০০০ টন। তাহা ছাড়া, লোহা ও ইস্পাতের যন্ত্রপাতি তৈয়ারী করিবার কারখানায় মাল বাহির হয় ১,৪৪১,৬৫০ টন।

বিগত কয়েক বৎসরের ভিতর কারখানাগুলা মাঝে মাঝে পুনর্গঠিত করা হইয়াছে। চরম "আধুনিকতা" বিরাজ করিতেছে সর্ব্বত্র। যুদ্ধের পর হইতে এইগুলার সংখ্যাও বাড়িয়া গিয়াছে। লোহালক্কড়-ঘটিত প্রায় সকল প্রকার দ্রব্যই সঙ্ঘের তৈয়ারী মালের অন্তর্গত।

রাইন-এলবে-উনিয়োন = ৬২ টাটা

ব্রাসার্টের হিসাবে "রাইন-এল্‌বে-উনিয়োন্" সঙ্ঘের লোহা এবং ইস্পাতের কারখানাগুলার কিম্মৎ ৭৫, ৫৮৩,০০০ ডলার। কয়লার কারখানাগুলার কিম্মৎ ৫৭, ৮৭১,০০০ ডলার। মজুত কয়লার কিম্মৎ হইবে ৩১, ৪৬০,০০০ ডলার। তাহা ছাড়া, বিভিন্ন জমিজমার এবং ঘর-বাড়ীর কিম্মৎ ধরা যাইতে পারে ৫১,১৪০,৫০০ ডলার। মোট ২১৬,০৫৪,৫০০ ডলার, অর্থাৎ প্রায় ৬৫ ক্রোর টাকা। (আমাদের টাটা কোম্পানীর লোহার কারবারের কিম্মৎ ১০ ক্রোর)।

ব্রাসার্টের অনুসন্ধানের আসল উদ্দেশ্য ছিল—জার্ম্মাণ সঙ্ঘ ২২ কোটি ডলারের সুদ (প্রায় ২০ লাখ ডলার) বৎসর বৎসর শোধ দিতে সমর্থ হইবে কি না তাহা খতাইয়া দেখা। তিনি বুঝিয়াছেন যে, প্রতি বৎসর লাভই উঠে সকল প্রকার খরচা বাদে, ৮,৪০০,০০০ ডলার অর্থাৎ সুদের চারগুণেরও বেশী। কাজেই আসল মারা যাইবার আশঙ্কা কম।

ভারতে ফরাসী সওদাগর

ভারতবর্ষের ফরাসী সওদাগরেরা ভারতীয় আয়-করের অধীনে আসিয়া পড়িয়াছে। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ফরাসী সমাজে প্রতিবাদ চলিতেছে। উত্তর ফ্রান্সের "গ্রুপমাঁ একোনমিক রিজানাল" (জনপদগত আর্থিক সঙ্ঘ) এবং "কোমিতে রিজানাল দে কঁসেইয়ে দু কমার্স একস্‌তেরিয়র" (বহির্ব্বাণিজ্যের জনপদগত উপদেষ্টা-সমিতি) নামক দুই প্রতিষ্ঠান লিল্ নগরে সভা ডাকিয়া নিজ নিজ মত জানাইয়া দিয়াছে। উভয়ের মত-ই একরূপ। ফরাসী পররাষ্ট্র-সচিবকে অনুরোধ করা হইয়াছে যে, তিনি বৃটিশভারতের রাজস্ব-বিভাগের সঙ্গে বচসা করিয়া ইন্‌কাম-ট্যাক্‌সের আওতা হইতে ভারতবাসী ফরাসী সওদাগরদিগকে রেহাই দিবার ব্যবস্থা করুন। কারণ, এইসকল ব্যবসায়ী ফ্রান্সেই নানা প্রকার কর দিতে বাধ্য।

বার্লিনে বাড়ী-ভাড়া

বার্লিনের কোনো দৈনিক কাগজে "বাড়ীভাড়া" স্তম্ভে নিম্নের বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে:—"চারখানা কামরা, চরম আরামের ব্যবস্থা; অতি মনোরম ঠাঁই, ইমারত নবীনতম প্রণালীতে গঠিত; হোহেনৎসোল্লার্ণ ডাম নামক সড়কের আন্ত:ভৌম রেলষ্টেশনের নিকট; কামরা চারটাই বড় বড়; জিনিষপত্রের জন্য কতকগুলা গুদাম-ঘর; ছাতের উপর এক প্রকাণ্ড মালগুদাম; ঝীর জন্য ঘর; স্নানাগার (স্নানের জন্য সাদা পোর্সলেনের টব এবং ঠাণ্ডা ও গরম জলের কল সহ); রান্নাঘর (জিনিষপত্র রাখিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন আলমারি সহ; গ্যাসের চুল্লী এবং পিঠাপুলি তৈয়ারী করিবার জন্য স্বতন্ত্র উনন ঘরের সঙ্গে গাঁথা); রান্নাঘরের লাগাও প্রকাণ্ড বারান্দা; প্রবেশ-পথে একখানা বড় কামরা; উচ্চ শ্রেণীর পার্কেট কাঠের মেজে প্রত্যেক কুঠরীতে; টাইলের মেজে রান্নাঘরে, স্নানাগারে এবং প্রবেশঘরে; প্রত্যেক ঘর গরম করিবার জন্য বাষ্পের কল আছে সর্ব্বত্র; রান্নাঘরের কলে ঠাণ্ডা এবং গরম দুই প্রকার জলই আসে। ঘরের জঞ্জাল বাহিরে পাঠাইবার জন্য কলের ব্যবস্থা আছে। বাক্‌স রাখিবার জন্য ঘরের দেওয়ালে বড় বড় আলমারি গাঁথা আছে। ঘর ঝাড়িবার জন্য ঝাঁটা রাখিবার আলমারিও দেওয়ালে গাঁথা।

কাপড়চোপড় কাচিবার জন্য ডেক্‌চি, গামলা, ঠাণ্ডা ও গরম জলের কল ইত্যাদি সবই আছে ধোলাই-ঘরে (এই ঘরটা অবশ্য একাধিক পরিবার-কর্ত্তৃক যথা-নির্দ্দিষ্ট দিনে ব্যবহৃত হয়)। কাপড়চোপড় শুকাইবার এবং ইস্ত্রী করিবার জন্য অন্য এক "সার্ব্বজনিক" ঘর। মোটর গাড়ী রাখিবার "গারাজ" ঘর। মেজের কার্পেট হইতে ধূলা চুষিয়া লইবার জন্য প্রকাণ্ড বিদ্যুতের "চোষক" আছে (এইটাও একাধিক পরিবার-কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হয়)।

মাসিক ভাড়া ২০০ মার্ক (=১৭৫ ভারতীয় টঙ্কা)। ঘর গরম করিবার খরচ এবং কলের গরম জলের খরচ বাড়ীওয়ালা দিবেন। কোনো প্রকার ট্যাক্‌স বা অন্য দেয় নাই।

মধ্যবিত্ত জার্ম্মাণ গৃহস্থের স্বচ্ছন্দতা

জার্ম্মাণিতে,—বার্লিনের মতন বড় বড় শহরে ইমারতগুলা সাধারণত: পাঁচতলা। প্রত্যেক তলায় এক, দুই বা

তিনটা করিয়া "ভোনুঙ্" থাকে। বিলাতে এবং আমেরিকায় "ভোনুঙ্"কে বলে "অ্যাপার্টমেণ্ট"। ফরাসী ভাষায় তাহারই নাম "আপার্ৎমাঁ"। আমরা সোজাসুজি তাহাকে বসত-বাড়ী ধরিয়া লইলাম।

হোহেন্‌ৎ-সোল্লার্ণ ডামের যে বাড়ীর ভাড়ার কথা বলা হইল সেইটা, এইরূপই একটা "ভোনুঙ্"।

এই "ভোনুঙের" বিবরণ পড়িয়া "ধনী" বাঙালীরাও মনে করিবেন যে, চরম বিলাস যেন কোনো এক কেন্দ্রে মজুত করা হইয়াছে। আসল কথা,—ইহা জার্ম্মাণ চিন্তায় "বিলাস" একদম নয়। অতি সাধারণ মধ্য-বিত্ত কেরাণী, ইস্কুলমাষ্টারের আটপৌরে জীবনই এইরূপ। এর চেয়ে নিম্নতর ব্যবস্থা ও যে নাই তা নয়। ~~ভব্যে জার্ম্মাণ~~ সমাজের ভদ্রলোকেরা সাধারণতঃ এই ধরণের ঘরবাড়ীতেই বসবাস করিয়া থাকে। অর্থাৎ আমাদের পয়সাওয়ালা লোকের চিন্তায়ও যাহা অতি-কিছু,—আশ্‌মানের চাঁদ,—জার্ম্মাণিতে তাহা লাখ লাখ রামা-শ্যামার নিত্যনৈমিত্তিক জীবনধারণের এবং স্বাস্থ্যরক্ষার মামুলি বাহন।

সস্তায় সুস্থ জীবন

মনে রাখিতে হইবে যে,—হোহেন্‌ৎসোল্লার্ণ ডাম অঞ্চলটা কলিকাতার চৌরঙ্গি বা পার্ক ষ্ট্রীট অঞ্চলের মতনই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, খট্‌খটে এবং স্বাস্থ্যকর। বস্তুতঃ, নোংড়া, দুর্গন্ধময়, অপরিষ্কার বা স্বাস্থ্যহানিকর পল্লী বার্লিন মহাশহরের কোনো কোণে আছে কি না সন্দেহ। তাহা সত্ত্বেও এই আরামদায়ক বসতবাড়ীর ভাড়া মাসিক ১৭৫৲। কলিকাতার বাঙালী মাসিক ১৭৫৲ খরচ করিয়া কিরূপ "ভোনুঙ্" পাইয়া থাকেন তাহা এই সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিতে হইবে।

জার্ম্মাণরা মামুলহিসাবে সুখেস্বচ্ছন্দে কর্ম্মঠ ও তাজা জীবন যাপন করিতেছে। সেই জীবনের আস্বাদ বাঙালী জানে না। আর সেই জীবনের জন্য জার্ম্মাণরা খরচ করে হাজার হাজার টাকা নয়। বাঙালীরা তিনগুণ খরচেও এর চতুর্থাংশ আরাম পায় না। অতি অল্প খরচেই শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখিবার কল-কৌশল আবিষ্কার করা জার্ম্মাণ-সভ্যতার, ও বাস্তবিক পক্ষে কিছু কিছু গোটা বর্ত্তমান জগতেরই, একটা বিশেষত্ব।

ফ্রান্সে মোটরকারের আমদানি-রপ্তানি

১৯২৫ সনে ফরাসীরা ১৬,২১৩ খানা মোটরকার বিদেশ হইতে খরিদ করিয়া আনিয়াছে। ১৯২৪ সনের তুলনায় এই সংখ্যা হাজার দু'এক বেশী। ইহার ভিতর এক মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতেই আমদানি হইয়াছে ১৪,৮৪৭।

মোটরলরি ইত্যাদি শ্রেণীর গাড়ী কেনা হইয়াছিল ১৫৩ খানা। তাহার ভিতর বিলাতী গাড়ীর সংখ্যা ৯৮।

ফরাসীরা নিজ দেশে যে সব মোটর গাড়ী তৈয়ারী করিয়াছিল তাহার ভিতর বিস্তর বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। ৫৬,৬৮৯ খানা ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিক্রী হইয়াছে। ফ্রান্সের নিকট হইতে এক বিলাত-ই খরিদ করিয়াছে ১২,৮৬৪ খানা। ১৯২৪ সনে ফ্রান্স হইতে বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল ৪৩,৮৬৩ খানা। অর্থাৎ এক বৎসরে রপ্তানি খুব বাড়িয়া গিয়াছে।

১৯২৫ সনে "লরি" জাতীয় গাড়ী রপ্তানি হইয়াছে ৪,৭৮২ খানা। তাহার ভিতর সুইট্‌সার্লাণ্ড খরিদ করিয়াছে ৯২২ খানা।

ফরাসী বাজারে স্বদেশী-বিদেশী

বিদেশ হইতে ফরাসীরা যে সব গাড়ী কিনিয়াছিল তাহার মোট কিম্মৎ প্রায় ১৬ কোটি ফ্রাঁর কিছু বেশী। কিন্তু বিদেশের নিকট ইহারা যে সব স্বদেশী গাড়ী বেচিয়াছে তাহার মোট কিম্মৎ প্রায় ২০১ কোটি।

ফরাসীরা সস্তা গাড়ী বিদেশ হইতে কিনিয়াছে। অপর পক্ষে ফরাসী-মার্কা বেশী দামের "ভোআত্যির দ' লুক্‌স্" (বিলাস-গাড়ী) বিদেশে বেচা হইয়াছে। গড়পড়তা এক এক খানা ফ্রান্সে আমদানি করা বিদেশী গাড়ীর দাম ৯,৮০০ ফ্রাঁ (প্রায় ১৫০০৲)। কিন্তু বিদেশে রপ্তানি-করা ফরাসী গাড়ীর গড়পড়তা দাম ৩৪,০০০ ফ্রাঁ (প্রায় ৫,১০০৲)।

বহির্ব্বাণিজ্য ও স্বদেশী আন্দোলন

বুঝা যাইতেছে যে,—স্বদেশে যন্ত্র-পাতির বা লোহা লক্কড়ের অথবা অন্য-কিছুর কারখানা থাকিলেই সেই জাতীয় বিদেশী মাল বয়কট করা অবশ্যম্ভাবী নয়। ফ্রান্সে একসঙ্গে একই কারবারে বিদেশী মাল ও চলিতেছে আবার স্বদেশী

মাল ও চলিতেছে। অধিকন্তু, স্বদেশী মালের রপ্তানি ও বেশ আছে বিদেশে। "বহির্ব্বাণিজ্যে"র এই সকল তথ্য অর্থাৎ আমদানির সঙ্গে রপ্তানির সম্বন্ধ বস্তুনিষ্ঠরূপে বুঝিতে পারিলে "স্বদেশী আন্দোলন" চালাইবার পক্ষে গভীরতর জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা। বহির্ব্বাণিজ্য-বিষয়ক "বিজ্ঞানে" ভারত-সন্তানের সকল দিক্ দেখিয়া শুনিয়া দক্ষতা লাভ করিবার সময় আসিয়াছে। আজ ১৯০৫ সনের বুলি চলিবে না।

ইতালির বিদ্যুৎ-কারখানায় মার্কিণ মূলধন

পিয়েমস্তে জেলায় ইতালিয়ানরা জলের তেজ হইতে বিদ্যুৎ বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে। কারবারের নাম "সোসিয়েতা ইদ্রো-এলেত্রিচা পিয়েমস্তে"। এই "সোসিয়েতা"র (কোম্পানীর) কর্ম্মকর্ত্তারা ইয়াঙ্কিস্থান হইতে ১ কোটি ১০ লাখ ডলার (১ ডলারে ৩৷৴০) কর্জ্জ লইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইতালিয়ান রাজস্বসচিবের তদবিরে এই মার্কিণ পুঁজির সাহায্য ইতালির ভাগ্যে জুটিয়াছে।

কর্জ্জটা শোধ দিতে হইবে ২৬ বৎসরের ভিতর। শতকরা ৭৲ হিসাবে সুদ। "পিয়েমস্তে"র "জল-বিদ্যুৎ কোম্পানী"র কতকগুলা কারখানা বন্ধক রাখা হইয়াছে। আওস্তে উপত্যকার কারখানাসমূহই প্রধান বন্ধক।

টাকা ধার দিয়াছেন কতকগুলা আমেরিকান ব্যাঙ্ক সম্মিলিত ভাবে। তাঁহাদের একজন প্রতিনিধি ইতালিতে আসিয়া কোম্পানীর পরিচালক সভায় অন্যতম কর্ত্তা হইবেন। এই হইতেছে একটা সর্ত্ত।

দুনিয়ার লৌহ-সমঝৌতা

প্যারিসের "পেতি পারিসিয়াঁ" দৈনিক বলিতেছেন:—"জার্ম্মাণির সহিত বাণিজ্যবিষয়ক যে সন্ধির কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, তাহা পাকাপাকি হইবার দিকে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। ফরাসী, জার্ম্মাণ, বৃটিশ, বেলজিয়ান এবং লুক্সেমবুর্গ দেশীয় লৌহ ও ইস্পাতের ব্যবসাদারগণের প্রতিনিধিরা ঐ দ্রব্য উৎপাদন ও তাহার বিক্রয়ের বাজার সম্বন্ধে একটা আন্তর্জ্জাতিক সমঝৌতায় উপস্থিত হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। তাহার ফলেই সন্ধির প্রস্তাবটি এতখানি অগ্রসর হইতে পারিয়াছে।

"একদিকে ফ্রান্সের এবং জার্ম্মাণির লৌহ ও ইস্পাতের কারবারগুলির সম্পর্ক ও অন্য দিকে পূর্ব্বোক্ত আন্তর্জ্জাতিক সমঝৌতা, এই উভয় দিকে লক্ষ রাখিয়া বন্দোবস্তটার খসড়াও তৈয়ারী হইয়াছে।

"উক্ত লৌহ ও ইস্পাত তৈয়ারীর পরিমাণও নির্দ্দিষ্ট রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, কারণ ঐ সকল দ্রব্য আজকাল অতিরিক্ত ভাবেই প্রস্তুত হইতেছে। আর যে সব দেশে ঐ দ্রব্যগুলি হয় না, সেখানে উহা কে কতখানি রপ্তানি করিবেন, তাহারও একটা হার বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে।"

ফরাসী-জার্ম্মাণ সদ্ভাবের সূত্রপাত

"পেতি পারিসিয়াঁ"র মতে—"উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করিলে, ইহা নিশ্চিত যে, বড় বড় লৌহ-উৎপাদক দেশগুলির মধ্যে স্বার্থের মিলন থাকিবে এবং অন্যান্য দেশের শিল্পকর্ম্মগুলি শান্তিতে ও অবিচলিতভাবে চলিতে পারিবে। বিগত ১২ই মার্চ্চ ফরাসী, বেলজিয়ান এবং সার ও লুক্সামবুর্গের উৎপাদকেরা জার্ম্মাণির সহিত লৌহ প্রভৃতি ধাতুর বিনিময়-সমস্যা মীমাংসা করিতে বসিয়া রেল-সম্বন্ধে ঐক্যমত্যে উপনীত হইয়াছেন।

"লরেন, লুক্সেমবুর্গ এবং সারের প্রস্তুত লোহা জার্ম্মাণিতে রপ্তানি হইতে পারিবে—অবশ্য নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে। ইহাতেও সকলে একমত। ইহার ফলে ফ্রাঙ্কো-জার্ম্মাণ বাণিজ্য-সম্মিলনের প্রবল বাধাগুলি অপসারিত হইবে। আর ভরসা হয়, ইহার জন্যই আন্তর্জ্জাতিক লৌহ-ট্রাষ্ট (সঙ্ঘ) বিষয়ে যে কথাবার্ত্তা চলিতেছে, তাহাও পাকাপাকি হইতে পারিবে।"

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ

দেশী

সরকারী দরিয়া-সম্মিলন

ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার নদীগুলা পঙ্কত্ব-প্রাপ্তির পথে অগ্রসর হইতেছে। এইগুলাকে বাঁচাইয়া রাখিবার উপায় আলোচনা করিবার জন্য গবর্মেণ্টের তরফ হইতে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ বাহাল করা হইয়াছে। তাঁহারা ঢাকায় বসিয়া আলোচনা সুরু করিয়াছেন। সরকারী তহবিল হইতে এই বৎসর লাখখানেক টাকা খরচ করা হইবে।

ত্রিবাঙ্কুরের কৃষি-সচিব

ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে কৃষি-শিক্ষার জন্য একটা মধ্য-বিদ্যালয় আছে। তথায় ছুতারমিস্ত্রিগিরির শিক্ষাও দেওয়া হয়। ছাত্রদিগকে চাষের কাজে অন্ন-সংস্থান করিতে উৎসাহিত করিবার জন্য গবর্মেণ্ট তাহাদিগকে জমিজমা দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে কিছু মূলধন কর্জ্জ দিবার আয়োজনও হইতেছে।

এই উপলক্ষ্যে রাজ্যের কৃষিসচিব শ্রীযুক্ত ডক্টর কুঞ্জন পিল্লে বলিতেছেন:—"সমগ্র ভারতেরই অবস্থা একরূপ। চাষের কাজে কোনো কৃষি-শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবাই লাগিয়া থাকিতে চাহে না। সকলেই সরকারী চাকরি ঢুঁড়িতেছে। কাজেই কৃষি-বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইতেছে।"

পাবনায় নারী-শিল্প

এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে পাবনা-নারী-শিল্পাশ্রমের বার্ষিক সভার অধিবেশন হয়। শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী, ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশ গুপ্তকে এতদুপলক্ষ্যে আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। একটি চরকা-প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বহুসংখ্যক কাটুনী এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছিলেন। ডাক্তার ঘোষ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন এবং মহিলাদিগকে সম্বোধন করিয়া খদ্দর এবং চরকা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি শিল্পাশ্রমের একজন সদস্যার কাটা সূতা হইতে বুনা একখানা ধুতি ডাক্তার ঘোষকে উপহার প্রদান করেন। শ্রীযুক্ত ইন্দুজ্যোতি মজুমদার এবং স্থানীয় অন্যান্য ভদ্রলোকগণ খাদি-প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মিগণের সহিত যোগ দিয়া খদ্দর ফেরি করেন।

নোয়াখালিতে বয়ন-বিদ্যালয়

আসাম-বেঙ্গল রেলপথের চৌমোহনী ষ্টেশনের এক মাইল পশ্চিমে বেগমগঞ্জে একটি বয়ন-বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। এই স্কুলে উন্নত প্রণালীতে নানাপ্রকার কাপড়, তোয়ালে, টুইল, সার্ট ও নানাবিধ জামার ছিট্ এবং পাড়ে নক্সাদির কাজ, পাটের সূতা নির্ম্মাণ, রং করা ও বুনন-প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হয়। স্কুলে যাহারা কাজ শিখিতে আসে তাহাদের নিকট হইতে বেতন লওয়া হয় না। অধিকন্তু, তাহাদিগকে গবর্মেণ্ট হইতে মাসিক ৪৲ চারি টাকা হিসাবে বৃত্তি দেওয়া হয়। নোয়াখালি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও বৃত্তি দিয়া থাকে। দূরবর্ত্তী স্থানের ছাত্রগণের থাকিবার জন্য ছাত্রাবাস আছে। স্থানটি স্বাস্থ্যকর।

লাহোরের তিলক পাঠশালা

শ্রীযুক্ত লাজপত রায়-প্রতিষ্ঠিত লাহোরের "তিলক

পাঠশালা"য় এই বৎসর দুনিয়ার রাষ্ট্রশাসন-প্রণালী সম্বন্ধে বারটা বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়াছিল। বারটা বিভিন্ন দেশের শাসন-প্রণালী বিবৃত হইয়াছে,—যথা (১) মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র (দুই দিন দুই বক্তৃতা), (২) ইংল্যাণ্ড, (৩) ফ্রান্স, (৪) জার্ম্মাণি, (৫) সুইট্সার্ল্যাণ্ড, (৬) সোভিয়েট রুশিয়া, (৭) জাপান, (৮) দক্ষিণ আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া, (৯) কানাডা, (১০) আইরিশ ফ্রী ষ্টেট, (১১) ভারতবর্ষ।

মাদ্রাজে কৃষি-কলেজের জুবিলী

মাদ্রাজের কোয়াম্বাটুর শহরের কৃষি-বিদ্যার্থী ছাত্র-সম্মেলনের উদ্যোগে আগামী ১২ই জুলাই হইতে ১৭ই জুলাই পর্য্যন্ত স্বর্ণ-জুবিলী উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। ১৮৭৬ সনে মাদ্রাজে কৃষি-কলেজ স্থাপিত হয়। ভারতে ইহাই সর্ব্বপ্রথম কৃষি-কলেজ। বর্ত্তমান উৎসবে (১) একটি নূতন গৃহের দ্বার উন্মুক্ত হইবে, (২) কৃষিপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইবে এবং (৩) খেলা-ধূলা থাকিবে।

নমঃশূদ্রের বাণী

ঢাকা, ফরিদপুর, যশোহর, খুলনা, বরিশাল, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, ২৪ পরগণা, বর্দ্ধমান ইত্যাদি জেলার নমঃশূদ্রেরা কাঁচড়াপাড়ায় সম্মিলিত হইয়াছিলেন (৪ এপ্রিল ১৯২৬)। সভায় প্রায় তিন শ' লোক উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি ছিলেন কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত মুকুন্দবিহারী মল্লিক, এম-এ, বি-এল। যশোহরের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত রসিকলাল বিশ্বাস, বি,এ, বলেন যে, বঙ্গীয় কাউন্সিল নির্ব্বাচন উপলক্ষ্যে পূর্ণবয়স্ক প্রত্যেক নরনারীরই ভোট দিবার অধিকার থাকা উচিত। অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে প্রস্তাবের ভার পড়িয়াছিল কলিকাতার প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত বিরাটচন্দ্র মণ্ডল, বি-এ'র উপর। ফরিদপুরের শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, বি, এ, চরকায় সূতা-কাটার আর্থিক মূল্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

"ইংলিশম্যান"এর হিরাট চিন্তা

কাবুল ও খাইবারের মধ্যবর্ত্তী দেশগুলির এবং গজনী ও কান্দাহারের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যসূত্রে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যোগ রহিয়াছে। খাইবার-রেলপথ খোলার পর হইতে কাবুলের বাণিজ্য-সম্বন্ধ ভারতের সঙ্গে আরও ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছে। "ইংলিশম্যান" (কলিকাতা) বলিতেছেন:—"হিরাটে বোলশেভিক প্রভাব-প্রাবল্যের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের স্বার্থরক্ষার সম্বন্ধে বিবেচনা করা অবশ্যই আবশ্যক। কারণ হিরাট ভারতের আর্থিক ও সামরিক ক্ষেত্রের প্রবেশ-দ্বার-স্বরূপ। আফগানিস্থানে এবং পূর্ব্বপারস্যে ইংরেজ যদি দৃঢ়ভাবে আপনার বাণিজ্য-ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে, কেবলমাত্র তাহা হইলে ভারতে বোলশেভিক প্রভাব দমনের আশা করা যায়।"

অভয়-আশ্রমের চিকিৎসালয়

কুমিল্লার অভয়-আশ্রমের অন্যতম বিভাগ হইতেছে চিকিৎসালয়। গত বৎসর এই বিভাগে ৬,৪২৯ জন রোগী চিকিৎসার জন্য আসিয়াছে। বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়া হইয়াছে বার আনা রোগীকে। অন্যান্য রোগীরা চিকিৎসার জন্য যাহা-কিছু দিয়াছে তাহা হইতে এই বিভাগের খরচ চালান হইয়াছে। চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধান করেন কাপ্তেন-ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মাছের আইন

ত্রিপুরার শাহ সৈয়দ ইমদাদুল হক বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মৎস্যের পোনা সংরক্ষণ বিল (বেঙ্গল ফিশ ফ্রাই প্রিজার্ভেশন বিল) পেশ করিয়াছেন। ইহা আইনে পরিণত হইলে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এই তিন মাস মাছ ধরা বন্ধ রাখা হইবে। এই বিল যাহাতে আইনে পরিণত না হয় তাহার জন্য "বঙ্গীয় ও আসাম মৎস্যজীবী সম্মিলনে"র মাদারিপুর অধিবেশনে (১১-১২ মার্চ্চ ১৯২৬) প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এইরূপ আইনে নাকি জেলেদের আর্থিক ক্ষতি ঘটিবার সম্ভাবনা।

মৎস্যজীবি-সম্মিলন

ঐ সম্মিলনের আর দুইটা প্রস্তাব উল্লেখযোগ্য। (১) জমিদারদের নিযুক্ত একচেটিয়া ফরিয়ার নিকট জেলেরা

আজকাল মাছ বেচিয়া থাকে। তাহাদিগকে যে কোনো ক্রেতার নিকট স্বাধীন ভাবে বেচিবার চেষ্টা করিতে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। (২) জেলেদিগকে "সমবায়ের" নিয়মে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার প্রস্তাব উঠিয়াছে। এই সমবায়-সমিতির সাহায্যেই জলকরের ব্যবস্থা করা হইবে, এইরূপ অভিপ্রায় বুঝা যাইতেছে। আজকাল জেলেরা ব্যক্তিগতভাবে জমিদারদের সঙ্গে জলকরের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। দেখিতেছি যে, এই ব্যবস্থা তুলিয়া দিবার দিকে লোকমত গড়িয়া উঠিতেছে।

চামার-বিদ্যালয়

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নিকটবর্ত্তী নাটঘর গ্রামে চামার বালকদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিদ্যালয়ের নাম চিত্তরঞ্জন জাতীয় প্রতিষ্ঠান। বর্ত্তমানে ছাত্র-সংখ্যা ৬৬। পরিচালক শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বর্ম্মণ।

যোগী জাতি সম্মেলন

শ্রীহট্ট জেলার ২৬টি, ত্রিপুরা জেলার ৩৪টি ও ময়মনসিংহ জেলার ৪টী গ্রাম—মোট ৬৪টি গ্রামের অনুমান ২৬ হাজার যোগী জাতীয় লোক লইয়া এই সমাজ গঠিত। বিগত ৮ই চৈত্র তারিখে বরইউরি গ্রামে এই ২৬ হাজার লোকের প্রতিনিধিগণ এক বিরাট সভার অধিবেশন করেন। সভায় প্রায় ৬০০ শত লোক উপস্থিত ছিলেন। চট্টগ্রামের কংগ্রেস-কর্ম্মী, আসাম-বঙ্গ যোগী-সম্মিলনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিমোহন নাথ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয় খদ্দর-নির্ম্মাণ ও প্রত্যেকের খদ্দর পরিধান, হিন্দু-সংগঠন ও হিন্দু জাতির ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ করিবার কারণ ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রায় চারি ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করেন। সভায় জনহিতকর অনেক আবশ্যক প্রস্তাব আলোচিত ও গৃহীত হয়। সভার কার্য্য প্রায় ১২ ঘণ্টা যাবৎ চলিয়াছিল। সভাস্থ সকলেই খদ্দর পরিধান করিবেন এবং বিবাহে পণ গ্রহণ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। (আনন্দবাজার পত্রিকা, কলিকাতা)।

কলিকাতায় করবৃদ্ধির প্রতিবাদ

স্বর্গীয় রায় নন্দলাল ও পশুপতি বসুর বাটীর প্রাঙ্গণে কলিকাতা কর্পোরেশনের করবৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য উত্তর কলিকাতাবাসী করদাতাদের এক বিরাট সভা হইয়া গিয়াছে।

রায় বাহাদুর আশুতোষ ব্যানার্জ্জী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় নিম্নমর্ম্মে দুইটী প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১। উত্তর-কলিকাতার ১ নং ওয়ার্ডের করদাতাগণ কর্পোরেশনের বর্দ্ধিতহারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে; কারণ ইতিপূর্ব্বেই যে করবৃদ্ধি করা হইয়াছে তাহা তাহারা অতি কষ্টে দিতেছে।

২। দ্বিতীয় প্রস্তাবে বলা হয় যে, একটী কমিটী গঠন করিয়া প্রত্যেক বাড়ীর যে কর কর্পোরেশন বৃদ্ধি করিয়াছেন তাহা নির্ণয় করিয়া ঐ বর্দ্ধিত করের বিরুদ্ধে প্রতীকারের জন্য চেষ্টা করা হইবে।

আগ্রায় প্রজাস্বত্ব

যুক্তপ্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় আগ্রা প্রজাস্বত্ব বিলের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। জনকয়েক স্বরাজী প্রথম অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। বে-সরকারী সদস্যেরা অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। অর্থসচিব প্রস্তাব করেন যে, উক্ত বিলখানি ১৪ জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হউক। উক্ত ১৪ জন সদস্যের মধ্যে ৩ জন স্বরাজী।

জমির আইনে নূতন ধারা

প্রস্তাবিত বিলে তিনটি বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। প্রথমতঃ, ১২ বৎসর কোনো জমি দখল করিলেই তাহাতে দখলী স্বত্ব জন্মিবে না। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক মূল প্রজাকে যাবজ্জীবন দখলীস্বত্ব দেওয়া হইবে। তাহার মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকারী মাত্র পাঁচবৎসরের জন্য দখলীস্বত্ব পাইবে। একটা নির্দ্দিষ্ট কাল বাদে খাজনার হার পরিবর্ত্তিত হইবে। বিলে প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, খাজনা বৃদ্ধি করিবার সময় পূর্ব্ব খাজনার এক-তৃতীয়াংশের অধিক বৃদ্ধি করা যাইবে না। দখলীস্বত্ব বা মালিকী স্বত্ব-বিশিষ্ট প্রজা স্বীয় জমি বা জমির অংশ পাঁচ বৎসরের জন্য অপরকে বন্দোবস্ত দিতে পারিবে। কয়েকটি নিয়মের

অধীন থাকিয়া জমিদারগণ নিজেদের চাষের জন্য, রাস্তার জন্য বাড়ী-নির্ম্মাণের জন্য অথবা কারখানা-নির্ম্মাণের জন্য দখলী জমি অধিকার করিতে পারিবে।

ভূমিব্যবস্থা সম্বন্ধে সরকারী মত

আগ্রা প্রজাস্বত্ব বিলের আলোচনা উপলক্ষ্যে যুক্ত-প্রদেশের সরকারী প্রতিনিধি স্যার স্যাম ওডোনেল বলিয়াছেন :—

"যুক্তপ্রদেশের কৃষকদের মধ্যেও নূতন ভাব ও নূতন আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে। চাষীরা নিজেদের অভাব অসুবিধার কথা বিশেষ করিয়া উপলব্ধি করিতে পারিতেছে। গবর্মেণ্টের বিশ্বাস এই যে, জমিদারগণ ইচ্ছা করিলে দেশের বিশেষ হিতসাধন করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে সময়ের পরিবর্ত্তনের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। বর্ত্তমান গণতান্ত্রিক যুগের নূতন আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদিগকে মানিয়া লইতে হইবে এবং উক্ত আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষার আহ্বানে সাড়া দিতে হইবে।"

মুক্তাগাছা কৃষক-শ্রমিক-সম্মিলন

২৮শে ও ২৯শে মার্চ মুক্তাগাছা থানার এলাকাধীন যুগীগ্রামে কৃষক-শ্রমিক-সম্মিলন বসিয়াছিল। সভায় বহুলোক সমবেত হইয়াছিলেন এবং বেশ একটা উৎসাহের সৃষ্টি হইয়াছিল। কিশোরগঞ্জের মৌলবী শা আবদুল হামিদ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অতঃপর প্রজাস্বত্বের সংশোধিত বিলটির আলোচনা হয়। সভায় নিম্নলিখিত মর্ম্মে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয় :—শীঘ্রই সিলেক্ট কমিটির রিপোর্টটি প্রকাশ করা হউক। এতদ্বারা গবর্ণমেণ্টকে জানান যাইতেছে যে, জমিদারগণ-কর্ত্তৃক যে সকল জনসভার অধিবেশন হইতেছে, তাহাকে যেন কৃষক, রায়ত ও শ্রমিক-দিগের সাধারণ সভা বলিয়া গ্রাহ্য না করা হয়। এতদ্বারা অনুরোধ করা যাইতেছে যে, প্রস্তাবিত রয়েল কমিশন যেন মফঃস্বলে আসিয়া স্থানীয় অনুসন্ধান গ্রহণ করেন। ভোট-দাতাগণকে জানান যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন সকল নির্ব্বাচনেই কৃষক বা তাঁহাদের শুভাকাঙ্ক্ষীদিগকে ভোট দেন। প্রত্যেক জেলায় প্রতি থানা ও ইউনিয়নের কৃষক ও শ্রমিক-গণ সমিতি গঠন করুন। মুক্তাগাছা থানায় একটী শক্তিশালী কৃষক-শ্রমিক-সমিতি গঠিত হউক। সমস্ত ইউনিয়ন বোর্ডই বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করুন।

ঢাকার মধ্য-কৃষি-বিদ্যালয়

চুঁচুড়ার মধ্য-কৃষি-বিদ্যালয় আজকাল বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান। সরকারী মধ্য-কৃষি-বিদ্যালয় আজকাল বাংলায় আছে মাত্র একটি,—সে ঢাকায়।

ঢাকার ছাত্রদিগকে মাসিক ১০৲ করিয়া বৃত্তি দেওয়া হয়। তাহাদের ঘর-ভাড়া লাগে না। ইস্কুলের বেতনও দিতে হয় না। তথাপি ছাত্র-সংখ্যা ২০।২৫টির বেশী নয়। বুঝিতে হইবে কৃষি-বিদ্যা এখনো বাঙালী সমাজের ধাতে লাগে নাই।

রেল-কর্ম্মচারীদের দুরবস্থা

গত ২১শে মার্চ গোরক্ষপুরে বেঙ্গল এণ্ড নর্থ ওয়েষ্ট রেলওয়ে কর্ম্মচারীদিগের সম্মিলনের ৫ম বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। ঐ সভায় সভাপতি শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল সরকার বলেন :—

"অপরাপর দেশের ন্যায় আমাদের দেশে ট্রেড্ ইউনিয়ন আন্দোলন বিশেষ সফল হইয়া উঠে নাই। পাশ্চাত্যের শ্রমিকেরা স্বীয় অবস্থা বুঝিতে এবং বুঝিয়া লড়িতে শিখিয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশের শ্রমিকেরা এখন অশিক্ষার অন্ধকারে আচ্ছন্ন। রেলওয়েতে যাঁহারা সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণীর কর্ম্ম করেন, তাঁহাদিগকে বেতনের স্বল্পতার জন্য অশন, বসন, বাসস্থান—সকল বিষয়েই অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হয়। যাহারা রেলওয়ের কারখানায় বা অন্যান্য কর্ম্মকেন্দ্রে কুলী-মজুরের কাজ করে, তাহাদের দুর্দ্দশা আরও শোচনীয়। সংক্রামক ব্যাধি বা মহামারীর সময়ে তাহাদের কষ্টের একশেষ হয়। সাধারণতঃ, স্ত্রীকুলীদিগের জন্য স্বতন্ত্র কোনো হাসপাতাল থাকে না। সাধারণ চিকিৎসার ব্যবস্থাও ঠিক প্রয়োজন-মত নহে।

"ভারতীয় নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারী বা কুলীদিগকে উপযুক্ত বাসস্থানের অভাবে বার বার রোগ ও মহামারীর করাল কবলে পতিত হইতে হয়।"

"ভারতীয় কর্ম্মচারীদিগকে প্রায়ই যখন-তখন জরিমানা দিতে হয়। সেই জরিমানার টাকা জমিলে তাহার বেশীর ভাগ সাহেব কর্ম্মচারীদিগের ক্রীড়া-কৌতুকাদিতে ব্যয় হইয়া থাকে। এ বিষয়ে গবর্মেণ্টের দৃষ্টিপাত করা বিশেষ আবশুক।"

"ব্যবস্থা-পরিষদে শ্রমিকদিগের পক্ষ হইতে কোনো প্রতিনিধি লওয়া হয় না। ব্যবস্থাপক সভায় একজনমাত্র সরকার-কর্তৃক মনোনীত হন। এই গণতন্ত্রতার যুগে ভারতের শ্রমিকদিগের এই দুর্দশা অত্যন্ত দুঃখজনক।"

খাদি-প্রতিষ্ঠানের প্রচার-কার্য্য

প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে এই প্রচার-ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার সেন, শ্রীযুক্ত দ্বিজরাজ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র ঘোষ চৌধুরী ইত্যাদি সুপরিচিত-ব্যক্তিগণ। ১৯২৬ সনের জানুয়ারি হইতে ১৭ই মার্চ পর্য্যন্ত এই আড়াই মাসের ভিতরেই তাঁহারা ফেরি করিয়া ২৫ হাজার টাকার খাদি বিক্রয় করিয়াছেন। ১৪টি জেলার ৪১টি স্থানও তাঁহাদের প্রচারের ফলে এই অল্প সময়ের মধ্যেই আজ খাদির কাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। স্থানগুলির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রেসিডেন্সি বিভাগ

১। মুর্শিদাবাদ জেলা—(১) বহরমপুর, (২) আজিমগঞ্জ। ২। খুলনা জেলা—(৩) নকীপুর, (৪) মঠবাড়ী, (৫) দুরমুস-খালি, (৬) বুড়িগোয়ালিনী, (৭) ঈশ্বরীপুর।

ঢাকা বিভাগ

৩। ঢাকা জেলা—(৮) রায়পুর। ৪। ময়মনসিংহ জেলা—(৯) ময়মনসিংহ, (১০) টাঙ্গাইল, (১১) জামালপুর, (১২) শেরপুর, (১৩) নেত্রকোণা। ৫। ফরিদপুর জেলা—(১৪) মাদারীপুর। ৬। বাখরগঞ্জ জেলা—(১৫) বরিশাল, (১৬) ভোলা, (১৭) পটুয়াখালী, (১৮) ঝালকাঠি, (১৯) পিরোজপুর।

চট্টগ্রাম বিভাগ

৭। ত্রিপুরা জেলা—(২০) চাঁদপুর। ৮। নোয়াখালি জেলা—(২১) নোয়াখালী, (২২) ফেণী, (২৩) চৌমোহানী। ৯। চট্টগ্রাম জেলা—(২৪) চট্টগ্রাম, (২৫) সেওড়াতলী, (২৬) পটিয়া, (২৭) সাতকানিয়া, (২৮) সুচিয়া।

রাজসাহী বিভাগ

১০। দিনাজপুর জেলা—(২৯) দিনাজপুর, (৩০) রায়গঞ্জ। ১১। রংপুর জেলা—(৩১) রংপুর, (৩২) কুড়িগ্রাম, (৩৩) গাইবান্ধা, (৩৪) ভুরুভাণ্ডার। ১২। বগুড়া জেলা—(৩৫) বগুড়া। ১৩। রাজসাহী জেলা—(৩৬) রাজসাহী, (৩৭) নাটোর, (৩৮) পুঠিয়া। ১৪। পাবনা জেলা—(৩৯) সিরাজগঞ্জ, (৪০) উল্লাপাড়া, (৪১) মোহনপুর।

কিন্তু প্রতিষ্ঠানের এই ধরণের প্রচারের কাজ ১৯২ সনের নবেম্বর হইতে আরম্ভ হইয়াছে। নবেম্বর ও ডিসেম্বর এই দুই মাসেও তাঁহারা খুলনা জেলার ৭টি, বর্দ্ধমান জেলা ৬টি এবং ঢাকা জেলার ৪টি স্থানে খাদি ফেরি ও খাদি বাণী প্রচার করিয়াছেন।

বিদেশী

বিলাতে বিদেশী কয়লার কুলীর দাবী

কয়লার খনি বিষয়ক বৃটিশ কমিশনের নিকট খাদের মালিকেরা একপ্রকার প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন। তাহার ঠিক উল্টা গান শুনিতেছি কয়লার খাদের মজুর-পরিষদের প্রস্তাবে।

মজুরদের মতে,—তড়িৎ, গ্যাস ও তেল এই তিন লাইনে সকল বিলাতী কারবারই কয়লার কারবারের সঙ্গে সম্বদ্ধ হউক। সমগ্রদেশব্যাপী এক বিপুল "শক্তি"-সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠুক। অধিকন্তু, এই ঐক্যগ্রথিত তড়িৎ-গ্যাস-তেল-কয়লা কারবার কোনো ব্যক্তি বা কোম্পানী-বিশেষের সম্পত্তি থাকিতে পারিবেনা। সবই দেশের সকল লোকের স্বত্বে

পরিণত হইবে। অর্থাৎ রাষ্ট্র হইবে এই শক্তি-সঙ্ঘের মালিক ও পরিচালক।

"শক্তি"-পরিচালনায় সরকারী শাসন

সরকারী শাসনে কারবারটাকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য গোটাচারেক নতুন কমিটি কায়েম করা দরকার হইবে। যথা,—(১) শক্তি এবং যাতায়াত বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা স্বরূপ এক পরিষৎ গঠিত হইবে। তাহাতে থাকিবেন মাত্র সাত ওস্তাদ। (২) কয়লা এবং অন্যান্য শক্তি উৎপাদনের জন্য দায়ী এক পরিষৎ। (৩) কয়লা-বিতরণের জন্য এক পরিষৎ। (৪) বিদেশে কয়লা রপ্তানির তদবির করা থাকিবে চতুর্থ পরিষদের কর্ম্ম।

আজকাল বিভিন্ন কারবারে যে-সকল কর্ম্ম-কর্ত্তা আছেন তাঁহারা সকলেই সরকারের অধীনস্থ কর্ম্মচারীতে পরিণত হইবেন।

ফরাসী চাকুরেদের কংগ্রেস

উত্তর-পূর্ব্ব ফ্রান্সের নাঁসি শহরে চাকুরেদের কংগ্রেস বসিয়াছিল। রবিবারে চৌপর দিনরাত যাহাতে সকল অফিস, কর্ম্মক্ষেত্র, দোকান, বাজার বন্ধ থাকে সেই বিষয়ে প্রস্তাব পেশ করা হইয়াছে। নিম্নলিখিত বিষয়ে বিশেষজ্ঞেরা বক্তৃতা করিয়াছেন:—(১) সরকারী সামাজিক বীমা, (২) ফ্যাক্টরির মজুর-সমাজে উচ্চতর শিক্ষাবিস্তার, (৩) মজুর-মহলে সালিশী, (৪) সস্তায় গৃহনির্ম্মাণ, (৫) আট ঘণ্টার রোজ।

প্যারিসে ইতালিয়ান মন্ত্রী হ্বল্‌পি

লণ্ডনে এবং হ্বাশিংটনে ইতালিয়ান মন্ত্রী হ্বল্‌পি দেনা শোধিবার বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়া প্যারিসের ফরাসী মাতব্বরদের বৈঠকে দেখা দেন। সেইখানে আমেরিকান ক্লাবে মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা হয়।

ফলারের পর হ্বল্‌পি বেশ এক মুখরোচক বক্তৃতা ঝাড়িয়াছিলেন। মিলানের ইতালিয়ান দৈনিক "কোরিয়েরে দেল্লা সেরা" হইতে তাহার কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি।

হ্বল্‌পির বাণী নিম্নরূপ:—"ফ্রান্স, ইতালি, গৃহস্থ নরনারী এবং জননায়ক ও রাষ্ট্রিকগণ, আপনারা আমার চিন্তায় আর কথাবার্ত্তায় পাবেন মাত্র এক বস্তু। আমি ফ্রান্সকে ভালবাসি। আর ফ্রান্সের সঙ্গে একমত হইয়া কাজ করা আমার দস্তুর। ফরাসী এবং ইতালিয়ান এই আট কোটি লোক গলায় গলায় বন্ধুত্ব চালাইতে চালাইতে ইয়োরোপের ভাগ্য গঠন করিতে অগ্রসর হউক।

"আজ জগতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সংবাদ রটে অতি দ্রুতবেগে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এক দেশের লোক অন্যান্য দেশের লোক সম্বন্ধে চরম অজ্ঞ। এইরূপ আন্তর্জ্জাতিক অজ্ঞতা নিবারণ করা বিশেষ জরুরি বিবেচনা করি।"

ইতালির লড়াইয়ের ঋণ

হ্বল্‌পি আরও বলিয়াছেন:—

"বিলাতে এবং আমেরিকায় আমি যা-কিছু বলিয়াছি ফ্রান্সেও তাহাই বলিব। ইতালিয়ানরা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে বটে। কিন্তু সেই বিজয়ের খরচ অসীম। ৬৩০,০০০ লোক আমাদের মারা গিয়াছে। ৮০০,০০০ হতাহতের পরিবারকে আমরা এক্ষণে অর্থসাহায্য করিতেছি। ১ কোটি নরনারী ইতালি ছাড়িয়া বিদেশে যাইতে বাধ্য হইয়াছে। শিল্প-কারখানায় ব্যবহারোপযোগী কুদরতী মাল আমাদের নাই। তাহা সত্ত্বেও আমরা লড়াইয়ের সময়কার বিদেশী ঋণ শোধ দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছি। আমাদের বন্ধুবর্গের নিকট যে নৈতিক দায়িত্ব আছে, তাহা পালন করা আমাদের জাতীয় সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার উপায় বিবেচনা করিয়াছি।

সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে নদী-ও-তড়িৎ-সম্মিলন

আগামী জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় সপ্তাহ ধরিয়া সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের বাজেল শহরে নদীবক্ষে ষ্টীমার-নৌকার চলাচল এবং জল-প্রপাতের বিদ্যুৎ-শক্তির সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে এঞ্জিনিয়ারদের এক আন্তর্জ্জাতিক বৈঠক বসিবে। ফ্রান্স, জার্ম্মাণি এবং সুইটসার্ল্যাণ্ড এই তিন দেশের সীমানায় হইতেছে বাজেল নগর অবস্থিত। রাইণ দরিয়া এই শহরের পার্শ্বেই প্রবাহিত। ইয়োরোপের পূর্ব্ব-পশ্চিমমুখো এবং উত্তর-দক্ষিণমুখো বড় বড় রেলপথগুলাও এই শহরেই

কাটাকাটি করিয়াছে। কাজেই মাল-চলাচলের এক বড় কেন্দ্র বাজেল।

সম্মিলন উপলক্ষ্যে এক প্রদর্শনী খোলা হইবে। তাহাতে দেখান হইবে জল-প্রপাতকে কাজে লাগাইবার যন্ত্রপাতি, ষ্টীমারাদি যান, বিদ্যুতের কলকব্জা ইত্যাদি।

ফরাসী বিজ্ঞান-পরিষৎ

প্যারিসের "আকাদেমী দে সিয়াঁস" (বিজ্ঞান-পরিষৎ) প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপক জর্জ ক্লোদ অক্সিজেনের ফ্যাক্টরিতে দৈবের উৎপাত পুনঃপুনঃ ঘটে কেন এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন (৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৬)। এইসকল উৎপাতের কারণ এতদিন পর্য্যন্ত পরিষ্কাররূপে জানা ছিল না। অক্সিজেন তৈয়ারী করিতে হইলে তরল বায়ুকে "ডিষ্টিল" করিতে (চোঁআইতে) হয়। সেই সময়ে যন্ত্রপাতির ভিতর কতকগুলা বাজে মাল আসিয়া জুটে। "এসেটিলিন" গ্যাস তাহাদের অন্যতম। "ওজোন" ও অনেক জন্মে। এই সবের দরুণই বিস্ফোটকের উদ্ভব হয়।

সামাজিক ঔষধের বিদ্যাপীঠ

বিশ বৎসর ধরিয়া বার্লিনে "সেমিনার ফ্যির সোৎসিয়ালে মেডিৎসিন" নামক সামাজিক ঔষধের বিদ্যাপীঠ চলিতেছে। পাশ-করা চিকিৎসা-ব্যবসায়ীরা এই 'সেমিনার'এ আসিয়া ব্যক্তিগত জীবনবীমা, সামাজিক বীমা, দেশের স্বাস্থ্যরক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। কোনো প্রকার বেতনাদি লাগে না। বাধ্যতামূলক সরকারী বীমা প্রতিষ্ঠানের নিয়মে অনেক চিকিৎসককে বীমাকারী রোগীর চিকিৎসা করিতে হয়। তাঁহাদের জন্য এই 'সেমিনার'এ বিশেষ ব্যবস্থা আছে। এই সকল কথা অবশ্য বর্ত্তমানে ভারতবাসীর নিকট দুর্বোধ্য।

জার্ম্মাণ কৃষি-যন্ত্র সঙ্ঘের অধিবেশন

চাষ-আবাদের যন্ত্রপাতি জার্ম্মাণির যে সকল ফ্যাক্টরিতে তৈয়ারী হয় সেই সব সম্প্রতি এক দেশব্যাপী সঙ্ঘের অধীনে কেন্দ্রীকৃত হইয়াছে। এই সঙ্ঘের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া বিগত ফেব্রুয়ারি মাসে বার্লিনের "কৃষি-সপ্তাহ" নামক চাষ-প্রদর্শনীর কর্ম্মকর্ত্তারা এক মজলিশ ডাকিয়াছিলেন। তাহাতে গবর্মেণ্টের বড় বড় লোক, কৃষি-সমিতির প্রতিনিধি, কৃষি-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ফ্যাক্টরি-সমিতির লোকজন ইত্যাদি নানা প্রকার লোক উপস্থিত ছিলেন।

কৃষি-বিষয়ক যন্ত্রপাতির দাম-সমঝৌতা

সঙ্ঘের সেক্রেটারি এঞ্জিনিয়ার নুস্‌বাউম জার্ম্মাণ কৃষি-যন্ত্র-শিল্পের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। "ডায়চে আল্‌গেমাইনে ৎসাইটুঙ্" কাগজে সারাংশ বাহির হইয়াছে। বক্তা বলিতেছেন,—"১৯১৩ সনে জার্ম্মাণ কৃষি-যন্ত্র যে দরে বিক্রী হইত আজ তাহার চেয়ে দর শতকরা মাত্র ২৫-৩০ বেশী। যন্ত্রপাতি তৈয়ারী করিতে যে সব জিনিষের দরকার তাহার দর আরও অনেক বেশী বাড়িয়া গিয়াছে। আবার, অন্যান্য শ্রেণীর যন্ত্রপাতির দর ১৯১৩ সনের তুলনায় শতকরা ১৫৮ হিসাবে বাড়িয়াছে। অতএব কৃষি-বিষয়ক যন্ত্র-পাতির ফ্যাক্টরিওয়ালারা সমবেত ভাবে একটা "প্রাইসকোন্‌ভেন্‌ট্‌সিয়োন" (দাম-সমঝৌতা) খাড়া করুন।"

বিদেশে জার্ম্মাণ কৃষি-যন্ত্র

নুস্‌বাউমের বক্তৃতায় জানা গেল যে, ১৯২৫ সনে জার্ম্মাণ ফ্যাক্টরিতে ৩৭৫,০০০ টন কৃষি-যন্ত্র তৈয়ারী হইয়াছে। তাহার ভিতর মাত্র ৭৫,০০০ টন বিদেশে রপ্তানি গিয়াছে। মোটের উপর এই শিল্পটাকে নুস্‌বাউম রপ্তানি শিল্পের হিসাবে বড় বিবেচনা করেন না। অথচ জার্ম্মাণরা ১৯২৫ সনে যত প্রকার যন্ত্রপাতি বিদেশে বেচিয়াছে তাহার শতকরা ১৮ অংশই ছিল কৃষি-বিষয়ক যন্ত্র।

সার বনাম কৃষি-যন্ত্র

বক্তৃতার এক অংশে নুস্‌বাউম বলিতেছেন "গবর্মেণ্টের বর্ত্তমান কৃষি-নীতিতে সারের ব্যবসার প্রতি পক্ষপাত দেখা যাইতেছে। এই ব্যবসার লোকেরা সরকারী খাজাঞ্চিখানা হইতে বহুকালের জন্য প্রচুর পরিমাণে কর্জ্জ পাইয়া থাকে। কিন্তু কৃষি-যন্ত্রের কারখানাওয়ালারা সরকারী কর্জ্জ এখনো অতি কম মাত্রায় ভোগ করিতেছে। এই

সকল কারখানার সংখ্যা আজকাল প্রায় ১০০০। এই সমুদয়ে লোক খাটে ৬০,০০০। কাজেই এই কারবারকে অগ্রাহ্য করা চলে না। বস্তুতঃ, এত বড় কারবার গবর্মেন্টের নিকট হইতে সহজ কড়ারে কর্জ্জ পাওয়া দাবী করিতে অধিকারী।"

প্যারিসে পাখী ও মাছের প্রদর্শনী

ফরাসী কৃষি-সচিবের তদবিরে প্যারিসে ছনিয়ার পাখী ও মাছ প্রদর্শিত হইয়া গেল। ৫৩ বৎসর পূর্ব্বে এই প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠা হয়। এই বৎসর ৯,০০০ এর বেশী পাখী প্রদর্শিত হইয়াছে।

ফরাসী মজুরদের উচ্চ শিক্ষা

ফ্রান্সের "শাঁবর দে দেপুতে"র (পার্লামেন্টের) টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা কমিটিতে বক্তৃতা করিতে গিয়া পোল বেনাজে বলিয়াছেন:—"আপনারা সকলেই জানেন যে, ১৯১৩ সনের জুন মাসে 'লোআ আস্তিয়ে' (শ্রীযুক্ত আস্তিয়ের নামে পরিচিত আইন) জারী হইয়াছে। সেই আইন অনুসারে সকল লোককে কাজ করাইতে করাইতে আমার কর্ম্মক্ষেত্র বাড়িয়া গিয়াছে। আইনটা বাধ্যতামূলক। কোনো কারখানা, ফ্যাক্টরি বা কর্ম্ম-কেন্দ্রই এই আইনের আওতা হইতে মুক্তি পাইবে না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ মজুরদিগের জন্য বিনা পয়সায় উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে বাধ্য। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কারখানার মালিকেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই এই দায়িত্ব পালন করিতেছেন।"

বিলাতী কাগজে জার্ম্মাণ বিজ্ঞাপন

লণ্ডনের "ডেলি মেল" দৈনিকে আজও জার্ম্মাণির বিরুদ্ধে এবং জার্ম্মাণ মাল-খরিদের বিরুদ্ধে জবর প্রোপাগাণ্ডা চলিতেছে। তাহা ছাড়া, একমাত্র বিলাতী দ্রব্য খরিদ করিবার জন্য, দেশের সর্ব্বত্র নরনারীকে উদ্বুদ্ধ করা হইতেছে। বিশেষ কথা এই যে,—লোহালক্কড়, তড়িতের যন্ত্রপাতি এবং ঐ জাতীয় দ্রব্যের পত্রিকাগুলায় জার্ম্মাণ কোম্পানীর বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হইতেছে না।

১৯২৫ সনের ডিসেম্বর মাসে কয়েকটা ইংরেজী পত্রিকার জবাব দেখিতেছি। "আয়রণ-মঙ্গার" (লোহার বেপারী) কাগজের কর্ম্মকর্ত্তা জার্ম্মাণ বিজ্ঞাপনদাতাকে জানাইয়াছেন, "জার্ম্মাণ বেপারীদের নিকট হইতে বিজ্ঞাপন লইবার সময় এখনো আসিয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নয়।"

"ইলেক্‌ট্রিক্যাল রিভিউ" লিখিয়াছেন,—"জার্ম্মাণির বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়।"

"বৃটিশ ট্রেড জার্ণ্যাল" বলিয়াছেন,—"আমাদের বিজ্ঞাপন-পৃষ্ঠাগুলা একমাত্র বিলাতী মালের জন্যই বাঁধা রাখিয়া থাকি।"

বার্লিন শহরের রেলপথ

"বার্লিন শহর" রেল কোম্পানীর নিকট হইতে নগরের রেলপথগুলা কিনিয়া লইবার প্রস্তাব করিতেছে। বিপক্ষে দাঁড়াইয়াছেন ন্যাশন্যালিষ্ট দলের মাতব্বরেরা। তাঁহাদের বিশ্বাস, এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে জার্ম্মাণ সমাজে আর্থিক ব্যবস্থার উপর "কম্যুনিটি"র অর্থাৎ দেশের বা রাষ্ট্রের এক্তিয়ার বাড়িতে থাকিবে। বস্তুতঃ, প্রকারান্তরে বোল্‌শেভিজমের একটা বড় খুঁটা সমাজে গাড়া হইয়া যাইবে।

সিনেমায় খাঁটি দুধ

বার্লিনের "উরাণিয়া" নামক সার্ব্বজনিক বক্তৃতাভবনে "খাঁটি দুধ"-বিষয়ক সিনেমা প্রদর্শিত হইয়াছে। বিপুল মহানগরীর দুধের যোগান কিরূপে সাধিত হয় তাহার খুঁটি-নাটি সবই দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। যুদ্ধের সময়ে, এবং কিছুকাল ধরিয়া যুদ্ধের পরেও, জার্ম্মাণির শহরে শহরে দুধের দুর্ভিক্ষ ছিল। কিন্তু এক্ষণে দুধ সম্বন্ধে প্রাক্‌-লড়াইয়ের যুগ ফিরিয়া আসিয়াছে। জার্ম্মাণরা সুখে আছে এবং ভবিষ্যতে দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির আশা করিতেছে।

রাসায়নিক এঞ্জিনিয়ার

সিভিল এঞ্জিনিয়ার, ইলেক্‌ট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ার এবং মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ার আমাদের দেশে অল্পবিস্তর পরিচিত। কিন্তু কেমিক্যাল এঞ্জিনিয়ার কি জীব, তা আমাদের দেশে এখনও বিশেষ জানা নাই। কেমিক্যাল এঞ্জিনিয়ারের জন্ম

আমেরিকায়। এখন কিন্তু ইংল্যণ্ড এবং জার্ম্মাণিতেও এই পদবীওয়ালা লোক দেখা যাইতেছে। ফ্রান্সেও এই দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে।

কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের কেমিষ্ট্রি সাধারণতঃ যতটা জানা দরকার, তা তো জানিতেই হয়, অধিকন্তু, মেকানিক্যাল ও ইলেক্‌ট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং বিষয়েও তার মোটামুটি পরিচয় থাকা চাই; সুতরাং ড্রয়িং (সেক্‌সান্‌, প্রজেক্‌সন্‌, মেসিন ড্রয়িং) সঙ্গে সঙ্গেই আসে।

কেমিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিংএর আলোচ্য বিষয়

কেমিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং বলিলে নিম্নলিখিত বিষয়ের আলোচনা বুঝিতে হইবে:—

(১) কাঁচা মাল ও তৈয়ারী (পাকা) মালের পরিমাণের সম্বন্ধ-নির্ণয়।

(২) কঠিন পদার্থ স্থানান্তরীকরণ।

(৩) তরল " "

(৪) বায়বীয় " "

(৫) বিভিন্ন প্রকারের কঠিন পদার্থ ভগ্ন ও চূর্ণীকরণ।

(৬) কাঁচামালের মিশ্রণ।

(৭) সর্ব্বপ্রকার চুল্লী-নির্ম্মাণের এবং তাহা চালাইবার ব্যবস্থা এবং উত্তাপ ও তাপমান নির্ণয়।

(৮) মিশ্র বস্তুর বিভিন্ন পদার্থ পৃথক-করণ।

(৯) ফিল্‌ট্রেশ্যান্‌

(১০) বাষ্পীকরণ

(১১) শুষ্কীকরণ

(১২) ডিষ্টিলেশ্যান্‌ (চোঁআনো)

(১৩) দানা বাঁধানো

(১৪) কারখানা নির্ম্মাণ

(১৫) অর্থের বিলিব্যবস্থা

শিল্পকর্ম্মের চিত্তবিজ্ঞান

"প্‌সিকো-টেক্‌নিক" নামক একটা বিদ্যা কয়েক বৎসর ধরিয়া জার্ম্মাণির শিল্প-কারখানা, ফ্যাক্টরি, এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সংসারে মাথা তুলিয়াছে। ইয়োরামেরিকার অন্যান্য দেশেও এই সকল টেক্‌নিক্যাল কর্ম্ম-ঘটিত চিত্ত-বিজ্ঞানের কথা শুনা যায়। কোন্‌ কোন্‌ কাজের জন্য কোন কোন্‌ মজুর বা কেরাণী বিশেষরূপে যোগ্যতাবিশিষ্ট তাহা বিচার-পূর্ব্বক নির্ণয় করা এই বিজ্ঞানের কার্য্য।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্ত-বিজ্ঞানের অধ্যাপক,—জার্ম্মাণ পণ্ডিত,—হুগো মুনষ্টারব্যর্গ রেলওয়ের কর্ম্মচারীদের লইয়া সর্ব্বপ্রথম এই বিষয়ে অনুসন্ধান এবং পরীক্ষা চালাইতে ব্রতী হন। এঞ্জিনিয়ার ডকটর সিন্নার বলিতেছেন,—"জার্ম্মাণিতে যুদ্ধের সময়ে এই বিদ্যার প্রচুর সাহায্য লওয়া হইয়াছে। অটোমোবিল, উড়োজাহাজ ইত্যাদির কাজে লোক বাছাই করিবার জন্য প্‌সিকো-টেকনিক বিদ্যা বেশ কাজে লাগিয়াছে। যুদ্ধের পর ট্রাম, রেল, এবং নানাপ্রকার যন্ত্রপাতি-ঘটিত কারখানায় এই বিদ্যার সাহায্যে সুফল পাওয়া গিয়াছে।" এই সকল বিষয় "প্‌সিকো-টেক্‌নিশে ৎসাইট্‌শ্রিফ্‌ট্‌" নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকায় আলোচিত হইয়াছে। প্রকাশক ওল্‌ডেনবুর্গ কোম্পানী, বার্লিন। অধ্যাপক হান্‌স্‌ রুপ্‌প পত্রিকার সম্পাদক।

রুশ-ফরাসী বিতণ্ডা

রুশিয়ার সঙ্গে ফ্রান্সের বিতণ্ডা এখনো শেষ অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে কিনা সন্দেহ। তবে রুশ গবর্মেণ্ট যুদ্ধের পূর্ব্বেকার ফরাসীদের দেওয়া কর্জ্জ "কিছু কিছু" স্বীকার করিতে রাজি হইয়াছেন। কিন্তু বিপ্লবের সময়ে যেসকল ফরাসীদের ধনেপ্রাণে অনিষ্ট ঘটিয়াছে তাহাদের ক্ষতিপূরণ করিতে সোহ্বিয়েট রুশিয়া রাজি নন। ব্যাপার কোথায় গিয়া ঠেকে এখনো বলা যায় না।

বিশ্ব-বাণিজ্যের বর্ত্তমান গতি

বার্লিনের "ইণ্ডুষ্ট্রী-উণ্ড-হাণ্ডেল্‌স্‌-কাম্মারের" (শিল্প-বাণিজ্য সঙ্ঘের) এক বৈঠকে জার্ম্মাণ মন্ত্রী অধ্যাপক হির্শ "আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের বর্ত্তমান সমস্যা" সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করিয়াছেন। বক্তার মতে, কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত পৃথিবীর সকল দেশেই অন্তর্ব্বাণিজ্যের ঠাঁই বহির্ব্বাণিজ্যের চেয়ে উঁচু ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ বহির্ব্বাণিজ্যের পরিমাণ প্রত্যেক দেশের অন্তর্ব্বাণিজ্যকে ছাপাইয়া উঠিতেছে। ১৯২১ সনের পর

হইতে বহির্ব্বাণিজ্য দিনদিনই বাড়িয়া যাইতেছে। এই হিসাবে প্রাক্-লড়াইয়ের অবস্থা ছাড়াইয়া যাওয়াও হইয়াছে।

হির্শ বলিতেছেন,—"বিশ্ববাণিজ্যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের হিস্যা পূর্ব্বেকার চেয়ে ৳ অংশ বাড়িয়াছে। বিলাতের অবস্থা এক্ষণে প্রায় পূর্ব্ববৎ। জার্ম্মাণি আমদানি-বাণিজ্যে পূর্ব্বের অবস্থায়ই আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু রপ্তানির হিসাবে এক্ষণে ১৯১৩ সনের শতকরা ৮৫ অংশ মাত্র জার্ম্মাণরা ভোগ করিতেছে।"

বালফোর বনাম হির্শ্

বিলাতের বালফোর বিশ্ববাণিজ্যের ওলট-পালট সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"যুদ্ধের পূর্ব্বে যে-সকল দেশ বিদেশ হইতে মাল আমদানি করিত আজকাল তাহারা প্রায় সকলেই স্বদেশী শিল্প প্রবর্ত্তন করিয়াছে। কাজেই দুনিয়ার বাজারের দিক্-পরিবর্ত্তন ঘটিতে বাধ্য।" জার্ম্মাণ পণ্ডিত হির্শ্ বলিতেছেন,—এই স্বদেশী আন্দোলনকেই বিশ্ববাণিজ্যের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে একমাত্র অথবা প্রধান দায়িত্ব দিলে চলিবে না!

জগদ্ব্যাপী দারিদ্র্য

তাঁহার মতে,—প্রত্যেক দেশের ক্রয়-ক্ষমতা কমিয়া গিয়াছে প্রচুর পরিমাণে। এই ক্রয়-ক্ষমতার অল্পতাই বর্ত্তমান অবস্থার প্রধান কারণ। যুদ্ধের লোকসান বশতঃ ইয়োরোপের বর্ত্তমান দারিদ্র্য সকলেরই জানা জিনিষ। হির্শ্ বলিতেছেন,—"এই দারিদ্র্যের দরুণ এশিয়া এবং আফ্রিকার লোকেরা ও যে দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে তাহা বুঝা আবশ্যক। ইয়োরোপের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া এইসকল কৃষি-প্রধান দেশের নরনারী কুদরতী মাল যোগাইয়া নিজ নিজ সম্পদ্ বৃদ্ধি করিত। কিন্তু ইয়োরোপের সম্পদে ভাঁটা পড়ায় এশিয়ার এবং আফ্রিকারও যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। সুতরাং বিশ্ববাণিজ্যের উপর এই জগদ্ব্যাপী দারিদ্র্যের প্রভাব দেখা যাইতে বাধ্য।"

কয়লা ও কুদরতী মাল

কয়লার ব্যবহার আজকাল অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। তাহার ফলেও ইয়োরোপের আর্থিক অবস্থার রূপান্তর ঘটিতেছে। হির্শ্ বলিতেছেন;—"পূর্ব্বে কয়লা রপ্তানি হইত পশ্চিম ইয়োরোপ হইতে। কয়লার জাহাজে সস্তা মাশুলে ইয়োরোপে আমদানি হইত খাদ্যদ্রব্য আর কারখানায় ব্যবহারোপযোগী কুদরতী মাল। কিন্তু কয়লার জাহাজ আজকাল বেশী যায় না বিদেশে। কাজেই বিদেশী মাল ইয়োরোপে পৌছে কথঞ্চিৎ চড়া খরচে।"

সোসিয়েতে দ' শিমি অ্যাঁদুস্ত্রিয়েল

প্যারিসের "সোসিয়েতে দ' শিমি অ্যাঁদুস্ত্রিয়েল" (শিল্প-রসায়ন-পরিষৎ) এর এক সভায় শ্রীযুক্ত জ্যাঁ আর্ণুল, তাঁহার তৈয়ারী একটা নূতন সিমেন্টের পরিচয় দিয়াছেন।

কাগজের শিল্প

ফ্রান্সের মধ্য-দক্ষিণ অঞ্চলে গ্রেণোব্ল্ বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ অঙ্গের শিল্প-শিক্ষার কেন্দ্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। এইখানে কাগজ-সম্বন্ধে রাসায়নিক এবং যান্ত্রিক সকল প্রকার শিক্ষা দেওয়া হয়। কাগজ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক মোরিস ব্রো সম্প্রতি পূর্ব্ব ফ্রান্সের "সোসিয়েতে অ্যাঁদুস্ত্রিয়েল" (শিল্প-সমিতি) কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। নাঁসি নগরে সভা বসিয়াছিল। ব্রো বলিয়াছেন:—"ফ্রান্স এক্ষণে কাগজের জন্য অনেক পরিমাণে বিদেশের উপর নির্ভর করিতেছে। কাগজ তৈয়ারীর বিদ্যায় মনোযোগী না হইলে ফরাসীরা আরও বহুকাল বিদেশী কাগজ কিনিতে বাধ্য থাকিবে।"

ঢালাই-পরিষৎ

ফ্রান্সের ঢালাই-কারখানাগুলা এক "সিঁদিকায়" (সিণ্ডিকেটে) সঙ্ঘবদ্ধ। তাহার বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট ড্যুফুর "অ্যাসোসিয়াসিওঁ টেক্‌নিক দ' ফঁদারি"র (ঢালাই-পরিষদের) উদ্যোগে "একল দার এ মেতিয়ে" নামক প্যারিসের শিল্প-কলেজে একটা বক্তৃতা করিয়াছেন। আলোচ্য বিষয়,—"ঢালাই-কারখানায় পরিচালকের কর্ম্ম।"

ঘরবাড়ী নির্ম্মাণের ব্যবসা

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ করের মতামত

কলিকাতার "কর কোম্পানী" ঘরবাড়ী নির্ম্মাণের কারবারে বেশ নাম করিয়াছেন। কিছুদিন হইল যশোহর-ঝিনাইদহ রেল-লাইনও এই কোম্পানীর হাতে আসিয়াছে। ইঁহাদের প্রতিষ্ঠাতা এঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ করের সঙ্গে আমাদের যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহার শর্টহাণ্ড বিবরণ দুই দফায় প্রকাশ করিব। এ-যাত্রায় ঘরবাড়ী নির্ম্মাণের ব্যবসা সম্বন্ধে উপেনবাবুর মতামত প্রকাশ করা যাইতেছে। (শর্টহাণ্ড লইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার চৌধুরী)।

প্রশ্ন। আপনাকে বিল্ডিং কনট্রাক্ট অর্থাৎ বাড়ীঘর তৈয়ারী সম্বন্ধে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। প্রশ্ন হচ্ছে কলিকাতায় যেসব কাজ চলেছে—সেই লর্ড কার্জ্জনের আমল থেকে আরম্ভ করে' বর্ত্তমানের "ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট" পর্য্যন্ত—এই সব বিল্ডিংএর নানা কারবারে আমাদের বাঙালী এঞ্জিনিয়ার ও কণ্ট্রাক্টারের লাভালাভ কি রকম হয়? এক কথায়, বাঙালী এঞ্জিনিয়ার ও কণ্ট্রাক্টারদের সংখ্যা গুণতি হিসাবে ও কাজের পরিমাণ হিসাবে কতটা বেড়েছে?

উঃ—বড় বড় "ফার্ম্মের" কাজ যে বেড়েছে মনে হয় না, তবে ছোট ছোট অনেকগুলি হয়েছে। কোনোটিই কিন্তু,—অল্প কয়েকটী ব্যতীত—বেশ সচ্ছল নয়।

প্রঃ—নাম করতে পারেন?

উঃ—বড় বড় "ফার্ম" যথা, জে, সি, বানার্জ্জি, অপূর্ব্ব আদিত্য, আমরা, এবং ছোট ছোট যেমন পি, সি, মিত্র, মহেন্দ্র সিংহ, যতীন সেন, প্রকাশচন্দ্র মিত্র ইত্যাদি।

প্রঃ—এই সব কোম্পানীর অধিকাংশই কি নূতন সৃষ্টি, না ১৫।২০ বৎসর আগেও ছিল?

উঃ—জে, সি, বানার্জ্জি, অপূর্ব্ব আদিত্য ও আমরা ১৬।১৭ বৎসর আগে ছিলাম, তারপর প্রকাশ মিত্র ইত্যাদির আরম্ভ।

প্রঃ—আপনি যে কয়টা ফার্ম্মের নাম করলেন এরা সকলেই কি "জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী" হিসাবে কাজ চালাচ্ছে, না, প্রত্যেকেই নিজ নিজ ব্যক্তিগত দায়িত্বে?

উঃ—"জয়েণ্ট ষ্টক" একটীও নাই।

প্রঃ—বিদেশী কোম্পানীর—ইংরেজ কোম্পানীর সংখ্যা কেমন বেড়েছে?

উঃ—নূতন একটীও দাঁড়াতে পারেনি। মধ্যে হয়েছিল, গিয়েছে। চার্লস্‌ব্রুক্‌ বলে একটা হয়েছিল, গেছে। এখন পর্য্যন্ত ম্যাকিণ্টস বার্ণ কোম্পানী টিকে আছে। এরা জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী। উইভার বলে, আর একটী হয়েছিল, গিয়েছে। তারপর মার্টিন আছে, সে ত অনেক দিনের। আর কোনো ইংরেজ ফার্ম নাই।

প্রঃ—আপনাদের কোম্পানীর শেয়ার বেচা হয় কি?

উঃ—শেয়ার দু'একটা দিই বটে। কিন্তু সে ভাবে

কোম্পানী এখনো রেজিষ্টার্ড হয় নি। এখনও প্রোপ্রাইটরী (ব্যক্তিগত সম্পত্তি) ভাবেই চলছে। জে, সি, বানার্জিও তাই।

প্রঃ—আচ্ছা, বিল্ডিং ট্রেডের ঝুঁকিটা বেশী কোথায়?

উঃ—ঝুঁকি মানে?

প্রঃ—কোন্ দিক্ থেকে লোকসানের সম্ভাবনা বেশী?

উঃ—সাহেবরা যদি কণ্ট্রাক্টি নেয়, জোর করে টাকা আদায় করে। কিন্তু টাকা আদায় করা আমাদের মুস্কিল। দেনাদাররা হয়রান না করে টাকা দেয় না।

প্রঃ—আচ্ছা, আপনি বাড়ী তৈয়ারী করতে যে মালপত্র ব্যবহার করেন, তার অধিকাংশ খরিদ করেন, না, তৈয়ারী করেন?

উঃ—খরিদ করি।

প্রঃ—আচ্ছা, কোম্পানী নয়, অথচ ছোট-খাট ঘরবাড়ী তৈয়ারীর কারবার করে, এই রকম বাঙালী কত জন আছে?

উঃ—খুব বেশী নয়, অবস্থা খারাপ হওয়ায় কমে গেছে। ৫।৬ জন হবে।

প্রঃ—কলিকাতায় যেসব বাড়ী তৈয়ারী হয়, বাড়ীওয়ালারা সেসব নিজে তদবির করে, না, কণ্ট্রাক্টার এঞ্জিনিয়ার-দের হাতদিয়ে করান হয়?

উঃ—সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউতে যতগুলি বাড়ী হয়েছে প্রায়ই মাড়োয়ারীর—সব ই, বি, রেলওয়ের একজন এঞ্জিনি-য়ারের সুপারভিশনে হয়েছে।

প্রঃ—তাহলে বেশীর ভাগ লোক নিজের দায়িত্বে এঞ্জিনিয়ার রেখে তৈয়ারী করে?

উঃ—সকলে এঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত করে না।

প্রঃ—আপনি যেসব বাড়ীর ফরমায়েস পাচ্ছেন সেগুলি কি ধরণের বাড়ী?

উঃ—বড়ও আছে, ছোটও আছে। ছোট বাড়ী আমরা সাধারণতঃ নিই না। ৫০ হাজার থেকে ৭ লাখ টাকা পর্য্যন্ত যেসব বাড়ীতে লাগে, আমরা সেই সবই করেছি।

প্রঃ—আচ্ছা, কলিকাতার ভিতর আপনাদের নিজের তৈয়ারী উল্লেখ-যোগ্য বাড়ী কোন্ কোন্টী?

উঃ—ডেভিস্ কোম্পানীর বিল্ডিং, এটা আফিস ভাড়া দেবার জন্য হয়েছে। তদভিন্ন মেডিকেল কলেজের চক্ষুর হাসপাতাল, তারপর বেঙ্গল সার্ভে আফিস। মিসেস মিত্রের বাড়ী অতি সুন্দর বিল্ডিং। তা ছাড়া আরো আছে।

প্রঃ—কলিকাতার বাইরের উল্লেখযোগ্য কোনো ইমারত আপনাদের গড়া কি?

উঃ—কলিকাতার চেয়ে বাইরেই বেশীরভাগ আমাদের কাজ। জামসেদপুরে আছে ডিরেক্টরের আফিস আর আফজাজ ইনষ্টিটিউট। এই ২টা বিল্ডিং উল্লেখযোগ্য। তদভিন্ন পাটনা কলেজ, গয়া ওয়াটার ওয়ার্কস। উত্তর-পাড়া, কৃষ্ণনগর, নৈহাটিতেও আছে। এখন ত কলিকাতা কর্পোরেশনের পলতা ইমপ্রুভমেণ্ট স্কীমে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার কাজ এসেছে। তা ছাড়া কোন্নগর স্কুল, নৈহাটী জুট মিল, গৌরীপুর জুট মিল, নদীয়া ও মেঘনা জুট মিল আছে।

প্রঃ—আমাদের দেশের যারা ১৫ বৎসর ধরে' এই কাজ করছে তাদের আর্থিক অবস্থা কি রকম? এই যে নূতন নূতন বাড়ী প্রস্তুত হচ্ছে তার সঙ্গে নূতন নূতন বাঙালীর কিছু অন্ন-সংস্থান হচ্ছে না কি? বিল্ডিং ট্রেডের ভিতর দিয়ে নূতন নূতন পরিবারের রোজগার বাড়ছে না কি?

উঃ—বিশেষ কিছু হয়েছে বলে মনে করি না।

প্রঃ—কেন বিশেষ কিছু নয়? ধরুন কলিকাতার কথা। এখানে সর্ব্বত্রই দেখ্‌ছি বাড়ীঘর তৈয়ারী হচ্ছে ও হয়েছে। এতে কি নানা ব্যবসায়ের অনেক লোকের কাজ হচ্ছে না?

উঃ—ইটের ব্যবসা ধরুন। এতে দামের উঠা-পড়া অতি ভীষণ। যখন ইটের দাম বেড়ে গেল লোকে বেশী টাকা দিয়ে জায়গা-জমি কিন্‌লে, কিনে ইট তৈয়ারী করতে আরম্ভ করলে। তারপর ইটের বাজার পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অনেকে সর্ব্বস্বান্ত হল।

প্রঃ—একি "স্পেকুলেশনের" ফল?

উঃ—যুদ্ধের ফল।

প্রঃ—কদিন চলেছে ?

উঃ—দু-তিন বছর।

প্রঃ—অনেকে তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ?

উঃ—হাঁ, যাঁরা ইটের কারবারে ও লোহার কারবারে যুদ্ধের সময় লাভ করেছে, যুদ্ধের পর তারা ইন্‌সলভেন্ট (দেউলিয়া) হয়েছে।

প্রঃ—কাঠের ব্যবসা ?

উঃ—কাঠের ব্যবসা সমভাবে আছে।

প্রঃ—ধরুন কলিকাতা, অতগুলি বাড়ী ছিল না, হয়েছে। অথবা অতগুলি বাড়ী ভেঙ্গে ফেলতে হয়েছে, ভাঙ্গার পর নূতন করে তৈয়ারী করতে হয়েছে। তাতে লোক দরকার। আপনি কি বলছেন কেরাণী হিসাবে, কন্‌ট্রাক্টার হিসাবে, ইটের ব্যবসা হিসাবে, কাঠের আমদানি-রপ্তানি হিসাবে অনেকগুলি নূতন পথ খোলে নি ?

উঃ—কাঠের ব্যবসাদার বড় ত দেখি না। তাতে কেহ বড় মানুষ হয়েছে বলে বিশ্বাস করি না। তবে মজুর বেশী নিযুক্ত হয়েছে।

প্রঃ—এই কলকাতা শহরে বাড়ী তৈয়ারী করবার ব্যবসাতে মোটের উপর কোন্ খাতে খরচ বেশী হয় ?

উঃ—ইট। তবে আজকাল যে "ষ্ট্রাকচার্যাল বিল্ডিং হয়েছে তাতে লোহা বেশী ব্যবহৃত হয়।

প্রঃ—আচ্ছা, ৫০ হাজার কি লাখ টাকার বাড়ীতে লোকের মজুরির সঙ্গে মালের (ইট, কাঠ প্রভৃতির) দামের তুলনায় যদি অনুপাত করতে যাই, তাহলে কি রকম দাঁড়াবে ?

উঃ—আমার বোধ হয় ২৫ : ৭৫। ইট, কাঠ প্রভৃতি ২৫ পারসেন্ট, মজুরি শতকরা ৭৫ অংশ। এই গেল সাধারণ ইটের বাড়ীতে। এখন ইট কমে যাবে, লোহা বাড়বে।

প্রঃ—এই যে বাড়ী প্রস্তুত হচ্ছে সেই সবের "ষ্টাইল" (বাস্তু রীতি) সম্বন্ধে বাড়ীওয়ালারা কিছু বলে কি ? এই রকম করতে হবে, ও রকম করতে হবে না, বা ঐ ধরণের কোনো কথাবার্তা হয় কি ?

উঃ—পাবলিক বিল্ডিং, পাবলিক ওয়ার্কস্, কি কর্পোরেশনের কাজে বাঁধাবাঁধি আছে। গভর্ণমেন্ট কিংবা আধা-গভর্ণমেন্ট-স্থানীয় কর্ম্ম-কেন্দ্রের কর্ত্তারা নিজেই "প্ল্যান" করে, আমাদিগকে সেই অনুসারে কাজ করতে হয়। জুটমিলের নক্‌সা আমাদিগকে করতে হয়েছে। নূতন নূতন যেসব বসতবাড়ী হয় তার নক্‌সাও আমরা দিই।

প্রঃ—আপনার ফার্মে সাধারণতঃ কোন্ গড়ন-প্রণালী অবলম্বিত হয় ? আমাদের দেশে পুরানো যে "ষ্টাইল" আছে, তাই, না, আধুনিক পাশ্চাত্য ষ্টাইল ?

উঃ—ইয়োরোপীয়ান। তবে গয়া ওয়ার্কস ইণ্ডিয়ান ষ্টাইলে হয়েছে। মিঃ ভেণ্ডার ভারতীয় বাস্তুরীতি সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান চালিয়ে এইটা খাড়া করেছেন।

প্রঃ—কোনো লোক যদি জিজ্ঞাসা করে,—অতগুলি বাড়ী প্রস্তুত করবার ভার যখন রয়েছে এবং থাকবে তখন আস্তে আস্তে হিঁদুয়ানী কি মোগলাই আমলের কোনো একটা নক্‌সা, কি সাজ গোজ, কি নূতন কিছু করবার চেষ্টা করছনা কেন ?

উঃ—মামুলি বসতবাড়ী যারা করে তারা ঐ রকম ডিজাইন করতে পারে না। কিন্তু যে সকল বাস্তু এঞ্জিনিয়ার রেখে বাড়ী করতে চায়, তারা চেষ্টা করলে করতে পারে। আমি এ ধরণের কাজের বিরুদ্ধে কিছু বলতে চাই না, বরং আমি এর স্বপক্ষে।

প্রঃ—বাড়ীওয়ালার নিজের মাথায় যদি কিছু থাকে তবে এটা করা কি সম্ভব মনে করেন ?

উঃ—হাঁ।

প্রঃ—আপনি কি মনে করেন আমাদের দেশে অদূর ভবিষ্যতে বেশ বড় বড় ইমারত তৈয়ারী করবার দরকার বেড়ে যাবে ?

উঃ—আমি পেসিমিষ্ট (নৈরাশ্যবাদী) নই। তবে ব্যবসা বাণিজ্যের বহর এবং আকার-প্রকার না বাড়লে কিছু হবে বলে আমি আশা করি না।

প্রঃ—আজকাল যেসব বড় বড় বাড়ী হচ্ছে, সেগুলার মালিক কি আমাদের দেশী লোকই ? আর তৈয়ারীও হয় কি দেশীদেরই হাতে ?

উঃ—প্রাইভেট বিল্ডিং ২ রকম—বসতবাড়ী এবং আফিস বা কর্ম্মকেন্দ্র। সেসব প্রায়ই দেশী লোকদের হাতে।

প্রঃ—বাংলাদেশে আপনাদের কাজের ভবিষ্যৎ কি রকম?

উঃ—ডিষ্ট্রিক্ট টাউন ইত্যাদিতে, জেলার হেড কোয়ার্টারে, যেখানে পালিটিকেল সেন্‌টার, গভর্ণমেণ্টের সৈন্য থাকে সেসব জায়গায় কিছু-কিছু আছে। পল্লীগ্রামে যেসব বিল্ডিং হয় তা ছোট ছোট কণ্ট্রাক্টারদের হাতে। কিন্তু অত ছোট কণ্ট্রাক্ট নিয়ে মফঃস্বলে যাওয়া আমাদের পক্ষে পোষায় না।

প্রঃ—ঘর-বাড়ীর ব্যবসা সম্বন্ধে ভালমন্দ, স্বপক্ষে বিপক্ষে, আপনি দেশের লোককে কিছু বলতে চান কি?

উঃ—শিল্প-বাণিজ্যের দিক্ থেকে দেখা যায় যে, ব্যাঙ্কের সুযোগ না বাড়লে আমরা কোনো দিকেই এগুতে পারব না। আমরা বিল্ডিং ট্রেড করে দেখেছি প্রাইভেট বিল্ডিংএ টাকা আদায় করা দুষ্কর ব্যাপার। ব্যাঙ্কিংয়ের সুযোগ থাকলে সে অসুবিধা হত না। একটা দৃষ্টান্ত দিই, ধরুন কোনো নামজাদা বাঙালীর বাড়ী তৈয়ারীর কাজ নিলাম। কাজ শেষ হওয়ার পর ১৬ মাস চলে গেল টাকা পাচ্ছিনা। তাগাদা করতে করতে হয়রান হচ্ছি, তারই মধ্যে তিনি মারা গেলেন। উইলের প্রোবেটের জন্য টাকা আটকে পড়ল, কবে পাব ঠিক নাই। কিন্তু একটা বড় ব্যাঙ্ক যদি আমাদের পেছনে দাঁড়ায় তা হলে আপদ্ চুকে যায়। একাধিক নামজাদা স্বদেশী জননায়কের বাড়ী নির্ম্মাণ করে আমরা এইরূপে মহা বিপদে পড়েছি। আমাদের দেশে যেসব ব্যাঙ্ক আছে তারা আমাদের সাহায্য করতে আসে না।

প্রঃ—আচ্ছা, সরকারী বা আধা-সরকারী ঘরবাড়ী তৈয়ারী সম্বন্ধে আইন-কানুন কিরূপ?

উঃ—বাংলা দেশের আইন বা দস্তুরটা সন্তোষজনক নয়। কলিকাতা কর্পোরেশনের যেসব প্রাইভেট বিল্ডিং হয় তাতে অন্ততঃ সুপারভিশানটা এক্সপার্ট এঞ্জিনিয়ারের হাতে থাকা উচিত। নইলে বিল্ডিং খারাপ করে ফেলে, ভেঙ্গে পড়তে পারে ও নানা বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। বোম্বে কর্পোরেশনে তা আছে। সুদক্ষ এঞ্জিনিয়ারের সুপারভিশনে ভিন্ন কোন বিল্ডিং সেখানে প্রস্তুত হতে পারে না। কলিকাতায় তা নাই। এ হলে এঞ্জিনিয়ারিং ব্যবসার কোম্পানীরা কাজের সুযোগ পায়, বাড়ীও আশঙ্কা-শূন্য হয়।

প্রঃ—আমি এক জায়গায় কতকগুলি বাড়ী দেখতে গিয়েছিলাম, তাতে দুইখানি ঘর, দেখলাম একটিও জানালা নাই।—তেতলা বাড়ী, রান্নাঘর করেছে এই টেবিলের সমান লম্বা-চওড়া। এ ধরণের ঘর তৈয়ারীর অনুমতি কর্পোরেশন থেকে পাওয়া যায় কি করে বুঝতে পারি না। একজন বল্লে কর্পোরেশনকে বলা হয় নি যে, এটা রান্না-ঘরের জন্য ব্যবহার হবে। এদিকে কর্পোরেশনের দৃষ্টি থাকা আবশ্যক নয় কি?

উঃ—হাঁ, নিশ্চয়ই, তা ছাড়া বিল্ডিং যাতে মজবুত হয় সেদিকেও কর্পোরেশনের দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। এখন যে নকসা তৈয়ারী হয় সাধারণ ড্রাফ্‌ট্‌সম্যানকে ১০।১৫ টাকা দিয়ে করে নেয়। ভিত্তি মজবুত হল কিনা কেহ দেখে না। আমি বলছি কর্পোরেশন থেকে রেগুলেশন, লেজিসলেশন হওয়া উচিত বিল্ডিং যেন শক্ত হয়, সেটা এঞ্জিনিয়ারেরা দেখে দিবে। এই নিয়ম এখানে নাই, বোম্বেতে আছে।

রেহ্বিয়ু একোনোমিক অঁ্যান্তার্ণ্যাশ্যন্যাল
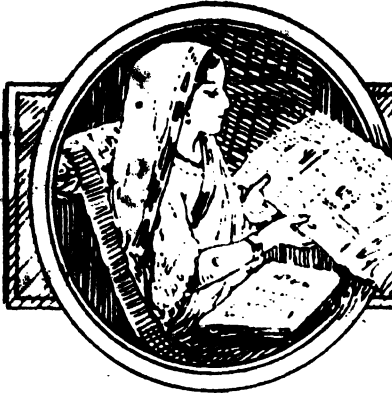
(আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক পত্রিকা), বেলজিয়ামের ব্রুসেল্‌স্ শহর হইতে প্রকাশিত। ত্রৈমাসিক, ১৮ বৎসর ধরিয়া কাগজটা চলিতেছে। প্রতি বৎসর প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠা করিয়া থাকে। ১৯২৫-২৬ সনে যেসকল রচনা বাহির হইয়াছে তাহার ভিতর কয়েকটা নিম্নরূপ—(১) বেলজিয়ান ফ্র্যাঁর উঠানামা-নিবারণ, (২) সোহ্বিয়েট রুশিয়ায় বিদেশী বেপারী (দ' গুলোহ্বিচ্), (৩) হাঙ্গারি দেশের মুদ্রা-সংস্কার (দ' ফেল্‌নার), (৪) বিনিময়ের কোনো স্বাভাবিক হার আছে কি? (আলবেয়ার আফ্‌তালিঅঁ), (৫) বেলজিয়ামের কয়লার কারবারে দুর্য্যোগ (দেল্‌মার), (৬) ফ্রান্সের রাজস্ব-সমস্যা (গিঞ্জু)।

ৎসাইট্‌শ্রিফ্‌ট্ ফ্যির ফোল্‌কস্-হ্বির্ট্‌শাফ্‌ট্ উণ্ড সোৎসিয়াল-পোলিটিক

(ধনবিজ্ঞান-এবং-সমাজনীতি-পত্রিকা), ত্রৈমাসিক। হ্বিয়েনা। প্রকাশক ড্যয়টিকে কোং। ১৯২৬ সনের দ্বিতীয় সংখ্যায় ১১৪ পৃষ্ঠা আছে। উল্লেখযোগ্য:—(১) মুদ্রার দেশী ও বিদেশী দাম। গবর্মেণ্টের আর্থিক রাজনীতির উপর এই দুই প্রকার দাম কতটা নির্ভর করে তাহার আলোচনা (এডুয়ার্ড লুকাস), (২) মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রানীতি। ১৯২০ সনের মুদ্রা-সঙ্কটের পরবর্ত্তী অবস্থা (হায়েক), (৩) ইতালিয়ান ধনবিজ্ঞানাচার্য্য পারেতো,—"অষ্ট্রিয়ান" মতের ধনবিজ্ঞান-ধারায় পারেতোর দান (কুনকে), (৪) ব্যবসা-কলেজে তথ্যতাত্ত্বিক-বিজ্ঞান-বিষয়ক শিক্ষার ব্যবস্থা, দেশের কথা এবং বিদেশী নজির (গুণ্টার ব্রাইস্‌কি)।

সেণ্ট্র্যাল ব্যাঙ্ক্ মান্থ্‌লি নোট্‌স্

বিদেশের বড় বড় ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানের তদবিরে ব্যাঙ্ক-ব্যবসা বিষয়ক পত্রিকা বাহির হইয়া থাকে। সেই সমুদয়ের নজিরে "সেণ্ট্র্যাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া"ও একটা মাসিক চালাইতেছেন। কিন্তু জনসাধারণের নিকট এই পত্রিকা পৌঁছিতে পায় না। সেণ্ট্র্যাল ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীদিগকে ব্যাঙ্ক-বিজ্ঞানে পারদর্শী করিয়া তোলাই এই পত্রিকার উদ্দেশ্য। বোম্বাইয়ের হেড আফিস হইতে প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক সংখ্যাতেই ব্যাঙ্কিং-বিদ্যা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য অনেক তথ্য থাকে।

কলিকাতায় এই ব্যাঙ্কের কয়েকটা শাখা আছে। ১০০ ক্লাইভ ষ্ট্রীটের বাড়ীটায় বড় আফিস চলিয়া থাকে। এই ভবন ব্যাঙ্কেরই নিজ সম্পত্তি। ১৯২৪ সনের জুলাই মাসে ভবনের দুয়ার খোলা হয়। সেই উপলক্ষ্যে স্যর বাজিল ব্ল্যাকেট একটা বক্তৃতা করেন। বিগত দেড় কি দুই বৎসরের ভিতর এই ধরণের আরও কতকগুলা বক্তৃতায় উপলক্ষ্য ঘটিয়াছে। সেই সমুদয় একত্র করিয়া "মান্থলি নোট্‌সের" মার্চ-এপ্রিল মাসের সংখ্যা দেখা দিয়াছে। ভারতে নব্য ব্যাঙ্ক-ব্যবসার ক্রমবিকাশ বুঝিবার জন্য এই সংখ্যাটা বিশেষ সাহায্য করিবে।

আমেরিকান ইকনমিক রিহ্বিউ

মার্কিণ ধনবিজ্ঞান-পরিষদের ত্রৈমাসিক পত্রিকা। বৎসরে প্রায় ৮৫০ পৃষ্ঠা থাকে। আজকাল কাগজটা প্রকাশিত

হয় ইলিনয় প্রদেশের এভান্‌ষ্টন নগর হইতে। ১৯২৫ সনের শেষ সংখ্যায় আছে :—(১) ধনবিজ্ঞান-বিস্তার-উপর আইন-কানুনের প্রভাব (লেহ্‌বেলিন), (২) লড়াইয়েব দেনা-পাওনার সঙ্গে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য-বিষয়ক চিন্তা-প্রণালীর যোগাযোগ কিরূপ ? (মোল্‌টন), (৩) "ফেডারাল ট্রেড কমিশ্যন" নামক বাণিজ্য ব্যবস্থায় ঐক্যবিধায়ক দেশব্যাপী কর্ম্মকেন্দ্রের সাহায্যে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসাজগতে লাভালাভ হইয়াছে কিরূপ ? (ষ্টীভেন্‌স্), (৪) বৎসর কয়েক পরে পরে প্রত্যেক দেশেই যে শিল্প-সঙ্কট, ব্যবসা-সঙ্কট ইত্যাদি দেখা দেয় তাহা সুদের হারের উপর নির্ভর করে কতটা ? (স্নাইডার)।

ইণ্ডিয়ান ইন্‌শিওর‍্যান্স জার্ণ্যাল

(ভারতীয় বীমা-পত্রিকা), নূতন মাসিক, কলিকাতা, ফেব্রুয়ারি ১৯২৬। ভারতীয় বীমা কানুনে যে পরিবর্ত্তন সাধনের প্রস্তাব চলিতেছে তাহার স্বপক্ষে বিপক্ষে এই সংখ্যায় "বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্সে"র মতামত উদ্ধৃত হইয়াছে। "লেজিস্‌লেটিভ্ অ্যাসেম্ব্লি"তে যেসব তর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে তাহার বৃত্তান্তও পাইতেছি।

অল্‌-ইণ্ডিয়া ট্রেড-ইউনিয়ন বুলেটিন

(নিখিল ভারতীয় মজুর-সঙ্ঘ পত্রিকা), বোম্বাই। বৎসর তিনেক ধরিয়া চলিতেছে। মাসিক। ট্রেড ইউনিয়ন ভারতে নতুন জিনিষ। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে আমাদের মজুর-সমাজ দিন দিন ব্যক্তিত্ব-লাভের পথে অগ্রসর হইতেছে। ট্রেড ইউনিয়নের শক্তি যতই বাড়িবে ভারতবর্ষ ততই যথার্থ স্বরাজের পথে উঠিতে থাকিবে। বোম্বাইয়ের এই পত্রিকায় মজুর-সমাজের উন্নতিবিধায়ক দেশী বিদেশী নানা প্রকার সংবাদ এবং আলোচনা বাহির হয়। কিন্তু কাগজের আকার যার পর নাই ছোট। ভারতীয় মজুর-শ্রেণীর অন্যতম হিতৈষী কর্ম্মদক্ষ শ্রীযুক্ত এন্, এম্, যোশী এই পত্রিকার প্রবর্ত্তক।

ইণ্ডিয়ান ট্রেড জার্ণ্যাল

(ভারতীয় বাণিজ্য-পত্রিকা), সাপ্তাহিক, কলিকাতা। ভারত গবর্মেণ্টের "কমার্শ্যাল ইন্টেলিজেন্স্ অ্যাণ্ড ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্" (ব্যবসা-বাণিজ্য-বিষয়ক সংবাদ ও তথ্যতালিকা) বিভাগ এই পত্রিকার প্রকাশক।

এই সরকারী সাপ্তাহিকে আর্থিক ভারতের প্রায় সকল তথ্যই দফায় দফায় জানিতে পারা যায়। বহির্ব্বাণিজ্য বিষয়ক নিয়মকানুন বুঝিবার জন্য এই কাগজ ব্যবসায়ীদের পক্ষে যার পর নাই মূল্যবান্। ভারতের রেলকোম্পানী-সমূহ কখন কোন্ ব্যবসায়ীর হাতে কোন্ মালের জন্য কত টাকার অর্ডার দিতেছে তাহাও প্রকাশিত হইয়া থাকে।

তাহা ছাড়া, ফসলের অবস্থা, আমদানি-রপ্তানির অঙ্ক, সরকারী আয়ব্যয়ের হিসাব ইত্যাদি নানা আর্থিক কথাও নিয়মিতরূপে আলোচিত হয়। প্রবন্ধ প্রকাশ করার দস্তুর নাই। অঙ্ক এবং তথ্যই প্রধান জিনিষ। তবে মধ্যে মধ্যে দেশ-বিদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য-সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণও দেখিতে পাই।

১৬ এপ্রিলের (১৯২৬) পত্রিকায় জাপানের বহি-র্ব্বাণিজ্য সম্বন্ধে ক্ষুদ্র বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে।

এই সংখ্যার এক বিশেষত্ব হইতেছে বিগত ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতীয় জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানীগুলার আর্থিক অবস্থা কিরূপ ছিল তাহার বিশ্লেষণ। এইসকল এবং অন্যান্য তথ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় সাধিত হইলে যুবক বাংলা ধনবিজ্ঞান বিদ্যায় কর্ম্মদক্ষ হইতে পারিবে।

লা জুর্ণে অ্যাঁদুস্ত্রিয়েল

শিল্প দৈনিক। প্যারিস। ব্যবসা, কৃষি, শিল্প, টাকার বাজার, মজুর-জীবন, আর্থিক আইন-কানুন ইত্যাদি বিষয় এই দৈনিকের একমাত্র আলোচ্য বিষয়। এই ধরণের দৈনিক ভারতে নাই।

ডি ইণ্ডাষ্ট্রী উণ্ড হাণ্ডেল্‌স ৎসাইটুঙ্

শিল্প বাণিজ্য পত্রিকা। দৈনিক, বার্লিন। ফ্রান্সের জুর্ণে অ্যাঁদুস্ত্রিয়েল যা, জার্ম্মাণির এই কাগজ তাই।

লা ফোর্মাসিঅঁ প্রোফেসনেল

শিল্প শিক্ষা। পাক্ষিক, প্যারিস। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য

সম্বন্ধে শিক্ষাপ্রণালীর উন্নতি-বিধান করা এই পত্রিকার উদ্দেশ্য। ফরাসী শিক্ষা-সচিবের অধীন কর্ম্মকেন্দ্রের তদবিরে এই পাক্ষিক পরিচালিত হয়। ফ্রান্সে ধনদৌলতের বিদ্যাপীঠ কোন্ নিয়মে এবং কিরূপ আদর্শে পরিচালিত হইতেছে তাহা বুঝিবার পক্ষে এই কাগজ বিশেষ সাহায্য করে।

ওয়েলফেয়ার

(হিতসাধন), মাসিক, কলিকাতা মে, ১৯২৬। উল্লেখ-যোগ্য,—"সোনার সঙ্গে লুকাচুরি" (শ্রীযুক্ত ভানুভূষণ দাসগুপ্ত এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ১৮৩৫ হইতে ১৯২০ পর্য্যন্ত ভারতীয় গবর্মেণ্টের "সোনা বনাম রূপা" নীতির বিভিন্ন অধ্যায় বিবৃত করিয়াছেন)।

জার্ণাল অব পোলিটিক্যাল ইকনমি

ধনবিজ্ঞান-পত্রিকা। আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হয় বৎসরে ছয় বার। ৩৩ বৎসর ধরিয়া চলিতেছে। ১৯২৫ সনের ষষ্ঠ সংখ্যা হইতে কয়েকটা প্রবন্ধের নাম উল্লেখ করা হইতেছে, যথা (১) চিনির চাহিদায় উঠা-নামা। এই সম্বন্ধে তথ্যগুলা একত্র করিয়া অঙ্কের তালিকার সাহায্যে "চাহিদার নিয়ম' প্রতিষ্ঠিত করা হইতেছে। প্রবন্ধ চলিতেছে ধারাবাহিক (শুল্‌টস্)। (২) মূল্য-তত্ত্বে দ্রব্যের প্রয়োজন-সাধনশক্তি একটা বড় ঠাঁই অধিকার করে। এই মতের আলোচনা এবং তাহার বিরোধী মতামত সম্বন্ধেও বিচার (হ্বিনার)।

রেভ্যু দেকোনোমি পোলিটিক

ধনবিজ্ঞান পত্রিকা। প্যারিস। ১৯২৫ সনের ষষ্ঠ (অর্থাৎ শেষ) সংখ্যায় আছে, (১) মুদ্রাতত্ত্ব (ফ্রাঁস্যোআ দি হ্বিজিয়া), (২) সুইট্‌সাল্যাণ্ডে শিল্প-সঙ্ঘ (জর্জ পাইযার), (৩) ১৯২০ হইতে ১৯২৪ সন পর্য্যন্ত ফ্রান্সের বাজার দর এবং টাকার বাজার (আলবেয়ার আফ্‌তালিঅঁ)।

বাণিজ্যবার্ত্তা

মাসিক, কুমিল্লা, ফেব্রুয়ারি ১৯২৬। "পাটের দর" (বিগত মহাসমরের সময় পাটের দর নিতান্ত কমিয়া যাওয়ার পর বাংলাদেশে পাট আর অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে না। সর্ব্বদাই প্রয়োজন অপেক্ষা কম উৎপন্ন হইতেছে। সুতরাং পাটের এরূপ দর বাড়িয়া গিয়াছে।)

মার্চ ১৯২৬, "যুক্ত প্রদেশে রেশম-শিল্প।"

ভারতবর্ষ

বৈশাখ, ১৩৩৩। শিশু-মৃত্যু ও মাতৃজাতি (শ্রীহরেন্দ্র কৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায়)।

বঙ্গবাণী

চৈত্র, ১৩৩২। ব্যাধি-বার্দ্ধক্য-দৈব-বীমা (শ্রীবিনয় কুমার সরকার)।

"বুলত্যাঁ দে রেলাসিঅঁ্জ উনিভার্সিতেয়ার"

(দুনিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ক পত্রিকা)। প্যারিস। "অাঁস্তিতিউ দ' কো-অপরাসিঅঁ আঁত্যালেক্‌তিয়েল" (আন্তর্জ্জাতিক বিদ্যা সমবায় পরিষৎ) কর্তৃক প্রকাশিত। দ্বৈমাসিক। বার্ষিক মূল্য ৩৬ ফ্রা (ফরাসী)।

প্ল্যাণ্টার্স জার্ণ্যাল অ্যাণ্ড অ্যাগ্রিকালচারিষ্ট

(চাষ-ব্যবসায়ীদের পত্রিকা), সাপ্তাহিক, কলিকাতা। ৬ মার্চ, ১৯২৬, মহম্মদ হুসেনের "পঞ্জাবে গমের চাষ" প্রবন্ধে বিশেষজ্ঞ-বিবৃত তথ্য পাইতেছি।

ৎসাইট্‌শ্রিফট ফ্যির বেট্রী্‌ব্‌স্‌ হ্বির্ট্‌শাফ্‌ট্‌

শিল্প-বাণিজ্যের কর্ম্ম-পরিচালনা-বিষয়ক পত্রিকা। মাসিক তিন বৎসর ধরিয়া চলিতেছে। বার্লিন এবং হ্বিয়েনা হইতে প্রকাশিত হয়। স্পেট উণ্ড লিণ্ডে কোং। ১৯২৬ সনের প্রথম দুই সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য :—(১) পরিচালনা-বিজ্ঞান (লীফমান), (২) কর্ম্মকেন্দ্রের উদ্বর্ত্ত পত্র (পোলাক), (৩) মাল-চলাচলের ব্যবসায় হিসাব রক্ষা করা (মায়ার), (৪) কর্ম্মকেন্দ্রে কর্ম্মের পরিমাণ এবং পরিচালনা-বিজ্ঞান (হারমান এবং মাউরিটস্)। প্রবন্ধগুলার নামেই মালুম হইতেছে যে, এই সব চীজ ভারতবর্ষে জানা নাই।

বঙ্গের আর্থিক ইতিহাস

মধ্যযুগে বাঙ্গালা—শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্‌স, কলিকাতা। ৪৮০ পৃ; মূল্য ৩৲ টাকা।

বর্ত্তমান জগতের আর্থিক সমস্যা লইয়াই আজকালকার পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বিশেষভাবে ব্যস্ত। কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস-কথা আর্থিক তরফ হইতে বিশ্লেষণ করিবার দিকেও অনেক ধন-বিজ্ঞান-বেত্তা সুধীর দৃষ্টি রহিয়াছে। আমরা ভারতে পাশ্চাত্য দেশের ভিতর ইংরেজ সমাজের ইতিহাসই বেশী জানি। বিগত দশ-পনের বৎসরের ভিতর আর্থিক ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন যুগ সম্বন্ধে কতকগুলা উচ্চশ্রেণীর অনুসন্ধান-মূলক গ্রন্থ বাহির হইয়াছে। হ্যামণ্ড প্রণীত "টাউন লেবারার" (নগরের মজুর), "ভিলেজ লেবারার" (পল্লী-মজুর) ইত্যাদি গ্রন্থে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের অবস্থা চিত্রিত আছে।

এই ধরণের গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত হইলে আমরা বিলাতী ইতিহাস-চর্চ্চার মাপকাঠি খানিকটা হস্তগত করিতে পারি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা আজকাল নিজ নিজ দেশের সামাজিক ইতিহাস রচনা করিবার সময় এক-একটা যুগ বা আন্দোলন সম্বন্ধে "ইন্টেন্‌সিভ্‌" অর্থাৎ গভীরতম এবং খুঁটিনাটি-পরিপূর্ণ তথ্যসঙ্কলনের পক্ষপাতী।

বাংলাদেশের লেখকেরা বাংলাদেশ সম্বন্ধে আর্থিক ইতিহাস রচনা করিবার সময় ঠিক সেই মাপকাঠি ব্যবহার করিবার অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন কিনা সন্দেহ। কেন না, এখনো আমরা ভারতের বিভিন্ন যুগ এবং আন্দোলন সম্বন্ধে ক্রমবিকাশের একটা চলনসই কাঠাম পর্য্যন্ত খাড়া করিতে পারি নাই। কোন্ কোন্ যুগ বা আন্দোলন সম্বন্ধে কত প্রকার সাক্ষী আছে তাহাই আমাদের ভাল রকম জানা নাই। তাহার উপর সাক্ষ্যগুলাও নানা ভাষায় নিবদ্ধ। একাধিক ভাষায় দখলওয়ালা পণ্ডিতের সংখ্যা আজও আমাদের দেশে বেশী নয়।

কিন্তু একটু একটু করিয়া ভারতীয় আর্থিক ইতিহাসের দলিলগুলা নাড়া-চাড়া করিবার জন্য আমাদের সুধীদিগের প্রবৃত্তি জাগিয়াছে। সমালোচ্য গ্রন্থখানি এই নবীন প্রবৃত্তির অন্যতম পরিচয়।

"নবাবী আমল"-প্রণেতা শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম বঙ্গীয় সুধীসমাজে সুপরিচিত। "মধ্যযুগে বাঙ্গালা" পুস্তকখানি লিখিয়া তিনি বাংলার পাঠকদের সমূহ উপকার সাধন করিয়াছেন। যদিও ইহা বাংলার এক সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন ইতিহাস না, তবু ইহাতে বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক এবং আর্থিক বিষয়ের যে বিবরণ আছে, তাহা হইতে দুইশত বর্ষ পূর্ব্বের বাংলা সম্বন্ধে পাঠকবর্গ অনেক বিষয়ই জানিতে পারিবেন। ৪৮০ পৃষ্ঠার মধ্যে বাংলা দেশের এত প্রকার সংবাদ এক সঙ্গে পাওয়া কম সুবিধার বিষয় নয়। এই হিসাবে বহিখানি বাঙালীমাত্রেরই আদরণীয় হওয়া উচিত। বাংলা সম্বন্ধে এই প্রকারের আর অন্য পুস্তক আছে বলিয়া জানি না।

এই পুস্তক প্রণয়নে লেখক বহুবিধ গ্রন্থ ব্যবহার করিয়াছেন। তন্মধ্যে মুসলমান ঐতিহাসিক ও বৈদেশিক ভ্রমণকারীদের বৃত্তান্ত ও বাংলা ধর্ম্ম-গ্রন্থই বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। পুস্তকটী ১৯ অধ্যায়ে বিভক্ত, তন্মধ্যে ৬টী

রাজনৈতিক বিষয়সংক্রান্ত, ৫টী আর্থিক বিষয়সংক্রান্ত, ও অবশিষ্ট ৮টী ধর্ম্ম ও সমাজসংক্রান্ত।

বাঙ্গলা যে একদিন বীরপ্রসূ ছিল, এবং কৃষি, শিল্প, ও বাণিজ্য যে একদিন বাংলা দেশে বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিল; "মধ্যযুগে বাঙ্গালা" পাঠ করিলে সে বিষয় সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বঙ্গদেশ যে কেবল মসলিন্ ও শস্যাদির জন্যই বিখ্যাত ছিল তাহা নহে। এখানে বহুপরিমাণে চিনি এবং লবণও উৎপন্ন হইত; এবং এই সমুদয় দ্রব্য সস্তায় বাংলা হইতে নানা দেশ-বিদেশে রপ্তানি হইত। আলোচ্য গ্রন্থে এইসকল বিষয় বেশ ভালরূপেই বিবৃত হইয়াছে। বাংলার প্রসিদ্ধ বন্দর সাতগাঁও, হুগলি ও চাটগাঁও প্রভৃতি স্থান হইতে যেমন একদিকে বিদেশে বহু জিনিষ রপ্তানি হইত, তেমনি নৌকাযোগে ও ভারবাহী বলদের পৃষ্ঠে বহুবিধ জিনিষ নিয়মিতরূপে ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে প্রেরিত হইত। দিল্লী ও আগ্রার সহিত বাংলা দেশের নিয়মিতরূপে বাণিজ্য চলিত। বৈদেশিক ভ্রমণকারীদের বৃত্তান্ত হইতে এবিষয়ে অনেক জানিতে পারা যায়। ১৫০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার রলফ্ ফিচের আগ্রা হইতে বাংলায় আগমন উপলক্ষ্যে যে ১৮০ খানি মালবাহী নৌকার উল্লেখ করিয়াছেন তাহা হইতেই এই সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারা যায়। এই অন্তর্ব্বাণিজ্য সম্বন্ধে খানিকটা বিস্তৃত আলোচনা করিলে বোধ হয় ভাল হইত। এই সম্বন্ধে পাঠকগণ মৎপ্রণীত "ইন্‌ল্যাণ্ড ট্রান্স্‌পোর্ট অ্যাণ্ড কমিউনিকেশন ইন মিডিভ্যাল ইণ্ডিয়া" (মধ্যযুগের ভারতে যাতায়াত ও খবরাখবর) নামক গ্রন্থে আরও কিছু কৌতূহলনিবৃত্তি করিতে পারিবেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, গ্রন্থখানিতে নানাবিধ বিষয় আলোচিত হইয়াছে। আশা করা যায় পাঠকবর্গ এই পুস্তকপাঠে যথেষ্ট আনন্দ ও শিক্ষালাভ করিবেন। এস্থলে সকল বিষয়ের বিশদ বিবরণ দেওয়া অনাবশ্যক। কেবল একটীমাত্র বিষয়ের উল্লেখ করিয়া এই ক্ষুদ্র সমালোচনা সমাপ্ত করিব। জমিদারী-বন্দোবস্ত-শীর্ষক অধ্যায়ে লেখক নানা তথ্যের আলোচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটী বিষয় দেশ-কাল হিসাবে সম্প্রতি বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। জমিদারবর্গের নানাবিধ সৎকার্য্য-সম্পাদনের মধ্যে জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে পরধর্ম্মের জন্য দান এস্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ২০৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন "হিন্দু জমিদারের মুসলমান প্রজার ধর্ম্মার্থে এবং মুসলমান জমিদারের হিন্দুদের সেবার জন্য ভূমিদানও অসাধারণ ঘটনা ছিল না"।

শ্রীবিজয়কুমার সরকার, এ, বি (হার্ভার্ড)

গড্ডলিকা

"পরশুরাম"-রচিত, (প্রকাশক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, ১৪ পার্শীবাগান, কলিকাতা); ১৷০; ১৩৩৩।

সমাজ সমালোচনা-বিষয়ক গল্প-সংগ্রহের বই। লেখক "পরশুরাম" নামে বাজারে দাঁড়াইতে চাহিয়াছেন। প্রথম রচনা, "শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড" "আর্থিক উন্নতির" পাঠকগণের নিকট উল্লেখযোগ্য।

রচনাটার উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন, লেখক আজকালকার ব্যবসা-বাণিজ্যের অলি-গলি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ সন্দেহ নাই। ইনি বাংলাদেশের একজন বস্তুনিষ্ঠ সাহিত্যসেবী। রচনা-কৌশলও উপাদেয়।

কোম্পানী খাড়া করা কাজের খুঁটিনাটি লেখকের বেশ জানা আছে। এই কাজে প্রবেশ করিয়া ধড়িবাজ খেলোয়াড়েরা যে-সকল ক্যারদানি দেখাইতে অভ্যস্ত, লেখক সেই সব তথ্য সজীব ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সাধারণ গল্প-সাহিত্যের তরফ ছাড়িয়া দিলেও আর্থিক জীবন বিষয়ক টেক্‌নিক্যাল রচনা হিসাবেই এই লেখার কিম্মৎ যথেষ্ট।
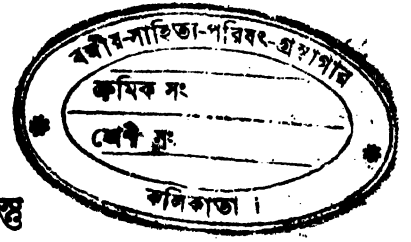
বিশ্ব-বাণিজ্যের বিজ্ঞান-বস্তু

মাল আমদানি-রপ্তানির কারবারে করিৎকর্ম্মা বেপারীদের কর্ম্মকাণ্ডই আমাদের একমাত্র দ্রষ্টব্য বস্তু নয়। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের দুনিয়ায় দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-কাণ্ডের ঠাঁইও খুব বড়। কর্ম্মদক্ষ ব্যবসায়ী হইতে হইলে এই "তত্ত্বাংশ", "বিজ্ঞান-বস্তু" বা "থিয়োরি"'র তরফটাও বুঝিয়া দেখা দরকার। ইংরেজ পণ্ডিত বাষ্টেবল্-প্রণীত "থিয়োরি অব ইণ্টার্ণ্যাশন্যাল ট্রেড" (আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের তত্ত্ব-কথা) বহুকাল হইতে ভারতে সুপরিচিত। এই শ্রেণীর এক উঁচু দরের বই সম্প্রতি (১৯২৪) ইতালিয়ান ভাষায় বাহির হইয়াছে। লেখক জেনেহ্বা শহরের ব্যবসায়-কলেজে এবং মিলানো শহরের ব্যবসায়-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। নাম আত্তিলিও কাব্যাতি। প্রকাশক স্তাবিলি-মেন্তো গ্রাফিক এদিতরিয়ালে (জেনেহ্বা)।

"প্রিঞ্চিপি দি পলিতিকা কমার্চিয়ালে" (বাণিজ্য-নীতির সনাতন নিয়ম) রূপে গ্রন্থ প্রচারিত। দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবার কথা। প্রথম খণ্ডে বিবৃত হইয়াছে "লা তেঅরিয়া জেনেরালে দেলি স্কাম্বি ইন্তার্ণ্যাৎসনালি" (আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের দার্শনিক তত্ত্ব)। শ'তিনেক পৃষ্ঠায় এই খণ্ড সম্পূর্ণ। পরবর্ত্তী খণ্ডে অবাধ (অশুল্ক) বাণিজ্য এবং সংরক্ষণনীতি (সশুল্ক বাণিজ্য) আলোচিত হইবার কথা। ইতালির ব্যবসা-কলেজের ছাত্রদের জন্য এই গ্রন্থ তৈয়ারী করা হইয়াছে।

আজকালকার দিনে প্রত্যেক দেশের বহির্ব্বাণিজ্যে প্রচুর পরিমাণে জটিলতা দেখা দিয়াছে। আমদানি-রপ্তানির তালিকা দেখিয়াই দুনিয়ার মালের চলাচল সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা করা যায় না। যে দেশে রপ্তানি হইতেছে ঠিক সেই দেশই হয়ত মালটার আসল ক্রেতা নয়। এই মালই আবার অন্য কোনো দেশে রপ্তানি হইতে পারে। অপর দিকে প্রত্যেক দেশেই আমদানি-রপ্তানির যন্ত্রে যথেষ্ট পাক-চক্র দেখা যায়। মাল অনেক সময়ে ব্যাঙ্কের জিম্মায় থাকে। বীমাকোম্পানীর হাত, যাতায়াত অর্থাৎ রেল জাহাজ সংক্রান্ত কোম্পানীর হাত এবং মালগুদামওয়ালা কোম্পানী ইত্যাদি নানাবিধ ব্যবসায়-সঙ্ঘের মধ্যস্থতার ফলে মালের গতিবিধি স্পষ্টরূপে ঠাওরাইয়া উঠা কঠিন হয়। বাস্তবিকপক্ষে কোন্ ব্যক্তি বা কোম্পানী ক্রেতা এবং কেই বা যে বিক্রেতা এই সামান্য বিষয়েই পরিষ্কার ধারণা জন্মে না।

তাহার উপর গোলযোগ উপস্থিত হয় মালের দাম দিবার প্রণালীতে। কাগজে-কলমে দামটা অবশ্য টাকা পয়সায়ই বুঝাইয়া দিবার দস্তুর আছে। কিন্তু কোনো দেশ হইতে অপর কোনো দেশে নগদ মুদ্রার চলাচল হয় যার পর নাই কম। সংসারে দেখিতে পাই কেবল মালেরই গতিবিধি। এক দেশের টাকা অন্যদেশে রপ্তানি হয় না বলিলেই ঠিক হয়। চলে কেবল "চেক" বা "কাগজ" আর মাল।

কাজেই বিশ্ববাণিজ্যের জটিলতা যার পর নাই বাড়িয়া গিয়াছে বলিতে হইবে। এই জটিল পাকচক্রের ভিতরও কোনো সূত্র ঢুঁড়িয়া পাওয়া সম্ভব কি? সেই সূত্রগুলা আবিষ্কার করাই বিজ্ঞান বা দর্শনের কাজ।

প্রথম সূত্র এই যে, কোনো মাল যখন বিদেশে বেচা হয় তখন তাহার পরিবর্ত্তে বিদেশ হইতে পাওয়া যায় অন্য কোনো মাল। বিদেশে যদি স্বদেশী মাল বেচিতে চাও ত কোনো না কোনো বিদেশী মাল কিনিতে হইবেই হইবে। মালে মালে বিনিময়ই আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের গোড়ার কথা। এক মালের দাম হইতেছে অপর এক মাল। মালে মালে কাটাকাটি হইয়া গেলেই আমদানি-রপ্তানির মামলা চুকিয়া যায়।

অতএব বিজ্ঞানের আসল সমস্যা হইতেছে কোন্ মালের পরিবর্ত্তে কোন্ মাল পাওয়া যায় তাহা অঙ্ক কষিয়া বাহির করা। অন্তর্ব্বাণিজ্যের বেলায় মালে মালে অদল-বদল মান্ধাতার আমলে দেখা যাইত। তাহা অবশ্য আজ-কালকার দুনিয়া হইতে উঠিয়া গিয়াছে। তাহার ঠাঁইয়ে

দেখিতে পাই মুদ্রার সাহায্যে মূল্য-নিরূপণ এবং মূল্যে মূল্যে সমতা-স্থাপন ও কাটাকাটি। আমদানি-রপ্তানির কারবারেও সেই নিয়মটাই খাটিতেছে। তবে এই সমতা-স্থাপনের কারবারে মুদ্রার ঠাঁই এক প্রকার নাই বলিলেই চলে।

আমদানিতে রপ্তানিতে যদি সমতা না ঘটে অর্থাৎ যদি পরস্পর কাটাকাটির সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে সমতা-স্থাপন এবং কাটাকাটি না ঘটা পর্য্যন্ত বাণিজ্য-জগতে অস্থিরতা বিরাজ করে। ঘরোআ বাজারে মূল্য-বৃদ্ধি নামক "অসাম্য" ঘটিলে মাল-স্রষ্টারা লোভে পড়িয়া অধিক পরিমাণে মাল তৈয়ারী করিতে লাগিয়া যায়। মালের পরিমাণ বাড়িবামাত্র ক্রমশঃ আবার দাম কমিতে সুরু করে। শেষ পর্য্যন্ত ক্রেতায় বিক্রেতায় সাম্য দেখা দেয়। আমদানি-রপ্তানির মুল্লুকে ও এই সোজা নিয়মটাই সর্ব্বদা কাজ করে। নানা দিক্ হইতে নানা শক্তি আসিয়া অসাম্যের অবস্থাকে সাম্যের দিকে লইয়া যায়।

বর্ত্তমান যুগে আমদানিকারক এবং রপ্তানিকারক দেশ ও লোকের সংখ্যা খুব বাড়িয়াছে। অধিকন্তু, কোন্ দেশের চাহিদা বাড়িবামাত্র কোন্ দেশে মাল তৈয়ারী করিবার হুজুগ চাগে তাহা অনেক সময়েই ধরিতে পারা যায় না। এই সকল কারণে বিশ্ব-বাণিজ্যের সমতা-সাধন কাণ্ডটা সহজে পাকড়াও করা সম্ভব নয়।

কাব্যাতি এই সাধারণ সূত্র দিয়াই জটিলতম লেনদেন-ময় বিশ্ব-ব্যবস্থার ব্যাখ্যা করিতেছেন। বুঝা যাইতেছে যে,—ধনবিজ্ঞান-বিদ্যার অন্যতম জন্মদাতা ডেভিড রিকার্ডো উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যেসকল সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়া গিয়াছেন, এক শতাব্দী পরেও আমরা সেই সকল সিদ্ধান্তই সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছি।

আর একটা সূত্র কাব্যাতির গ্রন্থে পরিষ্কাররূপে ধরিতে পারা যায়। ইনি বলিতেছেন যে, আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের সমতা সম্বন্ধে যে কথা বলা হইল তাহা পুরাপুরি খাটে সোনায় প্রতিষ্ঠিত মুদ্রানীতির আমলে। দুনিয়ায় একটা বড় গোছের লড়াই বাধিবামাত্র আমদানি-রপ্তানির কারবারে সমতা বাঁচাইয়া চলা খুবই কঠিন। তখন আন্তর্জ্জাতিক বৈঠক ডাকিয়া টাকার বিনিময় হার সম্বন্ধে দর-কষাকষি করিতে হয়। অধিকন্তু, প্রত্যেক দেশেই তখন গবর্মেণ্টের হস্তক্ষেপ এবং আইনকানুনই ব্যবসা-বাণিজ্যের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতারূপে দেখা দেয়। কিন্তু তখনও এইসকল বৈঠক এবং সরকারী শাসনের সাহায্যে একটা চলনসই বাণিজ্যিক "স্থিতি" বা সাম্য খাড়া করিয়া রাখিবার চেষ্টাই চলিতে থাকে।

গ্রন্থকারের তৃতীয় বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। লড়াইয়ের পর হইতে মুদ্রায় মুদ্রায় বিনিময়ের হার লইয়া মহা দুর্য্যোগ চলিতেছে। যেসকল দেশের মুদ্রা-প্রণালী এখনো পুনর্গঠিত হইয়া স্থিরতা লাভ করে নাই, তাহাদের অসুবিধা ঢের। কাব্যাতির মতে কোনো প্রকার কৃত্রিম কৌশলে সিক্কার স্থিরতা আনা সম্ভবপর হইবে না। বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্বে যেরূপ সোনায় প্রতিষ্ঠিত সিক্কাপ্রণালী প্রচলিত ছিল সেইরূপ ব্যবস্থাই পুনরায় কায়েম করা আবশ্যক।

শুল্ক সম্বন্ধে যাহা কিছু বক্তব্য তাহা কাব্যাতি দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশ করিবেন। কিন্তু প্রথম খণ্ডেই কিছু কিছু শুল্কবিষয়ক আলোচনা আছে। শুল্ককে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে :—(১) স্বদেশী মালের আত্মরক্ষায় সাহায্য-প্রদান স্বরূপ বিদেশী মালের উপর "সংরক্ষণ"-শুল্ক, এবং (২) স্বদেশের খাজাঞ্চিখানার আয় বাড়াইবার জন্য স্বদেশী বণিক-বেপারী-কারখানাওয়ালাদের নিকট হইতে আদায় করা "কর"-শুল্ক। এই কর-শুল্ক বর্ত্তমান খণ্ডেই আলোচিত হইয়াছে।

লড়াইয়ের পর হইতে একটা নূতন কাণ্ড আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য-জগতে দেখা দিয়াছে। দেশী কারখানাওয়ালাদিগকে তাহাদের দেশের বাজার হইতেই সমূলে উৎপাটন করিবার মতলবে বিদেশী কারখানাওয়ালারা নানা কৌশল অবলম্বন করিতেছে। এইসকল কৌশলের ভিতর গবর্মেণ্টের সাহায্য অন্যতম। তাহার ফলে বিদেশের বাজারে অতি সস্তায় মাল হাজির করা হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ, যদি কোনো দেশে ঘটনাক্রমে মজুরির হার নীচু থাকে তাহা হইলে যে-দেশে মজুরির হার উঁচু সেই দেশের কারখানাওয়ালারা নিজ মুল্লুকেই বিদেশী মালের সঙ্গে টক্কর দিতে অসমর্থ হয়। এই অবস্থায় বিদেশী মালের দৌরাত্ম্যে দেশ উস্কম-পুস্কম হইয়া পড়িতে পারে। এই

ধরণের বিদেশী মাল আমদানিকে ইংরেজিতে "ডাম্পিং" বলা হয়। "ডাম্পিং" হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য বিদেশী মালের উপর এক প্রকার শুল্ক বসান হইয়া থাকে। সেই শুল্কের কথাও কাব্যার্তির এই খণ্ডে আলোচিত হইয়াছে।

কিন্তু "ডাম্পিং"-বিরোধী কৌশলটাকে সাধারণ সংরক্ষণ-নীতি-মূলক শুল্ক হইতে তফাৎ করা উচিত কিনা সন্দেহ। কোনো দেশের বিভিন্ন কারবারগুলা নিজ নিজ স্বতন্ত্রতা ভাঙিয়া ফেলিয়া যদি বিপুল "ট্রাষ্ট" বা "কার্টেল" নামক সঙ্ঘ গড়িয়া তোলে তাহা হইলে তাহার দৌরাত্ম্য হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য যে আমদানি-শুল্ক বসান হয় তাহা যে বস্তু, "ডাম্পিং" হইতে নিজকে বাঁচাইবার কৌশলটাও ঠিক তাই না কি? আসল কথা, "ডাম্পিং" বস্তুটা সম্বন্ধেই এখনো খাঁটি বিজ্ঞান-সম্মত ব্যাখ্যা বাহির হয় নাই। নিজ দেশের স্বার্থের বিরোধী যে-কোনো আমদানিকেই "ডাম্পিং" রূপে গালাগালি করা হইতেছে মাত্র।

বিলাতের জমিদার

(১)

লণ্ডনের "কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস" হইতে "দি টেনিওর অব্ অ্যাগ্রিকাল্চারাল ল্যাণ্ড" (কৃষি-ভূমির স্বত্ব-ব্যবস্থা) প্রকাশিত হইয়াছে (৮+৭৬পৃ, ১৯২৫, ৩ শি ৬ পে)। অরুইন এবং পীল নামক দুইজন লেখক গ্রন্থকর্তা।

জমিজমার বন্দোবস্ত ইংরেজ-সমাজে সন্তোষজনক নয়। লেখকেরা বলিতেছেন,—"মান্ধাতার আমলের জমিদারী-প্রথা বিলাতে এখনো চলিতেছে। তাহা উঠাইয়া দেওয়া দরকার। কিন্তু জমিদারেরা অনেকাংশে বিলাতের ধনী এবং পুঁজিপতি। জমিদারী উঠিয়া গেলে দেশে মূলধনের অভাব ঘটিবার সম্ভাবনা। তাহা হইলে জমিজমার উন্নতিবিধানে বাধা পড়িতে পারে। চাষ-আবাদের কাজেও মন্দা দেখা যাইবার ভয় আছে।"

লেখকেরা কাজেই পুঁজি পুষ্ট করিবার কৌশল আলোচনা করিয়াছেন। দেশের লোকেরা যাহাতে আবাদে, ফ্যাক্‌টরিতে, ব্যবসায়ে টাকা জমা রাখিতে প্রলুব্ধ হয় এমন সুদের হার ধার্য্য করা গ্রন্থকারদের মতলব।

"প্রজা", "রাইয়ত" ইত্যাদি নামের লোক ইংরেজ-সমাজে আর থাকিবে না। প্রত্যেক চাষীই নিজ-নিজ জমির মালিক হইবে। আর এই ব্যবস্থায় "স্বত্বের যাদুতে বালু হইবে সোনায় পরিণত।" এই হইতেছে অরুইন এবং পীলের বিলাতী সমাজ সম্বন্ধে ভবিষ্যবাদ।

বর্ত্তমানে যে জমিদার-রাইয়ত-বিশিষ্ট ফিউডাল সমাজ চলিতেছে তাহা ভাঙিয়া দিবার জন্য লেখকেরা গবর্মেণ্টের আইন চাহিতেছেন। গবর্মেণ্ট স্বয়ং জমিদারের নিকট হইতে জমিজমা কিনিয়া লউন এবং দেশের সমগ্র চাষ-ব্যবস্থার পরিচালক হউন। চাষীরা গবর্মেণ্টেরই প্রজা হইবে আর গবর্মেণ্টের তহবিল হইতেই টাকা-পয়সা কর্জ্জ পাইবে। এই হইতেছে মোসাবিদা।

(২)

এই সুরেরই আর একখানা বিলাতী বইয়ের নাম "ল্যাণ্ড অ্যাণ্ড দি নেশ্যন" (ভূমি ও স্বদেশ)। "লিবারাল" দলের রাষ্ট্রনায়কেরা ১৯২৩ সনে একটা কমিটি কায়েম করিয়াছিলেন। ইংল্যাণ্ডের ভূমি-সমস্যা আলোচনা করিয়া কমিটি মন্তব্য প্রচার করিয়াছেন। ৫+৫৮ পৃষ্ঠায় সেইসকল মন্তব্য বাহির হইয়াছে (লণ্ডন, হটন্ অ্যাণ্ড ষ্টগ্‌টন, ৩ শি ৬ পে)।

এই বৃত্তান্তে জানিতে পারি যে, চাষ-আবাদের প্রায় সকল বিভাগেই ইংরেজ সমাজে অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে। ১৮১৪ সনে যে পরিমাণ মাল কৃষিক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন হইত আজ

ঠিক তাহাই দেখিতে পাই। অথচ ১৮৪০ সনের অবস্থা ইহা অপেক্ষা উন্নত ছিল। কি চাষ-আবাদ, কি বনসম্পদ, কি পশুপালন সর্ব্বত্রই এই মন্দা দেখা যাইতেছে।

কমিটির মতে এই দুরবস্থার কারণ নানাবিধ। প্রথমতঃ, জমিদারেরা জমির উন্নতির জন্য পুঁজি ঢালে কম। দ্বিতীয়তঃ, "প্রজারা" আবাদী জমির স্বত্ব সম্বন্ধে নেহাৎ অনিশ্চিত জীবন যাপন করে। তৃতীয়তঃ, কৃষি-বিষয়ক শিক্ষাপ্রণালী সেকেলে অবস্থায় রহিয়াছে। খেলাধূলার এবং আরামে জীবনযাত্রার দিকে ইংরেজ সমাজের ঝোঁক বাড়িয়া গিয়াছে। তাহার উপর ইংরেজরা নাকি আজকাল নূতন নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিতে অগ্রসর হয় না।

অতএব কঃ পন্থাঃ? লিবারাল পার্টির ভূমি-বিশেষজ্ঞদের মতে জমিদারী-প্রথা উঠাইয়া দেওয়া ইংরেজদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। ইংরেজ সমাজে কয়েকজন সৎপ্রবৃত্তিশীল জমিদার আছেন তাহা লেখকেরা অস্বীকার করিতেছেন না। কিন্তু জমিদার-রাইয়তের সম্বন্ধ যতদিন আছে ততদিন ইংরেজ সমাজের উন্নতি অসম্ভব। গবর্মেণ্টের হাতে সকল আবাদী জমির দখল আসুক। যেসকল চাষীরা জমি চাষ করিতে প্রস্তুত এবং সমর্থ, বাছিয়া বাছিয়া তাহাদিগকে জমি ভাড়া দেওয়া উচিত। জমিদারদের জমি কিনিয়া লইয়া গবর্মেণ্ট তাঁহাদের ক্ষতিপূরণ করিবার দায়িত্ব লইতে বাধ্য। কিন্তু যেসব কিষাণ বা জমিদার নিজ হাতে অথবা মজুর খাটাইয়া জমি চষিতে অভ্যস্ত তাহাদের জমি কাড়িয়া লইবার প্রয়োজন নাই।

এই ভূমিসংস্কারের ব্যবস্থায় ছোট ছোট বহুসংখ্যক চাষী সৃষ্ট হইবার কথা। তাহাদের হাতে হয়ত অনেক সময়েই প্রচুর পুঁজি না থাকিতেও পারে। কিন্তু পুঁজি দিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করা গবর্মেণ্টের একটা বড় কর্ত্তব্য থাকিবে। এই জন্য ভূমি-বিষয়ক কর্জ্জ-ব্যবস্থা নূতন সরকারী আইনের অন্যতম অঙ্গ হইবে।

শস্য ও ফসল এক ঠাঁই হইতে অন্য ঠাঁইয়ে পাঠাইবার সুযোগ বেশী নাই। বাজারে মাল বেচিবার ব্যবস্থাও সন্তোষ-জনক নয়; এই দুই দিকেই গবর্মেণ্টের নজর আবশ্যক। অধিকন্তু, বেপারীদের "ঘোঁট" ভাঙিয়া দিয়া চাষীদের সঙ্গে খরিদ্দারদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যোগাযোগ কায়েম করিবার ভার গবর্মেণ্টকে লইতে হইবে।

(৩)

মনে রাখা আবশ্যক যে, অরুইন এবং পীল বোল্‌শেভিক মতের লোক নন। ইংরেজ সমাজে ইঁহারা বিজ্ঞানদক্ষ কৃষি-বিশেষজ্ঞ নামে পরিচিত। আর "লিবারাল পার্টি",—যাতে আছেন অ্যাস্‌কুইথ আর লয়েড জর্জ,—ও বোল্‌শেভিক নন-ই। এমন কি, মামুলি "লেবার" পার্টি (মজুর-দলের) সঙ্গেও তাঁহাদের সমঝোতা অনেক ক্ষেত্রে ঘটিয়া উঠে না।

বিলাতে আজকাল যে আদর্শে জমিজমার আইনকানুন গড়িয়া তুলিবার আন্দোলন চলিতেছে, তাহার গোড়া ঢুঁড়িতে হইবে জার্ম্মাণির আইন-কানুনের ভিতর। বার্লিনের অধ্যাপক সেরিং এই আদর্শের অন্যতম জন্মদাতা। আর্থিক ইতিহাস-বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ স্যার হ্বিলিয়াম আশ্‌লি বিলাতী সমাজে জার্ম্মাণ আদর্শের অন্যতম নামজাদা প্রচারক।

আশ্‌লির জার্ম্মাণ-প্রীতির শেষ নিদর্শন দেখিতে পাই "অ্যাগ্রিকালচারাল ট্রিবিউন্যাল অব্‌ ইন্‌ভেষ্টিগেশান" (কৃষি-অনুসন্ধান-সমিতি) নামক গবর্মেণ্ট-প্রতিষ্ঠিত বিশেষজ্ঞ-সমিতির রিপোর্টে (লণ্ডন, ১৯২৪, ৪০৫ পৃষ্ঠা, ৫শি)। গবর্মেণ্টের সরকারী ছাপাখানা (হিজ ম্যাজেষ্টিস্‌ ষ্টেশ্যনারি অফিস) হইতে প্রকাশিত। এই কেতাবকে বর্ত্তমান জগতের কৃষি ও জমিজমা-বিষয়ক বিশ্ব-কোষ বলিলেও চলে। ইহাতে ডেন্মার্ক, জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি ইত্যাদি নানা দেশের তথ্য নানা বিশেষজ্ঞের হাতে সঙ্কলিত হইয়াছে।

এইগুলার কোনো কোনোটা সম্বন্ধে পরে সমালোচনা বাহির হইবে।

লেজ্ আসুস্থিরাঁস্ সোসিয়াল

(সামাজিক বীমা-ব্যবস্থা); শোহ্ব্যো; প্যারিস: ১৯২৬; ২৮৮ পৃ; ৯ ফ্রাঁ।

লা ফোর্মাসিঅঁ ইস্তোরিক দ' লেকোনোমি পোলিটিক

(ধনবিজ্ঞানের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ); পোল গিয়ো; প্যারিস; ১৯২৬; ১৮০ পৃ; ১২ ফ্রাঁ।

ল্যাফ্লাসিঅঁ আন্ ওরোপ এ ল' দেপ্লাস্মাঁ দ' লা রিশেস্

(ইয়োরোপে মুদ্রার পরিমাণ-বৃদ্ধি এবং ধনদৌলতের হস্তান্তর); রিশার লেহ্বিঁসোঁ; প্যারিস: ১৯২৬; ৪৪৮ পৃ; ৩০ ফ্রাঁ।

কন্‌ষ্টিটিউশ্যন্‌স, ফাঙ্ক্শ্যন্‌স্ অ্যাণ্ড ফিনান্স্ অব্ ইণ্ডিয়ান মিউনিসিপ্যালিটিজ্

(ভারতীয় মিউনিসিপ্যালিটির গঠন ও কার্য্য-প্রণালী এবং আর্থিক শাসন); শ্রীকান্তিলাল শা এবং কুমারী বাহাদুরজি; বম্বে; ইণ্ডিয়ান নিউজ্পেপার কোং: ৫১৩+৬২ পৃষ্ঠা; ১৯২৬; ১০৲ টাকা।

• ল্যাণ্ড অ্যাণ্ড দি নেশ্যন ঃ

(জমিজমা ও স্বদেশ); "লিবার‍্যাল"-পন্থী বৃটিশ রাষ্ট্রীয় দলের ভূমি-কমিটির (১৯২৩-২৫) অনুসন্ধান-মূলক পল্লী-বৃত্তান্ত; লণ্ডন; প্রকাশক হডার অ্যাণ্ড ষ্টগ্টন কোং; ৫+৫৮৪ পৃ; ৩ শিলিঙ ৬ পেন্স; ১৯২৬।

ইকনমিক পোজিশ্যন অব্ পার্শিয়া

(পারস্যের আর্থিক স্থিতি); মুস্তাফা খাঁ ফতে; লণ্ডন; পি, এস্, কিং অ্যাণ্ড সন্; ৭+৯৮ পৃ; ৬শি; ১৯২৬।

কেল্‌কেজ্ অঁ্যাফর্মাসিঅঁ স্যুর ল্যাঁদোশিন

(ইন্দো-চীন সম্বন্ধে কিছু খবর); কুশেকুসে; হানোআ (ইন্দো-চীন); ৩৯ পৃ; ১৯২৫।

কেল্‌কেজ্ অঁ্যাফর্মাসিঅঁ স্যুর ল' সিয়াম

(শ্যামদেশ সম্বন্ধে কিছু খবর); কুশেকুসে; হানোআ: ১২৪ পৃ; ১৯২৫।

এই দুই কেতাব বাহির হইয়াছে হানোআর "এদিসিঅঁ দ' লেহ্বেই একোনোমিক দ' ল্যাঁদোশিন" (ইন্দোচীনের আর্থিক জাগরণ) নামক গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত ভাবে।

ইল্ পিয়েমন্তে এ লি এফেত্তি দেল্লা গ্যোয়েরা সুল্লা সুআ হ্বিতাএ কনমিকা এ সসিয়ালে

(ইতালির পিয়েমন্তে বা পিড্‌মণ্ট জেলার আর্থিক ও সামাজিক জীবনের উপর বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব); জুসেপ্পে প্রাতো; বারি; লাত্যার্সা কোং; ১৫+২৪১ পৃ; ৩৬ লিয়ার; ১৯২৫।

লা সালুতে পুবুলিকা ইন ইতালিয়া দুরান্তে এ দপ লা গ্যোয়েরা

(ইতালির সার্ব্বজনিক স্বাস্থ্য,—যুদ্ধের সময়কার এবং পরবর্ত্তী অবস্থা); জার্জ্জ্য মর্তারা; বারি; লাত্যার্সা কোং; ২৩+৫৭৭ পৃ; ৭০ লিয়ার; ১৯২৫।

এই দুই গ্রন্থ "স্তরিয়া একনমিকা এ সসিয়ালে দেল্লা গ্যোয়েরা মন্দিয়ালে" (বিশ্বযুদ্ধের আর্থিক ও সামাজিক ইতিহাস) নামক গ্রন্থমালার ইতালিয়ান পর্য্যায়ের অন্তর্গত।

ট্যাক্সেশ্যন ইয়েষ্টার্ডে অ্যাণ্ড টুমরো

(কর আদায়ের অতীত ও ভবিষ্যৎ); রবার্ট জোন্স্; লণ্ডন; পি, এস, কিং অ্যাণ্ড সন; ১৯২৬; ১০+১৪৭ পৃ; ৫ শি ৬ পে।

প্রিন্‌সিপ্‌ল্‌স্ অব মার্চ্যাণ্ডাইজিং

(বাজারে মাল কেনা-বেচার বিজ্ঞান): মেলভিন টমাস কোপ্‌ল্যাণ্ড; নিউ ইয়র্ক; শ কোং; ১৯২৫; ৪+৩৬৮ পৃ; ৪ ডলার।

লা সিত্যিরাসিঅঁ একোনোমিক এ সোসিয়াল দেজ্ এতাজ্-উনি আঁ লা ফ্যাঁ দু দিজুইতিয়েম সিয়েক্‌ল্ দাপ্রে লে ভোয়াজ্যয়র ফ্রাঁসে

(ইয়াঙ্কি-স্থানের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা,—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের বৃত্তান্ত,—ফরাসী পর্য্যটকের বিবরণ অবলম্বনে লিখিত); আলেক্‌জাঁদর কাপিতেন; প্যারিস, ১৯২৬; ২০+১৬৪ পৃ, ১৫ ফ্রাঁ।

লা স্তাতিস্তিক আপ্‌লিকে ওজ্ আফেয়ার

(ব্যবসা-সংক্রান্ত তথ্য-তালিকা-বিজ্ঞান); ইজাবেল; প্যারিস; ১৯২৬; ১২৩ পৃ; ১৫ ফ্রাঁ।

এলেমাঁ দ' মার্শাঁদিজ:—তোম ত্রোআজিয়েম, প্রোডুই শিমিক্

(দ্রব্য-তত্ত্ব; তৃতীয় ভাগ,—রাসায়নিক পদার্থ); স্যু এব' গার্ত্যাঁ; প্যারিস; ১৯২৬; ৯৪ পৃ; ৬ ফ্রাঁ।

ডি সোৎসিয়াল-গেশিষ্টে ড্যর গ্রোস্-ষ্টাট্

(মহানগরীর সামাজিক-আর্থিক ইতিহাস); মার্টিন লাইনার্ট; হাম্বুর্গ; ফেরা-ফার্লাগ্ কোং; ১৯২৫; ২৯৯ পৃ; ৭ মার্ক ৫০ ফেন্নিগ্।

অ্যান ইকনমিক হিষ্ট্রি অব ইংল্যণ্ড

(বিলাতের আর্থিক ইতিহাস); শ্রীমতী শার্লট্ ওয়াটার্স; লণ্ডন; অক্‌স্‌ফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস; ১৯২৫; ১৮+৬১০ পৃ।

লে শাঁবর দ' কম্যার্স আল্‌ম্যাঁদ্

(জার্ম্মাণদের বণিক-সঙ্ঘ); পোল মেসেশমিৎ প্যারিস; ১৯২৬; ২০০ পৃ; ২০ ফ্রাঁ (ফরাসী)।

সোসিয়েতেজ্ আ রেস্‌পঁসাবিলিতে লিমিতে

(সীমাবদ্ধ দায়িত্ব-বিশিষ্ট শিল্প-বাণিজ্য-সমিতি অর্থাৎ লিমিটেড কোম্পানী): পোত্তিয়ে; প্যারিস; ১৯২৬ ৩৪২ পৃ; ৩৮ ফ্রাঁ।

ডাস গেলড্-প্রোব্‌লেম ইন মিট্‌টেল-অয়রোপা

(মধ্য-ইয়োরোপের মুদ্রা-সমস্যা); হাণ্টোস; য়েনা গুস্টাহ্‌ব্ ফিশার কোং; ১৯২৫; ৬+১৬২ পৃ; ৭ মার্ক।

দি ফর্ম্মেটিহ্‌ব্ পীরিয়ড অব্ দি ফেডার্যাল রিজার্ভ সিষ্টেম

(আমেরিকার ফেডার্যাল রিজার্ভ ব্যাঙ্কিং প্রথার জন্ম কাল ও কৈশোরাবস্থা,—বিশ্বযুদ্ধের সময়কার কথা) হার্ডিং; বষ্টন; হটন মিফ্‌লিন কোং; ১৯২৫; ৭+৩২০ ৪ ডলার ৫০ সেণ্ট।

মেমোর‍্যাণ্ডাম অন কারেন্সী অ্যাণ্ড সেণ্ট্র্যাল ব্যাঙ্কস্

(দুনিয়ার সিক্কা এবং কেন্দ্র-ব্যাঙ্ক সমূহের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে প্রবন্ধ,—১৯১৩ হইতে ১৯২৫ সন পর্য্যন্ত কালের বৃত্তান্ত); জেনেহ্বার "লীগ্ অব নেশ্যন্‌স্"-কর্ত্তৃক প্রকাশিত ১৯২৫; প্রথম খণ্ড, ২৩৮ পৃ; ৭ শি ৬ পে।

ফালুটা

(মুদ্রা ও সিক্কা); অধ্যাপক কার্ল ডীল-কর্ত্তৃক সম্পাদিত। বিভিন্ন গ্রন্থকারের মুদ্রাবিষয়ক রচনাবলীর সঙ্কলন; কার্লস্‌রুহে; ব্রাউন কোং; ১৯২৫; ৮+২৮১ পৃ ৬ মার্ক।

আর্থিক উন্নতি

শ্রীনারায়ণ ভারতী

যে দেশে "অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং" এই কথা হাটে-ঘাটে, যত্র-তত্র শুনিতে পাওয়া যায়, সে দেশে আর্থিক উন্নতির কথা বলার মত দুঃসাহস অল্প লোকেরই আছে। 'কৌপীন-বন্তে'র দেশে টাকা-কড়ির কথা বলিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। আর্থিক উন্নতি হইলে নাকি পরমার্থের হানি হয়! এ জন্য যাহারা উপদেশ দেন "ভিক্ষা করিয়া খাও আর হরি বলো" তাঁহাদের প্রতিই বাঙালীর শ্রদ্ধাতিশয্য দেখা গিয়াছে,—যদিও ঐ শ্রেণীর উপদেষ্টারা উপদিষ্টের কাছে নিজেদের প্রণামী কড়ায়-গণ্ডায় বুঝ্ করিয়া লইতে আদৌ দ্বিধা বোধ করেন না। যাহা হউক, এ কথা খুবই সত্য যে, অর্থই মানুষের অন্যতম মুখ্য সুহৃৎ। যাহারা অর্থাভাবে নিত্য-ক্লিষ্ট তাহাদের কাছে ধর্ম্মও অনেক সময় অর্থহীন হইয়া উঠে,—যদিও কথাটা মুখে কেহই স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন।

আর্থিক উন্নতি তখনই হয়, যখন বৈদেশিক ধনসম্পদের সহিত নিজেদের পণ্যদ্রব্যাদির বিনিময় বাধামুক্ত এবং সহজ-সাধ্য হওয়ায় এক দেশ অপর দেশের সঙ্গে আদান-প্রদানের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে। বিশেষ বিশেষ কারণে যখন এক দেশের একটী পণ্য দেশান্তরে বিনিময়রূপে গৃহীত না হয়, সে সময় নূতন উদ্ভাবনদ্বারা এমন বস্তু-জাত প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত ও দেশান্তরে রপ্তানি করা চাই, যাহা দেশ-ভেদে সর্ব্বজন-গ্রাহ্য বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে।

আমাদের দেশ হইতে বিদেশে যথেষ্ট পরিমাণে পাট রপ্তানি হয়। তাহাতে আমাদের যাহা কিছু আর্থিক লাভ হয়, তাহার চতুর্গুণ লোকসান যায় যখন ঐ পাট হইতে প্রস্তুত বিচিত্র শাল, আলোয়ান প্রভৃতি নানারূপ বস্ত্রাদি আমাদের দেশে বিক্রয় হইতে থাকে। বৈদেশিক বণিক-সম্প্রদায় উদ্ভাবনী শক্তিতে ঐ পাট হইতেই আমাদের চিত্তরঞ্জনকারী দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া বহু লক্ষ মুদ্রা লাভ করে।

আর্থিক উন্নতির প্রধান সহায় উদ্ভাবনী শক্তি। এই শক্তি-লাভের গোড়ার কথা দেশ-বিদেশের জ্ঞান-ভাণ্ডারে অনুপ্রবেশ এবং সুতীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসা। সংসারে টিকিয়া থাকার প্রবল ইচ্ছা যাহাদের মজ্জাগত, তাহারা উদ্ভাবনী শক্তির রহস্য-রন্ধ্র ভেদ করিয়া এমন সব পন্থা বাহির করিতে পারিতেছে যাহা আমাদিগকে অবাক্ মাত্র করে। বিদেশের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি আমাদিগের মনে বিস্ময় আনিয়া দেয়। আমরা অনেকটা অবাক্ হই কিন্তু সচেতন হই না—চেষ্টাবান্ হই না। চেষ্টা করিলে আমরাও যে অভীপ্সিত ফল-লাভ করিতে পারি সে বিশ্বাস নৈরাশ্যের কর্ম্মনাশা-জলে ডুবিয়া যায়।

যে ক্ষেত্রে প্রতীচ্য খণ্ডের সুচতুর মনীষিগণ নব নব যন্ত্র-সৃষ্টি, নব নব অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার প্রভৃতি দ্বারা দূরকে নিকট, অভাবনীয়কে করতলগত করিতে চেষ্টিত, সে ক্ষেত্রে আমাদের দেশের তথাকথিত বুদ্ধিমানগণ 'অতি-বুদ্ধি'র ফলে 'গলায় দড়ি' দিয়া মরার অভিনয়ে তৃপ্তিলাভ করিতেছেন। যে ক্ষেত্রে বৈদেশিক শক্তি আমাদের ধনশক্তির উপর বাজ হানিতেছে, সে স্থলে আমাদের পরস্পরের মধ্যে নানারূপ ভেদ-বৈষম্য সৃষ্ট হইয়া বিরোধের বিয়োগান্ত নাটকের রিহার্স্যাল চলিতেছে, যাহা দেখিয়া বঙ্গ-ভাগ্যলক্ষ্মীর চক্ষু জলে ভরিয়া উঠে এবং বিদেশীরা আনন্দে নৃত্য করে!

বর্ত্তমান যুগ প্রতিযোগিতার যুগ। বুদ্ধির সহিত বুদ্ধির প্রতিযোগিতা—শক্তির সহিত শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা অহরহঃ বিশ্ব-সমস্যাকে জটিল করিয়া তুলিতেছে। সমস্যার সমাধান সকলে মিলিয়া না করিলে একতরফা ডিক্রী হইতে দেরী হইবে না, এবং সে ডিক্রীটা ইয়োরোপের ভাগ্যেই গড়াইয়া যাইতে পারে। ব্যবসায়ের প্রতিযোগিতাই খুব বড় একটা কথা। কি করিয়া দেশ-বিদেশের ধাক্কায় নিজের বলক্ষয়ের

প্রতিরোধ করিতে পারিব, বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতার এই কর্ম্মমুখর যুগে সে কথা নূতন করিয়া ভাবিবার দিন আসিয়াছে। আমরা এমন একদল বুদ্ধিমান শ্রম-শক্তি-সম্পন্ন মানুষ চাই যাহারা অন্ন-সমস্যার ও অর্থ-সমস্যার সমাধানে ইচ্ছাশক্তি নিয়োগ করিবে।

ছোট হউক বড় হউক যে-কোনও সদুপায়ে দেশের দৈন্য নিবারণ করা আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হইলে, সেই সকল কার্য্যকে কখনই ঘৃণা করিব না—যাহার বাহ্য রূপটা তাদৃশ ভদ্রভাবাপন্ন নহে। কার্য্যের ভদ্রাভদ্র নাই ইহা বুঝিবার সময় আসিয়াছে। অনেক বড় বড় বন্দরে যাঁহারা প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী—ব্যবসায়ে যাঁহাদের লক্ষ লক্ষ টাকা খাটিতেছে—তাঁহাদের প্রথম ইতিহাস হয়তো মোটেই ভদ্র নহে। কেহ বা দিন-মজুরি করিতেন, কেহ বা ফেরিওয়ালা কি হাটুয়া ছিলেন। মুদিখানার দোকান করিতে করিতে অনেক লোক পাইকারী কারবার আরম্ভ করে এবং ক্রমে বড় বড় চালানী কারবার করিয়া লক্ষপতি হইয়াছে এমন বহু লোকের জীবনী আমাদের জানা আছে।

ভদ্র-বেকার-সমস্যা আমাদের দেশে বাড়িয়া চলিয়াছে বলিয়া যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়কে দোষী সাব্যস্ত করেন তাঁহাদের ধারণায় পাশ-করা যুবকেরা অকর্ম্মণ্য ও কল্পনা-প্রবণ। কিন্তু আমার বিশ্বাস ইস্কুল-কলেজে কিছুদূর অধ্যয়ন থাকিলে ব্যবসা-বাণিজ্য উত্তমরূপে চালানো যায়। মুদি-বৃত্তি যাহাদের বংশানুক্রমিক তাহারাই যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় ব্যবসায়ী হইবে এ কথার মধ্যেও যুক্তিসিদ্ধ তর্ক কমই পাওয়া যায়। ফলতঃ, ব্রাহ্মণের ছেলে হইলেই যেমন ঋগ্বেদের অর্থ সকলে করিতে পারে না, তেমনি মুদির সন্তানমাত্রেই ব্যবসার মর্ম্ম বুঝে না। শিক্ষা ও অনুরাগ থাকিলে প্রত্যেকেই যে-কোনও কার্য্য করিতে পারে। আমাদের দেশে যাহারা দৈবক্রমে বিকলাঙ্গ হইয়া জন্মে তাহাদের সম্বন্ধে আত্মীয়-স্বজনেরা সকল ভরসা ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু এণ্টোয়ার্প সহরে ফেল্‌ নামক একটী হস্তহীন ব্যক্তি পায়ের দ্বারা চিত্রাঙ্কণ করিতে শিখিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট হইয়াছেন। আমরা অন্ধ ব্যক্তিগণকে কৃপার পাত্র বলিয়া জানি। কিন্তু আর্থার পিয়ার্সন নামক একব্যক্তি পণরিত বয়সে অন্ধ হন এবং অদৃষ্টের দোহাই দিয়া হা-হুতাশ না করিয়া অন্ধগণের বিদ্যার্জ্জনের উপায় উদ্ভাবন করিয়া প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছেন। এই সকল কঠিন কার্য্য মানুষেই করিয়াছে এবং বর্ত্তমানে যাহা দুঃসাধ্যতম মনে হইতেছে অদূরবর্ত্তী কালে মানুষই সেগুলিকে সাধ্যের সীমায় আনিবে। কঠিন কাজ যেমন চেষ্টা, উৎসাহ ও অনুরাগ-সাধ্য, তেমনি সহজ কার্য্যও ঐগুলির দ্বারাই সম্পন্ন হয়। ব্যবসাদারী কার্য্যকে আমি অপেক্ষাকৃত সহজ কার্য্য মনে করি —যদিও অর্থনীতির মূলতত্ত্বগুলিতে বিশেষজ্ঞ না হইলে প্রকৃত ব্যবসায়ী হওয়া যায় না। ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়া কোনও জাতি বা দেশ কখনই ধন-সম্পদে ঋদ্ধ হইয়া উঠে না।

"আর্থিক উন্নতি" নামক যে মাসিক কাগজটী প্রকাশিত হইতেছে ইহার গুরুত্ব বুঝিবার লোক দুই-চারি জন এদেশেও আছেন, কিন্তু ইহার উপকারিতা বুঝিবার মত বুদ্ধি প্রতীচ্যের জনসাধারণমাত্রেরই আছে। আমাদের দেশের কর্ম্মিবৃন্দ অল্প আঘাতেই হতোৎসাহ হন। এ জন্য দেশ-বিদেশের কর্ম্মী পুরুষের জীবনী সংগ্রহ করিয়া সাধারণ্যে প্রচার করিবার আবশ্যকতা আছে।

আশাকরি "আর্থিক উন্নতি" পত্রে নানা দেশের নানা শ্রেণীর কর্ম্মি-চরিত্র প্রকাশ করিবার চেষ্টা চলিবে। লোকে নাটক নবেল লইয়া ব্যস্ত আছে। তাহাদের সমক্ষে চিত্তাকর্ষক উপায়ে কর্ম্মবীরদিগের চরিত-কথা উপস্থিত করিয়া তাহাদিগকে সাধনার পথ দেখাইয়া দিতে হইবে।

অন্নকষ্টে ও অর্থকৃচ্ছ্রতায় বাঙালী-সংসার জরাজীর্ণ। অন্নকষ্টের নিত্যসঙ্গী পারিবারিক কলহে পুর-পত্তন সর্ব্বদা নিরানন্দ। এই স্রোত ফিরাইতে হইলে দেশবাসীকে নানা সুগম পন্থায় অর্থাগমের প্রণালী জানাইয়া দিতে হইবে। "আর্থিক উন্নতি" পত্রখানির অভ্যুদয়ে আশা হয় যে, হয়তো একদা জাপানের মত এদেশেও শিল্প-বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারিবে। যদিও নানা শ্রেণীর রাষ্ট্রীয় দুর্দ্দৈবে বাণিজ্য ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বাঙালীকে

সর্ব্বপশ্চাতে রাখিয়াছে,—আলস্য, নৈরাশ্য, রোগ, শোক, অনাহার ও অশিক্ষার আঁধারে গোটা ভারতবর্ষ রাহুগ্রস্ত সূর্য্যের ন্যায় ম্লান-পিঙ্গল, তথাপি অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিতে করিতে দারিদ্র্য-দুঃখ উৎসাদিত হইবে। অনেকে বলেন বাঙালী সমবায়-প্রণালীতে ব্যবসা করিতে জানে না, ব্যাঙ্ক চালাইতে যাইয়া জুয়াচুরী—প্রতারণা করে, কাজেই ভাবী উন্নতির পথ তাহার পক্ষে কণ্টকার্গলে রুদ্ধ। এ ধারণা আমরা অতি অসার বলিয়া মনে করি। জুয়াচোর, প্রতারক পাশ্চাত্য দেশেও বড় কম নাই, আবার এদেশেও আছে। তাই বলিয়া এ কথা কিছুতেই সমর্থন করা যায় না যে, যেসব জাতির মধ্যে দুই একটা লোক মন্দ আছে তাহাদের আর উন্নতি হইবে না। বরং এই কথাই সত্য যে, সমষ্টি যদি উন্নতির দিকে অগ্রসর হয় তবে ব্যষ্টিগত দোষ স্বতই নিরাকৃত হইবে। সমষ্টির উন্নতি যাহাতে হয় সেই কথাই প্রধান কথা। ধর্ম্ম-কাম-মোক্ষ এই তিনটাই যেমন কাম্য অর্থও তেমনি কাম্য বস্তু। "চতুর্ব্বর্গ ফলে"র মধ্যে অর্থেরও ঠাঁই আছে। তাই অর্থের গুণগান করিবার জন্য শক্তিশালী লোক চাই।

বেকার-সমস্যা

পঞ্জাব কাউন্সিলের গবর্মেণ্ট-সদস্য শ্রীযুক্ত ক্যালভার্ট সাহেবের মতে বেকার-সমস্যাটা অর্থনৈতিক সমস্যারই একটি অঙ্গ। ভারতবর্ষে কর্ম্মনিযুক্ত প্রতি শত ব্যক্তির মধ্যে ৩ জন উচ্চ পদে, ২৬ জন নিপুণ শ্রমিকরূপে এবং ৭১ জন আনাড়ী শ্রমিকরূপে চাকরী করে। বাস্তবিক পক্ষে, ভারতবর্ষে—অন্ততঃ পঞ্জাবে—আনাড়ী বা নিপুণ শ্রমিকদিগের মধ্য হইতে উচ্চ পদে কাহাকেও নিযুক্ত করা হয় নাই। কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে মূলধন, ব্যবসায়ের উদ্যোগ, তৎপরিচালনা এবং তাহার তদারককারী কর্ম্মিবৃন্দ ইত্যাদি নানা বিষয়ের কথাই ভাবিয়া দেখিতে হইয়াছে। নিপুণ ও আনাড়ী শ্রমিকদিগকে উচ্চপদে নিযুক্ত করিতে গিয়া প্রায় ১৫ হইতে ২৫ হাজার টাকা মূলধনরূপে খাটাইতে হইয়াছে। কোনো কোনো স্থলে ৮০ হাজার টাকাও খাটিয়াছে। বস্তুতঃ, ব্যবসায়ে এক কোটি টাকা খাটাইতে পারিলে প্রায় পাঁচ শত লোককে উচ্চপদ দেওয়া যায়।

এদেশে মূলধনের নিতান্ত অভাব এ কথা স্বীকার করা যায় না। ডাকঘরের সেভিংসব্যাঙ্ক হইতে জানা যায় প্রায় ২৭ কোটি টাকা সেখানে গচ্ছিত আছে। তারপর বিগত চল্লিশ বৎসরে এই দেশ প্রায় ৪৮৪ কোটি টাকার সোনা খরিদ করিয়াছে। এইসব টাকার কিয়দংশও যদি শিল্প-ব্যবসায়ের উপযোগী যন্ত্রপাতি কিনিবার জন্য খরচ করা হয়, তাহা হইলে বেকার-সমস্যার অনেকটা সমাধান হইতে পারে। উক্ত কাউন্সিলের অন্য একজন বক্তা বলিয়াছেন, বিদেশী প্রভুত্বের জন্যই এই বেকার-সমস্যা। কিন্তু তদুত্তরে ক্যালভার্ট সাহেব জানাইয়াছেন যে, সরকার বাহাদুরই দেশের সর্ব্বপ্রধান নিয়োগকারী। দেশের সমস্ত জয়েণ্টষ্টক কোম্পানীর মূলধন একত্র করিলে একশত কোটি টাকা হইবে। তাহার সহিত তুলনা করিলে, সরকারের মূলধন দাঁড়াইবে ছয় শত কোটি। এই টাকাটা সরকারের নানা প্রতিষ্ঠানে খাটিতেছে এবং তাহাতে লোকও খাটিতেছে বিস্তর।

এই দেশে কর্ম্মনিয়োগ ব্যাপারে অসংখ্য সুবিধা আছে। ছোট-খাট ব্যবসায়ের ক্ষেত্রও অনন্ত বিস্তৃত। কিন্তু মুস্কিল এই যে, দেশের যুবকবৃন্দ বরং অন্যের নিকট চাকরী প্রার্থী হইবে, তবু নিজেরা কোনো ব্যবসায় খুলিবে না এবং খুলিয়া অপরকে চাকরী দিবার ব্যবস্থা করিবে না। দুগ্ধের কারখানা, পশু-পালন, ময়দার কল প্রভৃতি দেশে ত বিস্তর হইতেছে। কিন্তু কলেজের ছাত্রেরা সে-সব জায়গায় নিযুক্ত হইতে চাহে না।

ক্যালভার্ট সাহেব মনে করেন কৃষির উন্নতি হইলে বেকার-সমস্যার একটা মীমাংসা হয়। কৃষি হইতে শিল্প-ব্যবসায়ের জন্য কাঁচা মাল মিলিবে এবং তাহাতে কৃষিজীবীদের অর্থ বাড়িবে। অর্থ বাড়িলে তাহারা শিল্পোৎপন্ন দ্রব্য বেশী কিনিতে পারিবে। শেষ কথা, শিল্প-ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিশ্বাস থাকা চাই। তাঁহার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, শিল্প-ব্যবসায়ের বিস্তৃতির পক্ষে বিশ্বাস ও শ্রমের অভাবই প্রবল বাধা। (শ্রম অর্থে তিনি শিক্ষিত, অশিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ শ্রমিক-দিগের শ্রম ধরিয়াছেন।) এই বাধা দূর করিবার কাজ সরকার বাহাদুরের নহে, বেসরকারী নিয়োগকর্ত্তাদের।

যাঁহারা বিদেশী মূলধন উচ্ছেদ করিতে চাহেন, তাঁহাদের মানসিক অবস্থার কথা ভাবিয়া তিনি দুঃখিত। তাঁহার মতে যত দিন দেশীয় মূলধন না খাটে, ততদিন বিদেশী মূলধন এই দেশে খাটিলে অনেক শিক্ষিত যুবকের কর্ম্ম-প্রাপ্তির পথ প্রশস্ত হইয়া দাঁড়াইবে।

বিলাতী ব্যাঙ্কের হালখাতা

শ্রীবিজয়কুমার সরকার এ, বি (হার্ভার্ড)

বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া বিভিন্ন বিলাতী ব্যাঙ্কের, বিশেষতঃ, 'বিগ ফাইভ্' অর্থাৎ "বাঘা বাঘা পাঁচটা" ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান বাহাদুরেরা তাঁহাদের ব্যাঙ্কের বাৎসরিক অধি-বেশনে কেবল যে অংশীদারদিগের সম্বন্ধে ব্যাঙ্কসমূহের কাজের বিবরণ-ই দিতেছেন তাহা নহে, ব্যবসা সম্বন্ধে বাহিরের লোকদিগকেও অনেক কথা বলিতেছেন।

মিড্ল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক

এ বৎসর মিড্ল্যাণ্ড ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত রেজি-ন্যাল্ড ম্যাক্কেন্না সাহেব একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। অন্যান্য কথার মধ্যে তিনি নিম্নের কথাটির উপরেই বেশী জোর দিয়াছেন।

এবৎসরের সর্ব্বপ্রধান অর্থনৈতিক ঘটনা এই যে,—আমরা সোনার পরিমাণ অনুসারে টাকা-কড়ির দাম প্রচলনের প্রথায় (গোল্ড ষ্ট্যাণ্ডার্ডে) ফিরিতে পারিয়াছি। * * * * বিনিময়ের দিক্ দিয়া আমাদের এই নবীন মুদ্রানীতি সফল হইয়াছে এবং সে জন্য আমাদের রাজস্ব-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ ধন্যবাদার্হ।

যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে আমরা "স্বর্ণমুদ্রায়" ফিরিয়া যাইব এই নির্দ্দিষ্ট সঙ্কল্পের দ্বারাই আমাদের আর্থিক নীতি বিগত পাঁচ বৎসর চালিত হইয়াছে।

পাঁচ বৎসর পরে আমাদের সেই চেষ্টা যে ফলবতী হইল ইহা খুবই আনন্দের বিষয়। তবে আমরা সরলান্তঃকরণে স্বীকার করিতে বাধ্য যে, আমেরিকার মূল্যবৃদ্ধিই আমাদের সফলতার প্রধানতম কারণ।

"স্বর্ণমুদ্রায়" প্রত্যাবর্ত্তনের ফলাফল সম্বন্ধে অভিমত গঠন করিতে গেলে প্রধান প্রশ্ন দাঁড়ায়—আমাদের টাকার দর চড়া রাখা সম্ভবপর হইবে কি না এবং আমাদের বর্ত্তমান সঞ্চিত সোনার উপচয়-উদ্দেশ্যে কৃত্রিম উপায়ে বাজারে সম্ভ্রম (ক্রেডিট্) সীমাবদ্ধ রাখিতে পারা যাইবে কি না।

পৃথিবীর উৎপন্ন দ্রব্য স্বাভাবিক চাহিদার অতিরিক্ত। এই কথাটির উপরেই উক্ত প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করিতেছে।

যোগান কিছুদিন ধরিয়া চাহিদার অতিরিক্ত হইতে থাকিবে এবং সেই ফাজিল অংশটা ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার যুক্তপ্রদেশই টানিয়া লইবে। যেসব দেশে সোনার বাজার মুক্ত এবং ঐরূপ লইতে বাধ্য, সেইসব দেশের ব্যবসা ইহাতে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিবে বলিয়া আমার অনুমান। আমার মনে হয় আমার এ অনুমানটি যুক্তিসঙ্গত।

যে কয়েকবৎসর ধরিয়া ব্যবসায়ের বাজারে মন্দা চলিতেছে, সেই কয়েকবৎসর আমরা পৃথিবীর মধ্যে শিল্পজাত দ্রব্যের সর্ব্বপ্রধান রপ্তানিকারক। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যদিয়া আমাদের ব্যবসায় চলিলেও তাহার জীবনীশক্তি সাঙ্ঘাতিক-রূপে ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

আমি বিশ্বাস করি, মন্দা বাজারের কাল আমাদের পক্ষে একটা পরীক্ষার সময় গিয়াছে এবং তখনই আমরা ঘর সামলাইতে ব্যস্ত হইয়াছি। সাময়িক অর্থ-দৈন্যের দরুণই এই অসাধারণ মন্দা উপস্থিত হইয়াছিল। আমার বিশ্বাস যে, সেই দুরবস্থা এখন শেষ হইয়া আসিল।

বার্কলেজ্ ব্যাঙ্ক

বার্কলেজ্ ব্যাঙ্কের শ্রীযুক্ত গুডেনাফ্ যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার মুখ্য বিষয়গুলি নিম্নে বিবৃত হইতেছে :—

শুধু বৃটিশ সাম্রাজ্যের জন্য নহে, অন্যান্য দেশের জন্যও নূতন মূলধনের যথোচিত যোগান যোগাড় করা বর্ত্তমানের একটা বড় সমস্যা।

দেশে আমেরিকার টাকা বেশ পরিপূর্ণভাবেই খাটান যাইতেছে এবং বাহিরে ঋণ-দান-সম্বন্ধে লণ্ডনের বাজারে যে সব বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল, তাহাও বৃটিশ গভর্মেণ্ট তুলিয়া দিয়াছেন। সুতরাং যাহারা মূলধন খুঁজিতেছে তাহারা এখন কিছুদিন কেন্দ্রস্বরূপ এই লণ্ডনের দিকেই আবার তাকাইবে। আমাদের ভবিষ্যৎ রপ্তানি বাড়াইবার দিক্ হইতে এবং আমাদের শিল্প-ব্যবসায়ের কল্যাণে বিদেশে টাকা খাটাইবার উদ্দেশ্যে যতদূর সম্ভব চাহিদা অনুসারে যোগান দেওয়াই আমাদের বর্ত্তমান কর্ত্তব্য। অবশ্য সে কর্ত্তব্য-পালন যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে হয় তাহা দেখিতে হইবে।

বৃটিশ শিল্প-ব্যবসায়ে উন্নতির অনেক লক্ষণ দেখা যাইতেছে। স্বর্ণমুদ্রায় ফেরা হইতে আমেরিকার খুচরা দামের তুলনায় আমাদের দামগুলা বেশ সন্তোষজনক হইয়াছে।

স্বর্ণমুদ্রায় ফেরার দরুণ আমরা দামটা এরূপ স্তরে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিব যাহাতে আমরা অন্যান্য উৎপাদক দেশের সহিত ও প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইব। তাহা হইলে আমাদের দেশের অনুকূল ব্যবসায়ের ঝোঁজ ও গতি-রক্ষা করা আমাদের পক্ষে কঠিন হইবে না। যাহাতে আমাদের সঞ্চিত সোনা অযথা খাটান না হয় তাহার ব্যবস্থাও আমরা করিতে পারিব।

যে যে বিষয়ের দ্বারা দেশের বর্ত্তমান অবস্থা সূচিত হইতেছে, সেইসব বিষয় বিবেচনা করিয়া আমরা মনে করিতে পারি যে, আমরা ক্রমশঃ ভালর দিকেই যাইতেছি এবং আমাদের উৎসাহেরও যথেষ্ট কারণ আছে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এখন যে উদ্বৃত্ত সোনা আছে, তাহার পরিণাম কি হইবে তাহাই একটা বড় সমস্যা। * * * কেহই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না, আমেরিকার এই সোনা পৃথিবীর অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কি খেলা খেলিবে অথবা কখন এবং কি প্রকারে তাহা শোষিত হইয়া যাইবে।

এই সমস্যাটা মীমাংসা করা খুবই দরকার। যাহারা এই বিষয়ের সঙ্গে জড়িত, তাহাদের মধ্যে সহযোগিতা চাই। বিশেষতঃ, বৃটিশ ও আমেরিকার ট্রেজারী এবং ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ড ও ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মধ্যে সহযোগিতা একান্তই আবশ্যক। তাহা হইলে একদিকে বেশী তাড়াতাড়ি খরচও হইবে না, আবার অন্যদিকে বেশী তাড়াতাড়ি জমাও হইবে না। প্রাপ্য যোগানের জন্য অযথা প্রতি-যোগিতা করিলেই ঐরূপ হইয়া থাকে।

যদিও আমরা এখন কঠিন সঙ্কটের মধ্যদিয়া চলিতেছি, তথাপি আমাদের অবস্থা ভালর দিকেই যাইতেছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। আজ 'ভবিষ্যতের পানে তাকাই আশাভরা উল্লাসে'।

ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের উপরই দেশের সত্যকার শক্তি নির্ভর করে। কেবলমাত্র সেই উপায়েই আমরা সাম্রাজ্যের সমুদ্র-বাণিজ্য-বিস্তারকল্পে বিদেশে টাকা খাটাইতে সমর্থ হইব। আমাদের ভাবী উন্নতির চাবি সেইখানেই।

মালদহের পলিহা, পুণ্ডরী, সেরশাবাদী ও সাঁওতাল

(আর্থিক নৃতত্ত্ব)

শ্রীহরিদাস পালিত

(১)

পলিহা, কোচ, রাজবংশী, গণেশ, বড়িয়া, চাঁই, ধানুক ইত্যাদি জাতি রঙ্গপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চল হইতে মালদহে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়াছিল। বর্ত্তমানেও ইহারা প্রধানতঃ কৃষিজীবী। পলিহাদি জাতির কৃষিক্ষেত্র-নির্ব্বাচনের পদ্ধতি একটু স্বতন্ত্র ধরণের। তাহারা বাসভবনের সংলগ্ন পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের মধ্যেই ক্ষেত্র-বিভাগ করিয়া কৃষিকার্য্য করে। তরিতরকারীর কৃষিই প্রধান। ধান্যাদির আবাদ আবশ্যকমত, অথচ সুপ্রচুর নহে। কেহ কেহ তামাকের চাষ করে। কোনো কোনো গৃহস্থ ঘানির সাহায্যে তৈল উৎপাদন করিয়া থাকে। কিন্তু জীবন-যাত্রার উপযোগী কৃষিই ইহাদের প্রধান অবলম্বন।

প্রথমে যে পরিমাণ ভূমিতে ইহারা কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিয়াছিল, পরবর্ত্তী কালে, বংশবৃদ্ধির অনুপাতে কৃষিভূমির সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই, অথচ নূতন নূতন কৃষিক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধেও ইহারা উদাসীন থাকে। ক্ষেত্রোৎপন্ন যে শস্যাদিতে তাহাদের জীবন-যাত্রানির্ব্বাহ হইত, পরে ক্রমে বংশবৃদ্ধি হেতু উক্ত পরিমাণে আর চলে না। ক্রমেই খাদ্যাভাব হইতে থাকে। তথাপি তাহারা গোষ্ঠীর সংখ্যানুপাতে কৃষি ও কৃষিক্ষেত্রের পরিমাণ-বৃদ্ধি করে না। ফলতঃ, তাহারা অকালে লোপ পাইতে বসিয়াছে। এ জাতি মালদহ হইতে কোন্ দিন বিলুপ্ত হইত, যদি দুই চারি ঘর প্রবাসীরূপে আগমন না করিত। বর্ত্তমানে এ জাতি কৃষির সহিত শিল্পাদি গ্রহণ না করিলে শীঘ্রই লুপ্ত হইবে। এক্ষণে ইহারা নিতান্ত দুর্ব্বল ও লুপ্তপ্রায় জাতিতে পরিণত হইয়াছে।

গণেশজাতি অগ্রে কৃষিকার্য্যই করিত। পরে কার্পাস সূত্র দ্বারা বস্ত্রবয়ন শিক্ষা করিয়া কৃষি ত্যাগপূর্ব্বক তন্তুবায় রূপে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিত। পরিশেষে বস্ত্রশিল্পের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদেরও পতন হইয়াছে। এখন ইহারা প্রায় বিলুপ্ত জাতিতে পরিণত হইয়াছে।

(২)

পুণ্ডরী, কৈবর্ত্ত, বারিক, প্রভৃতি জাতি পরবর্ত্তী কালে মালদহবাসী হইয়াছে। এইসকল জাতি গৌড়ধ্বংসের পরেই বা কিঞ্চিত পূর্ব্বে, মালদহে কৃষিজীবিরূপে আগমন ও বাস করিতে আরম্ভ করে। এতন্মধ্যে পুণ্ডরীজাতি, সেই কাল হইতেই কঠোর পরিশ্রমী এবং একতাবদ্ধ জাতি ছিল। এই জাতি তৎকালপ্রসিদ্ধ জাতিগণের মধ্যে বীর এবং অধ্যবসায়ী থাকায় অল্পকাল মধ্যে কয়েক প্রকার শিল্প এবং ক্ষুদ্র বাণিজ্য অবলম্বন করিয়া যোগ্যতম জাতির মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। তাহাদের একমাত্র প্রতিদ্বন্দী ছিল "দেশীয়" মুসলমানগণ।

মুসলমানগণ তখন কৃষিশিল্প এবং প্রাদেশিক ক্ষুদ্র বাণিজ্যদ্বারা শ্রেষ্ঠ এবং যোগ্যতম জাতিরূপে পরিগণিত ছিল। তাহারা পুণ্ডরী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও কর্ম্মঠ জাতি ছিল। ক্রমে রেশম-কীট পালন প্রবর্ত্তিত হয়—পুণ্ডরীগণই এই প্রথার প্রবর্ত্তক। তৎকালে রেশম-সূত্র প্রস্তুত হইত অতি সামান্য। তুঁত পাতার কৃষি, রেশম-কীটের অনুপাতে যৎসামান্য হইত। ক্রমে গীরগোসা,এগণ বণিকরূপে দেখা দেয়, এবং কার্পাস ও রেশম-সূত্রের সম্মিলনে 'মসরু' নামক বস্ত্রের বয়ন তাহারা প্রবর্ত্তন করে। দক্ষিণ মালদহের মুসলমান এবং পুণ্ডরী জাতি কৃষিত্যাগ করিয়া মুখ্যরূপে মসরু বয়নে মনোযোগী হইয়াছিল। তাহারা আনুষঙ্গিক হিসাবে সামান্য রেশম-

কীট পালন এবং তুঁতের চাষ করিত। মসরুর থান প্রস্তুত ও বিক্রয় করিয়া তাহারা সুখে সংসার-যাত্রা চালাইতে লাগিল।

মসরু-শিল্পদ্বারা এই জাতি যথেষ্ট উন্নত হইয়াছিল। ক্রমে মসরুর থান বাজারে অনাদৃত এবং উপেক্ষিত হওয়ায় মসরুর প্রধান বণিক পীরগোসাঞগণের পতন হইল। যে তাঁত হিন্দু-মুসলমানগণের পুরুষের সংখ্যা-হিসাবে গণিত হইত, সেই তাঁত লোপ পাইল। কৃষিক্ষেত্রহীন এবং কৃষিকর্ম্মে অদক্ষ হিন্দুমুসলমান রেশম-কৃষির উন্নতি-বিধানে যত্নবান হইল। পরে মালদহ এবং রাজসাহীতে বৈদেশিক কোম্পানীর রেশম-শিল্পের কুঠি প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। রেশমের গুটী (ককুন) অধিক মূল্যে বিক্রয় হওয়ায়, তাঁতীগণ প্রচুর কোয়া উৎপাদন দ্বারা আশাতিরিক্ত অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিল।

কালক্রমে তাহারা অপরিমিতব্যয়ী, বিলাসী ও বহ্বাড়ম্বরে অভ্যস্ত হইয়া উঠিল এবং আমোদ-উৎসবে ব্যয়-বাহুল্য করিতে লাগিল। বিগত মহাযুদ্ধের সময় হইতে রেশমকুঠি উঠিয়া যাওয়ায় এবং অন্যান্য কারণে রেশমের বাজার মন্দা হওয়ায়, রেশম-কৃষির অবনতির যুগ দেখা দিল। তুঁতের কৃষির পতন আরম্ভ হইল। এখন রেশম-কৃষকগণের অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইতেছে। নিয়ত অন্নাভাব, অথচ অভ্যাসমূলে অর্থের অপব্যবহার হ্রাস পাইল না। অচিরে রেশমের বাজার উঠিবে এই আশায় মহাজনগণের নিকট প্রভূত ঋণ গ্রহণ করিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ দিন দিন বাজার পড়িয়া যাইতেছে। হিন্দু-মুসলমান রেশম-কৃষকের দুর্দ্দশা চরমে পৌছিয়াছে। নিয়ত দুর্ভিক্ষ এবং ব্যাধির আক্রমণে ঘনবসতিওয়ালা পল্লী বিরলবসতিতে পরিণত হইতেছে।

(৩)

এই মসরুর তাঁতীসকল ক্রমে কৃষিক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া রেশম-কৃষির মোহে যখন সামান্য তুঁত-ক্ষেত্র অবলম্বনে অগ্রসর হইতেছিল সেই মহেন্দ্রক্ষণে মুর্শীদাবাদ-জঙ্গীপুর অঞ্চল হইতে, "সেরশাবাদী" নামক দীর্ঘকায় বীর মুসলমান জাতি ভাগ্য-পরীক্ষার্থ দলে দলে মালদহে প্রবেশ করিয়া কৃষিক্ষেত্রসকল জমিদারগণের নিকট হইতে বন্দোবস্ত করিয়া লইতে আরম্ভ করিল। ক্রমে উক্ত কর্ম্মঠ জাতিতে মালদহের দক্ষিণার্দ্ধভাগ সমাচ্ছাদিত হইল। কাঠাল (বনভূমি), বিলান প্রভৃতি কৃষিভূমি সেরশাহী জাতির অধিকৃত হইল। কৃষিক্ষেত্রত্যাগী হিন্দুমুসলমানগণ কর্ম্মহীন, অর্থহীন, ঋণগ্রস্ত হইয়া অযোগ্য জাতিতে পরিণত হইল। দাসত্ব এখন তাহাদের সম্বল ! ধ্বংস তাহাদের সম্মুখে !

সেরশাবাদীরা বর্ত্তমান মালদহের কৃষিজীবিগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। তাহারা বিবিধ প্রকার কৃষিকার্য্য করে, লোহারের কর্ম্ম করে, হাল চষে, গোশকটের গাড়োয়ানী করে, চামড়ার ব্যবসা করে, দোকানদারীও করে। যে কার্য্যে অর্থ উপার্জ্জন হয় তাহাই করিতে তাহারা নিয়ত প্রস্তুত। বর্ত্তমানে তাহারা মালদহের একটী উন্নতিশীল জাতি। অন্যান্য জাতি অপেক্ষা তাহাদের বংশবৃদ্ধি দ্রুত। অনতিদূর ভবিষ্যতে এই জাতি ধনে, মানে ও সভ্যতায় শীর্ষস্থান অধিকার করিবে।

এই জাতি সংসারের জনসংখ্যানুসারে কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্যাদি বিভিন্ন অর্থাগমের উপায় নির্দ্ধারণ করে। কেহ সাধারণ কৃষিতে, কেহ রেশম-কৃষিতে, কেহ শিল্পাদির কার্য্যে নিযুক্ত হয়। এমন কি, কেহবা দূর বরেন্দ্র-ভূমিতে গিয়া প্রবাসীর ন্যায় হৈমন্তিক ধান্যের চাষ করিয়া অন্নের সংস্থান করে। ইহারা মিতব্যয়ী, অবিলাসী, বহ্বাড়ম্বরে অনভ্যস্ত, একতাবলম্বী এবং কঠোর-পরিশ্রমী। মালদহের দক্ষিণার্দ্ধ ইহাদের অধিকারভুক্ত। উত্তরার্দ্ধেরও দক্ষিণ-পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পূর্ব্বাঞ্চল ইহারা ক্রমশঃ অধিকার করিতেছে।

(৪)

পশ্চিম মালদহের দিয়াড়ভূমি নাগর জাতির অধিকারে আসিতেছে। এ জাতি বীর কিন্তু বিবাদপ্রিয় নহে। ইহারা অশিক্ষিত এবং বর্ত্তমান বিশ্ব-শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। স্ত্রী-পুরুষে কৃষি কাজ করিয়া থাকে। কৃষি হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের এবং কৃষিজ শিল্প-দ্রব্যের বাণিজ্য করিয়া ইহারা ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করিতেছে।

রাজমহল পাহাড়ের সাঁওতালগণ মালদহের উত্তরার্দ্ধ,—পলিহা, কোচ, রাজবংশী প্রভৃতির অধিকৃত বনভূমি,—পঙ্গপালের ন্যায় অধিকার করিতেছে। লুপ্তপ্রায় জাতির কৃষি-ভূমি ও বনভূমি তাহাদের হস্তবলে উর্ব্বর-ক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে। এই জাতি সেরশাবাদী মুসলমানগণের অনুরূপ প্রণালীতে সংসারে যোগ্যতা দেখাইতেছে। ইহারা কেবল কৃষির উপর নির্ভর করে না, কিন্তু কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের সাহায্যে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে।

বারিক, কাঁধু, কাঠী, কুড়াল প্রভৃতি জাতি আপন আপন ব্যক্তিগত বা জাতিগত কর্ম্ম ব্যতীত অন্য কিছুই করে না। এসকলই আধুনিক প্রবাসী। ইহারা সংখ্যায় অতি অল্প। বৈদেশিক জাতিসকল মালদহে প্রবেশ করিয়া ইতোমধ্যেই এই সকল জাতিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত করিতেছে।

(৫)

যে যে সামাজিক জাতি বা গোষ্ঠী বর্ত্তমান জগতের গতির সহিত সমবেগে অগ্রসর হইতে না পারিবে, তাহারাই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে ও ধ্বংস হইবে। প্রাচীন সংস্কারে আবদ্ধ যেসকল পূর্ব্বতন জাতি মালদহে বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাদের দ্রুত বিলোপের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইতেছি। আর যাহারা প্রাচীন সংস্কার-নীতিকে কালোপযোগী অভিনব রূপান্তর দিতে সমর্থ, তাহাদের দ্রুত উন্নতি এবং বংশ-বিস্তার ঘটিতেছে।

প্রাচীন জাতিগণের মধ্যে—পলিহা, কোচ, রাজবংশী, গণেশ, বড়িয়া, পুণ্ডরী (পুণ্ড্রক্ষত্রিয়), কৈবর্ত্ত (মাহিষ্য), বারিক, চাঁই, কাঁধু, ধানুক, নাগর, কাঠি, কাঁড়াল, কুড়াল, এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণেতর জাতি হিন্দু সমাজের অন্তর্গত।

মুসলমান—গৌড়িয়া, পাণ্ডুয়াই অর্থাৎ দেশীয় মুসলমান, কুজরা, পাঝরা এবং পিড়িয়া ইত্যাদি। সেরশাবাদী মুসলমান অভিনব শক্তিশালী জাতি।

হিন্দু-মুসলমানেতর জাতির মধ্যে—অভিনব কর্ম্মী সাঁওতাল, খৃষ্টান সাঁওতাল। দেশীয় খৃষ্টান, সঙ্কর জাতি, নবরওন—ইহারা স্তিমিত।

উপরি উক্ত জাতিসমূহের অবনতি ও উন্নতির বিশিষ্ট কারণ সাধারণতঃ দুইটী :—

(১) অবনতি-মুখী হেতু,—সুপ্রাচীন নীতি ও সংস্কারানুযায়ী জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহ ছাড়া আর কোনো কথা ইহারা জানে না। বর্ত্তমান বিশ্ব-শক্তির প্রতি অশ্রদ্ধা এবং ঔদাসীন্য এক বিশেষ লক্ষণ।

(২) উন্নতি-মুখী কারণ,—সর্ব্ববিধ সুপ্রাচীন দেশজ নীতি ও সংস্কারের উপর বর্ত্তমান জীবনী-শক্তির প্রতিষ্ঠা। সময়োপযোগী কৃষি-শিল্পাদির প্রবর্ত্তন। প্রাচীন কর্ম্মাদি সংস্কারের আবশ্যক মত ত্যাগ ও কর্ম্মের অভিব্যক্তি মুখী পন্থা অবলম্বন।

প্রথম পক্ষ—জাতীয় মান-মর্য্যাদা রক্ষার জন্য চিরপ্রচলিত সংস্কার-জাত, অভিমান-মূলক কর্ম্ম শ্রেণী-বিভাগ করিয়া গ্রহণ করে। বর্ত্তমান আর্থিক উন্নতির অনুকূল কর্ম্ম সংস্কার-বিরুদ্ধ হইলে আদৌ গ্রহণ করে না। চিরাভ্যস্ত কর্ম্মদ্বারা জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের একান্ত পক্ষপাতী। অলস ও দুর্ব্বল-চেতা অথচ আয়াসপ্রিয় এবং বিলাসী। কৃষি-শিল্পাদির কোনো একটীকে মুখ্যরূপে গ্রহণ করে, এবং প্রায়ই সেইটীকে অবলম্বন করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

দ্বিতীয় পক্ষ—আর্থিক উন্নতির দিকে ধ্রুব লক্ষ্য রাখিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। নিয়ত অর্থকর কর্ম্ম গ্রহণে তৎপর। কর্ম্মের শ্রেণী বিভাগ আর্থিক হিসাবেই করিয়া থাকে। একমাত্র লক্ষ্য অর্থ। জাতীয় সংস্কারে চিরাবদ্ধতা নাই। পরিশ্রমী এবং স্বাবলম্বী। ইহাদের নিকট কৃষি, শিল্প অথবা ক্ষুদ্র বাণিজ্য অনাদৃত নহে। কোনও একটীকে জীবন-যাত্রার অনুকূলে মুখ্যরূপে গ্রহণ করে না, যেটীতে অর্থ আছে সেইটি-ই গ্রহণ করে।

উভয় সম্প্রদায়েরই শিক্ষার ও বর্ত্তমান বিশ্ব-শক্তির সহিত পরিচয়ের অভাব। সরল ও সহজ পল্লী-জীবন ইহাদের আদর্শ। এইসকল বিভিন্ন জাতি প্রবাসি-রূপে বিভিন্ন কার্য্যে মালদহে আগমন করিয়াছে। অযোগ্যের বিদায়-গ্রহণ এবং যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন এই সকল অভিনব জাতির মালদহ-বাসের কারণরূপে নির্ণীত হইতে পারে।

অতি প্রাচীন গৌড়ীয় জাতির স্থান-ত্যাগ বা ধ্বংস এই

হেতুতেই ঘটে। যেসকল জনপদে প্রাচীন জাতি ধ্বংস হইয়াছে তথায় অভিনব প্রবাসী জাতি আসিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া মালদহবাসী হইয়াছে।

(৬)

দরিদ্রের পক্ষে সংসারে "যোগ্যতা" লাভ করা সম্ভব কোথায়? উদ্বর্ত্তন তাহার প্রতিরুদ্ধ, অভিব্যক্তি তাহার স্তিমিত, আত্মবল সংস্কার-শাসনে অভিভূত। সুতরাং ধরা-পৃষ্ঠ হইতে নিঃশেষে বিলুপ্ত হওয়াই তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।

মালদহের বাহিরে দৃষ্টিপাত করিলেও এইরূপই দেখিতে পাই। বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে সংস্কারের শতছিন্ন বাসে আবৃত সমাজ মৃত-প্রায় হইয়া রহিয়াছে। একমাত্র কর্ম্মবীরগণ, যুগোপযোগী অভিনব সংস্কার-বাসে দেহ মণ্ডিত করিয়া আত্মশক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। চক্ষুষ্মান দর্শন করিতেছে, শ্রুতিমান শ্রবণ করিতেছে। যাহারা প্রাচীন সংস্কার দূরে নিক্ষেপ করিতেছে না, তাহারাই সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছে। যাহারা সময়োপযোগী নীতি আত্ম-বলে গ্রহণ করিতেছে, তাহারাই যোগ্যতম হইয়া অযোগ্যগণকে অধিকার হইতে বিতাড়িত করিয়া উদ্বর্ত্তিত হইতেছে।

বঙ্গের প্রতি জেলায় প্রাচীন সংস্কার-পন্থীর পরাভব এবং বিলোপের প্রত্যক্ষ দৃশ্য পরিস্ফুট রহিয়াছে। সর্ব্বত্রই অভিনব আত্মবলে উদ্বুদ্ধ প্রাচীন-সংস্কার-ত্যাগী কর্ম্মবীরগণের দ্রুত উদ্বর্ত্তন এবং জীবন-যাত্রার সংগ্রামে বিজয়লাভের বাণী শ্রুত হইতেছে।

ভারতের শ্রমশক্তি*

মজুর ভারতের লোকবল

আমরা জানি প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় ২,০০০,০০০ শ্রমিক—স্ত্রী ও পুরুষ—ধর্ম্মঘট করিতে শিখিয়াছে এবং জানি যে, সে ধর্ম্মঘটের উদ্দেশ্য ইয়োরামেরিকার শ্রমিকদের উদ্দেশ্য হইতে এক চুলও এদিক্-ওদিক্ নহে। অর্থাৎ সকলেরই আকাঙ্ক্ষা—"কম ঘণ্টা খাটিয়া বেশী পারিশ্রমিক লইব, ভাল বাসস্থান পাইব এবং অন্যান্য অনেক সুবিধা ভোগ করিব।" তবু আমরা বলিতে বাধ্য, ভারতের শ্রমিক আন্দোলন এখনও শৈশব অবস্থা কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। এখনও তাহার আত্মজ্ঞান সম্পূর্ণ ভাবে জাগে নাই। কেন আমরা একথা বলিতেছি তাহা পরবর্ত্তী বিবরণ হইতেই বুঝা যাইবে।

বাংলার বহু কয়লার খনি ও পাটের কল, আসাম ও বাংলার অনেকগুলি চা-বাগান এবং উত্তর-পশ্চিম ও মাদ্রাজ প্রদেশের অনেকগুলি পশম-কলের মালিকগণ বিদেশী। শুধু ইহাদের বিরুদ্ধেই ভারতের শ্রমিক-আন্দোলন সুরু হইয়াছে একথা বলিলে মিথ্যা বলা হয়। বোম্বাইয়ের কাপড়ের কল-গুলির মালিক ত আর বিদেশী নহে; তাহারা ত দেশেরই-লোক। তাহাদিগের বিরুদ্ধেও এ আন্দোলন বন্ধ থাকে নাই। বলা বাহুল্য, শ্রমিক ও ধনিকের মধ্যের এই মন-কষাকষি কোনরূপ জাতিবিদ্বেষ-প্রসূত নহে। স্বদেশানুরাগ, জাতীয়তা বা রাজনীতির গন্ধও ইহার মধ্যে এক প্রকার নাই। শুদ্ধমাত্র আর্থিক অবস্থার দরুণই এই আন্দোলনের সূত্রপাত।

অনধিক ৩০,০০০৲টাকা মূলধন লইয়া যে-সমস্ত ছোট-খাট শিল্প-ব্যবসায় চলিতেছে, তাহাদের কথা বর্ত্তমানে না-হয় বাদ-ই

* শ্রীবিনয়কুমার সরকার-প্রণীত "ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট" নামক মাদ্রাজ হইতে সদ্যঃপ্রকাশিত ইংরেজি গ্রন্থের কোনো অধ্যায়ের এক অংশ হইতে তথ্য সঙ্কলিত।

দিলাম। তাহাতে বেশী লোক খাটে ও না এবং সেখানে ফ্যাক্টরি-চালানোর সমস্যা বা শ্রমের অবস্থা তেমন সঙ্গীনও না।

কিন্তু "মাঝারি" ও বিরাট শিল্পকারখানাগুলিতেই শ্রমসমস্যা সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে—তা সে কারখানাগুলি স্বদেশীরই হউক বা বিদেশীরই হউক। টাটার লৌহ-কারখানায় ২৫,০০০ হাজার, হুকুম চাঁদের পাটের কলে ৫,০০০ হাজার, কাপড়ের কলগুলায় গড়ে এক হাজারের উপর লোক কাজ করে। এ সমস্তই দেশীয় কারখানা।

সরকারী গোলাগুলির কারখানার প্রত্যেকটিতে গড়ে প্রায় সতের শ' লোক খাটে। অন্যান্য শিল্প-কারখানায় যাহারা কাজ করে, তাহাদের গড় ১০০ হইতে ১৫০, পর্য্যন্ত। এইরূপ শ্রমিকসংখ্যার গড় (ফ্যাক্টরি-প্রতি) বৃটিশ ভারতে ২৩০ এবং দেশীয় রাজ্যে ১৪০।

অবশ্য সব ক্ষেত্রেই সংখ্যাগুলিকে ঠিকের কাছাকাছি বলিয়া ধরিতে হইবে। যে সংখ্যা উপরে দেওয়া গেল সেটা কোনমতেই উপেক্ষণীয় নহে। জাপান, ইতালি, এমন কি ফ্রান্সেও—এক একটা ফ্যাক্টরির কথা ধরিলে—অবস্থা এখানকার অবস্থা অপেক্ষা বেশী ঘোরালো নহে। শ্রমিক পুরুষ ও স্ত্রীর মোট সংখ্যা হয় ত ভারতবর্ষ অপেক্ষা সেসব জায়গায় বেশী। কিন্তু প্রতি ফ্যাক্টরির শ্রম-বন্দোবস্ত-সমস্যা এবং মালিক ও ম্যানেজারদিগের উপর শ্রমিকদের প্রতিক্রিয়া ভারত ও বিদেশ সর্ব্বত্রই সমান। শিল্প-মজুরদের সমস্যা আজ আন্তর্জ্জাতিক হিসাবে পৃথিবী ব্যাপিয়া বর্ত্তমান।

কিন্তু ভারতের সাধারণ জীবনে শ্রম এখনও একটি প্রধান শক্তিরূপে কাজ করিতেছে না। শ্রমিক-সংখ্যাই তাহা বলিয়া দিতেছে। শিল্প-মজুরের সংখ্যা ভারতে ১,৩৭৬,১৩৬। এই সংখ্যাকে ভারতের অধিবাসীর সংখ্যার সহিত তুলনা করিলে বলিতে হইবে, ইহা নিতান্তই নগণ্য। রেলের লোক, জাহাজের খালাসী, খনির মজুর, চা-বাগানের কুলী, কারিগর এবং শিক্ষিত ও অশিক্ষিত শ্রমিক প্রভৃতি সকলের (স্ত্রী ও পুরুষ ধরিয়া) সংখ্যা ধরিলে দেখা যায়, ভারতের সমস্ত অধিবাসীর শতকরা প্রায় দশ ভাগ লোক এই সব দলের অন্তর্গত। তবু এই সংখ্যাটা গ্রেটব্রিটেন, আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্র, জার্ম্মাণি ও ফ্রান্সের সঙ্ঘবদ্ধ শিল্প-মজুরের তুলনায় খুব সামান্যই বলিতে হইবে।

শ্রমিক বনাম ধনিক

ভারতে শ্রমিকদের আকাঙ্ক্ষা কিরূপভাবে পূর্ণ হইতেছে, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার উত্তরে কেহ কেহ হয়ত বলিবেন—মন্দভাবে নহে। সপ্তাহে কত ঘণ্টা খাটিতে হইবে তাহা জেনেভার আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক মজলিসে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ভারতের ব্যবস্থাপক সভাও তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। গ্রেটব্রিটেন, যুক্ত-রাষ্ট্র, জার্ম্মাণি ও অন্যান্য শিল্প-প্রধান দেশে দৈনিক আট ঘণ্টা কাজ এখনও কিন্তু আইনে পরিণত হয় নাই। এই হিসাবে ভারতবর্ষকে আধুনিকতমই বলিতে হইবে। হয়ত একটু অকালেই তাহার এই আধুনিকতা!

কিন্তু এখনও অনেক-কিছু করিবার আছে। শ্রমিকদের অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত এন্. এম্ যোশী 'মেটার্ণিটি বিল' নামে একটি বিল ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করিয়াছেন। শ্রমিক স্ত্রীলোকদিগকে প্রসবের পূর্ব্বে ও পরে কতকগুলি সুবিধা দেওয়ার জন্যই ঐ বিলের উত্থাপন। কিন্তু উহা এখনো পাশ হয় নাই। উহার পাশ হইবার সম্ভাবনাও খুব কম। তাহার অনেক কারণ আছে। তন্মধ্যে একটি কারণ—কলের মালিকদিগের আপত্তি। মালিকদের সমিতি গভর্ণমেণ্টকে একখানি পত্রে জানাইয়াছেন যে, ঐ বিলের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইলে গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে তাঁহারা একমত। তাঁহারা তেজের সহিত বলিয়াছেন, ঐ বিষয়ে জনসাধারণের মত এখনও প্রবল নহে। ব্যবস্থাটা প্রবর্ত্তিত হইলে, ঐ বিষয়ে তদারক করাও কঠিন হইবে—ইত্যাদি। তাঁহাদের প্রদর্শিত কারণের মধ্যে একটি কারণ এই যে, শ্রমিকেরা বিশেষ ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হয় নাই। আর একটি কারণ এই যে, স্ত্রী-ডাক্তারের সংখ্যা পর্য্যাপ্ত নয়। সুতরাং বিলের সর্ত্তানুসারে ডাক্তারী সাহায্য প্রদান করা শক্ত।

এক পুরুষ আগে ঐ ধরণের যুক্তি ইয়োরোপেও শুনা যাইত। মনে রাখিতে হইবে যে, ভারতীয় গভর্মেণ্ট এখনও জানেন না—বাধ্যতা-মূলক সার্ব্বজনীন অবৈতনিক শিক্ষার আইন কি বস্তু! তাঁহাদের ব্যবস্থা হইতেই বেশ বুঝা যায়, আজ ভারতীয় শ্রমশক্তির দৌড় কত দূর এবং যে বিশ্ব-শ্রমের মধ্যে আজ সে আসন পাইয়াছে, তাহার পশ্চাদ্‌ভাগের কোন্ স্তরে তাহার অবস্থিতি। অবশ্য আর্থিক জগতে উন্নতি করিতে হইলে ভারতের পন্থা আধুনিক সমুন্নত দেশের পন্থা হইতে বিভিন্ন হইবে না।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলিয়া রাখা ভাল। শ্রমবীমা কি বস্তু তাহা কিন্তু ভারতে এখনও অজ্ঞাত। আকস্মিক বিপদ, রোগ অথবা বার্দ্ধক্যে শ্রমিক স্ত্রীপুরুষেরা বিশেষ কিছু সাহায্য পায় না। প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন বিল আইনরূপে পরিগণিত হইয়াছে কেবল মাত্র ১৯২৫ সনের প্রথম ভাগে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বোম্বাইয়ের কলের মালিকেরা ভারতবর্ষেরই লোক, ইয়োরোপের লোক নহেন। জাতীয়তা বা স্বাদেশিকতার কোনো দিক্ দিয়াই তাঁহাদের আচরণ প্রাচ্যের প্রতি প্রাচ্যের অনুরূপ নহে। অর্থাৎ তাঁহাদের ব্যবহার ইংরেজ মালিকদের ব্যবহারেরই সমতুল। কাজে-কাজেই ভারতের মজুরেরা দেশীয় ও বিদেশীয় মালিকের মধ্যে কোনো রকম ইতর-বিশেষ করিতে পারে না। আজ তাই ভারতের শ্রমিক-সমাজ ধনের বিপক্ষে, "ধন-তন্ত্রে"র বিপক্ষে দাঁড়াইতে শিখিতেছে। কোন্ জাত, কোন্ দেশের লোক, কোন্ ব্যক্তি-বিশেষ এই পুঁজির মালিক তাহার প্রতি তাহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই।

ভারতীয় শ্রমিক পত্রিকা

ভারতের শ্রমিক এখন উদ্বুদ্ধ হইবার চেষ্টা করিতেছে। এর মধ্যেই "নিখিল ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস" দেখা দিয়াছে। তাহার শাখা-প্রশাখাও প্রদেশে প্রদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে এবং প্রতি বর্ষে তাহার বৈঠকও বসিতেছে। ত্রিশ বৎসর আগে কেবলমাত্র একখানি শ্রমিক পত্রিকা ছিল। বোম্বাইয়ের স্বদেশ-প্রেমিক লখনদে গুজরাটী ভাষায় তাহা প্রকাশ করেন। তাহার নাম ছিল "দীনবন্ধু"। কিন্তু আজ সেইখানে ভারতের বিভিন্ন ভাষায় এবং ইংরেজীতে প্রকাশিত প্রায় বিশখানি পত্রিকার নাম করা যায়। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি শ্রমিকদের নিজেদের দ্বারাই পরিচালিত। অন্য সম্প্রদায়ের তাহাতে হাত নাই।

মারাঠীভাষায় 'কামগর উঁদয়' নামে একখানি পত্রিকা আছে। বোম্বাইয়ের সেণ্ট্র্যাল লেবার বোর্ড-কর্ত্তৃক তাহা প্রকাশিত। মারাঠী সাপ্তাহিক 'কামকরী' ও বোম্বাই হইতে প্রকাশিত হয়। আহাম্মদাবাদে গুজরাটীভাষায় 'মজুর-সন্দেশ' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা আছে। কানপুর হইতে হিন্দীতে 'মজদূর' পত্রিকা সপ্তাহে দুইবার করিয়া বাহির হয়। কলিকাতায় 'শ্রমিক' নামে একখানি সাপ্তাহিক আছে। তাহার দুইটি করিয়া সংস্করণ বাহির হয় একটী বাংলাতে, আর একটী হিন্দীতে।

রেলওয়ে কর্ম্মচারীদের স্বার্থের কথা প্রকাশ করিবার জন্য অনেকগুলি পত্রিকা ইংরেজীতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের ইণ্ডিয়ান লেবার ইউনিয়ন-কর্ত্তৃক 'ইণ্ডিয়ান লেবার জার্ণ্যাল' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা সাঁতরাগাছি হইতে বাহির করা হয়। বোম্বাই হইতে গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়ে ইউনিয়ন-কর্ত্তৃক 'জি,আই,পি হ্যারল্ড' নামে একখানি পত্রিকা মাসে দুইবার করিয়া বাহির করা হইয়া থাকে। নর্থওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে ইউনিয়ন-কর্ত্তৃক একখানি সাপ্তাহিক লাহোর হইতে প্রকাশিত হয়। আউদ-রোহিলাখণ্ড রেলওয়ে ইউনিয়ন-কর্ত্তৃক 'মজদুর' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশিত হয়। সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ইউনিয়নের 'দি রেলওয়ে গার্জ্জিয়ান' একখানি সরকারী পত্রিকা। নাগপত্তন (মাদ্রাজ) হইতে উহা প্রকাশিত। তারপর 'রেলওয়ে টাইমস' নামে একখানি সাপ্তাহিক আছে। ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের যাবতীয় রেলকর্ম্মচারীদের যা-কিছু সমস্যা, সে সমস্তই ইহাতে স্থান পায়। ঐ সব কর্ম্মচারীদের মিলন-সঙ্ঘ-কর্ত্তৃক মুখপত্ররূপে ইহা বোম্বাই হইতে বাহির হয়।

ডাক-বিভাগের কর্ম্মচারীদেরও অনেকগুলি পত্রিকা

আছে। বাংলা এবং আসামের পোষ্ট্যাল ও রেলওয়ে মেল সার্ভিস এসোসিয়েশন-কর্তৃক 'লেবার' নামে একখানি মাসিক-পত্রিকা কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। আর একখানির নাম 'পোষ্টম্যান'। ইহা বোম্বাই প্রদেশের 'পিয়ন ইউনিয়নে'র মুখপত্র। উক্ত পত্রিকাদ্বয়ই ইংরেজীতে লেখা হয়। বোম্বাই প্রদেশের পোষ্টাল ও রেলওয়ে মেল সার্ভিস এসোসিয়েশন-কর্তৃক 'জেনারেল লেটার্স' নামে একখানি মাসিক বোম্বাই হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই নামের আর একখানি মাসিক পত্রিকা পুনার পোষ্টাল ও রেলওয়ে মেল সার্ভিস এসোসিয়েশনকর্তৃক প্রকাশিত হয়। লাহোর হইতে পাঞ্জাব এবং নর্থওয়েষ্টার্ণ পোষ্টাল ও রেলওয়ে মেল সার্ভিস এসোসিয়েশন 'পাঞ্জাব কমরেড' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া থাকেন। কলিকাতা হইতে 'জেনারেল লেটার্স' নামে আর একখানি মাসিক নিখিল ভারতীয় (ব্রহ্মদেশ ধরিয়া) পোষ্ট্যাল ও রেলওয়ে মেল সার্ভিস এসোসিয়েশনকর্তৃক প্রকাশিত হয়।

ইংরেজীতে দুইখানি শ্রমিক পত্রিকা উল্লেখযোগ্য। একখানি বোম্বাই হইতে প্রকাশিত। নাম 'সোশ্যালিষ্ট'। ইহা সাপ্তাহিক। আর একখানি মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত। নাম 'স্বধর্ম্ম'। ইহাও সাপ্তাহিক।

বোম্বাই গভর্মেণ্টের 'লেবার বুরো' মাসে মাসে একখানি বুলেটিন প্রকাশ করিয়া থাকেন।

বাংলা শর্টহ্যাণ্ড

শ্রীইন্দ্রকুমার চৌধুরী

বহু পূর্ব্বে বাংলা শর্টহ্যাণ্ড বা কোনো শর্টহ্যাণ্ডের অস্তিত্ব এদেশে ছিল কি না বলা কঠিন। সংস্কৃতে থাকিলেও থাকিতে পারে, তাহা হয়ত অন্যান্য বিদ্যার মত লুপ্ত হইয়া থাকিবে। কিন্তু বাংলা শর্টহ্যাণ্ড না থাকাই সম্ভব। গত ১৯২১ সন হইতে পুলিশের জনকয়েক লোক এবং আমি প্রণালীবদ্ধ ভাবে বক্তৃতাদির রিপোর্ট লিখিতে আরম্ভ করি। অবশ্য ১৯২১ সনের পূর্ব্বেও পুলিশের লোকেরা বক্তৃতার আপত্তিজনক অংশ টুকিয়া লইবার জন্য কতকগুলি সঙ্কেত বা কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছিলেন এবং সেইটিই ক্রমোন্নতিতে যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহাই পুলিশ-বিভাগের বর্ত্তমান শর্টহ্যাণ্ড প্রণালী। ইহার সাহায্যেই তাঁহারা রিপোর্ট লিখিতেছেন। এটা অনেকটা ইংরেজী পিটম্যান শর্টহ্যাণ্ডের বাংলা অনুকরণ। আমি সে প্রণালীতে যাই নাই। ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাতঃস্মরণীয় ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 'রেখাক্ষর বর্ণমালা' নামে একখানা বই লিখিয়াছিলেন। প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন বোলপুর যাই তখন জানিতে পারি যে, তিনি উক্ত বইখানি সংশোধন করিতেছেন। তিনি আমাকে বইখানি দেখান। দেখিয়া আমার মনে হইল শর্টহ্যাণ্ড হিসাবে যদিও উহার বিশেষ কোনো মূল্য নাই তথাপি উহাতে এমন উপাদান আছে, যাহা বাংলা শর্টহ্যাণ্ড তৈয়ারীর পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিবে। পরবর্ত্তীকালে যে শর্টহ্যাণ্ড-প্রণালী রচনা করিয়াছি তাহাতে ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "রেখাক্ষর বর্ণমালা" কেবল অপ্রত্যক্ষ ভাবে নয়, প্রত্যক্ষ ভাবেও কাজ করিয়াছে। আপাততঃ বোধ হইবে যে, উক্ত রেখাক্ষর ও আমার শর্টহ্যাণ্ড এই দুইটীর মধ্যে সামঞ্জস্যের পরিমাণ খুবই কম এবং আকৃতি-গত পার্থক্যই বেশী। কিন্তু অভিনিবেশ সহকারে দেখিলে বুঝা যাইবে যে, উভয়ের মধ্যে ভাবের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য রহিয়াছে। আকৃতি হিসাবে পিটম্যানের শর্টহ্যাণ্ডের সঙ্গে কতকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু তাহার সঙ্গে ভিতরকার সামঞ্জস্য কিছুই নাই। বাইরের যে মিল সেটা ঘটনাচক্রের মিলন।

প্রত্যেক শর্টহ্যাণ্ডেই দুইটি জিনিষ একান্ত দরকার। (১) তাড়াতাড়ি লিখা (২) সহজে পড়া। যত তাড়াতাড়ি

একজন বলিয়া যাইবে ঠিক তত দ্রুত লিখিতে হইবে এবং তাহা পড়িয়া দিতে হইবে। যে-কোনো রেখাক্ষর হইলেই যে তাহা বক্তার দ্রুততার সঙ্গে সমান বেগে লিখা যাইবে তাহা নহে। শর্টহ্যাণ্ডের বাংলা বলা যাইতে পারে—শ্রুত-লিখন প্রণালী, বা শোনা কথা লিখিবার উপায়। ভাষার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য এবং প্রচলিত শব্দে অভিজ্ঞতা এই তিন ভিত্তির উপর সমস্ত শর্টহ্যাণ্ড প্রতিষ্ঠিত। পিটম্যানের শর্টহ্যাণ্ড এত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে তাহার কারণ ইংরেজী ভাষার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের উপর ঐ শর্টহ্যাণ্ড প্রতিষ্ঠিত। ইংরেজী ভাষার প্রকৃতি ও বাংলা ভাষার প্রকৃতি এবং তাহাদের উচ্চারণ একরকম কি না সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে। সে জন্ত আমি পিটম্যানের অনুকরণ করি নাই। এ সম্বন্ধে আমি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পদানুসরণ করিয়াছি। বাংলা ভাষার সঙ্গে তাঁহার প্রণালী থাপ খায়।

অনেকের বিশ্বাস 'সাউণ্ড' বা আওয়াজ দৃষ্টে শর্টহ্যাণ্ড লেখা হয়। প্রকৃত কথা এই যে, ব্যঞ্জন বর্ণের রেখাগুলি মাত্র শর্টহ্যাণ্ড-লেখক টানিয়া যায়। তাড়াতাড়ি লিখিবার সময় তাহাতে স্বর-সংযোগ করা হয় না। যেমন আমি লিখিব "বিদুরিত" কিন্তু শুধু লিখিলাম—"বদরত"। কোনো অক্ষরের সঙ্গে স্বর-সংযোগ করিলাম না। ইহারই নাম "সাউণ্ড" বা আওয়াজ দৃষ্টে লেখা। কারণ বিদুরিত শব্দ উচ্চারণ করিবার সময় ব, দ, র, ত এই চারিটী অক্ষরের আওয়াজই প্রধানতঃ উচ্চারিত হয়। স্বর-সংযোগ সেই উচ্চারণকে সহায়তা করে মাত্র। প্রশ্ন হইতে পারে-বদরত শব্দ হইতে আমি বিদুরিত শব্দ কেমন করিয়া পাইব? এখানে কল্পনার সাহায্যই প্রধান। শর্টহ্যাণ্ড বিশেষ সাহায্য করে না, খুব জোর এইটুক মাত্র করিতে পারে—প্রথম অক্ষর "ব" এর সঙ্গে হ্রস্ব ইকার মাত্র নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তাহা পারে না। দ, র ও ত এর সঙ্গে কোন্ স্বর যুক্ত হইবে তাহা কোনো শর্টহ্যাণ্ড-প্রণালী বলিতে পারে না। যদি পারিত তবে শর্টহ্যাণ্ড প্রণালীকে নির্ভুল, পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান বলা চলিত এবং তাহা হইলে ভাষার উপর দখল থাকার কোনো প্রয়োজন হইত না। পৃথিবীর কোনো শর্ট-হ্যাণ্ড প্রণালী এখন পর্য্যন্ত সে দাবী করিতে পারে না।

তারপর পিটম্যান শর্টহ্যাণ্ডের একটা বিশেষত্ব সরু ও মোটা রেখা। এটা আমিও কিয়ৎপরিমাণে গ্রহণ করিয়াছি। রেখা সরু ও মোটা না করিলে তাড়াতাড়ি লেখা যায় না এবং সেরূপ না লিখিতে পারিলে শর্টহ্যাণ্ডের কোনই মূল্য থাকেনা। গ্রেগ্ শর্টহ্যাণ্ড প্রণালীতে সরু-মোটা রেখা নাই বটে, কিন্তু শুনিয়াছি তৎপরিবর্ত্তে রেখাকে ছোট বড় করিবার নিয়ম আছে। কিন্তু তাহাতে তাড়াতাড়ি লিখিবার সময় শব্দ হইতে অক্ষর বাদ দেওয়ার প্রয়োজন হয় এবং ইংরেজী ভাষার উপর বিশেষ দখল না থাকিলে তাহা পড়া শক্ত হয়। মনে করুন গ্রেগ্ শর্টহ্যাণ্ডে আমাকে 'বিদূরিত' লিখিতে হইবে। সেখানে আমি লিখিব 'বিদৃত'। 'ইহা হইতে 'বিদূরিত' বুঝিতে হইবে। পৌর্ব্বা-পর্য্য দেখিয়া কল্পনা এবং স্মরণ-শক্তির সাহায্যে শর্টহ্যাণ্ডের এই সকল দোষ-ত্রুটী সারিয়া লইতে হয়। লিখিবার সময় রেখাকে সরু ও মোটা করা সম্ভব হয় না। সে জন্য পড়িবার সময় বেগ পাইতে হয়। সময়ও অনেক লাগে। এই অসুবিধা দূর করিয়া তাড়াতাড়ি লিখা সম্ভব কি না জানি না। অন্ততঃ পিটম্যান সাহেব তেমন কোনো উপায় উদ্ভাবন করেন নাই বা করিতে পারেন নাই। সকল শর্টহ্যাণ্ডেই খুব প্রচলিত শব্দসমূহকে সংক্ষেপ করা হয়। ইহাকে ইংরেজিতে "গ্রেমেলগ্" বা রেখা-শব্দ বলে। ইহাতে দুইটী সুবিধা আছে:—(১) পড়ার সুবিধা, (২) সময়-সংক্ষেপ। "গ্রেমেলগ" কোন্ শব্দের চিহ্ন-স্বরূপ বসিল তাহা নিশ্চিত-রূপে বুঝা যায়। এবং শব্দটী উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে তাহা অপেক্ষা কম সময়ে ঐটী লেখা যায়। সুতরাং অন্য শব্দ লিখিতে লেখকের সুবিধা হয়। পুলিশের শর্টহ্যাণ্ড প্রণালীতে ঐরূপ ন্যূনাধিক দেড়শটী 'গ্রেমেলগ' আছে। আমার প্রণালীতে তাহাদের সংখ্যা খুব কম। কিন্তু গ্রেমেলগ জাতীয় অন্য রকম রেখা আছে। তাহাদের সংখ্যা দুইশত হইবে। এমন অনেক প্রচলিত শব্দ আছে, ঠিক নিয়মমত লিখিতে গেলে উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়া শেষ করা যায় না। সে জন্য সাবধানে সেই সকল শব্দের ভিতর হইতে ২।১টী

অক্ষর বাদ দিতে হয়, যেন উচ্চারণের সঙ্গে শর্টহ্যাণ্ড সমান তালে চলিতে পারে। ইহাদিগকে ইংরেজীতে "কণ্ট্রাকশন" বা সংক্ষিপ্ত শব্দ বলে। পিটম্যানের শর্টহ্যাণ্ডে এরূপ প্রায় সাড়ে তিনশ' শব্দ আছে।

শর্টহ্যাণ্ডে লিখিতে হইলে বক্তার প্রত্যেক কথার অর্থ সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা লেখকের থাকা একান্ত আবশ্যক। ধর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি, বিষয়-কর্ম্ম, টাকাকড়ি, শিক্ষা, রেল, ইনসিওরেন্স, ব্যাঙ্ক, বা যন্ত্রাদি যে-কোনো বিষয় নিয়া বক্তৃতা হউক না কেন, লেখক যদি বক্তার ধারাবাহিক ভাব এবং কথার অর্থ বুঝিতে না পারে তবে তাহার পক্ষে শর্টহ্যাণ্ড পড়া অত্যন্ত দুরূহ। সে জন্য শর্টহ্যাণ্ড লেখকের জ্ঞানের ক্ষেত্র বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন। নতুবা তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। টেক্‌নিকেল বিষয় লইয়া যখন বক্তৃতা হয় তখন টেক্‌নিকেল শব্দের জ্ঞান থাকাও লেখকের পক্ষে আবশ্যক। এক কথায় শর্টহ্যাণ্ড লেখকের নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকা দরকার।

বাঙ্গালীর আর্থিক স্বাধীনতা-লাভের উপায়

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বসু, বি,এ (কোন্নগর)

(ছ) অগ্নি ও সমুদ্র বীমা

ব্যবসা বাণিজ্যে ব্যাঙ্ক যেমন অতি আবশ্যক বস্তু তেমন ইহাদের আর একটি প্রধান অঙ্গ হইতেছে বীমা। পণ্যদ্রব্য যখন গুদামজাত থাকে তখন অগ্নি লাগিবার বা চুরি যাইবার ভয় আছে এবং ইহা যখন অন্তর্ব্বাণিজ্য বা বহির্ব্বাণিজ্যের জন্য জলপথে যায় তখন ডুবিয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। সেই জন্য পণ্যদ্রব্যাদির অগ্নি, চৌর্য্য বা সমুদ্র বীমা করিয়া রাখিলে ব্যবসায়ীদের ঐ সমস্ত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না। বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালীর নিজস্ব এইরূপ বীমা-কোম্পানীর অভাব হেতু প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকার পণ্যদ্রব্যাদি ধ্বংসের ফলে ব্যবসায়ীদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। অবশ্য বিদেশে পণ্যদ্রব্য রপ্তানি করিবার সময় স্বদেশী ও বিদেশী বণিকেরা বিদেশী বীমা কোম্পানীর দ্বারা তাহাদের দ্রব্য বীমা করিয়া পাঠান। কিন্তু আমাদের পরিচালিত বীমাকোম্পানী থাকিলে বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হয়। অনেকেই বোধ হয় জ্ঞাত নহেন যে, বিদেশী কোম্পানীর জাহাজে বা বোটে মাল বোঝাই করিয়া না পাঠাইলে তাহারা উহা বীমা করে না। বীমা কোম্পানীর দ্বারা দেশের আর একটি উপকার সাধিত হইবে। বীমাকোম্পানীর ন্যায় প্রচুর মূলধন কোনো ব্যবসাতে সঞ্চিত হয় না। বিদেশী বীমাকোম্পানীরা তাহাদের স্ব স্ব দেশের বড় বড় শিল্প ও ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কার্য্যে তাহাদের মূলধন নিয়োজিত করেন। আমাদের বীমাকোম্পানীরাও ঐ সমস্ত কার্য্যে তাহাদের টাকা নিয়োগ করিয়া দেশের ও দশের উপকার করিতে পারিতেন। বাঙ্গালীর তেমন বড় বীমাকোম্পানী থাকিলে অন্ততঃ একটিও বাঙ্গালীর নিজস্ব পাটের কল থাকিত। ব্যবসা-বাণিজ্যে সম্পূর্ণ অধিকার লাভ করিতে হইলে বীমা-কোম্পানী অত্যাবশ্যক।

(চ) স্বদেশী জাহাজ কোম্পানী

বাঙ্গালা নদী-প্রধান দেশ। সেই জন্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, সুদূর অতীত কাল হইতে বাঙ্গালী জলপথে বাণিজ্য করিতে পটু। বাঙ্গালীর নৌবিদ্যাও একটি গৌরবের বিষয় ছিল। এখনও বাঙ্গালী লস্করেরা জাহাজের কার্য্যে বিশেষ দক্ষতা দেখায়। গত যুদ্ধে তাহারা ইংরেজ ও ফরাসী নাবিকদের ন্যায় বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে। কিন্তু তাহারা চিরকাল লস্করই থাকে। সুদক্ষ নাবিক হইবার সুবিধা পায় না। বাঙ্গালার মাঝির দ্বারা এখনও অধিকাংশ পণ্য দ্রব্য সমগ্র দেশে সরবরাহ হয়। দেশে একটি ব্যতীত তেমন সুগঠিত

স্বদেশী জাহাজ কোম্পানী নাই। বিদেশী জাহাজ কোম্পানীর রিবেট সিস্টেমের জন্য তাহাদের সঙ্গে স্বদেশীরা টক্কর দিতে পারে না। আবার সরকারের পক্ষ হইতে অনুকূল আইন না থাকায় অনেক দেশী কোম্পানী নষ্ট হইয়াছে। মারকেন্ট্যাইল মেরিণ কমিটির রায় এখনও কার্য্যে পরিণত হয় নাই। বাঙ্গালীর জাহাজ কোম্পানী অতিশয় দরকারী। বাঙ্গালার পণ্য দ্রব্য বাঙ্গালীর জাহাজে বোঝাই করিয়া, বাঙ্গালীর বীমাকোম্পানীতে বীমা করিয়া, বাঙ্গালীর ব্যাঙ্কের সাহায্যে দেশ-বিদেশে আমদানি-রপ্তানি করিতে হইবে! তবেই আমরা যথার্থ আর্থিক স্বাধীনতা লাভ করিব।

(ছ) গ্রাম্য শিল্প

ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি লাভ করিতে হইলে গ্রাম্য শিল্পেরও পুনরুদ্ধার করিতে হইবে। যে সমস্ত গ্রাম্য শিল্প এখনও আছে তাহা উত্তমরূপে গঠন করিতে হইবে। যে সমস্ত নূতন শিল্প অল্প মূলধনে চালাইতে পারা যায় তাহার সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে। ইহার জন্য ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি হইতে গ্রাম্যশিল্পের উপযুক্ত ছোট ছোট যন্ত্র-পাতি আনিতে হইবে। গ্রাম্য শিল্প যাহাতে দেশের প্রয়োজন মত এবং প্রভূত পরিমাণে প্রস্তুত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অনেক সময় দেখা যায়, শিল্পদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় না বলিয়া ইচ্ছা থাকিলেও ক্রয় করিতে পারা যায় না,—যেমন নিব, দিয়াশলাই, পেন্‌শিল, কলমের হাণ্ডেল, ছুরি, কাঁচি, ক্ষুর ইত্যাদি। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, বাঙ্গালার কৃষকেরা বৎসরের ভিতর ছয় মাস কার্য্যাভাবে আলস্যে কাল-যাপন করে। গ্রাম্য শিল্পের একটী প্রধান বিভাগ থাকিবে বঙ্গরমণীদের। যে সমস্ত শিল্প মহিলাদের উপযুক্ত সেইরূপ শিল্পদ্রব্য যাহাতে তাহাদের দ্বারা প্রস্তুত হয় তাহা করিতে হইবে। হিন্দু বিধবাদের হীন অবস্থা সকলেই অবগত আছেন। বাঙ্গালীর আর্থিক অবনতির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অবস্থা আরও হীন হইয়াছে। তাহাদের দ্বারা অনেক শিল্প-কার্য্য চালানো যাইতে পারিবে। এই বিভাগের ভার আমাদের জননী ও ভগিনীদেরই লইতে হইবে।

(জ) কৃষিকার্য্য

বাঙ্গালীকে বাণিজ্য ও শিল্প কার্য্যের ন্যায় কৃষি-কার্য্যও করিতে হইবে। আর বৃথা মান অভিমানের ক্রন্দনের সময় নাই। আমেরিকার ন্যায় আমাদের দেশেও একটি দল প্রস্তুত করিতে হইবে যাহাদের নাম হইবে "ভদ্র লোক কৃষক"। আহ্লাদের বিষয় অনেক বাঙ্গালী যুবক এ কার্য্যে নামিয়াছে। যাহাতে এ দেশে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকার্য্য আরম্ভ হয়, যাহাতে প্রতি বিঘার ফসল দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয়, যাহাতে ভাল বীজ বপন করা যায় ইত্যাদি বিষয়ের ভার ভদ্রলোক-কৃষকদের লইতে হইবে। বর্ত্তমান কালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রজাস্বত্ব আইনের ধারা বদলাইয়া যে বর্গাজমির আজগুবি ভাগের ব্যবস্থা হইতেছে, তাহাতে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থ লোপ পাইবার সম্ভাবনা। বাঙ্গালায় ভদ্র-কৃষকের দল দেখা দিলে উক্ত আইনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। এই ভদ্র কৃষকদের দেখাদেখি বাঙ্গালার সাধারণ কৃষকরাও বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষি-কার্য্য আরম্ভ করিবে। দেশে তুলার চাষ বৃদ্ধি করিতে হইবে। যে দেশের তুলা হইতে ঢাকাই মস্‌লিন্ তৈয়ারী হইত এক্ষণে সেই দেশের তুলা হইতে ভাল মিলের কাপড় পর্য্যন্ত তৈয়ারী হয় না! তরিতরকারী উৎপাদনে অনেক লাভ পাওয়া যায়। মফঃস্বলে প্রত্যেক বাঙ্গালী গৃহস্থের বাটীর সংলগ্ন অনেক জমি পড়িয়া আছে। একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া যদি আমরা মার্কেট-গার্ডেনিং করি ও তৎসহ নিজ নিজ পুকুরের মাছের ব্যবসা করি তাহা হইলে প্রাতে বাহির হইয়া রাত্রি দশটায় গৃহে প্রত্যাগত হইয়া "ডেলি প্যাসেঞ্জারী" করিতে হয় না। গ্রামের স্বাস্থ্য ইহাতে আপনা-আপনিই ভাল হইবে এবং ম্যালেরিয়া রাক্ষসী স্থানাভাবে পলাইবে। কারণ আমরা এমন ভাবে গ্রাম্য বাটীর চতুর্দ্দিকে বড় গাছ পুতিয়া ও জঙ্গল করিয়া রাখি যেন বায়ু ও আলোক প্রবেশ করিতে না পারে। আর পয়ঃ-প্রণালীর এমন সুবন্দোবস্ত করি যেন উহার জল খিড়্‌কি পুকুরে গিয়া পড়ে, যাহার জলে আমরা অন্নপাক করি। মার্কেট-গার্ডেনিং আরম্ভ করিলে সমস্ত জঙ্গল ও অস্বাস্থ্য-কর স্থান আপনিই পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

শিক্ষিত বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিলে আর এক শ্রেণীর লোক প্রস্তুত হইবে যাহারা হইবে "ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল্ কেমিষ্ট"। আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে অনেক বি, এস্-সি, এম, এস্-সি হইয়াছেন ও বিদেশে রসায়ন শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত অনেক যুবক আছেন। দুই চারি জন রসায়ন-ঘটিত কারখানায় নিযুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশই অনুকূল অবস্থা ও সাহায্যের অভাবে বেকার আছেন। কেহ বা চাকরির জন্য চেষ্টিত, কেহ বা এম, এস্-সি পাশ করিয়া আইন পাশ করিতেছেন। তাঁহারা যদি ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল কেমিষ্ট্রির সাহায্যে ছোট ছোট শিল্প-কার্য্যে নিযুক্ত হন, তাহা হইলে দেশে কত নূতন নূতন অর্থাগমের পথ হয়। তাহা হইলে বাঙ্গালায় শত শত "নাগার্জ্জুন" অবতীর্ণ হইবে ও হিন্দুর রসায়ন-শাস্ত্রের অতীত গৌরব আবার ফিরিয়া আসিবে। আমাদের দেশে যত প্রকার ফল, ফুল, লতা পাতা বৃক্ষাদি আছে অন্য কোনো দেশে তাহা নাই। ইহাতে কতপ্রকার শিল্প যে হইতে পারে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। যদি ফুল গাছের চাষ করিয়া ফ্লাওয়ার এসেন্স তৈয়ারী করা যায়, তাহা হইলে বিদেশ হইতে এসেন্সের আমদানি অনেক হ্রাস পায়। ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের দেশী রঙের শিল্প ইহাদের দ্বারা গঠিত হইতে পারে।

(ঝ) খদ্দর

শিল্প-বিভাগের মধ্যে চরকা ও খদ্দর আইসে। মহাত্মা গান্ধী ও আচার্য্য রায়ের উৎসাহে এবং দৃষ্টান্তে কোনো কোনো শিক্ষিত বাঙ্গালী ইহার প্রচার-কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। কোনো কোনো বাঙ্গালী পরিবার খদ্দর ব্যবহার করিতেছেন ও তাঁহাদের গৃহে চরকা চালাইতেছেন। খাদি-প্রতিষ্ঠানের চেষ্টায় কিছু সুফল ফলিতেছে। দশ হাজার বাঙ্গালীকে অন্ন দিতে পারা নেহাৎ ছেলে-খেলা নয়। এই দিকে আরও বেশী কাজ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(ঞ) স্থায়ী বাণিজ্য-প্রদর্শনী

ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প ইত্যাদি কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারের জন্য আজকাল পাশ্চাত্যদেশে আর এক প্রকার বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। ইহার নাম স্থায়ী বাণিজ্য-প্রদর্শনী। জার্ম্মাণির "লাইপ্‌জিগ্ ফেয়ার" "ফ্রাঙ্ক-ফোর্ট ফেয়ার," "ইনটারন্যাশন্যাল ট্রেড একজিবিশন্" ইহার জন্য বিখ্যাত। এইগুলি দেখিয়া ইংরেজরা "বৃটিশ ইন্‌ডাষ্ট্রিজ্ ফেয়ার", "বৃটিশ স্যাম্পলস্ লিমিটেড", ফরাসীরা বর্দো "ইন্টারন্যাশনাল স্যাম্পলস্ ফেয়ার" ও সম্প্রতি আমেরিকানরা "নিউ অরলিয়ানস্ পারমানেন্ট ইন্টারন্যাশন্যাল ট্রেড একজিবিশন্" খুলিয়াছে। ব্যবসা, বাণিজ্য ও শিল্প বৃদ্ধির জন্য ইহা একটী প্রকৃষ্ট উপায়। এই সমস্ত প্রদর্শনীতে দেশী ও বিদেশী কাঁচা মাল ও শিল্প-দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হয় এবং গ্রাহকেরা নিজেরা দেখিয়া অর্ডার দেয়। অতি অল্প খরচে, অল্প সময়ে, অল্প স্থানের মধ্যে কোটী কোটী টাকার ব্যবসাকার্য্য সম্পন্ন হয়। দেশ-বিদেশের বাণিজ্য-সম্বন্ধীয় সমস্ত তথ্য এই প্রদর্শনীতে পাওয়া যায় ও ব্যবসায়ীদের বিশেষ সুবিধা হয়। কিছু দিন পূর্ব্বে গভর্মেন্টের অধীনে কলিকাতায় একটী "কমারশিয়াল মিউজিয়াম" ছিল। "গেডিজের কুঠারাঘাতে" এইটীই প্রথমে বধ করা সাব্যস্ত হয়! আমাদের দেশেও অতি প্রাচীন কাল হইতে মেলার প্রচলন আছে। যে-কোনো ধর্ম্ম-অনুষ্ঠানের সঙ্গেই ইহা দেখা যায়। বিদেশী দ্রব্যই এই সমস্ত মেলায় বেশী পরিমাণে বিক্রয় হয়। শিক্ষিত বাঙ্গালীর প্রভাব এগুলির উপর কিছুমাত্র নাই। কলিকাতায় ও প্রত্যেক জেলায় একটী করিয়া স্থায়ী বাণিজ্য প্রদর্শনী করিতে হইবে এবং যাহাতে আমাদের মেলাগুলিতে দেশীয় শিল্প-দ্রব্যাদির ক্রয়-বিক্রয় হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(ট) এক্‌স্‌চেঞ্জ

স্থায়ী প্রদর্শনীর সহিত আর একটী বিভাগ রাখিতে হইবে, তাহার নাম "বঙ্গীয় এক্‌স্‌চেঞ্জ"। কলিকাতার রয়্যাল এক্‌স্‌চেঞ্জ সকলেই জ্ঞাত আছেন। উহাদ্বারা বিদেশী বণিকেরা পাট ইত্যাদি সর্ব্ববিধ পণ্য-দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করেন। উহা ইয়োরোপীয় বণিকদের "রিজারভড্ সাবজেক্ট"! উহাতে বাঙ্গালীর প্রবেশাধিকার নাই। আমাদেরও নিজেদের এইরূপ একটী এক্‌স্‌চেঞ্জ কায়েম করা দরকার। প্রত্যেক দ্রব্যের বাজার-দর চাহিদা ও যোগান অনুসারে নিরূপিত

হইবে। "স্পট্ কন্ট্রাক্ট", "ফরওয়ার্ড কন্ট্রাক্টে"র দর ইহা-দ্বারা ধার্য্য হইবে। তাহা হইলে বাঙ্গালাদেশ-জাত দ্রব্যাদি সেই সেই প্রকার বিদেশী দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারিবে। যেমন খদ্দর ও চরকার সূতা। বিলাতী কাপড় ও বিলাতী সূতার দর চাহিদা ও যোগানের অনুযায়ী হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। বিভিন্ন প্রকার বিলাতী কাপড়ের ও সূতার কোয়ালিটি, সাইজ্, প্যাকিং, ওজন, ট্রেডমার্ক ইত্যাদি নিয়মিত থাকে। তাহার উপর ব্যবসায়ীরা নির্ভর করিতে পারে ও ভবিষ্যতে কন্ট্রাক্ট করিতে পারে। যুদ্ধের সময় জাপানীরা ভারতে একচেটীয়া ব্যবসা করিয়াছিল এবং অন্য জাতি হইলে কেহ তাহাদিগকে সহজে হটাইতে পারিত না। কিন্তু উপরিউক্ত বিষয়ে তাহারা মনোযোগ না দেওয়াতে এবং নমুনা ও প্রেরিত মালের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকায়, যুদ্ধের পর তাহাদের দ্রব্য আর সেরূপ বিক্রয় হয় না। জার্ম্মাণি এ বিষয়ে সাবধান বলিয়া অনেক বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও তাহাদের প্রস্তুত দ্রব্যাদি পূর্ব্বের ন্যায় উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে বিক্রয় হইতেছে। আমাদেরও খদ্দর এবং সূতার সম্বন্ধে উক্ত বিষয়ে লক্ষ রাখিতে হইবে। আমরা অমনোযোগী বলিয়া এক্ষণে লক্ষ লক্ষ টাকার বিদেশী "খদ্দর" বিক্রয় হইতেছে। এই এক্স্চেঞ্জদ্বারা আর একটী অত্যাবশ্যক শিল্প রক্ষা করা যাইবে। আজকাল বাঙ্গালা দেশে অনেক দেশী দিয়াশলাইয়ের কারখানা হইয়াছে। বিদেশী দিয়াশলাইয়ের উপর অত্যধিক কর-স্থাপন হওয়ায় দেশী দিয়াশলাই বেশ সস্তায় ও লাভে বিক্রয় হইতেছে। কিন্তু প্রত্যেক দিয়াশলাই কোম্পানী যদি ঐরূপ এক্স্চেঞ্জের সাহায্যে তাহাদের দিয়াশলাই বিক্রয় করে, তবে ইহার একটী "বাজার" স্থাপিত হয়। এইরূপ ভাবে এক সঙ্গে গোষ্ঠীবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিলে ভবিষ্যতে ইহা একটী অতি লাভজনক শিল্প হইবে। নতুবা বিদেশী দিয়াশলাই-ব্যবসায়ীরা যেরূপ চেষ্টা করিতেছে তাহাতে দেশী কেন জাপানী দিয়াশলাইয়ের ও ভবিষ্যৎ অন্ধকার। সুইডিশ্ দিয়াশলাই-ব্যবসায়ীরা ১৮ কোটী টাকা মূলধনে একটা বৃহৎ কোম্পানী করিয়াছে ও কলিকাতা, বোম্বাই এবং করাচীতে তিনটী দিয়াশলাইয়ের কারখানা বসাইয়াছে। উদ্দেশ্য ভারতীয় কি জাপানী দিয়াশলাই যাহাতে বাজারে বিক্রয় না হয়। কিন্তু জাপানীদের গ্রাম্য-শিল্পের ন্যায় দিয়াশলাই প্রস্তুত করার শিল্প যদি আমরা সংগঠন করিতে পারি ও এক্স্চেঞ্জের সাহায্যে ক্রয়-বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করি, তবে ভয়ের কোনো কারণ নাই।

কবি দুঃখ করিয়া গাহিয়াছেন—"যদি আর কিছু না পারি, আমি জাগিয়ে দেব বাঘেরে, আমি ক্ষেপিয়ে দেব নাগেরে"। এই প্রবন্ধ পাঠে বাঙ্গালার বাঘ ও বাঘিনীরা "আত্মনোমোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" জাগিবে কি ?

এই প্রবন্ধ-পাঠে ভারতের অন্যান্য জাতি যেন মনে করেন না যে, "বেহার বেহারীদের জন্য", "পঞ্জাব পাঞ্জাবীদের জন্য" ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক ভাব লইয়া বাঙ্গালীও বুঝি "বাঙ্গালা বাঙ্গালীদের জন্য" এই ঢেউ তুলিল। বাঙ্গালী অন্য কোনো দেশী বা বিদেশী জাতিকে হিংসা করে না কিম্বা তাহাদের প্রতিযোগিতাকে ভয় করে না বা কখনো করিবে না। তবে বাঙ্গালী যাহাতে আবার নিজ পায়ের উপর দাঁড়াইতে পারে, এবং যে ব্যবসা, বাণিজ্য ও শিল্প তাহারা অন্যের হাতে তুলিয়া দিয়া স্বাধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, যাহাতে তাহা পুনরায় আয়ত্ত করিতে পারে, তাহা সে প্রাণপণে করিবে। আসুক স্কচ্, আসুক্ জার্ম্মাণ, জাপানী, আমেরিকান, মাড়োয়ারী ও ভাটিয়া। বাঙ্গালীও মন্ত্রের সাধনে শরীরপাত করিতে প্রস্তুত হইয়া "বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়" ব্যবসা-বাণিজ্যে নামুক। দেখা যাউক কে কাহাকে পরাস্ত করে।

আলোকস্তম্ভ

শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী

ভারতীয় নৌবাণিজ্য ও নৌসেনা লইয়া আমাদের জননায়কগণ কিছুকাল ধরিয়া আন্দোলন চালাইতেছেন। গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতেও এই বিষয়ে কিছু কিছু সাড়া পাওয়া যাইতেছে। ফলে একটা তথাকথিত ভারতীয় নেভী গড়িয়া উঠিবার সূচনা দেখা দিয়াছে। তাহা ছাড়া, 'মার্ক্যাণ্টাইল মেরিণ' অর্থাৎ জাহাজী বাণিজ্যের সম্পর্কে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের প্রসারেরও সম্ভাবনা। এই সকল কারণে জাহাজ, সমুদ্র-পথ ও তৎসম্পর্কীয় যাহাকিছু অনুষ্ঠান সমস্তই আমাদের পক্ষে একান্ত জ্ঞাতব্য বিষয় সন্দেহ নাই। আমাদের আর্থিক উন্নতির অনেক কথা এইসকলের সঙ্গে বিজড়িত। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে আলোকস্তম্ভ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

আমাদের মধ্যে যাঁহারা বঙ্গোপসাগর দিয়া ব্রহ্মদেশে গিয়াছেন, তাঁহারাই বেসিনের আলোকস্তম্ভ দেখিতে পাইয়াছেন। তাহার সেই প্রকাণ্ড লণ্ঠনের আলো রাত্রি-কালে সমুদ্র-বক্ষে কি সুন্দর হীরকের হার গাঁথে, লজ্জাশীলা ললনার মত কেমন করিয়া সে এক-একবার মুখখানি দেখায়, আবার ঢাকে, আবার দেখায়, আবার ঢাকে, এ সমস্তই তাঁহারা লক্ষ করিয়াছেন। এই আলো যেন বিপদের চোখ। এযেন ইশারায় বলিয়া দিতেছে, "ওগো নাবিক, আমি এখানেই আছি। তুমি নিকটে আসিলেই আমি তোমাকে আলিঙ্গনে বাঁধিয়া ফেলিব।"

ফ্যারো দ্বীপে এইরূপ একটি আলোকস্তম্ভ ছিল। সেটি পৃথিবীর মধ্যে একটি সুপ্রাচীন এবং সুপ্রসিদ্ধ স্তম্ভ। মিশরে আলেকজেন্দ্রিয়া বন্দরের প্রবেশ-মুখে একটি উন্নত স্থানে উহা নির্ম্মিত হয়। আগাগোড়া মার্ব্বেল পাথরে উহা তৈয়ারী। উহার উচ্চতা ছিল ৬০০ শত ফিট। এই স্তম্ভের শীর্ষদেশে প্রকাণ্ড একখানা কাঠ জ্বলিত। দিবসে তাহার ধূম এবং রজনীতে তাহার আলো নাবিকদিগকে পথ দেখাইত। মিশরের ফ্যারাও রাজবংশের নামানুসারে উহার নামকরণ হয়। খৃষ্টপূর্ব্ব ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উহা নির্ম্মিত বলিয়া জানা গিয়াছে। তৎপর পনের শত বৎসর দণ্ডায়মান থাকিয়া শেষে ভূমিকম্পে উহা ভাঙ্গিয়া যায়।

ফ্যারাও স্তম্ভ ছাড়া আরো অনেক আলোকস্তম্ভ প্রাচীন কালে ছিল। রোমকেরা ডোভারে একটি এবং তাহার অপর পারে আর একটি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করে। স্পেন দেশের "করুণা" সহরে একটা স্তম্ভ এখনও আছে। তাহার নাম "হারকুলীশ"। নাম শুনিয়া মনে হয়, উহা গ্রীক বা গ্রীক-ভক্ত অন্য কোনও জাতির তৈয়ারী।

আলোকস্তম্ভ ছাড়া, নাবিকদিগকে সতর্ক করিবার অন্যবিধ উপায়ও প্রাচীনকালে অবলম্বিত হইত। যথা, ঘণ্টাধ্বনি। আশঙ্কাজনক কোনও একটা জায়গায় ঘণ্টাটি এমনভাবে বাঁধা থাকিত যে, তাহা বাতাস এবং ঢেউয়ের দোলা পাইয়া ঠনঠন্ করিয়া বাজিতে পারে। সেই বাজনা শুনিয়াই নাবিকেরা সাবধান হইতে পারিত। এইরূপ ঘণ্টা অপেক্ষা আলোকস্তম্ভ যে শত গুণে শ্রেষ্ঠ তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

ইংলণ্ডের সমুদ্রোপকূলে বহুতর আলোকস্তম্ভ আছে। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি বন্দরের প্রবেশ-পথে তরঙ্গরোধক বাঁধের উপর, কতকগুলি দূর সমুদ্র-গর্ভশায়ী বিপজ্জনক পাহাড়ের উপর, কতকগুলি বা জলমধ্যে লুক্কায়িত চোরা বালির চড়ার পিঠে স্তূপীকৃত প্রকাণ্ড কাষ্ঠরাশির উপর এবং কতকগুলি পর্ব্বত-শৃঙ্গের উপর নির্ম্মিত।

লোকালয় হইতে বহুদূরে এই আলোকস্তম্ভে থাকিয়া যাহারা কার্য্য করে, তাহাদের কি ভয়ানক নির্ব্বাসিত জীবন! অনেকে বেশী দিন সেখানে কাজ করিতে পারে না—ছাড়িয়া চলিয়া যায়। কেহ কেহ বা পাগল পর্য্যন্ত হইয়া পড়ে। তাই অনেক স্থলে দুইমাস অন্তর এক মাসের

ছুটির বন্দোবস্ত আছে। চৌদ্দ দিন বা কোনও কোনও স্থলে এক মাস অন্তর তীর হইতে তাহাদের কাছে খাদ্যদ্রব্য পাঠান হয়। সেই সঙ্গে তাহারা তাহাদের চিঠিপত্র প্রভৃতিও পায়। ভয়ঙ্কর ঝড়-বাদলের সময় নির্দ্দিষ্ট দিনে খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি না ও পৌছিতে পারে। তখন এখানকার লোকদের যে কতখানি কষ্ট হয় তাহা সহজেই অনুমেয়।

আলোকস্তম্ভে এক সঙ্গে দুই-তিন জন লোক কাজ করে। কাহারও অসুখ-বিসুখ বা অন্য কোনও রকম বিপদ উপস্থিত হইলে অপরে স্তম্ভের উপর দুইটা কাল নিশান তুলিয়া দেয়। তাহা দেখিয়া তীর হইতে সাহায্য পাঠান হয়।

আলোকস্তম্ভের মূলের দিকে সর্ব্ব প্রথম ঘরে থাকে এঞ্জিন। সেটা দমকলের মত কাজ করিয়া উপরকার লম্বা ঘরের মাথায় রক্ষিত ফিল্টারে তেল পাঠায়। সেই ফিল্টার হইতে আবার ঐ তেল প্রদীপের সলিতায় ছিটাইয়া পড়ে। আজকাল কোনও কোনও আলোকস্তম্ভে "বিজলী" বাতি জ্বলিয়া থাকে। দমকলের এঞ্জিন তুলিয়া দিয়া সেখানে বসান হয় দুইটা ছোট জোরালো ডাইনামো। তাহাদ্বারাই তড়িৎ-স্রোত উৎপন্ন করা হয়।

আলোকস্তম্ভের দোতলার ঘরখানি রান্নাঘর এবং তেতলার ঘরখানি খাওয়ার-ঘর। চারিতলার ঘর শয়নের জন্য ব্যবহৃত। শয়ন-ঘরের উপরে এবং লণ্ঠনের ঠিক নীচে আর একটা ঘর আছে। সেখানে বসিয়া লোকেরা সলিতা ছাঁটে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, আলোকস্তম্ভের আলো একবার দেখা যায় একবার দেখা যায় না। এই দেখা ও না-দেখার মধ্যবর্ত্তী সময়টা কোনো স্তম্ভে দুই সেকেণ্ড, কোনো স্তম্ভে তিন সেকেণ্ড ইত্যাদিরূপ হইয়া থাকে। কোথাও একচোটেই দুইবার জ্বলিবার পরে তিন সেকেণ্ড অন্ধকার। এইরূপ দীপ্তি এবং দীপ্তির মধ্যবর্ত্তী অন্ধকারের সময় ও আলোর রং দেখিয়া অন্ধকার রাত্রিতেও নাবিকেরা বুঝিতে পারে তাহারা কোন্ আলোকস্তম্ভের নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

একেবারে খাঁটি কাচ না হইলে আলোকস্তম্ভের লণ্ঠনে স্থান পায় না। কাচটিকে আবার সব সময় পরিষ্কার রাখা চাই। প্রদীপাধারে চার-পাঁচটি সলিতা গোলাকারে সাজান থাকে। সেগুলি বড় একটি জ্যোতির্বর্দ্ধক আবরণে ঢাকা। তাহাতেই আলোটা পরিষ্কার দেখায়। লণ্ঠনটি নিয়মিতভাবে মধ্যে মধ্যে ঘোরে। সেটিকে ঘুরাইবার জন্য প্রকাণ্ড দুইটা ভারি সীসা ব্যবহৃত হয়। সেই সীসাদ্বয়ে একটা শিকল লাগান থাকে। ঘড়ীতে দম্ দিবার মত ঐ শিকলে দম দিতে হয়। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঐ দম দিবার কাজ চলে। সুতরাং যাহারা এইস্থানে কাজ করে, তাহাদের রাত্রে ঘুমাইবার জো নাই।

এইখান হইতে কুয়াশার সময় আধ মিনিট অন্তর ঘণ্টা বা শিঙা বাজান হইয়া থাকে। বাজাইবার ঘণ্টাটি বেশ বড়, প্রায় দুই টন্ (অর্থাৎ প্রায় ৫৪/ মণ) ভারি। লৌহ-দণ্ড হইতে তাহা ঝুলান।

আলোকস্তম্ভ গোলাকার এবং সেই জন্য ঝড়-ঝাপটা সহ্য করিতে সমর্থ। যেসমস্ত গাছের গুঁড়ি গোল তাহারা ঝড়-বাতাসে হঠাৎ পড়ে না। তাহা দেখিয়াই ইহার আকার ঐরূপ করা হইয়াছে।

হেন্‌রী উইনষ্ট্যান্‌লী-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত প্রথম আলোকস্তম্ভটি ঝড়ে ভাঙ্গিয়া যায়। রুডইয়ার্ড-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত দ্বিতীয় স্তম্ভটি আগুনে ভস্মসাৎ হয়। ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে স্মীটন্ নামক একজন দক্ষ এঞ্জিনিয়ার ঐ স্তম্ভনির্ম্মাণের আদেশ পান। ওকবৃক্ষকে গুরুঠাকুর করিয়া তিনি তাঁহার স্তম্ভটি নির্ম্মাণ করেন। ওক যেমন ঝড়ে দোলে অথচ ভাঙ্গে না, তাঁহার স্তম্ভটিও তদ্রূপ। সেই অবধি আলোকস্তম্ভের গড়ন ঐ রকমই হইয়া আসিতেছে।

স্তম্ভ-নির্ম্মাণের সুবিধা না থাকিলে কোনো কোনো স্থলে আলোক-জাহাজ রাখা হয়। তাহার নঙ্গর এমন দৃঢ়বদ্ধ থাকে যে, প্রবল ঝড়ের পক্ষেও তাহাকে স্থানান্তরিত করা সহজ নহে। এই জাহাজের মাস্তুলে লণ্ঠন ঝুলাইয়া তাহাতে আলো দেওয়া হয়।

হিন্দুর প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায়, তাঁহারা সমুদ্র-যাত্রা করিতেন। এতদুদ্দেশ্যে তাঁহাদের

যথেষ্ট অর্ণববানও ছিল। আলোকস্তম্ভের মত বিপদ্‌-নিবারক বস্তুর আবিষ্কারও তাঁহারা করিয়াছিলেন। এই সংবাদ দক্ষিণ ভারতের চোলসাম্রাজ্যের ইতিহাসে জানা গিয়াছে।

মুর্শীদাবাদের রেশমের কারবার

শ্রীনলিনাক্ষ সান্যাল, এম, এ, অধ্যাপক, কৃষ্ণনাথ কলেজ, বহরমপুর

বড় বেশী দিনের কথা নয়। মাত্র একশত বৎসর পূর্ব্বে মুর্শীদাবাদ জেলার সমৃদ্ধির তুলনা ছিল না। নানারূপ পণ্যসম্ভারে সজ্জিত হইয়া দেশী ও বিদেশী অসংখ্য জলযান পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর তাৎকালিক বিপুল বক্ষ সুশোভিত করিত। বাংলাদেশ কেন, সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে ঐ স্থান একটী বিশিষ্ট বাণিজ্য-ক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত ছিল। মুর্শীদাবাদের সেই আর্থিক উন্নতির মূলস্বরূপ যেসকল ব্যবসায় সেখানে পুষ্ট হইয়াছিল, রেশমের কার্য্য তাহার মধ্যে প্রধানতম। সুতরাং এই জেলায় বসিয়া দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যের কথা ভাবিতে গেলে প্রথমেই সিল্ক বা রেশমের কথা মনে হয়।

সে দিন আর নাই। হৃতসর্ব্বস্ব মুর্শীদাবাদ আজ অন্নাভাবে পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তথাপি এখনও জনবিরল অরণ্যময় গ্রামগুলির স্থানে স্থানে শিল্পাগার-সমূহ তাহাদের সংস্কারহীন উচ্চ ধূমনালী আকাশমার্গে উন্নত করিয়া অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে। কোনও কোনও কারখানায় ন্যূনাধিক কার্য্যও চলিতেছে।

(১)

রেশমের স্থানীয় ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যদিও প্রায় চারিশত বৎসর হইতে মুর্শীদাবাদে রেশম ও রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে, তথাপি খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে এই শিল্প বিশেষ প্রসার ও খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে স্থানীয় নবাব ও রাজপুরুষেরা এবং বাংলার অন্যান্য ভূস্বামিগণই প্রধানতঃ ইহার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। তৎপরে কতকগুলি ইংরেজ বণিক রেশম ও রেশমজাত বস্ত্র ইংলণ্ডে রপ্তানি করিয়া প্রচুর লাভ করিতে আরম্ভ করে। তখনকার স্থানীয় কুটীর-শিল্প হইতে আবশ্যকানুরূপ অধিক পরিমাণে রেশম উৎপন্ন না হওয়ায় তাহারা নিজেদের উদ্যোগে গঙ্গা ও অন্যান্য নদীর সন্নিকটবর্ত্তী সুবিধামত স্থানে অনেক কারখানা বা "কুঠি" নির্ম্মাণ করে। সেই সময়ে নানা কারণে নীলের ব্যবসায়ে লাভ কমিয়া যাওয়ায় অনেক নীলকুঠিকেও রেশম প্রস্তুত করার কার্য্যে নিয়োজিত করা হইয়াছিল। এইসকল কারখানায় প্রধানতঃ রেশমের গুটী হইতে সূতা বাহির করা ও তাহাকে বয়নোপযোগী করিয়া তোলা হইত। সেই অবস্থাতেই ঐ সূতা প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হইত। দেশীয় তাঁতীগণও নিজেদের ব্যবহারের জন্য অনেক সূতা কুঠি হইতে ক্রয় করিত।

এতদ্ভিন্ন কুঠিগুলি স্থানীয় তাঁতীদের প্রস্তুত স্বল্পমূল্যের রেশমের "কোড়া" কাপড়ও প্রভূত পরিমাণে বিদেশে প্রেরণ করিত। এখনও খুব সামান্য রকমে কোড়ার কারবার চলিতেছে।

তাঁতের কার্য্যাবলী আবহমান কাল হইতে এখানে কুটীরশিল্প ভাবেই চলিয়া আসিতেছে। কোড়া ভিন্ন তাঁতীগণ গত শতাব্দীতে নানাপ্রকার কারুকার্য্যপূর্ণ বহুমূল্য ও সাধারণ ব্যবহারোপযোগী শাড়ী, চাদর, বুটীদার, শাল প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের বস্ত্রাদি স্থানীয় ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করিত। বহরমপুর ও বালুচরের ব্যবসায়িগণ তাহা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিত। সমস্ত ভারতবর্ষেই এইসকল দ্রব্যের বিশেষ আদর ছিল।

প্রবীণ ও বিজ্ঞ লোকেরা বলেন যে, তখন এই জেলায় প্রায় দশ সহস্র রেশমের ও সূতার তাঁত চলিত এবং বিদেশী

ও স্থানীয় বহু ব্যবসায়ী এই কারবারে প্রচুর অর্থলাভ করিত। কিন্তু তাঁতীদের অবস্থা তাদৃশ স্বচ্ছল ছিল না। মধ্যবর্ত্তী মহাজনেরাই অত্যধিক লাভ করিত।

রেশমের কারখানাগুলিতে উপাদান সরবরাহের জন্য ঐ সময়ে মুর্শীদাবাদের গ্রামে গ্রামে অনেক পরিমাণে রেশমের গুটী প্রস্তুত করিবার কারবার বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। গঙ্গা বা ভাগীরথী নদীর উভয় পার্শ্বে এমন কোনো স্থান ছিল না, যেখানে যথেষ্ট তুঁতের চাষ না হইত। ইহাতেও জমিদার এবং মহাজনেরাই লাভের অধিক অংশ পাইতেন। ফলে যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহাই ঘটিল। শিল্পে নূতন প্রণালী এবং চাষে অধিকতর লাভজনক প্রথা অবলম্বনের জন্য শ্রমিকগণের আর তাদৃশ উৎসাহ ও আগ্রহ রহিল না। মূলে জল-অভাবে বৃক্ষের যে দশা হয় সমস্ত ব্যবসায়টীরও প্রায় তাহাই হইল।

(২)

এমন সময়ে দেশে মুগা ও তসরের শিল্প ক্রমে উন্নতিলাভ করিতে করিতে রেশমের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে ইতালি, ফ্রান্স, চীন, ও জাপানের শিল্পিগণ তত্তদ্দেশীয় গবর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃক বিশেষরূপে উৎসাহিত হইয়া অপেক্ষাকৃত সস্তা রেশম উৎপন্ন করিতে লাগিল। তখন ওয়াটশন কোম্পানী, লায়াল কোম্পানী, দি বেঙ্গল সিল্ক কোম্পানী প্রভৃতি পুরাতন রেশম-ব্যবসায়ীরা বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িল। ইহার উপরে যখন তাহাদের স্থানীয় কার্য্যাধ্যক্ষগণের অমিতব্যয়িতা ও স্বার্থপরতা ক্রমেই বাড়িয়া চলিল, তখন তাহারা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিল। দেশীয় শিল্পের অথবা স্থানীয় শ্রমজীবিগণের প্রতি মায়া করিবার তাহাদের কোনো কারণ ছিল না। সুতরাং তাহাদের বিদেশী ডিরেক্টরগণ শীঘ্রই কারবার বন্ধ করিবার আদেশ দিলেন। এইরূপে দেশীয় শিল্পী ও ব্যবসায়ীরা নিজেদের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারার পূর্ব্বেই প্রায় সমস্ত কারখানা বন্ধ করিয়া বিদেশীয়গণ চলিয়া গেলেন। দু'একটী মাত্র কোম্পানী তখনও একেবারে আশা-ত্যাগ করিতে পারে নাই। তাহাদের মধ্যে ফরাসী দেশীয় লুই পেন্ কোম্পানী প্রধান। পরে ঐ কোম্পানীর অধ্যক্ষ মিষ্টার গুর্জ্জু ও হতাশ হইয়া বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথমে কারবার গুটাইয়া লইলেন। এইরূপে মুর্শীদাবাদের রেশমের কারবারের একটী প্রধান অধ্যায় শেষ হইয়া গেল। এণ্ডারসন রাইট প্রভৃতি দু'একটী ছোট-খাট বিদেশী কোম্পানী এখনও সামান্য কার্য্য চালাইতেছে বটে, কিন্তু তাহা আর বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে।

যতদিন বিদেশী বণিকগণের সুবিধা ও সুযোগ এবং বৃটিশ রাজ্যের স্বার্থ প্রত্যক্ষভাবে মুর্শীদাবাদের এই বহু পুরাতন ব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল, ততদিন ভারত-সরকারও ইহার প্রতি অল্প-বিস্তর দৃষ্টি দিতেন। কিন্তু সে কারণ অভাবে ক্রমে সে দৃষ্টি অপসারিত হইল। মহাজনেরা জমিদারী ক্রয় করিয়া ব্যবসায় ভুলিয়া গেল। শিল্পীদের দুরবস্থার আর সীমা-পরিসীমা রহিল না। সময় বুঝিয়া দারুণ দুর্ভিক্ষও আসিয়া জুটিল। অন্নাভাবে দেশে হাহাকার পড়িয়া গেল। রেশমের বস্ত্র কিনিবে কে ? এইরূপে দেশী ও বিদেশী উভয় ক্ষেত্রেই রেশমের বিক্রয় প্রায় বন্ধ হইয়া আসিল। তাঁতীগণ অনেকেই ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া লাঙ্গল ধরিতে বাধ্য হইল। কেহ কেহ বৈরাগী হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিল। গুটী-নির্ম্মাণ ও তুঁতের চাষ প্রায় উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইল।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে এইসকল অভাবনীয় ব্যাপার সংঘটিত হইয়া গেল। স্থানীয় লোকেরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। সেই অবসরে বিদেশীয় বাণিজ্যক্ষেত্রগুলি ক্রমে অন্যদেশজাত রেশমে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এত বড় বাজার হারাইয়া মুর্শীদাবাদ পঙ্গু হইয়া পড়িল। স্থানীয় বড়লোক ও ব্যবসায়ীদের রেশমের কার্য্যে আর উৎসাহ রহিল না। সঙ্গে সঙ্গে দেশেও সস্তা দরের সৌখীন দ্রব্যাদির প্রতি লোকের অধিকতর টান হইতে লাগিল। উৎকৃষ্ট কারুকার্য্যপূর্ণ দ্রব্যাদির আদর কমিয়া গেল। নূতন চাহিদার প্রতি লক্ষ রাখিয়া দু'চারিজন উদ্যোগী ব্যবসায়ী রেশম-ব্যবসার উন্নতির জন্য নানা প্রকারে চেষ্টা করিতে লাগিল বটে, কিন্তু উপযুক্ত উৎসাহ ও অর্থবলের অভাবে

তাহাতে আশানুরূপ ফললাভ হইল না। শিক্ষার একান্ত অভাববশতঃ এদেশীয় তাঁতীগণও নূতন নূতন কার্য্যে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিল না।

গভর্ণমেণ্ট তখন সম্পূর্ণ উদাসীন। উপযুক্ত সময়ে রাজপুরুষেরা এদিকে লক্ষ করিলে আজ কখনই আমাদের এ দুর্দ্দশা হইত না। হয়ত চীন, জাপান, ইতালি ও ফ্রান্সের সহিত প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াও আমাদের রেশম অধিক আদৃত হইত। কিন্তু সময়ে সে চেষ্টা মোটেই হইল না।

(৩)

স্বদেশী আন্দোলনের সময় মুর্শীদাবাদের রেশম ও মটকার ব্যবসায়ে পুনরায় সামান্য উন্নতি দেখা গেল। তখন দেশে স্বদেশী ও রেশমের বস্ত্রাদির আদর ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করে। ব্যবসায়ীরাও আবার নূতন উদ্যমে কার্য্য আরম্ভ করিল। পুরাতন কুঠিগুলি প্রায়ই দেশীয় লোকেরা ক্রয় করিয়া লইল। কেহ কেহ সেই কারখানাগুলি চালাইতে লাগিল। তখন হইতে ন্যূনাধিক ১২টী কুঠী এখানে অল্প-বিস্তর কার্য্য করিয়া আসিতেছে। এক্ষণে বিদেশে সূতা রপ্তানি হওয়া প্রায়ই বন্ধ হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং বাংলার এবং ভারতের অন্যান্য স্থানের তাঁতীগণের ও মিল-গুলির নিকট বিক্রয় করাই বর্ত্তমান কারখানাসমূহের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

গভর্ণমেণ্টও রেশমের প্রতি কিঞ্চিৎ শুভদৃষ্টি দিয়াছেন, এবং "সেরিকালচার"—বিভাগ স্থাপিত করিয়া স্থানীয় গুটী-নির্ম্মাণ-প্রণালীর উন্নতি-বিধানের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এই উদ্যম এতই অল্প যে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইতেছে না। অধিকন্তু "সেরিকালচার"-বিভাগ কৃষি-বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকায় রেশমের শিল্প-মূলক কার্য্যাবলীর প্রতি কোনই দৃষ্টি পড়িতেছে না। শিল্প কি কৃষি কোনও বিভাগই রেশমের ব্যবসায়ের দায়িত্ব লইতেছে না।

(৪)

ইংরেজ বণিকগণের প্রত্যাবর্ত্তনের পর স্থানীয় রেশমের কারবারে একটী নূতন প্রভাব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বোম্বাই, রাজপুতানা ও কলিকাতা অঞ্চল হইতে অনেক মাড়োয়ারী ধনী আসিয়া রেশমে হাত লাগাইয়াছে এবং অধ্যবসায় ও কষ্টসহিষ্ণুতার বলে প্রচুর পরিমাণে রেশম ও বস্ত্রাদির ব্যবসায় হস্তগত করিয়া ফেলিয়াছে। এক্ষণে ভারতের অন্যান্য স্থানেও তাহারাই রেশমের কারবারে সর্ব্বাগ্রগণ্য হইয়া উঠিয়াছে। মাড়োয়রীগণের উদ্যোগে প্রথমে রেশমের কারবার বেশ উন্নতি লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের ব্যবসায়-প্রণালীর চাপে পড়িয়া সে উন্নতি বেশী দিন স্থায়ী হইতে পারিল না। কেন এরূপ হইতেছে তাহার কিঞ্চিত আভাষ দেওয়া আবশ্যক।

গত দশ-পনের বৎসর হইতে মুর্শীদাবাদ জেলায় রেশমের গুটী-নির্ম্মাণ খুবই কমিয়া গিয়াছে। ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য প্রকার রোগের দরুণ এখানে সবল লোকের সংখ্যা এতই কমিয়া গিয়াছে যে, চাষের কার্য্যে কর্ম্মঠ শ্রমিক পাওয়া নিতান্ত দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে। তাহার উপর পাতের বা তুঁতের জমির জন্য জমিদারগণ এত অধিক খাজানা আদায় করে যে, তাহার ফলে পাতের চাষ মুর্শীদাবাদ হইতে ক্রমশঃ উঠিয়া গিয়া বীরভূম ও মালদহ জেলায় বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। সুতরাং মুর্শীদাবাদের রেশমকুঠিগুলির কার্য্য এক্ষণে প্রধানতঃ ভিন্ন জেলা হইতে আনীত রেশমের গুটী বা 'পোলু'র উপরই নির্ভর করিতেছে। এই গুটী আমদানি বৎসরে প্রায় পাঁচবার পাচ "বন্দে" হইয়া থাকে। সুতরাং বৎসর ভরিয়া কার্য্য চালাইতে হইলে সমস্ত উপাদান ঐ সময়েই কিনিয়া রাখিতে হয়। দেশীয় কারখানাগুলির তেমন অর্থ-সঙ্গতি না থাকায় প্রায় প্রত্যেক "বন্দের" প্রথমেই মাল খরিদের জন্য অনেক টাকা ধার করিতে হয়। ফলে কারখানাগুলিকে মাড়োয়ারীগণের মুঠার মধ্যে গিয়া পড়িতে হইতেছে।

এক্ষণে মুর্শীদাবাদ জেলায় জঙ্গীপুর ও বেলডাঙ্গা অঞ্চলেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক কুঠি সংস্থাপিত রহিয়াছে। সেখানে প্রতি "বন্দের" পূর্ব্বে মাড়োয়ারী ব্যবসায়িগণ রেশমের সূতার একটী আনুমানিক দর দেয়। ঐ দরের আশায় কারখানাগুলি বিভিন্ন স্থান হইতে টাকা কর্জ্জ লইয়া অথবা

অগ্রিম লইয়া গুটী ক্রয় করিয়া থাকে। সাধারণতঃ মাড়োয়ারীগণ ঐ সময়ে শতকরা বার্ষিক ১২৲ বার টাকা হারে সুদ লইয়া থাকে। তৎপরে যখন সূতা প্রস্তুত হইয়া উঠে তখন প্রায়ই অনেক বিদেশী রেশম ও কৃত্রিম সূতার আমদানির খবর দিয়া বাজার-দর কমিয়া গিয়াছে বলে, এবং কারখানাগুলিকে বিশেষ বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়া তোলে। কুঠির মালিকগণ ভবিষ্যতে মূল্য বাড়িলে লাভ হইবে এই আশায় সূতা মজুত রাখিতে পারে না। কারণ তাহা হইলে কর্জ্জ লওয়া টাকার উপর অনেক সুদ গণিতে হয়। পক্ষান্তরে তৎক্ষণাৎ বিক্রয় করিতে গেলেও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। নিজেরা অন্যান্য স্থানে "মাল" লইয়া গিয়া বিক্রয় করিয়া আসিতে পারিলে অনেক স্থলেই অধিক দর পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতে কার্য্য চালাইবার জন্য অর্থ-সাহায্য মিলিবে না আশঙ্কা করিয়া উত্তমর্ণ মাড়োয়ারীগণের নিকটেই তাহারা দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। এইরূপ দোকর লাভের ব্যবসায় চালাইবার জন্য মাড়োয়ারীগণ অজস্র অর্থ "দাদন" দিয়া প্রায় সমস্ত কারখানাগুলিকে আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। তাহাদের যেরূপ কার্য্যপ্রণালী তাহাতে কোনও "সমবায়-সমিতি"ও অর্থ-সংগ্রহ ব্যবসায়ে তাঁহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সমর্থ হইতেছে না। এইরূপে আমাদের মাড়োয়ারী ধনিগণের দূরদর্শিতার অভাবে মুর্শীদাবাদের রেশমের কারবার ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে।

মাড়োয়ারীদের শুধু দোষ দিলেই চলিবে না। একথাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে, তাহাদেরই উদ্যোগে এখনও ভারতবর্ষের নানা স্থানে মুর্শীদাবাদের রেশম বিক্রয় হওয়া সম্ভব হইতেছে। তাহা ছাড়া, রেশম প্রস্তুত করিবার সময় যেসকল ছিন্ন অংশ প্রভৃতি পরিত্যক্ত হয়, তাহা লইয়া মাড়োয়ারীগণ "চশম" নামক একটি নূতন আনুষঙ্গিক ব্যবসায়ের সৃষ্টি করিয়াছে। কার্পেট প্রভৃতি দ্রব্য নির্ম্মাণের জন্য বোম্বাই এবং ইটালিতে অনেক পরিমাণে এই নূতন উপাদান রপ্তানি হইতেছে। বস্তুতঃ, এই 'চশমে'র মূল্যে বর্ত্তমান কারখানাগুলির বিশেষ সাহায্য হইতেছে বলিয়াই শিল্পিগণ কোনক্রমে কারবার চালাইতে সমর্থ হইতেছে।

(৫)

কয়েকবৎসর হইতে শুধু মুর্শীদাবাদ কেন, সমগ্র ভারতবর্ষে রেশম-শিল্পের আর একটী নূতন বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে প্যারীর প্রদর্শনীর পর প্রথম এদেশে "কৃত্রিম রেশমের" আমদানি হয়। তখনকার ব্যবসায়ে উহার চলন না থাকায় এবং সকল কৃত্রিমতার উপরেই দেশবাসীর একান্ত বিরাগ থাকায়, এখানকার তাঁতী ও ব্যবসায়িগণ উহা প্রত্যাখ্যান করে। ক্রমে দেশবাসীর অর্থসঙ্গতি ও মানসিক বৃত্তির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রভূত পরিমাণ কৃত্রিম রেশমে দেশ ছাইয়া গিয়াছে। গত মহাযুদ্ধের অবসানের পর বৎসর-বৎসর উহার আমদানি অত্যধিক বাড়িয়া যাইতেছে। এই বৎসরে দেশে এত অধিক পরিমাণে সস্তা "আল্পাকা" শাড়ী প্রভৃতি বিদেশী বস্ত্রাদি আমদানি হইয়াছে যে, এদেশীয় রেশমের কারবারের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। কেহ কেহ মনে করিতেছেন যে, মুর্শীদাবাদ শিল্পের এ অবস্থা হইতে পুনরুত্থানের আর কোনও আশাই নাই। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, সকল দিক্ দিয়া দেখিলে পাতের চাষ, গুটী-নির্ম্মাণ ও সূতা-তৈয়ারীর বর্ত্তমান অবস্থায় যাহা মোট খরচ পড়ে তাহাতে প্রতি সের ২০৲ বিশ টাকার নীচে রেশমের দর হইলে কারখানাগুলি কিছুতেই চলিতে পারে না। বিদেশী সস্তা রেশম ও কৃত্রিম দ্রব্যাদির সহিত দেশীয় রেশম কোনক্রমেই প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারিবে না। এ বৎসরে রেশমের দর ১৫৲ টাকা পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমানে উহা ১৮৲টাকায় উঠিয়াছে। এক্ষণে ইহা অপেক্ষা অধিক মূল্য হইবার সম্ভাবনা কম। সুতরাং রেশমের ব্যবসায়ের উপর আর দেশবাসীর আস্থা রাখা কর্ত্তব্য নহে। এইরূপ সিদ্ধান্তে তাঁহারা উপনীত হইয়াছেন।

(৬)

আমাদের কিন্তু বিশ্বাস যে, এখনও একেবারে হতাশ হইবার মত অবস্থায় আমরা পৌছাই নাই। যদিও বর্ত্তমান অবস্থায় এই ব্যবসায় আর অধিক দিন চলিতে পারে না, তথাপি দেশবাসী যদি এদিকে বিশেষ নজর রাখে

এবং অন্যান্য দেশের গভর্ণমেণ্ট রেশমের ব্যবসায়ে যেরূপ পোষকতা করিয়া থাকেন ভারতসরকারও যদি সেরূপ-করিতে উদ্যোগী হন, তবে এখনও এই ব্যবসায়কে বাঁচান যাইতে পারে। কৃত্রিম ও স্বভাবজ দ্রব্যের প্রতিযোগিতায় যদি সস্তা রেশমবস্ত্র প্রস্তুত করা লাভজনক না হয়, তবে বিশেষ কারুকার্যপূর্ণ বহুমূল্য দ্রব্যাদির প্রতি দেশীয় শিল্পিগণ অধিকতর মনোযোগ দিতে পারে। নবপ্রতিষ্ঠিত টারিফ-বোর্ড চেষ্টা করিলে সাময়িকভাবে এই দেশীয় শিল্পকে বিদেশীয় রেশমের অন্যায় প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে। নতুবা রেশমের কারবার একেবারে নষ্ট হইয়া গেলে তাহার পুনঃ সংস্থাপন আর সম্ভব হইবে না। ফলে এই জেলাতেই প্রায় বিংশ সহস্র ব্যক্তি বেকার হইয়া পড়িবে এবং দেশে হাহাকার লাগিয়া যাইবে। একবার সকলে মিলিয়া শেষ চেষ্টা করিয়া দেখুন, ইহাই মুর্শীদাবাদবাসীর কাতর প্রার্থনা।

ইংরেজের নয়া শুল্ক-নীতি

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

সেকালের কথা

"সেকালে" বিলাতে একবার প্রচলিত ছিল সশুল্ক-বাণিজ্যের রেওয়াজ। বিদেশী মাল আমদানির উপর চড়া হারে কর বসানো হইত। সংরক্ষণ-নীতির পথে চলিত ইংরেজ জাতি।

কালে ইংল্যাণ্ড দুনিয়ার কারখানায় পরিণত হয়। ইংরেজদের পল্লী-শহরের কারিগরেরা জগতের অলিতে-গলিতে মাল চালান দিতে থাকে। তখন আর ইংরেজকে বিদেশী আমদানির বিরুদ্ধে স্বদেশী-সংরক্ষণের জন্য আইন কায়েম করিতে হইত না। বরং এই সকল আইন "সেকেলে", "মান্ধাতার আমলের চিজ" বলিয়া পরিগণিত হইতে থাকে। ক্রমে সংরক্ষণ-পদ্ধতি আইনতঃ তুলিয়া দেওয়া হয়। ইংল্যাণ্ড পুরাপুরি অ-শুল্ক এবং অবাধ বাণিজ্যের আইন কায়েম করে। এই গেল বিগত শতাব্দীর মাঝামাঝি কালের কথা।

বিলাতের কুটির-শিল্প, ফ্যাকটরি-শিল্প সবই তখন সকল দেশের সেরা। বস্তুতঃ, বিলাতী সমাজে তখন শিল্প-বিপ্লবের জোয়ার ছুটিয়াছে। দুনিয়ার অন্যান্য দেশ—এমন কি, ফ্রান্স এবং জার্ম্মাণিও—তখন "শিল্প-বিপ্লবে"র আসল শক্তি চাখিতে সমর্থ হয় নাই। ইংরেজের কারখানাগুলা কাজেই কোনো বিদেশী কারখানার সঙ্গে টক্কর দিতে হইলে ইতস্ততঃ করিত না। প্রকৃতপক্ষে, সেই অবস্থায় বিদেশী মাল বিলাতের বাজারে প্রবেশ করিয়া বিলাতী মালের সঙ্গে প্রতিযোগিতা চালাইতে অসমর্থ হইত। ইংরেজদের সমান সস্তায় কোনো মাল দেওয়া বিদেশের কারখানার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না।

কাজেই ইংল্যাণ্ডের পক্ষে কোনো প্রকার বহিষ্কার-নীতি, স্বদেশী আন্দোলন, সংরক্ষণের আইন দরকারী-ই ছিল না। বরং বিদেশী মালের উপর শুল্ক না থাকা-ই ইংরেজদের পক্ষে সুবিধাজনক বিবেচিত হইত। বিদেশী মাল বিনাশুল্কে স্বদেশের ভিতর আমদানি করাই ছিল তখন ইংরেজ নরনারীর স্বার্থ। অ-শুল্ক আমদানির ব্যবস্থায়, ইংরেজরা বিদেশী খাদ্যদ্রব্য পাইত সস্তায়। কারখানার কাজে লাগাইবার জন্য যে সকল বিদেশী কুদরতী মাল দরকার, সেইসবও এই ব্যবস্থায় ইংরেজরা সস্তায়ই পাইত। কাজেই কি খাই-খরচ, কি মাল জোগাইবার খরচ, উভয় খরচই বিলাতে লাগিত কম। বিদেশে মাল রপ্তানি করিবার পক্ষে ইহা অপেক্ষা সুবিধাজনক ঘটনা আর কি ঘটিতে পারে? অবাধ বাণিজ্যনীতিতে ইংরেজের লাভ ছিল ষোল আনা। এই নীতির পশ্চাতে

লম্বাচৌড়া দার্শনিক তত্ত্ব-ঢুঁড়িতে যাইবার প্রয়োজন নাই। অতিমাত্রায় বস্তু-নিষ্ঠভাবেই ইংরেজরা বহির্ব্বাণিজ্যের নিয়ম-কানুন গুছাইয়া লইয়াছিল।

অবাধ বাণিজ্যের ব্যবস্থা সজোরে চলিতে থাকিল। বৃটিশ গবর্মেণ্ট ইংরেজ শিল্পী এবং সওদাগরদিগকে কোনো প্রকার সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ সাহায্য করা বন্ধ করিয়া দিলেন। শিল্প-বাণিজ্যে সরকারী অর্থ-সাহায্য পুরাপুরি লোপ পাইল। অপরদিকে অন্যান্য দেশের গবর্মেণ্টগুলাও যাহাতে স্বদেশী বাণিজ্যের প্রসার-কল্পে অর্থ-সাহায্য না করে, তাহার তদবির করা বৃটিশ গবর্মেণ্ট নিজের অন্যতম কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলেন। সরকারী অর্থ-সাহায্যের নীতি দুনিয়া হইতে তুলিয়া দেওয়াই হইল বৃটিশ সরকারের মস্ত এক ধান্ধা। নানা দেশের সঙ্গে এই বিষয় লইয়া ইংরেজজাতির সরকারী মন-কষাকষিও ঘটিয়া গিয়াছে।

ব্রুসেল্‌সের চিনি-বৈঠক

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংলাণ্ডের বাণিজ্য-নীতি এইরূপ। ১৯০২ সনের একটা ঘটনা এই উপলক্ষ্যে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এই বৎসর বেলজিয়ামের ব্রুসেল্‌স্ শহরে একটা আন্তর্জ্জাতিক বৈঠক বসে। তাহাতে চিনির আমদানি-রপ্তানি সম্বন্ধে একটা "বিশ্ব-সমঝৌতা" কায়েম হয়। ইংল্যাণ্ডের সরকারী প্রতিনিধিও হাজির ছিলেন।

এই মজলিশে ইংল্যাণ্ডের গলা অ-শুল্ক বাণিজ্যের স্বপক্ষেই প্রায় সপ্তমে গিয়া ঠেকিয়াছিল। প্রথম সাব্যস্ত হয় যে, কোনো গবর্মেণ্টই বিদেশে চিনি রপ্তানি করিবার উদ্দেশ্যে স্বদেশী ব্যবসায়ীদিগকে কোনো প্রকার অর্থ-সাহায্য করিতে পারিবে না। দ্বিতীয়তঃ, যদি কোনো দেশের চিনিওয়ালারা রপ্তানির জন্য সরকারী সাহায্য পায়, তাহা হইলে তাহাদের চিনি হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সেই চিনির উপর আমদানির দেশে, একটা আমদানি-শুল্ক বসানো যাইতে পারিবে। এই আমদানি-শুল্কের হার অন্ততঃ রপ্তানি-সাহায্যের হারের সমান রাখা চলিবে। তৃতীয়তঃ, দেশী চিনির উপরই যদি কোনো প্রকার "ভোগ-কর" থাকে তাহা হইলে আমদানি-করের হারটা তদনুসারে চড়াইয়া রাখিতে পারা যাইবে, ইত্যাদি। বিদেশী গবর্মেণ্ট যাহাতে নিজ দেশের চিনিওয়ালাদিগকে অতিমাত্রায় সাহায্য করিতে না পারে, আর সাহায্য করিলেও যাহাতে তাহাদের চেষ্টা বিফল হয় বা পচিয়া যায়, সেই লক্ষ্য নজরে রাখিয়া ব্রুসেল্‌সের বৈঠক আলোচনা চালাইয়াছিল।

১৯১৩-১৪ সনের আবহাওয়া

১৯১৩ সনে এই বৈঠকের সমঝৌতা পুনরায় কায়েম করিবার তিথি আসে। কিন্তু ইংলাণ্ড এইবার বাঁকিয়া বসিল। চিনির মুল্লুকে আন্তর্জ্জাতিক অশুল্ক বাণিজ্য-নীতি বজায় রাখিবার জন্য ইংরেজ-সরকারকে আর লালায়িত দেখা গেল না। বিলাতে নতুন ঢেউ পৌঁছিয়াছে।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের আর্থিক পুষ্টিসাধন এই যুগের বড় কথা। সাম্রাজ্যের অন্তর্গত উপনিবেশগুলাকে ঠেলিয়া জাতে তুলিতে হইবে, এই ছিল তখনকার রাষ্ট্র-দর্শন। ঔপনিবেশিক মালকে বিদেশী বিবেচনা করা হইবে না, আর যদি হয়ই, তাহা হইলেও ঔপনিবেশিক মালের উপর অন্যান্য বিদেশী মালের চেয়ে নরম হারে শুল্ক বসানো কর্ত্তব্য,—ইত্যাদি চিন্তার ধারা বৃটিশ সমাজে প্রবল হইতে থাকে। অর্থাৎ অবাধ এবং অশুল্ক আমদানি যদি চালাইতেই হয় তাহা হইলে একমাত্র ঔপনিবেশিক মাল সম্বন্ধেই এই নিয়ম খাটুক। এইরূপ বুঝিয়াই বিলাতী "এম্পায়ার ডেভেলপমেণ্ট" বা সাম্রাজ্য-পরিপুষ্টির ধুরন্ধরেরা "প্রেফারেনশ্যাল" বা পক্ষপাত-মূলক শুল্ক-নীতি প্রচার করিতে থাকেন।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের উপনিবেশে উপনিবেশে তখন আখের চাষ বেশ মোটা আকারে দেখা দিয়াছে। বিলাতের বাজারে এই চিনি-আমদানির পথ সহজ করিয়া দিবার দিকে তখন ইংরেজ মাতব্বরদের মতি-গতি। কাজেই ব্রুসেল্‌সের সমঝৌতা আর দ্বিতীয়বার ইংরেজ সমাজকে স্পর্শ করিতে পারিল না।

উপনিবেশ-সমন্বিত বৃটিশ সাম্রাজ্যই একটা বিপুল দুনিয়া। এই দুনিয়া অবশিষ্ট বিশ্বকে পর বিবেচনা করিতে থাকুক। কিন্তু এই দুনিয়ার বিভিন্ন অঙ্গের ভিতর পরস্পর আমদানি-রপ্তানি যথাসম্ভব অশুল্ক এবং অবাধরূপে চলুক। এই গেল

বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্রের সম-সম কালে ইংরেজজাতির আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় নীতি।

লড়াইয়ের পরে বেকার-সমস্যা

মহালড়াই থামিল। বিলাতী সমাজে দেখা দিল বিপুল আর্থিক সঙ্কট। সে সঙ্কট আজও চলিতেছে। এর মধ্যে আর্থিক দুনিয়ার আকার প্রকার বদলাইয়া গিয়াছে। সেকালের কাঠাম আর নাই। জগতের শিল্প-বাণিজ্যে নয়া অস্থি-মজ্জা দেখা দিয়াছে। মাল উৎপন্ন হয় আজকাল নতুন প্রণালীতে। কারখানার শাসন ঘটে নতুন কৌশলে। বাজার কায়েম করা, বাজার দখল করা, বাজার তাঁবে রাখা ইত্যাদি বস্তুও আজকাল একদম নয়া। আগে যেসব দেশ নেহাৎ বিদেশী মালের বাজার মাত্র ছিল, আজ সেসব দেশ স্বয়ংই মাল-স্রষ্টা এবং উৎপন্ন মালের জন্য নিজেই বিদেশে বাজার ঢুঁড়িতেছে।

বিশ্ব-শক্তির ওলট-পালট প্রত্যেক সমাজেই কম-বেশী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বিলাতের বড়-বড় শিল্প বাণিজ্যের কেন্দ্রগুলাও এই প্রভাব ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। কয়লার কারবার, লোহার কারবার, ইস্পাতের কারবার, তুলার তৈয়ারী কাপড়চোপড়ের কারবার, জাহাজের কারবার, এই সবই ছিল ইংরেজ-সমাজের ধনসম্পদের মোটা মোটা খুঁটা। এইগুলা আর পুরাণা জাঁক বজায় করিয়া চলিতে পারিতেছে না। দুনিয়ার ভাঙা-চুরার দাগ এইসব কারবারের ঘাড়ে, কপালে এবং হাতপায়েও দেখিতে পাইতেছি। সর্ব্বত্রই এক লক্ষণ বিরাজমান। সে হইতেছে বেকারের দল। চার-পাঁচ বৎসর ধরিয়া বেকার-সমস্যা চলিতেছে। কখনো কখনো বিশ লাখ পর্য্যন্ত মজুর কর্ম্মহীন রহিয়াছে। এই কয়বৎসরের ভিতর কোনো দিনই দশ লাখের কম বেকার বিলাতী সমাজে দেখা যায় নাই।

ইংরেজদের চাই এখন রপ্তানি-বৃদ্ধি। তাহা হইলেই কারবারগুলা পুরাদমে চলিতে পারিবে। তাহা হইলেই বেকার-সমস্যা চুকিবে। রপ্তানির পরিমাণ এবং দাম বাড়াইতে পারিলেই বিলাতের আর্থিক সঙ্কট ঘুচিবে। কিন্তু রপ্তানি-বৃদ্ধি করা যায় কি করিয়া? ডাকো রাষ্ট্রকে। রাষ্ট্রের আর্থিক সাহায্যই বিগত কয়েক বৎসরের বিলাতী সমাজের মুখ্য শিল্প-বাণিজ্য-নীতি।

রপ্তানি-সাহায্যের আইন-কানুন

১৯২০ হইতে ১৯২৪ সন পর্য্যন্ত কয়েক বৎসরের ভিতর কয়েকবার বহির্ব্বাণিজ্য বিষয়ক আইন জারী হইয়াছে। "ওভারসীজ ট্রেড অ্যাক্ট্‌স্" নামে এই সকল বিধি পরিচিত। আইনগুলার মোটা কথা নিম্নরূপ :—বিলাতী মাল বিদেশে রপ্তানি করিবার উদ্দেশ্যে গবর্মেণ্ট সওদাগরদিগকে আর্থিক সাহায্য করিতে পারিবেন। প্রথমতঃ, ধারে বেচিবার ব্যবসায়ে গবর্মেণ্ট ব্যবসায়ীকে টাকা আগাম দিতে অধিকারী। দ্বিতীয়তঃ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে, এমন কি ব্যবসার ঝুঁকিটাও গবর্মেণ্ট নিজের ঘাড়ে লইতে পারিবেন। এই মর্ম্মে আইনগুলা কায়েম করা হইয়াছে।

অন্যান্য কতকগুলা আইন ১৯২১ হইতে ১৯২৫ সন পর্য্যন্ত কালের ভিতর জারী হইয়াছে। এই সবকে বলে "ট্রেড ফেসিলিটীজ অ্যাক্ট্‌স্" (ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টিকরা বিষয়ক আইন)। এইসকল বিধির উদ্দেশ্য প্রধানতঃ দুই প্রকার। রাষ্ট্রকে ব্যবসায়ীদের কর্জ্জ কারবারে সুদ এবং মূলধন দুইই অথবা কেবলমাত্র সুদ কিম্বা কেবলমাত্র মূলধন সম্বন্ধে জিম্মাদারী লইবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। অধিকন্তু কোনো বৃটিশ উপনিবেশের জন্য যদি কোনো ব্যবসায়ী কর্জ্জ লয়, তাহা হইলে গবর্মেণ্ট সুদের বাবদ ব্যবসায়ীকে নগদ কিছু অর্থ সাহায্য পর্য্যন্ত করিতে পারিবেন।

অবশ্য সকল ক্ষেত্রেই গবর্মেণ্টের দৃষ্টি মাত্র এক দিকে। বেকার মজুরদের সংখ্যা কমাইতে পারা যাইবে এইরূপ সম্ভাবনা দেখিবামাত্র বৃটিশরাজ এই সকল নতুন আইনের শরণাপন্ন হইতে অধিকারী। মোটের উপর ইংরেজ ব্যবসায়ি-সমাজে আজকাল "লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন"-নীতি পাকা ঘর করিয়া বসিতেছে। বলা বাহুল্য, এই নীতির বিরুদ্ধেই ইংরেজ লড়িয়াছিল ১৯০২ সনের ক্রসেল্‌স বৈঠকে।

"বহির্ব্বাণিজ্য-বিষয়ক আইনে"'র ধারা-মাফিক কাজ করিবার জন্য ২ কোটি ৬০লাখ পাউণ্ড পর্য্যন্ত গবর্মেণ্ট

সরকারী তহবিল হইতে খরচ করিতে অধিকারী। আর "ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টি করার আইনগুলা"র মতলব অনুসারে ৭ কোটি পাউণ্ড পর্য্যন্ত গবর্মেণ্টের হাতে খরচ হইতে পারিবে।

১৯২৫ সনের বাজেট

এইখানেই খতম নয়। বৃটিশ গবর্মেণ্ট কতকগুলা শিল্প-কারবার সম্বন্ধে মা বাপ রূপে দেখা দিতেও রাজি হইয়াছেন। কোন্ কোন্ শিল্প? যেগুলা স্বদেশের সামরিক আত্ম-রক্ষার জন্য বিশেষ মূল্যবান, অথবা যেগুলা আজও বেশ নিজ পায়ের উপর দাঁড়াইতে অসমর্থ, অথবা যেগুলা কোনো না কোনো কারণে এখনো কিছু অভাবগ্রস্ত অবস্থায় রহিয়াছে। ১৯২৫ সনের বাজেট-আইন বিলাতী রাজস্ব-নীতিতে যুগান্তর আনিয়া শিল্প-বাণিজ্যে নয়া প্রাণ সঞ্চার করিতে বদ্ধপরিকর।

বিলাতের রাসায়নিক কারবারগুলা আজকাল খুব দুরবস্থায় রহিয়াছে। কৃত্রিম রেশমের কারবার এখনো বেশ পাকিয়া উঠিতে পারে নাই। চিনির বীট আর ফ্ল্যাক্সের কারবারেরও স্বাধীনভাবে মাথা খাড়া রাখিবার ক্ষমতা দেখা যাইতেছে না। তাহার উপর কয়লার খাদের কথা ত আছেই। এইসকল শিল্পেই ইংরেজ-সরকারের দেশোন্নতি-বিধায়ক কাজ আজকাল বেশ মোটা আকারে দেখা দিতেছে।

গবর্মেণ্টের অর্থ-সাহায্য বিতরিত হয় দুই প্রণালীতে। প্রথমতঃ, কারবারের মালিকেরা কারবার চালাইবার জন্য কোনো ব্যাঙ্কের নিকট হইতে কর্জ্জ লয়। এই কর্জ্জ শোধ করিবার জন্য "গ্যারাণ্টি" (শেষ দায়িত্ব) থাকে গবর্মেণ্টের উপর। দ্বিতীয়তঃ, গবর্মেণ্ট স্বয়ং অংশীদার হইয়া কারবারটা চালাইবার মূলধন কিছু-কিছু জোগাইয়া থাকেন। তৃতীয়তঃ, গবর্মেণ্টের সরকারী তহবিল হইতে চিনির কারবারে, কয়লার কারবারে আর রেশমের কারবারে "নগদ দান" আসিয়া পৌঁছে।

চিনির কারখানা

বীট চিনির কারবারটা ইংরেজ আজ কোন্ প্রণালীতে খাড়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছে? ফী আড়াই মণ স্বদেশী চিনির উপর গবর্মেণ্ট ১৯ শিলিঙ্ ৬ পেন্স (প্রায় এক পাউণ্ড) অর্থ-সাহায্য করিতে প্রস্তুত। এই সাহায্যের মাত্রা কোনো ক্ষেত্রেই ৬ শিলিঙের কম নয়। আগামী দশ বৎসর ধরিয়া চিনির কারখানাগুলাকে এই প্রণালীতে লালনপালন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ইংরেজের এই চিনির লড়াই চলিতেছে জার্ম্মাণদের সঙ্গে। ১৯২৫ সনের বাজেট-কানুনে উপনিবেশের চিনি অল্পমাত্র শুল্কেই বিলাতে আমদানি করা চলিবে। কিন্তু অন্যান্য বিদেশী চিনির উপর পুরাণা উঁচু হারের শুল্ক বজায় থাকিবে। কাজেই বিলাতে জার্ম্মাণ চিনির বাজার মারা পড়িবার অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইতেছে। ১৯১১-১৩ সনে ইংরেজরা জার্ম্মাণ চিনি খরিদ করিত বৎসরে গড়পড়তা ১৩ কোটি ৮০ লক্ষ মার্ক (১ মার্কের দাম বার আনা)। ১৯২৪ সনে জার্ম্মাণি বিলাতে বেচিতে পারিয়াছে মাত্র ২ কোটি ৭৫ লক্ষ মার্কের চিনি।

রেশমের কারবার

১৯২৫ সনের বিলাতী বাজেট-কানুনটা আরও বিশ্লেষণ করা যাউক। বিদেশী রেশম, কৃত্রিম রেশম, সূতা, বুনা কাজ এবং অন্যান্য কলের তৈয়ারী মালের উপর শতকরা ৩৩⅓ পর্য্যন্ত উঁচু শুল্ক বসানো হইয়াছে।

ইংরেজেরা বলিতে পারে যে,—স্বদেশী কৃত্রিম রেশমের উপরও ইংরেজদের নিকট হইতেই একটা "ভোগ-কর" তোলা হইয়া থাকে। কিন্তু বিদেশী ব্যবসায়ীদের নালিশ এই যে, ভোগ-করের পরিমাণ বিদেশী মালের উপরকার শুল্কের প্রায় আধাআধি মাত্র। বিদেশী মাল স্বদেশের বাজার হইতে বাহির করিয়া দেওয়াই ইংরেজ-রাজস্ব-নীতির মতলব।

আর এক কথা। স্বদেশী কৃত্রিম রেশম-শিল্পের বাজার স্বদেশে বাঁচাইয়া রাখাই ইংরেজদের একমাত্র লক্ষ্য নয়। তাহারা এই মাল বিদেশে চালাইবার জন্যও অনেক-কিছু করিতেছে। ইংরেজদের চিন্তা-প্রণালী নিম্নরূপ :—"আমাদের রেশম বিদেশে পৌঁছিলেই বিদেশী গবর্মেণ্ট তাহার উপর একটা আমদানি-কর বসাইয়া থাকে। ইহাতে ইংরেজ ব্যবসায়ীদের ক্ষতি হয়। অতএব আমাদের উচিত যে, সেই

পরিমাণ করের সমান একটা অর্থ-সাহায্য করিয়া আমরা আমাদের শিল্প ও ব্যবসাটাকে জগতে বাঁচাইয়া রাখি। এই জন্ম যখনই আমাদের ব্যবসায়ীরা বিদেশে রেশম পাঠাইবে তখনই আমরা তাহাদিগকে একটা নির্দ্দিষ্ট হারে টাকা দিয়া দিব।” এই চিন্তা-প্রণালী ১৯২৬ সনের আইনে নিরেট ভাবে বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। বৃটিশ গবর্মেণ্ট রেশমের জন্য রপ্তানি-সাহায্যের হার বাঁধিয়া দিয়াছেন শত করা ৪৲ টাকা হিসাবে।

কয়লার খাদে দুর্গতি

বর্ত্তমান জগতের আর্থিক জীবন খুলিয়া দিবার পক্ষে কয়লা এক মস্ত বড় চাবি। আমাদের আজকালকার পরিভাষায় কয়লার কারবার অন্যতম প্রধান "চাবি-শিল্প"। এই চাবি-শিল্পের অন্যতম নামজাদা মালিক হইতেছে ইংরেজ জাতি। ইংল্যাণ্ডের হাতেই বর্ত্তমান জগতের চাবি বিরাজ করিতেছে, অনেকটা এইরূপ বলা যাইতে পারে। কিন্তু সেই চাবি-শিল্পের দুর্গতি বিলাতে যার পর নাই বেশী। বৎসর বৎসর ইহার অবস্থা ক্রমিক কাহিল হইয়া আসিতেছে। কাজেই বৃটিশ গবর্মেণ্টের সরকারী অর্থ-সাহায্য খুব প্রচুর পরিমাণে বর্ষিত হইতেছে কয়লার উপর।

বিলাতে কয়লার দুর্গতি ঘটিল কেন? প্রথম কারণ, বিদেশে বাজারের অভাব। দ্বিতীয় কারণ, কয়লার খাদ-ওয়ালারা অসংখ্য ছোট ছোট স্ব-স্ব-প্রধান কারবারের মালিক। তাহাদের ভিতর কোনো প্রকার শৃঙ্খলা ও ঐক্যবন্ধনের আবহাওয়া দেখা যাইতেছে না।

তৃতীয় কারণ গুরুতর। এই কথাটা ভারতবাসীর পক্ষে সহজে বুঝা সম্ভব নয়। কিন্তু মার্কিণ এবং জার্ম্মাণ জাত এই কারণটা সহজেই ধরিতে পারে। তাহাদের মতে কয়লার শিল্প ইংরেজ সমাজে নেহাৎ "সেকেলে" অবস্থায় রহিয়াছে। দুনিয়ার জ্ঞানবিজ্ঞান এবং টেক্‌নিক্যাল কৌশল যে পরিমাণে বাড়িয়াছে ইংল্যাণ্ডের খনিওয়ালারা সেই পরিমাণে বর্ত্তমান-নিষ্ঠ হইতে পারে নাই। ইহাদের খাদে "মান্ধাতার আমলে"র যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। খাদ-পরিচালনার নিয়মও "সনাতন" অবস্থার উপর উঠিতে পারে নাই। শিল্পের তরফ হইতে কয়লার কারবারে ইংরেজরা নতুন নতুন কর্ম্ম-প্রণালী কায়েম না করা পর্য্যন্ত তাহাদের যথার্থ উন্নতি অসম্ভব।

তার পর আর এক কারণ। সে হইতেছে মজুরে-মালিকে মারামারি। শ্রমিক-সমস্যা অন্যান্য শিল্পেও কম নয়। কিন্তু খনির মজুরেরা বিলাতে অত্যন্ত প্রবল। তাহাদিগকে আটিয়া উঠা পুঁজিপতিদের পক্ষে অন্যতম অসাধ্য ব্যাপার।

বিলাতে কয়লা উঠে ৩,০০০ খনি হইতে। এই সকল খনির কাজ চালাইবার জন্য কোম্পানী আছে ১,৫০০। যেসকল জনপদে খনির কাজ চলে সেই সকল জনপদের মালিক সংখ্যা ৪,০০০। বুঝিতে হইবে যে, কয়লা সম্পত্তি ইংরেজ সমাজে বহুসংখ্যক ছোট ও মাঝারি টুকরায় ছড়াইয়া রহিয়াছে। বড় বড় কারবারের সংখ্যা খুবই কম। কাজেই উন্নত ও "আধুনিক" প্রণালীর খোদাই কাজ চালাইবার মত ক্ষমতা অনেকেরই নাই।

মজুরে মালিকে রফা

অধিকন্তু, মজুর-মালিকের সম্বন্ধ কয়লার খাদে বিশেষ রূপেই জটিল। ১৯২৪ সনের জুন মাসে একটা সমগ্র দেশব্যাপী "হ্বেজেস্ এগ্রীমেণ্ট" বা মজুরি-চুক্তি ঘটে। সেই রফার প্রধান কথা ছিল "মিনিমাম হ্বেজ" বা নিম্নতম মজুরির হার নির্দ্ধারণ। ঠিক হয় যে, ১৯১৪ সনের জুলাই মাসে কোনো কোনো জেলায় যে হারে মজুরি প্রচলিত ছিল তাহার সঙ্গে আরও এক-তৃতীয়াংশ জুড়িয়া নিম্নতম মজুরি নির্দ্ধারিত করা হইবে। অর্থাৎ তাহার চেয়ে কম হারে কোনো খনি-মজুর তলব পাইবে না। তাহার চেয়ে বেশীই পাইবার কথা। ১৯২৪ সনের রফায় আর একটা বড় কথা ছিল। সেটা লাভের অংশে ভাগ-বাটোয়ারার কথা। সকল প্রকার খরচ-পত্র বাদে খনির কাজে যাহা কিছু লাভ থাকিবে তাহার শতকরা ১৩ অংশ পাইবে মজুরেরা আর ৮৭ অংশ যাইবে মালিকদের হিস্যায়। এই হইয়াছিল চুক্তির কড়ার।

এক বৎসর ধরিয়া এই কড়ার অনুসারে কাজ চলিতে থাকে। কিন্তু চুক্তি বাঁচাইয়া কাজ করা মালিকদের পক্ষে ক্রমশঃ কঠিন হইয়া পড়ে। খনির কাজে লাভের বদলে লোকসান

দেখা দিতেছিল। যেখানে যেখানে লোকসান হয় নাই সেইসকল ক্ষেত্রেও লাভের পরিমাণ ছিল নগণ্য। কাজেই ১৯২৫ সনের জুলাই মাসে মালিকেরা চুক্তিটা নাকচ করিবার প্রস্তাব করে।

নিম্নতম মজুরির হার সম্বন্ধে মালিকদের নূতন প্রস্তাব মজুরদের কাছে পৌঁছে। সমগ্র দেশব্যাপী কোনো একটা হার নির্দ্দিষ্ট না করিয়া জেলায় জেলায় "ভাত-কাপড়ের" খরচের বিভিন্নতা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন হার নির্দ্ধারিত করিবার কথা তোলা হয়। মজুরেরা এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু করে। সারা দেশ জুড়িয়া বিপুল হরতাল কায়েম হয়-হয় হইয়া উঠিয়াছিল। খাদের মজুরদের সঙ্গে অন্যান্য কারখানার মজুরেরা হামদর্দ্দি দেখাইয়া দেশব্যাপী ধর্ম্মঘটে যোগ দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। রেল-মজুরেরাই এই দিকে বিশেষ ভাবে ঝুঁকিয়া পড়ে। ইংরেজ সমাজে তুমুল বিপ্লবের সূত্রপাত হয়।

বাল্‌ডুইনের কয়লা-নীতি

এই সঙ্কটের সময় বৃটিশ গবর্মেণ্ট আবার দেশোদ্ধারের দায়িত্ব নিজ মাথায় তুলিয়া লইলেন। মন্ত্রি-প্রধান বাল্‌ডুইন মজুরদিগকে ডাকিয়া বলিলেন:—"কুছ পরোআ নাই। তোমাদের ১৯২৪ সনের কড়ার-ই বজায় থাকিবে।" আর মালিকদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার পন্থাও তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। শ্যাম ও কুল দুই-ই একসঙ্গে রক্ষা পাইল।

মালিকদিগকে সন্তুষ্ট করা হইল কি করিয়া? সরকারী তহবিল হইতে খোলাখুলি অর্থ-সাহায্য করিয়া। বাল্‌ডুইন বলিলেন:—"আজ তোমরা ১৯২৪ সনের হার অনুসারে মজুরি দিতে যাইয়া ক্ষতি-গ্রস্ত হইতেছ, একথা বেশ বুঝিতেছি। অথচ তোমাদের নতুন প্রস্তাবটা মজুরেরা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নয়। অতএব একটা কাজ করা যাউক। তোমরা আজ যে হারে মজুরি দিতে সমর্থ তাহাই তোমরা দিয়া যাও। আর পুরাণা (অর্থাৎ উঁচু) হার পর্য্যন্ত উঠিতে যতখানি বাকী থাকে সেই সমস্তটা গবর্মেণ্টই পূরণ করিয়া দিবে।" ১৯২৫ সনের আগষ্ট হইতে ১৯২৬ সনের (বর্ত্তমান বর্ষের)মে পর্য্যন্ত বৃটিশ গবর্মেণ্ট এতখানি গচ্চা দিতে প্রস্তুত। ইহাও এক প্রকার "রামরাজ্য" আর কি!

মজুরেরা চড়া হারে মজুরি পাইয়া আসিতেছে। অপর দিকে মালিকদেরও লাভের ঘর খালি নয়। কেননা, তাহাদিগকে টন প্রতি ১ শিলিঙ ৩ পেন্স পর্য্যন্ত নিরেট লাভ রাখিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। গবর্মেণ্ট খনির কারবারের খাতাপত্র সবই পরীক্ষা করিতে অধিকারী। এইসকল কাজ সামলাইবার জন্য গবর্মেণ্টের খরচ হইতেছে বিস্তর। গত বৎসর বাজেটে খনি-সাহায্যের বাবদ এক কোটি পাউণ্ড দাগ দিয়া রাখা হইয়াছিল। ডিসেম্বর মাসের ভিতরই এই সব টাকা নিঃশেষ হইয়া যায়। বর্ত্তমান বৎসরের জন্য গবর্মেণ্ট আবার নব্বই লক্ষ পাউণ্ড আল্‌গা করিয়া রাখিয়াছেন।

আজ পর্য্যন্ত গবর্মেণ্ট খনি-সাহায্যের বাবদ যত খরচ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, টন প্রতি দুই শিলিঙ্ পড়ে। এতখানি সাহায্য পাওয়ার ফলে মালিকেরা কয়লার দাম কমাইতে পারিয়াছে। কাজেই বিলাতী কয়লার বিক্রয় আবার বাড়িতেছে। এক জার্ম্মাণ বাজারেই তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইতেছি। বার্লিনের "ডায়চে আল্‌গেমাইনে ৎসাইটুঙ" দৈনিকে এক লেখক বলিতেছেন যে,—১৯২৫ সনের প্রথম সাত মাসে গড়ে মাত্র ২২৫,০০০টন হিসাবে বিলাতী কয়লা জার্ম্মাণিতে আসিয়া ছিল। কিন্তু সরকারী সাহায্যের যুগে,—অর্থাৎ বৎসরের শেষের দিকে মাসে মাসে ৪০৫,০০০ টন কয়লা বিলাত হইতে জার্ম্মাণিতে পৌঁছিয়াছে।"

অবাধ বাণিজ্যের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি

বর্ত্তমান বিলাতের আর্থিক আইন-কানুন দুনিয়ার সকল দেশেরই সমজদার নরনারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। এই সকল আইন-কানুনের প্রথম কথা শিল্প-বাণিজ্যে সরকারী নগদ দান। দ্বিতীয় কথা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত উপনিবেশ-সমূহের মাল আমদানি সম্বন্ধে পক্ষপাত-মূলক নরম হারে শুল্ক-প্রবর্ত্তন। আর তৃতীয় কথা হইতেছে দুনিয়ার অন্যান্য দেশের মাল হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সংরক্ষণ-নীতি-

মূলক চড়া হারে আমদানি-শুল্কের রেওয়াজ। ধনসম্পদের তরফ হইতে গ্রেটব্রিটেনকে দুনিয়ার "একমেবাদ্বিতীয়ম্"রূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য একটা একটা করিয়া সকল প্রকার ছোট-বড়-মাঝারি মজবুত খুঁটা গাড়িয়া রাখা হইতেছে। আর দুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলিতেছে,—"বল হরি, হরিবোল, অবাধ বাণিজ্য-নীতিকে খাটে তোল।"

বিলাতের নয়া শুল্ক-নীতি কতদিন চলিবে তাহা এখনো কেহ জানে না। কিছু বেশী দিনের জন্যই ইহার আবির্ভাব, তাহা "যাঁহাদের দরদ" তাঁহারা বেশ বুঝিতেছেন। ফ্রান্স এবং জার্ম্মাণির শিল্প-ধুরন্ধরেরা মাথা চুলকাইতেছে আর ভাবিতেছে:—তাই ত! একি আমাদেরই বিরুদ্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্যের আর্থিক পায়তারা?

দুনিয়ার এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যোগ দিবার ক্ষমতা ভারত-সন্তানের নাই। বাহির হইতেই বা এই সকল লড়াই দেখিবার ও বুঝিবার ক্ষমতা আমাদের কয়জনের আছে জানি না।

যুবক-ভারতের কর্ত্তব্য

বৃটিশ সাম্রাজ্যকে আর্থিক হিসাবে দৃঢ়তর করিবার জন্য ইংরেজ জাত আজকাল যেসকল অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান এবং আইন-কানুন চালাইতেছে, সেইসবের পারিভাষিক নাম যাহাই হউক না কেন, তাহার ভিতর ভারতবাসীর আর্থিক উন্নতি ঘটিবার কিছু-কিছু কলকব্জা আছে। এই দিকে অন্ধ থাকিলে আমরা বেকুবি করিয়া বসিব। সেইগুলার সদ্ব্যবহার করিতে পারিলে, অন্ততঃ পক্ষে তাঁত-কাপড়ের তরফ হইতে, আমাদের লাভ ছাড়া লোকসান নাই। হয়ত, আজকালকার ভারতীয় বেকার-সমস্যাটা ঘুচাইবার নয়া নয়া পথ ঢুঁড়িয়া পাওয়া যাইবে।

রাষ্ট্রনৈতিক দলাদলিই যুবক-ভারতের পক্ষে চরম সত্য বিবেচিত হইতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রেই কথার মারপ্যাচ ছাড়িয়া দিয়া নিট লাভালাভের হিসাব করিতে শিখা আবশ্যক। দেশের আর্থিক উন্নতি যাঁহাদের চিন্তার ও কর্ম্মের লক্ষ্য, তাঁহারা একবার এই কথাটা গভীরভাবে বুঝিতে চেষ্টা করুন।

বৃটিশ সাম্রাজ্য সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া দানা বাঁধিতে চলিল। এই পাকচক্রের ভিতর ভারতীয় নরনারীর পক্ষে আর্থিক মঙ্গলজনক শক্তি কোথায় কোথায় আছে সেগুলার আলোচনায় সময় লাগানো স্বদেশ-সেবকদের অন্যতম কর্ত্তব্য।

বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর ব্যাঙ্ক

আধুনিক বাণিজ্যের যুগে শিল্প, ব্যবসায় প্রভৃতি সকল প্রকার অর্থোপার্জ্জনের ব্যাপারে ব্যাঙ্কের স্থান কোথায় তাহা বোধ হয় বিশদ ভাবে বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। ব্যাঙ্ক না হইলে কোনো শিল্প, ব্যবসায় বা বাণিজ্য যে অস্তিত্ব বজায় রাখিতে এবং শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে পারে না তাহা ব্যবসায়ীমাত্রেই জানেন। কেবলমাত্র নিজ মূলধন লইয়া যেটুকু কারবার করা যায়, তাহার ক্ষেত্র অতি সঙ্কীর্ণ। সেই মূলধনে ক্রীত দ্রব্যাদি বিক্রয় হইয়া বিক্রয়-লব্ধ অর্থ আবার নিজ হস্তে ফিরিয়া না আসিলে নূতন মাল পুনরায় খরিদ করা যায় না, এবং দ্বিতীয় বারের খরিদা মাল বিক্রয় হইয়া নগদ টাকা ঘরে না আসা পর্য্যন্ত লাভ পাওয়া যায় না। সুতরাং কেবলমাত্র নিজ মূলধনের উপর নির্ভর করিয়া খরিদ-বিক্রয় ও বিক্রয়ার্থ আদায় এই চক্র পূর্ণ-রূপে আবর্ত্তন হইতে অনেক সময় লাগে। ফলে মোট মাল কম বিক্রয় হয় এবং সেই জন্য মোট লাভ ও কম হয়।

এই পদ্ধতি পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল; কিন্তু এখন উন্নততর পদ্ধতি প্রচলিত হইতেছে। ব্যবসায়ী এখন কেবলমাত্র নিজ মূলধনে মাল খরিদ করে না। তাহার উপর মহাজন-দিগের যে বিশ্বাস আছে তাহার বলে সে অনেক মাল ধারে পায়। এদিকে সে আবার তাহার খরিদ্দারদিগকে যে

মাল বিক্রয় করে, তাহার মূল্য আদায় হইবার পূর্ব্বেই উহার অধিকাংশ পরিমাণ টাকা কোনো ব্যাঙ্ক হইতে দাদন পায়। এই ব্যবস্থার ফলে সে বেশী টাকার মাল খরিদ করিতে পারে। সুতরাং লাভের পরিমাণও বেশী হয়। আবার বিক্রীত মালের টাকার অধিকাংশ শীঘ্র দাদন পাওয়ায় পুনরায় নূতন মূলধন হস্তগত হয়। এই করিয়া তাহার মোট বাণিজ্যের পরিমাণ খুব বেশী হয়। কেবলমাত্র নিজ মূলধন খাটাইলে এবং প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে বিক্রয়ের টাকা আদায়ের জন্য মিয়াদী সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলে কখনও এরূপ হইতে পারে না।

অবশ্য এইসকল সুবিধার জন্য ব্যবসায়ীকে কিছু ব্যয় স্বীকার করিতে হয়। নগদে না লইয়া ধারে লওয়ার জন্য মালের মহাজনকে কিছু বেশী দাম দিতে হয় এবং মিয়াদী সময়ের পূর্ব্বে বিক্রয়ের টাকার অধিকাংশ দাদন পাওয়ার জন্য ব্যাঙ্ককে কিছু কমিশন দিতে হয়। কিন্তু এগুলি তাহার গায়ে লাগে না। কারণ এই বন্দোবস্তে তাহার খরিদ, বিক্রয় ও আদায়ের চাকাটা খুব শীঘ্র শীঘ্র ঘুরিতে থাকে। এই চক্রের পূর্ণ আবর্ত্তনের প্রতি বারে প্রাচীন পদ্ধতি অপেক্ষা লাভটা কিছু কম হইলেও আবর্ত্তনের সংখ্যাগুলি এত বেশী হয় যে, মোট বাণিজ্যের পরিমাণ খুব বেশী হইয়া যায় এবং ফলে মোট লাভটাও বেশ মোটা অঙ্কে দাঁড়ায়।

তাহা হইলে এই ব্যাপারটির মূলে দেখা যাইতেছে বিশ্বাস। এই বিশ্বাস বা ক্রেডিট হইতেছে বর্ত্তমান বাণিজ্য-জগতের মূল ভিত্তি। মালের মহাজনের নিকট ব্যবসায়ী যে "ক্রেডিট" বা ধার পায়, তাহা হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে মহাজন তাহাকে ব্যক্তিগত ভাবে চিনে এবং বিশ্বাস করে বলিয়াই পায়। কিন্তু আজকালকার পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্য-ব্যাপারে মালের মহাজন ও ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে ব্যক্তিগত আলাপ ও তাহার ফলে ক্রেডিট পাওয়াটা বিরল ঘটনা। সাধারণতঃ, মহাজন কোনো ব্যাঙ্কের জামিন পাইলে তবে ব্যবসায়ীকে ধারে মাল ছাড়িয়া থাকে। অতএব বলিতে হইবে যে, আজকালকার দিনে কোনো একটি ব্যবসায়ীর কারবারের বৃদ্ধি, এমন কি অস্তিত্বের মূল বা একমাত্র ভিত্তি হইতেছে ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্কের জামিন না পাইলে সে বেশী পরিমাণ মাল পাইতে পারে না, এবং ব্যাঙ্ক না থাকিলে তাহার বিক্রীত মালের মূল্যের অধিকাংশ শীঘ্র হস্তগত করিয়া দ্বিতীয় বার মাল খরিদ করিতে বা পূর্ব্ব খরিদের টাকা শোধ করিতে পারে না। এক কথায় বলিতে গেলে, মনুষ্যশরীরে রক্ত-চলাচল ও জীবনীশক্তি রক্ষার জন্য হৃৎপিণ্ড যেমন, বর্ত্তমান অবস্থায় ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সকল প্রকার ব্যবসায়, বাণিজ্য, শিল্প ইত্যাদি অর্থোপার্জ্জনের পন্থায় ব্যাঙ্ক সেইরূপ একটি অপরিহার্য্য ও অত্যাবশ্যক যন্ত্র।

বাঙ্গালা দেশে আমদানি-রপ্তানির অনেক রকম কারবার আছে। তাহার মধ্যে বাঙ্গালী-পরিচালিত অনেক ব্যবসায় আছে। সেই সকলের অস্তিত্ব ও শ্রীবৃদ্ধিকল্পে বাঙ্গালীর ব্যাঙ্ক কতটা কার্য্য করিতেছে একবার দেখা যাউক।

বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল কলিকাতা সহরের বাঙ্গালী-পরিচালিত ব্যাঙ্ক বাঙ্গালীর ব্যবসায়ের কতটা সহায়তা করিতেছে প্রথমেই তাহা অনুসন্ধান করিতে পারি।

কলিকাতা সহরে রাজশক্তি-পুষ্ট ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, বৃটিশ বণিকদ্বারা সমর্থিত ও তাহাদের স্বার্থোন্নতিতে নিযুক্ত ন্যাশনাল, চার্টারড, মারকেন্টাইল ব্যাঙ্ক ইত্যাদি, স্বর্ণ-প্রসূ ভারত ও সুজলা সুফলা বাঙ্গালার ঐশ্বর্য্যলোভে আকৃষ্ট বৈদেশিক আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ব্যাঙ্কিং করপোরেশন, জাপানী য়োকোহামা ব্যাঙ্ক, ওলন্দাজের নেদারল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক ইত্যাদি ধন-কেন্দ্র আছে। (এই তালিকা সম্পূর্ণ নহে, বড় বড় আরো গুটিকতক বিদেশী ও বৃটিশ ব্যাঙ্ক আছে)।

ইহা ছাড়া, অ-বাঙ্গালী, কিন্তু ভারতবাসি-পরিচালিত সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া এবং পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক আছে। সম্প্রতি বোম্বাইয়ের য়ীহুদী-প্রভাবিত ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া এখানে একটি শাখা খুলিয়াছে। তাহা ছাড়া আছে কারণানী ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক। ইহার অংশীদারের মধ্যে বাঙ্গালীও আছে। কর্ম্মচারীও জনকতক বাঙ্গালী আছে। কিন্তু ইহাকে বাঙ্গালীর ব্যাঙ্কের পর্য্যায়ে ধরা চলে না।

কলিকাতা ও কলিকাতার উপকণ্ঠে বাঙ্গালীর মূলধনে স্থাপিত ও বাঙ্গালী কর্ম্মকর্ত্তাদ্বারা পরিচালিত কয়েকটি ব্যাঙ্কের নাম পাওয়া যায়। ভবানীপুরে ওরিয়েন্ট ব্যাঙ্ক, ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং করপোরেশন ও লক্ষ্মী ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক। খিদিরপুরে

ইউনাইটেড ব্যাঙ্কিং অ্যাণ্ড ট্রেডিং কোং নামে যে ব্যাঙ্ক ছিল, তাহা বোধ হয় দেড় বৎসর হইল কাজ বন্ধ করিয়াছে। খাস কলিকাতার মধ্যে বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, কো-অপারেটিভ হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক, ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক, মহাজন ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কোং, বেঙ্গল সেণ্ট্রাল লোন কোং এই কয়টি নাম পাই। সম্প্রতি চিটাগং ব্যাঙ্কের নাম দেখিতেছি এবং শুনিয়াছি খুলনা-বাগেরহাট ব্যাঙ্ক নামে একটি ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই ব্যাঙ্কগুলি সবই যৌথ কারবার।

ভবানীপুরের তিনটি ব্যাঙ্কের মধ্যে ওরিয়েণ্ট ব্যাঙ্কের বিশেষ কোনো খবর সর্ব্বসাধারণ অবগত নহে। ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং করপোরেশন স্থানীয় অধিবাসীদিগের সুবিধার জন্য স্থাপিত হইয়াছিল এবং সেই ভাবেই চলিতেছে। ইহা খোলা থাকে প্রাতে ৮টা হইতে ১১টা ও বৈকালে ২টা হইতে ৫টা। বাঙ্গালীর ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে ইহা পুরাতন এবং ইহার শেয়ার পূর্ব্বে প্রিমিয়ামে (শতকরা একশ টাকার চেয়ে বেশী দরে) বিক্রয় হইয়াছে। ১৯১৮ সনের পর হইতে কয়েক বৎসর কলিকাতায় যে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের ঢেউ চলিয়াছিল তখন অনেক খরিদ্দারই এই ব্যাঙ্কের সাহায্যে খুব বড় দাঁও মারিয়াছিলেন এবং লোকসানও দিয়াছিলেন। সেইসকল টাকা আদায়ের জন্যই এই ব্যাঙ্ক এখন ব্যস্ত, অন্য কাজ হাতে লইবার বড় অবসর নাই। লক্ষ্মী-ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্কের উদ্ভাবক ঐ অঞ্চলের একটি বাঙ্গালী পরিবার। ইহা অনেকদিন চলিত সোনারূপার কারবার হইতে। পুরাতন সংস্কার এখনও বলবৎ, সেই জন্য সাধারণতঃ ঐরূপ জামিনের উপরই এই ব্যাঙ্ক ধার দিয়া থাকে। অন্য ব্যাঙ্কিং প্রণালী এখনও বিশেষ কিছু গৃহীত হয় নাই। এই দুইটি ব্যাঙ্কের আর্থিক স্বচ্ছলতা যথেষ্ট হইলেও এবং অন্য পাঁচ রকমে ইহারা খুব ভাল হইলেও, কলিকাতার ব্যবসায়-ক্ষেত্রে সাধারণ বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর বেশী কাজে ইহারা আসিতে পারে না। কেন না, ইহারা ব্যবসায়ের কেন্দ্র-স্থল ক্লাইভ ষ্ট্রীট অঞ্চল হইতে দূরে, সহরের এক উপকণ্ঠে পড়িয়া রহিয়াছে। ইহাদের দ্বারা স্থানীয় দোকানদার, ব্যবসায়ী প্রভৃতির কিছু উপকার সাধন হইতে পারে।

সকল রকম ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল ক্লাইভ ষ্ট্রীট অঞ্চলে বেঙ্গল ন্যাশনাল, হিন্দুস্থান, মহাজন ও ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল, একটু দূরে লালবাজারে বেঙ্গল সেণ্ট্রাল লোন, এবং চিৎপুর ক্যানিং ষ্ট্রীটের মোড়ে চিটাগং ব্যাঙ্ক পাইতেছি। খুলনা-বাগেরহাট ব্যাঙ্ক হ্যারিসন রোডে কলেজষ্ট্রীটের নিকট আছে, তবে তাহার কোনো কাজ আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া খবর পাই নাই। ইহার মধ্যে চিটাগং ব্যাঙ্ক সম্প্রতি খোলা হইয়াছে। বেঙ্গল সেণ্ট্রাল লোন কোংর কাজ ও ঠিক ব্যাঙ্ক ভাবে চলে বলিয়া বোধ হয় না। অন্য চারিটির মধ্যে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্কের চেক সাধারণের মধ্যে প্রচলিত দেখি না। বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, কো-অপারেটিভ হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক ও মহাজন ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কোং এই তিনটির কার্য্য-প্রণালী ব্যাঙ্কেরই মত।
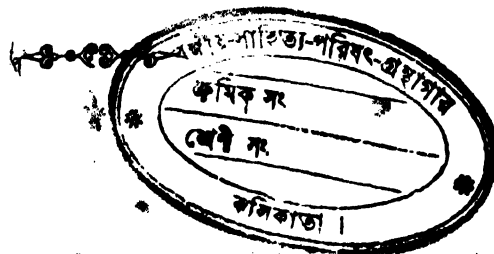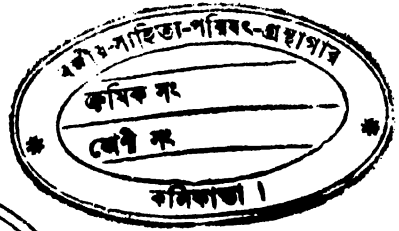
(ক্রমশঃ)

শ্রীব্যাঙ্ক-গবেষক

১০৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে শ্রীরঘুনাথ শীল বি, এ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১ম বর্ষ—৩য় সংখ্যা

আষাঢ়—১৩৩৩

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি॥

অথর্ব্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জন্ম আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।
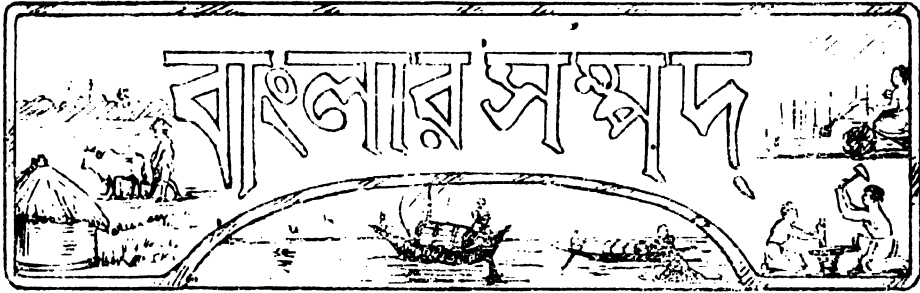
এগার হাজার কো-অপারেটিভ্ সোসাইটি

১৯২৪ সনের তুলনায় ১৯২৫ সনে কো-অপারেটিভ্ সোসাইটিগুলির সংখ্যা ৯,৩৪২ হইতে ১১,০৮১ এবং সভ্য-সংখ্যা ৩৪০,১৫৯ হইতে ৩৮৬,০৫০ পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে। ১৯২৪ সনে ১৯·৪ এবং ১৯২৩ সনে ১৭·৪ হারে সমিতি-সংখ্যার বৃদ্ধি হইয়াছিল। কিন্তু ১৯২৫ সনে ১৮·৩ হারে বৃদ্ধি হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরে সভ্যসংখ্যা-বৃদ্ধির হার ছিল ১৬·৯ এবং তৎপূর্ব্ব বৎসরে ১২·৬। কিন্তু ১৯২৫ সনে বৃদ্ধির হার হইয়াছে ১৩·৪।

ছয় কোটি আঠার লাখ কো-অপারেটিভ্ মূলধন

মূলধন বৃদ্ধি পাইয়াছে ৫·০৭ হইতে ৬·১৮ কোটি টাকা। ১৯২৪ সনে বৃদ্ধির হার ছিল ১৭·০৭ এবং ১৯২৩ সনে ১৭·৬। কিন্তু ১৯২৫ সনে বৃদ্ধির হার হইয়াছে ২১·৮। কেন্দ্রীয় এবং প্রাথমিক সমিতিগুলির ফাণ্ড পৃথক ভাবে গণ্য করিয়া যে সমস্ত খরচ হইয়াছে, তাহা না ধরিলে কো-অপারেটিভ্ আন্দোলনে যে টাকাটা খাটিয়াছে, তাহা ৩·৩২ ক্রোর হইতে ৩·৯৮ ক্রোর বাড়িয়াছে। আর সমিতি এবং সমিতির সভ্যদের নিকট হইতে যে টাকাটা পাওয়া গিয়াছে তাহা ১·৫৬ হইতে ১·৮১ ক্রোর পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে। আন্দোলনের জন্য যে টাকাটা পাওয়া গিয়াছে, তাহা অন্যান্য বৎসরাপেক্ষা বেশী।

কো-অপারেটিভ্ ঋণদান সমিতি

১৯২৫ সনে এই সমিতির ফাণ্ডে ৬২·৭১ লক্ষ টাকা—অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসর হইতে ২৪ লক্ষ টাকা বেশী—আদায় হইয়াছে। পাঁচ বৎসরেও এরূপ হয় নাই। অনাদায়ী টাকা ৫১·৭৮ লক্ষ হইতে ৪৯·২৬ লক্ষে নামিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ আলোচ্য বর্ষশেষে শতকরা ২৮·৫ হিসাবে অনাদায়ী টাকা পড়িয়া থাকিবে।

কৃষি-ক্রয়-বিক্রয় সমিতি

এইসকল সমিতির সংখ্যা ২২ হইতে ৩৩ পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে। ইহাদের সভ্য-সংখ্যা ৪,৪৪১ হইতে ৫,৩৩৭ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। কিন্তু ইহাদের যে মূলধন খাটিতেছিল, তাহার মোট টাকা ১,৫৬,১৬১, হইতে ৯৪,৪১৯, টাকায় নামিয়া গিয়াছে। "সুন্দরবন সরবরাহ ও বিক্রয় সমিতি" যে মূলধন খাটাইতেছিল, তাহা কমিয়া যাওয়ায় এরূপ হইয়াছে। সুন্দরবন সমিতিগুলি কিন্তু তাহাদের দেনার খানিকটা অংশ শোধ দিয়াছে এবং ব্যবসা ভাল চলায় লাভও অধিক করিয়াছে। এই শ্রেণীর সমস্ত সমিতির মোট লাভ ১৭,৭০১, টাকা। পূর্ব্ব বৎসর হয় ৩,৬২০, টাকা। এই শ্রেণীর সমিতিগুলির স্থায়িত্ব এবং সন্তোষজনক কার্য্য বজায় রাখিতে হইলে, কৃষি এবং গৃহসম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সরবরাহ ব্যাপারটা বড় করিয়া তোলা চাই।

ধান্য-বিক্রয় সমিতির কাজে গবর্মেণ্টের সাহায্য

ধান্য-বিক্রয় সমিতিগুলি যাহাতে তাহাদের মজুত ধান সুবিধাজনক ভাবে বিক্রয় করিতে পারে, তৎসাহায্য-কল্পে একটা স্কীম করা হইয়াছে। গবর্মেণ্ট-কর্ত্তৃক তাহা অনুমোদিত হইয়াছে। সেই অনুমোদন অনুসারে বঙ্গীয় কো-অপারেটিভ্ অর্গানিজেশন সমিতি লিমিটেড কর্ত্তৃক কলিকাতায় একটি কেন্দ্রীয় গুদাম স্থাপিত হইবে। সমিতি গবর্মেণ্টের নিকট হইতে গুদামের খরচ বাবদ প্রথম তিন বৎসর টাকা পাইবেন। গবর্মেণ্ট সামান্য কয়েকটি ধান ও পাট বিক্রয় সমিতির জন্য গোড়ায় একদল উপযুক্ত তদবির-কারক কর্ম্মচারী নিয়োগ করিবেন এবং সমিতিগুলির দ্রব্য মজুত রাখিবার স্থান-নির্ম্মাণের উদ্দেশ্যে টাকা ধার দিবেন—স্কীমে এইরূপ কথা আছে। যদি স্কীমটা চালান যায় তবে এই ধরণের সমিতিগুলির বিকাশের পক্ষে প্রভূত সহায়তা করা হইবে।

২৬৮টা পয়ঃপ্রণালী-সমিতি

এই সমস্ত সমিতির সংখ্যা ১৭৩ হইতে ২৬৮ পর্য্যন্ত, সভ্যসংখ্যা ৭,৩৭৬ হইতে ১০,৩৬৮ এবং যে মূলধন খাটিয়াছে তাহা ১,২৯,৫৯৮৲ হইতে ১,৯০,১২৪, টাকা পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে। বর্দ্ধমানে তিনটি, হুগলীতে চারিটি, মেদিনীপুরে একটি, এবং বগুরায় একটি সমিতি রহিয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ সমিতি আছে বাঁকুড়া ও বীরভূমে। বাঁকুড়ায় ১৪২টি সমিতি। তাহার অধীন জলসেচন-যোগ্য ক্ষেত্রের মোট পরিমাণ ছিল ২৫,৫৫৯ বিঘা। বীরভূমে আছে ১১৬টি সমিতি এবং তাহার অধীন ১৫,৫০২ বিঘা পরিমাণ জলসেচনযোগ্য ক্ষেত্র। তথায় পূর্ব্ব বৎসর ছিল ৫৮টি সমিতি এবং তদধীন ক্ষেত্র ছিল ৯,৭০৮ বিঘা। আলোচ্য বর্ষে বাঁকুড়ায় পুষ্করিণী-খনন-কার্য্য চলিয়াছে এবং বীরভূমে চলিয়াছে একটি নূতন খাল-কর্ত্তনের কার্য্য।

৬৩টা দুগ্ধ-সমিতি

৫৪টা হইতে ৬৩টা পর্য্যন্ত এইসব সমিতির সংখ্যা বাড়িয়াছে এবং তাহাদের সভ্যসংখ্যা বাড়িয়াছে ২,১৫৫ হইতে ২,৯০৯ পর্য্যন্ত। ৫৬টি সমিতি অর্থসম্বন্ধে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারিয়াছে। প্রতি সভ্য হিসাবে দুগ্ধের উৎপাদন যাহা হইয়াছে, তাহা তিন বৎসরে প্রায় দ্বিগুণ। তিন বৎসরে প্রত্যেক সমিতি-হিসাবে দুগ্ধের উৎপাদন গড়ে দৈনিক ২৬·৯ হইতে ৫২·৭ সের বাড়িয়াছে। এইসব সমিতির সকলগুলাই কলিকাতা দুগ্ধ-ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত। ইউনিয়ন আলোচ্য বর্ষে দুগ্ধ বেচিয়া ২,৪৭,৯৮৮৲ টাকা পাইয়াছে। ইউনিয়ন কলিকাতা কর্পোরেশনের সাহায্য পাইয়াছে। কলিকাতার জনসাধারণের স্বাস্থ্য এবং দুগ্ধ-যোগানের ব্যাপারটাকে উন্নত করিবার জন্য ইউনিয়ন যাহাতে তাহার কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে কর্পোরেশন তাহাকে টাকা ধার দিয়াছেন ও অর্থ-সাহায্য করিয়াছেন।

নওগাঁর গাঁজা-সমিতি

নওগাঁ গাঁজা-চাসীদের কো-অপারেটিভ্ সোসাইটি লিমিটেড আলোচ্য বর্ষে বেশ উন্নতির পথেই চলিয়া আসিয়াছে এবং স্থানীয় জনসাধারণের উপকারার্থ অনেক কাজেই বেশ উদারভাবে দান করিয়াছে।

"ষ্টোরস্"-সমিতির অকৃতকার্য্যতা

ষ্টোরস্ ও সরবরাহ-সমিতিগুলির কাজ ভাল হয় নাই। এই শ্রেণীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় হইতেছে কলিকাতার স্বদেশী কো-অপারেটিভ্ ষ্টোরস্ লিমিটেড। কিন্তু তাহা ১৯২৫ সনে ফেল মারিয়াছে। ষ্টোরস্ আন্দোলনকে পুনর্জ্জীবিত করিতে হইলে সভ্যগণকে বেশী বেশী অংশ এবং নিজেদের উপর বড় বড় ঝুঁকি লইতে হইবে।

শাঁখারী, কাঁসারী, তাঁতী ইত্যাদি শিল্পীদের সমিতি

ঢাকায় ৮টি শঙ্খ-সমিতি বেশ কাজ করিয়াছে। ব্রাহ্মণ-বাড়িয়ায় এই বৎসর একটি কাঁসারী-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে এবং তাহা কম লাভে কাজ করিয়াছে। গবর্মেণ্ট এই সমিতিকে ৭,০০০৲ টাকা ধার দিয়াছেন। এই বৎসর তাঁতীদের সমিতিও খুব বাড়িয়া গিয়াছে। মুর্শীদাবাদ জেলায় দোপুকুরিয়ায় গুটি হইতে রেশম গুটাইবার শ্রমিকদের একটি সমিতি-সংগঠন এই বর্ষে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। গবর্মেণ্ট এই সমিতিকে ৪,০০০৲ টাকা ধার দিয়াছেন।

কেন্দ্রীয় শিল্প-সমিতি

এইগুলি ৬ হইতে ৮টি পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে। এই বর্ষে ঢাকা ইউনিয়ন খুব সন্তোষজনক কাজ দেখাইয়াছে, এবং এই শ্রেণীর ইউনিয়নের মধ্যে তাহার অবস্থাই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল।

৯১টা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক

১৯২৫ সনে ইহাদের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৯১। এই সকল ব্যাঙ্কের অন্তর্গত সমিতিগুলির সংখ্যা ৮,২৮৯ হইতে ৯,৭৪৬ পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে। অংশীদারদের টাকা যাহা সম্পূর্ণ দেওয়া হইয়া গিয়াছে তাহা বাড়িয়াছে ২১·৫৪ হইতে ২৫·২৯ লাখ। রিজার্ভ ফাণ্ড ৯·৪৭ হইতে ১১·৪১ লাখ বাড়িয়াছে। সর্ব্বসমেত যে মূলধন খাটিয়াছে তাহা ১·৭৫ ক্রোর হইতে ২·০৫ ক্রোর পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে। ১৯২৫ সনে সমিতিগুলি হইতে সংগৃহীত টাকার পরিমাণ ৮৫·৪৭ লাখ ; পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ইহা ৩২·১৬ লাখ বেশী।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির হাতে ঘোরা-ফেরা করিবার মত প্রচুর টাকা ছিল এবং তাহারা কাজও ভাল ভাবে করিয়া আসিয়াছে। তাহাদের কাজ চালাইবার জন্য উপযুক্ত এক দল কর্ম্মচারী রাখা আবশ্যক।

পাবনায় তাড়াশ ব্যাঙ্ক

ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে টাকাকড়ির কারবার চালাইবার অভ্যাস বাঙ্গালী-সমাজে অল্পে অল্পে বাড়িয়া চলিতেছে। পাবনা জেলার তাড়াশ অঞ্চলে যে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার বিজ্ঞাপন নিম্নরূপ :—

চলতি হিসাবে, সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্টে ও নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য আমানত গ্রহণ করা হয়।

(ক) চলতি হিসাব :—বিনা খরচায় খোলা হয়। সুদ ইত্যাদির বিবরণ নিয়মাবলীতে দ্রষ্টব্য।

(খ) সেভিংস ব্যাঙ্ক :—আমানতি টাকায় ১০৲ হইতে ৫০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত শতকরা বার্ষিক ॥০ হারে সুদ দেওয়া হয়। বিস্তারিত বিবরণ আফিসে নিয়মাবলীতে দেখিবেন।

(গ) স্থির আমানত :—৬ মাস, ১বৎসর ও ২ বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক যথাক্রমে ৫৲, ৬৲ ও ৬৸০ হারে সুদ দেওয়ার নিয়ম হইয়াছে। অল্প কাল ও বেশী কালের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত হয়। তজ্জন্য এজেণ্টকে লিখুন।

দাদন :—কোম্পানীর কাগজ, শেয়ার, ডিবেঞ্চার, ইন্শিওরেন্স পলিসী, স্বর্ণ-রৌপ্য ও অন্যান্য অনুমোদিত বন্ধকীতে এবং রেল ও ষ্টীমার-চালানী মালের রসিদ ইত্যাদির জামিনে অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ দেওয়া হয়।

ব্যবসায়ী ও শিল্পজাতোৎপন্নকারীদিগকে বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয়।

পণ্য দ্রব্য ও অপরাপর মালের বন্ধকীতে "ক্যাশ-ক্রেডিট" হিসাব খোলা হয় এবং চলতি হিসাবের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়।

কোম্পানীর কাগজ, শেয়ার, ডিবেঞ্চার, হুণ্ডি প্রভৃতি ক্রয়-বিক্রয়, তাহাদের সুদ আদায় ইন্শিওরেন্স পলিসীর টাকা আদায় ও প্রিমিয়াম প্রদানের ভারগ্রহণ ও বন্দোবস্ত করা হয়।

কলিকাতা ও অপরাপর স্থানে কোম্পানীর এজেণ্ট থাকায় ভারতবর্ষের যে কোনো স্থানে চেক, হুণ্ডি, বিল প্রভৃতি আদান-প্রদানের বন্দোবস্ত করা হয়।

সাড়ে ছয় হাজার কারখানা

ভারতে কারখানার সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯২৩ সনে অনেক নেহাৎ ছোট কারখানাকে কারখানা বলা হইত না। তথাপি "ভারতীয় ফ্যাকটরীজ্ আইন"-মাফিক ৫,৯৮৫ কারখানা গণা হইয়াছিল। ১৯২৪ সনে ছোট কারখানাগুলাকে আর বাদ দেওয়া হয় নাই। সেইগুলিকেও কারখানা বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। মোট সংখ্যা ৬,৪০৬।

গবর্মেণ্টের কারখানা-শাসন

মধ্য প্রদেশে কার্পাস বীজ বহিষ্করণের ছোট ছোট কারখানাগুলি রেজিষ্ট্রেশন এড়াইয়া শাসনের হাত হইতে মুক্তি পাইবার চেষ্টায় স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু স্থানীয় গবর্মেণ্ট অতি সত্বর সেগুলির উপর "নোটিস জারি" করিয়াছেন। বোম্বাই প্রদেশে হস্তনির্ম্মিত দিয়াশলাইয়ের কারখানায় ছয় বৎসর বা তদূর্দ্ধ বয়সের বালকবালিকাদিগকে বহু সংখ্যায় নিযুক্ত করা হইত। নোটিস দিয়া সেই প্রথা বন্ধ করা হইয়াছে। বেহার এবং উড়িষ্যায় অনেকগুলি করাতের কলে বিশ জনের ন্যূন-সংখ্যক লোক নিযুক্ত হইত। কলগুলির অবস্থাও বিপজ্জনক ছিল। স্থানীয় গবর্মেণ্ট সেগুলিকে "নোটিস" দিয়াছেন।

পুরুষ ও স্ত্রী-মজুর

ছাপাখানা বাড়িয়াছে ২৩১ হইতে ২৬৯, বিশেষতঃ চা-কারখানাগুলিতে। ১৯২৩ সনে চা-কারখানা ছিল ৬৫৭টা। ১৯২৪ সনে সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৮১৭টা। কারখানার লোকজনদের সংখ্যা ১৯২৩ সনে ছিল ১,৪০৯,১৭৩। ১৯২৪ সনে এই সংখ্যা হইয়াছে ১,৪৫৫,৫৯২। ব্রহ্ম, মাদ্রাজ এবং মধ্যপ্রদেশেই এই সংখ্যা বাড়িয়াছে। বোম্বাইয়ে কারখানার সংখ্যা-বৃদ্ধি সত্ত্বেও, ব্যবসায়ে মন্দা বলিয়া কারখানার অনেকাংশের কাজ স্থগিত ছিল। বেহার ও উড়িষ্যায় কারখানার সংখ্যা কম হইলেও মজুরদের সংখ্যা বাড়িয়াছে। ১৯২৩ সনে স্ত্রী-মজুরদের সংখ্যা ছিল ২২১,০৪৫। ১৯২৪ সনে হইয়াছে ২৩৫,৩৩২।

কারখানায় বালক-বালিকা

১২ বৎসরের কম বয়সের বালকবালিকাদিগকে কারখানায় কাজ করিতে দেওয়া হয় নাই। ১৯২৪ সনের ইহাই বিশেষ কীর্ত্তি। ১৯২৩ সনে সকল বালকবালিকার সংখ্যা ছিল ৭৪,৬২০। কিন্তু ১৯২৪ সনে সংখ্যা নামিয়াছে ৭২,৫৩১ পর্য্যন্ত। পাটকলে তাহাদের সংখ্যা কমে নাই। সেখানে স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাদিগকে বে-আইনি ভাবে লওয়া হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ আনা হইয়াছে।

সুতাকাটার ও বয়নকলে বালকবালিকার সংখ্যা ১৯২২ সনে ছিল ২০,৪৫১। ১৯২০ সনে ছিল ২৪,৯১০। কিন্তু ১৯২৪ সনে ছিল কেবলমাত্র ১৬,১১১। বয়সের সার্টিফিকেট ব্যতীত বালকবালিকা-নিয়োগ প্রায়ই হয় নাই। সার্টিফিকেটগুলি খুব ভাল রকমে পরীক্ষা করা হইয়াছিল। ১৯২৪ সন আমাদের মজুর-সমাজের পক্ষে নবযুগের সূত্রপাত করিয়াছে।

"৩০-৪৮-৫৪ ঘণ্টার সপ্তাহ"

যেসমস্ত কারখানায় "পুরুষদের" জন্য ৪৮ ঘণ্টার সপ্তাহ রক্ষিত হয়, তাহাদের অনুপাত ছিল শত করা ২৯। যেখানে পুরুষেরা ৫৪ ঘণ্টা অথবা তাহার কম খাটে

তাহার অনুপাত শতকরা ৪১। ৫৪ ঘণ্টার বেশী যেখানে খাটিতে হয় তাহাদের অনুপাত শতকরা ৫৯। ১৯২৩ সনের তুলনায় "স্ত্রীলোকদের" তরফ হইতে ফ্যাক্টরিগুলার ঐরূপ অনুপাত ছিল শতকরা ৩৪, ১২ এবং ৫৪। এই অঙ্কটায় কিছু উন্নতি দেখা যায়। যে সমস্ত কারখানায় বালকবালিকা রাখা হয় এবং তাহাদের কাজ সপ্তাহে ৩০ ঘণ্টা অথবা তাহার কম, সে সমস্ত কারখানার শতকরা হার ৩৪। ১৯২৩ সনে ছিল ৪৩।

হাজার দশেক দুর্ঘটনা

১৯২৪ সনে দৈব-দুর্ঘটনা অনেক হইয়াছে। তাহাদের মোট সংখ্যা ১০,০২৯। তন্মধ্যে ২৮৪টা মৃত্যু। পূর্ব্বে কোনও বৎসর এইরূপ হয় নাই। ১৯২৪ সনের মধ্যভাগে "শ্রমিক ক্ষতি-পূরণ আইন" প্রচলিত হইয়াছে। তিনটি ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটে। একটি সূতার কলের খানিকটা অংশ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ২৬টি লোক মারা যায়। দিল্লীর একটি কারখানায় বয়লার পরিষ্কার করিবার সময় ১৮ জন লোক পুড়িয়া মরে। খান্দেশের একটা কারখানায় আগুন লাগায় ১২ জন স্ত্রীলোকের মৃত্যু ঘটে। ১৯১২ সনের পূর্ব্বে ঐ ধরণের দুর্ঘটনা যত ঘটিত, ফ্যাক্টরী আইনের ২০ ধারা প্রচলিত হইবার পর হইতে আর তত হয় না।

যন্ত্রপাতির জটিলতা-বৃদ্ধি

মারাত্মক ও সাঙ্ঘাতিক দুর্ঘটনার বৃদ্ধি দেখিয়া তৎসম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান হইয়াছে। তাহার ফলে জানা গিয়াছে, শিল্প-ব্যবসায়ের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ কলকব্জার জটিলতা বাড়িয়াছে, কিন্তু সেই সঙ্গে তাহাদিগকে কি ভাবে নাড়াচাড়া করিতে হয়, তাহার শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। চলমান যন্ত্র পরিষ্কার করিবার সময় অনেক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। ব্যবস্থা-পরিষদে একটি বিল উপস্থাপিত হইয়াছে, উহা পাশ হইলে এই প্রথা অনেকটা সংশোধিত হইবে।

মজুর-মঙ্গল প্রচেষ্টা

শ্রমিকদিগের মঙ্গল-সাধন-উদ্দেশ্যে অনেক চেষ্টা চলিতেছে। কলের মালিকেরা অনেকেই শ্রমিকদিগের উপযোগী বাসস্থান দিবার জন্য উদগ্রীব। কিন্তু জমি পাইতেছেন না বলিয়া তাঁহাদের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইতে পারিতেছে না। বোম্বাইয়ে শ্রমিকদিগের জন্য বাস-ভবন নির্ম্মিত হইতেছে। কারখানার মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে ভিজা হাওয়া আনা হইয়া থাকে। তাহাতে মজুরদের স্বাস্থ্য-হানি হইয়া থাকে। তাহা নিবারণের চেষ্টা চলিতেছে। বোম্বাইয়ে কোনো কোনো কারখানায় হাওয়া আনিবার জন্য কল স্থাপিত হইয়াছে।

পুঁজিপতি মনিবদের সাজা

"ফ্যাক্টরী আইন" ভাঙ্গিবার দোষে ১৯২৪ সনে সাজা পাইয়াছে ২২২ জন। অন্যান্য সাজা ধরিলে সবশুদ্ধ মোট ৬২৫টি দণ্ড হইয়াছে। অনেক প্রদেশে অনেক স্থলে জরিমানার হার বড় কম। রেঙ্গুনের হাইকোর্ট এই সম্বন্ধে ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া একটি সার্কুলার জারি করিয়াছেন। সেখানকার জজদিগের মত এই যে, যেসব অপরাধী আইন ভঙ্গ করিয়া শত শত টাকা সঞ্চয় করে, অল্প জরিমানা করিলে তাহাদিগকে অন্যায় প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

সরকারী কারখানা-পরিদর্শন

১৯২৪ সনে শতকরা ৮৩টি কারখানা পরিদর্শন করা হইয়াছে। ১৯২৩ সনে করা হইয়াছিল শতকরা ৮১টি। পরিদর্শিত কারখানার মোট সংখ্যা ৪,৮৩১ হইতে ৫,৩৪৯ পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে এবং অপরিদর্শিত কারখানার সংখ্যা ১,১৫৪ হইতে ১,০৫৭ পর্য্যন্ত কমিয়াছে। শেষোক্তের সংখ্যা বাংলা ও আসামেই বেশী। মধ্য প্রদেশে ৬১৮টি কারখানার মধ্যে মাত্র ১২টি অপরিদর্শিত। মাদ্রাজে তাহাদের শতকরা ভাগ দশ এবং বোম্বাইয়ে পাঁচের ও কম।

ব্যাঙ্কে জমা-বৃদ্ধি

"প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কগুলি"র এবং ভারতের "ইম্পীরিয়াল" ব্যাঙ্কের হিসাব-বিবরণ পরীক্ষা করিলে জানা যায়, ১৯২৪ সনে গবর্মেন্টের তরফ হইতে জমা কমিয়াছে, কিন্তু জনসাধারণের জমা বাড়িয়াছে। ভারতে যে সমস্ত "এক্‌সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক" কাজ

করিতেছে তাহাদের ১৮টির প্রাপ্ত মূলধন এবং গচ্ছিত টাকার সমষ্টি ১৯২৪ সনে ১৩· কোটি পাউণ্ডের উপর উঠিয়াছে। কিন্তু তাহাদের জমা দাঁড়াইয়াছে ৭ কোটি ১০ লাখ পাউণ্ড এবং নগদ ফাজিল হইয়াছে ১ কোটি ৬০ লাখ পাউণ্ড।

৫০০ শাখা-ব্যাঙ্ক

৬৯টি "জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্কের" শাখার সংখ্যা সর্ব্বসমেত প্রায় ৫০০ শত। ১৯২৪ সনে এইসব ব্যাঙ্কের প্রাপ্ত মূলধন এবং গচ্ছিত টাকার সমষ্টি হইয়াছিল ১১,৭৮ লক্ষ টাকা। জমা দাঁড়ায় ৫৫,১৭ লক্ষ এবং নগদ ফাজিল হয় ১১,৬৪ লক্ষ টাকা।

তিন শ্রেণীর ব্যাঙ্ক

ভারতের ঐ তিন শ্রেণীর ব্যাঙ্কের মোট জমা ১২১৫ সনে ছিল ৯৬ কোটি টাকা। তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯২৪ সনে দাঁড়াইয়াছে ২১০ কোটি টাকা। ১৯২৪ সনে যত জমা হয়, তাহার মধ্যে ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কের অংশ শতকরা ৪০ ভাগ, একস্‌চেঞ্জ ব্যাঙ্কের ৩৪ ভাগ এবং জয়েণ্টষ্টক ব্যাঙ্কগুলির ২৬ ভাগ।

আমানতের অনুপাতে নগদ ফাজিল

১৯২৪ সনের শেষে ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কে আমানতী জমার অনুপাতে নগদ ফাজিল ছিল শতকরা ১৮ ভাগ। একস্‌চেঞ্জ ব্যাঙ্কের ঐ অনুপাত ছিল শতকরা ২০ ভাগ। আর যে সমস্ত একস্‌চেঞ্জ ব্যাঙ্ক ভারতের বাহিরে বেশী কাজ করে, তাহাদের ঐ অনুপাত শতকরা ৩১ ভাগ দাঁড়াইয়াছিল। যে সমস্ত ভারতীয় জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্কগুলির মূলধন ও গচ্ছিত টাকা ৫,০০,০০০ এবং তাহার উপর, তাহাদের নগদ ফাজিল হইয়াছিল শতকরা ২১ ভাগ এবং যাহাদের মূলধন কম, তাহাদের হইয়াছিল শতকরা ২০ ভাগ।

কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্কের ক্রমোন্নতি

ভারতের কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্কগুলাকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। 'ক'-শ্রেণী—যাহাদের পাঁচ লক্ষ ও তদূর্দ্ধ টাকা মূলধন। 'খ' শ্রেণী—যাহাদের মূলধন এক লক্ষের উপর এবং পাঁচ লক্ষের কম। ১৯১৫-১৬ সনে 'ক' শ্রেণীর ব্যাঙ্ক মাত্র দুইটি ছিল ১০২৪-২৫ সনে হইয়াছে ৮টি। জমা এবং ঋণদান ১৯ লাখ ৪৬ হাজার টাকা হইতে ৪ কোটি ৫১ লাখ ৪১ হাজার টাকা পর্য্যন্ত" বাড়িয়াছে। 'খ' শ্রেণীর ১৯১৫-১৬ সনে ছিল ১৮টি, ১৯২৪-২৫ সনে হইয়াছে ৯০টি। ১৯২৪-২৫ সনে মূলধন ও গচ্ছিত টাকা হইয়াছে ১ কোটি ৬৬ লাখ ৮১ হাজার টাকা এবং জমা ও ঋণদান ৭ কোটি ৯৪ লাখ ৪৭ হাজার টাকা।

বোম্বাইয়ের তাঁতী-মজুর-সমিতি

১৯২৬ সনের ১লা জানুয়ারি "বোম্বাইয়ের তাঁতী-মজুর সমিতি "(টেকষ্টাইল লেবার ইউনিয়ন'') গঠিত হইয়াছে। ঐ সময়ের পূর্ব্বে সহরে কলের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে ছোট-খাটো প্রায় দশটি মজুর-সমিতি ছিল। কিন্তু বিগত বিরাট ধর্ম্মঘটের সময় বুঝা গিয়াছে, একই সহরে একই উদ্দেশ্য লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন সমিতি থাকিলে, তাহাদের দ্বারা কোনো ফললাভ হয় না। সেরূপ থাকাও বিপজ্জনক। সবগুলিকে একটি কেন্দ্রসমিতির অন্তর্গত করা বিশেষ দরকার। তাই পূর্ব্বোক্ত সমিতিগুলিকে লইয়া একটা নূতন সঙ্ঘ-গঠনের চেষ্টা হইল। ১৯২৫ সনের ৩১শে ডিসেম্বর তদানীন্তন বহু সমিতির এবং বোম্বাইয়ের অন্যান্ত ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিবর্গের একটা সভা হয় এবং তাহার ফলেই এই সমিতির জন্ম। ইহার সঙ্গে বোম্বাইয়ের নয়টি তাঁতী-মজুর-সমিতি মিলিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের সকল সভ্যেরাই ধর্ম্মঘটের সময় ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে চাঁদা দিতে পারে এমন সভ্যের সংখ্যা খুবই কম। তাই মিলিত সমিতিগুলির সভ্যপদ ব্যতিরেকেই বোম্বাই তন্তুবায়-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে।

ইউনিয়নের তিন মাস

এই সমিতি জানুয়ারিতে ৫২৪৭ জন সভ্য সংগ্রহ করে। তাহারা সকলেই চাঁদা দেয়। ফেব্রুয়ারিতে সভ্য-সংখ্যা উঠে ৭১০০ জনে। সহরের ৮২টি তাঁতকলের মধ্যে প্রায় ৪২টি হইতে সমিতি সভ্য পাইয়াছে। এই সভ্যের মধ্যে স্ত্রীলোকও আছে। যদিও কলের সব বিভাগ হইতেই

সভ্য গ্রহণ করা হইতেছে, তবু তাঁতবিভাগের সভ্য-সংখ্যাই বেশী। চাঁদার হার প্রতি সভ্যের চারি আনা মাত্র।

মজুর-সমিতির স্বরাজ-শাসন

ম্যানেজিং কমিটি কর্ত্তৃক সমিতির কার্য্য সম্পাদিত হয়। সমিতির কার্য্যবাহক এবং শ্রমজীবীদের প্রতিনিধিগণকে লইয়া ম্যানেজিং কমিটি গঠিত। প্রত্যেক কলের শ্রমজীবীদের সভায় প্রতি একশত জন শ্রমজীবীর মধ্য হইতে এক একটি প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়। বর্ত্তমানে ম্যানেজিং কমিটির সভ্য-সংখ্যা ৭৯ জন। তন্মধ্যে ৭১ জন শ্রমজীবী এবং চাঁদাদাতা সভ্যগণ কর্ত্তৃক গত জানুয়ারিতে নির্ব্বাচিত। ৮ জন কার্য্যবাহক। সমিতির কাজ ভালরূপে চালাইবার জন্য দুইটি কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। একটি কুর্লাতে, আর একটি মদনপুরায়। কেন্দ্র স্থানে কেন্দ্রীয় কমিটি রহিয়াছে। তাহা নিকটবর্ত্তী কলসমূহের শ্রমজীবীদের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। এইসব কেন্দ্রস্থানের প্রধানদিগকে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলা হয়। তাহারাও শ্রমজীবী, এবং শ্রমজীবীদের দ্বারাই নির্ব্বাচিত। ইহারাই সমিতির সেক্রেটারী এবং সেই জন্য সমিতির কার্য্য-নির্ব্বাহক-মণ্ডলীতে ইহাদের স্থান আছে।

ইউনিয়নের কার্য্য-প্রণালী

মাত্র তিনমাস হইল সমিতিটি গঠিত হইয়াছে বলিয়া এখনও ইহার সভ্যদের জন্য বিশেষ কোনো উপকারের পন্থা (বেনিফিট্ স্কীম) অবলম্বিত হয় নাই। সভ্য-সংখ্যা ও অর্থ বাড়াইবার দিকেই এখন ইহার নজর। মাসিক চাঁদা ছাড়া ইহার আয়ের আর কোনো উপায় নাই। চাঁদার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সমিতির সংস্থাপন (এষ্টাব্লিশমেণ্ট) ও প্রচার-কার্য্যে ব্যয়িত হয় এবং বাকী দুই-তৃতীয়াংশ উপকার উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্কে জমা থাকে।

যদিও সমিতির সভ্যেরা আর্থিক সাহায্যরূপে কোনো উপকার এখনও পাইতে আরম্ভ করে নাই, তথাপি তাহাদের দুঃখ-কষ্ট-নিবারণ এবং স্বার্থরক্ষা করিতে চেষ্টার ত্রুটি হইতেছে না। বাস্তবিকপক্ষে তাহাদের অভাব-অভিযোগের কথা লিপিবদ্ধ করিয়া তাহা দূর করাই সমিতির একটা প্রধান কার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

মালিকের বিরুদ্ধে মজুরের নালিশ

প্রথম তিনমাসে ৪০টি অভিযোগ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তন্মধ্যে ২২টার নিষ্পত্তি হইয়াছে এবং ১৮টা এখনও মুলতুবী রহিয়াছে। ৪০টি নালিশের মধ্যে ১৬টি পদচ্যুতির। ৫টি পুনর্নিয়োগে অস্বীকার, ৪টি আক্রমণ, বেতন ও গ্র্যাটুইটি রদ সম্বন্ধে ৩টি করিয়া, স্ত্রীলোকের প্রতি খারাপ আচরণ ২টি, বেতন-হ্রাস, জরিমানা ও ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে ১টি করিয়া এবং ৪টি বিবিধ। ১২টি মীমাংসিত পদচ্যুতি ব্যাপারে দুইটিতে কৃতকার্য্য ও তিনটিতে অকৃতকার্য্য হইতে হইয়াছে এবং সাতটি ধরা হয় নাই। শেষোক্তের মধ্যে ছয়টির কথা এই জন্য ধরা হয় নাই যে, সমিতি তাহাদের বিষয়ে কিছু করিবার পূর্ব্বেই তাহারা তাহাদের নিয়োগকর্ত্তৃগণ দ্বারা পুনর্নিযুক্ত হইয়াছে। পুনর্নিয়োগে অস্বীকার ব্যাপারে তিনটিতে অকৃতকার্য্য হইতে হইয়াছে। স্ত্রীলোকের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার ব্যাপারে দুইটিতেই কৃতকার্য্য হওয়া গিয়াছে। তিনটি বিবিধ ব্যাপারের একটিতে অকৃতকার্য্য হইতে হইয়াছে, আর দুইটি ধরা হয় নাই। এইসব অভিযোগ-ব্যাপারে প্রথম মিলের ম্যানেজারদিগের সহিত এবং পরে এজেন্টদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হয়। চিঠিপত্র লিখিতে হইলেও ঐরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়া থাকে। অধিকাংশ স্থলেই নিষ্পত্তির জন্য একাধিক বার সাক্ষাৎকার আবশ্যক হয়।

মজুর-সমিতির দুর্ব্বলতা

মাত্র তিন মাসে সমিতি ঐ কাজটুকু করিয়াছে। বোম্বাইয়ের তাঁতী-মজুরদের সংখ্যা ধরিলে, তাহার তুলনায় ইহার শক্তি অতি ক্ষুদ্র। সমিতির সভ্য-সংখ্যা বাড়াইবার চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু পথে অনেক বিঘ্ন-বাধা। প্রথমতঃ, যদিও শ্রমজীবীদের এই সমিতির প্রতি অনেক নিয়োগকারী সহানুভূতি-সম্পন্ন, তবু সকলে সেরূপ নহেন। দ্বিতীয়তঃ, শ্রমের ক্ষেত্র এরূপ বিস্তৃত যে, সমিতি তাহার

এই শৈশব অবস্থায় অর্থাভাবে সমস্ত স্থানের তত্ত্বাবধান এবং চাঁদা-সংগ্রহের জন্য কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে অসমর্থ। তৃতীয়তঃ, শ্রমজীবীরা অশিক্ষিত হওয়ায়, সমিতি তাহার সামান্য কয়জন কর্ম্মচারীর সাহায্যে এই সঙ্ঘের আবশ্যকতা কি, তাহা তাহাদিগকে বিশ্বাস করাইতে পারিতেছেন না।

মজুর ও ভারতীয় স্বরাজ

যাহা হউক, অন্যান্য দেশের মতন ভারতেও মজুর-সমাজ ক্রমশঃ আত্মপ্রতিষ্ঠার ও স্বরাজ-লাভের দিকে অগ্রসর হইতেছে। আর মজুরদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নতি ঘটিলেই অন্যান্য দেশের মতন ভারতেও জনগণের স্বরাজ ও স্বাধীনতা পাকা বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবার কথা। ইহাই ধনবিজ্ঞানের অন্যতম রাষ্ট্রীয় উপদেশ।

ইংরেজের হরতালে ভারত-সন্তানের দান

কাপড়ের কলের শ্রমিকদের সম্মিলনী ও কেন্দ্রীয় শ্রমিক-সমিতি ইংলণ্ডের ধর্ম্মঘটীদিগকে সহানুভূতি-সূচক এক তার করিয়াছিল। বোম্বাই শ্রমিক-সংগঠন তহবিল হইতে বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে ২০০ পাউণ্ড তারযোগে প্রেরণ করা হইয়াছে (মে ১৯২৬)।

ভারতীয় ও বৃটিশ মজুরদের কোলাকুলি

অন্যান্য দেশের মতন ভারতের মজুরেরা ও বৃটিশ মজুর-দিগকে আপন ভাই জ্ঞানে সম্মান করিতে শিখিয়াছে। বৃটিশ হরতালে ভারতীয় মজুরদেরও স্বার্থ গৌণ এবং পরোক্ষ ভাবে কথঞ্চিৎ পুষ্ট হইতে পারে এইরূপ ধারণা ভারতীয় মজুরের চিত্তে স্থান পাইতেছে। ভারতবর্ষ তাহার মজুর-সন্তানের সাহায্যে ক্রমে বিশ্বশক্তির ভিতর গিয়া পড়িতেছে। জগতের সভ্যতার ইতিহাসে এ এক নূতন ঘটনা। ভারতীয় ও বৃটিশ মজুরদের কোলাকুলিকে যাঁহারা আমাদের স্বরাজ-সাধনার অন্যতম খুঁটা বিবেচনা করেন, তাঁহাদের বিচার যুক্তি-সঙ্গত সন্দেহ নাই।

বোম্বাই প্রদেশে তামাকের চাষ

বোম্বাই প্রদেশে প্রায় একলক্ষ একর (১ একরে প্রায় তিন বিঘা) জমিতে তামাকের চাষ হয়। দক্ষিণ মহারাষ্ট্র দেশে এবং গুজরাটেও ইহা বেশ লাভের ফসল। কোন্ কোন্ জেলায় কতখানি জমিতে তামাকের চাস হয় তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল :—

জেলার নাম		একর জমি	মন্তব্য
কেরিয়া	...	৩৫,০০০	
আমেদাবাদ	...	১,৫০০	
ব্রোচ	...	২,০০০	
সাতারা	...	১১,০০০	দক্ষিণ মহারাষ্ট্র দেশ
বেলগাঁও	...	৩৮,০০০	
অন্যান্য জেলা	...	১৩,০০০	

ভারতবাসীর তামাক-সেবন

বরোদা এবং দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য রাজ্যেও ইহার চাষ আছে। বস্তুতঃ গোটা ভারতবর্ষেই ইহার ব্যবসায় বেশ পুরাদমে চলিয়া থাকে। যদিও আজকাল নরমগন্ধী সিগারেটের রেওয়াজ পড়িয়াছে, তথাপি উগ্রগন্ধী তামাকের চাহিদা কমে নাই। সেরূপ তামাককে দেশীয় প্রণালীতে কিছু সংশোধিত করিয়া লইতে হয়। বিড়ী ও নস্য বানাইবার জন্য এবং হুকায় খাইবার ও মুখে খাইবার জন্য দেশে এই তামাকের প্রচলন। সুতরাং তামাকের চাহিদা কোনক্রমেই কমিতেছে না।

ভিক্ষুক-বেশে ফরাসীরাজ

ফরাসীরাজের "সরকারী গৃহস্থালী"কে আর কোনো মতেই স্বাভাবিক অবস্থায় ঠেলিয়া তোলা যাইতেছে না। ফ্রান্স আজ দেনায় হাবুডুবু খাইতেছে। মামুলি আয়ের সাহায্যে খরচ কুলানো অসম্ভব। অসংখ্য প্রকার বাজেট-সংস্কারের প্রণালী অবলম্বিত হইল। কিন্তু কিছুতেই কিছু ঘটিতেছে না। শেষ পর্য্যন্ত দেশের লোকের নিকট সরকার আজ ভিক্ষা-প্রার্থী। "কোঁত্রিব্যিসিঅঁ হ্বলঁতেয়ার" (স্বেচ্ছা-প্রদত্ত কর) মাগিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ভিক্ষা-মাগার কল

এই ভিক্ষাটা মাগা হইতেছে অবশ্য খোদ সরকারের নামে নয়। দেশের হোমরা চোমরা লোকেরা এই জন্য একটা "কোমিতে ন্যাশন্যাল" (দেশব্যাপী সমিতি) কায়েম করিয়াছেন। তাহাতে আছেন প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্‌টর আপেল, বাঁক্ দ' ফ্রান্সের (সরকারী ব্যাঙ্কের) কর্ণধার রবিনো, ত্রাঁস্-আঁৎলাঁতিক্ জাহাজকোম্পানীর প্রেসিডেণ্ট দাল পিয়াজ, কয়লার খাদের "বাদশা"-বিশেষ দ' পেয়েরিমোফ ইত্যাদি ইত্যাদি। আর এই ভিক্ষুক-পালের গোদা হইতেছেন স্বয়ং সেনাপতি মার্শ্যাল জোফ।

ভিক্ষার ইস্তাহার

জোফের নামে ভিক্ষার ইস্তাহার জারি হইয়াছে (৩ মে ১৯২৬)। সেনাপতি বাহাদুর গাহিতেছেন :—

"প্রভু ফ্রাঁ লাগি আমি ভিক্ষা মাগি,
ওগো দেশবাসি, কে রয়েছ জাগি?" ইত্যাদি।

"ফ্রান্স-মাতার প্রত্যেক সুসন্তানেরই (তু বঁ ফ্রাঁসে) আজ তাহার ধন সম্পত্তির কিছু কিছু ত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকা কর্ত্তব্য, ঠিক যেমন ১২ বৎসর পূর্ব্বে এই রকমেরই এক দেশের ডাকে প্রত্যেক ফরাসী তাহার প্রাণ দান করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল।"

ফ্রাঁর উদ্ধার-সাধন

জোফ এইখানে তাঁহার মার্ণ-দরিয়ার লড়াই কীর্ত্তি স্মরণ করিতেছেন। সেই উপলক্ষেও তিনি এই সুরেই দেশের লোককে ডাকিয়াছিলেন। ভিক্ষার ইস্তাহারে লেখা আছে;—"আজ ফ্রান্সের শত্রু কে? "অ্যাঁফ্লাসিঅঁ" (কাগজী মুদ্রার পরিমাণ-বৃদ্ধি) আর সরকারী কর্জ্জ। ফ্রাঁর উদ্ধার-সাধন আর ফ্রান্স-মাতাকে দেনার দৌরাত্ম্য হইতে বাঁচাইয়া রাখাই ফরাসী নরনারীর একমাত্র স্বদেশ-সেবা। আমি আজ স্বদেশবাসীকে ফ্রাঁর জন্য এবং ফ্রান্সের জন্য আত্মত্যাগ করিতে আহ্বান করিতেছি।"

দেখা যাউক, মার্ণের বীর ফ্রাঁর লড়াইয়ে কতখানি বিজয় লাভ করেন।

ইতালিয়ান সঙ্ঘ-বিধি

বিগত মার্চ মাসে (১৯২৬) ইতালিতে সঙ্ঘ (সিণ্ডিকেট)-বিধি জারি হইয়াছে। তাহার ধারাগুলা নিম্নরূপ :—(১) ইতালিয়ান মজুর-চাষী, ব্যবসায়ী,—ধনজীবী মস্তিষ্কজীবী, শ্রমজীবী,—সকল প্রকার লোকই নিজ নিজ শ্রেণীর লোকের সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারিবে এবং এই সঙ্ঘগুলার কাজকর্ম্ম আইনসঙ্গত বিবেচিত হইবে। (২) সকল প্রকার সঙ্ঘই রাষ্ট্রের শাসন মানিয়া চলিতে বাধ্য। (৩) সঙ্ঘসমূহ

যেসকল চুক্তিতে আবদ্ধ হইবে সেসবই আইনসঙ্গত। (৪) শ্রমিকে ধনিকে গোলযোগ উপস্থিত হইলে তাহা মীমাংসিত হইবে মজুর-আদলতে। এই নামে কতকগুলা স্বতন্ত্র আদালত কায়েম হইল। মজুর-আদালতে জজ হিসাবে বসিবেন তিনজন আপীল-আদালতের বিচারপতি এবং দুই জন বিশেষজ্ঞ। (৫) নিয়োগকর্ত্তাদের তরফ হইতে মজুর-নিষ্কাসন এবং মজুরদের তরফ হইতে ধর্ম্মঘট দুই-ই আইনতঃ নিষিদ্ধ। দুয়েরই সাজা গুরুতর। বিশেষতঃ, জনসাধারণের হিতবিধায়ক কর্ম্মকেন্দ্রে ধর্ম্মঘট ঘটিলে মজুর-দিগকে অতিমাত্রায় শাস্তি দেওয়া হইবে। এইসকল সাজার আকার-প্রকার সম্বন্ধে যথাসময়ে আইন কায়েম করা চলিবে। (৬) প্রত্যেক সঙ্ঘই পার্ল্যামেন্টের সেনেট-সভায় একজন করিয়া প্রতিনিধি পাঠাইতে অধিকারী।

আমেরিকায় রেলের মাল

"আমেরিকান লোকোমোটিভ্" নামক কোম্পানী রেলের মাল, যন্ত্রপাতি, এঞ্জিন ইত্যাদি বস্তু তৈয়ারী করিয়া আসিতেছে। মূলধন ২॥০ কোটি ডলার (প্রায় সাড়ে সাত কোটি টাকা)। আজকালকার দিনে এই পরিমাণ মূলধনেও লোহালক্কড়ের কারবারে কাজ সামলাইয়া উঠা সম্ভব নয়। কাজেই এই কোম্পানী অন্য এক কোম্পানীর সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে। নাম তাহার "রেলওয়ে ষ্টীল স্প্রিং কোম্পানী।" তাহার মূলধন ৩৩,৭৫০,০০০ (অর্থাৎ প্রায় ৯ কোটি ৮২ লাখ ৫০ হাজার টাকা)। দুয়ে মিলিয়া ১৭ কোটি টাকার চেয়েও বেশী মূলধনের মালিক হইল।

মার্কিণ রংয়ের কারখানা

যুক্তরাষ্ট্রের রাসায়নিক কারখানাগুলায় রং তৈয়ারী হয় আজকাল বিস্তর। ১৯২৫ সনে তৈয়ারী হইয়াছে ৪ কোটি ৬০ লাখ সের মাল। কিম্মৎ ৪ কোটি ডলার (১২ কোটি টাকা)। ১৯২৪ সনে মাল উৎপন্ন হইয়াছিল ৩ কোটি ৯৫ লাখ সের। আর তাহার কিম্মৎ ছিল ৩ কোটি ৬০ লাখ ডলার (১০ কোটি ৮০ লাখ টাকা)।

আমেরিকায় পটাশ-সমস্যা

মার্কিণ চাষীরা সারের জন্য পটাশ ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত। এই মাল জার্ম্মাণিতে খরিদ করিবার জন্য আমেরিকাকে প্রতি বৎসর ৫ কোটি ডলার (১৫ কোটি টাকা) খরচ করিতে হয়।

সম্প্রতি ফ্রান্সে আর জার্ম্মাণিতে পটাশ-ব্যবসা লইয়া একটা সমঝৌতা কায়েম হইয়াছে। তাহার ফলে ফ্রাঙ্কো-জার্ম্মাণ পটাশ-সঙ্ঘ দুনিয়ায় একাধিপত্য চালাইতে সমর্থ। যুক্তরাষ্ট্র ব্যাপার দেখিয়া কিছু অস্থির হইয়া উঠিয়াছে।

আমেরিকার উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম প্রান্তে পটাশের খনি ঢুঁড়িবার আন্দোলন সুরু হইয়াছে। এই কাজে সাহায্য করিবার জন্য গবর্মেণ্ট হইতে ৫ লাখ ৫০ হাজার ডলার করিয়া প্রতি বৎসর খরচ করিবার প্রস্তাব চলিতেছে। চার বৎসর খরচ করিবার কথা। তাহা হইলে সরকারী বাজেটে মোটের উপর প্রায় ৬৬ লাখ টাকার বরাদ্দ।

টেক্‌সাস প্রদেশে পটাশ খুঁড়িয়া বাহির করা হইতেছে। উটা প্রদেশে পটাশের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রচুর পরিমাণে পটাশ পাইবার আশা করা যাইতেছে।

জার্ম্মাণদের উড়োজাহাজ-শাসন

লড়াই যখন থামে তখন জার্ম্মাণিতে উড়োজাহাজ চালাইবার জন্য ছিল ৪০টা কোম্পানী। বিগত সাত বৎসরের ভিতর কোম্পানীর সংখ্যা কমিতে কমিতে মাত্র ২টায় আসিয়া ঠেকিয়াছে। ছোট ছোট কোম্পানীগুলা সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইতে প্রকাণ্ড দুই কোম্পানীর উদরস্থ হইয়া পড়িয়াছে। আজ কাল দুইটা মাত্র কোম্পানী আছে। কিন্তু এই দুইটারও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আর বেশী দিন থাকিবে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। এই দুই সঙ্ঘ ভাঙ্গিয়া একটা বিপুল ট্রাষ্ট গড়িয়া তুলিবার আয়োজন চলিতেছে। "সস্তায় মাল জোগাইবার জন্য"ই কোম্পানীসমূহ বহুত্ব হইতে ঐক্যে আসিয়া ঠেকিয়াছে। কিন্তু উড়োজাহাজ চালাইবার কারবারে খরচ-পত্র এত বেশী যে, ঐরূপ শক্তিশালী সঙ্ঘও তাল সামলাইয়া চলিতে পারিতেছে না। কাজেই শেষ পর্য্যন্ত গবর্মেণ্টের নিকট অর্থ-সাহায্যের দরখাস্ত পেশ হইয়াছে। গবর্মেণ্ট বোধ হয় আধুনিক আন্তর্জ্জাতিক বড় বড় বায়ুপথের দায়িত্ব লইবেন। আর টেক্‌নিক্যাল কাজ-

কর্ম্ম-সংক্রান্ত গবেষণা, অনুসন্ধান এবং পরীক্ষা ইত্যাদির ভারও গবর্মেন্টের হাতেই থাকিবে। দেখিতেছি যে, উড়ো-জাহাজের শাসনেও জার্ম্মাণরা রেল-শাসনের ইতিহাসটারই পুনরাবৃত্তি করিতেছে।

ফরাসী শুল্কের হার-পরিবর্ত্তন

ফ্রান্সের বিদেশী অটোমোবিল-আমদানির উপর শুল্ক ধার্য্য ছিল এত দিন শতকরা ১২ টাকা হিসাবে। সম্প্রতি শুল্কের হার কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন হইতে শত করা ৬৲ হিসাবে শুল্ক উশুল করা হইবে। ৭,৫০০ ফ্রাঁ (৬৫০৲ টাকা) পর্য্যন্ত যেসকল মোটর-সাইক্‌ল্ ইত্যাদি জাতীয় গাড়ীর দাম তাহার উপর এই হার নির্দ্দিষ্ট হইল। কিন্তু ৭,৫০০ ফ্রাঁর বেশী যেসকল গাড়ীর দাম তাহার উপর শতকরা ১২৲ উশুল হইতে থাকিবে।

পল্লীগ্রামের বিজলী-ব্যবস্থা

পল্লীগ্রামের ঘরবাড়ীতে এবং কৃষি-শিল্পে বিজলী জোগাইবার জন্য ফ্রান্সে কয়েক বৎসর ধরিয়া বিপুল আন্দোলন চলিতেছে। অনেক পল্লীই নিজ ঘাড়ে এই কাজের দায়িত্ব লইতেছে। গবর্মেন্টের কৃষি-বিভাগ হইতে "দরকার হইলে" পল্লীর বিজলী-ভাণ্ডারে কিছু-কিছু অর্থ-সাহায্য আসিবে। ১৯২৪ সনের ৭ জানুয়ারি উক্ত মর্ম্মে একটা "আরেতে" (আইন) জারি হইয়াছে।

গবর্মেন্টের সাহায্যের লোভে পড়িয়া পল্লীগুলা দেদার টাকা খরচের নেশায় মাতিয়া গিয়াছে। তাহাদিগকে সংযত করিবার জন্য ৩ মে (১৯২৬) তারিখে এক সরকারী ইস্তাহার বাহির হইয়াছে। তাহাতে দেখিতেছি যে, প্রত্যেক বৎসরই এক একটা চরম সাহায্যের হার নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে। তাহার বেশী কোনো মতে কোনো পল্লীই পাইবে না।

বিলাতী হরতাল এবং রুশিয়া ও ডেন্মার্কের সহানুভূতি

ইংল্যাণ্ডের হরতাল-আন্দোলন দেশ-বিদেশের মজুর-দিগকে চাঙ্গা করিয়া তুলিয়াছে। রুশ মজুরেরা বলিতেছে :— "সাবাশ্ ইংরেজ!" বিশ লাখ রুব্‌ল্ সোভিয়েট মুল্লুকের ট্রেড-ইউনিয়ন-সঙ্ঘ বিলাতে তার করিয়াছে। এমন কি ডেন্মার্কের মজুরেরাও নিজ দেশেই সহানুভূতিসূচক ধর্ম্মঘটের আয়োজন করিতেছে। মজুর-দুনিয়া ভাবিতেছে ইংল্যাণ্ডের পুঁজিপতি আর গবর্মেন্ট ঘায়েল হইলে জগতে মজুর-স্বরাজের পথ সোজা হইয়া আসিবে।

ইংরেজ ও আথেন্সের মজুর

বিলাতী হরতালে হামদর্দ্দি দেখাইয়া আথেন্সের গ্রীক মজুরেরা সভা ডাকিয়াছিল। কমুনিষ্টগণ এবং মামুলি মজুরদল ছিল এই সভার পাণ্ডা। ইংরেজ মজুরদিগকে পয়সা দিয়া সাহায্য করিবার জন্য তাহারা প্রস্তুত, এই মর্ম্মে বিলাতে তার পাঠানো হইয়াছিল।

জার্ম্মাণ মজুরদের কর্ম্মতৎপরতা

সমগ্র জার্ম্মাণির মজুর-সঙ্ঘ, জার্ম্মাণ খাদ-কুলীর সমিতি, জার্ম্মাণ রেল-কুলীদের সঙ্ঘ এবং অন্যান্য মজুর সমিতি একত্র হইয়া ইংরেজ হরতালীদের পক্ষ গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা জার্ম্মাণ বন্দরের কোনো বিলাতী জাহাজে কয়লা তুলিবে না বা অন্য কোনো প্রকার মাল দিবে না এই রূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে। বিলাতের মজুরদিগকে অর্থ-সাহায্য পাঠাইবার ব্যবস্থাও হইতেছে।

বেলজিয়ামের রাজস্ব-সঙ্কট

রাজস্ব ব্যবস্থায় বেলজিয়াম আজকাল দোসরা ফ্রান্স। বিলাতী পাউণ্ড চড়িতেছে। আর বেলজিয়ান ফ্রাঁ দরে নামিতেছে। রাজস্ব-সচিব য়ানসেন বিশেষ বিচলিত নন বটে। কিন্তু মন্ত্রি-পরিষদে তাঁহার সঙ্গে যাঁহারা অন্যান্য বিভাগে সহযোগী, তাঁহারা অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। দুই জন মন্ত্রী কাজে ইস্তাফা দিলেন। তাঁহারা বলিতেছেন যে, গবর্মেন্টের রাজস্ব-নীতিতে তাঁহারা বিশেষ শঙ্কিত।

কারখানার উপর শিক্ষা-কর

"তাক্‌স্ দাপ্রেঁতিসাজ্" (শিক্ষানবীশ-কর) নামক একটা ট্যাক্‌স্ ফ্রান্সের সকল কারখানায় ও ব্যবসা-কোম্পানীতে কায়েম করা হইতেছে। ১৯২৫ সনের ১৩ জুলাই ফরাসী গবর্মেন্ট এই করের আইন জারি করিয়াছেন।

প্রত্যেক শিল্প-ও-বাণিজ্য-কোম্পানী এই আইন অনুসারে নিজ নিজ মজুর-কেরাণীকে উচ্চ শিক্ষা দিবার জন্য বাধ্য।

মজুর-কেরাণীদের জন্য কোম্পানী মজুরি ও বেতন হিসাবে প্রতি বৎসর যত টাকা খরচ করিয়া থাকে তাহার শতকরা ½ টাকা হিসাবে এই "শিক্ষানবীশ-কর" ধার্য্য করা হইয়াছে। ঠিক কত টাকা বেতন ও মজুরি বাবদ খরচ করা হয় তাহা প্রতি বৎসর সরকারকে জানাইবার জন্য প্রত্যেক কোম্পানী বাধ্য। যথার্থ হিসাব দেওয়া হইতেছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য গবর্মেণ্ট প্রত্যেক "দেপার্ৎর্মায়" (জেলায়) কমিটি কায়েম করিয়াছেন। যথাসময়ে হিসাবপত্র না দিলে কোম্পানীগুলা দণ্ডিত হইতে পারিবে, আইনে এইরূপ বিধান আছে। যেসকল কেরাণী ১৮ বৎসর বয়স পূর্ণ করে নাই একমাত্র তাহারাই এই আইন অনুসারে অবৈতনিক শিক্ষার অধিকারী। অনেক কোম্পানীই এই "তাক্‌স্ দাপ্রেঁতি সাজ" হইতে নিজকে বাঁচাইয়া চলিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু প্যারিসের "শাঁবর দ' কম্যার্স্" (ব্যবসায়-সঙ্ঘ) সকল ফরাসী শিল্পী ও বণিককে সমঝাইয়া দিতেছেন যে,—"চালাকি করিতে গেলে বিপদে পড়িতে হইবে। সুতরাং আইনটা মানিয়া চলাই বুদ্ধিমানের কাজ।

জার্ম্মাণির শিল্প-বাণিজ্যে সরকারী সাহায্য

বিগত তিন-চার বৎসরের ভিতর জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য শিল্প-বাণিজ্যের কারবারে সর্ব্বসমেত প্রায় ১২২৫½ মিলিয়ন মার্ক (৯২ ক্রোর টাকা) সাহায্য করিয়াছেন। এই অর্থ-সাহায্য তিন শ্রেণীর অন্তর্গত:—(১) গবর্মেণ্ট কতকগুলা কাজের লাভ-লোকসানের জন্য জিম্মাদারি লইয়াছেন। এই বাবদ প্রায় ৩৫ কোটি মার্কের (২৬½ কোটি টাকার) ঝুঁকি ঘাড়ে আসিয়াছে। দরকার পড়িলেই গবর্মেণ্ট সরকারী তহবিল হইতে এই পরিমাণ টাকা ঢালিতে বাধ্য হইবেন। (২) নগদ ধার দেওয়া হইয়াছে ১০ কোটি মার্ক (৭½ কোটি টাকা)। (৩) সরকারী খাজাঞ্চিখানাকে ৭৭½ কোটি মার্ক (৫৮ কোটি টাকা) আলগা করিয়া রাখিয়া দিতে বলা হইয়াছে। কোনো কোনো কোম্পানীকে এই তহবিল হইতে যথাসময়ে নির্দ্দিষ্ট-পরিমাণ সাহায্য করা যাইতে পারিবে।

২৬½ কোটি টাকার জামিন

জার্ম্মাণ গবর্মেণ্টের "গারান্টি" (জিম্মাদারি) ভোগ করিতেছে ১৯টা কোম্পানী। তাহার ভিতর ৬টা মার্ক-পতনের যুগে (অর্থাৎ ১৯২৩ পর্য্যন্ত) গবর্মেণ্টের নিকট হইতে এই জিম্মাদারি-প্রতিজ্ঞা পাইয়াছিল:—(১) সরকারী চাকরেরা "সমবায়ের প্রণালীতে ঘরবাড়ী" তৈয়ারী করিবার জন্য প্রায় ২ মিলিয়ন মার্ক (১৫ লাখ টাকা) পর্য্যন্ত সাহায্যের আশা পাইয়াছে। এই ধরণের বন্দোবস্ত লড়াইয়ের যুগে সুরু হয়। ১৯২২ সন পর্য্যন্ত এইরূপ বন্দোবস্ত চলিয়াছে। (২) বাডেন প্রদেশের পল্লীতে পল্লীতে সুইটসার্ল্যাণ্ড হইতে ধারে দুধ কেনা হইয়াছিল। এই ধারের জন্য জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য ১⅗ মিলিয়ন মার্ক (১২ লাখ টাকা) পর্য্যন্ত "জামিন" হইয়াছে। (৩) বাভেরিয়া এবং বাডেন প্রদেশের গোয়ালা-সমিতিসমূহ সুইটসার্ল্যাণ্ডে ধারে গরু কিনিয়াছিল। এই ধারের জন্য জার্ম্মাণ গবর্মেণ্টের জিম্মাদারির পরিমাণ ১⅗ মিলিয়ন মার্ক (৯ লাখ ৭৫ হাজার টাকা) ইত্যাদি।

১৯২৫ সনের মে মাস হইতে ১৯২৬ সনের এপ্রিল পর্য্যন্ত ৬ দফায় দায়িত্ব লওয়া হইয়াছে। জার্ম্মাণির কয়েকটা বড় বড় কারবার এইরূপ সরকারী জিম্মাদারিতে পায়ের উপর দাঁড়াইয়া আছে। "কালি-সিণ্ডিকাট" নামক পটাশ-সঙ্ঘ সার তৈয়ারির ব্যবসায় ৭৫ লাখ টাকার "সাহায্য" পাইয়াছে। রুশিয়ায় মাল পাঠাইবার জন্য যেসব জার্ম্মাণ কারখানা অর্ডার পাইয়াছে তাহাদের জন্য ১০৫ মিলিয়ন মার্ক (৭ কোটি ৬৫ লাখ টাকা) পর্য্যন্ত গবর্মেণ্ট দায়িত্ব লইয়াছেন।

৭½ কোটি টাকার সরকারী ঋণ-সাহায্য

জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য লোহালক্কড়, ইস্পাত, যন্ত্রপাতি এবং ধাতুর কারবারে প্রায় ৭½ কোটি টাকা নগদ ধার দিয়াছেন। জার্ম্মাণির সুপ্রসিদ্ধ পাঁচটা কারবার এই ধার পাইয়াছে। কারবারগুলার নাম:—(১) "রাইণ মেটাল", (২) "রেখলিঙ-কনৎসর্ণ," (৩) "য়ুঙ্কার্স্" (৪) "ষ্টুম-কনৎসর্ণ," (৫) "ওবার-স্লেজিশে আইজেন গেজেল শাফটেন"।

আরও ৫৮ কোটি টাকার সরকারী দায়িত্ব

জার্ম্মাণির কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য সাম্রাজ্যের নানা তহবিল

হইতে আরও ৭৭ কোটি মার্ক (৫৮ কোটি টাকা) পাইতেছে। এই তহবিল ১ মে তারিখে নিম্নরূপ বিভক্ত ছিল:— (১) এই বাবদ ডাকঘরে গবর্মেণ্টের জমা (৬৮মিঃ মার্ক) (২)সরকারের বন্ধকী আয় (১৫০ মিঃ মার্ক), (৩) রাইখস্ বাঙ্ক ইত্যাদি সরকারী প্রতিষ্ঠানে জমা ৩৪৫ মিঃ মার্ক, (৪) চাষ-আবাদে ধার দিবার জন্য জমা ১২৫ মিঃ মার্ক, (৫) ব্রাণ্ডি মদের সরকারী আফিসে ৫৬ মিঃ মার্ক, (৬) জার্ম্মাণরা "ডায়কে হেবর্কে" নামক লড়াইয়ের সরঞ্জাম তৈয়ারী করার কারখানাকে ভার্সাইয়ের সন্ধি অনুসারে শান্তির কারখানায় পরিণত করিতে বাধ্য হয়। এই রূপান্তরীকরণ কার্য্যের জন্য গবর্মেণ্ট কারখানাকে ১০ মিঃ মার্ক পর্য্যন্ত "দাদন" দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, (৭) বিভিন্ন প্রদেশের গবর্মেণ্ট জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের সরকারী তহবিল হইতে ১৮ মিঃ মার্ক কর্জ্জ পাইয়াছে।

বিলাতে জাহাজী আয় বনাম রেল-আয়

"চেম্বার অব শিপিং"এর মতে ১৯২৫ সনে জাহাজী মালের জন্য যে ভাড়া পাওয়া গিয়াছে তাহা ১৯২০ সন হইতে আরম্ভ করিয়া যে-কোনো বৎসরের ভাড়া অপেক্ষা অনেক কম। বৎসরের গোড়ায় যাহা ছিল, তাহা অপেক্ষা বৎসরের শেষে শতকরা দশ ভাগ কম। কিন্তু উক্ত সময়ের মধ্যে বৃটিশ রেলওয়ের ভাগ্যে অমন দুর্দ্দশা ঘটে নাই। তাহার কারণ যদিও জাহাজী আয় এবং রেল-আয় উভয়ই ব্যবসায়ের উপর নির্ভর করে এবং ব্যবসায়ের উন্নতি-অবনতিও সূচনা করে, তথাপি পূর্ব্বোক্তটী বহির্ব্বাণিজ্যের সঙ্গে যতটা সম্বদ্ধ, শেষোক্তটী ততটা নয়।

অন্তর্ব্বাণিজ্যের প্রসারে রেলের লাভ

বাস্তবিকপক্ষে ১৯২৫ সনে দেশের ভিতরকার বাণিজ্য খুব বেশী পরিমাণেই বৃদ্ধি পাইয়াছে। রেলওয়ের অঙ্কগুলি হইতেই তাহা বুঝা যায়। কারণ, যদিও বৎসরের মধ্যে আয়ের কমতি হইয়াছে, তবু তাহা মোটের উপর শতকরা দুই ভাগ এবং খরচা বাদে শতকরা ৫½ ভাগের বেশী হয় নাই।

বিলাতের চার রেল-কোম্পানী

১৯২১ সনের "রেলওয়েজ অ্যাক্ট" অনুসারে তখনকার বৃটিশ রেলওয়েগুলি চারিটা বড় কোম্পানীতে সঙ্ঘবদ্ধ হয়। যেসব জেলায় তাহারা কাজ করে তাহাদের নামানুসারে উহাদের নামকরণ হয়, যথা:—(১) লণ্ডন, মিডল্যাণ্ড এবং স্কটিশ (২) গ্রেট ওয়েষ্টার্ণ (৩) লণ্ডন ও নর্থ ইষ্টার্ণ এবং (৪) সাদার্ণ রেলওয়ে।

সরকারী শাসন হইতে রেলের মুক্তিলাভ

যুদ্ধকালীন সরকারী শাসন হইতে রেলওয়ে-পদ্ধতিকে মুক্তি দিবার সময় গবর্মেণ্ট কোম্পানীগুলিকে এক শত মিলিয়ন পর্য্যন্ত ক্ষতিপূরণস্বরূপ দিয়াছিলেন। এই টাকার নাম হয় "ক্ষতিপূরণ ফাণ্ড"। কোম্পানীগুলি যাহাতে অংশীদারগণকে লাভের অংশ দিয়া দিতে পারে তজ্জন্যই এই টাকা প্রদান। বিগত কয়েক বৎসরে রেলওয়ের আর্থিক ভাগ্যে ইহা অনেক কাজ করিয়াছে।

রেল-কোম্পানীর লোকসান

ঐ চারিটা বড় রেলওয়ের আয় ধরিলে (লণ্ডনে এবং অপর স্থলে আরো দুই একটা ছোট-খাট রেলওয়ে আছে, সেগুলিকে ধরা হইল না) আমরা দেখিতে পাই, ১৯২৫ সনে তাহাদের মোট আয় দাঁড়াইয়াছে, ২১০,৭০০,০০০ পাউণ্ড। ইহাতে বুঝা যায়, ১৯২৪ সনের তুলনায় ৪,১০০,০০০ পাউণ্ড লোকসান হইয়াছে। লোকসানের মাত্রা কমাইবার জন্য ব্যয়ভার কতক পরিমাণে কমাইতে হইয়াছে। তাহার ফলে ১,৮০০,০০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত খরচ বাঁচান গিয়াছিল। ১৯২৫ সনে মোট খরচ পড়িয়াছিল ১৭৬,৫০০,০০০ পাউণ্ড। সুতরাং শতকরা একভাগ খরচ কমিয়াছে। কোম্পানীগুলির খরচ বাদে আয় ছিল ৪১,৬০০,০০০ পাউণ্ড।

কয়লার চলাচল ও রেলের আয়

কয়লার দিক্ দিয়াই আয়টা কমিয়াছে। লণ্ডন এবং নর্থ ইষ্টার্ণের ন্যায় যে কোম্পানীগুলি কয়লার চলাচলে নিযুক্ত তাহাদেরই দুর্ভোগ। গত বৎসর শুধু মাল ও কয়লার দিক্ দিয়া তাহাদের ২,৭০০,০০০ পাউণ্ড লোকসান হয়। আর

যাত্রী-ব্যবসায়ে লোকসান হইয়াছে ১০ লাখ পাউণ্ডের কিছু কম। লণ্ডন এবং নর্থ-ইষ্টার্ণ রেলওয়ে ১৯২৪ সনে কয়লার ব্যবসায়ে লোকসান দিয়াছে ১,০০০,০০০ পাউণ্ড এবং ১৯২৫ সনে ৭৫০,০০০ পাউণ্ড।

ক্ষতিপূরণ ফাণ্ড হইতে সাহায্য-গ্রহণ

ফলে লভ্যাংশ কমাইয়া দিতে গিয়াও এই কোম্পানী-গুলিকে ক্ষতিপূরণ ফাণ্ডের নিকট অনেক টাকা ধার লইতে হইয়াছে। কয়লার ব্যবসা মন্দা হওয়ায় অন্যান্য সমস্ত রেলওয়ে ক্ষতিপূরণ ফাণ্ড হইতে এক সঙ্গে যত টাকা তুলিয়াছে তাহার অর্দ্ধেকেরও বেশী টাকা গবর্মেন্টের নিকট হইতে লণ্ডন ও নর্থ ইষ্টার্ণ রেলওয়েকে বিগত তিন বৎসরে তুলিতে হইয়াছে।

সাদার্ণ রেলওয়ে

এখন সাদার্ণ রেলওয়ের কথা বলা যাক। যাত্রীবাহক লাইন বলিয়া ব্যবসায়ের ওঠা-নামায় ইহার বড় ক্ষতি হয় নাই। এই কোম্পানীর জন্য গবর্মেন্ট "ট্রেড ফেসিলিটীজ্ অ্যাক্ট" অনুসারে নূতন মূলধন তুলিয়া দিবেন, এই অঙ্গীকার করায়, ইহা শহরতলীর জন্য সর্ব্বাপেক্ষা বড় একটা বৈদ্যুতিক শক্তি-সঞ্চারিত রেল লাইন নির্ম্মাণে হাত দিয়াছে। শেষ হইলে এই লাইনটা মোট ৬৪৭ মাইলের হইবে। এই কোম্পানীর চেয়ারম্যান বাহাদুর আশা করেন অদূর ভবিষ্যতে বৈদ্যুতিক শক্তি হইতে বেশী ভাল ফল পাওয়া যাইবে।

বৃটিশ রেলওয়ের আর্থিক ভবিষ্যৎ

গত বৎসরটা রেলওয়ের ইতিহাসে যে বড় দুর্য্যোগের বৎসর গিয়াছে একথা সমস্ত কোম্পানীর চেয়ারম্যান মহাশয়গণ একবাক্যে স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁহারা বলেন, কোম্পানীগুলির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

রেলওয়েগুলির মিশ্রণের ফলে শাসন-সংক্রান্ত যে সমস্ত সমস্যা উপস্থিত হইয়াছিল, সেসমস্ত এখন মীমাংসিত হইবার পথে দাঁড়াইয়াছে। ব্যবসায়ের অবস্থা ভাল হইলেই খরচ কমিবে ও আয় বাড়িবে। ক্ষতিপূরণ ফাণ্ড নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বেই অংশীদারেরা লাভ ভোগ করিতে পারিলে ইংরেজ জাতি বুঝিবে যে, রেল নিজ পায়ে দাঁড়াইতে পারিয়াছে।

ফ্রান্সে বিদ্যুতের কারবার

উত্তর ফ্রান্সে এবং প্যারি নগরীর নিকটবর্ত্তী স্থান-সমূহে সম্প্রতি কতকগুলি শক্তিশালী ষ্টেশন স্থাপিত হইয়াছে। সেইসব হইতে অসংখ্য নূতন তারিত-আধার প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। জল-শক্তির ব্যবস্থার কতখানি বিস্তৃতি ঘটিয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত ব্যাপারেই বুঝা যায়।—

১৯১৩ সনে শক্তি পাওয়া গিয়াছিল ৮৫০,০০০। ১৯১৯ সনে পাওয়া যায় ১,১৬০,০০০ এবং এখন ২৭ লাখের উপর। তাহার শতকরা ৪০ ভাগ ইলেক্ট্রো কেমিক্যাল এবং ইলেক্ট্রো মেটালার্জিক্যাল শিল্প ব্যবসায়ে ব্যবহৃত হইতেছে। ফরাসী আলসেস ও দুই-তিনটি নদীর ধারে ধারে যে রেলওয়ে কোম্পানী দুইটি তাহাদের লাইনগুলাকে বৈদ্যুতিক শক্তি-সম্পন্ন করিতে এখন নিযুক্ত, তাহাদের জন্য পীরেনিসে ও দর্দানের বরাবর অনেকগুলি ষ্টেশন নির্ম্মিত হইয়াছে।

ইতালির জল-বিদ্যুৎ

প্যারিসের ফরাসী বিদ্যুৎ-পরিষদের এক সভায় ইতালিয়ান এঞ্জিনিয়ার ছিবসমারা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তিনি ইতালির জল-বিদ্যুৎ-কারখানার সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। কয়লার অভাবে ইতালিয়ানরা শিল্পোন্নতির জন্য জল-বিদ্যুতের উপর নির্ভর করিতেছে। এই কারণে দুনিয়ায় ইতালির বিদ্যুৎ-কারখানাগুলা ক্রমেই নামজাদা হইয়া উঠিতেছে।

খালে খালে ইতালির ঐক্য

শিল্প-টেক্‌নিক সম্বন্ধে একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য তথ্য পাইতেছি। উত্তর ইতালির দরিয়াগুলায় শীতকালে জল থাকে কম। কিন্তু দক্ষিণ ও মধ্য ইতালির নদীতে জলের পরিমাণ বেশী কমে না। এই প্রভেদের কুফল হইতে ইতালিয়ানরা আত্মরক্ষার কল আবিষ্কার করিয়াছে। স্থানে স্থানে কৃত্রিম হ্রদ খুঁড়িয়া জল মজুত করিয়া রাখা হইয়া থাকে। আর প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তর পর্য্যন্ত লম্বা লম্বা খাল কাটিয়া জল-চলাচলের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গোটা ইতালি এইরূপে জলের সাহায্যে ঐক্য-গ্রথিত। আনুষঙ্গিক ভাবে ইতালিয়ান চাষীরা আবাদের জন্য জলের অভাবও মিটাইতে পারিতেছে।

ছিবস্‌মারার কথায় বুঝা যাইতেছে যে,—ইতালির সীমানার বাহিরেও এইসকল খালের ফ্যাক্‌ড়া চলিয়া যাইতেছে। তাহার ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে পরস্পর বন্ধনের নিরেট কৌশল কায়েম হইতেছে।

প্যারিসে শিল্প-সাংবাদিক-সম্মিলন

প্যারিসের প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে শিল্প-সাংবাদিকদের আন্তর্জ্জাতিক সম্মিলন অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে (১৪মে ১৯২৬)। টেক্‌নিক্যাল্, শিল্প-বিষয়ক, বাণিজ্যিক ও ব্যবসা-সম্পর্কিত এবং কৃষি-সম্বন্ধীয় সকল প্রকার দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রের সম্পাদক এবং সাংবাদিকগণ এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। এই "কোঁগ্রে দ' লা প্রেস্ তেক্‌নিক" (টেক্‌নিক্যাল পত্রিকার কংগ্রেস) সম্মিলনে অন্যতম উদ্যোগকর্ত্তা ছিলেন শ্রীযুক্ত বেনাজে। এই ব্যক্তি "আঁসাইনমাঁ তেক্‌নিক" (শিল্প-শিক্ষা) বিষয়ক সরকারী শাসনবিভাগের কর্ম্মকর্ত্তা।

কুমিল্লায় মেথর-বিদ্যালয়

এই বিদ্যালয় কুমিল্লার পূর্ব্বদিকে মেথর-পাড়ার নিকটেই অবস্থিত। প্রায় দেড় বৎসর হইল "অভয়-আশ্রম"-কর্ত্তৃক এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে ইহার ছাত্র-সংখ্যা আটাশ জন। তন্মধ্যে মেথর কুড়ি জন। মেথর ছাত্রদের মধ্যে এগার জন খদ্দর ব্যবহার করে। এই বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়া মেথর পাড়ায় অন্যান্য কার্য্যও আরম্ভ করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে একটি ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হইয়াছে। এই শহরের মেথরদিগকে মাসিক ৬ টাকা হারে সুদ দিতে হইত। মেথরদের কঠোর-শ্রমলব্ধ সামান্য আয়ের অধিকাংশ কঠোর কুসীদজীবীদের সুদ দিতেই নিঃশেষ হইয়া যাইত। মেথরদের এই শোচনীয় অবস্থা দূর করিবার নিমিত্ত আশ্রম হইতে নামমাত্র সুদে ইহাদিগকে ঋণ দিতে আরম্ভ করা হইয়াছে। এই কাজে প্রায় ৪০০০৲ হাজার টাকা মূলধন প্রয়োজন। জনৈক উদারচেতা ধনী এই টাকার জন্য ব্যাঙ্কে আশ্রমের পক্ষে জামিন দিতে স্বীকৃত হইয়া আশ্রম-সেবকগণের ও মেথরগণের নিকট ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। অন্যান্য অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যেও

ইহার কার্য্য শীঘ্রই বিস্তারলাভ করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

মেথরদের মদ-বর্জ্জন

আশ্রম-সেবক নিত্যগোপালের অক্লান্ত সেবা ও চেষ্টার ফলে মেথরপাড়া পূর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়াছে। তাহারা অনেকে মদ খাওয়া ত্যাগ করিয়াছে এবং অনেকে ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে যে সমস্ত অভিভাবকেরা ছেলেদের জোর করিয়া মদ খাওয়াইতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিত না, তাহারা এখন তাহাদের দোষ বুঝিতে পারিয়াছে এবং ছেলেমেয়েরাও বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীগণ—অনেকে স্বেচ্ছায় মদ ছাড়িয়াছে। (আনন্দ-বাজার পত্রিকা)।

বাঁকুড়া মেথর-বিদ্যালয়

গত ১লা জ্যৈষ্ঠ ডাঃ নীলমাধব সেনের সভাপতিত্বে "অভয় আশ্রম"-কর্ত্তৃক বাঁকুড়ায় এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ৩০ জন ছাত্র লইয়া এই বিদ্যালয় আরম্ভ হইয়াছে। আশ্রম-সেবক সুশীলচন্দ্র (বাঁকুড়া অভয় আশ্রমের পরিচালক) এই বিদ্যালয় পরিচালনার ভার লইয়াছেন।

ফ্রান্সে শিল্প বনাম কৃষি

ফ্রান্সের আরা ("রেজ্যনে") জেলায় "লা ফেদেরাসিঅঁ দে সোসিয়েতেজ আগ্রিকল" (কৃষি-সমিতি-সঙ্ঘ) এক সভা ডাকিয়া গবর্মেণ্টের শুল্ক-নীতির সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে শিল্পকে বাঁচাইবার জন্য ফরাসী সরকার যেরূপ দরদ দেখাইয়া থাকেন কৃষি-সম্বন্ধে সেরূপ দরদ দেখান না। গবর্মেণ্টের শুল্ক-নীতি বদলানো আবশ্যক। বিদেশী কৃষিজাত দ্রব্যের আমদানির উপর চড়া হারে কর না বসাইলে ফরাসী কৃষি সংরক্ষিত হইতে পাবে না। এইরূপ হইতেছে তাঁহাদের মত।

বিলাতী হরতাল ও ফরাসী "দেবা"

বিলাতের দেশব্যাপী হরতাল সম্বন্ধে প্যারিসের দৈনিক "দেবা" বলিতেছেন (৫ মে ১৯২৬):—"গোটা দেশকে জব্দ করিবার মতলবে এই যে হরতাল চলিতেছে তাহার আসল উদ্দেশ্য গবর্মেণ্টকে মজুর-সঙ্ঘের (সিঁদিকালিস্‌মের) পদানত করা। এই কর্ম্ম-প্রণালী যদি বিজয়লাভ করে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সমাজের ভিতর রাষ্ট্র অপেক্ষাও প্রতাপশালী আর একটা শক্তি আছে এবং গবর্মেণ্টটা সেই শক্তিরই চোপদার মাত্র। আর ইহাকেই বলে বিপ্লব। রাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বীরা,—যথা মজুরসঙ্ঘ,—বিজয়ী হইবে, কি রাষ্ট্র নিজের ইজ্জৎ বজায় রাখিতে পারিবে, তাহা নির্ভর করিতেছে একটি মাত্র বস্তুর উপর। রাষ্ট্রবীর ক্লেমেঁসোর বাক্য অনুসারে তাহার নাম শক্তি-পরীক্ষা বা "জোর যার মুল্লুক তার।"

বৃটিশ গেজেট

ইংরেজ মজুরেরা হরতাল সুরু করা মাত্র বিলাতে ছাপাখানার কাজ বন্ধ হইয়া যায়। কাজেই সরকারের পক্ষ হইতে একটা দৈনিক কাগজ বাহির করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে। এই কাগজটার "নাম বৃটিশ গেজেট"। প্রথম দিনই ছাপা হয় ২৩০,০০০ কপি। এ এক অসাধ্য-সাধন সন্দেহ নাই। এক সপ্তাহের ভিতরই রোজ ২৫ লাখ করিয়া ছাপিবার দরকার উপস্থিত হইয়াছিল! ছাপাও হইয়াছিল ঐরূপই। কাগজটা অবশ্য বেশী দিন বাঁচাইয়া রাখার দরকার হয় নাই। হরতালের আয়ু ছিল মাত্র এক হপ্তা। বিশ্ব-লড়াইয়ের যুগে ইংরেজ সমাজ ও রাষ্ট্র যে কর্ম্ম-দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছে তাহারই নানা ফল এক সঙ্গে এই হরতালের যুগে প্রকটিত হইল। ১৯১৪ সনের অবস্থা হইতে ইংল্যাণ্ড আজ বহু দূরে। কিন্তু লণ্ডনের সাপ্তাহিক (লিবার‍্যাল পক্ষীয়) "নেশ্যন" বলিতেছেন যে, বৃটিশ গেজেটের পরিচালনায় গবর্মেণ্ট অনেক গাজুরি চালাইয়াছেন।

মুসোলিনির বক্তৃতা

মজুর-সঙ্ঘের মুণ্ডপাত করিবার মতলবে মুসোলিনি "সিণ্ডিকেট" বা সঙ্ঘবিষয়ক এক আইন কায়েম করিয়াছেন। ইতালিয়ান পার্ল্যামেণ্টের দুই ঘরেই আইনটা স্বীকৃত হইয়াছে (মার্চ ১৯২৬)। এই উপলক্ষ্যে মুসোলিনি সেনেট সভায় যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহার সার মর্ম্ম নিম্নরূপ:—

(১) মূলধনের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালানো সমাজের পক্ষে

ক্ষতিকারক ; পুঁজির সাহায্য না পাইলে দেশোন্নতি-সাধন অসম্ভব। (২) মজুরে আর ধনীতে কোনো বিরোধ নাই। এই দুই শ্রেণী পরস্পর পরস্পরের সহায়ক। (৩) বিগত একশ' বৎসরে ইয়োরোপের লোক-সংখ্যা বাড়িয়াছে এক কোটিরও উপর। এক্ষণে কোনো এক শ্রেণীর লোককে খামখেয়ালী চালাইতে দেওয়া যাইতে পারে না। কোনো দেশে এক দিন এক ঘণ্টা ধর্ম্মঘট চলিলে গোটা দেশের চরম দুর্গতি দেখা দেয়।

হরতাল বনাম মামুলি ধর্ম্মঘট

মে মাসের বৃটিশ হরতালে একটা আইনের কথা পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বে কখনো এই বিষয়ে বিলাতে অথবা আর কোথাও আলোচনা একপ্রকার হয় নাই। কয়লার খাদের মজুরেরা ধর্ম্মঘট করিয়া খাদের মালিকদের নিকট হইতে মজুরি সম্বন্ধে সুব্যবস্থা আদায়ের চেষ্টায় আছে। মজুরে-মালিকে তক্‌রার চলিতেছে বৎসর দু'এক ধরিয়া। এই তক্‌রার ও বচসার শেষ অধ্যায় হইতেছে মজুরদের কাজে ইস্তাফা। কাজেই আইনতঃ কয়লার কুলীদের বিরুদ্ধে বলিবার কিছুই নাই।

ধর্ম্মঘট আইনসঙ্গত, হামদর্দ্দি বেআইনি

কিন্তু রেলের কুলী, ছাপাখানার কুলী ইত্যাদি অন্যান্য কর্ম্মকেন্দ্রের মজুরেরা নিজ নিজ কাজে ইস্তাফা দেয় কেন? তাহাদের সঙ্গে নিজ নিজ মালিকের কোনো বিতণ্ডা ঘটে নাই। তাহাদের অভাব বা অভিযোগ সম্বন্ধে না জানে মালিকেরা, না জানে দেশের লোক। আর, কাজে ইস্তাফা দিবার পূর্ব্বেও তাহারা মালিকদিগকে একবারও জানায় নাই। কয়লার কুলীদের সঙ্গে হামদর্দ্দি দেখাইবার জন্যই হঠাৎ "রাতারাত" এইসব মজুরেরা ধর্ম্মঘট চালাইয়া দেশব্যাপী হরতাল কায়েম করিয়াছে।

হরতাল স্বদেশ-দ্রোহ

এই হামদর্দ্দিমূলক হরতাল সমাজ, রাষ্ট্র ও দেশের বিরুদ্ধে লড়াইঘোষণা করা ছাড়া আর কিছু নয়। ইহাকে আর্থিক আন্দোলন কোনোমতেই বলা যাইতে পারে না। ইহা দস্তুর মতন দেশদ্রোহ, ঘরোআ লড়াই বা বিপ্লব। দেশের লোককে, জাতি-ব্যবসা-নির্ব্বিশেষে, ভাতে-কাপড়ে মারিয়া কুপোকষা করাই মজুর-নেতাদের মতলব। কাজেই এই হরতাল-আন্দোলন আইন-বিরুদ্ধ। অতএব ট্রেড-ইউনিয়ন-কংগ্রেস যখনই দেশের সকল মজুরকে হরতালে যোগ দিবার জন্য ডাকে তখনই তাহার পক্ষে বেআইনি-দেশদ্রোহ করা হয়। এই হইতেছে বিলাতী উকীলদের মত।

বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিটিউট

কলিকাতা সোপ্‌ ওয়ার্কস্‌ লিমিটেডের কারখানার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্‌ শ্রীযুক্ত গিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য গত চৈত্রমাসে বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্রদের নিকট "সাবানের ব্যবসায় ও নির্ম্মাণ-প্রণালী এবং ভারতবর্ষে এই ব্যবসায়ের অবস্থা" সম্বন্ধে পাঁচটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। গিরিজাবাবু প্রথম হইতে এই কারখানার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং সম্প্রতি ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও জার্ম্মাণিতে সাবানের কারখানা পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন।

বক্তৃতাগুলা প্রতি শনিবার বিকাল ৪টার সময় অনুষ্ঠিত হয়। ডক্টর হেমেন্দ্রকুমার সেন ডি, এস্‌-সি (লণ্ডন) নরেন্দ্র-নাথ সেন গুপ্ত পি-এইচ, ডি (হার্ভার্ড), রফিউদ্দিন আহমদ (ডেন্টিষ্ট), নিখিলরঞ্জন সেন পি-এইচ, ডি (বার্লিন), মিঃ আগরকার পি-এইচ, ডি (বার্লিন), যতীন্দ্রনাথ শেঠ এ, বি, (হার্ভার্ড), খগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র, ইত্যাদি বক্তারা ভিন্ন ভিন্ন তারিখে শিল্প ও বিজ্ঞানের নানা কথা আলোচনা করিয়াছেন। অধিকন্তু শ্রীযুক্ত কে, সি, চৌধুরী মজুর-জীবন সম্বন্ধে, ডক্টর গিরীন্দ্রশেখর বসু সাইকোআনালিসিস (চিত্ত-বিশ্লেষণ) সম্বন্ধে, স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় হিন্দু রসায়নের ইতিহাস সম্বন্ধে এবং ডক্টর বিরজাশঙ্কর গুহ পি-এইচ, ডি (হার্ভার্ড) নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তা ছিলেন। আর দীঘাপাতিয়ার কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় মধ্যযুগের বাংলা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন।

লোক-সেবায় খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের খরচ

লণ্ডন-মিশনারী সোসাইটীর তত্ত্বাবধানে পৃথিবীর মধ্যে যেসকল মানব-হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে, তাহার

জন্য দৈনিক ব্যয় হয় ১,০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ১৫,০০০৲ পনর হাজার টাকা। তাহা হইলে বার্ষিক হইতেছে—৫৪, ৭৫,০০০ টাকা। একটি মাত্র মিশনারী-সোসাইটীর দ্বারা এই বিপুল অর্থ প্রতি বৎসর খরচ হইতেছে। আমাদের এই ভারতেই ১৬৮টি মিশনারী-সোসাইটী কার্য্য করিতেছেন। পৃথিবীর অন্যান্য অংশে এই সকল মিশনারী-সোসাইটী এবং অন্যান্য প্রবল মিশনারী-সোসাইটীও কার্য্য করিতেছেন। ইহাতে আমরা সহজেই বুঝিতে পারি, প্রতি বৎসর কত কোটি টাকা খ্রীষ্টীয় মিশনারী-সোসাইটীর হাতে খরচ হয়। এসকল ত প্রটেষ্ট্যাণ্ট মিশনারী-সোসাইটী। ইহা ব্যতীত পৃথিবীব্যাপী রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টীয় সোসাইটীনিচয় কোটি কোটি টাকা নানাবিধ জনহিতকর কার্য্যে ব্যয় করিতেছেন। —(প্রচার, কলিকাতা)

পল্লী-সমাজ সম্বন্ধে "কৃষক"

মাসিক "কৃষক" বলিতেছেন :—

(১) হিন্দু কৃষক অনেকেই বিবাহ করিতে পারে না; পণ না দিলে কন্যা পাওয়া যায় না; টাকার অভাবে অনেকেই অবিবাহিত থাকে; সুতরাং তাহাদের বংশ লোপ পাইতেছে।

(২) প্রৌঢ় বয়সে যাহারা কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে, তাহারা ৮।১০ বৎসরের কন্যা বিবাহ করে এবং সন্তান হওয়ার পূর্ব্বে স্ত্রীকে বিধবা করিয়া পরলোক-যাত্রা করে; সুতরাং যাহারা বিবাহ করিতে পারে তাহারাও বংশবৃদ্ধি করিতে পারে না।

(৩) বরং যদি বিধবার বিবাহ-পদ্ধতি প্রচলিত থাকিত, তবে প্রৌঢ় বয়সে কৃষকেরা বিধবার পাণিগ্রহণ করিতে পারিত এবং পুত্র-কন্যা রাখিয়া পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইতে পারিত।

(৪) হিন্দু কৃষকেরা পুষ্টিকর খাদ্য খাইতে পায় না। হিন্দু কৃষকদের অনেকেরই গাভী নাই, সুতরাং দুধ, দই, ঘি খাইতে পায় না। অপরদিকে প্রায় সমস্ত মুসলমান কৃষক গাভী পালন করে,—গৃহজাত দুধের কিয়দংশ বিক্রয় করে, অপরাংশ নিজেরা পান করিয়া থাকে। মুসলমানেরা দিবসের কার্য্য অবসানে মাছ ধরে, হিন্দু প্রায়ই তাহা করে না; সুতরাং হিন্দু কৃষক দুর্ব্বল, মুসলমান সবল। মুসলমান সবল দেহ লইয়া যেরূপ উৎকৃষ্ট চাষ করিতে পারে হিন্দু দুর্ব্বলদেহে তাহা পারে না। কাজেই মুসলমান কৃষকের যেরূপ আয়, হিন্দুর সেরূপ নয়। দরিদ্রতা হিন্দু কৃষকের ধ্বংসের আর এক কারণ।

(৫) হিন্দু কৃষক দুর্ব্বলদেহে এক বিঘা জমিতে যত শস্য উৎপাদন করে মুসলমান কৃষক তদপেক্ষা বেশী উৎপান করিয়া থাকে; সুতরাং কৃষিকার্য্যে মুসলমানের যত লাভ হয়, হিন্দুর তত হয় না। হাট-বাজারে হিন্দু যে মূল্যে শস্যাদি বিক্রয় করিতে চায় মুসলমান তাহা অপেক্ষা কম মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকে। প্রতিযোগিতায় হিন্দু হারিয়া যাইতেছে। সুতরাং অনেক হিন্দু কৃষক বাধ্য হইয়া কৃষিকার্য্য পরিত্যাগ করিতেছে।

কায়স্থ চাষী

ময়মনসিংহের সাতটিয়া গ্রামে কায়স্থগণের একটী বিশেষ সভা হইয়াছিল। এই গ্রাম ও পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটী গ্রামের শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত কায়স্থগণ "কায়স্থগণের হলাকর্ষণ" সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, অতঃপর কায়স্থগণ নিঃসঙ্কোচে হলাকর্ষণ করিতে পারিবেন। সভার শেষে তাঁহারা পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষেত্রে স্বহস্তে হল-চালনা করিয়াছিলেন।

রাজসাহী জমিদার-সভা

কুমার শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের সভাপতিত্বে রাজসাহীর জমিদারবৃন্দের এক সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে :—

রাজসাহীর জমিদারবৃন্দ একটি সভায় সমবেত হইয়া বঙ্গীয় সংশোধিত প্রজাস্বত্ব বিলটি, যাহা এক্ষণে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সিলেক্ট কমিটীর সম্মুখে উপস্থাপিত রহিয়াছে, তাহা যাহাতে গৃহীত না হয় তজ্জন্য উহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন। কারণ, ইহাদ্বারা জমিদার ও প্রজা উভয়েরই স্বার্থে রীতিমত আঘাত পড়িবে এবং একটা সংঘর্ষের ভাব সৃষ্ট হইবে। ফলে তাঁহাদের মধ্যে অবিরাম মোকদ্দমা চলিবে এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে

জমিদারগণ যে মূল্যবান অধিকারসমূহ ভোগ করিয়া আসিতেছেন, তাহা হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করা হইবে; সুতরাং এই জমিদার-সভা, ঐ বিলটি যাহাতে একেবারেই পরিত্যক্ত হয়, তজ্জন্য দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা জানাইতেছেন।

লণ্ডন "চেম্বার অব কমার্সে" ভারত-কথা

লণ্ডন "চেম্বার অব কমার্সে"র ইষ্ট ইণ্ডিয়া বিভাগ লর্ড আরউইনকে বিদায়-ভোজ দিয়াছিলেন। সেই সময়, ভারতীয় জাহাজী বাণিজ্য যে গ্রেট ব্রিটেনের জাহাজী বাণিজ্যের সিকি ভাগের কম নয়, একথা স্যর ষ্টীফেন ডেমেট্রিয়াডি খুব জোর দিয়াই বলিয়াছেন।

ভারতীয় ব্যবসায়ের যথার্থ শক্তি তাহার বাণিজ্যের আদান-প্রদানের প্রকৃতির মধ্যে, আয়তনের মধ্যে নহে। অঙ্কগুলিদ্বারাও তাহা বেশ বুঝা যায়।

"ফিনান্শ্যাল টাইমস" পত্রিকা লিখিতেছেন, "পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কথা ছাড়িয়া দিয়া শুধু বৃটিশ মালের তালিকা লইলেও বুঝা যায়, জগতের চাহিদা মিটাইবার মত নানা জাতীয় কাঁচা মাল-উৎপাদনের সুবিধা অতিরিক্ত হিসাবে কেবল ভারতবর্ষেরই আছে। সুতরাং "শুল্ক" (টারিফ)-যুদ্ধের ভয় তাহার একেবারেই নাই।

শুল্ক-যুদ্ধে ভারতের ঠাঁই

একদিকে পাইকারি হিসাবে শুল্কবৃদ্ধির সঙ্কল্প এবং অন্যদিকে, পরস্পরের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কতকগুলি দ্রব্যের উপর শুল্ক বসাইবার ইচ্ছা—এই দুই বিষয় লইয়া আজ পৃথিবী জুড়িয়া যে বিরোধের সূত্রপাত হইতেছে তাহার উল্লেখ করিয়া এই পত্রিকা বলিতেছেন, "ভারতবর্ষে অধুনা একটিমাত্র টারিফ আছে। তাহা বাড়ানো-কমানো যায় না বলিয়াই অন্যান্য দেশের সহিত কারবার করিয়া লাভ করিবার শক্তি তাহার নাই। অবাধ বাণিজ্যের আওতায় প্রবর্দ্ধিত বলিয়াই বিলাতের বাণিজ্য-নীতির একটা বড় কথা—সমস্ত জাতির পক্ষে সুবিধাজনক সর্ত্তের প্রস্তাব করা। কিন্তু ভারতবর্ষের পক্ষে সে ধরণের প্রস্তাব করা সময়োপযোগী নয়, কারণ সে এখন ইচ্ছা করিয়াই সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন করিয়াছে।"

সত্য যে, "একক-টারিফ-পদ্ধতি"তে ভারতবর্ষ এযাবৎ টারিফ-যুদ্ধ হইতে রক্ষা পাইয়াছে। তারপর পৃথিবীর বাঞ্ছনীয় কাঁচামালের উৎপাদক বলিয়া তাহার অবস্থা বড়ই সবল। কাজেই কোনও দেশ হইতে বিরুদ্ধতাচরণের ভয় তাহার কিছুমাত্র থাকিবে না।

আধুনিকতম ব্যবসা-তালিকা দেখিলে জানা যায়, ভারতবর্ষ বিলাতে যত মাল বিক্রয় করে তথা হইতে তাহার এক-তৃতীয়াংশ বেশী মাল ক্রয় করে। অন্যান্য দেশ-সম্বন্ধে ঘটে কিন্তু ইহার একেবারে উল্টা। জাপানে সে যত মাল বিক্রয় করে, তাহার এক-তৃতীয়াংশ মাত্র ক্রয় করে। যুক্ত-রাষ্ট্রে ভারতের যত বিক্রয়, তাহার অর্দ্ধেকাংশ মাত্র ক্রয়। ইয়োরোপের নিকট হইতে ভারত যত কেনে, তাহার আড়াই গুণ সে সেখানে বেচে।

কাঁচামাল বনাম শিল্পজাত দ্রব্য

সাধারণ বাণিজ্য-নিয়ম এই যে, যে দেশ বেশী বিক্রয় করে, তাহার অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল। কিন্তু যেখানে-সেখানে এই নিয়ম খাটাইলে ভুল হয়। যেসব দেশ কাঁচামাল আমদানি এবং শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি করে, তাহাদের পক্ষে ঐ নিয়মটা খাটে। যেসব দেশ কাঁচামাল রপ্তানি এবং শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি করে তাহাদের পক্ষে ঐ নিয়ম খাটে না। শেষোক্তের উপর পূর্ব্বোক্তেরা নির্ভর করে দুই কারণে। প্রথম,—জীবন-ধারণের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিজেরা প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করিতে পারে না, তাই সেই দ্রব্যগুলির জন্য অপরের উপর তাহাদিগকে নির্ভর করিতে হয়। দ্বিতীয়,—শিল্পের জন্য কাঁচামাল একান্তই আবশ্যক, অথচ তাহারা তাহা একেবারেই উৎপাদন করে না। তাই কাঁচামালের জন্য অপরের উপর তাহাদিগকে নির্ভর করিতে হয়।

জাপান বনাম ভারত

জাপানের সঙ্গে ভারতের শুল্ক-লড়াই বাধিবার উপক্রম হইয়াছে। ভারত জাপানে বেচে কাঁচা তুলা আর লোহা। ভারতীয় তুলা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী যায় জাপানে। অধিকন্তু জাপান ভারতীয় লোহার এক মস্ত ক্রেতা। বলা

বাহুল্য জাপান ভারতের পক্ষে অতি-বড় বাজার। কিন্তু শুল্ক-লড়াই চরমে গিয়া ঠেকিলে ভারতের লোকসান বড় বেশী বলিয়া মনে হয় না। কেন না, ভারতের তুলা ও লোহা কিনিবার লোক অন্যান্য দেশে সহজেই পাওয়া যাইবে। কিন্তু জাপানের পক্ষে ভারতের তুলা না পাইলে কারখানাগুলা ঠুঁঠা হইয়া থাকিতে বাধ্য। তাহাতে মজুরদের কর্ম্মাভাব এবং গোটা সমাজের আর্থিক দুর্দ্দৈব অবশ্যম্ভাবী। অপর দিকে জাপানী সুতা ও কাপড় যদি ভারতে আসা বন্ধ হয় তাহাতে ভারতের ক্ষতি বেশী না। বরং লাভেরই সম্ভাবনা। এই ধরণের আলোচনা "ফিনান্শ্যাল টাইম্‌স্‌" কাগজে বাহির হইয়াছে।

ময়মনসিংহের হিন্দুসভা

ময়মনসিংহ হিন্দুসভার টাঙ্গাইল অধিবেশনে (২১ চৈত্র ১৩৩২) প্রত্যেক হিন্দুকেই জাতি-নির্ব্বিশেষে হালচাষ করিবার পাঁতি দেওয়া হইয়াছে। কার্য্যক্ষম ভিক্ষা-ব্যবসায়ী-দিগকে ভিক্ষা দেওয়া বন্ধ করার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। বিধবা-বিবাহ অনুমোদিত হইয়াছে। আর জল-চল সম্পর্কিত খুঁটিনাটি সমাজ হইতে তুলিয়াদিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

জেনেহ্বায় লাজপাত রায়

ভারতের শ্রমিকদের উন্নতির জন্য যেরূপ শিথিলভাবে চেষ্টা চলিতেছে, জেনেহ্বার আন্তর্জ্জাতিক মজুর-সভায় শ্রীযুক্ত লাজপত রায় তাহাতে নৈরাশ্য প্রকাশ করেন। তাঁহার মতে শ্রমিকবিভাগের অফিস হইতে প্রাচ্য দেশসমূহের শ্রমিকদের অবস্থার সম্বন্ধে তদন্ত হওয়া আবশ্যক; এ বিষয়ে প্রাচ্যে এবং প্রতীচ্যে সহযোগিতার দরকার। তিনি বলেন, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং কেনিয়ার কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকদের অবস্থার কথা জগতের লোকের নিকট প্রকাশ করা আবশ্যক; দক্ষিণ আফ্রিকার পার্ল্যামেন্টে কৃষ্ণাঙ্গ সম্পর্কিত যে আইনের খসড়া উপস্থিত হইয়াছে, তিনি তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতে চাহেন না; কারণ এই বিষয় লইয়া ভারত গবর্ণমেন্টের সহিত দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমেন্টের এখনও লেখালেখি চলিতেছে।

নবীন পারশ্যের আর্থিক ব্যবস্থা

যে দিন পারশ্যের নূতন সম্রাট রীজা শা পেহেলেবি পারশ্যের প্রাচীন কেয়ানি সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, ঠিক সেই দিন "ফ্রি প্রেসের" জনৈক প্রতিনিধি পারশ্যের কনসাল মীর্জা আশাদুল্লা খাঁ বেমানের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি প্রতিনিধির সমক্ষে পারশ্যের সম্রাট ও পারশ্যের শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ উক্তি করেন। নিম্নে তাহার সারমর্ম্ম প্রদত্ত হইল।

যে রাজা ও রাজবংশকে সিংহাসনচ্যুত করা হইয়াছে, তাঁহারা তুর্কী,—তাঁহারা প্রজার চিত্ত অধিকার করিতে সমর্থ হন নাই। নূতন সম্রাট রীজা শা পারশ্যের মাটিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। প্রজাদিগের নিকট তিনি একটি আদরের বিগ্রহস্বরূপ। বর্ত্তমান প্রিয়দর্শন সম্রাটের বয়স মাত্র ৪৮ বৎসর। প্রজার মঙ্গলের জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া থাকেন।

সাম্রাজ্যের ভিতর পোষ্টাফিস, টেলিগ্রাফ প্রভৃতির সুবন্দোবস্তের জন্য বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে। রাজধানী হইতে দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রের দিকে রাজপথাদি নির্ম্মিত হইতেছে। সম্রাট রীজা শা পারশ্যের বাহিরের দেশের সহিত বিমান-পথে চলাচলের পথ নির্ণয়কল্পে বর্ত্তমানে বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন। পারশ্যের রাজধর্ম্ম মহম্মদীয়। পারশ্যের যে-কোনো অধিবাসী উপযুক্ততা দেখাইতে পারিলে যোগ্য রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারেন,—তাহাতে আর্ম্মিনীয়, ইহুদী বা জোরোয়াষ্ট্রীয়ানদেরও কোন বাধা নাই। রুশিয়ার সহিত এই রাজ্যের মিত্রতা আছে।

পারশ্য-সম্রাট, পারশ্যের জীবনধারায় স্বদেশী বহাইতে সর্ব্বদা সচেষ্ট। পারশ্যের একজন সৈনিকের পাদুকা হইতে শিরস্ত্রাণ পর্য্যন্ত সকলই স্বদেশী। রেলওয়ের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকলার উন্নতি আরম্ভ হইয়াছে। পোষাক সম্বন্ধে পারশ্যকে আত্মনির্ভরশীল করিবার জন্য হাতে-কাটা সুতায় হাতে-বোনা কাপড়ের প্রচলনে রাজ-সরকার উৎসাহ দিতেছেন।

জীবনবীমার ব্যবসা

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতামত

[৺অম্বিকাচরণ উকীল-প্রবর্ত্তিত "হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্ ইন্‌শিওর‍্যান্স কোম্পানী" আজ বাংলাদেশে এবং বঙ্গের বাহিরেও বাঙালীর অন্যতম জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে পরিচিত। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম হইতেই এই কোম্পানীর কর্ণধার রহিয়াছেন। বিগত মার্চ মাসে তাঁহার সঙ্গে আমাদের যেসকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহার শর্টহাণ্ড বৃত্তান্ত নিম্নরূপ।]

প্রশ্ন—আমাদের বাঙ্গালীর পরিচালিত আর কোনো ইনশিওর‍্যান্স কোম্পানী আছে কি?

উত্তর—কয়েকটা আছে, তবে সম্পূর্ণরূপে বাঙালীর অধীন বেশী নাই। আমাদের সমসাময়িক তিনটী কোম্পানী আছে। "ন্যাশন্যাল," "ন্যাশন্যাল ইণ্ডিয়ান" আর এটী প্রায় এক সময়ে স্থাপিত হয়। মার্টিন কোম্পানী যে হিসাবে বাঙ্গালী, ন্যাশন্যাল এবং ন্যাশন্যাল ইণ্ডিয়ান ও সেই হিসাবে বাঙালী, তাতে সাহেব ম্যানেজিং এজেণ্ট। আমরা অবশ্য এই বলে' গৌরব করি যে আমরা সম্পূর্ণ বাঙালী, সাহেবের সম্পর্ক নাই, তাদের সাহায্যও নিই নাই।

প্রঃ—তা ছাড়া ভারতবাসীর ভিতর "ওরিয়েণ্টাল"?

উঃ—বম্বের "অরিয়েণ্টাল" ও "এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া" এ দুটীও নামজাদা কোম্পানী, তবে আধা-ইণ্ডিয়ান আধা-ইয়োরোপায়ান। তাদেরকে ধরলেও ধরতে পারি। আমাদের এখানে সবই ইণ্ডিয়ান।

প্রঃ—আচ্ছা, এই ১৫।২০ বৎসরের ভিতর আমাদের দেশের লোকেরা "ইনশিওর" করবার দিকে খানিকটা অগ্রসর হয়েছে কি?

উঃ—অনুমান করি হয়েছে, কারণ আমাদের প্রত্যেকেরই কাজকর্ম্ম বাড়ছে। এতেই বোধ হয় লোকের সেদিকে ঝোঁক হয়েছে। অবশ্য "ওরিয়েণ্টাল" কোম্পানীর যে হারে বাড়ছে সে হার আমাদের নয়। তবে প্রত্যেক ভারতীয় এবং আধা-ভারতীয় কোম্পানীরই উন্নতি হয়েছে।

প্রঃ—কোন্ শ্রেণীর লোকেরা বেশী বীমা করে?

উঃ—চাকর্‌যে লোক বলতে যা বুঝি, বেশীর ভাগ তারা। তাদের মাসিক আয়ের স্থিরতা থাকে, কিছু বাঁচিয়ে বীমায় দেবার ইচ্ছা হয়। হাতে কিছু জমা করে না, কারণ তাদের অভাব সব চেয়ে বেশী। হঠাৎ মারা গেলে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার বিপদে পড়বে এই ভেবে তারা ইন্‌শিওর করে। আমাদের চেষ্টায় এখন ক্রমশঃ জমিদার-ব্যবসাদারের মধ্যেও বীমাপ্রথা বিস্তার-লাভ করছে। তবে স্বাভাবিক ভাবে চাকর্‌যে লোক, যাদের চাকুরিতে পেনশ্যন আছে, তারাই করেন। পুলিস অফিসার, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট অনেকে করেন, কারণ যে সময় ছেলেমেয়ের বিয়ে দিতে হবে, কি শিক্ষার ব্যয় বহন করতে হবে, বীমা করা থাকলে সে সময়ে একটা মোটা টাকা হাতে পান।

প্রঃ—মোটের উপর আজকাল আপনাদের ব্যবসায়ে নিজের দায়িত্ব কি রকম? "পলিসির" পরিমাণ কতটা?

উঃ—এখন যে অবস্থায় রয়েছি তাতে দায়িত্ব আমাদের কোম্পানীর ৫০।৬০ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত। "পলিসি"র

পরিমাণ বার্ষিক বাড়ছে। সেটা দায়িত্ব বটে। তবে সঙ্গে সঙ্গে "প্রিমিয়াম" (চাঁদা) নিয়মিতরূপে আসে। তাতে দায় সামলাবার উপায় হয়।

প্রঃ—বছর বছর আপনাদের "ক্লেইম" পূরণ করতে হয় কতটা?—(ক্লেইমের বাংলা কি মামুলি "দাবী" বলব?)

উঃ—পণ, বীমার পণ, পণ আদায় করা, দাবী এই রকম ভাবে আমরা বলে থাকি। তবে বাংলা ভাষা ব্যবহার করবার সুযোগ কম ঘটে। যেখানে বাংলা লিখলে চলত সেখানেও ইংরেজী লিখি, টাইপের সুবিধা, কারবন কপি করা যায়। বাংলা ভাষার চলন কম।

আমাদের যে অবস্থা তাতে ফী বৎসর প্রায় লাখ দু-তিনেক দিতে হয়, অবশ্য আমাদের চাইতে "ওরিয়েন্টালের" বেশী কাজ, তাদের ২।৪ বৎসরের তালিকা পড়ে দেখিনি। নিশ্চয় তাদের বেশী দিতে হয়। যার যেমন "বিজ্‌নেস" (কাজ) তেমন দিতে হয়। আমরা বাঙালী যে কয়জন আছি "ওরিয়েন্টাল" বা "এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়ার" সমকক্ষ কেউ নই। তারা অনেক পুরোনো। কিন্তু আমাদের চাইতে পুরোনো হলেও তারা মাত্র সামান্য এগিয়ে আছে। তার পর বাঙালী কোম্পানীর মধ্যে কখনো আমরা এগোই, কখনো বা অন্যান্যেরা কিছু এগোয়।

প্রঃ—বাংলাদেশের বাইরে আপনাদের কাজ আছে?

উঃ—ভারতে আছে, ভারতের বাইরে দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি যেসব জায়গায় ভারতবাসী উপনিবেশ-স্থাপন করেছে, মোটের উপর বাঙালী, ভারতবাসী যেখানে আছে সেখানেই আমরা "বিজনেস" পাই।

প্রঃ—ইনশিওর‍্যান্স ব্যবসায়ের ঝুঁকিটা কোন্ জায়গায় বেশী?

উঃ—আসলে কোনো বড় ঝুঁকি নেই। প্রিমিয়াম (চাঁদা) যা পাই, আনুমানিক ভাবে গণনা করে' টাকাটা হেপাজাত করে মামুলি সুদে খাটালেই চলে যায়, সুতরাং সকলেই সে ভাবে রাখতে চান। ঝুঁকি বলতে যে রকম দায়িত্ব বুঝায় সে রকম কিছু নেই। অবশ্য যদি গণনায় ভুল হয় সে কথা আলাদা। অথবা খরচ অতিরিক্ত হয়ে যায় সেখানে ঝুঁকি আসতে পারে। কিন্তু সেজন্যও গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা আছে। তাতে ৫ বৎসর অন্তর নিজেদের "ভ্যালুয়েশ্যন" করতে হয়। অর্থাৎ ব্যয় এবং স্থিতি পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্য কি রকম দেখতে হয়। সেজন্য প্রত্যেকেই ব্যয় অপেক্ষা সংস্থান বেশী করে আসছে। এতে চিকিৎসার ব্যবস্থা আগে থাকতে করে নেয়। একটা পলিসি "ম্যাচুওর" হলেই ("পেকে উঠ্‌লেই") সতর্ক হতে হয়। মূলধন থেকে সাম্‌লে নেবার চেষ্টা করা যায়।

প্রঃ—প্রিমিয়াম (চাঁদা) কি রকম করে' ঠিক করা হয়? এক এক কোম্পানী এক এক রকম হিসাব করে কি?

উঃ—কম-বেশী আছে। আমাদের এদেশ গরিবের দেশ, "এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া" যত কম সম্ভব করেছে, আমরাও তদ্দূর করেছি। তারা "এক্‌সট্রা প্রফিট" (আলগা লভ্যাংশ) দিতে পারে না। সম্প্রতি তারা একটু এগিয়েছে। "ওরিয়েণ্টালে"র চেয়ে আমরা কিছু কম চাঁদা চাই। তবে সে ২।০ আনার এদিক-ওদিক মাত্র।

প্রঃ—বিদেশী কোম্পানী যারা আছে—তারা কিরকম প্রিমিয়ামের হার দেয়?

উঃ—বিলেতে প্রিমিয়াম (চাঁদা) কিছু বেশী নিয়ে থাকে। আমাদের দেশে লোকের আয়ু কম। সাধারণতঃ বিলিতী অভিজ্ঞতা যা তার চেয়ে ৬ বৎসর কম ধরা হয়। গড়পড়তা তাদের ২০ বৎসর ধরা হয়, আমরা তা পারি না। আমরা পাড়াগাঁয়ে থাকি, রোগের প্রবণতা বেশী। চিকিৎসা তেমন হয় না। এসব কারণে আয়ু কম হতে পারে। এ সব কাজে আয়ু কয়েক বৎসর কম ধরা দরকার। বিলেতে ১০।২০ হাজার লাইফের গড় করে তারা "হেল্‌থ্ টেব্‌ল্" খাড়া করেছে, তার তুলনায় আমাদের ৬ বৎসর ঘাটতি আছে।

প্রঃ—আমাদের দেশে এই রকম "টেব্‌ল্" (পরমায়ুর তালিকা) তৈরী করার চেষ্টা হয় না কেন?

উঃ—দেশী কোম্পানীগুলার অভিজ্ঞতা একত্র করলে "টেব্‌ল্।" তৈরী হতে পারে। তবে মিলে মিশে কাজ করা এদেশের ধাত নয়। প্রত্যেকে নিজের নিয়ে ব্যস্ত। এখনো সে অবস্থা বোধ হয় আসেনি।

প্রঃ—"অ্যাকচুয়ারি"র কাজ করতে পারে এমন কেহ বাংলাদেশে আছে কি?

উঃ—আমাদের জানিত একজন আছেন—যোগেশ সেন। তিনি একজামিন পাশ করলেন কিন্তু এ লাইনে কাজ করেন না। মাঝে মাঝে করেন। প্রধানতঃ ওকালতী করেন। তাতে বেশ একটা আয় আছে। এদিকে কি আয় হবে না হবে সে ভয়ও আছে। কাজেই পাশ করেও আসতে পারেন নি। বোম্বাইতে একজন আছেন শুনেছি, নাম কি, করেন কি, জানি না।

প্রঃ—তাহলে আমাদের দেশী কোম্পানী যখন "ভ্যালুয়েশ্যন" করেন, কি করে' করেন?

উঃ—আমরা বিলেত থেকে "কার্ড" ছাপিয়ে নিয়ে আসি। কার্ডে এক-একটা লাইফের বৃত্তান্ত থাকে। কার্ড বাক্‌স-জাত করে ষ্টক করে আমাদের পাঠিয়ে দেন।

প্রঃ—তাতে লাভ-লোকসান আপনাদের কিরূপ?

উঃ—মোটের উপর ভালই। সেটা গ্রহণ করতে আমরা আইনতঃ সম্পূর্ণ বাধ্য। তা ছাড়া ভাল আর কি হতে পারে? গড়পড়তা আয়ু আমাদের কত, কত লোক পলিসি করে, কত লোকে প্রিমিয়াম দেওয়া বন্ধ করে ইত্যাদি নানা বৃত্তান্ত "টেব্‌ল"এ থাকে। আমাদের অবস্থা ব্যবসা হিসাবে ভাল কি মন্দ তা তাঁরা বলে দেন। আসল কথা বলে' দেন আমাদের দায় কতটা। কাজেই আমরা ভাল করে তদবির করতে পারি, তাই "বোনাস"ও দিতে পারি।

প্রঃ—আপনারা কত বৎসর পর "ভ্যালুয়েশ্যন" করান?

উঃ—পাঁচ পাঁচ বৎসর পর, তা নইলে খরচ লাগে।

প্রঃ—আপনাদের কাছে "ডুপ্লিকেট" (কার্ডের নকল) থাকে?

উঃ—আমরা কার্ড কিনে রেখে দিই, খাতাতে মাল মশলা আছে, সংক্ষেপ বিবরণ আছে।

প্রঃ—শেষ কবে পাঠিয়েছেন? কদ্দিন লাগে?

উঃ—১৯২২ সনের এপ্রিলে পাঠিয়েছি। ৪।৫ মাস তৈরী হতে লাগে, গোছগাছ করতে মোটের উপর সব সুদ্ধু এক বৎসর যায়। আমাদের আফিসে অ্যাকচুয়ারির পরামর্শ মত খাতা তৈরী করবার লোক তৈরী হয়ে গেছে।

প্রঃ—তাহলে অ্যাকচুয়ারিকে জিনিষপত্র পাঠাবার জন্য সারা বছর ধরে স্বতন্ত্র লোক রাখ্‌তে হয়? না, আল্‌গা লোক সে সময় রাখেন?

উঃ—না, সে সময় আল্‌গা নূতন লোক নিলে ভুল হবার সম্ভাবনা। সে জন্য অভিজ্ঞ লোক আছে। প্রফিট কি রকম করছি, ভুলচুক না হয় এ সব দেখতে হয়। এ পর্য্যন্ত বেশ হয়েছে।

প্রঃ—তা হলে অ্যাকচুয়ারী আপনাদিগকে আসল সাহায্য করে কোন্ কোন্ বিষয়ে?

উঃ—প্রথমতঃ সংস্থান যথেষ্ট আছে কি না, কোনো রকম ছোট-খাট ব্যতিক্রম হয়েছে কি না, খরচ বেশী হয়েছে কি না, লাপ্‌স্ (চাঁদা-বন্ধ) বেশী কি না,—সেগুলি মাঝে মাঝে বুঝিয়ে দেয়। তাতে আমরা সাবধান হতে শিখি।

প্রঃ—সংস্থান ঠিক করবার সময় কোন্ কোন্ দফা আপনারা আলোচনা করেন?

উঃ—আমাদের দেনা-পাওনার বর্ত্তমান অবস্থা আর তাতে খাঁকতি বাড়তি কত এই সব দেখাতে হয়। এই করে গত ৫ বৎসরের যে হিসাব হয়েছে তাতে আমাদের হাজারকরা ৭৫৲ টাকা "বোনাস" (অতিরিক্ত লভ্যাংশ) পড়েছে।

প্রঃ—আপনারা কি গভর্মেণ্ট সিকিউরিটিতে টাকা জমা রাখেন?

উঃ—আমাদের বিশেষত্ব এই যে, আমরা পাঁচ সাত রকম

কারবারে টাকা খাটাই। গবর্মেণ্ট সিকিউরিটী ও আছে বটে, তবে বেশী নয়। গৃহস্থ লোকের বাসের উপযুক্ত জমি কিনে এ পর্য্যন্ত লাভবান হয়েছি। এ বৎসর পারছি না। পুরোনো যা আছে তাতেই চলছে।

প্রঃ—তা ছাড়া অন্য কোনো সাধারণ ব্যাঙ্কে কি ফ্যাক্টরিতে টাকা রাখেন না?

উঃ—না, এ পর্য্যন্ত তা করিনি। এখন কিছু-কিছু করছি। শিল্পকর্ম্মকে কি ক'রে সাহায্য করতে পারি? আমাদের ব্যবসার পক্ষে করা শক্ত। প্রথম প্রথম এই কথা রেখে ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানকে টাকা দিই—"তোমরা যে পরিমাণে দেশী শিল্পকর্ম্মকে সাহায্য করবে সেই পরিমাণে সাহায্য আশা করতে পার। কিন্তু তাতে ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়।" কি পর্য্যন্ত সাহায্য দেওয়া যেতে পারে সেটা অতি সাবধানে ঠিক করে থাকি। সম্পত্তির পেছনে যদি ভাল লোক এসে দাঁড়ায়, শিল্পকর্ম্মটা নিজের যদি হয়—কোনো ধনীব্যক্তি এসে যদি বলে—"আমি জানি এটা ভাল আমি পেছনে আছি" এ রকম যদি হয় তা'হলে টাকা দেওয়া যেতে পারে।

প্রঃ—এটা কি খাঁটি "গ্যারাণ্টি" (জামিন)?

উঃ—হাঁ, তিনি "গ্যারাণ্টি"। তা'ছাড়া জিনিষপত্রের আকার-প্রকার দেখে আমাদের টাকা দিতে আপত্তি থাকে না। ২।১টা কাজ আমরা সে ভাবে করেছি। ব্যাঙ্কগুলিকে কিছু-কিছু সাহায্য করেছি। "ইনডাষ্ট্রীর" মধ্যে রেলওয়ে বোধ হয় উপযুক্ত। ইটের ভাটি আছে ভাল, তাদের কিছু সাহায্য করেছি। এই দুটা পরীক্ষা করে দেখা গেল, এতে বিশেষ কিছু বুঝা যায় নি। এখন চা-বাগানের কোম্পানীর তরফ হতে প্রস্তাব আসছে' তাতে এখনো কিছু হয় নি।

ব্যবসাবাণিজ্যে, শিল্পকর্ম্মে টাকা খাটানো আমাদের কোম্পানীর বিশেষত্ব বলতে হবে। অপর কোনো ভারতীয় বীমা-কোম্পানী এদিকে যাবার চেষ্টা করে না। "ওরিয়েণ্টালের" বিজ্ঞাপনে লোকেরা কিছু ভুল বুঝে। মনে করে গভর্মেণ্ট স্বয়ংই বুঝি তাদের জামিন। এই ভুল বুঝার জন্য অনেক লোক তাদের মক্কেল হয়েছে। আসল কথা, তাদের টাকা প্রায় সবই সরকারী সিকিউরিটিতে জমা আছে।

কিন্তু গভর্মেণ্ট সিকিউরিটিতে সব টাকা রাখলে অসুবিধা আছে। "এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া" ঠেকে শিখেছে। ৫।৬ পারসেণ্ট যুদ্ধে নেমে গেল তাদের ফাণ্ড। শুনছি তারা নাকি আস্তে আস্তে "মর্টগেজে" নামছে। আমাদের অম্বিকাবাবু নির্ভীক লোক ছিলেন। যেখানে ভাল মনে করেছেন সাহায্য করেছেন। তিনিই এর প্রবর্ত্তক, তিনি আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করেছেন। আমরা বাঙালী মানুষ' ব্যবসায় স্বভাবতঃ ভয় পাই। সে জন্য একটা চরম-কিছু করি না। কিন্তু অম্বিকাবাবুর মাথা খেলত নতুন নতুন পথে টাকা খাটাবার দিকে। বাঙালী সমাজ তাঁর নিকট প্রচুর পরিমাণে ঋণী।

প্রঃ—আর কোনো বিষয় নিয়ে আপনি নিজ থেকে কিছু বলতে চান?

উঃ—আমার একটা কল্পনা ছিল। ভারতবর্ষে যে সব ইনশিওর্যান্স কোম্পানী আছে সকলে একত্র হয়ে নিজেদের পলিসির সামঞ্জস্য করে', মিলে মিশে নিজ নিজ অভিজ্ঞতার সাহায্য নিয়ে যদি পরমায়ুর তালিকা (লাইফ-টেবল্) তৈরী করতে অগ্রসর হয়, তা'হলে দেশের অশেষ উন্নতি হতে পারে। কিন্তু এখনো আমরা সেরূপ ভাবে সঙ্ঘবদ্ধতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে পারি নি। এটা দুঃখের বিষয়।

জ্যর্ণালে দেলি একনমিস্তি এ রিভিস্তা দি স্তাতিস্তিকা

ইতালিয়ান ধনবিজ্ঞান-সেবীদের মাসিক পত্র, রোম, এপ্রিল, ১৯২৬। প্রবন্ধ:—(১) সমুদ্র-বাণিজ্য ও নৌশিল্প-বিষয়ক সংরক্ষণ-নীতি (লুইজি ফেদেরিচি)। লেখক সংরক্ষণ-নীতি সম্বন্ধে পারেতো, হার্ব্বার্ট স্পেন্সার, হ্বাকার, হুনোয়ে, শেহ্বালিয়ে, লিষ্ট, মার্ক্‌স্, রিচ্চা সালের্ণো, লরিয়া প্যাটেন, ফেরারা, মিল ইত্যাদি পণ্ডিতগণের মত সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই নীতির প্রভাবে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য এই তিনের ভিতর কোনো এক বিভাগের কোনো নির্দ্দিষ্ট শাখার "পৌষমাস" ঘটিতে পারে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সকল প্রকার আর্থিক বিভাগের "সর্ব্বনাশ" অবশ্যম্ভাবী। সমুদ্র-বাণিজ্য এবং নৌশিল্পের ইতিহাস আলোচনা করিয়া লেখক সংরক্ষণ-নীতির নানা রূপ বিবৃত করিয়াছেন। "ন্যাভিগেশ্যন আক্‌টে"র সুবিস্তৃত সমালোচনা আছে। ফেদেরিচির মতে ক্রমওয়েল-প্রবর্ত্তিত "সাগর-বিধি" ইংরেজদের ক্ষতি করিয়াছে। (২) দক্ষিণ ইতালির কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যে মুদ্রার পরিমাণ-বৃদ্ধির প্রভাব (কারাণ-দন্‌ভিতে)। লেখকের বিবেচনায় এই জনপদের ইতালিয়ানদের পুঁজি প্রায় পুরাপুরি না হউক,—অন্ততঃ বার আনা অংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত দক্ষিণ ইতালিকে এই বিপদের ফল ভুগিতে হইবে।

শ্‌মোল্লার্স্‌ য়ারবুখ্‌ ফ্যির গেজেট্‌সগেবুঙ্‌, ফার্‌হ্বাল্টুঙ্‌ উণ্ড্‌ ফোল্‌ক্‌স্‌ হ্বির্ট্‌শাফ্‌ট্‌ ইম্‌ ড্যয়চেন রাইখে

শ্‌মোলা-রপ্রতিষ্ঠিত বর্ষপঞ্জী,—জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের আইন-কানুন, রাষ্ট্রশাসন এবং আর্থিক ব্যবস্থা-বিষয়ক ত্রৈমাসিক; মিউনিক ও লাইপৎসিগ; ডুঙ্কার উণ্ড হুমব্লট কোং।

৪৮ বৎসর বয়সের পঞ্জিকায় লোকসংখ্যার গণিত-তত্ত্ব (মাঠিমাটিশে বেফ্যেল-কারুংস্‌টেওরী) সম্বন্ধে আলোচনাটা শিক্ষাপ্রদ। জগতের লোক-সংখ্যা বাড়িতেছে এই কথা অল্পবিস্তর প্রায় সকলেরই জানা আছে। কিন্তু এই বৃদ্ধির হারটা জানা আছে বোধ হয় একমাত্র তথ্য-ও-অঙ্কতালিকায় বিশেষজ্ঞ লোকজনের। আর এই হারের সামাজিক প্রভাব সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা দুনিয়ার কয়জন নরনারীর মাথায় আছে বলা কঠিন। তবে বর্ত্তমান জগতের আর্থিক ব্যবস্থা লইয়া যাঁহারা চিন্তা করিয়া থাকেন তাঁহাদের এই বিষয়ে কিছু-কিছু মাথা ঘামাইতে হয়, অন্ততঃ মাথা ঘামাইতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। অষ্ট্রেলিয়ার সরকারী তথ্য-তালিকা-দক্ষ পণ্ডিত ক্নিব্‌স্‌ লোকসংখ্যার বৃদ্ধি-বিষয়ক নবীন আলোচনার পথপ্রদর্শক।

খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বেকার যুগে দুনিয়ার লোকসংখ্যা কত ছিল তাহা বড় একটা জানা যায় না। বোধ হয় জানিবার আর উপায়ও নাই। ১৮০৪ সনের লোক-সংখ্যা ৬৪ কোটি ধরিয়া লওয়া হয়। আর ১৯১৪ সনে এই সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১৬৪ কোটি ৯০ লক্ষ। অর্থাৎ ১১০ বৎসরে জগতের লোক-সংখ্যা বাড়িয়াছে প্রতিবৎসর হাজার করা ৮৬৪ জন হিসাবে। দেখা যাইতেছে যে, ৮০½ বৎসরে লোক-সংখ্যা পুরাপুরি দ্বিগুণ বাড়ে।

বর্ত্তমান যুগে যে হারে লোক বাড়িয়াছে সেই হার যদি অতীত কালেও খাটিয়া থাকে, তাহা হইলে দুনিয়ার প্রথম মানুষ,—একদম খাটি "আদি-মনু,"—জন্মিয়াছিল খৃষ্ট-পূর্ব্ব

৫০০ অব্দে। কিন্তু ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব আর নৃতত্ত্বের নজিরে আমরা আদিম মানবকে দেখিতে পাই আরও প্রাচীনকালে, খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৪০০০ অব্দেত পাই-ই, এমন কি খৃষ্ট-পূর্ব্ব ১০,০০০ অব্দ পর্য্যন্তও মানুষের হাড়-মাসে ঠেকা যায়।

তাহা হইলে বলিতে হইবে যে,—"সেকালে" লোক-বৃদ্ধির হার বর্ত্তমান যুগের হারের সমান ছিল না। "আজ-কালকার" হারের চেয়ে সেই হার যারপরনাই কম ছিল। এই অনুমান সত্য হইলে তাহার কারণ কি? কারণগুলা সহজে নির্দ্দেশ করা সম্ভব নয়। তখনকার দিনে নরনারী জীবন-ধারণের জ্ঞানবিজ্ঞানে পাকা ওস্তাদ ছিল না, প্রথমেই হয়ত এই কথা মনে উঠিবে। কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে, প্রাচীন ও "প্রাগৈতিহাসিক" যুগে অসংখ্য বার অশেষ প্রকার দৈব-দুর্ব্বিপাক মানব-সংসারে দেখা দিয়াছে। তাহার ফলে মাঝে মাঝে মানব-বংশ "নির্ব্বংশ" হইয়াছে।

যাহা হউক, সম্প্রতি অতীত সম্বন্ধে কল্পনা চালাইয়া বেশী দূর পৌছিবার সম্ভাবনা নাই। "ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্" বিদ্যার বেপারীরা আজকাল প্রধানতঃ ভবিষ্যতের কথায়ই মাথা ঘামাইতেছেন। এই দিকে কল্পনা খাটাইয়া ভবিষ্য মানবের ভাগ্য বুঝিতে চেষ্টা করাই তাঁহাদের বিজ্ঞান-সাধনার একমাত্র লক্ষ্য।

এই যে ১৮০৪ হইতে ১৯২৪ পর্য্যন্ত ১১০ বৎসর, এই কালের ভিতরই লোক-সংখ্যা জগতের সর্ব্বত্র সমান হারে বাড়িয়াছে কি? বাড়ে নাই। নানাস্থানের হার নানাবিধ। এই ১১০ বৎসরের প্রত্যেক দশকেই বৃদ্ধির হার সমান রহিয়াছে কি? রহে নাই। বিভিন্ন দশক বা অর্দ্ধ-দশকের হার বিভিন্ন। ১৯০৬ হইতে ১৯১১ সন—এইটুকু সময়ের বৃত্তান্তই ধরা যাউক। এই কয়বৎসরে লোক-সংখ্যা বাড়িয়াছে প্রতিবৎসর হাজারকরা ১১'৫৯ জন হিসাবে। এই হার যদি জগতে টিকিয়া যায় তাহা হইলে কি দেখিতে পাইব? আগামী ৬০ বৎসরের ভিতর জগতের লোক-সংখ্যা দ্বিগুণ বাড়িবে। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে যে ফল দেখিতেছি ৮০ ½ বৎসরে, সেই ফল পাইব মাত্র ৬০ বৎসরে। আর এখন হইতে ২০০ বৎসরের ভিতর,—অর্থাৎ ২১১১ সনে লোক-সংখ্যা হবে আজকার সংখ্যার পূরাপূরি ১০ গুণ।

আজকালকার দুনিয়ায় লোক-সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়া অতি সহজ। বিগত বিশ-পঁচিশ বৎসরের ভিতর মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান, কর্ম্মকৌশল এবং যন্ত্রপাতি অভাবনীয়রূপে উন্নতিলাভ করিয়াছে। মানুষের জীবনধারণের পক্ষে এই সবই যার পর নাই মঙ্গলজনক। জগতের শক্তিপুঞ্জকে মানুষের শক্তি, স্বাস্থ্য এবং সুখ বাড়াইবার কাজে আজকাল যত লাগানো যাইতে পারে তাহার তুলনা মানবেতিহাসের কোনো যুগে পাওয়া যায় না। অতএব লোক-সংখ্যা যদি অতি দ্রুতগতিতে বাড়িতে থাকে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই।

কিন্তু লোক বাড়িতে পারে যে হারে লোককে বাঁচাইয়া রাখিবার কলকব্জা,—অর্থাৎ ভাত-কাপড়—ঠিক সেই হারে বাড়িতে পারে কিনা সন্দেহ। আবার সেই ম্যাল্‌থাসের বাণী কানে পশিতেছে। ৩০০০ বৎসরের ভিতর লোক-সংখ্যা এত বাড়িতে পারে যে, বর্ত্তমান ভূমণ্ডলের মতন ১২টা ভূমণ্ডলেও নরনারীর ঠাঁই কুলাইবে না। কিন্তু আজকাল আমাদের তাঁবে যে ধরাপানা আছে তাহার পাহাড়-পর্ব্বত, খনি-নদী-হ্রদ-বন সবই ষোল আনা "চষিয়া" শেষ করিতে ৬০০।৭০০ বৎসরের বেশী লাগিবে না। অর্থাৎ এই সময়ের ভিতরেই পৃথিবী তাহার মানুষ ভরণপোষণ করিবার ক্ষমতার চরম দেখিয়া বসিবে। পৃথিবী যখন মানুষকে "জবাব" দিবে মানুষের অবস্থা তখন নেহাৎ কাহিল হইবে সন্দেহ নাই।

এইখানে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের লোকসংখ্যার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অ্যাড্‌মিরাল রজারের কথা বেশ চিত্তাকর্ষক। ১৯২৪ সনের আগষ্ট মাসে তিনি হ্বিলিয়ামস্টার্ডনের এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন,—"যুক্তরাষ্ট্রে আজ ১১ কোটি ২০ লক্ষ নরনারী বাস করে। যে হারে লোক বাড়িতেছে তাহাতে মনে হয় যে, ২০ কোটির কোঠায় পৌছিতে বেশী দিন লাগিবে না। ১৯৬০-৭০ সনের দশকে সেই কোঠায় আসিয়া ঠেকিব। তখন আমরা হয়ত নব নব জনপদ দখল করিয়া আমাদের "অতিরিক্ত" লোকজনের আবাসভূমি ঢুঁড়িতে বাধ্য হইব। কাজেই লোক-সংখ্যার কল্যাণে লড়াইয়ের প্রচেষ্টা অবশ্যম্ভাবী।"

তবে সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য প্রশ্নও উঠিতে বাধ্য। সভ্যতার ইতিহাসে কতকগুলা নবীন সমস্যা কঠোর আকারে দেখা দিতেছে। শীঘ্রই মানবজাতিকে এইসকলের জবাব দিতে হইবে। প্রশ্নটা এই :—"জগতের অধিকসংখ্যক নরনারী এক সঙ্গে কথঞ্চিৎ মাঝারি-গোছের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিবে? না, অল্পসংখ্যক লোক প্রত্যেকে বেশী-বেশী সুখ-স্বচ্ছন্দতার অধিকারী হইবে?" কাজেই কৃত্রিম উপায়ে লোক-সংখ্যা কমাইবার আন্দোলনও বর্ত্তমান নৈতিক-আধ্যাত্মিক জীবনের অন্যতম অঙ্গ বিবেচিত হইতে থাকিবে।

ইণ্ডিয়ান ইনশিওর‍্যান্স জার্ণ্যাল

(ভারতীয় বীমা পত্রিকা) মাসিক; মে ১৯২৬ :—(১) ভারতের বীমা-ব্যবসা সম্বন্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধ বাহির হইতেছে; (২) ১৯২৪ সনে বীমা-ব্যবসা ভারতে কতখানি উন্নতিলাভ করিয়াছে তাহার সরকারী রিপোর্ট হইতে খানিকটা চুম্বক প্রকাশ করা হইয়াছে। তথ্যগুলা মূল্যবান। ৬,৮৮,৫৯,২৫৯ টাকা মূল্যের বীমা ১৯২৪ সনে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ৩৬,২৫১ জন লোক বীমা করিয়াছে। এইজন্য তাহারা চাঁদা দিয়াছে ৩৮,১৫,৩১৮। অবশ্য এইসব অঙ্কে অ-ভারতীয় নরনারীর কাজকর্ম্মও ধরিতে হইবে।

হিন্দুস্থান রিভিউ

কলিকাতার ইংরেজি ত্রৈমাসিক, মে ১৯২৬ :—(১) রাজকীয় কৃষি-তদন্ত কমিশন ও সমবায় (মাননীয় শ্রীযুক্ত ডি, রামদাস পান্টুলু বি, এ, বি,এল) ১৮৬৬ সন হইতে অদ্যাবধি দেশের কৃষির উন্নতি বিষয়ে সরকারী প্রচেষ্টার ইতিবৃত্ত। কৃষি ও সমবায়-বিষয়ক তথ্যমূলক রচনা। (২) ভারতীয় মুদ্রা ও বিনিময় (শ্রীযুক্ত সি, গোপাল মেনন, এম, এল, সি)। ঐতিহাসিক নজির-সম্বলিত রচনা। (৩) কলিকাতার ম্যুন্সিপাল ইতিহাস (এ ডিচার)।

মহীশূর ইকনমিক জার্ণাল

(ধনবিজ্ঞান পত্রিকা) বাঙ্গালোর সিটি হইতে প্রকাশিত ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক মাসিক, মার্চ ১৯২৬ :—(১) ভারতীয় মুদ্রা-সমস্যা (বি, এন চাটার্জ্জি এম,এ, বি,এল, ও দয়া শঙ্কর দুবে, এম, এ, এল, এল, বি), (২) ভারতে সমবায় (বোম্বাই ল্যটের বক্তৃতা), (৩) শিল্প, বাণিজ্য, ব্যবসা (লণ্ডন য়ুনিভার্সিটী কলেজের পণ্ডিত পি, এ, চেষ্টের বক্তৃতা), (৪) জাপান ও ভারতীয় কলওয়ালা।

অ্যাগ্রিকালচারাল জার্ণ্যাল অব ইণ্ডিয়া

(ভারত সরকারের কৃষি-দপ্তর কর্ত্তৃক কলিকাতা হইতে প্রকাশিত দ্বৈমাসিক পত্রিকা) মে, ১৯২৬ :—(১) মান্দালয়ের বর্ম্মা কৃষি-বিদ্যালয় ও গবেষণাগার, (২) ভারতে কৃষির উন্নতি (শ্রীযুক্ত আর, এস, ফিনলো, বি, এস, সি, এফ, আই সি) (৩) ভারতে ইক্ষুর আবাদ (রাও সাহেব টি, এস বেঙ্কটমান), (৪) মান্দালয় ও কিয়াকসি জেলায় ব্যক্তিগত বীজ ফার্ম্ম (এল, লর্ড, বি, এ)।

ইণ্ডিয়ান রিভিউ

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত মাসিক, মে ১৯২৬; (১) গোল্ড ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফর ইণ্ডিয়া-ভারতের জন্য সোনার মাপে মুদ্রার ব্যবস্থা (লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার এড্‌উইন ক্যানান, এম, এ, এল, এল, বি), (২) বিজ্ঞানের সাহায্যে কৃষি (কৃষিতে বিজ্ঞান); আর, বালা সুব্রাহ্মণিয়া বি,এস-সি, এ-জি।

বম্বে কো-অপারেটিভ্ কোআর্টার্লি

সমবায়-প্রথা সম্বন্ধে ইংরেজিতে একটি ত্রৈমাসিক বাহির হয় বম্বেতে। তাহাতে যেসকল তথ্য থাকে তাহা জন-সাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার ব্যবস্থা করা স্বদেশসেবক-গণের কর্ত্তব্য।

বাণিজ্যবার্ত্তা

কুমিল্লা, মাসিক, মার্চ,১৯২৬, উল্লেখযোগ্য :—(১) মহীশূরে চা আবাদের চেষ্টা, (২) পাটকলে শিফ্‌ট সিষ্টেম (মজুরদের অদল-বদল প্রথা), (৩) বঙ্গদেশে মুক্তা-ব্যবসায় ও মুক্তা-সংগ্রহ, (৪) পাটের বাজারে জুয়া।

এই মাসিকের সংবাদ ও তথ্যগুলা আগ্রহের সহিত পাঠ করিবার উপযুক্ত। একটা সংবাদ উদ্ধৃত করিতেছি।

ভিতর বাজার তুলিয়া দিবার প্রস্তাব

"ফটকা বাজার বন্ধ করা উচিত"

"সম্প্রতি কলিকাতা বেল্ড জুট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে

রয়াল এক্‌সচেঞ্জে পাটব্যবসায়ীদিগের এক সভা হইয়াছিল। ইণ্ডিয়ান জুট মিল এসোসিয়েশন, কলিকাতা জুট ডিলারস' এসোসিয়েশন, কলিকাতা জুট ফেবরিক্‌স্‌শিপারস্‌ এসোসিয়েশন, জুট ফেবরিক্‌স্‌ ব্রোকারস এসোসিয়েশন, জুট বেলারস এসোসিয়েশন এবং বেল্ড জুট শিপার্স এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিগণ তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সভাপতি মিঃ আর, এইচ, চাইল্ডকে মেসার্স আরাডংনাম কোম্পানীর সহিত ভিতর বাজারের সম্বন্ধে পাট এসোসিয়েশনের ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য বিষয়ে পরামর্শ করিবার ক্ষমতা দেন। সভাস্থলে পাট এসোসিয়েশনের একখানি চিঠি আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন সভায় ঠিক হয় যে, ভিতর বাজারের কারবারের পরিবর্ত্তন-বিষয়ে এই সম্মিলন যেরূপ ঠিক করিবেন ভবিষ্যতে সেইরূপ ভাবেই কারবার চলিবে। বর্ত্তমানে ভিতর বাজার যেরূপ চলিতেছে, সভার মতে উহা একটা জুয়ার আড্ডা মাত্র। ন্যায্যমত এখন ওখানে কারবারের আদান-প্রদান চলা অসম্ভব। কেন না, সেখানে ফটকার সাহায্যে মুখে পাটের দর উঠে ও নামে। অনেকে পাটের ঠিক কারবারী না হইয়াও উক্ত উপায়ে বিস্তর টাকা লাভ করিয়া থাকে। ভবিষ্যতে এইরূপ প্রথা তুলিয়া দিয়া বৈধ ভাবে পাটের কারবার চালাইতে হইবে। ভিতর বাজার সম্পর্কে লণ্ডনের জুট এসোসিয়েশনও নাকি উক্ত অভিমত পোষণ করিতেছেন।

প্ল্যাণ্টার্স জার্ণ্যাল অ্যাণ্ড অ্যাগ্রিকাল্‌চারিস্ট

চাষ-ব্যবসায়ীদের সাপ্তাহিক পত্রিকা, কলিকাতা; ১৩ মার্চ, ১৯২৬; উল্লেখযোগ্য:— নাদিয়াড় জেলার তামাক চাষ, বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত ডি, এম্‌ মজুমদার-লিখিত "বোম্বাই প্রদেশে তামাকের চাষ।" পুসায় অনুষ্ঠিত কৃষি-সম্মেলনে এই প্রবন্ধ বক্তৃতার আকারে প্রচারিত হইয়াছিল।

রেভ্যিু অ্যাঁতার্ণ্যাশন্যাল দ্যু ত্রাভ্বাই

মজুর ও মজুরির আন্তর্জ্জাতিক পত্রিকা। জেনেভা। বিশ্বরাষ্ট্রপরিষদের মজুর-পরিষৎ প্রকাশক। ১৯২৫-২৬ সনের শেষ কয়েক সংখ্যায় বাহির হইয়াছে:—(১) নরওয়ে দেশে "সর্ব্বনিম্ন মজুরি"-বিষয়ক আইন (ফ্রেড্রিক ফস), (২) আট ঘণ্টার রোজ, এবং তাহার প্রভাবে শিল্পপ্রণালীর উন্নতি (মিলো), (৩) মজুরদের উদ্ভাবিত কল-কব্জা সম্বন্ধে সম্পত্তি-বিষয়ক নূতন অষ্ট্রিয়ান আইন (আড্‌লার), (৪) ফ্রাঙ্কফোর্টের মজুর-পরিষৎ, মজুরদের শিক্ষাবিধান-বিষয়ক ব্যবস্থা (মিশেল)।

বাঙ্ক-আর্খিহ্ব্‌

ব্যাঙ্ক-গ্রন্থালয়। ব্যাঙ্কিং এবং ষ্টক একস্‌চেঞ্জ ও টাকার বাজার সম্বন্ধীয় পাক্ষিক পত্রিকা। ২৫ বৎসর ধরিয়া চলিতেছে। বার্লিনের হ্বাল্টার ডি গ্রুইটার কোং প্রকাশক। বর্ত্তমান বর্ষে (১৯২৫-২৬) যেসকল প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে তাহার কয়েকটা নিম্নরূপ:—(১) আমেরিকার টাকার বাজার (হ্যারমান), (২) মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে জার্ম্মাণদের সম্পত্তি (সিমন), (৩) জার্ম্মাণের রাইখ্‌স্‌বাঙ্ক বা সরকারী ব্যাঙ্কের পঞ্চাশ বৎসর বর্ষাগম উপলক্ষ্যে লিখিত রচনা (ফ্রিশ্‌), (৪) ব্যাঙ্ক অব পোল্যাণ্ডের প্রথম বার্ষিক বিবরণ (কুল্‌শেহ্বস্‌কি)।

ইতালির ব্যাঙ্ক-সম্পদ্

মিলানোর "স্তাম্পা কমার্চিয়ালে" কোম্পানী হইতে ইতালিয়ান ব্যাঙ্ক-সম্পদ্ সম্বন্ধে একখানা বই বাহির হইয়াছে। ১৯১২ হইতে ১৯২২ সন পর্য্যন্ত দশ বৎসরের ব্যাঙ্ক-বৃত্তান্ত এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। লেখকের নাম সেগ্রে। কেতাব "লে বাঙ্কে নেল উল্‌তিম দেচেন্না" অর্থাৎ "শেষ দশকের ব্যাঙ্ক সমূহ" (১৯২৬) নামে পরিচিত।

গ্রন্থকার যুদ্ধের পরবর্ত্তী কালের "স্‌ভিলুপ্‌প পাতলজিক" (অস্বাভাবিক,—ব্যাধিমূলক,—বিকাশের লক্ষণসমূহ) বিশেষ রূপেই বিবৃত করিয়াছেন। বহুসংখ্যক ইতালিয়ান ব্যাঙ্কের বার্ষিক আয়ব্যয়-তালিকা এক সঙ্গে আলোচিত হইয়াছে।

গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন অধ্যাপক আইনোদি। ইতালিয়ান রাজস্ব সম্বন্ধে এই ব্যক্তি অন্যতম বিশেষজ্ঞ। আইনোদি বলিতেছেন,—"এই দশ বৎসরের ভিতর ইতালিতে মাঝারি ব্যাঙ্কের সংখ্যা বাড়িয়াছে। ছোট এবং বড় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কমিয়াছে। কাজেই বলা যাইতে পারে যে, ইতালিয়ান সমাজের আর্থিক মেরুদণ্ড খানিকটা শক্ত হইবার দিকে অগ্রসর হইয়াছে।"

দৃষ্টান্তদ্বারা কথাটা সহজে বুঝানো যাইতে পারে। লাখ বা দশ লাখ লিয়ারের কম যেসব ব্যাঙ্কের মূলধন সেগুলা ১৯১২ সনের পূর্ব্বে সংখ্যায় ছিল শতকরা ৫২টা। কিন্তু এই দশকে শতকরা ১৩তে দাঁড়াইয়াছে। যেসকল ব্যাঙ্কের মূলধন দশ লাখের উপর আর আড়াই ক্রোরের নীচে তাহারা গুণতিতে আগে ছিল শতকরা ৪৫টা এক্ষণে হইয়াছে শতকরা ৭১। আর দশ কোটির উপর মূলধন-ওয়ালা ব্যাঙ্ক শতকরা ১·৭ হইতে ১·৪ এ নামিয়াছে।

কিন্তু সেগ্রে অথবা আইনোদির মত গ্রহণীয় কিনা সন্দেহ। বিষয়টা তলাইয়া দেখা আবশ্যক। লিয়ারের দাম প্রাক্-লড়াইয়ের যুগে যাহা ছিল আজকাল নামিতে নামিতে তাহার ⅕ অংশে দাঁড়াইয়াছে। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বে লিয়ার ছিল ভারতীয় দশ আনার সমান। আজ কাল লিয়ার মাত্র দুই আনার চেয়ে বেশী নয়। "কাগজের টঙ্কায়" লাখ বা ক্রোর লিয়ার ধরিলে সেগ্রে আর আইনোদির কথা হয়ত বা ঠিক। কিন্তু লিয়ারের আসল দাম,- "সোনার টাকা"—বিচার করিলে ইতালিয়ান ব্যাঙ্কের অবস্থা অন্যরূপ।

দশলাখ বা দশলাখের চেয়ে কম "সোনার লিয়ার" যেসব ব্যাঙ্কের পুঁজি তাহারা সংখ্যায় কমে নাই, বরং বাড়িয়াছে। পূর্ব্বে শতকরা ৫২ ছিল তাহাদের সংখ্যা, এক্ষণে তাহারা গুণতিতে শতকরা ৬১টা। আর "মাঝারি" ব্যাঙ্কগুলার—অর্থাৎ যেসব ব্যাঙ্কের পুঁজি "সোনার লিয়ারে" দশ লাখ হইতে আড়াই কোটি—তাহারা গুণতিতে বেশ নামিয়াছে। আগে ছিল ৪৫, এক্ষণে এই হার ২৮ মাত্র। অধিকন্তু, বড় ব্যাঙ্ক, যার পুঁজি দশ ক্রোর "সোনার লিয়ার",—গুণতিতে সত্যিসত্যিই বাড়িয়াছে। আগে ছিল এইগুলা সংখ্যায় ২টা। এক্ষণে ইতালিতে ৩টা এই ধরণের বড় ব্যাঙ্ক আছে। বুঝিতে হইবে আইনোদি যে কথাটা বলিয়াছেন আসল কথা ঠিক তাহার উল্টা।

জাপানী ব্যাঙ্ক

বৎসরখানেক হইল,—জার্ম্মাণ ভাষায় জাপানের ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে একখানা পুস্তিকা বাহির হইয়াছে (১৯২৫) নাম "য়াপানিশেস্ বাঙ্ক্-হেবেজেন" (জাপানী ব্যাঙ্ক-প্রথা)। লেখক শ্রীযুক্ত তুশিমোতো একজন জাপানী। প্রকাশক ষ্টুটগার্ট শহরের পোেশেল কোম্পানী। গোটা পঞ্চাশেক

পৃষ্ঠার ভিতর গ্রন্থকার জাপানের সকল প্রকার ব্যাঙ্কের বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। জমিজমার ব্যাঙ্ক, শিল্প-বাণিজ্যের ব্যাঙ্ক ইত্যাদি সকল প্রকার "কর্জ্জ-প্রতিষ্ঠানে"র-ই বিবরণ আছে। ব্যাঙ্ক-পরিচালনার ব্যবস্থা, ব্যাঙ্ক-বিষয়ক আইন-কানুন কিছুই বাদ যায় নাই। জার্ম্মাণিতে জার্ম্মাণ ভাষায় প্রকাশিত বলিয়া জার্ম্মাণির ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দফায় দফায় তুলনা সাধন করা হইয়াছে। বাঙালীর পক্ষে এই কেতাব বিশেষ মূল্যবান হইবার কথা। বাংলায় ইহার তর্জ্জমা অথবা সংক্ষিপ্তসার বাহির হইলে ভাল হয়। মূল্য ২ মার্ক (১॥০ টাকা) মাত্র। গ্রন্থকার জাপানী মুদ্রা-সমস্যা সম্বন্ধে কোনো কথা বলেন নাই। টাকশাল, কাগজের টাকা ইত্যাদি বিষয় আলোচনায় বাদ পড়িয়াছে।

বিলাতে পল্লী-সংস্কার

ইংরেজ সমাজেও পল্লীসংস্কার-সমস্যা আছে। ফোর্ডহাম নামক এক পণ্ডিত "দি রি-বিল্ডিং অব রুর‍্যাল ইংল্যাণ্ড" (পল্লী-বিলাতের পুনর্গঠন) নাম দিয়া একখানা গ্রন্থ লিখিয়াছেন (১৯২৫)। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২+২১২। লণ্ডনের লেবার পাবলিশিং কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৩ শিলিঙ্।

গ্রন্থকারের মতে বিলাতী কৃষির অবনতি ঘটিয়াছে প্রধানতঃ দুই কারণে। প্রথমতঃ এই জন্য দোষী "ক্যাপিট্যালিজম্" বা পুঁজি-দৌরাত্ম্য। তাঁহার বিবেচনায় "অবাধ বাণিজ্য-নীতি"ও ইংরেজ সমাজে চাষ-আবাদের দুরবস্থার জন্য কম দায়ী নয়।

কো-অপারেশ্যন বা সমবায়-প্রণালী চাষের কতটা উন্নতি-সাধন করিতে পারিয়াছে? ফসল উৎপন্ন করিবার কাজে সমবায় প্রথায় অনেক উপকার হইয়াছে সত্য। কিন্তু বাজারে এইসকল মাল জোগাইবার কাজে সমবায়-প্রথা বিশেষ কার্য্যকর হইতে পারে নাই। বাজারের মামুলি দোকানদারেরা এই প্রথার যম-বিশেষ। তাহারা ঘোঁট-মজল করিয়া "সমবায়ী" বেপারীদিগকে কাবু করিতেছে।

কৃষির উন্নতি-বিধানের জন্য গ্রন্থকার কয়েকটা চরম দাওয়াইয়ের ব্যবস্থা করিতে চাহেন। সংসার হইতে ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্কার এবং টাকা-কড়ির দালাল নামক জীব তুলিয়া দেওয়া আবশ্যক। বাঁধা দাম নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। মালের উৎপাদনকারী এবং মালের ভোগকর্ত্তাদের মধ্যে কোনো তৃতীয় শ্রেণীর লোক থাকা উচিত নয়। প্রত্যেক শিল্পকর্ম্মের কর্ত্তা ও পরিচালক থাকিবে মজুরেরা নিজে। আর যদি লাভ কিছু জমে, তাহা হইলে শিক্ষা-প্রচারের জন্য তাহা খরচ করা কর্ত্তব্য। এইসকল মত অনুসারে কাজ চলিলে ইংরাজ পল্লী পুনর্গঠিত হইতে পারিবে।

সাউথ ক্যালকাটা সেবক-সমিতি

১৯২৪-২৫ সনে দক্ষিণ কলিকাতা সেবক-সমিতি যেসকল কাজ করিতে পারিয়াছেন এই পুস্তিকায় তাহার বিবরণ আছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এই সমিতির সভাপতি ছিলেন। ঠিকানা,—১।১এ দেবেন্দ্র ঘোষ রোড, ভবানীপুর।

অভয়-আশ্রম

তৃতীয় বার্ষিক কার্য্যবিবরণী, কুমিল্লা হইতে প্রকাশিত, ১৯২৬। ১৯২৫ সনের উদ্বর্ত্তপত্রে অঙ্ক দেখা গেল ১,১৬,৫৬৪৮০। আলোচ্য বর্ষে চাঁদা ও খুচরা সংগ্রহ ছিল ২৯,৩৯২৮৶১০।

নবীন মুদ্রা-নীতির গোড়াপত্তন

লড়াইয়ের পরবর্ত্তী কালে দুনিয়ার সকল দেশেই মুদ্রা-সংস্কারের সমস্যা দেখা দিয়াছে। কাগজের টাকা কমানো আর টাকার পরিমাণ কমানো এই হইয়াছে সংস্কার-ব্যবস্থার প্রধান মূর্ত্তি। পারিভাষিকে বলে "ডিফ্লেশ্যন"। ইংল্যাণ্ড, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স এবং চেকো-স্লোবাকিয়া,—এই চার দেশে "ডিফ্লেশ্যন"-নীতি কিরূপ ভাবে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে সেই বিষয়ে আলোচনা করিয়া প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ধনবিজ্ঞানাধ্যাপক শার্ল রিস্ত "লা দেফ্লা সিঅঁ অঁ প্রাতিক" (কার্য্যক্ষেত্রে মুদ্রার পরিমাণ-হ্রাস) নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন (১৯২৪)। সেই গ্রন্থের জার্ম্মাণ সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে (১৯২৫)।

রিস্ত্ বলিতেছেন,—"মুদ্রা-সংস্কারের প্রথম দফা হইতেছে সরকারী গৃহস্থলীর আয়-ব্যয়ে সামঞ্জস্য-স্থাপন। গবর্মেণ্টের বাজেট-কারবারই মুদ্রা-নীতির গোড়ার কথা। বাজেটে

যত দিন পর্য্যন্ত খরচের ঘর জমার ঘরের চেয়ে পুরু তত দিন দেশের ভিতরকার মুদ্রা-ব্যবস্থায় গণ্ডগোল থাকিতে বাধ্য। যুদ্ধ থামিবামাত্র,—এই কারণে,—গবর্মেণ্টগুলা নিজ নিজ ঘর সামলাইতে বাধ্য হইয়াছিল।"

"ঘর সামলাইবার" জন্য কি কি করা হইয়াছে? প্রত্যেক দেশেই সরকারী আয় বাড়াইবার চেষ্টা চলিয়াছে। অধিকন্তু, বিদেশে টাকা কর্জ্জ লইয়াও বাজেটের সামঞ্জস্য রক্ষা করা হইয়াছে।

এই কথাটার উপর জোর দেওয়া রিস্তের প্রধান উদ্দেশ্য। বাজেটে সাম্য স্থাপিত না হইলে কোনো দেশের মুদ্রাপদ্ধতি স্থিরপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত না। এই হইতেছে রিস্তের মত।

আর একটা কথা এই সঙ্গে রিস্তের আলোচনায় পরিষ্কার রূপে বুঝা যায়। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য-ক্ষেত্রে আমদানি-রপ্তানির সাম্য দুনিয়া হইতে উঠিয়া গিয়াছিল। নগদ টাকাকড়ি না পাঠাইয়া কোনো দেশ অপর কোনো দেশের সঙ্গে কারবার চালাইতে পারিত না। কাজেই আন্তর্জ্জাতিক দেনা-পাওনায় গণ্ডগোল বাধিত। মুদ্রা স্থিরীকৃত হইবামাত্র এই গণ্ডগোল চুকিয়াছে। বহির্ব্বাণিজ্যে দেনা-পাওনা-সমস্যা আজ কাল আর জটিলতাপূর্ণ নয়।

মুদ্রার স্থিরীকরণ কাণ্ডটা "সোনার মাপে" টাকাকড়ির মূল্য-নির্দ্ধারণ ছাড়া আর কিছু নয়। অর্থাৎ কথায় কথায় ছাপাখানায় কাগজ ছাপিয়া তাহাকে টাকা বলিয়া সমাজকে গতানো উঠিয়া গিয়াছে। এই "কাগজের রাজ্য" লুপ্ত হওয়া অবধি দেশে দেশে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য আবার প্রাক্-লড়াইয়ের অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে।

কুদরতী মাল ও খাদ্যদ্রব্য

১৯২৩ সনের জুলাই ও আগষ্ট মাসে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের হ্বিলিয়ামস্-টাউন নগরে বিলাতী "রাউণ্ড টেব্‌ল্" সভার বৈঠক বসিয়াছিল। সভাপতি ছিলেন মার্কিণ "টারিফ কমিশনে"র (শুল্ক-কমিটির) উপ-সভাপতি কালবার্ট্‌সন। সেই মজলিশের আলোচ্য বিষয় ছিল কুদরতী মাল ও খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধে আন্তর্জ্জাতিক সমস্যা।

সেইসকল আলোচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সঙ্কলন করিয়া এবং আরও অনেক তথ্য জুড়িয়া দিয়া কালবার্ট্‌সন একখানা ২৯৮ পৃষ্ঠার গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ফিলাডেল্‌ফিয়ার "আমেরিকান অ্যাকাডেমি অব পোলিটিক্যাল অ্যাণ্ড সোশ্যাল সায়েন্স" কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে (১৯২৪)। মূল্য দুই ডলার।

প্রথম অর্দ্ধে আলোচিত হইয়াছে রাউণ্ড টেব্‌ল্ সভার মন্তব্য এবং সমালোচনাসমূহ। এইগুলা ছয় বিভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্গত। (১) আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের কারবারে কুদরতী মাল সম্বন্ধে কোন্ দেশ কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকে—এই গেল প্রথম দফা। (২) দ্বিতীয় দফা হইতেছে খাদ্যদ্রব্য-বিষয়ক বাণিজ্য-নীতি। (৩) বিভিন্ন দেশের শুল্ক-নীতি তৃতীয় বিভাগের আলোচ্য বিষয় ছিল। (৪) চতুর্থ আলোচ্য বিষয় ছিল বিভিন্ন দেশের ব্যবসাবাণিজ্য-বিষয়ক সংবাদ-প্রচার সম্বন্ধে কোন্ দেশ কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করে, তাহার আলোচনা। (৫) লোক-সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারে প্রত্যেক দেশে আর্থিক চাঁড়ের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। তাহার প্রভাবে বাণিজ্য-নীতি কিরূপ পরিবর্ত্তিত হয়, তাহার বিশ্লেষণ ছিল "রাউণ্ড টেবল্" বৈঠকের পঞ্চম দফার অন্তর্গত। (৬) ষষ্ঠ আলোচ্য বিষয় ছিল লড়াইয়ের ব্যবস্থায় কুদরতী মাল ও খাদ্যদ্রব্যের ঠাঁই সম্বন্ধে বিচার।

বৈঠকে অনেক পাকা মাথার ঠোকাঠুকি চলিয়াছিল। কাজেই আলোচনাগুলার ভিতর বস্তুনিষ্ঠা প্রচুর পাওয়া যায়। যাহারা ব্যবসা-বাণিজ্যের কারবারে লিপ্ত আছেন তাঁহাদের পক্ষে তথ্যগুলা বেশ দামী। আর যাঁহারা দেশোন্নতি, রাষ্ট্রীয় উন্নতি অথবা আর্থিক উন্নতির জন্য মাথা ঘামাইতে অভ্যস্ত তাঁহারাও এই সমুদয় তথ্যে ভবিষ্যতের জন্য অনেক-কিছু ইঙ্গিত পাইবেন।

গ্রন্থের অপর অর্দ্ধে আছে কালবার্টসনের নিজের গবেষণা। কুদরতী মালের জোগান সম্বন্ধে তাঁহার প্রচারিত তথ্য ও মতগুলা যে-কোনো ধনবিজ্ঞান-সেবীর কাজে লাগিবে। দেশের শক্তি-বৃদ্ধির তরফ হইতে গ্রন্থকার এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কুদরতী মালের জোগানটা একটা "সমস্যায়" দাঁড়াইয়াছে কেন? প্রথমতঃ, দেশের

চতুঃসীমা বাড়িতেছে। দ্বিতীয়তঃ, শিল্প-বিপ্লব দেখা দিতেছে নতুন আকারে। আর তৃতীয়তঃ, কোনো কোনো জাতির তাঁবে বিপুলায়তন সাম্রাজ্য শাসিত হইতেছে।

এই সমস্যার জটিলতা বিশ্লেষণ করিবার পর কালব্যাটসন নানা দেশের "কুদরতী মালের জোগান-প্রণালী" বস্তুনিষ্ঠ রূপে বিবৃত করিয়াছেন। ঐতিহাসিক এবং সমসাময়িক আর্থিক ব্যবস্থার বৃত্তান্ত-হিসাবে এই অধ্যায় যার পর নাই দামী কথায় ভরা। এই উপলক্ষ্যে আলোচিত হইয়াছে:—(১) আমদানি ও রপ্তানির উপর সংরক্ষণ শুল্ক-প্রথা, (২) মাল সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা ও প্রবেশাধিকারের অনুমতি, (৩) পক্ষপাত-মূলক শুল্ক-ব্যবস্থা, (৪) রপ্তানি-সাহায্য, (৫) সরকারী একচেটিয়া ব্যবসা, (৬) উৎপাদনকারীদের যৌথ প্রচেষ্টা ও সমবায়, (৭) বেপারীদের সঙ্ঘ, (৮) বিদেশী পুঁজিপতিদিগকে স্বদেশের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক সুযোগ প্রদানের ব্যবস্থা।

কাল্‌বাটসন ইয়াঙ্কি। তিনি নিজ জন্মভূমির তরফ হইতেই সকল কথা খুলিয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু সমগ্রবিশ্বের আর্থিক ব্যবস্থা সম্বন্ধেও তাঁহার মতামত অযুক্তিসঙ্গত নয়।

বৃটিশ ও জার্ম্মাণ আয়-কর

অনেকদিন হইতেই জার্ম্মাণির রাজস্ব-সংস্কারকেরা ইংরেজের কর-নীতির তারিফ করিয়া আসিতেছেন। কম-সে-কম আয়-কর আদায় করিবার বৃটিশ প্রথাটা জার্ম্মাণ সমাজে চালাইবার স্বপক্ষে অনেক পণ্ডিতই মত দিয়াছেন।

বিলাতী প্রথার অন্যতম ভক্তরূপে ডীট্‌ৎসেল সুপরিচিত। বিশ্বযুদ্ধ থামিবার পরের বৎসর,—১৯১৯ সনে, ডীট্‌ৎসেলের লেখাগুলা "ফারাইন ফ্যির সোৎসিয়ালপোলিটিক" (সামাজিক রাষ্ট্রনীতি পরিষৎ) কর্ত্তৃক প্রকাশিত রচনাবলীর অন্তর্গত হইয়া বাহির হয়। ডীট্‌ৎসেল বলেন—"ঠিক যেখানে যেখানে কোন আয়ের উৎপত্তি হয় ইংরেজ গবর্মেণ্ট ঠিক সেইখানেই কর বসাইতে অভ্যস্ত। কিন্তু জার্ম্মাণ সমাজে এই নিয়ম প্রচলিত নয়। এই নিয়ম কায়েম করিলে আয়-কর সম্বন্ধে জার্ম্মাণিতে সুবিচার ঘটিতে পারিবে।"

সরকারী খাজনার সঙ্গে আন্যান্য প্রশ্ন ও জড়িত। খাজনার ভারটা সকল দেনাদারের পক্ষে "সমান" কিনা? এই প্রশ্ন রাজস্ব-প্রথায় বড় ঠাঁই অধিকার করে। অধিকন্তু, যে-যে লোক কোনো প্রকার কর দিতে আর্থিক হিসাবে অসমর্থ তাহাদিগকে রেহাই দিবার রেওয়াজ অল্পবিস্তর সর্ব্বত্রই আছে। এই হিসাবে জার্ম্মাণরা ইংরেজের নিকট কিছু শিখিতে পারে কিনা তাহাও আজকাল জার্ম্মাণিতে আলোচিত হইতেছে।

সকল কথা তলাইয়া মজাইয়া বুঝিবার জন্য ফ্রান্ৎস মাইজেল এক সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন (১৯২৫)। কেতাব প্রকাশিত হইয়াছে ট্যিবিঙ্গেন হইতে মোর কোম্পানী কর্ত্তৃক। প্রায় শ'পাঁচেক পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সম্পূর্ণ। "বৃটিশে উণ্ড ডায়চে আইনকোমেন-ষ্টয়ার" গ্রন্থে দুইদেশের আয়-কর প্রথা তুলনায় সমালোচিত হইয়াছে। তুলনার দফা প্রধানতঃ দুই:—(১) আয়-করের "মোরাল" অর্থাৎ ন্যায়ান্যায়, যৌক্তিকতা বা সমাজ-নীতি এবং (২) আয়-করের "টেক্‌নিক" অর্থাৎ আদায়-প্রণালী।

বিলাতে কর উশুল করা হয় আয়ের উৎপত্তিস্থলে। কিন্তু জার্ম্মাণিতে (এবং অষ্ট্রিয়ায় ও পুরাতন অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গারি হইতে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশসমূহে) আয়-কর আদায় করা হয়—আয়টা লোকজনের পকেটস্থ হইবার পরে। বিলাতী প্রথায় আফিসে বা কর্ম্মকেন্দ্রেই কর্ম্মচারীদের বেতন হইতে আয়-কর কাটিয়া রাখিবার ব্যবস্থা আছে। চাকুরেরা

দেয় টাকাটা স্পর্শ করিবার সুযোগই পায় না। আর জার্ম্মাণ প্রথায় আয়-কর-দেনেওয়ালা লোকেরা নিজ নিজ ট্যাঁক হইতে গুণিয়া খাজাঞ্চির আফিসে কর সমঝিয়া দিয়া আসিতে অভ্যস্ত। এই প্রথাই মোটের উপর সমগ্র মধ্য-ইয়োরোপে প্রচলিত।

মাইজেল বলিতেছেন,—"এই জার্ম্মাণ বা মধ্য-ইয়োরোপীয় প্রথাকে নেহাৎ নিন্দনীয় বিবেচনা করা উচিত নয়। ইহার ভিতরেও অনেক সু আছে। প্রথমতঃ, খাজনার পরিমাণ এই প্রথায় বেশী হয়। দ্বিতীয়তঃ, করদাতার সংখ্যা বাড়িয়া চলে। তৃতীয়তঃ, আয়ের পরিমাণ বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতর হারে কর বসাইবার ব্যবস্থা করা যায় অপেক্ষাকৃত সহজে। চতুর্থতঃ, প্রত্যেক কর-দাতার সকল প্রকার আর্থিক অবস্থা বুঝিয়া শুনিয়া করের হার বা পরিমাণ ধার্য্য করা সম্ভব।"

মোটের উপর,—জার্ম্মাণ প্রথায় খাজনা উশুল হইতে পারে বেশী। কিন্তু এই প্রথার অসুবিধাও কম নয়। কর-সংগ্রাহকের হাত এড়াইয়া পার পাইতে পারে অনেকে। এই দোষ অষ্ট্রীয়ার রাজস্ববিভাগে প্রচুর দেখা যায়। অষ্ট্রীয়ান খাজাঞ্চিখানার অঙ্ক-তালিকায় দেখিতে পাই যে, যেসব লোক বাঁধা মাহিয়ানা পায় তাহাদের নিকট হইতে আয়-কর বেশ নিয়মিতরূপে এবং আইন-মাফিকই আদায় হয়। কিন্তু জমিজমার মালিকেরা করাদান হইতে সহজেই আত্মরক্ষা করিয়া থাকে। আর ফ্যাকটরি-কারখানা-ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানের মালিকেরাও এই বিষয়ে খুব হুঁসিয়ার। এই দুই শ্রেণীর কর-দাতার নিকট হইতে যত আদায় হয় তাহা বাঁধা-মাহিয়ানা-ভোগী চাকুর্‌য়েদের নিকট হইতে আদায়-করা খাজনার তুলনায় আপেক্ষিক হিসাবে অনেক কম।

অষ্ট্রীয়ার কথা জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত নানা প্রদেশ সম্বন্ধেও খাটে। এইসকল দেশে কিষাণ-জমিদারেরা এবং শিল্প-বাণিজ্যের স্বত্বাধিকারীরা অষ্ট্রীয়ার তুলনায় পরিমাণে কিছু বেশী আয়-কর দেয়। কিন্তু সমগ্র রাজস্ব-তহবিলে বেতন-ভোগী চাকুর্‌য়েদের নিকট হইতে আদায়-করা আয়-করের হিস্যাই শতকরা হিসাবে বেশী। বুঝিতে হইবে, অন্যান্য শ্রেণীর করদাতারা গবর্মেণ্টকে ফাঁকি দিয়া আসিতেছে।

এইসকল ফাঁকিবাজির সুযোগ থাকা সত্ত্বেও মধ্য-ইয়োরোপীয় প্রথায় আয়-কর পরিমাণে খুব বেশীই দেখা যায়। কাজেই মাইজেল এই প্রথাকে মোটের উপর সুনজরে দেখিতেই প্রস্তুত। তবে তাঁহার মতে এই বিষয়ে কঠোরতর আইন কায়েম হওয়া আবশ্যক। অধিকন্তু, আদালতের বিচারেও কথঞ্চিৎ বেশী পরিমাণে সাজা দিবার ব্যবস্থা থাকা উচিত।

বিলাতী আয়-করের ব্যবস্থা দফায় দফায় আলোচনা করিয়া মাইজেল জার্ম্মাণির ব্যবস্থার সু-কু দেখাইয়াছেন। ইংরেজ খাজাঞ্চিখানায় "ক" শ্রেণীর করদাতাদের ভিতর পড়ে ভূমির মালিক। জমিদারী, গির্জ্জা-সম্পত্তি, এবং বিভিন্ন দেবোত্তর, "বিদ্যোত্তর" ইত্যাদি নানা প্রকার জমিজমার আয় হইতে প্রাপ্ত কর এই শ্রেণীর সামিল। মাইজেলের মতে,—বাড়ীঘর, ইমারত ইত্যাদি হইতে ইংরেজ সমাজের আদায় বেশ প্রচুর। আর চাষ-আবাদ, জমিজমা হইতে বৃটিশ গবর্মেণ্ট জার্ম্মাণ, অষ্ট্রীয়ান এবং অন্যান্য মধ্য-ইয়োরোপীয় গবর্মেণ্টের চেয়ে অনেক বেশী আদায় করিয়া থাকেন।

তবে এইখানে একটা প্রশ্ন উঠিতেছে। ইংরেজ সমাজে জমিদারী হইতে আয়-কর এত বেশী উঠে কেন? মধ্য-ইয়োরোপে বর্ত্তমানকালে এবং আজকালকার ভূমি-ব্যবস্থায় আসল জমিদার,—অর্থাৎ বিপুলবিস্তৃত ভূখণ্ডের মালিক নামক শ্রেণী এক প্রকার নাই। কিষাণেরা স্বয়ংই জমিদার; অথবা জমিদারেরা স্বয়ংই নিজ নিজ জমিজমা মজুরের সাহায্যে চষাইয়া ধনদৌলত সৃষ্টি করিতে অভ্যস্ত। রাইয়ত, প্রজা ইত্যাদি বলিলে যে শ্রেণীর লোক বুঝা যায় তাহার সংখ্যা নেহাৎ কম। এই শ্রেণী উঠিয়া যাইতেছে বা গিয়াছে বলিলেও চলে। কিন্তু বিলাতে জমিদার-রাইয়তের সম্বন্ধ এখনো অটুট রহিয়াছে। সে দেশে ভূম্যধিকারীদের নিকট হইতে জমি ভাড়া করিয়া লইয়া চাষীরা আবাদ চালাইতে অভ্যস্ত। জমিদারেরা চাষের ধার ধারে না। তাহারা ভাড়া-দেওয়া জমির জন্য "প্রজা"দের নিকট হইতে খাজনা ভোগ করিয়া থাকে।

সুতরাং জমিজমা সম্বন্ধে বৃটিশ ও জার্ম্মাণ আয়-করের প্রভেদ দেখিবার সময়ে স্বভাবতই সন্দেহ উপস্থিত হয়,—

প্রভেদটা কি রাজস্ব-নীতির প্রভেদের ফল? বোধ হয় ভূমি-ব্যবস্থা এবং জমিজমার আইন-কানুনকেই এই প্রভেদের আসল কারণ বিবেচনা করিলে বিষয়টা ঠিক বুঝা হইবে।

"খ" শ্রেণীর কর-দাতা হইতেছে রাইয়ত, প্রজা বা চাষীরা। জমিদারকে যে পরিমাণ খাজনা দেওয়া হয় তাহার মাপে গবর্মেণ্ট রাইয়তদের নিকট হইতে কর আদায় করে। মাইজেল বলেন,—"এই প্রণালীতে করটা আদায় করা সহজ। আর আদায়টা নিশ্চিতও বটে। কিন্তু মোটের উপর আদায়ের পরিমাণ অল্প।"

ইংরেজ আয়-করের "গ" শ্রেণীতে পড়ে সকল প্রকার সুদ। এই উপলক্ষ্যে লগ্নি-কারবারের, ব্যাঙ্কে জমা-রাখার, কোম্পানীর কাগজের এবং এই ধরণের অন্যান্য নির্দ্দিষ্ট আয়-যুক্ত সম্পত্তির হিসাব-নিকাশ করা তহশিলদারদের কার্য্য। গবর্মেণ্ট দেশের নরনারীর নিকট হইতে যেসকল সরকারী কর্জ্জ লন তাহার বার্ষিক বা ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক সুদ ভোগ করা কর্জ্জদাতাদের জীবনে একটা ছোট কথা নয়। বড় বড় নগরশাসক-সঙ্ঘও এইরূপ কর্জ্জ লইতে এবং সুদ দিতে অভ্যস্ত। প্রায় সকল সুদের উপরই গবর্মেণ্টের খাজনা আদায় করিবার দস্তুর আছে।

সুদের উপর কর বসাইতে যাইয়া ইংরেজ গবর্মেণ্টকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। কেন না, ঠিক যে যে কর্ম্মকেন্দ্রে সুদ জমা হইতেছে সেইসকল কর্ম্মকেন্দ্রের কর্ত্তারা কর্জ্জদাতাদের সুদের হিস্যা হইতে কর কাটিয়া রাখিয়া গবর্মেণ্টকে সমঝাইয়া দেয়।

যে সকল লোক বাঁধা মাহিয়ানা বা পেন্‌শ্যন পায় তাহারা এক স্বতন্ত্র (ঙ) শ্রেণীর অন্তর্গত। মধ্য-ইয়োরোপে এই দফায় যত আয়-কর আদায় হয় বিলাতে তত হয় না। ইংরেজ-সমাজে সরকারী চাকুরেদের শাসন সম্বন্ধে উপর-ওয়ালারা যথোচিত পরিমাণে যত্নশীল নয়। জার্ম্মাণিতে কড়াক্কড়ি খুব বেশী। এই কারণে জার্ম্মাণিতে আদায় হয় বেশী। মাইজেলের মতে এই দফা সম্বন্ধে বিলাতের নিকট জার্ম্মাণ গবর্মেণ্টের নতুন-কিছু শিখিবার নাই।

"ঘ" শ্রেণীর আয়-কর দেয় বণিকেরা, শিল্পীরা এবং খনিওয়ালারা। করটা আদায় করা বিলাতের গামুলি প্রণালীতে অসম্ভব। কেন না,—এইসকল ক্ষেত্রে "ধনের উৎপত্তিস্থলে" কর বসানো সহজ কথা নয়। কারখানা, ব্যবসা ও খনির স্বত্বাধিকারীরা নিজ নিজ কারবারের ভাল-মন্দ যেমন রিপোর্ট দেয় গবর্মেণ্ট তাহার উপরই নির্ভর করিতে বাধ্য। বলা বাহুল্য, আসল খবর পুরাপুরি জানা যায় না। অধিকন্তু, দেশের ভিতরকার কোন্ কোন্ ব্যক্তি বা কোম্পানী কর দিতে বাধ্য তাহার তালিকা আজও সম্পূর্ণ নয়। কাজেই "ঘ" দফায় বৃটিশ গবর্মেণ্টের হাত হইতে ফস্‌কিয়া যায় অজস্র টাকা। মাইজেলের মতে, প্রুশিয়ার জার্ম্মাণ ব্যবসায়ীরা গবর্মেণ্টকে যতটা ঠকাইতে পারে, বিলাতের গবর্মেণ্টকে ইংরেজ কারবারীরা তাহার চেয়ে বেশী ঠকাইয়া থাকে।

খুঁটিয়া খুঁটিয়া দফায় দফায় আলোচনা করিলে দেখা যায় যে,—ইংরেজের আদায়-প্রণালীটাকে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ঠাওরানো উচিত নয়। তাহার ভিতর গলদ রহিয়াছে অনেক। কাজেই চোখ-কান বুজিয়া ইংরেজের প্রণালী হুবহু নকল করিবার বিরুদ্ধে মাইজেল রায় দিতেছেন।

একটা অসুবিধার কথা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। আজকালকার দিনে আয়ের পরিমাণ বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে করের হার বাড়াইয়া দিবার রীতি সর্ব্বত্র অল্প-বিস্তর চলিতেছে। ইহাকে "প্রোগ্রেসিভ্" (বর্দ্ধনশীল) করাদান বলা হইয়া থাকে। কিন্তু বিলাতের মতন দেশে,—যেখানে আয়ের উৎপত্তিস্থলে কর আদায় করা দস্তুর, সেখানে এই বর্দ্ধনশীল প্রথা কায়েম করা খুবই কঠিন। কেননা, অনেক ব্যক্তির আয় আসে এক সঙ্গে বহু ক্ষেত্র হইতে। এই ভিন্ন ভিন্ন আয়ের কেন্দ্রে তাহাদের কর দিবার যথার্থ ক্ষমতা পূরা মাত্রায় আন্দাজ করা সম্ভব নয়। কোনো ব্যক্তির সকল প্রকার আয় একত্র হইবার পর তাহার আসল ঐশ্বর্য্য এবং সমাজ দেশ বা গবর্মেণ্টকে কর দিবার খাটি ক্ষমতা বুঝিতে পারা যায়।

তথাপি ইংল্যাণ্ডে "প্রোগ্রেসিভ্" প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়া গেল কি করিয়া? মাইজেলের মতে কারণটা ঢুঁড়িতে হইবে দুনিয়ার বর্ত্তমান ঝোঁকের ভিতর। বিশ্বশক্তি আজকাল সমাজ-তন্ত্রের প্রভাবে ধনীদের ধনদৌলতের উপর আক্রোশশীল।

বিলাতের গবর্মেণ্টও এই সোশ্যালিজ্‌মের দিগ্বিজয় হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই।

কিন্তু এখন আর বিলাতের সেই ইংরেজ-সুলভ, সনাতন "উৎপত্তিস্থলে করাদায়"-নীতি অটুট থাকিতে পারে কি? পারে না;—ইংরেজদের রাজস্ব-দক্ষ পণ্ডিতেরা "উৎপত্তি-স্থলের" মায়া কাটাইয়া ক্রমশঃ ব্যক্তিমাত্রের সমগ্র আয়টার হিসাব করিবার দিকে ঝুঁকিতেছেন। আর যেই সমগ্র আয়ের কথা ভাবা হইতেছে তখনই প্রকারান্তরে ইংরেজ সমাজ জার্ম্মাণ রাজস্ব-নীতির দিকে অগ্রসর হইতেছে না কি? তাহা অবশ্য এখনো ভবিষ্যতের কথা। ইংল্যাণ্ডের রাজস্ব-সংস্কারকদের মাথার ভিতর এইসকল চিন্তা খেলিতেছে।

ইংরেজ সমাজ জার্ম্মাণ-ঘেঁসা হইতে চলিল বটে। কিন্তু জার্ম্মাণ সমাজেরও আবার ইংরেজ-ঘেঁসা না হইয়া উপায় নাই। মাইজেলের মতন ভবিষ্যপন্থী জার্ম্মাণ রাজস্ববিদেরা বলিতেছেন,—"জার্ম্মাণ খাজাঞ্চিখানার শাসনে আইন-কানুনের আওতা যতটা দেখিতে পাই, ধনবিজ্ঞানের প্রভাব ততটা নাই। কিন্তু ইংরেজেরা আর্থিক ব্যবস্থার খুঁটিনাটি আল্‌গা আল্‌গা করিয়া বিশ্লেষণ করিতে সুপটু। জার্ম্মাণিতে এই আর্থিক বিশ্লেষণ-দক্ষতা আমদানি করা আবশ্যক।"

জার্ম্মাণিতে আজকাল যে-সব "প্রত্যক্ষ" (ডাইরেক্ট) কর আছে সেগুলাকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া "অপ্রত্যক্ষ" (ইন্‌-ডাইরেক্ট) করে পরিণত করিবার দিকে ভবিষ্যপন্থীরা ঝুঁকিতেছেন না। প্রত্যেক আয়ের দফা যাহাতে চুলচেরা করিয়া বিশ্লেষণ করা হয় তাহার দিকে গবর্মেণ্টের নজর আনা জার্ম্মাণ রাজস্ব-সংস্কারকদের মতলব। তাঁহাদের মতে ধনোৎপাদনের আকার-প্রকারগুলা,—শাখায় শাখায়, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আর্থিক কর্ম্মদক্ষতার তরফ হইতে যাচাই করিয়া দেখিতে হইবে। তাহার জন্য কোনো বিপুল দপ্তর দরকার হইবে না। চাই কেবল ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্‌ বিদ্যায় অভিজ্ঞ কয়েকজন মাথাওয়ালা ধনবিজ্ঞান-দক্ষ পণ্ডিতের সমবেত কর্ম্ম। তাঁহাদের সাহায্য পাইলে গবর্মেণ্ট আয়করের ব্যবস্থা প্রচুর পরিমাণে অর্থকরীরূপে গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইবেন।

রাজস্ব-আইন

প্রায় শ' চারেক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ একখানা রাজস্ববিষয়ক বই বাহির হইয়াছে প্যারিসে। প্রকাশক সিরে কোং। এই আফিস হইতে শার্ল জিদ্‌-সম্পাদিত "রেভ্যিু দেকোনোমী পোলিটিক" নামক ধনবিজ্ঞান-পত্রিকা বাহির হইয়া থাকে। বর্ত্তমান গ্রন্থের লেখক শ্রীযুক্ত জিরো পোআতিয়ে বিশ্ববিদ্যা-লয়ের আইন-ফ্যাকাল্টির "দোইআঁ" (অগ্রণী)।

গ্রন্থের নাম "মানুয়েল দ' লেজিস্‌ লাসিওঁ ফিনাঁসিয়্যার" (রাজস্ব-আইনের কেতাব)। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড পূর্ব্বে বাহির হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান খণ্ডে আছে এক মাত্র "লে রেস্‌সর্‌ প্যিবলিক" অর্থাৎ সরকারী আয়ের আলোচনা।

সাধারণতঃ লেখকেরা রাজস্ব-বিষয়ক "তত্ত্ব-কথা" বা দার্শনিক বিশ্লেষণ লইয়া গ্রন্থ সুরু করিয়া থাকেন। গ্রন্থের শেষের দিকে খাটি বাস্তব তথ্যগুলা দিবার রেওয়াজ। কিন্তু জিরো সাহেব একদম উল্টা পথে চলিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে তথ্যগুলাই "প্লাস্‌ দ'ন্নর' অর্থৎ সম্মানের ঠাঁই পাইয়াছে। "তত্ত্বাংশ"কে ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছে পিছনে।

সরকারী আয়গুলার আলোচনায় প্রত্যেক দফা কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় এই দুই ভাগে দেখানো হইয়াছে। পল্লীতে এবং শহরে কত টাকা উঠিতেছে এবং পল্লী ও নগরের জন্য কত টাকা খরচ হইতেছে তাহা বেশ চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখানো হইয়াছে। প্যারিস শহরের শাসনকর্ত্তারা সমবেত-ভাবে যেসকল কাজকর্ম্ম দ্বারা নরনারীর সেবা করিয়া থাকে তাহার বিশদ বিশ্লেষণটা চিত্তাকর্ষক।

"ফিনাঁস্‌ লোকাল" (স্থানীয় আয়-ব্যয়) আর "ফিনাঁস্‌ দেতা" (রাষ্ট্রীয় বা কেন্দ্রীয় আয়-ব্যয়) এই দুই দফা স্বতন্ত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু করদাতার পক্ষে এই দুইয়ের প্রভেদ এক প্রকার নাই বলিলেই চলে। কেন না ট্যাকের উপর তলব পড়ে দুইয়ের ডাকেই সমান প্রণালীতে। কাজেই জিরো এই দুই দফার চুলচেরা পার্থক্য করিতে রাজি নন।

সকল দিক্‌ হইতেই গ্রন্থের আলোচনা-প্রণালী ভারতীয় বিজ্ঞান সেবীর অনুকরণীয়।

এইগুলার কোনো কোনোটা সম্বন্ধে পরে বিস্তৃত আলোচনা বাহির হইবে।

আঁসিআঁ এ নুহ্বো অ্যা প দিরেক্ত্

(প্রাচীন ও নবীন প্রত্যক্ষ কর); লম; তুলুজ; অ্যাপ্রিমারি রেজ্যনাল কোং; ১৯২৫; ২৬৯ পৃষ্ঠা।

ইণ্টারেষ্ট রেট্স্ অ্যাণ্ড ষ্টক স্পেকিউলেশ্যন

(সুদের হার এবং ষ্টকের বাজারে জুয়াখেলা; ওয়েন্স্ ও চার্ল্স; নিউ ইয়র্ক্; ম্যাক্‌মিলান কোং; ১৯২৫; ১৪ + ১৯৭ পৃষ্ঠা।

ট্রেড ষ্টেবিলিটি অ্যাণ্ড হাউ টু অবটেইন ইট

(বাণিজ্যিক স্থিতি ও শান্তি এবং তাহা আনিবার উপায়); ম্যাকারা; ম্যাঞ্চেষ্টার; শেরাট অ্যাণ্ড হুজেস্ কোং; ১৯২৫; ১৫ + ৩৬২ পৃষ্ঠা; ৫ শি।

ডি এক্স্‌পোর্ট-ওর্গানিজাট্‌সিয়োন উণ্ড্ ইরে টেখ্‌নিক

(রপ্তানি-ব্যবস্থা ও তাহার কর্ম্মকৌশল); স্তেলেনবুর্গ; লাইপৎসিগ, গ্লোকনার কোং; ১৯২৫; ২০৩ পৃষ্ঠা; ৭.৮০ মার্ক।

প্রিন্‌সিপল্‌স্ অব্ মার্চ্যাণ্ডাইজিং

(বাজারে মাল ফেলিবার নিয়ম); কোপ্‌ল্যাণ্ড; শিকাগো; শ কোং; ১৯২৫; ১৪ + ৩৬৮ পৃষ্ঠা; ৪ ডলার।

এল্‌মাঁ দি'স্তোআর মারিতিম এ কলনিয়াল কঁতেঁপরেণ

(আধুনিক সমুদ্র-বাণিজ্য ও উপনিবেশ-বিষয়ক ইতিহাস), ১৮১৫-১৯২৪; ব্রাগঁ, জোআনে, এবং আঁদ্রে বয়স্‌নে; প্যারিস; সোসিয়েতে দে'দিসিআঁ জেঅগ্রাফিক কোং; ৭২৮ পৃষ্ঠা।

১৯২৪ সনের নারদ খনন কমিটির রিপোর্ট

রাজসাহী পল্লী-সংস্কার-সমিতি-কর্ত্তৃক অনুমোদিত ও প্রকাশিত। "নারদ" একটা নদীর নাম।

রাজসাহী কোঅপারেটিভ্ ম্যালেরিয়া-নিবারণী ও পল্লী-সংস্কার-সমিতি

এই সমিতির উপবিধি পুস্তিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। সম্পাদক শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এঞ্জিনিয়ার, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।

জীবনবীমা-তত্ত্ব

শ্রীযোগেশচন্দ্র মিত্র; কলিকাতা; মিত্র অ্যাণ্ড সন্স, ২১১ মিশন রো; ১৬৬ পৃষ্ঠা; ৷৷৹ আনা।

এঙ্গেল্‌স্ আল্‌স্ ডেঙ্কার

(দার্শনিক হিসাবে এঙ্গেল্‌সের চিন্তারাশি); আড্‌লার; বার্লিন; ডীট্‌স্ কোং; ১৯২৫; ১২২ পৃষ্ঠা ৪.২০ মার্ক।

ল'মনপল্ দেজ্ আলুমেৎ আঁ ফ্রাঁস আঁ ১৯২৪

(দিয়াশলাইয়ের সরকারী একচেটিয়া ব্যবসা,—১৯২৪ সনের ফ্রাসী বৃত্তান্ত); পিদাল; দিজঁ; বের্নিগো কোং; ১৯২৪; ১৬৩ পৃষ্ঠা।

"হেল্‌থ্ মেইণ্টন্যান্স ইন্ ইণ্ডাষ্ট্রী"

(কারখানায় স্বাস্থ্য-রক্ষা); হ্যাকেট; শিকাগো; শ কোং; ১৯২৫; ২০ + ৪৮৮ পৃষ্ঠা; ৪ ডলার।

এ গাইড টু দি ষ্টাডি অব অকিউপেশ্যনস্

(জীবিকার পথ সম্বন্ধে আলোচনা) ; অ্যালেন ; লণ্ডন ; মিল্‌ফোর্ড কোং ; ১৯২৫ ; ১৫ + ১৯৭ পৃষ্ঠা ; ১০শি ৬ পে।

ফ্যাক্‌টরি লেজিস্‌লেশ্যন অ্যাণ্ড ইট্‌স অ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেশ্যন

(কারখানা-বিষয়ক আইন-কানুন ও তাহার প্রয়োগ) ; মেস ; লণ্ডন ; জি, এস, কিং কোং ; ১৯২৬ ; ১২ + ২২৮ পৃষ্ঠা ; ১২শি ৬ পে।

কার্ল্‌ মার্কাসেস ক্যাপিট্যাল

(কার্ল্‌ মার্কস্‌-প্রণীত পুঁজি-বিষয়ক গ্রন্থের সমালোচনা); লিণ্ড্‌সে ; লণ্ডন ; অক্‌স্‌ফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস ; ১৯২৫ ; ১২৮ পৃষ্ঠা ; ২ শি ৬ পে।

ফার্জিখারুংস্‌-হেবজের (বীমা-প্রথা),

আলফ্রেড মানেস ; লাইপৎসিগ ; ট্যয়বণার কোং ; ১৯২৪ ; দুই খণ্ড, ১৪ + ২৩১, ১৪ + ৩৫৭ পৃষ্ঠা, চতুর্থ সংস্করণ, ১৬·৬০ মার্ক।

প্রেসি দ' লেজিস্‌লাসিঅঁ উহ্বরিয়্যার এ অ্যাঁদুস্ত্রিয়েল

(মজুর, মজুরি ও কারখানা-বিষয়ক আইনকানুন) ; দুপ্যাঁ, দেস্‌জে এবং পাঁস্তোলেলি ; প্যারিস, দুনো কোং ; ১৯২৫ ; ৩১ + ৩৭২ পৃ।

বৃটিশে উণ্ড ড্যয়চে আইনকোমেন্‌-ষ্টয়ার

(ইংল্যণ্ড ও জার্ম্মাণির আয়কর) ; ফ্রান্‌ৎস্‌ মাইজেল ; ট্যিবিঙ্গেন ; মোর কোং ; ১৯২৫ ; ৮ + ৪৭৪ পৃ ; ১৮ মার্ক।

র মেটিরিয়্যাল্‌স্‌ অ্যাণ্ড ফুড্‌ষ্টাফ্‌স্‌ ইন্‌ দি কমার্শ্যাল পলিসীজ্‌ অব্‌ নেশ্যনস্‌

(কুদরতী মাল ও খাদ্যদ্রব্য,—দুনিয়ার বাণিজ্যনীতির উপর এই সমুদয়ের প্রভাব) ; হ্বিলিয়াম কাল্‌ব্যর্টসন ; ফিলাডেল্‌ফিয়া ; আমেরিকান অ্যাক্যাডেমি অব্‌ পোলিটিক্যাল অ্যাণ্ড সোশ্যাল সায়েন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত ; ১৯২৪ ; ২৯৮ পৃ ; ২ ডলার।

মানি অ্যাণ্ড দি মানি মার্কেট ইন্‌ ইণ্ডিয়া

(অর্থ-তত্ত্ব ও ভারতীয় টাকার বাজার) ; পি, এ, হ্বাডিয়া এবং জি, এন্‌, যোশী ; লণ্ডন, ম্যাক্‌মিলান কোং ; ১৯২৬ ; ১২ + ৪৩৯ পৃ।

আর্বাইট্‌ উণ্ড্‌ রিথ্‌মুস

(মেহনৎ ও ছন্দ) ; কার্ল বিয়শর ; লাইপৎসিগ ; রাইনিকে কোং ; ১৯২৪ ; ১২ + ৪৯৭ + ১৪ পৃ।

লেজ য়োহ্বর সোসিয়াল দেজ্‌ অ্যাঁদুস্ত্রী মেতালুর্জ্জিক

(ধাতুর কারখানায় সমাজ-সেবা) ; রোবেয়্যার পিনো ; প্যারিস ; কোলেঁ্যা কোং ; ১৯২৪ ; ৮ + ২৭২ পৃ।

ডি হোখ্‌শুলেন ড্যয়েচলাণ্ড্‌স্‌

(জার্ম্মাণির বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ) ; কার্ল্‌ রেম্মে ; বার্লিন ; বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত ; ১৯২৬ ; ১২ + ২৯০ পৃ।

মার্কিণ মুল্লুকে চাষবাস

তাহেরুদ্দিন আহাম্মদ

মানুষ কেমন ক'রে প্রকৃতিটাকে দাসীর মত খাটাচ্ছে তা এই মার্কিণ মুল্লুকের কাজকর্ম্ম দেখলে হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারা যায়। সামান্য ঘর-ঝাড়দেওয়া থেকে সুরু করে গৃহস্থালীর খুঁটিনাটি যাবতীয় কাজ এদেশের লোকগুলো কল দিয়ে করিয়ে নেয়। বড় বড় কাজের তো কথাই নাই—বোতাম টিপলেই হ'ল! মার্কিণ জাতটা দুনিয়াটাকে ভেঙ্গে চুরে একেবারে আনকোরা নতুন করে গড়ে তুলতে চায়। এ জাতের লোকগুলি অনবরত ছুটোছুটি করছে, একটুও সোয়াস্তি নাই। রোজ রোজ একটা না একটা নয়া চিজ এরা দুনিয়াকে উপহার পাঠাচ্ছে। এদের দেশের বড় বড় বিজ্ঞান-পরিষদের মুখপত্রগুলির উপর চোখ বুলালে একথা স্বতই প্রমাণিত হয়। এরা প্রকৃতির আওতায় মোটেই নয়, বরং প্রকৃতিই এদের বশে। কল-কারখানা, যন্ত্রপাতি দিয়ে কেমন করে দুনিয়াটাকে হাতের মুঠোর মধ্যে আনা যায় তা এদের কাজ দেখলে বেশ বোঝা যাবে। এদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা,—এরা ভারি ধনী, দেশটা সোনা দিয়ে মুড়ে রেখেছে। আর এরা এত ধনের মালিক হয়েছে ঐ শিল্প-বাণিজ্য-ব্যবসাদ্বারা। ঐ যে ত্রিশ-বত্রিশতলা এক একটা ইমারত আকাশকে কলা দেখাচ্ছে, ঐগুলি হচ্ছে ওদের ধনদৌলতের বনিয়াদ। বেণে জাত, বড় বড় ফ্যাক্টরি চালায়। লোহালক্কড়, তুলা, রেশম, পশম, প্রভৃতির বড় বড় শিল্প-কারখানা এদের তাঁবে। এইসব কারখানাজাত মাল-পত্র দুনিয়ার বাজারে বিক্রী ক'রে যত টাকা-কড়ি এদের সিন্ধুকে তুলেছে। তাতেই এরা এত ধন—এই তো আমাদের ধারণা।

কিন্তু এ জাতটা যে চাষবাসের কাজেও দুনিয়ার সেরা এবং দুনিয়ার আর সব জাতকে বেশ দু'কথা শিখিয়ে দিতে পারে, তা হয়ত কেউ বিশ্বাস করবে না। এও কি কখনো সম্ভব? যে জাতটা দুনিয়ার চারিদিকে দিগ্বিজয়ের নিশান উড়িয়ে দিয়ে সকলের আগে আগে চলেছে, সে কিনা আদিম কালের সেই ছোট কাজ,—চাষবাস, তাতে পাকা ওস্তাদ,—একথা নিছক ছেব্‌লামি। বাস্তবিক এ জাতটা আবার মস্তবড় চাষাও। চাষবাসের কাজে এরা যে কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছে তা বাস্তবিকই খুব আশ্চর্য্য রকমের। কিন্তু এরা চাষা—পূরোদমে চাষা—একথা বললে বুঝবেন না যে এরা আমাদের দেশের চাষার মত সেই বাপদাদার আমলের কাঠের লাঙ্গল-ঠেলা চাষা। চাষবাসের কাজে এরা ধরায় এক যুগান্তর এনে ফেলেছে। এদের কথা হচ্ছে,—চাষবাসের কাজেও গতর খাটানো চাই না। এর যাবতীয় কাজ কল-কারখানা, যন্ত্রপাতির সাহায্যে সারতে হবে। এই যে রোদ নাই বৃষ্টি নাই—স্যাঁৎসেতে জায়গায় দাঁড়িয়ে জমির কাজে হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি খাটতে হয়, এ অমানুষিক ব্যবস্থা তুলে দিতে হবে। চাষী দূরে দাঁড়িয়ে থেকে কেবল তদারক করবে, আর সব কাজ আপনা-আপনি কলের সাহায্যে হয়ে যাবে। সে নিজে যন্ত্র না হ'য়ে যন্ত্রের মালিক হবে, আর যন্ত্রটা চালাবে।

উত্তর আমেরিকায় আজ কি দেখতে পাই? সেখানেও আমাদের এই বাংলা দেশের মতই হাজার হাজার বিঘা চাষ-আবাদের জমি আছে। সে ভূ-ভাগের মানুষগুলা সব তো আর সহরের বাসিন্দা নয়। অনেককেই আমাদেরই মত পাড়াগাঁয়ে বাস করতে হয়। তাদেরও চাষ-আবাদ করবার দরকার আছে। কিন্তু চাষ-আবাদেও আমাদের চাইতে তারা ঢের এগিয়ে গিয়েছে। সত্য কথা বলতে গেলে—তারা চলে যুগ-মাফিক, কাল-মোতাবেক চালে, আর আমরা পড়ে আছি সেই আর্য্য-যুগে—সেই দ্রাবিড়-যুগে। বাবলা কাঠের লাঙ্গল ও গ্রাম্য কামারের তৈরী একখানা লোহার ফাল! আর তা টানবার জন্য এক জোড়া আধ-মরা গরু! এই তো আমাদের সম্বল—চাষ-আবাদের সকল পুঁজিপাটা! কিন্তু এসব দেশে ওসব

আদিম কালের মাল-মশলা আর চলে না। ওগুলি এদের শিকেয় উঠেছে—এদের মিউজিয়ামে রাখা হয়েছে।

বলদ দিয়ে কাঠের লাঙ্গল চালানো অনেককাল আগে এদিক্ থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে। বলদের বদলে ঘোড়া ও কাঠের লাঙ্গলের বদলে লোহা কি ইস্পাতের লাঙ্গল অনেক দিন থেকে ইয়োরামেরিকায় চলে আসছে। এক জোড়া ঘোড়া দিয়ে হাল টানানোও উত্তর আমেরিকা হতে উঠে গেছে। মানুষের সময়ের মূল্য ঢের বেশী। এক জনেই যাতে অল্প সময়ের মধ্যে বেশী কাজ করে উঠতে পারে দুনিয়ার লোক সেই দিকে বেশী করে নজর দিচ্ছে। লাঙ্গলের ফাল যদি অনেকগুলা করা যায় তা হলে তা টানবার জন্য বেশী শক্তির দরকার হয়। কিন্তু তাতে ক'রে একজন মানুষের এক বিঘার জায়গায় তিন বিঘা ভূঁই চষবার ক্ষমতা হবে। আমেরিকায় চার ঘোড়ায় টানা লাঙ্গল আছে অনেক। কিন্তু ছয় ঘোড়ার লাঙ্গলেরই বেশী চলন। আট ঘোড়ার লাঙ্গলও অনেক দেখতে পাওয়া যায়। এ ছাড়া, চাষ-আবাদের আরও কত শত নতুন নতুন যন্ত্রপাতি কল-কারখানা এদের কৃষিকার্য্যে লাগছে তা নীচের অঙ্ক থেকেই বেশ ভাল বুঝা যাবে। উত্তর আমেরিকায় অর্থাৎ কানাডা ও যুক্ত-রাষ্ট্রে কি প্রভূত পরিমাণ যন্ত্রপাতির ব্যবহার হয় তা এই বিবরণী হতে বেশ বুঝতে পারা যাবে।

১৯২১ সনের সেন্‌সাস রিপোর্টে দেখা যায় কানাডার কৃষি-কর্ম্মে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি প্রভৃতি চাষ-আবাদের সাজসরঞ্জামের মূল্য দাঁড়ায় ৬৬৫,১৮০,৪১৬ ডলার (১ ডলারে ৩৷৴০ আনা)। ১৯১১ সনে এই অঙ্ক ছিল ২৫৭,০০৭,৫৪৮ ডলার। দশ বৎসরে ৪০৮,১৭২,৮৬৮ ডলার মূল্যের যন্ত্রপাতি বৃদ্ধি পায়; অর্থাৎ শতকরা প্রায় ১৬০ বেড়েছে। ১৯১১ ও ১৯২১ সনে প্রত্যেক ফার্ম্মে গড়ে যথাক্রমে ৯৩৫,৪৪ ও ৩৭৬২০ ডলার মূল্যের কৃষি-বিষয়ক যন্ত্রপাতি আমদানি করা হয়। অর্থাৎ দশ বৎসরের মধ্যে প্রত্যেক ফার্ম্ম ৫৫৯২৪ ডলার মূল্যের জিনিষ বেশী কেনে বা প্রত্যেক ফার্ম্মের কেনা যন্ত্রপাতি প্রায় শতকরা ১৪৮ বাড়ে।

এখানে প্রত্যেক একর জমির গড়পড়তা কিম্মৎ ১৯১১ সনে ছিল ২৩৬ ডলার। কিন্তু ১৯২১এ দাঁড়িয়েছিল ৪৭২ ডলার অর্থাৎ একেবারে ডবল। ইহার চাইতে ভাল জমির দাম ১৯১১ সনে ছিল ৫২৭ ডলার ও ১৯২১ সনে গিয়ে ঠেকেছিল ৯৪০ ডলারে। দাম চড়েছিল ৪১৩ ডলার অর্থাৎ শতকরা৭৮।

এইসমস্ত যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম, ব্যবহারে কি অনুপাতে খরচ পড়ে? ১৯২৩ সনে উত্তর আমেরিকায় এক কৃষি-তদন্ত কমিশন বসে। এই কমিশন ৯০টি কৃষি-ফার্ম্ম তদন্ত করে জানতে পারেন যে, বিশ থেকে পঞ্চাশ একরের ফার্ম্মওয়ালাদের প্রত্যেক একরে যন্ত্রপাতির খরচ হয় ৩৩৭ ডলার। পঞ্চাশ থেকে এক শ' একরের মালিকদের খরচ ২৫৯ ডলার। এক শ' থেকে দেড়শ' একর জমিওয়ালার খরচ প্রতি একরে ১৬৫ ডলার। এর দ্বারা বেশ বুঝা যায় যে, চাষ-আবাদের কাজে ছোট চাষীর যন্ত্রপাতির ব্যয় প্রতি একরে তার প্রতিবেশী বড় ফার্ম্মওয়ালার চেয়ে তিন গুণ বেশী পড়ে। যুক্তরাষ্ট্রে ৫০ বছর আগে কৃষিকার্য্যে যে পরিমাণ যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হ'ত তার তের গুণ হচ্ছে একালে। এদেশে প্রত্যেক চাষী গড়পড়তা ৩৬ ডলার মূল্যের যন্ত্রপাতি চাষের কাজে ব্যবহার করে।

এখন এইসব যন্ত্রপাতি চাষীর কাজে লাগাতে হলে একটা শক্তির দরকার হয়। এই কাজটা এক গো-মহিষ-ঘোড়া প্রভৃতি জানোয়ারের দ্বারা হ'তে পারে, নতুবা বাষ্প-গ্যাস-বিদ্যুৎ প্রভৃতির সাহায্যে সম্ভব হ'তে পারে। মার্কিণ মুল্লুকে এই দুই রকম শক্তিরই চলন আছে।

এখন জানোয়ারের দ্বারা মার্কিণরা কতখানি কাজ করে দেখা যাক। কানাডার ষ্ট্যাটিষ্টিকস্-ব্যুরো তাঁহাদের বাৎসরিক কৃষি-বিবরণীতে দেখাচ্ছেন যে, মার্কিণ কৃষি-ফার্ম্মসমূহে ১৯০৮ সনে ২১১৮১৬৫ ও ১৯২৫এ ৩৫৫৪০৪১ গুলি ঘোড়া ছিল। ১৭ বৎসরের মধ্যে ঘোড়া বৃদ্ধি পেয়েছে গড়পড়তা শতকরা ৬৭। তাছাড়া ১৯২৫ সনে মাদী কার্য্যক্ষম ঘোড়া ছিল ৩২২৫৫৬৪।

এই বিবরণীতে আরও দেখা যায় যে ১৮৭০ সনে যুক্ত রাষ্ট্রে ৯৫ লক্ষ ও ১৯২০ সনে ২ কোটীর বেশী ভারবাহী অশ্ব ছিল। যুক্ত-রাষ্ট্রের প্রত্যেক চাষীর গড়পড়তা জনপিছু ১৯১০ সনে ১৯৪টি ও ১৯২০ সনে ২১৩টি অশ্ব ছিল।

ইহা দ্বারা বুঝা যায়, এই দশ বৎসরের মধ্যে অশ্বের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় শতকরা ১১। অন্য দিকে, চাষবাসের কৃষি-জমাও বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯১০ সনে ঘোড়া-পিছু ১২৯ একর জমি ছিল। ১৯২০তে এই জমির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৩৮ একর।

১৯১০ থেকে ১৯২০ সনের চাষ-আবাদের ইতিহাসে আমেরিকায় মোটরের রেওয়াজ কৃষককুলের ভাগ্যে এক পরম দান। ১৯২১ সনের রিপোর্টে প্রকাশ কানাডার ৭১১০৯০টি করিৎকর্ম্মা কৃষি-ফার্ম্মের শতকরা ৭৬টি অর্থাৎ মোট ৪০৫৭৮টি ফার্ম্ম ৪৭৪৫৫টি মোটর ট্রাক্টর ব্যবহার করে। আর শতকরা ২১টি অর্থাৎ মোট ১৪৮৯২৬টি কৃষি-ফার্ম্ম ১৫৭০১২ মোটর ট্রাক্টর ব্যবহার করে। কানাডার মোটরযান (ভেহিকেল) বিভাগের দপ্তরে দেখা যায় যে, ১৯২৪ সনে মোট ৬৫২১২১ খানি গাড়ী রেজেষ্ট্রী হয়।

কানাডা বা মার্কিণ মুল্লুকের সব চাইতে বড় কৃষি-প্রদেশ ওণ্টারিও। এখানকার চাষী-মালিকেরা তাদের কৃষি-ফার্ম্মের জন্য মোট ৭৫৫৮৩ খানা মোটর ভেহিকেল ব্যবহার করে। ১৯২১ সনে এই প্রদেশের মোট ১৯৮০৫৩টি কৃষি-ফার্ম্মের শতকরা ৩৮টি ফার্ম্মে মোটরের রেওয়াজ দেখা যায়। ১৯২৩ সনে যুক্তরাষ্ট্রের ১৩৭১টি কৃষি-ফার্ম্ম পরিদর্শনের ফলে জানা যায় যে, ইহার মধ্যে ৯২৩টির অধীনে এক হাজার অটোমোবিল বা ট্রাক্টর আছে, এবং ইহার নিরেট ⅛ অংশ চাষের কাজে ব্যবহৃত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ১৯২০ সনের রিপোর্ট পড়িলে দেখা যায়, সেখানকার ১৯৭৯৫৬৪টি ফার্ম্মে ২১৪৬৩৬২ খানি অটোমোবিল আছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ১৯২৫ সনের কৃষি-দপ্তর হইতে জানা যায় যে, ঐ রাষ্ট্রের ফার্ম্মসমূহে ১৫৯১৬০০০ অশ্ব, ৪৬৫৪০০০ অশ্বতর বা খচ্চর ব্যবহৃত হয়।

উত্তর আমেরিকায় চাষবাসের কাজে বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োগ যদিও ততটা প্রসার লাভ করে নাই, তবু প্রায় পাঁচ লক্ষ বৈদ্যুতিক কারখানার আড্ডা-ঘর এখানে আছে। এবং উত্তর আমেরিকার ফার্ম্মসমূহের শতকরা ৫½ সাড়ে পাঁচ ভাগ কাজ বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা করান হয়। আমেরিকায় গড়ে শতকরা তিনটা ফার্ম্ম প্রধান বৈদ্যুতিক শক্তির কারখানার খরিদ্দার। কালিফোর্ণিয়া প্রদেশে কিন্তু শতকরা ২৭টি ফার্ম্ম বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা চালিত। যুক্তরাষ্ট্রের মোট ৪৯০০০০ লক্ষ ফার্ম্ম বৈদ্যুতিক শক্তির সাজসরঞ্জামে পুষ্ট। এইগুলির মধ্যে তিন লক্ষ ফার্ম্মের নিজেদের স্বতন্ত্র বৈদ্যুতিকাগার আছে। বাকী ১৯০০০০ ফার্ম্ম বিদ্যুৎ-সরবরাহ-কোম্পানীর সাথে কারবার চালায়।

১৯১৮ সনে পার্ল্যামেণ্টের আইনের ফলে কানাডার ওণ্টারিও কৃষি-প্রদেশে এক হাইড্রো-ইলেকট্রিক কমিশনের সৃষ্টি হয়। ইহাদের এক কেন্দ্রীয় এজেন্সি থাকে, ও প্রত্যেক মুনিসিপ্যালিটিতে ইহাদের শাখা বিস্তৃত হয়। ১৯২৩ সনে এই কমিশন ৫০টি গ্রাম্য শক্তি-কেন্দ্রে বিদ্যুৎ-সরবরাহ করেছে। সহর ও গ্রাম নিয়ে প্রায় পনর লক্ষ লোক এই কমিশনের সেবা পেয়েছে। মোটের উপর মার্কিণ মুল্লুকে চাষবাসের কাজের শতকরা ৬০ ভাগ পশুদ্বারা, ১৭ ভাগ ট্রাক্টর, ৪ ভাগ মোটর ট্রাক্‌টস্, ১২॥০ ভাগ ষ্টেসনারি এঞ্জিন, ৫॥০ ভাগ বিদ্যুৎ-শক্তি ও ১ ভাগ উইণ্ডমিল দ্বারা করান হয়।

এখন একটু অন্যান্য দেশের সাথে এই দেশটার তুলনা করে দেখা যাক। এ সেই ১৯১০ সনের হিসাব-নিকাশ। প্রত্যেক চাষী-পিছু গড়পড়তা জমি ছিল ইটালীতে ৪·৭, বেলজিয়ামে ৫·৩, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, হাঙ্গারী প্রভৃতি দেশে ৭·১ থেকে ৭·৩ একর। আর যুক্তরাষ্ট্র একাই এক শ'! এখানে জমি প্রত্যেক জন-পিছু ২৭ একরের কম নয়।

সেই রকম চাষীর উৎপাদন-শক্তি দেখতে হ'লে, যদি যুক্তরাষ্ট্রকে মাপ-কাঠি ক'রে তাহার ভাগে একশ' ফেলা হয়, তা হ'লে ইতালীর হবে ১৫, হাঙ্গারীর ২৭, ফ্রান্সের ৩১, বেলজিয়ামের ৪০, জার্ম্মাণির ৪১, আর ইংল্যাণ্ডের হবে ৪৩।

যুদ্ধের পর পাঁচ বৎসর যুক্তরাষ্ট্রের আবাদী জমি ঐ সব দেশের জমির চাইতে শতকরা ১৫৯ বেশী ফসল দিয়েছে। কিন্তু প্রত্যেক হাজার একরে চাষের জমি ইতালীতে ২৫৫, জার্ম্মাণিতে ১৬০, ফ্রান্সে ১২০, ইংল্যাণ্ডে ১০৫, ওয়েলসে ১০৫, স্কটল্যাণ্ডে ৬০ একর আছে। যুক্তরাষ্ট্রে আবাদী জমি আছে মাত্র প্রতি হাজার একরে ৪১ একর।

১৯১১ সনে কানাডায় ১৫২৬১৩০৮ একর জমি ছিল ও তাতে ৯৩৩৭০৫ জন চাষী ছিল। প্রত্যেক ৩৮ একর জমি একজন করে চাষীর পড়তায় পড়ে। প্রতি হাজার একরে ২৬ জন চাষী নিযুক্ত ছিল। আবার আলবার্টা, ম্যানিটোলা, সাস্‌কাচেহ্বান প্রভৃতি কৃষি-জনপদের ১৭৬৭৭০৯১ একর জমিতে ২৮৩৪১২ জন চাষী কাজ করত। তা হলে প্রত্যেক চাষীর হিস্যায় পড়ে ৬২ একর করে। প্রতিহাজার একরে ষোল জন ক'রে চাষী ছিল।

জমিতে ফসল ফললে তা কাটবার, আটি বাঁধবার, মাড়াই করে গোলাজাত করবার কি ব্যবস্থা এই জাতটা করেছে তা একবার দেখা যাক।

জমি চাষ করতে যতটা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম, তাতে ফসল ফললে তা কেটে গোলাজাত করতেও ঠিক সেইরূপ বা তার চাইতেও বেশী পরিশ্রমের দরকার হয়। ফসল পেতে হলে এ শ্রম এড়াবার উপায় নেই। আবার যে সব জায়গার আবহাওয়া ক্ষণে ক্ষণে বদলায়, সে সব জায়গায় খুব তাড়াতাড়ি এই ফসল-কাটা ইত্যাদি ব্যাপার সেরে নিতে হয়। ফলে অমানুষিক পরিশ্রম অনিবার্য্য হয়ে পড়ে। এই দরুণ পরিশ্রম কমাইবার জন্য কাস্তের বদলে এক নয়া যন্ত্রের চলন করা হয়। কিন্তু তার সাহায্যেও বিশেষ কোনোরূপ ফল দর্শে না। কারণ উহাদ্বারা কাজ খুব ধীরে ও পরিশ্রম ক'রে করতে হ'ত। আর এই নূতন ব্যবস্থায় এক একর জমির ফসল কাটতে, বাঁধতে ও পালা দিতে ৪ হ'তে ৫ জন লোকের সারা দিনের পরিশ্রম দরকার হ'ত। এই অসুবিধা দূর করতে ১৮০০ সন থেকে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার সমবেত চেষ্টা চলতে থাকে। অনেকের অনেক অকৃতকার্য্যতার পর ভার্জ্জিনিয়া প্রদেশের ছাইরান হল ম্যাককারসিয়ার একটা চলন-সই যন্ত্র খাড়া করেন। ম্যাককারসিয়ার-আবিষ্কৃত যন্ত্র একেবারে হাতে হাতে ফল প্রদান করতে থাকে। ১৮৪৭ সনে ম্যাককারসিয়ার ভ্রাতৃত্রয় শিকাগো উঠে যান এবং বর্ত্তমান জগতের মধ্যে সব চাইতে বৃহৎ কৃষি-যন্ত্রপাতির কারখানা খাড়া করেন। ১৮৫১ সনে বিলাতের প্রদর্শনীতে এই করাখানা-জাত মাল দেখান হয়। তাহার ফলে এ লাইনে ইংরেজের সকল কের্দ্দানি ফেঁসে যায়। কিন্তু ওসব যন্ত্রপাতিতেও যথেষ্ট ভুল-চুক ছিল।

ফসল-সংগ্রহের প্রাথমিক সমস্যা—ফসল-কাটা। তার সমাধান অনেক আগেই এইরূপে হয়েছিল। কিন্তু এতে আবার অনেকগুলি নতুন সমস্যার সৃষ্টি করে দেয়। ফসল-কাটা এত তাড়াতাড়ি হতে লাগল যে, একজনার কাটা শীষগুলি কুড়িয়ে আটি বাঁধবার জন্য ছয় হতে পনর জন লোকের দরকার হত। তখন চিন্তা হল এমন যন্ত্র আবিষ্কার করতে হবে যাতে নিজেই কাটবে, নিজেই বাঁধবে, নিজেই মাড়াই করে, বস্তাবন্দি করবে। এ পথে চিন্তা চালাতেও আমাদের সাহস হয় না, চেষ্টা তো দূরের কথা।

ফসল-কাটার যন্ত্র পূর্ব্বেই বাজারে বেরিয়েছিল। এবার এল এমন যন্ত্র, যাতে কাটা ফসল গোছা গোছা করে সমান সমান ভাগে দূরে ফেলে যায়! এখন বাঁধবার সমস্যা। ১৮৫৮ সনে মার্শ হার্ভেষ্টার বেরোল। একে অনেকে আত্ম-বন্ধনী (সেল্‌ফ-বাইণ্ডার) যন্ত্র বলত। কিন্তু আসলে ইহা কাটা ফসল একটা বাক্‌সের মধ্যে জমা করত, সেখানে তাহা বাঁধবার জন্য দুইজন মানুষের দরকার হ'ত। ১৮৭১ সনে আমেরিকার হ্বালটার উডের ফার্ম্ম পরীক্ষার জন্য বিশ হাজার পাউণ্ড খরচ করে এক প্রকার আত্ম-বন্ধনী বাজারে আমদানি করে। কিন্তু এই বন্ধনীর অনেকগুলি অসুবিধা ছিল।

অবশেষে আমেরিকা ও ইংলণ্ডের সমবেত চেষ্টার ফলে ১৮৭৫ সনে এপেলোকর্ত্তৃক আবিষ্কৃত আত্ম-বন্ধনী ও উল্লিখিত মার্শ হারভেষ্টার এই দুইয়ের সম্মিলনে ১৮৭৭ সনে একটা কার্য্যকর যন্ত্র বাজারে প্রচলিত হয়। এই যন্ত্রের দৌলতে তিন জন মাত্র মানুষ বার থেকে পনর একর (৩৬—৪৫ বিঘা) জমির ফসল সংগ্রহ করতে পারে। ইহার ফলে গতরের খাটুনি দশ আনা কমে গেছে। এই আত্ম-বন্ধনী কলে ফসল-কাটা, বাঁধা ও তাহা চাষীর সুবিধার জন্য সমান সমান দূরে ভাগে ভাগে ফেলে যাওয়া—এসব কাজ এক সঙ্গেই হয়ে যায়।

কিন্তু এখানেই এ ডানপিটে জাতটা থেমে যায় নি। ফসল-কাটা থেকে বস্তাবন্দি করা পর্য্যন্ত সব যাতে

একসঙ্গে হয় সেই রকম কল চাই। সে রকম যন্ত্র ও আবিষ্কার করা হল। এর নাম হল হার্ভেষ্টার থ্রেসার বা শীষ-মুড়ানো কল। ইহার এইরূপ নাম হবার কারণ হচ্ছে এই যে, এতে কেবল খাড়া ফসলের আগাটুকু কেটে নিয়ে চলন্ত গাড়ীর উপরই তাহা মাড়াই ও বস্তাবন্দি করে। এই রকম যন্ত্র চালাতে পঞ্চাশ ঘোড়ার শক্তি দরকার। এই প্রক্রিয়ায় আমেরিকার সব প্রদেশে কাজ হয় না। ইহাতে দুইটি জিনিষের প্রয়োজন— ফসলের পূর্ণ পক্কতা ও সামান্য একটু বায়ু-হিল্লোল। এই জন্য মাত্র ওয়াসিংটন প্রভৃতি কৃষি-জনপদ এইরূপ যন্ত্রের সুবিধা পূরাদমে ভোগ করে।

মোটের উপর আজ পর্য্যন্ত কৃষি-বিষয়ক যত প্রকার কল-কৌশল, যন্ত্রপাতি দুনিয়ায় আবিষ্কৃত হয়েছে, উত্তর আমেরিকা এই আবিষ্কারের ইতিহাসে বরাবর সুনাম রক্ষা করে এসেছে এবং আজও সে এ বিষয়ে দুনিয়ার সেরা ব'লে গর্ব্ব করতে পারে। আর সেই দেশের চাষীরা মাথাওয়ালা লোকদের এইসব নিত্য-নূতন আবিষ্কৃত কৃষি-বিষয়ক যন্ত্রপাতি প্রত্যেক দিনকার কাজে খাটিয়ে চাষবাসের প্রভূত উন্নতি সাধন কচ্ছে। এই কল-কারখানার যুগে—এই ১৯২৬ সনে আমাদের দুনিয়ার বুকে মানুষের মত টি'কে থাকতে হ'লে সেই মান্ধাতার আমলের খেলনা দিয়ে চাষ করা ছেড়ে দিতে হবে। দুনিয়ার সঙ্গে তালে তালে পা ফেলে চলতে হবে। হয়ত আমরা চলতে গিয়ে আর সবার চাইতে দুই-দশ পা পিছিয়ে চলতে পারি, কিন্তু তা বলে খনার বচনের যুগে প'ড়ে থাকলে আর চলবে না। যুবক ভারতের দৃষ্টি এ দিকে পড়বে কি ?

রেল-কারখানা ও নগর-গঠন

চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত ই, বি, রেলওয়ের একটি ষ্টেশনের নাম কাঁচড়াপাড়া। এখানে রেল-কর্ত্তৃপক্ষ-দ্বারা একটি বিরাট কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। তাহার দুইটি বিভাগ। একটির নাম "লোকো"। তাহাতে ভাঙ্গা এঞ্জিন মেরামত এবং কলকব্জা বাদে এঞ্জিনের অন্যান্য অংশ তৈয়ারী হয়। কলকব্জা বিলাত হইতে আসে। আর একটির নাম "ক্যারেজ ও ওয়াগন"। তাহাতে রেলগাড়ী প্রস্তুত হয় এবং গাড়ী ভাঙ্গিয়া গেলে তাহা মেরামতও হইয়া থাকে। দুই বিভাগে প্রায় পাঁচ হাজার শ্রমিক কাজ করে। 'কারিগর' ও 'আনাড়ী' এই দুই শ্রেণীতে শ্রমিকেরা বিভক্ত। তাহাদের মধ্যে অনেকেই রোজে খাটে। বাকী কতগুলি ঠিকায় কাজ করে। তাহাদের সংখ্যা অনুমান পাঁচ শত। কারিগরদিগের রোজগারের হার মাসিক বিশ টাকা হইতে দেড়শত টাকা এবং আনাড়ীদের তের টাকা হইতে চল্লিশ টাকা পর্য্যন্ত।

শনিবার ভিন্ন অন্যান্যবার সকাল সাড়ে ছয়টা (ষ্ট্যাণ্ডার্ড) হইতে সাড়ে দশটা ও পরে সাড়ে এগারটা হইতে সাড়ে তিনটা এবং শনিবারে সাড়ে ছয়টা হইতে সাড়ে বারোটা পর্য্যন্ত কারখানা খোলা থাকে। রবিবার ও অন্যান্য পর্ব্বদিনে কারখানা বন্ধ থাকে।

রেল-কর্ত্তৃপক্ষ এ পর্য্যন্ত প্রায় ছয়শত শ্রমিকের জন্য বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ভবিষ্যতে আরো দিবেন বলিয়া আশা করা যায়। বাসস্থানগুলি মোটের উপর মন্দ নহে। খোলা মাঠের উপর অবস্থিত বলিয়া সেগুলিতে আলো হাওয়া বেশ সহজেই খেলিতে পারে। সকলকে প্রকাণ্ড 'টিউবওয়েল' হইতে উত্থিত পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। শ্রমিকদিগের বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদ ও পাঠের জন্য একটি ভবন নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহার নাম 'ওয়ার্কমেন্‌স্‌ ইনষ্টিটিউট'। তাহাতে যে পাঠাগারটি আছে, তাহা এখনও খুব বড় হয় নাই। সমস্ত রেল-কর্ম্মচারীর সুবিধার জন্য এখানে একটি 'সমবায় দোকান' খোলা হইয়াছে। তাহার মূলধন প্রায় দশ হাজার টাকা। তাহা

দশ-দশ টাকার অংশে বিভক্ত। অনেক শ্রমিক এই দোকানের অংশীদার। তাহাদের বাসস্থানের অতি নিকটেই কর্ত্তৃপক্ষ একটি বাজার স্থাপিত করিয়াছেন। তাহাতে মাছ, তরি-তরকারী—যাহা প্রতিদিন দরকারে লাগে সমস্তই পাওয়া যায়। শ্রমিকদিগের সুবিধার জন্য এই বাজার বেলা সাড়েতিনটার সময় বসে। সেই সময় কারখানা বন্ধের শিটি বাজে বলিয়া ইহার নামও হইয়াছে 'শিটি বাজার'।

অসুখ-বিসুখ হইলে শ্রমিকেরা বিনাব্যয়ে চিকিৎসা ও ঔষধ পায়। এতদর্থে কর্ত্তৃপক্ষ একটি দাতব্য-চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

বিশ টাকার উপর যাহারা রোজগার করে, তাহারা 'প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে'র সুবিধা ভোগ করে। পনের বৎসরের উপর কাজ হইলে, প্রত্যেক বৎসরের জন্য অর্দ্ধ মাসের মাহিয়ানার হারে শ্রমিকদিগকে পারিতোষিক স্বরূপ টাকা দেওয়া হয়। এই টাকা তাহারা কাজ ছাড়িয়া যাইবার সময় পায়। ইংরেজীতে এই পারিতোষিককে "গ্র্যাটুইটি" বলে। রেলের নিয়মানুসারে শ্রমিকেরা অনেকেই নিজের এবং পরিবারের জন্য 'পি, টি, ও' অর্থাৎ ৳ ভাড়ায় রেলে যাতায়াতের সুবিধা এবং বিনা ভাড়ায় পাশ পায়। রেল-কর্ত্তৃপক্ষের স্থাপিত একটি সমবায় ঋণদান-সমিতি আছে। কলিকাতায় তাহার কার্য্যালয়। দরকার হইলে শ্রমিকেরা তথা হইতে অল্পসুদে টাকা ধার করিতে পারে।

শ্রমিকদিগের মধ্যে বাঙ্গালী ব্যতীত উড়িষ্যা, যুক্ত-প্রদেশ, বেহার, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ প্রভৃতি দেশবাসী অনেক লোক আছে। নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে যাহাদের বাসস্থান, তাহারা তথা হইতেই কাজ করিতে আসে। বিদেশী যাহারা রেল-কর্ত্তৃপক্ষ-নির্ম্মিত বাসস্থানের সুবিধা পায় নাই, তাহারা অনেকস্থলে জমি ইজারা লইয়া তাহার উপর বাসযোগ্য গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিতেছে। কারখানায় উপার্জ্জিত অর্থই তাহাদের একমাত্র সম্বল নহে। অবসর সময়ে তাহারা অনেকে দোকান করিয়া, দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া, লোকের গৃহে পানীয় জল টানিয়া দিয়া অথবা অন্যবিধ কায়িক পরিশ্রমের কার্য্য দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে।

রেল-কোম্পানী শ্রমিকদিগকে সুখে রাখিবার জন্য বহুবিধ চেষ্টাই করিতেছেন সত্য, কিন্তু তাহাদের নৈতিক উন্নতির জন্য বিশেষ কোনো ব্যবস্থা তাঁহারা এ পর্য্যন্ত এখানে করিতে পারেন নাই। যেরূপ দেখা যায়, তাহাতে মনে হয় মাদক দ্রব্যাদি এখানে কম পরিমাণে বিক্রী হয় না।

এখানে আজ পর্য্যন্ত কোনো শ্রমিক-সঙ্ঘ (ট্রেড ইউনিয়ন) গঠিত হয় নাই।

জার্ম্মাণ সমাজে দাসীগিরি

দাসীদের স্বকীয় ট্রেড ইউনিয়ান

ইংল্যণ্ডে অনেক চাকরাণীই "দৈনিক" কাজ পছন্দ করে। কিন্তু জার্ম্মাণ গৃহিণীরা তাহা চান না। শ্রমজীবীদের বাস-ভবন অত্যন্ত জনতাবহুল হওয়ায় বহু বালিকা এখন গৃহে চাকরী করিতে বাধ্য হইতেছে। কারণ গৃহে তাহারা শয়নের ঘর পাইয়া থাকে।

যুদ্ধের পূর্ব্বে ঘরে-থাকা ঝির অবস্থা ভাল ছিল না। তাহাদের শয়ন-ঘরটা ছিল তৈজসপত্র রাখিবার জায়গার সামিল! কাজ ছিল অবিচ্ছিন্ন এবং বাহিরে যাওয়ার ছুটি ছিল কদাচিৎ কখনো। কিন্তু যুদ্ধ-বিপ্লবের পরে ভিন্ন ভিন্ন ষ্টেটের প্রণীত আইনের দরুণ তাহাদের অবস্থা অনেকটা উন্নত হইয়াছে। "হাউস ফ্রাওয়েন বুণ্ডে"র (গৃহিণী-সমিতি, সমস্ত জার্ম্মাণিতে ইহার শাখা আছে) প্রতিনিধি এবং "মঙ্গল, ধর্ম্ম ও নারীসমিতি"র প্রতিনিধিদের সহিত পরামর্শ করিয়াই ঐ আইনের খসড়া প্রস্তুত হয়। চাকরাণীরা "ট্রেড ইউনিয়ানে"র অন্তর্গত হওয়ায়, "ট্রেড ইউনিয়ান" তাহাদের স্বার্থ দেখে এবং যাহাতে ঐ আইন কার্য্যে পরিণত হয় তাহার জন্য চেষ্টা করে।

চরিত্র-পুস্তক

দাসীকে চরিত্র-পুস্তক রাখিতে হয়। এ আইন জার্ম্মাণিতে বহুদিন ধরিয়াই আছে। যতদিন সে কোনও গৃহে কাজ করে, ততদিন পুস্তকখানা গৃহিণীর কাছে থাকে। তারপর কাজ ছাড়িয়া দিলে গৃহিণী তাহাতে নিজের মন্তব্য লিখিয়া দিয়া তাহা তাহাকে ফেরত দেন। ঝিকে কাজে বাহাল করিবার সময় এবং ঝি কাজ ছাড়িয়া যাইবার সময় গৃহকর্ত্রীকে পুলিশে খবর দিতে হয়। ইহার জন্য বিতং-দেওয়া ফর্ম্ম আছে। তাহাতে বহুসংখ্যক প্রশ্ন থাকে। সেগুলির উত্তর খুব সাবধানতার সহিত লিখিয়া দিতে হয়।

ষ্টেটভেদে গৃহিণী এবং দাসীর আইনেও ভেদ দেখা যায়। ব্যাভেরিয়ায় সমস্ত শ্রেণীর চাকরাণীর জন্য বেতনের হার নির্দ্দিষ্ট আছে। তাহারা মনের মত সাজানো শয়ন-ঘর পায়। সপ্তাহে তাহারা কোন্ সময় বাহিরে যাইবার ছুটি পাইবে এবং বৎসরেই বা কোন্ সময় কোন্ পর্ব্বে ছুটি পাইবে ইত্যাদি বিষয়ও নির্দ্দিষ্ট আছে। ভর্ত্তি করিবার এবং ছাড়িবার সময় পূর্ব্ব হইতে জানাইয়া দিবার নিয়ম আছে। অর্থাৎ যখন-তখন কথায়-কথায় বরখাস্ত করা চলে না। তাহাদের শয়ন-ঘরে সাধারণ সাজসজ্জা ছাড়াও পরিচ্ছদ বা তৈজসপত্র রাখিবার এমন একটা জায়গা থাকা চাই যাহা তালা-বন্ধ করিয়া রাখা যাইতে পারে। তাহাদের ঘরটা ভিতর হইতে বন্ধ করা যায় এমন হওয়া চাই-ই-চাই। যদি রান্নাঘরটা উত্তপ্ত না হয়, তবে ঘর গরম রাখিবার কোনও যন্ত্র তাহাদিগকে দিতে হইবে। জার্ম্মাণ রান্নাঘর-গুলিতে রান্না ও অন্যান্য গৃহকাজের জন্য বাসনপত্র বেশ-ই থাকে।

দৈনন্দিন কার্য্য-তালিকা

দৈনিক কাজের জন্য দশ ঘণ্টা সময় নির্দ্ধারিত। প্রাতে ৬টার আগে কাজ আরম্ভ হয় না এবং রাত্রে ৮টার পরে কাজ করিতে দেওয়া হয় না। ৮টার পরেও কাজ করাইতে হইলে অতিরিক্ত মাহিয়ানা দিতে হয়। দাসী যাহাতে ৯ ঘণ্টা নিরুপদ্রবে ঘুমাইতে পারে তাহার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। আঠার বৎসরের কম বয়সের দাসীদিগকে সপ্তাহে একদিন বৈকালে ২টা হইতে ৭টার মধ্যে চারি ঘণ্টা এবং রবিবার ও অন্য পর্ব্বদিনে বৈকাল ২টা হইতে রাত্রি ১০টার মধ্যে কম পক্ষে ছয় ঘণ্টা ছুটি দেওয়া হয়। আঠার বৎসরের অধিকবয়স্কাদের সপ্তাহে একদিন বৈকালে ৩টা হইতে রাত্রি ১২টার মধ্যে অন্ততঃ পক্ষে ছয় ঘণ্টা এবং রবিবারে ঐ সময়ের মধ্যে অন্যূন আট ঘণ্টা ছুটি পাইবার অধিকার আছে। রবিবার ও অন্য পর্ব্বদিনে প্রাতে ৬টার পরে প্রত্যেককে গির্জ্জায় যাইবার জন্য ছুটি দিতেই হইবে।

এক বৎসরের কাজ হইলে চাকরাণীরা অন্ততঃ আট দিনের ছুটি পায়—আহার-খরচ সমেত পুরা বেতনে। গৃহকর্ত্রীর বাড়ীতে যতদিন সে অনুপস্থিত থাকে, ততদিন তাহার ঘর-ভাড়া ও আহার বাবদ খরচ ঐ বেতনে সংকুলান হওয়া চাই।

গৃহস্থালীর সর্ব্ববিধ কাজে জার্ম্মাণ চাকরাণীরা বেশ শিক্ষিত। চৌদ্দ বৎসর বয়সে প্রাথমিক বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া কোনও বালিকা কাহারও গৃহে দাসীগিরি করিতে চাহিলে, তাহাকে সংসার-নির্ব্বাহ-পদ্ধতি শিক্ষাকল্পে মিউনিসিপ্যালিটির কোনো কন্টিনিউয়েশন স্কুলে সপ্তাহে সাড়ে আট ঘণ্টা করিয়া উপস্থিত থাকিতে হইবে—যত দিন পর্য্যন্ত তাহার সতের বৎসর বয়স না হয়। বালিকাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শেষ দুই বৎসর সাদাসিধা রান্নাবান্না এবং গৃহস্থালী শিখাইবার বন্দোবস্ত আছে। কন্টিনিউয়েশন স্কুলগুলিতে শুধু কার্য্যোপযোগী উপদেশই দেওয়া হয় না। সেখানে বালিকারা খাদ্যের গুণাগুণ, বর্ত্তমান বাজার-দর এবং কেনা-বেচার প্রণালী সম্বন্ধেও শিক্ষা পায়।

স্বাস্থ্যবীমা

ব্যাধি ও চিকিৎসার জন্য বীমার পদ্ধতি জার্ম্মাণিতে বহুদিন যাবৎ আছে। ইংরেজের "ন্যাশন্যাল হেল্থ ইন্সিওরেন্স স্কীম"টাই জার্ম্মাণ পদ্ধতিতে চালাই করা হইয়াছে। চিকিৎসার ব্যয় এবং ঔষধের দাম বাড়িয়া যাওয়ায় গত বৎসর গৃহিণী এবং দাসীর দেয় টাকার হার বৃদ্ধি করা হইয়াছে। বৃদ্ধ

বয়সে চাকরাণীরা "বুর্গারহাইমে" (নাগরিক-ভবনে) থাকিতে পায়। সেগুলি মিউনিসিপ্যাল শাসনের অধীন। বুর্গারহাইমে থাকিতে হইলে দরখাস্তকারিণীর উৎকৃষ্ট চরিত্র থাকা এবং বহুকাল চাকরী করা চাই।

কোনও চাকরাণী একই মনিবের কাছে পঁচিশ বৎসর কাজ করিলে জার্ম্মাণির কোনও কোনও অংশে সহর অথবা প্রাদেশিক সমিতি হইতে তাহাকে রূপার মেডেল দেওয়া হয়, সাধারণ সভায় এইরূপ মেডেল বিতরিত হইয়া থাকে। এই উপলক্ষে গৃহকর্ত্রী এবং তাঁহার চাকরাণীকে সকলেই প্রশংসা করে।

জার্ম্মাণির কণ্টিনিউয়েশন স্কুলে যে ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, সেইরূপ ভাবে ইংরেজ বালিকাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিলে বহু ইংরেজ পরিবার যে বিশেষ উপকৃত হইবেন সেবিষয়ে সন্দেহ নাই। এই কথা বুঝিয়া ইংরেজ সমাজ-সেবকেরা স্বদেশে জার্ম্মাণদের শিক্ষাপদ্ধতি চালাইবার জন্য আন্দোলন রুজু করিয়াছেন।

মুর্শীদাবাদ ও নদীয়ার কৃষি-কার্য্য

শ্রীনৃত্যগোপাল রুদ্র, এম, এ
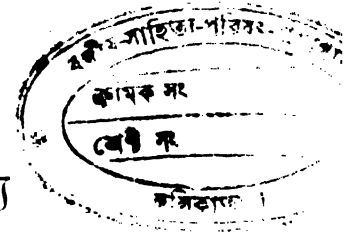
মুর্শীদাবাদ, নদীয়া এবং যশোহর প্রভৃতি জেলায় কৃষিকার্য্য অধিকাংশ স্থলে একরূপ ভাবেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। এইসকল স্থানের জমির মাটি প্রায় একই প্রকারের। সুতরাং বীজ-বপন, ফসলের কারাকিৎ বা যত্ন ও ফসল-কর্ত্তনাদি ব্যাপার প্রায় একই নিয়মে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। বর্দ্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি জেলার ন্যায় এইসকল জেলায় আমনের জমি বেশী নাই। বর্দ্ধমান, বীরভূমের জমির মাটি শক্ত ও মেটেল; তথায় অধিকাংশ ভূমিতেই আমন ধান জন্মিয়া থাকে। কিন্তু মুর্শীদাবাদ ও নদীয়ার ভূমি প্রায়ই বেলে অর্থাৎ মাটিতে বালির ভাগ বেশী, শক্ত মেটেল জমি কমই আছে। অবশ্য এইসকল স্থানেরও প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই কতক কতক নীচু জমি আছে। এইসকল জমিতে আমন ধান হইয়া থাকে। মুর্শীদাবাদের কতক অংশের নাম কালান্তর; তথায় বর্ষাকালে বিপুল বন্যা হইয়া থাকে। এই হেতু সেই স্থানের অধিকাংশ জমিতেই আমন ধান জন্মিয়া থাকে। সেই সব আমন ধানের গাছ দশ-বার হাত জলের মধ্যেও জন্মিয়া থাকে, যাহা হউক মুর্শীদাবাদ ও নদীয়ার অধিকাংশ স্থলেই আমনের জমি খুব কম। অধিকাংশ জমিতেই আউশ ধান বুনা হয়; এবং হেমন্তে চৈতালি ফসল বুনা হইয়া বসন্তে তাহা কাটা ও মাড়া হইয়া থাকে। এইসকল স্থানের আউশ ধান ও চৈতালির চাষের কথা পরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এতদঞ্চলের চাষকার্য্যে যেসকল ত্রুটি রহিয়াছে তাহারই আলোচনা করিব।

"খনার বচন" নামে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা আছে। সেইগুলিতে কৃষিকার্য্যের কতকগুলি নিয়ম আছে, ইহা অনেকেই জানেন। ফসল বুনিবার পূর্ব্বেই জমির উত্তমরূপ চাষ হওয়া প্রয়োজন। পৃথক পৃথক ফসলের চাষ সম্বন্ধে খনার নিম্নোক্ত বচনটি চলিত আছে;—'শতেক চাষে মূলা, তার অর্দ্ধেক তুলা, তার অর্দ্ধেক ধান, বিনা চাষে পান'। ভাল চাষ হইলে জমির মাটি আল্‌গা হয়, এবং উপরের ও নীচেকার অনেক পরিমাণ মাটি রৌদ্র ও বৃষ্টির সহায়তা লাভ করিতে পারে। বলা বাহুল্য, রৌদ্র এবং বৃষ্টি সারের কার্য্য করে। অনেক দূর নীচেকার পর্য্যন্ত মাটি লাঙ্গলের দ্বারা উত্তমরূপে কর্ষিত হইলে এবং তাহা উত্তম সূক্ষ্ম গুঁড়ায় পরিণত হইলে ফল এই হয় যে, বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার পর শিকড়সমূহ মাটির অনেক নীচে প্রবেশ করিতে এবং তথা হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারে।

গাছগুলির ভিত্তি ও ইহাতে সুদৃঢ় হয়। এইসকল কারণেই লাঙ্গলের দ্বারা উত্তম চাষ হইতেছে কি না ইহাই অগ্রে লক্ষ করিতে হইবে।

যাহা হউক, কি ধান, কি চৈতালি সকল ফসলের জন্যই জমিতে অনেকগুলি চাষ দেওয়া প্রয়োজন। আগেকার কৃষকগণ তাহাই করিত, কিন্তু এক্ষণে চাষের সংখ্যা কম হইয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে, অনেক কৃষকই অল্পসংখ্যক লাঙ্গলে বেশী জমি আবাদ করিয়া থাকে। এই অঞ্চলে এক লাঙ্গলে বার বিঘা জমি চাষ হইলেই যথেষ্ট হয়; খুব জোর যোল বিঘা পর্য্যন্তও চলিতে পারে। মুর্শীদাবাদ ও নদীয়ার অধিকাংশ স্থলেই রাঢ় অঞ্চলের মত জমি আক্রা নহে; সেই জন্য অল্পসংখ্যক লাঙ্গলের দ্বারা বেশী জমি আবাদের চেষ্টা অনেক কৃষকই করিয়া থাকে। তাহার ফল খুবই খারাপ হয়। যেসকল জমি অনুর্ব্বর তাহাতে ধান বুনিতে হইলে চৈতালি না বুনিয়া ফেলিয়া রাখিতে হয়। তাহাকে বারমেসে করা বলে। সেই সকল বারমেসে জমিতে বারো মাসে অন্ততঃ বারো বার চাষ করিতেই হইবে। বর্দ্ধমানের কৃষকগণও ধানের জন্য জমি বারমেসে এবং চৈতালির জন্য জমি পচান করিয়া থাকে। সেই সকল জমিতে পুনঃ পুনঃ চাষের প্রয়োজন।

এই গেল চাষের সংখ্যার কথা। তার পর চাষের প্রকারও ভাল হয় না। তাহার প্রধান কারণ, গরু-বলদের শোচনীয় অবস্থা। তা ছাড়া, কৃষকদিগের বংশধরগণও দুর্ব্বল হইতে দুর্ব্বলতর হইয়া পড়িতেছে। প্রথমতঃ, গরু-বলদের কথা আলোচনা করিতে গেলেই মনে পড়ে জমিদারগণের এক ব্যতিক্রমের বিষয়। পূর্ব্বকালে তাঁহারা যেমন মৌজায় মৌজায় কতক পরিমাণে পতিত জমি ফেলিয়া রাখিতেন, বর্ত্তমানে আর তাহা রাখেন না। ফলে গাভী দুগ্ধশূন্য এবং বলদ মৃতপ্রায়! এ অবস্থায় জমির চাষ যেমন হইতে পারে তেমনই হয়। তা ছাড়া, পূর্ব্বে প্রত্যেক গ্রামে ধর্ম্মের ষাঁড় থাকিত, এক্ষণে তাহা নাই। উৎকৃষ্ট ষাঁড়ের অভাবে বৎসগণ ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতেছে। আর কৃষকদের বংশধরগণ কিরূপ কৃশ হইতে কৃশতর হইতেছে তাহাও দেখিবার বিষয়। কয়েক পুরুষের মধ্যেই এদেশের লোকের আকৃতির কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে! আগেকার লোকই বা কেমন উচ্চাকৃতি, বলবান ও দৃঢ়কায় ছিল, আর এখনকার সব লোকই বা কেমন ক্ষুদ্র ও ক্ষীণকায় হইয়া পড়িতেছে! দেশহিতৈষী সুধীগণের ইহা লক্ষ করিবার বিষয়।

অতঃপর ফসলের বীজের কথা। বীজ উত্তমরূপে রৌদ্রে শুকাইয়া গোলাজাত করিয়া রাখা প্রয়োজন। একালেও কৃষকগণ প্রায়ই তাহা করিয়া থাকে। তবে অনেক বিষয়ে গতানুগতিক ভাবে কার্য্য করা হয়। হয়ত খারাপ পাটের আবাদ করিয়া আবার তাহারই বীজ রক্ষা করিয়া পুনরায় বপন করা হয়। এইরূপ ভাবে কৃষকগণ কার্য্য চালাইয়া থাকে। কোনো দূরবর্ত্তী স্থান হইতে উৎকৃষ্টতর বীজ সংগ্রহ করিয়া আনা আর তাহাদের প্রায়ই ঘটে না। ইহাতে এতদঞ্চলের কৃষকগণের শৈথিল্যই প্রমাণিত হয়।

পরিশেষে সারের কথা বলিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। এতদঞ্চলে জমিতে সার দেওয়া সম্বন্ধে যে ত্রুটি রহিয়াছে তাহাও লক্ষ করিবার বিষয়। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে মুর্শীদাবাদে ও নদীয়ায় বৎসর বৎসর অনেক জমিতে বারমেসে ও পচান চাষ করা হইয়া থাকে। অর্থাৎ এই সকল জমিতে একটা ফসলের আবাদ করা হয় না। ফলতঃ, ইহাতে জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হয়। সুতরাং এ প্রথাকে ভালই বলিতে হইবে। কিন্তু জমিতে উপযুক্তরূপ সার দেওয়ার ব্যবস্থা থাকিলে এইরূপ ভাবে জমি ফেলিয়া রাখার প্রয়োজন হয় না। বর্দ্ধমান ও বীরভূমে জমিতে প্রচুর সার দেওয়া হয়। তথায় কৃষকগণ গর্ত্ত বা ডোবার পচা মাটি, খইল, গোবর ও আবর্জ্জনার সার ইত্যাদি জমিতে দিয়া থাকে, এবং তাহার সুফলও ভোগ করে। কিন্তু এতদঞ্চলের কৃষকগণ জমিতে সার দেওয়া সম্বন্ধে বড়ই অলস। মুর্শীদাবাদ ও নদীয়ার কৃষকগণ প্রধানতঃ গোবরের সারই জমিতে দিয়া থাকে। গোবরের সার অবশ্যই উৎকৃষ্ট। কিন্তু সকল ফসলের নিমিত্ত একই সার দেওয়া সমীচীন নহে। কোন্ জমি কোন্ ফসলের উপযুক্ত এবং কোন্ ফসলের নিমিত্ত কোন্ সার দেওয়া উচিত তাহা বৈজ্ঞানিক উপায়ে জানা দরকার। যাহা হউক, এতদঞ্চলের কৃষকেরা

যেভাবে গোবরের সার রক্ষা করিয়া থাকে তাহা অতীব মূর্খতা ও আলস্যের পরিচায়ক। তাহারা গরু-বাছুরের গোবর একস্থলে পালা দিয়া রাখে। কিছুকাল পরে তাহাই সাররূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহার ফল এই যে, বৃষ্টিতে তাহার প্রয়োজনীয় অংশ প্রায়ই ধুইয়া যায় এবং কতক রস নিম্নের মৃত্তিকায় বসিয়া যায়। এইরূপে রোদে-বৃষ্টিতে তাহার সারত্ব প্রায়ই নষ্ট হইয়া যায়। যেখানে সার রাখিতে হইবে তাহার উপরে একখানি চালা করিয়া দেওয়া আবশ্যক। আর সার রাখিবার জন্য মাটিতে গর্ত্ত করিয়া সেই গর্ত্তটী যদি ইষ্টক দিয়া বাঁধাইতে পারা যায় তাহা হইলে খুব ভাল হয়। কারণ তাহা হইলে সেই সারের রস মাটিতে বসিতে পারে না। ময়লা আবর্জ্জনার সারও এইভ'বে রক্ষা করা উচিত। এইরূপে সার প্রস্তুত করিয়া তাহা প্রয়োজনমত জমিতে দিলে কৃষকেরা যে নিশ্চিতই লাভবান হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মুর্শীদাবাদ ও নদীয়ার অনেকস্থলেই বহু পরিমাণ পলি-পড়া জমি রহিয়াছে। সেই সব জমিতে বৎসর বৎসর নদীর জল উঠিয়া থাকে এবং পলি পড়ে। পলি-পড়া জমিতে সার দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। এমন কি, অনেক পলি-পড়া জমিতে বিনা চাষেও আবাদ হয়। বর্ষার জল নামিয়া গেলে রস থাকিতে থাকিতে সেই সব জমিতে বিনা চাষে কলাই খেসারী ইত্যাদির বীজ বুনিয়া দিলে সুন্দর ফসল হয়। কিন্তু সেই সমুদয় জমিতে যেমন পলি পড়া বন্ধ হয় তাহাদের উর্ব্বরতা তেমনই কমিয়া যাইতে থাকে। তৎকালে সেই সব জমিতে প্রয়োজন মত কিছু কিছু করিয়া সার দেওয়া উচিত। অনেক স্থলে কৃষকেরা তাহা দেয় না বলিয়া সেই সব ভাল জমি কালে নিতান্ত অনুর্ব্বর জমিতে পরিণত হয়। এই কৃষি-সর্ব্বস্ব দেশের কৃষকগণ যদি গতানুগতিকতা পরিত্যাগপূর্ব্বক একটু উদ্যমশীল হইয়া চাষের কার্য্যে বুদ্ধি-বৃত্তি প্রয়োগ করিত তবে দেশের অবস্থা অনেকটা ফিরিত।

বঙ্গে গো-চিন্তা

দুগ্ধ-সমস্যা

শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র চৌধুরী "স্বাস্থ্য সমাচারে" লিখিয়াছেন:—

ইয়োরোপে আহারের নিমিত্ত প্রত্যহ অসংখ্য গো-বধ হইলেও তথায় দুগ্ধ সুলভ, এবং প্রত্যেক ব্যক্তি গড়ে তিন পোয়া দুগ্ধ গ্রহণ করে। আমরা কিন্তু গড়ে অর্দ্ধ ছটাক দুধও খাই না। ইয়োরোপে সহরের বাহিরে দুগ্ধ টাকায় অন্যূন ৮ সের ও সহরে ৪ সের। তাহারা গো-খাদক হইলেও গরুর যত্ন করিয়া থাকে। আর আমরা হিন্দুগণ অন্ধ বিশ্বাসে গাভীকে মাতৃজ্ঞানে এবং ষাঁড়কে পিতৃজ্ঞানে পূজা করিলেও, উহা-দিগকে যত্ন করি না এবং উপযুক্ত পরিমাণে আহার দিই না। আহারের অভাবে বাঁটের দুধ শুষ্ক হয়, তাহা আমরা বুঝিয়াও বুঝি না, এবং তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করি না।

বঙ্গদেশে দুগ্ধ-সঙ্কটের দ্বিতীয় কারণ এই যে, বাঙ্গালার গরু অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহারা সাধারণতঃ দৈনিক অর্দ্ধসের হইতে একসের দুগ্ধ প্রদান করে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের একটি গাভী ১০ জনকে উপযুক্ত পরিমাণে দুগ্ধ প্রদান করে, কিন্তু বাঙ্গালার একটি গাভী হইতে একজন লোকেরও উপযুক্ত দুধ পাওয়া যায় না। বিশেষজ্ঞদিগের মতে বেহারের ও বাঙ্গালার গরু একই শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু আকৃতি ও দুধের কথা বিবেচনা করিলে, উহারা যে একই শ্রেণীভুক্ত তাহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হইবে না। বাঙ্গালার গরুর অধঃপতনের প্রধান কারণ দুইটি—একটি খাদ্যের অভাব, অন্যটি ষাঁড়ের অভাব। ইহাদের মধ্যে কোনটি প্রধান, তাহা আমরা নির্দ্দেশ করিতে পারি না। প্রকৃতপক্ষে দুইটিই প্রধান এবং দুইটিই তুল্য।

নূতন ধরণের গো-মড়ক

বিগত ১৮ই ফাল্গুন মঙ্গলবার বেলা দশটা হইতে দুইটা পর্য্যন্ত হবিগঞ্জের এলাকাধীন রাঢ়িশাল গ্রাম ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে প্রচুর বৃষ্টিপাত ও প্রবল বাতাস হইয়াছিল। ইহার প্রকোপে ৮।১০টি বিভিন্ন গ্রামের বহুসংখ্যক গরু মাঠেই

ধরাশায়ী হয়। ইহার কতকগুলি সেই সময়ে মারা যায় ও অপরগুলি বহন করিয়া ঘরে আনার পরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মঙ্গলবার বিকালবেলা হইতে এপর্য্যন্ত উল্লিখিত গ্রাম-সমূহের চতুর্দ্দিকে মৃত গরুর শবদেহ এত অধিক পড়িয়াছে যে, চামারেরা যথাসময়ে ঐ সকলের চামড়া তুলিয়া লইতে পারে নাই এবং শৃগাল, কুকুর ও শকুনি ঐ সকল মাংস নিঃশেষে খাইতে অক্ষম হইতেছে। এপর্য্যন্ত বিভিন্ন গ্রাম হইতে যত মৃত্যু সংখ্যা জানিতে পারা গিয়াছে, তাহার মোট সংখ্যা তিন-শতের মত হইবে। যে সকল গ্রাম গোচারণ মাঠ হইতে অধিক দূরে, সেই সব গ্রামের গরুই অধিক মারা গিয়াছে। যাহারা বৃষ্টিপাতের সূচনায় গরু লইয়া ঘরে আসিয়াছিল তাহাদের গরু কিন্তু প্রায়ই মরে নাই। মাঘ-ফাল্গুন মাসে এইরূপ বৃষ্টিপাত অনেকবারই হইতে দেখা গিয়াছে, কিন্তু এই ভাবে গরু মারা যাইতে দেখি নাই। এতদ্বারা পরিষ্কার বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ভাল খাদ্য ও উপযুক্ত পরিচর্য্যার অভাব বশতঃ দেশের গো-কুলের জীবনী শক্তি অত্যন্ত কমিয়া যাওয়ায় তাহারা বৃষ্টি-বাতাসের চোট সামলাইতে পারে না। পক্ষান্তরে ইহাদ্বারা দেশের লোকের গো-পালনের প্রতি কিরূপ অবজ্ঞার ভাব আসিয়াছে তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। সে যাহা হউক, চাষবাসের দিন অতি নিকট সমাগত। এই অবস্থায় আকস্মিক গো-মড়ক যে কাহারো কাহারো পক্ষে বিষম বিপদের কারণ হইয়াছে তাহাতে একটুও সংশয় নাই।

উপযুক্ত খাদ্য ও পরিচর্য্যার অভাবে দেশের গো-কুল দিন দিনই দুর্ব্বল ও খর্ব্বাকৃতি হইতেছে এবং ইহাই নানা-রোগের উদ্দীপক কারণ। সেজন্য বারমাস গো-মড়ক লাগিয়াই রহিয়াছে। তদ্দরুণ দেশের গরুর সংখ্যা অসম্ভব রকম কমিয়া যাইতে থাকায় গরুর মূল্যও দ্রুতগতি বৃদ্ধি পাইতেছে। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যে সব গরু ৪০৲—৫০৲ টাকা মূল্যে কিনিতে পাওয়া যাইত, ঠিক সেইরূপ গরুর মূল্য এখন ৮০৲—৯০৲ টাকার কম নহে। আধ সের দুধের গাভীর মূল্য ৪০৲ টাকার মতন। ভাল দুধের গাভী কিনিতে পাওয়াই যায় না। এই সকল কারণে দেশে দুধ-ঘি কিরূপ দুর্ম্মূল্য হইয়াছে তাহা সকলেই দেখিতেছেন। এই অবস্থায় শরীর-রক্ষা কিরূপ কঠিন তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। ততোঽধিক হতাশ হইবার কারণ এই যে, ইহার প্রতীকার-কল্পে দেশে কোন সাড়া-শব্দ নাই। দেশের উন্নতিকল্পে যাহাদের চিন্তা করিবার ও নানাপ্রকার অনুষ্ঠানাদিতে যোগদান করিবার অভ্যাস আছে, তাহাদিগকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করা বোধ হয় অন্যায় হইবে না—এমন গুরুতর প্রয়োজনীয় বিষয়ে তাহাদের ভুল হয় কেন?

শ্রীবাণেশ্বর সিংহ (জনশক্তি, শ্রীহট্ট)।

ধ্বংসের পথে গোজাতি

কৃষি-প্রধান দেশে গরুর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে বর্ত্তমান সময়ে এতদঞ্চলের গোজাতি যে ভাবে ধ্বংসের দিকে ধাবিত হইতেছে তাহাতে এখন হইতেই যদি আমরা গোজাতির রক্ষাকল্পে স্বাভাবিক জাড্য পরিহার করিতে অবহিত না হই, তবে ভবিষ্যৎ যে গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন তাহা নিঃসংশয়িতচিত্তেই বলা যাইতে পারে। গোজাতির অবনতির জন্য হিন্দুমুসলমান উভয়েই সমভাবে দায়ী। নিষ্ঠাবান হিন্দু প্রত্যূষে নিদ্রা ত্যাগের পর শাস্ত্রোক্ত মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক গো-মাতাকে প্রণাম করিয়া থাকেন, কিন্তু বৈষয়িক কার্য্যে লিপ্ত হইয়াই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ নানাভাবে গো-জাতির অমঙ্গল-কর কার্য্যে লিপ্ত হন। খাদ্য এবং পানীয়ের সুবন্দোবস্তের উপরই যে মানুষের ন্যায় গোজাতিরও শারীরিক উন্নতি নির্ভর করে তাহা হিন্দু কি মুসলমান কেহই হৃদয়ঙ্গম করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতেছেন না। মুসলমানগণ গোমাংস ভক্ষণ করেন এবং তাহাই সাধারণতঃ গোজাতি-ক্ষয়ের প্রধান কারণ বলা হইয়া থাকে। কিন্তু হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই ভাবে যতগুলি গরু ধ্বংস হইতেছে তাহার চেয়ে বহু গুণ বেশী গরু অন্যভাবে প্রতিনিয়ত অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। তবে ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশ পালন করিতে যাইয়া তাহারা গোজাতি-ধ্বংসের যতটুকু সহায়তা করিতেছেন তাহা যথাসম্ভব পরিহার করাই কর্ত্তব্য। আর এ বিষয়ে অন্ততঃ এ অঞ্চলের মুসলমানগণ যে অনেক পরিমাণে অবহিত হইয়াছেন তাহা সর্ব্বথা স্বীকার্য্য।

গ্রামে যথেষ্ট পরিমাণে গোচর ভূমি রাখা এবং গরুর পানীয়ের বন্দোবস্ত করা আবাহমান কাল হইতেই ভূম্যধিকারিগণের কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের ভূম্যধিকারীরা এতদ্বিষয়ে তাহাদের কর্ত্তব্য যথাযথভাবে প্রতিপালন করা দূরে থাকুক গ্রাম্য ভূম্যধিকারিগণ খামার-বৃদ্ধির প্রয়াসে গোচর ভূমির যতটুকু সম্ভব চাষী ভূমিতে পরিণত করিতেছেন। অপর জমিদারগণ দূরে থাকিয়া গোচর ভূমির পত্তন দ্বারা আদায়ী নজরাণার আয়-বৃদ্ধি দেখিয়া স্থানীয় কর্ম্মচারীকে ধন্যবাদ দিতেছেন। গো-চলাচলের রাস্তারূপে ব্যবহৃত গ্রাম্য গোরাট-গুলি পার্শ্ববর্ত্তী প্রজার ক্ষেত্রের পরিসর বৃদ্ধি করতঃ ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইয়া কোন কোন স্থলে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। গোরাট-গুলির রক্ষাকল্পে ভূম্যধিকারিগণ ত কিছুই করিতেছেন না, কৃষকগণও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া এতদ্বিষয়ে প্রতিকারোপায় অবলম্বনে উদাসীন। তাই আজ আমাদের গরুগুলি গ্রাম হইতে মাঠে যাওয়ার রাস্তা পায় না আর মাঠে যাইয়াও যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য পায় না।

পানীয় সম্বন্ধেও একই কথা। অনেক গ্রামেই গরুর জল-পানের জন্য কোন বন্দোবস্ত নাই। চৈত্রমাসে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তাপে তাপিত হইয়া দেবী ধরিত্রী যখন জীবকুলের পক্ষে সুধাস্বরূপ জলরাশি স্বীয় অন্তরে যথাসম্ভব বিলয় করিয়া লন। তখন চার-পাঁচ ঘণ্টা হলকর্ষণানন্তর পরিশ্রান্ত গো-কুলকে পিপাসার্ত্ত অবস্থায় ছটফট্ করিতে করিতে কোনস্থলে অর্দ্ধ মাইল, কোনস্থলে এক মাইল, কোনস্থলে বা ততোহধিক দূরবর্ত্তী স্বল্পতোয়া নদীর কিম্বা বিলের কর্দ্দম-মিশ্রিত জলে যাইয়া পিপাসা নিবারণ করিতে হয়। এইরূপে অত্যধিক পরিশ্রম, অত্যল্প আহার এবং যথোপযুক্ত পানীয়ের অভাব বশতঃ এতদঞ্চলের গো-জাতি ক্রমে বিলয়-প্রাপ্ত হইতেছে। গো-জাতি সম্বন্ধে কথা উঠিলেই আমরা দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়া থাকি "সংক্রামক ব্যাধিই গো-জাতির ধ্বংসের কারণ।" কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে উপরিবর্ণিত কারণে নিশ্চয়ই ক্রমে গরুর জীবনীশক্তি হ্রাস হইতেছে এবং তাহার ফলেই নানাপ্রকার সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া তাহারা পালে পালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। ভূম্যধিকারী এবং কৃষক উভয়েরই বর্ত্তমান সময়ে কি প্রকার খাদ্য ও পানীয়ের সুবন্দোবস্ত করিয়া গো-জাতিকে ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা করা যায় তদ্বিষয়ে অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য।

("প্রান্তবাসী", ময়মনসিংহ)

গোচারণ কর

আসাম কাউন্সিলে শ্রীযুক্ত রোহিণীকান্ত হাতিবরুয়া প্রস্তাব করেন—"আসাম হইতে গোচারণ কর তুলিয়া দিতে এই কাউন্সিল সরকারকে অনুরোধ করিতেছেন।" শ্রীযুক্ত হাতিবরুয়া বলেন যে, গোচারণ কর আসামীয়াদের নিকট কি প্রকার অপ্রিয় তাহা সরকার অবগত আছেন। এই কর তুলিয়া দিবার জন্য আবেদন-নিবেদনে সরকার কর্ণপাত করেন নাই। গোচারণ করের ফলে দুগ্ধ দুর্ম্মূল্য হইয়া পড়িয়াছে। সরকার-পক্ষে অর্থসচিব মাননীয় মিঃ বোথাম বলেন যে, যাহারা দুগ্ধের ব্যবসা করে মাত্র তাহাদিগকেই বর্ত্তমানে এই কর দিতে হয়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যাহারা গোচারণ কর দেয় এইরূপ দুগ্ধব্যবসায়ীদের মধ্যে আসামীয়াদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। মাড়োয়ারী এবং নেপালীরাই বেশীর ভাগ এই কর দেয়। সরকার গোচারণ আইনের যে সব নিয়ম প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতে কেবল ব্যবসায়ীরাই এই টেক্স দিবে। যাহারা নিজের প্রয়োজনের জন্য গরু রাখে, তাহাদিগকে এই কর দিতে হইবে না। বাবু ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বলেন যে, মাত্র ব্যবসায়ীদের উপর টেক্স বসাইলেও পরোক্ষভাবে সেই টেক্স দুগ্ধ-ক্রেতা-দিগকেই বহন করিতে হয়। কারণ ব্যবসায়ীরা যে পরিমাণ টাকা কর দিবে ক্রেতাদের নিকট হইত বিক্রয়কালে তাহা তুলিয়া নিবে। সেই জন্যই দুগ্ধ দিন দিন দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিতেছে।

মৌলবী ফইজনুর আলী বক্তৃতায় দেখাইয়া দেন যে, এই কর অচিরে উঠাইয়া না দিলে অসন্তোষ আরও বৃদ্ধি পাইবে। অতঃপর প্রস্তাব ভোটে দিলে দেখা যায় যে ভোটে উহা হারিয়া গিয়াছে।
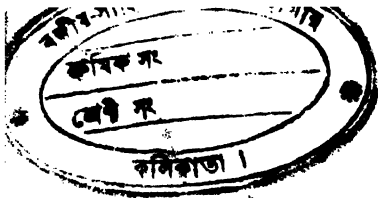
আর্থিক উন্নতির বনিয়াদ

(১) ব্যাঙ্ক-গঠন ও দেশোন্নতি

গত ২৬শে জানুয়ারী জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের উদ্যোগে থিয়োসফিক্যাল সোসাইটীর গৃহে অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার "ব্যাঙ্ক ও জাতীয় উন্নতি" সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন ভারতবর্ষে দেশীয় লোকদ্বারা পরিচালিত ব্যাঙ্কের সংখ্যা পাঁচটীও হইবে না। ব্যাঙ্কের উপরই ব্যবসা-বাণিজ্য নির্ভর করে। ব্যাঙ্কই জাতীয় উন্নতির মূল। কোন জাতির প্রাচীন গৌরব যাহাই থাকুক, যদি ভাল ব্যাঙ্ক না থাকে তবে আধুনিক সময়ে সে জাতির কোন মূল্য নাই। বঙ্গদেশে তিন শতটী লোন আফিস্ বা ঋণদান-সমিতি আছে। ইহাতে মনে হয় ব্যাঙ্কের উপর দেশের লোকের কিছু কিছু বিশ্বাস জন্মিয়াছে। ইয়োরোপে ব্যাঙ্কের উপরে লোকের বিশ্বাস দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। সেখানে চেক্ সহি করিয়া নিত্য হাট বাজার করা যায়। তিনি বলেন বাংলার এই সমস্ত লোন আফিসকে ব্যাঙ্কে পরিণত করিবার চেষ্টা করিলে চারি-পাঁচ বৎসরে সুফল প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

(২) ব্যাধি-বার্দ্ধক্য-দৈব বীমা

গত ২৮শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার বঙ্গীয় থিয়োসফিক্যাল সোসাইটীর গৃহে "ব্যাধি-বার্দ্ধক্য ও দৈব-বীমা" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, ১৯০৫ সন হইতে আমরা স্বদেশ-প্রেমিকের যে আদর্শ বঙ্গদেশে দেখিয়াছি তাহাতে "না-খেতে-পেয়ে-মরা" ভাবটাই প্রধান। কিন্তু জাপানের কি পাশ্চাত্য দেশের স্বদেশভক্তেরা অনাহারে মরিতে হইবে একথা ভাবে না। আমাদের দেশের লোকের কর্ম্মদক্ষতা নাই কেন? একটা কাজে অধ্যবসায়ের সহিত দুই-চারি মাস কি দুই-এক বৎসর কেহ লাগিয়া থাকিতে পারে না কেন? তাহার কারণ ব্যাধি, দুশ্চিন্তা ও অকাল বার্দ্ধক্য। এই উপদ্রব ও বিঘ্ন পাশ্চাত্য দেশেও আছে। কিন্তু তথায় ইহার সমাধান হইয়াছে। সেখানকার লোক গীতা পাঠ করিয়া লড়াই করিতে যায় না। তাহাদের সাধারণ ভাবের জীবনযাত্রার মধ্যেও অপূর্ব্ব স্বদেশভক্তি ও কর্ম্মদক্ষতা পরিস্ফুট হইয়া উঠে। তাহারা মরিতে ভয় পায় না, কারণ প্রত্যেকেই জানে তাহার পশ্চাতে বিপুল-শক্তি-সম্পন্ন রাষ্ট্র দণ্ডায়মান রহিয়াছে এবং তাহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই গবর্মেণ্ট তাহার দুঃস্থ পরিবারকে সাহায্য করিবে। এই ভরসায় সে নিশ্চিন্তে দেশের জন্য মৃত্যুমুখে যায়। সে ব্যাধিগ্রস্ত অথবা কোন দৈবদুর্ঘটনায় আক্রান্ত হইলে তাহার মনিব অবিলম্বে তাহার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিতে ও সাহায্য করিতে আইন অনুসারে বাধ্য। সুতরাং সে সাহসের সহিত কার্য্য করিতে পারে। বৃদ্ধ বয়সেও গবর্মেণ্ট তাহাকে মাসোহারা দিয়া সাহায্য করিবে। জার্ম্মাণীর সুবিখ্যাত রাষ্ট্রবীর, মনস্বী পণ্ডিত বিসমার্ক ১৮৮৩ সনে এই ব্যাধি, বার্দ্ধক্য ও দৈব-বীমার আইন জার্ম্মাণীতে প্রচলন করিয়াছিলেন। তাহা এখন পৃথিবীর সমস্ত সভ্যজাতি গ্রহণ করিতেছেন। অল্প দিন হইল লয়েড্ জর্জ্জের আমলে ইংলণ্ডেও বৃদ্ধবয়সের পেন্‌শন্ সম্বন্ধে আইন প্রচলিত হইয়াছে।

জনসাধারণকে কর্ম্মদক্ষ, সাহসী ও শক্তিমান করিবার নিমিত্ত এই জার্ম্মাণ পণ্ডিতের চিন্তায় যে অপূর্ব্ব উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছিল, পাশ্চাত্য অথবা প্রাচ্য সভ্যতার পূর্ব্বপুরুষেরা তাহা কল্পনাও করিতে পারেন নাই। তাঁহারা জরা, মৃত্যু ও ব্যাধির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত এমন উপায় অবলম্বন করার উপদেশ দিয়াছেন যাহাতে আর জন্মই না হয়। কেহ কেহ বানপ্রস্থ অবলম্বন করার কথাও বলিয়াছেন। কিন্তু তাহা সমগ্র জাতির মঙ্গলের পন্থা নহে। আমরা যদি এখনও আমাদের সেই পুরাতন গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া অতীত গৌরবের মোহেই অন্ধ হইয়া থাকি, তবে আমরা সভ্য-জগতের অগ্রগতি হইতে যতদূর পশ্চাতে আছি, সেই খানেই থাকিয়া যাইব।

(৩) জমিজমার আইন-কানুন

গত ২রা ফেব্রুয়ারী বুধবার এলবার্ট হলে এক সভায় অধ্যাপক শ্রীযুত বিনয়কুমার সরকার "জমিজমার আইন-কানুন" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, আইন-কানুন করিয়া কৃষি-সমস্যার কিরূপে সমাধান হয়, তাহার দৃষ্টান্ত আমরা ইয়োরোপের ফ্রান্স, জার্ম্মাণী ও ইতালী প্রভৃতি দেশ হইতে প্রাপ্ত হইতে পারি। ইতালীর অবস্থা অনেকটা ভারতবর্ষের মত। অবশ্য ভারতবর্ষের কৃষক অপেক্ষা ইতালীর কৃষক কিছু উন্নত। ফ্রান্সে সাড়ে চারি কোটী লোকের মধ্যে সাড়ে তিন কোটী লোকই কৃষাণ-মালিক ;—অর্থাৎ যাহারা চাষ করে তাহারাই জমির মালিক। ইতালীতে এখন এই আন্দোলন হইতেছে,—যাহারা চাষ করে না, তাহাদের হাত হইতে জমি ছাড়াইয়া, যাহারা চাষ করে তাহাদের হাতে ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া দেওয়া হউক। এই আন্দোলনের সূত্রপাত যেরূপে হইল তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই। আইন দুই রকম আছে,—ব্যক্তিগত ও সম্পত্তিগত। ব্যক্তিগত আইনে ব্যক্তির স্বার্থ ও অধিকারের দিকে লক্ষ রাখা হয়, তাহাতে সম্পত্তি অথবা জিনিষের ভাগ্যে যাহাই ঘটুক না কেন। আর সম্পত্তিগত আইনে দেখা হইবে যেন সম্পত্তি অথবা জিনিষটী নষ্ট না হয়। প্রাচীন রোমান ও হিন্দু আইন ছিল ব্যক্তিগত। তদনুসারে পিতার পাচ পুত্র তাহাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার অনুসারে সম্পত্তিকে পাঁচ ভাগ করিয়া গ্রহণ করিত। এই পাঁচ পুত্রের সন্তানাদি আবার সেই বিভক্ত সম্পত্তি পুনর্ব্বার ভাগ করিত। এইরূপ ব্যক্তিগত অধিকারের খাতিরে আসল সম্পত্তিটী ক্রমশঃ ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইতে হইতে অবশেষে নষ্ট হইয়া যায়।

প্রুশিয়াতে ১৭৭০ সনে এই প্রকার আইনের বিরুদ্ধে একবার আন্দোলন হয়। অতঃপর ১৮৯০ সনে জার্ম্মাণীতে স্পষ্টভাবে এই ব্যক্তিগত আইন উঠিয়া যায় ও তৎপরিবর্ত্তে সম্পত্তিগত আইন প্রতিষ্ঠিত হয়। তদনুসারে এই নিয়ম হইল,—পিতার মৃত্যুর পর পাঁচ পুত্রের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ না হইয়া যে পুত্র সেই জমি চাষবাস করিয়া উন্নত করিতে সম্মত হয়, পিতা তাহাকেই সমগ্র সম্পত্তি দিয়া যাইবেন। যদি সেই সম্পত্তির মূল্য ২৫ হাজার টাকা হয়, তবে যে পুত্র সমগ্র সম্পত্তি পাইবে, সে তখনি তার অপর চারি ভাইকে তাহাদের অংশের মূল্য স্বরূপ ২০ হাজার টাকা দিবে। যদি সে দিতে না পারে, তবে গবর্মেণ্টের ব্যাঙ্ক হইতে সেই টাকা তাহাকে কর্জ্জ দেওয়া হইবে। সে যথা-সময়ে তাহা পরিশোধ করিবে। এইরূপে সম্পত্তিটী চিরকাল সমগ্রভাবে রাখিবার উপায় হইয়াছে।

১৮৯৯ সনে ডেনমার্ক জার্ম্মাণীর অনুকরণে জমিজমার আইন পরিবর্ত্তন করে। পূর্ব্বে তথায় চাষীদের কাহারও ১০।১২ বিঘার বেশী জমি ছিল না। অবশেষে গবর্মেণ্ট নিয়ম করিল যে, প্রত্যেক গৃহস্থ-চাষীকে অন্ততঃ ৪৫ বিঘা জমি দিতে হইবে। যেসকল জমিদার জমির মালিক হইয়াও তাহা চাষ করে না তাহাদের নিকট হইতে গবর্মেণ্ট জমি কিনিয়া চাষীদের হাতে দিবার ব্যবস্থা করিলেন। যদি জমির মূল্য এক হাজার টাকা হয়, আর কোন চাষী যদি এত টাকা দিতে না পারে, তবে গবর্মেণ্ট তাহাকে নয় শত টাকা কর্জ্জ দিবেন ও বাকী একশত টাকা সে নিজে দিয়া জমি পাইবে। যথাসময়ে এই ঋণের টাকা শোধ হইয়া গেলে জমি চাষীরই হইল। এইরূপে ডেনমার্কের গবর্মেণ্ট কৃষাণ-মালিকের সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি করিতেছে। অতি অল্প কালের মধ্যেই তথায় ৪০ লক্ষ লোকের মধ্যে প্রায় ৩০ লক্ষ কৃষাণ-মালিক হইয়াছে।

তারপর ১৯১৯ সনে জার্ম্মাণীতে পুনরায় আইন হয় যে, ৮৭৫ বিঘার বেশী যদি কাহারও জমি থাকে, তবে সেই অতিরিক্ত জমির এক-তৃতীয়াংশ তাহাকে গবর্মেণ্টের নিকট বিক্রয় করিতে হইবে। ১৯০৮ সনে ইংলণ্ডে স্মল হোল্ডিংস্ আইন পাশ হয়। এইরূপে ইয়োরোপে জমিজমার আইন-কানুনের ফলে একটা বিপুল আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে। যে সমস্যার সম্মুখে ভারতবর্ষ আজ উপস্থিত হইয়াছে—অর্থাৎ পল্লীর কিরূপে উন্নতি করিতে হইবে, কারখানার মজুর ও ক্ষেত্রের কৃষকের মধ্যে কিরূপে সামঞ্জস্য-স্থাপন করিতে হইবে, কলকারখানা থাকিবে, না চাষের জমিজমা থাকিবে,— উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সেই সমস্যা ইয়োরোপের সম্মুখে

আসিয়াছিল। জার্ম্মাণী অগ্রসর হইয়া তাহার মীমাংসার উপায় করিয়াছে।

এই যে ভারতবর্ষে কৃষি-কার্য্যের অবস্থা অনুসন্ধানের নিমিত্ত রয়েল-কমিশন বসিতেছে, এই যে একজন কৃষিতত্ত্বাভিজ্ঞ পণ্ডিত ভারতের বড়লাট হইয়া আসিতেছেন, ইহা সেই আন্দোলনেরই অন্যতম তরঙ্গ। ভারতবর্ষে ইহার প্রয়োজন বর্ত্তমান সময়ে অত্যধিক। এই রয়েল কমিশনকে অনাবশ্যক বাহ্যাড়ম্বর বিবেচনা করিলে ভুল করা হইবে। একশত বৎসর ধরিয়া ইয়োরোপে যে সমস্যার মীমাংসা হইতেছে, আজ ভারতবর্ষে সেই সমস্যার আলোচনা আরম্ভ হইতেছে। তাহা হইলে দেখুন আমরা কত পশ্চাতে! যদি আমরা এই আন্দোলনের তরঙ্গ আত্মস্থ করিতে না পারি তবে যে একশত বৎসর পশ্চাতে আছি, সেখানেই পড়িয়া থাকিব।

(৪) শিল্প-কারখানায় মজুর-রাজ

গত ২৫ঠা ফেব্রুয়ারী এলবার্ট ইনষ্টিটিউট হলে অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার "শিল্পকারখানায় মজুর-রাজ" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন ভারতবর্ষের লোকের পক্ষে মজুর-রাজের কল্পনা করাও অসম্ভব। আর্থিক উন্নতির প্রথম খুঁটী অর্থ; তাহার প্রতিষ্ঠা ব্যাঙ্কে। দ্বিতীয় খুঁটী কর্ম্মক্ষম লোক; তাহার সৃষ্টি হয় ব্যাধি, বার্দ্ধক্য ও দৈববীমা দ্বারা। তৃতীয় খুঁটী চাষবাস; তাহার উপায় হয় জমিজমার আইনকানুন দ্বারা। চতুর্থ খুঁটী শিল্প; তাহার উন্নতি হয় কারখানায় মজুররাজ প্রতিষ্ঠার দ্বারা।

মজুর কথাটী ভারতে নাই। কাহারও অধীনে চাকুরী করিলেই সে মজুর হয় না। এ দেশের লোক অলস; বেশী পয়সা দিলেও কাজ করিতে চায় না। পুরাতন দা, বঁটি, ঝাঁটা প্রভৃতির দ্বারা তাহারা কোন প্রকারে কাজকর্ম্ম করিয়া যায়, বিজ্ঞানের নব উদ্ভাবিত যন্ত্রাদির সাহায্যে নিত্য নূতন নূতন সুবিধায় নিজেকে চোস্ত, পোক্ত ও দুরস্ত করিয়া কাজ করিতে জানে না। কিন্তু ইয়োরোপে ও আমেরিকায় মজুরেরা সেরূপ নয়। তাহারা যেমন পরিশ্রমী, তেমনি প্রতিদিন নূতন নূতন উদ্ভাবনের সাহায্যে কার্য্যের সুবিধা করিয়া শক্তিশালী হইতেছে। আমরা বেকার সমস্যাকে ভয় করিয়া চলি। কিন্তু ইয়োরোপ ও আমেরিকার বেকার মজুরের সংখ্যা শুনিলে আপনারা আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। ইতালীতে ৫ লাখ, ফরাসী দেশে ১৫ লাখ, ইংলণ্ডে প্রায় ২০ লাখ, আমেরিকায় প্রায় ৭৫ লাখ মজুর বিনা কাজে বসিয়া আছে অথবা কিছুদিন আগেও বসিয়া ছিল।

মজুরদের অবস্থা উন্নত করিবার জন্য ১৮৩০ সনে পাশ্চাত্য দেশে ট্রেড ইউনিয়ান স্থাপিত হইয়াছে। আর আমাদের দেশে ১৯২৬ সনে অর্থাৎ তাহার প্রায় একশত বৎসর পরে ট্রেড ইউনিয়ানের কথা শুনা যাইতেছে মাত্র। ১৯১৯ সনে জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রীয়া আরও অগ্রসর হইয়াছে। তথায় রাষ্ট্রীয় গঠনের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত করিয়া এমন একটী আইন তৈয়ারী করা হইয়াছে, যাহাতে মজুরদের মধ্যে স্বরাজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। অষ্ট্রীয়ায় ও জার্ম্মাণীতে এইরূপ আইন প্রচলিত হইয়াছে যে, পাঁচজন লোক কোন মনিবের অধীনে চাকুরী করিলেই তাহারা তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিয়া দিবে। সে মনিবের সহিত সমানে বসিয়া কর্ম্মচারীদের সুখ-সুবিধার বিষয় তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনা করিবে। কোনো কর্ম্মচারী এক মাস কাজ করিলেই সে প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনে ভোট দিবার অধিকার পাইবে। এই প্রতিনিধি ট্রেড্ ইউনিয়ানের মুখপাত্রস্বরূপ কার্য্য করিবে। মনিব ট্রেড্ ইউনিয়ানের আইন-কানুন মানিয়া চলিতেছে কিনা তাহা সে দেখিবে। যদি কোনো মনিব এই মজুর-রাজের প্রতিনিধির বিপক্ষে চলে বা তাহাকে বরখাস্ত করিবার চেষ্টা করে, তবে তাহার ১৫০০৲ টাকা জরিমানা ও ৮ মাস জেল হইবে। রাজ্যের সকল প্রকার কর্ম্মকেন্দ্রে, পরিবারে, আফিসে, কারখানায়, আমোদ-প্রমোদের স্থলে, ওকালতী, ডাক্তারী প্রভৃতি ব্যবসায়ে—সর্ব্বত্রই এই আইন প্রযুক্ত হইবে। ভারতের লোকের চিন্তায় এরূপ স্বরাজের কল্পনা এখনও আসিতে পারে না।

(৫) ধনোৎপাদনের বিদ্যাপীঠ

গত ১০ই ফেব্রুয়ারী এলবার্ট ইনষ্টিটিউট্ হলে অধ্যাপক

বিনয়কুমার সরকার "ধনোৎপাদনের বিদ্যাপীঠ" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন—আজকাল যেরূপ নানা প্রকারে ধনোৎপাদনের বিদ্যা শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে, ৫০ বৎসর পূর্ব্বে তাহা অজ্ঞাত ছিল। বাস্তবিক সকল প্রকার বিদ্যাই অর্থকরী। পৌরহিত্যও একটা ব্যবসায়। কিন্তু ভারতে যেরূপ বিনাক্লেশে ও প্রায় কিছু না শিখিয়াই পুরোহিতগিরি করা যায়, ইয়োরোপে তাহা যায় না। অথচ ইয়োরোপকে আমরা ধর্ম্মহীন দেশ বলিয়া থাকি। সেখানে অনেক অধ্যয়ন করিয়া, অনেক কঠিন পরীক্ষায় পাশ করিয়া, বহুদিন কোন গীর্জ্জায় বা ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানে হাতে-কলমে কাজ করিয়া পাকা হইলে তবে লোকে পৌরহিত্য করিবার সার্টিফিকেট পায়। আজকাল "ভোকেশানেল" স্কুল বলিয়া একটা কথা উঠিয়াছে। কিন্তু আমি বলিতে চাই, একথাটা কেহই বুঝেন না। ডাক্তারী ওকালতী, ইত্যাদি সমস্তই ত ব্যবসায়-মূলক ও অর্থকরী বিদ্যা। তবে আবার পৃথক ভোকেশানেল স্কুলের প্রয়োজন কি? ইয়োরোপে ভোকেশানেল স্কুল বলিতে যাহা বুঝা যায় তাহার ধারণাও ভারতের লোক করিতে পারিবে না। জার্ম্মাণীতে আইন আছে, প্রত্যেক জার্ম্মাণ নরনারী ১৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বিনা বেতনে স্কুলে পড়িতে বাধ্য। ইহাকে বলে সার্ব্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা। ইহাতে প্রত্যেক জার্ম্মাণ ধনোৎপাদনের এক একটী শক্তিশালী যন্ত্রস্বরূপ হইয়া পড়ে। এই শিক্ষার বিষয়ে আমরা জার্ম্মাণীর আদর্শ ধরিতে গেলে সেখানে থই পাইব না। ফ্রান্স আয়তনে অনেকটা বাংলাদেশের সমান। তাই ফ্রান্সের কথাই আমি বলিব।

ফ্রান্সে পৌনে চার কোটী লোক, এক লাখ এঞ্জিনিয়ার ও ৫০ লাখ মজুর। প্রত্যেক এঞ্জিনিয়ারের অধীনে গড়ে ৫০ জন মজুর। সেখানে বৎসরে আড়াই হাজার এঞ্জিনিয়ার তৈয়ারী হয়। তন্মধ্যে তিন-চার শত আসে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে, ছয় শত আসে কারখানার নিম্ন বিভাগ হইতে প্রমোশন পাইয়া, আর বাকী ১৫০০ এঞ্জিনিয়ার আসে ১০০টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টেকনিক্যাল স্কুল হইতে। দেশে উৎপন্ন আর্থিক সম্পদের দিকে লক্ষ রাখিয়া ফ্রান্সদেশকে ১১টী "রেজ্যানে" (বিভাগে) বিভক্ত করা হইয়াছে। এই ১১টী বিভাগে ঐ ১০০টী টেক্‌নিক্যাল স্কুল। যেখানে আঙ্গুরের চাষ হয় সেখানে মদ্যের কারখানা ও তাহার স্কুল;—যেখানে খনিজ দ্রব্যাদি প্রচুর সেখানে খনিবিদ্যার স্কুল;—যেখানে গুটী পোকার চাষ হয় সেখানে রেশমের কারখানা ও তাহার স্কুল ইত্যাদি। প্রসঙ্গতঃ আপনাদিগকে জানাইতেছি,—ফ্রান্সে ফরাসীদের ব্যবহারের জন্য যে মদ্য তৈয়ারী হয়, তাহাতে শতকরা ছয় কি সাত ভাগের বেশী সুরাসার (এলকোহল) থাকিতে পারে না,—কড়া আইনে তাহা নিষিদ্ধ। আর আমাদের আধ্যাত্মিক ভারতে শতকরা ৭৫ ভাগেরও বেশী সুরাসার (এলকোহল) চাই। যাহা হউক, ঐ ১০০টী টেক্‌নিকাল স্কুলের মধ্যে ২০টী মেয়েদের জন্য ও তিনটী চাষবাসের কার্য্য শিক্ষা দেওয়ার জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে।

বঙ্গদেশকেও ঐরূপ আর্থিক সম্পদ্ অনুযায়ী ভাগ করিয়া প্রত্যেক বিভাগে ঐ প্রকার টেক্‌নিক্যাল স্কুল স্থাপন করিতে হইবে। কিরূপে ৪০।৫০ হাজার টাকায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টেক্‌নিক্যাল স্কুল চালান যায় তাহা আপনারা ফ্রান্সে যাইয়া দেখিয়া আসুন। গবর্মেণ্ট একটা প্রস্তাব করিলেই অমনি আমাদের দেশের লোক তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া আন্দোলন করিতে থাকে,—এই যে নূতন বড়লাট আসিয়া কৃষি-কার্য্যের উন্নতি-সাধন করিবেন বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে,—অথবা এই যে কৃষকদের অবস্থা জানিবার নিমিত্ত রয়েল কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে অনেকেই গবর্মেণ্টের কোন অসদুদ্দেশ্য আছে বলিয়া খুব লেখালেখি ও চীৎকার করিতেছেন। কিন্তু আমি বলি, আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই, এমন কি, নামজাদা লোকেরাও এখনও গবর্মেণ্টের কোনো কার্য্যের সমালোচনা করিবার যোগ্যতালাভ করে নাই। আপনারা ইয়োরোপে যান—দুই একজন নয়, অন্ততঃ ৫০ জন বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল ও জ্ঞানী ব্যক্তি পাশ্চাত্যদেশে যান—সেখানে তাহারা কিরূপে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে তাহা দেখিয়া আসুন, তখন অন্ততঃ আপনারা গবর্মেণ্টের কার্য্যের দোষগুণ ধরিবার অধিকারী হইতে পারিবেন। ২৯ হাজার ফুট হিমালয়-শৃঙ্গে

রহিয়াছে জার্ম্মাণী, ইংলণ্ড, আমেরিকা,—আর ভারতবর্ষ অগাধ সাগরের তলদেশে!

(৬) আর্থিক উন্নতিতে নারীর কার্য্য

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী এলবার্ট ইনষ্টিটিউট হলে অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার দুনিয়ার আধুনিক "আর্থিক নারী" সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন,—সমগ্র বিশ্ব ও সমস্ত জাতি সেই পুরাকাল হইতে এক পথে চলিতেছে। পাশ্চাত্যের কর্ম্মপদ্ধতি এক প্রকার,—প্রাচ্যের অন্য প্রকার ইহা নহে। সুয়েজ খালের এক পারের লোকদের যে পথ,—অপর পারের লোকদেরও সেই একই পথ। প্রাচ্যদেশ যে আধ্যাত্মিক হিসাবে জগতের গুরুস্থানীয় এ কথা সত্য নহে! প্রাচ্যদেশ কোন অতীতকালে জগতের গুরু ছিল, তাহাও সত্য নহে। বড় জোর তাহারা পাশ্চাত্যের সমকক্ষ হইয়া চলিয়াছিল এই পর্য্যন্ত। সকলে এক দিকে চলিয়াছে। তবে কেহ বা অগ্রে, কেহ বা পশ্চাতে। কেহ বা দশম ধাপে, কেহবা অষ্টম ধাপে, কেহ বা তৃতীয় ধাপে; আবার কেহ প্রথম ধাপেও রহিয়াছে।

জগতের অনেক মহাপুরুষ এক একটী চিন্তায় মসগুল হইয়া শুধু সেই তত্ত্বকেই একমাত্র অবলম্বনীয় সত্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন—"সোহং," আমিই সেই;—কেহ বলিয়াছেন, "সর্ব্বান্ ধর্ম্মান্ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—কেহ বলিয়াছেন,"আমিই ঈশ্বরের প্রতিনিধি"। হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান সকলকেই আমি বলিতে চাই, এইসকল কথাই একমাত্র সত্য নয়। তেমনি আজ যদি কেহ বলেন দুনিয়ার ধনদৌলত যা-কিছু সমস্ত নারীর দ্বারাই সৃষ্ট হইয়াছে, তাঁহাকে আমি ভ্রান্ত বলি। একটী জিনিষকে এইরূপ প্রাধান্য দিতে গেলে সংসার এক অস্বাভাবিক, হাস্যকর ও লজ্জাজনক অবস্থায় উপনীত হয়।

নারীদের মধ্যে স্বাধীনতার অভাব পাশ্চাত্য দেশেও ছিল। সেই জন্যই নারী-স্বাধীনতার আন্দোলন ইয়োরোপে ও আমেরিকায়ই প্রথম আরম্ভ হয়। ভারতবর্ষই শুধু নারীদিগকে পদদলিত ও ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখে নাই। তবে পাশ্চাত্য দেশ গত চল্লিশ বৎসরের মধ্যে নারীদিগের অবস্থা উন্নত করিয়াছে, আমরা তাহার চেষ্টাই করিতে পারি নাই। এই বিষয়ে আমরা আধুনিক জগতের ৪০।৫০ বৎসর পশ্চাতে। নারীদের শিক্ষা ও কার্য্য বিষয়ে জার্ম্মাণি কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, আমি সেই কথাই বলিব।

জার্ম্মাণির নারীগণ প্রধানতঃ চারি বিভাগে আর্থিক উন্নতি সাধন করিয়া থাকে। (১) গৃহস্থালী (২) শিল্প (৩) বৈজ্ঞানিক কর্ম্ম (৪) সমাজ-সেবা। প্রথমতঃ, গৃহস্থালীর সকল কার্য্য প্রাতে ৫টা হইতে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত গিন্নীরা নিজে করেন। একজন জার্ম্মাণ গৃহিণী যেরূপ পরিশ্রম করিতে পারেন, আমাদের দেশী পাঁচ জন মহিলা তাহা পারেন না। তাঁহাদের ঘর-কন্না—আমি যখন তখন যাইয়া দেখিয়াছি—কোথায়ও একটু বে-শিজিল নয়। তাঁহাদের রান্নাঘর যেন একটী লেবরেটরী! এইসকল গৃহকর্ম্ম-অভিজ্ঞ নারীগণ গিন্নীপনার ব্যবসা করেন। ছাত্রাবাস ও হোটেলসমূহে এইসকল পাকা গিন্নীরা উচ্চ বেতনে পরিচালকের পদ গ্রহণ করেন। সকল স্বাস্থ্যনিবাসে তাঁহারাই প্রধান কর্ম্মকর্ত্রী। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বোর্ডিং-স্কুল তাঁহারা পরিচালনা করেন। এসকল গিন্নীপনার কার্য্য পরিবারের মধ্যে শিখিবার উপায় নাই। তজ্জন্য স্কুলে যাইতে হয়। জার্ম্মাণীতে ঝিগিরি, রাঁধুনীগিরি করিতে হইলেও পরীক্ষায় পাশ করিয়া সার্টিফিকেট লইতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ, পোষাক তৈয়ারী, টুপী তৈয়ারী ও অপরাপর নানাবিধ কাপড়ের শিল্পে মেয়েরা অনেক উপার্জ্জন করে। সুটের কাপড় কিনিয়া মেয়েদের কাছে দিলে তাহারা খুব সস্তায় পোষাক তৈয়ারী করিয়া দেয়। টুপী তৈয়ারী খুব শক্ত কাজ। প্যারিসের মেয়েরা এ কার্য্যে সিদ্ধহস্ত। তৃতীয়তঃ, বিজ্ঞানবিষয়ে মেয়েরা ডাক্তারের এসিষ্ট্যান্ট অর্থাৎ সহকারিণী। চিকিৎসালয়ের সমস্ত কাজই মহিলাগণ করেন। রাসায়নিক পরীক্ষাগারে, এঞ্জিনিয়ারের আফিসে নক্‌সার কার্য্যে, খাদ্যপরীক্ষার কার্য্যে বহুসংখ্যক মহিলা নিযুক্ত আছেন।

চতুর্থতঃ, সমাজ-সেবার নানা কার্য্যে প্রধানতঃ রোগীর

শুশ্রূষায় ও বীমা-বিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহে নারীগণ বহু প্রকার কার্য্য করিতেছেন। সেখানে রোগীদের জন্য শুশ্রূষাকারিণী-নিয়োগের বিশেষ কড়া পরীক্ষা আছে। আমাদের দেশের বি, এ, অথবা বি, এস্-সি'র সমান বিদ্যা না হইলে কেহ সমাজ-সেবার এই বিভাগে প্রবেশ করিতে পারেন না। ১৯১৪ সনের পূর্ব্বে জার্ম্মাণিতে এই প্রকার সমাজ-সেবার মহিলা-বিদ্যালয় ১০টী ছিল, এখন ৪০টী হইয়াছে। দুই তিন বৎসর কাল কোনো হাঁসপাতালে বা স্বাস্থ্য-নিবাসে হাতে-কলমে কাজ শিক্ষা না করিলে এইসকল বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার অধিকার কোনো নারী পায় না। এই বিদ্যালয় হইতে পাশ করিয়া সার্টিফিকেট পাইলেও ২৪ বৎসর না হইলে কোনো নারী রোগী-শুশ্রূষাকারিণীর কার্য্য করিতে পারে না। যিনি যে রোগের বিষয়ে বিশেষ সার্টিফিকেট পাইয়াছেন, তিনি সেই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরই শুশ্রূষা করিবেন। সেখানে এরূপ আইন-কানুন।

(সঞ্জীবনী, ২১শে মাঘ, ৬ ফাল্গুন, ১৩৩২)

প্রস্তাবিত বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব-আইনের সংশোধন

শ্রীবিনোদ বিহারী চৌধুরী বি, এ, (ঢাকা)

বাংলার অধিকাংশ লোক সাক্ষাৎ এবং পরোক্ষভাবে জমির উপর নির্ভর করে। কেহ কৃষিকার্য্যে দিন-মজুরি খাটে, কেহ নিজে কৃষি করে, কেহ কৃষককে জমি চাষ করিতে দিয়া তাহার বিনিময়ে প্রাপ্ত খাজনা—টাকার হিসাবেই হউক অথবা ফসলের পরিমাণেই হউক—ভোগ করে; এইরূপে এক ভাবে না হউক অন্য ভাবে বাংলার জন-সমষ্টির বৃহত্তম অংশ জমির উপর নির্ভর করিতেছে। কাজেই জমি-জমার আইনের পরিবর্ত্তনের ফলাফল অতি ব্যাপক ভাবে সমগ্র সমাজকে স্পর্শ করিবে। প্রস্তাবিত আইনের সংশোধন কোন্ শ্রেণীর উপর কিরূপ ফলাফলের কারণ হইবে—দিন-মজুর, কৃষক, মধ্যশ্রেণী এবং জমিদার কাহার পক্ষে কিরূপ হইবে, এই প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। আইনের সংশোধনের ফলে এমন কোনও অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে কিনা যাহাতে চাষী অধিক ফসল উৎপন্ন করিতে অথবা কম খরচে কৃষিকার্য্য করিতে সমর্থ হইবে, তাহারও আলোচনা করিব।

কৃষি-কর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থা

প্রথমেই কৃষিকর্ম্মের কথা ধরা যাউক। আমাদের কৃষির উন্নতির বিবিধ বিঘ্ন রহিয়াছে। বর্ত্তমান সংশোধনে সেইসকল দূর করিবার জন্য বিশেষ কোনও বিধান নাই আমাদের কৃষি গতানুগতিক ভাবে চলিতেছে। ঘন চাষ (গভীর আবাদ) অথবা বিপুলায়তন ব্যাপক কৃষি-ক্ষেত্র আমাদের দেশে নাই। ভূমির আইন, উত্তরাধিকার আইন, স্থিতিশীলতা এবং গতানুগতিকতা ইত্যাদি বিবিধ কারণে এই দুই ব্যবস্থা আমাদের দেশে চলিতে পারে না। অধিকন্তু, অন্যান্য উৎপাদক ব্যবসায়ে যেরূপ 'বিস্তৃতায়তন উৎপাদন' হইয়া থাকে, স্বাভাবিক কারণে কৃষিতে ততটা হয় না। কৃষি-ক্ষেত্রের প্রসার বড় হইতে বাধ্য। কাজেই অন্যান্য উৎপাদক ব্যবসায়ে যেমন ভালরূপ তত্ত্বাবধান করা চলে, কৃষিতে তেমন চলে না। মূলধন এবং মজুর সারাবৎসর ধরিয়া উৎপাদন-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে পারে না, কারণ কৃষি ঋতুবিশেষের ব্যবসায়। এই ত হইল সর্ব্বদেশ-সাধারণ কারণ।

উত্তরাধিকার আইন এবং জমির আইন আমাদের দেশে বিশেষ ভাবে কৃষির অন্তরায়। জমির আইনে কৃষক ইচ্ছামত ভূমি হস্তান্তর করিতে অসমর্থ। উত্তরাধিকার আইনে ভূমি ক্রমেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে। এই অবস্থায় যে উৎকৃষ্ট প্রণালীতে কৃষি করিতে চেষ্টা করিবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। এক বিঘা মাত্র জমিতে খরচ করিয়া

জল নিকাশের স্থায়ী সুবন্দোবস্ত করিতে গেলে অথবা উৎকৃষ্ট যন্ত্রাদির সাহায্যে চাষ করিতে গেলে খরচ উঠিবে না। কিন্তু বহু মাইল ব্যাপিয়া এইরূপ উৎকৃষ্ট প্রণালীতে চাষ করিতে গেলে বিঘাপ্রতি খরচ কম পড়িবে এবং কৃষকের যথেষ্ট লাভ থাকিবে। উত্তরাধিকার আইনের ফলে ভূমির খণ্ডীকরণে কৃষি ক্রমেই অধিকতর শ্রম-সাধ্য ও ব্যয়-সাধ্য হইয়াছে। এক বিঘা জমিতে চাষাদি করিতে যে শ্রম এবং ব্যয় হয়, এক বিঘার পঞ্চমাংশের চাষ করিতে অনুপাতে শ্রম এবং ব্যয় বেশী করিতে হয়। জমির সীমানা-শহীরন্দ ঠিক রাখিতে কৃষক বাধ্য। পাশাপাশি দুই ক্ষেতের মালিক হইলেও কৃষক মধ্যের আইল ভাঙ্গিয়া দুই ক্ষেতকে এক ক্ষেতে পরিণত করিতে পারে না। কাজেই কৃষককে বাধ্য হইয়া আগে এক ক্ষেতের চাষ সারিয়া পরে অন্য ক্ষেতের চাষ করিতে হয়। ইহাতে সময়ও বেশী লাগে এবং পরিশ্রমও বেশী করিতে হয়। হয়ত ছোট একটুকরা জমির ব্যবধানে কোনও কৃষকের খুব বড় বড় দুই ক্ষেত আছে। সেই ছোট টুকরা ক্রয় করিলেও কৃষক তাহার সব ক্ষেতগুলিকে এক ক্ষেতে পরিণত করিতে পারে না। প্রজাস্বত্ব আইনের নূতন বিলে সীমানা-শহীরন্দ ঠিক রাখা সম্বন্ধীয় কঠোরতায় হাত দেওয়া হয় নাই। কৃষকের ক্ষেতগুলি প্রায়ই এক চাপে এক জায়গায় থাকে না। একটি ক্ষেত হয়ত তাহার বাড়ীর পূর্ব্বদিকে আধ মাইল দূরে অবস্থিত আর একটী ক্ষেত হয়ত বাড়ীর পশ্চিমে এক মাইল দূরে আছে। এই দুই ক্ষেতে চাষের ভাল রকম তত্ত্বাবধান করা কৃষকের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হয়। ভূম্যধিকারীর বিনা অনুমতিতে জোত হস্তান্তরযোগ্য না থাকায় 'এওয়াজ' পরিবর্ত্তন করিয়া কৃষকগণ এই অসুবিধা দূর করিতে পারিত না।

বর্ত্তমান বিলে জমিকে মোটামোটি হস্তান্তরযোগ্য বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু পরিবর্ত্তিত ভূমির মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া মূল্যের চৌথ নামজারীর জন্য দাবী করার অধিকার জমিদারকে দেওয়ায় 'এওয়াজ' পরিবর্ত্তনের সন্তোষজনক বিধান আইনে হইল না। যেখানে কেবল মাত্র কৃষিকার্য্যের সুবিধার জন্য 'এওয়াজ' পরিবর্ত্তন হইবে, সেখানে জমিদার যাহাতে নামজারীর জন্য বেশী টাকা দাবী না করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। নতুবা 'এওয়াজ' পরিবর্ত্তনের অধিকারের মূল উদ্দেশ্য পণ্ড হইবে। অন্যত্র আমরা নামজারীর জন্য মূল্যের চৌথের ব্যবস্থার বিস্তৃত আলোচনা করিব। ভূমির খণ্ডীকরণ নিবারণের কোনও উপায় আইনে অবলম্বন করার সুবিধা আপাততঃ নাই বলিয়া মনে হয়।

কৃষককে অতি দীর্ঘ সময়ে ধীরে ধীরে পরিশোধ করার অবকাশ দিয়া ধার দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভূমির অতিবণ্টন নিবারণ করা যায়। ইয়োরোপের কোনও কোনও দেশে এইরূপ নিয়ম আছে যে, পৈতৃক কৃষি-জমির বণ্টন হইতে পারে না। ভাইদের মধ্যে একজন সমস্ত জমি নেয় এবং অন্য ভাইদের অংশের দাম ব্যাঙ্ক হইতে কর্জ্জ করিয়া তাহাদিগকে দিয়া দেয়। ব্যাঙ্কের পাওনা সে ধীরে ধীরে পরিশোধ করে। পাঁচ ভাই থাকিলে এবং পৈতৃক কৃষি জমির মূল্য ১০ হাজার টাকা হইলে, এক ভাই সমস্ত জমি অবিভক্ত অবস্থায় নিয়া বাকী চারি ভাইকে দুই হাজার করিয়া আট হাজার টাকা দিয়া দেয়। বর্ত্তমানে এই ব্যবস্থা আমাদের দেশে চালান সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। তবে যাহাতে বিক্রয়ের জন্য জমি বেশী ছোট করিতে না পারা যায় আইনে এইরূপ ব্যবস্থা করা সম্ভবপর। বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে যাহাতে জমিকে এক একরের ষষ্ঠাংশের চেয়ে ছোট করা না যায় তাহার ব্যবস্থা করা সম্ভবপর এবং উচিত।

প্রস্তাবিত বিল ও রায়ত

এইত গেল কৃষির কথা। প্রস্তাবিত সংশোধনে কৃষি-কার্য্যের সুবিধা বিশেষ কিছু হইবে বলিয়া মনে হয় না। রায়তের কি কি সুবিধা হইবে দেখা যাউক। রায়তকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে;—কৃষক রায়ত, অর্থাৎ যে নিজে নিজের জমিতে কৃষি করে এবং অকৃষক রায়ত, অর্থাৎ যে বর্গা ইত্যাদি প্রথায় অন্যের দ্বারা নিজের রায়তী জোত চাষ করায়। শেষোক্ত শ্রেণীর কথা বিস্তৃত ভাবে পরে আলোচিত হইবে।

বর্ত্তমান বিলে দখলী-স্বত্ব-বিশিষ্ট জোতমাত্রই হস্তান্তর-যোগ্য বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। দাখিল-খারিজের

নজর জোতের খরিদা মূল্যের চৌথ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। জমিদার ইচ্ছা করিলে ক্রেতাকে খরিদা মূল্য এবং তৎসহ শতকরা ১০৲ হারে ক্ষতিপূরণ দিয়া জোত নিজ দখলে নিতে পারিবে। শতকরা ২৫৲ হারে নজর ধার্য্য করায় জোতের ক্রেতা এবং বিক্রেতার অবস্থার প্রকৃত কোন উন্নতি হইল না। আইনে যাহাই থাকুক না কেন, রায়তী জোত পূর্ব্বেই কার্য্যতঃ হস্তান্তর-যোগ্য ছিল এবং সচরাচর শতকরা ২৫৲ টাকার বেশী নাম-জারীর জন্য নজর দিতে হইত না। জমির মূল্য যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ভবিষ্যতে যেরূপ বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে দাখিল খারিজের নজর শতকরা ২৫৲ টাকা হইতে যথেষ্ট পরিমাণে কমাইয়া শতকরা ৮৲ করিলেও ঐ বাবদে জমিদারের যে আয় হইত তাহার হ্রাস হইবে না। কারণ গত ৮।১০ বৎসরের মধ্যে জমির মূল্য ৩।৪ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিল-প্রণেতারা নিষ্কর ভূমির ভূস্বামীর জন্য শতকরা দুই টাকা হারে দাখিল খারিজের নজর ঠিক করিয়া দিয়াছেন এবং বিক্রীত জমি কোনো প্রকারেই ভূস্বামীর খাসে যাইতে পারে এরূপ ফাঁক রাখেন নাই। ইহা অতি উত্তম বিধি।

জমিদারদের সম্বন্ধেও ঐরূপ বিধি হওয়া উচিত। প্রচলিত আইনে জমিদার এবং নিষ্কর স্বত্বের অধিকারীর দাখিল-খারিজের নজর এবং বিনা অনুমতিতে হস্তান্তরিত জোত খাসদখলে নেওয়ার অধিকার একরূপই আছে। যদি নিষ্কর স্বত্বের অধিকারীদের নজর শতকরা দুই টাকা ধরা যাইতে পারে এবং বিক্রীত জমি খাসদখলে নেওয়ার উপায় হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করা যাইতে পারে, তবে জমিদারদের সম্বন্ধে ভিন্নরূপ আইন হওয়ার সঙ্গত কারণ কি থাকিতে পারে আমরা বুঝিতে অক্ষম। উত্তরে হয়ত কেহ বলিবেন যে, নিষ্কর স্বত্বের অধিকারীরা বিনা খাজনায় জমি ভোগ করেন বলিয়া তাঁহাদের সম্বন্ধে আইন ভিন্নরূপ হওয়া উচিত। কিন্তু জমিদারদের সম্বন্ধেও বলা চলে যে, তাঁহারা চিরস্থায়ী ব্যবস্থার ফলে অতি সামান্য স্থায়ী জমায় জমিদারী ভোগ করেন, অতএব তাঁহাদের শতকরা দুই টাকা হারে নজর পাওয়া উচিত এবং বিক্রীত জমি খাসদখলে নেওয়ার অধিকার তাঁহাদের না থাকা উচিত। দাখিল খারিজের নজর কমিলে জমিদারদের বিশেষ কোনো ক্ষতি হইবে না, কিন্তু নিষ্কর স্বত্বের অধিকারীদের বিশেষ ক্ষতি হইবে। নিষ্কর-স্বত্বাধিকারীদের সংখ্যা অত্যন্ত কম এবং তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা খুব সচ্ছল হওয়ার সম্ভাবনা আরও কম। পক্ষান্তরে জমিদারদের অর্থ ও প্রতাপ খুব বেশী, কাউন্‌সিলে তাঁহাদের দল বেশ পুরু। এই জন্যই ভিন্ন ব্যবস্থা। নতুবা রাজা ক্ষৌণীশচন্দ্রও স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, সমব্যবস্থার খাতিরে জমিদারদের খারিজের নজর শতকরা দুই টাকা হওয়া উচিত এবং তাহাদিগকে রাইট-অব্‌ প্রিএম্‌সন্‌ (প্রথমে কিনিবার অধিকার) হইতে বঞ্চিত করা উচিত।

যে সব জায়গায় দেশাচারের প্রভাবে খারিজের নজর খুব কম এবং বিনা অনুমতিতে হস্তান্তরিত জমি জমিদারের খাসে নেওয়ার প্রথা নাই, সেখানে এই আইন পাশ হইলে রায়তের বিশেষ অসুবিধা হইবে। আইনে স্পষ্ট এই কথা থাকা চাই যে, আইন পাশ হইলে ঐ সব জায়গায় প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম হইবে না। নতুবা ঐ সব স্থান সম্বন্ধে আইন প্রতিক্রিয়া-মূলক হইবে।

দাখিল খারিজের নজর বাবদে মূল্যের চৌথ ধার্য্য হওয়ায় জোতের ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়েরই অসুবিধা হইবে। চৌথের টাকা উভয়ের নিকট হইতেই যাওয়ার সম্ভাবনা। বিক্রেতা এই জন্য জমির মূল্য বাবদে কম টাকা পাইবে এবং ক্রেতাকে জমির জন্য সবশুদ্ধ বেশী টাকা দিতে হইবে। বিশেষ করিয়া ক্ষতি হইবে বিক্রেতার। যে জমির মূল্য ৫০০৲ টাকা হওয়ার কথা, সেই জমির জন্য ক্রেতা ৪০০৲ টাকার বেশী দিবে না, কারণ জমিদারকেও আবার ১০০৲ টাকা দিতে হইবে। জমির মূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইলে সেই বর্দ্ধিত মূল্যের এক-পঞ্চমাংশ হইতে বিক্রেতা বঞ্চিত হইবে। জমির যে বর্দ্ধিত মূল্যের জন্য জমিদার বা রায়ত কেহই কিছু করে নাই, তাহার এক-পঞ্চমাংশ হইতে রায়ত বঞ্চিত হইবে এবং রায়ত অর্থব্যয়ে জমির উন্নতি করিয়া যে মূল্য-বৃদ্ধি করিবে তাহারও এক-পঞ্চমাংশ হইতে সে বঞ্চিত হইবে। ইহা অত্যন্ত অন্যায় বিধি। জমিদারকে প্রথমে কিনিবার সুযোগ দেওয়ায় সে প্রতিদ্বন্দ্বী

ক্রেতা রূপে দাঁড়াইলে কোনো কৃষকেরই জমি কেনা সম্ভবপর হইবে না। দাখিল খারিজের নজর শতকরা ২৫৲ নির্দ্ধারিত হওয়ায় এবং খাসদখলে নেওয়ার জন্য ক্রেতাকে শতকরা ১০৲ হারে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিধি হওয়ায়, সাধারণ রায়ত অপেক্ষা জমিদার শতকরা ১৫৲ টাকা কম খরচে জমি কিনিতে পারিবে। যদি একান্তই জমিদারকে সর্ব্বাগ্রে কেনার অধিকার দিতে হয়, তবে বিক্রীত জমি খাসে নেওয়ার সময় দেয় ক্ষতিপূরণের হার যেন কিছুতেই দাখিল খারিজের নজরের হার হইতে কম না হয়।

নূতন বিলে প্রজার দখলী জমিতে কোঠা-বাড়ী করার এবং কূপ-খনন করার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। এই বিষয়ে আইনের ভাষা এমন স্পষ্ট এবং সরল করা উচিত যাহাতে জমিদারের বিনা অনুমতিতে রায়ত তাহার দখলী জমিতে কোঠাবাড়ী করিতে ও পুষ্করিণী, কূপাদি প্রয়োজনমত খনন এবং ভরাট করিতে যে আইনতঃ অধিকারী, সে বিষয়ে যেন বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ না থাকে এবং মামলা-মোকদ্দমার সৃষ্টি হইতে না পারে। প্রজা দখলী জমিতে ইচ্ছামত বৃক্ষাদি রোপণ হইতে পারিবে এবং বৃক্ষের কাঠ ও ফলের যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিবে, সে জন্য তাহার জমিদারকে কোন প্রকার নজর দিতে হইবে না—এই মর্ম্মে আইনের সংশোধন হওয়া উচিত। বিলের ১৯শ ক্লজে মূল্যবান বৃক্ষের দামের চৌথ দাবী করার অধিকার জমিদারকে দেওয়া নানা দিক্ দিয়া অসমীচীন হইয়াছে। ইহাতে অনর্থক মোকদ্দমার সৃষ্টি হইবে। বিক্রয় ব্যতীত, দান এবং এওয়াজ পরিবর্ত্তনদ্বারাও জমি হস্তান্তর করার অধিকার প্রজাকে দেওয়া হইয়াছে। এখানেও শতকরা ২৫৲ হারে সেলামীর ব্যবস্থা মন্দের ভাল হইয়াছে। বিলের ৩৫শ ক্লজে অনাবশ্যক খাজনার মোকদ্দমাদিদ্বারা জমিদারের উৎপীড়ন হইতে প্রজাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। মনি অর্ডারে প্রেরিত খাজনা জমিদার গ্রহণ করিবে। খাজনার চারি কিস্তির পরিবর্ত্তে দুই কিস্তি করা উচিত। প্রজার প্রতি উৎপীড়নের মূল কারণ তাহার অশিক্ষা। শিক্ষার অভাবহেতু প্রজা আইনের সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে না। আইন-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য। নতুবা প্রজা পরিবর্ত্তিত আইনের সুফল পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিতে পারিবে না।

জমিদারের বিনা অনুমতিতে বহু জমি হস্তান্তরিত হইয়া আছে। ঐ সকল জমির খাজনা পূর্ব্বাধিকারীর নামে জমা দেওয়া হয়। ঐ সকল জমি যাহাতে জমিদারের খাসে না যাইতে পারে এবং বর্ত্তমানে যাহারা ক্রয় অথবা অন্যবিধ সূত্রে জমি ভোগ করিতেছে তাহাদের যাহাতে খারিজ করিবার সুবিধা হয়, আইনের সংশোধনে সেরূপ ব্যবস্থা থাকা উচিত।

জমিদারের বিনা অনুমতিতে জোত হস্তান্তর-যোগ্য হইলে রায়তের সুবিধা বা অসুবিধা কি হইতে পারে তাহার বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক। কেহ কেহ বলেন যে, এই নিয়মের ফলে রায়তের জমি মহাজনের হস্তগত হইবে। এই আশঙ্কা অমূলক বলিয়া মনে হয়। জমি হস্তান্তর-যোগ্য না থাকায় রায়তের ধার পাইতে অত্যন্ত অসুবিধা হয়। খুব কম মহাজন-ই তাহাকে টাকা ধার দিতে চায়। কারণ জমিদার বিরোধিতা করিলে ধারের টাকা আদায় হইবার সম্ভাবনা থাকে না। মহাজন যদি নিজে জমিদারীর অংশীদার হয় অথবা জমিদারের সঙ্গে যদি তাহার ভাল ভাব থাকে, তবে সে টাকা ধার দিতে প্রস্তুত হয়। ইহার ফলে মহাজনের অনুপাতে খাতকের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী হইয়া পড়ে এবং প্রতিযোগিতায় রায়ত অতি কড়া সুদে টাকা কর্জ্জ করিতে বাধ্য হয়। বর্ত্তমান বিল আইনে পরিণত হইলে রায়তের ক্রেডিট্ বাড়িবে এবং অনেক মহাজন রায়তকে টাকা কর্জ্জ দিতে চাহিবে। ফলে প্রতিযোগিতায় সুদের হার কমিয়া যাইবে। বর্ত্তমানে ফসলের যেরূপ মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে তাহাতে সুদের হার কমিলে এবং প্রজারা মিতব্যয়ী হইলে তাহাদের পক্ষে দেনা শোধ করা সহজ হইবে। কিন্তু প্রতিযোগিতায় সুদের হার কমিবে সে আশায় থাকা উচিত নয়। সুদের হার যাহে বাস্তবিকই কমে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। যাহাতে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের বিস্তার হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

এখানে একটা অবান্তর প্রস্তাব করিতেছি। দাখিল খারিজের জন্য যে নজর ধার্য্য হইবে তাহার দশমাংশ গভর্ণমেণ্টের প্রাপ্য হইবে। এই আয়ের সঙ্গে কৃষিজ দ্রব্যের এবং তৎসমবায়ে প্রস্তুত অন্যান্য জিনিষের উপর ধার্য্য রপ্তানি-শুল্কের আয় একত্র করিয়া ঐ টাকা কৃষকের অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য ব্যয় করিতে হইবে। এই টাকা কৃষকের উন্নতির উদ্দেশ্যে ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যয় হইতে পারিবে না। কৃষকদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক স্থাপন ইত্যাদি কার্য্যে ইহা ব্যয় করিতে হইবে। রপ্তানি-শুল্ক সর্ব্ব-ভারতীয় বিষয় বলিয়া এ সম্বন্ধে যথেষ্ট বিঘ্ন আছে। তবে পাট এবং পাটে প্রস্তুত জিনিষের উপর রপ্তানি-শুল্ক হইতে যে আয় হয়, তাহা বাঙ্গালা দেশকে ছাড়িয়া দিতে অন্যান্য প্রদেশের আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না।

জমিদারের স্বার্থ-পুষ্টি

জমিদারদের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে দেখিতে পাই যে, এই বিল তাহাদের স্বার্থে বিশেষ কিছু আঘাত করে নাই। পরিবর্ত্তিত জনমতের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া জমিদারের স্বার্থে যত কম আঘাত লাগে বিলে তাহার চেষ্টা করা হইয়াছে। নিষ্কর স্বত্বের অধিকারীদের অধীন রায়তী জোত মালিকের বিনা অনুমতিতে দান, বিক্রয় এবং 'এওয়াজ' পরিবর্ত্তন করিতে পারা যাইবে; দাখিল খারিজের নজর শতকরা দুই টাকা হারে নির্দ্ধারিত হইয়াছে এবং মালিকদিগকে আগে কেনার অধিকার দেওয়া হয় নাই। কিন্তু জমিদারের অধীন রায়তী জোত দান, বিক্রয় এবং পরিবর্ত্তন দ্বারা হস্তান্তরিত হইলে জমির মূল্যের শতকরা ২৫৲ দাখিল খারিজের নজর বাবদে জমিদারের প্রাপ্য হইবে এবং খরিদা মূল্যের উপর শতকরা ১০৲ টাকা হারে ক্ষতিপূরণ দিয়া জমিদার বিক্রয়দ্বারা হস্তান্তরিত জমি নিজ খাসদখলে আনিতে পারিবে। ব্যবস্থার তারতম্য হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, নূতন বিলে জমিদারদের স্বার্থের প্রতি ষোল আনা দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। বিলের ১৭শ ক্লজে জমিদারের ক্রীত, স্ব-জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত রায়তী জোতের জমিদারী স্বত্বে পরিণত হইবার বিধান হইয়াছে। এই বিধানে জমিদারীর অন্যান্য অংশীদারগণের ক্ষতি হইবে। এই বিধান অন্যায় এবং অস্বাভাবিক। ইহার ফলে জমিদারীর নগণ্য অংশীদারও জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত যাবতীয় কৃষিজমির জমিদারীস্বত্বে মালিক হইতে পারিবে। অন্য শরিকদের ইহাতে যথেষ্ট ক্ষতি হইবে। জমিদারগণকে রায়তী জোত-স্থিত বৃক্ষাদির সিকি মূল্যের অধিকারী করায় তাহাদের হাতে প্রজাকে জব্দ করিবার একটী ত্যক্তকর ক্ষমতা দেওয়া হইল। ক্লজ নং ৯১তে প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তনের কেহ কেহ প্রতিবাদ করিয়াছেন। আমরা ইহার সমর্থন করি। ইহা প্রজা এবং জমিদার উভয়ের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে। অনেক সময় প্রবল শরিক অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল শরিককে জব্দ করিবার জন্য তাহার অংশের প্রাপ্য খাজনা না দিতে প্রজাদিগকে প্ররোচিত করে। খাজনার মোকদ্দমা হইলে প্রজার দ্বারা স্বত্বের প্রশ্ন তুলে এবং অর্থ-সাহায্য করিয়া প্রজার দ্বারা হাইকোর্ট পর্য্যন্ত মামলা চালায়। অনেক সময় শরিকগণের মধ্যে স্বত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিলে স্বত্বের মোকদ্দমা না করিয়া সোজাসোজি খাজনার মোকদ্দমায় প্রজার দ্বারা জবাব দেওয়ায়। প্রজারা এই বিষয়ে প্রতাপশালী অংশীদারদের হাতের যন্ত্র হইয়া পড়ে। প্রস্তাবিত সংশোধনে কোন অংশীদার এই পন্থা-অবলম্বনে অন্য শরিককে জব্দ করিতে চাহিলে নিজের প্রাপ্য খাজনা হইতে বঞ্চিত হইবে। ৯২ নং ক্লজের পরিবর্ত্তন দ্বারা খাজনার মোকদ্দমার আপীল-ঘটিত নিয়মের যে সংশোধন হইবে তাহাতে খাজনার মোকদ্দমার নিষ্পত্তি শীঘ্র হইবে এবং ইহাতে কাহারও অপকার হইবে না এরূপ আশা করা যায়।

অ-কৃষক জোতদার

পরিবর্ত্তিত আইনের ফল অ-কৃষক জোতদারের পক্ষে কিরূপ হইবে তাহার আলোচনা করা যাউক। বাংলার মধ্যশ্রেণী অর্থাৎ ভদ্রলোকশ্রেণী সাধারণতঃ অকৃষক জোতদার। বিলে অধস্তন রায়তের দখলীস্বত্ব পাওয়ার বিধান করা হইয়াছে। কারণ বলা হইয়াছে যে, ১৮৮৫

সনের আইনের উদ্দেশ্য ছিল,—যে জমি চাষ করিবে তাহার সুবিধা করা। প্রকৃত পক্ষে এখন কৃষক সুবিধা পাইতেছে না। এক নূতন শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছে। তাহাদের জমিতে দখলীস্বত্ব আছে বটে, কিন্তু নিজেরা কৃষি কাজ করে না। সেই জন্য যাহারা জমি চাষ করিবে তাহাদিগকে দখলীস্বত্ব দিবার জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সাধারণতঃ, তিন রকমের চুক্তিতে অধস্তন রায়ত জোতদারের নিকট হইতে জমি নিয়া থাকে। প্রথমতঃ, বিঘাপ্রতি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ফসল দিবে; দ্বিতীয়তঃ, বিঘাপ্রতি নির্দ্দিষ্ট হারে টাকা দিবে, এবং তৃতীয়তঃ, উৎপন্ন শস্যের এক নির্দ্দিষ্ট ভগ্নাংশ, সাধারণতঃ অর্দ্ধাংশ, দিবে।

অধস্তন রায়তের দখলী স্বত্ব

অধস্তন রায়তকে দখলীস্বত্ব দেওয়ার স্বপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তির অবতারণা করা হয়। অধস্তন রায়ত প্রকৃত পক্ষে কৃষি করে, ফসল উৎপাদনের জন্য হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে, অথচ সে তাহার পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফল নিজে ভোগ করিতে পারে না। তাহার পরিশ্রমের ফল মধ্যবর্ত্তী লোকে বিনা পরিশ্রমে ভোগ করে। এই অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য কোর্ফা চাষীকে দখলীস্বত্ব দেওয়া উচিত। আর একটী যুক্তি দেখান হয় যে, দখলীস্বত্ব না থাকায় কোর্ফা চাষী মনোযোগের সহিত চাষ করে না, জমিতে স্থায়ী দখল না থাকায় জমির উন্নতির জন্য কোনরূপ চেষ্টা করে না। অধস্তন রায়তকে দখলীস্বত্ব দিলে সে জমির উন্নতির সম্পূর্ণ ফল নিজে ভোগ করিতে পারিবে জানিয়া জমির উন্নতি করিতে সচেষ্ট হইবে। মোট কথা, অধস্তন রায়তকে দখলীস্বত্ব দিলে বাংলার উৎপন্ন কৃষি-দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে এবং সমস্ত দেশের উপকার হইবে।

এইসকল যুক্তির মূল্য পরীক্ষা করা যাউক। প্রথম যুক্তিটী আমাদের সহানুভূতি-বৃত্তিতে আঘাত করে। কোন বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ভাবে অনুসন্ধান করিয়া নিরপেক্ষ মত দিতে হইলে সুকুমার মনোবৃত্তিদ্বারা পরিচালিত হইলে চলে না। আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, কৃষক কৃষি-কার্য্যের জন্য যে পরিশ্রম করে এবং যে মূলধন খাটায় তাহা কৃষি ভিন্ন অন্য কোন ব্যবসায়ে প্রয়োগ করিলে তাহার যে আয় হইত, কৃষি হইতে তাহার আয় তদপেক্ষা কম হয় কিনা। আমাদের বিশ্বাস কম হয় না। প্রথমতঃ, ভূমির পরিমাণ-বৃদ্ধি মানুষের সাধ্যাতীত। দ্বিতীয়তঃ, উর্ব্বরতা এবং অন্যবিধ সুবিধা সকল ভূমির সমান পরিমাণে নাই। অধিকন্তু, কেবলমাত্র একখণ্ড ভূমি হইতে অধিক ফসল উৎপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত খরচ করিলে লাভ হয় না। এই সকল কারণে ভূমি হইতে মজুরি, টাকার সুদ ইত্যাদি পোষাইয়াও একটা অতিরিক্ত মুনাফা থাকে। কৃষকের যদি এই অতিরিক্ত মুনাফা (ইকনমিক রেণ্ট) সম্পূর্ণরূপে জমির দখলকারকে দিতে হয় তথাপি তাহার ক্ষতি হইবে না। কারণ তাহার মজুরি, টাকার সুদ এবং সাধারণ হারে লাভ (নর্ম্মাল রেট অব প্রফিট) থাকিয়া যাইবে। তবে যদি কখনও কৃষককে জমির "অতিরিক্ত মুনাফার" চেয়েও বেশী খাজনা দিতে হয় তাহা হইলে উপরের যুক্তি খাটিবে না। আমাদের দেশে কি কোর্ফা চাষীকে 'অতিরিক্ত মুনাফার' চেয়েও বেশী খাজনা দিতে হয়? আমাদের বিশ্বাস দিতে হয় না।

আমাদের দেশে কৃষি-জমিতে কাহারও একচেটিয়া অধিকার নাই। কৃষি-জমি অনেকের হাতে আছে। কাজেই প্রতিযোগিতায় কোর্ফা চাষীদিগকে কোণ-ঠেসা হইতে হয় না। ফসলের মূল্য-বৃদ্ধি-হেতু জমির 'অতিরিক্ত মুনাফা' বাড়িয়াছে এবং কোর্ফা চাষীদের দরাদরি করিবার শক্তি বাড়িয়াছে। ফলে 'অতিরিক্ত মুনাফা'র কিছু অংশ অন্ততঃ কোর্ফা চাষীদের হাতে থাকে।

গ্রামের অবস্থার দিকে চাহিলেই আমাদের উক্তির সত্যতা বুঝা যাইবে। অন্যের জমি চাষ করিয়া অনেক কৃষক পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল অবস্থায় আছে। চাকরের বেতন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও গ্রামে চাকর পাওয়া দুষ্কর হইয়াছে। কৃষকদের দরাদরি করার শক্তি বাড়িয়াছে; অনেকে চাকরী করার চেয়ে অন্যের জমি বর্গা বা অন্য কোন চুক্তিতে চাষ করা বেশী লাভজনক মনে করে। চাষীদিগকে যদি কেহ বর্গা বা অন্য চুক্তিতে জমি চাষ করিতে না দেয় তবে তাহাদের যথেষ্ট অসুবিধা হইবে। এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই যে খাঁটি কৃষকদের কোনো সভা অধস্তন

রায়তকে দখলীস্বত্ব দেওয়ার প্রস্তাবের প্রতিকূলাচরণ ব্যতীত সমর্থন করে নাই।

অধস্তন রায়ত দখলীস্বত্ব পাইলে উন্নত প্রণালীতে কৃষি করিবে এবং তাহাতে দেশের শস্যসম্পদ্ বৃদ্ধি পাইবে, এই যুক্তি প্রথম দৃষ্টিতে খুব প্রবল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, এ যুক্তির বিশেষ মূল্য নাই। এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে আমরা এদেশের কৃষির প্রকৃতি এবং তাহার উন্নতির অন্তরায়গুলির আলোচনা করিয়াছি। অধস্তন রায়তের দখলীস্বত্ব হইলেই সেই সব অন্তরায় দূর হইবে মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নাই। কৃষক নির্দ্দিষ্টপরিমাণ ফসলের অথবা টাকার চুক্তিতে যে জমি চাষ করে, তাহাতে তাহার কম যত্ন করিবার কোন সঙ্গত হেতু নাই। কারণ, ফসল কম হইলেও তাহাকে চুক্তিমত টাকা অথবা ফসল দিতে হইবে। কাজেই কৃষক স্বভাবতঃ অধিক ফসল উৎপন্ন করিবার চেষ্টা করে। কোনো প্রকার স্থায়ী উন্নতি সে তাহার নিজের জোতস্বত্বের জমিতেও করে না; কাজেই কোর্ফাস্বত্বের জমিতে তাহা না করিলে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। ভালমত চাষ করার অর্থ হইল—জমির আগাছা ভালমত বাছিয়া দেওয়া এবং ক্ষেতে দুই তিন ঝুরি গোবর বেশী দেওয়া! ভাল চাষ বলিতে আমাদের দেশে সাধারণতঃ ইহাই বুঝায়। পরের জমিতে এইরূপ 'উন্নত চাষ' করিতে কোনো কৃষকের বিশেষ আপত্তির কারণ নাই। আর দখলীস্বত্ব পাইলেই যে চাষের প্রকৃতি বদলাইবে এইরূপ মনে করার ও উপযুক্ত কারণ দেখি না। গোবর দিলে ক্ষেতের যে উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হয় তাহা দীর্ঘস্থায়ী নহে। পরের বৎসরও গোবর দেওয়ার দরকার হয়। এইসব কারণে আমরা মনে করিতে পারি না যে, অধস্তন রায়তকে দখলীস্বত্ব দিলেই বাংলার কৃষিতে যুগান্তর আসিবে। কৃষির অবনতির কারণ অন্যবিধ এবং সেই কারণগুলি দূর না হইলে কেবলমাত্র জমির আইন সামান্য রকম বদলাইলেই কৃষিতে যুগান্তর আসিবে না।

বর্গা চাষ

এখন বর্গা চাষের কথা ধরা যাউক। কৃষকের যদি সব জমিই বর্গা হয় তবে সে কৃষিতে অযত্ন করিবে না। কারণ বেশী ফসল হইলে অংশমত তাহার ভাগেও বেশী ফসল পড়িবে। অযত্ন করিলে সেও ঠকিবে। তবে যদি কৃষকের বর্গা জমির সঙ্গে সঙ্গে নিজ জোতের জমি অথবা টাকা কিম্বা ফসলের চুক্তিতে প্রাপ্ত অন্য চাষের জমি থাকে, তবে সে বর্গা ক্ষেতের চাষে অযত্ন করিয়া অন্য ক্ষেতগুলির চাষে বেশী যত্ন করিবে। এই ক্ষেত্রে বর্গাচাষের ফলে ফসলের পরিমাণ কমিবে বলা যাইতে পারে। কর বসানোর মূল নীতির দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে বর্গা চাষই ভাল। কারণ ইহাতে দেয় খাজনা উৎপন্ন ফসলের সঙ্গে সঙ্গে কম ও বেশী হইয়া থাকে।

ভদ্রলোকের অবস্থা

অধস্তন রায়তকে দখলীস্বত্ব দিলে ভদ্রশ্রেণীর লোকের এবং যেসব কৃষক অন্যের জমি চাষ করিয়া থাকে তাহাদের অত্যন্ত অসুবিধা হইবে। কৃষকগণ জমি পাইবে না। অনেক কৃষক দিন-মজুরে পরিণত হইবে। জমির দাম অত্যন্ত কমিয়া যাইবে। প্রথম প্রথম কেহ কেহ হয়ত জমি পতিত রাখিবে, তথাপি স্বত্ব হারাইবার ভয়ে অন্যকে চাষ করিতে দিবে না। দুই এক বৎসর এই জন্য দেশের শস্য-সম্পদ্ কম হইতে পারে। এই অবস্থা দেশের কাহারও পক্ষেই মঙ্গলজনক হইবে না। আইন এড়াইবার জন্য অনেক দুষ্টামীর সৃষ্টি হইবে এবং মোকদ্দমার সংখ্যা-বৃদ্ধি হইবে। কৃষককে চাকর অথবা অংশীদার বলিয়া চালাইবার চেষ্টা হইবে। অধস্তন রায়তের দখলীস্বত্ব হইলেও জোতদারের সঙ্গে খাজনার সম্বন্ধ থাকিবে। খাজনা সম্ভবতঃ যে চুক্তিতে জমি প্রথম চাষ করিতে দিবে তাহাই ধার্য্য হইবে। স্বত্ব হারাইবার ভয়ে জোতদারদের মধ্যে প্রতিযোগিতার অভাব হইতে পারে এবং তাহারা চাষীকে অতিরিক্ত হারে খাজনার চুক্তিতে জমি চাষ করিতে দিবে। তাহা হইলে দখলীস্বত্ব পাইয়াও চাষীদের সুবিধা হইবে না। বর্গার চুক্তিতেই যদি দখলীস্বত্ব হয় তবে বর্গাচাষের বিরুদ্ধে যে আপত্তি প্রকাশ করা হয় তাহাও থাকিয়া যায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে যেরূপ পত্তনীদার, দরপত্তনীদার, হাওলাদার প্রভৃতি বিবিধ শ্রেণীর ভূস্বামীর আবির্ভাব হইয়াছে, সেইরূপ অধস্তন রায়তের দখলীস্বত্বের

বিধি হইতে বহু স্তরের অধস্তন রায়তের সৃষ্টি হইবে। ইহাতে আইনের জটিলতা বিশেষ রকম বাড়িবে এবং মোকদ্দমার সৃষ্টি হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধর যাউক যে, এক রায়ত তাহার কোন এক আত্মীয়কে তাহার নিজের খাজনা অপেক্ষাও কম খাজানায় কোর্ফা বসাইয়া বাকী খাজনার দায়ে নিজের স্বত্ব নীলাম করায়। জমিদার যদি নিজে ঐ নীলাম ডাকিয়া রাখে, তবে সেই কোর্ফা রায়তের সঙ্গে তাহার কিরূপ খাজনার সম্বন্ধ হইবে? এই ভাবের বহু জটিলতার উৎপত্তি হইবে। জমির 'অতিরিক্ত মুনাফা' যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে প্রকৃত চাষীর উপরে বহু অধস্তন রায়ত হওয়ার সম্ভাবনা হইবে। ইহাতে ভবিষ্যতে উন্নত প্রণালীর কৃষি প্রবর্ত্তন করিতে বিশেষ অসুবিধা হইবে।

কেহ কেহ মনে করেন যে অধস্তন রায়তকে দখলীস্বত্ব দিলে ভদ্র শ্রেণী জমি ছাড়িতে বাধ্য হইবে এবং তাহার ফলে শীঘ্র শীঘ্র দেশের আর্থিক উন্নতি হইবে। তাঁহাদের বিশ্বাস যে, জমি থাকায় ভদ্রশ্রেণী ব্যবসায়ের দিকে নজর দেয় না; জমি না থাকিলে এ দিকে তাহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে। কিন্তু তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে, এই আইনের ফলে জমির মূল্য হ্রাস হইবে এবং সেই জন্য ভদ্র শ্রেণীর মূলধন যোগাইবার শক্তি কমিবে। বর্ত্তমান কৃষির অবস্থা আমাদের আর্থিক অবনতির মস্তবড় কারণ নয়। কিন্তু আর্থিক অবনতিই আমাদের কৃষির উন্নতির বড় অন্তরায়। আর্থিক উন্নতির ফলে যখন ভূমির উপর নির্ভরকারীদের সংখ্যা অত্যন্ত কমিয়া যাইবে তখনই 'লার্জ হোল্ডিংস' ও 'ব্যাপক কৃষি' হওয়ার সম্ভাবনা।

অধস্তন রায়তকে দখলীস্বত্ব দিলে ভদ্রলোকশ্রেণীর অত্যন্ত ক্ষতি হইবে। যে বেকার-সমস্যা ভদ্রশ্রেণীর ভিতর তীব্র ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহার কঠোরতা অত্যন্ত বাড়িয়া যাইবে। জমি হইতে যে সামান্য আয় ভদ্রলোকশ্রেণী এখন পাইয়া থাকে তাহাতে বেকার-সমস্যার কঠোরতা কিয়ৎপরিমাণে কমিবে। এই আয় হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিলে সমস্যা কঠোরতর হইবে। এই দুর্ম্মূল্যের দিনে অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় ভদ্রশ্রেণীর অবস্থা খারাপ হইয়াছে। তাহাদের আয় বাড়ে নাই, বাড়িয়া থাকিলেও বর্দ্ধিত মূল্যের অনুপাতে নহে। তাহাদের খরচ পূর্ব্বের চেয়ে কমে নাই। মেয়ের বিবাহ এবং ছেলেমেয়েদের লেখা-পড়া শিখানোর দায় পূর্ব্ববৎ আছে। অন্য সম্প্রদায়ের অবস্থা এইরূপ নয়। ব্যবসায়িগণ দুর্ম্মূল্যের সময়ে স্বাভাবিক হারের চেয়ে অধিক হারে লাভ করিয়া থাকে। শ্রমিকদের মজুরিও পূর্ব্বের চেয়ে ৩।৪ গুণ অধিক হইয়াছে। আবশ্যক দ্রব্যাদির মূল্য কিন্তু ৩।৪ গুণ বাড়ে নাই। অনেকে ভদ্রশ্রেণীকে পরগাছার সঙ্গে তুলনা করেন, তাহাদিগকে সমাজের শোষক বলেন। কিন্তু সব দেশে এই ভদ্রশ্রেণী হইতেই কলা, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের অধিক পরিমাণে উন্নতি সাধিত হয়। সামাজিক উন্নতি এবং রাজনৈতিক মুক্তির চেষ্টা এবং তজ্জন্য আত্মত্যাগ এই সম্প্রদায় হইতেই বেশী পরিমাণে হইয়া থাকে। এই 'পরগাছা' সম্প্রদায়ের দারিদ্র্য-বৃদ্ধির জন্য প্রবর্ত্তিত কোন বিধি দেশের পক্ষে মঙ্গল-জনক হইবে না। ইংরেজ পণ্ডিত কেইন্‌স্ তাঁহার "ট্র্যাক্‌ট অন্ মানিটারি রিফর্ম" নামক মুদ্রা-সংস্কার-বিষয়ক পুস্তিকার ৩০ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন যে, মধ্যবিত্ত ভদ্রলোককে গরিব করিয়া ফেলা আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের অবনতি-সাধন করা একই কথা।
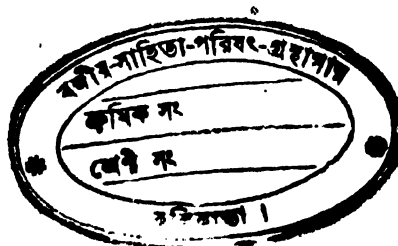
আসামের চিঠি

(মরিয়ানী-জোরহাট)

শ্রীসুধাকান্ত দে, এম, এ, বি, এল

অন্য বহু স্থানের ন্যায় এখানেও ভৃত্য-সমস্যা একটা বড় সমস্যা বটে। ঘরের কাজ করিবার জন্য আসামী মানুষ পাওয়া যায় না। ইহারা বাহিরের কাজ করিতে রাজী আছে। কিন্তু বাঙালীর কাপড় ধোওয়া, উচ্ছিষ্ট তোলা, বাসন মাজা ইত্যাদি কাজকে ইহারা অত্যন্ত অপমান-জনক মনে করে। তা ছাড়া, ইহাদিগের অনেকের জমি আছে, তাই ঘরে ধান আছে। তাতে সম্বৎসর খাওয়া চলে। কোনো কোনো পরিবারে লোক বেশী বলিয়া অবশ্য পরিবারের ছেলেরা কাজ করিতে যায়। যাদের ঘরে যথেষ্ট খাবার আছে তারাও দুই কারণে কাজের সন্ধানে বাহির হয়। (১) ইহাদিগকে বিবাহের সময় পণ দিতে হয়। দেখা গিয়াছে এই পণ দেওয়ায় অসামর্থ্যহেতু কোনো কোনো লোক ৩০।৩৫ কি ৪০ বছর পর্য্যন্ত বিবাহ করিতে পারে না। এই পণ-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যারা চাকরী করিতে আসে, তারা পণের টাকাটা জমাইতে পারিলেই চাকরী ছাড়িয়া দেয় এবং বিবাহ করিয়া গৃহস্থ-জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করে। বলা আবশ্যক, ঘরে যথেষ্ট খাবার থাকিলেও বহু ব্যক্তির উদ্বৃত্ত এমন কিছু থাকে না যদ্দ্বারা পণের টাকার জোগাড় হইতে পারে।

(২) যারা পণের টাকার কথা ভাবে না, তারাও চাকরী, বিশেষতঃ সরকারী চাকরী, করিতে আসে। তারা বলে,—"ভাত-কাপড়ের দুঃখ নাই। টাকাকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়াও বাহির হই নাই। ৫।১০ বছর চাকরী করিব। তার পর ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া যাইব। তখন আমার সম্মানটা যে কতখানি বাড়িয়া যাইবে তা আন্দাজ করিতে পারিতেছেন কি? সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিব। এবং আর দশ জনের কাছে নিজের অভিজ্ঞতার গল্প করিতে পারিব। তার কি একটা দাম নাই?"

* * * *

চা-বাগানে কুলীর কাজ করিতে আসামী লোককে দেখিতে পাই না, যারা আছে তারা হয় কেরাণী, নয় ডাক্তার, নয় অন্য কোন কর্ম্মচারী-অর্থাৎ বাবু।

বিহার, উড়িষ্যা এবং মান্দ্রাজ হইতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী লোক আমদানি করা হয়। মান্দ্রাজী স্ত্রী-পুরুষদের দেখিয়া মনে হয় ইহারা সমাজের সর্ব্বনিম্নশ্রেণীর জীব। যেমন অপরিষ্কার তেমনি কুৎসিৎ। ইহারা ভারি ভারি রূপার গহনা পরিতে ও ঝগড়া করিতে অত্যন্ত পটু। বিহার-উড়িষ্যাবাসীরাও ইহাদের মাসতুত ভাই! এই দুই শ্রেণী সর্ব্বপ্রকার মনুষ্যত্ব-বর্জ্জিত। ইহারা দলে দলে কেবলমাত্র চা-বাগানের জন্যই আসে। চা-বাগানের বাহিরে ইহাদের কোনো কাজে পাওয়া যায় না। এরা দিন ।০, ।৵০, ।৶০, ৷৹ উপার্জ্জন করিয়া থাকে। টাকাটা সপ্তাহের শেষে মিলে।

* * * *

কালো হইলেও সাধারণতঃ সুশ্রী, কর্ম্মঠ অথচ ফাঁকি দিতে ছাড়ে না—এমন ঢের সাঁওতাল চা-বাগানে কাজ করে। কিন্তু সাঁওতালরা চা-বাগানের বাইরেও স্বাধীনভাবে জমিজমা লইয়া ঘরবাড়ী তৈয়ারী করিয়া বসবাস করিতেছে। ইহারা আপনাদের স্বদেশ ও স্বজন পরিত্যাগ করিয়া এবং একেবারে ভুলিয়া গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে।

এই সাঁওতাল, হিন্দুস্থানী এবং নেপালী লোক বাড়ীর কাজের জন্য ভৃত্যরূপে পাওয়া যায়। কিন্তু যাদের ঘরবাড়ী ক্ষেতখামার আছে তারা সে সব ছাড়িয়া কেন ভৃত্যের কাজ করিতে আসিবে? আর যারা ভবঘুরে তাদের পক্ষে বাগানের মোহ অত্যন্ত প্রবল। গৃহের আরামে তারা অভ্যস্ত নহে। তাদের কাছে প্রতিদিনের গোটা গোটা উপার্জ্জন ও তদ্দ্বারা ইচ্ছামত মদ ইত্যাদি খাওয়া লোভনীয়।

সুতরাং স্থায়ী চাকর পাওয়া দুঃসাধ্য। সকলকেই এজন্য অল্পবিস্তর অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।

* * * *

কুলী-উদ্ধার, কুলীর দুঃখ-বিমোচন ইত্যাদি লইয়া আমরা এককালে খুব মাথা ঘামাইয়াছিলাম। চাঁদপুরের কুলী-ধর্ম্মঘট-কাহিনী সকলেরই মনে আছে। সেদিনকার কথা।

কুলীর সম্বন্ধে কিন্তু সাধারণ লোকের কোনো ধারণা নাই। ইহারা নিজেরাই একটা আলাদা জাত সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম, আচার-বিচার, আশা-আকাঙ্ক্ষা সমস্তই আলাদা মাপ-কাঠিতে বিচার করা প্রয়োজন।

কুলী গো-মহিষ পালিতেছে, ক্ষেতেও কাজ করিতেছে, অবসর মত চা ও তুলিতেছে। ইহারা ঘর বাঁধিয়াছে। কিন্তু বহু ঘর আবার তাসের ঘরের মত ভাঙ্গিয়া যায়। ইহারা টাকা পয়সা যথেষ্ট চিনে। কুলীদের ভগিনী অথবা কন্যাকে টাকাপয়সা অথবা জমিজমার লোভে বিসর্জন দিয়াছে এমন দেখা গিয়াছে। ২০।৩০ বছর ঘর করিয়াও কুলীরমণী তার স্বামী-পুত্র ছাড়িয়া অন্যের সঙ্গে পলায়ন করিয়াছে। ইহাও টাকার লোভে। অবশ্য অন্য কারণ থাকে না এমন বলিতেছি না।

বহু কুলী আছে যাদের বাপ, মা, আত্মীয়স্বজন তিনকুলে কেহ নাই। ইহারা উদ্দেশ্যহীন ভবঘুরের জীবন যাপন করে। কোনো বন্ধন নাই, মায়া-মমতারও কোনো বালাই নাই। কুলীর অভাব অত্যন্ত অল্প। সুতরাং ইহারা যদি ৫।১০ বছর স্থির হইয়া কোথাও মাসে ৫৲—৬৲ তলবে কাজ করে তবে অনায়াসে জমি কিনিয়া, গরু কিনিয়া, বিবাহ করিয়া গৃহস্থ-জীবন যাপন করিতে পারে। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তারা আজ এখানে কাল সেখানে করিয়া বেড়ায়। দুইদিন কামাইয়া হাতে টাকা জমিলে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, মদ খাইয়া, আমোদ করিয়া টাকা উড়াইয়া দেয়। টাকা নিঃশেষ হইয়া গেলে আবার কাজ খোঁজে। এ অবস্থায় কোথায় ঘরবাড়ী, কোথায় বা পারিবারিক জীবন?

অন্য যে সব কুলী ঘরবাড়ী করিয়া আছে তাদেরও কেহ কেহ যে এই পথের পথিক হয় তাহা বলা বাহুল্যমাত্র।

সম্প্রতি এখানে রামলীলা হইয়া গেল। উদ্যোক্তারা অবশ্য হিন্দুস্থানী। প্রায় ২৫।৩০ দিন যাবৎ রামের জন্মকথা হইতে আরম্ভ করিয়া রাবণ-বধ অবধি পালা চলিয়াছে। বাজারের কাছে একটা স্থান লইয়া, চালা বাঁধিয়া ও ঘের দিয়া লীলা চলে। সন্ধ্যা হইতে বাজনা বাজে ও লোকজন জমিতে থাকে এবং রাত ১২টা-১টার সময় শেষ হয়।

এখানকার এক চা-বাগানের সাহেব ঐ স্থানে রামলীলা করিতে অনুমতি দিয়াছিল। রামচন্দ্র স্বয়ং ঈশ্বর। সুতরাং দলে দলে স্ত্রীপুরুষ, বালকবৃদ্ধ সন্ধ্যার পর হইতে ছুটিতে থাকে—রামের কথা শুনিতে ও রামকে দেখিতে। কেহ কেহ অনেক দূর হইতে এবং ভক্তির সহিত আসে।

সেবাইতরা উপার্জন করিতেছে মন্দ নয়। গড়পড়তা দিনে বোধ হয় ৪৲—৫৲ টাকার কম হইবে না।

যারা রামলীলা দেখিতে আসে তাদের শতকরা ৯৯'৫ জন কুলী। সম্ভবতঃ, এই কয়দিনে মদের ভাটির কিছু ক্ষতি হইয়াছে।

* * * *

আসামীরা অবশ্য হিন্দু বলিয়া পরিচিত; কিন্তু এই হিন্দুত্বের সঙ্গে বাঙালীর হিন্দুত্বের অনেকখানি তফাৎ রহিয়াছে।

এদের ধর্ম্মের দুই শাখা। দামোদরিয়া ও মহাপুরুষী(খী)য়া। দ্বিতীয়টি শঙ্করদেও-প্রবর্ত্তিত। ইনি চৈতন্যদেবের শিষ্য ছিলেন।

শিবসাগরে শিব-মন্দির, দুর্গা-মন্দির, বিষ্ণু-মন্দির আহম রাজারা স্থাপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু উহার পূজারীরা তাঁদের আনীত বাঙালী ব্রাহ্মণ পুরোহিতের বংশধর। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় আসামদেশে মন্দির এবং মূর্ত্তির চলন নাই। বস্তুতঃ, প্রতিমা-শিল্পদ্বারা, এদেশীয় লোক কোথাও জীবিকা অর্জ্জন করে একথা আমার জানা নাই।

ইহাদের নামঘর আছে। এখানেও একটি দেখিতেছি। অন্য দশটা ঘরের সঙ্গে ইহার বড় পার্থক্য দেখিতেছি না। তবে ইহা কাহারো ঘর নয়। সচরাচর শূন্য পড়িয়া থাকে। এই নামঘরই আসামীদের মন্দির। কিন্তু এই নামঘরের ভিতর আসামীরা কোনো প্রকার মূর্ত্তি রাখে না।

কোনো কোনো পর্ব্ব উপলক্ষ্যে ইহারা অনেকে নামঘরে মিলিত হইয়া নাম-গান করে অর্থাৎ কীর্ত্তন করে।

* * * *

মরিয়ানীতে গরু, মহিষ, ছাগল, ঘোড়া মন্দ দেখি না। অধিকাংশ ঘোড়া চা-বাগানের মালিকদের, সুতরাং বাহিরের আমদানি। দেশী ঘোড়া মোট বহিতে ব্যবহৃত হয়। এখানকার এক তেলী তেল আনিবার জন্য নওগাঁও যায়। ঘোড়াই তাহার যাতায়াতের বাহন।

ছাগল কসাইয়ের। ২।৪ জন মুসলমান ছাগল পোষে এবং ছাগলের দুধ বেচিয়া দু'পয়সা উপায় পায়।

গোধন এখানে বড় ধন বটে। চায়ের জন্য, গরুর গাড়ীর জন্য, দুধের জন্য গরু ও মহিষ নিত্য প্রয়োজনীয়। যাহারা পারে তাহারাই গরু পালিয়া থাকে। ঘাসের অভাব নাই।

আসামের গরু-ঘোড়া দেখিতে হ্রস্বাকার। বড় গাই এখানকার জল-হাওয়া সহ্য করিতে পারে না। অবশ্য গরু-ঘোড়ার বংশোন্নতির জন্য এ পর্য্যন্ত কোনো প্রচেষ্টা হয় নাই।

এক একটা গাই দুধ দেয় আধসের, ১ সের, ২ সের, বড় জোর ৩ বা ৪ সের। সেইজন্য গাইয়ের দামও বেশ সস্তা—২০।২৫।৩০।৪০ টাকায় গাই গরু ও বলদ পাওয়া যায়। কিন্তু দুধের দাম বড় চড়া। গরুর দুধ টাকায় ৩ ও ৩½ সের, ছাগলের দুধ ২ অথবা ২½ সের বিকায়। এখানে গোয়ালা দেখি না। যাহাদের গরু বা ছাগল আছে, তাহাদের বাড়ী গিয়া দুধ লইয়া আসিতে হয়।

বানর, উল্লুক, শিয়াল, সাপ ছাড়া হিংস্র জন্তু বিস্তর আছে। কিন্তু ইহারা স্বভাবে বাংলা বা বিহারের জন্তুদের মত হিংস্র নয়। এ প্রসঙ্গে কুকুরের উপযোগিতা উল্লেখ-যোগ্য। বস্তুতঃ গৃহপালিত কুকুর এখানে অত্যন্ত উপকারী জীব। ইহারা গৃহস্থের গরু-ঘোড়া, হাঁস-কবুতর ও অন্যান্য জীবজন্তুকে শিয়াল, বাঘ ইত্যাদি হইতে সর্ব্বদা সতর্ক করিয়া দিতেছে ও রক্ষা করিতেছে।

এই বর্ষাকালটা জীবজন্তুর পক্ষে বড় অস্বাস্থ্যকর। অসংখ্য জীবজন্তু মরিতেছে।

* * * *

রেলে অবশ্য কয়লা পোড়ায়। কিন্তু সাধারণ গৃহস্থ-বাড়ীতে কয়লার ব্যবহার নাই। সকলে কাঠ পোড়ায়। আসামের প্রায় সর্ব্বত্র এই ব্যবস্থা।

কয়লা অপেক্ষা কাঠ সস্তা পড়ে। তা ছাড়া, জঙ্গলের অভাব নাই। মরা গাছের ডালপালার দ্বারাও গরিব-দুঃখীর আগুনের কাজ চলিয়া যায়।

* * * *

জোরহাট ষ্টেট রেলওয়ে বহুদিন যাবৎ টিম্ টিম্ করিয়া চলিতেছিল। ইহাতে সরকারের লাভ না হইয়া প্রতিবছর ক্ষতিই হইতেছিল।

কিছুদিন হইল এক বাঙালী ম্যানেজারকে এখানে আমদানি করা হয়। বসু মহাশয় এখানে আসিবার পর হইতেই ট্রেনগুলির চেহারা বদলাইয়া গিয়াছে। আর ভদ্র-লোক ক্ষতি না দেখাইয়া লাভ দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। জোরহাট রেলের ইতিহাসে এ ঘটনা এই প্রথম।

কিন্তু সম্প্রতি মুস্কিল ঘটিয়াছে। ঐ রেলের কোনো গার্ড নাকি এক মাড়োয়ারীর সহিত মন্দ ব্যবহার করিয়াছিল। মাড়োয়ারীরা এক যোট হইয়া ম্যানেজারের কাছে নালিশ করিয়াছিল। কিন্তু তথাপি কোনো প্রতিবিধানের চেষ্টা হয় নাই। ফলে সমস্ত মাড়োয়ারী এক যোট হইয়া ধর্ম্মঘট করিয়াছে।

মাড়োয়ারীরা জোরহাটে এক প্রকাণ্ড সভা করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে,—"যাবৎ কোনো প্রতিবিধান না হয় তাবৎ কোনো মাড়োয়ারী ঐ রেলের সাহায্যে জোরহাট—মরিয়ানী মাল-চলাচল করিবে না। যে করিবে তাকে অত টাকা জরিমানা এবং অমুক অমুক শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।"

বয়কটের ফল ফলিতেছে। ষ্টেট্ রেলওয়ের বিস্তর ক্ষতি হইতেছে। মাড়োয়ারীরাই প্রধান দেশী ব্যবসায়ী। সুতরাং তাদের হাতে বয়কট ব্রহ্মাস্ত্রবিশেষ।

এর মধ্যেই গরুর গাড়ীগুলির পোয়া বারো আর কি! তারা অনবরত মাল লইয়া মরিয়ানী-জোরহাটে যাতায়াত করিতেছে। কাল ও (১৪ জুন, ১৯২৬) তাহাই দেখিলাম। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, রেল-কর্ত্তৃপক্ষ এখনো মাড়োয়ারীদের ক্রোধ-শান্তি করেন নাই।

* * * *

এক বৃদ্ধা আসিয়া খবর দিল, "বাবু মহাশয় মরিয়ানী ষ্টেশনে বহুৎ কচ্ছপ ও কচ্ছপের ডিম আমদানি হইতেছে। মরিয়ানী বলিয়া নহে, আসামের সর্ব্বত্রই ময়মনসিং ও শ্রীহট্টের লোকেরা কচ্ছপের ব্যবসা করিতেছে। আসামী লোকেরা ষ্টেশনে গিয়া অত্যন্ত আগ্রহের সহিত কচ্ছপ ও কচ্ছপের ডিম কিনিতেছে। কাজেই বিক্রয়কারীদের বেশ দু'পয়সা লাভ হইতেছে। কচ্ছপ প্রতি গড়ে ২।৩।৪ টাকা লাভ হইয়া থাকে।

কচ্ছপ ও তার ডিম আসামীদের অতি-প্রিয় পবিত্র খাদ্য। আর একটি খাদ্য গোসাপ। ইহারও বেশ কাটতি আছে।

* * * *

হাতীর ব্যবসায় এখানে মন্দ লাভজনক নহে। কিন্তু সে ব্যবসা অল্প টাকায় হয় না। মরিয়ানীর বিস্তীর্ণ জঙ্গলে যথেষ্ট বন্য হাতী রহিয়াছে। শীতকালে মহাজনেরা কখনো একা কখনো বা দলবদ্ধভাবে হাতী ধরিতে আসে।

প্রত্যেক হাতীর জন্য সরকার ছয় শত টাকা নজর পাইয়া থাকেন। ধরিবার সময় হাতীর যদি কোনো গুরুতর জখম হয় তবে এই ৬০০৲ টাকা জলে যায়। তা ছাড়া, হাতী-ধরা একজন দু'জনের কর্ম্ম নয়। শত শত লোক চাই, তাদের বহুদিনের খোরাকের ব্যবস্থা চাই। অনেক তোড়-জোড়, সাজ-সরঞ্জামের দরকার। তাতেও খরচ পড়ে। শিকার সম্বন্ধে যাহার কোনপ্রকার অভিজ্ঞতা নাই এই ব্যবসায়ে তাহার সফলতার আশা খুবই কম।

এই গেল খরচের কথা। কিন্তু লাভের অঙ্কটা খুব মোটা। বয়স ও গুণানুসারে এক একটা হাতী ১০০০৲ টাকায়, ৪।৫ হাজার টাকায় কি তদূর্দ্ধেও বিকায়। হাতীর বাজার বেশ গরম। সর্ব্বদাই টান। সুতরাং যোগান যে চাহিদার বেশী হইবে তা সম্ভব নয়। রাজা-মহারাজারা এবং সরকার সর্ব্বদাই হাতী কিনিয়া থাকেন।

বলা বাহুল্য, যে পর্য্যন্ত বন্য হাতী পোষ না মানে সে পর্য্যন্ত উহা কোনো কাজে আসে না। তবে সাধারণতঃ ছয় মাসের মধ্যে হাতী পোষ মানে। এই ছয় মাস ব্যবসায়ীকে হাতীর ও তার জন্য দরকারী লোকজনের খাই-খরচ জোগাইতে হয়। অবশ্য সরকারী বন হইতে হাতী অন্যত্র লইয়া যাইতে হয় না। যে পর্য্যন্ত বিক্রয় না হয় সে পর্য্যন্ত তথায় রাখিতে পারে।

* * * *

আজ "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে" (১৬ জুন, ১৯২৬) খুব বৃষ্টি হইয়াছে। চারিদিকে ঢালু জমি জলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। দিন পনের ষোল ভয়ানক গরম গিয়াছে। আজ চাষীর উল্লাস হইয়াছে। এইবার সে ধানের জন্য মাটি নিড়াইয়া দিতে পারিবে। নদীর জল বাড়িতেছে। অর্থাৎ পাহাড়ে বৃষ্টি হইতেছে।

চা-বাগানের কর্ম্ম-পরিচালনা

শ্রীকুমুদ নাথ লাহিড়ী

ভারতীয় ইংরেজের চা-ভূমি

চায়ের চাষে বাঙালীরা বেশ ঝুঁকিয়া উঠিতেছে। বাঙালী পাঠকের পক্ষে চা সম্বন্ধে আলোচনা চিত্তাকর্ষক হইবারই কথা। অন্যান্য "আধুনিক" কারবারের মতন চায়ের কারবারেও ইংরেজরাই আমাদের শিক্ষাগুরু এবং পথ-প্রদর্শক। কাজেই ইংরেজের তদবিরে চা-বাগান কোন প্রণালীতে পরিচালিত হয় তাহা জানিয়া রাখা উচিত।

লঙ্কা হইতে একদল ইংরেজ চা-বাগানের মালিক আসাম, ডুয়ার্স্, দার্জ্জিলিঙ্, ইত্যাদি অঞ্চলের চা-ভূমি পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের ভ্রমণ-কাহিনী এবং মতামত কলিকাতার "প্ল্যান্টার্স্ জার্ণ্যাল অ্যাণ্ড অ্যাগ্রিকাল্চারিষ্ট" নামক সাপ্তাহিকে বাহির হইয়াছে। বর্ত্তমান রচনা সেই চাক্ষুষ বৃত্তান্ত ও সমালোচনা-অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে।

আসামের তকলাইতে ভারতীয় চা-সমিতির অন্তর্গত বিজ্ঞান-বিভাগের ল্যাবরেটরি ও বীক্ষণাগারগুলি অবস্থিত। ১৯১০ সনে এইসব স্থাপিত হইয়াছে। এখানে আজ চারিটি গৃহ বর্ত্তমান—(১) শাসন-গৃহ, (২) রাসায়নিক ল্যাবরেটরি, (৩) কীট-বিদ্যাবিষয়ক ল্যাবরেটরি ও (৪) বীজাণু-সম্বন্ধীয় ল্যাবরেটরি। দশ একর চায়ের জমি পরীক্ষার জন্য রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া, আরো ৪০ একর জমি বরভেট্টায় রহিয়াছে। তকলাই হইতে বরভেট্টা তিন মাইল দূরে। এই জমির সবটাতেই চা জন্মান হইয়াছে; বিশেষভাবে হইয়াছে ১৯১৬, ১৯২০ এবং ১৯২১ সনে।

তকলাইতে চারিজন রসায়নবিৎ, একজন কীটতত্ত্ববিৎ, একজন উদ্ভিদব্যাধিবিদ্যাবিৎ এবং একজন বীজাণুবিৎ আছেন। তকলাইয়ের শাসন-গৃহে প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্ম্মচারী ও তাঁহার কেরাণীকুলের জন্য কার্য্যালয় রহিয়াছে। চা-বাগানের ম্যানেজার ও তাহাদের সহকারীদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য এই গৃহের হলঘরটিতে লেকচার দিবার বন্দোবস্ত আছে।

রাসায়নিক ল্যাবরেটরি

এই গৃহটিতে আর স্থান সংকুলান হইতেছে না। গত তিন বৎসরে রাসায়নিক কাজ খুব দ্রুত বাড়িয়া গিয়াছে। মাটি ও সারের বিশ্লেষণ আর এখন এই বিভাগের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় না। তবে যদি সেগুলি বিশেষ কোনো সমস্যা ও গবেষণার সম্পর্কে আসে, তাহা হইলে হইয়া থাকে। আসামে যাঁহাদের চা-বাগান আছে, তাঁহারা সার-প্রয়োগ-প্রণালী সম্বন্ধে তকলাই হইতে উপদেশ লইয়া থাকেন। পঞ্চবর্ষ-পর্য্যায় (রোটেশন) রূপেই সাধারণতঃ সার প্রয়োগের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। যথা—প্রথম বৎসর গোবর অথবা খইল, দ্বিতীয় বৎসর ফসফেট্ এবং ছোট ছোট গাছের সবুজ সার, তৃতীয় বৎসর সালফেট অব এমোনিয়া। সবুজ সার জন্মানোর পক্ষে চুণ-প্রয়োগের কার্য্যকারিতা দেখা গিয়াছে বটে, কিন্তু চা-জন্মানোর পক্ষে চুণের প্রয়োগ খুব খারাপ ফল দেখাইয়াছে। পোড়া চুণের পাথর অর্থাৎ চুণ অপেক্ষা খুব বেশী গুঁড়া-করা চুণের পাথরই বেশী উপকারী। আসামের মাটির অম্লত্ব-সম্বন্ধে অনুসন্ধান চলিতেছে। কিন্তু তাহার ফল এখনও ভালরকম বুঝা যায় নাই। চায়ের গুণ ভাল করিবার জন্য যে কার্য্য হইয়াছে তাহাও সন্তোষ-জনক। আজকাল ধারণা দাঁড়াইয়াছে এই যে, পুরাণো লম্বা গুঁড়ি রাখিলে, খাটো করিয়া ছাঁটিলে এবং মাঝা-মাঝি ছায়ায় জন্মাইলে চায়ের গুণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়।

কীটতত্ত্ববিষয়ক ল্যাবরেটরি

আসামের প্রধান উৎপাত মশক। তাহার দৌরাত্ম্য-নিবারণ-কল্পে যে গবেষণা চলে, তাহার জন্য এই বিভাগের লোকসংখ্যা বাড়াইতে হইয়াছে। অন্যান্য কীটপতঙ্গকেও অবহেলা করা হয় না। তাহার মধ্যে নানা রকমের নেটল গ্রাব এবং ব্যাগ ওয়ার্মসও আছে। ভারতীয় চায়ে শট-হোল বোরার দেখা যায় না। ভারতবর্ষীয় টরট্রিক্স, হোমোনা, মেন্দিয়ানা প্রভৃতি বেশী ক্ষতিকারক নয়। স্কেল পোকাও বেশী দেখা যায় না।

উদ্ভিদ-ব্যাধি-বিদ্যা

কাছাড় এবং শ্রীহট্ট ছাড়া অন্যান্য সব জেলাতেই চায়ে ব্লিষ্টার ব্লাইট ব্যাধি দেখা যায়। কোন্ বাগান এই ব্যাধি হইতে মুক্ত, একথা ভালরকম পরীক্ষা না করিয়া বলা চলে না। লাইম সালফার ছিটাইলে এই ব্যাধি দমিত হয়। রপ্তানি-যোগ্য চা-বীজের সার্টিফিকেট এই বিভাগ হইতেই দেওয়া হয়। সার্টিফিকেট দেওয়ার আগে বীজগুলিকে তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করা হইয়া থাকে। ব্রাঞ্চ ক্যাঙ্কার, ডিপ্লোডিয়া, ফ্যাসর্ট বল, নানাবিধ সূত্রবৎ ব্লাইট এবং ব্রাউন ব্লাইট প্রভৃতি রোগও আসামে আছে। সিংহলের ব্রাঞ্চ ক্যাঙ্কার হইতে আসামের ব্রাঞ্চ ক্যাঙ্কার পৃথক। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের ঐ রোগ সিংহলের ব্রাঞ্চ ক্যাঙ্কারের সদৃশ। উদ্ভিদ-ব্যাধিবৈদ্যদিগের মতে দোষাবহ চাষ, ছাঁটা অথবা সার-প্রয়োগের ফলে চা গাছগুলি নিস্তেজ বা মৃত-কল্প হইলে ঐ সব রোগের দ্বারা বেশী আক্রান্ত হয়। তাহাদের বিশ্বাস, ভাল সার—বিশেষতঃ নাইট্রোজেন ও পটাশ—দিলে কতকগুলি রোগ নিরস্ত হয়, আর কতকগুলি হয় চুণ ও সালফার ছিটাইলে।

তকলাই ও বরভেট্টার পরীক্ষা-ক্ষেত্র

নানা জাতের চায়ের ফলন ও তাহাদের ছাঁটার পদ্ধতি সম্বন্ধে তকলাইতে অনুসন্ধান চলিতেছে। আর বরভেট্টায় চলিতেছে সার-সম্বন্ধীয় পরীক্ষা। আসামে সুপ্রচলিত সবুজ সারের গাছ—আলবিজ্জিয়া ষ্টিপুলেটা, ডেরিস রোবাষ্টা এবং ডাল বর্গিয়া আসামিকা। সবুজ সাররূপে বোগা অথবা ধল জন্মাইতে হইলে, সেগুলিকে অনাবৃষ্টির কাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ শুকনো কাল পর্য্যন্ত ফেলিয়া রাখিলেই ভাল ফল দেখা যায়। শুকনো কালের পরেই এখন ইহা সাধারণতঃ কাটা হইয়া থাকে।

ম্যানেজার এবং তাঁহাদের সহকারীদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে পর পর তিন সপ্তাহে সাপ্তাহিক লেকচার দিবার নিয়ম। প্রত্যেক বক্তৃতায় বিশ জন করিয়া শিক্ষার্থী উপস্থিত থাকে। তকলাইতে এ সম্বন্ধে কার্য্যতালিকা আছে। শিক্ষার্থীদের ব্যয়ভার তাহাদের নিয়োগকারীরাই বহন করে।

চা-চাষের প্রণালী

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা প্রায় ২৫০ হইতে ৩০০ মাইল পর্য্যন্ত সোজা লম্বা। সকল জায়গার বিস্তার ঠিক একরূপ নহে। তবে সীমান্ত প্রদেশে ৪০ হইতে ৫০ মাইলের কম বিস্তার হইবে না। সমস্ত উপত্যকাটি মাইলে এক এক ফুট করিয়া উঁচু হইয়া গিয়াছে। মাটি—পলি। পাথর বা নুড়ি এক টুক্‌রাও নাই। নিরক্ষবৃত্ত হইতে এই স্থানের দূরত্ব উত্তর দিকে ২৬ হইতে ২৭ ডিগ্রী। সেই জন্য শীত ও গ্রীষ্মের কাল এইখানে নির্দ্দিষ্ট। এখানকার অবলম্বিত কার্য্যপদ্ধতি তদনুসারেই নিয়ন্ত্রিত হয়। মে হইতে নভেম্বরের মধ্যে ফসল-সংগ্রহের কাজ চলে। সেই হিসাবে চয়ন, ছাঁটা, চাস প্রভৃতি কার্য্যও স্থিরীকৃত হইয়া থাকে।

ছাঁটা

কোনো একটা গাছ পরিণত হইয়াছে বলিয়াই যে তাহাকে ছাটিতে হইবে এমন নহে। কোনো একটা ক্ষেতের সমগ্র অথবা তাহার অংশবিশেষ ধরিয়াই ছাঁটার কাজ আরম্ভ হয়। ১৫।১৬ বৎসর অন্তর অন্তর সমস্তটা ক্ষেতের চা-গাছগুলিকে একেবারে গোড়া পাড়িয়া ছাঁটিতে হয়। তারপর প্রথম বৎসর ছাঁটা হয় ২৪ ইঞ্চি রাখিয়া, পরবর্ত্তী বৎসর ৬ হইতে ৯ ইঞ্চি রাখিয়া, তারপর প্রতি বৎসর ২ ইঞ্চি পরিমাণ বাড়িতে দিয়া বাকীটা ছাঁটিয়া ফেলা হয়। যথাসময়ে গুঁড়িটা ২৭ হইতে ৩০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বাড়াইয়া পুনরায় পূর্ব্বমত ৯ ইঞ্চির কম রাখিয়া বাকীটা ছাঁটা হইয়া থাকে। কাটার ক্ষত শীঘ্রই সম্পূর্ণ সারিয়া যায় এবং কাটার জন্য ডালটা নষ্ট হয় খুব কম। ছাঁটার ব্যয় সিংহলে যেমন পড়ে আসামেও তেমনি।

চাষ

সিংহলের মাটি হইতে আসামের মাটির আর্দ্রতা মোটের উপর বেশী। তবু সবুজসারের প্রচলন এখানে খুব আছে। প্রধান সবুজ সার—শোন পাট, ক্রোটালেরিয়া জুনসিয়া, কাউপি (ভিগনা ক্যাটজ্যাং), বোগামেডেলোয়া, ধল ধৈঞ্চা এবং ইণ্ডিগোফেরা এরেকটা। চূণ, খইল অথবা পার্ব্বত্য ফসফেট দিলে, এক এক ঋতুতে প্রতি একরে ১২ টন সবুজ-সার ফলিতে পারে। এই ফসল ছিঁড়িয়া তুলিয়া শেষে কোদালি দিয়া মাটির সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া হয়, অথবা জুলি কাটিয়া এগুলিকে তাহার মধ্যে ফেলা হয়। তাহার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে আগাছাও মিশানো থাকে।

ক্রমশঃ রাসায়নিক সারের প্রচলন হইতেছে। সব জায়গায় না হোক, অনেক জায়গায় তাহার প্রয়োগ হয়।

প্রস্তুত করণ

আসামের ও সিংহলের প্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আসামে ৬ মাসে সমস্তটা ফসল কাটিয়া তোলা হয়, তাহার অর্দ্ধেকটা হয় দুই মাসের মধ্যেই।

কারখানা-গৃহগুলি প্রায়ই একতলা। গাজাইবার জন্য পৃথক ঘর এবং শুকাইবার জন্য অনেকগুলি চালা আছে। সাধারণতঃ বাঁশ দিয়া এক রকম চং তৈয়ারী হয়। এগুলি ১২ হইতে ১৫ ফিট চওড়া এবং পরস্পর ২½ গজ তফাৎ। বালকেরা তাহাতে বসিয়া পাতা সংগ্রহ করিতে পারে।

গাঁজাইবার ঘরগুলাকে ঠাণ্ডা ও অন্ধকার রাখিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা চলিতেছে। মেজেগুলি সিমেণ্ট-করা। তাহার উপর পাতাগুলিকে খুব ঘন করিয়া—অনেক সময় ৫ ইঞ্চি পুরু করিয়া—সাজান হয়। সাধারণতঃ, অনবরত চাপ দিয়া তাপ দিবার কাজ করা হয়। তাহার জন্য যন্ত্র আছে, এঞ্জিন আছে। এঞ্জিন চালাইবার কয়লা বা তেলের অভাব নাই। নিকটেই দিগবয় হইতে তেল এবং মারঘেরিটা হইতে কয়লা পাওয়া যায়।

তুলিবার পরে দিনে দুইবার পাতাগুলির ওজন লওয়া হইয়া থাকে, একবার দ্বি-প্রহরে এবং আর একবার অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময়। এক পাউণ্ড ওজনের পাতা ৯ ফিট জায়গায় ছড়ান হয় এবং তাহা হইতে শতকরা ৬৫ ভাগ জল শোষিত হইয়া থাকে। রোলারের দ্বারাও শুকানোর কাজ হয়।

দুয়ার দেশ বা তরাই

দুয়ার দেশের চা খুব সুন্দর জাতের। তাহার পাতার আচ্ছাদনটা বেশ সমান। কিন্তু আসামের চায়ে যেমন কাটা-ছাঁটার চেহারা দেখা যায় ইহাতে সেরূপ দেখা যায় না। উচ্চ-চূড়াবিশিষ্ট গাছের ঝোপও এখানে বিরল। তকলাইয়ের কর্তৃপক্ষরা বলেন, মাথা সমতল থাকিলেই চা খুব ভাল হয়। এখানকার মাটিতে কাঁকর ও নুড়ি আছে। বৃষ্টিপাত বৎসরে প্রায় ১৮০ ইঞ্চি হয়। গ্রীষ্মকাল ও বর্ষাকাল প্রায় একসঙ্গে আসে। প্রধান রাস্তাগুলি বড়ই খারাপ, তবে আসামের রাস্তা হইতে ভাল। আসামের রাস্তায় অনেক ঋতুতে একখানা গরুর গাড়ী এক বাক্‌স্ চা ছাড়া আর কিছুই বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে না।

অনেকটা জমিতে আলব্যাজ্জিয়া ষ্টিপুলেটা, দিয়ারিস রোবাষ্টা এবং ধলবার্গিয়া জন্মিয়া থাকে। দাদপ ছাড়া বোগো, কাউপি এবং অন্যান্য ফসলও জন্মান হয়। সিংহল অপেক্ষা এখানে আগাছা অতি মারাত্মক ভাবে জন্মে। তবে সিংহলের মত এখানে জোঁকের ভয় নাই। আগাছাগুলি তুলিয়া ফেলার ব্যয় অপেক্ষা তাহার রক্ষণের ব্যয়ই বেশী। প্রাচীন চা-সরবরাহ-কার্য্য এখানে বেশ সফল এবং তাহা নিত্যনৈমিত্তিক। মশকের দৌরাত্ম্য এখানেও আছে। তারপর পাতার নানাবিধ ব্লাইট পীড়া ত আছেই।

সিংহলী সার-পদ্ধতি এখানে অজ্ঞাত। কোনো কোনো চা-বাগানের মালিক মনে করেন, এতদুদ্দেশ্যে প্রতি একরে ২০৲ টাকা ব্যয় করাই যথেষ্ট। বোধ হয় জমির উর্ব্বরতাই ইহার কারণ।

প্রত্যেক ঝোপকে সমান উচ্চতায় রাখিয়া উপর উপর অল্প-স্বল্প ছাঁটা হয়। মোটের উপর ডাঁটা শ্লেট-পেন্সিলের মত পুরু থাকে।

বাহিরের শুকাইবার চালাগুলিতে শুকাইবার কাজ হয়। শুকাইবার পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য তাহাতে কোনো সরঞ্জাম নাই। খুব দ্রুতগতি রোলার-চালনা হয়। বিশ হইতে ত্রিশ মিনিট পর্য্যন্ত দুইবার রোল দেওয়াই এ দেশের রীতি। এদেশে রোল দেওয়ার কাজটাকে খুব বেশী প্রয়োজনীয় মনে করা হয় না। তাই অভিনব কোনো রোল-যন্ত্রও এখানে নাই। গাঁজাইবার পদ্ধতিটাকে খুব প্রয়োজনীয় মনে করা হয়। বড় বড় অন্ধকার ঘরের মেজেতে সেই কাজ হইয়া থাকে। প্রায় ২৪০ ডিগ্রী তাপ দেওয়া হয়। স্থানীয় রোটারি চালুনিতে ছাকার কাজ চলে এবং বিশ বৎসর আগে সিংহলে যেরূপ হইত, সেইরূপ ভাবে শ্রেণী বিভাগের কাজ হয়।

দার্জ্জিলিং

এখানে চায়ের কাজ খুব ক্ষুদ্রাকারে চলিতেছে। চা-বাগানগুলি খাড়া পাহাড়ের গায়ে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। মাটিতে নাকি নাইট্রোজেন নাই। তবে পটাশ ও ফসফরিক এসিড খুব আছে। অনেকস্থলে অভ্র দেখা যায়। বহু জমির আকার লম্বা ও সরু। দার্জ্জিলিংএ প্রায় ৪০,০০০ হইতে ৫০,০৫০ একর জমিতে চা জন্মে। তাহার মধ্যে কেবল ⅙ বা ⅛ অংশে দার্জ্জিলিংয়ের বিখ্যাত সুগন্ধি চা হইয়া থাকে।

তামাক-চাষের আর্থিক কথা

[পুসায় কৃষি-সম্মিলন বসিয়াছিল। তাহাতে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে কৃষি-বিশেষজ্ঞ আসিয়াছিলেন। বোম্বাই প্রদেশের অন্যতম বিশেষজ্ঞ ছিলেন শ্রীযুক্ত ডি, এম্, মজুমদার (মজুমদার বাঙালী নন)। তিনি নাদিয়াদ জেলায় তামাক-চর্চ্চা করিয়া থাকেন। বোম্বাইয়ের তামাক-চাষ সম্বন্ধে তিনি যাহা-কিছু বলিয়াছেন, তাহা অন্যান্য প্রদেশের তামাক-চাষ সম্বন্ধেও অনেকটা খাটে। বস্তুতঃ, চাষ-বিজ্ঞানের নানা স্বীকার্য্য কথাই এই রচনায় পাওয়া যায়]।

একথা সত্য যে নরম-গন্ধি ও সস্তা সিগারেট বহুল পরিমাণে বিদেশ হইতে আসে। যদি সেইরূপ তামাক এদেশে জন্মান যায়, তবে ঐ সকল বিদেশী মাল আর এদেশে কাটিবে না। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে, তামাকের উন্নতিকল্পে দুইটি বিষয়ে বিবেচনা করিতে হইবে।

দেশী ধরণের তামাকের কাটতি বেশী বলিয়া তাহার প্রয়োজনের দিক্টা সকলের আগে দেখা কর্ত্তব্য। উগ্র, ঝাঁঝাল, মোটা পাতা ভাল ভাবে পুড়িলে সেই পাতার তামাকই ভাল মনে করিতে হইবে। তারপর ইহার রংটা হওয়া চাই হল্দে। তাহাতে সোনালী ছিট থাকা চাই। গুঁড়া করিয়া তবে ইহার ব্যবহার হয় বলিয়া পাতার সারাংশ বা তাহার শিরাগুলির কথা ভাবা হয় না।

কিন্তু বিদেশে চালাইবার তামাকের ধরণ হওয়া চাই স্বতন্ত্র। সে তামাকের থাকিবে—

(ক) পাতলা শিরাবিশিষ্ট পাতলা পাতা।

(খ) হলুদ রং ও নরম গন্ধ।

(গ) ভাল পোড়ার গুণ ও শাদা ছাই।

এইসব গুণগুলি থাকিলেই সে তামাক বিদেশের বাজারে চলিবে। তামাক-পাতায় ঐ সব গুণ জন্মাইতে হইলে, কৃষি ও বাণিজ্যের তরফ হইতে বিভিন্ন রকমের চাষ, সার ও রোগ-প্রতীকারের উপায়গুলি চিন্তা করিয়া বাহির করিতে হইবে।

নাদিয়াদ কৃষিক্ষেত্রের কর্ম্ম-প্রণালী

সাধারণকে কোনো নূতন পদ্ধতি ধরাইবার আগে, তাহারা যাহাতে তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে এমন ভাবে কাজ আরম্ভ করাই সঙ্গত। সেই জন্য দেশীয় বাজারের দিকে তাকাইয়া দেশীয় বিভিন্ন জাতের তামাকের উন্নতি করাই দরকার। এই উদ্দেশ্য মনে রাখিয়া নাদিয়াদ কৃষিক্ষেত্রের কাজ আরব্ধ হইয়াছে। তাহার স্কীমের সংক্ষিপ্ত বিবরণী হইতেই তাহা বুঝা যাইবে। স্কীমে সাব্যস্ত হয়, প্রথমতঃ উত্তর গুজরাটের উপযোগী করিয়া তামাকের বংশ লালন পালন করিতে হইবে এবং পরে প্রদেশের অন্যান্য স্থানে সেই কার্য্য প্রসারিত করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, যে সব জমিতে তামাক হওয়া উচিত অথচ হয় না, সেই সব জমিতে চাষের প্রণালী কিরূপ হইবে, সে বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, উৎপাদন যাহাতে মোটের উপর বেশী হয়, তাহার জন্য অত্যধিক সুফলপ্রদ সার আবিষ্কার করিতে হইবে। কীট-পতঙ্গ ও উদ্ভিদ-ব্যাধির বিষয় শিক্ষা করাও এই স্কীমের অন্তর্গত। কারণ ঐ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলেই ঐ সকলের দ্বারা যে ক্ষতি হয়, তাহা নিবারণ করা সম্ভব।

পরীক্ষার সুফল

বিগত তিন বৎসর ধরিয়া 'কুলীন' তামাকগুলির (পিওর ষ্ট্রেন্স্) প্রতিপালনের দিকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মনোযোগ দেওয়া হইতেছে। কারণ, দেশীয় তামাক অপেক্ষা উহার ফলন ঢের বেশী হওয়া সম্ভবপর। উহার চাষের উন্নতি হইতে থাকিলে তাহাতে কষ্ট ও ব্যয়-বাহুল্য কমিয়া যাইবে। উক্ত প্রণালীতে যে ১১টি স্বতন্ত্র জাত লালিত হয়, তাহার মধ্যে ৬নং জাতটির গুণ ও ফলন দেশীয় জাত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

নাদিয়াদ কৃষিক্ষেত্রের ফলনের একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল—

বৎসর	প্রতি একরের ফলন (পাউণ্ডে)		প্রতি একরে বৃদ্ধি
	৬নং	দেশীয়	
১৯২৩-২৪	১,৫৪০	১,৪০৪	১৩৬
১৯২৪-২৫	১,৫৩৯	১,৩৫০	১৮৯

১৯২৪-২৫ সনে কৃষকদের জমিতেও ইহার পরীক্ষা হইয়াছিল। তাহার ফলাফল নিম্নে দেওয়া হইল :—

গ্রাম	প্রতি একরের ফলন (পাউণ্ডে)			মন্তব্য
	৬নং	স্থানীয়	বৃদ্ধি	
নাদিয়াদ	১,৮১৭	১,৬৫৭	১৬০	
বোরিয়াডি	১,১৫০	৫৬০	৬৯০	শুকনো ও রোপিত ৩´×৩´
নাদিয়াদ	২,০০০	১,৬৪০	৩৬০	

এই ৬নং ভবিষ্যতে আরো ভাল হইবে, আশা করা যায়। কেবলমাত্র একটি বৎসর ইহার বীজ বিতরিত হইয়াছে। সে বীজের প্রার্থী হইয়া অনেকেই নিরাশ হইয়া ফিরিয়াছে। এ বৎসর ২০০ একর জমিতে ইহার চাষ হইয়াছে।

কৈরা জেলায় বিভিন্ন জাতের তামাক সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান সুরু হইয়া গিয়াছে। দক্ষিণ মহারাষ্ট্র দেশে এবং ব্রোচ জেলায় স্থানীয় তামাকের বীজ নির্ব্বাচন কার্য্যও এবার আরব্ধ হইয়াছে। আশা হইতেছে, ফলন বেশী হয়, এমনতর গাছ অদূর ভবিষ্যতে জন্মাইতে পারা যাইবে।

বিগত দুই বৎসর ধরিয়া স্বতন্ত্রীকৃত বীজের চাষ চলিতেছে এবং তাহার ফলও আশাপ্রদ। তামাক জন্মাইবার প্রধান বাধা মাটির ৬।৭ ইঞ্চি নীচেকার কঠিন স্তর। অল্প খরচে কেমন করিয়া এই বাধা দূর করা যাইবে, তাহার অনুসন্ধান চলিতেছে। এত শীঘ্র কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় নাই। মনে হইতেছে, ৬।৭ ইঞ্চি গভীর-চাষ দেওয়া জমিতে মোটা রকমের সার দিলে ঐ বাধা থাকিবে না। সার, কীট এবং রোগ-তত্ত্বের ও অনুসন্ধান সম্প্রতি সুরু হইয়াছে। তাই পরে কি হইবে না হইবে তাহা এখন বলা চলে না।

বিদেশী বাজারের জন্য ব্যবস্থা

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, বিদেশের প্রয়োজনীয় তামাক, দেশীয় তামাক হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সুতরাং বিদেশের প্রয়োজনটা কি কি, তাহার বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তথ্য-সংগ্রহ সর্ব্বপ্রথমেই করিতে হইবে। তাহা হইলেই ভাল জাতের তামাক পাইবার প্রকৃষ্ট উপায়টি আবিষ্কার করা সম্ভবপর। ভারতবর্ষে স্থানীয় তামাকের ফলনা খুবই বেশী। যদিও বিদেশী তামাকের তুলনায় তাহার দাম কম, তবু প্রতি একরে তাহা হইতে যে আয় হয়, তাহা বিদেশী তামাকের সমান, কোনো কোনো স্থলে কিছু বেশীও। পাতা পাতলা বলিয়া বিদেশী জাতের তামাক সাধারণতঃ কম ফলে। সেই জন্য একজন চাষী তাহার উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য কত পাইতে পারে, যথার্থ ফলন তাহার কতখানি হয়, ইত্যাদি বিষয় স্থির করা দরকার? যদি দেখা যায়, তাহার লাভ স্থানীয় তামাকের মত অথবা তাহা হইতে বেশী হয়, তবেই তাহাকে বিদেশী তামাকের আবাদ করিতে বলা সঙ্গত। তারপর বিদেশের রোগ-প্রতীকার-প্রণালী সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। সেগুলিকে ভাল রকমে শিখিয়া স্থানীয় অবস্থার উপযোগী করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে। তাহা হইলে যে ফসল পাওয়া যাইবে, তাহা সিগারেট প্রস্তুত করিবার পক্ষে উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। সুতরাং বিদেশী বাজারের জন্য বিভিন্ন জাতের তামাকের ব্যাধি-চিকিৎসায় ও চাষের প্রণালীতে অভিজ্ঞ একদল লোক রীতিমত রাখা দরকার।

তামাক চাষের মোসাবিদা

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, বোম্বাই প্রদেশে তামাকের উন্নতিকল্পে আমাদের নিম্নলিখিত পন্থাগুলি অবলম্বন করা আবশ্যক :—

ক। দেশীয় বাজারের জন্য—

(১) বর্ত্তমানে যেরূপ করা যাইতেছে সেইরূপ নির্ব্বাচন ও লালন-পালনের কাজ সমস্ত বোম্বাই প্রদেশে করিতে হইবে।

(২) যেসব জমিতে বিশেষ কোনো কারণ—যেমন কৈরা জেলায় শক্ত স্তর—থাকিবে, সেসব জমির প্রত্যেকটিতে

কোন্ ধরণের চাষের প্রণালী অবলম্বন করা আবশ্যক, তাহা জানিতে হইবে।

(৩) প্রত্যেক জমির খানিকটা খানিকটা অংশে সার প্রয়োগ করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট সারের প্রণালী শিক্ষা করিতে হইবে।

(৪) কেন্দ্র-কৃষি-ক্ষেত্রে কীট-পতঙ্গ ও ব্যাধির বিষয় শিক্ষা করিতে হইবে।

(৫) নানা জমিতে অধুনাদৃষ্ট ব্যাধি ও কীট-পতঙ্গ দূরীকরণের উৎকৃষ্ট প্রণালী শিখিতে হইবে।

(৬) জল অনেক নীচে নামিয়া গেলে তামাক জন্মাইবার উপযোগী জল-সরবরাহের ব্যবস্থা শিখিতে হইবে।

খ। বিদেশী বাজারের জন্য—

(১) যে সমস্ত বিদেশী তামাক এই দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় তামাকের তুলনায় ভালরকম জন্মিতে পারে, সেই সব তামাকের উৎকৃষ্ট জাতগুলি লইয়া পরীক্ষা করিতে হইবে।

(২) সেই সমস্ত তামাকের চিকিৎসা-প্রণালী এবং তৎসঙ্গে তৎসদৃশ দেশীয় তামাকগুলির চিকিৎসা-প্রণালীও শিখিতে হইবে।

(৩) রোগমুক্ত তামাকগুলিকে কিরূপ করিয়া আঁটিবদ্ধ করিতে হইবে এবং কি ভাবেই বা তাহাদিগকে স্থানান্তরিত করিতে হইবে, সেই সব বিষয় সম্যকরূপে শিক্ষা করিতে হইবে।

মূল্য-তত্ত্ব

(ডেভিড্ রিকার্ডো)

অনুবাদক

শ্রীশচীন্দ্রমোহন সেন, এম্,এ ও শ্রীসুধাকান্ত দে, এম,এ, বি,এল

(২)

রকমারী মেহনৎ ও আপেক্ষিক দাম

[শ্রমের গুণের তারতম্য অনুসারে দক্ষিণার তারতম্য ঘটে। কিন্তু এই কারণে দ্রব্যসমূহের আপেক্ষিক দামের কম-বেশ ঘটে না।]

১৩। সকল রকম দামের গোড়ায় শ্রম এবং শ্রমের আপেক্ষিক পরিমাণের তারতম্যই দ্রব্যের আপেক্ষিক দামের নিয়ামক—এই কথা বলিতেছি বলিয়া যেন মনে করা না হয় যে, আমি বিভিন্ন রকম শ্রমের কথা ভুলিয়া গিয়াছি এবং কোনো এক বিষয়ে এক ঘণ্টার বা এক দিনের শ্রমের সহিত অন্য বিষয়ে ঐ সময়ের শ্রমের তুলনা করা কত কঠিন তাহা আমার মনে নাই। কোন্ শ্রমের "মুরদ" কতখানি, তাহা শীঘ্রই সকল কাজকর্ম্মের পক্ষে যথেষ্টরূপ ঠিকভাবে বাজারে যাচাই ও নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায় এবং উহা শ্রমিকের কৌশল ও শ্রম-তৎপরতার উপর নির্ভর করে। একবার একটা মাপকাঠি দাঁড়াইয়া গেলে, তার উঠা-পড়ার সম্ভব খুব কম। শ্রমিক স্বর্ণকারের এক দিনের শ্রম যদি সাধারণ শ্রমিকের এক দিনের শ্রমের অপেক্ষা বেশী দামী হয়, তবে তাহার কারণ এই যে, উহা বহু পূর্ব্বেই যাচাই হইয়া গিয়াছে এবং দামের কোঠায় ঠিক স্থান অধিকার করিয়াছে। ১

১ "কিন্তু যদিও শ্রমই সকল দ্রব্যের বিনিময়-দামের প্রকৃত নিয়ামক, সাধারণতঃ উহাদ্বারাই দ্রব্যসমূহের দাম নির্ণীত হয় না। দুই বিভিন্ন পরিমাণ শ্রমের পরস্পর অনুপাত বাহির করা প্রায়ই শক্ত। দুই ভিন্ন রকমের কাজের কোন্‌টায় কতখানি সময় খরচ হইল শুধু, তাহাদ্বারাই সর্ব্বদা এই অনুপাত নির্ণয় করা চলে না। মাল প্রস্তুত করিতে যে নানাপ্রকার কৃচ্ছ্র ও নিপুণতা লাগে ইহাও মনে রাখিতে হইবে। দুই ঘণ্টার সহজ কাজ অপেক্ষা এক ঘণ্টার শক্ত কাজে বেশী পরিশ্রম লাগিতে পারে; অথবা সাধারণ ও সহজ ভাবে নিযুক্ত

সুতরাং একই দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দাম তুলনা-কালীন, কম বা বেশী নিপুণতা এবং সেই বিশেষ দ্রব্যের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের কঠোরতা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে, কারণ এই ন্যূনাধিক্য সকল সময়ে সমান ভাবে কাজ করে। এক সময়ের এক রকমের শ্রম অন্য সময়ের সেই রকম শ্রমের সহিত তুলনা করা হয়। যদি দশমাংশ, পঞ্চমাংশ অথবা চতুর্থাংশ যোগ করা হয় বা পৃথক করিয়া লওয়া হয়, তবে ফলে উৎপন্ন দ্রব্যের দাম-তারতম্যে সেইরূপ কম-বেশ হইবে।

যদি এক খণ্ড বস্ত্রের বর্ত্তমান দাম দুই খণ্ড লিনেনের দামের সমান হয় এবং যদি দশ বৎসর পরে সাধারণ এক টুকরা বস্ত্রের দাম দেড় টুকরা লিনেনের সমান হয়, তবে আমরা নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্তে পৌছিতে পারি যে, হয় বস্ত্র তৈয়ারী করিতে দশ বৎসর পরে কম শ্রমের নয় লিনেনের জন্য বেশী শ্রমের প্রয়োজন হইবে অথবা দুই কারণ-ই এক সঙ্গে কার্য্য করিবে।

যে অনুসন্ধানে আমি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই তাহা দ্রব্যসমূহের চিরন্তন দাম-সম্বন্ধীয় নহে—তাহাদের আপেক্ষিক দামের তারতম্যের ফল-সম্পর্কীয়। তাই ভিন্ন ভিন্ন রকমের মনুষ্য-শ্রমকে কতখানি প্রাধান্য দেওয়া হইল সে বিচারের বিশেষ কিছু সার্থকতা নাই। মোটামুটি আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, প্রথম প্রথম যে অসমতাই তাহাদের মধ্যে থাকুক্ না কেন, এবং এক প্রকারের সিদ্ধহস্ততা-লাভের চেয়ে অন্য প্রকারের সিদ্ধহস্ততা-লাভে যত বেশী চতুরতা, কৌশল ও সময় লাগুক না কেন,—বংশানুক্রমে এইসব প্রায় একরূপই থাকিয়া যায়; অন্ততঃ বৎসর বৎসর যে পরিবর্ত্তনটুকু ঘটে তাহা বড়ই কম; সুতরাং, অল্পকালের হিসাব লইলে, দ্রব্যের আপেক্ষিক দামের পক্ষে কোনো কাজের নহে।

"পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সামাজিক অবস্থা যতই উন্নতিশীল, স্থিতিশীল বা অধোগামী হউক না কেন তাহাতে শ্রমিকের বেতনের হারই বল আর শ্রমের ও পুঁজির ভিন্ন ভিন্ন নিয়োগ-প্রযত্নে "মুনাফা"র হারই বল—ইহাদের নিজেদের মধ্যে পরস্পর অনুপাতটা বিশেষ-কিছু পরিবর্ত্তিত হয় না। লোকহিতের এইসকল ওঠা-নামায় মজুরি অথবা মুনাফার সাধারণ হার পরিবর্ত্তিত হয় বটে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সকল প্রকার ব্যবসাতেই এই সকল হার সমানভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সুতরাং এইসকল সমাজ-বিপ্লব মজুরি ও মুনাফার হারের পরস্পর অনুপাতে কোনো পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে না। পরিবর্ত্তন ঘটিলেও তাহা বেশীদিন স্থায়ী হয় না। ২

(৩)

মেহনতের সমষ্টি ও আপেক্ষিক দাম

[শুধুমাত্র প্রত্যেক প্রত্যক্ষ শ্রমই দ্রব্যসমূহের দামের পরিবর্ত্তন ঘটায় তাহা নহে,—যন্ত্রপাতি, গৃহ (কার্য্যভূমি), যাহাদ্বারা ঐ শ্রমের সহায়তা হয়, তাহাদের জন্য যে শ্রম দেওয়া হয় তাহার দ্বারাও দাম পরিবর্ত্তিত হয়।]

১৪। অ্যাডাম স্মিথ যে আদিম অবস্থার কথা লিখিয়াছেন, সেই অবস্থায়ও এমন কিছু পুঁজির দরকার, যার সাহায্যে শিকারী মৃগয়া করিতে পারে। যদিও এই পুঁজি হয়ত তার নিজেরই তৈয়ারী ও নিজেরই সঞ্চিত। বিনা অস্ত্রে বীবর বা হরিণ কিছুই মারা যায় না; সুতরাং এইসব জানোয়ারের মূল্য শুধুমাত্র তাহাদের হননে যে সময় ও শ্রমের দরকার হয়

হইয়া ব্যবসায়ে এক মাস থাকা অপেক্ষা যে বাণিজ্য শিখিতেই দশ বৎসর লাগে সেই বাণিজ্যে একঘণ্টা দেওয়াতে বেশী শ্রম লাগিতে পারে। কিন্তু কষ্টই বল আর চতুরতাই বল, কাহারও একটা ঠিক মাপ পাওয়া সহজ নহে। বিভিন্ন প্রকার শ্রমের দ্বারা "উৎপন্ন" ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যকে পরস্পরের সহিত বিনিময় করিবার জন্য ঐ দুইয়ের (কৃচ্ছ্র ও নিপুণতা) সাধারণতঃ কিছু মর্য্যাদা দেওয়া হয় বটে। কিন্তু ইহা কোনও ঠিক পরিমাপক দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয় না, হয় বাজারের দর-কষাকষি ইত্যাদির দ্বারা। এই একরকম মোটামুটি সমতার অনুপাত একেবারে ঠিক না হইলেও প্রতি দিনকার ব্যবসার পক্ষে যথেষ্ট।" অ্যাডাম স্মিথ-প্রণীত "বিভিন্ন জাতির ধনসম্পদ্" প্রথম ভাগ, ৫ম অধ্যায়।

২ "বিভিন্ন জাতির ধন-সম্পদ্" প্রথম ভাগ, ১০ম অধ্যায়।

তাহার উপর নির্ভর করে না, শিকারীর যে পুঁজি ও অস্ত্রের, সাহায্যে হননকার্য্য সাধিত হয়, তাহা জোগাড় করিবার জন্ত যে সময় ও পরিশ্রম লাগে, তাহার উপরও নির্ভর করে।

মনে কর বীবরের কাছে যাওয়া হরিণের কাছে যাওয়া অপেক্ষা কঠিন বলিয়া বীবর-হননের নিমিত্ত যে অস্ত্র দরকার তাহার নির্ম্মাণে হরিণ-হননকারীর অস্ত্র অপেক্ষা অনেক বেশী শ্রম দেওয়া হইয়াছে; স্বভাবতই একটা বীবরের দাম দুইটা হরিণের দামের চেয়ে বেশী হইবে এবং ঠিক এই কারণেই মোটের উপর বীবর-হননের জন্ত বেশী শ্রমের দরকার হইবে। কিংবা মনে কর দুইটা অস্ত্রেরই নির্ম্মাণে সমপরিমাণে শ্রমের দরকার হইল; কিন্তু একটা আর একটার চেয়ে অনেক টেঁকসই। টেঁকসই অস্ত্রটার দামের অল্প অংশমাত্র দ্রব্যেতে বর্ত্তিবে, কিন্তু যে অস্ত্রটা টেঁকসই নয় তাহার দামের অনেক অংশ তৎসাহায্যে প্রস্তুত বা উৎপন্ন কি লব্ধ দ্রব্য হইতে আদায় করিয়া লওয়া হইবে।

বীবর ও হরিণ হননকারীর সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র এক শ্রেণীর লোকের অধিকারে থাকিতে পারে, এবং হননের শ্রম অন্য এক শ্রেণীর লোকের হইতে পারে; পুঁজিপাটার নির্ম্মাণে ও জানোয়ার-হননে যে শ্রম দেওয়া হইতেছে তাহারই অনুপাতে এই সমুদয়ের আপেক্ষিক দাম নির্দ্ধারিত হইবে। মনে কর মজুরদের সংখ্যা ঠিকই আছে, কিন্তু পুঁজিপাটার পরিমাণ সমাজে বাড়িতেছে বা কমিতেছে অথবা খাদ্যদ্রব্য ও অন্তান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের পরিমাণ বাড়িতেছে বা কমিতেছে। এই অবস্থায় যে সব লোক এ ব্যবসায়ে বা ও ব্যবসায়ে পুঁজি জোগাইতেছে তাহারা উৎপন্ন মালের অর্দ্ধেক, চতুর্থাংশ বা অষ্টমাংশ লইতে পারে; অবশিষ্ট হিস্যা মজুরদের মজুরি বাবদ যাইবে। তথাপি এই বিভাগ এই দ্রব্যসমূহের আপেক্ষিক দামে কোনো পরিবর্ত্তন ঘটাইবে না। কারণ পুঁজি-পাটার মুনাফা বেশী হোক বা কমই হোক, শতকরা ৫০, ২০, অথবা ১০—যাই হোক, শ্রমের মজুরি উঁচু বা নীচুদরের হোক্ তাহাদের ফল দুই প্রকার নিয়োগেই সমান হইবে।

১৫। এখন যদি আমরা মনে করি সমাজের কাজকর্ম্ম বাড়িয়া গিয়াছে, কতক লোক মাছ ধরিবার জন্ত প্রয়োজনীয় ডিঙ্গি ও পানসী বানাইতেছে এবং কৃষিতে যে বীজ ও আদিম যন্ত্রপাতি কাজে লাগে তাহা জোগাইতেছে। তথাপি সেই একই নিয়ম খাটে যে, উৎপন্ন দ্রব্যসমূহের বিনিময়-দাম তাহাদের উৎপাদনের জন্ত যে'শ্রম দেওয়া হয় তাহার অনুপাতে হইবে; শুধুমাত্র তাহাদের উৎপাদনের জন্ত প্রতক্ষ্যভাবে প্রদত্ত শ্রমের অনুপাতে নয়, কিন্তু যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র বা যন্ত্রপাতির দ্বারা সেই বিশেষ শ্রমকে কার্য্যকর করা হইয়াছিল তাহাদের নির্ম্মাণ-কার্য্যে প্রদত্ত শ্রমেরও বটে।

আমরা যদি এমন সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করি যেখানে অনেক উন্নতি করা হইয়াছে এবং যেখানে শিল্প ও বাণিজ্য প্রসার লাভ করিতেছে, সেখানেও আমরা দেখিব যে, এই নিয়মেরই বশবর্ত্তী হইয়া দ্রব্যসমূহের দাম বাড়িতেছে বা কমিতেছে। যথা, মোজার বিনিময়-দাম নির্ণয় করিবার সময় দেখা যায় যে, অন্যান্য জিনিষের সহিত তুলনায় উহা প্রস্তুত করিতে ও বাজারে আনিতে যে শ্রমের দরকার হয়, তার সমস্তটার উপর উহার দাম নির্ভর করে। প্রথমতঃ, যে জমিতে তুলা জন্মান হয়, তার চাষের জন্ত প্রয়োজনীয় শ্রম আছে; দ্বিতীয়তঃ, যেখানে মোজা তৈয়ারী হইতেছে সেখানে ঐ তুলা বহিয়া লইয়া আসিবার শ্রম আছে, ইহার কতকটা আবার যে জাহাজে তুলা চালান হইতেছে তাহার নির্ম্মাণের শ্রম এবং জিনিসপত্রের ভাড়া বাবদ তুলিয়া লওয়া হয়; তৃতীয়তঃ, জোলা তাঁতীর শ্রম আছে; চতুর্থতঃ, ইঞ্জিনিয়ার, কর্ম্মকার (কামার) ও ছুতার, যাহাদের সাহায্যে ঘরবাড়ী ও যন্ত্রপাতি তৈয়ারী হইয়াছে, তাদের শ্রমের কতক কতক আছে; পঞ্চমতঃ, যে সব খুচরা ব্যবসায়ী ও অন্য অনেকের শ্রম আছে তাদের প্রত্যেককে নাম ধরিয়া উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

এই ভিন্ন ভিন্ন রকমের শ্রম-সমষ্টিদ্বারা মোজার বিনিময়ে কোন্ পরিমাণ অন্য জিনিষ পাওয়া যাইবে তাহা নির্ণীত হয়। তেমনি, ঐ অন্য জিনিষগুলির জন্য যে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের শ্রম দেওয়া হইয়াছে সে কথা বিচার হইবে মোজার বিনিময়ে উহাদের কতখানি করিয়া লাগিবে তদ্দারা।

বিনিময়-দামের প্রকৃত গোড়ার কথা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবার জন্য মনে করা যাউক যেন অন্য জিনিষের সহিত

বিনিময়ের জন্য নির্ম্মিত মোজা বাজারে আসিবার পূর্ব্বে তুলা যে সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়া আসে, শ্রম-সংক্ষেপের দ্বারা তাহার উন্নতি করা হইতেছে। এখন দেখা যাউক তাহাতে কি ফল ফলিতে আরম্ভ করে। যদি তুলার চাষের জন্য অপেক্ষাকৃত কম লোক দরকার হয়, অথবা জাহাজ চালাইবার জন্য নাবিক এবং জাহাজ তৈয়ারীর জন্য নৌ-নির্ম্মাতা কম সংখ্যায় নিযুক্ত হয়, যদি ঘরবাড়ী ও যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের জন্য কম লোককে কাজ দেওয়া হয় অথবা নির্ম্মিত হইয়া যদি ইহারা পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী কার্য্যকর হয়, তাহা হইলে মোজার দাম নিশ্চয় নামিবে। কাজে কাজেই তাহার পরিবর্ত্তে অন্যান্য জিনিষ কম পরিমাণে পাওয়া যাইবে। মোজার দাম কমিবে, কারণ উহার উৎপাদনের জন্য কম পরিমাণ শ্রমের দরকার হইতেছে ও সেইহেতু যে সব জিনিষ নির্ম্মাণে এইরূপ শ্রম-সংক্ষেপ করা হয় নাই, সেই সব জিনিষের কম পরিমাণের সঙ্গে ইহার বিনিময় হইবে। শ্রমসংক্ষেপ করিলে দ্রব্যের আপেক্ষিক দাম কমিবেই কমিবে, সে সংক্ষেপ দ্রব্য-নির্ম্মাণের শ্রমেরই হোক, আর যে পুঁজি-পাটার সাহায্যে ঐ দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে তাহা জমাইবার জন্য দরকারী শ্রমেরই হোক। উভয়তই মোজার দাম কমিবে। কেননা জোলা, তাঁতী ইত্যাদি যে সব লোক প্রত্যক্ষভাবে দরকার তাদের কম করিয়া নিয়োগ করা হইতেছে; অথবা পরোক্ষভাবে দরকারী নাবিক, ভারবাহী, ইঞ্জিনিয়ার, কামার প্রভৃতিকে কম করিয়া নিয়োগ করা হইতেছে। এক ক্ষেত্রে সমুদয় শ্রমসংক্ষেপের ফলটা মোজাতেই বর্ত্তিবে। কারণ শ্রমের সেই অংশটা সম্পূর্ণই মোজার জন্য দেওয়া হইয়াছিল। অন্য ক্ষেত্রে, মোজার উপর কিছু অংশ মাত্র বর্ত্তিবে, বাকী সমস্তটা বর্ত্তিবে সেই সমস্ত দ্রব্যে, যাহাদের উৎপাদনে ঘরবাড়ী, যন্ত্রপাতি ও যানবাহন সহায় হইয়াছিল।

মনে কর যেন, সমাজের শৈশব অবস্থায়, জেলের ডিঙ্গি ও অস্ত্রশস্ত্র এবং শিকারীর তীরধনু সমান দামী ও স্থায়ী ছিল,—উভয়ে সমান পরিমাণ শ্রমে প্রস্তুত বলিয়া। এইরূপ অবস্থায়, শিকারীর দিনেকের শ্রমে লব্ধ হরিণের দাম জেলের দিনেকের শ্রমে প্রাপ্ত মাছের সমান। উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ যাহাই হউক, সাধারণ মজুরির ও মুনাফার হার যত উঁচু অথবা নীচু হউক, মাছ ও মাংসের আপেক্ষিক দাম সম্পূর্ণ-রূপে শাসিত হইবে কতখানি শ্রম খরচ হইয়াছে তাহার দ্বারা। যদি জেলের ডিঙ্গি ও যন্ত্রপাতির দাম হয় ১০০ পাউণ্ড এবং গণনা করিয়া দেখা যায় যে, ওগুলি দশ বৎসর টিঁকিবে এবং সে যদি ১০ জন লোক নিযুক্ত করিয়া থাকে, যার জন্য তাহার বাৎসরিক ১০০ পাউণ্ড খরচ হইতেছে, এবং যাহারা তাহাদের একদিনের শ্রমে ২০টা স্যামন মাছ আনিয়াছে। যদি শিকারী যে অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করে তারও দাম হয় ১০০ পাউণ্ড, এবং গণিয়া দেখা যায় যে, এই সব দশ বৎসর টিঁকিবে এবং সেও যদি ১০০ জন লোক লাগাইয়া থাকে যার জন্য তাহার বাৎসরিক ১০০ পাউণ্ড খরচ হইতেছে এবং যাহারা তাহাকে প্রতিদিন ১০টা হরিণ জোগাইতেছে। তবে স্বভাবতঃ একটা হরিণের দাম হইবে দুইটা স্যামন তা এখন যাহারা আহরণ করিয়া আনিল তাহাদের জন্য বিভক্ত উৎপন্ন দ্রব্যের অনুপাত কমই হোক বা বেশীই হোক। মুনাফা-ঘটিত প্রশ্নে মজুরির জন্য খরচ-করা অনুপাতের কথা খুব বেশী দরকারী, কারণ ইহা দ্রষ্টব্য যে, ঠিক যে অনুপাতে মজুরি কমিতেছে বা বাড়িতেছে সেই অনুপাতে মুনাফা বাড়িতেছে বা কমিতেছে; কিন্তু মজুরি একই সময়ে উভয় নিয়োগ-ক্ষেত্রে উঁচু অথবা নীচু হইবে বলিয়া ঐ অনুপাত মাছমাংসের আপেক্ষিক দামের উপর একটুও প্রভাব বিস্তার করিতেছে না। যদি শিকারী তার মাংসের বিনিময়ে জেলেকে আরো বেশী মাছ দেওয়াইবার জন্য এই ছুতা করিয়া বসে যে, তাকে মৃগয়ার বেশ বড় অংশ অথবা বেশ বড় একটা অংশের দাম দিতে হইতেছে মজুরি-স্বরূপ, তবে জেলেও বলিবে যে, তাকেও ঐ একই কারণে বেশী খরচ করিতে হইতেছে। সুতরাং মজুরি ও মুনাফার সকল প্রকার তারতম্য যাহা হউক, পুঁজিপাটা জমানোর সকল রকম ফল যাহা হউক,—যতক্ষণ পর্য্যন্ত একদিনের শ্রমে এক পরিমাণ মাছ ও এক পরিমাণ মাংস পাওয়া যাইতেছে, ততক্ষণ বিনিময়ের স্বাভাবিক হার হইবে দুইটা স্যামনের জন্য একটা হরিণ।

যদি সমপরিমাণ শ্রমের দ্বারা অল্পতর পরিমাণে মাছ বা বেশী পরিমাণে মাংস পাওয়া যাইত, তবে মাংসের দামের তুলনায় মাছের দাম বাড়িত। পরন্তু, যদি সমপরিমাণ শ্রমের

দ্বারা অল্পতর পরিমাণে মাংস অথবা বেশী পরিমাণে মাছ পাওয়া যাইত, তবে মাছের তুলনায় মাংস চড়া হইত।

১৬। যদি এমন একটি অন্য দ্রব্য থাকিত, যার দাম নিত্য (হ্রাস-বৃদ্ধিহীন), তবে ঐ দ্রব্যের সহিত মাছ ও মাংসের দামের তুলনা করিয়া আমরা বুঝিতে সমর্থ হইতাম এই দামের উঠা-নামার জন্য মাছের দামের পরিবর্ত্তন কতটা দায়ী আর মাংসের দামের পরিবর্ত্তনই বা কতটা দায়ী।

মনে কর অর্থ (মুদ্রা) সেই দ্রব্য। যদি একটা স্যামনের মূল্য হয় ১ পাউণ্ড ও একটা হরিণের ২ পাউণ্ড, তবে একটা হরিণ মূল্যে দুইটা স্যামনের সমান। কিন্তু হইতে পারে যে একটা হরিণ তিনটা স্যামনের সমান মূল্যে দাঁড়াইয়াছে, কারণ হয়ত হরিণ-শিকারে আরো বেশী শ্রমের দরকার হইতেছে অথবা স্যামন আহরণে আরো কম শ্রম লাগিতেছে অথবা দুই কারণই এক সময়ে কার্য্য করিতেছে। যদি আমাদের এই নিত্য মানদণ্ডটা হাতে থাকিত, তবে আমরা সহজেই স্থির করিতে পারিতাম কি অনুপাতে কোন্ কারণটা কাজ করিতেছে। যদি স্যামন ১পাউণ্ডেই বেচা হইতে থাকিত অথচ হরিণ ৩ পাউণ্ডে চড়িত, আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারিতাম যে হরিণ আহরণের জন্য আরো বেশী শ্রমের দরকার হইতেছে। যদি হরিণ আগের ২ পাউণ্ড দরেই বেচা হইতে থাকিত এবং স্যামন ১৩ শি, ৪ পে দরে বিক্রয় হইত, তখন আমরা নিশ্চিত হইতে পারিতাম যে স্যামন-সংগ্রহে অল্পতর শ্রমের দরকার হইতেছে; এবং যদি হরিণ ২ পা ১০ শিলিঙ্‌এ চড়িত ও স্যামন ১৬ শি ৮ পেন্সে নামিত, আমরা নিশ্চিত বুঝিতাম যে, এই দুই দ্রব্যের আপেক্ষিক দামের পরিবর্ত্তন-সাধনের জন্য উভয় কারণই কার্য্য করিয়াছে।

শ্রমের মজুরির কোন পরিবর্ত্তনেই এই দ্রবসমূহের আপেক্ষিক দামে কোন পরিবর্ত্তন উৎপাদন করিতে পারিত না। কারণ মনে কর যেন মজুরি বাড়িয়াছে। এই দুইয়ের কোন ব্যবসায়েই আরো বেশী পরিমাণ শ্রমের দরকার হইবে না। কিন্তু চড়া দরে মজুর লাগাইতে হইতেছে। যে যে কারণে শিকারী ও জেলে তাদের মাংস ও মাছের দাম বাড়াইতে চেষ্টা করিবে, সেই কারণসমূহই খনির মালিককে তার সোনার দাম বাড়াইতেও প্রবৃত্ত করিবে। এই কারণগুলি তিন ব্যবসায়েই সমান জোরের সহিত কাজ করায় এবং মজুরি-বৃদ্ধির পূর্ব্বে এবং পরে সেই সেই ব্যবসায়ে নিযুক্ত লোকদের আপেক্ষিক অবস্থা একই হওয়ায়, মাংস, মাছ ও সোনার আপেক্ষিক দাম অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া যাইবে। মজুরি শতকরা ২০ বাড়িতে পারে এবং সেই অনুসারে মুনাফা বেশী বা কম অনুপাতে নামিতে পারে, কিন্তু এই সব দ্রব্যের আপেক্ষিক দামে কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটিবে না।

এখন মনে কর যে, সমান পরিশ্রমে ও স্থায়ী পুঁজি পাটার সাহায্যে আরো (বেশী) মাছ উৎপন্ন হইল, কিন্তু আর সোনা বা মাংস হইল না, তাহা হইলে সোনা বা মাংসের সহিত তুলনায় মাছের আপেক্ষিক দাম নামিয়া যাইবে। যদি, এক দিনের শ্রমের ফল ২০ টা স্যামনের পরিবর্ত্তে ২৫টা হয় তবে স্যামনের দাম ১ পাউণ্ডের বদলে ১৬ শিলিং হইবে, এবং দুইটার স্থানে ২½ টা স্যামন একটা হরিণের বিনিময়ে দেওয়া হইবে, কিন্তু একটা হরিণের দাম আগের মত ২ পাউণ্ডই থাকিয়া যাইবে। এই প্রকারে যদি সমান পরিশ্রমে ও স্থায়ী পুঁজিপাটার সাহায্যে অল্পতর মাছ সংগ্রহ হয়, তবে মাছের আপেক্ষিক দাম চড়িবে। তাহা হইলে মাছ বিনিময়-দামে বাড়িবে বা কমিবে, কেবল এইহেতু যে, কোনো এক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আহরণের জন্য বেশী বা কম শ্রমের দরকার হইয়াছিল; এবং ঐ দাম কখনো দরকারী শ্রম-পরিমাণের অনুপাত-নিরপেক্ষ হইয়া বাড়িতে বা কমিতে পারে না।

তারপর আমরা যদি এক অপরিবর্ত্তনশীল মানদণ্ড পাইতাম, যার সাহায্যে অন্য দ্রব্যসমূহের হ্রাসবৃদ্ধি পরিমাপ করিতে পারিতাম, আমাদের কাল্পত এই অবস্থার মধ্যে উৎপন্ন হইলে, আমরা দেখিতে পাইতাম যে, যে উর্দ্ধতম সীমায় ঐ দ্রব্যসমূহ স্থায়ীভাবে চড়িতে পারে, তাহা তাহাদের উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অধিকতর শ্রমের পরিমাণের উপর নির্ভর করে; এবং যদি তাহাদের উৎপাদনের নিমিত্ত আরো শ্রম দরকার না হইত তবে তাহারা কোন ক্রমেই চড়িত না। মজুরি-বৃদ্ধি টাকা পয়সার হিসাবে দ্রব্যের দাম বাড়াইবে না, যে সকল দ্রব্য উৎপাদনের জন্য কোন

অধিকতর পরিমাণ শ্রমের দরকার হয় নাই ও যাদের জন্য সমান অনুপাতে স্থায়ী ও তরল পুঁজি এবং সমকালস্থায়ী স্থায়ী পুঁজি ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহাদের তুলনায়ও মজুরি-বৃদ্ধি কোনো দ্রব্যের দাম বাড়াইতে পারে না। যদি অন্য দ্রব্য উৎপাদনের জন্য বেশী বা কম শ্রম লাগে, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তাহাতে উহার আপেক্ষিক দামের পরিবর্ত্তন ঘটাইবে কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের জন্য দায়ী শ্রমের পরিমাণের পরিবর্ত্তন—মজুরির বৃদ্ধি নহে।

আয়-কর সম্বন্ধে ভারতীয় আইন

ভারতীয় ইন্‌কম্ ট্যাক্‌স্ (আয়-কর) আইনের ৬৬ ধারার সম্বন্ধে হাইকোর্ট এবং জুডিশ্যাল কমিশনারগণ যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা রাজস্ব-বিভাগের কেন্দ্রীয় বোর্ড-কর্ত্তৃক ১৯২৪-২৫ সনের ইন্‌কম্ ট্যাক্‌স্ রিপোর্টের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। আমরা নিম্নে সেইসব মন্তব্যের সারাংশ প্রদান করিলাম।

বোম্বে হাইকোর্ট

(১) ইনকম ট্যাকস্ আইনের ২ ধারা অনুসারে যদি রেজিষ্ট্রেশনের জন্য দরখাস্ত করা হয় এবং তাহা যদি ইন্‌কম্-রিটার্ণ দাখিলের জন্য যে সময় নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার মধ্যে না করা হয়, তবে তাহা অগ্রাহ্য হইবে। (২) কেহ কোন ব্যবসায়ের জন্য টাকা ধার করিয়া সেই টাকার সুদের পরিবর্ত্তে উত্তমর্ণকে তাহার লভ্যাংশ দিলে, সেই লভ্যাংশের দরুণ আইনের ১০ (২) (৯ম) ধারা অনুসারে কোনরূপ বাদ (ডিডাক্‌শন) দেওয়া হইবে না। (৩) কোন দেউলিয়ার ত্যক্ত সম্পত্তি গুটাইবার কালে যে ফী পাওয়া যায়, তাহা ৪ (৩) (৬ষ্ঠ) ধারা অনুসারে রেহাই পাইবে না। কারণ তাহা আকস্মিক ও পৌনঃপুনিক (ক্যাজুয়াল ও রেকারিং) ধরণের নহে। (৪) আইনের ৫০ ধারায় "যে বৎসর ট্যাক্‌স আদায় করা হয়" এই কথা দ্বারা যে বৎসর কোন কোম্পানী তাহার লভ্যাংশ ঘোষণা করে সেই বৎসর সূচিত হইতেছে, কিন্তু যে বৎসর কোম্পানী তাহার লাভের উপর (যে লাভ হইতে লভ্যাংশ দেওয়া হয়) ট্যাক্‌স দিয়া থাকে, সে বৎসর সূচিত হইতেছে না।

কলিকাতা হাইকোর্ট

(১) যেখানে একান্নবর্ত্তী হিন্দুপরিবার-ভুক্ত দুই ব্যক্তি কোন ব্যবসায়ের লাভ পরস্পরের মনোমত অংশে ভাগ করিয়া লয়, সেখানে ব্যবসায়দ্বারা একটি সাধারণ অরেজেষ্ট্রীকৃত ফার্ম্ম হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সেটা অবিভক্ত হিন্দু পরিবার নহে। (২) যখন ২২ (২) ধারা অনুসারে কোন রিটার্ণ পেশ করা হয় এবং তাহা অশুদ্ধ ও অসম্পূর্ণ বিবেচিত হয় এবং ২৩ (২) ধারার সর্ত্তানুসারে না হইয়া ২৩ (৪) ধারা অনুসারে সম্পত্তির মূল্য নির্দ্ধারিত হয়, তখন সেইরূপ নির্দ্ধারণ বাতিল হইবে। (৩) কোন কয়লার কোম্পানী তাহার উত্তোলিত কয়লার পরিমাণ অনুসারে রোড ও পাবলিক ওয়ার্কস সেস্ রূপে যে টাকাটা দেয়, তাহা ১৯২২ সনের ইন্‌কম্ ট্যাক্‌স আইনের ১০ (২) (৮ম) ধারা অনুসারে ব্যয়ের একটি স্বীকার্য্য দফা। (৪) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-করা সম্পত্তির মধ্যে মৎস্য-ব্যবসায়ে যে আয় হয়, তাহা কৃষি-সম্বন্ধীয় নহে, তাই তাহা ইন্‌কম্ ট্যাক্‌সের যোগ্য।

এলাহাবাদ হাইকোর্ট

(১) যৌথ কারবারের দলিল অনুসারে কোন ফার্ম্ম-কর্ত্তৃক দাতব্য অথবা ধর্ম্ম উদ্দেশ্যে যে ব্যবসায় চালান হয়, তাহা হইতে লাভের কোন অংশ পাইলে, সে অংশকে "ট্রাষ্টাধীন সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত আয়" বলিয়া ধরা হইবে না। (২) বাজিফেলা চুক্তি (ওয়েজারিং কন্ট্রাক্ট) হইতে যে লাভ হয়, তাহার উপর ইন্‌কম্ ট্যাক্‌স ধার্য্য হইবে। (৩) কোন ফার্ম্মকে লিমিটেড কোম্পানীরূপে পরিবর্ত্তিত

করিবার পূর্ব্বে তাহার লাভটাকে ফার্ম্মের লাভ বলিয়াই নির্দ্ধারিত করিতে হইবে, কিন্তু ট্যাক্স দিতে হইবে কোম্পানীকে। (৪) ব্যবসায়ের প্রধান স্থলে কোন ইন্‌কম্ ট্যাক্‌স কর্ম্মচারী থাকিলে, তিনি ঐ স্থানের ব্যবসায় এবং তাহার নানাবিধ শাখা হইতে প্রাপ্ত আয়ের সবটাকেই ট্যাক্‌সের যোগ্য বলিয়া ধার্য্য করিতে পারিবেন। এমন কি সেই সব শাখার হিসাব-পত্র উপস্থাপিত না হইলেও তিনি উহা করিতে পারিবেন।

পাটনা হাইকোর্ট

(১) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-করা সম্পত্তিতে অকৃষি আয় ট্যাক্‌সযোগ্য বলিয়া গণ্য হইবে না। (২) জমিদার-কর্ত্তৃক প্রাপ্ত কয়লাখনির সেলামি ট্যাক্‌স-যোগ্য। (৩) কোন ব্যবসায়ের কর্ম্মচারি-কর্ত্তৃক তহবিল আত্মসাৎ করা হইলে, সে টাকাটা লাভের অংশ হইতে আইন-অনুসারে বাদ যাইবে এবং কর্ম্মচারীদের বাড়ী যাওয়ার জন্য ও খাওয়ার জন্য যে টাকাটা সচরাচর দেওয়া হয়, তাহা রীতিমত ব্যবসায়ের খরচ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। (৪) আপীল করিলে, নির্দ্ধারিত ট্যাক্‌স বাড়াইবার ক্ষমতা অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনারের আছে, কিন্তু তাই বলিয়া আয়ের যে অংশটা ইনকমট্যাক্‌স কর্ম্মচারি-কর্ত্তৃক আদৌ ট্যাক্‌সের যোগ্য বলিয়া নিরূপিত হয় নাই, তাহা ট্যাক্‌স যোগ্যরূপে নির্দ্ধারণ করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই। (৫) খনিজ ধাতুবিশিষ্ট জমি বন্দোবস্ত করিয়া দিবার সময় জমিদার যে নজর পান, তাহা ইন্‌কম্-ট্যাক্‌স-যোগ্য নয়।

লাহোর হাইকোর্ট

কাঠ গুদামজাত করিবার উদ্দেশ্যে জায়গা ভাড়া দিলে তাহা হইতে যে আয় হয়, তাহা "কৃষি-সম্বন্ধীয় আয়" নহে।

নাগপুর হাইকোর্ট

(১) কোনো ফার্ম্ম রেজেষ্ট্রী করিবার জন্য এমন কি এপ্রিলের ১লা তারিখের পূর্ব্বেও দরখাস্ত দেওয়া যাইতে পারে। (২) ১৯১৮ সনের ইনকম্ ট্যাক্‌স আইন-অনুসারে যে সমস্ত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে সেই সব সম্বন্ধে হাইকোর্টের আর হুকুমনামা বাহির করিবার অধিকার নাই। (৩) ১৯২১—২২ সনে কোন ইন্‌কম্ ট্যাক্‌স কর্ম্মচারী ১৯২০—২১ সনের সমগ্র আয়টা নির্দ্ধারণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকিলে, তাহা ১৯ ধারা অনুসারে মীমাংসিত হইতে পারিবে। ১৯২১—২২ সনের ফিন্যান্‌শ্যাল (রাজস্ব) বৎসরের পরে হুকুম বাহির হয় নাই বলিয়াই এই প্রণালীকে বে-আইনী মনে করা যাইবে না।

শ্রীবিজয় কুমার সরকার

বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর ব্যাঙ্ক

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যে কয়েকটি বাঙ্গালী-পরিচালিত ব্যাঙ্ক খাঁটি ব্যাঙ্কের নিয়মে চলে বলা হইয়াছে, তাহারাই বা কলিকাতার অন্যান্য ব্যাঙ্কের সঙ্গে তুলনায় কিরূপ স্থান অধিকার করে সে কথা বাঙ্গালীমাত্রেরই জানা দরকার। বিদেশীদিগের ব্যাঙ্কের কথা সসম্ভ্রমে পরিত্যাগ করিয়া যদি অ-বাঙ্গালী-ভারতবাসীর দ্বারা পরিচালিত ব্যাঙ্কের কথাই ধরি, তবেই বা কি দেখিতে পাই?

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ১৯১১ সনে স্থাপিত। এই ব্যাঙ্ক যেরূপ দ্রুত উন্নতি করিতেছে তাহা আমরা সকলে দেখিতেছি। ইহার শত্রুও অনেক। তাহারা মাঝে মাঝে গুজব রটাইয়া আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছে। সে জন্য সময়ে সময়ে গচ্ছিত টাকা উঠাইবার হুজুগ পড়িয়াছে। এই রকম হুজুগে অনেক বড় বড় ব্যাঙ্ক ফেল হয়। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক একাধিকবার এইরূপ অবস্থায় পড়িয়াও ধাক্কা সামলাইয়াছে

এবং মনে হয় যেন আরো দৃঢ় ভিত্তি গাড়িয়াছে। টাটা ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক টাটা-পরিবারের বিপুল অর্থবল ও প্রতিপত্তি সত্ত্বেও টিঁকিতে পারিল না, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের মধ্যে লীন হইল। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ক্রমে ক্রমে ভারতের বড় বাণিজ্য-স্থানগুলিতে শাখা খুলিতেছে। এই ব্যাঙ্ক "ক্লিয়ারিং হাউসে"র একটি বিশিষ্ট সভ্য।

ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া বোম্বে সহরে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রায় সমান জোরে কাজ করে। এ পর্য্যন্ত কেবল আহাম্মদাবাদে একটি শাখা ছিল। এখন কলিকাতাতেও শাখা খুলিয়াছে। ইহার প্রতিপত্তি এইরূপ যে, ইহার মধ্যেই কলিকাতা "ক্লিয়ারিং হাউসে"র সভ্য হইয়াছে।

পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের মূল আফিস লাহোর সহরে। পঞ্জাব প্রদেশের বড় বড় সহরে শাখা খুলিয়া ক্রমে ভারতের প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র কলিকাতা সহরে কয়েক বৎসর একটি শাখা চালাইতেছে। ইহার কার্য্য ক্রমে এত বিস্তৃত হইয়াছে যে, তাহারই গুণে এবং ব্যাঙ্কিং-জগতে প্রভাবশালী কয়েকজন ভারতবাসীর সাহায্যে তুমুল আন্দোলনের ফলে ইয়োরোপীয় ব্যাঙ্কগুলির প্রবল বাধা সত্ত্বেও এই ব্যাঙ্ক এখন কলিকাতা "ক্লিয়ারিং হাউসের" মন্ত্রপ্রভাব-যুক্ত চক্রের মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে।

অ-বাঙ্গালী ভারতবাসি-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কগুলি প্রথমে বাঙ্গালার বাহিরে ও বাঙ্গালাদেশ হইতে দূরে কার্য্য আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে এবং ভারতের প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র কলিকাতার অতুলনীয় বাণিজ্য-সুবিধা লাভের আশায় আকৃষ্ট হইয়া এখানে শাখা খুলিয়াছে এবং এই কলিকাতাতেই এমন কৃতিত্ব দেখাইতেছে যে, ইহাদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত ইয়োরোপীয় ও অন্য বিদেশী এক্স্‌চেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলির প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও ইহারা কলিকাতার শীর্ষ-স্থানীয় ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে স্থান-লাভ করিয়াছে। আর বাঙ্গালার রাজধানী কলিকাতাতে বাঙ্গালী-প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা কিরূপ?

সর্ব্বাপেক্ষা বড় ও পুরাতন ব্যাঙ্ক বেঙ্গল ন্যাশনালের নারায়ণগঞ্জে একটি শাখা ছিল। প্রায় তিন বৎসর হইল তাহা বন্ধ হইয়াছে। এই ব্যাঙ্ক "ক্লিয়ারিং হাউসে"র সভ্য না হইলেও "সাব ক্লিয়ারিং"এর যে-কিছু সামান্য অধিকার ইহার ছিল, তাহাও প্রায় দুই বৎসর হয় বন্ধ হইয়াছে। হিন্দুস্থান ব্যাঙ্কের কোনো শাখাই নাই। পাবনা জিলার অন্তর্গত সারা-সিরাজগঞ্জ রেলওয়ের প্রায় মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত চাটমোহর নামক একটি বড় বাণিজ্য-কেন্দ্রে মহাজন ব্যাঙ্কের একটি শাখা আছে। স্থানীয় বৈশ্য মহাজনেরা ইহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু মহাজন ব্যাঙ্কের কাজের প্রসার সামান্য। মোট যে টাকা খাটিতেছে তাহা ব্যাঙ্ক-হিসাবে অতি সামান্যই বলিতে হইবে।

বাঙ্গালার রাজধানী কলিকাতাতেই বাঙ্গালীর ব্যাঙ্কের এই অবস্থা! বাঙ্গালার মফঃস্বলে ব্যাঙ্কের কাজ কিরূপ চলিতেছে সে আলোচনা বারান্তরে করিব।

শ্রীব্যাঙ্ক-গবেষক

অর্থকরী বিদ্যা ও হিন্দু-মুসলমানের মিলন

"আহ্‌মদী" মাসিকের বৈশাখ সংখ্যায় খান সাহেব আবুল হাসেম খান চৌধুরী, এম এ, "হিন্দু-মুসলমান-বিরোধ ও তাহা নিবারণের উপায়" সম্বন্ধে যেসকল কথা লিখিয়াছেন তাহা আমাদের অনেকেরই পড়িয়া দেখা উচিত।

কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

"(বিরোধের) ষষ্ঠ কারণ দেশের আর্থিক সমস্যা। দেশ ক্রমে দরিদ্র হইতে চলিয়াছে। অর্থ-উপার্জ্জনের পথ ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইতেছে। হিন্দু-মুসলমান ক্ষুধিত কুকুরের মত যৎসামান্য যে কয়েকটা অর্থসমাগমের পথ আছে, তাহা লাভ করিবার জন্য ব্যস্ত। ন্যায় হউক, অন্যায় হউক উভয় জাতিই নিজ নিজ প্রাণ-রক্ষার জন্য অন্য জাতিকে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিতেছে। তজ্জন্যই চাকরী বা কাউন্‌সিল ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালটীর কর্ত্তৃত্ব-লাভের জন্য এত ঝগড়া-বিবাদ।

"এই বিবাদ-বিসম্বাদের জন্য দায়ী কে? সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় অশিক্ষিত জনসাধারণ তাহাতে অপেক্ষাকৃত অধিক অংশ লইলেও, প্রকৃতপক্ষে উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ব্যক্তিগণই এই বিবাদের জন্য দায়ী। অশিক্ষিত জনসাধারণ তাহাদের ইঙ্গিতে চলে মাত্র। তাহারা নির্ব্বোধ, হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য। শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মতামতদ্বারা তাহাদের মতামত গঠিত হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয়, উভয় সম্প্রদায়ের অধিকতর শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে তাহাদের দায়িত্ব যথেষ্টরূপে উপলব্ধি করেন না।"

বিরোধ-নিবারণের উপায় আলোচনা করিয়া খান সাহেব বলিতেছেন :—

"এই বিরোধের জন্য হিন্দু-মুসলমান শিক্ষিত সমাজ ব্যতিরেকে সরকার বাহাদুর কতদূর দায়ী, তাহা জানিবার আবশ্যক নাই। সরকার বিদেশী, আমাদের ভালমন্দের সহিত তাঁহার কোন ঘনিষ্ট সম্বন্ধ নাই। স্বজাতির স্বার্থ উদ্ধার করা সরকারের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য। আমাদের দুঃখকষ্ট সরকার যথেষ্টরূপ অনুভব করেন না এবং করিতেও পারেন না। আপন জন না হইলে কে কাহার দরদ বুঝে?

"এখন প্রশ্ন হইতেছে, এ বিবাদ-নিবারণের উপায় কি? ইহার উত্তর—শিক্ষা এবং আন্দোলন।

"দেশে শিক্ষা বিস্তার কর। শিক্ষার সংস্কার কর। দেশের সন্তান যাহাতে দেশবাসীকে ভক্তি করিতে ও ভালবাসিতে শিখে, তাহার বন্দোবস্ত কর। পাঠ্য পুস্তক এবং সাহিত্যের পরিবর্ত্তন কর। যাহাতে হিন্দুর সন্তান মুসলমান জাতির ইতিহাস পড়িয়া তাহাদের ভারতে আগমন ভারতের সৌভাগ্য বলিয়া মনে করে, তদ্রূপ ইতিহাস লিখ। যাহাতে মুসলমান সন্তান হিন্দুর ইতিহাস পড়িয়া সে জাতিকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতে শিখে, তাহার চেষ্টা কর। নাটকে, নভেলে, সাহিত্যে স্বদেশকে এবং স্বদেশবাসীকে উজ্জ্বল রংএ অঙ্কিত কর। হিন্দু-মুসলমানের পরস্পর প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কোমলমতি বালকবালিকার সম্মুখে ধর। অবশ্য বিরোধ লোপ পাইবে, প্রীতির উদ্রেক হইবে।

"অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা দেও, পরে যেন চাকরীর জন্য উদ্‌গ্রীব হইতে না হয়। তাহাতে বিবাদের হ্রাস হইবে।"

তর্ক-প্রশ্ন

"আর্থিক উন্নতি"র প্রথম খণ্ডে "বাঙ্গালীর আথিক-স্বাধীনতা লাভের উপায়" প্রবন্ধে দেখিলাম "যদি জমিদারগণ তাহাদের জমিদারীতে জুটএজেন্‌সি বা জুটব্যাঙ্ক স্থাপিত করেন এবং খাজানার বিনিময়ে তাহারা প্রজার নিকট হইতে বাজার দরে পাট ক্রয় করেন, তাহা হইলে কৃষকদিগকে মহাজনের কবলে পড়িতে হয় না। এই পাট গুদামজাত করিয়া যদি পাটের কলে বা বিদেশে রপ্তানির ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বের ন্যায় আবার প্রতাপশালী লোক-হিতৈষী জমিদারে দেশ পূর্ণ হইতে পারিবে। অবশ্য সুদের টাকা ও অন্যান্য খরচ বাদ দিয়া যে লাভ থাকিবে তাহাই সমান ভাগে জমিদার ও প্রজা পাইবে।"

এই কথাটুকুতে কেমন একটুকু ধাঁধা লাগিয়াছে। জমিদার যদি খাজনার বিনিময়েই পাট নেয় তবে সে পাটে জমিদারেরই সম্পূর্ণ স্বত্ব বর্ত্তিল। এ অবস্থায় পরে বিক্রয়ে যে লাভ হইবে তাহার অংশ প্রজা পাইতে অধিকারী হইবে কেন? রক্ষিত পাট যদি দৈব ঘটনায় নষ্ট হইয়া যায় বা বাজার-দর কম হইয়া পড়ে ও বিক্রয়ে ক্ষতি হয়, তবে সে ক্ষতির অংশ প্রজারা বহন করিতে সুখ বোধ করিবে বলিয়া মনে হয় না। যদি প্রজা ও ভূম্যধিকারী উভয়ের মিলনে ঐরূপ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়া প্রবন্ধের লিখিতমত কার্য্য চলে, তবে সে কথা স্বতন্ত্র। এই জুট এজেন্‌সি বা ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে সহজ সরল ভাবে আলোচনা পত্রিকার ভবিষ্যৎ কোনো খণ্ডে হইলে দেশের উপকার হইবে। কথাটা ভালরূপে হৃদ্বোধ হইলে স্থানীয় জমিদারগণের সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া কতদূর কি কার্য্যে পরিণত হয় চেষ্টা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণনাথ সেন
(দিনাজপুর জমিদার-সভার সম্পাদক)

১০৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে শ্রীরঘুনাথ শীল বি, এ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
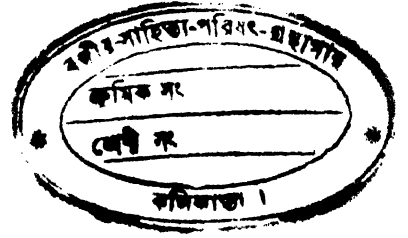
১ম বর্ষ—৪র্থ সংখ্যা

শ্রাবণ—১৩৩৩

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি॥

অথর্ব্ববেদ-১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জন্ম আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।
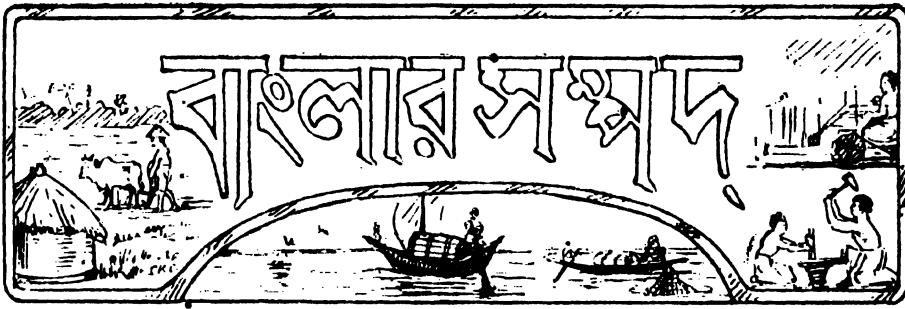
শ্রীহট্টে জুয়ার আড্ডা

"দেশবন্ধু" পত্রিকা বলিতেছেন,—

(১)

বিশ্বনাথ থানার অন্তঃপাতি জানাইয়া গ্রামে নিম্ন শ্রেণীর কয়েকজন লোক একটী জুয়া খেলার আড্ডা পূর্ণোদ্যমে চালাইয়া আসিতেছে। বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম বর্ত্তমানে জনকয়েক ভদ্র যুবক, এমন কি, কয়েকটী বালক পর্য্যন্ত এই দলে আকৃষ্ট হইয়াছে। এদিকে আমরা বিশ্বনাথের পুলিস কর্ত্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

(২)

শুনিতেছি সমসেরগঞ্জ বাজারে জুয়াখেলার একটা আড্ডা বসিয়াছে। একটা লোক নাকি খেলায় সমস্ত হারাইয়া আত্মহত্যাও করিয়াছে। সরকারী শান্তি-সেনাগণ কি এসব সংবাদ পাইতেছেন না?

মেদিনীপুরে জুয়ার আপৎ

"নীহার" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ জানা লিখিয়াছেন,—"তমলুক মহকুমার নন্দীগ্রাম থানার অন্তর্গত বিরুলিয়া ও ঘোলপুকুর গ্রামে জুয়াখেলা লইয়া এমন একটা অশান্তির সূত্রপাত হইতেছে যে, সত্বর ইহার কোনরূপ প্রতিকার না করিলে পরিণামে একটা বিষম বিভ্রাট ঘটিবে। বহু ব্যক্তি দলবদ্ধ হইয়া এই খেলার দ্বারা অবাধে অনেক নিরীহ ব্যক্তিকে প্রতারিত করিতেছে। নন্দীগ্রাম থানায় "দোনা চম্পট" নামক জুয়াখেলার লোমহর্ষণ পরিণামের কথা চিন্তা করিয়া আমরা সময় থাকিতে কর্ত্তৃপক্ষকে ইহার উপযুক্ত প্রতিকারের ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।"

এসিয়াটিক কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড্

কলিকাতার ১০১নং বাগমারী রোডে এই কারখানা অবস্থিত। বৃটিশ ফার্ম্মাকোপিয়ার এবং দেশজ গাছ-গাছড়া

হইতে যাবতীয় ঔষধ এবং ডিস্পেন্সারীর নিত্য-প্রয়োজনীয় সকল ঔষধ এখানে প্রস্তুত হয়। এই কারখানায় চা-বাগানের উপযোগী রাসায়নিক সার সুদক্ষ রাসায়নিকের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত করা হইয়া থাকে।

জলপাইগুড়ি, আসাম ও আগড়তলা প্রভৃতি স্থানের বহু চা-বাগানে এই কোম্পানী রাসায়নিক সার সরবরাহ করিয়া থাকে। চা-বাগানের মাটী পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত সারের ব্যবস্থাও দেওয়া হয়।

ঢাকায় মুচি-বিদ্যালয়

সহরের চৌধুরী বাজারে প্রায় ১২৫ ঘর মুচির বাস। তাহাদের অবস্থা অতীব শোচনীয় এবং বালক-বৃদ্ধ সকলেই নিরক্ষর। কতিপয় বৎসর হইল স্থানীয় "চৈতন্য আশ্রমে"র কর্ত্তৃপক্ষ তথায় একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে স্কুলে ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৪৩। দিন দিনই ছাত্র-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং তাহাদের মধ্যে লেখাপড়ার স্পৃহা বাড়িতেছে, ইহা অতীব সুখের কথা। মুচিদের আর্থিক, নৈতিক, ও শিক্ষা-বিষয়ক উন্নতি-সাধন বিষয়ে উপদেশ দিবার জন্য গত শুক্রবার রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর কমিশনার বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত এবং 'পঞ্চায়েৎ'-সম্পাদক মহাশয় তথায় উপস্থিত হন। "চৈতন্য আশ্রমে"র সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ব্রহ্মচারী হীরালালের উদ্যোগে তৎক্ষণাৎ মুচি-বিদ্যালয়ের সান্নিধ্যে এক অনাহুত সভার অধিবেশন হয়। প্রায় ১০০ মুচি তথায় উপস্থিত হয়। উমেশবাবু বিস্তৃতভাবে শিক্ষার উৎকর্ষ ও উপকারিতা মুচিদের বুঝাইয়া দেন। শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলে মুচিরাও অন্যান্য সম্প্রদায়ের ন্যায় উন্নত হইতে পারিবে, তাহারা যে দেশমাতৃকার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, ছেলেপিলেদের শিক্ষার বিষয়ে অনাগ্রহে মুচিগণ ধর্ম্মতঃ গর্হিত কার্য্য করিতেছে এবং ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়। মুচিদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের লক্ষণ দেখা গিয়াছে। ডন, কুস্তি ইত্যাদি ব্যায়ামাদির জন্য তথায় একটা স্থায়ী ব্যায়ামাগার-প্রতিষ্ঠায় চৈতন্য আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদিগকে আর্থিক সাহায্য করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। অনুন্নত জাতির উন্নতি-বিধানকল্পে চৈতন্য আশ্রমের কার্য্য অতীব প্রশংসনীয়।

বঙ্গে বৃত্তি-শিক্ষা

১৯২৪-২৫ সনের সরকারী শিক্ষা-বৃত্তান্তে জানা যায় যে, আইন পড়ে ৩০৭৬ হিন্দু, ৫২৬ মুসলমান এবং ৩২ অন্যান্য।

ডাক্তারী পড়ে ১৪৮৬ হিন্দু, ১৪০ মুসলমান, ৪১ দেশী খৃষ্টিয়ান, ১৫ অন্যান্য। ইহাদের মধ্যে ১২ জন ছাত্রী।

শিবপুরে এঞ্জিনীয়ারিং পড়ে ২৬৮ জন হিন্দু, ২৯ জন মুসলমান, ২২ জন ইয়োরোপীয় ও ফিরিঙ্গী, এবং ২ জন দেশী খৃষ্টিয়ান। ঢাকার আহাসানুল্লা এঞ্জিনীয়ারিং স্কুলে পড়ে ৪৩৬ জন হিন্দু, ৩৯ জন মুসলমান, এবং ৩ জন অন্যান্য।

কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট আর্টস্কুলে পড়ে ৩৪৩ জন হিন্দু, ১০ জন মুসলমান, এবং ৮জন অন্যান্য।

ব্রাহ্মণ-কায়স্থের হল-চালনা

কৃষিকার্য্যকে হেয় কার্য্য মনে করিয়া উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ অর্থাভাবহেতু নানাপ্রকার ক্লেশ ভোগ করিতেছেন। দিন দিন চাকরের অভাব এত বৃদ্ধি পাইতেছে যে, বর্ত্তমানে ভদ্র সমাজের পক্ষে পূর্ব্বসংস্কার বজায় রাখিয়া চলা দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে। ইহার প্রতিকার-কল্পে বিগত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে কিশোরগঞ্জ মহকুমার পাকুন্দিয়া থানার অধীন বিষুহাটি ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি হিন্দুগণের এক সভা হইয়া গিয়াছে। উক্ত সভায় স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, স্বহস্তে হল-চালনাদ্বারা কৃষিকার্য্য করিলে কোনও হিন্দুই আর সমাজচ্যুত হইবেন না। সভা-ভঙ্গের পর ঐ অঞ্চলের গণ্যমান্য ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের অনেকেই স্বহস্তে হল-চালনার দৃষ্টান্ত দেখান।

(ময়মনসিংহ সমাচার)

স্ত্রীশিক্ষায় হিন্দু ও মুসলমান

জামালপুরের "শান্তিবার্ত্তা" বলিতেছেন,—শিক্ষা-বিষয়ে এবং বিদ্যোৎসাহিতায় হিন্দুরা আপনাদিগকে মুসলমানদের

চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করেন; কিন্তু সাধারণ শিক্ষালয়-সকলে হিন্দু ছাত্রীর সংখ্যা ১,৩৫,২০৯ এবং মুসলমান ছাত্রীর সংখ্যা ১,৮১,০৩৬। বঙ্গে মুসলমানরাই সংখ্যায় প্রধান সম্প্রদায়। মুসলমান ছাত্রীদের সংখ্যাধিক্যের ইহা একটা কারণ। অবশ্য মুসলমান ছাত্রীদের সংখ্যাধিক্য পাঠশালাতেই বেশী; উচ্চতর বিদ্যালয়ে ও কলেজে অ-মুসলমান ছাত্রীর সংখ্যাই বেশী। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষাতেও হিন্দু বালিকাদের সংখ্যা এত কম হওয়া কুলক্ষণ। মুসলমানরা যে বালিকাদিগকে অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষাও দিতেছেন, ইহা সুলক্ষণ।

বাঙালীর শিক্ষা-ব্যবস্থা

বাংলার ডিরেক্টার অব পাবলিক ইনষ্ট্রাকশন ১৯২৪ ও ১৯২৫ সনের যে রিপোর্ট বাহির করিয়াছেন তাহা পাঠে জানা যায়, সমগ্র বঙ্গে অনুমোদিত ও অননুমোদিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৯২৪ সনে ছিল ৫৬,০০১; ১৯২৫ সনে হইয়াছে ৫৭,১৭৩; সুতরাং এক বৎসরে ১১৭২টি বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯২৫ সনে পুরুষদিগের বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪৩,৪১৫, স্ত্রীলোকদিগের ১৩,৭৫৮; কিন্তু ১৯২৪ সনে পুরুষদিগের বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৪২,৭৬১ এবং স্ত্রীলোকের ছিল ১৩,২৪০। ১৯২৫ সনে সমগ্র বাংলার ছাত্রসংখ্যা ২১,৫০,৯৪২; ১৯২৪ সনে ছিল ২০,৫৭,০৬২। অনুমোদিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৯২৪ সনে ৫৪,৬৪৯; ১৯২৫ সনে ৫৫,৮৯০। ১৯২৪ সনে অননুমোদিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৩৫২; ১৯২৫ সনে হইয়াছে ১২৮৩।

পাটের ফসল

পাট জন্মিবে বেশী কি কম, আর ভাল কি মন্দ এই সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ আলোচনা করা ইয়োরামেরিকার পাট-বেপারীদের রেওয়াজ। ভবিষ্যদ্বাণীটা কোনো সময়ে ঠিক ঠিক ফলিয়া যায়,—আবার অনেক সময়েই ঝুটা প্রমাণিত হয়। তাহার ফলে লিভারপুল, নিউ ইয়র্ক, হাম্বুর্গ, ওসাকা ইত্যাদি নগরের পাট-এক্‌স্‌চেঞ্জে চাঞ্চল্য ঘটিয়া থাকে।

বর্ত্তমান বর্ষে পাট সম্বন্ধে মেসার্স সিন্‌ক্লেয়ার মারে কোম্পানীর ওস্তাদ ব্যক্তিরা যাহা বলিয়াছেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। আলোচনা-প্রণালীটা লক্ষ করিবার বিষয়। ১২ই জুন বৃত্তান্ত বাহির হইয়াছে।

সাধারণ অবস্থা

এ বৎসর এ পর্য্যন্ত পাটের অবস্থা মোটামুটি বেশ ভালই দেখা যাইতেছে। তবে ২।১টি জেলায় আরও অধিক বৃষ্টি হওয়ার দরকার। পক্ষান্তরে উত্তরবঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলে অত্যধিক বৃষ্টি হইতেছে।

নারায়ণগঞ্জ

এখানকার আবহাওয়া বর্ত্তমানে পাটের পক্ষে বেশ সুবিধাজনকই দেখা যাইতেছে। তবে আরও কিছু বৃষ্টি হইলে ফসলের বৃদ্ধির পক্ষে ভালই হইত। বাছাই শেষ হইয়াছে, নিম্ন ভূমির পাট কাটা আরম্ভ হইয়াছে। নদীর জল গত বৎসরের এই সময়ের চেয়ে ২ ফুট নীচে আছে।

চাঁদপুর

আলোচ্য সপ্তাহে এখানকার জলবায়ুর অবস্থা খুবই আশাপ্রদ। পাটের গাছগুলি বেশ জন্মিয়াছে। গত বৎসরের চেয়ে এ বৎসর গড়পড়তা প্রতি একরে অধিক পাট উৎপন্ন হইয়াছে। অল্পস্বল্প পাট কাটা আরম্ভ হইয়াছে।

আখাউড়া

আবহাওয়া গরম ও শুষ্ক। তাহা হইলেও পাট গাছের তেমন ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু আরও বৃষ্টি চাই। নদীর জল ৪ ফুট ৯ ইঞ্চি। গত বৎসর এই সময় নদীর জল ছিল ১০ ফুট ২ ইঞ্চি।

চৌমোহানী

পাটের বৃদ্ধির পক্ষে জলবায়ু বেশ আশাপ্রদ। পাট পচাইবার জলের অভাবে তেমন জোরের সহিত পাট-কাটা আরম্ভ হয় নাই।

ময়মনসিংহ

আলোচ্য সপ্তাহে এখানকার জলবায়ুর অবস্থা অত্যন্ত আশাপ্রদ। সময়মত রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতেছে। পাটগাছগুলি বেশ সতেজ দেখাইতেছে এবং লম্বায় দুই হাত আড়াই হাত

হইতে চার হাত সাড়ে চার হাত হইয়া পড়িয়াছে। নদীর জল ধীরে ধীরে বাড়িতেছে, কিন্তু গত বৎসরের চেয়ে নদীর জল এবার এখনও নীচেই আছে।

নিকলীদামপাড়া

জলবায়ু বেশ আশাপ্রদ। নীচু জমির পাটগাছে ফুল ধরিতেছে, কিন্তু কাটা তেমন জোরের সঙ্গে আরম্ভ হয় নাই, কারণ নদীর জল তেমন বৃদ্ধি পায় নাই। নদীর জল পৌণে একহাত বাড়িয়াছে, তাহা হইলেও গত বৎসর অপেক্ষা দুই হাত এখনও কম আছে।

মাদারীপুর

জলবায়ু সন্তোষজনক। পাটগাছের বৃদ্ধি বেশ আশাপ্রদ। বাছাই শেষ হইয়াছে। নদীর জল ধীরে ধীরে বাড়িতেছে। গত বৎসরের চেয়ে পৌণে দুই হাত এখনও কম আছে।

উত্তরবঙ্গ

শিলিগুড়ি ও হলদীবাড়ী অঞ্চলের আবহাওয়া অত্যন্ত আশাপ্রদ। কিন্তু ডোমার ও দারোয়াসী অঞ্চলে অত্যধিক বৃষ্টিপাত হওয়ার দরুণ দেরীতে বুনা ফসলের পক্ষে বিঘ্ন জন্মিতেছে। কয়েকদিন রৌদ্র হইলে ফসলের বেশ উপকার হয়।

এ বৎসর ষোলআনা পাটই পাওয়া যাইবে, এরূপ আশা করা যায়।

"তাঞ্জিম" আন্দোলনে দান

"ফ্রী প্রেস অব্ ইণ্ডিয়া" নামক সংবাদ-সংগ্রাহক কোম্পানী ১০ই জুন তারিখে খবর দিয়াছেন যে, ডাঃ কিচলুর চট্টগ্রাম-পরিদর্শনের ফলে সেখানকার অধিবাসিগণ বঙ্গীয় "তাঞ্জিম আন্দোলনে" ২৫,০০০৲ টাকা প্রদান করিতেছেন। ইতিমধ্যে ডাঃ কিচলুর হস্তে উক্ত অর্থের মধ্যে ২০০০৲ টাকা প্রদান করা হইয়াছে।

পচা পুকুরের দৌরাত্ম্য

যেরূপ দেখিতেছি,—এই তথাকথিত "সুজলা সুফলা" বঙ্গভূমির নরনারী মারা পড়িবে এক মাত্র জলেরই অভাবে। "ত্রিপুরা-হিতৈষী"তে নিম্নের যে বিবরণ পাইতেছি তাহা বাংলাদেশের সকল অঞ্চল সম্বন্ধেই প্রায় সমান খাটে।

লাকশ্যাম থানার অন্তর্গত মুদাফরগঞ্জ একটী বিখ্যাত স্থান। এইখানে একটী বৃহৎ বাজার কোর্ট অব ওয়ার্ডস কাছারী, পোষ্ট অফিস, স্কুল, ডাকবাংলা ইত্যাদি আছে। তাই প্রত্যহই এই স্থানে বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এখানে পানীয় জলের অবস্থা শোচনীয়। উক্ত বাজারের সঙ্গেই ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের একটী পুকুর আছে। সেই পুকুরটীর অবস্থা যে কি ভয়াবহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা প্রত্যক্ষদর্শী ব্যতীত কেহই বুঝিতে পারিবে না। সামান্য লাভের আশায় পুকুরটীকে স্থানীয় কোনও লোকের নিকট ইজারা দেওয়া হইয়াছে। কাজেই ইজারাদার ভিন্ন ঐ পুকুরের উপর কাহারও কোনো প্রতিপত্তি খাটে না বলিয়া কেহই তাহার তত্ত্বাবধান করিতে সাহস করে না। পুকুরটী কচুরী পানায় এরূপ ভাবে পরিপূর্ণ হইয়াছে যে, তাহার ভিতরে একটী হাত পর্য্যন্ত প্রবেশ করান যায় না। স্থানে স্থানে পানা পচিয়া যাওয়ায় জলে ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ হইয়াছে। উহাতে ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি হইয়াছে।

গো-মড়ক

চৌয়াল্লিশ পরগণার স্থানে স্থানে ভীষণ ভাবে গো-মড়ক দেখা দিয়াছে। বহু লোকের গো-শালা গোশূন্য হইয়াছে। ফলে কৃষিকার্য্যে নিতান্ত বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে। কোনাগাঁও এবং অন্যান্য স্থান হইতে মৌলবী বাজারের পশু ডাক্তারকে আসিবার জন্য বার বার লিখা সত্ত্বেও তিনি পদার্পণ করেন নাই। ("দেশবন্ধু", শ্রীহট্ট)।

কচুরীপানা ও যুবক বাংলা

বিগত ১৮।১৯।২০শে জ্যৈষ্ঠ চণ্ডীপুর ম্যালেরিয়া-নিবারণী সমিতির উদ্যোক্তারা চণ্ডীপুর সীমানার খাল, বিল ও পুষ্করিণী প্রভৃতির অধিকাংশ স্থানের কচুরীপানা তুলিয়া ফেলিয়া ঐগুলি পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। চণ্ডীপুর যুবক-সঙ্ঘের এই আদর্শ নোয়াখালীর বিভিন্ন অঞ্চল অনুকরণ করিলে দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে সন্দেহ নাই। ("দেশের বাণী")

সন্দ্বীপে জলের ফিল্টার

"দেশের বাণী" খবর দিতেছেন যে, সন্দ্বীপ টাউনে পানীয় জলের অভাব দূরীকরণার্থ সন্দ্বীপের সাবডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট সরকারের অনুমোদনক্রমে এক জলের পাইপ টাউনের দীঘির পূর্ব্ব পাড়ে বসাইয়াছেন। তাহাতে জল বিশুদ্ধ করা হয়। টাউনবাসিগণ ঐ জল ব্যবহার করিতেছেন। ইহাতে টাউনবাসীর আর্থিক ক্ষতি হইলেও পানীয় জলের যে সুবন্দোবস্ত হইল তাহাতে সন্দেহ নাই।

দুধ দুর্ম্মূল্য কেন

আজকাল সর্ব্বত্রই দুধের দাম অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। দরিদ্রদের কথা দূরে থাকুক, মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণের ও দুগ্ধপোষ্য শিশু-সন্তানদিগকে দু'ফোঁটা দুধের অভাবে বাঁচাইয়া রাখা দায় হইয়াছে। বাংলার সর্ব্বত্রই এই হাহাকার। গো-পালনে অনাদর এবং গো-মড়কই যে ইহার প্রধান কারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু সাপ্তাহিক "বরিশাল" বলিতেছেন,—সে সকল সত্ত্বেও দুধ এত মহার্ঘ্য হইতে পারিত না যদি মিঠাই-মণ্ডার দোকানগুলি প্রতিদিন ভারে ভারে বহুশত মণ দুগ্ধ শোষণ না করিত। প্রত্যেক সহরে যে পরিমাণ দুগ্ধ গৃহস্থগণ ক্রয় করে তাহার দশ বারোগুণ দুধ কয়েক খানি মাত্র মিঠাইয়ের দোকানেই কাট্‌তি হয়। তারপরে যেখানে অপেক্ষাকৃত সামান্য একটু সস্তা, সেখানকার দুধ ছানা হইয়া ভারে ভারে নিকট কিংবা দূরবর্ত্তী স্থানের মিঠাইয়ের দোকানেই চালান হয়। সন্দেশ রসগোল্লাই হইয়াছে দুধের শনি। এই সব খাদ্যের বিলাসিতা কমাইয়া দিলে শিশু-সন্তানগুলির মুখে তবু দু'ফোঁটা দুধ দেওয়া সহজ হইতে পারে।

দুগ্ধবিক্রেতাদের আয়

বরিশাল সহরে যে সকল দুধওয়ালা দুগ্ধ বিক্রয় করিতে আসে, তাহারা গ্রাম হইতে সস্তায় দুধ কিনিয়া সহরে অধিক মূল্যে বিক্রয়দ্বারা লাভ করে। ইহাই তাহাদের একমাত্র উপজীবিকা। আজকাল সহরে দুধের সের সাধারণতঃ দশ-পয়সা হইতে ছয় আনা পর্য্যন্ত উঠে। কিন্তু ইহারা ৩৸৹ মণ হিসাবে বাঁধা দরে গ্রাম হইতে দুধ ক্রয় করিয়া আনে। এইরূপে ছয় পয়সার দুধ তাহারা ছয় আনা পর্য্যন্ত কোনো কোনো দিন বিক্রয় করিয়া থাকে। যে সব দিনে বিবাহ, শ্রাদ্ধ কি পূজা-পার্ব্বণ প্রভৃতির যোগ থাকে সেইসব দিনই দুধের দাম অসম্ভব রকমে চড়িয়া যায়। এক দুধওয়ালাকে সে দিন তাহার আয়ের কথা জিজ্ঞাসা করায় বলিল, 'বাবু দিনের শেষে টাকাটা লাভ কেহ ঠেকাইতে পারে না। তবে প্রায়-ই দেড় টাকা, দুই টাকা লাভ হইয়া থাকে। তিন-চারি টাকাও কোনো কোনো দিন হয়।" অর্থাৎ একজন দুগ্ধ-বিক্রেতার খুব কমপক্ষে মাসিক আয় ত্রিশ টাকা, সাধারণতঃ সে গড়ে পয়তাল্লিশ হইতে পঞ্চাশ টাকা আয় করে। ("বরিশাল")

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

ইহার সভ্য-সংখ্যা ১০৯ হইতে ১২২, অংশ ৪·৫৭ লাখ হইতে ৫·৪৮ লাখ, রিজার্ভ ও অন্যান্য ফাণ্ড ১·০৩ হইতে ১·১৩ লাখ এবং খাটানো মূলধন ৩৬·৭৭ হইতে ৬১·২০ লাখ পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে। অন্তর্গত সমিতিগুলিকে এই ব্যাঙ্ক দরকার মত টাকা ধার দিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে (১৯২৫) ২·৪১ ক্রোর টাকা ইহার হাতে ঘোরা-ফেরা করিয়াছে এবং ইহার লাভ হইয়াছে ৬৯,৬৪৬ টাকা।

ম্যালেরিয়া-সমিতি

কলিকাতা কেন্দ্রীয় কো-অপারেটিভ্ ম্যালেরিয়া-নিবারক সমিতি লিমিটেড।—১৯২৫ সনে এই বিভাগের আয়তন বাড়িয়াছে। ২৪ পরগণা জেলায় ম্যালেরিয়া-নিবারক সমিতিগুলি স্থানীয় চাঁদা প্রভৃতির সাহায্যে এবং কেন্দ্রীয় নিবারক সমিতির অগ্রিম দানের বলে অনেক স্থলে পানীয় জল সরবরাহ করিবার জন্য নল-কূপ বসাইয়াছে। খরচ যাহা পড়িয়াছে, তাহা বেশী নহে। এই বিভাগের কাজ বাড়িলে পল্লীগ্রামে জল-সরবরাহ-সমস্যার অনেকটা মীমাংসা হইতে পারিবে।

ভারতীয় শহর ও ব্যাঙ্ক

ভারতে ৭৩৮টা মাত্র শহরে ১০,০০০ বা তাহার চেয়ে বেশী লোক বাস করে। তাহা ছাড়া আছে ১,৫৭৮টা শহর। এই সমুদয়ে লোক-সংখ্যা দশ হাজারের কম। এই ২,৩১৬টা শহরের মধ্যে মাত্র ২৫০টায় "আধুনিক" প্রণালীর ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান চলিতেছে।

ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কের শাখা

আইন অনুসারে ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্ক মাত্র ১০০টা শাখা কায়েম করিতে অধিকারী। এই বৎসর শাখা-সংখ্যা পূর্ণ হইয়াছে। এই সংখ্যার ভিতর ৫৪টা এমন সব শহরে অবস্থিত যেখানে পূর্ব্বে কোনো প্রকার আধুনিক ব্যাঙ্ক ছিল না।

ভারতে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক

গত বৎসর গোটা ভারতে ৫০ কোটি টাকা বিভিন্ন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে জমা হইয়াছিল। সাত বৎসর পূর্ব্বে এই সংখ্যা ছিল মাত্র ১৪ কোটি।

পাটনায় পল্লীপথ

"ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" সূত্রটার ভিতর মান্ধাতার আমল বিরাজ করে বটে; কিন্তু "আধুনিকতার" লক্ষণ হিসাবেও এই বয়েৎ চলে মন্দ নয়। পাটনার জেলা বোর্ড জেলার ভিতরকার পল্লীপথগুলা মেরামত করিতেছেন। বলা বাহুল্য, টাকার অভাব। টাকা পাওয়া যাইবে কোথায়? লও কর্জ্জ। চার লাখ টাকা তোলা হইতেছে। সুদ দেওয়া হইবে বার্ষিক ৪৲ হিসাবে। বর্ত্তমান জগতের এই ধার-লওয়ার নীতি ভারতে এখনো বড় বেশী বিস্তারলাভ করে নাই।

মান্দ্রাজের মিউনিসিপ্যালিটি

১৯২৪-২৫ সনের মান্দ্রাজী মিউনিসিপ্যালিটিগুলার কর ভাল আদায় হয় নাই। বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত ১৬৷৷০ লক্ষ টাকা কর অনাদায় রহিয়াছে। গত বৎসর উহার পরিমাণ ছিল ১৪ লক্ষ টাকা। ৮০টি মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে মাত্র ৫টি মিউনিসিপ্যালিটির হিসাবপত্র সন্তোষজনক।

বড়োদায় নারী-শিল্পাশ্রম

নবসরাইতে একটি নারী-শিল্পাশ্রম এবং পাঠাগার নির্ম্মিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের নাম হইবে "মহারাণী চীরাবাই বনিতা বিশ্রাম।"

এই প্রতিষ্ঠানের জন্য শ্রীমতী রতনভাই রামজী ২৫,০০০ টাকা দান করিয়াছিলেন। ঐ দান হইতেই এই প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত। বড়োদার শিক্ষাবিভাগ, গৃহনির্ম্মাণের জন্য ৯০০ টাকা করিয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। বড়োদার দেওয়ান স্যার মনুভাই মেতা এবং নবসরাইর ব্যবসায়ি-সমিতি এই প্রতিষ্ঠানের জন্য এক হাজার টাকা করিয়া দান করিয়াছেন।

ভারতে বিলাতী পুঁজি

১৯২৫ সনে ইংরেজ জাতি ৩৫ লাখ পাউণ্ড (প্রায় ৫ ক্রোর টাকা) ভারতীয় কারবারে লাগাইয়াছে। এই টাকার প্রায় আটাশ গুণ অর্থাৎ ১৪০ কোটি টাকা সেই বৎসর ইংল্যণ্ড হইতে দুনিয়ার নানা দেশে ধার দেওয়া হইয়াছে। বুঝিতে হইবে যে, ভারতের বাহিরেও বিলাতের

অতি-বৃহৎ আর্থিক কর্ম্মক্ষেত্র রহিয়াছে। এই ১৪০ কোটির প্রায় দশ আনা অংশ অর্থাৎ প্রায় ৯২ ক্রোর গিয়াছিল ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা ইত্যাদি দেশে। অর্থাৎ ইংরেজের টাকা বৃটিশ সাম্রাজ্যের উপনিবেশগুলায় যত খাটিয়াছিল তাহার প্রায় ১৮ ভাগের এক ভাগ মাত্র আসিয়াছিল ভারতে।

পাটনায় সরকারী দিয়াশলাইয়ের কারখানা

উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক উপায়ে দিয়াশলাই সম্পর্কীয় শিল্পের উন্নতিসাধন-অভিপ্রায়ে এবং শিক্ষার্থীদিগকে ঐ শিল্প-সম্বন্ধে হাতে-কলমে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে বিহার-উড়িষ্যার গবর্মেণ্ট মাসাধিক কাল হইল পাটনা শহরে একটী আদর্শ দিয়াশলাইয়ের কারখানার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কারখানা-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে যেসকল প্রাথমিক বাধা-বিঘ্ন ছিল তাহা দূরীভূত হইয়াছে এবং কারখানার কাজ বেশ ভাল চলিতেছে। এখন কারখানায় প্রত্যহ ১৩০ গ্রোস দিয়াশলাই প্রস্তুত হইতেছে এবং আরম্ভ-কাল হইতে এ পয্যন্ত ৪ হাজার গ্রোস দিয়াশলাই প্রস্তুত হইয়াছে।

ভারতীয় নৌ-বহরে খরচ ৭০ লাখ

গত ৮ই মার্চ বিলাতে পার্ল্যামেণ্টের কমন্স সভায় শ্রমিক সদস্য মিঃ সিসিল উইলসন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—ভারতে নৌ-বহর প্রতিষ্ঠা হইবে বলিয়া যে লর্ড রেডিং ঘোষণা করিয়াছেন, তাহার জন্য খরচ কত পড়িবে এবং সে খরচ যোগাইবেই বা কে? উত্তরে ভারতের আণ্ডার সেক্রেটারী লর্ড উইণ্টারটন বলিয়াছেন, ভারতে নৌ-বহর নির্ম্মাণে খরচ পড়িবে ষাট লক্ষ হইতে সত্তর লক্ষ টাকার মধ্যে এবং ভারতের রাজস্ব হইতেই এই টাকা সরবরাহ করা হইবে।

বাল্য-বিবাহ বন্ধ

কোলাপুরের মহারাজা তাঁহার রাজ্যে বাল্য-বিবাহ বন্ধ করিবার জন্য আইন করিয়া দিয়াছেন। যে অভিভাবক তাঁহার দশ বৎসরের কন্যা ও ১৪ বৎসরের পুত্রের বিবাহ দিবেন তিনিই উর্দ্ধ সংখ্যায় ২০০৲ টাকা জরিমানা দিবেন। এইরূপ বিবাহের সাহায্যকারীরও ২০০৲ টাকা জরিমানা হইবে।

টাটা অয়েল মিল

বোম্বাইয়ের ৬ই জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ—টাটা অয়েল মিলসমূহের গত বৎসরের কার্য্য-বিবরণীতে দেখা যায় যে, ৩০লক্ষ ২২ হাজার টাকা লোকসান হইয়াছে।

২,০০০ ক্রোর টাকার ফসল

ভারতে প্রতি বৎসর যত ফসল উঠে তাহার মোট কিম্মৎ হইবে প্রায় ২,০০০ ক্রোর টাকা। উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীর চাষ কায়েম করিবার ফলে ফসলের কিম্মৎ কিছু বাড়িয়াছে। এই বাড়্তির পরিমাণ হইবে প্রায় ৩০ কোটি টাকা।

গুজরাটে খাদি বিক্রয়

গুজরাট প্রাদেশিক কংগ্রেস খাদিভাণ্ডারের একটি রিপোর্টে প্রকাশ যে, তথায় উৎপন্ন খাদির পরিমাণ ও বিক্রয় ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯২৩ সনের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯২৪ সনের আগষ্ট পর্য্যন্ত উক্ত ভাণ্ডারে মোট ১ লক্ষ ৪০ হাজার ৯৪ টাকা ২ আনা ৬ পাইয়ের খাদি বিক্রয় হয়। ১৯২৪ সনের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯২৫ সনের আগষ্ট পর্য্যন্ত বিক্রয়ের পরিমাণ ১৬৬৩০৭৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে। আর ১৯২৫ সনের সেপ্টেম্বর হইতে মে পর্য্যন্ত ৯ মাসে মোট ৯৫০৫৩৮।৫ পাইয়ের খাদি বিক্রয় হয়। উক্ত ভাণ্ডারে উৎপন্ন খাদির মূল্যও ক্রমশঃ কমিতেছে।

নাসিক জেলায় ব্ল্যাকষ্টোন কল

বোম্বাই প্রদেশের সমবায় সমিতির রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত জে, এস্, ম্যাডান, আই, সি, এস মহোদয় সম্প্রতি নাসিক জেলার নন্দ্গাঁও নামক স্থানে তুলা হইতে বীজ ছাড়াইবার জন্য একটী সমবায় সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। এই সমিতি বিগত অক্টোবর মাসে আরম্ভ করা হইয়াছে।

এই কোম্পানীর জন্য ইতিমধ্যেই একশত সভ্যের নিকট হইতে প্রায় পনের হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। উক্ত কার্য্যের জন্য চল্লিশ হাজার টাকা খরচ করিয়া আশী অশ্ব-শক্তির একটী ব্ল্যাকষ্টোন কল ক্রয় করা হইয়াছে, কাজও আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

বোম্বাই কো-অপারেটিভ্ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক টাকা দিয়া উক্ত সমিতিকে সাহায্য করিতেছেন।

যুক্তপ্রদেশে রেশমের কারখানা

হাতোয়া তাঁতের কেন্দ্রস্থল সাজাহানপুরে এ বৎসর দুইটি নূতন কারখানা খোলা হইয়াছে। বরবাদ রেশম বুনিবার জন্য আলমোরাতে আরো দুইটি কারখানা খোলা হইয়াছে। কাশীতে দুইটি কারখানা পূর্ব্বেই ছিল, আর একটী কারখানা নূতন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; বৈদ্যুতিক-শক্তি-চালিত কারখানার কেন্দ্র কাশী।

দ্বারকা বন্দর

বড়োদার মহারাজা বাহাদুর ফেব্রুয়ারি মাসের ২২শে তারিখে দ্বারকা বন্দরের উদ্বোধন-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। বড়োদা রাজ্য ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া এই বন্দর নির্ম্মাণ করিয়াছে। এই বন্দরে ৪০০ ফুট লম্বা ঘাট আছে। ইহার দুই প্রান্তে দুই খানা জাহাজ থাকিতে পারে। ভবিষ্যতে জাহাজ বান্ধিবার স্থান আরও প্রশস্ত করা হইবে। দ্বারকাতীর্থ-যাত্রীদের ইহাতে বিশেষ সুবিধা হইবে। কাথিয়ার, গুজরাট, রাজপুতনা প্রভৃতি অঞ্চলে এখন হইতে সহজে মাল-পত্র আমদানি-রপ্তানি হইবে। বন্দর খোলার সময় "সিন্ধিয়া ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানী"র ২ খানা জাহাজ "জলজ্যোতি" ও "সরস্বতী" ঘাটে লাগিয়া মালপত্র উঠাইতে আরম্ভ করিল। দেশীয় রাজ্যে এই প্রথম বন্দর-স্থাপন। ইহাতে স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হইবে।

ইংরেজের ধর্ম্মঘটে ভারতীয় দান

জামসেদপুর শ্রমিক সমিতি নিখিল ভারত ট্রেড্ ইউনিয়ন্ কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারীর নিকট ১০ পাউণ্ড প্রেরণ করিয়াছেন। উহা বিলাতে কয়লা খনির ধর্ম্মঘটকারী কর্ম্মচারীদিগের সাহায্যার্থ প্রেরিত হইবে।

মান্দ্রাজের সমবায়-ব্যাঙ্ক

মান্দ্রাজের জেলায় জেলায় ৩২টা কেন্দ্র-ব্যাঙ্ক চলিতেছে সমবায়ের নিয়মে। এইগুলার মাথায় আছে দুইটা প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক মান্দ্রাজ শহরে। এই ব্যাঙ্ক দুইটার সমবেত মূলধন প্রায় ৪৷৷০ কোটি টাকা। ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্ক এইসকল সমবায়-ব্যাঙ্কের মুরুব্বি দাঁড়াইয়া থাকে। ১৯২৪-২৫ সনে প্রায় ৪৭ লাখ টাকা এই সরকারী ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ধারস্বরূপ পাওয়া গিয়াছিল।

"সমবেত" ঘরবাড়ী তৈয়ারী

১৯২৪-২৫ সনে মান্দ্রাজ প্রদেশে ৩৩৭টা ঘরবাড়ী তৈয়ারী হইয়াছিল "সমবেত রূপে"। ৭৮টা সমিতি এই কাজের জন্য দায়ী। প্রায় লাখ চারেক টাকা উঠিয়াছিল সভ্যগণের নিকট হইতে চাঁদা হিসাবে। ঘরগুলা তৈয়ারী করিতে লাগিয়াছিল ১০,৫২,০০০ টাকা। বাংলা দেশে সমবায়ের নিয়মে কোনো ঘরবাড়ী তৈয়ারী হইতেছে কি?

কাঠিয়াওয়ারের লবণ

বাংলা দেশে যে লবণ আসে তাহার বেশীর ভাগ এডেন ও পোর্ট সৈয়দে জন্মিয়া থাকে। সম্প্রতি কাঠিয়াওয়ারে লবণ তৈয়ারীর কারখানা বসিয়াছে। কিন্তু পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়ায় তাহা বঙ্গদেশে আসে না। বিশেষতঃ, যে সব জাহাজে বোম্বাই হইয়া লবণ চট্টগ্রামে ও কলিকাতা বন্দরে আসিবে, ফিরিবার সময় যদি তাহারা মাল লইয়া ফিরিতে না পারে তবে প্রতিযোগিতায় কাঠিয়াওয়ার টিকিতে পারিবে না। বোম্বে চেম্বার সে জন্য গভর্মেণ্টের নিকট সাহায্য চাহিয়াছেন।

বাণিজ্যে অদল-বদল সমস্যা

একজন বিশেষজ্ঞ বলিতেছেন যে, বাঙ্গালা হইতে কয়লা

নেওয়ার বন্দোবস্ত করিলে সরকারী সাহায্য ছাড়া ও কাঠিয়া-ওয়ারের লবণ এই দেশে চালান দেওয়া যায়। এই সম্বন্ধে অনেক আলোচনা চলিতেছে। "বাণিজ্য বার্ত্তা" বলিতেছেন —অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় লবণেই ভারতবর্ষের চলিবে, তজ্জন্য লিবারপুলে বা এডেনে যাইতে হইবে না। কিন্তু চট্টগ্রামে কয়লা পাওয়া যায় না। তথা হইতে পাট, কার্পাস, চা, কাঠ, বোম্বের সওদাগরেরা গ্রহণ করিলে এই দেশের অসুবিধাও দূর হইতে পারে।

গত সনের রপ্তানি

১৯২৪-২৫ সনে ভারতে চাউল ফলিয়াছিল ৩ কোটি ১১ লাখ টন। তাহার ভিতর ২৩ লাখ টন অর্থাৎ প্রায় ১৪ ভাগের এক ভাগ মাত্র বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল।

গম উৎপন্ন হইয়াছিল ৮৭ লাখ টন। তাহার প্রায় অষ্টমাংশ (১১ লাখ টন) বিদেশে গিয়াছিল।

তেলের বীজ জন্মিয়াছিল ৩৭ লাখ টন। ইহার ভিতর হইতে বিদেশে রপ্তানি হয় ১৩ লাখ টন।

সস্তায় কাঁচা রেশম

১৯২৪-২৫ সনে রেশম-সূত্রের দরে সহসা অভূতপূর্ব্ব পতন পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ২৮০-২ নম্বরের বোনা সূতার দর প্রতি গাঁটে ১৯৫৲ টাকা হইতে ১৪০৲ টাকায় নামিয়া গিয়াছিল ; ৩৬-২ নম্বরের বরবাদ রেশমের দাম গাঁট প্রতি ৪১৲ টাকার পরিবর্ত্তে ২৭৲ টাকা হইয়াছিল। সর্ব্বত্র এইরূপ পড়তি হইয়াছিল।

কাঁচা মাল বনাম পাকা মাল

কাঁচা মালের দরে এতটা পড়তি, সুতরাং এই বৎসর বয়ন-শিল্পের প্রভূত উন্নতি করিবার কথা ছিল। কিন্তু বাস্তবিক তাহা হয় নাই দুইটা কারণে :—(১) রেশম-শিল্প বয়নের দিক্ দিয়া সুপ্রতিষ্ঠ বটে, কিন্তু বিক্রয়-ব্যবস্থার হিসাবে মোটেই দস্তুর-মাফিক নহে। রেশম-শিল্পের চাহিদা সকল সময়ে সমান থাকে না। বৎসরের প্রারম্ভে ওয়েম্বিতে অতি-মাত্রায় বিক্রয় বাড়িয়াছিল, কিন্তু অবশিষ্ট সময়ে চাহিদা মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। (২) বহুল পরিমাণে অল্প দরের বিদেশী রেশম ও পঞ্জাব রেশমের আমদানি হইয়াছিল।

সমবায়-সমিতির দোষগুণ

যুক্ত প্রদেশের সমবায় সমিতিগুলা অনেক সময়ে মামুলি মহাজনী ছাড়া অন্য ব্যবসা করে না। সমিতির কাজকর্ম্মের যথোচিত তদবির করা হয় না। সমবায়-তত্ত্ব হজম করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভবপর হয় নাই। এই মত প্রচারিত হইয়াছে সমবায়-সমিতি-বিষয়ক তদন্ত-কমিটির রিপোর্টে।

গয়ায় কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী

স্থানীয় ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড একটী কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়াছিলেন। প্রদর্শনী ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড-ভবনে ও তৎসংলগ্ন ময়দানে খোলা হয়। ১২ই জুন পর্য্যন্ত প্রদর্শনী খোলা ছিল। কৃষি-বিভাগে জেলার কৃষি-সম্বন্ধীয় নানা জিনিষ দেখান হইয়াছে। চাষের জন্য পুরাতন ও আধুনিক লাঙ্গল এবং অন্যান্য কল, কীট-পতঙ্গ-যাহাদ্বারা শস্যের হানি হয়, নানা প্রকারের সার, পশু ইত্যাদি সমস্ত জিনিষই প্রদর্শিত হইয়াছিল। কীট-পতঙ্গ হইতে শস্য রক্ষা করিবার উপায় এবং বিবিধ রোগ হইতে পশুদিগকে রক্ষা করিবার উপায় প্রদর্শনীতে দেখান হইয়াছে। কম্বল ও তাহা প্রস্তুত করিবার প্রণালী, তসর, হাতে-কাটা সূতা, কাপড়, কার্পেট, মাটি, পাথর, ধাতু-নির্ম্মিত দ্রব্যাদি, অভ্র ও অন্যান্য খনিজ দ্রব্যাদি শিল্প প্রদর্শনীতে ছিল।

আমেরিকায় কম মেহনতে বেশী মাল

মাকিণ মুল্লুকে মজুর আর শিল্প-দক্ষদের কর্ম্মশক্তি দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। এক জন লোক কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ফী ঘণ্টায় যতখানি কাজ করিতে পারিত, আজকাল তাহার চেয়ে বেশী কাজ করিতেছে। ১৯১৪ সনের তুলনায় ১৯২৩ সনে আমেরিকার ধনোৎপাদন মজুর প্রতি শতকরা ৩৩ অংশ বাড়িয়া গিয়াছে। আর একটা মজার কথা এই যে, ১৯১৪ সনে আমেরিকার কারখানায় কারখানায় কোনো পরিমাণ মাল তৈয়ারী করিতে মানুষের মেহনৎ যত লাগিত, ১৯২৩ সনে তাহার চারি ভাগের তিন ভাগ মাত্র লাগিয়াছে। অর্থাৎ লোক খাটিয়াছে গুণতিতে কম, কিন্তু মাল উৎপন্ন হইয়াছে পরিমাণে বেশী।

ইয়াঙ্কিস্থানের এই আর্থিক কাণ্ডে কোন্ যাদু কাজ করিয়াছে? এই যাদু ত্রিবিধ। প্রথমতঃ, আমেরিকায় বিজলী, গ্যাস ও বাষ্প কায়েম হইয়াছে বেশী। দ্বিতীয়তঃ, যন্ত্রপাতির রেওয়াজ বাড়িয়াছে প্রচুর পরিমাণে। আর তৃতীয়তঃ, কর্ম্মকৌশল, কারখানা-শাসন এবং কর্ম্মকর্ত্তার তদবির যথেষ্ট উন্নতি-লাভ করিয়াছে।

ফ্রান্সে কয়লার বাড়তি

১৯২৫ সনে ৩,৬৫৩,৭০২ টন কয়লা ফ্রান্সের সকল খাদ হইতে উঠিয়াছে। ১৯২৪ সনের তুলনায় এই পরিমাণ ৩০ লাখ টন বেশী। আর প্রাক্-যুদ্ধ যুগের তুলনায় ইহা ৮০ লাখ টন বেশী।

এমন কি, নর্ এবং পা দ' কালে নামক দুই জেলার খাদ হইতেও ১৯১৩ সনের তুলনায় এই বৎসর ১০ লাখ টন বেশী উঠিয়াছে। যুদ্ধের সময় এই দুই জেলার খনি-সমূহ একপ্রকার ধ্বংসই হইয়াছিল।

অশুল্ক জাহাজী মাল

গবর্মেণ্ট যদি শিল্প-বাণিজ্যের মা-বাপ হয় তাহা হইলে "পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং।" মুসোলিনির ইতালিতে ও এইরূপেই অসম্ভবও সম্ভব হইতেছে। ইতালিয়ান জাত জাহাজ-সম্পদে দরিদ্র। দেশটাকে এই দিকে বড় করিয়া তুলিবার জন্য মুসোলিনির আমলে গবর্মেণ্ট প্রাণপাত করিতেছেন।

সম্প্রতি একটা নতুন শুল্ক-আইন জারি হইয়াছে। তাহার বিধানে জাহাজ তৈয়ারী করিবার জন্য যেসকল মাল বিদেশ হইতে ইতালিতে আমদানি হইবে তাহার উপর কোনো শুল্ক বসানো হইবে না। এই রেহাই বাবদ ইতালিয়ান সরকার ৬৮৪,০০০,০০০ লিয়ার (প্রায় ৯ কোটি টাকা) গচ্চা দিতে প্রস্তুত।

আইনটা নিম্নরূপ। ১,০০০ টনের চেয়ে বড় যেসব জাহাজ সেইগুলার জন্য টন প্রতি ৪৮০ কিলোগ্রাম (১২ মণ) লোহালক্কড়, কাঠ ইত্যাদি বিনা শুল্কে আমদানি হইতে পারিবে। আর যে সকল জাহাজ ১,০০০ টনের চেয়ে ছোট তাহার জন্য টন প্রতি ৫৮০ কিলো (প্রায় ৯ মণ) মাল বিনা শুল্কে আসিবে।

এইখানেই খতম নয়। জাহাজ-কারখানাগুলাকে নগদ অর্থ-সাহায্য করিবার ব্যবস্থাও আছে। অধিকন্তু, জাহাজ তৈয়ারী করিবার জন্য মালপত্র যদি বিদেশে না কিনিয়া স্বদেশেই খরিদ করা হয় তাহা হইলে অর্থ-সাহায্যের

মাত্রা বাড়াইয়া দেওয়া হইবে। মুসোলিনি-রাজ এইরূপ বিধান করিয়াছেন।

অষ্ট্রেলিয়ার শুল্ক-নীতি

অষ্ট্রেলিয়ার গবর্মেণ্ট বিলাতী মাল আমদানি করিবার জন্য "পক্ষপাত"-মূলক শুল্ক-নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। অর্থাৎ অন্যান্য বিদেশী মালের উপর যে হারে শুল্ক বসানো হয়, বিলাতী মালের উপর তাহার চেয়ে কম হারে বসানো হইয়া থাকে। ১৯০৯-১১ সনের ব্যবস্থায় ২৩১টা জিনিষ সম্বন্ধে এই নিয়ম খাটিত। ১৯২৫-২৬ সনের শুল্ক-বিধিতে জিনিষগুলার সংখ্যা ৫৭৭।

আগেকার নিয়মে শতকরা ৫৲ টাকা পর্য্যন্ত "পক্ষপাতের" শেষ সীমা ছিল। এই সীমা এক্ষণে শতকরা ৭৷৷০। অর্থাৎ অন্যান্য বিদেশী মালের উপর যে শুল্ক বসানো আছে প্রয়োজন হইলে তাহার চেয়ে শতকরা ৭৷৷০ কম হারে বিলাতী মালের উপর বসানো যাইতে পারিবে।

প্রবাসী জাপানী

বৎসরে প্রায় হাজার সাড়ে পাঁচেক করিয়া জাপানী নরনারী বিদেশে প্রবাসী হয়। তাহার ভিতর এক ব্রেজিলেই যায় প্রায় সাড়ে তিন হাজার। ১৯২৪ সনে ব্রেজিলে গিয়াছিল ৩,৬৭৮, আর পেরুতে ৫৭৪। দক্ষিণ আমেরিকা, মেক্সিকো ইত্যাদি দেশের দিকেই ঝোঁক বেশী।

১৯২৫ সনের অক্টোবর মাসে প্রবাসী জাপানীদের তালিকা করা হয়। তাহাতে দেখা যায় যে, তখন ব্রেজিলে ৪১,৭৭৪ জন বসবাস করিতেছে। পেরুদেশে জাপানী বাসিন্দার সংখ্যা ৯,৮৬৪। মেক্সিকোয় ৩,৩১০ জাপানী বসবাস করে। ২,৩৮৩ জন আর্জ্জেণ্টিন দেশে প্রবাসী।

সর্ব্ব-জাপান মজুর-সঙ্ঘ

এতদিন জাপানে দুইটা বড় বড় "ট্রেড ইউনিয়ন" বা মজুর-সঙ্ঘ ছিল। একটাতে সঙ্ঘবদ্ধ ছিল এঞ্জিনিয়ারিং কারখানার মজুরেরা। কান্সাইয়ে ইহার কর্ম্মকেন্দ্র। অপর-কেন্দ্র কান্তোয় প্রতিষ্ঠিত। বিভিন্ন মজুর-সঙ্ঘের মহাসঙ্ঘ রূপে এই দ্বিতীয় সঙ্ঘ পরিচিত। কিন্তু বৎসরখানেক হইল এই দুইটা সঙ্ঘ এক নূতন সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই বিপুল মহাসঙ্ঘের নাম "রোদো কুম্যাই সোরেঙ্গো।" সহজে ইহাকে বলিতে পারি "সর্ব্বজাপান মজুর-সঙ্ঘ।" ১৫,০০০ নরনারী এই মহাসঙ্ঘের সভ্য।

জাপানের এশিয়ান উপনিবেশ

কোরীয়া, মাঞ্চুরিয়া এবং চীন ছাড়া এশিয়ার অন্যান্য দেশেও জাপানীরা স্থায়ী ভাবে বসবাস করিতেছে। ১৯২৫ সনের তালিকায় দেখিতে পাই ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জে ৮,৩৯০ এবং সিঙ্গাপুর ইত্যাদি অঞ্চলে ৪,৯৩৫ জাপানী নরনারীর ঘরবাড়ী আছে। আর ৪,১৬১ জন জাভা, সুমাত্রা ইত্যাদি দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী।

মার্কিণ, ইংরেজ এবং ওলন্দাজ জাতি নিজ নিজ সীমানার ভিতর এই কয়জন (১৭,৪৮৬) জাপানীর ছায়া দেখিয়াই আঁৎকাইয়া উঠিতে অভ্যস্ত।

ইতালিয়ান রেশম ও লিয়ার

মে মাসের মাঝামাঝি ইতালিতে রেশমের বাজারে একটা দুর্যোগ ঘটিয়া গিয়াছে। ইতালিয়ান মুদ্রা (লিয়ার) দুনিয়ার বিনিময়ে হঠাৎ অনেক নামিয়া যায়। রেশমের বেপারীরা আঁতকাইয়া উঠে। তাহার উপর সুরু হয় ঝড়বৃষ্টি। তাহাতে উত্তর ইতালির (রেশম-জনপদের) অনেক ক্ষতি ঘটে। আগামী ঋতুর ফসল কিরূপ দাঁড়াইবে ব্যবসায়ি-মহলে সে বিষয়ে অনেক সন্দেহ উপস্থিত হয়। ভ্যাবাচাকা খাইয়া অনেকে মাল-বেচা বন্ধ করিয়া দেয়। আর যাহারাও বা বাজারে মাল রাখিতেছিল তাহারাও অতি চড়া দর হাঁকিতে থাকে। এই দরে অবশ্য বিদেশী বেপারীরা মাল কিনিতে নারাজ। কিন্তু পরে বিনিময়ের বাজারে লিয়ার উঠিতে সুরু করিয়াছে। ইতালিয়ান রেশম ক্রমশঃ "প্রকৃতিস্থ" হইবে আশা করা যায়।

জাপানের চার বন্দর

"বন্দর" হিসাবে অর্থাৎ মাল-চলাচলের কেন্দ্র হিসাবে কোবে জাপানের নং ১। এই কেন্দ্রে ১৯২৫ সনে

৩,১১৭,৩৬৪,০৭৩ য়েন (১ য়েন=১৷৷০ টাকা) মূল্যের মাল আমদানি-রপ্তানি হইয়াছিল।

কোবের পরেই ওসাকার ঠাঁই। ওসাকায় মাল-চলাচলের কিম্মৎ ২,৮১৪, ৩০৯,৪৮৩ য়েন।

তাহার পর য়োকোহামা। ২,০৫০,২৭৩,৫৪৫ য়েন মূল্যের মাল আমদানি-রপ্তানি এই বন্দরে ঘটিয়াছিল।

তোকিও চতুর্থ স্থান অধিকার করে। এখানকার মাল-চলাচলের কিম্মৎ ৯১২,৪৮২,১৯৬ য়েন।

কানেগাফুচি সূতার কল

৪৩,০০০ পুরুষ ও স্ত্রী জাপানের কানেগাফুচি সূতার কারখানায় মজুরি করে। তুলার টাকু আছে ৫২২,৭৮৮ আর রেশমের টাকুর সংখ্যা ৭০,৯৬৪।

১৯২৫ সনের ডিসেম্বর মাসে ছয় মাসের হিসাব-নিকাশ হইয়া গিয়াছে। তাহাতে দেখা যায় যে, কোম্পানীর মোট লাভ দাঁড়াইয়াছে ১২২,৪২০,৩১৩ য়েন (অর্থাৎ প্রায় ১৮ কোটি টাকা)। এই সংখ্যা হইতে কাঁচা তুলা ও রেশমের দাম, মাসিক খরচ এবং যন্ত্রপাতির "মূল্য-হ্রাস" বাবদ ১০৩,৮২২,১৭০ য়েন কাটিয়া রাখা হয়। নিট লাভ থাকে ১৮,৫৯৮,১৪২ য়েন (প্রায় ২ কোটি ৭৫ লাখ টাকা)।

নিট লাভের বাঁটোয়ারা

এই নিট লাভটা কোম্পানী অংশীদারদিগকে বাঁটিয়া দিবার ব্যবস্থা করেন নাই। ভিন্ন ভিন্ন ছয় খাতে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে :—(১) ৫০০,০০০ য়েন কোম্পানীর "রিজার্ভ ফাণ্ড" বা গচ্ছিত ভাণ্ডারে তুলিয়া রাখা হইয়াছে, (২) ২৭০,০০০ য়েন পেন্‌শ্যনের ভাণ্ডারে গিয়াছে, (৩) ২৭০,০০০ য়েন মজুর-মঙ্গল ধনভাণ্ডারে জমা করা হইয়াছে, (৪) ২৭০,০০০ য়েন "চাকুর্‌য়ে"দিগকে "বোনাস" বা "উপরি" হিসাবে দান করা হইয়াছে, (৫) অংশীদাররা "ডিভিডেণ্ড" পাইয়াছে ৫,৪৩৩,১৯০ য়েন (অংশের পরিমাণ অনুসারে এই লাভ দাঁড়ায় শতকরা ৩৮), (৬) ১১,৮৫৪, ৯৫২ য়েন আগামী বৎসরের জন্য নগদ জমা করা হইয়াছে।

জাপানী মালের ইয়াঙ্কি খরিদ্দার

মার্কিণ জাতি জাপানী মালের সর্ব্বাপেক্ষা বড় খরিদ্দার। ১৯১২ সনে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কাটতি মাত্র ১৬ কোটি ৮০ লাখ য়েনের জাপানী মাল। ১৯২২ সনে কাটতি উঠে ৭৩ কোটি ২০ লাখ পর্য্যন্ত। আর ১৯২৫ সনে ১০০ কোটি য়েন (অর্থাৎ ১৫০ কোটি টাকা) মূল্যের জাপানী জিনিষ ইয়াঙ্কি নরনারী খরিদ করিয়াছে।

ভারতে জাপানী মাল

ইয়াঙ্কিস্থানের তুলনায় ভারতবর্ষ জাপানী মালের খরিদ্দার হিসাবে অনেক ছোট। কিন্তু তাহা বলিয়া ভারতবর্ষকে জাপানী বাজার হিসাবে নগণ্য বিবেচনা করা চলে না। ১৯১২ সনে আমরা মাত্র ২ কোটি ৩০ লাখ য়েনের জাপানী মাল আমদানি করিয়াছিলাম। আমাদের চাহিদা প্রায় ফী বৎসরই বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯২৪ সনে জাপান ভারতে পাঠাইয়াছিল ১৩ কোটি ৫০ লাখ য়েনের মাল। ১৯২৫ সনে আমাদের চাহিদা ১৭ কোটি ৩০ লাখ য়েনে (অর্থাৎ প্রায় ২৬ কোটি টাকায়) গিয়া ঠেকিয়াছে।

জাপানে ভারতীয় বাজার

জাপান ভারতবাসীর পক্ষে মাল বেচিবার এক বড় বাজার। ১৯১২ সনে জাপানীরা আমাদের জিনিষ কিনিয়াছিল ১৩ কোটি ৪০ য়েন দামের। ভারতীয় মাল সম্বন্ধে জাপানী চাহিদা বাড়িতে বাড়িতে ১৯২৫ সনে ৫৭ কোটি ৩০ লাখ য়েনে (অর্থাৎ ৮৫ কোটি টাকায়) আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

ভারতীয়-জাপানী বিতণ্ডা

কথাটা এই, জাপানীরা আমাদের মাল কিনে ৮৫ ক্রোর টাকার। আমরা জাপানী মাল কিনি ২৬ ক্রোর টাকার।

জাপানের সঙ্গে আড়ি করিলে ভারতবাসীর লাভ-লোকসান কতটা তাহা এই অঙ্কেই ধরা পড়িয়া যাইতেছে। সহজেই বুঝা যায় যে, জাপানীরা আমাদের মাল বয়কট করা সুরু করিলে লোকসান আমাদের নেহাৎ কম নয়। আর আমরা যদি গায়ে পড়িয়া জাপানীদের সঙ্গে দুস্‌মনি

চাগাইয়া তুলি তাহা হইলে আমরা নিজ বাজারটা নিজেই খোআইয়া বসিব। আন্তর্জ্জাতিক বিতণ্ডার কাণ্ডে লেন-দেনের তথ্যগুলা কব্জায় রাখা দরকার। অবশ্য ভারতীয় মাল না পাইলে জাপান যদি একদম কাৎ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে কথা কিছু স্বতন্ত্র।

ফরাসী মুক্তার বাজারে ভারতীয় বণিক

ফ্রাঁর ঘন ঘন পতনে প্যারিসের বাজারে ভারতীয় বণিকগণ খুব বেশী রকম ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। তা ছাড়া, আরবগণ প্যারিসের সঙ্গে সরাসরি সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া পশ্চিম মুল্লুকে খুব বড় মুক্তার ব্যবসা ফাঁদিয়া বসিয়াছে। ইহার ফলে বোম্বাইয়ের গুজরাতী বণিকদের একচেটে মুক্তার ব্যবসায়ে ভয়ানক ক্ষতি হইতেছে। এই কথা আমরা লালা লাজপত রায়ের চিঠিতে জানিতে পারিয়াছি।

লণ্ডনে চেকের চলাচল

ব্যাঙ্কের "চেক" ভারতে এখনো সুপ্রচলিত নয়। কিন্তু লণ্ডনে গত জুন মাসের প্রথম দিকে এক সপ্তাহে ৮২৫, ৭২৫,০০০ পাউণ্ড মূল্যের চেক চলিয়াছে। মে মাসের শেষের দিকে চেক-চলাচল হইয়াছিল ৬৪২,৩১৯,০০০ পাউণ্ডের। মার্চ মাসের শেষের দিকে এই চলাচলের পরিমাণ ছিল ৭৪৪,০৯৭,০০০ পাউণ্ড। তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে ৭২৬,-৮৪৯,০০০ পাউণ্ডের চেক লণ্ডনের "ক্লিয়ারিং হাউস" ভবনে হাত বদলাইয়াছে।

১৯২৫ সনের এপ্রিল—মে—জুন মাসের চেক-চলাচল কখনো ছিল সপ্তাহে ৭৪৭,৭৭৭,০০০ পাউণ্ডের, কখনো ৭২৫,৭১০,০০০ পাউণ্ডের। কখনো বা ৭৪৫,৪৭৯,০০০ পাউণ্ডের চেক কাটিয়া ইংরেজেরা সাপ্তাহিক কারবার সারিয়াছে।

দেখিতেছি যে, ইংরেজ সমাজে সপ্তাহে গড়পড়তা ১০৫০ ক্রোর টাকার চেক দরকার হয়। দিনে তাহা হইলে ইংরেজ নরনারী, বেপারী-ই হউক বা সাধারণ গৃহস্থই হউক, ১৫০ কোটি টাকার চেক ব্যবহার করে।

তবে এই সব টাকা একমাত্র ইংরেজেরই নয়। লণ্ডনের "চেক-খালাশ" আফিসে (ক্লিয়ারিং হাউস) গোটা দুনিয়ার চেকই আসিয়া হাজির হয়।

লোহালক্কড়ের ইতালিয়ান কারবার

রেল, জাহাজ ও বন্দর এই তিন দফায় লোহালক্কড়ের শিল্প ইতালিতে দ্রুত উন্নতি লাভ করিতেছে। অন্যান্য বৎসরের মতন ১৯২৫ সনেও ইতালিয়ান সরকার এইসকল দিকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। ১৯১৪ সনের পূর্ব্বে জার্ম্মাণ মাল আসিয়া ইতালিতে ছাইয়া ফেলিত। লড়াইয়ের সময় হইতে জার্ম্মাণ মাল ইতালিতে আর চলে না। উত্তর ও মধ্য ইতালি লোহালক্কড়ের কারবারে জাঁকিয়া উঠিয়াছে। দক্ষিণ ইতালিরও নানা স্থানে একটা একটা করিয়া এই সকল ফ্যাকটরি মাথা তুলিতেছে।

রেল, ট্রাম, অটোমোবিল, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, মোটর জাহাজ ইত্যাদি সবই প্রস্তুত হইতেছে বটে; কিন্তু লোহা এবং অন্যান্য কুদরতী মালের যোগান ইতালির খনিতে হয় অল্প মাত্র। তাহার জন্য ইতালিকে বিদেশের শরণাপন্ন হইতে হয়। ১৯২৫ সনে লোহার আমদানি হইয়াছে ২,৫০০,০০০,০০০ লিয়ার মূল্যের (প্রায় ৩০ কোটি টাকার)। ৬৯০০০ টন লোহা আসিয়াছে। প্রায় সবই যোগাইয়াছে বিলাত।

জার্ম্মাণির রাইখ্‌স্-বাঙ্ক

ফ্রান্সের "বাঁক্ দ' ফ্রান্স" যেরূপ প্রতিষ্ঠান, এবং ইতালির "বাঙ্কা দি তালিয়া" আর বিলাতের "ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ড" যেরূপ প্রতিষ্ঠান, জার্ম্মাণির "রাইখ্‌স্-বাঙ্ক" সেইরূপ প্রতিষ্ঠান। এইগুলা সবই "ষ্টেট ব্যাঙ্ক" বা সরকারী ব্যাঙ্ক। টাকা লেনা-দেনার মামুলি কাজ এই সকল ব্যাঙ্কের বিশেষত্ব নয়। গভর্মেণ্টের রাজস্ব-বিভাগ আর সরকারী টাকশাল এই দুই কর্ম্মকেন্দ্রের আর্থিক কারবার সামলানো ষ্টেট ব্যাঙ্ক-গুলার প্রধান উদ্দেশ্য। এই ধরণের ব্যাঙ্ক ভারতে এখনো নাই। এখানকার "ইম্পারিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া" খাঁটি "সরকারী ব্যাঙ্ক" নয়।

১৯২৪ সনে "রাইখ্‌স্-বাঙ্কের" মোটা লাভ ছিল ৩০৭,০০০,০০০ মার্ক (১ মার্কে ৸৹ আনা)। ১৯২৫ সনে মোটা লাভের পরিমাণ যথেষ্ট কম দেখা যায়। ইহা

১৮১,০০০,০০০ মার্কে নামিয়া আসিয়াছে। কিন্তু খরচ কমিয়াছে যথেষ্ট। ১৯২৪ সনে ছিল ১৮৪,০০০,০০০ মার্ক। গত বৎসর খরচ হইয়াছে মাত্র ১৩৮,২৬০,০০০ মার্ক। কাজেই নিট লাভ দাঁড়াইয়াছে ৪২,৭৪০,০০০ মার্ক। ১৯২৪ সনে ৭৯,৭৬০,০০০ বেশী ছিল নিট লাভ।

নিট লাভের পরিমাণ কমিয়াছে বটে। কিন্তু ডিভিডেণ্ড কমানো হয় নাই। শতকরা ১০৲ হিসাবেই অংশীদারগণ লভ্যাংশ পাইয়াছে।

ইতালির আর্থিক উন্নতি

ইতালিতে নতুন নতুন শিল্প-বাণিজ্য গড়িয়া উঠিতেছে। এই জন্য পুঁজির প্রয়োজন খুব বেশী। ১৯২৫ সনে ইতালিয়ান ব্যাঙ্কগুলা কারখানার আর ব্যবসায়ীদিগের পুঁজি যোগাইবার জন্য অনেক টাকা খরচ করিয়াছে। ব্যাঙ্কের কারবার এই কারণেই খুব বেশী মোটা দেখা যায়। এই সঙ্গে মনে রাখা আবশ্যক যে, ইতালিয়ান গবর্মেণ্টের রাজস্ব-বিভাগ ব্যাঙ্কগুলার সঙ্গে সহযোগী ভাবে কাজ করে। সরকারী ব্যাঙ্কের নাম "বাঙ্কা দি তালিয়া"। এই ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ বাজারে টাকা (লিয়ার) ছাড়া। গত বৎসর ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলা লিয়ারের উঠা-নামা শাসন করিবার জন্য সরকারী ব্যাঙ্কের সঙ্গে অনেকবার একযোগে কাজ করিয়াছে।

"ক্রেদিত ইতালিয়ান" ব্যাঙ্ক

ইতালির ব্যাঙ্কের ভিতর "ক্রেদিত ইতালিয়ান" নং ১। ১৯২৫ সনে ১৯২৪ সনের চেয়ে লাভ দাঁড়াইয়াছে ৬০ লাখ লিয়ার (প্রায় ৮½ লাখ টাকা) বেশী। ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইয়াছে শতকরা ১০৲ টাকা হিসাবে। ২০ লাখ লিয়ার জমা হইয়াছে গচ্ছিত ফণ্ডে। আর নগদ সাড়ে তিন লাখ আগামী বৎসরের জন্য হাতে রাখা হইয়াছে। জানা যাইতেছে যে, ইতালিতে ব্যাঙ্কের লাভালাভ বিশেষ কিছু হাতী-ঘোড়া নয়। তবে "ক্রেদিত ইতালিয়ান" এই বৎসর কাজ করিয়াছে ঢের। ৮১৪ মিলিয়ার্ড লিয়ার (৮১৪ কোটি লিয়ার=প্রায় ১১০ কোটি টাকা) মূল্যের কারবার চলিয়াছে। ১৯২৪ সনের তুলনায় উন্নতির পরিমাণ ১১৬ মিলিয়ার্ড লিয়ার (=প্রায় ১৫৷৷০ ক্রোর টাকা)। এই বৎসর যে পরিমাণ ব্যবসা-বাণিজ্য ঘটিয়াছে পূর্ব্বে কখনো সেরূপ দেখা যায় নাই।

রুশিয়ার বড় বাজার বিলাত

বিলাতে সোহ্বিয়েট রুশিয়ার মাল বিক্রী হয় বিস্তর। আজকাল বিলাতী বাজারে প্রায় ২৷৷০ ক্রোর পাউণ্ডের (প্রায় ৩৩।৩৪ ক্রোর টাকার) রুশ মালের কাটতি আছে। বিলাতকে তোয়াজ করা এই জন্য বোল্‌শেহ্বিকদের স্বধর্ম্ম। কিন্তু ইংরেজ বেপারীরা রুশিয়ায় এখনো বড় বেশী-কিছু বেচিতে পারিতেছে না। মাত্র ৬০ লাখ পাউণ্ডের বিলাতী মাল রুশিয়ায় বিক্রী হয়। আরও ১ ক্রোর ৩০ লাখ পাউণ্ডের বিলাতী মাল রুশিয়ায় যায় বটে; কিন্তু সে সবই রুশিয়া আবার অন্যান্য দেশে রপ্তানি করে।

ফরাসী রেলপথ

লড়াইয়ের পূর্ব্বে ফ্রান্সে ফী বৎসর শতকরা ৩ হিসাবে রেলের চলাচল বাড়িত। কিন্তু যুদ্ধের পর হইতে রেলপথে মালও চালান হইতেছে বিস্তর আর নরনারীও চলাফেরা করিতেছে খুব বেশী-বেশী। ১৯২১ সনে যাতায়াত ও চালানের অবস্থা যেরূপ ছিল তাহার তুলনায় ১৯২৫ সনে শতকরা ২০ বেশী দেখা যায়।

১৯০৯ হইতে ১৯১৩ সন পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর এঞ্জিন বাড়াইবার দস্তুর ছিল শতকরা ৩ হিসাবে, যাত্রীদের জন্য গাড়ী বাড়িত শতকরা ৩½ হিসাবে আর মালগাড়ী বাড়িত শতকরা ৪·২ হিসাবে।

তখনকার দিনে প্রতি বৎসর গড়ে ৩৮০ খানা এঞ্জিন, ১০৫০ যাত্রী গাড়ী এবং ১৪,৫০০ মালগাড়ী তৈয়ারী হইত। আজকাল বৎসরে ৬০০ খানা এঞ্জিন ১২০০ যাত্রী গাড়ী এবং ২২,০০০ মালগাড়ী তৈয়ারী হইতেছে।

১৯২১ হইতে ১৯২৪ পর্য্যন্ত ফরাসী রেল কোম্পানীগুলা ১২½ মিলিয়ার্ড ফ্রাঁ (১২৫ কোটি ফ্রাঁ—প্রায় ২৫ কোটি টাকা) বিদেশে ধার করিয়াছে। তাহার ভিতর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কর্জ্জ দিয়াছে অর্দ্ধেকেরও বেশী। তৃতীয়াংশের কিছু বেশী দিয়াছে ইংল্যণ্ড। আর অবশিষ্ট প্রায় ১৷৷০ কোটি আসিয়াছে স্যুইটসার্ল্যাণ্ড হইতে।

(ক) দেশী

ভারতীয় পশু-সম্মিলন

নিখিল ভারত পশু-কনফারেন্সের কলিকাতার অধিবেশনে শ্রীযুক্ত এস, এস, আমেদ বলেন ১,২০,৯০০ বর্গ মাইলের এই বিশাল বাংলা দেশে গরুর সংখ্যা কম হইলেও একেবারে নগণ্য নয়। ১৯২৪ সনের গরুর সেন্‌সাস রিপোর্টে দেখা যায় ২,৪৭,২৪,২৩৪টি গরুর মধ্যে ৮১, ১৮,২০৫টিই বৎসহীন দুগ্ধবতী গাভী। এরূপ হৃদয়বিদারক অবস্থার কারণ—(ক) গোচারণ মাঠের একান্ত অভাব, (খ) পাল দিবার উপযুক্ত ষাঁড়ের অভাব (গ) বাচ্চা গরু জবাই, (ঘ) অকর্ম্মণ্য গরু পালন করা (ঙ) গো-মারীর প্রাদুর্ভাব ও তাহার প্রতিকারের পক্ষে অনুপযুক্ত পশু-চিকিৎসক (চ) রায়ত ও কিষাণের অজ্ঞতা, দারিদ্র্য এবং কুসংস্কার।

ফেণীতে সমবায়-সম্মিলন

গত ১২ই ও ১৩ই জুন ফেণীতে চট্টগ্রাম বিভাগীয় সমবায় সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। কো-অপারেটিভ রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন মিত্র সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন সমিতি-সমূহের প্রতিনিধি ব্যতীত, কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেণ্টের অনেক সরকারী কর্ম্মচারী এবং বাংলা দেশের অন্যান্য জেলার বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোক নিমন্ত্রিত হইয়া সভায় যোগদান করেন।

সভাপতি মহাশয় অভিভাষণে সমবায়-সমিতির উদ্দেশ্য, নীতি ও উপকারিতা সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দেন। তিনি বলেন, সমবায়ীদের রাজনৈতিক, সাম্প্রদায়িক, সরকারী, বেসরকারী ভেদ নাই। এখানে সকলেই যোগদান করিয়া সমাজের ও নিজের উন্নতি জন্য চেষ্টা করিতে পারেন। সমবায়-আন্দোলনদ্বারা দেশের কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রভৃতি সকল সমস্যার সমাধান হইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে দেশে পল্লী-সংগঠন সম্বন্ধে চেষ্টা চলিতেছে। তাঁহার মতে, সমবায়ের সাহায্যে উহা বিশেষ সফলতার সহিত চালান যাইতে পারে।

গাইবান্ধায় প্রদর্শনী

জ্যৈষ্ঠমাসের প্রথম দিকে গাইবান্ধায় একটা কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। উদ্যোগী ছিলেন স্থানীয় ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জ বিহারী সেন ও শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র সরকার। "নানা প্রকার সাধারণ ও মূল্যবান খদ্দর, হাতীর দাঁতের সূক্ষ্ম কারুকার্য্য-করা সুচিক্কণ অলঙ্কারাদি, খাগড়ার বাসন, রেশম ও গরদের নানা প্রকার সুন্দর বস্ত্র, বেতের সুদৃশ্য চেয়ার ও কাউচ, কৃষ্ণনগরের মাটীর পুতুল প্রভৃতিতে প্রদর্শনী-মণ্ডপটী নিখুঁত ভাবে সুসজ্জিত হইয়াছে।"

কলিকাতা হইতে বক্তা গিয়াছিলেন ফরিদপুরের ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র গুহ রায়। ("পল্লীশ্রী")

আন্তর্জ্জাতিক মজুর-সম্মিলন ও বোম্বাইয়ের ব্যবসায়ী সমিতি

বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান মার্চ্চাণ্টস্ চেম্বারের কমিটি হইতে আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক-সম্মিলনের জেনেভা বৈঠকের কর্ম্মচারি-বর্গের নিকট গত ২৩শে এপ্রিল তারিখে একখানা পত্র লেখা হয়। ঐ পত্রে জেনেভা বৈঠকের জন্য ভারতীয় কর্ম্মচারি-নিয়োগ-কর্ত্তাদের পক্ষ হইতে ভারত সরকার-

কর্ত্তৃক স্যার আর্থার ফ্রোমের মনোনয়নের প্রতিবাদ করা হয়। ঐ পত্রে আরও বলা হয় যে, স্যার আর্থার ফ্রোম, ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জি এণ্ড কোম্পানীর অংশীদার, আর এই কোম্পানী একটী ব্রিটিশ শিপিং কোম্পানী। সুতরাং তাঁহার দ্বারা ভারতীয় স্বার্থ সংরক্ষিত হইতে পারে না। আন্তর্জ্জাতিক সম্মিলন-কর্ত্তৃক স্যার আর্থার ফ্রোমের মনোনয়ন অনুমোদিত হওয়া উচিত নয়। ভারতীয় চেম্বার অব্ কমার্স সমূহের একটিও স্যার আর্থার ফ্রোমের মনোনয়ন নির্দ্দেশ করেন নাই। এই কমিটি, সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর সভাপতি শ্রীযুক্ত নরোত্তম মোরারজির মনোনয়ন নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

ই, বি, রেলওয়ে কর্ম্মচারী সভা

নিখিল ভারত রেলকর্ম্মচারী সমিতির সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল সরকার ২রা জুলাই তারিখে কাটিহার হইতে লিখিতেছেন :—

ই, বি, রেলওয়ের ভারতীয় কর্ম্মচারিদিগের কাটিহারে ৫ম বার্ষিক সম্মিলন সুসম্পন্ন হইয়াছে। শুক্রবার অপরাহ্ণে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট হলে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সভার অধিবেশন হইয়াছিল এবং সভায় বহু জনসমাগম হইয়াছিল। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণের পর সভাপতি তাঁহার দীর্ঘ বক্তৃতায় ভারতীয় কর্ম্মচারীদিগের স্বার্থ ও চাকুরী সম্বন্ধে উল্লেখ করেন। তাঁহার বক্তৃতার বিশেষ বিষয়গুলি হইতেছে এই :—ধনী ও শ্রমিক, সমিতির মৌলিক নিয়মাবলী, বেতন, বাসগৃহ, সমান কাজের জন্য সমান বেতন, জাতিগত ভেদবিচার, অপর্য্যাপ্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রভৃতি।

উপসংহারে মিঃ ব্যানার্জ্জি রেলকর্ম্মচারীদিগের নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, রেল হইতেছে জনসাধারণের উপকারের জন্য, সুতরাং উহার কর্ম্মচারিগণ সাধারণের লোক বই কিছুই নহে। বিশেষতঃ জনসাধারণের সহানুভূতি না থাকিলে তাঁহাদের অবস্থার উন্নতি হইবে না।

দাঙ্গায় পাটের ক্ষতি

বিবিধ ব্যবসায়-সমিতির প্রতিনিধিগণ মিলিত হইয়া জুট-বেলার্স এসোসিয়েশন একচেঞ্জে সভা করিয়াছিলেন। তথায় বাংলার জেলাসমূহের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও বিরোধের হেতু সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছিল। এই সম্পর্কে বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের পরামর্শ গ্রহণ করিবার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। বৈঠকে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, গবর্ণমেণ্ট যদি অবিলম্বে জেলাসমূহের গণ্ডগোল নিবারণ করিতে চেষ্টা না করেন তবে পাটের ব্যবসায় সম্পর্কে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা।

বঙ্গীয় কুম্ভকার-সম্মিলন

জুনমাসের মাঝামাঝি নাটোরে বঙ্গীয় কুম্ভকার-সম্মিলনের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভাপতি ছিলেন ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ পাল।

নোয়াখালীতে সমবায়-বক্তৃতা

গত ১৪ই জুন সোমবার টাউনহলে বিশ্বভারতীর শ্রীনিকেতনের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ সমবায় ও স্বাস্থ্যোন্নতি সম্বন্ধে ম্যাজিক-লণ্ঠন-সাহায্যে এক বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন লাহিড়ী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ("দেশের বাণী")

বিহারে কিষাণ-সভা

বিহার প্রাদেশিক কিষাণ-সভার কার্য্যকরী সমিতির মতে রাজকীয় কৃষি-তদন্ত কমিশনের সভ্য-নিয়োগে ও অনুসন্ধানের সীমা-নির্দ্দেশকরণে কিষাণদের স্বার্থের প্রতি দারুণ ঔদাসীন্য দেখান হইয়াছে। রায়তের একজন খাস প্রতিনিধি মনোনয়ন করিবার জন্য বড়লাট বাহাদুরের দরবারে সভার দাবী জানান হইয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশের কিষাণ নেতাদের সহিত মোলাকাৎ করিয়া ষ্ট্যাটুটরী রিফর্ম্ম কমিশনের নিকট কিষাণদের অভাব-অভিযোগের বিবরণী উপস্থাপিত করিবার জন্য ও নিখিল ভারত কিষাণ-সভার বৈঠকের উদ্যোগ-আয়োজন করিবার জন্য শ্রীযুক্ত দেউকি প্রসাদ সিংহ, অরিক্ষণ সিংহ, বেণীদত ঝা ও স্বামী বিদ্যানন্দ প্রভৃতি কতিপয় সভ্যের উপর ভার দেওয়া হইয়াছে। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব-সংশোধনী প্রস্তাবের সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য কমিটী বাংলা-দেশে কয়েকজন সভ্যকে অনুরোধ করিয়াছেন। প্রজাস্বত্ব-বিষয়ক আইনকানুনে

প্রাদেশিক কংগ্রেসের মনোভাব কি তাহা কিষাণ-সভা বুঝিয়া ব্যবস্থা-পরিষদের জন্য সদস্য মনোনয়ন করিবেন কিনা এক মাস পরে বিবেচিত হইবে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারত-সন্তান

প্যাডিসন ডেপুটেশ্যনের অন্যতম মেম্বররূপে শ্রীযুক্ত স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রবাসী ভারতবাসীর অবস্থা কিরূপ, এই প্রশ্নের উত্তরে স্যার দেবপ্রসাদ বলেন, তথাকার অধিবাসী ভারতীয়দিগকে অচিরে তাহাদের নাগরিক অধিকারের প্রতি মনোযোগী করিতে হইবে। রাজনীতি বিষয়ে তাহাদিগকে সচেতন করার তেমন আবশ্যকতা এখন নাই। ভারতবাসীরা যদি যথার্থই প্রবাসী ভারতবাসীর দুঃখে কাতর হইয়া থাকেন, বক্তৃতায়, প্রবন্ধে এবং সংবাদ-পত্রের মারফতে তাঁহারা যে সমস্ত আর্ত্তনাদ করিয়াছেন, তাহা যদি যথার্থ প্রাণের জিনিষ হয়, তবে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয়দিগের সাহায্যের জন্য অর্থসংগ্রহ করা তাঁহাদিগের প্রধান কর্ত্তব্য। এই অর্থদ্বারা কতিপয় পরার্থপর কর্ম্মী তথায় প্রেরণ করা আবশ্যক। তাঁহারা তথাকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য বিষয়ে ভারতীয়দিগের উন্নতি-বিধানে সবিশেষ যত্ন করিবেন। পরিশেষে স্যার দেবপ্রসাদ বলেন যে, 'ভারত-সেবক সমিতি' এবং 'রামকৃষ্ণ সেবা-সমিতি'র পক্ষ হইতে একার্য্যে অগ্রসর হওয়ার একান্ত প্রয়োজন। তিনি স্বয়ং এই বিষয়ে সচেষ্ট হইবেন বলিয়াও মত প্রকাশ করিয়াছেন।

মাদ্রাজে পশু-মেলা

গত বৈশাখ মাসে তিরাপ্পুর নামক স্থানে ছালেম ও কয়ামবাটার জেলার রায়তগণের সম্মিলনে এক ঘোড়া ও গরুর মেলা হয়। মাদ্রাজ লাট ভাইকাউণ্ট গশেন উদ্বোধনী বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, সরকার উন্নত প্রণালীতে গো-পালন করিয়া পশুর সাধারণ উৎকর্ষ-বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত হোসুরে একটি ফার্ম্ম খুলিয়াছেন। কিন্তু রায়তগণ যদি এই প্রকার ফার্ম্মের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া গরুর থাকিবার জন্য স্বাস্থ্যকর গোশালা ও পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থার দিকে উপযুক্ত দৃষ্টি না দেয় তবে এইসকল ফার্ম্মে খরচ-করা সরকারের টাকা একেবারে নিরর্থক হইবে।

মেলায় দক্ষিণভারতের বৃহৎ গো-ফার্ম্মের মালিক শ্রীযুক্ত পালিয়াকোটটাও-কর্ত্তৃক টুট্টাকারানের দুইশত ষাঁড় এবং গরু প্রদর্শিত হইয়াছিল। তাহা ছাড়া, ব্যক্তিবিশেষের অনেকগুলি মোটা, তাজা ঘোড়া মেলায় আসিয়াছিল।

(খ) বিদেশী

জার্ম্মাণ মন্ত্রী কুর্টিয়ুসের আর্থিক বাণী

লাইপ্‌ৎসিগের "মেস্‌সে"তে (মেলায়) জার্ম্মাণ রাষ্ট্রপতি হিণ্ডেনবুর্গের "বাণী" লইয়া "হ্বিট্‌শাফ্‌ট্‌স্‌-মিনিষ্টার" (আর্থিক ব্যবস্থার মন্ত্রী) ডক্‌টর কুর্টিয়ুস উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার কিয়দংশ নিম্নরূপ :—

"আর্থিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে জার্ম্মাণ গবর্মেণ্ট এক প্রকাণ্ড মোসাবিদা কার্য্যে পরিণত করিবার পথে অগ্রসর হইয়াছেন। আমরা একদিকে খরচ-পত্র যথাসম্ভব কমাইয়া ফেলিতেছি। অপর দিকে দেশের আর্থিক উন্নতি সম্বন্ধে বহুকাল-ব্যাপী কাজের ব্যবস্থা করিয়াছি। কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্যের সকল বিভাগেই উপযুক্ত জনগণকে অর্থ-সাহায্য করাটাকে গবর্মেণ্ট স্বকীয় কর্ম্মপ্রণালীর কেন্দ্র-স্থলে রাখিয়া চলিতে ব্রতবদ্ধ হইয়াছেন। সম্প্রতি আমরা হয়ত এই বাবদ বেশী টাকা খরচ করিতে পারিব না। কিন্তু আমরা জানি যে, সামান্য আরম্ভেরও ফল কম বিপুল হয় না। এই সরকারী অর্থ-সাহায্য-নীতিকে আমরা এমন করিয়া গড়িয়া তুলিতেছি যে, ইহার দ্বারা জার্ম্মাণির আর্থিক জীবন নানা উপায়ে সমৃদ্ধ হইতে বাধ্য। জার্ম্মাণ নরনারীর আর্থিক শক্তি এবং

কর্ম্মক্ষমতা সম্বন্ধে সমগ্র দেশের জ্বলন্ত বিশ্বাস সর্ব্বদা জাগাইয়া রাখা রাইখ্‌স্‌-রেগিরুংয়ের (সাম্রাজ্যের গবর্মেণ্টের) নিকট অন্যতম প্রধান লক্ষ্য রহিয়াছে ও থাকিবে।"

ইতালিয়ান অধ্যাপক জিনি

বিলাতের "লণ্ডন স্কুল অব্‌ ইকনমিক্‌স্‌" নামক ধনবিজ্ঞান-বিদ্যালয় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়েরই অন্যতম অঙ্গ। ইতালির অধ্যাপক জিনি আজকাল বিলাতে বেড়াইতেছেন। এই উপলক্ষ্যে লণ্ডন-ধনবিজ্ঞান-বিদ্যালয় তাঁহাকে ডাকিয়া গোটাতিনেক বক্তৃতা দেওয়াইয়াছেন (৭-১২ জুন)। বক্তৃতার বিষয় ছিল,—"ইতালিয়ান ধনবিজ্ঞান এবং সংখ্যা-বিজ্ঞানের কয়েকটা কথা"।

মার্সেইয়ের ব্যবসায়ী সমিতি

মার্সেইয়ে বন্দরের ব্যবসায়ী সমিতি 'স্বদেশী শিল্প ও বাণিজ্যের আত্মরক্ষার জন্য এক আন্দোলন রুজু করিয়াছেন। ফরাসী আমদানি-শুল্কের তালিকা সংশোধন করিবার জন্য "শাঁবর দে দেপুতে" (পার্ল্যামেণ্ট) ভবনে দরখাস্ত গিয়াছে। কোনো কোনো কুদরতী মালের উপর শুল্ক কমাইবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। অপর কতকগুলা মাল বিনা শুল্কে আমদানি করিবার চেষ্টা চলিতেছে। অপরদিকে বিদেশে কোনো কোনো মাল রপ্তানির উপর কর বসাইবার কথা আলোচিত হইতেছে। কিন্তু এই সম্বন্ধে কোনো সাধারণ নিয়ম কায়েম হইবে বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না।

অষ্ট্রেলিয়ায় শিল্প-গবেষণা

অষ্ট্রেলিয়ার "ইন্‌ষ্টিটিউট্‌ অব্‌ সায়েন্স অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রি" পুনর্গঠিত হইতেছে। প্রথম বৎসর ৪০,০০০ পাউণ্ড খরচ করিবার প্রস্তাব আছে। এই খরচ প্রতি বৎসর বাড়ানো হইবে। তৃতীয় বৎসরে ১০০,০০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত বাড়িবে। তাহা ছাড়া, ১০০,০০০ পাউণ্ড আল্‌গা গচ্ছিত রাখিবার প্রস্তাব চলিতেছে। এই গচ্ছিত টাকার ভাণ্ডার হইতে অষ্ট্রেলিয়ান যুবাদিগকে উচ্চ অঙ্গের শিল্প-গবেষণার জন্য বৃত্তি দেওয়া যাইবে। বিলাতের সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়ার গবেষক-বিনিময় পাতাইবার কথা উঠিয়াছে।

টেক্‌নিক্যাল শিক্ষায় জাপানী

জাপানে আজকাল ২০টা উচ্চশ্রেণীর টেক্‌নিক্যাল কলেজ চলিতেছে। সবগুলা সরকারী প্রতিষ্ঠান। এই বিশটার ভিতর দুইটা তোকিওয় অবস্থিত। অন্যান্যগুলা ওসাকা, কিয়োতো, নাগোয়া, কুমামোতো, য়োনেজাওয়া, আকিতা, কিরিয়ু, য়োকোহামা, হিরোশিমা, কানাজাওয়া সেন্দাই, ফুকুওকা, কোবে, হামামাচু, তোকুশিমা, নাগাওকা, ফুকুই এবং য়ামানাশি নগরে অবস্থিত। এইসকল নগরের নাম,—দু'একটা ছাড়া,—ভারতে পরিচিত নয়। কিন্তু আধুনিক শিল্প-কেন্দ্র এবং ব্যবসা-কেন্দ্র হিসাবে এইসকল নগর জাপানী সমাজে প্রসিদ্ধ।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলা শিখাইবার ব্যবস্থা আছে,—

(১) মেক্যানিক্যাল পূর্ত্তবিদ্যা, (২) বৈদ্যুতিক পূর্ত্তবিদ্যা, (৩) কার্য্যকরী রসায়নবিদ্যা (৪) চীনের বাসন ও কাচ প্রস্তুত করণ (৫) রঞ্জন-শিল্প, (৬) বয়ন, (৭) বাস্তু, (৮) বিয়ার প্রস্তুত করণ, (৯) জাহাজ-নির্ম্মাণ, (১০) খনি ও ধাতু-বিদ্যা, (১১) নাগরিক পূর্ত্তবিদ্যা, (১২) মুদ্রণ, (১৩) কলের সূত কাটা ও তাঁত।

কোনো কোনো কলেজে দুইটা মাত্র বিদ্যা শিখানো হয়। কোনো কোনোটায় গোটা নয়েক বিষয় শিখাইবার আয়োজন আছে।

বৎসর তিনেক করিয়া প্রত্যেক ছাত্রকে পড়িতে হয়। নিম্নতর টেক্‌নিক্যাল পাঠশালার পাশ অথবা সাধারণ "ম্যাট্রিকুলেশন পাশ" না থাকিলে কাহাকেও ভর্ত্তি করা হয় না।

সাম্রাজ্য-সম্মিলনে বাঙালী

আগামী অক্টোবর মাসে লণ্ডনে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিবর্গ মিলিয়া নিজ নিজ অঞ্চলের সুযোগ-দুর্যোগের কথা আলোচনা করিবেন। রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক উভয় তরফ হইতেই সাম্রাজ্যকে ঐক্যসূত্রে

গাঁথিবার প্রস্তাব চলিবে। বর্দ্ধমানের মহারাজা থাকিবেন ভারতের অন্যতম প্রতিনিধি।

রোমের কংগ্রেসে অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিশ্বজনীন আর্থিক কংগ্রেসের সভা বসিয়াছে। কংগ্রেস তিন বিভাগে আলোচনা চালাইতেছেন। একটার আলোচ্য বিষয় কৃষি। দ্বিতীয়টায় আলোচিত হইতেছে কারখানা-শিল্প। আর তৃতীয় বিভাগের আলোচ্য কথা ব্যবসা-বাণিজ্য। স্যার অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কৃষি-বিভাগের ভারতীয় প্রতিনিধি।

কাগজের মতন নরম কাচ

পৃথিবীতে বর্ত্তমানে নানা কাজে কাচ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কাচের এই একটা মস্ত অসুবিধা যে, উহা অতি সহজেই ভাঙ্গিয়া যায় এবং উহা নমনীয় নহে। সম্প্রতি ইংল্যণ্ডের একজন বৈজ্ঞানিক নমনীয় কাচ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই কাচ যে-ভাবে-ইচ্ছা মোচড়াইলেও ভাঙ্গে না, কাগজের মত কাঁচি দিয়া উহাকে সহজেই কাটা যায়—অধিকন্তু আগুনের সংস্পর্শে উহার কোনো পরিবর্ত্তন হয় না। ইংল্যণ্ডে বর্ত্তমানে তিন ফুট চওড়া ও একশত ফুট লম্বা কাচের পাত তৈয়ারী হইয়া বিক্রয় হইতেছে।

আমেরিকায় ভারতীয় চিকিৎসক

জগদ্বিখ্যাত দাতা ধনকুবের রকফেলারের টাকায় আমেরিকায় অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসা-বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ হইবার জন্য রকফেলার-ফাউণ্ডেশনের কর্ম্মকর্ত্তারা ভারত সরকারকে ৬টি ভারতীয় যুবক বাছাই করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন। ভারত সরকার কিন্তু মাত্র ৪জনকে মনোনীত করিয়াছেন। ইঁহাদের দুই জন মাদ্রাজী, একজন পাঞ্জাবী ও একজন যুক্ত প্রদেশের লোক।

ক্যানাডার প্রদর্শনীতে বিজয়রাঘব

আগামী ২৮ আগষ্ট টোরোণ্টো শহরে ক্যানাডার "ন্যাশন্যাল একজিবিশ্যান" অনুষ্ঠিত হইবে। এই প্রদর্শনীর দুয়ার খুলিবার জন্য মাদ্রাজের স্যার বিজয়রাঘব আচারিয়ার ক্যানাডা গবর্মেণ্টের নিমন্ত্রণ পাইয়াছেন। তিনি মাদ্রাজের মৎস্য ও শিল্পবিভাগের ডিরেক্টর। গত বৎসর তিনি লণ্ডনের সাম্রাজ্য-প্রদর্শনীতে অন্যতম ভারতীয় কমিশনর ছিলেন।

স্বাস্থ্য-রক্ষার জার্ম্মাণ প্রদর্শনী

বিগত এপ্রিল মাসে জার্ম্মাণির প্রায় প্রত্যেক শহরে ও পল্লীতে স্বাস্থ্যরক্ষার মেলা অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এই আন্দোলনের নাম ছিল সাম্রাজ্যের স্বাস্থ্য-সপ্তাহ (রাইখ্‌স্ গেজুণ্ড্‌-হাইট্‌স্ হ্বোখে)। প্রত্যেক জার্ম্মাণ নরনারীর আয়ু এবং কর্ম্মক্ষমতা বাড়াইয়া তোলা এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য।

এই উপলক্ষ্যে বার্লিনের "ফুঙ্ক-হালে" সৌধে (র‍্যাডিও ভবনে) "বর্ত্তমান যুগের স্বাস্থ্যরক্ষা-প্রণালী" প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রদর্শনী নানা বিভাগে বিভক্ত ছিল,—(১) বিবাহ এবং প্রাক্‌-বিবাহ সম্পর্কে যাহা-কিছু জ্ঞাতব্য। (২) জন্ম ও শৈশব,—শিশুদের খাদ্য, মাতৃপিতৃহীন শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ, বিদ্যালয়ের চিকিৎসকের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, কানা, খোঁড়া, কালা এবং অন্যান্য বিকলাঙ্গদের বিদ্যালয়, বিদ্যালয়ের দন্তচিকিৎসালয়, বাল্যাবস্থার খাদ্যাখাদ্য ইত্যাদি বিষয়ক নানা তথ্য এই সংগ্রহে দেখানো হইয়াছে। (৩) কর্ম্মক্ষেত্র এবং সামাজিক বীমা,—শিল্প-কারখানা এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে পরামর্শ, কারখানা-বিষয়ক স্বাস্থ্যরক্ষার বিধিব্যবস্থা, ফ্যাকটরি-সংসৃষ্ট খেলাধুলার মাঠ এবং ব্যায়াম-ভবন ইত্যাদি। সঙ্গে সঙ্গে হতাহত সম্পর্কে প্রাথমিক সাহায্য, কারখানার দৈব হইতে আত্মরক্ষার উপায়, বীমায় চাঁদা দিবার নিয়ম, সরকারী বীমা-প্রতিষ্ঠানসমূহের আইনকানুন, সার্ব্বজনিক স্বাস্থ্য-ভবন, পাহাড়ী আরোগ্যশালা ইত্যাদি সম্বন্ধে খবরাখবর কিছুই বাদ যায় নাই। (৪) খেলাধুলা, কুস্তী, কসরৎ, ব্যায়াম-চিকিৎসক, ব্যায়াম-শিক্ষক, দৌড়ঝাঁপের আখড়া, সাঁতার-বিদ্যালয় ইত্যাদি এক স্বতন্ত্র বিভাগের অন্তর্গত ছিল। (৫) যক্ষ্মারোগ-ঘটিত সকল তথ্য অন্য এক বিভাগে প্রদর্শিত হইয়াছে।

উদ্বর্ত্ত পত্র

শিল্প-বাণিজ্য-বিষয়ক কোম্পানীসমূহ বৎসরে দু'একবার "ব্যালান্স শীট" প্রকাশিত করে। আয়-ব্যয়ের বৃত্তান্ত এই সকল "উদ্বর্ত্ত পত্রে" প্রচারিত হয়। লণ্ডনের ধনবিজ্ঞান বিদ্যালয়ে এই বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন শ্রীযুক্ত হ্বিলিয়াম ক্যাশ (১৭ই মে)।

লিওঁ শহরের প্রদর্শনী

ফ্রান্সের লিওঁ শহর শিল্প-বাণিজ্যের বড় কেন্দ্র। এই খানে যে প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় তাহাকে ফরাসীরা "ভ্রেমঁ। আঁত্যার্ণ্যাশন্তাল" (দস্তুরমতন আন্তর্জ্জাতিক) বলিয়া থাকে। ১৯২৫ সনে খরিদ্দার আসিয়াছিল যুক্তরাষ্ট্র, সুইটস্যার্ল্যাণ্ড, বিলাত, বেলজিয়াম, ইতালি, চেকোস্লোভাকিয়া, রুশিয়া, ডেন্মার্ক, স্পেন, আর্জ্জেন্টিনা, অষ্ট্রিয়া, হলাণ্ড, সুইডেন এবং মেকসিকো ইত্যাদি দেশ হইতে রেশম, টুপী, তুলার কাপড়-চোপড়, ধাতুজ দ্রব্য, চীনের বাসন, কাগজ-পত্র, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, অটোমোবিল ইত্যাদি হরেক বস্তু ফরাসীরা বেচিয়াছে।

জার্ম্মাণির কৃষি-পরিষৎ

"ড্যয়চে লাণ্ডহ্বির্টশাফ্‌ট্‌স-গেজেলশাফ্‌ট্" নামক "জার্ম্মাণ কৃষি-পরিষৎ" ৪০ বৎসর পূর্ণ করিল। ১৮৮৫ সনে ২৫০০ সভ্য লইয়া এই পরিষদের জন্ম। ১৯২৪ সনে ৩৩,০০০ ছিল সভ্য-সংখ্যা। কৃষিকর্ম্মে যন্ত্রপাতি এবং বিজ্ঞান কায়েম করা এই পরিষদের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ৪০।৪৫ বৎসর পূর্ব্বে জার্ম্মাণির চাষীরা চাষবাসে যথোচিত সুফল পাইত না। সেই দুর্গতি নিবারণ করিবার জন্যই কৃষিৎকর্ম্মা লোকেরা উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছিল। আলবার্ট লুপিট্‌স্ নামক এক ব্যক্তি রাসায়নিক সার ব্যবহারের পথ-প্রদর্শক। কৃষি পরিষদের উদ্যোগে এই সারের ব্যবহার জার্ম্মাণ চাষী মহলে দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে।

বিজলীর সাহায্যে উর্ব্বরতা-বৃদ্ধি

নভোমণ্ডল হইতে বিদ্যুত লইয়া বৃক্ষের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করা যায় কিনা, এই সম্বন্ধে গোয়াটিমালার শ্রীযুক্ত য়োসে গ্যালেগোস পরীক্ষা করিতেছিলেন। "সায়েন্টিফিক আমেরিকান" পত্রিকায় তাঁহার একটী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। তাহার সারাংশ নিম্নে দেওয়া গেল :—

তাড়িত-বাহক (লাইটনিং কণ্ডাক্‌টার) হওয়া বৃক্ষগুলির স্বাভাবিক ধর্ম্ম। তাহাদের পাতা ও কাঁটার অগ্রভাগ নভোমণ্ডলের সঙ্গে বৈদ্যুতিক সম্পর্ক-বিশিষ্ট দেখা যায়। প্রত্যেক বজ্র-ঝঞ্ঝার পরে বৃক্ষগুলি নূতন শক্তি ও বিকাশ লাভ করে। যদি সরু তামার বাঁধ দিয়া বৃক্ষের ডাঁটা ও শাখার দুই তিন জায়গায় তামার তার লাগান যায় এবং তাহাদের উপরের প্রান্তগুলি নভোমণ্ডলের দিকে ক্ষুদ্র বজ্র-শূলের আকারে উন্মুখ করিয়া রাখা যায়, তবে বৃক্ষ নভোমণ্ডলের বিদ্যুতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসে। তাহার ফলে গাছের এমন উত্তেজনা হয়, যাহাতে তাহারা অনেক নূতন ফুল ও ফল ধারণ করে। এই কৌশলের জন্য ফলগুলির আকার এবং গুণও অনেক বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

পেয়ারা ও লেবুর গাছ লইয়া নানাবিধ পরীক্ষা চলিয়াছিল। বিদ্যুৎকে উর্ব্বরাকারক রূপে ব্যবহার করিয়া উভয় গাছেই বেশ সুফল পাওয়া গিয়াছে।
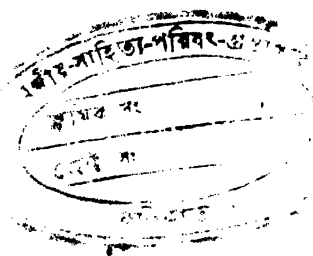
ব্যাঙ্কের কার্য্য-পরিচালনা

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ লাহিড়ীর মতামত

[কলিকাতার "হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ১৯০৫-৬ সনের স্বদেশী যুগের অন্যতম বাঙালী প্রতিষ্ঠান। বিগত গ্রীষ্মের সময় এই ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান ম্যানেজার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ লাহিড়ীর সঙ্গে আমাদের যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল নিম্নে তাহার শর্ট্‌ হ্যাণ্ড বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইতেছে।]

প্রশ্ন:—আপনাদের ব্যাঙ্ক কি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ?

উত্তর—আমাদের "আর্টিকেল" (গঠন-শাসনের নিয়ম) নুসারে লভ্যাংশের কিছু হিস্যা অংশীদারদের আর কিছু হিস্যা আমাদের কর্ম্মচারীদের দিবার ব্যবস্থা আছে।

প্রঃ—তাহলে বীমা-কোম্পানী যাকে "বোনাস" দিবার প্রণালী বলে' সে প্রণালীর সঙ্গে আপনাদের সমবায় ব্যাঙ্কিং প্রণালী কি এক, না কোনো তফাৎ আছে ?

উঃ—বীমা কোম্পানীর "বোনাস" দেওয়া হয় নিজ ব্যবসার সম্পূর্ণ মূল্য-নির্দ্ধারণের উপর, কিন্তু আমাদের প্রথায় লভ্যাংশ ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে "বোনাস" বিতরিত হয়।

প্রঃ—তা ছাড়া প্রণালীটা এক বলবেন ? শুধু তফাৎ—একটা লভ্যাংশের উপর, অপরটা "ভ্যালুয়েশ্যন" বা মূল্য-নির্দ্ধারণের উপর নির্ভর করে ?

উঃ—তা ছাড়া, বীমা কোম্পানীর "বোনাস" বীমাকারীরা পায়, কর্ম্মচারীরা পায় না। অধিকন্তু, এই ব্যাঙ্কে আমানতকারীরা সুদও পায় আবার কিছু কিছু লভ্যাংশও ভোগ করে।

প্রঃ—ইতিমধ্যে কয়বার দিয়েছেন ?

উঃ—১৯২০ সনের চলতি হিসাবে যে সব আমানতকারীর সঙ্গে সারা বৎসর কাজ চলেছে, তাদের বোনাস দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায়, ১৯২৬ সনের এই ৩ মাসে যা দেখা গেল এ বৎসরের শেষে অংশীদার ভিন্ন আমানতকারীদের জন্যও লভ্যাংশের কিছু ছাড়া যেতে পারবে।

প্রঃ—এই রকম ব্যাঙ্ক বাংলা দেশে আর আছে ?

উঃ—না।

প্রঃ—আচ্ছা, মফঃস্বলে যে সব "লোন আফিস" আছে তার সঙ্গে তুলনায় আপনাদের ব্যাঙ্কের কার্য্য-প্রণালী কি রকম ? লোন আফিসে আর ব্যাঙ্কে প্রভেদ কি ?

উঃ—আমানতের তরফ হইতে মফঃস্বলের লোন আফিস আর কলিকাতার ব্যাঙ্ক একই জিনিষ। আমানত লওয়া হয় দুই ক্ষেত্রেই একই রকম লোকের নিকট হইতে। কিন্তু টাকা খাটাইবার প্রণালীতে প্রভেদ আছে।

প্রঃ—আচ্ছা, মফঃস্বলের লোন আফিসগুলি কি ভাবে টাকা খাটালে তাদেরকে আপনি ব্যাঙ্ক বলবেন ?

উঃ—কলিকাতার ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ জমিজমা বন্ধক লইয়া কোনো লোককে টাকা দেয় না। মফঃস্বলে এটা আছে। অবশ্য মফঃস্বলের লোন আফিসগুলাও কলিকাতার প্রণালীতেই আসছে। তারা এতদিন যে ভাবে চলেছে তাতে তাদের অনেক অসুবিধা

এসে জুটেছে। জমিদারীর উপর টাকা লাগাবার ঝোঁক বেশ কমে এসেছে মনে হয়। লোন আফিস-গুলা খাঁটি ব্যাঙ্কে পরিণত হবার পথে খানিকটা এগিয়েছে বলতে পারি। এটা আমি লক্ষ্য করেছি, তাদের লোন আফিসের যে অপবাদ তা দিন দিন ঘুচে যাচ্ছে—একদিনে যাবে না যদিও, তথাপি ক্রমে যে উন্নতির দিকে যাচ্ছে তা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়।

প্রঃ—কোনো একটী জেলা সম্বন্ধে বলতে পারেন যার কাজ ব্যাঙ্কের লাইনে অগ্রসর হয়েছে ?

উঃ—পারি। মফস্বঃলের লোন আফিস এবং ব্যাঙ্কের সঙ্গে আমাদের ব্যাঙ্কের কারবার সকলের চেয়ে বেশী। আমরা রাজসাহী সদর, নাটোর, নওগাঁ, পাবনা সদর পাবনার মফঃস্বল, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর সাব-ডিভিশ্যান, রংপুর সদর, জলপাইগুড়ি, ময়মনসিং সদর, জামালপুর, চাটগাঁ, পুরী, পাটনা, বিহার, গয়া, বিহার ইত্যাদি ২৪।২৫টী ব্যাঙ্কের সঙ্গে কারবার করছি। এদের কারবার গত ৫ বৎসরে যা দেখতে পেয়েছি তাতে বুঝি, পাবনা সদর সকলের চেয়ে এগিয়ে গিয়েছে। তারপর জলপাইগুড়ি সদর।

প্রঃ—আচ্ছা, এই যে মফঃস্বলের ব্যাঙ্কগুলি আপনাদের সঙ্গে কারবার করছে তাদের ২।১টী কারবারের প্রণালী বলতে পারেন ? কোন্ কোন্ বিষয়ে তারা আপনাদের সাহায্য চায় ?

উঃ—পারি। মফঃস্বলের ব্যাঙ্কের সহিত আমাদের এই ভাবের কাজ নিম্নরূপ। বাংলা দেশে মফঃস্বলের প্রায় সর্ব্বত্র কলিকাতা থেকে নুণ, চিনি, কেরোসিন, কাপড় করগেটেড আইরন শিট ও মসল্লা কিনে। তার দরুণ কলিকাতায় দাম দিতে হয়। মফঃস্বলের বেপারীরা মফঃস্বলের ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়ে সেই ব্যাঙ্কের কাছ থেকে আমাদের ব্যাঙ্কের উপর একটা চেক নিয়ে আসে। সেই চেক আমাদেরকে দিলে আমরা ভাঙ্গিয়ে দিই। আর তারা মালবিক্রেতাদের "পেমেন্ট" করে' ফিরে যায়। অনেক সময় মফঃস্বলের বেপারীদের নিজের আসবার দরকার হয় না। মফঃস্বলের ২।৩ জায়গার যে মাল কলিকাতায় বিক্রীর জন্য আসছে তার দাম কলিকাতা থেকে মফঃস্বলে পাঠাতে হয়। তার জন্য অনেক সময় "পেমেন্টটা" কলিকাতায়ই পাওয়া যায়। সেই টাকা আমরা সংগ্রহ করে' মফঃস্বলের বেপারীদের জমার খাতে ক্রেডিট করে দিই। কাজেই মফঃস্বলের লোকেরা যখন খরিদ্দার হয় তখন আর কলিকাতায় কিছু টাকা বা চেক না পাঠাইলেও চলে। অনেক সময় মফঃস্বল থেকে সমস্ত সপ্তাহে যত টাকা জমা পড়ে তা সপ্তাহ অন্তে এখানে একবার পাঠিয়ে দেয়। সে টাকাথেকেও কলিকাতায় তাদের যা কিছু দেনা আছে সবই শোধ করা হয়। ফলতঃ, কলিকাতা এবং লণ্ডনের সঙ্গে যে ভাবে কাজ চলছে মফঃস্বল এবং কলিকাতার সঙ্গে ঠিক সেই প্রণালীতে কাজ চলছে। কিছু কিছু করে এবং ক্রমে বেশী কাজ চলতে আরম্ভ হয়েছে বললেই ঠিক বলা হয়।

প্রঃ—তাহলে আসল টাকার চলাচল, মফঃস্বল থেকে কলিকাতায় অথবা কলিকাতা থেকে মফঃস্বলে,—সপ্তাহে ও মাসে, নগদ কত প্রয়োজন হয় ? চেক চলে না নগদ চলে ?

উঃ—মফঃস্বলে—উত্তরবঙ্গে ও পূর্ব্ববঙ্গে আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা হয়েছে তার জোরেই বলছি, যেখানে পাটের কারবার বেশী চলছে সেখানে জুলাই, আগষ্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর পর্য্যন্ত কলিকাতা থেকে টাকা মফঃস্বলে বেশী যায়। মফঃস্বলের লোকেরা তখন পাট বেচে। অক্টোবরের শেষে নবেম্বরে মফঃস্বলের লোন আফিসে বহুতর টাকা জমা হয় এবং আস্তে আস্তে কলিকাতা পৌঁছে যায়।

প্রঃ—সে টাকাটা পাঠায় কেমন করে ? এখান থেকে টাকা চলাচলের প্রণালী কি ? ইম্পারিয়াল ব্যাঙ্ক সমস্ত মফঃস্বলে টাকা চলাচলের সুবিধা করে দেয় না ?

উঃ—আমরা এবৎসর পাটের বাবতে ময়মনসিংহ ইম্পারিয়াল ব্যাঙ্কের সাহায্যে কিছু কারবার করব তার জন্য

বন্দোবস্ত ঠিক করেছি, দেখি ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্ক কদ্দূর কি করে। জুলাই মাস হ'তে কাঁচা টাকা এখান থেকে পোষ্ট আফিস ও রেলে বেশীর ভাগ যায়।

প্রঃ—মফঃস্বলের লোন আফিস কিম্বা ব্যাঙ্কগুলাকে ব্যবহার করে কি?

উঃ—মফঃস্বলে বেশীর ভাগ জায়গায় চেক ব্যবহার হয় না। পোষ্টাফিসের সেভিংস্ ব্যাঙ্কের কারবার বেশী। "পাশ বই" চলে। সেখানে চেকের চলন নাই।

প্রঃ—মফঃস্বলের কোনো লোক মফঃস্বলের কোনো ব্যাঙ্ককে যদি বলে, কলিকাতার "অমুক লোককে টাকা পাঠাও" তাহলে চিঠি ভিন্ন উপায় আছে কি?

উঃ—কলিকাতার কোনো ব্যাঙ্কে মফঃস্বলের কোনো ব্যাঙ্কের যদি টাকা জমা থাকে, তা হলে সেই ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ কলিকাতার ব্যাঙ্ককে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেয় যে, অমুক লোককে টাকা দিতে হবে। মফঃস্বলের ব্যাঙ্ক চেক দেয় না। আমরা অবশ্য মফঃস্বল ব্যাঙ্কের' চেক নিতে প্রস্তুত আছি। তবে তারা সাধারণতঃ "ড্রাফ্‌ট্" 'ব্যবহার করে' থাকে। তারা চেক ব্যবহার না করে' আমাদের উপর অর্ডার দিলে, আমরা টাকাটা যথাস্থানে সমঝিয়ে দিই। বিলাতেও "ড্রাফ্‌ট্" চলে বিস্তর।

প্রঃ—ড্রাফ্‌টের চল কি আমাদের দেশে বেশ বাড়ছে?

উঃ—নিশ্চয় মনে হচ্ছে। তা ছাড়া এক ব্যাঙ্কের সঙ্গে আমাদের প্রাইভেট কোড টেলিগ্রাফিক কারবার ও চলছে। আজকে "টি-টি" পেলাম "অমুককে অত টাকা দাও।" বিলেতে ঠিক যা হয়েছে, রসিদ দিয়ে টাকা নিয়ে চলে গেল। আজকেই নিয়েছে। আবার আকিয়াব থেকে টেলিগ্রাম এসেছে। এটা চাটগাঁএর কারবার।

প্রঃ—আচ্ছা, ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় আমাদের দেশে উন্নতি হচ্ছে না কেন,—যেমন হওয়া উচিত? অথবা আপনি কি মনে করেন উন্নতি হচ্ছে?

উঃ—আমার বিশ্বাস যে ব্যাঙ্কিং স্বভাবে (ব্যাঙ্কিং হ্যাবিট) বাঙ্গালী খুব দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে।

প্রঃ—ব্যাঙ্কিং হ্যাবিট বলতে কি বুঝেন?

উঃ—নিজের কাছে টাকা জমা না রাখা; নিজে লগ্নি কারবার না করা। জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্কিং মফঃস্বলে গত ৪ বৎসরে যে হারে বেড়েছে তার ফল খুব আশা-প্রদ। মফঃস্বলের ব্যাঙ্কের উপর বিশ্বাস মফঃস্বলের নরনারীর দিন দিন বাড়ছে। ব্যাঙ্কিংয়ের মূল কথা বিশ্বাস। যে ব্যাঙ্কের কার্য্য-পরিচালনা-প্রণালী জনগণের মধ্যে অনেকখানি বিশ্বাস সৃষ্টি করে তার উন্নতি ক্রমে দেখতে পাওয়া যায়। কলিকাতার ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে—কলিকাতায় মাড়োয়ারীদের যে কয়টী ব্যাঙ্ক আছে তাদের অবস্থার বিষয় আলোচনা করতে গেলে কথাগুলা নেহাৎ ব্যক্তিগত হয়ে পড়্‌বে—এই আশঙ্কায় আমি কিছু বলতে চাই না।

প্রঃ—ব্যাঙ্ক-পরিচালনার গুরুত্ব কোথায়?

উঃ—যে সমস্ত লোক শিল্পে ও বাণিজ্যে নিযুক্ত আছে তাদের সাধুতা, আত্মসম্মান, বাজারের প্রতি দায়িত্বজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় যেখানে কম সেখানে ব্যাঙ্কের আপদ্-বিপদ অনেক। এই বিষয়ে মাড়োয়ারী সমাজের প্রশংসা না করে থাকা যায় না। তারা "ডিউ ডেট" (টাকা শোধ দিবার নির্দ্দিষ্ট দিন-ক্ষণ, মাফিক যাতে কাজ হয়, তার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে। "ওয়াদা" "মুদ্দৎ" ইত্যাদি শব্দের রেওয়াজ মাড়োয়ারী মহলে অনেক পাবেন।

প্রঃ—"ডিউ ডেট"এর ইজ্জৎ বাংলায় বেশী লোকে বুঝে না কি?

উঃ—সুখের বিষয় ক্রমে অতি আস্তে আমরা বাঙ্গালীরা এই সকল বিষয়ের উপকারিতা বেশ উপলব্ধি করছি। লড়াইয়ের সময়ে আর লড়াইয়ের ঠিক পরে যে রকম "বোগাস" কোম্পানী এবং বোগাস ফার্ম্ম এবং রাতারাতি বড় মানুষ হওয়ার ইচ্ছায় প্রলুব্ধ লোক ব্যবসায়ের ভিতর এসে পড়েছিল। তারা আজকাল প্রায় খতম হয়ে এসেছে। এখন যে

সকল ব্যবসা-বাণিজ্য রয় সয় সে সব আস্তে আস্তে বাড়ছে। যাদের কারখানা বা কারবারকে সাহায্য করবার জন্য ব্যাঙ্ক টাকা দেয় তারা প্রতিজ্ঞা মত টাকা শোধ করলে ব্যাঙ্কের দুর্যোগ কমে। নালিশ করে' বন্ধক ধরে' টাকা আদায় করতে গেলে ব্যাঙ্কের দুর্যোগ বাড়ে, বলাই বাহুল্য।

প্রঃ—কৃষি, শিল্প আর বাণিজ্য এই তিনের মধ্যে আপনি কোনো তফাৎ করতে চান? ব্যাঙ্কের ব্যবসা হিসাবে কোন দিকে সাহায্য করা ব্যাঙ্কের উচিত।

উঃ—তফাৎ করতে পারি। জিনিষ খরিদ-বিক্রী ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে "লিকুইড ট্র্যানজ্যাকশান্" (সচল টাকার কারবার) মনে করা হয়। কারণ জিনিষ বিক্রী হলে টাকা হাতে আসে। ব্যাঙ্কের পাওনা টাকা চলে আসে। কিন্তু ফ্যাকটরির মালিকেরা টাকা নিয়ে বেশীর "ভাগ ব্লক" অ্যাঁকাউন্টে ইমারতে, যন্ত্রপাতিতে আর কুদরতী মালে খরচ করে। তাতে টাকাটা আটক পড়ে যায়, নড়নচড়ন-হীন হয়ে থাকে। কাজেই টাকা উশুল হওয়া ফ্যাকটরির পক্ষে অসাধ্য সাধন দাঁড়িয়ে যায়। "ফ্যাকটরি প্ল্যাণ্ট", লোহালক্কড়, কলকব্জা ইত্যাদি বাবদ যে টাকা খরচ হয় সেই ফ্যাকটরি চলবার পর তাহার লভ্যাংশ থেকে দেনা শোধ হতে অনেক সময় লাগে। অথচ অনেকগুলি ফ্যাকটরি আমার যা জানা আছে, নিজদের "পেড আপ ক্যাপিট্যাল" (উশুল করা পুঁজি) কম নিয়ে কাজ আরম্ভ করে' বসে। "ওয়ার্কিং ক্যাপিট্যাল" (দৈনিক কাজ চালাবার মূলধন) না থাকার দরুণ ব্যাঙ্কের কাছে ধার করতে হয়। যতটা দরকার ততটা ব্যাঙ্ক না দিলে লভ্যাংশ কমে যায়। মূল দেনা শোধ হতে পারে না।

প্রঃ—দেশের লোককে এই সম্বন্ধে আর কিছু সাধারণ ভাবে বলতে চান?

উঃ—আমি যতটুকু দেখেছি তাতে আমার মনে হয়েছে বাঙ্গালী এখন চিনা-পরিচয়ের উপর বেশী বিশ্বাস করে। কোম্পানীর গুণাগুণ দেখে তাতে টাকা কম ঢালে। যোগ্যতার যথার্থ পরিচয় দিলে বাঙ্গালীর ব্যবসায় উন্নতির বাধা আছে কিম্বা ভবিষ্যতে হবে আমি মনে করি না।

বাঙ্গালা দেশে ৪০ কোটী টাকার উপর পাট বিক্রী হয় ২৬ কোটী টাকার উপর চা বিক্রী হয়। বাঙ্গালীদের অংশ এতে কতই কম! জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীর উপর বাংলা দেশের যথেষ্ট অশ্রদ্ধা আছে জানি। কিন্তু এবৎসর অত্যন্ত সুখের সহিত দেখ্‌ছি কোম্পানী ভাসাবার পর ক্যাপিটাল যত চাই তার চেয়ে বেশী চাঁদা উঠেছে। এ সব সুলক্ষণ। তা ছাড়া, জয়েণ্ট-ষ্টক ব্যাঙ্কিং মফঃস্বলে দিন দিন উন্নতি লাভ করছে' এটাও সুলক্ষণ। কলিকাতার ব্যাঙ্কিং—যেটাকে বাংলাদেশের সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-কারবারের "কী" বা চাবি মনে করা যায়—তার উন্নতির জন্যও সকলে বদ্ধ-পরিকর হয়েছে।

এই সময় বাংলায় যাঁরা বিদ্যা-চর্চ্চার দিক্ থেকে, "থিয়োরির" দিক্ থেকে, আর্থিক সাহিত্য সৃষ্টি করার দিক থেকে, আর দেশের লোককে ব্যাঙ্কিং, বীমা, পুঁজির সদ্ব্যবহার ইত্যাদি বিষয় বুঝাবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন তাঁদের নিকট ব্যবসায়ীদের ও ব্যাঙ্কারদের বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকারই কথা।
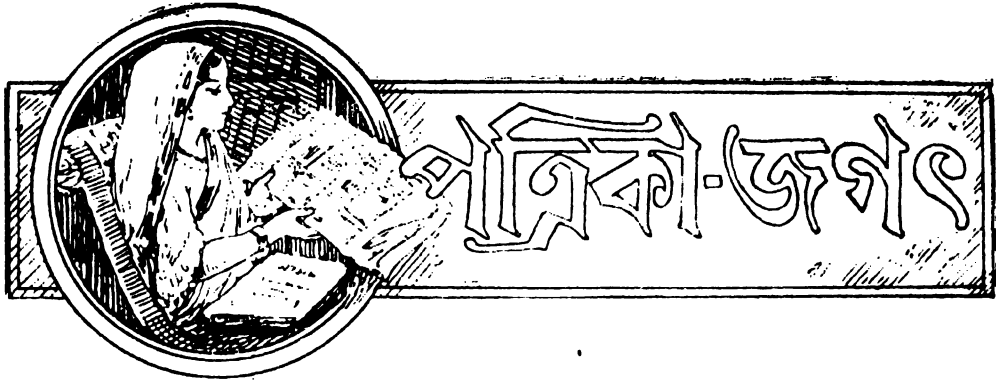
জ্যর্ণালে দেলি একনমিস্তি এ রিহ্বিস্তা দি স্তাতিস্তিকা

ইতালিয়ান ভাষায় "ধনবিজ্ঞান ও সংখ্যা-বিজ্ঞান" বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। রোম হইতে প্রকাশিত। রোমের ব্যবসায়-কলেজের অধ্যাপক আলব্যার্ত্তো বেনেহ্বচে, ত্রিয়েস্তের ব্যবসায়-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দেল হ্বেক্কো এবং মিলানো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জ্যর্জ্য মর্ত্তারা এই পত্রিকার সম্পাদক। ৪১ বৎসর ধরিয়া চলিতেছে।

এই পত্রিকার সমালোচনা-অংশ সম্বন্ধে কিছু পরিচয় দিতেছি। এই বৎসরের এপ্রিল সংখ্যায় ৫ খানা বইয়ের "বিস্তৃত" বিবরণ আছে। সমালোচক চার বিভিন্ন ব্যক্তি। বইগুলার ভিতরে ৩টা ইতালিয়ান, ১টা মার্কিণ এবং ১টা ইংরেজী। ৫টা সমালোচনায় রয়্যাল অকটেভো আকারের ২ পৃষ্ঠা মাত্র গিয়াছে। এই ধরণের "বিস্তৃত" বিবরণকে বলে "রেচেন্‌সিঅনি" (বিশ্লেষণ বা সমালোচনা)।

আর ১৭ খানা বই সম্বন্ধে আছে "নতে বিব্লিঅ-গ্রাফিকে" (সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ-পরিচয়)। এইজন্য লাগিয়াছে ৪ পৃষ্ঠা। ৯ জন লেখকের সাহায্যে এই গ্রন্থপঞ্জী তৈয়ারী করা হইয়াছে। বইগুলার ভিতর ১ খানা স্পেনিশ, ১খানা উক্রাণিয়ান, ২ খানা ইংরেজী, ৪ খানা ফরাসী, ৭ খানা জার্ম্মাণ এবং ২ খানা ইতালিয়ান।

গ্রন্থগুলার নাম নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে,—

"লাৎস্তেন্দা ইন্দুস্ত্রিয়ালে" (শিল্প-কারখানার শেয়ার); ব্রলিয়া; তরিণ (টুরিণ); মার্কুরিঅ কোং; ১৯২৫; ৫০ লিয়ার।

"ল' কম্যার্স এ ল্যাঁদুস্ত্রী দ' লা অংগ্রী আঁ ১৯২৪" (হাঙ্গারি দেশের শিল্প-বাণিজ্য,—১৯২৪ সনের কথা); বুদাপেস্ত; শাঁবর দ' কম্যার্স এ দ্যাঁদুস্ত্রী; ১৯২৫।

"ডী হ্বেরুংস্ প্রোব্‌লেমে সোহ্বিয়েটরুস্‌লাণ্ড্‌স্" (সোহ্বিয়েট রুশিয়ার মুদ্রাসমস্যা),—জুরোহ্বস্কি; বার্লিন; প্রাগার কোং; ১৯১৫।

"শিপিং" (জাহাজের খালাশী),—লেবার রিসার্চ ডিপার্টমেণ্ট; লণ্ডন; লেবার পাব্‌লিশিং কোং; ১৯২৩; ১ শি।

"ইল্ পাত্রিমনিঅ প্রিভাত দুন দজে দেল সেকল ১৩" (ত্রয়োদশ শতাব্দীর এক দজে-নবাবের নিজ পৈত্রিক সম্পত্তি),—লুৎসাত্ত; হ্বেনিস; ১৯২৫।

"মানি" (টাকাকড়ি),—লেফেল্ট্; লণ্ডন; অক্‌সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস; ১৯২৬; ২ শি ৬ পে।

"দি ফর্মেটিভ পীরিয়ড অব্ দি ফেডার্যাল রিজার্ভ সিষ্টেম" (ফেডার্যাল রিজার্ভ-ব্যাঙ্কিং প্রথার জন্মকাল),—হার্ডিং; বষ্টন; হটন মিফ্‌লিন; ১৯২৫; ৪.৫০ ডলার।

"লেৎসিয়োনে দি এস্তিমো" (হিসাব-শিক্ষা),—মারেঙ্গি; মিলান; লিব্রেরিয়া এদিত্রিচে পলিতেক্‌নিকা; ১৯২৫; ৫০ লিয়ার (৫৲)।

"ইল্ বিলাঞ্চ্য দেল্লে সচ্যেতা আননিমে" (ব্যবসা-কোম্পানীর উদ্বর্ত্তপত্র); দে গব্বিস; রোম; আল্‌বৃজি এ সেগাতি; ১৯২৫; ৩০ লিয়ার (৩৲)।

"লোত্রিশ্ এ সন্ একজিস্তাঁস্ একোনোমিক" (অষ্ট্রিয়ার আর্থিক স্থিতি),—বাশ ও দ্বোরাচেক; প্রাগ (চেকো-স্লোহ্বাকিয়া); অরবিস কোং; ১৯২৫; ৬.৫০ ফ্রাঁ।

"প্যর লা স্তরিয়া দেল্লে কস্‌ক্রৎসিয়নি নাহ্বালি আ হ্বেনেৎসিয়া নেই সেকলি ১৫ এ ১৬" (১৫ ও ১৬ শতাব্দীর

ভেনিসে নৌশিল্পের ইতিহাস),—কুৎসাও ; পাদুআ ; ১৯২৫।

"ক্যেন্তিয়োনেস দে দেরোকো মারিতিমে" (সামুদ্রিক শিল্প ও বাণিজ্য-বিষয়ক আইন),—মাৎসি ; কর্দবা (স্পেন) ; ১৯২৫ (স্পেনিশ ভাষায় লিখিত)।

"লে দোক্‌ত্রিন্ জেকোনোমিক আঁ ফ্রাঁস দেপুই ১৮৭০" (ফ্রান্সে আর্থিক মতবাদ— ১৮৭০ সনের পরবর্ত্তী কাল), পিরু ; প্যারিস ; কলাঁ ; ১৯২৫ ; ৬ ফ্রাঁ।

"ডী ডেফ্‌লাটসিয়োন উণ্ড ঈরে প্রাক্‌সিস্ ইন্ এংলাণ্ড, ডেন ফারাইনিগ্‌টেন ষ্টাটেন, ফ্রাঙ্করাইখ উণ্ড ডার চেকোস্লোহ্বাকাই" (মুদ্রার পরিমাণ-হ্রাস,—ইংলাণ্ড, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স এবং চেকোস্লোহ্বাকিয়া এই চার দেশের অভিজ্ঞতা),—রিস্ত্ ; বার্লিন ; স্প্রিঙ্গার ; ১৯২৫ ; ৬·৫০ মার্ক (ফরাসী গ্রন্থের জার্ম্মাণ অনুবাদ)।

"রী-বিল্ডিং ইয়োরোপ" (ইয়োরোপকে পুনর্গঠিত করা),—রাউজ ; লণ্ডন ; ষ্টুডেণ্ট ক্রিশ্চিয়ান মুভ্‌মেণ্ট ; ১৯২৫ ; ২ শি ৬ পে।

"ডী হ্বেরুংস্-গেজেট্‌স্-গেবুঙ্ ডার সুকৃৎসেসিয়োনস্-ষ্টাটেন এষ্টার-রাইখ্-উঙ্গার্ণস্" (অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গারি হইতে পুনর্গঠিত নবীন রাষ্ট্রপুঞ্জের মুদ্রা-বিধি)—ষ্টাইনার ; হ্বিয়েনা; ফার্বাণ্ড্ এষ্টার-রাইখিশার বাঙ্কেন উণ্ড বাঙ্কিয়ার্স ; ১৯২১।

"ওষ্ট্-অয়রোপ্যেইশার আউফবাউ" (পূর্ব্ব-ইয়োরোপের গঠন) ; ক্যেনিগ্‌সবার্গ ; জেফ্‌ট্ কোং ; ১৯২২ (১৯২২ সনের ২০ মার্চ, সোহ্বিয়েট রুশিয়ায় বিদেশী মুদ্রার সঙ্গে রুব্‌ল্ মুদ্রার বিনিময় সম্পর্কে যে আইন জারি হইয়াছিল সেই আইন রুশ হইতে জার্ম্মাণে অনূদিত হইয়াছে। রুশিয়া এবং প্রাচ্য ইয়োরোপের জনপদ সম্বন্ধে আর্থিক অনুসন্ধান চালাইবার জন্য ক্যেনিগ্‌স্‌ব্যার্গে "হ্বির্ট্‌শাফ্‌ট্‌স্-ইনষ্টিটুট ফ্যির রুস্‌লাণ্ড উণ্ড ডী ওষ্ট-ষ্টাটেন" নামক প্রতিষ্ঠান আছে। সেই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগেই বর্ত্তমান গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে)।

"হ্বির্ট্‌শাফ্‌ট্‌স্-গেজেট্‌স্-গেবুঙ্ উণ্ড্ আক্‌টসিয়েন-কুর্সে ইন ডয়েচলাণ্ড জাইট ডার ষ্টাবিলিজীরুং" (জার্ম্মাণির আর্থিক আইন-কানুন এবং শেয়ারের দর,—মুদ্রাস্থিরী-করণের পরবর্ত্তী অবস্থা)—স্লুল্‌ৎস বাখ ; ষ্টুটগার্ট ; এঙ্কে কোং ১৯২৫ ; ৩·২০ মার্ক।

"উক্রাইনা—নতিৎসিয়ারিঅ স্তাতিস্তিক" (উক্রানিয়ার তথ্যরাশি) ; শার্কফ্ কোং ; ১৯২৫ (সরকারী রিপোর্ট, উক্রাণিয়ান ভাষায় লিখিত)।

"গেল্ড্-এণ্ট্‌হ্ব্যার্টুঙ্ উণ্ড লীফারগেশ্যেফ্‌টে" (মুদ্রার মূল্যপতন ও চুক্তি-ব্যবসা)—হ্বেগাণ্ড্ ; বার্লিন ; বার্ণ হাইমার কোং ; ১৯২৪।

"ল' প্রোব্‌লেম কঁস্তিতিয়শনেল শিনোআ" (চীনের শাসন-সমস্যা),—উ (চীনা গ্রন্থকার) ; প্যারিস ; জিরার কোং ; ১৯২৫ ; ১৫ ফ্রাঁ।

মাসের পর মাস ইতালিয়ান পণ্ডিতেরা এই প্রণালীতে পত্রিকা সম্পাদন করিয়া চলিতেছেন। ইতালিয়ান চিন্তা-ধারা কি ভাবে পুষ্ট হইতেছে তাহার সামান্য আভাষ এই প্রণালীর কাঠাম হইতে পাওয়া যাইবে। গ্রন্থগুলার ভিতর অথবা সমালোচনা-প্রণালীর ভিতর এই যাত্রায় প্রবেশ করিব না।

জার্ণ্যাল অব্ দি রয়্যাল সোসাইটি অব্ আর্ট্‌স্

রাজকীয় শিল্প-পরিষৎ-পত্রিকা ; সাপ্তাহিক ; লণ্ডন ; ১৪ মে, ১৯২৬ ; সুকুমার শিল্পে ও কারখানা-শিল্পে শিক্ষার ব্যবস্থা (ডসন)। লেখক বলিতেছেন—"জনগণের কর্ম্ম-ক্ষমতার চরম বিকাশ সাধন করাই বৃটিশ জাতির পক্ষে সর্ব্বপ্রধান চাবি-শিল্প।" প্রবন্ধটা আমাদের দেশে সু-প্রচারিত হইলে ভাল হয়।

ইন্‌ভেষ্টর্‌স্ রিহ্বিউ

পুঁজি-প্রযোক্তাদের পত্রিকা ; সাপ্তাহিক; লণ্ডন ; ২২মে, ১৯২৬,—(১) ক্রস্ অ্যাণ্ড ব্ল্যাকওয়েল কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা-বিশ্লেষণ, (২) রয়্যাল মেল ষ্টীম প্যাকেট কোম্পানীর বৃত্তান্ত। ২৯ মে,—(১) চায়ের ব্যবসায়-কোম্পানীদের আর্থিক স্বচ্ছলতা, (২) ইণ্ডিয়া জেনার‍্যাল ন্যাভিগেশ্যন অ্যাণ্ড রেলওয়ে কোম্পানীর উদ্বর্ত্ত-পত্র সম্বন্ধে আলোচনা।

লে দোকুমাঁ দু ত্রাভ্বাই

মজুর ও মজুরি বিষয়ক দলিল,—প্যারিস, বৎসরে ছয়বার বাহির হয়। ১৯২৫ সনের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে উল্লেখযোগ্য,—(১) বেকার সমস্যার সঙ্গে লড়াই ও দেশোন্নতি (মার্ক্স লাজার), (২) বিদেশী মজুর-সংগ্রহ ও নিয়োগ (ওয়ালিদ), (৩) বিলাতে বেকারদের শ্রেণীবিভাগ।

লেবার

মেহনৎ; মাসিক; কলিকাতা (২৩৬ বহুবাজার ষ্ট্রীট)। ভারতীয় ডাকঘর এবং রেলওয়ে বিভাগের কর্ম্মচারীদের মুখ-পত্র। বাংলা ও আসাম প্রদেশের চাকর্য়োরা এই মাসিকের পরিচালক। উল্লেখযোগ্য,—(১) মজুরি বাড়াইবার উপায়, (২) ব্যবস্থাপক সভায় ডাক ও ডাক-কর্ম্মচারীদের অবস্থা আলোচনা, (৩) ১৯২৫-২৬ সনের বাংলা ও আসামের কর্ম্মচারীদের প্রাদেশিক সমিতির বার্ষিক বিবরণী (এই সমিতির অন্তর্ভুক্ত ৩২টা জেলাসমিতি আছে। সভ্যসংখ্যা কেরাণীর নিম্নপদস্থ ৮৭২৮, কেরাণী এবং অন্যান্য চাকর্য়ো ৩৯৯৬। ১৯২৬ সনের মার্চ মাসে সমিতিগুলার জমা ছিল ২৪,৭৫৩৲ টাকা)।

কংস-বণিক পত্রিকা

বঙ্গীয় কংস-বণিক সম্মিলনীর মুখপত্র; মাসিক; বৈশাখ, ১৩৩৩; উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ,—বৃটিশ এম্পায়ার একৃজিবিশনে বাঙ্গালার কাংস্য ও পিত্তলের বাসন (শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী)। এই প্রবন্ধের কিয়দংশ নিম্নে বিবৃত হইল।

"যে সকল জিনিষ বিলাতে প্রেরিত হইয়াছিল তন্মধ্যে খাগড়া, নবদ্বীপ, বহিরগাছি, কলম প্রভৃতি স্থানের কাঁসার জিনিষগুলিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কলিকাতা সিমলার পিত্তলের পুতুল, শান্তিপুরের বৈঠক ও কমণ্ডলু এবং রাণাঘাটের কোবরা ক্যাণ্ডল্ ষ্টিক অর্থাৎ সর্পবাতিদান যদি আরও অধিক পরিমাণে পাঠান হইত তাহা হইলে তাহাও পড়িয়া থাকিত না, ইহাই আমার ধারণা।

"এক্ষণেবিদেশে—ভারতের বাহিরে, আমাদের কংসবণিক শিল্পজাত দ্রব্যাদি চালাইতে হইলে আমাদের শিক্ষিত স্বজাতীয়গণের মধ্য হইতে কার্য্যক্ষম ও অভিজ্ঞ লোক নিযুক্ত করিয়া উৎকৃষ্টতর দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে হইবে এবং বিভিন্ন দেশের প্রদর্শনী প্রভৃতির সাহায্যে গ্রাহক আকর্ষণ করিতে হইবে। এই সমস্ত বিষয়ে আমাদের স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণের মনোযোগ অত্যন্ত কম দেখিয়া সময়ে সময়ে আমি আমাদের সমাজের শিল্প-বাণিজ্য-বিষয়ক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অত্যন্ত সন্দিহান হইয়া পড়ি।

"দুঃখের কথা বলিতে কি—আমি বিলাত হইতে কত শিল্পের কল-কারখানা দেখিয়া আসিলাম, ঢালাই, গালাই, ফিনিশ্, পালিশ প্রভৃতির কত উৎকৃষ্টতর ও উন্নত পদ্ধতি দেখিয়া শিখিয়া আসিলাম কিন্তু আমার স্বজাতীয় শিল্পী ও বাণিজ্য-কুশল ভ্রাতৃগণের মধ্যে কাহারো সে সকল বিষয় জানিবার ও শুনিবার, বিলাতের বিবিধ শিল্পের পরিচালনা-প্রণালী ও অবস্থা অবগত হইবার আগ্রহ একেবারেই দেখিলাম না।"

"লেকোনোমিস্তা ওরোপেঅঁ"

"ইয়োরোপীয়ান ধনতত্ত্ববিৎ",—সাপ্তাহিক; প্যারিস; ১৯২৫ সনের জুলাই মাসে উল্লেখযোগ্য,—(১) সমাজ বীমা বিষয়ক আইনের খসড়া (মোরিস জালাবেয়ার), (২) কেরোসিন-শিল্প ও রাষ্ট্র (রেণেটেরি), (৩) মাগ্গি জীবন সম্বন্ধে বিলাতী গবর্মেণ্টের অনুসন্ধান (এদমঁ বুশেরি), (৪)১৯২৫ সনের ৪% কর্জ্জ সম্বন্ধে ডবল জামিন (রেণেটেরি), (৫) কর্জ্জদ্বারা কর্জ্জ-শোধ (টেরি), (৬) ইতালির আর্থিক ও রাজস্ব-ব্যবস্থা (রেমঁ মুলেৎ)।

কালিকলম

মাসিক; কলিকাতা; আষাঢ়, ১৩৩৩। অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত মুরলীধর বসু সাহিত্যসেবীর আর্থিক সমস্যা আলোচনা করিয়াছেন "বিচিত্রায়"। কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে,—

বড় বড় কাগজগুলি যে কাহাকেও কিছু না দিয়াই সকলকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করিয়া চালানো হয় এমন অসার অভিযোগ তুলিবার অভিপ্রায় আমাদের নাই। শুধু জিজ্ঞাসা এই যে, যাহা দেওয়া হয় লাভের তুলনায় তাহার পরিমাণ কতটুকু?

তাহাও কি আবার সব সময় আপনা হইতে দেওয়া

হয়? না চাহিয়া পাঠাইলে কি পাওয়া যায়? নিতান্তই কি দায়ে ঠেকিয়া দেওয়া নয়?

অবশ্য ইহার কৈফিয়ৎ আছে।

প্রথম, লেখার বা ছবির কি আবার টাকা পয়সা দিয়া দাম হয়? এ সব ত অমূল্য বস্তু! কোন্ দুঃসাহসী, অরসিক ইহার যথাযথ মূল্য নির্ণয় করিবে?

দ্বিতীয়, যৎকিঞ্চিৎ অর্থের সাথে অজস্র অকৃত্রিম সম্পাদকীয় কৃতজ্ঞতা যখন পত্রযোগে প্রেরণ করা হয়, তখন লেখক বা চিত্রকরের গদগদ না হওয়াই মনুষ্যত্ব-হীনতার পরিচায়ক। তাঁর রচনা-প্রকাশ, নাম ও খ্যাতির জন্ম তিনি ত ঐ পত্রিকার নিকট চিরঋণে আবদ্ধ!

যাঁহারা আরও একটু সপ্রতিভ তাঁহারা বলেন—

"আগে ত সকলকেই দিতাম। তার পর দেখি সেইসব লেখকই বিনামূল্যে অন্ত কাগজে লেখা দেন। তাঁরা যখন নিজেরাই চান না, তখন আর অনর্থক আমরা ক্ষতি গুণি কেন? এত বিপুল প্রচার আমাদের,—এ কাগজে লেখা বার হওয়াই ত তাঁদের পক্ষে লাভের।......তবে আমরা দিই, যাঁদের লেখা না হলে আমাদের চলে না, আবার টাকা না হলে যাঁরা লেখা দেন না, তাঁদের আমরা দিই,—কিছু কিছু দিই।"

কাহারও কাহারও স্পষ্টবাদিতা আবার ইহার উপরেও যায়।

"যাঁরা—দেবার মত, তাঁদের আমরা দিই, কিন্তু এর বেশী দিলে আমাদের পোষায় না। যে বাজার! এম্‌নিই লোকসান যাচ্ছে মহাশয়!"

প্রপার্টি

স্বত্ব; সাপ্তাহিক; কলিকাতা; ২৬জুন, ১৯২৬,—(১) "ওয়ার্কমেন্‌স কম্পেন্‌সেশ্যন অ্যাক্‌ট্" (মজুরদের ক্ষতিপূরণ আইন) অনুসারে একটা মামলার বিবরণ, (২) আদালতে জমিজমার মামলা।

অন্তান্ত সংখ্যায়ও এই দুই ধরণের মামলার বৃত্তান্ত আছে। এইসব জানিয়া রাখিলে দেশের অনেক লোকের উপকার সাধন করিবার ক্ষমতা জন্মিবে।

লে কোনোমিস্ত ফ্রাঁসে

ফরাসী ধনতত্ত্ববিৎ; সাপ্তাহিক; প্যারিস; ১৯২৫ সনের জুলাই মাসে যেসকল রচনা বাহির হইয়াছে তাহার কোনো কোনোটা নিম্নে বিবৃত হইতেছে,—(১) খাজাঞ্চি-খানাকে সাহায্য করিবার মোসাবিদা (আঁদ্রে লিস্), (২) রেল লাইনগুলার আর্থিক অবস্থা,—১৯২৪ সনের বৃত্তান্ত (এড়ুয়ার পায়াঁ), (৩) সোনার সাহায্যে আর্থিক সমতা লাভের উপায় (লিস্), (৪) জল-বিদ্যুতের কারবার (এড়ুয়ার পায়াঁ), (৫) আর্থিক সমতা (লিস্), (৬) বোলশেভিকদের প্রচার-কার্য্য, (৭) ফ্রান্সে লোহালক্কড়ের কারবার—১৯২০-২৪ সনের বৃত্তান্ত (পায়াঁ)।

ত্রিস্রোতা

সাপ্তাহিক; জলপাইগুড়ি; ১২ আষাঢ় ১৩৩৩; জলপাইগুড়ির বাঙালী সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধের কিয়দংশ—

"ভবের হাটে ঘুরিতে ঘুরিতে জলপাইগুড়িতে বাঙ্গালীর ব্যবসায়ের সফলতা দেখিয়া প্রাণ গৌরবে উৎফুল্ল হইল। যেখানে যেখানে গিয়াছিলাম, সেই সেই স্থানেই বাঙ্গালীকে মসীজীবী চাকুরীয়া ভাবে দেখিয়াছি—কি বৃহত্তর বঙ্গে, কি বাঙ্গালীর নিজ বাসভূমে, দেরাদুন হইতে সুদূর ব্রহ্মদেশের সীমান্ত পর্য্যন্ত দেখিতেছি, বাঙ্গালী অতি পাণ্ডিত্যে আড়ষ্ট—ইংরেজী বলিতে সুদক্ষ হইয়াও কর্ম্মক্ষেত্রে ইংরেজের কোন বিষয়ে সমকক্ষ হইতে পারে নাই—কাঠের পুতুলের মত বাঙ্গালীকে যেন নিস্পন্দ, জ্যোতিঃহীন, আশাহীন নিরানন্দ দেখিতেছি। সর্ব্বস্থানেই দেখিতেছি আবেদন-পত্রপাণি মদীয় দেশবাসী চাকুরীর মোহে শৃঙ্খলাময় কর্ম্মপটুতা পুরুষানুক্রমে হারাইতে বসিয়াছে। যে কর্ম্মযোগের অদম্য শক্তিতে বাঙ্গালী পাহাড় চূর্ণ করিয়া, বন কাটিয়া নগর বসাইবে, ভীম উৎসাহে ও পরিশ্রমে দৈহিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবসাদ দূর করিয়া দিবে, 'যেমন তেমন চাকুরী ঘি ভাত' এই মরীচিকামন্ত্রে—অমানুষিক অবাস্তব, শুষ্ক বাক্যকাকলী পূর্ণ অবিদ্যাময়ী অতিবিদ্যার গুরুভারে যেন কি এক কঠিন লৌহ নিগড়ে বদ্ধ হইতে বসিয়াছে! সে দিন কলিকাতায় এক উচ্চপদস্থ বন্ধুর আলয়ে এম, এ উপাধি-অভিশাপ-

বিড়ম্বিত, শুষ্ককণ্ঠ, কোটরগতচক্ষু, অজ্ঞানতাবুলিমুখর একটী বাঙ্গালী যুবকের চাকুরী-প্রার্থনার মর্ম্মশ্বাসে যেন হৃদ্‌পিণ্ড গলিয়া গেল!

"বাঙ্গালীর এইরূপ অসহায় ও অনাথভাবের মধ্যে জলপাইগুড়িতে আসিয়া চায়ের ব্যবসায়ের সজীবতায় বাঙ্গালীর পুষ্ট প্রাণ, দীপ্ত আনন্দ, খরতর উৎসাহ দেখিয়া যেন প্রাণে শান্তির লহরী খেলিয়া গেল। স্বচ্ছন্দদেহ, অনবদ্য-স্বাস্থ্য, উৎসাহী, কর্ম্মযোগী চা-ঐশ্বর্য্যের নেতাগণের সাফল্য-মণ্ডিত জয়শ্রীতে মুগ্ধ হইলাম। অকুতোভয়, হিতকর্ম্মা, কলির সোমরস চা-অমৃতের হোতা সুধীগণের সঙ্গে আলাপনে ও আলোচনায় যেন জলপাইতে আসিয়া ঘোর তমিস্রার মধ্যে কি এক আলোকরশ্মি দেখিতে পাইলাম। যেসব মহাত্মাগণ এই ক্ষুধাতুর দেশে চা-বাগিচা-স্থাপনে জীবিকার সন্ধান করিয়া দিয়াছেন, ক্ষীণ স্বরে তাঁহাদের অগণিত ধন্যবাদ দিলাম! যে ব্যবসায়ে বাঙ্গালী হাত দিয়াছে, মহার্ণবে মণিমুক্তা অন্বেষণে যেসব বাঙ্গালী অবগাহন করিয়াছে, তাহারা সকলেই যেন পাইয়াছে অকিঞ্চিৎকর কর্দ্দম। পাট, তামাক, চাল, সূতা, গন্ধক, মাইকা প্রভৃতি ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে; কেবল চায়ের ব্যবসায়ে বাঙ্গালী অমোঘ সফলতা লাভ করিয়াছে। তাই আশাপূর্ণ হৃদয়ে প্রার্থনা করি এই সব কর্ম্মযোগিগণের মহান্ আদর্শ বাঙ্গালার সর্ব্বত্র বিস্তৃতি লাভ করুক। তজ্জন্য সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে চেষ্টা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে।

"ব্যবসায়ের প্রথম ও প্রকৃষ্ট সোপান বিলাস-ব্যসনহীনতা। জলপাইগুড়িতে আমার ভ্রাম্যমান্ জীবনে চায়ের নেতৃবর্গের ঐশ্বর্য্যশ্রীতে যেরূপ তৃপ্ত হইলাম চা-ব্যবসায়ে লক্ষপতিগণের অনাড়ম্বর-শুচি জীবনধারায় সেইরূপ মুগ্ধ হইলাম। বাঙ্গালী জাতিকে লক্ষ্মীশ্রীশোভিত করিতে হইলে, বঙ্গদেশ হইতে দারিদ্র্য দূর করিতে হইলে, চাই এইরূপ অটুট পরিশ্রমী, অমিত অধ্যবসায়ী, কঠোর কঠিন শুভ্র জীবন—চাই লক্ষ্মী-সাধনায় ঐকান্তিকী নিষ্ঠা, পাষাণ-ভেদী দৃঢ়তা। ফুলের হাওয়ায় যাহারা মূর্চ্ছা যায়—বেশ-বিন্যাস ও পারিপাট্যে যাহারা জীবনের অর্দ্ধেক সময় ব্যয় করিয়া ফেলে—কুঞ্চিত কেশদামের সুঠাম বল্লরীভঙ্গি সযত্নে রক্ষা করিতে যাহারা প্রাণশক্তি ব্যয় করে—মুখস্থ করিয়া যাহারা বিদ্যা গলাধঃকরণ পূর্ব্বক জীবনীশক্তি হারায়, ব্যবসায়, শিল্প, স্বাধীন জীবিকা তাহাদের নহে। কলিকাতার এক লক্ষ্মীমান্, শক্তিমান্ ব্যবসায়ী লেখক বলিয়াছিলেন,—একটী জিনিষের সঠিক দর জানিতে তিনি স্বয়ং ৩২ মাইল পথ অনায়াসে পদব্রজে অতিক্রম করিয়াছিলেন।"

কশ্চিৎ পান্থঃ

ব্যবসা ও বাণিজ্য

মাসিক; কলিকাতা; বৈশাখ, ১৩৩৩,—(১) গালার ব্যবসায়, (২) বড় বড় কণ্ট্রাক্টের খবর ও বিবরণ। জ্যৈষ্ঠ,—(১) বঙ্গদেশে তেলের কল, (২) মুর্গীর ব্যবসা। আষাঢ়,—(১) কাঠের পালিশ, রং ও বার্ণিসের ব্যবসায়, (২) ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের বন্দরসমূহের বিবরণ।

আত্মশক্তি

সাপ্তাহিক; কলিকাতা; প্রত্যেক সংখ্যায় "কৃষি ও বাণিজ্য" এবং "চাষী ও মজুর" এই দুই অধ্যায় দেখিতে পাইতেছি। এই ধরণের তথ্য বাংলার সাপ্তাহিকে এবং দৈনিকে প্রচুর পরিমাণে বাহির না হইলে আমাদের মাসিক, ত্রৈমাসিক এবং গ্রন্থ-সাহিত্য উন্নত হইতে পারে না। দৈনিক এবং সাপ্তাহিক কাগজের পরিচালকদের দায়িত্ব খুব বেশী।

১৪ জুলাইয়ের সংখ্যায় শ্রীযুক্ত সনৎকুমার বসু "বেকার-সমস্যা"র আলোচনায় নিরেট তথ্য সঙ্কলনের জন্য একটা প্রতিষ্ঠান-গঠনের প্রস্তাব তুলিয়াছেন।

"বর্ত্তমান জগৎ" অধ্যায়ে শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার সেন ফী সপ্তাহে দুনিয়ার রাষ্ট্রিক ও আর্থিক গতিবিধি বুঝাইয়া যাইতেছেন।

পুনর্গঠিত "আত্মশক্তি" সাপ্তাহিক-পরিচালনায় উন্নত পথের প্রবর্ত্তন করিলেন।

বণিক

মাসিক; কলিকাতা; জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়, ১৩৩৩। মাত্র চার পৃষ্ঠায় থাকে পঠিতব্য মাল। আর সবই বিজ্ঞাপন। এক টুকরা তথ্য উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

ভারতীয় ব্যবসায়ে বৈদেশিক প্রভাব

বৃটিশ জাতি ৩৫০ কোটি পাউণ্ড মূলধন দ্বারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনা করিতেছেন। তন্মধ্যে ভারতের ব্যবসায়ক্ষেত্রে নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ ৪৫ কোটি পাউণ্ড। এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য বিদেশী ব্যবসায়ের মূলধন অন্যূন ৫ কোটি পাউণ্ড হইবে। এই বিপুল মূলধনের সাহায্যে ভারতবর্ষে বিভিন্ন বৃহৎ ব্যবসায় পরিচালিত হইতেছে। এখন ভারতবর্ষে ৮৬টি বড় বড় পাটের কল আছে; কিন্তু ইহার শতকরা ৯০টী কলই বিদেশীয় স্কচ ব্যবসায়িগণের মূলধনে স্থাপিত। ১৯১২ সনে ২৫ লক্ষ পাউণ্ড মূলধন লইয়া এ দেশে ১৫৬টি চা কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করা হয়, কিন্তু তন্মধ্যে শতকরা ৮০টি কোম্পানীই ইংলণ্ডে রেজিষ্টারীকৃত এবং একমাত্র ইয়োরোপীয়গণের মূলধনদ্বারা পরিচালিত। ভারতবর্ষের স্বর্ণখনিসমূহে বৎসরে প্রায় তিন কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণ উৎপন্ন হয়। কিন্তু এইসকল খনিও সর্ব্বতোভাবে বিদেশীয়-দিগের কর্ত্তৃত্বাধীন। স্বর্ণ ও কয়লার খনিসমূহ বিদেশীয়-গণের হস্তে থাকায় এদেশের যে ভীষণ ক্ষতি হইতেছে, তাহা আর পূরণ হইতেছে না। কারণ যেসকল খনি হইতে স্বর্ণ কিম্বা কয়লা নিঃশেষে উদ্ধৃত হয়, তাহাতে আর তাহা উৎপন্ন হয় না। ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানী, রেশম ও পশম শিল্পজাত পণ্যদ্রব্যের উৎপাদক এবং চা, কাফি ও সিঙ্কোনার আবাদকারী কোম্পানীসমূহ সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য।

এইসকল ব্যবসায় যে কেবল ইয়োরোপীয় মূলধন দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে তাহা নহে; পরন্তু, ইহাদিগের কর্ম্মাধ্যক্ষগণও ইয়োরোপীয়। ভারতবাসীরা অধিকাংশ স্থলেই তাঁহাদিগের অধীনে তত্ত্বাবধায়ক বা কেরাণীর কার্য্য করিয়া থাকেন। আসামে ৫৪৯টী চা-বাগান ইয়োরোপীয় মূলধনে এবং ৬০টী মাত্র বাগান দেশীয় মূলধনের সাহায্যে পরিচালিত হইয়া থাকে। এইসকল বাগানে ৫৩৬ জন ইয়োরোপীয় ও ৭৩ জন দেশীয় কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োজিত আছেন। বঙ্গদেশে যে সকল পাটের কল আছে, তাহাদের কার্য্যাধ্যক্ষগণও ইয়োরোপীয়। বোম্বাই প্রদেশে এই প্রথার ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। বোম্বাইয়ে কেবল ভারতবাসীর মূলধনদ্বারা প্রতিষ্ঠিত ১১০টী সূতা ও কাপড়ের কল আছে। এতদ্ব্যতীত ২৫টী কলে ইয়োরোপীয় ও ভারতবাসী উভয়েরই অংশ আছে। তথায় একমাত্র ইয়োরোপীয়দিগের মূলধনে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত কলের সংখ্যা ১২টী মাত্র। কিন্তু এইসকল কলের কর্ম্মাধ্যক্ষগণের মধ্যে ৪৩ জন ব্যতীত অপর সকলেই ভারতবাসী। স্বর্ণখনিসমূহে ইয়োরোপীয় কর্ম্মচারীর সংখ্যা ভারতবাসী কর্ম্মচারীর চতুর্গুণ, কিন্তু কয়লার খনিসমূহে ভারতীয় কর্ম্মচারীর সংখ্যা ইয়োরোপীয়গণের দ্বাদশ গুণ।

আবাদ

মাসিক; কলিকাতা; বৈশাখ ১৩৩৩,—(১) বাংলার পাট চাষ (শ্রীচারু চন্দ্র সান্যাল) (২) বেলজিয়ামে স্ত্রীলোক দিগের কৃষি-শিক্ষা। জ্যৈষ্ঠ,—(১) ফলের বাগান, (২) আনারসের চাষ ("ট্রপিক্যাল অ্যাগ্রিকালচারিষ্ট" পত্রিকা হইতে অনূদিত)। আষাঢ়,—(১) গবাদি পশুর বর্ত্তমান অবনতির কারণ ও উহার উন্নতি-বিধানের উপায়।

ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট

ইংরেজি সাপ্তাহিক; কলিকাতা; ২৬ জুন ১৯২৬,—(১) কলিকাতার পার্ক ও স্কোয়ারসমূহ (এইচ, জি, বীল নামক কলিকাতার ইয়ংমেন্‌স্ ক্রিশ্চিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের ব্যায়াম-শিক্ষাধ্যক্ষ প্রত্যেক পার্কের ভিতর খেলাধূলার মাঠ, আখড়া ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার প্রস্তাব আনিয়াছেন। প্রবন্ধ ধারাবাহিকরূপে চলিতেছে। আলোচনা-প্রণালীর দিকে পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আলোচ্য বিষয়ও গুরুত্বপূর্ণ। (২) বোম্বাই কর্পরেশনের কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে ঘুস, চুরি, জুলুম জবরদস্তি ইত্যাদি বিষয়ক নালিশ। ৩ জুলাই,—(১) কলিকাতার পার্ক ও স্কোয়ার (ক্রমশঃ), (২) আমেরিকার মেয়র (নগর-শাসক) সম্বন্ধে প্রবন্ধ ধারাবাহিকরূপে চলিবে। এই সংখ্যায় আছে বষ্টনের জেম্‌স্ কার্লির কর্ম্ম-কথা।

১৭ই জুলাই,—ভেজালহীন এবং স্বাস্থ্যকর খাদ্য দ্রব্যের লক্ষণ স্থির করিবার জন্য কলিকাতা কর্পরেশন কয়েকজন বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করিয়াছিলেন (এপ্রিল, ১৯২৫)। এই বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। দুধ, দই, ছানা

খোয়া, মাখন, ঘী, সরিষার তেল, অন্যান্য খাইবার তেল, এবং চা—এই কয় বিষয়ে মত পাওয়া গিয়াছে।

রেভ্যি দেকোনোমী পোলিটিক

ধনবিজ্ঞান-পত্রিকা; বৎসরে ছয়বার করিয়া বাহির হয়, প্যারিস;—সম্পাদক অধ্যাপক শার্ল জিদ। সম্পাদনকার্য্যে সহায়ক আছেন এগার জন,—তাঁহারা প্রায়ই প্যারিসের বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপক। বাহিরের লোক আছেন মিশেল উব্যার। ইনি ফ্রান্সের সরকারী তথ্য-তালিকা (ষ্টাটিষ্টিক্স্) বিভাগের কর্ত্তা। অধ্যাপক রিস্ত্, ক্রশি, ইতিয়ে, জার্মাঁ মার্ত্যাঁ, দেশাঁ ইত্যাদির নাম ফরাসী পণ্ডিত-মহলে সুপরিচিত।

এই পত্রিকার দুইটা বিশেষত্ব দেখিতে পাই। প্রথমতঃ, মাসের পর মাস, রোজ রোজ যেসকল আর্থিক আইন-কানুন জারি হইতেছে অথবা ঐ সকল বিষয়ে আলোচনা হয় সেই সব ধারাবাহিকরূপে উল্লিখিত হইয়া থাকে। সরকারী নিম-সরকারী যতগুলা প্রতিষ্ঠান আছে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক বিধি-ব্যবস্থাই এই "ক্রণিক লেজিস্লাতিভ্" অধ্যায়ে ঠাঁই পায়। ১৯২৫ সনের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে ১৩৪ দফায় তথ্যগুলা বিবৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান জগৎ আইন-কানুনের দুনিয়া। আর ইহার ভিতর আর্থিক জীবন বিষয়ক বিধিব্যবস্থার পরিমাণ বিপুল। ভারতে আর্থিক আইন-কানুন স্বতন্ত্র আকারে আলোচনা করিয়া দেখিবার সুযোগ এখনো নাই। কিন্তু সেই দিকে ফরাসীরা বিশেষ ওস্তাদ। বস্তুতঃ, ধনবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি বিদ্যাগুলা ফরাসী চিন্তায় আইন বিদ্যারই অন্তর্গত। ফ্রান্সের বিশ্ববিদ্যালয়ে "ফ্যাকুল্‌তে দ' দ্রোআ" (আইন-ফ্যাকালটি) এইসকল বিদ্যার শাসনকর্ত্তা।

জিদ-সম্পাদিত পত্রিকার অপর বিশেষত্ব,—"নৎ এ মেমরাঁদা" (আর্থিক ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে তথ্য-পঞ্জী)। এই অংশটা "নমো নমঃ" করিয়া সারিয়া দেওয়া হয় না। যে সংখ্যায় ১৭৬ পৃষ্ঠা (রয়্যাল অক্টেভো) সেই সংখ্যার ৫৫ পৃষ্ঠায়ই তথ্য-পঞ্জীর মাল। ১৯২৬ সনের প্রথম সংখ্যায় নিম্নলিখিত বিষয়ে "নৎ" বাহির হইয়াছে,—(১) ধনবিজ্ঞানের নয়া মোসাবিদা (রেণে গণার), (২) ইয়োরোপের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবায়-নীতি শিখাইবার ব্যবস্থা (তোতোমিয়াঁৎস), (৩) মুদ্রা-স্থিরীকরণের বৃত্তান্ত, ফ্রান্স এবং ফিন্‌ল্যাণ্ড এই দুই দেশের কথা আছে (রিস্ত), (৪) আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বৃত্তান্ত, লীগ অব নেশ্যনের (বিশ্ব-রাষ্ট্রপরিষদের) আর্থিক কাজকর্ম্ম বিবৃত হইয়াছে (পিকার), (৫) রুশিয়ার শিল্প-কারখানা (এলিয়াশেফ), (৬) ফরাসী কর্জ্জ-সমস্যা এবং ফ্রান্সের আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য (মেলিয়াল), (৭) ফ্রান্সের রাজস্ব-ব্যবস্থা,—১৯২০ হইতে ১৯২৫ পর্য্যন্ত কালের বিবরণ (রিস্ত্)।

সায়েন্টিফিক আমেরিকান

উলওয়ার্থ ভবন হইতে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মাসিক পত্র; জুলাই ১৯২৬,—(১) বিজ্ঞান কর্ত্তৃক চাষবাস দখল—মার্কিণে কৃষির ক্রমোন্নতি, (আর্চ্চার পি, হোয়ালন), (২) আমাদের কয়েকটি বৃহৎ সেতু (জে, বার্ণার্ড ওয়াকার), (৩) সাগরের উপর কথার সেতু নির্ম্মাণ, রেডিও জগৎ—(ওরিন ই ডানলপ), (৪) শিল্প রসায়ন বিদ্যায় আশ্চর্য্য রকম ফলোৎপাদন, (৫) গ্রীষ্মপ্রধান দেশে চাষবাস, এক একর জমিতে কলার চাষ গম বা অন্য ফসলের চাইতে বেশী লাভ-জনক।

এগ্রিকালচার‍্যাল জার্ণ্যাল অব ইণ্ডিয়া

ভারত সরকারের কৃষি-দপ্তর হইতে প্রকাশিত দ্বৈ-মাসিক; মে; ১৯২৬;—(১) পশু সম্মিলনী (সম্পাদকীয়), (২) ভারতে সমবায় আন্দোলন, (এইচ ক্যালভার্ট), (৩) পুসা হইতে উন্নত পর্য্যায়ের বীজ সরবরাহ (এফ, জি, এফ, শ) (৪) ভারতে দুগ্ধ-ব্যবসায়ে সমবায় নীতি, (ডব্লিউ, স্মিথ), (৫) ইক্ষুর চাষ (টি, এম, বেঙ্কট রমন, বি, এ, আর আর, টমাস), (৬) ভারতে মুর্গীর ব্যবসায় (শ্রীমতী এ, কে, ফক্স্)।

ইণ্ডিয়ান ইনশিওর‍্যান্স জার্ণ্যাল

জুন, ১৯২৬; কলিকাতা;—(১) জীবন-বীমা ও কারেন্সী কমিশন, (অধ্যাপক জে, সি, মিত্র এফ, এস, এস (২) লাহোরের লক্ষ্মী ইনশিওরেন্স কোম্পানী-কর্ত্তৃক সরকারের নূতন বীমা আইনের প্রতিবাদ।

সোনার টাকার প্রত্যাবর্ত্তন

ইতালিয়ান অধ্যাপক কাব্যাতিকে পূর্ব্বে আমরা একবার দেখিয়াছি। তখন বিশ্ববাণিজ্যে বিজ্ঞান-বস্তু সম্বন্ধে তাঁহার মতামত আলোচনা করা গিয়াছিল। এইবার তাঁহার সঙ্গে টাকাকড়ির কথা লইয়া মোলাকাৎ। বইয়ের নাম "ইল্ রিতর্ণ আল্-অর" (স্বর্ণে প্রত্যাবর্ত্তন) বা "আবার ফিরো সোনায়"। প্রকাশক মিলানোর বক্কনি বিশ্ব-বিদ্যালয়; ১৯২৫।

আজকালকার দিনে টাকাকড়ির সাহিত্য বিপুল আকার ধারণ করিতেছে। কাব্যাতির গ্রন্থ "আন্নালি দি একনমিয়া" নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের অন্যতম অধ্যায় রূপে বাহির হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও রচনায় "অধ্যায়"-সুলভ অসম্পূর্ণতা বেশী নাই। প্রচুর তথ্য একত্র দেখিতেছি। তবে অনেক স্থলেই সংক্ষিপ্ত আকারে।

মুদ্রার মূল্য-স্থিরীকরণ সম্বন্ধে কাব্যাতি যাহা কিছু বলিতেছেন তাহাতে ইতালিয়ানদের বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী অনেক বিচারই আছে। ইতালিতে, ভারতের মতন, আজও লিয়ার স্থির-প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। এখনো কিছুকাল নানাপ্রকার পরীক্ষা চলিবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তত্ত্বের তরফ হইতে কাব্যাতির আলোচনায় সার্ব্বজনিক ও সাধারণ সত্য কতকগুলা দেখিতে পাই। টাকা-কড়ির উঠা-নামার সঙ্গে জিনিষ-পত্রের দাম কিরূপ পরিবর্ত্তিত হয় তাহার বিশদ অলোচনা আছে। আবার বাজার-দরের অবস্থা অনুসারে টাকার বাজারে যেসব উঠা-নামা ঘটে তাহার বিশ্লেষণে ও কাব্যাতির দৃষ্টির অভাব নাই।

বিলাতী টাকার বাজার সম্বন্ধে বিশ্লেষণ এই রচনার এক বিশেষত্ব। ইতালিয়ান মুদ্রাসমস্যাও আলোচিত হইয়াছে। সোনায় ফেরা বিষয়ক কাব্যাতির আলোচনা সম্বন্ধে অধ্যাপক দেল হেবক্কা বলিতেছেন :—"আজকালকার দিনে টাকার বাজারে যত বিচিত্র আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় শক্তির জটিল খেলা চলে সেইগুলা দখল করিয়া বিশ্লেষণ করা খুব কম লেখকের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু কাব্যাতি একাধারে বাজার-দক্ষ এবং বিজ্ঞান-দক্ষ। এই জন্য তাঁহার পক্ষে পাকা খেলোয়াড়ের মতন শক্তিগুলাকে লইয়া তাসের জুয়া দেখানো সম্ভবপর হইয়াছে। রিকার্ডোর আমল হইতে আজ পর্য্যন্ত যিনিই টাকাকড়ির বিজ্ঞান আলোচনা করিতে ঝুঁকিয়াছেন তাঁহাকেই কঠিন কঠিন সমস্যার সম্মুখে খাড়া হইতে হইয়াছে। কাজেই কাব্যাতির আলোচনায়ও কট-মট বাদ যাইবার কথা নয়।"

গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে ১৯২৫ সনে, অর্থাৎ "ইনফ্রেশ্যান" বা কাগজীমুদ্রার পরিমাণ-বৃদ্ধির যুগ চলিয়া যাইবার অনেক দিন পরে। কিন্তু কাব্যাতি ধনবিজ্ঞানের তরফ হইতে ইনফ্লেশ্যানের স্বপক্ষেই রায় দিয়াছেন।

এই উপলক্ষ্যেই দেল্ হেবক্কা বলিতেছেন,—সংসারে যাহা-কিছু ঘটিয়াছে তাহা সবই কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধের বিশ্লেষণ দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব। কিন্তু তাহা বলিয়া সব-কিছুই সমর্থন-যোগ্য নয়। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে,—ধনবিজ্ঞানের তরফ হইতে ইনফ্রেশ্যান কোনো মতেই সমর্থনযোগ্য নয়। সংরক্ষণ-নীতি আর ইনফ্রেশ্যান এই দুইটার কোনোটাই ধনবিজ্ঞান-সম্মত নয়। কিন্তু দুনিয়ায় সংরক্ষণও চলে আর কাগজী মুদ্রার পরিমাণও যখন-তখন বাড়াইয়া দেওয়া হয়। এই সব কাণ্ডের সমর্থনের জন্য যদি যুক্তি ঢুঁড়িতেই হয় তবে তাহা ধনবিজ্ঞানের এলাকার বাহিরে অন্য কোথাও ঢুঁড়িতে হইবে।

আর্থিক বাংলার এক টুকরা

শ্রীরামানুজ কর প্রণীত **"বাঁকুড়া জেলার বিবরণ"** সুরেন্দ্র প্রিন্টিং ওয়ার্কস, বাঁকুড়া হইতে প্রকাশিত। ১১৯ পৃষ্ঠা, মূল্য ৷৹ আনা। প্রবাসীর সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভূমিকা লিখিয়াছেন। এই পুস্তকখানি প্রকৃত বাঁকুড়া জেলার পঞ্জিকা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বাঁকুড়ার সকল কথাই ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। জেলার সহিত পরিচিত হইতে হইলে যে যে মূল বিষয় জ্ঞাত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় তাহার সকলগুলিই রামানুজ বাবু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "বিবরণ" নাম সার্থক হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলেরই পৃথিবীর বৃত্তান্ত যেমন জানা উচিত, নিজের গ্রাম, সহর ও জেলার বৃত্তান্ত তাহা অপেক্ষাও ভাল করিয়া জানা উচিত।" বাঁকুড়া জেলার বিবরণে এ উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। বাঁকুড়া জেলার সকলেরই ইহা ধর্ম্ম-পুস্তকের ন্যায় পাঠ করা আবশ্যক। বাংলার সকল জেলার লোককেই জেলার বিবরণ অবগত হইতে হইবে। ইহা পাঠশালায় পঠিত হইলে বিশেষ উপকার হইবে বলিয়া মনে হয়।

বাঁকুড়া জেলার অবনতির কারণগুলি সহজেই অবগত হওয়া যায়। অবনতির কারণ অবগত হইলে উক্ত কারণের গতি রোধ করা সহজ হইয়া থাকে। মৃত্যুর মূল কারণ অবগত হইয়াও যদি কোনো জাতি তাহা দূর করিতে সচেষ্ট না হয়, তাহা হইলে সে জাতির মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।

পাপের ভয় এবং পাপীর কঠোর শাস্তির কথা বলিয়া যেমন পৃথিবী হইতে পাপীর ও পাপ-কর্ম্মের লোপ হয় না, তদ্রূপ সেন্সাস রিপোর্টে জন-সংখ্যার হ্রাস দেখাইয়া জনগণকে কর্ম্মী করা যায় না। রামানুজ বাবু দেখাইয়াছেন "বামুন, বাউড়ী, কায়স্থ, কলু, তিলি, বৈদ্য, সদ্গোপ—সকল জাতিই প্রায় মৃত্যুমুখে পতিত। দরিদ্র এবং অশিক্ষিত জাতির সংখ্যাই হ্রাস হয় নাই।" ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছু নাই। দরিদ্রগণ দুঃখের সহিত যুদ্ধ করিয়া রক্ষা পাইতেছে দুঃখ-কষ্ট তাহাদের সহ্য হইয়া গিয়াছে। দুর্ভিক্ষের ধাক্কা সকলেরই লাগিয়াছে। দুর্ভিক্ষে তাহারা অভ্যস্ত, সুতরাং তাহাদের উপর একটা অভিনব ধাক্কা কিছুই করিতে পারে নাই। ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজ সুকুমার হইয়াছে, সুতরাং ধাক্কা সহ্য করিবার শক্তি তাহাদের নাই—সেই জন্য মরিয়াছে। রামানুজ বাবু দেখাইয়াছেন কৃষিকার্য্য ৭,৮৫,৭৮২ জন করে, শিল্প ৯৪,৪৬১ জন এবং বাণিজ্য ৪৮,১৮৮ জন করে। সুতরাং বাঁকুড়া কৃষি-প্রধান দেশ। কৃষির মধ্যে ধান্যই প্রধান। বাঁকুড়া জেলায় জলাভাব। বৃষ্টিপাতও বাংলার সকল দেশ হইতে কম। এক্ষেত্রে বাঁকুড়ার ধান্য-কৃষি যে ভাল নহে ইহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। বাঁকুড়া জেলায় ম্যালেরিয়া এবং কালাজ্বর অপেক্ষাও আমাশয় অতীব ভীষণতর। স্ত্রীলোকের মৃত্যুর হার দেখিলে আতঙ্কিত হইতে হয়। কুষ্ঠরোগীর সংখ্যাও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। কুষ্ঠাশ্রমের বিবরণে দৃষ্ট হয় যে, ১৭৩টি রোগীর মধ্যে ১৭২টি খৃষ্টিয়ান। বাঁকুড়ার স্বাস্থ্যের কথা তৃতীয় অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। বাঁকুড়ার স্বাস্থ্য আদৌ ভাল নহে।

চতুর্থ অধ্যায়ে শিক্ষার কথা বলা হইয়াছে। শিক্ষা ক্রমশঃ উন্নত, কিন্তু এ শিক্ষায় যে বাঁকুড়ার বিশেষ কোনো উপকার হইতেছে না ইহা গ্রন্থের বিবরণদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। গ্রন্থকার দুঃখের সহিত ষষ্ঠ অধ্যায়ে শিল্প-বিবরণে ব্যক্ত করিয়াছেন—"অতি পরিতাপের বিষয় এই যে, সামান্য ব্যবসাটিও (কাঠের মালার) মাড়োয়ারী গ্রাস করিয়াছে।" ইহাতে তাঁহাদের কোনই অপরাধ নাই। বোধ হয় কাঠের মালার ব্যবসায় মাড়োয়ারীদের হাতে না পড়িলে এ ক্ষুদ্র শিল্পটীও নষ্ট হইত। বাঁকুড়ার কেতাবী শিক্ষা একটি সামান্য শিল্পের উন্নতি-কল্পেও কিছুমাত্র করে নাই। সুতরাং বর্ত্তমান শিক্ষা দেশরক্ষা করিতে অসমর্থ ইহাই প্রমাণিত হইতেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে ২৫ প্রকার কুটির-শিল্পের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, কিন্তু কোনও শিল্পই উন্নত নহে—মাড়োয়ারীদের কৃপায় যেন জীবিত রহিয়াছে। গ্রন্থকার বলিয়াছেন— "বাঙ্গালী তাঁতী রেশমের বস্ত্র বুনে কিন্তু বস্ত্রের ব্যবসা মাড়োয়ারী

বণিকের হাতে। বাঁকুড়ার রেশম-বস্ত্র বোম্বাই, মাদ্রাজ, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর, সিংহল এবং ব্রহ্মদেশে রপ্তানি হয়। বাঁকুড়ার শিক্ষিত কি অশিক্ষিত কেহই জানে না—বিষ্ণুপুর ও সোনামুখীর রেশম-বস্ত্র কোন্ কোন্ মোকামে চালান যায়। তাঁতীরা কাপড় বুনিয়া মাড়োয়ারীকে বিক্রয় করে। মাড়োয়ারীরা তাহা নানা মোকামে চালান দিয়া লাভবান হয়।" সুতরাং জীবন-সংগ্রামে মাড়োয়ারীরাই যোগ্যতম এবং বাঙ্গালী অযোগ্য ইহাই প্রমাণিত হইতেছে। বাঙ্গালীর শিক্ষার ফলশ্রুতি যে হীন তাহাতে আর ভুল নাই। যে শিক্ষায় আত্মরক্ষা ও দেশ-রক্ষা হয় না, সে শিক্ষার প্রয়োজন কি ? মাড়োয়ারীদের বিদ্যাই শ্রেষ্ঠ।

সপ্তম অধ্যায়ে সমবায়-সমিতির উল্লেখ আছে এবং উহার সুফলের কথাও বর্ণিত হইয়াছে। "বাঁকুড়া এখন সর্ব্ববিষয়ে পরমুখাপেক্ষী।" গ্রন্থকারের এই উক্তি কেবল বাঁকুড়া নহে, সমগ্র বঙ্গের পক্ষে খাটে। শিক্ষকের সংখ্যা বাংলায় কম নহে, অথচ পরমুখাপেক্ষিতার ক্রমশঃ বৃদ্ধিই হইতেছে। ইহা বর্ত্তমান শিক্ষার ফল কি অন্য কিছু ? আমাদের দুর্দ্দশা স্বোপার্জ্জিত। গোশালার কথায় রামানুজ বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা অতি খাঁটি কথা, বিশুদ্ধ দুগ্ধের জন্য মাড়োয়ারীদের ভাবিতে হয় না, আর "বাঁকুড়ার হতভাগ্য বাঙ্গালীরা অনাহারে মারা যাইতেছে।"

রামানুজ বাবু লিখিয়াছেন,—"চাল-ধানের উপর 'মহাদেবী' বলিয়া অতিরিক্ত কর আদায় করা হয়। পূর্ব্বে ইহার অর্দ্ধেক বাঙ্গালী মহাজনেরা পাইত, অর্দ্ধেক মাড়োয়ারীরা গোশালা বা ধর্ম্ম-শালার জন্য লইত। বাঙ্গালী মহাজনেরা এই টাকা রথযাত্রায় খরচ করিত, কিন্তু মাড়োয়ারীরা এই অর্দ্ধেক টাকা দেওয়া বন্ধ করিয়াছে। ইহাতে দুঃখের কিছুই নাই, মাড়োয়ারীরা কিছু অন্যায় করিয়াছে একথা বলা যায় না। মাড়োয়ারীদের গোশালার উপস্থিত আয় ২০।২৫ হাজার টাকা। আমদানি খৈল ও লবণে বস্তাপ্রতি এক পয়সা আদায় হয়। এই প্রকার আমদানি মালের উপর হইতে যে বৃত্তি আদায় হইয়া থাকে, তাহাতেই গোশালা-ফণ্ডে টাকা জমিতেছে এবং সেই ফণ্ডের টাকা হইতে ব্যাঙ্কের মত কার্য্যও চলিতেছে। এই গোশালা-ফণ্ডের টাকা হইতে ১৮ হাজার টাকা মূল্যে একটি বাটী ও জমি ক্রয় করা হইয়াছে, অথচ ফণ্ডে ২৫ হাজার টাকা মজুত আছে"। মাড়োয়ারীরা এইরূপে একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিলেন এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করিলেন। বাঙ্গালী মহাজনেরা এক রথযাত্রা উৎসব ব্যতীত অন্য কিছুই করিতে সমর্থ হইলেন না। রথযাত্রা এবং গোশালা দুইটীর মধ্যে গোশালাই শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। সদ্‌ব্যয়দ্বারা প্রতিষ্ঠান স্থায়ী করা বুদ্ধিমানেরই কার্য্য। অর্থের সদ্ব্যবহার মাড়োয়ারীরাই করিতে জানেন। কৌশলে গোশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাঙ্গালী মহাজনেরা তদনুরূপ কিছুই করিতে সমর্থ হন নাই। দোষ বাঙ্গালীর, মাড়োয়ারীর নহে। তাঁহারা বুদ্ধি-বলে, যথেষ্ট বিশুদ্ধ দুগ্ধ পান করিতেছেন। বাঙ্গালী দুগ্ধের অভাব বোধ করিতেছেন। বিদ্যা ও কর্ম্মবুদ্ধি সমান নহে। বিদ্যার ব্যবহার শিক্ষা না হইলে বাঙ্গালীকে চিরকাল দুঃখই পাইতে হইবে। মাড়োয়ারীর বিদ্যা বাঙ্গালীকে শিক্ষা করিতে হইবে। মাড়োয়ারী বাঙ্গালীর গুরু। বাঙ্গালী মহাজনেরা এই গুরুর নিকট শিক্ষা করিয়া সমকক্ষ হইলে, "মহাদেবীর" অর্দ্ধেক টাকা পাইতে বিলম্ব হইবে না।

অষ্টম অধ্যায়ে—সরকারের রাজস্ব, ষ্টাম্প বাবদে আয় ও জেলাবোর্ড প্রভৃতির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে মহান্ত-সংখ্যার উল্লেখ আছে। মহান্ত ১৫ জন। "ইহারা জমিদারের প্রদত্ত নিষ্কর ভূসম্পত্তি ভোগ করিতেছেন। এই সকল মহান্তদের বার্ষিক সমবেত আয় তিন লক্ষ টাকার কম নহে।" মহান্ত সম্বন্ধে অনেক কথা অবগত হওয়া যায়। বাঙ্গালীর ধর্ম্মের একটি দিক্ ঐরূপে উন্মুক্ত। মাড়োয়ারীর গোশালাও ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান। এই অধ্যায়ে বিশিষ্ট ব্যক্তির পরিচয়ও রহিয়াছে।

পরিশিষ্টে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় সারস্বত সমাজের উদ্বোধন পত্রে লিখিয়াছেন বলিয়া যাহা উক্ত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় তিনি লিখিয়াছিলেন—"আশ্চর্য্য এই, বাঁকুড়ায় এক লক্ষ ব্রাহ্মণের বাস আছে। এই অসভ্য, বর্ব্বর দেশে ইঁহাদের আদিপুরুষ কেন আসিয়াছিলেন কে জানে ?"

ব্রাহ্মণগণ বর্ব্বরদিগকে সুসভ্য করিবার জন্যই বর্ত্তমান আছেন। কিন্তু এক লক্ষ ব্রাহ্মণও যখন বাঁকুড়াকে বর্ব্বরতা হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ হন নাই, তখন আর বোধ হয় উপায় নাই।"

দোল-যাত্রার মূল কারণ বাঁকুড়া হইতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। রথযাত্রায় কিন্তু বাঁকুড়া মাড়োয়ারীদের নিকট হার মানিয়াছে। একই মূল কেন্দ্র হইতে রথ এবং গোশালা আরম্ভ হয়। গোশালা-ফণ্ডে এখন ব্যাঙ্কের কার্য্য চলিতেছে। বাঙ্গালীর রথ-ফণ্ডে কি চলিতেছে অবগত হওয়া যায় নাই।

এই গ্রন্থে সকল তথ্যই প্রকাশিত হইয়াছে। এ প্রকার পুস্তকের বহুল প্রচার হইলে দেশের লোকের মতিগতি ফিরিলেও ফিরিতে পারে। রামানুজ বাবুর পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে মনে হয়। দেশের লোক এ পুস্তক পাঠ করিলে দেশের উপকার হইবে এরূপ আশা করা যায়।

শ্রীহরিদাস পালিত

চড়া হারে মজুরি

অষ্টিন ও লয়েড নামক দুইজন যুবক ইংরেজ এঞ্জিনিয়ার কয়েকটি শিল্প-সমস্যা-নিরাকরণের জন্য কয়েকমাস পূর্ব্বে ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রে গিয়াছিলেন। "উচ্চ পারিশ্রমিক-রহস্য" (দি সিক্রেট অব হাই ওয়েজেস্) নামক পুস্তিকায় তাঁহারা তাঁহাদের মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পুস্তিকা-খানি ফিশার আনউইন-কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দাম ৩শি ৬পে। এই পুস্তকখানি মনোযোগ সহকারে পাঠ করা কর্ত্তব্য।

বহু সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহাদের অনুসন্ধানের ফল একটি মাত্র প্রশ্নে সংক্ষেপ করা যায়। তাহা এই—যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প-ব্যবসায়গুলি বেশী পারিশ্রমিক দিয়াও দ্রব্যের মূল্য এত কম কেমন করিয়া রাখিতে পারে? যুক্তরাষ্ট্রে যে আর্থিক উন্নতি সত্য সত্যই ঘটিয়াছে এ বিষয়ে তাঁহারা দৃঢ়নিশ্চয়। বাজার-দরের তুলনায় পারিশ্রমিকের উচ্চ হার তাঁহাদের প্রধান সাক্ষী। তাঁহারা বুঝিয়াছেন আমেরিকায় দ্রব্যমূল্য কম, পারিশ্রমিক উচ্চ, আর এই অনুপাত ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে।

আমেরিকায় শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সদ্ভাব আছে। অধিকন্তু, যুক্তরাষ্ট্র শিল্প-ব্যবসায়ের পদ্ধতি সম্বন্ধে জগতে মাতব্বরি করিতে অধিকারী। মার্কিণ মালিক ও শ্রমিক উভয়েরই কর্ম্ম-স্বভাব তাহাদের বৃটিশ প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে স্বতন্ত্র। শ্রম-লাঘবের যন্ত্রপাতি তৈয়ারী করিয়া বিস্তীর্ণ পরিমাণে মাল উৎপাদন করা যায়, একথা ইংরেজ বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছে। কিন্তু বহুকালাগত প্রথায় ইংরেজ কারিগরের হাত-পা বাঁধা। তাই সহজ সংস্কার বশতঃ তাহার আস্থা গিয়াছে সঙ্কীর্ণ উৎপাদন ও চড়া দামে বিক্রয়ের দিকে উচ্চ হারে পারিশ্রমিক দিতে সে স্বভাবতই নারাজ। ব্যয় কমাইয়া তাহাকে লাভ করিতে হইবে। কিন্তু আমেরিকাবাসী চায় বিক্রয় বাড়াইবার দিকে মন দিতে। কঠোর ভাবে অপচয়-নিবারণ এবং দক্ষ ব্যবস্থার দ্বারা ব্যয় কমাইয়া সে উচ্চহারে পারিশ্রমিক দিবার পক্ষপাতী। কারণ, সে মনে করে, উহাতেই উৎপাদনের প্রবৃত্তি জাগাইয়া তুলে।

গ্রন্থকারদ্বয় বৈষয়িক উন্নতির ভিত্তিরূপে নয়টি ব্যবস্থা-বিধির নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (১) নিযুক্তদিগকে গুণানুসারে উন্নীত করিতে হইবে এবং অনুপযুক্তদিগকে বর্জ্জন করিতে হইবে। (২) দাম কমাইলে এবং বিক্রয় বাড়াইলে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সুবিধা পাওয়া যায়। (৩) ঘন ঘন হস্তান্তর হইলে মূলধন বাঁচে। (৪) সময় বাঁচে ও কষ্ট কমে এমন যন্ত্রপাতি দ্বারা মাথাগুণ্তি হিসাবে শ্রমের উৎপাদন-শক্তি যথেচ্ছ বাড়ান যায়। (৫) পারিশ্রমিক নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না, উৎপাদনের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ থাকিবে। (৬) ফার্ম্মগুলি পরস্পরের সহিত স্বাধীনরূপে ভাবের আদান-প্রদান করিবে। (৭) সমস্ত রকম অপচয় নিবারণ করা চাই। (৮) নিযুক্তদিগের মঙ্গলের দিকে সযত্ন দৃষ্টি রাখিতে হইবে। (৯) রিসার্চের (গবেষণার) কাজে উৎসাহ দেওয়া চাই।

শিক্ষণীয় হিসাবে এ সকলের মধ্যে নূতনত্ব কিছুই নাই। তবে ইংরেজ-আচরণের বিরোধী অনেক-কিছু এইসকলের মধ্যে আছে। তন্মধ্যে শ্রমলাঘবের যন্ত্রপাতির প্রতি আস্থা সম্বন্ধে ইংরেজের সহিত আমেরিকাবাসীর বৈসাদৃশ্য বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য। ইংরেজের কিম্বদন্তী এই যে, শ্রমিকেরা মাথা খাটাইয়া কাজ করে না, মাংসপেশী খাটাইয়া পরিশ্রম করে। সুতরাং তাহারা শ্রম-লাঘবকর যন্ত্রপাতিকে সন্দেহের

চক্ষে দেখিয়া থাকে। কারণ সেগুলি যত বাড়িবে, ততই তাহাদের কাজ মারা যাইবে। কিন্তু আমেরিকাবাসী ঐ যন্ত্রপাতিকে তাহার ক্ষমতা বাড়াইবার কৌশল স্বরূপেই গ্রহণ করিয়া থাকে। কাজেকাজেই তাহার চিন্তায় যন্ত্রপাতিও মজুরি বাড়াইবার কল।

এই বইয়ের মতামত ইংরেজ সমাজে সাগ্রহে আলোচিত হইতেছে। লেখকেরা হয়ত বা খানিকটা "স্বদেশ-সেবক" হিসাবে নিজ মাতৃভূমিকে চাঙ্গা করিয়া তুলিবার জন্য এক বিদেশের কর্ম্মদক্ষতার তারিফ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই তারিফের মাত্রা হয়ত বা কিছু অতিরিক্ত। তাহা সত্ত্বেও আমেরিকার স্বপক্ষে যে সব কথা বলা হইয়াছে তাহার ভিতর নিরেট যুক্তি কম নাই।

ইংরেজের মুখে ইয়াঙ্কিস্থানের প্রশংসা শুনিয়া ভারত-সন্তানের পক্ষে অন্ততঃ একটা লাভ হইতে পারে। কোনো একটা দেশকে চিরকাল সকল বিষয়ে সকল দেশের সেরা বিবেচনা করিবার প্রবৃত্তি কমিতে পারে। আমেরিকার ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান, মার্কিণ সমাজের মজুরি-প্রথা এবং ফ্যাকটরি-পরিচালনা ইত্যাদি সম্বন্ধে সুবিস্তৃত জ্ঞান অর্জ্জন করিলে যুবক ভারতের উন্নতি ঘটিবার সম্ভাবনা আছে।

বীমা

ধনবিজ্ঞান-বিদ্যার বিভিন্ন শাখার মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ বোধ হয় বীমা-বিদ্যা। ভারতের ত কথাই নাই, এমন কি জার্ম্মাণিতেও বিশ-বাইশ বৎসর পূর্ব্বে বীমা-প্রথা সম্বন্ধে যোল কলায় পূর্ণ বিজ্ঞান-সম্মত গ্রন্থ বড় বেশী ছিল না। কিছু দিন হইল জার্ম্মাণির আইনদক্ষ পণ্ডিত এরেণব্যর্গ "ডায়চে য়ুরিষ্টেন-ৎসাইটুঙ" নামক আইন-পত্রিকায় বলিয়াছিলেন,—অ্যালফ্রেড মানেস প্রণীত গ্রন্থেই সমাজ জীবনের বীমা-তথ্যগুলা সর্ব্বপ্রথম স্বতন্ত্র আকারে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শৃঙ্খলীকৃত হইয়াছে। অর্থাৎ তখনকার দিনে জার্ম্মাণিতেও বীমা সম্বন্ধে একখানা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর "টেক্‌স্‌ট-বুক" ঢুঁড়িতে হইলে গলদঘর্ম্ম হইতে হইত।

মানেসের বই বাহির হইয়াছিল ১৯০৪ সনে। নাম "ফার্জিখারুংস-হেবজেন।" চতুর্থ সংস্করণ বাহির হইয়াছে ১৯২৪ সনে প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, দুই খণ্ডে, লাইপৎসিগ, ট্যয়বনার কোং (মূল্য ১৬৫০ মার্ক)। এই বিশ বৎসরে অন্যান্য লেখকের বইও বিস্তর বাহির হইয়াছে। বীমা-সাহিত্য জার্ম্মাণিতে আজকাল বিপুল।" বস্তুতঃ, বীমা বস্তুটাই জার্ম্মাণ সমাজে যার পর নাই বাড়িয়া গিয়াছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে (১৯০১) জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের তরফ হইতে বীমা-বিষয়ক আইনের প্রয়োগ-বিষয়ে তদবির করিবার জন্য সবে মাত্র সরকারী কর্ম্মকেন্দ্র কায়েম হইয়াছিল। অর্থাৎ বীমা প্রথার উপর গবর্মেণ্টের নজর তখনও বিশেষ তীক্ষ্ণ ছিল না। তখনও বীমা-বিষয়ক চুক্তি সম্বন্ধে গবর্মেণ্টের বিশেষ কোনো ব্যবস্থা কায়েম হয় নাই।

আজকাল বীমা-প্রথা বৈচিত্র্যময়। এইসকল বিচিত্র শাখা-প্রশাখার নাম পর্য্যন্ত সে যুগে অজ্ঞাত ছিল। আজ যেমন কৃষি-শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যের পর্দ্দায় পর্দ্দায় কোনো না কোনো বীমা-প্রণালীর শিকড় জড়ানো আছে, সে কালে সেরূপ ছিল না। তখনও দু'চারটা বড় বড় বীমা-প্রতিষ্ঠান ছিল সত্য, কিন্তু আর্থিক জীবনের উপর সে সমুদয়ের প্রভাব অল্পমাত্র দেখা যাইত।

কাজেই বিশ পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেকার জার্ম্মাণ আইনজ্ঞেরা বীমা সম্বন্ধে অনেকটা অজ্ঞ থাকিত। ধন-বিজ্ঞানের সেবকেরাও বীমা-বিদ্যার ধার ধারিত না। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ-চর্চ্চায় বীমার নামোল্লেখ পর্য্যন্ত হইত কিনা সন্দেহ। বোধ হয় এক গ্যোটিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয়ে পঠন-পাঠন চলিত।

আজ জার্ম্মাণির অলিতে গলিতে বীমা-প্রতিষ্ঠান, বীমা-বিধি, বীমা-কৌশল ইত্যাদি সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে বীমা-সাহিত্যেরও জোয়ার বহিতেছে। মানেসের বইটা কিন্তু আজও বীমা-দক্ষেরা আদর করিয়া থাকে। মানেস তাঁহার গ্রন্থের এই চতুর্থ সংস্করণে বিশ বৎসরের সকল প্রকার ব্যক্তিগত এবং দেশোন্নতি-বিষয়ক তথ্য যথোচিত পরিমাণে ঠাসিয়া দিতে ভুলেন নাই। সে যুগে মানেস "ডায়চে ফারাইন ফ্যির ফার্জিখারুংস্-হ্বিসেন্‌শাফ্‌ট্‌" (জার্ম্মাণ বীমা-বিজ্ঞান-পরিষৎ) এর কর্ম্মকর্ত্তা মাত্র ছিলেন। এক্ষণে তিনি সভাপতির পদে উঠিয়াছেন।

যুদ্ধের যুগে যেসকল নতুন নতুন বীমা-তত্ত্ব গজিয়া উঠিয়াছে সেইসব পুরাপুরিই শেষ সংস্করণে ঠাঁই পাইয়াছে। যুদ্ধের পরবর্ত্তী কালের তথ্য-তালিকা, আইন-সংস্কার এবং বীমা-তাত্ত্বিকদের মতামত সবই ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

শিল্প ও বাণিজ্যের জন্ম যে মূলধন লাগে আজকাল তা দু-চার-দশ জন পুঁজি-পতির অধীনে কেন্দ্রীকৃত। ট্রাষ্ট, কার্টেল ইত্যাদি নানা নামে একচেটিয়া ব্যবসা চলিতেছে। এই সমুদয়ের প্রভাবে বীমা-প্রথা অনেকটা রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। এই রূপান্তরের কাহিনীও মানেসের গ্রন্থে বিবৃত আছে।

আমাদের দেশে আজকাল বীমার আইন শোধরাইবার প্রস্তাব চলিতেছে। অন্যান্য দেশের কোথাও কোথাও এই সংশোধন সাধিত হইয়া গিয়াছে। জার্ম্মাণির ১৯২৩ সনের আইন এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। বলা বাহুল্য, মানেসের গ্রন্থে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

আজকালকার দিনে বীমা-কোম্পানীর মূলধন ও আমানত-সমস্যা সম্বন্ধে সর্ব্বত্রই কঠোরতা লক্ষিত হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে হিসাব-পত্র রাখার নিয়মে এবং কর্ম্ম-পরিচালনা সম্বন্ধে ও কড়াক্কড়ি দেখা যাইতেছে। ইয়োরোপের নানা দেশ সম্বন্ধে এইসকল বিষয়ক তথ্য মানেসের গ্রন্থে যথোচিত স্থান পাইয়াছে।

প্রথম খণ্ডে আলোচিত হইয়াছে বীমা-বিষয়ক সার্ব্বজনিক এবং সাধারণ কথা। দ্বিতীয় খণ্ডের আলোচ্য বিষয় আগুন, দৈব, সমুদ্র ইত্যাদি বিভিন্ন শাখার আর্থিক ও পরিচালনা-তথ্য। ১৯১৯ সনে জার্ম্মাণির সমুদ্র-বীমা-প্রতিষ্ঠানগুলা সমবেত হইয়া কতকগুলা নিয়ম জারি করিয়াছে। এই বিষয়ের বিশ্লেষণও গ্রন্থের অন্যতম বিশেষত্ব।

বীমা-সাহিত্য ভারতে এখনো এক প্রকার অজ্ঞাত। তবে এই দিকে ক্রমে ক্রমে আমাদের দৃষ্টি পড়িতেছে। একখানা জার্ম্মাণ "টেক্‌স্‌ট বুকের" সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল মাত্র। সকল বইয়েরই তর্জ্জমা বা দফায় দফায় সার-সঙ্কলন সম্ভবপর নয়।

টাকার বাজার

ধনবিজ্ঞানের মুলুকে ভারত-সন্তানের লেখা বই ১৯১৫ সনের পূর্ব্বে খুব কমই ছিল। বৎসর দশেক ধরিয়া এই বিদ্যার নানা বিভাগে ভারতীয় লেখকের ছায়া দেখা যাইতেছে।

হ্বাডিয়া এবং যোশী হইতেছেন বোম্বাইয়ের "মাণিক-জোড়"। বৎসর কয়েক হইল তাঁহারা দুইজনে মিলিয়া "হ্বেল্‌থ্‌ অব্‌ ইণ্ডিয়া'' (ভারতীয় ধন-সম্পদ্‌) নামে এক কেতাব ছাপিয়াছিলেন। প্রকাশক ছিল বিলাতের ম্যাক্‌-মিলান কোং। আবার তাঁহারা সম্প্রতি দেখা দিয়াছেন একত্রে "মানি অ্যাণ্ড দি মানি মার্কেট ইন্‌ ইণ্ডিয়া" নামক গ্রন্থের লেখকরূপে। গ্রন্থের পৃষ্ঠা-সংখ্যা প্রায় ৪৫০। টাকা-কড়ি-বিষয়ক বিজ্ঞান বলিলে যাহা-কিছু বুঝা যায় তাহার কোনো-কিছুই বাদ পড়ে নাই। বিশেষত্ব হইতেছে ভারতীয় মুদ্রা, বিনিময়ের হার, ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির বিস্তৃত আলোচনা। গ্রন্থখানা সুপাঠ্য।
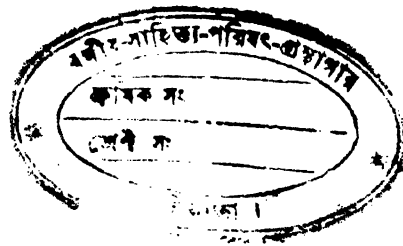
এইগুলার কোনো কোনোটা সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

"ডী আরবাইট্‌স্‌-লাইষ্টুঙ্‌ ফোর উণ্ড নাখ ডেম ক্রীগে"

কারখানায় মেহনতের ফলাফল—লড়াইয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী কালের তুলনা); হেন্‌ৎসেল; ষ্টুটগার্ট: প্যেশেল কোং; ৮+১৩৫ পৃ; ১৯২৫; ৮ মার্ক।

"বিজনেস অর্গানিজেশ্যন"

(কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের শাসন ও কর্ম্ম-পরিচালনা-প্রণালী); হেনী; নিউ ইয়র্ক; ম্যাক্‌-মিলান কোং; ১৬+৫২৪ পৃ; ১৯২২।

"ভুলের ফসল"

(গল্পের আকারে কৃষি-শিক্ষা) শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র (বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের কর্ম্মচারী); কলিকাতা, ১ নিকাশী পাড়া লেন হইতে শ্রীরবীন্দ্রনাথ মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ৬+৭৯ পৃষ্ঠা; ১৯২২; মূল্য ।৵০ আনা।

"মেমর‍্যাণ্ডাম অন কারেন্সী অ্যাণ্ড সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ১৯১৩-২৪"

(মুদ্রা এবং কেন্দ্র ব্যাঙ্কসমূহ সম্বন্ধে খতিয়ান); জেনেহ্বার লীগ অব নেশ্যন্‌স্‌ কর্ত্তৃক-প্রকাশিত; ১৯২৫; ১৮ শি।

"রুস্‌সিশে হ্বির্ট শাফ্‌ট্‌স-গেশিষ্টে"

(রুশিয়ার আর্থিক ইতিহাস); কুনিশার; য়েনা: ফিশার কোম্পানী; ২২+৪৫৮ পৃ; ১৯২৫; ২৪ মার্ক।

"বর্ডারল্যাণ্ডস্‌ অব ইকনমিক্‌স্‌"

(ধন-বিজ্ঞানের সীমান্ত-প্রদেশ); শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়; লণ্ডন; অ্যালেন অ্যাণ্ড আন্‌উইন; ১৮০ পৃষ্ঠা; ১৯২৫; ১২ শি ৬ পে।

"'ল' ত্রিয়ঁফ্‌ দে ফর্স জেকোনোমিক ১৯১৪-১৯১৮"

(আর্থিক শক্তিপুঞ্জের বিজয়-লাভ,—মহাযুদ্ধের ঘটনা ও অবস্থা-বিশ্লেষণ); কনসেট ও ডানিয়েল; ইংরেজী গ্রন্থ ফরাসীতে অনূদিত হইয়াছে; প্যারিস; সোসিয়েতে দেদিসিঅঁ জেঅগ্রাফিক্‌: মারিণ্‌ এ কলনিয়াল; ২০+২৯০ পৃ; ১৯২৪; ১০ ফ্রাঁ।

"লাঁসাইনমাঁ কমার্সিয়াল আঁ ফ্রাঁস এ আ লেত্রাঁজে"

(ব্যবসায়-শিক্ষা—ফরাসী ও বিদেশী বৃত্তান্ত); ফাসি; প্যারিস; দোআঁ; ১৯২৩; ১৪ ফ্রাঁ।

"ইণ্টার্ণ্যাশন্যাল ট্রেড"

(আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য); ব্রাউন; নিউ ইয়র্ক; ম্যাকমিলান কোং; ১২+১৯১ পৃষ্ঠা; ১৯২১।

"ষ্টীভেনস এলিমেণ্টস অব মার্ক্যান্‌টাইল ল"

(ষ্টীভেনস্‌-প্রণীত ব্যবসা-বিষয়ক আইন); যাকব্‌স্‌ কর্ত্তৃক সম্পাদিত; লণ্ডন; বাটারওয়ার্থ কোং; ৬১+৬৮৭ পৃ; ১৯২৫ (সপ্তম সংস্করণ)।

"ইণ্ট্রোডাক্‌শ্যন টু ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল মেথড্‌স্‌"

(তথ্য-তালিকা-বিজ্ঞানের অনুমোদিত আলোচনা-প্রণালী) সেক্রিষ্ট; নিউ ইয়র্ক, ম্যাকমিলান কোং; ৩৩+৫৮৪পৃ; ১৯২৫।

কৃষকদের আর্থিক শিক্ষা

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাস

[চাষীদের আর্থিক উন্নতি না ঘটিলে বাঙালী সমাজের চৌদ্দ আনা লোক দরিদ্র থাকিতে বাধ্য। একথা বুঝিয়া বাংলায় আজকাল স্বদেশ-সেবকমাত্রেই আইনের তরফ হইতে কৃষকদের অবস্থা আলোচনা করিতেছেন। কৃষি দক্ষেরা চাষ-বিজ্ঞানের আলোক ফেলিয়া বিষয়টা বিশ্লেষণ করিতে ঝুঁকিয়াছেন। সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রনীতি এবং ধনবিজ্ঞান বিদ্যার সেবকেরাও কিছু কিছু এই দিকে নজর ফেলিতেছেন।

শিক্ষার তরফ হইতেও দেশোন্নতির এই বিভাগ সম্বন্ধে অনেক-কিছু আলোচনা করিবার আছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের "সাহিত্য সমাজ" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাস-লিখিত "বাঙ্গালার কৃষক" প্রবন্ধের শেষ অংশ বাহির হইয়াছে। তাহাতে কৃষি-শিক্ষা অথবা কৃষকদের আর্থিক শিক্ষা সম্বন্ধে সুবিস্তৃত এবং সুচিন্তিত আলোচনা পাইতেছি। রচনাটা গোটা বাঙালী সমাজের কাজে লাগিবার উপযুক্ত। স্থানে স্থানে একটু আধটু বদলাইয়া প্রবন্ধটা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।—সম্পাদক]

দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী, পল্লীর সংস্কারক, কৃষকের মঙ্গলকামী মহাপুরুষগণ এখন সর্ব্ববিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া বাঙ্গালার কৃষকের শিক্ষার পথ নির্দ্দেশ করুন। কৃষক যেন খরচের চাপে পরিত্রাহি না ডাকে এবং ছাত্রও যেন উদরান্নের জন্য অপরের কৃপাপ্রার্থী না হয়। আমার অনুরোধ—শিক্ষার জন্য কৃষককে ব্যয়ভারে অব্যাহতি দিউন এবং ছাত্রকে অন্যূন একাদশ বৎসরেই স্বাবলম্বী হইতে দিউন। অথচ এমনি পন্থা অবলম্বন করুন, যেন কৃষিবিদ্যালয় অত্যল্প সময়েই নিজে সমস্ত ব্যয় বহন করিতে পারে। সর্ব্ব বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া, বাঙ্গালার কৃষকের উপযোগ হইবে আশা করিয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাবনা সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিলাম।

বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগ

(৫—১১ বৎসর)

শ্রেণী	বয়স	সময়	বিষয়
১ম মান (ক + খ)	পাঁচ বৎসর হইতে সাত বৎসর	প্রাতে ৬—৯, বৈকালে ১—৩	লিখন, পঠন, ধারাপাত, যোগ, বিয়োগ ইত্যাদি।
		ঐ ৩—৪	গাছের গোড়ায় জল দেওয়া, ছাগল, হাঁস ইত্যাদিকে খাবার দেওয়া এবং এই প্রকার কাজ, যাহা বালকেরা আনন্দের সহিত করিতে পারে ও ছুটাছুটী খেলা।
২য় মান (ক + খ)	সাত বৎসর হইতে নয় বৎসর	প্রাতে ৬—৯	সাহিত্য (বাঙ্গালা)—কৃষি-বিষয়ক, পশু-পালন-বিষয়ক, স্বাস্থ্য-বিষয়ক, ব্যাকরণ, অঙ্কশাস্ত্র (শুভঙ্করী)।
...	...	বৈকালে ১—৩	তুলার পাঁজ করা, চরকা কাটা, সূতা গুটান ইত্যাদি।
...	...	ঐ ৩—৪	সহজ উপায়ে পাটের দড়ি পাকান, দড়ির তাল করা, গাছের গোড়ায় জল দেওয়া, গৃহপালিত পশুর যত্ন ইত্যাদি।
...	...	ঐ ৪—৪॥	ছুটাছুটী খেলা।

শ্রেণী	বয়স	সময়		বিষয়
৩য় মান (ক+খ)	নয় বৎসর হইতে ১১ বৎসর	প্রাতে	৬—৯	সাহিত্য (বাঙ্গালা) কৃষি-বিষযক—যথা বীজ-বপন, শস্য-সংগ্রহ, সময় নিরূপণ। মৃত্তিকার লক্ষণ ও শ্রেণী-বিভাগ, পশু-পালন ও টোটকা পশু-চিকিৎসা, স্বাস্থ্যতত্ত্ব টোটকা ঔষধ-শিক্ষা, বাঙ্গালা দেশের প্রাকৃতিক বিবরণ ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও ব্যাকরণ, অঙ্কশাস্ত্র ইত্যাদি। দলিল পত্র লিখন।
...	...	বৈকালে	১—৩	চরকা কাটা, বসিবার আসন, সতরঞ্চ ও বস্তা বুনন শিক্ষা।
...	৯—১১	ঐ	৩—৪	ক্ষেতের কাজ—ঘাস তোলা, জল দেওয়া শস্যসংগ্রহ ইত্যাদি।
...	...	ঐ	৪।—৫	খেলা—বউ বসান, হাডুডু, গজে ইত্যাদি।

বিদ্যালয়ের শিক্ষানবিশ বিভাগ *

(১১—১৬ বৎসর)

শ্রেণী	বয়স	সময়		বিষয়
৪র্থ মান (ক+খ)	১০—১৩	প্রাতে	৬—৯	হাল চষা, সার দেওয়া, বীজ বপন, নিড়ান, শস্য সংগ্রহ ইত্যাদি ক্ষেতের কাজ, পশুপালন।
...	...		১১—১২	চরকা কাটা।
...	..	বৈকালে	১—৪	দড়ি পাকান, কাছি, আসন, সতরঞ্চ, বস্তা, মোজা, গেঞ্জী, বস্ত্র বয়ন শিক্ষা, ফলের চাষ, বুনন শিক্ষা। বাঁশের কাজ ইত্যাদি, পাখা, পেতে, চুপড়ী, ঝুড়ি, ঝাকা, মোড়া, চেয়ার, পেটরা ইত্যাদি।
..	..		৪—৫	খেলাধূলা—হাডুডু, গজে, কুস্তি।
		সন্ধ্যায়		
...	...		৭—৭-৪৫	ইংরেজী শিক্ষা।
...	...		৭ ৪৫—৮-১৫	হিন্দী শিক্ষা।
...	..		৮-১৫—৯	কৃষি বিষয়ক আলোচনা।
...	...		৯—৯-৩০	স্বাস্থ্যতত্ত্ব—সহজ গৃহচিকিৎসা, রোগ নির্ণয় টোটকা ও হোমিও চিকিৎসা।
...	...		৯-৩০—১০	সর্ব্বপ্রকার খত-পত্র, দলিল, কোবালা, কবচ বা দাখিলা লিখন শিক্ষা ও তাহাদের টিকিটের নিয়ম।
৫ম মান	১৩—১৬	প্রাতে	৬—৯	সর্ব্বপ্রকার চাষের কাজ—হাল চষা, মাটিকাটা, জল সেচা, বীজবপন, নিড়ান, শস্যসংগ্রহ ইত্যাদি।
...	...	ঐ	১১॥—১২॥	চরকা কাটা।

* এই বিভাগ অবৈতনিক। ছাত্রগণকে দিবারাত্র বিদ্যালয়ে বাস করিতে হইবে। বিদ্যালয় তাহাদের ভরণ-পোষণের ভার গ্রহণ করিবে।

শ্রেণী	বয়স	সময়	বিষয়
৫ম মান	১৩—১৬	বৈকালে ১—৪	দর্জ্জির কাজ, ছুতারের কাজ, কামারের কাজ ইত্যাদি।
...	...	ঐ ৪॥—৫॥	খেলাধূলা—কুস্তি, লাঠি খেলা, তীর চালনা, বর্শা ও বল্লম-চালনা।
		সন্ধ্যায়	
...	...	৭—৭-৪৫	কৃষি-বিষয়ক আলোচনা।
...	...	৭-৪৫—৭-১৫	স্বাস্থ্যতত্ত্ব—সহজ গৃহচিকিৎসা—কবিরাজী, সহজ পশু চিকিৎসা।
			ইংরেজী শিক্ষা—লিখন পঠন ও কথাবার্ত্তা।
...	...	৮-১৫—৯	হিন্দী শিক্ষা—লিখন পঠন ও কথাবার্ত্তা।
...	...	৯—৯-৩০	সহজ জরিপ শিক্ষা, প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনাদি, রাজাপ্রজা সম্বন্ধ, কৃষকের কর্ত্তব্য ইত্যাদি।
...	...	৯-৩০—১০	সমাজ ও ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা, বিভিন্ন ধর্ম্মের সমন্বয় ইত্যাদি।

শিক্ষণীয় বিষয় ও শিক্ষাপ্রণালী

মোটকথা কৃষিবিদ্যালয় এমন ভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে যেন ইহা একাধারে "গুরুগৃহ", বিদ্যালয়, শিল্পাগার, নার্সারি, গোলাঘর, সালিশী, আদালত, ভেষজখানা, দুগ্ধাগার, ক্ষুদ্র মেডিক্যাল কলেজ, আইন কলেজ, পশু চিকিৎসালয়, কারখানা এবং মুক্তি-সেনার ব্যারাক অথচ নিরীহ কৃষকের সামান্য কুটীরখানি হয়। কৃষি-বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের বিভিন্ন নামের জাঁকজমকে ভুলিবেন না, বা অপরের চক্ষে ধাঁধা লাগাইবেন না। বড় বড় কথার বৃথা আড়ম্বরে নিজের উদ্দেশ্য হারাইয়া যায়। মনে রাখা উচিত কৃষি-বিদ্যালয় বাঙ্গালার সেই কৃষকের জন্য, যাহারা শীত, গ্রীষ্ম, জল, কাদা, ঝঞ্ঝাবায়ু তুচ্ছ করিয়া বার মাস মাঠে মাঠে হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়া বেড়াইবে। তাহাদের হ্যাট-কোট, জুতা-মোজা, পাল্লাদার শালের বা খাট-পালঙ্কের প্রয়োজন নাই—কালিয়াপোলাও রাজভোগের আবশ্যক নাই। তাহাদের জীবন যেমন সরল কার্য্য যেমন কঠিন এবং বিরামহীন অথচ ফলপ্রসূ, বিদ্যালয় ও তেমনি সাধারণ, আড়ম্বরহীন, এবং শিক্ষাও তেমনি সহজ অথচ দৃঢ় নিয়মাধীন ও কার্য্যকরী হওয়া চাই। এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কৃষি-বিদ্যালয়ের সম্বন্ধে একবার আমূল আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

কৃষি বিদ্যালয়কে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—(১) প্রাথমিক ও (২) শিক্ষানবিশ।

প্রাথমিক বিভাগে ৫ হইতে ১১ বৎসর পর্য্যন্ত ৬ বৎসর অধ্যয়ন-কাল। এই সময়ের মধ্যে ছাত্রকে বাঙ্গালা লিখন-পঠন হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষিকার্য্য, সহজ শিল্প, স্বাস্থ্যরক্ষা, দেশীয় টোটকা, সহজ পশু-চিকিৎসা ইত্যাদি যতদূর সম্ভব পাঠ দেওয়া হইবে। ছাত্রকে এখানে ইংরেজী শিক্ষার মহাসমুদ্রে ফেলিয়া হাবুডুবু খাওয়ান হইবে না। তাহার ভবিষ্যৎ কৃষক-জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় বিষয়ে মৌখিক ও সম্ভবমত ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়া হইবে। বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা ও আয় হিসাবে প্রাথমিক বিভাগ বেতনগ্রাহী বা অবৈতনিক হইতে পারে। আরো মনে রাখিতে হইবে, সাহিত্যই অঙ্কশাস্ত্র ভিন্ন অন্যান্য সর্ব্ব বিষয়ের আধার হইবে। ছাত্রেরা বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন পুস্তক দেখিয়া সাধারণতঃ দিশাহারা হইয়া যায়। সে জন্য সাহিত্যখানি এরূপভাবে সুসজ্জিত করিতে হইবে যেন উহা সর্ব্ব-বিষয়ের আকর অথচ মনোমুগ্ধকর হয় এবং অর্জ্জিত বিদ্যা ভবিষ্যৎ জীবনে আদৌ বিফলে না যায়। নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে পাঠ্য পুস্তকের পরিবর্ত্তন হইবে না। প্রকাশক ও গ্রন্থকারের আয়ের পরিবর্ত্তে ছাত্রের শিক্ষাই লক্ষ্য হইবে!

দ্বিতীয় (শিক্ষানবিশ) বিভাগে ১১ হইতে ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসর শিক্ষা-কাল। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালার কৃষকের যেরূপ অবস্থা তাহাতে (১) কৃষি-কার্য্যের ক্ষতি করিয়া (২) খোরাক, পোষাক, মাহিনা ও পুস্তকের দাম দিয়া কার্য্যক্ষম পুত্রকে বিদ্যালয়ে পাঠানো অসম্ভব। সেজন্য শিক্ষানবিশ বিভাগ সমস্ত ছাত্রের ভরণ-পোষণ ও বাসস্থানের ভার গ্রহণ করিবে, অর্থাৎ প্রকৃত প্রস্তাবে ১১ বৎসর হইতেই কৃষক-পুত্রকে স্বাবলম্বী করিতে হইবে। ইহাতে তাহার পিতার ব্যয়ভারের লাঘব হইবে, নিজের শিক্ষার পথ প্রশস্ত হইবে, দিবারাত্র স্কুলে থাকিয়া বিভিন্ন বিদ্যা আয়ত্ত করিবার সুযোগ হইবে, সর্ব্বদা শিক্ষকদিগের সংস্পর্শে থাকিয়া তাহাদের কার্য্যকলাপ, আচার-ব্যবহার ও চরিত্র অনুকরণের সুবিধা হইবে, বিভিন্ন জাতীয় বহু সহপাঠীর সহিত একত্রে বাস করিয়া, একত্রে কার্য্য করিয়া, একই শিক্ষা পাইয়া একতা অভ্যাস করিতে এবং ভবিষ্যতে পরস্পর সম্মিলিত হইয়া যৌথ কৃষি ও অন্যান্য শিল্প ব্যবসায়ের পরিচালনা করিতে শক্তি জন্মিবে। প্রথম হইতেই কৃষি-কার্য্যের সমুদয় দুঃখ-কষ্টের মধ্যে নিজের দেহ মন সবল সক্ষম করিয়া এবং কুস্তি ও লাঠি খেলা ইত্যাদি পুরুষজনোচিত ক্রীড়ায় শক্তিসম্পন্ন হইয়া কৃষকপুত্র দস্যু-তস্করের আক্রমণ অনায়াসেই প্রতিহত করিতে পারিবে। বিভিন্ন দেশের আলোচনায় তাহার দেশাত্মবোধ জন্মিবে।

শিক্ষানবিশ বিভাগে হাতে হাতিয়ারে কাজ করিতে হইবে। সেজন্য সমস্ত দিবাভাগ বিভক্ত করিয়া কৃষি ও বিভিন্ন শিল্পের জন্য পৃথক করা হইয়াছে। হল-চালনা ইত্যাদি চাষবাসের কাজ দিবসের প্রথম ভাগেই প্রশস্ত। অন্য সময় যখন সূর্য্যের তাপ প্রখর হয়, তখন ছায়ায় বসিয়া নানাবিধ শিল্প-কার্য্য করা যাইতে পারে। ৪র্থ ও ৫ম মানে পাঁচটী শিল্পের উল্লেখ করা হইয়াছে। বর্ত্তমান স্কুল বা কলেজের ন্যায় কিয়ৎক্ষণ বিজ্ঞান ও সাহিত্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট না করিয়া এক বার্ষিক ছাত্রকে এক বৎসর ধরিয়া একটী শিল্প শিক্ষা দিয়া ব্যুৎপন্ন করিতে হইবে। শিল্প বিভাগ যেমন পাঁচ ভাগে বিভক্ত, ব্যায়াম বিভাগও সেইরূপ ছাত্রের বয়স, শক্তি ও যোগ্যতানুসারে বিভিন্ন "আখড়ায়" বিভক্ত করিতে হইবে। ব্যায়াম বিভাগে ক্রিকেট, ফুটবল ইত্যাদি আধুনিক ক্রীড়ার উল্লেখ নাই বলিয়া কেহ কেহ "চাষাড়ে কাণ্ড" বলিয়া উপহাস করিতে পারেন। একথা যাহারা বলেন তাহারা মনে রাখিবেন এটী কৃষি বিদ্যালয়—চাষার ছেলের জন্য এবং গরিবের জন্য। তাহাদের পাঁচ বিঘা জমি পতিত রাখিয়া টাকা দিয়া "বল" কিনিয়া "ম্যাচ" খেলিবার সামর্থ্য নাই। মিতব্যয়িতা এখানকার মূলধর্ম্ম। আর ঘরের মধ্যে সিঁদ কাটিয়া চোর প্রবেশ করিলে, গৃহস্বামী ফুটবল ক্লাবের ক্যাপ্টেন শুনিয়া চোর মহাশয় সকাতরে "হ্যাণ্ডকাপ" চাহিয়া লইবেন না। আবার শস্যক্ষেত্রে শৃগাল বা বন্যবরাহ উৎপাত করিলে, তাহারাও ফুটবলের নাম শুনিয়া পশ্চাদ্ভাগের পদদ্বয়মধ্যে পুচ্ছ লুকাইয়া পলাইবে না—বরং বল খেলোয়াড়কে "গোয়াল" পর্য্যন্ত তাড়া করিয়া "গোল" করিতে পারে। বস্তুতঃ বল খেলার উপকারিতা এইখানেই দেখিতে পাওয়া যায়। স্বীকার করি বল খেলা একটী উৎকৃষ্ট ব্যায়াম, ইহাতে শরীর দৃঢ় ও কষ্ট-সহিষ্ণু করে—কিন্তু শত্রু হইতে এক মাত্র পলায়ন ভিন্ন অন্য কোনোরূপেই আত্ম-রক্ষা করিতে সাহায্য করে না।

শিক্ষানবিশ বিভাগে সন্ধ্যার পর ৭—১১টা নৈশ বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা রহিয়াছে। এই নৈশ বিদ্যালয় এই বিভাগের একমাত্র থিয়োরেটিক্যাল বিভাগ। (১) এখানেই ছাত্রের প্রথম ইংরেজী অক্ষর-পরিচয় হইবে এবং ৪র্থ ও ৫ম মানে পাঁচ বৎসর ধরিয়া তাহাকে লিখিতে পড়িতে ও বলিতে শিক্ষা দেওয়া হইবে। ছাত্র যাহাতে শীঘ্র এবং অনায়াসে কথাবার্ত্তা কহিতে পারে সেই দিকেই বেশী লক্ষ্য রাখা হইবে। ভাষা-শিক্ষা যখন মনের ভাব প্রকাশের জন্য, তখন যত সহজে মনের ভাব কথায় ব্যক্ত করা যায় সেই চেষ্টা করাই সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। (২) অতঃপর ছাত্রের হিন্দী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে। বাঙ্গালা ভাষা যতই মধুর হউক এবং বাঙ্গালী বাঙ্গালা ভাষার যতই উন্নতি করুক না কেন, মনে রাখা উচিত বাঙ্গালাদেশের সীমার বাহিরে বাঙ্গালা ভাষার কোনই আদর নাই এবং অ-বাঙ্গালীর মধ্যে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিবার আগ্রহ হাজারকরা একজনেরও আছে কিনা সন্দেহ। অথচ বাঙ্গালা দেশ এখন জগতের সমুদয় জাতির

মিলন-স্থান এবং এইসমুদয় জাতির মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান করিতে ইংরেজী প্রথম এবং হিন্দী দ্বিতীয় উপায়। বাঙ্গালীকে যখন অ-বাঙ্গালীর সহিত আদান-প্রদান করিতেই হইবে, তখন হিন্দী ভাষাও শিখিতেই হইবে।

(৩) কৃষি বিষয়ের আলোচনা কৃষি শিক্ষকের নিজস্ব থাকিবে। তিনি এই সময় স্থানীয় কৃষি ও বিভিন্ন দেশীয় উন্নত প্রণালীর কৃষি সম্বন্ধে সরলভাবে বক্তৃতা দিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভিন্নদেশীয় কৃষি-পদ্ধতি কিরূপে যথাসম্ভব অল্প ব্যয়ে আমাদের দেশে প্রবর্ত্তিত করা যায় সেরূপ উপায় ও স্থির করিবেন। ভিন্ন দেশীয় কৃষি-পুস্তক ও বাৎসরিক বিবরণ হইতে আবশ্যক অংশ ছাত্রদিগকে বুঝাইয়া দিবেন। বীজ সংগ্রহ, সংরক্ষণ, সার সংগ্রহ, জমি ভেদে সারের উপকারিতা ইত্যাদি চাষবাস সংক্রান্ত সমুদয় বক্তব্য বিষয়ের আলোচনা হইবে। কৃষি শিক্ষক মনে রাখিবেন, তিনি সন্ধ্যায় যে যে বিষয়ে বক্তৃতা দিবেন প্রাতে সেই সেই বিষয় যথাসম্ভব কার্য্যে দেখাইতে হইবে। স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য এই হইবে যে কৃষককে কথায় কথায় ডাক্তার ডাকিতে না হয়, অথচ সে যেন অযত্নে, অচিকিৎসায়, অকালে না মরে; সে যেন ভবিষ্যৎ জীবনে নিজের পারিবারিক স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে পারে; পরিবারস্থ কেহ সামান্য পীড়িত হইলে বা কোনও আকস্মিক বিপদে সে যেন ভাবিয়া আকুল না হয় এবং বাসস্থানের পারিপাট্য, আহার ও পানীয়ের নির্দ্দোষতা উপেক্ষা করিয়া বিপদগ্রস্ত না হয়। তাহার যতটুকু সাধারণতঃ দরকার এবং সাধ্য তাহাই শিক্ষা দেওয়া হইবে। (৫) ব্যবহারিক বিভাগে এরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে যেন ছাত্র সংসারে প্রবেশ করিয়া নিজেই নিজের জমিজমার স্বত্ব-স্বামিত্ব, টাকা পয়সায় আদান-প্রদান বা ব্যবসায়াদির চুক্তি পত্রাদিতে লক্ষ্য রাখিতে পারে। মোট কথা নিজের অজ্ঞতাহেতু সে যেন কোনও বিষয়ে প্রবঞ্চিত না হয়।

নৈশ বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় উল্লিখিত বিষয় ব্যতীত যদি কখনও কোনও সাময়িক ঘটনার আলোচনা করিলে, ছাত্রদিগের লাভবান হইবার আশা থাকে, তাহা হইলে সে সমস্ত বিষয়েরও যথাসম্ভব আলোচনা হইবে। মোটকথা ছাত্রকে মানুষের মত গড়িয়া তুলিতে কোন বিষয়েই কার্পণ্য করা হইবে না।

মৌখিক ও ব্যবহারিক শিক্ষাদান ব্যতীত কৃষিবিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের আরও অনেক কর্ত্তব্য থাকিবে। বিদ্যালয়ের বহির্ভূত সাধারণ কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষবিধান, কৃষকদিগের মধ্যে উৎকৃষ্ট বীজ ও উৎকৃষ্ট সার সরবরাহ করা, শস্যের পরিবর্ত্তে যথাসাধ্য অল্পসুদে অর্থ সাহায্য, সূতার বিনিময়ে বস্ত্রবয়ন, কাটারি, কুড়ালি, চরকা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ দেশের স্বাস্থ্য, সমাজ, ধর্ম্ম, উৎপন্ন দ্রব্যের খরিদ-বিক্রয় সম্বন্ধে উপদেশ, স্থানীয় বাদবিসম্বাদের মীমাংসা ইত্যাদি তাহাদের অন্যতম কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য হইবে। মোট কথা, কৃষি বিদ্যালয় যেন দেশের জাতীয় প্রতিষ্ঠান হয়—দেশের আদর্শ স্থল হয়। দেশের লোক যেন কৃষি বিদ্যালয়কে নিজের জিনিষ বলিয়া গৌরব করিতে পারে।

বিদ্যালয়ের খরচপত্র

উপরে যেরূপ প্রস্তাব করিয়াছি তদনুসারে একটী আদর্শ কৃষিবিদ্যালয়ের জন্য নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি প্রয়োজন হইবে যথা, ৫০/০ বিঘা জমি একবন্দে, চারিটী হালের গরু, চাষ-বাসের দ্রব্যাদি, শিল্পযন্ত্রাদি, পাঠ্যপুস্তকাদি, অন্ততঃ দশটী গাভী, একটী উৎকৃষ্ট ষাঁড়, ছাগল, হাঁস, মোরগ মুরগী ইত্যাদি। একটী পুষ্করিণী, পানীয় জলের জন্য একটী "টিউবওয়েল" একটী প্রশস্ত পাঠ-গৃহ, পাঁচটী শিল্পশাসন, হিন্দু ও মুসলমান ছাত্র ও শিক্ষকদিগের জন্য দু'টী পাকশালা, গোয়ালঘর, গোলাঘর ও ছাগলাদির জন্য পৃথক খোঁয়াড় থাকিবে। প্রধান পাঠগৃহের সম্মুখে প্রশস্ত উঠান রাখিয়া নানাবিধ নিত্য প্রয়োজনীয় ফল-মূলের গাছ লাগাইয়া বিদ্যালয়টী এরূপভাবে সুসজ্জিত করিতে হইবে যেন উহা বনদেবীর নির্জ্জন অথচ মনোহর মন্দিরটী বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

এখন সদাশয় দেশভক্তদিগের প্রতি আমার অনুরোধ—প্রজার মঙ্গলের জন্য এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া সহর হইতে দূরে অথচ কোনও রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটে, কৃষকপল্লীর মধ্যে ৫০/ বিঘা জমি ও উপযুক্ত আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করুন। পল্লীতে ২০০০৲ হইতে

৩০০০৲ টাকার মধ্যে ৫০/বিঘা জমি চেষ্টা করিলেই পাওয়া যাইবে। গৃহাদি নির্ম্মাণ, পুষ্করিণী খনন, ও অন্যান্য আসবাব পত্রাদির জন্য আরও ৫০০০৲ টাকার প্রয়োজন। প্রতি মহকুমায় একটী করিয়া আদর্শ কৃষিবিদ্যালয়ের প্রয়োজন। অন্ততঃ প্রতি জেলায় একটি করিয়াও পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। একটী জেলার জন্য এই ৮০০০৲ আট হাজার টাকা সংগ্রহ করুন, অন্যান্য আয় ব্যয়ের পথ ক্রমে নির্দ্দেশ করিতেছি।

প্রথম হইতে ৫ম মান পর্য্যন্ত যেরূপ শিক্ষাকার্য্যের তালিকা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে অন্ততঃ ১৪জন শিক্ষকের প্রয়োজন। শিক্ষকদিগের যোগ্যতা, কার্য্য ও বেতন নিম্নলিখিত তালিকাভুক্ত করা হইল।

তালিকা

সংখ্যা	শিক্ষক	কার্য্যকাল	কার্য্য	মাসিক বেতন
১	প্রধান কৃষি-শিক্ষক	প্রাতে ৬—৯	ক্ষেত্রে কৃষিকার্য্যের	
	আমেরিকা বা হল্যাণ্ডের		পরিদর্শন	
	কৃষিপ্রণালী-অভিজ্ঞ	মধ্যাহ্নে ১২॥—১॥	চরকা	
		বৈকালে ২—৫	বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান	
		সন্ধ্যায় ৭—১০	৪র্থ ও ৫ম মানে বক্তৃতা দেওয়া	১০০৲
১	সহকারী কৃষি-শিক্ষক	প্রাতে ৬—৯	হল-চালনা ইত্যাদি চাষবাস	
	শিক্ষিত ও স্থানীয়	১২॥—১॥	চরকাকাটা	
	কৃষি-কার্য্যে অভিজ্ঞ			
		বৈকালে ২—৪	কোন হস্ত শিল্প	
		সন্ধ্যায় ৫—৭॥	গবাদি পশুর তত্ত্বাবধান—	
			জাব দেওয়া ইত্যাদি।	২০৲
২	প্রাথমিক শিক্ষক	প্রাতে		
	(১ জন হিন্দু ও	৬—৯ ও	১ম ও দ্বিতীয় মানে	
	১ জন মুসলমান)	বৈকালে ১—৪	যাবতীয় শিক্ষা	
		সন্ধ্যায় ৮—১১	রন্ধনকার্য্য ও পরিবেষণ	২০৲ হিঃ ৪০৲
২	ব্যায়াম-শিক্ষক	প্রাতে ৮—১১	রন্ধনকার্য্য ও পরিবেষণাদি	
	(১ জন হিন্দু ও	বৈকালে ১—৪	শিল্প-কার্য্য	
	১ জন মুসলমান)			
		সন্ধ্যায় ৭—১০	বিদ্যালয়ের যাবতীয়	
			হিসাব রক্ষণ	২০৲ হিঃ ৪০৲
৪	সাধারণ শিক্ষক			
	[(ক) ১জন মোক্তারশিপ		২য় ও ৩য় মানের	(ক) ৩৫৲
	পাস বা ফেল	প্রাতে ৬—৮	শিক্ষকতা	
	(খ) ১ জন হিন্দী অভিজ্ঞ	মধ্যাহ্নে	চরকা, হস্তশিল্প ও	(খ) ৩০৲
	(গ) ১ জন কবিরাজ	১২॥—৪॥	চিকিৎসা ইত্যাদি	(গ) ৩৫৲

সংখ্যা	শিক্ষক	সময়	কার্য্য		মাসিক বেতন
	(ঘ) ১ জন হোমিও ডাক্তার				
	অন্ততঃ আই, এ	৭—১০	৪র্থ ও ৫ম মানের	(ঘ)	৫৫৲
	বা এণ্টান্স পাশ হইবেন]		শিক্ষকতা		
৪	শিল্পশিক্ষক				

[(ক) তন্তুবায়, (খ) দর্জ্জি (গ) সূত্রধর, (ঘ) কর্ম্মকার—ইহারা অপরাহ্ন ২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত নিজ নিজ বিভাগে শিক্ষা দিবেন। অন্য সময় নিজেই ২।১ জন দক্ষ ছাত্রের সাহায্যে স্ব স্ব কার্য্য করিবেন। বিদ্যালয় ইহাদের কার্য্যের ব্যবস্থা ও গঠিত দ্রব্যের বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবেন] ৩৫৲ হিঃ ১৪০৲

৪র্থ ও ৫ম মানের প্রতি বার্ষিক শ্রেণীতে অনুমান ১২জন করিয়া মোট ৬০ জন ছাত্র ও ১৪ জন শিক্ষকের মাসিক খোরাকী ৭॥০ হিসাবে ৫৫৫৲

অথবা বার্ষিক ব্যয়— ১২,৩৮০৲

বিদ্যালয়ের আয়

	আনুমানিক ছাত্র সংখ্যা	মাসিক মাহিনা	মাসিক মোট	বাৎসরিক মোট
১ মান				
[১ম বর্ষ	২৪	।০	৬।০	৭৫৲
২য় বর্ষ]	২০	।০	১০৲	১২০৲
২য় মান				
[১ম বর্ষ	১৬	৸০	১২৲	১৪৪৲
২য় বর্ষ]	১৬	৸	১২৲	১৪৪৲
৩য় মান				
[১ম বর্ষ	১৫	১৲	১৫৲	১৮০৲
২য় বর্ষ]	১৫	১৲	১৫৲	১৮০৲

৪র্থ মানের ১ম বর্ষের প্রতি ছাত্রের এক কালীন পনর টাকা করিয়া আনুমানিক ১২ জন ছাত্রের ভর্ত্তি ফি ... ... ১৮০৲

১০২৩৲

সুশৃঙ্খলায় কার্য্য করিলে ৬০ জন ছাত্র এবং ১০ জন শিক্ষক চরকা কাটিয়া ও অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্যাদিতে দৈনিক ।০ চারি আনা করিয়া অনায়াসেই উপার্জ্জন করিতে পারেন। এই হিসাবে অন্ততঃ মাসিক ৭৲ করিয়া ৭০ জনের বার্ষিক উপার্জ্জন ... ... ৫৮৮০৲

চাষের উৎকর্ষ-সাধন হইলে, ও উৎপন্ন দ্রব্য যথাসময়ে প্রকৃত বাজার-দরে বিক্রয় করিলে প্রতি বিঘায় একশত টাকার ফসল অনায়াসেই পাওয়া যায়। সেই হিসাবে পুষ্করিণী ও ঘরবাড়ীর জন্য ৫৴০ বিঘা জমি বাদে ৪৫৴০ বিঘা জমির বার্ষিক আয় ... ... ৪৫০০৲

৪ জন শিল্প শিক্ষকের ২।১ জন ছাত্র সাহায্যে দৈনিক আয় অনায়াসেই ১॥০ থেকে ২৲ টাকা হইতে পারে। তন্মধ্যে ছাত্রের অংশ পরিত্যাগ করিয়া শিক্ষকের আয় ১৷০ করিয়া দৈনিক ধরিলে ও ৪ জনের বার্ষিক আয় ১৮০০৲

একুন ১৩২০৩৲

ইহাতেই দেখা যাইতেছে যে, আন্তরিক চেষ্টা করিলে কৃষি-বিদ্যালয় নিজের অভাব নিজেই পূরণ করিতে পারে। তাহা ছাড়া, যখন সকল বিদ্যালয়ই গবর্ণমেণ্টের সাহায্য পাইয়া থাকে তখন কৃষি-বিদ্যালয়ও কিছু দাবী করিতে পারে। উপরিলিখিত উপার্জ্জন ভিন্ন সার বিক্রয় কৃষক-দিগের মধ্যে বিতরিত অর্থের সুদ, বিবাহাদি কার্য্যে দান, সালিশী আদালতের জরিমানা, দুগ্ধ ও ছাগাদি বিক্রয়ের আয় থাকিবে। ক্রমে শিল্পবিভাগ যত উন্নতি লাভ করিবে, কৃষি বিভাগে যত উন্নত পদ্ধতি প্রকাশিত হইবে, ততই বিদ্যালয়ের আয় বৃদ্ধি পাইবে।

হিন্দু মুসলমান

স্পষ্ট করিয়া বলা উচিত যে, "বাঙ্গালার কৃষক" বলিতে হিন্দুমুসলমান সকলকেই তুল্যরূপে লক্ষ্য করিয়াছি, এবং কৃষিবিদ্যালয় যে জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে বাঙ্গালার কৃষকের সৎশিক্ষার কেন্দ্র হইবে ইহাই আমার আন্তরিক উদ্দেশ্য। যাঁহারা বাঙ্গালায় শিক্ষার বহুল প্রচলন, বিভিন্ন জাতি ও ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে একতা এবং উন্নত জাতীয় জীবন গঠন করিতে অভিলাষী, তাঁহারা একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন এইরূপ পন্থা অবলম্বন ভিন্ন উপায় নাই। বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি আংশিক অপ্রয়োজনীয় এবং অসম্পূর্ণ। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য জ্ঞানলাভ, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য অর্থোপার্জ্জন। উপস্থিত শিক্ষায় আমাদের কোনও উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয় না। ছাত্র বিদ্যালয় হইতে বাহিরে আসিয়া একটী নূতন জগৎ দেখে এবং তাহার স্থান সে জগতের কোন্ প্রান্তে তাহা সন্ধান করিতে পারে না। সমাজ, ধর্ম্ম, স্বাস্থ্য কি ব্যবহারিক রীতিনীতি ইত্যাদি কোনও বিষয়ে তাহার জ্ঞান জন্মিয়াছে এ কথা কিছুতেই বলা যায় না। সুতরাং শিক্ষার প্রহসন পরিত্যাগ করিয়া যথার্থ শিক্ষার অবতারণা করাই মঙ্গলজনক।

নবীন বঙ্গের গোড়াপত্তন

১। বাঙালী সমাজে ব্যাঙ্কিং স্বভাব

আজকালকার বাঙালী ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে নিজ টাকাকড়ি বাঁচাইতে ও বাড়াইতে অভ্যস্ত। এই অভ্যাস দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে।

যত উপায়ে ব্যাঙ্ক গড়িয়া তোলা যায় তাহার ভিতর সমবায়-প্রথা অন্যতম। সমবায়-প্রণালীতে গঠিত ব্যাঙ্কগুলা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। পল্লী-সমিতির তাঁবে যে সকল ধন-কেন্দ্র পরিচালিত হয় সেগুলাকে "স্থানীয়" বলে। তাহা ছাড়া, জেলা বা ডিভিশনের এলাকার পল্লী-ব্যাঙ্কগুলাকে সাহায্য, শাসন ও পোষণ করিবার নিমিত্ত জায়গায় জায়গায় বড় বড় সমবায়-ব্যাঙ্ক চলিতেছে। সেইগুলাকে বলে সেন্ট্রাল বা কেন্দ্র-ব্যাঙ্ক।

মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম এবং বর্দ্ধমান এই তিন অঞ্চলের "সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক" সম্বন্ধে সংবাদ বাহির হইয়াছে "ভাণ্ডার" মাসিকে (কলিকাতা, আষাঢ়, ১৩৩৩)। সর্ব্বত্রই বাংলার নরনারী ব্যাঙ্কের আওতায় আসিবার জন্য সচেষ্ট এইরূপ বুঝিতেছি। এই অভ্যাস এবং স্বভাবই কালে যুবক বাংলার আর্থিক ভাগ্যে যুগান্তর আনিবে।

মেদিনীপুর সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক

১৯২৪-২৫ সনে এই ব্যাঙ্কের মূলধন ছিল ৩,৭৫,৫৪৪৲। ১৯২১-২২ সনে অর্থাৎ চারি বৎসর পূর্ব্বে মূলধনের পরিমাণ ছিল ২,১৫,৩২৬৲। এই চারি বৎসরের মধ্যে মূলধনের যে বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা বেশ সন্তোষজনক। আলোচ্য বর্ষে সমিতির ২৪৪টী সাধারণ ও ৫৪টী বিশিষ্ট অংশীদার ছিল। সাধারণ অংশীদারদের মধ্যে বেশী ভাগই কৃষি-সমিতি। কয়েকটী অন্যান্য প্রকারের সমিতিও ছিল। ব্যাঙ্কের আমানতের কারবার প্রসার লাভ করিতেছে। আলোচ্য বর্ষে বিনা সুদে চলতি আমানতের পরিমাণ ১০,৭৯৪ হইতে ১৯,৭৯৫ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। সভ্য সমিতিগুলি এই ব্যাঙ্কের নিকট সাধারণতঃ ৯৷৵০ হারে কর্জ্জ পাইয়া থাকে। গত বৎসর ব্যাঙ্কের নিট লাভ ৯,৩৯৫৷১০ হইয়াছিল। এই টাকা হইতে ৯৷৵০ আনা হিসাবে লভ্যাংশ বিতরণ করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে এই ব্যাঙ্কের এলাকায় ৮৮টী সমিতি রেজিষ্ট্রী হইয়াছে। গত বৎসর দুইটী নূতন তত্ত্বাবধায়ক ইউনিয়ন স্থাপিত হইয়াছে। এরূপ ইউনিয়নের মোট সংখ্যা এখন ৪। ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরগণ বলিতেছেন যে, সমিতির প্রধান প্রধান সভ্যগণই সাধারণতঃ পঞ্চায়েৎ নির্ব্বাচিত হওয়ায় পঞ্চায়েৎ-

গণের কার্য্যের প্রতিবাদ করিবার সুযোগ প্রায়ই সাধারণ সভ্যগণের ঘটিয়া উঠে না। ইহাতে অনেক স্থলে পঞ্চায়েৎগণ সমিতির বেশী ভাগ মূলধন ইচ্ছামত নিজেরাই কর্জ্জরূপে গ্রহণ করিতেন। কিন্তু উপর্য্যুপরি কয়েক বৎসর এ বিষয়ে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করায় এই প্রকার দোষ আশানুরূপ হ্রাস হইয়াছে।

চট্টগ্রাম সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক

১৯২৪-২৫ সনে চট্টগ্রাম সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের মূলধন ছিল ২,৭৩,৩০২ টাকা। ১১ বৎসর পূর্ব্বে যখন এই ব্যাঙ্কটী স্থাপিত হয় তখন ইহার মূলধন মাত্র ১১,৪৪০ টাকা ছিল। ১৯২১ সন হইতে এই ব্যাঙ্ক বিশিষ্ট অংশ বিক্রয় করা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ১৭টী নূতন যৌথ ব্যাঙ্ক গঠিত হইয়াছে, তাহাতে সংযুক্ত সমিতির সংখ্যা গত ৩০শে জুন মোট ১২১টী হয়। ইহা ছাড়া, ৭টী সমিতি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। সংযুক্ত সমিতিগুলির কার্য্যাবলী উল্লেখযোগ্য। চট্টগ্রাম ইণ্ডাষ্ট্রীয়্যাল ইউনিয়নের সাহায্যে ৬টী তন্তুবায় ও ২টী ধীবর সমিতি খোলা হইয়াছে। পাঠানটুলি আশ্রাবাদ যৌথ শিল্প সমিতিতে রজ্জু তৈয়ারী করা হইতেছে। এই সমিতির মেম্বরগণকে সস্তা দরে কাঁচা মাল সরবরাহ করা হয়। দুর্গাপুর গ্রাম্য মহাজনী সভা স্থানীয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে সমবায় ও শিল্প সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত করিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ের সংলগ্ন প্রকাণ্ড ময়দানে উন্নত প্রণালীতে কৃষি-কার্য্য শিক্ষা দেওয়ার জন্য কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করা হইয়াছে। অন্যান্য কতকগুলি সমিতি শিক্ষা, হাসপাতাল, সেবাশ্রম, পথঘাট-নির্ম্মাণ ইত্যাদি দেশহিতকর কার্য্যে সাহায্য করিতেছে। চট্টগ্রাম ব্যাঙ্কের এলাকায় রিবেট প্রথা ও হোমসেফ বকস্ প্রচলন করিয়া সুফল লাভ হইতেছে। রিবেট প্রণালীতে মেম্বরগণ যথাসময়ে কিস্তি পরিশোধ করিলে তাঁহাদিগকে সুদের উপর শতকরা ২৷৹ টাকা ফেরৎ দেওয়া হয়। চট্টগ্রাম সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক হইতে ২০০ শত গৃহ-সঞ্চয় বাক্‌স বিতরণ করা হইয়াছে। কতকগুলি সমিতি এই বাক্‌সের দ্বারা স্বল্প সঞ্চয়ে প্রভূত আমানত সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছে। আশা করা যায় এই বাক্‌সের প্রচলন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে।

বর্দ্ধমান সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক

১৯২৫ সনের ৩০শে জুন তারিখে এই ব্যাঙ্কের মূলধন ছিল ৪,৯৮,৬৫৫৲ টাকা। তন্মধ্যে আমানতের পরিমাণ ছিল ৩,৩৪,১০৮৲ টাকা। এই আমানতের ১,৮৮,০৭০৲ চলতি ও ১,৪৬,০৩৭৲ টাকা স্থায়ী হিসাবে ছিল। ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরগণ বলিতেছেন, এই চলতি আমানত-প্রথা অবলম্বিত হওয়ায় বর্দ্ধমানের ব্যবসাদার, জমিদার, উকীল, মোক্তার ও সর্ব্বসাধারণের একটী বিশেষ অভাব দূরীভূত হইয়াছে এবং ব্যাঙ্কটী জনপ্রিয় হইয়াছে। এই ব্যাঙ্কের চেক এখন প্রায় সকল ব্যাঙ্কেই গ্রহণ করা হয়। আলোচ্য বর্ষে ফসল ভাল না হওয়ায় কিস্তি-আদায় আশানুরূপ হয় নাই। পরন্তু, অধিকাংশ সমিতিকেই চাষ-আবাদের জন্য সামান্য কর্জ্জ দিতে হইয়াছে। ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরগণ বলিতেছেন,—"বর্দ্ধমান প্রধানতঃ চাষীর দেশ। অধিকাংশ স্থানেই বৃষ্টির জলের অভাবের জন্য চাষের কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে গ্রামে গ্রামে জল সরবরাহ সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইলে বর্দ্ধমান আবার শস্যশ্যামল হইবে। বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায় বহু-সংখ্যক ইনেস্পেক্টর ও সুপারভাইজার গবর্মেণ্ট হইতে দেওয়ায় উক্ত দুই জেলায় বহু-সংখ্যক জল-সরবরাহ-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে এবং উক্ত দুই জেলায় দুর্ভিক্ষ হইবার সম্ভাবনা একেবারে কমিয়া গিয়াছে। এই বৎসর বৃষ্টির অভাবে বর্দ্ধমানের অনেক গ্রামে দুর্ভিক্ষ হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলার ন্যায় এখানেও কতকগুলি আলগা কর্ম্মচারী না দিলে সরবরাহ সমবায় সমিতির প্রসার-কার্য্য কখনই সম্ভবপর হইবে না।

২। চায়ের বাজারে "গবেষণা"

এতদিনে বাঙালীরাও ব্যবসা-জগতে মাথা দেখাইতে সুরু করিয়াছে। সে চায়ের মুল্লুকে। জলপাইগুড়ির চা-বাগান আজকালকার কলিকাতায় বেশ প্রসিদ্ধ। সঙ্গে সঙ্গে জলপাইগুড়ির বেপারীরাও কলিকাতার বাজারে নাম করিতেছে।

চায়ের ব্যবসায় কেনা-বেচা কোন্ প্রণালীতে সাধিত হয়

তাহা অনেক বাঙালীরই জানা নাই। জলপাইগুড়ির "ত্রিস্রোতা" কাগজে কলিকাতা হইতে একজন বেপারী চায়ের বাজার সম্বন্ধে "গবেষণা" করিয়া সংবাদ পাঠাইয়াছেন। তাহাতে ব্যবসায়ীরা ব্যবসার "টিপ্" পাইবেন। আর "ইতরে জনাঃ" বুঝিবেন চায়ের ব্যবসায়-কর্ম্ম-পরিচালনার কায়দাটা।

সংবাদদাতা বলিতেছেন,—

৪নং নীলামে সকল বাগানের চায়ের দরই ৵০আনা হইতে ৵১০ পয়সা পর্য্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। গুদামে চায়ের মজুতও বেশী হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া খরিদ্দারেরা সন্দেহ করিতেছে যে, শীঘ্রই দাম পড়িয়া যাইবে। সেই আশায় খরিদে তাহারা তেমন উৎসাহ দেখাইতেছে না। কলিকাতা বাজারের খবর এই যে, পাতা চা "লীফ গ্রেড্‌স্" ও ভাঙ্গা চা "ব্রোক্‌ন্ গ্রেড্"এর কোনই চাহিদা নাই। বড় খরিদ্দারেরা বাজার নামিয়া যাইবে এই আশায় নীলাম পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে মাত্র। পুনরায় গত বৎসরের মত হঠাৎ দাম পড়িয়া যাওয়ার আশঙ্কা আমরাও করিতেছি। তবে সুখের বিষয় এই যে, আসামের সর্ব্বত্রই অনাবৃষ্টির দরুণ চা আশানুরূপ হইতেছে না। সুতরাং যদি গত বৎসর অপেক্ষা এবৎসর চা অত্যন্ত বেশী না হয় তবে দাম আরও কিছু বাড়িতে পারে।

৪নং নীলামে যে ভীতি আসিয়াছে তাহাতে আমাদের মনে হয় যে, গত বৎসরের মত জলপাইগুড়ি হইতে কয়েকজন প্রতিনিধি পাঠান উচিত। ৫নং নীলাম দেখিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ঠিক করা উচিত। এখন হইতেই সব বাগানে চায়ের পরিমাণ বেশী হইতে আরম্ভ করিবে। তবে বাজার উঠুক বা পড়ুক জলপাইগুড়ির কর্তৃপক্ষগণের এসময়ে একবার নীলাম পর্য্যবেক্ষণ করা দরকার। নীলাম পর্য্যবেক্ষণের উপকারিতায় বোধ হয় গত বৎসরের সফলতা দেখিয়া কেহই সন্দেহ করিবেন না। দ্বিতীয়তঃ, যে সন্দেহ সকলের মনে জাগিয়াছে তাহার সত্যতা নিরূপণ করাও প্রয়োজন হইলে কলিকাতা ডক হইতে মাল খালাশ করিয়া বিলাতে পাঠাইয়া দেওয়া সঙ্গত। বিলাতে চায়ের বাজারও এখন স্থির নাই—প্রায়ই কম দরে চা বিক্রয় হইতেছে। তবে বিলাতে পাঠানোর সুবিধা এই যে ইহাদ্বারাঃ—

(১) কলিকাতার বাজার পাতলা করা যাইবে।

(২) দুনিয়ার বাজারে আমাদের এখানকার বাগানের নাম ও চা যাচাই করা যাইবে।

(৩) গড়পড়তা দর প্রতিপাউণ্ডে ৩ হইতে ৬ পাই পর্য্যন্ত বেশী পাওয়া যাইতে পারে। যে সমস্ত বাগানে ৭—১০ হাজার মণ পর্য্যন্ত চা উৎপন্ন হয় সেই সমস্ত বাগানের ২।১ হাজার মণ চা বিলাতে পাঠান সম্ভব এবং তাহা করা উচিত।

সর্ব্বশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, গত বৎসরের মত এবারও নীলাম পর্য্যবেক্ষণের জন্য জলপাইগুড়ি হইতে প্রতিনিধি পাঠানোর সময় আসিয়াছে। তাহাতে ছোট বড় সকল কোম্পানীগুলিরই স্বত্ব ও স্বার্থ বজায় থাকিবে।

৪নং নীলামে প্রায়ই লাল ডাঁটী বেশী দেখা যাইতেছে এবং সেজন্য দামও কমিয়া যাইতেছে। মজুত চা বাল্‌কড টী প্রথমতঃ ভালরূপে চুণাই করা উচিত, কারণ কাটুনী, চালনীর পরে মজুত চায়ের একটী ডাঁটী ভাঙ্গিয়া দশটী হয়।

বাগানের গুদামে চা বেশী মজুত হইয়া পড়িতেছে। সত্বর চালান না দিলে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা।

৩। রায়তদের আর্থিক উন্নতি

রায়তেরা নিজেদের স্বার্থ-পুষ্টির জন্য যেসকল কথার আলোচনা করিতেছেন তাহার এক পরিপূর্ণ তালিকা দেখিতে পাই বরিশালের আগৈলঝাড়ায় অনুষ্ঠিত রায়ত কন্‌ফারেন্সের প্রস্তাবসমূহে। রায়তের আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গোটা বাংলার সম্পদ্-বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। কাজেই রায়তদের মোসাবিদাগুলা সর্ব্বদাই গভীর ভাবে বুঝিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

প্রস্তাবগুলা নিম্নরূপ

১। এই কন্‌ফারেন্স স্থির করিতেছেন যে, দখলীস্বত্ব-বিশিষ্ট রায়তের সর্ব্বপ্রকার বৃক্ষাদি ছেদন ও গ্রহণ করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আইনে বিধিবদ্ধ করা হউক।

২। এই কন্‌ফারেন্স সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, দখলীস্বত্ব-বিশিষ্ট রায়তের কূপ ও পুষ্করিণী খনন করার ও পাকা ইমারত নির্ম্মাণ করার অধিকার আইনে বিধিবদ্ধ করা হউক।

৩। এই কন্‌ফারেন্স সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, রায়ত

ও জোতদারশ্রেণীর কর-বৃদ্ধির যে যে বিধান আছে, তাহা সর্ব্বতোভাবে রহিত করিয়া তাহাদের খাজানা চিরস্থায়ী করার ব্যবস্থা করা হউক।

৪। এই কন্‌ফারেন্স স্থির করিতেছেন যে, কালেক্টরীতে জমিদারী ও তালুকের যে পৃথক হিসাব খোলার ও পার্টিসনের বিধান আছে, জোতদার ও রায়তগণ সম্বন্ধে ঐরূপ বিধান করা হউক।

৫। এই কন্‌ফারেন্স স্থির করিতেছেন যে, কোর্ফা প্রজার দ্বাদশ বৎসরের উর্দ্ধকাল দখলদ্বারা দখলীস্বত্ব জন্মিবার ও ঐ দখলীস্বত্ব ওয়ারিশসূত্রে ভোগ করিবার অধিকার দেওয়া হউক।

৬। এই কন্‌ফারেন্স স্থির করিতেছেন যে, রায়তের অধীন বর্গাদারগণের বর্গা জমিতে দখলীস্বত্ব জন্মিতে না পারার বিধান করা হউক।

৭। এই কন্‌ফারেন্স স্থির করিতেছেন যে, ভূমিতে রায়তগণের সর্ব্বপ্রকার স্বত্ব-স্বামিত্ব থাকিবার ও কেবল মাত্র রায়তগণের নিকট হস্তান্তর করার অধিকার থাকার বিধান করা হউক।

৮। এই কন্‌ফারেন্স সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, ঐ প্রকার হস্তান্তরের নাম-পত্তনের জন্য মালিকের খাজানার উপর শতকরা ২৲ টাকা ফিস পাওয়ার বিধান করা হউক এবং ঐ ফিস রেজেষ্টারী আফিসে দাখিল করিলে ঐ হস্তান্তর মালিকের স্বীকৃত বলিয়া গণ্য হইবে এইরূপ আইন বিধিবদ্ধ করা হউক।

৯। এই কন্‌ফারেন্স সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, রেন্ট মনি অর্ডারের রসিদ ও স্বীকারপত্র বিনা প্রমাণে আদালতে গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করা হউক।

১০। এই কন্‌ফারেন্স সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, প্রেসিডেন্সি টাউনের ন্যায় রায়তগণের করের বিশ গুণ কালেক্টরীতে মালিকের নামে দাখিল করিয়া দিলে তাহাদিগকে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে নিষ্করে জমা-জমি ভোগ করার অধিকার দেওয়া হউক।

১১। এই কন্‌ফারেন্স স্থির করিতেছেন যে, জমিদারকে তাহার ষ্টেটের প্রজাগণের প্রাথমিক শিক্ষা, কৃষি ও স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য স্বীয় আয়ের এক চতুর্থাংশ প্রদান করিতে বাধ্য করিবার ব্যবস্থা করা হউক।

১২। এই কন্‌ফারেন্স স্থির করিতেছেন যে, নিম্নলিখিত সভ্যগণ লইয়া বাখরগঞ্জ রায়ত সমিতি নামে একটী স্থায়ী সমিতি স্থাপিত করা হইক।

১৩। এই কন্‌ফারেন্স সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, জমিদারগণ যাহাতে সাধারণ প্রতিষ্ঠান হইতে ব্যবস্থাপক সভাসমূহে নির্ব্বাচিত হইতে না পারেন তৎসম্বন্ধে বিধান করা হউক এবং রায়তগণের পক্ষ হইতে উপযুক্তসংখ্যক মেম্বর নির্ব্বাচন ও মনোনয়নের ব্যবস্থা করা হইক।

১৪। এই কন্‌ফারেন্স রায়ত ভোটারগণকে অনুরোধ জানাইতেছেন যে, এরূপ বিধান না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা যেন কোনও জমিদার অথবা তৎপক্ষীয় কোনও লোককে ভোট না দিয়া প্রজাহিতৈষী প্রার্থিগণকে ভোট দিয়া নির্ব্বাচিত করেন।

১৫। এই কন্‌ফারেন্স রায়তী জমা হস্তান্তর হইলে জমিদারগণকে তাহা ক্রয় করার অধিকার দেওয়া সম্বন্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছেন।

১৬। এই কনফারেন্স প্রস্তাব করিতেছেন যে, প্রত্যেক জেলায় রায়ত সমিতি গঠিত হইয়া বিভিন্ন জেলার রায়ত সমিতির প্রতিনিধিগণদ্বারা বঙ্গীয় প্রাদেশিক রায়ত সমিতি গঠিত হইবে।

১৭। এই কন্‌ফারেন্স প্রস্তাব করিতেছেন যে, প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে কৃষি-ব্যাঙ্ক, সমবায় সমিতি, ধর্ম্মগোলা ও রায়ত-ভাণ্ডার স্থাপন করা হউক।

১৮। এই কন্‌ফারেন্স ঘোষণা করিতেছেন যে, রায়তগণের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও প্রকার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও মনোমালিন্য নাই এবং ভবিষ্যতে ঐরূপ কোনও বিদ্বেষ বা মনোমালিন্যের সূচনা হইলে রায়ত সমিতি তাহার মীমাংসা করিবেন।

১৯। এই কনফারেন্স প্রস্তাব করেন জমিদারকর্ত্তৃক যাহাতে আবুয়াব, মাথট, সাদিয়ানা, তহুরী ইত্যাদি বাজে আদায় না হইতে পারে, তজ্জন্য উপযুক্ত বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হউক এবং বাজে আদায়কারী জমিদার ও তাহাদের

কর্ম্মচারিগণকে ফৌজদারীতে দণ্ডনীয় করার জন্য ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের নূতন ধারা প্রবর্ত্তিত করা হউক।

২০। অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচারের জন্য প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে স্কুল, মক্তব ও পাঠশালা গভর্ণমেণ্ট ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ব্যয়ে অচিরে স্থাপন করার জন্য এবং ঐ মর্ম্মে বঙ্গীয় আইনসভায় যে মন্তব্য পাশ হইয়াছে, তাহা অচিরাৎ কার্য্যে পরিণত করার জন্য এই সভা গভর্ণমেণ্টকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছেন।

২১। উপযুক্ত গোবাস ও গোচারণের মাঠের অভাবে দেশব্যাপী গো-জাতির মৃত্যুর আধিক্য দেখিয়া এই সভা প্রত্যেক জমিদার ও তালুকদারকে তাহাদের অধীন প্রত্যেক গ্রামে উপযুক্ত প্রচুর গো-বাস প্রস্তুত করার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতেছেন এবং আইনের দ্বারা ঐরূপ গো-বাস প্রস্তুত করার জন্য এই সভা গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছেন।

২২। এই সভা আবশ্যক অনুযায়ী গ্রামে পানীয় জলের পুষ্করিণী খনন করিবার জন্য ও জল নিষ্কাসনের আবশ্যক বন্দোবস্ত করার জন্য ও পশুচিকিৎসা-বিদ্যালয়ে রায়তদের মধ্য হইতে উপযুক্তসংখ্যক ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়ার জন্য ডিষ্ট্রীক্ট ও লোকাল বোর্ডকে অনুরোধ জানাইতেছেন।

২৩। ভারতের কৃষির উন্নতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও উপায় নির্দ্ধারণ জন্য যে 'রয়াল কমিশন' নিযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে বঙ্গীয় রায়তের প্রতিনিধি মেম্বর গ্রহণ ও রায়তের সাক্ষ্য গ্রহণ করার জন্য গভর্মেণ্টকে এই কনফারেন্স অনুরোধ করিতেছেন।

২৪। এই সভা প্রত্যেক রায়তকে তাঁহার বার্ষিক দেয় খাজানা প্রতি সন চৈত্রমাস মধ্যে আদায় করার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেছেন এবং কোনও রায়ত সঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে খাজানা আদায়ে ত্রুটী বা অবহেলা করিলে তিনি রায়ত সমিতির সভ্যপদচ্যুত হইবেন।

২৫। উল্লিখিত মন্তব্যের নকল গভর্ণমেণ্টের এবং সংবাদপত্রাদিসমূহে ও প্রত্যেক জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট জজ ও কাউন্সিলের মেম্বরের নিকট ও কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট প্রেরণ করা হউক।

৪। আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যে তিলি জাতি

(১) বঙ্গীয় তিলিজাতি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট এসোসিয়েসন লিমিটেড

সন ১৩৩০ সালের ১৫ই পৌষ তারিখের তিলিজাতি সম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশনের প্রস্তাবানুযায়ী কাশিম-বাজারের মহারাজার কলিকাতাস্থিত ৩০২ আপার সার্কুলার রোডের প্রাসাদে এই ব্যাঙ্ক স্থাপিত এবং বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের রেজিষ্ট্রার কর্ত্তৃক উহার নিয়মগুলি অনুমোদিত হইয়া রেজেষ্ট্রারি হইয়াছে। ব্যাঙ্কের মূলধন দুই লক্ষ টাকা। প্রতি অংশের মূল্য ২০৲ টাকা। এক্ষণে অংশ প্রতি ১০৲ টাকা মাত্র এককালে বা উপর্য্যুপরি মাসিক দশ কিস্তিতে প্রদেয়। তিলিজাতি অংশীমাত্রেই ১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত কর্জ্জ পাইতে পারেন। কর্জ্জ টাকার উপর শতকরা বার্ষিক সুদ ৯।৵ হারে দিতে হয়। আমানতি টাকার সুদ এক বৎসরের অধিক কালের মিয়াদে বার্ষিক শতকরা ৬৷০ হারে দেওয়া হয়। সেক্রেটারী শ্রীবরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী।

(২) কুমারখালি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট এসোসিয়েসন লিমিটেড

এই ব্যাঙ্কটি কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল কুমারখালির অন্যতম জমিদার স্বর্গীয় মুকুন্দলাল কুণ্ডু বি-এল মহাশয় কর্ত্তৃক ১৩১৮ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ত্তমান ম্যানেজিং ডিরেক্টার জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীলাল কুণ্ডু এবং অন্যান্য ডিরেকটার মহোদয়গণের ঐকান্তিক যত্নে এবং পরিশ্রমে ইহা ক্রমশই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। ১৩২২ সনে শতকরা ৮৲ হিসাবে, ১৩২৩ সনে শতকরা ১০৲ হিসাবে, ১৩২৪ সনে শতকরা ৮৲ হিসাবে, ১৩২৫ সন হইতে ১৩২৯ সন পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর ১৫৲ হিসাবে এবং ১৩৩০ সনে শতকরা ২৫৲ হিসাবে ডিভিডেণ্ড দিতে সমর্থ হইয়াছে। ১৩৩১ সনে সমস্ত খরচ-খরচা বাদে শতকরা ৬০৲ টাকারও উপর লাভ হইয়াছে। ইহা ভিন্ন ব্যাঙ্কের "রিজার্ভ" ফাণ্ড রহিয়াছে। জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু নন্দগোপাল কুণ্ডু, শ্রীযুক্ত বাবু ভোলানাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ কুণ্ডু, শ্রীযুক্ত বাবু নিত্যগোপাল কুণ্ডু,

শ্রীযুক্ত বাবু নিকুঞ্জলাল সাহা মহাশয়গণ ইহার ডিরেক্টার। ব্যাঙ্কটির বিশেষত্ব এই যে, ইহা তিলি কর্ত্তৃক স্থাপিত, তিলি কর্ত্তৃক পরিচালিত। ইহার কর্ম্মচারিগণও তিলি-জাতীয়। ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সাহা, ক্লার্ক শ্রীযুক্ত জগবন্ধু সাহা, অডিটর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ সাহা বি-এস-সি মহাশয় প্রভৃতি সকলেই তিলিজাতীয়। এমন কি, ইহার অংশী এবং আমানত-কারীরাও অধিকাংশই তিলি। ফলতঃ, এই ব্যাঙ্কটি তিলিজাতির কৃতিত্বের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

(৩) নদীয়া এবং আমবাড়ী টী কোং লিমিটেড

গত ডিসেম্বর মাসে এই কোম্পানী দুইটির ১৯২৪ সনের সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। সেই সভায় আমবাড়ীর বার্ষিক শতকরা ১৩৫৲ এবং নদীয়ার বার্ষিক শতকরা ২২২৲ টাকা হারে লভ্যাংশ প্রদান করা স্থিরীকৃত হয়। তিলিজাতির কৃতিত্বের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই কোম্পানী দুইটি প্রধানতঃ আমলার জমিদার শ্রীযুক্ত জানকীনাথ সাহা, শ্রীযুক্ত ভগবান চন্দ্র সাহা, শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ সাহা এম এ, স্বর্গীয় কেদার নাথ সাহা, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কুমার সাহা প্রভৃতি মহোদয়গণের প্রাণান্তিক পরিশ্রমের ফল।

এইসকল দেখিয়া শুনিয়া, তিলিজাতির প্রতিভা নাই, মনীষা নাই, ব্যবসায় বুদ্ধি নাই ইত্যাদি কথা বলিতে আমাদের আর আদৌ ইচ্ছা হয় না। বস্তুতঃ, তাঁহাদের সকলই আছে, নাই শুধু সাহসে নির্ভর করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার এবং অদম্য উৎসাহে বুক বাঁধিয়া কার্য্য করিবার সামর্থ্য। আমরা জানি, আমলার এই সাহা বাবুরাই প্রথমে কয়লার খনি ইত্যাদির কার্য্য করিতে গিয়া বিস্তর টাকা লোকসান দিয়াছিলেন। এইরূপ ঘা খাইয়া খাইয়াই তাঁহারা ক্রমশঃ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহার ফলে তাঁহাদের এই বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠা।

শুনিতে পাই, এই কোম্পানী দুইটির ডিরেকটার মহোদয়েরা পারিশ্রমিক স্বরূপ যে অর্থ পান, তাহা তাঁহারা তাঁহাদের বাসভূমি আমলা গ্রামের হিতার্থে ব্যয় করিয়া থাকেন। এই কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের কর্ত্তব্য আমলা গ্রামে সত্বর কয়েকটি "টিউবওয়েলের" প্রতিষ্ঠা করা। আমলায় পানীয় জলের একান্ত অভাব।

("বঙ্গীয় তিলিসমাজ পত্রিকা," মাঘ-ফাল্গুন, ১৩৩২)

ডাক-কর্ম্মীদের সঙ্ঘ*

এ দুনিয়ায় পেটের দায় বড় দায়। সকল দেশে ও সকল সমাজে মানুষের যতগুলি অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান আছে তার প্রত্যেকটি বিশ্লেষণ করে দেখতে গেলে আমরা দেখতে পাই গোড়াতে রয়েছে হয় ধর্ম্ম-বিশ্বাস, নয়তো আর্থিক সুখ-দুঃখের চিন্তা। সমাজ-জীবনেই হউক, আর ব্যক্তিগত জীবনেই হউক, পেটের দায় বা অন্নচিন্তা মানুষকে ঝড়ের মতো নাড়াচাড়া দিয়ে গড়ে তোলে। ডাকঘরের কর্ম্মচারিগণও যখন মানুষ, তখন এই মানবধর্ম্মের হাত তারা এড়াবে কি করে? তাই আর্থিক সুখ-দুঃখ ও 'চমৎকারা' অন্নচিন্তা তাদের ঘা দিয়ে দিয়ে গড়ে তুলছে। সকল ব্যথা সয়ে কথাটি না বলে তারা কাজ চালিয়েছে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। কিন্তু সহ্য করবার ক্ষমতারও শেষ আছে। যাদের তারা ভালবাসে, যাদের তরে সকাল-সন্ধ্যা গতর খাটিয়ে টাকা কামাতে এসেছে, তারাই যদি পেট ভরে খেতে না পায়, দুঃখের ভারে মুষড়িয়ে পড়ে, তাহলে মানুষের ধৈর্য্য থাকে কি? য়ুরোপে যুদ্ধের দামামা যখন বেজে উঠল তখন আমাদের দেশে চড়া দরের কড়া কথা শুনে সকলের সঙ্গে ডাকঘরের কর্ম্মীদের জীবনও অতিষ্ঠ হয়ে

* মালদহ-দিনাজপুর পোষ্টাল কন্‌ফারেন্সের বার্ষিক সম্মেলনে (১৯২৬ খৃষ্টাব্দে) প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।

উঠল। প্রেমাস্পদ ও স্নেহাস্পদদের দুবেলা পেটভরে খেতে দিতে অপারগ হয়ে, তাদের অসুখ-বিসুখে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে না পেরে অর্থ-কষ্টের ঘা খেয়ে খেয়ে ভারতের ডাককর্ম্মীরা মরিয়া হয়ে উঠল। নানা দেশের রাষ্ট্রের ভাঙ্গনে ও গড়নে অথবা দুনিয়ার আর্থিক চেহারার পরিবর্ত্তনে য়ুরোপীয় কুরুক্ষেত্রের যে প্রভাবই থাকুক না কেন, উহা দুনিয়ার সকল দেশের আমাদের মতো কর্ম্মীদের জীবনকে নাড়া দিয়ে গেছে আমাদের চোখ ফুটিয়ে নতুন বলে বলীয়ান করে'। দুনিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম, সকল দেশের সহকর্ম্মীদের তুলনায় আমরা কত পেছনে পড়ে আছি, তাদের তুলনায় আমাদের দুরবস্থা কত বেশী। তাদের স্বাচ্ছন্দ্যের কারণ অনুসন্ধান করতে যেয়ে আমরা শিখলাম সঙ্ঘ-শক্তির মাহাত্ম্য। সমস্ত দুনিয়াটা আমাদের কানের কাছে কেবল তোলপাড় করে বল্‌তে লাগল "কল্যাণ চা'ও ত সংহত হও—সঙ্ঘবদ্ধ হও। সঙ্ঘে শক্তিঃ কলৌ যুগে"। বিশ্বের সঙ্ঘ-শক্তির এই উদাত্ত সুর শুনে আমরা গোটা ভারতের ও ব্রহ্মদেশের ডাক-কর্ম্মীরা অভাব ও দুঃখ কষ্টের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছি আজ সাত বৎসর আগে। এই সাতবৎসরে আমাদের অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। সকল দেশের সকল প্রতিষ্ঠানকেই তিনটি স্তরের ভিতর দিয়ে যেতে হয়। প্রথম নির্য্যাতন, দ্বিতীয় উদাসীনতা, তৃতীয় সহানুভূতি। নিখিল ভারত ও ব্রহ্মদেশের ডাক-কর্ম্মীদের সঙ্ঘও প্রথম দুই স্তর অতিক্রম করে এখন তৃতীয় স্তরে অর্থাৎ মনিবের সহানুভূতির আওতায় এসে পড়েছে। প্রথম স্তরের পরে লর্ড চেমস্‌ফোর্ড যখন দেখলেন যে উদাসীনতার শেষ ফল ভাল নয়, তখন তিনি ১৯২০ খৃষ্টাব্দে একটি কমিটি বসালেন আমাদের দুঃখ-কষ্ট ও অভাব-অভিযোগ তদন্ত করবার জন্য। এই তদন্তের ফলে আমাদের মাইনা কিছু বেড়েছে বটে, কিন্তু টিকে থাকবার মতো তলব আমাদের এখনো হয় নি। এই মাইনা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অপমানের বোঝাও যে আমাদের মাথায় না চেপেছে তা নয়। এই অপমানের প্রতিবাদ করতে যেয়ে স্বইচ্ছায় চাকরী হারালেন শ্রীযুক্ত তারাপদ মুখোপাধ্যায়। আমাদের সঙ্ঘ-সৃষ্টির ইতিহাসে এই আঘাতটার দাম খুব বেশী। এই একটা আঘাত আমাদের আধ-মরাদের ঘা দিয়ে বাঁচিয়েছে। আমাদের ভিতর যাঁরা তখনো সঙ্ঘের বাইরে দূরে দূরে ছিলেন গভর্মেণ্ট এই এক আঘাতে তাঁদের সকলকে এনে হাজির করলেন সঙ্ঘের ভিতরে। দেখতে না দেখতে নিখিল ভারত ও ব্রহ্মদেশের ডাক-কর্ম্মীদের য়ুনিয়ানের ভিত্তি শক্ত হয়ে গড়ে উঠল।

এই সাত বৎসরে য়ুনিয়ান আমাদের অনেক দুঃখ কষ্ট নিবারণ করেছে এবং নিকট ভবিষ্যতে আরও অনেক কষ্ট দূর হবে বলে বিশ্বাস করি। তবে মাইনা বাড়াবার চেষ্টাতে এখনো সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হতে পারা যায় নি। সে জন্য হতাশ হলেও চলবে না। কথাটা একটু খুলে বলি। আজকাল কেবল আমাদের সমাজের নয়, সকল সভ্য সমাজেরই ভিত্তি বিনিময়ের উপরে স্থাপিত। সমাজে বিনিময়ের রীতি চলিত আছে বলেই এখন কাহাকেও নিজের অভাব-পূরণের জন্য নিজে পরিশ্রম করতে হয় না। আমরাও আমাদের শ্রমের বিনিময়ে অর্থ-সংগ্রহ করি। বাজারে আমাদের শ্রমের যে দাম তার চাইতে বেশী দাবী করলেই মনিব তা দিবে কেন? আমরাই কি সওদা কিনতে গেলে বাজারদরের চেয়ে বেশী দেই, যদি নেহাৎ না ঠেকি? সকল জিনিষের মতো পরিশ্রমেরও দাম নির্ভর করে টান ও জোগানের নিয়মের উপর। এই হিসাবে আমাদের শ্রমের দাম যাচাই না করে শুধু ফাঁকা আওয়াজ করলে কোনো মনিব তা শুনবে না। কিন্তু গোটা ভারতের ডাককর্ম্মীরা যে মাইনা দাবী করেছেন তা ধনবিজ্ঞানের এই সুপ্রতিষ্ঠিত টান্ যোগানের নিয়মকে অগ্রাহ্য করে। জোগানের নিয়ম অনুযায়ী আমাদের শ্রমের বাজার-দর যাই হউক না কেন আমরা চাই এমন পরিমাণ মাইনা যাতে আমরা বেঁচে থাকতে পারি। ধনবিজ্ঞানের নিয়মকে অগ্রাহ্য করে ভারতের ডাককর্ম্মীরা এই যে এক নূতন দাবী পেশ করেছেন, এটা কেবল ভারতেই যে নূতন তা নয়, অনেক দেশেই নূতন। এটা সুরু হয়েছিল জার্ম্মাণিতে, ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়েছে দুনিয়ার সব দেশে। যাঁরা দুনিয়ার আবহাওয়ার খবর রাখেন

তাঁরা বুঝেন গোটা দুনিয়াটা এই আওতায় আসতে এখনো ঢের দেরী। ইংলণ্ডের কয়লার খনির শ্রমিকদের সঙ্ঘ-শক্তির জোর আমাদের য়ুনিয়ানের চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু তারাও বার বার হার মেনেছে। একবারে কি দুবারে সফল হতে পারি নি বলে হতাশ হয়ে মুষড়ে গেলে চলবে কেন? লেগে থাকতে হবে; শক্তির পরিচয় দিতে হবে। "নায়ম আত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"। বলহীনের কিছুই লাভ হয় না। রুদ্ধ দুয়ারে বারে বারে ঘা দিলে তবে তো সে দুয়ার খুলবে। শক্তির বিকাশ না হলে প্রাপ্তির আশ্বাস কোথায়?

গভর্ণমেণ্টের কাছে অনেক সময় শুনতে পাই ১৯২০ সনে যে মাইনা বাড়ানো হয়েছে তাতেই ডাককর্ম্মীদের আর্থিক কষ্ট দূর হয়েছে, তাদের স্বাচ্ছন্দ্য বেড়েছে। মাইনা বেড়েছে একথা সত্য, কিন্তু তা প্রাথমিক অভাবগুলি পূরণ করবার মতো হয়েছে কি? এই পাঁচ বৎসরে ডাক-কর্ম্মীদের সকলেরই মাইনা বেড়েছে, অনেকে আবার একসঙ্গে কতকগুলি টাকাও পেয়েছেন। কিন্তু এ সত্বেও এই পাঁচ বৎসরেই শুধু কো-অপারেটিভ্ ক্রেডিট্ সোসাইটির নিকট তাঁদের ঋণের পরিমাণ কত বেড়েছে শুনুন—

১৯২২ খৃষ্টাব্দে ছিল ৮ লাখ টাকা।
১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ছিল ১০ লাখ টাকা।
১৯২৪ খৃষ্টাব্দে হয়েছিল ১৩ লাখ টাকা।
১৯২৫ খৃষ্টাব্দে হয়েছে ১৮ লাখ টাকা।

এছাড়া, বন্ধু-বান্ধবদের নিকট, ব্যাঙ্কের নিকট, স্থানীয় মহাজনের নিকট ঋণের ও দোকান-বাকী প্রভৃতির অঙ্কগুলি যোগ দিলে মোট ঋণের পরিমাণ আরও বেড়ে যাবে। এই পাঁচ বৎসরে ডাকঘরের কর্ম্মচারীদের বাবুগিরি বাড়ে নাই; তাঁরা অমিতব্যয়ী হয় নাই, তাঁদের মধ্যে অন্ততঃ শতকরা ৯৫ জন নেশায় কি বেশ্যায় টাকা উড়িয়ে দেয় নি। আমি ২০ বৎসর যাবৎ বিভিন্ন প্রদেশে মোসাফিরি করছি। আমার এই মোসাফিরি-জীবনে বহুশত ডাকঘরের কর্ম্মচারীর সংস্পর্শে এসে এটুকু দেখেছি যে, তাঁদের অনেকেই আর যাই হউন, অমিতব্যয়ী নন্। যেটুকু ব্যয় না করলে নয় কেবল তাই তাঁরা করেন। এ রকম ভাবে জীবন যাপন করে এবং মাইনা বাড়া সত্বেও ডাকঘরের ৯২৪৫ জন কর্ম্মচারীর মধ্যে কেন ঋণের পরিমাণ ১৮ লক্ষ টাকার বেশী হয়? এটা সচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের লক্ষণ কি? দেশের যাঁহারা মনীষী তাঁরা একবার ভেবে দেখুন, এঁদের বাস্তবিক অবস্থা কি?

আপনারা হয়তো মনে মনে বলছেন "আমরা কি করতে পারি? আমরা বাইরের লোক, আমাদের এতে কি আসে যায়?" কিন্তু আপনাদের কাছে আমি করযোড়ে নিবেদন করছি আপনারা একটু স্থির হয়ে ভেবে দেখুন দেখি ডাকঘরের কর্ম্মীদের সুখ-দুঃখ আপনাদের স্পর্শ করে কিনা। ডাকঘরে ১ লক্ষ ৫ হাজার কর্ম্মচারী কাজ করে। প্রত্যেক কর্ম্মচারীর পরিবারে ৫টি করে লোক যদি ধরা যায়, তাহলে ৫ লক্ষ ২৫ হাজার নরনারী ডাক-ঘরের চাকরীর দুঃখ-কষ্টের অভাব-অসুবিধার আওতায় থাকিয়া দিন কাটাচ্ছে বুঝা যায়। এই যে প্রায় ৫½ লক্ষ নরনারী, এরাও তো মানুষ, আপনাদের দেশবাসী, আপনাদের সমাজের লোক। এতগুলি লোক বাদ দিয়া আপনাদের দেশ ও সমাজ পুষ্ট, উন্নত ও বড় হতে পারে কি? ডাক-ঘরের কর্ম্মচারীরা, তাঁদের ছেলেরা, বৌঝিয়েরা যদি ক্ষীণ-শরীর, রুগ্নদেহ, অপুষ্ট ও নিরানন্দময় মন নিয়ে গড়ে উঠে তাতে দেশের ও সমাজের কল্যাণ আশা করা যায় কি? দেশতো কেবল গাছ-পাথর, খাল-বিল, নদী নয়! দেশের প্রত্যেকটী নরনারীর উন্নতিতেই দেশের উন্নতি। অতগুলি লোক যদি দৈহিক ও মানসিক অবনতির মধ্যে থাকিতে বাধ্য হয় তাহলে সমাজের মঙ্গল কোথায়? এই সব নরনারীর নিকট পুষ্ট দেহ ও সরস মনের সন্তানাদিই বা আশা করা যায় কিরূপে? দুনিয়ার সঙ্গে টক্কর দিয়ে ভারতকে বড় করতে হলে এই ৫½ লক্ষ নরনারীর সুখ-দুঃখের প্রতি উদাসীন হলে চলবে না। আমরা নীরবে দশের-সেবা করছি। আমাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিয়ে দেশ সেবায় আমাদিগকে অধিকতর সুযোগ দেওয়া কি দেশবাসী বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞদিগের কর্ত্তব্য নয়? আমাদের নিত্য নিয়মিত শৃঙ্খলাবদ্ধ সেবার উপরে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য কতটা নির্ভর করে তা ভেবে ব্যবসায়িগণ আমাদের জন্য কিছু করেন কি?

সুদূরে প্রবাসী পুত্রের কুশল-বার্ত্তা বহন করে এনে মায়ের হাতে পৌঁছে দেই, তার জন্য দেশের মায়েদের স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ আমরা দাবী করতে পারি না কি? হে যুবক, ভরা বাদরে চারিদিকে বারিধারা যখন অঝোরে ঝরে, বাংলার মাঠ-ঘাট যখন জলে থৈ থৈ করে, তখন যে ডাকহরকরা তোমার প্রেমিকার প্রেমলিপিখানা দূর—বহুদূর হতে বহন করে এনে তোমার বিরহ-কাতর হৃদয় শান্ত করে দেয়, তুমি কি একবারও অন্ততঃ সেই হরকরার দুঃখ কষ্টের কথা ভেবেছ? কেবল সেবা চাইলে চলিবে কেন? সেবককে বাঁচিয়ে রাখবার ব্যবস্থাও করতে হবে—দেশবাসীর নিকট এই আমার নিবেদন।

আসামের চিঠি

(মরিয়ানী-জোরহাট)

শ্রীসুধাকান্ত দে এম, এ, বি, এল

মরিয়ানী না শহর, না গ্রাম। পরে ইহার রূপ কি হইবে বলিতে পারি না; কিন্তু ইহাকে গড়িয়া তুলিতেছে তিনটি জিনিষ—চা, বন ও রেল। এই তিনের মধ্যে কার কীর্ত্তি সব চেয়ে বেশী তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

চা-বাগানগুলির ইতিহাস খুঁজিলে দেখা যায়, রেলের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের উদ্ভব। হাজার হাজার মণ চা চালান হইতেছে। ট্রেন না থাকিলে তাদের গতি কি হইবে? সম্ভবতঃ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে (১৮৯৬–৯৭) আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের পত্তন হয়। তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত চা-বাগান সংখ্যায় দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। এবং স্থানীয় যে নূতন নূতন লাইন খোলা হইতেছে তারও দুই দিকে বিস্তর চা-বাগান চোখে পড়িবে। ফলে সমগ্র আসামের অনেকখানি জায়গাকে চা-বাগান বলিতে পারি।

চা-বাগানের ম্যানেজারেরা এক একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্রাট বিশেষ। ইহারা বিলাত হইতে নিযুক্ত হইয়া আসে। বলিতে গেলে, বন ও অল্পস্বল্প জমি বাদ দিয়া গোটা মরিয়ানীই কোন না কোন চা-বাগানের মধ্যে পড়ে। সুতরাং ইহাদের যে অত্যন্ত প্রতিপত্তি হইবে তা আর বিচিত্র কি?

যে অল্পস্বল্প জমি চা-বাগানের বাহিরে পড়িয়া রহিয়াছে, তাও ইহারা আস্তে আস্তে গ্রাস করিতেছে। আসামে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নাই, রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত প্রচলিত। তারই মধ্যে এই চা-করেরা নূতন এক শ্রেণীর জীব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাংলার জমিদারদের সঙ্গে ইহাদের তুলনা করা চলে।

চা-করেরা সুখী জীব। খায় দায়, মোটর হাঁকায় এবং সাধারণতঃ স্ফূর্ত্তি করিয়া জীবন যাপন করে। মরিয়ানী হেন জংলা জায়গাতেও তারা একটা ক্লাব স্থাপন করিয়াছে। তার চারি পাশের জমির উঁচুনীচু ভাঙ্গিয়া সমতল করিয়াছে। সেখানে প্রতি শনিবার তারা পোলো খেলিতে আসে। বিকালে দিন ভাল থাকিলে ২।৩ ঘণ্টা খেলে। ক্লাবে বসিয়া ইচ্ছা হইলে গল্পগুজব করে, তার পর চলিয়া যায়। পর্ব্বদিনে বা বিশেষ কারণ ঘটিলে শনিবার ছাড়া অন্য দিনেও সকলে মিলিয়া আনন্দ করিতে আসে।

ইহাদের প্রত্যেকের একটা বা ততোঽধিক ঘোড়া আছে। অনেকের মোটর অথবা মোটর সাইকেল আছে। ছোট বড় সব ম্যানেজার ভিন্ন ভিন্ন বাংলাতে বাস করিতে পায়।

* * * * *

পূর্ব্বে চাল-চলনে ও হাব-ভাবে, বিশেষ কুলীদের সহিত ব্যবহারে, চা-করদের অত্যন্ত ঔদ্ধত্য ও নবাবী প্রকাশ পাইত। তারা কুলীদের সহিত কুকুর-বিড়ালের ন্যায় ব্যবহার

করিতেও লজ্জিত হইত না। কিন্তু আজ ৪।৫ বৎসর যাবৎ এই সাহেবদের ব্যবহারে ধীরে ধীরে ঘোর পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। আজকাল ইহারা কুলীদের সঙ্গে বাপু-বাছা করিয়া কথা বলে, গায়ে হাত দিয়া আদর করে এবং তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করে। আজকাল আদালতে ২।১ টি মোকদ্দমার কথা শুনা যায় কুলী-মারা বা কুলী-হত্যার বিষয়ে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কুলীরা আজকাল লাথি-ঝাঁটা আগের তুলনায় খুব কম খায়। পূর্ব্বে ইহারা অনেক বেশী অত্যাচার মুখ বুজিয়া সহ্য করিত, প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করিতে সাহস করিত না, মোকদ্দমা ত দূরের কথা।

একজন আসামে ত্রিশ বছর কর্ম্মময় জীবন যাপন করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, "২০ বছর আগে কুলীকে কেহ মানুষ মনে করিত না। চা-কররা তাদের সঙ্গে যা-ইচ্ছা-তাই ব্যবহার করিত, অকথ্য অত্যাচার করিত। তবু ইহারা সাহেব দেখিলেই তটস্থ হইত আর উঠিতে বসিতে প্রণিপাত করিত। কিন্তু আজ কোনও সাহেব কোনও রকম অত্যাচার করিলে, এমন কি কুকথা বলিলে ইহারা ঠ্যাঙ্গাইয়া দিতেও ছাড়ে না। তখনকার দিনে সাহেবের গায়ে হাত তোলা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। আজ তাহা নিত্যকার ঘটনা।

"২০ বছরে এই পরিবর্ত্তন ধীরে ধীরে হইয়াছে। কি করিয়া হইল বলিতে পারি না। কেহ কেহ মনে করেন অসহযোগ আন্দোলন অথবা চাঁদপুরের কুলী-ধর্ম্মঘট চা-করদের আচ্ছা শিক্ষা দিয়া গিয়াছে। সেই দিন হইতেই কুলীরা নিজেদের ক্ষমতা বুঝিতে শিখিয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ, এই ভাবের উন্মেষ অসহযোগের পূর্ব্বেই দেখা দিয়াছে।

"সুসভ্য ইংরেজ রাজত্বেও উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে এক প্রকার দাস-ব্যবসায় প্রচলিত ছিল, তাহা আজকালকার লোকে ভুলিয়া গিয়াছে। আড়কাটিরা ছলে বলে কৌশলে কুলী ভুলাইয়া আনিত। কত না ভদ্রলোকের মেয়ে ও ছেলে এইরূপে আড়কাটির হাতে পড়িয়া ধনে-প্রাণে মারা গিয়াছে। সে সব কথা চা-বাগানের ইতিহাসে জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা থাকিবে। 'গিরিমিট' কুলী অর্থাৎ চুক্তিবদ্ধ কুলীর চির-দাস হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। তিন বছর বা যত বছরের জন্যই আসুক, অবস্থার পাকে পড়িয়া তাকে আর চা-বাগানের বাহিরে পা দিতে হইত না। পলাইয়া গেলে তাকে ধরিয়া কঠোর শাস্তি দিবার ব্যবস্থা ছিল। আদালত ছিল শাস্তি-দাতার সহায়।

"আজ সে নিয়ম উঠিয়া গিয়াছে। স্বেচ্ছায় চুক্তিবদ্ধ না হইলে কেহ জোর করিয়া কাহাকেও চুক্তিবদ্ধ করিলে আদালতে প্রথমোক্ত ব্যক্তির শাস্তি হইবে। তা ছাড়া কুলী আজ চুক্তির সময় গত হইবার পূর্ব্বেও কিছু অর্থদণ্ড দিয়া তার কুলীজীবন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। অর্থাৎ আজ আইন কুলীর স্বপক্ষে।

"এ প্রসঙ্গে সঞ্জীবনী ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রের নাম ভুলিয়া গেলে চলিবে না। নীল-চাষ উঠাইয়া দেওয়ার জন্য নীলদর্পণ ও দীনবন্ধু মিত্র যা করিয়াছিলেন, সঞ্জীবনী ও কৃষ্ণবাবু চা-বাগানের কুলীর উপর অত্যাচার নিবারণকল্পে তার চেয়ে বড় কম করেন নাই। এককালে সঞ্জীবনী সমস্ত বঙ্গদেশকে তোলপার করিয়াছিল ও সকলকে এই সমস্যার কথা ভাবিতে বাধ্য করিয়াছিল।"

*　*　*　*

আজ ৪।৫ বৎসর মরিয়ানীতে যাতায়াত করিতেছি। দেখিতেছি ৪।৫ বৎসরের মধ্যে চা-বাগানগুলির অনেক সংস্কার হইয়াছে। চা-বাগানের চারিদিকে ড্রেণ কাটা হইয়াছে। কলঘরের কাছে কাছে কোথাও কুলীকামিনীদের ছেলেরা ফুটবল খেলিতেছে। কুলী-বস্তিতে নূতন ঘরবাড়ীও তৈয়ারী হইতেছে।

বলা বাহুল্য, কুলীবস্তিগুলির সব ঘরবাড়ী চা-করদের পয়সায় তৈয়ারী। কেহ কেহ অবশ্য বাহির হইতেও আসিয়া কাজ করে। তারা চা-করদের নিকট হইতে জমি লইয়া চাষবাস করে, গরু রাখে আর সমস্ত দিন (১০টা—৪টা) খাটিয়া দিয়া যায়। চা-পাতা তোলা, কলে ছাঁটিয়া চা বাহির করা, চা-গাছ রোপণ করা ইত্যাদি অধিকাংশ কাজ স্ত্রী-লোকেরা করে। প্রতিদিন বৈকালে দেখা যাইবে রমণীরা কলঘর (যেখানে চা-পাতা কলে ছাঁটিয়া বাহির করা হয়) হইতে বাহির হইতেছে। ইহারা সারাদিন রোদ-বৃষ্টি মাথায়

করিয়া আজকাল চা-পাতা তুলিতেছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঝুড়ি মাথা হইতে অথবা কাঁকে ঝুলাইয়া রাখিয়াছে।

* * * *

সাধারণ লোকের ধারণা যে, আমরা যে চা খাই তা এই সব চা-বাগানের চা। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে বাগানের চা অতি উৎকৃষ্ট। সে চা ভারতবর্ষে বিক্রয় হয় বলিয়া আমার জানা নাই। যদিই বা বিক্রয় হয় তাহাও খুব অল্প। কারণ সে চা অগ্নি-মূল্য। পাউণ্ড প্রতি ১০।১৫।২০ টাকা পড়ে।

চা জন্মে এখানে। কিন্তু আমরা যে চা খাই তা বিলাত হইতে বাক্‌স-বন্দী হইয়া আসে। ঐ চায়ের কতক চা-পাতা আর কতক চা-পাতার গুঁড়া। আমরা মিশ্রিত চা খাই। যারা সোজাসুজি বাগান হইতে চা আনাইবার সুযোগ রাখে তারাও ঐ মিশ্রিত চায়েরই ইতর-বিশেষ পায়।

* * * *

আসামে যথেষ্ট বন আছে। আগে ত মরিয়ানী সমস্তই জঙ্গল ছিল এখানে আজ ৫।৭ বৎসর যাবৎ একটা আলাদা ফরেষ্ট রেঞ্জ হইয়াছে। সুতরাং প্রতি বৎসর গাছ রোপণ, পথ পরিষ্কার, লতা কাটা, মাটি কাটা, পুল তৈয়ারী ইত্যাদি পুরাদমে সরকারী বনের ভিতর চলিতেছে। তার জন্য বিস্তর লোক খাটিতেছে। দু'পয়সা উপার্জ্জনও করিতেছে।

কন্‌ট্রাক্টাররা চুক্তি করিয়া সরকারের নিকট হইতে এক একটা বনের অংশ (কুপ) লইয়াছে। কেহ একের অধিকও লইয়াছে। তাহারা লোক নিযুক্ত করিয়াছে, গাছ কাটিতেছে, কাঠ তৈয়ারী করিতেছে এবং তাহা চালান দিতেছে অথবা রেল-কর্ত্তৃপক্ষের কাছে বেচিতেছে। বলা বাহুল্য, সরকারকে নজর দিয়া এবং শ্রমিকের সমস্ত তঙ্কা মিটাইয়া দিয়াও তাদের মুনাফা বেশ মোটা দাঁড়াইতেছে।

এই প্রসঙ্গে সেকেন্দর আলি সাহেবের নাম করিতে পারি। তিনিও একজন ঠিকাদার। এ বছর ২।৩টা অংশ (কুপ) লইয়াছেন এবং পুরাদমে ব্যবসা চালাইতেছেন। ভদ্রলোক থাকেন অত্যন্ত সাদাসিধা ভাবে। বেশভূষার কোনো প্রকার পারিপাট্য নাই। ব্যবহার বিনীত। জোরহাট-মরিয়ানী ১২ মাইল পথ, নিজের একখানা পুরাণো সাইকেল আছে, তাহাতেই যাওয়া আসা করেন। অধিকাংশ সময়েই মরিয়ানীর বন-বিভাগের কাছে নিজ কর্ম্মস্থানে যাপন করেন।

অথচ এ ভদ্রলোক লক্ষপতি। মোটর আছে, তাহা ছেলেরা হাঁকাইয়া বেড়ায়। ছেলেরা অবশ্য দিব্য সুখে ও আরামে বাস করে। ইনি এখনও অর্থের চিন্তা করিতেছেন এবং সেজন্য এ বয়সেও খুব খাটিতেছেন। এককালে ইনি দরিদ্র ছিলেন।

* * *

রেল মরিয়ানীকে অনেকখানি গড়িয়াছে, তাতে আর সন্দেহ কি? রেলের বাবুরা অর্থাৎ কর্ম্মচারীরা অধিকাংশ বাঙালী।

মরিয়ানী একটি জংশন। এখনি ইহা বেশ বড় হইয়াছে। জোরহাট-মরিয়ানী স্থানীয় রেল থাকায় ইহার মূল্য আরো বাড়িয়াছে। একদিকে ব্রহ্মপুত্রের তীর থেকে মাছ, দুধ, ঘী হইতে আরম্ভ করিয়া চা, কাঠ ইত্যাদি মাল চালান যাইতেছে। অন্যদিকে লোক বাড়িতেছে। আর বাহির হইতে নানাপ্রকার দ্রব্যাদি আসিতেছে। কাজের ধান্ধায় লোকও আসিয়া জুটিতেছে।

* * *

রেল ও বনের কাজের জন্য মিস্ত্রির প্রয়োজন। এখানে চীনা ও পাঞ্জাবী মিস্ত্রির প্রাধান্য দেখিতেছি। দেশী মিস্ত্রিও আছে, কিন্তু কাজ ভাল করিতে জানে না, অথবা অলস—ফাঁকি দেয়।

চীনাদের খরচ বেশী। কিন্তু ইহারা অত্যন্ত কর্ম্ম-কুশল। বস্তুতঃ চীনা মিস্ত্রি খুব বেশী টাকার খাই সত্ত্বেও ধীরে ধীরে অন্য সব মিস্ত্রিদের হঠাইতেছে। একমাত্র পাঞ্জাবীরাই এখনো টিকিয়া আছে।

এ বিষয়ে অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি বলিতেছেন, "চীনা মিস্ত্রি একবার কাজ হাতে লইলে এক মুহূর্ত্তও বসিয়া থাকে না। তার দ্বারা যতদূর সম্ভব ততদূর সুন্দর ও নিখুঁত কাজটা সম্পন্ন করিতে সে চেষ্টা করে। তাকে কোন কাজের ভার দিয়া তুমি নিশ্চিন্ত ভাবে যা-খুসী করিতে পার।

"কিন্তু পাঞ্জাবীই বল আর যাই বল, সকলের উপর

তোমার চোখ রাখিতে হইবে, পাহারা দিতে হইবে। চোখ সরাইয়াছ কি ফাঁকি দিতে আরম্ভ করিয়াছে। অধিকন্তু, ইহারা কথা দিয়া কথা রাখিতে পারে না। চীনা মিস্ত্রি কখনো সে রকম করে না। সে নিজের সামর্থ্য অনুসারে কথা দিয়া থাকে।

"আসামী মিস্ত্রি সকলের অধম। প্রথমতঃ, সে মিস্ত্রির কাজই হয়ত ভাল করিয়া জানে না। তার উপর ফাঁকিবাজ।"

* * *

আসামী মজুর সম্বন্ধেও ঐ কথা কিছু পরিমাণে খাটে। সাঁওতাল তার চেয়ে বেশী বিশ্বাসযোগ্য। ঘরে ছাউনি দিতে, রেলের কাজ কর্ম্মে সাধারণতঃ আসামী মজুর দেখিতে পাই। বনের কাজেও অল্প-স্বল্প আছে।

বনের কাজে সাধারণতঃ সাঁওতালরা খাটিতেছে। তাছাড়া, খুব শক্ত সমর্থ এক শ্রেণীর মজুর বনের কাজের জন্য পাওয়া যায়। ইহারা নাগা। শীতকালে দলে দলে কাজ করিতে নামিয়া আসে, আবার শীতের শেষে পাহাড়ের উপর চলিয়া যায়।

নাগা পাহাড় মরিয়ানী হইতে বেশী দূরে নহে। ছয় মাইলের পর ইহার ছোট ছোট ঢিবিগুলি দেখা দেয়। আকাশে মেঘ না থাকিলে নীল পাহাড়-শ্রেণী পূর্ব্বে, দক্ষিণে, পশ্চিমে চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে। কখনো কখনো পাহাড়ের উপরকার নাগাদের ঘরবাড়ী পথঘাটও স্পষ্ট হইয়া উঠে। নাগাপাহাড় ৫০০।৬০০ ফিটের বেশী উঁচু হইবে বলিয়া মনে হয় না।

* * * *

নাগারা অসভ্য জাত অর্থাৎ ইহারা পাহাড়ে বাস করে, কাপড় পরিতে জানে না। সমতল ভূমিতে নামিবার সময় লেংটি পরিয়া নামে। সমতলবাসীর সহিত মাত্র শীত-কালটা লেন-দেন চালাইয়া থাকে।

ইহারা অত্যন্ত বলিষ্ঠ এবং কষ্ট-সহিষ্ণু। গায়ের জোরে এক একটি নাগা এক একটি দৈত্যবিশেষ। ইহাদের চেহারা দেখিয়া এক সাহেব বলিয়াছিলেন (তখন যুদ্ধের সময়) "মহাশয়, চাহিয়া দেখুন, কি চমৎকার ইহাদের গঠন। সরকার যে কেন সৈন্যের ভাবনা করিতেছেন, বুঝিতে পারি না। ইহারাই ত আছে। শিক্ষা পাইলে ইহারা এমন চমৎকার সৈন্য হইয়া দাঁড়াইবে যে জার্ম্মাণরা দেখিয়াই ভয়ে পলাইতে থাকিবে। ঠাট্টা নয়। বড় বড় কামান দাগার জন্য ও ভারি মোট বহনের জন্য ইহাদিগকে নিয়োগ করিলে কাজ সহজ হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।"

নাগারা একদমে সারাদিন অক্লান্তভাবে খাটিতে পারে। আলোক-লতা ও অন্যান্য নানাপ্রকার বিষাক্ত লতা জঙ্গলের গাছগুলিকে জড়াইয়া মারিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে। সেজন্য ইহাদিগকে কাটিয়া ফেলা হয়। বেশ শক্ত কাজ। ইহার জন্য ডাক নাগাকে। পটি কাটিতে হইবে অর্থাৎ বনের মধ্যে কতকগুলি নিয়ম ও শৃঙ্খলা রাখিয়া রাস্তা কাটিয়া যাইতে হইবে। হয়ত পাশে গাছ বা বীজও লাগাইতে হইবে। ডাক নাগাকে। মাটি কাটিতে হইবে ও সে মাটি বহিয়া লইয়া অন্যত্র ফেলিতে হইবে। সেখানেও ডাক নাগাকে। এই রকম সব ভারি কাজে নাগারা ওস্তাদ।

বস্তুতঃ, নাগা মজুর ছাড়া বন-বিভাগে মুস্কিলে পড়িতে হয়। মরিয়ানীর সরকারী বনে অবশ্য সাঁওতাল এবং আসামী লোকও মজুরের কাজ করিতেছে বটে; কিন্তু নাগা মজুর একটা বড় অবলম্বন। আর শেষ পর্য্যন্ত খরচও বেশী পড়ে না। এক এক দল নাগার এক একজন সর্দ্দার থাকে। কাজের পূর্ব্বে তার সঙ্গে টাকাকড়ির চুক্তি অর্থাৎ কথাবার্ত্তা হয়।

* * *

বর্ষার সময়টা আসাম দেশ বাঙ্গালা দেশেরই মত। তখন বেশী কাজ-কর্ম্মের সুবিধা হয় না। বন-বিভাগের কাজও শীতকালেই বেশ পুরাদমে চলে। সেই জন্য নাগারা সে সময় উপার্জ্জন করিতে নামিয়া আসে। সারা শীতটা যা উপার্জ্জন করে তার দ্বারা আবশ্যক জিনিষপত্র কিনিয়া লইয়া যায় ও বৎসরের বাকী সময়টার ব্যবস্থা করে। প্রত্যেক বছর দলে দলে নাগা কাজ খুঁজিতে নামে। প্রত্যেক বছর কাজও যথেষ্ট হয়। সুতরাং প্রতিবারে ইহারা বেশ কতকগুলি টাকা উপার্জ্জন করিয়া লয়।

নাগারা বেচিতে সঙ্গে লইয়া আসে প্রধানতঃ একপ্রকার খুব ঝাল লঙ্কা। তারা আলুও জন্মায়। তবে সে আলু

নিজেদের ভোগে লাগে। আর যা ২।১টা তরীতরকারী আনে তা সাধারণতঃ সমতলবাসীদের বিশেষ কাজের নয়।

পূর্ব্বে নাগারা 'মিরিজিন' বলিয়া এক প্রকার অতি উৎকৃষ্ট কম্বল-জাতীয় জিনিষ তৈরারী করিয়া বেচিত। তাতে বেশ দু' দশ টাকা লাভ হইত। মিরিজিন ঠিক কম্বল নহে। ইহা উহাদের দেশের একপ্রকার তুলায় তৈরারী। সাদা, বেশ শক্ত হয়। এক পিঠে রোয়া রোয়া বাহির হইয়া থাকে। ইহা কম্বলের মত গায়ে ব্যবহার করা যায় না, কিন্তু পাতিয়া শোওয়া যায়।

এই মিরিজিন খুব শক্ত হয়। অনেকদিন টিকে। আমি যে মিরিজিন ব্যবহার করিতেছি তাহা ২৫।২৬ বছরের পুরাণো। বলিতে গেলে, এখনো তার কিছু হয় নাই। আরো বহুদিন ব্যবহার করা চলিবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় নাগারা আজকাল এই মিরিজিন বেচিতে পায় না, অর্থাৎ সমস্তই সরকারকে বেচিতে হয়। বাহিরের লোক কিনিতে পারে না। কিছুকাল হইল সরকার এই হুকুম জারি করিয়াছেন "হে নাগাগণ! তোমরা যত মিরিজিন প্রস্তুত করিবে সব আমরা কিনিয়া লইব। অবশ্য একটা নির্দ্দিষ্ট হারে তোমাদের এই মিরিজিন সমুদয় বেচিতে হইবে। কোন আপত্তি টিকিবে না। কিন্তু সাবধান! লুকাইয়া যেন অর্থের লোভে কাহাকেও এই মিরিজিন বেচিও না। যদি বেচ মিরিজিন পিছু তোমাদের ৫০৲ টাকা করিয়া জরিমানা হইবে।"

এই নিয়ম সত্ত্বেও ২।১ খানা মিরিজিন যে বাহিরে আসে না তা বলিতে পারি না। মাড়োয়ারীরা যেমন করিয়াই হউক কিনিয়া আনে এবং বেচিয়া লাভও খায়।

* * *

নাগারা যা পায় তাই খায়। সাপ, গরু, ছাগল, ভেড়া, মুরগী, হাতী কোন কিছুতেই ইহাদের আপত্তি নাই। আগে কাঁচা খাইত। এখন রান্না করিতে শিখিতেছে। নাগা-পাহাড়ে এক রকম ধান জন্মে, তাহা হইতে মোটা মোটা চাল হয়। ইহারা মাংস অনেকদিন পর্য্যন্ত শুকাইয়া রাখে ও ভাতের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া সিদ্ধ করিয়া সব শুদ্ধ খায়।

নাগার একটি প্রিয় খাদ্য কুকুর ও কুকুরের বাচ্চা। প্রতি বছর শীতের সময় সমতলের লোকদের নিকট উহারা কুকুরের বাচ্চা কিনিয়া লয়। এক একটা বাচ্চার জন্য তারা ২৲—৫৲ পর্য্যন্ত দিয়া থাকে।

* * *

নাগাদের প্রসঙ্গে খৃষ্টিয়ান পাদ্রীদের কথা বলা অন্যায় হইবে না। নাগাদেরও ভিন্ন ভিন্ন দল আছে। কিন্তু যে জাতের নাগাই নামিয়া আসুক, আজকাল দেখিলেই মনে হয় ইহারা বুঝি খৃষ্টিয়ান। বাস্তবিক পাদ্রীরা নাগাপাহাড় বিজয়ে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। বিস্তর নাগা দলে দলে খৃষ্টিয়ান হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একজন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এ পাশ পর্য্যন্ত করিয়াছে।

নাগাদের খৃষ্টিয়ান করিবার চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু এখন আর সভ্য করার চেষ্টা হইতেছে না। অর্থাৎ সরকার হইতে আদেশ হইয়াছে, "তোমরা খৃষ্টিয়ান হইতেছ। বেশ ভাল কথা। আরো অনেকে হও। কিন্তু খৃষ্টিয়ান হইলেই তোমরা সাহেব অথবা আসামী সাজিবে কেন? নাগা সভ্যতা বলিয়া কি কোনও চীজ্ নাই? তোমাদের পিতা পিতামহরা বহু যত্নে, বহু সংগ্রামে যে সভ্যতার ধারা লইয়া আসিয়াছেন তা কিসের মোহে ত্যাগ করিবে? কাজ নাই বাপু! যার যা আছে তাই ভাল। সুতরাং তোমরা সাহেব অথবা আসামীর নকল করিয়া পড়িতে শিখিও না ইত্যাদি। সুতরাং পাদ্রীরাও ঐ সুরে কথা বলিতেছে।

ফলে নাগা নাগাই থাকিয়া যাইতেছে। শুধু ধর্ম্মে নাম লিখাইতেছে খৃষ্টিয়ান বলিয়া। কিন্তু একটা উপকার হইয়াছে। পুরুষেরা এখনও লেংটি পরে বটে; কিন্তু নাগা স্ত্রীলোকেরা কাপড় ও জামা পরিতেছে। আগে ইহারা কিছুই পরিত না।

পাদ্রীরা নাগাদের ভাষা শিখিয়া ইংরেজী বর্ণমালায় লিখিয়া তাহা আবার নাগাদের শিখাইতেছে। নাগা ভাষায় ইংরেজীর সুরে খৃষ্টিয়ানী গান শিখাইতেছে। নাগা মেয়েরা একত্র হইয়া সেই গান গাহিতেছে এরূপ দৃশ্য সমতলে দেখা যায়।

* * *

পাদ্রীদের প্রশংসা করি। সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া আসিয়া তারা দিনের পর দিন এই অসভ্য

জাতের মধ্যে পড়িয়া থাকে। কত কষ্ট, যত্ন, পরিশ্রম করিয়া ইহাদের ভাষা, আচার-ব্যবহার আয়ত্ত করিয়া লয়, সহানুভূতি ও ভালবাসা দিয়া আপনার করিয়া লয়! ফলে যে নাগারাই খৃষ্টিয়ান হইতেছে তা নয়, অনেক সাঁওতালও হইয়াছে।

নাগাদের হিংস্র প্রকৃতিকে বশে আনিতে ইংরেজের কামান-বন্দুক সাহায্য করিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু অক্লান্ত কর্ম্মী পাদ্রীও কম সাহায্য করে নাই।

অধিকন্তু, খৃষ্টিয়ান গির্জ্জা ধনবলেও বলী বটে। পাদ্রী যাকেই খৃষ্টিয়ান করে তারই একটা সুবিধা করিয়া দিতে চেষ্টা করে। টাকা-আনা-পয়সার টান সব মানুষের পক্ষে অত্যন্ত প্রবল। ধর্ম্মের জন্য না হোক, ভাল খাইতে পরিতে পাইব, সম্মান পাইব, সমাজে মিশিতে পারিব ইত্যাদি বিবেচনা বহুলোককে খৃষ্টিয়ান করিয়াছে সন্দেহমাত্র নাই। খৃষ্টিয়ান ধর্ম্ম যে বহু ব্যক্তির রুজির যোগাড় করিয়া দিতে পারিয়াছে, ইহা তার পক্ষে অগৌরবের কথা নহে।

নিজের চোখে দেখিতেছি এক উড়িষ্যাবাসী আমাদের বাড়ীতে কাজ করিত। তারপর এখানে সেখানে চাকর হইয়া দিন কাটায়। কিছুদিন আগে সে খৃষ্টিয়ান হইয়াছে। এখন দেশী পাদ্রী হইয়া ধর্ম্মপ্রচার করিয়া বেড়াইতেছে। এক খৃষ্টিয়ান নারীকে বিবাহ করিয়াছে। সুখে না হোক্ স্বচ্ছন্দভাবে তার জীবন চলিয়া যাইতেছে।

ইহাতে কি খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মের আধ্যাত্মিকতা কমিয়া গিয়াছে?

* * *

জ্ঞানের দিক্ দিয়াও পাদ্রীদের কর্ম্ম-প্রচেষ্টার একটা সার্থকতা ও মূল্য আছে। ইহাদের কৃপায় নাগাদের সম্বন্ধে রাশি রাশি এমন সব তথ্য সংগৃহীত হইতেছে, যা বহু তত্ত্ববিদের কাজে লাগিবে। অবশ্য সকল বিবরণ একদেশদর্শী হইবার সম্ভাবনা আছে। কারণ ইহারা সর্ব্বদাই খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মের চোখে সব জিনিষ দেখিতেছে। কিন্তু উপায় কি?

সমাজ-সমস্যার কয়েক দফা

১। নমঃশূদ্রের দাবী

বিগত আষাঢ় মাসে বরিশালের আগৈলঝাড়া গ্রামে বাংলার নমঃশূদ্রেরা সমবেত হইয়াছিলেন। কন্‌ফারেন্সে নানা প্রস্তাব গৃহীত হয়। তাহার ভিতর হইতে আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় দফাগুলা উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

(১) যাহাতে গভর্ণমেণ্টের শাসন, শিক্ষা এবং বিচার প্রভৃতি বিভাগে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের উপযুক্তসংখ্যক লোক নিয়োজিত হয় তজ্জন্য এই কনফারেন্স সরকার বাহাদুরের নিকট তাহাদের ন্যায়-সঙ্গত দাবী জানাইতেছেন।

(২) এই কন্‌ফারেন্স কাউন্সিল, ডিঃ বোর্ড, লোকাল-বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটীতে নমঃশূদ্র সম্প্রদায় হইতে উপযুক্ত-সংখ্যক সভ্য মনোনয়ন দ্বারা নিযুক্ত করিবার জন্য সরকার বাহাদুরকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছেন।

(৩) এই কন্‌ফারেন্স ইনজিনিয়ারিং কৃষি ও মেডিকেল কলেজ এবং স্কুলে নমঃ সম্প্রদায়ের জন্য কতিপয় সিট্ রিজার্ভ করিতে গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জানাইতেছেন।

২। নমঃশূদ্র-আন্দোলন ও মুসলমান মত

"বঙ্গ মিহির" বরিশালের মুসলমান সাপ্তাহিক। এই পত্রিকার এক সংখ্যায় হিন্দু সমাজের নমঃশূদ্র আন্দোলন সম্বন্ধে সমালোচনা বাহির হইয়াছে। তাহার কিয়দংশ নিম্নরূপ:—

বাঙ্গালার উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণের মধ্যে নমঃ জাতিকে জাগাইবার জন্য তেমন কোন চেষ্টা হয় নাই। বাঙ্গালার কোন স্থানেই ছোঁয়াচে রোগটী দূরীভূত হয় নাই। কেবল কথা দ্বারাই এযাবৎ সহানুভূতি দেখান হইয়াছে। এবারও যদি কেবল কথায়ই সমস্ত আন্দোলন শেষ হইয়া

যায় তাহা হইলে বিশেষ নিরাশারই কথা। আমরা দেখিতে চাই কাজে প্রকৃত সাম্যভাব; মানুষে মানুষে জাতিগত প্রভেদ ঈশ্বরের বাঞ্ছনীয় নহে। সকল জগতের কর্ত্তা ঈশ্বরের নিকট সকলেই সমান।

আগৈলঝাড়ায় গত ৩০।৩১শে জ্যৈষ্ঠ পূর্ব্ব প্রস্তাব অনুসারে রায়ত কন্‌ফারেন্স হইয়াছে। শেষ সেখানে ৩২শে জ্যৈষ্ঠ নমঃ কনফারেন্স হওয়া সাব্যস্ত হয়। বিদেশীয় হিন্দু-নেতাগণ নমঃ কন্‌ফারেন্সে যোগ দেওয়ায় এই কনফারেন্স বিশেষ গুরুত্ব ও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ৩১শে জ্যৈষ্ঠ কলিকাতা হইতে বরিশালে বাবু শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, বাবু পীযুষকান্তি ঘোষ আরও অনেক নেতা আগমন করেন। ৩২শে জ্যৈষ্ঠ মদনমোহন মালব্য, সরলা দেবী বরিশালে আগমন করেন। তাঁহাদিগকে এখানে বিশেষ সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। মালব্যজীর প্রতি মুসলমানগণ তেমন ভাল ভাব পোষণ করে না। কাজেই মিউনিসিপ্যালিটীর মুসলমান মেম্বরগণ মালব্যজীকে অভিনন্দনপত্র দিতে নারাজ ছিলেন। হিন্দু মেম্বরগণ অধিকাংশ ভোটের জোরে মালব্যজীকে অভিনন্দনপত্র দেওয়া পাস করিয়া লন। তদনুযায়ী ৩২শে জ্যৈষ্ঠ মালব্যজীকে এক অভিনন্দন পত্র দেওয়া হইয়াছে এই উপলক্ষ্যে ৩২শে জ্যৈষ্ঠ পূর্ব্বাহ্নে স্থানীয় হিন্দুধর্ম্ম-রক্ষিণী সভাগৃহে এক সভা হইয়াছিল। এই সভায় মালব্যজী যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহাতে সাম্প্রদায়িক কিছুই বলেন নাই। ৩২শে জ্যৈষ্ঠ মালব্যজী, সরলা দেবী ও বরিশালের নেতাগণ দলবলে আগৈলঝাড়া রওনা হইয়া গিয়াছেন।

৩। চট্টগ্রামে কিচলুর বক্তৃতা

পঞ্জাবের মুসলমান নেতা ডাক্তার কিচলু বাংলায় শফরে আসিয়াছিলেন। মতলব ছিল হিন্দু-মুসলমানের সদ্ভাব-বর্দ্ধন করা। নানা জেলায় "তান্জিম" সম্বন্ধে সভা ও বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। চট্টগ্রামের সভায় কিচলু বলিয়াছেন,—কাউন্সিলে প্রবেশ এবং তথায় গভর্ণমেণ্টকে বাধাদানে যে স্বরাজ আসিবে, তাহা আমি বিশ্বাস করি না। বস্তুতঃ, হিন্দু মোছলমান মিলন ব্যতীত স্বরাজের আশা দুরাশা মাত্র। বর্ত্তমানে রাজনৈতিক ক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া আমি সামাজিক কল্যাণে আত্মনিয়োগ করিয়াছি। সময় আসিলে পুনরায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যোগদান করিব। মোছলমানদের আর্থিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য আমি "নিখিল ভারত তান্জিম কমিটিসমূহ" গঠনের জন্য বর্ত্তমানে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি। বাংলার জেলায় জেলায় তান্জিম কমিটি গঠন ও তাহাদের উন্নতি-সাধন করিতে হইবে।

ভারতের হিন্দু মোছলমান প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য "স্বরাজ"। এই একই লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইলে উভয় জাতিকেই নিজের দুর্ব্বলতা সমূলে দূর করিয়া শিক্ষিত, সরল ও চরিত্রবান হইতে হইবে। এবং আমি মনে করি, এই জন্যই হিন্দু-সংগঠন ও তান্জিম উভয়েরই আবশ্যকতা আছে।

আমার বিশ্বাস, আমরা সরলভাবে পরস্পরের নিকট মনোভাবের আদান-প্রদান করিলে, হিন্দু মোছলমান একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা রাখিলে, একে অপরকে উন্নত হইতে সহায়তা করিলে নিশ্চয়ই হিন্দু-মোছলমানে মিলন হইবে এবং "স্বরাজ" আসিবেই আসিবে। স্বরাজই আমাদের লক্ষ্য। গো-হত্যা বা মসজিদের সম্মুখে বাদ্য-বাজানো সামান্য ও গৌণ সমস্যাই বটে। আইন করিয়া বা হিন্দু-সংগঠন করিয়া গো-হত্যা কমাইতে পারা যাইবে না। গো-হত্যা নিবারণের জন্য মহাত্মা গান্ধীর পন্থাই অবলম্বনীয়। মহাত্মাজী স্বয়ং এবং আমাদিগের দ্বারা মোছলমান সমাজের নিকট গো-হত্যা নিবারণের জন্য ভ্রাতৃভাবে আবেদন এবং আপিল করিয়াছিলেন এহং তৎফলে অসহযোগের যুগে গো-হত্যা অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছিল। আমি মনে করি মসজিদের সম্মুখে বাদ্য বাজানো সম্বন্ধেও আমার মোছলমান ভ্রাতারা হিন্দুদের সদ্বিবেচনা ও সুবিচারের উপর নির্ভর করিতে পারেন এবং তদ্রূপ করিলে এই ক্ষুদ্র সমস্যার সহজেই মীমাংসা হইয়া যাইবে। সামান্য ঘটনাকে বড় করিয়া বিদ্বেষ প্রচার করা কোন সম্প্রদায়ের পত্রিকা-সম্পাদকের বা বক্তার উচিত নহে।

তান্জিম অর্থাৎ মোছলেম-সংগঠন। ইহাকে হিন্দু ভ্রাতাদের অবিশ্বাসের বা সন্দেহের চক্ষে দেখিবার কোন

কারণ নাই। মোছলমান সমাজের এমন অনেক অভাব আছে, যাহা মোছলমানরাই কেবল দূর করিতে পারেন। হিন্দু সমাজেরও বহু আবশ্যক সংস্কার যথা—অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, বিধবা বিবাহ, তীর্থক্ষেত্র ও মন্দির সমূহ সংস্কার, বিবাহে পণ প্রথা নিবারণ—কেবল হিন্দুরাই করিতে পারেন। সেই জন্য আমি হিন্দুসভা বা হিন্দু-সংগঠনের বিরুদ্ধে নহি। হিন্দু-সংগঠনে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত। আমি আশা করি হিন্দুরাও তাঞ্জিম কমিটিসমূহের উপর এইরূপ প্রীতির ভাব রাখিবেন।

৪। বিক্রমপুরে যোগি-সম্মিলন

বিগত ২০শে বৈশাখ রবিবার শৌলপড়ান, হাসাইল, মান্দ্রা, পাঁচগাও, বিদগাঁও, মনিয়ার পাড়, নগর যোষর ও বানরী এই কতিপয় গ্রাম লইয়া "শৌলপড়ান গ্রাম্য সমিতি" ২য় বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উক্ত গ্রামের স্বজাতি-প্রেমিক, ধনবান শ্রীযুক্ত রাজমোহন নাথ ও শ্রীযুক্ত মদনমোহন নাথ দালাল মহাশয়দ্বয়ের বাড়ীতে অধিবেশন বসিয়াছিল।

বিক্রমপুরস্থ উক্ত কতিপয় গ্রাম হইতে প্রায় দেড় শতাধিক লোক সভায় সমবেত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত গোপীনাথ নাথ বি-এস-সি মহাশয় সম্মিলনীর উদ্দেশ্য ও সামাজিক একতা-স্থাপনের উপায় অতি সরল ভাষায় সকলকে বুঝাইয়া দেন। মিউনিসিপ্যালিটী, লোকালবোর্ড, ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড ও নানাবিধ কমিটির মেম্বর নির্ব্বাচনের সময় গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি যাহাতে যোগি-জাতির শিক্ষিত লোকের উপর আকৃষ্ট হয় ও যোগি-জাতির শিক্ষিত লোকের দাবী যাহাতে উপেক্ষিত না হয় তাহার মূল জাতীয় একতা—ইহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন।

("যোগি-সখা", কলিকাতা)

৫। আর্থিক ও সামাজিক ভাঙা-গড়া

বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষদিকে বরিশালের আগৈলঝাড়া গ্রামে দুইটা বড় বড় সম্মিলন বসিয়াছিল। এই দুই বৈঠকে বাঙালী সমাজের আর্থিক ও সামাজিক বনিয়াদ নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার আন্দোলন মূর্ত্তিগ্রহণ করিয়াছে।

এই আন্দোলনের দৌড় সকল বাঙালীই সমান ভাবে বুঝিতে পারিতেছেন এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ নাই। "উজ্জ্বল ভারত" নামক সাপ্তাহিক বৈঠক দুইটা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে এক দিক্‌কার কথা স্পষ্ট হইয়াছে।

এই পত্রিকার মন্তব্য নিম্নরূপ :—

রায়ত কন্‌ফারেন্স :—গত ২৯শে ও ৩০শে জ্যৈষ্ঠ গৌরনদী থানার অন্তর্গত গৈলার নিকটবর্ত্তী আগৈলঝাড়া গ্রামে একটি রায়ত সভার অধিবেশন হয়। বরিশালের উকীল মৌলবী হাসেমালী খাঁ সাহেব সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সহস্র সহস্র নমঃশূদ্র ও মুসলমান এই সভায় যোগ দিয়েছিলেন। সভায় নাকি জমিদার তালুকদারের বিরুদ্ধে মন্তব্য গৃহীত এবং সরকার যে প্রজাস্বত্ব আইন পাশ করতে ব্যাকুল তাও নাকি সমর্থিত হয়েছে।

এরা বুঝতে পাচ্ছেন না প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হলে কেমন করে প্রজাবৃন্দ অধিকতর বন্ধনদশার ভিতর চলে যাবেন, কেমন করে এরা বাড়ী-ঘর জমি-জায়গা সব হারিয়ে পথের কুলী-মজুরের দলভুক্ত হবেন। যে তালুকদারের অধিকার ক্ষুণ্ণ করবার জন্য সরকারের এই প্রজার প্রতি দরদ সেই তালুকদারশক্তি কিছু নির্জীব হবে বটে; কিন্তু প্রজারা ততোহধিক বণিক্ তালুকদারের হাতে গিয়ে পড়বে, যার ফলে দেশ নিশ্চয় বলসেভিকমতের ভিতর পড়ে সর্ব্বতোভাবে হাবুডুবু খাবে। চালক ও চালিত, জমিদার ও প্রজা, কেন্দ্র ও পরিধির সমন্বয় না হলে, না চলতে পারে কোনো সঙ্ঘ, না পারে কোন জমিদারী।

অখণ্ড বস্তুর এক অর্দ্ধেকে ব্যভিচার এলে অপরটার উপর জোর দিতে গিয়ে মাত্রা ছাড়ালে ভবিষ্যতে আবার একটি বিপ্লব-সৃষ্টির পথ করে রাখা হয় মাত্র। প্রজার কল্যাণের জন্য জমিদার ধ্বংস করতে গেলে জমিদার আপাততঃ মরতে পারে, কিন্তু জমিদারকে কেন্দ্র করে যে আবার একটা বিদ্রোহ ভবিষ্যতে ফুটে উঠবেই তা রোধ করবার কোন শক্তি থাকবে না।

বর্ত্তমান যুগ অসাম্প্রদায়িকতার যুগ। জমিদার সম্প্রদায় প্রজাসম্প্রদায় কাহাকেও কোলের বা কাহাকেও পিঠের না করে অখণ্ড কল্যাণে লক্ষ্য রেখে কেবল প্রাণের জাগরণের আন্দোলন করতে হবে। সমাজে জমিদার চাই, প্রজাও চাই, এবং তাদের ভিতরের পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ স্থাপনও চাই। নচেৎ প্রজাও মরবে, জমিদারও মরবে, দেশ ডুববে।

নমঃশূদ্র কন্‌ফারেন্স:—রায়ত সভা হয়ে যাবার পর ঐ আগৈলঝাড়ায় এক নমঃশূদ্র সভা হয়। সেখানে প্রায় ১৫ হাজার নমঃশূদ্র একত্র হন। গত ৩১শে জ্যৈষ্ঠ ঐ কন্‌ফারেন্সে যোগ দেবার জন্য পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয় ও আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার বরিশাল আসেন। তাঁহারা ঐ দিনই মাদারীপুরের ষ্টীমারে আগৈলঝাড়া যান। তৎপরদিন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, শ্রীযুক্তা সরলাদেবী চৌধুরাণী, শ্রীযুক্ত পদ্মরাজ জৈন, স্বামী বিশ্বানন্দ, শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, নন্দলাল ঘোষ মহোদয়গণ এই কন্‌ফারেন্সে যোগদান-মানসে বরিশালে পদার্পণ করেন। বেলা ৯৷৷০ টার সময় মিউনিসিপালিটি ও হিন্দুসভার পক্ষ হতে মালব্যজীকে ধর্ম্মরক্ষিণী সভাগৃহে দুইটী অভিনন্দন দেওয়া হয়। তাঁহারা ঐ দিনই মাদারীপুর ষ্টীমারে চলে যান। বরিশাল থেকে গৈলানিবাসী বিশিষ্ট বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ এদের আদর আপ্যায়নের জন্য গিয়াছিলেন। শ্যামবাবু বুধবার ফিরে আসেন; অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বৃহস্পতিবার ফিরে আসেন। বৈকালে ২৷৷টায় শ্রীযুত মালব্যজী ও শ্রীযুতা সরলাদেবী শঙ্করমঠে যান। নারীমঙ্গল বালিকা বিদ্যালয় ও নারী শিল্পাশ্রমের পক্ষ হতে তাহার সম্পাদিকাদ্বয় শ্রীযুক্তা সরলা দেবীকে স্বরাজসেবক-সঙ্ঘের জাতীয় বিদ্যালয় গৃহে একটী অভিনন্দন প্রদান করেন। মালব্যজী বারলাইব্রেরীতে কিছু বলেন। ৫ টার সময় তাঁহারা বরিশাল ত্যাগ করেন।

একদল নমঃশূদ্র "তথাকথিত" উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর সংস্রব বর্জ্জন করতে যাওয়ার ফলে অভ্যাগতদের বিশেষ অসুবিধা হয়েছে। গৈলার ভদ্রমহোদয়গণ না থাকলে খাওয়ার যৎপরোনাস্তি অসুবিধা হত। রায়তগণ চায় জমিদারের উচ্ছেদ, একদল নমঃশূদ্রও চায় উচ্চশ্রেণীর উচ্ছেদ।

উভয়েরই বেদনার কারণ আছে সত্য, কিন্তু রাগ হয়ে যা তা করলেই ত দেবতা প্রসন্ন হবেন না। স্বামী বিশ্বানন্দ বলেছেন, যে বলি দেয় সে যেমন হীন, যাকে বলি দেয় সেও কম হীন নয়। সিংহকে বলি দেবার আশাও কেউ করে না। উচ্চশ্রেণীরা চায় অপমান করতে যাতে অপমান তাদের উপর বর্ষিত না হয় তজ্জন্য নিম্নশ্রেণীর দল আত্মশক্তির জাগরণের চেষ্টা না করে কেবল হিংসা-বিদ্বেষ বাড়ালে কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণ হয় বেশী। উচ্চশ্রেণীর মধ্যে এমনসব নিরভিমান লোক জন্মেছেন যাঁরা কাহারো অপমান করতে পারেন না, সেসব বন্ধুদেরও যদি এরা পায়ে ঠেলেন, কল্যাণ অনেক পিছনে পড়বে। হিংসায় মানুষ জাগেনা, জাগে আত্মশক্তির উদ্বোধনে।

পাঞ্জাবী চাষীর গম-সম্পদ্

মহম্মদ হুসেন, লায়ালপুর, পঞ্জাব

চাষ

কৃষিক্ষেত্রের মাটির গুণাগুণ সম্বন্ধে গমের মত উদাসীন খুব কম উদ্ভিদই আছে। অতিরিক্ত বেলেমাটি এবং শক্ত কাদা অর্থাৎ এটুলে মাটি ব্যতীত প্রায় সব রকম মাটিতেই ইহা জন্মে। বেশ মোটা পলি মাটিই ইহার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কিন্তু নীচের মাটির কথাটাও ভাবা দরকার। যদি তাহা উপযোগী না হয়, তবে শিকড়টা গজাইবে চটান জমিতে। তাহাতে গাছের পরিপূর্ণ বিকাশ হইবে না। সৌভাগ্যের কথা, পঞ্জাবের বিশাল পলিপূর্ণ সমতল ভূমির নীচে আবশ্যকমত মাটির অভাব নাই। অবশ্য ভূমি সব

জায়গায় সমতল নয়। মধ্যে মধ্যে বিস্তীর্ণ নদীর খাত আছে। তা ছাড়া, হিমালয় ও অন্যান্য শৈলশ্রেণী এবং রাওলপিণ্ডি, আটক ও জিলাম জেলার গিরি-সঙ্কটগুলি ত আছেই।

গমটা রবিশস্য। অক্টোবরের মাঝামাঝি হইতে নভেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত ইহার বপন-কার্য্য চলে এবং এপ্রিলে এই শস্য কাটা হয়। পরেও যে ইহার বপন-কাজ না চলে এমন নয়। উত্তর পঞ্জাবে যদি শীতকালীন বৃষ্টি দেরীতে হয়, তবে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত ইহার বপন চলিতে পারে।

পর্য্যায়

সাধারণতঃ, যে জমি পূর্ব্ব খারিফে (বৎসরে একটি মাত্র ফসল) পতিত পড়িয়া থাকে, সেই জমিতেই গম বুনিতে হয়। গ্রামের কাছে ভাল রকম সার দেওয়া জমিতে ভুট্টার পরেই গম বোনা হয়। যেখানে তুলার চাষ বেশী, সে খানে গমের পর তুলা। কিন্তু তুলার পর গম দিতে হইলে, তুলা যে সময় তোলা হয় অর্থাৎ ডিসেম্বরের শেষ হইতে অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত জমিটাকে ফেলিয়া রাখিয়া তারপর গম বুনিতে হয়। নিম্নলিখিত পর্য্যায়টি প্রায় সর্ব্বত্রই অনুসৃত হইয়া থাকে :—

১। গম—তোরিয়া—তুলা

২। গম—গম—তোরিয়া—তুলা

৩। ভুট্টা—ইক্ষু—গম

৪। ভুট্টা—গম—তুলা।

প্রথম দুইটি পর্য্যায় প্রধানতঃ লায়ালপুর উপনিবেশে চলে। যেখানে জল ও সার প্রচুর, সেখানে বিস্তৃত চাষে, তৃতীয় ও চতুর্থ পর্য্যায় অবলম্বন করা হয়। বারাণী ভূখণ্ডে গমের পর গম অনেক বৎসর ধরিয়া চলে, অথবা ইহার পরে তুলা, বজরি, কিম্বা কোনো খারিফ শস্য বুনিবার পর এক বৎসর জমিটা ফেলিয়া রাখিয়া তারপর তাহাতে গম বোনা হয়।

কর্ষণ

পাঞ্জাবী চাষীদের হাতে গমের চাষটা খুব ভালই হইয়া থাকে। নানা জায়গায় নানারকম লাঙ্গল দেওয়ার পদ্ধতি আছে। স্থানের বিশেষত্ব, মাটির বিশেষত্ব, চাষীর শক্তি ও অবসরের তারতম্যানুসারে পদ্ধতিটা নিয়মিত হয়। বিশ বার লাঙ্গল দেওয়া একেবারেই অসাধারণ নহে। তবে গড়ে আটবার লাঙ্গল সর্ব্বত্রই চলিয়া থাকে। পাঞ্জাবী প্রবাদ আছে—

"গাজোরে দাও সাতবার লাঙ্গল, আখে দাও বারো,
(আর) গমের বেলা লাঙ্গল চালাও যত খুসি পারো।"

আগের ফসল উঠিয়া যাইবার পর যত সত্বর সম্ভব গমের ক্ষেতে লাঙ্গল দেওয়া ভাল। বাস্তবিক কিন্তু খারিফ ফসলের আগেই গমের জমিতে লাঙ্গল দেওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। প্রচুর বৃষ্টিপাতের পরে মেঘমুক্ত আকাশ দেখিয়া কর্ষণের কাজ আরম্ভ হয়, কারণ মাটি তখন চাষের উপযুক্ত। মাটি ভিজিবার পক্ষে প্রচুর বৃষ্টি হইলেই জমিদার (রায়ত) তাহার অবসর মত লাঙ্গল লইয়া মাঠে যায় এবং জমিতে চাষ দিতে থাকে। বারবার লাঙ্গল দিলে যে আগাছা জন্মাইতে পারে না, মাটির ডেলা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায়, আলো-বাতাস মাটির মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে বেশ নরম রাখে এবং তাহাতে সামান্য বৃষ্টির জলও আর দাঁড়াইয়া নষ্ট হইতে পায় না, এসব বিষয় তাহার খুব ভালই জানা আছে।

বপন করিবার পূর্ব্বে যান্ত্রিক উপায়ে মাটির উপযুক্ত কারকিৎ ও কোমলত্ব-বিধান করা সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। কৃষক যতই মাটিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া পিষিয়া একেবারে গুঁড়া গুঁড়া করিয়া ফেলিবে, ততই যে প্রকৃতিকে তাহার সাহায্য করা হইবে, এবং ততই যে প্রকৃতি তাহাকে প্রচুর শস্য দিবেন, এই কথা কৃষককে বারবার শুনাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। আমাদের চাষীদেরও সে জ্ঞান আছে। এ সম্বন্ধে বচনই আছে—"যত দেবে লাঙ্গল, তত পাবে ফসল।" "একবার দুবার লাঙ্গল দিলে, ফসল কি আর বেশী মিলে?"

শেষ লাঙ্গল দেওয়ার পরে ভারি একটা চৌকোণা তক্তা দিয়া ক্ষেতটাকে পালিশ করা হয়। তাহার নাম "সুহাবা।" ইহাদ্বারা ক্ষেতের ডেলা নষ্ট হয়, মাটির উপরিভাগ শক্ত করিয়া তাহার আর্দ্রতা বজায় রাখে এবং জমি উঁচু-নীচু না থাকায় শস্য কাটিবার সময় লোকের বেশ সুবিধা হয়।

সার-প্রয়োগ

কিঞ্চিদধিক দশ বৎসর পূর্ব্বে ক্যানাল উপনিবেশসমূহে মাটিতে একটু আঁচড় দিয়া বীজ বুনিয়া, তাহার পর প্রচুর জল ঢালিতে পারিলেই ফসল ফলিত অতি চমৎকার। কিন্তু মাটির শক্তি ক্রমে ক্রমে কমিয়া যাওয়াতে, এখন উপযোগী সার দিবার আবশ্যকতা সমস্ত শ্রেণীর কৃষকদের মধ্যেই বেশ অনুভূত হইতেছে। সার দিলে যে জমির শক্তি বাড়ে, একথা জমিদারেরা বুঝে না, তাহা বলা যায় না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সার-প্রয়োগটা প্রায় সর্ব্বত্রই যা-তা করিয়া সারা হয়—এবং সারের মধ্যে যেটি প্রধান, সেটী জ্বালানি কাজেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ফলতঃ, এই সারটার দরকার যতই বাড়িতেছে, ততই ইহার যোগান কমিয়া যাইতেছে। কমিয়া যাইতেছে বলিয়াই রাসায়নিক সারের (কমার্শিয়েল ফার্টিলাইজার) ব্যবহারের দরকার হইয়া পড়িতেছে। অনেকে এইরূপ সারের মূল্য এখনও বুঝিতে পারে নাই। কেহ কেহ আবার ইহার বিরুদ্ধেও মত পোষণ করে। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, এইরূপ সারে ফলনটা বেশীই হইয়া থাকে। নাইট্রেড অব সোডাতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভাল ফল দেখা যায়। বেশ বুঝা যায়, নাইট্রেট অব সোডার মধ্যে নাই-ট্রোজেন বেশী থাকে বলিয়াই গমের সার-রূপে ইহার প্রচলন। গমজন্মানোর পক্ষে নাইট্রেট অব সোডার কার্য্য-কারিতা অনেক জমিদারই পরীক্ষা করিয়াছে। নিম্নে তাহার একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

গত বৎসর জালন্ধর ক্যাণ্টনমেণ্টের নিকটবর্ত্তী ধনোয়ালী গ্রামে এস, হাজরা সিংএর গমের ক্ষেতে প্রত্যেক একরে এক মণ হারে নাইট্রেট অব সোডার সার দেওয়া হয়। অপর দিকে ঠিক তৎপরিমাণ আর একটা ক্ষেতে কোন সারই দেওয়া হয় না। তাহাদের ফলাফল কি হইয়াছিল, নিম্নের তালিকা হইতে তাহা বুঝা যাইবে।—

সারযুক্ত ক্ষেতের ফসলের দাম প্রতি একরে	১২৫৲
সারশূন্য ক্ষেতের ফসলের দাম প্রতি একরে	৮৫৲
বৃদ্ধি	৪০৲
তাহা হইতে বাদ যায় ১৴ একমণ নাইট্রেট অব সোডার দাম—	১২৲
লাভ—	২৮৲

বীজ ও বপন

অবস্থা ও স্থানভেদে প্রতি একরে বীজের পরিমাণ বিভিন্ন রকম হইয়া থাকে। যদি সময় আগাইয়া কাজ করিতে হয়, যদি বৃষ্টি লঘু হয়, মাটি উর্ব্বর থাকে, কারকিৎ ভাল হয়, তবে বীজ কম লাগে। ফলন কিন্তু উপ্ত বীজের সমানুপাতে হয় না। তাহার কারণ গমের গাছ কম-বেশী ফেকড়ি বাহির করিয়া নিজকে ক্ষেতের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া লয়। জলসিঞ্চিত ক্ষেতে প্রতি একরে গড়ে ॥৴৪ সের বীজ বোনা হইয়া থাকে।

গম-বপনের তিনটী প্রণালী :—(১) পোরা অর্থাৎ নলের ভিতর করিয়া, (২) কেরা অর্থাৎ লাইনবন্দী করিয়া। (৩) হাতের দ্বারা চারিদিকে ছিটান। প্রবাদ আছে—

"রাজা হল পোরা;
মন্ত্রী হল কেরা,
আর ভিখারী সে হাত ছিটান
বীজ—লক্ষ্মীছাড়া।"

এই প্রবাদ হইতেই বুঝা যায়, নলের ভিতর করিয়া বীজ-বপন প্রণালীই সুব্যবস্থা ও মিতব্যয়িতার দিক্ দিয়া বিশেষ আদৃত। বীজগুলি সারিবন্দী ভাবে সাজাইয়া বুনিলে অনেক সুবিধা হয় বলিয়া কেরার আদর। হাতে ছিটানো অপেক্ষা ইহাতে কম বীজ লাগে এবং সব জায়গায় সমান ভাবে বীজ পড়ে। সর্ব্বত্র সমান গভীর মাটিতে যদি ইহা, পড়ে, তবে ইহার অঙ্কুরোদ্গম শীঘ্র শীঘ্র হইয়া থাকে। ইহাতে আগাছাও বেশী জন্মিতে পারে না।

গম-কাটা

কাস্তের সাহায্যে ইহা কাটা হয়। কর্ত্তনকারী পায়ের উপর বসিয়া, বাঁ হাত দিয়া যতটা আঁটে ততটা গোছা ধরে, তারপর গোড়া পাড়িয়া কাটে। এই রকম বসিয়া বসিয়া

কাটা এবং কাটিতে কাটিতে অগ্রসর হওয়া আর তাহার সঙ্গে দুই হাত যোড়া থাকার প্রণালীটা বড়ই কদর্য্য। কর্ত্তনযন্ত্র এখনও পঞ্জাবে প্রচলিত নয়। যে সমস্ত কৃষক বৎসরে বিশ একরের অধিক জমিতে গম জন্মায়, তাহারা যদি যন্ত্রে কিছু ব্যয় করে তবে সে ব্যয়টা লাভজনক হইতে পারে। পঞ্জাব কৃষি-বিভাগের শ্রীযুক্ত ডি, পি, জনষ্টোন হাতে কাটার এবং যন্ত্রে কাটার খরচের নিম্নলিখিত ভাবে তুলনা করিয়াছেন :—

হাতে কাটা,—একদিনে এক একর জমিতে পাঁচজন লোক লাগে। এই কাজের ফলে তাহারা পাঁচ আঁটি শস্য পায়। পাঁচ আঁটি শস্যে মোটামুটি ২/ মণ দানা থাকে (৪৲ কাটা করিয়া মণ ধরিলে মূল্য ৮৲) এবং ৪/ মণ ভূষি থাকে, (তাহার প্রতি মণ ৷৷০ আনা হিসাবে ধরিলে দাম হয় ২৲ টাকা। তাহা হইলে হাতে কাটার খরচ পড়ে ১০৲ টাকা)।

যন্ত্রে কাটা,—শতকরা ১০৲ টাকা হিসাবে যন্ত্রের দাম

৫০০৲ টাকার সুদ	...	৫০৲
শতকরা ১৫৲ টাকা হিসাবে		
মূল্য-হ্রাস ...	...	৭২৲
মর্দ্দন তেল	...	৭৲
ছুরি ধার দিবার জন্য কারবোব্যাণ্ডাম ফাইলের দাম ৬৲ (চারি বৎসর যায় বলিয়া বৎসরে)	...	১৷৷০
মেরামতী, খোলাখুলি ইত্যাদিতে	...	৩০৲
দৈনিক ১৷৷০ হিসাবে ৮ জন মানুষের ১৪ দিনে ...	...	১৬৮৲
প্রতি যোড়া বলদের জন্য ১৲ টাকা হিসাবে	...	২৮৲
	মোট—	৩৫৬৷৷০

মনে করা যা'ক, এই যন্ত্রে এক দিনে ৫ একর জমির গম কাটা যায়। তাহা হইলে ১৪ দিনে ৭০ একর জমির গম কাটা হইবে। সুতরাং প্রতি একরে খরচ পড়িবে ৫৲ টাকা। একটা ঋতুতেই তাহা হইলে খরচ বাঁচে ৩৪৩৷৷০ আনা। দুইটি যন্ত্র হইলে খরচ আরো কম পড়ে।

উৎপাদন

মাঝারি রকম ফসল ও বেশী পরিমাণ ফসলের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, জমিদারকে তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। মাঝারি রকম ফসল পাইবার আশায় বসিয়া থাকিলে ক্ষতি হয় এই যে, বেশী পরিমাণ ফসল-লাভের উপায় অবলম্বন করা হয় না। কিন্তু পঞ্জাবের ভাল ভাল কৃষকেরা উপযুক্ত যন্ত্র লইয়া যদি বেশী ফসলপ্রদ জাতের গম বপন করে, তবে তাহারা প্রত্যেক একরে গড়ে ২০৲ মণ গম ফলাইতে পারে। এই দিকে চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। জনকয়েক জমিদার এবিষয়ে ইতিমধ্যেই চেষ্টা করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহারা সংখ্যায় খুবই অল্প। সেই জন্য গড়পড়তা হিসাবে তাহাদের উৎপাদিত শস্যের পরিমাণ-বৃদ্ধি হয় নাই। প্রতি একরে তাহারা প্রায় ১১/ মণ শস্য জন্মাইতে পারিয়াছে। ক্যানাডায় কিন্তু প্রতি একরে জন্মে ১৬/ এবং ইংলণ্ডে ২৫/ মণ।

মূল্য-তত্ত্ব

(ডেভিড্ রিকার্ডো)

অনুবাদক

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেন, এম, এ ও শ্রীসুধাকান্ত দে, এম, এ, বি, এল

(৪)

মজুরি বনাম যন্ত্রপাতি

[যে পরিমাণ শ্রম দ্রব্যের উৎপাদনে প্রদত্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারাই দ্রব্যাদির আপেক্ষিক দাম নির্দ্ধারিত হয় বটে, কিন্তু যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য স্থির ও স্থায়ী পুঁজিপাটার নিয়োগের ফলে এই নিয়মের উনিশ-বিশ ঘটিয়া থাকে।]

১৭। পূর্ব্ববর্ত্তী পল্লবে আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে, হরিণ ও স্যামন হননের জন্য যে সব যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্রের দরকার তাহা সমকালস্থায়ী ও সমপরিমাণ শ্রমের ফল প্রসূত। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, হরিণ ও স্যামনের আপেক্ষিক দামের তারতম্য, উহাদিগকে আহরণ করিতে যে কম বা বেশী পরিমাণ শ্রমের আবশ্যক, সম্পূর্ণরূপে তাহারই উপরে নির্ভর করে। কিন্তু সমাজের যে কোন অবস্থাতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ে ব্যবহৃত অস্ত্র, যন্ত্র, কল ও কারখানা, সকলই আর কিছু সমান স্থায়ী নহে ও তাহাদের উৎপাদনের জন্যও শ্রমের কম বা বেশী অংশ দরকার হইতে পারে। কি পরিমাণ পুঁজিপাটা শ্রমিকের পোষণে খরচ হইবে, আর কি পরিমাণ বা অস্ত্র, কল, ঘরবাড়ীতে লাগান হইবে, তাহার পরস্পর সম্বন্ধও বহু ভিন্ন ভিন্ন রকমে নির্দ্ধারিত হইতে পারে। স্থির পুঁজিপাটার স্থায়িত্বে এইরূপ বিভিন্নতা থাকায় এবং দুই প্রকার পুঁজিপাটা যে ভিন্ন ভিন্ন অনুপাতে মিশিতে পারে তাহার এই বহুলতা (দ্রব্যাদি উৎপাদনের জন্য কম বা বেশী পরিমাণ শ্রমের কথাত আছেই) আপেক্ষিক দামের তারতম্যের হেতুস্বরূপ অন্য একটী কারণেরও প্রবর্ত্তন করে। সেই কারণ হইতেছে শ্রমের দামে হ্রাস-বৃদ্ধি।

যে খাদ্য ও বস্ত্র মজুর ব্যবহার করে, যে কারখানাতে সে কাজ করে, যে যন্ত্রপাতি তার শ্রমের সাহায্য করে সে সবই অস্থায়ী। অবশ্য, এই ভিন্ন ভিন্ন পুঁজিপাটার কোন্টা কত সময় টিকিয়া থাকিবে সে বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য বিশাল। একটা বাষ্প-যন্ত্র একটা অর্ণবযান অপেক্ষা বেশী দিন টিকিবে, একটা অর্ণবযান মজুরের পরিহিত বস্ত্র অপেক্ষা বেশী দিন টিকিবে, এবং মজুরের বস্ত্র তাহার খাদ্য অপেক্ষা বেশী দিন টিকিবে।

কোনো কোনো পুঁজিপাটা দ্রুত ধ্বংসশীল এবং সেই জন্য সর্ব্বদাই তাহার পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হওয়া দরকার। আবার কোনো কোনোটা আস্তে আস্তে ধ্বংস পায়। এই বিভিন্নতা অনুসারে পুঁজি পৌনঃপুনিক* ও স্থির এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। শুঁড়ির কলকারখানা দামী ও স্থায়ী (টেকসই) বলিয়া বলা হয় যে, অনেক পরিমাণ স্থির পুঁজিপাটা ব্যবহৃত হইতেছে। অপরদিকে মুচির পুঁজিপাটার বেশীর ভাগ মজুরি-শোধে যায় ও কলকারখানার চেয়ে বেশী ধ্বংসপ্রবণ দ্রব্যের অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্যের জন্য খরচ হয়, সেই জন্য বলা হয় যে, অনেক পরিমাণ পৌনঃপুনিক পুঁজিপাটা ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহাও দ্রষ্টব্য যে, পৌনঃপুনিক পুঁজিপাটার সঞ্চালনে অথবা নিয়োগ-কর্ত্তার নিকট প্রত্যাবর্ত্তনে খুব অসম সময় লাগিতে পারে। রুটি তৈয়ারী করিবার জন্য রুটিওয়ালা যে

---

* "সার্কুলেটিং ক্যাপিট্যালে"র প্রতিশব্দরূপে পূর্ব্বে যে "ভ্রমণশীল পুঁজিপাটা" ব্যবহার করিয়াছি, তদপেক্ষা "পৌনঃপুনিক" কথাটা ভাল ও বিশদ মনে হইতেছে। ভবিষ্যতে সর্ব্বত্র এই কথা ব্যবহার করিব। বলা বাহুল্য, "পুঁজিপাটা" ক্যাপিট্যালের অর্থ হিসাবে "মূলধন" অপেক্ষা বেশী স্পষ্ট। শুধু পুঁজি কথাটা "ষ্টকের" জন্য বসিতে পারে।—অনুবাদক

১ এমন কিছু অপরিত্যাজ্য বিভাগ নহে, এবং দুইয়ের পার্থক্য-রেখা ঠিক মত টানাও সোজা নহে।

গম কিনে, তার তুলনায় চাষী যে গম বপন করিবে বলিয়া কিনে তাহা স্থির পুঁজিপাটা। একজন উহাকে মাটির তলায় রাখিয়া দেয় এবং বৎসরেক কাল কোন ফল পাইতে পারে না। অন্য জন উহাকে পিষাইয়া ময়দা পাইতে পারে, 'গাহেক'দের কাছে রুটি করিয়া বেচিতে পারে এবং পূর্ব্ব ব্যবসায় নূতন করিয়া করণার্থ অথবা নূতন ব্যবসায় আরম্ভের জন্য সপ্তাহকালমধ্যে তার পুঁজিপাটা মুক্ত করিয়া লইতে পারে।

অতএব দেখিতেছি যে, দুই ব্যবসাই সম-পরিমাণ পুঁজি-পাটা লাগাইতে পারে; কিন্তু কি পরিমাণ স্থির আর কি পরিমাণ পৌনঃপুনিক হইবে তাহা লইয়া বহু ভিন্ন প্রকার ভাগ হইতে পারে।

এক ব্যবসায়ে পুঁজিপাটার খুব অল্পটা পৌনঃপুনিক পুঁজিপাটারূপে অর্থাৎ কিনা মজুরি পোষাইতে নিয়োগ করিয়া উহা প্রধানতঃ কলকারখানা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত স্থির ও স্থায়ী প্রকৃতির পুঁজিপাটাতে লাগান হইতে পারে। অন্য ব্যবসায়ে ব্যবহৃত পুঁজিপাটা তুল্য পরিমাণের হইতে পারে, কিন্তু উহা হয়ত প্রধানতঃ মজুরি পোষাইতে খরচ হইতেছে এবং খুব অল্পটা কল-কারখানা, যন্ত্রপাতিতে লাগান হইতেছে। মজুরি বাড়িলে, এইরূপ বিভিন্ন অবস্থায় উৎপন্ন দ্রব্যাদিকে অসমভাবে আঘাত না করিয়াই পারে না।

আবার, দুই কারবারী সমপরিমাণ স্থির ও সমপরিমাণ পৌনঃপুনিক পুঁজিপাটা লাগাইতে পারে; কিন্তু উহাদের স্থির পুঁজিপাটার স্থায়িত্বে গভীর বৈষম্য থাকিতে পারে। একজনের হয়ত ১০,০০০ পাউণ্ড দামের কতকগুলি বাষ্প-যন্ত্র আছে, অন্যের ঐ দামের কতকগুলি জাহাজ আছে।

যদি লোকে উৎপাদনে কোন কল ব্যবহার না করিত, শুধু শ্রম করিত, এবং দ্রব্যাদি বাজারে আনিবার পূর্ব্বে তাদের তুল্য পরিমাণ সময় অতিবাহিত হইত, তাহা হইলে লোকের সব জিনিষের বিনিময়-দাম নিয়োজিত শ্রমের ঠিক পরিমাণ-অনুপাতে হইত।

যদি লোকে সমান দামী ও সমকাল-স্থায়ী স্থির পুঁজিপাটা ব্যবহার করিত, তাহা হইলেও উৎপন্ন দ্রব্যসমূহের দাম একই হইত এবং তাদের উৎপাদনের জন্য বেশী পরিমাণ বা কম পরিমাণ শ্রম নিযুক্ত হওয়া অনুসারে উহাদের দামে ক্রমিক হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিত।

১৮। মালের উৎপাদনে যে শ্রম প্রয়োজন তার পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি ব্যতীত অন্য কোন কারণে, তুল্য অবস্থায় উৎপন্ন দ্রব্যসমূহের দামে পরস্পরের তুলনায় তারতম্য ঘটে না। তথাপি অন্য যে সব দ্রব্য স্থির পুঁজিপাটার হারাহারি পরিমাণের সাহায্যে উৎপন্ন হয় নাই তাদের তুলনায় অন্য-কারণেও উহাদের দামে ন্যূনাধিক্য হইবে। শ্রমের "দাম" বাড়িলেই এরূপ ঘটিবে, যদিও উহাদের কোনটার উৎপাদনেই শ্রম বেশীও দেওয়া হয় নাই কমও দেওয়া হয় নাই। মজুরির যে কোন হ্রাস-বৃদ্ধি হোক্, যব ও ওট্সের পরস্পর সম্বন্ধ অপরিবর্ত্তনীয় থাকিবে। যদি তুলার জিনিষ ও বস্ত্র ঠিক তুল্য অবস্থায় উৎপন্ন হয়, তাদের সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটিবে। কিন্তু শুধু মজুরির হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তুলার জিনিষের তুলনায় যব, এবং বস্ত্রের তুলনায় ওট্স বেশী বা কম দামী হইতে পারে।

মনে কর, দুইটি কল তৈয়ারী করিবার জন্য দুই ব্যক্তি প্রত্যেকে এক বছরের জন্য একশ' জন করিয়া লোক নিযুক্ত করিল। অন্য এক ব্যক্তি ফসল চাষের জন্যও ঐ পরিমাণ লোক নিযুক্ত করিল। বৎসরান্তে প্রত্যেকটা কলই দামে ফসলের সমান হইবে। কারণ, উহাদের প্রত্যেকেই তুল্যপরিমাণ শ্রমে উৎপন্ন হইবে। মনে কর, পরের বছর এক কলের মালিক, একশ' লোকের সাহায্যে বস্ত্র প্রস্তুত করিতে লাগিল এবং অন্য কলের মালিকও ঐ রকম এক শত লোকের সাহায্য লইয়া তুলার জিনিষ প্রস্তুত করিতে লাগিল। কিন্তু চাষী পূর্ব্বের মত একশ' লোককে ফসলের চাষেই লাগাইতে লাগিল। দ্বিতীয় বছরে উহারা সকলেই সমপরিমাণ শ্রম লাগাইয়া থাকিবে। কিন্তু কাপড়-ব্যবসায়ীর এবং তুলার কারবারীরও মালপত্র এবং কল একত্রে হইবে এক বছরের জন্য নিযুক্ত দুইশ' লোকের শ্রমের ফল; অথবা দুই বছরের জন্য নিযুক্ত একশ' লোকের শ্রমের ফল। পরন্তু, এক বছরের জন্য (নিযুক্ত) একশ' লোকের শ্রমের ফল হইবে ফসলটা। কাজে কাজেই ফসলের দাম

যদি হয় ৫০০ পাউণ্ড, কাপড়-ব্যবসায়ীর কল ও বস্ত্রের একত্রে দাম হওয়া উচিত ১০০০ পাউণ্ড এবং তুলার কারবারীর কল ও তুলার জিনিষের দামও ফসলের দামের দ্বিগুণ হওয়া উচিত। কিন্তু উহাদের দাম ফসলের দামের দ্বিগুণেরও বেশী হইবে। কারণ, প্রথম বছরে কাপড় ব্যবসায়ীর ও তুলার কারবারীর পুঁজিপাটার উপর মুনাফা তাদের স্ব স্ব পুঁজিপাটার সঙ্গে যোগ করা হইয়াছে। কিন্তু চাষীর মুনাফাটা ব্যয় হইয়া গিয়াছে ও ভোগ করা হইয়াছে। তাদের পুঁজিপাটার স্থায়িত্বের ক্রম বিভিন্ন বলিয়া—অথবা অন্য কথায়, মাঝে কিছুসময় না গেলে, এক দফা দ্রব্যসামগ্রী বাজারে আসিতে পারে না বলিয়া—একমাত্র শ্রমের পরিমাণ হিসাবে ঐ সমুদয়ের দাম হইবে না—তাদের অনুপাত ২:১ হইবে না, কিন্তু কিছু বেশী হইবে। সর্ব্বাপেক্ষা দামী দ্রব্যটাকে বাজারে আনিবার পূর্ব্বে যে সুদীর্ঘ সময় নষ্ট করা হইয়াছে, তার শোধবোধ ত হওয়া চাই।

মনে কর যেন প্রত্যেক কারিগরের শ্রমের জন্য বাৎসরিক ৫০ পাউণ্ড দেওয়া হইয়াছিল, অথবা যেন ৫০০০ পাউণ্ড পুঁজিপাটা নিয়োগ করা হইয়াছিল এবং মুনাফা ছিল শতকরা ১০ পাউণ্ড। তাহা হইলে, প্রথম বছরের শেষে প্রত্যেক কল ও ফসলের দাম ৫৫০০ পাউণ্ড হইবে। দ্বিতীয় বছর কারবারীরা ও চাষীরা আবার প্রত্যেক ৫০০০ পাউণ্ড শ্রমের পোষণার্থ লাগাইবে এবং সেইজন্যই তাদের মাল আবার ৫৫০০ পাউণ্ডে বেচিবে। কিন্তু যারা কল ব্যবহার করিয়াছে তারা চাষীদের সহিত তুল্যমূল্য হইবার জন্য, শুধু যে শ্রমে নিযুক্ত সমতুল্য ৫০০০ পাউণ্ড পুঁজিপাটা হইতে ৫৫০০ পাউণ্ড আদায় করিবে তাহা নয়, অধিকন্তু ঐ ৫৫০০ পাউণ্ড তারা কলে লাগাইয়াছিল বলিয়া উহার উপর মুনাফা হওয়াতে আরো ৫৫০ পাউণ্ড বেশী পাইবে। ফলে তারা তাদের মালসমূহ ৬০৫০ পাউণ্ডে বেচিবে। সুতরাং, এস্থলে দেখা যাইতেছে, তাদের স্ব স্ব দ্রব্যাদি উৎপাদনের জন্য দুই মহাজন বৎসর বৎসর ঠিক তুল্য-পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করিতেছে। তথাপি তারা যে মাল উৎপন্ন করিতেছে তাদের দামে পার্থক্য ঘটিতেছে। হেতু এক বা অন্য কর্ত্তৃক নিযুক্ত স্থির পুঁজিপাটার অথবা মৌজুদ শ্রমের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন। বস্ত্র ও তুলার জিনিষ সব তুল্য দামী। কারণ উহারা তুল্য পরিমাণ শ্রমের ও তুল্য পরিমাণ স্থির পুঁজিপাটার (সাহায্যে উৎপন্ন) ফল।' কিন্তু এই সব দ্রব্যের যা দাম ফসলের দাম তা নয়। কারণ, স্থির পুঁজিপাটার কথা ধরিলে বলা যায়, উহা ভিন্ন অবস্থায় উৎপাদিত হয়।

কিন্তু শ্রমের দামে কোন বৃদ্ধি ঘটিলে, উহা কিরূপে উহাদের আপেক্ষিক দাম বদলাইবে? ইহা প্রতীয়মান হইতেছে যে, বস্ত্র ও তুলার মালসমূহের আপেক্ষিক দামে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিবে না। কারণ, আমাদের কল্পিত অবস্থায় একের পরিবর্ত্তন অন্যেরও পরিবর্ত্তন ঘটাইবে। গম এবং যবের আপেক্ষিক দামেও কোন পরিবর্ত্তন ঘটিবে না, কারণ স্থির ও পৌনঃপুনিক পুঁজিপাটার কথা ধরিলে উহারা সমান অবস্থায় উৎপন্ন হইতেছে। কিন্তু শ্রমের মূল্যবৃদ্ধি ঘটিলে, বস্ত্রের অথবা তুলার জিনিষের তুলনায় ফসলের আপেক্ষিক দামে নিশ্চয়ই পরিবর্ত্তন ঘটিবে।

মুনাফায় ঘাটতি না পড়িলে শ্রমের দাম বাড়িতে পারে না। যদি ফসলটা চাষী ও মজুরের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে হয়, মজুরকে যে অনুপাতে বেশী অংশ দেওয়া হইবে, সেই অনুপাতে কম অংশ চাষীর জন্য থাকিবে। সেইরূপ, যদি বস্ত্র অথবা তুলার জিনিষ কারিগর ও তার প্রভুর মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়, পূর্ব্বোক্তকে যে অনুপাতে বেশী দেওয়া হইবে, শেষোক্তের জন্য সেই অনুপাতে কম থাকিবে। এখন মনে কর যেন মজুরি-বৃদ্ধির দরুণ, মুনাফা শতকরা ১০ হইতে ৯ পাউণ্ডে পড়িয়া গেল। কারবারীরা, তাদের স্থির পুঁজিপাটার উপর মুনাফা-হেতু তাদের মালের দরের (৫৫০০ পাউণ্ডের) সহিত ৫৫০ পাউণ্ড যোগ করিবার পরিবর্ত্তে শুধু শতকরা ৯ পাউণ্ড অর্থাৎ ৪৯৫ পাউণ্ড যোগ করিবে। ফলে, দর দাঁড়াইবে ৬০৫০ পাউণ্ডের পরিবর্ত্তে ৫৯৯৫ পাউণ্ড। এদিকে ফসল ৫৫০০ পাউণ্ডে বিকাইতে থাকিবে বলিয়া, কারবারে প্রস্তুত যে সব মালে বেশী স্থির পুঁজিপাটা লাগান হইয়াছিল, উহারা ফসলের অপেক্ষা যে সব মালে কম স্থির পুঁজিপাটা লাগান হইয়াছিল তাদের

তুলনায় দরে নামিবে। সমগ্র পুঁজিপাটার কি অনুপাতে স্থির পুঁজিপাটা লাগান হইতেছে, তারই উপর নির্ভর করিবে—শ্রমের হ্রাসবৃদ্ধির দরুণ মালসমূহের আপেক্ষিক দামে পরিবর্ত্তন কতখানি হইবে না হইবে। যে সকল দ্রব্য খুব দামী কলের সাহায্যে অথবা খুব দামী ঘরবাড়ীতে উৎপন্ন হয় অথবা অনেক দীর্ঘ সময় অতীত না হইলে যাদের বাজারে আনা যায় না, সেই সব দ্রব্যের দাম অপেক্ষাকৃত নামিবে। কিন্তু অন্য যে সমস্ত দ্রব্য প্রধানতঃ শ্রমের সাহায্যে উৎপন্ন হয় অথবা খুব তাড়াতাড়ি বাজারে আনা যায়, তাদের দাম অপেক্ষাকৃত চড়িবে।

পাঠক অবশ্য লক্ষ্য করিবেন যে দ্রব্য-তারতম্যের এই হেতুটা অপেক্ষাকৃত স্বল্প-ফল-প্রদ। মজুরি-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মুনাফায় শতকরা ১ পাউণ্ড হ্রাস ঘটিলে মৎকল্পিত অবস্থায় উৎপন্ন মালগুলি আপেক্ষিক দামে কেবলমাত্র শতকরা ১ পাউণ্ড উঠা-নামা করে। মুনাফায় এত বড় একটা হ্রাস ঘটিলে তবে দাম ৬০৫০ হইতে ৫৯৯৫ পাউণ্ডে নামে। মজুরি-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সব দ্রব্যের আপেক্ষিক দরে সব চেয়ে বেশী পরিবর্ত্তন যা হইতে পারে তা কখনো শতকরা ৬ বা ৭ পাউণ্ডের বেশী নহে। কারণ, সম্ভবতঃ কোন অবস্থাতেই মুনাফা তার চেয়ে বেশী কোন ক্ষয় স্থায়ী রূপে বরদাস্ত করিতে পারে না।

দ্রব্যাদির দামে তারতম্যের অন্য প্রধান কারণটার অর্থাৎ উহাদের উৎপাদনে যে পরিমাণ শ্রম দরকার তার বাড়তি বা কমতির সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। যদি ফসল উৎপাদন করিতে একশ' লোকের পরিবর্ত্তে আশী জনের প্রয়োজন হয়, ফসলের দাম শতকরা ২০ পাউণ্ড, অর্থাৎ ৫৫০০ পাউণ্ড হইতে ৪৪০০ পাউণ্ডে নামিয়া যাইবে। যদি বস্ত্র প্রস্তুত করিবার জন্য একশ' জনের পরিবর্ত্তে আশী জন লোকের শ্রম যথেষ্ট হয়, কাপড়ের দর ৬০৫০ হইতে ৪৯৫০ পাউণ্ডে নামিবে। মুনাফার স্থায়ী হারে কোন গুরুতর পরিবর্ত্তন অনেক কারণের ফল এবং অনেক কাল ধরিয়া ঘটে। কিন্তু দ্রব্য-উৎপাদনে যে পরিমাণ শ্রম দরকার তার পরিবর্ত্তন প্রতিদিনকার ঘটনা। ফলে যন্ত্রপাতিতে, কারখানাতে অথবা কাঁচা মাল তুলিতে, যে উন্নতিই সাধিত হোক, তাহা শ্রমসংক্ষেপ করে এবং যে যে দ্রব্যে ঐ উন্নতির ফল প্রয়োগ করা যায় সেই সেই দ্রব্য আমাদিগকে আরো ক্ষিপ্রতার সহিত উৎপাদনে সমর্থ করে। আর ফলে উহার দামে অদল-বদল হয়। তারপর দ্রব্যাদির দামে তারতম্য কেন ঘটে তাহা অবধারণ করিতে গিয়া শ্রমের দামের (মজুরির) হ্রাসবৃদ্ধি কি ফল প্রসব করিতেছে সে কথা একেবারে বাদ দেওয়া অন্যায় হইলেও, উহাকে খুব বেশী বড় করিয়া দেখাও ঠিক ঐরূপ অন্যায় হইবে। সুতরাং এই পুস্তকের পরবর্ত্তী ভাগে, যদিও আমি কখনো কখনো তারতম্যের এই কারণটাকে উল্লেখ করিব, তবু দ্রব্যাদির আপেক্ষিক দামে বড় বড় যে সব তারতম্য ঘটে, তারা সমস্তই ঐ দ্রব্যাদি উৎপাদন করিতে যে কখনো বেশী, কখনো বা কম পরিমাণ শ্রমের দরকার হয়, তারই ফলে হইতেছে বলিয়া ধরিয়া লইব।

ইহা বলা বাহুল্য যে, যেসব দ্রব্যের উৎপাদনে সমপরিমাণে শ্রম দেওয়া হইয়াছে, তারা একই সময়ে বাজারে আনীত হইতে না পারিলে তাদের বিনিময়-দামে পার্থক্য ঘটিবে।

ধর, আমি একটা দ্রব্য-উৎপাদনে এক বছরের জন্য ১০০০ পাউণ্ড ব্যয়ে কুড়িজন লোক নিযুক্ত করিলাম। এবং বৎসরের শেষে ঐ দ্রব্যকেই সম্পূর্ণ বা নিখুঁত করিবার জন্য আরও এক বছরের জন্য আরও ১০০০ পাউণ্ড ব্যয়ে আবার কুড়িজন লোক নিযুক্ত করিলাম। দুই বছরের শেষে উহা বাজারে আনিলাম। যদি মুনাফা শতকরা ১০ পাউণ্ড হয়, আমার দ্রব্য নিশ্চয় ২৩১০ পাউণ্ডে বিকাইবে। কারণ আমি এক বছরের জন্য ১০০০ পাউণ্ড পুঁজিপাটা এবং অতিরিক্ত এক বছর ২১০০ পাউণ্ড পুঁজিপাটা লাগাইয়াছি। অন্য একজন ঠিক ঐ পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করিল, কিন্তু সমস্তই প্রথম বছরে লাগাইল। সে ২০০০ পাউণ্ড ব্যয়ে চল্লিশজন লোক নিযুক্ত করিল। প্রথম বছরের শেষে সে শতকরা ১০ পাউণ্ড মুনাফা রাখিয়া অর্থাৎ ২২০০ পাউণ্ডে উহা বেচিল। তাহা হইলে দুইটী দ্রব্য পাইতেছি যাদের জন্য তুল্য পরিমাণ শ্রম লাগান হইয়াছে। উহাদের একটা বিকাইতেছে ২৩১০ পাউণ্ডে—অন্যটা ২২০০ পাউণ্ডে।

মনে হয় যেন এই ব্যাপারের সহিত পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারের পার্থক্য রহিয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ উহারা এক। উভয়ক্ষেত্রে

এক একটা দ্রব্যের চড়া দর হইয়াছে বাজারে আনিবার পূর্ব্বে অপেক্ষাকৃত বেশী সময় অবশ্যম্ভাবী রূপে অতীত হইয়া যাওয়ার দরুণ। পূর্ব্ব ক্ষেত্রে উহাদিগের জন্য কেবল মাত্র দ্বিগুণ পরিমাণ শ্রম দেওয়া সত্ত্বেও, কল ও বস্ত্রের দাম ফসলের দামের দ্বিগুণেরও বেশী হইয়াছিল। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উহার উৎপাদনে একটুও বেশী শ্রম না লাগা সত্ত্বেও, এক দ্রব্য অন্য দ্রব্য অপেক্ষা বেশী দামী হইতেছে। উভয় ক্ষেত্রে দামে যে পার্থক্যটা জমিয়াছে, তাহা সম্ভব হইয়াছে মুনাফাকে পুঁজিপাটারূপে জমিতে দেওয়া হইয়াছে বলিয়া। এবং উহা শুধু যেসময়টা পুঁজিপাটাকে সরাইয়া রাখা হইয়াছিল, তার প্রকৃত ক্ষতিপূরণ।

যদি না উহাদের উৎপাদনে শ্রমের পরিমাণ বাড়ান বা কমান যায়, তবে দ্রব্যাদির দামে কখনো তারতম্য ঘটে না বলিয়া একটা সাধারণ ও সর্ব্বত্র প্রযোজ্য নিয়ম ছিল। এক্ষণে ইহা প্রতীয়মান হইতেছে যে, যেখানে বলিতে গেলে কেবলমাত্র শ্রম উৎপাদন-উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতেছে সেখানে, পুঁজিপাটাকে বিভিন্ন হারে স্থির ও পৌনঃপুনিক ভাবে বিভক্ত করায় ঐ নিয়মে অল্প রূপান্তর ঘটিতেছে না। এই পল্লবেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, শ্রমের পরিমাণে কোন পরিবর্ত্তন না ঘটিলেও, কেবলমাত্র শ্রমের মূল্যবৃদ্ধিই যেসব দ্রব্যের উৎপাদনে স্থির পুঁজিপাটা লাগান হইয়াছে তাদের বিনিময়-দামে হ্রাস ঘটাইবে। স্থির পুঁজিপাটা পরিমাণে যত বেশী হইবে হ্রাসও তত গুরুতর হইবে।

(৫)

মজুরি বনাম মুনাফা

[মজুরির হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দামের পরিবর্ত্তন ঘটে না বটে, কিন্তু সব পুঁজিপাটা সমান স্থায়ী নহে ও সমান তাড়াতাড়ি নিয়োগকারীর নিকট ফিরিয়া আসে না। কাজেই দামের সাধারণ নিয়মটা কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হয়।]

১৯। পূর্ব্ববর্ত্তী পল্লবে আমরা ধরিয়া লইয়াছিলাম, দুই বিভিন্ন বৃত্তিতে, উভয়ের সমান সমান পুঁজিপাটার মধ্যে, স্থির ও পৌনঃপুনিক পুঁজিপাটার পরিমাণ এক হারে ছিল না। এক্ষণে মনে করা যাক যেন উহারা হারে এক অথচ স্থায়িত্ববিষয়ে অনৈক্যবিশিষ্ট। স্থির পুঁজিপাটা যত কম স্থায়ী হয় তত পৌনঃপুনিক পুঁজিপাটার স্বভাবের কাছাকাছি আসিয়া পড়ে। কারবারীর পুঁজিপাটা অক্ষত রাখিবার জন্য, উহা নিঃশেষিত হইলে বেশ শীঘ্র শীঘ্র উহার তুল্য মূল্য পুনরুৎপন্ন হইবে। আমরা এইমাত্র দেখিয়াছি যে, যখন মজুরি বাড়ে কোন কারবারে স্থির পুঁজিপাটার হারে আধিক্য ঘটার সহিত, ঐ কারবারে উৎপন্ন দ্রব্যাদির দাম, অন্য যে সব কারবারে পৌনঃপুনিক পুঁজিপাটার আধিক্য তাহাদিগের উৎপন্ন দ্রব্যাদি অপেক্ষা তুলনায় নিম্নতর হয়। স্থির পুঁজিপাটা যত কম স্থায়ী হইবে ও পৌনঃপুনিক পুঁজিপাটার কাছাকাছি পৌঁছিবে তত তুল্য কারণে তুল্য ফল প্রসূত হইবে।

যদি স্থির পুঁজিপাটা স্থায়ী প্রকৃতির না হয় তবে ইহাকে ইহার আদিম অবিকৃত কার্য্যকরী অবস্থায় রাখিবার জন্য বছর বছর অনেক পরিমাণ শ্রমের আবশ্যক হইবে। কিন্তু এইরূপে প্রদত্ত শ্রমকে বস্তুতঃ কারবারীর দ্রব্যের জন্য ব্যয়িত শ্রমের মধ্যে ধরা যাইতে পারে; এবং ঐ দ্রব্যের দামের মধ্যে এইরূপে শ্রমের গুরুত্ব অনুযায়ী একটা দাম নিহিত থাকিবে। যদি আমার ২০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের একটা কল থাকে, যা নামমাত্র শ্রমের সাহায্যে দ্রব্যাদি উৎপাদনে সমর্থ ছিল, আর যদি এরূপ কলে "ছিঁড়াখোড়া" (স্বাভাবিক ক্ষয়-প্রাপ্তি) নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর পরিমাণে হইত এবং সাধারণ মুনাফার হার হইত শতকরা ১০ পাউণ্ড, তবে আমার কলকে কাজে লাগাইয়াছি বলিয়া, আমাকে জিনিষ-পত্রের দরের সঙ্গে ২০০০ পাউণ্ডের উপর বিশেষ-কিছু যোগ করিতে হইত না। কিন্তু ঐ কলের "ছিঁড়াখোড়া" যদি বেশী হইত, যদি উহাকে কার্য্যপটু অবস্থায় রাখিবার জন্য যে পরিমাণ শ্রমের প্রয়োজন তাহা পঞ্চাশ জন লোকের বাৎসরিক শ্রম হইত, তবে আমাকে জিনিষগুলির জন্য একটা অতিরিক্ত দর চাহিতে হইত। পঞ্চাশ জন লোক লাগাইয়া ও একদম কোন কল ব্যবহার না করিয়া অন্য কারবারী, অন্যান্য জিনিষ উৎপাদনে যে দর পাইতেছে আমাকেও তার সমান দর চাহিতে হইত।

শীঘ্র ক্ষয় পাইতেছে এমন কলের সাহায্যে কতকগুলি দ্রব্য উৎপন্ন হয়। আর কতকগুলির ধীরে ক্ষয় পাইতেছে এমন কলের সাহায্যে হয়। কিন্তু এই উভয় প্রকার দ্রব্যের উপর মজুরির কোন রকম বৃদ্ধি একভাবে কার্য্য করিবে না। একের উৎপাদনে শ্রমের অনেকখানি ক্রমাগত উৎপন্ন দ্রব্যে রূপান্তরিত হইবে। অন্যেতে খুব অল্প কিছু এইরূপ বদলী হইবে। অতএব মজুরির প্রত্যেক বৃদ্ধি, অথবা অন্য কথায়, মুনাফার প্রত্যেক ঘাটতি, স্থায়ী প্রকৃতির পুঁজিপাটার সাহায্যে উৎপন্ন দ্রব্যাদিকে তাদের আপেক্ষিক দামে নামাইবে; এবং ক্ষণস্থায়ী পুঁজিপাটার সাহায্যে উৎপন্ন দ্রব্যাদিকে হারাহারিভাবে চড়াইবে। মজুরির হ্রাসে ঠিক উল্টা ফল হইবে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, স্থির পুঁজিপাটা বিভিন্ন পরিমাণ কাল স্থায়ী। এখন মনে কর একটা কল কোন এক বিশেষ ব্যাপারে * এক বৎসরের জন্য একশ' লোকের কাজ সম্পাদন করিতে নিযুক্ত হইয়াছে। আরও মনে কর যে উহা মাত্র এক বৎসর টিকিবে। আরও মনে কর, কলে খরচ পড়িয়াছে ৫০০০ পাউণ্ড, এবং বছরে একশ' লোককে মজুরি বাবদ দিতে হইতেছে ৫০০০ পাউণ্ড। ইহা প্রতীয়মান হইবে যে, কলই কিনুক আর লোকই লাগাক কারবারীর পক্ষে উভয় সমান কথা। কিন্তু মনে কর শ্রম চড়িতেছে এবং ফলে এক বছরের জন্য একশ' জনের মজুরি ৫৫০০ পাউণ্ডে উঠিয়াছে। ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, কারবারী এখন আর ইতস্ততঃ করিবে না। কল কিনিয়া ৫০০০ পাউণ্ডের মধ্যে তার কাজ সম্পন্ন করা, তারই স্বার্থের পক্ষে অনুকূল হইবে। কিন্তু কলের দর কি বাড়িবে না? শ্রমের বৃদ্ধির ফলে উহার মূল্যও কি ৫৫০০ পাউণ্ড হইবে না? যদি এমন হয় যে, উহার নির্ম্মাণের জন্য কোন পুঁজি লাগে নাই এবং উহার নির্ম্মাতার পক্ষে লভ্য কোন মুনাফার দরকার হয় নাই, তবে উহার দর চড়িবে। উদাহরণ—যদি, প্রত্যেক বৎসর ৫০ পাউণ্ড মজুরি লইয়া উহার জন্য কাজ করিবার পর কলটা একশ' লোকের শ্রমের ফল হয় এবং ফলে উহার দর হয় ৫০০০ পাউণ্ড; ঐ মজুরি যদি বাড়িয়া ৫৫ পাউণ্ড হয়, উহার দর হইবে ৫৫০০ পাউণ্ড। কিন্তু এরূপ হইতে পারে না। একশ' লোকের কম নিযুক্ত করা হইয়াছে। তা না হইলে উহা ৫০০০ পাউণ্ডে বিক্রীত হইতে পারিত না। কারণ এই ৫০০০ পাউণ্ডের ভিতর হইতেই লোকগুলির নিয়োগকারীকে পুঁজির মুনাফা ধরিয়া দিতে হইবে। অতএব মনে কর যেন পঁচাশী জন লোক প্রত্যেকে ৫০ পাউণ্ড ব্যয়ে অর্থাৎ বাৎসরিক ৪২৫০ পাউণ্ডে নিযুক্ত হইয়াছে এবং কল বিক্রয় হেতু লোকগুলাকে অগ্রিম মজুরি দেওয়ার পর যে ৭৫০ পাউণ্ড পাওয়া গেল তাহা হইল পুঁজির মুনাফার সম্বল। যখন মজুরি শতকরা ১০ পাউণ্ড চড়িল, সে অতিরিক্ত আরও ৪২৫ পাউণ্ড পুঁজিপাটা ব্যবহার করিতে বাধ্য হইবে; এবং কাজে কাজেই ৪২৫০ পাউণ্ডের জায়গাতে ৪৬৭৫ পাউণ্ড লাগাইবে। সে যদি তার কল ৪০০০ পাউণ্ডেই বেচিতে থাকে, তবে ঐ পুঁজিপাটার উপর সে কেবল ৩২৫ পাউণ্ড মুনাফা পাইবে। কিন্তু সকল কারবারী ও মহাজনেরই ঠিক এই অবস্থা। মজুরির বৃদ্ধি উহাদের সকলকে তুল্যভাবে আঘাত করিতেছে। সুতরাং যদি কল প্রস্তুতকারক মজুরি-বৃদ্ধির ফলে উহার দাম বাড়ায়, এইরূপ কলের নির্ম্মাণে অস্বাভাবিক পরিমাণে পুঁজিপাটা নিযুক্ত হইতে থাকিবে, যাবৎ না উহাদের দর হইতে মুনাফা চলতি হারে উঠে।১ এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে মজুরি বৃদ্ধির ফলে কলের দর চড়িবে না।

---

* রিকার্ডো 'ইনডাষ্ট্রি' অর্থে সর্ব্বত্র 'ট্রেড' কথাটা ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁর সময়ে ইনডাষ্ট্রি ও ট্রেড—ব্যবসা ও বাণিজ্যে ভেদটা তত স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই।—অনুবাদক।

১। এখানে আমরা বুঝিতেছি কি কারণ পুরাতন দেশসমূহকে ক্রমান্বয়ে কলের ব্যবহারে প্ররোচিত করে এবং নব নব দেশকে শ্রমের নিয়োগে প্রবৃত্ত করে। শ্রমীদের ভরণ-পোষণ-নির্ব্বাহ যেমন শক্ত হইতে থাকে, শ্রমের দাম তেমনি অবশ্যম্ভাবিরূপে চড়ে। এবং শ্রমের দর যেমন চড়িতে থাকে, কল ব্যবহার করিবার জন্য নূতন নূতন প্রলোভন আসিয়া উপস্থিত হয়। পুরাতন দেশসমূহে শ্রমীকে ভরণ-পোষণ করার বিপদ চিরন্তন ঘটনা; নূতন দেশে মজুরিতে কিছুমাত্র বৃদ্ধি না ঘটিলেও লোকসংখ্যা-বৃদ্ধি খুব বেশী হইতে পারে। বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ লক্ষ লোককে পালন করা যত সহজ, সত্তর, আশী, নব্বই লক্ষ লোককেও পালন করা তত সহজ হইতে পারে।

যাহোক্, যে কারবারী মজুরির বৃদ্ধির সময় সাধারণতঃ কলের আশ্রয় লইতে পারে অথচ তজ্জন্য উৎপাদনের ব্যয়ভার তাকে তার দ্রব্যের উপর চাপাইতে হয় না, যদি সে তার জিনিষের জন্য পূর্ব্বের দর দাবী করিতে থাকে, সে অনেক আলাদা সুবিধা ভোগ করিবে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, সে তার দ্রব্যাদির দাম নামাইতে বাধ্য হইবে। নতুবা যে পর্য্যন্ত না তার মুনাফা সাধারণ হারে পৌঁছে সে পর্য্যন্ত তার পুঁজিপাটা তার ব্যবসায়ে আসিতে থাকিবে। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে,—যন্ত্রপাতির দ্বারা সর্ব্বসাধারণ উপকৃত হয়। এই "মূক কর্ম্মীরা" সর্ব্বদা যে পরিমাণ শ্রমকে স্থানচ্যুত করে, এমন কি মুদ্রার হিসাবে উভয়ের খরচ সমান হইলেও তদপেক্ষা অনেক কম শ্রমে প্রস্তুত হইতেছে। কলের প্রভাবে খাদ্য-সম্ভারের দর-বৃদ্ধি মজুরি-বৃদ্ধির কারণ। তাহাতে অপেক্ষাকৃত কম লোক ভুগিবে। ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী উদাহরণের একশ' লোকের পরিবর্ত্তে পঁচাশী জন লোককে স্পর্শ করিবে, এবং কারবারে প্রস্তুত দ্রব্যের ন্যূনীকৃত দর দ্বারা বুঝা যাইবে যে, উহার ফলস্বরূপ শ্রম-সংক্ষেপ হইয়াছে। কল বা কলে প্রস্তুত দ্রব্যাদির প্রকৃত দাম চড়ে না; কিন্তু কলে প্রস্তুত সমস্ত দ্রব্য নামে—কলের স্থায়িত্বের হার অনুসারে নামে।

২০। এক্ষণে ইহা দেখা যাইতেছে যে, সমাজের প্রথম অবস্থায়, বেশী কিছু কল অথবা স্থায়ী পুঁজিপাটা ব্যবহার হওয়ার পূর্ব্বে, সমান সমান পুঁজিপাটার সাহায্যে উৎপন্ন দ্রব্যাদি দামেও প্রায় সমান সমান হইবে; এবং তাদের উৎপাদনের জন্য বেশী বা কম শ্রম লাগিতেছে বলিয়া, তারা পরস্পর তুলনায় চড়িবে অথবা নামিবে। কিন্তু এই সব ব্যয়-সাপেক্ষ ও স্থায়ী যন্ত্রপাতির প্রয়োগের পর সমান সমান পুঁজিপাটার নিয়োগে উৎপন্ন দ্রব্যাদির দামে অত্যন্ত বৈষম্য হইবে। এবং যদিও বেশী বা কম শ্রম তাদের উৎপাদনে প্রয়োগ হইতেছে বলিয়া তাদের দাম পরস্পর তুলনায় উঠা-নামা করিবে, তবু মজুরি এবং মুনাফার হ্রাস-বৃদ্ধি হেতু অপ্রধান হইলেও অন্য একটী তারতম্যেরও তারা অধীন হইবে। যেহেতু, যে মাল ৫০০০ পাউণ্ডে বেচা হইতেছে, তাহা অন্য যে মাল ১০,০০০ পাউণ্ডে বেচা হইতেছে তার জন্য দরকারী পুঁজিপাটার পরিমাণের সমান পরিমাণের ফল হইতে পারে। এই জন্য তাদের কারবারে মুনাফাগুলা সমতুল্য হইবে। কিন্তু মুনাফার হারে বাড়তি-কমতির সঙ্গে সঙ্গে যদি জিনিষের দর না উঠা-নামা করিত, তবে ঐ মুনাফাগুলা সমতুল্য হইত না।

ইহাও বুঝা যাইতেছে যে, কোন কিছু উৎপাদনে নিয়োজিত পুঁজিপাটা যে অনুপাতে স্থায়ী, সেই অনুপাতে এরূপ স্থায়ী পুঁজিপাটা যে দ্রব্যাদির উপর প্রযুক্ত হইবে তাদের আপেক্ষিক দর মজুরির ঠিক উল্টাদিকে উঠা-নামা করিবে। মজুরি যখন বাড়িবে উহা নামিবে, এবং মজুরি কমিলে উহা বাড়িবে। অপর পক্ষে, যেসব দ্রব্য ন্যূনতর স্থির পুঁজিপাটার সাহায্যে অথবা দর-নির্দ্দেশক মধ্যস্থ অপেক্ষা ক্ষণস্থায়ী স্থির পুঁজিপাটার সাহায্যে প্রধানতঃ শ্রমদ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহাদের দর মজুরি বাড়িলে চড়িবে এবং কমিলে নামিবে।

কারেন্সী কমিশনের রিপোর্ট*

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

ভারতীয় কারেন্সী কমিশনের রিপোর্ট বাহির হইবার পর তাহার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যে সকল মতামত চতুর্দ্দিকে প্রকাশিত হইতেছে, সে সকল মতামত পাঠে একটা কথা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, কি ইউনিভারসিটির অধ্যাপক, কি ব্যবসাদার সকলেই কারেন্সীর সংস্কার অর্থে বুঝিযাছেন—শুধু কারেন্সীর সেই অংশটুকুর সংস্কার যাহার সহিত ভারতের আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের সম্বন্ধ গভীর ও অচ্ছেদ্য। কারেন্সী কমিশনারগণ যে দেশের ভিতরের ব্যবসা বাণিজ্য, কুলি-মজুরের বেতন ইত্যাদির কথা ভাবেন নাই তাহা নহে। কিন্তু সকল চিন্তার উপরে তাঁহাদের চিন্তা ছিল আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা বজায় রাখা ও ইংলণ্ডের সহিত ভারতের অর্থনৈতিক বন্ধন আরও দৃঢ়ীভূত করা। ইম্পারিয়াল ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ভারতে নিজেদের আর্থিক রাজত্ব সুদৃঢ় করিয়াছেন, এখন কারেন্সী সংস্কারের দোহাই দিয়া ভারতকে সম্পূর্ণরূপে নিজেদের আয়ত্তে আনিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। রাষ্ট্রনৈতিক দাসত্ব অপেক্ষা অর্থনৈতিক দাসত্বের জের অধিকদূর পৌঁছায়; এমন কি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা পাইয়াও বহু জাতি আজ পৃথিবীতে বস্তুতঃ অপরের দাসত্ব করিতেছে। যথা, আমেরিকার যুক্তরাজ্যের নিকট দক্ষিণ আমেরিকার জাতিসমূহের দাসত্ব, ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানের নিকট "স্বাধীন" চীনের দাসত্ব।

ভারতের কারেন্সী ইংরেজের আশ্রয়ে এক অপূর্ব্ব অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের রূপ ধারণ করিয়াছে। হিন্দু সতী যেরূপ স্বামী মরিলে সহমরণে তাহার অনুগমন করিত, ভারতের কারেন্সীও তেমনি ইংরেজের কারেন্সীর সহিত বাঁচিলে বাঁচে ও মরিলে মরে। সকল দেশের জাতীয় মুদ্রানিচয়ের অপর জাতীয় মুদ্রার সহিত বিনিময়ের হার কতকগুলি অর্থনৈতিক নিয়ম অনুসারে নির্দ্ধারিত হয়। এই নিয়মগুলির মধ্যে প্রধান হইতেছে (১) দেশের মানমুদ্রার সাধারণভাবে দ্রব্যক্রয় ক্ষমতা, (২) বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পরের দেশের দ্রব্যের চাহিদা বা ক্রয়েচ্ছা এবং (৩) আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রার বাজারে বিভিন্ন জাতির মুদ্রার সরবরাহ। (অপরজাতির মুদ্রা প্রায় সর্ব্বস্থলেই অপর জাতির কোন দেনদার ব্যাঙ্ক বা ব্যক্তির উপর পত্রের অধিকারীকে মুদ্রা দিবার আদেশপত্র বা "বিল" রূপে ক্রয়-বিক্রয় হয়)।

ভারতের কারেন্সী বা মুদ্রার কিন্তু এই সকল স্বাভাবিক অর্থনৈতিক নিয়ম মানিয়া চলিলে চলেনা। কারণ, এ দেশের "মালিক"-গণকে সদাসর্ব্বদা নানা উপলক্ষ্যে স্বদেশে অর্থ প্রেরণ করিতে হয় এবং তজ্জন্য তাঁহাদের কোনপ্রকার ক্ষতি কোন দিক্ দিয়া না হয় তাহার জন্য দরিদ্র ভারতবাসী করদাতার অর্থে অভিনব ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত "মালিক" জাতির বণিকগণের জন্য আন্তর্জ্জাতিক বিনিময়ের হারের বাড়তি-কমতি সংক্রান্ত লোকসানের পথও উক্ত দরিদ্র করদাতাগণের অর্থে বন্ধ করা আবশ্যক। নিউইয়র্ক ও লণ্ডন, অথবা প্যারিস ও মিলানের মধ্যে এই বিনিময়ের হার স্বাভাবিক অর্থনৈতিক নিয়ম মানিয়া স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু ইংরেজ-সভ্যতাপীড়িত ভারতবর্ষে করদাতার দিক্ হইতে বিনিময়ের হারকে ঠেকো দিয়া না রাখিলে কিছুতেই চলে না।

কারেন্সী কমিশন বসিবার সময় শুনিযাছিলাম এবার নূতন কিছু হইবে। শুনিতেছি নাকি স্বর্ণমান হইবে, রৌপ্যমান ও ঠেকো দেওয়া এক্সচেঞ্জ আর এ মহাযুদ্ধের পরের যুগে চলিবে না। কিন্তু কমিশনের রিপোর্টে যাহা দেখিতেছি তাহার সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার তারতম্য বিশেষ নাই। পূর্ব্বেও ঠেকো দিয়া ভারতের ঘরের পয়সা খরচ করিয়া এক্সচেঞ্জ-মহিষ তাড়ান হইত, এখনও তাহাই হইবে;

* বর্ত্তমান প্রবন্ধ আনন্দবাজার পত্রিকায় বাহির হইয়াছে।

কেবল শুনিতেছি রৌপ্যের মূল্য যাহাতে না বাড়ে তাহার জন্য বড় বড় রাজকর্ম্মচারিগণ সর্ব্বদা আশা করিবেন। এ ব্যবস্থাও যে পূর্ব্বে না ছিল তাহা নহে—তবে আশা সর্ব্বদা ফলবতী হইত না, এখনও হইবে বলিয়া মনে হয় না।

দেশের ভিতরে যে ব্যবসা-বাণিজ্য চলে তাহার পরিমাণ দেশের আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য অপেক্ষা বহুগুণ অধিক। তাহার সহিত যে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের সম্বন্ধ নাই তাহা নহে, তবে তাহার উন্নতির জন্য যে সকল কারেন্সী-সংক্রান্ত ব্যবস্থার প্রয়োজন, তাহার সহিত শুধু এক্সচেঞ্জটী টাকায় দেড় শিলিং হারে বজায় রাখার অনেক পার্থক্য আছে।

দেশের সকল স্থলে টাকার সরবরাহ ব্যবসার প্রয়োজনীয়তা অনুসারে শীঘ্র শীঘ্র বাড়ানো কমানোর প্রয়োজনীয়তা, এক্সচেঞ্জ নির্দ্দিষ্ট হারে বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষা করদাতা ভারতবাসীদিগের দিক্ হইতে অনেক অধিক। কারণ এক্সচেঞ্জের সুব্যবস্থার লাভের অধিকাংশ বিজাতীয়ের হস্তে যাইবে এবং দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবসার সুব্যবস্থা হইলে দেশের লোকের লাভ অধিক।

স্বর্ণমান বলিতে আমরা বুঝি—দেশের মানমুদ্রার সহিত কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। কমিশন যাহাকে স্বর্ণমান নাম দিয়া চালাইবার চেষ্টা করিতেছেন, সেই "গোল্ড বুলিয়ন ষ্টাণ্ডার্ড" শুধু নামেই স্বর্ণমান হইবে। কারণ স্বর্ণের ভাষায় দেশের প্রচলিত মুদ্রা চলিলেও সে মুদ্রার পরিবর্ত্তে প্রথমতঃ স্বর্ণ পাওয়া যাইবে না এবং দ্বিতীয়তঃ আরও বিপজ্জনক ব্যাপার এই যে, সেই মুদ্রার পশ্চাতে পুরাপুরি স্বর্ণের পুঁজি থাকিবে না। যে টুকু স্বর্ণ বা থাকিবে তাহার অর্দ্ধেক দেশের বাহিরে (লণ্ডনে) থাকিবে। অর্থাৎ এই স্বর্ণমান স্বর্ণ অপেক্ষা প্রতিষ্ঠাতাদিগের সুনামের উপর অধিক নির্ভর করিবে। ইহাকে "বৃটিশ ক্রেডিট ষ্টাণ্ডার্ড" নাম দিলে ঠিক হইত। ইহা পুরাতন "গোল্ড এক্সচেঞ্জ ষ্ট্যাণ্ডার্ড" অপেক্ষা ভাল সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা অপেক্ষা ভাল হইত যদি শুধু স্বর্ণের উপর নির্ভর না করিয়া ভারতীয় কারেন্সী ইংলণ্ডের সহিত সম্বন্ধচ্যুতভাবে গড়িয়া তোলা হইত এবং ভারতের স্বর্ণ ভারতেই থাকিত। যেরূপ সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের সাহায্যে এখন দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য মুদ্রা ব্যবসার অনুপাতে কমবেশী বাজারে রাখিবার ব্যবস্থা হইবে, স্বাধীন স্বর্ণমান হইলেও সেইরূপ ব্যবস্থা হইতে পারিত। লাভ হইত যুদ্ধ-বিগ্রহপ্রিয় ইম্পীরিয়ালিষ্ট ইংরেজের কবল হইতে মুক্তি। প্রফেসার এডউইন্ ক্যানান বলিয়াছেন যে, এক্সচেঞ্জ অস্বাভাবিক উপায়ে স্থির রাখিবার ভার ইংরেজের হস্তে রাখিলে তাহা হইতে ভারতের জাতীয় লোকসানের ভয় আছে। কারণ রক্ষকদের ভক্ষকভাব। নূতন ব্যবস্থাতেও এই ভয় বজায় রহিল। নূতন সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক স্থাপন সম্বন্ধে বহু কথা বলা চলে। অবশ্য ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কের হস্তে নূতন কাজের ভারার্পণ করিলে কাজটা সস্তায় হইত; কিন্তু ইহাতে বহু ইংরেজের চাকরীলাভ ঘটিত না এবং বর্ত্তমান "পেপার কারেন্সী" আফিসের অনেকের কাজ হয়ত যাইত। দ্বিতীয়তঃ, নূতন একটী ব্যাঙ্ক হইলে, ব্যবস্থার সিঁড়ির কয়েকটী ধাপ পড়িয়া গিয়া কারেন্সী বাড়ানো কমানোর কার্য্যে বিলম্ব হইবে এবং তাহাতে ক্ষতি হইবে।

কমিশনের রিপোর্টে দেখিলাম যে, টাকার মূল্য দেড় শিলিং স্থির করা হইয়াছে, এই হেতু যে বর্ত্তমানে শ্রমিকদিগের মজুরি ও সকল দ্রব্যের মূল্য, টাকার মূল্য দেড় শিলিং হইলে যেরূপ হইত সেইরূপই আছে এবং থাকিবে। এই কথায় আপত্তি করিবার এই আছে যে, শ্রমিকদিগের দ্বারা ক্রীত দ্রব্যসম্ভারের খুচরা দর সম্বন্ধে আমাদের এমন কোন জ্ঞান নাই যাহা দ্বারা ঐরূপ জোর করিয়া বলা চলে। উপরন্তু, গবর্ণমেণ্ট বহুকাল ধরিয়া অস্বাভাবিক উপায়ে এক্সচেঞ্জ দেড়শিলিংএ স্থির রাখিয়াছেন। ইহাতে কমিশনের কথা প্রমাণ হয় না।

বঙ্গদেশে নলকূপ

শ্রীবিপদবারণ সরকার, বি, এ, নলকূপ-বিশেষজ্ঞ

গত ৩।৪ বৎসর ধরিয়া বঙ্গদেশে নলকূপ বেশ প্রসার লাভ করিতেছে। কলিকাতার উপকণ্ঠে পল্লীগ্রামে ইহাই এখন পুষ্করিণীর স্থান দখল করিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অদূর ভবিষ্যতে নলকূপই বঙ্গপল্লীর জলকষ্ট-সমস্যার সমাধান করিবে। সুতরাং এই সম্বন্ধে জিলা বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি এবং ইউনিয়ন বোর্ডের পরিচালকগণের ও জনসাধারণের মোটামুটি জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক। কোনও কোনও বিষয়ে তাঁহারা ভুল ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন। এই প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিয়া এ সম্বন্ধে যথাযথ তথ্য সর্ব্বসাধারণের নিকট উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিব।

বঙ্গদেশে প্রায় সর্ব্বত্রই ১৫।২০ ফুটে বা বড় জোর ২২।২৪ ফুটে জলবাহী স্তর আরম্ভ হয়, সুতরাং সর্ব্বত্রই ৩০ ফুটের মধ্যে একটী নলকূপ নির্ম্মিত হইতে পারে—এই ধারণা ভুল। ভূস্তরে জল থাকিলেই জল উঠে না। যদি জল থাকিলেই জল উঠান যাইত, তবে নলকূপ-নির্ম্মাণ কার্য্যটী অতি সহজ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইত। ৩০ ফুটের জল ভাল কি মন্দ সে আলোচনা আমি এখানে করিতেছি না। ৩০ ফুটের অতি কদর্য্য জলও যদি নলকূপ বসাইয়া প্রচুর পরিমাণে উত্তোলন করা যাইত, তবে কৃষি-কার্য্যের কি সুবিধাই না হইত।

হুগলী জিলায় এমন সব পল্লী দেখিয়াছি যেখানে চৈত্রের রৌদ্রে ১৫ ফুট গভীর পুষ্করিণী জলশূন্য অবস্থায় পড়িয়া আছে। একজন যুবক আমার নিকট নলকূপ-নির্ম্মাণ শিক্ষা করিয়া আমারই পরামর্শে ঐরূপ একটী পুষ্করিণীর মধ্যে ৯ ফুট গভীর একটি নলকূপ নির্ম্মাণ করে। উহাতে গ্রামের জলাভাব আংশিকরূপে দূর হইয়াছে। অবশ্য মোটা দানার বালি ছিল বলিয়া উহা সম্ভব হইয়াছে।

দানাদার বালি, মোটা বালি এবং কাঁকর স্তরের মধ্যে প্রচুর জল আছে। আবার দোঁআস মাটী, ধুলাবালিতেও যথেষ্ট জল বিদ্যমান। কিন্তু শেষোক্ত দুইটী স্তরে জল থাকিলেও তাহা নলকূপে উঠিবে না। ৩০ ফুটে দোঁআস মাটী বা ধুলবালির মধ্যে জল থাকিলে, সেই জল পাম্পের টানে চুয়াইয়া ফিলটার দিয়া আসিতে বাধা পায়। কিন্তু মোটা দানার বা অন্ততঃ সরু দানার বালি "ছাক্‌শন পাম্পের" টানে ফিল্‌টার দিয়া অনায়াসে উঠিয়া আইসে। যে গ্রামে ২০।২২ ফুটে বা ৩০ ফুটে দানাদার বালি বা কাঁকর স্তর আছে তথায় ৩০ ফুটের নলকূপ নির্ম্মাণ সম্ভবপর। চব্বিশ পরগণার অন্তর্গতঃ চিংড়িপোতা, গোবিন্দপুর, বারুইপুর প্রভৃতি পল্লীতে ২০।৩০ ফুটের অসংখ্য নলকূপ আছে। চেতলায় ৪০ ফুট নলকূপের দ্বারা বড় একটা ধানকলের জল সরবরাহ হইতে দেখিয়াছি। ইহার কারণ ঐসব অঞ্চলে অতি অল্পেই মোটা বালির স্তর পাওয়া যায়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ৩০ ফুটে জল থাকিলেও সর্ব্বত্র নলকূপ-নির্ম্মাণ সম্ভব হয় না। কলিকাতা, চুঁচুড়া, হুগলী, মগরা, তারকেশ্বর, দমদম, বালিগঞ্জ, পানিহাটি, সোদপুর, বরিশাল সহর এবং পাটনা সহরে ১২৫ ফুট হইতে ১৭৫ ফুটের মধ্যে নলকূপের উপযুক্ত জলবাহী স্তর পাইয়াছি। ঐ প্রকার গভীর স্তরের উপরে আদৌ মোটাবালির স্তর নাই, অথচ কলিকাতায় ১০ ফুট খনন করিতে না করিতে প্রচুর জল আসিয়া পড়ে। কলিকাতায় ২০ ফুটে কূপ নির্ম্মাণ হইতে পারে, কিন্তু নলকূপ করিতে হইলেই ১৫০ ফুট গভীর স্তরে যাইতে হয়। সেখানকার জল ভাল বা মন্দ সে ত পরের কথা, ইহার কম হইলে জল উঠিবেই না। বস্তুতঃ, নলকূপ-নির্ম্মাণকারীরা কোন্ স্তরে জল আছে তাহার সন্ধানে ব্যস্ত থাকেন না। বঙ্গদেশে ২০।২৫ ফুট হইতে আরম্ভ করিয়া যত নীচে নামা যায় সর্ব্বত্রই জল বিদ্যমান, কেবল এঁটেল মাটি বা কাঁকর মিশ্রিত এঁটেল মাটিতে জল নাই। তাঁহারা খোঁজেন কোথায় মোটা বালি আছে, কোথায় কাঁকর আছে, আবার যদি বা মোটা দানার বালির স্তর থাকে তাহা অন্ততঃ ৬ ফুট পুরু কিনা ইত্যাদি। এইসব অনুকূল অবস্থা পাইলেই তাঁহারা খনন-কার্য্য শেষ করিয়া ঐ স্তরে ফিল্‌টার প্রোথিত করেন এবং পাম্প সংযোগ করিয়া জল তুলিতে থাকেন।

এই আলোচনা হইতে আমরা দেখিতে পাই, আমাকে

৩০ ফুটে একটী নলকূপ করিয়া দিউন বা আমার নলকূপ ৬০ ফুট গভীর হইলেই চলিবে, এ জাতীয় চুক্তিতে কোনও কণ্ট্রাক্টার এবম্বিধ কার্য্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন না। মোটা দানার বালুস্তর কোথায় আছে জানা নাই। ৩০ ফুটে হউক, ৬০ ফুটে হউক, আর ১৫০ ফুটেই হউক যেখানে দানাদার বালির সন্ধান পাওয়া যায়, ঠিকাদারগণকে বাধ্য হইয়া তত নীচে যাইতেই হইবে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে খরচও বাড়িতে থাকিবে। এই জন্য কত খরচে একটী নলকূপ হয় তাহা বলা কঠিন, ফুট প্রতি কত ব্যয় পরে তাহাই সকলে বলিতে পারেন।

বঙ্গদেশে যাঁহারা নলকূপ নির্ম্মাণ করেন তাঁহাদিগকে ৩ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এক দল আছেন যাঁহারা একটী হন্দর দ্বারা ঠুকিয়া ঠুকিয়া পাইপ বসাইয়া দেন। এই হন্দরটাকে "মাঙ্কি" বা হনুমান বলে। ইঁহারা ৩০।৪০ ফুট এমন কি ৭০।৮০ ফুট পর্য্যন্ত গভীর স্তরে নল চালাইতে পারেন। ইহাতেও উপযুক্ত দানাদার বালির সন্ধান না পাইলে ইঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ইঁহারা আর অধিক অগ্রসর হইতে পারেন না। কাজেই ৫ বৎসর পূর্ব্বে, যখন ঠুকো নলকূপওয়ালাদের বিদ্যায়ই এ কাজ সাধিত হইত, তখন অনেক নলকূপ-নির্ম্মাণের চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যাইত। গত ২।৩ বৎসরে বঙ্গদেশ এ বিষয়ে অনেকদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। এখন এই জাতীয় ঠুকো ওস্তাদেরা প্রায় সকলেই "বোরিং" করিতে শিখিয়াছেন। এই বোরিং করা কোম্পানী বর্ত্তমানে বঙ্গদেশে অন্ততঃ ৫০টী আছে। এবং সকলেই বেশ কৃতকার্য্যতার সহিত নলকূপ নির্ম্মাণ করিতেছেন। শেষোক্ত বিশেষজ্ঞগণকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নলকূপ-বিশেষজ্ঞ বলা যাইতে পারে।

ইঁহারা "কেসিং পাইপ" বা বহির্নল ব্যবহার করেন না, কেবল ১½ বা ২ ইঞ্চি নলকেই "কেসিং পাইপ" স্বরূপ করিয়া উহার ভিতরে একটী ¾ বা ১ ইঞ্চি নল ভরিয়া তদ্দ্বারা ভিতরের মাটি খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া হস্ত-চালিত পাম্পদ্বারা জলের ধারা প্রয়োগ করতঃ মাটি বা বালি তরল করিয়া তুলিয়া ফেলেন। ইঁহারা ১৭৫ ফুট বা ১৯০ ফুট বা ইহারও নীচে বালি থাকিলে ২০০ ফুট পর্য্যন্ত গভীর নলকূপ করিতে সমর্থ। ৫০।৬০ ফুটে ৫।৭ ফুট পুরু একটী বালুস্তর থাকিলেও তাঁহারা ঐ স্তর ভেদ করিয়া পরবর্ত্তী ১৫০ ফুট বা ১৭৫ ফুট স্তরে ফিল্টার পৌছাইতে পারেন। এই ১৫০ফুট বা ১৮০ ফুট স্তরকে সাধারণতঃ দ্বিতীয় স্তর বলা হয়। আমাদের দেশে যতগুলি জ্ঞাতনামা বা অজ্ঞাতনামা নলকূপ কোম্পানী আছে, তাহাদের শতকরা ৯৯টীর বিদ্যা ঐ দ্বিতীয় স্তরেই শেষ হয়। এই ১৫০ ফুটের পর ২৩০।২৫০ বা ২৭০ ফুটে তৃতীয় স্তর পাওয়া যায়। কিন্তু ইঁহারা ১৫০ ফুটের বালির কামড় এড়াইয়া ২৫০ ফুটের স্তরে পাইপ পৌছাইতে পারেন না। ১½", ২" বা ২½" পাইপ ভাঙ্গিয়া যায়। যাঁহারা ২৫০ ফুটের স্তরে বা তৃতীয় স্তরে নলকূপ করেন তাহাদিগকে প্রথম শ্রেণীর নলকূপ-বিশেষজ্ঞ বলা যায়। ইহারা ৪" ইস্পাতের নলদ্বারা শক্তি-চালিত পাম্পের জল-ধারার সাহায্যে তৃতীয় স্তরের নলকূপ করিয়া থাকেন সুতরাং ইহাতে খরচও অনেক বেশী পড়ে। বেঙ্গল কেমিক্যাল, সুইডিশ ট্রেডিং কোং, টেকৃছাস, স্কট অ্যাণ্ড সেকৃসবি বঙ্গদেশে তৃতীয় স্তরের বা ২৫০।২৬০।২৭৫ ফুটের নলকূপ নির্ম্মাণ করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিতেছেন। কাহারও কাহারও মুখে ৪০০।৫০০ ফুট, এমন কি ১০০০ ফুট নলকূপের কথাও শুনিতে পাওয়া যায়। বঙ্গের বালিমাটির দেশে ১০০০ ফুট গভীর নলকূপ-নির্ম্মাণ অসম্ভব। কলিকাতায় ঐ ৩য় স্তরের বেশী গভীর নলকূপ আছে বলিয়া আমার জানা নাই। ৪০০।৫০০ ফুট গভীর নলকূপ করা সম্ভবপর হইলেও তাহার তোড়জোড়ে এত বেশী খরচ পড়ে যে শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। একটী মাত্র বহির্নল দ্বারা অত নিম্নস্তর পর্য্যন্ত খনন করা অসম্ভব। এসম্বন্ধে আমি একজন ইংরেজ বিশেষজ্ঞের উক্তির বঙ্গানুবাদ নিম্নে দিতেছি।

"যখন ৫০০।৬০০ ফুট নলকূপ করা সাব্যস্ত হয়, তখন প্রথমতঃ একটী ৮" নল ২৫০ ফুট বা তাহার কাছাকাছি স্তরে বসাইয়া দিতে হয়। ৮" নলের মধ্যে ৬" পাইপকে আরও ১০০ ফুট বসাইয়া দেওয়া চলে। ইহার পর ৬" নলের মধ্যে ৪" নল আরও ১৫০।২০০ ফুট চালাইয়া সর্ব্বশেষে একটী ৫০০।৬০০ ফুট গভীর ৪" নলকূপ করা সম্ভব হয়। ইহা হইতে সহজেই দেখা যাইতেছে ৫০০।৬০০ ফুট গভীর নলকূপ করা কি দুরূহ এবং ব্যয়-সাধ্য ব্যাপার। একটী ৪" নলকূপ করিতে আপনাকে ২৫০ ফুট গভীর ৮" নলকূপের

খরচ বহন করিতে হইবে।" এই জাতীয় নলকূপে ফিল্টার ব্যবহৃত হয় না। কূপনলে ৬" কি ১" পরিমিত স্থানে কতকগুলি ছিদ্র থাকে। বঙ্গদেশে ফিল্টার-পয়েন্ট দিয়াই নলকূপ প্রস্তুত হইতেছে। সুতরাং ফিল্টারের জালকে রক্ষা করিবার জন্য ঐ ৪" নলের মধ্যে ২" নলকূপ করিতে হইবে। বেঙ্গল কেমিক্যাল কোম্পানি পটুয়াখালিতে ৬০০ ফুট গভীর একটী নলকূপ নির্ম্মাণ করিয়া লোনা জল পাওয়ায় উহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। শুধু খরচ বাবদেই তাঁহারা ১৫০০০৲ টাকা পাইয়াছিলেন।

কেহ কেহ মনে করেন ৩০ ফুটের জল ব্যবহার করিতে করিতে শুকাইয়া যায় এবং শেষে নলকূপ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। ধরিত্রীর রসভাণ্ডার এত অপ্রচুর নহে যে, ৪০০।৫০০ শত বাল্তি জল রোজ খরচ হইলে, তাহা নিঃশেষে ফুরাইয়া যাইবে। কূপের জল অনবরত তুলিতে তুলিতে শুষ্ক হইতে দেখা যায়, কেননা যে পরিমাণ জল তোলা হয়, হয়ত তত পরিমাণ জল চুয়াইয়া কূপে আসিতে পারে না। কিন্তু নলকূপের ফিল্টার মোটা দানার বালির স্তরে নিমজ্জিত থাকে। চোষণ পাম্পের টানে কূপকেন্দ্র হইতে দূরবর্ত্তী স্থানের জলও নলকূপমধ্যে আসিতে বাধ্য হয়। দোঁআস মাটির স্তরের জল অপেক্ষা বালুস্তরের জল সহজে টানের মুখে ছুটিয়া আসিতে পারে। কাঁকর স্তর হইলে ত কথাই নাই। আমাদের দেশে কূপ-খনন যে জাতীয় স্তরে (দোঁআস মাটি বা সরু দানার বালুস্তর) শেষ হয়, তাহাতে শূন্য স্থান পূর্ণ করিবার উপযোগী জলের গতি অল্পবিস্তর প্রতিহত হয়। কিন্তু যে স্থানে নলকূপ বসান হয় কেবল সেই স্থানই জলের যোগান দেয় না, সেই বালুস্তর যতদূর বিস্তৃত ততদূর আশপাশ এবং উঁচু নীচু স্থান হইতে জলের যোগান পাওয়া যায়। পাম্পের টান যত প্রবলতর হইবে কূপ-কেন্দ্র হইতে ততই দূরতর স্থানের জলের যোগান পাওয়া যাইবে।

যদিও ব্যবহারে জলের হ্রাস হয় না বরং বৃদ্ধিই হইয়া থাকে, তথাপি কোনও কোনও নলকূপে বর্ষা ঋতুতে বেশ জল থাকে, কিন্তু গ্রীষ্মে জল উঠা বন্ধ হইয়া যায়। নদীয়া জিলাবোর্ডের এঞ্জিনিয়ার মহাশয় ২০।২৫ ফুট গভীর নলকূপ সম্বন্ধে এই অসুবিধার কথা উল্লেখ করিয়া আমাকে চিঠি দিয়াছেন। অতি গ্রীষ্মে জল ২০।২৫ ফুট নীচে নামিয়া যায় বলিয়া পূর্ব্বোক্ত নলকূপগুলিতে জল উঠে না। নল আর কিছু বসাইয়া দিলে ফিল্টার যদি বালুস্তর পার হইয়া না যায় তবে সমস্ত ঋতুতেই ঐ সব নলকূপে জল উঠিবে।

কিছু-দিন উঠিতে উঠিতে জল কমিয়া যায় সেই জন্য অগভীর নলকূপ ২।১ বৎসরেই বন্ধ হইয়া যায়—এ ধারণা একান্ত ভুল। গ্রীষ্মে জলের "সারফেস" নীচু হওয়া, ফিল্টারে মরিচা ধরিয়া ছিদ্র-পথ বন্ধ হওয়া, পাম্প নষ্ট হইয়া যাওয়া ইত্যাদি কারণে নলকূপ খারাপ হয়। তাহার বিস্তৃত আলোচনা পরে করিব।

উত্তমর্ণ আমেরিকা

যুদ্ধের জন্য ঋণ বাবদ ইংল্যাণ্ড আমেরিকার নিকট টাকা ধার লইয়াছিল। তৎসম্পর্কে বাজেট আলোচনার সময় স্নোডন সাহেব পার্ল্যামেণ্টে বলিয়াছেন,—"আমাদিগকে বৎসর বৎসর শোধ করিতে হইতেছে ৩৪,০০০,০০০ পাউণ্ড (=৫১০,০০০,০০০৲ টাকা) এবং সাত বৎসরের মধ্যে ইহা দাঁড়াইবে ৩৮,০০০,০০০ পাউণ্ডে (=৫৭০,০০০,০০০৲ টাকায়)। সমস্ত ঋণ এইরূপে ৬২ বৎসরে শোধ করিব এই কড়ারে রাজী হইয়াছি।

"অথচ যেসকল মিত্র শক্তিকে আমরা টাকা ধার দিয়াছিলাম তাদের যদি কড়ার করাইয়া লইতে পারিতাম ত আমরা বছরে ৮৪,০০০,০০০ পাউণ্ড (=১২৬০,০০০,০০০৲ টাকা) করিয়া পাইতাম। উহা হইতে অনায়াসে ৩৮,০০০,০০০ পাউণ্ড বছরে ধার-শোধ হইয়া হাতে ৪৬,০০০,০০০ পাউণ্ড (=৬৯০,০০০,০০০৲ টাকা) করিয়া মজুত থাকিত অর্থাৎ আয়করের উপর ১ পাউণ্ড ১১ পে। সে লাভ কম নয়।

"আমেরিকা যুদ্ধে নামিল যুদ্ধ বাধার ২½ বছর পরে। আর ঐ ২½ বছরে মিত্র শক্তিরা আমেরিকার নিকট হইতে গোলাগুলি, রসদ ইত্যাদি ক্রয় করাতে তার লাভ হইয়াছিল ২,৪০০,০০০,০০০ পাউণ্ড (=৩৬,০০০,০০০,০০০৲ টাকা); অধিকন্তু, ২½ বছর যুদ্ধে না নামিয়া সে অনেক লোকসানও এড়াইয়াছিল। সুতরাং আমেরিকা সব দিক্ দিয়াই জিতিয়াছে। আর হতভাগা আমরা প্রথমে আমেরিকার এই মুখের কথায় বিশ্বাস করিয়াছিলাম যে, আমেরিকা দানসাগর হইয়াছে, ঋণ হিসাবে টাকা দিতেছে না। তজ্জন্য এখন পস্তাইতেছি।"

চার্চিল সাহেব। আচ্ছা বেশ, আমরা উহাদের অনুগ্রহ বা দয়ার ভিখারী রহিব না। প্রতিজ্ঞা করিলাম যেমন করিয়া হোক্ ঐ ঋণ ধীরে ধীরে শোধ করিব। আমরা যদি ইচ্ছা করিতাম তবে আমরা কি আমাদের শত্রুদের কাণে ধরিয়া আমাদের প্রাপ্য টাকাটা আদায় করিয়া লইতে পারিতাম না। কিন্তু আমরা সে রকম ছোট লোক নহি।

স্নোডন সাহেব। কিন্তু দাদা ধীরে। আমেরিকা উত্তমর্ণ। শুনিতে পাইবে।

চ্যার্চিল সাহেব (ক্ষণকাল স্থিরভাবে ভাবিয়া)—তাইত। কিন্তু আমি ত আর আমেরিকার নিন্দা করিতেছি না। সকল দেশের নীতি বা ধর্ম্মের বাটখারা এক রকম হইবে এমন কি কথা আছে? আমেরিকার লজ্জিত হইবার কোন কারণ দেখিতেছি না। তবে উহাদের সুধীজনেরা কি পুনরায় বিষয়টার গুরুত্ব আলোচনা করিয়া দেখিবেন না? ভাবিয়া দেখ আমাদিগকে এবং তারপর আমাদের নাতি-প্রণাতিদিগকে বহুকাল ধরিয়া আমেরিকাকে প্রতিদিন ১০০,০০০ পাউণ্ড (=১,৫০০,০০০৲ টাকা) করিয়া শোধ দিতে হইবে।

জোন্স সাহেব—আঃ! আমরা যে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলাম তা ভুলিয়া যাইতেছ?

বঙ্গে বয়ন-বিদ্যালয়

১। পাবনা গভর্মেণ্ট উইভিং স্কুল।

পাবনা জেলার মধ্যে যে সকল তন্তুবায় আছে তাহাদের উন্নতি-সাধন উদ্দেশ্যে পাবনা সহরে গভর্মেণ্ট নানাপ্রকার বুনন করিবার নূতন নূতন প্রণালী শিক্ষা দিবার জন্য ১০ বৎসর যাবৎ একটী তাঁত স্কুল খুলিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ে ঠক্ঠকি কলে অতি সহজে রেশম ও সূতার নানাপ্রকার কাপড়, ধুতি ও সাড়ীর পাড়ে কল্কা, তোয়ালে ও নানা প্রকার ছিট ইত্যাদি বয়ন শিক্ষা দেওয়া হয়। এই সকল কাজ শিক্ষা করিলে এক একজন তন্তুবায়ের আয় দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইতে পারে।

এ বিদ্যালয়ে ১ বৎসর পর্য্যন্ত কাজ শিক্ষা করিতে হয়। যাহারা এই বিদ্যালয়ে কাজ শিক্ষা করিতে আসিবে তাহাদের নিকট হইতে বেতন লওয়া হয় না। তাহাদিগকে মাসিক ৮৲ টাকা হারে বৃত্তি দিয়া সাহায্য করা হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া, ছাত্রেরা নিজে নিজে ইচ্ছামত সূতা খরিদ করিতে পারে আর তাদের বোনা কাপড় যথায় ইচ্ছা বিক্রয় করিয়া সম্পূর্ণ লাভ গ্রহণ করিতে পারে। সংপ্রতি বৎসরের যে কোন সময়ে ছাত্র ভর্ত্তি করা হইয়া থাকে। এক সময়ে ২০ জনকে ভর্ত্তি করা যাইতে পারে। বৎসরে একবার অর্থাৎ জানুয়ারি মাসে নূতন ছাত্র ভর্ত্তি করিতে পারিলে কার্য্য-শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিবার সুবিধা হয়। মফঃস্বলের ছাত্রদিগের থাকিবার জন্য বিনা ভাড়ায় ছাত্রাবাসে স্থান দেওয়া হয়। পূর্ব্বোক্ত মাসিক ৮৲ টাকা বৃত্তি হইতে প্রতি মাসে ২৲ টাকা হারে প্রত্যেক ছাত্রকে জমা রাখিতে হয়। তাহারা তাহার কার্য্যশিক্ষা কাল এক বৎসর পূর্ণ হইলে বাড়ী ফিরিয়া যাইবার সময় একটী

ঠক্‌ঠকি তাঁতকল ও তাহার সরঞ্জাম ইত্যাদি সে খরিদ করিয়া লইতে পারে।

সাধারণতঃ, তন্তুবায়গণ নিজ নিজ ব্যবসা চালাইবার জন্য মহাজনদিগের নিকট হইতে চড়া সুদের চুক্তিতে টাকা কর্জ্জ লইতে বাধ্য হয় অথবা সূতা ও নগদ টাকা দাদন লইয়া অল্পলাভে মহাজনের নিকট কাপড় বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। এই প্রকার অসুবিধা দূর করিবার জন্য গভর্মেণ্ট এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা-প্রাপ্ত প্রত্যেক ছাত্রকে প্রতি টাকায় মাসিক এক পাই সুদে একশত টাকা পর্য্যন্ত কর্জ্জ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই টাকা তিন বৎসরের কিস্তিবন্দীতে পরিশোধ করিতে পারা যায়।

২। গভর্মে‍ণ্ট উইভিং স্কুল, টাঙ্গাইল

টাঙ্গাইলে গভর্মেণ্ট-কর্ত্তৃক একটী উইভিং স্কুল খোলা হইয়াছে। নূতন প্রণালীতে বয়ন-বিদ্যা শিক্ষা দিয়া তাঁত ব্যবসায়ীদের অবস্থার উন্নতি করাই এই বয়ন-বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। যাহারা জাতিতে তাঁতী কিংবা যাহাদের ঘরে তাঁতের কাজ আছে তাহাদিগকে এই স্কুলে আসিয়া উন্নত প্রণালীতে বয়ন-কার্য্য শিক্ষাকালীন গভর্মেণ্ট হইতে ৪৲ টাকা এবং জেলা বোর্ড হইতে ৪৲ টাকা মোট ৮৲ টাকা সাহায্য দেওয়া হয়। স্কুলের শিক্ষা শেষ হইলে উন্নত প্রণালীর বয়ন যন্ত্রাদি কিনিয়া লইবার জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক টাকা কর্জ্জ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এই স্কুলে এক বৎসর কাজ শিখিতে হয় এবং ছাত্রদের নিকট হইতে কোন বেতন লওয়া হয় না। নিকটবর্ত্তী স্থানের ছাত্রগণ বাড়ী হইতে আসিয়া স্কুলে কাজ শিখিতে পারে এবং দূরবর্ত্তী স্থানের ছাত্রগণের জন্য স্কুলে ছাত্রাবাস আছে, তথায় বিনা ভাড়ায় থাকিতে দেওয়া হয়। গভর্মেণ্ট একজন উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন, তিনি ছাত্রদিগকে যত্নসহকারে শিক্ষা দিয়া থাকেন এবং ছাত্রদের সুখ-সুবিধার জন্য সর্ব্বদা যত্ন লইয়া থাকেন। এই কার্য্যে তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য একজন সহকারী শিক্ষকও আছেন। যাহাদের ঘরে তাঁতের কাজ নাই তাহাদিগকেও তাঁতের কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে তাহারা কোনরূপ সাহায্য গভর্মেণ্ট বা জেলা বোর্ড হইতে পায় না। পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান ছাত্রগণ শিক্ষাকালীন কাপড় বুনিয়া তাহা বিক্রয় দ্বারা দু'পয়সা রোজগারও করিয়া থাকে। যাহারা উন্নত প্রণালীর বয়ন-বিদ্যা শিখিয়া নিজেদের অবস্থার ও বয়ন-শিল্পের উন্নতি করিতে চায় তাহারা উক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের নিকট আসিলে অথবা পত্র লিখিলে সমস্ত বিবরণ জানিতে পারিবে। বৎসরের সব সময়েই ছাত্র ভর্ত্তি করিতে পারা যায় যদি সিট খালি থাকে। মোট ২০টি বৃত্তিসহ সিট আছে।

৩। মেদিনীপুর বয়ন-বিদ্যালয়

বয়ন ও সূতা-কাটা শিক্ষা দেওয়ার জন্য মেদিনীপুর শহরে একটী বিদ্যালয় আছে। ঐ স্কুলে ছাত্রদের নিকট হইতে কোন বেতন লওয়া হয় না। উপরন্তু, দরিদ্র ছাত্রদিগকে সাহায্যস্বরূপ মাসিক ৭৷৷০ হিসাবে ১১টি বৃত্তি দেওয়া হয়। ছাত্রগণের সুবিধার জন্য স্কুলের সংলগ্ন একটী ছাত্রাবাসও আছে।

তর্ক-প্রশ্ন

"ক্রেডিট" শব্দের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ

"আর্থিক উন্নতি"র বৈশাখ সংখ্যায় দেখিলাম "টাকার কথা" নামক নবপ্রকাশিত-পুস্তক-প্রণেতা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায় "ক্রেডিট" শব্দের বাঙ্গালায় "পসার" শব্দ চালাইতে চান। "পসার" শব্দ ব্যবসারের প্রসার (বিস্তার) অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা, উকীলের পসার, ডাক্তারের পসার। কিন্তু একজন পসারওয়ালা উকীল হয়ত খুবই ঋণগ্রস্ত অথবা সচ্ছল হইয়াও হয়ত টাকা-কড়ির লেন-দেন ব্যাপারে ওয়াদার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে অনভ্যস্ত। ফলে, লোকের

কাছে হাত পাতিলে তিনি সহজে টাকা পান না। এরূপ অবস্থায় বেশ বলা চলে যে, উকীলটির পসার আছে কিন্তু ক্রেডিট নাই। এখন এই ক্রেডিট শব্দের স্থানে যদি নরেনবাবুর কথামত "পসার" শব্দ বসাই, তবে বাক্যটী দাঁড়ায়—উকীলটির পসার আছে কিন্তু পসার নাই। সুতরাং পসার শব্দ ক্রেডিট অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে না। "পূর্ব্ববঙ্গে" বা কোথাও পসার শব্দ ঠিক ক্রেডিট অর্থে ব্যবহৃত হয়ও না।

নরেন বাবুর শব্দটী গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি বটে, কিন্তু তিনি যে "সংস্কৃত অভিধানের ভাণ্ডার" এবং কলিকাতার অলিগলি কি সহরতলী এমন কি পশ্চিম বঙ্গের সীমানা পর্য্যন্ত ছাড়িয়া শব্দের সন্ধানে সটান পূর্ব্ব বঙ্গে—ঢাকায় পর্য্যন্ত ক্ষেপ দিয়াছেন এজন্য ধন্যবাদ দিতেছি। তিনি পশ্চিমবঙ্গবাসী হইলে ধন্যবাদ দেই তাঁহার সহৃদয়তাকে, অন্যথা ধন্যবাদ দেই তাঁহার দুঃসাহসকে। কারণ "স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি" গ্রহণযোগ্য হইলেও বচনং বাঙ্গালাদপি গ্রহণযোগ্য বলিয়া এযাবৎ অবগত নহি।

যাহা হউক, পশ্চিম বঙ্গে যদি "বাজার সম্ভ্রম" "বাজার খাতির"ছাড়া "ক্রেডিট" অর্থ-প্রকাশক কোনো শব্দ নেহাৎ না-ই পাওয়া যায়, তবে বাঙ্গালের অভিধান হইতে আমি ক্রেডিট অর্থবাচক একটি শব্দের উল্লেখ করিতে পারি। "সাউকারি" শব্দটী অবিকল ক্রেডিট অর্থে পূর্ব্ববঙ্গের অনেক জেলাতেই ভদ্রেতর সকলের মধ্যে হরদম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সংস্কৃত সাধু (বণিক) শব্দ হইতে প্রাকৃত সাহু ও সাহুকার শব্দের উৎপত্তি। ইহাদের মানে—ব্যবসায়ী, মহাজন। সাহু শব্দ হইতে বাঙ্গালা সাহা, সাউ, সা শব্দের উৎপত্তি। সাহুকার শব্দ হইতে হিন্দী সাউকার শব্দের উৎপত্তি। ইহারও মানে ব্যবসায়ী, মহাজন। এই সাউকার শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে ইহার হিন্দী অর্থই রক্ষা করিয়াছে কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দী অর্থটী একেবারে পরিত্যাগ করিয়া (স্থান-বিশেষে ঐ অর্থের সঙ্গে) এক নূতন অর্থ গ্রহণ করিয়াছে। "লোকটি সাউকার" বলিলে পূর্ব্ববঙ্গবাসী বুঝিবে সে টাকাকড়ির ব্যাপারে খুব বিশ্বস্ত—হাত পাতিলেই টাকা পায়, ওয়াদার মর্য্যাদা রক্ষা করে ইত্যাদি অর্থাৎ "ম্যান অব ক্রেডিট" বলিলে যা বুঝা যায় ঠিক তাই এই সাউকার শব্দ হইতেই গুণবাচক বিশেষ্য "সাউকারি" শব্দ আসিয়াছে। এই দুইটি শব্দ একটু রূপান্তরিত ভাবে নোয়াখালী ও বরিশালে চলিয়া থাকে। সেখানে বলা হয় "সাউগারি", "সাউগার"। হিন্দীতে সাউকারি বলিলে বণিকবৃত্তি, ব্যবসাদারি বুঝায়, কিন্তু সাউপন (সাহুপন) শব্দ ঠিক ক্রেডিট অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই "সাউপন" হইতে বাঙ্গালা "সাউপনা" শব্দ ("গুণপনার" ন্যায়) প্রস্তুত করা চলে। কিন্তু যখন বাঙ্গালা দেশের এতগুলি জেলার লোক সাউকারি শব্দ ঠিক ক্রেডিট অর্থে ব্যবহার করিতেছে, তখন নূতন শব্দ তৈয়ারী করিতে যাওয়া অনাবশ্যক। উত্তর বঙ্গের কোনো কোনো জেলাতেও সাউকারি শব্দ ক্রেডিট অর্থে চলে কিনা জানি না। "আর্থিক উন্নতি"র পাঠকগণের মধ্যে উত্তর-বঙ্গবাসী কেহ যদি ঐ কাগজের মারফৎ সে বিষয়ে খাঁটি খবর জানান তবে বড়ই ভাল হয়।

প্রসঙ্গক্রমে একথা বলা যাইতে পারে "ব্যবসায়ী" অর্থবাচক সাউকার শব্দ পূর্ব্ববঙ্গে যে অর্থান্তর গ্রহণ করিয়াছে তদ্বারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, এক সময়ে পূর্ব্ববঙ্গের ব্যবসায়িগণের মধ্যে ক্রেডিট গুণটা খুবই উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল।

"আর্থিক উন্নতি"র জনৈক পাঠক
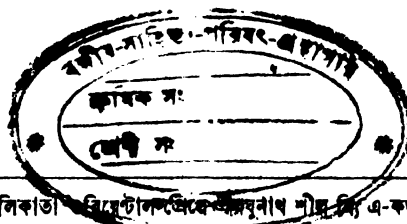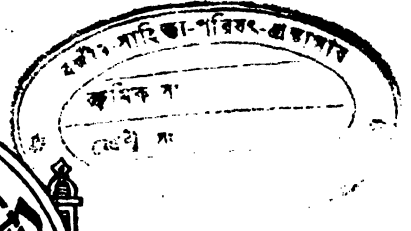
১০৭নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্ কলিকাতা ... প্রেস হইতে শ্রীরঘুনাথ শীল বি, এ-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১ম বর্ষ—৫ম সংখ্যা

ভাদ্র—১৩৩৩

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি।

অথর্ব্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জন্ম আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।
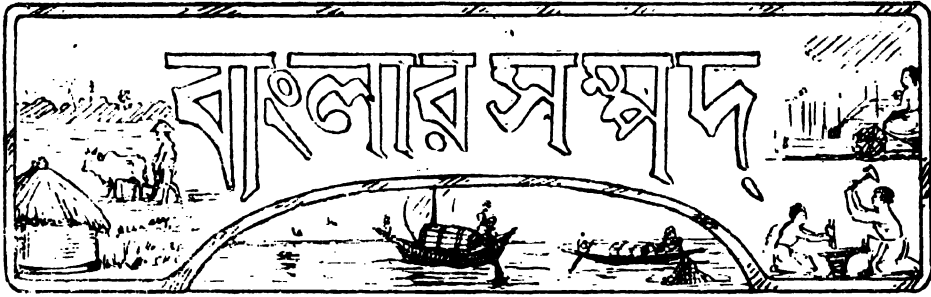
ঢাকেশ্বরী কটন মিল্‌স্

আলোচ্য বর্ষের (১৯২৫) ৩১শে ডিসেম্বর তারিখ মোট বিক্রীত অংশের মূল্য ১৫,১৯,৩৯০ টাকা। এতদ্ভিন্ন ৮,০৬২ অংশের টাকাও ৩১শে ডিসেম্বর মধ্যে গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং প্রকৃত পক্ষে ১৯২৫ সন পর্য্যন্ত ১৬,০০,০১০ টাকা মূল্যের অংশ বিক্রী হইয়াছে। ১৯২৬ সনের মার্চ পর্য্যন্ত ৯৮,০৭,৯১০ টাকার অংশ বিক্রী হইয়াছে।

সুদ ও প্রবেশ ফিঃ ইত্যাদি বাবদ আলোচ্য বর্ষে ১৫,৬৭৭৸৶৯ পাওয়া গিয়াছে, এবং আফিস বাবদ মোট ২৬,৭৭২৵৩ পাই খরচ হইয়াছে।

ফ্যাক্টরী-গৃহের কার্য্য শেষ হইয়াছে। গুদাম ও কর্ম্মচারীদিগের বাসাবাড়ীও শেষ হইয়া গিয়াছে। কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদের গৃহে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন শ্রমিকগণের জন্য ১৫২টী কুঠরী-বিশিষ্ট পাকা দোতলা বাড়ী প্রায় শেষ হইয়াছে।

প্রথমে ৫০০ তাঁত ও ২০,০০০ টাকু লইয়া কাজ আরম্ভ করিবার প্রস্তাব ছিল। অর্ডার দিবার সময় সমস্ত মেশিনের অর্ডার দিয়া প্রথমবারে ১১,৪৪৪ টাকু ও ৩১২ খানি তাঁত (আবশ্যক সাজ-সরঞ্জামাদি সহ) আনিবার এবং অবশিষ্ট তাঁত ও টাকু কিছু দিন পরে লইবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। উক্ত ১১,৪৪৪ খানি টাকু ও ৩১২ খানি তাঁত সাজ-সরঞ্জাম সহ মিলে পৌছিয়াছে এবং কর্ম্মচারিগণের তত্ত্বাবধানে ঐ সকল কল বসান হইতেছে। ইঞ্জিন ও বয়লার ৮৫০ অশ্ব-বল-সম্পন্ন এবং সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক ও উন্নত প্রণালীতে প্রস্তুত। ইহা দ্বারা ৫০০ তাঁত এবং ২০,০০০ টাকু অনায়াসে চালিত হইবে। তাঁতের সংখ্যা দেড়গুণ হইলেও এই ইঞ্জিনেই চলিবে।

বর্তমানে যে সকল "বিদেশী" শ্রমিক লইয়া কাজ আরম্ভ করিতে হইবে তাহাদের তত্ত্বাবধানে স্থানীয় লোককে কাজ শিখাইয়া লইবার ব্যবস্থা হইতেছে। সুতরাং বাকী কল আসিলে আর "বিদেশ" হইতে লোক-সংগ্রহের জন্য কোনো বেগ পাইতে হইবে না।

উদ্বর্ত্তপত্র

দায়,—		
মূলধন	...	১১,৯৮,২০৪/৩
অগ্রিম "কল"	...	৪,৮৫০॥৴
অংশের আমানত	...	১৬,১২৪৲
আমানত	...	৭৯৬৲
আমানত	...	৪৭,৫৮২॥৯
ঋণ	...	৩৯,০৮৬৷৴৩
আমানত	...	৮১,১২৯॥৯
দেনা	...	২,২৭৫৮৬
		১৩,৯০,০৫৯৲৬ পাই
স্থিত,—		
জমি, ইমারত, কল-কব্জা	...	৮,১৬,৮২২৮২
আসবাব পত্র	...	২,৯৫৩৷৩
বন্দুক	...	২২০৴
নৌকা	...	১,০৬৪৷৶৩
পুস্তক	...	২৬২৶
দাদন	...	৭৭,৯১৭৷৶৬
বিলাতী ওয়ার	...	৮৯,৬৮১৮/৮
লগ্নি	...	১৯,৫০৫॥৯
অগ্রিম দাদন	...	১,৮৯,৫৯৭॥৶৫
সুদ প্রাপ্য	...	২,২৫২॥৶
প্রাথমিক ব্যয়	...	৩০৩৮৷৯
অংশ বিক্রীর কমিশন	...	৮১,৬৪৫৷০
নগদ তহবিল	...	১,১৯১৮৶৯
কলিকাতা ব্যাঙ্কে	...	১,৮০৮৵৭
লণ্ডন ব্যাঙ্কে	...	৮৮,৯৫৯/৪
ঢাকা ব্যাঙ্কে	...	১১১৮৬
ষ্ট্যাম্প	...	৬৯৮৬
নাজাত	...	১২,৯৫১॥৯
		১৩,৯০,০৫৯৲৬

বাঙালী ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন

বাংলাদেশের সাপ্তাহিক, মাসিক ও দৈনিক কাগজগুলার অষ্টেপৃষ্ঠে সাধারণতঃ দেখিতে পাই কেবল ওষুধপত্রের বিজ্ঞাপন। কিন্তু বিজ্ঞাপনের বাজারে একটু আধটু করিয়া এক "নয়া বাঙলা" দেখা দিতেছে তাহাও লক্ষ্য করা যায়। জলপাইগুড়ির বিজ্ঞাপনদাতারা এই বিষয়ে আমাদের অন্যতম পথ-প্রদর্শক। কয়েকটা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

(১)

জলপাইগুড়ির চা কোম্পানী শতকরা ৩৫০৲ পর্য্যন্ত
লভ্যাংশ দিয়াছে।
নূতন ও পুরাতন চা কোম্পানীর অংশ ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য
নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন—
ডুয়ার্স ও দার্জ্জিলিংএর উৎকৃষ্ট চা আমরা
সুলভ মূল্যে বিক্রয় করি।
মেসার্স ঘটক এণ্ড কোং, শেয়ার ব্রোকার্স, জলপাইগুড়ি।

(২)

রায়, চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোং
শেয়ার ডিলার্স ও অর্ডার সাপ্লায়ার্স

এখানে চা বাগানের শেয়ার খরিদ-বিক্রী হয়। বিস্তৃত বিবরণ ও চার্টের জন্য পত্র লিখুন। এখানে সুলভে দার্জ্জিলিং ও ডুয়ার্সের চা বিক্রয় হয়।

সোল প্রোপ্রাইটার—রবীন্দ্রমোহন রায়।

(৩)

চা-বাগানের অংশ
খরিদ-বিক্রয় করিতে হইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। গত ইং ১৯২২ সন হইতে এই কার্য্য করিয়া আসিতেছি। ইতি—

শ্রীগণেশ চন্দ্র রায়, শেয়ার ব্রোকার
কেয়ার অব শ্রীযুক্ত বাবু জয়গোবিন্দ গুহ, জলপাইগুড়ি।

পাহারাওয়ালার চাকরী

কলিকাতার বাৎসরিক পুলিশ রিপোর্টে প্রকাশ ১৯২৫ সনের শেষ ভাগে অধিকসংখ্যক কনেষ্টবলের চাকরী খালি পড়ে। এই সমস্ত পদের জন্য অতি অল্পসংখ্যক বাঙ্গালী আবেদন করে। আবার ইহাদের অধিকাংশ কলিকাতার রাজপথে বেটন-হাতে টহল দিয়া ফিরিবার চাইতে পুলিশ দপ্তরের নির্জ্জন কক্ষের কেরাণী-জীবন পছন্দ করে। বাঙ্গালী যুবকের এইরূপ মনোভাবের ফলে বর্ত্তমানে শহরের ৪২০০ কনেষ্টবলের মধ্যে মাত্র ১৩৮ জন খাস বাঙ্গালী আছে। বাকী সবই পশ্চিমা লোক।

কাগজের মজুরদের ইউনিয়ন

বিগত ৩০শে জুন তারিখ ভাটপাড়া বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন গৃহে কাগজের কলের শ্রমিকদের এক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সর্ব্বসম্মতিক্রমে উপরি উক্ত নামে একটি ইউনিয়ন গঠিত হইয়াছে। শ্রীযুত সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ইউনিয়নের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

ফেরিওয়ালা বন্ধ

বর্ত্তমানে পুটীজুরী পরগণার অন্তর্গত অমৃতা নামক গ্রামে ফেরিওয়ালা বন্ধ করা হইয়াছে। কারণ পল্লীবাসী দরিদ্র পুরুষদের বাড়ী না থাকা কালে যখন ফেরিওয়ালারা বাড়ীতে আসে, তখন গৃহস্থ-ঘরের বৌ ও মেয়েরা গৃহস্থের কত পরিশ্রমের ধানচাউলদ্বারা ফেরিওয়ালার সঙ্গে খরিদ-বিক্রীর কার্য্য করেন। ইহাতে গৃহস্থকে অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়।

চুঁচুড়ায় রেশম চাষ

সরকারী রেশম-বিভাগের কাজ ক্রমেই বিস্তার লাভ করিতেছে। "আবাদ" বলিতেছেন,—কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে যে রেশম চাষ সম্ভব তাহা এখন তাঁহারা কার্য্যে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কলিকাতার নিকটে চুঁচুড়া কৃষি-বিদ্যালয়ে তাঁহারা একটী কেন্দ্র স্থাপন করিয়া এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে রেশমের কাজ শিখাইতেছেন। এখানে এরি গুটি ও ছোট পলুর গুটী পালন বেশ চলিতেছে। এই শিল্প যদি ইহাদের চেষ্টায় বাঙ্গালায় আবার প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে সত্যই বাঙ্গালার অর্থাগমের এক নূতন পথ মুক্ত হইবে।

চট্টগ্রামে শ্লেট্ ও পেন্সিল নির্ম্মাণ

চট্টগ্রাম জিলার অন্তঃপাতি পটিয়া থানার অন্তর্গত দক্ষিণ ভূর্ষী শাখা কংগ্রেস কমিটির সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কাশীশ্বর গুহ বারংবার চেষ্টার ফলে শ্লেট্ পেন্সিল, চক্ পেন্সিল এবং শ্লেট্ প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়াছেন। ইনি পূর্ব্বে চা-বাগানে চাকরী করিতেন। সেখানে প্রথমতঃ পাহাড়ের মাটীদ্বারা শ্লেট পেন্সিল তৈয়ারী করিতে চেষ্টা করেন। দুই বৎসর চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হন। তৎপর সহযোগিতা-বর্জ্জন আন্দোলনের সময় ইনি চাকরী ত্যাগ করিয়া কংগ্রেসের কার্য্যে ব্রতী হন। কংগ্রেসের কার্য্য শেষ হইলে পুনরায় তিনি শ্লেট পেন্সিল, শ্লেট, চক্ পেন্সিল প্রভৃতি তৈয়ারী করিতে চেষ্টা করেন। "জ্যোতিঃ" বলিতেছেন এইরূপে বহুবার চেষ্টা করিয়া অল্পদিন হইল ইনি কার্য্যে সফলতা লাভ করিয়াছেন।

লাঙ্গল পূজা

ময়মনসিংহ জেলার চাঁদপুর গ্রামে সম্প্রতি এক অভিনব ব্যাপার হইয়া গিয়াছে। তথাকার ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় সেদিন একত্র হইয়া সকলে উৎসাহের সহিত স্বহস্তে হল-চালনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে জমিদার, গ্রন্থকার, শিক্ষক, ছাত্র প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকই ছিলেন। কয়েক বন্দ জমি কর্ষণের পর সকলে এক সভায় মিলিত হন। তথায় সভাপতি মহাশয় লাঙ্গলের মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া বলেন—"লাঙ্গল অন্নদাতা, লাঙ্গল উৎকর্ষ ও শিক্ষার নিদানস্বরূপ। পুরাকালের ঋষিগণ চাষের কার্য্যে সুদক্ষ ছিলেন। রাজর্ষি জনক স্বয়ং চাষ করিতেন। হলধারী বলরাম হল-চালনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। হল-চালনায় নিন্দার বিষয় কিছুই নাই।"

চাঁদপুরের ভদ্রসম্প্রদায় অতঃপর নিজেরাই স্বহস্তে সুবিধামত আবাদের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন। "নীহার" বলিতেছেন,—আমাদের কাঁথিতেও কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথের সহিত কতিপয় সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তি স্বহস্তে হল-চালনা করিয়াছিলেন। কিন্তু যাঁহাদের সময় ও সুবিধা আছে তাঁহারা অসার অভিমান ভুলিয়া এই নির্দ্দোষ কার্য্যে কেন অগ্রসর হইতেছেন না? লাঞ্ছনা, অপমান সহ্য করিয়া পরের অনুগ্রহলোলুপ থাকিয়া চাকরীর পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়ান অপেক্ষা এরূপ স্বাধীন ভাবে পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকার্জ্জন করা কি শতগুণে শ্রেষ্ঠ নহে?

সোদপুরে খাদি-প্রতিষ্ঠান

সোদপুর কলিকাতা হইতে নয় মাইল দূরে। এই স্থানে ষ্টেশন-সংলগ্ন একখণ্ড ভূমিতে প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মশালা স্থাপিত হইতেছে। এখানে কাপড় ধোয়া, রং করা ও ছাপার কাজ চলিবে। তাহা ছাড়া প্রতিষ্ঠানের যে সকল একনিষ্ঠ কর্ম্মী পরিবার-প্রতিপালনের ভার প্রতিষ্ঠানের উপর দিয়া নিজেরা সর্ব্বদা প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মে ও চিন্তায় সময় ও শক্তি দিতে চান, তাঁহাদের জন্যও কতকগুলি বাড়ী তৈয়ারী করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। সোদপুরে প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মশালা গড়িয়া উঠিলে প্রতিষ্ঠানের কার্য্য আরও সুশৃঙ্খল ও দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইবে।

শিক্ষায় খরচ ৩।।০ কোটি

সাড়ে চার কোটি বাঙালীর দেশে প্রায় সাড়ে তিন ক্রোর টাকা ফী বৎসর খরচ হয়,—শিক্ষা বাবদ। এই ৩।।০ কোটির প্রায় অর্দ্ধেক দেয় ছাত্রেরাই বেতন হিসাবে। অপর অর্দ্ধ আসে গবর্মেণ্টের তহবিল হইতে আর জেলা বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটির নিকট হইতে।

মিউনিসিপ্যালিটি সাধারণতঃ ৩ লাখের বেশী দিতে অসমর্থ। লাখ পনর দেয় জেলা বোর্ড। ১৯২৪ ও ১৯২৫ সনের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

১৯২৪ সনে সাধারণ শিক্ষায় ব্যয় হইয়াছিল ৩,৪৪,৪৮,৩০৭৲ টাকা; ১৯২৫ সনে হইয়াছে ৩,৫৬,৪৫,৯৩৯৲ টাকা। ১৯২৫ সনের ব্যয়ের টাকার মধ্যে প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে ১,৩৩,৮২,৯৬২৲ টাকা সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। জেলা বোর্ড ও মিউনিসিপ্যাল বোর্ড হইতে সাহায্য পাওয়া গিয়াছে ১৫,৪৫,৮০৫৲ ও ৩,০৫,৯৮৮৲ টাকা। ছাত্রদের বেতন-স্বরূপ পাওয়া গিয়াছিল ১,৪৬,৩৭,১২৬৲ টাকা এবং বে-সরকারী দান ৫৭,৭৫,.৫৮৲ টাকা। ১৯২৪ সনের ব্যয়ের টাকার মধ্যে প্রাদেশিক রাজস্ব, জেলা বোর্ড ও মিউনিসিপ্যাল বোর্ড হইতে যথাক্রমে সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল ১,৩০,০৯,৪৮৬ টাকা, ১৪,৮৯,২৩৪ টাকা ও ৩,৩০,৩৫৪ টাকা।

১৯২৪ সনে ছাত্রদের নিকট হইতে বেতন পাওয়া গিয়াছিল ১,৪০,১৬,৩৬৪ টাকা এবং বে-সরকারী দান পাওয়া গিয়াছিল ৫৬,০২,৮৬৯ টাকা।

বর্ষাতির ব্যবসা

বর্ষাতির বর্ত্তমান আমদানি এইরূপ হইয়াছে :—

১।	বর্ষাতির কাপড়	...	১৭৫,৮৬০৲
২।	তেল কাপড়	...	৮৫৭,৪৭০৲
৩।	ছাতার কাপড়	...	৮৯৫,৪১,৯১৮৲
৪।	মোটর হুডের জন্য বর্ষাতি ক্যান্‌বিস্	...	৩১,০৯,৮৬০৲
৫।	তৈয়ারী ছাতা	...	৯,৬৭,৩৪৬৲
			৯,৪৬৪২,৩৫৪৲ টাকা

এতগুলি টাকা প্রতি বছর বিদেশে যায় দেখিয়া শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষ এম, এ, বি, এল মহাশয়ের মাথায় প্রথম খেয়াল আসে যে স্বদেশী বর্ষাতি তৈয়ারী করিতে হইবে। এই ভদ্রলোক ব্যবসায়-রসায়ন সম্বন্ধে কোনো প্রকার কার্য্যকরী শিক্ষা না পাইয়াও নিজ অধ্যবসায় ও চেষ্টার বলে অতি উৎকৃষ্ট দেশী বর্ষাতি তৈয়ারী করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইনি বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলে ডাই হাউস মাষ্টারের কাজ করার সময় এ বিষয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করেন। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁরই অর্থ-সাহায্যে ইনি ৩৯ নং দক্ষিণ রসা রোড, টালিগঞ্জে এই উদ্দেশ্যে "দি

ন্যাশনাল ডাই এণ্ড ওয়াটার প্রুফ ওয়ার্কস” নামে এক কারখানা খুলিয়াছেন ও কলিকাতা কর্পোরেশনের সাহায্য পাইয়াছেন। তৎকর্ত্তৃক প্রস্তুত সোয়ানব্যাক বর্ষাতির বেশ কাটতি হইয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশনও ঢের অর্ডার দিতেছেন।

সম্প্রতি আলিপুরস্থ গবর্ণমেণ্ট টেষ্ট হাউসে এই কারবারের বর্ষাতির পরীক্ষা হইয়াছে। তাহাতে মসৃণতা রং ও জল না বসিয়া যাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে বিলাতী বর্ষাতির অপেক্ষা ইহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইয়াছে।

গভর্ণর সাহেব মনোরঞ্জন বাবুকে ডাকিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিয়াছিলেন। গবর্ণরের ষ্টোর ডিপার্টমেণ্টের কণ্ট্রাক্টর গঙ্গাধর বানার্জি কোং ইঁহাদের দ্বারা ওয়াটার প্রুফ তৈয়ারী করাইয়া লইয়াছেন। সাহায্য পাইলে এই ব্যবসা অন্যান্য দিকেও “স্বদেশী”র অভাব পূরণ করিতে পারিবে।

বাংলায় খদ্দর বিক্রয়

বাংলায় খাদির চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। “খাদি প্রতিষ্ঠান” ১৯২৪ সনে ১২ মাসে মোট খাদি বিক্রয় করিয়াছেন ৮৫,৩৫৮৲ টাকার। ১৯২৬ সনের জানুয়ারি হইতে এপ্রিল পর্য্যন্ত মাত্র চারি মাসে প্রতিষ্ঠান বিক্রয় করিয়াছেন মোট ৮৬,৮৩০৲ টাকাব। যে হারে বাংলায় খাদির চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে ১৯২৫ সনের বিক্রয়ের অঙ্ক যে ১৯২৬ সনের অঙ্কের অনেক পিছনে পড়িয়া থাকিবে তাহাতে আর কোনো সন্দেহ নাই। নিম্নের তালিকা শিক্ষা-প্রদ :—

	১৯২৪	১৯২৫	১৯২৬
জানুয়ারি	৩২৯৬৲	৬৬৪৮৲	২১৭১০৲
ফেব্রুরারি	৩৭১০৲	৬০৮২৲	২০৬০৪৲
মার্চ	২৬৬২৲	৮৫০৪৲	২৪৬৪৭৲
এপ্রিল	৪১৬৫৲	১৭৬৯০৲	১৯৮৬৯৲
			৮৬৮৩০৲ (চারিমাসে)
মে	৩৮৫৪৲	১৮২৭০৲	
জুন্	৬৫২৯৲	১৩৪২২৲	
জুলাই	৫৭৩১৲	১২৯১২৲	
আগষ্ট	১২৯৩০৲	১৪০৬৪৲	
সেপ্টেম্বর	১৪৩০৭৲	২৯০৮৭৲	
অক্টোবর	১২৪৩২৲	১৩৬৫৮৲	
নভেম্বর	৮৪৩৮৲	১৮৩৭৩	
ডিসেম্বর	৭৩০৪৲	২০৫১৫৲	
	৮৫৩৫৮৲	১৭৯২৫২৲	
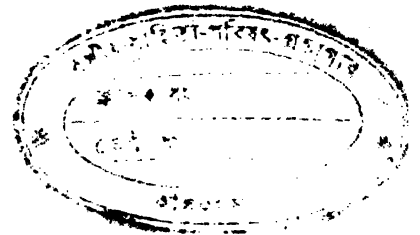
যুক্তপ্রদেশে কম্বলের কারবার

প্রত্যেক জেলায় জেলায় কম্বল প্রস্তুত হইলেও মজঃফরনগর ও নজিরাবাদই ইহার প্রধান আড্ডা। এই দুই স্থানের কো-অপারেটিভ সোসাইটি-কর্ত্তৃক প্রস্তুত কাপড় খুবই সরস এবং কতকগুলি ইয়োরোপীয় মালের সহিত তুলনায় কোনো মতেই নিকৃষ্ট নহে। কাপড়গুলি বিদেশী জিনিষের মত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে হইলে উন্নত প্রণালীর সাজ-সরঞ্জাম প্রয়োজনীয়। বিদেশী মালের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে হইলেও তাঁতীদের প্রস্তুত জিনিষ শীঘ্রই বাজারে বিকাইয়া যায়। এই কারবারের প্রধান অসুবিধা উপযুক্ত পরিমাণ সূতার অভাব। সূতার অধিকাংশই স্থানীয় চরকায় কাটা হয়। চরকায় তাড়াতাড়ি সূতা কাটা চলে না এবং সূতা অসমান হয়। এরূপ সূতা সরস বস্ত্র নির্ম্মাণের পক্ষে মোটেই উপযোগী নয়। কলে কাটা সূতার চাহিদাই বেশী, কিন্তু তাহা সকল সময় পাওয়া যায় না এবং তাহার দাম খুব চড়া। এই সমস্ত অসুবিধা লক্ষ্য করিয়া সরকার কানপুরের গভর্মেণ্ট টেকসটাইল বিদ্যালয়ে একটা মোটর-চালিত ফ্যাক্টরী খুলিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

মাদ্রাজ শিল্প-প্রতিষ্ঠান

ইণ্ডাষ্ট্রীর ডিরেক্টরের নির্দ্দেশমত মাদ্রাজ সরকার সরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানটি ১৯২৭ সনের মার্চ মাস পর্য্যন্ত অস্থায়ী ভাবে পরিচালনা করিবার অনুমতি দিয়াছেন। বর্ত্তমান গৃহে উঠিয়া আসিবার পর হইতে ইহার কার্য্য অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। আর উৎপন্ন দ্রব্য ও বিক্রয়াদি হইতে বেশ বুঝা যায় প্রতিষ্ঠানটি চারিদিকেই খুব উন্নতি দেখাইতেছে। দক্ষিণ ভারতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উন্নত ধরণের কালী প্রস্তুত হইতে পারে এই শিল্প-ভবন তাহা প্রমাণ করিয়াছে।

বিহারে কাগজের কারবার

১৯২৪-২৫ সরকারী বৎসরে বিহার-উড়িষ্যার শিল্প-বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তা (ডিরেক্টর অব ইণ্ডাষ্ট্রীস্) দেরাছুনের পেপার-পাল্প-বিশারদ কর্ত্তৃক পরীক্ষার নিমিত্ত আঙ্গুল বনের ১০টা বাঁশ সেখানে পাঠান। তিনি ইহা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে দেখা যায় আঙ্গুল বনের বাঁশ দিয়া কটকে পেপার পালপ ফ্যাক্টরি কায়েম করিলে তাহা খুবই সফল হইবার কথা। এখন এইরূপ একটি লাভজনক ব্যবসায়ে টাকা খাটাইবার লোক আবশ্যক। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকে সরকার অবশ্যই সাহায্য করিবেন এইরূপ বুঝা যাইতেছে।

রুমাল ও লুঙ্গির ৪০ হাজার তাঁত

মাদ্রাজে রুমাল ও লুঙ্গি শিল্পে ৪০ হাজার হস্ত-চালিত তাঁত চলে এবং প্রায় লক্ষাধিক লোক খাটে। প্রত্যেক বৎসর রুমাল ও লুঙ্গির ৪ কোটী গজ কাপড় একমাত্র বিদেশেই রপ্তানি হয়। ইহার মূল্য দাঁড়াইবে আড়াই কোটী টাকা। হস্তচালিত তাঁতের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় যন্ত্রচালিত তাঁত (পাওয়ার লুম) ফেল মারিয়া গিয়াছে। ইহার কারণ হস্তচালিত তাঁতে অল্প খরচে বিভিন্ন রকম ডিজাইন করা চলিতে পারে। তাহা ছাড়া, বর্ত্তমানে হস্তচালিত তাঁতে যেরূপ সুন্দর সুন্দর বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইতেছে সেগুলি ইয়োরোপীয় বাজারেও বিদেশী মালকে হার মানাইয়া দিতেছে। মাদ্রাজী লুঙ্গি প্রধানতঃ পেনাং, সিঙ্গাপুর, বর্ম্মা ও মালয় ষ্টেট প্রভৃতি দেশের বাজার দখল করিয়া বসিয়াছে।

১৯২৩-২৪ সনে বিদেশে প্রায় ৩৩ লক্ষ টাকা মূল্যের ২৬ লক্ষ গজ রুমালের বস্ত্র রপ্তানি করা হইয়াছে। ঐ বৎসর লুঙ্গি রপ্তানি হইয়াছে সাড়ে তিন কোটী গজের উপর এবং ইহার মূল্য সওয়া দুই কোটী টাকা।

মহীশূর রাজ্যে কাপড়ের কল

১৯২৪-২৫ সনের সরকারী রিপোর্টে দেখা যায় ঐবৎসর ব্যবসায়িগণের বড়ই দুঃসময় গিয়াছে। বাজারের মন্দাভাব নয়া মিলগুলির পরিচালনার কাজে বড়ই বাধা বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছে। সরকার মিলগুলিকে যথাসম্ভব সাহায্য করিবার নিমিত্ত বিশেষ আইন প্রণয়ন করিয়াছেন।

আলোচ্য বৎসরে মিনার্ভা মিল ২৫,০০০ টাকু লইয়া কাজ আরম্ভ করে। বাঙ্গালোর উলেন, কটন এণ্ড সিল্ক কোং লিঃ এবং মহীশূর স্পিনিং, উইভিং এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ তাঁহাদের ব্যবসার অনেকটা শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিয়াছেন। কৃষ্ণ রাজেন্দ্র মিলে বর্ত্তমানে ২৫,০০০ টাকু চালান হইতেছে। সমগ্র মহীশূর রাজ্যে মোট ১৩০,০০০ টাকু (স্পিণ্ডল) এবং ১,২৮৫ খানি তাঁত চলে। সূতার চাহিদা মন্দা হওয়ায় নূতন মিলগুলি আরও তাঁত বাড়াইবার মতলবে আছে। সূতা রং করিবার ও বস্ত্র ছাপাইবার প্রচেষ্টা ছোট-খাট ভাবে আরম্ভ করা হইতেছে। পশমের কারবারের ভারি খারাপ সময় যাইতেছে। কাইজারি হিন্দ উলেন মিল এবং মহালক্ষ্মী মিলকে লোকসান দিয়া কারবার চালইতে হইতেছে। কম্বল প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত ঠক্‌ঠকি তাঁত পরিবর্দ্ধিত করিবার কাজে ব্যক্তিগত চেষ্টার সাহায্য করিবার জন্য সরকারকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

বাঙ্গালোরের রেশম

সিল্কের দর অসম্ভব রকমে পড়িয়া যাওয়ায় সিল্ক ব্যবসায়ের যার পর নাই ক্ষতি হইয়াছে। ইহার ফলে গুটি হইতে রেশম প্রস্তুত করিবার খরচা কমিয়া গিয়াছে। চিক্কণ মসলিন প্রস্তুত করিবার জন্য যন্ত্রপাতি বাড়াইবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। বাঙ্গালোরের রেশম কোম্পানী ৭৫ হাজার টাকা মূলধনে প্রাথমিক অসুবিধা দূর করিতে সমর্থ হইয়াছে। বর্ত্তমানে এই কারবার প্রতিদিন অল্প খরচায় বিশ পাউণ্ড সিল্ক উৎপাদন করিতেছে। সরকারী উইভিং ফ্যাক্টরী ও অন্যান্য কয়েকটি কারখানায় যতদূর সম্ভব স্থানীয় সিল্ক ব্যবহৃত হয়। ইহার ফলে মহীশূরে উৎপন্ন দ্রব্যের গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ম্যাকলেস ফিল্ড মিলে উৎপন্ন মহীশূরের সিল্কের নমুনায় সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, সিল্ক পরিমার্জ্জিত করিবার উপযুক্ত সাজসরঞ্জাম পাইলে খুব উঁচু দরের মাল প্রস্তুত করা সম্ভব।

সোনালী সূতা

সোনার লেস্ তৈয়ারী করিবার পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ গোল্ড থ্রেড ফ্যাক্টরী শীঘ্রই মাসিক ২৫,০০০৲ টাকা মূল্যের সোনার লেস তৈয়ারী করিতে পারিবে।

মাদ্রাজে কৃষি-যন্ত্রপাতির ব্যবহার

সরকারী কৃষি-বিভাগ-কর্ত্তৃক কৃষকদের মধ্যে কৃষি যন্ত্রপাতি প্রচলন করিবার চেষ্টা খুব ধীরে অগ্রসর হইলেও বেশ ফলপ্রদ হইয়াছে। গতবৎসরে ১৮৩৪ খানা লাঙ্গল এবং ২৬৮২টি খণ্ড যন্ত্র বিক্রী হইয়াছে। খুব বেশী খণ্ড যন্ত্র বিক্রয় হওয়ায় বুঝা যায় যে লাঙ্গলগুলি বেশ সুন্দরভাবে চালানো হইতেছে। ইহা বড়ই আশার কথা সন্দেহ নাই। কঙ্কন, মেষ্টন ও মনসুন লাঙ্গলই বেশী ব্যবহৃত হয়। এগুলির দাম কম বলিয়াই সাধারণ কৃষকের বেশী পছন্দ হয়। চাষবাসের নূতন নূতন হাল-হাতিয়ার আবিষ্কার করিবার জন্য একজন কৃষি-ইঞ্জিনিয়ার গবেষকের অভাব কৃষি-বিভাগ কর্ত্তৃক বিশেষ ভাবে অনুভূত হইতেছে।

বড়োদা রাজ্যে ট্রাক্টর-যন্ত্র

বড়োদা রাজ্যে ট্রাক্টর যন্ত্রের সাহায্যে চাষবাসের কাজ জোর চলিতেছে। পূর্ব্বের চাইতে এখন ৩০খানি নূতন ট্রাক্টর বেশী আছে। বয়রা তালুকের কাপুরা নামক স্থানে সমবায় নীতিতে তুলা বিক্রয় আরম্ভ করা হইয়াছে। কাদী জিলার ৬টি তালুকের ২৪টি কৃষি ক্ষেতে পুসার সরকারী ফার্ম্মের মত গমের ফলন বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা চলিতেছে। মাসুপুরে জমির নীচে ১১৭ হাত গভীর এক

জলের উৎস খনন করা হইতেছে। বড়োদার কৃষি-ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের কাজ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং এই বিভাগের কাজের সুবিধা করিয়া দিবার জন্য নূতন আইন কায়েম করা হইয়াছে।

উন্নত গম

পুসার গম সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচলন করিবার কাজে এবং ফলের চাষের প্রসার জন্য কাদী জিলার জগুদান ফার্ম্ম উল্লেখযোগ্য কাজ করিয়াছে। স্থানীয় অধিবাসীর প্রচলিত মতবাদের জন্য আধুনিক উন্নত প্রণালীতে কৃষি কাজ চালাইতে দাবৈওয়াদ্দানা ফার্ম্মকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছে। বড়োদা সরকার ওয়াদ্দানায় বহু টাকা ব্যয়ে জলাশয় খনন করাইয়াছেন। ওয়াদ্দানা ফার্ম্মটি যাহাতে স্থানীয় কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া ভালভাবে কৃষির কাজ চালাইতে পারে সরকারের সেদিকে নজর দিবার যথেষ্ট কারণ আছে। ফার্ম্মটি না চলিলে সরকারের জলাশয়-খনন জন্য অর্থ-ব্যয়ের কোনই সার্থকতা হইবে না।

তুলা-বিক্রয়ের সমবায়

যৌথ প্রথায় তুলা-বিক্রয়ের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনে অভাবনীয় ফল পাওয়া গিয়াছে। বড়োদায় এই ব্যবস্থা কায়েম করার ফলে ব্যক্তিগত ভাবে বিক্রয়ে কোন কোন জিলার অধিবাসী যে টাকা পাইত তাহা অপেক্ষা প্রায় দুই হাজার টাকা বেশী পাইয়াছে। কৃষিবিভাগ অন্যান্য সকল প্রধান তুলাকেন্দ্রে এইরূপ ব্যবস্থা স্থায়ী ভাবে কায়েম করিবার চেষ্টায় আছেন।

সরকারী কূপ

বড়োদায় মরশুম কৃষির অনুকূল হইলেও স্থানে স্থানে জল-সরবরাহের অভাব খুব বেশী পরিলক্ষিত হয়। এ বৎসর সরকারী কৃষি-বিভাগ ৭১টি কূপ খননের চেষ্টা করেন, তার মধ্যে মাত্র ৪৬টিতে কৃতকার্য্য হওয়া গিয়াছে।

জুনমাসের বহির্ব্বাণিজ্য

কমার্সিয়াল ইণ্টেলিজেন্স বিভাগ (ব্যবসা-সংক্রান্ত সংবাদ সরবরাহ দপ্তর) কর্ত্তৃক প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যায়, মে মাসের তুলনায় জুন মাসের আমদানি-রপ্তানি হ্রাস পাইয়াছে, কিন্তু পুনঃ রপ্তানি বৃদ্ধি পাইয়াছে। জুন মাসে মোট ১৬,৩৪,০০,০০০ টাকার মাল আমদানি করা হয়। ইহাতে দেখা যায় মে মাসের চাইতে ৩,৫৮,০০,০০০ টাকার মাল কম আমদানি করা হইয়াছে। ভারত-জাত পণ্যদ্রব্যের রপ্তানি মালের মূল্য জুন মাসে ২৪,১৬,০০০,০৬, টাকা দাঁড়ায়, কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী মাসে ইহা ২৪,৪৮,০০,০০০, টাকা ছিল। জুন মাসে পুনঃ রপ্তানি বৃদ্ধি পাইয়া ১৫ লক্ষ হইতে ৬৮ লক্ষে গিয়া পৌছিয়াছে।

সোনারূপার আমদানি-রপ্তানি

ব্যবসায়িগণের পাওনা হিসাবে কারেন্সি নোট সমেত জুন মাসে ৩,৭২,০০,০০০ টাকা এদেশে আসে। মে মাসে ঐ টাকার পরিমাণ ছিল ৪,৮৬,০০,০০০ এবং বিগত বৎসরের জুন মাসে উহা ছিল ১,৪৬,০০,০০০।

বিগত বৎসরের তুলনায় সোনারূপার আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

এপ্রিল হইতে জুন তিন মাসের হিসাব

[বৃদ্ধি (+), হ্রাস (—)]

	১৯২৬ (লক্ষটাকা)	১৯২৫ (লক্ষটাকা)	১৯২৫এর তুলনায় ১৯২৬ (লক্ষটাকা)
স্বর্ণের আমদানি	৭,৩৭	৬,৯১	+৪৬
স্বর্ণের রপ্তানি	৪	৮	— ৪
রৌপ্যের আমদানি	৫,৩২	৫,২৪	+ ৮
রৌপ্যের রপ্তানি	৩৪	৪৪	—১০

আমরা বেচি বেশী, কিনি কম

১৯২৬ সনের জুন মাসের ব্যবসায়ে ভারতের যত আমদানি হইয়াছে তাহা অপেক্ষা ৪,৮৩,০০,০০০টাকা বেশী রপ্তানি হইয়াছে। মে মাসে এই সংখ্যা ছিল মাত্র ৪১ লক্ষ টাকা, কিন্তু, বিগত বৎসরের জুন মাসে এই সংখ্যা ছিল ১৪,৫২,০০,০০০। ১৯২৬ সনের জুন মাস পর্য্যন্ত তিন মাসে ভারতে যত আমদানি হইয়াছে তাহা অপেক্ষা

৯,১২,০০,০০০ টাকা বেশী রপ্তানি হইয়াছে। বিগত বৎসর ঐ সময়ে ইহা ছিল ৩৫,৭১,০০,০০০ টাকা।

ভারতে বিদেশী খাদ্যদ্রব্য

১৯২৫ সনের জুন মাসে ১৬,৮০,০০,০০০ টাকার আহার্য্য পানীয় ও তামাক প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য আমদানি করা হইয়াছিল। এ বৎসর কিন্তু ঐ সময়ে উহা হইতে ৮ লক্ষ টাকা মূল্যের জিনিষ কম আমদানি করা হইয়াছে। বিগত বৎসর জুন মাসে ১২,৪৫,০০,০০০ টাকা মূল্যের কারখানা-জাত মাল আমদানি করা হয়। এ বৎসর ঐ সময়ে উহা হইতে ৯ লক্ষ টাকার মাল কম আমদানি করা হইয়াছে। পরন্তু, কাঁচা মালের দাম সেই ১৯২৫ সনের মতন ১৮০ লক্ষ টাকাই রহিয়াছে।

আহার্য্য, পানীয়, তামাক এবং চিনির আমদানি ৬৩ লক্ষ টাকা মূল্যের ২৫ হাজার টন হইতে ৪৩ লক্ষ টাকা মূল্যের ১৭ হাজার টনে নামিয়া গিয়াছে। কাঁচা মালের মধ্যে কেরোসিন ছাড়া খনিজ তেলের আমদানি ১৪ লক্ষ টাকা কমিয়া গিয়াছে।

বিদেশী কাপড়চোপড়

কারখানা-জাত মালের হিস্যায় ২১লক্ষ টাকা মূল্যের ২১০ লক্ষ গজ সূতার কাপড়ের আমদানি বৃদ্ধি পায়। শ্বেত ও রঙ্গিন বস্ত্র যথাক্রমে ২০ ও ১০ লক্ষ টাকা মূল্যের ৮০ ও ৪০ লক্ষ গজ আমদানি করা হয়। ধূসর বস্ত্র ৮০ লক্ষ গজ বেশী আমদানি করা হয়; কিন্তু বাজার দর পড়িয়া যাওয়ায় ইহার মূল্য ১১ লক্ষ টাকা হ্রাস পায়।

অন্যান্য আমদানি

লোহালক্কড় ও ইস্পাত এবং তুলা ও কৃত্রিম রেশম-বস্ত্রের আমদানি যথাক্রমে ১৭ ও ১৩ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু রেলওয়ে প্লাণ্ট ও রোলিংষ্টক ২৯ লক্ষ, কলকারখানার যন্ত্রপাতি ৩৩ লক্ষ এবং সূতার আমদানি ১৬ লক্ষ টাকা হ্রাস পায়।

বিদেশে ভারতীয় খাদ্যদ্রব্য

ভারতীয় পণ্যসম্ভার—খাদ্য, পানীয় এবং তামাক ১৯২৫ সনের জুন মাসে যাহা বিদেশে রপ্তানি করা হইয়াছিল তাহার কিম্মৎ দাঁড়াইবে ৫,৩৯,০০,০০০ টাকা, কিন্তু এ বৎসর ঐ সময়ে খাদ্যদ্রব্যের, বিশেষ করিয়া ২,১০,০০,০০০ টাকা মূল্যের গম ও চাউলের, রপ্তানি কম হওয়ায় এবার ভারতের রপ্তানির হিস্যা ২,১৩,০০,০০০ টাকা হ্রাস পাইয়াছে। এবার ১২ লক্ষ টাকা মূল্যের চা বেশী রপ্তানি হইয়াছে।

তূলা, তিসি, চামড়া, পাট

বিদেশে রপ্তানি কাঁচা মাল ও শিল্প দ্রব্য ১১,২৭,০০,০০০ হইতে ৭,২০,০০,০০০ টাকায় নামিয়া যায়। এই বিভাগে ৫,৮৩,০০,০০০ টাকার তুলা ও ১,৭২,০০,০০০টাকার তিল সর্ষপাদি শস্য কম রপ্তানি হয়। ইহার মধ্যে একমাত্র তিসিই ৯৭ লক্ষ টাকা কম চালান হয়। ১১ লক্ষ টাকার কাঁচা চামড়া কম রপ্তানি হইয়াছে। কিন্তু ৫২ লক্ষ টাকার পাট বেশী রপ্তানি হইয়াছে।

অন্যান্য রপ্তানি

বিদেশে রপ্তানি ৫০ হাজার টন তুলার মধ্যে একমাত্র জাপান ও চীন একত্রে ৩৫ হাজার টনের অর্থাৎ শতকরা ৭০ ভাগের খরিদ্দার। বাকী ৩০ভাগ ইতালী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মাণি প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হয়। ৮২,০০০,০০ হইতে ১,৩৪,০০,০০০ টাকার যথাক্রমে ১৫,২০০ টন হইতে ২৫,৬০০ টন পাট বিদেশে চালান দেওয়া হয়। শিল্পজাত দ্রব্য ২৭ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৭,১৯,০০,০০০ টাকায় গিয়া পৌছে। আফিং ১৫, সীসা ৯ ও দস্তা ৭ লক্ষ টাকার বেশী রপ্তানি করা হয়।

ভারতে বিদেশী বাজার

১৯২৫ সনের জুন মাসে ইংল্যাণ্ড শতকরা ৫২ভাগ মাল ভারত হইতে আমদানি করিয়াছিল। ১৯২৬ সনের জুন মাসে ঐ সংখ্যা ৪৬এ নামিয়া গিয়াছে। ইংল্যাণ্ডের রপ্তানি শতকরা ২০ হইতে ১৬তে নামিয়াছে। জার্ম্মাণি জাপান ও যুক্ত রাষ্ট্রের হিস্যায় পড়িয়াছে যথাক্রমে শতকরা ১০,৮,৮ ভাগ আমদানি ও ৭,১৫,২২ রপ্তানি।

গ্রীসে রাজস্ব ও মুদ্রা-সংস্কার

গ্রীসে সরকারী কর্জ্জের একটা নতুন কায়দা দেখিতে পাইতেছি। সেনাপতি পাঙ্গালস মন্ত্রিপ্রধান হইবামাত্রই দেশের লোককে দুইটা কর্জ্জ লইতে বাধ্য করিয়াছেন। গবর্মেণ্টের রাজস্ববিভাগের সংস্কার সাধন করাই হইতেছে মতলব। মোটের উপর ২,০০০ মিলিয়ান দ্রাখ্‌ম (প্রায় ৮ কোটি টাকা) এর বরাদ্দ।

এই দুই কর্জ্জের দ্বারা এতদিন যে সকল ছোট-খাট কর্জ্জ ছিল সেই সমুদয়ের কিনারা করা হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে কাগজের টাকা কমাইয়া "ইন্‌ফ্লেশ্যন" (মুদ্রার পরিমাণের অতিবৃদ্ধি) বন্ধ করা হইতেছে।

গ্রীক কর্জ্জের কায়দা

প্রথম কর্জ্জটার পরিমাণ ১,২৫০ মিলিয়ান দ্রাখ্‌ম্ (প্রায় ৫ কোটি টাকা)। বিশ বৎসর পরে,—১৯৪৬ সনে এই দেনা শোধ করা হইবে। সুদ শতকরা ৬৲। ১৯২২ সনে যে কর্জ্জ লওয়া হইয়াছিল সেই কর্জ্জের আয় বর্ত্তমান কর্জ্জের জন্য বন্ধক রাখা হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক-নোট যাহাদের হাতে আছে তাহারা সকলেই সরকারকে কর্জ্জ দিতে বাধ্য। প্রত্যেককেই নিজ নোটের চার ভাগের এক ভাগ কর্জ্জ দিতে বাধ্য করা হইয়াছে। ২৫ দ্রাখ্‌মের (প্রায় ১৲) উপর নম্বরের নোটগুলা ভাঙ্গাইয়া দেওয়া হইতেছে। বার আনা অংশ লোকেরা পাইতেছে নতুন নোটে, আর চার আনা প্রত্যেকের নামে কর্জ্জদাতা হিসাবে জমা করা হইতেছে। এই উপায়ে পুরাণো নোটগুলা বাজার হইতে উঠিয়া যাইতেছে। রাজস্বের এবং মুদ্রার সংস্কার এক সঙ্গে সাধিত হইতেছে।

চতুর্থাংশের নোটগুলা বন্ধক রাখিয়া লোকেরা যে-কোনো ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা পাইতে পারিবে। গবর্মেণ্টের জিম্মাদারি খোলাখুলি স্বীকৃত হইয়াছে। আর বার আনা অংশের নোটগুলাকে গবর্মেণ্ট শীঘ্রই নতুন এক প্রকার নোট কায়েম করিয়া বাজার হইতে সরাইয়া লইবার ব্যবস্থা করিবেন।

বাধ্যতা-মূলক সরকারী কর্জ্জ

দ্বিতীয় কর্জ্জটার পরিমাণ ৭৫০ মিলিয়ান দ্রা (প্রায় ৩ কোটি টাকা)। স্বদেশ-রক্ষা-ধনভাণ্ডার নামে যে পুরাণা সরকারী কর্জ্জ আছে সেইটার কিয়দংশ শোধ করিবার দিন-ক্ষণ আসিয়াছে। কিন্তু তাহা শোধ করা হইবে না। তাহা একটা নতুন কর্জ্জস্বরূপ বাজারে খাড়া করা হইল। অবশ্য গবর্মেণ্টের সরকারী ব্যাঙ্ক এই কর্জ্জের পশ্চাতে হাজির আছে। এই কর্জ্জটা বেশী দিন স্থায়ী হইবে না। ১৯২৭ সনের মার্চ মাসে স্বদেশরক্ষা-ভাণ্ডারের যে কর্জ্জ শুধিবার কথা সেই সমস্তটা তৎক্ষণাৎ নগদ সমঝিয়া দেওয়া হইবে এইরূপ ব্যবস্থা করা হইল।

দ্রাখ্‌ম ও পাউণ্ড

এই দুই কর্জ্জের ফলে দুনিয়ার বাজারে দ্রাখ্‌মের দর চড়িতে সুরু করিয়াছে। বিলাতী পাউণ্ডের বদলে পাওয়া যাইতেছিল ৩৮০-৪০০ দ্রা। মুদ্রা সংস্কারের আইন জারি হইবামাত্র ৩৫০ দ্রা তে পাউণ্ড পাওয়া যাইতেছে।

আমেরিকায় চাউলের ব্যবহার

আমাদের দেশের ধারণা আমরাই বুঝি শুধু ভাত খাই, কিন্তু এ কথা সত্য নয়। "আবাদ" বলিতেছেন,—আমেরিকায়

আজকাল চাউলের ব্যবহার বাড়িতেছে। সেখানে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে, চাউল অপেক্ষাকৃত অধিক পুষ্টিকর। একজন মানুষকে বাঁচিতে হইলে ৫৪০০ কেলোরি অগ্নি-উত্তাপ প্রয়োজন হয়। অর্দ্ধসের চাউলে প্রায় ১৫৯০ কেলোরি পাওয়া যায় অর্থাৎ একটী মানুষের এক সের চাউল খাইলে চলে। পরীক্ষার পর হইতে আমেরিকায় চাউলের ব্যবহার বাড়িতেছে এবং ধানের চাষ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। সেখানে বৎসরে মানুষ পিছু ২॥ আড়াই সের চাউলের প্রয়োজন।

দক্ষিণ আমেরিকায় চাউলের ব্যবসা

দক্ষিণ আমেরিকায় চাউলের ব্যবহার অধিক। এখানে ধানের চাষও যথেষ্ট হয়। ব্রেজিল দেশেই ইহার চাষ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। আমেরিকায় প্রধানতঃ দক্ষিণ চীন ও ভারতবর্ষ হইতে চাউল আসে। প্রায় ৭৯ লক্ষ মণ চাউলের আমদানি সে দেশে হইয়া থাকে। তন্মধ্যে এক ভারতবর্ষই এক-তৃতীয়াংশ প্রেরণ করে। অর্থাৎ এখন প্রায় ২৫ লক্ষ মণ চাউল আমরা সে দেশে পাঠাই। আমরা চেষ্টা করিলে আরও অধিক পাঠাইতে পারি। ১৯২২ সনে আমরা ১৪ লক্ষ মণ পাঠাইয়াছিলাম, ১৯২৩ সনে ২০ লক্ষ মণ ও ১৯২৪ সনে প্রায় ২৫ লক্ষ মণ। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে ক্রমেই সে দেশের সহিত আমাদের ব্যবসা বাড়িয়া চলিয়াছে। আমাদের অগ্রসর হইয়া এই ব্যবসাটী হস্তগত করিতে হইবে।

আমেরিকার রাইস এক্সচেঞ্জ

আমেরিকার সবই নূতন। সেখানে ব্যবসা করিতে হইলে—"এক্সচেঞ্জ" এর দরকার। এক্সচেঞ্জকে দালালের বাজার বলা যায়—অর্থাৎ এখানে কেনা-বেচা দালাল মারফৎ চলে। আবার যে-সে দালাল হইলে চলিবে না, সেই বাজারের নিজস্ব দালাল চাই। আমেরিকার গম, চিনি, রবার সকল দ্রব্যেরই এক্সচেঞ্জ আছে। এবার চাউলেরও এক্সচেঞ্জ নূতন স্থাপিত হইয়াছে। এ বাজারে প্রত্যেক সওদার পরিমাণ ৫০০ মণের কম হইলে চলিবে না। প্রত্যেক সওদার জন্য ক্রেতা ও বিক্রেতা প্রত্যেককেই ৬০০ টাকা জমা দিতে হয়। মাল খরিদ করিবার পর একটী রসিদ পাওয়া যায়। মাল এক মাসের মধ্যে ছাড় করিতে হয়। এই সময়ের মধ্যে মাল ইচ্ছা করিলে লইয়া যাইতে পারা যায় বা রসিদ বাজারে বিক্রয় করা যায়। এই প্রকার আদান-প্রদান সুবিধাজনক। প্রথমতঃ, মাল বুঝিয়া পাওয়া যায়, ঠকিবার কোনো সম্ভাবনা নাই; দ্বিতীয়তঃ, মাল যখন দরকার তখনি ছাড়ানো যায়, গুদামের হাঙ্গাম নিজেদের বহিতে হয় না। তৃতীয়তঃ, চাষীরা এই রসিদ দেখাইলে ব্যাঙ্ক টাকা ধার দেয় এবং সময়ে মাল সমস্ত নিজেদের ঘরে তোলে।

সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে মজুর-ব্যাধির প্রতিকার

মজুরেরা কারখানায় কাজ করিতে করিতে শিল্প-সংক্রান্ত প্রক্রিয়ার দরুণ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া থাকে। তাহার জন্য কারখানার মালিকেরা হয়ত অনেক সময়েই সকলে দায়ী নয়। শিল্পকর্ম্মের প্রকৃতিই এই সকল ব্যাধির কারণ। এই তথ্য লক্ষ্য করিয়া সুইস গবর্মেণ্ট ১৮৭৭ সনে মজুর-ব্যাধির প্রতীকার (লা রেপারাসিঅঁ দে মালাদি প্রোফেশ্ননেল) বিষয়ক আইন জারি করেন। সুইটসার্ল্যাণ্ডের দেখাদেখি অন্যান্য দেশেও আজকাল এইরূপ আইন জারি হইয়াছে।

কোন্ কোন্ শিল্পকর্ম্মের কারখানা এই আইনের তাঁবে আসিবে তাহার তালিকা করা আছে। ১৮৮৭ সনে ২২টা বস্তুর নাম করা ছিল। আজ কাল তালিকায় ৮২টা নাম দেখা যায়। বস্তুগুলা প্রধানতঃ রাসায়নিক গ্যাস-বিষ সংক্রান্ত।

কারখানার শিল্প-কর্ম্মই যে ব্যাধির জন্য দায়ী তাহা প্রমাণ করা অবশ্য মজুরের কর্ত্তব্য। কিন্তু গবর্মেণ্ট স্বয়ংই মজুরের পক্ষ লইয়া এই দিকে সকল প্রকার অনুসন্ধান চালাইয়া থাকেন।

প্রতীকারের জন্য কারখানার মালিকেরা দায়ী। "দৈব" সম্বন্ধেও যে আইন, শিল্পজনিত ব্যাধির প্রতীকার সম্বন্ধেও সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের আইন ঠিক তাই।

মেক্‌সিকোর জমিদার

"আবাদ" বলিতেছেন,—মেক্সিকোতে এক নতুন আইন পাশ হইয়াছে। এই আইনের বলে সরকার এখন জমিদারদিগকে তাঁহাদের জমিতে জলের ব্যবস্থা করিতে বাধ্য করিবেন।

সরকার দেখিয়াছেন—মেক্সিকোতে জলাভাবে ফসল ভাল জন্মে না, আবার জন্মিলে শুকাইয়া যায়। তাই এই আইন। যে জমিদার এই কার্য্য করিতে অপারগ, সরকার তার জমিতে জলের বন্দোবস্ত করিবেন এবং জমিদারের খানিকটা জমি এই কাজের মূল্যস্বরূপ লইবেন। এই জমি সরকারের খাস হইবে এবং সরকার ইহা দরিদ্র প্রজাদের মধ্যে বিলি করিবেন।

ফরাসী-ইতালিয়ান শুল্ক-সমঝোতা

ইতালিয়ান মাল ফরাসী বাজারে চালাইবার জন্য দুই দেশে বুঝা-পড়া চলিতেছে। ফ্রান্সের গবর্মেণ্ট শুল্কের হার কথঞ্চিৎ নরম করিতেছেন। রেশম সম্বন্ধে সমঝোতা কায়েম হইতেছে। লোহার ঝড়তি-পড়তি বা রদ্দি মাল লইয়াও শুল্কের উঠানামা আলোচিত হইয়াছে। শ্যাম্পেন মদের বাজার বাড়াইবার ব্যবস্থাও করা হইল।

রোমের "পপল দিতালিয়া" কাগজের সাংবাদিককে মন্ত্রী বেলুৎস বলিয়াছেন :—"ফরাসী-ইতালিয়ান শুল্ক-সমঝোতায় দুই দেশের বন্ধুত্ব নিবিড়তর হইয়া উঠিতেছে।"

মার্কিণ কর্ম্মকেন্দ্রে বিবাহিতা নারী

আজকাল আমেরিকায় প্রায় ২,০০০,০০০ বিবাহিতা নারী বাহিরে খাটিয়া অন্নসংস্থান করে। ১৮৯০ সনে অর্থাৎ প্রায় ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এই সংখ্যা ছিল মাত্র ৫০০,০০০।

১৯১৩ সনে কারখানায় যত স্ত্রী-মজুর কাজ করিত তাহার ভিতর শতকরা ৪১ জন ছিল বিবাহিতা। ১৯২৩ সনের ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌সে অনুপাত দাঁড়াইয়াছে শতকরা ৮৮। নারী মজুরদের শতকরা ১২ জন মাত্র অনূঢ়া।

পরিবারের "অন্নদাতা" নারী

বিবাহিতা নারীদের রোজগার পারিবারিক খরচের জন্যই ব্যবহৃত হয়। ইহারা বাহিরে খাটিতে না গেলে স্বামিপুত্রকন্যার অন্ন-সংস্থান অসম্ভব। অর্থাৎ একমাত্র স্বামীর রোজগারে গোটা সংসার চলিতে পারে না। অঙ্ক কষিয়া দেখা গিয়াছে যে, আজকাল যত বিবাহিতা নারী টাকা রোজগার করিয়া আনে তাহাদের শতকরা ৯৫ জনই পরিবারের আংশিক বা পুরাপুরি "অন্নদাতা।"

শিশু-মৃত্যু বাড়ে নাই

মেয়েরা রোজগার করিয়া স্বামিপুত্রকন্যাকে খোর-পোষ দিতেছে। ইহা বর্ত্তমান আমেরিকার এক মস্ত আর্থিক তথ্য। ইহাতে সমাজের কোনো অমঙ্গল ঘটিতেছে কি ? একটা তরফ হইতে খাঁটি তথ্য পাইতেছি। সে শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা। যে-যে পরিবারে মা চাকরি করিতে যায় না, সেইসকল পরিবারে শিশু-মৃত্যু গুনতিতে যত, খেটে-খাওয়া নারীর পরিবারে তাহার চেয়ে বেশী নয়। অর্থাৎ বাহিরে খাটিতে যাওয়ায় আর গৃহস্থালীর কাজকর্ম্মে সকল সময় দেওয়ায় এই হিসাবে কোনো প্রভেদ নাই। বরং রোজগার বাড়িয়া যাইবার জন্য সমগ্র পরিবারের জীবনযাত্রা প্রণালীতে উন্নতি লক্ষ্য করা যায়।

জাভার চিনি

১৮৯৪ সনে জাভায় চিনির জন্য ৫২৫ লক্ষ বিঘা জমিতে চাষ হইত, আর ১৯২৫ সনে ইহার পরিমাণ বাড়িয়া ১ কোটী ১২ লক্ষ বিঘা হইয়াছে। ১৮৯৯ সনে চিনি জন্মাইত ৮৪ লক্ষ মণ, আর ১৯২৫ সনের চিনির পরিমাণ সাড়ে তিন কোটী মণ। জগতে যে পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হয় তাহার ভিতর শতকরা ১৪ ভাগ জাভাতে জন্মায়।

রুশ বাণিজ্যে জার্ম্মাণির সরকারী সাহায্য

রুশিয়ায় জার্ম্মাণ মাল চালান হইতেছে হরদম। কিন্তু রুশিয়া থেকে টাকা আদায় হইতে সময় বেশী লাগে।

বিদেশীদের হিসাবে রুশিয়ার দেনাদারেরা ভারতীয় দেনাদারদের মতন কিছু বেশী ঢিলে। অর্থাৎ ৩।৪।৫।৬ মাসের আগে ইহারা দাম সমঝাইয়া দিতে পারে না। জার্ম্মাণ গবর্মেণ্ট কিন্তু রুশ দেনাদারদের উপর বিশ্বাস রাখেন। এই জন্য জার্ম্মাণ বেপারীদের রপ্তানি-বাণিজ্যে গবর্মেণ্টের সাহায্য জুটিয়াছে। ৩০ কোটি মার্ক (এক মার্কে বার আনা) পর্য্যন্ত গবর্মেণ্ট এই সাহায্যের জন্য খরচ করিতে প্রস্তুত। রুশ আমদানিকারকেরা যথাসময়ে টাকা দিতে না পারিলে জার্ম্মাণ বেপারীরা নিজ গবর্মেণ্টের নিকট হইতে সুদে আসলে মূল্য ফেরৎ পাইবে এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

এইরূপ ব্যবস্থা বিলাতেও আছে। ফ্রান্সেও এই সম্বন্ধে আইন কায়েম হইতেছে।

জাপানী কারখানায় দৈব-সংখ্যা

রাত্রিকালে কারখানায় কাজ করার ফলে মনোযোগ-শক্তি হ্রাস পায়। তাহার ফলে দৈব-দুর্ঘটনা বৃদ্ধি পায়। জাপানের কোনো এক কারখানায় ২৩ মাসে দিনরাত্রি নিযুক্ত ৮ হাজার শ্রমিকের মধ্যে ১৫৭৩ জখম হয়। প্রাতঃকালে দুর্ঘটনার সংখ্যা শতকরা ঘণ্টায় ২.৭ হইলে অপরাহ্ণে হয় ৫.৮ এবং রাত্রে তাহা একেবারে ডবল দাঁড়ায় অর্থাৎ ১০.৩।

জাপানে স্ত্রী-মজুর

১৯২৫ সনের শেষভাগে জাপানে মোট ৮৫৭৯৩০ জন স্ত্রী-মজুর ছিল। ইহার মধ্যে ১৫ থেকে বিশ বছর বয়সের মজুরের সংখ্যা ১১৫ ৮০১। আর ইহাদের অধিকাংশকে রাত্রিদিন কারখানায় কাজ করিতে হইত। যে সমস্ত স্ত্রীলোককে **২৪ ঘণ্টা** চরকা চালাইতে হয় তাহাদের সংখ্যা দাঁড়াইবে ১৮৪,১৭৮। স্ত্রী-মজুরদের গড়পড়তা দৈনিক বেতন ৮৬ সেন (১ সেনে ১ পয়সা)।

কারখানায় ব্যাধি-মৃত্যু

বয়ন-কারখানায় নৈশ শ্রমের ফলে নারী ও নাবালক শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষয়রোগ, বদহজমী, বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি দেখা দেয়। ডাক্তার ইশাহারা অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন, নৈশ শ্রমের ফলে হাজার করা ২৩ জন স্ত্রী-মজুরের অকাল-মৃত্যু হয়। তাহা হইলে দেখা যায়, জাপানের কল-কারখানার ৮,৫৭,০০০ স্ত্রী-মজুরের মধ্যে বৎসরে ১৯৫৫০ জন বয়ন-কারখানার অমানুষিক নৈশ শ্রমের ফলে প্রাণত্যাগ করে।

ইস্পাতের কারবারে মুনাফা

ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ ষ্টীল কর্পোরেশ্যন নামক মার্কিণ ইস্পাতের কারবার জগদ্বিখ্যাত। ১৯২৫ সনের শেষ ত্রৈমাসিক আয় হইয়াছিল ৪২,২৮০,০০০ ডলার। পূর্ব্ববর্ত্তী ত্রৈমাসিক আয় ছিল ৪২,৪০০,০০০ ডলার।

অংশীদারেরা শেষ ত্রৈমাসিকে ডিভিডেণ্ড পাইয়াছে ২৩,৫৩৪,০০০ ডলার (অর্থাৎ প্রায় ৭ কোটি টাকা)। বুঝিতে হইবে যে, বৎসরে মোটের উপর প্রায় ২৮ কোটি টাকা মুনাফা উশুল হয়।

হাঙ্গারীতে জমির নূতন ব্যবস্থা

হাঙ্গারীর সরকার গরিব চাষীদিগকে জমি দেবার এক নূতন ব্যবস্থা করেছেন। তাঁরা বড় বড় জমিদারদের আয়ের উপর শতকরা ১৭ টাকা ট্যাক্স স্থাপন করেছেন। জমিদাররা অনেকেই এই টাকা দিতে পারেন নি। সরকার তাই তাদের খানিকটা করে জমি নিয়ে এই ট্যাক্স থেকে রেহাই দিয়েছেন। আর এই জমি, যাদের জমি কম তাদের দিয়েছেন আর যাদের জমি নেই তাদের দিয়েছেন। এই আইন হয়েছিল ১৯১৯ সনের ৭ই ডিসেম্বর। কথা ছিল যে পাঁচ বৎসর এই আইনের ফল দেখা যাবে। তার পর ফল ভাল না হলে আইন নাকচ করা হবে। গত বৎসর আইন সভায় এই আইন আবার পাশ হয়েছে। এতে অনেক ভাল হয়েছে। গরিব চাষীরা অনেকেই বেশ দু'পয়সার মুখ দেখছে। এবার আবার তাদের কম সুদে সরকার থেকে টাকা দেবার বন্দোবস্ত হচ্ছে ("আবাদ", কলিকাতা)।

বহির্ব্বাণিজ্যের ফরাসী সঙ্ঘ

বর্দো নগরে ফরাসী বহির্ব্বাণিজ্য-সঙ্ঘের তৃতীয় বার্ষিক কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হইয়া গেল (জুন ১৯২৬)। প্রেসিডেণ্ট ছিলেন সেনেটার ক্লেমেঁতেল। অন্যতম বক্তা ছিলেন ব্যার্জে। তাঁহার মতে, ফ্রান্সের বর্ত্তমান সমস্যা মীমাংসার প্রধান উপায় হইতেছে বিদেশে রপ্তানি বাড়ানো। তাহা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে শীঘ্র শীঘ্র ফরাসীদের বিদেশী দেনা শোধ হইবে না। তিনি জনগণের নিকট হইতে গবর্মেণ্টের জন্য স্বেচ্ছা-করও চাহিয়াছেন।

ব্যাঙ্কার বুইসঁর বক্তৃতা

ঐ কংগ্রেসে "বাঁক্ ন্যাশন্যাল ফ্রাঁসেজ দ্যু কম্যাস এক্‌স্তেরিয়্যর" নামক বাহির্ব্বাণিজ্য-সম্বন্ধীয় ফরাসী ব্যাঙ্কের প্রেসিডেণ্ট আলবেআর বুইসঁ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার কিয়দংশ নিম্নরূপ :—

"অন্যান্য দেশে বহির্ব্বাণিজ্যে সাহায্য করিবার জন্য সরকারের তরফ হইতে বেপারীদিগকে টাকা দেওয়া হইতেছে। ফ্রান্সেও সেইরূপ ব্যবস্থা করা উচিত। সরকারী সাহায্য লইবার বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি উঠা উচিত নয়। এই সম্বন্ধে আমার ব্যাঙ্ক ১৯২১ সনেই গবর্মেণ্টের নিকট প্রস্তাব তুলিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখনো বিশেষ ফললাভ হয় নাই।"

বহির্ব্বাণিজ্য-বীমা

এই বক্তৃতার পর কংগ্রেসে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়,—

প্রথমতঃ, ফরাসী গবর্মেণ্ট বিদেশী গবর্মেণ্টের কার্য্য-প্রণালী অনুসরণ করিয়া বহির্ব্বাণিজ্যে অর্থ-সাহায্য করিতে অগ্রসর হউন।

দ্বিতীয়তঃ, এই উদ্দেশ্যে বহির্ব্বাণিজ্য-বীমা সম্বন্ধে একটা প্রতিষ্ঠান কায়েম করা হউক। এই প্রতিষ্ঠান গবর্মেণ্টের নিকট হইতে দরকার হইলে ক্ষতিপূরণ পাইবে এই মর্ম্মে প্রথম হইতেই সরকারী দায়িত্ব কায়েম হউক।

তৃতীয়তঃ, বহির্ব্বাণিজ্যবিষয়ক যে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই ব্যাঙ্কের সঙ্গে এই নূতন বীমা-প্রতিষ্ঠানের নিবিড় যোগাযোগ আইনতঃ স্থাপন করা হউক।

আচার্য্য স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচেন্‌সলার আচার্য্য ব্রজেন্দ্র নাথের উপর সম্প্রতি রাজসম্মান বর্ষিত হইয়াছে। বাঙ্গালীর কাছে ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথের নূতন করিয়া পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। ছাত্রাবস্থা হইতেই দর্শনশাস্ত্রের উপর তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ সুবিদিত। যৌবনকালেই তাঁহার পাণ্ডিত্যের গৌরব দিগন্তব্যাপী হইয়া উঠে। তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অসীম অধ্যবসায়, কঠোর শ্রমস্বীকার, এবং পাঠে আগ্রহাতিশয্য অতুলনীয়। যৌবনেই তিনি যে সমস্ত পুস্তক পাঠ করিয়া সার-সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন. তৎকালীন বহু প্রাচীন সাহিত্যিক পণ্ডিতও ঐ সমস্ত পুস্তকের নাম পর্য্যন্ত শুনেন নাই। তিনি যে শুধু দর্শন এবং সাহিত্যেই কৃতবিদ্য এমন নহে, বিজ্ঞানেও তাঁহার অগাধ ব্যুৎপত্তি। প্রাচীন হিন্দুদিগের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সম্বন্ধে তিনি যে পুস্তক প্রণয়ন করেন তাহাই তাঁহার বিজ্ঞানানুরাগের পরিচায়ক। গণিত-শাস্ত্রেও তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য। নৃতত্ত্ব এবং অন্যান্য বিজ্ঞানে পারদর্শী বলিয়া ১৯১১ খৃঃ অব্দে তিনি লণ্ডন বিশ্বজাতি কংগ্রেসের প্রথম

অধিবেশনের সভাপতি নিযুক্ত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাসম্বন্ধীয় ব্যাপারে তাঁহার যে কৃতিত্ব দেখা গিয়াছে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষবর্গ তাহা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করেন। ডাঃ শীল নানা ভাষায় সুপণ্ডিত। রাজনীতিক্ষেত্রেও তাঁহার প্রতিভা কম নহে। তাঁহার রচিত "মহীশূর রাজ্যের কনষ্টিটিউশন্" হইতেই তাঁহার গভীর চিন্তাশীলতা ও রাজনীতিজ্ঞান প্রতিফলিত হইয়া পড়ে। ধনবিজ্ঞান বিদ্যায়ও তাঁহার অধিকার অসাধারণ।

রোমে আরণ্য কংগ্রেস

"প্রকৃতি" (কলিকাতা) বলিতেছেন,—সম্প্রতি রোম নগরে একটি বিরাট আরণ্য-কংগ্রেসের বৈঠক হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের প্রতিনিধি স্বরূপ অধ্যাপক ষ্টেবিং তথায় উপস্থিত ছিলেন। ইনি পূর্ব্বে ভারত-সরকারের আরণ্য বিভাগের প্রধান কীটতত্ত্ববিৎ ছিলেন। ইংলণ্ডের প্রতিনিধি লর্ড লভাট এবং এতদ্ভিন্ন জার্ম্মাণি, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্সী, ব্রেজিল, জাপান, স্পেন প্রভৃতি নানা দেশ হইতে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। বিগত ২৯শে এপ্রিল ইটালির রাজা ও মুসলিনী সভার উদ্বোধন-কার্য্য সম্পাদন করেন। কয়েকটি বিভাগের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলে নানা দিক হইতে আলোচনা হইল অরণ্যের উৎকর্ষ-সাধনে রাষ্ট্রশক্তি কি ভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত; আর্থনীতির দিক হইতে গাছপালার উপকারিতা কিরূপ; আইন কানুন কি ভাবে বিধিবদ্ধ হইলে অরণ্য রক্ষা সুসম্পন্ন হয়; আরণ্য-কৃষি সম্বন্ধে শিক্ষাবিস্তার সাধারণ্যে কি ভাবে হওয়া উচিত, কাষ্ঠ এবং অন্যান্য অরণ্যজাত দ্রব্যের ব্যবসায় কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিলে বিশেষ শুভ ফল পাওয়া যাইতে পারে; গিরিনির্ঝর সংযত করা কখন আবশ্যক হইয়া পড়ে; বৃক্ষহীন পাহাড়তলীতে কেমন করিয়া বন্যপাদপ উৎপন্ন করা যাইতে পারে; বিশেষতঃ উষ্ণপ্রধান দেশের জঙ্গল সম্বন্ধে গবেষণার প্রসার বৃদ্ধি কত দূর সম্ভবপর।—এই সমস্ত বিষয় সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলী ধীর ভাবে আলোচনা করিয়া কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। যে সকল প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছিল, কংগ্রেসের সম্মতিক্রমে তাহা বিভিন্ন ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়া প্রচারিত হইল। প্রায় আড়াই শত প্রবন্ধের মধ্যে কতকগুলির সংক্ষিপ্তসার পঠিত হইয়াছিল।

আমেরিকার বৃটিশ চেম্বার অব কমার্স

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ইংরেজ বণিকদের এক সঙ্ঘ আছে। তাহার তত্ত্বাবধানে একটা মাসিক পত্র বাহির হইয়া থাকে, এক সংখ্যায় বলা হইয়াছে যে,—পুঁজিপতি মালিকেরা মজুর ও কেরাণীদিগকে যথোচিত মজুরি ও বেতন না দিলে ব্যবসায়ে উন্নতি ঘটিতে পারে না, সমাজেও শান্তি আসিবে না। পুঁজিপতিরা আজকাল পুঁজিপতিদিগকে নিজ নিজ কর্ত্তব্য শিখাইতেছেন। ইহা বর্ত্তমান আর্থিক জগতের এক নতুন লক্ষণ।

বোম্বাইয়ের ভারতীয় বণিক-সঙ্ঘ

বিদেশ হইতে বিস্তর মাল ভারতীয় গবর্মেণ্টের জন্য খরিদ হইয়া আসে। অন্যান্য বিদেশী মাল আমদানির উপর যেমন শুল্ক চাপানো হয় সরকারের জন্য আমদানি মালের উপর সেরূপ করা হয় না। বস্তুতঃ, শুল্কটা চাপানো হয় বটে, কিন্তু আমদানিকারকে আবার ফেরৎ দেওয়া হয়।

এই প্রণালীর বিরুদ্ধে বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান মার্চ্চ্যাণ্টস্ চেম্বার গবর্মেণ্টের নিকট প্রতিবাদ তুলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে বিদেশী মালের উপর শুল্ক না থাকিলে স্বদেশী শিল্প টিঁকিতে পারিবে না। ইহাতে দেশের ক্ষতি হইতেছে। তাঁহাদের আর একটা প্রস্তাব উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, যে সকল মাল বিদেশে কিনিতেই হইবে সেই সমুদয়ের দাম ভারতীয় সিক্কায় নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। বিলাতী পাউণ্ডে দরদস্তুর করিতে গেলে স্বদেশী বেপারীদের লোকসান হয়।

ফ্রান্সে ২০০ ইতালিয়ান এঞ্জিনিয়ার

ইতালির ২০০ শত বিজলী-পূর্ত্তবিৎ (ইলেক্‌ট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ার) ফ্রান্সের বিভিন্ন পল্লী-নগরে শফর করিতে

আসিয়াছিলেন। ফরাসী বৈদ্যুতিক কারখানাসমূহের পর্য্যবেক্ষণ এবং খতিয়ান করা উদ্দেশ্য ছিল। লুর্শ, মৎরজ্যো, তুলুজ ইত্যাদি জনপদের কারখানাগুলা ভাল করিয়া দেখা হইয়াছে। পর্য্যটকদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম ইতালিয়ান বিদ্যুৎ-কারখানার উপ-সভাপতি প্যাৎসনে এবং ইতালির রেলশাসন-কর্ম্মকেন্দ্রের অন্যতম মাতব্বর লাম্বানজাতি।

বাষ্পযন্ত্রের মালিকদের বৈঠক

জুন মাসের মাঝামাঝি লিঅঁ শহরে যন্ত্রপতিদের একটা বার্ষিক মজলিশ বসিয়াছিল। এই শহরের যে সকল কারবারী বাষ্পযন্ত্রের মালিক তাঁহারা পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ এই ধরণের বার্ষিক চালাইয়া আসিতেছেন। এবারকার মজলিশে বেলজিয়াম, সুইটসার্ল্যাণ্ড, ইতালি এবং সার-জনপদের যন্ত্রপতিরাও উপস্থিত ছিলেন। প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল, বাষ্পযন্ত্রের রক্ষণাবেক্ষণ। সঙ্গে সঙ্গে খরচ কমাইবার জন্য বাষ্পযন্ত্রের কলকব্জায় উন্নতিসাধন সম্বন্ধে তর্কপ্রশ্ন চলিতে থাকে। অধিকন্তু, কয়লা তেল ইত্যাদি ইন্ধনের সদ্ব্যবহার সম্বন্ধেও টেক্‌নিক্যাল সমস্যা বিশ্লেষিত হয়।

বার্লিনে শিল্প-বক্তৃতা

কিছুদিন হইল—"ইঞ্জেনিয়ার হাউস" নামক বার্লিনের পূর্ত্তবিদ্‌-ভবনে ডক্টর আড্‌লার বার্লিনের ট্রাম, রেল ও লরি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। সেই দিনই আমেরিকার বসতবাড়ীর নির্ম্মাণ-কৌশল সম্বন্ধে বক্তৃতা হয় "আকাডেমী ডার কিন্‌ষ্টে" নামক সুকুমার-শিল্প-পরিষদে। বক্তা ছিলেন বাস্তুশিল্পী পাউলসেন।

বার্লিনের টেক্‌নিক্যাল কলেজে পরের দিন বক্তৃতা দিয়াছিলেন রেল-বিশেষজ্ঞ রেথেনবাখ। আলোচ্য বিষয় ছিল জার্ম্মাণির বৈদ্যুতিক রেল। ঐ কলেজেই আর এক দিন বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয় পেরুর আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে। তুর্কীস্থানের সাহায্যে রুশিয়া কুদরতী মাল সম্বন্ধে কতটা আত্ম-নির্ভর করিতে পারে সেই বিষয়ে আর এক বক্তৃতা প্রদত্ত হইয়াছে।

কৃষক-রায়ত-সম্মিলন

অবসরপ্রাপ্ত সবজজ শ্রীযুক্ত লাটুবিহারী বসু, বি, এল মহাশয়ের সভাপতিত্বে ১৮ই আগষ্ট তারিখে কলিকাতার অ্যালবার্ট হলে কৃষক-রায়ত-সম্মিলনের সভা অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।

আলোচ্য বিষয় ছিল নিম্নরূপ :—

(১) প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন সম্বন্ধে সরকারি মতের প্রতিবাদ এবং পল্লী সমাজ ও রায়তের কল্যাণমূলক সংশোধনের ব্যবস্থা।

(২) পাটের মূল্য-হ্রাস-জনিত ক্ষতি নিবারণের চেষ্টা ও কৃষিজাত দ্রব্যের উচ্চ মূল্য প্রাপ্তির সমবায়াদি-মূলক সুব্যবস্থা।

(৩) রেলে ব্যবসায়ী কাপড়ওয়ালা, ছানা ও দুধওয়ালা এবং কৃষিজাত দ্রব্যাদি বিক্রেতাগণের যাতায়াত ও ভাড়ার অসুবিধা-নিবারণ।

(৪) আগামী নির্ব্বাচনে রায়তগণের হিতৈষী প্রতিনিধি প্রেরণ সম্বন্ধে কৃষক-রায়ত সভার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ।

মুদ্রাসংস্কার সম্বন্ধে

স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাস

স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস বলেন যে, "আমি রিপোর্টে যাহা বলিয়াছি, তাহার অতিরিক্ত আর কিছু বলিবার নাই; আমি যে সামান্য সময় পাইয়াছি, সে সময়ের মধ্যে আমার মতের সমালোচনা পাঠ করিয়াছি। আমি এই মাত্র বলিতে পারি যে, আমার মতের কোন একটী কথার জন্যও আমি দুঃখিত নহি। আমি যে সমস্ত কথা লিখিয়াছি, তাহা না লিখিলেই আমার অপরাধ হইত এবং আমি কখনও নিজেকে মাপ করিতাম না। আমার বিরুদ্ধে একটী অভিযোগ এই যে, আমি সমগ্র দেশের স্বার্থ না দেখিয়া কেবলমাত্র বোম্বাইয়ের স্বার্থ দেখিয়াছি। আমি একথা প্রমাণ করিতে বলিতেছি।"

১৮ পেন্সের স্বপক্ষে দাদাভাই

কারেন্সী কমিশনের রিপোর্ট সম্বন্ধে অভিমত দান কালে স্যার মানেকজী দাদাভাই বলিতেছেন—"আমি স্বীকার করি না যে, টাকার মূল্য ১৮ পেন্স হইলে কৃষকদের ক্ষতি হইবে। গত দুই বৎসর কার্য্যতঃ এই হার চলিয়া আসিতেছে। এই হারেই মূল্য এবং মজুরি স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে। কাজেই যদি ১৬ পেন্সের হার অবলম্বন করা যায়, তবে এই দেশের আর্থিক ক্ষেত্রে নিতান্ত গণ্ডগোল উপস্থিত হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, যদি ১৮ পেন্সের হার অবলম্বন করা যায়, তবে তাহার সমীচীনতা আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে প্রমাণিত হইবে।"

১৮ পেন্সের বিপক্ষে সেঠনা

মাননবর স্যার পি, সি, সেঠনা বলেন :—

"ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে। ব্যাবিংটন স্মিথ কমিটির রিপোর্টে স্যার দাদিভা দালাল একা ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরবর্ত্তী ঘটনায় তাঁহার কথাই ঠিক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল। স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাসের বেলায়ও ঠিক সেই ব্যাপারই ঘটিবে। তিনি তাঁহার বিশ্বাস মত কাজ করিয়াছেন। স্যার পুরুযোত্তম দাস যে কথা বলিয়াছেন তাহা একমাত্র বোম্বাইয়ের কথা নহে, সে কথা সমগ্র ভারতের পক্ষে সত্য। যখন এই কমিশন নিযুক্ত হয় তখন কমিশনের সদস্যবৃন্দ সম্বন্ধে লোকে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে এবং সেই জন্যই তখন স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাসকে সদস্যপদ গ্রহণ না করিতে অনুরোধ করা হইয়াছিল। স্যার পুরুষোত্তম দাস কমিশন বয়কট না করায় সে সময়ে সকলে তাঁহার উপর খাপ্পা হইয়াছিলেন। স্যার পুরুযোত্তম দাস রিপোর্টে স্বতন্ত্র মত প্রদান করিয়া তাঁহার কার্য্যের যৌক্তিকতা প্রমাণ করিয়াছেন। আমরা আশা করিয়াছিলাম যে, স্যার পুরুষোত্তমদাস তাঁহার সহকর্ম্মীদিগকে স্বমতে আনিতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইবার কারণ এই যে, গবর্মেণ্ট টাকার মূল্য ১৮ পেন্স ধার্য্য করার সঙ্কল্প পূর্ব্ব হইতেই করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্কল্প কমিশনকে

লিখিয়া জানাইয়াছিলেন। বোধ হয় এই জন্যই রিপোর্ট-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংবাদ প্রকাশিত হয় নাই।"

ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার বাহাল হইয়াছেন। শিক্ষা-ব্যবসায়ীর এই পদে নিযুক্ত হওয়া বোধ হয় আর কখনো ঘটে নাই। যদুবাবুকে লোকে সাধারণতঃ আওরাংজেবের ঐতিহাসিক বলিয়া জানে। ফার্শী কেতাব ঘাঁটাঘাঁটি করাই তাঁহার প্রধান কাজ সন্দেহ নাই। কিন্তু যৌবনে তিনি ইংরেজি সাহিত্যের চর্চ্চাও করিয়াছেন। পাশ্চাত্য জগতের আধুনিক ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং ইংরেজি সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ের অধ্যাপনা লইয়াই যদুবাবু শিক্ষাসংসারে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

ধনবিজ্ঞান-বিদ্যার অনুশীলনেও তিনি কিছু সময় কাটাইয়াছেন। তাঁহার লেখা "বৃটিশ ভারতীয় আর্থিক জীবন" বিষয়ক ইংরেজি গ্রন্থ বোধ হয় বি, এ ক্লাশের ছাত্রেরা আজও পড়িয়া থাকে। মোগল-মারাঠা ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস লিখিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি জমিজমার ব্যবস্থা, রাজস্বের কথা এবং অন্যান্য আর্থিক তথ্যও আলোচনা করিয়াছেন। অধিকন্তু, ফরাসী এবং পর্ত্তুগীজ ভাষায় যদুবাবুর দখল আছে। একাধিক ভারতীয় ভাষাও তিনি জানেন।

জেনেহ্বায় "প্রবাসী"-সম্পাদক

জেনেহ্বার বিশ্বরাষ্ট্র-পরিষৎ "প্রবাসী" এবং "মডার্ণ রিহ্বিউ"র সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে স্বাধীন চোখে আন্তর্জ্জাতিক সঙ্ঘের সকল কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। রামানন্দবাবু জেনেহ্বায় পৌঁছিয়াছেন। তাঁহার ইয়োরোপ-পর্য্যটন এবং জেনেহ্বা-প্রবাসের ফলে বিশ্বশক্তির সঙ্গে যুবক ভারতের সামনাসামনি মোলাকাতের প্রবৃত্তি বাড়িয়া যাইবে বিশ্বাস করি। আমাদের আর্থিক উন্নতির জন্যও দুনিয়ায় সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ চাই,—এই বুঝিয়া আমরা "প্রবাসী"-সম্পাদকের প্রবাসগমনে আনন্দিত হইয়াছি।

"চাষী"-লাটের বাণী

বড়লাট লর্ড আরউইন ২২শে জুলাই নাগপুর শহরে পৌঁছিয়া মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের ৫০ জন বাছা বাছা কৃষি-জীবীর অভিনন্দনের উত্তরে বলেন,—"সাধারণতঃ পল্লী-বাসী কৃষকশ্রেণীর কথা শহরের অধিবাসীদের কথার মত কাহারও কানে উঠে না বটে, কিন্তু ইহা কৃষকদের পক্ষে বেশ একটা সান্ত্বনার কথা যে, পল্লীবাসী কৃষকরাই জাতির মেরুদণ্ড এবং তাহারাই দেশের প্রকৃত কল্যাণের মূল ভিত্তি। অতএব আপনারা নিশ্চিত জানিয়া রাখুন যে, কৃষক-সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে আমাকে যখনই যাহা বলা হইবে, আমি তদ্দণ্ডেই তাহাতে অতি আগ্রহের সহিত কান দিব। আমি আজ আপনাদের সঙ্গে কৃষকের সহিত কৃষকের মতই কথা কহিতেছি। আপনারা আমারই মত আধুনিক কৃষিকার্য্যের অনুরাগী। হাতে হেতেরে কৃষি-কার্য্য করিয়া আপনারা অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। অতএব আপনারা এ সম্বন্ধে যাহা বলিবেন, আমি সবই শুনিব। মধ্যপ্রদেশ ও বেরার গবরর্মেণ্ট ইতিমধ্যেই এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। শীঘ্রই ইহা রয়াল কমিশনেরও বিবেচনাধীন হইবে।" কাজের পদ্ধতি সম্বন্ধে লর্ড আরউইন বলিয়াছেন,—"কৃষক-সম্প্রদায়ের ভিতর শিক্ষা-প্রচার করিতে না পারিলে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সহযোগ সাধিত না হইলে, আজকাল উন্নতি একেবারেই অসম্ভব। বৈজ্ঞানিক উপায়ে বীজ-নির্ব্বাচন উন্নত প্রণালীর যন্ত্রাদি-নিয়োগ, জমিতে রাসায়নিক উপাদান সন্নিবেশ, এই সবই হইল কৃষির প্রধান অঙ্গ।"

লর্ড আরউইনের শিল্প-নিষ্ঠা

বড়লাট বাহাদুর ভারতের কাঁচা মাল দেশীয় শিল্প কারখানায় ব্যবহার করিবার যে আশ্বাস দিয়াছেন তাহা কার্য্যে পরিণত করা হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। তিনি বলেন,—"ভারত হইতে প্রভূত পরিমাণ কাঁচা মাল বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। ভারতেরই কলে এবং ভারতেরই কারখানায় এই সব কাঁচা মাল হইতে ব্যবহারোপযোগী পণ্য প্রস্তুত হইতে পারে। ভারতেই বীজ বপন করিয়া কাঁচা মাল উৎপাদন হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতেরই কলে তাহা হইতে ব্যবহারোপযোগী জিনিষপত্র তৈয়ারী পর্য্যন্ত সকল কাজ নির্ব্বাহ সম্বন্ধে কার্য্যতঃ কোনোরূপ ব্যবস্থা হইলে, আমি সর্ব্বদাই তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিব।"

রেল-ব্যবসায়ে বাঙালী

যশোহর-ঝিনাইদহ রেলের কথা

রেল-চালানো যে একটা ব্যবসা-বিশেষ তা অনেক বাঙালীরই সাধারণতঃ মনে আসে না। যশোহর-ঝিনাইদহ রেল-লাইনে বাঙালীর ব্যবসা-শক্তি পরীক্ষিত হইতেছে। ইহার ম্যানেজিং এজেণ্ট্‌সদের প্রধান পরিচালক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ কর এই সম্বন্ধে আমাদের সঙ্গে যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহার শর্ট্‌হ্যাণ্ড বৃত্তান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

প্রশ্ন—আপনাদের হাতে একটা রেলওয়ে লাইন এসেছে ?

উত্তর—হাঁ।

প্রঃ—কোন্ জেলায় ?

উঃ—যশোহরে।

প্রঃ—কোন্ থেকে কোন্ পর্য্যন্ত ?

উঃ—যশোর থেকে ঝিনাইদহ।

প্রঃ—কত মাইল ?

উঃ—৩৮ মাইল। এটা "ন্যারোগেজ" (ছোট রাস্তা)।

প্রঃ—কেমন করে আপনাদের হাতে এল ?

উঃ—ক্ষেত্র মোহন দে নামে একজন করিৎকর্ম্মা লোকের তত্ত্বাবধানে একটী কোম্পানী প্রথম এটী আরম্ভ করে। ১৯১৪ সনে এই লাইন তৈয়ারী শেষ হয়। এতে অনেক বাঙালীর শেয়ার ছিল। ক্ষেত্র মোহন বাবু ৩।৪ মাস এটী পরিচালনা করেন। তিনি নিজে দেখতে শুনতে পারতেন না বলে মেক্‌লিয়ড্ কোম্পানীর হাতে দিলেন। এই কয় বৎসর তারাই চালিয়েছে এবং খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শেষ কালে তারা ফেল মেরেছে। তাদের কাছ থেকে আমরা খরিদ করি এবং প্রাইভেট সিণ্ডিকেট গঠন করি।

প্রঃ—নিতে সাহস করলেন কি করে ? সাহেব কোম্পানী লিকুইডেশনে গেছে—চালাতে পাচ্ছে না—আপনারা কেন ভাবলেন যে এতে লাভবান হবেন ?

উঃ—দেশের কাজ করার দিক্ থেকে করেছি। মেকলিয়ড্ কোম্পানীর বড়বাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। আমি একবার সেদিকে যাই। তিনি আমাকে চেপে ধরলেন, বল্লেন—"আপনারা নিন, খরচ-পত্রের কাগজগুলো দেখুন।" দেখে আমার মনে হল; ম্যানেজারের দোষে ক্ষতি হয়েছে। তার পর ওখানে স্থানীয় কোনো কারখানা ছিল না। গাড়ীর সাধারণ মেরামত করতে হলেও মালগাড়ী করে অনেক দূরে পাঠাতে হত। ধরুন চাকা মেরামত করতে হবে। খুলে প্যাক করে' একবার পাঠাবে, আবার প্যাক হয়ে আসবে, সেটা জুড়ে দিতে হবে। এতে অনেক খরচ হয়—কিছু বাঁচেনা। ওদের ইঞ্জিনিয়ার নূতন। তার পর বেশীর ভাগ প্যাসেঞ্জার কোর্টে আসা-যাওয়া করে। ঠিক সময়ে কোর্টে না পৌছিতে পারাতে অন্য উপায়ে তারা কোর্টে আসত। এতে প্যাসেঞ্জার কমে গিয়েছিল। মহাজনেরা মালপত্র গাড়ীতে বেশী পাঠাত না। ওদের পুঁজি ছিল ১৪।০ লক্ষ টাকা। সেটা আমরা কিনেছি ৪ লক্ষ টাকায়। আমার মনে হল এতে ৬ পার্সেণ্ট লাভ হবে।

প্রঃ—কবে আপনাদের হাতে এসেছে ?

উঃ—২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯২৪।

প্রঃ—আপনারা ম্যানেজিং এজেন্ট ?

উঃ—হাঁ, ঝিনাইদহ রেলওয়ে সিণ্ডিকেট ম্যানেজ করছে।

প্রঃ—শেয়ার-হোল্ডার কে কে ?

উঃ—ময়মনসিংহের মহারাজা "বোর্ড অব ডিরেক্টরস"এর প্রেসিডেন্ট। শেয়ার-হোল্ডার অনেক আছে। প্রধান জন কয়েকের নাম করছি—ভবেন্দ্র নাথ রায়, রায় বাহাদুর দেবেন্দ্র নাথ বল্লভ, সুরেন্দ্র নাথ লাহা, নাড়াজোলের কুমার, উপেন্দ্র নাথ মজুমদার, শরচ্চন্দ্র বসু ইত্যাদি।

প্রঃ—এই ধরণের রেল আর আছে ?

উঃ—বেঙ্গল প্রোভিন্শিয়াল রেল আছে।

প্রঃ—সেটা কোথায় ?

উঃ—বৰ্দ্ধমানে।

প্রঃ—এই দুইটী মাত্র ?

উঃ—হাঁ। তবে লাভ দেখাবার মধ্যে আমাদের এটাই প্রথম।

প্রঃ—জেলার সঙ্গে ও ইণ্ডিয়ান গবর্মেন্টের সঙ্গে কোনো এগ্রিমেন্ট হয়েছে ?

উঃ—জেলার সঙ্গে এই হয়েছে, তারা রাস্তার ধারের জমি বিনা খরচে ব্যবহার করতে দিবে। গবর্মেন্টের সঙ্গে আগে ৪ পার্সেণ্ট ডিভিডেণ্ড্ গ্যারাণ্টি ছিল। এখন সেটা উঠিয়ে দিয়েছে। গবর্মেন্টের সঙ্গে এইমাত্র বন্দোবস্ত আছে যে, তাদের মিলিটারী আর রসদপত্রাদি নিতে হবে।

প্রঃ—তা ছাড়া আর কোনো বাধ্যবাধকতা নাই ?

উঃ—না, আর কিছু নাই। সাবসিডি না নেওয়াই ভাল।

প্রঃ—আপনারা ডিভিডেণ্ড কিছু দিয়েছেন ?

উঃ—হাঁ। হাওড়ার মার্টিন কোম্পানীর যে লাইন আছে তাতে তারা ৮ পার্সেণ্ট ডিক্লেয়ার করেছে। আমরা প্রথম বৎসরেই ৬ পার্সেণ্ট ডিক্লেয়ার করেছি।

প্রঃ—তাহলে এটাকে ঠিক বাঙালী প্রতিষ্ঠান সকল হিসাবেই বলা যেতে পারে

উঃ—আমরা বার্ষিক যে বিবরণ বের করেছি তার আয়-ব্যয় দেখুন, যা হয়েছে সে ৭ পার্সেণ্টে। আগামী বৎসর আরো ভাল হবে।

প্রঃ—মোটের উপর এই কোম্পানীর ক্যাপিটেল কত—সারকুলেটিং (চল্তি) এবং ফিক্স্ড্ (স্থাবর) ?

উঃ—ফিক্স্ড্ ক্যাপিটেল ৫ লাখ টাকা, কিন্তু এর অ্যাসেট্ (সম্পত্তি) ঢের বেশী। রেলওয়ে ষ্টক, রেল, এবং সমস্ত প্রপার্টির ভেলু নিয়ে টোট্যাল অ্যাসেট্ ১৪ লাখ টাকা।

প্রঃ—এর ভিতর সর্ব্বশুদ্ধ কত লোক খাটে ?

উঃ—ষ্টেশন মাষ্টারের ষ্টাফ শুদ্ধ মোটামুটী ৭৫।৮০ জন সেখানে। আর এখানে কেরাণী ৫।৭টা। মাল-চলাচল খুব হয়।

প্রঃ—কোন্ মাল ?

উঃ—বেশীর ভাগ জুট। ওটা পাটের জেলা। ওখান থেকে পাট কলিকাতায় আসে। আগে কোটচাঁদপুরে গুড় ছিল, খুব রপ্তানি হত। কিন্তু সেটা এখন ফেল হয়েছে। সেটা থাকলে অবশ্য আমাদের খুব লাভ হত।

প্রঃ—গুড়ের কারবার ফেল হয়ে গেল কেন ?

উঃ—চিনির দাম কমে গেছে বলে লোকে গুড় তৈরী কচ্ছে না। যন্ত্রপাতি সব পড়ে রয়েছে। খেজুরী গুড় হত। এই একটা শিল্প গেল। জাভার চিনি এত সস্তা করে ফেলেছে যে টক্কর দেওয়া অসম্ভব।

প্রঃ—খেজুরী গুড়ের কারবার পর্য্যন্ত চল্ল না! দুঃখের বিষয়। আচ্ছা রেলের জন্য যে লোকজন রেখেছেন তারা কি-দরের লেখাপড়া-জানা লোক ?

উঃ—সাধারণ কথা আছে—রেলের চাকুরী মূর্খের জন্য। তবে গুটীকতক লেখাপড়া-জানা লোকও আছে। তা ছাড়া সব থার্ড ক্লাস, ফোর্থ ক্লাস।

প্রঃ—আপানারা এই রেলের জন্য, যশোরে যে ওয়ার্কশপ করেছেন তাতে ইঞ্জিনিয়ার আছে ?

উঃ—অফিসার নাই, তবে মেকানিক্যাল এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়ার কম্বাইন্ড আমাদের যিনি এখানে

ছিলেন তাঁকে সেখানে পাঠিয়েছি। টেক্‌নিক্যাল এবং যন্ত্রপাতি-ঘটিত সব কাজ তাঁর দ্বারাই চলছে।

প্রঃ—আচ্ছা, এ সম্বন্ধে আপনি আর কিছু বলতে চান ?

উঃ—এই রেল-সংস্রবে আমার একটা বড় কষ্টকর অভিজ্ঞতা হয়েছে। এই রেল যখন মেক্‌লিয়ড কোম্পানীর হাত থেকে আমরা নিলাম তখন ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কে তাদের সাড়ে তিন লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত "ওভার ড্রাফ্‌ট" ছিল—অ্যাসেট, লোন এবং গ্যারান্টির উপর। আমরা যখন বায়না দেই তখন ভাবলাম ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কে ঐ সাড়ে তিন লক্ষ টাকার ওভার ড্রাফ্‌ট্‌ রেখে দিব, বাকী ৫০ হাজার মেকলিয়ডকে দেব। তিন সপ্তাহ ধরে ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কে ঘুরলাম। শেষ সপ্তাহে তারা বল্ল, আমাদের প্রস্তাবে তারা রাজী নয়। তখন বড়ই মুস্কিলে পড়লাম—৪ লাখ টাকা এখন কোথায় পাই? টাকা দেওয়ার তারিখ উত্তীর্ণ হয়ে গেল। তখন নিরুপায় হয়ে আবার মেকলিয়ডকে ১০ হাজার টাকা বায়না দিয়ে বল্লাম, যদি এবার টাকা দিতে না পারি তবে আমাদের ২০ হাজার টাকাই যাবে; এবং এক মাস সময় নিলাম। আবার ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্ককে বল্লাম—তোমরা কেন দিচ্ছনা? অ্যাসেট্‌ একই আছে, কেবল মেকলিয়ড্‌ কোম্পানীর জায়গায় 'কর কোম্পানী' গ্যারান্টি এই মাত্র তফাৎ থাকবে। তোমরা কি মনে কর আমরা বিশ্বাস যোগ্য নই? তারা বল্লে, না তা নয়, আমরা জানি তোমরা বিশ্বাসযোগ্য, কিন্তু তোমরা আর কোনো নূতন প্রস্তাব দিতে পার না? তখন আমরা বল্লাম, দেড় লাখ টাকার শেয়ার ক্যাপিটেল নগদ দিচ্ছি, তাহলে তোমাদের ওভার ড্রাফ্‌ট প্রায় আধাআধি কমে যায়। হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে সে বন্দোবস্ত করলাম, তাতেও তারা রাজী হল না। তখন অগত্যা ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্ককে আর একটা নূতন প্রস্তাব দিলাম—বল্লাম আমাদের যে ইটের কারবার আছে তাতে দুই লাখ টাকার ইট আছে, সেটা গ্যারান্টি রাখ। তখন তারা বল্লে এটা সুন্দর প্রস্তাব। গিলবার্ট ও ক্রয়ডন সাহেব সেই অনুসারে আমাদের প্রস্তাব কেটে ছেঁটে ঠিক করে পাঠাল, কিন্তু দিন চারেক থাকতে বলে পাঠাল তাদের ডিরেক্টরেরা ওতেও রাজী হয় না। জিজ্ঞাসা করলাম—কেন? বল্লে,—ইট জলে গলে যায়। বল্লাম, বর্ষাকালে ইট তৈরী হয় না তোমরা জাননা? শীতকালেও ত জল হতে পারে। ঝড়-জলের জন্য ১০।১৫ পার্সেণ্ট নষ্ট হবে ধরাই থাকে। তোমরা আমাদের ষ্টক গুণে দেখ, ষ্টক ত সাজান থাকে, ইটের রো সাজান আছে। বলে পাঠালে তাতেও তারা রাজী নয়। এটা হবে না যখন বুঝতে পারলাম তখন হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্স থেকে ৮ পার্সেণ্ট সুদে টাকা লোন নিয়ে ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কের টাকা শোধ করলাম। আমাদের সঙ্গে ব্যাঙ্কের ব্যবহার এই রকম!

প্রঃ—তাহলে শেয়ার ক্যাপিটেল কি ভাবে ব্যবহার করছেন?

উঃ—ডিবেঞ্চার পে করছি, শেয়ার-মনি কিছু আছে। মফঃস্বলে যে সব লোন অফিস আছে তাদের নিয়ে একটা ব্যাঙ্কিং কন্‌ফারেন্স আমন্ত্রণ করবার প্রস্তাব হয়েছে। সেটা যদি কাজে পরিণত হয় এবং রেলে কিম্বা পাটে যাদের টাকা আছে তাদিগকে যদি আনতে পারি এবং দেশী কোম্পানীর যদি একবার তাতে বিশ্বাস জন্মে, তা হলে ভবিষ্যতের জন্য বাঙালীর ব্যবসার একটা প্রশস্ত পথ তৈরী হয়ে যাবে।
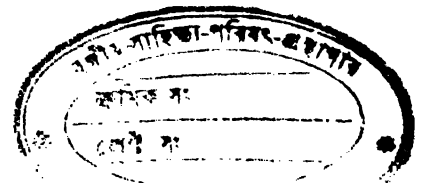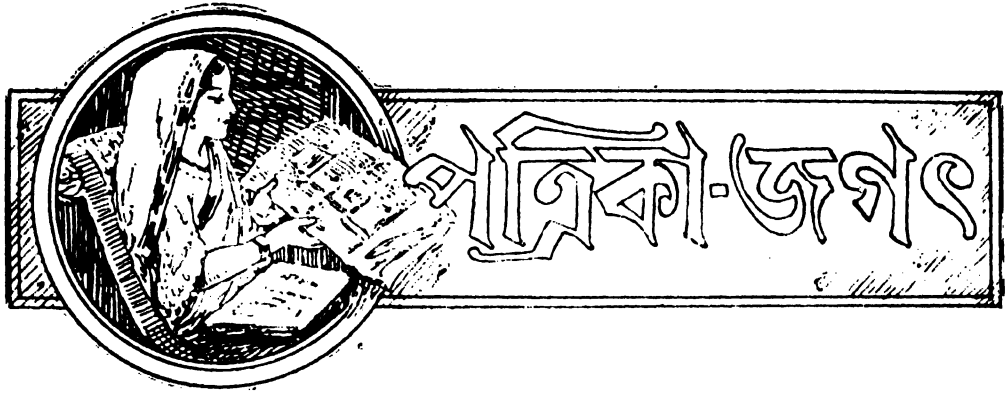
জ্যর্ণালে দেলি একনমিস্তি এ রিহ্বিস্তা দি স্তাতিস্তিকা

ইতালিয়ান আর্থিক পত্রিকা, জুলাই ১৯২৬, প্রবন্ধঃ—(১) ধনবিজ্ঞানে "যুক্তি" কতটা আর "ভক্তি" কতটা? (পুইজি আমরস), (২) পুঁজির আন্তর্জ্জাতিক আমদানি-রপ্তানি (মারিঅ পুলিয়েসে)। প্রবন্ধ দুইটায় অতি মূল্যবান তথ্য আছে। স্বতন্ত্র প্রবন্ধাকারে সার সঙ্কলিত করা যাইবে।

সমালোচিত হইয়াছে প্যালগ্রেভ-প্রবর্ত্তিত বিলাতী "ধনবিজ্ঞান-বিশ্বকোষ" গ্রন্থের নূতন সংস্করণ (১৯২৩-১৯২৬)। এই তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ গ্রন্থে ইতালিয়ান ধনবিজ্ঞান-সেবার পরিচয় যথেষ্ট নয় দেখিয়া সমালোচক মহাশয় (অধ্যাপক মর্ত্তারা) দুঃখিত। বস্তুতঃ, বিগত বিশ-পঁচিশ বৎসরের ভিতর ইতালিয়ান পণ্ডিতেরা এই বিদ্যায় উল্লেখযোগ্য অনেক-কিছু করিয়াছেন। কিন্তু বিদেশে নাম করা বড় সহজ বস্তু নয়,—বিশেষতঃ বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে। এন্‌সাইক্লোপীডিয়া বৃটানিকা নামক ইংরেজ-প্রচারিত ইংরেজি বিশ্বকোষে অনেক নামজাদা আমেরিকান সুধী-সাহিত্যসেবী ও বিজ্ঞানবীরের নামগন্ধ নাই। মার্কিণরা এই জন্য ইংরেজের উপর চটা। যাহা হউক, ইংরেজি ধনবিজ্ঞান-বিশ্বকোষে পান্তালেঅনি এবং পারেত এই দুই জন "বাঘা বাঘা" ইতালিয়ান পণ্ডিতের কাজকর্ম্ম বিবৃত আছে। এই দুই জনের কথা ভারতেও সুপ্রচারিত হওয়া আবশ্যক।

বঙ্গবাণী

শ্রাবণ, ১৩৩৩, উল্লেখযোগ্য :—"ভারতের লোকসংখ্যা বনাম দারিদ্র্য" (শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত)।

ইকনমিক জার্ণ্যাল

আর্থিক পত্রিকা, লণ্ডনের রয়াল ইকনমিক সোসাইটী নামক রাজকীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের ত্রৈমাসিক মুখপত্র। বর্ত্তমান সম্পাদক কেইন্‌স এবং ম্যাকগ্রেগর।

জুন ১৯২৬ সংখ্যায় আছে ১৬০ পৃষ্ঠা। তাহার ভিতর মাত্র ৫০ পৃষ্ঠা প্রবন্ধের মাল। অবশিষ্ট অংশ তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে আছে সমালোচনা। এই জন্য গিয়াছে পৃষ্ঠা পঞ্চাশেক। দ্বিতীয় ভাগের নাম "নোটস্ অ্যাণ্ড মেমোর‍্যাণ্ডা"। তাহাতে আছে সাময়িক আলোচনা ৪০ পৃষ্ঠা। পরবর্ত্তী ভাগে ৮ পৃষ্ঠা। তাহাতে দেশ-বিদেশের ধনবিজ্ঞান পত্রিকার সংক্ষিপ্ত সূচী প্রকাশিত আছে। শেষ ভাগে দেখিতে পাই নব প্রকাশিত বহির নাম। বহিগুলি বিভিন্ন "ভাষা" ও দেশ অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ যথা—(১) ইংরেজী (২) আমেরিকান (৩) ইণ্ডিয়ান (৪) ফরাসী (৫) জার্ম্মাণ (৬) ওলন্দাজ (৭) সুইডিস (৮) ইতালিয়ান। মোটের উপর ৭২ খানি গ্রন্থের নাম আছে।

প্রবন্ধের নাম নিম্নে বিবৃত হইতেছে—

(১) ইংলাণ্ডে লোক-সমস্যা,—মার্কিণ চোখে সমালোচনা (অধ্যাপক টমসন), (২) ব্যবসা-বাণিজ্যের ঝুঁকি (লাভিংটন) ধারাবাহিকরূপে আলোচিত হইতেছে, (৩) যুক্তরাষ্ট্রে কিস্তিতে কিস্তিতে দাম দেওয়ার প্রথা (রড্), (৪) ব্যাঙ্কের কর্জ্জতত্ত্ব (অধ্যাপক পিগু্)।

২৬খানা বহির সমালোচনা করা হইয়াছে। তাহার ভিতর ২খানা ফরাসী ও একখানা ইতালিয়ান। অন্য সবই ইংরেজি। সমালোচকদের মধ্যে অনেকেই নামজাদা

ধনবিজ্ঞান-দক্ষ পণ্ডিত, যথা—অ্যাশলে, বোলে, কেনান্ মার্শ্যাল, পিগ্‌ত্ ইত্যাদি।

ক্যালকাট্টা কমার্শ্যাল গেজেট

বাঙালী-পরিচালিত ব্যবসা-সাপ্তাহিক। শেয়ার বাজারের দর, টাকার বাজার, জিনিষপত্রের মূল্য এবং নানা কোম্পানীর ক্রমোন্নতি বিবৃত করা এই পত্রিকার বিশেষত্ব। এই সব দেখিয়া ব্যবসায়ীদের সুবিধা ত হয়-ই, যাঁহারা ব্যবসায়-কলেজের ছাত্র বা অধ্যাপক তাঁহাদের পক্ষেও নিয়মিতরূপে এই কাগজের তথ্যগুলার সম্পর্কে আসা উচিত।

প্রবন্ধও থাকে কিছু-কিছু। তাহা ছাড়া, এখান-ওখান হইতে সংগৃহীত দেশ-বিদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের গতিবিধি ও শিল্প-কথা উল্লেখযোগ্য।

মাইসোর ইকনমিক জার্ণ্যাল

মহীশূর হইতে প্রকাশিত ইংরেজী আর্থিক পত্রিকা। প্রতি মাসে বাহির হয়। ১২ বৎসর ধরিয়া চলিতেছে। সুসম্পাদিত।

জুন মাসের সংখ্যায় আছে (১) ভদ্র দরিয়ার খাল খোলা উপলক্ষ্যে মহারাজার বক্তৃতা, (২) বিহার ও উড়িষ্যার কৃষি, (৩) ক্যানাডায় আর্থিক তথ্য-সংগ্রহ, (৪) দৈনিক সংবাদ-পত্রের পরিচালনা, (৫) আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক সম্মিলন, (৬) ক্যানাডার বহির্ব্বাণিজ্য, (৭) আর্থিক ভারত (বন-বিদ্যার শিক্ষাপ্রচার, ভারতীয় পুঁজি, ভারতে তুলার চাষ, মহীশূরের খনিজ পদার্থ, সোনা, মাদ্রাজের কাটা-মারান গাছ, ভারতীয় কাঠ, খাদ্যদ্রব্যের দাম, শুল্কের আয়, বোম্বাই প্রদেশে যন্ত্রপাতির কারখানা), (৮) পত্রিকার সারাংশ, (৯) পঞ্জাবে আর্থিক অনুসন্ধানের বৃত্তান্ত (১০) গ্রন্থসমালোচনা, (১১) ক্রোড়-পত্র। মহীশূরের দেওয়ান মির্জ্জা ইস্মাইল রেপ্রেজেণ্টেটিভ্ অ্যাসোম্ব্লিতে যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহার ভিতর আর্থিক এবং রাজস্ব-সংক্রান্ত অনেক তথ্য আছে। বক্তৃতাটা পুরাপুরি ছাপিবার জন্য ক্রোড়-পত্র প্রকাশ করা হইয়াছে।

টাইম্‌সের শিল্প-সাপ্তাহিক

এই বিখ্যাত বিলাতী দৈনিকের ট্রেড্ অ্যাণ্ড্ এঞ্জিনিয়ারিং সাপ্লিমেণ্ট (ক্রোড়-পত্র) সপ্তাহে একবার করিয়া বাহির হয়। প্রত্যেক সংখ্যায়ই দুনিয়ার শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধে সংবাদদাতাদের দেওয়া খবর প্রকাশিত হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া বিশেষজ্ঞদের লেখা টেক্‌নিক্যাল এবং ব্যবসা-সম্পর্কিত রচনা এই সাপ্তাহিকের বিশেষত্ব। ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইতালিয়ান, রুশ, ডেনিশ, জাপানী, এবং স্পেনিশ ভাষা যে সকল ইংরেজ ব্যবসায়ী এবং ধনবিজ্ঞানবিদের জানা নাই তাহাদের পক্ষে এই পত্রিকা বিশেষ কার্য্যকরী। ভারতের ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য উচ্চশিক্ষিত মহলেও এই কাগজের পড়ুয়া জুটিলে ঘরে বসিয়াই আমরা আর্থিক ব্যবস্থার বিশ্ব-বিধান অনেকটা বুঝিতে পারিব। দশ বৎসর ধরিয়া এই ক্রোড়-পত্র চলিতেছে। লড়াইয়ের সময় সুরু হয়।

১৯ জুন তারিখের কয়েক দফা সংক্ষিপ্ত আকারে বিবৃত হইতেছে,—(১) ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে জার্ম্মাণি, ফ্রান্স এবং ইংল্যাণ্ডের তুলনামূলক তথ্য, (২) বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরকার দেশে দেশে বাণিজ্য, (৩) দুনিয়ার বাণিজ্য কথা,—যুক্তরাষ্ট্র, জার্ম্মাণি, বেলজিয়াম, হাঙ্গারি, রুমেণিয়া ইতালি ইত্যাদি নানা দেশের আর্থিক সপ্তাহ (৪) যাতায়াতের এবং মাল-চলাচলের সংবাদ, (৫) স্বদেশী শিল্পের অবস্থা (লোহালক্কড়, কয়লা, চীনের বাসন, রাসায়নিক কারখানা, জুতা, চামড়া, মোটর, কাঠ, খাদ্য দ্রব্য), (৬) বৃটিশ সাম্রাজের আর্থিক সমস্যাবিষয়ক ধারাবাহিক প্রবন্ধ, (৭) ধর্ম্মঘটের ফলে বিলাতের কোন্ কারবারের অবস্থা কিরূপ তাহার বৃত্তান্ত। (৮) ইংল্যাণ্ডের জেলায় জেলায় যন্ত্রপাতি-ঘটিত কারবার কোথায় কতখানি বাড়িতেছে তাহার সংবাদ, (৯) জাহাজের কারখানা, (১০) ধাতুগালাইয়ের কারবার, (১১) নতুন করাত তৈয়ারীর ফ্যাকটরি, (১২) টেক্‌নিক্যাল গ্রন্থের সমালোচনা, (১৩) ডায়াগ্রামের ("চিত্রের") সাহায্যে লণ্ডনের বাজার-দর (১৫ মার্চ হইতে ১৫ জুন পর্য্যন্ত)।

"বৃটিশ এম্পায়ার প্রডাক্‌ট্‌স্" নামে টাইম্‌সের শিল্প-ক্রোড়পত্রের একটা বিশেষ সংখ্যা বাহির হইয়াছিল ১৭

এপ্রিল তারিখে। এই সংখ্যার সংক্ষিপ্ত সূচী নিম্নরূপ,—(১) বৃটিশ সাম্রাজ্যের শস্য-কেন্দ্র, (২) জমানো মাংস, (৩) চাউল, (৪) দুধের তৈয়ারী জিনিষ, (৫) টিনে বাঁচানো শাকশব্জী-ফলমূল (৬) রবার, (৭) কাফি, (৮) চায়ের ব্যবসা, (৯) কোকো, (১০) মোটরগাড়ী, (১১) ইম্পীরিয়াল ইন্‌ষ্টিটিউটের কার্য্য-তালিকা এবং বর্ত্তমান অবস্থা (উদ্ভিজ্জ এবং অণ্ডজ বস্তু, রেশম-বিষয়ক পরীক্ষা ও অনুসন্ধান, ধাতু-গবেষণা, চীনের বাসন বিষয়ক ল্যাবরেটরী, স্থায়ী প্রদর্শনী)। (১২) বিদেশে বিলাতের বাজার,—১৮৭০ সনের তুলনায় ১৯২৬ সনের অবস্থা, (১৩) মালের শ্রেণীবিভাগ করা, (১৪) পাইকারি এবং খুচরা বিক্রীর ব্যবসা, (১৫) প্যাকিং করা ও মার্কা মারিয়া দেওয়া, (১৬) ভারতীয় মজুরদের বিদেশগমন (কেনিয়া-সমস্যা ইত্যাদি), (১৭) সাম্রাজ্যের নানা জনপদে বৃটিশ পুঁজি-প্রয়োগের সুযোগ-দুর্যোগ, (১৮) ক্যানাডার আর্থিক উন্নতি, (১৯) অষ্ট্রেলিয়ার ক্রমবিকাশ, (২০) দক্ষিণ আফ্রিকা, (২১) নিউজীল্যাণ্ড, (২২) ভারতবর্ষ, (২৩) হঙ্কং।

প্রপার্টি

কলিকাতা হইতে প্রকাশিত সম্পত্তি-বিষয়ক সাপ্তাহিক। ১৯২৬ জুনের সংখ্যায় একটা মোকদ্দমার বৃত্তান্ত আছে। গনি মিঞা নামক এক ব্যক্তি "ইণ্ডিয়া জেনারাল ন্যাভিগেশ্যন অ্যাণ্ড রেলওয়ে কোম্পানীর" নামে নালিশ করে। ক্ষতিপূরণ ছিল মামালার উদ্দেশ্য। তাহার অন্নদাতা আবদুস সাম্মাদ ওয়েলিংটন জুটমিলসের ঘাটে জাহাজ হইতে পাটের বস্তা নামাইতেছিল। হঠাৎ "ক্রেণ" হইতে একটা বস্তা তথায় পড়ে, তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়। বিচারে কোম্পানী ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হইয়াছে। মজুরের স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য ওয়ার্কমেনস্ কম্পেন্সেশ্যন অ্যাক্‌ট জারি আছে। কলিকাতার "রাইটার্স বিল্ডিংসে" এই জন্য আদালত বসে।

ফর্টনাইটলি রিভিউ

লণ্ডন, জুন, ১৯২৬ :—(১) ধর্ম্মঘট ও রক্ষণশীল মন্ত্রি-সমাজ (সারজন ম্যারিওট), (২) একমাত্র উপায় শিল্প-বিপ্লব, (এল, লটন), (৩) সমাজ-বীমা (জি, এল, হস্কিং)।

কোয়ার্টারলি জার্ণ্যাল অব ইকনমিকস্

ধনবিজ্ঞানের ত্রৈমাসিক, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, ফেব্রুয়ারি ১৯২৬ :—(১) নগর পরিচয়—নিউইয়র্ক, (কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রবার্ট মারে হেগ), (২) কলকারখানায় যন্ত্রপাতি প্রচলন ও মজুর (জনস্ হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের জর্জ্জ, ই, বার্ণেট), (৩) শিল্প-জগতের আবিষ্কার, (হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যালফ সি, এপ্‌সটাইন), (৪) ফার্ম্মের ব্যয় অনুসন্ধান (ষ্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের খাদ্য-গবেষণা পরিষদের এম, কে, বেনেট), (৫) মূল্য-নির্দ্ধারণ সাহিত্য (কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের, জেমস, সি, বনব্রাইট)।

কলিকাতা রিভিউ

জুলাই ১৯২৬, রেলওয়ে রেটের মূলনীতি,—(এস, সি ঘোষ্)।

এডিনবারা রিভিউ

লংম্যান গ্রিণ কোং প্রকাশিত ত্রৈমাসিক, ১৯২৬ এপ্রিল—(১) ফরাসী ফ্র্যাঁর পুনর্গঠন, (মাননীয় জর্জ্জ পিল), (২) দুনিয়ার গম,—(সার হার্ব্বার্ট, টি, রবসন), (৩) পশুহত্যা,—(শ্রীমতী লেটিস ম্যাকনাটেন)।

জিওগ্রাফিক্যাল জার্ণ্যাল

ভৌগোলিক পত্রিকা, বিলাতের রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির মুখপত্র,—জুন, ১৯২৬,—(১) আবিসিনিয়ার গুদর ও গোডাজাম দর্শন, (সি, এফ, রে), (২) মাদ্রিদের ভৌগোলিক পরিষদের পঞ্চদশ বার্ষিকী, (৩) হকিন দ্বীপের অনাবাদী ভূমি ও ফকল্যাণ্ড দ্বীপ।

আমেরিকান ইকনমিক রিভিউ

আমেরিকান ধনবিজ্ঞান পরিষদের ত্রৈমাসিক মুখপত্র। সাত জন অধ্যাপক সম্পাদক-সংঘ রূপে বিবৃত। তাঁহাদের মধ্যে অধ্যাপক ডেভিস্ ডুয়ী ম্যানেজিং এডিটর। সমালোচনার জন্য রচনাবলী সংগ্রহ করা এবং সমালোচ্য বহিগুলি যথাস্থানে চালান করা ম্যানেজিং এডিটরের কর্ত্তব্য।

১৯২৬ জুন সংখ্যায় আছে প্রায় ১৯০ পৃষ্ঠা, তাহার ভিতর প্রবন্ধে গিয়াছে ৬০ পৃষ্ঠা। গ্রন্থ-সমালোচনার অংশ দেখিতেছি ৮৪ পৃষ্ঠা।

সমালোচ্য গ্রন্থগুলি নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত :—(১) ধন-বিজ্ঞান-বিষয়ক তত্ত্ব ও ইতিহাস, (২) আর্থিক ইতিহাস ও ভূগোল, (৩) কৃষি, খনি, বন এবং মাছ, (৪) শিল্পকলা ও কারখানা, (৫) যাতায়াত ও খবরাখবর, (৬) ব্যবসা-বাণিজ্য ও বাণিজ্য-সঙ্কট, (৭) হিসাবপত্র, কর্ম্মপরিচালনা, টাকা খাটান ইত্যাদি, (৮) পুঁজি এবং পুঁজি সংক্রান্ত সংগঠন, (৯) মজুর এবং মজুর-সঙ্ঘ, (১০) টাকা, দাম, কর্জ্জ এবং ব্যাঙ্কিং, (১১) সরকারী গৃহস্থালী, খাজনা এবং শুল্ক, (১২) লোক-সংখ্যা, লোক-চলাচল এবং দেশান্তর-গমন, (১৩) সমাজ-সমস্যা ও সমাজ-সংস্কার, (১৪) বীমা ও পেন্‌শন্ প্রথা, (১৫) দারিদ্র্য, দান, খয়রাত এবং লোক-সেবা, (১৬) সমাজ-তন্ত্র এবং সমবায়, (১৭) তথ্য-তালিকা ও তৎসংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক আলোচনা-প্রণালী। মোটের উপর ৬০ খানা বহির সুবিস্তৃত আলোচনা আছে। তাহা ছাড়া প্রত্যেক শ্রেণীতেই নব প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর তালিকা দেওয়া আছে।

প্রায় ৩০ পৃষ্ঠা বিভিন্ন পত্রিকার সূচী ও সার-সঙ্কলনে লাগান হইয়াছে। তথ্যগুলি পত্রিকার নাম অনুসারে সাজান নয়। বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়ের শ্রেণী দেখিতেছি। প্রত্যেক শ্রেণীতে বিভিন্ন পত্রিকার প্রবন্ধ উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা :—(১) তত্ত্ব, (২) আর্থিক ইতিহাস (আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র), (৩) আর্থিক ইতিহাস (বিদেশী), (৪) কৃষি, (৫) ব্যবসা-বাণিজ্য, (৬) রেল এবং অন্যান্য যাতায়াতের ব্যবস্থা, (৭) সার্ব্বজনিক কর্ম্মকেন্দ্র-সমূহের আথিক ব্যবস্থা, (৮) হিসাব-নিকাশ, (৯) কর্ম্ম-পরিচালনা, (১০) মজুর এবং মজুরি, (১১) টাকা, দাম, কর্জ্জ, ব্যাঙ্কিং, (১২) রাজস্ব, (১৩) লোক-সংখ্যা, (১৪) বীমা, (১৫) দারিদ্র্য, দান, খয়রাত ইত্যাদি, (১৬) তথ্য-তালিকা।

প্রত্যেক শ্রেণীতেই, ইংরেজি, ফরাসী এবং ইতালিয়ান পত্রিকার মাল পাওয়া যায়। এই ১৬টী শ্রেণীতে ১৬ জন লেখক-লেখিকা বাহাল আছেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই তিন তিন মাসের ভিতর নিজ নিজ লাইনে পত্রিকা-জগতের যাহা-কিছু জ্ঞাতব্য সবই সংগ্রহ করিয়া যাইতেছেন। ডেনিশ, ওলন্দাজ এবং সুইডিশ ভাষায় প্রচারিত পত্রিকা-

সমূহের মাল সংগ্রহ করিবার জন্য একজন বিশেষজ্ঞকে স্বতন্ত্র ভাবে রাখা হইয়াছে।

৪ পৃষ্ঠা আর্থিক জীবন বিষয়ক আইন-কানুন, সরকারী দলিল এবং কার্য্যবিবরণী প্রকাশের জন্য বাঁধা আছে। এই অধ্যায় নিম্নলিখিত ৫ শ্রেণীতে বিভক্ত। (১) শিল্প-বাণিজ্য, (২) মজুর এবং মজুরি, (৩) ব্যাঙ্কিং, (৪) সার্ব্বজনিক কর্ম্মকেন্দ্র, (৫) রাজস্ব।

শেষ অধ্যায় ৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। তাহাতে আছে নানাপ্রকার সঙ্ঘ, সমিতি এবং পরিষদ্ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সাময়িক সংবাদ। আর আছে আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ধন-বিজ্ঞান-বিশারদ অধ্যাপকগণের চলা-ফেরা ও কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে খবর।

কমার্শ্যাল ইণ্ডিয়া

"ব্যবসায়ী ভারত", মাসিক, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। পাঁচ বৎসর ধরিয়া চলিতেছে। ভারতের শুল্ক-সংস্কার সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রবন্ধ আছে জুলাই সংখ্যায়। খাদ্য-দ্রব্য, চিনি, নুণ, কুদরতী মাল, কারখানা-জাত দ্রব্য, যন্ত্রপাতি, বস্ত্র ইত্যাদি নানা বিষয়ের শুল্ক স্বতন্ত্র ভাবে আলোচিত হইয়াছে। শুল্ক-সংস্কার সম্বন্ধে একটা কথা বিশেষরূপেই আলোচ্য। গবর্মেণ্টের যে সকল মাল বিদেশ হইতে আসে তাহার উপর কোনো শুল্ক বসানো হয় না। ইহাতে স্বদেশী শিল্প-সংরক্ষণের পথে বিশেষ বাধা জন্মে। গবর্মেণ্ট মস্ত-বড় খরিদ্দার। দেশের লোক যত বিদেশী মাল কিনে একমাত্র তাহার উপর শুল্ক থাকিলে অনেক পরিমাণ বিদেশী মালই শুল্ক হইতে রেহাই পাইতে বাধ্য। কাজেই গবর্মেণ্ট যে সকল বিদেশী মাল কিনিবেন তাহার উপরও শুল্ক বসানো কর্ত্তব্য।

এই সংখ্যায়ই ক্যাটালগ তৈয়ারী করা, মাল বস্তাবন্দি করা, খুচরা দোকানদারি চালানো ইত্যাদি নানা বিষয়ে বিলাতী আলোচনা-প্রণালীর সরস এবং সরল ব্যাখ্যা দেখিতে পাইতেছি। ইহা ব্যবসায়ী এবং কলেজের ছাত্র উভয়েরই কাজে লাগিবে।

"কমার্শ্যাল ইণ্ডিয়ার" প্রকাশকেরা "ইণ্ডাষ্ট্রী" নামে শিল্প-বিষয়ক একখানা মাসিকও চালাইতেছেন। প্রথম

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে তাহার সূত্রপাত হয়। কাগজ দুইটার সাহায্যে বাংলাদেশের লোকেরা ইংরেজী ভাষায় আধুনিক কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধে দুনিয়ার নানা তথ্য পাইয়া আসিতেছে। রচনাবলীর অধিকাংশই বিদেশী বিশেষজ্ঞ-প্রণীত গ্রন্থ ও প্রবন্ধের সারাংশ বলিয়া সাধারণতঃ নির্ভুল। এই ধরণের পত্রিকায় হাত মক্‌স করিতে করিতেই যুবক বাংলা একদিন উন্নততর টেকনিক্যাল কাগজ চালাইবার উপযুক্ত হইতে পারিবে। আর্থিক জীবনের বিভিন্ন বিভাগের জন্য এইরূপ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কাগজ আরও চাই।

ইণ্ডিয়ান জার্ণ্যাল অব ইকনমিকস

ভারতীয় ধন-বিজ্ঞান পরিষদের ত্রৈমাসিক মুখপত্র, এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত। জানুয়ারি, ১৯২৬। অধিবেশন সংখ্যা—বিগত জানুয়ারি মাসে পরিষদের মাদ্রাজস্থিত নবম বাৎসরিক অধিবেশনে পঠিত ও আলোচিত প্রবন্ধসমূহ এই সংখ্যায় আছে।

(১) ভারতীয় ধন-বিজ্ঞান-বিবরণী—শ্রীযুক্ত টি, কে, দোরায়স্বামী আয়ার, (২) ভারতীয় কৃষির উৎপাদন-সমস্যা (ডি, কারওয়াল), (৩) ভারত ও পল্লী-সমস্যা (এস, বৈদ্যনাথ আয়ার), (৪) পল্লীর আর্থিক অনুসন্ধান (এ, জে, সণ্ডার্স), (৫) পল্লীর আর্থিক জীবন, (এস, কেশব, আয়াঙ্গার, এম-এ, এফ, আর, ই, এস, (৬) আর্থিক বাংলার একটি গ্রাম, (এস, ডি, আয়ার ও এ, কে, আহাম্মদ খাঁ), (৭) পল্লীর ঋণের কারণ-অনুসন্ধান (পি, আর, বেঙ্কট সুব্রাহ্মণীয়া, বি-এ, (৮) কৃষির উন্নতি এবং সমবায় (কে, সি, রামকিষণ), (৯) ভারতে বৈদেশিক মূলধন (সি, গোপাল মেনন এম-এল-সি), (১০) ভারতে বিদেশীর পুঁজি (পি, এস, লোকনাথন), (১১) ঐ (জ্ঞান চাঁদ, এম-এ), (১২) ঐ (এস, সুব্রহ্ম আয়ার, এম-এ, ডি-পি-একন), (১৩) ঐ (এস, কে, ঘোষ)। ঐ বিষয়ে ৬৫ পৃষ্ঠা লেখা হইয়াছে।

লেখকগণের অধিকাংশই ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ধন-বিজ্ঞান অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে মাদ্রাজীর সংখ্যাই বেশী। বাঙালী মাত্র একজন আছেন।

আর্থিক পত্রিকায় লোক-বিদ্যা

লোক-সংখ্যা, লোকজনের গতিবিধি এবং জনগণের দেশান্তর-গমন ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা কাগজে প্রবন্ধ বাহির হইতেছে। বিগত কয়েক মাসের ভিতর যে সকল রচনা বাহির হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল:—

(১) উত্তর অষ্ট্রেলিয়ার স্বাস্থ্য এবং কর্ম্মশক্তি (ইউনাইটেড্ এম্পায়ার পত্রিকা, নভেম্বর ১৯২৫)। লেখক শ্রীযুক্ত সিলেণ্টো বলেন—সাদা চামড়াওয়ালা নরনারী অষ্ট্রেলিয়ার গ্রীষ্মপ্রধান জনপদেও বেশ সুস্থ, সবল ও কর্ম্মঠ ভাবে জীবন-যাপন করিতে সমর্থ।

(২) পারিবারিক ভাতা (ইউজেনিক্‌স্ রিভিউ, জানুয়ারি, ১৯২৫)।

(৩) সন্তান-নিবারণ। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের তরফ হইতে আলোচনা। নিউইয়র্ক প্রদেশের মাতৃ-স্বাস্থ্য কমিটী এ সম্বন্ধে যে সব অনুসন্ধান করিয়াছেন তাহার ফলাফল প্রবন্ধে বিবৃত আছে (আমেরিকার গিনিকলজিক্যাল সোসাইটীর "ট্রানজাকশ্যন্‌স্" নামক প্রসূতি-পত্রিকার ১৯২৪ সনের সংখ্যায় প্রকাশিত)।

(৪) জন্মসংযম আন্দোলনকারীদের আহাম্মুকী (আটল্যান্টিক মান্থলি, ফেব্রুয়ারী ১৯২৬)। লেখক শ্রীযুক্ত ডাবলিন বলিতেছেন—"যুক্তরাষ্ট্রে জন্মসংযম অনাবশ্যক। আমাদের দেশে লোক-সংখ্যা কিছু অত্যধিক হারে বাড়িতেছে না। রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করিবার জন্য আমরা আরও অনেক লোক চাই।"

(৫) লোকসংখ্যা বৃদ্ধির যথার্থ হার (জর্ণ্যাল

অব দি আমেরিকান ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল অ্যাসোসিয়েশুন, সেপ্টেম্বর ১৯২৫)।

লেখক ডাবলিন্ এবং লোটকা বলিতেছেন—"যুক্তরাষ্ট্রে হাজারকরা বার্ষিক ১০·৯৯ হারে লোক বাড়িতেছে। কিন্তু এই হার যথার্থ হার নয়। বিদেশ হইতে যে সকল লোক আমেরিকায় আসিয়া স্থায়ী ভাবে বসবাস করিতেছে তাহাদের সংখ্যা বাদ দিলে আমাদের লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির হার হইবে হাজারকরা বার্ষিক ৫·৪৭। ১৯২০ সনে প্রত্যেক বিবাহিত পরিবারে সন্তান ছিল গড়পড়তা ৩·০৬।"

(৬) বার্লিন এবং জুরিখ শহরে পরিবারের আয়তন হ্রাস, (শ্মোল্লার্স্ য়ারবুখ্, ৪৯ বার্ষিক চতুর্থ সংখ্যা)। লেখক এর্কার সুইট্জারল্যাণ্ড এবং জার্ম্মাণির নানা শহরে জন্ম-সংখ্যার হ্রাস দেখাইতেছেন। ভিন্ন ভিন্ন আর্থিক শ্রেণীতে জন্ম-মৃত্যু দেখান হইয়াছে।

(৭) দেশান্তর-গমন (রেহ্বিু দেকোনোমি পোলিটিক, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ১৯২৫)। লেখক গোনার বলিতেছেন "জনগণের স্থায়ী ভাবে দেশান্তর-গমন এবং প্রবাস-জীবন সম্বন্ধে ধনবিজ্ঞানবিদ্ অথবা সমাজ-তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা যথোচিত নজর দেন নাই। কিন্তু এই সকল বিষয় দুনিয়ার ভবিষ্যৎ গঠন সম্বন্ধে যারপরনাই মূল্যবান। জন্ম এবং মৃত্যু মানব-সমাজের খুব বড় ঘটনা। তাহার পরেই এই দেশান্তর-গমন সমাজ-বিদ্যায় ঠাঁই পাইবার যোগ্য"।

(৮) শহর ও শহুরে জীবন বুঝাইবার প্রয়াস, (কোয়ার্টারলি জার্ণ্যাল অব ইকনমিক্স্, ফেব্রুয়ারি, ১৯২৬), লেখক শ্রীযুক্ত হেগ বলিতেছেন:—আমেরিকার লোকেরা ভবিষ্যতে আরও বেশী নগর-জীবনের দিকে ঝুঁকিবে। নগরের আয়তন-বৃদ্ধি বর্ত্তমান যুগের আর্থিক কারণে অবশ্যম্ভাবী।

(৯) আমেরিকার লোক-আমদানি-বিষয়ক নূতন আইন এবং রাষ্ট্রনীতি (সিয়েন্টিয়া, মার্চ, ১৯২৬)। ফরাসী লেখক 'ওজেয়ার' এই ইতালিয়ান পত্রিকায় আমেরিকার লোক-সংখ্যা-বিষয়ক আইনকানুন এবং তাহার ফলাফল বস্তুনিষ্ঠ ভাবে বিবৃত করিয়াছেন।

(১০) দুনিয়ার লোক-সমস্যা (সিয়েন্টিয়া, অক্টোবর নভেম্বর ১৯২৫)। অষ্ট্রেলিয়ার সংখ্যাতত্ত্ববিদ্ ক্নিব্স্ নানাপ্রকার হিসাব চালাইয়া বলিতেছেন, "পৃথিবীতে শেষ পর্য্যন্ত কত লোক বসবাস করিতে পারে তাহার আন্দাজ সম্বন্ধে নানাপ্রকার মতামত পাওয়া গিয়াছে। কোনো কোনো মতে ২৯০ কোটী হইতেছে ধরাতলের চরম শক্তি। যাঁরা অতিমাত্রায় আশাবাদী তাঁহাদের বিবেচনায় ১৩৪০ কোটী নরনারীর আবাস হইলেও দুনিয়া লোকের ভিড়ে বসবাসের অযোগ্য হইবে না।" ক্নিব্সের অন্যান্য কথায় বর্ত্তমান আন্তর্জাতিক সমস্যা আলোচিত হইয়াছে। সংসারে লোকসংখ্যার চাপ কোথায় কত বেশী এবং তাহার ফলে ভবিষ্যতে লোকজনের গতিবিধি কখন কোন্ আকার গ্রহণ করিবে তাহার বিশ্লেষণ লেখকের অন্যতম উদ্দেশ্য।

(১১) লোক-চলাচলের বর্ত্তমান ধরণ-ধারণ (আমেরিকান ফেডারেশুন, মার্চ, ১৯২৬), লেখক ম্যাগন্যুসন বলিতেছেন—"মহাযুদ্ধের পর হইতে দুনিয়ায় লোকজনের দেশান্তর-গমন কমিয়া গিয়াছে। সকল দেশেই প্রবাস-বাস সম্বন্ধে কঠোর আইনকানুন জারী হইয়াছে এবং লোক-আমদানি সম্বন্ধে গভর্মেণ্ট কড়াকড়ি চালাইতেছেন। জেনেহ্বাতে বিশ্বরাষ্ট্র-পরিষদের সম্পর্কে যে আন্তর্জ্জাতিক মজুর অফিস আছে তাহার অধীনে এই দেশান্তর-গমন-সমস্যা অনেকটা শৃঙ্খলীকৃত হইবার সম্ভাবনা আছে।"

(১২) এশিয়ার নরনারী সম্বন্ধে কালিফর্ণিয়া-বাসীদের কর্ম্মনীতি। (অ্যান্যাল্স্ অব দি আমেরিকান অ্যাক্যাডেমি অব পোলিটিক্যাল সায়েন্স, নভেম্বর, ১৯২৫)। লেখক বলিতেছেন—কালিফর্ণিয়ার আমেরিকানরা এশিয়ার নরনারীর বিরুদ্ধে আর্থিক কারণে খড়্গ-হস্ত। এই সকল লোককে চিরকালের মতন আমেরিকা হইতে বাহিরে রাখা কালিফর্ণিয়ার মতলব। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য ইঁহারা যে কর্ম্মপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন তাহা কোনো মতেই যুক্তিসঙ্গত নহে।"

(১৩) ইয়োরোপে দেশান্তর-গমনের তথ্য (রেহ্বিু দে সিয়াঁস্ পোলিটিক, জুলাই, আগষ্ট, সেপ্টেম্বর ১৯২৫)।

ফরাসী লেখক মোরিয়িয়ে প্রধানতঃ ৩টি ইয়োরোপীয়ান দেশের লোক-রপ্তানি আলোচনা করিয়াছেন। (১) ইতালী, (২) ইংল্যণ্ড, (৩) পোল্যাণ্ড। ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের তথ্য-তালিকাও আলোচিত হইয়াছে। ফরাসী দেশে বিদেশী জনগণের লোক-সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে, একথা লেখক বেশ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ইতালিয়ান গভর্মেণ্ট লোকজনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য যে রাষ্ট্রনীতি চালাইতেছেন তাহার বৃত্তান্ত আছে। লেখকের মতে এই লোকজনের আমদানি-রপ্তানি কাণ্ডে আন্তর্জ্জাতিক রাষ্ট্রীয় সমস্যার কতকগুলি জটিল এবং সূক্ষ্ম গোলযোগ ঢুকিতে সুরু করিয়াছে।

(১৪) নিউজীল্যাণ্ডে শিশু-মৃত্যু গবেষণা। (জার্ণ্যাল অব দি আমেরিকান ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল অ্যাসোসিয়েশ্যন, সেপ্টেম্বর, ১৯২৫)। লেখক নীল বলিতেছেন—নিউজীল্যাণ্ডে শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা গণনায় অন্যান্য দেশের চেয়ে কম। তাহা ছাড়া, নিউজীল্যাণ্ডে গভর্মেণ্ট জনগণের জন্মমৃত্যু-বিষয়ক তথ্য-তালিকা নিখুঁত ভাবে সংগ্রহ করিয়া থাকেন। এই কারণে শিশুজীবন-বিষয়ক গবেষকদের পক্ষে নিউজীল্যাণ্ড সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্মকেন্দ্র।

(১৫) নগর-মুখী চাষী, যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা (ইকনমিক ওয়ার্লড্, আগষ্ট, ১৯২৫)। লেখক টেলার বলিতেছেন—"শহরের দিকে পল্লীবাসীর অভিযানে সাহায্য করা দেশের লোকের কর্ত্তব্য। চাষ-আবাদে অন্ন-সংস্থানের সুবিধা না থাকিলে পল্লী ছাড়িয়া শহরে আসিয়া শিল্প-কর্ম্মে লাগিয়া যাওয়াই আর্থিক উন্নতির সুপথ।"

(১৬) ইংরেজ পর্য্যটক আর্থার ইয়াং এবং ফ্রান্সের লোকসংখ্যা (রেভ্যিু দেকোনোমি পোলিটিক, নভেম্বর, ডিসেম্বর, ১৯২৫)।

(১৭) জনপদহিসাবে লোকের পরিমাণ এবং নর-নারীর সংখ্যাবৃদ্ধি (ৎসাইটশ্রিফ্‌ট্ ফ্যির গেওপোলিটিক, ১৯২৫)।

(১৮) কলেজের ছাত্রদের পরিবারের লোকসংখ্যা (জার্ণ্যাল অব দি আমেরিকান ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল অ্যাসোসিয়েশ্যন, ডিসেম্বর, ১৯২৫) লেখক টমসন বলিতেছেন, "যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলে উচ্চ শিক্ষিত ভদ্রলোকের সন্তান-সংখ্যা বাড়িতেছে না। পশ্চিম অঞ্চলের কোনো কোনো জেলায়ও ঐ অবস্থা। কিন্তু দক্ষিণ অঞ্চলে লোকসংখ্যা শিক্ষিত সমাজেও দস্তুর মত বাড়িতেছে।"

আর্থিক মতবাদের ধারা

আর্থিক জীবন এক বস্তু; আর্থিক জীবন-বিষয়ক চিন্তা আর এক বস্তু। আর্থিক ইতিহাস বলিলে আর্থিক জীবনের ইতিহাস বুঝায়। কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের ক্রম-বিকাশ, ব্যাঙ্কিং, বীমা, ব্যবসায়ি-সঙ্ঘ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের উন্নতি-অবনতি এই ইতিহাসের অন্তর্গত। কিন্তু আর্থিক মতবাদের ইতিহাসকে আর্থিক জীবন-বিষয়ক বিভিন্ন চিন্তা-রাশি বুঝিতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিত আর্থিক ব্যবস্থা, টাকাকড়ির লেন-দেন, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের গতিবিধি, ব্যাঙ্ক-বীমা ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের জীবন-কথা সম্বন্ধে যেরূপ মত প্রচার করিয়াছেন, সেই মত এবং চিন্তাগুলা ছাড়া এই সাহিত্যের আর কোনো আলোচ্য বিষয় নাই। এক কথায় এই সাহিত্যটা দর্শনের অন্যতম বিভাগ। ধন-বিজ্ঞানের ইতিহাস বলিলেও এই সাহিত্যের স্বরূপ বিবৃত করা হয়।

আমাদের দেশে এই ধরণের সাহিত্য কিছুকাল ধরিয়া ফরাসী পণ্ডিত জিদ এবং রিস্ত্ প্রণীত "হিষ্টরি অব ইকনমিক ডক্‌ট্রিনস" নামক গ্রন্থের ইংরেজি তর্জ্জমায় মূর্ত্তি পাইয়া আসিতেছে। তবে উচ্চশিক্ষিত জনসাধারণের ভিতর এই গ্রন্থের তথ্যরাশি বোধ হয় এখনো সুবিস্তৃত হয় নাই। এই গ্রন্থের কোনো কোনো অধ্যায় বাংলায় প্রচারিত হইলে বাঙালীর মাথা অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসিবে।

সম্প্রতি আর একখানা ফরাসী গ্রন্থ বাহির হইয়াছে, তাহার ইংরেজি তর্জ্জমা এখনো হয় নাই। লেখকের নাম গোনার। গ্রন্থ তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ (২৯২, ৩৯, ৩৬৫ পৃঃ)। ১৯২১-২২ সনে বাহির হইয়াছে, "ইস্তোআর দে দোক্‌ত্রিন্ জেকোনোমিক" (আর্থিক মতবাদের ইতিহাস) নামে। প্রকাশক মুভেল লিব্রেয়ারি ন্যাশন্যাল (প্যারিস)।

প্রথম খণ্ডে আছে মান্ধাতার আমলের পণ্ডিতগণের চিন্তারাশি। গ্রীক, রোমাণ, মধ্যযুগের ক্যাথলিক খ্রীষ্টিয়ান এবং পরবর্ত্তী কালের "মার্ক্যানটাইল" ("ব্যবসায়ী") পন্থী লেখকদের মতামত। যাঁহারা প্রাচীন ভারতের আর্থিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মতবাদের বিশ্লেষণে বা ইতিহাসে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের পক্ষে এই খণ্ড বিশেষ কাজে লাগিবে।

দ্বিতীয় খণ্ডের আলোচ্য বিষয় "ফিজিঅক্র্যাট" (প্রকৃতি-তন্ত্রবাদী) এবং "ক্লাসিক্যাল" (এক কথায় যাহাকে বলা যায় বর্ত্তমান ধন-বিজ্ঞান বিদ্যার জন্মদাতার দল) মতের রচনাবলী। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্য্যন্ত এই সাহিত্যের সীমানা।

তৃতীয় খণ্ডে আছে বর্ত্তমান যুগ অর্থাৎ বিগত ৫০।৬০ বৎসরের পণ্ডিত ও সমাজ-সংস্কারকদের চিন্তা-প্রণালী এবং ধরণ-ধারণ ও দার্শনিক কাঠাম। জিদ ও রিস্ত্ প্রণীত গ্রন্থের শেষ তৃতীয়াংশে যে সকল কথা আছে তাহারই বিশেষ বৃত্তান্ত এই খণ্ডে পাওয়া যায়। যুবক বাংলাকে এই অংশের মালের সঙ্গেই বর্ত্তমানে গভীর ভাবে পরিচিত হইতে হইবে। এই যুগকে প্রধানতঃ "সোশ্যালিষ্টিক" (সমাজ-তন্ত্রনিষ্ঠ) এবং "রিয়ালিষ্টিক" (বস্তুনিষ্ঠ) রূপে বিবৃত করা হয়।

আমাদের দেশে পাশ্চাত্য সৎসাহিত্যের সারাংশ প্রকাশ করিবার জন্য স্বতন্ত্র মাসিক পত্রিকা বাহির হওয়া আবশ্যক। সকল বইয়েরই অনুবাদ বাহির করা সোজা নয়। খরচপত্রের মামলা ত আছেই। তাহার উপর আছে "কপিরাইটের" হাঙ্গামা।

কিন্তু সমালোচনার আকারে শ'তিনেক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ বইয়ের সংক্ষিপ্ত সার কোনো মাসিকের দুই তিন সংখ্যায় ছাপা যাইতে পারে। পৃষ্ঠা ত্রিশেকের মাল পাইলে বইয়ের

চুম্বক বেশ সরস ভাবে পাইবার কথা। তাহাতে বোধ হয় কপিরাইটও মারা যায় না আর হাজার হাজার বাঙালীর পেটেও হোমিওপ্যাথিক ডোজে বর্ত্তমান জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞান আসিয়া হাজির হইতে পারে।

বাংলা মাসিকের সাহায্যেই বাঙালীকে বর্ত্তমান-নিষ্ঠ হইয়া উঠিতে হইবে। যাঁহারা দিনে এক ঘণ্টা বা সপ্তাহে চার ঘণ্টা মাত্র লেখাপড়ায় খরচ করিতে সমর্থ তাঁহারা নিজ নিজ লাইনে নামজাদা গ্রন্থকারদের রচনাবলী ধারাবাহিক রূপে বাংলায় বাঁটিতে সুরু করুন। বিদেশী উচ্চ সাহিত্য বাংলায় বাহির হইতে থাকিলে যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ পড়িবার সুযোগ পান না, তাঁহারা ঘরে বসিয়াই এম, এ পড়ার ফল পাইবেন।

হাজার হাজার বাঙালীকে একসঙ্গে এম, এ পড়াইতে হইলে বাংলা মাসিককে উন্নত করিয়া তুলিতে হইবে। ধন-বিজ্ঞান বিদ্যার সেবকেরা মাসিকের সেবায় প্রবৃত্ত হইলে এক দিক্ হইতে আমাদের অভাব খানিকটা পূরণ হইতে পারিবে।

শিল্প-বিপ্লবের সমসমকালে

ভারতে আজকাল শিল্প-বিপ্লবের যুগ চলিতেছে। আমাদের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য সবের কাঠামই আগাগোড়া বদলাইয়া যাইবার উপক্রম দেখা যাইতেছে। এই ধরণের ওলট-পালট ইয়োরামেরিকার নানা দেশে বহু পূর্ব্বেই সাধিত হইয়া গিয়াছে। ইংরেজ সমাজ এই বিষয়ে দুনিয়ার অগ্রণী। এক কথায় আমরা আর্থিক হিসাবে বিলাতকে বর্ত্তমান জগতের জন্মদাতা বলিতে পারি।

আর্থিক ইতিহাসের এই স্তর সুরু হয় কবে ? সাধারণতঃ ১৭৬০ সনকে শিল্প-বিপ্লবের প্রথম তারিখ রূপে ধরিয়া লওয়া হয়। বর্ত্তমান জগতের গোড়ার কথাটা এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় শিল্প-বিপ্লবের আধ্যাত্মিক আদি-গুরুর জন্ম-বৃত্তান্ত বুঝিতে হইলে সেই ১৭৬০ সনের এদিক্-ওদিক্কার বিলাতী সমাজই যুবক ভারতে আলোচিত হওয়া আবশ্যক। তাহার জন্য বাঙ্গালীকে সম্প্রতি কিছুকাল স্বাধীনভাবে মাথা না খেলাইলেও চলিবে। কেননা ইংরেজ এবং অন্যান্য ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা এই যুগটা সম্বন্ধে নানা প্রকার গবেষণা চালাইতেছেন। শিল্প-বিপ্লবের তরফ হইতে বিভিন্ন শ্রেণীর তথ্য বাহির হইয়া আসিতেছে। বিগত আট-দশ বৎসরের ভিতর বিলাতের আর্থিক ইতিহাস সম্বন্ধে কতকগুলা "গভীরতর গবেষণা"-মূলক (ইণ্টেন্সিভ রিসার্চ) রচনা প্রকাশিত হইয়াছে।

মফ্ফিট্-প্রণীত "ইংল্যাণ্ড অন্ দি ঈভ্ অব্ দি ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল রেভোলিউশ্যন" (শিল্প-বিপ্লবের সমসমকালের বিলাতী সমাজ) এই সমুদয় গ্রন্থের অন্যতম। ২১+৩১২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ (১৯২৫)। প্রকাশক লণ্ডনের কিং কোম্পানী। গ্রন্থের বিশেষত্ব ল্যাঙ্কাশিয়ার জেলার চাষ এবং চাষীদের বৃত্তান্ত। নতুন নতুন শিল্প-প্রণালীর প্রভাবে ইংরেজদের কৃষিকর্ম্ম কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইতেছিল তাহা আজকালকার বাঙালীর পক্ষে জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

এই শ্রেণীরই আর এক গ্রন্থ "ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সোসাইটি ইন্ ইংল্যাণ্ড টুয়ার্ডস্ দি এণ্ড্ অব্ দি এইটিন্থ্ সেঞ্চুরি" (বিলাতের শিল্প-সমাজ, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিক্কার অবস্থা)। প্রকাশক লণ্ডনের ম্যাক্মিলান (১৯২৫, ৩৪৫ পৃষ্ঠা)।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি যে শিল্প-বিপ্লব উপস্থিত হয় তাহার পশ্চাতে কতকগুলা "আধ্যাত্মিক" কারণ ছিল। সেই যুগে বিলাতের ধনী লোকেরা কৃষি, শিল্প ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনুসন্ধান এবং গবেষণা চালাইবার জন্য উপযুক্ত লোক বাহাল করিয়া প্রচুর টাকা ঢালিতেন। ইহা একটা মস্ত কথা।

নতুন নতুন শিল্পের মালিকেরা একটা নবীন অভিজাত সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিতেছিল। টাকার জোরে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা এবং প্রভাবও আপনা-আপনিই তাঁহাদের তাঁবে আসিতেছিল। ছলে বলে কৌশলে পার্ল্যামেণ্টে বসিবার ঠাঁই এই সকল পয়সাওয়ালাদের দল দখল করিতে লাগিল।

সেই সময়ে আর্থিক ঝগড়া চলিতেছিল দুই নম্বর। প্রথম, চাষী বনাম শিল্পী। দ্বিতীয়, প্রাচীন শিল্প-ওয়ালা বনাম নবীন শিল্প-পতির দল। প্রাচীনেরা নবীনের কর্ম্মকৌশল এবং সফলতা দূর হইতে দেখিয়া হা-হুতাশ করিতেছিল।

এই সকল তথ্য জগতের ইতিহাসে প্রায় ১০০।১২০ বৎসরের পুরাণা। কিন্তু যুবক ভারতের পক্ষে এই ধরণের তথ্য ঠিক যেন আজকালকারই জীবন-কথা। দুনিয়া চলিতেছে সর্ব্বত্র একই পথে।

মহানগরীর আর্থিক জীবন

বড় বড় শহর কিছুদিন পূর্ব্বে ইয়োরামেরিকায়ও ছিল না। পল্লী-জীবন, পল্লী-সভ্যতা, পাড়াগাঁয়ের আদর্শ ইত্যাদি মাল মান্ধাতার আমল হইতে সেদিন পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য সমাজেরও অতি পরিচিত বস্তু। কিন্তু মহানগরী নামক জনপদ বা জীবন-কেন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীতে দেখা দিয়াছে। আর তাহার ধারা বিংশ শতাব্দীতে জোরেই বহিতেছে। আমাদের ভারত এই পল্লী-নগর-সমস্যায় আগাগোড়া পাশ্চাত্যেরই জুড়িদার। তবে আমরা কাল হিসাবে ইয়োরামেরিকানদের পেছনে পেছনে চলিতেছি—এই যা প্রভেদ। মাল হিসাবে ভারতে এবং পাশ্চাত্যে কোনো তফাৎ নাই।

নগর-জীবনকে দুস্মনের তাণ্ডব বিবেচনা করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। এই সম্বন্ধে মাথা খাটাইতে হইবে। মাথা খাটাইবার কাজেও আবার পাশ্চাত্যেরাই অগ্রণী। বর্ত্তমান জগতের মহানগরী সম্বন্ধে ইংরেজি, ফরাসী এবং জার্ম্মাণ সাহিত্য বিপুল।

প্লাট্‌স্‌-প্রণীত "গ্রোস-ষ্টাট উণ্ড মেনশেন্‌টুম" (মহানগরী ও মানব সমাজ) নামক জার্ম্মাণ গ্রন্থে আছে ৮+২৭৬ পৃষ্ঠা। প্রকাশক মিউনিকের কোজেল কোং। ১৯২৪ সনে প্রকাশিত হইয়াছে।

নগরের নরনারীর আত্মিক উন্নতি-অবনতি আলোচনা করা প্লাট্‌সের উদ্দেশ্য। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সমাজ-কথা তাঁহার গ্রন্থে বিশ্লেষিত হইয়াছে। মস্তিষ্কজীবী, মজুর এবং পুঁজিপতি এই তিন শ্রেণীর নৈতিক এবং মানসিক ফটোগ্রাফ তুলিয়া গ্রন্থকার বর্ত্তমান জগৎটাকে পাঠকের নিকট খুলিয়া ধরিয়াছেন।

বর্ত্তমান জগতের বিশেষত্ব দুনিয়া-নিষ্ঠা, সংসার-শ্রদ্ধা এবং শক্তি-পূজা। নগর-জীবনে এই সবই পুঞ্জীকৃত। লেখক রোমাণ ক্যাথলিক ধর্ম্মের আধ্যাত্মিকতা এবং ভগবৎ-প্রীতির বন্যা আনিয়া আধুনিক সাংসারিকতা এবং জগৎ-প্রীতির সংস্কার করিতে প্রয়াসী। রোমাণ ক্যাথলিক ধর্ম্মের বেদান্তবাগীশেরা সংসারকে সয়তানের কর্ম্মকেন্দ্র বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত। আমাদের দেশে যাঁহারা হিন্দুত্বের বড়াই করেন, তাঁহারা এই জার্ম্মাণ ক্যাথলিক পণ্ডিতের কেতাব ঘাঁটিলে নিজ নিজ খেয়াল-মাফিক অনেক যুক্তি পাইবেন।

এই গেল নগর-জীবন আলোচনার এক রীতি। অন্য রীতি দেখিতে পাই লাইনার্ট-প্রণীত "ডী সোৎসিয়ালগেশিষ্টে ডার গ্রোস্‌ষ্টাট্‌" (মহানগরীর সামাজিক ইতিহাস) নামক ৩০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ জার্ম্মাণ গ্রন্থে। প্রকাশক ফেরা কোং, হাম্বুর্গ, ১৯২৫।

লাইনার্ট বস্তুনিষ্ঠ লেখক। "আদর্শ", "সনাতন ধর্ম্মের ডাক" ইত্যাদি বিষয়ে চর্চ্চা করা তাঁহার দস্তুর নয়। আর্থিক ক্রমবিকাশের ফলে পল্লী এবং নগর কোন্ যুগে কিরূপ মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে তাহার আলোচনা পাইতেছি প্রথমে। লোক-সংখ্যার বৃদ্ধি, নরনারীর যৌন সম্বন্ধ, বিবাহ-প্রথা, নগরের চৌহদ্দি এবং বহর, নগরের গৃহনির্ম্মাণ এবং গৃহসংখ্যা ইত্যাদি লাইনার্টের আলোচ্য বিষয়। বাস্তুরীতি এবং ঘরবাড়ী তৈয়ারী করিবার বিভিন্ন কায়দাই গ্রন্থকারের দৃষ্টি বেশী টানিয়া লইয়াছে।

বর্ত্তমান জগতে নগর বলিলেই মজুরদের জীবন, মজুরির কর্ম্মকাণ্ড বিশেষভাবে নজরে পড়িবার কথা। লাইনার্ট সেই দিকে যথেষ্টই আলোচনা চালাইয়াছেন। মজুরদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে যে সকল তথ্য পাওয়া যাইতেছে তাহাতে জার্ম্মাণির আর্থিক এবং সামাজিক অবস্থা সুদৃঢ় বনিয়াদের উপর অবস্থিত এইরূপ বুঝা যায়।

অধিকন্তু সরকারী এবং বে-সরকারী লোকহিতের প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে বৃত্তান্ত পাইতেছি। নগর-পরিচালিত শিল্পকর্ম্ম, সেভিংস্ ব্যাঙ্ক, শিক্ষাকেন্দ্র, যৌবনভবন এবং গ্রন্থশালা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের বিবরণগুলা অতিশয় চিত্তাকর্ষক।

লাইনার্টের বর্ণনায় বর্ত্তমান জগতের জীবনকেন্দ্র সম্বন্ধে আশার কথা এবং উন্নতির লক্ষণ অনেক পাওয়া যায়।

গৃহ সমস্যা

দুনিয়ার সকল দেশে গৃহস্থদের বাস্তু-ভিটা সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। তাহার মীমাংসা করিবার জন্য সর্ব্বত্র কম বেশী আন্দোলনও দেখিতেছি। "লণ্ডন ন্যাশন্যাল হাউসিং অ্যাণ্ড টাউন প্ল্যানিং কাউন্সিল" নামক গৃহ ও নগর নির্ম্মাণের পরিষদ গঠিত হইয়াছে। এই পরিষদ হইতে ১৯২৩ সনে একখানা গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার নাম "দি ন্যাশান্যাল হাউসিং ম্যানুয়্যাল"। লেখক শ্রীযুক্ত আলড্রিজ ৫২৬+৫ পৃষ্ঠায় এক বিপুল গৃহ-পঞ্জিকা তৈয়ারী করিয়াছেন। ইংরেজী ভাষায় এই সম্বন্ধে এত বড় এবং এরূপ সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ কেতাব বোধ হয় আর নাই। ১৯১৪, ১৯১৯ এবং ১৯২৩ সনে বিলাতে তিন বার "হাউসিং অ্যাক্ট' নামক গৃহ-বিধি জারি হইয়াছে। এই বিষয়ক সকল তথ্যই গ্রন্থের ভিতর সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। লেখক বলিতেছেন—দেশের লোক স্বাধীনভাবে ঘরবাড়ী তৈয়ারী করিতে আর সমর্থ নহে। গভর্মেণ্ট এবং নগর ও অন্যান্য "স্থানীয়" শাসনকর্ত্তারা এদিকে নজর না দিলে নরনারীকে আসমানের নীচে বিনা ছাদে জীবন কাটাইতে হইবে। ১৮৯০ হইতে ১৯২৩ পর্য্যন্ত ৩৩ বৎসরের ভিতর ১৩ বার ১৩টি আইন পাশ হইয়াছে। প্রত্যেকটী আইনের সকল ধারাই কেতাবের ভিতর দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে যাঁহারা ঘরবাড়ীর চর্চ্চা করিতেছেন তাঁহাদের পক্ষে এই বই বাস্তবিকই অনেকটা পঞ্জিকার মত ব্যবহারযোগ্য। আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক জেমস ফোর্ড বলিতেছেন—আলড্রিজ বিলাতের তথ্যগুলি সবই নির্ভুল ভাবে দিতে পারিয়াছেন। কিন্তু বিদেশ সম্বন্ধে তাঁহার কথাগুলি প্রায় সবই অশুদ্ধ, আংশিক ও ব্যবহারের অনুপযুক্ত। গ্রন্থকার গৃহ ও নগর পরিষদের সম্পাদক।

ঘরবাড়ী সম্বন্ধে আর একখানি সুবিস্তৃত ইংরেজি বহি বাহির হইয়াছে লণ্ডনের আর্নেষ্ট বেন কোম্পানী হইতে। গ্রন্থের নাম হাউসিং অর্থাৎ গৃহ-সমস্যা (১৯২৩, পৃষ্ঠা ৪৫০)। গ্রন্থকার বার্নাস ঘরবাড়ী তৈয়ারী করিবার খরচপত্র এবং বাড়ীভাড়া বিশ্লেষণ করিয়াছেন। বিলাতের সরকারী গৃহ-নির্ম্মাণের নীতি বুঝিবার পক্ষে এই কেতাব বিশেষ সাহায্য করিবে।

অপব্যয়ের পরিমাণ

যুক্তরাষ্ট্রে ৮০ লক্ষ নরনারী এমন সব কাজে অন্ন-সংস্থান করিতেছে যাহা দেশের পক্ষে বিশেষ বাঞ্ছনীয় নহে। বৎসরে প্রতিদিন গড় পড়তা ৬০ লক্ষ লোক অলস ভাবে কাল কাটায়। এমন সব কর্ম্ম-প্রণালী চলিতেছে যাহার ফলে অন্ততঃ পক্ষে ৪০ লক্ষ মানবের শক্তির বাজে খরচ হইতেছে। তাহা ছাড়া ২৫ লক্ষ লোকের কার্য্য-ক্ষমতা অনর্থক লেন-দেনের কাজে নিযুক্ত আছে। এই সব দেখিয়া শুনিয়া শ্রীযুক্ত ষ্টুয়ার্ট চেজ্ যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক অবস্থাকে যারপর নাই শোচনীয় বিবেচনা করিতেছেন। ২৯৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ একখানি বহি প্রণীতও হইয়াছে। নাম "দি ট্র্যাজেডি অব ওয়েষ্ট" (নিউইয়র্ক, ১৯২৫)। চেজের মতে মার্কিণ নরনারীরা প্রায় আধাআধিই কর্ম্ম-শক্তির অপব্যয় করিতেছে। অপব্যয়ের পরিমাণ বুঝাইবার জন্য চেজ কয়লা, তেল, কাঠ এবং অন্যান্য কুদরতী মালের বাজে খরচ ও হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন। এই সকল লোকসান হইতে দেশকে বাঁচাইবার জন্য গ্রন্থকার রাষ্ট্র-শাসন ও রাষ্ট্র-পরিদর্শনের স্বপক্ষে রায় দিয়াছেন। তাঁহার মতে আমেরিকার কোটী কোটী লোক প্রতি বৎসর অর্দ্ধাশনে আছে। মজুরি এবং বেতনের হার মার্কিণ মুল্লুকে নাকি জীবন-ধারণের উপযোগী নহে। তাহাকে "ডাইং ওয়েজ" অর্থাৎ মরিবার সহায়ক ভাতা বলিলেই চলে। সংসারে কাজের ইজ্জৎ বাড়াইলে এবং তাহার গতি অনুসারে দেশকে সজাগ করিবার সুযোগ থাকিলে আমাদের কার্য্যের ফল দ্বিগুণ বাড়াইয়া দেওয়া সম্ভব। সঙ্গে সঙ্গে জীবন-ধারণের প্রণালী এবং মাপকাটিও উন্নত হইতে বাধ্য। লেখক আমেরিকায় আজকালকার ইংরেজ সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হবসন এবং টনে ইত্যাদি পণ্ডিতগণের চিন্তা-প্রণালী প্রচার করিতেছেন।

ইয়োরোপের টাকাকড়ি

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সেনেট সভা হইতে দুনিয়ার সোনা

ও রূপা সম্বন্ধে খতিয়ান করিবার জন্য একটা কমিশন গঠিত হইয়াছিল। এই কমিশনের তত্ত্বাবধানে ২ খণ্ডে সম্পূর্ণ (১০+৫৪৮, ১১+৪১১ পৃষ্ঠা) গ্রন্থ বাহির হইয়াছে, নাম "ইয়োরোপীয়ান কারেন্সি অ্যাণ্ড ফিনান্স।" সম্পাদক বাহাল ছিলেন ইয়ং সাহেব। ওয়াশিংটনের সরকারী দপ্তরখানা হইতে ১৯২৫ সনে এই কেতাব বাহির হইয়াছে।

১৯১৪ হইতে ১৯২৫ পর্য্যন্ত কালের ইয়োরোপের নানাদেশের মুদ্রা এবং রাজস্বের অবস্থা বর্ত্তমান গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। আমদানি-রপ্তানির তথ্য-তালিকা, গভর্মেণ্টের সরকারী কর্জ্জ, জিনিষ-পত্রের দাম, ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানের লেন-দেন ইত্যাদি সকল কথা নানা তালিকায় এক সঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়। তালিকাগুলির সরল ব্যাখ্যাও সর্ব্বত্রই আছে। ইয়োরোপ এবং আমেরিকার বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ এই গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায় লিখিয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ দেশের মুদ্রা, ব্যাঙ্কিং, রাজস্ব এবং বাণিজ্যের অবস্থা বিবৃত করিয়াছেন।

সোভিয়েট রুশিয়ার সমবায়

১৮৬৫ সনে রুশিয়ায় সর্ব্বপ্রথম সমবায়-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। দোকানদারির জন্য এই সমিতি কায়েম হইয়াছিল। ১৯১৭ পর্য্যন্ত অন্যান্য দেশের মতন রুশিয়ায়ও সমবায়ের আন্দোলন অল্প-বিস্তর বাড়িতে থাকে। সেই বৎসর রুশিয়ায় বোলশেভিক রাষ্ট্র গঠিত হয়। তাহার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত সমবায়ের আন্দোলন বরাবর চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু এই বোলশেভিক আমলে ইতিমধ্যেই সরকার পক্ষ হইতে ৩।৪টি কর্ম্ম-প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। প্রথমতঃ কায়েম হয় ষোল আনা কমুনিজম বা ধনসাম্যের নিয়ম। সমবায়-সমিতিগুলিকে বোলশেভিক সরকার ধনসাম্যের মতে নিয়ন্ত্রিত করিতে সচেষ্ট হন। দ্বিতীয়তঃ, ১৯২১ সনে গভর্মেণ্ট বোলশেভিক নীতি শোধরাইতে বাধ্য হন। তাহার পরিবর্ত্তে রুজু হয় অনেকটা অন্যান্য দেশে সুপ্রচলিত আর্থিক নীতি। এই নূতন আর্থিক নীতি অনুসারে সমবায়সমিতিগুলি পরিচালিত হইতে থাকে। তৃতীয়তঃ, ১৯২৩ পর্য্যন্ত এই প্রণালীতে কার্য্য করিবার পর গভর্মেণ্ট সমবায়-আন্দোলনকে আরও খানিকটা বেশী স্বাধীনতা দিয়াছেন।

১৯২৫ সন পর্য্যন্ত ৮।৯ বৎসরের ভিতর বোলশেভিক রুশিয়ার সমবায়-আন্দোলন সম্বন্ধে যাহা কিছু ঘটিয়াছে তাহার তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য জেনেভার আন্তর্জাতিক মজুর আফিস হইতে এক কমিটি গঠিত হয়। সেই কমিটির অনুসন্ধান-ফল সম্প্রতি গ্রন্থাকারে বাহির হইয়াছে (১০+৩৬২ পৃষ্ঠা, ১৯২৫)। গ্রন্থের নাম "দি কোঅপারেটিভ মুভমেণ্ট ইন্ সোভিয়েট রুশিয়া।" ১৯২১ সনে নূতন আর্থিক নীতি কায়েম হইবার সঙ্গে সঙ্গে সমবায়-কেন্দ্রগুলি পুরাণা স্বাধীনতা ফিরাইয়া পায়। বর্ত্তমান গ্রন্থে দোকানদারি বিষয়ক সমবায়-প্রথাই বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। কৃষি-সমবায়, শিল্প-সমবায় এবং সমবেত ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানের কথা বাদ পড়িয়াছে। ১৯২৩ সনে রুশিয়ায় ব্যবসা-সঙ্কট ও সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক দুর্যোগ দেখা দেয়। তাহা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য বোলশেভিক গভর্মেণ্ট সমবায়-কেন্দ্রগুলিকে অতিমাত্রায় শাসন করিবার নীতি বর্জ্জন করিতে বাধ্য হন। সমবায়-সমিতিগুলিও তখন হইতে সরকারী আড়ৎ ও দোকান ছাড়িয়া অন্যত্র জিনিষপত্র খরিদ করিতে অধিকারী হইয়াছে। কিন্তু যথার্থ সমবায়ের নীতি এই সকল সমিতি অনেক সময় রক্ষা করিয়া চলে না। তাহারা মামুলি ব্যবসাদারের সঙ্গে টক্কর দিবার জন্য অনেক সময় অত্যধিক ঝুঁকি-বিশিষ্ট কারবারে লাগিতেছে।

বোলশেভিক গভর্মেণ্ট সমবায়-সমিতির সঙ্গে মামুলি ব্যবসাদারদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা কোন্ পথে চালাইবেন তাহা এখনও বুঝা যাইতেছে না। দুই প্রকার ব্যবসা-কেন্দ্রই গভর্মেণ্টের হাতে রাখিবার চেষ্টা দেখা যাইতেছে।
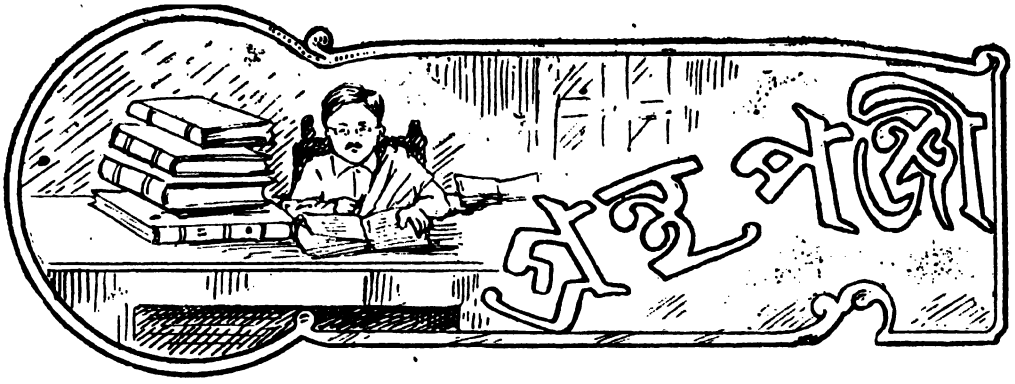
ফোল্‌কস্‌-হ্বির্ট্‌শাফট, আর্বাইট্‌স্‌-রেখট্‌ উণ্ড সোৎসিয়াল-ফার্জি-খারুং ডার শোআইট্‌স

(সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের আর্থিক জীবন, মজুর-বিধি এবং সমাজ-বীমা),—সরকারী গ্রন্থ, ১১০২ পৃষ্ঠা। দুই খণ্ডে বিভক্ত (প্রথম খণ্ডে আছে বিবরণ ও ব্যাখ্যা, দ্বিতীয় খণ্ডে আছে আর্থিক আইন-কানুনসমূহ)। প্রকাশক বেনৎসিগার কোং (আইনসীডেলন্‌ নগর, ১৯২৫)।

রুস্‌সিশে হ্বির্টশাফ্‌ট্‌স্‌গেশিষ্টে

(রুশিয়ার আর্থিক ইতিহাস),—কুলিশার,য়েনা, ফিশার কোং, ২২+৪৫৮পৃ, ১৯২৫, ২৪ মার্ক।

দি ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ওয়ার্ক অব দি ন্যাশন্যাল গবমেণ্ট

(যুক্তরাষ্ট্রের ফেডার‍্যাল গবর্মেণ্টের অধীন তথ্য-সংগ্রহের কার্য্য),—শ্‌মেকেরিয়ার, বাল্টিমোর, জনস্‌হপকিন্‌স্‌ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত, ১৯২৫, ৫ ডলার।

দি অ্যামালগ্যামেশ্যন মুহ্বমেণ্ট ইন ইংলিশ ব্যাঙ্কিং

(বিলাতী ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ে কেন্দ্রীকরণের ধারা) ; সাইক্‌স্‌, লণ্ডন, কিং কোম্পানী ; ২২৭ পৃষ্ঠা, ১৯২৬, ২শি ৬পে।

পপিউলেশ্যান প্রবলেম্‌স্‌ অব দি এজ অব ম্যালথাস

(ম্যালথাসের সময়কার লোক-সমস্যা) ;—গ্রিফিথ, কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯২৬, ২৭০পৃ, ১২শি ৬পে।

ইণ্ডিয়ান কারেন্সী অ্যাণ্ড এক্‌স্‌চেঞ্জ

(ভারতীয় মুদ্রা ও বিনিময়),—চাবলানি, অকস্‌ফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস ; ১৮২পৃ, ১৯২৫ ; ৭শি ৬পে।

দি গ্রাউণ্ড ওয়ার্ক অব ইকনমিক্‌স্‌

(ধনবিজ্ঞানের বনিয়াদ), শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়, লণ্ডন, লংম্যান্‌স্‌ গ্রীণ অ্যাণ্ড কোং ; ৮+২১৭পৃ, ১৯২৫, ৬শি।

দাল্‌ প্রতেৎশনিস্‌ম আল্‌ সিন্দিকালিস্‌ম

(সংরক্ষণ-নীতি হইতে সঙ্ঘ-নীতি পর্য্যন্ত)—রিচ্চি, বারি, লাতার্ৎসা কোং, ১৯০পৃষ্ঠা, ১৯২৬।

লেভলিউসিঅঁ কমার্সিয়াল এ অঁ্যাদুস্ত্রিয়েল দ' লা ফ্রাঁস্‌ সু লাঁসিয়াঁ রেজিম্‌

(ফরাসী শিল্প-বাণিজ্যের ক্রমবিকাশ, বুর্বঁ আমলের কথা), —আঁরি সে ; প্যারিস জিয়ার কোং, ৩৯৬পৃ, ১৯২৫।

দি মিডীভ্যাল হ্বিলেজ

(মধ্যযুগের পল্লী),—কুল্টন ; কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ৩০+৬০৩পৃ, ১৯২৫, ২৫ শি।

গোল্ড উণ্ড্‌ ষ্টাট

(টাকা ও রাষ্ট্র), গ্যারবার ; য়েনা, ফিশার কোং ; ১৯০পৃ, ১৯২৬।

দি ইকনমিক্‌স্‌ অব ট্যাক্‌সেশ্যান

(করাদায়ের আর্থিক তত্ত্ব),—ব্রাউন, নিউইয়র্ক, হোল্ট কোং, ২১+৩৪৪পৃ, ১৯২৪।

ষ্টাডীজ্‌ ইন পাবলিক ফিনান্‌স

(সরকারী গৃহস্থালী-বিষয়ক প্রবন্ধাবলী)—সেলিগ্‌ম্যান ; নিউইয়র্ক, ম্যাক্‌মিলান, ৯+৩০২পৃ,১৯২৫।

চেঞ্জেস্‌ ইন দি সাইজ অব আমেরিকান ফ্যামিলীজ ইন ওয়ান জেনারেশ্যন

(এক পুরুষের ভিতর মার্কিণ পরিবারের আয়তনের পরিবর্ত্তন), বাবার এবং রস,—ম্যাডিসন, উইস্‌কন্সিন বিশ্ববিদ্যালয়, ৯৯পৃ, ১৯২৪।

মধ্যপ্রদেশে কয়লার ব্যবসা

শ্রীঈশ্বরদাস শেঠি, জুনেরদেও, ছিন্দওয়াড়া

ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে নানা প্রকার খনিজ পদার্থ আছে। এস্থানে মধ্যপ্রদেশের কথা কিছু বলিব। এ প্রদেশ বহুবিধ খনিজ পদার্থে পরিপূর্ণ। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, সীসা, মিশ্রধাতু, লৌহ, মার্ব্বেল, কয়লা, চুণ, অভ্র প্রভৃতি যাবতীয় খনিজ পদার্থের আকর এখানে আছে। কিন্তু এই সমুদয়ের মধ্যে কয়লার খাদ ও ম্যাঙ্গানিজ এবং লোহার খনিই প্রধান। চুণ, অভ্র ইত্যাদির স্থান তৎপরে।

এখনো বৃহু পরিমাণ কয়লার জমি পড়িয়া আছে। কয়লার "সীম"সকল কোথাও কোথাও অগভীর স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। কোথাও কোথাও নদী-নালার জল-স্রোতে উপরের মাটি ও পাথর ধুইয়া যাওয়ায় কয়লা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। বেঙ্গল কয়লা অপেক্ষা এখানকার কয়লা উত্তম না হইলেও ইহা ২য় শ্রেণীর অন্তর্গত। অধিকাংশ কয়লাই "গুড সেকেণ্ড ক্লাস". (উত্তম ২য় শ্রেণীর)।

এস্থান হইতে বোম্বাই ও পঞ্জাব প্রদেশে মাল চালানো সুবিধাজনক। মধ্যপ্রদেশ, মধ্যভারত, বোম্বাই ও পঞ্জাব প্রদেশের নানা স্থানে তুলার জিনিং ফ্যাক্টরী ও প্রেস এবং মিল থাকায় কয়লার প্রচুর চাহিদা আছে। ঐ সব প্রদেশে বেঙ্গল হইতে কয়লা আনাইতে যে খরচ পড়ে তাহা অপেক্ষা এখানকার কয়লা নিতে খরচ কম। বেঙ্গলের দ্বিগুণ মূল্যে খরিদ করিয়াও মায় রেল-মাশুল এখানকার কয়লা বেঙ্গল কয়লা অপেক্ষা ঐসব স্থানে সুলভ মূল্যে বেচা সম্ভব।

এখানে কয়লার গ্রাহক এত যে উহা কখনও পড়িয়া থাকে না। এখানকার কয়লার বাজার বর্ত্তমানে মন্দা হইলেও বেঙ্গলের তুলনায় দ্বিগুণ চড়া। বেঙ্গলের মত এখানে রেলগাড়ী বা গাড়ীর কামরা সাপ্লাইয়ের টানাটানি নাই ও বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। জি, আই, পি, আর এবং বি, এন, আর ছোট লাইন এখানকার কয়লা ও ম্যাঙ্গানিজ ফিল্ডে বর্ত্তমান আছে।

এখানে অনেক কয়লার খাদ চলিতেছে। ঐ সকল খাদের মালিক অধিকাংশই বোম্বাই, পঞ্জাব, যুক্ত প্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশের অধিবাসী। ইংরেজ সাওয়ালেস কোম্পানী, নিউটন কোং ও জি, আই, পি, আর কোম্পানীর মোপানী কলিয়ারী চলিতেছে। বেঙ্গল প্রদেশের হুগলী জেলার অধিবাসী শ্রীপ্রতুলনারায়ণ মুখোপাধ্যায় নামক একজন মাত্র বাঙ্গালীর কলিয়ারী এখানে আছে। আমার পরিভ্রমণ কালে উক্ত বাঙ্গালী ভদ্রলোকের নিকট তাঁহার কলিয়ারী সম্বন্ধে যে সকল বিষয় অবগত হইয়াছি এস্থানে তাহা উল্লেখ করিতেছি।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত পরাসিয়া নামক জি, আই, পি, রেল ষ্টেশনে আমার সাক্ষাৎ হয়। ঐ ষ্টেশন বি, এন, আর এবং জি, আই, পি রেলের জংসন ষ্টেশন। পোষ্ট-অফিস, থানা প্রভৃতি সব তথায় বর্ত্তমান আছে, কিন্তু জেলা ছিন্দওয়াড়া। মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রচুর কয়লার জায়গা (প্রায় ১০ মাইল,) লইয়াছেন। ইঁহার কলিয়ারীর কয়লা উত্তম দ্বিতীয় শ্রেণীর মাল,—অন্য কলিয়ারীর কয়লা অপেক্ষা ভাল।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় পূর্ব্বে কলিয়ারী-ম্যানেজারের কার্য্য করিতেন। ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ ব্যুৎপত্তির জন্য সাধারণ্যে তাঁহার খ্যাতি আছে। তিনি বহু অর্থ ও সময় ব্যয় করিয়া কয়লার ভূমি সংগ্রহ করিয়া তাহাতে ১১টী খাদ করিয়াছেন। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত মেশিনারি বসাইতে পারেন নাই। কয়লার বাজার বর্ত্তমানে নরম। এজন্য তিনি একজন ধনী মহাজন খুঁজিতেছেন। এগার জন পর্য্যন্ত ধনী পাইলেও তিনি এক এক জনকে এক একটী খাদের ভার দিতে পারেন। মিলিত ভাবে (পার্টনারশিপ) কিম্বা পৃথক সর্ত্তে পৃথক ভাবে বন্দোবস্ত চলিতে পারে। তাহা হইলে যাবতীয় মেশিনারি ইত্যাদির ব্যবস্থা হইতে পারিবে।

কলিয়ারীতে মেশিনারি বসাইলে প্রতি টন রেলগাড়ী বোম্বাই পর্য্যন্ত ২৲ টাকা পড়তা পড়িবে। কিন্তু কয়লার

বাজার যতই নরম হউক এখানে প্রতি টন ৫॥• সাড়ে পাঁচ টাকা হইতে ৬৲ টাকা পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়া থাকে। অতএব ৫০% লাভ হইবে। যত বেশী মূলধন লাগান যাইবে তত বেশী লাভ হইবে।

কোনো ধনী ব্যক্তি যদি ২৫ হাজার টাকা হইতে ১ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার সঙ্কল্পে এক মাইল স্থানের বন্দোবস্ত করেন তাহা হইলে যদিও কয়লার বাজার গরম না হয় তবু ১ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবার দুই বৎসরের মধ্যে তাঁহার মূলধন উঠিয়া আসিবে। একটী খাদ কমপক্ষেও ৪০।৫০ বৎসরের মধ্যে বন্ধ হইবে না। ততদিন পর্য্যন্ত লাভ চলিতে থাকিবে। যদি কয়লার বাজার গরম হয় তাহা হইলে ত কথাই নাই। প্রতি বৎসর অনেক টাকা লাভ হইবে। পাঠকগণের মধ্যে কাহারও আবশ্যক হইলে প্রতুলবাবুর নিকট—সাক্ষাৎ মতে বা পত্র লিখিয়া—সমুদয় সন্ধান জানিতে পারিবেন। তাঁহার ঠিকানা নিম্নরূপ:—পরাসিয়া, ছিন্দওয়াড়া, সি, পি।

ধর্ম্মমত ও ধনদৌলত

একটা জাতির ব্যবসা-বুদ্ধির হ্রাস-বৃদ্ধির জন্য যে তাহার ধর্ম্মমত ও দেশাচার অনেকটা দায়ী একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। প্রত্যেক দেশের ধর্ম্মমত, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতির মধ্যে সেই আদিম কাল থেকে একটা জাতি-ভেদ প্রথা চলে আসছে। আর সেই থেকে ব্যবসায়ী, শিল্পী, কারিগরের স্থান সমাজে সকলের নীচে দেওয়া হয়েছে। নিজ হাতে কাজ করা অত্যন্ত অসম্মানজনক এই ধারণা সেই মান্ধাতার আমল থেকে চলে আসছে। আজকালকার সভ্যতম জাতের মধ্যেও এ ভাবটা অল্প-বিস্তর রয়েছে।

রেনহোল্ড নেবুর জুন মাসে "আটলান্টিক মান্থলি" মাসিকে (নিউ ইয়র্ক) "পিউরিটানিজম ও প্রসপারিটি" নামক প্রবন্ধে লিখেছেন,—পাশ্চাত্য জগতের আন্তর্জ্জাতিক জীবনে আমেরিকার সম্পদ্ এক অত্যন্ত জটিল সমস্যা সৃষ্টি করেছে। ইয়োরোপ আমাদের কাছে এত ঋণী যে, বংশপরম্পরায় তার জীবনযাত্রার মাপকাঠি খাটো না করলে সে আমাদের বিপুল ঋণ শোধ দিয়ে উঠতে পারবে না।

আমাদের অর্থ এত প্রচুর যে ইহা ইয়োরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকার আর্থিক জীবনের নিয়ামক হয়েছে। আমরা এত বিলাস-ব্যসনের মধ্যে থাকলেও বছরে বছরে আমাদের এই সোনার আমেরিকা খেয়ে-খরচে অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ টাকা মজুত করছে। আর বিদেশে লাগানো টাকার সুদও বেড়ে চলেছে। একজন ইংরেজ ধন-বিজ্ঞানবিৎ হিসাব করে দেখেছেন যে, আমেরিকার বিদেশে ছড়ানো ধন-ভাণ্ডারের লভ্যাংশ বর্ত্তমান হারে বেড়ে চললে ১৯৫০ সনে এক মাত্র এই সম্পদ্‌ই ফ্রান্স-জার্ম্মাণির সমবেত ধনদৌলতের উপর টেক্কা দেবে। ইয়োরোপের কাগজগুলা খুললে বেশ বুঝতে পারা যায় ওরা আমাদের এই ধনকুবেরের দেশকে কতটা হিংসা করে। আমাদের এত সম্পদ্ দেখে ওদের গা-জ্বালা হয়।

আমাদের এরূপ অতিমাত্রায় ধনী হওয়ার কারণটা কি? আর সব পাশ্চাত্য জাতির মত আমরাও আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতির ভাণ্ডার-দ্বার উন্মুক্ত করেছি। এখন ওদের চাইতে আমাদের বেশী ধনী হওয়ার একটা কারণ হচ্ছে আমাদের এই দেশ কিছু বেশীমাত্রায় শস্যশালী। আর একটা কারণ হচ্ছে আমেরিকার আর্থিক জীবন ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন স্বার্থের দ্বন্দ্ব-কোলাহল-ময় "জাতীয়তা"র ঝগড়ায় হয়রাণ নয়। ওতেই তো ইয়োরোপের সর্ব্বনাশটা করেছে।

আবার আমেরিকার জলবায়ুরও একটা গুণ রয়েছে। এখান-কার আবহাওয়ায় আকৃষ্ট হয়ে যারা এদেশে এসে বসতি-স্থাপন করে, তারাই খুব অসমসাহসিক, চটপটে ও করিৎকর্ম্মা হয়। এগুলিই কিন্তু সমস্ত কারণ নয়। আমেরিকার ধন-সম্পদের মূল

আবিষ্কার করতে হলে আরও কিছু দূরে যেতে হবে। অনেক বড় বড় সমাজতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতের মতে "কালচার" এবং ধর্ম্মমতের প্রভাব আর্থিক জীবনের উপর খুব বেশী। জার্ম্মাণ সোসিওলজিষ্ট ম্যাক্স্ হেবার এ সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণার ফলে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, বর্ত্তমান ক্যাপিটালিষ্টিক স্পিরিটের (পুঁজিনীতির) একমাত্র কারণ প্রটেষ্টান্টিজম। আর এই ধর্ম্মমতবাদের মধ্যে পিউরিট্যানিজম ব্যবসা-বাণিজ্যকে সব চাইতে বেশী উৎসাহ দান করেছে। একাধারে পিউরিট্যান ও সমৃদ্ধিশালী আমেরিকা এই মন্তব্যের প্রমাণ।

এটা সহজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, বর্ত্তমানে ব্যবসায়ী লোকের মানসম্ভ্রম আগের আমলের চাইতে অনেক গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। সেকালে শিল্প ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ক যাবতীয় প্রচেষ্টা দাস বা নীচজাতীয় লোকগণের দ্বারা পরিচালিত হ'ত। প্লেটো তাঁর "রিপাব্লিকে"র আদর্শ জাতবিচারে ব্যবসায়ী ও শিল্পীদের নীচ স্থান দিয়েছেন। এটাকে জগতের সেই অতীত যুগের একটা প্রতিচ্ছবি বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে যখন কেবল ক্ষত্রিয় ও দার্শনিক-সম্প্রদায়েরই একচেটে সম্মান ছিল।

মধ্যযুগের নগর গড়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা-প্রচেষ্টাকে লোকে কতকটা সামাজিক সম্মান দিতে রাজী হলেও শ্রমের উপর এই যুগে যুগে সঞ্চিত বিতৃষ্ণাকে মানুষ তখনও একেবারে তুচ্ছ বলে ঠেলে দিতে পারে নি। তার পর রিফর্ম্মেশনের (ধর্ম্ম-সংস্কারের) ধাক্কা। কোনো কাজেই অসম্মান নাই দুনিয়া এইটা মেনে নিতে রাজী হয়। এই কাজের গরব, মেহনতের গৌরব ইয়োরোপের আবহাওয়াকে একেবারে বদলে ফেলে। লক্ষ্মীর দুয়ার ইয়োরোপের সামনে খুলে যায়। এই আন্দোলনের হোতা প্রটেষ্টান্ট সম্প্রদায় এবং ইহার প্রথম ফল হচ্ছে সেই উচ্চতর সাধুতার প্রবর্ত্তন ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে যাহা একান্ত প্রয়োজনীয়।

বর্ত্তমান ব্যবসা-বুদ্ধি এবং তদ্দ্বারা ধনার্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা যে খুব গাঢ় ভাবে প্রটেষ্টান্ট ধর্ম্মমতের সহিত জড়িত আছে তাহা এই ইয়োরোপের অবস্থা দেখলে বুঝা যায়। প্রটেষ্টান্ট প্রুসিয়া শিল্পপ্রধান (ইনডাষ্ট্রীয়াল) ক্যাথলিক ব্যাভেরিয়া কৃষিপ্রধান। প্রটেষ্টান্ট স্কটল্যাণ্ড শিল্পপ্রধান, ক্যাথলিক আয়ারল্যাণ্ড কৃষিপ্রধান, আবার প্রটেষ্টান্ট আলষ্টার শিল্প-প্রধান। প্রটেষ্টান্ট ইংল্যাণ্ডের ব্যবসায়ী মধ্যবিত্ত সমাজ পিউরিটান নন-কনফর্ম্মিষ্ট-সম্প্রদায়ভুক্ত।

কিন্তু ইয়োরোপের এই সমস্ত দেশ প্রটেষ্টান্ট হলেও এদিগকে পুরাপুরি প্রটেষ্টান্ট বলা যায় না। কারণ মধ্যযুগের মতবাদ এখানে এখনও চলে। আমেরিকার বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, এখানে ব্যবসাবাণিজ্য একেবারে খাঁটি পিউরিট্যান মতবাদসম্মত হয়ে গড়ে উঠেছে।

জার্ম্মাণিতে যুদ্ধের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সামরিক কুলীন-দিগকেই বেশী সম্মান দেওয়া হত। বিলাতে এই সেদিন পর্য্যন্তও ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ম্যাগনেটদিগকে জমিজমা খরিদ করে ব্যবসার জীবন ভুলে যাবার জন্য জমিদারের চালচলনে বাস করতে দেখা গেছে।

মধ্য ও আদিম যুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত যে সমস্ত ধর্ম্ম-সংক্রান্ত ও সামাজিক রীতিনীতি চলে এসেছে একমাত্র আমেরিকাই সেগুলিকে বেপরোয়া করে চলেছে। ব্যবসা-প্রচেষ্টা-সম্পর্কিত চিরচলিত আচার-বিচার ও কুসংস্কারকে তোয়াক্কা না করে আমরা ব্যবসা ও শিল্প বাণিজ্যের প্রচেষ্টায় নিযুক্ত শিল্পী ও ব্যবসায়ীদিগকে সমাজে বড় আসন দিতে পেরেছি। কুলীনের সম্মান এঁদিগকে দেওয়া হয়েছে বলেই আমাদের দেশ আজ এতটা অগ্রসর হয়েছে।

(আট্লাণ্টিক্ মান্থলি)

সুইডেনের মজুর-আন্দোলন

তাহেরউদ্দিন আহ্‌মদ

"মজুর"-আন্দোলনের জন্মদাতা রবার্ট ওয়েনের মতন আর কোনো "মনিবকে" এ আন্দোলনে অগ্রণী হতে দেখা যায় না। নয়া দুনিয়ার এই জগৎজোড়া আন্দোলনটার হাতেখড়ি মজুরদের কাছে হয় নাই। বর্ত্তমান যুগের ধনিক সম্প্রদায় আজ চারদিকে যে ধূমায়মান বিভীষিকা ও গাঢ় অন্ধকার দেখতে পাচ্ছেন এর স্রষ্টা তাঁদেরই পূর্ব্বপুরুষ।

আর সব দেশের মত সুইডেনেও এ আন্দোলনটা প্রথমে "মনিব"দের দ্বারাই সুরু হয়। এই অল্প কিছু দিন হল মনিবরা অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে উন্টা সুর ধরতে বাধ্য হয়েছে। ডেনমার্ক ও জার্ম্মাণিকে "গুরুরূপে বরণ ক'রে তাদের সমসাময়িক আন্দোলনকে সামনে রেখে ১৮৮০ সনে "সুইডিস ট্রেড ইউনিয়ন" গড়া হয়। এটাকে সরাসরি ইঙ্গ-জর্ম্মণ ধরণের মজুর-আন্দোলন বলা চলে। স্থানীয় মজুর-সঙ্ঘগুলি লইয়া এর গোড়াপত্তন করা হয়। এক একটা শিল্পের অধীনে যত মজুর কাজ করে তাদের সবকে নিয়ে সঙ্ঘ গড়ে তুললে সেগুলি খুব শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন কায়েম করবার পক্ষে জবর হাল-হাতিয়ার হবে, এই চিন্তাধারা সুইডেনের মজুর-নায়কদের মাথায় আসে। এই ব্যবস্থানুযায়ী ১৮৯০ সনের মধ্যে সারা দেশটা ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়নে ছেয়ে ফেলা হয়।

১৮৯৮ সনে জেনারেল ফেডারেশন অব সুইডিস ট্রেড ইউনিয়ন নামে একটা কেন্দ্রীয় সঙ্ঘ স্থাপন করে মজুরদের আন্দোলনটাকে দৃঢ় করা হয়। তখন এই সঙ্ঘের আওতায় যতগুলা ট্রেড ইউনিয়ন আসে তার সভ্য-সংখ্যা দাঁড়ায় ২৭,৩৭১ জন। কতকগুলি ইউনিয়ন ঐ সময় ইহার বাইরে থাকলেও পরে তাদের অধিকাংশই এই কেন্দ্রীয় সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯০৮ সনের আর্থিক সঙ্কট ও পরবর্ত্তী বৎসরের সাধারণ ধর্ম্মঘটের কথা ছেড়ে দিলে, জেনারল ফেডারেশন গোড়া থেকে আজ পর্য্যন্ত দিন দিন উন্নতির পথেই এগিয়ে চলেছে। ১৯২৪ সনে ইহার অধীনে ৩৩টি ইউনিয়ন, ৩৪৪৮ শাখা সমিতি এবং মোট ৩১৩০০০ জন সভ্য দাঁড়ায়। এ ছাড়া ফেডারেশনের বাইরে যে সব ট্রেড ইউনিয়ন রয়েছে তার সভ্যই ৫০,০০০।

সুইডিস ওয়ার্কমেনস ফেডারেশন নামক মজুর-সংসদটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এটাকে ফরাসী সিণ্ডিক্যালিষ্টিক আন্দোলনের খাঁটি নকল বলা চলে। এদের মূলমন্ত্র হচ্ছে মনিব বাদ দিয়ে কলকারখানায় পুরাপুরি মজুর-রাজ প্রতিষ্ঠা করা। সুইডেনের এই চরম দলের খাতায় নাম লিখিয়েছে কম সে কম ৩৪ হাজার মজুর। তাহলে মোটামুটি ৪ লাখ মজুর সুইডেনে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে তাদের ন্যায্য অধিকারের জন্য লড়ছে। এদেশে যত মজুর আছে তাদের তুলনায় এ সংখ্যা খুবই বেশী বলতে হবে। তাহলে দেখা যায়, এ লাইনে সুইডেন আর সব দেশের চাইতে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া বা যুক্ত নরওয়ে-সুইডেন ছাড়া দুনিয়ার আর কোনো দেশে এত অধিকসংখ্যক দলবদ্ধ মজুর আছে বলে মনে হয় না।

দিন দিন মজুর-সংসদের আশঙ্কাজনক দলপুষ্টি হতে দেখে সুইডেনের কলকারখানার মালিকরা তাদের স্বার্থ রক্ষার্থে ১৯০২ সন থেকে পাল্টা আন্দোলন রুজু করে দিয়েছে। ১৯০১ সনের হরতাল বা সার্ব্বজনিক ধর্ম্মঘটের অভিজ্ঞতায় সুইডেনের বড় বড় শিল্পের প্রতিনিধি মালিকরা এম্প্লয়ার্স ফেডারেশন নাম দিয়ে এক ধনিক প্রতিষ্ঠান খাড়া করে। মনিবদের ফেডারেশন এই কয়েক বৎসরের মধ্যে তাদের মজুর-দলনের শুভ প্রচেষ্টায় খুবই কৃতকার্য্য হয়েছে। ১৯০৩ সনে ইহার অধীনে ছিল ১০১ জন মনিব ও ২৯ হাজার মজুর। ১৯২৪ সনে এই সংখ্যা ঠেকেছে ২,১৫৫ মনিব ও ২২১১৬৭ মজুরে।

সুইডেনে মজুর ও মনিব দুই দলের আন্দোলনই খুব জোর

চলেছে। পাশাপাশি ছুটো প্রতিষ্ঠান সমানে-সমান চলায় পক্ষদ্বয়ের মধ্যে এক চুক্তিনামা আদান-প্রদান করা হয়। যুদ্ধ-বিগ্রহদ্বারা আর্থিক অবস্থার ওলট-পালট না হলে এই সর্ত্তের মেয়াদ ছিল সাধারণতঃ ৫ বৎসর। কিন্তু বর্ত্তমানে ইহা ১ বৎসর করা হয়েছে।

কতকগুলি চুক্তিনামা সমগ্র দেশের জন্য স্থিরীকৃত হলেও অধিকাংশই স্থানবিশেষের জন্য নির্দ্দিষ্ট। ১৯২৩ সনে মনিবদের পক্ষ হতে ১১৪৩৭ ও মজুরদের পক্ষ হতে ৩৯১১৯৭খানা চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির ফলে মজুর ও মনিব উভয়কেই কম-বেশী অসুবিধা ভোগ করতে হয়। সাধারণতঃ মজুরদেরই বেশী অসুবিধা ও ক্ষতি সইতে হয়। স্নইডেনের হাইকোর্টে সাব্যস্ত হয়েছে যে, উভয় পক্ষের এই মিলিত চুক্তিনামা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করবার জন্য মজুর ও মনিব উভয়ের প্রতিষ্ঠান দায়ী থাকবে।

চুক্তিনামায় পরিষ্কার নিষেধ না থাকলে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উভয় দলের মনোমালিন্য ঘটলে সাধারণ ধর্ম্মঘট বা লকআউট (মনিব কর্ত্তৃক শিল্প-কারখানার কাজ বন্ধ করা) আইন-বিগর্হিত বিবেচিত হবে না। চুক্তি-পত্রের ধারা ঠিক পালন করা সম্বন্ধে বিশেষ আইন প্রণয়ন করবার চেষ্টা চলেছে স্নইডেনের পালিয়ামেণ্ট বা আইন-সভা রিকস্‌ডাগে।

নীচের অঙ্কগুলা থেকে স্নইডেনের মজুর-মনিব লড়াইয়ের বহর অনুমান করা যায়।

১৯০৩ থেকে ১৯০৮ সনের মধ্যে ২৪২ বার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়ে কাজ বন্ধ হয়। ইহার ফলে ২৫,৬৮০ জন মজুর ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং মোটের উপর ১০,৪২,২০০ কাজের দিন মারা যায়। সাধারণ ধর্ম্মঘট থাকায় ১৯০৯ সনের অঙ্ক সবচাইতে বেশী দাঁড়ায়। এ বছরে ১৩৮ দফা মজুরে-মনিবে মনোমালিন্য ঘটিয়া কল-কারখানার কাজ স্থগিত থাকে। ৩০১,৭৪৯ জন মজুরকে ক্ষতি সইতে হয় আর ১১,৭৯৯,০০০গুলি কাজের দিন নষ্ট হয়। ১৯১০ থেকে ১৯১৬ সন পর্য্যন্ত অন্দোলন একটু মন্দা পড়ে যায়, আবার ১৯১৮ থেকে পুরাদস্তুর চলতে থাকে। ১৯২০ সনে ৪৮৬টি ধর্ম্মঘট, ১৩৯,০৩৯ জন মজুর ক্ষতিগ্রস্ত ও ৮,৯৪,২৫৩ দিনের কাজ নষ্ট হয়। ১৯২১-২২ মোটামুটি ভাবে চলতে থাকে। ১৯২৩ সনে ২০৬ বার বিরোধ উপস্থিত হয়, ১,০২,৮৯৬ জন মজুরকে গচ্চা দিতে হয় এবং ৬৯,০৭,৩৯০ দিনের কাজ মাটী হয়। ১৯২৪ সনে আন্দোলনের গতি একটু নরম হয়। এই সনের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৬১ ধর্ম্মঘট, ২৩,৭৭৬ মজুর ক্ষতিগ্রস্ত ও ১২,০৪,৫০০ দিনের কাজ নষ্ট।

মজুর-মনিবের বিরোধ সালিশী করিয়া মিটাইয়া ফেলিবার জন্য স্নইডেনে যেসব আইনকানুন আছে তাহা প্রধানতঃ উভয় পক্ষের স্বেচ্ছাকৃত মিলনের মনোভাবের উপর নির্ভর করে। এসম্বন্ধে আইনের কোনও জোর-জবরদস্তি নাই। সরকারী মধ্যস্থতা গ্রহণ করা না করা উভয় পক্ষের মর্জ্জির উপর নির্ভর করে। আইনের কোনও কড়াক্কড়ি নাই। এই ধরণের আইন ১৯০৬ সনে প্রথম কায়েম করা হয়। ১৯২০ সন পর্য্যন্ত এর মেয়াদ চলে। তারপর এক নয়া আইন খাড়া হয়। ইহার ফলে শিল্প-বিরোধের মধ্যস্থতা করবার জন্য বিভিন্ন জেলার ৭ জন সরকারী পঞ্চায়েৎ নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোনও শিল্প-বিবাদে ৫।৭টা জেলা সংসৃষ্ট থাকলে, যে শিল্প লইয়া বিবাদ, তাতে যিনি সব চাইতে বিশেষজ্ঞ সেইরূপ পঞ্চায়েতের হাতে নিষ্পত্তির ভার দেওয়া হয়। সাধারণতঃ এইরূপই ঘটে। আইনে এরূপ ব্যবস্থাও আছে যে, জেলার কোনো বিশেষ শিল্পের বিবাদ-বিসম্বাদ সালিশী করিয়া রফা নিষ্পত্তি করবার জন্য কোনো পঞ্চায়েৎকে স্থায়ী ভাবে নিযুক্ত করা যেতে পারে। সাধারণতঃ বড় বড় ধরণের সংঘর্ষ মিটমাট করবার ভার দেওয়া হয় বিশেষ সালিশী কমিশনের হাতে। সাধারণ পঞ্চায়েৎরা ঐ কমিশনের সভ্য হতে পারে।

১৯২০ সনে সালিশী আইনকানুনের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আরও ছুটি নূতন আইন পাশ করা হয়। একটির দ্বারা প্রধান সালিশী কোর্ট স্থাপন করা হয়। এই কোর্টে মজুর-মনিবের মিলিত চুক্তিপত্রের ব্যাখ্যা ও তাহার প্রয়োগ কিরূপ হইবে তাহা নিরূপণ করা হয়। আর একটিতে শ্রমশিল্প-বিবাদ নিবারণার্থ বিশেষ পঞ্চায়েৎ

নিয়োগের ব্যবস্থা আছে। প্রধান সালিশী কোর্টের ৭ জন সভ্য। ইঁহাদের তিনজন সরকার-কর্তৃক ও ২ জন দুই দলের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান-কর্তৃক নিযুক্ত হন। দুই দলের সম্মতিতে যে সব বিষয় বিচারার্থ উপস্থিত করা হয় তা ছাড়া কোর্ট অন্য কিছু আলোচনা করতে অধিকারী নয়। কিন্তু ইহার উপর যে যে বিষয় বিচারের ভার দেওয়া হয়, সে সম্বন্ধে ইহার রায় অবশ্যপালনীয়।

ভারতে মজুর-আন্দোলন আরও সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে হওয়া প্রয়োজনীয়। সুইডেনের মজুর-প্রচেষ্টা থেকে ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়নের মাতব্বরদের অনেক-কিছু শিখবার আছে।

রেশম-শিল্পের নবীন-প্রবীণ

(১) ভাগলপুরে তসর-শিল্প

ভাগলপুরের তসর-শিল্প অনেক কালের। তসরের কারবার বলিতে গেলে বিহারের একচেটে। আসান, শাল, অর্জ্জুন, বয়ার প্রভৃতি বৃক্ষের পত্র-ভক্ষণকারী কীট হইতে প্রধানতঃ রেশম পাওয়া যায়। তসর-নির্ম্মাণ অনেক দিনের কারবার আর তসরের কাপড়ের চাহিদাও খুব বেশী; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এই লাভজনক ব্যবসাটা সম্পূর্ণরূপে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে এবং অধঃপতনের পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

গুটির লালন-পালনের কাজ প্রধানতঃ এখানকার আদিম অধিবাসী পাহাড়িয়াদের হাতে। ইহারা বন-জঙ্গলে বাস করে এবং ব্যবসায়ীদের নিকট গুটি বিক্রয় করে। পূর্ব্বে 'দাদন লওয়ায় পাহাড়িয়াদিগকে ব্যবসায়ীদের নিকটে ব্যবসায়ীদেরই দরে গুটি বিক্রয় করিতে হয়। কারবারের ফলাফল অনিশ্চিত বলিয়া লোকে সুবিধা পাইলেই অন্য লাভজনক কাজে লাগিয়া যায়। মোটের উপর রেশম লালন-পালনের কাজ লোকে অবসর মত করিয়া থাকে এবং ইহার উপর কেহই নির্ভর করে না। তাঁতীরা মধ্যবর্ত্তী পাইকারদের নিকট হইতে গুটি ক্রয় করিয়া বাড়ীতে মেয়েদের দ্বারা অবসর সময়ে নাটাই-চরকির সাহায্যে সূতা প্রস্তুত করিয়া বস্ত্র-বয়ন করে। ইহারাও রেশম-ব্যবসায়ী বা বড় বড় কারিগরের নিকট হইতে পূর্ব্বেই দাদন লইয়া থাকে এবং শেষে তাহাদেরই নির্দ্ধারিত মূল্যে বস্ত্র বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। ব্যবসায়ীরা বাজারে বেশী দামে বেচিয়া মোটা লাভ করে। এই বস্ত্র বাজারে চালাইবার জন্য কোনোরূপ সুব্যবস্থা নাই। চীনা, জাপানী ও ইয়োরোপীয় রেশমের সূতা এদেশে চালাইবার জন্য একটা জোট আছে। ইহার ফলে এই সকল সুদূর দেশের রেশমী বস্ত্র ছোট-বড় সকল স্থানেই, এমন কি দূর পল্লীপ্রান্তে পর্য্যন্ত, সহজলভ্য হয়। অন্যদিকে কোনোরূপ সুশৃঙ্খলা না থাকায় দেশের রেশমে দেশে প্রস্তুত বস্ত্র সর্ব্বত্র দুর্ল্লভ। অনেক বড় সহরেও দেশী রেশম-জাত বস্ত্র পাওয়া সুকঠিন।

আজকাল ভাগলপুরে যতগুলি তাঁত চলে তাহার শতকরা ৭৫খানিতে জাপান, ইংলণ্ড, ইতালী প্রভৃতি দেশ হইতে আগত রেশম-সূতায় বস্ত্র-বয়ন হয়। বাংলায়, কাশ্মীরে কি আসামে এখানকার রেশমের কোন চাহিদা নাই। লোকের রুচি জঘন্যভাবে বদলাইয়া গিয়াছে। পপলিন, লিনেন, তসরেট প্রভৃতি অল্প মূল্যের খেলো বস্ত্র তাহারা সিল্ক বলিয়া ক্রয় করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না। বেশীর ভাগ ব্যবসায়ীরা লোকের অজ্ঞতার সুযোগ লইয়া এগুলিকে আসল রেশম বলিয়া বেমালুম চালাইয়া দেয়। অথচ আসলে এগুলির মধ্যে রেশমের নাম-গন্ধ নাই। এমন কি বাজারে যাহাকে পয়লা নম্বরের সিল্ক বলা হয় তাহা একেবারে সব চাইতে নিকৃষ্ট এবং ট্যানিক এসিড, সুগার টিনসল্ট প্রভৃতি ভেজাল-মিশ্রিত। সিল্ক-প্রস্তুতকারী দেশের অব্যবহার্য্য, তৃতীয় শ্রেণীর রদ্দী মাল প্রধানতঃ কষ্টিক সোডায় জ্বাল দিবার পর তদ্দ্বারা চাকচিক্যময় কাপড় প্রস্তুত করিয়া এদেশে চালান করা হয়।

যন্ত্রপাতির সাহায্যে অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে

এই ধরণের তৃতীয় শ্রেণীর ওয়েষ্ট সিল্ককটন ও অন্যান্য পুরাতন বস্ত্রাদি হইতে প্রস্তুত সূতা উল্লিখিত কেমিক্যাল দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করা হয়। উহা হইতে প্রস্তুত বস্ত্রাদি অসম্ভব রকম সুলভ মূল্যে বাজারে বিক্রী হয়। এই প্রকারে প্রস্তুত সূতাকে কখনই খাঁটি সিল্ক বলা চলে না।

দশ বৎসর পূর্ব্বে বেনারস এই প্রকার সিল্কের প্রধান কেন্দ্র ছিল। কিন্তু এখন জনসাধারণ এইরূপ নকল সিল্কের ব্যবসায়ের জুয়াচুরি ধরিয়া ফেলিয়াছে। আজকাল অতি অল্প লোকই এরূপ খেলো জিনিষ ব্যবহার করিয়া থাকে। বেনারস হইতে এই সিল্কের আড্ডা বর্ত্তমানে ভাগলপুরে স্থানান্তরিত হইয়াছে। ভাগলপুরের সিল্কই আজকাল সর্ব্বসাধারণের নেক নজরে পড়িয়াছে। কিন্তু ভাগলপুরের সিল্কের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ বর্ত্তমান আছে। ইহা এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং ইহারও বেনারস সিল্কের দশা পাইবার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে।

তাঁতীদের মধ্যে খাঁটি তসর ব্যবহারে সাধারণ আপত্তি বর্ত্তমান আছে। কারণ খাটি রেশম হইতে বয়নোপযোগী সূতা প্রস্তুত করিয়া লইতে যথেষ্ট সময় ও পরিশ্রম দরকার হয়। কিন্তু বিদেশী মাজা-ঘষা এবং তখন-তখন ব্যবহারোপযোগী সূতা লইয়া কোনই বেগ পাইতে হয় না। আজকালই খাঁটি তসর সূতা দিয়া বস্ত্র বয়ন করিবার উপযুক্ত তাঁতীর অভাব হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ অবস্থা আর দুই-দশ বৎসর চলিলে ভাগলপুরের তসর-শিল্প চিরকালের মত লুপ্ত হইয়া যাইবে। অন্যদিকে ব্যবসায়ীরা বিদেশী সূতায় প্রস্তুত দ্রব্যাদি বেশী পছন্দ করে। কারণ ইহাতে তাহাদের লাভের পরিমাণ বেশী থাকে। সিল্ক-প্রস্তুতকারী জেলাসমূহে যাইয়া যে-কেহ সূতা ক্রয় করিতে সমর্থ। সেই জন্য ইহাতে অল্প লাভ ঘটে। কিন্তু অতি অল্পসংখ্যক বড় বড় পাইকারই বিদেশ হইতে আমদানি-করা সূতার কারবার চালাইতে পারে এবং সেইজন্য ইহারা বেশী লাভ পাইয়া থাকে। তসরের সূতা প্রস্তুত ও বয়ন বিহারের অন্যতম গৃহশিল্প। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, ভাগলপুরের তসর-শিল্প লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। অনেক স্থানে খুব বড় বড় কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার সবগুলিতেই তসরের পরিবর্ত্তে বিদেশী সিল্ক ব্যবহার করা হয়। অনেক পরিবার গুটি লালন-পালন করিয়া এবং তাহার সূতা প্রস্তুত করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিত। কিন্তু যে সমস্ত তাঁতে তসর বোনা হইত তাহার অধিকাংশ বন্ধ করিয়া দেওয়ায় উহারা কারখানার অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

ভাগলপুরের তসর-শিল্প লুপ্ত হইবার কারণ—

(১) ভারতীয় তসরের সূক্ষ্ম আঁশ মলবেরী আঁশের মত পরিপাটি হইয়া পড়ে না।

(২) পাচ হইতে ছয়টি গুটির আঁশ দ্বারা একটি মাত্র সূতা প্রস্তুত হয়। এগুলি সংলগ্ন এবং ভাল পাক হয় না। বস্ত্র-বয়নের সময় যদিও রেশমগুলি সংলগ্ন হইয়া পাশাপাশি পড়িয়া যায় কিন্তু বস্ত্র ধোলাই করিবার সময় রেশমগুলি ছ্যাকড়া ছ্যাকড়া হইয়া পড়ে। ইহার ফলে বস্ত্র সহজেই ছিঁড়িয়া যায়।

(৩) টানা সূতা অপেক্ষাকৃত অল্প হওয়ায় বস্ত্র সস্তায় বিক্রী হয়।

(৪) খাপি করিয়া বয়ন না করায় বস্ত্রের জমিন ভাল হয় না।

(৫) ভারতীয় তসর চীনা তসরের চাইতে স্থায়ী ও চাকচিক্যময় হইলেও ইহার রং চীনা তসরের মত তত চিত্তাকর্ষক নয়।

(২) মালদহে রেশম চাষ

মালদহের গুটিপোকার চাষীরা ভাল গুটি পাইয়াও শিক্ষার অভাবে এবং অবহেলায় বেশী পরিমাণ রেশম-কীট উৎপাদন করিতে পারে না। তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য মালদহের সেরিকালচার বিভাগ গত মে মাস হইতে প্রদর্শনী খুলিয়া আসিতেছেন। অমৃতী কেন্দ্রীয় নার্শারির অন্তর্গত কমলপুর এবং পিয়াসবাড়ী কেন্দ্রীয় নার্শারির অন্তর্গত জালালপুর গ্রামদ্বয়ে সর্ব্বপ্রথম পরীক্ষার কাজ চলে। বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের ডিরেক্টার সাহেব এই সব গ্রাম পরিদর্শনকালে স্থানীয় গুটির চাষীদের সহিত অনেক আলোচনা করেন। প্রত্যেক গ্রামে পাঁচ শত

হইতে এক হাজারেরও অধিক চাষী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদের অভাব-অভিযোগের কথা জানায়। তত্রত্য সেরিকালচার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এস, এন, বোস গুটি-চাষের উন্নত প্রণালীর উপকারিতা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেন এবং তাহাদের বক্তব্য ডিরেক্টার সাহেবকে জানান।

রেশম-কীট-পালন

রেশম বঙ্গদেশের একটি প্রাচীন শিল্প-ব্যবসায়। মালদহ জেলার ইহাই প্রধানতম ব্যবসায় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কারণ, জেলার অর্দ্ধাধিক অধিবাসী কোনো না কোনো রকমে এই ব্যবসায়ের নানা বিভাগের সহিত জড়িত। রেশম কীট পালনই যখন এই ব্যবসায়ের ভিত্তি, তখন কীটের উন্নতি-বিধান না করিতে পারিলে, এই ব্যবসায়ের উন্নতি হইতে পারিবে না। বিভাগীয় কর্ত্তাদের কার্য্য-পদ্ধতি দেখিয়া চাষীরা বুঝিয়াছে যে, গুটি কেবল রোগমুক্ত হইলেই চলিবে না, উহার পালনের জন্য স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় যে সমস্ত তথ্য আছে, চাষীদিগকে তাহাও বিশেষ ভাবে শিখিতে হইবে। অর্থাৎ নার্শারিতে যে ভাবে কাজ চলে সেই ভাবে কাজ চালাইবার জন্য তাহাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে। কর্তৃপক্ষীয়গণ গ্রামে তাঁহাদের কার্য্য দেখাইবার ফলে চাষীরা গুটি-পোষণ-ঘরে ধোঁয়া দিবার জন্য সালফার ব্যবহার করিতেছে। বিশোধকরূপে ফর্ম্মালিন, ইক্লোরিণ, কপার সালফেট প্রভৃতির ব্যবহার কত উপকারী ও লাভজনক তাহাও তাহাদিগের জানা চাই। অবশ্য এই সব ব্যবহার করিতে গেলে গোড়ার খরচটা ব্যক্তিগতভাবে খুব বেশীই পড়ে।

যে সব গ্রামে কার্য্যপদ্ধতি দেখান হইয়াছে, সে সব গ্রামে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করায় গুটিপোকার অনেক সাংঘাতিক রোগ নিবারিত হইয়াছে।

বিভাগীয় প্রদর্শনী

যাহাতে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের চাষীরা একত্র সমবেত হইয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালী দর্শনে গুটির উন্নতি সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা করিতে পারে, তজ্জন্য গত ২৩শে এপ্রিল কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর কর্ত্তৃক পিয়াসবাড়ী কেন্দ্রীয় নার্শারিতে একটি প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। তাহাতে প্রায় এক হাজার চাষী উপস্থিত হয়। প্রদর্শনীতে বহু উন্নত গুটি পোকা, রেশম সূত্র, হাতে কাটা মটকা সূতা, চরকায় কাটা রেশম সূতা প্রভৃতি দেখান হইয়াছিল। যোগ্য ব্যক্তিদিগকে মেডাল, সার্টিফিকেট অথবা গুটি-পালনের যন্ত্রপাতি উপহার দেওয়া হয়।

(৩) শিল্প-জগতে কৃত্রিম রেশম

৩৫ বৎসর পূর্ব্বের অজ্ঞাতনামা "রেঅঁ" আজ বিজ্ঞানের কল্যাণে এক প্রধান শিল্পের স্থান দখল করে বসেছে। দিন বয়ে চলেছে রসায়নবিৎ তার মগজ থেকে রোজ একটা না একটা নয়া চিজ তুনিয়াকে উপহার দিচ্ছে। রাসায়নিক উপায়ে মানুষ রেশম তৈরী করবে এ আজগুবি খেয়ালটা প্রথম ১৭৫০ সনে জনৈক ফরাসী রাসায়নবিদের মাথায় ঢোকে। এ নিয়ে অনেক গবেষণা, লেখালেখি তর্কাতর্কির পর মাত্র ১৮৮৪ সনে ফ্রান্সের হিলার দে চার্দো নকল সিল্ক তৈরীর এক পেটেণ্ট উদ্ভাবন করেন। কিন্তু আসলে মাত্র ১৮৯১ সন থেকে ব্যবসার আকারে প্রথম কৃত্রিম রেশম তৈরী হতে সুরু হয়। গোড়াতে শিল্পে তেমন জোর না বাঁধলেও রাসায়নিক দমে যাবার পাত্র নয়। এটাকে তুনিয়ার একটা লাভের ব্যবসা করে দাঁড় করবার জন্য গবেষণাগারে দিনের পর দিন রাসায়নিকের প্রচেষ্টা চলতে লাগল। অবশেষে সাধনারই সিদ্ধি হল। আজ সারা তুনিয়ায় আসল রেশমের চাইতে নকল রেশম বেশী উৎপন্ন হচ্ছে।

"রেঅঁর" জন্ম ইতিহাসটা একবার বলে নেওয়া দরকার। এটা ফরাসী কথা। "রেঅঁ" অর্থে আলোক বা উজ্জ্বলতা বুঝায়। মানুষের তৈরী বলে একে নকল সিল্ক বা কৃত্রিম রেশম বলা হয়। তাই অনেক দিন পর্য্যন্ত কুলীন শিল্পের মধ্যে একে স্থান দেওয়া হয় নাই ও লোকের কাছে এর তেমন আদর হয় নাই। আজ কিন্তু সর্ব্বসাধারণ-কর্ত্তৃক "রেঅঁ" শিল্প-জগতের এক উঁচু তক্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। "রেঅঁ" আজ শিল্পমহলে তার নিজের পায়ে

দাঁড়িয়ে গিয়েছে। একমাত্র প্রকৃতির সিল্কের হুবহু অনুকরণ ব'লেই যে লোকে তাকে গ্রহণ করেছে তা নয়। পরন্তু "রেঅঁ'র" নিজস্ব অনেকগুলি গুণ রয়েছে যা বস্ত্র-শিল্পের বিভিন্ন অবস্থায় কাজে লাগান যেতে পারে।

খুবই আশ্চর্য্য হবার কথা যে গুটিপোকা যেমন করে রেশম তৈরী করে বর্ত্তমান যুগের রাসায়নিকরা ঠিক তেমনি প্রক্রিয়াতে রেশমের আঁশ তৈরী করে ছেড়েছে। এই অদ্ভুত কাজের রাসায়নিকরা গুটীপোকার খাদ্যকে প্রধান অবলম্বন করেছে। গুটিপোকার খাদ্য শাকসব্জীর রস (ভেজিটেবল সেলুলস)। সেই গাছপালার নির্য্যাস নিঙরিয়ে তা দিয়ে "রেঅঁ'র" গোড়াপত্তন করা হয়েছে।

"রেঅঁ" তৈরী করতে রসায়ন ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় খুব ভাল রকম দখল থাকা চাই। নানা প্রকার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রক্রিয়ার দ্বারা "রেঅঁ" প্রস্তুত করতে হয়। এই সবের উপর কারিগরের সম্পূর্ণ অধিকার থাকা আবশ্যক।

চার রকম উপায়ে "রেঅঁ" প্রস্তুত করা যেতে পারে। প্রত্যেকটিই রাসায়নিক প্রক্রিয়ালব্ধ বিশুদ্ধ সেলুলসকে ভিত্তি করে করতে হবে। সেলুলস কাঠ বা তুলা দুই জিনিষ থেকেই সংগ্রহ হতে পারে। দুনিয়ার ৳ অংশ "রেঅঁ" এই প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়। "রেঅঁ" তৈরী অবিকল গুটি (কোকুন) তৈরীর মত। গুটিপোকা যেমন তার মুখ থেকে লালার মত এক প্রকার তরল পদার্থ বের করে; আর তা তৎক্ষণাৎ বাতাস লেগে শক্ত হয়ে যায় তেমনি বৈজ্ঞানিক উপায়ে সেলুলসকে বিভিন্ন রাসায়নিক অবস্থার মধ্যে ফেলে অবিকল গুটি পোকার লালার মত "ডিস্কো" নামক এক আটাযুক্ত তরল পদার্থ তৈরী করা হয়। ইহাই শেষে কল ও রসায়নের সাহায্যে শক্ত ও মজবুত করে যে কোনো দৈর্ঘ্যের রেশম আঁশ প্রস্তুত করা যেতে পারে। গুটি পোকার সূতা কিন্তু সাধারণতঃ পঁচিশ গজের বেশী লম্বা হয় না।

গুটি পোকার সাহায্যে প্রাপ্ত রেশম আঁশ কখনই সমান পরিপাটি হয় না কিন্তু মানুষের তৈরী রেশমের সূতা আগাগোড়া এক সমান হয়। ইহা গুটির রেশম আঁশের মত এখানে মোটা সেখানে সরু হয় না। এর কারণ গুটি যন্ত্রের মত এক ওজনে, এক নিয়মে, নির্ভুল ভাবে সূতা কাটে না এবং মুখ থেকে লালাটা অনবরত একটানা ভাবে ছাড়ে না। যন্ত্রে এ সব কাজ এক সমানে, একটানা ভাবে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়। যন্ত্রের একটু অসুবিধা এই, উত্তম বস্ত্র নির্ম্মাণের জন্য টেঁকসই ভাল সূতা তৈরী করতে হলে স্থিরীকৃত পন্থার একচুল এদিক্-ওদিক্ হলেই সব মাটী হয়ে যাবার সম্ভাবনা। রান্না ধ'রে গেলে বা পুড়ে গেলে চলবে না। খাঁটি পরিপাটী নিটোল জিনিষটি চাই। "রেঅঁ" তৈরীর প্রথম দফা হচ্ছে কাঠ বা তুলা ষ্টিমে জ্বাল দেওয়া। রাসায়নিক মাল-মসলার সাহায্যে সেলুলস ছাড়া আর সব জিনিষ ধ্বংস করে দিতে হবে। তারপর এগুলিকে রোলার দিয়ে চেপে অবিকল ব্লটিং কাগজের মত লম্বা লম্বা চাদর তৈরী করতে হয়। পাল্প এবং কাগজ যে যে প্রণালীতে করা হয় এও ঠিক সেই ধরণের। এই প্রকাণ্ড চাদরগুলি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ১২ ইঞ্চি টুকরা করে কেটে ফেলা হয় এবং কষ্টিক সোডার জলে ২২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখা হয়। তারপর এগুলিকে ঘুর্ণায়মান চাকুর কলের চাকা দিয়ে কুচি কুচি করা হয়। এখন যে জিনিষটা দাঁড়ায় সেটাকে স্বাভাবিক আবহাওয়াযুক্ত একটা বিশেষ নির্দ্দিষ্ট ঘরে ৪৮ ঘণ্টা রাখা হয়। একে "মারথার্জ্জিং" প্রক্রিয়া বলা হয়।

এখন যে জিনিষটা উৎপন্ন হল একে অ্যালকালি সেলুলস বলে এবং এগুলিকে কার্ব্বন বাইসালফেট সহ একটা পাত্রে রাখিয়া তাহা একটা চরকি কলের নীচে স্থাপন করা হয়। কলের হাতলগুলি সমান ভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে একটি আর একটির সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে মিশ্রিত করিয়া ফেলে। তখন ইহা কমলা লেবুর রঙ্গের মত ঈষৎ হলদে হয়। ইহাই সেলুলস ডিস্কো বা রেশম-লালা তৈরী করবার সর্ব্বশেষ প্রক্রিয়া।

এইবার সূতা তৈরীর কথা। যে রেশম-লালা মানুষের তৈরী গুটি পোকা বা কল ও রসায়নের সাহায্যে পাওয়া যায় তাহার ভিতর অ্যালকালি বা ক্ষারের ভাগ বেশী থাকে। ইহা অ্যাসিডের সংস্পর্শে এলেই শক্ত হতে বাধ্য। এই নকল রেশম তৈরী করবার জন্য চৌদ্দটী বা তারও বেশী

ছিদ্রওয়ালা একটা পাত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পাত্রটির ছিদ্রগুলি এক ইঞ্চির অর্দ্ধেক থেকে পাঁচ হাজার ভাগের এক ভাগ পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র। এগুলিকে একরূপ অদৃশ্যই বলা চলে। তীব্র আলোর কাছে না ধরলে মানুষের চক্ষুতে এই ক্ষুদ্র ছিদ্রগুলি দেখা যায় না। এই অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া রেশম-লালা একটানা ভাবে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধারে একই ওজনে বৃষ্টি-ধারার মত ঝরতে থাকে। এবং এই রেশম-ধারাগুলি সঙ্গে সঙ্গে অ্যাসিড-স্নাত হওয়ায় শক্ত আঁশে পরিণত হয়। এইবার সদাপ্রস্তুত কলের নাটাইগুলি সেগুলিকে সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে ফেলে। পরে এই আঁশগুলি নাটাই হইতে খুলে কলের টেকোদ্বারা তাহাতে কতকটা নির্দ্দিষ্টসংখ্যক পাক দেওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্য নাটাইগুলিদ্বারা তাহা জড়িয়ে নেওয়া হয়। এসবই কলের সাহায্যে দ্রুত সম্পন্ন হয়। এইবার সূতা বেশ শক্ত ও মজবুত হলে পর অন্যান্য যন্ত্রাদি দ্বারা রেশমের ফেটী তৈরী করা হয়। রেয়ঁর ফেটির পরিধি ৪৪ ইঞ্চি। এই ফেটিগুলিকে উত্তমরূপে ধোলাই করবার পর যে শুভ্র সুন্দর জিনিসটা দাঁড়ায় তাহাই উজ্জ্বল চাকচিক্যময় রেয়ঁ রেশম।

এখন বেশ বুঝা গেল গুটি পোকার রেশমে আর কলের রেশমে কোনো তফাৎ নাই। দুইটাই একই মাল-মশলায় তৈরী, কেবল প্রক্রিয়াটা বিভিন্ন। গুটি পোকার লালাও যে উদ্ভিদাদি হতে উৎপন্ন হয় রেয়ঁর ডিম্বোও ঠিক সেই গাছ-পালার সেলুলস হতে পাওয়া যায়। তফাৎ এই, গুটি পোকার তৈরী রেশমের উৎপত্তি প্রাণী থেকে তাই এতে নাইট্রোজেন আছে।

শুষ্ক রেয়ঁ খাঁটি রেশমের অর্দ্ধেক টেঁকসই এবং আর্দ্র অবস্থায় আরো কম টেঁকসই হয়। তাই রেয়ঁ বস্ত্র ধোলাই করবার সময় খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। যে কোনো জলে, এবং পশমী কাপড় ধোয়া সাবানে ইহা ধৌত করা চলে। রেয়ঁ বস্ত্রে ইস্ত্রি করবার জন্য মাড় দিলেও কোনো ক্ষতি হয় না। রেয়ঁর নতুন কালের রং কোনো দিনই বদলায় না বা অনেক রেশমের মত জ্বলে যায় না। রেয়ঁর সূতাগুলি খুব মসৃণ এবং পরিপাটি হয়। ইহার চাকচিক্য এবং উজ্জ্বলতাই একে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

বয়ন-শিল্পে রেয়ঁ ধরাতলে এক যুগান্তর এনে ফেলেছে। রেয়ঁর আঁশ পশমী সূতার সঙ্গে সংযোগ করলে এক অতি সুন্দর উজ্জ্বলতা সৃষ্টি করে। রেয়ঁর সাথে অন্য বিভিন্ন জিনিষের সূতার সংমিশ্রনে নতুন নতুন সুন্দর সুন্দর কাপড় তৈরী করা হয়। এগুলি আসল রেশম বস্ত্রের চাইতে বেশী চিত্তাকর্ষক।

গেঞ্জি, মোজা প্রভৃতি হোসিয়ারী শিল্পে রেয়ঁ সব চাইতে বেশী ব্যবহৃত হয়। আণ্ডার ওয়্যার, লেস, লিনেন, পাড়, খেলাধুলার কাপড় চোপড়, ছাতা, রেনকোট, রিবন, ফিতা দস্তানা, সৈন্যদের ব্রেডস প্রভৃতি হাজার রকমের জিনিষ এই রেয়ঁ দিয়ে তৈরী হচ্ছে। শরীরের ঘাম হজম করবার শক্তি আছে বলে রেয়ঁর আণ্ডার ওয়্যারের চলন খুব বেশী। পূর্ব্বে অনেকের ধারণা ছিল রেয়ঁ অদাহ্য; কিন্তু ইহা সত্য নয়।

রেয়ঁ শিল্প ফ্রান্সের মাটিতে পাকা-পোক্ত ভাবে আঁকড়ে বসেছে। ১৯২৩ পর্য্যন্তও এর জন্মভূমিতে অন্যান্য শিল্প একে বয়কট করেছে। সাধারণের মধ্যে চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় আজ সকল শিল্প-ব্যবসায়ীকেই রেয়ঁর নিকট কুর্নিশ করে' তাকে ঘরে তুলতে হয়েছে। ফ্রান্সের ঘরোয়া চাহিদাই ১৯২৪ সনে ১৯২৩ সনের চাইতে ½ অংশ বৃদ্ধি পায়।

ফ্রান্সে বর্ত্তমানে ৫০টা ফ্যাকটরি রেয়ঁ উৎপন্ন করছে। ১৯২৫ সনে ফরাসী জাত এই ব্যবসায়ে জগতে পঞ্চম স্থান অধিকার করলেও তার ঘরোয়া চাহিদা মিটাতেই ১৮৫ লক্ষ পাউণ্ড ঘাটতি পড়ে। ইংলণ্ডে রেয়ঁর বড় কারবার স্থাপন করা হয়েছে। কানাডার জঙ্গলের প্রচুর পরিমাণ কাঠ দ্বারা অধিক পরিমাণ রেশম উৎপাদনের আশায় সেখানে ইংরেজের এক বড় ব্রাঞ্চ কারখানা কায়েম করা হয়েছে। জার্ম্মাণির পূর্ব্বতন গোলা-বারুদের কারখানাকে রেয়ঁর কারখানায় পরিণত করা হয়েছে। রেয়ঁ শিল্পের অবস্থা অন্যান্য শিল্পের চাইতে সচ্ছল এবং এর ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল।

বেলজিয়মে উৎপন্ন রেয়ঁ দেশের কাজেই ব্যবহৃত হয়। সুইটসারল্যাণ্ডে চাহিদা বাড়ছে। ইতালী বিরাট বহরে রেয়ঁ তৈরীতে লেগে পড়েছে। ইতালীর উৎপন্ন রেয়ঁ

পয়লা নম্বরের না হলেও বাজারে এর বিক্রী খুব বেশী। অনেকের ধারণা ইতালী শীঘ্রই এ লাইনে আর সবাইকে পরাস্ত করে দেবে।

১৯২৫ সনের ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌সে দেখা যায় ইতালী দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। ফার্ষ্ট বয় যুক্ত আমেরিকা। দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলি রেঅঁ উৎপন্ন না করলেও তারা রেঅঁর বড় খরিদ্দার। আমাদের এসিয়া ভূখণ্ডের চীন-জাপানও এদিকে মন দিয়েছে। রেশমের আদিভূমি চীনদেশ রেঅঁর জবর বাজার হয়ে উঠেছে। ভারতেও সেই অবস্থা। জাপানে রেঅঁ শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছে।

মার্কিণ রাসায়নিকদের তদবিরে উচ্চ অঙ্গের সিল্ক তৈরী হওয়ায় সেগুলি বাজারের সস্তা বিদেশী মালের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে যাচ্ছে। এ ব্যবসায়ে আমেরিকা সকলের সেরা। ১৯২৫ সনে দুনিয়ার উৎপন্ন নকল সিল্কের তিন ভাগের এক ভাগই যুক্তআমেরিকায় তৈরী। ঐ বৎসর আমেরিকা ৫৫০ লক্ষ পাউণ্ড রেঅঁ উৎপন্ন করে।

বাজারে আসল রেশমের তুলনায় রেঅঁর দাম অকিঞ্চিৎকর হওয়ায় স্বভাবতই ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্য সব শিল্পের মত এর দামে উঠা-নামা নাই। যুদ্ধের পূর্ব্বেও যেমন এখনও তেমন। যে উপাদান দিয়ে রেঅঁ তৈরী করা হয় তা সব গাছ-গাছরাতেই পাওয়া যায়। তাই আর সব শিল্পের ভাগ্যে যা-ই ঘটুক, রেঅঁ অফুরন্ত কাঁচা মালের রসদ পাবে। আর এর দামও মোটের উপর বেশী উঠানামা করবে না।

জাপানী ব্যাঙ্ক

অধ্যাপক শ্রীবিজয়কুমার সরকার, এ, বি (হার্ভার্ড)

আধুনিক জাপান বলিতে যাহা বুঝা যায় আধুনিক জার্ম্মাণির ন্যায় ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের পর তাহার জন্ম। সেই সময় হইতেই জাপানের কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন আরম্ভ হইয়াছে; এবং প্রকৃত প্রস্তাবে জাপানের যাহা-কিছু উন্নতি তাহা ইহার পর স্বল্পকালমধ্যে হইয়াছে। অন্যান্য দেশের ন্যায় জাপানের আর্থিক উন্নতির অন্যতম প্রধান কারণ জাপানী ব্যাঙ্ক। এই ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে এখানে মোটামুটি দু'চারটী কথা বলা যাইতেছে।

দেশের উন্নতির জন্য জাপান পৃথিবীর যেখানে যাহা কিছু ভাল পাইয়াছে সেখান হইতে তাহাই গ্রহণ করিয়াছে। জাপানের ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান প্রধানতঃ আমেরিকা, ফ্রান্স ও জার্ম্মাণির আদর্শে গঠিত। পাশ্চাত্য জগতের উন্নতিশীল দেশের ন্যায় জাপানেও কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যাঙ্ক আছে। উহাদের মধ্যে কতকগুলি গভর্ণমেণ্ট হইতেও অনেক প্রকার সুবিধা এবং সাহায্য পাইয়া থাকে। মূলধন বৃদ্ধি করিয়া ব্যাঙ্কের কাজ আরও ভালরূপ চালাইবার জন্য য়ুরোপ ও আমেরিকায় যেমন বহু ব্যাঙ্ক একত্রে সমন্বিত হইতেছে, জাপানেও সেইরূপ সমন্বয় আরম্ভ হইয়াছে। ১৯২০ ও ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে জাপানে এইরূপ দুইটী বৃহৎ ব্যাঙ্কের সমন্বয় হয়। একটীর নাম "যুগো ব্যাঙ্ক"। ইহা তিনটী প্রধান প্রধান ব্যাঙ্কের সমন্বয়। অপরটীর নাম "য়াসুদা ব্যাঙ্ক"। ইহা ১০টি ব্যাঙ্কের সমন্বয়। যেমন ইংলণ্ডের "বড় পাঁচটি"র (অর্থাৎ বড় পাঁচটি ব্যাঙ্কের) কথা শুনা যায় সেইরূপ জাপানেরও "বড় ছয়টি"র বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাদের আয়তন সম্বন্ধে নিম্নপ্রদত্ত তালিকা হইতে কিছু আভাস পাওয়া যাইবে :—

	মূলধন	আমানত	ধার	স্থাপিত
	(কোটি য়েন ; ১ য়েন = ১৷৷০ টাকা)			
য়াসুদা	১৫	৫৭	৫০	১৮৮১ খৃঃ
মিত্সুই	১০	৪০	৩৯	১৮৭৭ ,,
সুমিতমো	৭	৩৭	২৯	১৮৯৫ ,,
যুগো	১০	৩৫	৩৫	১৮৭৮ ,,
দাই-ইচি	৫	৩৪	৩১	১৮৭৪ ,,
মিত্সুবিসি	৫	৩০	২১	১৮৯৫ ,,

অন্য ৩৪টি ব্যাঙ্কের মূলধনও ৫ কোটি কি তাহার অধিক য়েন হইলেও উপরিউক্ত ছয়টি ব্যাঙ্ক মূলধন এবং লেন-দেন ব্যাপারে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক য়েনের কারবার করিয়া থাকে বলিয়াই উহাদের "বড় ছয়টি" আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।

জাপানে এই ব্যাঙ্ক-সমন্বয়-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। এখনও ছোট-ছোট ব্যাঙ্কের সংখ্যাই অধিক। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে জাপানের বাণিজ্য-সংক্রান্ত ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও অবস্থা দেখাইবার জন্য নিম্নে একটি তালিকা দেওয়া গেল :—

মূলধন	সংখ্যা	সমবেত মূলধন	গড়ে
১০ লাখ য়েনের কম	১,০৯০	৩৩.৯ কোটি	৩ লাখ
১০ লাখ হইতে ১ কোটি য়েনের মধ্যে	৪৫৮	৯২.৯ „	২০ „
১ কোটি হইতে ৫ কোটি য়েনের মধ্যে	৩৮	৫০.৬ „	১,৩২ „
৫ কোটি য়েনের অধিক	৯	৬৭.০ „	২০ „
মোট	১,৫৯৫	২৪৪.২ „	১৫ „

এই তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে, জাপানে বৎসরখানেক পূর্ব্বে সর্ব্বসমেত ১৫৯৫টি বাণিজ্য-সংক্রান্ত ব্যাঙ্ক এবং উহাদের সর্ব্বসমেত ২৪৪ কোটী য়েন অর্থাৎ ৩৬৬ কোটি টাকা মূলধন ছিল। মাত্র ৯টি ব্যাঙ্কের মূলধন ৫ কোটি য়েন অর্থাৎ ৭½ কোটি টাকার অধিক ছিল। কিন্তু ১০৯০টি অর্থাৎ দুই-তৃতীয়াংশ ব্যাঙ্কেরই মূলধন ১০ লাখ য়েন অর্থাৎ ১৫ লাখ টাকারও কম ছিল।

শাখা-ব্যাঙ্কও জাপানে বেশ প্রসার লাভ করিয়াছে। এবং অনেক ব্যাঙ্কেরই পৃথিবীর প্রধান প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্রে শাখা ও এজেন্সী আছে। দেশের নানা স্থানে ৪০।৫০টি শাখা অনেক ব্যাঙ্কেরই আছে। যুগো ব্যাঙ্কের ৮২টি এবং যাসুদা ব্যাঙ্কের ১৬২টি শাখা এবং এজেন্সী আছে।

য়ুরোপ ও আমেরিকার তুলনায় না হইলেও ভারতবর্ষের তুলনায় জাপানী ব্যাঙ্ক খুবই উন্নতি লাভ করিয়াছে বলিতে হইবে। ভারতবর্ষে শাখা ব্যাঙ্কিং এক প্রকার নাই বলিলেই চলে। শুধু ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্ক গভর্ণমেণ্টের আইন অনুযায়ী ১০০টি শাখা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। কয়েকটী বিদেশী একস্‌চেঞ্জ ব্যাঙ্ক ছাড়া ভারতীয় ব্যাঙ্কের মধ্যে একমাত্র সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়াই মূলধন ও লেন-দেন কারবার হিসাবে বড় বড় জাপানী ব্যাঙ্কের কতকটা কাছাকাছি যাইতে পারে।

এযাবৎ কেবল সাধারণ বাণিজ্যসংক্রান্ত ব্যাঙ্কের কথাই বলা হইয়াছে। ইহা ছাড়া অর্থাৎ সাধারণ ব্যাঙ্কিং আইনের বহির্ভূত বিশেষ সনন্দদ্বারা প্রতিষ্ঠিত জাপানের কয়েকটি বিশেষ ব্যাঙ্কের ঈষৎ বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

১। ব্যাঙ্ক অব জাপান—বিলাতের "ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ড" যেরূপ প্রতিষ্ঠান এবং জার্ম্মাণির "রাইখ্‌স্‌-বাঙ্ক" আর ফ্রান্সের "বাঁক ফ্রান্স" যেরূপ প্রতিষ্ঠান, জাপানের "ব্যাঙ্ক অব জাপান" ও সেইরূপ প্রতিষ্ঠান। এগুলি সবই "সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক।" সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের অভাব দূর করিবার জন্য ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে "ব্যাঙ্ক অব জাপান" প্রতিষ্ঠিত হয়।

সাধারণ ব্যাঙ্কের ন্যায় "ব্যাঙ্ক অব জাপান" সকল রকম কারবারে টাকা খাটাইতে পারে না। ইহার কাজকর্ম্মের অনেক 'আট-ঘাট' বাঁধা আছে। নোট বাহির করা, গভর্ণমেণ্টের টাকাকড়ি রাখা, এবং অন্যান্য ব্যাঙ্কের বিলের উপর পুনর্ব্বার বাটা লইয়া টাকা ধার দেওয়া ইহার প্রধান কাজ। নোট-প্রচার-কার্য্যে "ব্যাঙ্ক অব জাপান" মোটামুটি জার্ম্মাণির "রাইখ্‌স্‌ ব্যাঙ্কের" আইনকানুন অনুসরণ করিয়া চলে।

ব্যাঙ্ক অব জাপানের মূলধন ৬ কোটি য়েন অর্থাৎ ৯ কোটি টাকা।

২। ইয়োকোহামা স্পিসি ব্যাঙ্ক—বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিময়ের কার্য্য করিবার জন্য ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে এই ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। এই ব্যাঙ্কই সর্ব্বপ্রথম বৈদেশিক বাণিজ্যে জাপানী মূলধন খাটায়। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে গবর্মেণ্টের কার্য্য করিবার জন্য "ইয়োকোহামা ব্যাঙ্ক" বিশেষ সনন্দ লাভ করে। গবর্মেণ্টের বিদেশস্থিত টাকাকড়ির কাজ এই ব্যাঙ্কের হাত দিয়া হয়। গবর্মেণ্টের বিদেশে ঋণ তুলিবার কাজও এই ব্যাঙ্কের হাতে। এই দুইটি সুবিধার উপর ইয়োকোহামা ব্যাঙ্কের আরও একটি বিশেষ সুবিধা এই যে, ব্যাঙ্ক অব জাপানের নিকট এই ব্যাঙ্ক অনেক টাকা

খুব অল্প সুদে ধার পাইতে পারে। এই সব নানা কারণে ইয়োকোহামা ব্যাঙ্ক বৈদেশিক বিনিময়-কার্য্যে এখনও সর্ব্ব-প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে।

"ইয়োকোহামার" মূলধন ১০ কোটি য়েন অর্থাৎ ১৫ কোটি টাকা এবং রিজার্ভ ফাণ্ড ৮ কোটি ৬৫ লাখ য়েন অর্থাৎ প্রায় ১৩ কোটি টাকা। গত ২৪।২৫ বৎসর যাবৎ ইয়োকোহামা ব্যাঙ্ক নিয়মিতরূপে বাৎসরিক ১২% ডিভিডেণ্ড দিয়া আসিতেছে।

৩, ৪। ব্যাঙ্ক অব তৈওয়ান (ফর্ম্মোসা) ব্যাঙ্ক অব চোজেন (কোরিয়া) একমাত্র—কৃষি ও শিল্পের উন্নতি-বিধানের জন্য "তৈওয়ান ব্যাঙ্ক" ১৯০৫ এবং "চোজেন ব্যাঙ্ক" ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। স্ব স্ব প্রদেশে উভয় ব্যাঙ্কই গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে নোট-প্রচার-কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইয়াছে।

কৃষি ও শিল্পের সাহায্যের জন্য স্থাপিত হইলেও উভয় ব্যাঙ্কই সম্প্রতি বিনিময়-কার্য্যও আরম্ভ করিয়াছে। "ব্যাঙ্ক অব তৈওয়ান" অল্পদিন হইল গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বিনিময়-কার্য্যকে ইহার প্রধান কার্য্য করিবার অনুমতি পাইয়াছে এবং ইহার এই বিনিময়-কার্য্য এতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছে যে, স্থানবিশেষে এই ব্যাঙ্ক ইয়োকোহামা স্পিসি ব্যাঙ্ককেও বিনিময়-কার্য্যে হার মানাইয়াছে।

তৈওয়ান ব্যাঙ্কের মূলধন ৪½ কোটি য়েন (৬¾ কোটি টাকা), চোজেন ব্যাঙ্কের মূলধন ৪ কোটি য়েন (৬ কোটি টাকা)।

৫, ৬। হাইপোথেক্ ব্যাঙ্ক অব জাপান, হোক্কাইডো কলোনিয়াল ব্যাঙ্ক—কৃষি ও শিল্পের উন্নতিবিধান-কল্পে এই দুইটি ব্যাঙ্ক যথাক্রমে ১৮৯৭ ও ১৯০০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। অন্যান্য দেশের "ল্যাণ্ড (জমি-সংক্রান্ত) ব্যাঙ্কের" ন্যায় "হাইপোথেক ব্যাঙ্ক" খত (ডিবেন্চার) দ্বারা টাকা ধার করিতে পারে। এই উভয় ব্যাঙ্কই অল্প সুদে ৫০ বর্ষ-কালব্যাপী ধারও দিয়া থাকে।

ব্যাঙ্ক দুইটির মূলধন যথাক্রমে প্রায় ৯½ কোটি ও ২ কোটি য়েন অর্থাৎ প্রায় ১৪ কোটি ও ৩ কোটি টাকা।

৭। ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক অব জাপান—সর্ব্বপ্রকার শিল্পকার্য্যের সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমশঃ ইহা দেশীয় ও বিদেশীয় বাণিজ্যে বিনিময়কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। শিল্পকার্য্যে অর্থ-সাহায্য করিবার জন্য জাপানে "হাইপোথেক ব্যাঙ্ক" ও "ইণ্ডাষ্টিয়াল ব্যাঙ্ক" প্রধান।

ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কের মূলধন ৫ কোটি য়েন অর্থাৎ ৭½ কোটি টাকা।

উপরি উক্ত ৭টি ব্যাঙ্ক ছাড়া জাপানের প্রত্যেক প্রদেশে কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য এক একটি করিয়া "হাই-পোথেক ব্যাঙ্ক" আছে। উহারা হাইপোথেক ব্যাঙ্ক অব জাপানের ন্যায় স্ব স্ব প্রদেশে কৃষি ও শিল্পের উন্নতিকল্পে নিয়মিতরূপে সাহায্য করিয়া থাকে।

আসামের চিঠি

(মরিয়ানী-জোরহাট)

শ্রীসুধাকান্ত দে, এম, এ, বি, এল

আজ বছরখানেকের উপর হইল আমার ভগিনী মরি-য়ানীতে মুরগী ও পায়রা লইয়া একটা পরীক্ষা করিতেছে—ব্যবসা চালানো যায় কিনা। জমি তার নিজের নয়। মুরগী ও পায়রার ঘরের জন্য কাঠেরও দাম দিতে হয় নাই। তা ছাড়া আর সব খরচ নিজে দিতেছে। এইরূপে সে খরচ বাদে ডিম ইত্যাদি বিক্রয় বাবদ প্রায় ৯০০৲ টাকা পাইয়াছে। এটা মন্দ আয় নহে।

মরিয়ানীর আশে-পাশে যত চা-বাগান তার সব সাহেবরা

খুব ডিম খায়। সুতরাং টাটকা ডিমের 'টান' লাগিয়াই আছে। এক একটা ডিম /০ আনা করিয়া বিকায়। বর্ষার সময় সাধারণতঃ মুরগী কম ডিম পাড়ে। সে সময় ডিম প্রতি পাঁচ-ছয় পয়সা, এমন কি দুই আনা পর্য্যন্ত দাম পাওয়া যায়। পায়রার 'টান'ও বেশ। এক একটা পায়রা ।/০, ।৵০, ।ø০ আনায় বেচা চলে।

মুরগী ও পায়রার ব্যবসা চালানো সোজা কথা নয়। অনেক হাঙ্গাম পোহাইতে হয়। খাটুনীও যথেষ্ট। আদর-যত্ন না করিলে সিদ্ধি নাই। মুরগী ও পায়রা উভয়ই সুখী জীব, ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারে না। অপরিষ্কারও থাকিতে পারে না। সেজন্য তাদের বাসস্থান সর্ব্বদা শুক্‌না, খটখটে থাকা দরকার। চারিদিকে যথেষ্ট আচ্ছাদন থাকিবে অথচ বাক্স বা খোপের ভিতর যেন স্থানের অপ্রাচুর্য্য না হয়। প্রতিদিন তাদের ঘর সাফ্ করিতে হইবে। রোগ হইলে ত কথাই নাই। তৎক্ষণাৎ রোগীকে 'অন্তরীণ' করিতে হইবে। নচেৎ দলকে দল মুরগী সাবাড় হইয়া যাইবে। তারপর মুরগীর বাচ্চা তোলায় আরও অনেক কাঠখড়ের দরকার হয়। পায়রার বাচ্চা খোপেই বড় হইয়া যায়। কিন্তু মুরগীর ছানা ডিম ফুটিয়া বাহিরে আসিলেই তাকে চোখে চোখে রাখিতে হয়। তাকে রাত্রিতে শিয়াল ও দিনে কাক, চিল এবং মানুষের হাত হইতে রক্ষা করিতে হয়। সর্ব্বদা তার খাবার তদবির করিতে হয়। অর্থাৎ তার পিছনে সারাদিন খাটিতে হয়।

আমার বোন্ এ সমস্তই সহ্য করিয়াছে। ১৪টা মুরগী আজ ৭২টায় পৌছিয়াছে। ইহার মধ্যে অল্পই কেনা। বাকী সব ঘরের ডিম হইতে তোলা পালিত মুরগী। বাংলা দেশে প্রায় একাকী কোনো মেয়ে এরূপ একটা পরীক্ষা চালাইয়াছে, ইহা আমার জানা নাই। সম্ভবতঃ এ ক্ষেত্রে সেই প্রথম। অনেক মেয়ে আছেন, যারা স্বাবলম্বী হইতে চান। তাঁরা মুরগী, পায়রা পুষিয়া এটাকে "কুটির শিল্প" হিসাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

আমার ভগিনী বলিতেছে, "দাদা, শ্রম ও যত্নে সোণা ফলানো আর অবিশ্বাস করি না। তোমরা শুধু আমার পরিশ্রমটাই দেখিতেছ। কিন্তু ইহার অন্য একটা দিক্ আছে ভুলিয়া যাইও না। আনন্দ ও শিক্ষার দিক্। দেখিতেছ না আমার কাছে নূতন এক রাজ্য খুলিয়া গিয়াছে। মুরগীর সম্বন্ধে আমি যত নূতন কথা জানিতে পারিয়াছি, তোমরা বই পড়িয়া তার শতাংশও জানিতে পারিবে না।

"শুধু শ্রম ও যত্ন দ্বারাই লাভবান্ হওয়া যায় মনে করিও না। দরদ চাই। মুরগীগুলি স্নেহের ডাক ভারি বুঝে! এই দেখ, প্রত্যেকটা মুরগী আমার কেমন বশ! প্রত্যেকটা মুরগীর বিশেষ স্বভাব আমার জানা আছে—কোনটা ভীতু, কোনটা দুলালী, কোনটা অভিমানী, কোনটা বদ্‌রাগী। প্রত্যেকের মেজাজ বুঝিয়া আমাকে চলিতে হয়। এখন আমি ইহাদিগকে এমন বুঝিয়া ফেলিয়াছি যে ইহারা যদি আমাকে এক ঘণ্টা দেখিতে না পায় তবে ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়া দেয়।

"তবু প্রতিদিন আমার এখনো নব নব অভিজ্ঞতা লাভ হইতেছে। ইহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা, বেয়ারাম-পীড়ার কথা ও আহার-বিহারের কথা আরও ভাল করিয়া জানিতেছি। সে জ্ঞান আবার ইহাদের শ্রীবৃদ্ধির পক্ষে কাজে লাগিতেছে।"

বলা বাহুল্য মুরগীর চরিবার জন্য জায়গা যত বিস্তৃত হয় তত ভাল।

* * * *

মরিয়ানীর পূর্ব্বদিক্ দিয়া একটা নদী বহিয়া যাইতেছে ও মরিয়ানীকে দ্বিখণ্ডীকৃত করিয়াছে। দেখিতে মানিকতলার খালের মত। এ প্রকার নদী আসামের প্রতি জনপদেই পাওয়া যাইবে।

এ নদীর উপর দিয়া একটা লোহা, কাঠ ও বেতের তৈরী পুল দেওয়া হইয়াছে অর্থাৎ ইহার খুঁটিগুলি কাঠের, বরগাগুলি লোহার, ছাউনিটা বেতের। ইহা মিউনিসিপ্যালিটির কীর্ত্তি। শীতকালে ও অন্যান্য সময়ে জল বেশী থাকে না। পায় হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। কিন্তু বর্ষাকালে দুকূল ভাসিয়া যায় আর বেশ স্রোত হয়। পাহাড়ে নদী—তখন পুল ছাড়া গতি নাই।

এই নদীর তীর ধরিয়া সোজা উত্তর দিকে চলিয়া গেলে তিন মাইলের পর, এ পারে একটা 'স-মিল' দেখা যাইবে।

ইহা সেকেন্দর আলীর বসানো। ভদ্রলোক ঐখানেই ব্যবসার সুবিধার জন্য থাকেন। ওপারে সরকারী বন আরম্ভ হইয়াছে।

* * * *

জঙ্গলের কাছে নদী থাকাতে সুবিধা হইয়াছে। জোরহাট রেলওয়ে সৃষ্টির পরেও বড় বড় মোটা ও ভারি কাঠ জলে ভাসাইয়া গন্তব্য স্থলে লইয়া যাওয়া হয়। স্রোতের সঙ্গে যাইতে হইলে ত কথাই নাই, ছাড়িয়া দিলেই হইল। ভাসিয়া গিয়া যখন স্থানমত পৌঁছিবে তখন ধরিয়া রাখিলেই হইল। স্রোতের বিপরীত দিকে নিতে হইলে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে হয়।

যখন আসাম-বেঙ্গল রেলের সৃষ্টি হয় নাই, তখন ব্রহ্মপুত্রের মধ্য দিয়াও এইরূপ কাঠ ভাসাইয়া নিয়া যাওয়ার প্রথা ছিল। কারণ ষ্টীমার ঘন ঘন যাতায়াত করিত না। আর ষ্টীমারে কত কাঠই বা ধরে? অবশ্য কাঠ সহ নৌকার চলাচল এখনও হইতেছে, তখনও হইত। দেখা যাইবে, নৌকা আগে আগে চলিয়াছে আর পিছনে কাঠ চলিয়াছে।

* * * *

ধর, বনের মধ্যে তিন মাইল দূরে খুব প্রকাণ্ড এক গাছ কাটা হইল। অথবা ধর, বনের মধ্যে একটা নদী আছে (আসামে এ রকম প্রায়ই আছে) তার উপর পুল দিতে হইবে। তখন উপায় কি?

মানুষ (যতই বলবান হোক্) বা গরুর গাড়ীর সাধ্য নাই যে সেই কাঠ জল পর্য্যন্ত টানিয়া আনে অথবা জলে ফেলে। ক্রেণ ইত্যাদি কলের কারবারও একেবারে নাই। খরচে পোষায় না। সুতরাং হাতীর শরণাপন্ন হইতে হয়। মোটা মোটা কাছি দিয়া হাতীর গায়ের সঙ্গে আর কাঠের সঙ্গে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। হাতী সেই কাঠ টানিয়া দরকার-মত স্থানে লইয়া যায়।

* * * * *

বাঙালীর মত আসামীরও সাধারণতঃ ব্যবসায়-বুদ্ধি নাই। তবে বাঙালীর চেয়ে আসামীর অবস্থা অনেক ভাল। ইহাদের প্রত্যেকের ঘরের চারিপাশে যথেষ্ট জায়গা আছে। কারো ২।১ বিঘা, কারো বা ৫।১০ বিঘা বা তদপেক্ষা বেশী।

জমিওয়ালা বাঙালী এবং আসামীর মধ্যেও একটা প্রভেদ লক্ষিত হইবে। আজকাল বাংলা দেশে খুব পাট চাষের দিকে ঝোঁক পড়িয়াছে। পাটে লাভ হয়, তাই বাঙালী কৃষক যত পারে কেবল পাটই চাষ করে। তারা মনে করে পাট বেচিয়া যে লাভ হইবে, তাতে ধান কিনিবে, মহাজনের ধার শোধ করিবে এবং যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে তদ্দ্বারা নিজের সচ্ছলতা বাড়াইবে। কিন্তু ফলে হয় উল্টা। ধান-চাল কম জন্মে ও বিদেশে বেশী রপ্তানি হয় বলিয়া আক্রা হয়। সুতরাং চাষীকে ঐ আক্রা দরে বেশী টাকা খরচ করিয়া ধান-চাল কিনিতে হয়। তার উপর সকলেই লাভের আশায় পাট উৎপাদন করায় ও তাড়াতাড়ি বেচিয়া বেশী লাভের চেষ্টা করায় পাটের দাম সস্তা হয়। মাঝখান থেকে মাড়োয়ারী দাদনদার আসিয়া যথাসাধ্য কম দামে পাট কিনিয়া নিজে বড় মুনাফাটা ভোগ করে। আজকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই মাড়োয়ারীরা মহাজনও বটে। সুতরাং চাষী পাকে প্রকারে তাদের কাছে পাট বেচিতে বাধ্য হয়। তখন কোনো দিকে লাভ হওয়া দূরে থাক, পেটের অন্নের জন্য চাষীকে ভাবিতে হয়। এইরূপে তার সর্ব্বনাশ হইতেছে। কিন্তু তবু বাংলার চাষীর চৈতন্য হয় না। পুনরায় সে এই 'জুয়া খেলায়' মাতে।

কিন্তু আসামের চাষী কখনও এরূপ করে না। সে প্রাণান্তেও আপনার প্রয়োজনীয় ধান-ক্ষেতের উপর হাত দিবে না। আগে প্রয়োজন মত ধান জন্মাইবে, তারপর বেশী জমি থাকে তাতে ভুট্টা, তরকারী, সরিষা ইত্যাদি লাগাইবে।

বলিতে গেলে আসামের মধ্যবিত্ত প্রায় সকলেই চাষী অর্থাৎ সকলের জমি আছে ও ধান চাষ করে বা করায়। সুতরাং অনেকের অন্নের জন্য ভাবনা করিতে হয় না অথবা খুব কম ভাবিতে হয়।

অধিকাংশ জমি খুব উর্ব্বরা, অল্প চেষ্টা করিলে সোণা ফলিতে পারে। কিন্তু আসামীরা, বিশেষতঃ পুরুষেরা সাধারণতঃ বড় অলস। কোনো রকমে খাইবার সংস্থান

হইলেই হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকে; আয় বাড়াইবার জন্ম আর চেষ্টা-চরিত্র করে না। চাকরীর মোহ ২।১ জন শিক্ষিত লোক ছাড়া বড় কারো নাই।

মরিয়ানীর চারিদিকে ঘুরিয়া দেখিতেছি বাড়ীর পাশে বাঁশঝাড় ও কলাগাছ আসামী গৃহের বিশেষত্ব। মোচা পোড়াইয়া এক রকম ক্ষার ইহারা প্রস্তুত করে। তাহা ইহাদের প্রিয় খাগ্ত। বাঁশ চাঁচিয়াও ইহারা এক প্রকার চাট্‌নি প্রস্তুত করিতে জানে। ইহার আস্বাদ টক। কুলীরা, বিশেষ সাঁওতাল কুলীরা, ভুট্টা ও সরিষার ক্ষেত করিতে ভালবাসে।

* * * * *

মরিয়ানীর প্রধান ব্যবসায়ী মাড়োয়ারী তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। মরিয়ানীর মত জায়গায়ও মাড়োয়ারীরা দোকান ফাঁদিয়া জাঁকিয়া বসিয়াছে। সাধারণতঃ, ইহারা ভাল জিনিষ দেয় ও ভাল ব্যবহার করে।

ইহারা প্রত্যেক চা-বাগানের সম্মুখে 'সাইকোলজিক্যাল' স্থানে এক একটা দোকান খুলিয়া বসিয়া আছে। প্রতি শুক্রবার কুলীরা তলব পায়, আর বাহির হইয়াই ঐ দোকান হইতে জিনিষ কিনিতে থাকে।

দেখিতেছি ঢাকার 'বাঙাল' বেপারীরাও এখানে আস্তানা গাড়িয়াছে। কিন্তু মাড়োয়ারীদের সঙ্গে প্রতি-যোগিতায় ইহারা পারিতেছে না। তথাপি মাড়োয়ারীদের ঠিক নীচেই ইহাদের স্থান বলিতে পারি। ইহাদের প্রধান দোষ এই যে, মিষ্টি করিয়া কথা বলিতে জানে না। ইহারা বুঝে না যে, খরিদ্দার বশ করিতে মিষ্টি কথা ও ভদ্র ব্যবহারের মত চিজ দুনিয়ায় আর কিছু নাই।

পান, সিগারেট, দিয়াশলাই, আয়না, চিরুণী, সাবান, তেল, সস্তা ছিটের জামা ও রঙচঙে শাড়ী বেশ বিক্রী হয়। চাল, ডাল, নুন, তেল ইত্যাদি ত আছেই। বলা বাহুল্য অধিকাংশ জিনিষ বাহিরের আমদানি।

* * * *

মরিয়ানীতে সপ্তাহে এক দিন করিয়া হাট বসে। রবিবার দিন। যে স্থানে হাট বসে তাহা চা-করের এলাকার মধ্যে। সুতরাং যে-কেহ মাল বেচিতে আসে তাকে 'তোলা' অর্থাৎ নজর দিতে হয়। এই নজরের হার বাঁধা আছে।

হাটে মাছ আসে। এই একটা দিন মাত্র এখানে মাছ পাওয়া যায়। এ মাছ রেলগাড়ী চড়িয়া ব্রহ্মপুত্র হইতে অথবা কলিকাতা হইতে আসে। এখানকার নদীতে অথবা খালবিলে যারা মাছ ধরে, তারা নিজেরাই তাহা খাইয়া ফেলে, বিশেষ কিছু উদ্বৃত্ত থাকে না। আর সে সব মাছ বড়ও নয়।

আসামে যারা মাছ ধরে ও মাছের ব্যবসা করে তাদের ডোম ও ডুম্‌নী বলা হয়। কয়েক বৎসর হইল এই সম্প্রদায় আন্দোলন-আলোচনার পর পৈতা গ্রহণ করিতেছিল ও আপনাদিগকে কৈবর্ত্ত বলিতেছিল। মধ্যে এমন হইয়াছিল যে ডুম্‌নীরা বাজারে আসিয়া মাছ-বেচা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। ডোমেরা বেঁচিত। দেখিতেছি এখন সে হুজুগ মন্দা পড়িয়াছে।

লাউ, কুমড়া, কপি, নানা প্রকার শাক ও পেঁপে, কলা, ইত্যাদি স্থানীয় "উৎপন্ন"। বেগুন, উচ্ছে, ডিম, পায়রা, হাঁস, মুরগীও বিকায়। তার কতক আমদানি।

* * * *

স্কুল নাই। হাঁসপাতাল নাই। কিন্তু 'পশুর ডাক্তার' ও 'পশুর ডাক্তারখানা' আছে। বর্ষার সময় দেখিতাম ডাক্তার বেচারা ভোর হইতে আরম্ভ করিয়া রাত পর্য্যন্ত সাইকেলের উপর এক বাগান হইতে অন্য বাগানে টো-টো করিতেছে। এবার বর্ষায় গরু-ভেড়ার মড়ক গেল।

ট্রেজারি জোরহাটে অবস্থিত। কিন্তু ডাকঘর ও 'তার'ঘর আছে। আয় মন্দ হয় না। কারণ চা-করদের দেদার চিঠিপত্র ও টাকা-পয়সা এই ডাকঘর দিয়া যায়। তবে ইহা নিম্ন (সাব্‌) ডাকঘর।

এখানেও একটি খ্রীষ্টিয়ান গীর্জ্জা আছে। মাটির দেওয়াল দেশীয় লোক ও সাঁওতাল পাদ্রীরা চালায়। মুসলমানদের মসজিদ্‌টা ইহা অপেক্ষা সমৃদ্ধিজ্ঞাপক। এই ঘরটি ছোট-খাট, কিন্তু পাকা। মরিয়ানীর কোথাও হিন্দুর দেবদেবীর কোনো মন্দিরের চিহ্নমাত্র দেখিতে পাই না। কিন্তু দুইটি ক্লাব আছে। সন্ধ্যায় সেখানে লোক জমায়েত হয়। সরস্বতী

পূজা ও থিয়েটার হয়। এ দুটি আসামের সর্ব্বত্র বাঙালীর আমদানি।

* * * *

মরিয়ানীর সড়ক একটাও পাকা নয়। বৃষ্টি হইলে কাদা, আর রোদ হইলে ধূলা অনিবার্য্য। বিশেষ গরুর গাড়ী চলিয়া রাস্তার রাস্তাত্ব ঘুচাইয়া দেয়। মিউনিসিপ্যালিটির বিশেষ দোষ দিতে পারি না। একেই যে রাস্তায় গরুর গাড়ী চলে তাকে সামলে রাখা কঠিন; তার উপর প্রত্যেকটা সড়ক প্রকাণ্ড লম্বা। কত পথ যে গ্রামের মধ্য দিয়া পাহাড় ঘেসিয়া, নদীর উপরের পুল পার হইয়া, বন পার হইয়া চলিয়া গিয়াছে তার অন্ত নাই। আসামের গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড্ ডিব্রুগড় হইতে আরম্ভ হইয়াছে, আর শেষ হইয়াছে গিয়া গৌহাটীতে—আমিনগাঁওয়ে। অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র ও ডিব্রু নদীর মোহানা হইতে আরম্ভ হইয়া যেখানে ব্রহ্মপুত্র আসাম ও বাংলার সীমা-রেখা নির্দ্দেশ করিতেছে সেই পর্য্যন্ত। ইহাই সর্ব্ববৃহৎ রাস্তা। ইহা মরিয়ানীর বাজার ঘেসিয়া চলিয়া গিয়াছে। অন্য রাস্তাগুলিও বড় বড়। সুতরাং দরিদ্র মিউনিসিপ্যালিটি এগুলির খবরদারি করিতে পারিবে না, ইহা আশ্চর্য্য নহে।

তবে মিউনিসিপ্যালিটির অমনোযোগও আছে বটে। পথে আলোর কোনো বন্দোবস্ত নাই। অবশ্য রাত্রিতে বড় কেহ চলাফেরা করে না। বাঘ-সাপের ভয়ে ঘরে ঘরে দুয়ার বন্ধ হইয়া যায়। যারা বাহির হয়, লণ্ঠন অথবা মশাল সঙ্গে করিয়া লয়।

যানের মধ্যে ঘোড়ার গাড়ীর কল্পনা করা চলে না। চা-করেরা মোটর চালায়। কিন্তু গরুর গাড়ীর অবাধ গতি। দিন-রাত চলিতেছে। যখন জোরহাট ষ্টেট রেলওয়ে হয় নাই তখন জোরহাট-মরিয়ানীর প্রধান বাহন ছিল গরুর গাড়ী। ইহাদের অনেকটা অন্ন মারিয়াছে ১নং রেল, ২নং মোটর লরী।

রেল হওয়া সত্ত্বেও গরুর গাড়ীর আদর ছিল। কিন্তু ২।৪ মাস যাবৎ ২।১ জন পাঞ্জাবী ঠিকাদার মোটর লরী কিনিয়া আনিয়াছে। তাহাতে গরুর গাড়ী বেশ কাবু হইতেছে। অনেক পয়সা পাঞ্জাবীর পকেটে যাইতেছে। লরীতে অল্প সময়ে মাল লইয়া মরিয়ানী-জোরহাট যাতায়াত করা যায়। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যও বেশী। সুতরাং কে না লরীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইবে? কাঠ ইত্যাদি বহিতেও লরী সুবিধাজনক।

* * * *

এতক্ষণ যাহা বলিলাম তাহাতে মরিয়ানীর কোন্ ছবি ফুটিয়া উঠিল? মরিয়ানীতে ফাঁকা জায়গা খুব বেশী নাই। কিন্তু জঙ্গল বিস্তর রহিয়াছে। রোগ-পীড়া, ম্যালেরিয়া, প্লীহা বহু ঘরে দেখা যায়। রেল কোম্পানী অল্প লোকের জন্য পরিষ্কার জলের বন্দোবস্ত করিতে পারিয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ লোক ডোবার অপরিষ্কৃত জল পান করিয়া থাকে। লোকেরা যে যার আপন আপন কাজ ও চাকরী লইয়া ব্যস্ত আছে। একে অন্যের সুখদুঃখের খোঁজ লইবার বড় অবসর পায় না। এখানে মানুষকে পোকা-মাকড়, মশা-মাছির অসহ্য উৎপাত সহিয়া টিকিয়া থাকিতে হয়। এই হইল মরিয়ানীর অন্য দিক্।

* * * *

মাত্র ১২ মাইলের ব্যবধানে জোরহাট। অথচ উভয়ে আকাশ-পাতাল তফাৎ।

ইতিমধ্যে একদিন (২৭ মে, ১৯২৬) জোরহাট যাওয়া গিয়াছিল। সেদিন ভয়ানক গরম। ঘামে শরীর ভিজিয়া যাইতেছিল। সেই প্রখর রৌদ্রের মধ্যেও মহা আরামে সেকেন্দর সাহেবের মোটরে যাত্রা করা গেল। ট্রেনে যাওয়া মনঃপূত হইল না।

হুড্ ফেলা ছিল। বেশ বাতাস খাইলাম। রাস্তা জোরহাট ষ্টেট্ রেলওয়ের সমান্তরালে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু মোটর চলিবার সড়কের অধিকাংশটা কতকগুলা চা-বাগানের মধ্যে পড়ে। মাঝে মাঝে অল্প কিছু রাস্তা অত্যন্ত খারাপ। তার জন্য দায়ী গরুর গাড়ী।

কিন্তু চা-বাগানের মধ্যের সড়ক দিব্য ফিট্‌ফাট ও উজ্জ্বল, ভূমি সমতল। দুই ধারে চা-ক্ষেতের মাঝখান দিয়া চা-করেরা চমৎকার সড়ক বানাইয়াছে। মোটর বেশ সহজ গতিতে চলে। বলা বাহুল্য, এই সব সড়কে গরুর গাড়ীর 'প্রবেশ নিষেধ'। তার আলাদা রাস্তা সঙ্গে সঙ্গেই গিয়াছে।

সেকেন্দর আলীর জ্যেষ্ঠপুত্র নিজেই মোটর চালাইতে লাগিল। দুই ধারে পর পর খালি চা-বাগান নজরে পড়িতেছে। কুলীরমণীগণ রোদ মাথায় করিয়া মস্ত মস্ত ঝুড়িতে চা-পাতা তুলিতেছে। চা-বাগানের সাহেবরা সুন্দর বাংলাতে বাস করিতেছে। বিদ্যুতের আলো ও পাখা তাদের সেবা করিতেছে।

মোটর-চালক বলিল, "মহাশয়, দেখিতেছেন কি? এই ২।১টা স্থান যে জঙ্গল ও পতিত মনে করিতেছেন, উহাও চা-বাগানের অন্তর্গত। জ্বালানি কাঠের জন্য উহা রাখিয়া দিয়াছে।

"বস্তুতঃ, মরিয়ানী হইতে জোরহাট পর্য্যন্ত আপনি এক ছটাক জমিও পাইবেন না যাহা কোন না কোন চা-বাগানের অন্তর্গত নহে।

"আপনি এই সব ক্ষেত-খামার দেখিয়া মনে করিতেছেন লোকেরা নিশ্চয় চা-বাগান হইবার পূর্ব্বে এই সব জমি লইয়াছিল। কিন্তু না মহাশয়, এই সমস্তই চা-বাগানের। লোকেরা চা-করদের নিকট হইতে জমি পত্তন লইয়া চাষ-বাস করিতেছে।

"এই যে বড় দোতলা বাড়ীটি দেখিতেছেন ইহা এই বাগানের হাঁসপাতাল। এই কাচের ঘরটি কার্য্যাধ্যক্ষের আফিস। দেখুন কতখানি জায়গা জুড়িয়া আছে। কত ঘরবাড়ী ইহাদের কর্ম্মচারীদের জন্য। ইহা হইতে ইহাদের ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে কিছু আন্দাজ করিতে পারিতেছেন কি? ইহারা একটা ডাকঘরও বসাইয়াছে।

"নিজের নিজের বাগানের সীমার মধ্যে ম্যানেজাররা এক একটি রাজপুত্র বিশেষ। ইহাদের বাগানে বা বাগানের কাছা-কাছি যদি গরু-ছাগল যায়, ইহারা অম্লান-বদনে নিজেদের তৈরী খোঁয়াড়ে চালান দেয়। আপনাকে পয়সা দিয়া ছাড়াইয়া আনিতে হইবে। কিন্তু মজা এই, খোঁয়াড়গুলি বে-আইনি—সরকারের অনুমোদিত নহে। পয়সাগুলি চা-করের পকেটে যায়। কিন্তু সে কথা লইয়া ইহাদের সহিত কে বুঝাপড়া করিতে যাইতেছে বলুন। কে সাহস করে?"

জোরহাট সহরের কাছে যাইয়াই সেই ভদ্রলোক পুনরায় বলিতেছে, "এই জোরহাট আরম্ভ হইল। এই দেখুন বাঁ দিকে পাওয়ার হাউস্। এখান হইতে সমস্ত সহরে জল সরবরাহ হয়। সহরে ঢুকিয়া দেখিবেন রাস্তায় রাস্তায় জলের কল দাঁড়াইয়া আছে। সকল লোক বাল্তি করিয়া সেই জল লইয়া যায় ও ব্যবহার করে। সমগ্র সহরে দেদার কল রহিয়াছে।

"আপনি জানেন কি, জোরহাটে বিদ্যুৎ বাতি জ্বলে ও পাখা চলে? লামডিং জংশনের ষ্টেশনে বিদ্যুতের আলো রেলের কীর্ত্তি। আর এখানকার এই বিদ্যুতের কারবার কার কীর্ত্তি জানেন? এক আসামী ভদ্রলোকের। তাঁর নাম শশী সৈকিয়া। এই জোরহাটেই তাঁর বাড়ী।"

শশী সৈকিয়ার ইতিহাস বিচিত্র ও শিক্ষাপ্রদ। ভদ্রলোক দেশ-বিদেশে বেড়াইয়া অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। কয়েক বৎসর হইল কয়েক জন আসামী ভদ্রলোক বরপাথা নামক স্থানে একটি স্বদেশী কাগজের কল স্থাপন করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন। তাঁরা সেখানকার নল-খাগড়ার বন হইতে উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সেই কোম্পানী হইতেই এই ভদ্রলোককে জাপানে পাঠানো হয় অথবা তিনি নিজেই পূর্ব্বে কাগজ প্রস্তুত প্রণালী শিখিবার জন্য জাপানে গিয়াছিলেন, ইঁহারা তাঁকে নিয়োগ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সৈকিয়া ফিরিয়া আসিলেও নানা কারণে কাগজের কল আর খোলা হইল না।

তখন সেই কোম্পানীরই অর্থে (ক্ষতিপূরণ স্বরূপ?) বিদ্যুতের বিষয় আয়ত্ত করিবার জন্য শশী সৈকিয়া পুনরায় জার্ম্মাণিতে প্রেরিত হন। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়াই তিনি জোরহাটে বিদ্যুতের কারবার খুলিবার সঙ্কল্প করিলেন। সে সময় সকলেই বাধা দিয়াছিল। কিন্তু তিনি তাতে না দমিয়া হাতে যা-কিছু টাকা ছিল সব বিদ্যুতের সাজ-সরঞ্জাম কিনিতে খরচ করিয়া ফেলেন।

ইহার পর এক সময়ে তাঁর এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, দুই বেলা খাওয়া জুটিত না। ভাবনা-চিন্তায় ও দারিদ্র্যের পেষণে তিনি মরণাপন্ন হইয়াছিলেন। শুনিয়াছি সেই সময় মাড়োয়ারীরা অগ্রসর হইয়া তাঁর সাহায্য করিয়াছিল।

পরেও তারা তাঁকে অনেক প্রকারে সহায়তা করিয়াছে।

যাহা হোক শশী সৈকিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছেন। মানুষটা বেশ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কাজে লাগিয়া থাকিতে জানেন। এখন বিশেষ উৎসাহের সহিত ব্যবসা চালাইতেছেন। সম্ভবতঃ এখনও মোটা মুনাফা মারিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁর 'ফেল মারিবার'ও আর কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই। মাড়োয়ারীরা সকলেই নিজগৃহে ও দোকান-পাটে ৫।৬।৭।৮টা করিয়া বাতি লইয়াছে ও ২।৪ খানা করিয়া পাখা চালাইতেছে। মিউনিসিপ্যালিটিও তাঁর সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়াছে। জোরহাটে শিবসাগর জেলার সকল বড় কর্ম্মচারীর বাসস্থান। তাঁদের প্রত্যেকের বাড়ীতে বিজলীর বাতি ও পাখা। প্রত্যেক ভদ্র গৃহস্থের বাড়ীতেও বটে।

সম্প্রতি গভর্ণর কের সাহেব সৈকিয়াকে ডাকিয়া দেখা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ শীঘ্রই ডিব্রুগড়ে বিদ্যুতের আলো ও পাখার বন্দোবস্ত করিয়া দিবার ঠিকা লইবেন। সুতরাং বলা যাইতে পারে, সৈকিয়ার আর ভয় নাই, শীঘ্রই তিনি ফাঁপিয়া উঠিবেন।

বলা বাহুল্য একা মানুষের এ প্রকার প্রচেষ্টা সমগ্র আসামে এই প্রথম। বিদ্যুতের কারবারের ইতিহাসে সৈকিয়ার নাম জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা থাকিবে।

কবি কৃপার বলিয়াছেন, "ভগবান গ্রাম তৈরী করিয়াছেন সহর মানুষে তৈরী করিয়াছে।" কলিকাতা সহর ইংরেজের কীর্ত্তি সন্দেহ নাই। জোরহাটও ইংরেজের কীর্ত্তি। কীর্ত্তি বলিলে কম করিয়া বলা হয়। বলা উচিত জিদ। আহোম রাজাদের সময় হইতে শিবসাগর মহকুমা শিক্ষা, দীক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য ও সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত ছিল। আজও সেখানে রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ রংঘর (অর্থাৎ ক্লাব), বাইচ ও পোলো খেলিবার মাঠ, দুইটী প্রকাণ্ড হ্রদ (শিবসাগর ও জনসাগর) এবং তিনটী প্রাচীন বিশাল প্রস্তর-মন্দির আহোম রাজাদের কীর্ত্তির সাক্ষ্য দিতেছে। আর আজও বাংলা দেশে শান্তিপুর, নবদ্বীপ বা বিক্রমপুরের যে স্থান, সমগ্র আসামে শিবসাগরের সেই স্থান।

কিন্তু এই সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর স্থানটি ইংরেজ-রাজের মনঃপূত হইল না। তাঁরা জিদ করিয়া নিজেদের জন্য এই জোরহাট গড়িলেন। ইহার জন্য অজস্র টাকা ঢালিয়া দিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। বস্তুতঃ, আজ জোরহাট 'ভারি সহর' দাঁড়াইয়াছে। দোকান-পাট হাট-বাজার, রেল-মোটর, স্কুল, বিদ্যুৎ, লোকজনে গম্‌গম্ করিতেছে। কিন্তু ইহার জন্য ঢের কাঠখড় পুড়িয়াছে।

জোরহাটের সড়ক মন্দ নয়। পাকা বটে। কিন্তু ধূলারও কম্‌তি নাই। রাত্রিতে বাতির বন্দোবস্ত আছে। অধিকাংশ বাড়ী খড়ের। টিনের রেওয়াজও বেশ দেখিতেছি। দোতলা বাড়ীও চোখে পড়িতেছে।

মোটর-বাসগুলি যাত্রি-বোঝাই হইয়া অনবরত যাতায়াত করিতেছে। মাল ও লোক লইয়া জোরহাট-মরিয়ানীও যাতয়াত চলিতেছে। ভাড়া-মোটর ও ঘরের মোটর হরদম ছুটিতেছে। গাড়ীর রাজা গরুর গাড়ীর ত কথাই নাই। সাইকেলও দেদার।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ঘোড়ার গাড়ী বলিয়া কোনো জিনিষ এখানে দেখিতে পাইতেছি না। অথচ মোটর ঘোড়ার গাড়ীর মত সস্তা নহে। মাইলখানেক দূরে ষ্টেশনে যাইতে ২৲ টাকা লইতেছে। জোরহাট হইতে মরিয়ানী পর্য্যন্ত ভাড়া ৬৲ টাকা। রেলে ॥০ কি ॥৵০ মাত্র।

ডাকঘর, তারঘর, কাছারি, কোষাগার, সরকারী ডাক্তার-খানা আছে। দুইটি দাতব্য হাঁসপাতাল। দেশী লোকের কীর্ত্তি।

* * * *

স্কুল দুইটা—একটা সরকারী, অন্যটা বে-সরকারী। প্রত্যেকের ছাত্র-সংখ্যা ৫৫০। তা ছাড়া, একটা নর্ম্মাল স্কুল ও মিশনারীদের চালিত কতকগুলি নিম্ন স্কুল চলিতেছে। শিলং হইতে পুলিশ-ট্রেনিং স্কুল এখানে উঠিয়া আসিয়াছে। মেয়েদের একটা মাইনর স্কুল মন্দ চলিতেছে না।

আসামে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। শিক্ষা-ব্যাপারে সমগ্র আসামে গৌহাটি প্রথম, ডিব্রুগড় দ্বিতীয় এবং জোরহাট তৃতীয় মনে হইতেছে। গত ম্যাট্রিকুলেশনে জোরহাটের সমস্ত ছেলে পাশ হইয়াছিল।

ইহাদের খেলিবার জন্য বিস্তীর্ণ মাঠ রহিয়াছে। উহা প্রস্তুত করিতে কম টাকা খরচ পড়ে নাই।

জোরহাটে সরকারী "এগ্রিকালচার ফার্ম্ম" (চাষের ক্ষেত) খুলিয়া নানা প্রকার পরীক্ষা চলিতেছে। "বোটানিক ইকনমিষ্ট" একজন বাঙালী। এ ভদ্রলোক শুনিয়াছি আই, এস-সি পর্য্যন্ত পড়িয়া আমেরিকায় যান ও নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের বলে তাঁর বিষয়টা শিক্ষা করিয়া আসেন। আজ বড় চাকরী করিতেছেন।

ফার্ম্মের জন্য অনেক জায়গা-জমি লওয়া হইয়াছে। দেখিলাম বড় বড় ধান গাছ জন্মিয়াছে।

সেকেন্দরের পুত্র বলিল, "মহাশয় এখানকার ৫টা চাউলের কলের মধ্যে ২টা বিদেশীদের ৩টা আসামীদের। আগে পাদ্রীরাও একটা খুলিয়াছিল। এখন বন্ধ করিয়াছে। মাড়োয়ারীরা একটা তেলের কল চালাইতেছে। আমরা কলে ছাঁটা চাল ও কলের তেল ব্যবহার করিয়া থাকি।

"বাজারের অবস্থা বেশ সমৃদ্ধ। মাড়োয়ারীই প্রধান। অবশ্য আপনাদের পূর্ব্ববঙ্গের বেপারীও ঢের আছে।

"কিন্তু একটা কথা মনে রাখিবেন জোরহাট ডিব্রুগড় নহে। ডিব্রুগড়ের মত জোরহাটের লোকসংখ্যাও এই কয় বছরে খুব বাড়িয়াছে। সুতরাং মাছ-তরকারী, চাল-ডাল, কাপড়-চোপড়, ওষুধ-পত্র পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী বিক্রয় হইতেছে। ডিব্রুগড়ের বৃদ্ধি যেরূপ প্রধানতঃ বিদেশীয়দের জন্য হইয়াছে, জোরহাটের সেরূপ নহে। অর্থাৎ ডিব্রুগড়ে আপনারা বাঙালী, মাড়োয়ারী ইত্যাদি আসিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আস্তানা গাড়িয়াছেন। সাহেবদের পরেই আপনাদের প্রাধান্য। বাহিরের কেহ আসিলে বুঝিবে না ডিব্রুগড় বাঙালী সহর না আসামী সহর। কিন্তু জোরহাট খাটি আসামী সহর। আর ইহার লোক-সংখ্যায় বুঝা যাইতেছে আসামীরা বাড়িতেছে ও সমৃদ্ধ হইতেছে।"

এই সহর—সমগ্র শিবসাগর জিলাও বটে—রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনে অগ্রণী। এখানে "স্বদেশী"র ভাব প্রবল এবং এখন পর্য্যন্ত হিন্দু ও মুসলমান (সংখ্যায় অল্প নহে) সদ্ভাবে বাস করিতেছে।

সরকারী কৃষি-সাম্মলন

নবাব বাহাদুর সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরীর সভাপতিত্বে কৃষি-সম্মেলনের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। সমবায়-পদ্ধতিতে একটি সিঞ্চন-বিভাগ খোলা, কৃষি-শিক্ষা, রেশম শিল্প, গৃহ-শিল্প, তাঁত-শিল্প প্রভৃতি আলোচিত হয়।

নবাব বাহাদুর সভার উপসংহারে বলেন—

বাঙ্গালার গ্রামবাসীরাই যে জাতির মেরুদণ্ড একথা আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া বাহুল্যমাত্র। কাজেই রয়েল কমিশনদ্বারা গ্রাম্য উন্নতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান কেবল অর্থনীতি বা সমাজনীতির দিক্ হইতেই যে অত্যাবশ্যক তাহা নহে, পরন্তু রাজনীতির দিক্ হইতেও অত্যাবশ্যক। আপনারা যে ভাবে সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়াছেন তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, আপনারা এ বিষয়ের গুরুত্ব সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আলোচ্য বিষয়ে যাঁহারা গবর্মেণ্টকে উপদেশ দিতে পারেন, সেই সমস্ত লোকই যে যথেষ্ট সংখ্যায় এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন তাহা আমি দ্বিধাশূন্য হইয়া বলিতে পারি। কৃষি-বিভাগের বোর্ডে রয়েল কমিশনের একজন সদস্য আছেন। ইহাতে ঐ বোর্ড গৌরবান্বিত।

নবাব বাহাদুর ঐ সভায় যে বক্তৃতা প্রদান করেন নিম্নে তাহার সারমর্ম্ম প্রদত্ত হইল।

প্রথমে দেখিতে হইবে যে, কৃষি-বিষয়ে উন্নতির পথে কি কি বাধা পড়িতেছে, তবেই আমরা উপযুক্ত উপায় নির্দ্ধারণে সমর্থ হইব।

ইহা সর্ব্বজনবিদিত সত্য যে, ভারতীয় কৃষকগণ,

বিশেষতঃ, বাঙ্গালার কৃষকগণ রক্ষণশীল। এই জন্য নূতন বৈজ্ঞানিক প্রথায় কৃষিকার্য্য প্রচলন করিতে একটু বিলম্ব হইবে। কিন্তু কৃষকদিগের ভিতর নূতন বৈজ্ঞানিক প্রথায় কৃষিকার্য্য চালাইবার কৌশল প্রদর্শন করিবার জন্য রীতিমত চেষ্টা করিতে হইবে।

এতদিন কেবল রিসার্চ্চ ইত্যাদিতেই কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু এক্ষণে ঐ সকল পরীক্ষার ফল কাজে লাগাইতে হইবে।

কৃষকদিগের মধ্যে যদি ছোট ছোট সমিতি গঠিত করিয়া উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রথায় কৃষিকার্য্য চালাইবার চেষ্টা করা হয়, এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যদি উহার উন্নতির বিষয়ে আলোচনা হয়—তাহা হইলে গবর্মেণ্টের সাহায্য পাইয়া তাহারা ভবিষ্যতে কৃষিকার্য্যের উন্নতি করিতে পারিবে। এই বাঙ্গালা দেশ কৃষি-প্রধান। অথচ এখানে কৃষিশিক্ষার সেরূপ কোন ব্যবস্থা নাই। কৃষকের পুত্র অল্প কিছু লেখাপড়া শিখিয়াই নিজেদের ব্যবসায় ভুলিয়া যায়। উপরন্তু, সাহিত্যিক শিক্ষার এত বেশী প্রচলন হইয়া পড়িয়াছে যে, যুবকগণ শারীরিক পরিশ্রমের কার্য্যে অপটু ও বিরাগী হইয়া পড়িতেছে। ইহাও বাঙ্গালার কৃষির উন্নতির পক্ষে একটি প্রধান অন্তরায়।

পৃথক পৃথক ছোট ছোট অংশে জমি-চাষের চেষ্টা দ্বারা উন্নতির পক্ষে বাধারই সৃষ্টি হইয়া থাকে। বৃহৎ ভূমিখণ্ডে একত্রে চাষ আরম্ভ না করিলে নূতন বৈজ্ঞানিক প্রথায় উন্নতি করা সম্ভব নয়।

এদিকে আবার দেশের প্রাকৃতিক অবস্থাও চাষের উন্নতি সম্বন্ধে কতকটা বাধা দিতেছে। কোনো কোনো জায়গায় পূর্ত্ত-কার্য্যের মাটি লাল, কোনো জায়গায় লোনা, আবার কোনো কোনো জায়গায় অনবরতই বৃষ্টি পড়ে। এগুলিও অন্তরায়।

কৃষিকার্য্যের উন্নতির আর একটি অন্তরায় এই যে, এদেশে বর্ত্তমানে গবাদি পশুর রক্ষা ও উন্নতির দিকে দৃষ্টি একেবারে কমিয়া গিয়াছে। গবাদি পশুই কৃষিকার্য্যের প্রধান সহায়।

কৃষকগণ উত্তম গরু পালন করিয়া দুগ্ধ-বিক্রয় দ্বারা লাভবান হইতে পারে।

এদেশের কৃষকগণের দারিদ্র্যই তাহাদের উন্নতির প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে; তাহার উপর আবার জলবায়ু ও অস্বাস্থ্যকর অবস্থানের প্রভাব। দুর্ব্বল কৃষকগণ রীতিমত পরিশ্রম করিতেও অপটু হইয়া পড়িয়াছে।

বাঙ্গালার কৃষির উন্নতি-সাধন বড় হালকা কথা নহে; ইহার জন্য ব্যবস্থাপক সভা ইত্যাদির রীতিমত সাহায্য ও চেষ্টার প্রয়োজন। সমবায়-সমিতি স্থাপনের দ্বারা কৃষক-গণের উন্নতি-সাধন করা যাইতে পারে। কৃষকদিগের ভিতর উটজ শিল্পের প্রচলনে কৃষক-পরিবারের দারিদ্র্য ঘুচিতে পারে। এইরূপে বাঙ্গালার কৃষককুলের উন্নতি-সাধন করিতে হইবে। তবেই গোটা দেশের উন্নতি হইবে। নতুবা দেশোন্নতি কথার কথা মাত্র।

জুয়ার বিরুদ্ধে আইন আবশ্যক

(১)

আজকাল মফঃস্বলে প্রায় সর্ব্বত্র ছোট-খাট মেলা বসাইবার একটা প্রবল প্রয়াস মফঃস্বলবাসীদের মধ্যে দেখা যাইতেছে। ঐ সব অনুষ্ঠানের ব্যয়ভার বহন করিতেও বিশেষ ভাবিতে হয় না। ইচ্ছা করিলেই একটী ছোট গ্রামেও এইরূপ মেলা বসান যাইতে পারে।

একমাত্র জুয়াড়ীরাই ঐ সব অনুষ্ঠানের ব্যয়ভার বহন করিয়া থাকে। তাহারা মেলার অধ্যক্ষগণের সহিত দৈনিক বা এককালীন কিছু টাকার চুক্তি করিয়া মেলায় খেলা পাতিয়া থাকে। অধ্যক্ষগণও ঐ টাকায় পুতুল-নাচ, যাত্রা প্রভৃতির দ্বারা গ্রামের একটী ময়দানে মেলার জাঁক জমক করিতে থাকেন।

মেলায় পার্শ্ববর্ত্তী ও দূরবর্ত্তী গ্রামের অনেক ছেলে, মেয়ে ও বৃদ্ধ সকলেই আমোদ-প্রমোদে যোগদান করিতে গিয়া থাকে। পরে ঐ সব দর্শকের অধিকাংশই জুয়া খেলিতে বসিয়া প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, প্রকারান্তরে গ্রামবাসীদের নিকট হইতেই টাকা পয়সা লইয়া এইরূপ আমোদ-প্রমোদ করা হইয়া থাকে। যদি বাস্তবিকই আমোদ-প্রমোদের প্রয়োজন হইয়া থাকে, তবে আপনাপন ক্ষমতানুযায়ী চাঁদা প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিলেই কাহারও কোন অনিষ্ট হয় না। ফন্দী-ফিকিরের দ্বারা গ্রামবাসীদের ঐরূপ অর্থ-শোষণ করিয়া আমোদ প্রমোদের আয়োজন করিবার প্রয়োজন কি? ইহার ফলে পল্লীগ্রামে চুরি ডাকাতি ইত্যাদি অশান্তি পুরামাত্রায় চলিতে থাকে।

আমাদের ভগবানপুর থানার অন্তর্গত মহম্মদপুরের মেলাটী ঠিক এইভাবে পরিচালিত হইতেছে। উক্ত গ্রামের কোকিলার পুকুর নামক একটী ময়দানের মধ্যস্থিত পুকুরের পাড়ে একটী মেলা আজ ৬।৭ বৎসর কাল পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। কয়েকটী যুবক কর্ত্তৃক মেলাটী পরিচালিত হইতেছে! ঐ ব্যাপারে কয়েকজন পক্ককেশ বয়োবৃদ্ধও আছেন। শোনা গিয়াছে যে জুয়াড়ীরা মেলাটী ১০০৲ টাকায় বন্দোবস্ত লইয়াছে। ঐ অর্থে মেলাটী পক্ষাধিক কাল চলিয়া থাকে। এই কয়েকদিন মেলা দেখিতে আসিয়া বহু দর্শক জুয়াড়ীদের হাতে বহু টাকা নষ্ট করিয়া দেয়।

দিবসে মাত্র কয়েকজন দোকানদার ছাড়া মেলায় কেহই থাকে না। বেলা ৩টা হইতে পুতুল নাচ আরম্ভ হয়, পরে সন্ধ্যায় কীর্ত্তন আরম্ভ হইলে লোকজন জড় হইতে থাকে। রাত্রি দুইটা পর্য্যন্ত মেলায় লোকজন থাকে। প্রায় ১০।১২ দল জুয়াড়ী সন্ধ্যা হইতে শেষ রাত্রি পর্য্যন্ত খেলিতে থাকে। জুয়াড়ীদের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। গুমগড়, ২৪ পরগণা, ময়না প্রভৃতি অঞ্চল হইতে জুয়াড়ীরা আসিতেছে।

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে যুথ্যা গ্রামনিবাসী শ্রীযুত অধরচন্দ্র বেরা এইরূপ জুয়া খেলায় ১০০৲ নষ্ট করিয়া আপন ভ্রাতার সহিত পৃথক হইয়াছেন।

এ ছাড়া অনেক বালকও এই খেলার নেশায় পড়িয়া নিজেদের বাড়ীর টাকা-পয়সাদি চুরি করিয়া নষ্ট করিয়া দেয়। এইরূপ প্রতারণা-মূলক খেলার দ্বারা দেশের নানারূপ অনিষ্ট ও অশান্তি ঘটিতেছে। দেশের যেরূপ দুর্দ্দিন পড়িয়াছে, তাহাতে সত্বর এ প্রদেশে আইন-প্রবর্ত্তন দ্বারা এই খেলা বন্ধ করিয়া দিবার বিশেষ ব্যবস্থা হওয়া একান্তই বাঞ্ছনীয়। কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের জেলাবোর্ডের সুযোগ্য চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ শাসমল মহাশয়কে উক্ত প্রকারে এই জেলার জুয়া খেলা বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে দেখা গিয়াছিল। এখন যাহাতে সত্বর এতদঞ্চলে জুয়াখেলার আইন প্রবর্ত্তন করিয়া এই প্রতারণা-মূলক খেলা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় তজ্জন্য আমরা কর্ত্তৃপক্ষগণকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেছি।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বেরা

(২)

ভবানীপুর থানার অন্তর্গত সুনহৎও গ্রামে অন্যূন তিন শত লোকের বাস। দুই এক ঘর অবস্থাপন্ন লোক বাদে অবশিষ্ট লোক প্রায় সকলেই দরিদ্র। ইহাদের অধিকাংশ লোকই প্রায় বরজ চাষী। বরজে গুরুতর পরিশ্রম করিলেও ইহাদের জীবিকার্জ্জন সুচারুরূপে হয় বলিয়া বোধ হয় না। এস্থলের শ্রমিকেরা দৈনিক আট আনা হিসাবে বার মাস পারিশ্রমিক পাইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময় জুয়াখেলার প্রাবল্য হেতু উপযুক্ত মজুরি দিয়াও শ্রমিক পাওয়া যায় না।

ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত, মূর্খ, সকলেই জুয়াখেলায় উন্মত্ত। শ্রমিকগণ আর খাটিতে চাহে না। সমস্ত রাত্রি খেলার পর অনিদ্রাবশতঃ শরীর দুর্ব্বল হওয়ায়, তাহারা দিবাভাগে নিদ্রা যায়। প্রায় প্রতি রাত্রিতে খেলা হইয়া থাকে। এই গ্রামের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ১০।১২ খানি গ্রামে জুয়াখেলার অত্যধিক প্রাবল্য ঘটিয়াছে। সামান্য কোনো মেলা উপলক্ষে, অথবা বারোয়ারী উপলক্ষে জুয়া খেলোয়াড়দের সহিত ঐ গ্রামসমূহের তথাকথিত ভদ্রনামধারী চাঁইগণ ফুরাণ করিয়া খেলা পাতিবার অনুমতি প্রদানকে এক প্রকার বাহাদুরীর কার্য্য মনে করে। ভীম মেলা উপলক্ষে দ্বারিমারা হাটে সপ্তাহকালব্যাপী খেলা হইয়াছিল।

খাজুরআড়ি ও পাষনকুল গ্রামে চব্বিশ প্রহর ও বারোয়ারী উপলক্ষে প্রায় এক মাস কাল যাবৎ খেলা চলিতে থাকে। মহম্মদপুর গ্রামে কোকিলাপুষ্করিণীতে মেলা উপলক্ষে প্রায় এক মাস কাল ব্যাপী দিবারাত্র এই খেলায় সর্ব্বসাধারণের সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে। গ্রাম্য চাঁইগণ স্বার্থান্ধ হইয়া জুয়াখেলার প্রশ্রয় দিয়া থাকে। নিরপেক্ষ কথা বলিতে গেলে তাহাদের স্বার্থের ব্যাঘাত হয়, কাজেই তাহারা দল পাকাইয়া কলে বলে ছলে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির অনিষ্ট করিবার সুযোগ অন্বেষণে রত হয়। এই ভয়ে কেহই কিছু বলিতে সাহসী হয় না।

জুয়াখেলায় আর্থিক সর্ব্বনাশ ত আছেই, তাহা ছাড়া জুয়াখেলা অশেষ প্রকার নৈতিক চরিত্রহীনতার প্রস্রবণ স্বরূপ। জুয়াখেলা দ্বারা গ্রামের দলাদলি, জুয়াচুরি, চুরি, বদমায়েসী, মারপিট, হাঙ্গামা, গৃহে অগ্নি প্রদান প্রভৃতি সর্ব্বসাধারণের সুখ-শান্তি-বিনাশকারী নানাবিধ কার্য্য সংসাধিত হইয়া থাকে। গত বৎসর হইতে খেলার মাত্রা-বৃদ্ধি হইয়াছে। তাহা ছাড়া শ্রমিকগণ শারীরিক পরিশ্রম করিতেও নারাজ। যাহাদের জীবিকার জন্য মজুরি খাটা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না, তাহারা মজুরি করিতে আজ অপমান মনে করে। তাহাদের বিলাসিতাপূর্ণ জীবনযাপন ও তাহাদের আতর ফুলের তৈল মর্দ্দিত, বাবরি ছাঁটা, কুঞ্চিত টেরি-কাটা, দীর্ঘ চুল দেখিলে নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের ন্যায় ধ্বংসোন্মুখ পল্লী-সমাজের বিষাদপূর্ণ চিত্র স্বতই মানসপটে অঙ্কিত হইয়া যায়। এই খেলায় মাতিয়া পল্লীমাতার অনিন্দ্য-চরিত্র যুবাকুল হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া অর্থ অর্জ্জন করিবার জন্য অসদুপায় অবলম্বন করিয়া ধ্বংসের পথে ধাবিত হইতেছে।

দেশের এই দুর্দ্দিনে, দুর্ভিক্ষ ও দুর্ম্মূল্যের বাজারে কি ঘোর সর্ব্বনাশ হইতেছে তাহা ভাবিলে দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয় ও মন ভাবী অমঙ্গল-আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠে। এ অবস্থায় কর্তৃপক্ষগণকে এই খেলা নিবারণের বিহিত বিধান করিয়া অশান্তিপূর্ণ পল্লীগুলিতে শান্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি।

শ্রীঃ—হরিপুর (নীহার, কাঁথি)

ময়মনসিংহে পাটের চাষ

(১)

কৃষিজাত যে সকল জিনিষ এদেশ হইতে বিদেশে রপ্তানি হয় তন্মধ্যে পাট সর্ব্বপ্রধান। এই পাটের চাষে বঙ্গের জেলাসমূহের মধ্যে ময়মনসিংহ শীর্ষস্থানীয়। সমগ্র বঙ্গে যে পরিমাণ পাট উৎপন্ন হয় এক ময়মনসিংহ জেলায়ই তাহার পঞ্চমাংশ হইতে প্রায় চতুর্থাংশ পর্য্যন্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ পাটের চাষোপযোগী মোট ২৮ লক্ষ একর ভূমিতে সমগ্র বাঙ্গালা দেশে তিন হইতে চার কোটী মণ পাট উৎপন্ন হইতেছে; এবং তন্মধ্যে ময়মনসিংহের উৎপন্ন পাটের পরিমাণ ৬০ লক্ষ হইতে ৮০ লক্ষ মণের মধ্যে।

কিন্তু গত বৎসর নানা কারণে ময়মনসিংহের বিভিন্ন কেন্দ্রে পাট-ফসল আশাতীতরূপে বিধ্বস্ত হওয়ায় ময়মনসিংহের পাটচাষী যে সাংঘাতিক ক্ষতি সহ্য করিয়াছে পাটের দাম পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরসমূহের দরের দ্বিগুণের চেয়ে বেশী হওয়া সত্ত্বেও সে ক্ষতির পূরণ সম্ভবপর হয় নাই। ময়মনসিংহ জেলার মধ্যে নেত্রকোণা মহকুমাই এজন্য অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ফলে এবার নেত্রকোণার যেরূপ আর্থিক দুরবস্থা হইয়াছে তাহা অবর্ণনীয়। গত বৎসর ময়মনসিংহ জেলায় ৪৩ লক্ষ মণের বেশী পাট উৎপন্ন হয় নাই। বিগত ২৫ বৎসরের মধ্যে এ জেলায় এত অল্প পরিমাণ পাট কখনও উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত

নহি। পাট-বীজ বপনের সময় যথোচিত বারিবর্ষণের অভাব, পরে অত্যধিক শিলাপাত ও অবশেষে জলাভাবের অবশ্যম্ভাবী ফলে এ অঞ্চলে পাট-ফসলের যে ক্ষতি গত বৎসর হইয়াছিল তাহা কৃষিজীবী ময়মনসিংহবাসী মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছে। তাই এ বৎসরের প্রারম্ভে নৈসর্গিক অবস্থানিচয়ের আশাপ্রদ ভাব দেখিয়া ময়মনসিংহের কৃষকবৃন্দ উৎফুল্ল হইয়াছিল। কিন্তু প্রায় একমাস যাবৎ যেমন গরমের প্রাখর্য্য ও বৃষ্টিপাতের অভাব হইয়াছে, তাহাতে অধিকাংশ স্থলে পাটগাছসমূহের স্বাভাবিক বৃদ্ধির প্রতিবন্ধকতা হওয়ায় ও সেগুলির অকালপক্কতার সম্ভাবনা হওয়ায় তাহারা প্রমাদ গণিতেছে। এরূপ হওয়া সত্ত্বেও গত বৎসরের তুলনায় এবার এ জেলায় দেড়গুণ পাট উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু উৎপন্ন পাটের কোয়ালিটী অন্যান্য বৎসরের অপেক্ষা খারাপ হইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। সুতরাং পরিমাণে গত বৎসরের চেয়ে বেশী এবং দরে পূর্ব্ব বৎসরের অনুরূপ হইলেও মাল খারাপ হইবে বলিয়া দামের হিসাবে মোটের উপর কোনো আশানুরূপ পরিবর্ত্তন হইবে এরূপ মনে হয় না। তদুপরি এবার পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় পাটের দাম তত অধিক হইবে বলিয়া কিছুতেই আশা করা যায় না। মিলগুলির ব্যবহারের উপযোগী খারাপ পাট অধিক-মাত্রায় ও বিদেশে রপ্তানির উপযোগী ভাল পাট সামান্য মাত্রায় উৎপন্ন হইলে মিলপরিচালকগণের সমবেত নিয়ন্ত্রণশক্তি প্রয়োগের ফলে পাটের মূল্য বহুল পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই।

(২)

ময়মনসিংহের কৃষক-সম্প্রদায় ও মধ্যবর্ত্তী পাটব্যবসায়িগণ এ অবস্থার স্বরূপ সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিয়া অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করিলে উৎপন্ন পাটে আশানুরূপ অর্থাগম হওয়া অসম্ভব হইবে না। এ অঞ্চলের অজ্ঞ কৃষককুল অধিকমাত্রায় পাট উৎপাদন করিবার জন্য ব্যস্ত হয়; চাহিদা অনুযায়ী পাটের কোয়ালিটী যাহাতে ভাল হয় তদনুরূপ চিন্তা করিয়া অল্পপরিমাণ পাটেই অধিক পরিমাণ পাটের মূল্য অর্জ্জন করিবার আগ্রহাতিশয্য তাহারা প্রদর্শন করে না। তাহারা শুধু বিদেশী বণিক-গণের মুখের দিকে তাকাইয়া তাহাদের কৃপাকটাক্ষ লাভ করিতে পারিলেই নিজেদের কঠোর পরিশ্রম সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে মনে করিয়া আত্মতৃপ্তি অনুভব করে। পাট-উৎপাদনে তাহাদের যে পরিমাণ অর্থব্যয় হয় তাহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ তদপেক্ষা বেশী হয় কিনা তাহা একবার তাহারা ভাবিয়াও দেখে না। অনেকস্থলে তাহাদের পরিশ্রমই মাত্র সার হয়।

প্রতি কাঠা জমিতে পাট-উৎপাদনের ব্যয় সাধারণতঃ ৭।৮ টাকার কম নহে; এবং ফসল ভাল হইলে কাঠায় ১ কি ১॥০ মণ মাত্র পাট হইয়া থাকে। প্রতি মণ পাটের মূল্য গড়ে যদি ১০৲ হয় তবে খরচ বাদে পাটের চাষে যে লাভ হয় তাহা কৃষকের কঠোর পরিশ্রমের তুলনায় নগণ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আজকাল পাটের মূল্য-নির্দ্ধারণ কঠোর যাচাইয়ের উপর নির্ভর করে। এই যাচাইয়ের অগ্নি-পরীক্ষায় যে পাট সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা নিকৃষ্টতম পাটের অন্ততঃ দ্বিগুণ মূল্যে বিক্রী হইতে পারে। যাচাইয়ের ক্রম ও আদর্শানুযায়ী এক প্রকারের পাট হইতে অন্যপ্রকারের পাটের দরের তারতম্য আজকাল ২৲।৩৲ টাকার কম নহে। পূর্ব্বে তাহা এক টাকার বেশী ছিল না।

মিল-পরিচালকগণ সাধারণতঃ কম দরে অপেক্ষাকৃত খারাপ প্রকৃতির পাট ক্রয় করিয়া থাকেন। কিন্তু ব্যবসা-দার বিদেশে রপ্তানির জন্য যতদূর সম্ভব উচ্চস্তরের পাট ক্রয় করিতে যত্নবান হন। এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানে পট্টশিল্পের ক্রমোন্নতি ও সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের আশাতীত উৎকর্ষ-লাভের ফলে উচ্চশ্রেণীর পাটের চাহিদা অতিমাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। বঙ্গদেশে পাটের এই বিশ্বব্যাপী চাহিদা-নিবন্ধন কৃষককুল উৎসাহিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু চাহিদা অনুযায়ী পাটের কোয়ালিটীর উৎকর্ষ-সাধনে তাহারা যত্নবান না হইলে ইহার ফলভোগের আশা তাহাদের পক্ষে দুরাশা মাত্র।

(৩)

"প্রান্তবাসী" হইতে উদ্ধৃত এই প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশে

যে সকল কথা আলোচিত হইয়াছে সে সম্বন্ধে বাঙালী গবেষকেরা আজ পর্য্যন্ত যার পর নাই উদাসীন রহিয়াছেন। তুলা, গম ইত্যাদি সম্বন্ধে গবর্মেণ্টের পুসা কলেজে যে সকল পরীক্ষা চলিতেছে তাহার অনুরূপ পরীক্ষা পাট সম্বন্ধেও চালানো আবশ্যক। পরীক্ষা চালানোই একমাত্র কর্ত্তব্য নয়। আমাদের স্বদেশ-সেবক, বিজ্ঞান-সেবক এবং কৃষি-সেবকেরা সেই পরীক্ষাবলীর ফলসমূহ দেশের পল্লীতে পল্লীতে ছড়াইয়া ফেলিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেই বাংলার সম্পদ্ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। যুবক বঙ্গকে এজন্য বিশেষ তৎপর হইতে হইবে।

নবাবগঞ্জ জাতীয় বিদ্যালয়

নবাবগঞ্জ ঢাকা জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত একটী থানা। ১৯২১ সনে অসহযোগ আন্দোলনের প্রারম্ভে কংগ্রেস-নির্দিষ্ট কর্ম্মপন্থা অনুসরণ করিয়া কয়েকজন কর্ম্মী এখানে কাজ আরম্ভ করেন। প্রথম দুইবৎসর খদ্দরের কাজেই তাঁহারা বিশেষ করিয়া মনোযোগ দেন। ১৯২৩ সনে স্থানীয় জাতীয় বিদ্যালয়ের ভার কর্ম্মিগণের হস্তে ন্যস্ত হয়। পূর্ব্বে জাতীয় বিদ্যালয়ের ঘরবাড়ী ছিল না। তাঁহারা স্থানীয় জমিদারগণের নিকট হইতে ৪৫০০৲ সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা মূল্যের জমি বিনামূল্যে পত্তন লন এবং সেই জমির উপরে ৩৫০০৲ টাকা ব্যয় করিয়া একটি ঘর তৈয়ারী করেন।

নবাবগঞ্জে ১২জন কর্ম্মী আছেন। কর্ম্মিগণ সকলেই সুশিক্ষিত। বর্ত্তমানে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিভাগে কাজ হইতেছে।

১। জাতীয় শিক্ষা

(ক) কর্ম্মিগণ দ্বারা পরিচালিত একটি উচ্চ শ্রেণীর জাতীয় বিদ্যালয় আছে। তাহার ছাত্রসংখ্যা ১২৫ জন, শিক্ষক-সংখ্যা ১১ জন। এই বিদ্যালয়ে বাংলা, ইংরেজী, সংস্কৃত, পাশী, হিন্দী, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, প্রকৃতি বিজ্ঞান ও প্রাথমিক পৌর নীতি বিজ্ঞান পড়ান হয়। সূতা-কাটা ও খদ্দর-পরা বাধ্যতা-মূলক। তাঁতের নানাপ্রকার ডিজাইন শিক্ষার বন্দোবস্ত আছে। যে কোন ছাত্র ইচ্ছা করিলে শিখিতে পারে। প্রতি রবিবারে কৃষি সম্বন্ধে একটি ক্লাশ হয়। সেখানে কৃষি সম্বন্ধে ছাত্রগণকে ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। বিদ্যালয় হইতে প্রতি মাসে হস্ত-লিখিত একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির হয়। তাহাতে ছাত্র ও শিক্ষকগণ নানা প্রকার প্রবন্ধ ও কবিতা লেখে। বিদ্যালয়ের সংলগ্ন একটি ছাত্রাবাস আছে।

(খ) পাঠশালা বিভাগ

বর্ত্তমানে হরিস্কুল, নওগাঁ, কান্দামাত্তা, বর্দ্ধাপাড়া, দেওতলা, বক্সনগর, বড়নগর এই ৭টি পাঠশালায় প্রায় ৪০০ ছেলে শিক্ষা পাইতেছে। ইহার মধ্যে ৩।৪টি পাঠশালা বিশিষ্ট কর্ম্মিগণ কর্ত্তৃক আদর্শ পাঠশালা রূপে পরিচালিত হইতেছে। পাঠশালাসমূহে সঙ্গীত ও ড্রিল অবশ্যকরণীয়।

২। খদ্দর বিভাগ

গত ১৯২৫ সনে এই বিভাগে মোট ২৮৮৫৲ টাকার খদ্দর উৎপন্ন হইয়াছে এবং ৪৩৫৮৲ টাকার খদ্দর বিক্রয় হইয়াছে। নবাবগঞ্জে উৎপন্ন খদ্দর ছাড়া সহকর্ম্মিগণ পরিচালিত কুমিল্লা কেন্দ্র হইতেও কিছু খদ্দর আমদানি করা হইয়াছিল। গত বৎসরের মোট উৎপন্ন সূতার পরিমাণ ১৮৷০ মণ। কাটুনীরা সূতা কাটিয়া ৬০০৲ এবং তাঁতীরা কাপড় বুনিয়া ৯৩০৲ টাকা মজুরি পাইয়াছে।

৩। বয়ন বিভাগ

এই বিভাগে নানাপ্রকার ডিজাইনের খদ্দর বোনা হয় এবং ছাত্রগণকেও শিক্ষা দেওয়া হয়।

৪। বাগান বিভাগ

কর্ম্মিগণ নিজেদের ব্যবহারের সকল প্রকার তরকারী

নিজেরা উৎপন্ন করেন। উদ্বৃত্ত তরকারী কিছু কিছু বিক্রী করা হয়।

৫। প্রচার বিভাগ

ম্যাজিক লণ্ঠন সাহায্যে দেশের সাধারণ দুরবস্থা, বস্ত্র-শিল্পের ধ্বংস ও পুনঃ প্রতিষ্ঠার উপায়, অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন ইত্যাদি সম্বন্ধে মোটামুটি ভাবে সাধারণের মধ্যে প্রচার করা হয়। এবৎসর ইতিমধ্যেই প্রায় ২৫টি স্থানে বক্তৃতা হইয়াছে।

৬। সেবাশ্রম

কর্ম্মিগণ দ্বারা পরিচালিত একটী সেবাশ্রম আছে। বর্ত্তমানে এই সেবাশ্রম হইতে ১১টি অন্ধ, আতুর, অনাথ ও পঙ্গুর ভরণ-পোষণের সমস্ত ভার লওয়া হইয়াছে। অনুন্নত জাতির উন্নতি-বিধান, গরিবের শিক্ষার ব্যবস্থা ও "ব্রতী বালক দল" (বয়-স্কাউট্‌স্) গঠন এই বিভাগের কাজ।

৭। পুস্তকালয় বিভাগ

এই বিভাগ হইতে পুস্তক-সংগ্রহ, সাধারণ পাঠাগার-স্থাপন ও থানার বিভিন্ন স্থানের সহিত যোগ রাখিয়া চলন্ত লাইব্রেরী-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলিতেছে।

নবাবগঞ্জ থানা হইতে এ পর্য্যন্ত কর্ম্মিগণ মোট নগদ ১০০০০৲ দশ হাজার টাকার উপর ও ৫৫০০৲ টাকা মূল্যের জমি পাইয়াছেন। বাহির হইতেও ৪০০০৲ চারি হাজার টাকার উপর সংগৃহীত হইয়াছে।

আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত শরৎকুমার ঘোষ প্রভৃতি নেতৃবর্গ এবং গত বৎসর মহাত্মা গান্ধী এই কেন্দ্রটি পরিদর্শন করেন। মহাত্মা গান্ধীর আগমন উপলক্ষে এই থানা হইতে তাঁহাকে ৬৫০০৲ সাড়ে ছয় হাজার টাকার একটি তোড়া উপহার দেওয়া হয়।

শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়

বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য কিসে ভাল হইতে পারে*

শ্রীঅমূল্যচরণ উকিল, এম, বি

বাঙ্গালী জাতির স্বাস্থ্যের অবনতির ২টি প্রধান কারণ—

১। উপযুক্ত খাদ্যের অভাব।

২। ব্যায়াম-বিমুখতা।

বাঙ্গালায় মৃত্যু-হার বাড়িতেছে

১৮৮৫ সনে বাঙ্গালায় হাজারকরা ২২·৭৮ জন লোক মারা গিয়াছিল। ১৯১৫ সনে " " ৩১·৮ " " মরিয়াছে।

জন্ম-হার কমিতেছে

১৮৯০ সনে বাঙ্গালায় হাজারকরা ৫১·৮ জন লোক জন্মিয়াছিল। ১৯১৫ সনে " " ৩১·৮ " জন্মিয়াছে।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান হাজারকরা জন্মহার ... ২৭·২
" " " মৃত্যুহার ... ৩৭·২

জাপানের বর্ত্তমান হাজারকরা জন্মহার ... ২৪·১
" " " মৃত্যুহার ... ১৫·৩

জাপানে গড়ে জনপ্রতি দৈনিক আয় ... ৪৷৶০
ভারতবর্ষে " " " " ... ৴১০

এখন কর্ত্তব্য কি

বিগত ৫০ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালীর ব্যায়াম-চর্চ্চা ও কার্য্য-তৎপরতা অনেক কমিয়া গিয়াছে এবং খাদ্যের বহু আবশ্যক উপাদান লুপ্ত হইয়াছে। খরচ বিশেষ না বাড়াইয়া বাঙ্গালীর খাদ্যকে অনেক সংশোধিত করা যাইতে পারে (নিম্নে তালিকা দেখুন)। দেহের অনুশীলন ত প্রত্যেক লোকেরই হাতে। নিয়মিতভাবে মুক্ত বাতাসে প্রত্যহ কিছুক্ষণ ধরিয়া ব্যায়াম করুন এবং সুস্থ-সবল হইয়া

* শ্রমজীবি-শিক্ষাপরিষদের জন্য লিখিত।

দেশের ও সমাজের কাজে নিযুক্ত হউন। প্রত্যেকের দেহ, মন, গৃহ, পল্লী ও গ্রাম পরিষ্কার রাখুন। রোগ হইলে চিকিৎসা করা অপেক্ষা দেহকে সুস্থ রাখিয়া রোগ না হইতে দেওয়া কি ভাল নয় ?

আহারের তালিকা

(পূর্ণবয়স্ক লোকের)

খাদ্য	পরিমাণ	মূল্য (আনুমানিক)
সকালে		
ছোলা—আদা সহ (ভিজা অঙ্কুরিত অবস্থায়)	১½ ছটাক	৫
মধ্যাহ্নে		
চাউল { ঢেঁকীতে ছাঁটা (কারণ কলে ছাঁটা চাউলের উপকারিতা কম) }	৩ছটাক হইতে ১ পোয়া (শারীরিক পরিশ্রম অনুসারে)	৵০—৵১০
ডাল … …	১ ছটাক	
মাখন বা ঘৃত …	¼ তোলা	
সরিষার তৈল (তরকারীর সহিত)	¼ তোলা	
মাছ বা ছানা …	১ ছটাক	
তরকারী … …	১ ছটাক	
বৈকালে		
মুড়ি … …	১½ ছটাক	১০—১৫
ছোলা ভাজা অথবা …		
কাঁটাল বীচি পোড়া …	১ ছাটাক	
নারিকেল … …	½ ছটাক	
রাত্রে		
চাউলের পরিবর্ত্তে আটার রুটী—১ পোয়া; অন্যান্য উপাদান মধ্যাহ্নের মত		৵০—৵১০

ইহা ব্যতীত প্রত্যেক লোকেরই অবস্থানুযায়ী প্রত্যহ কিছু-না-কিছু ফল খাওয়া উচিত। উপরে দরিদ্র অবস্থার লোকের আহারের তালিকা দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক লোককেই অন্ততঃ ।/০—।৵০ দৈনিক আহারের জন্য ব্যয় করিতে হইবে। যদি সে পয়সা না থাকে, তবে অর্থোন্নতির উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। কারণ সবল অবস্থায় জাতিকে রাখিতে হইলে ইহা অপেক্ষা খাদ্যের উপাদান আর কমান যাইতে পারে না।

যাঁহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল তাঁহারা ভাত ও রুটী কমাইয়া তাহার পরিবর্ত্তে ডিম, মাংস বা দুধ খাইতে পারেন এবং সকালে মুগের ডাল ভিজা—১ ছটাক, মাখন—১ তোলা ও মিছরি—½ ছটাক ও বিকালে নিম্ন তালিকাদ্বয়ের যে কোনো একটা অনুসারে জলখাবার খাইতে পারেন।

১। চিঁড়া … … ১ ছটাক
কলা … … ২ টা
দুধ … … ১ পোয়া
গুড় … … ½ ছটাক
} মূল্য ৵০

২। মোহনভোগ (সুজি—১ ছটাক, চিনি—১ছটাক, ঘী ½ তোলা)
আটার রুটী বা পাঁউরুটী … ১ ছটাক
কমলা লেবু … ১টা
} মূল্য ৵০

বালকদিগের পক্ষে দুধ, ছানা, ডিম, মাখন বেশী আবশ্যক। বাঙ্গালীর বর্ত্তমান খাদ্যে দুধ-ছানা-ডাল জাতীয় জিনিষ, মাখন এবং ফল উপযুক্ত পরিমাণে নাই। এই সকল উপাদান কম থাকিলে শরীরের যথোচিত পুষ্টি হয় না।

হাওড়া-সেতু আইন

("আনন্দবাজার" হইতে উদ্ধৃত)

১৯০৯সন হইতে বর্ত্তমান হাওড়া পুলটির পুনর্নির্ম্মাণ লইয়া নানা প্রস্তাব চলিতেছে। গত ১৯২৪ সনে গবর্ণমেণ্ট এতৎ সম্পর্কে এক আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন—আমরা সেই সময়ে সর্ব্বপ্রথম এই বিষয়টি লইয়া আলোচনা আরম্ভ করি। সেই আলোচনার ফলে সমুদয় সংবাদপত্রে ইহা লইয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং উক্ত পাণ্ডুলিপিখানি সিলেক্ট কমিটির হস্তে আলোচনার জন্য পেশ হয়। উক্ত কমিটি বিলখানির আমূল সংস্কার করিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। প্রথম বিলে সেতুটি ক্যাণ্টিলিভার ধরণের হইবে এবং তাহার নির্ম্মাণ-ব্যয় আনুমানিক ৬ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা লাগিবে এরূপ ধার্য্য হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত জমি-জমা সংগ্রহের জন্য ও ৩।৪ কোটি টাকা ব্যয় হইবে অনুমিত হইয়াছিল। কলিকাতার বা বাঙ্গালার মাত্র একটি সেতুর জন্য এত টাকা ব্যয় করা আদৌ সম্ভবপর নহে। আমরা এ কথা পূর্ব্বাপর বলিয়া আসিয়াছি। লর্ড লিটন এই ক্যাণ্টিলিভার সেতু-নির্ম্মাণ সম্বন্ধে এতই স্থিরনিশ্চিত ছিলেন যে, সে সম্বন্ধে ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশনে প্রীতি-ভোজের বক্তৃতায় বলেন যে, তিনি আশা করেন, তাঁহার কার্য্যকাল শেষ হইলে কল্পিত নূতন সেতুর উপর দিয়া তিনি গঙ্গা পার হইবেন। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, তাঁহার সেই কল্পনা জল্পনায় পরিণত হইল! উপস্থিত সিলেক্ট কমিটি স্থির করিয়াছেন যে, অল্প ব্যয়ে যেরূপ পুল তৈয়ারী সম্ভব হয়, তাহাই করিতে হইবে। ভাসমান সেতুই এখন স্থিরীকৃত হইয়াছে এবং আশা করি যে, স্যার ব্রাডফোর্ড লেস্‌লির প্রস্তাবিত যুগ্ম ভাসমান সেতু নির্ম্মাণই প্রশস্ত বলিয়া গ্রাহ্য হইবে। তাঁহার নির্ম্মিত বর্ত্তমান সেতুটি নির্ম্মাতার আশাতিরিক্ত কার্য্য দান করিয়াছে এবং রীতিমত সংস্কারের দ্বারা ইহাকে অনির্দ্দিষ্ট কাল অবধি যে কার্য্যোপযোগী করিয়া রাখা চলিতে পারে, তাহা পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা হইতে নিশ্চয় করিয়া বলা যায়।

আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে, কলিকাতার ন্যায় সহরে মাত্র একটি সেতুর দ্বারা চলিতে পারে না,—নূতন সেতু নির্ম্মাণের সময় যেন কর্ত্তৃপক্ষ একথা স্মরণ রাখেন।

১৯২৪ সনের পুরাতন আইনের খসড়ায় "ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের" উপর নূতন সেতু নির্ম্মাণের কার্য্যভার প্রদত্ত হইয়াছিল। নূতন আইনে পোর্ট-কমিশনারগণের উপর সেই কার্য্যভার ন্যস্ত হইবে। ইহাতে বিশেষ আপত্তির বিষয় কিছু না থাকিলেও এই প্রস্তাবের আপত্তিকারকগণের কথা অবহেলা করিবার নহে। বর্ত্তমান পোর্ট কমিশনারগণের কার্য্যের উপর সাধারণের কোনো হাত নাই—এই সমষ্টিটির আভ্যন্তরিক কার্য্য সম্বন্ধে সাধারণের প্রতিনিধিত্ব আদৌ নাই। এত বৃহৎ কার্য্যের ভার যখন তাঁহাদের উপর ন্যস্ত হইল, তখন তাঁহাদের পরিচালকগণের মধ্যে করদাতাদের অধিক-সংখ্যক প্রতিনিধির ব্যবস্থা সত্বর হওয়া কর্ত্তব্য। কেবলমাত্র "বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্স" হইতে প্রতিনিধি লইলে চলিবে না। ইঁহারা মাত্র একটি সওদাগর ও মহাজন সমিতি। ইঁহাদের স্বার্থ অপেক্ষা করদাতার স্বার্থ বহুগুণে অধিক। কলিকাতা ও তৎসন্নিকটস্থ নদীতীরবর্ত্তী মিউনিসিপ্যালিটিসমূহ হইতে "পোর্ট কমিশনারের" বোর্ডে প্রতিনিধি গ্রহণের ব্যবস্থা যাহাতে অচিরে হয়, তাহা করা কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে গবর্মেণ্ট সত্বর একটি আইনের খসড়া কৌন্সিলে উপস্থিত করিবেন। আশা করি সে সময়ে সদস্যগণ আমাদের প্রস্তাবটি সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিবেন।

১৯২৬ সনে যে নূতন আইন কাউন্সিলে উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহাতে সেতু-নির্ম্মাণের ব্যয় কিরূপ আমানৎ হইবে তাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কলিকাতা ও হাওড়া, টালিগঞ্জ এবং সাউথ সুবার্ব্বন মিউনিসিপ্যালিটির

জমির উপর শতকরা ।০ আনা হিসাবে অতিরিক্ত কর আদায় হইবে—গবর্ণমেণ্ট কমিটির এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে শতকরা ৮০ কর ধার্য্য করিবার প্রস্তাব করিলে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহ মহাশয় ৮০ আনার স্থলে ॥০ প্রস্তাব করেন। শেষোক্ত প্রস্তাবই গ্রাহ্য হয়। ফলে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীকে ঐ হারে অতিরিক্ত কর বসাইতে হইবে।

কলিকাতার সন্নিকটস্থ মিউনিসিপ্যালিটি যথা,—হাওড়া, টালিগঞ্জ এবং সাউথ সুবার্ব্বন মিউনিসিপ্যালিটির উপরও ঐ হারে কর-ধার্য্যের প্রস্তাব ছিল। কিন্তু নবাব নবাব আলি সাহেব "হাঁ" ও "না" দুই পক্ষেই ভোট দেওয়ায় তাঁহার ভোট নাকচ হয়। ফলে উক্ত তিনটী মিউনিসিপ্যালিটি অতিরিক্ত কর হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। ইহাতে নবাব সাহেবের ভুল এক পক্ষের হিতের কারণ।

কমিটি ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের হাওড়া ষ্টেশন হইতে যে সকল মাল আমদানি-রপ্তানি হইবে, তাহার উপর মণকরা দুই পাই শুল্ক-স্থাপনের প্রস্তাব করেন; কিন্তু সাধারণে ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি করেন। পরে স্থির হয় যে, বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের মালের উপরও ঐ পরিমাণে শুল্ক স্থাপিত হইবে। আমাদের বিবেচনায় ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের উপরও শুল্ক-স্থাপন বিধেয়। বালীর সেতু নির্ম্মিত হইলে হাওড়ার অনেক আমদানি ও রপ্তানির মাল শিয়ালদহ ষ্টেশন হইয়া যাতায়াত করিবে। তখন হাওড়ার মালের পরিমাণ হ্রাস হওয়ায় উক্ত স্থান হইতে কর বহু পরিমাণে কম আদায় হইবে এবং ফলে আশানুযায়ী অর্থের অভাব পড়িলে সেই অর্থ কোথা হইতে আসিবে? অথচ যে সেতু নির্ম্মাণের ফলে ঐ আয় হ্রাস পাইবে, তাহার আংশিক ব্যয়ও কলিকাতাবাসীর স্কন্ধে চাপিয়াছে। আমরা রেলওয়ে মালের উপর শুল্ক-স্থাপনের পক্ষপাতী নহি, বরং সমুদ্রযানে যে সকল মাল আমদানি রপ্তানি হয় তাহার উপর দুই পাই হিসাবে শুল্ক চড়াইলে সাধারণের "গায়ে লাগিত না"। বিদেশ হইতে আমদানি রপ্তানি মালের উপর শুল্ক বসানই শ্রেয়ঃ। রেলের মালের উপর আমদানি শুল্ক অত্যন্ত আপত্তিজনক, যেহেতু তাহাতে সাধারণের আহার্য্য ও নিত্যনৈমিত্তিক গার্হস্থ্য উপকরণের উপর শুল্ক বসান হইবে এবং তাহার ফলে গার্হস্থ্য ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে—ইহা আদৌ সমর্থনীয় নহে। তবে কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম! ভারত-গবর্ণমেণ্টের যাহাতে এক-চেটিয়া স্বত্ব, তাহার উপর তাঁহারা কোনও রূপ শুল্কাদি বসাইতে বা পুল-নির্ম্মাণের কোনও ব্যয় চাপাইতে আদৌ স্বীকৃত নহেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট ক্যান্‌টিলিভার সেতু নির্ম্মাণের জন্য কিছু ব্যয় বহন করিতে স্বীকৃত ছিলেন; কিন্তু ভাসমান সেতুর জন্য একটী পয়সাও দিবেন না বলিয়াছেন।

রেলওয়ে যাত্রীর টিকিটের উপরও এক পয়সা হিসাবে কর ধার্য্য হইবে এবং মাসিক টিকিটের উপর ।৵০ হিসাবে কর-ধার্য্যের প্রস্তাব ছিল; কিন্তু শ্রীযুক্ত অমূল্যধন আঢ্য মহাশয়ের প্রস্তাবে ছয় আনার স্থানে চারি আনা কর ধার্য্য হওয়া স্থির হইয়াছে।

বীমার ব্যবসায়ে বাজে খরচ

("আত্মশক্তি" হইতে গৃহীত)

এদেশে বীমা বলিতে জনসাধারণ সাধারণতঃ জীবন-বীমাই বুঝিয়া থাকেন। অবশ্য যাঁহারা উচ্চ শিক্ষিত অথবা বড় বড় সহরে ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত আছেন, তাঁহারা বহুবিধ বীমার সন্ধান রাখেন। কিন্তু পোষ্টাফিসের "ইন্‌সিওর" পর্য্যন্তই যাঁহাদের চিন্তাশক্তি সীমাবদ্ধ, বর্ত্তমান প্রবন্ধ মোটামুটিভাবে তাঁহাদের উদ্দেশ্যেই লিখিত। তবে জীবন-বীমা বর্ত্তমানে আমাদের দেশে যে ভাবে দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে বা ভবিষ্যতে করিবে সে সম্বন্ধে কয়েকটী বিষয় বিশেষভাবে জানা দরকার।

সরকারী জামিন বা আমানৎ

প্রথমতঃ ভারতীয় জীবন-বীমা আইনের কথা আলোচনা করা যাক। ১৯১২ সনের ৬ আইনে, বীমা কোম্পানীকে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইলে, ২৫০০০৲ সরকারী আমানতের ব্যবস্থা দেখা যায়। অর্থাৎ কমপক্ষে, বাজার দরে ২৫০০০৲ কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করিলেই চলিতে পারে। বলা বাহুল্য, বর্ত্তমানে কোম্পানীর কাগজের যে দর চলিতেছে তাহাতে নির্দ্ধারিত দামের চেয়ে অনেক কম মূল্যে ঐ টাকা আমানৎ রাখা যাইতে পারে এবং তাহাতে চুক্তি-রক্ষাও চলিতে পারে। প্রধানতঃ বীমাকারীর স্বার্থ-রক্ষার্থেই ভারত সরকার এই ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা বিশেষ কার্য্যকর হয় নাই। আইনে আছে, প্রত্যেক বীমা (জীবন) কোম্পানী প্রথমে ২৫০০০ আমানৎ রাখিবেন এবং ক্রমশঃ বীমার তহবিল-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বার্ষিক হিসাব দৃষ্টে এক-তৃতীয়াংশ টাকা উক্ত সরকারী আমানতি তহবিলে জমা দিয়া দুই লক্ষ টাকা পূরণ করিয়া দিবেন। ইহার পরে আর কোনো ব্যবস্থা নাই।

বিলাতে জীবন-বীমা কোম্পানীকে কাজ আরম্ভ করিতে হইলেই সরকারের তহবিলে ২০০০০ পাউণ্ড আমানৎ করিতে হয়। সুতরাং সে দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে ভারতীয় বীমাকারিগণের স্বার্থ বিশেষ সুরক্ষিত বলিয়া মনে হয় না এবং বিলাতের তুলনায় আমানৎ অতি সামান্য বলিতে হয়। বলা প্রয়োজন যে, ভারত সরকারের আইনের সহিত বিলাতী বীমা কোম্পানী, যাঁহারা ভারতে জীবন-বীমার কাজ করিতেছেন, তাঁহাদের কোনো সংস্রব নাই। এই আইনের আমলে না আসিয়াও তাঁহারা স্বচ্ছন্দে ব্যবসায় করিতেছেন, বীমাকারীর স্বার্থ এই সকল কোম্পানীর মর্জ্জির উপরই নির্ভর করিতেছে। অবশ্য ২।৪টী বিলাতী কোম্পানী স্বেচ্ছায় ভারত সরকারের তহবিলে ঋণ দান করিয়া অথবা টাকা গচ্ছিত রাখিয়া এই চুক্তি বজায় রাখিয়াছেন।

এক্ষণে দেখা যাউক, বীমাকারীর স্বার্থ বর্ত্তমান আইনে কতখানি সুরক্ষিত হইয়াছে। এই আইনের দোহাই দিয়া বীমা কোম্পানীর দালাল বা প্রতিনিধিগণ অনেক বাজে কথা বলিয়া সহজপন্থী এবং অজ্ঞান ভারতবাসীর মন ভিজাইয়া থাকেন। অনেকে কোম্পানীর গচ্ছিত টাকার কথা তুলিয়া এ আশ্বাসও দেন যে, কোম্পানী উঠিয়া গেলেও গবর্মেণ্ট এই গচ্ছিত তহবিল হইতে বীমাকারীর দেয় টাকা বুঝিয়া দিবেন এবং বীমা কোম্পানী কোনো মতেই এই গচ্ছিত টাকায় হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না।

সাধারণ দেশবাসী যেন এবিষয়ে বিশেষ সতর্ক হয়েন। কারণ উক্ত আইনে আপাতদৃষ্টিতে এই ধারণা মনে আসিলেও কার্য্যক্ষেত্রে ইহা বীমাকারীর স্বার্থরক্ষা-বিষয়ে পর্য্যাপ্ত নহে।

বিলাতী কোম্পানীর সম্বন্ধে সকল সংবাদ এদেশে পাওয়া সম্ভবপর নহে এবং যাহা পাওয়া যায় তাহাও শুধু বিশ্বাস করা ছাড়া বিচার করিবার উপায় নাই। পর্দ্দার আড়ালে অনেক-কিছুই ঘটিতে পারে যাহার সন্ধান ভারতীয় বীমাকারীর পাইবার কোন সুযোগ নাই, যদিও প্রয়োজন আছে। সামান্য লাভ পাইলেই যাহারা আনন্দে আটখানা হয়, তাহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে হইলে প্রকৃত মোট লভ্যাংশের এক আনা অংশ দিয়া বাকী পনর আনা যদি কর্ত্তৃপক্ষ সাগর পারে বসিয়া রত্নের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া নিজেরা ভোগ করেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ একেবারে গণেশ উল্টাইয়া ফেলার চেয়ে রেখে খাওয়া অনেক ভাল। ভারতবাসীর ইহাই ইংরেজি বাণিজ্যের সম্বন্ধে ধারণা।

ভারতীয় কোম্পানীর কার্য্য-বিবরণী—যাহার শেষ পুস্তিকা গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রকাশিত হইয়াছে—তাহা হইতে একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া দেখান যাইতেছে যে, উক্ত সরকারী আইন থাকা সত্ত্বেও কি ভাবে বীমাকারীর টাকার অপচয় ঘটিয়াছে।

দেশীয় মিউচুয়্যাল কোম্পানীর কথা বাদ রাখিয়া, বর্ত্তমানে ১৯০৭ সন হইতে এযাবৎ যে দেশীয় বীমা কোম্পানীগুলি স্বত্বাধিকারী রূপে অংশীদারগণের মূলধনে চালিত হইতেছে তাহার হিসাবে দেখা যায় যে, আজও

অনেক কোম্পানী সরকারী আমানতের ২ লক্ষ টাকা দিয়া উঠিতে পারেন নাই। ইহার মধ্যে ৭টী কোম্পানী প্রায় ৫ বৎসর পূর্ব্বে, ৬টী ১৯১৬ খৃঃ এবং ২১টী ১৯০৭-৮ খৃঃ স্থাপিত হইয়াছে। এই কোম্পানীগুলি একত্রে মাত্র ৬,৭৫,১১২৲ টাকা সরকারী তহবিলে এ পর্য্যন্ত জমা দিয়াছে। অথচ একত্রে ইহাদের আদায়ী মূলধন ১২,৪৫,০৯৩ টাকা। গোড়ার খরচ অর্থাৎ কোম্পানীগুলির সংগঠন ও প্রসারার্থ বিজ্ঞাপন এবং বিবিধ বিষয়ে ব্যয় মোট ৫,০৯,৬৬২ টাকা। বীমাকারিগণের হিসাবে উদ্বৃত্ত তহবিল মোট ৪,৪১,০০২ টাকা; বার্ষিক চাঁদা হিসাবে বীমাকারিগণের নিকট হইতে মোট আয় ৫,৫১,০৩৮ টাকা এবং মোট বার্ষিক খরচ ৩,৯১,৬৩৫ টাকা। পৃথক ভাবে দেখিলে ২১৩টী কোম্পানীর অবস্থা কিছু ভাল দেখা যাইবে। কিন্তু জাতীয় ব্যবসা হিসাবে দেখিতে হইলে মোট সংখ্যার হিসাব ও ছোট বড় কোম্পানীকে একত্রে গড়ে সমান ভাবে দেখাই উচিত।

পূর্ব্বোক্ত হিসাব হইতে দেখা যাইতেছে যে, কোম্পানীগুলির বীমার হিসাবে উদ্বৃত্ত অর্থ তাহাদের বার্ষিক আদায়ী চাঁদার তুলনায় ৪এর পঞ্চমাংশ মাত্র। অর্থাৎ আয়ের শতকরা ৭১ অংশ ব্যয় হইয়া যাইতেছে শুধু কোম্পানীর কাজ চালাইতে। তাহা হইলেই ইহা সহজে অনুমেয় যে, বীমাকারিগণের প্রদত্ত অর্থের যথেষ্ট অপব্যয় হইয়াছে। এক্ষণে যদি বীমাকারিগণ স্থির চিত্তে বুঝিয়া দেখেন তাহা হইলে দেখিবেন যে, সমষ্টির পক্ষ হইতে হিসাব করিলে তাঁহারা কোম্পানীকে যে টাকা দিতেছেন তাহার শতকরা ৩০৲ টাকারও কম তাঁহাদের ভবিষ্যৎ দাবীর তহবিলে জমিতেছে। আর কোম্পানী যত পুরাতন হইবে, (এবং যদি এই ভাবে কাজ চলিতে থাকে তাহা হইলে) যাহারা বীমা করিয়াছেন তাঁহাদের দাবীও তত শীঘ্র পাইবার সময় হইয়া আসিবে। অথচ টাকা যে হিসাবে জমিতেছে তাহা আশাপ্রদ নহে। মাত্র ২১৩টী কোম্পানীর পৃথক হিসাব দৃষ্টে বলা যায় যে, তাহাদের কৃতিত্ব আছে। একথাও সত্য যে, প্রতিযোগিতার হীন সুযোগ লইয়া অনেক অসৎপ্রবৃত্তির লোক কর্ত্তা হইয়া নিজ স্বার্থসিদ্ধি করিয়াছে। ফলে এই সকল কোম্পানীর বাজে খরচ আরও বাড়িয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় যদি বীমাকারিগণ সরকারকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আইন সত্ত্বেও যদি বাহ্যাড়ম্বর এবং নিতান্ত বাজে খরচের দরুণ কোম্পানী দেউলিয়া হয় তাহা হইলে কি হইবে, তবে সরকার কি উত্তর দিবেন ?

২১৩ টি কোম্পানী ছাড়া কোনও দেশীয় কোম্পানী বীমাকারিগণকে লভ্যাংশ বিতরণ করেন নাই, কেবল তহবিল দেখাইয়া কাজ লইতেছেন। "পরের ধনে পোদ্দারী" যাহাকে বলে এ যেন তাহাই চলিতেছে।

বীমাকারিগণ যেন স্মরণ রাখেন যে, সরকারী আমানতি টাকা শুধু তাঁহাদের জন্যই বিশেষ ভাবে রক্ষিত হয় না। যদি কোম্পানী ফেল হইয়া যায় তাহা হইলে অন্যান্য পাওনাদারগণও উক্ত টাকা হইতে প্রাপ্য দাবী করিতে পারেন এবং নিযুক্ত ঋণ-পরিশোধকারী কর্ম্মচারী (লিকুইডেটর) সমস্ত ন্যায়সঙ্গত ঋণের পরিমাণ স্থির করিয়া উক্ত গচ্ছিত টাকা হইতে তুল্যাংশে বণ্টন করিয়া দেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সরকারী আমানৎ পর্য্যাপ্ত নহে এবং সুরক্ষিতও নহে। একটা দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা একটু পরিষ্কার হইবে।

এলাহাবাদের "অ্যালায়েড লাইফ কোং" ১৯১৮ খৃঃ স্থাপিত হয়। কর্ম্মকর্ত্তাদের অপরিণামদর্শিতার ফলে এবং বার্ষিক প্রাপ্য চাঁদার অনুপাতে ব্যয়ের মাত্রা অত্যধিক হওয়ায় ইহা ১৯২৪ খৃঃ দেউলিয়া হইয়া পড়ে। এই দৃষ্টান্ত হইতে ছোট ছোট কোম্পানী এবং নূতন প্রতিষ্ঠানগুলি যদি শিক্ষালাভ করিয়া আয়ের পরিমাণে ব্যয় করেন এবং শুধু রঙীন ভবিষ্যতের অলীক কল্পনায় অভিভূত হইয়া ব্যয় বাড়াইয়া না চলেন তাহা হইলে সুফল আশা করা যায়।

যাহা হউক সরকারী ঋণ-পরিশোধকারীর বিবরণে প্রকাশ যে, উক্ত কোম্পানী যত দিন কাজ করিয়াছে তাহাতে প্রায় ৯২,০০০ টাকা চাঁদা পাইয়াছিল এবং উক্ত সময়ে মোট ব্যয় ৯৯,০০০ টাকা, অর্থাৎ আয়ের অপেক্ষা ৭,০০০ টাকা অধিক। এই ব্যয়ের অধিকাংশ টাকা অর্থাৎ ৬৬,০০০ টাকা শুধু ম্যানেজার, সেক্রেটারী প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণের বেতন, যাতায়াতের ব্যয় ও রাহাখরচ এবং দালালের প্রাপ্য চুকাইতেই নিঃশেষ হইয়াছে। বাকী

টাকা আফিসের অন্যান্য খরচ, সরঞ্জাম রক্ষা ও খরিদ এবং বিজ্ঞাপন ইত্যাদিতে গিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই ভাবের নবাবী খরচে অনেক টাকা বাজে গিয়াছে। এ ছাড়া এমন কতকগুলি ব্যাপার আছে (যেমন গঠন-খরচা ও কমিশন) যাহার ফাঁকে কর্ম্মকর্ত্তারা ইচ্ছা করিলে বহু অর্থ আত্মসাৎ করিতে পারেন এবং ২।১ স্থলে কেহ কেহ সেরূপ করিয়াছেন বলিয়াও অভিযোগ হইয়াছে।

এই কোম্পানী যখন ফেল হয় তখন ২৫,০০০ টাকা সরকারী তহবিলে আমানৎ ছিল। কিন্তু মাত্র ৬০০০ টাকা অবশিষ্ট রাখিয়া ১৯,০০০ টাকা শুধু পাওনাদারের ডিক্রী শোধ দিতে উঠাইয়া দেওয়া হয়। এই অবশিষ্ট ৬০০০ টাকা হইতে বীমাকারিগণকে শতকরা ২০৲ হিসাবে দিতে প্রস্তাব করা হয়। অতএব দেখা গেল যে, টাকা থাকিতেও বীমাকারিগণের শতকরা ৮০৲ দণ্ড গেল এবং গচ্ছিত টাকা শুধু বীমাকারিগণের দাবী মিটাইবার জন্যই রক্ষিত হয় নাই। বীমা কোম্পানীর গোড়ায়ই যত গলদ এবং ব্যয়-বাহুল্য ঘটিয়া থাকে। মূলে অনভিজ্ঞতাও কম নাই। এদেশে অর্থ থাকিলেই সবজান্তা হওয়া যায় এবং এই অর্থ সম্বল করিয়া পরিচালকরূপে অনেক অনর্থ ঘটানই সম্ভব হয়। দরিদ্র বিশেষজ্ঞের স্থান নাই। এই ব্যাধি আমাদের দেশে বীমা কোম্পানীর পরম শত্রু তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই অপ্রিয় সত্য লিখিতে বসিয়া একটা আশঙ্কা হইতেছে যে, দেশীয় বীমা কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ হয়তো রুষ্ট হইবেন। কিন্তু সাধারণের হিতার্থে কঠোর সত্য বলিতেই হইবে। যাঁহারা এই অবস্থা পার হইয়া গিয়াছেন,—যেমন, "ওরিয়েণ্টাল", "এম্পায়ার", "ভারত" ইত্যাদি—তাঁহাদের সম্বন্ধে একথা প্রযোজ্য নহে।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

জাপানে ফ্যাক্টরির আবহাওয়া

জাপান অমানুষের মত তার মজুরদের খাটিয়ে নেয়। মজুর-দলনে জাপান সভ্য দেশের মধ্যে পয়লা নম্বর ওস্তাদ। ১৯১৯ সনের ওয়াশিংটন লেবার কনভেনশনকে তোয়াক্কা না করে সে স্ত্রী ও বালক মজুরদের রাত্রে পর্য্যন্ত কাপড়ের কলের ঘানিতে যুড়ে অল্প খরচায় ভারতের বাজারে সস্তা মাল পাঠায় ইত্যাদি নানা ধরণের অভিযোগ জাপানের বিরুদ্ধে ভারত ও বৃটিশ উভয় তরফ থেকেই আনা হয়েছে। জেনেভার আন্তর্জ্জাতিক মজুর-সম্মিলনে ভারতের বৃটিশ বাণিজ্য-স্বার্থের প্রতিনিধি সার আর্থার ফ্রম বলেছেন ভারত ওয়াশিংটন বৈঠকের সকল সর্ত্তই পুরাপুরি পালন করেছে। কিন্তু জাপান ঐ নীতি অনুযায়ী কাজ না করায় অনেক দিক্ দিয়া ভারতের স্বার্থ-হানি হচ্ছে। জাপানের এইরূপ অমার্জ্জনীয় অপরাধের যথাবিধি বিহিত না করলে আন্তর্জ্জাতিক মজুর-সংসদের প্রতি ভারতের আস্থা ছুটে যাবে। ভারতের ব্যবসায়ী মহলে, বিশেষ করে, বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলের মালিকদের মধ্যে কিছুদিন হতে "জাপান বয়কট" রব উঠেছে। দেশ-বিদেশের মাসিক ও দৈনিক কাগজে জাপানের বিরুদ্ধে প্রপাগাণ্ডা চলেছে। নিজেদের দেশের বাজারে সস্তা জাপানী মালের সাথে ভারতীয় ব্যবসায়িগণ প্রতিযোগিতায় ফেল মারায় বোম্বাই চেম্বার অব কমার্স ভারত সরকারকে অনুরোধ উপরোধ করে জাপানের সঙ্গে যে ব্যবসা-সন্ধি আছে তার কিছু এদিক্-ওদিক্ রদ-বদল করে জাপানের উপর উচ্চ হারে শুল্ক বসান যায় কিনা তার ফন্দি-ফিকির আবিষ্কার করবার জন্য এক দোসরা ট্যারিফ বোর্ড কায়েম করেছেন। সাধু সঙ্কল্প।

জাপান এত সস্তায় মাল উৎপন্ন করে' বিদেশের হাট-বাজার যেমন করে' দখল করে' বসতে সমর্থ হচ্ছে ভারত-সন্তানের তা ভাববার বিষয় বটে। কিন্তু জাপান অমানুষিক

ভাবে মজুর খাটিয়ে, চালবাজি করে, অসৎ উপায়ে মাল উৎপন্ন করছে সব সময় এই খারাপ দিক্‌টা ভাবলে চলবে না। ভারতবাসীর কি কি গলদ রয়েছে তা আগে ঘেঁটে বের করতে হবে। ভারতে ব্যবসা-মহলে ইংরেজের এক-চেটে আধিপত্যে দোসরা ভাগী উপস্থিত হওয়ায় মুনাফার ষোল আনা ইংরেজের ট্যাঁকে পৌছিবার পক্ষে বিষম বাধা উপস্থিত হয়েছে; তাই ইংরেজ ভারতবাসীকে জাপান-বয়কট আন্দোলনে খুব মাতিয়ে তুলছে। বিদেশী কাগজ-গুলাতে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের প্রতি খুব দরদ দেখান হচ্ছে।

জাপানের বিরুদ্ধে যতগুলি অভিযোগ আনা হয়েছে তার সবগুলিই সত্য একথা বলা চলে না। এতে অনেক স্বার্থান্বেষীদের কারসাজি আছে একথা স্বীকার না করে পারা যায় না। তবে কিছুদিন হল বোম্বাই চেম্বার অব কমার্সের দৌলতে এবং ষ্টেটসম্যানের জাপান সাংবাদিকের মারফতে জাপানের স্ত্রী ও বালক মজুরদের অভিযোগের যে এক দলিল পাওয়া গেছে তা সত্য হলেও জাপানের বিরুদ্ধে বয়কট আন্দোলন চালান যুক্তিসঙ্গত হতে পারে।

জাপানের কলকারখানার স্ত্রী ও বালক মজুরগণ জাপানের পার্ল্যামেন্টে যে দরখাস্ত পেশ করেছে তাতে বলা হয়েছে যে, ১৯২৬ সনের ৩৩নং সংশোধিত ফ্যাক্টরী আইনের সঙ্গে যে অতিরিক্ত অংশ যুড়ে দেওয়া হয়েছে তা নাকচ করা হোক এবং শ্রমিকগণের বাসস্থান-নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করা হোক। এইখানে বলা যেতে পারে, ঐ সংশোধিত আইন প্রণয়ন দ্বারা জাপানে স্ত্রী ও বালকদের নৈশ শ্রম নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু বণিক সম্প্রদায়ের বিশেষ পীড়াপীড়িতে সরকার এর সাথে উপধারা যোগ করে দেওয়ায় ঐ আইনের কার্য্য-কারিতা কিছুদিনের জন্ম বাতিল করে দেওয়া হয়। ১৯১৯ সনের ওয়াশিংটন শ্রমিক বৈঠকের নির্দ্দেশ মত জাপানে স্ত্রী ও বালকদের নৈশ শ্রম নিষিদ্ধ করে ঐরূপ আইন বিধিবদ্ধ করা হয়। ১৯২৩ সনে ফ্যাক্টরী আইনের যে সংশোধন করা হয় তাহাতে নৈশশ্রম নিষিদ্ধ বলে স্বীকৃত হলেও ইহার উপ-ধারায় বলা হয় যে, এই আইন প্রবর্ত্তনের তিন বৎসর পরে নিষিদ্ধতা গ্রাহ্য করা হবে। সরকার ও মালিক উভয়েই নৈশ শ্রমের কুফল স্বীকার করলেও মালিকদের প্রতি-বন্ধকতায় নয়া ফ্যাক্টরী আইন মোতাবেক কাজ করা যাচ্ছে না। ইহার কার্য্যকারিতা অস্থায়ী ভাবে স্থগিত রাখা হয়েছে।

এই আইন প্রণয়নের সময় জাপানের ফেডারেশন অব স্পিনিং কোম্পানী ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাতে থাকে, এবং সরকার ও পার্ল্যামেন্টকে ঐ আইনের কার্য্যকারিতা তিন বৎসরের জন্ম স্থগিত রাখবার প্রচেষ্টায় জয়ী হয়। মালিকদের মতে নৈশ শ্রম নিষিদ্ধ করলে ৪০ লক্ষ বেশী টেকো খাড়াতে হবে। তা না করলে বাজারের চাহিদা যোগান দেওয়া সম্ভবপর হবে না। তাই তাঁরা এর বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত।

মজুরদের পক্ষ থেকে দাবী করা হচ্ছে যে, ১৯২৩ সনের পর থেকে আজ পর্য্যন্ত বাস্তবিক পক্ষে ৪০ লক্ষের উপর টেকো বেড়ে গেছে, তাহলে ঐ আইন এখন বলবৎ করবার পক্ষে কোন ন্যায়সঙ্গত আপত্তি থাকতে পারে না। উহা এখন বাধ্যতামূলক করা উচিত। এ ছাড়া স্ত্রীলোকদের নৈশশ্রমের বিপক্ষে আরও কতকগুলি সাধারণ কারণ দেখান হয়েছে।

(১) নৈশশ্রম স্বাস্থ্যের ঘোর অনিষ্টজনক, (২) মজুরির হার ও অস্বাস্থ্যজনক বাসস্থানের কথা ভেবে দেখলে বর্ত্তমান প্রণালীর নৈশশ্রম কোনমতেই চলতে দেওয়া উচিত নয়, (৩) নৈশশ্রমের ফলে সামাজিক ও নৈতিক জীবনের অবনতি ঘটে, (৪) নৈশশ্রমের জন্ম কারখানায় বাসস্থানের ব্যবস্থা থাকা দরকার হয়। ঐ সমস্ত স্থানে স্ত্রী-মজুরদের উপর পাশবিক অত্যাচার করা হয়, (৫) নৈশশ্রম দ্বারা আন্তর্জ্জাতিক বন্ধন ছেদন করা হয়, (৬) ইহা অদূর ভবিষ্যতে জাতীয় শিল্পের পক্ষে ক্ষতিজনক হইতে বাধ্য।

সরকারী অনুসন্ধানে দেখা যায়, কোন কারখানায় ৮১জন স্ত্রী-মজুর নিযুক্ত করা হয়, নৈশশ্রমের ফলে প্রতি সপ্তাহে প্রত্যেক মেয়ের তিন পোআ করে ওজন কমে এবং দিনের তাঁতে কাজ করার ফলে তাদের এক পোআর কিছু বেশী ওজন বাড়ে। মোটের উপর বরাবর সপ্তাহে প্রায় আধ সের ওজন কমতে থাকে। তার ফলে শেষে অকালে তাদের জীবনপাত করতে হয়।

বয়ন-কারখানায় নৈশ শ্রমের ফলে স্ত্রী ও বালক শ্রমিকদের ক্ষয়রোগ, বদহজমী, বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি দেখা দেয়। ডাক্তার ইশিহেরা অনুসন্ধান করে দেখেছেন নৈশশ্রমের ফলে হাজার করা ২৩জন স্ত্রী-মজুরের মৃত্যু হয়। তা হলে দেখা যায়, জাপানের কলকারখানায় মোট ৮৫৭০০০ স্ত্রী-মজুরের মধ্যে বৎসরে ১৯৫ রাত্রিকালে কারখানায় কাজ করার ফলে মরে।

নৈশ শ্রমের ফলে মনোযোগ-শক্তি হ্রাস পায়, ইহার ফলে দৈব-দুর্ঘটনা বৃদ্ধি পায়। জাপানের কোনো কারখানায় দিনে ও রাত্রে অদল-বদল ভাবে নিযুক্ত ৮০০০ স্ত্রী-মজুরের মধ্যে ২৩ মাসে ১৫৭৩ জন জখম হয়। প্রতি ঘণ্টায় জখমের অনুপাত শতকরা প্রাতে ২·৭ হলে, অপরাহ্নে ৫·৮ দাঁড়ায় এবং রাত্রে ঐ সংখ্যা একেবারে ডবল অর্থাৎ ১০·৩ হয়।

১৯২৪ সনে জাপানের কলকারখানায় ৮৫৭,৯৩০ জন স্ত্রী-মজুর ছিল, ইহাদের মধ্যে পনর থেকে বিশ বছরের মেয়ের সংখ্যাই বেশী। বার থেকে পনর বছরের মজুরের সংখ্যা ছিল ১১৫,৮০১। ইহাদের সবাইকে রাত্রে ও দিনে অদল-বদল ভাবে কাজ করতে হত। ১৮৪১৭৮ জন মেয়েকে ১৪ ঘণ্টা চরকা চালাতে হয়। ১৯২৪ সনে ইহাদের প্রত্যেকের দৈনিক মজুরি ছিল ৮৬ সেন (১ পয়সায় এক সেন)। যে সব মেয়েদের আয়ের অধিকাংশ বাপমাকে পাঠাতে হয়, তাদের খাওয়া ও থাকা খুব দরিদ্রভাবে চলে।

১৯২৪ সনে সরকারের ফ্যাক্টরী আইনের অধীনে ২৫,৫৫৯টী ফ্যাক্টরী ছিল। ইহার মধ্যে ১০৫৭০টায় স্বতন্ত্র বাসস্থান ছিল। এই সমস্ত ফ্যাক্টরীতে নিযুক্ত স্ত্রী-মজুরদের নৈতিক অধঃপতন হতে বাধ্য। স্ত্রী ও বালক মজুরদের আবেদন এই যে, এই সমস্ত বাসস্থান সরকারের কড়া তত্বাবধানের অধীনে আনবার জন্য আইন হোক।

চীন, ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য প্রাচ্য দেশে বস্ত্রব্যবসায়ের যেরূপ উন্নতি হতে চলেছে তাতে জাপান যদি এদের সঙ্গে টক্কর দিয়ে তার বস্ত্র-শিল্পকে দুনিয়ার বাজারে সেরা বলে প্রতিপন্ন করতে চায়, তা হলে জাপানকে তার মজুরদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে হবে; মজুরদের দক্ষতা ও কার্য্যকরী শক্তি বাড়াতে হবে এবং যন্ত্রপাতির উন্নতি সাধন করতে হবে। মজুরদের দক্ষতা বাড়াতে হলে সর্ব্বপ্রযত্নে জাপানকে নৈশশ্রম নিষিদ্ধ করে দিতে হবে। জাপান প্রথম আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক বৈঠকে প্রতিজ্ঞা করে' দেশে এসে নৈশ শ্রম নিষিদ্ধ করে' যে আইন জারী করেছিল তা অক্ষরে অক্ষরে বাধ্যতা-মূলক করতে হবে। এই মর্ম্মে স্ত্রী ও বালক মজুরদের এক আবেদন পার্ল্যামেন্টে পেশ করা হয়েছে।

মূল্য-তত্ত্ব

(ডেভিড্ রিকার্ডো)

অনুবাদক

শ্রীসুধাকান্ত দে, এম, এ, বি, এল ও শ্রীশচীন্দ্রমোহন সেন, এম, এ

(৬)

দামের এক অপরিবর্ত্তনীয় মানের কথা

২১। দ্রব্যসমূহের আপেক্ষিক দামে যখন তারতম্য ঘটিতেছে, সে সময় কোন্‌টার প্রকৃত দাম নামিল আর কোন্‌টার চড়িল, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য কোন মধ্যস্থ থাকিলে ভাল হয়। ইহা সম্ভব কেবল তখনই যখন প্রত্যেক দ্রব্যকে কোন অপরিবর্ত্তনীয় প্রমাণ * মানদণ্ডের সহিত তুলনা করা চলে। অবশ্য ধরিয়া লইতে হইবে যে, এই মানদণ্ড নিজে অন্যান্য দ্রব্যাদির ন্যায় কোন উঠা-নামার অধীন নহে। এরূপ একটি মানদণ্ড হাতে পাওয়া অসম্ভব।

* ষ্ট্যাণ্ডার্ডের প্রতিশব্দরূপে বোধ করি প্রমাণ কথাটাই সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন। "আদর্শ" বলিলে আইডিয়াল বুঝায়। প্রমাণ ছবি, প্রমাণ শাড়ী ইত্যাদিতে ষ্ট্যাণ্ডার্ড অর্থই পাওয়া যায়।

কারণ, দুনিয়ায় এমন কোন দ্রব্য নাই যাহা, যে সব জিনিষের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, তাদেরই মত নিজেও তারতম্যের অধীন নহে; অর্থাৎ যার উৎপাদনে কম বা বেশী শ্রম লাগে না। কিন্তু কোন মধ্যস্থের দামের মধ্য হইতে যদি এই তারতম্যের কারণটাকে বাদ দেওয়া যাইত—যেমন ধর যদি ইহা সম্ভব হইত যে, মুদ্রার উৎপাদনে সকল সময়ে তুল্য পরিমাণ শ্রমই দরকার হইতেছে—তথাপি ইহা দামের নিখুঁত প্রমাণ অথবা অপরিবর্ত্তনীয় মানদণ্ড হইত না। কারণ, আমি পূর্ব্বেই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, ইহার এবং অন্য যে সব দ্রব্যাদির দামের পরিবর্ত্তন আমরা নির্দ্ধারণ করিতে চাহি তাদের উৎপাদনে ভিন্ন ভিন্ন হারে স্থির পুঁজিপাটার প্রয়োজন বলিয়া মজুরির হ্রাসবৃদ্ধির দরুণ অন্যান্য দ্রব্যের মতন এই বস্তুও আপেক্ষিক তারতম্যের অধীন হইবে। পূর্ব্ববৎ কারণে ইহার উপর ও ইহার সহিত যে দ্রব্যাদির তুলনা হইবে তাদের উপর যে স্থির পুঁজিপাটা লাগান হইয়াছে তার স্থায়িত্বের ক্রম বিভিন্ন বলিয়াও ইহা তারতম্যের অধীন হইতে পারে। অথবা একটিকে বাজারে আনিতে যে সময় লাগে তাহা, যাদের তারতম্য নির্ণয় করিতে হইবে সেই দ্রব্যসমূহকে বাজারে আনিবার সময় অপেক্ষা হ্রস্বতর বা দীর্ঘতর হইতে পারে। যে কোন দ্রব্যের কথাই ভাবা যাক না কেন, এই সকল বিবেচনা তাকে দামের সম্পূর্ণ শুদ্ধ মানদণ্ডরূপে কল্পনা করিতে বাধা দেয়।

মনে কর আমরা সোনাকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিলাম। কিন্তু অন্যান্য যে কোন দ্রব্যের মত ইহাও নানা অনিশ্চয়তার মধ্যে উৎপন্ন। ইহা একটি দ্রব্য মাত্র, এবং ইহা উৎপাদন করিতেও শ্রম এবং স্থির পুঁজিপাটা দরকার হয়। অন্যান্য দ্রব্যের ন্যায় ইহার উৎপাদনেও শ্রম-সংক্ষেপক উন্নতিসমূহ প্রয়োগ করা যায় এবং ফলে শুধু-মাত্র উৎপাদন সুসাধ্যতার দরুণ অন্যান্য জিনিষপত্রের তুলনায় উহার আপেক্ষিক দাম নামিতে পারে।

যদি আমরা ধরিয়া লই তারতম্যের এই কারণ দূরীভূত হইয়াছে, সমতুল্য পরিমাণ সোনা পাইতে সর্ব্বদা সমতুল্য পরিমাণ শ্রম লাগিতেছে, তথাপি সোনা দামের এমন নিখুঁত মানদণ্ড হইবে না যে তদ্দ্বারা আমরা ঠিক ভাবে অন্য সমস্ত জিনিষের তারতম্য মাপিতে পারি। কারণ, অন্যান্য সব জিনিষ স্থির ও পৌনঃপুনিক পুঁজিপাটার যে মিশ্রণে উৎপন্ন হয় উহা ঠিক সমতুল্য মিশ্রণের সাহায্যে উৎপন্ন হইবে না কিম্বা সমতুল্য স্থায়িত্ব-বিশিষ্ট স্থির পুঁজিপাটার সাহায্যেও উৎপন্ন হইবে না। আর বাজারে আনীত হইবার পূর্ব্বে ঠিক সমান দীর্ঘ সময়ও লাগিবেনা। ঠিক তত্তুল্য অবস্থায় যে সকল জিনিষ উৎপন্ন হয় তাদের পক্ষে উহা দামের এক নিখুঁত মানদণ্ড হইতে পারে, অন্য কোন জিনিষের পক্ষে নহে। মনে কর, বস্ত্র ও তুলার জিনিষ উৎপাদন করিতে আমরা যে অবস্থার দরকার বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম, যদি সোনাও তত্তুল্য অবস্থায়ই উৎপন্ন হইত, তবে ইহা ঐসকল জিনিষের পক্ষে দামের নিখুঁত মানদণ্ড হইত বটে, কিন্তু ফসলের পক্ষে, কয়লার পক্ষে এবং অন্যান্য যে দ্রব্যাদি হয় কম নয় বেশী হারে লাগান স্থির পুঁজিপাটার সাহায্যে উৎপন্ন হইয়াছে তাদের পক্ষে হইত না। কেননা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে (উহাদের উৎপাদনার্থ যে শ্রম নিয়োজিত হইতেছে তার পরিমাণে কোন পরিবর্ত্তন হউক বা না হউক) মুনাফার হারে স্থায়ী পরিবর্ত্তন ঘটিবামাত্র এইসকল জিনিষের আপেক্ষিক দামের তারতম্য ঘটিতে বাধ্য। যদি সোনা ফসলের তুল্য অবস্থায় উৎপন্ন হইত, আর যদি সে অবস্থা অপরিবর্ত্তনীয়ও হইত তথাপি ঐ পূর্ব্ববর্ত্তী কারণে ইহা সকল সময়ে বস্ত্র এবং তুলার জিনিষপত্রের দামের নিখুঁত মানদণ্ড হইত না। সুতরাং সোনা হোক্ বা অন্য যে কোন দ্রব্য হোক্ কোনটাই সকল জিনিষের পক্ষে কখনো দামের নিখুঁত মানদণ্ড হইতে পারে না। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে লক্ষ্য করিয়াছি যে মুনাফার তারতম্যে জিনিষপত্রের আপেক্ষিক দরে যে তারতম্য ঘটে তাহা তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। উৎপাদনের জন্য যে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ শ্রমের দরকার হয় তার প্রভাবই প্রধানতঃ প্রবল। অতএব আমরা যদি ধরিয়া লই সোনার উৎপাদনে বর্ত্তমান তারতম্যের এই প্রধান কারণ দূরীকৃত হইয়াছে, তবে বোধ করি অনুমানতঃ যতদূর সম্ভব ততদূর দামের একটা প্রমাণ মানদণ্ডের নিকটতম সন্নিকর্ষ লাভ করিব। সোনাকে কি এমন একটি দ্রব্যরূপে কল্পনা করা যায় না, যাহা নাকি

উৎপন্ন হইতেছে দুই প্রকার পুঁজিপাটার এরূপ সব অনুপাতে যাহা অধিকাংশ দ্রব্যাদির উৎপাদনে নিয়োজিত গড়পড়তা পরিমাণের সর্ব্বাপেক্ষা কাছাকাছি পৌছিয়াছে? এই অনুপাতগুলি কি দুই চরমপ্রান্তে—যেখানে অল্প স্থির পুঁজিপাটা ব্যবহার হইতেছে ও অন্যপক্ষে অল্প শ্রম নিযুক্ত হইতেছে, এমন প্রায় সমান দূরে দূরে—হইতে পারে না, যাহাতে উহাদের মধ্যে ঠিক একটা মাঝারি গঠিত হওয়া সম্ভব হয়?

এক্ষণে, যদি ধরিয়া লই যে, আমি এমন একটি প্রমাণ পাইয়াছি যাহাকে প্রায় অপরিবর্ত্তনীয় বলা যাইতে পারে, তাহার সুবিধা এই হয় যে, যে মধ্যস্থের হিসাবে দরদাম করা হইতেছে, প্রত্যেকবার তার দামে সম্ভাবিত পরিবর্ত্তনের বিষয়ে মাথা না ঘামাইয়া, অন্ত জিনিষপত্রের তারতম্যের কথা বলিতে সমর্থ হই।

অতএব এই অনুসন্ধান-কার্য্যের উদ্দেশ্য যাহাতে সহজ-সাধ্য হয় তজ্জন্য আমি ইহাকে অপরিবর্ত্তনীয় ধরিয়া লইব। যদিও আমি ভুলিয়া যাই নাই যে, স্বর্ণে প্রস্তুত মুদ্রা অন্যান্য জিনিষপত্রের অধিকাংশ তারতম্যেরই অধীন। সঙ্গে সঙ্গে এরূপও ধরিয়া লইব যে আমি যে দ্রব্যের কথা বলিতেছি তার কোন পরিবর্ত্তনই মূল্য পরিবর্ত্তনের কারণ।

পরিশেষে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, আডাম স্মিথ এবং তৎপরবর্ত্তী সমস্ত লেখকেরা প্রচার করিয়াছেন যে, শ্রমের দর-বৃদ্ধি সমস্ত দ্রব্যাদির দর-বৃদ্ধির কারণ হইবে। একজনও অন্যরূপ বলিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। আশা করি আমি দেখাইতে সমর্থ হইয়াছি যে এরূপ অভিমতের কোন ভিত্তি নাই। মজুরি বাড়িলে যাদের উপর দর-নির্দ্দেশক মধ্যস্থ অপেক্ষা কম স্থির পুঁজি-পাটা লাগান হইয়াছিল, কেবল সেই দ্রব্যসমূহের দাম চড়িবে এবং অন্য যাদের উপর বেশী লাগান হইয়াছিল তাহাদের দর নিশ্চিতরূপে কমিবে। অপর পক্ষে, যদি মজুরি নামে যাদের উপর দর-নির্দ্দেশক মধ্যস্থ অপেক্ষা কম হারে স্থির পুঁজিপাটা লাগান হইয়াছিল, সেই দ্রব্যসমূহের দরই কেবল নামিবে কিন্তু যাদের উপর বেশী লাগান হইয়াছিল তাহাদের দর নিশ্চিতরূপে চড়িবে।

একথাও আমার বলা কর্ত্তব্য—আমি ইহা বলি নাই যে, যেহেতু একটি দ্রব্যে সেই পরিমাণ শ্রম দেওয়া হইয়াছে যার খরচ দাঁড়ায় ১০০০ পাউণ্ড, এবং অন্যটিতে সেই পরিমাণ যার খরচ ২০০০ পাউণ্ড, অতএব একটার দাম হইবে ১০০০ পাউণ্ড আর অপরটার ২০০০ পাউণ্ড; কিন্তু আমি ইহাই বলিয়াছি যে তাদের পরস্পর দামের অনুপাত হইবে ২:১ এবং এই অনুপাতেই তাদের পরস্পর বিনিময় চলিবে। এই দুই দ্রব্যের একটা দ্রব্য ১১০০ পাউণ্ডে ও অন্যটা ২২০০ পাউণ্ডে বিকাইল অথবা একটা ১৫০০ পাউণ্ডে ও অন্যটা ৩০০০ পাউণ্ডে বিকাইল, তাতে এই মতবাদের* সত্যতার কোন ইতর-বিশেষ হয় না; আমি সম্প্রতি সে প্রশ্নের অনুসন্ধান করিতেছি না; আমি শুধু বলিতে চাহি যে, তাদের আপেক্ষিক দাম অনুশাসিত হইবে তাদের উৎপাদনে প্রদত্ত শ্রমের আপেক্ষিক পরিমাণ দ্বারা। ১

২২। যদিও আমার পূর্ব্ব ব্যাখ্যামত মুদ্রাকে সাধারণতঃ অপরিবর্ত্তনীয় মনে করিব, তথাপি অন্য জিনিষপত্রের দামে আপেক্ষিক তারতম্যের কারণসমূহ আরও স্পষ্টতররূপে প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে আমি যে সব কারণের কথা বলিয়াছিলাম, (যেমন ধর, দ্রব্যাদি উৎপাদন করিতে যে

---

১ ম্যালথাস সাহেব এই মতবাদের উপর মন্তব্য করিতেছেন,—"কোন দ্রব্যের উপর যে শ্রম নিয়োজিত হইয়াছে তাকেই যথেচ্ছভাবে উহার প্রকৃত দাম বলিবার অধিকার আমাদের অবশ্য আছে, কিন্তু তদ্বারা আমরা শব্দসমূহকে মামুলি অর্থে ব্যবহার না করিয়া ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিতেছি; আমরা তখনই খরচ ও দামের মধ্যে অত্যন্ত দরকারী পার্থক্যের কথাটা গোলমাল করিয়া ফেলি; এবং বস্তুতঃ এই পার্থক্যের উপর যে ধনোৎপাদন নির্ভর করে তার প্রধান প্ররোচনাকে পরিষ্কার করিয়া বুঝানো প্রায় অসম্ভব করিয়া ফেলি।"

মনে হয় ম্যালথাস সাহেব ভাবিয়াছেন যে কোন জিনিষের খরচ ও দাম তুল্য হওয়া দরকার ইহা আমার মতবাদের একটা বিষয়, তাই বটে যদি তিনি খরচ দ্বারা মুনাফা শুদ্ধ "উৎপাদন খরচ" বুঝিয়া থাকেন। উদ্ধৃত অংশে তিনি এরূপ বুঝেন নাই। সুতরাং তিনি আমার কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নহে।

* ডক্ট্রিন কথার প্রতিশব্দ 'মতবাদ' করা যাইতে পারে না কি?—অনুবাদক।

শ্রমের বিভিন্ন পরিমাণ দরকার, এবং স্বয়ং মুদ্রার দামে তারতম্য) তাহাদের প্রভাবে দামের তারতম্য ঘটিলে কিরূপ ফলাফল হয়, তাহা লক্ষ্য করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

মুদ্রা একটি পরিবর্ত্তনশীল দ্রব্য। সুতরাং সচরাচর মুদ্রার দাম হ্রাস হইলে মুদ্রায় মাপা মজুরির বৃদ্ধি ঘটিবে। বাস্তবিক এ-কারণে মজুরির বৃদ্ধি ঘটিলে আনুষঙ্গিকভাবে দ্রব্যাদির দরও চড়িবে; কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে দেখা যাইবে যে, শ্রম এবং দ্রব্যাদি পরস্পরের তুলনায় উঠা-নামা করে নাই; তারতম্যটা মুদ্রাতেই আবদ্ধ রহিয়াছে।

মুদ্রা বিদেশ হইতে আমদানি করা দ্রব্য। ইহা সমস্ত সভ্য দেশের মধ্যে সাধারণ বিনিময়-মধ্যস্থ। কল ও বাণিজ্যের প্রত্যেক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এবং ক্রমবর্দ্ধনশীল জনগণের খাদ্যপানীয় আহরণে উত্তরোত্তর কাঠিন্য-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, মুদ্রা ঐ সকল দেশে চির-পরিবর্ত্তনশীল হারে বিতরিত হয়। কাজেই মুদ্রা অবিরত তারতম্যের অধীন রহে। কতকগুলি তারতম্য স্বয়ং দ্রব্যের স্বভাববশতঃ ঘটে, আর অপর কতকগুলি দাম-নির্ণায়ক বা দর-প্রকাশক মধ্যস্থে তারতম্যের জন্য ঘটে। বিনিময় দাম ও দর-নিয়ামক তত্ত্বসমূহ নির্দ্দেশ করিবার সময় এই পার্থক্য দু'টি আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত।

২৩। মুদ্রার দামে কোনো পরিবর্ত্তন হেতু যে মজুরি-বৃদ্ধি, তাহা দরের উপর সাধারণ প্রভাব বিস্তার করে, এবং সেই জন্য ইহা মুনাফার উপর কোন প্রকৃত প্রভাব বিস্তার করে না। অপর পক্ষে, মজুরকে যথেষ্ট পুরস্কৃত করাতে, অথবা যে সব আবশ্যক দ্রব্যের উপর মজুরি খরচ হইয়া যায় তাদের আহরণে কাঠিন্য-হেতু যে মজুরি-বৃদ্ধি তাহা কোনো কোনো ক্ষেত্র ব্যতিরেকে, দর চড়াইবার পক্ষে সহায়তা করে না, কিন্তু মুনাফার ঘাটতি ফলাইতে সহায়তা করে। প্রথম ক্ষেত্রে মজুরদের পালনের জন্য দেশের বাৎসরিক শ্রম কোনো বৃহত্তর অনুপাতে ব্যয়িত হয় না; কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এক বৃহত্তর অংশ এইরূপে প্রযুক্ত হয়।

কোনো খামার-বিশেষের জমিতে উৎপন্ন সমস্ত ফসল জমিদার, মহাজন এবং মজুর এই তিনশ্রেণীর মধ্যে যে ভাবে ভাগ হইতেছে, সেই অনুসারেই আমাদিগকে বিচার করিতে হইবে—খাজনা, মুনাফা এবং মজুরি বাড়িল অথবা কমিল; পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া স্বীকৃত মধ্যস্থ দ্বারা ঐ ফসলের যে দাম নির্দ্ধারিত হইতে পারে তদনুসারে বিচার করিলে চলিবে না।

কোনো এক শ্রেণী কর্ত্তৃক সমগ্র ফসলের কতখানি আহৃত হইতেছে, তদ্দারা নহে, কিন্তু ঐ ফসল পাইতে শ্রমের কি পরিমাণ দরকার তদ্দারা আমরা মুনাফা, খাজনা ও মজুরির হার পরিশুদ্ধরূপে আলোচনা করিতে পারি। কল ও কৃষিকর্ম্মে উন্নতির দ্বারা সমগ্র ফসল দ্বিগুণিত হইতে পারে; কিন্তু যদি মজুরি, খাজনা এবং মুনাফাও দ্বিগুণিত হয়, এই তিনের পরস্পর অনুপাত ঠিক পূর্ব্বের মত থাকিবে, এবং কোনোটাই অন্যটার তুলনায় উঠানামা করিতেছে বলা চলিবে না। কিন্তু যদি মজুরি এই বৃদ্ধির সমগ্র অংশটা না পাইত, যদি উহা দ্বিগুণিত হওয়ার পরিবর্ত্তে মাত্র অর্দ্ধগুণ বাড়িত; যদি খাজনা, দ্বিগুণিত হওয়ার পরিবর্ত্তে, তিন-চতুর্থাংশ বাড়িত; এবং অবশিষ্ট বৃদ্ধিটা মুনাফায় পড়িত, আমি জানি, আমার পক্ষে এই কথা বলাই যুক্তিযুক্ত হইত যে, খাজনা ও মজুরি নামিয়াছে কিন্তু মুনাফা উঠিয়াছে। কারণ, এই ফসলের দাম মাপিবার জন্য একটা অপরিবর্ত্তনীয় "প্রমাণ" যদি আমাদের হাতে থাকিত তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইতাম যে, পূর্ব্বে যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে তার তুলনায়, মজুর ও জমিদার শ্রেণীর লোকদের কপালে কম দাম পড়িয়াছে এবং মহাজন শ্রেণীর লোকদের কপালে বেশীর ভাগ দাম পড়িয়াছে। যেমন ধর, আমরা দেখিতে পাইতাম, যে যদিও দ্রব্যাদির সমগ্র পরিমাণ দ্বিগুণিত হইয়াছে, তথাপি তারা ঠিক পূর্ব্বের সমতুল্য পরিমাণ শ্রমেরই উৎপন্ন ফল। উৎপাদিত প্রতি শত টুপি কোট ও কোয়ার্টার ফসলের যদি

মজুরেরা পূর্ব্বে পায়	... ...	২৫
জমিদারেরা	... ...	২৫
মহাজনেরা	... ...	৫০
		১০০

এবং যদি, এই দ্রব্যসমূহ দ্বিগুণপরিমাণ হওয়ার পর, প্রতি একশতে

জমিদারেরা পায় মাত্র	... ...	২২
মজুরেরা পায় মাত্র	... ...	২২
মহাজনেরা	... ...	৫৬
		১০০

সে ক্ষেত্রে আমি বলিতে পারি যে মজুরি এবং খাজনা নামিয়াছে এবং মুনাফা উঠিয়াছে; যদিও দ্রবাদির প্রাচুর্য্যের ফলস্বরূপ মজুর ও জমিদারের প্রাপ্য পরিমাণ ২৫:৪৪ এই অনুপাতে বৃদ্ধি পাইবে। মজুরি কষিতে হইবে উহার প্রকৃত দাম বিচার করিয়া অর্থাৎ উহাকে উৎপাদন করিতে শ্রম ও পুঁজিপাটার যে পরিমাণ নিযুক্ত হইতেছে তাহা বিচার করিয়া, এবং কোট, টুপি, মুদ্রা বা ফসলরূপ উহার আপাত দামের বিচার-দ্বারা নহে। এইমাত্র যে অবস্থা কল্পনা করিলাম তাহাতে, দ্রব্যসমূহ তাহাদের পূর্ব্বদরের অর্দ্ধেকেও নামিয়া যাইত। যদি তাহা হইলে দেখা যায় যে, যে মধ্যস্থের দামে কোনো পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, তার হিসাবে মজুরি নামিয়া গিয়াছে, তবে পূর্ব্ব-মজুরি অপেক্ষা এক্ষণে তাকে অধিকতর পরিমাণে সস্তা দ্রব্যাদি কিনিতে সমর্থ করিতেছে বলিয়া তাহা কম প্রকৃত হ্রাস হইবে না।

মুদ্রার দামে তারতম্য যত বেশীই হোক্ না, তাহা মুনাফার হারে কোন পার্থক্য ঘটায় না; কারণ, মনে কর কারবারীর জিনিষপত্র ১০০০ পাউণ্ড হইতে ২০০০ পাউণ্ডে অথবা শতকরা ১০০.পাউণ্ড উঠিয়াছে। যদি তার পুঁজিপাটা, যার উপর মুদ্রার তারতম্যের প্রভাব কাঁচা ফসলের দামের উপরকার প্রভাবের অনুরূপ, যদি তার কল-কারখানা এবং ব্যবসার পুঁজিও শতকরা ১০০ পাউণ্ড বাড়ে, তাহা হইলে তার মুনাফার হার পূর্ব্ববৎ থাকিবে, এবং সে দেশের পূর্ব্বতুল্য শ্রমের পরিমাণ ফলই ভোগ করিতে পাইবে, বেশী নহে।

যদি নির্দ্দিষ্ট দাম-বিশিষ্ট পুঁজিপাটার সাহায্যে, সে শ্রম-সংক্ষেপ দ্বারা ফসলের পরিমাণ দ্বিগুণিত করিতে পারে এবং ইহা পূর্ব্বদরের অর্দ্ধেকে নামিয়া যায়, তবে পূর্ব্বে যে অনুপাত ছিল এখনও ইহা ইহার উৎপাদক পুঁজিপাটার সেই অনুপাতে বর্ত্তমান থাকিবে, আর ফলে মুনাফা তখনও পূর্ব্ব হারে রহিবে।

যদি, সে সময়ে সে সমতুল্য পুঁজিপাটার নিয়োগ দ্বারা ফসলের পরিমাণ দ্বিগুণিত করে, সেই সময়ে মুদ্রার দাম কোনো আকস্মিক কারণে অর্দ্ধেক হইয়া যায়, তবে ফসলটা পূর্ব্বের দ্বিগুণ মুদ্রাদামে বিকাইবে; কিন্তু ইহা উৎপাদন করিতে যে পুঁজিপাটা নিযুক্ত হইতেছে তাহাও পূর্ব্বের মুদ্রাদামের দ্বিগুণ হইবে; সুতরাং এক্ষেত্রেও পূর্ব্বের মত ফসলের দাম ও পুঁজিপাটার দাম পরস্পরের সঙ্গে সমানুপাতে রহিবে; এবং ফসল দ্বিগুণিত হইলেও উৎপন্ন ফসলের অংশগ্রাহী তিনশ্রেণীর মধ্যে এই দ্বিগুণ ফসল যে যে অনুপাতে বিভক্ত হইবে, কেবল সেই অনুপাতগুলির তারতম্যের সঙ্গে সঙ্গে খাজনা, মজুরি এবং মুনাফা পরিবর্ত্তিত হইবে।

পাট-চাষীদের সঙ্ঘ

মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন, মুন্সী বাজার, শ্রীহট্ট

যাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া সরকারী আমলাবর্গ ও জমিদারগণের আহারের বন্দোবস্ত করে, মহাজনের গোলা ও ধনভাণ্ডার পূর্ণ করে এবং সত্য কথায় জনশক্তি, গণশক্তি ও জাতি বলিতে যাহাদিগকে বুঝায় তাহারাই চাষী। তাহারাই দেশবন্ধুর ভাষায় সাক্ষাৎ নারায়ণ। বাঙ্গালী চাষীর প্রধান চাষ ধান ও পাট। এযাবৎ কাল কোনো কোনো স্থানে শুধু ধান ও কোনো কোনো স্থানে ধান এবং পাট উভয়েরই চাষ হইয়া আসিতেছিল। গতবৎসর পাটের

দর অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় এবৎসর অনেকেই ধানের চাষ ছাড়িয়া শুধু পাটের চাষ করিয়া বসিয়াছে। চাষীরা মনে করিয়াছে পাট বিক্রয় করিয়া ধান খরিদ করিবে। এদিকে চতুর পাট-ব্যবসায়ীরা আড়ি পাতিয়া বসিয়াছে —তাহাদের ইচ্ছামত দরে না পাইলে তাহারা পাট খরিদ করিবে না। পাট একচেটিয়া ভাবে খরিদ হয়। সুতরাং ব্যবসায়ীরা যে দর বসাইবে সেই দরেই জনসাধারণ পাট বেচিতে বাধ্য হইবে। কাজেই চাষীদের সংবৎসরের পরিশ্রমের ফলটা সিকি মূল্যে খরিদ করিয়া ব্যবসায়ীরা মজা মারিবে। অথচ এই সকল পাট-ব্যবসায়ীরাই চাষীদিগকে উচ্চ আশ্বাসে আকাশে উঠাইয়া তাহাদের ধান্য চাষের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। লোকে ধান্যের চাষও করে নাই, অথচ পাট বিক্রয় করিয়া তেমন অর্থ পাইবে না, যদ্দারা প্রয়োজনমত ধান্য খরিদ করা যাইবে। সুতরাং দেশের যে কি ভয়াবহ অবস্থা হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। যে পাটের দরুণ দেশে দুর্ভিক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা, সেই পাটই আবার স্বর্ণপুরীতে পৌঁছিয়া হীরা জহরৎ ফলাইবে এবং পুনরায় এদেশবাসীর কাছে রূপান্তরে উপস্থিত হইয়া লক্ষ লক্ষ শরীরের রক্ত শোষণ করিবে।

আমাদের মতে এ সর্ব্বনাশের একমাত্র প্রতিকার—পাট উৎপাদনকারীদিগকে নিয়া সমিতিগঠন ও এতদ্বিষয়ক আলোচনা। চাষী জনসাধারণ সমিতি-গঠন কি তাহা বুঝিবে না, কোনো সমিতিও করিবে না। সুতরাং সরকার স্বয়ং ও দেশের নেতৃস্থানীয় মহোদয়গণ এই আসরে না নামিলে ভাবী দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসের হস্ত হইতে চাষীরা নিস্তার পাইবে না। এখন হইতেই স্থানে স্থানে সমিতি গঠন করিয়া উপযুক্ত মূল্য না পাইলে পাট বিক্রী বন্ধ রাখা হউক। তবেই দেখা যাইবে চতুরের চাতুরী কোথায় যায়—দেখা যাইবে ব্যবসায়ীরা উপযুক্ত মূল্যে পাট ক্রয় করিতে বাধ্য হয় কি না।

যে পাট সমগ্র পৃথিবীই চায়, যে পাটের চাষ দেশে অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া গুজব উঠিয়াছে, বঙ্গ ও আসাম ভিন্ন অন্য কোথাও কিন্তু সে পাট উৎপন্ন হয় না। এহেন পাটের যদি বিক্রয় বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে পৃথিবীর হাজার হাজার পাটকল কি বন্ধ থাকিবে? আর যদিই বা বন্ধ হয় তবে কলের লক্ষ লক্ষ মজুরের আহার যোগাইবে কে? কলের মালীকদের কোটি কোটি টাকা মূলধনের সুদটাই বা আসিবে কোথা হইতে? সমগ্র পৃথিবীর ১ কোটি গাইট কাঁচা পাটের প্রয়োজন। তারই বা বিনা পাটে চলিবে কিরূপে? অথচ চাহিদার পরিমাণে দেশে পাটের চাষ ও ফলন হয় নাই। পাট-চাষীর এসোসিয়েশন্ গঠন করিয়া উপযুক্ত দরে পাট বিক্রয় করিতে চাহিলে উচিত মূল্য পাইবার পক্ষে কোনো বাধা থাকিবে কি?

আমরা এবিষয়ে বড়লাট বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। যিনি ভারতে প্রবেশ করিয়াই কৃষি ও কৃষকের কথা আলোচনা করিয়াছেন তাঁহার কাছে বোধ হয় এদিকে কিছু আশা করিতে পারি।

পল্লীহিতৈষী দরিদ্র-বন্ধু নেতৃগণকেও এবিষয়ে আন্দোলন আরম্ভ করিতে সাগ্রহ অনুরোধ করিতেছি।

বন্যাবিধ্বস্ত মেদিনীপুর

বিভিন্ন সাহায্য-কেন্দ্রের রিপোর্ট দেখিয়া জানা যাইতেছে যে, মেদিনীপুরের সবঙ্গ ও পিংলা থানার এলাকার বন্যা-পীড়িত লোকদিগেরই অত্যন্ত দুর্দ্দশা হইয়াছে। এখনও পাঁচ সাত ফুট গভীর জলের নীচে প্রায় ৮৫ বর্গমাইল পরিমিত স্থান রহিয়াছে। ২৫০০ বাড়ী পড়িয়া গিয়াছে, তাহার ফলে পঞ্চাষ হাজার লোক গৃহহীন হইয়াছে। কতকগুলি মৌজা হইতে জল নামিয়া যাইতেছে এবং প্রত্যহ আরও বাড়ী পড়িয়া যাইতেছে। নিম্নলিখিত

তালিকাটি পড়িলেই বন্যাপীড়িত লোকদিগের দুর্দ্দশা সম্বন্ধে মোটামুটিরূপে একটা ধারণা করা যাইবে।

মৌজার নাম	বন্যার পূর্ব্বে বাড়ীর সংখ্যা	বন্যায় নষ্ট বাড়ীর সংখ্যা
নারায়ণবার	৬০	৫৪
কাপাসদা	৫০	৪০
মোহর, উদ্ধবপুর, কেকর, রায়বার	২০০	১৬০
বিষ্ণুপুর	৪০০	৩২০
তালাদিহা	২৫০	২৩০

উক্ত এলাকার ভিতরে সমস্ত স্কুলবাড়ী পড়িয়া গিয়াছে। কতকগুলি স্কুলবাড়ী হঠাৎ এমনভাবে পড়িয়া যায় যে, স্কুলের আসবাব-পত্রও রক্ষা করা যায় নাই।

স্থানীয় গৃহহীন লোকেরা এক্ষণে বান্দী বাঁধের উপর বাস করিতেছে; তাহাদের মাথার উপরে কোন ছাউনি নাই। কেহ কেহ উপস্থিতমত ছাউনি করিয়া লইয়াছে। খাদ্যাদি মোটেই পাওয়া যাইতেছে না। খুব কম লোকেই তাহাদের ধান রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। খড় পাওয়া যাইতেছে না। গরু-বাছুরগুলি গত কয়েক দিন যাবৎ কাদার উপর দাঁড়াইয়া আছে। খাদ্যাভাবে প্রত্যহ গরু-বাছুর মারা যাইতেছে।

কর্ম্মিগণ নৌকাযোগে সাহায্য বিতরণ করিতেছেন; আবশ্যক-সংখ্যক নৌকাও মিলিতেছে না। কর্ম্মিগণ নৌকার অভাবে উপস্থিত মত কলা গাছের ভেলা ভাসাইয়া নৌকার কাজ চালাইয়া লইতেছেন। তাঁহারা কতকগুলি লোককে সাহায্যাভাবে তাহাদের বাড়ীর ভগ্নাবশেষের উপর মৃত ও মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত দেখিতে পান। একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ৯ দিন অনাহারে থাকিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। খারিকাতে একটি পরিবারের তিন জন লোক ৮।১০ দিন অনাহারে থাকিবার পর সামান্য কিছু ডাল খাইয়া জীবন রক্ষা করে; তখনও পর্য্যন্ত সেখানে সাহায্য লইয়া যাওয়া হয় নাই। একটি বৃদ্ধ ও একটি শিশুকে অনাহারে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়।

বরহালে একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক দশ দিন অনাহারে কাটায়; তাহার স্বামী ও পুত্র আশ্রয়ের সন্ধানে গ্রাম ছাড়িয়া যায়। রামভদ্রপুরে একটি পরিবারের ছয় জন লোক অনাহারে কাটায়; তারপর কংগ্রেসের সাহায্য আসিয়া পৌঁছে। মাধবপুরে বাঁধের উপরে একটি অন্ধ লোককে অজ্ঞানাবস্থায় পাওয়া যায়।

বাড়ীর সব জিনিষপত্র ভাসিয়া যাওয়ায় বস্ত্র, বিছানা, রাঁধিবার বাসনপত্র ইত্যাদির অভাবে লোকজনের অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। প্রায় তিনশত লোক কোমরে চট ও ছেঁড়া মাদুর জড়াইয়া দিন কাটাইতেছে। প'ড়োচালার নীচে আট দশ জন লোককে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় দেখা যায়। তাহারা লজ্জায় সাহায্য লইতেও বাহিরে আসিতে পারে নাই।

মানুষ ও গরু-বাছুরের মৃতদেহ জলে ভাসিতেছে; তাহার দরুণ জল দূষিত হইতেছে। কয়েকটি গ্রামে কলেরা, আমাশয় ও বসন্ত দেখা দিয়াছে।

স্থানীয় প্রায় তিন হাজার লোক কলা গাছের ভেলায় করিয়া খাদ্যান্বেষণে বহির্গত হয়। তাহাদের কেহই প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে না। অনেকে মনে করিতেছেন যে, তাহাদের কেহ কেহ মারা গিয়াছে।

শাক-সব্জী একদম পাওয়া যাইতেছে না। লোকে শুধু লবণ দিয়া ভাত খাইতেছে; কাহারও কাহারও লবণও জুটিতেছে না। শিশুরা দুগ্ধ ও পুষ্টিকর খাদ্য না পাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে।

বন্যাপীড়িত লোকদিগকে বাঁচাইতে হইলে প্রত্যহ ২৫ মণ করিয়া চাল, ৫ মণ করিয়া ডাল, ২ মণ করিয়া নুণ ও আধমণ করিয়া লঙ্কা আবশ্যক; এবং ইহা একমাস যাবৎ পাঠাইতে হইবে। এজন্য দশ হাজার টাকার দরকার। ইহার পর দুই হাজার লোককে এক বৎসরের জন্য সাহায্য করিতে হইবে। (আনন্দ বাজার পত্রিকা)

পঞ্চান্নগ্রামের পোদ, বাগ্‌দী ও অন্যান্য জাতি

(আর্থিক নৃতত্ত্ব)

শ্রীহরিদাস পালিত

(১)

পোদ (পদ্মরাজ), বাগ্‌দী, কেওট, কাওড়া, ভাসা, তিয়র, বুনো, দেশী খ্রীষ্টান, মোসলমান, ও অপরাপর হিন্দুজাতি, বৈদেশিক—মাড়োয়ারী এবং পশ্চিম দেশীয় হিন্দু এ অঞ্চলের (পঞ্চান্ন গ্রামের) অধিবাসী। মেদিনীপুর, কটক, বালেশ্বর হইতে আগত ভূঞমালী জাতিও এখানে বাস করে।

সমগ্র ২৪পরগণা জিলার জাতীয় পরিবর্ত্তনের বিবরণ প্রদান করা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। "পঞ্চান্ন গ্রামের" মধ্যে কলিকাতা ব্যতীত অপরাংশের বিবরণ সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল।

"পঞ্চান্নগ্রাম" বলিলে কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ ৫৫ খানি গ্রামকে বুঝাইত, যাহা ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ বণিকের সহিত মীরজাফরের সন্ধিসর্ত্তে কোম্পানী বাহাদুর বিনা খাজনায় প্রাপ্ত হন। ইহার মধ্যগত যে ভূভাগ মহারাষ্ট্র নালা (মারহাট্টা ডিচ) দ্বারা সীমাবদ্ধ তাহাই কলিকাতা মহানগর বলিয়া গণ্য ছিল। ইহার অবশিষ্টাংশ এখন ২৪ পরগণার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। দমদমা, টালিস্ নালা, মগ্‌রাহাট সীমান্তর্গত ভূভাগের কথাই উক্ত হইয়াছে।

পোদ (পদ্মরাজ) জাতি এতদঞ্চলের অপেক্ষাকৃত পুরাতন অধিবাসী। ইহারা বিদেশাগত—উত্তর-পশ্চিম বা উত্তর ভূভাগ হইতে কোন বিশেষ কারণে চব্বিশ পরগণায় আগমন করিয়াছিল। বর্ত্তমানে ইহারা এই অঞ্চলের অধিবাসী বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

এই জাতি প্রথমে সুন্দরবনের অধীন লবণাম্বুময় স্থানে ভাগ্যপরীক্ষার্থ বাস করে। ইহারা মৎস্যের ব্যবসা ও কৃষিকর্ম্মে অভ্যস্ত এবং ভীষণ বনপ্রান্তে পৃথকরূপে বাস করিত। পরে সংখ্যাধিক্য হইলে ইহারা বিভিন্ন স্থানে বাস করিতে থাকে।

ক্রমে পোদগণের মধ্যে যাহারা কিঞ্চিৎ শিক্ষিত বা অর্থশালী হইল তাহারা মাছ ধরিত না, কিন্তু মাছের ব্যবসা করিত ও কৃষিকর্ম্ম করিত। এইরূপে একই জাতি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া এক ভাগ "ভদ্র" ও অন্যভাগ মৎস্যজীবী হইয়াছে।

এই জাতি প্রথমে কৃষি ও ধীবরের কর্ম্মদ্বারা উন্নতিলাভ করিয়াছিল। ক্রমশঃ, মুখ্যরূপে ধীবরের কার্য্য ত্যাগ করিয়া জমিদার বা কালেক্টরী হইতে খাজনায় ভেড়ী (সীমাবদ্ধ লোণা জলাভূমি—যেখানে প্রচুর মৎস্য জন্মে) বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া, অথবা কোরফা প্রজারূপে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য গ্রহণ করিয়া, ধীবর পোদ দ্বারা গৌণভাবে মাছের কারবার করিত।

কৃষি তখন এজাতির মুখ্য ব্যবসা ছিল না। ইহারা সুন্দরবন হইতে কাঠ, গোলপাতা, হোগ্‌লা প্রভৃতি আনিয়া তাহা সহরবাসীর কাছে বিক্রয় করিত। লোণা ভূমিকে 'বাদা' বলে। বাদার যে স্থান জোয়ারের জলে ডুবিয়া যায় কিন্তু সর্ব্বদা জলমগ্ন থাকে না, তথায় প্রচুর 'ঘাস' জন্মিয়া থাকে। ইহারা এই ঘাসের জমি বন্দোবস্ত লইয়া ঐ ঘাস কাটিয়া, শুষ্ক করিয়া, আটি বাঁধিয়া, কলিকাতার ঘাস-পটির ব্যবসাদারদিগকে বিক্রয় করিত। এই শুষ্ক ঘাস অশ্বের প্রধান খাদ্য।

বাদা জলার মধ্যে স্থানে স্থানে উচ্চ ভূখণ্ড আছে, তথায় উলু-ঘাস জন্মায়। সেই ঘাসকে 'উলু খড়' বলে। তাহারা এই উলু খড়ের ব্যবসাও করিত।

চুণ প্রস্তুত করিবার জন্য বিবিধ প্রকার ঝিনুক, জোম্‌ড়া এবং এক পোয়া হইতে অর্দ্ধসের ওজনের বড় ঝিনুক (যাহাকে 'কস্তুরো' বলে) সুন্দরবনের খালে যথেষ্ট পাওয়া যায়। উহারা এই সকল সংগ্রহ করিয়া চুণ প্রস্তুত-কারকদিগকে বিক্রয় করিত।

এই সকল কর্ম্ম তৎকালে অন্য ভদ্রলোকে করিত না।

এই সকল কর্ম্মে, ইহাদের প্রতিযোগীও বড় কেহ তখন দেখা দেয় নাই। সুতরাং বিবিধ কর্ম্ম দ্বারা এই জাতি যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ধনী হইয়া উঠে।

ক্রমে ক্রমে ইহাদের প্রতিযোগী দেখা দিল। ভেড়ী, মৎস্য, কাঠ, ঘাস, চুণের উপাদান প্রভৃতির ব্যবসা এই জাতির হাত হইতে প্রতিযোগীদের হস্তগত হইতে লাগিল। শুষ্কমৎস্য (শুট্‌কীমাছ) প্রস্তুত ও বিক্রয় করা একটী বিশেষ লাভের ব্যবসা। এ ব্যবসাও ইহাদের হাত হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন লোকের অধিকারে গেল। সুতরাং এই জাতির ধনিগণ মহাজন রূপে দেখা দিল। তাহারা জলকর জমা লইয়া উহা অন্য লোককে বিলি করিত। যাহারা দরিদ্র, তাহারা মহাজনগণের খাতক ও প্রজারূপে আর্থিক সচ্ছলতার জন্য ব্যস্ত হইল।

দরিদ্র পোদগণের উপর শ্রমসাধ্য কর্ম্মগুলি সমর্পণ করিয়া ধনী পোদেরা নিশ্চিন্ত হইল। দরিদ্রগণ কঠোর পরিশ্রমে উন্নত হইতে আরম্ভ করিল। এই পোদই দ্বিতীয় শ্রেণীর পোদ। ইহারাই প্রথম শ্রেণীর ধনী বা মহাজন পোদ হইতে নিম্ন সোপানে অবস্থিত। পরবর্ত্তী কালে এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে যাহারা অর্থশালী হইল, তাহারা প্রথম শ্রেণীর সহিত মিলিত হইয়া গেল। দরিদ্র শ্রমজীবীরাই পতিত হইয়া রহিল।

প্রথম শ্রেণীর মধ্যে যাহারা অর্থহীন তাহারাই কৃষি-কার্য্যে মনোযোগী হইল। সভ্যতার খাতিরে এবং স্বজাতীয় সভ্য সমাজের সামাজিক শাসনের ভয়ে তাহারা পুনশ্চ পূর্ব্বাচরিত কর্ম্ম গ্রহণ করিল না। প্রথম শ্রেণীর মধ্যে বিদ্যার চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছিল। জীবিকানির্ব্বাহার্থ এই সময় এই শ্রেণীর অনেকে মুদীর দোকান, কাপড়ের দোকান ইত্যাদি খুলিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে ভদ্র জাতির অনুকরণে ইহারা উকিল, মোক্তার, ও নানাবিধ কর্ম্মচারিরূপে দেখা দিল। এই শ্রেণী ভদ্র হইল এবং পূর্ব্ববৃত্তিধারী দরিদ্র পোদগণের সহিত একজাতীয়তার বন্ধন হইতে মুক্তি-লাভের প্রয়াস পাইল।

এই প্রকার স্বাভাবিক উপায়ে জীবন-ধারার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমান কালে এই জাতির মধ্যে, জমিদার, মহাজন, ব্যবসাদার, কর্ম্মচারী, ডাক্তার, মোক্তার উকিল দেখা দিয়াছে।

প্রথম শ্রেণীর মধ্যে দরিদ্রের সংখ্যা পরিবর্দ্ধিত হইল। জাতীয় প্রথমিক কর্ম্ম-সংস্কারের বিরোধী হইয়া এবং নির্দ্দিষ্ট সভ্যসমাজের পোষাকী অনুকরণ করিয়া ইহারা লাভজনক বিবিধ জাতীয় কর্ম্মকে ঘৃণা করিতে লাগিল। প্রতিযোগী বা প্রতিদ্বন্দ্বী বিভিন্ন কর্ম্মঠ জাতি, এই সময়ে পোদগণের যাবতীয় কর্ম্মগুলি, একে একে গ্রহণ করিয়া উন্নত হইতে লাগিল। প্রতিযোগিতায় ইহাদের পরাজয়ের যুগ প্রবর্ত্তিত হইল।

দ্বিতীয় শ্রেণীয় দরিদ্র পোদগণ প্রতিযোগিতায় সহজেই পরাজিত হইয়া কঠোর দরিদ্রতার শাসনে বলহীন হইয়াছে ও পরের দাসত্ব করিয়া ধ্বংস পাইতেছে। প্রথম শ্রেণীর মধ্যে যাহারা দরিদ্র, তাহাদের অবস্থাও সাংঘাতিক হইয়াছে। এই জাতির সংখ্যা নিতান্ত কম নহে; কিন্তু ইহাদের অবনতির যুগ আরম্ভ হইয়াছে।

(২)

কাওড়া ও কেওট জাতি পোদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। পোদগণের ভেড়ী ও মাছের ব্যবসা ইত্যাদি ইহারাই গ্রহণ করিয়াছে। ইহারা স্ত্রী-পুরুষে মাছ ধরে, কাঁকড়া ধরে এবং হাটে-বাজারে ঐসব বিক্রয়ার্থ গমন করে। এই দুই জাতির মধ্যে কাওড়া জাতি সংখ্যায় কেওট অপেক্ষা অধিক এবং সাংসারিক সচ্ছলতায়ও উন্নত। এই দুইজাতি মূলতঃ এক। কেওট প্রথমাগত, কাওড়া পরবর্ত্তী কালে আসিয়াছে।

প্রথমাগত কেওট পোদগণের পরিত্যক্ত ব্যবসা কর্ম্মগুলি গ্রহণ করিয়া উন্নত হইতেছিল এবং ক্রমেই পোদগণের অনুকরণে ভিন্নপ্রকৃতি-বিশিষ্ট হইতে আরম্ভ করিল। উহারা মাছের ব্যবসা ব্যতীত কোনো ব্যবসা অবলম্বনের প্রয়োজন উপলব্ধি করিল না। কারণ, কলিকাতায় যথেষ্ট লোকসংখ্যাধিক্য-নিবন্ধন মাছের মূল্য, পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। যে এক ঝুড়ি মাছের মূল্য পূর্ব্বে আট আনা ছিল, তখন সেই মাছই দুই টাকায় বিক্রয় হইত। অল্প পরিশ্রমে অধিক লভ্য হওয়ায় এবং স্ত্রী-পুরুষে অর্থ উপার্জ্জন করায় ইহাদের ব্যয় অপেক্ষা আয় অনেক বেশী

হইত। ক্রমে এই জাতি শ্রমকাতর হইতে আরম্ভ করিল।

কাওড়া আসিয়া কেওটদের অধিকারে দৃঢ়পদে দাঁড়াইল। ধীরে ধীরে এই কর্ম্মঠ শ্রমসহিষ্ণু জাতি কেওটদের কর্ম্মগুলি স্ত্রীপুরুষে আয়ত্ত করিয়া কেওটদিগকে স্বকার্য্যে শ্রমিকরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিল। কেওটগণ কাওড়াদের মজুর হইতে আরম্ভ করিল। এখন কেবল ইহাদের নারীরা মাছ, কাঁকড়া ধরিয়া বা ক্রয় করিয়া হাটে-বাজারে বিক্রয় করিয়া থাকে। কেওট জাতি এই প্রকারে ধ্বংসের পথে ধাবিত হইয়াছে। ইহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ ক্ষীণ ও অবস্থা অতীব দরিদ্র হইতেছে। কাওড়া ক্রমশঃ বাড়িতেছে। ইহারা মাছ ধরিয়া বিক্রয় করে, জমি চাষ করে ও দোকান করে। ইহারা ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে।

পূর্ব্বের ন্যায় ভেড়ীতে আর যথেষ্ট মাছ হয় না, বিশেষতঃ কলিকাতার পারিপার্শ্বিক ভেড়ীগুলি ক্রমশঃ ভরাট হইয়াছে এবং হইতেছে। তদুপরি ভেড়ী, খাল ও জলাগুলির খাজনা পূর্ব্বাপেক্ষা অন্ততঃ শতকরা একশ' টাকা বর্দ্ধিত হইয়াছে। ভেড়ীর মালিক এখন কেবল পোদগণ নহে। উহা ব্রাহ্মণাদি ভদ্রজাতির জমিদারীর মধ্যে গণ্য হইয়াছে, নগণ্যাংশ মাত্র পোদগণের হস্তে রহিয়াছে। কাওড়া এবং পোদগণ, কোরফা স্বত্বে এবং নির্দ্দিষ্ট কালের (ঊর্দ্ধ সংখ্যায় তিন বৎসরের) জন্য ভেড়ী ইজারা লইয়া থাকে। খাজনা অসম্ভবরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছে বলিয়া লাভ প্রায়ই হয় না। বর্ত্তমানে মাছের বাজারদর দশগুণ বা তদপেক্ষাও অধিক হওয়ায় ভেড়ীর খরচ, খাজনা ইত্যাদি দিয়া যাহা লাভ হয় পূর্ব্বের তুলনায় তাহা কিছুই নহে। তদুপরি বরফ দ্বারা মৎস্য-সংরক্ষণের উপায় প্রবর্ত্তিত হওয়ায় রেলযোগে বঙ্গের দূরবর্ত্তী স্থান হইতে, কলিকাতায় প্রচুর মৎস্যের আমদানি হইতেছে; সুতরাং লোণা ভেড়ীর মাছের মূল্য দিন দিন কমিয়াই যাইতেছে, অথচ ভেড়ীর খাজনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হওয়ায় পোদ, কেওট, কাওড়াদের অবস্থা শোচনীয় হইয়াছে।

পোদেরা নানা কর্ম্মে লিপ্ত হইয়াছে, কাওড়ারাও একাধিক ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে, কিন্তু কেওটগণ তদ্রূপ কিছুই করে নাই। তাই কেওট প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। পোদগণের মধ্যে মাটী-কাটার মজুরের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে এবং বিবিধ উপায়ে ও বিবিধ কর্ম্ম অবলম্বনে অর্থার্জ্জনের প্রয়াস দেখা যাইতেছে। (ক্রমশঃ)

তর্ক-প্রশ্ন

১। "আর্থিক উন্নতির" ভুলচুক

শ্রাবণ মাসের "আর্থিক উন্নতি" সম্বন্ধে আমার কয়েকটী মন্তব্য আছে, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম :—

(১) "২০০০ ক্রোর টাকার ফসল" শীর্ষক সংবাদে লিখিত হইয়াছে, উন্নত প্রণালীতে চাষ কায়েম করার জন্য ফসলের কিম্মৎ বাড়িয়াছে ৩০ ক্রোর টাকা। অর্থাৎ কিম্মৎ বৃদ্ধির হার শতকরা ১½ ভাগ দেখাইয়াছেন। এই যে কিম্মৎ-বৃদ্ধি, ইহা জমিতে উন্নত প্রণালীর চাষ কায়েম করার জন্য, না ফসল বিক্রয়ের দর-বৃদ্ধি হওয়ার জন্য? যদি উন্নত প্রণালীর চাষ কায়েম করার জন্যই হয় তাহা হইলে আলোচ্য বর্ষের উৎপন্ন ফসলের পরিমাণের সহিত তৎপূর্ব্ব বৎসরের উৎপন্ন ফসলের পরিমাণের তুলনা হইলে আপনাদের মতানুযায়ী কারণ বিবেচিত হইতে পারিত।

(২) "বঙ্গে বৃত্তি-শিক্ষা"—ইহাতে বঙ্গের বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বৃত্তি-শিক্ষার্থী ছাত্রদের সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই সংবাদটী কেবলমাত্র গভর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগের কার্য্য-বিবরণী হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এই জন্য গভর্ণমেণ্টের শিল্প-বিভাগের শ্রীরামপুর-উইভিং ইনষ্টিটিউট ও কয়েকটি টেকনিক্যাল স্কুল এবং কৃষিবিভাগের ঢাকা এগ্রিকালচারল স্কুল ও চীনসুরা

এগ্রিকালচারল স্কুল এবং বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের সুবৃহৎ টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটের কথা বাদ পড়িয়াছে। ঐ সকল শিক্ষালয়ের উল্লেখ থাকিলে আপনাদের সংবাদটী নিখুঁত হইত।

(৩) "স্ত্রীশিক্ষায় হিন্দু ও মুসলমান" শীর্ষক সংবাদে 'শান্তি-বার্ত্তা' হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন—হিন্দু ছাত্রীর সংখ্যা ১,৩৫,২০৯ এবং মুসলমান ছাত্রীর সংখ্যা ১,৮১০৩৬। আমার মনে হয় এই সংবাদ যাচাই করিলে ইহার সত্যতা প্রমাণিত হইবে না। আমার কাছে এখন বঙ্গীয় শিক্ষা-বিভাগের কোন নজির নাই, তবুও প্রসঙ্গতঃ স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে বর্ত্তমান আগষ্ট মাসের মডার্ণ রিভিউ (১২৭ পৃঃ) হইতে একটী কথা উল্লেখ করিতেছি—বাংলা দেশে ২০ বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্কা ইংরেজী-শিক্ষিতা স্ত্রীদিগের সংখ্যা ২৬,৮০৯। তন্মধ্যে ১,৭৪৯ জন মুসলমান ও বাকী ২৫,০৬০ অ-মুসলমান। যদিও আপনাদের সংবাদে উল্লেখ আছে উচ্চতর বিদ্যালয়ে ও কলেজে অ-মুসলমান ছাত্রীর সংখ্যাই বেশী, তবু মডার্ণ রিভিউর সংবাদের সহিত আপনাদের সংবাদের অনুপাতের এত পার্থক্য যে, আপনাদের সংবাদ সত্য হইলে বলিতে হইবে মুসলমানদিগের স্ত্রীশিক্ষার জন্য চেষ্টা আমাদের অনুপাতের কল্পনাকে অতিক্রম করিয়াছে।

(৪) "গত সনের রপ্তানি" বিষয়ক সংবাদটী বেশ হইয়াছে। ইহাতে উৎপন্ন জিনিসের পরিমাণ ও তাহার রপ্তানির অংশ নির্ণীত হইয়াছে। এই সঙ্গে যদি রপ্তানি অংশের মূল্যও দেওয়া থাকিত তাহা হইলে আমার ও আমার ন্যায় অন্যান্য পাঠকের জিনিসের দাম জানিবার সুবিধা হইত। আপনাদের কাছ হইতে যদি এইরূপ 'উপরস্ত' খবরের আশা করা অসঙ্গত মনে করেন তাহা হইলে আমার বলিবার কিছু নাই।

(৫) "দুধ দুর্ম্মূল্য কেন"—এ সম্বন্ধে সাপ্তাহিক "বরিশাল" যাহা বলিয়াছেন তাহা যথার্থ। আমি এই প্রসঙ্গে আরও বলিতে চাহি কলিকাতায় এমন অনেক প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ ও সবল 'বাবু' আছেন যাঁহারা গোয়ালার দুগ্ধ পান না করিলে দিন অতিবাহিত করিতে পারেন না। গরিব শিশুদিগের মুখ হইতে এরূপ দুগ্ধ কাড়িয়া লওয়াকে আমি পাপ মনে করি। ইতি

ল্যাবরেটরী
কেপ কপার কোম্পানী লিঃ
রাখামাইন্‌স
সিংভূম। — শ্রীজগজ্জ্যোতি পাল

উত্তর

এইরূপ সমালোচনা পাইয়া আমরা যারপর নাই উপকৃত হইয়াছি।

(১) এই প্রবন্ধে "বৃদ্ধির হার" সম্বন্ধে কোনো কথা বলা হয় নাই। তুলনা করা উদ্দেশ্য ছিল না। একটা তথ্য বিবৃত হইয়াছে মাত্র। কাজেই কোনো কারণ আলোচনা করা যায় নাই। অঙ্কে বুঝানো হইয়াছে মাত্র এইটুকু যে, উন্নত প্রণালী অবলম্বিত না হইলে কিম্মৎ দাঁড়াইত ১৯৭০ ক্রোর।

(৩) শিক্ষিতা বাঙালী নারীর সংখ্যা ১৯২১ সনের সেন্সাস অনুসারে নিম্নরূপ :—

	০-১০ বৎসর	১০-১৫ বৎসর	১৫-২০	২০ এর উপর
হিন্দু	২৭,৪৯৬	৫১,৫৯২	৫২,১১১	১৮৫,৯৯১
মুসলমান	৮,৩২২	১১,৯২১	১০,৪৬৫	২৮,৬৭১

আমাদের ছাপায় ভুল ছিল। সংশোধন করিবার সুযোগ পাইলাম বলিয়া লেখককে ধন্যবাদ দিতেছি। ইতি—সম্পাদক।

২। বাংলা শর্টহ্যাণ্ড

আর্থিক উন্নতির জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় "বাংলা শর্টহ্যাণ্ড" বলে একটা প্রবন্ধ পড়লাম। লেখক শ্রীইন্দ্রকুমার চৌধুরী কে আমি জানি না, তবে প্রবন্ধেই প্রকাশ যে তিনি ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রেখাক্ষর বর্ণমালা থেকে স্বয়ং নাকি আর একটা শর্টহ্যাণ্ড আবিষ্কার করেছেন।

আলোচ্য প্রবন্ধের প্রথমে তিনি লিখেছেন "গত ১৯২১ সন হইতে পুলিশের জনকয়েক লোক এবং আমি প্রণালী-বদ্ধভাবে বক্তৃতাদির রিপোর্ট লিখিতে আরম্ভ করি। অবশ্য ১৯২১ সনের পূর্ব্বেও পুলিশের লোকেরা বক্তৃতার আপত্তিজনক অংশ টুকিয়া লইবার জন্য কতকগুলি সঙ্কেত

বা কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছিলেন; এবং সেইটিই ক্রমোন্নতিতে যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহাই পুলিশ-বিভাগের বর্ত্তমান শর্টহ্যাণ্ড-প্রণালী।"

এই সম্বন্ধে বলতে চাই যে, প্রথমতঃ "পুলিশ বিভাগের বর্ত্তমান শর্টহ্যাণ্ড-প্রণালী" বলে কিছু নেই। যে শর্টহ্যাণ্ড গবর্ণমেণ্ট রিপোর্টাররা ব্যবহার করে, তার আবিষ্কারক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ। এসম্বন্ধে তিনি যে বই ছাপিয়েছেন তা সর্ব্বসাধারণে কিনে শিখতে পারে, তাতে কোন বাধা নেই। অনেক বে-সরকারী কর্ম্মচারী তা শিখেছে এবং শিখছে। এটা শুধু "কতকগুলি সঙ্কেত বা কৌশল"এর "ক্রমোন্নতিতে" দাঁড়ায় নি, অথবা আপত্তি-জনক অংশ তুলে নেবার জন্যও এর সৃষ্টি হয় নি। একে দস্তুরমত বিজ্ঞানসম্মত উপায়ের উপর ভিত্তি করে একটা বিশিষ্ট শাস্ত্রের মত গড়ে তোলা হয়েছে। যাঁদের "পুলিশের জন কয়েক লোক" বলা হয়েছে তাঁরা সকলেই গ্র্যাজুয়েট এবং বাংলা জ্ঞানের প্রতিযোগিতার পরীক্ষায় বৃত্তিধারী যুবক। বর্ত্তমানে তাঁদের সম্বন্ধে বেশী বলা নিষ্প্রয়োজন।

তারপর ইনি লিখেছেন "এটা অনেকটা ইংরেজী পিটম্যান শর্টহ্যাণ্ডের বাংলা অনুকরণ"। বাইরে কতকটা সামঞ্জস্য থাকলেও বাংলা ইংরেজীতে কতটা তফাৎ তা খ ঘ ছ ঝ ঠ ঢ থ ধ ফ ভ এবং ক্ষ ঞ্জ ণ্ট ন্ত ম্প ইত্যাদি অজস্র যুক্ত বর্ণমালার সন্ধান নিলেই বোঝা যায়। আমার মনে হয়, এ বিদ্যার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে লেখকের বিশেষ কিছু জানা নেই, নতুবা তিনি এরকম লিখতেন না।

অতঃপর ইনি লিখেছেন "আমি সে প্রণালীতে যাই নাই।" সাধু! ইনি নাকি ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বর্ণ-মালা থেকে "প্রত্যক্ষভাবে" কাজ করেছেন।

কিন্তু পরলোকগত মনস্বী ৺ঠাকুর মহাশয়ের পুণ্য স্মৃতির প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা দেখিয়ে আমি বলতে চাই, তিনি যে প্রণালীতে রেখাক্ষর করতে চেয়েছেন তা কখনো চলতে পারে না। তা মোটেই বিজ্ঞানসম্মত নয়। তাঁর বই আমি দেখেছি। তাঁর কোণ-বিশিষ্ট লেখার সঙ্গে সিংহ মহাশয়ের আবিষ্কৃত প্রণালীর তুলনা করলে নিঃসংশয়ে বোঝা যায় কোন্‌টি ভালো ও কার্য্যোপযোগী।

এই শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহকে সাধারণে জানে না, কারণ তিনি নামের চেষ্টা কোনদিন করেন নি। আজকের দিনে এঁর পরিচয় দরকার হয়ে পড়েছে, কারণ বাংলা শর্টহ্যাণ্ড নিয়ে প্রায়ই আলোচনা চলছে।

১৮৯২ সনে দ্বিজেন বাবু যখন মাত্র ২১ বৎসরের যুবক তখন বাংলা শর্টহ্যাণ্ড সম্বন্ধে প্রথম বই বার করেন।

তারপর "বাংলা ভাষায় সঙ্কেতলিখন-প্রণালী শিক্ষা দেবার প্রয়োজন হওয়ায়, ১৯০৭ সনে উপযুক্ত লোক নির্ব্বাচনের জন্য স্যার এইচ ষ্টুয়ার্ট, স্যার চার্লস ষ্টিফেনসন মুর, শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর মিঃ আর্ল, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রায় বাহাদুর ঈশানচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতিকে নিয়ে এক কমিটি তৈরী হয়। ঐ কমিটি দ্বিজেন বাবুকেই এই ভার অর্পণ করেন। সেই কমিটিতেই আবার স্থির হয় যে, দ্বিজেনবাবুর প্রবর্ত্তিত শর্টহ্যাণ্ড যদি কার্য্যকর হয় তবে তাঁকে সরকার থেকে এককালীন হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

১৯০৯ সনে রাঁচি পুলিশ ট্রেনিং কলেজের ছাত্রদের শর্টহ্যাণ্ড পরীক্ষায় আশার অতীত ফল হওয়ায় দ্বিজেনবাবুকে সেই পুরস্কার দেওয়া হয়। পরীক্ষক ছিলেন স্বয়ং শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর ও গভর্ণমেণ্ট কমার্শিয়াল ইন্‌ষ্টিটিউটের লেক্‌চারার মিঃ ডি, এল, দত্ত।

১৯১৮ সনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত ছেলেদের মাসিক ৭৫৲ বৃত্তি দিয়ে বাংলা শর্টহ্যাণ্ড শেখাবার ব্যবস্থা হয়। বৃত্তি দেবার কারণ, ভাল ছেলেরা নিজের পয়সা খরচ করে কিম্বা অল্প পয়সার প্রলোভনে দু'বছর ধরে এমন একটা জিনিষ শিখ্‌তে রাজী হয় নি, যার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত কোনো ভরসা দেওয়া যায় না।

১৯২০ সনে কমার্শিয়াল ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রিন্সিপাল রায় সাহেব গিরীন্দ্রকুমার সেন আর রায়বাহাদুর এস, সি, মজুমদারের পরীক্ষায় যুবকেরা মিনিটে ১৩০ কথা লিখিতে কৃতকার্য্য হয়। সে সময় পরীক্ষকদ্বয় ইংরেজীতে যে সরকারী রিপোর্ট লিখেছিলেন বাংলায় তার সারাংশ দেওয়া গেল—

"বাংলায় শর্টহ্যাণ্ড লিখে তা এত সুন্দরভাবে রেখান্তরিত করতে দেখে আমরা বিস্মিত হয়েছি। ১৩০টা

বাংলা কথা, আমাদের মনে হয়, ইংরেজী ১৬০টা কথার সমান। সে দক্ষতা লাভ করতে হলে তিন বৎসরের অবিশ্রাম পরিশ্রম চাই।

আমরা মনে করি এই ছাত্রদের দ্রুতলিখনের এমন ভিত্তি তৈরী হয়েছে যাতে তারা বাংলায় রিপোর্ট করতে পারে।"

এই যে ভদ্রলোক ২১ বছর বয়স থেকে এত বছর বাংলা শর্টহ্যাণ্ড নিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করে এলেন, তার দরুণ পাশ্চাত্য জগতের তুলনায় তিনি কি পুরস্কার পেয়েছেন?

সুদূর আমেরিকা, ইটালী, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, ইংলণ্ড, স্পেন প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে যে প্রণালী বিজ্ঞানসম্মত বলে গৃহীত হয়েছে তাকে শুধু "লোকের বক্তৃতার আপত্তিজনক অংশ টুকিয়া লইবার জন্য কতকগুলি সঙ্কেত বা কৌশলের ক্রমোন্নতি" বলা আমার বিবেচনায় ধৃষ্টতা মাত্র।

আমার মনে পড়ে গবর্মেণ্ট থেকে গত বৎসর লোকের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। লেখক সে সময় কোথায় ছিলেন? তিনি কি সংবাদ রাখেন না?

দ্বিজেন্দ্র বাবুর সম্বন্ধে বর্ত্তমান প্রবাসী সম্পাদক "প্রদীপে" লিখেছিলেন—

"এই প্রবন্ধের লেখক বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয়ের পরিচয় বোধ হয় সকল পাঠক অবগত নহেন। ইনি রেখাশব্দাভিজ্ঞান-বিদ্যায় একজন পারদর্শী ব্যক্তি। বাঙ্গালা ভাষায় সঙ্কেতলিখন-প্রণালী ইঁহার উদ্ভাবিত। থ্যাকার স্পিঙ্ক কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত ইঁহার "রেখাশব্দাভিজ্ঞান" পুস্তক শিক্ষিত সমাজে সাদরে গৃহীত হইতেছে। ইংলণ্ড, আমেরিকা ও জার্ম্মাণী দেশের রেখাশব্দাভিজ্ঞানবিৎ সমাজেও এই পুস্তকের বিশেষ প্রশংসা হইয়াছে ও তৎসমাজ হইতে দ্বিজেন্দ্র বাবু অশেষ উৎসাহ এবং নানাক্ষর-বিশিষ্ট উপাধিমালা প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

সে বহুকালের কথা। এখন দেশের লোক তাঁর পরিচয় জানে না বলে, যাঁদের কাছে তিনি পরিচিত তাঁরাও যদি তাঁর প্রবর্ত্তিত সুন্দর প্রণালীটিকে "পুলিশের শর্টহ্যাণ্ড" বলে হেয় করবার চেষ্টা করেন, তাহলে সেটা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় নয় কি?

স্যার আইজ্যাক পিটম্যানও দ্বিজেন্দ্র বাবুর কৃতিত্বের প্রশংসা করেছেন। সে ১৮৯৪ সনের কথা।

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু, বি-এ

৩। সমালোচিত গ্রন্থপত্রিকার দাম

আর্থিক উন্নতিতে যে সকল পুস্তক সম্বন্ধে উল্লেখ, সুপারিস বা সমালোচনা থাকে, তাহাদের সকলগুলির নাম ও দাম সকল সময়ে যথাযথভাবে লিখিত হয় না। উদাহরণ স্বরূপ "শেয়ারের বাজারের চড়াই উৎরাই সম্বন্ধে একখানা মাসিক পত্রে"র (আঃ উঃ বৈশাখ) এবং "ইনল্যাণ্ড ট্র্যান্সপোর্ট অ্যাণ্ড কমিউনিকেশ্যন ইন মিডিভ্যাল ইণ্ডিয়া"র (আঃ উঃ জ্যৈষ্ঠ) কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। যদি এইরূপ সকল পুস্তকের বা মাসিকের নাম এবং দাম সকল সময়েই সম্পূর্ণভাবে লিখিত হয়, তাহা হইলে মফঃস্বলের পাঠকদিগের এবং আমাদের ন্যায় অসূর্য্যম্পশ্য জীবদিগের একটু সুবিধা হয়, এবং আর্থিক সাহিত্যপ্রচারের পক্ষেও ভাল হয়। ইতি—

সি, আই, ডি কর্ত্তৃক "সেন্সর্ড অ্যাণ্ড-পাস্ড্" — শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেটিনিউ, আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল

উত্তর

অনেক সময়েই দাম বইয়ের গায়ে লেখা থাকে না। ইতি—সম্পাদক।
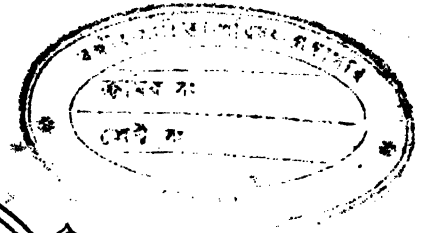
১০৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে শ্রীরঘুনাথ শীল, বি, এ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১ম বর্ষ—৬ষ্ঠ সংখ্যা

আশ্বিন—১৩৩৩

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি॥

অথর্ব্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জন্ম আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।
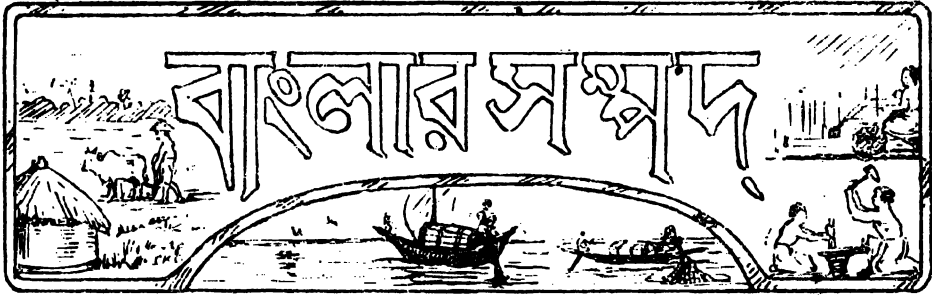
কলিকাতায় মোটর-বৃদ্ধি ও দুর্ঘটনা

১৯২৫ সনে কলিকাতার রাজপথসমূহে মোটর বাসের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ২৫৩। ১৯২৪ সনে ঐ সংখ্যা ছিল ১৪ এবং তার আগের বছর ছিল মাত্র ৬। এই বৃদ্ধির ফলে মোটর-দুর্ঘটনার সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে হতাহতের সংখ্যা যথাক্রমে ১২৫ ও ১৫৭৫। ইহার মধ্যে ৮৮ জন হত ও ৯৫০ জন আহতের জন্য মোটর ভেহিক্যালস দায়ী। ১৯২৪ সনে হতাহতের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৭১ ও ৮৪৬।

হাওড়া পুল আইন

কলিকাতা এবং হাওড়ার মধ্যে গঙ্গার উপরে যে ভাসমান পুল আছে, তাহা বদলাইয়া তাহার স্থানে একটা নূতন সেতু তৈয়ারীর জন্য কয়েক বৎসর হইতেই চেষ্টা চলিতেছিল। প্রায় ৫২ বৎসর পূর্ব্বে ১৮৭৪ সনে এই সেতু নির্ম্মিত হয়। তখন ইঞ্জিনিয়ার বলিয়াছিলেন যে, সেতুটী ত্রিশ বৎসর আন্দাজ বেশ চলিবে। তদনুসারে ১৯০৯ সন হইতেই ইহাকে বদলাইয়া ইহার স্থানে একটী নূতন সেতু নির্ম্মাণ করিবার কথা উঠে। কিন্তু কথায় কথায় ১৫।১৬ বৎসর চলিয়া গিয়াছে, কাজ কিছুই হয় নাই। মধ্যে একবার পোর্টকমিশনারেরা বলিয়াছিলেন যে, পুলটির অবস্থা এতই খারাপ হইয়াছে যে, কখন খসিয়া পড়িবে তাহা বলা যায় না। তাহার পর হইতেই নূতন পুল তৈয়ারীর জন্য তাড়া পড়িয়া যায়। ১৯২৪ সনে এ সম্বন্ধে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক 'বিল' অর্থাৎ আইনের খসড়া পেশ হইয়াছিল। তাহার পর ইহা "সিলেক্ট কমিটিতে" দেওয়া হয়। সিলেক্ট কমিটির নির্দ্দেশ মত বিগত ১২ই জুলাই বাংলা কাউন্সিলে বিলটি পাশ হইয়া গিয়াছে। পুলটা কিরকমের হইবে তাহা এখনও স্থির

হয় নাই। পোর্টট্রাষ্ট যেরূপ ভাল মনে করিবেন, সেইরূপই করিতে পারিবেন। তবে ট্যাক্সের হারটা ঠিক হইয়া গিয়াছে। স্থির হইয়াছে,—কলিকাতার জমির বাৎসরিক ভ্যালুয়েশনের উপর শতকরা আট আনা হিসাবে কর আদায় করা হইবে।

দুই লক্ষ পশুর জন্য একজন চিকিৎসক

একজন ডিরেক্টর ও তাঁহার ২ জন সহকারী, ৮ জন ইনস্‌পেক্টর ও ১২০ জন মাত্র ভেটারিনারী অ্যাসিষ্ট্যান্ট সার্জ্জন বিরাট বাংলা দেশের পশুর কল্যাণের জন্য নিযুক্ত আছেন। এর দ্বারা দেখা যায় একজন ভেটারিনারী অ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জন বা পশুর ডাক্তারের ভাগে ২০৬০৩৫টি পশুর চিকিৎসার ভার পড়ে। আবার তাঁর কাজের বহর কতটা দেখুন,—

(১) পশুর টীকা দেওয়া,
(২) স্থানীয় ফার্ম্ম কর্ত্তৃক নিযুক্ত পশু পরিদর্শন,
(৩) মেলা ও মড়কের স্থানে গমন,
(৪) মারীর বিস্তৃতি নিবারণকল্পে উপায়-উদ্ভাবন,
(৫) আফিসের কাজ।

তার দৈনন্দিন কাজ অত্যধিক বলিতে হইবে।

সারা বাংলাদেশে মাত্র ১৪৫টি ষাঁড় আছে যদ্দ্বারা পাল দিবার কার্য্য উপযুক্তরূপে চলিতে পারে।

কুলীর জীবনের মূল্য

কলিকাতা হাইকোর্ট কুলীর জীবনের মূল্য তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ২০০৲ টাকা জরিমানা স্থির করিয়াছেন। আসামের চা-বাগানের বিয়েটি নামক একজন সাহেব তেলু নামক একজন কুলীকে গুরুতররূপে প্রহার করিয়া হত্যা করার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিল। জোর-হাটের সেসন্স জজ চারজন ইউরোপীয় জুরী ও একজন দেশীয় জুরীর সঙ্গে একমত হইয়া বিয়েটীকে বেকসুর খালাস দেন। হাইকোর্টে আপীলের পর পূর্ব্বোক্তরূপ বিচারফল বাহির হইয়াছে। অথচ মজা এই যে, বিয়েটীর আঘাতেই যে তেলু প্রাণ হারাইয়াছে হাইকোর্ট তাহা স্বীকার করিয়াছেন। বিয়েটী তেলুর অপেক্ষা বলশালী তাহাও প্রকাশ পাইয়াছে। এ অবস্থায় এই প্রকার প্রহারে তেলুর প্রাণ-সংশয় হইতে পারে এ ধারণা বিয়েটীর ছিল, অন্ততঃ একজন সাধারণ লোকের এ ধারণা আছে, আইনের চোখে তাহা ধরিয়া লইতে হইবে। কিন্তু "সাতকাণ্ড রামায়ণ শুনে সীতা রামের মা"। এত কাণ্ড স্বীকার করিয়া লওয়ার পরও মাত্র তিনমাস সশ্রম কারাদণ্ড! (পল্লীবাসী)

পাট ও সরকারী রিপোর্ট

গভর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশে পাটের আবাদ সম্বন্ধে প্রতি বৎসর কয়েকবার আনুমানিক বিবরণ প্রকাশ করিয়া থাকেন। ঐ আনুমানিক বিবরণকে ইংরেজী ভাষায় "জুট ফোরকাষ্ট" বলে। সমগ্র বঙ্গদেশে কত বিঘা ভূমিতে পাটের আবাদ হইয়াছে, জলবায়ুর অবস্থা কিরূপ, মোটের উপর কত পাট উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা ইত্যাদি বিবরণ ঐ "ফোরকাষ্টে" প্রকাশিত হইয়া থাকে। প্রথমে অনুমান যেরূপ হয়, পরিণামে তাহা ঠিক না হইতে পারে। কারণ অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির জন্য পাটের হ্রাস-বৃদ্ধি হইতে পারে। গভর্ণমেণ্টের ঐ আনুমানিক বিবরণের উপর নির্ভর করিয়াই পাটের মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অর্থাৎ সরকারী রিপোর্টে যদি এইরূপ প্রচারিত হয় যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত পাট উৎপন্ন হইবে, তাহা হইলে স্বভাবতই পাটের মূল্য কমিয়া যায়; আবার পাট অল্প উৎপন্ন হইবে এইরূপ সংবাদ সরকারী বিবরণীতে প্রচারিত হইলে পাটের মূল্য বৃদ্ধি পায়।

ঘাটাল অঞ্চলে অন্নাভাব

ঘাটাল মহকুমার মহেশপুর, শ্যামপুর, রামবেড়া মুড়াকাটা, হুড়হুড়া প্রভৃতি গ্রামের প্রজাগণ গত বৎসরের অনাবৃষ্টির ফলে একরূপ অন্নহীন হইয়া রহিয়াছে। তদুপরি বর্ত্তমান বৎসরের অনাবৃষ্টি-নিবন্ধন তাহাদের দুরবস্থার সীমা-পরিসীমা নাই। প্রজাগণ বীজধান্য পর্য্যন্ত নিঃশেষ করিয়া বন্য ফলমূল ও পত্রাদি ভক্ষণ করিয়া জীবন-যাপন করিতেছে। শীঘ্র এতদঞ্চলে সাহায্য প্রদান না করিলে অনেকেই আহারাভাবে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে। শীঘ্র এই অঞ্চলে রিলিফ ওয়ার্ক খোলা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। প্রজাগণ গভর্ণমেণ্টের নিকটও দরখাস্ত করিয়াছে। আশা করি গভর্ণমেণ্ট সত্বর দুঃস্থ ব্যক্তিগণের দুর্দ্দশা-মোচনের আয়োজন করিবেন।

ঘাটাল অঞ্চলের দুর্ভিক্ষ-নিবারণের জন্য পাইকমাজিটা গ্রামে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের কর্ম্মিগণ একটী সাহায্য-কেন্দ্র খুলিয়াছেন তাহাতে প্রায় ২৫ গ্রামের লোক সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। জেলাবোর্ড হইতেও এতদঞ্চলের জন্য সাহায্য প্রদত্ত হইয়াছে।

নূতন রেলের ব্যবস্থা

শুনা যায় ফেনী ষ্টেশন হইতে ১৭ মাইল দূরবর্ত্তী স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের বিলনিয়া পর্য্যন্ত শাখা রেলপথ বিস্তারের জন্য আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানী কর্ত্তৃক জরিপ কার্য্য ভারতগভর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করিয়াছেন। প্রথমতঃ ১০ মাইল দূরবর্ত্তী ফুলগাজী পর্য্যন্ত রেল-রাস্তা হইবে। ফুলগাজী ও পশুরাম পর্য্যন্ত আজ ৩।৪ বৎসর যাবৎ যে প্রকার অবিরাম গতিতে মোটর গাড়ী চলিতেছে তাহাতে রেলওয়ে খুলিলে লাভ হইবার কথা। তবে এই লাইন ফেনী হইতে রাণীরহাট হইয়া পশ্চিম দিকের পাহাড়ের নিকট দিয়া না নিয়া পাঠাননগর কাছারী ও মজুমদার বাজার হইয়া ফুল-গাজী নিলে অধিকতর লাভজনক হইবে।

খাদ্যদ্রব্যের অভাব

বাজারে দুধ, মাছ এবং তরকারী দুর্ঘট হইয়াছে। দুর্ম্মূল্য হইলে তবু অনেক মূল্য দিয়া পাওয়া যাইত, কিন্তু "বরিশাল" বলিতেছেন,—অবস্থা এমন হইয়াছে যে এখন টাকা দিয়াও জিনিষ পাওয়া যায় না। দুধের ৬০ তোলা ওজনের সের চারি আনা হইতে সাড়ে পাঁচ আনা বিক্রয় হয়। মাছ একদম পাওয়াই যায় না। ক্ষুদ্র চিংড়িই এখন সহর-বাসীর প্রধান সম্বল। যত ক্ষুদ্রই হউক চারি পয়সার কমে একটি কই মাছ মিলে না। তরকারীর বাজারও আগুন। হাত দিবার যো নাই। একটি শসা দুই আনার কমে মিলে না, ঝিঙের সের তিন আনা, আলু।৵৹, পটল।৵৹, তাহাও আবার সব সময় আবশ্যক মত পাওয়া যায় না। বাজারের এইরূপ শোচনীয় দুরবস্থা ইহার পূর্ব্বে কোনো দিন দেখা যায় নাই।

টাকাকড়ি বনাম খাদ্যদ্রব্য

বাজারে জিনিষের আমদানি নাই অথচ চাহিদা বাড়িতেছে। প্রত্যেক গৃহস্থ তাহার লাউ, কুমড়া, শসা, ঝিঙে প্রভৃতি লতাকৃষির প্রতি যত্নবান না হইলে এ দুর্দ্দশা আর কোনো দিনই ঘুচিবে না। আমরা বাড়ীতে চাষ-আবাদের কথা ভুলিয়া গিয়া কেবল বাজারের জিনিষের দিকেই চাহিয়া থাকি বলিয়া এই দুর্গতি। মাঠে ভিটায় পাট লাগাইয়া রাতারাতি টাকা করার মোহে এই সব ক্ষুদ্র অথচ একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষগুলির দিকে আমাদের দৃষ্টি কমিয়াছে। তাই বাজারে আর টাকার থলি লইয়া গেলেও তরকারী মিলানো যায় না। এই অবস্থায় যাঁহারা সবচেয়ে অধিক কষ্ট ভোগ করেন, তাঁহারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। আশা করি এইবারে তাঁহারা ঠেকিয়া শিখিবেন যে, বাড়ীর আশে পাশে ক্ষুদ্র জমিটুকুও ফেলিয়া রাখা উচিত নয়। কেবল টাকা লইয়া বাজারের উপর নির্ভর না করিয়া সবলে নিজেদের বাড়ীতে তরকারী উৎপন্ন করার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন। (বরিশাল)

সিংহজানী লোন আফিস

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, সিংহজানী লোনআফিস শতকরা ৭৫৲ টাকা হিসাবে এই বৎসর লভ্যাংশ বিতরণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। আফিসটী ডিরেক্টরগণের চেষ্টায় যেরূপ দিন দিন উন্নতি করিতেছে তাহাতে ডিরেক্টরগণের কার্য্য বিশেষ প্রশংসার্হ সন্দেহ নাই। আমরা এই আফিসটীর উন্নতি কামনা করি। কোম্পানী অল্প সুদে টাকা দাদন করিয়া মহাজনের কবল হইতে দরিদ্র কৃষককে রক্ষা করুন। (শান্তিবার্ত্তা)

চাউলের মণ ৭৷৷৹ টাকা

"প্রান্তবাসী" সংবাদ দিতেছেন, এ অঞ্চলের বহু স্থানে এবার আউশ ফসল বিনষ্ট হইয়াছে। ইহার ফলে চাউলের দাম বাড়িয়া গিয়াছে; মহকুমায় প্রতিমণ ৭৷৷৹ টাকা হইতে ৮৲ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে। দাম আরও বাড়িবে বলিয়া অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন। তবে নৌকা-চলাচলের পথ সুগম হইলে বহুল পরিমাণে চাউল আমদানি হইতে পারে বলিয়া আশা করা যায়।

আসামে রেশম-চাষ

আসাম গবর্মেণ্ট টিটাগর, জোরহাট এবং শিলংএ রেশমের চাষ আরম্ভ করিয়াছেন। এখন যেরূপ রেশম

প্রস্তুত হইতেছে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট রেশম প্রস্তুত করা সরকারের উদ্দেশ্য। এল, এম, দাস নামক ফ্রান্স-প্রত্যাগত জনৈক ধুরন্ধরকে এই বিভাগের সুপারিন্টেন্ডেন্ট নিযুক্ত করা হইয়াছে।

মফঃস্বলে মাছ ও দুধ

এই বৎসর বাজারে মাছের বড় অভাব। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর এই সময়ে বাজারে শ্রীহট্ট অঞ্চলের কই মাছের প্রচুর আমদানি থাকিত। এই বৎসর তাহারও অভাব হওয়ায় এবং খাদ্যদ্রব্যের দাম অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাওয়ায় বড়ই অসুবিধা হইয়াছে।

নেত্রকোণা ক্রমে কি হইতে চলিল? দুধ টাকায় দুই সের, মধ্যে মধ্যে ৷৵০ কি ৷৶০ আনা হিসাবেও সের বিক্রয় হইতেছে। ২।১টী পশ্চিমা স্ত্রীলোক এর মধ্যে পাইকারী আরম্ভ করিয়াছে। ইহারা সকালে বাজারে গিয়াই সমস্ত দুধ খরিদ করিয়া পরে ইচ্ছামত চড়া দরে খরিদ্দারকে সরবরাহ করে। একে বর্ষাকাল, তাহাতে নেত্রকোণার দুধ, সুতরাং জলের ভাগ কতটুকু তাহা ভুক্তভোগীরাই অবগত আছেন।

(প্রান্তবাসী)

গোমতীর উপর সেতু

কুমিল্লার গোমতী নদীর উপর একটী পুলের আবশ্যকতা বহুদিন যাবৎ অনুভূত হইতেছে। যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে গবর্মেণ্ট হইতে নাকি এই পুল মঞ্জুর হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধের সময় অর্থাভাবে উহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। তারপর জলের কল নিয়া ব্যস্ত থাকায় কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত বিষয়টী একেবারে চাপা পড়িয়াছিল। যাহা হউক এখন পুনরায় সকলের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে সহরের লোক-সংখ্যা যেরূপ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে এবং জমির মূল্য যেরূপ অসম্ভবরূপে বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে সহরটীকে উত্তরদিকে বাড়াইবার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সহরটী উত্তরদিকে বাড়াইবার একমাত্র অন্তরায় গোমতী নদী। এই নদীর উপর দিয়া সহজে পার হইবার পথ থাকিলে সহরের কিয়দংশ অনায়াসে নদীর অপর পাড়ে চলিয়া যাইতে পারিত। ইহাতে যে কেবল লোকজনেরই সুবিধা হইত তাহা নয়, মিউনিসিপ্যালিটীর এবং সহরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইত। যদি গোমতী নদী অন্যান্য সহরের নিকটবর্ত্তী নদীর ন্যায় প্রশস্ত হইত তবে বহু ব্যয়সাধ্য বলিয়া উহাতে হস্তক্ষেপ করা ইতস্ততঃ করিবার বিষয় হইত। কিন্তু গোমতীর ন্যায় ক্ষুদ্র নদীর উপর একটী সেতু নির্ম্মাণ করা তেমন ব্যয়সাধ্য হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। এসম্বন্ধে নদীর অপর পাড়ের বাসিন্দাগণ গবর্মেণ্টের নিকট একখানি দরখাস্ত দিয়াছেন। খেয়া পার হইতে লোকদিগকে পয়সা দিয়া যে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় তাহাতে তাহারা এ নিমিত্ত কোনরূপ ট্যাক্স বসিলে তাহা দিতেও অস্বীকার করিবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। এ বিষয়ে আমরা সরকার বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

(ত্রিপুরা হিতৈষী)

নৌকা-ভাড়া

কচুরি পানা দেশের নদী খাল বিল এমনভাবে ছাইয়া ফেলিয়াছে যে, আজকাল ইহার জন্য দেশে নৌকা যোগে যাতায়াতের পথ বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতে কচুরি পানার জন্য নৌকা ভাড়া অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্যান্য বৎসর দৈনিক নৌকা ভাড়া ছিল ৸০।১৲। সে স্থলে এবার ৩৲।৪৲ রোজের কমে নাকি কোথাও নৌকা যাইতে চায় না। কয়েক বৎসর যাবৎ এই পানা ধ্বংস করিবার জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে, কিন্তু কার্য্যতঃ এই ভীষণ শত্রুকে দেশ হইতে তাড়াইবার কোন উপায়ই আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইল না। ইহা কি কর্ত্তৃপক্ষের কলঙ্কের কথা নহে? ইহার দরুণ শস্য নষ্ট, স্বাস্থ্য নষ্ট এবং যাতায়াতের পথ বন্ধ হইয়াছে। আরও কত অনিষ্ট যে ইহা হইতে উৎপন্ন হইবে তাহা কে বলিতে পারে?

কলিকাতা কর্ড রেলওয়ে

জমি-সংগ্রহ কার্য্যের অসুবিধা বিদূরিত হইয়াছে এবং প্রস্তাবিত কলিকাতা কর্ড রেলওয়ের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ জমি সংগৃহীত হওয়ায় প্রাথমিক কার্য্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এই স্কীমের ভার-প্রাপ্ত কর্ম্মচারী মিঃ এ, এইচ, জনষ্টন কলিকাতায় যে সমস্ত লোহার সাজ-সরঞ্জাম পাওয়া অসম্ভব ঐ সমস্ত বিলাতে ফরমাস দিয়া তৈরী করাইবার জন্য

বিলাত গিয়াছেন। এখন কার্য্যের ভার মিঃ বি, এল, হার্ভের উপর পড়িয়াছে। গত একপক্ষকাল যাবৎ নদীর উভয় পাড়ে মাটি তোলা, রাস্তা তৈরী করা প্রভৃতি প্রাথমিক কার্য্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। কলিকাতার দিকের পাড়ের জন্য কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোং হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহের এবং বালীর দিকের পাড়ের জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের ইলেকট্রিক সাপ্লাই হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছে। নদীর উভয় তীরে ভূমি সংগ্রহ করিতে সামান্য কিছু অসুবিধা হইয়াছিল। এখনও আরও কিছু জমির দরকার। এই জমি সংগৃহীত না হইলে বিস্তৃত ভাবে কার্য্য আরম্ভ করা যাইবে না। ৫,০০০ কুলীর বাসোপযোগী গৃহের ব্যবস্থা করা হইতেছে। এই ব্যাপারে বালীর অধিবাসিবৃন্দের একটা মহা সুবিধা হইবে। এই সমস্ত গ্রামে উন্নততর ড্রেনের এবং পরিষ্কার জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইবে। এখন হইতেই প্রাথমিক কার্য্যে প্রায় ৩০০ লোক নিযুক্ত করা হইয়াছে। লোহার জিনিষ-পত্র কতকগুলি বিলাত হইতে আনা হইবে, কতকগুলি এখানেও তৈয়ারী করা হইবে। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, লঞ্চ, পনটুন ও অন্যান্য জিনিষপত্র এখানেই তৈয়ারী করা হইবে। ১৯১৫ সনের হার্ডিং সেতুর যে সমস্ত লোহালক্কড় পড়িয়া আছে, ব্যয়-সংক্ষেপের নিমিত্ত সেগুলিও খাটাইয়া দেওয়া হইবে। ইস্পাতের দ্রব্যাদি কলিকাতার বার্ণ কোম্পানী এবং মেসার্স জোসেফ কোম্পানীই সরবরাহ করিবেন। বৃষ্টির আধিক্যে কার্য্যের ব্যাঘাত হইতেছে। বিলাতের ধর্ম্মঘটের জন্যও সেতুর গঠনমূলক কার্য্যে সম্ভবতঃ অনেকটা বিলম্ব ঘটিবে।

এবারকার পাট

বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা এবং আসাম এই তিন প্রদেশে আনুমানিক ৩,৬০০০০০ একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে অর্থাৎ গত বৎসরাপেক্ষা ৪৮৯,৮০০ একর অধিক জমিতে পাট বপন করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে এক বাঙ্গালা দেশে ৪,৪১,৪০০ একর অধিক জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। সেইরূপ আসামে ৩১,৬০০ একর এবং বিহার ও উড়িষ্যায় ১৬৮০০ একর অধিক জমিতে উহার আবাদ হইয়াছে।

এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশে যে বৃষ্টিপাত হইয়াছে, তাহা পাটের আবাদের পক্ষে অনুকূল এবং বর্ত্তমানে মোটের উপর পাটের অবস্থা ভালই বলিতে হইবে। বিহার ও উড়িষ্যায় পাটের জন্য এখনও বৃষ্টির আবশ্যকতা আছে বটে, তথাপি উহার বর্ত্তমান অবস্থা ভালই বলিতে হইবে। আসামে এরূপ সময়ে পাটের অবস্থা সচরাচর যেরূপ থাকে সেইরূপই আছে।

বাঙ্গালা দেশে একমাত্র পাবনায় বৃষ্টির অভাবে ও পোকা লাগাতে পাটের কিছু ক্ষতি হইয়াছে, সেইরূপ ময়মনসিংহেও কতকটা অনিষ্ট হইয়াছে।

কচুরী পানা ও জেলাবোর্ড

ফরিদপুর জেলাবোর্ড কচুরী ধ্বংসের জন্য গত বজেটে সাত হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। কিন্তু শুনা যাইতেছে উহার ধ্বংস-কার্য্যে এই টাকার যৎসামান্য খরচ করা হইতেছে। এদিকে কচুরীপানায় জেলাটাকে ছাইয়া ফেলিতেছে। ছোট ছোট খালের মধ্যে যাইয়া উহারা নৌকাপথ অবরোধ করিয়াছে। বিলের ক্রোড়ে যাইয়া জেলার ফসলের সর্ব্বনাশ করিতেছে। ফরিদপুরের এক সাপ্তাহিক বলিতেছেন,—"এসম্বন্ধে আমরা অনেকবার আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু 'অন্ধের কিবা রাত্রি কিবা দিন' স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশের অনুপযুক্ত লোকের হস্তে স্বায়ত্ত-শাসন না থাকাই মঙ্গল। স্বার্থসিদ্ধি ও নামজাহিরই অধিকাংশ সভ্যের চরম উদ্দেশ্য। যাহা হউক, এখন হইতে জেলাবোর্ড কচুরীর ধ্বংসে অগ্রসর হউন।"

মিউনিসিপ্যাল রাস্তাঘাট

ফরিদপুর মিউনিসিপ্যাল পথগুলি বে-দোরস্ত হইয়া আছে। বর্ষার দিনে ঐ রাস্তাগুলি অগম্য হইয়া পড়ে। উহার মধ্যে স্থানে স্থানে যে গর্ত্ত তৈয়ারী হইয়াছে, বৃষ্টিপাতে সেগুলি পূর্ণ হইয়া যায়। যাহারা পাদুকা ব্যবহার করে তাহাদের ঘোর অসুবিধা হইয়াছে। আঁধার রাত্রিতে এই অসুবিধা পাদুকাধারী পথিককে গভীরভাবেই ভুগিতে হয়। মিউনিসিপ্যাল পথঘাটের অবস্থা দেখিয়া আমাদের কষ্ট বোধ হয়। মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষ ফরিদপুর সহরবাসীর প্রতি কিঞ্চিৎ কৃপাপরবশ হইয়া রাস্তাগুলিকে চলনসই করিবার আশু ব্যবস্থা করিবেন।

ফরিদপুরের রাস্তাগুলি অতি কদর্য্য, চলাফিরা বড়ই কষ্টকর। বৃষ্টির জল আটকাইয়া থাকে। উহাদের মধ্যে কতক নীচু বলিয়া এরূপ শোচনীয় অবস্থা হয়। এরূপ অবস্থার কি পরিবর্ত্তন হইবে না? ফরিদপুর সহর নানা কারণে বাসের অযোগ্য হইয়াছে। (সঞ্জয়)

সার প্রয়োগে চাষের উন্নতি

নদীয়া ও চব্বিশ পরগণা জিলার দ্বাদশ স্থলে, আশু-ধান্তের জমিতে খৈল সার ব্যবহারে ধান্তের ফলন বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রত্যেক বিঘায় ১৷০ মণ হিসাবে খৈলসার ব্যবহার করিয়া ১৷০মণ হইতে ৫৷০ মণ পর্য্যন্ত অধিক ধান্য পাওয়া গিয়াছে। এক মণ খৈলের মূল্য ২৷৷০ টাকা মাত্র। আমন ধান্তের জমিতে ধৈঞ্চাসার ব্যবহার করাতে ধান্তের ফসল ১৷০ হইতে ৩৷০ মণ পর্য্যন্ত অধিক হইয়াছে। আটটী স্থলে ধৈঞ্চাসার পরীক্ষা করা হইয়াছিল। সকল স্থলেই ফলন বাড়িয়াছে। তদ্ভিন্ন কুড়ি কিতা জমিতে হাড়ের গুড়া সাররূপে ব্যবহার করিয়াও সুফল পাওয়া গিয়াছে। উহাতে ধান্তের ফলন বিঘা প্রতি ১৷০ মণ হইতে ৪৷০ মণ পর্য্যন্ত অধিক হইয়াছে। হাড়ের গুড়ার সার দিতে প্রতি বিঘায় ২৷৷০টাকা খরচা পড়ে।

মাড়োয়ারী ও পাটের ব্যবসা

সিরাজগঞ্জ মহকুমায় বর্ত্তমানে পাটের কারবার সম্বন্ধে যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, মাড়োয়ারীরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার দরুণ টাকা মারা যাইতে পারে বলিয়া আগাম টাকা দিতে ভয় করিতেছে। কলিকাতায় পাটের দর কমিয়া যাওয়াও ইহার একটি কারণ। মফঃস্বলের পাট-ক্রেতারা প্রত্যহ নাকি কলিকাতা হইতে পাট ক্রয় না করার জন্য সংবাদ পাইতেছে।

পাট এক্ষণে ৭—১০ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে এবং ক্রেতার সংখ্যা খুব বিরল হইয়া উঠিতেছে। গত বৎসর এই সময়ে পাটের দর ১৫—১৮ টাকা ছিল। এজন্য কৃষকদের মধ্যে আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে।

কাপড় আমদানি বন্ধ

কলিকাতার গত হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলে মাড়োয়ারীর চেম্বার অব কমার্স নাকি আর বিলাতী কাপড় আমদানি করিবে না। কয়েকদিন হইল শ্রীযুক্ত গণপতিরায় খেমকারের সভাপতিত্বে এক সভা হইয়া গিয়াছে। নভেম্বর মাসে মাড়োয়ারীরা যে কাপড়ের অর্ডার দিয়া থাকে এবৎসর আর সে অর্ডার দিবে না। যদি অন্য কোন লোকদ্বারা ঐরূপ কোন মাল আমদানি বা বিক্রয় করা হয় তবে চেম্বারের নিয়মাবলী অনুসারে প্রতি গাইটে ৫১৲ টাকা জরিমানা দিতে হইবে। বাজারে যে কাপড় মজুত আছে তাহাও কেহ বিক্রয় করিতে পারিবে না বলিয়া প্রকাশ।

চায়ের বাজার

এবৎসর প্রথম প্রথম চায়ের দর দেখিয়া সকলেই একটু আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু চায়ের দর ক্রমেই কমিতেছে, এমন কি ১৷৷০ আনা হইতে একেবারে ৷৶০ আনায় নামিয়াছে। সেজন্য সকলেই চিন্তিত হইয়াছেন এবং শীঘ্রই এখান হইতে ডিরেক্টার মহাশয়দের মধ্যে কেহ কেহ নাকি দর-বৃদ্ধিকল্পে কলিকাতা যাত্রা করিবেন। গত বৎসর এইরূপ দর কমিয়া যাওয়ায় এখান হইতে কলিকাতা যাইয়া ২।১টি নীলাম বন্ধ করিয়া দেওয়ায় পুনরায় দর-বৃদ্ধি হইয়াছিল। (ত্রিস্রোতা)

বাংলায় মৃৎ-শিল্প

বহুদিন পূর্ব্বে নদীয়া-কৃষ্ণনগরের জনৈক শিল্পী মাটির পুতুল প্রস্তুত করিয়া তৃতীয় নেপোলীয়ানের প্রশংসাপত্র লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ছিল শ্রীরাম পাল। পরে মহারাণী ভিক্টোরিয়া কৃষ্ণনগরের অন্যতম মৃৎ-শিল্পী যদু পালকে উপযুক্ত মাসিক বৃত্তি দিয়া বিলাতে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করেন। কিছুদিন পরে বিলাতের ওয়েমব্লী প্রদর্শনীতে নানাপ্রকার মনোহর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া গোপেশ্বর পাল সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও রাজমহিষীর নিকট হইতে যথেষ্ট উপঢৌকন ও সম্মান প্রাপ্ত হন।

চরকা ও খদ্দর সমিতি টাঙ্গাইল

এই সমিতির সভ্যাগণের মধ্যে যাঁহারা বিগত জুন ও জুলাই মাসে অন্যূন ২৫০০ আড়াই হাজার গজ সূতা জমা দিয়াছেন তাঁহাদের নাম ও সূতার পরিমাণ নিম্নে পৃথকভাবে প্রদত্ত হইল।

জুন মাস—জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী ৫১৫০ গজ, ধুরন্ধর বসু ঠাকুর ৪০০০০, উষালতা বসু ৬৮৫২, হেমাঙ্গিনী বর্দ্ধন

৩১০০, প্রতিভা বসু সরস্বতী ২৯৫০, মনোরমা দেবী ২৮২৭।

জুলাই মাস—প্রতিভা বসু সরস্বতী ৪১০০ গজ, উষালতা বসু ৪০০০, হেমাঙ্গিনী বৰ্দ্ধন ৪০০০, জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী ৩৩০০, কুমারী পৌর্ণমাসী দেবী ৩৩০০, কুমারী সুনীতি বালা দাস ৩০০০, মাধবচন্দ্র কুণ্ডু তত্ত্বনিধি ২৬৪৫, ধুরন্ধর বসু ঠাকুর ২৫০০, কুমারী নীহারকণা বসু রায় ২৫০০।

শ্রীধুরন্ধর বসু, সম্পাদক।

সবঙ্গ থানায় জলপ্লাবন

মেদিনীপুর সবঙ্গ থানার দক্ষিণ সীমানায় পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে কালীঘাই নদী প্রবাহিত। তাহার সহিত সবঙ্গের মধ্য দিয়া প্রথমে দক্ষিণ পরে পূর্ব্ব মুখে কপালেশ্বরী নদী সবঙ্গ থানার দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে মিলিত হইয়া হলদী নদীতে পড়িয়াছে। হলদীর মোহনা হইতে উভয় নদীর মিলন-স্থান পর্য্যন্ত নদীর তলদেশ জোয়ার-ভাটার পলিতে ভরাট এবং অত্যন্ত অপ্রশস্ত। তাই শত শত মাইল দূর হইতে উক্ত উভয় নদী যে পরিমাণ জল বহন করিয়া আনে তাহা সেই স্থান দিয়া নিঃশেষ হইতে পারে না। তাই প্রতি বৎসর এই উভয় নদীর জল স্ফীত হইয়া উভয় কূলের গ্রামগুলিকে আতঙ্কিত করে। কালীঘাইর প্লাবন হইতে কাঁথি মহকুমার পটাশপুর, ভগবানপুর প্রভৃতি থানাকে রক্ষা করিবার জন্য কালীঘাইর দক্ষিণ পাড় পাবলিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেন্টের বাঁধ দ্বারা সুরক্ষিত। উক্ত পাড় জমীদারী পাড় দ্বারা সবঙ্গ থানাকে রক্ষা করিতেছিল। সবঙ্গ থানাতে জলপ্লাবনাশঙ্কা অত্যধিক থাকায় নদীর তীরবর্ত্তী বাঁধ সত্ত্বেও অভ্যন্তর ভাগের প্রত্যেক গ্রাম এক একটী গ্রামবেষ্টনী বাঁধ দ্বারা সুরক্ষিত। তাহা সত্ত্বেও এ বৎসরের ভীষণ বারি-বর্ষণের ফলে উক্ত নদীদ্বয়ের জল অত্যধিক স্ফীত হইয়া উত্তর তীরবর্ত্তী সবঙ্গ থানার ৬৫খানি গ্রামকে ১৫ই জুলাই রাত্রিকালে ডুবাইয়া দেয়। সেই অবধি ১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত ৩১ দিনকাল প্রত্যহ এরূপভাবে বৃষ্টি হইতে থাকে যে, সেই ভীষণ বন্যার জল সমস্ত দেশ প্লাবিত করে। তাহার ফলে ২৫০০ শত গৃহ ভূপতিত হয়। প্লাবিত গ্রামের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩৭, বিপন্ন লোকের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৫০০০ হাজার। ৮৫ বর্গ মাইল স্থান জলমগ্ন। গ্রামগুলির উপর ১০।১৫ ফুট জল দাঁড়াইয়া একটী সমুদ্রাকার ধারণ করে। তাহার পর কালীঘাইর দক্ষিণ বাঁধে এবং মোরাদ ও ডেমুরার পূর্ব্ব বাঁধে হানা পড়িয়া জল ক্রমে ক্রমে কমিতে আরম্ভ করে। এখন স্থানবিশেষে ৫ ফুট জল দাঁড়াইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ দুই চারি খানি গ্রামের জল একেবারে নিঃশেষ হইয়াছে। শতাব্দীর মধ্যে এ অঞ্চলে কেহ এরূপ সর্ব্বগ্রাসী বন্যার কথা শুনে নাই।

ধান ও তরিতরকারীর অবস্থা

এতদঞ্চলের প্রধান ফসল হৈমন্তিক ধান্য। বন্যার জলে তাহার সমস্ত চারাই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। প্লাবিত ৮৫বর্গ মাইল স্থানের মধ্যে এক মুষ্টি ধান্যোৎপাদনের সম্ভাবনা নাই। বিশেষভাবে চেষ্টা করিলে অল্প পরিমাণ জমিতে বোরো ধান আবাদ করা যাইতে পারে। তরিতরকারীর গাছ সমূলে নষ্ট হইয়া গিয়াছে; বর্ত্তমানে সে সব কিছুমাত্র নাই। এখন নূতন করিয়া আবাদ করিবার কোন সুযোগও নাই। তবে কার্ত্তিক হইতে রবি ফসল উৎপাদনের চেষ্টা চলিতে পারে।

ঘরের অবস্থা

প্লাবিত স্থানের ১৫০০০ হাজার গৃহের মধ্যে ২৫০০ গৃহ ভূপতিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে সাহায্য করিবার উপযোগী গৃহের সংখ্যা ১০০০এর কম হইবে না। এই ১০০০ গৃহের গৃহিগণের মধ্যে জমি-জায়গাশূন্য লোকের সংখ্যাই অধিক। অবশিষ্টাংশেরও দুই-এক বিঘার বেশী জমি নাই।

বাংলার লবণ

কাথিয়াবাড়ের বিখ্যাত লবণ-ব্যবসায়ী ও রাসায়নিক শ্রীযুত কপিরাম উকীল জানাইয়াছেন,—বাংলা দেশে বৎসরে মোট সওয়া কোটী মণ লবণ আমদানি হইয়া থাকে। এডেনের ৩টি কারখানা হইতে লবণ পাওয়া যায়। তাহার ২টি কারখানা বোম্বাইয়ের ব্যবসায়ীদিগের। দ্বারকার নিকট পোর্ট ওখাতে লবণের নূতন কারখানা হইতেছে। তাহা হইলে আগামী বৎসর হইতে বাংলায় আর বাহিরের লবণ আনিতে হইবে না। লবণের উপর রক্ষাশুল্ক বসাইবার এখন কোন প্রয়োজন নাই।

আর্থিক বাংলা

সমস্ত বাংলার পরিমাণ ৮২২৭৭ বর্গমাইল তন্মধ্যে **বনজঙ্গল ১০৮৬২** বর্গমাইল (জাপান বা ইংলণ্ড হইতে সামান্য ছোট)।

রাজসাহী, বর্দ্ধমান, প্রেসিডেন্সী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম এই ৫টা বিভাগে যথাক্রমে ৮, ৬, ৫, ৪, ৫ একুনে ২৮টি জেলা।

চাষের জমির পরিমাণ		৭০৯২৬৩০০ বিঘা
ধানের জমির	,,	৬২৮০৬১০০ বিঘা
ফসলের	,,	৩১৩০৩০৫০০ মণ
পাটের জমির	,,	৭০৭২৮০০ বিঘা
ফসলের	,,	৩৫৮২৮২৯০ মণ
তামাকের জমির	,,	৮৪০৯০০ বিঘা
ফসলের	,,	৩৩৬৩৬০০ মণ
ইক্ষুর জমির	,,	৬১৮৬৮০ বিঘা
ফসলের	,,	১০৯২৮৬০০ মণ

জনসংখ্যা প্রায় ৪ কোটি ৬৬ লক্ষ (সমস্ত বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের জনসংখ্যা ৪॥০ কোটী)। শতকরা ৯৩ জন কৃষিজীবী। জন প্রতি চাষের জমি ১৫ বিঘা। স্ত্রী ও পুরুষের সংখ্যা সমান। সহর ১৩৫টি। শতকরা ৬ জন সহরে বাস করে। গ্রাম ৮৯৫২৫টি। শতকরা ৯৪ জন গ্রামে বাস করে।

দিয়াশলাই শিল্প

কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে ৮টা বৃহৎ ও আধুনিক উপায়ে পরিচালিত দিয়াশলাইয়ের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। এই কয়েকটা কারখানায় প্রত্যহ ১৩০০ গ্রোস বাক্স দিয়াশলাই তৈয়ারী হইবে। যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানায় হস্তচালিত কল দ্বারা গৃহশিল্পরূপে দিয়াশলাই তৈয়ারী হয়, তাহারা আধুনিক উপায়ে চালিত এই সব কারখানার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবে না। কারণ দিয়াশলাই প্রস্তুত করিতে নানা প্রকার প্রক্রিয়া আবশ্যক এবং এই সব বড় কারখানার মালের দর অত্যন্ত কম।

বঙ্গীয় শিল্পবিভাগের অনুসন্ধানের ফলে যদিও দিয়াশলাই প্রস্তুত করার পক্ষে উপযোগী অনেক প্রকার কাঠ বাংলাদেশের জঙ্গলে পাওয়া গিয়াছে, তথাপি জঙ্গল সকল নানা স্থানে ছড়াইয়া আছে বলিয়া এবং রেলের ভাড়া অত্যন্ত বেশী বলিয়া এই সকল কাঠ কার্য্যে লাগাইবার জন্য বিশেষ কিছুই করা হয় নাই।

অধিকাংশ কারখানায় সুইডেন ও সাইবেরিয়া হইতে কাঠ আমদানি করা হয়। কোন কোন কারখানায় গেঁয়ো কাঠ ব্যবহারের চেষ্টা চলিতেছে। এই কাঠ সুন্দরবনে পাওয়া যায় ও তথা হইতে দেশী নৌকায় অতি অল্প খরচে আনা চলে। কিন্তু যে গেঁয়ো কাঠ পাওয়া যায় তাহা প্রচুর হইলেও অফুরন্ত নহে। সেজন্য যে পর্য্যন্ত এই গাছের উপযুক্তরূপ চাষ না হয় সে পর্য্যন্ত ইহার সরবরাহ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। গেঁয়ো কাঠের দিয়াশলাইয়ের কাঠি শুভ্র করিবার জন্য শিল্পবিভাগে যে রাসায়নিক পরীক্ষা চলিতেছিল তাহা সফল হইয়াছে। যদিও আমদানি করা কাঠ হইতে প্রস্তুত উচ্চ শ্রেণীর দিয়াশলাইয়ের কাঠির তুলনায় এই শুভ্র করা গেঁয়ো কাঠের কাঠি কিঞ্চিৎ নিকৃষ্ট, তথাপি ইহা দেখা গিয়াছে যে, এই কাঠ দ্বারা উত্তম শ্রেণীর দিয়াশলাই কাঠি প্রস্তুত হইতে পারে।

এই ব্যবসায়ে যাহারা লিপ্ত হইতে ইচ্ছুক তাহাদের সুবিধার্থ দিয়াশলাই-শিল্পের জন্য আবশ্যক অর্থব্যয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হইয়াছে এবং বিভিন্ন আকারের কারখানা স্থাপন সম্বন্ধে আয়ব্যয় প্রভৃতির খসড়া তৈয়ারী করা হইয়াছে। দিয়াশলাইয়ের কাঠির অগ্রভাগে লাগাইবার মশলা আর্দ্রতায় নষ্ট না হয় এরূপ ভাবে প্রস্তুত করা সম্বন্ধে শিল্পবিভাগের রাসায়নিক পরীক্ষাগারে নানারূপ পরীক্ষার পর অতি উচ্চ শ্রেণীর মশলা প্রস্তুত করা হইয়াছে। বঙ্গদেশে এই শিল্পকে সম্পূর্ণরূপে লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত করার জন্য আরও পরীক্ষা চলিতেছে।

খদ্দর ভারত

জানুয়ারী মাস হইতে আরম্ভ করিয়া মে মাস পর্য্যন্ত পাঁচ মাসে অন্ধ্র প্রদেশে ৪৪৪০১৲ টাকা মূল্যের খদ্দর প্রস্তুত হইয়াছে এবং ১০২৯৯৪৲ টাকা মূল্যের খদ্দর বিক্রয় হইয়াছে। বিহারে ৯৮৫৬২৲ টাকা মূল্যের খদ্দর প্রস্তুত এবং ৮২৪৮৭৲ টাকা মূল্যের খদ্দর বিক্রয় হইয়াছে। উৎকলে ১৫২৯৪৲ টাকা মূল্যের খদ্দর প্রস্তুত এবং চারি মাসে ৯০২০৲ টাকার খদ্দর বিক্রয় হইয়াছে। বাঙ্গালায় ১৬৯৮০৩৲ টাকার খদ্দর প্রস্তুত এবং ১৫৭৩৯২৲ টাকার খদ্দর বিক্রয় হইয়াছে। সারা ভারতে এই কয় মাসে মোট ৭৫২১৯৮৲ টাকা মূল্যের খদ্দর প্রস্তুত এবং ১০৯২৫৭৪৲ টাকার খদ্দর বিক্রয় হইয়াছে।

জুন মাসে তামিল নাড়ু ৩৯৭৫৪৲ মূল্যের খদ্দর প্রস্তুত করিয়াছে এবং ৬৭১২৯৲ মূল্যের খদ্দর বিক্রয় করিয়াছে। বাঙ্গালা দেশে ৪৬,৪৫২৲ উৎপন্ন ও ৩৪৪৯৮৲ বিক্রয়। অন্ধ্র দেশের উৎপন্ন ও বিক্রয়ের সংখ্যা যথাক্রমে ১৫৩২৭৲ ও ২২০১৮৲ টাকা। বোম্বাইয়ের উৎপাদনের হিসাব পাওয়া যায় নাই, ঐ মাসে বিক্রয়ের পরিমাণ ২৭৩৪৪৲। বিহার ১৪২০৪৲ টাকা মূল্যের খদ্দর প্রস্তুত করিয়াছে এবং ৮০২৭৲ টাকার খদ্দর বিক্রয় করিয়াছে।

তাহা হইলে দেখা যায় তামিল নাড়ু ও বাঙ্গালা খদ্দর উৎপাদনে ও বিক্রয়ে সেরা স্থান দখল করিয়াছে। উৎপাদনের দিক্‌ দিয়া ধরিলে উভয় স্থানের অবস্থাই প্রায় সমান। বিক্রয়ের দিক্‌ দিয়া বাঙ্গালা অবশ্য তামিল নাড়ুর ঢের পশ্চাতে। এইখানে বলা যাইতে পারে, অন্যান্য প্রদেশের অপেক্ষা ঢের পরে বাঙ্গালায় খাদির কাজ সুরু হয়। কিন্তু তাহা হইলেও দুই তিন বৎসরের চেষ্টায় বাঙ্গালা সকলকে ঠেলিয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে এবং বাঙ্গালায় খাদির উৎপাদন ও বিক্রয় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

বাঙ্গালার খাদি-আন্দোলনের সফলতার জন্য "অভয় আশ্রম" ও "খাদি প্রতিষ্ঠানে"র প্রাণপণ চেষ্টা অবশ্যই প্রশংসনীয়। জানুয়ারী হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত খাদি প্রতিষ্ঠানের তিনটী দল বাঙ্গালার কম্‌ সে কম ৩০০টি স্থানে সফর করিয়াছেন। তাঁহারা গ্রামে গ্রামে ছায়া-চিত্রের সাহায্যে বক্তৃতা করিয়া খাদির বার্ত্তা বাঙ্গালার কুটিরে কুটিরে পৌছাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এই প্রচারের অবকাশে তাঁহাদের আনুষঙ্গিক কাজ ছিল খদ্দর ফিরি করা। ফিরি করিয়া তাঁহারা যে পরিমাণ খদ্দর বিক্রয় করিয়াছেন তাহার দ্বারাই তাঁহাদের সাফল্যের একটা আংশিক পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙ্গালার বিভিন্ন জেলার সফরে মোট ৩৬৯১৭৷৷৵৬ টাকার খদ্দর বিক্রয় হইয়াছে। তাহা ছাড়া যেখানেই তাঁহারা গমন করিয়াছেন, সেইখানেই তাঁহাদের আদর্শ ও তাঁহাদের সাধনা একটা নতুন ধরণের আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছে।

পঞ্জাবে গমের ভূঁই

পঞ্জাবে সমস্ত রকম শস্যক্ষেতের মোট পরিমাণ সাধারণতঃ প্রায় ২ কোটি ৮০ লাখ একর। তাহার মধ্যে যবের ক্ষেত প্রায় ৯০ লাখ একর অর্থাৎ সমস্ত শস্যক্ষেতের শতকরা প্রায় ৩২ ভাগ। পয়ঃপ্রণালীর দ্বারা যে সমস্ত গমের ক্ষেতে জল দেওয়া হয়, তাহার পরিমাণ প্রায় ৫০ লাখ একর। ঐ পরিমাণের বড় একটা নড়চড় হয় না। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেতের পরিমাণ বৎসর বৎসর খুবই বদলায়। ১৯২৪-২৫ সনে ভাল রকম বৃষ্টিপাত হওয়ায় কতকগুলি ক্ষেতে পয়ঃপ্রণালীর সাহায্য দরকার হয় নাই; অন্যথা দরকার হইত। পয়ঃ-প্রণালীর সাহায্য যেথানে লওয়া হয় না, সে সমস্ত স্থানের

আবাদী জমির পরিমাণ বাড়িয়া প্রায় ৫০ লাখ একর হয়। (এক একর=৩ বিঘা)

কাগজ আমদানি

গত ১৯২৫ সনে বিদেশী কাগজের আমদানি কম হইয়াছে। দেশীয় কাগজের পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া বিদেশী কাগজের আমদানি আরও কমিবে। তবে তকতকে ঝকঝকে তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর বিলাতী কাগজ এখনও সমাজের উচ্চ স্তরে চলিতেছে। এ দেশীয় মিলের কর্ত্তারা এই অভাবটী দূর করিতে পারিবেন না কি ?

১০ লক্ষ পাউণ্ডের অর্ডার প্রত্যাখ্যান

এক লক্ষ টন ইস্পাত স্লিপার প্রয়োজন হওয়ায় রেলওয়ে বোর্ড টাটা কোম্পানীকে জিজ্ঞাসা করেন তাঁহারা ইহা সরবরাহ করিতে পারিবেন কিনা, এবং পারিলেও সম্পূর্ণ বা কতটা মালের ভার তাঁহারা লইতে সমর্থ।, কারণ ইহা খুব বড় অর্ডার—১০ লক্ষ পাউণ্ডের কণ্ট্রাক্ট ইহার সহিত জড়িত।

টাটা কোম্পানী ষ্টিল ট্যারিফ (ভারতে আমদানি ইস্পাতের উপর শুল্ক-নীতি) আরও দশ বৎসরের জন্য বাড়াইয়া দিবার চেষ্টায় আছেন। রেলওয়ে বোর্ডের ১ লক্ষ টন ইস্পাত ও স্লিপারের ২৫ হাজার টন সরবরাহ করিবার ক্ষমতা ইঁহাদের আছে। কিন্তু সরকার লৌহ-ইস্পাত শিল্পে ভবিষ্যতে কিরূপ পরিপোষণ-নীতি চালাইবেন তাহা প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে তাঁহারা এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নহেন। কারণ নয়া ব্যবস্থার ফলে ভবিষ্যতে ইস্পাতের কারবার কিরূপ প্রভাবিত হইবে তাহা অনিশ্চিত। অর্ডারটি বিলাতের ডিরেক্টর অব ষ্টোর্স গ্রহণ করিয়াছেন।

মাদ্রাজে কাঠের ভেলা

সরকারী বন হইতে মাদ্রাজের ধীবরগণকে কাঠের ভেলা সরবরাহ করা যায় কিনা মাদ্রাজ বন-বিভাগ তাহা বিবেচনা করিতেছেন। মাদ্রাজ উপকূলের আদিয়ার ও রয়াপুর বন্দরের মধ্যস্থানে প্রতি দিন কম পক্ষে ছয়শত ভেলা ব্যবহৃত হয়। তাহা ছাড়া আরও অতগুলি সমুদ্র-তীরে মজুত রাখা হয়। সমুদ্রের ভেলাগুলি বেশীক্ষণ জলে থাকায় যখন শুষ্ক করিবার প্রয়োজন হয়, তখন এইগুলি ব্যবহৃত হয়। সিংহলের মালাভাম্বু নামক এক প্রকার বৃক্ষ হইতে এই ভেলাগুলি তৈয়ারী হয় এবং ধীবরগণ ভেলা নির্ম্মাণের জন্য এই কাঠ ছাড়া অন্য কোন কাঠের সন্ধান জানে না। সমস্ত কাঠই সিংহলের পোর্টোনোভো বা নেগাপত্তম প্রভৃতি বন্দর হইতে আসে। প্রায়ই ধীবররা নিজে ঐ সমস্ত বন্দরে যাইয়া তৈয়ারী ভেলা বা কাঠ ক্রয় করিয়া আনে। তাহারা ঐগুলি ভাসাইয়া নিজ নিজ স্থানে লইয়া যায়। ধীবরগণের এই সাহসিকতা খুবই প্রশংসনীয়। ইহা ছাড়া সমুদ্রকূল হইতে প্রায় দশ পনর মাইল জলে তাহারা মাছ ধরিতে যায়। সাধারণতঃ তাহারা এক সময়ে বার ঘণ্টারও অধিক সমুদ্রে থাকে। কিন্তু সমুদ্রে তুফান থাকিলে কখন কখন তাহাদিগকে এক বা দুইদিনও জলে থাকিতে হয়।

সাধারণতঃ বড় ও ছোট দুই প্রকারের ভেলা ব্যবহৃত হয়। বড়গুলি ১৮ থেকে ২৩ ফুট লম্বা ও ৬ হইতে [illegible] ফুট চওড়া এবং ১২ হইতে ১৫ ইঞ্চি গভীর হয়। ছোটগুলি ১২ হইতে ১৫ ফুট লম্বা ৪॥ ফুট চওড়া এবং ৯ হইতে ১২ ইঞ্চি গভীর হয়। ইহা ছাড়া খুব ছোট ভেলাও দেখা যায়। একখানা নতুন ভেলা ৭ থেকে ১০ বছর যায়। ইহার পরে এই পুরাতন ভেলার চারি পাশ চাঁচিয়া ছোট ছোট ভেলা তৈয়ারী করা হয়। এগুলি আরও ৫ বৎসর টেঁকে। ভেলার পরিমাণ অনুসারে ইহা প্রস্তুত করিতে ৮০৲ হইতে ২৫০৲ টাকা লাগে। ধীবরদের অনেকেই বেশী সুদে টাকা কর্জ্জ করিয়া এই ভেলা তৈয়ারী করে। শেষে ঐ টাকা সারা জীবন খাটিয়াও আর পরিশোধ করিতে পারে না। অনেক সময় মহাজনদিগকে সুদের উপর মাছও খাওয়াইতে হয়।

যে মালাভাম্বু কাঠ দিয়া ভেলা প্রস্তুত হয়, তাহার এক ঘন ফুটের ওজন ২৬ হইতে ২৭ পাউণ্ড। সরকারী অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, মাদ্রাজের সরকারী বনে মালাভাম্বুর মতন কয়েক প্রকার ভেলা তৈয়ারীর উপযোগী কাঠ আছে। এগুলি দ্বারা প্রস্তুত ভেলার মূল্য কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা কূলে আনয়ন করিবার কিরূপ সুবিধা হইবে, সেগুলি জলে কিরূপ টিঁকিবে ইত্যাদি অনুসন্ধান করা হইতেছে।

যুক্তপ্রদেশে শিল্প-শিক্ষা

যুক্ত প্রদেশের শ্রমবিভাগের দায়িত্বে ও কর্ত্তৃত্বাধীনে এলাহাবাদে চর্ম্ম-শিল্প-বিদ্যালয় এবং ফৈজাবাদে সূত্রধর-শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্য

বর্ত্তমান বৎসরের এপ্রিল মাসে ভারতে ২০ কোটি ৫ লক্ষ টাকার মাল বে-সরকারীভাবে আমদানি করা হইয়াছে। বিগত মার্চ মাসে ইহা অপেক্ষা ২ কোটি ২৫ পঁচিশ লক্ষ টাকার মাল বেশী আমদানি হইয়াছিল। আর উক্ত এপ্রিল মাসে ২৬ কোটি ১৮ লক্ষ টাকার শিল্পজাত ও কৃষিজাত দ্রব্য ভারত হইতে রপ্তানি হইয়াছিল। মার্চ মাসে ৩১ কোটী ২ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানি হইয়াছিল। আবার আমদানি করা মালের রপ্তানি এপ্রিল মাসে মাত্র ৮০ লক্ষ টাকার পরিমাণ হইয়াছিল। কিন্তু তৎপূর্ব্ব মাসে ইহা অপেক্ষা ৭ সাত লক্ষ টাকার মাল বেশী রপ্তানি হইয়াছিল।

কারেন্সী নোট সহ বিগত এপ্রিল মাসে ৩ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকার বে-সরকারী ধন-রত্ন আমদানি হইয়াছিল। মার্চ মাসে হইয়াছিল ৫ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার পরিমাণ। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ৩ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকার ধনরত্নাদি আমদানি হইয়াছিল।

রেলে ইয়োরোপীয়ান কর্ম্মচারী

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়েতে ১৪৬১ জন ইয়োরোপীয় কর্ম্মচারী আছে। তন্মধ্যে ২৫০৲ টাকা বা তদূর্দ্ধ বেতনের আছে ৮৭৫ জন। গেজেটেড্ ইয়োরোপীয় কর্ম্মচারীর সংখ্যা ১৯২৪ সনে ১৮৯ জন এবং ১৯২৫ সনে ১৮৪ জন ছিল। বিভিন্ন রেলে ইয়োরোপীয় কর্ম্মচারীর সংখ্যা নিম্নরূপ :—

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেল	...	১৪৬১ জন
সাউথ ইণ্ডিয়ান রেল	...	১৬৪ জন
গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেল	...	১০২৫ জন
নিজাম গ্যারাণ্টিড্ রেল	...	৮৪ জন

নিজাম গ্যারাণ্টিড্ রেল ৯৬২ মাইল বিস্তৃত অর্থাৎ ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেল যত মাইল বিস্তৃত তাহার ⅓ অংশ। এই রেলে ৮৪ জন ইয়োরোপীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলে ২৫২ জন ইয়োরোপীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত হওয়া উচিত; কিন্তু আছে ১৪৬১ জন।

ভারতীয়, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও ইয়োরোপীয়ান কর্ম্মচারীর অনুপাত

রেলে অধিকতর সংখ্যায় ভারতবাসী নিযুক্ত করিতে গভর্ণমেণ্ট রাজী হইয়াছিলেন। তাহার ফলে ১৯২৪ সনে সমগ্র ভারতের সরকারী রেলে যে স্থানে ১৫১০ জন ইয়োরোপীয় নিযুক্ত ছিল সেই স্থানে ১৯২৫ সনে ১৫১৬ জন ইয়োরোপীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছে!

১৯২৪ সনে গভর্ণমেণ্টের রেল বিভাগে ২৫০৲ টাকা বেতনের কর্ম্মচারীর মধ্যে কোন্ জাতীয় লোক কতজন ছিল তাহার শতকরা হিসাব :—

ইয়োরোপীয়	...	৩৮·৯ জন
অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান	...	৩১·১১ "
ভারতীয়	...	২৪·৯৪ "

১৯২১-২২ হইতে ১৯২৩-২৪ সন পর্য্যন্ত শতকরা ৭৬ জন উচ্চ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে কোন্ জাতির কতজন নিযুক্ত হইয়াছে তাহার তালিকা :—

ইয়োরোপীয়	...	শতকরা ৩২ জন
অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান	...	" ২৩ "
ভারতীয়	...	" ২১ "

রেলে ভাড়া-বৃদ্ধি

১৯১৬ সনে মধ্যম শ্রেণীর রেলভাড়া যত ছিল বর্ত্তমান সময়ে তাহার তুলনায়—

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলে	শতকরা ৬৬ ভাগ অধিক
ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলে	" ১০০ " "
বেঙ্গল নাগপুর রেলে	" ৬৪ " "

১৯১৬ সনে তৃতীয় শ্রেণীর রেলভাড়া যত ছিল বর্ত্তমান সময়ে তাহার তুলনায়—

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলে	শতকরা ৪০ হইতে ১০০ ভাগ অধিক
ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলে	" ৪০ হইতে ১৬০ " "
বেঙ্গল নাগপুর রেলে	" ৫০ ভাগ অধিক
আসাম বেঙ্গল রেলে	" ৩৩ হইতে ১৬৬ " "

মাদ্রাজে ম্যালেরিয়া নিবারণ

মাদ্রাজ প্রদেশে ম্যালেরিয়া-নিপীড়িত স্থানসমূহে ম্যালেরিয়া দমনের জন্য সাধারণের মধ্যে কুইনাইন বিতরণের প্রস্তাব চলিয়াছে। আপাততঃ তথায় কুইনাইনের দাম কমাইয়া প্রতি পাউণ্ড ২৪৲ টাকার স্থলে ১৫৲ টাকা করা হইয়াছে।

বাঙ্গালোরে ধর্ম্মঘট

১৭ই আগষ্ট প্রাতে মহীশূর কটন মিলের ২ হাজার লোক ধর্ম্মঘট করায় কাজকর্ম্ম সমস্ত বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ধর্ম্মঘটকারিগণ এখন পর্য্যন্ত তাহাদের অভিযোগ নির্দ্ধারণ করে নাই, তবে যতদূর জানা গিয়াছে মনে হয়, কমংবেতন এবং দীর্ঘকাল কাজই তাহাদের আপত্তির বিষয়। পুলিশ মিল পাহারা দিতেছে।

টাটার কারখানায় দুর্দ্দৈব

গত ১৮ই আগষ্ট বুধবার সায়াহ্ন ৫ ঘটিকার সময়, নূতন ষ্টীল ওয়ার্কসে ডুপ্লে প্ল্যান্টে একটি গলিত লৌহের কড়া প্রায় ১৪০০ মণ উত্তপ্ত লৌহ সহ প্রায় ৫০ ফুট উর্দ্ধ হইতে হঠাৎ উল্টাইয়া পড়িয়া যায়। নিম্নে কর্ম্মরত বহু রাজমিস্ত্রী ও মজুরদিগের উপর তপ্ত লৌহ পতিত হয় এবং তৎক্ষণাৎ উহার ভিতর ২ জন লোক জলিয়া যায়। পরে সেই স্থলে আরও ৬ জন লোক দগ্ধাবস্থায় মারা যায়। বহু আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়, তন্মধ্যে ৪ জন রাস্তাতেই মারা যায়। রাত্রিতে হাসপাতালে পুনরায় ৯ জন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পরদিন প্রাতে কারখানা হইতে কিঞ্চিৎ দূরে একটি মৃতদেহ দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ বেচারী ভয় পাইয়া কোনক্রমে দগ্ধদেহ টানিয়া ঐ মাঠে গিয়া পড়ে। সমস্ত রাত্রিতে তাহার খোঁজ হয় নাই। হতভাগ্য ওখানেই মরিয়া পড়িয়া থাকে। দেখা গেল, তাহার মৃতদেহ কাক ও শকুনীতে খাইতেছে। বহু বৎসর টাটার কারখানায় এমন ভীষণ দুর্ঘটনা হয় নাই। এখানকার ডাক্তার সাহেব বলেন তাঁহার ১৮ বৎসর অভিজ্ঞতায় তিনি এমন ভয়াবহ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন নাই। শ্রমিক সমিতির সম্পাদক মিঃ শেঠী বলেন, তিনিও এমন ঘটনা কখনও দেখেন নাই। কোম্পানীর ম্যানেজার ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া রোদন করিয়াছিলেন।

দুই কোটি টন কয়লা

ভারতীয় খনিসমূহের প্রধান ইনস্পেক্টার যে রিপোর্ট বাহির করিয়াছেন তদ্দৃষ্টে জানা যায় যে, গত ১৯২৫ সনে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের খনিসমূহ হইতে নিম্নলিখিত পরিমাণ কয়লা উত্তোলিত হইয়াছে :—

আসাম ৩১৭৯৯৭ টন, বেলুচিস্থান ২২৭০৭, বাঙ্গালা ৪৯১৩৮৫২, বিহার ও উড়িষ্যা ১৩৯৩১২৩৪, মধ্যপ্রদেশ ৭০৮৫৫৪ এবং পঞ্জাব ৭৪৬৬২ টন। সমগ্র ভারতে ১৯৯৬৯০৪১ টন।

এই বৎসর ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে যে কয়লা উঠিয়াছে তাহার আনুমানিক তালিকা—

	ফেব্রুয়ারী	মার্চ
বঙ্গদেশ (রাণীগঞ্জ)	৫৩৩৫৫৭ টন	৫০৭৫৪৪ টন
বিহার	১০১০৭৭ ”	১০০২৭৮ ”
ঝরিয়া	১১২৩৮৭০ ”	১০৮৬৮৮৪ ”
গিরিধি	৭৮৪৭১ ”	৮০৪০৫ ”
জয়ন্তী	৮৯৫৩ ”	৮৫৪৫ ”
সমগ্র ভারত	২০৬৬৯৬০ ”	১৯৬৩৮৪ ”

বর্ম্মায় বন্যা

মোগঙ্গে ভীষণ বন্যা হইয়াছে। নাম্‌তি রেল ষ্টেশনের নিকটে রেল লাইন বন্যায় ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। লুইনি চাঙ্গের নিকটবর্ত্তী পুলটি জলমগ্ন। নানিন ও মোগঙ্গ নদীর জল বৃদ্ধি হইয়া মোগঙ্গ সহরটি প্লাবিত করিয়াছে। বাজারটী ও শস্যের গুদামগুলি জলমগ্ন হওয়ায় রীতিমত ক্ষতি হইয়াছে। নাটকিগণে বন্যার প্রবাহ এত প্রবল হইয়াছিল যে, অধিবাসিগণ তাহাদের দ্রব্যাদি কিছুই রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। এখানকার বাড়ীঘর বন্যায় ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে বা জলমগ্ন রহিয়াছে। সাবডিভিশন্যাল জজ কোর্ট ও টাউন-

শিপ জজ কোর্টের নীচের তলা জলমগ্ন। পোষ্ট আফিস ও সামরিক পুলিশের বাড়ীও জলমগ্ন। মোগঙ্গ হইতে ক্যামেঙ্গ পর্য্যন্ত টেলিগ্রাম লাইন বন্ধ রহিয়াছে। মানুষ ও পশু আশ্রয় ও খাদ্যাভাবে কষ্ট পাইতেছে। যে সকল কুলিরা মাটির কাজ করিত, তাহারা এক্ষণে কাঁটাল গাছের উপর বাস করিতেছে। কিয়ান থাহিন ও যু চে সে নামক দুইজন চীনদেশবাসী, দরিদ্রদিগের ভিতর চাউল বিতরণ করিতেছেন। সাহায্য-প্রদানের জন্য গবর্ণমেণ্টের একটী লঞ্চ পাঠানো হইয়াছে। মোগঙ্গ হইতে মিটকিনা পর্য্যন্ত রেল-চলাচল এখনও বন্ধ আছে। এ পর্য্যন্ত কোন মানুষের মৃত্যুসংবাদ পাওয়া যায় নাই। গরু, বাছুর, কুকুর ইত্যাদি অনেক মারা গিয়াছে, তবে তাহাদের সংখ্যা এখনও জানা যায় নাই।

করাচীতে ঝড়ের উৎপাত

করাচীতে এমন ভয়ঙ্কর ঝড়বৃষ্টি ও ঘূর্ণীবাত্যা হইয়াছে যে, ভারতবর্ষের এই অংশে বহু বৎসরের মধ্যেও এরূপ ঝড় দেখা যায় নাই। ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে ১২ ইঞ্চির অধিক বৃষ্টিপাত হইয়াছিল, ফলে সমস্ত সহরটি একটী জলমগ্ন দ্বীপের মত দেখা যাইতেছিল। সমস্ত প্রকার যানবাহনাদির চলাচল বন্ধ ছিল এবং বৃষ্টিবর্দ্ধিত জলের প্রবল স্রোতে বহুসংখ্যক গো-মহিষ ও উষ্ট্রাদি ভাসিয়া গিয়াছিল। এই সমস্ত হতভাগ্য জন্তুর প্রায় সকলগুলিই মারা পড়িয়াছে। বাতাসের ভীষণ বেগে সহরের কয়েকটি বৃহৎ ও প্রাচীন বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে। অনেক গৃহের ছাদ উড়িয়া গিয়াছে, ৫০টি তারের থাম পড়িয়াছে, কাচের জানালা-শার্সি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়াছে এবং তিনটি প্রকাণ্ড বাড়ী তাসের ঘরের মত ভূমিসাৎ হইয়াছে। কয়েকজন লোক আহত হইয়াছে এবং তিন বৎসরের একটী শিশু মারা গিয়াছে। সহরের বাহিরেও ঝড়ে অনেক ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। রয়েল এয়ার ফোর্শ ডিপোর দিকে যে রাস্তাটি গিয়াছে, তাহা এরূপভাবে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে যে, সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত সে পথে চলাচল করা যাইবে না। সমস্ত প্রকার টেলিগ্রাফের তার নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং টেলিফোন লাইনও বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। করাচী ও লান্ধির মধ্যে রেল লাইন ভগ্ন হওয়ায় রবিবার হইতে কোন ট্রেণ পঞ্জাব অভিমুখে চলিতে পারিতেছে না। অন্যান্য ট্রেণেরও যাতায়াত সম্বন্ধে অত্যন্ত গোলমাল ঘটিয়াছে। সহরের প্রধান প্রধান রাস্তাসমূহে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ পড়িয়া পথ বন্ধ হইয়াছে এবং জীবজন্তু প্রভৃতির মৃতদেহে সমস্ত রাস্তাঘাট পরিপূর্ণ হইয়াছে। সহর জলে এমন প্লাবিত হইয়াছে যে, নৌকাই চলাচলের একমাত্র প্রধান উপায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

রেলওয়ের আয়

২১শে আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতের সমুদয় সরকারী রেলওয়েগুলির নেট আয় হইয়াছে ১৫৬ লক্ষ টাকা। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহে ১ লক্ষ টাকা বেশী আয় হইয়াছিল এবং বিগত বৎসরের ঐ সময়ের আয় অপেক্ষা ইহা ৩ লক্ষ টাকা কম। এই বৎসর ২১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ৩৬০৯৭ কোটী টাকা আয় হইয়াছে, ইহা বিগত বৎসরের ঐ সময়ের আয় হইতে ১২ লক্ষ টাকা কম। বিগত বৎসরের তুলনায় দেখা যায় বর্ম্মা, ইণ্ডিয়ান এবং বোম্বে, বরদা, সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া প্রভৃতি রেলওয়েগুলি ছাড়া অন্যান্য সকল রেলেরই আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের আয়ই সব চাইতে বেশী হইয়াছে। এই রেলে তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট বেশী বিক্রয় ও অধিক পরিমাণ পণ্য দ্রব্য চালান হওয়ায় ১॥ লক্ষ টাকা বেশী আয় হইয়াছে।

যাতায়াতের অসুবিধা সৃষ্টির জন্য বর্ম্মা রেলওয়ের ৩½ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িয়াছে। নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়েতে তিসি, সর্ষপ, গম প্রভৃতি শস্য কম চালান হওয়ায় ২½ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িয়াছে।

পুসায় নতুন পশু-খাদ্য

পুসা কৃষি-বিভাগে বারসিন নামে এক প্রকার নূতন পশু-খাদ্যের চাষে বিশেষ সফলতা লাভ হইয়াছে। ২৮৮ বিঘা জমিতে ঐ উদ্ভিদের চাষ হয়। তাহাতে ডিসেম্বর হইতে মে মাস পর্য্যন্ত ৫০০ পশু চরিয়া হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ হইয়াছে। ৭৮টী গাভী এই নূতন খাদ্য গ্রহণের ফলে প্রত্যেকে প্রতিদিন গড়ে সাত সের করিয়া দুধ দিয়াছে।

ভারতে জল-সেচন ও উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ

বিগত ১৯২৩-২৪ সনে গবর্ণমেণ্টের জল-সেচন রীতির প্রভাবে কত একর জমিতে ফসল জন্মিয়াছে এবং কোন প্রদেশে কত একর জমি আবাদ করা হইয়াছিল তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল :—

প্রদেশ	ফসল জন্মিয়াছে এরূপ জমির নিট আয়তন	গবর্ণমেণ্টের জল সেচন বন্দোবস্তের ফলে যে পরিমাণ জমিতে জল সেচন করা হইয়াছে	ফসল জন্মিয়াছে এবং জল সেচন করা হইয়াছে এরূপ জমির পরিমাণ শতকরা হিসাব	১৯২৩—২৪ সনের শেষ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের জল সেচন ও নৌকার্য্যের দরুণ মোট ব্যয়	উৎপন্ন ফসলের মোট মূল্য
মাদ্রাজ	৩৬,৪২৪	৬,৯৯৯	১৮·৯	১,২০৭	৩,৫৫৬
বোম্বে দাক্ষিণাত্য	৩৯,০০০	৪১৮	১·০	৮৮১	৫৩৮
সিন্ধুদেশ	৪,১৩৪	৩,৪২৭	৮২·৯	৪৭৯	১,০৫৪
যুক্তপ্রদেশ	৩৫,০১১	১,৯৭৯	৫·৭	১,৫৭৭	১,৩৪৮
পঞ্জাব	২৬,৭৩১	১০,২০৭	৩৮·২	২,৫৪৩	৫,৫০৫
ব্রহ্মদেশ	১৩,৮৫৭	১,৭৩০	১২·৫	৩৬৩	৮১২
বিহার ও উড়িষ্যা	২৪,৬৬০	৯৫৪	৩·৯	৬২৭	৬২২
মধ্যপ্রদেশ	১৭,৪২৭	৪৩৮	২·৫	৪৮৩	২৮১
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	২,৫৯৩	৩৫৯	১৩·৮	২৭৬	২২৬
রাজপুতনা	২৮১	১৬	৫·৮	৩৫	৫
বেলুচিস্থান	২৮৬	২৬	৯·০	৩২	৫
মোট	২২৩,২১৫	২৬,৫৩৮	১১·৯	৮,৯২৫	১৪,০৩০

পশম জগৎ

১৯২৫ সনে সমগ্র জগতে ২৮,৯২০ লক্ষ পাউণ্ড পশম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা ১৯২৪ সনের চাইতে ৮৬০ লক্ষ পাউণ্ড বেশী। অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও যুক্তরাষ্ট্র এই তিনটি প্রধান উৎপাদনকারী দেশেই উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পাইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া যুক্তরাষ্ট্র ও উরুগুয়ায় যথাক্রমে ৭২০, ১৫০ ও ১৩০ লক্ষ পাউণ্ড বেশী উৎপন্ন হইয়াছে।

মোটের উপর ১৯২৫ সনে অষ্ট্রেলিয়া ৭৩৫০, যুক্তরাষ্ট্র ৩০০০, দক্ষিণ আফ্রিকা ১৮৫০, উরুগুয়া ১১০০, ব্রিটেন ৯৬০, নিউজীল্যাণ্ড ১৭০০, স্পেন ৮২০, ইতালী ৬০০, রুমাণিয়া ৫৫০, জার্ম্মাণি ৫১০, ফ্রান্স ৪৫০ লক্ষ পাউণ্ড পশম উৎপন্ন করে। মোটামুটী খসড়া হিসাবে দেখা যায়, চীন ৭৫০, তুর্কি ৬০০, পারস্য ১৫০ লক্ষ পাউণ্ড উৎপন্ন করিয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্র তার বিপুল উৎপন্ন পশমেও সন্তুষ্ট না হইয়া আরও ৩০০০ লক্ষ পাউণ্ড আমদানি করে। সে দেশে ১৬০০ লক্ষ পাউণ্ডের কেবল কার্পেটই প্রস্তুত হয়।

নেপালে দাসত্ব-লোপ

কাটামুণ্ডের এটিস্লেভারী অফিস হইতে সম্প্রতি যে সরকারী বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায়, যে, নেপাল হইতে দাসত্বপ্রথার শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত হইল। মোটের উপর ৫৭৮৮৯ জন ক্রীতদাস মুক্তি লাভ করিয়াছে। বহুকালের উদ্যম, পরিশ্রম ও বিপুল ত্যাগের পর মহারাজা এতদিনে তাঁহার রাজ্যের এই কলঙ্ক অপনোদন করিতে সমর্থ হইলেন।

এই মহান্ কার্য্য সাধনের জন্য মহারাজা বিগত ১৯২০ খৃষ্টাব্দ হইতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। সেই সময় তিনি দাসত্বপ্রথার বিরোধী কয়েকটি আইন প্রণয়ন করেন এবং নিয়ম করেন যে, যে সমস্ত ক্রীতদাস বিদেশে ১০ বৎসর যাবৎ বাস করিতেছে, তাহাদিগকে স্বাধীনতা দেওয়া হইবে এবং যাহারা গৃহ হইতে তিন বৎসর অন্যত্র অবস্থান করিয়াছে, তাহারা তাঁহাদের মনিবকে ন্যায্য মূল্য দিলেই মুক্তি পাইবে। অন্য কয়েকটি আইন প্রণয়ন করিয়া তিনি দাসদিগকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রদান করেন।

১৯২৪ সনের ২৮শে নভেম্বর মহারাজা এক আবেদনপত্র প্রচার করিয়া বলেন যে, তাঁহার স্বদেশস্থ সমস্ত দাসকে মুক্তি দিতে হইবে। তিনি ঘোষণা করেন, এই হীন প্রথায় ভগবানের অভিসম্পাৎ বর্ষিত হইবে, কারণ ইহা মাতাপিতা ও সন্তান-সন্ততির করুণ অশ্রুজলে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে।

মহারাজার এই সদয় আবেদনের ফলে তাঁহার দেশস্থ লোকগণের মধ্যে ক্রীতদাস-মুক্তির একটা বিপুল আন্দোলনের সৃষ্টি হইল।

পূর্ব্বে নিয়ম ছিল যে, মুক্তিপ্রাপ্ত দাসদিগকে তাহাদের মনিবের জন্য ৭ বৎসর কাজ করিতে হইবে। ঘোষণা-জারির কয়েক মাস পরেই দেখা গেল যে, ইহা উচ্ছেদ করা সম্ভব। আবেদনের পরক্ষণেই মহারাজা ৫৩ লক্ষ টাকা এই মহান্ কার্য্য-সম্পর্কে ব্যয় করিবার জন্য নির্দ্দেশ করেন। যাঁহাদের অধিকারে ক্রীতদাস ছিল, মহারাজা তাঁহাদের প্রতি কোনও প্রকার জোর-জবরদস্তি কিম্বা জুলুম প্রকাশ করেন নাই। এই প্রকার 'মনিবের' সংখ্যা ১৫৭১৯ ছিল। আবেদনের ফলে তাঁহাদের অধিকাংশই দাসপ্রথা উচ্ছেদের জন্য সম্মত হইলেন।

১২৮১ জন দাস-অধিকারী তাঁহাদের দাসদিগকে বিনা ক্ষতিপূরণে মুক্তি দিতে রাজী হন। যাঁহারা বিনা মূল্যে দাসদিগকে স্বাধীনতা দিতে সম্মত ছিলেন না, তাঁহাদের জন্য নেপাল সরকার বয়স অনুযায়ী একটা নির্দ্দিষ্ট হার স্থির করিয়া দেন।

অবশেষে গত বৎসর নেপালের মহারাজা আইন প্রণয়ন করিয়া দাসত্ব প্রথাকে একেবারে উচ্ছেদ করিয়া দেন। তিনি নিয়ম করেন, সমস্ত নেপাল রাজ্যে কেহ কোনও প্রকার দাস-ব্যবসায় করিতে পারিবে না এবং যে কেহ এই আদেশ লঙ্ঘন করিবে, তাহাকে ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে।

তূলা ও বস্ত্র-শিল্পের দুনিয়া

অষ্ট্রীয়া ও চেকো-শ্লোভাকিয়ায় এই ব্যবসার চরম দুরবস্থা চলিতেছে। পূর্ব্ব বৎসরের চাইতে মিলগুলি শতকরা ৩০ হইতে ৪০ ভাগ কম সময় চলিতেছে। অনেকগুলিই এক সপ্তাহ অন্তর এক সপ্তাহ চালান হইতেছে।

বেলজিয়ামে এপর্য্যন্তও পূর্ণ সময় কাজ চালান হইতেছে। লাভের ভাগ কমিয়া গেলেও অবস্থা সেরূপ আশঙ্কাজনক নয়।

ইংলণ্ডে আমেরিকান সূতা প্রস্তুত বিভাগের অবস্থা খুব খারাপ যাইতেছে। খরিদ্দার নাই। কয়লা-ধর্ম্মঘটের জন্য মিশরীয় বিভাগে অনেকগুলি মিল বন্ধ আছে। ধর্ম্মঘট মিটিয়া গেলে এই বিভাগে সচ্ছলতার আশা করা যায়। বয়ন বিভাগে শিল্পের অবস্থা সব চাইতে খারাপ যাইতেছে। বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের মাল খরিদে কোন আস্থা নাই; কারণ তাহারা আশঙ্কা করে তুলার দাম আরও পড়িয়া যাইতে পারে। এইজন্য তাহারা দিনকার প্রয়োজনীয় মাল দিন খরিদ করিতেছে। বড় অর্ডার পাওয়া যাইতেছে না।

ফ্রান্সে সর্কল মিলগুলিই পূর্ণ সময় চলিতেছে। কিন্তু বর্ত্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কটের জন্য যে কোন মুহূর্ত্তে এগুলি হাত গুটাইয়া বসিতে পারে। তবে এখানে কোন মজুত মাল নাই।

জার্ম্মাণির ভারি দুঃসময় পড়িয়াছে। স্পিনার্সদের হাতে প্রচুর মাল জমা আছে। দাম নেহাৎ কম। অক্টোবর বা নভেম্বরের পূর্ব্বে কোন উন্নতির আশা করা যায় না। অবস্থা এরূপ খারাপ যে, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, তৈয়ারী বস্ত্রের মূল্যের হার যে সূতা দ্বারা উহা প্রস্তুত হইয়াছে তাহার চাইতেও কম। বয়ন-বিভাগে সপ্তাহে তিন দিন কাজ চলিতেছে। উৎপন্ন দ্রব্যের হার অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়াছে।

হলাণ্ডে ব্যবসার অবস্থা তত ভাল নয়, কিন্তু ইংলণ্ডের মত অত খারাপও নয়।

ইতালীর অবস্থা ১৯২৫ সনের মত অত সচ্ছল নয়। বয়ন মিলগুলি স্বাভাবিক মত চলিতেছে। কাপড়ের গাইট আশঙ্কাজনকরূপে বৃদ্ধি পায় নাই। সূতার মিলগুলি দুই মাসের কাজ হাতে রাখিয়া চালান হইতেছে।

জাপানী মিলগুলি প্রতি "শিফট্"এ ১০ ঘণ্টা করিয়া প্রত্যেক দিন ২ "শিফট্"এ ২০ ঘণ্টা চালান হইতেছে। আভ্যন্তরীণ ব্যবসার অবস্থা ভাল নয়। রপ্তানি ব্যবসা আরও খারাপ। খুব সামান্য লাভ। অনেক কোম্পানীকে ক্ষতি সহ্য করিয়া কাজ চালাইতে হইতেছে।

ইতালীতে সোনার খনি

কিছুদিন পূর্ব্বে কতকগুলি পাহাড়িয়া যন্ত্রপাতি সান দিবার জন্য পাথরের সন্ধানে ইতালীর ফ্রুইলি পাহাড়ের চড়াইয়ে জার্মুলা নামক স্থানে গমন করে। এই স্থানে তাহারা কতকগুলি পাথরে আশ্চর্য্যরকম ধাতুর নমুনা পায়। সহরে ফিরিয়া জনৈক ধাতুবিৎকে তাহারা এইগুলি প্রদর্শন করে। তিনি এগুলি পরীক্ষার্থ মিলান সহরে প্রেরণ করেন। মিলানের পণ্ডিতগণ এগুলির মধ্যে স্বর্ণের সন্ধান পাইয়াছেন।

শীঘ্রই সোনার খনির সন্ধানে ঐ অঞ্চলে ধাতুবিশারদ মাতব্বরদিগকে পাঠান হইতেছে। উত্তর ইতালী অঞ্চলে এই প্রথম সোনার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ইহার পূর্ব্বেও এরূপ আবিষ্কার হইয়াছে। কিন্তু সোনার পরিমাণ অতি অল্প হওয়ায় সেদিকে কেহ মাথা ঘামান প্রয়োজন মনে করে নাই। এবার কিন্তু কিছু বেশী লাভের আশা করা যাইতে পারে।

গমের গতিবিধি

দুনিয়ায় যে পরিমাণ গম মজুত আছে তাহা দ্বারা আগামী ফসল পর্য্যন্ত দুনিয়ার চাহিদা সহজেই পূরণ করা যাইবে। ১৯২৫ সনের আগষ্ট মাসে হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে খরচা বাদে ফাজিল ৩৩ কোটি সেণ্টাল (১ সেণ্টাল=৫০ সের) গম রপ্তানি করা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া আর্জ্জেণ্টিনা ও অষ্ট্রেলিয়া হইতে আগত ফসলের উদ্বৃত্ত অংশ ১৪ কোটী সেণ্টালে গিয়া দাঁড়াইবে। ১৯২৫ সনের ১লা আগষ্ট হইতে ১৯২৬ সনের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত আমদানি-কারক দেশসমূহের জন্য অনুমান ৪৭ কোটি সেণ্টাল গমের প্রয়োজন। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ার ফসলের সম্বন্ধে বিগত অক্টোবর মাসে যেরূপ আশা করা গিয়াছিল সেরূপ না হওয়ায় দক্ষিণ ভূভাগের সরবরাহের ভাগ কম হইয়া গিয়াছে।

বায়োস্কোপ ফিল্‌ম্ ব্যবসায়ে মার্কিণ

১৯১৩ সন হইতে এই ব্যবসাটি লাভজনক হইয়া দাঁড়ায়। ঐ বৎসরে আমেরিকা ৩২০ লক্ষ ফুট চলন্ত ছবির ফিল্‌ম্ বিদেশে পাঠায়। ইহার ১৭০ লক্ষ যায় ইয়োরোপে। ল্যাটিন আমেরিকা ও সুদূর প্রাচ্য প্রত্যেকে ১৫ লক্ষ করিয়া ক্রয় করে। অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ড একত্রে ৩০ লক্ষ ফুট আমদানি করে। কানাডা নিজেই চলন্ত ছবি প্রস্তুত করে; সে একাই ছিল ১ কোটি ফুটের ক্রেতা।

ঠিক ১২ বৎসর পরে ১৯২৫ সনে যুক্তরাষ্ট্রের এই ব্যবসার আকার কিরূপ দাঁড়াইয়াছে দেখুন। এই বৎসর ২৩৫০ লক্ষ ফুট ফিল্‌ম্ বিদেশে চালান করা হইয়াছে। ইহা ১৯১৩ সনের রপ্তানির ৭ গুণ। ইহার ৮৬০ লক্ষ ফুট ইয়োরোপে পৌছিয়াছে, ৬ কোটি লাটিন আমেরিকা ও ৪ কোটি প্রাচ্য দেশগুলি খরিদ করিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ডে প্রেরিত ফিল্‌মের পরিমাণ ৩০ লক্ষ ফুট হইতে ২৪০ লক্ষ ফুট দাঁড়াইয়াছে। কানাডা একা ২৩০ লক্ষ ফুটের ক্রেতা। আফ্রিকা যুদ্ধের পূর্ব্বে চলন্ত ছবির তেমন ভক্ত ছিল না। ১৯২৫ সনে আফ্রিকার ইজিপ্ট ও দক্ষিণ প্রদেশ ৫০ লক্ষ ফুট ফিল্‌ম্ আমদানি করিয়াছে। ইহা দ্বারা এই বৎসর বিদেশ হইতে মার্কিণের পকেটে ৭॥০ কোটি ডলার আসিয়াছে।

মোটর বাসের আদমসুমারি

ইয়োরোপে ৭৮ হাজার মোটর বাস আছে ইহার মধ্যে ফ্রান্সে আছে ৩৫ হাজার এবং গ্রেট বৃটেনে ২০ হাজার। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, জার্ম্মাণিতে আছে মাত্র ৫০০ খানা। জার্ম্মাণিতে রেল লাইনের ও আভ্যন্তরীণ জলযান প্রভৃতির আধিক্যই ইহার একমাত্র কারণ। স্পেনে রেল লাইন এখনও চাহিদা-মাফিক বিস্তার লাভ করে নাই, তাই এই দেশে জার্ম্মাণির ১০ গুণ মোটর বাস চলে।

যুক্তরাষ্ট্রের সহরগুলিতে মোটর বাস বিগত দুই এক বৎসরের মধ্যে অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইলেক্ট্রিক ট্রলিগুলি ১০ বৎসর পূর্ব্বে সহরগুলিতে একচেটিয়া আধিপত্য কায়েম করিয়া বসিয়াছিল। আজ মোটর বাসের চাপে সেগুলি কোণ-ঠেসা হইয়াছে। বর্ত্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে ৮০ হাজার মোটর বাস চলে।

মাংসের বাজার

বিলাতে গত দশ বৎসরে গরু-ভেড়ার সংখ্যা-হ্রাস এবং মাংসের চাহিদা-বৃদ্ধি হওয়ায় তথাকার প্রয়োজনের প্রায় অর্দ্ধেক মাংস উপনিবেশ বা অন্যান্য দেশ হইতে আমদানি করিতে হয়।

অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড এবং কানাডা এই তিন দেশ শতকরা ২৫ ভাগ মাংস সরবরাহ করে। বাকীটা অন্যান্য দেশ হইতে, বিশেষতঃ দক্ষিণ আমেরিকা হইতে, পাওয়া যায়।

অষ্ট্রেলিয়ায় গো-চারণ ও গো-পালনের যে মাঠ আছে তাহাতে প্রায় এক কোটী গবাদি পশু লালিত পালিত হইতে পারে।

তেলের খনির নল

"অ্যাংগ্লো পার্শিয়ান অয়েল কোম্পানী" বিলাতী ফার্ম্মের হাতে ১৪০০ টন লাইন পাইপের (তেলের খনিতে

ব্যবহারোপযোগী নলের) অর্ডার দিয়াছেন। ইহাতে হাজার লোকের তিন মাসের জন্য বেকার-সমস্যার সমাধান হইবে। উহার আচ্ছাদন-নির্ম্মাণের জন্য আট শত লোকের দেড় মাসের এবং চারি শত লোকের চারি মাসের কাজ মিলিবে। তাহা ছাড়া, এই কাজের জন্য যে ইস্পাত দরকার হইবে তাহা প্রস্তুত করিতে ১৪৫০ লোক দেড় মাসের কাজ পাইবে এবং অন্যান্য কাজের জন্য মাসাধিক কাল বার শত লোক খাটান দরকার হইবে। গ্লাসগোর ষ্টুয়ার্ড ও লয়েড কোম্পানী এই অর্ডার সরবরাহ করিবেন।

জাপানে তুলার চাষ

তুলার জন্য জাপানকে এ যাবৎ অন্য দেশের উপর নির্ভর করিতে হইত। যাহাতে এই পরমুখাপেক্ষিতা না থাকে তাহার উপায়স্বরূপ পূর্ব্বাপেক্ষা অত্যধিক পরিমাণ তুলার চাষের ব্যবস্থা করা হইতেছে। কৃষকেরা এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ সাহায্য পাইতেছে। জাপানে ব্যবহৃত তুলার অর্দ্ধেক ভারত হইতে যায়।

নিউ ইয়র্কের ডাইনামো

সম্প্রতি নিউ ইয়র্ক সহরে পৃথিবীর বৃহত্তম ডাইনামো যন্ত্র তৈরী হচ্ছে। এই যন্ত্রের উচ্চতা পঞ্চাশ ফুট এবং ওজন লক্ষ পাউণ্ডের অধিক হবে। এই যন্ত্র চালাবার জন্য প্রতি ঘণ্টায় ত্রিশ টন এবং প্রতি মিনিটে হাজার পাউণ্ড কয়লা ব্যয় হবে।

প্রতি ঘণ্টায় ৩০ টন কয়লার পরিবর্ত্তে আশী হাজার অশ্বশক্তি-পরিমিত বৈদ্যুতিক শক্তি তৈরী হবে। এই একটী মাত্র যন্ত্রের সাহায্যে সমগ্র নিউইয়র্ক সহরটির যাবতীয় কার্য্য সমাধা করা যাবে।

এই যন্ত্র তৈরী করবার জন্য বহু উচ্চশিক্ষিত সুযোগ্য ইঞ্জিনিয়ার ও অসংখ্য মজুর প্রায় দেড় বৎসর ধরে নিযুক্ত হয়েছে। তারা অনবরত পরিশ্রম করেও এখন পর্য্যন্ত কাজ শেষ করে উঠতে পারে নি। এই কার্য্য শেষ হলে বর্ত্তমান জগতের শ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ারদের একটী অতুল কীর্ত্তি চিরকাল থেকে যাবে।

অনেক দিন পূর্ব্বে সুইডেন সর্ব্বপ্রথম এই ধরণের যন্ত্র আবিষ্কার করেন। তখনকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডাইনামোর বৈদ্যুতিক শক্তি একশ' অশ্বশক্তির অধিক ছিল না। সুতরাং বিজ্ঞান-জগৎ যে আজ উন্নতির পথে কতদূর অগ্রসর হয়েছে তা সহজেই বোঝা যাচ্ছে। (আত্মশক্তি)

ডাকে প্রেরিত জিনিষের উপর শুল্ক

ষ্টকহল্‌ম আন্তর্জ্জাতিক ডাক বৈঠকে (ইণ্টারন্যাশন্যাল পোষ্টাল কনভেন্‌শনে) স্থিরীকৃত হয় যে, ডাকে প্রেরিত যে সমস্ত জিনিষের উপর শুল্ক ধার্য্য হওয়া সম্ভব তাহাদের শুল্ক পূর্ব্বাহ্নে চিঠি ও প্যাকেটের সঙ্গে ডাক টিকিটে প্রেরণ চলিতে পারিবে, যে সমস্ত দেশে ঐগুলি যাইবে তাহাদের যদি কোন আপত্তি না থাকে। ঐ সমস্ত চিঠি বা প্যাকেটের উপর বিশেষ সবুজ লেবেল আঁটিয়া দিতে হইবে এবং শুল্কের রসিদ বা চালান (ইনভয়েস) উপযুক্ত ভাবে পূরণ করিয়া ইহার সঙ্গে গাথিয়া দিতে হইবে। ১৯২৫ সনের ১লা অক্টোবর হইতে এই আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইতেছে। অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষও ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

যে সমস্ত দেশ এই আইনানুযায়ী কার্য্য করিতে অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছে তাহাদের মধ্যে বেলজিয়াম, চীন, জাপান, ইতালি, তুর্কি, সোভিয়েট রিপাব্‌লিক, ফিনল্যাণ্ড, উরুগুয়া ভেনেজুয়েলা, মেক্সিকো প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

স্পেনে বৈদ্যুতিক শক্তি

কিছুদিন হইল স্পেনের মন্ত্রিসমাজ যে মতলব আঁটিয়াছেন তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে স্পেনকে আর পরের দুয়ারে কয়লার জন্য হাত পাতিতে হইবে না। স্পেন অধিকাংশ কয়লা বিলাত হইতে আমদানি করে। সে এখন কয়লার বদলে বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা তাহার ঘরোয়া কাজ চালাইবার সঙ্কল্প করিয়াছে। বিদেশ হইতে সে আর কয়লা আমদানি করিতে চায় না। ইহাতে ইংলণ্ডের কয়লার খনির মালিকদের ভাবনা হইবার কথা।

এই সম্পর্কে অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, স্পেনে বিরাট জলশক্তি (হাইড্রলিক পাওয়ার) পড়িয়া আছে। এই জলশক্তি দ্বারা বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হইবে। ফলে স্পেন শ্বেত কয়লার (হোয়াইট কোল) তরফ হইতে ইয়োরোপের অন্যতম সমৃদ্ধিশালী দেশে পরিগণিত হইবে।

সম্প্রতি স্পেনের বড় বড় নদীর উপর ৫টী প্রধান হাইড্রলিক মেশিন বা জলশক্তির আড্ডা স্থাপন করা হইতেছে। বিশাল এব্রো নদীর উপর যেটীর স্থাপন-কার্য্য চলিতেছে সেইটিই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হইবে। এইসমস্ত জলশক্তির বৈদ্যুতিক আড্ডাঘরগুলি হইতে বিভিন্ন স্থানে বিদ্যুৎ-সরবরাহ করিতে ১৪ শত মাইল তার ব্যবহৃত হইবে। ইহাতে খরচ হইবে ৪০ লক্ষ পাউণ্ড।

মিল-পরিচালনায় জাপানী ও বোম্বাইওয়ালা

জাপান কটন স্পিনার্স অ্যাসোসিয়েশনের বোম্বাইস্থিত এজেণ্ট শ্রীযুক্ত তামসাকি বলেন, বোম্বাইয়ের মিলগুলি জাপানী প্রতিযোগিতার চাইতে ঘরোয়া প্রতিযোগিতাতে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহে ফ্যাক্টরি আইন না থাকায় বোম্বাইকে ঐ সমস্ত রাজ্যের অস্বাভাবিক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয়। বিগত তিন বৎসরের দেশীয় রাজ্যের উৎপন্ন ও জাপানের আমদানি পণ্যের তালিকা হইতে ইহা পরিষ্কার বুঝা যাইবে। দেশীয় রাজ্যসমূহ ১৯২৩—২৪ সনে ১৩৮০ লক্ষ গজ, ১৯২৪—২৫ সনে ১৭১০ লক্ষ গজ এবং ১৯২৫—২৬ সনে ১৮০০ লক্ষ গজ বস্ত্র উৎপাদন করে। জাপান হইতে ঐ তিন বৎসর যথাক্রমে ১২২০, ১৫৫০, ২১৭১ লক্ষ গজ কাপড় ভারতে আমদানি হয়। এই কয়েক বৎসরে দেশীয় রাজ্যের মিল বৃদ্ধি পাওয়ায় ৪২০ লক্ষ গজ কাপড় বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং জাপানের আমদানি ৯৫০ লক্ষ গজ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

জাপানী তুলা ও বস্ত্র-শিল্পের প্রতিনিধি আঁরও বলেন,—বোম্বাইয়ের মত ক্ষুদ্র সহরে ভারতের অধিকাংশ মিল কেন্দ্রীভূত হওয়াও বোম্বাইয়ের কলকারখানাগুলির অবনতির অন্যতম কারণ। গোড়াতে এই মিলগুলি প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ছিল কেবল বিদেশে সূতা রপ্তানি করা। ব্যবসা-জগতের বিরাট কারবার ও উহার পরিবর্ত্তনের প্রতি তখন কোন দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই এবং প্রধানতঃ ভারতের চাহিদা মিটাইবার জন্য এগুলি খাড়া করা হয় নাই। এগুলি যদি দেশের অভ্যন্তরে স্থাপিত হইত তাহা হইলে ব্যবসার মন্দা ভাবের জন্য এতটা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইত না।

উপযুক্ত কেন্দ্রে সূতা ও বস্ত্রশিল্প-কারখানা স্থাপনের সময়ে ভবিষ্যতে ভারতবাসীকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ঐ সমস্ত স্থানে (১) আবশ্যক পরিমাণ তুলা সংগৃহীত হইবে কিনা, (২) পরিচালনাশক্তি মিলিবে কিনা, (৩) উৎপন্ন মাল বিভিন্ন স্থানে পাঠাইবার সুবিধা, (৪) মজুর-সংগ্রহ এবং (৫) ঐ সমস্ত স্থানের মজুরীর হার কিরূপ হইবে ইত্যাদি।

তামসাকির মতে (১) বোম্বাই মিলগুলিকে উৎকোচ ও ব্যবসা সম্পর্কিত দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হইতে হইবে এবং ইহাদিগের পরিচালনার আরও উৎকর্ষসাধন প্রয়োজনীয়। (২) জাপানী মিলগুলি তুলা আমদানিকারক ও বস্ত্র-ব্যবসায়িগণের সহিত সরাসরি আদান-প্রদান করে, সেখানে কোন মধ্যবর্ত্তী লোক নাই। মালিকরাই ব্যবসায়িগণের সঙ্গে নিজেরা কথাবার্ত্তা চালায় এবং তাহাদের পুঁজিপাটা নিজেরা খাটায়। (৩) জাপানের মত বোম্বাইয়ে কোন সূতার বিনিময় বাজার (কটন ইয়ার্ণ এক্সচেঞ্জ) নাই। জাপানী কলওয়ালারা ব্যবসার মন্দাভাব লক্ষ্য করিলেই তৎক্ষণাৎ "হেজ কণ্ট্রাক্ট" দ্বারা এক্সচেঞ্জে মাল বিক্রয় করিয়া ফেলে। বোম্বাইয়ে এইরূপ সুবিধা হওয়া আবশ্যক। (৪) জাপানে ডিরেক্টররা নিজে মিলগুলি পরিচালনা করেন। ইঁহারা মিলের সকল বিভাগের খুঁটিনাটি বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী; কারণ ইঁহারা সকলেই নিম্নতম স্তর হইতে উচ্চে উঠিয়াছেন।

জাপানের পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া চলিলে ভারতীয় তুলা ও বস্ত্রশিল্প-ব্যবসায়ীরা বিশেষ উপকৃত হইবেন বলিয়া মনে হয়। কেবল জাপান বয়কট আন্দোলন করিলে চলিবে না, নিজেদের মিলগুলির উৎকর্ষসাধন করিতে হইবে।

দেশী

মহীশূরে গো-রক্ষা

মহীশূর রাজ্যের ব্যবস্থাপরিষৎ গোরক্ষার জন্য অবিরত অনুরোধ করায় এবং জনসেবকসঙ্ঘ ও গো-রক্ষা-সভার অনুরোধাতিশয্যে সম্প্রতি মহীশূর রাজ্যের শাসন-বিভাগ ঘোষণা করিয়াছেন যে, দুইজন মুসলমান দুইজন খ্রীষ্টান এবং পাঁচ জন হিন্দুকে লইয়া একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হইবে। স্যার পুত্তানা চেট্টি এই কমিটির অধ্যক্ষ হইবেন। এ বিষয়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের ব্যবস্থা এবং গোরক্ষার সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক সুখসুবিধা সম্বন্ধে তাঁহারা অনুসন্ধান করিবেন এবং মহীশূরে গোহত্যা-নিবারণকল্পে কিরূপ ব্যবস্থা করা আবশ্যক তাহা নির্দ্দেশ করিবেন।

কৃষিবিজ্ঞানাধ্যাপক আয়্যাঙ্গার

অধ্যাপক আয়্যাঙ্গার কৃষি-শিক্ষার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, যোড়াতাড়া দিয়া যে ব্যবস্থার কল্পনা হইতেছে, উহার দ্বারা কোন কাজ হইবে না। এ পর্য্যন্ত কিছুই হয় নাই, হইবার সম্ভাবনাও নাই। কলেজে কৃষিশিক্ষা দিতে হইলে এমন ভাবে ব্যবস্থা করিতে হইবে যে, অধিকাংশ মধ্যবিত্ত ঘরের শিক্ষিত ছাত্রই উহার দিকে আকৃষ্ট হইতে পারে। অনেকের ধারণা, বর্ত্তমান উন্নতিশীল জাতিগণের মধ্যে যে বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, উহার প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন। সে প্রবর্ত্তনও অর্দ্ধেক কি সিকি মাত্রায় হইলে চলিবে না; একেবারে পূরামাত্রায় হওয়া চাই। কোন-কিছু আধাআধি করিয়া প্রবর্ত্তন করিলে মনুষ্যের মনও তাহার দিকে আধাআধিই আকৃষ্ট হয়, পুরাপুরি হয় না। অন্যান্য দেশের জমি এদেশের মত উর্ব্বর নহে। সে সকল দেশের অনুর্ব্বর মাটিও বিজ্ঞানের বলে উর্ব্বর হইয়াছে; পাথর পাহাড় কাটিয়া মাটি বাহির করিয়া তাহাতে শস্য উৎপাদন করা হইতেছে। আর এদেশের মাটি স্বভাবতই উর্ব্বর, তবু এদেশে অনেক স্থানে চাষের সুব্যবস্থা নাই। প্রফেসর আয়্যাঙ্গার বলেন, কলেজে রীতিমত বৈজ্ঞানিকভাবে কৃষিশিক্ষা প্রদান করিয়া শিক্ষিত ভদ্রসন্তানগণকে ঐ কার্য্যে ব্রতী করিতে হইবে—এখন যেমন হইতেছে তেমন ভাবে নহে। ত্রিশ চল্লিশ বৎসর হইতে প্রায় একভাবেই শিক্ষিত যুবকেরা ইউরোপীয় প্রথায় কৃষি-বিদ্যা শিক্ষা করিয়া কেহ বা অন্য পথে যাইতেছে, আবার কেহ বা চাকরী লইতেছে। ইহা ভিন্ন অন্য কোনও ভাব ত কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। উহাতে দেশের কি উপকার হইল? তাই তিনি বলেন, ঐ শিক্ষালাভ করিয়া বাস্তবিক কৃষক হইতে হইবে। নিজে চাষের কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইবে এবং অন্য লোককে সেই শিক্ষার সুবিধা দিতে হইবে। দেশের আপামর সাধারণই যে বিজ্ঞান-জ্ঞান-সম্পন্ন হইবে তাহাও সম্ভবপর নহে। নিজে ব্রতী হইয়া অশিক্ষিত সাধারণ কৃষককে ঐ পথে চালাইয়া লইতে হইবে। তাহা হইলেই কৃষির অবস্থা উন্নত হইবে। (বঙ্গবাসী)

বাছুরেরা দুধ পায় না

বাংলা সরকারের পশুসম্বন্ধীয় পরামর্শদাতা (ভেটারিনারী অ্যাডভাইসার) শ্রীযুক্ত পি, জে, কার এবং সরকারী কৃষি-বিভাগের সহকারী ডিরেক্টর মিঃ কে, ম্যাকলিন তাঁহাদের মন্তব্যপত্রে বলিতেছেন বঙ্গের গো-জাতির অবস্থা অতীব শোচনীয়,—সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে শোচনীয়তম। তাঁহারা বলেন, "প্রথম হইতে বাছুরগুলি যথেষ্ট পরিমাণ দুধ পায় না। গোয়ালা ও গৃহস্থদের অনেকেই গরুর বাঁট হইতে সবটুকু

দুধ দোহন করিয়া লয়। বাছুরের ভাগ্যে মায়ের দুধ অতি অল্পই জোটে। ইহার ফলে বাছুর দিন দিন শীর্ণ হইতে থাকে ; শেষে এইরূপে না খাইতে পাইয়া অধিকাংশই মারা পড়ে। অন্যান্য দেশে এরূপ অবস্থায় বাছুরকে দুধের বদলে অন্যরূপ খাদ্য দেওয়া হইয়া থাকে, বঙ্গে তাহা হয় না। তাঁহারা গো-চর ভূমির অভাব এবং গো-মড়কের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রমিকসঙ্ঘের কর্ত্তা ও বয়নশিল্প

বয়নশিল্পানুসন্ধান সমিতির নিকট কেন্দ্রীয় শ্রমিকসঙ্ঘের সাধারণ কর্ম্মকর্ত্তা মিঃ এস, এন, ঝাবরওয়ালা, যে, বর্ণনাপত্র দিয়াছেন, তাহাতে তিনি জানাইয়াছেন যে, বস্ত্রশিল্পকে বাঁচাইতে হইলে 'স্বদেশী' প্রচারের পূর্ণ ব্যবস্থা করিতে হইবে। তিনি বলেন যে, সর্ব্বপ্রকার স্বদেশী শিল্পকে সরকার এবং জনসাধারণের সাহায্য করা আবশ্যক। যদি এই প্রচারের জন্য আমদানি দ্রব্যের উপর প্রতিরোধক কর বসাইতে হয়, তবে কমিটি তাহার ব্যবস্থা করিবেন ; কিন্তু সে ব্যবস্থা এমন ভাবে করিতে হইবে যে, দরিদ্রের ক্ষতি না হইয়া যেন বড়লোকেরই ক্ষতি হয়।

গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য

গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য সমস্ত প্রকার বিদেশী দ্রব্য বিতাড়িত করিতে সাহায্য করা, কেবলমাত্র তাহাই নহে, সর্ব্বপ্রকার বিদেশী দ্রব্য বাজার হইতে সাহসিকার সহিত বিতাড়িত করা। দেশে যদি স্বদেশী দ্রব্যের কাটতি বাড়ে, তবেই স্বদেশীর উন্নতি সম্ভবপর হইবে। স্বদেশী শিল্পকে এই সর্ত্তে সাহায্য করিতে হইবে যে, সাহায্যপ্রাপ্ত উৎপাদকগণ জনসাধারণের সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে ন্যায়তঃ বাধ্য থাকিবে।

লভ্যাংশের উপর শ্রমিকদের দাবী স্বীকার করিতে হইবে; তাহাদিগকে শুধু যন্ত্রমাত্র মনে করিলে চলিবে না।

ভারতে কৃষি-ব্যাঙ্ক

মাদ্রাজের মহাজনসভায় শ্রীযুক্ত টি, কে, স্বামীনাথন বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন, রায়তকে ঋণের হাত হইতে বাঁচাইতে হইলে কৃষিব্যাঙ্ক-স্থাপন বিশেষ প্রয়োজনীয়। মিশরে এরূপ ব্যাঙ্কের দ্বারা যথেষ্ট উপকার পাওয়া গিয়াছে। ভারতের মত বিশাল কৃষিপ্রধান দেশে এরূপ ধরণের কতকগুলি ব্যাঙ্ক স্থাপন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ব্যক্তিগত মূলধন ও প্রচেষ্টায় এই ধরণের ব্যাঙ্ক-গঠন সম্ভবপর। ব্যক্তিবিশেষকেই ব্যাঙ্কগুলি গড়িয়া তুলিবার ভার নিতে হইবে। এইগুলি কি প্রণালীতে চালাইতে হইবে, মাত্র সেই দিকে সরকার উপদেশাদি দিবেন। ইহার জন্য সমবেত চেষ্টা আবশ্যক।

সভাপতি শ্রীযুক্ত দেওয়ান বাহাদুর টি, রঙ্গচারিয়ার, এম, এল,এ মহাশয়ের মতে কৃষিই ভারতের মেরুদণ্ড ছিল এবং ইহাই তাহার প্রধান অবলম্বন হইতে চলিয়াছে। অধুনা সহরের দিকে লোকের বেশী ঝোঁক পড়ায় কৃষির দিকে লোকের আকর্ষণ কমিয়া আসিয়াছে। সেকালের লোকের কৃষির দিকে যে রকম আগ্রহ ছিল, আজকাল সে রকম আগ্রহ ও উৎসাহ দেখা যায় না। দেশের লোকের উপকারের জন্য কৃষিব্যাঙ্ক-স্থাপনের প্রচেষ্টায় সরকারের সাহায্য করা একান্ত কর্ত্তব্য।

বঙ্গীয় কুম্ভকার সম্মিলনী

হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ পাল, এম-এ, বি-এল মহাশয়ের সভাপতিত্বে সম্প্রতি নাটোরে বঙ্গীয় কুম্ভকার সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছে। এই সম্মিলনে সাম্প্রদায়িক বৈষম্য নিবারণ, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন, বরপণ নিবারণ, কুম্ভকারদিগের জাতীয় ব্যবসায়ের উন্নতির চেষ্টা ও সংবাদপত্র পরিচালনা প্রভৃতি সম্বন্ধে কয়েকটী প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইয়াছে।

হাঁস ও মুর্গীর ব্যবসা

ঢাকায় গবর্মেণ্টের যে কৃষি-পরীক্ষাগার আছে তথায় হাঁস ও মুর্গী পালনের ব্যবস্থা করিতে গবর্ণমেণ্ট মনস্থ করিয়াছেন। ইতিমধ্যে এই ব্যবসা চালাইবার জন্য কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে। দেশীয় বিভিন্ন জাতের ও বিদেশী উৎকৃষ্ট হাঁস ও মুর্গীর ব্যবসা আরম্ভ হইবে। দেশীয় হাঁস ও মুর্গীর উন্নতির জন্যও চেষ্টা করা হইবে।

কলিকাতার অন্ধ বিদ্যালয়

আজ প্রায় ৩০ বৎসর হইল শ্রীযুক্ত লালবিহারী সাহা মহাশয় অন্ধদিগের শিক্ষার জন্য উক্ত বিদ্যালয়টি স্থাপন করেন। এযাবৎকাল স্কুলের বাড়ী না থাকায় ভাড়া বাড়ীতে স্কুলের কার্য্য চলিতেছিল এবং স্থানাভাব হেতু অনেক সময় ছাত্র-ছাত্রীগণের প্রবেশের আবেদন অগ্রাহ্য করিতে হইয়াছে। সাধারণের বদান্যতায় ও বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে কলিকাতার দক্ষিণে বেহালা নামক স্থানে সম্প্রতি স্কুলের বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে এবং সেখানে এক শত ছাত্র-ছাত্রীর বাস ও শিক্ষার স্থান করা হইয়াছে। লেখাপড়া, শিল্প-কার্য্য ও গীত-বাদ্যাদি শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী আছে। আরও ৫০ জন (৩০টী বালক ও ২০টী বালিকা) এখনি গ্রহণ করা যাইতে পারে। অভিভাবকদিগের ক্ষমতানুযায়ী বেতন ধার্য্য হয় এবং দরিদ্র ও উপযুক্ত ছাত্র-ছাত্রীর ব্যয়ভার বহন করিতে কর্ত্তৃপক্ষ প্রস্তুত আছেন। অধিকাংশ শিক্ষক স্কুল সংলগ্ন আবাসে এবং বালিকারা শিক্ষয়িত্রীদের তত্ত্বাবধানে থাকে। কয়েকটী ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের বৃত্তি খালি আছে।

"সৎসঙ্গ" শিক্ষাসমিতি

পাবনার "সৎসঙ্গ"-প্রতিষ্ঠানে বার্ষিক আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গেল (৩০ ভাদ্র)। শিক্ষা, সমাজ, শিল্প-কলা ও স্বাস্থ্য এই কয় বিষয়ে আলোচনা চালানো হইয়াছিল। এই উপলক্ষে "সৎসঙ্গ-প্রদর্শনী" এবং "বঙ্গীয় হিতসাধন-মণ্ডলীর স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী খোলা হয়। সন্তরণ-প্রতিযোগিতা, লাঠি-খেলা, জিউজিৎসু এবং নৌচালন-প্রতিযোগিতা দেখানো হইয়াছে। শিশুমঙ্গল সম্বন্ধে ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে বক্তৃতার ব্যবস্থাও ছিল।

বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধে অধ্যাপক আস্তিয়া

সিডেনহাম কলেজের অধ্যাপক মিঃ আস্তিয়া বলেন যে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্যবসায়ে মন্দা পড়ায়ই ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের দুরবস্থা ঘটিয়াছে। খরিদ করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে অবস্থার উন্নতিলাভ হইবে। ভারতে যেমন মন্দা পড়িয়াছে জাপানেও তেমন মন্দা পড়িয়াছে। সাধারণতঃ কয়েক বৎসর মন্দার পরে কয়েক বৎসর ভাল যায়। তাঁহার মতে ভারতীয় কলে অতিরিক্ত মাত্রায় মাল জমিয়া গিয়াছে। এজেণ্টগণ সস্তায় মাল ছাড়িতে রাজী হয় না বলিয়াই এইরূপ ঘটিয়াছে।

মহারাজা কাশিমবাজার কমার্শ্যাল ইনষ্টিটিউট

কলিকাতা ৭৪।১ নং হ্যারিসন রোডে উপরিউক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষিত যুবকদিগকে হাতে কলমে ব্যবসা শিক্ষা দিবার জন্য ১লা সেপ্টেম্বর হইতে একটী বিভাগ খোলা হইয়াছে। এই বিভাগে বাংলা ভাষায় ছাত্রদিগকে এরূপভাবে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইতেছে যাহাতে যুবকেরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে নিজ নিজ অবস্থানুসারে কোন একটা ব্যবসা অবলম্বন করিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারে। এই বিভাগে "মহাজন সখা" প্রভৃতি পুস্তক-প্রণেতা শ্রীযুত সন্তোষ নাথ শেঠ সাহিত্যরত্ন মহাশয় শিক্ষকতার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। হাতে কলমে শিক্ষার জন্য সপ্তাহে এক দিন কলিকাতার বিভিন্ন বাজারে ছাত্রগণকে লইয়া গিয়া, কোথায় কোন জিনিষের আমদানি-রপ্তানি হয় তাহার সন্ধান, রেল ও ষ্টীমারে কি করিয়া মাল চালান দিতে ও ডেলিভারী লইতে হয় ইত্যাদি দেখান হইবে।

কৃষি-সভা

গোয়ালন্দ মহকুমার পাংশা ও বালিয়াকান্দী থানায় গত ৯ই ও ১০ই জুলাই তারিখ কৃষি ও গবাদি পশুর উন্নতিকল্পে এক মহতী সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। সভায় বহু গণ্য-মান্য ভদ্রলোক এবং বহু কৃষকশ্রেণীর লোক উপস্থিত ছিলেন। এই অঞ্চলে কৃষির উন্নতি করিতে হইলে চন্দনা নদীর ও খাল-বিলগুলির সংস্কার করা সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। ইহাতে যে স্বাস্থ্যও পুনরায় ফিরিয়া আসিবে তাহা বলাই বাহুল্য। প্রচুর গো-চারণ ভূমি ও ষাঁড়ের অভাবই যে গো-জাতির অবনতির প্রধান কারণ সকলে একবাক্যে তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

বরিশালে কৃষি ও পশুর উন্নতি-বিধানের জন্য গত ৫ই জুলাই এক সভা হইয়াছিল। কৃষি-বিভাগের কর্ম্মচারী শ্রীযুত বীরেশ্বর লাহিড়ী এক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন।

কর-অনুসন্ধান-কমিটির রিপোর্ট

ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদে স্যার বাজিল ব্লাকেট প্রস্তাব করেন যে, বড়লাট কর-অনুসন্ধান সমিতির রিপোর্ট আলোচনা করুন।

স্যার বাজিল ব্লাকেট বলেন যে, তিনি রিপোর্টের নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে কোন ঘোষণা করিবেন না। কি ভাবে কর ধার্য্য করা হয় সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনুসন্ধান ভারতে এই প্রথম। করদাতৃগণের পক্ষে বিশেষ কষ্ট না হয়, তেমন ভাবে কি করিয়া কর সংগ্রহ করা যায় তাহাই ছিল কমিটির তদন্তের বিষয়। ভারতবর্ষ অপর দেশের মত নহে। ভারতবর্ষ সার্ব্বজনিক এবং জনহিতকর কার্য্যের জন্য গবর্ণমেণ্টের মুখ চাহিয়া থাকে। কাজেই গবর্ণমেণ্টকে ব্যয়ভার বহন করিতে হয়। ফলে তাহাদিগকে কর আদায় করিতে হয়। তিনি কর আদায় করার পক্ষপাতী নহেন। তিনি মনে করেন যে, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টদের দেয় টাকা মকুব হইয়া গেলে তাহারা ধীরে ধীরে কর-প্রথা তুলিয়া দিতে পারিবেন। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে পূর্ব্বেই হাত দিয়াছেন। তাঁহারা লবণকর কমাইয়া দিয়াছেন ও বয়নশুল্ক তুলিয়া দিয়াছেন।

ভূমির রাজস্ব প্রদেশের হাতে তুলিয়া দেওয়া এবং রেলওয়ের আয়-ব্যয় পৃথক করিয়া দেওয়ায় কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের বাজেট-সমস্যা অনেকটা সহজসাধ্য হইয়াছে। এই সমস্যাকে তাঁহার পূর্ব্বতন পদাধিকারী "বৃষ্টির জুয়া" বলিয়া গিয়াছেন। চুঙ্গী হইতে যে শুল্ক আদায় হয়, তাহার ফলেই এই 'জুয়ার' পুনঃ প্রবর্ত্তন হইতে পারে নাই। একথা উল্লেখযোগ্য, কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য শুল্কের মধ্যে শতকরা ৭২॥০ টাকা চুঙ্গী বিভাগ হইতে আদায় হয়।

স্যার বাজিল ব্লাকেট উপসংহারে বলেন যে, ভারতসরকার প্রথমে প্রাদেশিক সরকারের দেয় রাজস্ব মকুব করিবেন; অতঃপর মেষ্টনী ব্যবস্থায় ছোটখাট দুই একটি পরিবর্ত্তন করিবেন।—এ, পি

ঢাকায় কৃষি-প্রদর্শনী

কৃষি বিষয়ে অনুসন্ধান লইবার জন্য যে রয়াল কমিশন বসিয়াছে, তাহার সভ্যদিগকে বাঙ্গালার কৃষিসমস্যায় 'ওয়াকিবহাল' করিবার জন্য বাঙ্গালার সরকার ঢাকায় একটি কৃষি-প্রদর্শনী করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। কৃষিবিভাগের ডিরেক্টর মিঃ আর, এস, ফিন্‌লো এই প্রদর্শনী খুলিবার যাবতীয় আয়োজন করিবেন। তিনি ইহার সাফল্যের জন্য ইতিমধ্যেই অনেককে পত্র লিখিতেছেন। বাঙ্গালার স্বাস্থ্যবিভাগ, শ্রমশিল্প বিভাগ ও সমবায় সংক্রান্ত বিভাগ যাহাতে এই কার্য্যে সহযোগিতা করেন সেজন্যও চেষ্টা হইতেছে। কৃষি-প্রদর্শনীর যে উপকারিতা আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কেবল যদি রয়াল কমিশনের সভ্যদিগকে এ দেশের কৃষির অবস্থা বুঝাইবার জন্যই এই প্রদর্শনীর প্রয়োজন বিবেচিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে কেবল ঢাকায় উহার ব্যবস্থা করিলেই সে উদ্দেশ্য সফল হইবে কি? বাঙ্গালার বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষির অবস্থা বিভিন্নরূপ; সুতরাং যাহাতে রয়াল কমিশনের সভ্যগণ সকল অঞ্চলের কৃষির অবস্থা জানিতে পারেন, সেইরূপ ব্যবস্থা করা আবশ্যক। ঢাকার প্রদর্শনীতে যে পশ্চিম বঙ্গ বা দক্ষিণ বঙ্গের কৃষকেরা তাহাদিগের কৃষিজাত সামগ্রী বা কৃষিপ্রণালী প্রদর্শনার্থ কষ্ট স্বীকার করিয়া যাইবে, তাহা সম্ভব নহে। সুতরাং এই প্রদর্শনীতে যে অর্থের অপব্যয় হইবে না এরূপ বলা যায় না।

(পঞ্চায়েৎ)

কৃত্রিম পাট

কথা উঠিয়াছে, বিলাতের দুইজন রাসায়নিক পণ্ডিত রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা নূতন এক প্রকার পদার্থ আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা দ্বারা পাটের কার্য্য চলিবে এবং পাট অপেক্ষা তাহার মূল্য অনেক কম হইবে। এরূপ অনেক বিষয়েই অনেক গুজব সময় সময় রটে। ফলে শেষ পর্য্যন্ত অনেক কথাই সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। এই কৃত্রিম পাটের কথাটাও গুজব কি না এখনও ঠিক বলা যায় না। এই গুজব শুনিয়া পাটের চাষী বা ব্যবসায়ীদের

বিচলিত হইবার কোন কারণ নাই। যদি আবিষ্কার সত্যও হয় তথাপি তাহার ফল আমাদের দেখিতে অনেক বিলম্ব আছে। (শান্তিবার্ত্তা)

মণিপুর কৃষি-বিদ্যালয়

এই বিদ্যালয়টি ঢাকার মণিপুর কৃষিফার্ম্মের মধ্যে অবস্থিত। উন্নত প্রণালীতে কৃষিকার্য্য বিষয়ে যাবতীয় শিক্ষা দেওয়াই এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য। কৃষি বিষয়ে ছাত্রদের উৎসাহ দিবার জন্য সরকার মাসিক দশ টাকা হারে তাহাদিগকে বৃত্তি দিয়া থাকেন। একজন প্রধান শিক্ষক ও তাঁহার দুইজন সহকারী ইহার তত্ত্বাবধান করেন।

বিদেশী

আন্তর্জ্জাতিক উৎকোচ-নিবারণী সমিতি

দুনিয়ার অনেক দেশেই ব্যবসা সম্পর্কে ঘুষের রেওয়াজ আছে। ব্যবসায়িগণ অন্যের সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ করাইয়া দিয়া নিজেদের সঙ্গে কারবার চালাইবার মতলবে অনেক সময় গোপনে ফার্ম্মের উপরওয়ালা কর্ম্মচারী প্রভৃতিকে উৎকোচ প্রদান করিয়া নিজেদের কাজ হাসিল করে।

এই উৎকোচ দিবার প্রথা তুলিয়া দিবার মানসে ইউরোপের কতকগুলি ব্যবসায়ী জাতি লইয়া একটা আন্তর্জ্জাতিক কংগ্রেস কায়েম করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া, ইংলণ্ড, জার্ম্মাণি ও সুইডেন এই প্রথার বিরুদ্ধে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গিয়াছে। ঐ সমস্ত দেশে ইহার সহিত লড়িবার জন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ খাড়া করা হইয়াছে। ইংলণ্ড আইন জারি করিয়া এইরূপ হীন উপায়ে ব্যবসায়ের সুবিধা করিয়া লওয়াকে অবৈধ কাজ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

লণ্ডন সহরে সম্প্রতি উৎকোচ-নিবারণার্থ আন্তর্জ্জাতিক কংগ্রেসের এক বৈঠক বসিয়াছিল। তথায় অনেক বক্তাই স্বীকার করেন যে, এইরূপ কুপ্রথা দুনিয়ার ব্যবসা মহলে অল্প-বিস্তর বর্ত্তমান আছে। একজন এঞ্জিনিয়ার বলেন, পরামর্শদাতা এঞ্জিনিয়ারগণকে সহজেই উৎকোচ দিয়া কার্য্য-সিদ্ধি করা যাইতে পারে; কারণ বড় বড় ইমারত, জাহাজ, রেল প্রভৃতির কণ্ট্রাক্ট ইহারা ইহাদের ইচ্ছামত বিল্ডার বা নির্ম্মাতাদিগের হাতে দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন।

বিলাতের চিফজাষ্টিসের মতে উৎকোচ দান সর্ব্বাপেক্ষা জঘন্য পাপ ও জাতীয় ধ্বংসের পূর্ব্বাভাষ। উৎকোচ গ্রহণকারীর হীনতা প্রকাশ পাইলে বাজারে তাহার সুনাম নষ্ট হইয়া যায়—এমন কি উৎকোচ-প্রদানকারী অনেক সময় ইহা প্রকাশ করিয়া দিতে উৎসুক থাকে।

বড় বড় ফার্ম্মের কর্ম্মচারিগণকে মোটা হাতে উৎকোচ দিয়া বশীভূত করিয়া ব্যবসার সুবিধা করিয়া লওয়া হয়। ঐ সমস্ত কর্ম্মচারী উৎকোচপ্রদানকারী ব্যবসায়ীদের হাতে কণ্ট্রাক্ট দিবার মতলবে পুরাতন ফার্ম্মগুলির মালগুলি নেহাৎ খারাপ, অকেজো, তাহাদের সঙ্গে লেন-দেন সুবিধা-জনক নয় ইত্যাদি অজুহাত ধরিয়া পুরাতন কণ্ট্রাক্ট ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টায় অনেক সময় কৃতকার্য্য হয়। এইরূপ ভাবে কর্ম্মচারীদিগকে বশীভূত করিয়া স্বপক্ষে আনিতে ব্যবসায়ি-গণের অনেক টাকার শ্রাদ্ধ হইয়া যায়।

আন্তর্জ্জাতিক কংগ্রেস সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, জেনেভার বিশ্বরাষ্ট্র পরিষদের হাতে উৎকোচ-নিবারণের ভার অর্পণ করা হউক।

স্পেনে বৃটিশ চেম্বার অব কমার্স

প্রত্যেক দেশেই বৃটিশ চেম্বার অব কমার্স আছে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান ইংলণ্ডের ব্যবসা বাণিজ্য বিস্তারের যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকে। স্পেন দেশে যে বৃটিশ চেম্বার অব কমার্স বা ব্যবসা-বাণিজ্য-বিষয়ক প্রতিষ্ঠানটি আছে তাহার কেন্দ্র বার্সেলোনায় ও মাদ্রিদে। (১) এই প্রতিষ্ঠানটি স্পেনের ব্যবসা বাণিজ্যের বহু বৎসরের অভিজ্ঞতা ইহার সভ্যগণকে প্রদান করে (২) বৃটিশ ফার্ম্মগুলি স্পেনের উপযুক্ত এজেন্টগণের সঙ্গে পরিচিত করাইয়া দেয়,

(৩) স্পেনের ব্যবসা-বাণিজ্যের ফার্ম্মগুলির খাঁটি অবস্থা জ্ঞাপন করে, (৪) ঐ দেশের শুল্কনীতির যথাযথ বিবরণ প্রদান করে, (৫) শুল্কের হার এবং ব্যবসাবাণিজ্য-সংক্রান্ত প্রস্তাবিত আইন কানুন, যাহা বিশেষ বিশেষ ব্যবসার উপর ক্রিয়া করিতে পারে, তাহা পূর্ব্বাহ্ণে সভ্যগণকে জ্ঞাপন করে, (৬) বিলাতী মালের স্পেনিশ খরিদ্দারগণের নামের তালিকা প্রেরণ করে, (৭) খরিদ্দারগণকে দিবার নিমিত্ত সভ্যগণের নামের তালিকা করিয়া রাখে, (৮) স্পেন ও গ্রেটব্রিটেনের মধ্যে ব্যবসাবাণিজ্য সংক্রান্ত যাবতীয় নিরেট তথ্যপূর্ণ বিবরণী সভ্যগণকে প্রদান করে, (৯) ব্যবসায়ী পরিব্রাজক ও বৃটিশ ফার্ম্মের প্রতিনিধিগণকে স্পেনের ব্যবসাবাণিজ্যের সাময়িক অবস্থার বিষয়ে ওয়াকিবহাল রাখে, (১০) সভ্যগণের শুল্ক ও অন্যান্য ব্যবসা সম্পর্কিত অসুবিধা দূরকরণে সাহায্য করে, (১১) সভ্যগণের ব্যবহারের জন্য ও ব্যবসা সংক্রান্ত অনুসন্ধানের জন্য রেফারেন্স লাইব্রেরী ও পাঠাগারের ব্যবস্থা করে, (১২) ব্যবসায়ী পরিব্রাজকগণের সুবিধার জন্য আফিসের ব্যবস্থা করিয়া দেয়। এখানে ইঁহারা অন্যান্য ব্যবসায়িগণের সঙ্গে মোলাকাৎ করা, চিঠিপত্র লেখা প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন। (১৩) প্রতিষ্ঠানটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করে এবং পাক্ষিক সার্কুলার ছাপাইয়া তাহা দ্বারা সভ্যগণকে নূতন নূতন ব্যবসায়-পথের সন্ধান প্রদান করে। এগুলি বিনা পয়সায় সভ্যগণের মধ্যে বিতরণ করা হয়। (১৪) প্রত্যেক সভ্যকে বৎসরে ছয় বার স্পেনের ব্যবসা কেন্দ্রগুলির সম্বন্ধে খবরাখবর প্রদান করা হয়।

ইহাদের চেষ্টার কোন ত্রুটী নাই। এইরূপ সমগ্র ভাবে ঐকান্তিক চেষ্টা ও সাধনা করিয়াই বৃটিশ জাতি ব্যবসা বাণিজ্যে আজ এত বড় উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। জগতের বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠিত এই সমস্ত বৃটিশ চেম্বার অব কমার্সের কার্য্যাবলী ঘাঁটিয়া দেখিলে আমাদের দেশের ব্যবসায়িগণের অনেক উপকার হইবে।

বিলাতে খদ্দর-প্রচার

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বিলাতে এক নবগঠিত ভারতীয় মজলিসের বক্তৃতায় নিম্নোক্তরূপ বলিয়াছেন।

"বিগত ৪ বৎসরের মধ্যে খদ্দরের বাণী প্রচারকল্পে প্রায় ৪৫ হাজার মাইল স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছি। আজিও সেই কথাই বলিব।

"সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে আগেকার বিলাত-ফেরৎ দেশীয়গণ প্রকৃত পক্ষে স্বদেশীর শত্রুই ছিলেন। ডব্লিউ, সি, ব্যানার্জ্জি, মনোমোহন ঘোষ প্রমুখ কতিপয় 'ব্যারিষ্টারের আমল হইতে আহারে বিহারে আমরা পুরামাত্রায় পাশ্চাত্য জীবনযাত্রা-প্রণালীর অনুকরণ করিয়া আসিতেছি এবং এইরূপে দেশের লক্ষ লক্ষ মূক জনসাধারণের নিকট হইতে আমরা দূরে সরিয়া পড়িতেছি। একজন শ্বেতাঙ্গ যখন বিলাতে কোন মোটর-বাস বা অপর কোন যানে আরোহণ করেন, তখন ভাড়ার পয়সাটা তাহার নিজের পকেটে গিয়াই পড়ে; কেন না, ঐ সমস্ত গাড়ী যে কোম্পানীর, তিনিও উহার একজন অংশীদার। কিন্তু আমাদের দেশের তথাকথিত শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে যাঁহারই সঙ্গতি আছে তিনিই ডজ অথবা রোলস্ রয়েসের গাড়ী কিনিয়া থাকেন। কিন্তু ঐ সময় ইঁহারা এটুকু মনে করেন না যে, ইহাতে তাঁহাদের নিজেদের দেশের অর্থই বাহির হইয়া যাইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে গ্রেটবৃটেনে প্রায় দুই হাজার ভারতীয় ছাত্র বাস করিতেছেন। গড়ে প্রত্যেকে বৎসরে ২৫০ পাউণ্ড অর্থাৎ মোট ৭৫,০০,০০০৲ ব্যয় করিয়া থাকেন। কিন্তু এত অর্থ ব্যয় করিয়া ইহারা দেশে ফিরিয়া হয় ব্যবহারাজীব-বহুল আদালতের ব্যবহারাজীবের সংখ্যা আরও বাড়াইবেন, নতুবা চিকিৎসা ব্যবসায় গ্রহণ করিবেন, অথবা কোন একটা বড় গোছের চাকুরী বাগাইবার চেষ্টায় থাকিবেন। দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে শিল্প-প্রতিষ্ঠান বা কারবার খোলা কাহারও দ্বারা সম্ভবপর হইবে না। অপর এক দিকের চিত্র আরও শোচনীয়। প্রতিবৎসর গড়ে অন্ততঃ দুইজন করিয়া দেশীয় রাজা বিলাতে আসিয়া থাকেন। ইঁহারা এখানে আসিয়া বড় বড় নামজাদা হোটেলের সুরম্য গৃহে বাস করিতে থাকেন এবং রাশি রাশি অর্থ জলের মত ব্যয় করিতে থাকেন। অথচ ঐ অর্থই তাঁহাদের অসহায় দরিদ্র প্রজাদের শোষণ করিয়া

সংগৃহীত হইয়া থাকে—দারিদ্র্য এবং অজ্ঞতার অন্ধকারে আজন্ম নিমজ্জিত থাকিয়া তাহারাই এই অর্থ জোগায়। বাঙ্গালার রংপুর, কুচবিহার প্রভৃতি স্থানই তামাকের জন্মভূমি। কিন্তু বিলাতফেরৎগণ বা ভারতীয় তথাকথিত শিক্ষিতসম্প্রদায় দেশী তামাকের নামে আঁৎকাইয়া উঠেন। ইহারা হুকায় তামাক খান না; উহা নাকি বর্ব্বরতার নিদর্শন! ইহারা ইংলণ্ডে তৈয়ারী সিগারেট ফুঁকিয়া থাকেন, জনসাধারণও ইহাদের অনুকরণ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

এক বাঙ্গালা হইতেই আমরা এই সমস্ত বৈদেশিক বিলাসিতার জন্ত বৎসরে এক কোটী টাকা দিয়া থাকি। আমাদের দেশে যে সমস্ত সাবান তৈয়ারী হইতেছে, কলিকাতা সোপ ওয়ার্কসে যে সমস্ত সাবান তৈয়ারী হইতেছে, ঐগুলি বিলাতী সাবান অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহে। কিন্তু আমাদের দেশের "শিক্ষিত" লোকদের এমনই মনোবৃত্তি যে, তাঁহারা দেশী জিনিষ হাজার ভাল হইলেও দু'চক্ষে দেখিতে পারেন না। এখানকার অনেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান প্রচার করিয়া থাকেন, 'বিলাতী জিনিষ ক্রয় করিয়া ধন্ত হও।' কিন্তু আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য এমনই যে, একমাত্র খদ্দর ক্রয়ের জন্ত শত অনুনয়-বিনয় করিয়াও কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই। খদ্দরই ভারতের অর্থ-নৈতিক মুক্তির পন্থা। ভারতের শোচনীয় দারিদ্র্যের কোন ধারণা অনেকের নাই। সার উইলিয়ম হান্টার এডিনবারায় বলিয়াছিলেন,—ভারতের এক-পঞ্চমাংশ লোক পূর্ণোদর ভোজনের আনন্দই লাভ করিতে পারে না। অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হইলে ত দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। অনেক সময় জীবনহানিও ঘটিয়া থাকে। একমাত্র যদি খদ্দরের প্রচলন হয় তাহা হইলে ৬০ কোটী টাকা দেশে থাকিয়া যাইবে এবং অনেকের মুখে অন্ন উঠিবে।

খাদি-প্রচারের জন্ত বাঙ্গালার খাদিপ্রতিষ্ঠানের চেষ্টা ধন্তবাদার্হ। মহাত্মার চেষ্টায় দেশে আত্মসম্মানবোধ জাগিয়াছে। একজন কুলীও আর অসম্মান হজম করিতে রাজী নহে। ঘরে ফিরিবার বাণী মহাত্মাই প্রচার করিয়াছেন; অনেক পাশ্চাত্য-সভ্যতা-বিষ-জর্জ্জরিত ব্যক্তিও এখন তাঁহার আহ্বানে ঘরের দিকে দৃষ্টি দিয়াছেন। অতঃপর বক্তা সকলকে স্বদেশী এবং খদ্দর গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন।

আর্থিক জীবন ও নারী-স্বরাজ

কি পার্লামেণ্ট, কি আইন-ব্যবস্থাপক সভা, কি শহরের মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশ্যন, কি পল্লী-সভা বা গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেই মানুষের আর্থিক ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করা হইয়া থাকে। টাকাকড়ির লেনদেন, ধন-দৌলতের গতিবিধি, ব্যবসা-বাণিজ্যের উঠা-নামা, সম্পত্তির ভাগবাঁটোয়ারা, জমিজমার স্বত্বাধিকার ইত্যাদি সকল প্রকার আর্থিক কাণ্ডই এই সকল রাষ্ট্রীয় সভায়-মহাসভায় আলোচিত হয়। কাজেই এই সকল মজলিশে স্থান না পাইলে কোনো লোক নিজের আর্থিক জীবন সম্পর্কিত কার্য্য-কলাপে স্বরাজ ভোগ করিতে পারে না।

দুনিয়ার সর্ব্বত্রই এতদিন ধরিয়া মেয়েদের আর্থিক ভাগ্য পুরুষদের হাতে শাসিত হইত। কিন্তু একে একে প্রায় সকল দেশ হইতেই মেয়েদের এই পর-রাজ অল্প-বিস্তর চলিয়া গিয়াছে বা যাইতেছে। রাষ্ট্রীয় সভায় মেয়েরা আজকাল কমবেশী স্বরাজ-ভোগের পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

চেকোশ্লোভাকিয়া, ডেনমার্ক, ফিনল্যাণ্ড জার্ম্মাণি, আইসল্যাণ্ড, আইরিস ফ্রিষ্টেট, কেনিয়া, লেটোনিয়া, লিথুয়েনিয়া, লুক্সেমবুর্গ, নেদারল্যাণ্ডস্, নিউজীল্যাণ্ড, নরওয়ে, পোলাণ্ড, রোডেসিয়া, রুশিয়া, সুইডেন, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের নারীরা পুরুষের তুল্য ভোটাধিকার (সাফ্রেজ) এবং সকল প্রকার নির্ব্বাচিত প্রতিষ্ঠানের সভ্য হইবার অধিকার পাইয়াছেন।

অষ্ট্রেলিয়া ও অষ্ট্রিয়ার মেয়েরা ভোটাধিকার এবং পার্লামেণ্ট ও মিউনিসিপ্যাল প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রবেশাধিকার পাইয়াছেন। বেলজিয়ামের মেয়েরা কেবলমাত্র মিউনিসি-প্যালিটীতে ভোট দিতে ও ইহার সভ্য হইতে পারেন। বেলজিয়ামের পার্লামেণ্টে ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় যুদ্ধে দেউলিয়া কতক সম্প্রদায়ের ছাড়া সব মেয়েরা নির্ব্বাচিত

হইবার অধিকারিণী; কিন্তু ঐসমস্ত প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতাপ্রদান ছাড়া তাঁহাদের ভোট দিবার কোন ক্ষমতা নাই। কানাডায় মেয়েরা ফেডারেলে ও প্রাদেশিক সকল নির্ব্বাচিত প্রতিষ্ঠানে ভোট দিতে ও নির্ব্বাচিত হইতে পারেন; কিন্তু তাঁহারা ফেডারেল সেনেটর হইতে পারেন না। কানাডার কুইবেক প্রদেশের মেয়েরা নির্ব্বাচিত হওয়া দূরের কথা ভোটাধিকারেও বঞ্চিত।

বিলাতের মিউনিসিপ্যালিটিসমূহে মেয়ে পুরুষের সমান অধিকার আছে। মেয়েরা এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে মেয়র পর্য্যন্ত নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। কিন্তু বিলাতের পার্ল্যামেণ্ট মহাসভায় ত্রিশ বৎসরের নিম্নবয়স্কা মেয়েদের ভোট দিবার ও নির্ব্বাচিত হইবার ক্ষমতা নাই। পুরুষদের বেলায় কিন্তু ২১ বছরই যথেষ্ট। ইহা ছাড়া, আরও দুই এক বিষয়ে নারীর অধিকার খর্ব্ব করা হইয়াছে।

গ্রীসে মিউনিসিপ্যালিটী ও সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনে মেয়েদের হাতে কতকটা নির্দ্দিষ্ট ক্ষমতা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ভোট দেওয়া ছাড়া নির্ব্বাচনে দাঁড়াইবার অধিকার তাঁহাদের দেওয়া হয় নাই। গ্রীসের এই নয়া ব্যবস্থা ১৯২৭সন থেকে কায়েম করা হবে। হাঙ্গারীতে পার্ল্যামেণ্ট ও মিউনিসি-প্যালিটি প্রভৃতিতে ৩০ বছর বয়সের মেয়েদের ভোটাধিকার মাত্র দেওয়া হইয়াছে। পুরুষের বেলায় কিন্তু সেই ২১ বছরই ধার্য্য আছে। এ ছাড়া, শিক্ষা বিষয়ে পুরুষে মেয়েতে অনেক পার্থক্য বর্ত্তমান আছে।

বৃটিশ ভারতে বোম্বাই, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, আসাম ও বাংলায় মেয়েদের ভোটাধিকার এবং কোন কোন স্থানে নির্ব্বাচনাধিকারও দেওয়া হইয়াছে।

ব্রহ্মদেশে বিশেষ আইনের বলে মেয়েদের হাতে ভোট দিবার ক্ষমতা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে; সেখানকার ব্যবস্থাপক সভা আইন প্রণয়ন করিয়া মেয়েদের নির্ব্বাচিত হইবার অধিকারও দিতে পারেন এরূপ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। বৃটিশ-শাসিত ভারতের বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় সহরে মেয়েরা মিউনিসিপ্যালিটীর নির্ব্বাচনে ভোট দিতে ও তাহাতে নির্ব্বাচিত হইতে পারেন। দেশীয় নৃপতির শাসিত এলাকা মধ্যে কোচিন, ত্রিবাঙ্কুর, ঝালওয়ার এবং মহীশূরে মেয়েদের ভোটের ক্ষমতা আছে।

জামেকায় পুরুষ ও মেয়ের সমান ভোটাধিকার; কিন্তু মেয়েরা নির্ব্বাচিত হইতে পারেন না। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে মেয়েদের মাত্র মিউনিসিপ্যালিটীতে ভোট দিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। রাষ্ট্রপরিষদে মাত্র ২৫ বৎসরের মেয়েদের ভোটাধিকার ও নির্ব্বাচনাধিকার আছে। এখানেও পুরুষ ২১ বৎসর বয়সেই এই সকল অধিকার ভোগ করিয়া থাকে। পালেষ্টাইনে মেয়েদিগকে পুরুষের মত অধিকার দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইহুদীদের জাতীয় রাষ্ট্রপরিষদে মেয়েরা নির্ব্বাচিত হইলেও পরিষদের কার্য্যাবলী আলোচনা করিতে পারেন মাত্র। সেখানে ভোট দিবার ক্ষমতা তাঁহাদের নাই।

দক্ষিণ আফ্রিকায় মিউনিসিপ্যালিটীতে পুরুষে মেয়েতে সমান অধিকার ভোগ করিয়া থাকে। স্পেনের মিউনিসি-প্যালিটিতে কিন্তু কতকটা নির্দ্দিষ্ট অধিকার মেয়েদের হাতে দেওয়া হইয়াছে। ত্রিনিদাদ, তোবাগো, উইণ্ডওয়ার্ড দ্বীপ প্রভৃতি স্থানে ৩০ বছরের নারীর ভোটাধিকার আছে। পুরুষের বেলায় ২১ বছর। তা ছাড়া মেয়েদের কাউন্সিলে বসবার যোগ্যতা দেওয়া হয় নাই।

জার্ম্মাণির উদ্যান ও দুগ্ধ বিদ্যালয়

বাগান করিয়া ফলফুল শাকসব্জী ইত্যাদি উৎপাদন সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার জন্য জার্ম্মাণিতে ছয়টী বিদ্যালয় আছে। তন্মধ্যে ৩টী সরকারী ও ৩টী দেশের লোকের। এদেশের আই-এ পরীক্ষার সমান একটী পরীক্ষায় পাশ করিয়া চারি বৎসর কাল নিজে নিজে বাগান করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ না করিলে কোন ছাত্রকেই এই স্কুলে ভর্ত্তি করা হয় না।

এছাড়া দুগ্ধ সরবরাহের জন্য ও দুগ্ধ সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্য শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে তথায় ১২টী স্কুল চলিতেছে। পাঁচ কি সাত বৎসর কাল গাভী ও দুগ্ধ লইয়া নাড়াচাড়া না করিলে কেহই এই স্কুলে প্রবেশ করিতে পারে না। শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে দুগ্ধ-কর্ম্মচারী নামে অভিহিত হইয়া ছাত্রেরা দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে নিযুক্ত হয় এবং ইচ্ছা করিলে নিজেরাও ব্যবসা করিতে পারে।

অধ্যাপকের মুদিখানা

[কলিকাতা কার্মাইকেল মেডিকেল কলেজের প্রফেসার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় ১৬নং এণ্টেলি মার্কেটের "পিওর ফুড-ষ্টাফ্ এজেন্সী" নামক ষ্টোর্সের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। তাঁহার সঙ্গে আমাদের যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।—সম্পাদক]

প্রশ্ন—আপনাদের কি একটী কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স্ আছে ?

উত্তর—হাঁ, এটাকে ঠিক কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স্ বলা যায় না। কো-অপারেটিভ ষ্টোর্সের যা দস্তুর সে ভাবে আমরা করি নাই। কয়েকজন বন্ধু একত্র হয়ে এটী করেছি। আমরা চেষ্টা করছি যে, অন্ততঃ একটা সেক্শনে প্রতিদিনের আবশ্যক জিনিষপত্রের কতক সরবরাহ করি। কো-অপারেটিভ ষ্টোরসের আইন অনুসারে এটা রেজিষ্ট্রী করা হয় নাই।

প্রঃ—কদ্দিন থেকে চলেছে ?

উঃ—তিন চার বৎসর।

প্রঃ—কি কি জিনিষ আছে ?

উঃ—যে সমস্ত জিনিষে বাজারে খুব ভেজাল দেওয়া হয় সেগুলি নিয়ে আমরা আরম্ভ করেছি। যেমন তেল, ঘি, আটা। অবশ্য অন্যান্য জিনিসও কিছু কিছু সঙ্গে আছে। খাঁটি আটা করবার জন্য আমরা নিজে যাঁতা বসিয়েছি। বিশ্বস্ত ঘানিওয়ালার সঙ্গে তেলের বন্দোবস্ত করেছি, এবং আমাদের কারবারের সঙ্গে একজন্ জমীদার যুক্ত আছেন, তাঁদের জমীদারী থেকে ঘি আনাবার বন্দোবস্ত করেছি।

প্রঃ—কত ঘর বাঁধা খরিদ্দার আছে ?

উঃ—ত্রিশ চল্লিশ ঘর হবে। অনেক জায়গায় আমাদের জোগান দিবার চেষ্টা সফল হয় নাই। বড়লোকের বাড়ীতে এবং কোনরূপ প্রতিষ্ঠানেই—যেমন হাস্পাতাল, ছাত্রাবাস, হোটেল ইত্যাদি—আমরা থাকিতে পারি নাই। কিন্তু ছোট ছোট মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পরিবার—যেমন ডাক্তার, প্রফেসার ইত্যাদি—এঁদের মধ্যে থাকতে পেরেছি।

প্রঃ—ছাত্রাবাস কিম্বা বড় লোকের বাড়ীতে থাকতে পারলেন না কেন ?

উঃ—যাঁরা বড়লোক, তাঁরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে বাজার-সরকার ও গোমস্তার হাতের মধ্যে। এরা যা খুসি তাই কর্‌তে পারে—বোধ হয় মেরেও ফেল্‌তে পারে। ছাত্রাবাস প্রভৃতির ম্যানেজারগণ ঠাকুর-চাকরের ভয়ে অস্থির। তাদেরকে অসন্তুষ্ট কর্‌লে পাছে তারা চলে যায় এই ভয়েই সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত।

প্রঃ—ঠাকুর-চাকরের ভয়ে কিন্‌তে চায় না!

উঃ—তাঁরা বলেন, ঠাকুর চাকরের হাতে লাভ না রাখলে তারা থাকবে না।

প্রঃ—ঠাকুর-চাকর কিন্‌তে চায় না কেন ?

উঃ—অন্যান্য দোকানে বেশী দস্তুরীর বন্দোবস্ত আছে ; সেটা আমরা দিতে পারি না। কোন হাসপাতালের সরকারের কাছ থেকে আমরা প্রস্তাব পেয়েছিলাম এক মণ জিনিষের অর্ডার দিলে যেন আমরা ৩৫ সের মাল দেই, বাকী ৫ সেরের দাম তাহারা নিজে ভাগবাঁটরা করে নেবে।

প্রঃ—বড়লোকের বাজার-সরকার বা গোমস্তা কিন্‌তে চায় না কেন ?

উঃ—তারাও যে দস্তুরী চায় সেটা আমাদের পক্ষে দেওয়া অসম্ভব। আমরা একটা ন্যায্য কমিশন দিতে পারি। কিন্তু "ওয়েট কাটিং" কিম্বা দামের লোকসান আমরা করতে পারি না। একটা দৃষ্টান্ত দিই। কোন মহারাজার বাড়ীতে আমরা জিনিষ দিতাম। সরকার এসে বল্‌ল—তেলের বিল বাজার দরের চাইতে দু'আনা বেশী করবেন, আপনারা আপনাদের প্রকৃত দাম পাবেন, বাকী আমরা পাব। এতে আপনাদেরও লোকসান নাই আমাদেরও কিছু থাকবে। আমরা তাতে রাজী হতে পারলুম না বলে তারা রাগ করে' টাকা বন্ধ করে' আমাদিগকে হয়রাণ করতে লাগলো; অনেক হাঙ্গামার পর শেষে টাকা আদায় হয়। আর একজন রাজার বাড়ীতে জিনিষ-পত্র সরবরাহ করবার বন্দোবস্ত করেছিলাম। তাঁর একজন আত্মীয় আমাদেরই একজন মুরুব্বি। এখান থেকে জিনিষ নিত না অথচ যখনই তাঁদের বাড়ীর কোন জিনিষ খারাপ বের হত তখনি আমাদের উপর দোষারোপ করত।

প্রঃ—কি বিপদ! অন্য জায়গার খারাপ জিনিষ, আর দোষ আপনাদের!

উঃ—হুকুম হল সব জিনিষ আমাদের এখান থেকে যাবে। যখনই খারাপ জিনিষের জন্য কৈফিয়ৎ তলব হ'ত, বল্‌ত আমাদের এখান থেকে জিনিষ কিনেছে। এই ঘটনা পরে আমরা জানতে পাই। অনেক সময় সরকার বা ঠাকুর-চাকর এমন একটী দস্তুরী আশা করে, যা ওয়েট কাটিং না করে, ন্যায্য ভাবে দেওয়া একেবারেই সম্ভব নয়।

প্রঃ—ওয়েট কাটিং মানে কি?

উঃ—আপনি দু'সের ঘি আন্‌তে পাঠালেন, দোকানদার দুই ছটাক ঘি কম দিল। আপনি টের পেলেন না; কারণ, সব সময় প্রত্যেক জিনিষ ওজন করা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়, তাহা করেনও না। এই ভাবে আপনার কাছ থেকে পাঁচ ছয় আনা পয়সা বের করে কিছু নিজেরা নিল কিছু চাকরকে দিল।

প্রঃ—দস্তুরী কি মাপে চুরি করেই দেওয়া হয়?

উঃ—ওয়েট কাটিং ছাড়া অনেক সময় বড়লোকের বাড়ীর মালের দর বাড়িয়ে লেখা হয়। বাজারের ন্যায্য দর কি বড় লোকেরা সাধারণতঃ তাহা দেখতে যান না। ঘি যখন ২।০ টাকা সের তখন ৩৫০ বিল করলে তাঁরা ধরতে পারেন না।

প্রঃ—তাহলে দোকান থেকে কি একটী মিথ্যা বিল পাঠায়?

উঃ—হাঁ, অনেক সময় তাই হয়। তা ছাড়া মাসিক ও বার্ষিক দস্তুরীর বন্দোবস্তও আছে।

প্রঃ—দোকানদার যে মিথ্যা বিল করে, সেই বিলের টাকার কি বন্দোবস্ত হয়?

উঃ—দোকানদার তার ন্যায্য দাম পায়, বাকীটা গোমস্তা বাবুর কাছ থেকে আদায় করে' ঠাকুর-চাকর নিজে নেয়। বড় লোকেরা নিজে কিছুই দেখেন না। ছাত্রদের মেসে, যেমন পূর্ব্বে বলেছি, পাছে ঠাকুর চাকর বলে' বসে "আমরা চল্লাম" সেই ভয়ে বাজারের উপর হাত দিতে সাহস করে না।

প্রঃ—কেবল মেসেই ঠাকুর-চাকরের এইরূপ দৌরাত্ম্য হয়, না গৃহস্থ ঘরেও হয়।

উঃ—যাঁরা নিজেরা বাজার করেন না সে সকল গৃহস্থ ঘরেও ঐ অবস্থা।

প্রঃ—আপনারা মাল আনেন কোথা থেকে?

উঃ—আটা সম্পূর্ণরূপ আমাদের নিজের হাতের জিনিষ। হাওড়ার হাটে ভাল যে গম পাই তাই এনে ছেঁকে ঝেড়ে নিজেদের যাঁতায় পেষাই করি। নোংড়া হবে বলে আটা ছাঁকবার জন্য মেজের উপর ক্যানভাস পেতে নিই। সাধারণতঃ সবাই মেজেতেই ঢালে। তাতে রাস্তার ও পায়ের ধুলা বালি, নোংড়া জিনিষ সব এসে আটার সঙ্গে মিশে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিক্ থেকেও উন্নতি করবার অনেক আছে। বিশ্বস্ত ঘানিওয়ালার সঙ্গে আমরা তেলের বন্দোবস্ত করেছি। অবশ্য তাহাদের সাধুতার উপর নির্ভর করতে হয়। এখনও সন্দেহের কোন কারণ পাই নাই। পূর্ব্বে বলেছি ঘি মফঃস্বল থেকে আনাই।

প্রঃ—কলিকাতার আটার ব্যবসা আজকাল প্রধানতঃ কাদের হাতে আছে ?

উঃ—কতগুলি বড় বড় মিল গম ভেঙ্গে ময়দা, সুজি, আটা ইত্যাদি বিভাগ করে বাজারে দেয়। সেগুলো বেশীর ভাগ সাহেবদের হাতে, কিছু মাড়োয়ারীদের হাতেও আছে। তাড়িত-চালিত ছোট ছোট যাঁতা অসংখ্য আছে। ইহার শতকরা ৯০টী মাড়োয়ারীদের হাতে।

প্রঃ—এই ছোট ছোট যাঁতাওয়ালাদের ব্যবসায় লাভ কিরূপ ?

উঃ—আমার মনে হয় প্রত্যেকেই মাসে ২০০।২৫০৲ মুনাফা রাখতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেই জিনিষই আমরা লোকসানে চালাচ্ছি।

প্রঃ—কেন ?

উঃ—এর ভিতরও অনেক গলদ আছে। প্রথমতঃ গম খরিদের ভিতর কতগুলি জুয়াচুরি আছে। আপনি যাবেন হাবড়ার হাটে গম কিনতে, গিয়ে দেখবেন অনেক দালাল। নমুনা পছন্দ করে আপনি ৫০ বস্তার অর্ডার দিয়ে এলেন। আগের জানাশুনা থাকলে তারা টাকা পয়সা কিছুই চাইবে না, গম পাঠিয়ে দিবে। ২।১ দিন পরে ২।৩ জন উড়ে আসবে ওজন দিতে। তারা মহাজনের লোক। তারা এখান-সেখান থেকে কয়েকটী বস্তা ওজন করে ৫০ বস্তার গড় ওজন বের করে টুকে নিয়ে যাবে। সেই অনুসারে আপনি বিল পাবেন। এই ওজন উড়েদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে কিছু কমিয়ে নেওয়া যায়। অনেকে করেও তাই। তাদের প্রত্যেক খরিদে ৫।৭ টাকা থাকে। একশ' মণের ভিতর আধ মণ কম হলে মহাজন টের পায় না বা টের পেয়েও কিছু বলে না।

প্রঃ—ওজন দিতে উড়ে আসে কেন এবং সঙ্গে মহাজনের নিজের বিশ্বাসী লোক থাকে না কেন ?

উঃ—কতগুলি লোক এইসব কাজের ভিতর ঢুকে গিয়েছে। উড়েদের একদিকে যেমন বুদ্ধি আছে অন্য দিকে পরিশ্রম করতেও তারা রাজি আছে। বস্তা টেনে বের করা ওজন করা আবার ঠিক ঠিক হিসাব করা এক উড়ের দ্বারাই সুবিধা হয়। তা না হলে কুলি ও গোমস্তা দুই রকম লোক পাঠাতে হ'ত।

প্রঃ—উড়েরা মহাজনের নিজের লোক অথচ ওজনে তাহাকেই ঠকায় !

উঃ—আমার বিশ্বাস উড়েদের এই ব্যাপায় মহাজনরাও না জানে তা নয়। তারা হিসেব করেই দর কসে নেয়। তাকে মাহিনা হয়ত দেয় ৫৲, ঐ ব্যবস্থাতেই সে খুসী থাকে। শেষ কালে লোকসান ত আমার।

প্রঃ—তাহলে দাঁড়ালো এই—(১) মাল সাধারণতঃ আপনার ঘরে এসে ওজন হয়, (২) ওজনের সময় খরিদ্দার অন্ততঃ কিছু ওজন কমাতে পারে, (৩) মহাজন জেনেশুনেও ইহার বিশেষ প্রতিকার করেন না।

উঃ—হাঁ আমার তাই বিশ্বাস।

প্রঃ—আপনাদের প্রতিযোগিতা কোথায়, কার সঙ্গে ?

উঃ—ছোট ছোট কলওয়ালাদের সঙ্গে।

প্রঃ—সকলেই কি হাবড়ার হাটে মাড়োয়ারীদের কাছ থেকে গম কিনে ?

উঃ—হাঁ, বড় মিল, ছোট মিল, ইলেক্‌ট্রিক যাঁতাওয়ালা সকলেই হাবড়ার হাটে মাড়োয়ারীদের কাছ থেকে গম কিনে। গম বেশী আসে যুক্ত প্রদেশ থেকে। ভাগলপুর থেকেও কিছু আসে। অষ্ট্রেলিয়া ও কানাডার গমও মধ্যে মধ্যে আসে। হাবড়াতে বহু গাড়ীবোঝাই মাল গুদামভর্ত্তি হয় এবং সেখানে সাধারণতঃ বিল অব লেডিং বা মাল চালানী রসিদ নিয়ে কারবার হয়। নমুনা দেখিয়ে হাজার হাজার মণ গম একসঙ্গে বিক্রী করা হয়।

প্রঃ—আটার ব্যবসায় আপনারা প্রতিযোগিতায় পারেন না বলেছেন, কি কি কারণ বলুন।

উঃ—পূর্ব্বে বলেছি প্রত্যেক খরিদে ছোট মিলওয়ালারা ৮।১০ টাকা জমাতে পারে, আমরা পারি না।

প্রঃ—কেন পারেন না ?

উঃ—কারণ আমরা মিথ্যা ওজন লিখাতে প্রশ্রয় দিই না। তার পরে ভেজাল।

প্রঃ—আটাতে কত রকমের ভেজাল চলে?

উঃ—সোপ ষ্টোন বলে একটা খনিজ পদার্থ আটাতে চালানো হয়।

প্রঃ—কোথায় পাওরা যায়?

উঃ—সাবান তৈয়ারী করতে অনেক ক্ষেত্রে ইহা ব্যবহৃত হয়। তারপর চিনা মাটি, যাহা দ্বারা চায়ের পেয়ালা ইত্যাদি তৈয়ারী হয়। ইহাকে কেওলিন বলে। আর একটী জিনিষ আছে, যা মিউনিসিপ্যালিটীর আইন বাঁচিয়েও যাঁতার আটায় ভেজাল চলিতে পারে। ইহাকে "পালট আটা" বলে। বড় কলওয়ালারা খুব সস্তায় এই জিনিষ বিক্রী করে। ময়দা, সুজি প্রভৃতি সারবান জিনিষ বাহির হবার পর যা পড়ে থাকে সেটাই পালট আটা। যাঁতার আটার থেকে এর তফাৎ সহজে বুঝা যায় না। যাঁতার আটায় সার জিনিষ থাকে। পালট আটায় ভুষির ভাগই বেশী। ইহা মিশালে আটার পড়্‌তা অনেক কমে যায়।

প্রঃ—করপোরেশন থেকে জাল আটা নিবারণের কোন চেষ্টা হয় না?

উঃ—করপোরেশনের আইন রয়েছে, তাদের খাদ্য পরীক্ষক রয়েছে, আটা নিয়ে তারা পরীক্ষা কর্‌তে পারে, কিন্তু আমার বিশ্বাস এ সব সত্ত্বেও বাজারে ভেজাল চলে।

প্রঃ—আর কি অসুবিধা বলুন?

উঃ—আর একটা অসুবিধা হচ্ছে এই যে, ইলেকট্রিক কোম্পানীকে কারেন্ট বাবদ মাসে ২৫৲।৩০৲ টাকা একটা মিনিমাম চার্জ্জ (নিম্নতম দায়ধারা) দিতে হয়— কল চলুক আর নাই চলুক। অনেকের বাড়ী হতে গম, ডাল ইত্যাদি ভাঙ্গিয়ে নেয়। ইহা ছোট কলওয়ালাদের একটী আয়ের পন্থা। আমাদের সে পথও প্রায় বন্ধ।

প্রঃ—কেন?

প্রঃ—এখানেও অনেক গলদ। সাধারণতঃ পেষাই মজুরী মণে আট আনা। আমরা ইহা হতে চাকরকে এক আনা দস্তুরী দিই। কিন্তু এবিষয়ে চাকরদের কলওয়ালার সঙ্গে বন্দোবস্ত থাকে যে, ভাঙ্গা হয়ে গেলে মণ প্রতি অন্ততঃ পাঁচ সের আটা তাহারা অর্দ্ধ মূল্যে কিনে রাখবে। মনিব প্রায়ই বাড়ীতে আটা ওজন করে নেয় না। অর্থাৎ এক মণ গম পেষাই করতে এসে ভৃত্য দস্তুরী এক আনা ও আটার আট আনা এই নয় আনা উপার্জ্জন করল। কলওয়ালা তার পেষাই মজুরী সাত আনা এবং আটার দামের বাদ বাকী আট আনা এই পনর আনা পাইল। দু'জনারই লাভ। অনুপস্থিত মনিবেরই লোকসান। আমরা জেনে শুনে ইহাতে রাজি হই না বলে আমাদের কাছে পেষাই কর্‌তে আসে না। আমি আটা সম্বন্ধে আরো ২।১টী ঘটনা বলি। কোনও এক সম্ভ্রান্ত জৈন জমীদারের হুকুম ছিল আমাদের যাঁতার আটা তাঁর বাড়ীতে ব্যবহৃত হবে। দেখা গেল এখানকার আটা নিলেই তাঁর বাড়ীর সরকার, চাকর, দরোয়ান ইত্যাদি সকলেরই মুখে বালি যায়, পেট ব্যথা করে। এসব জানতে পেরে বাবু একদিন নিজে গোপনে এসে আমাদের দোকান থেকে কিছু আটা নিয়ে গেলেন এবং কাউকে জানতে না দিয়ে সেই আটা বাড়ীতে ব্যবহার কর্‌তে দেন। ২।৩ দিনই এরূপ করলেন। বেড়াবার পথে লুকিয়ে আটা নিয়ে যান। কারো পেট ব্যথাও করে না, মুখেও বালি লাগে না। তখন তিনি সকলকে ডেকে বল্লেন, যে দোকানের আটায় তোমাদের পেট ব্যথা করে এও সেই আটা। কাজেই তোমাদের সব কথা মিথ্যা। অতএব সেই আটাই তোমাদের খেতে হবে। অনুসন্ধানে জানা গেল, যাদের উপর আটা খরিদের ভার তারা অন্য দোকানের বেশী দস্তুরীর লোভে ঐরূপ করত।

প্রঃ—তাহলে আপনি বল্‌তে চান, সাধু উপায়ে ব্যবসা চালানো এক প্রকার অসম্ভব।

উ :—আজকাল এক প্রকার তাই হয়ে পড়েছে।

প্রঃ—আপনার যুক্তি এই—

(১) মাল কিনবার সময় ঘুষ দেওয়া হয়,

(২) ভেজাল মাল চালানো হয়,

(৩) যারা খরিদ্দার, তাদের কতগুলি অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে হয়।

উঃ—খরিদ্দার নয়, মধ্যবর্ত্তী লোক।

প্রঃ—খরিদ্দার যদি অন্যায়কে প্রশ্রয় না দেয় তবে ব্যবসায় এসব অসাধু উপায় চলতে পারে না। সমাজের দুর্নীতিই ব্যবসাদারদের বেশী সাফল্যের কারণ।

উঃ—কি হিসাবে একথা বলেন? আমি বলতে চাই, বাঙ্গালী সমাজের যারা ক্রেতা, বা কনজিউমার তাদের উদাসীনতা হেতু ব্যবসায় অসাধুতা ঢুকেছে।

প্রঃ—বাঙ্গালী সমাজ বল্লে, ক্রেতা, বিক্রেতা মাঝামাঝি লোক, কুলি, কেরাণী, জমীদার, গোমস্তা সকলকেই বুঝায়।

উঃ—ক্রেতাদের দুর্নীতি বল্‌তে পারি না। তাদের বোকামি বা উদাসীনতা। নতুবা তারা কি জেনে শুনেও ঠকে?

প্রঃ—আমি বলছি বাঙ্গালী সমাজেই দুর্নীতি চলছে। আজ কালকার ব্যবসাদারদের অন্ততঃ আট আনা সাফল্য-লাভের প্রধান সহায় এই দুর্নীতি।

উঃ—তা বলতে পারেন।

প্রঃ—আচ্ছা কলিকাতায় সাধারণতঃ দোকানে যে তেল বিক্রী হয় তা আসে কোথা থেকে।

উঃ—চৌদ্দ আনা মিল থেকে আসে। আটার যেমন তাড়িত-শক্তি চালিত যাঁতা হয়েছে, তেলেরও সেরূপ অনেক ঘানি হয়েছে। আট দশটী ঘানি বিদ্যুৎ-শক্তিতে চলছে। এই তেল সম্বন্ধে এতদিন যে আইন ছিল সেটী অত্যন্ত অসম্পূর্ণ। কি জিনিষ ভাঙ্গা হচ্ছে বলে দিলেই খালাস। মিলওয়ালা সাইন বোর্ডে লিখে রাখতো "এখানে সরিষা, চিনাবাদাম ইত্যাদি ইত্যাদি মিশ্রিত তৈল প্রস্তুত হয়।" এতে তেলের খরিদ্দারদের প্রতি অত্যন্ত অবিচার হ'ত; কারণ তারা তেল কিনে মুদির কাছ থেকে, মিল থেকে নয়। তারা কি করে জানবে কি মিশ্রিত তেল খাচ্ছে। বর্ত্তমানে সংশোধিত আইনে সরিষার তেল বলে যেটা বেচবে সেটাকে সরিষার তেলই হতে হবে। এতে বাজারের তেলের কিছু উন্নতি হওয়ার আশা আছে। অবশ্য ভেজাল বন্ধ করা খুবই শক্ত।

প্রঃ—তেলের ব্যবসা আজকাল কাহাদের হাতে?

উঃ—মাড়োয়ারী বাঙ্গালী দুইয়েরই হাতে আছে।

প্রঃ—বেশী মাড়োয়ারী না বেশী বাঙ্গালী?

উঃ—মাড়োয়ারীই বেশী।

প্রঃ—সরিষা আসে কোথা থেকে?

উঃ—বেশীর ভাগ পশ্চিম থেকে।

প্রঃ—সরিষার আমদানি ব্যবসাতে কোন লোক বেশী খাটে?

উঃ—মাড়োয়ারী। শস্যের ব্যবসামাত্রই মাড়োয়ারীর হাতে।

প্রঃ—চাউলও মাড়োয়ারীর হাতে?

উঃ—পূর্ব্বে বাঙ্গালীর হাতে ছিল, এখন ক্রমে মাড়োয়ারীর হাতে চলে যাচ্ছে।

প্রঃ—গমের আড্ডা যেমন হাওড়ায় সরিষার আড্ডা কোথায়?

উঃ—হাওড়ায়।

প্রঃ—২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে এই সব ব্যবসা কাদের হাতে ছিল?

উঃ—বাঙ্গালীর হাতে ছিল, ক্রমে মাড়োয়ারীর হাতে এসেছে। পূর্ব্বে বড় বড় কারখানা ছিল না। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মণ গম এসে মজুত হওয়া এখনকার নূতন কথা। ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে মিলের প্রাদুর্ভাব হয় নাই।

প্রঃ—যে দিন থেকে মিল গড়ে উঠেছে সেই দিন থেকেই কি মাড়োয়ারীরা তার কর্ত্তা হয়েছে?

উঃ—তা নয়, আস্তে আস্তে তাদের হস্তগত হয়েছে।

প্রঃ—কেমন করে তাদের হাতে গেল? যন্ত্রপাতি, মিল, ফ্যাক্টরি প্রভৃতি নূতন নূতন লাইনে বাঙ্গালী কেন

কর্ত্তা হতে পারল না? অন্য জাতি কেন ব্যবসার পাণ্ডা হল?

উঃ—বাঙ্গালীর বুদ্ধি আছে বটে কিন্তু তারা চাকরীর মোহে পড়ে গেল। ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে যখন ইংরেজী শিক্ষার প্রচার আরম্ভ হল এবং ইংরেজী শিখে লোকে বড় বড় সরকারী চাকরী পেতে লাগল মস্তিষ্কজীবী সম্প্রদায় তখন দেখল ইংরেজী শিক্ষায় টাকা হয়, শুধু ইংরেজী শিখলেই খাওয়া জোটে। এই দেখে তারা ইংরেজী লেখাপড়ার দিকে ঝুঁকে পড়ল। ব্যবসায়ী শ্রেণীকে তারা নীচ বোধে অবজ্ঞার চোখে দেখতে লাগল।

প্রঃ—ব্যবসাকে ভদ্রভাবে দেখা কোনো দেশেই আগে ছিল না। বিদ্যার চর্চ্চা করা, পুরোহিতগিরি করা, লড়াই করা, সরকারী চাকরী করা জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড সকল দেশেই ভদ্রলোকের কাজ বলে গণ্য ছিল। চাষবাস বৈশ্য ব্যবসায় ছোট কাজ বলে গণ্য হত। সব দেশেই আস্তে আস্তে এই ধারণা বদলে যাচ্ছে, হয়ত আমাদের দেশেও যাবে।

উঃ—এখন ইংরেজী শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় দেখা যাচ্ছে শুধু ইংরেজী শিখে চাকরী করে খাওয়া সম্ভব নয়। তাই অন্য দিকে লোকের দৃষ্টি পড়েছে। কিন্তু সব রাস্তা অন্যে দখল করে নেওয়ার পর আমরা অতি বিলম্বে জেগে উঠেছি।

প্রঃ—আটা, তেল, চাউল প্রভৃতির ব্যবসার ভিতর বাঙ্গালী মুসলমান কি যুক্তপ্রদেশের মুসলমানদের কোনো হাত আছে কি?

উঃ—আমার মনে হয় চাঁউলের ব্যবসায়ে বড়দরের মুসলমান মহাজন আছেন; কিন্তু আটা, তেল ইত্যাদির ব্যবসায়ে খুব কম।

প্রঃ—আপনি যেমন বল্লেন, আটা ও তেলের ব্যবসার অন্ততঃ আমদানির দিক্‌টা যদি মাড়োয়ারীর হাতে থাকে তা হলে গোটা কলিকাতা শহরটী এই দুই বিষয়ে তাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে?

উঃ—নিশ্চয়ই। এই দুইটী বিষয়ে কেন? ওরা ইচ্ছা করলে বোধ হয় আমাদের না খাইয়ে মেরে ফেলতে পারে।

প্রঃ—চাউল সম্বন্ধে?

উঃ—চাউলের ব্যবসাও ক্রমে ওদের হাতে চলে যাচ্ছে।

প্রঃ—মফঃস্বল থেকে যে চাউল কলিকাতায় আসে তাহার ভিতর বাঙ্গালীর ঠাঁই কতখানি?

উঃ—বাঙ্গালী ক্রমে হটে যাচ্ছে মাড়োয়ারী আসছে। আমি জানি আসামের অনেক স্থানেই বড় বড় কারবারগুলি তাহারা হস্তগত কর্‌ছে। ক্রমশঃ তারা পাড়াগাঁয়ে ঢুকছে। তাদের যথেষ্ট টাকা আছে এবং ঝুঁকি নেওয়ার প্রবৃত্তি আছে। কৃষকদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে টাকা দাদন দিয়ে পাট, ধান প্রভৃতি সমস্ত ফসল তারা হাত করে ফেলছে। এটা আশঙ্কাজনক।

প্রঃ—আশঙ্কার কারণ কি?

উঃ—ষোল আনা ব্যবসাই যদি তাদের হস্তগত হয় তবে যখন ইচ্ছা তাহারা দর বাড়াতে কমাতে পারবে। তার ফলে চাষীরা ধানে পাবে মণ প্রতি ৩৲, চাউল খেতে হবে ১০৲ মণ দরে। লড়াইয়ের পর ৬৲ জোড়া কাপড় কিনতে হয়েছে কেন?

প্রঃ—চাউল পাট প্রভৃতি ব্যবসায়ে বাঙ্গালী মুসলমানদের আর্থিক উন্নতি হচ্ছে কি?

উঃ—বাঙ্গালা দেশের কৃষক অধিকাংশ মুসলমান। কৃষির দ্বারা অধিকাংশ মুসলমানের জীবিকার্জ্জন হচ্ছে। উন্নতি করতে পারুক না পারুক, খেয়ে আছে। পাটের টাকা বেশীর ভাগ মুসলমান চাষী পাচ্ছে। আরো ২।১টী ব্যবসা এখনও মুসলমানের হাতে আছে। যথা চামড়ার ব্যবসা।

প্রঃ—দেশের অধিকাংশ কৃষক যখন মুসলমান তখন দেশের ভিতর যে আমদানি রপ্তানি হয় তাতে মুসলমানদের সঙ্গে মাড়োয়ারীদের অনেক ক্ষেত্রে যোগ আছে।

উঃ—নিশ্চয় আছে।

প্রঃ—এই যে নূতন যুগ এসেছে তার সুযোগ মাড়োয়ারীরাই বেশী ব্যবহার করতে পারছে, বাংলা দেশের লোক পারছে না কেন?

উঃ—দেশে কলকারখানা আসার ঠিক পর মুহূর্ত্তেই মাড়োয়ারী সেটা ধরেছে না বাঙ্গালী প্রথম ধরেছিল মাড়োয়ারী আস্তে আস্তে তাদেরকে হটিয়ে দিয়েছে এটা ঠিক বলতে পারি না। এখন যা হয়েছে দেশের চৌদ্দ আনা ব্যবসা মাড়োয়ারীর হাতে গিয়ে পড়েছে। বঙ্গলক্ষ্মীর মত ২।১টী মিল ছাড়া যে ক'টী দেশীয় জুট বা কটন মিল আছে তাও মাড়োয়ারীর।

প্রঃ—দেশের ভিতর আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর শীঘ্র বড় রকম ঠাঁই পাওয়ার সম্ভাবনা আছে কি?

উঃ—খুব শীঘ্র পাবে না, পরিশেষে পাবে। কেন পাবে তার কারণ বলছি। বাঙ্গালার শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় চাকরী দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন বা পরিবার প্রতিপালন অসম্ভব দেখে ব্যবসায়ের দিকে ঝুঁকেছে। যদি বাস্তবিক তাহারা উদ্যমের সহিত এ লাইনে খাটে তাহা হ'লে ব্যবসায়ের নৈতিক স্তর উন্নত হবে। এরা যখন ব্যবসাতে উন্নতি লাভ করবে এবং প্রতিযোগিতায় আস্তে আস্তে জয়ী হবে তখন তারা বাঙ্গালা দেশের ব্যবসায়ে নিজেদের স্থান অধিকার করবে। সাফল্যের একটা অন্তরায় এই যে সাধারণ বাঙ্গালীর জীবন-যাত্রা-প্রণালী সাধারণ মাড়োয়ারীর চাইতে বেশী খরচসাপেক্ষ। মাড়োয়ারীরা আমাদের চাইতে বেশী কষ্টসহিষ্ণু ও শ্রমক্ষম। আমরা বাঙ্গালীরা চিরকাল সুজলা, সুফলা দেশে বাস করে আস্‌ছি, জীবন-সংগ্রামে আমরা অনভ্যস্ত। তাতে আমাদিগকে অলস করে ফেলেছে। এই আলস্যকে যদি আমরা জয় করতে পারি তবেই প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে।

প্রঃ—তাহা হ'লে আপনার কথার সারমর্ম্ম এই—(১) ব্যবসাতে খুব অসাধুতা চলেছে। (২) ব্যবসায়ে মাড়োয়ারী প্রধান স্থান অধিকার করেছে। (৩) বিশেষ চেষ্টা করলে তাতে বাঙ্গালীর ঠাঁই একদিন হতে পারে।

উঃ—হাঁ।
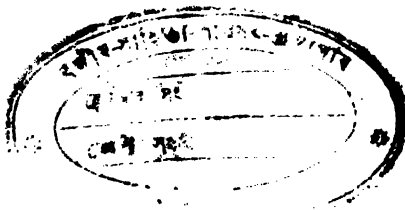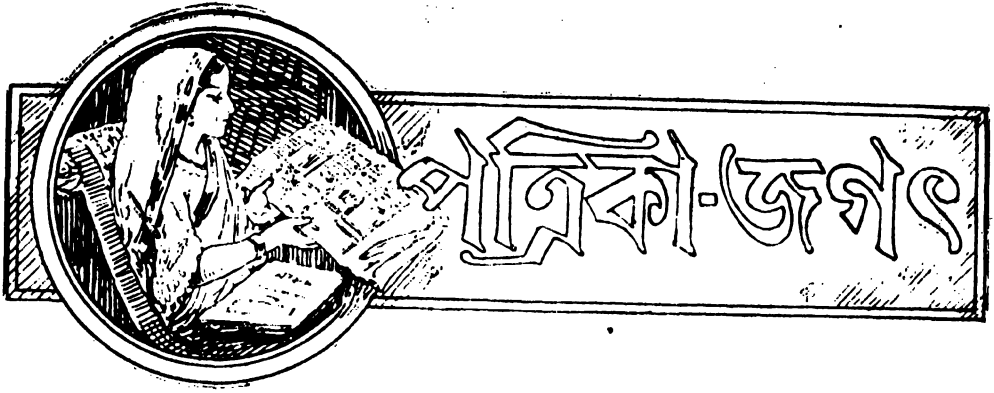
"নোয়াখালী-হিতৈষী"

অর্থসমস্যা ও মুসলমান সমাজ

বিংশ শতাব্দীর বিবিধ সমস্যাপরিপূর্ণ কালে অধুনা মোস্লেম সমাজের প্রত্যেক স্তরে যে ঘোর অর্থসমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা বড়ই ভয়াবহ ও ঘোর চিন্তার বিষয়। কি শিক্ষিত সমাজ, কি অশিক্ষিত সমাজ, কি উচ্চ শ্রেণী, কি সাধারণ শ্রেণী, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই অর্থ-সমস্যা বিরাট মূর্ত্তিতে বিরাজমান। ইহার একমাত্র কারণ কর্ম্মশক্তি ও ব্যবসায়-বুদ্ধির অভাব। আত্ম-নির্ভরতা, উৎসাহ, উদ্যম, কর্ম্মস্পৃহা এবং স্বাধীন ভাবে জীবিকার্জ্জনের প্রবৃত্তি ও স্বাবলম্বন-শক্তি হারাইয়া আজ মুসলমান সমাজ হীন ও দুর্ব্বল হইয়াছে। যে জাতির অর্থবল নাই, সে জাতির উন্নতি কখনও হইতে পারে না।

মুসলমান আমিরী খেয়ালে নিমগ্ন থাকিয়া ব্যবসা বাণিজ্য পরিত্যাগ করিয়া বসিয়াছে। ওদিকে যে তাহাদের ভাণ্ডারে অর্থাভাব ও অন্নাভাবের ঘোর হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইয়াছে, সেদিকে লক্ষ্যই নাই। কেবল বাহিরের আভিজাত্যাভিমান লইয়াই মুসলমান ব্যস্ত। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কেবল ২।৪ খানা হোটেল, ২১ খানা কাপড়ের দোকান ও ছোট ছোট কয়েকখানি মনোহারী দোকান ছাড়া কোনও ব্যবসায়ে মুসলমানগণ লিপ্ত নাই। ইহা বাস্তবিকই নিতান্ত দুঃখের কথা।

এমন কতকগুলি জিনিষ আছে, যাহা গৃহ-কার্য্যে মুসলমানদের নিত্য প্রয়োজনীয়। যেমন হাঁড়ি, পাতিল, বাসন, বাটী, দা, কুড়াল, কাস্তে, খন্তা ইত্যাদি। এই সকল জিনিষের জন্য মুসলমানদিগকে পরের মুখাপেক্ষী হইতে হয়। এই সাম্প্রদায়িক সমস্যার যুগে যদি অপর সম্প্রদায় এই সকল জিনিষ মুসলমানদের নিকট বিক্রয় না করে, তবে তাহাদের কি উপায় হইবে তাহা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত।

তারপর কামার, কুমার, ক্ষৌরকারের ব্যবসায় ও মুদিখানা ইত্যাদি কারবার অবলম্বন করাও মুসলমানগণ যেন নেহাৎ অপমানজনক মনে করে। অথচ এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসাদ্বারা তাহাদের অনেক অভাব পূরণ হইতে পারে এবং পরমুখাপেক্ষিতা কমিতে পারে। পরমুখাপেক্ষী জাতির উন্নতি কখনও হইতে পারে না।

দায়ে না ঠেকিলে কাহারও চৈতন্য হয় না। কলিকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর হইতে মুসলমানদের কতকটা চৈতন্য হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে। মুসলমানগণ স্থানে স্থানে মুদীর দোকান, কাপড়ের দোকান দিয়া ও ক্ষৌরকার, স্বর্ণকার, কুম্ভকার' কাপড় ধোলাইয়ের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া আপনাদের অভাব-মোচনের পথ পরিষ্কার তথা ব্যবসায়ে অনভিজ্ঞতার অপবাদ দূর করিবার উপায় বিধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইহা আশার কথা হইলেও বিরাট সমাজের পক্ষে এগুলি যথোপযুক্ত হয় নাই। বাঙ্গালার প্রত্যেক জেলায় জেলায়, মহকুমায় মহকুমায়, গ্রামে গ্রামে এই সকল দোকান ও কারবার প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজনীয়। এসকল ব্যবসা অবলম্বন করিতে অপমানের বিষয় কিছুই নাই। বরং হালাল ব্যবসা যাহা যাহা আছে, সবগুলিই অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ। কাহারও সহিত রেষারেষি ও জেদাজেদী করিয়া কাজ করার উদ্দেশ্যে এই সকল ব্যবসায়

অবলম্বন করা সমীচীন নয়, পরন্তু জাতির মঙ্গল ও জাতীয় উন্নতি-বিধানের নিমিত্তই সর্ব্বপ্রকার ব্যবসায় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক মুসলমানই বর্ত্তমান অবস্থার দিকে লক্ষ্য করিয়া এই সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে জাতীয় মঙ্গল সাধিত হইবে।

"পল্লীবাসী" (কালনা)

কচুরীপানার সার

কচুরীপানা হইতে অতি সহজ উপায়ে উত্তম সার প্রস্তুত হইতে পারে। ইহা অনেকেই অবগত নহেন। সাধারণের অবগতির জন্য আমরা পত্রান্তর হইতে উহার নির্ম্মাণ-প্রণালী প্রকাশ করিলাম :—

প্রথমে কোনও জলাশয় হইতে কচুরীপানা তুলিয়া এক দিন রৌদ্রে রাখিতে হইবে। ১২ হাত দীর্ঘ ও ৮ হাত প্রস্থ একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়া উক্ত স্থানের উপর ৫ গাড়ী পানা বেশ করিয়া বিছাইয়া দিয়া তদুপরি আধ গাড়ী মাটি, আধ গাড়ী গোময় ও ঝুড়ি দুই কাঠের ছাই ও জল দাও। এইরূপে ৩০ কি ৪০ গাড়ী কচুরীপানার একটি স্তূপ প্রস্তুত কর। সর্ব্বশেষে ঐ স্তূপকে অত্যধিক রৌদ্রের তাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সামান্য ভাবে মাটি দিয়া ঢাকিয়া দাও এবং মাসখানেক ফেলিয়া রাখ। শীঘ্রই পচিতে আরম্ভ করিয়া কচুরীপানাগুলি একটি সিক্ত স্তূপে পরিণত হইবে। দ্বিতীয় মাসের শেষাশেষি পচন কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়া যাইবে। এই সার প্রস্তুত করিবার কার্য্য প্রতি বৎসর কার্ত্তিক হইতে বৈশাখ মাসের মধ্যে করা কর্ত্তব্য। এই সার জমিতে দিলে উহার উর্ব্বরতা আশ্চর্য্যরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইন্দোর রাজ্যে ইহা কার্পাসের উৎকৃষ্ট সার বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ভারতীয় কৃষি-বিভাগের রিপোর্টে প্রকাশ যে, এই সার ধান্য, পাট, আলু, শাকসব্জী প্রভৃতি জন্মাইবার পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট।

এই সার জমিতে ব্যবহার করিলে দ্বিবিধ ফল পাওয়া যাইবে। প্রথমতঃ, ইহার ব্যবহারে জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পাইবে। দ্বিতীয়তঃ, গ্রামের খাল, বিল, ডোবা, পুষ্করিণী প্রভৃতির কচুরীপানা সকল বিনষ্ট হইবে। ফলে ম্যালেরিয়া-নিবারণের সহায়তা হইবে। আজকাল অনেক স্থানে অনেক ভদ্রলোক কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহারা যদ্যপি এই সারের প্রচলন করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের দৃষ্টান্ত কৃষক-সমাজেও অনুসৃত হইবে।

"মুক্তি" (পুরুলিয়া)

বাঙ্গালার ঐশ্বর্য্য

বার্ণিয়ার ১৬৫৬—১৬৬৮ খৃঃ মোগল সাম্রাজ্য পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে জানিতে পারি যে, এম্ থেবেনট্ তাঁহাকে একটি জটিল বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। ইনি অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং অনুসন্ধিৎসু ছিলেন এবং অধ্যয়ন দ্বারাই এমন অনেক গুরু বিষয় আবিষ্কার করিয়াছিলেন যাহা অনেকে জল-পথে পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াও করিতে পারেন নাই। প্রশ্নটী ছিল এই—বাঙ্গালা দেশের উর্ব্বরতা, সমৃদ্ধি এবং সৌন্দর্য্যের বিষয় সাধারণতঃ যেরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা সত্য কি না।

বার্ণিয়ার আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ১৬৬০-১৬৬৮ খৃঃ অব্দের মধ্যে দুইবার বঙ্গদেশ পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি এম্, থেবেনট্‌কে একখানা পত্র লিখিয়াছিলেন যে, "জগতের মধ্যে উর্ব্বরতম প্রদেশ বলিয়া মিশরের খ্যাতি আছে। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা আমি সঞ্চয় করিয়াছি তাহাতে আমার বিশ্বাস যে, এই খ্যাতি বাঙ্গালারই প্রাপ্য; কারণ বাঙ্গালায় চাউল এত অধিক পরিমাণে জন্মে যে, তাহা পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ ব্যতীত বহুদূরবর্ত্তী প্রদেশেও প্রেরিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালার চাউল গঙ্গা-পথে পাটনা এবং সমুদ্র-পথে মসলীপট্টম্ পর্য্যন্ত রপ্তানি হয়। বিদেশেও ইহা প্রেরিত হয়। বাঙ্গালায় চিনিও এত প্রচুর পরিমাণে হয় যে, আরব, মেসোপটেমিয়া এবং পারস্যে যত চিনির প্রয়োজন তাহা বাঙ্গালা হইতেই সরবরাহ হইয়া থাকে। বাঙ্গালা মিঠাই মণ্ডার জন্যও প্রসিদ্ধ।

* * * *

"সাধারণের" মধ্যে একটী প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে যে, বাঙ্গালা দেশে প্রবেশ করিবার জন্য শত শত দ্বার উন্মুক্ত আছে, কিন্তু বাহির হইবার জন্য একটীও পথ নাই। ইহার উৎপত্তির কারণ বাঙ্গালার জমির প্রচুর উৎপাদিকা শক্তি

এবং বাঙ্গালী রমণীদের মনোরম স্বভাব। বৈদেশিক বণিক-দিগকে আকর্ষণ করিবার মত এত সব বিভিন্ন প্রকারের মূল্যবান পণ্য দ্রব্য অন্য কোন প্রদেশে আছে কি না জানি না। চিনির কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সে কথা ছাড়িয়া দিলেও বাঙ্গালায় তুলা এবং রেশম এত বেশী হয় যে, এই দুইটি পণ্যের জন্য বাঙ্গালা দেশকে শুধু হিন্দুস্থান অথবা মোগল সাম্রাজ্যের নয়, শুধু পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যসমূহের নয়, সমগ্র ইউরোপেরও সাধারণ ভাণ্ডারগৃহ বলা যাইতে পারে। হল্যাণ্ড-বাসীরা সরু, মোটা, সবুজ প্রভৃতি নানা প্রকারের রঙীন কার্পাস-বস্ত্র বিশেষ ভাবে জাপানে এবং ইংলণ্ডে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি করিয়া থাকে। কখনও কখনও এই ব্যাপার আমার নিকট বিরক্তিকর বলিয়া বোধ হইয়াছে। ইংরেজ, পর্ত্তুগীজ এবং স্থানীয় অধিবাসিগণও এই সকল পণ্যের যথেষ্ট ব্যবহার করিয়া থাকে।"

অতঃপর বার্ণিয়ার ব-দ্বীপের নদী এবং জল-প্রাণালী-পথে নৌ-ভ্রমণের বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, "বহু পূর্ব্ব-কালে এই সকল প্রণালী তুলা, রেশম এবং ধান্য প্রভৃতির বাণিজ্যের সুবিধার জন্য বহু পরিশ্রমে কাটান হইয়াছিল। ইহাদের দুই পার্শ্বেই জনবহুল গ্রাম ও নগর বর্ত্তমান। সর্ব্বত্রই ধান, আক, শস্য তিন চারি প্রকার, শাক-সব্জী, সরিষা, তিল প্রভৃতির দিগন্তবিস্তৃত ক্ষেত ও গুটী পোকার জন্য ছোট ছোট তুঁত গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাঙ্গালার সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক এবং অপূর্ব্ব দৃশ্য হইতেছে গঙ্গার উভয় পার্শ্ববর্ত্তী অসংখ্য ছোট ছোট শ্রেণীবদ্ধ দ্বীপ। এই সকল প্রণালী ও দ্বীপপুঞ্জের মধ্য দিয়া হুগলী হইতে পিপ্‌লী পর্য্যন্ত নয় দিবস ব্যাপী ভ্রমণ আমার এখনও মনে জাগে।

অনেক পৃষ্ঠা ধরিয়া ইহার বর্ণনা করা হইয়াছে এবং অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় এরূপ ঠিক ভাবে বলা হইয়াছে যে, বর্ত্তমান সময়েও তাহার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইতে পারে। এই বিবরণ হইতে কার্পাস ও রেশমের সূতা কাটা এবং বস্ত্র বয়ন প্রভৃতি গৃহশিল্পের অত্যধিক প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইতে পারে। কারণ এই দূরপ্রসারিত বাণিজ্য দ্বারাই যে এই প্রদেশ এত সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। বার্ণিয়ার যে বাঙ্গালাকে পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী ও মনোরম দেশ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার মধ্যে যথেষ্ট আবেগের পরিচয় পাওয়া গেলেও অতিরঞ্জন কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। আওরঙ্গজেবের সময়ে বাঙ্গালার যে এই অবস্থা ছিল তাহার মূলে ছিল বাঙ্গালার কুটির শিল্প। সেই অপূর্ব্ব জলপথ, সহরের রমণীয় দৃশ্য এবং তীরবাসী বাঙ্গালীর সুন্দর এবং সুগঠিত মূর্ত্তি —এই সকলের নিদর্শনই আমরা এই সুস্পষ্ট বর্ণনার মধ্যে পাই।

কিন্তু সোনার বাঙ্গালার আজ আর অতীতের সে ঐশ্বর্য্য নাই। বাঙ্গালীর মূর্ত্তির মধ্যে, পুরাতন জলপথের উভয় পার্শ্ব-স্থিত শস্য ক্ষেত্রের মধ্যে অতীতের সেই সৌন্দর্য্য আজও বহুলপরিমাণে বর্ত্তমান আছে। কিন্তু সকল দিকেই দারিদ্র্য, ধ্বংস, অভাব এবং শ্রীহীনতা প্রবেশ লাভ করিয়াছে। প্রায় সাগর-সঙ্গম পর্য্যন্ত ভাগীরথীর উভয় তীরের শ্যাম শোভা পাটের কল হইতে উদ্গীর্ণ ধূমে কলঙ্কিত হইয়াছে। স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য এই ভাবে নষ্ট করার বিরুদ্ধে কবি রবীন্দ্র নাথ অত্যন্ত তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থনৈতিক শোষণ যাহা হইতেছে সৌন্দর্য্যহানি অপেক্ষা তাহা সমধিক শোচনীয়। শান্তি-নিকেতনের নিকটবর্ত্তী বহু গ্রাম ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছে। আমি গ্রামের পর গ্রাম পরিভ্রমণ করিয়াছি, দেখিয়াছি অধিকাংশ গৃহই পতনোন্মুখ, জলাশয়গুলি শুষ্কপ্রায়। যে কয়টী কুটীর অবশিষ্ট আছে সেগুলিও অপরিচ্ছন্ন, তাহাদের চারিদিক্ আবর্জ্জনারাশিতে পরিপূর্ণ ও শ্রীহীন। দারিদ্র্য এবং ধ্বংসের চিহ্ন প্রত্যেক দিকেই বর্ত্তমান। গ্রামবাসীর উদ্যমহীনতা এবং ম্যালেরিয়ার প্রাবল্য ধ্বংসের ভয়াবহ মূর্ত্তিকে পূর্ণতা দান করিয়াছে। এই অবনতির মূল কারণ—ল্যাঙ্কাশিয়ার হইতে অল্প মূল্যে কলের সূতা ও কাপড়ের আমদানি এবং তাহার ফলে বাঙ্গালার বস্ত্র-শিল্পের দ্রুত ধ্বংস। এই ধ্বংসের বিবরণ ইতিহাসেই পাওয়া যায়।

বাঙ্গালার শিল্পপ্রধান গ্রাম্যজীবনের অর্থ-নৈতিক অবস্থা ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। শাসক-সম্প্রদায় জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে এই পরিবর্ত্তনের সমর্থন এবং সাহায্য

করিতেছিলেন। জনসাধারণ এই নূতন শক্তির বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। আর ইহার প্রতিরোধ করিবার সামর্থ্যও তাহাদের একেবারেই ছিল না।

কল-কারখানা-স্থাপনের ফলে ইংলণ্ডেও এইরূপ ভাবেই গ্রাম্য জীবনের ধ্বংস আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু ইংলণ্ডে শাসিত এবং শাসক একই দেশের লোক ;—এক পক্ষের ক্ষতিতে অপর পক্ষেরও যথেষ্ট ক্ষতির সম্ভাবনা। সুতরাং ধ্বংসের হাত হইতে অব্যাহতির সুযোগ ইংলণ্ডবাসীর যথেষ্টই ছিল। কিন্তু ইংরেজ শাসনাধীনে বাহিরের লোকেরাই ভারতবর্ষের অনিষ্টসাধন করিয়াছে। সুতরাং ক্ষতি স্থায়ী হইয়াছে এবং ক্ষতির পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে।

অতীতের সমৃদ্ধি ফিরাইয়া আনিবার একটী মাত্র পথ আছে। পথটী সরল এবং সঙ্কীর্ণ হইলেও ইহা মুক্তিরই পথ। ইহা দুর্ব্বলতার চিহ্নস্বরূপ আত্মসমর্পণের প্রশস্ত ধ্বংসের পথ নয়। আত্মত্যাগের উপর নির্ভর করিয়া একাগ্রতার সহিত গ্রামের ঘরে ঘরে চরকা এবং তাঁতের পুনঃ প্রবর্ত্তন করিতে পারিলেই সেই সোণার বাঙ্গালার সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, স্বাস্থ্য এবং সমৃদ্ধি আবার ফিরাইয়া আনিতে পারা যাইবে।

সি, এফ্, অ্যাণ্ড্রুজ্

("ইয়ং ইণ্ডিয়া" হইতে "মুক্তি" পত্রিকায় অনূদিত)

"কমার্শ্যাল অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ইণ্ডিয়া"

কলিকাতা হইতে মহাসমারোহে নব প্রকাশিত কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য-বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। জুলাই ১৯২৬, প্রথম সংখ্যা :—(১) কৃষি—গ্রীষ্মপ্রধান দেশের চাষবাসে রাসায়নিক সার ব্যবহার, (২) তুলার আবাদ, (৩) পশু পালন ও চাষ আবাদ, (৪) খনিজ সম্পদ, (৫) ভারতে শিল্পাগমের সুবিধা, (৬) ইংরেজের একটী সুবৃহৎ শিল্প, (৭) এঞ্জিনিয়ারিং, (৮) খুচরা ব্যবসায়, (৯) বিল্ডিংস—নব্য-কলিকাতা ও পুঁজির মালিকদের অভাবনীয় সুবিধা, (১০) রাস্তা ঘাট, (১১) কলিকাতার যান বাহন সমস্যা, (১২) মোটরের ব্যবসা, (১৩) মোটর গাড়ীর হালখাতা, (১৪) অর্থনীতি, (১৫) সর্ব্ব-জন-প্রিয় সমবায় ব্যাঙ্ক, (১৬) বাঙ্গালার পাট-সমস্যা।

"ক্যাপিট্যাল"

সাপ্তাহিক, কলিকাতা, কমার্শ্যাল বিল্ডিং, ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯২৬। ৩৪ বৎসর ধরিয়া চলিতেছে। ব্যাঙ্ক বীমা, রেল, জাহাজ প্রভৃতি দেশী বিদেশী যাবতীয় ছোট বড় কোম্পানীর ইতিবৃত্ত, ইহাদের উন্নতি অবনতির তালিকা ইহাতে থাকে। মোটের উপর জগতের যাবতীয় ব্যবসা বাণিজ্যের প্রচেষ্টার ইতিবৃত্ত প্রতি সপ্তাহে ইহার দীর্ঘায়তন কলেবরে লিপিবদ্ধ হয়। প্রতি পৃষ্ঠায় নিরেট তথ্যমূলক আর্থিক খবরের ছড়াছড়ি!

(১) ভারতীয় পল্লী-সমস্যা (ধারাবাহিক মূল্যবান প্রবন্ধ চলিয়াছে), (২) ধনবিজ্ঞান ও রাজনীতি, (৩) ক্যাপিট্যালের ট্রেড ডিরেক্টরী (যাবতীয় কোম্পানীর হিসাব নিকাশের রোজনামচা, (৫) বর্ত্তমান রবার শিল্প, (৬) বৃটিশ ইঞ্জিনিয়ারির উন্নতি, (৭) ইঞ্জিনিয়ারি ও টান্সপোর্ট, (৮) বস্ত্র-শিল্পের অবস্থা, (৯) ষ্টক একস্চেঞ্জ নোট, (১০) টাকার বাজার, (১১) বিনিময়, (১২) ক্লিয়ারিং হাউস রিটার্ণস, (১৩) ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ড, (১৪) বুলিয়নের বাজার, (১৫) পেপার কারেন্সি, (১৬) ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের হিসাব খতিয়ান, (১৭) ভারত সরকারের ট্রেজারি ব্যালান্স (১৮) গোল্ড ষ্ট্যাণ্ডার্ড রিজার্ভ, (১৯) চা-জেলাগুলির বিবরণী, (২০) শেয়ারহোল্ডারগণের সভাসমিতি (২১) কোম্পানীগুলির বিবরণী ও বিজ্ঞাপন, (২২) লভ্যাংশ—বিজ্ঞাপিত ও প্রকৃত, (২৩) কলিকাতা শেয়ারের বাজার।

"জার্ণ্যাল অব দি রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটী"

লণ্ডন হইতে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্র। জুন ১৯২৬ :—
(১) সের শাহেব রাজস্ব বন্দোবস্ত (মোরল্যাণ্ড)।

"হিন্দুস্থান রিভিউ"

ত্রৈমাসিক, কলিকাতা, জুলাই ১৯২৬ :—
(১) ক্রয়-শক্তি সমতা, (অধ্যাপক বৃজনারায়ণ), (২) পল্লীর ধনাগম-প্রচেষ্টা (এন, সি, মেহ্‌তা, আই, এস), (৩) ভারতে কৃষির উন্নতি, (এস, কে, সেন, বি, এস-সি, এফ, ই, এস)।

"জার্ণ্যাল অব দি অ্যাসোসিয়েশ্যন অব এঞ্জিনিয়ার্স"

(বাংলার ইঞ্জিনিয়ার-সঙ্ঘের ত্রৈমাসিক মুখপত্র, কলিকাতা, মার্চ ১৯২৬ :—

(১) কোলারের স্বর্ণখনি (শ্রীশ্রীশচন্দ্র চাটার্জ্জি এম, আর, এ, এস), (২) ১৯২৫ সনের সাধারণ সভার বিবরণী (৩) কিং জর্জ্জ ডক নির্ম্মাণ।

"এগ্রিকালচারাল জার্ণ্যাল অব ইণ্ডিয়া"

ভারত সরকারের কৃষি-দপ্তরের ত্রৈমাসিক, জুলাই, ১৯২৬ :—

(১) ভারতীয় গোজাতির বিভিন্ন পর্য্যায়, ওঙ্গল বা নেলোর শ্রেণী (ডব্লিউ, স্মিথ ও লিটল উড), (২) বর্ত্তমান কৃষিবিভাগের সুবিধা (জি, এস, হেণ্ডারসন), (৩) তুলা গাছের পোকা (ই, জি, বাটলার, ডি, এস-সি), (৪) তুলার আঁশ পরীক্ষা (জেমস্ টার্ণার, বি, এস-সি), (৫) দক্ষিণ বর্ম্মায় ধান্তের আবাদ (ডেভিড হেণ্ডি), (৬) তুলা চাষের উন্নতি (ট্রেভোর ট্রাকৃট, এম, এ), (৭) গো-রোগ ও তাহার প্রতিকার, (৮) সাম্রাজ্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা (টমাস, এইস, হলাণ্ড)।

"দি ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইষ্টার্ণ এঞ্জিনিয়ার"

ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারগণের মাসিক পত্রিকা, কলিকাতা, আগষ্ট, ১৯২৬ :—

(১) নবীন পারস্য ও ইরাণের আথিক প্রচেষ্টা, (২) কৃষি শিল্প বিভাগ, (৩) রেলওয়ে ও যাতায়াত সমস্যা। (৪) হিউম কংক্রিট পাইপ ও জলসরবরাহ সমস্যা (৫) বেরল কোম্পানীর ধাতব সুইস্‌গিয়ার (৬) সুদূর পূর্ব্ব প্রান্তের চিঠি।

"এম্পায়ার রিভিউ"

১৯০১ সনে প্রতিষ্ঠিত মাসিক পত্রিকা, নিউ ইয়র্ক, আগষ্ট ১৯২৬ :—

(১) সার জন সাইমনের জেনারেল ষ্ট্রাইক বা বিলাতের সাধারণ ধর্ম্মঘট সম্বন্ধে ৩টি বক্তৃতা, (২) ক্যানাডার রেলওয়ে—অতীত ও বর্ত্তমান। (নাজেট, এম, ক্লোফার)।

"ডানস্ ইণ্টারন্যাশনাল রিভিউ"

নিউইয়র্ক হইতে প্রকাশিত, মাসিক, ইহাতে আন্তর্জ্জাতিক রপ্তানির খবর বেশী থাকে। জুন, ১৯২৬ :—

(১) বিশ্বশিল্পে কংক্রিটের মূল্য, (জর্জ্জ, এস্, এটন), (২) বর্ত্তমান সাইবেরীয়ায় আদিম কালের ব্যবসা পদ্ধতি, (৩) আমেরিকার চলন্ত ছায়া-চিত্রের রপ্তানি ব্যবসা (সি, জে, নর্থ), (৪) বাতাসের শক্তির বিদ্যুৎ রূপে ব্যবহার, (৫) মোটরবাস, (৬) দুনিয়ারাউৎপন্ন পেট্রোলিয়াম, (৭) বিশ্ববাণিজ্য, যন্ত্রপাতি, কল-কারখানা, ইঞ্জিনিয়ারিং, যানবাহন প্রভৃতির খবরাখবর।

"মহীশূর ইকনমিক জার্ণ্যাল"

(বাঙ্গালোর হইতে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা)। জুন, ১৯২৬ :—

(১) বিহারে কৃষির উন্নতি (১৯২৪-২৫), (২) ক্যানাডার সংবাদ (সম্পাদক), (৩) অন্নসমস্যা (জামসেদ এন্. আর, মেহ্‌তা), (৪) দৈনিক সংবাদপত্র (পল হাচিন), (৫) জেনেভার আন্তর্জ্জাতিক ধনবিজ্ঞান বৈঠক, (৬) পাশ্চাত্য ধনবিজ্ঞান—আয়কর বা ইনকাম ট্যাক্স ধার্য্যের নীতি, (৭) ক্যানাডার ব্যবসা ও আর্থিক অবস্থা. (৮) ধনবিভাগের শিক্ষা।

"আনন্দবাজার পত্রিকা"

নূতন বৈজ্ঞানিক লাঙ্গল

(শ্রীযুত এ, সি, বেরা এম, এ, বি-এস-সি, বার-এট্-ল)

আমাদের দেশের শতকরা ৮৫জন কৃষক অতি প্রাচীন প্রথায় অত্যন্ত কষ্টে কেবলমাত্র কৃষিকার্য্য দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহা নিশ্চয় যে, বৈজ্ঞানিক কৃষিযন্ত্র দ্বারা চাষ-আবাদ করিলে দেশে প্রচুর "শস্যরত্ন" লাভ হয়, এবং তাহাতে অনেক সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

এ যাবৎকাল যে সমস্ত বিদেশী কৃষিযন্ত্র আমাদের দেশে আমদানি হইয়াছে তাহার কোনটাই, আমাদের দেশের দুরে

দূরে অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড বলদ দ্বারা চাষ করিয়া ধান, পাট প্রভৃতি শস্য উৎপাদনের পক্ষে, দরিদ্র কৃষকের উপযুক্ত হয় না। উহা শীতপ্রধান দেশের শস্য এবং জমির পক্ষে ইঞ্জিন দ্বারা চালাইবার উপযুক্ত বটে। তা ছাড়া, উহা দুর্মূল্য ও অত্যন্ত ভারি যন্ত্র। তবে উহা আমাদের দেশের প্রদর্শনীতে দেখিতে সুন্দর সন্দেহ নাই।

কৃষিশিল্পবিদ্ শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র লস্কর (কনসালটীং ইঞ্জিনিয়ার ঢাকুরিয়া, কলিকাতা) যে লাঙ্গল আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাতে আমাদের দেশের কৃষির উন্নতির সহজ উপায় হইতে পারে। উহা এরূপ সরল হইয়াছে যে, সাধারণ কৃষক বিনা শিক্ষায় চালনা করিতে পারিবে।

আমার আবাস ভূমি হাওড়া জেলার শীতলপুর গ্রামে। তথায় এই নূতন লাঙ্গল দ্বারা বাঙ্গালার সাধারণ বলদের সাহায্যে ৭ ইঞ্চি প্রস্থ ৬ ইঞ্চি গভীর করিয়া প্রাচীন লাঙ্গল অপেক্ষা চারিগুণ অধিক চাষ হইতেছে।

এই নব হলের নির্ম্মাণকৌশলে মাটীর প্রতিবন্ধকতা শক্তি কমিয়া যায় বলিয়া ইহা দেশীয় সাধারণ বলদে অনায়াসে টানিতে পারে; পরন্তু ইহা দ্বারা একবার চাষ করিলেই সম্পূর্ণ জমি চাষ হয় এবং ঘাস পাতা প্রভৃতি সহ উপরের মাটী নীচে পড়িয়া এবং নীচের মাটী উপরে উঠিয়া রৌদ্র, আলো এবং বায়ু সংযোগে ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা সাধন করে। অন্যদিকে এককালে অধিক জমি চাষ করিয়া বপনের উপযোগী করা যায় বলিয়া কার্ত্তিক অগ্রহায়ণে ধান্য কাটিবার পর, অতি সত্বর সমস্ত জমিতে কলাই জাতীয় শস্য, তারপর অন্য জাতীয় শস্য উৎপন্ন করিতে পারা যায়। কিন্তু প্রাচীন লাঙ্গল দ্বারা কোন প্রকারেই এই সমস্ত বিষয়ে যথাসময়ে অধিক কার্য্য সমাধা করিয়া উপযুক্ত লাভ করা যায় না।

এই হলের মূল্যও অধিক নয়। ইহা লোহা ও ইস্পাতে নির্ম্মিত বলিয়া আজীবন স্থায়ী হইবে। এই হিসাবে প্রাচীন লাঙ্গল অপেক্ষা এই নূতন লাঙ্গল বহুগুণে সস্তা। আমি এই হলের এই সমস্ত গুণ দেখিয়া, সর্ব্বসাধারণকে অনুরোধ করিতেছি যে, তাহারা যেন এই হল বহুল প্রচারের সহায়তা করিয়া এবং ইহার ব্যবহার করিয়া নিজের ও দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করেন।

"জাগরণ" (কুষ্টিয়া)

ধানের পোকা

পামরী পোকা—এই ছোট কাল কাঁটা বিশিষ্ট পোকা সময় সময় ধানের ক্ষতি করে। কীড়া এবং পামরী পোকা উভয়েই পাতার সবুজ অংশ খাইয়া কোন কোন সময় ফসলের বিশেষ ক্ষতি করে। শুষ্ক ক্ষেতে (যেমন আশু ধান্যের) এই পোকা দেখা দিলে ক্ষেতের উপরে পোকাধরা থলে টানিয়া পোকা ধরিয়া মারিতে পারা যায়। বাঁশের ফ্রেম (কাঠাম) প্রস্তুত করিবে এবং ৯ ফুট চওড়া ও ৫ ফুট গভীর একটি বড় কাপড়ের থলে প্রস্তুত করিয়া তাহার মুখটা ফাঁক করিয়া ঐ ফ্রেমের চারিদিকে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া দিবে। দুইজন লোক এই থলেটির উপরের বাঁশ ধরিয়া আক্রান্ত ক্ষেতের উপর টানিবে, তবেই পোকাগুলি উহার মধ্যে যাইবে। এইরূপে পোকাগুলি সংগ্রহ করিয়া কেরোসিন তৈল মিশ্রিত জলে ফেলিয়া মারিবে।

ধানের গান্ধি পোকা—এই লম্বা সবুজ পোকা সময় সময় ধানের রস (দুধের ন্যায়) চুষিয়া খাইয়া অনিষ্ট করে। ইহাদিগকেও ঐরূপ কাপড়ের থলে দ্বারা ধরিয়া মারা যাইতে পারে। দুইজন লোক থলের মুখ ফাঁক করিয়া ক্ষেতের উপরে টানিয়া পোকা ধরিবে। এই ক্ষেত্রে বাঁশের ফ্রেমের দরকার নাই। এইরূপে অনেক পোকা থলের ভিতর সংগ্রহ হইলে থলেটি গুছাইয়া তাহা হাত দিয়া চাপিবে, যেন পোকাগুলি আধমরা হয়। পরে থলে ঝাড়িয়া পোকা সংগ্রহ করিয়া মারিবে।

ধানের মাজরা পোকা—এই সাদা কীড়া ধান গাছের ভিতর ছিদ্র করে এবং মাজটি মারিয়া ফেলে। এই কীড়ার সাদা প্রজাপতিগুলি বহুসংখ্যায় আলোতে আসে, কাজেই ডিম পাড়িবার পূর্ব্বে ইহাদিগকে আলোক ফাঁদে মারা যাইতে পারে। একটি মেটে গামলায় জল ও কিছু কেরোসিন তৈল রাখিয়া রাত্রে তাহার উপর একটী লণ্ঠন জ্বালাইয়া ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে। তবেই পোকাগুলি আলোকদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ঐ জলে পড়িয়া মরিবে।

ধানের চোঙ্গা পোকা—এই পোকা শাইল ধানের পাতা কাটিয়া ক্ষতি করিয়া থাকে। এগুলি এক টুকরা পাতা কাটিয়া

তাহার দ্বারা একটী চোঙ্গা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বাস করে এবং পাতার সবুজ অংশ খায়। যদি সম্ভব হয় কিছু সময়ের জন্য ক্ষেতের জল ছাড়িয়া দিবে; কারণ এই পোকাগুলি জলে বাস করে, কাজেই জল না থাকিলে ইহারা বাঁচিতে পারে না।

"জার্ণ্যাল অব্ দি ইনষ্টিটিউট্ অব্ অ্যাকচুয়ারীজ্"

বিলাতে জীবনবীমা-বিজ্ঞানে একদল বিশেষজ্ঞ আছেন তাঁহাদিগকে ইংরেজী ভাষায় অ্যাকচুয়ারী বলা হয়। নূতন বীমাকোম্পানী গঠন করিতে হইলে চাঁদার হার ইঁহারা প্রস্তুত করিয়া দেন এবং মধ্যে মধ্যে (সাধারণতঃ পাঁচ পাঁচ বৎসর অন্তর) ইঁহারা বীমা আফিসের কাগজ-পত্র খতাইয়া দেখেন এবং আফিস এই সময়ের মধ্যে কত লাভ করিল বা লোকসান দিল এবং লাভ করিয়া থাকিলে সেই টাকা বীমাকারীদের মধ্যে কি ভাবে বণ্টন করিতে হইবে সে বিষয়ে উপদেশ দেন। এই শ্রেণীর বিশেষজ্ঞদের লণ্ডনে একটি সমিতি আছে। উক্ত পত্রিকাখানি সেই সমিতি হইতেই প্রকাশিত হয়। বৎসরে সাধারণতঃ তিন সংখ্যা বাহির হয়। জীবনবীমা-বিজ্ঞানের অতিশয় জটিল সমস্যাগুলি সাধারণতঃ এই কাগজে আলোচিত হইয়া থাকে। ১৯২৬ সনের জুলাই মাসে এক সংখ্যা বাহির হইয়াছে। ঐ সংখ্যার নিম্নলিখিত প্রবন্ধ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য :—

(১) "ব্যাঙ্ক এবং বীমাকোম্পানীর পেন্সনপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীদের মৃত্যুর হার নির্ণয়।" বিলাতের ৫টী বড় ব্যাঙ্ক এবং ২৫টী বীমাকোম্পানীর কর্ম্মচারী, যাহারা ১৯০০ সনের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯২৪ সনের ৩১শে ডিসেম্বর এই ২৫ বৎসরের মধ্যে পেন্সন্ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে মৃত্যুর হার নির্ণয়ের চেষ্টা করা হইয়াছে। লেখক প্রুডেন্শ্যাল্ ইনসিওরেন্স্ কোম্পানীর মিঃ সি, এফ্, ওয়ারেন।

(২) জীবনবীমা আফিসের লভ্যাংশ কি করিয়া বণ্টন করিতে হয় সে বিষয়ে আলোচনা।

(৩) ভারতীয় বীমাকারীদের মধ্যে মৃত্যুর হার। লেখক এ, হাণ্টার এফ্, এ, এস্, এফ, এফ, এ। ১৮৮৫ সনে নিউইয়র্ক বীমা-কোম্পানী ভারতে জীবনবীমার ব্যবসা করিতে আসে এবং বিগত মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে পর ইহারা ইহাদের বীমাপত্রগুলি ক্যানাডার সান্‌লাইফ জীবন-বীমা কোম্পানীর নিকট বিক্রয় করিয়া দেশে চলিয়া যায়। এই সময়ের মধ্যে তাহাদের বীমাকারীদের মধ্যে যে মৃত্যুর হার পরিলক্ষিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। রচনার শেষ ভাগে লেখক কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা আমাদের মনে রাখা ভাল।

(ক) ভারতের বাহিরের লোক, যাঁহারা ভারতে বাস করিয়া জীবন-বীমা করিয়াছেন, তাঁহাদের মৃত্যুর হারের চেয়ে ভারতীয় বীমাকারীদের মৃত্যুর হার অনেক বেশী। অবশ্য একথা মনে রাখিতে হইবে যে, ৫৫ বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়সেই অনেক অ-ভারতবাসীই তাঁদের কর্ম্মক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া নিজ দেশে অর্থাৎ এখানকার চেয়ে স্বাস্থ্যকর স্থানে চলিয়া যান।

(খ) ভারতবর্ষে বীমার চাঁদার হার নির্দ্ধারণ করিবার কালে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। কারণ নানা শ্রেণীর লোকের মধ্যে মৃত্যুর হারের খুব প্রভেদ আছে দেখিতে পাওয়া যায়।

(গ) সাধারণতঃ বীমাকারীদের মধ্যে যেসকল মৃত্যু হইয়া থাকে, তাহার এক-তৃতীয়াংশ নিম্নলিখিত রোগ সমূহে ঘটিয়া থাকে,—আমাশয়, ওলাউঠা, প্লেগ এবং নানা জাতীয় জ্বর। বিলাতে প্রৌঢ়দের মধ্যে এ সকল রোগ বড় বেশী দেখা যায় না।

"ব্যাঙ্কার্স ম্যাগাজিন"

১৮৪৪ সনে প্রতিষ্ঠিত মাসিক, লণ্ডন হইতে প্রকাশিত। জুন ১৯২৬,—(১) গ্রেট বৃটেন এবং আয়র্ল্যাণ্ডের ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান (১৯২৫ সনের বার্ষিক বৃত্তান্তের সমালোচনা), (২) বিলাতী বাজেট, (৩) ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানের তুলনাসাধন,—ক্যানাডিয়ান ব্যাঙ্ক অব্ কমার্স, চার্টার্ড ব্যাঙ্ক এবং হঙ্কং-শাংহাই ব্যাঙ্ক এই তিন ব্যাঙ্কের তথ্যবিশ্লেষণ।

ব্যাঙ্কিং-ব্যবসায়ে যেসকল লোকের হাতে খড়ি হইতেছে তাহাদের জন্য এই পত্রিকায় একটা শিক্ষা-বিভাগ আছে।

"জ্যর্ণালে দেলি একনমিস্তি এ রিহ্বিস্তা দি স্তাতিস্তিকা"

ইতালিয়ান আর্থিক পত্রিকা, মাসিক, মার্চ্চ ১৯২৬ :—(১) ধনসঞ্চয়ের তত্ত্বকথা (উম্ব্যার্ত রিচ্চি), (২) মজুরির হার পরিবর্ত্তন (১৯১৪-২৪), মিলানের কোনো কোনো শিল্প কারখানার অবস্থা-সমালোচনা (রুদলফ্ হ্বিচেস্তি), (৩) ধনবিজ্ঞানে খরচপত্রের বিশ্লেষণ (গুস্তাহ্ব দেল হ্বেক্ক্যা)।

জুন, ১৯২৬ :—(১) মূল্যতত্ত্বের সমাজ-বিজ্ঞান (ফিলিপ্প কার্লি), (২) সোহ্বিয়েট রুশিয়ার আর্থিক স্থিতি (য়েনি গ্রিজ্যতি ক্রেশ্মান)।

"চেম্বার অব্ কমার্স জার্ণ্যাল"

বৃটিশ ব্যবসায়ি-সঙ্ঘের মুখপত্র, লণ্ডন হইতে প্রকাশিত, সাপ্তাহিক ; ৯ জুলাই, ১৯২৬। আলোচিত বিষয়,—বৃটিশ মাল রপ্তানি বৃদ্ধির উপায়, নিউজীল্যাণ্ডের আর্থিক অবস্থা, দক্ষিণ আমেরিকার চিলি দেশের আমদানি-বাণিজ্য, ব্যবসায়ি-সঙ্ঘের ভোজ-বক্তৃতাবলী, ব্যাঙ্কের লভ্যাংশ সমালোচনা, আদালতে ব্যবসা-মোকদ্দমা, ক্যানাডার রাসায়নিক কারখানা, ভারতে মোটরকার বিক্রী, নরওয়ের পল্লী-গৃহে বিজলী-দ্রব্য, বিভিন্ন দেশের শুল্ক-ব্যবস্থা, বিভিন্ন বৃটিশ ব্যবসায়ি-সঙ্ঘের সংবাদ।

"জার্ণ্যাল অব দি বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্স"

বাংলাদেশে বাঙালী এবং অন্যান্য ভারতীয় ব্যবসায়ীদের এক বড় সঙ্ঘ আছে। তাহার নাম "বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্স"। বিলাতী, ফরাসী, জাপানী এবং অন্যান্যদেশীয় ব্যবসায়ি-সঙ্ঘের আদর্শে এই বাঙালী সঙ্ঘের কাজকর্ম্ম চলিয়া থাকে।

সম্প্রতি এই সঙ্ঘ তাঁহাদের মুখপত্র স্বরূপ একখানা ত্রৈমাসিক কাগজ বাহির করিবার আয়োজন করিয়াছেন। বর্ত্তমান সংখ্যায় পত্রিকা সুরু হইল (সেপ্টেম্বর, ১৯২৬)। সম্পাদক শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

বাংলা দেশে বাঙালীর সম্পাদিত ইংরেজী ধনবিজ্ঞান-পত্রিকা বোধ হয় এই প্রথম। প্রথম সংখ্যায় (১৫০ পৃষ্ঠা) আছে,—(১) রাজা হৃষীকেশ লাহার ভূমিকা, (২) ব্যবসা-বাণিজ্যের নবীন ধরণ-ধারণ, (৩) বিদেশে ভারতীয় মালের বাজার, (৪) সরকারী আয়ব্যয়ের মোসাবিদার সঙ্গে বহির্ব্বাণিজ্যের সম্বন্ধ (ইতালির নজির), (৫) মুদ্রা-স্থিরী-করণের পর হইতে জার্ম্মাণির আর্থিক অবস্থা, (৬) গ্রেটবৃটেনে দৈব-বীমা, (৭) মোটরকার বীমা, (৮) স্বর্ণে প্রত্যাবর্ত্তন,—বিলাতের অবস্থা সমালোচনা, (৯) ব্যাঙ্ক-পরিচালার সমস্যা-সমূহ,—জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কসমূহের উদ্বর্ত্তপত্র, (১০) ব্যবসা-বাণিজ্যের সেবক ব্যাঙ্ক,—ইংরেজ-সমাজের দৃষ্টান্ত, (১১) হিল্টন ইয়ং কারেন্সী কমিশন, (১৪) স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাসের প্রতিবাদ, (১৫) কারেন্সী রিপোর্ট সম্বন্ধে বাঙালী মতামত, (১৬) ঐ সম্বন্ধে অধ্যাপক চাবলানীর প্রবন্ধ, (১৭) ঐ সম্বন্ধে ষ্টেট্‌সম্যান দৈনিক কাগজের মন্তব্য, (১৮) ঐ বিষয়ে স্যার বাজিল ব্ল্যাকেটের ব্যাখ্যা, (১৯) গোল্ড বুলিয়ন ষ্ট্যাণ্ডার্ড (শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার), (২০) ভারতে যন্ত্র-পাতির চাহিদা ও ব্যবহার বাড়িয়া যাইতেছে, (২১) বাঙালীর ব্যবসা,—(ক) জলপাইগুড়ি ব্যাঙ্কিং অ্যাণ্ড ট্রেডিং কর্পো-রেশুনের উদ্বর্ত্তপত্র, (খ) হিন্দুস্থান ইনশিওর্যান্স কোম্পানীর সংবাদ, (২২) ভারতে কয়লা ও তুলার ব্যবসা,—ব্যাঙ্ক-নীতির সমালোচনা (শ্রীধীরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্, এ), (২৩) ভারতীয় দিয়াশলাইয়ের কারখানার বর্ত্তমান অবস্থা (টি, এন, গুপ্ত এম্,এ), (২৪) জাপানের শিল্প ও ব্যবসায় সভা, (২৫) দুনিয়ার অন্যান্য দেশের ব্যবসায়ি-সঙ্ঘ, (২৬) আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক আইন-কানুন, (২৭) বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্সের ইতিহাস (শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ), (২৮) বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বারের ত্রৈমাসিক আত্মকথা। এই গেল ইংরেজি অংশ।

বাংলা অংশে আছে,—(১) ষ্টেট রেলওয়ে কারখানাগুলির কুর্চ্চিনামা, (২) চা-ব্যবসায়ে ভারতবাসী, (৩) বিলাতের নৌশিল্প (শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী), (৪) বাঙ্গালীর বায়স্কোপ-ব্যবসায়, (৫) কলিকাতা জেনার‍্যাল ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন।

ইতালিয়ান জমিজমার ব্যবস্থা

সার্পিয়েরি প্রণীত "লা পলিতিকা আগ্রারিয়া ইন্ ইতালিয়া এ ই রেচেন্তি প্রভেদি মেন্তি লেজিসলাতিভি" (ইতালির ভূমিসমস্যা ও ভূমিবিষয়ক আইন কানুন) গ্রন্থে বাঙ্গালীর জ্ঞাতব্য অনেক তথ্য আছে (গ্রন্থপঞ্জী দ্রষ্টব্য)। গ্রন্থকার ইতালিয়ান পণ্ডিত-সমাজে ভূমি-বিশেষজ্ঞরূপে পরিচিত।

ভারতবর্ষে আজকাল যে সকল ভূমি-সমস্যা চলিতেছে তাহার অধিকাংশই জার্ম্মাণি, ডেন্‌মার্ক, ফ্রান্স ইত্যাদি দেশে ইতিপূর্ব্বে উপস্থিত হইয়া মীমাংসিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইতালি এখনও ইয়োরোপের উন্নত দেশসমূহের কোঠায় আসিয়া পৌঁছে নাই। এই কারণে অনুন্নত ইতালির সঙ্গে অবনত ভারতের অনেক বিষয়ে মিল আছে।

জমিজমার বিধিব্যবস্থায় ইতালির গবর্মেণ্ট এবং ইতালিয়ান সুধী ও চাষীরা যাহা-কিছু করিতেছেন তাহার সঙ্গে পরিচয় থাকিলে বাঙ্গালীরা নিজ নিজ কর্ত্তব্য খানিকটা সহজেই সমঝিতে পারিবেন। অন্যান্য বিষয়েও আধুনিক ইতালির নজির আমাদের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান।

সার্পিয়েরি বলিতেছেন,—"আর্থিক জীবনের সকল বিভাগেই গবর্মেণ্টের হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় নয়। ব্যক্তিগণের স্বাধীন প্রতিযোগিতা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই দেশের ধনসম্পদ্ বৃদ্ধির পক্ষে মঙ্গলকর। কিন্তু গবর্মেণ্টের হস্তক্ষেপ এবং সরকারী শাসনে বা তদবিরে ব্যবসা চালানো কোনো কোনো ক্ষেত্রে যার পর নাই আবশ্যক।"

যে যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থ বিশেষরূপে পরিস্ফুট নয় সেই সকল ক্ষেত্রে সার্পিয়েরির মতে সরকারী হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয়। দেশব্যাপী সমাজ-হিত-বিষয়ক অনুষ্ঠানের জন্য গবর্মেণ্টের আর্থিক এক্তিয়ার বাড়ানো যাইতে পারে। এমন অনেক আর্থিক কাজকর্ম্ম দেখা যায়, যে সমুদয়ের সুফল কুফল ফলিতে বহু বৎসর লাগে। এই সকল কাজকর্ম্মের পরিচালনায়ও গবর্মেণ্টেরই হাত থাকা বাঞ্ছনীয়।

এইসকল কারণে সার্পিয়েরি সরকারী জমিজমা বা খাসমহলের স্বপক্ষে রায় দিয়াছেন। সার্ব্বজনিক পল্লী-স্বার্থ বা নগর-স্বার্থের পুষ্টির জন্য ও ইতালিতে যে সমুদয় ভূমি-বিধি কায়েম হইয়াছে তাহার স্বপক্ষে গ্রন্থকারের মত আছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র "জমীদার" অর্থাৎ জমির মালিক সৃষ্টি করিবার জন্য যে সকল চেষ্টা চলিতেছে সেই সবও সার্পিয়েরির পছন্দসই। অধিকন্তু ধনসম্পদ্ সম্বন্ধে ইতালিয়ান সরকারের বিধি-ব্যবস্থা এই নবীন চিন্তা-প্রণালীরই প্রতিমূর্ত্তি।

ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ে ঐক্যগঠন

বাংলা দেশে আজকাল ছোট-বড়-মাঝারি লোন-আফিস বা ব্যাঙ্কের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। এই সকল কর্জ্জ-প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রমশঃ উন্নতির পথে উঠিবে বলিয়া বিশ্বাস করা যায়। বর্ত্তমানে আমরা ব্যাঙ্ক-পরিচালনার যে অবস্থায় আছি সে অবস্থা ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি ইত্যাদি দেশে অনেকদিন হইল অতীত হইয়া গিয়াছে।

আমাদের দেশের মতন এই সকল দেশেও বহুসংখ্যক ছোট খাটো ব্যাঙ্কের যুগ ছিল। ব্যাঙ্কগুলা ক্রমে ক্রমে ঐক্য-বদ্ধ হইতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে এই ক্রমবিকাশের ধারা বেশ স্পষ্টরূপে ধরিতে পারা যায়। সম্প্রতি ইংরেজী ভাষায় একখানা বই বাহির হইয়াছে

বিলাত সম্বন্ধে (১৯২৬)। প্রকাশক লণ্ডনের কিং কোং। লেখকের নাম সাইক্‌স্।

গ্রন্থকার "দি অ্যামালগ্যামেশ্যন মুভ্‌মেণ্ট ইন্ ইংলিশ ব্যাঙ্কিং" (বিলাতী ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ে ঐক্যবন্ধনের আন্দোলন) নাম দিয়া তাঁহার তথ্যগুলা শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন। ১৮২৫ হইতে ১৯২৪ পর্য্যন্ত পুরাপুরি একশ' বৎসরের বৃত্তান্ত এই কেতাবে পাই। আমাদের দেশে যাঁহারা ব্যাঙ্ক বা লোন আফিস চালাইতেছেন তাঁহাদের পক্ষে এই বই যার পর নাই মূল্যবান। দাম ১০ শি ৬ পে।

সাইক্‌স্ বিলাতী ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানসমূহের ঐক্যবন্ধন পাঁচ যুগে ভাগ করিয়া দেখাইয়াছেন। এই যুগ-বিভাগের দিকে ভারতীয় পাঠকের নজর ফেলা আবশ্যক। কোন্ যুগে কতগুলা যোগাযোগ কায়েম হইয়াছে নিম্নের তালিকায় তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে :—

১৮২৫-৪৩	...	...	১২২
১৮৪৪-৬১	...	...	৪৪
১৮৬২-৮৯	...	...	১৩৮
১৮৯০-১৯০২	...	...	১৫৩
১৯০৩-১৯২৪	...	...	৯৫
			৫৫২

একশ' বৎসরে মোটের উপর ৫৫২ বার বিভিন্ন ব্যাঙ্কের ভিতর "ছোট ভাঙ্গিয়া বড় গড়িবার" কাজ দেখা গিয়াছে। অর্থাৎ গড়পড়তা বৎসরে প্রায় ৫৷৷০ উপলক্ষ্যে ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্মিলিত হইয়া বিপুলয়াতন ধন-কেন্দ্র গড়িয়া তুলিয়াছে।

বিলাতী আর্থিক ইতিহাসের এই সকল তথ্য বাঙালী সমাজে বড় কাজে লাগিবে। আমরা ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় এই "অ্যামালগ্যামেশ্যন" বা একীকরণের প্রাথমিক যুগে পা ফেলিবার অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি। ছোট ভাঙিয়া বড় গড়িবার প্রয়াস এখনো বিশেষ বলবান নয়। কিন্তু শীঘ্রই বাঙালী ব্যাঙ্ক-মাতব্বরদিগকে এই পথের পথিক হইতে হইবে।

আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য

প্রায় প্রত্যেক দেশের বাণিজ্যই দ্বিবিধ,—(১) অন্তর্ব্বাণিজ্য, (২) আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য। ব্যবসা-বাণিজ্য-বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করিতে হইলে এই দুই প্রকার বাণিজ্যের কথাই আলোচনা করা দরকার হয়। আজকাল ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে আলোচনার উপলক্ষ্যে প্রধানতঃ আমদানি-রপ্তানি অর্থাৎ বিদেশের সঙ্গে আমাদের লেনদেন সমূহ বিবৃত হইয়া থাকে। কিন্তু দেশের ভিতরই এক জেলা হইতে অপর জেলায় মাল-চলাচল কিরূপ এবং কিরূপে সাধিত হইতেছে সেই বিষয়ে খোঁজখবর খুব কমই লওয়া হইয়া থাকে। ভারতীয় সাহিত্যে অন্তর্ব্বাণিজ্যের চর্চ্চা একদম নাই বলিলেই চলে।

কিন্তু ইতালিয়ান ধনবিজ্ঞান-পণ্ডিত গারিণ কানিনা "পলিতিকা কমার্চিয়ালে" (ব্যবসা-বাণিজ্যের রাষ্ট্রনীতি) সম্বন্ধে যে গ্রন্থ লিখিয়াছেন (গ্রন্থপঞ্জী দ্রষ্টব্য) তাহা ষোল কলায় পরিপূর্ণ। তাহার ভিতর অন্তর্ব্বাণিজ্যের বস্তু এবং কর্ম্মপরিচালনা ইত্যাদি সবই যথোচিত ঠাঁই পাইয়াছে। এইসকল গ্রন্থের রচনা-প্রণালীতে যুবক ভারতের লেখকগণ অনেক-কিছু শিখিতে পারেন।

একটা কথা উল্লেখ করা আবশ্যক। মাছের বাজারে, তরিতরকারীর বাজারে এবং দুধ ও ফলমূলের বাজারে মূল্য নির্দ্ধারিত হয় কি করিয়া? কেনাবেচার ভিতর বিজ্ঞান বা দর্শন আছে কতটুকু? এই সকল প্রশ্নের জবাব দিতে না পারিলে বাজার-তত্ত্ব বা মূল্যতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। সেইরূপ আমদানি-রপ্তানির বেলায়ও একটা আন্তর্জ্জাতিক মূল্যের বিজ্ঞান বা দর্শন আছে। সেই বিজ্ঞান বা দর্শনই বহির্ব্বাণিজ্য বা আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের প্রাণবস্তু।

বাংলা দেশে যাঁহারা উচ্চতম ধন-বিজ্ঞান-বিদ্যায় প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে এই সম্বন্ধে অল্পবিস্তর মাথা খাটাইতে হয়। কিন্তু মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, বিষয়টার আলোচনা বাস্তবিক পক্ষে বাঙালী সুধীসমাজে এখনো প্রবেশ করে নাই। এই বিষয়ে আমাদিগকে স্বতন্ত্র প্রবন্ধমালার ব্যবস্থা করিতে হইবে। একখানা বইয়ের বিবরণ দিবার সময় অতদূর দৌড় মারা চলিবে না।

এই আন্তর্জ্জাতিক মূল্যের ভিতরকার কথা "কস্তি কম্পারাতিভি"। ইংরেজিতে ইহাকে বলে কম্পারেটিভ

কষ্ট" (খরচ-পত্রের তুলনাসাধন)। যে দুইটা বস্তুর বিনিময় সাধিত হইতেছে সেই বস্তু দুইটা তৈয়ারী করিতে যে খরচ হয়, সেই খরচের তুলনা করা আবশ্যক। সেই খরচ হিসাব করিয়া প্রত্যেক দেশ যদি বুঝে যে নিজের লাভ থাকিবার সম্ভাবনা, তাহা হইলেই অন্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্য পাতাইবার দিকে তাহার মতি ঝুঁকিবে।

বর্ত্তমান গ্রন্থে এই তত্ত্বের বিশদ আলোচনা আছে। টাকাকড়ির যুগে ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানের প্রভাবে এবং এক সঙ্গে দুনিয়ার বাজারে বহু জাতির প্রতিযোগিতায় আন্তর্জ্জাতিক মূল্য কতটা পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে তাহার আলোচনাও আছে। অধিকন্তু সংরক্ষণ-নীতি এবং সশুল্ক বাণিজ্য-নীতির প্রভাবও বিবৃত হইয়াছে।

আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের তত্ত্বকথা বুঝিতে হইলে একসঙ্গে কতদিকে মাথা খেলানো আবশ্যক এই সামান্য বৃত্তান্ত হইতে তাহার কিছু আন্দাজ চলিতে পারে।

আর্থিক ইয়োরোপের ভবিষ্যৎ

লাইপৎসিগ হইতে "ডাস্ ফারাইনিগ্‌টে অয়রোপা" (সংযুক্ত ইউরোপ) নামক একখানা বই বাহির হইয়াছে (১৯২৫, ১৯৮ পৃষ্ঠা, ৪·৫০ মার্ক)। প্রকাশক হ্বাইগার কোং। গ্রন্থকারের নাম নয়েন ক্রুথ।

লেখকের মতে,—পশ্চিম ইয়োরোপের লোকেরা এতদিন অনুন্নত এবং আর্থিক হিসাবে অর্দ্ধ-বিকশিত দেশসমূহের উপর কর্ত্তামি করিয়া নিজেদের ক্ষমতা জাহির করিয়াছে। যে সকল দেশে পুঁজি-নীতি পাকিয়া উঠে নাই সেই সব দেশ পশ্চিম ইয়োরোপের পুঁজি-ব্যবস্থার অধীনে জীবন চালাইয়া আসিয়াছে।

কিন্তু পুঁজিপতিদের নিকট কুদরতী মাল জোগাইয়া এক্ষণে কোনো দেশই আর সন্তুষ্ট থাকিতে রাজি নয়। সকল দেশেই আজকাল পুঁজি গড়িয়া উঠিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক দেশেই যন্ত্রপাতি-নিয়ন্ত্রিত কারখানার সাহায্যে স্বদেশী কাঁচা মাল স্বদেশেই পাকা মালে পরিণত হইতেছে। অর্থাৎ অর্দ্ধ-বিকশিত এবং অনুন্নত দেশগুলা ক্রমেই আর্থিক উন্নতির উচ্চতর সিঁড়িতে আসিয়া দেখা দিতেছে।

কাজেই পাশ্চাত্য সমাজের কুলীন পুঁজিপতিদের পক্ষে ভাবিবার সময় আসিয়াছে। সহজে কোনো দেশকে কাঁচা মালের দেশে পরিণত করা আর সম্ভব হইবে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ হইতে আজ পর্য্যন্ত আর্থিক দুনিয়া যে পথে চলিয়াছে সে পথে আর চলিবার সম্ভাবনা খুবই কম। বস্তুতঃ, প্রত্যেক দেশকেই এখন হইতে কাঁচা মাল এবং খাদ্য দ্রব্য সম্বন্ধে যথাসম্ভব স্বরাটরূপে গড়িয়া উঠিতে হইবে। এইরূপ আত্মকেন্দ্রী দেশের উৎপত্তি আগামী ভবিষ্যতে আর্থিক ইয়োরোপের অবশ্যম্ভাবী লক্ষণ।

জার্ম্মাণির পক্ষে কর্ত্তব্য কি? এই প্রশ্নের আলোচনায় নয়েনক্রুথ্ বলিতেছেন,"—মামুলি কাপিটালিস্‌মুস (পুঁজি-নীতি) ভাঙিয়া ফেলা দরকার। কোনো কুদরতী মালের জন্য অবনত দেশের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না।' এই বুঝিয়া দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের পুনর্গঠন সুরু করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে ইয়োরোপে এক আর্থিক ও সামাজিক নবজীবন কায়েম হইতে পারিবে। সেই নব-জীবনের ভগীরথ হইবে জার্ম্মাণি।"

মজুর-বিধি

প্যারিসের ব্যবসায়-কলেজের অধ্যাপক দুর্পা এবং অধ্যাপক দেভো "প্রেসি দ' লেজিস্ লাসিঅঁ উভ্রিয়ে এ অঁ্যাদুস্ত্রিয়েল" (মজুর ও কারখানা বিষয়ক আইন) নামক ৩১ + ৩৭২ পৃষ্ঠায় এক সম্পূর্ণ গ্রন্থ লিখিয়াছেন। (প্রকাশক দুনো কোং, প্যারিস ১৯২৫)। ফ্রান্সের শিল্প-বিদ্যালয়ে এই বই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আদালতের কাজের জন্যও উকিল-জজেরা এই বইয়ের সাহায্য লইতে পারেন।

মজুর-বিধি ফ্রান্সে "কদ দু ত্রাভাই" নামে সংক্ষিপ্তভাবে পরিচিত। ১৯১০ হইতে ১৯২৪ পর্য্যন্ত মজুর-জীবনের নানা বিভাগে যে সকল আইন কানুন জারি হইয়াছে সবই এই গ্রন্থে শৃঙ্খলীকৃতরূপে বিবৃত আছে। চুক্তির আইন, কারখানার শাসন, বিচারালয়ের ব্যবস্থা, সালিসী ইত্যাদি কিছুই বাদ যায় নাই। শিল্পজগতে আবিষ্কারের সম্পত্তি বিষয়ক আইনও বিবৃত আছে। এই ধরণের কোনো বই ভারত সম্বন্ধে আছে কিনা জানি না। এই দিকে ধন-বিজ্ঞান বিদ্যার সেবকগণের দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক।

"মান্নুয়েল দেকোনোমি কমার্সিযাল" (ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহের বৃত্তান্ত), ক্ল্যার্জে; প্যারিস; কোলাঁ্যা কোং; ১৯২৫, ১০ ফ্রাঁ।

"লেৎসিঅনি দি পলিতিকা একনমিক,—পার্তে প্রিমা, পলিতিকা কমার্চিয়ালে" (ধনবিজ্ঞান, প্রথম ভাগ,—বাণিজ্যনীতি); গারিণ কানিনা; পাদহ্বা; লা লিতভিপা কোং; ১৯২৬, ৩৪ লিয়ার।

"ৎস্থর গেশিষ্টে ডার আর্বাইটার বেহ্বেগুঙ ইন শ্বোয়েডেন" (সুইডেনে মজুর-আন্দোলনের ইতিহাস); হেবেরলে; য়েনা; ফিশার কোং; ১৯২৫, ৬ মার্ক।

"দি অয়েল ইণ্ডাষ্ট্রী অ্যাণ্ড দি কম্পিটিটিহ্ব সিষ্টেম" (তেলের কারবার ও প্রতিযোগিতার রাজ্য); ষ্টকিং; বষ্টন; হটন মিফলিন কোং; ১৯২৫, ১০+৩২৩ পৃষ্ঠা; ৩.৫০ ডলার।

"ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার অ্যাণ্ড ন্যাশন্যাল প্রোগ্রেস" (বিজলী-শক্তি ও দেশোন্নতি); কুইগলি; লণ্ডন; অ্যালেন অ্যাণ্ড আন্‌ুইন কোং; ১৯২৫; ১৬০ পৃষ্ঠা; ৮ শি ৬ পে।

"ওয়ার্লড্-ডেহ্বেলপমেণ্ট্‌স্ ইন দি কটন্ ইণ্ডাষ্ট্রি" (তুলার কারবার,—দুনিয়ার খবর); বাডার; নিউ ইয়র্ক; নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস; ১৯২৫, ১৭+১৮৭ পৃষ্ঠা; ৩ ডলার।

"ল' মনপল দেজ আলুমেৎ অাঁ ফ্রাঁস অাঁ ১৯২৪" (ফ্রান্সে দিয়াশলাইয়ের সরকারী একচেটিয়া এক্তিয়ার,—১৯২৪ সনের বৃত্তান্ত); পিদোল; দিজ; বার্ণিগো কোং; ১৯২৪; ১৬৩ পৃষ্ঠা।

"ডী ষ্টয়ার-লাষ্ট্ ইন্ ড্যয়েচলাণ্ড" (জার্ম্মাণিতে খাজনার ভার); মেরিং; য়েনা, ফিশার কোং; ১৯২৬, ৫৩+৪ পৃষ্ঠা; ২.৮০ মার্ক।

"ড্যর ক্রেডিট ইম্ ইণ্টার্ণ্যাশনালেন হাণ্ডেল" (আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কর্জ্জ লওয়া-দেওয়া); শেক্সমান; মস্কো; রুশিয়ার সরকারী রাজস্ববিভাগ হইতে প্রকাশিত; ১৯২৫; ১৫৮ পৃষ্ঠা; ১.২০ মার্ক।

"সোশ্যাল ইন্‌শিওর‍্যান্স ইউনিফাইড" (জীবন বীমায় শৃঙ্খলা ও ঐক্যবন্ধন; কোহেন; লণ্ডন; কিং কোং; ১৯২৪; ৫ শি।

"লা পলিতিকা আগ্রারিয়া ইন ইতালিয়া এ ই রেচেন্তি প্রভেদিমেন্তি লেজিস্‌লাতিহ্বি" (ইতালির ভূমি-সমস্যা ও ভূমি-বিষয়ক আইন-ব্যবস্থা); সাপিয়েরি; প্যাচেন্‌ৎসা হইতে "ফেদেরাৎসিঅনে ইতালিয়ানা দেই কনসৎসি আগ্রারি" নামক ভূমি-সমিতির ইতালিয়ান মহাসভা-কর্তৃক প্রকাশিত; ১৯২৫; ২০ লিয়ার।

"লে ফিনাঁস্ প্যিব্‌লিক দ' লা ফ্রাঁস এ লে ফর্ত্তুন প্রিহ্বে" (ফ্রান্সের সরকারী আয়ব্যয় এবং ফরাসী নরনারীর ব্যক্তিগত ধনদৌলত); জার্মাঁ-মার্ত্তাঁ; প্যারিস; পেয়ো কোং; ১৯২৪; ৪৩৬ পৃষ্ঠা।

"দি ইণ্ট্রোডাকশ্যন অব অ্যাডাম স্মিথস্ ডক্‌ট্রিন্‌স্ ইনটু জার্ম্মাণি" (জার্ম্মাণিতে অ্যাডাম স্মিথের মত-প্রবর্ত্তন); হাসেক; নিউ ইয়র্ক; কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়; ১৯২৫; ১৫৫ পৃষ্ঠা।

মার্কিণ ধনকুবের রকাফেলার

আমেরিকা আজব দেশ। যা-কিছু বৃহৎ, যা-কিছু অত্যাশ্চর্য্য, তাই নিয়ে আমেরিকার কারবার। সব দিকে পয়লা নম্বর থাকা চাই। আরব্যোপন্যাসের বাস্তব দেশ এই আমেরিকা আজ পৃথিবীর সেরা ধনী। সমগ্র ইয়োরোপ তার কাছে ঋণী। যুদ্ধে দেউলে ইয়োরোপের বড় মহাজন আমেরিকা। আমেরিকায় এমন এক এক জন ধনকুবের রয়েছেন, যাঁরা ইয়োরোপের এক একটা গোটা রাজ্য কিনে ফেলবার ক্ষমতা রাখেন। কার্ণেগী, রকাফেলার, অ্যাণ্ড্রুজ, ফোর্ড প্রত্যেককে এই শ্রেণীতে ধরা যেতে পারে। বিলাতে প্রকাশিত সেপ্টেম্বরের "গ্রেট থটস্" মাসিকে দেখা যায়—ঢুনিয়ার ধন-সম্রাট রকাফেলার তাঁর বাৎসরিক আয় দিয়ে গ্রীসের মত একটা গোটা সাম্রাজ্য পরিচালনা করতে পারেন .এবং এ করতে তাঁর বিপুল অর্থ ব্যয় হয়ে যা থাকবে, তা দিয়েই যে-কোন ধনকুবেরের ধনের গর্ব্ব তাঁর ধনৈশ্বর্য্য ও জাঁকজমক-পূর্ণ জীবন-যাত্রা-প্রণালী দ্বারা নিষ্প্রভ করে দিতে পারেন।

রকাফেলারের ঐশ্বর্য্যের দৌড় কতদূর তার একটা আন্দাজ করতে হলে এইগুলি বুঝতে হবে। পাড়াগাঁয়ে সম্পত্তি কেনার মত সহজে তিনি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড যুদ্ধ—জাহাজগুলি খরিদ করতে পারেন। বিশ হাজার লোকের একটা সহরকে বার মাস সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে, এমন কি সাধারণ বিলাসিতার মধ্যে, প্রতিপালন করতে পারেন। এ করতে দিনের মধ্যে মাত্র একবার যে অর্থ তাঁর হাতে আসে, তাও খরচ হয় না। হাজার জোয়ান তাঁর অর্থের পরিমাণ সোনার ভার বয়ে নিতে পারে না।

জগতের সেরা ধনী, ধনসম্রাট জন ডেভিডসন রকাফেলারের তুলনায় প্রবাদের ক্রীসাসও পথের ফকির। ষষ্ঠ শতাব্দীর লিডিয়া-অধিপতি ক্রীসাস পারস্য সম্রাট্ প্রবল প্রতাপান্বিত সাইরাসের বিরুদ্ধে অভিযান-কল্পে প্রভূতপরিমাণ সোনা গলিয়ে তাহা দ্বারা ১১৭টি মস্ত মস্ত সোনার ইট তৈরী করান (প্রত্যেকটিতে দুই ট্যালেন্ট সোনা ছিল অর্থাৎ বর্ত্তমান পাঁচ শত পাউণ্ডের সমান) এবং দশ ট্যালেন্ট সোনা দিয়ে একটা সিংহ প্রস্তুত করান। ইহা ছাড়া সোনার প্রভূত আসবাব-পত্র ও তিন হাত লম্বা একটি সোনার নারী-মূর্ত্তি এবং তাহার সহিত ক্রীসাস-মহিষীর বহুমূল্য অলঙ্কারসমূহ ডেলফির দেবতার নিকট অর্ঘস্বরূপ প্রেরণ করে' যুদ্ধজয়ের আশীষ কামনা করেন। ক্রীসাসের এই যাবতীয় ধনৈশ্বর্য্যও রকাফেলারের ঐশ্বর্য্যের কাছে কল্কে পায় না।

রকাফেলারের জীবনকাহিনী-অবলম্বনে মস্ত বড় রোমান্স লেখা চলে। প্রথমে কেউ তা বিশ্বাস করতে চাইবে না। ৭০ বছর আগে যে সামান্য চাষার ছেলের রোজগার ছিল ঘণ্টায় এক আনা মাত্র, তিনিই আজ ১৫০ কোটি ডলারের (১ ডলারে ১ টাকা) অধিপতি!

আমেরিকার বড় বড় ধনকুবেরদের প্রত্যেকের ধনার্জ্জন-ব্যাপারে হাতে খড়ি হয় কারখানার নিম্নতম ভৃত্য রূপে। মহামতি কার্ণেগী, হেনরী ফোর্ড সকলের জীবনই অতি দরিদ্র ভাবে আরম্ভ হয়। ফোর্ড মোটর কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট তাঁর জীবন আরম্ভ করেন সামান্য এক কারখানার কারিগর রূপে। তিনি দিনে দশ ঘণ্টা খেটে সপ্তাহে মাত্র ২৷৷ ডলার রোজগার করতেন এবং রাত্রে ৪ ঘণ্টা খেটে আর দুই ডলার পেতেন।

রকাফেলার তাঁর যে-কোনো বছরের রোজগার দিয়ে ত্রিশ জন ধনকুবের জন্মাতে পারেন। এটা ঠিক সিন্ধুবাদ নাবিকের গল্পের মত শোনাচ্ছে, কিন্তু অক্ষরে অক্ষরে সত্য। রকাফেলারের এই অত্যাশ্চর্য্য ধনের কথা শুনে আমরা গরিব ভারতবাসী খুব বিস্মিত হতে পারি, কিন্তু সোনার পাহাড়ের দেশ আমেরিকা বিস্মিত হওয়া দূরের কথা এদিকে ভ্রূক্ষেপও করে না। সেখানে যার যার তালে সে খাটছে; অন্যের দিকে তাকাবার অবসর তাদের নাই। অমন ছোট খাট রকাফেলার আমেরিকায় ঢের রয়েছে।

রকাফেলার নিজেই নাকি তাঁর প্রভূত ধনের খবর রাখেন না। তাঁর হাতে তাঁর দিনকার রোজগার বাবদ পনর ডলার করে' যদি এক একটা বিল তৈরী করে' দেওয়া হয়, তা হলে তাঁকে দিনে আট ঘণ্টা করে ঘণ্টায় হাজার বিল গ্রহণ করতে হয়—মিনিটে হল ১৬টি। অর্থাৎ তাঁর দৈনিক আয় ১,২০,০০০ ডলার বা টাকা। খুব সকালে বাড়ী থেকে বেড়িয়ে দুই দশ মাইল জনবহুল আমেরিকার সড়কে চক্কর দিয়ে পথে স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকা যার সাথেই দেখা হোক না কেন, প্রত্যেককে যদি মুঠা মুঠা ডলার দেন, তাহলেও তাঁর দিনকার রোজগারের বিশ ভাগের এক ভাগ ফুরোবে না। হিসাব করে দেখুন ইঁহার ঐশ্বর্য্যের সীমা কোথায়। মাথায় আসে না—চিন্তার অতীত!

৮৬ বছর কেটে গেছে এই চাষীর ছেলে, এই স্বর্ণ-যাদুকর, ওয়াছা হ্রদের তীরে এক পর্ণ কুটীরে তাঁর "দিন ভিক্ষা তনুরক্ষা" গোছের বাপের ঘরে দুঃখ বাড়াবার জন্য জন্মগ্রহণ করেন। কৃষক পিতা তাঁর অনুর্ব্বর জমি থেকে তাঁর স্ত্রীর ও ৬টি সন্তানের উদরান্নের ব্যবস্থা করে উঠতে পারতেন না। তাই নিউ ইয়র্ক ষ্টেটের ওয়েগো প্রদেশে তিনি উঠে যান। এখানেও কিন্তু অবস্থার কোনই পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। কৃষকের সৌভাগ্যক্রমে তাঁর বড় তিন ছেলে জন, উইলিয়ম ও ফ্রাঙ্ক বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশীদের ফার্ম্মের মাঠে কাজ করে প্রত্যেক দিন এক শিলিং করে আনতে লাগলেন। যুবক জন কিন্তু কিছুতেই এই সামান্য একটা ফার্ম্মের রোজগারে সন্তুষ্ট থাকতে পারছিলেন না। তিনি এত অল্পে জীবন ধারণ করতে চান না। তিনি ছিলেন ভারি দুরাকাঙ্ক্ষী ডানপিটে ছেলে। বাইরের বৃহত্তর জগৎ দেখবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁকে পেয়ে বসেছিল। তিনি চান নতুন নতুন জিনিষের সন্ধান—অর্থাগমের নয়া নয়া পথ আবিষ্কার করতে। তাঁর মগজে অদ্ভুত অদ্ভুত খেয়াল জমা হচ্ছিল। তখন তাঁর বয়স ষোল বছর। একদিন এই ডানপিটে ছেলেটি তাঁর ফার্ম্মের লাঙ্গল প্রভৃতিকে প্রণাম করে ক্লীভল্যাণ্ড সহরের দিকে অভিযান করলেন। একমাত্র দুর্জ্জয় আকাঙ্ক্ষা ছিল তার অজানা পথের সম্বল। ক্লীভল্যাণ্ড সহরে এসে তিনি এক আফিসে বয়ের কাজ পেলেন। রকাফেলার নিজে বলেছেন, "আমি এইদিনগুলি জীবনে ভুলব না। ক্লীভল্যাণ্ডে আফিসবয় হয়ে আমার জীবন আরম্ভ। সেখানে ব্যবসা সংক্রান্ত অনেক বিষয় শিখবার ও পর্য্যবেক্ষণ করবার সুযোগ সুবিধা আমার ঘটে। কিন্তু এই সহরে আমার সব চাইতে বড় উপকার হয়েছিল এই যে, দুনিয়াটা যে বিরাট এই সত্যটা বুঝবার সূক্ষ্ম দৃষ্টি আমার খুলে গিয়েছিল। আমার মনে তখন উচ্চাকাঙ্ক্ষা। তখন থেকে আমি হাড়ে হাড়ে বুঝতাম, যদি দুনিয়ায় আমার কিছু করতে হয়, যদি মানুষের মত মানুষ হতে হয় তাহলে আমাকে সে জন্য হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটতে হবে।" তাঁর এই হাড়ভাঙ্গা খাটুনির যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে তাঁর তখনকার ও পরবর্ত্তী জীবন-প্রণালীতে।

আফিসে কাজ করবার সময় সবটুকু অবসরকাল তিনি তাঁর কাজে লাগাতেন। পাড়াগাঁয়ে যে যৎকিঞ্চিৎ বিদ্যা তাঁর পেটে পড়েছিল, তিনি সেইটার চর্চ্চা করতে থাকেন। এমনি করে দিন দিন তাঁর জ্ঞানবৃদ্ধি হতে থাকে। আফিসে বেশী দিন তাঁকে গোলামী করতে হয় নাই। তাঁর আফিসের ব্যবসা-বাণিজ্যের বহর দেখে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন—আমি ছোট থাকতে চাই না। আমি এ সামান্য জীবনে সন্তুষ্ট হব না। তিনি টাকা রোজগারের নতুন নতুন পথের সন্ধানে থাকলেন। এমনি করে বেশীদিন তাঁকে ঢুঁড়তে হয় নাই। তিনি ছোট খাট ধরণে টাকা খাটাবার একটা সুবিধা পেলেন। আফিসে কাজ করে তাঁর হাতে কিছু ডলার জমেছিল। একদিন তিনি দেখলেন পিপায় বেড় দিবার কতকগুলি লোহার তাড় (হুপ পোলস) সস্তায় বিকাচ্ছে। তিনি কয়েক ডলার দিয়ে সেগুলি সব কিনে ফেল্লেন এবং নিজে ঘাড়ে করে বয়ে ওহিও নদীর পাড়ে এক মিলারের কাছে নিয়ে হাজির করলেন। মিলার সেগুলি তৎক্ষণাৎ কিনে নিল। রকাফেলারের লাভ হল একশ' ডলার। এই তাঁর বিপুল ধন-ভাণ্ডারের প্রথম বনিয়াদ। এইভাবে একটার পর আর একটা চল্‌ল। এমনি করে অল্পদিনের মধ্যে তিনি অনেক টাকার মালিক হয়ে বসলেন। এইবার হিউয়েট নামক এক

বন্ধুর সঙ্গে যোগ দিয়ে ক্লীভল্যাণ্ডের এক পুরাতন দালানে তিনি একটা ছোট খাট গুদাম ঠিক করলেন ও মাল তৈয়ারীর কারবার খুলে দিলেন।

খুব সকাল থেকে অনেক রাত পর্য্যন্ত তিনি তাঁর নূতন কারখানায় অমানুষিক পরিশ্রম করতে লাগলেন। কোনো কাজেই তাঁর এতটুকু বিরক্তি ছিল না। প্রত্যেকটা কাজ তিনি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে করে যেতেন।

একদিন এক বন্ধু এসে দেখলেন রকাফেলার কলাই বাছাই করছেন। তিনি বন্ধুকে বল্লেন, "এই যে গাদি দেওয়া কলাই দেখছ এগুলি নিজ হাতে বাছাই করে রেখেছি। এগুলি কিছু সস্তায় পেয়েছিলাম, কারণ এর ভিতর কাল কলাই ছিল। আমি আমার অবসর সময়ে বসে বসে এগুলি বাছাই করেছি। এখন যা মাল দাঁড়িয়েছে সেটা হচ্ছে পয়লা নম্বরের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদ। এই মাল বেচবও এখন বেশী দামে।" একদিনে রকাফেলার কোটীপতি হয়ে বসেন নি। এই কোটীপতির পিছনে ছিল তাঁর অদম্য সাধনা ও বড় হবার সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা কার্য্যে পরিণত করবার বিপুল উদ্যম। প্রথমে সামান্য কলাই বাছাই করে, সামান্য ক'গাছা লোহার তার রাস্তা থেকে কিনে নিয়ে তা বেশী দামে বেচে যিনি আজ জগতের সেরা ধনকুবের হয়েছেন, তাঁর কতটা মনের বল ছিল, কি দুর্জ্জয় সাধনা ছিল তা ভেবে দেখলে বিস্মিত হতে হয়। সাধনা ছাড়া সিদ্ধি নাই একথা রকাফেলার ছেলেবেলা থেকে বুঝেছিলেন।

৫ বৎসর পরে যখন তাঁর হাতে দশ হাজার ডলার জমা হল তখন তাঁর মনে হল, এর চাইতে বড় আকারে ব্যবসা খুলতে হবে। তিনি এখন আরও সাহসিকতার কাজে হাত দিতে অগ্রসর হলেন। তিনি তাঁর বহুপরিশ্রমলব্ধ ধন কোন্ দিকে খাটাবেন সে সম্বন্ধে তাঁর বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছিল না। তখন তেলের ব্যবসার ভয়ানক দুঃসময়, অনেক রিফাইনারিজ বা তেল-পরিষ্কারের ফার্ম্ম ফেল মেরেছে। সমস্ত ব্যবসা বিশৃঙ্খল। মূলধন নাই, আর লোকের সে ব্যবসার প্রতি তেমন আস্থাও নাই। রকাফেলার এই দিকে তাঁর টাকা খাটাবার মতলব আঁটলেন। এটা বড় কম দুঃসাহস নয়। যে ব্যবসাটা অধঃপাতে যেতে বসেছে, যেটা আর সবাই ছেড়ে দিয়েছে, সেইটাকে আঁকড়ে ধরে তাতে টাকা খাটাবার ইচ্ছা যে-সে লোকের হতে পারে না। রকাফেলার ভারি চতুর লোক। তিনি দেখলেন এই ব্যবসাকে যদি সঞ্জীবিত করে তোলা যায়, তা হলে লাভ অবশ্যম্ভাবী। অভাবনীয় লাভের সন্ধান তিনি এখানে পেয়েছিলেন। তিনি তাঁর তীক্ষ্ণবুদ্ধি দ্বারা বুঝতে পারলেন কিসে ব্যবসার অধঃপতন হয়েছে। খাদের তেল থেকে এই তথাকথিত রিফাইনারির পরিষ্কৃত তেলের বড় বেশী পার্থক্য ছিল না। বাজারে এমন তেলের চলন হয়েছিল যা কেবল কোনই কাজে আসত না তা নয়, পরন্তু খুব বিপজ্জনকও ছিল। এরূপ অবস্থায় তেলের কারবার থেকে টাকা রোজগার করতে হলে তেল পরিষ্কারের দিকে বেশী নজর দিতে হয়। তেলের পদ ভাল করতে হবে। তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য এই দিকে নিয়োগ করলেন। তিনি সেকেলে পদ্ধতির চাইতে এক নতুন ধরণের তেল পরিষ্কারের উন্নত পন্থা আবিষ্কার করলেন এবং ইহা হতে দাহ্য গ্যাস বাদ দিবার চেষ্টায় থাকলেন। দাহ্য গ্যাস থাকা বিপজ্জনক বলে এই তেলের ব্যবহার একরূপ লোপ পেতে বসেছিল।

এই নতুন পদ্ধতি অবলম্বনে অ্যাণ্ড্রু বলে তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে যোগে একটা ছোট ধরণের অয়েল রিফাইনারি খুললেন। এই প্রচেষ্টার যা উন্নতি হতে লাগল তা তাঁর কল্পনারও অতীত ছিল। এই নতুন তেলের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল। প্রত্যেক জায়গা থেকে এর অর্ডার আসতে লাগল। কারবার দিনরাত চালিয়েও তাঁরা এই অসম্ভব রকম চাহিদার জোগান দিতে পারছিলেন না। আর একটা রিফাইনারি খোলা হল, তার পর তৃতীয়, তারপর চতুর্থ, এমনি করে কারবার বেড়ে চল্ল। অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁদের কারখানাগুলি দিনে দুই হাজার তেলের পিপা তৈরী করতে লাগল। কিন্তু এত করেও চাহিদা মিটান যাচ্ছিল না। এইরূপে ক্রমে একদিন তিনি দেখতে পেলেন, তিনি পেট্রোলিয়ামের রাজা হয়ে বসেছেন। ১৮৭০ সনের কাছাকাছি ব্যবসা এরূপ সচ্ছল অবস্থায় দাঁড়াল যে, ইহাকে অতঃপর ১০ লক্ষ ডলার মূলধনে একটা কোম্পানীতে পরিণত করতে হল। ইহাই

জগদ্বিখ্যাত "ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানী"। ইহার প্রেসিডেন্ট হলেন জন ডেভিডসন রকাফেলার। তাঁর ভাই উইলিয়ামও একজন কোটিপতি হওয়ার নছিব নিয়ে এসেছিলেন। তিনি হলেন তাঁর সহকর্মী ডেপুটি। ৩১ বৎসর বয়ঃক্রম কালেই রকাফেলার তাঁর ছেলে বেলার উচ্চাকাঙ্ক্ষার চরম সার্থকতা দেখতে পেলেন।

এই জগদ্বিখ্যাত "ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানী" দুনিয়ায় সর্ব্বপ্রথম বৃহদাকার একচেটে ব্যবসা। এত বড় রকম ব্যবসা আর কোন দিন কেউ খোলে নাই। বর্ত্তমানে ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীতে ২৫ হাজার লোক খাটে, আর এদের মাইনে বাবদ ৪০ লক্ষ পাউণ্ডের উপর দিতে হয়। বিশ হাজার মাইল অয়েল পাইপ এই কারবারে ব্যবহার করা হয়। তা ছাড়া দুশ' ষ্টিমার ও ৪০টি তেলের পুষ্করিণী আছে। ৪০ লক্ষের বেশী তেলের পাইপ ও ৪০ কোটী তেলের কড়াই বা ক্যান ব্যবহার করতে হয়। তা ছাড়া মাল আনা-নেওয়া করবার জন্তে ৭ হাজার ডেলিভারি ওয়াগন আছে।

বর্ত্তমানে এই কোম্পানীটি বৎসরে লভ্যাংশ বাবদ অংশীদার বা সেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে ১৬০ লক্ষ পাউণ্ড বিতরণ করে। যে এক পাউণ্ডের অংশ খরিদ করেছিল, সে আজ ৮০ পাউণ্ডে করে পাচ্ছে। এই কোম্পানীতে রকাফেলারের নিজের আছে তিন কোটী পাউণ্ড মূলধন। তিন কোটী পাউণ্ড হল ৪০ কোটি টাকার উপর। তিলক স্বরাজ্য ফাণ্ডের এক কোটী টাকা তুলতে মহাত্মা গান্ধিকে আসমুদ্র হিমাচল ছুটোছুটি করতে হয়েছিল। তারই চল্লিশ গুণ একটা তেলের কোম্পানীতে খাটছে আমেরিকার একজন ধনকুবেরের মূলধন। দেশটা কোথায় আছে একবার ভাবুন। রকাফেলারের নিজের মূলধন এই কোম্পানীতে খাটছে ৩ কোটি পাউণ্ড, তাঁর ভাই উইলিয়ামের ২ কোটী পাউণ্ড এবং মিঃ ফ্লাগলারের ১ কোটী পাউণ্ড। এত বড় সচ্ছল কোম্পানীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠা যে-সে লোকের কর্ম্ম নয়। যারাই এর সঙ্গে যুদ্ধ করতে কোমর বাঁধলেন প্রত্যেককে একে একে ঐ বাতুলের প্রচেষ্টা হতে বিরত হতে হল। আর যারা নিজেদের মূলধন ও কারখানা ঐ কোম্পানীর সাথে যোগ করে দিলেন তারাই বেশী বুদ্ধিমানের কাজ করলেন। অল্পদিনের মধ্যেই সকল প্রতিযোগিতার অবসান হল।

সামান্য চাষার ছেলে রকাফেলার এখন নিজের টাকশালে টাকা পয়দা করেন। এমন ভাবে টাকা জন্মান যে, কেউ কোনো দিন তা কল্পনা করতে পারে নাই। রকাফেলার এখন কেবল মাত্র ডলারের কোটীপতি নন, তিনি এখন পাউণ্ড ষ্টার্লিঙের কোটীপতি। প্রত্যেক বছরে অসম্ভব রকমে তাঁর ধন-বৃদ্ধি হতে লাগল। কিন্তু এখনও তিনি তাঁর স্বর্ণ হিমালয় সৃষ্টিবিষয়ে সন্তুষ্ট হতে পারছিলেন না। সোনার পাহাড় আরও বাড়াতে হবে, দুনিয়ার ধনকুবের-দলের মিথ্যা অহঙ্কার চূর্ণ করতে হবে, এই হল তাঁর মতলব। তিনি নয়া জগতের সন্ধানে বেড়িয়ে পড়লেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করবার সুযোগ ঘটল। এইবার তিনি খনি, গ্যাস ও রেল রাস্তার মালপত্রে এবং রেলের যন্ত্রপাতিতে টাকা ঢালতে লাগলেন। ফলে অসম্ভবরকম ধনবৃদ্ধি হতে লাগল। তাঁর এই সময়ের এক দিনের রোজগারে যে কেউ মস্ত বড় ধনকুবের হয়ে যেতে পারত।

নীচের অঙ্ক থেকে বুঝতে পারা যাবে কিরূপ আশ্চর্য্য ভাবে তাঁরার অর্থ বেড়ে চলেছে। এ তালিকা কেউ সহজে বিশ্বাস করতে চাইবে না। কিন্তু এটা অকাট্য সত্য—হাতে কলমে হিসাব করা অঙ্ক।

তিনি যখন ক্লীভল্যাণ্ড সহরে কলাই বাছাই করছিলেন তখন তাঁর পুঁজি ছিল এক হাজার পাউণ্ড। ১০ বৎসর পরে ঐ মূলধন ২ লক্ষ পাউণ্ডে দাঁড়ায়। ৩০ বৎসর বয়সে তিনি ডলারের মিলিঅনেয়ার। ১৮৮৫ সনে তাঁর ধনসম্পদ ১ কোটী পাউণ্ডে দাঁড়ায়। ১৮৯০ পর্য্যন্ত ঐ ঐশ্বর্য্য বৎসরে ১০ লক্ষ করে বৃদ্ধি পেয়ে পাঁচ বৎসরে ২ কোটি পাউণ্ডে পৌঁছে। এবং ১৮৯৯ সনে ইহা একেবারে ৬ কোটী পাউণ্ড হয়। ঐ ৬ কোটী পাউণ্ডের সোনার ভার৹ ৫ হাজার বলশালী জোয়ান কষ্টে বহন করতে সমর্থ। বর্ত্তমানে হিসাব করে দেখা গেছে যে রকাফেলারের ধনদৌলত কম সে কম দশ কোটী পাউণ্ড। তা হলে দেখা যায় ক্লীভল্যাণ্ডের গুদাম ঘর থেকে আজ

পর্য্যন্ত রকাফেলারের বাৎসরিক আয় প্রায় ২০ লক্ষ পাউণ্ড।

একমাত্র ১৯০০ সনেই তিনি তিন কোটী পাউণ্ড আয় করিয়াছিলেন। এর উপর ষ্টাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানী (যাতে তাঁর ৪০০ শেয়ার) ঐ বৎসর তাঁকে ২ কোটী ৪৮ লক্ষ পাউণ্ড লভ্যাংশ দেয়। যাঁর ধন এরূপ অসম্ভব রকমে দিনে দিনে বৃদ্ধি পায় তাঁর পক্ষে নিজের ধনদৌলতের খাঁটি খবর না জানাই সম্ভব। এই বিশাল ধন-সম্পদের মালিক বিরাট রকাফেলার তাঁর জীবনে দুইটি ইচ্ছার সফলতা দেখতে পেরেছেন। তাঁর দুইটী সব চাইতে বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল দীর্ঘজীবী হওয়া এবং ধনী হওয়া। তাঁর শেষ বয়সে তাঁকে যিনি সব চাইতে ভাল করে জানেন তিনি যে চিত্র এঁকেছেন সেটা বড় চিত্তাকর্ষক নয়।

তিনি লিখেছেন—

রকাফেলার একজন বিরাট পুরুষ। তাঁর এক সময়কার বিশাল বাহুযুগল ও বৃষতুল্য স্কন্ধের পরিচয় এখনও কতকটা পাওয়া যায়। আজ বৃদ্ধ বয়সে জরা ব্যাধি তাঁর সকল শক্তি হরণ করে নিয়েছে, তাঁর কেশশূন্য বিরাট মস্তকে আর সে মস্তিষ্ক নাই, চক্ষুর জ্যোতিঃ ম্লান হয়ে এসেছে। তিনি আজ স্থবির, মরণ পথের যাত্রী। তাঁর চোখে মুখে একদিন যে সৌন্দর্য্য প্রকাশ পেয়েছিল আজ তা ম্লান হয়ে গেছে। মুখের ও শরীরের চামড়া শিথিল হয়ে গেছে। তাঁর মুখশ্রী দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়, এ ব্যক্তি অনেক সাধনার পরে আজ জয়ী হয়েছেন—জীবনে জয়ের আনন্দ উল্লাস ও দারুণ পরিশ্রমের ক্লেশ দুইই তাঁর চেহারা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। তাঁর মাথাটী এমনি বিস্ময়কর যে, যে-কেহ একবার সেটি দেখেছে সে আর জীবনে তা ভুলবে না।

সারা আমেরিকায় জন ডি, রকাফেলারের মত এমন আর একটি ধনকুবের নাই যাঁর ধনদৌলত সম্পূর্ণভাবে লোক-চক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত আছে। তিনি কখনো ক্লাবে বা প্রীতিভোজে যোগদান করেন না। মস্ত মস্ত প্রাসাদের মালিক এবং অদ্বিতীয় ধনসম্পদের অধিকারী হয়েও তিনি তাঁর একজন সামান্য কর্ম্মচারীর মত সাদাসিধে ভাবে জীবন যাপন করেন। অতি প্রত্যুষে তিনি শয্যাত্যাগ করেন। সারাদিন কঠিন পরিশ্রম করা তাঁর অভ্যাস।

এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী ধনকুবেরের প্রধান খাদ্য সামান্য কয়েক টুকরা রুটি ও দুধ। খেলাধুলার দিকে তাঁর বিশেষ আগ্রহ নাই; তবে সামান্য একটু গল্‌ফ খেলতে তিনি ভালবাসেন। মাঝে মাঝে তাঁর প্রিয় বাদ্যযন্ত্র ভায়ওলিন বাজাতে তিনি খুব ভালবাসেন।

এই বিপুল ধনসম্পদ্ রোজগার করাতেই মাত্র তিনি আনন্দ পেয়েছেন, তা ছাড়া তাঁর পার্থিব জীবনের আনন্দ-বৃদ্ধির জন্য কোন কাজেই ইহা লাগে না। তিনি বলেন, "আমার এই বিপুল স্বর্ণের বোঝা আমার জীবনের সকল আনন্দ আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে। আমার চাইতে একটা মানুষ বৎসরে ৩০০ পাউণ্ডে বেশী সুখী হতে পারে। কারণ আমার মত তার এত ধনের ভাবনা-চিন্তার বালাই থাকে না। নিউ ইয়র্কের এক বাইবেল ক্লাশে বক্তৃতা প্রদান কালে রকাফেলার বলেছিলেন, "ধনৈশ্বর্য্য নিজে মানুষকে সত্যকার কোন সুখ দিতে পারে না। কিন্তু আমার মতে ইহা অন্বেষণ করা খারাপ নয়। ধনসম্পদ্ ভাল কাজ করবার এক অতি-বড় হাতিয়ার। যদিও দুনিয়ায় বদ ধনী ঢের আছে, যেমন বদ গরিব লোকও আছে, তবু আমি এটা বিশ্বাস করি যে, অধিকাংশ ধনীরা মনে করেন তাঁহাদের প্রতিবেশীদের দুঃখ-দারিদ্র্য মোচনের জন্যই তাঁহারা এত ধনসম্পদের অধিকারী হয়েছেন এবং তাঁহারা ইহার জিম্মাদার মাত্র।"

বাস্তবিক পক্ষে এই ধনকুবেরের জীবনের একমাত্র আনন্দ হচ্ছে তাঁর অফুরন্ত ধনভাণ্ডার জগতের মহান্ অনুষ্ঠানে ব্যয়িত করা। তাঁর দান-খয়রাতের পরিমাণ অনেক দিন হল ৫ কোটী পাউণ্ড ছাড়িয়ে গেছে। তিনি আমেরিকার জেনারেল এডুকেশন বোর্ডের হাতে দিয়েছেন ৮৬লক্ষ পাউণ্ড এবং রাশ মেডিক্যাল্ কলেজে তাঁর দান ১২ লক্ষ পাউণ্ড। এতো তাঁর বিপুল দান-খয়রাতের সামান্য উদাহরণ। কেবল আমেরিকা নয়, সমগ্র জগতে শিক্ষার জন্য ও মানব-সমাজের কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানসমূহে তাঁর দানের পরিমাণ যথেষ্ট। এই সেদিন ভারতবর্ষের ৪ জন যুবকের

আমেরিকায় চিকিৎসাশাস্ত্রের গবেষণা করবার জন্য রকাফেলার বোর্ড থেকে আমান্ত্রণ এসেছিল। যুদ্ধে বিধ্বস্ত বেলজিয়ামের নরনারী রকাফেলারের দানের কথা জীবনে ভুলবে না।

এই ক্ষণজন্মা পুরুষ ধীরে ধীরে মৃত্যুপথে অগ্রসর হচ্ছেন। জগতে তাঁর কীর্তিরক্ষার্থে তিনি এক বিপুল স্বর্ণমিনার স্থাপন করে গেলেন, যা তাঁর পূর্ব্বে আর কেউ করতে পারে নাই। তাঁর ধন তিনি লোক-সেবায়, ব্যথিত-পীড়িত মানব-সমাজের কল্যাণের জন্য নিয়োগ করেছেন। ৮৬ বৎসরের এই বৃদ্ধ আজ তাঁর বিপুল ঐশ্বর্য্য অন্তঃসার-শূন্য মনে করেন।

জাপানে শ্রমিক আন্দোলন

তাহেরুদ্দিন আহ্‌মদ

জাপানের ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে 'রোদো সোদমি' (জেনারেল ফেডারেশন অব লেবার) বা সাধারণ শ্রমিক সঙ্ঘটিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিপত্তিশালী। ইহার সভ্য-সংখ্যাও খুব বেশী। প্রথমে এই প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে নরম ও গরম দুই শ্রেণীর লোক ছিল। এক দলের মতে ধনিক-কর্তৃক শ্রমিক নীতির সংস্কার ধীরে সুস্থিরে অগ্রসর হওয়া চাই। আর একদল ঘোর প্রজাতন্ত্রবাদী। ইহারা এখনই মজুরের প্রতি মালিকের অমানুষিক ব্যবহারের আমূল পরিবর্ত্তন চান। সঙ্ঘটি নিজেদের তাঁবে আনিবার প্রচেষ্টা উভয় দলেই সমানভাবে চলিতে থাকে। বিগত মহাযুদ্ধের ফলে জগতে চারিদিকে যে বিপ্লবের ঝড় উঠিয়াছে, তাহার ধাক্কা জাপানেও পৌঁছিয়াছে। ইহাতেই জাপানের শ্রমিকগণ যে অনেকটা প্রভাবিত হইয়াছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় জাপানের মজুর জনসাধারণের মধ্যে আমূল পরিবর্ত্তনের মনোভাব হইতে।

কতকগুলি প্রতিকূল অবস্থার জন্য জাপানের চরমপন্থীরা জেনারেল ফেডারেশন অব লেবার প্রতিষ্ঠানটি নিজেদের দখলে আনিতে সমর্থ হয় নাই। ইহার মধ্যে (১) বর্ত্তমানে রুশিয়ার সোভিয়েট গণতন্ত্র-কর্তৃক যুদ্ধ-কালীন প্রচণ্ড কম্যুনিজমের উগ্রতা-হ্রাস (২) বিলাতে লেবার পার্টির আন্দোলনের মন্দাভাব, (৩) শ্রমিকের বিরুদ্ধে ধনিকের পাল্টা অভিযানের সাফল্যলাভ, (৪) জাপানে ১৩২৩ সনের সর্ব্বগ্রাসী ভূমিকম্প, (৫)জাপান সরকার কর্তৃক প্রাপ্তবয়স্ক লোককে ভোটাধিকার অর্পণ প্রভৃতি কারণগুলি উল্লেখযোগ্য। ১৯২৫ সনের মে মাসে সঙ্ঘের যে বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে তাহাতে সংস্কারপন্থীদের মত গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহার ফলে চরমপন্থীরা "রোদো সোদমি" হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া "হায়ো নিকাই" (ন্যাশনাল কাউন্সিল অব ট্রেড ইউনিয়ন) নামে একটা নয়া প্রতিষ্ঠান খাড়া করিয়াছেন। ইহাদ্বারা বুঝা যায়, জাপানের শ্রমিকগণ দুইটি পরস্পর বিরোধী ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে নাম লিখাইয়াছে।

সংস্কারপন্থী ও চরমপন্থী দলের সংঘর্ষের পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৯২৪ সনের জুন মাসে 'সিজ কেঙ্কু ফাই' (সোসাইটি ফর পলিটিক্যাল রিসার্চ) নামক রাজনৈতিক আখড়াটি কায়েম করা হয়। ইহার উদ্দেশ্য শ্রমিকদের মধ্যে রাজনৈতিক জ্ঞানবিস্তার করিয়া ভবিষ্যতে একটি জাতীয় প্রোলেটেরিয়ান দল স্থাপন-কার্য্যে সহায়তা করা। গোড়াতে শিক্ষিত সম্প্রদায় ও সমাজতন্ত্রবাদিগণের সামান্য কয়েকজন লইয়া ইহার ভিত্তি স্থাপন করা হয়। ক্রমে ইহার কার্য্যক্ষেত্র বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রজাতন্ত্রবাদীরা দলে দলে ইহাতে যোগ দিতে আরম্ভ করিলেন এবং কিছু কালের মধ্যেই নব প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল কাউন্সিল অব ট্রেড ইউনিয়নের চরমপন্থী সভ্যগণ ইহা দখল করিয়া বসিলেন।

প্রজাতন্ত্রবাদীরা 'সিজিকেঙ্কুকাই' অধিকার করিয়া বসায় ইহার অপেক্ষাকৃত নরমপন্থী সভ্যগণ বিগত ফেব্রুয়ারী মাসে 'দোকুর্ত্তিসু রোদো ফিউফাই' নাম দিয়া

একটি পৃথক শ্রমিক-সঙ্ঘ স্থাপন করেন। ইহাদের উদ্দেশ্য জাপানের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সামাজিক সংস্কার সাধন, মজুর-সাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক জ্ঞান-বিস্তার, এবং মধ্যবিত্ত ও অনুন্নত সম্প্রদায়কে সঙ্ঘবদ্ধ করা।

অন্যান্য শ্রমিক দলের সহযোগিতায় জাপানে একটী প্রোলেটেরিয়ট পার্টি সমিতি স্থাপনের জন্য 'নিহেনি নোসিন কুর্ণিয়াই' নামক জাপানের সর্ব্বপ্রধান রায়তসঙ্ঘ-কর্ত্তৃক ১৯২৫ সনের আগষ্ট মাসে এক প্রস্তাব স্থিরীকৃত হয়। এই কৃষক-সঙ্ঘ খুব প্রতিপত্তিশালী এবং ইহার অধীনে ১৩২৫ সনে ৫৩, ১৩০ জন কিষাণ সভ্য ছিল। ১৯২৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসে সর্ব্বপ্রথম ওসাকা সহরে প্রলেটেরিয়ট পার্টী গঠনের উদ্যোগ করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন শ্রমিক দল একমত হইরা কার্য্য করিতে অসমর্থ হওয়ায় ঐ বৈঠক ভাঙ্গিয়া যায়। অনেক চেষ্টা-চরিত্রের ফলে জাপান কৃষক-সঙ্ঘ পুনর্ব্বার বৈঠক আহ্বান করেন। কিন্তু এবার জেনারেল লেবার ফেডারেশন তাঁহাদের সভ্য প্রেরণে অসম্মতি জ্ঞাপন করায় দ্বিতীয়বারের প্রচেষ্টাও সাফল্য-মণ্ডিত হইতে পারে না।

যাহা হউক নানা বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া জাপানের কৃষক-সঙ্ঘ জাপান পেজ্যাণ্টস্ এণ্ড ওয়ার্কার্স পার্টি নাম দিয়া একটি কৃষক ও শ্রমিক সমিতি স্থাপনে কৃতকার্য্য হন। দুর্ভাগ্যক্রমে এই নূতন সঙ্ঘের উদ্বোধন অধিবেশনের তিন ঘণ্টা পরেই সরকার এই বৈঠক ভাঙ্গিয়া দিবার হুকুম জারি করেন। গভর্ণমেণ্ট নাকি এই নবগঠিত সম্মিলনীর ভবিষ্যৎ কার্য্য-প্রণালীর পুস্তিকায় কম্যুনিষ্ট মতবাদের গন্ধ পাইয়াছিলেন। জাপান সরকারের আপত্তির আরও কারণ এই যে, ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অব ট্রেড ইউনিয়ন ও পলিটিক্যাল রিসার্চ্চ সোসাইটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইহাতে যোগদান না করিলেও ঐ সকল কম্যুনিষ্ট মতাবলম্বী সঙ্ঘের সভ্যগণ ব্যক্তিগত ভাবে ইহাতে যোগদান করিয়াছেন। জাপান গভর্ণমেণ্টের এই কার্য্যের দ্বারা বুঝা যায়, কম্যুনিজম মতবাদের উপর তাঁহারা কিরূপ খড়্গহস্ত। সরকার সম্মিলনের কাজ এইরূপ নষ্ট করিয়া দেওয়াতেও জাপানের কিষাণ ও শ্রমিকরা বসিয়া যায় নাই। তাহারা বিগত মার্চ্চ মাসে ওসাকা সহরে "রোদো নমিন তো" নাম দিয়া তৃতীয়বার ওয়ার্কার্স ও পেজ্যাণ্টস পার্টী স্থাপনে কৃতকার্য্য হন। এই সমিতিতে উল্লিখিত চরমপন্থিগণের প্রতিষ্ঠান দুইটি ছাড়া অন্যান্য শ্রমিক ও কিষাণ সমিতির প্রতিনিধি গ্রহণ করা হইয়াছে। এই নয়া কৃষক ও শ্রমিকসঙ্ঘের সভ্যসংখ্যা অনুমান দুই লক্ষ। ইহার উদ্বোধন-সভায় যে কার্য্য-প্রণালী গৃহীত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, আইন মোতাবেক শ্রমজীবিগণের জাগরণ ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। সরকার এবার কোনো বাধা দেন নাই। এইবার পাকাপাকি ভাবে শ্রমজীবিগণের স্বার্থরক্ষার্থ একটি স্থায়ী রাজনৈতিক সমিতি কায়েম হইল। ইহাতে এপর্য্যন্ত দুইলক্ষ সভ্য যোগদান করিয়াছেন।

জাপানের 'কাই গুণ্ণ রোদো কুমিআই রেন সি' নামক যে নাবিক সংসদ (কনফেডারেশন অব ন্যাভাল আর্সেনাল ওয়ার্কার্স) আছে তাহার সভ্যসংখ্যা ৪৩ হাজার।

ইহা ছাড়া ক্যানসাইয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমজীবী ইউনিয়ন এবং কভানতোর জাপান ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়ন সম্মিলিত হইয়া জাপান কনফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়ন (রোদো কু সেই সোর দো) একটি সঙ্ঘ স্থাপিত হইয়াছে। ইহার সভ্য-সংখ্যা ১৫ হাজার।

নিখিল জাপান রেলওয়ে মেনস্ ইউনিয়নটি এই বৎসরের জানুয়ারী মাসে খোলা হয়। গভর্ণমেণ্ট রেলওয়ের গতর-খাটান মজুরের সংখ্যা ১৮০ হাজার এবং ইহাদের ট্রেড ইউনিয়ন প্রচেষ্টাকে সরকার বেশ ভয় করে। ১৯২০ সন হইতে তাহারা দুইবার ট্রেড ইউনিয়ন স্থাপনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে; কিন্তু গভর্ণমেণ্ট উভয় বারেই ইহাদের প্রচেষ্টা বিনষ্ট করিয়া দেয়। বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠানটি তাহাদের তৃতীয় বারের চেষ্টার ফল। যদিও ইহাতে বর্ত্তমানে সরকারী রেলওয়ের ৩ হাজার সভ্য মাত্র আছে তবু ইহা স্থাপনের কৃতকার্য্যতাকে জাপানে একটা অভিনব জিনিষ বলিতে হইবে।

উপর্য্যুপরি ব্যবসায়ের মন্দাভাবের জন্য শ্রমিকরা যা-কিছু দাবি করিয়াছে সবগুলিই ধনিক সম্প্রদায় অগ্রাহ্য করিয়াছে। শ্রমজীবীর বিবাদের মীমাংসা করা দূরে থাকুক

ধনিকরা গোপনে গোপনে শ্রমিকের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইতেছে।

ইউনিভার্সাল ম্যানহুড সাফ্রেজ অ্যাক্ট বা সাবালকদের সার্বজনীন ভোটাধিকার আইনের বলে জাপানে ২৫ বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক যে-কেহ ভোট দিতে অধিকারী হইয়াছে। কোনো ট্যাকস্ ডিস্কোয়ালিফিকেশন (কর প্রদান জন্য অক্ষমতা) রাখা হয় নাই। এই আইনের ফলে শ্রমজীবীদের হাতে কিছু অধিকার দেওয়া হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু অন্য দিকে 'প্রিজারভেশান অব পিস' নামক এক শান্তিরক্ষা আইন করিয়া যে-কোন সঙ্ঘ ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবে—সে আন্দোলন সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে নরমপন্থী সংস্কারবাদী বা চরমপন্থী যাহাদ্বারাই রুজু হউক না কেন—সরকার এই আইনের বলে তাহা তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবেন এবং ঐরূপ সঙ্ঘকে চরম শাস্তি দিতে পারিবেন। জাপানের বিভিন্ন শ্রমজীবি-সঙ্ঘের তুমুল প্রতিবাদ সত্ত্বেও আইনসভায় ইহা পাশ হইয়া গিয়াছে।

আর্থিক জীবন-বিষয়ক আইন-কানুন

১। বেঙ্গল ফিশারীজ বিল

প্রাকৃতিক বিধানে নদীর সৃষ্টি। ইহার কল্যাণে লোকের ব্যবসায়-বাণিজ্যের ও যাতায়াতের সুবিধা হয়। জমীদারদের কর্তৃক জমি নদীর কবলে থাকিলেও প্রজাদের প্রচুর উপকার হয় বলিয়া নদীর কোন কর দিতে হয় না। তজ্জন্য আমরা বিনা করে স্নান ও নদীর জলদ্বারা অনায়াসে অন্য কার্য্য করিতেছি। ভাড়াটিয়া নৌকা, মহাজনদের মাল বোঝাই নৌকা অথবা কোম্পানীর বড় বড় জাহাজ, ষ্টীমার প্রভৃতি নদী দিয়া চলিলেও তাহাদের উপর কোন কর ধার্য্য নাই। অথচ এই সমস্ত নৌকা বা জাহাজদ্বারা লক্ষ লক্ষ টাকা আয় হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যাহারা এই নদী হইতে মাছ ধরিয়া বিক্রয় করিয়া দিন কাটায় সেই সমস্ত দরিদ্র জেলেরা কর হইতে অব্যাহতি পায় নাই। আরও আশ্চর্য্যের বিষয়, জীবিকা হিসাবে না ধরিয়া খাওয়ার জন্য মাছ ধরিলেও কোনো কর দিতে হয় না। ইহা যে কিরূপ একদেশদর্শিতা ও অবিবেচনার কার্য্য তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

দ্বিতীয় কথা, এই করের আবার কোন সীমাও নাই। ১০ বৎসর পূর্ব্বে যে জলার কর ২০০৲ টাকা ছিল বর্ত্তমানে তাহার কর ২০০০৲ হাজার টাকায় উঠিয়াছে। ইহার ফলে মৎস্য-জীবীদের যেমন দুঃখ-দৈন্য বৃদ্ধি পাইতেছে বাঙ্গালীর মৎস্য-ভোজনও তেমনি হ্রাস পাইতেছে।

মৎস্যজীবিগণ সাধারণতঃ অর্থশূন্য দরিদ্র লোক। তাহারা কেবল পোড়া পেটের জ্বালায় নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়া আমাদের খাদ্য সংগ্রহ করিতেছে। কিন্তু তাহাদের দুঃখে সহানুভূতি দেখাইবার লোকের একান্ত অভাব। আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, যদি কোন হৃদয়বান ব্যক্তি জেলেপাড়ায় গমন করিয়া ইহাদের অনাহারক্লিষ্ট পুত্র-কন্যা, ছাউনি-শূন্য কুড়ে ঘর, শতধা-জীর্ণ বস্ত্রপরিহিত স্ত্রী, জননী ও ভগিনীদের অবলোকন করেন তবে তিনি কখনই অশ্রু সম্বরণ করিতে ও তাহাদের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন না হইয়া থাকিতে পারিবেন না।

যাহা হউক সুখের বিষয় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, নদীয়ার প্রতিনিধি, বাবু হেমন্তকুমার সরকার মহাশয় তাঁহার "বেঙ্গল ফিশারীজ বিল"এ বিনাকরে নদীতে মাছ ধরার জন্য আইন করিতে গভর্ণমেণ্ট সমীপে এক প্রস্তাব দিতেছেন। আশা করি মহামান্য গভর্ণমেণ্ট ও ব্যবস্থাপক সভার সদস্যবৃন্দ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া এই আইনটা পাশ করিবেন।

পরিশেষে আমি জেলে, মৎস্যের বেপারী ও দেশীয় জনসাধারণ এবং দেশীয় অনুষ্ঠানগুলিকে অনুরোধ করিতেছি, তাহারা যেন অবিলম্বে সর্ব্বত্র সভা করিয়া এই আইনটী পাশ করিয়া দরিদ্র জেলেদের জীবন বাঁচাইতে মহামান্য গভর্ণমেণ্ট বাহাছুর সমীপে আবেদন করেন।

মহাম্মদ আব্দুলগণি
সেক্রেটারী, আঞ্জমানে কওমে বণি এছরাইল,
জামালপুর (ময়মনসিংহ)

২। কলিকাতা বাড়ীভাড়া আইন

(জনৈক নাগরিক লিখিত)

কলিকাতার অধিবাসিগণ অবগত আছেন ১৯২০ সনের মে মাসে এই নগরে যে বাড়ী-ভাড়ার আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহার স্থায়িত্বকাল কাউন্সিল-কর্ত্তৃক বর্দ্ধিত না হইলে ১৯২৭ সনের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট আছে। যাঁহারা লক্ষ্মীর বরপুত্র নন, যাঁহাদের ভাড়া দেওয়ার মত উপযুক্ত বাড়ী নাই, যাঁহারা ভাড়া বাড়ীতে বাস করেন, তাঁহারা কি এই আইন রহিতের পরিণামের গুরুত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছেন? এই নগরের মুষ্টিমেয় লোকেরই নিজেদের বসতবাটী বা ভাড়া দেওয়ার মত বাড়ী আছে। এই নগরের অধিবাসিগণের মধ্যে শতকরা ৯৯ জনকেই নীতিশাস্ত্রের "পরাবসথশায়ী" সংজ্ঞায় ফেলা যায়। যদিও বর্ত্তমান সময়ে শত সহস্র দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক এই আইনের সাহায্যে উপকৃত হইতেছেন, তথাপি কত নিরীহ প্রজা অর্থগৃধ্নু ভূস্বামীর হস্তে নিগৃহীত হইতেছেন, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? এই আইন ও বাড়ীভাড়ার আদালত উঠিয়া গেলে ভূস্বামী বা গৃহস্বামিগণ স্বাধীনভাবে বাড়ীভাড়া বাড়াইতে পারিবেন এবং যথেচ্ছভাবে প্রজাদিগকে বাড়ী হইতে উচ্ছেদ করিয়া দিতে পারিবেন। ঈদৃশ অত্যাচার নিবারণকল্পেই স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট উক্ত আইন প্রচলন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অধুনাও ভাড়াটিয়া বাড়ীর সংখ্যা এত অধিক হয় নাই অথবা ভাড়াটিয়াগণ উচিত ভাড়ায় বাড়ী পাইতে পারেন এমন কোন ব্যবস্থা হয় নাই বা এই আইন রহিত হইলে বাড়ীভাড়া ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইবে না, এমন কোন বিধানও হয় নাই, যাহাতে লক্ষ লক্ষ কলিকাতাবাসীর প্রার্থনা নামঞ্জুর করিয়া স-কাউন্সিল গবর্ণর এই আইন রহিত করিতে পারেন। যাহাতে জনসাধারণের প্রতিনিধি কাউন্সিল মেম্বারগণ এই আইনকে সংশোধিত অবস্থায় চিরস্থায়ী করেন, তৎপ্রতি সকলেরই যত্নবান হওয়া উচিত। ধনী, ও সুশিক্ষিত ভূস্বামি-সম্প্রদায়ের নিকট জনসাধারণ কি এই আশা করিতে পারে না যে. তাঁহারা তাঁহাদের ভাড়া দেওয়া বাড়ীগুলির উচিত ভাড়া পাইয়া সন্তুষ্ট থাকেন এবং উক্ত উচিত ভাড়া নির্ণায়ক আইন আদালতের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে যত্নবান হন?

জনসাধারণ এই নগরে এমন একটি স্থায়ী বাড়ী ভাড়ার আদালত চায়, যেখানে তাহারা আবশ্যক হইলে তাহাদের বাসগৃহের উচিত ভাড়া স্থির করাইয়া লইতে পারে এবং যাহা হইলে তাহারা বাড়ীওয়ালার অন্যায় অত্যাচারের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে।

এই আইন ও আদালত এরূপ হইবে যাহাতে বাড়ী-ওয়ালাগণ তাহাদের ভাড়া দেওয়া বাড়ীর উপযুক্ত খাজনা নির্ব্বিঘ্নে পাইতে পারেন এবং যাহাতে প্রজাগণ আবশ্যক হইলে যথাসম্ভব অল্পব্যয়ে ও অল্পকালমধ্যে তাহাদের বাসগৃহের উচিত ভাড়া স্থির করাইয়া লইতে পারেন। বর্ত্তমান আইনের জীবনকাল কিস্তিতে কিস্তিতে বাড়াইয়া দেওয়ার বিধান দুরভিসন্ধিমূলক না হইলেও ক্ষতিকারক। প্রজাবর্গের অধিকাংশই এই আইনের জীবনীশক্তি হৃদরোগ-গ্রস্ত রোগীর জীবনীশক্তির ন্যায় অনিশ্চিত মনে করিয়া বাড়ীভাড়ার আদালতের আশ্রয় লয়েন নাই। তাঁহারা জানেন, এই আইন রহিত হইলে তাহাদের কলিকাতায় বাসকরা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে।

বর্ত্তমান বাড়ীভাড়ার আইনের অনেক ত্রুটি আছে। প্রত্যেক নূতন আইনেই এরূপ ত্রুটি থাকিবে। এই ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি দূর করিয়া নূতন কাউন্সিল চিরস্থায়ী বাড়ী-ভাড়ার আইন প্রচলিত করুন। ইহা সকলেই জানেন যে, কলিকাতার মত জনবহুল নগরে এই আইন একবার প্রবর্ত্তিত হইলে আর তাহার রদ হওয়া অসম্ভব। এই আইন রহিত

হইলে প্রজার দুর্দ্দশা স্মরণ করিয়া প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই অনুমান করিতে পারেন যে, ইহা ১৯২৭ সনের মার্চ্চ মাসে রহিত হইলেও ঐসনের জুন মাসেই আবার এই বাড়ীভাড়ার আইনকে নূতন জীবন দান করিতে হইবে।

৩। কলিকাতায় বাড়ী ভাড়া

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার পক্ষ হইতে কলিকাতা বাড়ী ভাড়া আইনের ২নং সংশোধিত বিল সম্বন্ধে "বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স" বা বাংলার জাতীয় বণিক সমিতির মতামত চাহিয়া পাঠান হয়। তদুত্তরে চেম্বারের অবৈতনিক সম্পাদক বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা বিভাগের সেক্রেটারীকে যে চিঠি প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ।

("দৈনিক বসুমতী")

(১) বণিক-সমিতির কমিটীর অভিমত এই যে, কলিকাতা বাড়ীভাড়া আইন বহাল রাখিবার আর প্রয়োজনীয়তা নাই। এই আইনের ফলে ধনী লোকেরা আর দালান, কোঠা ইমারত তৈয়ারী করিতেছে না, তাহার ফলে কলিকাতায় নূতন দালান-কোঠার সংখ্যা আর তেমন বাড়িতেছে না।

(২) বিলটির উদ্দেশ্যে এ কথা বিবৃত হইয়াছে যে, ১৯২০ সনের বাড়ীভাড়া আইনের কয়েকটি ত্রুটি সংশোধন করাই বর্ত্তমান বিলের উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কি তাই? বিলটি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে স্পষ্টতঃ বুঝা যাইবে যে, বাড়ীর মালিকদের ক্ষমতা আরও সঙ্কুচিত করাই বিলটির উদ্দেশ্য। বিলের ৩নং ধারাই এ কথার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ। ১নং কৈফিয়তে বলা হইয়াছে যে, বাড়ীওয়ালা যতক্ষণ না প্রমাণ করিতে পারিবেন যে, যে বাড়ীতে তিনি বাস করিতেন সেই বাড়ী বাসের অযোগ্য, ততক্ষণ তাঁহাকে অথবা তাঁহার কোন লোককে নূতন বাড়ীতে বাস করিতে দেওয়া যাইবে না। এই কমিটী মনে করেন যে, ইহা বাড়ীর মালিককে যে বাড়ীতে তিনি পূর্ব্বে বাস করিতেছিলেন, সেই বাড়ীতে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাস করিতে বাধ্য করা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। এরূপ প্রস্তাব বাড়ীর মালিকের ক্ষমতার উপর অযথা হস্তক্ষেপ ছাড়া আর কিছু নহে।

(৩) বিলের ২নং কৈফিয়তে বলা হইয়াছে যে, বাড়ীওয়ালা যদি তাঁহার নিজের বাড়ীর সংস্কার অথবা পুনর্নির্ম্মাণ করিতে চাহেন, তাহা হইলে কন্‌ট্রোলারের নিকট হইতে এই মর্ম্মে একখানা সার্টিফিকেট লইতে হইবে যে, "বাড়ীটি এরূপ জরাজীর্ণ হইয়াছে যে, উহা বাসের অযোগ্য।" বাড়ীওয়ালাকে কেন যে নিজের বাড়ীর পুনর্নির্ম্মাণ অথবা সংস্কারের জন্য কন্‌ট্রোলারের অনুমতির অপেক্ষায় থাকিতে হইবে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। নিজের বাড়ীর আবশ্যক মত সংস্কার ও পুনর্নির্ম্মাণ প্রভৃতি বিষয়ে বাড়ীওয়ালার নিজের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা চাই।

(৪) এই বিলের ৫নং ধারা ও ৩নং উপধারায় যে কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে ভাড়াটিয়াকে আংশিক ভাড়া দিবার অধিকার দেওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে। তাহাতে বাড়ীওয়ালার বিশেষ অসুবিধা হইবে। তাহা ছাড়া কলিকাতার বাড়ীই যাহাদের যাবতীয় সম্পত্তি, তাহাদের এইরূপ আংশিক ভাড়া আদায়ের ফলে মহাকষ্টে পতিত হইতে হইবে এবং কোর্ট হইতে সেই আংশিক ভাড়া তুলিবার ব্যয়ও বহন করিতে হইবে।

(৫) ৪নং ধারা ও ৩নং উপধারা পড়িয়া কমিটী আদৌ বুঝিতে পারিতেছেন না কেন ভাড়াটিয়া স্বত্ব নির্দ্ধারণের পরেও বাড়ীভাড়া নির্দ্ধারিত করিবার জন্য প্রস্তাব হইয়াছে।

(৬) ধারা নং ৫। কমিটীর মনে আছে যে, ১৯২৪ সনে যখন বাড়ীভাড়ার সংশোধিত আইন পাশ হয়, তখন এ কথা বলা হইয়াছিল যে, ২৫০ টাকার উপর যে বাড়ীতে মাসিক ভাড়া দেওয়া হয়, সে বাড়ীর প্রতি এই আইন প্রযুক্ত হইবে না। এখন সেই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজনীয় হইয়াছে বলিয়া কমিটী মনে করেন না। কাজেই কমিটীর মত এই যে, উক্ত ধারাটি একেবারে তুলিয়া দেওয়া হউক। কমিটীর ইহাও অভিমত যে, যদি বাস্তবিকই এই ধারার কোন পরিবর্ত্তন করিতে হয়, তবে তাহা দুই শত টাকা মাসিক বাড়ী ভাড়া দেয় এইরূপ বাড়ীর উপর যেন প্রয়োগ না করা হয়।

৪। মোটর বাস সম্বন্ধে নূতন আইন

("আনন্দবাজার" হইতে উদ্ধৃত)

কলিকাতা সহরে বাস গাড়ী ঘণ্টা প্রতি বার মাইলের অধিক চালাইতে পারিবে না, এইরূপ মর্ম্মে এক নিয়ম

গবর্ণমেণ্ট করিতে চান। আমাদের বিবেচনায় বাসের এইরূপ স্বল্প গতি সহরবাসীর পক্ষে আদৌ সুবিধাজনক হইবে না। ইহাতে রাস্তায় গাড়ী-চলাচলের বিশেষ অসুবিধা হইবে এবং তাহার ফলে দুর্ঘটনা-বৃদ্ধির সম্ভাবনা সমধিক। আমরা যতদূর অবগত আছি, তাহাতে কোনও সভ্য দেশে মোটরবাস গাড়ীর এত স্বল্প গতি নির্দ্ধারিত হয় নাই। তাহার উপর যখন সহরে দ্রুততর গতিবিশিষ্ট গাড়ী বর্ত্তমান, তখন স্বল্পতর গতিশীল গাড়ী পূর্ব্বকথিত গাড়ীর পক্ষে বিশেষ প্রতিবন্ধক। আমেরিকার আইনানুসারে কোনও মিউনিসিপ্যালিটি মোটর গাড়ীর গতি ঘণ্টাপ্রতি ১৫ মাইলের নিম্নে নির্দ্ধারণ করিতে পারেন না। ইউরোপে সাধারণতঃ ২০ মাইল নির্দ্ধারিত হয়। এরূপ স্থলে আমরা বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের এবম্বিধ প্রস্তাবের সারবত্তা অনুমান করিতে অক্ষম। মেলগাড়ীর ইঞ্জিনকে রাস্তা পেযাইয়ের কার্য্যে নিযুক্ত করা যেরূপ অস্বাভাবিক, দ্রুতগামী গাড়ীকে গরুর গাড়ীতে পরিণত করাও তদ্রূপ অযৌক্তিক।

পূর্ব্বকথিত ইস্তাহারে পুলিশ কমিশনার বা তাঁহার নিযুক্ত যে কোনও কর্ম্মচারীকে ১২ মাইলের ঊর্দ্ধ গতিতে গাড়ী চলিলে তাহার শিল কাটিয়া দিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হইবে। আমরা এ ব্যবস্থার প্রতিবাদ করি। প্রথম কথা গাড়ীর গবর্ণর শিল করিবার প্রথা অবৈজ্ঞানিক, অনিশ্চিত ও প্রলোভনপূর্ণ। গবর্ণমেণ্ট যখন নিয়ম করিতেছেন, আর সেই নিয়মের প্রতিপালক যখন লাইসেন্স করা চালক, তখন এই নির্দ্ধারণই যথেষ্ট। গবর্ণর শিল করা ব্যপদেশে পুলিশের কর্ম্মচারীরা বাস গাড়ীওয়ালাদিগের উপর যেরূপ অত্যাচার করে, তাহার দুই একটি উদাহরণ আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি। এই শিল প্রথার ফলে বাস ব্যবসায়টিকে সর্ব্বনাশের পথে প্রেরণ করা হইতেছে। সত্বর এই প্রথা উঠাইয়া দেওয়া আবশ্যক। তারপর দ্রুততর গতিশীল গাড়ী বন্ধ করিবার ক্ষমতা যে-কোনও কর্ম্মচারীর হস্তে দিলে অত্যাচার, ভীতিপ্রদর্শন, প্রভৃতির পথ প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হইবে। এ ক্ষমতা এসিষ্টেণ্ট কমিশনারের নিম্নতর পদস্থ কর্ম্মচারীর হস্তে প্রদান করা আদৌ কর্ত্তব্য নহে। তাহার পর এই জাতীয় কর্ম্মচারীর মোটর ইঞ্জিনিয়ারিং ও যান-বাহনের গমনাগমন সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। নচেৎ একটি ব্যবসার উপর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব পুলিশ কর্ম্মচারীদের খামখেয়ালির হস্তে প্রদান করা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত নহে। পুলিশের সম্পর্ক চোর বদমায়েসদের সঙ্গে—তাঁহাদের হস্তে ব্যবসায়ীর ইষ্টানিষ্ট অর্পণ করা আর ব্যবসায়ীয় সর্ব্বনাশ করা একই কথা।

আমরা পাশ্চাত্য দেশের ও আমেরিকার সম্বন্ধে যতদূর অবগত আছি তাহাতে এবম্বিধ শিল প্রথা কোনও বিশিষ্ট দেশে নাই। মোটর গাড়ীর পক্ষে ঘণ্টায় পনর মাইলের কম গতি নির্দ্ধারিত হওয়া অত্যন্ত অসুবিধাজনক। সাধারণে যে কারণে দ্রুতগতিশীল গাড়ী ব্যবহার করে, ঘণ্টায় ১২ মাইল গতিতে সে উদ্দেশ্য আদৌ সাধিত হইবে না। গরিব কেরাণী ও ব্যবসায়ীদের সময়ের মূল্য অল্প নহে। তাহারা সস্তায় এখন যে সুবিধা পাইতেছে তাহা হরণ করিলে শুধুই যে তাহাদের অসুবিধায় ফেলা হইবে এমন নহে, উপরন্তু যে সকল মধ্যবিত্ত লোক বাস্‌ব্যবসায়ে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা এই কলিকাতা সহরে ন্যস্ত করিয়াছে, তাহাদেরও সর্ব্বনাশ সাধিত হইবে এবং বহু লোকের (প্রায় তিন হাজার) অন্নে হাত পড়িবে। বাস্‌গাড়ী প্রচলনের ফলে অনেক মোটরচালকের আয়-বৃদ্ধি ও নৈতিক উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

প্রস্তাবিত আইন পাশ হইলে ট্রামগাড়ীর প্রতিযোগিতায় বাসগাড়ীগুলি মোটেই টিকিতে পারিবে না।
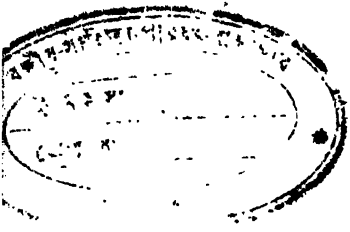
ভারতীয় ডাক-কর্ম্মীদের ঋণ

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়, তত্ত্বনিধি, বি, এ

বৎসর	সোসাইটীর সংখ্যা	সভ্য-সংখ্যা	খাতকের সংখ্যা	লগ্নি টাকার পরিমাণ
১৯২১-২২	২৯	১৪,০৪২	৫,৪৮২	৮ · ০৮ লাখ টাকার উপর
১৯২২-২৩	...	১৭,১২১	৭,৩৭১	১০ · ৭৫ লাখ টাকা
১৯২৩-২৪	৩২	১৯,৭১০	৭,৯৪৭	১৩ · ৮৬ "
১৯২৪-২৫	৩৫	২১,৯৩৪	৯,২৪৫	১৮ · ৫৩ "

আজকাল ভারতবর্ষে কয়েকবৎসর যাবৎ ডাকঘরের কর্ম্মচারিগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া নিজেদের জন্য কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। এই সোসাইটী-গুলি চলে তাঁহাদের টাকায়, চালান তাঁহারা নিজেরাই, ফলভোগ করেনও কর্ম্মচারীরাই; বাহিরের লোকের কোনও সম্পর্ক ইহাতে নাই।

এই সব সোসাইটী বা সমিতিগুলির প্রধান কাজই মেম্বর-দিগকে টাকা ধার দেওয়া। কোনও কোনও সমিতিতে প্রভিডেন্ট ফণ্ডের ব্যবস্থাও হইয়াছে। ডাক-কর্ম্মীদিগের প্রত্যেককেই সরকারী চাকরীর জন্য জামিন দিতে হয়। কতকগুলি সমিতি ডাক-কর্ম্মীদিগের জামিনদারও হইতেছেন।

পোষ্টাল কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটীগুলির সৃষ্টি হওয়াতে ডাকঘরের অনেক কর্ম্মীই হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছেন। এই স্বস্তির লক্ষণ বাংলাদেশেই বেশী। সংসার করিয়া থাকিতে গেলেই খাই-খরচ ছাড়া আপদ-বিপদ, অসুখ-বিসুখ, মেয়ের বিবাহ, ছেলে পড়ান, গরিবের মতো ২।৪টা ব্রতপার্ব্বণ ও দশকর্ম্ম আছে। ইহাদিগকে "বেদের" মতো সমস্ত সংসারটা সঙ্গে লইয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া অল্প উপার্জ্জনে সংসার-খরচ চালাইতে হয় বলিয়া ইহাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। অনেকেরই "হাঁড়ি ঠন্ ঠন্' বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহার উপর ছুটী না পাওয়ার দরুণ প্রতি বৎসর দেশে যাইয়া পৈতৃক ভিটাখানাও ঠিক রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন না। এই জন্য অনেকেরই বাড়ী "পড় পড়"। অনবরত বদলি, অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস, বিশ্রামহীন ও নিরানন্দময় একঘেয়ে চাকরীর দরুণ স্বাস্থ্যনাশ প্রভৃতি কারণে অতিরিক্ত ব্যয় ত আছেই। কাজেই সঞ্চয়ের ঘরে ইহাদের অনেকেরই 'অষ্টরম্ভা'। এমন আর্থিক অবস্থা লইয়া বিদেশে বিভূঁইয়ে অভাব-অনাটনে পড়িয়া ঋণের জন্য হাত পাতিলে বন্ধক ছাড়া, জামিন ছাড়া ইহাদিগকে টাকা ধার দেয় কে? কাজেই পোষ্টাল কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটীগুলি ডাক-কর্ম্মীদিগের পরম বন্ধুস্বরূপ হইয়াছে।

এই সমিতিগুলির হিসাবপত্র নাড়িয়া চাড়িয়া ডাকঘরের কর্ম্মচারীদিগের ঋণের পরিমাণ আন্দাজ করিবার চেষ্টা করা যাউক। অবশ্য কাহারো ঋণের পরিমাণ ঠিক ঠিক জানা শক্ত—যদি তিনি নিজে না বলেন। যাহা হউক ঋণের তথ্য যাহা পাওয়া যায় তাহাই আলোচনা করিলে ইহাদের আর্থিক অবস্থার আঁচ পাওয়া কতকটা সম্ভব।

উপরে যে তালিকা দেওয়া হইল উহা হইতে দেখিতে

পাওয়া যায়, ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে সমগ্র ভারতে এই সোসাইটী-গুলির সংখ্যা ছিল ১৪,০৪২, আর ১৯২৪-২৫ খৃঃ হইয়াছে ২২, ৯৩৪। প্রয়োজনের সময় টাকা ধার পাওয়া যাইবে এই আশায় কর্ম্মিগণ এইসব সোসাইটীর মেম্বর হন। যাঁহার সঞ্চিত টাকা আছে, নিজের ঘরের টাকায় অভাব অনাটন যিনি কায়ক্লেশেও মিটাইতে পারেন, তিনি কি কখনো সুদ দিয়া টাকা ধার করিবার জন্য অপরের কাছে (ব্যক্তিই হউক আর প্রতিষ্ঠানই হউক) আসেন? এই ২২,৯৩৪ জন ডাককর্ম্মী যখন প্রয়োজনের সময়ে ঋণপ্রাপ্তির আশায় মেম্বর হইয়াছেন, তখন ইহা অনায়াসে অনুমান করা যাইতে পারে যে, তাঁহাদের অনেকেরই সঞ্চিত অর্থ নাই, অথবা থাকিলেও খুবই কম। কাজেই এই কথা যদি অনুমান করি যে, অন্ততঃ এই ২২, ৯৩৪ জন ডাকঘরের কর্ম্মচারীর আর্থিক অবস্থা সচ্ছল নহে, তাহা হইলে বোধ হয় ভুল হইবে না। প্রতি পরিবারে যদি ৫ জন করিয়া লোক ধরা যায়, তাহা হইলে এই ২২,৯৩৪ জন কর্ম্মচারীর সংসারে ১৪৪,৬৭০ জন নরনারী আছে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই ১৪৪, ৬৭০ জন নরনারী ডাকঘরের চাকরীর দুঃখ-কষ্টের, অভাব-অসুবিধার আওতায় থাকিয়া টানাটানির মধ্যে দিন কাটাইতেছে বুঝা যায়। অবশ্য যাঁহারা এই সব ক্রেডিট সোসাইটীর মেম্বর হন নাই তাঁহাদের অবস্থাও সচ্ছল নয়; তাঁহাদের পরিবারভুক্ত নরনারীও অভাব-অসুবিধার আওতায় দিন কাটাইতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের সম্বন্ধে হাতের সামনে কোনও তথ্য না থাকাতে এখানে কিছু বলা শোভন মনে করি না।

সমগ্র ভারতে ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে পোষ্টাল কো-অপারেটিভ সোসাইটীর সংখ্যা ছিল ২৯, আর ১৯২৪-২৫ খৃষ্টাব্দে হইয়াছে ৩৫টী। এই ৩৫টীর মধ্যে ১৮টীই বাঙ্গালা ও আসাম প্রদেশে, ৮টী বোম্বেতে এবং ৩টী মাদ্রাজে। সুতরাং ২২,৯৩৪ জন মেম্বরের মধ্যে অধিকাংশ লোকই যে বাঙ্গালা ও আসাম প্রদেশের কর্ম্মচারী তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

এই সব সোসাইটী হইতে যাঁহারা টাকা ধার নিয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে ছিল ৫,৪৮২, আর ১৯২৪-২৫ খৃষ্টাব্দে হইয়াছে ৯,২৪৫। মোট ঋণের পরিমাণ ১৯২১-২২ খৃঃ ছিল ৮·০৮ লাখ টাকার উপরে; ১৯২৪-২৫ খৃষ্টাব্দে হইয়াছে ১৮·৫৩ লাখ টাকা। শুধু কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটির নিকট ঋণের পরিমাণই এই। এ ছাড়া বন্ধুবান্ধবদিগের নিকট, ব্যাঙ্কের নিকট, স্থানীয় মহাজনের নিকট ঋণের ও দোকানবাকী প্রভৃতির অঙ্কগুলি যোগ দিলে মোট ঋণের পরিমাণ আরও ঢের বাড়িয়া যাইবে। ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে ডাকবিভাগে টাইম্ স্কেলের মাইনা প্রবর্ত্তিত হওয়াতে সকল কর্ম্মচারীরই তলব গড়ে শতকরা ৮০৲ বাড়িয়াছে। অনেকে আবার একসঙ্গে কতকগুলি টাকাও পাইয়াছেন। কিন্তু ইহা সত্বেও এই পাঁচ বৎসরেই ঋণের পরিমাণ অত্যন্ত বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহার কারণ কেহ কেহ হয়ত বলিবেন "বাড়্তি আয়ের ফলে বে-পরোয়া খরচ সুরু হইয়াছে। ঠাট বাড়িয়াছে। তাই ঋণ না করিয়া উপায় কি? কিন্তু ডাকঘরের কর্ম্মচারীদিগের যাঁহারা শত্রু তাঁহারাও স্বীকার করিবেন যে, এই পাঁচ বৎসরে ভারতীয় ডাক-কর্ম্মীদিগের বাবুগিরি বাড়ে নাই; তাঁহারা অমিতব্যয়ী হয়েন নাই, তাঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ শতকরা ৯৫ জন নেশায় কি বেশ্যায় টাকা ছড়াইয়া দেন নাই। আমি প্রায় ২০ বৎসর যাবৎ মুসাফিরি করিতেছি। আমার এই মুসাফিরি জীবনে বহু শত ডাকঘরের কর্ম্মচারীর সংস্পর্শে আসিয়া এইটুকু দেখিয়াছি যে, তাঁহাদের অনেকেই আর যাই হউন, অমিতব্যয়ী নহেন। এখনো প্রাথমিক অভাবগুলি মিটাতেই তাঁহাদের মাথার ঘাম পায়ে পড়ে, বাবুগিরির কথা তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন না। তাঁহাদের দৈনিক জীবনের ঠাট ১৯০৯-১৯১০ খৃঃ অথবা ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে যাহা ছিল তাহার চেয়ে বাড়ে নাই। কাজেই বাড়ীতে আয়ের ফলে বে-হিসাবী খরচ হওয়ায় অনুমানটা সত্য বলিয়া মনে হয় না। বরং তথ্যগুলি ভাগ করিয়া খতাইয়া দেখিলে কারণ আর কিছু বলিয়া মনে হয়। ১৯১০ হইতে ১৯২৫ এই ১৫ বৎসরের মধ্যে ভারতের ডাকঘরের কর্ম্মচারীদিগের জীবন-যাত্রার ঠাটের সহিত জিনিষপত্রের দামের তুলনামূলক আলোচনা করিলেই আসল কারণটা জানা যাইবে। সকলেই স্বীকার করিবেন যে, ১৯১০ খৃঃ হইতে এদেশে জিনিষপত্রের

দাম বাড়িয়াছে শতকরা ২০০ বা ২৫০। আর গড়ে শতকরা ৮০ টাকা তলব বাড়াইয়া ডাক-বিভাগে বর্ত্তমান মাইনার হারটা সৃষ্টি করা হইয়াছে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে। এই এগার বৎসর চড়াদরের কড়া শুনিয়া কর্ম্মচারিগণের জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। যাদের তারা ভালবাসে যাদের তরে সকাল সন্ধ্যা গতর খাটাইয়া টাকা কামাইতে আসিয়াছে, তারাই যদি পেট ভরিয়া খাইতে না পায়, দুঃখের ভারে মুসড়াইয়া পড়ে তাহা হইলে মানুষের ধৈর্য্য থাকে কি? প্রেমাস্পদ ও স্নেহাস্পদদের দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইতে দিতে অপারগ হইয়া, তাদের অসুখবিসুখে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে না পারিয়া অর্থকষ্টের ঘা খাইয়া খাইয়া ভারতের ডাক-কর্ম্মীরা টিকিয়া থাকিবার জন্য মহাজনের নিকট ঋণ করিতে আরম্ভ করিল। মহাজনদের নিকট হাত পাতিতে হইয়াছিল, কারণ, তখনো পোষ্টাল্ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট্ সোসাইটী গড়িয়া উঠে নাই।

এই এগার বৎসরের মধ্যে জিনিষপত্রের দাম চড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ডাক-কর্ম্মীদিগের আয় না বাড়িবার ফলে যে আর্থিক সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে এই নিরীহ কর্ম্মী-দিগের মূক মুখও মুখর করিয়া তুলিয়াছিল। ১৯২০-২১ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের মাইনা বাড়িয়াছে সত্য, কিন্তু স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া টিকিয়া থাকিবার মতো তলব এখনো হয় নাই। টাকার হিসাবে মাইনা বাড়িলেও জিনিষপত্রের কড়া দরের অনুপাতে উহা বাড়ে নাই বলিয়া এই বাড়্তি আয়েও যে ভোগ্য-সংগ্রহ হয় তাহাতে সংসার চালানো এখনো কষ্টকর। অসুখ-বিসুখে আপদ-বিপদে, পূজা-পার্ব্বণে যে খরচটুকু নেহাৎ না করিলে নয়, তাহার জন্য এখনো ধার করিতে হয়, পুরাণো ঋণ শোধ করিবে কি দিয়া? এদিকে পুরাণো মহাজনেরা আর অপেক্ষা করিতেও নারাজ। তাঁহারা ক্রমশঃ টাকা আদায়ের জন্য চাপ দিতেছেন। ফলে উপায়ান্তর না দেখিয়া ডাককর্ম্মীরা পোষ্টাল্ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট্ সোসাইটীর নিকট হইতে শতকরা ৯৲ টাকা সুদে টাকা ধার করিয়া মহাজনের বেশী সুদের ঋণ ক্রমশঃ শোধ করিয়া দিতেছেন। ফলে তাঁহাদের ঋণ শোধ হইতেছে না, কেবল হাতফের হইতেছে মাত্র। মিতব্যয়িতা এবং মাইনা-বৃদ্ধি সত্ত্বেও ডাক-কর্ম্মীদিগের সচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে নাই। তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা ১৯০৯—১৯১০ খৃঃ যেরূপ ছিল ১৯২৪—২৫ খৃষ্টাব্দেও প্রায় সেইরূপ।

এতগুলি লোক অসচ্ছলতার মধ্যে থাকিতে বাধ্য হইয়া সমাজ-জীবনে ঘুণ ধরিবার সাহায্য করিতেছে না কি?

জামালপুর লোন্ আফিস লিমিটেড্

ডিরেক্টরগণের ১৩৩২ সনের রিপোর্ট

উদ্বর্ত্তপত্র

এই রিপোর্টের সহিত ১০ম বর্ষের একখানা উদ্বর্ত্তপত্র প্রকাশিত হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অডিটার শ্রীযুক্ত বীরভদ্র চৌধুরী মহাশয় তাহা পরীক্ষা করিয়াছেন।

মূলধন

এই কোম্পানীর রেজেষ্ট্রীকৃত মূলধন ৩০,০০০৲ হাজার টাকা প্রতি অংশ ১০৲ দশ টাকা হিসাবে ৩০০০ তিন হাজার অংশে বিভক্ত। তন্মধ্যে বিতরিত ১০০০ এক হাজার অংশের সম্পূর্ণ ১০,০০০ দশ হাজার টাকা আদায় হইয়াছে।

রিজার্ভ ফণ্ড

১৩৩১ সনে মোট রিজার্ভ ফণ্ড ১৮,০০০৲ আঠার হাজার টাকা ছিল। আলোচ্য বর্ষের আয় হইতে ১০,০০০৲ দশ

হাজার টাকা রিজার্ভ ফণ্ডে রাখা ডিরেক্টরগণ অনুমোদন করিতেছেন। তাহা হইলে আলোচ্যবর্ষ পর্য্যন্ত রিজার্ভ ফণ্ডে মোট ২৮,০০০৲ টাকা হইবে। রিজার্ভ ফণ্ডের সম্পূর্ণ টাকা পৃথকভাবে বিশিষ্ট কোনও ব্যাঙ্কে আমানত রাখা ডিরেক্টরগণ সঙ্গত মনে করেন। ডিরেক্টরগণ কলিকাতা কো-অপারেটিভ হিন্দুস্থান ব্যাঙ্কে দ্বিবার্ষিক হেডে যে ২৫০০০৲ পঁচিশ হাজার টাকা আমানত রাখিয়াছেন তাহা রিজার্ভ ফণ্ডের টাকা হইতে পৃথকভাবে আমানত রাখা সঙ্গত মনে করেন।

আমানত

বিগত বর্ষে মোট ৩,৩৯,৯৪৪৴০ আমানত ছিল। আলোচ্য বর্ষে বহু আমানত পরিশোধান্তেও ৭৫,১২১।৵৩ পাই আমানত বৃদ্ধি হইয়া মোট ৪,১৫,০৬৫।৴৩ পাই আমানত দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে এবং কঠোর প্রতিযোগিতার মধ্যেও ঐ পরিমাণ টাকা আমানত বৃদ্ধি হওয়া কোম্পানীর দৃঢ়তা ও তৎপ্রতি জনসাধারণের আন্তরিক বিশ্বাসের পরিচায়ক। আমানত-সংগ্রহ বিষয়ে ম্যানেজিং ডিরেক্টর মহোদয়ের চেষ্টা উল্লেখযোগ্য।

দাদন ও আদায়

বিগত বর্ষে হেড আফিসে ১,২৫,৯১০৲ টাকা ও ব্র্যাঞ্চ আফিসে ৬১,১৫৮৲ টাকা, মোট ১,৮৭,০৬৮৲ টাকা দাদন এবং হেড আফিসে ১,১৩,৬৩৩৵৩ পাই ও ব্র্যাঞ্চ আফিসে ২,২৬৪৲ টাকা, মোট ১,৩৭,৮৯৭৵৩ পাই আদায় হইয়া, বৎসরান্তে ২,৩২৬৩৩৲৬ পাই দাদনে ছিল। আলোচ্য বর্ষে হেড আফিসে মোট দাদন ১,৩৯,২৭৯৲ টাকা ও ব্র্যাঞ্চ আফিসে ৭৮,৬৮২৲ টাকা একুনে ২,১৭,৯৬১৲ টাকা দাদন এবং হেড আফিসে ১,১৫,৫৯৮।৴০ আনা ও ব্র্যাঞ্চ আফিসে ২৩,৬৭৪৲ টাকা, মোট ১,৩৯,২৭২।৴০ আদায় হইয়া বৎসরান্তে ৩,০৪,৭৯১ ॥৵০ আনা দাদনে আছে। দাদন ও আদায় উভয়ই সন্তোষজনক।

ভিন্ন কোম্পানীতে আমানত দেনা

বিগত বর্ষে বিভিন্ন কোম্পানীতে পরিশোধান্তে মোট ৭৯,২৮৯৲ টাকা আমানত ছিল। আলোচ্য বর্ষে মোট ১,৮০,৮৭৯৶৬ পাই আমানত দেওয়া হইয়াছিল এবং ১,৫০,১৮৯৲ টাকা পরিশোধ হইয়া বৎসরান্তে মোট ১,০৯,৯৭৯৶৬ পাই বিভিন্ন কোম্পানীতে সুদী আমানত আছে।

সুদ আদায়

বিগত বর্ষে মোট ৪৩,৫১২৸৵০ আনা সর্ব্বপ্রকার সুদে ও অন্যান্য প্রকারে আয় হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে সর্ব্বপ্রকার দাদন ও আমানতের সুদে ও অন্যান্য প্রকারে মোট ৫৮,৯৭৮৸৵৩ পাই আদায় হইয়াছে।

অস্থাবর সম্পত্তি

১৩৩১ সন পর্য্যন্ত কোম্পানীর ২১৭৪৸৴৬ পাই মূল্যের অস্থাবর সম্পত্তি ছিল। আলোচ্য বর্ষে ৬৪১॥৴০ আনা মূল্যে অস্থাবর সম্পত্তি খরিদ হইয়া ৫৪।৵০ আনা ক্ষয় ও মূল্য-হ্রাস বাবদ খরচ বাদে ২৭৬১৲৬ পাই মূল্যের অস্থাবর সম্পত্তি আছে।

স্থাবর সম্পত্তি ও আফিস বাড়ী

১৩৩১ সনের শেষ তারিখ পর্য্যন্ত মোট ১১৯৩৫৴০ আনা মূল্যের স্থাবর সম্পত্তি ছিল। আলোচ্য বর্ষেও তাহাই আছে।

মোকদ্দমা

আলোচ্য বর্ষে বিল অব একস্‌চেঞ্জ মূলে ৩৫৫৲ টাকা, হাণ্ডনোট মূলে ৩০০৲ শত টাকা, সাধারণ খত মূলে ২১৮১৲ টাকা ও রেহাণী তমশুক মূলে ১৬৬৫৲ টাকা, মোট ৪৫০১৲ আসল টাকার বাবদ ৩২টী নালিশ দায়ের হইয়া ২৬টী ডিক্রী হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ডিক্রীর টাকা সহ আলোচ্য বর্ষে সর্ব্বপ্রকারে আসল মোট ৬৫৩৩৲৩ পাই আদায় হইয়া মোট ৯,৪০৪॥৯ পাই নালিশে আছে। আলোচ্য বর্ষে ৬টী মোকদ্দমা আদালতে দায়ের ছিল তাহা ১৩৩৩ সনে ডিক্রী হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত কামিনীকান্ত ভট্টাচার্য্য সুপারভাইজার মহোদয় মোকদ্দমা সেরেস্তায় কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন এবং তাঁহার চেষ্টায় ও একাগ্রতায়ই বহু টাকা আদায় হওয়া সম্ভবপর হইয়াছে।

লভ্য বিভাগ

আদায়ী লভ্য হইতে সর্ব্বপ্রকার খরচ বাদে মোট ২০,০৯৬ ৷৶৩ পাই নিট্ লাভ হইয়াছে। তন্মধ্যে ১০,০০০৲ দশ হাজার টাকা রিজার্ভ ফণ্ডে রাখিয়া বক্রী ১০,০৯৬৸৶৩ পাই ও গত বৎসরের উদ্বৃত্ত লভ্য ৫১৮৶৩ পাই, মোট ১০৬১৫৲৬ পাই মধ্যে শতকরা ১০৲ টাকা হারে ১০,০০০৲ দশ হাজার টাকা ডিভিডেণ্ড দেওয়া ডিরেক্টরগণ অনুমোদন করেন, এবং ৬১৫৲৬ পাই আগামী বর্ষের জন্য উদ্বৃত্ত তহবিল রাখা ডিরেক্টরগণ সঙ্গত মনে করেন।

ডিরেক্টর সভা

আলোচ্য বর্ষে হেড আফিসে মোট ২৮টী সভা আহূত হইয়া ২৮টী সভারই অধিবেশন হইয়াছে এবং ব্রাঞ্চ আফিসে তিনটী সভার অধিবেশন হইয়াছে।

অডিটর

গভর্ণমেণ্ট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অডিটর শ্রীযুক্ত বীরভদ্র চৌধুরী মহাশয় আলোচ্য বর্ষে কোম্পানীর হিসাব বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়াছেন।

ইন্‌স্পেক্সন

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঘটক হেড আফিসের ও শ্রীযুক্ত অক্ষয়কৃষ্ণ বসু এম, এ, বি, এল, সেরপুর ব্রাঞ্চ আফিসের যাবতীয় হিসাবপত্র ও দলীলাদি বিশেষ ভাবের পরীক্ষা করিয়াছেন।

আফিস বাড়ী

আফিস বাড়ী সুদৃঢ় প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত এবং সম্পত্তি ও দলীলাদি রাখার জন্য পাকা সুদৃঢ় কোষাগার আছে। ব্রাঞ্চ আফিসের জন্য একটি উৎকৃষ্ট ও সুদৃঢ় দালান বার্ষিক ৪০০৲ চারিশত টাকা ভাড়ায় আছে। উভয় আফিসেই বন্দুক ও রীতিমত পাহারা দেওয়ার বন্দোবস্ত আছে। স্থানীয় কো-অপারেটিভ টাউন ব্যাঙ্ক ও কো-অপারেটিভ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক রীতিমত ভাড়া দিয়া এই কোম্পানীর কোষাগারে তাহাদের নিজ নিজ লোহার সিন্দুকে ৪।৫ বৎসর অবধি তাহাদের টাকা রাখার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত এই মহকুমার বহু লোন আফিস ও ব্যাঙ্ক এই কোম্পানীকে ব্যাঙ্কার নিযুক্ত করিয়াছেন।

সেরপুর ব্রাঞ্চ আফিস

আলোচ্য বর্ষে সেরপুর ব্রাঞ্চ আফিসের কার্য্য অতিশয় সন্তোষজনক হইয়াছে। এডভাইসরী বোর্ডের মেম্বর মহোদয়গণ সকলেই বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত কার্য্যদক্ষ লোক। তাঁহারা আফিসের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমে বিশেষ যত্ন লইয়াছেন। তজ্জন্য ডিরেক্টর বোর্ড তাহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

মন্তব্য

(ক) এই কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর বহু কষ্ট ও আয়াস স্বীকার করিয়া কোম্পানীর উন্নতিকল্পে কলিকাতায় যাইয়া কো-অপারেটিভ হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক লিমিটেডের সহিত এই কোম্পানীর একটী সুবিধাজনক বন্দোবস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। উক্ত বন্দোবস্তমূলে এই কোম্পানী ম্যানেজিং ডিরেক্টর মহোদয়ের ব্যক্তিগত গ্যারাণ্টিতে ১৬২৫০৲ টাকা এবং স্থায়ী আমানতের দ্বারা আরও ২৩৭৫০৲ টাকা একুনে ৪০,০০০৲ চল্লিশ হাজার টাকা কো-অপারেটিভ হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক হইতে ওভার ড্রাফ্‌টের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং তদনুসারে কার্য্য চলিতেছে। কলিকাতা কো-অপারেটিভ হিন্দুস্থান ব্যাঙ্কের সহিত ময়মনসিংহ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কিং সংস্রব থাকায় এই কোম্পানী উক্ত উভয় ব্যাঙ্কের সাহায্যে চেক দ্বারা কলিকাতায় হুণ্ডির কারবার চালাইতে সমর্থ হইয়াছেন এবং হেড আফিস ও ব্রাঞ্চ আফিসে বর্ত্তমানে হুণ্ডির কারবার চলিতেছে। ম্যানেজিং ডিরেক্টর মহোদয় কোম্পানীর উন্নতিকল্পে কো-অপারেটিভ হিন্দুস্থান ব্যাঙ্কে স্বয়ং দায়িত্ব গ্রহণপূর্ব্বক গ্যারাণ্টি ফরম বিনা দ্বিধায় সম্পাদন করিয়া দিয়া কোম্পানীর প্রতি তাঁহার সম্যক শ্রদ্ধা ও নির্ভরতা প্রদর্শন করিয়াছেন তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ।

(খ) সরিষাবাড়ী ব্যাঙ্ক এণ্ড লোন আফিস লিমিটেড্, দেওয়ানগঞ্জ ব্যাঙ্ক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী লিমিটেড, মেলান্দহ লোন আফিস লিমিটেড্, বালিজুরি লোন আফিস লিমিটেড, ইউনিয়ন লোন কোম্পানী (জামালপুর) লিমিটেড্, খড়মা লোন আফিস লিমিটেড, সেরপুর দয়াময়ী ব্যাঙ্ক এণ্ড লোন আফিস লিমিটেড, কেন্দুয়া কালীবাড়ী লোন আফিস

লিমিটেড, বাউসী লোন আফিস লিমিটেড্, প্রভৃতি এই কোম্পানীকে ব্যাঙ্কার নিযুক্ত করিয়াছেন।

(গ) রংপুর লোন আফিস লিমিটেড্, বদরগঞ্জ লোন আফিস লিমিটেড, গাইবান্ধা লোন আফিস লিমিটেড্, গাইবান্ধা ব্যাঙ্ক লিমিটেড্, নওখিলা লোন কোম্পানী লিমিটেড, কিশোরগঞ্জ লোন আফিস লিমিটেড্, নেত্রকোণা লোন আফিস লিমিটেড, নসিরাবাদ লোন আফিস লিমিটেড, কিশোরগঞ্জ ইষ্ট বেঙ্গল রুরাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড্, দিনাজপুর ট্রেডিং এণ্ড ব্যাঙ্কিং কোম্পানী লিমিটেড, দিনাজপুর আঞ্জুমান ট্রেডিং এণ্ড ব্যাঙ্কিং কোম্পানী লিমিটেড্, নান্দিনা ব্যাঙ্ক এণ্ড কমার্স লিমিটেড্, জামালপুর চিত্তরঞ্জন ব্যাঙ্ক লিমিটেড্, রংপুর নর্থ বেঙ্গল ব্যাঙ্ক আফিস লিমিটেড্, দেওয়ানগঞ্জ লোন কোম্পানী লিমিটেড্, গোপালপুর লোন আফিস লিমিটেড্, জলপাইগুড়ি ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন লিমিটেড্, গৌরীপুর লোন আফিস লিমিটেড্, পোরজানা লোন আফিস কোম্পানী লিমিটেড্, কলিকাতা কো-অপারেটিভ হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক প্রভৃতি কোম্পানী এই আফিসের প্রতি সহযোগিতা প্রদর্শন করায় তাঁহাদিগকে ডিরেক্টরগণ আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

পঞ্চান্ন গ্রামের পোদ, বাগদী ও অন্যান্য জাতি

(আর্থিক নৃতত্ত্ব)

শ্রীহরিদাস পালিত

(৩)

তিয়র মৎস্যজীবী জাতি। এ জাতি ভাগে ভেড়ী করে। ইহারা কিঞ্চিৎ দক্ষিণ হইতে আসিয়া ভেড়ীওয়ালাদিগের ভেড়ী ভাগে বন্দোবস্ত করিয়া লয় ও কয়েক মাস অবস্থান করে এবং যথাসময়ে শ্রীপঞ্চমীর পর ভেড়ীর কার্য্য শেষ করিয়া স্ব স্ব গ্রামে চলিয়া যায় এবং তথায় কৃষিকার্য্যাদি করে।

কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী ভেড়ী বা লোনা জলার আদর অধিক, কারণ এই সকল ভেড়ীর মাছ কলিকাতায় প্রাতে ও সন্ধ্যায় বিক্রয় করা চলে। কলিকাতা হইতে দূরবর্ত্তী পূর্ব্ব ও পূর্ব্ব-দক্ষিণ অঞ্চলের জলার মাছ কলিকাতায় আনয়নের সুবিধা নাই। সুতরাং জমীদারগণ উক্ত অঞ্চলের জলাভূমিগুলিকে উচ্চ বাঁধ দিয়া, যাহাতে লোনা জল প্রবেশ করিতে না পারে তদুপযুক্ত বন্দোবস্ত করিয়া ধান্যক্ষেত্রে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। তথায় কেবল ধান্য ও সব্জী হয়। তিয়র, পোদ, মোসলমানগণ উক্ত অঞ্চলে চাষ-বাসের জন্য কলিকাতার পারিপার্শ্বিক পল্লী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। তিয়রগণ প্রাচীন ব্যবসা ত্যাগ করে নাই তাহারা ধানের চাষ ও মাছের চাষ করিয়া সময়ের সদ্ব্যবহার দ্বারা উন্নতি করিতেছে। এই জাতির মধ্যে এবং কেওট কাওড়াদের মধ্যে কতক লোক খৃষ্ট ধর্ম্মও গ্রহণ করিয়াছে।

(৪)

ভাসা বৈদেশিক জাতি। এ জাতি দক্ষিণ পশ্চিম হইতে আগত। ইহা মেদিনীপুর অঞ্চলের বন্য জাতিবিশেষ। ইহারা বলে জলপ্লাবনে এদেশে ভাসিয়া আসিয়াছে। অনেকে বলে ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় দেশত্যাগ করিয়া এতদঞ্চলে আসিয়াছে। ইহাদের কথিত ভাষা উড়িয়া ভাষার সহিত বিজড়িত। গৃহে ইহারা মাতৃভাষায় কথোপকথন করে এবং সাধারণের সহিত কেওট ও কাওড়াদের ভাষার ন্যায় হীন বঙ্গভাষা ব্যবহার করে। এ জাতি প্রকৃত হিন্দু নহে বর্ত্তমানে হিন্দু হইয়াছে।

ইহারা মুখ্যভাবে মৎস্যজীবী নহে। ইহারা সামান্য কৃষি করে এবং মৎস্যের ব্যবসাও অল্প-স্বল্প করে; মাটী-কাটার কাজও করিয়া থাকে। ইহারা কৃষির সময় কৃষিকার্য্য এবং

অন্য সময়ে মাটী-কাটার কার্য্য করে। স্ত্রীলোকেরা মাছ ও কাঁকড়া ধরে এবং বিক্রয় করে।

এই জাতি দলবদ্ধভাবে ক্ষুদ্র পল্লীতে বাস করে। ইহাদের অবস্থা অনুন্নত, সংখ্যার হ্রাস ব্যতীত বৃদ্ধি নাই। অন্য কোন ব্যবসা-ই ইহারা অবলম্বন করে নাই। পূর্ব্বে ইহারা মৎস্যের ব্যবসা করিত, কিন্তু ভেড়ীর দর-বৃদ্ধি হওয়ায় বাব বার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া চাষ ও মজুরী অবলম্বন করে। পূর্ব্বের তুলনায় ইহারা দরিদ্র হইয়াছে। এজাতি অলস নহে, মাটির কার্য্যের দ্বারা সংসারযাত্রা একরূপ সচ্ছল করিয়া রাখিয়াছে। এই জাতির বৃদ্ধি বা উন্নতি যেন স্তিমিত হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে ইহারা পতন ও উত্থানেব মধ্যস্থলে অবস্থিত রহিয়াছে। সংখ্যায় ইহারা নগণ্য।

(৫)

বুনো—ইহারা সুদূর পশ্চিম অর্থাৎ মানভূম, পুরুলিয়া হইতে সমাগত কর্ম্মঠ জাতি। ইহাদের ভাষা সাঁওতালী বা প্রায় তদনুরূপ। গৃহে ইহারা মাতৃভাষায় কথোপকথন করে। স্বজাতি ব্যতীত অপর জাতির সহিত. কথোপ-কথনের সময় কাওড়াদের ভাষা মিশ্রিত বঙ্গভাষা ব্যবহার করে। সাঁওতালী সভ্যতা ইহাদের মধ্যে এখন বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহারা প্রকৃত হিন্দু নহে, বর্ত্তমানে হিন্দু হইয়াছে।

মাটির কার্য্য ইহাদের প্রধান অবলম্বন। এই জাতির মত মাটির কার্য্য এতদঞ্চলে অন্য কোন জাতি করিতে পারে না। পোদগণও মাটির কার্য্য করে, কিন্তু তাহারা ইহাদের সমতুল্য নহে। ভাসা জাতি পোদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও বুনোদের ন্যায় মাটির কার্য্যে দক্ষ নহে।

বুনোরা পূর্ব্বোক্ত জাতির ন্যায় হাঁস, ছাগল ইত্যাদি পালন করে, মুরগী পোষে ও ডিম বিক্রয় করে এবং মৎস্যাদির ব্যবসা অতি সামান্যরূপ করে। স্ত্রীলোকেরা মাছ ও কাঁকড়া ধরে এবং বিক্রয় করে। পুরুষেরা মাছ ধরে, ভেড়ীতে মাটির কার্য্য ও মজুরী করে এবং ভেড়ীদারদের মাছ ধরিয়া দেয়। কোদাল ইহাদের একমাত্র জীবিকা। ইহারা সামান্য চাষ করে, তন্মধ্যে ধান্যের চাষই প্রধান। যাহা উৎপন্ন হয়, তদ্বারা কাহারও সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ হয় না। এতদ্ব্যতীত তরিতরকারীও সামান্য চাষ করে। অন্য কোন প্রকার ব্যবসা ইহারা করে না।

পূর্ব্বে এই জাতি যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিল। তখন যথেষ্ট কৃষিক্ষেত্র ছিল। ক্রমে যখন ভূস্বামীরা কৃষি-ভূমির খাজনাব আয অপেক্ষা জলা বা ভেড়ীর আয় অত্যধিক দেখিয়া অধিকাংশ কৃষিক্ষেত্রগুলিকে লোনা জলায় পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিলেন, তখন হইতে এই কৃষিপ্রধান জাতি মাটির কার্য্য ব্যতীত অন্য কার্য্য না পাইয়া দবিদ্র হইয়া পড়িযাছে। বর্ত্তমানে এই জাতি ক্রমশঃ সংখ্যায় হ্রাস পাইতেছে এবং ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

এই ক্ষুদ্র জাতি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণী বরাহভোজী অপব শ্রেণী বরাহভোজী নহে। সুতরাং নারী-গ্রহণ ব্যাপারে উভযের মধ্যে ঐক্য না থাকায় বংশ-বৃদ্ধির ব্যাঘাত-নিবন্ধন ইহাদের বংশ-বৃদ্ধি নাই।

(৬)

বাগদী দুই শ্রেণীর—কুশমেটে ও তেঁতুলে। ইহারা বৈদেশিক জাতি, এ অঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসী নহে। ইহারা উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চল হইতে আগত এবং নিতান্ত অলস ও শ্রম-কাতর।

বাগদী মৎস্যজীবী। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা শ্রমশীলা। স্ত্রীপুরুষে মিলিত ভাবে মাছ, কাঁকড়া ধরে এবং বাজারে বিক্রয় করে। পুরুষেরা সামান্য মাটির কার্য্যও করে এবং ঘরামিব কার্য্য করিয়া থাকে। ইহারা যাহা আয় করে তাহাই প্রায় মাদক দ্রব্যে ব্যয় করে। সাধারণতঃ রমণীরাই সংসার চালায়। ইহারা দাসত্বও করে। সকল জাতি অপেক্ষা এই জাতি দরিদ্র। ইহাদের ভেড়ী বা জলা নাই; সাধারণ জলায় জমীদারকে জালপ্রতি নির্দ্দিষ্ট কর দিয়া কিছু কিছু মাছ ধরে। বাসস্থান অতি অপরিষ্কার ও নিতান্ত হীন। গৃহে এক বেলার মত খাদ্য থাকিলে পুরুষেরা কোন কর্ম্মে বাহির হয় না। এই জাতি ধ্বংসোন্মুখ জাতিসমূহের অন্যতম।

(৭)

মোসলমান স্থানীয় নিম্ন জাতি হইতে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে। এই জাতি কৃষিপ্রধান ও ব্যবসায়ী। শুট্‌কী মাছ, ঘাস, খড়, গোলপাতা, হোগলা, ঝিনুক, জোমড়া কস্তুরো ইত্যাদির ব্যবসা প্রায় এই জাতির একচেটিয়া হইয়াছিল।

স্বদেশী, পশ্চিমা এবং পূর্ব্বদেশী, এই তিন শ্রেণীর মোসলমান বাদায় বাস করে। স্বদেশীরা কথঞ্চিৎ অলস। ইহাদের অধিকাংশ কৃষিকার্য্য করে ও তরিতরকারীর আবাদ করে। পূর্ব্বদেশী মোসলমানগণ বাদা হইতে হাঁস, মুরগী, ছাগল, ডিম ক্রয় করিয়া কলিকাতার বাজারে বিক্রয় করে এবং নৌকার মাঝি বা দাঁড়ীর কার্য্য করে। তাহারা প্রায় চাষ করে না।

খোট্টা বা অবিশুদ্ধ হিন্দীভাষাভাষী পাটনাই ও ভাগলপুরী মোসলমানগণ এদেশে আগমনপূর্ব্বক সুন্দর, গরাণ, গেঁও প্রভৃতি কাঠ, গোলপাতা, হোগলা, দরমা, নলখাগড়া, খড় (বিচালী) উলু, শুষ্ক ঘাস, ঝিনুক, জোমড়া, কস্তুরো এবং গরু-বাছুর (কসাইখানার জন্য) ক্রয় বিক্রয় করে। ইহারা ঝিনুক পোড়ায় এবং চুণ প্রস্তুত করে। ইহারা সকলেই এদেশের অধিবাসী নহে, কতক কতক এদেশে বাস করিয়াছে এবং করিতেছে। এদেশে ইহারাই কাঁচা চামড়ার ব্যবসা করে; তা ছাড়া কাপড় ও কাটা কাপড়ের দোকান করে এবং মনোহারি জিনিষ ফেরি করে। কেহ অলসভাবে কাল কাটায় না। এই শ্রেণীর মোসলমানেরা ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে। ইহারা দেশীয় মোস্‌লেম নারীর সহিত বিবাহাদি সূত্রে আবদ্ধ হইয়া এদেশী মোসলমানের সংখ্যা বর্দ্ধিত করিতেছে।

বাদার দেশী মোসলমানগণ হাটে বাজারে চাউল, ধান, খেজুর ও তালের গুড় বিক্রয় করে। পোদ ও বুনোদের সহিত মাটিকাটার কাজও করে। ইহারা পশ্চিম দেশাগত মুসলমান হইতে ক্রমশঃ দরিদ্র হইতেছে। ইহাদের জমিজমা ক্রমশঃ পশ্চিমাগত মোসলমানগণের হস্তগত হইতেছে। দেশী মোসলমানগণ দুর্ব্বল ও নির্ধন হইয়া যাইতেছে। ক্রমেই এ শ্রেণী হ্রাস পাইতেছে অথবা পশ্চিমা মোসলমানের মধ্যে বিলীন হইয়া যাইতেছে।

পূর্ব্বদেশী মোসলমান মাঝি-মাল্লা-ফেরিওয়ালারা ক্রমশঃ বাদায় বাস করিতেছে এবং এদেশী মোসলমান রমণীর সহিত বিবাহ ও নিকা দ্বারা নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতেছে। এই উন্নতিশীল জাতি একে একে পৃথক পৃথক ব্যবসা অবলম্বন করিতেছে। ইহারা গুড়, তরিতরকারী, কলা, পেঁপে প্রভৃতির ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছে। ফেরিওয়ালার কার্য্যই ইহারা বেশী পছন্দ করে।

পশ্চিমদেশী মোসলমান ও পূর্ব্বদেশী মোসলমান প্রধান স্থান অধিকারে ব্যগ্র হইয়াছে। তাড়ির দোকানগুলি পশ্চিমাগণের একচেটীয়া হইয়াছে। এই জাতিরাই ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে।

(৮)

খ্রীষ্টান—নিম্ন হিন্দু হইতে যাহারা খ্রীষ্টান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহারা পূর্ব্বের জাতীয় ব্যবসা পরিত্যাগ করিতেছে, এবং শিক্ষার দিকে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। ইহারা বিবিধ শিল্পকর্ম্ম ও চাকরী করিতেছে; কিন্তু কোন কর্ম্মেই সুদক্ষ হইতে পারে নাই। ইহারা টিন দ্বারা খেলনা, মগ, বালতি, পোর্টমেণ্ট ইত্যাদি তৈরী করার এবং শেলাই কর্ম্ম ইত্যাদির শিক্ষানবিশী করিতেছে। ইহারা দরিদ্র অথচ কৃষিকার্য্য করে না বা কৃষিকার্য্যে ইহাদের লক্ষ্য নাই। সকলেই চাকরীর জন্য লালায়িত। স্ত্রীলোকেরা কর্ম্মহীনা। অবস্থা অতীব হীন।

(৯)

সাধারণ হিন্দু জাতি কৃষিকর্ম্ম করে বটে, কিন্তু ভাগে বা পরের দ্বারা। অনেকেই চাকরীজীবী, ব্যবসাদারের সংখ্যার ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে। মাড়োয়ারী প্রভৃতি জাতি কাপড়ের ব্যবসা এবং মুদিখানা প্রায় পনর আনা দখল করিয়াছে। ধান চাউল ইত্যাদি ভুষিমাল ঐ জাতিরাই ক্রয়-বিক্রয় করিতেছে। বাঙ্গালী ডাক্তারী, মোক্তারী ওকালতী ও কেরাণীগিরি করিতে দৌড়িতেছে। ইহারা অবস্থায় ক্রমশঃ হীন ও সংখ্যায় ক্ষীণ হইতেছে। মুখ্যরূপে ইহাদের কোনো ব্যবসা নাই সুতরাং কর্ম্মহীন হইয়াছে।

(১০)

উড়িয়ারা ভদ্রলোকের বাগান-বাগিচা জমা লইয়া কৃষিকার্য্য করিতেছে। শাকসজী ও ফলমূল উৎপাদন ব্যতীত, বাদা অঞ্চলে অন্য বিশেষ কোনো কার্য্যই ইহারা করে না। কিন্তু ইহারাই বাদায় ধান পাকিলে দলে দলে ধান কাটিয়া দেয়। এই কর্ম্মটী উড়িয়ারা প্রায় দখল করিয়াছে। নিম্নশ্রেণীর ধীবরজাতীয় উড়িয়ারা বাদার মাছ ভেড়ী প্রভৃতি স্থান হইতে লইয়া সহরে এবং সহরসন্নিকটস্থ পল্লীতে বিক্রয় করিতেছে। এই প্রকারে উড়িয়াপল্লী প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হইয়াছে।

বিদেশী জাতিরা বাদায় প্রবেশ করিয়া বাদার অধিবাসীদিগকে ধীরে ধীরে বলহীন ও কর্ম্মহীন করিয়া তাহাদের কার্য্যগুলি দখল করিতেছে এবং উদ্বর্ত্তিত হইতেছে।

রুশিয়ার ঘরের খবর

(১) ষ্টালিনের বক্তৃতা

বিগত ২২শে জুলাই, জিনোভীফ রুশিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্র-সমিতি হইতে বিতাড়িত হন। ঐ সমিতির অধিবেশনে ষ্টালিন তাঁহার বক্তৃতার শেষভাগে বলেন,—

"আমাদের নিজের ঘরে কত না বাধা-বিপত্তির সহিত লড়াই করিতে হইতেছে। তার উপর আমাদের সকল চেষ্টাকে বিফল করিয়া দিবার জন্য কতকগুলি মতবাদীর উদ্ভব হইয়াছে। ইহারা কাগজে কলমে আমাদের ভুলচুক বাহির করিতে সর্ব্বদাই ব্যস্ত। হ্যান করিব, ত্যান করিব ইত্যাদি বড় বড় কথাও ইহারা বলিয়া থাকে। কিন্তু কাজের বেলা ইহাদের টিকিও খুঁজিয়া পাই না।

"এরা শুধু আপন দলের ঐক্যবন্ধন ভাঙ্গিতেই সচেষ্ট নয়, আমাদের যত কিছু অতীত ভ্রম-প্রমাদ অনেক বড় করিয়া জগতের লোকের সাম্‌নে ধরিতেছে। আর পরদিন ভোরে উঠিয়া পুঁজিপতিদের কাগজগুলি খুলিয়া দেখিতেছি—'জবর খবর! আত্ম-কলহে সোভিয়েট রুশিয়া এইবার রসাতলে গেল।'

"এ ধরণের লোকেরা বিরক্তিকর। এরা আমাদের নীরব কাজে সর্ব্বদা বাধা দিতেছে। কিন্তু তবু এরা চরম অনিষ্টকারী নয়। আমাদের পার্টি-সভাগুলিতে ছোট—অতি ছোট—একটা নগণ্য দল আছে। তার কর্ত্তা হইতেছে এই জিনোভীফ্ (আঙ্গুল দ্বারা দেখাইয়া দিলেন)। এর মত অনিষ্টকারী আর কেহ নয়।"

"এই ব্যক্তি (আবার জিনোভীফকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইলেন) এমন নির্ব্বোধের মত যেখানে-সেখানে যা-তা বলিয়া বেড়াইতেছে যে, চারি চারিটা বিদেশী শক্তির সহিত বোঝাপড়া করিতে গিয়া আমরা অকৃতকার্য্য হইলাম। অথচ উহাদের নিকট হইতে ঋণ অথবা বাণিজ্য দ্রব্য আমদানি না করিলে আজিকার দিনে রুশিয়ার টিকিয়া থাকা অসম্ভব।

"এই ব্যক্তি আমাদের প্রিয়তম মৃত নেতার সঙ্গে সঙ্গে ছিল। এটা তার পক্ষে মস্ত বড় একটা পুঁজি হইয়াছে এবং তারই সুযোগ লইয়া এমন অবস্থা করিয়াছে যে, আজ সমগ্র জগৎ রুশিয়ার সঙ্গে লেন-দেনের কথায় ভয় পায়। একমাত্র এই লোকটীর জন্য ইংল্যণ্ডের সহিত আমাদের রফাটা ব্যর্থ হইয়া গেল। ইহার নির্ব্বোধের মত কাজ ও কথাবার্ত্তায় আমাদের প্রতি আমেরিকার সব সহানুভূতি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তারাও আর "জগৎ-জোড়া বিদ্রোহ" চায় না।

"আর না! রক্ষা কর! ওকথা যথেষ্ট হইয়াছে। ঐ নির্ব্বোধ মতবাদ দূর করিয়া দাও। দেশবিদেশে যত যত নির্ব্বোধের রাজা আছে, যারা ভাবে তারা ইচ্ছা করিলেই কোটি কোটি লোককে পুঁজির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করিতে পারে, তাদেরকে অর্থহীন প্রলাপপূর্ণ চিঠি লেখা—যথেষ্ট হইয়াছে।

"ঐ লোকটী (আবার জিনোভীফকে দেখাইলেন) আজ জগৎশুদ্ধ প্রত্যেক সোশ্যালিষ্টকে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়াছে।"

"সে আমাদের শাসন ব্যাপারটাকে ইংরেজ সোশ্যা-লিষ্টদের কাছে একটা অস্পৃশ্য ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছে।

"সে আমাদিগকে সমস্ত জগতের কাছে হাস্যাস্পদ করিয়াছে। কি জন্য শুনি।

"আমরা রুশিয়াকে চিনি। আমরা রুশিয়ার মন জানি বলিয়াই আমাদের বিদ্রোহ অব্যর্থ হইয়াছিল।

"কিন্তু আমরা কি আমেরিকার হাটের মানুষের মন জানিতাম?

"আমরা কি ইংরেজ মজুরের মন জানিতাম?

"না, আমরা তা জানিতাম না।

"কিন্তু এই লোকটীর কৃপায় (জিনোভীফকে দেখাইয়া) আমরা তাও বেশ করিয়া জানিলাম। প্রত্যেক ব্যবসায়ী দেশের মজুরদের মন জানিতে পারিলাম। জানিলাম তারা আমাদের বিরোধী।

"এই লোকটীকে আর অবহেলা করা চলে না। এর এই সমস্ত সর্ব্বনেশে কাজকর্ম্ম বন্ধ করিয়া দিবার সময় আসিয়াছে। আর সময় আসিয়াছে সেই সমস্ত লোককে দূর করিয়া দিবার, যারা অস্থায়ীভাবেও আবার অপবিত্র পুঁজির পোঁ ধরিতে বসিয়াছে—যেমন এই ব্যক্তি (এইবার আঙ্গুল দিয়া ট্রট্‌স্‌কিকে দেখাইলেন)।

"যেখানে জ্ঞান এবং বিচারবুদ্ধিতে কুলায় না, সেখানে কথা বলিবার আর সীমা নাই। খালি কথা আর কথা! শেষে আমাদের মুচির ছেলে মাথা ঘুরিয়া মরে আর কি। যেন কোন কলেজ অধ্যাপকের অথবা বৈজ্ঞা-নিকের কথা শুনিতেছি। আমি তার এক বর্ণও বুঝিতে পারি না।

"তবে কি করিব? জারকে কি ডাকিয়া আনিব? না।

"সোভিয়েট রুশিয়ার যুক্ত রিপাবলিকগুলির সোজা পথ পড়িয়া রহিয়াছে। আমরা 'জগৎ বিদ্রোহীদের' নির্ব্বোধ বুলিও শুনিব না, নিরাশাবাদী ভবিষ্যদ্বক্তাদের কথাও কানে নিব না—সোজা পথে বিজয়-গর্ব্বে চলিয়া যাইব।"

(২) "আমরা যুদ্ধ করিব"

ষ্টালিন তাঁর বক্তৃতায় বলিতেছেন, সব দেশের মজুররা তাঁদের বিরোধী। কিন্তু মস্কোর "প্রাফদা" কাগজ শ্রীযুক্ত ল্যান্সবারীর (বিলাতী পার্লামেণ্টের মজুর সভ্য) এক বক্তৃতা ছাপাইয়াছে। তাহাতে তিনি টোমস্কীর সভাপতিত্বে এইরূপ বলিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ :—

"আপনাদের দেশে প্রথম যখন পদার্পণের পর সৌভাগ্য বশতঃ আপনাদের এবং আমাদেরও নেতা লেনিনের সহিত আমার চূড়ান্ত কথাবার্ত্তা হয়, তখন হইতেই আমি স্থির ভাবে জানি রুশিয়ার বিদ্রোহ-ভার উপযুক্ত লোকদের হাতেই ন্যস্ত রহিয়াছে।

"বৃটেনের মজুররা ভাল করিয়া জানে যে, শেষকালে একটা লড়াই করিয়া তাদের উদ্দেশ্য ও কাজ হাসিল করিতে হইবে। কেহ কেহ মনে করে, নির্ব্বিরোধ শান্তিতেও আমরা যা চাই তা পাইব। কিন্তু তা যদি সম্ভব না হয়, আমরা যুদ্ধ করিব। আমি দেশের সমস্ত মজুর-সৈনিকের সহিত একযোগে যুদ্ধ করিব, যেন উন্নততর ও স্বাধীনতর জীবন-যাপন সম্ভব হয়।"

শ্রীযুক্ত টোমস্কী সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়নের নেতাদের সঙ্গে আমাদের মিলনের এই ত শুভ মুহূর্ত্ত উপস্থিত।"

(৩) অন্য দিকের ছবি

অনেকে বর্ত্তমান রুশিয়ার অবস্থা অত্যন্ত মসীবর্ণে চিত্রিত করিয়াছিল। এ বিষয়ের উল্লেখ ষ্টালিনের বক্তৃতাতেও আছে। কিন্তু অন্যপ্রকার কথাও যে কেহ কেহ বলেন তাহা নিম্নলিখিত অ-রুশ উক্তি হইতে পওয়া যাইবে—

"এইমাত্র আমি সোভিয়েট ইউনিয়নের চারিদিকে ৪০০০ মাইলের ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া ফিরিলাম। 'ডেলি মেল' কাগজের একখণ্ড হাতে লইয়া দেখি সেখানে নাকি 'উক্রেণিয়ায় বিদ্রোহ', 'মস্কোর রাস্তাঘাটে লড়াই" এবং আরো অনেকানেক রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটিতেছে। অমনি আমার সেই সব দিনের কথা মনে পড়িল যখন সন্ধ্যাকালে দুইবার করিয়া লেনিন ট্রট্‌স্‌কীকে অথবা ট্রট্‌স্‌কী লেনিনকে কয়েদ করিত।

"আমি ভোল্গা নদীর তীরে তীরে শামারা শহর, শারাটোভ, ও ষ্টালিনগ্রাড শহর, উত্তর ককেশাস্ অতিক্রম করিয়া ককেশাস্ পর্ব্বত উত্তীর্ণ হইলাম। তারপর বাটুম্, টিফ্লিস ও বাকু (এগুলি জর্জিয়াতে) ও আজেরবাইজানের মধ্য দিয়া চলিলাম। ফিরিবার পথে উক্রেণিয়ার রোস্তোভ ও মার্কোভোর মধ্য দিয়া আসিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয়, বিলাতী কাগজগুলিতে প্রকাশিত বিদ্রোহ, ধরপাকড়, যুদ্ধ-বিগ্রহের চিহ্নও কোন স্থানে দেখিতে পাইলাম না।

"যা দেখিতে পাইলাম তা হইতেছে—সোভিয়েট বন্দরগুলি মাল-চলাচলে গমগম করিতেছে, সুখী মজুররা স্বাস্থ্যকর স্থানে বেড়াইতে আসিতেছে, আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড উর্ব্বর ক্ষেত্রে সন্তুষ্টচিত্ত কৃষকেরা স্বর্ণপক্ক শস্যগুলি স্তূপাকার করিয়া সাজাইতেছে। আর দেখিলাম ডোনেটজ বাসিনে হাজার জলন্ত চিমনীর ধূম উপরে উঠিতেছে।"

(৪) কৃষি বনাম বাণিজ্য

ইউরোপের কাগজগুলি বলিতেছে, "রুশিয়ার ব্যাপার সঙ্গীন হইয়া উঠিল দেখিতেছি! জিনোভীফ দেশের পক্ষে অমঙ্গলের প্রতিমূর্ত্তি বুঝিতে পারি। উহার জন্য রুশিয়াকে যে কিরূপ আর্থিক ক্ষতি সহিতে হইয়াছে, তা অবর্ণনীয়। সকল দেশকে চটাইয়া দিয়াছে। কে আর রুশিয়াকে সাহায্য করে?"

"সুতরাং ট্রট্‌স্‌কি যখন উহার বিরুদ্ধে কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইলেন, আমরা ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলাম ও আনন্দিত হইলাম। জিনোভীফ তাড়িত হইল। আপদ্ বিদায় হইল। কিন্তু এখন দেখিতেছি স্বয়ং ট্রট্‌স্‌কিও বিতাড়িত। আমরা ইহার অর্থ বুঝিতেছি না। যার পর নাই বিস্মিত হইয়াছি।"

একজন ইংরেজ সংবাদদাতা লিখিতেছেন, "অল্প কয়েক জন মাথা-পাগ্‌লা লোক ছাড়া (জিনোভীফ এই দলের) আজ আর রুশিয়ার কোন নেতা জগৎ-জোড়া বিদ্রোহের স্বপ্ন দেখে না। সত্য বটে একদল লোক প্রকৃতই মনে করে, জগৎব্যাপী বিদ্রোহ ব্যতীত সোভিয়েট রাজত্ব টিকিবে না। কিন্তু ইহারা সংখ্যায় অত্যন্ত অল্প ও প্রভাবে নগণ্য।

"ঝগড়াটা বাঁধিয়াছে একদম ঘরের ব্যাপার লইয়া। তার সঙ্গে অন্য দেশের সম্পর্ক নাই। বিবাদটা হইতেছে সমাজে চাষীদের স্থান কি হইবে এই লইয়া। অর্থাৎ সেই মান্ধাতার আমলের কথা—দেশের পক্ষে কৃষি বেশী মঙ্গলজনক না বাণিজ্য—ঘুরিয়া নূতন বেশে দেখা দিয়াছে।"

আমাদের দেশেও এ প্রশ্ন লইয়া এই বিংশ শতাব্দীতে নিত্য ঝগড়া চলিতেছে। সুতরাং রুশিয়ার কথাটা ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিলে আমাদের হয়ত উপকার হইতে পারে।

রুশিয়াতে মোটামুটি দুই দল দাঁড়াইয়াছে। এক পক্ষ চাষীদের সহায়, অন্য পক্ষ মজুরদের সহায়। বিদ্রোহের পর ব্যবসা-বাণিজ্যের চেয়ে কৃষি অনেক তাড়াতাড়ি রুশিয়াতে উন্নত অবস্থায় পৌছিয়াছে। ফলে রুশিয়ার কৃষক আজ মজুরদের চেয়ে অনেক ভাল খাওয়া-পরা পাইয়া হৃষ্ট-পুষ্ট হইতেছে ও সন্তুষ্ট আছে।

ইহাতে জিনোভীফ এবং তাঁর বন্ধুরা শঙ্কিত হইয়া বলিতেছেন, "এ লক্ষণ ভাল নয়। ইহারা ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিতেছে। পরে আর আমাদের মানিবে না। সুতরাং ইহাদের উপর কর চাপাইয়া ইহাদের অত্যন্ত বৃদ্ধিটাকে বন্ধ করা হউক। করের শুভ ফল হইবে দুইটা—(১) সেই কর দ্বারা মজুরদের শ্রীবৃদ্ধি করা চলিবে; তারা আর অসন্তুষ্ট থাকিবে না, (২) চাষীদের স্বচ্ছন্দতা একটু কমিলে তাদের বর্ত্তমান ঐশ্বর্য্য-গর্ব্ব দূর হইবে।"

কিন্তু বর্ত্তমান রুশিয়াতে এই মজুরসহায় দল প্রবল নহে। কৃষিসহায় দল অত্যন্ত প্রবল। এমন কি ইহাদের নেতা ষ্টালিন অতি শীঘ্র দ্বিতীয় লেনিন হইয়া উঠিবেন, অনেকে এইরূপ মনে করেন। এই দল বলেন, "সোভিয়েট রাজত্ব বজায় রাখিতে হইলে, চাষীকে সন্তুষ্ট রাখিতেই হইবে। মজুরের শ্রীবৃদ্ধি করিতে গিয়া আমরা এত বড় বিপদ্ ঘাড়ে লইতে রাজী নই।"

ষ্টালিন অত্যন্ত স্পষ্টাস্পষ্টি কথা বলেন। তাঁর মতে, রুশিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য যে ভাল করিয়া মাথা তুলিতে পারিল না, তার প্রধান কারণ সোভিয়েট সরকারের অনভিজ্ঞতা। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেছেন, "বাড়াও,

উৎপাদন আরও বাড়াও। দাম আরো সস্তা হোক্। চাষীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আরো বাড়িয়া যাক্। চাষীরা বুঝুক তাদের একমাত্র মা-বাপ সোভিয়েট ; বুঝুক এত সুখ ও আরাম সোভিয়েট রাজত্ব ভিন্ন অন্যত্র তাদের পক্ষে কখনো সম্ভব নহে। এ যদি তারা বুঝে তবে প্রাণান্তেও সোভিয়েটের বিরুদ্ধাচরণ করিবে না। নহিলে বিরোধী হইবে।"

(৫) নয়া রীতি

১৯২১ সনে লেনিন-কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত "নয়া আর্থিক রীতি"র পর হইতে রুশিয়ার দিব্য দৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছে। কিসে রুশিয়ার "আর্থিক জাগরণ" হয় তাহাই অধিকাংশ কমিউনিষ্ট নেতার ধ্যান-ধারণার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁরা এখনও একথা বলিতে ছাড়িতেছেন না যে, জগতের মুক্তির একমাত্র উপায় কমিউনিজম তার সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিতেছে রুশিয়াকে আর্থিক সভ্যতায় অগ্রণী করিতে।" কৃষি-বাণিজ্যের উত্তরোত্তর উন্নতি চোখে পড়িলেই তাঁরা উল্লাসিত হইয়া বলেন, "আমাদের রাজত্ব দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতেছে।" তেমনি অবনতি দেখিলে তার কারণ খুঁজিয়া তাকে দেশছাড়া করিতে তাঁরা চেষ্টা করেন।

যুক্তরাষ্ট্রে তেজারতির মুনাফা

আজকাল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রই পৃথিবীর মধ্যে ভাগ্যবান। সেখানে বেকার-সমস্যা নাই বলিলেই হয়। মজুরির হারও বেশ উচ্চ এবং দেশের সর্ব্বত্র শ্রমিকদিগের মধ্যে শান্তি বিরাজ করিতেছে।

গত বৎসর অন্যূন প্রায় ৯৪টি কর্পোরেশন এই দেশে ছিল এবং তাহাদের জ্ঞাত আয় ১০,০০০,০০০ ডলারেরও বেশী। পাঁচটি বড় বড় কোম্পানীর কথা বলা যাইতেছে :—

(ক) আমেরিকান্ টেলিফোন এবং টেলিগ্রাফ কোম্পানী ১৯২৫ সনে আয় করিয়াছিল ১০৭,০০০,০০০ ডলারেরও বেশী।

(খ) জেনারল মোটর্স—১০৬,০০০,০০০ ডলার।

(গ) ফোর্ড মোটর কোম্পানী তাহাদের আয়ের কথা সাধারণ্যে প্রকাশ করে না। কিন্তু ওয়ালষ্ট্রীট পত্রিকা বলেন, তাহাদের আয় হইয়াছিল ১০০ হইতে ১১৫,০০০,০০০ ডলারের মধ্যে।

(ঘ) ইউনাইটেড ষ্টেটস্ ষ্টীল—৯০,০০০,০০০ ডলার।

(ঙ) নিউ জার্সের ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল—১৯২৪ সনে আয় করিয়াছিল ৮০,০০০,০০০ ডলার এবং গত বৎসর ১০০,০০০,০০০ ডলারের বেশী।

ঐ গুলি সত্য সত্যই বড় কোম্পানী। কিন্তু ঐসব ছাড়া আরো অনেক কোম্পানী আছে। সাধারণের ধারণা, বড় বড় ব্যাঙ্কগুলা আয়ের হিঁসাবে সকলের অগ্রবর্ত্তী। এ ধারণার কথা উল্লেখ করিয়া একজন লেখক ব্যাঙ্কার্স এসোসিয়েশন জার্ণালের গত সংখ্যায় বলিয়াছেন যে, বস্তুতঃ তাহা নহে, তাহারা অনেকেরই পশ্চাতে। প্রাচ্যের ব্যাঙ্কগুলা টাকা-উপার্জ্জনে ওস্তাদ। কিন্তু এদেশে ব্যাঙ্কের এবং মহাজনের কারবার টাকা উপার্জ্জন বিষয়ে বড় উচ্চস্থান অধিকার করে না।

ব্যাঙ্কের লাভ

কোন কোন বিষয় খতাইয়া দেখিলে সহজেই বুঝা যায় ব্যাঙ্কের কাজ এবং মহাজনের কারবারের আয় ইস্পাত নির্ম্মাণ ও গ্যাসোলিন-বিক্রয় ব্যবসায়ের কাছেও যায় না। গত বৎসর দুইটী ব্যাঙ্কের আয় একটি প্রসিদ্ধ ক্ষুর-কারখানার আয়ের সমান হইয়াছিল। এই দুইয়ের একটি নিউ ইয়র্কের ন্যাশন্যাল সিটি ব্যাঙ্ক (যাহার আর্থিক অবস্থা আমেরিকার সমস্ত ব্যাঙ্ক অপেক্ষা উৎকৃষ্ট) এবং অন্যটি নিউ ইয়র্কের ফার্ষ্ট ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক (যাহা প্রতিভাশালী জি, এফ, বেকার কর্ত্তৃক পরিচালিত)।

রেলের আয় আর একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আয়-হিসাবে রেল কোম্পানীগুলি দ্বিতীয় স্থানে। অধিকাংশ সংবাদ-পত্র পাঠকের ধারণা অপেক্ষা তাহাদের অনেকের আয় কিন্তু

অনেকটা বেশী। তাহাদের আয়ের পক্ষে নানা বিঘ্ন লাগিয়াই আছে। সেই সব কাটাইয়া উঠিতে তাহাদিগকে অনেক বেগ পাইতে হয়। গত বৎসর পেনিসিলভেনিয়ার আয় হইয়াছিল ৬২,০০০,০০০ ডলার, নিউ ইয়র্ক সেণ্ট্রালের হইয়াছিল ৪৮,০০০,০০০ ডলার এবং এচিছন-টোপেকা-সাণ্টাফের হইয়াছিল ৪৬,০০০,০০০ ডলার। সাদার্ণ প্যাসিফিক এবং ইউনিয়ন প্যাসিফিক কোম্পানীর আয়ও ৩০,০০০,০০০ ডলারের বেশী হইয়াছিল। এ সব বেশ সন্তোষজনক। তেল কোম্পানীর মধ্যে ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব ইণ্ডিয়ানার আয় হয় ৫২,০০০,০০০ ডলার, টেকসাসের আয় ৪০,০০০,০০০ ডলারের কিছু কম এবং গালফ্ ও কর্পোরেশনের আয় ৩৫,০০০,০০০ ডলারের বেশী। জেনারেল ইলেকট্রিক ৩৮,০০০,০০০ ডলার আয় করে। ৩০,০০০,০০০ ডলারের কম আয় যাহাদের, তাহাদের নাম আর উল্লিখিত হইল না।

শিল্পাদির কথা

শিল্পাদি-সম্বন্ধীয় দশটি কারখানার মধ্যে অন্ততঃ একটিও দশ মিলিয়ন ডলার উপার্জ্জন করিতে পারে নাই। মোটর জাতীয় বড় বড় গাড়ীর কারখানাও তাহা পারে নাই। এমন কি, সঙ্গীতাদি কলা সম্বন্ধীয় কর্পোরেশনও নহে। এটা খুবই আশ্চর্য্যের কথা। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রের আয়ের প্রায় অধিকাংশ ভাগই আমোদ-আহ্লাদের ভিতর দিয়া চলাফেরা করে। বড় বড় পশমের কোম্পানীই বল, সূতার কারখানাই বল, আর সেই বড় বড় কাঠের কোম্পানীই বল, যাহারা আমেরিকার অতুলনীয় সৌধ নির্ম্মাণের কাঠ সরবরাহ করে, কেহই দশ মিলিয়ন ডলার উপার্জ্জন করিতে পারে নাই।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের কথা এই যে, প্রধান প্রধান রেশম কোম্পানীর একটিও ১০,০০০,০০০ ডলার লাভ করে নাই। অথচ আমেরিকার প্রবল ক্রয়শক্তি বিবেচনা করিলে এবং দুনিয়ার রেশম বাজারে এই দেশ যে বিশাল পরিমাণ রেশম যোগায় তাহা ভাবিলে প্রত্যেকেই মনে করিবেন, এদিকে তাহাদের লাভটা অদ্ভুত। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। সাহস করিয়া বলিতে পারি, দশজনের মধ্যে অন্ততঃ নয়জন লোকও আশা করেন, এই দেশের পুস্তক ও পত্রিকা-প্রকাশকেরা হয়ত দশ মিলিয়ন ডলার উপার্জ্জন করিয়া থাকে,—বিশেষতঃ সেই সব পত্রিকা, যাহারা কেবলমাত্র একটি বারের জন্য এক পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনে ১০,০০০ ডলার হাঁকিতে অধিকারী। কিন্তু "দশ মিলিয়নের শ্রেণীতে" ইহারা কেহই প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই। কাপড়ের কল ত গণ্ডীর বাহিরে। লৌহেতর ধাতুর অথবা জাহাজ-নির্ম্মাণ ব্যবসায়ের একটী কোম্পানীও ঐ টাকা পায় নাই।

সাধারণের বিশ্বাস, আমেরিকার গাঁইটদারগণ (প্যাকার্স) অত্যন্ত ধনী। পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তাহাদের নাম বিখ্যাত। কিন্তু তাহারাও ধনী নহে। যে সমস্ত দোকান পাঁচ এবং দশ সেণ্ট মূল্যের দ্রব্য এক উপকূল হইতে অপর উপকূল পর্য্যন্ত বিক্রয় করে, তাহাদের আর্থিক অবস্থা প্রসিদ্ধ আরমার এবং সুইফটের দোকান হইতে ঢের ভাল। সমস্ত গাঁইটদারগণ সমবেত ভাবেও ৩০,০০০,০০০ ডলারের বেশী উপায় করিতে পারে নাই। তাহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান যেটি, সেটিও উলওয়ার্থের দোকানের অনেক নিম্নে।

যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশী বাণিজ্য

ব্যবস্থাপক সভায় 'বিদেশী ব্যবসায় বিল অল্প দিন হইল পাশ হইয়াছে। তাহাতে আমেরিকার জাহাজী ব্যবসায়ের উন্নতি হইবে। ঐ বিল অনুসারে আমেরিকার জাহাজী বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে কমার্স-বিভাগে একটা বিদেশী বাণিজ্য বিভাগ (ফরেন ট্রেড সার্ভিস) খুলিবার কথা আছে। তাহাতে নির্দ্দিষ্ট বেতন এবং বেশী দৈনিক ভাতারও বন্দোবস্ত থাকিবে। কতগুলি সভ্য মন্ত্রণাসভায় আপত্তি তুলিয়াছিলেন যে, মাহিয়ানার হারটা খুব উচ্চ। কিন্তু সে আপত্তি সত্ত্বেও বিল পাশ হইয়াছে এবং হারও কমে নাই।

এশিয়ার অনেক স্থলে দেখা যায় যে, বহুলোক যুক্তরাষ্ট্র গবর্মেণ্টের অধীন চাকরী করিতে করিতে অন্যত্র ভাল একটা কাজ পাইলেই চাকরী ছাড়িয়া দেয়। এই গবর্ণমেণ্টের বৈদেশিক ব্যবসার বিভাগে যাঁহারা কাজ করেন, তাঁহারা বলেন, এ চাকরীতে তাঁহাদের চলে না। তাঁহাদিগকে ভারতবর্ষ, চীন, দক্ষিণ আমেরিকা বা অন্যত্র তিন বৎসর করিয়া থাকিতে হয়। তারপর যখন ছুটিতে থাকেন তখন

কোন বড় কোম্পানী তাহাদিগকে দ্বিগুণ বেতন দিয়া রাখিতে রাজী হয়—এই সর্ত্তে যে, তাঁহারা যে সব স্থলে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, সেই সব স্থলে কোম্প্যানীর স্বার্থানুসারে কাজ করিবেন। এই রূপ দশ বারো জন লোক, যাহারা ভারতবর্ষ বা এশিয়ার অন্যত্র যুক্তরাষ্ট্রের কনসালের অধীনে চাকরী করিত, তাহারা সে চাকরী ছাড়িয়া বেসরকারী পণ্য-ব্যবসায়ীদের নিকট চাকরী গ্রহণ করিয়াছে। সেখানে তাহারা সরকারী বেতন অপেক্ষা ঢের বেশী পায়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বিল আইনে পরিণত হইলে শ্রীযুক্ত হুভার (কমার্সের সেক্রেটারী) গবর্মেণ্টের এই চাকরীকে তাঁহার সঙ্কল্পানুসারে উন্নত করিয়া তুলিতে পারিবেন। ১৯২১ সনে কমার্স বিভাগে প্রবেশ করিবার পর হইতেই হুভারের মাথায় এই সঙ্কল্পটি খেলিতেছিল। সঙ্কল্পটি কার্য্যে পরিণত হইলে আর বেসরকারী দল সরকারের শিক্ষিত লোকদিগকে বেশী বেতনের লোভে সরাইয়া লইতে সমর্থ হইবে না।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহাদের নিযুক্ত লোকদিগকে যে বেতন দেন, আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট তাহা অপেক্ষা ⅓ অংশ বেশী সহজেই দিয়া থাকেন। তবু উৎকৃষ্ট লোকদিগকে কিসে রাখা যায়, ইহাই আমেরিকার সমস্যা দাঁড়াইয়াছে। বোম্বাই হইতে ইয়োকোহামা যাও, যে কোন বাণিজ্যবন্দরে দেখিতে পাইবে বহু বে-সরকারী প্রতিনিধি কাজ করিতেছে। তাহারা তাহাদের প্রথম অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল আমেরিকার কনসালের অধীনে চাকরী করিয়া। কিন্তু এজন্য তাহাদিগকে দোষী করা চলে না।

বাঙ্গালার শিল্প-বাণিজ্য

সরকারী শিল্পবিভাগের কার্য্যকলাপে অনেক-কিছু আশা করা যায়। জাতীয় জীবনের বিকাশ ও উন্নতি-কল্পে ইহার উপকারিতাও খুব বেশী। সেই জন্যই এই বিভাগে কি কি কার্য্য হইতেছে, তাহার বিশদ বিবরণ জানিবার জন্য সাধারণের আগ্রহ থাকা উচিত এবং কোন্ কোন্ প্রধান ক্ষেত্রে কি কি পরীক্ষা চলিয়াছে, তাহাও তাহাদের সম্যক্ জানা কর্ত্তব্য।

সরকারী শিল্পবিভাগের নীতি

এই বিভাগের ১৯২৫ সনের রিপোর্টে ইহার নীতি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথা আছে :—

বর্ত্তমান উৎপাদন-রীতিতে কৃষিক্ষেত্রে যে বেশী লাভ হইবে, সে অবস্থা বঙ্গদেশের আর নাই। স্পষ্টতঃ বুঝা যাইতেছে, অতিরিক্ত লোকের জন্য আয়ের অন্যবিধ পন্থা আবিষ্কার করিতে হইবে। শিল্পই সেই আবিষ্কারের অবশ্যম্ভাবী ফল। গবর্মেণ্ট এই প্রদেশের শিল্পোন্নতিকল্পে নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করিতে চাহেন।

(১) প্রয়োজনীয় এবং আধুনিকতম তথ্য সংগ্রহ। (২) কার্য্যপ্রণালী উন্নত করিবার জন্য কুটির শিল্পগুলির পর্য্যবেক্ষণ। (৩) কাঁচামাল ব্যবহারের জন্য গবেষণা এবং সেই সব গবেষণার ফল প্রদর্শন। (৪) হস্তচালিত শিল্পের শিক্ষা প্রদান। (৫) শিল্পীদিগের উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা এবং মধ্যম শ্রেণীর শিল্পীদিগকে টাকা ধার দিবার ব্যবস্থা।

উৎসাহ-প্রাপ্ত শিল্প

গবর্ণমেণ্টের নিকট মুখ্যভাবে উৎসাহ পাইতেছে দেশলাইয়ের কাজ। তিনটি বড় আধুনিক দেশলাইয়ের কারখানা কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের মুস্কিল এই যে, ভাল কাঠির জন্য দেশজ কাঠ সস্তায় পাইতেছে না। "গেঁয়ো" কাঠ লইয়া পরীক্ষা চলিতেছে। আশা করা যায়, ইহাতে কাজ চলিবে। গবর্ণমেণ্টের বনবিভাগ এই বিষয়ে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। কম হারে চালানি মাশুল এবং ধারের কতগুলি

সুবিধাও মঞ্জুর হইয়াছে। দেশীয় বনজ বাদাম প্রভৃতি কঠিন ত্বক্ বিশিষ্ট ফল হইতে বোতাম এবং ডিনামাইট গ্লিসারিণ বিস্ফোরক প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থাও চলিতেছে। বায়ু নিষ্কাশিত টিনে ফল-সংরক্ষণ শিল্পকে সর্ব্বরকমে উৎসাহ দিলেও তাহা ভালরকম চলিতেছে না। তৎসম্বন্ধে কতগুলি বাধা আসিয়া জুটিয়াছে। সে বাধা অধিক হইলেও অনতিক্রমণীয় নয়। বর্ত্তমানে কলিকাতায় চীনাদিগের তত্ত্বাবধানে শতকরা ৯০ ভাগ বুট ও জুতা তৈরী হইতেছে। কলিকাতার রিসার্চ্চ ট্যানারিতে বুট ও জুতা তৈরীর জন্য একটা কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে। উহা হইলে বেকার বাঙ্গালী ভদ্রলোক শ্রেণীর কাজ পাইবার সুবিধা হইবে। রিসার্চ্চ ট্যানারি ট্যানিংয়ের উন্নত প্রণালী দেখাইয়া, শিক্ষানবীশদিগকে শিক্ষা দিয়া এবং দেশীয় ব্যবসায়কে সাহায্য করিয়া ট্যানিং শিল্পের বিকাশ সাধন করিয়াছে। বয়নশিল্পকে উন্নত করিবার জন্য শ্রীরামপুর বয়ন বিদ্যালয় উদ্যোগী হইয়াছে। এই দেশে জ্যাকোয়ার্ড ও ডবি বয়নযন্ত্র তৈরী করিবার চেষ্টাও সফল হইয়াছে।

শিল্প বিদ্যালয় ও ল্যাবরেটরি

আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। এণ্টালি, ক্যানাল সাউথ রোডে কলিকাতার রিসার্চ্চ ট্যানারির অধীন জমির উপর একটি বড় রিসার্চ্চ ল্যাবরেটরি তৈরী হইতেছে। এই খানে শিল্প-বিষয়ক কেমিষ্ট নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধীয় সমস্যা লইয়া গবেষণা করিবেন :—

(১) কাচ শিল্প, (২) সাবান ও তৈল শিল্প, (৩) রং ও বার্ণিশ শিল্প। এতদিন পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে আমিন, সার্ভেয়ার, ওভারশিয়ার ও সব-ওভারসিয়ার বানাইবার জন্য শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে, ফলাফল কি দাঁড়াইবে, তৎসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট অনেক দিন ধরিয়া চিন্তা করিয়া আসিতেছেন।

এই ধরণের একটি আদর্শ বিদ্যালয়ে চারিটি শ্রেণী থাকিবে। যথা—(ক) শিল্প শ্রেণী (খ) টেকনিক্যাল শ্রেণী (গ) শিক্ষা-নবীশ শ্রেণী (ঘ) বিষয়-মাফিক পাঠ্য পুস্তক পড়িয়া ডিপ্লোমা প্রাপ্তির শ্রেণী। প্রথমটি দ্বারা শিক্ষিত মিস্ত্রী, দ্বিতীয়টি দ্বারা টেকনিক্যাল জ্ঞান-বিশিষ্ট ছাত্র, তৃতীয়টি দ্বারা সুপারভাইজর, ফোরম্যান প্রভৃতি এবং শেষেরটি দ্বারা এঞ্জিনিয়ার পাওয়া যাইবে। কোনো কোনো স্থলে ইতিমধ্যেই কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে।

বাঙ্গালার বাণিজ্য

১৯২৪-২৫ সনের এডমিনিষ্ট্রেটিভ রিপোর্ট পাঠে জানা যায়, বাঙ্গালায় জাহাজী ব্যবসা হইয়াছে ২৮৩ কোটি টাকার। গত বৎসর আমদানি কম হইয়াছে। তাহার সহিত তুলনায় ঐ অঙ্কের কত প্রভেদ ১৯২৪-২৫ সনে আমদানি ও রপ্তানি উভয়ই পরিমাণ ও মূল্যে বাড়িয়াছে। রপ্তানি বাড়িয়াছে বিশ কোটির উপর ; আমদানি বাড়িয়াছে সাড়ে সাত কোটি। স্বর্ণ ও রৌপ্যের তথ্য দেখিলে বুঝা যায়, তাহা ঐ সমষ্টির উপর কার্য্য করে নাই। বাঙ্গালায় সোনারূপার আমদানি বেশীই হইয়াছে। আমদানি ও রপ্তানির প্রভেদ হইয়াছে ২½ কোটি। সূতী ও রেশমী কাপড়ের আমদানি খুব বাড়িয়াছে। বঙ্গদেশে মহাত্মা গান্ধীর চরকা অভিযান কতদূর সফল তাহা ইহা হইতেই বুঝা যাইবে। বঙ্গদেশীয় লোকের ক্রয় ক্ষমতা ঢের বেশী, তাহারই এটা নিশ্চিত নিদর্শন। ১৫০ মিলিয়ন গজ অতিরিক্ত কাপড় এখানে বিক্রী হইয়াছে। চিনির আমদানি বৃদ্ধিও বেশী ধনাগমের নিদর্শন। ভারতীয় ইক্ষু ফসলের আংশিক হ্রাসেই এই আমদানির বৃদ্ধি।

লৌহ ও ইস্পাতের তথ্যে সংরক্ষণ শুল্কের ফলাফল দেখা যায়। রিপোর্টে লেখা আছে, "এক বৎসরে কতগুলি ইস্পাতের উপর যে সংরক্ষণ শুল্ক চাপান হইয়াছে, তাহার ফলে যন্ত্রপাতি, মিলের কাজ, রেলওয়ে প্ল্যাণ্ট ও গাড়ীর আমদানি কমিয়াছে।" তথাপি আমদানি করা সর্ব্ববিধ লৌহ ও ইস্পাতের প্রস্তুত দ্রব্যের মূল্য শত লক্ষের উপর বাড়িয়াছে। এই সব দ্রব্যের ব্যবহার-বৃদ্ধি শিল্প-জগতে উন্নতির পরিচায়ক। গত বৎসর বিনিময় ব্যাপারের উন্নতির দরুণ লৌহ আমদানি বন্ধ রাখিতে শুল্ক বিভাগ (টেরিফ) অসমর্থ হন। ইহাতে বিদেশীয় মালের দাম ভারতীয় টাকার

দাম অনুসারে কম হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে রপ্তানি করা দ্রব্যের জন্য সুবিধাজনক দামও মিলিয়াছে। বিদেশী মালের দাম কমিয়াছিল বলিয়া বঙ্গদেশের ক্রয়শক্তিও বাড়িয়াছিল। মনে হইয়াছিল, শুল্করীতি আমদানি করা জিনিষের ক্ষতি করিবে, কিন্তু তাহা করে নাই। তাহাতে দুঃখ করিবার কি আছে? সংরক্ষকগণের চেষ্টা যে উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হউক, তাহাতে বঙ্গের সমগ্র অধিবাসীদের যথার্থ উপকারই হইয়াছে।

রপ্তানি ব্যবসায় বেশ বাড়িয়াছে এবং তাহার বিশেষত্ব এই যে, তাহার উন্নতিটা হইয়াছে সার্ব্বভৌম। বহুতর ভারতীয় দ্রব্য কেবল মাত্র বিলাতে নয়, জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, ইতালী, যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ আমেরিকা, জাভা, চীন এবং জাপানেও গিয়াছে। পৃথিবী ব্যাপিয়া আবার যে ক্রয়শক্তি বাড়িয়াছে, এই ব্যাপার তাহারই সূচনা করিতেছে। সমগ্র রপ্তানির প্রায় ৡ ভাগ পাট, চা এবং শস্য। পাট-নির্ম্মিত বস্তু পরিমাণে শতকরা ৯ ভাগ এবং দামে শতকরা ২২ ভাগ ভাল হইয়াছে। কাঁচা পাটের দাম ৯ কোটি বাড়িয়াছে, যদিও যে অতিরিক্ত মাল বাহিরে পাঠান হইয়াছে, তাহার পরিমাণ বেশী নহে। ফসল ভাল হইবে না এই আশঙ্কায় দাম চড়িলেও, মূল্যের দিকে যে বেশ উন্নতি দেখা যাইতেছে, ইহাই তাহার নিদর্শন। চায়ের ব্যবসায়ও ভাল হইয়াছে। যে পরিমাণ চা বিক্রী হইয়াছে, তাহার তুলনায় তাহার দাম পাওয়া গিয়াছে বেশী। যে বৎসর ভারতবর্ষের মোট রপ্তানি কমিয়াছে, সেই বৎসরই কলিকাতা হইতে কাঁচা তুলা ঢের রপ্তানি হইয়াছে। লা, বীজ, সার, নীল এবং কাঁচা রেশমের ব্যবসায় সন্তোষজনক নহে। যুক্তরাষ্ট্র এখনও ভারতের বাজারে তামাক পাঠাইয়া থাকে। 'ভারতের সিগারেট শিল্পের' জন্য সমস্ত তামাকই তাহারা পাঠাইয়াছে। এই বিষয় হইতে একটা কথা মনে হয়, ভারতবর্ষে উপযুক্ত তামাক জন্মাইবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত অনুসন্ধানের প্রয়োজন। এ যাবৎ একটা ধারণা চলিয়া আসিতেছে যে, ভারতে তামাক হয় বটে, কিন্তু সে তামাক "ভদ্রলোকের পাতে" দেওয়া চলে না। কিন্তু মাটি, সার, গাছের রোগ-নিবারণ প্রভৃতি সম্বন্ধে আবশ্যক জ্ঞানের অভাবই, এই অসম্পূর্ণতার কারণ।

এইরূপ আরও অনেক বিষয় আছে, যাহা ভারতবর্ষ নিজেই নিজের জন্য করিয়া লইতে পারে। কিন্তু বিদেশীরা তাহাই এখন করিয়া দিতেছে। শুল্কপক্ষপাতীরা মনে করেন, শুল্ক দ্বারা শিল্প প্রতিপালিত হয়। কিন্তু প্রতিপালন অপেক্ষা শুল্কের মোহ আলস্য ও নিরুদ্যমকেই প্রশ্রয় দিয়া থাকে বেশী। ভারতকে এই মোহ ত্যাগ করিতে হইবে।

পাট চিন্তায় বাঙালী

(১) পাট চাষ

গত বৎসর বঙ্গে মোট ৩১ লক্ষ ১৫ হাজার ২ শত একর ভূমিতে পাট চাষ হইয়াছিল; এবার ৩৬ লক্ষ ৫ হাজার একর ভূমিতে পাট চাষ হইয়াছে। এক একরে প্রায় তিন বিঘা। গত বৎসর অপেক্ষা এবার পাট চাষ অনেক অধিক। গত বৎসর পাটের মূল্যের অত্যধিক বৃদ্ধি হইয়াছিল বলিয়া এবার অনেক চাষী ধানের জমিতেও পাটের চাষ দিয়াছে। কিন্তু কোন কোন স্থান হইতে যতদূর সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে প্রকাশ, এবার পাটের দর মণকরা বারো টাকা হইতে পনর টাকা;—কোন কোন স্থলে ইহা অপেক্ষা দর ন্যূনাধিকও হইতে পারে। আমরা বহুবারই বলিয়াছি,—নগদ টাকার লোভে চাষিগণের ধান চাষ কমাইয়া পাটের চাষ বাড়ানো কিছুতেই উচিত নহে। (বঙ্গবাসী)

(২) পাটের দর

"খুলনা" সংবাদ-পত্র লিখিয়াছেন,—"মাড়োয়ারী মহাজনেরা দাঙ্গার জন্য টাকা লইয়া মফঃস্বলে পাট খরিদ করিতে

না যাওয়ায় পাটের দর ৭৲ টাকায় নামিয়াছে। গত বৎসর এই সময় পাটের দর ১৮৲ টাকা ছিল।" এবার অনেক চাষী, ধানের চাষ কমাইয়া পাট চাষ করিয়াছে, আশা—পাট-বেচিয়া অনেক টাকা উপার্জ্জন করিবে। অথচ পাটের দর এবার খুব কম। ইহার ফলে অতঃপর চাষীদের ধান চাষ তুলিয়া দিয়া পাট চাষ করিবার প্রবৃত্তি কমিবে কিনা কে বলিবে ?

(৩) পাটের অবস্থা

পাট বুনিবার পূর্ব্বেই দেশের কতিপয় নেতা ও পত্রিকার সম্পাদক মহোদয়গণ পাট কম করিয়া বুনিবার জন্য কৃষকগণকে উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের অযাচিত উপদেশ শুনে কে ? গত বৎসরের পাটের দরে কৃষকমণ্ডলী আনন্দে আত্মহারা। তাহারা একবারও ভাবে নাই যে, তাহারা মাত্র গাধার মত পরিশ্রম করিয়া পাট তৈয়ার করিতে পারিবে বটে, কিন্তু কি দরে পাট বিক্রয় হইবে ইহা ঠিক করিবার ভার বিদেশী বণিকগণের হাতে। এখন পাট বিক্রয় করিবার সময় বড় বড় পাটের ব্যবসায়িগণ জেদ করিয়াছেন যে, তাঁহারা এবার কম দরে পাট খরিদ করিবেন। কারণ তাঁহারা জানেন যে, এবার বিস্তর পাট জন্মিয়াছে। চাষিগণ আদৌ ধান্যের চাষ করে নাই। তাহাদের তিনটী মহাসঙ্কট সমুপস্থিত, ভাত, জমিদারের খাজনা ও মহাজনের সুদ। উক্ত তিনটী যমদূতের তাড়নায় কৃষকগণ যে মূল্যেই হয় এখন পাট বিক্রয় করিতে বাধ্য। এ সময় ব্যবসায়ীরা কিছুকাল পাট খরিদ না করিলেই তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। তজ্জন্যই এবার এখনও কোন মোকামেই খরিদ আরম্ভ হয় নাই। ইহাতেই পাট ব্যবসায়িগণের দুরভিসন্ধি বুঝা যাইতেছে। হে হতভাগা কৃষকগণ ! তোমাদের হাতে কি এমন কোন অস্ত্র নাই যদ্দারা ইহার প্রতিকার করিতে পার ? তোমরা সঙ্ঘবদ্ধ হও এবং জেদ করিয়া বস যে, উচ্চ মূল্য না হইলে পাট বিক্রয় করিবে না ; অন্যথা তোমাদের যে কি দশা হইবে তাহা কি একবার চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ ? ক্ষেত্রে পাট বুনিয়াই তো ৩০৲ মণ হিসাব করিয়া উচ্চ সুদে টাকা কর্জ্জ করিয়া নানা অপব্যয় করিতেও ভয় কর নাই। আর পাটের দর ৭৲।৮৲ টাকা মণ। এখন উপায় কি ?

হে জমীদার ও মহাজনগণ ! আপনারা ত সর্ব্বদাই কৃষকগণকে শোষণ করিতেছেন। এবার কি তাহাদের প্রতি একটু দয়াদ্র্র হইবেন না ? তাহারা ধ্বংস হইলে ভবিষ্যতে আর কাহার নিকট হইতে খাজানা ও সুদ আদায় করিবেন ? হে দেশের নেতৃগণ ? কৃষকেরা আপনাদের উপদেশ পালন করে নাই বলিয়া কি আপনাদের চুপ করিয়া বসিয়া থাকা উচিত ? স্থানে স্থানে সভা করিয়া ইহার প্রতিকার করা কি আপনাদের কর্ত্তব্য নহে ? কৃষককুল বিনষ্ট হইলে আপনারা কাহার উপর নেতৃত্ব করিবেন ? হে উকিল, মোক্তার, ডাক্তার মহোদয়গণ ! এই যে এবার পাটের এই অবস্থা হইল ইহার প্রতিকারার্থে আপনারা কোনই উচ্চবাচ্য না করিয়া চুপ করিয়া রহিয়াছেন। এ বিষয়ে কি আপনাদের কোনই কর্ত্তব্য নাই ? নিশ্চয় জানিবেন কৃষকগণের হাতে টাকা না পড়িলে আপনাদের পকেটও শূন্য থাকিবে।

হে কৃষকগণ ! এবারও যদি তোমরা ভবিষ্যতের জন্য সাবধান না হও তবে তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য্য।

মহাম্মদ হেলালউদ্দিন . ("পঞ্চায়েৎ" ঢাকা)

(৪) ফরিদপুরে পাটের অবস্থা

ফরিদপুর অঞ্চলে পাটের দর ক্রমশই কমিতেছে ; কারণ মাড়োয়ারী খরিদ্দারগণ পাট খরিদ একরূপ বন্ধই করিয়াছেন। বর্ত্তমান বৎসরে প্রথমতঃ পাটের দাম প্রতি মণ ৮ টাকা হইতে ১০।১২ টাকা হওয়ায় সকলেই ভাবিয়াছিল যে, এ বৎসরও গত বৎসরের ন্যায় পাটের মূল্য বৃদ্ধি হইবে, কিন্তু এখন যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে সকলেই ভবিষ্যতের জন্য চিন্তাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। এই বৎসর জমি চাষ, পাট বপন, নিড়ান, কাটা প্রভৃতিতে কৃষকগণের বহু টাকা ব্যয় হইয়াছে। মজুরের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি পাওয়ায় এ বৎসর যাহাদের জমি নাই তাহারাও মজুরের কাজ করিয়া বেশ দু'পয়সা আয় করিয়াছে। অনেক পতিত জমিতেও এবার পাটের চাষ করা হইয়াছিল। তদুপরি বৃষ্টি ভাল হওয়ায় পাটও প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হইয়াছে। অনেক কৃষকই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া গত বৎসর অত্যধিক মূল্যে পাট

বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিল, তাহা শিশু পুত্র-কন্যাদের বিবাহে ও টিনের ঘর প্রভৃতি তুলিয়া এবং অন্যান্য অনাবশ্যক ব্যয়ে নিঃশেষ করিয়া পুনরায় উচ্চ সুদে টাকা ধার করিয়া পাটের চাষ করিয়াছিল—আশা ছিল, পাট বিক্রয় করিয়া টাকা শোধ দিবে। একেই পাটের মূল্য বৃদ্ধি পায় নাই, তদুপরি এই বৎসর নানা অসুখে অনেক বলদ, গাভী প্রভৃতি মারা যাওয়ায় কৃষকগণ প্রভূত পরিমাণে ক্ষতি-গ্রস্ত হইয়াছে। আমরা অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি যে. এ বৎসর প্রতি মণ পাটের জন্য কৃষকগণের প্রায় ১০৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে। তদ্ভিন্ন পাটের দর বৃদ্ধি না পাইলে জমীদার তালুকদারের খাজনা কিংবা মহাজনের প্রাপ্য আদায়েরও এবার বিশেষ সম্ভাবনা নাই। পাটের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে এই আশায় অপেক্ষা করিতে অক্ষম, অভাবগ্রস্ত কৃষকগণ পাটের এই মন্দা বাজারেও প্রতি হাটেই কিছু কিছু পাট বিক্রয় করিতেছে। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে যে ইহাদের কি অবস্থা হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

পূর্ব্ববঙ্গ অঞ্চলে কৃষকগণ সাধারণতঃ মুসলমান। পাটের খরিদ্দার মাড়োয়ারী ও সাহা জাতি। নিরক্ষর কৃষকগণ কলিকাতা কিংবা বিলাতের বাজারে পাটের চাহিদা কিরূপ তাহা জানে না। তাহাদের মনে এরূপ ধারণা হইয়াছে যে, মুসলমানগণের হিন্দুদিগের সহিত বিষাদের ফলেই পাটের দাম এবার বৃদ্ধি পায় নাই, কারণ খরিদ্দার হিন্দুগণ মুসলমান-গণের নিকট হইতে পাট কিনিতে অনিচ্ছুক।

(আনন্দবাজার পত্রিকা)

(৫) নেত্রকোণায় পাটের ফসল

নেত্রকোণা সবডিভিসনে অন্যূন ৭৫০০০০ হাজার একর ভূমিতে এবার পাটের চাষ হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রতি একর ভূমিতে গড়ে ১৫ মণ করিয়া পাট উৎপন্ন হইলে এ মহকুমায় মোট ১০।১২ লক্ষ মণ পাট হইবে বলিয়া আশাকরা যায়। কোন কোন স্থানে পাট কাটা ইতিপূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়াছে, মাঝে মাঝে বৃষ্টিও বেশ হইতেছে। পাট ফসল এ অঞ্চলে ভাল হইবে বলিয়াই ভরসা করা যায়। শুনা যায় সমগ্র দেশে নাকি ৬৬ লক্ষ একর ভূমিতে এবার পাট চাষ হইয়াছে। বিগত ২৫ বৎসর মধ্যে এরূপ অধিক পরিমাণে পাট আর কখনও উৎপন্ন হয় নাই। ফলে বৎসরের প্রারম্ভেই পাটের মূল্য হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে কৃষকগণ সবিশেষ চিন্তাকুল হইয়াছে সত্য, কিন্তু কি উপায়ে এ অবস্থার প্রতিকার হইতে পারে তদ্বিষয়ে তাহারা একে-বারেই উদাসীন। গত বৎসর নেত্রকোণার আর্থিক অবস্থা অতি শোচনীয় আকার ধারণ করিয়াছিল। তাই এবারকার ফসলের অবস্থা দেখিয়া নেত্রকোণাবাসী আশায় উৎফুল্ল হইয়াছিল। কিন্তু বিদেশী বণিকগণের সমবেত চেষ্টার ফলে যদি পাটের দাম আশানুরূপ না হয়, তবে তাহাদের কষ্টের পরিসীমা থাকিবে না। (প্রান্তবাসী)

(৬) পাট সম্বন্ধে অভিজ্ঞের মত

এ বৎসর যে পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে তাহাতে জনৈক অভিজ্ঞ ব্যক্তি অনুমান করেন যে, এ বৎসর প্রতি একরে (৩ বিঘায়) গড়ে তিন গাঁট বা ১৫ মণ পাট উৎপন্ন হইবে। তাহা হইলে মোটের উপর এক কোটি গাঁট বা পাঁচ কোটি মণ পাট উৎপন্ন হইবে। কিন্তু তিনি আশঙ্কা করেন, এই পাটের বার আনা অংশ কলিকাতায় আসিবে কি না সন্দেহ। তিনি বলেন, উহার কারণ এই যে, মফঃস্বলে এত অধিক পাট স্থানান্তরে চালান দিবার সুযোগ নাই। গত বৎসর সমস্ত জিলায় ১ কোটি ১৫ লক্ষ গাঁট পাট জন্মিয়া-ছিল, কিন্তু মাত্র ৮৩ লক্ষ গাঁট কলিকাতায় আসিয়াছিল। তাহার উপর এবার কোন জিলায় পুরাতন পাট মজুত নাই বলিলেই হয়। ইহাতে এ বৎসর যে পাট হইবে চাষীরা তাহা ধরিয়া রাখিতে পারে। গত মরশুমে চাষীরা প্রায় সর্ব্বত্রই পাটে বেশ লাভ করিয়াছে এবং সে জন্য তাহারা মহাজনের নিকট ঋণী নহে। সুতরাং এখন পাটের বাজার যেরূপ নামিয়াছে, তাহাতে পাট ধরিয়া রাখা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব নহে। (ত্রিপুরাহিতৈষী)

ইয়োরোপে চিনির ফসল

সমগ্র ইয়োরোপে ১৯১৩-১৪ সনে উৎপন্ন ৮০৩৪৮০০ টন বিট চিনির মধ্যে জার্ম্মাণি একাই ২৬৭৬০০০ টন, চেকো-স্লোভাকিয়া সমেত অষ্ট্রীয়া হাঙ্গারী এবং রুশিয়া তাহার উক্রেণিয়া ও পোলাণ্ড প্রদেশ লইয়া প্রত্যেকে ১৬৬২০০০ টন করিয়া উৎপন্ন করে। ফ্রান্সের ভাগে পড়ে মাত্র ৭৬৮৮০০ টন। যুদ্ধের সময় উৎপাদন হ্রাস পায়। ১৯১৯-২০ সনে ইয়োরোপের উৎপন্ন চিনির পরিমাণ ছিল মাত্র ২৫৮৯৯০০ টন; কিন্তু ১৯২০-২১ সনে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ৩৬৮৩৪০০ টনে দাঁড়ায়, আবার ১৯২৩-২৪ সনে হয় ৫০৫৭৮০০ টন। ১৯২৪-২৫ সনে মরশুম ভাল থাকায় এবং বিট ও ইক্ষুচাষের জমি আরও বৃদ্ধি করায় উৎপাদন ২০ লক্ষ টন বৃদ্ধি পাইয়া ৭০৭৮৪৯০ টনে গিয়া পৌছে। ১৯২৫-২৬ সনে উৎপাদনের হার আরও ৩৮৯২০০ টন বৃদ্ধি পাইয়া যুদ্ধের পূর্ব্বকালীন অবস্থার সমান হয়। এই বৎসরে ইয়োরোপে ৭৪৬০৪০৩ টন বিট চিনি জন্মে।

নীচের তালিকায় ইয়োরোপ, আমেরিকা ও ক্যানাডার ১৯১৩-১৪, ১৯২৩-২৪, ও ১৯২৫-২৬ সনের উৎপন্ন বিট চিনির হিসাব প্রদত্ত হইল।

দেশের নাম	১৯১৩-১৪	১৯২৩-২৪	১৯২৪-২৫	১৯২৫-২৬
জার্ম্মাণি	২,৬৭৬,০০০	১১৪৬৮৯১	১৫৭৫৬৮৪	১৬০০০০০
চেকো-স্লোভাকিয়া		১০০১০৪৯	১৪০৯৭০৩	১৫২০০০০
অষ্ট্রীয়া	১৬৬২০০০	৪৭৩২১	৭৫৪৪৩	৮০০০০
হাঙ্গারী		১২২৫২৮	২০২৩৫৪	১৬২০০০
ফ্রান্স	৭৬৮৮০০	৪৯০৮৫০	৮২৭৪৭২	৭৫৫০০০
বেলজিয়াম	২২৫৪০০	৩০০১২১	৪৮০১০৫	৩৩৫০০০
হলাণ্ড	২২৭৮০০	২৩১৯২৩	৩২৯২৪৪	৩১০০০০
রুশিয়া ও উক্রেণিয়া	১৬৬২০০০	৩৬৬৭৪২	৪৫৮৩৭৫	১০৪১৯০৩
পোল্যাণ্ড		৩৮৯৯৯৫	৪৯৪৮৫৪	৫৯০০০০
সুইডেন	১৩৫১০০	১৫৩৮৩০	১৩৫২৭০	২০৪৫০০
ডেনমার্ক	১৪৩৪০০	১০২৩৫৮	১৪০০০০	১৭৫০০০
ইতালি	...	৩৫১১০২	৪২২৪২৯	১৬২০০৯
স্পেন	...	১৮৫০৬৩	২৬০০০০	২২৫০০০
সুইট্সার্ল্যাণ্ড	...	৫৮৯৬	৫৯০৬	৬৩৯৫
বুলগেরিয়া	...	২৬৫৬৬	৩৯৭৫৮	৩৮০০০
রুমাণিয়া	...	৭১৮২৬	৮৬২৫৬	১১০০০০
ইংলণ্ড	...	১৩১৮০	২৩৭৩০	৫১১৪০
ইয়োরোপের অন্যান্য দেশ	৫৩৪৩০০	৫০৩০০	১৯১৯০৭	৯৪৪৬৫
যুক্তরাষ্ট্র	৬৫৫৩০০	৭৮৭২১৭	৯৭৪১৮৫	৮০৪৪৩৯
ক্যানাডা	১০০০০	১৬৫০০	৯৬২০০	৩২৪৭৫
মোট—	৪,৭০০,১০০	৫৮৬১৪৭৪	৮০৮৮৮৭৫	৮২৯৭৩১৭

১৯১৩-১৪ সনে জার্ম্মাণি, অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গারী ও রুশিয়া এই তিনটি দেশ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বিট চিনি রপ্তানি করিত। যুদ্ধের পর হইতে চেকো-শ্লোভাকিয়া, জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, হলাণ্ড এবং ইতালী প্রভৃতি দেশগুলি প্রধানতঃ বিটচিনি উৎপাদন করে। রুশিয়া তার নষ্ট ব্যবসা উদ্ধার করিবার জন্য জবর চেষ্টা চালাইতেছে। খুব সম্ভব রুশিয়া শীঘ্রই বিদেশে চিনি রপ্তানি করিতে পারিবে। পোল্যাণ্ডের সহযোগে রুশিয়া যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্ব বৎসরে ১৬৬০০০০ টন চিনি উৎপন্ন করে। ১৯২১-২২ সনে ইহা ৫০ হাজার টন কমিয়া যায়; কিন্তু রুশিয়ার উৎপন্ন আবার ১৯২৫-২৬ সনে ১০৪১০০০ টনে গিয়া পৌঁছে। বর্ত্তমানে পোল্যাণ্ডের মাটিতে ৫৯০০০০ টন চিনি ফলে। সে ইহা হইতে ১৯২৫-২৬ সনের ৭ মাসে ২৫০০০০ টন বিদেশে চালান দিতে সমর্থ হইয়াছিল। ঐ সময়ে চেকো-শ্লোভাকিয়া তার উৎপন্ন ১৫২০,০০০ টনের ৬৪৬৩৩৩ টন মাল রপ্তানি করে। ফ্রান্স যুদ্ধের পূর্ব্বকালীন অবস্থার চাইতে একটু উন্নতি দেখাইয়াছে। ১৯১৩-১৪ সনে ফ্রান্স ৭৬৮৮০০ টন চিনি জন্মায়, ১৯১৪-২৫ সনে ইহা ৮২৭৪৭২ টনে দাঁড়াইয়াছে। ইহাতেই ফ্রান্সের ঘরোয়া চাহিদা মিটিয়া যায়।

ইহার পরেই ইতালী হলাণ্ড ও বেলজিয়ামের স্থান। ১৯২৫-২৬ সনে এই তিনটি দেশ যথাক্রমে ১৬২,০০০, ৩১০০০ ও ৩৩৫০০ টন উৎপন্ন করে। ইতালীর উৎপাদন ১৯২৪-২৫ সনে ৪২২ হাজার টন ছিল।

হলাণ্ড ও বেলজিয়াম যুদ্ধের পূর্ব্বকালীন অবস্থার চাইতেও উন্নতি করিয়াছে। বর্ত্তমানে ইহারা নিজেদের দেশের চাহিদা সরবরাহ করিয়াও বিদেশে রপ্তানি করিবার ক্ষমতা রাখে।

১৯২৪-২৫ সনে চেকো-শ্লোভাকিয়া ৯৭৮৩৮০, জার্ম্মাণি ৩৫০৬২৮, ফরাসী ২৫২১৭৩, বেলজিয়াম ২৪৪৬২০, ও হলাণ্ড ৩৭৬০৩৯ টন চিনি রপ্তানি করে। ১৯২২-২৩ সনে ঐ দেশগুলি যথাক্রমে, ৩৭৭৬২১, ৫৫০০০, ১৯৮৪৩১, ১৬৩৩৬১ ও ২৩০০০৭ টন রপ্তানি করিয়াছিল।

ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও আয়ার্লাণ্ড চিনির সব চাইতে বড় খরিদ্দার। ইহারা নিজেদের দেশে ইক্ষুও জন্মাইবার চেষ্টায় আছে। এ বৎসর বিলাতে এক লক্ষ একর জমিতে বিট ও আকের চাষ দেওয়া হইয়াছে। দেশের এই চিনির ব্যবসাটিকে বিদেশের হাত হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সরকার কর্ত্তৃক ১৯২৪-২৫ হইতে ১৯২৭-২৮ সন পর্য্যন্ত ৪ বৎসরের জন্য প্রত্যেক টন পিছু ৯ পাউণ্ড ১৫ শিলিং ৯½ পেন্স অর্থাৎ প্রায় ২৪৩ টাকা করিয়া সাহায্য দেওয়া হইতেছে।

ইয়োরোপের বাহিরে যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডা বিট চিনি তৈয়ারী করে। যুক্তরাষ্ট্রের বিট ও ইক্ষু শিল্প টন প্রতি ৯ পাউণ্ড ৯ শিলিং ৭ পেন্সের শুল্ক সুবিধা ভোগ করিয়া থাকে। এইরূপ সরকারী সংরক্ষণের (প্রটেকশন) জন্য যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প ক্রমেই বিস্তার লাভ করিতেছে। ১৯১৩-১৪ সনের যুক্তরাষ্ট্র ৬৫৫ হাজার টন চিনি উৎপন্ন করে ১৯২৪-২৫ সনে ইহা ৮০৪ হাজার টন দাঁড়াইয়াছে।

ক্যানাডা যুদ্ধের পূর্ব্বে ১০ হাজার টন চিনি উৎপাদন করিত; কিন্তু ১৯২১-২২ সনে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৮৯০০ টনে দাঁড়ায় এবং ১৯২৪-২৫ সনে এই সংখ্যা ডবল অর্থাৎ ৩৬,২০০ টন হয়। ক্যানাডায় চিনি-পরিষ্কার করার মস্ত বড় শিল্প চলিতেছে। ক্যানাডা কেবল মাত্র নিজের দেশের আক গুড় পরিষ্কার করে না, বৃটিস ওয়েষ্ট ইণ্ডিস ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থান এমন কি কিউবা, স্যান দোমিন গো প্রভৃতি স্থান হইতে কাঁচা মাল দেশে পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত আমদানি করে। ইহা ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র হইতে যৎকিঞ্চিৎ পরিষ্কৃত চিনি ক্যানাডাকে আমদানি করিতে হয়। কিন্তু তাহা হইলেও ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও ক্যানাডা আর সকল দেশের চাইতে বেশী চিনি রপ্তানি করে।

১৯২৪ সনে ক্যানাডায় ৩॥ লক্ষ টন চিনি ব্যবহৃত হয়। ১৯২৩ সনে ক্যানাডা বৃটিশ সাম্রাজ্য ও অন্যান্য দেশ হইতে যথাক্রমে ১২৯৩৯১ ও ২৪৯৪১১ টন কাঁচা মাল আমদানি করে এবং ঐ বৎসর সে পরিষ্কৃত চিনি ৭,৬০৮ টন আমদানি করে; আর ৫৩১৭৩ টন পরিষ্কৃত চিনি বিদেশে রপ্তানি করে। ১৯২৪ সনে বৃটিশ সাম্রাজ্য ও বিদেশ হইতে ক্যানাডার কাঁচা মাল আমদানির পরিমাণ যথাক্রমে ১৭২৫৯০ ও ১৯৭০৬৩ টন। ১৯২৫ সনে ঐ সংখ্যা ছিল ১৭৬৪৮১ ও ৩৪৬৩০৯। ঐ দুই বৎসর ক্যানাডা যথাক্রমে ১৯,১৫৩ ও

৭১০৬ টন পরিষ্কৃত চিনি আমদানি করে এবং রপ্তানি করে যথাক্রমে ৩৭৫০৮ ও ১৩৬২১৭ টন।

যুক্তরাষ্ট্র ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, জার্ম্মাণি রুশিয়া, ফ্রান্স, ভারতবর্ষ, জাপান ও অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ সব চাইতে বেশী চিনি খায়। ১৯২৫ সনে যুক্তরাষ্ট্র ৫৫১০০৬০ টন চিনি ধ্বংস করে। তাহা হইলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেক লোক ১০৭½ পাউণ্ড করিয়া চিনি খায়। যুক্তরাষ্ট্র খুব বেশী চিনি খায়। ১৯০৫ সনে খাইয়াছে ২৬৩২৬১৬ টন। ১৯২৫ সনে একেবারে ডবলের কাছাকাছি—৫৫১০০৬০ টন। প্রত্যেক বিশ বছর পরে পরেই সংখ্যা এইরূপ দ্বিগুণ হয়।

ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডের ব্যবহৃত চিনির পরিমাণ ছিল ১৯২৩ সনে ১৪৭০২১৩, ১৯২৪ সনে ১৫৬৩১৩৭ এবং ১৯২৫ সনে ১৬৬২৯৮২ টন। এই হিসাবে বিলাতে প্রস্তুত দেশী চিনি ধরা হয় নাই। আয়ার্লাণ্ড বাদ দিলে গ্রেট বৃটেনের লোকসংখ্যা ৪৫০৬৪ হাজার। তাহা হইলে প্রত্যেক লোকের ভাগে পড়ে ৮৪·৬ পাউণ্ড। এই শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে গ্রেটবৃটেনের ব্যবহৃত চিনির পরিমাণ বৃদ্ধি হইতেছে বলিয়া মনে হয় না।

অষ্ট্রেলিয়ায় কিন্তু উত্তোরোত্তর চিনির ব্যবহার বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯২৪ সনে অষ্ট্রেলিয়া ৩০৫৯০২ টন চিনি হজম করে। জনসংখ্যানুপাতে অষ্ট্রেলিয়ার প্রত্যেক লোক ঐ বৎসরে ১২০·৩৯ পাউণ্ড চিনি খায়। ১৯২১ সনে ঐ সংখ্যা ছিল ১০৫·৩ পাউণ্ড। জ্যাম এবং জেলি তৈয়ার করায় যে চিনি প্রয়োজন হয়, তাহাও ঐ হিসাবে ধরা হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে ফলের মরশুমের সময় ফল হইতে নানা প্রকার সুস্বাদু চাটনী ও পানীয় নির্ম্মাণের জন্য অষ্ট্রেলিয়ায় যথেষ্ট পরিমাণ চিনি ব্যবহৃত হয়।

ফ্রান্সেও চিনির চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯২১-২২ সনে ইহা ছিল ৭২৬০৬৪, ১৯২২-২৩ সনে ৭৬৮০৭৬, ১৯২৩-২৪ সনে ৭৪৪০৪৪এবং ১৯২৪-২৫ সনে ৪৩৭৬৩৬ টন। এই চারি বৎসরের তালিকা হইতে দেখা যায় গড়ে ৭৬৮৯৫০ টন চিনি ব্যবহৃত হইয়াছে। ১৯১০-১৩ সন পর্য্যন্ত ছিল ৬৮৫৫০০ টন।

১৯১৩ সনে জার্ম্মাণির লোক সংখ্যা ছিল ৬৫০৮০০০০, যুদ্ধে লোকক্ষয় হইয়া ১৯১৯ সনে ৫৯৮৫২০০০ জন দাঁড়ায়। জার্ম্মাণিতে ১৯১০-১৪ সনের মধ্যে গড়পড়তা ১৩৬৪০০০ টন চিনি ব্যবহৃত হইত। বিগত ৪ বৎসরে ঐ সংখ্যা ১২১৩০০০ টনে নামিয়াছে। কিন্তু জনসংখ্যা হ্রাস পাওয়াই ইহার একমাত্র কারণ। জনপিছু হিসাব করিয়া দেখিলে জার্ম্মাণিতে চিনির চাহিদা পূর্ব্বাপেক্ষা সামান্য কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে।

প্রাচ্যে জাপান ও ভারতবর্ষ অনেকটা বেশী পরিমাণে চিনি ব্যবহার করে।

প্রত্যেক বৎসরই ভারতের চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে সাধারণতঃ বৃদ্ধির হার ছিল বাৎসরিক ৪৫ হাজার টন। জাভা চিনি ছাড়াও ইয়োরোপ হইতে বেশী পরিমাণ মাল আমদানি হয়। ১৯২২-২৩ সনে পরিষ্কৃত চিনি ৫১৫৪০০ টন ব্যবহৃত হয়। ১৯২৩-২৪ সনে ৫২৮০৭৪; ১৯২৪-২৫ সনে ৭০৯১৪১ টন। ১৯২৫-২৬ সনের নির্দ্ধারিত তালিকায় দেখা যায় বিগত বৎসরের চাইতে এ বৎসরের পরিমাণ কম হইবে না। বাহিরের আমদানি এবং দেশে প্রস্তুত প্রায় বাৎসরিক ১২৫ হাজার টন চিনি ছাড়াও দেশে ইক্ষু প্রভৃতি হইতে অত্যধিক পরিমাণ গুড় তৈয়ারী হয়। এ সবই ভারতে ব্যবহৃত হয়।

দেশে ব্যবহারের জন্য বিগত ৫ বৎসরে যে গুড় উৎপন্ন হইয়াছিল তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১৯২৪—২৫ সনে	...	২৪ লক্ষ টন
১৯২৩—২৪ ,,	...	৩১০৩০০০ ,,
১৯২২—২৩ ,,	...	২৯৫৩০০০ ,,
১৯২১—২২ ,,	...	২৫২২৫০০ ,,
১৯২০—২১ ,,	...	২৪৪৮০০০ ,,

জাপানের সরকারী বিবরণে জানা যায় ১৯২৪ সনে তথায় ৬৭৩৫৮৫ টন চিনি ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ঝোলা গুড় ও সিরাপ ধরা হইয়াছে। জাপানে ১৯১৯ সনে ৪৮৪৪২৭ টন চিনি ব্যবহৃত হয়। ৫ বৎসরে ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ১৯২৩ সনে ৬২৮৭০৩ টনে পৌঁছে। এই স্থানে বলা যাইতে পারে যে, একটা জাতির ধনদৌলতের পরিমাণ অনুপাতে চিনি ব্যবহৃত হয় না। "ফিলিপাইন সুগার

জর্ণ্যাল"এ ফেয়ারচাইল্ড সাহেব এক প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে, ফ্রান্সে ১৯১৩ সনে প্রত্যেক লোক ৪৩.৪ পাউণ্ড চিনি খায়, কিন্তু প্রত্যেক ফরাসীর আয় ছিল ১৪৭৫ ডলার। অন্য দিকে ক্যানাডার জনপিছু গড়পড়তা আয় কম হইলেও সেখানকার প্রত্যেক লোক ৯৬.৫৫ পাউণ্ড চিনি ব্যবহার করে। যুদ্ধের পর প্রধানতঃ ইয়োরাপের হলাণ্ড, বেলজিয়াম ও ইতালীর চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এমন কি যুদ্ধে বিধ্বস্ত ও হৃতসর্ব্বস্ব জার্ম্মাণিও পূর্ব্বের চাইতে বেশী চিনি খায়।

বিগত ৭ বৎসরের মধ্যে জগতের চিনির উৎপন্নের হার ৯০ লক্ষ টন বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার মধ্যে একমাত্র কিউবাতে ১১½ লক্ষ টনের উপর বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবশিষ্ট ইক্ষু ও বিটপ্রধান দেশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। উৎপন্ন মালের সঙ্গে চাহিদা সমতা রাখিতে পারে নাই। ফলে ১৯২৪-২৫ সনের শেষভাগে ২৮৯০০০০ টন চিনি মজুত থাকে। বিগত বৎসরে অর্থাৎ ১৯২৩ ২৪ সনে ছিল ১৮২৫০০০ টন। যুদ্ধের পূর্ব্বে গড়ে বৎসরে ৭৬০ হাজার টন করিয়া বকেয়া মজুত চিনির অঙ্ক টানিতে হইত। ১৯২৫-২৬ সনেও খুব বেশী মজুত থাকিবে বলিয়া মনে হয়। ইহার আনুষঙ্গিক ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে, গত দুইবৎসর হইতে চিনির দর অনেক কমিয়া গিয়াছে। ১৯২৫ সনের প্রথম ভাগে মজুত মালের চাপে বাজার দর পড়িয়া যাইতেছে ইহা ভালরূপ বুঝা গিয়াছিল না।

"জুর্ণলে দে ফ্যাব্রিকে দে সুকারে''র মতে দুনিয়ার চাহিদা বৎসরে শতকরা ৩⅚ ভাগ অর্থাৎ ৭৫০ হাজার টন করিয়া বৃদ্ধি পাইবে। বিগত কালের মত চিনির চাহিদা উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে কিনা ইহা সমস্যাপূর্ণ; যদিও ভারতবর্ষ, জাপান এবং চীন দাম সস্তা হইলে আরও বেশী পরিমাণ চিনির গ্রাহক হইতে পারে। বৎসরে ৭৫০ হাজার টন করিয়া চাহিয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে ইহা স্বীকার করিয়া লইলে ১০ বৎসর পরে ৭৫ লক্ষ, টন চিনি বেশী ব্যবহৃত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

শিল্পে বেশী পরিমাণ মূলধন খাটাইলেই এরূপ চাহিদা-বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। কিন্তু বণিকরা এটাকে লাভের ব্যবসা বলিয়া না বুঝিলে ইহাতে টাকা খাটাইতে রাজী হইবেন না। চাহিদা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্নের হার বৃদ্ধি হইয়াই চলিবে কিনা কিংবা ফসলের পরিমাণ কমাইয়া দিয়া দুনিয়ার ভাণ্ডার শূন্য করা হইবে কিনা ইহা বড়ই সমস্যার কথা। উৎপন্নের ভাগ হ্রাস করিলে জিনিষের দাম চড়িবে এবং ইহার ফলেই শিল্পটি ভাল ভাবে পরিচালনা করিবার নিমিত্ত বণিক তাহার পুঁজি লইয়া অগ্রসর হইবে।

উৎপন্নের হার সীমাবদ্ধ করিবার নিমিত্ত গত দুই বৎসর কিউবাতে আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে। ইহার ফলে সাময়িক কিছু সুবিধা হইতে পারে।

কিন্তু ইহাদ্বারা অন্যান্য দেশের উৎপন্ন বন্ধ করা চলিবে না। বাজার যতদিন চড়া থাকিবে ততদিন তাহারা উৎপন্ন কম করিতে রাজী হইবে না। এইস্থানে ভুলিলে চলিবে না যে, জার্ম্মাণি এখনও যুদ্ধের পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া যাইতে পারে নাই। রুশিয়াও তাহার উৎপন্নের হার বৃদ্ধি করিতে প্রয়াস পাইবে।

ইয়োরোপের আধুনিক রিপোর্টে দেখা যায়, ৫৩৯৪৭০০ একর জমিতে বিটের চাষ করা হইয়াছে। গত বৎসরের চাইতে ১২০০০০ একর বেশী আবাদ করা হইয়াছে।

কোন্ পদ্ধতি অবলম্বনে জন্মা কম করিয়া চাহিদা বৃদ্ধি করা যাইবে ইহাই এখন সব চাইতে বড় সমস্যা। জিনিষের মূল্যই সাধারণতঃ সরবরাহ ও চাহিদা নির্দ্ধারিত করে। দাম চড়িলেই জিনিষ কম কাটতি হইবে। অন্যদিকে দাম বর্ত্তমান হারে রাখা হইলে ফ্যাক্টরিগুলি চিনি প্রস্তুত করিতে সম্মত হইবে না; কারণ ইহাতে তাহাদের মোটেই লাভ নাই। যুদ্ধের পরে উৎপাদনের হিস্যা অনেকগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্ত্তমানের অনির্দ্দিষ্ট বাজারের জন্য দামের উঠানামা চলিতেছে। ইহাতে মাত্র কতকগুলি স্পেকুলেটরের লাভ হইতে পারে কিন্তু ব্যবসার পক্ষে ইহা ক্ষতিজনক।

তর্ক-প্রশ্ন

বাঁকুড়ার কথা

শ্রীরামানুজ কর প্রণীত "বাঁকুড়া জেলার বিবরণে"র সমালোচনা করিতে যাইয়া শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয় ৪র্থ সংখ্যা 'আর্থিক উন্নতি'র ২৭৫ পৃষ্ঠার 'প্রথম চারি লাইনে বাঁকুড়াবাসীর উদ্দেশে অতি তীব্র মন্তব্য বা কটূক্তি করিয়াছেন। ইহাতে বাঁকুড়াবাসীর প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিয়াছে বলিয়া আমি কয়েকটী কথা 'আর্থিক উন্নতি'র পাঠকবর্গকে জানাইতে চাই।

বাঁকুড়া জেলার প্রাকৃতিক অবস্থা যেরূপ তাহাতে বহু আয়াস স্বীকার করিলে তবে গ্রাসাচ্ছাদনের কোনরূপ সংস্থান করিতে পারা যায়; সেই জন্য অধিকাংশ বাঁকুড়াবাসী কলিকাতাবাসীদের ন্যায় আরামপ্রিয়, সৌখীন, বিলাসী ও ফেশান্ কায়দা দুরন্ত হইবার সুযোগ পায় নাই, এবং অন্যান্য স্থানের বাঙ্গালীদের ন্যায় ব্যবসাবাণিজ্য সম্পর্কে মাড়োয়ারীদের নিটক হার মানিয়াছে—এই অর্থে "বর্ব্বর" বুঝাইলে, তাহার সংশোধন, ব্রাহ্মণদের ক্ষমতা দ্বারা সম্ভব নহে, বৈশ্যবৃত্তির অনুশীলনই একমাত্র উপায়।

আত্মীয়দিগকে ভৎ'সনা করিবার জন্য কোন প্রবীণ ব্যক্তি আক্ষেপ করিয়া যে সকল শব্দ ব্যবহার করেন সেই সকল শব্দ বিদ্রূপের সুরে অপর ব্যক্তি প্রয়োগ করিলে তাহা ভদ্রনীতি-বিরুদ্ধ হয়। সমালোচক মহাশয় বাঁকুড়াবাসীর প্রতি সেইরূপ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।

১৩৩০ সনের অগ্রহায়ণ মাসের 'প্রবাসীতে' (পৃঃ ২৩৪) বাঁকুড়া সারস্বত সমাজের উদ্বোধন পত্র প্রকাশিত যইয়াছে। উদ্বোধন পত্রখানি পড়িলে বিদ্যানিধি মহাশয়ের উক্তির অর্থ এইরূপ দাঁড়াইবে—পূর্ব্বকালে বাঁকুড়ায় সাঁওতাল, বাউরী প্রভৃতি যাহারা দুরন্তভাবে জীবনযাপন করিতে অভ্যস্ত তাহাদেরই বাস অধিক ছিল। পাহাড় জঙ্গল পরিপূর্ণ এই দেশে ব্রাহ্মণদের মত সুকুমার-দেহধারী শ্রমকাতর লোক এত অধিকসংখ্যায় কেন আসিয়াছিলেন তাহা তিনি বলিতে পারিতেছেন না।

উক্তির প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়া এবং বর্ত্তমান পুস্তকে কি ভাবে উহা আলোচিত হইয়াছে তাহা না পড়িয়াই শ্রীযুক্ত পালিত মহশয় কল্পনা করিলেন যে—পাদ্রীদের ন্যায় ব্রাহ্মণগণও বর্ব্বরদিগকে সুসভ্য করিবার জন্য, তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাইবার জন্য দলে দলে বাঁকুড়ায় আসিয়া বর্ত্তমান আছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণদের পরিশ্রম ও ত্যাগস্বীকার ব্যর্থ হইয়াছে; বাঁকুড়াবাসী এখনও তেমনই বর্ব্বর আছে এবং ভবিষ্যতে তাহাদের সুসভ্য হইবার সম্ভাবনা একেবারে নাই দেখিয়া তিনি (পালিত মহাশয়) হতাশ হইয়াছেন।

রথযাত্রাকে তিনি সহজে ছাড়েন নাই, একবার ছাড়িয়া আবার প্রবন্ধের শেষভাগে ধরিয়াছেন। ইহাতে মনে হয়, রথযাত্রা বনাম গোশালা সম্বন্ধে ভাবিয়া তাঁহার মেজাজ গরম হইয়াছিল এবং তিনি বাঁকুড়ার বাঙ্গালীদিগকে উত্তম মধ্যম দুই কথা শুনাইবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে করিতে বিদ্যানিধি মহাশয়ের উক্তিটীকে স্বপক্ষে সহায় মনে করিয়া একটী টিপ্পনী কাটিলেন।

শ্রীগোপেশ্বর খাঁ

[হরিদাসবাবুর লিখিত সমালোচনা পড়িয়া গোপেশ্বর বাবু দুঃখিত হইয়াছেন এবং হয়ত বা আরও কেহ কেহ দুঃখিত হইয়াছেন। কিন্তু সমালোচনায় কোনো ব্যক্তি বা জেলাবিশেষের উপর আক্রমণ থাকিলে আমরা তাহা ছাপিতাম না।—সম্পাদক]
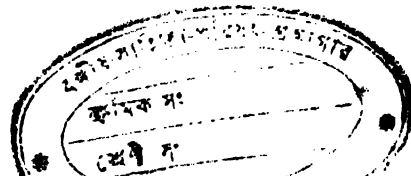
১০৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে শ্রীরঘুনাথ শীল বি, এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
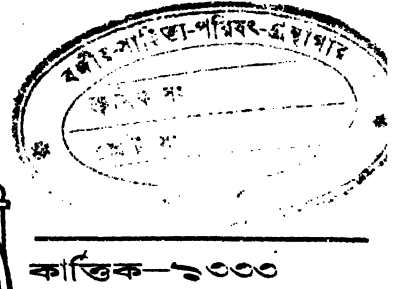
১ম বর্ষ—৭ম সংখ্যা কার্ত্তিক—১৩৩৩

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি।

অথর্ব্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমেঃমূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জন্ম আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।
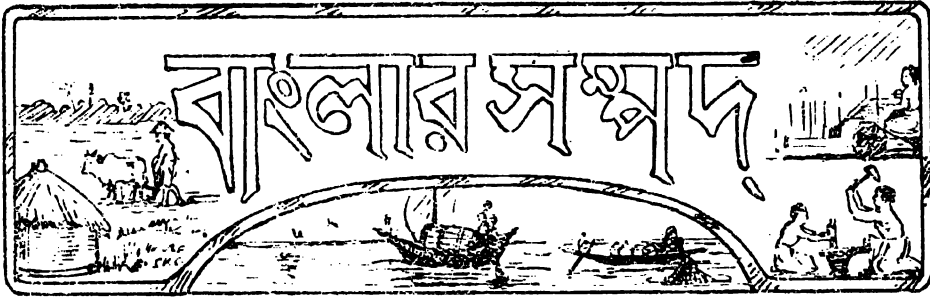
শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত চওড়া রেল

গত ১লা অক্টোবর হইতে কলিকাতা ও শিলিগুড়ির মধ্যে চওড়া রাস্তা দিয়া গাড়ী চলাচল করিতেছে। এ পর্য্যন্ত কলিকাতা হইতে মাত্র পার্ব্বতীপুর পর্য্যন্ত চওড়া রেলের উপর দিয়া গাড়ী চলিত। এই নূতন ব্যবস্থার ফলে দার্জ্জিলিং যাত্রিগণের অনেক সুবিধা হইয়াছে। তাঁহাদিগকে আর পার্ব্বতীপুরে গাড়ী বদল করিতে হয় না।

ঈষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে (১৮৫৭-১৯২৬)

ঈষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে খাস সরকারী সম্পত্তি এবং সরকারী তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। রেলওয়ের বড়কর্ত্তা বা এজেন্ট ভারত সরকারের রেলওয়ে দপ্তরের নিকট জবাবদেহি থাকিতে বাধ্য। লাইনটি গোটা বাংলা জুড়িয়া রহিয়াছে। বাংলার অধিকাংশ প্রধান প্রধান স্থানকে ইহার আওতায় আনা হইয়াছে। ১৮৫৭ সনে ইহার প্রতিষ্ঠা। ১৮৮৭ সনে অন্যান্য রেলের সঙ্গে ইহার সংযোগ কায়েম করা হয়।

নদী-নালা ও রেলের খরচ

বাংলার বুকের উপর অনেক ছোট-বড় নদী-নালা প্রবাহিত। এইগুলি রেল লাইন বিস্তারের পক্ষে খুব অসুবিধাজনক। ঈষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়েকে পুল নির্ম্মাণের জন্য অনেক খরচ করিতে হইয়াছে। সারাতে পদ্মার উপরের পুল তাহার নিদর্শন। শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত প্রশস্ত রেল বিস্তার করায়ও অনেক খরচ পড়িয়াছে। তবে উত্তর বঙ্গ ও কলিকাতার মধ্যে দূরত্বের পরিমাণ কমিয়া আসিল।

বাখরগঞ্জে রেলের অভাব

উত্তরে এই রেলওয়েটি ভুটান সীমান্তে হিমালয়ের পা পর্য্যন্ত গিয়া ঠেকিয়াছে। পশ্চিমে বিহার প্রদেশে ঈষ্টইণ্ডিয়ান ও বেঙ্গল নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলের সঙ্গে ইহার যোগ আছে। পূর্ব্বে আসামের কতকটা অংশ ইহার আওতায় আসিয়াছে। দক্ষিণে স্থন্দরবনের সীমানা পর্য্যন্ত ইহা বিস্তারলাভ করিয়াছে। একমাত্র বাখরগঞ্জ ছাড়া বাংলার আর সকল জেলাতেই রেল লাইন আছে। বাখরগঞ্জেও রেল বিস্তারের প্রস্তাব চলিতেছে। বহু নদী-নালা-বিধৌত বাখরগঞ্জ জেলায় ইহা কোনো দিন সম্ভব হইবে কিনা তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ বর্ত্তমান। স্থন্দরবনের মধ্যে আরও রেলবিস্তারের সম্ভাবনা আছে।

রেলে পাট, ধান ও চা'র চলাচল

পাট বাংলার প্রধান ফসল। স্থতরাং ইহার চলাচল হইতে রেলওয়ের খুব বেশী আয় হয়। বাংলার প্রত্যেক জেলাতে পাট জন্মে; কিন্তু সব চাইতে বেশী জন্মে ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর ইত্যাদি জেলাতে। এই সমস্ত জেলায় ধানের আবাদ কম হয়, কারণ পাট ও ধান একই মরশুমের ফসল। উত্তরবঙ্গের রঙ্গপুর, দিনাজপুর ও বগুড়ায় এবং আসাম প্রদেশের কয়েকটি জেলায় ধান্যের আবাদ বেশী। এই সমস্ত স্থানের ধান্য ও চাউল চালানীতে রেলওয়ের বেশী আয় হয়। এতদ্ব্যতীত চা-প্রধান উত্তর বঙ্গ ও আসাম রেলওয়ের লভ্যাংশ বৃদ্ধি করিতে যথেষ্ট সাহায্য করে।

বাখরগঞ্জে রেল লাইন না থাকাতে এই জেলার বিরাট ধান্য ও চাউলের রপ্তানির লভ্যাংশ হইতে রেলওয়ে বঞ্চিত হইয়াছে। বাখরগঞ্জ হইতে বাংলার বিভিন্ন স্থানে সাধারণতঃ নৌকা, ষ্টীমার প্রভৃতি জলযানে ধান্য ও চাউল প্রভৃতি পণ্য দ্রব্য রপ্তানি হয়।

বাংলায় মোসাফিরি, আমদানি-রপ্তানি ও রেলের আয়

১৮৮৭ সনে ঈষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের মোট আয় হইয়াছিল ৯৪,৩০,৩৯৯ টাকা এবং ইহাতে ৬৭,৩৩,৩০৪ জন আরোহী চড়িয়াছিল। ১৮৯৭ সনের আয় ১,৪৭,৬২,২৩৩ টাকা, আরোহী ১,০৭,৭৭,০০০ জন, এবং ১৫,৩৬,৯৩৯ টন মালের চলাচল ঘটিয়াছিল। ১৯০৭ সনে ইহাতে ২,৪২,২৫,০০০ আরোহী যাতায়াত করে ও ৪১,০১০০০ টন মাল চালান দেওয়া হয়। ইহার নেট আয় হইয়াছিল ২,৬৯,০০,২৪২ টাকা। ১৯১৭ সনের আয়, আরোহী ও মালের ওজন যথাক্রমে, ৩,৭৪,৯৪,৫৫১ টাকা, ৩,৭২,৯২,৮০০ জন এবং ৫৩,৬৮,০০০ টন। ১৯২৬ সনের মার্চ মাসে যে বৎসর শেষ হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, ঐ বৎসর ৪,৬৫,২৬,৬৫০ জন আরোহী রেলে গমনাগমন করিয়াছে এবং ৬৮,৬৭,৭৫০ টন মাল চালান করা হইয়াছে। ইহার বাবদ রেলকোম্পানীর মোট আয় হইয়াছে ৬,৪৯৫৪,৫৯১ টাকা। ঐ বৎসর রেলে দশ লক্ষ টন পাট, আড়াই লক্ষ মণ ধান-চাউল এবং পঞ্চাশ হাজার টন চা বিভিন্ন স্থানে চালান করা হয়।

কলিকাতায় মোটর বাস্

(১)

এখন কলিকাতায় বাস্ চলিতেছে ৫০০ খানি। তন্মধ্যে ভারতবাসীর ৪৫০ খানি।

অত্যল্প কাল মধ্যে ভারতবাসী ৪০ লক্ষ টাকা এই ব্যবসায়ের জন্য ঢালিয়া দিয়াছে। স্থতরাং বলিতে পারি যুবক ভারত এই একটা ব্যবসা খুব জোরে চালাইতে চাহিতেছে।

(২)

সমস্যা উঠিয়াছে বাস্ বনাম ট্রাম। সম্প্রতি কলিকাতায় স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর সভাপতিত্বে এক সভা হইয়া গেল। তাতে কলিকাতাবাসীরা বাসের স্বপক্ষে ভোট দিয়াছেন। শুধু স্বদেশী পুঁজিপাটা বলিয়া নহে, ট্রামের চেয়ে বাস্ই কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষে সস্তা পড়িবে। কারণ, বাস্ ও ট্রাম কোম্পানী বৎসরে নিম্নলিখিতরূপ সাহায্য (সাবসিডি) চাহিয়াছেন।

ওয়ালফোর্ড ট্র্যান্সপোর্ট কোম্পানী ৮৮.৯৬৯৲ টাকা
কোলফিল্ট কোম্পানী প্রথমে ৬১,৫০০৲ „

ঐ কোম্পানী	পরে	৪৫,০০০৲ টাকা
শিয়ালদহ মোটর সারভিস্ ৩ বছরের জন্য		১৫,০০০৲ „
	তৎপরে	৫,০০০৲ „

(উঁহারা ভাড়া করিবেন ⁄১০ পয়সা)

জোয়ারদার মোটর সারভিস্		৬,০০০৲ „

(ভাড়া করিবেন ⁄১৫ পয়সা)

ট্রাম কোম্পানী প্রথমে	...	১,১৪,২৬৩৲ „
পরে	...	৫৪,১৮০৲ „

গো-মড়ক

মেদিনীপুরের "নীহার" লিখিতেছেন,—পটাশপুর ও দুর্গাপুর থানার স্থানে স্থানে গো-মড়ক দেখা দিয়াছে। এই রোগকে পাড়াগাঁয়ের গো-চিকিৎসকগণ "বাতরোগ" বলিয়া জানে। এই রোগের আক্রমণে প্রথমে গরুর সামান্য জ্বর হইয়া গলা ফুলিয়া গিয়া মুখ বন্ধ হইয়া যায় ও লালা পড়িতে থাকে। পরে খাদ্য দূরের কথা ঔষধও গিলিতে পারে না। ইহাতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু ঘটে।

সাতকানিয়া রাঙ্গাখালী ও চকরিয়া থানার অন্তর্গত গ্রাম সমূহে সংক্রামক রোগে বহু গো-মহিষ ছাগল ইত্যাদি মরিয়া গিয়াছে। অনেক গ্রাম পশুশূন্য হইয়া গিয়াছে। এখন লোকে গো-মহিষ ক্রয় করিয়া আনিলেই পরদিন সংক্রামক রোগে মরিয়া যাইতেছে। কৃষিকার্য্য বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম। ("আলোক")

হাতিয়া থানার অন্তর্গত চর ঈশ্বর রায়, তমরদ্দি, চরলক্ষ্মী-দিয়া এবং বুড়িচর প্রভৃতি গ্রামে প্রত্যহ বহু গরু মহিষ ও ছাগল ইত্যাদির মৃত্যু হইতেছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। এসব মৃত জন্তুর পচা দুর্গন্ধে গ্রামে বাস করা দায় হইয়া পড়িয়াছে। ("দেশের বাণী")

বরিশাল কো-অপারেটিভ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

(১৯২৬ সনের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কের বার্ষিক হিসাব)

দেনা

১।	১২২৮টী বিশেষ অংশ	২৪,৫৬০৲
২।	২৮৬১টী সাধারণ অংশ	৬৮,১৫৫৲
৩।	সভ্যের ও অপর ব্যক্তির আমানত	৮,৫২,৩১৭।৮
৪।	সুদ দেয়	১৪,৯১৫৶০
৫।	রিবেট্ দেয়	৮৩৮৶০
৬।	লভ্যাংশ দেয়	১৩০।৶৬
৭।	ফেরৎ লভ্যাংশ দেয়	৪০।৶০
৮।	কর্ম্মচারীর বেতন প্রভৃতি দেয়	১০০২।⁄০
৯।	প্রভিডেণ্ট ফণ্ড	২৯৬৫।৮
১০।	সমিতি সমূহের রিজার্ভ ফণ্ড	৯৬৬৮৶৬
১১।	দশ হাজার বিঘা সমিতির অতিরিক্ত আদায়ী অডিট ফিস দেয়	৶০
১২।	সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের রিজার্ভ ফণ্ড	২৬,৫০০৲
১৩।	পরিদর্শন ফণ্ড	৭১৩৮৶৯
১৪।	বিল্ডিং ফণ্ড	১০,০০০৲
১৫।	অনাদায়ী ফণ্ড	৫৫০০৲
১৬।	এডুকেশন ফণ্ড	৩০৪৲
১৭।	লাইব্রেরী ফণ্ড	৮০।০
১৮।	দাতব্য ফণ্ড	২।০
১৯।	প্রোপাগাণ্ডা ফণ্ড	৪৫৩॥৶০
২০।	পুরস্কার ফণ্ড	৯৫।৶০
২১।	গত বৎসরের অবিতরিত লভ্য	২৯৶⁄ ১১

মোট—১০,১৭,৫৯৮৶৯

আলোচ্য বর্ষের লাভ—১৮৫৮১⁄৯

সর্ব্বমোট—১০,৩৬,১৭৯।৬

পাওনা

১।	হাতে ও ব্যাঙ্কে মজুত তহবিল	৩৯,৭৮৪৶২
২।	ক্যাশ সার্টিফিকেট	৭৪৭১।০
৩।	প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্কে অংশ	১২,০০০৲
৪।	দালান [খাস্তা ৫৩৫৲]	১০,১৬৫৲
৫।	সদর ডাক বাংলা	১৯২৮।৯
৬।	জমির মূল্য	৫১৯৮৲
৭।	প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্কে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের গচ্ছিত রিজার্ভ ফণ্ড	১৯,০২৭॥০

৮।	অনাদায়ী ফণ্ড পৃথক ভাবে প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্কে গচ্ছিত	৫৫০০৲
৯।	বিল্ডিং ফণ্ড পৃথক ভাবে প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্কে গচ্ছিত	৯০০০৲
১০।	প্রভিন্সিয়াল ও সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে আমানত	৪,০২,৭৪৭৸৵১
১১।	সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের রিজার্ভ ফণ্ড [পোঃ আঃ সেভিং ব্যাঙ্কে আমানত]	১।০
১২।	আদায় বাকী হাওলাত	২৮০৲
১৩।	ঐ প্রভিডেণ্ট ফণ্ড	৩৭৲
১৪।	অন্তর্ভুক্ত গ্রাম্য সমিতিতে কর্জ্জ	৪,৯৭,৩৮৬৷৶৬
১৫।	সুদ পাওনা	২১,৯২৬৷৷৵৩
১৬।	সরঞ্জামের মূল্য [৭৪৶৩ খাস্তা বাদে]	৭৬২৲
১৭।	বন্দুকের মূল্য [১১৲ খাস্তা বাদ]	৯৯৲
১৮।	মজুত ফরম ও বহির মূল্য	২৫০৲
১৯।	ক্যাশ সার্টিফিকেটের বর্দ্ধিত মূল্য	১৫৭৬৷৶০
২০।	প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্কে লভ্যাংশ পাওনা	৬৭৯৮৵৯
২১।	সমবায় ও দেশের কথা	১১৮৷৶০
২২।	আলিগঞ্জ ডাকবাংলার সরঞ্জাম ও জমির মূল্য	২৪০৲
	মোট—	১০,৩৬,১৭৯৷৶

১। শ্রীচাঁদ মোহন চাটার্জ্জি, ডেপুটী চেয়ারম্যান

২। শ্রীমথুরা নাথ সেন, জয়েণ্ট সেক্রেটারী

৩। আবদুল গফুর, ডিরেক্টর

কলিকাতা হইতে মুক্তিলাভ

গত ১৯শে আগষ্ট বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে কলিকাতা মিউনিসিপাল বিল সংশোধন করিবার উদ্দেশ্যে কাশীপুর-চিৎপুর এবং গার্ডেনরীচ অঞ্চলকে কলিকাতা করপোরেশনের অধীনতা হইতে মুক্তি দেওয়ার জন্য ডাঃ আবদুল্লা সুরওয়ার্দ্দী এক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। ১৯২৩ সনে ঐ সকল স্থান কলিকাতা করপোরেশনের অধীনে আসে। তথাকার অধিবাসীরা পূর্ব্বে শতকরা ৭৷৷০ টাকা কর দিত। এক্ষণে তাহারা শতকরা ১৭৷৷০ টাকা কর দেয়, অথচ অতিরিক্ত কোন সুবিধাই তাহারা লাভ করে নাই। মিঃ মহবুল হক, মিঃ জে, এন, বসু, মিঃ বি, কে, বসু এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন। প্রস্তাবটী অধিকাংশের মতে গৃহীত হয়।

চট্টগ্রামে নূতন রেল

চট্টগ্রাম হইতে হাটহাজারী পর্য্যন্ত নূতন লাইট রেলওয়ে লাইন হইতেছে। পনর লক্ষ টাকা এই জন্য মঞ্জুর হইয়াছে। জমি মাপ আরম্ভ হইবে ১৯২৮ সনে। এক বৎসর পরে লাইন তৈয়ারীর কার্য্য এবং তাহার দুই বৎসর পরে রেল চলা আরম্ভ হইবে। আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানী এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে।

কলিকাতা পাটের বাজার

গত সপ্তাহে কলিকাতায় ৬৭ হাজার মণ পাট আমদানি ও কলিকাতা হইতে ৬২ হাজার মণ পাট রপ্তানি হইয়াছে। ঐ সপ্তাহের শেষে কলিকাতায় ১৮১০০০ মণ পাট মজুত ছিল। গত বৎসর এই সময় ১৮৭০০০ মণ পাট মজুত ছিল। এ সপ্তাহে যে পাট ৮৷০ হইতে ১২৶১০ মূল্যে বিক্রী হইয়াছে গত বৎসর এ সময় তাহার মূল্য ১৪।০ হইতে ১৯৲ টাকা ছিল। বাজার একটু গরম আছে। বিক্রেতারা উচ্চ-মূল্যেও বিক্রয় করিতে সম্মত নহেন। গতপূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা আলোচ্য সপ্তাহে খোলা পাট আট আনা অধিক মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে।

নৌকাডুবী

বিগত ২৬শে আগষ্ট বৃহস্পতিবার হাতিয়া হইতে আসিবার সময় প্রায় শতাধিক লোক, ১৩টী ছাগল ও ৭১৮টি গরু সহ একখানা খেয়া নৌকা লাঙ্গলিয়া চরের অগ্রভাগে আসিয়া হঠাৎ জলমগ্ন হয়। ইহাতে ৭ জন মাত্র লোক কোন রকমে প্রাণ রক্ষা করিয়া সহরে পৌছিয়াছে। অবশিষ্ট সকলেই সলিল-সমাধি প্রাপ্ত হইয়াছে, না খরস্রোতা মেঘনার প্রবল স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে, এখনও তাহার প্রকৃত সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

হাতিয়া ও নোয়াখালী যাতায়াত কালে যে সকল নৌকাডুবী হইতেছে, তাহার ফলে দেশের জনসাধারণ মহা আতঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। প্রতি বৎসরই এই পথে নৌকাডুবী হইতেছে। গত বৎসরও ঠিক এমনি দিনে এমনি একটী ভীষণ নৌকাডুবী হইয়া বহু লোক মারা গিয়াছিল। এই বৎসরও অল্প কয়েক দিন পূর্ব্বে আর একখানা নৌকাডুবী হইয়া গেল। ইহার কারণ কি? লোকের জীবন লইয়া যাহারা ছিনি মিনি খেলা করে তাহাদের কর্ত্তব্য-বুদ্ধি আছে বলিয়া আমরা কখনও মনে করিতে পারি না।

অতিরিক্ত বোঝাই নৌকা চালানে অক্ষমতা, মাল্লাদের হঠকারিতা ও অমনোযোগিতা ইত্যাদি কারণে এই সকল নৌকাডুবী হইতেছে। নতুবা পরিমিত বোঝাই নৌকা চালানে দূরদর্শিতা ও নৌকা চলিবার সময় মাঝি মাল্লাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকিলে কখনও নৌকাডুবী হইতে পারে না। কখনো কখনো বহুকালের পুরাতন নৌকা দ্বারাও মাঝিগণ অল্পব্যয়ে বহু লাভের লালসা পরিত্যাগ করিতে পারে না। ইহাও নৌকাডুবীর কারণ সমূহের অন্যতম।

আমরা এসম্বন্ধে আজ কয়েক বৎসর যাবৎ তীব্র ভাবে সমালোচনা করিয়া আসিতেছি। কিন্তু না কর্ত্তৃপক্ষের না মাঝি মাল্লাদের চৈতন্যোদয় হইল। গত বৎসরকার সাংঘাতিক নৌকাডুবী ও বহু প্রাণ হানির বিষাদস্মৃতি এখনও কেহ বিস্মৃত হইতে পারে নাই। এত সতর্ক করা সত্ত্বেও কেন যে পুনঃ পুনঃ নৌকাডুবী হইতেছে, তাহা বিশেষ রূপে ভাবিয়া দেখিবার বিষয় বটে।

ফেরীঘাটসমূহ ইজারা দেওয়ার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে আমরা কর্ত্তৃপক্ষকে বিশেষ ভাবে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনীর ন্যায় আমাদের সে সতর্কীকরণ তৃণবৎ উড়িয়া গিয়াছে। ("নোয়াখালী-হিতৈষী")

সিলেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক

এই ব্যাঙ্কের বিবরণীতে দেখা যায়, ইহার সঙ্গে ৯৮টী সমিতি সংযুক্ত আছে। ঐ সমিতির মোট সভ্য-সংখ্যা ১৫৯০ জন। ৯৮টী সংযুক্ত সমিতির মধ্যে ২টী ষ্টোরস্, ২টী তন্তুবায় সমিতি, ২টী মৎস্যজীবী সমিতি এবং বাকী কয়টী ঋণদান সমিতি। ব্যাঙ্ক সমস্ত জেলায় মোট ১২২টী সমিতিকে টাকা দাদন দিয়াছেন। ১টী মাত্র নূতন কৃষি সমিতি গঠিত হইয়াছে। আলুর বীজের জন্য ৭টী সমিতিকে ৪২০০০৲ টাকা দাদন দেওয়া হইয়াছে। কৃষিসমিতিগুলি মং ২৩৭৯৷০ আনার বীজ খরিদ করে এবং এই সমিতির সংগৃহীত ফসলের মূল্য ৪২,২৫৭ টাকা হইবে।

ব্যাঙ্কের লাভ হইয়াছে মং ২৮৯৫৷৵৪ পাই। প্রতি বিশিষ্ট অংশে শতকরা ৯৲ টাকা এবং সাধারণ অংশে ৭৲ টাকা হিসাবে লভ্যাংশ বণ্টনের জন্য ডিরেক্টারগণ প্রস্তাব করিয়াছেন।

অংশ বাবদ মূলধন ১৬,৬৩০৲, মেম্বারগণ হইতে আমানত ২৫,৭৭৪।৴৭, নন্‌মেম্বার হইতে ১,১৫,৩১৮৲১১। সমিতি হইতে আমানত ৬,১৬৯।৯। মোট ১,৬৩,৪৯১৷৷৴৩ পাই।

বৎসরের শেষ তারিখে আসল মধ্যে মং ২৫৭৫৲ টাকা অনাদায় ছিল। কিন্তু এই টাকার আদায়ের কাল বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ১৯২৬ সনের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত প্রাপ্য সুদ বাবদ মং ১৮৫৯৸৵৯ পাই বাকী ছিল; তন্মধ্যে এ পর্য্যন্ত মাত্র ৯২৸৵০ বাকী রহিয়াছে।

ইক্ষুর আবাদ

বর্ত্তমান বৎসরে বঙ্গদেশে ইক্ষুর আবাদ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের প্রথম অনুমান প্রকাশিত হইয়াছে। এবৎসর সমগ্র বঙ্গদেশে অনুমান ২০,৩,১০০ একর (এক একর তিন বিঘার কিছু অধিক) ভূমিতে ইক্ষুর আবাদ হইয়াছে। গত বৎসর মোটের উপর ২,১২৫০০ একর ভূমিতে আবাদ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। তাহা অপেক্ষা কিছু ন্যূনাধিক হইতে পারে। ইক্ষু রোপণের সময় জলবায়ুর অবস্থা মন্দ ছিল না, কিন্তু মধ্যে বৃষ্টির অভাব হওয়াতে পশ্চিম বঙ্গে ও ময়মনসিংহে ইক্ষুর চারাগুলি কিছু হীনতেজ হইয়া পড়িয়াছিল। পরে বর্ষার জলে পুনরায় সকল স্থানেই গাছগুলি বেশ সতেজ হইয়াছে। যদি আর কোনরূপ ব্যাঘাত না হয়, তাহা হইলে গুড়ের পরিমাণ আশানুরূপ হইবে বলিয়া মনে হয়।

পঞ্জাবে হাতের তাঁত

হাতের তাঁতে পাঞ্জাবীরা তুলার কাজ করিত। বিগত পাঁচ বৎসর ধরিয়া রেশমের দিকে তাহাদের নজর গিয়াছে। কৃত্রিম রেশমের রেওয়াজও বাড়িতেছে। প্রায় ১,০০,০০০ নরনারী হাতের তাঁতে জীবিকা অর্জ্জন করে। প্রায় ১৫।২০ হাজার তাঁত পঞ্জাবের পল্লীতে পল্লীতে সজোরে চলিতেছে। অধিকাংশই সেকেলে তাঁত। আধুনিক "ফ্লাই-শাটল" কায়েমের ব্যবস্থা হইয়াছে। গবর্মেন্টের শিল্প-বিভাগ এই দিকে পথপ্রদর্শক।

পাঞ্জাবী তাঁতীর আর্থিক অবস্থা

এক লাখ তাঁতীর ভিতর প্রায় ৬০,০০০ লোক নিজ নিজ তাঁতের মালিক। এই ষাট হাজারের ভিতর অবশ্য স্ত্রীপুত্র-কন্যা ইত্যাদি পোষ্যবর্গকেও ধরিতে হইবে। অপর ৪০,০০০ নরনারী ছোট-খাট কারখানায় কর্ম্ম করে। তাঁতীরা নিজে টাকা খাটাইয়া কাপড় বুনিতে অসমর্থ। বেপারীরা তাহাদিগকে দাদন দেয়। এই দাদনই তাহাদের মূলধনস্বরূপ। পাঞ্জাবী তাঁতের রেশমী কাপড় মালাবার, লঙ্কা, ব্রহ্মদেশ এবং ভারতের অন্যান্য জনপদে চালান হয়।

কোটী টাকার অভ্র রপ্তানি

অভ্র খনিজ পদার্থ। কিন্তু ইহাকে ধাতুর মধ্যে গণনা করা চলে না। ভারতবর্ষের খনিতে খনিতে যে অভ্র জন্মে তাহা বিদেশে বেচিয়া ভারতবাসী প্রচুর টাকা রোজগার করে।

অভ্রের মতন আরও অনেক অ-ধাতব খনিজ পদার্থ ভারত হইতে বিদেশে রপ্তানি হয়। কিন্তু এই শ্রেণীর মধ্যে অভ্রই সর্ব্বপ্রধান। কারণ তিন বৎসরে মোট রপ্তানি ১০৭, ১০৫ ও ১০৬ লাখ টাকার মধ্যে অভ্রের মূল্য যথাক্রমে ৮৬, ১০৩ ও ১০৪ লাখ টাকা। ইহার মধ্যে ইংল্যাণ্ড গত বৎসর ৪৪ লাখ ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ৩৮ লাখ এবং অন্যান্য দেশ বাকী টাকার মাল লইয়াছে। ইদানীং অভ্র প্রধানতঃ এঞ্জিন গৃহের দেওয়াল নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কারণ ইহা অত্যন্ত উত্তাপসহ।

অ্যাস্‌ফাল্ট ও গ্রাফাইটের আমদানি

অ্যাস্‌ফাল্ট রাস্তা ও গৃহ নির্ম্মাণে এবং গ্রামোফোনের রেকর্ড নির্ম্মাণে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। ইহার আমদানিও ১৯২৩ ও ১৯২৪ সনে হয় ১১ লাখ টাকার কিঞ্চিৎ অধিক এবং গত বৎসর হয় ১৩ লাখ টাকারও অধিক। আমাদের দেশে চীনামাটির ব্যবহার কম নয়। ১৯২৩ ও ১৯২৫ সনে ১৬ লাখ ও ১৯২৪ সনে প্রায় ১৯ লাখ টাকা। গ্রাফাইট গত তিন বৎসরে কোনো বারেই ২।৩ লাখ টাকার কম আমদানি হয় নাই।

ভারতে মণি-মুক্তা-মার্ব্বেলের চাহিদা

মূল্যবান প্রস্তরাদি ও মুক্তা প্রথম বৎসর ১৮০ লাখ, দ্বিতীয় বৎসর ১২০ লাখ ও গত বৎসর ১২৪ লাখ টাকার আমদানি হইয়াছে। ইহার মধ্যে গত বৎসর যুক্তরাষ্ট্র (১৭ লাখ), বেলজিয়াম (৪৭ লাখ) প্রস্তরাদি এবং বেহ্রীন্ দ্বীপ ও মস্কট্ যথাক্রমে ২৩ ও ১৬ লাখ টাকার মুক্তাদি ভারতে পাঠাইয়াছে। সাধারণ প্রস্তর ও মার্ব্বেল প্রস্তর গড়ে ৫ হাজার টন ও সাত লাখ টাকা মূল্যের প্রতি বৎসরে আমদানি হইয়াছে। প্রস্তরনির্ম্মিত দ্রব্যাদি ইহার অন্তর্গত নহে। মোটের উপর ফী বৎসর প্রায় কোটী টাকার এই সকল জিনিষ ভারতে আসে।

অনাথাশ্রম ও মজুর-আন্দোলন

বিহার-উড়িষ্যার স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় বাবু গণেশ দত্ত সিং মাসিক তাঁহার বেতনের তিন হাজার টাকা প্রদান করিয়া একটী ফণ্ড করিয়াছেন। তাহাতে সম্প্রতি এক লক্ষাধিক টাকা হইয়াছে। তিনি এ টাকা হইতে একটী হিন্দু অনাথাশ্রম স্থাপনের জন্য এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। বাকী টাকা বিহার-উড়িষ্যা শ্রমিক প্রচার কার্য্যের জন্য প্রদান করা হইবে।

মধ্যপ্রদেশে "কন" আগাছা

মধ্য প্রদেশের ভূমিতে "কন" নামক একপ্রকার আগাছা জন্মিয়া থাকে, ইহা বড়ই দুর্দ্দান্ত। এই প্রদেশের কৃষি-বিভাগীয় ডেপুটি ডিরেক্টর মিঃ রিচি কলের লাঙ্গল চালাইয়া পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, "কন নামক আগাছা, যা সাগর বিভাগস্থিত জেলাগুলির প্রশস্ত মাঠগুলিকে উচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছিল,—সেই দুরন্ত আগাছা বিনাশে ট্রাক্টর যন্ত্র খুব উপযোগী বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।"

ব্রহ্মদেশে লৌহ-খনির আবিষ্কার

মেসার্স বুলক ব্রাদার্স কোম্পানীর কর্ম্মচারী মিষ্টার ইউ, আব, এড্ওয়ার্ড "লৌহ" সম্বন্ধে রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্‌ষ্টিটিউটে এক বক্তৃতা করেন। তৎপর মিষ্টার এ, সি, মার্টিন নামক খনিবিদ্যায় পারদর্শী জনৈক ব্যক্তি ঘোষণা করেন যে, রেঙ্গুনের ৬৪—৬৮ মাইলের মধ্যে তিনি এক প্রকাণ্ড লৌহখনি আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহার ফলে লোহা সম্বন্ধে ব্রহ্মদেশ পৃথিবীর মধ্যে একটী সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী দেশে পরিণত হইবে।

ভারতে নীলের চাষ

সমগ্র ভারতে ১১১২০০ একর জমিতে নীলের চাষ হইয়াছে। মোট ২২,১০০ হন্দর নীল উৎপন্ন হইবে বলিয়া মনে হয়। গত বৎসর ১৭,২০০ হন্দর উৎপন্ন হইয়াছিল।

সমগ্র ভারতে যত নীল জন্মে তাহার ৪১·৬ ভাগ মাদ্রাজে, ১৩ ভাগ বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে, ১২·৯ ভাগ যুক্ত প্রদেশে, ১০·৯ ভাগ পঞ্জাবে, ২·৮ ভাগ বোম্বাইতে এবং ২·৬ ভাগ বঙ্গদেশে উৎপন্ন হয়। প্রতি একরে মাদ্রাজে ১৪ সের, বিহারে ৭ সের, যুক্ত প্রদেশে ৬।৷০ সের, পঞ্জাবে ১০।৷০ সের ও বোম্বাইতে ৭।৷০ সের নীল উৎপন্ন হয়।

পাতিয়ালায় সোনার খনি

পাতিয়ালা ষ্টেটে নারনল নামক স্থানের নিকট স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হইযাছে। প্রায় ১২ হইতে ১৬ বর্গ মাইল পরিমিত স্থানে উহা বিস্তৃত।

ব্রহ্ম-ভারতের রেল-সংযোগ

ভারতের প্রত্যেক প্রদেশেই আজকাল রেল আছে। আর রেলপথেই যে-কোনো প্রদেশ হইতে অন্যান্য প্রদেশে মোসাফিরি করা সম্ভব। কিন্তু ব্রহ্মদেশে যাইতে হইলে সাগর পাড়ি দিতে হয। রেলে রেলে ভারত হইতে ব্রহ্মে পৌছানো অসম্ভব। এ অসুবিধা দূর করিবার ব্যবস্থা চলিতেছে। পাহাড়ী পথ দুরস্ত করিতে সময় লাগিবে। কিন্তু আকিয়াব পর্য্যন্ত রাস্তা জরীপ করা হইয়া গিয়াছে।

ভারতীয় রেল ও দক্ষিণ এশিয়া

ভারতের যে-কোনো পল্লীতে রেলে চাপিয়া দক্ষিণ এশিয়ার যে-কোনো পল্লীতে পৌছিবার ব্যবস্থাও হইতেছে। একদিকে ব্রহ্মের পথে চীনের সীমানা পর্য্যন্ত গিয়া ভারতীয় রেল ঠেকিবে। অপর দিকে শ্যাম দেশের রেল পথের সঙ্গে ব্রহ্ম-ভারতীয় রেলের যোগাযোগ কায়েম হইতেছে। তাহার ফলে সমুদ্রযাত্রায় জাত না মারিয়াও বরাবর সিঙাপুর ও পেনাঙ্ পর্য্যন্ত মোসাফিরি করা চলিবে। এই গেল দক্ষিণ এশিয়ার পূর্ব্ব অঞ্চলের কথা। পশ্চিম অঞ্চলের সঙ্গেও ভারতীয় রেলের কুটুম্বিতা ঘনাইয়া আসিতেছে। পারস্যে পৌছিবার জন্যও ভারত সন্তানকে আর কালাপানি পার হইতে হইবে না।

৩৮,০০০ মাইল রেলপথ

ভারতে আজকাল ৩৮,০০০ মাইল বিস্তৃত রেলপথ আছে। ১৮৯০ সনে ছিল মাত্র ১৫,০০০ মাইল। বিশ পঁচিশ বৎশর পূর্ব্বে লর্ড কার্জ্জনের আমলে বৎসরে ৭০০।৮০০ মাইল করিয়া নতুন পথ তৈয়ারী হইত। কিন্তু আজকাল বৎসরে প্রায় ১,০০০ মাইল পথ তৈায়ারী হয়। আগামী পাঁচ বৎসরের ভিতর ৬০০০ মাইল নতুন পথ প্রস্তুত হইবে।

এই ৩৮,০০০ মাইলের ভিতর ২৮,০০০ মাইল সরকারী সম্পত্তি। ইহার ভিতর আবার ১৫,৫০০ মাইল খাস সরকারের অধীনে পরিচালিত হয়। গবর্মেণ্টের নিকট হইতে অবশিষ্ট ১২,৫০০ মাইলের জন্য বিভিন্ন কোম্পানী "ইজারা" লইয়াছে।

কোন্ রেলে কোন্ মাল

নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়েতে গমের চলাচল বেশী। কয়লা, তেলের বীজ আর গম এই তিন মাল ঈষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলের উপর দিয়া চলে। আসাম এবং ঈষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলে আমদানি-রপ্তানি হয় পাটের এবং চা'র। বার্ম্মা-রেলের প্রধান মাল কাঠ, চাউল ও ধান। মাদ্রাজ এবং সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে তেলের বীজ আর তুলা বহিয়া থাকে। এই দুই বস্তুই আবার গ্রেট-ইণ্ডিয়ান পেনিন্সুলার রেল এবং বম্বে-বড়োদা ও সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়ান রেলের মাল-গাড়ীর ভার সৃষ্টি করে। দক্ষিণ ইণ্ডিয়ান রেলেওয়ে দিয়া আমদানি-রপ্তানি হয় তেলের বীজ, চাউল এবং বাদাম।

মান্দ্রাজে মজুর-সঙ্ঘ

মান্দ্রাজের মজুর-সঙ্ঘ ১৯২৫ সনে ১২০টা পাঠশালা কায়েম করিতে পারিয়াছে। আজকাল এইরূপ পাঠশালার মোট সংখ্যা ৭২৩। গত বৎসর ২৫,৬০৬ ছাত্রছাত্রী এই স্কুলে লেখাপড়া শিখিয়াছে। এই সংখ্যার ভিতর ২২,৪১৭ বালক এবং ৩,১৮৯ বালিকা। পাঠশালায় কোনো বেতন লওয়া হয় না।

স্কুল কায়েম করাই মজুর-সঙ্ঘের একমাত্র কর্ম্ম নয়। ঘরবাড়ী তৈয়ারী করিবার দিকে সঙ্ঘের নজর আছে। পতিত জমি চাষে আনিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। সমবায় সমিতি কায়েম হইয়াছে। কূয়া, পুকুর, পায়খানা রাস্তা-ঘাট ইত্যাদির দিকেও যথোচিত দৃষ্টি আছে।
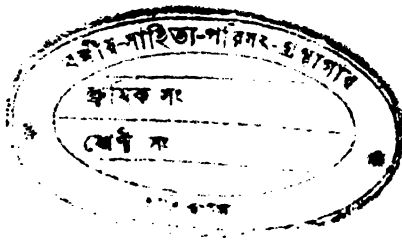
তুরস্ক ও আমেরিকায় বাণিজ্য-সন্ধি

লোজানে আঙ্গোরা-সরকার ও মার্কিণ-সরকারের মধ্যে যে বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল, এই বৎসর তার মেয়াদ ফুরাইবার কথা। কিন্তু ইতিমধ্যে মার্কিণ-সরকারের প্রতিনিধি আঙ্গোরায় আসিয়া সেই সন্ধির মেয়াদ আরও বাড়াইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। মার্কিণ প্রতিনিধি যুক্তি-প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এই সন্ধিতে আঙ্গোরা-সরকার ও তুর্কী জাতিই অধিক লাভবান হইয়াছেন। কারণ, মার্কিণ হইতে যত টাকার মাল তুরস্কে আমদানি হয়, তার চেয়ে অনেক বেশী টাকার তুর্কী মাল আমেরিকার বাজারে বিক্রয় হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি দেখাইয়াছেন যে, মার্কিণ দেশে জাত একমাত্র মোটর গাড়ীই স্মার্ণা ও ইস্তাম্বুলের বাজারে বিক্রয় হয়; কিন্তু তুরস্কের সমস্ত ফল, তামাক ও সিগারেটের ক্রেতা আমেরিকা। আঙ্গোরা-সরকার মার্কিণ প্রতিনিধির এই যুক্তির সারবত্তায় নিঃসন্দেহ হইয়া সন্ধির মেয়াদ বাড়াইয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

জাপানে "রেঅঁ" রেশম

জাপানে প্রভূত পরিমাণে প্রাকৃতিক রেশম প্রস্তুত হইলেও সেখানে "রেঅঁ" বা নকল রেশমের উৎপাদন যথেষ্ট বিস্তার লাভ করিয়াছে। "রেঅঁ" শিল্পে জাপান অপর সকল দেশের সঙ্গে তালে তালে পা ফেলিয়া চলিয়াছে। আর আর দেশের মত রেঅঁ রেশমের দাম অপেক্ষাকৃত সস্তা হওয়ায় জাপানেও ইহার চাহিদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯২৫ সনে জাপান ৩০ লক্ষ পাউণ্ড রেঅঁ রেশম প্রস্তুত করে। ইহার শতকরা ৯০ ভাগ উৎপন্ন হয় তিকক্ু রেঅঁ কোম্পানী ও আসাহি সিল্ক উইভিং কোম্পানীর কারখানায়। বর্ত্তমান বৎসরের উৎপাদন অনুমান ৪০ লক্ষ হইতে ৪৫ লক্ষ পাউণ্ডে দাঁড়াইবে।

রেঅঁ শিল্পে দশ কোটী ইয়েন

রেঅঁ ব্যবসায়ে পুঁজি খাটাইবার নানা প্রকার আয়োজন চলিতেছে। নিপ্পন রেঅঁ কোম্পানী ১॥০ কোটী ইয়েন স্থিরীকৃত মূলধনে উজি শহরে যে বিরাট কারখানা স্থাপনের মতলব আঁটিয়াছেন সেখানে দিনে দুই হাজার পাউণ্ড করিয়া রেঅঁ প্রস্তুত হইবে। মিৎসুই কোম্পানীর পরিচালিত তোকিও রেঅঁ কোম্পানী তাহার সমুদয় পুঁজি এক কোটী ইয়েন ব্যয়ে জিজি শহরে একটি প্রকাণ্ড কারখানা স্থাপন করিবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। তোকিও রেঅঁ কোম্পানী তাহার বর্ত্তমান মূলধন বৃদ্ধি করিয়া ২০ লক্ষ ইয়েনের স্থানে ২ কোটী ইয়েন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই সমস্ত দেখিয়া মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে রেঅঁ শিল্পে খাটানো জাপানের সমবেত মূলধন দাঁড়াইবে ১০ কোটী ইয়েন (১ ইয়েন = ১॥০ টাকা)।

উজির কিনারায় রেঅঁ-কারখানা

জাপানের রেঅঁ শিল্প তুলা ও বস্ত্র শিল্পের কারখানার মালিকদের দ্বারা পরিচালিত। এইসকল কারখানায় বেশীর ভাগ ভিস্কো সিল্ক প্রস্তুত করা হয়। এই ধরণের সিল্ক নির্ম্মাণের জন্য প্রভূত পরিমাণ জলের প্রয়োজন হওয়ায় ব্যবসায়িগণ রেঅঁ শিল্পাগারগুলির জন্য সাধারণতঃ বিওয়া হ্রদ বা উজি নদীর তীর পছন্দ করেন। এই স্থানগুলির

আরও সুবিধা এই যে, এগুলি কোবে এবং ওসাকা বন্দরের সন্নিকটে অবস্থিত।

ইতালিতে মেয়ে-মজুর

ইতালির অনেক কারখানায় ১০ বছরের ছোট ছেলে-মেয়ে মজুরের কাজে নিযুক্ত আছে। তাদের মজুরি দিনে ৫ হইতে ৭ লিয়ার পর্য্যন্ত (৷৷৹ হইতে ৷৷৵৹)। তারা খাটে দিন ১০ ঘণ্টা করিয়া।

নেপলসের এক ফ্যাক্টরীতে ১২ বছরের মেয়েরা কাজ করে। মজুরি ৷৷৴১০ হইতে ৷৷৵৹ পর্য্যন্ত। তারাঁতোর এক তামাকের কারখানায় মেয়েরা কাজ করে। প্রতি দুই পাউণ্ড (১ সের) তৈরী তামাকের জন্য তারা মজুরি পায় ৴৫ পয়সা।

ইতালির এক রবার কারখানায় মেয়ে-মজুরদের ঘণ্টা হিসাবে বেতন দেওয়া হয় ৴৫—এক আনার কিছু বেশী। এক পেরেকের কারখানায় মেয়েরা দিন দশ ঘণ্টা কাজ করিয়া প্রতিদিন ৷৷৴১০ উপার্জ্জন করে।

পুনর্গঠিত রাঁস নগর

বিগত মহাযুদ্ধে রাঁস নগর উচ্ছন্ন হইয়া যাওয়াতে উহাকে এক প্রকার পুনর্নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। উহা একটী নূতন নগরে পরিণত হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে তথায় ১০৮০০টি গৃহ ছিল, এক্ষণে তথায় ১৪৫০০ গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু উহার অধিবাসীর সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা ১৫০০০ কম রহিয়াছে। ইহার কারণ পূর্ব্বেকার অধিবাসীদিগের অনেকে দেশান্তরে বাস করিতেছে। নগর পুনর্নির্ম্মিত হওয়ায় অনেক বিদেশী লোক আসিয়া তথায় বাস করিয়াছে। নগরে তিন লক্ষ লোক বাস করিতে পারিবে এই ভাবে উহা সংগঠিত হইয়াছে।

ফ্রান্সের নয়া সড়ক

ফ্রান্সে ৫৮,৬৯৭ কিলোমেতর (১ কিলোমে=⅝ মাইল) সড়ক নষ্ট হইয়াছিল। ১৯২৬ সনের প্রথম পর্য্যন্ত ৫৩,১৬৫ কিঃ সড়ক পুনর্গঠিত হইয়াছে। রেলের রাস্তা নষ্ট হইয়াছিল ১,৪০৮ কিঃ, পুনর্গঠিত হইয়াছে ২,৩৬১ কিঃ।

ফরাসী চাষীর নূতন জমি

চাষের জমি নষ্ট হইয়াছিল ১,৯২৫,৪৭৯ হেক্‌তার (১ হেক্=৭৷৷৹ বিঘা)। আজ পর্য্যন্ত ১,৮১৫,৪৪৯ হেক্ জমি পুনরায় কার্য্যোপযোগী হইয়াছে।

ফরাসীদের নূতন নূতন ঘরবাড়ী

ঘরবাড়ী নষ্ট হইয়াছিল ৮৬০,৪৪৪। ইহার ভিতর পুনর্গঠিত অথবা মেরামত হইয়াছে ৫২১,৯১৩। এইগুলার মধ্যে বসতবাড়ীর সংখ্যা ৩৬৪,৪০৬। সরকারী বা সার্ব্বজনিক ঘরবাড়ী নষ্ট হইয়াছিল ১৭,৬১৬। তাহার ভিতর ১১,৩৪৩ পুনর্গঠিত হইয়াছে আর ২,৮৫৬ টা সাময়িক ভাবে মেরামত হইয়াছে।

কারখানার জন্য ঘরবাড়ী নষ্ট হইয়াছিল ৯,৩৩২। এইগুলায় মজুর খাটিত প্রায় এক লাখ। আজ পর্য্যন্ত ৮,২২৮ টা কারখানা নূতন খাড়া হইতে পারিয়াছে।

ফ্রান্স-মেরামতের খরচ

লড়াইয়ের ভাঙ্গা-চূরা ফ্রান্সকে মেরামত করিতে গিয়া আজ পর্য্যন্ত ফরাসীরা ১০২ মিলিয়ার্ড (১ মিলিয়ার্ড=১,০০০ মিলিয়ন=১০০ কোটি) ফ্রাঁ (১ ফ্রাঁ আজকাল—এক আনা, কখনো কখনো তিন আনার সমান ছিল। যুদ্ধের পূর্ব্বেকার ফ্রাঁ=দশ আনা) খরচ করিয়াছে। ইহার ৮৫ মিলিয়ার্ড গিয়াছে বিভিন্ন প্রকার সম্পত্তির পুনরুদ্ধার বা পুনর্গঠনের হিসাবে,—যথা, (১) ২৫ মিলিয়ার্ড দেওয়া হইয়াছে শিল্প-কারখানার লোকসান পূরণের জন্য, (২) ২০ মিলিয়ার্ড আবাদী জমির পুনরুদ্ধারের জন্য খরচ হইয়াছে (৩) ৪০ মিলিয়ার্ড গিয়াছে অন্যান্য বাবদ।

অবশিষ্ট ১৭ মিলিয়ার্ডের কিয়দংশ খরচ হইয়াছে শাসন সংক্রান্ত কর্ম্মের জন্য। রেলপথ মেরামত ও পুনর্নির্ম্মাণের জন্য কিছু গিয়াছে। তাহা ছাড়া, দুঃস্থ, পীড়িত ইত্যাদির সেবায় লাগিয়াছে কিছু।

বিদেশে ফরাসী রেশম

১৯২৫ সনে লিওঁ শহরের রেশম-শিল্পীরা ৩,৭৫৪,৬২২,০০০ ফ্রাঁর রেশম বিদেশে বেচিয়াছে। এই বৎসর সমগ্র

ফ্রান্স বিদেশে যত মাল রপ্তানি করিয়াছে রেশম তাহার শতকরা ৮.২৫ অংশ (মূল্য হিসাবে)। ১৯২৪ সনের তুলনায় ফরাসী রেশমের রপ্তানি বাড়িয়াছে শতকরা ১৬.৫০ অংশ।

রেশম-দুনিয়ায় শুল্ক-দেওয়াল

ফরাসী রেশমের রপ্তানি বাড়িয়াছে বটে। কিন্তু ফরাসী রেশমের বিরুদ্ধে অনেক দেশেই শুল্ক-দেওয়াল গড়িয়া উঠিয়াছে। ১৯১৮ সন হইতে বিলাতে বিদেশী রেশমের আমদানির বিরুদ্ধে আইন জারি আছে। ফরাসীরা ইংরেজ সমাজে আর দন্তস্ফুট করিতে পারিতেছে না। গ্রীস দেশে পুরাপুরি রেশমের তৈয়ারী বিদেশী কাপড়চোপড় আমদানি নিষিদ্ধ। ইতালির সঙ্গে ১৯২৩ সনে ফ্রান্সের এক বাণিজ্য সমঝৌতা কায়েম হয়। তদনুসারে ইতালিতে ফরাসী রেশম রুখিবার জন্ম কোনো শুল্ক-দেওয়াল কায়েম হইবে না এইরূপ ঠিক ছিল। কিন্তু নানাপ্রকার অছিলায় ইতালি ফরাসী রেশমের প্রবেশপথ অনেকটা রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। রুমেণিয়া দেশে আইন আছে যে, যে কাপড়ে আধাআধি রেশম আছে, সে কাপড় আমদানি করা চলিবে না। তাহার ফলে রুমেণিয়ায় ফরাসী রেশমের বাজার কমিয়া আসিয়াছে। জার্ম্মাণির সঙ্গে ফরাসীদের বুঝাপড়া এখনো চলিতেছে। কিন্তু ইতিমধ্যে ইতালিয়ান এবং সুইস বেপারীরা জার্ম্মাণিতে নিজ নিজ রেশম বেচিবার জন্ম নরম হারে শুল্কের ব্যবস্থা কায়েম করাইতে পারিয়াছে। ইহাতেও ফরাসী রেশমের বিদেশী বাজার খাটো হইয়া গিয়াছে। অপর দিকে হাঙ্গারি দেশে ফরাসী রেশমের উপর শুল্কের হার কমিয়াছে।

কৃত্রিম রেশমে ইয়োরোপ বনাম আমেরিকা

১৯২৫ সনে সমগ্র ইয়োরোপে ৫৫,৪৯২,৫০০ কিলো (১ কিলো=১ সের) কৃত্রিম (রাসায়নিক) রেশম উৎপন্ন হইয়াছে। কৃত্রিম রেশমের উৎপাদন ক্রমেই বাড়িতেছে। ১৯২৪ সনে উৎপন্ন হইয়াছিল ৪৫,০০০,০০০ কিঃ। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ১৯২৪ সনে উৎপন্ন হইয়াছিল ২২,০০০,০০০ কিঃ (অর্থাৎ সমগ্র ইয়োরোপের প্রায় আধাআধি)। কিন্তু ১৯২৫ সনে উৎপন্ন হয় ২৩,৫০০,০০০ কিঃ। অর্থাৎ বুঝিতে হইবে যে, এই বৎসর যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব্বেকার অনুপাত রক্ষিত হয় নাই। ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে কৃত্রিম রেশমের উৎপত্তি অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণে বাড়িয়াছে। ফরাসীরা ১৯২৫ সনে ৬,৩৪২,০০০ কিঃ কৃত্রিম রেশম উৎপন্ন করিয়াছে। ১৯২৪ সনেও প্রায় এই পরিমাণই ছিল, তবে কথঞ্চিৎ কম। জার্ম্মাণিতে, ইতালিতে এবং ইংল্যাণ্ডে,—প্রত্যেক দেশেই ১২,০০০,০০০ কিলো করিয়া উৎপন্ন হইয়াছে।

মার্কিণ খাদ্যদ্রব্যের রপ্তানি

আমদানি-রপ্তানির বাজারে দুনিয়ায় নতুন নতুন লক্ষণ দেখা দিয়াছে। ১৯০৯-১৪ সনের ভিতর মার্কিণ মুল্লুক হইতে খাদ্য দ্রব্যের রপ্তানি হইত গড়পড়তা বার্ষিক ৪৩৬,০০০,০০০ ডলার (১ডঃ=৩৷৵০)। ১৯২২ সনে এই রপ্তানির কিম্মৎ ছিল ১,০৬৫,০০০,০০০ ডলার। ১৯২৪ সনে আমেরিকা বিদেশে খাদ্যদ্রব্য বেচিয়া ৯৮৯,০০০,০০০ ডলার পাইয়াছে। প্রাক্-যুদ্ধ যুগের তুলনায় এই বৃদ্ধি প্রায় আড়াই গুণের কাছাকাছি (মূল্য হিসাবে)। কিন্তু যুদ্ধের পর সকল দেশেই "মূল্য" বৃদ্ধি ঘটিয়াছে বিস্তর। কাজেই রপ্তানি বাস্তবিক পক্ষে কতটা বাড়িয়াছে তাহা একমাত্র ডলারের সংখ্যা গুনিয়া বুঝা কঠিন। কিন্তু সের, মণ ইত্যাদির ওজনে দেখা গিয়াছে যে, সেকালে যত পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য মার্কিণ মুল্লুকের ব্যবসায়ীরা বিদেশে পাঠাইত আজকাল তাহার ডবলের কাছাকাছি রপ্তানি করিতেছে। এইসকল খাদ্যদ্রব্যের ভিতর কিয়দংশ শিল্প-জাত কারখানায় তৈয়ারী বস্তু। অর্থাৎ সবই নেহাৎ কৃষিজাত কুদরতী মাল নয়।

বহির্ব্বাণিজ্যের ওঠানামা (১৯২৫)

১৯২৫ সনে ইংরেজ জাতের বহির্ব্বাণিজ্য প্রাক্-যুদ্ধ যুগের কোঠায় আসিয়া ঠেক' ঠেক' হইয়াছে। ১৯১৩ সনের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্র ১৯২৫ সনে শতকরা ৩০ অংশ বেশী বহির্ব্বাণিজ্য চালাইয়াছে। ফরাসীরাও শতকরা ৫ অংশ বেশী দেখাইয়াছে। জার্ম্মাণি এখনও তাহার প্রাক্-যুদ্ধ যুগের কোঠায় আসিতে পারে নাই। বস্তুতঃ, শতকরা ২৭ অংশ কমই ১৯২৫ সনের জার্ম্মাণ বহির্ব্বাণিজ্যের পরিমাণ।

দেশী

কৃষি-কমিশন

কৃষি-কমিশনের তদন্ত সুরু হইয়াছে। শিমলায় এবং পুণা ও বম্বেতে সাক্ষী ডাকা হইয়া গিয়াছে। সাক্ষীদের জবানবন্দী দৈনিক পত্রিকায় পত্রিকায় বাহির হইতেছে। যাঁহারা এইগুলা আগাগোড়া পড়িবার মতন ধৈর্য্য রাখেন, তাঁহারা ভারতীয় চাষ-আবাদের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি-বিজ্ঞানের সহায়ক এবং আনুষঙ্গিক অনেক তথ্য দখল করিতে পারিবেন।

মাল বস্তাবন্দি করা

"রেলে যে-সকল মাল পাঠানো হয়, সেই সব ভাল করিয়া প্যাক করা হয় না।" কৃষি-কমিশনের শিমলা অধিবেশনে রেলওয়ের চীফ কমিশনার স্যার ক্লেমেন্ট হিণ্ডলে এইরূপ সাক্ষ্য দিয়াছেন। ভারতবাসী এই দিকে বিশেষ অমনোযোগী। এই জন্য মালগাড়ী হইতে চুরি-ছ্যাঁচড়ামি হইয়া থাকে। কমিশনের অন্যতম সভ্য অধ্যাপক নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী জিজ্ঞাসা করেন:—"প্যাকিং সম্বন্ধে দেশের লোককে শিক্ষা দিবার কোনো ব্যবস্থা করা যায় না কি? হিণ্ডলে বলিয়াছেন,—"তাহার জন্য অবশ্য রেল-কোম্পানীর মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন দেখি না। তবে আমদানিকারক এবং রপ্তানি-কারকেরা সকলেই যদি কোনো নির্দ্দিষ্ট মাপজোপ অনুসারে মালপত্র 'বস্তাবন্দি' করিতে শিখে তাহা হইলে তাহাদেরও লোকসান বন্ধ হয় আর রেল-কোম্পানীও অনেকটা জিম্মাদারি হইতে বাঁচে। সিনেমার ছবি দেখাইয়া জনগণের মধ্যে প্যাকিং সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট প্রণালী প্রচার করিবার জন্য রেল-কোম্পানী ব্যবস্থা করিতে পারে। ইতিমধ্যেই রেল-কোম্পানী মাল আমদানি-রপ্তানির জন্য কতকগুলা বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছে। গরমে যাহাতে তাজা জিনিষ নষ্ট না হইয়া যায় তাহার জন্য "ঠাণ্ডি মালগাড়ী" চালানো হইতেছে। কোনো কোনো ষ্টেশনে "কোল্ড ষ্টোরেজ" অর্থাৎ ঠাণ্ডি গুদাম আছে। কিন্তু সে সব রেল-কোম্পানীর সম্পত্তি নয়। বাজারের সাধারণ কোম্পানী এই সবের ব্যবস্থা করিয়াছে।"

চাষী ও রেলের মাশুল

কৃষি-কমিশনের অন্যতম সাক্ষী ছিলেন পঞ্জাবের ক্যালভার্ট সাহেব। তাঁহার বিবেচনায় চাষীদিগকে সাহায্য করা রেল-কোম্পানীর কর্ত্তব্য। এই সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন,—"বেলজিয়াম, জার্ম্মাণি এবং ডেন্‌মার্কে চাষীদের মাল-চলাচলের জন্য রেলকোম্পানী মাশুল কমাইতে অভ্যস্ত। এইরূপ সাহায্যের ফলে চাষ-আবাদ সংরক্ষিত হইতে পারে। ভারতেও কোনো কোনো রেলে গো-ছাগলের জন্য ঘাস ও অন্যান্য খাদ্য বহিবার মাশুল কমাইবার ব্যবস্থা আছে। যে যে ক্ষেত্রে মাশুল কমানো হয়, সেই সব ক্ষেত্রে প্রাদেশিক গভর্মেণ্ট রেল-কোম্পানীর ক্ষতিপূরণ করিয়া দেয়।"

সংরক্ষণ শুল্ক ও হাতের তাঁত

তূলার কাপড় বিষয়ক সংরক্ষণশুল্ক-কমিটি (টারিফ-বোর্ড) পঞ্জাবে তদন্ত করিতে গিয়াছিল। এই প্রদেশের সরকারী শিল্প-বিভাগের ডিরেক্টর ডক্টর রলে বলিয়াছেন,—"বিদেশী সূতার উপর শুল্ক চড়াইলে হাতের তাঁতীরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। ইহাতে ভারতের কাপড়ের কলওয়ালারা লাভবান হইতে

পারে। কিন্তু হাতের তাঁতে যাহারা কাপড় বুনে তাহাদিগকে (শুল্কের দরুণ) বেশী দামে বিদেশী সুতা কিনিতেই হইবে।" তদন্ত কমিটির প্রেসিডেণ্ট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"কেন?" রলের জবাব নিম্নরূপ,—"এ দেশের কলে যে পরিমাণ সুতা তৈরী হয় তাহার সবই দেশী কলের তাঁতে লাগিয়া যায়। হাতের তাঁতীরা দেশী সুতা একদম পায় না। তাহাদিগের পক্ষে বিদেশী সুতা না কিনিলে নয়। কাজেই শুল্কের দরুণ বিদেশী সুতার দাম বাড়িলে হাতের তাঁতওয়ালাদের ক্ষতি। কম সে কম যেসকল খরিদ্দার হাতের তাঁতের কাপড় কিনিতে চায় তাহাদের পক্ষে বাজার আক্রা হইয়া দাঁড়াইবে।

শিল্প-প্রদর্শনীর দোষ

এ বারেও খুলনায় কৃষিশিল্প প্রদর্শনী হইবে বলিয়া গত ৩১শে আগষ্ট এক বৈঠক বসিয়াছিল। তাহাতে গত বৎসরের ন্যায় এবারেও স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর চাঁদা আদায় করিবার ভার দেওয়া হইয়াছে। ২।৪টা কলা মূলা, খানকয়েক খদ্দরের কাপড় দেখাইয়া বিশেষ লাভ কি হইবে বুঝি না। যে পরিমাণ টাকা ব্যয় হয় তাহার তুলনায় ফল অতি সামান্যই দেখা যায়। অথচ ৮৸০।৯৲ টাকা দরে চাউল কিনিয়া কয়জন লোক দু'বেলা অন্নের সংস্থান করিতে পারিতেছে? আমরা এই দুর্ভিক্ষের দিনে এ প্রকার প্রদর্শনীর আদৌ পক্ষপাতী নহি। যদি বুঝিতাম সামান্য ব্যয়ে এই কার্য্য সাধিত হইতে পারে তবে আমাদের এ সকল কার্য্যে আন্তরিক সহানুভূতি থাকিত। ("খুলনা")

ধর্ম্মের ষাঁড়

বেঙ্গল ক্যাটল বিল সম্বন্ধে যে সিলেক্ট কমিটি মনোনীত হইয়াছে তাহার হিন্দু ও মুসলমান মেম্বরদের মধ্যে "ধর্ম্মের ষাঁড়" সম্পর্কে মতভেদ দেখা দিয়াছে। হিন্দু মেম্বারগণ দাবী করিতেছেন যে, এই সব ষাঁড় যতই দৌরাত্ম্য করুক না কেন, তাহাদিগকে কিছুতেই বধ করা যাবে না, কেবল খোয়াড়ে দেওয়া চলিবে, কারণ এই সব ষাঁড় নাকি তাহাদের ধর্ম্মের ষাঁড়। মুসলমান মেম্বারগণ বলিয়াছেন, "কাজে কাজেই সাধারণের দোকান, শস্য-ক্ষেত্র প্রভৃতির উপর এই ধর্ম্মের ষাঁড় ছাড়িয়া না দিয়া এসবের প্রতিপালনের ভার ইহাদের ভক্তদেরই লইতে হইবে।"

"মোসলেম বাণী"

রন্ধন-বিদ্যায় বালিকাদের কৃতিত্ব

ঢাকা বিভাগের মেয়েদের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়সমূহ হইতে পাঠ্য পুস্তকের পরীক্ষা ব্যতীত রন্ধনের পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ আছে। এই পরীক্ষার্থিনীদিগকে কাগজে লিখিয়া এবং নিজ হস্তে পাক করিয়া পরীক্ষা দিতে হয়। স্কুল ইন্সপেক্‌ট্রেস্ মহোদয়া ঢাকা বিভাগের বালিকা-বিদ্যালয়সমূহের রন্ধনের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। বরিশাল বালিকা বিদ্যালয়ের তিনটী বালিকা এবৎসর উক্ত পরীক্ষার তিন বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

আমেদাবাদের কলওয়ালাদের সাক্ষ্য

১৪ই সেপ্টেম্বর বয়ন-অনুসন্ধান সমিতির নিকট আমেদাবাদ কলওয়ালাদের প্রতিনিধিগণের সাক্ষ্য গৃহীত হয়। তাঁহারা বলেন যে, তাঁহারা ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে মজুরীর হার শতকরা ১৫॥০ কমাইয়া দিয়াছেন। তারপর আর তাঁহারা মজুরী কমান নাই। কারণ তাঁহাদের আশঙ্কা এই যে, মজুরী আরো কমাইলে শ্রমিকরা দীর্ঘকালের জন্য ধর্ম্মঘট করিবে। আমেদাবাদের মজুররা বিশেষভাবে সঙ্ঘবদ্ধ। আমেদাবাদের মজুররাও বোম্বাইয়ের মজুরদের মত দক্ষ। প্রকৃত পক্ষে আমেদাবাদের মজুরদের দক্ষতা কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গরমের মধ্যে কাজ করিতে হয় বলিয়া তাহাদিগকে ১২ঘণ্টার স্থলে ১০ ঘণ্টা খাটান হয়। এখানে বেশী বেতনের দরুণ অনুপস্থিতির সংখ্যা বোম্বাই অপেক্ষা অনেক কম।

তাঁহারা স্বয়ংক্রিয় তাঁত স্থাপন করেন নাই, তাহার কারণ এই যে, ঐ তাঁত স্থাপন করিবার খরচা অত্যধিক এবং স্থানীয় শ্রমিকরা একসঙ্গে আটটি তাঁতের উপর নজর রাখিতে পারে না।

তাঁহারা কয়েকটি কলে দুই হাজিরায় কাজ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ছয় মাসের মধ্যেই তাঁহাদিগকে নিরস্ত হইতে হয়, কারণ তাহাতে লোক পাওয়া যায় না

এবং জিনিষ খারাপ হয়। মজুরীর খরচা বোম্বাই অপেক্ষা আমেদাবাদে শতকরা আড়াই টাকা কম।

সভাপতি মহোদয় মন্তব্য করেন যে, স্থানীয় শ্রমিক-সঙ্ঘ সাক্ষ্য না দেওয়ায় ক্ষতি হইয়াছে। উক্ত সঙ্ঘ সাক্ষ্য দিলে শ্রমিকদের মত জানা যাইত।

পুনরায় জিজ্ঞাসিত হইয়া সাক্ষীরা বলেন যে, বয়লার পরিদর্শক রাখার বাধ্যতা এবং স্মোক নুইস্যান্স অ্যাক্টের প্রয়োগ-ফলে তাহাদের অত্যন্ত অসুবিধা হইয়াছে। জলের করও এইস্থানে অত্যধিক।

তাঁহারা সুপার ট্যাক্স তুলিয়া দিতে এবং ৬০ নম্বরের সূতা ও ঐ নম্বরের সূতায় প্রস্তুত সর্ব্বপ্রকার বিদেশী বস্ত্রের উপর শতকরা সাড়ে বার টাকা আমদানি কর বসাইতে অনুরোধ করেন।

নারীশিল্প-প্রদর্শনী

৺হিরণ্ময়ী দেবীর প্রতিষ্ঠিত, ৫৫নং গড়িয়াহাট রোডস্থিত বিধবা-শিল্পাশ্রম ও তাহার সদুদ্দেশ্য সম্বন্ধে আজ নূতন করিয়া বেশী কিছু লেখা বাহুল্য। পরলোকগতা প্রতিষ্ঠাত্রীর পুণ্য স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে এবং বঙ্গনারীগণের শিল্প-চর্চ্চার উন্নতি-কল্পে গত বৎসর ডিসেম্বর মাসে আশ্রম-ক্ষেত্রে যেরূপ শিল্প-মেলায় অনুষ্ঠান হইয়াছিল আশ্রম-কর্ত্রীগণের এ বৎসরও সেইরূপ মেলার আয়োজন করিবার ইচ্ছা আছে। সেবার অল্প সময়ের মধ্যেও যেরূপ সাফল্যলাভ হইয়াছিল, তাঁহারা আশা করেন এবার সময় মত বিজ্ঞাপন দেওয়ায় অনুষ্ঠানটি অধিকতর সাফল্যমণ্ডিত হইবে। সহর ও মফঃস্বলবাসী শিল্পকুশল বঙ্গনারীমাত্রেই স্ব স্ব কৃতিত্বের পরিচায়ক শিল্প প্রেরণ দ্বারা এবং মেলা-ক্ষেত্রে আসিয়া যোগদানে শুভ কর্ম্ম সুসম্পন্ন করাইবেন। এই আমাদের বিনীত অনুরোধ। নিয়মাবলী,—(১) ৬ই হইতে ১০ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত প্রদর্শনী কেবল মহিলাদিগের জন্য খোলা থাকিবে। প্রবেশিকা ৵০ মাত্র। (২) প্রেরিত দ্রব্য ৩০শে নবেম্বরের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পৌছানো চাই, এবং তাহার রসিদ লওয়া চাই। (৩) কলিকাতা ও মফঃস্বলবাসী যে-কোন মহিলা স্বহস্ত-রচিত বা অপর কোন মহিলার রচিত কারুকার্য্য পাঠাইতে পারেন। (৪) প্রত্যেক দ্রব্যের টিকিটের উপর স্পষ্টাক্ষরে রচয়িত্রীর নাম, প্রেরকের নাম ও ঠিকানা, এবং বিক্রয়ার্থ হইলে, দ্রব্যের মূল্য লিখিতে হইবে। (৫) বিক্রীত দ্রব্যের উপর টাকায় ৵১০ শিল্পাশ্রমে দান বলিয়া কাটা যাইবে। (৬) ক্রেতারা কিনিবার সময় দ্রব্যের মূল্য নগদ দিবেন। পরে ১৫ই থেকে ২০শে ডিসেম্বরের মধ্যে সেই টাকার রসিদ দেখাইয়া, ক্রীত দ্রব্য লোক পাঠাইয়া ও রসিদ দিয়া লইয়া যাইবেন। (৭) উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা বিচার করাইয়া নিম্নলিখিত বিভাগে পদকাদি পুরস্কার দেওয়া যাইবে।

(ক) সেলাই (সাদা ও সৌখিন)। (খ) মাটির ছাঁচ বা অন্য গঠনকার্য্য। (গ) চিত্র-শিল্প। (ঘ) খাদ্য দ্রব্য (পরীক্ষার সুবিধার্থে অল্পপরিমাণ স্বতন্ত্র নমুনা সঙ্গে দেওয়া চাই)। (ঙ) বয়ন-কার্য্য। (চ) অন্যান্য কারুকার্য্য।

শ্রীমতী কল্যাণী দেবী,
সম্পাদিকা, মহিলা শিল্পাশ্রম,
১৫নং গরিয়াহাট রোড বালিগঞ্জ।

বিদেশী

লিসবনের চিঠি

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন এম্, এ, পি এইচ্, ডি, পি, আর, এস্ মহাশয় লিস্‌বন হইতে তাঁহার জনৈক আত্মীয়কে লিখিয়াছেন।

শ্রীচরণ কমলেষু

তিন সপ্তাহ হইল লিস্‌বনে আসিয়াছি। এখানকার সরকারী দপ্তরের পুরাতন চিঠিপত্র পড়িতেছি। ইংলণ্ডে বাঙ্গালা বলিবার সুযোগ প্রায়ই জুটিত। এখানে বাঙ্গালা ত দূরের কথা ইংরাজী বলিবার সুযোগই কদাচিৎ মিলে। এদিকে আমার ত এদেশের ভাষার জ্ঞান পুঁথি পড়িবার মত। অভিধান লইয়া পুঁথি পড়িতে পারি। এখানে আসিয়াই তাই আবার মাষ্টার রাখিয়া দস্তুরমত পর্ত্তুগীজ ভাষা পড়িতে সুরু করিয়াছি; নিজের মনের ভাব যদিও কষ্টেসৃষ্টে প্রকাশ করিতে পারি কিন্তু এদেশের লোকেরা ঝড়ের

বেগে যা বলিয়া যায় তার কিছুই অনুমানও করিতে পারি না। শিক্ষিত লোকেরা সকলেই বেশ ফরাসী বলিতে পারে; কিন্তু সেখানেও আমার ঐ দুরবস্থা—অভিধান লইয়া পড়িতে পারি, বলিতে চেষ্টা করিলে ভাষা হারাইয়া যায়।

আসিবার সময় স্পেনের ভিতর দিয়া আসিয়াছি। ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের গ্রাম এবং স্পেন ও পর্ত্তুগালের গ্রামের মধ্যে স্বর্গ-নরক প্রভেদ। স্পেনের গ্রামগুলি যেমন অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন তেমনই সংকীর্ণ। দারিদ্র্যের ও অজ্ঞতার চিহ্ন সর্ব্বত্রই সুস্পষ্ট। পশ্চিম স্পেনে কৃষকেরা যে ঘরে বাস করে মাহিলাড়ার (লেখকের নিজ গ্রাম) অনেক গোয়ালঘরও তাহার চেয়ে ভাল। কিন্তু জীবনযাত্রা প্রণালীর দোহাই দিয়া যে আফ্রিকা ও আমেরিকা হইতে ভারতবাসীদিগকে গলাধাক্কা দেওয়া হয়, স্পেনের চাষারা সেখানে বেওজর ঢুকিতে পারে! ("বরিশাল")

ইতালির "ফিয়াৎ" কোম্পানী

১৯২৫ সনের কার্য্য-বিবরণীতে ইতালির "ফিয়াৎ" কোম্পানী বলিতেছেন :—"অটোমোবিল আর মোটর তৈয়ারী করা আমাদের প্রধান কাজ। এই কাজে আমাদের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ। কেননা জগতে অটোমোবিলের চাহিদা বাড়িয়া যাইতেছে।

"এতদিন দুনিয়ার নরনারী অটোমোবিলকে বিলাস-গাড়ী বিবেচনা করিত। আজকাল ক্রমশঃ লোকেরা এই গাড়ীকে অতি প্রয়োজনীয় জিনিষ সমঝিতেছে। এই গাড়ী ব্যবহার করিয়া জগতের প্রত্যেক দেশেই বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা নিজ নিজ ব্যবসায়ে প্রচুর পরিমাণ লাভ উঠাইতে পারিতেছে। সকল শ্রেণীর লোকই মোটরগাড়ীকে নিজ নিজ কাজের এক মস্ত সহায়ক বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত হইতেছে। এই যখন জগতের নরনারীর মনের অবস্থা তখন আমরা যদি সস্তায় গাড়ীগুলা ছাড়িতে পারি, আর বেশ সুবিধাজনক কিস্তিতে দাম লইবার ব্যবস্থা করি, তাহা হইলে আমাদের কোম্পানী দিনদিনই উন্নতিলাভ করিতে থাকিবে।"

দক্ষিণ আফ্রিকায় দরবার

ভারতে আসিয়াছিল দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে কয়েকজন লোকের "ডেপুটেশ্যন"। তাঁহারা আমাদের কি দেখিয়া গেলেন এখনো কিছু বুঝা যাইতেছে না। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা ইত্যাদি বৃটিশ উপনিবেশের কথা ভারতবাসীকে ভুলিলে চলিবে না। ঐ সকল দেশে আজকাল আমাদের বিরুদ্ধে যেরূপ আইনই কায়েম হউক না কেন, সেই সব আইন কাটাইয়া উঠিতেই হইবে। ভারতের লোকসংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে। ভারত-সন্তানের জন্য বিদেশে সসম্মানে ঘরবাড়ী পাতিবার সুযোগ সৃষ্টি না করিতে পারিলে ভারতীয় আর্থিক উন্নতির অন্যতম পথ রুদ্ধ থাকিতে বাধ্য। আগামী ডিসেম্বর মাসে দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন শহরে ভারতীয়-আফ্রিকান সংযুক্ত দরবার বসিবে। ভারত-গবর্মেণ্টের পক্ষ হইতে স্যার মহম্মদ হাবিবুল্লা, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, স্যার ফেরোজ সেঠনা ইত্যাদি কয়েকজন উপস্থিত থাকিবেন। ফলাফল সম্বন্ধে অতিমাত্রায় মেজাজ গরম না করিয়া এশিয়া-সমস্যা সম্বন্ধে এই বৈঠকের আলোচনাগুলার দিকে নজর রাখা কর্ত্তব্য। অনেক ক্ষেত্রেই আমরা বর্ত্তমানে অদূর ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হইতেছি এইরূপ জানিয়া রাখা মন্দ নয়।

কাঠ হইতে রেশম

ইতালীর জনৈক বৈজ্ঞানিক কাঠ হইতে এক প্রকার রেশম প্রস্তুত করিয়াছেন। উহা দেখিতে রেশমের মত বেশ নরম। আবার ব্যবহারে কাঠের মতন টেক্‌সই। দামেও কম হইবার সম্ভাবনা।

বাঁশ হইতে কাপড়

সম্প্রতি বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তার নাগ্নি নামক একজন ভারতীয় বাঁশ হইতে বস্ত্র-নির্ম্মাণের চেষ্টায় অনেকাংশে সফল হইয়াছেন। তিনি আশা করেন শীঘ্রই বাঁশ হইতে প্রস্তুত কাপড় বিলাসের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইবে এবং উহা নকল রেশম প্রভৃতি বস্ত্রের মূল্য অনেক কমাইয়া দিবে। উহা হইতে কাগজেরও উপাদান পাওয়া যাইবে।

আমেদাবাদের মজুর-পরিষৎ

শ্রীমতী অনসূয়া সারাভাইয়ের মতামত

[গুজরাতী মহিলা শ্রীমতী অনসূয়া সারাভাই বোম্বাই প্রদেশের লোকহিত-আন্দোলনে সুপ্রসিদ্ধ। ইনি লণ্ডনে গিয়াছিলেন উচ্চতর চিকিৎসা-বিদ্যা শিখিবার জন্য। কিন্তু বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিবার পর চিকিৎসা ব্যবসায়ে প্রবেশ না করিয়া মজুর-আন্দোলনে জীবন সমর্পণ করিয়াছেন। অনসূয়ার ভাই আম্বালাল আমেদাবাদের অন্যতম নামজাদা ধনী ও কাপড়ের কলের মালিক। এই কলের সম্পর্কেই অনসূয়া মজুর-সেবায় লাগিয়া গিয়াছেন। ক্রমশঃ অন্যান্য কলের মজুররাও এই আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

আনুষঙ্গিক ভাবে বলিয়া রাখা যাইতে পারে যে,—অনসূয়া গান্ধি-পথের পথিক। কিন্তু আম্বালাল ঠিক তাহার বিপরীত-পন্থী। অধিকন্তু ফ্যাকটরী পরিচালনা সম্বন্ধে আম্বালাল মালিক-মেজাজী লোক। আর অনসূয়া ঠিক তাঁহার উল্টা,—মজুর-পন্থী। "ক্যাপিটালিজ্‌ম্" বা পুঁজি-নীতির বিরোধী মত লইয়াই তিনি কাজে নামিয়াছেন।

এই বৎসর গ্রীষ্মকালে দার্জ্জিলিঙে শ্রীমতী অনসূয়ার সঙ্গে আমাদের যে-সব কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহার কিয়দংশ নিম্নরূপ।]

প্রশ্ন—আপনি কি মজুর-পরিষদের সম্পাদক?

উত্তর—না, আমি সভানেত্রী।

প্রঃ—এই পরিষৎ কি আমেদাবাদের সকল প্রকার মজুরদেরই কর্ম্ম-কেন্দ্র?

উঃ—না, একমাত্র টেক্‌সটাইল লেবার অর্থাৎ তাঁত ফ্যাক্টরীর মজুরদের সঙ্ঘ।

প্রঃ—আপনারা কি ভিন্ন ভিন্ন ফ্যাক্টরীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন সমিতি কায়েম করেছেন?

উঃ—তাও আছে বটে, কিন্তু আমরা তাঁত ফ্যাক্টরীর কর্ম্মটিকে ৪।৫ ভাগে শ্রেণীবদ্ধ করে নিয়েছি,—যেমন ইঞ্জিন ঘরের কাজ, কাপড় বোনার কাজ ইত্যাদি।

প্রঃ—আপনারা কি আমেদাবাদের সকল মজুরকেই পেয়েছেন?

উঃ—এখনও পাইনি, তবে শতকরা ৭০।৮০ জন আমাদের পরিষদের লোক। এখন প্রায় হাজার সতের মজুর সভ্য আছে। এরা প্রত্যেকে কম সে কম মাসে এক আনা করে' চাঁদা দেয়। দু' আনা করে' চাঁদার ব্যবস্থাও আছে। তা ছাড়া ৪ আনা চাঁদা দিবার দল ও আছে। বৎসরে চাঁদায় প্রায় হাজার পঁচিশ টাকা উঠে।

প্রঃ—আমেদাবাদের মজুর-পরিষদের সঙ্গে বোম্বাই সহরের মজুর-পরিষদের কোনো যোগাযোগ আছে কি?

উঃ—কিছুই নাই।

প্রঃ—আপনাদের ইউনিয়নগুলির (সমিতিগুলির) কর্ম্ম-প্রণালী কিরূপ?

উঃ—প্রত্যেক ইউনিয়নে একটি করে' "প্রতিনিধি মণ্ডল" আছে। মজুরেরা নিজেদের এই প্রতিনিধি-মণ্ডলের মধ্য থেকে বাছাই করে' প্রতিনিধি পাঠায়। এই মণ্ডলই ইউনিয়নের সকল কর্ম্ম চালিয়ে থাকে। ফী বছর ৭০।৭৫ বার প্রতিনিধি মণ্ডলের বৈঠক বসে অর্থাৎ মাসে গড়পড়তা ৬ বার।

প্রঃ—এই সকল "মণ্ডলের" সভায় মজুররা নিয়মিতরূপে হাজির থাকে কি ?

উঃ—নিশ্চয়ই। ইউনিয়নের যত সভ্য আছে তার শতকরা অন্ততঃ ৭০।৮০ জন প্রত্যেক সভায় যোগদান করে।

প্রঃ—মজুরদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা করবার কোনো আয়োজন আপনারা করেছেন কি ?

উঃ—হাঁ, ঐ উদ্দেশ্যে আমরা ফ্যাক্টরীতে ফ্যাক্টরীতে গিয়ে ছুটীর পর মজুরদের মজলিস ডাকি। বৎসরে ১৩০ কিংবা ১৪০ বার এই ধরণের সভা হয়। এই সকল সভায় অবশ্য খাঁটী মজুর-জীবন, মজুরী অথবা মালিকদের সঙ্গে মজুরদের সম্বন্ধ ইত্যাদি বিষয়ে বেশী আলোচনা হয় না। আমরা মজুরদের ভিতর সার্ব্বজনিক বিষয়ে—মজুরদের সাধারণ কর্ত্তব্য পালন, স্বাস্থ্যরক্ষা, কর্ম্মদক্ষতা ইত্যাদি সম্বন্ধে বক্তৃতা করে থাকি। তা ছাড়া মজুরদের পাড়ায় পাড়ায় গিয়েও আমরা বৎসরে অনেকবার এই ধরণের লোক-শিক্ষার ব্যবস্থা করে আসছি। তাতে মজুরদিগকে নগর-শাসন, মিউনিসিপ্যাল ভোট, রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করি।

প্রঃ—আপনাদের পরিষদের সবচেয়ে দায়িত্বপূর্ণ কাজটা কি ?

উঃ—বুঝতেই পাচ্ছেন, মজুরদেরকে দলবদ্ধ করে মালিকদের সঙ্গে দলবদ্ধ ভাবে মজুরীর হার, কাজ-কর্ম্মের আব-হাওয়া, স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম-পালন ইত্যাদি বিষয়ে যুক্তি করানো আমাদের প্রধান কার্য্য। ইংরেজীতে যাকে বলে "কলেক্‌টিভ বার্গেনিং" মজুর-আন্দোলনের প্রাণই হচ্ছে সেই দলবদ্ধ চুক্তির ব্যবস্থা। মালিকদের বিরুদ্ধে মজুরদের নালিশ যখনই উপস্থিত হয় তখনই আমরা সে বিষয় নিয়ে মালিকদের কাছে উপস্থিত হই। মালিকদেরও পরিষৎ আছে, নাম "মিল ওনারস অ্যাসোসিয়েশ্যান"। এই অ্যাসোসিয়েশ্যানের সঙ্গে আমাদের ইউনিয়নের আনাগোনা খুব বেশী। বাস্তবিক পক্ষে এই অ্যাসোসিয়েশ্যানকে মজুরদের চুক্তি-মাফিক কাজ করানোই আমাদের ইউনিয়নের প্রধান ধান্ধা।

প্রঃ—মালিকদের বিরুদ্ধে মজুরদের নালিশ কি কি রকম ক্ষেত্রে উপস্থিত হয় ?

উঃ—আপনাকে এক বৎসরের হিসাব দিলেই বুঝতে পারবেন। ১৯২৪ সনে আমরা ৭৪৩টী নালিশ পাই। তার ভিতর শতকরা ৩০টী ছিল বরখাস্ত, জরিমানা ইত্যাদি ঘটিত, শতকরা ২০টী ছিল দুর্ব্যবহার, ঘুষ খাওয়া, অন্যায় নিয়োগ ইত্যাদি ঘটিত, জল সর-বরাহের ব্যবস্থা খাবার, ঘর, পায়খানা এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত বিষয়ের নালিশগুলি ছিল গুন্‌তিতে শতকরা ১৫, দর্ম্মাহা দিবার প্রণালী, মজুরীর হার ইত্যাদি বিষয়ে ছিল শতকরা ১৫টী নালিশ, কাজ করবার দিন-ক্ষণ, ছুটীর ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধীয় নালিশগুলি ছিল গুন্‌তিতে শতকরা ১৪, অবশিষ্ট শতকরা ৬টী ছিল ফ্যাক্টরীর যন্ত্রপাতির দোষ এবং অন্যান্য মাল-সরবরাহের ব্যবস্থা-ঘটিত নালিশ।

প্রঃ—এই সব নালিশ মীমাংসা করেন আপনারা কি করে ?

উঃ—আমরা মালিকদের অ্যাসোসিয়েশ্যানে যাই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একবার দু'বার হাঁটাহাঁটিতে নিষ্পত্তি হয়। কখন কখন ৫।৬ বার যাওয়া আসা করতে হয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমন কি ২০ বার পর্য্যন্ত যাওয়া আসা করতে হয়েছে।

প্রঃ—নালিশগুলির শেষ নিষ্পত্তি সম্বন্ধে আমাকে কিছু খবর দিতে পারেন ?

উঃ—পূর্ব্বোক্ত ৭৪৩টী নালিশের বৃত্তান্তই আমার জানা আছে। তার ভিতর ৪৭১টী সম্বন্ধে আমরা মজুরদের দাবী মালিকদের দিয়ে গ্রাহ্য করাতে পেরেছি। ৪৬টী নালিশ খতিয়ে দেখা গেল ওর ভিতর নালিশের কিছুই নাই, সেসব নেহাৎ ছেলে-খেলা। ৬৪টী নালিশে মালিকদের জয় হয়েছে, মজুরেরা হেরেছে।

প্রঃ—আপনি বল্লেন, কোনো কোনো মামলা নিষ্পত্তি করতে এমন কি ২০ বার পর্য্যন্ত আনাগোনা করতে হয়েছে, এত দেরী হয় কেন ?

উঃ—যে যে ক্ষেত্রে বাকী মজুরী আদায় করতে হয়, সে সব ক্ষেত্রে মালিকদের সঙ্গে বচসার দরকার হয়, খুব বেশী।

তা ছাড়া, মজুরদের জন্য খাবার ঘর তৈয়ারী করাতে গিয়াও আমরা খুব গলদঘর্ম্ম হই। ফ্যাক্টরীর মজুরদের জন্য খাবার জলের ব্যবস্থা করানও বিশেষ কষ্টসাধ্য। কিন্তু আসল কথা এই, ফ্যাক্টরীর মালিকেরা এখনও বেশ নিয়মবদ্ধ ভাবে শিজিল মত কাজ করতে অভ্যস্ত নয়। ফ্যাক্টরীর শৃঙ্খলা ও শাসন সম্বন্ধে ওদের নিয়ম-কানুন এখনও বেশ পাকা-পোক্ত হয়ে দাঁড়ায় নি। মজুরদের সঙ্গে কাজের চুক্তির সময় এরা কোনো বাঁধাবাঁধি এবং সার্ব্বজনিক নিয়মের কথা বলেন না। কাজেই মজুরেরা বাস্তবিক পক্ষে ফ্যাক্টরীর আদব-কায়দা ভাল রকম বুঝে না। সুতরাং গণ্ডগোল উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা। আর, আমরাও যখন মজুরদের উকীল ভাবে মালিকদের কাছে যাই তখন কোনো সহজ ব্যবস্থা ঘটানো কঠিন।

প্রঃ—ফ্যাক্টরীর শাসন সম্বন্ধে শৃঙ্খলা আনবার জন্য আপনারা কোনো ব্যবস্থা করতে চান কি?

উঃ—হাঁ, চেষ্টায় আছি। মালিকদের অ্যাসোসিয়েশ্যান আর আমাদের ইউনিয়ন এই দুইয়ে মিলে যদি বছরে ৮।১০ বার বৈঠক বসাতে পারি, তাহলে বোধ হয় নালিশের সংখ্যা কম আসবে, আর আমেদাবাদের সকল ফ্যাক্টরীতে অনেকটা একই রকম নিয়ম চল্‌বে।

প্রঃ—আচ্ছা এসব সালিশীতে যদি সুফল না ঘটে তাহলে আপনাদের হাতে আর কি যন্ত্র আছে?

উঃ—তা তো জানেনই। মজুরদের হাতে আসল হাতিয়ার মাত্র একটা, সে হচ্ছে "ষ্ট্রাইক", ধর্ম্মঘট বা হরতাল। অনেকবার আসা যাওয়া করে যদি মালিকদেরকে নরম করতে না পারি অথবা আনাগোনায় যদি বেশী সময় নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে মজুরেরা অপেক্ষা করতে চায় না, হরতাল করে বসে।

প্রঃ—আপনাদের ইউনিয়নে মালিকে মজুরে লড়াইয়ের সালিশী এবং হরতাল ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে কাজ-কর্ম্ম করা হয় কি?

উঃ—নিশ্চয়ই হয়। (১) এই ধরুন আমরা একটা বেশ বড় গোছের হাসপাতাল আর ২টা ডিস্পেন্সারী কায়েম করেছি। এ বছর আমাদের খরচ হয়েছে ১৩।১৪ হাজার টাকা। হাসপাতালে ২০টা বিছানা আছে।

(২) মজুরদেরকে আমরা অল্প সুদে টাকা ধার দিয়ে থাকি। বৎসরে প্রায় ১১।১২ হাজার টাকা এই ভাবে আমরা খরচ করি। সুদও মাত্র শতকরা ৬।০ টাকা। কিন্তু মজুরেরা যদি বাইরে টাকা কর্জ্জ নিতে যায় তাহলে শতকরা ৮০ টাকা সুদে টাকা নিতে বাধ্য হয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাইরে শতকরা দুইশ' টাকা পর্য্যন্ত সুদ দিতে হয়।

(৩) আমরা কতকগুলি নৈশ বিদ্যালয় এবং কতকগুলি সাধারণ পাঠশালা দিনে চালিয়ে থাকি। আজকাল ছাত্রসংখ্যা সবশুদ্ধ প্রায় ১২০০ হবে। ছাত্রেরা উপস্থিতও হয় মন্দ না—শতকরা ৭৫।৮০ প্রতিদিন উপস্থিত থাকে। এতে আমাদের খরচ হয় বৎসরে প্রায় ২৫হাজার টাকা। আপনার মনে থাকতে পারে যে, "তিলক স্বরাজ্য ফণ্ড" যখন কায়েম হয় তখন আমেদাবাদের "মিল ওনারস অ্যাসোসিয়েশ্যান" তাতে ৩ লক্ষ টাকা দান করেন। সেই ৩ লক্ষ টাকার সুদ মাসে সাড়ে বারশ' টাকা তারা মজুরদের শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য দাগ দিয়ে দিয়েছেন। কাজেই এই ফণ্ড থেকে আমরা বৎসরে ১৫হাজার টাকা পাই।

(৪) স্থানে স্থানে গ্রন্থালয় ও পাঠাগার করেছি।

(৫) 'মজুর সন্দেশ' নাম দিয়ে গুজরাটী ভাষায় আমরা একখানা সাপ্তাহিক কাগজ চালিয়ে থাকি। প্রত্যেক সংখ্যা হাজার পাঁচেক ছাপা হয়। এই কাগজে আমরা স্বাস্থ্য, সমাজ-সংস্কার, মাদকতা-নিবারণ ও অন্যান্য লোকহিতকর বিষয়ে প্রবন্ধ এবং সংবাদ ছেপে থাকি।

প্রঃ—আপনি বলছিলেন যে, আপনারা মাঝে মাঝে মজুর-পল্লীতে গিয়ে মজুরদিগের মধ্যে মিউনিসিপ্যাল আইনকানুন সম্বন্ধে. লোক-শিক্ষা প্রচার করে থাকেন; এ সম্বন্ধে একটু খোলাসা ভাবে বলুন।

উঃ—আপনি শুনে খুসী হবেন যে, এদিকে আমরা সম্প্রতি একটা যুগান্তর সৃষ্টি করতে পেরেছি। কাচড়াভাই ভাগত নামে একজন মেথরকে আমরা আমেদাবাদ

মিউনিসিপ্যালিটীর সভ্য করে' পাঠাতে পেরেছি। ব্যাপারটা বুঝুন—একে মেথর এবং অস্পৃশ্য, তার উপর তার মাসিক রোজগার মাত্র ২৫ টাকা। কিন্তু তার স্বপক্ষে ভোট দেয় ২ জন হিন্দু মজুর, তার ভিতর আবার একজন ব্রাহ্মণ। তার বিরুদ্ধে কেহই দাঁড়ায় নি। ভাগত মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার হয়ে নগরের শাসন-কর্ত্তাদের ভিতর অন্যতম রূপে সকলের সুখ ও স্বাস্থ্য পর্য্যবেক্ষণ করছে।

প্রঃ—মিউনিসিপ্যালিটী মজুর-পাড়ার ঘরবাড়ী, রাস্তা-ঘাট এবং স্বাস্থ্য-রক্ষা সম্বন্ধে কিরূপ যত্ন নেয়?

উঃ—এ সম্বন্ধেও আমাদের কাজ-কর্ম্মের পরিমাণ কম নয়। মজুরপাড়া তদন্ত করবার জন্য আমরা একটী কমিটী খাড়া করেছি। ১৯২৪ সনে আমরা ২ হাজার বাড়ীতে গিয়ে প্রত্যেক লোকের ঘর, জলের ব্যবস্থা, সাধারণ স্বাস্থ্য ইত্যাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেছি। তা ছাড়া, পারিবারিক আয়-ব্যয়, জিনিষ-পত্রের দাম প্রভৃতি বিষয়ে অনুসন্ধানের ফল আমরা "মজুর সন্দেশ" কাগজে ছেপে থাকি। যে যে ক্ষেত্রে আমরা মনে করি মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ত্তব্য আছে, সে-সব জায়গায় আমরা মিউনিসিপ্যাটীকে তাদের কর্ত্তব্য সমঝিয়ে দিই। ১৯২৪ সনে আমাদের আনা-গোনার ফলে মিউনিসিপ্যালিটী থেকে ৫০টী নূতন জলের কল মজুরপাড়ায় কায়েম করা হয়েছে। ৬টী সার্ব্বজনিক পায়খানা বসানো হয়েছে, তা ছাড়া, ৭৭ জায়গায় আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রঃ—আপনাদের ইউনিয়নের যে-সকল মজুর "প্রতিনিধি মণ্ডলে" বেশ করিতকর্ম্মা রূপে মজুরদের স্বার্থপুষ্ট করে, তাদের উপরে মালিকদের নজর কিরূপ?

উঃ—মালিকেরা অবশ্য সাধারণতঃ "প্রতিনিধি মণ্ডলে"র লোকজনকে,—মজুরদের সর্দ্দারদেরকে,—ভাল চোখে দেখে না। যে-সকল মজুর মজুরদের স্বার্থরক্ষা করবার জন্য অথবা মজুরসমাজে এই সকল বিষয়ে আন্দোলন চালাবার জন্য নামজাদা হয়ে উঠে, তাদেরকে বরখাস্ত করতে পারলেই মালিকেরা খুসী।

প্রঃ—এই ধরণের বরখাস্ত মজুরদেরকে আপনারা কোনো রকম সাহায্য করেন কি?

উঃ—হাঁ, বৎসরে ২৫।৩০ জন মজুর মজুর-সেবার জন্য মালিকদের কু-নজরে পড়ে' বরখাস্ত হয়। তাদেরকে আমরা অন্ততঃ ৩ মাস পূরো মাহিনায় অথবা আধা মাহিনায় বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করি।

প্রঃ—এইবার আপনাকে আর একটী প্রশ্ন করে' খতম করব। ফ্যাক্টরীর কাজ করতে করতে দৈবক্রমে যদি কোনো মজুরের ক্ষতি হয় তবে ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে আপনাদের ইউনিয়ন কোনো তদবির করে কি?

উঃ—এ বিষয়ে আমরা অনেক-কিছুই করে থাকি। আপনি জানেন যে, ১৯২৪ সনের জুলাই মাসে "ওয়ার্ক মেন্‌স্ কম্পেন্‌সেশ্যন অ্যাক্ট" (মজুরদের ক্ষতিপূরণ আইন) জারি হয়েছে। এই আইনটা আমরা গুজরাটী ভাষায় তর্জ্জমা করে' মজুরদের মধ্যে বিলি করেছি। তা ছাড়া, যখনই কোনো ফ্যাক্টরীতে দৈব ঘটে তখনই সে সম্বন্ধে আমাদের ইউনিয়ন অফিসে হিসাব রাখা হয়। ১৯২৪ সনে মাস ছয়েকের ভিতর আমরা ৬১টী ক্ষতিপূরণের মামলা পাই। তার ৩৯ টীতে মজুরেরা মালিকদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ পেয়েছে। তার পরিমাণ প্রায় ১৭ হাজার টাকা। ক্ষতিপূরণের টাকা অনেক সময় মজুরদের বিধবা পত্নী অথবা অনাথ বালক-বালিকারা পেয়ে থাকে। এই টাকার পরিমাণ অনেক ক্ষেত্রে বেশ মোটা। বিধবারা অথবা শিশুরা এত টাকা এক সঙ্গে পেলে অপব্যয় করতে বাধ্য হবে, এই বুঝে আমরা টাকাটা ইউনিয়নে জমা করে রাখি। আর এই জমার উপর বিধবা অথবা শিশুদেরকে ন্যায্য হারে সুদ দিয়ে যাই। সে বৎসর আমাদের ইউনিয়নে ক্ষতিপূরণের টাকা জমা হয়েছিল প্রায় হাজার পনর। তার ভিতর মাত্র হাজার পাঁচেক আমরা তৎক্ষণই যথাস্থানে পাঠিয়ে দিয়েছি। বাকী হাজার দশেক ব্যাঙ্কে জমা করে রেখেছি।
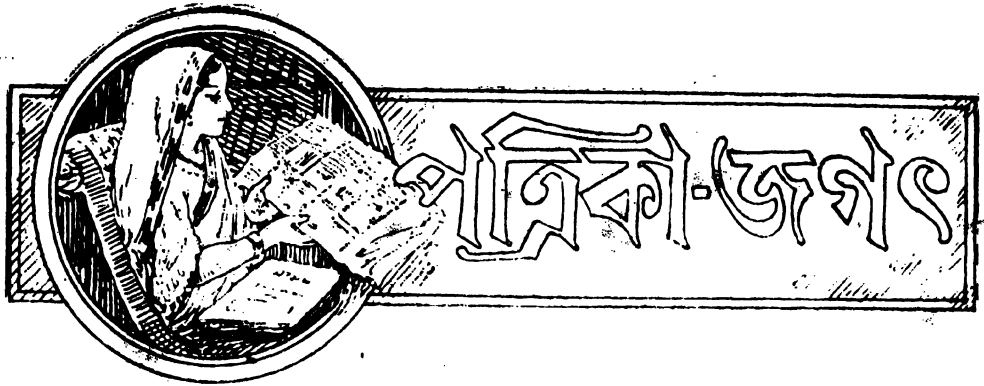
"জুর্ণাল দেজ্ একোনোমিস্ত্

ফরাসী ধনবিজ্ঞান-পরিষদের মাসিক মুখপত্র। ১৫ এপ্রিল, ১৯২৬। (১) জাপানী অধ্যাপক ফুকুদা ফরাসী ভাষায় এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে ১৮৬৮ হইতে ১৯২৫ সন পর্য্যন্ত জাপানের সঙ্গে বিদেশের আন্তর্জ্জাতিক লেনদেন বিবৃত হইয়াছে। এই লেনদেনের আর্থিক অংশগুলায় "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন" লক্ষ্য করা যায়। এই তত্ত্ব ফুটাইয়া তোলা লেখকের উদ্দেশ্য। (২) যুক্তরাষ্ট্রে ফরাসী কর্জ্জ। লেখক লেগ্রো বলিতেছেন যে, ১৮১৬ সনে ইংল্যণ্ড লড়াইয়ের কর্জ্জগুলা তামাদি বিবেচনা করিয়াছিল। সেই পন্থা অবলম্বন করিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষেও আজ তাহার পাওনা টাকা তামাদি বিবেচনা করা উচিত। (৩) সামাজিক বীমা-প্রথা। লেখক দ'ন্সুহিবঁ সরকারী সমাজ-বীমার বিরোধী

অ্যান্যাল্‌স্ অব্ দি আমেরিকান অ্যাক্যাডেমি অব্ পোলিটিক্যাল অ্যাণ্ড সোশ্যাল সায়েন্স

ফিলাডেল্‌ফিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের সমাজ ও রাষ্ট্র-বিজ্ঞান পরিষদের কর্ম্মকেন্দ্র। এই কেন্দ্র হইতে বৎসরে চার বার করিয়া "অ্যান্যাল্‌স্" নামক ত্রৈমাসিক বাহির হয়। প্রধানতঃ আর্থিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যার আলোচনা এই পত্রিকার বিশেষত্ব। "কেজো" লোকেরা "অ্যান্যাল্‌সে"র লেখক। "মাষ্টার"দের লেখাও যে বাহির হয় না তা নয়।

সেপ্টেম্বর ১৯২৬ এর সংখ্যাটা যুক্তরাষ্ট্রের বাজার-সম্পদ্ সম্বন্ধে বিশেষ সংখ্যা। চার স্বতন্ত্র বিভাগে রচনাগুলা শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে। (১) ভূমিকা, (২) দুনিয়ার ব্যবসাবাণিজ্য, (৩) বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের আলোচনা, (৪) রাষ্ট্র-নীতি ও বাজার-সমস্যা। এই চার শ্রেণীতে ২৪টা প্রবন্ধ দেখিতেছি। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৯০। গ্রন্থসমালোচনার জন্য অতিরিক্ত ১১ পৃষ্ঠা। তাহার উপর সূচী ৩ পৃষ্ঠা।

ভূমিকা লিখিয়াছেন পেন্‌সিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বাই। "বিদেশী বাজার ও রাষ্ট্র-নীতি" এই ভূমিকার আলোচ্য বিষয়।

"আমেরিকান বহির্ব্বাণিজ্যের বর্ত্তমান গতিবিধি" সম্বন্ধে লেখক ডুরাণ্ড। ইনি যুক্তরাষ্ট্রে ফেডার্যাল দরবারে তথ্য-তালিকা-বিভাগের বড় কর্ত্তা। ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লিটম্যান "মহাযুদ্ধের বাণিজ্য-প্রভাব" বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

ক্যালিফর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের "খাদ্যদ্রব্যের পরীক্ষাগার" হইতে টেলার সাহেব "গম এবং ময়দা ও আটা" সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠাইয়াছেন। শিকাগোর সুইফ্‌ট্ কোম্পানী বাণিজ্য-বিষয়ক অনুসন্ধান ও গবেষণার জন্য একটা বিভাগ চালাইতেছে। তাহার কর্ম্মকর্ত্তা হেবেল্ড "জানোআর ও মাংসের বিদেশী বাজার" আলোচনা করিয়াছেন। "আমেরিকান মোটর-গাড়ী" সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ডজ ব্রাদার্স কোম্পানীর বিদেশী বিক্রয়-বিভাগের বড়বাবু ওয়েন। "বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদির বর্ত্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ" বিবৃত করিয়াছেন হার। ইনি ওয়েষ্টিং হাউস ইলেক্‌ট্রিক অ্যাণ্ড ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কোম্পানীর প্রেসিডেণ্ট। "বিদেশে মার্কিণ রেলওয়ে এঞ্জিন বিক্রয়ের বাধা-বিঘ্ন" বিবৃত হইয়াছে গ্রেগ সাহেবের রচনায়। ইনি ফেডার্যাল গবর্মেণ্টের যাতায়াত-

বিভাগের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী। "চাষ-আবাদের যন্ত্রপাতি-বিষয়ক রপ্তানি-বাণিজ্য" সম্বন্ধে একটা লেখা বাহির হইয়াছে। শিকাগোতে "মার্কিণ কৃষি-যন্ত্রস্রষ্টা কোম্পানীদের সঙ্ঘ" আছে। এই সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীযুক্ত হোয়াইট কৃষি-যন্ত্রের রপ্তানি আলোচনা করিয়াছেন। টিনের কৌটায় খাদ্যদ্রব্য বাঁচাইয়া রাখা মার্কিণদের এক বড় শিল্প। বিদেশে এই "ক্যান্‌ড্ ফুডের" বাজারও খুব বড়। এই বিষয়ে যিনি প্রবন্ধ দিয়াছেন তিনি "ন্যাশন্যাল ক্যানার্স অ্যাসোসিয়েশ্যানের" কর্ম্মকর্ত্তা। "কেরোসিন তেলের বহির্ব্বাণিজ্য" আলোচিত হইয়াছে যাঁহার রচনায় তিনি "অয়েল অ্যাণ্ড গ্যাস জার্ণ্যাল" নামক পত্রিকার বিশেষজ্ঞ। "মোশ্যন-পিক্‌চার নিউজ" নামক সিনেমা পত্রিকার সম্পাদক সিনেমা-ঘটিত শিল্প ও বাণিজ্য বিবৃত করিয়াছেন। "কয়লার আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য" লিখিত হইয়াছে হ্বাড্‌লে কর্ত্তৃক। ইনি "কয়লা" নামক পত্রিকার সম্পাদক।

এগারটা রচনা বাহির হইয়াছে "রাষ্ট্রনীতি ও ভবিষ্যতের বাজার" সম্বন্ধে। এইগুলা নিম্নরূপ :—(১) বহির্ব্বাণিজ্য ও মার্কিণ, (২) ইয়োরোপের শুল্ক-ব্যবস্থা ও বাজার-সমস্যা, (৩) যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানি-বাণিজ্য ও শুল্ক-ব্যবস্থা (৪) বহির্ব্বাণিজ্যে মার্কিণ গবর্মেণ্টের সাহায্য, (৫) বাণিজ্য সংবাদ বিতরণ সম্বন্ধে অন্যান্য গবর্মেণ্টের কার্য্য-প্রণালী, (৬) বহির্ব্বাণিজ্যে সরকারী সাহায্য, (৭) বিদেশী বাজার তাঁবে আনিবার মতলবে টাকা খাটানো, (৮) আমেরিকার রেলওয়ে এবং বহির্ব্বাণিজ্য, (৯) বন্দরের এবং নদী-নালার উন্নতি-সাধন আর তাহার সাহায্যে নূতন নূতন বাজার সৃষ্টি, (১০) বিদেশে মার্কিণ যাতায়াত-বীমার প্রভাব, (১১) রপ্তাণি-বাণিজ্যের জন্য বিজ্ঞাপন।

এই সকল রচনার কোন্‌টা ছাড়িয়া কোন্‌টার চুম্বক প্রকাশ করিব ঠাওরাইয়া উঠিতে পারিতেছি না। কেননা আজকালকার ভারতে যে সকল সমস্যা উপস্থিত তাহার সবই "অ্যানাল্‌সের" রচনাবলীতে বিশ্লেষিত আছে। মার্কিণ লেখকেরা স্বদেশের আর্থিক উন্নতির দিকে নজর রাখিয়াই কলমে হাত দিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু "ঘর-কুনোমি" তাহাদের রচনায় প্রকাশ পায় নাই। গোটা দুনিয়ার তথ্য তাঁহাদের মগজে ঠাঁই পাইয়াছে। কাজেই ভারতের জন্য যাঁহারা মাথা ঘামাইতে অভ্যস্ত তাঁহারা এই সকল লেখার ভিতর নিজ নিজ স্বার্থ-মাফিক অনেক তত্ত্ব, কর্ম্ম-প্রণালী ও আলোচনা-পদ্ধতি পাইবেন।

"অ্যানাল্‌সের" মতন পত্রিকা বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলায়, অন্ততঃ ২।৩ কেন্দ্রে একখানা করিয়া থাকা আবশ্যক। যাঁহারা কংগ্রেসে কাউন্সিলে বক্তৃতা করিয়া থাকেন, অথবা যাঁহারা খবরের কাগজের লেখক বা সাংবাদিক আর যাঁহারা পল্লীসেবার বিভিন্ন বিভাগে নিজকে মোতায়েন রাখিতে সচেষ্ট, তাঁহাদের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের জন্য এইরূপ পত্রিকা দৈনিক খোরাক জোগাইতে পারে। এই কথাটা বুঝিলে আমাদের স্বদেশ-সেবকগণ নূতন কতকগুলা কর্ত্তব্য চোখের সম্মুখে রাখিতে পারিবেন।

"সম্মিলনী"

বিলাতে কোম্পানী-গঠনের হুজুগ

প্রত্যেক বৎসর গড়ে ছয় হাজার নূতন কোম্পানী ইংলণ্ডে রেজিষ্ট্রী হয়। কিন্তু ইহার অধিকাংশেরই পরমায়ু এক বৎসরের মধ্যে শেষ হইয়া যায়। যে-কোনো কোম্পানীর রেজিষ্ট্রী হইলেই ধনীর দেশ ইংলণ্ডে তাহার অংশ বিক্রয় হইতে বিলম্ব হয় না। বিশেষতঃ, উদ্যোক্তারা যদি তাহাদের কর্ম্মপদ্ধতিতে বেশ চটক লাগাইয়া সাধারণের দৃষ্টি-আকর্ষণে সমর্থ হয়, তবেত আর কথাই থাকে না।

অনেক কোম্পানী কেবল অনুমানে নির্ভর করিয়া রেজিষ্ট্রী হয়। কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত করা সম্ভবপর কি না সেদিকে মোটে কেহই লক্ষ্য করে না। সমুদ্রের ফেণা হইতে সোনা-সংগ্রহের মতলবে এইরূপ একটী কোম্পানী কয়েক বৎসর হইল গঠিত হইয়া বহু লক্ষ টাকার অংশ বিক্রয় করিয়াছিল। এযাবৎ তাহারা কিছুই করিতে পারে নাই, অথবা চেষ্টা করিয়া টাকাগুলিকে শেষ করিয়া দিয়াছে। এইরূপ আর একটী কোম্পানী সূর্য্যের তাপ ঘন করিয়া বোতলে আঁটিয়া শীতের দিনে বিক্রয় করিয়া খুব লাভবান হইবে বলিয়া গঠিত হইয়াছিল। ইহারাও খুব অংশ বিক্রয় করিয়াছিল। কিছুদিন পরে আর তাহাদের সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না।

বেশী দিনের কথা নহে, লণ্ডনবাসীরা যাহাতে প্রত্যহ প্রাতঃকালে ঘরে বসিয়া ব্রাইটনের সমুদ্র-জলে স্নান করিতে পায় তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিবে বলিয়া একটা কোম্পানী রেজেষ্ট্রী হইয়াছিল। আর একটী কোম্পানী সহরবাসীকে পল্লীর বিশুদ্ধ বায়ু যোগাইবার প্রলোভন দেখাইয়া অনেক টাকা আত্মসাৎ করিয়াছিল।

গুপ্তধন উদ্ধার করিবার মতলবে অনেক কোম্পানী গঠিত হয়। বড়লোক হওয়ার প্রলোভনে এই ধরণের কোম্পানীর অংশ সাধারণ লোকেরা খুব আগ্রহের সহিত কিনিয়া থাকে। ট্রাফালগার যুদ্ধে আবুকির বেতে বহু ধন-রত্ন নিমজ্জিত হয়। উহা উদ্ধারের জন্য যে কোম্পানী আছে, তাহাদের দশ বৎসরের চেষ্টা বৃথা হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত তাহারা কিছুই করিতে পারে নাই।

১৮৯৭ সনে হীরক জুবিলীর মিছিল যাহাতে সাধারণে দেখিবার সুযোগ পায় সে জন্য এক পক্ষ কালের মধ্যে লণ্ডনে কুড়িটী কোম্পানী রেজিষ্ট্রী হইয়াছিল। ইহারা বাড়ীর জানালা ও প্রকাশ্য স্থানগুলি আগে ভাড়া লইয়া কোম্পানীর অংশীদারদের মিছিল দেখিবার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিল। এইরূপ একটী কোম্পানী মিছিল-দর্শকদের নিকট হইতে একশত পাউণ্ড করিয়া আদায় করিয়াছিল।

ইংলণ্ডে অনেক পারিবারিক কোম্পানী আছে। বাড়ীর ধনী কর্ত্তা পরিবার-ভুক্ত লোকদের মধ্যে অংশ বিক্রয় করিয়া গৃহস্থালীটিকে একটি মেসে পরিণত করেন। আর একটী কোম্পানী কেবল পিতা ও পুত্রে গঠিত হইয়াছিল। পিতা এই কোম্পানীর গভর্নিং ডিরেক্টর এবং পুত্র ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কার্য্য করিতেন। মোটর গাড়ী চালানো ছিল ইহাদের কাজ। পুত্র ড্রাইভারি করিতেন। বৎসরান্তে হিসাব নিকাশ হইয়া গেলে লাভের কিছু টাকা তহবিলে রাখিয়া অংশীদার পিতা ও পুত্র অংশানুযায়ী লাভ গ্রহণ করিতেন।

জ্যর্ণালে দেলি একনমিস্তি এ রিহ্বিস্তা দি স্তাতিস্তিকা

ইতালিয়ান ধনবিজ্ঞান-পত্রিকা, মাসিক, সেপ্টেম্বর ১৯২৬, (১) তথ্য-তালিকা সংগ্রহের কার্য্যে যন্ত্রপাতির সাহায্য (সুইজি দে বেরাদিনিস), (২) সম্পত্তির বার্ষিক আয় হিসাব করিবার বিভিন্ন প্রণালী (পাচিফিক মাৎসনি)। বেরার্দিনিস সমর-বিভাগের লোক আর মাৎসনি "ইস্তিতুত নতিক" বা সমুদ্র-জরীপ বিদ্যালয়ের অধ্যাপক। এই দুই প্রবন্ধে গিয়াছে ৩৫ পৃষ্ঠা।

সদ্যঃপ্রকাশিত সাহিত্য আট বিভাগে বিবৃত হইয়াছে। এই জন্য লাগিয়াছে ২৮ পৃষ্ঠা।

সমালোচ্য সাহিত্য নিম্নরূপ:—(১) আর্থিক তথ্য ও অঙ্ক-বিষয়ক ইংরেজী, জার্ম্মাণ, ফরাসী ও ইতালিয়ান গ্রন্থাবলী (লেখক অধ্যাপক মর্ত্তারা), (২) জেনেহ্বার বিশ্ব-রাষ্ট্র-পরিষদের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী, (৩) আন্তর্জ্জাতিক কৃষি-পরিষদের বার্ষিক বিবরণী (মর্ত্তারা), (৪) বিভিন্ন দেশের সরকারী তথ্যতালিকা-বিষয়ক রিপোর্ট। আর্জেন্টিনা, অষ্ট্রেলিয়া, অষ্ট্রীয়া, ব্রেজিল, বুলগেরিয়া ক্যানাডা, চেকো-স্লোভাকিয়া, চিলি, ফিনল্যাণ্ড, জার্ম্মানি, জাপান, গ্রীস, ইংলণ্ড, নরওয়ে, নিউজীল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, রুমেণিয়া, স্পেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, সুইডেন, সুইটসার্ল্যাণ্ড, এবং সোহ্বিয়েট রুশিয়া এই ২৩ দেশের সরকারী রিপোর্টগুলা ছোট-বড়-মাঝারি রচনায় বিবৃত হইয়াছে (মর্ত্তারা), (৫) ইতালির বিভিন্ন তথ্য-তালিকা-বিষয়ক রিপোর্টের খতিয়ান। ২১টা সরকারী ও বে-সরকারী কর্ম্ম কেন্দ্রের প্রচারিত সাহিত্য হইতে তথ্য সঙ্কলিত হইয়াছে (মর্ত্তারা), (৬) বিভিন্ন ইতালিয়ান নগরের শাসন-বিষয়ক তথ্য এবং ব্যবসায়ি-সঙ্ঘের কর্ম্ম-বৃত্তান্ত (মর্ত্তারা)।

অপর দুই বিভাগে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থের সমালোচনা বাহির হইয়াছে।

"বরিশাল"

রেল কেন চাই

কলিকাতা-বরিশাল রেল লাইন খোলার জন্য কয়েকবার প্রস্তাব হইয়াছে, আবার তাহা প্রত্যাহৃত হইয়াছে। ফলে ষ্টীমার কোম্পানীর স্বেচ্ছাচার দেশবাসীকে অবনত মস্তকে গ্রহণ করিয়া চলিতে হইতেছে। আবার কলিকাতা হইতে

বরিশালে রেল লাইন খোলার জন্ত জরীপ আরম্ভ হইবে। আমরা এই সংবাদ আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতেছি।

কেহ কেহ এই প্রস্তাবে বিজ্ঞতা দেখাইয়া বলিতেছেন, রেল হইলে আর দেশের কিছু থাকিবে না, স্বাস্থ্য, খাদ্য সব সর্ব্বনাশ পাইবে। এই কথার উত্তরে জিজ্ঞাসা করিতে হয় যে, আমাদের কি আছে। রেল লাইন হইলে ম্যালেরিয়ার আশঙ্কা। তাহা কি রেল লাইন হইবার বহু পূর্ব্বেই আমাদের গ্রামগুলি গ্রাস করে নাই? রেল হইলে আর কয়জন বেশী মরিবে? কচুরীপানায় ম্যালেরিয়ায় দেশ উৎসন্ন গেল, তাহার কোনো প্রতিকার হইল না। এখন রেল আসিলে তাহাতে আর কতটুকু ক্ষতি বাড়াইবে?

বরিশালের বিশেষত্ব ছিল এই যে, এখানে মাছ, দুধ, চাউল, ডাইল, তরকারী অর্থাৎ প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্য সকলই বেশ সস্তা। কিন্তু তাহা এখন অতীতের কাহিনীতে পরিণত হইয়াছে। বরিশালে যে ইলিশ মাছ চারি পয়সা ছয় পয়সায় বিক্রী হইত, তাহা এখন এক একটা দেড় টাকা দুই টাকায় কিনিতে হয়, তাহাও আবার প্রয়োজন মত পাওয়া যায় না। দুধের কাঁচি সের (=৬০ তোলা) পাঁচ আনা অর্থাৎ কলিকাতার দর হইতেও চড়া। চাউল-ডাইলেরও কলিকাতা অপেক্ষা বেশী দর। সেই যে আট টাকা চাউলের মণ কোন্ দুর্বৎসরে উঠিয়া বসিয়াছে, তাহা আর নামে না। বর্ষাকালে বরং কলিকাতায় চাউল সস্তা। তরকারীর অবস্থা না জানে এমন গৃহী নাই। রেল লাইন হইলে আলু, পটল, বেগুন প্রভৃতি তরকারী ত সস্তা হইবে। আর এমন করিয়া প্রত্যেক খাদ্য দ্রব্যের অভাবে মাথায় হাত দিতে হইবে না। অন্য দেশের ভালো ভালো উৎপন্ন দ্রব্যের ভাগ বরিশালবাসীও পাইতে পারিবে। মাছ-দুধও যেখানে সস্তার বিক্রয় হয় সেখান হইতে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িবে।

স্বাস্থ্য এবং খাদ্যের কথা এই। দ্রুতগামী যানের অভাব বরিশালবাসীকে যে কত প্রকারে কাণা করিয়া রাখিয়াছে, তাহার দুই একটা নমুনা দিতেছি। এখান হইতে ষ্টীমার ও রেল পথে কলিকাতার দূরত্ব মাত্র ২১৩ মাইল। কিন্তু কলিকাতা হইতে মণিঅর্ডার, রেজেষ্ট্রী চিঠি, পার্শেল প্রভৃতি পাইতে লাগে তিন দিন, কখনো চারি দিন। শীতের দিনে কুয়াসায় ষ্টীমার প্রায়ই অত্যন্ত বিলম্বে বরিশালে আসে। আমরা ডাকের জন্য, খবরের কাগজের জন্য হা করিয়া বসিয়া থাকি। ষ্টীমারে কোনো আত্মীয় আসিবেন, আটটার সময় গিয়া বসিতে হইবে আর ফিরিতে হইবে হয় তো তিনটায়। কেননা আটটা কিংবা তিনটার মধ্যে কোনো সময়ই যথাযথ নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া ষ্টীমার কোম্পানীর সাধ্যাতীত।

কাহারো অত্যন্ত কঠিন বেয়ারাম, চিকিৎসার্থ তাহাকে কলিকাতা পাঠানো দরকার; তখন ঢিক্ ঢিক্ করা ষ্টীমার ব্যতীত গতি নাই। দুই দিনে নিয়া তাঁহারা কলিকাতায় পৌছাইবেন, তাহাতে রোগী বাঁচুক আর মরুক কাহারো কিছু আসে যায় না। একজন রোগীর মল কিংবা মূত্র কলিকাতা হইতে পরীক্ষা করাইয়া আনিতে হইলে খুব কম পক্ষে লাগিবে পাঁচ দিন; রেল হইলে জোর বারো ঘণ্টায়ই কলিকাতা পৌছা যাইবে এবং কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত রোগী অচিকিৎসায় মারা যাইবে না।

রেলপথ-বিস্তার শিক্ষা ও সভ্যতার অপরিহার্য্য অঙ্গ। ইহাকে বাদ দিয়া চলিবার উপায় নাই। পৃথিবীর কোনো সভ্য সমাজ ইহা বাদ দিতে পারেও নাই। সুতরাং বরিশাল কলিকাতা রেলপথ যত শীঘ্র খোলা হয় ততই ভালো। ইহাতে শত অসুবিধা থাকিলেও সহস্র সুবিধা আছে জানিয়া দেশবাসী ইহাকে সাদরে গ্রহণ করিবে।

"পল্লী" (কলিকাতা, আশ্বিন ১৩৩৩)

গ্রাম্য ঔষধাগার

গ্রামসমূহে অধিকসংখ্যক ঔষধাগারের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে পল্লীগ্রামে অধিকসংখ্যক চিকিৎসক বসাইতে হইবে। যদি যথেষ্টসংখ্যক যোগ্য চিকিৎসককে পল্লীগ্রামবাসী করাইতে না পারা যায়, যদি প্রত্যেক জেলাতে ডাক্তারী শিক্ষার স্কুল স্থাপন করিয়া স্থানীয় চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধি না করা যায়, তবে সুলভ ঔষধাগারের প্রতিষ্ঠাদ্বারা কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে, এবং শিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত—অর্থাৎ ম্যালেরিয়া, উদরাময়, আমাশয় প্রভৃতি সাধারণ রোগগুলির জন্য ঔষধাদি নির্ব্বাচনে

সম্পূর্ণ যোগ্য চিকিৎসকদিগের অধীনে এই সকল ঔষধাগার ৪।৫খানি গ্রামের ব্যবহারোপযোগী ঔষধে পূর্ণ করিয়া রাখিতে হইবে।

এইরূপ ঔষধাগার প্রতিষ্ঠার ও উহার কার্য্য চালাইবার ব্যয় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) ৪।৫ খানি গ্রাম লইয়া একটী ছোট ঔষধাগার ঔষধপূর্ণ করিবার মূলধন ... ২৫০৲

(২) সুযোগ্য (বা অর্দ্ধযোগ্য) কোন চিকিৎসকের মাসিক ২৫৲ টাকা হিসাবে ছয় মাসের পারিশ্রমিক দিবার মূলধন ... ১৫০৲

[ছয়মাস পরে ঔষধাগার হইতেই চিকিৎসকের মাহিনার সংস্থান হইতে পারিবে এবং এই টাকা কাজ চালাইবার মূলধনে যুক্ত করা চলিবে]

(৩) কাজ চালাইবার মূলধন ... ১০০৲

মোট—৫০০৲ টাকা

স্থানীয় যে-কোন অবস্থাপন্ন ব্যক্তিই এইরূপ চিকিৎসকের বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। মাত্র আহার ও বাসস্থানের বিনিময়ে একজন চিকিৎসককে সদাসর্ব্বদা নিকটে প্রাপ্ত হওয়া যে কত সুবিধা, পল্লীগ্রামে তাহা বুঝিবার মত লোকের অভাব হইবে না। চিকিৎসক মাসিক ২৫৲ টাকা পারিশ্রমিক পাইবেন—'প্রাইভেট্ প্রাক্‌টীস্' করিতে পারিবেন, তবে রোগীদের আর্থিক অবস্থা সম্যক্ বিবেচনা করিয়াই তিনি তাঁহার কি গ্রহণ করিবেন। এই 'প্রাইভেট্ প্র্যাক্‌টীস্' হইতে বেশী না হইলেও অন্ততঃ মাসিক ৬০৲ টাকা উপার্জ্জন করা কঠিন হইবে না। ইহা ব্যতীত ঔষধ বিক্রয়ের অনুপাতে একটা নির্দ্দিষ্ট কমিশনও তিনি পাইবেন।

চার পাঁচ মাসের মধ্যেই পরে বিবৃত "ম্যালেরিয়া মিকশ্চার" ব্যতীতও ৪।৫ খানি গ্রাম হইতে অন্য ঔষধাদি বিক্রয় বাবদ মাসে অন্ততঃ একশত টাকা পাওয়া যাইতে পারিবে; এই টাকা নিম্নলিখিত বাবদে খরচ হইবে:—

নূতন ঔষধ কিনিবার খরচ..............৫৫৲

ডাক্তারের বেতন..........................২৫৲

ঐ—কমিশন..............................১৫৲

মূলধন প্রত্যর্পণ..............................২৲

ঔষধাদির লোকসানি..........................৩৲

মোট.....১০০৲ টাকা।

ঔষধাগার, প্রাইভেট্ প্র্যাক্‌টীস্ পারিশ্রমিক ও উপরন্ত বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান পাইলে পল্লীগ্রামে কাজ করিবার জন্য চিকিৎসক পাওয়া কঠিন হইবে না। স্থানীয় লোক পাইলে আরও কম খরচে ঔষধাগার চলিতে পারিবে।

নদনদী পরিষ্কার ও জল চলাচল

এবিষয়ে সরকারের অনেক পরিকল্পনা আছে। কিন্তু যতদিন সরকারী তহবিল হইতে টাকার ব্যবস্থা সম্ভবপর না হয়, ততদিন কাজে পরিণত হইতে পারে না। জল চলাচলের ব্যবস্থা বিষয়টী বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ইতালির ⅓ অংশ ম্যালেরিয়ায় জর্জ্জরিত ছিল; ইতালির সরকার তাহাদের জলনিকাশ ও জল চলাচলের জন্য বহু ব্যয় করিয়া দেশের অনেক জায়গা হইতে ম্যালেরিয়া বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ৫০ বৎসর যাবৎ প্রতিবৎসরে প্রায় ৫৬ লক্ষ টাকা খরচ হইতেছে; এই ব্যাপারে দেশের সরকার, জমীদার ও প্রজা একসঙ্গে কটিবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতেছেন; ফলে দেশের ম্যালেরিয়া বিতাড়িত হইয়াছে, দেশে আবার সুস্থ ও সবল লোকের সংখ্যা বেশী হইয়াছে, চাষ-আবাদ উন্নত হইয়াছে, দেশের অবস্থা ফিরিয়া গিয়াছে। আমাদের বাংলাদেশেও এইরূপ একাগ্রচিত্ত হইয়া ম্যালেরিয়ার প্রতিকার করিতে হইবে; নদ-নদীতে জল চলাচলের ব্যবস্থা, দেশে জল-নিকাশের বন্দোবস্ত, ও বন-জঙ্গলাদি পরিষ্কার করিতে হইবে। এজন্য গবর্ণমেণ্ট, দেশের জমীদার ও প্রজার একতাবদ্ধ চেষ্টা আবশ্যক। দেশ সমৃদ্ধিশালী হইলেই ইহার খরচ আপনি উঠিয়া যাইবে।

রেল লাইনে সাঁকো

প্রত্যেক মাইলে অন্ততঃ ৪।৫টী করিয়া সাঁকো বা কালভার্ট থাকিলে জল-চলাচলের সুবিধা হয়। রেল-লাইনগুলি বাঙ্গালার সমতল ভূমিকে বাঁধ দিয়া নানাভাবে বিভক্ত

করিয়া রাখিয়াছে, সব জায়গার জল ছড়াইয়া পড়িবার সুবিধা পায় না;—কোথাও জলাভাব, কোথাও বা বন্যা আসিয়া পড়ে। ইহাও ম্যালেরিয়া-বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

শ্রীগিরীন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র এম, বি

লেকোনোমিস্ত্, ফ্রাঁসে

মার্চ ১৯২৬,—১৯২৫ সনে সীসার উৎপত্তি, দাম ও বাজার।

এপ্রিল ১৯২৬,—(১) জার্ম্মাণির রাসায়নিক সঙ্ঘ (লেখক কাহ্ বলিতেছেন যে, প্রাক্-যুদ্ধ যুগের বাজার দখল করিবার জন্য জার্ম্মাণরা এই বিপুল সঙ্ঘ কায়েম করিল)। (২) ১৯২৫ সনে দুনিয়ার যত জায়গায় তামা উঠিয়াছে তাহার বিবরণ।

মে ১৯২৬,—১৯২৫ সনের রেশম-শিল্প। লিঅঁ শহরের কারখানাগুলার বিবরণ।

আমেরিকান ইকনমিক রিহ্বিউ

আমেরিকান ধন-বিজ্ঞান-পরিষদের ত্রৈমাসিক মুখপত্র। সেপ্টেম্বর ১৯২৬। প্রবন্ধ :—(১) ১৯২৬ সনের রেহ্বিনিউ অ্যাক্‌ট (রাজস্ব আইন) (অধ্যাপক ব্লেকী), (২) পরিমাণ বিশ্লেষণ এবং ধনবিজ্ঞান-বিদ্যার ক্রম-বিকাশ (কর), (৩) মজুরির হার ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার (অধ্যাপক গ্রাহাম), (৪) মজুর-বিষয়ক ধনবিজ্ঞান (অধ্যাপক ব্রিসেন্ডেন)।

পত্রিকায় আছে প্রায় ২০০ পৃষ্ঠা। তাহার ভিতর মাত্র ৫০ পৃষ্ঠা গিয়াছে এই চারটা প্রবন্ধে। গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দেওয়া হইয়াছে প্রায় ৮০ পৃষ্ঠা। বিভিন্ন পত্রিকার সূচী ও সারাংশে লাগিয়াছে পৃষ্ঠা পঁচিশেক।

এই পত্রিকার বিশেষত্বসমূহ সম্বন্ধে পূর্ব্বে আলোচনা করা গিয়াছে। এইবার একটা নূতন বিশেষত্বের কথা বলিব। আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ধনবিজ্ঞান-বিদ্যায় যে সকল ছাত্র পি-এইচ, ডি, উপাধি পায় তাহাদিগকে একটা করিয়া "ডিস্যার্টেশ্যন" বা অনুসন্ধান-মূলক প্রবন্ধ লিখিতে হয়। এই প্রবন্ধ-রচনাই একমাত্র কাজ নয়। পি-এইচ, ডি উপাধি-প্রার্থী ছাত্র-ছাত্রীদিগকে অন্যান্য পরীক্ষার্থীদের মতনই কতকগুলা বিষয়ে লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষাও দিতে হয়। "ডিসার্টেশ্যন টা" অতিরিক্ত। একমাত্র ডিসার্টেশ্যনের জোরে আমেরিকায় কেহ "ডকটর" হইতে পারে না। এম্, এ পাশের পরও অনেকদিন পর্য্যন্ত ইস্কুলে বসিয়া বই মুখস্থ করা দরকার হয়। ভারতে এই কথাটা খুব ভাল করিয়া হজম করা আবশ্যক; কেন না আমাদের দেশে বি, এ পাসের পরেই "রিসার্চ" করিতে লাগিয়া যাওয়া দস্তুর।

আমেরিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাও অনেক আর "ডক্টর"ও বাহির হয় ঝুড়ী-ঝুড়ী। কাজেই ডিসার্টেশ্যনে ডিসার্টেশ্যনে "ধূলপরিমাণ"। বর্ত্তমান সংখ্যার "রিহ্বিউ"য়ে প্রায় ৩০ পৃষ্ঠা-ব্যাপী বিপুল তালিকা দেখিতেছি। আজকাল যে-সকল ডিসার্টেশ্যন লেখা হইতেছে অথবা লেখা সম্পূর্ণ হইয়াছে এই তালিকায় সেইগুলার নাম বিভিন্ন বিষয় অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে। গুন্‌তিতে এইগুলা প্রায় ৬০০ হইবে।

ডিসার্টেশ্যনের নাম শুনিবামাত্রই আঁতকাইয়া উঠিবার প্রয়োজন নাই। ডকটর উপাধির জন্য এই সকল বড় বড় দেশে যে সব প্রবন্ধ-গ্রন্থাদি লেখা হইয়া থাকে সেইগুলাকে "ছেলে-ছোকরার কাজ" বিবেচনা করাই ইহাদের দস্তুর। এই সকল রচনা লেখকদের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রবেশিকা বা অ, আ, ক, খ মাত্র। আর আমরা ভারতে বোধ হয় এই ধরণের কোনো পরীক্ষায় প্রাইজ পাওয়া রচনার লেখককে মহাবীর বিবেচনা করিয়া থাকি। অধিকন্তু ঐ ধরণের দু'একখানা লেখার ভারতীয় লেখকও ধরা-খানাকে সরা জ্ঞান করিতে অভ্যস্ত। বিদ্যার রাজ্যে আর চরিত্রের রাজ্যে দুনিয়ার অন্যান্য দেশের কত নীচে ভারতবর্ষ অবস্থিত তাহা এই সামান্য কথা হইতেই অনেকটা মালুম হইবে। ভারতে চিন্তা-প্রণালীর এবং বিজ্ঞান-গবেষণার মাপ-কাঠি আরও উঁচু করা দরকার। ইহা বুঝিয়াই একটা অপ্রিয় সত্য প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া ফেলা গেল।

ফরাসী ধন-বিজ্ঞানের কেতাব

প্যারিসের জিয়ার কোং হইতে অধ্যাপক আঁসিও প্রণীত "ত্রেতে দেকোনোমী পোলিটিক" (ধনবিজ্ঞান) গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে (১৯২৬)। মূল্য ৬০ ফ্রাঁ। ফরাসীরা সরস রচনায় সিদ্ধহস্ত। অধিকন্তু বাস্তব জীবনের তথ্য হইতে অতি দূরে সরিয়া গিয়া ধন-সম্পদের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা তাঁহাদের রেওয়াজ নয়।

বর্ত্তমান খণ্ডে যে সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে তাহার ভিতর কয়েকটা উল্লেখ করা যাইতেছে। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের তত্ত্ব-কথা বিবৃত হইয়াছে। আঁসিও বলিতেছেন,—"আর্থিক দুনিয়ায় একঘরে হইয়া জীবন কাটানো অসম্ভব। জগতের নানা লোকের সঙ্গে মালের আদান-প্রদান অবশ্যম্ভাবী। ঘরের দুয়ার বন্ধ করিয়া মানব-জাতিকে কলা দেখানো কখনই চলিতে পারে না।"

সংরক্ষণ-শুল্ক সম্বন্ধে গ্রন্থকারের রায় নিম্নরূপ :—"ইহাতে দেশের গরিব লোকের ক্ষতি হয়। আটপৌরে জিনিষের জন্য বেশী দাম দিতে হয়। কাজেই সমাজে বহু অনিষ্ট ঘটে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও জগতের সর্ব্বত্রই সংরক্ষণ-নীতি চলিতেছে। তাহার কারণ এই যে,—জগতে শিল্পোন্নতি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ এত দ্রুত ঘটিতেছে যে, সংরক্ষণের কু-গুলা ঢাকা পড়িতেছে।" অবাধ বাণিজ্য নীতির স্বপক্ষে যাহা কিছু বলা সম্ভব আঁসিও সবই বলিয়াছেন।

আর্থিক জগতের "সঙ্কট"-বিশ্লেষণ বর্ত্তমান গ্রন্থের একটা প্রধান জিনিষ। আর্থিক "চক্রের" বিভিন্ন অবস্থা বিবৃত হইয়াছে। প্রথম অবস্থায় "দেদার মজা", তাহার পর "ভজকট" ও অবসাদ এবং শেষ পর্য্যন্ত আবার "স্থিতি-সাম্যে" পুনর্গমন—এই হইতেছে আর্থিক উঠা-নামার ধারা। এই ধারার নানা কারণ সংক্ষেপে বুঝানো হইয়াছে।

টাকাকড়ির আলোচনা এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে মূল্য-তত্ত্ব গ্রন্থের অনেক ঠাঁই জুড়িয়াছে। আঁসিও বলিতেছেন,—"চলতি টাকার পরিমাণ বাড়িলে জিনিষ-পত্রের দাম বাড়ে। মুদ্রা-তত্ত্বের পরিমাণ-পন্থীরা এইরূপ বলিয়া থাকেন। ইহা অবশ্য অসত্য নয়। কিন্তু দ্রব্যের দাম বাড়িলে টাকার পরিমাণ বাড়ানো দরকার হয় না কি? ধরা যাউক যেন, বিদেশের সঙ্গে লেন-দেনের দরুণ দেশী মুদ্রার দাম কমিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ বেশী টাকা না দিলে বিদেশী মুদ্রা পাওয়া যায় না। এই অবস্থায় দেশী মুদ্রার পরিমাণ না বাড়াইলে বেশী দামের দ্রব্য কেনা-বেচা অসম্ভব।"

টাকার বাজারের ব্যবসা-বাণিজ্য

ফরাসী ধনবিজ্ঞান-পণ্ডিত বারিঅল ফ্রান্সে এবং ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে অন্যতম সুলেখক রূপে পরিচিত। তাঁহার "তেওরী এ প্রাতিক্ দেজ ওপরাসিঅঁ ফিঁনাসিয়্যার" (টাকা-কড়ি-বিষয়ক লেনদেনের তত্ত্ব ও কর্ম্মকথা) টেকসট-বুক হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। প্যারিসের দোআঁ কোম্পানী প্রকাশক। ১৯২৫ সনে এই বইয়ের তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে।

অল্প মেয়াদের টাকা খাটানো সম্বন্ধে বারিঅল আলোচনা করিয়াছেন প্রথমে। তাহার পর আলোচিত হইয়াছে লম্বা মেয়াদের লগ্নি-কারবার। ষ্টক্-এক্‌সচেঞ্জের টাকা-চলাচল স্বতন্ত্র ভাবে বিবৃত হইয়াছে। আর ব্যাঙ্কের কারবারে টাকার ব্যবসা-সম্বন্ধেও সুবিস্তৃত আলোচনা আছে।

সরকারী রাজস্ব-ব্যবস্থাও গ্রন্থে ঠাঁই পাইয়াছে। এই সূচী হইতে গ্রন্থের আলোচনা-প্রণালী ধরিতে পারা যাইবে। এই ধরণের গ্রন্থ ভারতীয় পাঠকদের চোখে বড় একটা পড়ে না।

জীবন-বীমার প্রত্ন-তত্ত্ব

"জীবন-বীমার ইতিহাস এবং জীবন-বীমার কর্ম্মকৌশল" সম্বন্ধে ব্রাউনের "গেশিষ্টে ড্যর লেবেন্স্-ফার্জি খারুঙ্ উণ্ড ড্যর লেবেন্স্-ফার্জি খারুঙ্স্-টেখ্নিক" (ন্যির্ণব্যার্গ, কোখ কোং) ১৯২৫ সনে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক তথ্যের তরফ হইতে ভারতে জানিয়া রাখা দরকার যে, গ্রন্থকার একদম মান্ধাতার আমলেও জীবন-বীমা-প্রণালীর শিকড় ঢুঁড়িয়া পাইয়াছেন। জানিতে পারি যে, প্রাচীন গ্রীক ও রোম এই দিকে কিছু-দূর অগ্রসর হইয়াছিল। মধ্যযুগে বীমা-প্রথা উন্নতি বা বিস্তৃতি লাভ করে নাই। কিন্তু ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে ইয়োরোপীয় নরনারী বীমা-প্রথাকে সমাজে বেশ সুপ্রচলিত করিতে থাকে। তবে উনবিংশ শতাব্দীই বীমা-প্রতিষ্ঠানের আসল যুগ। ভারতে পাশ্চাত্য যুগের পূর্ব্বে বীমা-প্রথা কোথাও প্রচলিত ছিল কি? আথিক ইতিহাস, আথিক প্রত্নতত্ত্ব এবং আর্থিক নৃতত্ত্বের অনুসন্ধানকারীরা এই প্রশ্ন লইয়া মাথা ঘামাইতে পারেন। ব্রাইনের গ্রন্থ অবশ্য প্রধানতঃ বর্ত্তমান যুগের তথ্যেই ভরপুর।

সোভিয়েট মতের ধনবিজ্ঞান

১৮৯৭ সনে রুশ লেখক বোগদানোফ একখানা ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক কেতাব রচনা করেন। বাদশাহী আমলে বইটা বড় বেশী চলে নাই। চুরি-চামারি করিয়া লোকেরা এখানে ওখানে এই রচনার তথ্যের সঙ্গে পরিচিত হইতে পারিত।

কিন্তু রুশিয়ায় বোলশেভিক শাসন কায়েম হইবামাত্র দেশ-নায়কদের নজর আপনা-আপনিই পড়ে বোগদানোফের বইয়ের দিকে। আন্তর্জ্জাতিক কমিউনিষ্ট কংগ্রেসের চতুর্থ অধিবেশনে ঠিক করা হয় যে, এই বইটাকে মার্ক্স্-পন্থী ধন-বিজ্ঞানের টেক্স্টবুক রূপে লওয়া যাইতে পারে। বর্ত্তমান ইংরেজী অনুবাদ সেই পাতি অনুসারেই জারি হইয়াছে। প্রকাশক লণ্ডনের লেবার পাবলিশিং কোং (১৯২৫)। অনুবাদকের নাম ফিনেব্যর্গ। মূল্য ২ শি ৬ পে।

বোগদানোফের পুস্তিকাটা রুশিয়ার হাজার হাজার পাঠশালায় ছাত্র-ছাত্রীদিগকে মুখস্থ করানো হইতেছে। বইটার নাম ইংরেজিতে যদিও "এ শর্ট কোর্স অব ইকনমিক সায়েন্স" (ধনবিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত সার), ইহাকে ধনদৌলত বিষয়ক" বিজ্ঞান না বলিয়া "আর্থিক ইতিহাস" অথবা "ধনদৌলতের রূপ পরিবর্ত্তন" ইত্যাদি বিষয়ক কেতাব বলাই উচিত। "ঐতিহাসিক" বিষয়ই "বৈজ্ঞানিক" দফার চেয়ে বেশী ঠাঁই পাইয়াছে।

প্রথমে আলোচিত হইয়াছে মানব-সমাজের জন্ম-কথা। তাহার পর কমিউনিষ্ট বা ধনসাম্য-পন্থী সমাজের স্তর। তাহার পর জনক-বিধি-নিয়ন্ত্রিত প্যাট্রিয়ার্ক্যাল সমাজ। তাহার পর "ফিউড্যাল" বা জমীদার-রায়তের স্তর-বিন্যস্ত সমাজ। এই যুগের পর দেখা দিয়াছে ব্যবসায়ীদের যুগ। তাহার প্রধান কথা দ্রব্য-বিনিময় এবং মুদ্রার প্রচলন। গোলামি-প্রথা, "শ্রেণী"-স্বরাজ, নগরের কারিগর ইত্যাদি সামাজিক অভিব্যক্তি এই যুগের নানা লক্ষণ।

অবশেষে দেখিতেছি শিল্প-কারখানার অধিপতি এবং তাহাদের অধীন সমাজ-বিন্যাস। এই স্তর আসিয়া ঠেকিয়াছে "ফিনান্স্" বা পুঁজি-নিয়ন্ত্রিত সমাজ-বিন্যাসে।

মানবজাতি এখন চলিতেছে "সোশ্যালিষ্ট" বা সমাজ-তন্ত্রের শাসনের দিকে। আজকাল যাহাকে কমিউনিষ্ট বলা হয় বোগদানোফ "সেকালে" তাহাকেই "সোশ্যালিষ্ট" বলিয়া গিয়াছেন। আর এই ধনসাম্য-পন্থী ভবিষ্যসমাজের পানে তিনি চাহিতেছেন "আশা-ভরা আহ্লাদে।"

সমাজ-তত্ত্বের জার্ম্মাণ ধারা

জার্ম্মাণ অধ্যাপক রবার্ট মিকেল্স্ "রাষ্ট্রীয় দল" নামক গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবে সুপরিচিত। সেই গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ আমেরিকায় বাহির হইয়াছে ১৯১৫ সনে।

সম্প্রতি তাঁহার "সোৎসিওলোগী আল্জ্ গেজেলশাফ্‌ট্‌স্-হ্বিস্‌সেন্‌শাফ্‌ট" গ্রন্থ বাহির হইয়াছে (১৯২৬)। প্রকাশক বার্লিনের সোরিট্‌সিউস কোম্পানী। এই ১৫১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ক্ষুদ্র গ্রন্থে মাল ঠাসা আছে অনেক।

গ্রন্থকার ইতালিয়ান সমাজ ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে অন্যতম জার্ম্মাণ বিশেষজ্ঞ। বর্ত্তমান কেতাবে জার্ম্মাণি ও ইতালির সমাজ-তত্ত্ববিদ্‌গণের অনুসন্ধানসমূহ সুবিবৃত আছে। এইগুলার উপর সমালোচনা এবং দার্শনিক টীকাটিপ্পনীও কম নাই। বস্তুতঃ, আধুনিক ইয়োরোপে সমাজ-বিদ্যা বলিলে কি বুঝা যায় তাহা দখল করিবার জন্য মিকেল্‌সকে পথপ্রদর্শক রূপে গ্রহণ করা চলিতে পারে।

পরিবার, পারিবারিক জীবন ইত্যাদি বিষয়ক তথ্যের বিশ্লেষণে গ্রন্থকার শেষের দিকে কিছু সময় দিয়াছেন। জার্ম্মাণ-সমাজ-তত্ত্ববিৎ সিম্মেল-প্রবর্ত্তিত আলোচনা-প্রণালী এই জন্য অবলম্বিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের বিশ্বাস এই যে, সমাজ-বিদ্যার সাহায্যে একটা নীতিশাস্ত্র গড়িয়া তোলা সম্ভব। বস্তুনিষ্ঠ প্রণালীতে নিরেট তথ্য ঘাঁটাঘাঁটি করিবার ক্ষমতা এই কেতাবের অনেক জায়গায় দেখিতে পাওয়া যায়।

শাখা-ব্যাঙ্কের "দৌরাত্ম্য"

আমেরিকায় নিয়ম আছে,—"ন্যাশন্যাল" নামধারী ব্যাঙ্কগুলা কোনো শাখা কায়েম করিতে পারিবে না।" "ষ্টেট" নাম ধারী ব্যাঙ্ক সম্বন্ধেও ঐ আইন। যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব্বপ্রান্তের নগরগুলায় এই কানুনের কড়াকড়ি খুব বেশী। নিউইয়র্ক, বষ্টন্, শিকাগো ইত্যাদি শহরের কোটী কোটী ডলারওয়ালা ব্যাঙ্কসমূহ নিজ নিজ শহরের প্রাসাদেই বন্দী থাকিতে বাধ্য। শহরের নানা পাড়ায় অথবা মফঃস্বলের কোনো পল্লীতে ইহাদের গতিবিধি নিষিদ্ধ।

কিন্তু দক্ষিণ এবং পশ্চিম অঞ্চলের মার্কিণরা অন্য পথের পথিক। কালিফর্ণিয়া প্রদেশের ব্যাঙ্কগুলা পল্লীতে পল্লীতে শাখা কায়েম করিতে অধিকারী। যখন যে-অঞ্চলে টাকার চলাচল বেশী তখন সেই অঞ্চলে এই সকল ব্যাঙ্ক সশরীরে হাজির থাকে। কালিফর্ণিয়া বিপুল দেশ। এখানকার অসংখ্য জনপদে চাষ-আবাদের বৈচিত্র্য অনেক। কাজেই বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন কেন্দ্রে টাকার স্রোত বহিতে থাকে। এই টাকার আমদানি-রপ্তানি কাজে ব্যাঙ্কের শাখাগুলা খুবই সাহায্য করে। ফলতঃ, অল্প-সংখ্যক স্বাধীন ব্যাঙ্কের দ্বারাই সুবিস্তৃত প্রদেশের টাকার চলাচল নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে।

বলা বাহুল্য, যে-সকল ব্যাঙ্কের শাখা আছে তাহাদের ব্যবসা বাড়িয়া যায়। কিন্তু যে-সকল ব্যাঙ্ক আইনতঃ শাখা কায়েম করিতে অনধিকারী তাহাদের "মালখানায়" ক্রোর ক্রোর টাকা থাকা সত্ত্বেও তাহারা জেলায় জেলায় যাইয়া ব্যবসা বাড়াইতে অনধিকারী। আজকাল দেখা যাইতেছে যে, বড় বড় ব্যাঙ্কগুলা এখন এই শাখাওয়ালা ছোট ব্যাঙ্কদের সঙ্গে তুলনায় খাটো হইয়া পড়িতেছে। কাজেই "ন্যাশন্যাল" এবং "ষ্টেট" নামধারী ব্যাঙ্কগুলার চোখ টাটাইতেছে। তাহারা আদালতে মামলা রুজু করিতেছে। তাহারাও সর্ব্বত্র শাখা খুলিয়া দেশের সকল প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্যে আঙ্গুল চালাইতে চায়।

এই হইতেছে মার্কিণ মুল্লুকের অন্যতম ব্যাঙ্ক-সমস্যা। ভারতের পক্ষে এই সমস্যাটা নূতন এবং বোধ হয় খানিকটা কিম্ভূতকিমাকারও বটে। কিন্তু কলিন্‌স্-প্রণীত "দি ব্রাঞ্চ-ব্যাঙ্কিং কোয়েশচান" (শাখা-ব্যাঙ্ক-সমস্যা) পড়িয়া দেখিলে আর্থিক জীবন বিষয়ক আইন-কানুনের অনেক কথা সহজে মালুম হইবে। বইটা ছোটও বটে (১৭৬ পৃষ্ঠা); প্রকাশক নিউ ইয়র্কের ম্যাক্‌মিলান (১৯২৬); মূল্য ১·৭৫ ডলার।

দেশ-বিদেশের আর্থিক রাষ্ট্র-নীতি

মার্কিণ লেখক কাল্‌বার্টসনের রচনা পূর্ব্বে একবার দেখিয়াছি। সম্প্রতি "ইণ্টার্ন্যাশন্যাল ইকনমিক পলিসীজ" নামক তাঁহার আর একখানা গ্রন্থ বাহির হইয়াছে। দুনিয়ার আর্থিক রাষ্ট্রনীতি এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। প্রকাশক নিউ ইয়র্কের অ্যাপলটন কোং। লেখক বলিতেছেন,—"আর্থিক আড়াআড়িই রাষ্ট্রীয় আড়াআড়ির একমাত্র কারণ নয়। কিন্তু কুদরতী মালের জোগান, রপ্তানি বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা, বিদেশে বাজার সৃষ্টি, টাকা-কড়ি কর্জ্জ ইত্যাদি আর্থিক কাজকর্ম্ম লইয়া রাষ্ট্রে

রাষ্ট্রে মনোমালিন্য ঘটিয়া আসিতেছে এবং ভবিষ্যতেও ঘটিবে।"

বর্ত্তমান গ্রন্থে যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী আর্থিক গতিবিধি বিবৃত হইয়াছে। আর্থিক ইতিহাসের তরফ হইতে এই সকল বৃত্তান্ত বিশেষ মূল্যবান। আজকালকার দুনিয়ার বাণিজ্য-নীতি কোন্ দেশে কি আকার গ্রহণ করিতেছে তাহার বস্তুনিষ্ঠ বৃত্তান্ত আট দশ অধ্যায়ের বিশেষত্ব। নয়টা পরিশিষ্টে অনেক মাল ঠাসিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বৃটিশ সাম্রাজ্যে "প্রেফারেনশ্যাল টারিফ" (পক্ষপাত-মূলক শুল্ক-ব্যবস্থা) কিছু কিছু চলিতেছে। এই আন্দোলনের যথাযথ বিবরণ দিবার পর গ্রন্থকার সমালোচনায় বলিতেছেন, —"অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড ইত্যাদি উপনিবেশ জেনেভার বিশ্বরাষ্ট্র-পরিষৎ ইত্যাদি আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানে এবং কংগ্রেসে প্রায় স্বাধীন অথবা নিম-স্বাধীন দেশের মতন ঠাঁই পাইয়া থাকে। অথচ কোনো কোনো আর্থিক আইন-কানুনের সময় তাহারা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত এক একটা প্রদেশমাত্র রূপে থাকিতে চাহে। এইরূপ দু-মুখো ব্যবহার বেশী দিন চলিবে না। যদি বাহিরে বাহিরে তাহারা স্বাধীনতা চায় তাহা হইলে তাহাদিগকে বাহিরের লোকজনের সঙ্গে সমানে-সমানে আর্থিক লেনদেন চালাইতে শিখিতে হইবে।" অর্থাৎ সাম্রাজ্যের আঁচল ধরিয়া চলা এবং সাম্রাজ্যের বহির্ভূত রাষ্ট্রসমূহকে কলা দেখাইয়া পক্ষপাতমূলক শুল্কের ব্যবস্থা করা বৃটিশ উপনিবেশসমূহের পক্ষে আর সাজে না।

জমিজমা ও কৃষিকর্ম্ম

পঞ্জাবের কয়েক জন ইংরেজ চাকুরো আর্থিক জীবন সম্বন্ধে মূল্যবান গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাঁহাদের মতগুলা অনেক সময়েই গ্রহণীয়। রাষ্ট্রনৈতিক চসমার দরুণ যাহাদের চোখগুলা বাস্তব সত্যকে রঙিন ভাবে দেখিতে অভ্যস্ত তাঁহারা ছাড়া অন্যান্য লোকেরা ক্যাল্‌ভার্ট ইত্যাদি ইংরেজের অনুসন্ধানে অনেক-কিছু শিখিবার বস্তু পাইবেন। ক্যালভার্টের কোনো কোনো মত আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি।

ডার্লিঙ-প্রণীত "দি পাঞ্জাব পেজাণ্ট ইন্ প্রস্পারিটি অ্যাণ্ড ডেট্" (সুখে-কর্জ্জে পাঞ্জাবী কিষাণ) গ্রন্থ অক্‌সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে (২২+২৯৮ পৃ, ১৯২৫)। এই জনপদগত অনুসন্ধানটা অনুসন্ধান হিসাবেও কম মূল্যবান নয়।

সমবায়ের দাওয়াই দিয়া ডার্লিঙ্ পাঞ্জাবীকে চাঙ্গা করিয়া তুলিতে চাহেন। এই দাওয়াইটা ইয়োরোপের নানা দেশে আজকাল কি প্রণালীতে বিতরিত হইয়াছে সেই সম্বন্ধে আর একজন পাঞ্জাবী ইংরেজ শ্রীযুক্ত ষ্ট্রিকল্যাণ্ড দুই খণ্ডে বিভক্ত কেতাব বাহির করিয়াছেন। "ষ্টাডীজ ইন্ ইয়োরোপীয়ান কোঅপারেশ্যন" (ইয়োরোপীয় সমবায়-প্রথা-বিষয়ক রচনা) নামে এই বই লাহোরের গবর্মেণ্ট প্রিণ্টিং কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ডেন্মার্ক, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ইত্যাদি নানা দেশের বৃত্তান্ত আছে। "ল্যাণ্ডমর্টগেজ ব্যাঙ্ক" (জমি-বন্ধক-ব্যাঙ্ক) নামক প্রতিষ্ঠান ডেন্মার্কে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। এই সম্বন্ধে বিশদ বৃত্তান্ত প্রচার করিয়া গ্রন্থকার ভারতীয় পাঠকদের উপকার করিয়াছেন। এই ধরণের ব্যাঙ্ক ভারতে বেশী নাই। কিন্তু শীঘ্রই এদিকে আমাদের নজর পড়িবে এইরূপ বিশ্বাস করি
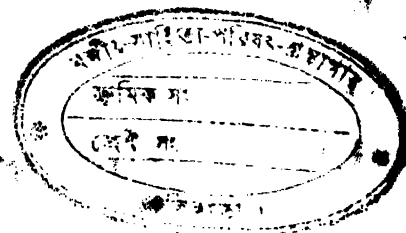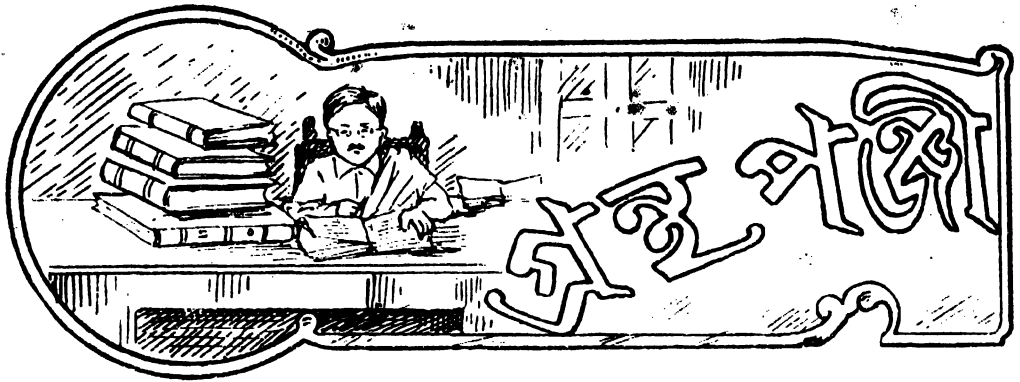
"জার্ম্মাণ বিজ্‌নেস অ্যাণ্ড ফিনান্স আণ্ডার দি ডয়েস-প্ল্যান" (ডয়েস-প্রবর্ত্তিত আর্থিক ব্যবস্থার বিধানে জার্ম্মাণির শিল্প-বাণিজ্য ও রাজস্বের অবস্থা),—আণ্ডার্স'ন, নিউ-ইয়র্ক, চেজ ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক, ২৪ পৃষ্ঠা।

"দাল প্রাতেৎস্যনিস্‌ম আল সিন্দিকালিস্‌ম (সংরক্ষণ-নীতি হইতে সঙ্ঘ-নীতি),—রিচ্চি; বেরি, লাতার্সা কোং, ১৯২৬, ৮+১৮৮ পৃষ্ঠা, ১২ লিয়ার।

"আন-এমপ্লয়মেণ্ট অ্যাজ অ্যান ইন্‌টার্ণ্যাশন্যাল প্রব্‌লেম" (দুনিয়ার বেকার সমস্যা),—রীস,—লণ্ডন, কিং কোং, ১৯২৬, ১৫+১৮৮, ১০ শি ৬ পে।

"প্রোটেকটিভ লেবার লেজিস্‌লেশ্যন উইথ স্পেশ্যাল রেফারেন্স টু উইমেন ইন্ দি ষ্টেট অব নিউ ইয়র্ক" (নারী-মজুরদের রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ক আইন, নিউ ইয়র্ক প্রদেশের তথ্য-বিশ্লেষণ),—এলিজাবেথ বেকার,—নিউ ইয়র্ক, লংম্যানস্ কোং, ১৯২৬, ৪৬৭ পৃষ্ঠা।

"ইকনমিক্‌স প্রিন্‌সিপল্‌স অ্যাণ্ড প্রব্‌লেমস" (ধন-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত ও সমস্যা), এডী, নিউইয়র্ক, ক্রোয়েল কোম্পানী, ১৯২৬, ৭৯৯ পৃষ্ঠা।

"পাবলিক ওনারশিপ" (সরকারী দখল),—টম্‌পসন, নিউ ইয়র্ক, ক্রোয়েল কোং, ১৯২৫, ৪৪৫ পৃষ্ঠা।

"অ্যান ইণ্ট্রোডাকশ্যান টু সোসিঅলজি অ্যাণ্ড সোশ্যাল প্রব্‌লেমস্" (সমাজ-বিজ্ঞান ও সামাজিক সমস্যা),—বীচ এবং অগ্‌বার্ণ; বষ্টন, হটন গিফ্‌লিন কোং, ১৯২৫, ১৪+৩৬৯, ২.২৫ ডলার।

"ফ্যামিলি অ্যালাউয়্যান্সেস্ ইন প্র্যাক্‌টিস্" (পারিবারিক ভাতার ব্যবস্থা,—হিবার্ট, লণ্ডন, কিং কোং ১৯২৬, ২৩৭ পৃ, ১০ শি ৬ পে।

"দি রাইজ অব মডার্ণ ইণ্ডাষ্ট্রি" (আধুনিক শিল্প-বাণিজ্যের উৎপত্তি ও ক্রম-বিকাশ),—জে, এল, এবং বার্বারা হ্যামণ্ড; নিউ ইয়র্ক, হার্কোর্ট কোং, ১৯২৬, ১১+২৮১ পৃষ্ঠা, ২.৭৫ ডলার।

"ফাণ্ডামেণ্ট্যাল থট্‌স্ ইন ইকনমিক্‌স্" (ধনবিজ্ঞানের মূলসূত্র),—ক্যাস্‌সেল, নিউ ইয়র্ক, হার্কোর্ট কোং, ১৯২৫, ১৫৩ পৃষ্ঠা।

"লা বাঁক আঁ বেলজিক্,—(বেলজিয়ামের ব্যাঙ্ক, ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক আলোচনা), শ্লেপ্‌নার, ব্রুসেল্‌স, ল্যাম্যার্ত্যাঁ কোং, ১৯২৬, ৪২৯ পৃষ্ঠা।

"দি কন্‌জিউমার্স কো-অপারেটিভ্ মুভ্‌মেণ্ট ইন্ জার্ম্মাণি" (জার্ম্মাণির ক্রেতা-সমবায় আন্দোলন),—টেয়োডোর কাস্‌সাও প্রণীত জার্ম্মাণ গ্রন্থ হইতে গিল্‌স্-কৃত ইংরেজি তর্জ্জমা। নিউইয়র্ক, ম্যাক্‌মিলান, ১৯২৫, ১৬+২০১ পৃষ্ঠা।

"দি সোশ্যাল থিয়োরি অব জর্জ সিম্মেল" (জার্ম্মাণ সমাজ-তত্ত্ববিৎ জর্জ সিম্মেলের সমাজ-বিষয়ক চিন্তা-প্রণালী ও সিদ্ধান্ত), স্পাইক্‌ম্যান, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপাখানা হইতে প্রকাশিত, ১৯২৫, ২৯+২৯৭ পৃ, ৩ ডলার।

বিলাতে আর্থিক শফর *

আচার্য্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়

এবার হঠাৎ আবার আড়াই মাসের জন্য আমাকে বিলাত যেতে হয়েছিল। কখনো ভাবতে পারিনি আমার এই শেষ জীবনে পঞ্চম বার ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, আয়ার্ল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, জার্ম্মাণি প্রভৃতি দেশ পর্য্যটনের অবকাশ হবে। এখন যে রকম বার্দ্ধক্য উপস্থিত হয়েছে, এবং আমার যাঁরা সমসাময়িক ছিলেন তাঁরা যেরূপ একে একে ইহলোক ত্যাগ করছেন, তাতে বাইরে যেতে বড়ই আতঙ্ক হয়। তা সত্ত্বেও এবার যখন বিপদের পথে পা বাড়াতেই হয়েছিল তখন আর একবার ঐ দেশগুলিকে ভাল করে দেখে এসেছি। ইতিপূর্ব্বেও অনেকবার এই দেশগুলি দেখবার ও বুঝবার সুযোগ হয়েছিল; কিন্তু এবারের দেখার সঙ্গে আর সব বারের দেখার পার্থক্য ঢের। পূর্ব্বে রাসায়নিক ভাবে রাসায়নিকের চক্ষু নিয়ে সমসাময়িক বিজ্ঞান-জগতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য, তাদের ল্যাবরেটরী বা বিজ্ঞান-মন্দিরগুলি চাক্ষুষ দেখবার মানসে, সে সব দেশের বিজ্ঞানাচার্য্যগণের সাথে ভাবের বিনিময় করবার আনন্দ পেতে গিয়েছি। এবার অর্থনীতির দিক্ দিয়ে এই দেশগুলিকে বুঝতে প্রয়াস পেয়েছি। ফলে প্রভূত অভিজ্ঞতাও অর্জ্জন করা হয়েছে।

আর্থিক হিসাবের দিক্ দিয়ে দেখতে গেলে, কেন এরা এত উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী হয়েছে, আর তার তুলনায় আমরাই বা কেন এতটা পশ্চাতে পড়ে আছি বাঙ্গালীর মনে আগেই এই প্রশ্ন জেগে উঠে।

মার্সেই সহরে আরও অনেকবার গিয়েছি, কিন্তু এবার নূতন চোখে সহর দেখা হল। সহরে নেমে ঘোড়াগুলা যেন হাতীর মত দেখলাম। সকাল বেলা দশ-এগার বার তের-চৌদ্দ বছরের মেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে দেখলাম। তাদের মুখে চোখে সর্ব্বদাই হাসি লেগে আছে। মেয়েগুলি স্বাস্থ্যের জাজ্বল্যমান প্রতিমূর্ত্তি। এদের কাছে জীবনের একটা সাড়া পাওয়া গেল। আমাদের দেশের মা লক্ষ্মীদের,—তাদের আর মা লক্ষ্মী বল্‌তে ইচ্ছে করে না—দিদিমণিদের মতন এরা এনেমিক—রক্তশূন্য ও স্বাস্থ্যহীন নয়।

ফ্রান্স কৃষি-প্রধান দেশ

চৌদ্দ-পনর ঘণ্টায় গাড়ীতে প্যারিস যাওয়া গেল। ফ্রান্স বাস্তবিকই কৃষিপ্রধান দেশ। এখন গ্রীষ্মকাল, এই সময় বাঙ্গালা দেশের মতন ফ্রান্সও সুজলা সুফলা ফলপুষ্প-শালিনী। মার্সেই থেকে প্যারিসের পথে রেলের লাইনের দু'ধারে কেবল সবুজের চাদর বিছানো দেখলাম। চারিদিকে সবুজ ঘাস। নানান রকম চাষ। এতটুকু জমিও পড়ে নাই। আর এই সব জমির আশ পাশ দিয়ে, উঁচু নীচু চড়াই ঢালু উপত্যকা ইতস্ততঃ ভেদ ক'রে ফ্রান্সের নদী ছুটেছে। ফোয়ারা বা ঝরণার জল আর আকাশের বৃষ্টি এই হল ফরাসী নদীর খোরাক। এই গ্রীষ্মকালে ফ্রান্সে কত রকম ফসলের আবাদ হয়। এক ঘাসের চাষই প্রচুর পরিমাণে করা হয়। এতো হ'ল গবাদি পশুর খোরাক। তা ছাড়া যব, গম, আলু, দ্রাক্ষা, কমলা লেবু, আপেল এ সবই ফ্রান্সের মাটিতে ফলে। দ্রাক্ষা দিয়ে আবার বোঁর্দো প্রভৃতি জনপদে শ্যাম্পেন, শেরি প্রভৃতি পয়লা নম্বরের মদ তৈরী হয়। মদের আস্বাদ কিরূপ তা পরীক্ষা করি নাই। তবে দীনবন্ধু মিত্রের পুস্তকে তার বর্ণনা আছে।

ফুলের চাষ

নিস সহরে ফুলের চাষ নজরে পড়ল। কত রকম-বেরকম ফুল। চামেলি, গোলাপ, যুঁই আরও কত কি।

---

* বিগত ১২ই ভাদ্র ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ গৃহে প্রদত্ত বক্তৃতার অনুলিপি অবলম্বনে তাহেরউদ্দিন আহমদ কর্ত্তৃক লিখিত।

এদিয়ে সব পারফিউমারি বা সুগন্ধি তৈরী হয়। এবিষয়ে ফ্রান্স সবার সেরা। সুদূর ফ্রান্সে তৈরী এই সব সুগন্ধির সঙ্গে এদেশের সবাকারই পরিচয় আছে। কলেজের বাবুরা আর দিদিমণিরা তো নিত্য এগুলি ব্যবহার করে থাকেন। ভাবলাম এও একটা ঐশ্বর্য্যের পথ বটে। ফুলের যথেষ্ট চাষ-আবাদ দেখলাম।

আনন্দ মেলা

আমার হোটেলের পাশেই গার্ডেন অব লুকশেম-বুর্গ-মস্তবড় বাগান। এটাকে আনন্দ মেলা বল্‌লে হয়। আবালবৃদ্ধবনিতা এখানকার মুক্ত বায়ু সেবন করছে, বেড়াচ্ছে, নাচছে, গাইছে, লাফাচ্ছে। একটা অদ্ভুত ব্যাপার! এদের দেখলে একটা জ্যান্ত জাতের পরিচয় পাওয়া যায়। মেয়েদের মুখে চোখে কি লাবণ্য ফুটে বেরোচ্ছে। তাদের গোলাপী গণ্ড রক্তচ্ছটায় টুক টুক করছে। কি স্ফূর্ত্তি মানব-জীবন কি সুন্দর! এরা জানে কি করে প্রকৃতির সঙ্গে এক হয়ে মিশে যেতে হয়। আমরা ঘরের কোণে প্রকৃতি-বিষয়ক কাব্য ও কবিতা গদ গদ ভাবে পড়তে পড়তে ভাবে আত্মহারা হয়ে পড়ি। এখানে প্রকৃতির সঙ্গে ভাবের সম্বন্ধ স্থাপন হতে পারে, কিন্তু বাস্তব সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয় না। আমাদের যুবকরা চায়ের দোকানে বা তাসের মজলিসে তিন চার ঘণ্টা আড্ডা দিতে পারেন, কিন্তু এই যে ময়দান এত সন্নিকটে, এত ম্যাচ হচ্ছে—মোহন বাগান বনাম ক্যালকাটা—এই ময়দানের বুকের উপর দিয়ে সবুজ ঘাস দলে' খেলা দেখতে যান বটে, কিন্তু এই খানটায় প্রকৃতির সঙ্গে যে একটা সংযোগ হচ্ছে তা একেবারেই ভুলে যান। গোল-কিপারের এই দোষ, হাফ-ব্যাক ভাল নয়, কুমারের খেলা অতি বিশ্রী হয়েছে ইত্যাদি বক্‌তে বক্‌তে যাওয়া আসা করেন।

ফ্রান্সে ফুলের আদর

প্যারিসে আর একটা জিনিষ দেখলাম। মোড়ে মোড়ে ফুলের দোকান। ছোট বড় তোড়া এক পয়সা থেকে টাকা টাকা দাম। সকলেই ফুল ভালবাসে। আমাকে মফঃস্বলে অনেক স্থানে অভিনন্দন করবার সময় ফুলের মালা গলায় পড়িয়ে দেওয়া হত। এসব এই আগান বাগান থেকে কুড়ানো বুনো ফুলে তৈরী। তার তীব্র গন্ধে আমার মাথা ধরে যেত। ভদ্রতার খাতিরে খানিকক্ষণ গলায় ধারণ করে পরে তফাতে রেখে নিষ্কৃতি লাভ করতাম। আজকাল যাদের অবস্থা ভাল তাদের মধ্যেও ফুলের বাগান করা এক রকম উঠে গেছে। পঞ্চাশ-ষাট বছর পূর্ব্বে পাড়াগাঁয়ে সঙ্গতি-সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ী মাত্রেই ফুলের বাগান দেখতে পাওয়া যেত।

বিলাতে চাষের জমি

ক্যালে থেকে ডোভার—ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে লণ্ডনের পথে যাচ্ছি। আপনাদের হয়ত ধারণা, বিলাতে কেবল ইট-পাথর, ও চূণ-সুরকির তৈরী বড় বড় ইমারত আর কল-কারখানার ছড়াছড়ি, সেখানে মোটেই ঘাসের জমি নাই। ডোভার থেকে লণ্ডনের পথে রেলের দু'ধারে কেবল চাষের জমি দেখলাম। সবুজ মাঠের উপর ফ্রান্সের মতই স্থূলকায় হৃষ্টপুষ্ট গাভীসকল স্বচ্ছন্দে বিচরণ করছে। এগুলি আমাদের দেশের গরুর সঙ্গে তুলনা করতে যাবেন না। আমাদের দেশে গো-জাতির যে কি দুর্দ্দশা, দিন দিন এগুলি কিরূপ শীর্ণকায় হয়ে যাচ্ছে তা ভাবা যায় না।

শতকরা ৬০ জন সহরে বসবাস করলেও ইংলণ্ডকে কৃষি-প্রধান দেশ বলতে হবে। বিলাতের লোক-সংখ্যা স্থানানুপাতে খুব বেশী। সেখানে যে শস্য উৎপন্ন হয় তাতে তাদের তিন-চার মাসের বেশী চলে না। তা হ'লেও ভাববেন না, বিলাতে চাষ-আবাদ খুব কম করা হয়। লণ্ডন থেকে এডিনবরার পথে আমাদেরই পাড়াগাঁয়ের মতন রেলের সড়কের দু'ধারে ঘাসের জমি আর চাষের জমি যথেষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। এই সব জমিতে রকম রকম চাষ চলেছে। এক জমিতেই বছরে তিন চার বার ফসল উৎপন্ন করা হয়।

লণ্ডনে খাঁটী দুধ

লণ্ডনে ৭০ লক্ষ লোক। সহরটা কেবলই বেড়ে চলেছে। উত্তরে ধরুন সেই বরানগর আর দক্ষিণে বজবজ। কেবল বাড়ছে। অদ্ভুত ব্যাপার! এই ৭০ লক্ষ লোকের দুধ যোগায় পল্লী। গাড়ীতে শেষ-রাত্রে বড় বড় টিনের পাত্রে পল্লী থেকে দুধ সহরে আসে। এটা শীতপ্রধান দেশ। এরা ১২টা একটায় শয়ন করে আর সাতটার পূর্ব্বে কেউ ঘুম

থেকে উঠে না। তাদের ঘুম থেকে জাগবার পূর্ব্বেই প্রত্যেকের দরজায় দরজায় দুধের বোতল দিয়ে যাওয়া হয়। গৃহস্বামীকে ঘুম থেকে ডেকে তুলবার দরকার করে না, কারণ ওদের দেশে একজন আর এক জনের জিনিষ ছোঁয় না। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মূল্য ওখানে খুব বেশী। বাড়ী বাড়ী দুধ দেওয়া সারা হলে ন'টা দশটার মধ্যে আবার রেল-গাড়ী দুধের খালি টিনগুলি পৌছিয়ে দিতে পল্লীর দিকে ছুটল। আর সে দুধ কি! উপরে ক্রিম, ননী ভাসছে, আঙ্গুলে মাখন জড়িয়ে আসে। বিশুদ্ধ দুগ্ধ যাকে বলে! কলিকাতার বিশুদ্ধ দুগ্ধ নয়। বাংলার পাড়াগাঁয়েও অমনতর ঘন দুধ মেলা ভার, কারণ ওগুলি হ'ল হৃষ্টপুষ্ট, নীরোগ গাভীর দুধ।

ওদের দেশে দুধের ইজ্জৎ বজায় রাখবার জন্য কত কি আয়োজন চলেছে। মিনিষ্টার অব এগ্রিকালচার বা কৃষি-সচিব, মিনিষ্টার অব পাবলিক হেল্‌থ বা স্বাস্থ্য-সচিব এরা কেবল নজর রাখছেন পীড়িত গরুর দুধ দোহন করা না হয়। টিউবারকিউলোসিস বা অন্যান্য গো-রোগ আছে কিনা তা পরীক্ষা করবার জন্য ডজনে ডজনে ডাক্তার মোতায়েন আছে। পরীক্ষা করে টিউবার কিউলোসিসের সন্ধান পেলে তৎক্ষণাৎ সেই রোগাক্রান্ত গরুকে গুলি করে মেরে ফেলে দেওয়া হয়। এমন কি সেটাকে আবার পুড়িয়ে রোগের সকল বীজ নষ্ট করে দেওয়া হয়, পাছে গো-মারী হয় এই আশঙ্কা। কত সাবধানতা, কত সতর্কতা! কোনো চেষ্টার ক্রটী নাই। কোনো রকম ভেজাল চাই না, এই তাদের পণ। ব্যাক্‌টিরিয়লজিক্যাল, কেমিক্যাল প্রভৃতি যাবতীয় পরীক্ষা দ্বারা দুগ্ধের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা হয়। এখন এই যে বিশুদ্ধ খাঁটী ঘন দুধ, এর দর কত? শুনে আশ্চর্য্য হবেন একেবারে কলিকাতার দামে এগুলি ঐ সব ধনী দেশে বিকাচ্ছে। আড়াই সের তিন সের টাকায়। এইখানটায় আর্থিক হিসাবে আবার একটু গোলমাল আছে। আর্থিক ব্যবস্থার দিক্ দিয়ে দেখতে গেলে তাদের ধনী দেশের জিনিষের দর আর আমাদের গরিব দেশের জিনিষের দরের মধ্যে ঢের পার্থক্য রয়েছে। সে কথা পরে বলব।

ডেয়ারি ফার্ম্ম

আবার পাড়ায় পাড়ায় ডেয়ারি ফার্ম্ম আছে। কেবল দুগ্ধ মাখন নয়, দুধ থেকে যা-কিছু তৈরী হতে পারে সব ঐ সকল গো-গৃহে করা হয়। এ সব দেশের লোক দুধ ঘি, মাখন, ছানা প্রভৃতি দুগ্ধ-জাত দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে খেতে পায়। আপনারা গড়ে এক ছটাক দুধও খেতে পান না। তা আবার দিন দিন দুগ্ধ-ব্যবসায়ীদের কৃপায় দুধের যে চেহারা দাঁড়িয়েছে! কলিকাতার কথা ছেড়ে দিন। পাড়াগাঁয়ে, বিশেষ করে বর্ষাকালে খুলনা, ফরিদপুর, যশোর প্রভৃতি জায়গায়, আট আনা সের পাওয়া ভার। কলিকাতা থেকে টিন টিন দুধ যাবে তবে এই সব জায়গার দুগ্ধ-পোষ্যদের এক চামচ করে দুধ জুটবে। দুধের স্থান বালিতে জুড়ে বসেছে।

ঘাসের চাষ

পূর্ব্বেই ঘাসের চাষের কথা উল্লেখ করেছি। এই সব দেশে ঘাসের চাষ প্রচুর পরিমাণে করা হয়। ঘাসের চাষেরই দুই তিন ফসল। এরা ঘাসের জমিতে সার দেয়। ঘাস বড় হলে সেগুলি কেটে শুকিয়ে পালা করে রাখে। এ ছাড়া গরুর খাবারের জন্য শালগম, গাজর, ম্যাঙ্গোল, ফার্ণ প্রভৃতির যথেষ্ট চাষ করে। এরা মানুষের খাবারের জন্য যতটা ব্যস্ত গরুর খাদ্যের জন্যও ঠিক ততটা ব্যস্ত।

গো-সেবা

ওদের ডেয়ারি ফার্ম্ম বা গোপালন-গৃহগুলি কি রকম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ফিট ফাট! এদেশের গরুর গোয়ালের দুর্দ্দশার কথা ছেড়ে দিন,—এদেশের মানুষের চাইতেও ভাল ঘরে ওরা গরুকে রাখে। সেবার বিলাতে একটা গরু একদিনে ৪।৫ বার দুয়ে একমণ পর্য্যন্ত দুধ পাওয়া গিয়েছিল দেখেছি। যাক, এটা একটা রেকর্ড কোয়ান্টিটী। তা হলেও সচরাচর ১৮ সের থেকে আধমণ দুধ ইংলণ্ডের অনেক গরুই দিয়ে থাকে। এখন বুঝুন গরুর জন্য যদি কোনো জাত প্রাণপাত করে থাকে তবে সে আমাদের দেশের গো-মাতা-রক্ষী দল নয়, সে ঐ ইংরেজ-ফরাসী। আমাদের দেশে কোনো জিলায় গো-মড়ক দেখা দিলে আর রক্ষা নাই। তা দেখতে দেখতে সারা দেশটা ছেয়ে ফেলে। ফরিদপুরে গো-মারী আরম্ভ হলে তার সংলগ্ন যশোরে অমনি সে রোগ দেখা দেয়,

তার সংলগ্ন খুলনায় আসতেও তত বেশী দেরী লাগে না। এমনি করে চলল। সারা দেশটা গো-মড়কে ভরে গেল। লাখ লাখ গরু মরে গেল। মাড়োয়ারীরা বলেন, "পল্টনে গরু খায়, মুসলমান গো-খাদক, এদের জন্তই এদেশের গো-জাতির সর্ব্বনাশ হচ্ছে, দিন দিন গো-ধনের এরূপ দুর্দ্দশা হচ্ছে।" এটা কিছুতেই যুক্তি-সঙ্গত কথা নয়। ইংলণ্ড তো মস্ত-বড় গো-খাদক দেশ—রোষ্ট বিফ না হ'লে তার এক সন্ধ্যা চলে না। ও দেশে তো আমাদের দেশের মতন গরুর এমন ঘোর দুর্দ্দশা নাই। তাদের দেশের গো-জাতির সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। আর সে সব কি জোয়ান হৃষ্টপুষ্ট গাভী ও বলদ!

শুধু গো-খাদকের ওজর দিলে চলবে না, বা গো-মাতার রক্ষার্থে ভারত-জোড়া সভাসমিতি স্থাপন করলেও চলবে না। গো-পালনের দিকে মন দিতে হবে। পশ্চিমের দেশগুলো যেমন গরুর রোজগার খেতে জানে তেমন গরু পালন করতেও জানে। গো-খাদক মুসলমান বা পল্টন কত গরু খায়? এই যে একবার মড়কে দেশকে দেশ গো-জাতি নির্ম্মূল করে দেয় এর হিসাব খতিয়ান করে দেখলে তাদের আহারের জন্ত যে গো-হত্যা করা হয় তুলনায় সেটা কিছুই না।

সবুজের দেশ আয়ার্ল্যাণ্ড

এইবার আয়ার্ল্যাণ্ডের কথা কিছু বলা যাক। কবির কথায় এটা হচ্ছে কেবল সবুজ বরণ মাঠ। বিস্তীর্ণ ঘাসের জমি পড়ে আছে। আর সেই সবুজ ঘাসের মাঠের উপর দিয়ে অজস্র হৃষ্টপুষ্ট সুস্থ গরু চরে বেড়াচ্ছে। এটাও কৃষিপ্রধান দেশ। এরা যব গম, বার্লি সবই চাষ করে। এদের গো-পালন একটা মস্ত-বড় ব্যবসা। এরা যথেষ্ট ঘি-মাখন তৈরী করে। এদের দেশের চাহিদা সরবরাহ করেও ইংলণ্ডে এগুলি চালান দেয়। এটা এখন স্বাধীন রাজ্য। এর নামকরণ হয়েছে আইরিশ ফ্রিষ্টেট। আজকাল আর বিলাত থেকে সরাসরি বিনা পরীক্ষায় এখানকার সীমানায় পা বাড়ানো চলে না। আমাদেরও একসাইজ অফিসার পরীক্ষা করে ছাড়পত্র দিলে।

আলষ্টারে লিনেনের কারবার

আলষ্টারে দুনিয়ার সব চাইতে বড় লিনেন ফ্যাক্টরী আছে। লিনেন তিসি জাতীয় এক প্রকার পাট গাছ থেকে তৈরী হয়। ইহা আয়ার্ল্যাণ্ডে ও রুশিয়াতে বেশী হয়। পাট যেমন কেটে জলে ভিজিয়ে তার পর আঁশ ছাড়িয়ে নেওয়া হয়, ইহাও ঠিক সেই প্রক্রিয়া দ্বারা লব্ধ হয়। আলষ্টারে লিনেনের মস্ত বড় কারবার। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার! সমস্ত দুনিয়ার বাজারে আইরিশ লিনেন যায়।

রোপ ফ্যাক্টরী

আর এক জিনিষের জন্ত আলষ্টার বিখ্যাত। আলষ্টারে "বিগেষ্ট" রোপ-ফ্যাক্টরী, দুনিয়ার সেরা দড়া-দড়ি তৈরীর কারখানা আছে। হেম্প বন থেকে জাহাজের প্রয়োজনীয় জিনিষ প্রচুর পরিমাণে এই সব কারখানায় তৈরী হচ্ছে। তা ছাড়া আলষ্টারে বড় বড় জাহাজ তৈরী হয়। আলষ্টার বাদ দিলে আয়ার্ল্যাণ্ডের কিছু থাকে না।

আমরা খেতে পাই না

আমাদেরও কৃষি-প্রধান দেশ। আমাদের দেশে গো-জাতির কি দুরবস্থা তা সকলেই জানেন। দুধ দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। খাদ্যাভাবে গরুর দুর্গতি অবর্ণনীয়। আমরা দুগ্ধ হতে প্রাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্যের কিছুই খেতে পাই না। আমাদের স্বাস্থ্য যে দিন দিন উচ্ছন্ন যাবে ইহাতে আর আশ্চর্য্যের কি আছে? খাদ্যাভাবই আমাদের আজ সব চাইতে বড় অভাব। আমরা খেতে পাই না।

ওরা কি খায়

পশ্চিমা জাতগুলো কি খায়? তারা মাংস যথেষ্ট খায়। দুধ-মাখন তো আছেই। এক এক জন ইংরেজ একমাত্র পনীরই কত খায়! আর এক কথা—ওরা বড্ড বেশী চিনি খায়। দুনিয়ার ১৮ ভাগ চিনির একা ইংলণ্ড খায় এক ভাগ। চিনি যে কত রকমে খায় তার ইয়ত্তা নাই। জ্যাম, জেলি, চকোলেট, কেক ৭০।৭৫ বছর বয়সের বৃদ্ধের পকেটেও থাকে। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে আর ২।১টা করে মুখে দিচ্ছে।

দুনিয়ার যত সেরা জিনিষ তা ওরা প্রচুর পরিমাণে খায়। তাই ওরা অমন সুস্থ-সবল। ওদের তুলনায় আমরা কি খাই ?

ওদের টাকা আসে কোত্থেকে

ওরা এত ভাল ভাল জিনিষ খাবার টাকা পায় কোথায় ? ওদের কিনবার টাকা আসে কোথা থেকে ? লণ্ডন অতবড় সহর, সর্ব্বদা এর রাস্তা দিয়ে বাস্ ছুটছে। এ ছাড়া রেলওয়ে, আণ্ডার গ্রাউণ্ড টিউব রেলওয়ে রয়েছে। আমরাও আজকাল বাসে চড়তে ঢের শিখেছি। আমাদের চড়ায় আর ওদের চড়ায় ঢের পার্থক্য আছে। ইংরেজ টিউব-রেলওয়েতেই চড়ুক আর রেলওয়ে বা বাসেই চড়ুক সে সবই তাদের নিজস্ব। প্রত্যেকেই কোন-না-কোন কোম্পানীর অংশীদার। যে পয়সাটা তারা দেয় তার সবটাই তাদের নিজের পকেটে যায়। আমরা যে মোটর বাস প্রভৃতিতে চড়ি তার টায়ার থেকে আরম্ভ করে সামান্য খুঁটিনাটি সাজসরঞ্জাম পর্য্যন্ত বিদেশ থেকে আসে। বিদেশে সমস্ত টাকা চলে গেল। এই হল এক নম্বর কথা। তার পর পেট্রোল, যাতে গাড়ী চলে, সেটার মালিক হচ্ছেন বি, ও, সি (বার্ম্মা অয়েল কোম্পানী)। এটী ইংরেজের তেলের একটা সেরা কোম্পানী। আমি তো মনে করি কেবল এই মোটর-চালক শোফারগুলিই আমাদের। তা ছাড়া গাড়ী, টায়ার, টিউব, পেট্রোল, কোম্পানী সবই ওদের। আবার এই মোটর-চালকের কাজও বাংলাদেশে পাঞ্জাবীরা একচেটে করে নিয়েছে। "বল মা তারা দাঁড়াই কোথা।" ট্রামে তো পুরোপুরি ওদের চিরস্থায়ী স্বত্ব কায়েম করা হয়েছে। তা ছাড়া ষ্টিমার বা রেলে যেই উঠলেন তা যদি এক টাকার টিকিট কেনেন তবে অমনি ৸৶০ আপনাকে বিলাত পাঠাতে হল। আর বাকী ৵০ এই সারেঙ্গ ড্রাইভার টিকিট বাবু কুলি কেরাণী ইত্যাদির পকেটে গেল। তা হলেই দেখুন ওদের চড়ায় আর আমাদের চড়ায় কতটা তফাৎ বর্ত্তমান। আমাদের দেশের যুবকরা যেই বিলাসিতার দিকে মনোযোগ দিলেন অমনি সঙ্গে সঙ্গে দেশের টাকা বিদেশে পাঠাবারও প্রতিজ্ঞা করে বসলেন। ইংরেজ যে আরও কত উপায়ে সারা দুনিয়া থেকে ধনদৌলত ঝেঁটিয়ে নিয়ে তার স্বদেশে জমা করছে তার ইয়ত্তা নাই। আপনারা ভাবেন—আর ছেলেবেলা থেকে পড়েও আসছেন—ভারতভূমি ইংরেজের প্রধান দুগ্ধবতী গাভী। জাহাজে যাবার সময় কলিকাতার একজন নামজাদা গণ্যমান্য ইংরেজ সহযাত্রী বললেন, বিলাতের মাত্র ৮ হাজার লোক সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে সরকারী মজুরীর উপর নির্ভর করে। এদেশের ষোল শ' সিভিলিয়ানের আয়ে তাদের কিছু আসে যায় না। ভারতবর্ষ ছাড়াও অন্য কত দেশ থেকে তারা মৌমাছির ন্যায় মধু আহরণ করছে।

চা-ব্যবসায়ে ইংরেজ

আসাম টি-গার্ডেন চায়ের বিরাট কারবার। ইহা ইংরেজের একচেটে। বাঙ্গালীরও কিছু কিছু আছে ; কিন্তু সেটা নেহাৎ কম। শতকরা ৩ ভাগ বাঙ্গালীর। ইংরেজের তুলনায় এটা ধর্ত্তব্যই নয়। তবে কুলিগিরি আমাদের একচেটে।

কয়লার মালিক ইংরেজ

তারপর কোল-মাইন (কয়লার খাদ)। ঝরিয়া রাণীগঞ্জ আসানসোলের কয়লার খনি। এও ওদের একচেটে। শতকরা ৯৫ ভাগ ওদের, আর বাকী ৫ ভাগ বাঙ্গালী ও অ-বাঙ্গালী ভারতবাসীর। মাড়োয়ারী ও বাঙ্গালীর কয়লার খাদের খাই বেশী না, উপর-উপর। কেনিয়া থেকে এদেশে কয়লা আসার কথা শুনে মাড়োয়ারীরা প্রমাদ গণেছিল—এইবার তাদের সর্ব্বনাশ। কিন্তু ওরা এত সহজে বিচলিত হয় না।

ইংরেজ পাটের দালাল

বাংলার প্রধান সম্পদ্ পাট। বাংলায় দু'শ' পাটের কল আছে। এর ২ কি ৩টি পশ্চিমা মাড়োয়ারীর তাঁবে, আর বাকী সব ওদের। বাঙ্গালীর নাই বল্লেই চলে। কোটি কোটি টাকার কারবার। বাঙ্গালী ঐ সব গগন-ভেদী পাটকলের চূড়ার দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। এই কাঁচা পাটের কি বিরাট ব্যবসা! কত কোটী কোটী টাকা এতে খাটছে! সেদিন একজন বিখ্যাত পাটের ব্যবসায়ী আমাকে বল্লেন ৫০ থেকে ৬০ কোটী

টাকার পাট হেসিয়ান ও গানি হয়। এর সব মুনাফা যায় বিলাতের ডাণ্ডি সহরে। আমরা কেবল বাবুগিরি করতে শিখেছি। আমাদেরই দেশের পাট ওরা কিনে নিয়ে যখন খাঁটি সিল্কের মত দিব্যি রেশমী কাপড় তৈরী করে এদেশে ফেরৎ আনে, তখন আমাদের বাবুরা সেগুলি কিনে বিলাতের ব্যবসায়ীদের বস্ত্র-শিল্পে সহানুভূতি দেখান।

বার্ম্মার বনে ইংরেজ

বার্ম্মার জেলাকে জেলা সুন্দরবনের মত জঙ্গলে পূর্ণ। এখানকার টিম্বার বিখ্যাত। এই টিম্বারের মস্ত বড় ব্যবসা ইংরেজের তাঁবে। এখনই আমরা এক-একটা বিরাট প্রতিষ্ঠান দেখতে পাচ্ছি। গোড়াতে এরূপ ছিল না। এর এক একটি খাড়া করতে যথেষ্ট অধ্যবসায়, অজস্র অর্থ ইংরেজকে ঢালতে হয়েছে। কোন সময় এমন কি ২৮ মণ পাথর গুড়ো করে মাত্র কয়েক পেনি মূল্যের সোণা পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু গোড়াতে শত বাধা-বিঘ্ন উপেক্ষা করেছে বলে আজ ইংরেজ জাতটা এত উন্নত।

বরুণদেব ইংরেজ

ভারতবর্ষ থেকে ৪০।৫০ কোটী টাকার পাট বিদেশে রপ্তানি করা হয়। এই পাট জাহাজে যায়। বাণিজ্য-তরণীও ইংরেজের একচেটে। যুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মাণির দুই একখানা জাহাজ চলাফেরা করত, কিন্তু সে সব অধিকার বর্ত্তমানে ইংরেজ কেড়ে নিয়েছে। ইংরেজের তরণী কেবল ভারতের কূলেই ভিড়ে না। চীন, অষ্ট্রেলিয়া সব জায়গাতেই ইহা যায়। মোটের উপর বলতে গেলে গোটা দুনিয়ার সমুদ্রের সব চাইতে বড় মালিক ইংরেজ। কত বড় বড় এক একটা কোম্পানী! চায়না-অষ্ট্রেলিয়া অ্যাঙ্কর লাইন, চায়না-অষ্ট্রেলিয়া সিটি লাইন, আমেরিকা-ইংল্যাণ্ড ওসেন লাইন, পেনিনসুলার এণ্ড ওরিয়েণ্টাল সেলিংস্—এই সব লাইনের এক একটা জাহাজের টনেজ আট হাজার থেকে ষাট হাজার পর্য্যন্ত। জাহাজের জায়গার পরিমাণ হিসাব করবার জন্য এক টন হচ্ছে একশ' বর্গ-ফুট। পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বড যাত্রী জাহাজ হচ্ছে ৫৯,৯৫৭ টনের। তার নাম হচ্ছে লেভিয়াথান। এটি লম্বায় ৯০৭ ফুট, চওড়ায় ১০০ ফুট আর উঁচুতে ৫৮ ফুট। এটি আমেরিকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ জার্ম্মাণির কাছ থেকে পেয়েছে। এর মধ্যে বাগান, নাচঘর, ড্রয়িং রুম, বৈঠক-খানা, আরাম ঘর, বাজার সব-কিছু আছে। এর দাম কত ভাবুন। এর পরেই ইংরেজদের জাহাজ ম্যাজেস্টিক। এটার টনেজ ৫৬,৫৫১। আমার জাহাজ "কায়সারিহিন্দ" ১১,৪০০ টনের। "ম্যালোজ" ও "মুলতান" জাহাজ প্রত্যেকে ২১ হাজার টনের। একখানা ১২ হাজার টনেজের দাম কত এক বন্ধুর কাছে জিজ্ঞাসা করায় বল্‌লেন দেড় কোটী টাকা। সুয়েজ খাল দিয়ে যত জাহাজ যাওয়া আসা করে, তার ৯০ ভাগ ইংরেজের, আর দশ ভাগ দুনিয়ার বাকী আর সব জাতের। টন প্রতি কম পক্ষে আট আনা করে ধরলেও কত কোটী—কতশ' কোটী টাকা ইংরেজের পকেটে যাচ্ছে।

সুয়েজ খাল

ইংরেজ সমুদ্রে একদম সর্ব্বেসর্ব্বা। কারো সঙ্গে ঝগড়া করবার তার প্রয়োজন করে না। ইংরেজ এক দিনেই সমুদ্রের রাজত্ব পায় নি। এই সুয়েজ ক্যানেল যথেষ্ট চালবাজির ফলে ইংরেজ তার আধিপত্যে এনেছে। সুয়েজ খাল কাটবার ভার প্রাপ্ত হন ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার লেসেপস। ১৮৬৯ সনে তিনি ইহা সমাধা করেন। ইজিপ্টের তদানীন্তন খেদিভ ইসমাইল পাশা খুব বেশী ব্যয়ী ছিলেন। বহু টাকা তিনি নষ্ট করতেন। তাতে মিশরে অর্থ-সঙ্কট উপস্থিত হয়। ইংরেজ মিশরের অর্থ-সঙ্কটের সুযোগ গ্রহণ করে ইসমাইল পাশাকে টাকা ধার দিতে থাকে। সেকালে বিলাতের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন ডিজরেলী বা আর্ল অব বিকন্সফিল্ড। ইনি ছিলেন জাতিতে ইহুদি। ইনি খাঁটি ইহুদির চাল খেলে কৌশল করে, বেনামী করে নাম মাত্র মূল্য ৪ কোটী টাকায় সুয়েজ খালের ১৭৬৬০২টি শেয়ার খরিদ করেন। মিশর ফ্রান্সের হাত থেকে ইংরেজের করতলগত হল। এই খানে ইংরেজের কত বড় আর্থিক লাভ হয়েছে। সুয়েজ খালের উপর অধিকার পেয়ে ইংরেজের ব্যবসা-বাণিজ্যের ধারা এক দম বদলে গেছে।

আজ এশিয়ার সমস্ত দেশের হাট-বাজার ইংরেজের পণ্য-সম্ভারে দখল করে বসেছে। এই জাহাজের দরুণ-ই ইংরেজ কত কোটী কোটী টাকা পায়। যাত্রী বা পণ্য-সম্ভারের আমদানি-রপ্তানির জাহাজ ভাড়া ছাড়াও সুয়েজ খাল দিয়ে যত জাহাজ চলাচল করে তার উপর ইংরেজের ট্যাক্স আছে।

রবার

রবারের ব্যবসায়ে ইংরেজ পয়লা নম্বর। মালয়, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ইংরেজের মস্ত মস্ত কারখানা আছে। আর রবারের দাম আজকাল প্রায় ৪ গুণ বেড়ে গেছে।

সোডা

সোডায় সাবান, কাঁচ, সাল্‌ফিউরিক এসিড প্রভৃতি তৈরী হয়। জার্ম্মাণ কেমিষ্টের মতে সকল রকম শিল্পের আদি জননী সোডা। সোডার কারবার সকল রকম ইণ্ডাষ্ট্রির চাইতে বড়। ব্রেয়ল্যাণ্ড মণ্ট দুনিয়ার সব চাইতে বড় সোডা প্রস্তুত-কারক।

সাবানের কারবারে ষাট কোটী

লেভেন ব্রাদার্সের সাবানের ফ্যাক্টরী জগতের সেরা। এর মূলধন ষাট কোটী টাকা। ৫০ বছর আগে লেভেন এক মুদির দোকানে বাকবয়—সামান্য চাকর ছিলেন। আজ সেই সামান্য বাকবয় ৬০ কোটী টাকা মূলধনের কারবার চালাচ্ছে। এটা যৌথ কারবার হলেও লেভেন ব্রাদার্সের ই সব-কিছু। এই সর্ব্ববৃহৎ সাবানের কারখানার জন্য সুদূর কোচিন, ওয়েষ্টইণ্ডিস্, আফ্রিকা থেকে নারিকেলের তেল যায়। ঐ সমস্ত দেশের নারিকেল তেলের কারবারও ইংরেজের হাতে।

লাঙ্কাশিয়ার

ইংলণ্ডের প্রতিভা বহুমুখী। বস্ত্র-বয়ন ও তুলা-শিল্পে লাঙ্কাশিয়ার-ম্যানচেষ্টারকে দুনিয়ার সেরা বলতে হবে। কত বড় কাপড়ের ব্যবসা! স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। লাঙ্কাশিয়ার আর ম্যানচেষ্টারই ভারতের বাজারে ৬০ কোটী টাকার কাপড় বিক্রী করে। বার্ম্মিংহাম লিড্‌সে উলের কারবার। বার্ম্মিংহামে রেল গাড়ীর এঞ্জিন তৈরী করা হয়। শেফিল্ডে বড় বড় কামার। ছুড়ি কাঁচির মস্ত বড় কারখানা। একেবারে তাক লাগিয়ে দেয়। এখন বুঝুন আকারে বাংলার সমান দেশটার ধনদৌলত কোথায় গিয়ে ঠেকেছে। জগতের যেখানে যা-কিছু ধনের সন্ধান পাওয়া গেছে সেখানেই ইংরেজ হাজির।

তেলের রাজা

পারস্যের মাটীতে তেলের অফুরন্ত ভাণ্ডার রয়েছে। ইংরেজ তার দ্বারোদ্ঘাটন করেছে। আজ অ্যাংগ্লোপার্শিয়ান অয়েল কোম্পানী তৈল-জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে বসে আছে। তুরস্কের মোসুলে তেলের খাদ আছে—ইংরেজের তা চাই-ই। কত কি ডিপ্লোমেসির চাল চেলে স্বাধীন কামালীদের হাত থেকে সেটা কেড়ে নিয়েছে। ইংরেজের আয় শত দিক্ দিয়ে হয়।

ইংরেজের পণ,—"বিদেশী কিনব না" *

ইংরেজ কোনো বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী থাকতে রাজী নয়। আমেরিকায় তৈরী আমেরিকান্ পুঁজির ফোর্ড মোটরে চড়ব না এই হল তাদের পণ। ফোর্ড বেচারা অগত্যা ইংলণ্ডে তার কোম্পানীর শাখা কারখানা খুলতে বাধ্য হয়েছে। এতে বিলাতী মজুর নিযুক্ত হয় এবং অনেক ইংরেজের পুঁজিও এতে আছে। ইংরেজের,—পণ "পারত পক্ষে বিদেশী জিনিষ কিনব না„ আর এ দুর্ভাগা দেশের বিলাতফেরতদের পণ— "পারত পক্ষে স্বদেশী জিনিষ কিনব না।" এঁরা ভুলে যান, বিলাত এঁদের স্বদেশ নয়।

ইংলণ্ডে কত ফ্যাক্টরী, কত কল-কারখানা, কত শিল্প-প্রতিষ্ঠান! আজ কাল নকল রেশমের কারবার চলেছে। কৃত্রিম উপায়ে আসল রেশমের মত চটকদার রেশম তৈরী করা হচ্ছে। নকল রেশমের আদর কি তা উডল্যাণ্ড ব্রাদার্সের গত বছরের মুনাফা থেকে বুঝা যায়। গত বৎসরে ঐ বিখ্যাত রেশম-ব্যবসায়ীর ৬॥০ কোটী টাকা মুনাফা হয়। ইংরেজের ব্যবসা-বাণিজ্যের বহর কি বিরাট,

* কথাটা ঠিক নয়,—অন্ততঃ এই ভাবে বলা চলিতে পারে না। কেন না বিদেশী মাল বিলাতে আমদানি হয় বিস্তর। সম্পাদক।

তা ষ্টেটস্‌ম্যানের ইয়ার বুক, টাইমসের ট্রেড এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং সাপ্লিমেণ্ট (শিল্প-পত্রিকা) প্রভৃতির পাতা খুললে দেখা যায়। ইংরেজ কত টাকা রোজগার করে তার ইয়ত্তা নাই।

এখন ইংলণ্ড কেন যে এত পেট ভরে ভাল ভাল পুষ্টিকর খাদ্য খেতে পায় তা বুঝতে পারেন। ওদের টাকা আছে খুব বেশী, কিনবার ক্ষমতাও খুব বেশী।

আর্থিক বাংলা ও বিলাত

এই আমাদের চোখের সামনে মস্ত বড় ইকনমিক রিভলিউসন (আর্থিক ওলট্‌পালট) হয়ে গেছে। পঞ্চাশ বছর আগে মেসে ৭৲৮৲ হলে বাসা ভাড়া খাওয়া থাকা চলে যেত। আজকাল সিটরেণ্টই আট টাকার কম নয়। আজকাল শ্রীমানরাতো ব্যয় করেন আর অভিভাবকরাতো ব্যয়ভার বহন করেন। এখন ৪০৲ কমে কলিকাতা সহরে একটা ছেলের থাকা খাওয়া পড়া চলতে পারে কি? ডাক্তারী পড়তে হ'লে আরও বেশী টাকার দরকার। মেডিক্যাল কলেজে পড়তে হ'লে মাসিক ৬০।৭০৲ টাকার কমে হয় না।

ইংরেজের আয় ৪০ গুণ বেশী

এখন লণ্ডনে যদি টাকায় আড়াই সের তিন সের দুধ বিক্রী হয় কলিকাতায় কয় সের হওয়া উচিত? ইংলণ্ডে পৃথিবীর সকল দেশের ধনদৌলত এসে জমছে। একজন ইংরেজের গড়পড়তা আয় একজন ভারতবাসীর গড়পড়তা আয়ের ৪০ গুণ বেশী। তা হলে একজন ইংরেজের ব্যয় করবার ক্ষমতাও ৪০ গুণ বেশী একথা স্বীকার করতেই হবে। ইংরেজের ক্রয় করবার ক্ষমতা ভারতবাসীর চাইতে চল্লিশগুণ বেশী হলেও সেখানে দুধের যে দর এই কলিকাতা সহরেও যদি সেই একই দর হয় তাহলে পার্থক্যটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় একবার বুঝুন। বিলাতের তুলনায় গরিব কলিকাতার দুধের দর কত হওয়া উচিত?

ইংলণ্ডে রুটির দাম ভারতবর্ষের সমান। রেলী ব্রাদার্স পঞ্জাব থেকে বিলাতে যে গম প্রেরণ করেন তার জাহাজ ভাড়া ও অন্যান্ত খরচ খরচা বাবদ টন প্রতি এক শিলিং মাত্র পড়ে। এক হন্দরে হল আট আনা মাত্র। বিলাতের রুটি আর আমাদের দেশের রুটির দামের পার্থক্য তাহলে কোনো মতেই বেশী হবে না। যে আপনার চাইতে ৪০ গুণ ধনী সেও যে দরে রুটি দুধ পাচ্ছে আপনিও ঠিক সেই দরে পাচ্ছেন। এখন ভাবুন অবস্থাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াল।

৮ লক্ষ টাকায় ছবি বিক্রয়

সে দিন মার্সেইয়ে এক খবরের কাগজে দেখলাম বিখ্যাত চিত্রকর রমণীর একখানা ছবি নীলামে বিক্রয় করা হবে। রমণী স্যার যোশুয়া রেনল্ড, গেন্সবরো প্রভৃতি বড় বড় শিল্পীর অন্যতম ছিলেন। জীবদ্দশায় হয়ত এঁর ছবি জোর ১০ পাউণ্ড মূল্যে বিক্রী হতো। ছবির নীলাম দেখতে যাওয়া গেল। দর উঠল। একজন অজ্ঞাতনামা লোক এক কোণে বসে দর বাড়াতে লাগলেন। অন্যে যা বলে তিনি তার চাইতে কিছু বেশী বলে যেতে লাগলেন। শেষে সেই অজ্ঞাতনামা ভদ্রলোক ৬১ হাজার পাউণ্ড দাম করলেন অর্থাৎ ৮ লক্ষ টাকা! একখানা ছবি আট লক্ষ টাকা দিয়ে কিনে বৈঠকখানার ঘরে টাঙ্গিয়ে রাখবার সখ যারা করতে পারে তাদের ধনদৌলতের দৌড় কতদূর তাহা সহজেই অনুমেয়। ফিরবার পথে জাহাজে বোম্বাইয়ের হোমরা-চোমরা মস্ত মস্ত ধনকুবের আমার সঙ্গে একই জাহাজে আসছিলেন। কারেন্সি কমিশনের স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস, ম্যানেকজি দাদাভয়, ফিরোজ সেঠনা প্রভৃতি লাখপতি কোটিপতি আমার সহযাত্রী ছিলেন। এঁদেরকে বল্লাম বোম্বাইয়ের আপনারা তো ভারতবর্ষের মধ্যে সেরা ধনী, আপনারাই কি ৮ লক্ষ টাকা দিয়ে একখানা ছবি কিনে বৈঠকখানার ঘরে টাঙ্গিয়ে রাখতে পারেন? এঁরা বল্লেন,—এসব আমাদের কর্ম্ম নয়।

সাধারণের অর্থে হাসপাতাল

ইংলণ্ডে বড় বড় হাসপাতাল অসংখ্য রয়েছে। এই ধরুন গাইজ হস্‌পিটাল, সেণ্ট বার্থেলমী হসপিটাল, কিংস হসপিটাল। এর এক একটা হাসপাতালে হাজার দেড় হাজার বেড। এ ছাড়া বিশেষ বিশেষ রোগের স্বতন্ত্র হাসপাতাল রয়েছে। যক্ষ্মা, হৃদ্‌রোগ—এর জন্য বিশেষ হাসপাতালের ব্যবস্থা আছে।

এই ধরণের কয়েক শ' হাসপাতাল বিলাতে আছে। এই সব হাসপাতালের জন্য বছরে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। কিন্তু ইহার যাবতীয় অর্থ দেশের লোক স্বেচ্ছায় দান করে। ভলান্টারি কনট্রিবিউশনে এগুলি চলে। এ সব অর্থ আকাশ থেকে পড়ে না। লোকে উপযাচক হ'য়ে দিয়ে যায়। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করবার দরকার করে না। কিছু করতে হয় না। গাইজ হসপিটালে একটা স্পেশাল ওয়ার্ড খোলা হবে। টাইম্‌স কাগজে এই মর্ম্মে এক বিজ্ঞাপন বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ৫০ হাজার পাউণ্ডের এক চেক এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির কাছ থেকে হাসপাতাল-কর্ত্তৃপক্ষদের হাতে এসে পৌছিল। এ রকম ঘটনা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। এই যে একটা জাত এরা যেমন রোজগার করতে শিখেছে তেমনি এরা সৎকাজে ব্যয় করতেও জানে। শিশুদের জন্য এক প্রতিষ্ঠান আছে। এখানে কয়েক হাজার শিশুর প্রতিপালন হয়। হয়ত বাপ মা খেতে দিতে পারে না; হয়ত কোন বিধবার সন্তান বা বাপ-মা-হারা—তারা এইখানে আশ্রয় পায়।

রেলী ব্রাদার্স

দেশ বিদেশ থেকে এরা টাকা রোজগার করে মাতৃভূমির শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছে। এদেশে রেলী ব্রাদার্সের ফার্ম্ম সব চাইতে বড় পাটের বেপারী। এরাই সকলের বেশী পাট রপ্তানি করে। এই ব্যবসায়ে বৎসরে ৪৭ লক্ষ টাকা করে আসে। তা ছাড়া চট্টগ্রাম থেকে আরম্ভ করে আসামের গারো হিলের সীমানা পর্য্যন্ত তুলার ব্যবসায় রেলী ব্রাদার্সের এক চেটে। সমস্ত বোম্বাই প্রদেশের তুলা রপ্তানি করে একমাত্র রেলী ব্রাদার্স।

এতদ্ব্যতীত ঐ কোম্পানী এই মগরাহাট থেকে কত লক্ষ লক্ষ মণ চাল বিলাতে পাঠায়। রেলী ব্রাদার্সের মস্ত বড় চামড়া রপ্তানির কারবার আছে। এমন জিনিষ নাই যা ঐ বিলাতী কোম্পানী বিদেশে রপ্তানি না করে। এতো গেল রপ্তানি। আমদানির বেলাও ওদের সংখ্যাটা নেহাৎ কম নয়। কত লক্ষ লক্ষ টাকার পিসগুডস এরা এদেশে আমদানি করে। এটা একটা প্রাইভেট কোম্পানী। একা রেলী ব্রাদার্সের আয় কত? আমি তা ভাবতেও পারি না। যব গম পাট চাল তুলা চামড়া এসব ঐ কোম্পানীর এক চেটে। আরও যে কত কি তার ঠিকানা নাই। যাঁরা রেলী ব্রাদার্সের কাছে চাকুরী করেন তাঁরা আমার চাইতে ভাল বলতে পারবেন। মোটের উপর রেলী ব্রাদার্স আমদানি-রপ্তানির রাজা। গিলেণ্ডার, অ্যাণ্ড্রু ইউল, টার্ণার মরিসন এসব কয়টিই কলিকাতার এক একটা বাঘা বাঘা কোম্পানী। এদের আয় কত? ওদের আয়ের পথ কত দিকে বিস্তৃত? আর আমাদের?

ভারতবাসীর আয়

রমেশদত্ত, দাদাভাই নৌরজি বলেন আমাদের জন পিছু গড়পড়তা আয় দৈনিক ছয় পয়সা। আজকাল আয় অনেকটা বেড়েছে। আবার সেই অনুপাতে ব্যয়ের হিস্যাটাও অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। জিনিষপত্রের দাম তিনগুণ চড়েছে। ধরুন—পূর্ব্বে ছয় পয়সা আয় ছিল এখন নয় তার ডবল তিন আনা হয়েছে। কিন্তু এই আপনাদের চোখের সামনে চাল-ডালের দাম কি পরিমাণে বেড়ে গেছে তা বেশ বুঝতে পারছেন। সুতরাং ছয় পয়সার স্থানে তিন আনা এতে কিছু যায় আসে না। আমাদের আয়তো সেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দরুণ ক ঘর জমীদার পত্তনীদার! এছাড়া বলতে পারেন হাইকোর্টে স্যার বি, সি, নৃপেন সরকার প্রভৃতি নামজাদা ব্যারিষ্টার, যাঁরা মাসে ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকা রোজগার করছেন। এদের আমি হিংসা করি না, এরা সবাই আমার ছাত্র। বেশ দু' পয়সা আয় করে সেটা ভালই। তারা না আনলে তো ইংরেজ নেবে। উকিল, ব্যারিষ্টার, স্কুল মাষ্টার ডাক্তার যাই বলুন এরা সব পরগাছা। ধনবিজ্ঞান শাস্ত্রের আদিগুরু ফিজিওক্রাটসদের মত আমিও বলব একমাত্র কৃষকরাই রোজগারী। আর সব তাদের হায়ারলিংস্‌। ধন-বিজ্ঞানবিদ্‌রা বলে গেছেন চাষীরাই আসল। উকিল ইত্যাদি মামলা মোকদ্দমা চালিয়ে টাকা রোজগার করেন। কিন্তু এঁরা যা রোজগার করেন, সেই পরিমাণ আর সকলের ব্যয় করতে হয়। টাকার হাত বদলী হয় মাত্র। আমি বলব এই রসা রোড, হরিশ মুখার্জ্জি রোডে যত উকীল ব্যারিষ্টার আছেন এর একজনও আসলে এক পয়সা রোজগার করেন

না। উকিল-ব্যারিষ্টাররা চাষা-ভুষার ভিটে-মাটিতে জাঙ্গাল দিয়ে জমীদারের ঘর উচ্ছন্ন করে তবে নামজাদা হয়ে বসেন। টাকা রোজগার এঁরা করেন না। টাকা এক হাত থেকে আর এক হাতে যায় মাত্র। এতে করে দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি মোটেই হয় না। *

আজ বিশ বৎসর ধরে দেশের অন্ন-সমস্যার কথা বলছি। ইংরেজের উপর আমার কোন দ্বেষ নাই। তাদের উৎসাহ উদ্যম কর্ম্মশক্তি অসমসাহসিকতা ধর্ম্মশীলতা এসবই আছে। বর্ত্তমান জগতে এই গুণগুলি যে জাতের থাকবে সে দুনিয়া জয় করবে।

২২ লাখ অ-বাঙ্গালী

খুলনা রাষ্ট্রীয় সমিতির চেয়ারম্যানরূপে বলেছিলাম বাঙ্গালার মাটীতে ২২লক্ষ অ-বাঙ্গালী টাকা রোজগার করছে। মাদ্রাজী, মাড়োয়ারী, উড়িয়া, পাঞ্জাবী, বিহারী সকলেই এই বাঙ্গালায় ছড়িয়ে আছে। চাকর, দরোয়ান, বেহারা, হয় উড়িয়া নয় খোট্টা। বড়বাজার থেকে আরম্ভ করে সমস্ত বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে মাড়োয়ারী বস্ত্র-ব্যবসায়ীর রাজত্ব। বাঙ্গালার মফঃস্বলে পর্য্যন্ত উড়ে বেহারা, উড়ে চাকর। খোট্টা পেয়াদা বরকন্দাজ মুটে মজুর যথেষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। উত্তর বঙ্গের প্লাবনের সময় সান্তাহার রিলিফ কমিটি পাঁচ হাজার উড়ে ও খোট্টার সাহায্যে দান করেছে। বাঙ্গালী দেখতে পাওয়া যায় নি। জমীদার, তালুকদার, পত্তনিদার, উকিল, ব্যারিষ্টার য করেন তাতে দেশের টাকা দেশেই থাকে। তাতে করে বাইরে থেকে দু'পয়সা আসে না। দিল্লীওয়ালা, পার্শি, ভাটিয়া, ইহুদি, আর্ম্মাণি প্রভৃতি এক একটা সম্প্রদায় বাংলার বুকের উপর কি বিপুল ব্যবসা ফেঁদে বসেছে। কুলি মজুর সহর থেকে আরম্ভ করে মফঃস্বলের সর্ব্বত্র অ-বাঙ্গালী। রেল ষ্টেশন বলুন ষ্টিমারঘাটা বলুন পাটকলের আড়ৎ বলুন সব জায়গাতেই ঐ হিন্দী বাত। একজন মজুরের কম পক্ষে ১৮৲ থেকে ২০৲ টাকা গড়পড়তা মাসিক আয়। দিন একজন কুলি ৷৵০ থেকে ১৲ রোজগার করবেই। তাহলে এই ২২লক্ষ অ-বাঙ্গালীর গড়পড়তা আয় কত?

বাঙ্গালীর আহার

দিন দিন আমরা যে কত রকমে হীনবীর্য্য হয়ে পড়ছি তার ইয়ত্তা নাই। একজন ইংরেজের গড়পড়তা খোরাকের তুলনায় আমরা কি খাই? মাছের সের ১৷৹ ভাবুনতো ক'জনে—বাঙ্গালার ক'টি পরিবার—মাছ খেতে পারে। মধ্যবিত্ত পরিবারের লোক কতটুকু মাছ খায়? এদের মাছ খাওয়া মানে আমাদের মা লক্ষ্মীরা সধবা আছেন এইটুকু প্রবোধ দেওয়া। হোমিওপ্যাথিক ডোজে বাঙ্গালী মাছ খায়। মিউনিসিপ্যালিটী যেমন আগে যত রাজ্যের রাবিশ ঢেলে তার উপর খানিকটা চুণ সুরকির লেপ দেয়, আমরাও তেমনি আমাদের উদর-গর্ত্তটা রাবিশ দিয়ে ভর্ত্তি করি। দুই পয়সার চিংড়ি এর মধ্যে এক রাজ্যের পুঁই শাকের বা লাউয়ের ডগা, তার সঙ্গে এক বাটি ধনে-সরষে বাঁটা—এইতো আমাদের খাওয়ার উপকরণ। এর আর পুষ্টি-শক্তি কত হবে? ওরা মাংস, দুধ, মাখন, ছানা পনীর প্রচুর পরিমাণে খায়। আমরা ছয় পয়সার ডাল কিনে তা এক কড়াই জলে চড়িয়ে দিয়ে গোষ্ঠি চালাই। আমরা যেমন দরিদ্র, আমাদের আহারও তেমনি!

বর্ত্তমানের এই ভীষণ প্রতিযোগিতার দিনে বাঙ্গালী জাতির টেঁকা দায়। এখনও ত্রিশ চল্লিশ হাজার ছেলে কলেজে। এছাড়া আরও কত আছে। এদের কি উপায় হবে? বাঙ্গালী ছাত্র কি উপায়ে অর্থ রোজগার করবে?

একজন উকিলের গড়পড়তা মাসিক আয় পনর টাকা। আজকালকার দিনে নিজের গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করা ভার। অথচ এখনও তিন হাজার ছেলে ল কলেজে পড়ে। এখনও বিলাতের ইনে ব্যারিষ্টারী পড়তে ছুটে। এ জাতের আর হবে কি? এদের অর্থাগমের কোনরূপ সংস্থান নাই। অন্ন-সমস্যাই আজ বাঙ্গালীর বড় সমস্যা। সোজা কথায় বাঙ্গালার নরনারী দু'বেলা পেট ভরে খেতে পায় না।

ইংরেজ জাত কত দিক্ দিয়ে কত রকমে অর্থোপার্জ্জন করে সে সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে হলে পুরো একটা দিনের দরকার। আপনাদের শুধু একটা আভাষ মাত্র দিলাম।

* উকিল ইত্যাদি ব্যবসায়ীদের সম্বন্ধে যে মত এখানে প্রচারিত হইতেছে সেই মত টেঁকসই নয়। ইঁহারাও ধন-স্রষ্টা বটে। সম্পাদক।
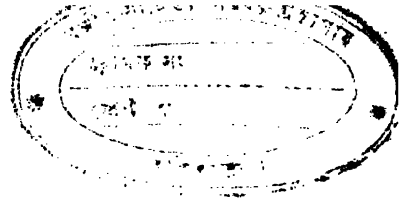
কলিকাতা সহর ও বাড়ীভাড়া

কলিকাতা সহরটা হঠাৎ একদিন ভুঁই ফুঁড়ে বেরোয় নি। এই এত বড় সহরটা কোনো একটা মাত্র ইমারত-নির্ম্মাতা ইঞ্জিনিয়ার কোম্পানী কণ্ট্রাক্ট নিয়ে এক বা দুই বা দশ বছরে গড়ে তোলে নি। এ সহরটা আজকেরও নয়। সেই মোগলাই-নবাবী আমল থেকে এর পত্তন সুরু হয়েছে। আজ দেড়শ' বছর ধরে আমাদের বর্ত্তমান ইংরেজ বাদশা এটাকে তাঁদের বিরাট প্রাচ্য জমীদারির কেন্দ্ররূপে গড়ে তুলছেন। সেই সিরাজী আমল থেকে আজকার এই ১৯২৬ সনের কলিকাতা গড়ে উঠেছে। প্রায় দুশ' বছরের জিনিষ এটা, কিম্বা তারও বেশী দিন এর বয়স। এই ১৯২৬ সনের বর্ত্তমান কলিকাতার কথা ভেবে সিরাজদ্দৌলার সৌধশিল্পী বা রাজমিস্ত্রিরা প্রাসাদ নির্ম্মাণ কার্য্যে হাত দেয় নাই। সহরবাসীর আধুনিক রুচির কথা চিন্তা করে তাদের বাপ-দাদারা এই সহরের ইমারত, স্কোয়ার, পুকুর, রাস্তা, পার্ক, বস্তি, মাঠ, ময়দান প্রভৃতি তৈরী করে যায় নি। আজ যে কলিকাতা আমরা চোখের সামনে দেখছি, তা তৈরী হ'তে কত যুগ কেটে গেছে, কত শত মানুষের খামখেয়ালী খোস মেজাজের ক্রিয়া এর মধ্যে যে রয়েছে, তার ঠিকানা নাই। একটা বা দশটা মাত্র লোকের ফরমাস অনুযায়ী তাদের খেয়াল-মাফিক এই মহানগরীটা গড়ে উঠে নি। কিংবা বর্ত্তমান ইংরেজ-প্রভুও এর নির্ম্মাতা নন। ইংরেজ এদেশটা দখল করে ভাগীরথীতীরে এক বিস্তৃত জনমানবশূন্য প্রান্তরে নূতন উপনিবেশ স্থাপন করে এই বর্ত্তমান কলিকাতা মহানগরীর জন্ম দেন্ নি, বা ইংরেজ-ভারতের বর্ত্তমান রাজধানী বাদশাদের দিল্লী সহরকে যেমন রায়সিনায় নূতন করে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে গড়ে তোলা হচ্ছে, তেমন করে ভারতের এই ভূতপূর্ব্ব রাজধানী গড়ে উঠে নি। তা হ'লে আজ এটা একটা ছাঁচে ঢালাই-করা নিখুঁত জিনিষ দাঁড়াত। তাহলে এটা সবার পছন্দমাফিক হত। তা হলে আর বড়বাজার-চিৎপুরের মত বড় বড় ব্যবসাপল্লীর রাস্তা অতটা সঙ্কীর্ণ হত না অথবা তার ইমারতগুলি অমন বে-মানানসই ভাবে একটার পর আর একটা ঘেঁসা-ঘেঁসি অবস্থায় কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকত না। তাহলে হ্যারিসন রোডের ৪।৫ তলা বাড়ীর ঠিক পাশেই দুই একখানা খোলার বাড়ী আজও দেখতে পাওয়া যেত না। তেমনটি হলে চৌরঙ্গীর দোকান-বাড়ীগুলার সঙ্গে বড়বাজার-চিৎপুরের ব্যবসাপল্লীর পার্থক্য অত বেখাপ্পা ভাবে চোখে ধরা পড়ত না।

কোনো বড় সহরই ছাঁচে ঢালা নিখুঁত হতে পারে না। তবে শুনা যায়, আমেরিকার নিউইয়র্ক, সিকাগো না কি এ দাবী করতে পারে। হাজার হলেও ওটা আমেরিকা—নিউ ওয়ার্ল্ড বা নবীন দুনিয়া। উহার সাথে তুলনা চলে না। দিনে দিনে সহরবাসীর অভাব-অভিযোগ লক্ষ্য করে সহরটাকে মাঝে মাঝে ভেঙ্গেচুরে নূতন করে গড়া দরকার হয়। কলিকাতা মহানগরীকেও ভেঙ্গেচুরে নূতন করে গড়ে তুলবার জন্য কয়েক বছর হল ইম্‌প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট বলে একটা বিভাগ কায়েম করা হয়েছে। কলিকাতা মহানগরীকে সোজাসুজি ইয়োরোপীয় ছাঁচে ঢালতে গেলে একটা বলসেভিক আন্দোলন রুজু করে দিতে হয়। কিন্তু এই নগরের উৎকর্ষ-সাধক বিভাগ এত বড় গুরুভার এখনও গ্রহণ করতে সাহসী হয় নাই। তবুও যুদ্ধের পর এই কয়েক বছরের মধ্যে সহরের চেহারা যে ভাবে বদলে ফেলা হয়েছে তা বাস্তবিকই খুব আশ্চর্য্যজনক। এই নগর ঢেলে সাজার কাজের মধ্যে বিরাট সেণ্ট্রাল অ্যাভেনিউ বা নয়া সড়কের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। সেই উত্তরে বিডন ষ্ট্রীট থেকে আরম্ভ করে সোজা দক্ষিণে এস্‌প্লানেডে চৌরঙ্গীতে যে বিরাট রাজপথ এসে মিশে গেছে, তা ক্যালকাটা ইম্‌প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের এক বড় কীর্ত্তি বলে ধরা যেতে পারে। বহু ছোট-বড় দালান-কোঠা

রাস্তা, বস্তি ভেঙ্গেচুরে এই বৃহৎ রাজপথটা তার পথ করে নিয়েছে। এই রাজপথের দুই ধারে কত বড় বড় ইমারত রাজপ্রাসাদরূপে গড়ে উঠেছে। এই নয়া সড়ক কলিকাতার চেহারা আগাগোড়া বদলে ফেলেছে। যে যে পাড়ার মধ্যে এই রাস্তাটা তার একতিয়ার কায়েম করেছে, সে সব পাড়া, সে সব বস্তির রূপ একদম বদলে গেছে। এই রকম কলিকাতা সহর ও সহরতলীর সব জায়গাতেই নূতন করে গড়ার একটা ধুম পড়ে গেছে। কিন্তু এই বিভাগ এতটা অগ্রসর হলেও ইহার কাজ আরও ব্যাপক ভাবে হওয়া দরকার। এবারকার মাসব্যাপী দাঙ্গায় এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরীর শান্তি-রক্ষার জন্য বড়বাজার, চিৎপুর প্রভৃতি অঞ্চলের দালান কোঠাগুলি একেবারে ভেঙ্গেচুরে নূতন করে গড়ে তুলতে হবে। অলি-গলি বড় করতে হবে। মোটের উপর এই সব দাঙ্গা-হাঙ্গামার কেন্দ্র-গুলিকে একেবারে ঢেলে সাজতে হবে। কলিকাতা মহানগরীর উত্তরাঞ্চলে এই দাঙ্গা একমাসকাল স্থায়ী হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে এই সব অশাস্ত্রীয় প্রণালীতে নগর নির্ম্মাণ করা। মোটের উপর সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউ ও তার আশ-পাশ দিয়ে যেরূপ নূতন করে নগর গড়ার কাজ চলেছে, ঠিক তেমি ধারা সমস্ত উত্তর-কলিকাতার রাস্তা-ঘাট গড়ে তুলবার ভার ইম্প্রুভ্‌মেণ্ট ট্রাষ্টকে গ্রহণ করতে হবে।

কলিকাতা মহানগরীর সহর বলতে সাধারণতঃ ঐ সাহেবপাড়ার চৌরঙ্গী, ডালহৌসী প্রভৃতি জায়গা বুঝায়, আর মফঃস্বল বলতে উত্তরাঞ্চলের ঘেঁসা-ঘেঁসি-করা নানান ঢংয়ের দালান-কোঠা, টালি-খোলার ঘর যুক্ত দেশী পাড়া বুঝায়। সাহেবপাড়ার সঙ্গে এই খাস দেশীপাড়ার একেবারে আকাশ-পাতাল তফাৎ। ওটা যদি হয় স্বর্গ, এটা তার উল্টো—নরক। ওটা যদি হয় স্বাস্থ্য-নিকেতন, এটাকে বলব রোগ-নিকেতন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন মেয়র হয়ে তাঁর সর্ব্বপ্রথম বক্তৃতায় এই শেষোক্ত পাড়ার দুর্দ্দশার কথাই বার্ বার উল্লেখ করেছিলেন।

বাড়ীভাড়া

এই সহরে বাড়ী ভাড়া করা একটা মস্ত বড় সমস্যা। ভুক্তভোগী মাত্রেই এটা স্বীকার করবেন। এই প্রবন্ধের লেখক বাড়ী ভাড়া করবার মানসে প্রায় তিন মাস কাল খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন ধরে গোটা সহরের পাড়ায় পাড়ায় অনেক বাড়ীতে বাড়ীতে ঢুঁড়েছেন। সাধারণতঃ সহরে প্রায়ই একটা কথা শুনা যায় যে, কলিকাতার বাড়ীভাড়া অনেক নেমে গেছে। কিন্তু এই তিন মাসের অভিজ্ঞতা থেকে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, এটা একেবারে ডাহা মিথ্যা কথা। সহরের দক্ষিণাঞ্চলে অর্থাৎ সাহেব-পাড়ায়—সেই লোয়ার সার্কুলার রোড থেকে ধর্ম্মতলা এস্প্লানেড পর্য্যন্ত এই চৌহদ্দির মধ্যে—একটা আট কামরাওয়ালা অনন্যসংলগ্ন গোটা বাড়ীর ভাড়া গড়ে মাসিক সাতশ' থেকে বারশ' টাকার মধ্যে। একটা চার কামরাওয়ালা ফ্লাটের ভাড়া কম পক্ষে আড়াইশ' থেকে সাড়ে চারশ' টাকার মধ্যে। মোটের উপর যাঁরা অন্যূন ছ'শ' টাকা বা তার বেশী ভাড়া দিতে সমর্থ, কেবল তাঁরাই এই অঞ্চলে বসবাস করতে অধিকারী। সাহেব সুবা এবং এদেশীয় কতকগুলি ধনী লোক মাত্র এই অঞ্চলে উপযুক্ত ভাড়া দিয়ে একরূপ চলনসই গোছের বাড়ী খুজেঁ পাবেন। কলিকাতা সহরের ঠিক বুকের উপর তিনশ' চারশ' টাকার মধ্যে বাড়ী পাওয়া সুকঠিন। সহরতলীতেও উপযুক্ত অনুসন্ধান করলে দুই একটা এরূপ বাড়ী হঠাৎ ভাগ্যক্রমে মিলে যেতে পারে। তিনশ' চারশ' টাকার মধ্যে একটু বাগান, একটু খোলা মাঠ সমেত একটা ভাল বাড়ী তো কখনই পাওয়া যাবে না। একটা ফ্লাট পাওয়া যেতে পারে মাত্র। এই তো গেল কলিকাতার পয়লা নম্বর ভাড়াটেদের বাড়ীভাড়া-সমস্যা।

মধ্যবিত্ত লোকের সামর্থ্যানুযায়ী উপযুক্ত বাড়ী ভাড়া পাওয়া আরও কঠিন। কলিকাতায় আজ দশ বছরে যত দালান-কোঠা, বড় বড় ইমারত তৈরী হয়েছে এবং হতে যাচ্ছে, তাতে করে এই সব মধ্যবিত্ত লোকরা ন্যায়তঃ আশা করতে পারে যে, বাড়ীভাড়া অনেকটা নেমে যাবে; কিন্তু নামা তো দূরের কথা, দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউর দুই ধারে সারি সারি বড় বড় ইমারত গড়ে উঠলে মধ্যবিত্ত পরিবার আশায় বুক বেঁধেছিল, হয়ত

এবার সস্তায় ভালভাবে স্বাস্থ্যকর বাড়ীতে মানুষের মত থাকা চলবে, হয়ত ভাড়াটেদের বাড়ীর দৈন্য এবার ঘুচে যাবে। কিন্তু কই, বাড়ী তৈরী শেষ হতে না হতেই চড়া চড়া ভাড়ায় ভাড়াটেরা আগে থাকতে বাড়ীওয়ালাদের বায়না করে ঘর দখল করে বসে থাকে। এই সব এত বড় বড় ইমারতের একটা ঘরও কি এ গরিবদের জন্ত খালি থাকে? খালি থাকলেও এদিকে পা বাড়ানো সহজ ব্যাপার নয়।

কলিকাতার বাড়ীওয়ালারা সব সময়ই তাদের বাড়ীর ভাড়াটে পায় না। কোন কোন সময় কোন কোন বাড়ী খালি পড়ে থাকতে দেখা যায়। তিন মাস কাল বাড়ী খুঁজবার সময় অনেক বাড়ী ছ' মাস কাল ধরে ভাড়াটে বিনা খালি পড়ে রয়েছে দেখেছি। সাহেবপাড়ায় যে-সব বাড়ী খালি পড়ে আছে দেখেছি, তাদের অধিকাংশের ভাড়া না হবার কারণ বাড়ীওয়ালাদের অসম্ভব রকম ভাড়ার দাবী। কলিকাতার বাড়ীওয়ালারা প্রায় সকলেই খুব ধনী। এজন্য তাদের বাড়ী দু'দশ মাস পড়ে থাকলেও তাদের কিছু আসে যায় না। বাড়ী খালি পড়ে থাকলে কর্পোরেশনের কিছু ক্ষতি হয়; কারণ, কর্পোরেশন খালি বাড়ী হতে ট্যাক্স আদায় করতে পারে না। এই সব বাড়ীওয়ালারা হয়ত তাদের বাড়ী আট দশ মাস, এমন কি, দুই এক বছরও খালি রাখতে রাজী আছে, তবু ভাড়া কিছু কম কোন মতেই করবে না। অনেক সময় দেখা যায়, এক ভাড়াটে বাড়ী ছেড়ে গেলে বাড়ীওয়ালা বিশ পঁচিশ টাকা বেশী ভাড়ায় নূতন ভাড়াটের সঙ্গে বাড়ীর বন্দোবস্ত করে। সরকারের এদিকে কড়া নজর দেওয়া দরকার। যখন অনেকগুলি বাড়ী ভাড়ার জন্য পড়ে থাকে দেখা যায় এবং ভাড়া নেবার জন্যও যখন অনেকে বাড়ী খুঁজে বেড়ায়, কিন্তু বাড়ীর মালিকদের অত্যধিক চড়া দাবীর জন্য ভাড়া নিতে পারে না, তখন ঐ সব খালি বাড়ী যাতে ন্যায্য ভাড়ায় ভাড়া দেওয়া হয় গবর্ণমেণ্ট বা মিউনিসিপ্যালিটির তা দেখা উচিত। তাতে এক দিকে কতকগুলি সহরবাসীর অসুবিধা দূর হবে অন্যদিকে মিউনিসিপ্যালিটিরও কর আদায় হবে।

সহরের দেশী পাড়ায়ও অনেক বাড়ী খালি পড়ে থাকতে দেখা যায়। এসব বাড়ী ভাড়া না হবার কারণ, কেবল মাত্র বাড়ীওয়ালার অন্যায্য ও অসম্ভব দাবী নয়। অনেকস্থলে বাড়ীগুলি অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর বলেও পড়ে থাকে। অনেক বাড়ীতে হয়ত বহুদিন চূণ-সুরকিরও লেপ পড়ে না। এখানে ভেঙ্গে পড়েছে, ওখানে ভেঙ্গে একটু ধসে গিয়েছে। এসব বাড়ীতে হয়ত কালে-ভদ্রেও আলো বাতাস আসে না। সেই বাপ-দাদারা যা করে গিয়েছেন তাঁদের বংশধরগণ তার উপর আর হাত দেওয়া উচিত মনে করেন নি। ভাড়াটেরা এ সব স্যাঁৎ-স্যাঁতে অস্বাস্থ্যকর বাড়ী পারৎপক্ষে ভাড়া নিতে রাজী হয় না। কিন্তু এসব বাড়ী হাজার অস্বাস্থ্যকর হলেও এই বাংলা দেশে সেগুলি ভাড়া নেবার লোকের অভাব হয় না। বহু মধ্যবিত্ত অল্প-স্বল্প আয়ের পরিবার সামান্য একটু সুবিধা পেলেই এসব বাড়ী ভাড়া নিতে এতটুকু আপত্তিও করে না। এসব বাড়ী যাতে অচিরে মেরামত করা হয় ও স্বাস্থ্যকর করে তোলা হয়, কর্পোরেশন ও সরকারের সে দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। কারণ, এরূপ বাড়ীতে যে সব ভাড়াটে বাস করে, তারা অচিরে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

গাড়ীতে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর অসুবিধা দূর করবার জন্য খবরের কাগজে খুব আন্দোলন হয়ে থাকে। রেলের সে অসুবিধা সাময়িক। কিন্তু মাসের পর মাস বৎসরের পর বৎসর ধরে এই যে সহরের মধ্যবিত্ত লোক অস্বাস্থ্যকর, অপেক্ষাকৃত অল্প ভাড়ার বাড়ীতে স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে জীবন কাটায়, এদের দুঃখ দূর করবার জন্য সংবাদপত্রের স্তম্ভে বেশী করে আন্দোলন হওয়া উচিত। বাড়ীওয়ালারা যাতে তাদের বাড়ীগুলিকে স্বাস্থ্যকর করে তোলে এবং সেগুলি উপযুক্ত ভাড়ায় ভাড়া দেয়, সে জন্য কাউন্সিল ও কর্পোরেশনের পক্ষে আইন প্রণয়ন করা আশু কর্ত্তব্য হয়ে পড়েছে। সহরে মধ্যবিত্ত পরিবারের স্ত্রীলোকগণের স্বাস্থ্য অল্প দিনের মধ্যে ভেঙ্গে পড়ার একমাত্র কারণ, এই সব আলো-হাওয়া-শূন্য অস্বাস্থ্যকর বাড়ীগুলি।

প্রত্যেক দেশেই বাড়ী ভাড়া একটা বড় সমস্যা। সরকার অনেক দেশে নিজ খরচায় স্বাস্থ্যকর বাড়ী তৈরী করে সস্তায় সেগুলি অল্প আয়ের সহরবাসীদের ভাড়া দিয়ে থাকেন। বিলাতে মজুরদের বাড়ীভাড়া সমস্যা মিটাতে না পারার জন্য সরকারকে পদত্যাগ করতে পর্য্যন্ত দেখা গিয়েছে। কলিকাতায়ও এটা একটা খুব বড় সমস্যা দাঁড়িয়েছে। কর্পোরেশন ও সরকারের এ বিষয়ে যথাবিধি অনুসন্ধান করে দেখা আবশ্যক। বাড়ীর মালিকগণ যাতে অধিক ভাড়ার জন্য ভাড়াটেদের উপর জুলুম চালাতে না পারে এবং অল্প কিছু খরচ করে "যেন তেন প্রকারেণ" বাড়ী মেরামতের কাজ সম্পন্ন না করে, বাড়ীগুলি যাতে যথার্থই বাসের উপযুক্ত করা হয়, সে দিকে কর্পোরেশনের কড়া নজর থাকা আবশ্যক। মধ্যবিত্ত পরিবার যাতে অল্প ভাড়ায় স্বাস্থ্যকর বাড়ীতে বাস করে দুনিয়ায় মানুষের মত বেঁচে থাকতে পারে, সে জন্য সরকারী ব্যয়ে গৃহনির্ম্মাণ-কার্য্য আরব্ধ হওয়াও প্রয়োজনীয়।

মফঃস্বলের বাণী

বাংলাদেশের জেলায় জেলায় যে-সকল সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির হয় তাহার সম্পাদনে যেন অনেকটা উন্নতি লক্ষ্য করিতেছি। তের চৌদ্দ বৎসরের পূর্ব্বেকার তুলনায় আমাদের বর্ত্তমান মফঃস্বল-সাহিত্যকে বেশ কর্ম্মঠ এবং সজাগ চিন্তা-রাশি মনে হইতেছে।

প্রথমতঃ, সম্পাদকগণ জেলার ভিতরকার আর্থিক এবং সামাজিক গলি-ঘোঁচে বস্তুনিষ্ঠ রূপে ঘোরাফিরা করিবার অভ্যাস কিছু কিছু দেখাইতেছেন। দ্বিতীয়তঃ, এই সকল তথ্য যথাযথ বিবৃত করিয়াই তাঁহারা কাজ খতম করেন না। অনেক সময়ে তাঁহাদের মন্তব্য, সমালোচনা এবং পরামর্শও যথেষ্ট বিচক্ষণতার সহিত প্রচারিত হয়। তৃতীয়তঃ, দেশী বিদেশী কাগজ হইতে মূল্যবান্ তথ্য ও তত্ত্বের তর্জ্জমা অথবা চুম্বক প্রকাশ করিয়া পল্লীতে উচ্চশিক্ষা-বিস্তারের দায়িত্বও তাঁহারা কেহ কেহ লইতেছেন।

ইতিমধ্যে আমরা নানা উপলক্ষ্যে মফঃস্বলের সাহিত্য হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি। ভবিষ্যতেও "আর্থিক উন্নতি"র "সংবাদদাতা"স্বরূপ এই সকল পত্রিকা সর্ব্বদাই ব্যবহৃত হইবে।

এই সংখ্যায় গাভী-সমস্যা এবং কলের লাঙ্গল ইত্যাদি সম্বন্ধে কয়েকটী রচনা উদ্ধৃত করিতেছি।

বাঙালীর গাভী-সমস্যা

(১)

বাংলা প্রদেশের তথা সমগ্র ভারতের জনসাধারণের কৃষিই প্রধানতম উপজীবিকা। বিশেষজ্ঞগণ হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, যে ভারতের শতকরা ৭২ জন লোক কৃষিজীবী। খাদ্য শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হেতু এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পাশ করার অনুপাতে চাকুরীর সংখ্যা বৃদ্ধি না পাওয়ায় কৃষিকার্য্যের প্রতি দেশবাসীর বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে এবং তজ্জন্য কৃষির উন্নতি সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনাও চলিতেছে। ইহা শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষ কল-কারখানার দেশ নহে। বিশেষজ্ঞগণ যুক্তি দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, কৃষকগণ নিতান্ত গরিব ও ছোট ছোট জোতের মালিক বলিয়া কলের দ্বারা এ দেশের কৃষির কোনো উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। সুতরাং কৃষির জন্য আমাদিগের গরুর আবশ্যকতা কিছুমাত্র কম হইবার অদূর ভবিষ্যতে কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। অধিকন্তু স্বাস্থ্যের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলেও ইহার উপকারিতা বলিয়া শেষ করা যায় না।

দুঃখের বিষয় এই যে, দেশের স্বাস্থ্য ও কৃষি-সম্পদ্ যে গোজাতির উপর এতটা নির্ভর করে, সেই

গোজাতির উন্নতি-অবনতি সম্বন্ধে দেশবাসী সম্পূর্ণ উদাসীন। গত বৎসর ১৲ টাকা ১।০ সিকা পর্য্যন্ত দামে খুলনায় ⁄১ সের দুধ বিক্রয় হইয়াছে। সহরে দূরবর্ত্তী স্থান হইতেও দুধের আমদানি হয়, তাই এখানে দুধ অমিল হয় নাই। কিন্তু পল্লীগ্রামে দুধ সাধারণতঃ মিলে না ইহা আমরা জানি।

সংক্রামক ব্যাধিতে গো-জাতির মৃত্যু হয় কি পরিমাণে তাহা অনেকেরই ধারণা নাই। ১৯২৩ সনে পাইকগাছা ও আশশুনি থানার অধিকাংশ গ্রামে যে সংক্রামক গোব্যাধি বিস্তার লাভ করে তাহাতে ঐ অঞ্চলের শতকরা অন্যূন ৭৫টী গরু মরিয়া যায়। এ বৎসরও খুলনা জেলার অধিকাংশ স্থানে গো-মড়ক আরম্ভ হইয়াছে, সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে মোরেলগঞ্জ, রামপাল, এবং বাগেরহাট থানার কতকাংশে সংক্রামক ভাবে গোজাতির মধ্যে বসন্তরোগ দেখা দেয়। ফলে বহুসংখ্যক গরু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে ঐ রোগ পাইকগাছা, বটিয়াঘাটা, দৌলতপুর ও খুলনা সদর থানায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বয়রা, হোগলবুনিয়া, দেলুটী প্রভৃতি গ্রামে অনেক গরু মরিয়া যাওয়ায় সদর পশুচিকিৎসক ঐ সমস্ত গ্রামে টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া সংক্রামক ব্যাধি উপশমিত করিয়াছেন। বর্ত্তমানে চুণকুড়ি, কাতিয়ানাংলা, দাকুপী, বাণীশান্তা, আলাইপুর, রামনগর, শিরোমণি প্রভৃতি গ্রাম বিশেষভাবে আক্রান্ত। কিন্তু সদরের একজন মাত্র চিকিৎসকের পক্ষে একই সময় এই প্রকার বিভিন্ন গ্রামে চিকিৎসা করা সম্ভব নহে। ফলে এই গো-মড়কের কোন প্রতীকার হইতেছে না বলিতে হইবে।

প্রতি বৎসর যদি এইরূপ হাজার হাজার গরু ধ্বংস হইতে থাকে তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে ইহার পরিমাণ কি হইতে পারে সামান্য যোগ বিয়োগের দ্বারা তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। কিন্তু জাতীয় এই সর্ব্বনাশের দিকে জনসাধারণ, গবর্ণমেণ্ট বা ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড সকলেই উদাসীন। গো-কের্ব্বানি লইয়া যে হিন্দু সমাজ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন ও গোজাতির ধ্বংস হইবার ভীষণ পরিণাম সম্বন্ধে যাঁহারা ব্যাকুল হইয়া উঠেন, সেই হিন্দু সমাজের চোখের উপর গো-জাতির মধ্যে বৎসরের পর বৎসর মৃত্যুর যে তাণ্ডব লীলা চলিতেছে ও কৃষি-প্রধান দেশের কৃষির একমাত্র অবলম্বন, বালক বৃদ্ধের জীবন স্বরূপ দুধ সরবরাহের একমাত্র আধার গোধন যে নির্ম্মূল হইয়া যাইতেছে হিন্দু সমাজ তাহার কোন খোঁজ খবর রাখা আবশ্যক বোধ করেন না।

চেষ্টা করিলে এই সংক্রামক ব্যাধি প্রশমিত করিয়া অনেক গরু'যে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করা যায় তাহাতে সন্দেহ নাই। টীকা দিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায় দেখা গিয়াছে। কিন্তু এক এক মহকুমায় মাত্র একজন পশু-চিকিৎসকের পক্ষে আবশ্যক বিধি ব্যবস্থা করা ও সংক্রামক ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা একান্ত- অসম্ভব। দেশের এ সমস্ত অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন-নিবেদন ও অরণ্যে রোদন একই কথা। দেশ-হিতকর বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে তাঁহারা নিতান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও পারেন না, যেহেতু হামেশাই তাঁহাদের অর্থাভাব। এমতাবস্থায় গোজাতি এইরূপে নির্ম্মূল হইয়া যাইবে তাহার কি কোন প্রতিবিধান হইবে না? ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের পক্ষেও কি কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব নহে? আমরা এ বিষয়ে বোর্ডের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ("খুলনাবাসী")

(২)

বঙ্গের ন্যায় কৃষিপ্রধান দেশে গোজাতির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। বর্ত্তমান সময়ে এদেশের গোজাতি যেরূপ দ্রুত গতিতে ধ্বংসের দিকে ধাবিত হইতেছে, তাহাতে এখন হইতে যদি আমরা গো-জাতির রক্ষাকল্পে মনোযোগী না হই তাহা হইলে নিশ্চয় অদূর ভবিষ্যতে, বোধ হয় অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যেই, গোজাতির সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী জাতিও ধরা-পৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যাইবে। এদেশে গো-জাতির অধঃপতনের সঙ্গে দুগ্ধ-সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে এবং কৃষির অবনতি ঘটিয়াছে। গো-জাতির অবনতির জন্য বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমান উভয়েই সমভাবে দায়ী। খাদ্য পানীয় এবং সুখ স্বচ্ছন্দতার উপর জীব মাত্রেরই শারীরিক উন্নতি নির্ভর করে। ইহা বুঝিয়া হিন্দু-

মুসলমান কেহই গো-রক্ষায় মনোযোগী নহেন। মুসলমান ও খৃষ্টানগণ গো-মাংস ভক্ষণ করিতেছেন তাই ভারতে গো-জাতি ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে বলিয়া অনেকে অনুযোগ করিয়া থাকেন। হিসাব করিলে দেখা যায় প্রতি বৎসর এই ভাবে যতগুলি গোহত্যা হয়, তাহা অপেক্ষা বহুগুণ বেশী গরু অন্য প্রকারে কালগ্রাসে পতিত হইয়া থাকে।

উপযুক্ত খাদ্য ও পরিচর্য্যার অভাবে দেশের গো-কুল দিন দিন দুর্ব্বল ও খর্ব্বাকৃতি হইতেছে এবং ইহাই নানা রোগের উদ্দীপক কারণ। প্রায় বার মাস কোনও না কোন স্থানে গো-মড়ক লাগিয়া থাকায় দেশে গো-জাতির সংখ্যা অসম্ভব রকম কমিয়া যাইতেছে। দশ বৎসর পূর্ব্বে যে গরুর মূল্য ২০৲ ছিল, এখন তাহা ৪০৲ টাকার কমে পাওয়া যায় না। উপরোক্ত কারণে দুধ-ঘিও দুর্ম্মূল্য হইয়াছে। আগে যে গাভীটী পাঁচ সের দুধ দিত, এখন তাহারই বক্না ⁄১ সেরের বেশী দুধ দেয় না।

ইউরোপ বা আমেরিকাবাসী গো-খাদক হইলেও তাহারা গো-পালন করিতে জানে। হিন্দু আমরা গাভী ও বৃষকে মাতৃ-পিতৃ-জ্ঞানে পূজা করিলেও মাতা পিতার মত যত্ন করি না—উপযুক্ত আহার ও সুপানীয় দেই না। দেশবাসী হিন্দু মুসলমান গো-জাতির প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া যদি পাশ্চাত্য দেশবাসীর ন্যায় গোজাতির সম্যক পরিচর্য্যা করেন এবং গোকুলের বংশ বৃদ্ধির চেষ্টায় সতত রত থাকেন, তা'হলে বঙ্গের পল্লীগ্রামে আবার গোদুগ্ধ এক টাকায় ৮।১০ সের পাওয়া অসম্ভব হয় না। পাশ্চাত্য দেশে আহারের নিমিত্ত প্রত্যহ অসংখ্য গোবধ হইলেও তথায় এখান অপেক্ষা দুগ্ধ সুলভ ও খাঁটী পাওয়া যায়। সে দেশের প্রত্যেক ব্যক্তি গড়ে তিন পোয়া দুধ খাইতে পায়। কিন্তু আমাদের গড়ে আধ ছটাকও পড়ে না। ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে পল্লীগ্রামে যথেষ্ট পরিমাণ গোচর ভূমি দেখা যাইত। অন্যান্য সম্প্রদায়ের ন্যায় আজকাল জমির মালিকগণও অর্থকেই পরমার্থ জ্ঞানে খামার বৃদ্ধির প্রয়াসে গোচর ভূমিগুলিকে যথাসম্ভব কৃষি ভূমিতে পরিণত করিতেছেন। কেহ বা গোচর ভূমি পত্তন দ্বারা আদায়ী নজরাণার বর্দ্ধিত পরিমাণ দর্শনে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া কর্ম্মচারীকে ধন্যবাদ দিয়া থাকেন।

বঙ্গের বাহিরে ভারতের প্রায় সর্ব্ব প্রদেশেই গরুর খাদ্যের চাষ হইয়া থাকে। বিহারের কোন কোন অংশে এবং যুক্ত প্রদেশের সর্ব্বাংশেই কৃষকগণ অন্যান্য ফসলের ন্যায় গোকুলের জন্য বাজ্‌রীর আবাদ করিয়া থাকে। বর্ষার পর যখন সমস্ত মাঠ আবাদ হইয়া যায় অথবা গ্রীষ্মকালের প্রখর রৌদ্রে যখন কোথাও ঘাস কুটা পাওয়ার উপায় থাকে না, সেই সময় ঐ কাঁচা অথবা সঞ্চিত শুষ্ক বাজ্‌রীর গাছ ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া খাওয়ান হয়। তাছাড়া, গম যবের ভূষি আদি তো থাকেই। বঙ্গের বাহিরে যে সব দরিদ্র লোকদের গরু আছে তাহারা প্রায় সকলেই পতিত জমি হইতে খুরপা দিয়া ঘাস ছিলিয়া আনিয়া গরুকে খাওয়ায়। বঙ্গের কয়টা দরিদ্র ব্যক্তি গরুর জন্য এতটা পরিশ্রম করিয়া থাকে? এখন গোচরণ ভূমির অভাব জন্য বঙ্গেও গো-খাদ্যের আবাদ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

গো-জাতির পানীয় সম্বন্ধেও একই কথা। অনেক গ্রামেই গরুর পানের জন্য সুপেয় জল নাই। কৃষকগণ প্রখর রৌদ্রে চারি পাঁচ ঘণ্টা হাল কর্ষণানন্তর পরিশ্রান্ত বলদগুলিকে জল খাওয়াইবার জন্য প্রায় এক আধ মাইল হাঁটাইয়া লইয়া যাইয়া তবে কোথাও একটু কর্দ্দমমিশ্রিত জলের সম্মুখে পৌছাইতে সক্ষম হয়। মানুষের খাদ্যের জন্য গোহত্যাই গো-জাতির সংখ্যা-হ্রাসের একমাত্র কারণ নয়—অল্পাহার এবং সুপানীয়ের অভাবেই গোমড়কে গো-জাতি ধ্বংস হইতেছে।

সরকার এখন প্রত্যেক জেলায় এক একটী পশু-চিকিৎসালয় রাখিতে জেলাবোর্ডগুলিকে বাধ্য করিয়াছেন। ভেটারীনারি সার্জ্জনগণ নিজ নিজ জেলার গো-মড়কে নজর রাখেন। কিন্তু এই ব্যবস্থাই কি গোরক্ষার পর্য্যাপ্ত ব্যবস্থা? জেলাবোর্ড বা ইউনিয়ন বোর্ডের কর্ত্তৃবর্গ গোচারণ-ভূমি রাখিয়া গোজনন জন্য ভাল বৃষের কোনরূপ ব্যবস্থা করিতে পারেন না কি? দেশবাসীর প্রতিনিধিগণ ব্যবস্থাপক সভার মারফতে কোনরূপ আইন করিয়া পল্লীগ্রামের প্রত্যেক মৌজায় গোচারণ মাঠ রাখিবার জন্য জমির মালিকগণকে বাধ্য করিতে পারেন না কি? দেশের নেতৃস্থানীয়গণ এখন রাজনীতির চর্চ্চায় বিভোর আছেন। সরকার এখন

ইঁহাদের লইয়া অতি-ব্যস্ত। এখন অবস্থা বুঝিয়া গো-সমস্যার ব্যবস্থা জনসাধারণেরই করা উচিত। ("মালদহ-সমাচার")

পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা

পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণের জন্য কলিকাতায় একটি সমিতি আছে। এই সমিতির কর্ম্মচারীও কম নহে। এই সব কর্ম্মচারীদের অধিকার কতকটা পুলিশেরই মত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা কলিকাতায় যত দেখা যায়, বোধ হয় তত আর কোথাও নহে। বলা বাহুল্য পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণের জন্য আইন আছে; সম্প্রতি সেই আইনের সংশোধন হইতেছে। কলিকাতা করপোরেশন বলিতেছেন,—পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণের অধিকার করপোরেশনকে দেওয়া হউক। গত ১১ই আগষ্ট করপোরেশনের সভায় এ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। রায় বাহাদুর ডাক্তার হরিধন দত্ত বলেন,—করপোরেশনের একটা পশুচিকিৎসা বিভাগ প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্য্যন্ত পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণ করিতে হইলে পশু-চিকিৎসার ব্যবস্থাও চাই। কিন্তু একটা কথা—কলিকাতা করপোরেশন আবার একটা নূতন কাজের ভার হাতে লইয়া সামলাইতে পারিবেন ত? রাস্তাগুলির সংস্কার জল সরবরাহ, আবর্জ্জনা পরিষ্কার প্রভৃতি একান্ত প্রয়োজনীয় কাজগুলিই আজ কাল স্থানে স্থানে ভাল চলিতেছে না বলিয়া মনে হইতেছে। এক সঙ্গে সহরের বহু রাস্তাই বে-মেরামত হইয়া পড়িয়াছে; স্থানে স্থানে আবর্জ্জনাও স্তূপে স্তূপে সজ্জিত থাকিতেছে। আর জল কষ্টের ত কথাই নাই। ইহার উপর আবার একটা গুরু দায়িত্বপূর্ণ নূতন কাজ হাতে লইয়া কি হইবে? তবে, এক হিসাবে পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণের ভার করপোরেশনের হাতে থাকাই উচিত। আমরা কলিকাতার গোয়ালাদের গরুর প্রতি নিষ্ঠুরতা লক্ষ্য করিয়াই ইহা বলিতেছি। কলিকাতার অনেক গোয়ালা কসাই অপেক্ষাও অধিক নিষ্ঠুর। যতদিন দুধ থাকে, ততদিন তাহারা অনেকে ফুকা দিয়া গরুর শেষ রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত শোষণ করিতে ছাড়ে না; দুধ ছাড়িলেই, তাহারা কেহ কেহ গরু-গুলিকে কসাইয়ের নিকট বেচিবার জন্য চেষ্টা করে, সুযোগ ঘটিলেই বেচিয়া ফেলে, নতুবা দুধহীন গরুগুলিকে খাইতে না দিয়া শুকাইয়া শুকাইয়া মারে। অবশ্য সব গোয়ালাই যে এমন নিষ্ঠুর তাহা আমরা বলিতেছি না; কিন্তু সন্ধান করিলে যে এমন নিষ্ঠুর গোয়ালাও অনেক পাওয়া যাইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সি-এস-পি-সি-এ অর্থাৎ কলিকাতার পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণের জন্য প্রতিষ্ঠিত সমিতি সকল গোয়ালা বাড়ীর যথোচিত খবর লইয়া থাকেন কি? কখনও কদাচিৎ একটা আধটা ফুকার মোকদ্দমা হইতে দেখা যায়। গোশালাগুলি করপোরেশনের শাসনাধিকারভুক্ত; সুতরাং অত্যাচারী গোয়ালাদের অত্যাচার নিবারণ করিতে হইলে, করপোরেশনের হাতেই এই ভার দেওয়া উচিত। (নোয়াখালী-হিতৈষী)

চাষ-আবাদে লাভাভাব

বর্ত্তমান সময়ে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ এত কমিয়া গিয়াছে কেন? অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের হস্তে সম্পূর্ণরূপে কৃষিকার্য্যের ভারার্পণ ইহার অন্যতম কারণ। সরকারের অমনোযোগিতাও এ বিষয়ে কম দায়ী নহে। উত্তরাধিকার আইনে এবং অন্য উপজীবিকা অভাবে একমাত্র কৃষি-কার্য্যাবলম্বনের ফলে চাষের জমি অতিশয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া অধিকতর লাভজনক চাষের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িতেছে। জমিতে উপযুক্ত পরিমাণ সার প্রয়োগের অভাবে জমির উৎপাদিকা শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে। এসম্বন্ধে এপর্য্যন্ত কোনও প্রণালীবদ্ধ চেষ্টা হয় নাই। বিনা ব্যয়ে জমির মাটী বিশ্লেষণ করিবার জন্য ঢাকা নগরে গভর্ণমেন্টের একটী ল্যাবরেটারী আছে। উহাতে মাটী পাঠান ত দূরের কথা মফঃস্বলের কৃষকগণ উহার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই অজ্ঞ। সরকারের কৃষি-প্রতিষ্ঠানগুলি সাক্ষাৎভাবে চাষীদের সংস্পর্শে না আসায় তাহাদের কোনই লাভ হইতেছে না। (টাঙ্গাইল-হিতৈষী)

ভারতে কলের লাঙ্গলে চাষ

(১)

ভারতে ট্রাক্টর যন্ত্র বা কলের লাঙ্গল ব্যবহার করা যায় কিনা সে সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে।

শিক্ষিত সাধারণের নিকটে অধুনা কৃষি-ব্যবসায় একটি অতি আদরের ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। অধিকাংশ শিক্ষিত যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লইয়া বা অন্যবিধ মার্কা লইয়া বাহির হইয়া আসিয়া সাংসারিক জ্ঞান-শূন্য, জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহে অক্ষম অবস্থায় স্বকীয় ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় দেখিতেছে। যদিও কৃষি-ব্যাপার বা ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ অশিক্ষিত ও অভিজ্ঞতা শূন্য তথাপি তাহারা এই সকল কারবারে মনোযোগ দিতে শিখিয়াছে ও এই সব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে সমুৎসুক হইয়াছে। ইহা সুলক্ষণ বটে। বিরাট ভারতের বিশাল উর্ব্বর কৃষি-ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে যদি ফসল প্রস্তুত করিয়া তোলা হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে যদি কৃষিজ মালকে দস্তুর অনুযায়ী ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যে পরিণত করিয়া উপযুক্ত সংস্থান ও ব্যবস্থা করিয়া লওয়া হয়, যদি উটজ শিল্পোন্নতির যথোচিত সুব্যবস্থা করা হয়, তা হইলে অদূর ভবিষ্যতে আজিকার দরিদ্র ভারত সোণার ভারতবর্ষে পরিণত হইবে, সারা জগতের মাঝে একটি ধন-সম্পদ্-সমৃদ্ধ দেশরূপে পরিগণিত হইবে। যাহা হউক, কৃষি-ব্যবসায়ে ইদানীং সকলের নজর পড়িয়াছে। এ দেশের কৃষি-ব্যবস্থাকে কেমন করিয়া উৎকৃষ্ট ও বর্ত্তমান সময়োপ-যোগী পন্থায় প্রকৃষ্ট লাভজনক করা যাইতে পারে নানা দিকে নানা ভাবে তাহাই আলোচিত হইতেছে। বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত আমরা গরুতে-টানা লাঙ্গলের চাষ কার্য্য চালাইতেছি, সুতরাং গোধনের উপর নির্ভর করিতেছি। অধুনা প্রশ্ন, উঠিয়াছে, আমরা কি কৃষি-ব্যাপারে গোধন লইয়াই তুষ্ট থাকিব অথবা তৎপরিবর্ত্তে কলের লাঙ্গল চালাইব? যদি মত হয়—তাহা সম্ভবপর কি? কলের লাঙ্গল ভারতের জমিতে গ্রহণযোগ্য ও কর্ম্মোপযোগী হইবে কি?

শ্রীযুক্ত চারু চন্দ্র সান্যাল একজন কৃষি-ব্যাপারে শিক্ষিত ও পারদর্শী ব্যক্তি। তিনি সম্প্রতি "ফরওয়ার্ড" নামক সমাচার-পত্রে ভারতে কলের লাঙ্গল ব্যবহারের কার্য্যকারিতা ও উপকারিতা সম্বন্ধে বিস্তারিত প্রবন্ধ ও দীর্ঘ আলোচনা প্রকাশ করিয়াছেন। সান্যাল মহাশয় কলের লাঙ্গল ব্যবহার সম্পর্কে নিম্ন বিষয়গুলির সমালোচনা করিয়াছেন।

১। কৃষিক্ষেত্রগুলিতে গড়পড়তায় ট্রাক্টর যন্ত্রের কার্য্য-কারিতা।

২। বাংলার মাটিতে উচ্চ ও নিম্নভূমির তারতম্যানুসারে ইহার উপকারিতা।

৩। কলের লাঙ্গল সাহায্যে চাষ বাংলা দেশের সাধারণ কৃষাণ সম্প্রদায়ের পক্ষে এবং ভদ্রশ্রেণীর পক্ষে উপযোগী কিনা।

৪। ভারতীয় জনসাধারণের পক্ষে কলের লাঙ্গল ব্যবহারের ফলাফল এবং ভারতীয় গোধনের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক।

কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে, লায়ালপুর নামক স্থানে কলের লাঙ্গল দিয়া ভূমিকর্ষণের পরীক্ষা করা হইয়াছিল। তাহাতে প্রকাশ ট্রাক্টর যন্ত্রের গুণানুসারে গড়ে একর প্রতি চাষের খরচ প্রায় ৫৲ টাকা হইতে ৬৲ টাকার মধ্যে এবং দৈনিক কর্ষিত ভূমির পরিমাণ প্রায় ৩ একর হইতে ৫ একর পর্য্যন্ত। গড়ে প্রতি কলের লাঙ্গলের স্থায়িত্ব বা জীবনকাল ৫ বৎসর হইয়া থাকে। ইহা ভূমির অবস্থা ও যন্ত্রের পরিচালন-গতির উপরে কতকটা নির্ভর করে। পঞ্জাব প্রদেশস্থ সরকারী কৃষি-বিভাগের মিঃ ষ্টুয়ার্ট ও জনসন এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, একটী ট্রাক্টরের গতি বেগের সংখ্যা প্রতি ১,০০০ বার। এই সংখ্যাকে অর্দ্ধেক করিয়া দিলে সম্ভবতঃ কলের স্থায়িত্ব সময় দীর্ঘতর হইতে পারে।

আমেরিকার ওহায়ো রাজ্যে ট্রাক্টর যন্ত্র সাহায্যে যারা চাষকার্য্য চালায় সেই সব কৃষাণদের কৃষি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। রিপোর্টটি খুব মূল্যবান। ইহা কলের লাঙ্গল সম্বন্ধীয় বহু অবশ্যজ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ।

অপর কতিপয় রাজ্যের তথ্য-সংগ্রহের দ্বারা অবধারিত হইয়াছে যে, গড়পড়তায় একটী ট্রাক্টর যন্ত্র ৫ হইতে ৭ বৎসর পর্য্যন্ত স্থায়ী হইতে পারে।

১৯২৪ সনের মে মাস পর্য্যন্ত ৪ বৎসর কাল ৬২টি কলের লাঙ্গল লইয়া অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করা হইয়াছিল। এই চারি বৎসর পরে পঞ্চম বর্ষে তাহাদের ৬১টি লাঙ্গল বা মূল

সংখ্যার শতকরা ৫০টি মাত্র অধুনা ব্যবহৃত হইতেছে। অপর ৩১টি লাঙ্গল বিভিন্ন সময়ে বিক্রয় করা হইয়াছিল, তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

	১ বৎসর	(প্রায়)	১টী	কলের	লাঙ্গল
১ হইতে	২ "	"	৪টী	"	"
	৩ "	"	৭টী	"	"
	৪ "	"	৮টী	"	"
	৫ "	"	১১টী	"	"

ওহায়ো রাজ্যে অনুসন্ধানের সময় বহু কৃষাণ মত প্রকাশ করিয়াছে, ঘোড়ার দ্বারা চাষ অপেক্ষা ট্রাক্টর যন্ত্র বা কলের লাঙ্গলে খরচ অধিক; কিন্তু কলের লাঙ্গল তাহারা পছন্দ করে এই কারণে যে, ইহার দ্বারা অল্পতর সময়ে কার্য্য-সম্পাদন হয় বলিয়া তাহাদের পক্ষে পরিশ্রমের যথেষ্ট লাঘব হইয়া থাকে।

("ত্রিপুরা হিতৈষী")

(২)

মিঃ কোরবেট কৃষি-ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ। তিনি কলের লাঙ্গল সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য ও খরচাদির বিস্তৃত আলোচনা করিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হয়, ভারতের কৃষিক্ষেত্রে সাধারণ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ট্রাক্টর যন্ত্রের উপযোগিতা অত্যল্প। যে সব স্থলে কর্ষিতব্য ভূমির পরিমাণ অতি বেশী, কিন্তু শ্রমিক দুষ্প্রাপ্য অথবা শ্রমিকের সংখ্যা অত্যল্প সেই সব জায়গায় কলের লাঙ্গল উপযোগী ও আবশ্যক হইতে পারে। পঞ্জাব প্রদেশে নূতন আবাদকৃত ভূমিতে, আসামের জঙ্গল-ময় ক্ষেত্রে, অথবা মধ্যপ্রদেশস্থ জমির জন্য (যেখানে এখন পর্য্যন্ত বাসিন্দা আমদানি করিবার প্রয়োজন) ট্রাক্টর যন্ত্র বা কলের লাঙ্গলের দরকার হইতে পারে।

মিঃ জ্যাক নামক একজন কৃষি-বিশেষজ্ঞ মালয়ের কৃষি-বিষয়ক পত্রে কলের লাঙ্গলের উপযোগিতা সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। * তা হতে বুঝা যায় ধান্য ক্ষেত্রের পক্ষে ট্রাক্টর বা কলের লাঙ্গল অপেক্ষা মহিষে টানা লাঙ্গলের উপযোগিতা অধিক। বাংলা দেশ ধান্য-কৃষি-প্রধান দেশ, সুতরাং বাংলার পক্ষেও এই মন্তব্য প্রযোজ্য।

ট্রাক্টর যন্ত্র কার্য্যকর হইবে কিনা প্রাথমিক অবস্থায় এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। কিন্তু এক কথায় এই প্রশ্নের মীমাংসা করা সম্ভবপর নয়; শুধু হাঁ অথবা শুধু না বলিয়া ইহার উত্তর দেওয়া যায় না। কারণ কলের লাঙ্গল ব্যবহারের পরীক্ষায় আজ পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন রূপ ফল পাওয়া গিয়াছে।

ভারতের কৃষি-ক্ষেত্রে কলের লাঙ্গল চালাইবার পক্ষে কোনরূপ স্থায়ী, স্বাভাবিক, ক্ষেত্রজ বাধা-বিপত্তির সম্ভাবনা নাই সত্য; কিন্তু ভারতীয় কৃষাণের ইদানীন্তন অবস্থা যা, তাহাতে বর্ত্তমানে ও নিকট ভবিষ্যতে যথেষ্ট প্রতিবন্ধক আছে। প্রথম নম্বরের প্রতিবন্ধক নিরক্ষর কৃষক সম্প্রদায়ের শিক্ষার এবং যান্ত্রিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার একান্ত অভাব।

ভারতে বর্ত্তমান অবস্থায় কলের লাঙ্গল বা অপরবিধ যান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে হইলে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। সরকারী কৃষি-বিভাগ ও কো-অপারেটিভ বা সমবায় বিভাগের সহকারিতায় নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সমাধান করিয়া লওয়া আবশ্যক।

(১) কৃষাণদিগকে উপযুক্ত ড্রাইভার বা চালক এবং মিস্ত্রির কার্য্য শিক্ষা দান করিবার উচিত ব্যবস্থা।

(২) কল ভাঙ্গিয়া গেলে মেরামত করিবার জন্য অংশ-গুলি উচিত দরে পাইবার ব্যবস্থা।

(৩) জমি ও ফসলের অবস্থানুসারে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর কলের লাঙ্গলের উপযোগিতা। ("আলোক")

নিউ ইয়র্কের তুলার বাজার

শ্রীপ্রভাতকুমার ব্যানার্জী, সীতাবল্‌দী, নাগপুর

আমেরিকার নিউইয়র্কে তুলার দর এত কমিয়া গিয়াছে যে, গত ১৯২১ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাস হইতে আজ পর্য্যন্ত এত কম কখনও হয় নাই। ইহার কারণ আমেরিকায় কৃষির উন্নতি। আমেরিকাবাসী তাহাদের জমি বৈজ্ঞানিক উপায় দ্বারা এত উর্ব্বর করিয়া ফেলিয়াছে যে, তাহাদের সহিত টক্কর দেওয়া ভারতবাসীর পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। ইহার ফলে ভারতীয় কৃষকদের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইবে।

আজকাল সর্ব্বত্র মজুর পাওয়া সহজ নহে। যদি বা পাওয়া যায়, তাহারা দৈনিক মজুরী বেশী লয়। ইহাতে তুলা জন্মাইতে খরচ বেশী পড়ে। এদিকে আমেরিকায় দর কমিয়া যাওয়ায় ভারতীয় তুলার দর স্বাভাবিক ভাবে কমিয়া যাইবে; কারণ নিউইয়র্কের তুলার দরের নামা-উঠার সঙ্গে সঙ্গে জগতের সকল স্থানের তুলার বাজারের দর নামিতে উঠিতে থাকে। তুলার ব্যবসায়ীদের যাহাই হউক্ না কেন, কৃষকদের দুরবস্থা অনিবার্য্য। যদি আমেরিকার তুলা দৈব ঘটনা দ্বারা নষ্ট না হইয়া যায়, তাহা হইলে এ বৎসর ভারতবর্ষের তুলার বাজারের শোচনীয় অবস্থা হইবে।

আমেরিকায় গত বৎসরের ৩৬ লক্ষ তুলার গাঁট অবিক্রী ভাবে মজুত আছে। এদিকে আমেরিকান এগ্রিকাল্‌চর্‌্যাল্ ব্যুরোর হালের রিপোর্টে প্রকাশ, এ বৎসর ১,৫৮,১০,০০০ (এক কোটী আটান্ন লক্ষ দশ হাজার) তুলার গাঁট হইবার নির্ঘাত সম্ভাবনা। এখনও গাছ হইতে কাপাস তুলিবার সময় আছে। তজ্জন্য আরও প্রায় ৪,০০,০০০ তুলায় গাঁট হইবার সম্ভাবনা। তাহা হইলে মোটামুটি ভাবে প্রায় ২,০০,০০,০০০ (দুই কোটি) তুলার গাঁট হইবার সম্ভাবনা। ইয়োরোপ ভারতবর্ষ হইতে খুব কম তুলা কিনিবে; আমেরিকা হইতে বেশী কিনিবে। ভারতবর্ষের তুলা অপেক্ষা আমেরিকার তুলা আবার খুব ভাল। ভারতবর্ষের তুলার চাহিদা বেশী না হইলে, বাজার দর সকল সময়েই নরম থাকিবে।

জীবন-বীমায় "অ্যাকচুয়ারি"র কাজ

শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র প্যাল, এম, এ, ইন্‌শিওর্‌্যান্স এজেন্ট, কুমিল্লা

জীবন বীমা বিজ্ঞানে একদল বিশেষজ্ঞ আছেন ইংরেজিতে তাঁহাদিগকে "অ্যাকচুয়ারি" বলা হয়। জীবন বীমা আফিসের চাঁদার হার সচরাচর তাঁহারাই নির্ণয় করিয়া থাকেন। এই হার নিরূপণ সহজ ব্যাপার নহে। ইহা করিতে অনেক প্রকার জটিল গণনা করিতে হয়। তবে এই সম্বন্ধে সকলেরই একটা মোটামুটি জ্ঞান থাকা দরকার। এই প্রবন্ধে তাহারই একটু আভাষ দিতেছি।

মনে করুন "যমুনা" নামক বীমা কোম্পানীতে ৩৫ বৎসর বয়সের এক হাজার যুবক বীমা করিতেছে। অবশ্য কোনো কোম্পানীতে শুধু ৩৫ বৎসর বয়সের লোকই বীমা করে না, নানা বয়সের লোকই করিয়া থাকে। তবে ব্যাপারটা সহজে বুঝিবার জন্য এখানে শুধু এক বয়সের লোকের কথাই ধরা হইতেছে। এক হাজার যুবক আমি ইচ্ছা করিয়াই বলিয়াছি, কম বলি নাই; কারণ সংখ্যা

খুব বেশী না হইলে গড় ঠিক হয় না। পাঁচ জন যুবকের মধ্যে আগামী বৎসর কত জন মরিবে বলা চলে না। কিন্তু ৫০০০ যুবকের মধ্যে কত জন মরিবে তাহা মৃত্যুর হার থেকে কষিয়া বলিলে খুব বেশী ভুল হয় না।

যাক্, বলিতেছিলাম এই ১০০০ যুবক "যমুনা"তে বীমা করিতেছে। ধরুন তাহাদের প্রত্যেকেরই বীমার পরিমাণ এক হাজার টাকা, এবং তাহারা প্রতি বৎসরের প্রথম দিনে একটা নির্দ্দিষ্ট চাঁদা দিবে। এই চাঁদার পরিমাণ কত তাহাই নির্দ্দেশ করিতে হইবে। যদি এক বৎসরের চাঁদা দিয়াই কেহ মরিয়া যায় তবে তাহাকে ত আর দিতে হইবেই না, অধিকন্তু, বীমা-কোম্পানী তাহার ওয়ারিশকে তৎক্ষণাৎ ১০০০৲ টাকা দিতে বাধ্য। সুতরাং পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে, এই চাঁদার হার নিরূপণ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমেই এই যুবকদের মধ্যে মৃত্যুর হার কত তাহা অনুমান করিয়া লইতে হইবে। অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয় প্রভৃতি বৎসরে কত কত করিয়া যুবক মরিবার সম্ভাবনা তাহা আন্দাজ করা আবশ্যক। যদি অনুমান করি যে, প্রথম বৎসরে ১০ জন, দ্বিতীয় বৎসরে ১১ জন, তৃতীয় বৎসরে ১২ জন ইত্যাদি হারে মরিবে, তাহা হইলেই চাঁদার হার নির্দ্ধারণ করা সম্ভবপর হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে চাঁদার হার নির্ণয় করিতে হইলে প্রথমেই আমাদিগকে মৃত্যু-সংখ্যার একটা হার অনুমান করিয়া লইতে হইবে। সাধারণতঃ দেশের জন্ম-মৃত্যুর হার থেকে মৃত্যুর হারের তালিকা প্রস্তুত করা হয়। বীমা কোম্পানী ২৫।৩০ বৎসর কাজ করিলে তাদের অভিজ্ঞতা থেকেও তালিকা প্রস্তুত করা যায় এবং এই তালিকার উপরেই বেশী নির্ভর করা চলে। মোটের উপর মৃত্যুর হারের একটা তালিকা চাই যাহা অবলম্বন করিয়া চাঁদার হার নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

মৃত্যুর হার যদি ঠিক হইল তাহা হইলে আমরা মোটামুটি বুঝিতে পারিব এই ১ হাজার যুবকের মধ্যে কতজন লোকের চাঁদা আসিয়া প্রতি বৎসর কোম্পানীতে জমা হইবে। ব্যাপারটা সহজবোধ্য করিবার নিমিত্ত এখানে আমি ধরিয়া লইতেছি যে, আমাদের এই যুবকগণ যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে ততদিন সকলেই চাঁদা দিবে। কেহই এই কোম্পানী হইতে নাম কাটাইয়া লইবে না। এক্ষণে এই যে টাকাগুলি বৎসর বৎসর আসিয়া জমা হইতেছে তাহা সুদে বাড়াইতে হইবে। সুতরাং চাঁদার হার নির্ণয় করিতে যাইয়া দ্বিতীয়তঃ আমাদিগকে দেখিতে হইবে, কত সুদে টাকাগুলি খাটাইতে পারা যাইবে। তারপরে বীমা আফিস চালাইবার খরচ আছে। প্রথমতঃ, দালাল নিযুক্ত করিয়া লোককে বীমার উপকারিতা বুঝাইয়া দিতে হয়। তাহাদের কমিশন, অফিসের কর্ম্মচারীদের বেতন, নানাবিধ চিঠিপত্রের বাবদ খরচ ইত্যাদি অনেক প্রকার খরচ আছে। চাঁদার হার নির্ণয় করিবার কালে সর্ব্বশেষে অ্যাকচুয়ারিকে ইহাও দেখিতে হইবে যে, যে সকল টাকা চাঁদারূপে আসিয়া আফিসে জমা হইবে তাহার শতকরা কত অংশ খরচ বাবদ চলিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

তাহা হইলে দেখা গেল চাঁদার হারের তালিকা প্রস্তুত করিতে মোটের উপর অ্যাকচুয়ারিকে তিনটি বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখিতে হয়—(১) মৃত্যুর হারের তালিকা, (২) উপার্জ্জিত সুদ এবং (৩) আফিসের ব্যয়।

এইরূপে চাঁদার হারের তালিকা প্রস্তুত হইলে প্রতি বৎসর অনেক লোক ঐ তালিকা অনুযায়ী চাঁদা দিয়া বীমা কোম্পানীতে ভর্ত্তি হয়। এভাবে বৎসরের পর বৎসর আফিসে কাজ চলিতে থাকে। তারপরে সাধারণতঃ পাঁচ পাঁচ বৎসর অন্তর অ্যাকচুয়ারি কোম্পানীর কাগজ-পত্র খতাইয়া দেখেন তাঁহার অনুমান বা নির্দ্দেশ মত কাজ চলিতেছে কিনা। অর্থাৎ ৫ বৎসর অন্তর তিনি হিসাব করিয়া দেখেন মৃত্যুর হারের যে তালিকা অবলম্বন করিয়া তিনি চাঁদার হার নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন বস্তুতঃ কোম্পানীতে মৃত্যুর হার সে ভাবেই চলিতেছে কি না। যদি মৃত্যু-সংখ্যা কিছু কম হইয়া থাকে তাহা হইলে কোম্পানী এইখানে কতক টাকা লাভ করিয়াছে, বেশী হইয়া থাকিলে লোকসান দিয়াছে। তারপরে তিনি দেখেন যে, সুদের হার তিনি যাহা অনুমান করিয়াছিলেন কোম্পানী বস্তুতই সেই হারে সুদ উপার্জ্জন করিয়াছে কি না। আফিসের খরচের বেলাও সেই ভাবে খতাইয়া দেখেন—চাঁদার শতকরা যত টাকা খরচ হইবে বলিয়া তিনি ভাবিয়া-

ছিলেন বস্তুতঃ তাহার চেয়ে বেশী কিংবা কম হইয়াছে। এই ভাবে পাঁচ বৎসর পর পর তিনি কাগজপত্র খতাইয়া কোম্পানীর লাভ-লোকসান বাহির করেন। লাভ হইয়া থাকিলে কি ভাবে লাভের টাকা বণ্টন করিয়া দিতে হইবে সে বিষয়ে কোম্পানীকে বলিয়া দেন। পক্ষান্তরে লোকসান হইয়া থাকিলে কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে সে বিষয়েও পরামর্শ দেন। মোটের উপর এই ভাবে জীবন-বীমা আফিসের কাজ চলিয়া থাকে।

অনেকগুলি বৃটিশ এবং কয়েকটি আমেরিকান কোম্পানী আজকাল আমাদের দেশে পুরা দমে জীবন-বীমার ব্যবসা চালাইতেছেন। আমরা এদেশীয়গণ ইহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া এই ব্যবসায়ে সফলকাম হইতে পারিব কি না এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। জীবনবীমা আফিস সুচারুরূপে চালাইতে হইলে উপরে লিখিত ঐ তিনটি বিষয়েই আমাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত।

প্রথমতঃ ধরুন মৃত্যুর হার। বিলাতী কোম্পানী হইলেই তাহাতে মৃত্যুর হার কম হইবে এবং দেশীয় হইলেই বেশী হইবে এমন কোন নিয়ম নাই। বীমার আবেদন গ্রহণ করার কালে যে কোম্পানী—দেশীই হউক কি বিদেশীয় হউক—আবেদনকারীকে ডাক্তার দ্বারা ভালরূপে পরীক্ষা করাইয়া লইবে এবং আবেদনকারীর পরিবারের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ভাল করিয়া খোঁজ লইয়া বীমা স্বীকার করিবে তাহারই মৃত্যু-সংখ্যা কম হইবে। ইহা ইচ্ছা করিলে আমরা অনায়াসেই করিতে পারি।

দ্বিতীয়তঃ—উপার্জ্জিত সুদ। এ বিষয়ে একটুকু কথা আছে। বীমা কোম্পানীর পরিচালকগণ বীমার তহবিলের টাকা লইয়া ছিনিমিনি খেলিতে পারেন না। বীমার মূল নীতিই এই যে, অধিক সুদের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া এমন জায়গায় বীমার টাকা গচ্ছিত রাখিতে হইবে যেখানে ইহা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা না থাকে। অকালমৃত্যু হইলে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার ভরণ-পোষণের নিমিত্ত অথবা বাঁচিয়া থাকিলে বৃদ্ধ কালের সম্বলের জন্য লোকে বীমা করিয়া থাকে। সুতরাং এই টাকা যাহাতে নষ্ট না হইতে পারে ইহাই সর্ব্ব-প্রথমে দেখিতে হইবে। সাধারণতঃ দেশীয় কোম্পানীর বীমার টাকা গবর্ণমেণ্টকে অথবা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন প্রভৃতিকে ধার দেওয়া হয়। বীমাকারিগণ নিজেরাও অনেক টাকা ধার নেন। মর্টগেজ (বন্ধক) রাখিয়া ধার দেওয়াও চলে। বিলাতী কোম্পানী তাদের টাকা কোথায় কোথায় রাখে তাহা ঠিক-ঠিক জানা যায় না। তবে কথা এই যে, আমাদের ভারত গবর্ণমেণ্ট অথবা ভারতীয় মিউনিসিপ্যালিটি যত সুদ দিয়া থাকেন বিলাতী গবর্ণমেণ্ট ততটা নিশ্চয়ই দেন না। সুদের হার আমার মনে হয় ভারতেই বেশী। অবশ্য ব্যবসা করিতে গেলে বিলাতে বেশী লাভবান হওয়া যাইতে পারে বটে, তবে তাহাতে লোকসানের আশঙ্কাও সমধিক। কাজেই মোটের উপর এ কথা বলা চলে যে, লোকসানের আশঙ্কা যথাসম্ভব কমাইয়া বিলাতের চেয়ে ভারতেই বেশী সুদ পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এ বিষয়ে বিলাতী কোম্পানী ভারতীয় কোম্পানীর চেয়ে বেশী সুবিধা ভোগ করে না।

সর্ব্বশেষে দেখিতে হইবে আফিসের ব্যয়। সাধারণতঃ আফিসগৃহ, গৃহের আসবাব, কর্ম্মচারীদের বেতন, দালালের কমিশন ইত্যাদি বিষয়ে বিলাতী কোম্পানী একটু বেশীই খরচ করিয়া থাকে। অধিকাংশ বিলাতী কোম্পানীই এদেশে এজেন্সীর মারফতে কাজ করে। ইহাতেও খরচ কিছু বেশী পড়ে। তথাপি হিসাবে দেখা যায়, মোটের উপর বিলাতী কোম্পানীর খরচের হার কিছু কম। ইহা কি করিয়া হয় বলিতেছি। বিলাতী কোম্পানীগুলি সাধারণতঃ বেশী পরিমাণ কাজ পাইয়া থাকে। অবশ্য ২।১টী ভারতীয় কোম্পানী আছে, যেমন "ওরিয়েণ্ট্যাল্", যাহার কাজও খুব বেশী হয়। কিন্তু অধিকাংশ ভারতীয় কোম্পানী বেশী কাজ পায় না। তারপরে আমাদের দেশীয় কোম্পানীগুলি যে সকল বীমা পায় তাদের বেশীর ভাগই অল্প টাকার। মোটা টাকার বীমাগুলি বিলাতী কোম্পানীদের একচেটিয়া বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মনে করুন "আল্‌ফা" কোম্পানীতে কোন ভদ্রলোক দশহাজার টাকার একটি বীমা করিল এবং আমাদের "যমুনা" কোম্পানীতে দশজন ভদ্রলোক প্রত্যেকে

এক হাজার টাকা করিয়া দশ হাজার টাকার বীমা করিল। উভয় কোম্পানীই প্রতি বৎসর এই বাবদ সমপরিমাণ চাঁদা পাইতেছে। কিন্তু "যমুনা" কোম্পানী খরচ করিতেছে অনেক বেশী। "আল্‌ফা" কোম্পানী ডাক্তারের ফিস্ একবার দিয়াছে, যমুনা তাহা দশবার দিয়াছে। আল্‌ফা যেখানে একখানা চিঠি লিখে যমুনাকে সেই জায়গায় দশখানা লিখিতে হয়। আপনারা জানেন বীমা যতদিন চলিতে থাকে ততদিন পর্য্যন্ত বীমাকারীকে সচরাচর কোম্পানীর অনেক চিঠিই লিখিতে হয়। এইভাবে দেশীয় কোম্পানীর খরচ বেশী হইয়া যায়। তবে দেশের ধনবান ভদ্রমহোদয়গণ, যাঁহারা মোটা টাকার বীমা করিয়া থাকেন, তাঁহারা যদি এ বিষয় অবহিত হইয়া দেশীয় কোম্পানীতে বীমা করেন, তবে দেশীয় কোম্পানীগুলিও এ বিষয়ে বিলাতীদের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে।

মোটের উপর দেখা যাইতেছে যে, ইচ্ছা করিলে বিলাতের মতন আমরাও নিজেরা এদেশে জীবনবীমার ব্যবসা চালাইতে পারি। এ দেশের অবস্থা এই ব্যবসার পক্ষে প্রতিকূল ত নহেই বরং অনুকূল।

পল্লী-সেবা

(১)

দেশবন্ধু পল্লীসংস্কার-সমিতি, ধুলজোড়া কেন্দ্র

গত বৎসর আগষ্ট মাস হইতে এই কেন্দ্রে কাজ আরম্ভ হইয়াছে। এই কেন্দ্রের প্রধান কর্ম্মী শ্রীযুক্ত বাবু সুরেশ চন্দ্র মজুমদার মহাশয় এই কেন্দ্রে আসিয়া প্রথমতঃ ১২ খানি গ্রাম লইয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। এই সব গ্রামে ভদ্র লোকের সংখ্যা অতি কম, একরূপ নাই বলিলেও চলে। অধিবাসিবৃন্দের মধ্যে নমঃশূদ্র এবং মুসলমানই বেশী এবং শিক্ষার আবশ্যকতাও অনেকে বুঝে না। এক বৎসর ধরিয়া সুরেশবাবুর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে গ্রামবাসীরা শিক্ষার উপকারিতা কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়াছে। সেই জন্যই সকলে মিলিয়া ডুমুরশিয়া বাজারে একটী নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং চূড়ারগাতী বাজারে একটী মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। প্রায় ৩০০৲ টাকা খরচ করিয়া ডুমুরশিয়া বাজারে একখানা, টিনের ঘর করা হইয়াছে। এই ঘরেই নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাজ হইতেছে। এই বিদ্যালয় বেশ চলিতেছে; ছাত্র-সংখ্যা প্রায় ৪০ হইয়াছে। মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের জন্য চূড়ারগাতী বাজারের উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহটী মেরামত করা হইয়াছে এবং অন্যান্য আসবাব সব ঠিক করা হইতেছে।

বর্ত্তমানে এই বিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যা ৭৫। আশা করা যায়, শীঘ্রই ছাত্র-সংখ্যা ১০০ হইবে। বিদ্যালয়ের কার্য্য বেশ ভাল ভাবেই চলিতেছে। সাধারণে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। ২টা নৈশবিদ্যালয়ও হইয়াছে এবং বেশ ভাল ভাবেই চলিতেছে। ছাত্র-সংখ্যাও প্রায় ৪০ জন হইয়াছে। যদি কোনও রূপ বাধাবিঘ্ন না হয় তবে এই সব বিদ্যালয়ের সাহায্যে নমঃশূদ্র, মুসলমান, বাগদী প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর যে সব লোক বেশী অর্থব্যয় করিয়া লেখাপড়া করিতে পারে না, তাহারা অবসর সময়ে মোটামুটি লিখিতে ও পড়িতে অভ্যাস করিয়া তাহাদের নিজেদের কাজ চালাইতে পারিবে। সুরেশবাবুর পরিচর্য্যায় এবং সাধারণের চেষ্টায় বিদ্যালয়গুলি ধীরে ধীরে বেশ উন্নতির পথেই চলিয়াছে। সম্প্রতি চূড়ারগাতী স্কুলের সংলগ্ন অনুমান ১৵০ এক বিঘা জমি স্কুলের কার্য্যের জন্য জমা লওয়া হইয়াছে। এই সব জমির জন্য টাকা গ্রামবাসীরাই চাঁদা করিয়া দিয়াছেন। ছেলেদিগকে উন্নত প্রণালীতে কৃষিকার্য্য শিক্ষা দেওয়াই জমি লইবার উদ্দেশ্য। যশোহর

জেলা বোর্ড হইতে একটী বোর্ড মডেল স্কুলও শীঘ্রই এই কেন্দ্রের মধ্যে হইবে স্থির হইয়াছে। মাগুরা সার্কেলের স্কুল সমূহের সাব ইনস্পেক্টর বাবু সেজন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। এই কেন্দ্রের মধ্যে একটি পুস্তকালয়ও স্থাপিত হইয়াছে এবং কিছু কিছু ভাল বই আনাইয়া মধ্যে মধ্যে সকলকে তাহা পাঠ করিয়া শুনান হয়।

সাধারণের স্বাস্থ্য বিষয়েও বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইতেছে। গ্রামবাসীরা যাহাতে ম্যালেরিয়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পায় সে জন্য সকলের চেষ্টায় একটি ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি স্থাপন করা হইয়াছে। সমিতিতেই ঔষধপত্র আনাইয়া বিনা মূল্যে রোগীদিগকে ঔষধ দেওয়া হইতেছে। বিনোদপুরের ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু গিরিজা ভূষণ মজুমদার মহাশয় সে জন্য আমাদিগকে মধ্যে মধ্যে সাহায্য করিয়া থাকেন। এই বৎসর প্রায় ৫৩০ জন রোগী সমিতি হইতে বিনা মূল্যে ঔষধ লইয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছে। গত জানুয়ারী মাস হইতে সমিতি যশোহর জেলা বোর্ডের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াছে এবং জেলা বোর্ড এই সমিতির কাজের জন্য ১৯০৲ দান করিয়াছেন। সমিতির কাজও বেশ ভালই চলিতেছে। সম্প্রতি মাগুরা মহকুমার সমবায় সমিতির অডিটর মহোদয় সমিতির কার্য্যাদি দেখিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন এবং তিনি এই সমিতি কলিকাতা কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতির সহিত যুক্ত করিতে উপদেশ দিয়াছেন। শীঘ্রই সে চেষ্টা করা হইবে এবং তাহাদের সাহায্য পাইলে এই সমিতির কাজ আরও ভাল ভাবে চলিবে আশা করা যায়। গত মার্চ্চ ও এপ্রেল মাসে এই কেন্দ্রে ভীষণ কলেরা হয়। সেই সময় সমিতির স্বেচ্ছাসেবকগণ বিশেষ কৃতিত্বের সহিত রোগীর দেখা শুনা করা, তাহাদের সেবা শুশ্রূষা করা এবং ঔষধ দেওয়া প্রভৃতি কার্য্য করিয়া সাধারণের বিশেষ উপকারসাধন করিয়াছেন। তাহাতে সাধারণে এই সমিতির উপকারিতা বুঝিয়া ইহার কাজ যাহাতে বেশ স্থায়ী ভাবে চলে সে বিষয়ে বিশেষ যত্ন লইতেছে।

এই কেন্দ্রে চরকা ও খদ্দরের কাজ বেশী হয় নাই। ১০।১২টী মাত্র চরকায় অল্প অল্প সূতা কাটা হয়। তবে খদ্দর অনেকে পরে। সে জন্য সুরেশ বাবু খাদি প্রতিষ্ঠান এবং অভয় আশ্রম হইতে খদ্দর আনাইয়া ফেরি করিয়া থাকেন এবং সাধারণে যাহাতে খদ্দর পায় সে ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কেন্দ্রের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী, সুতরাং কৃষি-কার্য্যাদি সম্বন্ধে আর নূতন করিয়া প্রচার করিবার আবশ্যকতা নাই। তবে যাহাতে আলুর চাষ এদিকে প্রচলন করা যায় সেই বিষয়ে চেষ্টা করা হইতেছে। কুটীর শিল্পের মধ্যে বেতের ব্যাগ, বাক্স, প্রভৃতি তৈয়ারী করা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এখানে ভাল বেত পাওয়া যায় না বলিয়াই এ কাজে তত লাভ হইতেছে না। বেশী লোক কাজ শিক্ষা করিলে অন্যত্র হইতে বেত আনিয়া কাজ একটু বিস্তৃত ভাবে করিবার ইচ্ছা আছে।

সামাজিক ও নৈতিক উন্নতির জন্যও বিশেষরূপ চেষ্টা হইতেছে। অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ দূর করিবার জন্য সুরেশ বাবু নিজে সকলের সঙ্গে মেলা মেশা করিয়া অস্পৃশ্যতা ও ভেদ-নীতির কুফল সকলকে বুঝাইতেছেন। এইরূপ ভাবে জাতিভেদ দূর হইলে আমাদের একতাবদ্ধ ভাবে কাজ করিবার শক্তি বৃদ্ধি পাইবে এবং পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ কমিয়া যাইবে ইত্যাদি নানারূপ ভাবে সুরেশ বাবু সকলের মধ্যে এই মিলন মন্ত্র প্রচার করিতেছেন। এইসব প্রচারের ফলে এই অল্প সময়ের মধ্যেই পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ভাব যে কমিয়া গিয়াছে তাহা বেশ উপলব্ধি করা যায় এবং আশা করা যায় যে, এই ভাবে কাজ করিতে পারিলে অদূর ভবিষ্যতে সকলের মধ্যে বিশেষ প্রীতির ভাব দৃষ্ট হইবে। এই কেন্দ্রে হিন্দু-মুসলমানের বর্ত্তমান বিরোধ আদৌ দেখা যায় নাই।

এই সব বিষয় প্রচারের জন্য সাধারণ লোকদের লইয়া মধ্যে মধ্যে সভা করা হয় এবং সেই সব সভাতে এই সব বিষয় আলোচনা করা হয়। দেশবন্ধু পল্লীসংস্কার সমিতির কলিকাতা কেন্দ্র হইতেও মধ্যে মধ্যে প্রচারক আসিয়া এই সব বিষয় প্রচার করিয়া থাকেন। গত ডিসেম্বর মাসে সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার মুখোপাধ্যায় ম্যাজিক লণ্ঠন সাহায্যে এই সব বিষয় সাধারণকে বিশদ ভাবে বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছেন।

শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ
সম্পাদক।

(২)

বিশ্বভারতীর পল্লীসেবা

আমাদের দেশে, বিশেষ ভাবে পল্লীগুলিতে, দাইদিগের অজ্ঞতার জন্য প্রতি বৎসর শত শত শিশু এবং প্রসূতি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। গভর্ণমেণ্ট প্রত্যেক জিলার হেল্‌থ অফিসারের সহায়তায় গ্রামের অশিক্ষিত দাইদিগকে ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য গ্রামে গ্রামে কেন্দ্র খুলিতেছেন। গত ৬ই অক্টোবর বিশ্বভারতীর পল্লীসেবা বিভাগের তত্ত্বাবধানে ঐরূপ একটী ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষার কেন্দ্র শ্রীনিকেতনে খোলা হইয়াছে। প্রথম দিন নিকটস্থ পল্লীগুলি হইতে ১০ জন দাই শিক্ষালাভের জন্য শ্রীমিকেতনে উপস্থিত হইয়াছিল। ঐ দিবস বীরভূম জিলার হেল্‌থ অফিসার ডাঃ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয় শ্রীনিকেতমে উপস্থিত হইয়া পল্লীসেবা বিভাগের ডাঃ শ্রীপ্রফুল্ল কমল রায় এম, বি মহাশয়ের সহিত ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা বিষয়ে পরামর্শ করিয়া যান। স্থির হইয়াছে যে, সপ্তাহে ২ দিন করিয়া দাইদিগকে ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইবে, এবং শিক্ষাকার্য্য শেষ হইলে দাইদিগের প্রত্যেককে তাহাদের কার্য্যের জন্য উপযুক্ত সরঞ্জামে পূর্ণ একটী করিয়া পুরস্কার গভর্ণমেণ্ট হইতে দেওয়া হইবে। তদনুযায়ী শিক্ষাদানের কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে।

নৈশ বিদ্যালয় :—অবনত শ্রেণীর বালক-বালিকাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য পল্লীসেবাবিভাগ বর্ত্তমানে ১০টী নৈশ বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেছেন। গতমাসে বোলপুরের শ্রমজীবিগণ এবং মালদহ ও বল্লভপুরের বালকবালিকাদিগকে লইয়া তিনটি নূতন নৈশ বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সকল বালকবালিকারা যাহাতে অল্প-বিস্তর সব্জী বাগানের কার্য্য ও নেওয়ার তৈরীর কার্য্য শিক্ষা করিতে পারে, সে বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে। পারিপার্শ্বিক কুসংসর্গ ও অনাচারের হাত হইতে যাহাতে নিজেদের বাঁচাইয়া চলিতে পারে, সে সম্বন্ধে ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে বালকদিগকে উপদেশ দেওয়া হয়। এইরূপ ভাবে শিক্ষা দেওয়ার ফলে বালকদিগের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের লক্ষণ দেখা দিয়াছে।

স্বাস্থ্যোন্নতি সমিতি :—বর্ত্তমানে ১০টী স্বাস্থ্যোন্নতি সমিতি পল্লীসেবা বিভাগের তত্ত্বাবধানে সুচারুরূপে পরিচালিত হইতেছে। উক্ত ১০টী সমিতির মধ্যে ৮টি সমিতি গভর্ণমেণ্ট কো-অপারেটিভ এবং নিয়মানুযায়ী রেজেষ্ট্রী করা হইয়াছে। সমিতির সভ্যগণ গত আগষ্ট মাস হইতে ম্যালেরিয়া নিবারণের ব্যবস্থা বিশেষ শৃঙ্খলার সহিত করিতেছে। গ্রামের প্রত্যেক প্লীহারোগীকে সপ্তাহে ১০ গ্রেণ করিয়া কুইনাইন প্রদান করা হইতেছে এবং যাবতীয় জঙ্গল ও আবর্জ্জনা পরিষ্কার করা হইতেছে। গ্রামের অপ্রয়োজনীয় জল নালা কাটিয়া গ্রামের বাহির করিয়া দেওয়া হইতেছে। গ্রামের পুষ্করিণী ও ডোবাগুলি পরিষ্কার করিয়া নিয়মিতরূপে কেরোসিন তৈল প্রদান করা হইতেছে। আমরা আশা করি গ্রামবাসীদিগের কার্য্য-নৈপুণ্যে ও নিষ্ঠায় এ গ্রামে এ বৎসর ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব কম হইবে।

হিমালয়ের আর্থিক কথা

শ্রীসুধাকান্ত দে, এম্, এ, বি, এল

১৯শে জুন, ১৯২৬—মরিয়াণী হইতে সোজা কারসিয়াঙ অভিমুখে যাত্রা করিলাম। বলা বাহুল্য, ট্রেণ বদলাইতে হইল দুইবার। এক, আমিনগাঁও-পাণ্ডুর মধ্যগত ব্রহ্মপুত্রের বিস্তারটুকু। এই জলভাগের উপর পুল বসাইবার কল্পনা বহুদিন হইতে চলিতেছে। সারাঘাটে যদি পুল বসিতে পারে, এখানে বসাও তেমন-কিছু অসম্ভব নহে। যদি ডিব্রু-সদিয়া রেল হইত তবে এতদিনে দেখিতাম ব্রহ্মপুত্রের বুকের উপর দিয়া গড়গড় করিয়া গাড়ী ছুটিতেছে। কারণ ডিব্রু-সদিয়াকে পয়সার জন্য ভাবিতে হয় না। শুনিয়াছি, পৃথিবীর মধ্যে উহার মুনাফা দ্বিতীয়। প্রতিবেশী হইলেও আসাম-বেঙ্গলের সৌভাগ্য এরূপ নহে। ইহার যে একটা পাহাড়-পথ আছে সেটা কোম্পানীকে রীতিমত সন্ত্রস্ত করিয়া রাখে। কখন যে কোথায় পাহাড় ধসিয়া লাইন বন্ধ করিয়া রাখিবে, বিশেষ বর্ষার সময়, কেহ বলিতে পারে না। ঐ পথে পাহাড় কাটিয়া ৩২টা ছোট বড় সুড়ঙ্গ তৈরী হইয়াছিল রেল চালাইবার জন্য। সুতরাং সেইগুলিরও খবরদারি করিতে হয়। ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুচবিহার, শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থান হইতে উত্তর আসাম যাইবার ঐ পথ। এই সব কারণে, ব্রহ্মপুত্রের উপর পুল করা আসাম-বেঙ্গলের পক্ষে ঘটিয়া উঠে নাই।

দ্বিতীয়বার ট্রেণ বদলাইলাম শিলিগুড়িতে। আসাম যাত্রীরা বরাবর ট্রেণ পায়—পার্ব্বতীপুরে বদলাইতে হয় না। আজকাল অবশ্য ট্রেণের নয়া ধারা আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতাগামীরা শিলিগুড়ির গাড়ী ধরিয়া হুট্ করিয়া বরাবর কলিকাতায় যাইতে পারে।

শিলিগুড়ি হইতে এক গার্ড সাহেব বার বার আলাপ জমাইতে চেষ্টা করিল। পরে স্পষ্টই বলিল, "মহাশয় দেখুন কল্য হইতে আমি এক বিন্দু কিছু মুখে দিতে পারি নাই। তৃষ্ণায় আমার জিহ্বা শুকাইয়া গিয়াছে। আপনি আমাকে দয়া করিয়া একটা টাকা দিন না।"

লোকটা বুড়া হইয়াছে বেশ। ভ্রূ পর্য্যন্ত পাকিয়া গিয়াছে। কিন্তু দিব্য সুস্থ-সবল চেহারা। বকশীশের লোভে সে বলিতে লাগিল, "মহাশয়! আজকাল দিনকাল সব বদলাইয়া যাইতেছে। ভারতবর্ষের লোক দিনে দিনে সেয়ানা হইয়া উঠিতেছে। তাহারা আজকাল নিজের হাতে শাসন-ভার লইতে চাহে। আমি বলিতেছি না ইহা মন্দ; কিন্তু আমি বলিতেছি ইহাতে আমাদের আর্থিক বিস্তর ক্ষতি ও অসুবিধা হইতেছে।

"আজ ২০ বৎসর আমি ভারতবর্ষে গার্ডের কাজ করিতেছি। ইহার পূর্ব্বে সৈন্যবিভাগে কাজ লইয়া আফ্রিকায় গিয়াছিলাম। তখন যৌবন কাল। আমি পরম উৎসাহে আমার রাজার জন্য, আমার দেশের জন্য লড়িয়াছিলাম। এই দেখুন আমার টুপিতে এখনো সযত্নে সম্মান-চিহ্নটা রক্ষা করিতেছি। বুয়ররা খুব যুদ্ধ করিয়াছিল বটে।

"যুদ্ধের পর কর্ত্তারা সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে আফ্রিকাতে একটা গার্ডের কাজ জোটাইয়া দিল। অতঃপর আমি ভারতবর্ষে আসিলাম। সেই হইতে এ দেশে রহিয়াছি। কদাচিৎ কখনো দেশে যাই।

"হাঁ মহাশয়, লণ্ডনে আমার বাড়ী ও লণ্ডন ইস্কুলে আমার দুই মেয়ে পড়িতেছে। হায় মহাশয়! আমার মত সামান্য গার্ডের সাধ্য কি যে মেয়েদের অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজে পড়াই অথবা লণ্ডনে বাস করি? আমরা লণ্ডনের মফঃস্বলে থাকি। সেখানে ঘরবাড়ী ও জিনিষপত্র কিছু সস্তা।

"লণ্ডনের কথা আর জিজ্ঞাসা করিবেন না। উহা নরক-কুণ্ড বিশেষ। লণ্ডনে ছেলেপিলে রাখিয়া পালন করা অতি কঠিন ব্যাপার। মানুষকে ভুলাইয়া বিপথে লইবার জন্য শত শত প্রলোভন সেখানে ফাঁদ পাতিয়া রহিয়াছে। বিশেষতঃ অল্প-বয়স্কেরা অতি সহজে বিগড়াইয়া যায়। সেইজন্য আমি লণ্ডনকে দু'চোখে দেখিতে পারি না এবং মেয়েদের জন্য ভয়ে ভয়ে থাকি।

"মহাশয়, আপনাদের কলিকাতা সহরও দ্বিতীয় লণ্ডন হইয়া উঠিতেছে দেখিতেছি। কলিকাতাও ছেলেমেয়েদের পক্ষে নিরাপদ নহে। লণ্ডনে যেমন মাথা গুঁজিবার স্থান নাই, লোক গিস্ গিস্ করিতেছে, আপনাদের কলিকাতাও অবিকল তাই হইয়াছে। আমি কলিকাতায় গিয়া থই পাই না। আর বাড়ী-ভাড়াও ত বিষম সমস্যা। তা নয় কি?"

আমি কহিলাম—"ধন্যবাদ গার্ড সাহেব। এই লও তোমার বকশীশ।"

(২)

ট্রেণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত আসামের মধ্য দিয়া চলিতে থাকে, ততক্ষণ লাইনের দুই পাশে বিস্তীর্ণ ধানের ক্ষেত দেখিতে পাই। ক্বচিৎ পাট ক্ষেত চোখে পড়ে। কিন্তু যেই বাংলা দেশে পড়িলাম, অমনি যেখানে সেখানে পাটের ক্ষেত দেখিতে পাই। বিশেষতঃ সৈদপুর অঞ্চল হইতে দেখি, দুই ধারে পাটের ফসল খুব ভাল হইয়াছে। ধান আর দেখা যায় না।

কেনা-বেচার সোজা নিয়ম হইতে বুঝিতেছি, পাটের যোগান খুব বেশী হইয়াছে। চাহিদা যদি সেই প্রকার প্রবল না হয় তবে পাট-চাষীরা মারা পড়িবে। বিশেষ যারা সংবৎসরের ধান না জন্মাইয়া পাটের দিকে ঝুঁকিয়াছে, তাদের সর্ব্বনাশ হইবে।

কেন এইরূপ হইয়াছে তাও কতক বুঝিতেছি। গত বছর নানা কারণে পাটের ফসল ভাল হয় নাই। বাজারে যত পরিমাণ পাটের দরকার ছিল, চাষীরা সেই পরিমাণ পাট যোগাইয়া উঠিতে পারে নাই। তাই শাপে বর হইয়াছিল। দালালেরা নিজেদের পকেট তেমন করিয়া ভরিতে পারে নাই। চাষীরা দু'পয়সা ঘরে আনিতে পারিয়াছিল।

তাহা দেখিয়া এ বছর চাষীরা মনে করিল, "সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। যদি বেশী করিয়া পাট জন্মাই, জিতিয়া যাইব, দাঁ মারিয়া বসিব।" কিন্তু এ কথা কেহ ভাবিল না যে, দাঁ মারিবার ইচ্ছা প্রত্যেকের মনে জাগিতে পারে এবং প্রত্যেকে বেশী করিয়া পাট জন্মাইতে পারে।

বস্তুতঃ, অন্ততঃ বাঙ্গালা দেশে, প্রত্যেক চাষীই পাটের উপর ঝোঁক দিয়াছে। ফলে আশঙ্কা করিতেছি, এবার দালালরা মোটা হইবে এবং পাট-চাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

(৩)

কারসিয়াঙ শিলিগুড়ি হইতে ৩২ মাইল এবং দারজিলিঙ হইতে মাত্র ২০ মাইল দূরে অবস্থিত। উচ্চতা ৪৮২৪ ফুট। দারজিলিঙের মত ঠাণ্ডা নয়। ষ্টেশন হইতে একটু বাম দিকে সরিয়া আসিলেই দক্ষিণ দিকে বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি চোখে পড়িবে। সম্মুখের দৃষ্টি কোন উঁচু পাহাড়ে ব্যাহত হয় না বলিয়া সারাদিন সমতলের উপর মেঘ ও রৌদ্রের লুকোচুরি খেলা চোখে পড়ে।

দারজিলিঙের মত না হইলেও কারসিয়াঙ প্রাকৃতিক দৃশ্যে সুন্দর বটে। এখানে এখনও যথেষ্ট জঙ্গল আছে। সেজন্য দারজিলিঙ জেলার মধ্যে এখানে বৃষ্টিপাত খুব বেশী। হিংস্র জন্তুর ভয়ও আছে।

দারজিলিঙের চেয়ে এখানে সড়কের সংখ্যা কম। অলি-গলিও বেশী নহে। সড়ক প্রধানতঃ দুইটা। (১) কার্ট রোড। এ রাস্তা রেল-লাইনের সঙ্গে সঙ্গে উপরে দারজিলিঙ পর্য্যন্ত উঠিয়া গিয়াছে আর নীচে শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত রাস্তা। (২) ওল্ড মিলিটারি রোড। ইহা দারজিলিঙের দিকে প্রথমে খাড়া উপরে আঁকিয়া বাঁকিয়া উঠিয়া গিয়াছে। প্রায় মাইল চারেক গেলে ইহার সর্ব্বোচ্চ চূড়া চিমনীতে পৌছা যায়। তাহার উচ্চতা নাকি ঘুম ষ্টেশনের সমান। তারপর ঐ রাস্তা কখনো নামিয়া কখনো উঠিয়া দারজিলিঙ পর্য্যন্ত গিয়া পৌছিয়াছে। নীচের দিকে এই মিলিটারি রোড আগে চা-বাগানের মধ্য দিয়া বিস্তৃত ছিল। তখন রেল হয় নাই। গোরারা সেই দুর্গম পথ দিয়া দারজিলিঙ-শিলিগুড়ি গতয়াত করিত। এখন বর্দ্ধমান রোড নামে ছোট্ট একটা রাস্তা এই সড়ককে পাংখাবাড়ী রোডের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দিয়াছে। পাংখাবাড়া রোড বরাবর খাড়া নীচের দিকে নামিয়া গিয়াছে।

পথে বাহির হইয়া দেখিতেছি, বর্ষায় সড়কের সড়কত্ব ঘুচাইয়া দিয়াছে। প্রত্যেক দিকেই সড়কগুলির অবস্থা শোচনীয়। বৃষ্টিপাতে মাটি ধুইয়া লইয়া গিয়াছে, পাথর সব

বাহির হইয়া পড়িয়াছে। প্রত্যেক সড়কের ধারে বরাবর ভাঙ্গা ও আভাঙ্গা অবস্থায় পাথর স্তূপাকার করিয়া রাখা হইয়াছে। নেপালী মেয়েরা আসিয়া সারাদিন ধরিয়া সেই পাথর আরো ছোট ছোট করিয়া ভাঙ্গিতেছে। ইতিমধ্যেই পাংখাবাড়ীর উপর পাথর ও মাটি বসাইয়া দিয়া কিছু সংস্কার করিয়াছে। সুতরাং আশা করা যায় বর্ষা-শেষে সড়কগুলির চেহারা ফিরিবে।

এই সুযোগে নেপালী স্ত্রীলোকেরা পাথর ভাঙ্গিয়া কিছু পয়সা ঘরে আনিতেছে। তারা এক এক ঝুড়ী পাথর ভাঙ্গিলে এক পয়সা কি দু'পয়সা পায়।

(৪)

এত বড় বড় সড়কের তদবির করা সোজা কথা নহে। অনেক টাকার কারবারও বটে। কিন্তু কারসিয়াঙ মিউনিসিপ্যালিটির চৌহদ্দি খুব ছোট। সুতরাং ঝুঁকিটা সামলাইতে হইতেছে পূর্ত্ত বিভাগকে।

মিউনিসিপ্যালিটি ছোট হইলেও ইহার আয় কম নহে—ষাট হাজার টাকা। কিন্তু এই ষাট হাজার টাকা হইতে কারসিয়াঙকে যতটা সমৃদ্ধিশালী বোধ হইতে পারে, কারসিয়াঙ ততটা সমৃদ্ধ নয়। বস্তুতঃ, ব্যয় এবং সম্ভবতঃ অপব্যয়ও যথেষ্ট।

কলের জল আছে। কিন্তু তাহা দারজিলিঙের মত সুবিধাজনক অবস্থায় পাওয়া যায় না। কারসিয়াঙ মিউনিসিপ্যালিটিকে সে জন্য অনেক টাকা ঢালিয়া দিতে হয়। তা সত্ত্বেও অধিবাসীদিগকে যখন তখন জলের কষ্ট পাইতে হয়। অদূরবর্ত্তী সিঞ্চল হ্রদে নির্ম্মল জল আবদ্ধ করিয়া রাখায় দারজিলিঙ জল-সঙ্কট হইতে চিরকালের জন্য মুক্তি পাইয়াছে। দারজিলিঙ মিউনিসিপ্যালিটির একমাত্র চিন্তা নলগুলি যাতে ঠিকমত কাজ করে। কিন্তু কার্সিয়াঙে সে সুবিধা নাই।

চারিদিকে পয়ঃপ্রণালীর বন্দোবস্ত আছে। তা ছাড়া দারজিলিঙ, কারসিয়াঙ প্রভৃতি জায়গায় প্রকৃতি স্বয়ং মিউনিসিপ্যালিটির অনেক কাজ করিয়া দেয়। পাহাড়ে জায়গায় এই এক সুবিধা যে, যত বৃষ্টিই হোক্ না কখনো জল জমিতে পারে না। জল গড়াইয়া নীচে চলিয়া যায় ও সড়কগুলি দিব্য শুষ্ক হইয়া থাকে। চেরাপুঞ্জি বৃষ্টির জন্য পৃথিবীর মধ্যে বিখ্যাত। কিন্তু একদিনও কেহ চেরাপুঞ্জিকে কলিকাতার মত জল-মগ্ন দেখে নাই। আসামে সাধারণতঃ বৃষ্টি বেশী হয়। বিশেষতঃ গরুর গাড়ীর কৃপায় সেখানে কাদা হয়। সেখানে পয়ঃপ্রণালীর তেমন সুবন্দোবস্তও নাই। কিন্তু তবু দেশব্যাপী বন্যা না হইলে জল দাঁড়ায় না। বেলে মাটি বলিয়া জল চুয়াইয়া নীচে চলিয়া যায়। এমন দেখা গিয়াছে, এ বেলা বৃষ্টি হইয়া যে সড়কে এক হাঁটু কাদা হইল, ও বেলা রোদ হওয়ায় সেই সড়কেই ধূলা উড়িতে লাগিল।

মল-নিঃসরণের ব্যাপারে, দারজিলিঙের তুলনায় কারসিয়াঙকে ঘোরতর অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। দারজিলিঙে অত্যন্ত সহজে বিদ্যুতের সাহায্যে সমস্ত মল আপনা আপনি হাজার হাজার ফুট নীচে চলিয়া যাইতেছে। ঘড়ির কাঁটার মত কল চলিতেছে। অথচ সস্তা। কারসিয়াঙ মিউনিসিপ্যালিটিকে গাড়ীবোঝাই করিয়া প্রত্যহ মল লইয়া যাইতে হয়। অনেক মেথর পুষিতে হয়। তারপর মল নীচে ফেলিয়া দিবার হাঙ্গামাও আছে। সবটা মিলিয়া বিরাট ব্যাপার ও অনেক খরচ।

এখানে আজ পর্য্যন্ত সহরে বিদ্যুতের বাতির ব্যবস্থা হয় নাই, শুধু ষ্টেশনে আছে। তার কারণ দারজিলিঙে বিদ্যুতের বাতি জ্বালাইতেছে ৭ মাইল নীচে অবস্থিত জলের প্রচণ্ড শক্তি। এই বিদ্যুৎ নানাপ্রকারে দারজিলিঙের সেবা করিতেছে। শুনিতেছি বটে যে মিউনিসিপ্যালিটি আগামী বৎসর সহরে বিদ্যুতের আলোর ব্যবস্থা করিবে।

সড়কে বাতি জ্বালিবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সুবিধাজনক নহে। রাত্রির অন্ধকার তাতে দূর হয় না। অধিকন্তু সে আলোও সারা রাত পাওয়া যায় না। বাঘ ভালুকের ভয় আছে। সেই জন্য রাতে যারা বাহির হয় তারা মশাল হাতে করিয়া বাহির হয়। আসামের মত আর কি!

(৫)

এই উঁচু-নীচু তেড়াবেঁকা সহরেও লোকে "পা-গাড়ী" চালাইতেছে। সহর ছোট হইলে কি হয়, অসংখ্য মোটর গাড়ী চলাফেরা করিতেছে, ভাড়াও খাটিতেছে। উপরে দারজিলিঙ ও নীচে শিলিগুড়ি মোটর গাড়ী এবং মোটর লরী

লোকজন লইয়া ছুটিতেছে। এখানকার এক বাসিন্দা বলিতেছেন, "মহাশয়! দেখিতেছেন কি, আমরা মোটর গাড়ীর উৎপাতে শশব্যস্ত। এই এক কারসিয়াঙ সহরেই অনেকগুলি ভাড়ায় খাটিতেছে।

"৩।৪ বৎসর পূর্ব্বেও এত মোটর গাড়ী ছিল না। ২।১খানা যা ছিল, বিস্তর লাভ করিত। তাই দেখিয়া ইহাদের যে কি এক ঝোঁক চাপিল, অনেকে জমি বাড়ী বেচিয়াও মোটর গাড়ী কিনিতে লাগিল। তেমনি বাছাধনরা এখন পস্তাইতেছেন। লাভের ঘরে শূন্য পড়িতেছে।"

এরূপ জায়গায় ঘোড়ার গাড়ীর কল্পনা করিতে পারি না। কিন্তু ঘোড়ার চল আছে। তবে দারজিলিঙে যেমন ঘোড়া অনেক এবং ইচ্ছা করিলেই যে-সে ভাড়া লইয়া চড়িতে পারে, এখানে সেরূপ নয়। এখানে চড়িবার উপযুক্ত ঘোড়া খুব কম। সেই জন্য ভাড়াও বেশী। ঘণ্টায় ১৲ অথবা ১।০। চিমনীর নীচে কোন স্থান অবধি যাওয়া-আসা আধ ঘণ্টার কর্ম্ম। কিন্তু ঘোড়াওয়ালা সেই আধ ঘণ্টায় মাথাপিছু ২॥০।৩॥০ টাকা আয় করিয়া থাকে।

গদাইলস্করী চালে গরুর গাড়ী চলিতেছে। কিন্তু বেশী দেখিতে পাইতেছি না। দারজিলিঙে এখানকার চেয়ে গরুর গাড়ী বেশী বলিয়া মনে হয়। ঘোড়ার গাড়ীও রহিয়াছে। ঘোড়া নহিলে ময়লার গাড়ী টানিবে কে?

(৬)

বাড়ী-ঘরের একটা বিশেষত্ব এখানে এবং দারজিলিঙেও লক্ষ্য করিতেছি। জানালায় কাচ দিবার রেওয়াজ এ অঞ্চলে খুব বেশী। বুঝিতে পারি প্রকৃতির সৌন্দর্য্য পথে-ঘাটে ছড়ানো রহিয়াছে বলিয়া, মানুষ যতটা পারে তাহা উপভোগ করিয়া লইতে চায়। কিন্তু একথাও মনে রাখিতে হইবে, সমতল ভূমিতে কাচের জানালা রাখিয়া কোন মানুষ নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। চোরের ভয় ত আছেই। অধিকন্তু, গৃহস্বামী প্রভাতে উঠিয়া কোন দিন হয়ত দেখিলেন, ঢিলের চোটে তার বহু কাচ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

এই দুই আপদের কথা এখানে কেহ ভাবে না। তা ছাড়া, খরচের দিক্ দিয়াও হয়ত কাচে সস্তা পড়ে। কাঠ এখানে সস্তা নহে।

পাথরের ঘর, অর্থাৎ দেওয়াল ও ভিত পাথরে গাঁথা এমন ঘর, দু'চার জনের আছে। কিন্তু সাধারণ ঘরে কাঠ লাগানো হইয়া থাকে। টিন ও টালির রেওয়াজ দেখিতেছি। চালের ছাউনিতে ছন কোথাও দেখিতে পাইলাম না। এখানে ছন পাওয়া যায় না। নীচ হইতে ছন আনা কষ্ট-সাধ্য ও ব্যয়সাধ্য। তা ছাড়া, এ তীব্র ঝড়ের দেশ, টিন-টালি উড়াইয়া লইয়া যায়, ছন ত দূরের কথা।

বাড়ীর শ্রীছাঁদ বলিয়া কোন একটা জিনিষ কোথাও খুঁজিয়া পাইলাম না। এখানে বাস্তরীতিতে একটা খিচুড়ী বনিয়া গিয়াছে। তাহা না দেশী, না বিদেশী। পাহাড়ের কোলে কোলে সাদা লাল বাড়ীগুলি দূর হইতে দেখিতে মন্দ লাগে না। কিন্তু কাছে আসিলে বুঝিতে পারি "যেন তেন প্রকারেণ" একটা আশ্রয়-স্থান খাড়া করা হইয়াছে। কোন প্রকৃষ্ট নির্ম্মাণ-কৌশল অবলম্বন করিয়া ঘরবাড়ী গড়িলে তাহা যে পাহাড়ের সৌন্দর্য্যের সঙ্গে আরো বেশী খাপ খাইত, তাহা কেহ বুঝে না। অথচ লোকে যথেষ্ট খরচপত্র করিয়া বাড়ীঘর তৈয়ারী করে। জমিও সস্তা নহে।

(৭)

নবাগত কোন ভারতবাসী এখানে হঠাৎ আসিলে অত্যন্ত অসুবিধায় পড়িবেন। কারসিয়াঙে থাকিবার স্থানের অভাব। দুইটা কি তিনটা হোটেল সাহেবদের জন্য আছে। বাঙালীরা একটা মেস্ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বদা স্থানীয় ভদ্র লোকেরা দখল করিয়া আছেন। তাঁরা শুধু বাহিরের লোকের খাওয়ার বন্দোবস্ত করিতে পারেন। ডাকবাংলা সুবিধার নহে। সকল সময়ে পাওয়াও যায় না।

তবে খাওয়ার সুবিধা এখানে বেশ আছে। সোরাবজী এখানে এক হোটেল ঠিক ষ্টেশনের মধ্যেই খুলিয়া বসিয়া আছেন। উপরে ও নীচে যে সকল ট্রেণ যাতায়াত করে, তাদের অনেক আরোহী ঐ হোটেলে খাইয়া লয়। তাতে সোরাবজীর বেশ উপার্জ্জন হয়। দুই দিকের মেল ট্রেণই ১০টা ১১টায় এখানে থামে।

অধিকন্তু, কারসিয়াঙের বহু সম্পন্ন ব্যক্তি নিজেদের ঘরে চুলা জ্বালায় না। তারা প্রত্যহ দুইবেলা আসিয়া সোরাবজীর এখানে খাইয়া যায়। ডিম, মাংস প্রভৃতি সুস্বাদু খাদ্য বিনা

আয়াসে লাভ করে। অবশ্য সোরাবজীর দর খুব চড়া। এক এক বেলার "বিদায়" গুণানুসারে ২॥০ টাকা ও ১॥০ টাকা। মাস ভরিয়া খাইলে দশ টাকা মাফ হয়। মাসে হোটেলের আয় বড় কম দাঁড়ায় না।

কিন্তু সোরাবজী ইহাতেও সন্তুষ্ট নন্। আরও ২।৪ পয়সা যাতে ঘরে আসে সেজন্য হোটেলের মধ্যেই মনোহারী দোকান সাজাইয়া রাখিয়াছেন। আচারটা, সাবানটা, আতরটা—এই রকম কত টুক্‌টাক্ মাল যে রহিয়াছে তার ইয়ত্তা নাই। বিক্রীও বেশ হয়। কারণ, রেলের সহিত বন্দোবস্তে সোরাবজী জিনিষপত্র কম ভাড়ায় আনিতে পারে বলিয়া অন্য সব দোকানের চেয়ে সস্তায় মাল ছাড়িতে পারে।

দেখিতেছি, আসামে, বাঙ্গালায়, বিহারে, উড়িষ্যায়, পশ্চিমে রেল ষ্টীমারের হোটেল-পরিচালনার ব্যবসা এই পার্শীরা একচেটিয়া করিয়া লইয়াছে এবং প্রতিদিন যাত্রীদের নিকট হইতে অনেক টাকা আদায় করিতেছে। বঙ্গ-সন্তান হোটেল চালানোর দিকে একেবারে মন দেয় নাই, একথা বলিতে পারি না। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা পার্শীদের সঙ্গে টক্কর দিয়া উঠিতে পারে না। অথচ মজা এই, পার্শীরা সামান্য চা-রুটি হইতে ভাত-রুটী পর্য্যন্ত সকল জিনিষের জন্য দ্বিগুণ ত্রিগুণ বা বহুগুণ দাম চাহিয়া থাকে। গোয়ালন্দে এক জনের ভাত, ডাল, মাছ, তরকারী ইত্যাদির জন্য লাগে মাত্র ৷৶০ আনা। রান্নাও বেশ ভাল হয়। কিন্তু ঐ পরিমাণ খাদ্য পার্শীরা কিছুতেই ১৲ টাকা ১॥০ টাকার কমে দিবে না। তবু বাঙ্গালীর হোটেল অধিকাংশ ক্ষেত্রে উঠিয়া যায় কেন?

যে হোটেল পয়সা লয় অথচ ভাল খাইতে দেয় না, তাহা উঠিয়া গেলে অথবা টিমটিম করিয়া চলিলে, তার অর্থ বুঝা যায়। যেমন এখানে এই সোরাবজীর হোটেলের পাশে এক হিন্দু হোটেল আছে। তাহা হোটেল নামের অযোগ্য।

পার্শীরা এমন কিছু অসাধারণ বুদ্ধিমান নহে। কিন্তু শৃঙ্খলা, সময়ানুবর্ত্তিতা, আলস্যহীনতা ইহাদের প্রধান গুণ। ব্যবসায়-ক্ষেত্রে ইহারা কোন প্রকার ভাব-বিলাসিতার স্থান মাত্র দেয় না। যেখানে পয়সা পাইবে সেখানেই খরিদ্দারকে খাতির করে, অন্যত্র নহে। কিন্তু এ সকল গুণ অর্জ্জন করা এমন কিছু কঠিন নহে। বরং ইহারা ব্যবসায়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুঁজি—মিষ্ট কথা ও মিষ্ট ব্যবহার—ধীরে ধীরে হারাইতেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভারতসন্তানের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে না। ফলে, সাহেবরাই ইহাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সুতরাং একথা সত্য বলিয়া মনে হয় না যে, পার্শী ছাড়া অন্য ভারত-সন্তানেরা এ বিষয়ে কৃতকার্য্যতা লাভ করিবে না। বিশেষ, বঙ্গ-সন্তানদের এ বিষয়ে মনোযোগী হওয়া উচিত। হোটেল-পরিচালনা অত্যন্ত তুচ্ছ জিনিষ নহে। টাকা আনা পাই-ই ইহার সমগ্র প্রাণ নহে। অন্য একটা সুন্দর ও মহৎ দিক্‌ও আছে। বহু ভিন্ন দেশী, ভিন্ন ভাষা-ভাষী ও ভিন্ন প্রকারের লোকের মিলন-ক্ষেত্র হোটেল হইতে পারে। সুন্দর সুন্দর স্থানে যা-কিছু জ্ঞাতব্য, শ্রোতব্য বিষয় আছে হোটেল-কর্ত্তার কর্ত্তব্য সেগুলির সহিত অতিথিদের পরিচয় করাইয়া দেওয়া। মনে হয়, বাঙ্গালীর ছেলে এ বিষয়ে সর্ব্বদা বেশী সাহায্য করিতে পারিবে। এক একটা সহর গড়িয়া তুলিবার পক্ষে হোটেল তার সহায়তা করিবে। বস্তুতঃ, ভারতের নানা স্থানে বঙ্গ-সন্তান হোটেল খুলিলে বাঙালীর ভ্রমণলিপ্সাও হয়ত বাড়িবে। সেটাও একটা মস্ত লাভ।

(৮)

এই স্থানে একটি "ফরেষ্ট-স্কুল" আছে। মিলিটারী রোড ধরিয়া মাইল দুই উপরে উঠিলে এই বিদ্যালয় মিলিবে। সুতরাং এখানকার শিক্ষা-নবীশেরা প্রায় দারজিলিঙের আবহাওয়া ভোগ করিতেছে।

স্থানীয় এক ভদ্রলোক ১০০টা বাঁশ কাটিবার জন্য "অনুমতি-পত্র" চাহিতে আসিয়াছিলেন। তাঁকে ৫৲ টাকা দক্ষিণা দিয়া ঐ পত্র লইতে হইল।

বন-বিভাগের এক কর্ম্মচারী সেই উপলক্ষ্যে বলিলেন, 'হাঁ মহাশয়' এই ৫৲ টাকা সরকারের লাভ হইল। আমার তাতে কিছু লাভ বা লোকসান হইল না। কারণ ইহার উপর কোন কমিশন আমাকে দেওয়া হইবে না।

যদি সারা বছরে সরকারের একটা পয়সাও লাভ না হয় তবু আমার মাহিনা আমি নিয়মিত পাইতে থাকিব।

“কিন্তু কমিশনে আমি রাজী নই। দারজিলিঙ জেলায় কেহই রাজী হইবে না। কারণ এখানকার বন-বিভাগের আয় অত্যল্প। সুতরাং “দরমাহার” উপর মাত্র দু’চার টাকা লাভ করিয়া কি হইবে? সুন্দর-বনের কথা আপনারা জানেন না। সেখানে সরকারের আয় খুব মোটা। আর কাজকর্ম্মও খুব চলিতেছে। বাহিরের লোক হরদম কাঠ, খড়, বাঁশ ইত্যাদির ইজারা লইতেছে। ওখানকার কর্ম্মচারীদিগকে কমিশন পাইবার ব্যবস্থা দিলে কি আর রক্ষা আছে? উহারা দরমাহা বাদ দিয়াও ঢের ঢের টাকা উপার্জ্জন করিবে। আর আমরা পূর্ব্ববৎ ভাতে মরিতে থাকিব। তা হইতে পারে না। আমরা কমিশন চাহি না।

“বস্তুতঃ, এই বন-বিভাগের কোন কোন স্থান অতীব দুর্গম। এমন কোন কোন স্থান আছে যেখানে গাছ কাটিয়া রাখা হইয়াছে; বছর ঘুরিয়া গেল, অথচ সে কাঠ লইবে এমন লোক দেখা গেল না। কাঠ পচিয়া ধূলা হইয়া মাটির সঙ্গে মিশিয়া গেল। ইহাতে সরকারের ক্ষতি। কিন্তু উপায় কি? সেই দুর্গম স্থান হইতে কাঠ আনা কি সোজা কথা? রেল লাইন বহুদূরে। মানুষে টানিয়া তুলিতে পারে না। হাতী সেই দুর্গম স্থানে যাইতে পারে না। সে কাঠ আনিতে গেলে যে খরচ পড়িবে তাহা কোন সওদাগর পোষাইতে পারিবে না। সুতরাং এইরূপে বহু কাঠ নষ্ট হইয়া যাওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। আর রেল লাইন দূরে বলিয়া অন্য কাঠ নামাইতেও খরচপত্র বিস্তর। সেজন্য এখানে কাঠের বড় দাম।”

বলা বাহুল্য ক্রেণ ইত্যাদির কথা এখানে কারো মাথায় ঢুকে নাই। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিলে হয়ত বন-বিভাগের কোন কোন কাজ সহজ হইয়া যাইতে পারে।

(৯)

ঐ স্কুলের এক শিক্ষা-নবীশ বলিতেছেন, “আমরা এই বাড়ীতে মেস করিয়া আছি। ইহা সরকারের তৈরী। আমাদিগকে কোন ঘর-ভাড়া দিতে হয় না। মহাশয়, আমরা কারসিয়াঙে থাকিয়াও দারজিলিঙের সুন্দর হাওয়া উপভোগ করিতেছি বলিয়া আপনি আমাদিগকে হিংসা করিতেছেন। কিন্তু মস্ত বড় অসুবিধা আপনি ভুলিয়া যাইতেছেন। বাজার এখান হইতে বহুদূরে। আপনারা যেখানে বড় জোর চার পয়সা কুলির জন্য খরচ করিতেছেন, আমাদিগকে সেখানে প্রতি সপ্তাহে ৩।৪ টাকা করিয়া অনর্থক ব্যয় করিতে হইতেছে। সেই জন্য আমাদের মাসিক খরচ মাথাপিছু ২০।২৫ টাকারও বেশী পড়িতেছে।

আমাদের এখানে দুই বৎসর শিক্ষা-নবীশি করিতে হয়। সময় সময় অনেক দুর্গম ও গহন কানন কান্তার ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। এখান হইতে পাশ করিলে “ফরেষ্টার” হওয়া যায়। কেহ কেহ “ডেপুটি রেঞ্জার” বা “রেঞ্জার” হয়। অত্যধিক উৎকর্ষ দেখাইলে তা সম্ভব। আমরা সকলেই চাকরী করিতে করিতে এখানে প্রেরিত হইয়াছি।

“পরীক্ষাগুলি সোজা বিবেচনা করিবেন না মহাশয়। সব পরীক্ষাই অতর্কিত অর্থাৎ বলা-কহা নাই হঠাৎ একদিন ক্লাসে গিয়া শুনিলাম, আজ পরীক্ষা। সুতরাং আমাদের সর্ব্বদাই সশঙ্কচিত্তে প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হয়। আর এক কঠোর নিয়ম প্রচলিত আছে যে, এইরূপে প্রত্যেক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে অর্থাৎ প্রত্যেককে শতকরা অন্ততঃ ৫৫ নম্বর রাখিতে হইবে। কেহ হয়ত “শেষ পরীক্ষায়” খুব ভাল করিয়া উত্তীর্ণ হইতে পারে। কিন্তু এই পরীক্ষাগুলিতে উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে তার আর সে সুযোগ মিলিবে না। এই বছর এইরূপ দুইজন ছাত্রকে বিতাড়িত করা হইয়াছে।

“না মহাশয় বাংলা দেশে বন-বিভাগের কর্ম্মচারীদের বেতনের হার আসামের তুলনায় নীচু। আমরা প্রত্যেক বিভাগেই তাদের চেয়ে ৫।১০।১৫ টাকা কম পাইয়া থাকি। যদিও কাজ হয়ত সমানই করি।”

(১০)

সড়কে বেড়াইতে বাহির হইয়া উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্ব্বে, পশ্চিমে যেখানে যাই, ডাইনে বাঁয়ে শুধু চা-বাগান চোখে পড়ে। পাহাড়ের গায়ে সারি সারি চা-গাছ লাগানো রহিয়াছে।

এখানকার চা-গাছ আসামের চা-গাছের মত অত বড় হয় না। দারজিলিঙ জেলার চা ও আসামের চা মিলাইয়া যে চা হয়, তাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আসামের চায়ে রস বেশী হয়। দারজিলিঙের চা'র রঙ খোলে ও স্বাদ হয়। সুতরাং দুই মিলাইয়া একসঙ্গে রস, রঙ ও সুগন্ধ পাওয়া যায়।

পঁচিশ ত্রিশ বৎসর আগেও চায়ের ব্যবসা ভারতবর্ষে এই রকম ফাঁপিয়া উঠে নাই। তখন খুব অসম্ভব রকম সস্তায় এক একটা চা বাগান কিনিতে পাওয়া যাইত। সে সময় যাঁরা চা-বাগান কিনিয়া রাখিয়াছিলেন, আজ তাঁদের বংশধরগণ কোন-কিছু না করিয়াও স্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করিতেছে। কিন্তু আজ আর চা-বাগান সস্তায় কিনিতে পাওয়া যায় না। সব অগ্নিমূল্য হইয়া গিয়াছে।

(১১)

আসামের চা-করদের দেখিবামাত্র চিনা যায়। তারা এক আলাদা জীব। সর্ব্বদাই প্রভুভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে। দেশের ষোল আনা সুখস্বাচ্ছন্দ্য তারাই ভোগ করে। কিন্তু কারসিয়াঙ ও দারজিলিঙ সহরে কে যে চা-বাগানের ম্যানেজার তা খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন। তার প্রতাপ প্রকট নহে।

অল্প কয়েক মাইলের ব্যবধানে জলপাইগুড়িতে বাঙ্গালীরা চায়ের ব্যবসার এক বড় আড্ডা গাড়িয়া বসিয়াছে। সেখানে বাঙ্গালীর ব্যাঙ্কিং লেনদেন দেখিলে আশ্চর্য্য হইয়া যাইতে হয়। ব্যবসা-কেন্দ্র হিসাবে জলপাইগুড়িকে বাঙ্গালার বোম্বাই বলিতে পারি। অর্থাৎ বোম্বাইয়ে যেমন, জলপাইগুড়িতেও তেমন, ব্যবসার বড় মুনাফাটা "স্বদেশী লোকে" মারিতেছে।

জলপাইগুড়ির অবস্থাভিজ্ঞ এক ভদ্রলোক বলিতেছেন, "মহাশয়, বাঙ্গালীই সেখানে প্রভু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গিয়া দেখুন, কাছারীতে উকীলরা দিব্য শুইয়া বসিয়া দিন কাটাইতেছেন। মোকদ্দমা ও মক্কেলের পরোয়া করিতেছেন না। কেন করিবেন? ওকালতী না করিয়াও তাঁরা ভাতে মরিতেছেন না। প্রত্যেকেরই ঘরে যথেষ্ট পয়সা আছে। কেহ কেহ বাবুগিরি করিতেও সমর্থ। এ সবই চা-বাগানের প্রসাদে।

"বলিব কি মহাশয়, সেখানে এক রাঁধুনে বামুন এককালে কোন চা-বাগানের শেয়ার কিনিয়াছিল। কিন্তু আজ তার বাৎসরিক আয় পাঁচ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। এই টাকা আমরা সারা জীবনেও জমাইতে পারিব কিনা সন্দেহ।

"বাঙ্গালীর চা-বাগানগুলি গত বছর খুব মোটা দরে লাভের হার দিয়াছে। এক কোম্পানী শতকরা ৩৭৫৲ টাকা পর্য্যন্ত দিয়াছে। কিন্তু ইহাতে আপনি বিস্মিত হইবেন না। এক সাহেব কোম্পানী গত বছর তার অংশীদারদের শতকরা ১২৲ টাকা হিস্যা দিয়াছিল, তাতেই বিলাত হইতে ম্যানেজারকে প্রশংসা করিয়া লম্বা এক চিঠি লেখা হইয়াছে।

"এ জেলায় চায়ের কারবারে সাহেবরা বাঙ্গালীর সঙ্গে টক্কর দিয়া উঠিতে পারিতেছে না। তার প্রধান কারণ হইতেছে, সাহেব কোম্পানীর তুলনায় বাঙ্গালী কোম্পানীর খরচ অত্যন্ত কম। বাঙ্গালীর চা-বাগানে ১৫০।২০০৲ টাকায় বাঙ্গালী ম্যানেজার পাওয়া যায়। অথচ তার কার্য্যপটুতা সাহেবের চেয়ে বেশী ছাড়া কম নয়। সাহেব ম্যানেজার ৫০০৲ টাকার কমে আসিবে না। তা ছাড়া তার সহকারী, আফিস, কাছারী, সাজসরঞ্জাম খরচের আর অন্ত নাই। সেখানে বাঙ্গালী অনেক কম খরচ করিয়া যে বহুগুণ লাভ বাঁটিয়া দিতে পারিবে, তা আর বিচিত্র কি?"

বাঙ্গালীর ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা তার সম্মানের একটা প্রধান কারণ সন্দেহ নাই। সঙ্গে সঙ্গে সাহেবরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া মনে করিবার অবসর পায় না। আর একটা কারণও সম্ভবতঃ সমান কার্য্যকর হইয়াছে। প্রতি গ্রীষ্মে ও পুজায় বাঙ্গালা হইতে বহু উকীল, ব্যারিষ্টার, বড় সরকারী কর্ম্মচারী নামজাদা অধ্যাপক, লেখক, বৈজ্ঞানিক, কবি, চিত্রকর ইত্যাদি ইত্যাদি এই সব অঞ্চলে যাতায়াত করিতেছেন। সেখানে এ দেশীয় কোন সাহেব বলিতে পারিতেছে না, "আমি বড়, আমাকে সম্মান করিতে হইবে।"

ফলে, শুধু চা-কররা নয়, সর্ব্ব শ্রেণীর ইংরেজ ও অন্যান্য জাতি বাঙ্গালীদের সঙ্গে এবং নেপালীদের সঙ্গে সাধারণতঃ প্রভুত্বসূচক ব্যবহার করার সুবিধা পায় না।

(১২)

চা-বাগানের সহিত সর্ব্বত্রই রেলের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। রেল ভিন্ন চা-বাগানের সমৃদ্ধি কল্পনা করা যায় না। রেল আফিস-গুলি পূর্ব্বে দারজিলিঙে ছিল। কারসিয়াঙে শীতের প্রকোপ কিছু কম বলিয়া বোধ করি ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে আফিস্‌গুলি উপড়াইয়া এখানে লইয়া আসা হইয়াছে। সুতরাং এটা একটা রেলকর্ম্মচারীদের বড় আড্ডাও হইয়াছে বটে।

পাহাড় কাটিয়া রেল লাইন চলিয়াছে। উপরে নীচে সর্ব্বত্রই পাহাড়। সুতরাং রেল-কর্ত্তৃপক্ষদিগকে সর্ব্বদাই লাইনের তদবির করিতে হয়। বিশেষ বর্ষার সময় পাহাড় ধসিয়া পড়িবার ভয় খুব বেশী। দেখিতেছি প্রতিদিন পাথর ভাঙ্গিতেছে ও লাইনে দিতেছে। সুতরাং সর্ব্বদাই মজুর খাটিতেছে। এদিকে রেলের খরচ আছে বলিতে হইবে।

পাগলা-ঝোরার মতিগতির ঠিক নাই। প্রত্যেক বছর কিছু না কিছু রেলের ক্ষতি না করিয়া ছাড়ে না। কোন বছর বেশী কোন বছর কম। সেজন্য খরচ আছে। উঁচু নীচু উঠা নামা করিতে হয় বলিয়া বেশী কয়লা পুড়ে, বেশী ষ্টীম লাগে, সে সব খরচ ত আছেই।

ফলে দারজিলিঙের রেলের ভাড়া বেশী। এবং দোকানীরা মাল আনিতে বেশী ভাড়া দেয় বলিয়া জিনিষ-পত্রের দামও অন্য জায়গা অপেক্ষা চড়াইতে বাধ্য হয়।

মজুর যুগাবতার রবার্ট ওয়েন

তাহেরুদ্দিন আহ্‌মদ

নবীন দুনিয়ার মজুর আন্দোলনের জন্মদাতা রবার্ট ওয়েন ছিলেন ওয়েলসের সামান্য একজন কারিগরের ছেলে। তিনি ছেলে বেলাতেই এক কাপড়ের কলে শিক্ষানবীশ হয়ে ঢুকে পড়েন। ওয়েনের কপাল ছিল খুব ভাল। ত্রিশ বৎসর বয়সেই তিনি ঐ কারখানার একজন মালিক ও সহকারী পরিচালক হয়ে বসেন। তাঁর জীবনের কাজ-কর্ম্ম দেখে মনে হয়, তিনি একজন পাকা ব্যবসায়-বুদ্ধি-বিশিষ্ট লোক ছিলেন।

তিনি তাঁর কারখানার বস্ত্র-শিল্পের উন্নতিকল্পে নানা প্রকার নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন করেন। তাঁর কারখানার মজুরদের দুরবস্থা দেখে, তাদের অযথা শক্তিক্ষয় হতে দেখে খুব ব্যথিত হন এবং এই হীন অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধনের জন্য ও মজুর মালিকের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপনের জন্য সম্পূর্ণরূপে আত্ম-নিয়োগ করেন। প্রথমে তিনি তাঁর ম্যানচেষ্টারের ফ্যাক্টরীতে ও পরে নিউ লেনার্কের কারখানায় কাজ সুরু করেন। এই নিউ লেনার্কের কারখানায় সে সময় দুই হাজার লোক খাটিত এবং কারখানাটি আসলে বলতে গেলে তাঁরই তাঁবে ছিল। তিনি এই নিউ লেনার্কের কারখানাকে উন্নত ধরণের এক নয়া শিল্পনীতির আখড়া রূপে গড়ে তোলেন। এ করতে তাঁকে ব্যবসায়ে লোকসান দিতে হয় নাই। কারখানাটির শিল্প বহরের ঠাট সম্পূর্ণই বজায় রাখা হয়েছিল।

নিউ লেনার্কে তিনি যে কাজ আরম্ভ করেন সে একটা পরীক্ষা মাত্র। তিনি হাতে কলমে দেখাতে চেয়েছিলেন যে, একটা কারখানার সমাজ সম্বন্ধে যা করা যেতে পারে দেশের অন্যান্য কারখানায়ও তা করা সম্ভব। তিনি শিল্প সমাজে এক নয়া ধরণের উপনিবেশ স্থাপনের সঙ্কল্প করেন। তিনি চেয়েছিলেন ঠিক নিউ লেনার্কের প্রণালীতে নতুন নতুন শিল্প সহর গড়ে তুলতে। এই সময় তিনি দুনিয়ার লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ওয়েনের অভিনব প্রণালীতে পরিচালিত আদর্শ শিল্প-কারখানা দেখবার জন্য দেশ বিদেশ থেকে তীর্থযাত্রী আসত। এঁদের মধ্যে অনেক নামজাদা লোক ছিলেন। জার প্রথম আলেকজান্দারের উত্তরাধিকারী গ্রাণ্ডডিউক নিকোলাসের নাম এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। কুইন ভিক্টোরিয়ার পিতা ডিউক অব কেণ্ট ওয়েনের পরম বন্ধু ছিলেন। তা ছাড়া, ইয়োরোপের অন্যান্য

রাজারাজরা তাঁদের দেশের আর্থিক উন্নতি বিষয়ে ওয়েনের সঙ্গে পত্রব্যবহার করতেন। প্রুশিয়ার রাজা এক সময় তাঁর এলাকায় কিরূপ শিক্ষা প্রবর্ত্তন করা হবে সে বিষয়ে ওয়েনের মতামত চেয়ে পাঠান। হলাণ্ডের রাজা দান-খয়রাতের বিষয়ে ওয়েনের সঙ্গে আলোচনা করেন। সেকালে বিলাতের "টাইমস" ও "মর্নিং পোষ্ট" তাঁর প্রস্তাব সমর্থন করেছিল।

১৮১৫ সনের আর্থিক সঙ্কটের ফলে ওয়েন দেশের আর্থিক ব্যবস্থার প্রভূত দোষ ত্রুটী দেখতে পান। এই সময়ে ওয়েনের জীবনের দ্বিতীয় পর্য্যায় আরম্ভ হয়। তিনি এই সময় কতকগুলি অসমসাহসিক প্রচেষ্টায় হাত দেন। ১৮২৫ সনে আমেরিকার ইণ্ডিয়ানা প্রদেশস্থ নিউ জার্ম্মাণি অঞ্চলে এবং স্কটল্যাণ্ডের অরবিষ্টন সহরে তিনি নয়া ধরণের শিল্প-উপনিবেশ স্থাপন করেন, এবং ইহাতে তাঁর অধিকাংশ পুঁজি ঢালেন। মজুরদের ব্যথার ব্যথী ওয়েন তাঁদের জন্য বাসস্থান নির্ম্মাণ, তাদের শ্রম অপনোদনের জন্য জল-যোগের ব্যবস্থা ও তাদের সামাজিক ও নৈতিক উন্নতি-বিধানকল্পে নানা কর্ম্মচারী নিয়োগ করেন। তাঁর এ সকল আদর্শ শিল্প-উপনিবেশ বেশী দিন টিকে থাকতে না পারলেও তাঁর এই সময়ের প্রচেষ্টা পরবর্ত্তী পঞ্চাশ বছরের ফ্যাক্টরী বিষয়ক আইনকানুন প্রণয়নের কাজে প্রভূত সহায়তা করেছে।

এর নজির তাঁর কর্ম্ম-জীবনে ঢের দেখতে পাই। তিনি তাঁর কারখানায় দৈনিক ১৭ ঘণ্টার স্থলে ১০ ঘণ্টা মেহনত কায়েম করেন। তাঁর ফ্যাক্টরীগুলি স্বাস্থ্যপ্রদ ও আরাম-জনক করেন। দশ বছরের কম বয়সের বালক বালিকা কারখানার কাজে ভর্ত্তি করা নিষিদ্ধ করেন। পরন্তু এদেরকে অবৈতনিক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন এবং সেজন্য স্কুল স্থাপন করা হয়। এ ছাড়া তাঁর কারখানার মজুরদের শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করেন এবং তারা যাতে উন্নত ধরণের ওস্তাদ কারিগর হতে পারে সে দিকে দৃষ্টি দেন। ব্যবসার মন্দা ভাবের সময় বেকার মজুরদের মজুরী দিবার ব্যবস্থা করেন। আর মজুরদের সব রকম জরিমানা—যা সে সময় সব কারখানার একটা দস্তুর হয়ে উঠেছিল—উঠিয়ে দেন। এদের সাধারণ শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮০০ সন থেকে ১৮২৮ সন পর্য্যন্ত ওয়েন তাঁর এই সাধু প্রচেষ্টায় অনেকটা অগ্রসর হন। অনেকে বলেছেন ওয়েন বড় বড় আদর্শের স্বপ্ন দেখতেন। তিনি আদর্শবাদী ছিলেন একথা আংশিক সত্য হতে পারে কিন্তু তাঁর জীবন আলোচনা করবার সময় তাঁর কাজগুলিই আমাদের চোখে বেশী পড়ে। তিনি যে যে আদর্শের স্বপ্ন দেখতেন তার প্রত্যেকটিই হাতে কলমে করে যেতে প্রয়াস পেয়েছেন।

তাঁর প্রধান গ্রন্থ "নিউ মর্যাল ওর্য়াল্ড।" তাঁর আদর্শ এবং স্বপ্নগুলা সে কালের ও একালের বাস্তব জগৎ হতে ঢের দূরে। কিন্তু ওয়েনের এই সকল বড় বড় আদর্শ ও তাঁর ঐ সময়ের প্রচেষ্টা মজুর-আন্দোলনের জন্য দু'টি যমজ মতবাদ সৃষ্টি করে গেছে। একটি হল "ষ্ট্রাইক"—ধর্ম্মঘট বা হরতাল আর একটি শিল্প-কারখানায় মজুর-রাজ প্রতিষ্ঠা, যা মূর্ত্তি গ্রহণ করেছে বিংশ শতাব্দীর ফরাসী "সিণ্ডিক্যালিষ্ট" আন্দোলনে। এর মূলমন্ত্র হচ্ছে মনিব বাদ দিয়ে কল-কারখানায় পূরোপুরি মজুরদের একতিয়ার কায়েম করা।

ওয়েনের এই মজুর-প্রীতি কিন্তু তাঁর সমসাময়িক ব্যবসায়ীরা মোটেই পছন্দ করেন নাই। তারা এর পাল্টা আন্দোলন আরম্ভ করবার পথ খুঁজছিলেন। ওয়েন-তদানীন্তন রাজকীয় খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। তাঁর এই তথাকথিত নাস্তিকতার দোষ ধরে এরা তাঁকে অপদস্থ করবার চেষ্টা করেন। ওয়েনের সমসাময়িক পুঁজি-পতিদের গাত্রদাহের প্রধান কারণ ছিল এই যে,এইসব বিদ্রোহমূলক প্রস্তাব তাঁদের সর্ব্বনাশ করবে। এইসব "বদ খেয়াল" "ছোট লোকদের" মাথা বিগড়ে দেবে। এসব ওয়েনের অপরিণামদর্শিতারই ফল ইত্যাদি। ওয়েন কিন্তু এঁদের স্বার্থপরতা মোটেই সইতে পারেন নাই। তিনি এঁদেরকে বলতেন,—"একটা ফ্যাক্টরী বহু সাজসরঞ্জামপূর্ণ, তার যন্ত্রপাতি পরিষ্কার চকচকে ঝকঝকে ও উত্তম আর একটা ফ্যাক্টরীর যন্ত্রপাতিগুলি জঘন্য ভাবে রাখা হয় এবং কালেভদ্রে মেরামত করা হয় আর সেগুলি দিয়ে খুব বেশী রকম অসুবিধার সঙ্গে কাজ চালাতে হয়—এ দু'টির মধ্যে যে ঢের পার্থক্য রয়েছে তা আপনাদের বহুদিনের

অভিজ্ঞতা থেকে অবশ্যই স্বীকার করে নেবেন। এখন কলকারখানার যন্ত্রপাতিগুলিকে উন্নত করবার জন্য আপনারা যতটা চেষ্টা চরিত্র করেন, কলের মজুরদের জন্য ঠিক ততটা করলে আপনারা কি তাদের কাছ থেকে সেইরূপ বেশী ফল-লাভের আশা করতে পারেন না? এটা খুবই স্বাভাবিক যে, মানব-শরীরের এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জটিল যন্ত্রপাতিগুলির প্রতি সামান্য যত্ন নিলে, তাদের ভাল অবস্থার মধ্যে রাখলে সেগুলির কাছ থেকে নিশ্চয়ই খুব বেশী কাজ আদায় করে নেওয়া যেতে পারে। কলের মজুরদের ভাল থাকবার, ভাল খাবার ব্যবস্থা করলে তাদের কর্ম্মশক্তি অবশ্যই বেড়ে যাবে। ওয়েন "সোশ্যালিষ্ট" (সমাজতন্ত্রবাদী) ছিলেন না। মহানুভবতাপ্রণোদিত হয়েই তিনি মজুরদের অবস্থার উন্নতি-বিধানের জন্য চেষ্টা করেন। তাঁর নিউ লেনার্কের পরীক্ষা-কেন্দ্র দুনিয়ার অন্যান্য সাধু উদ্দেশ্যে স্থাপিত শিল্প-ভবনের প্রথম পথপ্রদর্শক। বর্ত্তমানে লর্ড লেভার হিউমের পোর্ট সান লাইট, ক্যাডবেরীর বোর্ণ ভিলা, আমেরিকার ফোর্ড কারখানা প্রভৃতি কয়েকটি কারবারকে ওয়েনের নিউলেনার্কের ফ্যাক্টরীর সঙ্গে তুলনা করা চলে। ওয়েনের এই "একস্পেরিমেন্ট" সমাজতান্ত্রিক না হলেও তাঁর উপনিবেশ-স্থাপনকে আজ ষ্টেট সোশ্যালিজম বলা যেতে পারে। তাঁর আমেরিকান একস্পেরিমেন্টে এবং তাঁর পরবর্ত্তী লেখায় সমাজতন্ত্রবাদের পূর্ণবিকাশ পরিলক্ষিত হয়।

ওয়েন যখন দেখলেন যে তাঁর আদর্শ শিল্প-কারখানা ও মালিক হিসাবে বাজারে তাঁর যে সুনাম আছে তাহাতে তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য পুঁজিপতিদিগকে প্রভাবিত করতে সমর্থ হল না, তখন তিনি রাষ্ট্র-সভার আশ্রয় গ্রহণে অগ্রসর হলেন। তিনি প্রথমে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করেন। পরে অন্যান্য দেশের শাসক-সম্প্রদায়ের নিকট তাঁর যথার্থ দাবী জ্ঞাপন করেন। তাঁর বিবেচনায় তিনি ব্যক্তিগতভাবে কারখানাগুলির ও মজুরদের যে সংস্কার সাধন করছিলেন সেই কাজ দেশের সরকারের সদিচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে পূর্ব্বেই আরম্ভ করা উচিত ছিল।

ওয়েনের চেষ্টার ফলে ১৮১৯ সনে বিলাতে প্রথম ফ্যাক্টরী-আইন পাশ হয়। ইহার ফলে নয় বৎসরের কম বয়সের বালকবালিকা কারখানার কাজে ভর্ত্তি করা নিষিদ্ধ হয়ে যায়, যদিও ওয়েন নিজে দশ বৎসরের পক্ষপাতী ছিলেন। এই আইনের ফলে মালিক-কর্ত্তৃক মজুর-শোষণ অনেকটা কমে যায়। ইহার কতকগুলি ধারা দেখে আজকে আমাদের অনেকটা বিস্মিত হতে হয়। নয় দশ বৎসরের কম বয়সের বালকবালিকাকে কারখানায় খাটানোর বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নের দরকার হতে পারে, এটা আমাদের বুদ্ধিতে আসে না। কিন্তু সে ছিল একশ' বছর আগেকার দিন। বাস্তবিক পক্ষে ওয়েনের চেষ্টায় ইংলণ্ডে ঐ প্রথম ফ্যাক্টরী আইন পাশ হওয়ার ফলে একটা নতুন যুগ আরম্ভ হল। এটাকে বালকবালিকার "ম্যাগ্না কার্টা" (ব্যক্তিগতস্বাধীনতার দলিল) বলা চলে। গরিব মাতাপিতার সন্তানকে কারখানায় অবশ্যই কাজ করতে হত। কিন্তু এই আইনের বলে কারখানার অনেক কেলেঙ্কারীর অবসান ঘটে।

ওয়েন সরকারের কাছে যেরূপ সাহায্য-প্রাপ্তির আশা করেছিলেন তা না পাওয়ায় পুঁজিপতিগণের পৃষ্ঠপোষকতার ও সরকারের আইন কানুনের অসারতা উপলব্ধি করে তিনি এবার সঙ্ঘ গড়বার কাজে মন দেন। তাঁর মতে একমাত্র সঙ্ঘই নতুন আবহাওয়া সৃষ্টি করবে এবং দলবদ্ধ সঙ্ঘ ছাড়া সামাজিক ব্যবস্থার সমাধান কোনরূপে সম্ভবপর নয়। নয়া আবহাওয়া সৃষ্টি করাই ওয়েনের সকল প্রচেষ্টার একমাত্র উদ্দেশ্য হল। তিনি পুঁজিপতিদের কাছেই যান, আর সরকারের সাহায্য-ভিক্ষাই করুন বা মজুরদের চাঙ্গা করেই তুলুন, তাঁর একমাত্র মন্ত্র ছিল "নতুন আবহাওয়া সৃষ্টি করা চাই"।

ওয়েনের মতবাদে শিক্ষাকে খুবই উঁচু স্থান দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার প্রসার দ্বারাই এই নতুন আবহাওয়া গড়ে তোলা সম্ভব। বর্ত্তমান সমাজের কোন ব্যক্তিবিশেষকেই তার কাজের জন্য দায়ী করা চলে না। সে যেমনটি শিক্ষা পেয়েছে, যে রকম আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছে ঠিক তেমনটি হতে বাধ্য। তাকে যে ছাঁচে ঢালা হবে সে ঠিক তেমনটি হয়ে বেরুবে। তার আবহাওয়া বদলে ফেল। তার শিক্ষার পরিবর্ত্তন কর—সে আপনাআপনি পরিবর্ত্তিত হয়ে যাবে।

এই আবহাওয়া বদলাতে হলে প্রথমে শিল্প-কারখানার লাভের বখরা নাকচ করা চাই। এই প্রফিট (মুনাফা) হল আদত অনিষ্টের মূল। এর যা সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা হয়েছে তাতেই ঘোর অবিচার রয়েছে। প্রফিটের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, "জিনিষ তৈরীর খরচা বাদে আয়"। যে খরচায় একটা জিনিষ তৈরী হয় ঠিক সেই মূল্যেই সেটা বিক্রী হওয়া উচিত।

প্রফিট বা মুনাফা কেবল অন্যায় নয় ঘোর অনিষ্টজনকও বটে। দুনিয়ার বাজারে যে-সব আর্থিক সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে তার গোড়াতে দেখা যায় পুঁজিপতিদের লাভ করবার প্রবৃত্তি। লাভের বখরা থাকার দরুণ উৎপাদনকারীরা তাদের গতর-খাটানো মেহনতের মাল পুনরায় ন্যায্য দামে খরিদ করতে পারে না। ফলে তারা যা উৎপন্ন করে তার দামে তাদের ব্যবহার্য্য দ্রব্য পায় না। শ্রমিক যেই একটা জিনিষ তৈরী করলে, অমনি ধনিক তার কাছ থেকে সেটা ছিনিয়ে নিয়ে যায় ও নিজের উপরি লাভটা তৈরীর খরচার সঙ্গে যোগ করে দেয়। এইবার বাজারে যে দামে জিনিষটা বিকায় সেটাকে কখনই ন্যায্য দাম বলা চলে না; কারণ উৎপাদনকারী একমাত্র তার পরিশ্রমের বিনিময়ে তা খরিদ করবার অধিকারী নয়। জিনিষটি কিনতে হলে তাকে আরও বেশী দাম দিতে হবে, কারণ ধনিকের উপরি লাভের হিস্যাটা যোগ করা হয়েছে।

কিন্তু দামের মধ্যে "কষ্ট্ অব প্রোডাকশ্যন" অর্থাৎ জিনিষ উৎপাদনের মজুরী এবং পুঁজির ব্যবহার-ঘটিত ক্ষয় বা লোকসান ছাড়া আর কিছু ধরা উচিত নয়। প্রফিট (মুনাফা) একেবারে তুলে দেওয়া চাই।

হেডোনিষ্টিক মতবাদিগণ জোরগলা করে বলে গেছেন যে, নিখুঁত প্রতিযোগিতায় লাভের বখরায় শূন্য পড়বে। ওয়েন এঁদের এই মতবাদে আস্থাবান ছিলেন না। ওয়েন প্রতিযোগিতা ও মুনাফার মধ্যে কোনই বিরোধ দেখতে পান নাই। তার মতে দু'টার মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান। একটা যদি হয় যুদ্ধ আর একটি লুটের মাল। মুনাফা উৎপাদনের খরচার একটা অংশ বলে ধরা হলে তখন এটাকে ইণ্টারেষ্ট থেকে পৃথক করা একরূপ অসম্ভব হয়। এক্ষেত্রে দেখা যায় নিখুঁত প্রতিযোগিতা মালিকদের লভটাকে লোপ করে দিতে সমর্থ নয়। নিখুঁত প্রতিযোগিতার ফলে কেবল দ্রব্যের মূল্য কমাইয়া উৎপাদনের খরচায় আনা হয়। এ ক্ষেত্রে মুনাফাকে অন্যায় বলা চলে না, কারণ এর দ্বারা যে খরচায় তৈরী করা হয় ঠিক তাতেই বিক্রী করা হয়।

প্রফিট বা মুনাফাকে যখন উৎপাদনের খরচার মধ্যে ধরা হয় না, তখন এটাকে ইণ্টারেষ্টের (সুদের) সঙ্গে গোলমাল করার সম্ভাবনা থাকে না। একটা জিনিষ বাজারে যে দামে বিক্রী করা হয়, তা থেকে জিনিষটা পুনরায় তৈরী করতে যা খরচা পড়ে সেই খরচাটা বাদ দিলে যা দাঁড়ায়, তাকেই প্রফিট বা মুনাফা বলা হয়। এই হিসাবে মুনাফাটা বাস্তবিকই অন্যায় এবং নিখুঁত প্রতিযোগিতায় এ অব্যবস্থা টিকতে পারে না। যে একচেটে কারবারের উপর এটা প্রতিষ্ঠিত তা প্রতিযোগিতার ফলে বিনষ্ট হবেই।

এ করতে হ'লে এমন কোন সঙ্ঘ গড়ে তুলতে হবে যার দ্বারা মুনাফা লোপ করে দেওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে 'সস্তার বাজারে মাল কিনে আক্রার বাজারে বেচব' ইত্যাদি মতলবেরও অবসান ঘটিয়ে দেওয়া চাই।

মুনাফার প্রধান বাহন হচ্ছে মুদ্রা বা স্বর্ণ-রৌপ্য। মুনাফা সব সময় মুদ্রার মধ্য দিয়া পাওয়া যায়। স্বর্ণই বিনিময়ের ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করে। কারেন্সি রিড্ল বা মুদ্রা-সমস্যা ওয়েনকে খুব প্রভাবিত করেছিল। তিনি এই পরিবর্ত্তনশীল মুদ্রার বাজারের অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে কোমড় বাঁধেন। তিনি বলেন, যতদিন আমরা এই পরিবর্ত্তনশীল মুদ্রার রেওয়াজ উঠিয়ে না দি ততদিন কিছুতেই আর্থিক সুবিচারের আশা করতে পারি না। মুদ্রার ওঠা-নামার জন্য দুনিয়ার বাজারের বিনিময় কারবারে এক ঘোর অবিচার চলছে। জিনিষ যে উৎপাদন-খরচার চাইতে বেশী দামে বিক্রী হয় সে জন্য এই মুদ্রাই দায়ী। ওয়েন বলেন "লেবার-নোটকে" মুদ্রার তক্তে বসাতে হবে। মুদ্রা চাই না। উহাই সকল অনিষ্টের মূল। এই "লেবার-নোট" বা মেহনতের চিঠা মূল্য-নির্দ্ধারণের এক সুন্দর মাপ-

কাঠি হবে। মুদ্রার চাইতে এর কিম্মৎ ঢের ঢের বেশী হবে। জিনিষের মূল্য নির্দ্ধারণ করবার সময় কতটা মেহনত জিনিষটা তৈরী হতে লেগেছে তা ধরা হয়ে থাকে। আর ধরা হয়ে থাকে পুঁজিপতির কতটা লাভের বখরা থাকা চাই। এখন মেহনতই যখন মূল্য-নির্দ্ধারণের প্রধান বা একমাত্র কারণ এবং এইটাই যখন আসল বস্তু, তখন এইটাকেই মুদ্রার আসনে বসিয়ে দিলে সব গোলমাল চুকে যাবে। ওয়েন বল্লেন, "ঐ মুদ্রার অক্ষরগুলোর জায়গায় মেহনতের ঘণ্টা-গুলো লিখে দাও।"

তাঁর এক অভিনব প্রচেষ্টা হল এই "লেবার-নোট" চালানো। এক ঘণ্টা, পাঁচ ঘণ্টা, বিশ ঘণ্টা করে কাজের ছাপ এর উপর থাকত। যে মাল উৎপাদনকারী তার মাল বেচতে চায়, তাকে তার খাটুনির ঘণ্টা হিসাব করে "লেবার-নোট" দেওয়া হবে। আবার যে ক্রেতা, তাকেও ঠিক অতগুলি ঘণ্টার লেবার নোট দিয়ে ঐ জিনিষ কিনতে হবে। এই ব্যবস্থার আমলে প্রফিট (মুনাফা) আপনা আপনি বাদ পড়ে যাবে।

মুদ্রার প্রতি লোকের বীতশ্রদ্ধার ভাব এই নতুন নয়। তবে ওয়েনের নতুন আবিষ্কারটা হচ্ছে এই যে, লেবার-নোট বা মেহনতের চিঠা মুদ্রার পরিবর্ত্তে কাজ চালাতে পারে। মুদ্রা না হলেও যে কেনা-বেচা ও বিনিময়ের কাজ চালানো যায়, লোকে এ সত্যটা এই প্রথম জানতে পারল। ওয়েন বলেন, "এই আবিষ্কার মেক্সিকো ও পেরুর সোণার খনি আবিষ্কারের চাইতে বেশী মূল্যবান।"

বাস্তবিকই এ একটা আশ্চর্য্য খনি! সকল সোশ্যালিষ্ট বা সমাজতন্ত্রপন্থী এ খনি থেকে রত্ন-রাজি আহরণ করছে। সোশ্যালিষ্ট মতবাদের সঙ্গে ওয়েনের কম্যুনিষ্ট মতবাদ খাপ খায় নাই। ওয়েনের আদর্শ ছিল, প্রত্যেককে তার প্রয়োজন অনুসারে অভাব বিমোচন করতে হবে। লেবার-নোট প্রবর্ত্তনের মূলে তাঁর ইচ্ছা ছিল প্রত্যেককে যোগ্যতা-নুসারে মজুরী দেওয়া।

এখন দেখা যাক মুদ্রাকে এরূপভাবে একঘরে করা সম্ভবপর কি না। বাস্তবিক পক্ষে মুদ্রা বাদ দিয়ে কাজ চালানো যায় কি? লণ্ডন সহরে ওয়েনের আমলে "ন্যাশনাল একুইটেবল এক্সচেঞ্জ" নামক শ্রমিকদের জাতীয় বিনিময় প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন দ্বারা এর একটা পরীক্ষা করা হয়েছিল। ওয়েন নিজে এটার বিষয়ে ততটা গৌরব বোধ না করলেও তাঁর সমস্ত আন্দোলনের মধ্যে এই লেবার এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এটা একটা কো-অপারেটিভ সোসাইটি বা সমবায় ভাণ্ডারের আকারে খোলা হয়। এর একটা কেন্দ্রীয় ডিপো (গুদাম) ছিল। ঐখানে বিনিময়ের সকল সভ্য তাদের মেহনতে তৈরী দ্রব্য এনে জমা করত এবং উহার মূল্য বাবদ লেবার-নোট (মেহনতের চিঠা) গ্রহণ করত। দামটা দেওয়া হত ঘণ্টা হিসাবে—জিনিষটি তৈরী করতে যে কয় ঘণ্টা মেহনত লেগেছে সেই কয় ঘণ্টার লেবার-নোটের আকারে। জিনিষটি করতে কত ঘণ্টা লেগেছে তা সভ্যদেরকেই বলতে দেওয়া হত এবং এই উৎপন্ন জিনিষগুলির গায়ে ঘণ্টার হিসাবে টিকিট লাগিয়ে রাখা হত।

সমবায়ের যে-কোনো সভ্য ঐ টিকিটের গায়ে লেখানুযায়ী লেবার-নোট দিয়ে জিনিষটি কিনতে পারেন। ধরুন যার এক জোড়া মোজা বুনতে দশ ঘণ্টা সময় লেগেছে, সে উহার মূল্যরূপে প্রাপ্ত লেবার নোট দ্বারা সমবায়ের যে-কোনো জিনিষ, যা তৈরী করতে ঐ দশ ঘণ্টা সময় লেগেছে, তা কিনতে অধিকারী। এইভাবে সকলেই জিনিষ তৈরীর আসল খরচায় কেনা-বেচা করতে লাগল। এইভাবে প্রফিট (মুনাফা) আপনা থেকেই অন্তর্দ্ধান করল। মুনাফাকারী—সে শিল্পীই হোক আর বণিকই হোক কি মধ্যস্থ ফড়ে বা দালালই হোক—তাদেরকে দূর করে দেওয়া হল। কারণ উৎপাদনকারী ও খরিদ্দার বা জিনিষ-ভোগকারী (কনজিউমার) সামনাসামনি এসে দাঁড়াল এবং উভয়ে সরাসরি কথাবার্ত্তা চালাতে লাগল। এইভাবে প্রফিট বা মুনাফার খাতায় শূন্য পড়ল।

১৮৩২ সনে "লেবার এক্সচেঞ্জ" কায়েম করা হয়। ইহা গোড়াতে বেশ উন্নতি দেখায়। তখন এর সভ্য-সংখ্যা ছিল ৮৪০। এমন কি এঁরা কতকগুলি শাখা স্থাপনেও কৃত-কার্য্য হয়েছিলেন। কিন্তু নীচের লিখিত কারণগুলি এই প্রতিষ্ঠানটি উঠে যাওয়ার জন্য অনেকটা দায়ী।

(১) বিনিময়ের সভ্যগণকে তাদের নিজের নিজের জিনিষ তৈরীর ঘণ্টা বলবার সুযোগ দেওয়ায় তাঁরা স্বভাবতই কাজের ঘণ্টাগুলি বাড়িয়ে বলতেন। ফলে জিনিষের প্রকৃত দাম ঠিক করবার জন্য মূল্য-নিরূপণ-কারী ওস্তাদ নিযুক্ত করা হল। এঁরা কিন্তু ওয়েনের আদর্শের সঙ্গে ততটা পরিচিত ছিলেন না। এঁরা আর দশ জনের মত টাকার মূল্যের দিক্ দিয়ে জিনিষের মূল্য ধার্য্য করতে লাগলেন এবং সেই হিসাবে "লেবার নোট" কাটতে লাগলেন। এক ঘণ্টা মেহনতের জন্য এঁরা ৬ পেন্স করে দেওয়া সাব্যস্ত করলেন। এতে করে ব্যাপার দাঁড়াল ওয়েনের যা আদর্শ ছিল তার একেবারে উল্টো। তিনি মুদ্রার সঙ্গে কোন সম্বন্ধই রাখবেন না—মুদ্রাকে একেবারে বয়কট করবেন। আর এঁরা সেই মুদ্রাকেই বিনিময়ের তক্তে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে ঘরকন্না আরম্ভ করে দিলেন এবং "লেবার ষ্ট্যাণ্ডার্ড" বা মেহনতের মাপকাঠি দিয়ে জিনিষের দাম নির্দ্ধারণ না করে টাকার মূল্যের তরফ থেকে জিনিষের দাম কসে দিতে লাগলেন।

(২) প্রতিষ্ঠানে এমন অনেক সভ্য এসে জুটতে আরম্ভ করলেন, যাঁরা আগেকার সভ্যগণের মত অতটা বিবেক-বুদ্ধি-সম্পন্ন ও ধর্ম্মভীরু নয়। এঁদের কল্যাণে শীঘ্রই এক্সচেঞ্জ এমন সব মালে পূর্ণ হয়ে গেল যেগুলি বাস্তবিক পক্ষে বিক্রয়ের অযোগ্য। এই সব অকেজো মালের দাম কষে যে লেবার-নোট দেওয়া হয়েছিল এক্সচেঞ্জের কর্ম্মকর্ত্তাদের এখন বাধ্য হয়ে সেগুলির বিনিময়ে আবার কতকগুলি ভাল জিনিষ (যার দাম ঠিক ভাবে কষা হয়েছিল এবং বাস্তবিক পক্ষে যেগুলি ঐ দামের উপযুক্ত) দিয়ে দিতে হল। ফলে দাঁড়াল, ভাল ভাল মালগুলা সাবাড় হয়ে গেল আর যে মাল রইল সেগুলির কোন দিনই বিক্রী হবার সম্ভাবনা থাকল না। মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে এক্সচেঞ্জ এমন সব জিনিষ খরিদ করে ফেল্লে যার দাম বাজার দরের চাইতে ঢের চড়া। আবার এমন সব জিনিষ বেচে ফেল্লে যার দাম বাজার দরের চাইতে নেহাৎ কম।

নোটগুলি রেজিষ্ট্রীকৃত না হওয়ায় যে-কেহ, সে সমিতির সভ্য হোক বা না হোক, ঐ নোটগুলি ক্রয়-বিক্রয়ের দালালী করে বেশ দু'পয়সা আয় করে নিতে লাগল। লণ্ডনের তিনশ' বণিক তাদের দ্রব্যসম্ভারের মূল্য বাবদ লেবার নোট নিতে থাকেন এবং এই নোট দিয়ে তাঁরা এক্সচেঞ্জের ভাল ভাল দামী মালগুলো কিনে নিতে লাগলেন। শেষে যখন তাঁরা দেখলেন বিনিময়ে আর কিনবার মত কোন জিনিষ নাই, যা আছে সব রদ্দি মাল, তখন তাঁরা লেবার নোট নেওয়া বন্ধ করলেন। এই ভাবে তাঁরা এক্সচেঞ্জটীর ধ্বংস-সাধনে কৃতকার্য্য হন।

বাজার দর সম্বন্ধে যার সামান্য একটু জ্ঞান আছে তিনিই এটা স্বীকার করবেন যে, এ রকম প্রতিষ্ঠান টিঁকতে পারে না। কিন্তু তা হলেও এটা অবশ্যই মেনে নিতে হবে যে, ওয়েনের এই মুদ্রা লোপ করণের প্রস্তাব আর্থিক জীবনের চিন্তা ধারায় এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করেছিল এবং তার দেখাদেখি ভবিষ্যতে এই ক্ষেত্রে আরও অনেকগুলি আন্দোলন উপস্থিত হয়, তার প্রত্যেকটিরই আদর্শ মুদ্রার হাত হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার পথ আবিষ্কার করা। ফরাসী সমাজ-দার্শনিক প্রুধঁ'র ব্যাঙ্ক ও সল্ভের সমাজ-প্রতিষ্ঠানে এই একই চিন্তা বর্ত্তমান দেখতে পাই।

লেবার এক্সচেঞ্জ বা মুনাফা-লোপের প্রতিষ্ঠানটিই ওয়েনের আসল উদ্দেশ্য নয়। সেটা ছিল একটা পন্থামাত্র। আসল জিনিষ ছিল মুনাফা বা প্রফিট লোপের আদর্শটা। লেবার-নোট কৃতকার্য্য না হলেও এই ব্যাপারে মানুষের এক অতি বড় প্রয়োজনীয় সমবায় প্রতিষ্ঠান বা কো-অপারেটিভ সোসাইটির চরম উৎকর্ষ ও সফলতা দেখতে পাই। আজ যে জগৎজোড়া সমবায় আন্দোলন চলেছে এর গোড়াতে দেখতে পাই রবার্ট ওয়েনের ঐ লেবার এক্সচেঞ্জ। তিনিই এই আন্দোলনের আদি পুরোহিত। ১৮৩২ সনে কো-অপারেটিভ সোসাইটির প্রথম প্রতিষ্ঠা দেখতে পাই ব্যাঙ্ক এক্সচেঞ্জ প্রচেষ্টায়। সমবায় আন্দোলন অতি সামান্য ভাবেই আরম্ভ করা হয়। ১৮২০ থেকে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দব্যাপী ওয়েনাইট আন্দোলনের সময় ইংলণ্ডে সমবায় আন্দোলন বিস্তার লাভ করছিল। এই সময় শত শত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে এই সমিতিগুলি দ্রুত বিলুপ্ত হয়ে

যায়। রকডেলের কয়েকজন উদ্যোক্তার চেষ্টাতেই সমবায় আন্দোলন স্থায়িত্ব লাভ করে।

বর্ত্তমান সময়ে জগতে প্রায় ৫০টি দেশে সমবায় আন্দোলন চলছে। এই সমস্ত সমবায়-সমিতির সংখ্যা দাঁড়াবে ৫০ হাজারের উপর এবং ১৯২০ সন পর্য্যন্ত সমবায়ের সভ্য তালিকার খাতায় কম সে কম চার কোটী লোক নাম লিখিয়েছে।

বর্ত্তমান জগতের কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলি সাধারণতঃ গরিব মধ্যবিত্ত লোকদের সমবায়ে ও তত্ত্বাবধানে চলে এবং এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কেনা বেচা করা হয় ও জিনিষ উৎপন্ন করা হয়। ডেয়ারী (দুগ্ধ-জাতীয় জিনিষ তৈয়ারীর ভাণ্ডার) এবং কৃষি-ফার্ম্মও ইহার দ্বারা চালান হয়। কো-অপারেটিভ রিটেল সোসাইটিগুলির (খুচরা সমবায় সমিতি) আদর্শ এই যে, হয় কোন মুনাফা করা হবে না, কিম্বা মুনাফা কিছু করলেও সেটা সমবায়িগণের মধ্যে তাঁদের ক্রয়ের অনুপাতে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দেওয়া হবে। বাস্তবিক পক্ষে বলতে গেলে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিতে মুনাফা একরূপ নাই বললেই চলে। এইখানটায় ঠিক ওয়েনের আদর্শ-মাফিক কাজ করা হয়েছে। তাঁর মতলব ছিল মধ্যবর্ত্তী লোক বা দালালকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়ে উৎপাদনকারী (প্রডিউসার) ও জিনিষের ক্রেতা বা ভোগী (কনজিউমার) এ দু'য়ের মধ্যে সরাসরি সম্বন্ধ স্থাপন করা। কো-অপারেটীভ সোসাইটিগুলি ঠিক এই আদর্শেই চলতে প্রয়াস পাচ্ছে। এঁদের কার্য্য-কলাপেও বিনা লাভে বিক্রয়ের ব্যবস্থা দেখা যায়। সমবায় প্রতিষ্ঠান দুনিয়ায় ওয়েনের এক অতুলনীয় স্মৃতিসৌধ। এর আরও প্রসার বৃদ্ধির সঙ্গে ওয়েনের খ্যাতিও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। ওয়েন কিন্তু জীবন-কালে তার এ স্মৃতিসৌধের পরিচয় লাভ করেন নাই। বর্ত্তমান জগতের সমবায়-আন্দোলন গড়ে' তোলার কাজে তাঁর দান কত বড় একথা তিনি বুঝে যেতে পারেন নি। তাঁর লেখার মধ্যে সমবায় কথাটার ব্যবহার খুব কমই পাওয়া যায়। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না; কারণ সে সময় ঐ শব্দটার অর্থ যা ছিল আজ তার চাইতে ঢের ঢের বেশী ব্যাপক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তখনকার দিনে রকডেলের উদ্যোক্তাদের সমবায়-আন্দোলনে ওয়েন ততটা উৎসাহ বোধ না করলেও বর্ত্তমানে উহার আদর্শ ও বিস্তার দেখলে তিনি এটাকে তাঁরই আদর্শে স্থাপিত প্রতিষ্ঠান বলে স্বীকার করে নিতেন। একশ' বছর আগের সমবায়-আন্দোলনের সঙ্গে আজকার সমবায়-আন্দোলনের পার্থক্য ঢের।

ওয়েন যখন ৬৩ বছরের বুড়ো সেসময়ে স্বীয় আদর্শ-গুলির কোন প্রকার সফলতা দেখতে না পেয়ে তিনি বড়ই মুসড়ে পড়েন। তাঁর উপনিবেশ-স্থাপনের চেষ্টা ব্যর্থ হল। কয়েক বৎসর মাত্র তিনি ঐ আদর্শ শিল্প-উপনিবেশগুলি চালাতে সমর্থ হয়েছিলেন। লেবার এক্সচেঞ্জ, যা তাঁর আদর্শে গড়ে তোলা হয়েছিল, সেটাও বন্ধ হল। উপর্য্যুপরি ব্যর্থতার আঘাতে নিরুৎসাহ হয়ে পড়লেও তিনি তাঁর স্থিরীকৃত আদর্শ ও অচল অটল বিশ্বাস কোন দিন ছাড়েন নি। তাঁর মতবাদে তিনি চিরদিন সম্পূর্ণ আস্থাবান ছিলেন।

এই সময় ওয়েন তাঁর জীবনের তৃতীয় পর্য্যায় আরম্ভ করলেন। তিনি তাঁর "নিউ মর‍্যাল ওয়ার্ল্ড" গ্রন্থের মতবাদ প্রচারে এই সময় নিজেকে নিযুক্ত করলেন এবং ঐ নামে সংবাদপত্র চালাতে লাগলেন। তিনি এই সময় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে মেতে উঠেন। কিন্তু ভবিষ্যতে যা তাঁর অদ্বিতীয় কীর্ত্তিস্তম্ভ হয়ে থাকবে, ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে রকডেলের উদ্যোক্তাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সেই কো-অপারেটিভ সোসাইটির প্রতি তাঁর ততটা সহানুভূতি ছিল না। রকডেলের উদ্যোক্তাদের ২৮ জনের মধ্যে ৬ জন ওয়েনের ভক্ত শিষ্য ছিলেন এবং এদের মধ্যে ওয়েনের পরম ভক্ত চার্লস হাওয়ার্থ ও উইলিয়ম কুপার ঐ অদ্বিতীয় অমর প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ ছিলেন।

বর্ত্তমান সমবায় আন্দোলনের চেলাদের তাঁর মতাবলম্বী বলে মেনে নেওয়া না হলে বলতে হয়, ওয়েন কোন স্কুল বা তাঁর নিজ মতবাদের সমাজ স্থাপন করে যান নাই। তবে ওয়েনের শিষ্যবর্গের মধ্যে অনেকে তাঁর মতবাদ কাজে খাটানোর প্রয়াস পেয়েছেন।

ওয়েন গঠন-মূলক কাজে হাত দিয়েছিলেন। তিনি চরম সোশ্যালিষ্ট ছিলেন না। তিনি কখনো মজুরকর্ত্তৃক মনিব-

বেদখলের আদর্শ সমর্থন করেন নি। তিনি শিল্প-কারখানায় বিপ্লব আনবার আকাঙ্ক্ষা করতেন না। এমন কি, তিনি সেকালের "চার্টিষ্ট মুভমেণ্ট" (মজুরকর্ত্তৃক সার্ব্বজনীন ভোটাধিকার দাবীর আন্দোলন) সমর্থন করতে পারেন নি। এসব সত্ত্বেও ওয়েন একজন পাকা সোশ্যালিষ্ট (সমাজতন্ত্রবাদী), এমন কি তিনি একজন কম্যুনিষ্ট (সাম্যবাদী)। ওয়েনই সর্ব্বপ্রথম সোশ্যালিজম কথাটা ব্যবহার করেন। ১৮৪১ সনে প্রকাশিত ওয়েনের "হোয়াট ইজ সোশ্যালিজম" গ্রন্থের পূর্ব্বে আর কেহ ঐ কথাটা ব্যবহার করে নাই।

ওয়েনের জীবন সদা কর্ম্মময় ছিল। ৮৭ বৎসর বয়সে ১৮৫৭ সনে তাঁর মৃত্যু হয়। ওয়েন তাঁর অনন্যসাধারণ কর্ম্ম-জীবনে সাহিত্য-সাধনা করবার অবসর খুব অল্পই পেয়েছিলেন। তাই অল্প কয়েকখানা মাত্র বই তিনি লিখে গেছেন। ওয়েনের সুদীর্ঘ কর্ম্মজীবন ও তাঁর বহুবিধ চিন্তাধারা সম্বন্ধে পুরোপুরি এখানে বলা সম্ভবপর নয়। ইংরেজ লেখক পড মোরের "লাইফ অব রবার্ট ওয়েন" কিংবা তাঁর নিজের লেখা কাহিনীতে এ সম্বন্ধে বিশদভাবে জানিতে পারা যায়। ফরাসী লেখক দলিয়ঁ ফরাসী ভাষায় তাঁর জীবন ও মতবাদ সম্বন্ধে ১৯০৭ সনে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করে গেছেন।

কারিগর গড়িয়া তুলিবার উপায়

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাস, দক্ষিণ গোবিন্দপুর, ২৪ পরগণা।

সকল পরিশ্রমেরই মূল্য আছে। একটী সপ্তমবর্ষীয় বালক অপরের গৃহে তামাকু সাজিয়াও নিজের ভরণপোষণ উপার্জ্জন করে। ইহাতে এই বুঝা যায় যে, ঐ সাত বৎসরের বালকের অত্যল্প সামর্থ্যও অপরের কাজে লাগিবার উপযুক্ত এবং তাহারও দাম আছে। কেবল সামর্থ্যানুযায়ী কর্ম্মের সন্ধান এবং প্রতি কার্য্য অর্থোপার্জ্জনোন্মুখ করা চাই। যখন কোন পরিশ্রমই বিফলে যাইবে না, তখনই আমাদের অন্ন-সমস্যার সমাধান হইবে। পরিশ্রম করিয়া যদি অর্থাগম না হয়, তাহা হইলে সেজন্য আমাদের অদৃষ্ট কখনই দোষী নহে—পরিশ্রমকে যথোপযুক্ত কাজে লাগাইবার অক্ষমতাই দোষী।

বিদেশীবর্জ্জন আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক জাতীয় শিল্প-শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাতাদের আশা ছিল, এই শিক্ষালয়গুলি জাতির জাতীয়তা রক্ষা করিতে পারিবে এবং দেশের অভাব পূরণ করিয়া সময়ে বিদেশ হইতেও অর্থা-গমের পথ সুগম করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হয় নাই। অধিকন্তু, বিদ্যালয়গুলি স্থাপন করিতে যে অজস্র অর্থব্যয় হইয়াছিল, তাহার কপর্দ্দকও আর ঘরে ফিরিয়া আসে নাই। এত অর্থব্যয়, জীবনপণ উদ্যম, স্বার্থত্যাগ, অক্লান্ত পরিশ্রম কিছুই সার্থক হইল না কেন? সফলতার পথে এমন কি দুর্লঙ্ঘ্য অন্তরায় ছিল?

ইতিপূর্ব্বে "বাঙ্গালার কৃষকদের" শোচনীয় জীবনের ছবিখানি সাধারণের দৃষ্টিগোচর করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম এবং তাহার প্রতিকারের উপায়স্বরূপ একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সহজসাধ্য প্রস্তাবনা সাধারণের বিচার-বিবেচনার জন্য উপস্থিত করিয়াছিলাম (১)। গরিবের দান বলিয়া তাহা কেহই উপেক্ষা করেন নাই, ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য। পক্ষা-ন্তরে অনুগ্রহ করিয়া অনেকে অনেক প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য পরে বলিতেছি।

বাঙ্গালার শিক্ষাধারার পরিবর্ত্তনের সময় আসিয়াছে। শিক্ষার্থীর জন্য যত টাকা ব্যয় করা যায়, অনেক সময়, সারা জীবনেও সে তাহা উপার্জ্জন করিতে পারে না। এমন কি,

(১) "আর্থিক উন্নতি"র শ্রাবণ সংখ্যা—"কৃষকদের আর্থিক শিক্ষা"।

নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যও তাকে অপরের মুখাপেক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে শিক্ষা অর্থে উচ্চ শিক্ষা ধরিব না। উচ্চ শিক্ষার স্পষ্ট উদ্দেশ্য বর্ত্তমান, কিন্তু সকলেই উচ্চ শিক্ষার গুরুতর ব্যয় বহন করিতে পারে না। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে ম্যাট্রিকুলেশনই যথেষ্ট। এমনি শিক্ষার রীতি যে ১৬ বৎসরেই ছাত্রদের "আওতার গাছ" করিয়া তোলে—রোদের আঁচ লাগিলেই শুকাইয়া উঠে। অনেক বাঙ্গালীরই কিছু না কিছু ভূসম্পত্তি আছে, কিন্তু ম্যাট্রিক ছাত্র না পারে একখানি দাখিলা (কবচ) বুঝিয়া লইতে, না পারে একটা দলিল কোবালার মুসাবিদা করিতে। বাঙ্গালা আজকাল আধি-ব্যাধির আকর। কিন্তু ম্যাট্রিক ছাত্র না পারে নিজের স্বাস্থ্যে লক্ষ্য রাখিতে, না পারে পরিবারের কোন কাজে লাগিতে—কথায় কথায় ছুটিয়া যায় ডাক্তার বাড়ী। আর যদি গৃহে অর্থের সাচ্ছল্য না থাকে তখন অশ্রুত্যাগ ও অদৃষ্টের দোষ! কিরূপে রোগীর শুশ্রূষা করিতে হয়, তাহাও সে জানে না। বাঙ্গালা দেশ আজকাল পৃথিবীর অ-বাঙ্গালীর মিলন-স্থান, আর তাহাদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের একমাত্র সেতু হিন্দী ও ইংরেজী। কিন্তু বাঙ্গালার বিদ্যালয়ে হিন্দী শিক্ষণীয় ভাষা নয়। আর ইংরেজীতে ম্যাট্রিক ছাত্রের কথোপকথন-শক্তির উল্লেখ না করিলেই ভাল। সর্ব্বোপরি চাকরীই যখন শিক্ষার লক্ষ্য, তখন একখানি মনোরম আবেদন বা যুক্তিপূর্ণ পত্র তো তাহার নিকট আশা করা চলে। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য—সেদিকেও অষ্টরম্ভা! তবেই দেখুন, এক বেলা অনাহারে থাকিয়া যে পুত্রের শিক্ষার ব্যয় বহন করিতে হইয়াছে, ১৬ বৎসর বয়সে সংসারে তাহার যোগ্যতা কেথায়!

বাঙ্গালার চৌদ্দ আনা লোক কৃষক এবং তাহারা নাম ডাকের গরিব। সুতরাং শিক্ষায় আমীরি চাল ছাড়িয়া গরিবানা ভাব ধরিতে হইবে। ঘরে ঘরে শিক্ষার বিস্তার আবশ্যক। কিন্তু ব্যয় পরিহার করিবার সুযোগ চাই। "বাবু শিক্ষা"র সমাধি এবং কৃষি ও শিল্পশিক্ষার উদ্বোধনই ইহার একমাত্র মীমাংসা। কৃষি ও শিল্প অর্থ-লাভের সোপান। সুতরাং সর্ব্বসাধারণের উপযুক্ত করিবার জন্য শিক্ষা অবৈতনিক হওয়া আবশ্যক। আবার যখন ছাত্ররা সকল বিষয়েই পরিশ্রম করিবে, তখন তাহাদের সার্থক পরিশ্রম হইতে গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ হওয়ারও প্রয়োজন। "কৃষি-বিদ্যালয়" সর্ব্বদা পরের কাছে হাত পাতিবে না এবং ছাত্রের ও নিজের ভবিষ্যৎ পরের সাহায্যের উপর ছাড়িয়া দিবে না, অর্থাৎ দেশ নিজের সন্তানকে মানুষ করিয়া নিজের কাজে লাগাইবে ইহাই আমার "প্রস্তাবনার" মূল সূত্র। এই কারণে কাঁচা মাল উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে পাকা মাল তৈয়ারী করিবার সহজ উপায়গুলি হাতে কলমে শিক্ষা দিতে হইবে। তাহা হইলে বাঙ্গালার বাজার অ-বাঙ্গালীর হাতে থাকিলেও বাঙ্গালার কৃষককে যখন তখন বিপদে পড়িতে হইবে না।

উক্ত "প্রস্তাবনা" পাঠ করিয়া কেহ কেহ বলিয়াছেন, "শিক্ষাধীন ছাত্রের হস্ত-নির্ম্মিত শিল্প দ্রব্য অর্থাগমের উপায় বলিয়া কাগজে কলমে দেখানো যাইতে পারে, কিন্তু কার্য্য-কালে তাহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। কারণ, ছাত্রের তৈয়ারী দ্রব্যাদি এত নিকৃষ্ট হয় যে, বাজারে তাহার খরিদ্দার পাওয়া যায় না। স্বদেশী আন্দোলনের আমল থেকে বার বার পরীক্ষা করে দেখা গেছে।" উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, তখনকার বিদ্যালয়গুলি নির্দ্দোষ ছিল না, সেজন্য আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নাই। দোষ অন্য কোথাও ছিল না, ছিল শিক্ষা-নীতিতে। 'ছোট মুখে বড় কথা' শুনিয়া খড়্গহস্ত হইবেন না—সবটুকু শুনিতে অনুরোধ করি। ভাষা ও জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চ্চার স্কুল কলেজে প্রত্যহ সময়ের বিভাগ অনুসারে শ্রেণীগুলিতে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষা বা বক্তৃতা দেওয়া হয়। একটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিলেও গতানুগতিকতার মোহে তাহাতে পূর্ব্বপ্রচলিত শিক্ষার ধারা অনুসৃত হইয়া থাকে।

নিম্নশ্রেণীর মধ্যে একটা চল্‌তি কথা আছে—"যে বিয়ের যে মন্তর।" আমরা সেটী স্মরণ রাখি না। ভাষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত বিষয়গুলি পরস্পর অল্প-বিস্তর সম্বন্ধবদ্ধ। সেজন্য গণিতের ঘণ্টার পর ইতিহাস পাঠে কোনই অসুবিধা হয় না। কিন্তু একটী শিল্পবিদ্যালয়ের বুননের কাজ দর্জ্জির কাজ, ছুতারের কাজ ও কামারের কাজ কাহারও সহিত কাহার সম্বন্ধ নাই। এক ঘণ্টা ছুতারের কাজ করিয়া পর ঘণ্টায় বুননশালায় আসিলে ছাত্রের কি অবস্থা হয়? এখানে কি বিষয়ান্তরজনিত শ্রমলাঘবের আনন্দ

থাকা সম্ভব? কখনই না। এইরূপ অধ্যাপনায় বিশৃঙ্খলা হয়। সুতরাং বিশৃঙ্খলাজাত দ্রব্যাদি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দেখিবার আশা বাতুলতা মাত্র। সাহিত্য ত্যাগ করিয়া প্রথম হইতে গণিত বা ইতিহাস চর্চ্চা করা যায় না। কিন্তু একজন উৎকৃষ্ট দর্জ্জির পক্ষে কামারশাল চক্ষে দেখিবারও প্রয়োজন হয় না। সমষ্টি রূপে যদি এই চারিটী শিল্প চারি বৎসরে শিক্ষণীয় বিষয় করিয়া স্কুল কলেজের রীতিতে শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা হইলে চারি বৎসর শেষ হইবার পুর্ব্বে ছাত্র কোন বিষয়েই কৃতী হইতে পারিবে না। অর্থাৎ যদি তিন বৎসর শিক্ষা করিয়া কোন ছাত্র দুর্নিবার বাধাবিঘ্ন বশতঃ বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে তাহার তিন বৎসরব্যাপী পরিশ্রম ও শিক্ষা সবই ব্যর্থ! সংসারে সে যে অকুলে সেই অকূলে! কিন্তু যদি একটী শিল্প স্বতন্ত্ররূপে এক বৎসরের শিক্ষণীয় বিষয় ধার্য্য হয়, তাহা হইলে ছাত্র একটী বিদ্যা এক বৎসরে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া, দৈবদুর্বিপাকে বৎসরান্তে স্কুল ছাড়িতে বাধ্য হইলেও, সংসারে সেই বিষয়ের উপর নিঃসন্দেহে নির্ভর করিতে পারে। তাহার সময়, সামর্থ্য, শিক্ষা কিছুই ব্যর্থ হয় না। অধিকন্তু, বৎসরাবধি প্রত্যহ একটী বিষয়ের বিভিন্ন স্তর অভ্যাস করিয়া পঠদ্দশাতেই সেই শিল্পজাত দ্রব্যের উৎকর্ষ সাধন করিয়া প্রতিষ্ঠানের সাহায্য করিতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, জেলখানায় যাহারা কাজ করে তাহারা দক্ষ শিল্পী হইয়া জেলখানায় প্রবেশ করে না; বিদ্যালয়ের বালকদিগের ন্যায় শান্ত শিষ্ট বা পুণ্যাত্মাও তারা নয়। কিন্তু তাহাদের হাতের নির্ম্মিত সতরঞ্চ, কম্বল ইত্যাদি বাজারের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পণ্য। এখনও বলিবেন কি, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান অর্থাগমের পক্ষে যথেষ্ট নয়?

মাসাধিক পূর্ব্বে চুঁচুড়া এগ্রিকালচার‍্যাল কলেজের প্রিন্সিপালের সহিত এ বিষয়ে যাহা কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাই আর একটু বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। আলোচিত "কৃষিবিদ্যালয়ে" ৪র্থ ও ৫ম মানের ৫ বৎসরে পাঁচটী শিল্প শিক্ষণীয় বিষয় লওয়া হইয়াছে। বৎসরে ২০টী ছাত্র ভর্ত্তি হইলে ৫ম বৎসরে ছাত্র-সংখ্যা ১০০টী দাঁড়াইবে। যদি প্রতি বর্ষের ২০টী ছাত্র সমান ৫ গোষ্ঠীতে বা দলে বিভক্ত করা যায়, তবে ৫ম বর্ষে মোট ২৫টী গোষ্ঠী হইবে। পূর্ব্বলিখিতভাবে একটি বিদ্যালয়ে ২৫টী গোষ্ঠীর শিক্ষা দেওয়া সহজ নহে। শিক্ষা-সৌকর্য্যার্থে প্রতি শিল্পবিভাগে ৫ বৎসরের ৫টী গোষ্ঠী লইয়া মিলিত শ্রেণী গঠন করিতে হইবে। যদি ক, চ, ট, ত, প এই পাঁচটী শিক্ষণীয় শিল্প ও ১ হইতে ২৫ সংখ্যা পাঁচ বৎসরের ২৫টী গোষ্ঠী ধরা যায়, তাহা হইলে নিম্নপ্রদর্শিত রূপে শিক্ষা-পদ্ধতিটীকে আরো সহজবোধ্য করা যাইতে পারে;—

শিক্ষণীয় বিষয়	ক	চ	ট	ত	প	ছাত্র-সংখ্যা
১ম বর্ষ	১	২	৩	৪	৫	= ২০
২য় বর্ষ	২+৬	৩+৭	৪+৮	৫+৯	১+১০	= ৪০
৩য় বর্ষ	৩+৭+১১	৪+৮+১২	৫+৯+১৩	১+১০+১৪	২+৬+১৫	= ৬০
৪র্থ বর্ষ	৪+৮+১২ +১৬	৫+৯+১৩ +১৭	১+১০+১৪ +১৮	২+৬+১৫ +১৯	৩+৭+১১ +২০	= ৮০
৫ম বর্ষ	৫+৯+১৩ +১৭+২৬	১+১০+১৪ +১৮+২২	২+৬+১৫ +১৯+২৩	৩+৭+১১ +২০+২৪	৪+৮+১২ +১৬+২৫	=১০০

৫ম বৎসরান্তে ১ম বার্ষিক ছাত্রদের সমুদয় শিক্ষা সম্পূর্ণ হওয়ায় তাহারা বিদায় লইবে। আশা করি পদ্ধতিটী নিবিষ্টভাবে সকলেই চিন্তা করিয়া দেখিবেন। এক বৎসর ধরিয়া একটী বিদ্যা সম্পূর্ণরূপে হাতে হাতিয়ারে আয়ত্ত করিলে, তাহা আর ভুলিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। এই প্রথায় কেহ কেহ আপত্তি দেখাইয়াছেন যে, ছাত্রেরা বিদ্যালয়ে সারাদিন ধরিয়া একই কাজ করিতে পারিবে না। তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, প্রতি শিল্পের মধ্যে অনেকগুলি

শিক্ষণীয় স্তর আছে। প্রতি ঘণ্টায় শিক্ষণীয় স্তর পরিবর্ত্তন করিলেই এই অসুবিধা দূর হইবে। উদাহরণ স্বরূপ দেখাইতে পারি যে, কলিকাতা—আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের "বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী" টেলারিং শিক্ষা দিয়া থাকেন। ছাত্ররা প্রত্যহ ১২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া ৯মাসেই দর্জ্জির কাজে পারদর্শী হয়। এখানে কোন ছাত্রই তো ৪ ঘণ্টা একঘেয়ে কাজ করিতে অসুবিধা মনে করে না।

পরিশেষে নিবেদন এই যে, শিক্ষার যে ধারা স্বাভাবিক তাহাই অনুসরণ করুন—"যে বিয়ের যে মন্তর" তাই পড়ুন। তাহা হইলে পরিশ্রম ও স্বার্থত্যাগ অবশ্যই সাফল্যমণ্ডিত হইবে। শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্র সংসার-সংগ্রামে ভয় কাহাকে বলে জানিবে না। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিও নিজের নিজের পায়ে ভর করিয়া উন্নত শিরে সগর্ব্বে জগতের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হইবে।

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক ক্যান্যাল

আমরা কিছুদিন পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাবিত গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক ক্যান্যাল কাটা সম্বন্ধে কয়েকটা বিষয় প্রকাশ করিয়াছিলাম এবং আশা করিয়াছিলাম যে, গভর্ণমেণ্ট এই খাল কাটার প্রস্তাব পরিত্যাগ করিবেন। কিন্তু যখন দেখিতে পাইলাম যে, গভর্ণমেণ্ট এমন একটা অপব্যয়ের প্রস্তাব পাশ করিবার জন্য বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এমন চেষ্টা করিয়াছিলেন, যাহা সফল হইলে সমস্ত গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক ক্যান্যাল কাটার প্রস্তাবটাই স্বীকার করিয়া লইতে হয়, তখন বুঝিলাম গবর্ণমেণ্টের ঘাড়ে এই মতলব ভূতের মত এখনও চাপিয়া আছে।

এই গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক ক্যান্যাল কাটাইতে ২,৭৯,২৩,১২২৲ টাকা ব্যয় হইবে ইহা অনুমান করা হইয়াছে। গভর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্য-বিভাগে টাকার অভাব, এই অজুহাতে কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগ দেশ হইতে দূর করিবার জন্য এত ব্যস্ততা নাই; কিন্তু ব্যস্ততা দেখিতে পাইতেছি এই গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক ক্যান্যাল কাটার জন্য। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, এই খাল কাটা হইলে আই, জি, এস, এন ও আর, এস, এন কোম্পানীর জাহাজসকল অতি সহজে কলিকাতা হইতে পূর্ব্ববঙ্গে মাল বহিয়া লইয়া যাইতে পারিবে এবং তাহাতে এই দুই কোম্পানীর ব্যয় কম হইবে ও তজ্জন্য তাহার ইংরেজ অংশীদারদিগের লাভ বেশী হইবে। ইহা ছাড়া এই খাল কাটার আর কোনও কারণ দেখা যাইতেছে না। তর্কস্থলে বলা যাইতে পারে যে, দেশী জাহাজ কোম্পানীরও ঐ খাল ব্যবহার করিতে বাধা নাই। স্বীকার করি; কিন্তু দেশী কোম্পানী কি আছে? যাহা আছে তাহা ঐ সকল কোম্পানীর সহিত দরের প্রতিযোগিতায় পরাজিত হইয়া অল্পদিনের মধ্যেই মাল বহন করা ছাড়িয়া দিবে।

গভর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন যে, সুন্দরবনের নদীসকল মজিয়া যাইতেছে। তথায় একটা খাল কাটান হইয়াছিল তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং অবিলম্বে এই খাল না কাটাইলে জাহাজ চলাচল করা বিপজ্জনক হইবে। সুন্দরবনের যে সকল নদী দিয়া জাহাজ চলাচল করে, তাহা দিয়া কেবল পূর্ব্বোক্ত কোম্পানীর জাহাজই যাতায়াত করিয়া থাকে, অন্য যে দুই একখানা যায় তাহা নামমাত্র। এখন দেখা যাইতেছে যে, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক ক্যান্যাল দিয়াও কেবল ঐ কোম্পানীর জাহাজ যাতায়াত করিবে এবং ক্যান্যাল প্রধানতঃ তাহাদের জন্যই কাটা হইবে। ঐ খাল দিয়া মালবাহী নৌকা চালান বিপজ্জনক হইবে, কারণ একে নদীর ন্যায় খালের পরিসর থাকিবে না, তাহাতে খালে স্রোত থাকিবে না, সেজন্য বড় বড় জাহাজ গমনাগমনে ভীষণ ঢেউয়ের উৎপত্তি হইবে। ইহাতে মালবাহী নৌকা কয়টা গমনাগমন করিবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

বঙ্গদেশের নদী খাল ও নালাসকল দক্ষিণবাহিনী। কিন্তু এই খালটি কাটা হইবে পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে। ইহার

ফল হইবে এই যে, জলনির্গমের সমস্ত স্বাভাবিক প্রণালী দিয়া জল সহজে বাহির হইতে পারিবে না। নমুনাস্বরূপ গভর্ণমেণ্টের দ্বারা কাটা কৃষ্ণপুর খালের কথা বলা যাইতে পারে। কলিকাতার নিকট হইতে এই খাল কাটা হইয়াছে এবং ইহাও পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে লম্বা। এই খাল কাটায় খালের উত্তরের প্রণালীসকল দিয়া আর সহজে জল বাহির হইতে পারে না এবং তাহার জন্য আজ বারাসত প্রভৃতি স্থানে কালাজ্বরের এত প্রাদুর্ভাব। এই কালাজ্বরে বহু লোক তথায় মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে ও যাহারা বাঁচিয়া আছে তাহারা ঐ রোগে ভুগিয়া অস্থি-চর্ম্ম-সার হইয়াছে। ঐ সকল স্থানের নিকট ঘোলা গ্রামে বিনামূল্যে কালাজ্বর চিকিৎসার ইঞ্জেকশান দেওয়া হইতেছে। অবিমৃষ্যকারিতার এই ফল দেখিয়াও গভর্ণমেণ্টের চৈতন্যোদয় হইল না। গভর্ণমেণ্ট পুনরায় এক খাল কাটিয়া খালের উত্তরে যে সমস্ত স্থান আছে তাহা কালাজ্বরে পূর্ণ করিতে চাহেন। কিন্তু অর্থহীন, দুঃখী সহায়হীন দেশবাসী কালাজ্বরে প্রাণদান করিবে কাহার জন্য? ঐ আই, জি, এস, এন এবং আর, এস, এন কোম্পানীর ইংরেজ অংশীদারগণ বিলাতে বসিয়া সুদ পাইবেন তাহারই জন্য। ইংরেজ জাহাজ কোম্পানী বঙ্গদেশে অবাধে বাণিজ্য করিতে পারিবে তাহার জন্য গভর্ণমেণ্ট সুবিধা করিয়া দিতেছেন। কথাটা এই ভাবেই স্পষ্ট হয়।

এই খাল কাটাইবার জন্য গভর্ণমেণ্টের আগ্রহ এত অধিক যে, তহবিলে টাকা নাই তথাপি খাল কাটান চাই! এ আগ্রহ বঙ্গের স্বাস্থ্যের উন্নতির দিকে নাই। গভর্ণমেণ্টের অর্থের অভাব, সেজন্য ঋণ গ্রহণ করিয়াও খাল কাটাইবেন। যে আয় হইবে, তাহাতে খাল কাটার তিন বৎসরের মধ্যে ঋণের সকল সুদ প্রদান করিতে পারিবেন। ধরিয়া লইলাম যে, কেবল সুদ কেন, সমস্ত ঋণের টাকাই গভর্ণমেণ্ট পনর বৎসরের মধ্যে শোধ করিয়া দিবেন। কিন্তু কাহাদের দেহপঞ্জরের অস্থি সেই টাকা সংগ্রহ করিবে? দেশ ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরে উজাড় হইয়া যাইবে। আর গভর্ণমেণ্ট স্বাভাবিক প্রণালী এরূপ ভাবে খাল কাটিয়া বন্ধ করিলে জলপ্লাবনে গ্রামবাসীর কষ্ট ও রোগ হইবে এবং শস্য নষ্ট হইবে। স্বাভাবিক পয়ঃপ্রণালী বন্ধ হইয়া দেশে যে কালাজ্বর ও ম্যালেরিয়ার আড়ৎ হইয়াছে তাহা স্বাস্থ্য-বিভাগের ডিরেক্টর তাঁহার পুস্তকে প্রমাণ করিয়াছেন। তথাপি গভর্ণমেণ্ট এই খাল কাটিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। বাঙ্গালী কৃষকগণ তাহাদের পীড়ার জন্য অদৃষ্টকেই ধিক্কার দিতে জানে। অন্য সকল কারণ ছাড়িয়া দিলেও একমাত্র স্বাস্থ্যের জন্যও এই খাল কাটার বিরুদ্ধে সর্ব্বসাধারণের তীব্র প্রতিবাদ করা প্রয়োজন।

এই খাল কাটা হইবে বলিয়া গভর্ণমেণ্ট কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়া আছেন। খাল সত্য সত্য কাটা হইবে কিনা তাহার ঠিক নাই, খাল কাটার জন্য ব্যবস্থাপক সভায় অর্থ চাহিয়া লওয়া হইল না, কিন্তু খাল কাটার জন্য গভর্ণমেণ্টের এত অধিক আগ্রহ যে, বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের হস্তে টাকা না থাকায় গভর্ণমেণ্ট তখন ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট ঋণ করিয়া অর্থ লইলেন এবং প্রায় ৪০ লক্ষ মুদ্রায় ড্রেজার ক্রয় করিলেন। এই টাকার সুদ বঙ্গদেশকে এখনও দিতে হইতেছে। কোথায় খাল কাটা হইবে, তাহার টাকা পর্য্যন্ত ঠিক করা হইল না, তথাপি ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এক বৃহৎ ড্রেজার ক্রয় করা হইয়া গেল! এই ড্রেজার ক্রয় করিতে বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের ইঞ্জিনিয়ার মিঃ এডাম্‌স্ উইলিয়ম্‌স্ ইংলণ্ড গেলেন এবং ড্রেজার তৈয়ারী করাইয়া এদেশে আনিলেন।

এই এক খাল কাটার জন্য যেরূপ নির্লজ্জের মত নানা ভাবে টাকা খরচ করা হইয়াছে এবং এই খাল কাটার জন্য গভর্ণমেণ্টের যেরূপ উদ্বেগ রহিয়াছে, সেরূপ ভাবে উদ্বেগের সহিত যদি ৬৮ লক্ষ টাকা গভর্ণমেণ্ট দেশের স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য ব্যয় করিতেন, তাহা হইলে বরং বুঝিতাম যে, একটা দেশহিতকর কার্য্যে ব্যস্ত হইয়া গভর্ণমেণ্ট একটা সৎকার্য্য করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু তাহা নয়, কোন দুইটী ইংরেজ জাহাজ কোম্পানীর দুঃখে গভর্ণমেণ্ট বিগলিত হইয়া এই টাকা ব্যয় করিতেছেন। সুন্দর বনের দো আগ্রা খাল বন্ধ হইয়া যাইতেছে, এখন যে, নদী দিয়া জাহাজ ঘুরিয়া যাইতে পারে, গভর্ণমেণ্ট বলিতেছেন যে, তাহাতেও চড়া পড়িতেছে এবং শীঘ্রই সে পথও বন্ধ হইবে। তাহা যদি হয়

তবে জাহাজ ফ্রেজারগঞ্জের সম্মুখ দিয়াও ঘুরিয়া যাইতে পারে।

আসল কথা হইতেছে সুন্দর বনের নদীতে চড়া পড়িয়া যাওয়া নহে, কিন্তু জাহাজ কোম্পানীকে কলিকাতা হইতে প্রায় ৭০ মাইল দক্ষিণে গমন করিতে হয় এবং পুনরায় ৭০ মাইল উজাইয়া উত্তরে আসিতে হয়, এই ১৪০ মাইল বৃথা গমন করিতে হয়, তাহাতে সময় নষ্ট হয়, অধিক ব্যয় হয়, অথচ আয় নাই। এই অপব্যয়টা দূর করার জন্য জাহাজ কোম্পানী যেমন ব্যস্ত, গভর্ণমেণ্টও একটা সুবিধা জাহাজ-কোম্পানীকে দিতে ব্যস্ত। প্রায় ১৪ বৎসর পূর্ব্বে এই খাল কাটার কথা প্রথমে উত্থাপিত হয়। যদি গভর্ণমেণ্টের টাকা থাকিত তবে নূতন শাসন সংস্কারের ফলে ব্যবস্থাপক সভা স্থাপিত হইবার পূর্ব্বেই এই খাল কাটা হইয়া যাইত। কিন্তু টাকা না থাকায় তাহা হইয়া উঠে নাই। সে সময়ে এই খাল কাটা হইলে দেশের লোকের আপত্তি সত্ত্বেও এই খাল কাটা হইয়া যাইত। সুন্দর বনের নদী মজিয়া যাওয়াটা প্রাকৃতিক ব্যাপার। এইরূপে নদী মজিয়াই তবে ২৪ পরগণার সৃষ্টি হইয়াছে। নদী মজিয়া গিয়াছে বলিয়া খাল কাটিতে হইবে এ যুক্তি গবর্ণমেণ্ট কখনও উপস্থিত করেন নাই। ভাগীরথীর মুখ বন্ধ হইয়া গিয়াছে বলিয়া তথায় খাল কাটাইবার প্রস্তাব করেন নাই।

দেশের স্বাস্থ্য যে খাল কাটাইবার জন্য নষ্ট হয়, তাহা ব্যবস্থাপক সভার ১৮ই আগষ্টের অধিবেশনের প্রশ্নোত্তরে কৃষ্ণপুর খাল কাটায় দেশবাসীর যে দুরবস্থা হইয়াছে তাহা হইতে বেশ জানিতে পারা যায়। দেশের তিন ক্রোর মুদ্রা ব্যয় করিয়া লাভ হইবে দেশবাসীর মধ্যে ম্যালেরিয়া ও কালা-জ্বরের বিস্তৃতি ও জাহাজ কোম্পানীর লাভের মাত্রাবৃদ্ধি। এই গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক ক্যান্যালের বিরুদ্ধে আমরা তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি এবং আশা করিতেছি যে দেশবাসী এই অনিষ্টকর প্রস্তাবের কথা বুঝিয়া তাহার প্রতিবাদ করিয়া এই অপব্যয় দুর করিবেন এবং গভর্ণমেণ্ট যে ড্রেজার ক্রয় করিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছেন, যাহার জন্য মাসে মাসে সুদ এবং চালকগণের বেতন দিতে হইতেছে, সেই "শ্বেত হস্তী" বিক্রয় করিয়া ফেলিতে গভর্ণমেণ্টকে বাধ্য করিবেন। ("সঞ্জীবনী")

আসামে শ্রমিক প্রতিনিধি

আসাম চা-বাগানে পূর্ণ প্রদেশ। এই প্রদেশের শ্রমিকদের মধ্যে প্রায় পনর আনাই চা-বাগানের মজুর। গত অসহযোগ অন্দোলনের সময় এ প্রদেশে শ্রমিকদের মধ্যে প্রথম চাঞ্চল্য দেখা দেয়। অবশ্য কর্ত্তৃপক্ষ ইহাকে রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদের গুপ্ত ইঙ্গিতের ফল বলিয়া জগৎ সমক্ষে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলেও ইহার মূলে যে যুগযুগান্তের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ বর্ত্তমান ছিল তাহা কে অস্বীকার করিবে? চা-বাগানের চতুঃসীমার ভিতর আসামের অরণ্য মধ্যে ভগবানের সৃষ্ট কুলী নামধারী জীবগুলি যে কি ভাবে দিন কাটায় তাহা এখন আর সভ্য জগতের অবিদিত নয়। ইহাদিগকে কে বলিয়া দিবে?—

"মুহূর্ত্ত তুলিয়া শির একত্রে দাঁড়াও দেখি সবে,
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।"

আসাম প্রাদেশিক কাউন্সিলে এই নিরীহ, নিরস্ত্র, নিরন্ন, শ্রমজীবীদের প্রতিনিধি কে? আমরা এই প্রশ্নের উত্তরে ১৯২৫ সনের ৯ই জুলাই পার্ল্যামেণ্টের হাউস্ অব্ কমন্স সভায় কর্ণেল ওয়েজউড্ যাহা বলিয়াছিলেন তাহারই উল্লেখ করিতেছি—"আসাম কাউন্সিলে আসামের কুলীদের প্রতিনিধি এমন একজন, যে ৫০০০ মজুরের উপর কর্ত্তৃত্ব করে। ইহা সুখের বিষয় নয়।"

ঐ সভায় মিঃ জনষ্টন বলিয়াছিলেন—"আসাম গভর্ণমেণ্ট এমন একজন লোককে শ্রমিক প্রতিনিধি মনোনীত করিয়াছেন, যে একজন বড় চা-কর, যাহার অধীনে বহুসংখ্যক মজুর খাটিতেছে এবং যে প্লাণ্টার্স এসোসিয়েশনের একজন সদস্য।" এখন দেশবাসী বিষয়টি একবার তলাইয়া দেখুন, আমরা কোনও মন্তব্য করা প্রয়োজন মনে করি না।

শাসন-সংস্কার আইনের প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদে শ্রমিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু ভারতের শ্রমজীবিগণ সঙ্ঘবদ্ধ না হওয়ায় গভর্ণমেণ্ট শ্রমিকদের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি মনোনীত করিবেন। যথা, ভারতরাষ্ট্রীয় পরিষদে একজন, আসাম প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদে একজন, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদে দুইজন, বিহার ও উড়িষ্যায় একজন এবং বোম্বাই প্রদেশে একজন। ধনী মহাজনগণ নিম্ন হিসাবে প্রতিনিধি প্রেরণ করেন।

ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ		২০ জন
বাংলা	,,	২৫ ,,
বোম্বাই	,,	১২ ,,
মাদ্রাজ	,,	১৩ ,,
বিহার ও উড়িষ্যা	,,	৯ ,,
যুক্তপ্রদেশ	,,	১০ ,,
মধ্যপ্রদেশ	,,	৪ ,,
পঞ্জাব	,,	৪ ,,
আসাম	,,	৬ ,,

আসামের এই ছয়টির মধ্যে কমার্স ও ইণ্ডাষ্ট্রী বিভাগের একটি। অবশিষ্ট পাঁচটি চা-করদের। তদুপরি শ্রমিকদের পক্ষ হইতেও চা-করকেই মনোনীত করা হয়। জানি না এ কোন্ ব্যবস্থা!

শ্রমিক প্রতিনিধিত্বের জন্য শ্রমিকদের একমাত্র সঙ্ঘ, "নিখিল ভারত ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেস" আন্দোলন সুরু করিয়াছেন। তাহারা নিম্নলিখিত হারে প্রতিনিধি-পদ দাবী করিতেছেন—

ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ		১২
বাংলা	,,	১২
বোম্বাই	,,	১২
মাদ্রাজ	,,	১২
বিহার ও উড়িষ্যা	,,	৮
যুক্ত-প্রদেশ	,,	৮
পঞ্জাব	,,	৮
ব্রহ্মদেশ	,,	৮
মধ্যপ্রদেশ	ব্যবস্থা-পরিষদ	৬
আসাম	,,	৬

ধনীদের সংখ্যানুপাতে এই দাবী অত্যধিক নয়।

এখন আসামের কথা। আগামী নির্ব্বাচন নিকটবর্ত্তী। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য—আসাম সরকার কি এবারও এই প্রহসনের পুনরাভিনয় করিবেন? মুখে যতই বড়াই করি না কেন, শ্রমজীবীদের স্বার্থরক্ষার জন্য সারা ভারতে কয়জন আছেন? মিঃ জনষ্টনের মুখ দিয়া বলাই ভাল। তিনি বলিয়াছিলেন, ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য-সংখ্যা ১৪০। ইহাতে স্বরাজিষ্টরাও আছেন, কিন্তু শ্রমজীবীদের পক্ষে মাত্র ৩।৪ জন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আরও বলি, উত্তর হবিগঞ্জ মহকুমার অ-মুসলমান প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রলাল চৌধুরী। ইনি একজন জমীদার অথচ স্বরাজিষ্ট। কিন্তু এদিকে জনসাধারণের প্রতিনিধির মুখোস পরিয়া গেল বার আসাম কাউন্সিলে প্রজাস্বত্ব আইনের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন। এবারও গোপেন্দ্রবাবু আসাম কাউন্সিলের জন্য নির্ব্বাচনপ্রার্থী। জানি না তাঁহার নির্ব্বাচনকেন্দ্রের ভোটদাতারা এই কার্য্য সমর্থন করেন কি না। এই সব দেখিয়া শুনিয়া আমাদিগকে কেহ ভুল বুঝিলে আমাদের প্রতি সুবিচার করা হইবে না। তেত্রিশ কোটীর বাসভূমি ভারতবর্ষে মাত্র যাট লক্ষ লোকের ভোটাধিকার আছে এবং ইহারা সকলেই তথাকথিত অভিজাত-সম্প্রদায়-ভুক্ত। সুতরাং সম্প্রদায়-বিশেষের প্রতিনিধি শ্রমজীবাদের জন্য লড়াই করিবে কেন? এজন্য আমরা শাসন-সংস্কার আইনের ভোটাধিকার-নীতির নিন্দাই করিতেছি।

সুরমা উপত্যকা সম্মিলনীর বিগত অধিবেশনে রায়ত ও শ্রমজীবীদিগকে সংঙ্ঘবদ্ধ করার প্রস্তাব আনয়ন করিয়াছিলাম; কিন্তু বড় বড় কংগ্রেস নেতারা দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহার প্রবল প্রতিবাদ করায় অগত্যা প্রস্তাব দু'টী প্রত্যাহার করিয়া হাঁফ ছাড়িয়া পৈতৃক প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলাম।

গণতন্ত্র গড়িয়া তুলিতে হইলে, দলিত-মথিত-নির্য্যাতিতদের জন্য স্বরাজ সাধন করিতে হইলে, নবাবী সুনীল রক্তের ঔদ্ধত্য পরিহার করিতে হইবে। কেন না আমরা জানি স্বরাজ ব্যষ্টির জন্য নয়, আভিজাত্যের জন্য নয়, শ্রেণী-বিশেষের স্বার্থের জন্য নয়। ("দেশবন্ধু")

তর্ক-প্রশ্ন

১। বাংলা শর্টহ্যাণ্ড

"আর্থিক উন্নতি"র ভাদ্র সংখ্যায় শ্রীযুত প্রভাত কিরণ বসু, বি, এ, বাংলা শর্টহ্যাণ্ডের আলোচনা করিতে যাইয়া জ্ঞানের ও তথ্যের দিক্ হইতে আলোচনা না করিয়া ব্যক্তিগত প্রাধান্য ও উত্তেজনার দিক্ হইতে এই নির্দোষ বিষয়টীর আলোচনা করিয়াছেন। ইন্দ্রবাবুর অতি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথ সিংহের নাম না করাতে ও তাঁহার প্রণালীকে পুলিশের প্রণালী বলাতে বসু মহাশয় ভয়ানক চটিয়াছেন। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথ সিংহ পুলিশ বিভাগের পেন্সন প্রাপ্ত কর্ম্মচারী বলিয়া তাঁহার শর্টহ্যাণ্ডের উপর কোন দোষ আসে না। দোষাদোষের অথবা ব্যক্তিগত আলোচনার নামগন্ধও ইন্দ্র বাবুর ক্ষুদ্র প্রবন্ধে নাই। তিনি শুধু বলিয়াছেন, "পুলিশ বিভাগের জন কয়েক লোক একটা শর্টহ্যাণ্ড ব্যবহার করে।" বসু মহাশয় বলিতে চাহেন পুলিশ বিভাগ ছাড়া বাহিরের লোকেও ঐ শর্টহ্যাণ্ড প্রণালী শিখিয়াছে। ইহা আমাদের কাছে নূতন কথা বটে। কারণ পুলিশের লোক ছাড়া বাহিরের একজন লোককেও এ পর্য্যন্ত কোন সভা-সমিতিতে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহের প্রণালীতে বক্তৃতা উঠাইতে আমরা দেখি নাই বা এ বিষয়ে জ্ঞাত নহি। বসু মহাশয় বলিতেছেন—যাহারা উক্ত প্রণালী শিখিয়াছে সকলেই "বে-সরকারী কর্ম্মচারী"। ইহাতে আমাদের সন্দেহ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে; কারণ বসু মহাশয় যে সার্টিফিকেট উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহের শর্টহ্যাণ্ডে দক্ষতা লাভ করিতে হইলে তিন বৎসরের অবিশ্রান্ত পরিশ্রম চাই। আমরাও জানি পুলিশ বিভাগের যাঁহারা সিংহ মহাশয়ের শর্টহ্যাণ্ড প্রণালী শিখিয়াছে, তাহাদিগকে ক্লাশেই রোজ ৫।৬ ঘণ্টা করিয়া দুই, বৎসর খাটিতে হইয়াছে। এমতাবস্থায় কলিকাতা সহরে হাজার হাজার শিক্ষাভিলাষী যুবক ছাত্র থাকিতে আফিসের হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর "বে-সরকারী কর্ম্মচারীরা এই দুরূহ বিষয়ে এতটা মনোনিবেশ করিলেন কেন? আমাদের সন্দেহ হয়—অবসর নাই বলিয়া সভা-সমিতিতে আসা অথবা কাহারও অনুরোধ-মাফিক অধীত শর্টহ্যাণ্ডে কৃতিত্ব প্রদর্শন করা কর্ম্মচারীদের পক্ষে সম্ভব হইবে না, এই জন্য যত ইচ্ছা তত বে-সরকারী কর্ম্মচারী সিংহ মহাশয়ের শর্টহ্যাণ্ডে দক্ষতা লাভ করিয়াছে বলিলে কেহ তাহাদের দক্ষতা সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ তলব করিতে পারিবে না—এই উদ্দেশ্যেই "অনেক কর্ম্মচারী" বাংলা শর্টহ্যাণ্ড শিখিয়াছে একথা বলা হইয়াছে। আমাদের সন্দেহ যদি আপত্তিজনক হয় বসু মহাশয় তাহার প্রতিবাদ করুন।

বসু মহাশয় বলেন—দস্তুরমত বিজ্ঞানসম্মত উপায়ের উপর সিংহ মহাশয়ের শর্টহ্যাণ্ডের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। এখানে বলিতে চাহি শর্টহ্যাণ্ডের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই, উহা তাড়াতাড়ি লিখিবার কৌশল মাত্র। পিটম্যান গ্রেগ ও শ্লোয়ান প্রভৃতি সাহেবগণ তাহাদের শর্টহ্যাণ্ডকে বিজ্ঞান অথবা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত বলিয়া ঘুণাক্ষরেও বলেন নাই। বসু মহাশয় যাঁহার পক্ষ-সমর্থন করিতেছেন সেই দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহই তাঁহার বইয়ের নাম দিয়াছেন "রেখা-শব্দ অভিজ্ঞান"। বিজ্ঞান নহে, অভিজ্ঞান। অভিজ্ঞানের অর্থ সঙ্কেত অর্থাৎ সাঙ্কেতিক রেখা বা শর্টহ্যাণ্ড। ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহাও বলেন নাই। তিনি তাঁহার বইয়ের নাম দিয়াছেন "রেখাক্ষর বর্ণমালা"; কারণ উহা সাঙ্কেতিক রেখা বা শর্টহ্যাণ্ড নহে। ঙ'র নীচে আমি যখন ক বসাই তাহা যেমন কোন বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বসাই না অথবা যিনি ক, খ আবিষ্কার করিয়াছেন তিনি যেমন তাহা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে করেন নাই, সেইরূপ সরল রেখা বা বক্র রেখার সঙ্গে ঐ ঐ রেখা যোগ করিবার সময় কেবল দৃষ্টি থাকে যেন তাড়াতাড়ি লেখা ও পড়া যায়। আর সরল ও বক্র রেখা উদ্ভাবন করা হয় উচ্চারণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিবার কৌশল স্বরূপ। ইহাকে

বিজ্ঞান বলে না। শর্টহ্যাণ্ডের ভিতরকার খবর যাঁহারা রাখেন না, তাঁহারা এই বিদ্যাটীর উপর ভক্তি দেখাইবার জন্যই ইহা বিজ্ঞান বা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত ইত্যাদি বলিয়া থাকেন। সকলেই জানেন, একজনের লিখিত শর্টহ্যাণ্ড দ্বিতীয় শর্টহ্যাণ্ড লেখক পড়িতে পারে না। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলেই জানা যায়, বিজ্ঞানের সঙ্গে শর্টহ্যাণ্ডের কোন সম্পর্ক নাই। ইহা একটা সঙ্কেতমাত্র এবং কলা বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত।

বসু মহাশয় বলেন—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথ সিংহ পিটম্যানের অনুকরণ করিয়াছেন বটে কিন্তু খ, ঘ, ছ ক্ষ, ঞ, স্ক প্রভৃতি অসংখ্য বাংলা শব্দের জন্য তাঁহাকে অনেকখানি বেগ পাইতে হইয়াছে। তাহা তো হবেই; কারণ ইংরেজী ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার কোনই সামঞ্জস্য নাই। এখানেই দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রেখাক্ষরের শ্রেষ্ঠত্ব। প্রাতঃস্মরণীয় ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রেখাক্ষরে এমত ইঙ্গিত আছে যাহাতে সংযুক্ত বর্ণ অতি সহজে ও স্বাভাবিক ভাবে লেখা যায়। এই রেখাক্ষর হইতে ইন্দ্রবাবু যে শর্টহ্যাণ্ড তৈয়ারী করিয়াছেন তাহার সঙ্গে সিংহ মহাশয়ের শর্টহ্যাণ্ডের তুলনা করিয়া দেখিয়াছি। প্রায় ১২ আনা সংযুক্ত বর্ণই ইন্দ্রবাবুর শর্টহ্যাণ্ডে অধিকতর সংক্ষিপ্তভাবে ও সহজে লিখিত হয়, কার্য্যক্ষেত্রে ইন্দ্রবাবুর সফলতার ইহাই প্রধান কারণ।

বসু মহাশয় বলেন শ্রীযুত ইন্দ্রকুমার চৌধুরী কে তাহা তিনি জানেন না। তাঁহার অবগতির জন্য জানাইতেছি:—

ইন্দ্র বাবু ১৯২১ সনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে এবং বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম ভাগে কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহাদের পূর্ব্ববঙ্গ-ভ্রমণের সময় বাংলা শর্টহ্যাণ্ড লেখক নিযুক্ত হইয়া গিয়াছিলেন। ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-কর্ত্তৃক রবীন্দ্রনাথের ধারাবাহিক "কমলা রীডারশিপ" বক্তৃতা এবং বর্ত্তমান বর্ষে জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালের "রাষ্ট্রনীতি" ও "ইংরেজী শিক্ষার ইতিহাস" সম্বন্ধীয় ধারাবাহিক বক্তৃতা উঠাইবার জন্য শর্টহ্যাণ্ড লেখক নিযুক্ত হন। তিনি ১৯২৩ সন হইতে এ পর্য্যন্ত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সের সমস্ত অধিবেশনের এবং অনেক ডিষ্ট্রীক্ট কনফারেন্সের রিসেপশন কমিটির চেয়ারম্যান কর্ত্তৃক ঐ সকল কনফারেন্সের বাংলা শর্টহ্যাণ্ড রিপোর্টার নিযুক্ত হন। এতদ্ভিন্ন শান্তিনিকেতনের বিশেষ বিশেষ বক্তৃতা, সাহিত্যপরিষদে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতা, বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালের ধারাবাহিক বক্তৃতা এবং প্রফেসর বিনয়কুমার সরকারের ধনবিজ্ঞান, ব্যাঙ্ক, বাণিজ্য বিষয়ক বক্তৃতা ও কথোপকথন, স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সমাজ বিষয়ক বক্তৃতা, শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক প্রভৃতির ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা, শ্রীযুক্ত জে এম সেনগুপ্ত, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, প্রতাপচন্দ্র গুহ রায়, প্রভৃতির রাজনীতি বিষয়ক বক্তৃতা ইন্দ্রবাবু উঠাইয়াছেন এবং নিয়মিতভাবে উঠাইতেছেন। গত ভাদ্রমাসের মাসিক বসুমতী এবং "আর্থিক উন্নতি"তেও তাঁহার রিপোর্ট দেখিতে পাইবেন।

বাংলা শর্টহ্যাণ্ডের সার্টিফিকেটের জন্য যাঁহারা বাংলা ভাষা জানেন না, এমন "সুদূর আমেরিকা, ইটালী, জার্ম্মেণী, ইংলণ্ড" প্রভৃতি দেশের অধিবাসীর নিকট ইন্দ্রবাবু যান নাই। কিন্তু যাহারা স্কোয়ারে বা হলে দাঁড়াইয়া বাংলায় অনর্গল বক্তৃতা দিয়াছেন ও দিতেছেন তাঁহাদের অনেক সার্টিফিকেটই ইন্দ্রবাবু পাইয়াছেন, তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক।

সমালোচক মহাশয় যদি দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহের প্রশংসা করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন তাহা হইলে আমাদের কিছু বলিবার ছিল না; কিন্তু তিনি ইন্দ্রবাবুকে আক্রমণ করিয়াছেন। ম্যালেরিয়া নিবারণী সভার বার্ষিক অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—ম্যালেরিয়ায় বাঙ্গালীর যে কেবল শারীরিক দৈন্যই উপস্থিত হইয়াছে তাহা নহে, মানসিক দৈন্যও দেখা দিয়াছে। কেহ কোন বিষয়ে কৃতিত্ব দেখাইলে আমাদের হৃদয়টা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠে। আমরা তাহা সহ্য করিতে পারি না, হৃদয়ে বিঁধে।

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার "ভারতী"তে "দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাংলা শর্টহ্যাণ্ড" শীর্ষক প্রবন্ধে আমি এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। বসু মহাশয় তাহা একবার পড়িয়া দেখিলেই তাঁহার সমস্ত ভ্রম দূরীভূত হইবে।

শ্রীসুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী, বি, এস্-সি

একটা কথা

মূল বিতণ্ডায় আমরা যোগ দিতে চাই না; কিন্তু "রাস্তার লোক" হিসাবে একটা কথা বলিতেছি। সুরেন্দ্রবাবু শর্টহ্যাণ্ডে বিজ্ঞান বা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দেখিতে পান না। আসল কথা,—বিদ্যামাত্রই বিজ্ঞান। রান্নাবাড়িতে আর গোয়ালঘর পরিষ্কার করার কাজেও বিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছেই আছে। জীবনের যে-যে কাজকে "কলা" মাত্র বলা হয়, তাহার আষ্টেপৃষ্ঠে আগায় মাথায়ও বিজ্ঞান বিরাজ করে। সুযুক্তি ও সামঞ্জস্যপূর্ণ, প্রণালীবদ্ধ এবং নিয়মাধীন যে-কোনো কর্ম্মই বিজ্ঞানসম্মত এবং বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত জিনিষ। সম্পাদক।

২। আর্থিক পরিভাষা

(ক) মূল্যতত্ত্বের লেখকদ্বয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড শব্দটীর প্রতিশব্দ লিখিতে গিয়া প্রথমে "প্রমাণ" (মানদণ্ড) লিখিয়াছেন। পরে প্রমাণ কথাটী ইন্‌ভার্টেড্ কমার ভিতর দিয়া প্রবন্ধের অন্যান্য জায়গায় চালাইয়াছেন। আমার মনে হয় "নির্দ্ধারণ" কথাটী ঠিক ষ্ট্যাণ্ডার্ডের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। আমি এ পর্য্যন্ত বিজ্ঞানে ষ্ট্যাণ্ডার্ডের মানে যা বুঝিয়াছি তাতে বুঝি 'একটী নির্দ্ধারিত জিনিষ'।

(খ) "আর্থিক উন্নতি"তে কয়েকটী গেঁয়ে কথা লিখিয়া আপনারা বেপরোয়াভাবে সাহিত্যে উহার স্থান দিতেছেন; অথচ সেই সকল জায়গায় সাহিত্যে চলিত শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারিত। যেমন:—"ক্যাপিট্যাল"এর প্রতিশব্দ আপনারা পুঁজিপাটা ব্যবহার করিতেছেন। এ জায়গায় মূলধন অক্লেশে ব্যবহার করা যাইতে পারে। "ক্যাপিট্যালিষ্ট" এর প্রতিশব্দ পুঁজিপতি লিখিতেছেন। এ জায়গায় 'ধনস্বামী' লেখা যাইতে পারে। আমাদের দেশে 'ধনী' ও 'মহাজন' শব্দদ্বয় যদিও বিভিন্নার্থবোধক, তবুও ইহারা ক্যাপিট্যালিষ্ট অর্থবোধকরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

শ্রীজগজ্জ্যোতি পাল

৩। স্ত্রীশিক্ষায় হিন্দু ও মুসলমান

এই বিষয়ে ভাদ্র সংখ্যার "আর্থিক উন্নতি"র ৩৯৮ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত জগজ্জ্যোতি পাল মহাশয় যা লিখিয়াছেন এবং সম্পাদক মহাশয় তাহার যে উত্তর দিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমার বক্তব্য নিম্নরূপ:—

১৯২৪।২৫ সনের সরকারী শিক্ষা-বিভাগের রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে যে, সর্ব্বপ্রকার শিক্ষালয়ে সর্ব্বসমেত ১৩৫২০৯ জন হিন্দু ও ১৮১০৩৬ জন মুসলমান ছাত্রী অধ্যয়ন করিতেছে। তন্মধ্যে সর্ব্বনিম্ন শিক্ষালয়ের ছাত্রী-সংখ্যা ৯৬০৫১ জন হিন্দু ও ১৫৪৯৬১ জন মুসলমান। অর্থাৎ সর্ব্বনিম্ন শিক্ষালয়ে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৫৯০০০ বেশী। উচ্চতর শিক্ষালয়সমূহে হিন্দু ছাত্রীর সংখ্যা বেশী হওয়াতে মোট ছাত্রীসংখ্যার হিসাবে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান প্রায় ৪৬০০০ বেশী দাঁড়াইয়াছে।

কেবল স্ত্রী-শিক্ষায় কেন, ১৯২৪।২৫ সনের রিপোর্টে ইহাও দেখিতেছি যে, সর্ব্বনিম্ন শিক্ষালয়ে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা ৫০৪৯৮২ এবং হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা ৩৮৭৬৮০। মুসলমানগণ শিক্ষাবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন বুঝা যাইতেছে। এ জন্য শিক্ষা আন্দোলনের মুসলমান নেতৃগণ সমগ্রজাতির ধন্যবাদের পাত্র। হিন্দুদের শ্রেষ্ঠতার অহঙ্কারের শেষ চিহ্নটুকুও তাঁহারা শীঘ্রই লুপ্ত করিয়া দিতে পারিবেন এরূপ আশা করা অসঙ্গত নয়।

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
ডেটিনিউ, আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল

৪। বৃদ্ধদের অন্ন-সংস্থান

(১) ভারতের ভিতরে বা বাহিরে কোথায় কোথায় কি রকম কর্ম্মের খুবই চাহিদা আছে? কর্ম্মক্ষম বৃদ্ধদের কোনও সার্টিফিকেট না থাকিলে, তাহারা পেটের দায়ে কি করিবে? কোথায় কোথায় বৃদ্ধদের কি রকম কর্ম্মের চাহিদা আছে?

(২) কোনও পুঁজিপাটার সহিত ঝুঁকি নিয়া খাটিতে না পারিলে, কর্ম্মঠ বৃদ্ধগণও দেশের এবং সমাজের পদদলিত হইয়া না খাইয়াই মরিবে না কি?

(৩) ঐ শ্রেণীর কর্ম্মঠ বৃদ্ধগণ সামান্য একশত বা দুইশত টাকা মূলধন লইয়া পরিবর্ত্তনশীল নূতন নূতন রকমের প্রতিযোগিতার সংঘর্ষে টিকিয়া কোথায় কোথায় কি রকম

কাজে দৈহিক, মানসিক ও বিদ্যা-বুদ্ধির শক্তির পরিচালনা করিতে পারে ?

(৪) ভারতের ভিতরে বা বাহিরে কোথায় কোথায় কর্ম্মনিয়োগ-সমিতি আছে ?

(৫) ভারতের ভিতরে বা বাহিরে কোথায় কোথায় ভারতীয় বেকার-সমস্যার প্রতিকারার্থ সহায়-সম্পদ্, মুরুব্বি বা পরামর্শদাতা আছে ? এজন্য কি কি পত্রিকা প্রচলিত আছে ?

(৬) বেঙ্গল গভর্মেণ্ট বেকার-সমস্যার প্রতিকারার্থ কোথায় কোথায় কি বিধি-ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং করিতেছেন ?

শ্রীমধুসূদন সেনগুপ্ত

৪২, মদনমোহন বসাকের রোড, ঢাকা

৫। ডাককর্ম্মীদের অবস্থা শোচনীয় কি সচ্ছল

আশ্বিন সংখ্যায় শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায়, তত্ত্বনিধি, বি, এ, মহাশয় ডাককর্ম্মীদের ঋণের পরিমাণ দেখাইয়াছেন। তিনি ডাক-কর্ম্মীদের স্বপ্রতিষ্ঠিত কো-অপারেটিভ সোসাইটী সমূহের লগ্নি টাকার পরিমাণ দেখিয়া তাঁহার বক্তব্য স্থির করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ১৯২১-২২ খৃঃ ঋণের পরিমাণ ছিল ৮·০৮ লাখ টাকার উপর আর ১৯২৪-২৫ খৃঃ তাহা হইয়াছে ১৮·৫৩ লাখ টাকা। প্রবন্ধ-লেখক তাঁহার প্রবন্ধের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন, "এই সোসাইটিগুলি চলে তাঁহাদের টাকায়, চালান তাঁহারা নিজেরাই...।" সুতরাং এই প্রসঙ্গে আমি যদি বলি, ১৯২১-২২ খৃঃ ডাককর্ম্মীরা ৮·০৮ লাখ টাকা ধার দিয়াছিলেন এবং ১৯২৪-২৫ খৃঃ ১৮·৫৩ লাখ টাকা ধার দিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহা হইলে তত্ত্বনিধি মহাশয় কি বলিতে পারেন ?

তত্ত্বনিধি মহাশয় সোসাইটিগুলির ২২,৯৩৪ জন সভ্য সকলেরই অবস্থা অসচ্ছল ধরিয়া লইয়াছেন ; কিন্তু তাঁহারই প্রদত্ত তালিকা হইতে দেখিতে পাই ৯,২৪৫ জন সভ্য ঋণ লইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আমি যদি বলি বাকী ১৩৬৮৯ জন সভ্যের অবস্থা সচ্ছল ও সঞ্চয়ক্ষম, তাহা হইলে লেখক কি বলিবেন ? লেখককে আরও বলিতে পারি, এই কো-অপারেটিভ সোসাইটীসমূহের ৯,২৪৫ জন খাতকের সকলেরই অবস্থা যে অসচ্ছল তাহা নহে। তাঁহাদের কেহ কেহ যদি বাইসাইকেল কিনিবার জন্য, হারমনিয়াম কিনিবার জন্য বা গহনা গড়াইবার জন্য টাকা ধার নিয়া থাকেন—পরে কিস্তি হিসাবে শোধ করিবেন এইরূপ আশায়—তবে এই সকল খাতকদের অবস্থাও যে অসচ্ছল তাহা আমরা বলিতে পারি না। এই সমালোচনা পাঠে কেহ যেন মনে না করেন, ডাককর্ম্মীদের অবস্থার প্রতি আমার সহানুভূতি নাই। বাস্তবিকই আমি অনেক সময় তাঁহাদের জন্য সহানুভূতি অনুভব করিয়াছি।

লেখক মহাশয়ের এই প্রবন্ধে আর একটুকু স্লিপ্ অব্ পেন ঘটিয়াছে। তিনি ২২,৯৩৪ কে ৫ দিয়া গুণ করিয়া ১৪৪,৬৭০ লিখিয়াছেন। এটীর উল্লেখ করিতাম না, কিন্তু উল্লেখ করিতে হইল এই জন্য যে, আর্থিক বিজ্ঞানের অঙ্কই হচ্ছে প্রাণ।

শ্রীজগজ্জ্যোতি পাল

রাখামাইনস্, সিংভূম

কৈফিয়ৎ

সকল ক্ষেত্রেই অঙ্কের ভুল মারাত্মক বটে। কিন্তু এখানে লেখক বেচারাকেই দোষী ঠাওরানো উচিত কিনা সন্দেহ। সাধারণতঃ "প্রিণ্টার্স ডেভিল" নামক সম্পাদক হইতে সুরু করিয়া ছাপাখানার ম্যানেজার পর্য্যন্ত সয়তানের সঙ্ঘ যে-সকল কথ্যাকথ্য ভুল করিয়া থাকেন, এই ভুলটা, তাহার অন্তর্গতও হইতে পারে। এই ধরণের ভুল যাহাতে না থাকে তাহার জন্য লড়াই চালানো হইতেছে। কিন্তু এই দুরাত্মা দুসমনকে বড় সহজে ঘাল করা সম্ভব নয় তাহাও বুঝা যাইতেছে। তবে পাঠকদের মধ্যে কেহ কেহ সহায়ক আছেন দেখিয়া লড়াইয়ের সাহস বাড়িতেছে।—সম্পাদক।

১০৭নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে শ্রীরঘুনাথ শীল, বি, এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১ম বর্ষ—৮ম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ—১৩৩৩

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্‌।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি॥

অথর্ব্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জন্ম আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।
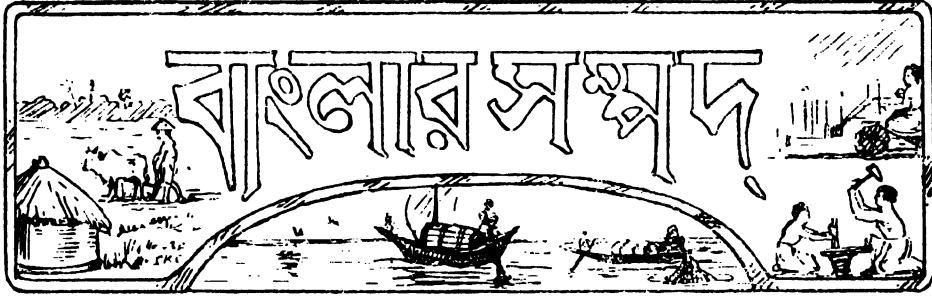
বাছাইয়ের খর্চ্চা

"কাউন্সিল" আর "অ্যাসেম্ব্লি" এই দুই সরকারী রাষ্ট্র-সভায় জনগণের প্রতিনিধিরূপে গিয়া বসিবার জন্য আজকাল বাংলাদেশে কম সে কম তিনশ' লোক উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। হরদম চলিতেছে যাওয়া-আসা, রেলে, ষ্টীমারে, নৌকায়, উটে, গরুর গাড়ীতে, ঘোড়ার গাড়ীতে, অটোমোবিলে। আর চলিতেছে বচসা, বিতণ্ডা, হাতে মাথা কাটাকাটি আর "চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার।" এই শেষের দিক্‌টায় নজর আমরা না দিতেও পারি। কিন্তু "আর্থিক উন্নতি"র পক্ষে "যাওয়া আসা" কাণ্ডটা ফেলিয়া দিবার চিজ নয়। ইহার জন্য লাগে "রূপচাঁদ"। রাহা-খরচ আছে, সেলামি আছে, "মিষ্টিমুখি" আছে। তাহা ছাড়া আরও অনেক-কিছু আছে, যাহার জন্য দরকার হয় দক্ষিণা—পাণ্ডাদের প্রদত্ত সুফল অথবা ঐ জাতীয় মালের মূল্য।

ভোটের বাজার

আমরা যে শাস্ত্র আলোচনা করিয়া থাকি তাহার আসল কথাই হইতেছে কেনা-বেচা। "ভোট" তো আর সৃষ্টি-ছাড়া সামগ্রী নয়। ভোটেরও কেনা-বেচা সম্ভব। যখন স্বর্গ-লাভ বা নরক-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত কেনা-বেচার মামলায় আসিয়া ঠেকিতে পারে, তখন রাষ্ট্র-সভায় মাতব্বরি করিবার অধিকার, পদগৌরব বা ক্ষমতা কেনা-বেচার বাহিরে থাকিবে কি করিয়া? ভোটেরও "হাট" "বাজার" আছে।

খরচের পরিমাণ

আমাদের শ'তিনেক বাঙালী বন্ধুরা কে কত খরচ করিলেন তাহা সম্প্রতি আন্দাজ করিতে বসিয়া লাভ নাই। কেননা সরকারের কানুন আছে যে, এই সব বাছাইয়ের খরচপত্র প্রত্যেককেই গবর্মেণ্টের নজরে আনিতে হইবে।

আর তখন দেশশুদ্ধ লোক তাহা জানিতে পারিবে। অবশ্য সকল খরচই যে প্রত্যেকে অতি সুবোধ বালকের মতন বলিয়া দিবেন এরূপ বিশ্বাস করিবার কোনো কারণ নাই। কিন্তু মোটের উপর অনেকটা ধরিতে পারিব। বুঝা যাইবে বাছাই-ব্যবসায় খর্চ্চা লাগে কত।

বাজে খরচ না ভাবুকতা

রাষ্ট্র-সভায় প্রতিনিধি হইবার জন্য বাঙালীরা টাকা খরচ করিতেছে ইহা সুখের কথা। বুঝিতেছি যে,—"ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার" মতন লোক বাংলায় দেখা দিতেছে। আর তার জন্য টাকা ঢালিবার উন্মাদনাও আত্ম-প্রকাশ করিতেছে। বাঙালী-চরিত্রে বোধ হয় এই একটা নয়া বিশেষত্ব। অন্ততঃ ১৪।১৫ বৎসর পূর্ব্বে এই বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যাইত না। যদিও বা দেখা যাইত, তাহা মাত্র দু'দশ জন লোকের ভিতর আবদ্ধ ছিল। কিন্তু আজ ১৯২৬ সনে দেখিতেছি বাংলার প্রত্যেক জেলায়ই গণ্ডা গণ্ডা লোক এইরূপ "বাজে খরচের" নেশায় মাতোয়ারা।

অনেকে হয়ত এই খরচপত্রকে অপব্যয় বিবেচনা করিতেছেন। আমরা কিন্তু ইহাকে ভাবুকতার অন্যতম নিদর্শনরূপে আদর করিতে চাই। ইহাতে নিত্য-নৈমিত্তিক হাঁড়ীকুড়ি ডালচালের সীমানা ছাড়াইয়া খর্চ্চে লোক-গুলাকে খানিকটা সূক্ষ্মতর সুখভোগের রাজ্যে চরিয়া বেড়াইবার সুযোগ দেয়। নিজের কথা আর নিজ পরিবারের কথা না ভাবিয়াও মানুষ যে দুই দণ্ড, দুই সপ্তাহ, দুই মাস কাটাইতে পারে আর তাহার জন্য টাকা ঢালিতে পারে, তাহা আমরা বাঙালীরা পূর্ব্বে বড় একটা জানিতাম না। বাছাইয়ের উপলক্ষ্যে বাঙালী সমাজে এক অভিনব আদর্শ-নিষ্ঠা দেখিয়া আনন্দিত হইতেছি।

পারিবারিক খরচের নয়া দফা

সরকারী রাষ্ট্র-সভা অথবা বে-সরকারী কংগ্রেস কনফারেন্স ইত্যাদির জন্য খরচপত্রকে আমরা বাজে খরচ বিবেচনা করি না। অবশ্য মাত্রাটা কবে কখন কোথায় গিয়া ঠেকে তাহা যথাসময়ে ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখা কর্ত্তব্য। সম্প্রতি দেখিতেছি এই পর্য্যন্ত যে, দেশের নামে অথবা দেশ-সেবার গন্ধের জন্য আমাদের উচ্চশিক্ষিত অথবা সম্পন্ন লোকেরা পয়সা খরচ করিতেছেন। ইহা সুলক্ষণ।

"আর্থিক উন্নতি"র তরফ হইতে আর একটা কথা লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। পয়সা খরচ করিবার নতুন নতুন কতকগুলা উপলক্ষ্য বাঙালী (এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয়) সমাজে দাঁড়াইয়া যাইতেছে। আড়কাঠি বাহাল না করিলে ভোটের বাজারে সওদা করা চলে না। একমাত্র চরিত্রের জোরে কি বিদ্যার জোরে অথবা কর্ম্মদক্ষতার জোরে স্বয়ং ভগবানও কোনো মানব-সমাজে ভোট পাইবার উপযুক্ত বিবেচিত হইবেন কিনা সন্দেহ। কচিৎ কখনো দু'এক ক্ষেত্রে একমাত্র গুণের শক্তিতেই ভোট টানিয়া আনা অসম্ভব না হইতেও পারে। কিন্তু সাধারণতঃ সর্ব্বত্রই চাই গলাবাজি, কলমের জোর, কথা কাটাকাটি, আর তার জন্য লেখক ও বক্তা জাতীয় ডজন ডজন লোকের গতিবিধি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সকল লোকের "খোর পোষ" জোগানো ভোট-প্রার্থীর পক্ষে আবশ্যক। অর্থাৎ নিজ খাই খরচের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল খরচ বাঙালী সমাজে পারি-বারিক জীবন-যাত্রার অন্যতম অঙ্গে পরিণত হইতেছে। ১৮৯৫—১৯০৫ সনের বাঙালী জীবন-যাত্রায় আর ১৯২৬ সনের বাঙালী জীবন-যাত্রায় এই এক প্রভেদ।

জীবন-যাত্রা প্রণালীর বহর বৃদ্ধি

বুঝিতেছি যে, বাংলায় কনজাম্পশ্যন্" নামক ধন-বিজ্ঞানের পারিভাষিক ভোগ-বস্তুটা আকারে ও প্রকারে বাড়িয়া যাইতেছে। আমরা নয়া নয়া দফায় খরচ করিতে শিখিতেছি। কেবল শিখিতেছি মাত্র নয়,—খরচ করিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত আছে। সোজা কথায় ইহার নাম "ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব্ লিভিংয়ের" (জীবন-যাত্রা প্রণালীর) বহর-বৃদ্ধি। যে যে ব্যক্তি অথবা যে যে পরিবার এই সকল নতুন দফায় টাকা পয়সা ঢালিতে সমর্থ, তাঁহারা তাঁহাদের বাপ-দাদাদের চেয়ে উচ্চতর আর্থিক ধাপে জীবন চালাইতেছেন।

আয়-বৃদ্ধি

এই সকল খরচপত্র বাড়ানো সম্ভবপর হইতেছে কোথ

হইতে? সকলেই যে "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ"-নীতির ধুরন্ধর এরূপ সন্দেহ করিবার কারণ নাই। আর কোনো কোনো ভোটপ্রার্থী অন্যান্য দফায় খরচ কমাইতে বাধ্য হইয়াছেন এরূপ সংবাদও পাওয়া যায় নাই। মোটের উপর, অন্যান্য সাংসারিক খরচপত্রের উপরই এইটা বাড়তি খরচ।

অন্যান্য খরচও কমে নাই আর কর্জ্জ করিয়া ভোট কেনাও চলিতেছে না,—এই যদি অবস্থা হয় তাহা হইলে টাকা-পয়সা আসিতেছে কোথা হইতে? জবাব সোজা।

বুঝা উচিত যে নিজ নিজ আয় হইতেই খরচ চলিতেছে। যাঁহাদের নিজ ট্যাঁকে পয়সা নাই, তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতেছেন হয় বন্ধুবান্ধব, না হয় সভা-সমিতি, এক কথায় "দেশের লোক"।

যে পথেই টাকা আসুক না কেন, টাকাটা আসিতেছে ইহাই ধনবিজ্ঞানের তথ্য। অতএব যদি কেহ বলেন যে, অন্ততঃপক্ষে ভোটপ্রার্থীদের দলে বা সমাজে আয়ের পরিমাণ কিছু বাড়িয়াছে তবে তাহাতে সন্দেহ করা কঠিন। গোটা বাংলাদেশের আর্থিক অবস্থা বিগত ত্রিশ-চল্লিশ বৎসরের ভিতর কতটা উন্নত হইয়াছে তাহা এই তথ্যের জোরে আন্দাজ করা সম্ভব নয়। কিন্তু বাঙালী সমাজের কোনো কোনো অংশে সম্পদ্-বৃদ্ধি ঘটিয়াছে এইরূপ বিশ্বাস করিতেই হইবে। দেশের দারিদ্র্য-সমস্যা আলোচনা করিবার সময় এই কাথাটা মনে রাখা কর্ত্তব্য।

ভোট-প্রার্থীদের ইস্তাহার

আমরা ভোট-প্রার্থীদের ইস্তাহার অনেক পড়িয়া দেখিয়াছি। তাহা ছাড়া দৈনিকে সাপ্তাহিকে তাঁহাদের স্বপক্ষে বিপক্ষে নানা তথ্য পাইয়াছি। দলাদলির যা-কিছু দস্তুর তাহার কিছুই আমাদের সংবাদ-সাহিত্যে বাদ পড়িতেছে না। কিন্তু এই দুই মাস ধরিয়া যে বাকবিতণ্ডা চলিতেছে তাহার ভিতর যেন কাজের কথা প্রচুর পরিমাণে বাদ পড়িয়া গিয়াছে।

কোনো দলের স্বপক্ষে বিপক্ষে মতামত ঝাড়া আমাদের মতলব নয়। কিন্তু এ কথাটা বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, স্বরাজ-স্বাধীনতা শব্দটার বানান, উচ্চারণ ও ব্যাখ্যা এবং হিন্দু-মুসলমান দুনিয়ার ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত রাষ্ট্রীয় কাউন্সিল অ্যাসেম্ব্লির একমাত্র আলোচ্য বিষয় নয়। এই দুই বিষয় বাদ দেওয়া উচিত আমরা এরূপ বলিতেছি না, বলিতেছি এই যে,—পাঁচ কোটি বাঙ্গালী নরনারীর রাষ্ট্রীয় স্বার্থের ভিতর আরও অনেক-কিছু আছে। সেই সকল চিজ ভোট-প্রার্থীদের ইস্তাহারে পাওয়া কঠিন। তাঁহারা দেশের লোকের "প্রতিনিধি" কিনা অনেক ক্ষেত্রে এরূপ সন্দেহ করা চলে।

চাষী-মজুর কেরাণীর স্বার্থ

"আর্থিক উন্নতি"র চোখে এই ইস্তাহারগুলার কিছু সমালোচনা অপ্রাসঙ্গিক নয়। খুঁটিয়া খুঁটিয়া দফায় দফায় সকল কথা বলিবার ইচ্ছা নাই। কিন্তু দেখিতেছি যে, দেশের পল্লীতে পল্লীতে চাষীরা নতুন নতুন কথা শুনাইতেছে। তাহাদের বাণী ইস্তাহারে ইস্তাহারে ঠাঁই পায় নাই কেন? মজুরদের সুখ-দুঃখও আজকাল সমাজের ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে মূর্ত্তি পাইয়া উঠিতেছে। তাহাদের কথা ইস্তাহারগুলায় শুনিতে পাইলাম না কেন? দেশের লোক খাইতে পাইতেছে না পরিতে পাইতেছে না বলিয়া চীৎকার করিতেছে। এই চীৎকারের প্রতিধ্বনিও ইস্তাহার-সাহিত্যে বিরল কেন? এই সকল এবং অন্যান্য এই শ্রেণীর বিষয় সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন মত থাকা সম্ভব। ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যপ্রণালী থাকাও সম্ভব। সেই সকল মত এবং কার্য্যপ্রণালী বিভিন্ন দলেরও প্রাণস্বরূপ। কিন্তু কাগজে এই সকল বিষয়ে উল্লেখযোগ্য আন্দোলন হইল কৈ?

আর্থিক আইন-কানুন

আর একটা কথা মনে রাখা আবশ্যক। কাউন্সিল অ্যাসেম্ব্লির আসল কাজ হইতেছে আইন-কানুন তৈয়ারী করা। আর এই আইনকানুনের বার আনা চৌদ্দ আনা অংশ হইতেছে ধনদৌলত-সম্পর্কিত। বহির্ব্বাণিজ্য-অন্তর্ব্বাণিজ্য সম্বন্ধে বিধি-ব্যবস্থা কায়েম করা এই সকল

আইন-গঠনের অন্তর্গত। রেলের আইন, জাহাজের আইন তাহাদের অন্যতম। ফ্যাক্টরি-কারখানার শাসন-পরিচালনা এই সব আইনেরই অধীনে চলিয়া থাকে। গো-জাতির উৎকর্ষবিধান, খাঁটি ঘী-দুধের ব্যবস্থা, পল্লী-শহরের স্বাস্থ্যোন্নতি ইত্যাদি সবই শেষ পর্য্যন্ত কাউন্সিল-অ্যাসেম্ব্লিতে আইন-সৃষ্টির উপর নির্ভর করে। এই সকল বিষয়ে বাংলার যে যে "জন-নায়ক" অথবা রাষ্ট্রীয় দল বিশেষ কোনো মত পোষণ করেন না অথবা দেশবাসীকে কোনো আন্দোলনের স্বপক্ষে মত পোষণ করিতে সাহায্য করেন না, তাঁহারা কাউন্সিল-অ্যাসেম্ব্লিতে যাইবার অযোগ্য।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, আজকাল কয়েকটা বড় বড় সমস্যা সরকারী রাষ্ট্র-সভায় আলোচিত হইবার কথা। সরকারকে ভারতীয় নরনারীর ট্যাক্স দিবার ক্ষমতা কতখানি আছে এই বিষয়ে সরকারী তদন্ত হইয়া গিয়াছে। সে সম্বন্ধে বাঙালী ভোট-প্রার্থীদের মতামত কি তাহা তাঁহাদের ইস্তাহারে এবং নিজপক্ষীয় কাগজে আলোচিত হওয়া দরকার। এই বিষয়ে স্পষ্ট কর্ম্মপ্রণালী এবং আইনের খসড়া নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। বিদেশী মূলধনের সাহায্যে দেশের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের উপকার কতটা সাধিত হইতে পারে এবং সেই উদ্দেশ্যে কিরূপ আইন গঠিত হওয়া উচিত এই সকল বিষয়ও ইস্তাহারে ইস্তাহারে বিবৃত হওয়া উচিত। ভারতের সঙ্গে বিদেশের আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যকে সকল ক্ষেত্রেই শুল্ক-নীতির বশবর্ত্তী করিয়া রাখা উচিত কিনা সেই সম্বন্ধে ভোট-প্রার্থীদের মতামত প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। মুদ্রা-সংস্কারের জন্য "রিজার্ভ-ব্যাঙ্ক" গঠিত হইবার কথা উঠিয়াছে। এই বিষয়ে ভোট-প্রার্থীরা কে কি বুঝেন ও ভাবেন তাহাও দেশবাসীকে জানানো তাঁহাদের কর্ত্তব্য। আজকাল কৃষি-কমিশন বসিয়াছে। কৃষির উন্নতির জন্য কোন্ ভোটপ্রার্থী গবর্মেণ্টকে কিরূপ আইন তৈয়ারী করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছেন তাহাও দেশের লোক জানিতে অধিকারী।

রাষ্ট্র-শক্তির আর্থিক সদ্ব্যবহার

রাষ্ট্র একটা বিপুল যন্ত্র। লোকহিতের বাহনস্বরূপ এই যন্ত্রকে যখন-তখন অস্বীকার করিয়া চলা উচিত নয়। বস্তুতঃ, রাষ্ট্র-যন্ত্রকে ভারতবাসীর কব্জায় আনা চাই-ই চাই। কিন্তু রাষ্ট্রকে হাতিয়ারের মত ব্যবহার করিতে হইলে পাকা কারিগর হওয়া আবশ্যক। আর্থিক হিসাবে দেশকে বড় করিয়া তুলিবার জন্য রাষ্ট্রকে কত উপায়ে নিজের কব্জায় আনা সম্ভব সে সম্বন্ধে বাঙালী স্বদেশ-সেবকগণ এখনো বেশ সজাগ হইয়া উঠেন নাই। রাষ্ট্র-শক্তির আর্থিক সদ্ব্যবহার করিতে হইলে বাঙালীর পক্ষে যে-যে নূতন-নূতন যোগ্যতা অর্জ্জন করা আবশ্যক, সেই সকল যোগ্যতা ১৯২৬ সনের বাংলায় বেশী দেখা গেল না। সেই যোগ্যতা বাড়াইবার এবং সমাজের নানা স্তরে ছড়াইবার সুযোগ সৃষ্টি করিবার জন্য বর্ত্তমান হিড়িকে প্রস্তুত হইতে শিখিলে আমরা ১৯৩০ সনের জন্য উপযুক্ত হইতে পারি।

চাই বিভিন্ন আর্থিক নীতি

ক্বচিৎ কোনো কাগজে দু'একটা আর্থিক বক্তৃতা ছাপা হয় নাই সে কথা বলিতেছি না। কোনো কোনো ইস্তাহারে চাষী-মজুর-মধ্যবিত্তের নাম করা হয় নাই তাহাও বলিতেছি না। বলিতেছি এই যে,—বাংলাদেশের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য পুষ্ট করিবার জন্য এবং সঙ্গে সঙ্গে চাষী-মজুর-কেরাণীর অন্নকষ্ট, জল-কষ্ট, স্বাস্থ্য-কষ্ট, শিক্ষা-কষ্ট ঘুচাইবার জন্য কোন্ ব্যক্তি বা কোন্ দল কিরূপ আইন তৈয়ারী করিতে বা করাইতে প্রস্তুত আছেন, সেই কথাটা কোথায়ও বড় একটা জমিয়া-মজিয়া উঠে নাই। প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় দলের একটা আর্থিক নীতি এবং কর্ম্মকৌশল থাকা আবশ্যক। আর কাগজে কাগজে সভায় সভায় সেই সম্বন্ধে বিপুল আন্দোলন চাই। তাহা যতদিন না দেখিতেছি ততদিন ভোট-প্রার্থীদিগকে এবং দলগুলিকে আর্থিক হিসাবে দেশের লোকের যথার্থ প্রতিনিধি বলিতে পারিব না। অবশ্য আর্থিক মত এবং আর্থিক কর্ম্ম-প্রণালী থাকিলেও "কাউন্সিল-অ্যাসেম্ব্লি"তে সেই সব কাজে পরিণত করিবার সুযোগ বা ক্ষমতা পাওয়া যাইবে কি না সে কথা স্বতন্ত্র। ১৯২৬ সনের বাছাই-কাণ্ডের আন্দোলনটা দেখিয়া যুবক বাঙালী ভবিষ্যতের জন্য স্বদেশ-সেবার কর্ম্মপ্রণালী ঢুঁড়িতে প্রবৃত্ত হইলে আমাদের একটা শিক্ষালাভ হইয়া গেল বলিতে পারিব।

আর্থিক স্বার্থ ও হিন্দুমুসলমান

একটা বদখেয়ালের দলাদলি বাজারে বেশ পাকিয়া উঠিয়াছে। কথায় কথায় "হিন্দুর স্বার্থ", "মুসলমানের স্বার্থ" ইত্যাদি বোল ঝাড়া হইতেছে। এই সকল তথাকথিত হিন্দু-স্বার্থ মুসলমান-স্বার্থ ঠিক কোন্ প্রকৃতির চিজ তাহা স্বদেশ-সেবার তরফ হইতে যাচাই করিয়া দেখা হয় নাই। সে দিকে নজর দেওয়া সম্প্রতি সম্ভব নয়।

"আর্থিক উন্নতি"র তরফ হইতে মাত্র এইটুকু বলিতে চাই যে,—সেই দ্বন্দ্ব আমাদের কোঠে অজ্ঞাত। যে-যে প্রণালী অবলম্বন করিলে বাংলার চাষী মজুর কেরাণী শিল্পী ও বণিক পরিবারগুলা দুই বেলা পেট পূরিয়া খাইতে পারিবে, শীতকালে গায়ে আলোয়ান জড়াইবে, গরমে-বর্ষায় ছাতা মাথায় দিবে, স্বাস্থ্যকর ঘরবাড়ীতে শুইতে পারিবে, ইস্কুল-কলেজে পড়িতে পারিবে, অসুখ হইলে ডাক্তার-কবিরাজ-হাকিম ডাকিতে পারিবে আর সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু টাকাও জমাইয়া রাখিতে পারিবে,—সেই প্রণালীগুলা বাঙালী হিন্দুর পক্ষেও যা, বাঙালী মুসলমানের পক্ষেও তাই।

ধনবিজ্ঞানের জাতি-ভেদ, মত-ভেদ, ধর্ম্ম-ভেদ, ভাষা-ভেদ নাই। এ হইতেছে অতিমাত্রায় সনাতন, বিশ্বজনীন বিদ্যা। আর্থিক উন্নতির ঝাণ্ডা খাড়া করিলে হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েই ঐক্যবদ্ধ হইতে বাধ্য। যদি অনৈক্য দেখা দেয়, সে অনৈক্য আসিবে ধনী-নির্ধনে, মজুর-মালিকে, চাষী-জমিদারে,—ধর্ম্মে ধর্ম্মে নয়। সেই অনৈক্য-নিবারণের জন্য আবার অন্য কতকগুলা সনাতন দাওয়াই আছে। তাহা লইয়া সম্প্রতি মাথা-ঘামানো অনাবশ্যক। যুবক বাংলাকে বিচক্ষণরূপে রাষ্ট্রীয় সংসারে প্রবেশ করিতে হইবে। গামুলি বুলি ছাড়িয়া নতুন পথের পথিক হইবার জন্য ১৯২৬ সনের দলাদলি চিন্তাশীল বাঙালী কর্ম্মীদিগকে অনেক-কিছু সাহায্য করিবে আশা করিতেছি।

কলিকাতায় খোলার ঘর

কলিকাতা কর্পোরেশ্যন ১৯২৩ সনের মিউনিসিপ্যাল আইনের সাহায্য লইয়া কলিকাতা শহর হইতে খোলার ঘরের সংখ্যা কমাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। ঠিক হইয়াছে যে, নিম্নলিখিত চৌহদ্দিগুলির ভিতর কেহ খোলার ঘর তুলিতে পারিবে না।

(১) উত্তরে হ্যারিসন রোড, পশ্চিমে সেণ্ট্রাল এভিনিউ, পূর্ব্বে কলেজ স্কোয়্যার, দক্ষিণে বহুবাজার ষ্ট্রীট। (২) উত্তরে মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, দক্ষিণে হ্যারিসন রোড, পূর্ব্বে কলেজ ষ্ট্রীট, পশ্চিমে সেণ্ট্রাল এভিনিউ। (৩) দক্ষিণে মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, পশ্চিমে সেণ্ট্রাল এভিনিউ, পূর্ব্বে কলেজ ষ্ট্রীট ও উত্তরে মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট।

এই তিন অঞ্চলে খোলার ঘর তুলিতে হইলে কর্পোরেশনের বিশেষ অনুমতি দরকার হইবে।

১৫,৪২৯ পল্লী-পরিদর্শন

১৯২৫-২৬ সনে পশু চিকিৎসা-বিভাগের অ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনগণ ১৫ হাজার ৪ শত ২৯টি গ্রাম পরিদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা ১ লক্ষ ৮ শত ৩০টি পশুর চিকিৎসা করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে বৎসর তাঁহারা ১৫ হাজার ২২টি গ্রাম পরিদর্শন করিয়াছিলেন এবং ৯৪ হাজার ৮শত ৯৪টি পশুর চিকিৎসা করিয়াছিলেন।

রংপুরে পশু-চিকিৎসা

রংপুর জেলাবোর্ড পশু-চিকিৎসার বিশেষ উন্নতি করিতেছেন। তাঁহাদের অধীনে ৭টি পশু-চিকিৎসালয় ও ১টি হাসপাতাল আছে। সরকার এজন্য রংপুর জেলা-বোর্ডকে বিশেষ ধন্যবাদ দিয়াছেন।

সরকারী চিকিৎসালয়ে ২৮৮৩ পশু

১৯২৫-২৬ সনে চিকিৎসালয়ে দুই হাজার ৫ শত ৮৭টি পশু চিকিৎসিত হইয়াছে এবং ২ শত ৯৬টি পশুর উপর অস্ত্রোপচার করা হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব বৎসরে ২ হাজার ৮৮টি পশু চিকিৎসিত ও ২ শত ১৮টি পশুর উপর অস্ত্রোপচার করা হইয়াছিল। এই বৎসর চিকিৎসালয়ের ৩০ হাজার ৮ শত ২০ টাকা আয় হইয়াছে।

বঙ্গে পশু-মড়ক

১৯২৫—২৬ সনে সংক্রামক ব্যাধিতে ৩১ হাজার ২ শত ২৪টি পশু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব বৎসর ২১ হাজার ৯ শত ১টি পশু মারা গিয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে এক গো-মড়কেই ২৪ হাজার ৬ শত ৯৫টি পশু মারা গিয়াছে। ইহার পূর্ব্ব বৎসর মাত্র ১৯ হাজার ৮৮টি পশুর মৃত্যু হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে ত্রিপুরা, দিনাজপুর, ঢাকা, রংপুর, ময়মনসিংহ ও পাবনা জিলাতেই বহু গবাদি পশু মারা গিয়াছে। ঢাকা ও ময়মনসিংহের জেলাবোর্ড 'সিরাম' সরবরাহের মাত্রা কমাইয়া দিয়াছিলেন বলিয়াই ৯ শত ৮২টি পশুর মৃত্যু হইয়াছে।

টীকায় পশুর উপকার

১৯২৫-২৬ সনে পশু চিকিৎসকগণ ১ লক্ষ ৭৩ হাজার ৭ শত ৬২টি পশুকে টীকা দিয়াছেন। ইহার পূর্ব্ব বৎসর ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৪ শত ৪৮টি পশুকে টীকা দেওয়া হইয়াছিল। যে সমস্ত পশুকে টীকা দেওয়া হইয়াছিল, তাহার মধ্যে মাত্র ৯ শত ৭২টি পশু মারা গিয়াছে।

পশু-চিকিৎসা কলেজে ২৯ বাঙালী ছাত্র

১৯২৫-২৬ সনে বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে। বৎরের শেষে বিদ্যালয়ে এক শত জন ছাত্র ছিল। ইহার পূর্ব্ব ৪ বৎসরে যথাক্রমে উক্ত বিদ্যালয়ে ১৪৩, ১৩৯, ১৩৭ ও ১৩২ জন ছাত্র ছিল। আলোচ্য বর্ষের ছাত্রদের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক ছাত্র বিহার ও উড়িষ্যার লোক। ঐ বৎসর মাত্র ২৯ জন বাঙালী ছাত্র কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিল। বাঙ্গালার জেলাবোর্ডসমূহ পাশ-করা পশুচিকিৎসক নিয়োগ করিতেছেন না এবং বাঙ্গালা সরকার পূর্ব্বে ছাত্রদিগকে যে বৃত্তি দিতেন, বঙ্গীয় ব্যয়সঙ্কোচ কমিটির প্রস্তাব অনুসারে তাহা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

চিটাগঙ্ লোন কোম্পানী

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং ব্যবসা চালাইবার জন্য চট্টগ্রামে চিটাগঙ্ লোন কোম্পানী নামে একটা প্রতিষ্ঠান কায়েম হইতেছে। ৫ লাখ টাকা মূলধনে কোম্পানী খাড়া করা হইবে। ৫০,০০০ শেয়ার থাকিবে,—প্রত্যেক শেয়ারের মূল্য ১০৲। অন্ততঃ ১০০০ টাকার শেয়ার না কিনিলে কেহ ডিরেক্টর হইতে পারিবেন না। নাগ ব্রাদার্স কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র নাগ হইবেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর। অন্ততঃ ১৫ বৎসর ধরিয়া তিনি এই পদে বাহাল থাকিবেন এইরূপ ব্যবস্থা করা হইতেছে।

রেলে কেরাণী-নিয়োগ

১৯২১ সনে রেল-বোর্ড হইতে কানুন জারি করা হইয়াছে যে, কলিকাতার ষ্টেশনে কোন কর্ম্মচারীকে মাসিক ৩৩৲ টাকার কমে কাজ দেওয়া হইবে না। অথচ শুনা যাইতেছে যে, বেঙ্গল-নাগপুর রেলের ব্যবস্থায় ২৪৲ টাকা বেতনেও অনেক কেরাণী বাহাল করা হইতেছে। এই কোম্পানীর বিরুদ্ধে আর একটা নালিশ এই যে,—কর্ম্মচারি-নিয়োগের নিয়ম নেহাৎ গোলমেলে। কোনো কোনো কেরাণীকে একদম বিনা পরীক্ষায় বাহাল করা হয়। যে সকল লোককে চার পাঁচ বার পরীক্ষা করা হইয়াছে তাহাদিগকে বাদ দিয়াও এমন সব লোককে কাজ দেওয়া হইতেছে, যাহাদের কোনো পরীক্ষাই লওয়া হয় নাই। তাহা ছাড়া, পাশ-করা লোককে চাকরি না দিয়া একদম আল্‌গা, অপরীক্ষিত লোককে চাকরি দেওয়া হইতেছে। তাহার উপর, পদোন্নতি সম্বন্ধেও নাকি খামখেয়ালি চলিতেছে। অনেক দিনকার অভিজ্ঞতা-বিশিষ্ট লোকের মাথা ডিঙাইয়া নেহাৎ নতুন লোক উচ্চতর পদে বসিতেছে। এই সকল অনিয়ম সম্বন্ধে সরকারী তদন্ত হওয়া আবশ্যক।

অভয় আশ্রমের সস্তা খদ্দর

১৯২১ সনে ৭।০ টাকার কমে কুমিল্লার অভয়-আশ্রম ৮ গজ ৪৪ ইঞ্চি ধুতীর জোড়া বেচিতে পারিত না। ফী বৎসরই দাম কমিয়া আসিতেছে লক্ষ্য করা যায়। ১৯২২ সনে দর ছিল ৬৲ টাকা জোড়া। ১৯২৫ সনে দাম নামিয়া আসে ৫৲ টাকা পর্য্যন্ত। আর এই বৎসর অভয়-আশ্রম ৩৸০ আনা দরে জোড়া ধুতী বিক্রী করিতেছে। অর্থাৎ ১৯২১ সনের তুলনায় দাম আঁজকাল অর্দ্ধেক মাত্র। বঙ্গলক্ষ্মী কটনমিলের দরের সঙ্গে অভয়আশ্রম ১৯২৬ সন ধরিয়া টক্কর দিতে পারিতেছে।

ধুতীর দর কমিবার অন্যতম কারণ হইতেছে তুলার দরের হ্রাস। বিগত দুই বৎসর ধরিয়া তুলা ক্রমেই দরে নামিয়া আসিতেছে।

খদ্দরে উন্নতি চারগুণ

আর একটা কথা মনে রাখা আবশ্যক। ১৯২০।২১ সনে খদ্দর বেশী টেকসই ছিল না। আজকালকার খদ্দর টেকসই হিসাবে প্রায় ডবল উন্নত হইয়াছে। একে টাকাকড়ির হিসাবে দাম কমিয়াছে আধা-আধি, তার উপর টেকসই ডবল!

১৯২০-২১ সনে এক খানা খদ্দরের ধুতী কিনিতে লাগিত ৩৸৹ আনা। ধরা যাউক যেন সেই ধুতী টিকিত মাত্র ১ বৎসর। আজ ৩৸৹ আনায় পাওয়া যাইতেছে দুই খানা ধুতী। আবার প্রত্যেকটাই টিকিবে দুই বৎসর। অতএব বলিতে হইবে, এই পাঁচ ছয় বৎসরে খদ্দরের উন্নতি সাধিত হইয়াছে চারগুণ।

কৃত্রিম ঘী ও কৃত্রিম রেশম

"রেঅঁ" বা কৃত্রিম রেশম আজকাল দুনিয়ার সর্ব্বত্র দিগ্বিজয় চালাইতেছে। এক মাত্র প্রাকৃতিক রেশমের দ্বারা জগতের নরনারীর রেশম-চাহিদা মিটিবার সম্ভাবনা কম। কৃত্রিম রেশম সম্বন্ধে মানবজাতির ভবিষ্যৎ যার পর নাই উজ্জ্বল।

সংসারে "ঘী"র অবস্থাও তদ্রূপ। প্রাকৃতিক অর্থাৎ গাওয়া বা ভৈঁসা ঘীর পরিমাণ জগতে প্রচুর নয়। অথচ ভারতের নরনারীর ঘী-তৃষ্ণা বাড়িয়াই চলিয়াছে। চাহিদা বাড়িতেছে অথচ জোগান যথোচিত বাড়িতেছে না। কাজেই এক দিকে বাড়িতেছে দাম, অপর দিকে চলিতেছে ভেজালের জয়জয়কার। ঘীর নামে সংসারের সকল প্রকার জীবজন্তুর চর্ব্বি দুনিয়ার সর্ব্বত্র,—মায় গোঁড়া হিন্দুদের দেব-সেবায় এবং জঠর-সেবায় ব্যবহৃত হইতেছে।

তেলের বীজ হইতে ঘী সৃষ্টি

যখন সর্ব্বত্র এই ঘী-সমস্যা তখন কৃত্রিম উপায়ে ঘী উৎপন্ন করা যায় কিনা সেদিকে রাসায়নিক, এঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী ইত্যাদি সকল প্রকার লোকের নজর পড়িয়াছে। ভেজাল অথবা চর্ব্বি হইতে ঘীর উদ্ধার সাধন করা এই কৃত্রিম ঘী উৎপাদনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। এই মতলবে গাছ-গাছড়া ফলমূল, বীজ ইত্যাদি যাবতীয় উদ্ভিজ্জের দিকে বিজ্ঞানসেবীরা অভিযান চালাইতেছেন। অভিযান সার্থকও হইয়াছে ইয়োরামেরিকায় অনেক পরিমাণে। যাঁহারা ভেজাল ঘী বা চর্ব্বির দৌরাত্ম্য হইতে আত্মরক্ষা করিতে চাহেন, তাঁহারা "উদ্ভিজ্জ ঘী" বা কৃত্রিম ঘী ব্যবহার করিয়া এক সঙ্গে ঘী-পিপাসা এবং স্বাস্থ্য-আকাঙ্ক্ষা দুই-ই মিটাইতেছেন। কৃত্রিম ঘীকে উদ্ভিজ্জ তেলের ঘী বলা চলে।

কৃত্রিম ঘীর কারখানা

ভারতে "কৃত্রিম ঘী"র বাজার খুব বড়। ঘী—চর্ব্বিহীন ঘী ভারতবাসীর না হইলে চলিবে না। কাজেই কৃত্রিম ঘী সৃষ্টি করিবার দিকে যাঁহারা ঝুঁকিবেন তাঁহাদের ব্যবসা সফল হইবার কথা এইরূপ বুঝিয়া কলিকাতার ইণ্ডো-সুইস ট্রেডিং কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত (ইলেক্‌ট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ার) কয়েকজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে মিলিয়া কৃত্রিম ঘীর কারখানা খুলিতেছেন। তিন লাখ টাকা মূলধনে কোম্পানী খোলা হইবে। বার হাজার শেয়ার বেচা হইবে, প্রত্যেক শেয়ারের মূল্য ২৫৲। রাসায়নিক বিশেষজ্ঞ হইবেন কেমিক্যাল এঞ্জিনিয়ার অধ্যাপক বাণেশ্বর দাস। বাণেশ্বর বাবু আমেরিকায় এবং ইয়োরোপে ছিলেন ১৪ বৎসর। যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় সরকারী বে-সরকারী ফ্যাক্টরিতে এবং জার্ম্মাণির কোনো কোনো রাসায়নিক কারখানায় তাঁহার বহুকালব্যাপী অভিজ্ঞতা আছে। এই সকল কর্ম্মকেন্দ্রে তিনি মার্কিণ এবং জার্ম্মাণ রাসায়ণিকদের কাজ তদারক করিতেন।

চাষী প্রতি ১০ বিঘার কম আধা-ভারতে

চাষী প্রতি ভারতে চষা-জমির পরিমাণ কত? ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে অনুপাত ভিন্ন ভিন্ন। যুক্ত-প্রদেশে গড়-পড়তা প্রায় ২॥০ একর (৭॥০ বিঘা) জমি এক একজন চাষীর হিস্যায় আসে। আসামে ২·৯৬ অর্থাৎ প্রায় তিন একর (৯ বিঘা), বিহার এবং উড়িষ্যায় ৩·০৯ একর এবং বাংলায় ৩·১২ একর অর্থাৎ যুক্ত প্রদেশের চেয়ে কিছু বেশী। কিন্তু তবুও মোটের উপর ১০ বিঘার চেয়ে কম জমি বাঙালী, বিহারী, উড়িয়া এবং আসামী চাষীরা চষিয়া থাকে। এই গেল আধা-ভারতের অবস্থা।

মান্দ্রাজে ও বার্ম্মায় ১৫।১৭ বিঘা

মান্দ্রাজের চাষীদের হিস্যায় পড়ে ৪·৯১ একর (পৌনে ১৫ বিঘা) আর ব্রহ্মদেশে ৫·৬৫ একর (প্রায় ১৭ বিঘা)। জমির পরিমাণ হিসাবে মান্দ্রাজ এবং বার্ম্মার চাষীরা গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মাতৃক জনপদের চাষীদের চেয়ে যথেষ্ট উন্নত।

মধ্যপ্রদেশে ও পঞ্জাবে ২৭।২৮ বিঘা

এই হিসাবে মধ্য-প্রদেশ ও বিহারের লোকেরা আরও উঁচু শ্রেণীর লোক। এই অঞ্চলে চাষী প্রতি পড়ে ৮·৪৮ একর (প্রায় ২৫॥০ বিঘা)। আর পাঞ্জাবী চাষী তাদের চেয়েও উন্নত অবস্থায় রহিয়াছে। কেননা ৯·১৮ একর (প্রায় ২৭॥০ বিঘা) গড়পড়তা তাহাদের হিস্যায় আসে।

৩৬॥০ বিঘা বোম্বাইয়ে

সমগ্র ভারতে এই বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বোম্বাই প্রদেশ। বোম্বাইয়ের চাষীদের জন প্রতি ১২·১৫ একর (প্রায় ৩৬॥০ বিঘা) জমি আছে।

এই গেল গোটা প্রদেশ সম্বন্ধে মোটা খবর। কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিলে প্রত্যেক প্রদেশেই চাষী-প্রতি চষা-জমির পরিমাণ সম্বন্ধে অন্য ধারণা জন্মিবে।

শতকরা ২২ পাঞ্জাবীর ৩ বিঘা মাত্র

পঞ্জাবের কথা ধরা যাউক। দেখা গেল যে, এই প্রদেশে চাষী-প্রতি প্রায় ২৭॥০ বিঘা পড়ে। কিন্তু এক একরের (৩ বিঘার) চেয়ে কম জমি চষে এমন চাষীর সংখ্যা পঞ্জাবে কম নয়। গোটা চাষী সমাজের শতকরা ২২ জন এই শ্রেণীর অন্তর্গত। কাজেই ঐ ২৭॥০ বিঘার "গড়" দেখিয়া পাঞ্জাবী চাষীর আসল অবস্থা বুঝা যায় না।

শতকরা ৫৫ পাঞ্জাবীর চাষে ১৫ বিঘার কম

এক একর হইতে ২॥০ একর পর্য্যন্ত অর্থাৎ ৭॥০ বিঘার চেয়ে কম জমি চষে এমন পাঞ্জাবী চাষীও গুনতিতে অনেক। শতকরা তাহারা ১৫·৪। আর ২॥০ হইতে ৫ একর অর্থাৎ ১৫ বিঘার চেয়ে কম পরিমাণ জমির চাষী শতকরা ১৭·৭ জন। দেখা যাইতেছে যে, ১৫ বিঘার চেয়ে কম জমি চষে পাঞ্জাবী চাষীদের ১০০ জনের ভিতর প্রায় ৫৫ জন। অর্থাৎ অর্দ্ধেকের চেয়েও বেশী চাষীর অবস্থা এইরূপ।

অন্যান্য পাঞ্জাবী চাষীর জমির পরিমাণ

বাস্তবিক পক্ষে ৯·১৮ একর বা ২৭॥০ বিঘা জমি চষে কত জন পাঞ্জাবী? শতকরা ১৫ জন মাত্র। ৭½ হইতে ১০ একর পর্য্যন্ত জমির চাষী শতকরা ৯ জন। আর ৫ হইতে ৭½ একর পর্য্যন্ত জমি যাহাদের হাতে আছে তাহারা শতকরা ১১জন মাত্র।

২০ একর (৬০ বিঘা) জমি আছে কয়জনের? শত করা মাত্র ৮ জনের।

ভারতের সামরিক খরচ ৬১ কোটি

১৯২৪-২৫ সনে ভারত গবর্মেণ্টকে "দেশ-রক্ষার" জন্য খরচ করিতে হইয়াছে ৬০ কোটি ৪৯ লক্ষ ৯৬,০০০ (প্রায় ৬১ কোটি) টাকা। এই টাকার শতকরা প্রায় ১৬।১৭ অংশ খরচ হইয়াছে বিলাতে। ভারতবর্ষের ভিতর খরচ হইয়াছিল প্রায় ৪৬ কোটি টাকা। ভারত-শাসনের সকল প্রকার খর্চ্চা একত্র করিলে যত টাকা দাঁড়ায় তাহার প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ যায় সমর-বিভাগে। এই অঙ্ক এবং এই অনুপাত ভারতে কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রায় সমানই চলিতেছে।

ভারতীয় রেলের লাভালাভ

প্রতি বৎসর আজকাল (১৯২৩-২৪) ভারতীয় রেলের তৃতীয় শ্রেণীতে মোসাফিরি করে প্রায় ৫০॥০ (সাড়ে পঞ্চাশ) কোটি নরনারী। সকল শ্রেণীর মোসাফির আর সকল প্রকার মাল বহিতে রেল কোম্পানীর খরচ পড়ে প্রায় ৯১।৯২ কোটি টাকা। আয় হয় প্রায় ৯৩।৯৪ কোটি টাকা। কিছু লাভ থাকে। কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত লোকসান চলিতেছিল। ১৯২১-২২ সনে প্রায় ৯॥০ (সাড়ে নয়) কোটি টাকা গচ্চা দিতে হইয়াছিল। ভারত সরকারের সমগ্র খরচের প্রায় আট ভাগের একভাগ হয় রেল চালাইবার খরচ।

নর্ম্মদার বানে ধনপ্রাণ শেষ

মধ্য প্রদেশে নর্ম্মদা নদীর বন্যা-প্লাবনে বিধ্বস্ত জব্বলপুর, হোসাঙ্গাবাদ, নরশিংপুর, বিলাসপুর প্রভৃতি জেলায় ৭৩ জন মানুষ ও ২২৪০টি গরু ডুবিয়া মরিয়াছে এবং ৬,৭০০ খানি বাড়ী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়াছে।

পঞ্জাবের লক্ষ্মী বীমা কোম্পানী

লাহোরের লক্ষ্মী ইন্‌শিওর্যান্স কোম্পানী ১৯২৪ সনে প্রতিষ্ঠিত। ১৯২৬ সনের ৩০শে এপ্রিল যে বার্ষিক রিপোর্ট বাহির হইয়াছে তাহাতে দেখি, এই বৎসর বীমার জন্য প্রস্তাব আসে ২,৭২২টা। "পলিসি"গুলার সমবেত মূল্য ৫১,৮১,৫০০ টাকা। "চাঁদা" আদায় হইয়াছে মোট ২,১৩,২৯৪৮ আনা। কোম্পানীর সমুদয় বার্ষিক আদায় ২,৩৫,৫৪২৴০ আনা। মোট খরচ ১,৭১,৬১৩ টাকা। এই খরচের ভিতর ধরা হইয়াছে ১৬,০০০ টাকা বীমার দাবী। জীবনবীমা তহবিলে জমা আছে ৬৪,৪২৯ টাকা। ৬৪,৯৪২৸৴০ আনা খাটিতেছে গবর্মেণ্ট সিকিউরিটিতে। ৫৫,১৮০ জমা আছে ব্যাঙ্কে।

আসামে ৯৩০ চা-বাগান

১৯২৫ সনের শেষ দিকে আসামে চা-বাগানের সংখ্যা ছিল মোট ৯৩০টি। পূর্ব্ব বৎসরে ছিল ৯০৬টি। ঐ বৎসর কাছার জিলায় ৯টি, গোয়ালপাড়া লক্ষ্মীপুরে ৬টি, সিলেটে ৪টি, শিবসাগরে ২টি নতুন চা-বাগান পত্তন করা হয়। সিলেটের একটি বাগান পূর্ব্বে অন্য একটির অন্তর্ভুক্ত ছিল, সেটিকে এক্ষণে পৃথক করিয়া লওয়া হইয়াছে। সিলেট, গোয়ালপাড়া ও শিবসাগরের প্রত্যেক জেলার একটি করিয়া চা-বাগান অন্য কোম্পানীর একটির সহিত মিলিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বালিয়াপাড়া সীমান্ত-ভূমির একটি চা-বাগান ডেরাং জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। গত বৎসর কামরূপে ৫টি বাগানের কাজ বন্ধ ছিল।

চায়ের জমির পরিমাণ পূর্ব্ব বৎসর ছিল ৪১২,৮৫৯ একর। এই বৎসর হইয়াছে ৪১৬,৪৭৭ একর। ৬,২৫৬ একর জমি নতুন আবাদে আনা হইয়াছে ও ৩,০৩৪ একর জমিতে চায়ের চাষ বন্ধ করা হইয়াছে। চা'র ব্যবসায়ে লাভের আশাই আবাদ-বৃদ্ধির কারণ। ঐ বৎসরে ৪০০,৫৪৪ একর জমি হইতে চা-পাতা সংগ্রহ করা হয়। ১৯২৪ সনে ঐ সংখ্যা ছিল ৩৯৭,০৫৭ একর।

মোট ১,৫৫৬,২৯২ একর জমি চা-বাগানের এলাকার মধ্যে আসে। পূর্ব্ব বৎসরে ছিল ১,৫৩৮,৯৬০ একর। ইহার শতকরা ২৭ ভাগ জমিতে বাস্তবিক পক্ষে চায়ের চাষ করা হয়।

৫২৭, ৪৯৬ চায়ের মজুর

চা-বাগানের জমি বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও চা-বাগানের দিন-মজুরের সংখ্যা ৫৩৪,২০৪ হইতে ৫,২৭,৪৯৬তে নামিয়াছে। ইহার মধ্যে চা-বাগানের স্থায়ী মজুরের সংখ্যা ৪৬১,২২১। স্থায়ী বাহিরের মজুর ৩০,২৫২জন এবং অস্থায়ী বাহিরের মজুর ছিল ৩৬,০২৩ জন। পূর্ব্ব বৎসরে ঐ সংখ্যাগুলি যথাক্রমে, ৪৭১,৩৬১, ২৫,৭৪৫ ও ৩৭,০৯৮ ছিল। ডেরাং ও লক্ষীপুর জেলায় প্রধানতঃ মজুরের সংখ্যা হ্রাস পায়।

২২॥০ কোটি পাউণ্ড চা

বেশী জমিতে চায়ের চাষ করা হইলেও উৎপত্তির হার ঐ বৎসর বৃদ্ধি না পাইয়া বরং অনেক কমিয়া গিয়াছে। আলোচ্য বৎসরে সমগ্র আসাম প্রদেশে ২২৩, ৬৬০, ৯৭০ পাউণ্ড "ব্লাক্ টি" ও ১,৫১৮,৭১৭ পাউণ্ড "গ্রীণ টি" উৎপন্ন হয়। ১৯২৪ সনে ঐ সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৩৬,০৫৪,০৬৯ ও ১,১০০,০৪০ পাউণ্ড। তাহা হইলে দেখা যায়, ১১,৯৭৩, ৪২২ পাউণ্ড অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৫ ভাগের উপর উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে। আবহাওয়ার অবস্থা ভাল না থাকার জন্য ও মজুর ঘাটতি পড়ার জন্য লক্ষীপুর, শিবসাগর ও ডেরাং এই তিনটি জেলায় প্রধানতঃ উৎপাদনের হার কমিয়া যায়। নওগাঁ জেলার একটা ভারতীয় চা-বাগান মজুর অভাবে চা উৎপাদন করিতে পারে নাই। সিলেট, গোয়ালপাড়া ও কাছারের দুইটি বাগানে "গ্রাণ টি" উৎপন্ন করা হয়। বিগত ৫ বৎসরে বিভিন্ন জেলায় একর প্রতি কত পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইয়াছে তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল। গড়ে আলোচ্য বৎসরে ১৯২৪ সনের তুলনায় একর প্রতি ৩৫ পাউণ্ড উৎপাদন কমিয়া গিয়াছে।

একর প্রতি উৎপন্ন চায়ের হিসাব (পাউণ্ডে)

জেলা	১৯২১	১৯২২	১৯২৩	১৯২৪	১৯২৫
কাছাড়	৩৭১	৪৬৮	৫৩৫	৪৮৭	৪৮৭
সিলেট,	৩৬৭	৪৪৩	৫৬৪	৫২৪	৫৩৪
গোয়ালপাড়া	৩০৭	৩১৪	৩৩০	৩৭৫	২৭৬
কামরূপ	২২৩	১৭৬	২৮৬	২৬৭	২৭৫
ডেরাং	৫৪৪	৪৯৬	৬১৩	৫৭৬	৫৫৩
নওগাঁ	৪৩৩	৪৬২	৫২৮	৫১৫	৫০২
শিবসাগর	৫১৩	৫১২	৫৯২	৬১৪	৫৫৭
লক্ষীপুর	৫৬৯	৬৪০	৭২২	৭৫২	৬৬৮
সাদিয়া সীমান্ত	৫৪৬	৬০৩	৫১৬	৬২৬	৪৭২
গড়ে	৪৩৪	৫১৬	৬০৫	৯৫৭	৫৬২

আসামী চা'র বাজার-দর

পূর্ব্ব বৎসরের চাইতে চায়ের বাজার কিছু পড়িয়া গিয়াছিল। তাহা হইলেও দাম চড়া-ই ছিল। "ইণ্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশ্যানে"র সেক্রেটারী কলিকাতা হইতে যেবিবরণী প্রকাশিত করিয়াছেন তাহা এখানে উদ্ধৃত করা গেল।

উৎপন্ন চায়ের হিসাব

	ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা				সুর্ম্মা উপত্যকা			
	গাঁইটের সংখ্যা	পাউণ্ড প্রতি দাম			গাঁইটের সংখ্যা	পাউণ্ড প্রতি দাম		
১৯২৬ সনের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত		শিলিং		পেন্স		শিলিং		পেন্স
১২ মাসে বিলাত বিক্রী	৮৫০,৩০৭	১		৮·৭৩	২৮৯,৩৩৬	১		৪·২৯
১৯২৫ সনের ঐ	১,০২৬,৬৮১	১		৮·৬৮	৩৩৮,৫৪০	১		৫·৩২
১৯২৬ সনের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত		টাকা	আনা	পাই		টাকা	আঃ	পাঃ
১২ মাসে কলিকাতা বিক্রী	২২৯,৬৬২	০	৸৵	৯	১৮১,৪৮৫	০	||৶	৪
১৯২৫ সনের ঐ	২৫৯,৪৭৩	১	০	৪	১৬৭,৫২৫	০	৸৵	৪

চা পরীক্ষায় সরকারী দান

"ইণ্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশ্যান" তাঁহাদের ত্রৈমাসিক মুখপত্র পূর্ব্বের মতই প্রকাশ করিয়া যাইতেছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের মত আসাম সরকার ১০,০০০ টাকা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালাইবার জন্য সমিতির হাতে অর্পণ করিয়াছেন।

বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের মজুর-নির্য্যাতন

খড়গপুর শ্রমিক সমিতির সম্পাদক তার করিয়া জানাইয়াছেন :—বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের অন্তর্গত শ্রমিক সমিতির খড়্গপুর শাখার একটি জরুরী সভা গত ৭ই নবেম্বর তারিখে হইয়া গিয়াছে। মিঃ বি, এন, সরকার এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। রেল ষ্টেশনের বিভিন্ন বিভাগের প্রায় দশ হাজার কর্ম্মচারী উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। ধোপা, ঝাড়ুদার প্রভৃতিও বাদ পড়ে নাই।

খড়্গপুরের রেলওয়ে শ্রমিকদের প্রধান অভিযোগ এই যে, (১) বি, এন, রেলওয়ের চাকুরীর স্থায়িত্ব নাই। আজ আছে, কাল তাহা চলিয়া যাইতে পারে, (২) মাহিনা অতি অল্প, (৩) পরিদর্শন-কর্ম্মচারিবৃন্দের দুর্ব্ব্যবহার ও অনর্থক নির্য্যাতন অনেক।

এই সমস্ত অভাব-অভিযোগের কথা বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের এজেন্টের নিকট জ্ঞাত করার জন্য একটি ডেপুটেশন প্রেরণ করার কথা স্থির হইয়াছে। তজ্জন্য সমিতি ১৫ দিন সময় নিয়াছেন।

বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় আলোচনা করার জন্য শীঘ্রই উক্ত শ্রমিক সমিতির কেন্দ্রীয় কর্ম্মকরী সমিতির একটি সভা বসিবে। যদি ইতিমধ্যে শ্রমিকদের অভাব অভিযোগগুলি দূরীভূত না হয় তবে একটা বিরাট ধর্ম্মঘটের সম্ভাবনা।

সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে :—

"ষ্টেশন কমিটির কর্ত্তৃপক্ষ বিনা বিচারে এবং আসামী পক্ষের কথা না শুনিয়া নিতান্ত অন্যায় ভাবে কতিপয় চৌকি-দারকে বরখাস্ত করিয়াছেন এবং কয়েকজনকে তাহাদের বাসা হইতে বিতাড়িত করিয়াছেন। বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের শ্রমিক সমিতির এই সভা উপরোক্ত কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন এবং বি, এন, রেলওয়ের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীকে অনুরোধ করিতেছেন যে, তিনি যেন অচিরে এ বিষয়ের তদন্তের বন্দোবস্ত করেন এবং যে পর্য্যন্ত সেই তদন্ত শেষ না হয়, সেই পর্য্যন্ত চৌকীদারগণের প্রতি বাসা পরিত্যাগের আদেশ স্থগিত রাখেন।

১৩ লাখ ৭৩ হাজার টন লোহা ও ইস্পাত

লোহা ও ইস্পাত দু'য়ের পরিমাণ একত্র করিলে ১৯২৫-২৬ সনে টাটা কোম্পানীর মাল তৈয়ারী হইয়াছে ১৩,৬৩,০০০ টন। ১৯২৪-২৫ সনে ১১,৭১,০০০ টন তৈয়ারী হইয়াছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় এই বৎসর উৎপন্ন হইয়াছে ১৯২,০০০ টন (প্রায় দুই লাখ টন) বেশী।

টাটার লাভ প্রায় ৯৯ লাখ টাকা

টাটা কোম্পানীর লোহা ও ইস্পাতের কারবারে ১৯২৬ সনের মার্চ পর্য্যন্ত বর্ষশেষে নিট লাভ দাঁড়াইয়াছে ৯৫ লাখ ৭৫ হাজার ৬৮৫৷৵৫ পাই। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের লভ্যাংশ হইতে জমা ছিল ৩,০৬,৯৪৭৷৷৵১১ পাই। অতএব এই বৎসরের মোট লাভ প্রায় ৯৯ লাখ (৯৮,৭৯,৬৩২ ৸৶৪)।

ব্যবসায় ব্যবহার-জনিত ক্ষতির পরিমাণ

৯৯ লাখ টাকা নগদ লাভ দাঁড়াইয়াছে বটে; কিন্তু তাহা বলিয়া এই সব টাকাই টাটা কোম্পানী নিজেদের ভিতর ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া লইতে ঝুঁকে নাই। সকল কারবারেই "শেষ রক্ষার" কথা ভাবিতে হয়। কারবারটা শেষ পর্য্যন্ত টিঁকিবে কি ফেল মারিবে একমাত্র এই বিষয়ে চিন্তা করাই "শেষ রক্ষা-"সমস্যার অন্তর্গত নয়। কারবারটার ভিতর যে সব যন্ত্রপাতি, মালগুদাম, ইমারত রসদ মশলা আছে এইগুলা প্রতিদিনই ব্যবহারের দরুণ কিছু-না-কিছু ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। এইরূপ ব্যবহার-জনিত ক্ষতি বা লোকসানের জন্য প্রথম দিন হইতেই প্রস্তুত থাকিতে হয়। বাহিরের লোকেরা কারবারের ভিতরকার এই সব কথা বুঝিতে চেষ্টা করে না। কাগজে কলমে ৯৯ লাখ দেখিবা মাত্র মনে হয়, বুঝি বা টাটা কোম্পানী বেশ সচ্ছল ভাবে "হেসে খেলে" কাজ চালাইতেছে। আসল কথা কিছু গুরুতর রকমের। কোম্পানীর চিন্তায় নগদ ৬০ লাখ টাকা "ব্যবহার-জনিত ক্ষয়-প্রাপ্তির" জন্য তুলিয়া রাখা আবশ্যক। অর্থাৎ যন্ত্রপাতি, বাড়ীঘর ইত্যাদি মেরামত করিতে কিম্বা পুনর্গঠিত করিতে হইলে এই পরিমাণ টাকা লাগিতে পারে, কোম্পানীর কর্ত্তারা এইরূপ সমঝিয়াছেন। কাজেই ৯৯ লাখের ৬০ লাখ অস্পৃশ্য। অতএব খাঁটি লাভ বলিলে কোম্পানী বুঝিতেছেন প্রায় ৩৯ লাখ টাকা (৩৮,৭৯,৬৩৮ ৸৶৪)।

"পক্ষপাতমূলক" অংশের মালিক

এই ৩৯ লাখ টাকা বিতড়িত হইতেছে কি রূপে? যে সকল অংশীদের সঙ্গে চুক্তি থাকে যে নিট লাভ দাঁড়াইবা মাত্র তাহাদিগকে কোনো নির্দ্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইবে এবং তাঁহাদিগকে টাকা দিবার পর কিছু বাঁচিলে অন্যান্য অংশীরা লাভের হিস্যা পাইবে, তাঁহাদিগকে "পক্ষপাত-মূলক" অংশের ("প্রেফারেন্স" শেয়ারের) মালিক বলে। টাটা কোম্পানীতে এইরূপ পক্ষপাত-মূলক অংশের মালিক দুই স্বতন্ত্র শ্রেণীর অন্তর্গত। এই দুই শ্রেণীকে লভ্যাংশের নির্দ্দিষ্ট হিস্যা সমঝাইয়া দেওয়া কোম্পানীর প্রথম কর্ত্তব্য। ১৯২৪-২৫ সনের কারবারে কোম্পানীর অবস্থা ছিল খারাপ। সেই বৎসর "প্রেফারেন্স শেয়ার"-ওয়ালারা নিজ নিজ চুক্তি-মাফিক লভ্যাংশ পায় নাই। ১৯২৫-২৬ সনের নিট ৩৯ লাখ হইতে প্রথম শ্রেণীকে দেওয়া হইবে ৯ লাখ আর দ্বিতীয় শ্রেণীকে দেওয়া হইবে ২৬,১৩,৫৮৭৷৷ ৪ পাই।

ইহাতে প্রথম শ্রেণীর লোকেরা ১৯২৪ হইতে ১৯২৬ পর্য্যন্ত দুই বৎসরের পাওনা পুরাপুরিই পাইবে বটে; কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদের পাওনা বাকী থাকিবে প্রচুর। এই শ্রেণীর অংশ-সংখ্যা ৬৯৩,১০৬। চুক্তি অনুসারে এই প্রায় ৭ লাখ অংশের প্রতি অংশে দেওয়া উচিত ২৯৸৪। কিন্তু সম্প্রতি দেওয়া হইতেছে ৩৸৪ পাই মাত্র। যদি দ্বিতীয় শ্রেণীর পক্ষপাতমূলক অংশীদিগকে তাহাদের প্রাপ্য সকল টাকা এখনই সমঝিয়া দিতে হয় তাহা হইলে কোম্পানীর তথা-কথিত লভ্যাংশে কুলায় না।

আগামী বৎসরের জন্য নগদ জমা

কিন্তু আগামী বৎসরের জন্য কিছু নগদ টাকা হাতে রাখিয়া দেওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য। এই বুঝিয়া কোম্পানী ৩,৬৬,০৪৫৸ আনা মজুত রাখিতেছেন। কাজেই যেখানে শেয়ার প্রতি ২৯৸৪ পাই দেওয়া উচিত, সেখানে "নমো নমঃ" করিয়া ৩৸৪ পাই মাত্র দিয়াই কোম্পানী এই বৎসরের মতন খাতা বন্ধ করিতেছেন।

টাটা কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা

পক্ষপাতমূলক শেয়ারগুলাই কোম্পানীর এক মাত্র অংশ নয়। আরও অন্যান্য অংশ বিক্রী হইয়াছে ঢের। তাহারা

(১) "অর্ডিনারি" (বা মামুলি) এবং (২) "ডেফার্ড" (বা পরবর্ত্তী) অংশ নামে বাজারের পারিভাষিকে পরিচিত। প্রেফারেন্স শেয়ারওয়ালারা নিজ নিজ লভ্যাংশ পাইবার পর কিছু বাঁচিলে আগে পাইবে "মামুলি"রা, তাহার পর "পরবর্ত্তী"রা।

এই ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে, পক্ষপাতমূলক শেয়ার-ওয়ালারাই তাহাদের ন্যায্য পাওনা পূরাপুরি পাইল না। সুতরাং মামুলি আর পরবর্ত্তীদের কথা ভাবিবার অবসর কোথায়? অর্থাৎ ১৯২৫-২৬ সনের কারবারের ফলে টাটা কোম্পানী নিজের অংশীদিগকে দস্তুরমাফিক এবং চুক্তি-মাফিক লভ্যাংশ বিতরণ করিতে অসমর্থ।

সরকারী সাহায্য ও টাটা কোম্পানী

১৯২৫ সনের অক্টোবর মাস হইতে ১৯২৭ সনের মার্চ পর্য্যন্ত দেড় বৎসরের জন্য ভারত গবর্মেণ্ট টাটা কোম্পানীকে ৬০ লাখ টাকা নগদ সাহায্য করিতে রাজি হইয়াছেন। ইস্পাত-শিল্পে সংরক্ষণ-নীতি কায়েম করিবার জন্য যে তদন্ত কমিটি বসিয়াছিল তাহার মতে ৯০ লাখ টাকা সাহায্য না পাইলে টাটার অবস্থা শোচনীয় হইবে। কিন্তু গবর্মেণ্ট প্রথম কিস্তিতে ৬০ লাখের বেশী দিতে রাজি হন নাই। এক্ষণে আবার অনুসন্ধান চলিতেছে। আগামী মার্চ মাসে গবর্মেণ্টের তহবিল হইতে টাটাকে আবার কত লাখ টাকা সাহায্য দেওয়া যাইতে পারে তাহার বিচার চলিতেছে।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে,—গবর্মেণ্টের দেওয়া ৬০ লাখ টাকা টাটা কোম্পানী কি বাবদ খরচ করিলেন? প্রথমেই দেখিয়াছি যে, তথাকথিত ৯৯ লাখের ভিতর হইতে ৬০ লাখ "অস্পৃশ্য" ভাবে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে যন্ত্রপাতি ও ঘরবাড়ীর ব্যবহার-জনিত লোকসান সামলাইবার জন্য।

বুঝা যাইতেছে যে, সরকারী ধনভাণ্ডার অর্থাৎ ভারতীয় নরনারীর ট্যাক্স হইতে সাহায্য না পাইলে টাকা কোম্পানী একদম অচল। অতএব টাটা কোম্পানীর শাসন সম্বন্ধে ভারতীয় জনসাধারণের এক্তিয়ার কায়েম হওয়া আবশ্যক।

সংরক্ষণ-নীতি ও স্বরাজ

সংরক্ষণ-নীতির ফলে ভারতের নরনারীকে নানা তরফ হইতে অনেক অর্থকষ্ট সহিতে হইতেছে। কোনো একটা নির্দ্দিষ্ট শিল্প বা ব্যবসাকে নিজ পায়ের উপর দাঁড় করাইবার জন্য এরূপ স্বার্থত্যাগ ট্যাক্সদাতাদের পক্ষে কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়ত বা অনুচিত নয়। কিন্তু সংরক্ষণ-নীতির অপর দিক্‌টাও ভারতের স্বদেশ-সেবকগণের মগজে বসা দরকার। যে যে শিল্পকে বা ব্যবসাকে বাঁচাইবার জন্য ভারতসন্তান নিজের রক্ত দিতে বাধ্য হইতেছে, সেই সকল শিল্প ও ব্যবসার কর্ম্মপরিচালনায় তাহাদের মতামত এবং স্বার্থ রক্ষিত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। স্বরাজ-নীতিকে বাদ দিলে সংরক্ষণ-নীতির আধখানাই মাঠে মারা যাইবে। টাটার উপর কঠোর নজর রাখা প্রত্যেক বিচক্ষণ ভারত-সন্তানের অবশ্য কর্ত্তব্য।

দেশ-শাসনের বিভিন্ন বিভাগে আমরা আত্মকর্তৃত্ব দাবী করিতে অধিকারী একথা আজকাল ভারতের নানা আন্দোলনে মূর্ত্তি পাইয়াছে। টাটা ইত্যাদি সংরক্ষণ-শুল্কের দ্বারা পরিপুষ্ট কারবার সম্বন্ধেও আমরা যে আত্মকর্তৃত্বের দাবী রাখিতে পারি এ কথাটা এখনো ভারতের আবহাওয়ায় ছড়াইয়া পড়ে নাই। কিন্তু কি আর্থিক আন্দোলনের প্রতিনিধি, কি রাষ্ট্রনৈতিক কর্ম্মের প্রতিনিধি প্রত্যেকের পক্ষেই এই দিকে মাথা খেলাইবার "দিন আগত ঐ"।

যুক্তরাষ্ট্রে তুলা-শাসন

মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্রের জর্জ্জিয়া প্রদেশে তুলা জন্মিয়াছিল বিস্তর। বাজারে সবই যথোচিত দামে বেচিবার সুযোগ নাই, এই বুঝিয়া নবেম্বর মাসের প্রথম দিকে আটলান্টা ও অন্যান্য নগরের বেপারীরা তুলা বাজার হইতে তুলিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। প্রায় ৩০০,০০০ বস্তা ভবিষ্যতের সুক্ষণের জন্য সরাইয়া রাখা হইতেছে। প্রায় দুই বৎসর পর্য্যন্ত এই মাল বাজারে ফেলা হইবে না।

একটা বিপুল কেন্দ্রে বস্তাগুলা মজুত রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু তুলা না বেচিলে চাষীরা গৃহস্থালীই বা চালাইবে কোথা হইতে আর আগামী বৎসরের জন্য আবাদই বা চালাইবে কোথা হইতে? চাষীদের মুরুব্বি জুটিয়াছে জর্জ্জিয়া প্রদেশের পাঁচ পাঁচটা বড় বড় ব্যাঙ্ক। ইহারা সকলে মিলিয়া ১ কোটি ২০ লাখ ডলার (তিন কোটি যাট লাখ টাকার চেয়েও বেশী) দিয়া তুলা-ভাণ্ডার সৃষ্টি করিল। এই ভাণ্ডার হইতে চাষীদিগকে সাহায্য করা হইবে। বন্ধক থাকিল তুলার গাঁইট। গবর্মেণ্টের নিকট কোনো প্রকার আবেদন-নিবেদন দরকার হয় নাই।

বিলাতী রংয়ের সঙ্ঘ

"বৃটিশ ডাই-ষ্টাফস কর্পোরেশ্যন" নামক রংয়ের কারবারের সঙ্ঘ এতদিন ম্যাঞ্চেষ্টারে বড় আফিস রাখিয়াছিল। এইবার ব্ল্যাকলে শহরে তাহারা উঠিয়া গেল। ব্ল্যাকলে এবং হাডার্স‌ফীল্ড শহরের কারখানাগুলায় এখন হইতে এই সঙ্ঘ তাহাদের শক্তি কেন্দ্রীভূত করিবে। এই দুই শহর ছাড়া অন্যত্রও তাহাদের ফ্যাক্টরি আছে। এলেসমেয়ার, ক্লেটন এবং টার্ণব্রিজ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ব্ল্যাকলে এবং হাডার্স‌ফীল্ডের উপর নজর বেশী দিলে লাভের সম্ভাবনা বেশী। খরচ কমানো হইতেছে। ফলে কর্পোরেশ্যন পাউণ্ড প্রতি ৫ পেন্স করিয়া দাম কমাইতে পারিয়াছে।

আমেরিকায় জার্ম্মাণ ইস্পাত

জার্ম্মাণ ইস্পাত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করিতেছে প্রচুর পরিমাণে। ওয়াশিংটনের ফেডারাল দরবারের বিশ্বাস,—জার্ম্মাণরা রপ্তানি-বাণিজ্যে সরকারী সাহায্য পাইতেছে। এই জন্যই মার্কিণ বাজারে তাহাদের ইস্পাত মার্কিণ ইস্পাতের সঙ্গে টক্কর দিতে সমর্থ। হেস্ত-নেস্ত করিবার জন্য জার্ম্মাণ-আমেরিকান "কথাবার্ত্তা" সুরু হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রে কত তেল উঠে

প্রতি সপ্তাহে মার্কিণ মুল্লুকে কেরোসিন তেল উঠে প্রায় ২০ লাখ ব্যারেল। এই বৎসরের প্রথম দিকে এক সপ্তাহে উঠিয়াছিল ১,৯০৬,০০০ ব্যারেল। এই হইতেছে বর্ত্তমান বর্ষের সর্ব্বনিম্ন অঙ্ক। কিন্তু মোটের উপর সপ্তাহে ২,০৫৪,০০০, ২,০৩৩,০০০ ইত্যাদি ব্যারেলই সাধারণ কথা।

বিলাতের দুঃসময়

বিলাতে জাহাজ তৈয়ারীর কারবার, লোহালক্কড়, তুলা, রেশম, পশমের শিল্প-কারখানাগুলি অতি কষ্টে কাজ চালাইতেছে। সকল শিল্পেই বেকার বৃদ্ধি পাইতেছে ও অল্প

সময়ের জন্য কারখানাগুলি চালান হইতেছে। চলতি পুঁজি ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণস্বরূপ। টাকা আর পাওয়া যাইতেছে না। মজুরদের মজুরী ও অংশীদারদের লভ্যাংশের বখরা দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। ফলে লোকের কিনিবার ক্ষমতাও কমিয়া যাইতেছে এবং বাধ্য হইয়া কারখানাসমূহ উৎপাদনের হার কমাইয়া ফেলিতেছে।

ইতালির কৃত্রিম রেশম শিল্প

ইতালির বহির্ব্বাণিজ্য-দপ্তর হইতে তাহার শিল্প ব্যবসা বাণিজ্য ও আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে কৃত্রিম রেশম-শিল্পে দুনিয়ার বাজারে ইতালিকে আমেরিকার পরেই স্থান দেওয়া হইয়াছে। ইতালিতে বর্ত্তমানে কৃত্রিম রেশম উৎপাদনের ১৬টি কোম্পানী আছে, ইহার মধ্যে ৭টি ১৯২৫ সনে স্থাপিত এবং তাহাদের মূলধন ১১৭,১৫,৩৮৫ পাউণ্ড। ঐ সকল কারখানায় ৩৫ হাজার শ্রমিক কাজ করে। ইতালির রেশমের বড় খরিদ্দার গ্রেট ব্রিটেন। ইতালির রপ্তানির শতকরা ৩০ ভাগ বিলাতে প্রেরিত হয়।

পশু-পালন জন্য চল্লিশ হাজার পাউণ্ড

লর্ড উলাভিংটন এবৎসরের বিখ্যাত ডার্বি রেস জিতিয়াছেন। তিনি অনেক রেস খেলার ঘোড়ার মালিক। তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে পশু-পালন গবেষণা স্থাপনের নিমিত্ত দশ হাজার পাউণ্ড দান করিয়াছেন। তাঁহার দেখাদেখি আমেরিকার রকাফেলার ইণ্টারন্যাশনাল এডুকেশন বোর্ড ঐ অনুষ্ঠানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে ত্রিশ হাজার পাউণ্ড দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহাদের সর্ত্ত এই যে, ঐ কার্য্যের জন্য ঠিক অতটা পরিমাণ টাকা বিলাত হইতে উঠা চাই।

পুঁজি-সঙ্ঘ

লণ্ডন ও বার্লিনে সংবাদ রটিয়াছে যে, কতকগুলি ইয়োরোপীয়ান ব্যাঙ্ক বিশ কোটী ষ্টার্লিং দিয়া এক বিরাট ফিনান্স ট্রাষ্ট (আর্থিক সংসদ) কায়েম করিবার মতলবে আছেন। এঁদের আসল উদ্দেশ্য ইয়োরোপে বিনিময় সুনির্দ্দিষ্ট করা। আমেরিকাকে এই অনুষ্ঠানে যোগ দিবার জন্য বোধ হয় আমন্ত্রণ করা হইবে। দেখা যাইতেছে যে,—ইস্পাত-সঙ্ঘের পরে এইবার ফিনান্স ট্রাষ্ট বা পুঁজি-সঙ্ঘ করা হইবে। ব্রিটেন, জার্ম্মাণি, আমেরিকা, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, সুইট্‌সারল্যাণ্ড, অষ্ট্রীয়া, চেকো-শ্লোভাকিয়া, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের ব্যাঙ্কের সঙ্গে এ সম্পর্কে খবরাখবর ও কথাবার্ত্তা চালানো হইতেছে।

ছোট বহরের ইয়োরোপীয়ান চাষী

ভারতের মতন ইয়োরোপেও কোথাও কোথাও খুব ছোট ছোট জমির চাষী বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। ডেনমার্কে ৬৮,০০০ জমির টুকরার কথা শুনিতে পাই। প্রত্যেকটা আয়তনে ১¾ একর বা ৪¾ বিঘার চেয়ে ছোট। তিন চার একর অর্থাৎ ১০।১২ বিঘা পরিমাণ জমির সংখ্যা অনেক।

ফরাসী দেশে ২½ একর (৭॥০ বিঘা) পরিমাণ জমির সংখ্যা ২০ লাখেরও বেশী। জার্ম্মাণিতে ১ একর বা ৩ বিঘা বিস্তৃত জমির সংখ্যা ৩০ লাখের কম হইবে না। বিলাতেও ১—৫ একর (৩—১৫ বিঘা) পরিমাণ জমির সংখ্যা ৮১,০০০।

জমির বহরে ইয়োরোপ ও ভারত

এই সকল ছোট ছোট জমি অবশ্য ইয়োরোপের সাধারণ কথা নয়। একমাত্র ঐ পরিমাণ জমির উপর নির্ভর করিয়া কোনো চাষী পরিবার-পালনে সমর্থ নয়। তাহাদিগকে আনুষঙ্গিক ভাবে অন্যান্য কাজ করিতে হয়। আসল কথা বড় বড় জমিই ইয়োরোপের নানা দেশে সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। ফ্রান্সে চাষী প্রতি চষা জমির পরিমাণ গড়পড়তা ১৫.০৫ একর (৪৫.১৫ বিঘা)। জার্ম্মাণিতে সেই গড় ১৯.২৫ একর (৫৭.৭৫ বিঘা) আর বিলাতে ২৬.৯৫ (প্রায় ৭০ বিঘা)। এইখানে মনে রাখা আবশ্যক যে, ভারতের সর্ব্ববৃহৎ জমির টুকরা গড়পড়তা ১২.১৫ একর (প্রায় ৩৬॥০ বিঘা)। এই কথা একমাত্র বোম্বাই প্রদেশ সম্বন্ধে খাটে।

জীবনযাত্রা-প্রণালী ও জমির বহর

ছোট বড় মাঝারি বহরের জমি কাহাকে বলে? এক মাত্র বিঘা কাঠা মাপিয়া জমির আসল বহর মাপা সম্ভব নয়। এই জন্য মাটির গুণ, জলসেচের সুযোগ-দুর্যোগ, বাজারের দূরত্ব ইত্যাদি নানা কথা জানা আবশ্যক। আসল কথা হইতেছে, জমি হইতে উৎপন্ন ফসলের জোরে একটা পাঁচমুখ-ওয়ালা পরিবার "সুখে-স্বচ্ছন্দে" বসবাস করিতে পারে কি না? যে পরিমাণ জমি এই পরীক্ষায় পাশ হইবে তাহাকেই বলা হইবে "ছোট্ট" বা চলনসই; তাহার মাপ গজ-কাঠির লম্বা-চৌড়াতে যতই হউক না কেন। কোনো জমির টুকরা হইতে উৎপন্ন ফসলের জোরে "জীবনযাত্রা"র জন্য দরকারের চেয়ে যদি বেশী উৎপন্ন হয় তাহা হইলে সেই টুকরাকে বলা হইবে মাঝারি,—ইত্যাদি।

পাশ্চাত্য "পারিবারিক আবাদ"

মনে রাখা দরকার যে, পরিবারের সকলেই,—স্ত্রী-পুরুষ বালকবালিকা,—ক্ষেত্রে কাজ করিতেছে। প্রয়োজন হইলে দু'একজন মজুর আল্‌গা বাহাল করা হয়। আর, পরিবারের এই সমবেত মেহনতে (সকল প্রকার ট্যাক্স বাদে) যা-কিছু উৎপন্ন হয় তাহার দ্বারাই পরিবারের ভরণ-পোষণ চলিতেছে। পাশ্চাত্য সমাজে প্রচলিত ছোট্ট বা "চলন-সই" আবাদকে এই কারণে সহজে "পারিবারিক আবাদ"ও বলা হইয়া থাকে।

বিলাতে ১২ বিঘা চলন-সই

বিলাতে যে সকল চাষীরা শাক-সব্জীর চাষ করে, তাহাদের যদি ৪ একর (১২ বিঘা) জমি থাকে তাহা হইলে সাধারণতঃ "সুখে স্বচ্ছন্দে" তাহাদের চলিয়া যায়। মুরগী পোষা যাদের ব্যবসা তারাও কম সে কম ১২ বিঘার কমে সংসার চালাইতে পারে না। অবশ্য শাকসব্জী আর মুর্গীর ব্যবসা দুই-ই এক সঙ্গে চলিয়া থাকে।

ইংরেজ গোআলার দরকার কম সে কম ৭৫ বিঘা

কিন্তু ইংরেজ গোআলারা ১২ বিঘা জমিকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করে। জীবনযাত্রার পক্ষে এই পরিমাণ জমি কিছুই নয়। দুধের ব্যবসা যে সকল গোআলা চালায় তাহাদের দরকার কম সে কম ২৫ একর (৭৫ বিঘা) জমি। গো-সেবা কাহাকে বলে বাঙালীর শিখিতে হইবে গো-খাদক ইংরেজের নিকট হইতে। ধর্ম্ম বা আধ্যাত্মিকতার কথা এখানে নাই। আর্থিক হিসাবে গোচারণের মাঠ একটা অতি বড় বস্তু।

বিলাতী মাপে ২১০ বিঘার আবাদ "ছোট্ট"

দেখা যাইতেছে যে, বিলাতের লোকেরা এক ব্যবসার জন্য ১২ বিঘা জমিকে বলে ছোট্ট বা চলন-সই। কিন্তু অন্য এক ব্যবসার জন্য ৭৫ বিঘা জমি চলন-সই মাত্র। আর চাষ-আবাদের জন্য তাহাদের ধারণা আরও গুরুতর।

এতদিন পর্য্যন্ত ইংরেজেরা বিবেচনা করিত যে, ৫০ একর (১৫০ বিঘা) জমি না হইলে কোনো পাঁচ-মাথাওয়ালা পরিবারের চলিতে পারে না। আজকাল তাহাদের নজর চড়িয়াছে। এক্ষণে কম-সে-কম ৭০ একর (২১০ বিঘা) জমি হইতেছে আবাদী-চাষীর পক্ষে চলন-সই মাত্র। এইরূপ "ছোট্ট" এক এক টুকরা জমি চাষী মহলে ছড়াইবার জন্য ইংরেজ গবর্মেন্ট উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।

ফরাসী ও জার্ম্মাণ মাপের ছোট্ট জমি

ফ্রান্সে যে সকল চাষীরা আঙুর চাষ এবং হ্বাঁ্য (আঙুরের মদ) তৈয়ারী করে তাহারা ৫ একর (১৫ বিঘা) জমি পাইলেই সন্তুষ্ট। পনর বিঘা হইল পারিবারিক আঙুর আবাদের নিম্ন সীমানা। এই পরিমাণের কমে তাহাদের পরিবার-পালন করা চলে না। যাহাদের বেশী আছে তাহারা বেশ সচ্ছল অবস্থার লোক।

জার্ম্মাণ চাষীরা "পারিবারিক আবাদ" বলিলে সাধারণতঃ ৫০ একর (১৫০ বিঘা) বুঝিয়া থাকে। কোথাও কোথাও কমেও চলে। এই জমিতে সকল প্রকার শস্যের চাষই চালানো যাইতে পারে।

জমির বহর অনুসারে ফসলের প্রভেদ

দেখা যাইতেছে যে,—ইয়োরোপের চাষীরা জমির বহর অনুসারে ফসল বদলাইতে অভ্যস্ত। ছোট-বড়-মাঝারি

সকল আয়তনের জমিতেই প্রত্যেক চাষী গম, বার্লি, যব ইত্যাদি খাদ্য-শস্য বুনে না। যে জমিতে যে জিনিষ বুনিলে বাজারে ফসল বেচিয়া বেশী লাভ করিবার সম্ভাবনা তাহারা সেই জিনিষ বুনিতেই অভ্যস্ত। ছোট ছোট জমিতে এই কারণে শাকসব্জী, ফলমূল ইত্যাদির রেওয়াজ। তামাক, বীট, আঙুর ইত্যাদির যেটা যেখানে খাপ খায় সেইটা সেইখানে লাগাইয়া দিতে ইহারা অভ্যস্ত।

আন্তর্জ্জাতিক লৌহসঙ্ঘ

বেলজিয়ামের ব্রুসেলস্ নগরে আন্তর্জ্জাতিক লৌহ-সঙ্ঘ কায়েম হইল (অক্টোবর ১৯২৬)। এই সঙ্ঘের মেয়াদ সম্প্রতি ৫ বৎসর। যে ধরণের সঙ্ঘের সূত্রপাত হইল তাহাকে পাশ্চাত্য পারিভাষিকে "ট্রাষ্ট" অথবা "কার্টেল" বলে।

"কার্টেলের" ভিতর আছেন চার জাত,—জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, বেলজিয়াম এবং লুকসেম্বুর্গ। এ এক বিপুল "সমূহ" বা সঙ্ঘ-সমুত্থান"। ২ কোটি ৫০ লক্ষ টন ইস্পাত ফী বৎসর এই কার্টেলের তাঁবে নিয়ন্ত্রিত হইবে। এই সঙ্ঘের ইস্পাত-সৃষ্টি-শক্তি আরও বেশী। ৩ কোটি টন পর্য্যন্ত তৈয়ারী হইবার কথা। আর এই হিমালয়-প্রমাণ লোহার চাপের কিম্মৎ কম সে কম ৩ মিলিয়ার্ড মার্ক। এই অঙ্কটা শূন্য দিয়া লিখিলে দেখায় নিম্নরূপ—৩,০০০,০০০,০০০,০০০। এক মার্কে বার আনা।

ইস্পাত-সৃষ্টির সমঝৌতা

এই সঙ্ঘটা ইস্পাত-লোহার বাজার-দর নির্দ্ধারণ করিবার জন্য কায়েম হইল এইরূপ বুঝিতে হইবে না। ইহার আসল উদ্দেশ্য ইয়োরোপের কারখানাগুলার লোহা সৃষ্টি করিবার শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করা। ইস্পাত-লোহার পরিমাণটাই এই সঙ্ঘের সমঝৌতায় কড়াক্কড়ি ভাবে শৃঙ্খলীকৃত হইতে চলিল।

বর্ত্তমানে এই কয় দেশে যত মাল উৎপন্ন হইতেছে নিম্নের তালিকায় তাহার বিবরণ দিতেছি। ১৯২৬ সনে এপ্রিল—জুলাই এই চার মাসের তথ্য সঙ্কলিত হইতেছে। প্রথমে দেখানো যাইতেছে লোহার হিসাব। দ্বিতীয় তালিকায় আছে ইস্পাতের পরিমাণ।

লোহা তৈয়ারী হইয়াছে

১৯২৬	জার্ম্মাণিতে	ফ্রান্সে	বেলজিয়ামে	লুকসেম্বুর্গে	
এপ্রিল	৬৬৮,০০০	৭৬৮,০০০	২৮৮,০০০	১৯৭,০০৯	টন
মে	৭৩৬,০০০	৭৮৩,০০০	৩০০,০০০	১৯৫,০০০	"
জুন	৭২০,০০০	৭৭৮,০০০	২৯৫,০০০	২১১,০০০	"
জুলাই	৭৬৮,০০০	৭৯২,০০০	৩০৭,০০০	২১১,০০০	"

ইস্পাত তৈয়ারী হইয়াছে

১৯২৬	জার্ম্মাণিতে	ফ্রান্সে	বেলজিয়ামে	লুকসেম্বুর্গে
এপ্রিল	৮৬৭,০০০	৬৮৩,০০০	২৬৮,০০০	১৮১,০০০
মে	৯০০,০০০	৬৬৭,০০০	২৭২,০০০	১৭০,০০০
জুন	৯৭৭,০০০	৬৯৪,০০০	২৯৮,০০০	১৯০,০০০
জুলাই	১,০২২:০০	৭১৮,০০০	২৯৬,০০০	১৯২,০০০

ইয়োরোপ বনাম ইংলাণ্ড

জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, বেলজিয়াম এবং লুকসেম্বুর্গের সঙ্ঘে ইয়োরোপের অন্যান্য লোহা-ইস্পাতওয়ালা দেশ মাথা গুঁজিবার চেষ্টা করিতেছে। অষ্ট্রীয়া, চেকো-শ্লোভাকিয়া, রুমেনিয়া এবং হাঙ্গারি এই চার দেশের কারবারীদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চলিতেছে। বাহিরে থাকিতেছে কেবল ইংল্যাণ্ড তথা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র। বাজারে গুজব, ইংল্যাণ্ডের কারবারের সঙ্গে টক্কর দিবার জন্যই ইয়োরোপের এই সাজগোজ। জার্ম্মাণির কোনো কোনো শিল্প-পতি কিন্তু ইংল্যাণ্ডকেও দলের ভিতর ভিড়াইতে প্রয়াসী। তাহা হইলে লৌহ-সংগ্রাম চলিবে,—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বনাম ইয়োরোপ। এ কথাটা জানিয়া রাখা দরকার যে, যুক্তরাষ্ট্র একাই দুনিয়ার অর্দ্ধেকের চেয়ে বেশী ইস্পাত প্রস্তুত করে।

ফরাসী আইনে আর্থিক ব্যবস্থা

মানুষের আর্থিক সুখদুঃখের সঙ্গে আইন-কানুনের যোগাযোগ অতি নিবিড়। মাস মাস ফ্রান্সে যে-সকল আইন

জারি হয় তাহার তালিকা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। বিগত জুন মাসে ২৩টা আইন জারি হইয়াছে। একটার দ্বারা দিয়াশলাইয়ের কারখানায় মারাত্মক হলদে ফস্‌ফেট ব্যবহার করা তুলিয়া দেওয়া হইল। এই বিষয়ে একটা আন্তর্জ্জাতিক সমঝৌতা ছিল। এতদিনে ফ্রান্স কাগজে কলমে সেই সমঝৌতা স্বীকার করিল। পেট্রোলিয়ম তেল সম্বন্ধে একটা আইন জারি হইয়াছে। বিজ্ঞাপনের উপর কর বসাইবার জন্য প্যারিস শহরকে একতিয়ার দেওয়া হইল একটা আইনের দ্বারা। ফ্রান্স, বেলজিয়াম এবং গ্রেট বৃটেনের সঙ্গে উড়ো জাহাজের চলাচল লইয়া একটা বুঝা-পড়া সহি হইয়াছিল মে মাসে। সেই সঙ্গে সঙ্গে আকাশপথে মাল আমদানি-রপ্তানির নিয়মও স্থিরীকৃত হয়। এক্ষণে এই দুই বিষয়ে ফরাসী গবর্মেণ্ট এক আইন জারি করিলেন। বিভিন্ন উপনিবেশ সম্বন্ধে ৪টা আইন জারি হইয়াছে। বিলাসের সামগ্রী কাহাকে বলা হইবে তাহার ব্যবস্থা করা এক আইনের উদ্দেশ্য। রপ্তানির উপর কর ধার্য্য করা হইয়াছে এক আইনের সাহায্যে। গবর্মেণ্ট কোনো কোনো কোম্পানীকে অ্যালকহল তৈয়ারী করিবার একতিয়ার বিক্রী করিয়াছেন। তাহার দর-দস্তুর নির্দ্ধারিত হইয়াছে এক আইনে। ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় ৮ ঘণ্টার রোজ কায়েম করা এক আইনের উদ্দেশ্য।

ফ্রান্সে কৃষি দৈব কানুন

শিল্প-কারখানার কাজ করিতে করিতে দৈবক্রমে মজুরদের কোনো অনিষ্ট ঘটিলে তাহাদের স্বার্থরক্ষা করিবার জন্য অন্যান্য উন্নত দেশের মতন ফ্রান্সেও আইন আছে। কিন্তু কৃষি-ক্ষেত্রের মজুরদের জন্য "দৈব" কানুন ছিল না। ১৯২২ সনের শেষের দিকে কৃষি-মজুরদের জন্যও দৈব-কানুন জারি হয়। সম্প্রতি,—১৯২৬ মে মাসে,—সেই কানুনের কতকগুলা অসম্পূর্ণতা সংশোধিত করা হইয়াছে। কোনো কোনো বিষয়ে আইনটা অস্পষ্ট ছিল। কোনো কোনো দফার পরিবর্ত্তনও আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। সকল দিক্ দেখিয়া শুনিয়া একটা নতুন কৃষি-দৈব কানুন জারি করা হইল।

আর্থিক জীবন বিষয়ক ফরাসী আইন

বিগত মে মাসের ভিতর ফ্রান্সে ১৩টা বিভিন্ন আইন জারি হইয়াছে। এইগুলার ভিতর ৫টা আলজিরিয়া প্রদেশ সম্বন্ধে। আলজিরিয়া আফ্রিকায় অবস্থিত বটে। কিন্তু ফরাসীরা এই প্রদেশকে "কলোনি" বা উপনিবেশ বিবেচনা করে না। ফ্রান্সেরই একটা জেলা রূপে আলজিরিয়ার শাসন চলিয়া থাকে। খাঁটি উপনিবেশ-বিষয়ক আইন ছিল ২টা। মজুরদের স্বার্থে আইন জারি হইয়াছে ২টা। দুইটা আইন রাজস্ব-বিষয়ক। ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে কর আদায় করিবার কর্ম্মপ্রণালী এক আইনের বিষয়। আলজিরিয়ায় বিদেশীদের অস্থাবর সম্পত্তির উপর কর বসানো অন্য আইনের উদ্দেশ্য। খুচরা দোকানদারদিগকে ৮ ঘণ্টার রোজ পালন করিতে বাধ্য করা হইয়াছে তৃতীয় আইনের সাহায্যে। খাদ্যদ্রব্যের বিক্রেতারা এই আইনের আওতায় আসে না। খনির কাজে যে সব মজুর বাহাল আছে মালিকদিগকে তাহাদের আপদবিপদে আশ্রয়-সাহায্য জোগাইতে বাধ্য করা হইয়াছে অন্য এক আইনের জোরে।

ফরাসী পার্ল্যামেণ্টের কাজকর্ম্ম

বড় বড় দেশের লোকেরা পার্ল্যামেণ্টে বসিয়া কোন্ কোন্ বিষয় আলোচনা করে তাহার হিসাব রাখা আমাদের পক্ষে মন্দ নয়। ফরাসী "শাঁবর দে দেপুতে" (পার্ল্যামেণ্টের) দুই মাসের কার্য্য-বিবরণী হইতে তাহার কিছু-কিছু মালুম হইবে। ১৯২৬ সনের মে-জুন মাসে শাঁবরের প্রতিনিধিদিগকে নিম্নলিখিত বিষয়ে মাথা ঘামাইতে হইয়াছে। (১) অস্থায়ী কর্জ্জগুলাকে স্থায়ী কর্জ্জে পরিণত করা ছিল তাঁহাদের এক ধান্ধা। (২) মজুরদের দৈব আলোচনা করা আর তাহার প্রতীকারকল্পে চিকিৎসার এবং ওষুধপত্রের খরচ জোগানো আর এক ধান্ধা। তাহা ছাড়া, (৩) পেট্রোলিয়ম তেলের উৎপত্তি ও বিক্রয় সম্বন্ধে শাসন, (৪) নাইট্রোজেন তৈয়ারী করিবার কারখানা সম্বন্ধে আইন জারি করিবার ব্যবস্থা, (৫) গরিবদের জন্য সস্তায় ঘরবাড়ী তৈয়ারী করা, (৬) চাস-আবাদের মজুরদের সঙ্ঘ-বদ্ধভাবে চুক্তি চালাইবার

ক্ষমতা, (৭) সওদাগরি জাহাজে বিদেশী মজুর নিয়োগ, (৮) বার্দ্ধক্য-বীমা, (৯) ব্যাধি-বীমা, (১০) বিদেশী মালের প্রভাব হইতে দেশের বাজারকে রক্ষা করা, (১১) কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ক সঙ্ঘ, (১২) রাজস্বে সমতা-বিধানের ব্যবস্থা, (১৩) মুদ্রার মূল্যে স্থিরতাসাধন, (১৪) নূতন নূতন সরকারী আয়ের পথ আবিষ্কার, (১৪) কারখানায় কাজ করিতে করিতে মজুরদের অনিষ্ট ঘটিলে তাহার জন্য দায়িত্ব কাহার? (১৬) পশ্চিম আফ্রিকার ফরাসী ব্যাঙ্ক, (১৬) খনির মজুর, (১৭) পারস্পরিক সাহায্য-সঙ্ঘ নামক সমবায়-নিয়ন্ত্রিত সমিতির কার্য্য-প্রণালী ইত্যাদি বিষয়ে ফরাসী পার্ল্যামেণ্টে বাক্-বিতণ্ডা চলিতেছে। দেখা যাইতেছে, আর্থিক জীবন লইয়া মাতামাতি করা শাঁবরের সভ্যদের প্রধান কাজ।

যবদ্বীপে বোল্‌শেভিকী

জাভায় বোলশেভিক আন্দোলন মাথা তুলিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই কমীউনিষ্ট দলের লোকেরা এই দ্বীপের মুসলমান-সমাজে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিল। জের আজও চলিতেছে। চিনির ক্ষেতের কুলীরা অনেকে এক্ষণে ধনসাম্যপন্থী। মাঝে মাঝে গণ্ডগোল ঘটিয়া থাকে।

বিদ্রোহ-লুটপাটের সম্ভাবনাও নাকি যথেষ্ট। এই জন্য এই সকল দ্বীপের ওলন্দাজ লাটসাহেব ২০টা চিনির ক্ষেতের বড় বড় কর্ম্মচারীদিগকে সশস্ত্র থাকিবার হুকুম দিয়াছেন। সোয়েরা কর্ত্তা জনপদে বোলশেভিক মিছিল বাহির হয়। এই সম্পর্কে ১৫।২০ জন মাতব্বরকে পাকড়াও করা হইয়াছে।

ইতালির আমদানি বেশী রপ্তানি কম

১৯২৬ সনের প্রথম ছয় মাসের হিসাবে দেখিতেছি যে, ইতালি বিদেশে কিনিয়া থাকে বেশী আর বেচে কম। ১৪,৩৫৭,০০০,০০০ লিয়ারের মাল ছিল আমদানি, আর রপ্তানি ছিল ৮,২৭১,০০০,০০০ লি। অর্থাৎ ৬,০৮৬,০০০,০০০ লিয়ার ইতালির বিদেশের নিকট ঋণ ছিল। তবে বিদেশী পর্য্যটকেরা ইতালিতে বেড়াইতে আসিয়া অনেক বিদেশী টাকা ইতালিতে খরচ করিয়াছে। তাহাতে ইতালির পাওনার ঘর পুরু হইয়াছে। কাজেই দেনা অনেকটা কমিয়াছে।

১৯২৫ সনের প্রথম ছয় মাসেও ইতালির বহির্ব্বাণিজ্যের ধরণ-ধারণ এইরূপ। ইতালি কিনিয়াছিল বেশী, বেচিয়াছিল কম। সেই বৎসর ইতালির বাণিজ্যিক দেনা ছিল ৫,৮৩৭,০০০,০০০ লিয়ার।

ইতালিয়ান বহির্ব্বাণিজ্যের বিশেষত্ব

এই সঙ্গে আর একটা কথা মনে রাখা দরকার। ইতালিয়ানরা এই বৎসর বিদেশী মাল পরিমাণে বেশী কিনে নাই। বিদেশী মালের দাম বাড়িয়াছে। এই জন্য আমদানির হিসাবে লিয়ারের পরিমাণ চড়িয়াছে। অপর দিকে ইতালিয়ানরা যে সব মাল বিদেশে বেচিয়াছে সেই সব মালের দাম নামিয়া গিয়াছে। কাজেই ইতালিয়ানরা স্বদেশী মাল বেশী পরিমাণে বিদেশে পাঠাইয়াও কম টাকা পাইয়াছে। ১৯২৫ সনে ইতালির কৃত্রিম রেশম বিদেশে গিয়াছিল ২১১,৩০০,০০০ লি। এই বৎসর তাহার ঠাঁইয়ে দেখিতেছি ১৬৩,০০০,০০০ লি। অথচ পরিমাণ হিসাবে ইতালি এই বৎসর বিদেশে বেচিয়াছে ৩,৭২৬,০০০ কিলো কৃত্রিম রেশম। পূর্ব্ব বৎসর বেচিয়াছিল ৩,৫৯১,০০০ কিলো মাত্র।

দেশী
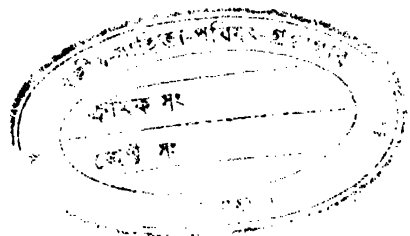
জার্ম্মাণ বিদ্যুৎ এঞ্জিনিয়ার ভারতে

জার্ম্মাণির এক সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যুৎ-এঞ্জিনিয়ার ডক্‌টর ওস্কার ফোন মিলার আগামী জানুয়ারি মাসে ভারতে আসিতেছেন। জার্ম্মাণির "নর্ড-ডয়চার লয়েড" নামক জাহাজ-কোম্পানী তাঁহাকে জাভা, সুমাত্রা ইত্যাদি দ্বীপপুঞ্জে এবং ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য পাঠাইতেছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক সকল প্রকার তথ্য-সংগ্রহ তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রধান ভাবে জল-শক্তি এবং বৈদ্যুতিক কারবারের বর্ত্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ ক্রম-বিকাশের সুযোগ সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্যই তিনি এই পর্য্যটনে বাহির হইবেন।

ওস্কার ফোন মিলারের কীর্ত্তি

ওস্কার ফোন মিলার জার্ম্মাণির উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম প্রান্তে বহুসংখ্যক বৈদ্যুতিক কারখানা গড়িয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে গিয়া শ্রীযুক্ত কার্ক্‌শিট্ বলিতেছেন,—"জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের কৃতি-শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের মধ্যে ওস্কার ফোন মিলার অন্যতম।" জার্ম্মাণির টেক্‌নিক্যাল শিল্প-ঘটিত কারবারে তাঁহার যশ আজকাল একরূপ অদ্বিতীয় বলা যাইতে পারে। মিউনিখের "ডয়চেস মুজেয়ুম" নামক মিউজিয়াম বা সংগ্রহালয় গঠন করিয়া তিনি বাস্তবিক পক্ষে একটা বিশ্বকীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, এঞ্জিনিয়ারিং, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ঘটিত অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান মান্ধাতার আমল হইতে আজ পর্য্যন্ত যে-সকল যুগের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়াছে সেই সকল যুগের পারম্পর্য্য প্রদর্শন করা ওই মিউজিয়ামের উদ্দেশ্য। এত বড় বৈজ্ঞানিক এবং টেক্‌নিক্যাল সংগ্রহালয় জগতের আর কোথায়ও নাই।

"বৃহত্তর ভারত"-পরিষৎ

কলিকাতায় "বৃহত্তর ভারত"-পরিষৎ নামক এক পণ্ডিত সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মধ্য এশিয়ায়, চীনে, জাপানে, ইন্দো-চীনে, আনামে, শ্যামে এবং জাভা, সুমাত্রা ইত্যাদি দ্বীপসমূহে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার যে সকল নিদর্শন পাওয়া যায় সেই সম্বন্ধে ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, নৃতাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য আলোচনা চালানো এই পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য। আফগানিস্থান, পারশ্য এবং প্রাচ্য এশিয়ার অন্যান্য জনপদেও বৃহত্তর ভারতের চিহ্ন ঢুঁড়িয়া বাহির করিবার দিকে এবং সেই সম্বন্ধে গবেষণা চালাইবার দিকে এই পরিষদের লক্ষ্য থাকিবে।

পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার। উদ্যোক্তাদের নাম কালিদাস নাগ, বিনয়কুমার সরকার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ খৈতান, বেণীমাধব বড়ুয়া ইত্যাদি। পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে আছেন পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বিধুশেখর শাস্ত্রী, মদনমোহন মালবীয়, যুগলকিশোর বিড়লা, রাজা হৃষীকেশ লাহা ইত্যাদি ব্যক্তিগণ। কর্ম্মকেন্দ্রের ঠিকানা ৯১ আপার সার্কুলার রোড কলিকাতা। কর্ম্মকর্ত্তা কালিদাস নাগ।

প্রাচীন ভারতের আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য

প্রাচীন ভারতের নরনারী সেকালের দুনিয়ায় যে সকল আন্তর্জ্জাতিক লেন-দেন চালাইয়াছে তাহার কিছুই বৃহত্তর ভারত-পরিষদের আলোচনায় গবেষণায় বাদ পড়িবে না।

বহির্ব্বাণিজ্য ছিল একালেরই মতন সেকালেও ভারতীয় ব্যবসায়ীদের অন্যতম আর্থিক কর্ম্ম। এই কর্ম্মকাণ্ডের সঙ্গে যাতায়াতের কথা, যানবাহনের কথা, কৃষি-শিল্পের কথা, মাল আমদানি-রপ্তানির কথা, পথঘাটের কথা, বলদ গাধা নৌকা গাড়ী জাহাজের কথা সবই অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বদ্ধ। প্রাচীন ভারতীয় আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের সকল তথ্যই এই পরিষদে আলোচিত হইতে পারিবে। কাজে ধনবিজ্ঞান-সেবীদের পক্ষে এই পরিষদের কার্য্যাবলী অনেক তরফ হইতেই কাজে লাগিবার কথা।

উপনিবেশের প্রবাসী ভারত

প্রত্নতত্ত্ব অর্থাৎ সেকেলে ভারত-সন্তানের জীবন দুনিয়ার দিকে দিকে কতখানি দিগ্বিজয় করিয়াছিল তাহার চৌহদ্দি জরীপ করাই এই পরিষদের একমাত্র লক্ষ্য নয়। বর্ত্তমান ভারতের নরনারী অষ্ট্রেলিয়ায়, নিউজীল্যাণ্ড ফিজিদ্বীপে ক্যানাডায়, দক্ষিণ আফ্রিকায়, পূর্ব্ব আফ্রিকায়, ট্রিনিডাড ইত্যাদি মধ্য আমেরিকার দ্বীপসমূহে এবং মরিশাস ইত্যাদি আফ্রিকার উপকূলস্থ দ্বীপে, "উপনিবেশে" "উপনিবেশে"—কেহ কেহ বা দুই তিন পুরুষ ধরিয়া কেহ কেহ বা কয়েক দশক ধরিয়া বসবাস করিতেছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন উপনিবেশে এবং ফরাসী ও ওলন্দাজ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত জনপদে বর্ত্তমান কালে এই উপায়ে একটা বৃহত্তর ভারত গড়িয়া উঠিয়াছে। এই প্রবাসী ভারতের জীবনযাত্রা, আর্থিক লেন-দেন, শিক্ষাদীক্ষা এবং সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির অবস্থা বুঝিবার জন্যও এই পরিষদে চেষ্টা চলিবে। "উপনিবেশ-সমস্যা" যুবক ভারতে উপস্থিত হইয়াছে। তাহা বুঝিবার প্রয়াসও এই পরিষদে কিছু কিছু অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে।

বৃহত্তর ভারতের একাল সেকাল

আফগানিস্থান, মধ্য এশিয়া, চীন, জাপান, শ্যাম, আসাম ইত্যাদি দেশের প্রাচীন বৃহত্তর ভারতের বর্ত্তমান অবস্থাও এই সকল নবীন বৃহত্তর ভারতের জীবন-কথার সঙ্গে সঙ্গে আলোচিত হইবে। ইহাতে ভারতবর্ষের সঙ্গে এই সকল 'প্রবাসী' ভারত-সন্তানের আত্মিক যোগাযোগ কায়েম হইতে থাকিবে।

এতগুলা কাজ কোনো এক পরিষদের উদ্যোগে সুসিদ্ধ হইতে পারিবে কি না জানি না। কিন্তু বৃহত্তর ভারতের একাল-সেকালকে উপেক্ষা করিয়া চলিতে যুবক ভারত আর রাজি নয়। এই পরিষদের প্রতিষ্ঠায় আমরা এইরূপই বুঝিতেছি।

রেলমজুরদের ইউনিয়নে বক্তৃতা

কিছু দিন হইল বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের মজুর ইউনিয়নের গার্ডেনরীচ (কলিকাতা) শাখায় একটা বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। বেঙ্গল সোশ্যাল সার্ভিস লীগের একজন বক্তা স্বাস্থ্য-রক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বেরি-বেরি নিবারণের উপায় সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে ছবি দেখানো হইয়াছিল। নিরক্ষর মজুরদের অনেকে উপস্থিত ছিল।

ভারতীয় বাণিজ্য-মহাসভা

আগামী ৩০শে ও ৩১শে ডিসেম্বর ১৯২৬ সন এবং ১লা জানুয়ারী ১৯২৭ সন নিখিল ভারত বাণিজ্য ও শ্রমিক মহাসভার অধিবেশন হইবে। অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং শ্রীযুত ঘনশ্যাম দাশ বিড়লা সভাপতি হইয়াছেন।

দিনাজপুরে ডাককর্ম্মীদের সভা

দিনাজপুরে একটা জনসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভায় ডাক-কর্ম্মচারিগণ অনেকেই সমবেত হইয়াছিলেন। ত্রিচিনোপল্লীর পার্থসারথী আয়েঙ্গার নিখিল ভারত ডাক কর্ম্মচারী সমিতি প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা বর্ণনা করেন। এবং বাবু তারাপদ মুখার্জ্জি প্রতিষ্ঠিত আন্দোলনের ইতিহাস বর্ণনা করেন। বক্তা বলেন, "সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে হইলে এবং নিজেদের অভাব-অভিযোগ দূর করিতে হইলে সঙ্ঘশক্তিকেই সম্বল করিয়া লইতে হইবে। ডাক কর্ম্মচারীদের পক্ষে ইহা বড়ই কলঙ্কের কথা যে, ৩৫,০০০ ডাককর্ম্মচারীর মধ্যে মাত্র ১৫,০০০ জন অদ্যাবধি সমিতির সদস্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন"। বক্তা কর্ম্মচারীদিগকে অবিলম্বে সমিতিতে যোগদান করিতে অনুরোধ করেন।

বক্তা বলেন, "সরকারকে চাপ দিয়া বেতন বৃদ্ধি করাই আমাদের অভিপ্রায় নহে, আমাদের নিজেদের মধ্যে একটা সখ্য-ভাব সৃষ্টি করাও আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য।

আর্থিক পঞ্জাব সম্বন্ধে বড়লাট

বড়লাট সম্প্রতি লাহোর দরবারে পঞ্জাবের কৃষি-বিষয়ক উন্নতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "পঞ্জাবের কতিপয় উপনিবেশে খাল খনন প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ হইতে আর বাকী নাই। ইহার ফলে বৃটিশ ভারতে আরও ১০ লক্ষ একর জমিতে খাল খনন করা হইবে। রেলওয়ে লাইন দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। বর্ত্তমান বৎসরে আরও কম সে কম ছয়টা ব্যাপারে হাত দেওয়া গিয়াছে। যাতায়াতের রাস্তা পথঘাটের দিকেও নজর দেওয়া হইয়াছে। বিরাট হাইড্রো ইলেক্ট্রিক জল-শক্তির বিদ্যুৎ-কারখানা স্থাপনের ফলে এ প্রদেশের শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি আশা করা যায়। গত ছয় বৎসরের মধ্যে পঞ্জাবে যেরূপ শিক্ষার বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে তাহার তুলনা ইহার অতীত ইতিহাসে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তা ছাড়া, ইহার কোঅপারেটিভ ক্রেডিট (সমবায় ঋণদান) ও ব্যাঙ্ক আন্দোলন গোটা ভারতের মধ্যে সেরা স্থান দখল করিয়া বসিয়াছে। পঞ্জাবের আর্থিক অবস্থা দিন দিন উন্নতির দিকে যাওয়ার দরুণ মন্ত্রিগণ মেডিক্যাল রিলিফ ও অন্যান্য স্বাস্থ্যোন্নতি-বিষয়ক কার্য্যে হাত দিতে পারিয়াছে।"

লর্ড আরুইনের কৃষি-বক্তৃতা

"আপনারা জানেন কৃষির প্রতি আমি ব্যক্তিগতভাবে আগ্রহসম্পন্ন। প্রকৃতিদেবী আপনাদিগকে উদার হস্তে সম্পদ্ দান করিয়াছেন; আপনাদের বিশাল পর্ব্বতমালায় প্রকৃতি-প্রদত্ত তুষার এবং বরফের আকারে জলরাশি সঞ্চিত আছে। আপনাদের সমতল ভূমির মাটী প্রকৃতির রসে আপনা হইতেই উর্ব্বর। আপনাদের দেশের উত্তাপ বেশী। এই গরম মানুষের পক্ষে অনেক সময় কষ্টকর হইলেও ভূমির রাসায়নিক পরিবর্ত্তন-সাধনে ইহার কার্য্যকারিতা অসামান্য। উদ্ভিদের জীবন-ধারণের পক্ষে যা-কিছু দরকার সবই আপনাদের দেশের উর্ব্বর ভূমিতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। এইজন্য আপনারা বৎসরের পর বৎসর কৃত্রিম সাহায্য বিনা শস্য উৎপাদন করিয়া আসিতেছেন। ইংলণ্ড বা অন্যান্য দেশ হইতে এমনটি সম্ভব হইত না।

"বিজ্ঞান সম্প্রতি জগৎকে অনেক নতুন নতুন তথ্য শিক্ষা দিয়াছে। হয়ত পঞ্জাবের কৃষকগণ এটাকে ততটা তৎপরতার সহিত গ্রহণ করিয়া লইতে পারেন নাই। তাঁহারা স্বভাবতই রক্ষণশীল। রক্ষণশীল হওয়া খুবই ভাল কথা; কিন্তু চাষবাসের নয়া নয়া পদ্ধতি ও নতুন নতুন আবিষ্কারগুলির প্রতি আপনাদের উদাসীন থাকিলে চলিবে না। আপনারা যাঁহারা কৃষিবিষয়ে পারদর্শী ও নেতৃস্থানীয় তাঁহাদের উচিত বিজ্ঞানের এই সকল দানগুলি নিজেরা কাজে খাটাইয়া অন্যান্য নিরক্ষর কৃষকগণকে ঐসব যন্ত্রপাতি ও নিয়মপদ্ধতি ব্যবহারে উৎসাহিত করা।"

ট্রাম কোম্পানী বনাম বাস

"ষ্টেটস্‌ম্যান্" লিখিতেছেন, "বাসের সম্বন্ধে ট্রাম কোম্পানীর কর্ত্তারা মত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। বিগত বৎসরের আগষ্ট মাসে ট্রামের তদানীন্তন প্রতিনিধি রোটারী ক্লাবের বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, "ট্রাম কোম্পানী স্থায়ী ব্যবসা, বাস দুদিনের, এর কোন ভরসা নাই"। এই বৎসরে ট্রাম কোম্পানীর বর্ত্তমান প্রতিনিধি জে, আর ডেন সাহেব বলিতেছেন, "কলকাতার মত বিরাট সহরে দু'টো ব্যবসায়ই পাশাপাশি চালানো সম্ভব"। ডেন সাহেবকে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে বাস ব্যবসা নিজের স্থায়িত্বের সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ দিয়াছে। এটা সহরের বুকের উপর পাকাপোক্ত ভাবে শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে। অনেকের মতে ট্রাম কোম্পানীর আয়ু ফুরাইয়া আসিয়াছে—এটা সেকেলে জিনিষ। লোকে এখন বাসের বেশী ভক্ত। লোকের এই যুক্তির তেমন সারবত্তা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমেরিকা বা ইয়োরোপ কোন দেশেই বাসের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ট্রাম কোম্পানীকে ব্যবসা গুটাইতে হয় নাই।

ট্রামের আয়ু সম্বন্ধে মত

কলিকাতায় এমন কতকগুলি বিশেষ কারণ বর্ত্তমান আছে যাহাতে ট্রাম কোম্পানীকে কোন মতেই ফেল মারিতে

হইবে না। একটা কারণ, ডেন বলিয়াছেন, ট্রাম কোম্পানীর অভাবে কলিকাতায় যাত্রীর যাতায়াতের জন্য চারি হাজার বাস গাড়ীর প্রয়োজন হইবে। এই প্রয়োজনীয় মোটর বাসের ৪ ভাগের ১ ভাগ আজকাল যেরূপ ভাবে কলিকাতার রাজপথ-গুলি ভরিয়া ফেলিয়াছে তাহাতে ট্রাম উঠাইয়া দিয়া ৪ হাজার মোটরবাস প্রচলনের প্রস্তাবে সহরবাসী কিরূপ আতঙ্কিত হইয়া উঠিবেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। অন্যান্য সভ্য দেশের মত বর্ত্তমানে মাটীর নীচে বা মাথার উপরে রেল সড়ক নির্ম্মাণের কোনরূপ সুবিধা এখানে আশা করা যায় না। এক্ষেত্রে ট্রাম কোম্পানী চলিবেই।

ভারতীয় কারেন্সী লীগ

বোম্বাইয়ের লক্ষপতি মিলওয়ালারা স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাসের নেতৃত্বে একটা "ভারতীয় কারেন্সী লীগ" কায়েম করিয়াছেন। ১৮ পেন্সের টাকার বিরুদ্ধে লড়াই চালানো এই লীগের উদ্দেশ্য। তাঁহারা টাকার দাম কমাইয়া ১৬ পেন্সে নামাইতে চাহেন। ভারতে নানা স্থানে এই মতের লোকেরা লীগের সভ্য হইতেছেন। সম্প্রতি কলিকাতায় বিড়লাদের বাড়ীতে পুরুষোত্তমদাস আসিয়া বক্তৃতা করিয়া গিয়াছেন। সেই বক্তৃতার অধিকাংশই "আর্থিক উন্নতি"র সম্পাদকের বিবেচনায় যুক্তিহীন। অধিকন্তু সরকারী কারেন্সী কমিশন সম্বন্ধে পুরুষোত্তমদাস যে সকল মত ছাপিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধেই "আর্থিক উন্নতি" সম্পাদকের মত "ফরওয়ার্ডে"র মোলাকাৎ-অধ্যায়ে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার বিবেচনায় কারেন্সী কমিশনের প্রস্তাবগুলার ভিতর অধিকাংশই, বিশেষতঃ মোটা মোটা কথাগুলা সুযুক্তিপূর্ণ এবং গ্রহণযোগ্য। তবে ১৬ আর ১৮ পেন্সের ঝগড়ায় ১৭ পেন্স পর্য্যন্ত ঠেকা অসম্ভব নয়।

বিদেশী

সাম্রাজ্য-সম্মিলনের আর্থিক প্রস্তাব

অক্টোবর মাসে লণ্ডনে বৃটিশ সাম্রাজ্য-সম্মিলন বসিয়াছিল। তাহার আলোচনায় আর্থিক কথাও ছিল কম নয়। গম, মাছ, ফলমূল ইত্যাদি দ্রব্য ঠাণ্ডা অবস্থায় তাজা করিয়া রাখিবার উপায় সম্বন্ধে উন্নত প্রণালী আবিষ্কারের জন্য গবেষণাবৃত্তি কায়েম করা হইবে। কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটা বৃত্তির ব্যবস্থা হইতেছে। মাছ সম্বন্ধে পরীক্ষার জন্য ক্যানাডায় এবং নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে গবেষণা-ভবন গড়িয়া তুলিবার কথা উঠিয়াছে। শস্য-সম্পদ্‌কে পোকা-মাকড়ের উৎপাত হইতে বাঁচাইবার জন্যও বিশেষ বিশেষ পরীক্ষা-কেন্দ্র কায়েম করা হইবে। এই জন্য লণ্ডনের "ইম্পীরিয়্যাল বিউরো অব্ এণ্টমলজি"কে (কীট-তত্ত্ব-পরিষৎ) মোতায়েন রাখা হইবে। ট্রিনিডাড দ্বীপের কৃষি কলেজকে বেশ একটা মোটা অর্থ-সাহায্য দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। তুলার চাষ সম্বন্ধে এইখানে গবেষণা চলিবে)।

ফরাসী ধনবিজ্ঞান-পরিষদে শুল্ক সমালোচনা

জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে "সোসিয়েতে দে কোনোমী পোলিটিকে"র পরিষদের) এক সভা অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। বক্তা ছিলেন লাকুর-গেয়ে। আলোচ্য বিষয় ছিল "শুল্ক-সংস্কার"। আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন সেনেটার কোআনে, পরিষদের সভাপতি ঈভ-গীয়ো এবং অন্যান্য সভ্য। শ্রীযুক্ত পুপাঁ বলেন,—"ফ্রান্সের যেখানে সেখানে শুনা যায় যে, রপ্তানি-বৃদ্ধির জন্য আমাদের দেশের দুরবস্থা বাড়িতেছে। এ কথাটা ঠিক নয়।" বাণিজ্য-সচিবের অন্যতম সহকারী ফিগিয়েরা বলিয়াছেন,—"নয়া শুল্কের ব্যবস্থায় পূর্ব্বেকার জটিলতা অনেক সরল করা হইবে। যে যে বস্তু ফ্রান্সে উৎপন্ন হয় না, সেই সকল বস্তুর আমদানি সম্বন্ধে ১৮৯২-১৯১০ সনের শুল্ক-আইনই বজায় রাখা হইবে। ভিন্ন ভিন্ন দেশের সঙ্গে ভিন্ন সমঝৌতা কায়েমের ব্যবস্থা হইতেছে। সামরিক হিসাবে দেশ-রক্ষার জন্য কতকগুলা শিল্প বাঁচাইয়া রাখিবার দিকে বাণিজ্য-সচিবের নজর আছে বলাই বাহুল্য।" কৃষি-সচিব রিকার বলিয়াছেন,—"যুদ্ধ থামিবার পর আজ প্রায় আট বৎসর চলিয়া গেল। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন দেশের সঙ্গে ফ্রান্সের বাণিজ্য-সমঝৌতা পুনর্গঠিত হইল না। জার্ম্মাণির সঙ্গে এই সমঝৌতা কায়েম

করিতে আমাদের যত সময় লাগিতেছে তত লাগা উচিত নয়।

শুল্ক-নীতি সম্বন্ধে লাকুর-গেয়ের মতামত

প্রধান বক্তা লাকুর-গেয়ে বলেন,—"ফরাসীরা সংরক্ষণ পন্থী হইতেছে তিন কারণে। প্রথমতঃ, ফরাসী ফ্রাঁর দর টাকার বাজারে নামিয়া গিয়াছে বলিয়া। কিন্তু তাহার জন্য সংরক্ষণের দরকার কি? ফরাসী মুদ্রার দর কমিয়া যাওয়ায় বিদেশীরা ফরাসী মাল বেশী কিনিতে সমর্থ। ফরাসীরা বিদেশী মাল কিনিতে অসমর্থ। দ্বিতীয়তঃ, সংরক্ষণপন্থীরা বলেন যে, ফ্রান্সে বিদেশী মালের আমদানি বাড়িয়া যাইতেছে। এই কারণে সংরক্ষণ-শুল্ক কায়েম হওয়া উচিত। বক্তার মতে একথাও ঠিক নয়। ১৯২৬ সনের ফ্রান্স আমদানির চেয়ে রপ্তানি বেশী করিয়াছে। সংরক্ষণের তৃতীয় কারণ দেখানো হয় এই বলিয়া যে, দুনিয়ার অন্যান্য সকল দেশই সংরক্ষণ-পন্থী হইয়া পড়িয়াছে। এই তথ্য লাকুর-গেয়ে স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার মতে এই জন্য ফ্রান্সের পক্ষেও সংরক্ষণ-পন্থী হইতেই হইবে কি না ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

সংরক্ষণ-নীতির গোড়ার কথা

লাকুর-গেয়ের মতে সংরক্ষণ-নীতি ভাল কি মন্দ এই বিষয়ে তর্ক করিবার কোনো দরকার নাই। ফ্রান্সের বর্ত্তমান অবস্থায় কি ভাল কি মন্দ তাহাই বিবেচনা করা যুক্তিসঙ্গত। বক্তা বলিতেছেন,—"বিদেশে কিছু কিছু মাল ফ্রান্সকে কিনিতেই হইবে। তাহা না হইলে স্বদেশের শিল্প-বাণিজ্য অচল থাকিতে বাধ্য। আবার অপর দিকে বিদেশে ফ্রান্সকে কিছু কিছু মাল বেচিতেও হইবে। তাহা না হইলে বিদেশী জিনিষের দাম সমঝাইয়া দেওয়া যাইবে কোথা হইতে? এই সকল গোড়ার কথা ধামা চাপা দিয়া রাখিলে শুল্ক সম্বন্ধে সুব্যবস্থা করা অসম্ভব।"

শুল্ক-নীতির নয়া ভিত্তি

সকল ক্ষেত্রেই অঙ্ক কষিয়া দেখা আবশ্যক এক একটা জিনিষ তৈয়ারী করিয়া বাজারে ফেলিতে খরচ পড়িতেছে কত। যদি দেখা যায় যে, বিদেশী মাল সস্তায় পাওয়া যাইতেছে তাহা হইলে এই দুই দরের প্রভেদটাকে শুল্কের দ্বারা যথাসম্ভব কমাইবার চেষ্টা করা চলিতে পারে। কিন্তু তাহা বলিয়া যে ব্যবসাটার বাঁচিবার কোনো সম্ভাবনা নাই তাহার জন্য বিদেশী মালের উপর মোটা হারে শুল্ক বসানো অসঙ্গত। আবার যখন-তখন যে-সে স্বদেশী কারবারকে "শিশু"-কারবার বলিয়া তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জলের মত টাকা ঢালাও আহাম্মুকি। বিদেশী মালের উপর শুল্ক চাপানো লাকুর-গেয়ের মতে অন্যায় নয়। কিন্তু তাহার দরুণ যেন দেশের ভিতর কোনো একটা শিল্প-সঙ্ঘ একচেটিয়া অধিকার পাইয়া না বসে। তাহা হইলে বিপুল "ট্রাষ্ট" গড়িয়া উঠিবার আশঙ্কা থাকে। তখন দেশের লোক সেই "ট্রাষ্টের" খামখেয়ালি ও যথেচ্ছাচার-নিয়ন্ত্রিত দাম সহিতে বাধ্য হইবে।

ইংরেজদের দুশ্চিন্তা

বড় বড় ইংরেজ ব্যবসায়ীদের সকলের মুখেই এক কথা—"ব্যবসার এমন দুঃসময়, এ রকম অচল অবস্থা আর তাঁদের আমলে কোনো দিন দেখা যায় নাই। গত সনের চাইতে এ বৎসরের প্রথম চারি মাসে ব্যবসার উন্নতির একটা লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। রেলওয়ের আয় ১৯২৫ সনের চাইতে শতকরা ২·৬ ভাগ বেশী হয়। প্রায় ১০ লক্ষ পাউণ্ডের উপর মোটা আয়। প্রথম চারি মাসে ইস্পাত ও লোহা লক্কড়ের জিনিষ উৎপাদন শতকরা ৯·৮ ভাগ বৃদ্ধি পায়। জিনিষের সাধারণ পাইকারী দাম ১৩·১ ভাগ কম ছিল। ১লা ডিসেম্বর থেকে ১লা মে পর্য্যন্ত হিসাব করিয়া দেখা যায় জীবন-যাত্রা প্রণালীও খাট করা হইয়াছিল। এই সমস্ত অনুকূল অবস্থার দরুণ মজুরী-সমস্যার অনেকটা সমাধান করা হয়। এই ধর্ম্মঘট-ই আমাদের সর্ব্বনাশটা করিল।"

ইংল্যাণ্ড ও ইতালির মিতালী

ইতালীয়ান ব্যারণ স্যান সেভেরিনো নব্য ইতালির সকল প্রকার উন্নতি সম্বন্ধে লণ্ডনের মহলে মহলে বক্তৃতা দিয়া ফিরিতেছেন। সেদিন শহরের লর্ড মেয়র সরকারী ভাবে তাঁহাকে এক সভায় অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। সভায় রোম সম্বন্ধে তিনি বক্তৃতা করেন।

লণ্ডন স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের আমন্ত্রণে ও

উদ্যোগে রয়্যাল মেডিক্যাল কলেজে তিনি ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ইতালি ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে কিরূপ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে তাহা ছায়াচিত্র দ্বারা প্রদর্শন করেন। তিনি ইতালির আকাশ অভিযান সম্বন্ধেও বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতা "বৃটিশ ব্রডকাষ্টিং কোম্পানী" ইংল্যাণ্ডের প্রধান প্রধান শহরে ছড়াইয়া দিয়াছে। বর্ত্তমান নব্য ইতালির সঙ্গে বাহিরের জগৎকে পরিচিত করিয়া দেওয়াই ব্যারণের একমাত্র উদ্দেশ্য। মুসোলিনী তাঁহার এই সাধু সঙ্কল্পে খুব আনন্দিত হইয়াছেন।

"আর্থিক স্বাধীনতা"র আন্দোলন

ইয়োরামেরিকার কয়েকজন জাঁদরেল ব্যাঙ্কার ও ব্যবসায়ী ইয়োরোপের ব্যবসা-বাণিজ্যের অসুবিধা দূর করিবার জন্য সম্মিলিত ভাবে এক ইস্তাহার জারী করিয়াছেন। মহাযুদ্ধের পর হইতে টারিফ (শুল্কনীতি), স্পেশাল লাইসেন্স (বিশেষ অনুমতি) ও প্রহিবিশান (বহিষ্করণ) আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের কিরূপ প্রতিবন্ধকতা সাধন করিয়াছে ইঁহারা ইস্তাহারে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন এবং দুনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্যকে ভালভাবে দাঁড় করাইবার জন্য "আর্থিক" স্বাধীনতা"র দাবী করিয়াছেন।

স্বাক্ষরকারিগণের মধ্যে রাইস ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট ডাক্তার শাক, সার আর্থার বালফুর, লর্ড ব্রাডবেরী, এফ, সি, গুডেনাফ, লর্ড ইঞ্চকেপ, রেজিনাল্ড ম্যাক্‌কেনা মণ্টেগু এবং মেসার্স নর্ম্মাণ ও জে, পি, মর্গানের নাম উল্লেখ-যোগ্য।

আন্তর্জ্জাতিক অর্ণবপোত-সম্মিলন

লণ্ডন শহরে শ্রীযুক্ত ওয়াল্টার রান্সিম্যানের সভাপতিত্বে ইণ্টার্ণ্যাশনাল শিপিং কনফারেন্সের এক বৈঠক হইয়া গিয়াছে। অধিবেশনে অনেকগুলি মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে। ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে লেনদেন, যাতায়াতের পথের সুবিধা ও স্বাধীনতা রক্ষার্থে এবং বাণিজ্যের সমঝোতা স্থাপনে তাঁহারা লীগ অব নেশান্স বা জাতিসঙ্ঘের সঙ্গে মিলিয়া কাজ করিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু তাঁহাদের মতে লিগ অব নেশান্স যেন বাণিজ্য-বিষয়ক ঐ সকল আন্তর্জ্জাতিক প্রচেষ্টার মধ্যেই কর্ম্মশক্তি নিবদ্ধ রাখেন।

অধিবেশনে লীগ অব নেশান্সকে এক স্বতন্ত্র ম্যারিটাইম (সামুদ্রিক) সমিতি স্থাপনের জন্য অনুরোধ করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক শিপিং কনফারেন্স এবং "ফরাসী কোমিতে মারিতিম আর্তার্ণ্যাশন্যাল" এই দুই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া কাজ করা ঐ সমিতির উদ্দেশ্য থাকিবে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত অনুসন্ধান করিবার জন্য কনফারেন্স-কর্তৃক একটি স্পেশ্যাল কমিটি নিয়োগ করা হইয়াছে।

মার্কিণ কৃষিকার্য্যে বিষ ব্যবহার

আমেরিকার উইসকনসিন প্রদেশের হেমলক বনের ধ্বংসকারী পোকা মারিবার জন্য এরোপ্লেন হইতে ছয় টন বিষ বনের উপর বর্ষণ করা হইয়াছে। পোকামাকড়ে এক বৎসরের মধ্যে ঐ বনের ৬০ লক্ষ ফুট ধ্বংস করিয়াছে। আমেরিকার আঙ্গুর, আপেল ইত্যাদি ফলমূলের বাগান-বাড়ীর পুলিশ হইতেছে এই পোকা-ধ্বংসকারী বিষ। এই উপায়ে বাগান ও ক্ষেত-খামার রক্ষার্থ ওয়াশিংটন সহরে স্বতন্ত্র বিষ-গবেষণাগারে পরীক্ষা চলিতেছে।

সমুদ্রের জলে সোনার সন্ধান

জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক হাবার সমুদ্রের জল সম্বন্ধে গবেষণা চালাইয়া জানিতে পারিয়াছেন যে, অনেক স্থলে সমুদ্র-জলে যথেষ্ট স্বর্ণ মিশ্রিত আছে। হামবুর্গ-আমেরিকান লাইন অধ্যাপক হাবারের জন্য একখানা স্পেশ্যাল জাহাজ মোতায়েন করিয়াছেন। হাবার ঐ জাহাজে চড়িয়া দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে সমুদ্র-জল পরীক্ষার্থ বাহির হইবেন। এপর্য্যন্ত স্যানফ্রান্সিস্কো উপকূলের এক টন জলে এক মিলিগ্রামের এক শতাংশ পরিমাণ স্বর্ণ পাওয়া গিয়াছে।

লণ্ডনের নগর-শাসন

শ্রীমতী মুরিয়েল লেষ্টারের সঙ্গে কথোপকথন

ইংরেজ মহিলা মুরিয়েল লেষ্টার কয়েক মাস ধরিয়া ভারতে শফর করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে কাশীতে এবং কলিকাতায় আমাদের যে-সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছে নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

প্রশ্ন:—আপনি কি লণ্ডনের নগর-শাসকদের একজন?

উত্তর—লণ্ডনের নগর-শাসক বল্লে কথাটা ঠিক বোঝা যায় না; কেন না, লণ্ডন নামক সহরটা কোনো একটা শাসন-সঙ্ঘের অন্তর্গত নয়। লণ্ডনে কতকগুলি "বরো" আছে। এই সকল 'বরো' প্রত্যেকে এক একটী স্বাধীন নগর-বিশেষ। আমি এইরূপ একটী বরোর শাসনসমিতির "অ্যাল্ডারম্যান"।

প্র:—সেই "বরোটির" কি নাম?

উ:—পপ্‌লার।

প্র:—আচ্ছা, আমাদের দেশে যাকে আমরা "ওয়ার্ড" বলি, আপনাদের লণ্ডনের "বরো"গুলি কি তাই?

উ:—না, তাও নয়, আমাদের প্রত্যেক "বরো"ই অনেক-গুলি ওয়ার্ডে বিভক্ত,—যেমন পপ্‌লার বরোতে ১১টী ওয়ার্ড আছে।

প্র:—পপ্‌লারের লোক-সংখ্যা কত?

উ:—১ লক্ষ ৬২ হাজার। এ বিষয়টী ভাল করে বোঝাবার জন্য আপনাকে বল্‌তে পারি যে, ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টার বরোর লোক-সংখ্যা ১ লক্ষ ৪২ হাজার মাত্র। ওয়েষ্ট-মিন্‌ষ্টারের নাম করছি এই জন্য যে, এই "বরো" বিলিতী সমাজে খুব নামজাদা। এখানে আমাদের পার্ল্যামেণ্ট অবস্থিত। বড় বড় সরকারী বাড়ীঘর এই মহল্লারই গৌরব। ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টারের উল্টাই হচ্ছে আমাদের পপ্‌লার। আমরা লণ্ডনের অন্যতম গরিব পাড়ার লোক।

প্র:—সহরের সরকারী আয়ের তরফ থেকে ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টার ও পপ্‌লার "বরো"তে কিরূপ তফাৎ?

উ:—পপ্‌লারের আয় ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টারের আয়ের ১০ ভাগের এক ভাগ। ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টারের ৮০ লক্ষ পাউণ্ডের উপর "রেটেব্‌ল্ ভ্যালু", আমাদের মাত্র ৮ লক্ষ পাউণ্ড "রেটেব্‌ল্"।

প্র:—"রেটেব্‌ল্ ভ্যালু" কি বস্তু?

উ:—সহরের ভিতর যত লোকের যত প্রকার সম্পত্তি আছে সেই সম্পত্তির একটা মূল্য নির্দ্ধারণ করা হয়। সেই মূল্যের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশের উপর নগর-শাসকেরা একটা কর (রেট) বসাইয়া থাকেন। সম্পত্তির মূল্যের যে নির্দ্দিষ্ট অংশটার উপর কর বসান হয়, তাকেই বলে "রেটেব্‌ল্ ভ্যালু" অর্থাৎ করযোগ্য মূল্য। বুঝতেই পাচ্ছেন রেট বা কর আর "রেটেব্‌ল্ ভ্যালু" এক জিনিষ নয়। মোটের উপর ধরে নিন যে, ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টারের নগর-শাসকেরা ৮০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের একটা অংশ কর স্বরূপ আদায় করে, আর আমরা মাত্র ৮ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের খানিকটা অংশ করস্বরূপ পাইয়া থাকি।

প্র:—পপ্‌লারে আপনি অ্যাল্ডারম্যান হলেন কি করে?

উঃ—এই "বরো"র কাউন্সিল অর্থাৎ মিউনিসিপ্যাল কর-পোরেশন ৬ জন অ্যাল্ডারম্যান বহাল করতে অধিকারী। এই ৬ জনের ভিতর বর্ত্তমানে ২ জন মহিলা অ্যাল্ডারম্যান আছেন। তাঁদেরই একজন আমি।

প্রঃ—আচ্ছা, বরো কাউন্সিলের সভ্যে আর অ্যালডারম্যানে কি প্রভেদ?

উঃ—কাউন্সিলের সভ্যেরা "বরো"র নরনারী-কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হয়, আর অ্যালডারম্যানদিগকে ডেকে নিয়ে আসে এই কাউন্সিলের সভ্যেরা। পপ্‌লারের নগর-সভায় আজকাল ৪২ জন কাউন্সিলার আছেন।

প্রঃ—পপ্‌লার পাড়ার লোকজন প্রধানতঃ কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত।

উঃ—আমাদের এই অঞ্চল প্রধানতঃ জাহাজের খালাসী, কুলী-মজুর ইত্যাদির বাসস্থান। ষ্টীমার জাহাজ তৈয়ারী করবার ডক এই পাড়াতে অবস্থিত। দেশী বিদেশী সমুদ্র-পথের জাহাজ পপ্‌লারের বন্দরে অনেক যাওয়া-আসা করে। মাল উঠানো-নামানোর কাজ চলে বিস্তর। ষ্টীমার জাহাজ মেরামতের কারবারও দস্তুর মত হয়ে থাকে।

প্রঃ—এই অঞ্চলে আপনি অ্যাল্ডারম্যান রূপে নগর-সভার সভ্যদের দ্বারা বাছাই হলেন কি করে?

উঃ—আমি ছেলে বেলা থেকে লোক-হিতকর কাজে সময় দিয়ে এসেছি এই জন্য পপ্‌লারের মজুর নরনারীরা আমাকে ভাল রকম জানে। কাজেই নগর-শাসক-গণ আমাকে দিয়ে সভার ভিতর অনেক-কিছু করিয়ে নিতে পারবেন বলে বিশ্বাস করেন।

প্রঃ—আপনি বলেছেন আপনাদের পাড়ায় জাহাজের গতিবিধি আর খালাসীদের কাজকর্ম্ম বেশী। আচ্ছা তাহলে এই বেকার-সমস্যার দিনে পপ্‌লারের অবস্থা কিরূপ?

উঃ—পপ্‌লারের দুর্গতি আজকাল খুব বেশী। এখানে একটা বিশেষ কথা বলা দরকার, আপনি জানেন যে ভার্সাই সন্ধি অনুসারে অনেক জার্ম্মাণ জাহাজ ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট বিনা পয়সায় পেয়েছিলেন। গভর্ণমেণ্ট এই জাহাজগুলি দেশের নানা জাহাজ কোম্পানীকে বেচেছেন। ফলে দাঁড়িয়েছে এই, জাহাজ তৈয়ারী করা ব্যবসাটা বিলেতে অনেক কমে গেছে। বিলেতে যত বন্দরে জাহাজ তৈয়ারী হয় সর্ব্বত্রই কারখানায় কর্ম্মাভাব। আমাদের পপ্‌লারেও ঠিক তাই হয়েছে। ৫ জন মজুর যেখানে কাজ পেত এখন সেখানে মাত্র এক জন কাজ পায়। তাহলে বুঝুন পপ্‌লারের বেকার-সমস্যা কত দুরূহ।

প্রঃ—আপনি প্রথমে বল্লেন লণ্ডন নামক একটা সহরে নগর-শাসক বলে কোন পদ নাই, তাহলে কি আপনি বল্‌তে চান যে, লণ্ডনের ভিতরকার ভিন্ন ভিন্ন "বরো"গুলি সবই স্বস্বপ্রধান স্বাধীন নগর-বিশেষ?

উঃ—না, তাও ঠিক নয়, গোটা লণ্ডনের জন্য যে শাসনের ব্যবস্থা আছে তার কর্ত্তাকে আমরা করপোরেশন কিম্বা মিউনিসিপ্যালিটি বলি না, তাকে বলি "কাউণ্টি কাউন্সিল"। এই হিসাবে লণ্ডন নামক মহা সহর ঠিক সহর নয়, একটা কাউণ্টি বা জেলা-বিশেষ।

প্রঃ—লণ্ডন কাউণ্টি কাউন্সিলের সঙ্গে বিভিন্ন "বরো" কাউন্সিলের কি সম্বন্ধ?

উঃ—লণ্ডনের কাউণ্টি কাউন্সিল প্রধানতঃ, এমন কি এক-মাত্র শিক্ষা-ব্যবস্থার জন্য দায়ী। তা ছাড়া, অন্যান্য সকল প্রকার নাগরিক কাজকর্ম্ম বরোর অধীন। তবে এখানে বলা দরকার, লণ্ডন কাউণ্টি কাউন্সিলের মত আরো তিনটা কর্ম্মকেন্দ্র আছে, যেগুলি সকল বরোর উপর কর্ত্তৃত্ব করতে অধিকারী।

প্রঃ—কোন্ কোন্ বিষয়ে এই সকল কর্ম্মকেন্দ্রের একতিয়ার আছে।

উঃ—প্রথমতঃ, পুলিস পাহারাওয়ালার ব্যবস্থা সম্বন্ধে বরোদের কোন হাত নাই। আবার কাউণ্টি কাউন্সিলেরও কোন হাত নাই। তার জন্য এক স্বতন্ত্র আয়োজন আছে। তেমনি জল-সরবরাহের ব্যবস্থাও কাউণ্টি কাউন্সিলের তাঁবে নয়, আবার বরোদের হাতেও নয়।

তাহার জন্য আছে "ওয়াটার বোর্ড" বা জল-কমিটি। সেইরূপ সকল বরোর জন্য কতকগুলি বিশেষ শ্রেণীর হাসপাতাল অন্য এক কর্ম্মকেন্দ্রের অধীনে শাসিত হয়। এই সকল হাসপাতালে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা হয়ে থাকে। তা ছাড়া, "ফিভার হসপিটেল" বলে কতগুলি কঠিন রকম জ্বর ব্যাধির জন্য আরোগ্যশালা আছে। সেগুলিও কোন "বরোর অধীন নয়। এই বিশেষ শ্রেণীর হাসপাতালগুলি "অ্যাসাইলাম্‌স্ বোর্ড" বা আশ্রয় কমিটির অধীন। তাহলে দেখতেপাচ্ছেন যে, সমগ্র নগর-শাসক বল্লে মোটের উপর ৪টী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কর্ম্মকেন্দ্র বুঝায়। এই ৪টীকে কেন্দ্রীভূত করবার কোন ব্যবস্থা নাই অর্থাৎ পুলিস, জল, শিক্ষা আর আশ্রয় (অ্যাসাইলাম্‌স্) এই ৪ দফায় "বরোগুলি" স্বাধীন নয়। অথচ এই সব কাজ কোন একটা শাসন-পরিষদের অন্তর্গতও নয়, চার চারটা বিভিন্ন সঙ্ঘ, পরিষদ বা কমিটি স্বতন্ত্রভাবে গোটা লণ্ডনের ৪টী বিভিন্ন প্রকারের কাজকর্ম্ম সামলিয়ে থাকে।

প্রঃ—এই ৪ কর্ম্মকেন্দ্রের খরচপত্র আসে কোত্থেকে? বরোগুলি এদেরকে কিছু টাকাপয়সা দেয় কি?

উঃ—বরোগুলি হতে বিভিন্ন হারে এই সকল কর্ম্মকেন্দ্রে চাঁদা আসে, কেননা স্বতন্ত্রভাবে কর তুলবার অধিকার এই সকল কর্ম্মকেন্দ্রের নাই। বরোরাই লণ্ডন সহরে নাগরিক খাজনা আদায়ের একমাত্র কর্ত্তা অর্থাৎ যে ৪টী বিষয়ের কথা বলা হল এই ৪টী বিষয় বাদ দিলে বরোগুলিকে সম্পূর্ণ স্বাধীন জীবনকেন্দ্র বিবেচনা করা সম্ভব।

প্রঃ—পপ্‌লারের বরো কাউন্সিল যে সকল কাজ করে থাকে তার একটা খসড়া তালিকা দিতে পারেন কি?

উঃ—মোটের উপর ১০।১২ শ্রেণীতে আমাদের কাজ বিভক্ত করা যেতে পারে।

(১) রাস্তাঘাট তৈরী, মেরামত ও শিজিল-মিজিল রাখা আমাদের বড় কাজ।

(২) ১৯১৮ সনে বিলাতের গভর্ণমেণ্ট প্রসূতি ও শিশু-মঙ্গল সম্বন্ধে একটা আইন জারি করেছেন, সেই আইন অনুসারে কাজ করান এবং প্রত্যেক জননী ও শিশুর অবস্থা তদবির করা আমাদের উল্লেখযোগ্য কাজ।

(৩) সম্পত্তির মূল্য নির্দ্ধারণ করা আর তার করযোগ্য মূল্য নির্দ্দিষ্ট করা এবং অধিকন্তু সেই "রেটেবল্ ভ্যালুর" উপর "রেট" বা করের হার ধার্য্য করা আমাদের কাজ।

(৪) বরোর ভিতর বিদ্যুতের ব্যবহার সম্বন্ধে আমরা নিজেরাই মালিক।

(৫) বরোর সার্ব্বজনিক স্বাস্থ্য রক্ষা করা আমাদেরই হাতে। অবশ্য আগেই বলেছি যে, মানসিক ব্যাধির হাসপাতাল ইত্যাদি কতকগুলি আরোগ্যশালা "বরো"র অধীন নয়। এইগুলি বাদে স্বাস্থ্যরক্ষার অন্যান্য সকল অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানই "বরো"র তাঁবে শাসিত হয়।

(৬) বরোর ভিতর যে সকল সার্ব্বজনিক ইমারত, বাগান ইত্যাদি আছে, সেগুলি মেরামত করা আমাদের কাজ।

(৭) বরোর নানা অঞ্চলে টেনিস খেলবার মাঠ আছে, খোলা হাওয়ায় সাঁতার কাটবার বন্দোবস্ত আছে, এসবগুলি আমাদের তদবির করতে হয়। তা ছাড়া, ঘরবাড়ীর সংখ্যা নরনারীর সংখ্যা অনুসারে বাড়ছে কিনা তাহাও আমাদের দেখতে হয়, আর যথাসময়ে বাড়ীঘর তৈয়ারী করবার ব্যবস্থাও করতে হয়।

(৮) হাউসিং বা গৃহ-সমস্যা সামলানো আমাদের অষ্টম ধান্দা।

(৯) পল্লীর দরিদ্র নরনারীর খোরপোষের সাহায্য করা আমাদের কাজ। এজন্য চাঁদা তোলা, গরিবের সংখ্যা গণনা করা এবং যথাসময়ে তাহাদিগকে নিয়মিত রূপে টাকা পৌঁছিয়ে দেওয়া আমাদের কাজ।

(১০) একটা "কর্ম্মশালার" (ওয়ার্ক হাউস) তদবির করা আমাদের হাতে। বরোর যে সকল দরিদ্র নরনারী কাজ করতে সমর্থ অথচ কোন না কোন কারণে বসে আছে, তাদেরকে এই কর্ম্মশালায় বাহাল করে

দারিদ্র্য-সমস্যার মীমাংসা করা এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। তা ছাড়া, দুশ্চরিত্র বাপ মার ছেলেপিলেদের অভিভাবক আমরা। যে সব ছেলেমেয়েদের বাপ মা মারা গেছে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করা আমাদের এই শ্রেণীর কাজেরই অন্তর্গত। আমি বলতে ভুলে গেছি যে, এই ১০।১২ দফা কাজের ভিতর "বরোর" নর্দ্দমা-নালার তদবির করা অন্যতম।

প্রঃ—আচ্ছা, বিগত ৫।৭ বৎসরের মধ্যে নগর-শাসনে বিলেতে বিশেষ কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে কি?

প্রঃ—আমাদের পপ্‌লার সম্বন্ধে ২।১টী কথা বলতে পারি। অনেক দিন ধরে' আমাদের "বরো"তে যে সার্ব্বজনিক স্নানাগার এবং ধোবীখানা বা ধোলাইখানা আছে আজকাল সেই সকল জায়গায় কলের ব্যবহার বাড়ছে। আমি বিশেষ ভাবে ধোবীখানার কথা বল্‌তে চাই। "বরো"র নরনারী এই সকল ধোলাইখানায় নিজ নিজ নোংড়া কাপড়চোপড় নিয়ে আসে। আগেকার দিনে তাদেরকে অনেক পরিশ্রম করে হাতের এবং পায়ের জোর খাটিয়ে কাপড় কাচতে হত। এখন তারা ধোলাইখানার ইঞ্জিনিয়ারকে কাপড়গুলি দিয়ে দেয়। কাপড় কাচা, শুকানো, আর ইস্ত্রী করা সবই যন্ত্রের সাহায্যে হইয়া যায়। এই জন্য লোকজনের কাছে অতি সামান্য দাম আদায় করা হয়। এই ধরণের ৫টী বড় বড় নাগরিক ধোলাইখানা আছে। আমি মনে করি যে, জন-সাধারণের শারীরিক মেহনত বাঁচিয়ে এই সকল যন্ত্রপাতি আমাদের সুখ-বৃদ্ধি করতে পেরেছে। পপ্‌লার ইংরেজ সমাজে এই একটা নতুন-কিছু দাঁড় করাতে পেরেছে বলে আমরা গৌরব করি।

প্রঃ—আপনি ১৯১৮ সনের যে আইনটার কথা বললেন তার সম্বন্ধে কিছু বিস্তৃত বিবরণ দিতে পারেন কি?

উঃ—সে আইনটার নাম "চাইলড্‌স ওয়েলফেয়ার এণ্ড ম্যাটারনিটি অ্যাক্‌ট" (শিশু-মঙ্গল ও প্রসূতি-বিষয়ক আইন) এই অ্যাক্‌ট মাফিক কাজ করা "বরো" কাউন্সিলের হাত। কিন্তু এজন্য যত খরচ হয় তার অর্দ্ধেক আসে "বরো"র তহবিল হতে ও আর অর্দ্ধেক দেয় স্বয়ং বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট।

প্রঃ—আচ্ছা, কি রকম খরচপত্র পড়ে তার একটা আন্দাজি হিসাব দিতে পারেন কি?

উঃ—হাঁ, একটা খাঁটি হিসাবই দিচ্ছি,—গত বৎসর আমরা পপ্‌লার বরোতে শিশুদেরকে বিনা পয়সায় দুধ জুগিয়েছি। অন্ততঃ এক বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুদেরকে আমরা দুধ দিয়ে থাকি। এ বাবদ আমাদের খরচ হয়েছে ৮০০০ পাউণ্ড (এক লক্ষ টাকার উপর)। আমাদের পাড়ায় দুধের দর প্রতি গ্যালন ২ শিলিং পাইকারী। অর্থাৎ টাকায় প্রায় ২॥ সের।

প্রঃ—বিনা পয়সায় দুধ দেওয়া ছাড়া এই আইন মাফিক আর কোনো কাজ আছে কি?

উঃ—প্রথমতঃ, আমরা কতকগুলি স্বাস্থ্য-পরীক্ষাগার কায়েম করেছি, এগুলিকে বলা হয় "ক্লিনিক"। এখানে প্রতি সপ্তাহে জননীরা তাদের শিশুদেরকে নিয়ে আসে, তাদেরকে ওজন করা হয়, তাদের দাঁত এবং সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়, জননীদেরকে নানা প্রকার পরামর্শ দেওয়া হয়, দরকার হলে চা-রুটীও খেতে দেওয়া হয়। এই স্বাস্থ্য-পরীক্ষালয়ে সকলেই বিনা পয়সায় ব্যবস্থা পায়। তা ছাড়া, আর এক প্রকার ক্লিনিক আছে, সেখানে অন্তঃসত্ত্বা নারীদিগকে সকল প্রকার পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে। এজন্যও কোনো পয়সা নেওয়া হয় না। তৃতীয়তঃ, দাঁত-পরীক্ষালয় নামে কতকগুলি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান আছে। অনেক সময় দেখা যায় যে, মায়ের দাঁত খারাপ হলে শিশুর স্বাস্থ্যহানি ঘটে। এই অবস্থায় মায়ের দাঁত চিকিৎসা করা হয়, দরকার হলে দাঁত তুলে ফেলাও হয়। দেখা গিয়েছে যে, মায়ের দাঁত যদ্দিন খারাপ ছিল তদ্দিন শিশু ওজনে কমে যেত, কিন্তু মায়ের দাঁতের চিকিৎসার পর শিশু ওজনে বাড়ছে। এই সকল দাঁত-পরীক্ষালয়ে ৫ বৎসরের ছোট সকল শিশুরই বিনা পয়সায় চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়ে থাকে। তা ছাড়া, আর এক রকম ক্লিনিক

আছে, তাকে "কৃত্রিম সূর্য্য-রশ্মি চিকিৎসালয়" বলা হয়। যে সব শিশু অথবা জননী রিকেট বা ঐ ধরণের বেয়ারামের জন্য বিকলাঙ্গ বা ক্ষীণতেজ হয়, তাদের জন্য এই সকল ক্লিনিকের ব্যবস্থা তাদেরকে সূর্য্য-রশ্মির ভিতর বসিয়ে দেওয়া হয়। এই আলোককে "আল্ট্রাভায়লেট" বলা হয়, পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে, যে সব লোকের শরীর সাধারণতঃ নিস্তেজ বা যারা মেজাজে কিছু নরম, খিট্‌খিটে, স্ফূর্ত্তিহীন তারা সপ্তাহে কয়েকবার এই আলোকপূর্ণ ঘরের ভিতর খেলাধুলা করলে পরে বেশ চাঙ্গা হয়ে ওঠে। এই আলোক যন্ত্রপাতির সাহায্যেই যে কোনো ঘরে তৈরী করা সম্ভব। বাইরে যখন কুয়াশা ঘরের ভিতর তখন ফুটফুটে রোদ।

প্রঃ—দুঃস্থ নরনারীদেরকে সাহায্য করার নিয়মটা আমি আর একটু ভাল করে জানতে চাই। জন প্রতি মাসে বা সপ্তাহে কত করে সাহায্য করবার নিয়ম আছে?

উঃ—"প্যারিশ রিলীফ" বা "পল্লী দারিদ্র্য-নিবারণের" যে হার, তার কথা বল্লেই আপনি বিষয়টা বুঝতে পারবেন। প্রত্যেক পুরুষকে সপ্তাহে ১০ শিলিং করে দেওয়া হয়ে থাকে, প্রত্যেক স্ত্রী সম্বন্ধেও তাই নিয়ম। প্রথম শিশু পায় ৬ শিলিং, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও অন্যান্য শিশুদের হার ৫ শিলিং। মনে করুন কোনো পরিবারে স্বামী এবং স্ত্রী ছাড়া ৪টী শিশু আছে, তা হলে তারা সপ্তাহে পাবে ৪১ শিলিং অর্থাৎ প্রায় ৩০৲ টাকা।

প্রঃ—১৯১৮ সনের শিশু-মঙ্গল আইন জারী হওয়ার পর পপ্‌লার "বরো"তে কোনো সুফল পেয়েছেন কি?

উঃ—পেয়েছি বটে, কিন্তু কতটা একমাত্র এই আইন-মাফিক কর্ম্ম করার ফল তা বোধ হয় এখনও বলা সম্ভব নয়। তবে একটা অঙ্ক বল্লে খানিকটা ধরতে পারবেন। ১৯১১ সনে এক বৎসরের ও তার কম বয়সের শিশু বিলাতে মরত প্রতি হাজারে ১৫৯ জন। ১৯২৩ সনে এই সংখ্যা ছিল পপ্‌লার বরোতে হাজার করা ৬০। এই সময় শিশু-মঙ্গল কমিটির তদবির করা ছিল আমার নিজের কাজ।

প্রঃ—আপনি বলেছেন, বিদ্যুতের কারবার বিষয়ক সকল-কিছু "বরো"র হাতে। এই সম্বন্ধে আমি বিস্তৃতরূপে জানতে চাই।

উঃ—এ সম্বন্ধে পপ্‌লার একটা উল্লেখযোগ্য কিছু করেছে আমি বলতে পারি। আমরা সব চেয়ে সস্তা দরে বিদ্যুৎ তৈরী করি, অথচ লাভও থাকে আমাদের দস্তুরমত। "বরো" স্বয়ংই বিদ্যুতের কারখানার মালিক। এই হিসাবে পপ্‌লার বিলাতের অন্যান্য বরো ও সহরের পথপ্রদর্শক। আমরা চেষ্টা করছি যাতে প্রত্যেক গৃহস্থ তাদের সকল প্রকার গৃহস্থালীর কাজে বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পারে। এমন কি যাতে প্রত্যেক বাড়ীতেই কলে গরম জল পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করাও আমাদের উদ্দেশ্য রয়েছে। জল গরম করবার জন্য আমরা বিদ্যুতের ব্যবহার করব।

প্রঃ—আপনারা নগরের নরনারীদের জন্য মোটের উপর গড়পড়তা কত করে খরচ করে থাকেন?

উঃ—জন প্রতি পপ্‌লারে খরচ হয় ২৩ শিলিং ২ পেন্স, অর্থাৎ প্রায় টাকা ষোল সতের। আমরা অবশ্য গরিব পাড়ার লোক আগেই তা বলেছি। কিন্তু আর একটি পাড়ার খরচের হিসাব দিলে লণ্ডনের দৌড় বুঝতে পারবেন। কেনসিংটন বরোতে গড়পড়তা জন প্রতি খরচ হয় ৩০ শিলিং ১০ পেন্স অর্থাৎ প্রায় ২২ টাকা। তবে এখানে একটা কথা আপনার জানা আবশ্যক। গরিব বরোদেরকে ধনী বরোদের তরফ হতে টাকা সাহায্য করবার আইন আছে। সেই আইনের নাম "লোক্যাল অথরিটিজ ফিনানশ্যাল প্রোভিসন্‌স্ অ্যাক্ট"। এর ফলে গরিব বরোদের কাউন্টি কাউন্সিল ইত্যাদি ৪ কর্ম্মকেন্দ্রে কম চাঁদা দিলেও চলে। অর্থাৎ শিক্ষা-ব্যবস্থা, জল-সরবরাহ, পুলিস এবং আশ্রয় নামক ৪ কর্ম্মকেন্দ্রে যত টাকা খরচ হয় তার অধিকাংশ আসে ধনী বরো হতে।

প্রঃ—এখন আমি আপনার ব্যক্তিগত কাজ সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই।

উঃ—আমার কাজকর্ম্ম প্রধানতঃ ২টী প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কে চলে থাকে। প্রথমটীর নাম "কিংস্‌লি হাউস", দ্বিতীয়টির নাম "চিলড্রেন্‌স্‌ হাউস"। এই ২টী প্রতিষ্ঠানের জন্মদাতা আমার পিতা। আমরা দুই বোন এই কাজে লেগে আছি। প্রতিষ্ঠানের ঘর-বাড়ীগুলি আমাদের টাকাতেই তৈরী হয়েছে; কিন্তু কাজকর্ম্ম যা চলে তার জন্য কিছু পাই চাঁদা তুলে, অধিকাংশ খরচই আসে লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিল থেকে অথবা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের তহবিল থেকে

প্রঃ—কাউন্টি কাউন্সিল আপনাদেরকে টাকা দেয় কেন?

উঃ—আমাদের "চিলড্রেনস্‌ হাউস" বা ছেলেপিলেদের ভবনটা বাস্তবিক পক্ষে শিক্ষাকেন্দ্র বা পাঠশালা-বিশেষ। কাজেই কাউন্টি কাউন্সিলের সাহায্য আমরা সহজেই আশা করতে পারি।

প্রঃ—আপনাদের এই সকল পাঠশালায় কিরূপ কাজ হয়? তার একটা বিবরণ দিবেন কি?

উঃ—২ বৎসর থেকে ৫ বৎসর বয়সের শিশুরা এখানে আসে। সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্য্যন্ত এখানেই থাকে। খাওয়া দাওয়া এখানেই হয়। শিশুদের কাছ থেকে জন প্রতি সপ্তাহে আমরা দেড় শিলিং বা টাকা খানেক নিয়ে থাকি। এতে অবশ্য কুলায় না, সমস্ত খরচ আমাদেরকে বহন করতে হয়। এটাকে একটা কিণ্ডারগার্ডেন স্কুল বিবেচনা করা যেতে পারে। তা ছাড়া, আর একটা শিক্ষাকেন্দ্র আছে, সেটা একমাত্র রবিবার দিন বসে। এতে রাস্তার ছেলেপিলেরা এসে জমা হয়। তাদেরকে শিখাবার জন্য আমাদের পরিচিত বন্ধুদের মেয়েরা কাজ করে। এই দুই স্কুলেরই সঙ্গে গল্প বা কথকতা, গান-বাজনা ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে। ৪টা থেকে ৫ টার ভিতর সপ্তাহে একদিন এই অনুষ্ঠান চলে।

প্রঃ—"কিংস্‌লি হাউসে" কি কি কাজ হয়?

উঃ—আমরা যখন কাজ সুরু করি তখন মাদকতা-নিবারণ ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। তা ছাড়া, পাড়ার লোকেরা এসে কোনো এক জায়গায় বিনা পয়সায় খেলাধুলা আমোদ-প্রমোদ গল্প-গুজব করতে পারে, তার জন্য একটা আড্ডা তৈরী করে দেওয়া আমার পিতার উদ্দেশ্য ছিল। এই প্রতিষ্ঠানটা এখন নানা বিভাগে বিভক্ত হয়ে উঠেছে। প্রতি সপ্তাহে একদিন করে বিকাল বেলা মেয়েদের ক্লাব বসে। তাতে ৪০।৫০ জন লোক সাধারণতঃ উপস্থিত হয়। আর একটা বিভাগে মেয়েদেরকে শিশু-পালন; স্বাস্থ্য-রক্ষা, গৃহস্থালী, শিল্প-কাজ ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। রবিবার দিন আমরা গীর্জ্জা-বিবর্জ্জিত ধর্ম্ম-প্রচার, বক্তৃতা, সাহিত্য-আলোচনা, সঙ্গীতচর্চ্চা এবং নানা বিষয়ে তর্কপ্রশ্ন চালিয়ে থাকি। এতে লোকজন উপস্থিত হয় ঢের। গ্রীষ্মকালে আমরা সদলবলে সহরের বাইরে বন-ভ্রমণের ব্যবস্থা করি। তা ছাড়া, এই প্রতিষ্ঠান থেকে এমন কি সরকারী আইন অনুসারে বিবাহ দিবার আয়োজনও হতে পারে।

প্রঃ—আপনার সঙ্গে কাজ করে কয় জন লোক?

উঃ—১১ জন, তাদের ভিতর একজন মাত্র পুরুষ। অন্যান্য ১০ জনের ভিতর এক জন আমার ভগ্নী। এদের ভিতর মাত্র একজন বাহির থেকে আসেন। তা ছাড়া আমরা ৯ জন এই "চিলড্রেন হাউস" বাড়ীতে বসবাস করে থাকি।

প্রঃ—বিলাতী সমাজের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কোন কোন লোক আপনাদের কাজে সহানুভূতি দেখিয়েছেন কি?

উঃ—সাহিত্যরথীদের ভিতর ওয়েলস্‌, গলসওয়ার্থি ইত্যাদি নামজাদা লোক আমাদের কাজ বেশ পছন্দ করেন। রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের ধুরন্ধরদের ভিতর মজুর দলের রামজে-ম্যাকডোনাল্ড, ল্যান্সবেরী, স্মার ইত্যাদি অনেকেই আমাদের পৃষ্ঠপোষক। সরকারী কর্ম্মচারীদের ভিতর কৃষি-সচিব বাক্‌সটন এবং প্রধান মন্ত্রী বলডুইনের পত্নী আমাদের কাজের খোঁজ খবর নিয়ে থাকেন। আমার বিলাত ছেড়ে আসবার কয়েক দিন আগে ১০নং ডাউনিং ষ্ট্রীটে,—মন্ত্রি-প্রাসাদে,—বলডুইনের পত্নীর আয়োজনে আমাদের একটী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

"হেবেল্ট হিবর্ট্ শাফ্ টলিখেস্ আখিহ্ব"
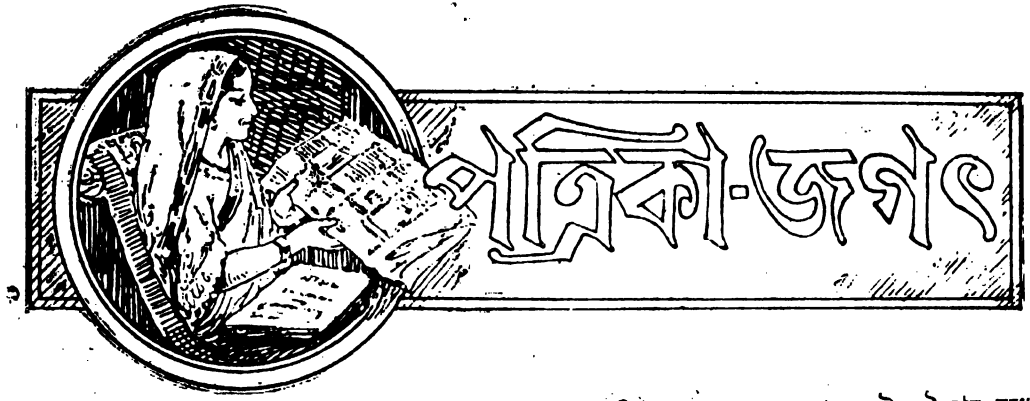
এপ্রিল, ১৯২৬, (১) এক প্রবন্ধে ইয়োরোপের আর্থিক অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া লেখক ফ্রেঙ্কেল বলিতেছেন,—"আমেরিকা হইতে পুঁজি না পাইলে ইয়োরোপের দেশগুলা আর্থিক উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না। অধিকন্তু মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, এবং আফ্রিকা ইত্যাদি জনপদে ইয়োরোপীয়ান উপনিবেশ কায়েম হওয়া আবশ্যক। ইয়োরোপের সঙ্গে এই সকল নবভূখণ্ডের আমদানি-রপ্তানি না বাড়িলে ইয়োরোপ আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না।" (২) আর এক প্রবন্ধে হান্তোস বলিতেছেন,—"ইয়োরোপ রাষ্ট্রীয় হিসাবে নানা খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আর্থিক হিসাবে এইগুলাকে একটা ইয়োরোপীয় শুল্ক-সঙ্ঘের তাঁবে ঐক্যগ্রথিত করা আবশ্যক।"

"কাজের লোক"

গোবরের সার

আমাদের দেশে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত সার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নদীর পলী, পচা পুকুরের পাঁক, গোময়, গোমূত্র, ভেড়া ও ছাগলের মূত্র এবং নাদী, গোয়াল কোঁড়া, গোয়ালের ঘর মোছা খড়কুটা পচান, ঘুঁটে বা কাঠ পোড়ান ছাই, মানুষ ও পশু-পক্ষীর বিষ্ঠা, উঠান ঝাঁট দেওয়া আবর্জ্জনা, পাতা পচা, সরিষা বা রেড়ীর খইল, হাড়ের গুঁড়া, নুণ।

গতবারে নদীর পলীর কথা বলিয়াছি, গোবর এবং গোমূত্রে উদ্ভিদের জীবনধারণোপযোগী অনেক পদার্থ বিদ্যমান থাকে বলিয়া গোময় এবং গোমূত্র উৎকৃষ্ট সার মধ্যে গণ্য। এই উভয় পদার্থে যথেষ্ট পরিমাণ পটাস, ফস্ফর, নাইট্রোজেন থাকে। গোময় অপেক্ষা গোমূত্রেই অধিক পরিমাণ নাইট্রোজেন থাকে। এই নাইট্রোজেন উদ্ভিদ-জীবনের পক্ষে অতি আবশ্যক উপাদান।

কিন্তু আমাদের দেশের কৃষকগণ এই দুইটী পদার্থই অতি অযত্নে রক্ষা করিয়া থাকে। গোবর রক্ষা করিতে হইলে একটা খাদের মত কাটিয়া তাহার তলাটা কংক্রিট করার মত করিয়া সিমেণ্ট করিয়া দিলে আর মৃত্তিকার দ্বারা সারের আবশ্যক উপকরণসমূহ শোষিত হইতে পারে না, গোবরে পটাস, নাইট্রোজেন, ফস্ফর ঠিক থাকে। এই খাদের ভিতর সঞ্চিত গোবরে প্রখর রৌদ্র লাগিলেও ইহার আবশ্যক উপাদানগুলি নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং ইহার উপর চালা করিয়া একটা আচ্ছাদন দিতে পারিলে সার ঠিকই থাকিয়া যায়। কিন্তু এমন করিয়া কোনো কৃষক সার রক্ষা করে কেহ কি দেখিয়াছেন? আমাদের দেশের অনভিজ্ঞ কৃষক জমিতে কতকগুলা শুষ্ক গোবরের গাদা ঢালিয়া দিয়া দর্প করিয়া বেড়ায় যে জমিতে যথেষ্ট সার দিয়াছি। সে সার বৃথা সার। সে নির্জীব সার দেওয়ায় শস্যের কিছু হিত হয় না, শুধু বহনের ব্যয় হয় ও সময় নষ্ট হয়, ফলে চাষের খরচ বাড়ে মাত্র।

তারপর অনেক স্থলে কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে গোময় পোড়াইয়া ছাইগুলি জমিতে দেওয়া হইয়া থাকে। এই ছাই সারে জমির মাটি একটু সচ্ছিদ্র করিয়া দেয় মাত্র এবং ইহাতে পটাসেরও অংশ থাকিতে পারে। কিন্তু এই ঘুঁটের ছাই গোমূত্রে সিক্ত করিয়া সযত্নে রাখিয়া দিতে পারিলে কতকটা উপকার হইতে পারে।

গোমূত্র এবং পশু-মূত্র এদেশে একেবারেই উপেক্ষিত। কৃষকগণ মূত্ররক্ষার জন্য আদৌ যত্নবান নহে। এই উৎকৃষ্ট সারটা অযথা নষ্ট হইয়া যায়।

পাশ্চাত্য দেশে গবাদির শয়নের জন্য বিচালী বিছাইয়া দেওয়া হয়। এই বিচালির উপর প্রস্রাব করিলে মূত্রের আবশ্যক উপাদান অনেকটা ঐ মূত্রসিক্ত বিচালির দ্বারা ধরা পড়িয়া থাকে। সেই বিচালি লইয়া গিয়া ক্ষেত্রে গর্ত্ত করিয়া পুঁতিয়া দেওয়া হয়, এবং এইরূপে গোশালা-জাত সারের সদ্ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

মানুষের বিষ্ঠা গোময় অপেক্ষা আদৌ নিকৃষ্ট সার নহে। কিন্তু এদেশে তাহা সহরের নিকটবর্ত্তী কপির ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য জমিতে দেওয়া হয় না। তবে গ্রামের নিকটবর্ত্তী জমিগুলিতে লোকে মলমূত্র ত্যাগ করে বটে। এখন আর গো-চারণের মাঠ কোথাও নাই বলিলেই হয়। শস্য উঠাইয়া লওয়া হইলে মাঠে গরু চরান হয়; কিন্তু পল্লী গ্রামে অনেকে লক্ষ্য করেন না যে, অনেক নিম্ন শ্রেণীর নর-নারী মাঠের গোবর কুড়াইয়া লইয়া তাহা দ্বারা ঘুঁটের ব্যবসা করিয়া থাকে। এটা গ্রামের লোকের বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। এইরূপে জমিতে যে অল্প-বিস্তর সার স্বাভাবিক উপায়ে পড়িত, তাহাও নষ্ট হইয়া যায়।

"নেচার"

প্রকৃতি, লণ্ডনের সাপ্তাহিক বিজ্ঞান-পত্রিকা; ২ অক্টোবর ১৯২৬। নাইট্রোজেন-ঘটিত সার কৃত্রিম উপায়ে বাড়াইবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য। প্রবন্ধে জার্ম্মাণ রাসায়নিক হাবারের উদ্ভাবিত প্রণালীর তারিফ আছে। জার্ম্মাণির পরেই আজকাল বিলাতের ঠাঁই। কৃত্রিম সার ব্যবহারে, পরিমাণ হিসাবে সর্ব্বপ্রথম হইতেছে হল্যাণ্ড, তাহার পর জার্ম্মাণি। সম্পাদক বলিতেছেন,—"রাসায়নিক শিল্পে ও বাণিজ্যে ইংরেজকে জগতে মাথা খাড়া করিয়া রাখিতে হইলে এই দিকে পাকা মাথাওয়ালা লোকজনকে টানিয়া আনা দরকার। তাহার জন্য চাই যথোচিত দক্ষিণার ব্যবস্থা। তাহা ছাড়া, ইংরেজ চাষীরা বড় বেশী সনাতনপন্থী। তাহাদিগকে দিয়া একটা নতুন-কিছু করানো সোজা কথা নয়। চাষী মহলে কৃত্রিম নাইট্রোজেন-সার সুপ্রচলিত করিতে হইলে বিজ্ঞাপনে, দর্শনীতে আর পল্লী-পরীক্ষাগারে অনেক টাকা ঢালিতে হইবে।"

"সায়েণ্টিফিক্ মান্থলি"

বৈজ্ঞানিক মাসিক,—নিউ ইয়র্ক, অক্টোবর ১৯২৬,—(১) চষা জমির সঙ্গে লোক-সংখ্যার সম্বন্ধ (স্যার ডেনিয়েল হল)। লেখকের মতে পৃথিবীর লোক-সংখ্যা যেরূপ বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে খাদ্যসঙ্কট অবশ্যম্ভাবী। লোক-সংখ্যা যাহাতে না বাড়িতে পারে সেই দিকে প্রথম দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ, ফসল বাড়াইবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু চাষ-যোগ্য জমির পরিমাণ জগতে বেশী নয়। অতএব বৈজ্ঞানিক প্রণালী কাজে লাগাইয়া অল্প-পরিমাণ জমি হইতে বেশী মাল উৎপন্ন করা মানবজাতির বর্ত্তমান সাধনা। (২) যুক্তরাষ্ট্রের "শক্তি"-সম্পদ্ (হ্যারিসন প্যাণ্টন)। জল-শক্তির সদ্ব্যবহার বাড়াইবার দিকে দুনিয়ার সর্ব্বত্রই নজর গিয়াছে। লেখক বলিতেছেন,—"তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু মার্কিণ মুল্লুকে কয়লার সম্পদ্ প্রচুর। কয়লার যুগ জগতে এখনো অনেক দিন থাকিবে।"

"আমেরিকান জার্ণ্যাল অব্ সোসিঅলজি"

মার্কিণ সমাজবিজ্ঞান-পরিষদের ত্রৈমাসিক মুখপত্র, সেপ্টেম্বর ১৯২৬,—(১) দারিদ্র্যের পরিমাণবৃদ্ধি এবং সরকারী শাসনের প্রসার-লাভ (পিটিরিম সর্‌কিন)। (২) মহিলাদের উচ্চশিক্ষা আর পারিবারিক জীবনের উপর তাহার প্রভাব (নান্সি স্কট)। লেখিকা বলিতেছেন যে, আমেরিকার মহিলা গ্র্যাজুয়েটেরা ঘরকন্না পছন্দ করে না বলিয়া যে গুজব রটিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ অমূলক। বরং তাহারা উচ্চ অঙ্গের পরিবার গড়িয়াই তুলিতেছে। ইহাতে ভবিষ্যতের মার্কিণ সমাজ উন্নত হইবে। (৩) ধনদৌলতের সঙ্গে ধর্ম্ম-কর্ম্মের যোগাযোগ।

"হিব্বার্ট জার্ণ্যাল"

ধর্ম্মতত্ত্ব ও দর্শন বিষয়ক ত্রৈমাসিক, লণ্ডন, অক্টোবর ১৯২৬ :—"ধন-সঞ্চয়ের নীতি" (আলেকজাণ্ডার ম্যাকেন্‌ড্রিক)।

"ডায়চে রুণ্ডশাও"

"জার্ম্মাণ পর্য্যবেক্ষণ," মাসিক, বার্লিন, অক্টোবর ১৯২৬,—(১) ভবিষ্যতের আর্থিক জীবন (অধ্যাপক হ্বার্ণার সোম্বার্ট), (২) যুক্তরাষ্ট্রের আটপৌরে জীবনে যন্ত্রপাতি এবং কলকব্জার বাড়তি (অধ্যাপক কর্ণেলিয়ুস গুলিট)।

"রেহ্বি দেকোনোমী পোলিটিক"

ফরাসী আর্থিক পত্রিকা, দ্বৈমাসিক, প্যারিস, মে-জুন ১৯২৬ :—(১) বিনিময়ের বিভিন্ন দার্শনিক ব্যাখ্যা (আল্‌বেয়ার আফতালিঅঁ, (২) টাকাকড়ি সম্বন্ধে আজকালকার বিলাতী মতামত (জঁ পেয়ার লাজার), (৩) বিলাতের দুর্গতির বিলাতী ব্যাখ্যা (লুই বোস্থঁ), (৪) শুল্ক-সমস্যায় কৃষি ও শিল্প, (৫) রুশিয়ায় কন্‌সেশ্যনের (অনুগ্রহের) যুগ, (৬) জেনেহ্বার আন্তর্জ্জাতিক মজুর-কর্ম্মকেন্দ্র।

জুলাই-আগষ্ট, ১৯২৬ :—

(১) বিনিময়ের চিত্ত-বিজ্ঞান (আলবেয়ার আফতালিঅঁ। (২) "ক্রয়-শক্তির সমতার" উপর বিনিময়ের হার নির্ভর করে কি? (আল্‌ফ্রেদ পজ)। সুইডেনের ধনবিজ্ঞানাধ্যাপক কাসেল এই মত প্রচার করিয়াছিলেন। যুদ্ধের সময় সকল দেশেই মূল্যবৃদ্ধি ঘটে আর কাগজের টাকার চলও বাড়ে। সোনার টাকা কোথাও ছিল না। কাসেল বলেন, এই অবস্থায় কাগজের টাকার আসল মূল্য ছিল মাল এবং পণ্যদ্রব্য। এক দেশের টাকার সঙ্গে অন্য দেশের টাকার তুলনা করিবার সময় লোকেরা প্রত্যেক টাকার পশ্চাতে সোনা কতখানি আছে না আছে ভাবিয়া দেখিত না। ভাবিয়া দেখিত একমাত্র মাল খরিদ করিবার ক্ষমতা। এক দেশের টাকার ক্রয়-শক্তির সঙ্গে অপর দেশের টাকার ক্রয়-শক্তির সমতা দেখিয়া বিনিময়ের হার নির্দ্ধারণ করা হইত। এই হার-নির্দ্ধারণটা নেহাৎ খাম-খেয়ালির চিজ নয়। সোনার টাকার আমলে বিনিময়ের হার যেরূপ কড়ায় ক্রান্তিতে সম্ভবপর ছিল এই কাগজী টাকার আমলেও সেইরূপই দেখা গিয়াছে। কাসেলের মতে এই নয়া হারটা সহজেই বাহির করা যায়। যে-দেশে টাকার দাম যত কমিয়াছে তত দিয়া পুরাণা হারকে গুণ করিলেই হইল। ধরা যাউক সোনার যুগে ১ পাউণ্ডের দাম ২০ মার্ক। ইন্‌ফ্লেশ্যানের (কাগজীমুদ্রার পরিমাণ-বৃদ্ধির) ফলে ধরা যাউক নয়া পাউণ্ডের দাম হইয়াছে পুরাণা পাউণ্ডের দুই ভাগের এক ভাগ আর নয়া মার্কের দাম হইয়াছে ১০ ভাগের এক ভাগ। তাহা হইলে এই কাগজী মুদ্রার বিনিময়ের হার হইবে ২ পাউণ্ড = ২০০ মার্ক। কাসেলের এই মত কতটা টেঁকসই তাহা সমালোচনা করিবার জন্য পজ সুইডেন, স্পেন, ফ্রান্স, ইতালি, ইংল্যণ্ড, এবং জার্ম্মাণি এই কয়দেশের মূল্যবৃদ্ধি ইন্‌ফ্লেশ্যনের পরিমাণ এবং বাস্তব জগতের বিনিময়-হার এক সঙ্গে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। পজ বলিতেছেন,—"কাসেলের সিদ্ধান্তের সঙ্গে বাস্তবের মিল নাই।"

"বঙ্গবাণী"

কার্ত্তিক, ১৩৩৩ :—(১) কহে শুভঙ্কর মৌজুদ গণ (শ্রীহৃষীকেশ সেন), (২) সেকালে বাঙ্গালীর বাণিজ্য (শ্রীতমোনাশ চন্দ্র দাসগুপ্ত)

ভারতীয় রাজস্ব-প্রথা বুঝাইবার জন্য শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ সেন যাহা বলিয়াছেন তাহার কিয়দংশ নিম্নরূপ :—

সংস্কৃত শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হবার পূর্ব্বে সকল প্রকার আয় ভারত গবর্ণমেণ্টেই জমা হত, আর ভারতগবর্ণমেণ্ট তদধীন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলিকে তাঁদের ব্যয়ের জন্য যা' আবশ্যক তা' দিতেন। সংস্কৃত শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হবার পরে আয়কর কতকগুলি বিষয়, যেমন জমির খাজনা কাটা-খালের আয়, আবগারি, কোর্ট ফি ষ্ট্যাম্প প্রাদেশিক গবর্ণ-

মেণ্টগুলির হাতে সমর্পণ করে দেওয়া হল। তাঁরাই এই সকল রাজস্ব সংগ্রহ করবেন এবং তা ব্যয় করবেন। এই বন্দোবস্তের মধ্যে কিন্তু সর্ত্ত থাকল যে, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট-গুলিকে সকলে মিলে ভারত গবর্ণমেণ্টকে দিতে হবে ন' কোটি তিরাশী লক্ষ টাকা। এর মধ্যে বাঙলার ভাগে ৬৩ লক্ষ টাকা। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট এখন দু'ভাগে বিভক্ত—এক ভাগে থাকল সপারিষদ গবর্ণরের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব, আর অপর ভাগে থাকল গবর্ণরের অনুগ্রহাধীন মন্ত্রীদের কর্ত্তৃত্ব। বিষয় বিভাগ হল বটে কিন্তু বিষয়ের আয়টার ভাগ হল না। বন্দোবস্ত হল আয়টা এক জায়গায়ই থাকবে, মন্ত্রীদের যা' আবশ্যক, তা' তাই থেকে দেওয়া হবে। দেওয়া হবে, কিন্তু দিতেই হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা থাকল না। কাজেই কথার মত কাজ হল না। মন্ত্রীরা আবশ্যকমত টাকা পেলেন না। অন্য অন্য কারণের মধ্যে এই একটা কারণ, বোধ হয় প্রধান কারণ, যার জন্য দ্বৈত শাসন কোন কোন প্রদেশে অচল হয়ে গেল। যে ব্যবস্থায় স্থাবর শাসকমণ্ডলী প্রজা-প্রতিনিধিদের ভোটের দ্বারা স্থানচ্যুত হতে পারে না, সে ব্যবস্থায় অস্থাবর দায়িত্ববিহীন মন্ত্রীদিগকে স্থানচ্যুত করে দ্বৈত শাসনের এক অঙ্গকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করাই সহজ এবং প্রতিনিধিরা তাই করেছেন। স্থাবর শাসকমণ্ডলী এবং জঙ্গম মন্ত্রিমণ্ডলী—এ দুয়ের একীকরণে যে দ্বৈত শাসন, তা' কখনও স্থায়ী হতে পারে না।

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ভারতগবর্ণমেণ্টের আর্থিক অবস্থা এক রকম ভালই ছিল। কিন্তু ১৯১৮-১৯ সনে দেখা গেল জমার চেয়ে খরচ বেশী হয়েছে ৬ কোটি টাকা। পর বৎসর ছ' কোটি বেড়ে ২৪ কোটি হল, খরচের চেয়ে জমার কমতি হল ২৪ কোটি। তার পর বৎসর (১৮২০-২১ সনে) কমতি হল ২৬ কোটি। তার পর বৎসর অর্থাৎ ১৯২১-২২ সনে নতুন সংস্কৃত শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রথম অধিবেশন হল। নতুন ব্যবস্থাপকেরা দেখলেন সেবারকার বজেটে কমতি হয়েছে ১৮,০০,০০,০০০আঠার কোটি। এই স্বল্পতা পূরণ করবার জন্য বাণিজ্যশুল্ক কিছু কিছু বাড়াবার প্রস্তাব করা হল; সঙ্গে সঙ্গে খরচ কমাবারও প্রস্তাব করা হল। হিসেব করে দেখা গেল এতে বৎসরের শেষে রাজস্ব কিছু উদ্বৃত্ত হবে। কিন্তু পর বৎসর ব্যবসা-বাণিজ্য বড় মন্দা হয়ে গেল। যত টাকা রাজস্ব আদায় হবে আশা করা গিয়েছিল প্রকৃত পক্ষে তার চেয়ে ২০,০০,০০,০০০ কুড়ি কোটি টাকা কম আদায় হল। আর খরচ কিছু বেড়ে গেল। ফল হল ৩৩,০০,০০,০০০ তেত্রিশ কোটি টাকার ঘাটতি। নতুন ব্যবস্থাপক সভা এতে অসন্তুষ্ট হলেন এবং গবর্ণমেণ্টকে খরচ কমাতে বললেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যখন রাজস্ব-বৃদ্ধির সম্ভাবনা বোঝাবার চেষ্টা করে দেশী-বিলাতী সুতো এবং কাপড়ের উপর শুল্ক বাড়াতে চাইলেন তখন ব্যবস্থাপক সভা উল্টো বুঝলেন। তাঁরা বুঝলেন যে, এই শুল্ক-বৃদ্ধির প্রস্তাব কাজে পরিণত হলে দেশী মিলের সুতো এবং কাপড়ের ব্যবসায়ের হানি হবে। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিলিতী মিলেরই সুবিধা হবে। কাজেই ব্যবস্থাপক সভায় সে প্রস্তাব গৃহীত হল না। নুণের টেক্সও বাড়াবার চেষ্টা গবর্ণমেণ্ট করেছিলেন। ব্যবস্থাপক সভা তাতেও বাধা দিলেন।

তার পরেই আরম্ভ হল খরচ কমাবার চেষ্টা। লর্ড ইঞ্চকেপ-শীর্ষক কমিটি ভারতগবর্ণমেণ্টের সমস্ত কার্য্যবিভাগ নিরীক্ষণ করে ১৯,২৫,০০,০০০ উনিশ কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা পরিমাণ ব্যয়-সংক্ষেপের প্রস্তাব করলেন। এক সৈনিক বিভাগেই ১০,৫০,০০,০০০ দশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকার খরচ কমাইতে চাইলেন। অন্যান্য বিভাগের মধ্যে রেলওয়ে বিভাগে সাড়ে চার কোটি, পোষ্ট এবং টেলিগ্রাফ বিভাগে এক কোটি ত্রিশ লক্ষ এবং সাধারণ শাসন-বিভাগে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা খরচ কমাবার প্রস্তাব করলেন।

প্রস্তাব ত হল এই রকম। কিন্তু কাজ কি রকম হল দেখা যাক। সৈনিক বিভাগে ইঞ্চকেপ কমিটি প্রস্তাব করেছিলেন সাড়ে দশ কোটী টাকা কমাতে; গবর্ণমেণ্ট কমাবার প্রস্তাব করলেন পৌনে ছ' কোটি (পাঁচ কোটী পঁচাত্তর লক্ষ)। আর অ-সৈনিক বিভাগে কমিটির প্রস্তাব ছিল আট কোটি টাকা কমান। গবর্ণমেণ্ট কমাবেন বললেন ছ' কোটি ষাট লক্ষ। এ ছাড়া আরও দু' একটি বিষয়ে কিছু কিছু কমাতেও গবর্ণমেণ্ট রাজী হলেন। এর মোট ফল হল এই:—১৯২২-২৩ সনের বজেটে অনুমান করা

গিয়েছিল যে পর বৎসর মোট খরচ হবে ২১৫ কোটি ২৭ লক্ষ। কিন্তু ১৯২৩-২৪ সনের হিসাব প্রস্তুত হলে দেখা গেল খরচ হয়েছে ২০৪ কোটি ৩৭ লক্ষ। কিন্তু জমাটা হল ১৯৫ কোটি ২০ লক্ষ—অর্থাৎ জমার চেয়ে খরচ বেশী হল ৯ কোটি ১৭ লক্ষ। এ অবস্থার প্রতিবিধানের একমাত্র উপায় জমার বৃদ্ধি করা এবং গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করলেন নুণের টেক্স বৃদ্ধি করে এই কাজ করা সব চেয়ে সহজ। টেক্সটা ছিল মণকরা ১।০। প্রস্তাব হল একে বাড়িয়ে করা হক মণকরা ২।।০ টাকা। রাজস্ব-সচিব অনেক তর্কজাল বিস্তার করে ব্যবস্থাপক সভাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, এই প্রস্তাব ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক অনুমোদিত না হলে জমা খরচের মিল রাখা অসম্ভব, এবং জমাখরচের মিল রাখতে না পারলে টাকার বাজারে ভারতগবর্ণমেণ্টের পসার প্রতিপত্তির হানি হবে। কিন্তু দেশীয় নির্ব্বাচিত সদস্যেরা এ যুক্তি বুঝলেন না; প্রস্তাবটিও তাঁদের অনুমোদিত হল না। কিন্তু তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন যে, তাঁদের অনুমোদনটা পরামর্শ মাত্র; পরামর্শগ্রহীতা তা শুনতেও পারেন, না শুনতেও পারেন। এক্ষেত্রে পরামর্শগ্রহীতা গবর্ণর জেনারেল পরামর্শটা শুনলেন না, সার্টিফিকেট দিয়ে বর্দ্ধিত লবণকর সমেত বজেট পাশ করে দিলেন। দেশের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক অবস্থার উপর এর প্রভাব যাই হক, বজেটে জমাখরচের মিল হল; টাকার বাজারে গবর্ণমেণ্টের প্রতিপত্তি বাড়ল।

টাকার বাজারে পসার-প্রতিপত্তি বাড়ার অর্থ সহজে ঋণ পাওয়া। ঋণ পাওয়া গেলেই ঋণগ্রহণের প্রবৃত্তিটা প্রবল হয়। প্রয়োজনটা (কাল্পনিক বা বাস্তবিক) অবশ্য সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে। এমন অবস্থায় দর্শনকারের পরামর্শ 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' অবশ্য গ্রহণীয়। ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে এ পরামর্শ-গ্রহণের যুক্তি এই যে, সে ঋণ আর শোধ দিতে হবে না, ঋণগ্রহীতার ভস্মীভূত দেহের সঙ্গে তার অবসান হবে। গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এই যুক্তি দেখান যেতে পারে যে, ঋণগ্রহীতা গভর্ণমেণ্ট "ঘৃতং পিবেৎ" এবং তার পরবর্ত্তী গভর্ণমেণ্ট তা "পরিশোধয়েৎ।" এই নীতি অনুসারে ১৯২৩ সনে গভর্ণমেণ্ট ঋণ করলেন ভারতবর্ষে ২৪ কোটি টাকা এবং বিলেতে ২০ মিলিয়ন পাউণ্ড বা তিন কোটি টাকা। ভারতবর্ষের টাকার ঋণটার সুদ হল শতকরা পাঁচ টাকা আর সেই সুদটা হল আয়করমুক্ত। সুদটা আয়করমুক্ত হওয়াতে সাক্ষাৎভাবে গবর্ণমেণ্টের এবং পরোক্ষভাবে দেশের শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষতি হয়েছে—এ কথা গবর্ণমেণ্টের বোঝা উচিত ছিল। ঋণদাতারা যদি এই টাকাটা ঋণরূপে গবর্ণমেণ্টকে না দিয়ে মূলধনরূপে শিল্পবাণিজ্যে নিযুক্ত করতেন তা' হলে তার লাভ থেকে তাঁদের আয়কর দিতে হত। সুতরাং টাকাটা ঋণরূপে গ্রহণ করে গবর্ণমেণ্ট সেই অনুপাতে আয়কর থেকে বঞ্চিত হয়েছেন আর দেশের শিল্পবাণিজ্যও সেই অনুপাতে মূলধন থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

বিলিতী ঋণের প্রথম কথাই এই যে, তার কাগজ গবর্ণমেণ্ট শতকরা ৯০ টাকায় বার করলেন—অর্থাৎ মহাজনকে শতকরা ১০ টাকা নজরাণা দিয়ে এই টাকাটা ধার করলেন। ঋণ গ্রহণের আরম্ভেই এই ক্ষতি। তার পর সুদ দেবার সময় ভারতীয় টাকাকে বিলিতী পাউণ্ডে পরিণত করবার বাটা দিয়ে বিলেতে পৌছে দিতে হবে। বাটার পরিমাণটি নিতান্ত নগণ্য নয়। ১৯২৩-২৪ সনে বিলিতী ঋণের সুদের বাবদে এবং অন্যান্য বাবদে গবর্ণমেণ্টকে বাটা দিতে হয়েছিল ১৪,৭৭,৫৬,২১৬, চোদ্দ কোটি সাতাত্তর লক্ষ, ছাপান্ন হাজার দু'শ' ষোল টাকা। এ সম্বন্ধে আর একটি কথা আছে। (১৯২৪-২৫) সনের বাটার হার ছিল টাকাটায় এক শিলিঙ চার পেন্স। কিন্তু পর বৎসর (১৯২৪-২৫) গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছামত একে করে নিয়েছেন টাকায় দুই শিলিঙ; এতে গবর্ণমেণ্টের ইংরেজ কর্ম্মচারীদের বিলেতে টাকা পাঠানোর খুব সুবিধা হয়ে গিয়েছে। আগে একজন ইংরেজ সিবিলিয়ানকে এক পাউণ্ড বিলেতে পাঠাতে হলে পনর টাকা দিতে হত। এখন দশ টাকা দিলেই হয়। কিন্তু একজন বণিক যদি এক পাউণ্ড বিলেতে পাঠাতে চান তাঁকে দিতে হবে ১৩।।০ টাকা, কারণ বাণিজ্য-জগতে ও হার চলে না। সেখানকার বর্ত্তমান হার টাকায় ১ শিলিঙ ৫¾ পেন্স। ভারতীয় টাকার ঋণে এ বালাই নাই।

"অ্যাগ্রিকালচারাল জার্ণ্যাল অব ইণ্ডিয়া"

ভারত সরকারের কৃষি-দপ্তরের ত্রৈমাসিক, জুলাই, ১৯২৬।

(১) বোম্বাই ও দাক্ষিণাত্যের ক্যানাল ভূভাগে কৃষি-বিস্তার, (টি, এফ, মেন), (২) উৎকৃষ্ট সার নির্ম্মাণের জন্য গোময় ও গোমূত্র সম্বন্ধে গবেষণা (পি, ই, ল্যাণ্ডার), (৩) ব্যাধির হস্ত হইতে গোজাতির রক্ষার উপায়, (বেনেট), (৪) বীজ শিল্পের প্রসার ও ডেনমার্কে সমবায়, (৫) আইলের চাষ-পদ্ধতি (ভীমাভাই, এম, দেশাই), (৬) যুক্ত প্রদেশে পাটের চাষ (টি, আর, লো), (৭) রথাম ষ্টিডে কৃষি-বিজ্ঞান গবেষণা (সার এডওয়ার্ড জন রাসেল), (৮) কালিফোর্ণিয়ায় তুলা শিল্প বিস্তারের নিয়ম কানুন (ও,এফ, কুক), (৯) জাভার ইক্ষু ফসল (সুৎনি কোয়ার), (১০) যুক্ত প্রদেশে মুর্গীপালন, (১১) ডিমের গুদাম।

"দি ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইষ্টার্ণ এঞ্জিনিয়ার"

কলিকাতা অক্টোবর, ১, ১৯২৬।

(১) মজুরী ও জরিমানা, (২) ট্রেড ও টেকনিক্যাল বিষয় (সচিত্র), (৩) ক্লাশ ই কার্ব্বন টুল ষ্টীল (৪) নিউজিল্যাণ্ড ও দক্ষিণ সাগর প্রদর্শনী, (৫) ব্যবসা বিষয়ে অনুসন্ধান, (৬) আবাদের জন্য নিড়ানি প্রস্তুত করা, (৭) জাহাজ নির্ম্মাণের অয়েল এঞ্জিন, (৮) টিউব ও অন্যান্য লোহা লক্কড়, (৯) আয়ার্লাণ্ডের নবীন যানবাহন, (১০) সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, (১১) আর্সেনাল ষ্টীল ওয়ার্কস, (১২) হাইকম্প্রেশান অয়েল এঞ্জিন, (১৩) মোটর বাস, (১৪) রেলওয়ে ব্রিজ।

"প্রবাসী"

কলিকাতা, অগ্রহায়ণ ১৩৩৩,—(১) তুলার কীট (শ্রীধীরেশলোভন সেন, এম্, এস-সি, [illegible]ষ্টার, এ, আই-সি), (২) ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা (শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়)।

উত্তরা

লক্ষ্ণৌ, আশ্বিন ১৩৩৩,—(১) ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড্ ও তাহার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত চিন্তামণি ঘোষ (শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস), (২) সামাজিক বিরোধ (শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়)। লেখকের বক্তব্য নিম্নরূপ :—"যে সব জনপদে এখন পর্য্যন্ত আপন আপন ওয়ার্ডের কল্যাণকল্পে নগরবাসীর মনে কোনই সামাজিক কর্ত্তব্যের উদ্রেক হয় না, সেখানে জাতি বা সম্প্রদায় হিসাবে সামাজিক কর্ত্তব্য ভাগ করিয়া লওয়াই কার্য্যকরী। * * * দেশ-ধর্ম্ম যত দিন দুর্ব্বল থাকে জাতি-ধর্ম্মকেই আহ্বান করিয়া সামাজিক কর্ত্তব্যের দিকে পরিচালন করিতে হইবে। * * * ধীরে ধীরে তাহার পর দেশ-ধর্ম্ম জাগিবে। আপনার গণ্ডীর বাহিরে সমাজ ও দেশের প্রতি নূতন কর্ত্তব্যবোধ জাগিবে।"

"মডার্ণ রিভিউ"

কলিকাতা, নবেম্বর ১৯২৬,—(১) ভারতে তেলের কল চালাইবার ব্যবসা সম্বন্ধে লাভালাভের মোসাবিদা (অধ্যাপক বাণেশ্বর দাস), (২) দক্ষিণ আফ্রিকায় কন্‌ফারেন্স। এই মুলুকে ভারতসন্তানের প্রথম অভিযান হইতে আজ পর্য্যন্ত অবস্থা কিরূপ তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। ডিসেম্বর মাসে কেপটাউন নগরে কন্‌ফারেন্স বসিতেছে। সেখানে বৃটিশ ভারতের এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারী প্রতিনিধিগণ এক সঙ্গে প্রবাসী ভারত-সন্তানের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিবেন।

"ইকনমিষ্ট"

লণ্ডন হইতে প্রকাশিত আর্থিক সাপ্তাহিক, ২রা অক্টোবরের সংখ্যায় আছে,—(১) টাকার বাজার, (২) সরকার ও কয়লা-সমস্যা, (৩) কয়লা, লোহালক্কড় ইস্পাত প্রভৃতির সমঝোতা, (৪) ফ্রান্স ও সার উপত্যকা, (৫) দক্ষিণ আফ্রিকার খনিজ সম্পদ্, (৬) ক্যানাল কোম্পানীর ফলাফল, (৭) অর্দ্ধ-বৎসরের হিসাব-নিকাশ (৮) আন্তর্জ্জাতিক ইস্পাত-সঙ্ঘ,

(৯) তুলা শিল্প কারখানায় অল্প সময়ের কাজ, (১০) অষ্ট্রেলিয়ায় লোহালক্কড়ের উপর শুল্কের হার।

"কণ্টেম্‌পোরারি রিভিউ"

লণ্ডন হইতে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা। সেপ্টেম্বর ১৯২৬,—

(১) ইয়োরোপের আর্থিক সমঝৌতা (জে, এ, হবসন), (২) ভারতীয় কৃষি ও সমবায় আন্দোলন (দেবেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি।

অক্টোবর ১৯২৬। (১) কয়লার ব্যবসায় বিরোধ, (সার হিউ, বেল), (২) উৎপাদনের উপর জমিজমার আইনের প্রভাব (স্যার হেনরি রিউ)।

"আত্মশক্তি"

"বর্ত্তমান-জগৎ"—বিবৃত করিতে গিয়া শ্রীপ্রমোদকুমার সেন নিম্নলিখিত তথ্য প্রচার করিয়াছেন :—

রুশিয়া, আফগানিস্থান, পারস্য ও তুরস্ক

সম্প্রতি রুশিয়ার সহিত আফগানিস্থানের যে সন্ধি হইয়াছে সেই সম্পর্কে গত বুধবারে বিলাতে হাউস অব কমন্সে বৈদেশিক সচিব সার অষ্টেন চেম্বারলেন বলিয়াছেন যে, ইংরাজ এই সন্ধিতে ইংলণ্ডের ও ভারতবর্ষের স্বার্থের হানি হইবে বলিয়া মনে করে না। ও দিকে রুশিয়ার সহিত ইংরাজের ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়াইবার যে কথা হইয়াছে, সেই সম্পর্কে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এই সর্ত্ত দিয়াছে যে, রুশিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র পাকাইতে পারিবে না।

মোট কথা রুশিয়া, পারস্য, তুরস্ক ও আফগানিস্থান পরস্পর মৈত্রী স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছে দেখিয়া ইংরাজ বিশেষভাবে সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, পাছে ভারতবর্ষে ইংরাজের স্বার্থের কোনো অনিষ্ট ঘটে। সম্প্রতি তুরস্কের পররাষ্ট্র-সচিব রুশ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধির সহিত কথাবার্ত্তা বলিবার জন্য দক্ষিণ রুশিয়ার ওয়েসা বন্দরে গিয়াছেন বলিয়া বিলাতে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। অনেকে মনে করিতেছে পাশ্চাত্য জাতিদের আন্তর্জ্জাতিক সঙ্ঘের ন্যায় প্রাচ্য জাতিসমূহ এক সঙ্ঘ স্থাপন করিবে। তাহা হইলে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের প্রাচ্যে প্রতিপত্তি নষ্ট হইবে।

বিলাতে ধর্ম্মঘটের অবসান

সাত মাসের পর বিলাতের কয়লার খনির ধর্ম্মঘটের অবসান হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। মজুরগণ গবর্ণমেণ্টের সর্ত্তে রাজী হইয়াছে। এখন প্রত্যেক জেলার মত গ্রহণ করা হইতেছে। সর্ত্তের ফলে মজুরগণ বেতন ও কাজের সময় লইয়া কোনো আপত্তি করিবে না; কোনো স্থলে খনিমালিকদের সহিত মতের বিভিন্নতা হইলে গবর্ণমেণ্ট মধ্যস্থতা করিবেন। ইতিমধ্যেই অনেক মজুর কাজে ফিরিয়া গিয়াছে। মোটের উপর মালিকদের জেদ বজায় থাকিল ও মজুরগণ অর্থের অনাটনের জন্য তাহাদের দাবী ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল।

এতদিন ধর্ম্মঘটের ফলে ইংলণ্ডের যে প্রভূত অর্থনাশ হইয়াছে ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতি হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। স্বরাষ্ট্র-সচিব এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, বিগত দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধে ইংলণ্ডের যে অর্থনাশ হইয়াছিল এই ধর্ম্মঘটের ফলে তাহা অপেক্ষা বেশী অর্থনাশ হইয়াছে। কিন্তু ধর্ম্মঘটের অবসান হইলে পুনরায় বাণিজ্যের উন্নতি হইবে এইরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

শ্রমিকদলের জয় জয় কার

বিলাতে লণ্ডন ব্যতীত অন্যান্য সহরের মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনে শ্রমিকদলের জয় জয়কার হইয়াছে। শ্রমিক-দলের মোট ১৫৮টী স্থান লাভ হইয়াছে ও রক্ষণশীলদল ৮৯ স্থান হারাইয়াছে। মধ্যপন্থী দল হারাইয়াছে ৫৭টি স্থান ও স্বাধীন দল ৩৫টী।

শ্রমিকদলের এই জয়লাভ হইতে মনে হয় আগামী পার্ল্যামেণ্টের নির্ব্বাচনেও তাহাদের জয়লাভের সম্ভাবনা।

'ইণ্ডিয়ান রিভিউ'

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত ভারতীয় মাসিক পত্রিকা,— সেপ্টেম্বর ১৯২৬,

(১) টাকার সমতা-নির্দ্ধারণ, (অধ্যাপক টি, কে, দোরাস্বামী আয়ার), (২) কারেন্সি বিল (এ, রামিয়া),

(৩) লোক-সংখ্যা সম্বন্ধে মতামত (আব্রাহাম), (৪) পল্লী-গড়নের আদর্শ (আর, কৃষ্ণ শাস্ত্রী), (৫) ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য (এস, জি, ওয়ারটি)।

"মুস্‌লিম রিভিউ"

মুস্‌লিম ইনষ্টিটিউট, কলিকাতা হইতে সদ্যঃপ্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা জুলাই, সেপ্টেম্বর, ১৯২৬।

(১) ঢাকার ইংরেজ ফ্যাক্টরীর প্রাচীন ইতিহাস (এ, এফ, এম, আব্দুল আলী), (২) বাংলায় কৃষি-সমবায়,—বঙ্গের কেন্দ্রীয় কৃষি-ক্রয়-বিক্রয়-সমিতি স্থাপন সম্বন্ধে কতকগুলি যুক্তি (পি, মুখার্জ্জি)।

"বেঙ্গল কো-অপারেটিভ জার্ণ্যাল"

বঙ্গীয় সমবায় সমিতির মুখপত্র, কলিকাতা রাইটার্স বিল্ডিং হইতে প্রকাশিত, অক্টোবর ১৯২৬।

(১) বাংলার কৃষি-সমবায়ের উদ্দেশ্য ও আদর্শ, (শ্রীযামিনী মোহন মিত্র) (২) বাংলার সমবায় সঙ্ঘ (সুধীর কুমার লাহিড়ী), (৩) সমবায় ও সমাজ-সেবা, (অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ বল), (৪) কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্ম্মচারীদের সমবায়-ভাণ্ডার (সুকুমার রঞ্জন দাস), (৫) পাটের ফোরকাষ্ট ও কৃষক, (শিবনাথ ব্যানার্জী), (৬) বাংলার মৎস্য-সম্পদ, (৭) বাগের-হাট উইভিং ইউনিয়ন, (৮) সমবায় প্রণালীতে পাট বিক্রীর মোসাবিদা, (৯) রাঁচি উইভার্স কো-অপারেটিভ ষ্টোর, (১০) রাণাঘাটে প্রেসিডেন্সি বিভাগীয় সমবায় অধিবেশন।

"আনন্দবাজার পত্রিকা"

পাহাড়পর্ব্বতের লীলাভূমি আফগানিস্থানে বহুবিধ খনিজ পদার্থ ভূগর্ভনিহিত রহিয়াছে। ইহা এতদিন মানব-জ্ঞানের অগোচর ছিল। সম্প্রতি আফগানিস্থান হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, নবনিযুক্ত ইঞ্জিনিয়ারদিগের অনুসন্ধানের ফলে আফগানিস্থানের মৃত্তিকা-মধ্যে অফুরন্ত ধনের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। নানা প্রকার অত্যাবশ্যক খনিজ পদার্থের প্রাচুর্য্য দেখিয়া আশা করা যাইতেছে যে, আফগান গবর্ণমেণ্ট যদি যথোপযুক্ত অর্থব্যয় ও সুনিয়ন্ত্রিত কর্ম্ম-শৃঙ্খলার সহিত খনিজ পদার্থ উত্তোলন ও ব্যবহারোপযোগী বিশুদ্ধ ধাতুতে পরিণত করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে অল্পসময়ের মধ্যেই আফগান রাজ্য ধন-সম্পদে পৃথিবীর অন্যান্য সমৃদ্ধ রাজ্যগুলির সমকক্ষ হইয়া উঠিবে। অধুনা আফগান গবর্ণমেণ্টের বিবিধ খনির কার্য্যে লাগাইবার মত প্রচুর অর্থাভাব; আফগান রাজ্য সমুদ্র-তীরবর্ত্তী নহে বলিয়া অন্যান্য রাজ্যের সহিত তাহার নৌ-ব্যবসায় সম্বন্ধ প্রায় নাই এবং রাস্তাঘাটের অবন্দোবস্তের দরুণ স্থল-বাণিজ্যের অবস্থাও তত উন্নত নয়। কিন্তু আফগানিস্থানের নবীন আমির আমান উল্লাহ্ খাঁ সাহেব যেরূপ রাজ্যের উন্নতিকামী ও অধ্যবসায়ী, তাহাতে মনে হয় যে, তিনি এ সমস্ত অসুবিধা বিদূরিত করিয়া আফগানিস্থানে উন্নতির স্রোত বহাইতে পারিবেন। এযাবৎ যে যে স্থানে যে সকল খনিজ পদার্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহার একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

১। কান্দাহারের নিকট হীরকের খনি। ২। গপমাম পাহাড়ের সন্নিকটে কাঁচা বৈদ্যুতিক লৌহের খনি। ৩। সিরাজ পাহাড়ের নিকট তাম্রের খনি। ৪। সিরাজ পাহাড়েও নিকট লোহিত বর্ণের লৌহের খনি। ৫। কাবুল হইতে ৫০ মাইল দূরে বৃহৎ তাম্রের খনি। ৬। হিন্দুকুশ পর্ব্বতের উত্তর প্রান্তে কয়লার খনি। ৭। হিরাটের পশ্চিম দিকে ত্রিপুল নামক স্থানে পেট্রোলের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

তথ্য-তালিকার আলোচনা-প্রণালী

১৯১৯ সনে ইতালিয়ান অধ্যাপক নিচেফর 'লা মেজুরে দেল্লা ভিতা' নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সম্প্রতি এই বহির ফরাসী তর্জ্জমা বাহির হইয়াছে, (প্যারিস ১৯২৫, ৬৫২ পৃষ্ঠা)।

নিচেফর ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্ বিদ্যাটা একসঙ্গে নানা তরফ হইতে আলোচনা করিবার পক্ষপাতী। তিনি দুনিয়ার সকল তথ্য, বিশেষভাবে জীবনের কথাগুলি, মাপিয়া জুকিয়া বুঝিবার জন্য সচেষ্ট। যাহা কিছু সংখ্যার সাহায্যে সীমাবদ্ধ করা সম্ভব তাহার কিছুই তিনি ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্ বিদ্যা হইতে বাদ দিতে রাজী নন। গাছ পাথর ইত্যাদি বস্তুর তো কথাই নাই, এমন কি সুকুমার শিল্প এবং সাহিত্যও তাঁহার মাপকাটি হইতে বাদ যায় নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, মান্ধাতার আমলের ল্যাটিন কবি হরেস্ এবং আনাক্রেয়ন্ ইত্যাদি কবির কাব্যগুলির দৈর্ঘ্যও নীচেফরের সংখ্যাবিজ্ঞানে মাপজোপ করা হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন শতাব্দীতে বিভিন্ন চিত্রকরের দল যে সকল ছবি আঁকিয়াছেন তাহাও গুনিয়া দেখা হইয়াছে। ফরাসী কবি বোদলেয়ার প্রণীত চতুর্দ্দশপদী কবিতা-সমূহে রং বাচক শব্দ কতবার ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাও নিচেফর গুনিয়া দেখিয়াছেন। ফরাসী গল্পবীর বাল্‌জাক যৌবনের রচনায় বাক্যগুলি কত বড় বড় লিখিতেন তাহাও মাপা হইয়াছে। প্রবীণ বয়সের বালজাক গ্রন্থ লিখিবার সময় বাক্যগুলির বহর কতখানি রাখিতেন তাহার সঙ্গে সেগুলির তুলনা করা হইয়াছে। অবশ্য নিচেফর এই ধরণের সূক্ষ্ম ব্যক্তিত্বকে মাপিয়া জুকিয়া বিশ্লেষণ করিবার বিরুদ্ধে যাহা কিছু বক্তব্য সে সম্বন্ধেও অন্ধ নহেন। সংখ্যা-বিজ্ঞানের সম্পূর্ণতা ও সীমানা সম্বন্ধে তাঁহার টনটনে জ্ঞান আছে। ফরাসী ভাষায় গ্রন্থের নাম "লা মেজুর দ লা ভি" "লামেতদ স্তাতিস্তিক"।

ব্যাঙ্কের কারবার

কুর্সেল-লীস

ফরাসী ব্যাঙ্ক-সাহিত্যের অন্যতম প্রসিদ্ধ লেখকের নাম কুর্সেল। ইনি সাধারণ ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক টেক্‌স্ট-বুকের প্রণেতা বলিয়াও প্রসিদ্ধ। তাহা ছাড়া, "লা সোসিয়েতে মদার্ণ" (বর্ত্তমান যুগের মানব-সমাজ বা বর্ত্তমান জগৎ) নামক গ্রন্থে এবং অন্যান্য রাষ্ট্রনৈতিক রচনায় কুর্সেল অর্থ-নৈতিক তথ্যের সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। সংরক্ষণ-নীতির বিরুদ্ধেও তাঁহার এক বই আছে।

কুর্সেল অবশ্য অনেক দিনের লোক। তাঁহার ব্যাঙ্ক-বিষয়ক গ্রন্থ প্রথম বাহির হয় ১৮৫২ সনে। মান্ধাতার আমল বলিলেই চলে। বইয়ের নাম "লজ ওপরাসিওঁ দ' বাঁক" (ব্যাঙ্কের কাজ-কর্ম্ম)। আজকাল সে ফ্রান্সও নাই আর সে ব্যাঙ্কও নাই। কিন্তু গ্রন্থকার বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে বইয়ের দশ দশটা সংস্করণ বাহির হয়। দশম সংস্করণ বাহির হয় ১৯০৯ সনে। এ অবশ্য "আজকালকার"ই কথা। বলা বাহুল্য বইটা প্রত্যেক সংস্করণেই আকারে ও প্রকারে বাড়িয়াছে।

৫৭ বৎসর ধরিয়া একটা লোক নিত্য নতুন তথ্য সংগ্রহ করিয়াছে আর নিত্য নতুন তত্ত্ব জোগাইয়াছে। আর যুবক ফ্রান্স অর্দ্ধ শতাব্দী কাল কুর্সেলের তথ্য এবং তত্ত্ব খাইয়াই মানুষ হইয়াছে। অবশ্য কুর্সেল ছাড়া অন্যান্য লেখকও উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে ফ্রান্সে ব্যাঙ্ক-চর্চ্চা করিয়াছেন। কিন্তু কুর্সেলকে সর্ব্বপ্রসিদ্ধ "ক্লাসিকে"র রচয়িতা বলিতে পারি।

গ্রন্থের প্রকাশক প্যারিসের ফেলিক্স্ আলফোঁ কোং। ইঁহারা ১৯০৯ সনের পর দুইটা সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। একাদশ সংস্করণ বাহির হয় ১৯২০ সনে। ইহার ভিতর বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্রের ছাপ পড়িয়াছে। তাহার পর ১৯২২ সনে প্রকাশিত হইয়াছে দ্বাদশ সংস্করণ। এই অবস্থায় গ্রন্থের কলেবর ১৮+৭৫৪ পৃষ্ঠায় পরিপূর্ণ।

১৯২০ ও ১৯২২সনের সংস্করণের জন্য প্রকাশকেরা আঁদ্রে লীস্ নামক ধনবিজ্ঞানসেবীকে সম্পাদক বাহাল করিয়াছেন। কুর্সেলের "ক্লাসিক"কে আধুনিকতম গড়ন দিবার ভার যাহার হাতে পড়িয়াছে তিনি স্বয়ংই একজন মস্ত বড় ব্যাঙ্ক-লেখক। ১৯১৫ সনে তাঁহার এক গ্রন্থ "লোর্গানিজাসিওঁ দু ক্রেদি আন্ আলমাঞ এ আঁ ফ্রাঁস" (ফ্রান্সে ও জার্ম্মাণিতে কর্জ্জ-লগ্নি কারবারের ব্যবস্থা) নামে প্রচারিত হইয়াছে। ফ্রান্সের নামজাদা পুঁজিপতিদের কর্ম্মবৃত্তান্ত প্রকাশ করিবার জন্য তিনি ১৯০৮ সনে একখানা বই লিখিয়াছেন। তাহা ছাড়া ষ্ট্যাটিষ্টিক্স্ সম্বন্ধে তাঁহার একখানা বই আছে (১৯১৯)। অধিকন্তু মেহনৎ-মজুর ও মজুরি সম্বন্ধে তিনি ১৮৯৯ সনে বিজ্ঞান, শিল্পকারখানা এবং সামাজিক জীবনের তরফ হইতে একখানা বই লিখিয়াছেন। "একোনোমিস্ত্ ফ্রাঁসে" (ফরাসী ধনবিজ্ঞান-সেবী) নামক সাপ্তাহিকের তিনি বর্ত্তমান সম্পাদক। এই সূত্রে লীসের নাম আমরা "পত্রিকা-জগৎ" অধ্যায়ে একাধিক বার দেখিয়াছি। প্যারিসের কোঁজার্ভা-তো আর দেজ আরজ্ এ মেতিয়ে" নামক টেক্‌নিক্যাল কলেজের তিনি অন্যতম ধনবিজ্ঞানাধ্যাপক।

১৫ প্রকার ব্যাঙ্ক ব্যবসা

কুর্সেল-লীসের গ্রন্থ ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে টাকাকড়ি, পুঁজি এবং কর্জ্জ-লগ্নি সম্বন্ধে তত্ত্ব-বিশ্লেষণ আছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাজকর্ম্ম দফায় দফায় বিবৃত হইয়াছে। জগতের প্রায় প্রত্যেক ব্যাঙ্কেই একাধিক কাজকর্ম্ম চালানো হইয়া থাকে। বিভিন্ন প্রকারের কারবার কোনো এক ব্যাঙ্কে চলিলে তাহার আকার-প্রকার কিরূপ হয় এই বিষয়ের জন্য তৃতীয় অধ্যায় লিখিত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় ব্যাঙ্ক পরিচালনার বিভিন্ন কৌশল। পঞ্চম অধ্যায়ে আছে ব্যাঙ্ক-ব্যবসা বিষয়ক সামাজিক আর অন্যান্য সাধারণ কথা। ষষ্ঠ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় ব্যাঙ্ক-ব্যবসার গণিত শাস্ত্র।

প্রত্যেক অধ্যায় নানা পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ের ১৬ পরিচ্ছেদে টাকাকড়ি ইত্যাদি সম্বন্ধে বিজ্ঞানের মোটা কথাগুলা বিবৃত হইয়াছে। সূচী নিম্নরূপ :—(১) ধন, (২) বিনিময় (৩) টাকা, (৪) পুঁজি, (৫) বিভিন্ন রকমের পুঁজি, (৬) কর্জ্জচুক্তি, (৭) সুদ, (৮) সুদের হার, (৯) ভিন্ন ভিন্ন পুঁজির ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্র, (১০) কর্জ্জ আদায়ের প্রণালী, (১১) বাণিজ্য-সঙ্কট, (১২) পুঁজির মূল্যের ওঠা-নামা, (১৩) টাকার মূল্যের ওঠানামা, (১৪) ঋণপত্রের বিভিন্ন শ্রেণী, (১৫) ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ব্যাঙ্ক-ব্যবসার এই সব গোড়ার কথা যেরূপ সরস ভাবে এই ফরাসী গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে ইংরেজি ও মার্কিণ গ্রন্থে সাধারণতঃ সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্যাঙ্ক-ব্যবসার আসল কারবারটা কি বা কি কি? এই সম্বন্ধে আছে ১৭ পরিচ্ছেদ। মোটের উপর ১৪ প্রকার বিভিন্ন কারবার নিম্নরূপ :—(১) সোনা-রূপার বেচা-কেনা, (২) টাকাকড়ি ভাঙ্গানো বা পোদ্দারি, (৩) লোকের টাকাকড়ি জমা রাখা, (৪) যে সকল লোক ব্যাঙ্কে টাকাকড়ি জমা রাখিয়াছে তাহাদের পরস্পর দেনা-পাওনা কাটাকাটি করা। এ জন্য টাকার চলাচল আবশ্যক হয় না। ব্যাঙ্কের খাতা-পত্রে একজনের জমা হইতে খরচ লিখিয়া আর এক জনের হিসাবে জমা করা হয় মাত্র। খাঁটি ব্যাঙ্কিং বলিলে এই কারবারটার কথাই খুব বেশী মনে পড়ে। ব্যবসায়ি-মহলে এই ব্যাপার অহরহ চলিতেছে। (৫) ব্যবসাদারদের "চিঠিপত্র" বা কাগজ "ভাঙানো। বর্ত্তমান জগতে এই কাগজ-বস্তুটার রেওয়াজ খুব বেশী। রামার নিকট টাকা পাইবে শ্যামা। রামা দিল শ্যামাকে একখানা চিরকুট। শ্যামা এই চিরকুটের জোরে আবদুলের নিকট হইতে মাল খরিদ করিল। আবদুল শেষ পর্য্যন্ত রামার নিকট টাকা সমঝিয়া লইতে আসিল। রামার নিকটও আসিবারদর কার নাই। রামা যে ব্যাঙ্কের সঙ্গে কারবার

করে সেই ব্যাঙ্কই আবদুলকে চিরকুটটা ভাঙাইয়া দিবে। এই হইল অতি সহজ ধরণের বাণিজ্য-কাগজ। এই চিরকুটটা যখন এক শহর হইতে আর এক শহরে যায় অথবা যখন এক দেশের লোক আর এক দেশের লোকের নামে চিরকুট ঝাড়ে, তখন তাহার নাম হয় আর কিছু। এই সব পারিভাষিকে সম্প্রতি প্রবেশ করিবার দরকার নাই। তৃতীয় শ্রেণীর "কাগজ" হইতেছে "চেক"। আর এক প্রকার কাগজ হইতেছে গুদামজাত মালপত্রের সার্টিফিকেট বা রসিদ। এই কাগজটা দেখিয়া ব্যাঙ্ক বুঝে যে কাগজওয়ালার তাঁবে অমুক জায়গায় অত পরিমাণ মাল আছে। আবাদের ফসল সম্বন্ধেও এইরূপ গুদামি রসিদ চলিতে পারে। এই সকল রকমারি কাগজ, চিরকুট, হুণ্ডি, চেক, রসিদ ভাঙানো ব্যাঙ্ক-ব্যবসার বড় কাজ। এই দিকে বাঙালীর হাতে খড়ি সুরু হইতেছে মাত্র।

(৬) মক্কেলদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকট হইতে তাহাদের পাওনা টাকাকড়ি আদায় করিয়া দেওয়া। (৭) এক শহর বা দেশ হইতে অন্য শহরে বা দেশে টাকা পাঠাইবার জন্য বাটা আদায় করা হইয়া থাকে। (৮) ভিন্ন ভিন্ন শহরের এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশের রকমারি "কাগজের" সওদা করা। এক স্থানের কাগজ কিনিয়া অন্য স্থানে বেচা হইয়া থাকে। টাকা চলাচলের দরকার উঠিয়া যায় (৪নং দ্রষ্টব্য)। এই ধরণের কাগজ ভাঙাভাঙি করা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে একটা মস্ত ব্যবসা। বাঙালী এখনো এই পথের পথিক হইতে শিখে নাই বলিলেই চলে। বর্ত্তমান জগতের ইহা একটা বিশেষত্ব। এই হিসাবে বাঙালীরা এখনো বর্ত্তমান জগতের লোক নয়।

(৮) "কাগজ"গুলা লইয়া অন্যান্য ভাঙাভাঙি ও স্বতন্ত্র কারবার। তাহার একটাকে বলে কাগজ "ডিস্কাউন্ট" করা। আবদুলের সইওয়ালা অর্থাৎ দেনার স্বীকারওয়ালা কাগজটা রামার নিকট হইতে লইয়া কোনো ব্যাঙ্ক যদি তাহাকে তৎক্ষণাৎ নগদ টাকা সমঝিয়া দেয় তাহা হইলে ব্যাঙ্ক কাগজটা "ডিস্কাউন্ট" করিল। এই ডিস্কাউন্ট কাণ্ডে ঝুঁকি অনেক, বলাই বাহুল্য। কিন্তু যে-দেশে ব্যাঙ্ক এই ঝুঁকি লইতে সাহসী হয় না, সেই দেশে ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান আছে বলিয়া স্বীকার করা চলে না। এই কষ্টি পাথরে ঘষিলে দেখিব বাঙালী সমাজ এখনো প্রায় ব্যাঙ্ক-হীন অবস্থায়ই যেন রহিয়াছে।

কাগজ ভাঙাইবার আর এক কায়দাকে ফরাসীতে বলে "আক্সেপতাঁস্", জার্ম্মাণে "আক্‌ৎ সেপ্‌ট্", আর আমাদের চলতি ইংরেজি "অ্যাক্সেপ্‌ট্যান্স"। সোজা কথায় কাগজ স্বীকার করা বুঝিতেছি। এই "স্বীকার" বা "গ্রহণ" করাটা নগদ টাকা দিয়া দেওয়ার সামিল নয়। ব্যাঙ্ক কাগজটার উপর সহি দিয়া বলে মাত্র,—"যদু, তোর মালপত্র বা সম্পত্তি বা পুঁজি সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস আছে।" যদু ব্যাঙ্কের এইরূপ সহিওয়ালা চিরকুট লইয়া অন্য এক ব্যাঙ্কের নিকট হইতে নগদ টাকা পাইতে পারে। এই দ্বিতীয় ব্যাঙ্ক "ডিস্কাউন্ট" করিল,—প্রথম ব্যাঙ্কটা করিয়াছে মাত্র "অ্যাক্সেপ্ট" অর্থাৎ স্বীকার, গ্রহণ বা বিশ্বাস। নগদ টাকা দিল দ্বিতীয় ব্যাঙ্ক প্রথম ব্যাঙ্কের ঝুঁকিতে। যদি যদুর অবস্থা কাহিল হয় তাহা হইলে স্বীকারকারী প্রথম ব্যাঙ্কের ঘাড় ভাঙা হইবে। কাজেই "আক্সেপ্‌তাঁস" ব্যবসাটা গুরুতর রকমের।

(৯) চল্‌তি হিসাবের খাতা-পত্র রাখা। বাজার হইতে মক্কেলদের জন্য তাহাদের পাওনা টাকা উসুল করা আর মক্কেলদের পক্ষ হইতে তাহাদের দেনা শুধিয়া দেওয়া ব্যাঙ্কের এই শ্রেণীর কাজ। সংখ্যা এবং পরিমাণ হিসাবে এই কাজ খুবই বেশী,—কেননা প্রত্যেক মক্কেলের জন্য প্রতি দিনই এই ধরণের কাজ কিছু না কিছু সামলাইতে হয়ই হয়। ব্যাঙ্কের খাতায় প্রতিদিনই মক্কেলদের জমাখরচের হিসাব চলিতে থাকে। (১০) নোট ছাড়ার কাজ। যে যে লোককে টাকা দিতে হইবে তাহাদিগকে নগদ টাকা না দিয়া একটা প্রতিজ্ঞা-পত্র দেওয়ার নাম নোট জারি করা। আগেকার দিনে একাধিক ব্যাঙ্কের এই ক্ষমতা ছিল। কিন্তু প্রায় সকল দেশেই গবর্মেণ্ট এই ব্যবসাটা শেষ পর্য্যন্ত কোনো একটা নির্দ্দিষ্ট ব্যাঙ্কের একচেটিয়া কারবারে পরিণত করিয়া দিয়াছে। প্রতিজ্ঞাপত্র বা নোট জারি করিবার নিয়ম কানুন বিলাতে, জার্ম্মাণিতে এবং ফ্রান্সে পৃথক পৃথক। বাঙ্গালী এই ব্যবসা একদম জানেই না। আর জানিবার সম্ভাবনাও

আমাদের নাই। তবে এখন ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল। এই হিড়িকে দেশের লোকের ভিতর নোট, কাগজী টাকা, নোট-ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্কের প্রতিজ্ঞা-পত্র ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা এবং তর্কপ্রশ্ন সুরু হইতেছে।

(১১) সওদাগরি মাল বা মাল চালানের রসিদ বন্ধক রাখিয়া মক্কেলকে টাকা দেওয়া। চাষ আবাদের ফসল সার্ব্বজনিক গোলায় ("ধর্ম্মগোলায়") বন্ধক রাখিয়াও ব্যাঙ্ক চাষীদেরকে নগদ টাকা দেয়। (১২) এই ধরণের তৃতীয় বন্ধকি কারবার হইতেছে জমিজমার বন্ধকে টাকা দেওয়া। সকল প্রকারের বন্ধকি রসিদই অন্যান্য বাণিজ্য-চিরকুটের মতন বাজারে কেনা-বেচা চলে। আর এই কেনা-বেচার কাজও ব্যাঙ্কে করা হয়। এই সকল বিষয়ে চর্চ্চা বাংলাদেশে কিছু কিছু সুরু হইয়াছে। কিন্তু কাজ বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই।

(১৩) রেলকোম্পানী, শিল্প-কারখানা, বা ঐ জাতীয় কারবারের সঙ্ঘেরা বাজারে টাকা ধার করিতে চাহিলে তাহাদের হইয়া ব্যাঙ্ক ঐ কর্জ্জ চায় কিংবা এই সকল সঙ্ঘের "শেয়ার" বেচিবার ভারও ব্যাঙ্কেরা লইয়া থাকে।

(১৪) বাজারে জনসাধারণের নিকট হইতে "কর্জ্জ" না চাহিয়া অথবা জনসাধারণের নিকট "শেয়ার" বেচিবার চেষ্টা না করিয়া ব্যাঙ্কগুলা খোদই কারবারী সঙ্ঘগুলাকে কর্জ্জ দেয় এবং তাহাদের শেয়ার খরিদ করে। এই সব "এলাহি কারখানা" বাঙালীর পক্ষে সম্প্রতি সুদূর ভবিষ্যতের কথা। ফ্রান্সেও সকল ব্যাঙ্ক এই সব দিকে মাথা খেলাইতে সাহস পায় না। এজন্য ব্যাঙ্কে টাকার জোর থাকা চাই খুবই বেশী।

(১৫) ষ্টক একস্‌চেঞ্জে যত রকমের "কাগজ" লইয়া লেনাদেনা চলে তাহার ভিতর নাক গুঁজিয়া রাখাও ব্যাঙ্কের এক বড় কারবার। ষ্টক-বাজারের দালালদের সঙ্গে ব্যাঙ্কের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সৃষ্ট হয়। মক্কেলদের জন্য নানা প্রকার কাগজ কেনা বেচা করিতে করিতে ব্যাঙ্কগুলাকে খানিকটা জুয়াড়ি হইয়া পড়িতে হয়। ইহাতে ঝুঁকির পরিমাণ প্রচুর। বাঙালী ব্যাঙ্কের পক্ষে এই কারবার সম্প্রতি স্বপ্নাতীত।

রকমারি ব্যাঙ্ক-শাসন

এই ১৫ দফা ব্যাঙ্ক ব্যবসা বিবৃত করিবার জন্য কুর্সেল-সীস লাগাইয়াছেন ৯৪ পৃষ্ঠা। ফরাসীরা যত সহজে কঠিন কঠিন কটমট জিনিষগুলা বুঝাইতে পারে ইংরেজ মার্কিণরা সাধারণতঃ তত সহজে পারে না। অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ লক্ষ্য করিয়াছি। বর্ত্তমান রচনায় তাহার প্রমাণ পাইতেছি পদে পদে।

ব্যাঙ্ক-ব্যবসার বিভিন্ন দফা সম্বন্ধে একখানা বাংলা বই লিখিবার সময় আসিয়াছে। এই সামান্য চুম্বক হইতে মালুম হইবে বাংলার বর্ত্তমান লোন আফিসগুলাকে কোন্ পথে চালাইতে হইবে। বাঙালীর আজকালকার অবস্থা আশা-জনক। নতুন নতুন দিকে মাথা খেলাইবার লোক কয়েক জন হইলেই আর এক ধাপ অগ্রসর হওয়া সম্ভব।

কুর্সেল-সীসের গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায় ১০ পরিচ্ছেদে বিভক্ত। ১৫ দফা কারবারের ভিতর কোন্ কোন্‌টা এক সঙ্গে চালানো সম্ভব এবং কোন দফায় ঝুঁকি কত তাহার বিশ্লেষণ এই সকল পরিচ্ছেদের মতলব। "নোট-ব্যাঙ্ক" কাহাকে বলে তাহার প্রকৃতি, নোট-ছাড়ার দায়িত্ব, নোট-সংখ্যার সীমানা এই সকলের সুবিস্তৃত আলোচনা আছে। ভিন্ন ভিন্ন কারবার অনুসারে ব্যাঙ্কের প্রকৃতি এবং নাম বিভিন্ন। পরিচ্ছেদগুলা এই বিভিন্নতা অনুসারে প্রণীত হইয়াছে। বাঁক-দ-ফ্রাঁস" নামক ফরাসী নোট-ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে আলোচনা এই অধ্যায়ের অন্তর্গত।

চতুর্থ অধ্যায়ে আছে ১১ পরিচ্ছেদ। স্কটল্যাণ্ড, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যাণ্ড, আয়র্ল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, সুইটসার্ল্যাণ্ড, ইতালি, স্পেন এবং জার্ম্মাণি এই সকল দেশের ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস এবং বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রবন্ধ আছে। তাহার পর আছে বিভিন্ন দেশের ব্যাঙ্ক-প্রণালীর তুলনায় সমালোচনা। এত বিভিন্ন ব্যাঙ্ক প্রণালী সম্বন্ধে এইরূপ বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা সাধারণতঃ কোনো ইংরেজি মার্কিণ বইয়ে দেখা যায় না। এই অধ্যায়-টার ইংরেজি তর্জ্জমা প্রকাশ করিলেও ইংরেজি ব্যাঙ্ক-সাহিত্যের গৌরব বাড়িতে পারে। ব্যাঙ্কের শাসন-কর্ম্ম সম্বন্ধে বাঙ্গালী সমাজের একপ্রকার কোনো জ্ঞান নাই বলিলেই

চলে। কিছুকাল ধরিয়া হাতে কলমে অভিজ্ঞতা লাভ হইতেছে মাত্র। আলোচ্য গ্রন্থের তথ্যরাশি বাংলাভাষায় দেখা দিলে আমাদের অনেক উপকার হইবে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে যে সকল তথ্য বিবৃত হইয়াছে সেই সব সাধারণ ব্যাঙ্ক বিষয়ক বইয়ে দেখা যায় না। এমন কি খাঁটি ব্যবসাবিষয়ক স্কুল কলেজ ছাড়া অন্যান্য বিদ্যাপীঠে ছাত্রেরা এই বিষয়ে শিক্ষা পায় না। কিন্তু ব্যাঙ্কের ব্যবসা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভের জন্য এই সকল আইন এবং অঙ্কের খবর রাখা দরকার। কুর্সেল লীস এইরূপ ষোলকলায় পূর্ণ ব্যাঙ্ক-সাহিত্যেরই স্রষ্টা।

"স্বাধীনতা"র অবসান

ধনবিজ্ঞানে "স্বাধীনতা" শব্দ একটা বিচিত্র অর্থে ব্যবহৃত হয়। ব্যক্তির জীবনে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ না থাকিলেই অবস্থাটাকে স্বাধীন অবস্থা বলা হইয়া থাকে। ফরাসী পারিভাষিকে ইহার নাম "লেস্‌সে-ফেয়ার" (অর্থাৎ করতে দাও, হ'তে দাও বা যেতে দাও ইত্যাদি)। ইংরেজিতে ফরাসীর তর্জ্জমা "লেট্-অ্যালোন" (ঘাঁটাঘাঁটি করোনা, যা চল্‌ছে চলুক)।

ইংরেজ পণ্ডিত জন মেনার্ড কেইন্‌স্ ৫৪ পৃষ্ঠার একখানা প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। নাম তাহার "স্বাধীনতার অবসান" (দি এণ্ড্ অব লেস্‌সে-ফেয়ার)। প্রকাশক লণ্ডনের হোগার্থ প্রেস। ইংরেজি ধনবিজ্ঞানের সাহিত্যে সেকালের রিকার্ডো খুব প্রচুর পরিমাণে আর একালের মার্শ্যাল কিছু কিছু উভয়েই কটমট রচনাপ্রণালী চালাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু কেইন্‌সের রচনা ঝরঝরে ও প্রাঞ্জল। কোনো কোনো বিষয়ে বেজহটের লিপিচাতুর্য্য কেইন্‌সের প্রবন্ধ-গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধেও এই সদ্‌গুণ বর্ত্তমান।

বিলাতী সমাজ-সাহিত্যে "স্বাধীনতা"-তত্ত্বের ধারা খুবই প্রবল। রাষ্ট্রের একতিয়ার হইতে ব্যক্তিকে মুক্তি-প্রদান করার কথা দার্শনিক লক এবং হিউম প্রচার করিয়া ছিলেন। পরবর্ত্তী যুগে বেন্থাম এই মতের প্রচারক। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার-প্রবর্ত্তিত সমাজ-বিজ্ঞান এই মতের উপরই প্রতিষ্ঠিত। এই সকল দার্শনিক আবহাওয়ায়ই আর্থিক কাণ্ডে স্বাধীনতার তত্ত্বও ফুটিয়া উঠিয়াছে। "নিজ নিজ স্বার্থ পুষ্ট করিবার জন্য ক্রেতারা, বিক্রেতারা, মজুরেরা, মালিকেরা, যাহা-কিছু করিতেছে তাহাতেই প্রত্যেকেরই লাভ হইতেছে আবার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশের বা সমাজেরও কল্যাণ সাধিত হইতেছে ;—অতএব মানুষের আর্থিক লেনদেনে টাকা-কড়ির কারবারে গবর্মেণ্টের কোনো কানুন জারি শাসন কায়েম করিবার প্রয়োজন নাই,"—এই উপদেশ ধনবিজ্ঞানের প্রায় সকল বিলাতী অধ্যাপকই প্রচার করিয়া আসিয়াছেন।

কেইন্‌স্ কোনো কোনো ইংরেজ বিজ্ঞানবীরের রচনায় এই মতের স্বপক্ষে বেশী কিছু পান নাই। ফরাসী পণ্ডিত বাস্তিয়া অবশ্য কট্টর স্বাধীনতাবাদী। ইংরেজ ম্যাক্-কালক এবং সিনিয়র এই পথেরই পথিক। কিন্তু কেইন্‌সের মতে ইংরেজদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতেরা এই দিকে বেশী চলেন নাই। অ্যাডাম স্মিথ, ম্যাল্‌থাস এবং রিকার্ডোর রচনায় স্বাধীনতার স্বপক্ষে যুক্তি কমই পাওয়া যায়। এই কথাটা কেইন্‌সের রচনায় প্রথম শুনা যাইতেছে, কেন না ইংরেজি ধনবিজ্ঞানের এই ত্রিবীরকে স্বাধীনতাবাদী বলিয়াই লোকে জানে। তবে একথা অস্বীকার করিবার জো নাই যে, জন ষ্টুয়ার্ট মিল "স্বাধীনতা"র বিরুদ্ধেই বেশ পাকিয়া উঠিয়াছিলেন। আর মার্শ্যালের রচনাবলীর ভিতর জটিল মারপ্যাচের সংখ্যা এবং ব্যতিরেকের তালিকা বিপুল হইলেও তাঁহাকে অনেক ক্ষেত্রে "স্বাধীনতা"র উল্টা দিকেই দেখিতে পাওয়া যায়।

কেইন্‌স্ এই গ্রন্থে স্বাধীনতার উল্টা দিকেই দেখা দিতেছেন। চুক্তি করিবার স্বাধীনতা আছে বলিয়াই মজুরেরা সুখী একথা আর বিশ্বাস করা চলে না। ফ্যাক্‌টরির মালিকেরা পরস্পর টক্কর দিয়া মাল তৈয়ারী করিতেছে বলিয়াই যে দাম কমিবে আর সমাজের নর-নারীর উপকার হইবে তাহা অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একচেটিয়া একতিয়ার দু'চার দশ বিশ জন লোকের তাঁবে আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। কাজেই ব্যক্তি-গুলাকে স্বাধীন জীব বলিয়া ছাড়িয়া দিলেই তাহারা সুখে-

স্বচ্ছন্দে "হেসে খেলে" জীবন চালাইতে পারিবে এমন কোনো কথা নাই। অতএব কোনো কোনো ব্যক্তিকে অপর কোনো কোনো ব্যক্তির দৌরাত্ম্য, অত্যাচার, একচেটিয়া অধিকার ইত্যাদি সামাজিক পাপ হইতে বাঁচাইবার জন্য ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন আছে। অর্থাৎ "স্বাধীনতা"র খর্ব্বতা বা লোপ-সাধন না করিলে অনেক সময়েই দুনিয়ার নরনারীর সুখবৃদ্ধি অসম্ভব। কথাটা শুনাইতেছে অতি নিষ্ঠুর কঠিন কঠোর।

কিন্তু এই নির্ম্মম দর্শনের ভিতরকার কথাটা কি? "স্বাধীনতার অবসান" বলিলে আর্থিক দুনিয়ার কোন্ তথ্য নজরে পড়িতেছে? এইখানে কেইন্‌স্ এক জবর মৌলিকতা দেখাইয়াছেন। এতদিন ধরিয়া আমরা জানি ব্যক্তির জীবনে রাষ্ট্রের প্রভাব বসাইলেই স্বাধীনতার অবসান হয়। বাজারদরে আইন কায়েম কর, ফ্যাক্টরির পরিচালনায় সরকারী কানুন জারি কর, জমিজমার স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে গবর্মেন্ট জমীদারদের বিপক্ষে আর চাষীদের স্বপক্ষে বিধিব্যবস্থা করুক,—তাহা হইলেই আমরা বুঝিতাম "যা চলছে চলুক" বা "যেতে দাও" ইত্যাদি নীতির খতম হইল। রাষ্ট্র আসিয়া নরনারীর ভাগ্যনিয়ন্তা, সুখদুঃখের কর্ত্তা হইল।

এক কথায়, মামুলি মতে—সোশ্যালিজ্‌ম্ বা সমাজ-তন্ত্র স্বাধীনতা-তত্ত্বের উল্টা পক্ষ। ভাবিয়াছিলাম কেইন্‌স্ বুঝি এইবার সোশ্যালিষ্টদের খাতায় নাম লেখাইলেন। রাধা মাধব! ইনি সোশ্যালিজ্‌মের কট্টর দুস্‌মন। এমন কি রাষ্ট্র-প্রবর্ত্তিত সংরক্ষণ-নীতিও ইনি কোনো দেশের শুল্ক-ব্যবস্থায় পছন্দ করেন না। স্বাধীনতার ঠাঁইয়ে তিনি যে ধরণের রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ চাহিতেছেন তাহা কিছু অদ্ভুত ধরণের। কিন্তু কথাগুলার ভিতরে গ্রহণীয় এবং আলোচনা-যোগ্য অনেক তত্ত্বই আছে।

রাষ্ট্র আর ব্যক্তির মাঝখানে কেইন্‌স্ কতকগুলা নিম-স্বরাজী সঙ্ঘ বা কর্ম্মকেন্দ্র ঢুঁড়িতেছেন। এই সকল কর্ম্মকেন্দ্রে কোনো ব্যক্তি বা দল-বিশেষের স্বার্থ পুষ্ট হইতে পারিবে না, পুষ্ট হইবে একমাত্র গোটা দেশের স্বার্থ। এই সঙ্ঘ বা কর্ম্মকেন্দ্র কোথায়ও আছে কি? আছে বৈ কি। কেইন্‌সের মতে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলা এইরূপ প্রতিষ্ঠান, বিলাতের ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ড এইরূপ প্রতিষ্ঠান, পোর্ট অব লণ্ডন নামক লণ্ডন বন্দরের কর্ম্মকেন্দ্র এইরূপ প্রতিষ্ঠান। এমন কি, রেলওয়ে কোম্পানীগুলাকেও এইরূপ নিম-স্বরাজী দেশ-স্বার্থ-পোষণকারী সঙ্ঘ বিবেচনা করা যাইতে পারে। কেইন্‌স্ বিবেচনা করেন যে, উন্নত দেশগুলার শিল্পবাণিজ্য সবই ক্রমশঃ এই আদর্শের দিকে ধাপে ধাপে উঠিতেছে। লভ্যাংশ ক্রমেই বাঁধা হারে শৃঙ্খলীকৃত হইতেছে। অংশীরা কারবারে শাসনক্ষমতা একপ্রকার ভোগ করিতেই পায় না। আসল শাসনকর্ত্তা হইতেছে ডিরেকটারেরা। এঁদের একমাত্র লক্ষ্য থাকে কারবারটাকে ব্যবসা হিসাবে কৃতকার্য্য করিয়া তুলিবার দিকে। ইংল্যাণ্ডের বিপুলায়তন কারবারগুলা সবই ক্রমশঃ এই মূর্ত্তি গ্রহণ করিতে থাকিবে বলিয়া গ্রন্থকারের বিশ্বাস।

রাষ্ট্র তাহা হইলে কি করিবে? ব্যক্তিরা যাহা-কিছুই আজকাল করিতেছে রাষ্ট্র তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবে না। অবশ্য এই সমুদয়ের ভিতর কোনো কোনোটা গভর্মেণ্টের হাতে থাকিলে কিছু কিছু সুফলই ফলিতে পারে। কিন্তু কোনো মতেই গবর্মেণ্টকে কেইন্‌স্ এই সব কাজের ভার লইতে দিবেন না। তাহা হইলে রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য থাকিবে কিরূপ? যে সব কাজ আজকাল একদম কেহই করিতেছে না, একমাত্র সেই সব কাজ সামলানো হইবে গবর্মেণ্টের ধান্ধা।

একটা দৃষ্টান্ত বাণিজ্য-সঙ্কট। বার্ষিক কালবৈশাখীর মতন কয়েক বৎসর পর পর "ক্রাইসিস" নামক শিল্প-সঙ্কট, বাণিজ্য-সঙ্কট আর্থিক দুনিয়ায় লণ্ডভণ্ড সৃষ্টি করে। এই নিয়মিত ধূমকেতুটাকে বশে আনিয়া ঘাল করিবার প্রণালী আজ পর্য্যন্ত কেহ খুঁজিয়া পান নাই। বস্তুতঃ, তাহার জন্য কাহারও মাথাব্যথাই নাই। কেইনস্ বলিতেছেন,—"বহুত আচ্ছা! এই ধূমকেতুটাকেই গবর্মেণ্টের ঘাড়ে চাপানো যাউক। দেশের টাকাকড়ি আর কর্জ্জ লেনাদেনা শাসন করিবার জন্য গবর্মেণ্ট মোতায়েন থাকুক। আর গবর্মেণ্টের হাতে এইজন্য একটা যন্ত্র দিয়া দেওয়া যাউক। তাহার নাম কেন্দ্রীয় কর্জ্জ প্রতিষ্ঠান।"

গবর্মেণ্টের পক্ষে দ্বিতীয় দফা কাজের মতন কাজ

কেইনসের মতে হইতেছে—দেশব্যাপী প্রপাগাণ্ডা। গবর্মেণ্ট আর্থিক সংবাদ সংগ্রহ করুক এখান ওখান সেখান হইতে আর ডাইনে বাঁয়ে এখানে ওখানে সেখানে এই সংবাদগুলা ছড়াইবার ভার লউক। কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক আর বার্ষিক রোজনামচা লোকেরা নির্ভুলভাবে বলিতে পারিলে সংসারে অনেক অপব্যয় ও শক্তিক্ষয় নিবারিত হইবে। আর্থিক দুনিয়ার ষ্টাটিষ্টিকস্ বা তথ্য ও অঙ্ক বাঁটিয়া গবর্মেণ্ট দেশের সেবা করুক।

কেইনস্ গবর্মেণ্টের ঘাড়ে তৃতীয় বোঝা চাপাইতেছেন টাকাকড়ির সঞ্চয়-লগ্নি কারবার। তাঁহার মতে দেশের লোক প্রতি বৎসর কত টাকা জমাইবে তাহা মাপিয়া জুকিয়া জরীপ করিয়া দেওয়া গবর্মেণ্টের কর্ত্তব্য। কেবল তাহাই নয়। টাকাকড়ি জমা হইবার পর কোন্ শিল্পে কোন্ বাণিজ্যে কোথায় কবে কত লাগানো যাইবে সেই সম্বন্ধেও গবর্মেণ্টের শাসন থাকা আবশ্যক।

চতুর্থ দফায় কেইন্‌স্ বলিতেছেন যে, এক মাত্র ধন-দৌলত, ব্যবসাবাণিজ্য, কৃষি-শিল্প, টাকাকড়ি, ব্যাঙ্ক বীমা ইত্যাদির কথা ভাবিলে চলিবে না। গভর্মেণ্টকে আর একটা বড় কাজের জিম্মা লইতে হইবে। সে হইতেছে মানুষগুলাকে দুরস্ত করা। পৃথিবীতে লোক পয়দা হইতেছে অহরহ,—যেখানে সেখানে। এই লোক-সংখ্যার উপর গবর্মেণ্টকে চৌকিদারি করিতে হইবে। লোক-সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি, নরনারীর চলাফেরা, দেশ-বিদেশে গমনাগমন ইত্যাদির উপর শাসন রাখা সম্ভব একমাত্র রাষ্ট্রের পক্ষে। সকল দিক্ হইতে মানুষের জন্ম-মৃত্যুর উপর কর্ত্তামি করা রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য থাকিবে। আর সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক ব্যক্তিই যাহাতে গুণ হিসাবে অর্থাৎ শিক্ষাদীক্ষায়, চরিত্রবত্তায় আর কর্ম্মদক্ষতায় উন্নত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করাও থাকিবে গবর্মেণ্টের অন্যতম বড় ধান্ধা।

দেখা যাইতেছে যে, কেইনস্ গতানুগতিক সোশ্যালিষ্টের যম হইয়াও সোশ্যালিজ্‌মের ইতিহাসে এক নবীন অধ্যায় খুলিয়া দিলেন। এই যেসকল গঠনমূলক প্রস্তাব কেইনসের গ্রন্থে পাইতেছি তাহার স্বপক্ষে বিপক্ষে অন্যান্য যে যুক্তিই থাকুক না কেন মার্কস্-পন্থী লেনিন-পন্থী কট্টর সোশ্যালিষ্টরাও সেইগুলাকে জাতি হিসাবে সোশ্যালিজ্‌মের অন্তর্গতই বিবেচনা করিবে। যাহা হউক, কেইনস্ নিজকে অ সোশ্যালিষ্টরূপে বাজারে দাঁড় করাইবার জন্য একটা নয়া পারিভাষিক সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি তাঁহার দর্শনকে "সাব্লিমেটেড ক্যাপিট্যালিজ্‌ম্" বা "উদারীকৃত পুঁজিতন্ত্র" নামে প্রচার করিলেন।
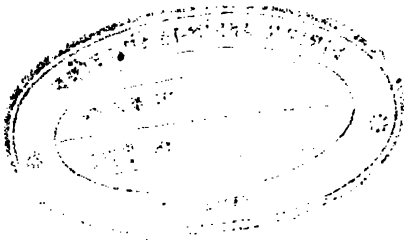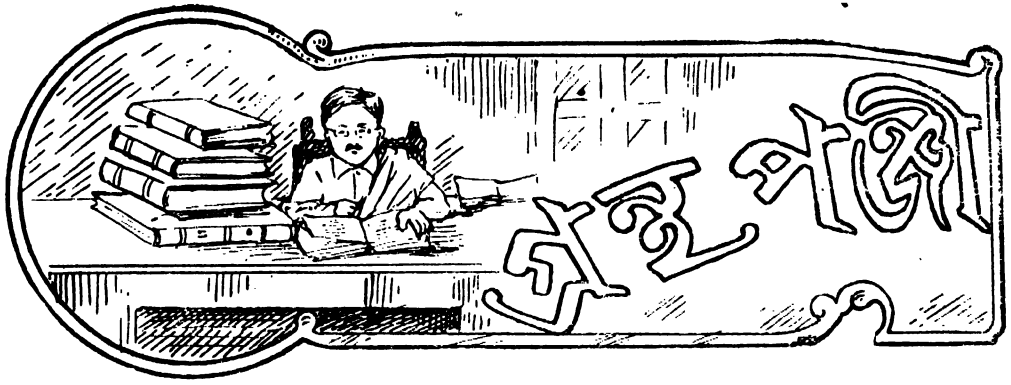
"লা লুৎ কঁতর্ লা শ্যার্তে এ লা কোঅপরাসিঅঁ" (মাগ্‌গি জীবনের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে লড়াই আর সমবায় নীতি), শার্ল জিদ, প্যারিস, ১৯২৫, ২২৮ পৃষ্ঠা।

"লাইফ ইন্‌শিওর্যান্স অ্যাজ এ লাইফ-হ্বর্ক" (জীবন-বীমার ব্যবসায় জীবন কাটানো), হার্ট, ক্রফ্‌ট্‌স কোং, নিউইয়র্ক, ১৯২৬, ২০২ পৃষ্ঠা, ২ ডলার।

"ডাস সোৎসিয়ালে সিস্টেম ডেস কাপিটালিস্‌মুস" (পুঁজি-নীতি-শাসিত আর্থিক ব্যবস্থার সমাজ-কথা,—"গ্রুণ্ডরিস ড্যর সোৎসিয়াল-য়েকোনোমিক" অর্থাৎ ধন-বিজ্ঞানের বনিয়াদ নামক জার্ম্মাণ অর্থনৈতিক বিশ্বকোষের নবম খণ্ড), মোর কোং কর্তৃক ট্যিবিঙ্গেন হইতে প্রকাশিত, ১৯২৬, ৬+৫১৫ পৃষ্ঠা, ২৭·৫০ মার্ক।

"ষ্টাডীজ ইন্ দি ল্যাণ্ড রেহ্বিনিউ হিষ্টরি অব বেঙ্গল ১৭৬৯-১৭৮৭" বঙ্গের ভূমি-কর সম্বন্ধীয় ইতিহাসের এক অধ্যায়, প্রথম অবস্থা)--রামসবোথাম, অকস্‌ফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, লণ্ডন, ১৯২৬, ৫+২০৫ পৃষ্ঠা, ১০ শি ৬ পে।

"ক্রাইম ইন্ ইণ্ডিয়া" (ভারতে অপরাধ ও অপরাধী) —এডোয়ার্ডস্, অকস্‌ফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, লণ্ডন, ১৯২৬, ৮+১৭১ পৃষ্ঠা, ৮ শি ৬ পে।

"ইণ্ডিয়া এ ফেডারেশান?" (ভারতবর্ষ কি ফেডার‍্যাল নিয়মে শাসিত?),—স্যার ফ্রেড্‌রিক হোয়াইট, ভারত গবর্মেণ্টের দপ্তর হইতে প্রকাশিত, ১৯২৬, ১৪+৩২৬ পৃষ্ঠা ২৷৷০ আনা।

"হিন্দু পলিটিক্‌স্ ইন ইটালিয়ান" (ইতালিয়ান ভাষায় হিন্দু রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান গবেষণার বৃত্তান্ত ও সমালোচনা); শ্রীবিনয়কুমার সরকার,—এন, সি, পাল, ১০৭ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ১৯২৬, ৬২ পৃষ্ঠা, আট আনা।

"হ্বেলথ্, হ্বর্চুয়্যাল হ্বেলথ্ অ্যাণ্ড ডেট" (ধন, "ধনের প্রতিনিধি" এবং কর্জ্জ), ফ্রেড্‌রিক সডি,—অ্যালেন আন্‌উইন, লণ্ডন, ১৯২৬, ৩২০ পৃষ্ঠা।

অর্থনৈতিক পুস্তিকা

১। "নিউ ওরিয়েন্টেশ্যান্‌স্ ইন্ কমার্স" (ব্যবসা-বাণিজ্যের নবীন নবীন দিক-প্রদর্শন), শ্রীবিনয়কুমার সরকার,—বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্স পত্রিকা হইতে পুনর্মুদ্রিত পুঁথি, কলিকাতা, সেপ্টেম্বর ১৯২৬, ১০ পৃষ্ঠা।

২। "মেমোর্যাণ্ডাম অন পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ষ্টাডীজ, হ্বিথ্ স্পেশ্যাল রেফারেন্স টু ইকনমিক্‌স্ অ্যাণ্ড দি অ্যালায়ড সায়েন্সেজ" (ধনবিজ্ঞান এবং ধনবিজ্ঞান-সংশ্লিষ্ট বিদ্যাসমূহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ শ্রেণীতে কিরূপ এবং কতখানি শিখানো হইয়া থাকে তাহার বৃত্তান্ত আর এই বিষয়ে শিক্ষা-সংস্কারের প্রস্তাব),—শ্রীবিনয়কুমার সরকার,—"ক্যালকাটা রিহ্বিউ" পত্রিকা হইতে পুনর্মুদ্রিত পুঁথি, আগষ্ট ১৯২৬, কলিকাতা ইউনিভার্সিটি প্রেস হইতে প্রকাশিত, ১৫ পৃষ্ঠা।

৩। "এ স্কীম অব ইকনমিক ডেহ্বেলপমেণ্ট ফর ইয়ং ইণ্ডিয়া" (যুবক ভারতের জন্য আর্থিক উন্নতির মোসাবিদা) শ্রীবিনয়কুমার সরকার,—ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯২৬, চার আনা।

৪। "বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ",—শ্রীবিনয়কুমার সরকার—ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরি, কলিকাতা, ১৯২৬, এক আনা।

বাংলার অন্তর্ব্বাণিজ্য

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাস

বাংলার কৃষি সম্পদ পাট কোন জেলায় কিরূপ চাষ হয় এবং কোন বৎসর কি পরিমাণে বহির্ব্বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে,—সে কথা সরকারী বিবরণ সাহায্যে সকলেই জানিতে পারেন। কিন্তু ইহা কৃষকের কুড়েঘর হইতে কিরূপে কত স্থান ঘুরিয়া মিলওয়ালা ও জাহাজওয়ালার আতিথ্য লাভ করে সে কথা অনেকেই জানেন না। যে জেলায় যেরূপ ভাবেই পাট কাষ হউক দেশের এবং বিদেশের পাটকলগুলিই তাহার পরা গতি এবং কলিকাতার বাজারই তাহার প্রধান আড্ডা। কলিকাতার আড্ডায় পৌছাইতে তাহাকে কোন কোন আবর্ত্ত ভেদ করিতে হয় একবার তাহার সন্ধান লওয়া যাউক। কিন্তু এই সন্ধান পাইবার পূর্ব্বে সকলেরই মনে রাখা উচিত যে, বাংলার সর্ব্বত্র একরূপ পাটের কাষ হয় না। পাট প্রধানতঃ দুই প্রকার, "বঙ্গী" ও "লংকাগড়" অর্থাৎ যাহাদের ফল লম্বা ও আস্বাদ মিষ্ট এবং যাহাদের ফল গোল ও আস্বাদ তিক্ত। দ্বিবিধ পাটের মধ্যে "ছোট্‌না" ও 'বড়ান্' অথবা "আউস" ও "আমন" ইত্যাদি বিভাগ আছে। আবার স্থানভেদে "বঙ্গী" ও "লংকাগড়ের" বিবিধ নাম আছে। দক্ষিণ ২৪ পরগণায় লংকাগড়ের নাম "দক্ষিণা।" ইহার বিশেষত্ব এই যে, কৃষকেরা চৈত্রমাসে প্রথম বৃষ্টি হইলেই সাধারণতঃ আমন ধানের নিম্ন জমিতে ইহার বীজ বপন করে এবং আষাঢ় মাসের মধ্যে পাট তুলিয়া লইয়া পুনরায় সেই জমিতে আমন ধান রোপণ করে, ফলতঃ একই জমিতে তাহারা ধান ও পাট দুইটী প্রধান ফসল পায়। "বঙ্গী" পাট ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি ও মুরশীদাবাদ জেলায় "দেশী" নামে অভিহিত। তেমনি "লংকাগড়" মেদিনীপুর, ঢাকা, মৈমনসিংহ, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলায় "বিলাতী" বলিয়া খ্যাত, এবং বঙ্গী পাট মুরশীদাবাদ, নদীয়া, যশোহর ও খুলনা জেলায় "উত্তরে' নামে পরিচিত। পূর্ব্ব-বঙ্গের স্থানে স্থানে রক্তিম তন্তুবিশিষ্ট একপ্রকার পাট জন্মে, তাহাকে "তোসা" বলে। পাট গাছের রং কতক শাদা ও কতক লাল। সাধারণতঃ দেখা যায় বাঙ্গালার সর্ব্বত্র মিশ্র পাটের চাষ হয়।

অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ পাটের রং, তন্তু ও দৈর্ঘ্য দেখিয়া বঙ্গী ও লংকাগড়ের মধ্যে ১।২।৩।৪ নং এইরূপ শ্রেণী-বিভাগ করেন। শ্রেণী-বিভাগের উপর দরের তারতম্য হয়। প্রধানতঃ বঙ্গী (মিষ্ট) পাট ধূসর বর্ণের ও তন্তু অপেক্ষাকৃত কোমল এবং লংকাগড় (তিক্ত) পাট শ্বেত বর্ণের ও তন্তু কিঞ্চিৎ কর্কশ। পাট-পচাইবার জলের উপর পাটের ভাল-মন্দ নির্ভর করে। সমুদয় "উত্তরে" পাটের মধ্যে নদীয়া জেলার কাঞ্চনপুরের ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানের পাট সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃশ্য ও উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হয়।

বিক্রয়যোগ্য হইলে "বেপারীরা" কৃষকের ঘর হইতে পাট সংগ্রহ করিয়া যথাসম্ভব শ্রেণীবিভাগ করিয়া বাঁধাই করে। বাঁধিবারও নামকরণ আছে যথা, "ফেটী", "গিলা" ও "কৃষ্ণগঞ্জের মোড়া" ইত্যাদি। এই বস্তাগুলির ওজন কমবেশী এক মণ। আবার "বেলার" বা" "মিলওয়লা"কে বিক্রয় জন্য কাঁচা গাইট বাঁধিতে হয় ওজনে কখন ১৷৷০ মণ কখন ৩৷৷০ মণ। পরিপাটী করিয়া বস্তা বাঁধিয়া স্থানীয় গঞ্জ, আড়তদারের গুদাম বা মিলওয়ালার নিকট পৌছানই প্রধানতঃ বেপারীর কাজ। মোকামে বা গঞ্জে আসিলেই আড়তদার, বেলার বা মিলওয়ালার সন্ধান পাওয়া যায়। অনেক বেপারী মোকামে (স্থানীয় গঞ্জে) বিক্রয় না করিয়া সোজাসুজি কলিকাতায় আড়তে বা পাটকলে লইয়া গিয়া বিক্রয় করে।

কলওয়ালা ও বেলারদিগের ক্রয়-পদ্ধতি অনেকটা এক প্রকার। উভয়েই দালালের সাহায্যে পাট খরিদ করে। দালালগণ বেতনভুক্ নয়। প্রতি মণে প্রায়ই ৫১০ পয়সা দালালী নির্দ্দিষ্ট থাকে। কলওয়ালা ও বেলারদিগের অনেক

"বাজার খরিদ্দার" আছে। দালালেরা এই সমস্ত বাজার খরিদ্দারের নিকট দৈনিক মূল্যের ইঙ্গিত লইয়া বাজারে "আড়তদারের" সহিত সওদা করে। পরে বাজার খরিদ্দার নিজ "কয়াল" "যাচনদার" ও যানবাহনাদি লইয়া আড়তদারের গুদামে উপস্থিত হয়। আড়তদারের নিজ কয়াল ওজন করিতে থাকে, খরিদ্দারের কয়াল ওজনে দৃষ্টি রাখে ও এক টুক্‌রা কাগজে লিখিয়া প্রত্যেক বস্তার মধ্যে গুঁজিয়া দেয় (পরে বিতর্ক উপস্থিত হইলে, এই কাগজখণ্ড দেখিয়া নিষ্পত্তি হয়)। যাচনদার পাটগুলি এক শ্রেণীর কিনা এবং তাহাতে জলের পরিমাণ কতটা আছে যাচাই করিতে থাকে। যেরূপ অবস্থায় সওদা হইয়াছে তাহার অপেক্ষা পাটের কোয়ালিটী খারাপ হইলে কিংবা তন্নিহিত জলের পরিমাণ অধিক হইলে সওদা বাতিল হইতে পারে, বা মূল্যের হ্রাস হইতে পারে। অতঃপর উহা মুটিয়ার সাহায্যে গরুর গাড়ী, মহিষের গাড়ী, মোটর লরি বা নৌকাযোগে গন্তব্য স্থানে যায়। ইহার মধ্যে বেলারকে আবার ক্রীত পাট পেষাই কলে (প্রেস্) ফেলিয়া গাঁইট বাঁধিতে হয়। এদেশের পাট তখন বিলাতযাত্রার জন্য উপযুক্ত হয়।

"আড়তদারকে" বিক্রয়কারী বলা যাইতে পারে। বিক্রয়ের সুবিধার জন্য আড়তদারকে গুদাম রাখিতে হয়। এই দাদনের টাকার প্রায়ই সুদ লওয়া হয় না, তবে বেপারী যত পাট খরিদ করিতে পারিবে তাহার সমস্তই ঐ আড়তদার বিক্রয় করিবে এইরূপ ব্যবস্থা থাকে। আড়তদার বিক্রী পাটের মণপ্রতি ।৵০ আনা বা তদনুরূপ আড়তদারি বা কমিশন কাটিয়া বেপারীকে "হাত" বা মূল্য দেয়। বেপারী "আড়তদারি" দিয়া আড়তদারের "গদিতে" বিনা খরচায় থাকিতে ও খাইতে পায়। বেপারী ইচ্ছা করিলে আড়তদারের নিকট নাও আসিতে পারে। পাট চালান দিয়া আড়তদারকে নিজের "পড়তার" কথা জানাইলে আড়তদার নিজেই বিক্রয় করিয়া বেপারীর টাকা পাঠাইয়া দিতে পারে। বেপারীর যাহাতে সুবিধা হয় এইরূপ দরে পাট বিক্রয় করিতে আড়তদার চেষ্টা করে, কিন্তু বেপারীর লাভ-লোকসানে তাহার নিজের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই—আড়তদার নিজের কমিশন বুঝিয়া লইবেই। বেপারীর এই সুবিধা যে, সে পাট পৌছাইলেই খালাস। আড়তদার পাট বিক্রয় করিয়া টাকা আদায় করিতে পারুক না পারুক বেপারীর দেখিতে হয় না। অনেক সময় বেপারী পাট পৌছাইয়া দিয়া বিক্রয়ের জন্য অপেক্ষা করে না—বাজার অনুযায়ী কমবেশী টাকা লইয়া পুনরায় খরিদ করিবার জন্য মোকামে চলিয়া যায়। বেলার বা মিলওয়ালাগণ পাট খরিদ করিয়া নির্দ্দিষ্ট দিনের (ডিউ) পূর্ব্বে আড়তদারকে টাকা দেয় না। যদি কোন আড়তদার ঐ দিনের পূর্ব্বে টাকা লইবার ইচ্ছা করে, তবে তাহাকে নির্দ্দিষ্ট ব্যাজ বাদ দিয়া টাকা লইতে হয়। সাধারণতঃ বিক্রয়ের তিন দিন পরে বিল ডিউ হয়।

বিলাতী ও তোসা পাটের জন্য কলিকাতার আড়তদারদিগের প্রধান আড্ডা চিৎপুর, বাগবাজার, হাটখোলা, ফুলবাগান, উল্টাডিঙ্গি এবং দক্ষিণা, বঙ্গী, উত্তরে ও দেশী পাটের জন্য শ্যামবাজার, টালা, বেলগাছিয়া। কলিকাতায় যত পাট বিক্রয় হয় তাহাতে কিছু না কিছু জল থাকে। তবে হাটখোলার আড়তদারগণ প্রায়ই নীরস শুষ্ক পাট বিক্রয় করে। দক্ষিণা পাটেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জল থাকে (পাটের চাহিদা থাকিলে বস্তা হইতে টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে দেখা যায়)। বোধ হয় এই কারণেই হাটখোলা মোকামের পাট অধিক দরে বিক্রয় হয়।

বেপারীরা নিজের টাকা ও আড়তদারের "দাদনী" টাকা লইয়া কৃষকদের মধ্যে দাদন করে। ঐ টাকা কাজের উন্নতির জন্যই সকল সময় ব্যয়িত হয় না—কৃষকদের সাংসারিক খরচেই বেশী লাগে। বেপারী দাদনী টাকার সুদের দাবী করে না, কিন্তু উৎপন্ন পাটের সমস্তই কৃষককে তাহার নিকট বেচিতে বাধ্য করে এবং বাজার দর হইতেও মণ প্রতি ।৵০ আনা ॥০ আনা কম দেয়।

পূর্ব্বে কলওয়ালা ও বেলারগণ পাটের জন্য প্রধানতঃ আড়তদারের উপর নির্ভর করিত। আড়তদারও নিজের আমদানির সুবিধার জন্য বেপারী সত্ত্বেও বিভিন্ন জেলার পাটবহুল স্থানে "মোকাম" খুলিয়া নিজের টাকায় পাট খরিদ করিত। এখন মিলওয়ালা এবং বেলারগণও এই পথ ধরিয়াছে। ফলে আড়তদারদিগের আয় কমিয়াছে

নিম্নে বিভিন্ন জেলার কতকগুলি প্রধান মোকাম ও তাহার পাটের গতিবিধির উল্লেখ করিতেছি—

(১) কোলাঘাট, বক্সীর হাট ও গেঁওখালি মেদিনীপুর জেলার প্রধান মোকাম। এই সমস্ত মোকামের পাট নৌকা-যোগে গঙ্গাতীরস্থিত মিলগুলির উদরপূর্ত্তি করিয়া থাকে। আড়তদারগণও মাঝে মাঝে যৎকিঞ্চিৎ দেখিতে পায়।

(২) আমতলা, রাজার হাট, জয়নগর, সূর্য্যপুর, দত্তপুকুর ও গোবরডাঙ্গা ২৪ পরগণার প্রধান মোকাম। প্রথম দুইটি মোকামের কতক পাট গরুরগাড়ী ও মোটর লরীতে কলিকাতায় উপস্থিত হয়, কতক সাল্‌তী করিয়া কাওরা পুকুরের ঘাটে আসে ও তথা হইতে বজবজ অঞ্চলের পাটকলে ও শ্যামবাজার অঞ্চলের আড়তদারের গুদামে পৌছায়। জয়নগর ও সূর্য্যপুর মোকামের পাট গো-শকট ও মোটর লরীতে কুলপীরোড দিয়া কলিকাতায় যায়। দত্তপুকুর মোকামের দেশী পাট যশোর ট্রাঙ্ক রোড দিয়া স্থলপথে কলিকাতা যাত্রা করে এবং গোবরডাঙ্গার পাট ই, বি, আর রেলের শরণাপন্ন হয়।

(৩) চিংড়ীহাটাকে খুলনার পাটের কেন্দ্র বলা যায়। স্থানীয় পাট জলপথে ও স্থলপথে এখানে জমা হয়, এবং বেপারী ও বেলারদের মোকাম-খরিদ্দারের সাহায্যে রেল-পথে বেলগাছিয়ায় উপনীত হয়।

(৪) যশোহরের "উত্তরে" পাটের প্রধান আড্ডা ঝিকরগাছা ঘাট, বনগাঁও, বেনাপোল, নাভারণ ইত্যাদি। চৌগাছা, রূপদিয়া, বয়ড়া, নাটিমা, গড়াপোতা, সিন্দ্রানী ইত্যাদি ছোটখাট মোকাম। স্থলপথে গো-শকটে এবং ইচ্ছামতী, কপোতাক্ষীর জলপথে নৌকাযাত্রা করিয়া কতক পাট বরাবর কলিকাতায় উপনীত হয় ও কতক ঝিকরগাছা, বনগ্রাম, বেনাপোল, নাভারণ হইতে রেলপথ অবলম্বন করে।

(৫) আড়ংঘাট, বগুলা, কৃষ্ণগঞ্জ ইত্যাদি নদীয়া জেলার পাটের প্রধান কেন্দ্র এবং রেলপথই এখানকার প্রধান অবলম্বন। ইচ্ছামতীর তীরবর্ত্তী শ্যামকুড়ও বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এই শ্যামকুড় মোকামেই কাঞ্চনপুরের বিখ্যাত পাট পাওয়া যায়। ইহা জলপথে কলিকাতা রওনা হয়।

(৬) ভগবানগোলা, লালগোলা, জিয়াগঞ্জ, বেলডাঙ্গা প্রভৃতি মুরশীদাবাদ জেলার প্রধান মোকাম। জঙ্গীপুর, পলাশী, পাট্‌কিয়াবাড়ী ইত্যাদি মোকামেরও নাম করা যাইতে পারে। রেলপথ ও ভাগীরথীর জলপথ এই সমস্ত পাট কলিকাতায় আনিতে সাহায্য করে।

(৭) হুগলী জেলার সেওড়াফুলী ও হাওড়ার ডোমজুড় ও আমতা পাটের প্রসিদ্ধ মোকাম। ভাগীরথী তীরবর্ত্তী মিলগুলি প্রধানতঃ এই সমস্ত পাট সংগ্রহ করে। সুতরাং জলপথ প্রধান অবলম্বন। কলিকাতার আড়তদারগণ কদাচিৎ এই সমস্ত পাটের মুখ দেখিতে পায়। পূর্ব্ব বঙ্গের মোকামগুলি সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা নাই। সুতরাং নীরব থাকাই ভাল। কোন্ মোকাম হইতে প্রতি বৎসর কত পাট চালান হয় তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

বেলার ও মিলওয়ালাদের কন্‌ট্রাকট ও ফরওয়ার্ড কন্‌ট্রাকট হিসাবে পাট কিনিবার নিয়ম আছে। তাহা ছাড়া ইহাদের কতিপয় বিশ্বস্ত এজেণ্টকে অগ্রিম টাকা দিবার ব্যবস্থাও আছে। এজেণ্টগণ ক্রীত পাটের উপর মণপ্রতি কমিশন পাইয়া থাকে, সুতরাং লাভলোকসানের ভাগী হয় না।

বাঙ্গালার কৃষিসম্পদ্ পাট পৃথিবীর হাটে প্রেরণ করিতে আড়তদারগণই বাঙ্গালীর শেষ পাণ্ডা। বেলারদিগের মধ্যেও কতিপয় কৃতী বাঙ্গালীর সন্ধান পাওয়া যায়, যথা (১) রায় দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ বাহাদুর, (২) ইউ, এন, রায় চৌধুরী ইত্যাদি। মাড়োয়ারীরা পাটের সর্ব্ব দিকে একচেটিয়া করিতে চেষ্টা করিতেছে। সম্প্রতি মোকাম স্থাপন ও মোকাম খরিদ তাহাদের ব্যবসায়ের প্রধান অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। সে কারণ টাকার অভাববশতঃ ও মাড়োয়ারী-দিগের বেলার এবং মিলওয়ালাদের সহিত সম্বন্ধ থাকায় বাঙ্গালীরা প্রতিযোগিতায় হটিয়া আসিতেছে।

সাধারণতঃ লোক মারফতে সহর হইতে মফঃস্বলে পাটের জন্য টাকা পাঠান হইয়া থাকে মাঝে মাঝে ডাকবিভাগের সাহায্য লওয়া হয়। মফঃস্বলের ব্যাঙ্কের সাহায্য লওয়া হয় বলিয়া শুনি নাই। এই বিষয়ে ব্যাঙ্কের সাহায্য পাইলে লোক মারফতে এত অধিক টাকা প্রেরণের যে বিপদ আছে তাহা নিবারিত হইতে পারে। বিশেষজ্ঞগণ এবিষয়ে সচেষ্ট হইলেই পাট-ব্যবসায়ীর প্রভূত উপকার হইবার সম্ভাবনা।

ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা

শ্রীসুধাকান্ত দে, এম, এ, বি, এল

সম্প্রতি রিকার্ডোর অর্থতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিখ্যাত বইয়ের মূল্য-তত্ত্ব নামক প্রথম অধ্যায়ের তর্জ্জমা সমাপ্ত হইয়াছে। তজ্জন্য যে সমস্ত পরিভাষার সৃষ্টি করিতে হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদিগের নিকট বিশেষ আলোচনা প্রার্থনা করিতেছি। এই আলোচনা ব্যতিরেকে কোনো পরিভাষাই তার খাঁটি ও বৈজ্ঞানিক কাঠাম পাইবে না।

পরিভাষার আলোচনা-প্রসঙ্গে আমার কেবল দুইটি কথা নিবেদন করিবার আছে।

(১) এ বিষয়ে যাঁরা চর্চ্চা রাখেন না, তাঁরা আলোচনা করিলে কোনো উপকার দর্শিবে না। ইহা প্রত্যেকেই স্বীকার করিবেন যে, শাস্ত্র অথবা বিজ্ঞান, যে যে অংশ লইয়া গঠিত তারা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সমগ্রের জ্ঞান এবং সর্ব্বদা চর্চ্চা ব্যতিরেকে আমরা একটি নূতন শব্দ নির্ভুল ভাবে গড়িতে পারিব না। ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন, শুধু জ্ঞান এবং চিন্তা থাকিলেই যেমন হয় না, সেরূপ শুধু হাটবাজার বা ব্যবসা-বাণিজ্য-মহলের খবর রাখিলেই চলে না। দুইটাই তুল্য দামী। অনেক আলোচনা ও বিবেচনার পর আমাদের এমন সব শব্দ গড়িতে হইবে যাদের প্রত্যেকের পিছনে একটা ইতিহাসের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব হয়।

(২) যাঁরা যখন যে বিষয়ে অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা করিতেছেন, চিন্তা করিতেছেন অথবা ইংরেজি, বাংলা বা অন্য কোনো ভাষায় কিছু লিখিতেছেন, তাঁরা সেই নির্দ্দিষ্ট বিষয়েই তৎক্ষণাৎ আলোচনা আরম্ভ করিবেন। তদ্দ্বারা শব্দগুলি খাপছাড়া ভাবে সৃষ্ট না হইয়া বেশ সুসঙ্গতভাবে হইবার সম্ভাবনা অধিক হইবে।

এক্ষণে পরিভাষাগুলি দেখা যাক্। বলা বাহুল্য, সকল পরিভাষা আমার নিজকৃত নহে। অন্যকৃত যেটা সমীচীন বিবেচনা করিয়াছি তাকে ছাড়িয়া দিই নাই।

(১) পোলিটিক্যাল ইকনমি = রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি।
ডোমিষ্টিক ইকনমি = গার্হস্থ্য অর্থনীতি।

(২) ইকনমিক্‌স = অর্থশাস্ত্র।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ রায় ইকনমিক্‌স অর্থে "ধনবিজ্ঞান" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু ধনবিজ্ঞানের কোন অর্থ হয় না। ধনের আবার বিজ্ঞান কি (১)? ধনাগম-বিদ্যা বা 'তত্ত্ব' বুঝিতে পারি কিংবা অর্থতত্ত্বও নিরর্থক নহে। কিন্তু যে শব্দটা এতকাল লোকমুখে চলিয়া আসিতেছে তাকেই ধন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনার কথা বুঝাইতে প্রয়োগ করিলে ক্ষতি কি? আরিষ্টটল যে অর্থে 'পলিটিক্‌স' শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা হইতে তার অর্থ আজ ভিন্ন। সুতরাং কৌটিল্যের অর্থে "অর্থশাস্ত্র" কথাটা ব্যবহার না করিলে নিশ্চয় মহাভারত অশুদ্ধ হইবে না (২)।

(৩) ভ্যালু = দাম, মূল্য।
ভ্যালু ইন্ ইউজ্ = প্রয়োজনে-দাম, প্রয়োজন-দাম।
ভ্যালু ইন্ এক্সচেঞ্জ = বিনিময়ে দাম, বিনিময়-দাম।

ভ্যালুর পরিভাষারূপে মূল্য ব্যবহার করিলে কোনো দোষ হয় না বটে। কিন্তু দামের একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে। গ্রীক দ্রাক্‌মার ইহা স্বগোত্র। এই শব্দটা অন্ততঃ গ্রীক ও ভারতীয় সভ্যতার একটা লেনদেনের খবর দেয়। কে কার কাছে ঋণী সে হিসাব অবশ্য ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক করিবেন।

(৪) প্রাইস্ = দর।

---

(১) কেন? ধন সম্বন্ধে বিজ্ঞান।—সম্পাদক।

(২) এই যুক্তি মন্দ নয়।—সম্পাদক।

(৫) মানি—মুদ্রা।
কয়েন—ধাতু মুদ্রা।

মুদ্রা কথাটি অতীব পুরাতন। 'যার উপর মুদ্রিত হয়' এই একটি অর্থের জন্য মানির যে যে গুণ থাকা দরকার, তা সূচনা করিতেছে ও ইহাকে একটি স্পষ্টতা দান করিতেছে (৩)।

(৬) মার্কেট—বাজার।

(৭) গুড্‌স—দ্রব্য, মাল। ম্যাটিরিয়েল—মাল।
কমোডিটি—দ্রব্যাদি, পণ্যদ্রব্য।

এই দুই শব্দের উপযুক্ত প্রতিশব্দ আজও খুঁজিয়া পাই নাই (৪)।

(৮) ক্যাপিটাল—পুঁজিপাটা।
ফিক্সড্ ক্যাপিটাল—স্থির পুঁজিপাটা।
সার্কুলেটিং ক্যাপিটাল—পৌনঃপুনিক পুঁজিপাটা।

(৯) ষ্টক্—পুঁজি।
এ্যাকুমুলেটেড্ ষ্টক্—মৌজুদ পুঁজি।

ক্যাপিটাল এবং ষ্টকের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা বুঝাইবার জন্য দুইটা শব্দের আবশ্যক। আমার মনে হয় ক্যাপিটালের পরিভাষারূপে 'পুঁজিপাটা' ব্যবহার করা বেশী সমীচীন। ও-কথাটার ঐরূপ চলনও আছে। কিন্তু মুস্কিলে পড়া গিয়াছে ফিক্সড্ ও সার্কুলেটিংএর তর্জ্জমায়। আপাততঃ দুইটা বিসদৃশ শব্দ "স্থির" ও "পৌনঃপুনিক" লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছে।

(১০) লেবার—শ্রম, শ্রমিক,—মেহনৎ (সরকার)।
লেবারার—মজুর।

(১১) ফার্ম্মার—চাষী।

(১২) ওয়ার্কম্যান—কারিগর।

(১৩) রেণ্ট—খাজানা।

(১৪) ওয়েজ্‌স—মজুরি।

(১৩) প্রফিট্‌স—মুনাফা।

শ্রীযুক্ত বিজয় কুমার সরকার ওয়েজ্‌সের পরিবর্ত্তে "তলব" ব্যবহার করিয়াছেন। উহা অপেক্ষা মজুরি কি বেশী দ্যোতক নহে?

(১৬) ইন্‌ডাষ্ট্রি—ব্যবসা।

(১৭) ট্রেড্—বাণিজ্য।

(১৮) অকিউপেশন—বৃত্তি।

ব্যবসা ও বাণিজ্যের সূক্ষ্ম প্রভেদটা শুধু ব্যবহার দ্বারা ধীরে ধীরে ধরা পড়িবে।

(১৯) মেশিনারি—কল।

(২০) টুল্‌স—হাতকল।

(২১) ইমপ্লিমেণ্টস্—যন্ত্রপাতি।

(২২) ওয়েপন্‌স—অস্ত্র শস্ত্র।

চরকা এবং বাটালি দুইই টুল্‌স। হাতকল অপেক্ষা উহার ভাল প্রতিশব্দ আমি খুঁজিয়া পাই নাই।

(২৩) ম্যানুফ্যাকচার—কারবার
ম্যানুফ্যাকচারার—কারবারী।

(২৪) ম্যাটিরিয়েল—মাল।
র-ম্যাটিরিয়েল—কাঁচী মাল।

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার হয়ত "কুদ্‌রেতী" মাল র-ম্যাটিরিয়েলকে বুঝাইতে ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু 'কাঁচী মাল' শব্দটা চলিয়া যাওয়ায় একটা সম্ভ্রম পাইয়াছে নিশ্চয়।

(২৫) বিল্ডিংস—কারখানা, কোঠাবাড়ী।

(২৬) ল্যাণ্ডলর্ড—জমীদার।

(২৭) ক্যাপিটালিষ্ট—মহাজন।

জমীদার কথাটা বাংলার সকলের কাছে পরিচিত। মহাজনও তদ্রূপ। শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার 'পুঁজিপতি' ব্যবহার করিতেছেন। কথাটা খুব সুন্দর। যদিও পুঁজিপাটা ক্যাপিটেলের জন্য ব্যবহার করিয়াছি, তথাপি ক্যাপিট্যালিষ্টের প্রতিশব্দে পুঁজিপতিতে আপত্তি নাই। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, এতকাল ব্যবহৃত মহাজন শব্দটার কি অর্থ দাঁড়াইবে? আর দুইয়ের মধ্যে পার্থক্যটা কি হওয়া উচিত?

(৩) তাহা হইলে কাগজের "মানিকে"ও মুদ্রা বলা চলিবে। ভালই।—সম্পাদক।

(৪) কেন? এই শব্দগুলাই বা মন্দ কিসে?—সম্পাদক।

(২৮) ভেরিয়েশন=তারতম্য।

এই শব্দটাকে লইয়া আমাকে বিশেষ গোলে পড়িতে হইয়াছে। কোথাও কোথাও বাধ্য হইয়া 'উঠানামা' চালাইয়াছি। কিন্তু ঠিক কথাটা বাহির করা আমার সাধ্যে কুলাইল না।

(২৯) ডেফিনিশন=সংজ্ঞা।

(৩০) ডক্ট্রিন=মতবাদ।

(৩১) ওপিনিয়ন=অভিমত।

ডক্ট্রিন মতবাদ বটে। কিন্তু ডক্ট্রিন অব মায়া= মায়াবাদ।

(৩২) মেজার=মানদণ্ড, মান।

(৩৩) ষ্ট্যাণ্ডার্ড=প্রমাণ।

প্রমাণ কথাটা দর্জ্জির দোকানে ঐ অর্থে বহুকাল যাবৎ চলিয়া আসিয়াছে। তাকে পরিত্যাগ করিয়া লাভ নাই।

(৩৪) মিডিয়াম—মধ্যস্থ।

(৩৫) মীন=মাঝারি।

(৩৬) একস্ট্রিম=চরম, প্রান্ত।

(৩৭) জেনারেল=সামান্য, সাধারণ।

(৩৮) পার্টিকুলার=বিশেষ।

(৩৯) রিয়্যাল (ওয়েজস)=প্রকৃত (মজুরি)।

(৪০) নমিন্যাল (ওয়েজস)=আপাত (মজুরি)।

নমিন্যালের প্রতিশব্দরূপে সদা-ব্যবহার্য্য আর কোন পরিষ্কার কথা আছে কি?

(৪১) প্রোপোরশন=অনুপাত।

বোধ করি সমগ্র মূল্য-তত্ত্ব তর্জ্জমা করিবার সময় আমাকে প্রোপোরশন ও ভেরিয়েশন এই দুইটি শব্দ যত জ্বালাইয়াছে, আর কোন কিছু তত জ্বালায় নাই। ইহার পরিভাষার ভার সুধীবর্গের উপর দেওয়া গেল।

(৪২) রেট (অব্ প্রফিট্)=হার (মুনাফার)।

(৪৩ থিওরেটিকেলি=অনুমানতঃ।

বাংলা ভাষায় প্র্যাকটিকাল ও থিওরেটিকালের প্রতিশব্দ জানিতে চাহি।

(৪৪) এপ্রোক্সিমেশন=সন্নিকর্ষ।

(৪৫) নেসেসারীস্=আবশ্যকীয়।

বলা বাহুল্য দুইটা প্রতিশব্দের একটাও আমার পছন্দ হয় নাই। তথাপি ইহাদের দ্বারা কাজ চালাইতে হইয়াছে।

(৪৬) প্রডিউস্—ফসল।

(৪৭) কর্ণ্=ফসল।

কর্ণের জায়গায় শস্য না লিখিয়া আমি সর্ব্বত্র ফসল চালাইবার অভিলাষী। কারণ ফসল কথাটা অনেক বেশী লোকে বুঝে ও ব্যবহার করে।*

---

* বলা বাহুল্য, পারিভাষিকগুলা সম্বন্ধে এখনো কিছুকাল নানা মুনির নানা মত চলিবে। খোলা মাঠের হাওয়ায় যে-যে শব্দ সরল ও সজীব ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবে সেইগুলাই বাংলা ধনবিজ্ঞান-সাহিত্যের সম্পদ্ বিবেচিত হইবে। কাজেই অনেক আলোচনা চাই।—সম্পাদক।

মধ্যপ্রদেশের খনি-ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর হিস্যা

শ্রীপ্রভাতকুমার ব্যানার্জ্জী, সীতাবল্দী, নাগপুর

ভাদ্র মাসের "আর্থিক উন্নতি"তে শ্রীঈশ্বর দাস শেঠি সংগৃহীত 'মধ্যদেশে কয়লার ব্যবসা' শীর্ষক সংবাদটী পড়িয়া আরও গোটাকতক সংবাদ জনসাধারণকে জানাইতেছি।

মধ্যপ্রদেশের (সেণ্ট্রাল প্রভিন্সের) গভর্ণমেণ্ট দ্বারা প্রকাশিত 'সি, পি, মাইনিং ম্যানুয়েল্' খুলিলেই বহু পৃষ্ঠায় মিষ্টার পি, সি, দত্তের নাম দেখিতে পাইবেন। তিনি একজন বাঙ্গালী। তিনি বহু পরিশ্রম করিয়া মধ্যপ্রদেশের স্থানে স্থানে নিজে বা লোকদ্বারা "প্রস্পেক্টিং' বা খনিজ অনুসন্ধান করিয়াছেন ও করাইয়াছেন। এখন বহু ইয়োরোপীয়ান কোম্পানী তাঁহার খোঁজা খনির কার্য্যে ব্রতী।

শ্রীরামপুরের মিষ্টার এস্, সি, দে (শ্রীসতীশচন্দ্র দে) বহু কয়লা ও ম্যাঙ্গানীজের খনি নিজে তল্লাস করিয়া, বোম্বাই সহরের প্রসিদ্ধ ধনীদের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিজে কয়েক আনার অংশীদার রূপে বহুবর্ষব্যাপী কার্য্য করিতেছেন। তিনি এ প্রদেশে বিশেষ পরিচিত।

আমি নিজে ১৯২১ সন হইতে মধ্যপ্রদেশে কয়লার ব্যবসা আরম্ভ করিয়া, ১৯২২ সনে মধ্যপ্রদেশের ছিন্দওয়াড়া জেলাস্থিত পরাসিয়া নামক কয়লা-প্রধান পল্লীতে মেসার্স্ রায় সাহেব এইচ্, বর্ম্মা ও এম্, কন্থৈয়ালাল লিমিটেড্ নামক যৌথ কারবার খুলিয়া, অংশীদার ও প্রথম সাতজন ডিরেক্টারদের ভিতর একজন ডিরেক্টার ভাবে যোগ দিই। এই কোম্পানীর মূলধন রাখা হয় ২,০০০০০ (দুই লক্ষ) টাকা। প্রথমে যে কোলিয়ারীগুলি রায় সাহেব এইচ্, বর্ম্মা ও মিষ্টার এম্, কন্থৈয়ালালের অধীনে ছিল সেই সব কোলিয়ারী এই লিমিটেড্ কোম্পানীর অধীনে আসে। ঐ বৎসরই মধ্যপ্রদেশের সরকারের আয়-কর বিভাগকে সুপারট্যাক্স বা অতিরিক্ত কর দিতে হয়। এই কোম্পানী এখনও বিদ্যমান। আমি ঐ সময়েই অন্যান্য কোম্পানীরও অংশীদার, ম্যানেজিং এজেণ্ট্ এবং ঠিকাদার ছিলাম।

তাহার পর শ্রীযুক্ত প্রতুল নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় কোলিয়ারী খোলেন ও তাহাতে ১১টী মুখ খুলিয়া, অংশীদার খুঁজিতেছেন। এ সংবাদ ভাদ্র মাসের "আর্থিক উন্নতি"তে পাঠকবর্গ পাইয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহার শ্রম সার্থক করুন ও স্বদেশে-বিদেশে বাঙ্গালীকে প্রকৃত ব্যবসায়ী করিয়া তুলুন। বাঙ্গালীদের দু'দিনের ব্যবসা করিলে আর চলিবে না।

আরও কতিপয় বাঙ্গালী ভদ্রলোক মধ্যপ্রদেশস্থ খনির কার্য্যে নামিয়াছিলেন বা নামিয়াছেন। তাঁহাদের নাম—শ্রীযুক্ত মৈত্র মহাশয়, সিহোরা তহসীল, জেলা জব্বলপুর; শ্রীইন্দুপ্রকাশ দত্ত, অন্ধেরদেব, জব্বলপুর; শ্রীযুক্ত বি, কে, চাটার্জ্জি সিভিল লাইন, নাগপুর; শ্রীঅনুপমচন্দ্র মৈত্র, বেঙ্গলী স্কুল, নাগপুর; শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী (মেসার্স্ নারোজী রুস্তমজী ও মনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী ফার্ম্মের), বান্ধব কুটীর, সীতাবল্দী, নাগপুর; শ্রীমতিলাল গুপ্ত (উপস্থিত তাঁহার পুত্র কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন) সিভিল্ লাইন্স, নাগপুর; শ্রীকালীপদ রায়, জমীদার বেলরুই পোষ্ট, সীতারামপুর, জেলা বর্দ্ধমান; শ্রীনৃত্যগোপাল বসু, সিভিল্ লাইন্স, নাগপুর ও আরও হয়ত কয়েকজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক আছেন—যাঁহাদের নাম মধ্যপ্রদেশস্থ সরকার দ্বারা প্রকাশিত পত্রিকায় আছে। তবে তাঁহাদের সংখ্যা খুব বেশী নহে এটা নিশ্চয়। মধ্যপ্রদেশের খনিতে কর্ম্মচারী ভাবে নিম্নপদ হইতে উচ্চপদ পর্য্যন্ত বহু বাঙ্গালী আছে।

আমি বঙ্গবাসী কলেজে নিজ ছাত্র-জীবনে যখন প্রিন্সিপাল, প্রোফেসার ও ছাত্রদের লইয়া "দি বঙ্গবাসী কলেজ কো-অপরেটিভ ষ্টোর্স লিমিটেড" খোলা হয়, তখন প্রথম কতিপয় ডিরেক্টারদের মধ্যে সর্ব্বাধিক ও সংখ্যায় বহু ভোট পাইয়া একজন ডিরেক্টারভাবে নির্ব্বাচিত হই। সুখের বিষয় যে, এই লিমিটেড ষ্টোর্স এখনও ২৮নং স্কটস্

লেনস্থ ক্যানিং বিল্ডিংসে বিদ্যমান আছে। প্রতিবৎসর ইহার অংশীদাররা বেশ লভ্যাংশ পাইতেছেন। কয়লার ব্যবসা মন্দা পড়িবার দরুণ আমি গত ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ২২শে অক্টোবর হইতে তুলার কার্য্যে নামিয়াছি ও তাহার সব দিক্ অধ্যয়ন করিতেছি। আমার মতে তুলার ব্যবসা রাজ ব্যবসা। এ ব্যবসায়ে সাধারণতঃ প্রচুর লাভ। জগদ্ব্যাপী এই ব্যবসায়ে বহু লোক নিযুক্ত। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এই ব্যবসায়ে অগ্রণী। এই সম্বন্ধে পরে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

রেল-যাত্রীদের সংবাদ

(১)

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ

বর্ত্তমানে শিলিগুড়ির দিক্ হইতে গোয়ালন্দ যাইবার যে বন্দোবস্ত আছে তাহাতে জলপাইগুড়ি, রংপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি উত্তর বঙ্গীয় জেলাসমূহে চাকুরী বা ব্যবসায় উপলক্ষ্যে যে সকল পূর্ব্ববঙ্গবাসী বসতি করিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে গোয়ালন্দ অথবা তাহার পরবর্ত্তী স্থানসমূহে যাতায়াত করা অত্যন্ত কষ্টকর ও অসুবিধাজনক। ডাউন দার্জ্জিলিং মেলে পোড়াদহ যাইয়া ঢাকা মেল ধরা ও গোয়ালন্দ যাইয়া ষ্টীমার ধরার ব্যবস্থা আছে বটে; কিন্তু দার্জ্জিলিং মেলে পোড়াদহ পৌছিয়া এত অল্প সময় পাওয়া যায় যে, প্রায়ই দৌড়াইয়া যাইয়া ঢাকা মেল ধরিতে হয়। পুরুষের কথা বাদ দিলেও স্ত্রী যাত্রীদের ও বালকবালিকাদের কষ্টের কথা বলিবার নহে। দার্জ্জিলিং মেল পোড়াদহ পৌছিতে দেরী হইলে (যে কারণেই হউক প্রায়ই দেরী হইয়া থাকে) যাত্রীদিগকে অল্পপরিসর বিশ্রামাগারে সমস্ত রাত্রি যাপন করিতে হয় এবং গোয়ালন্দ ষ্টীমার ধরিতে না পারিয়া পরবর্ত্তী সমস্ত দিনরাত্রি গোয়ালন্দ ঘাটে বা হোটেলে অশেষ দুঃখকষ্টের সহিত কাটাইতে হয়। সঙ্গের লগেজ প্রায়ই দার্জ্জিলিং মেলে যায় না বলিয়া মালিককে তাহার গন্তব্যস্থানে পৌছিয়াও ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোনো স্থানে বা ২৪ ঘণ্টাও মালের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। কারণ অধিকাংশ লোককেই ষ্টেশন হইতে বহু দূরপথে বর্ষাকালে নৌকায় ও অন্য সময় হাঁটিয়া যাইতে হয় এবং সঙ্গে করিয়া মাল লইয়া যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। নদীর পাড়ে ছোট ছোট ষ্টেশনে কখনও বা নদীর চরে ২৪ ঘণ্টা অনাহারে নিরাশ্রয় অবস্থায় ঝড়-জলে যাহাদিগকে সময় মত গাড়ী বা মাল না পৌছার জন্য কাটাইতে হয়, তাহাদের অবস্থা কল্পনা করিলেও চোখের জল রোধ করা কষ্টকর। ফিরিবার পথে আরও বিপদ। চাঁদপুর ষ্টীমার ব্যতীত সকল ষ্টীমারই রাত্রিতে গোয়ালন্দ পৌছে, এবং ঢাকা মেলে পোড়াদহ আসিয়া শিলিগুড়িগামী গাড়ীর জন্য ২১৩ ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া পরদিন রাত্রি ৯।১০টার সময় শিলিগুড়ি পৌছিতে হয়। সে সময় মেল কিংবা অন্য কোন দ্রুতগামী গাড়ী চলাচল করে না। এ সম্বন্ধে অনেক বলিবার আছে, স্থানাভাবে এখনকার মত স্থগিত রাখিলাম।

বড় লাইন শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত প্রসারিত হইলে গাড়ীগুলির নূতন করিয়া বিলি বন্দোবস্ত হইবে আশা করা গিয়াছিল। গত সপ্তাহের "ত্রিস্রোতায়" প্রকাশিত সময়ের নির্ঘণ্ট দেখিয়াও ঐরূপ মনে হয়। যেরূপ ব্যবস্থা হইবে বুঝা যাইতেছে তাহাতে গোয়ালন্দ যাতায়াতের কোনো সুবিধা তো হইবেই না, বরং অসুবিধাই বেশী হইবে। শিলিগুড়ি হইতে যে গাড়ীখানা ৪-৩০ মিনিটে ছাড়ে, সেইখানাই যদি বরাবর গোয়ালন্দ যাওয়ার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে তাহা হইলে শিলিগুড়ি হইতে রওনা হইয়া গোয়ালন্দের ষ্টীমার ধরিতে ২৪ ঘণ্টা লাগিবে। অথচ আজকাল অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও ১২ ঘণ্টার মধ্যে যাওয়া যায়। তা ছাড়া, সমস্ত ষ্টেশনে থামিতে থামিতে যাইবে বলিয়া গাড়ীতে সকল ষ্টেশনের যাত্রিরাই যাওয়া আসা করিবে এবং তাহাতে এত ভীড় হইবার সম্ভাবনা যে, গোয়ালন্দ অভিমুখের যাত্রিগণ, যাহারা দিনাজপুর, রংপুর

অঞ্চল হইতে আসিয়া উঠিবেন এবং যাহারা মধ্যবর্ত্তী ষ্টেসনগুলি হইতে চড়িবেন তাহাদের পক্ষে গাড়ীতে চড়া অত্যন্ত দুরূহ হইবে এবং চড়িতে পারিলেও হয়তো সমস্ত রাস্তা দাঁড়াইয়া যাইতে হইবে। স্ত্রীলোক ও শিশুদের যে কষ্ট হইবে তাহা বর্ণনাতীত। সমস্ত দিন অনাহারে একটী ছোট কুঠুরীতে আবদ্ধ থাকিতে হইবে। এত কষ্ট করিয়া গোয়ালন্দ পৌঁছিয়াই যে সর্ব্বদা ষ্টীমার ধরা যাইবে তাহার নিশ্চয়তা সম্বন্ধেও সন্দেহ আছে। কারণ যে ২৪ ঘণ্টা লাগিবে তাহার মধ্যে অনেক কাল মেলের জন্য, এক্সপ্রেসের জন্য বা অন্য ট্রেনের জন্য কখনও পথে, কখনও সাইডিংএ, কখনও বা প্ল্যাটফরমে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। তা ছাড়া, পাহাড় পথের গাড়ীর প্রায়ই দেরী হয় দেখা যায়, সেই কারণে মেল বা অন্যান্য গাড়ীও দেরী করে, সুতরাং এ গাড়ীখানাকেও দেরী করিতে হইবে। যেরূপ দেখা যায়, যে গাড়ীখানা আজকাল এখান হইতে রাত্রি ১॥ টার সময় ছাড়িতেছে তাহারই পরিবর্ত্তে এই গাড়ীখানা যাত্রীদিগকে এক ষ্টেশন হইতে কাছাকাছি আর এক ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দিবার কার্য্য করিবে এবং সেইরূপ অল্পদূরের যাত্রীদিগের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলাচল করিবে। তাহাতে গোয়ালন্দ অভিমুখের যাত্রীদের—যাহাদের সুবিধার নাম করিয়া এই গাড়ীর ব্যবস্থা হইল—নানাপ্রকার অসুবিধা ভোগ করিতেই হইবে। যাত্রীদের মালামাল সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছিবে বলিয়া যেমন আশা করা যায়, সেই সঙ্গে তেমনি আশঙ্কাও আছে যে মাল প্রায়ই অত্যন্ত বেশী লোকসানি অবস্থায় পৌঁছিবে, আর এই সঙ্গে মালগাড়ী জুড়িয়া দেওয়া হইবে এবং যত রাজ্যের মাল এই গাড়ীতে চাপান হইবে। এই গাড়ীখানাই যদি বরাবর গোয়ালন্দ যাইবে স্থির হইয়া থাকে তাহা হইলে নিশ্চয়ই যে ঐদিককার যাত্রীদের সুবিধার জন্য করা হয় নাই তাহা বুঝা যাইতেছে। অথচ পূর্ব্ব-বঙ্গবাসী যাত্রীদের বিশেষ সুবিধা হয় এরূপ একখানা গাড়ী শিলিগুড়ি হইতে গোয়ালন্দ যাতায়াত করার ব্যবস্থা করা যে নিতান্ত দরকার তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আধুনিক সভ্য যুগে একই বাঙ্গালাদেশের এক বিভাগের সহিত অন্য বিভাগের সুবিধামত যোগাযোগ নাই ইহা কি বড়ই বিসদৃশ বোধ হয় না? বাঙ্গালাদেশে একমাত্র শৈলাবাস দার্জ্জিলিং। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের কোনো স্থান হইতে এই শৈলাবাসে যাইতে হইলে যে পরিমাণ সময় লাগে ও যে পরিমাণ পথকষ্ট ভোগ করিতে হয়, তাহা আধুনিক সভ্যতাসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। প্রাতে ষ্টীমারে যাত্রা করিলে দ্বিতীয় দিন রাত্রিতে শিলিগুড়ি পৌঁছিয়া রাত্রিতে ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে পড়িয়া থাকিয়া ২ দিন ২ রাত্রি অনাহার অনিদ্রা পথশ্রম ভোগের পর তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় দার্জ্জিলিং পৌঁছিতে পারা যায়। কর্ত্তৃপক্ষের কি এদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত নয়?

উত্তর বঙ্গের জেলাসমূহে যত ব্যবসায়ী, উকিল, মোক্তার, মুহুরী, কেরাণী আছেন তাহার মধ্যে অধিকাংশই পূর্ব্ববঙ্গবাসী। ইহাদের অনেকেরই হয়তো স্ত্রীপুত্রপরিবার সুদূর পূর্ব্ববঙ্গের বাড়ীতে থাকেন। কাজেই বৎসরে এক আধবার দেশের বাড়ীতে অনেককেই যাইতে হয়। তা ছাড়া, পূর্ব্ববঙ্গবাসীদের সকলেরই কিছু না কিছু জমি জমা থাকিতে দেখা যায়। এই সব কারণে, বাড়ী যাওয়ার বাতিকটা বেশী থাকায় অনেকেই অন্ততঃ একবার করিয়া বাড়ী যাইয়া থাকেন। কিন্তু ছুটী বেশী দিন পাওয়া যায় না। অথচ আসিতে যাইতে ৪ দিন পথেই কাটিয়া যায়। তাহাতে যে তাহাদের কি পরিমাণ ক্ষতি হয় তাহা ভুক্তভোগীরাই জানেন। ই, বি, রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহার কোনই ব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত করেন নাই।

ই, আই, আর, বি, এন, আর প্রভৃতি অন্যান্য রেল কোম্পানীর সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় ২৮৪ মাইল (শিলিগুড়ি হইতে গোয়ালন্দ) যাইতে ২৪ ঘণ্টা দূরের কথা ৭।৮ ঘণ্টার বেশী কোন প্যাসেঞ্জার ট্রেনেরই দরকার হয় না। অথচ ই, বি, আর লাইনে দার্জ্জিলিং মেলে গেলেও ১২ ঘণ্টা লাগে। ইহা কি ই, বি, রেলওয়ের লজ্জার কথা নহে? এতদিন একটা অজুহাত ছিল। পার্ব্বতীপুর ও পোড়াদহে গাড়ী বদল করিতে হইত, মালপত্র টানাটানির হাঙ্গামায় অনেক সময় যাইত। বরাবর বড় লাইন হইলে অসুবিধা সকলই দূরীভূত হইবে। যাত্রীদের অভাব-অভিযোগ দূর করিবার ইচ্ছা থাকিলে এখন আর তাহাতে কোন বাধা থাকিবে না। যাত্রীদের বর্ত্তমান অসুবিধা সমস্ত দূর করিয়া অধিকন্তু অনেক অল্প সময়ে যাতায়াতের বন্দোবস্ত অনায়াসে

করা যাইতে পারে। ১৬নং ডাউন যে সময়ে ছাড়ে ঐ রকম সময়ে শিলিগুড়ি ছাড়িয়া বরাবর গোয়ালন্দ যাইয়া ভোরে ষ্টীমার ধরাইয়া দিতে পারে এমন ট্রেণের বন্দোবস্ত করিলে বোধ হয় সকলেরই সুবিধা হয়। রেল কোম্পানীরও তাহাতে অসুবিধা হইবার কোনো কারণ নাই। অধিকন্তু মামলা মোকদ্দমা উপলক্ষ্যে যাহারা এখানে আসিবে তাহাদের ফিরিয়া যাইবার পক্ষেও ইহাতে খুব সুবিধা হইবে। ইহা ছাড়া, অন্য যে গাড়ী গোয়ালন্দের যাত্রী বহন করিবে তাহার বদলি পোড়াদহে না করিয়া ঈশ্বরদীতে করিতে হইবে। তাহাতে যাত্রীর ভীড়ও কম হইবে আর কুলী মজুর ও খাদ্যদ্রব্যের অভাবে পোড়াদহে যে কষ্টভোগ করিতে হইত তাহাও দূর হইবে। সিরাজগঞ্জ হইতে গোয়ালন্দ যে গাড়ীখানা যায় তাহাকে প্রায়ই ফাঁকা যাইতে দেখা যায়। এই সিরাজগঞ্জ—গোয়ালন্দ গাড়ীখানার সময় আবশ্যকমত পরিবর্ত্তন করিয়া তাহাতে ঈশ্বরদী হইতে উত্তরবঙ্গ অঞ্চলের গোয়ালন্দ মুখের যাত্রীদিগকে বহন করিয়া ষ্টীমার ধরাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

আশা করি কর্ত্তৃপক্ষগণ এবং কমিশনার ও ডেপুটী কমিশনার বাহাদুর এই অঞ্চলের, বিশেষ করিয়া এই জেলাবাসী পূর্ব্ববঙ্গীয়দের, সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শিলিগুড়ির সহিত গোয়ালন্দের যোগ-সাধনে যত্নবান হইবেন। শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট ও জনসাধারণের প্রতি আমাদের এই নিবেদন যে, তাঁহারা যেন এই ব্যাপার লইয়া বারংবার কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে বুঝাইয়া দেন যে, সুবিধামত সময় গোয়ালন্দ যাইবার সুবিধাজনক গাড়ী না হইলে তাহাদের কিছুতেই চলিবে না। এতদ্ব্যতীত এ অভাব দূর হইবার নহে।

শ্রীগিরিজাভূষণ দাশগুপ্ত ("ত্রিস্রোতা")

(২)

বঙ্গীয় রেল-যাত্রী সঙ্ঘ

এতদ্বারা সাধারণকে জানান যাইতেছে যে, রেলযাত্রিগণের অভাব-অভিযোগ দূরীকরণকল্পে একটি রীতিমত ধারাবাহিক আন্দোলন চালাইবার জন্য আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে সভাপতি করিয়া দৃঢ় কমিটীর সহিত উল্লিখিত সঙ্ঘটি গঠিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানটির সাফল্যের জন্য মফঃস্বলের নানাস্থানে ইহার শাখা-স্থাপন আবশ্যক এবং দেশবাসীর ইহার সদস্য হওয়া উচিত। যাত্রীদিগের অসুবিধা, কষ্ট ও রেলকর্ম্মচারীদিগের কর্ত্তব্যের অবহেলা প্রভৃতি তৎক্ষণাৎ সঙ্ঘের নজরে আনা দরকার। আন্দোলন চালাইবার দিক্ দিয়া দৈনিক যাত্রিগণ সঙ্ঘের অনেক কার্য্য করিতে পারেন। তাঁহারা যেন অপরাপর যাত্রিগণকে তাঁহাদের ন্যায্য অধিকার ও সুবিধার দাবী বুঝাইয়া দেন এবং নিজেরা এই সঙ্ঘের সদস্য হন। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করিয়া থাকে। সকলেই জানেন তাহাদের প্রতি কিরূপ হীন আচরণ করা হইয়া থাকে। ইহা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত গ্লানিকর। তাহাদের দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা যে শুধু আমাদের বিশেষ কর্ত্তব্যের মধ্যে তাহা নহে, উপরন্তু আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের দিক্ দিয়া দেখিলেও দেখিতে পাইব যে, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রিগণের সুবিধা করিয়া দিয়া নিঃসন্দেহে আমরাই উপকৃত হই এবং আমাদের বন্ধুগণ ও আত্মীয় স্বজনেরাই উপকৃত হন। অতএব আমরা আশা করি যে, বাঙ্গালার প্রত্যেক শিক্ষিত নরনারী এই সঙ্ঘের সহিত সহযোগিতা করিবার চেষ্টা করিবেন।

পার্থিব জগতে টাকা ছাড়া কোনো কার্য্যই চলে না, অতএব এই সঙ্ঘেরও অর্থ আবশ্যক। অনেক চিঠিপত্র লেখালেখি করিতে হইবে, মাঝে মাঝে স্থানীয় তদন্তের আবশ্যক হইবে; সুতরাং অর্থ ছাড়া কার্য্য চলিতে পারে না। উপস্থিত সদস্যদিগের বার্ষিক চাঁদা আট আনা করিয়া ধরা হইয়াছে। ইহাতে সঙ্ঘের সহিত সাক্ষাৎভাবে যুক্ত থাকিতে কাহারও অসুবিধা হইবে না। আমরা আশাকরি, সকল দেশহিতৈষী ব্যক্তিই অবিলম্বে এই সঙ্ঘে যোগদান করিবেন। সঙ্ঘের উদ্দেশ্য প্রচারের জন্য একদল স্বেচ্ছাসেবক আবশ্যক।

ব্রহ্মের ধন-সম্পদ্‌

শ্রীনারায়ণচন্দ্র মজুমদার, এম, এস-সি

অতি প্রাচীনকাল হইতেই ব্রহ্মদেশ প্রাকৃতিক ধন-সম্পদের জন্য জগতে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থসমূহেও ব্রহ্মদেশকে "স্বর্ণভূমি" আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। দিন দিন নব নব তৈল ও রত্নখনির আবিষ্কার হওয়াতে এই নামের সার্থকতা আরও বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, সমস্ত পরাধীন দেশের ন্যায় ব্রহ্মদেশের এই ধন-সম্পদে ব্রহ্মবাসীর খুব সামান্যই অধিকার আছে। বিদেশী চতুর বণিক, সরলবিশ্বাসী অজ্ঞ ব্রহ্মবাসীর অমূল্য সম্পদ্‌ বিনিময়ে তাহাকে তুচ্ছ বিলাস-সামগ্রীর মোহে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। যাহা হউক, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা ব্রহ্মের এই অতুল ধন-সম্পদের কিছু পরিচয়-দানের চেষ্টা করিব।

শাল সেগুণ

ব্রহ্মের সম্পদের মধ্যে তাহার দিগন্তবিস্তৃত শাল ও সেগুণের বনের কথাই প্রথমে মনে হয়। ব্রহ্মের যে শাল ও সেগুণ জগতে প্রসিদ্ধ, সেই শাল ও সেগুণ ব্রহ্মের পরাধীনতার প্রধান কারণ। ব্রহ্মরাজের সহিত ইংরাজদের যতগুলি যুদ্ধ হয়, তাহার মূল কারণ এই শালবন। যখন ইংলণ্ডের ওকৃবংশ ধ্বংস হইয়া আসিল ও ফরাসীরা ব্রহ্ম-রাজের প্রিয়পাত্র হইয়া তাঁহার শাল সেগুণে জাহাজ তৈয়ারী করিতে লাগিল, তখন হইতেই ব্রহ্মযুদ্ধের সূত্রপাত হইল। তাহার পর যে ভাবে সমগ্র ভারতে বিজয়লক্ষ্মী ইংরাজের অঙ্কশায়িনী হইয়াছেন, এখানেও সেই ভাবে হইলেন। ১৮৫৬ সনে দ্বিতীয় ব্রহ্ম-সমরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মৌলমেন নগরী জাহাজ-নির্ম্মাণের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। বর্ম্মারা এই কাঠের জাহাজ-নির্ম্মাণ বিদ্যা ফরাসীদের নিকট শিক্ষা করে। মৌলমেনে নির্ম্মিত একশত বৎসর পূর্ব্বের একটী জাহাজ আজিও আমেরিকার ব্যবহৃত হইতেছে। শালবনসমূহ অত্যন্ত দুর্গম ও হিংস্রজন্তুপরিপূর্ণ। ম্যালেরিয়ার প্রভাবও কম নয়। সমস্ত বনই ব্রহ্ম-সরকারের নিজস্ব। সুখগম্য বনসমূহ হইতে সরকার নিজের তত্ত্বাবধানে কাঠ কাটাইয়া চালান দেন। বেশীর ভাগ বনই পত্তনি করিয়া দেওয়া। তাহা হইতে বাৎসরিক এক কোটীরও উপর ধনাগম হয়। এই সব ভারি ভারি গাছ বন হইতে কাটাইয়া সাধারণতঃ হাতীর সাহায্যে নদীতে ফেলা হয়। নদীতে ভাসিতে ভাসিতে কাঠ গম্য স্থানে পৌছায়। এই জন্য বহু হস্তী এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকে। এই কাঠে এক রকম তৈলাক্ত পদার্থ আছে, যে জন্য ইহার স্থায়িত্ব এত অধিক। কারলি গুহায় একটী সেগুণের কাঠের ছাতা আছে, তাহা দুই হাজার বছরেরও বেশী পুরাতন। ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে শালবংশ ধ্বংস হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে এই কাঠ এই দেশে এত সস্তা ছিল যে, লোকে সাধারণ জ্বালানি কাষ্ঠরূপে ইহা ব্যবহার করিত। ব্রহ্মদেশের প্রায় সমস্ত গৃহই পূর্ব্বে কাষ্ঠে নির্ম্মিত হইত। এখন ইটের ব্যবহার কিছু বাড়িয়াছে। গত বৎসর প্রায় তিন কোটী টাকার কাঠ বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। ইহা হইতে ইহার ধনসম্পদের কিছু অনুমান করা যায়।

তৈল

যে খনিজ তৈল উপলক্ষ্য করিয়া তুর্কী ও ইংলণ্ডে আগুন জ্বলিবার উপক্রম হইয়াছিল, সেই তৈল-সম্পদে ব্রহ্মদেশ অতুল বিভবশালী। নদীর মোহনা ছাড়াইয়া জাহাজ যেমন ইরাবতী বহিয়া রেঙ্গুন অভিমুখে অগ্রসর হয়, তখন রেঙ্গুনের নিকট নদীর তীরে সিরিয়ামে বর্ম্মা অয়েল কোম্পানির সুবৃহৎ কারখানা দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। খনি হইতে তৈল আহরণ ও পরিষ্কার করা ব্রহ্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়। ১৯০৪ সনে এক কোটী সায়ত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মণ এবং

১৯২১ সনে তিন কোটী পঁচাত্তর লক্ষ মণ তৈল খনি হইতে উত্তোলন করা হইয়াছে। কতকগুলি তৈলকূপ খালি হওয়ায় ১৯২২ সনে প্রায় পাঁচ লক্ষ পঁচিশ হাজার মণ তৈল কম উঠিয়াছে। বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন, ব্রহ্মে এখনও বহু অনাবিষ্কৃত তৈলখনি আছে। তাহার স্থান-নির্দ্দেশ জন্য চেষ্টা হইতেছে। ইয়ানজাউং, ইয়ান জ্যা ও সিঙ্গু নামক স্থানই তৈলের প্রধান খনি। এই সমস্ত খনিরই মালিক বিদেশী বর্ম্মা অয়েল কোম্পানী। অসীম অধ্যবসায় সহকারে এই কোম্পানী উপরি উক্ত তিনটি স্থানের খনিকে সিরিয়ামের সহিত ২৭৫ মাইল লম্বা এক নল-প্রণালী দ্বারা সংযুক্ত করিয়াছে। এই সমস্ত স্থান হইতে অপরিস্কৃত তৈল এখানে আসিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরিস্কৃত পেট্রোল ও অপেক্ষাকৃত অপরিস্কৃত জ্বালানি তৈল ও মালিস তৈলরূপে বাজারে বিক্রী হয়। ১৯২৩-২৪ সনে ব্রহ্মদেশ হইতে দশ কোটি টাকা মূল্যের উপর খনিজ তৈল ও মোমবাতি বিদেশে রওনা হইয়াছে। ভারতবর্ষই প্রায় সাত কোটি টাকার জিনিষ কিনিয়াছে।

ধান চাউল

রেঙ্গুন চাউলের কথা বোধ হয় দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বঙ্গবাসী আজিও ভুলে নাই। ধানের উপর ব্রহ্মের সম্পদ্ অনেকটা নির্ভর করে। চাউল মানবের একটি প্রধান খাদ্য। ব্রহ্মজাত এই ধান পৃথিবীর ধানের অভাব শতকরা ৬৩ ভাগ পূরণ করিয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে এখানে দেড়শত লক্ষ মণ ধান উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য অর্দ্ধেক এই দেশেই থাকিয়া যায় এবং অর্দ্ধেক বিদেশে রপ্তানি হয়। বর্ত্তমানে প্রায় ২৬ কোটী বিঘাতে ধানের চাষ চলিতেছে। ১৮৫২ সনে নিম্নব্রহ্ম ইংরাজের দখল হওয়ার পর ধানের চাষ খুব বাড়িয়াছে, কিন্তু চাষ-প্রণালীর বিন্দুমাত্রও উন্নতি হয় নাই। অতি সামান্য মাত্র চেষ্টা করিলে উৎপন্ন ধানের পরিমাণ স্বচ্ছন্দেই তিন গুণ বাড়িয়া যাইবে। এ বিষয়ে প্রজা ও সরকার উভয়েই উদাসীন। এখানকার জমি অত্যন্ত উর্ব্বর। অতি সামান্য মাত্র পরিশ্রমেই প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয়। দুর্ভিক্ষ বড় একটা হয় না। এই সমস্ত কারণে ব্রহ্মবাসী সাধারণতঃ শ্রমবিমুখ ও অমিতব্যয়ী। আমাদের দেশের মত এখানে রোয়া ও বোনা,—দুই রকম ধানই হয়। ধানের ক্ষেতে কাজ করিবার জন্য মরসুমে বাঙ্গালী ও মাদ্রাজী কোরঙ্গী কুলির বিস্তর আমদানি হয়। ধান সাধারণতঃ এখান হইতে ভানিয়া ছাঁটিয়া বিদেশে পাঠান হয়। এজন্য অন্ততঃপক্ষে তিনশত ভাল চাউলের কল এখানে আছে। বলা বাহুল্য, বর্ম্মাদের ব্যবসায়-বুদ্ধি কিছু কম থাকাতে চাউলের বাজার বিদেশী বণিকের হস্তগত। ১৯২৩-২৪ সনে প্রায় ২৮ কোটী টাকার চাউল বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। ইংরাজের করতলে আসিয়াই বর্ম্মারা এত নগদ টাকার মুখ দেখিতেছে। তার ফলে বর্ম্মাদের ঘর বিদেশী বিলাস-ব্যসনে পরিপূর্ণ হইতেছে।

রবার

রবারের চাষ ব্রহ্মদেশে ইংরাজেরই কীর্ত্তি বলিতে হইবে। বর্ত্তমান যুগে জগতের ব্যবসায়-ক্ষেত্রে রবারের চাহিদা অসম্ভব বাড়িয়া গিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বর্ম্মা সরকার প্রথমে মাগুই জেলায় রবারের চাষ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া আশাতিরিক্ত ফললাভ করেন। রবার এক রকম গাছের আটা। এই পরীক্ষার ফলে ব্রহ্মদেশে এখন প্রায় সাত শত চব্বিশটী রবারের বাগান হইয়াছে। তাহাতে আড়াই লক্ষ বিঘারও উপর জমির মধ্যে প্রায় দুই লক্ষ বিঘা জমি আবাদ হইতেছে। ১৯১৯ সনের চেয়ে এখন প্রায় ৫০ হাজার বিঘা বেশী আবাদ হইয়াছে। ১৯২৩ সনে সাড়ে দশ লক্ষ সেরের উপর রপ্তানি হয়। ১৯২৪ সনে বত্রিশ লক্ষেরও উপর শুক্না রবার চালান হয়। ইহা হইতে সহজেই এই কাজের কেমন প্রসার হইতেছে বুঝা যায়।

তূলা

সম্প্রতি এখানে তূলার কাজ বেশী করিবার জন্য আগ্রহ দেখা দিয়াছে। বিদেশী সভ্যতার অনুকরণে ব্রহ্মবাসী দেশী মোটা পরিধেয় ছাড়িয়া ম্যানচেষ্টারের কাপড়ে লজ্জা-নিবারণ করিতেছে। এদেশ হইতে ১৯২৩-২৪ সনে এক কোটি ছাব্বিশ লক্ষ টাকার তূলা প্রধানতঃ জাপানে রপ্তানি

হইয়াছে। সম্প্রতি মিনজান সহরে একটি কাপড়ের কল স্থাপিত হইয়াছে। এখানে প্রাচীন কালে চরকার বহুল প্রচলন ছিল। এখনও শান প্রভৃতি অসভ্য প্রদেশে বিস্তর চরকা চলিয়া থাকে।

ধাতুদ্রব্য

সম্প্রতি ব্রহ্মে কয়েকটি ধাতুর খনিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। গত বৎসর প্রায় কুড়িলক্ষ টাকার পিগলেড ভারতে রপ্তানি হয় ও এককোটি কুড়িলক্ষ টাকার বিদেশে রপ্তানি হয়। শান ষ্টেটে কালাও নামক স্থানে একটি সীসার খনি আবিষ্কৃত হইয়া কার্য্যোপযোগী হইয়াছে। একজন ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ার নাকি রেঙ্গুনের নিকট ৭০ মাইল মধ্যে খুব ভাল লৌহখনির সন্ধান পাইয়াছেন। পৃথিবীর অনেক স্থানের লৌহ অপেক্ষা তাহা উৎকৃষ্ট।

গালা ও চামড়ায় ব্রহ্মদেশ বেশ-কিছু টাকা পায়। গত বৎসর ৫৭ লক্ষ টাকার গালা কলিকাতায় চালান হয়। ইহার অধিকাংশই শান ষ্টেটের আমদানি। ঐ সময় প্রায় পনর লক্ষ টাকার চামড়া রপ্তানি হইয়াছে। বর্ম্মার চামড়া ভাল নয় এবং এখানে পাকা চামড়া তৈয়ারী করিবার কোনো কারখানা নাই।

আরও ছোট খাট অনেক প্রকার জিনিষে ব্রহ্মদেশ সমৃদ্ধিশালী। কিন্তু এখন যে ভাবে দেশ হইতে তাহার সম্পদ্ পরের ধনাগারে আশ্রয়লাভ করিতেছে, তাহাতে বিশেষ যত্ন না করিলে ব্রহ্মদেশ অদূর ভবিষ্যতে গজভুক্ত কপিত্থের দশা প্রাপ্ত হইবে। ("আনন্দ বাজার")

কেরাণীদের কর্জ্জ

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়, তত্ত্বনিধি, বি, এ

(১)

মালদহ ও দিনাজপুর জেলার ডাক-কর্ম্মীদিগের আর্থিক অবস্থা বুঝিবার চেষ্টা করা গেল। পূরা তথ্যের অভাবে এ বিষয়ে খাঁটি কিছু বুঝা যাইতেছে না। তবে যাহা দেখিতেছি ও বুঝিতেছি তাহাতে কতকটা আন্দাজ করা চলিতে পারে।

এই দুই জেলার ডাককর্ম্মীরা মিলিয়া যে পোষ্টাল্ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট্ সোসাইটী স্থাপন করিয়াছেন উহার সেক্রেটারী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম কর্ম্মচারীরা এই সোসাইটী ছাড়া অন্য কোথাও ধার করেন কি না।

তিনি বলিলেন, "ধার করেন বৈকি? স্থানীয় ব্যাঙ্কে, কোনো কোনো মহাজনের নিকট, বন্ধুবান্ধবদিগের নিকটও অনেকের ধার আছে। এ ছাড়া, দোকানবাকী তো প্রায় সকলেরই আছে। সব জিনিষ নগদ কিনিয়া সংসার চালানোর ক্ষমতা আমাদের অনেকেরই নাই। একমাস ধারে খাই প্রায় সকলেই। মাসকাবারে দোকান-বাকী শোধ করি।"

ইনিও এই জেলার একজন ডেকো কেরাণী। বলিলাম, "তাহা হইলে দেখিতেছি এই ক্রেডিট্ সোসাইটীর খাতাপত্র নাড়িয়া কর্ম্মীদিগের ঋণের পরিমাণ খাঁটিরূপে জানা সম্ভবপর নয়।"

তিনি বলিলেন, "না, কেবল আংশিক খবর পাইবেন মাত্র। ব্যাঙ্কের নিকট, মহাজনের নিকট ও দোকানের নিকট ঋণের পরিমাণ জানিতে পারিবেন না। সরকারী চাকুরেদের ঋণের পরিমাণ খুব বেশী থাকিলে বরখাস্ত হইবার ভয় থাকে বলিয়া ঋণের পরিমাণের খাঁটি খবর জানিবার উপায় নাই। তবে এই কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটীর তথ্যগুলি হইতে আমাদের আর্থিক অবস্থার কতকটা আঁচ পাইবেন।"

(২)

এই ক্রেডিট্ সোসাইটীটি স্থাপিত হইয়াছে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে। চারি বৎসরের খাতাপত্র নাড়িয়া দেখিলাম মেম্বরের সংখ্যা—

১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে ছিল	৯৪	জন
১৯২২-২৩ ,, ,,	৯৭	,,
১৯২৩-২৪ ,, ,,	১০২	,,
১৯২৪-২৫ ,, ,,	১১০	,,

খাতকের সংখ্যা—

১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে ছিল	১৭	জন
১৯২২-২৩ ,, ,,	২৮	,,
১৯২৩-২৪ ,, ,,	৩৩	,,
১৯২৪-২৫ ,, ,,	৪৪	,,

ঋণের পরিমাণ ছিল—

১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে	১৬৭৩৲	টাকা
১৯২২-২৩ ,,	১৮০৫৲	,,
১৯২৩-২৪ ,,	২৬১৬৲	,,
১৯২৪-২৫ ,,	৩৬৫৮৲	,,

সেক্রেটারী মহাশয় বলিলেন, "এই ক্রেডিট্ সোসাইটীর যাঁহারা মেম্বর, তাঁহারা প্রয়োজনের সময় টাকা ধার পাইবার আশাতেই মেম্বর হন। অন্য মতলবের পরিচয় পাওয়া যায় নাই।"

তাহাহইলে এটুকু অন্ততঃ অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই ১১০ জন মেম্বরের সঞ্চিত অর্থ নাই; অথবা থাকিলেও উহার পরিমাণ এত কম যে অসুখবিসুখ আপদ বিপদ প্রভৃতি প্রয়োজনের সময় উহাতে চলিতে পারে না। অর্থাৎ এই ১১০ জন কর্ম্মচারীর অবস্থা 'দিন আনে দিন খায়' গোছের। সচ্ছল জীবন ইঁহাদের মোটেও নয় ইহা বলা যাইতে পারে।

এই দুই জেলাতে ডাকহরকরা, পিয়ন, কেরাণী ইত্যাদি সকল শ্রেণীর কর্ম্মচারী মিলিয়া ৩৯৭ আছেন। উহার মধ্যে ৭৫ জন ডাক-বিভাগের এজেন্ট। সুতরাং ৩২২ জন ডাক-বিভাগের খাঁটি কর্ম্মচারী। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে প্রায় ⅓ কর্ম্মীর আর্থিক অবস্থা সচ্ছল নহে। ইঁহারা কিছুই জমাইতে পারেন না। নিত্য নিয়মিত খাইখরচ ছাড়া অসুখবিসুখে, আপদবিপদে, বদলির সময়ে ঋণের জন্য অপরের নিকট হাত পাতিতে হয়।

এই ক্রেডিট্ সোসাইটীর নিকট ঋণের পরিমাণ ১৯২১-২২ সনে ছিল ১৬৭৩৲ টাকা, ১৯২৪-২৫ সনে উঠিয়াছে ৩৬৫৮৲ টাকায়। প্রতি বৎসরই উহা বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহার কারণ কি? সেক্রেটারী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়, ১৯২১ সনে আপনাদের মাইনা বাড়িল, অনেকে এক সঙ্গে কতকগুলি টাকাও পাইলেন, অথচ এই চারি বৎসরেই কর্ম্মীদিগের ঋণ বাড়িয়াছে! ফলে ঠাট্ বাড়িয়াছে কি? চালচলন বড় হইয়াছে কি? আয় বাড়িবার দরুণ কর্ম্মীরা খরচ্যে হইয়াছে কি?"

তিনি উত্তর করিলেন, "মাইনা বাড়িয়াছে সত্য; কিন্তু চালচলনও বড় হয় নাই, ঠাট্ও বাড়ে নাই। দশ বৎসর আগে যে রকম চালচলন ছিল আজও সেই রকম আছে, অথবা তার চেয়ে বরং কিছু কমিয়াছে। ডাকঘরের কর্ম্মচারীরা চিরদিনই অত্যন্ত সাদাসিধা জীবন যাপন করে। অমিতব্যয়ী তাহারা কোনকালে ছিল না, আজও হয় নাই।"

নিজের চোখেও যে কয়টী কর্ম্মচারীকে এবং তাঁহাদের সংসারের হালচাল দেখিবার ও বুঝিবার সুযোগ পাইলাম, তাহাতেও দেখিতেছি কোনও বিষয়ে প্রাচুর্য্য তাঁহাদের নাই। যেটুকু নেহাৎ না করিলে নয়, তাই তাঁহারা করেন। অত্যন্ত সাদাসিধা জীবন। বৌঝি, ছেলেমেয়েদেরও তাই। বাবুগিরির আওতায় ইঁহারা আছেন এ কথা বলা চলে না।

জীবন-যাত্রার ঠাট্ বাড়ে নাই, অথচ মাইনা বাড়া সত্ত্বেও ঋণ বাড়িয়া চলিয়াছে, ইহার কারণ কি? কর্ম্মীদিগের সহিত আলাপ ও তর্কপ্রশ্ন করিয়া যাহা বুঝিলাম তাহাতে দেখিতেছি ১৯১০ হইতে ১৯২১ সনের মধ্যে সমস্ত ভারতবর্ষের মতো এই দুই জেলাতেও জিনিষপত্রের দাম অত্যন্ত বাড়িয়াছিল। কিন্তু ঐ সময় মধ্যে মাইনা না বাড়িবার ফলে ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই ধার করিয়া সংসার চালাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এখনো সেই পুরাতন ঋণই শোধ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। চড়া দরের অনুপাতে মাইনা

বাড়ে নাই বলিয়া এখনো বাড়তি তলবের সাহায্যে যে ভোগ্য সংগ্রহ হয় তাহাতেও টানাটানি করিয়া সংসার চলিতেছে। অসুখবিসুখ, বদলি, পূজায় ছেলেমেয়েদের ২।১ খানা কাপড়, মেয়ের বিবাহ, ছেলের পরীক্ষার ফি, ঘরের চালে খড় ইত্যাদি বাবদ খরচের দরকার হইলেই এখনো ঋণ করিতে হইতেছে। মহাজন বা ব্যাঙ্কের সুদ বেশী বলিয়া ও তাগাদায় অস্থির হইয়া অনেকেই এই ক্রেডিট্ সোসাইটীর নিকট হইতে অল্প সুদে টাকা ধার নিয়া আগেকার ঋণ ক্রমশঃ শোধ করিতেছেন। তাহার উপরে এই দুই জেলাতে চিকিৎসা ও ঔষধের জন্য খরচ বৎসরে মাথাপিছু নেহাৎ কম নয়। বাংলার অনেক জেলার চেয়েই বেশী। এই খরচও কর্ম্মিগণ মাইনা থেকে মিটাইতে পারেন না। ঋণ করিতে হয়। সোসাইটীর টাকা থাকিলে বোধ হয় আরও লোকে টাকা ধার নিত। এই দুই জেলার ডাকঘরের কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে আকস্মিক খরচের জন্য নূতন ঋণ ও পুরাণো ঋণের হাতফের এই দুই কারণে দেখিতেছি গত চারি বৎসরে ঋণের পরিমাণ বাড়িয়াছে।

(৩)

এই দুই জেলার ডাক-কর্ম্মিগণ কি বাবদ কোন বৎসর কয়জন টাকা ধার নিয়াছেন তাহার হিসাব নিম্নরূপ :—

	পুরাণো ঋণশোধ	নিজের ও পরিবার-ভুক্ত অন্যান্য লোকের চিকিৎসা	মেয়ের বিবাহ	বাড়ী তৈয়ারী	বাড়ী মেরামত	শ্রাদ্ধ	উপনয়ন	ছেলের শিক্ষার খরচ	অন্নাভাব
১৯২১-২২	১১	১	৪	১	—	—	—	—	—
১৯২২-২৩	১০	১০	১	৩	৩	১	—	—	—
১৯২৩-২৪	৯	১৭	৪	—	২	—	১	—	—
১৯২৪-২৫	৭	১৮	৩	৯	৪	১	১	১	—

১৯১০ হইতে ১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অন্যান্য জেলার মতো এই দুই জেলাতেও জিনিষপত্রের দাম চড়িয়াছিল। কিন্তু চড়া দরের সঙ্গে সঙ্গে আয় না বাড়াতে অনেকে মহাজনের নিকট হইতে ঋণ করিয়া সংসার চালাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মহাজনের তাগিদ সহ্য করিতে বা এড়াইতে না পারিয়া তাঁহারা পোষ্টাল কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটীর নিকট হইতে টাকা ধার করিয়া পুরাণো মহাজনদিগের বুঝ দিতেছেন। ঋণের হাতফের হইতেছে। এই দুই জেলাতে এই হাতফের হওয়ার কাজটা ক্রমশঃ সম্পূর্ণ হইয়া আসিতেছে বলিয়া মনে হয়। তাই প্রতি বৎসর এই বাবদ খাতকের সংখ্যা কমিতেছে।

মালদহ ও দিনাজপুর দু'টী জেলাই ভয়ানক অস্বাস্থ্যকর। ম্যালেরিয়ার ডিপো বলিলেই হয়। ১৯১১ হইতে ১৯২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কয় বৎসরে শুধু দিনাজপুর জেলার মৃত্যুর গড় কষিলে দেখা যায়, হাজার করা ৩৪·২২ জন মরিয়াছে জ্বরে, আর ৩·০৮ জন মরিয়াছে অন্যান্য সকল রকম রোগে। মাইনা বাড়া সত্ত্বেও গত চার বৎসরে এই জেলার ডাককর্ম্মিগণ মাইনা থেকে এই বাবদের খরচ মিটাইতে পারিতেছেন না। প্রতি বৎসরই এই বাবদ খাতকের সংখ্যা বাড়িতেছে।

দেখিতেছি মাইনা বাড়া সত্ত্বেও খাইখরচ বাদে যে-কোনো ন্যায্য খরচ উপস্থিত হইলেই ইঁহারা মুস্কিলে পড়েন। সচ্ছল অবস্থা ইঁহাদের এখনো হয় নাই। নিশ্চিন্ত হইয়া চাকরী করিবার মতো অবস্থা সৃষ্ট হয় নাই। ইহাতে কর্ম্মপটুতা বাড়িতেছে না। দেশের সেটা লাভ না লোকসান?

ব্যাঙ্ক-ব্যবসার গোড়ার কথা*

শ্রীবিনয়কুমার সরকার
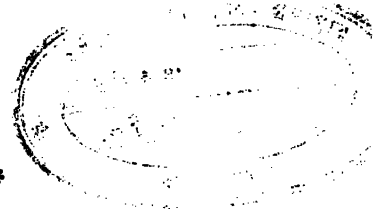
আজকে "ব্যাঙ্ক-গঠন ও দেশোন্নতি সম্বন্ধে" কথা বলা হবে। ব্যাঙ্ক বস্তুটা এক হিসাবে অতি কঠিন, আবার আর এক হিসাবে খুব সোজা। কঠিন বলি এই জন্য যে, পাঁচ কোটী বাঙ্গালীর তাঁবে ব্যাঙ্কের মতন ব্যাঙ্ক পাঁচটাও নাই। নাই যে সে সম্বন্ধে কোনো-কিছু সন্দেহ করবার কারণ দেখি না।

টাকা-কড়ির বাজার

অথচ ব্যাঙ্ক অতি সোজা জিনিষ। ব্যাঙ্ক আর বাজারের মধ্যে কোনো তফাৎ নাই। বাজারে মাছ-দুধ কেনা-বেচা হয়, আর ব্যাঙ্কে টাকা-পয়সা কেনা-বেচা হয়। সত্যি সত্যি টাকা কেনা-বেচা হয় না—আসলে ওখানে ধার নেওয়া আর দেওয়া হয়। যে টাকা ধার নেওয়া হবে, সেটা আবার আর একজনকে ধার দিতে হবে।

এই টাকা নিয়ে টাকা লাগাতে গেলে কিছু মুনাফা দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু এ করতে কোনো দর্শনের সাহায্য নিতে হয় না, বা কোনো অতি গভীর যুক্তিশীলতার দরকার হয় না। আমি পাঁচ হাজার টাকা নেব, বৎসরে চার টাকা সুদ। এই টাকা নিয়ে আমি পুঁতে রাখতে পারি না। আমি যে টাকা নেব ঐ টাকা যাতে খাটাতে পারি, তার ব্যবস্থা করতে হবে। যদি এই টাকা আর কাউকে ধার দিতে চাই তবে সেটা কেমন করে দেওয়া যেতে পারে? কোনো লোক ধার চাইলে তাকে বলতে হবে আমি নিজে চার টাকা সুদ দিচ্ছি, তার চেয়ে যদি বেশী সুদ আমায় দাও, তা হলে তোমাকে ধার দিতে পারি। ব্যাঙ্কের মূল কথাটা হচ্ছে এইটুকু।

ধরুন যদি শতকরা ৪৲ টাকা সুদে টাকা এনে শতকরা ৭৲ টাকা সুদে লাগান যায়, তা হলে অন্ততঃ ৩৲ টাকা লাভ থাকে। কখনো তিন টাকা, কখনো সাত টাকা, কখনো দশ টাকা, কখনো বা আঠার টাকা ইত্যাদি। এই তিন টাকা, দশ টাকা, আঠার টাকার উপরেই বিপুল বিপুল ইমারত গড়ে উঠে। পাঁচ শ', সাত শ' কি হাজার লোক খাটানো সম্ভব হয়। তিন চার হাজার টাকা মাইনে দিয়ে ম্যানেজার রাখা চলে। বড় বড় ফ্যাক্টরী, ইনসিওর‍্যান্স কোম্পানী, বহির্বাণিজ্যের বড় বড় সৌধমালা মাথা তুলে দাঁড়ায়।

জীবনযাত্রার বাস্তব মাপকাঠি

ব্যাঙ্ক অতি সোজা সন্দেহ নাই, কিন্তু আবার এই সোজা কথাটার মধ্যে একটা গভীর কথাও আছে। দেশোন্নতি, আর্থিক উন্নতি, জাতীয় চরিত্র, আধ্যাত্মিক জীবন এই ব্যাঙ্ক-গঠনের সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। প্রথমতঃ, এই ব্যাঙ্কের দ্বারা একটা জাতির ভিতরকার আসল কথাগুলা পাকড়াও করা যেতে পারে। যে দেশে ব্যাঙ্ক নাই, অথবা তার সংখ্যা কম, বুঝতে হবে সে দেশের জাত ধনসম্পদ্-শালী নয়—একটা নিরেট পাকা বনিয়াদের উপর তার ভিত্তি নয়। ব্যাঙ্ক ধন-সম্পদের ভিত্তি।

দ্বিতীয়তঃ, ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান একটা যন্ত্রবিশেষ। দেশের ধনদৌলত জরীপ করবার, আর্থিক জীবন মাপবার যন্ত্র। একটা জাতের আর্থিক দৌড় কতদূর, তা তার ব্যাঙ্কগুলার একতলা বাড়ী কি দোতলা বাড়ী, সেখানে ৫০০ লোক খাটে কি পাঁচ হাজার লোক খাটে, সেই সবের শাখা আফিস কতগুলি—এই সব দেখলেই বলে দেওয়া যেতে পারে। কাজেই দেশটা বড় কি ছোট তার আসল সাক্ষী হচ্ছে ব্যাঙ্কের আকার-প্রকার। কালবৈশাখীর ঝড় আসছে কিনা তা যেমন ব্যারোমেটার যন্ত্র বলে দেয় তেমনি এদেশটা ওদেশের চেয়ে কত বড় বা কত ছোট তা এই ব্যাঙ্ক-যন্ত্রের মাপজোকে আমরা সহজেই বুঝে নিতে পারি।

---

* জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের তত্ত্বাবধানে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ অবলম্বনে তাহেরুদ্দিন আহ্‌মদ-কর্তৃক লিখিত।

তৃতীয়তঃ, একটা গুরুতর কথা ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানে ধরা পড়ে। যে জাত ব্যাঙ্ক চালাতে জানে না, সেটা নেহাৎ অপদার্থ। যে জাতের তাঁবে একটা ব্যাঙ্কও নাই, তাকে শুধু দরিদ্র বলতে হবে না, সঙ্গে সঙ্গে বলতে হবে তার চরিত্র অতি ঘৃণ্য, সভ্যসমাজে তার নামোল্লেখ করা যায় না। নরনারীর জীবনীশক্তি মাপবার যন্ত্র হচ্ছে ব্যাঙ্ক। জাতীয় চরিত্র, নৈতিক জীবন, আধ্যাত্মিকতা—এসব মাপবার বুঝবার বিপুল যন্ত্র ব্যাঙ্ক।

যাঁরা কতকগুলা বিশেষ্য বিশেষণ কায়েম করে' কোনো জাতি সম্বন্ধে বা তার চরিত্র সম্বন্ধে মতামত জাহির করতে অভ্যস্ত, তাঁরা একটা মস্ত দোষ করে ফেলেন। কারণ, বস্তুনিষ্ঠ ভাবে জাতিকে, জাতির জীবনকে, তার নৈতিক চরিত্র প্রভৃতিকে বুঝবার জন্য তাঁরা কোনো বিশেষ মাপ-কাঠি ব্যবহার করেন না। তাঁদেরকে বলতে চাই যে, হাজার উপায়ে বাস্তব প্রণালীতে জাতির চরিত্র বুঝা সম্ভব। ব্যাঙ্ক হচ্ছে এই কাজের জন্য অন্যতম বিপুল যন্ত্র। এ যন্ত্র কায়েম করলে জাতীয় চরিত্র সমঝিবার পক্ষে কোনো গোঁজামিল দিবার সম্ভাবনা থাকে না।

বিশ্বাস-তত্ত্ব ও জাতীয় চরিত্র

ব্যাঙ্কের প্রাণ হচ্ছে বিশ্বাস (ক্রেডিট)। ইয়োরামেরিকার সব জাতির মধ্যেই ব্যাঙ্ক শব্দটা প্রচলিত। তবে ভিন্ন ভিন্ন জাতি তাদের ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় শব্দটার উচ্চারণ একটু অদল-বদল করে নেয়। যথা ফরাসী বাঁক, জার্ম্মাণ বাঙ্ক, ইতালিয়ান বাঙ্কা ইত্যাদি।

কিন্তু ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানের জন্য "ক্রেডিট" শব্দ বেশী ব্যবহার করে থাকে ফরাসীরা, ইতালিয়ানরা আর জার্ম্মাণরা। বিলাতে আর আমেরিকায় এই শব্দের রেওয়াজ এক প্রকার নাই। 'ব্যাঙ্ক'ই এই দুই মুলুকে একমাত্র শব্দ। কিন্তু জার্ম্মাণিতে 'ক্রেডিট আনষ্টাল্ট' 'ক্রেডিট প্রতিষ্ঠান' নামে অনেক ব্যাঙ্ক প্রচলিত। অষ্ট্রীয়া, সুইটসার-ল্যাণ্ড ইত্যাদি জার্ম্মাণভাষী দেশেও এইরূপ। ফরাসীরা 'সোসিয়েতে ক্রেদি' নামে ব্যাঙ্কের পরিচয় দিতে অভ্যস্ত। ইতালিতে এই সম্পর্কে "ক্রেদিত" শব্দের রেওয়াজ আছে।

ধার দেওয়া আর ধার লওয়া পরস্পরের বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। কাজেই যে শব্দের অর্থ বিশ্বাস সেই শব্দেই ধার দেওয়া লওয়ার কর্ম্মকেন্দ্রও বুঝাইতেছে। তুমি তোমার টাকা হাজির করেছ বলেই তোমাকে ব্যাঙ্ক বিশ্বাস করতে পারে না। অপরিচিত লোকের জন্য প্রতিনিধি দরকার হয় বা বিশ্বাস প্রতিপন্ন করবার জন্য দু' একজনের চিঠি আনা প্রয়োজন হয়। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করেই টাকার লেনা দেনা চলে থাকে। যে জাতের মধ্যে ব্যাঙ্ক নাই, বুঝতে হবে তার নরনারীর ভিতর পরস্পর বিশ্বাস, আস্থা জিনিষটাও নাই; সে জাতের লোক কখনও কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না। থার্ম্মোমেটার যেমন তাপের মাত্রা কতখানি বলে দেবে, ব্যারোমেটার যেমন হাওয়ার চাপের পরিমাণ বলে দেবে, আকাশ জরীপ করবার প্রয়োজন হবে না, ব্যাঙ্কও তেমি একটা জাতের নৈতিক দৌড় কতদূর সহজেই বলে দেবে। টাকা-পয়সা বিনিময়ের বিশ্বাস যে জাতটার মধ্যে নাই আধ্যাত্মিক হিসাবে সে জাতটা অধঃপতিত। এ অতি সোজা কথা।

বর্ত্তমান ভারতের ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান

যদিও ইংরেজ, ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইতালিয়ান সকলের কথাই আজ আপনাদিগকে কিছু কিছু বল্‌ব, কিন্তু আমার প্রধান আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আমার দেশ। এ দেশটা কোন্ অবস্থায় আছে? অন্যান্য জাতের সমকক্ষ হতে এর কতদিন লাগবে? বাংলায় ব্যাঙ্ক-গঠন কোন্ অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে?

প্রথমতঃ, এক রকম ব্যাঙ্ক যা আমাদের দেশে প্রায় পাঁচ সাত শ' বছর ধরে চলে আসছে। ঐ যাকে বলে কিনা হুণ্ডি ব্যাঙ্ক। পুঁজিপতির নিকট যত টাকা আছে, প্রধানতঃ তা দিয়ে নিজে নিজে কারবার চালানো সম্ভব। হুণ্ডি ব্যাঙ্কের কাজ এই শ্রেণীর ব্যক্তিগত কাজ। পরের টাকা ধার লওয়া হয় না, পরকে টাকা ধার দেওয়াই প্রায় একমাত্র ব্যবসা। এসব ব্যাঙ্ক সমস্তই ভারত-সন্তানের হাতে।

দ্বিতীয় রকম ব্যাঙ্ক যা কিনা বিদেশীদের হাতে। পরের টাকা ধার লওয়া হয়। এই ধার লওয়া টাকা আবার

অন্যকে ধার দেওয়াও হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য, বড় বড় কারবার, রেলওয়ে, জাহাজ-কোম্পানী ইত্যাদি যা-কিছু সবই এই সকল ব্যাঙ্কের সাহায্যে চল্‌ছে। বিদেশী টাকা-পয়সাও এই ধরণের ব্যাঙ্কে ভাঙানো চলে। বিদেশীদের তাঁবে এই সব চলছে বটে, কিন্তু এই জাতীয় ব্যাঙ্কে আমাদের দেশী লোকের টাকাও বিস্তর মজুত আছে। এই সব বিদেশী প্রতিষ্ঠান ভারতে না থাকলে বহু ভারতবাসীর অনেক ক্ষতি হত। আমাদের যারা অগাধ টাকার মালিক তাঁদের কেবলই ভেবে মরতে হত—এই সব টাকা দিয়ে তাঁরা কি করবেন —যদি এই ধরণের ব্যাঙ্ক এদেশে না থাক্‌তো। এই সব ব্যাঙ্কে টাকা রেখে এ দেশের ধনীরা আর কিছু না হোক নিরাপদে ঘুমোতে পারেন। বিদেশী-পরিচালিত ব্যাঙ্ক হলেও আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে এগুলি হতে অনেক সময়েই বিস্তর সাহায্য পাওয়া যায়। কাজেই স্বীকার করা কর্ত্তব্য যে, আমাদের আর্থিক উন্নতি বিষয়েও এই সব বিদেশী ব্যাঙ্ক কিছু কিছু সাহায্য করছে।

তৃতীয়তঃ, যে সব ব্যাঙ্ক আমাদের নিজের হাতে অর্থাৎ যার মূলধন আমাদের দেশী লোকের, আর যার পরিচালনাও আমাদেরই করিৎকর্ম্মা লোকের অধীনে। ভারতে এই রকম বোধ হয় মাত্র ৫।৭টি ব্যাঙ্ক আছে। এইগুলাকে কোনো মতে ফরাসী, জার্ম্মাণ ইত্যাদি জাতীয় কোনো কোনো ব্যাঙ্কের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। অন্ততঃপক্ষে এই সব ভারতীয় ও বিদেশী ব্যাঙ্কগুলা একই জাতের। ছোটবড়, উচ্চনীচ ভেদ আলাদা কথা। ভারতে আবার বাঙালীদের ব্যাঙ্কের কোনই ইজ্জৎ নাই।

ভারতের মধ্যে একমাত্র "সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক"ই কিছু মর্য্যাদা সম্মান দাবী করতে পারে; কিন্তু এটা পার্শীদের তাঁবে। এর মধ্যে বাঙালীর কিছু নাই। এর সমস্ত কর্ম্মচারী—সেই নীচের দরোয়ান থেকে সুরু করে উচ্চতম ম্যানেজার পর্য্যন্ত —আগাগোড়া পার্শী। বোম্বাইয়ের বড় আফিসের কথা বল্‌ছি। যা হোক, এই ব্যাঙ্ক একমাত্র ভারতবাসীর দ্বারা পরিচালিত। এর মূলধন ছিল আড়াই কোটী; বর্ত্তমানে এই ব্যাঙ্কে জমা হয়েছে কমসে কম পনর কোটী টাকা। এর পরে আসন দিতে পারি "পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক"কে। পাঞ্জাবীদের বাঙালীরা কি চক্ষে দেখে জানি না, তবে এই জাতটা ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে বাঙালীকে অনেক-কিছু শিখিয়ে দিতে পারে। যদিও এই পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক আর সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের প্রভেদ আকাশপাতাল। "বেনারস ব্যাঙ্ক" বলে আর একটা ব্যাঙ্ক আছে। এটা নেহাৎ ছোট হলেও এরণ্ড যেমন "দ্রুম", সেইরূপ আমাদের দেশের ব্যাঙ্কের মধ্যে এটাও নিজের আসন দাবী করতে পারে।

ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় বাঙালীর দৌড়

আর আমাদের বাংলায় আছে "বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক"। সেটার ভিত্তি ১৯০৫ সনের স্বদেশী আন্দোলনের সময় গড়ে উঠে। সেই যুগে "হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক" বাঙালীর কর্ত্তৃত্বে মাথা তুলে। এখনো তার টিকি দেখা যাচ্ছে বটে, তবে সেটা জেঁকে উঠতে পারে নি। দেশে ফিরে আসবার পর "মহাজন ব্যাঙ্ক" বলে আর একটা ব্যাঙ্কের নাম শুন্‌তে পাচ্ছি। এর মূলধন কত হবে জানি না, তবে পঞ্চাশ ষাট হাজারের বেশী মূলধন বোধ হয় নয়;—লাখেও যেয়ে পৌছিয়ে থাক্‌তে পারে। যদি এখন আপনারা জানতে চান এই দেড়টা, দু'টা কি আড়াইটা ব্যাঙ্কের মূলধন একত্র হয়ে কত দাঁড়াবে, তবে বল্‌তে পারি, আজ পর্য্যন্ত মাত্র যদি খুব বেশী করে ধরা যায় তবে ৩০ থেকে ৪০ লাখ। ১৯২৬ সন পর্য্যন্ত এই আমাদের দৌড়।

কিন্তু এসব ব্যাঙ্ক ছাড়াও বাংলার মফঃস্বলে কতকগুলি ব্যাঙ্ক গড়ে উঠেছে। এগুলিকে সাধারণতঃ "লোন আফিস" বলা হয়। এই বাংলাদেশেই কমসে কম দু'শ লোন আফিস আছে শুন্‌তে পাচ্ছি। যদিও এগুলিকে যথাযথভাবে ব্যাঙ্ক বলা চলে না, কিন্তু এইগুলিই ভবিষ্যতে বড় বড় ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি গড়ে তুলবে। পাঁচজন, দশজন, ত্রিশজন মিলে এক একটা বিশ্বাসস্থাপনের প্রতিষ্ঠান, ধার লওয়া-দেওয়ার কেন্দ্র গড়ে তুল্‌ছে। এই সব ছোট ছোট লোন-আফিসের দ্বারা আর যাই হোক না কেন, একটা বিশ্বাসের ক্ষেত্র, আস্থা-স্থাপনের কর্ম্মভূমি, পরস্পর-মৈত্রীর বাস্তব কেন্দ্র গড়ে উঠেছে।

এখন কথা হচ্ছে কেমন করে এই সব "লোন আফিস"কে খাঁটি ব্যাঙ্কে পরিণত করা যেতে পারে। এইটাই

বর্ত্তমানে নব্য বাঙালীর এক বড় সমস্যা। থার্ম্মোমেটার ব্যারোমেটারে উত্তাপ আর আবহাওয়া মাপা যেতে পারে। দড়ি ধরে মেপে দেওয়া চলে হিমালয়ের কত নীচে রকি পর্ব্বত। আবার তেম্নি ব্যাঙ্কের কথা উঠলে আর সব দেশের তুলনায় বলা চলে বাঙালী জাতটা ঐ বঙ্গোপসাগরের তলে বাস করছে।

বিলাতী ব্যাঙ্কের বহর

বিলাতের অনেক "বাঘা" "বাঘা" বড় লোকের নাম আপনারা শুনে থাকবেন। এসব লোকের মধ্যে ম্যাককেনা একজন মস্ত লোক। ফরাসী, আমেরিকান, জার্ম্মাণ্‌রা সকলেই এ লোকটাকে জবরদস্ত বিবেচনা করে থাকে। টাকার বাজারে ম্যাককেনার মত বাঘা লোক অতি কমই আছে। এই ম্যাককেনা "মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্কে"র একজন কর্ণধার। এই ব্যাঙ্কের ১৯২৫ সনের যে রিপোর্ট আমি পেয়েছি তাতে তিনি বলছেন, "এই মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্কের ২২০০টি শাখা স্থাপিত হয়েছে এবং এগুলি কেবলমাত্র ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডের মধ্যে স্থাপিত।" এই সবকটী দেশ মিলে আমাদের গোটা বাংলার সমান। অথচ এদের কাছে বাঙালীর স্থান কত নীচে। আমাদের দেশের "ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কে"ও এক শতের বেশী শাখা নাই—কারণ তা থাকবারই আইন নাই।

এই রকম মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্কের মত আরও কয়েকটা বাঘা বাঘা ব্যাঙ্ক বিলাতে রয়েছে। একটা হচ্ছে "বার্কলেস্ ব্যাঙ্ক"—এর শাখা হচ্ছে ১৭০০; "লয়েডস্ ব্যাঙ্ক", "ওয়েষ্ট মিনষ্টার ব্যাঙ্ক", "ন্যাশন্যাল প্রেভিন্‌শ্যাল ব্যাঙ্ক"—এই ৫টা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ব্যাঙ্ক লণ্ডন সহরে আছে। ম্যানচেষ্টার সহরটা নিজেই একটা বিপুল সাম্রাজ্যের রাজধানী হতে পারে। তেম্নি লিবারপুলও একটা সাম্রাজ্য চালাতে পারে। এই দুই সহরেই একাধিক বড় বড় ব্যাঙ্ক আছে। বিলাতে অলিতে গলিতে যে অসংখ্য ছোট-খাট ব্যাঙ্ক রয়েছে, সে সব ছেড়ে দিলেও মোটামুটী বড় বড় ব্যাঙ্কের শাখা এই ১৯২৬ সনে আট হাজার দাঁড়াবে। এই শাখা দিয়ে একমাত্র বিলাতেই ধরতে হয় কমসে কম আট হাজার ব্যাঙ্ক চলছে। এখন আমাদের দেশের সঙ্গে ও-দেশটার তুলনা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়? কোথায় হিমালয় পর্ব্বত আর কোথায় বঙ্গোপসাগর!

জার্ম্মাণ ও আমেরিকান ব্যাঙ্কের কথা

এবার জার্ম্মাণির 'ডায়চে বাঙ্কে'র কথা বলি। যে পাড়ায় এই ব্যাঙ্কটি স্থাপিত সেখানে গেলে আপনাদের গোলকধাঁধা লেগে যাবে। লম্বা চওড়ায় বহর তার এই কলেজ স্কোয়ার থেকে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ। এর বিপুলকায় বাড়ীগুলি দেখতে দেখতে চোখে ছানাবড়া লেগে যায়।

এবার আমেরিকার কথা। ইয়োরোপের বড় বড় দেশে কোটী কোটী নিয়ে কারবার; কিন্তু আমেরিকার আর কোটীতে কুলায় না। সেখানে অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ! সে দেশের এক ডলার আমাদের তিন টাকার উপর। তার পিছনে আবার কেবল শূন্য। চেক কাকে বলে এই আমেরিকায় তা বুঝা যায়। এখানে পাঁচসিকা, এমন কি পাঁচ গণ্ডা পয়সার সওদায়ও চেক চলে। পানওয়ালী, বিড়িওয়ালা, মুচি এদের পয়সাকড়ি পর্য্যন্ত চেকে দেওয়া যায়। এমনিতর আজগুবি দেশ এই আমেরিকা।

পূর্ব্ব বনাম পশ্চিম

এখন কথা হচ্ছে আমাদের আর ওদের তফাৎ কোন্ খানটায়? আপনারা হয়ত বলবেন "ওরা হল পশ্চিমের দেশ, পশ্চিমের লোক, পশ্চিমা জাত—ওদের এসব সাজে। আর আমরা হলাম পুবের দেশ, আধ্যাত্মিকতার দেশ। ওরা হল ছোট জাত, নেহাৎ ছোট, ওরা কেবল টাকা, টাকা, টাকা এই নিয়েই থাকে। আমাদের হল মুনিঋষির দেশ, আমরা পার্থিব চিন্তাকে ছোট কাজ বলে মনে করি"। আপনাদেরকে পাল্টা জবাব দিয়ে ওরা বলে—"তোরা হলি পুবের লোক, সুয়েজের ওধারে ব্যাঙ্ক গড়া সাজে না। তুরস্ক, জাপান, ভারত—এরা ব্যাঙ্কের কোনো কদর জানে না।"

এসব শুনে কিন্তু আমাদের লোকেরা চটে লাল। এঁরা বলেন:—"বটে রে! তোরা হলি অতি ছোট জাত, কতকগুলি টাকা জমিয়েছিস বই তো নয়। টাকাকে যদি ভাল বলে

জ্ঞান কর্‌তাম, তবে আমরাও জমাতে পারতাম। আমাদের ঠাকুরদাদারাই তো বলে গেছে "অর্থমনর্থং"। আমাদের এটা হল মুনি-ঋষি-মহাত্মা-সন্ন্যাসী-স্বামী-বাবার দেশ। পশ্চিমের জাতগুলোর আমরা হলাম গুরু। ওদের শিক্ষার ভার নেবার জন্যইতো আমাদের পয়দা। ওদের আধ্যাত্মিকতা শিক্ষা দেব আমরা, ওদের টাকা শেষে আপনাআপনি আমাদের পায়ে এসে লুটাবে, কেননা, আমরা হচ্ছি আধ্যাত্মিক" ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সকল বাক্যের লড়াইয়ে যাঁর যাঁর ইচ্ছা মেতে থাকুন। আমার কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বলে কোনো কথা আমি বিশ্বাস করি না। এ সবই আসলে এক জিনিষ। কেবলমাত্র আগু-পিছু প্রভেদ। জাতের, ধর্ম্মের, রক্তের, আদর্শের কোনো তফাৎ নাই। আমি বুঝি কেবল লোকগুলা পয়লা, দোস্‌রা কি তেস্‌রা ইত্যাদি। বাজারে আলু পটোল দেখে যেমন বলে দেওয়া যায় কোন্‌টা পয়লা, কোনটা দোস্‌রা, কোনটা তেস্‌রা নম্বরের, তেম্নি ব্যাঙ্কের দ্বারাও জাত বাছাই হয়। কেউ আগে, কেউ পরে। পূরবী বনাম পশ্চিমা নামক সমস্যা খাড়া করা আমার মতে আহাম্মুকি। যদি পশ্চিমেও কতকগুলি নরনারী বা নরনারীর দল আধ্যাত্মিক থাকে, তা'হলে এই পূরবী পশ্চিমার পার্থক্যটা টেঁকে কি? যদি পূর্ব্বেও পশ্চিমের মত কেউ উত্তরে যায় বা কেউ দক্ষিণে যায়, তা হলে বুঝতে হবে যে, কি পূর্ব্বে, কি পশ্চিমে দুই দুনিয়াতেই লোকেদের গতিবিধি একই প্রকারের। সভ্যতার পথ, জীবনের চলাফেরা ইত্যাদি সম্বন্ধে আকাশ-পাতাল প্রভেদ আবিষ্কার করা অসম্ভব।

ইতালি ও ভারত

আর এককথা। ইয়োরোপ বলতে কেবল জার্ম্মাণ ইংলণ্ডকেই বুঝায় না। ধরুন না, এই ইতালির কথা। এ দেশের লোকেরা তো পশ্চিমের একটা বড় জাত। কিন্তু তা হলে কি হয়? এই ইতালিয়ানরা একেবারে ভারতবাসীর মাসতুত ভাই। ওদের ভার্জ্জিল আমাদের কালিদাস। ওরাও যেমন ভার্জ্জিল-সাহিত্য নিয়ে গর্ব্ব করছে, আমরাও তেম্নি আমাদের কালিদাসকে সপ্তমে চড়িয়েছি।

এই যে ইতালি, যার রাজধানী রোম,—"রোমেশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা",—সেই রোমে আজ কি দেখতে পাই? ম্যালেরিয়া রোমকে গ্রাস করতে বসেছে। কোনো ইংরেজ যদি রোমের যে-কোনো বাড়ীতে বাস কর্‌তে পারে, তবে তাকে নিশ্চয়ই বাহাদুর ছেলে বলতে হবে। ফ্লোরেন্স ইতালির আর একটা বড় সহর। এটি আর আমাদের কাশী ঠিক যেন এক ছাঁচে ঢালা।

আপনারা সকলেই ভেনিসের নাম শুনেছেন। ভেনিসের মত রম্য সহর আর নাই-ই—এইতো আপনাদের ধারণা। কি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য, কি মনোরম রেণেসাঁসের গড়া ঘরবাড়ী—যেন ছবি! খালের ধারের এক একটা প্রাসাদ যেন এক একটা তাজমহল! কিন্তু এ সব বাড়ীগুলির অবস্থা কিরূপ শুনবেন? ঐ হুগলীর ধার দিয়ে গঙ্গার ঘাটে কতকগুলি বাড়ী আছে না—যা আমাদের ঠাকুরদাদারা করে গেছে? চুন-শুরকী খসে পড়ছে, নাতিরা আর তার জীর্ণ-সংস্কার করতে বা তার চাইতে বেশী কিছু করতে পারে নি। ভেনিসের এই সব বাড়ী যেন এক একটা প্রত্নতত্ত্ব গবেষণাগার! অর্থাৎ কবরের মুল্লুক! এখানে তাজা প্রাণবান মাল বিরল। টুরিষ্টদের বরাদ্দ এখানে আড়াই রাত!

একবার ইতালির কোনো এক সহরে এক জমীদার ভদ্রলোকের অতিথি হয়েছিলাম। আমি তাঁকে বল্‌লাম, "আমার কিছু অর্থের প্রয়োজন। আমার একখানা চেক আছে, তুমি এটা রেখে তোমার কিছু লিয়ার দাও।" এই ভদ্রলোকটি আবার একজন খ্যাতনামা অস্ত্র-চিকিৎসক। চার চারটা ভাষা তাঁর দখলে—জার্ম্মাণ, ইতালিয়ান, ফরাসী, ইংরেজী। নিজে আবার অধ্যাপকও বটে। এ ছাড়া আরও যতরকম গুণাবলী থাকা দরকার, তা এঁর আছে। তিনি চেকখানা দেখলেন। সেটা সুইট্‌সারল্যাণ্ডের এক ব্যাঙ্কের, আর জার্ম্মাণ ভাষায় লেখা। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আমাকে কি করতে হবে?" আমি বললাম "আমাকে লিয়ার দাও। মাত্র আমার ৭৫৲ তঙ্কা দরকার।" লোকটি আবার আমার বন্ধু—এম্নি ধারে চাইলেও পেতাম,

কিন্তু মনে করলাম চেক যখন আছে, তখন এই ভাঙিয়েই নেওয়া যাবে। যাক, তিনি বললেন, "এ চেক নিয়ে আমি কি করব"? বল্‌তে কি, তাঁর মত অত বড় শিক্ষিতকেও আমায় বোঝাতে হ'ল তিনি চেক দিয়ে কি করবেন! কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে কিছুতেই চেক নিতে রাজী করতে পারলাম না। তিনি বল্‌লেন, "ধরুন, যদি ব্যাঙ্কটা উঠেই যায়!" এই তো ইতালির অবস্থা। অবশ্য সকল ইতালিয়ান পণ্ডিতই এমন হুসিয়ার, এরূপ ভাববার কারণ নাই।

চেকের চলন

আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, কেবল বাংলা দেশই দুনিয়ার একমাত্র দেশ নয়, যেখানে লোকেরা ব্যাঙ্ক বা চেক বোঝে না; পরন্তু সুয়েজের ওপারেও ঠিক এমনি দেশ আছে —সেটা হচ্ছে, মহাকবি ভার্জ্জিলের দেশ। চেক জিনিষটা ইতালির জনসাধারণ বোঝে না—হয়ত ১০।২০ জন, দুশ' পাঁচশ' লোকে জানে বা বোঝে। কিন্তু জাতকে জাত এ বস্তুটা বোঝে, একথা কোনো মতেই বলা চলে না বা স্বীকার করা যেতে পারে না। তার অনেক পরিচয় আমি ইতালির পল্লীতে সহরে পেয়েছি। দশ বিশজন হয়ত বা ব্যাঙ্কে টাকা রাখল বা ব্যাঙ্কের সঙ্গে লেনা দেনা চালাল, কিন্তু জাতকে জাত ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখা—এমন জিনিষ ইতালিতে এখন পর্য্যন্তও সম্ভব হয়ে উঠে নি।

জার্ম্মাণ দেশটাতেই এই মাত্র পঁচিশ ত্রিশ বছর থেকে চেক চলে আস্‌ছে। যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইংল্যণ্ডেও চেকের চল বড় বেশী ছিল না। শুধু প্রাচ্যেই এর একমাত্র অভাব পরিলক্ষিত হয়, এরূপ ভাবলে আমাদের উপর অবিচার করা হবে। ইতালি, বুলগেরিয়া, রুমাণিয়া প্রভৃতি ইয়োরোপের অনেক দেশে এখনও চেকের চলন হয় নাই। পশ্চিমা খ্রীষ্টিয়ানদের অনেকেই আমাদের পূরবী হিন্দু-মুসলমানের অবস্থায়ই রয়েছে।

জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কের ত্রিশ বৎসর

এইবার আরও গুরুতর কথা বলব। এক সময়—সে বড় বেশী দিনের কথা নয়—এই ব্যাঙ্ক কথাটা ইতিহাসেই ছিল না, ইয়োরোপে ব্যাঙ্কবস্তু দেখা যেত না। জার্ম্মাণির কথা বল্‌লেই বেশ পরিষ্কার বুঝা যাবে। জার্ম্মাণিতে—যেখানে কিনা আজ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ব্যাঙ্ক দেখতে পাচ্ছি—সেখানে ব্যাঙ্কগুলা মাত্র সেদিন গড়ে উঠেছে। আজ জার্ম্মাণিতে অনেকগুলি "ডে" ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত দেখতে পাচ্ছি। "ডি" (যার জার্ম্মাণ উচ্চারণ হচ্ছে "ডে") অক্ষর দিয়ে যে সকল নাম সুরু হয়, সেগুলিকে বলে "ডে" ব্যাঙ্ক। এগুলির একটু আশ্চর্য্যরকম ইতিহাস রয়েছে। এ বুঝতে হলে ১৮৭০ সনে ফিরে যেতে হয়।

১৮৭০ সনে এমন কোনো ব্যাঙ্ক জার্ম্মাণিতে ছিল না যার কিনা আর একটি মাত্র স্বতন্ত্র শাখা-আফিসও ছিল। এই সময় "ডায়চে বাঙ্কে"র পর্য্যন্ত মাত্র একটা আফিস ছিল। এই যদি ১৮৭০ সনের জার্ম্মাণি হয়, তা হলে তাকে প্রাচ্য না প্রতীচ্য বলব? সেই যুগে বড় বড় ব্যাঙ্কগুলার সমবেত মূলধন ছিল মাত্র আট কোটি টাকা। ১৮৭০ থেকে ১৮৯৫ পর্য্যন্ত ২৫ বছরে মূলধনের দৌড় ত্রিশ কোটিতে গিয়ে পৌঁছেছিল। এ হাতী-ঘোড়া এমন কিছু নয়। আজকালকার ভারতবাসীর পক্ষে ইহা কল্পনা করা আর নেহাৎ অসাধ্য নয়। ১৯০০ সন পর্য্যন্ত ৩০ বৎসরের মধ্যে লণ্ডন সহরে একটা শাখা স্থাপন করবার সাহস "ডায়চে বাঙ্ক" ছাড়া আর কোনো জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কের হয় নি। তা ছাড়া ১৮৭০—১৯০২ এই সময়ের মধ্যে কেউ ব্যাঙ্কে টাকা ধার দিত না। কোনো ব্যাঙ্ক এই যুগে চেক চালাতে সাহসী হয় নাই।

এই জার্ম্মাণি আজ দুনিয়ার এক সেরা দেশ। কিন্তু এর এই ৩৫ বছরের জীবনের সাথে তুলনায় বাঙালী-জীবনে কোনো তফাৎ দেখা যায় কি? কিচ্ছু না। "অর্থমনর্থং" খ্রীষ্টীয় সাহিত্যেও যথেষ্ট রয়েছে। জার্ম্মাণ সমাজেও আজ পর্য্যন্ত ব্যবসা করা একটা হীন কাজ। জুতা মেরামত করা একটা বড়-কিছু বিবেচিত হয় না। যাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাঁদের সঙ্গে জার্ম্মাণির কুলীনরা সামাজিক বন্ধন রাখেন না—বিবাহাদি দেন না। বিলাতী সমাজেও এমনিতর ধারণা কিছু-কিছু আছে। তবে সর্ব্বত্রই কিছু-কিছু "সমাজ-সংস্কার" এখন দেখা যাচ্ছে।

এই ৩৫ বছরের ঘটনা ভেবে দেখতে গেলে কি দেখা যায়? এই ৩৫ বছরে যেমন "খোকা হাঁটে পা পা" ঠিক তেম্নি আস্তে আস্তে পা ফেলে ফেলে জার্ম্মাণ জাতটা অগ্রসর হয়েছে। একদিনেই এদের এই বর্ত্তমান বিপুল কারবার-ব্যাঙ্ক-সঙ্ঘ ফুলে উঠে নি। যদি জার্ম্মাণির অবস্থা ৫০ বছর আগে প্রায় আজকালকার বাঙ্গালীর মতনই হতে পারে, তা হলে প্রাচ্যে প্রতীচ্যে প্রভেদটা কোথায়? এই বিগত ৫০ বছরের পেছনে তাকালে দেখতে পাই, ইয়োরোপেও এমন যুগ গিয়েছে, যে যুগে দুর্ব্বলতা, অক্ষমতা ওদেরও মজ্জাগত ছিল।

যাক্, আর প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মামলায় সময় কাটাতে চাই না। এখন দেখতে হবে কেমন করে আমাদের জাতটা ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলায় কর্ম্মদক্ষ হতে পারে। জার্ম্মাণি এই ৫০ বছরে বিপুল বিপুল ব্যাঙ্ক গড়ে তুলেছে বলে আমরাও পারব না কেন—তা নিয়ে মাথা গরম করবার দরকার নাই। আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। আমরা আজ একদম শিশু। একথা স্বীকার না করে নিলে লোকসান ছাড়া লাভ নাই।

ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠার একনম্বর কথা হচ্ছে অংশীদারদের মূলধন (শেয়ার ক্যাপিটাল)। দুই নম্বর ব্যাঙ্কের শাখা-স্থাপন। তিন নম্বর হচ্ছে চেক। উদ্ভিদতত্ত্ব জানা থাকলে গাছের পাতা বা শিকড় দেখে যেমন বলে দেওয়া যায় এটা কি গাছ, জীবতত্ত্বজ্ঞ যেমন একখানা হাড় দেখে বলে দেবে এটা অমুক জানোয়ারের হাড়, তেম্নি শেয়ার ক্যাপিটাল দেখে বলা যেতে পারে ব্যাঙ্কটা কি অবস্থায় রয়েছে। ব্যাঙ্কের শাখা দেখে বলা যেতে পারে এ ব্যাঙ্ক উন্নত শ্রেণীর কিনা। জার্ম্মাণি তার বর্ত্তমান অবস্থায় আসতে ৫০।৫৫ বছর নিয়েছিল।

১৮৭০ সনের ফরাসী ব্যাঙ্ক

পঞ্চাশ বছর আগে ১৮৭০ সনে ফ্রান্স কি অবস্থায় ছিল? ফ্রান্সে ও জার্ম্মাণিতে এই সময় একটা যুদ্ধ হয়। সেই থেকে ফ্রান্সে নব যুগের সৃষ্টি। ঐ সময় ফ্রান্সের ৮৩টা "দেপার্ৎমাঁ" বা জেলার ভিতর মাত্র উনিশটাতে ব্যাঙ্ক ছিল। এটা হচ্ছে ১৮৭০ সনের কথা। কেবল মাত্র ১৯টা জেলায় ব্যাঙ্ক। আবার প্যারিসের মতন পাঁচ ছয়টা বড় সহর ছাড়া আর কোনো সহরে একাধিক ব্যাঙ্ক ছিল না।

আর এক পা পেছনে দৃষ্টিপাত করলে কি দেখতে পাই? ১৮৪০ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় "কঁতোআর দেস্কঁৎ"। এইটাই ফ্রান্সের প্রথম "আধুনিক" ব্যাঙ্ক। কিন্তু আধুনিকতা ফরাসী সমাজে শিকড় গাড়তে সমর্থ হয় ১৮৭০ সনের হিড়িকে। ১৮৪০—১৮৭০ যুগ যেমন ইয়োরোপে, প্রায় তেম্নি হচ্ছে ১৯০৫—১৯২৫ আমাদের এই বাংলায় বা ভারতে।

১৯২৬ সনের বাণী

আমরা এই বিশ বৎসরে বেশী দূর অগ্রসর হতে পারিনি। আমাদেয় কৃতিত্ব যারপর নাই ছোট দরের। আজ ১৯২৬ সন। আজ কি দেখতে পাই? জগৎ অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে। যুবক ভারত এসে ঠেকেছে অল্প দূরে মাত্র। চোখের সাম্‌নে, এই ধরুন বিলাতী "লেবার পার্টি"র কথা। বিশ বছর আগে এর কথা কেউ জানত না—লেবার পার্টি বলে এমন কোনো জিনিষই ছিল না। আজ এই বিশ বছরের চেষ্টায় তাহা গোটা দেশের শাসন কাজে তাদের মাঝ থেকে একজন প্রধান মন্ত্রী পর্য্যন্ত নিয়োগ করতে পেরেছে। আর দুনিয়ার সর্ব্বত্রই মজুর-রাজ না হয় মজুর-ঘেঁসা দলের রাজত্ব চল্‌ছে। ১৯০৫ সনের যুগে ইয়োরোপে বিকার-গ্রস্ত নরনারীও এসব কল্পনা কর্‌তে পারত না। কিন্তু আমরা ভারতে ১৯০৫ সনের পর থেকে এতখানি এগিয়ে আস্‌তে পেরেছি কি? পারিনি। যাক্ সে কথা।

আমাদের জাতটাকে আমরা নূতন করে গড়ে তুলতে চাই। হেগেল, ম্যাক্সমুলার ইত্যাদি পণ্ডিতের মতন পাপী আর নাই। তাঁরা তাঁদের মন-গড়া দর্শন দিয়ে ভারত-সন্তানকে ভারতীয় চরিত্র সম্বন্ধে অসংখ্য বুজরুকি শিখিয়েছেন। সেই পাপ বাংলার মগজ থেকে ঝেড়ে বের করে দিতে হবে। এঁরাই প্রাচ্য-প্রতীচ্যের ব্যবধান সৃষ্টি করে গিয়েছেন। কিন্তু পূরবই বা কোথায় আর পশ্চিমই বা কোথায়? পূরব-পশ্চিমের মধ্যে তো মাত্র ৫০।৭৫ বছরের তফাৎ।

এখন কথা হচ্ছে আমরা এই ৫০ বছর দখল করতে পারব

কি? ভারতে অনেক বড় বড় যুগ চলে গেছে। মৌর্য্য-চন্দ্রগুপ্তের যুগ, মারাঠা-মোগলদের যুগ। সে সব আজ "সেকেলে" কথা। আবার ১৯০৫ সনের স্বদেশী যুগ। কিন্তু ১৯০৫—২৫ এটাকেও আজ "প্রাগৈতিহাসিক যুগ" বলতে চাই। একে "সেকেলে," মান্ধাতার আমল, প্রত্নতত্ত্বের যুগ বলতে চাই। এর মোহে অন্ধ হয়ে থাকলে চল্‌বে না। চাই জীবনের বাড়তি, চাই নবীন জীবনবত্তা।

ছনিয়ার ১৮৪৮—১৮৭০ সনের কোঠায়ই আমরা ভারতে আজও রয়েছি। কথাটা বিনা গোঁজামিলে স্বীকার করা কর্ত্তব্য। আমরা কতখানি পশ্চাৎপদ তা একটা কথা বললেই মালুম হবে। ১৮৭০ সনের যুগে প্রাথমিক শিক্ষা ছনিয়ার সকল সভ্যদেশে সার্ব্বজনীন বাধ্যতামূলক হয়, যা কিনা ভারতে বর্ত্তমানেও নাই। আর এই যে বিলাতী, ফরাসী, জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কগুলার কথা বলা হল, সে সবও ১৮৭০ সনের এ-পিঠে আর ও-পিঠে মাথা খাড়া করেছে।

যুবক বঙ্গের নবীন সাধনা

আমাদের আজ ছোট থেকেই কাজ আরম্ভ করতে হবে। বাংলায় যে দেড়শ-ছু'শ "লোন আফিস" আছে তাদেরকে খাঁটি ব্যাঙ্কে পরিণত করতে হবে। ১৯২৬ সনের যুবক-বাংলার পক্ষে এই হচ্ছে অন্যতম বিপুল সাধনার ক্ষেত্র। আমাদের গোটা জাতের নিকট এই এক বিরাট সমস্যা। এই সব লোন-আফিসকে খাঁটি ব্যাঙ্কে পরিণত করার পর কলিকাতার কোনো কোনো সেন্ট্রাল আফিসে এই প্রতিষ্ঠানগুলাকে কেন্দ্রীভূত করা আমাদের দ্বিতীয় সমস্যা। এর ফলে গোটা বাঙালী জাতের ধনশক্তি কতকগুলা বড় বড় ঘাঁটিতে জমাট বেঁধে উঠতে থাকবে। আর সেই ধনশক্তির সাহায্যে নরনারীর আর্থিক উন্নতি সাধন করা এবং নতুন নতুন পল্লী-সহর গড়ে তোলা হচ্ছে আমাদের নবীন জীবন-দর্শনের প্রাথমিক বনিয়াদ।

বেকারের দলে বিদেশ-ফের্ত্তা বাঙালী*

শ্রীশ্রীশ চন্দ্র পাল

"আর্থিক উন্নতি"র সম্পাদকের সঙ্গে আমাদের বেকার-সমস্যা সম্বন্ধে বর্ত্তমান লেখকের কিছু আলোচনা হয়। তাঁহার ইচ্ছা অনুসারে কয়েকটা তথ্য বিবৃত করিতেছি। কোনো ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা উচিত নয়। তবে ঘটনাগুলা যে সত্য তাহা বুঝাইবার জন্য ছু একটা খুঁটিনাটি বলা আবশ্যক। এই ঘটনাগুলা দেশের লোকের জানা থাকিলে যথার্থ অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে। যাঁহাদের সম্বন্ধে তথ্যগুলা বিবৃত করা গেল, তাঁহাদের কাহারও কাহারও চোখে হয়ত এই লেখাটা পড়িতে পারে। আশা করি তাঁহারা ইহাতে দুঃখিত হইবেন না।

১। শ্রীযুক্ত * * * বাড়ী ঢাকা। তিনি বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌স্টিটিউটের ছাত্র ছিলেন। ১৯২২ সনে বয়ন-বিদ্যা শিখিবার জন্য জার্ম্মাণি যান। সেখানে পৌছিয়া একটা কটন মিলে এক বৎসর কাল শিক্ষানবিশী করেন। অতঃপর ৎসিত্তাও শহরের বয়ন-বিদ্যালয়ে বাৎসরিক ১০০ পাউণ্ড হিসাবে বেতন দিয়া ভর্ত্তি হন এবং বৎসরান্তে সেখানকার পাঠ সমাপ্ত করিয়া কৃতিত্বের সহিত ডিপ্লোমা লইয়া বাহির হন। তারপর ছয় মাস কাল একটা কটন্ মিলে শিক্ষানবিশী করিয়া চেকো-শ্লোভাকিয়ায় যান এবং সেখানকার বুনন-বিদ্যালয় হইতে কৃতিত্বের সহিত ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হন। অতঃপর ১৯২৫ সনে দেশে ফিরিয়া আসিয়া বাংলা দেশের সমুদয় বাঙালী ও অ-বাঙালী মিল-গুলিতে ঘুরাফিরা করিয়া ১০০ টাকার একটা চাকুরীও যোগাড় করিতে পারেন নাই। বোম্বাইয়ের মিল-কেন্দ্রে

* এই ধরণের আরও তথ্য আমরা পাইতে ইচ্ছা করি।—সম্পাদক।

ঘুরাঘুরি করিয়াও কোনো ফল হয় নাই। আজ ১৯২৬ সনেও তিনি বেকার অবস্থায় আছেন।

২। শ্রীযুক্ত * * * বাড়ী ঢাকা। ১৯২০ সনে আই, এস-সি পর্য্যন্ত পড়িয়া জার্ম্মাণি যান। ম্যাট্রিকুলেশনে বৃত্তি পাইয়াছিলেন। জার্ম্মাণিতে কট্‌বুস্ শহরের একটা বড় বয়ন-কারখানায় এক বৎসর শিক্ষানবিশী করিয়া ৎসিত্তাও শহরের বয়নবিদ্যালয়ে এক বৎসর শিক্ষালাভ করেন। অতঃপর সোরাও শহরের টেক্‌স্‌টাইল বিদ্যালয়ে ডাইং, ব্লিচিং ও মার্সেনাইজিং শিক্ষা করেন। অতঃপর তিনি ইয়োরোপের নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া ১৯২৫ সনে দেশে ফিরিয়া আসেন। তিনি আজ পর্য্যন্ত দেশে কোনো সুবিধা করিতে পারেন নাই।

৩। শ্রীযুক্ত * * * বাড়ী বরিশাল। জার্ম্মাণিতে কাগজ তৈয়ারী শিখিয়া ১৯২৫ সনে দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। আজ পর্য্যন্তও তাঁহার কোনো সুবিধা হয় নাই।

৪। শ্রীযুক্ত * * * বাড়ী ঢাকা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ। ১৯২২ সনে জার্ম্মাণি গিয়া আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে কাঠের কাজ শিখিয়া আসিয়াছেন। জার্ম্মাণদের কাঠের কাজের মত এত সুন্দর কাজ পৃথিবীর অন্য কোনো দেশেই হয় না। ১৯২৫ সনে দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। আজও তিনি বেকার অবস্থায় আছেন।

৫। শ্রীযুক্ত * * * বাড়ী শ্রীহট্ট। এখানে আই, এ, পর্য্যন্ত পড়িয়া ১৯২২ সনে ট্যানিং শিখিবার জন্য জার্ম্মাণি যান। ছ' মাস বার্লিন শহরে একটা ট্যানারিতে শিক্ষানবিশী করেন। অতঃপর লাওজিটস্ এর ওবেস্ শহরের এক বড় কারখানায় ছ'মাস শিক্ষানবিশী করেন। পরে এক ট্যানিং ইস্কুলে পাঠ সমাপ্ত করিয়া ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হন। এখানে পাঠ শেষ করিয়া তিনি জগৎবিখ্যাত ফ্রাউকফুর্টের লিওপোল্ড ক্যাজেনা নামক আনিলিন ফ্যাক্টরীতে একবৎসর চামড়ায় রং লাগানো শিখিয়া ১৯২৫ সনে দেশে ফিরিয়া আসেন। তিনি এখনো কোনো সুবিধা করিতে পারেন নাই। জার্ম্মাণি থাকিবার সময় আসাম গভর্ণমেণ্ট হইতে এককালীন ১২০০ টাকা বৃত্তিস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৬। শ্রীযুক্ত * * * বাড়ী ঢাকা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ। ১৯২২ সনে সাবান তৈয়ারী শিখিবার জন্য জার্ম্মাণি যান। ২½ বৎসর সেখানে শিক্ষালাভ করিয়া ১৯২৫ সনে দেশে ফিরিয়া আসেন। এপর্য্যন্ত কোথাও কোনো সুবিধা হয় নাই।

৭। শ্রীযুক্ত * * * বাড়ী কলিকাতা অঞ্চলে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর এম, এস-সি। ১৯২২ সনে জার্ম্মাণি যাইয়া ট্যানিংএ গবেষণা করিয়া ডক্টর উপাধি লইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। পূর্ব্বে তিনি কোনো গভর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। দুঃখের বিষয় দেশে আসিয়া তাঁহার মত যোগ্য ব্যক্তিও কোনো সুবিধা করিতে না পারিয়া পুনরায় কলেজের মামুলি চাকুরী গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

৮। শ্রীযুক্ত * * * বাড়ী ঢাকা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ। ১৯২২ সনে জার্ম্মাণি যাইয়া "ক্যানিং শিক্ষা করিয়াছেন। স্বদেশ-প্রত্যাগত ছেলেদের দুরবস্থার সংবাদ জানিয়া দেশে ফিরিতেছেন না।

৯। শ্রীযুক্ত * * * বাড়ী ঢাকা। এখানকার আই, এস-সি। ১৯২২ সনে জার্ম্মাণি যাইয়া ১½ বৎসর বয়ন-কারখানায় শিক্ষানবিশী করিয়া বয়ন ও বুনন বিদ্যালয় হইতে ডিপ্লোমা পান। অতঃপর তিনি ১৯২৬ সনে ইংলণ্ড যাইয়া এক কারখানায় শিক্ষানবিশী করিতে থাকেন। ইতিমধ্যে সেখান হইতে দেশের নানা কর্ম্মকেন্দ্রে আবেদন করিয়াও কোনো সাড়া পান নাই। ১৯২৭ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি দেশে ফিরিবেন।

১০। শ্রীযুক্ত * * * বাড়ী কলিকাতা অঞ্চলে। এখানকার আই এস-সি। ১৯২২ সনে জার্ম্মাণি যাইয়া ইলেক্‌ট্রিক এঞ্জিনিয়ারিং শিখিয়া ১৯২৫ সনে দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্তও কোনো সুবিধা করিতে পারেন নাই।

১১। শ্রীযুক্ত * * * বাড়ী ঢাকা। ১৯২২ সনে জার্ম্মাণি যাইয়া একবৎসর কাল ফোর্ষ্ট শহরে এক ট্যানারীতে

শিক্ষানবিশী করেন। অতঃপর জার্ম্মাণ ট্যানিং ইস্কুল হইতে কৃতিত্বের সহিত ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হইয়া এক ট্যানারীতে শিক্ষানবিশী করেন। অতঃপর বার্লিন শহরের বিখ্যাত "আগ্ ফা" নামক আনিলিন ফ্যাক্টরীতে লেদার ডাইং শিক্ষা করিয়া ১৯২৫ সনে দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। আজও তাঁহার কোনো সুবিধা হয় নাই।

১২। শ্রীযুক্ত * * * বাড়ী নোয়াখালি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এস্-সি। ১৯২২ সনে জার্ম্মাণি যাইয়া ব্যবহারিক রসায়ন বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া ১৯২৬ সনে দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। কোনো সুবিধা করিতে পারেন নাই।

১৩। শ্রীযুক্ত * * * বাড়ী কলিকাতা অঞ্চলে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এস-সি। ইংলণ্ডে দুই বৎসর ব্যবহারিক রসায়ন বিজ্ঞান শিক্ষা করিবার পর জার্ম্মাণি যাইয়া ১½ বৎসর কাগজ তৈরী শিক্ষা করেন। ১৯২৪ সনে দেশে ফিরিয়াছেন। এখনো কোনো সুবিধা হয় নাই।

১৪। শ্রীযুক্ত * * * বাড়ী কলিকাতা অঞ্চলে। এখানকার বি, এস-সি। ১৯২০ সনে জার্ম্মাণি যাইয়া লাইপৎসিক্ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্টর উপাধি লাভ করেন। দেশে আসিয়া প্রায় এক বৎসরকাল বসিয়া থাকিয়া সম্প্রতি একটা কাজে যোগ দেওয়ার সুযোগ পাইয়াছেন।

১৫। শ্রীযুক্ত * * * বাড়ী ঢাকা। এখানকার আই, এস-সি। ১৯২১ সনে জার্ম্মাণি যাইয়া ডাইং ক্লিনিং শিক্ষা করিয়া ১৯২৫ সনে দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। আজ পর্য্যন্তও কোনো সুবিধা হয় নাই।

১৬। শ্রীযুক্ত * * * বাড়ী ঢাকা। এখানকার আই, এ। ১৯২৩ সনে জার্ম্মাণি যাইয়া বার্লিন শহরে কমার্স শিক্ষা করেন। স্বদেশ-প্রত্যাগত ছাত্রদের দুরবস্থার কথা জানিয়া এখনো তিনি সেখানেই আছেন।

দিয়াশলাইয়ের কারবারে বিশ্বপ্রতিযোগিতা

অধ্যাপক শ্রীহীরালাল রায়, এস্, বি (হার্ভার্ড), পি-এইচ, ডি (বার্লিন)

ইতিপূর্ব্বে এই পত্রিকায় এক প্রবন্ধে বর্ত্তমান শিল্প-সংগ্রামের বিষয় আলোচনা উপলক্ষ্যে বলেছিলাম যে, রক্ষণ দ্বারা দেশীয় শিল্প কেবল মাত্র কিছু দিনের জন্য বাঁচিয়ে রাখা যেতে পারে, কিন্তু আধুনিক প্রথায় তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি না হলে বিদেশী দ্রব্যের এবং মূলধনের প্রতিযোগিতায় তাকে রক্ষা করা অত্যন্ত দুরূহ। এই প্রবন্ধে আমরা দিয়াশলাই শিল্পের আসরে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে কি ভীষণ সংগ্রাম চলছে তাহাই দেখাবার চেষ্টা করব।

সুইডেন্

গত কয়েক বৎসর যাবৎ ভারত গভর্ণমেণ্ট দিয়াশলাইয়ের উপর রক্ষণ-শুল্ক বসিয়েছে। তাহার পরিমাণ এখন গ্রোস প্রতি ১৷৷০ টাকা। কিন্তু এই রক্ষণ-শুল্কের হাত এড়াবার জন্য সুইডেন দেশের দিয়াশলাই-ব্যবসায়ীরা এদেশে কারখানা খুলেছে। সুইডেনই দিয়াশলাই ব্যাপারে পৃথিবীতে একচেটে ব্যবসার চেষ্টা করছে। আমরা সবাই জানি সুইডেন দেশ অত্যন্ত ধনী নয়। সুতরাং তার পেছনে নিশ্চয়ই অন্য শক্তি কাজ করছে। এ বিষয়ের বিশদ আলোচনা করলে আমরা বুঝতে পারব এই ব্যাপারটি কত জটিল।

গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে দিয়াশলাইয়ের কাঁচামাল (কাঠ, কেমিক্যাল ইত্যাদি) অনেকটাই বিদেশ থেকে আনতে হত; কিন্তু যুদ্ধের সময় তা অসম্ভব হওয়ায় সুইডেনের দিয়াশলাই-ব্যবসায়ীরা রুশিয়ার বাল্টিক সাগরের পাড় থেকে কাঠ না এনে নিজের দেশের বনসমূহ কিনে সেখান থেকে কাঠের বন্দোবস্ত করল; দিয়াশলাই প্রস্তুত করার যন্ত্রপাতি বিদেশ

থেকে না আনিয়ে দেশেই তৈয়ারী করতে লাগল। পটাশিয়াম ক্লোরেট প্রভৃতি কেমিক্যালও দেশেই প্রস্তুত করতে আরম্ভ করল।

দিয়াশলাই বিক্রী করার নূতন ব্যবস্থা দ্বারা তারা বিশ্ব-প্রতিযোগিতায় সহজেই উচ্চস্থান অধিকার করল। মাল তৈয়ারী করবার কারবারে এই সকল পরিবর্ত্তন সাধিত হল। সঙ্গে সঙ্গে বাজারে মাল ফেলবার কারবারেও সুইডেনের দিয়াশলাইওয়ালারা অনেক-কিছু নতুন প্রণালী কায়েম করেছিল। প্রথমতঃ, তারা "মধ্যস্থ" বেপারীর সংখ্যা কমিয়ে দিল। দিয়াশলাইয়ের ব্যবসায় এই সব মধ্যবর্ত্তীর দল একপ্রকার উঠেই গেল। দ্বিতীয়তঃ, কোম্পানীগুলা নিজেই নিজেদের মাল বেচবার ভার নিল। প্রত্যেক কারবারের সঙ্গে সঙ্গেই একটা করে বিক্রয়-বিভাগ খোলা হল। তৃতীয়তঃ, খুচরা দোকানদারদেরকে ধারে বেচবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এমন কি ছয় মাস পর্য্যন্ত টাকা ফেলে রাখবার বন্দোবস্ত ছিল। চতুর্থতঃ, দিয়াশলাইয়ের দামও খুব নরম করে রাখা হয়েছিল। ফলে দুনিয়ার দেশে দেশে সুইডেনের দিয়াশলাইয়ের বড় বড় বাজার গড়ে উঠতে পেরেছে।

বিদেশী রক্ষণ-শুল্কের ভার এড়াবার জন্য সুইডেনের দিয়াশলাই ট্রাষ্ট্ অনেক দেশে নিজেদের কারখানা বসিয়েছে। যথা, ভারতবর্ষ, ইংল্যাণ্ড, ফিন্‌ল্যাণ্ড্, উত্তর আমেরিকা এবং সম্প্রতি বর্ম্মা। শীঘ্রই অষ্ট্রেলিয়াতেও কারখানা খুলবে।

বোম্বে, কলিকাতা, করাচি, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে প্রতিষ্ঠিত নিজেদের কারখানায় তৈয়ারী দিয়াশলাই বিক্রী করে ভারতীয় রক্ষণ-শুল্কের সুবিধা তারাও ভোগ করছে এবং ভারতবর্ষে বসে বিদেশ হতে আমদানি এবং এই দেশেই তৈয়ারী দিয়াশলাইয়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে।

অনেক বৎসরের জন্য লেট্‌ল্যাণ্ড্, পোল্যাণ্ড, পেরু এবং পর্ত্তুগালে দিয়াশলাইয়ের একচেটিয়া ব্যবসায়ের অধিকার পাওয়ায় সুইডেনের কারখানাগুলি এই সব দেশে দিয়াশলাইয়ের কারবারে অত্যন্ত বেশী লাভ করছে। যথা, সুইডেনে দিয়াশলাইয়ের যে দাম পেরুতে তার দশগুণ।

এত বড় কারবার চালাতে টাকা লাগে ঢের। সুইডেনের দিয়াশলাই-সঙ্ঘ দেশ-বিদেশে শেয়ার বেচে টাকা না তুললে এই কারবার এত বিপুল আকারে দাঁড়াতে পারত না। ইংল্যাণ্ড আর আমেরিকার ধনীরা অনেক শেয়ার কিনেছে। অর্থাৎ বিদেশী পুঁজির জোরে সুইডেনের কারবারটা চলছে। কিন্তু এইখানে জেনে রাখা আবশ্যক যে, শেয়ার বেচবার সময় এমন সর্ত্ত করা হয়েছে যে, বিদেশীরা সঙ্ঘের শাসনে বেশী একতিয়ার না পায়। কারবার চালাবার ক্ষমতা সুইডেনের ধনীদের হাতেই রয়েছে অধিক পরিমাণে।

আজ পৃথিবীতে উপরি উক্ত উপায়ে সুইডেন দিয়াশলাইয়ের বাণিজ্যে যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, তার মূলে প্রথম কর্ম্মকর্ত্তাদের বুদ্ধি এবং দূরদর্শিতাই বর্ত্তমান। সুইডিস্ সেফ্‌টি-ম্যাচের আবিষ্কর্ত্তা লুণ্ডষ্ট্রোম ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ইয়নক্যপিঙ্গে দিয়াশলাই প্রস্তুত আরম্ভ করেন। হে নামক শিল্পদক্ষ বেপারী-পণ্ডিত এই কারখানাটীকে অনেক বড় করে বিশ্ববিশ্রুত কীর্ত্তি লাভ করেন। ল্যেহ্বেনাড্‌লার ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে একটা সঙ্ঘ গড়ে সাতটী বিভিন্ন কারখানাকে একত্র করেন। ইভার ক্রয়গার আর আটটী কারখানাকে ১৯১৩ সনে অন্য এক সঙ্ঘে একত্র করেন এবং বিদেশে মাল বিক্রয়ের সুবিধার জন্য লণ্ডনে প্রধান আফিস খোলেন। বিশ্বযুদ্ধের সময় এই দুই সঙ্ঘ একত্র হয়ে বর্ত্তমান "স্‌ভেনস্কা ট্যেণ্ডষ্টিক" কোম্পানী নামে সঙ্ঘবদ্ধ হয়। বাণিজ্য-বিজ্ঞানের মার্কিণ পারিভাষিকে কোনো কোনো বিষয়ে ইহাকে হোল্ডিং কোম্পানী বলা যেতে পারে। ক্রয়গার পরে "ক্রয়গার টোল কোম্পানী" নামে দ্বিতীয় একটী হোল্ডিং কোম্পানী সৃষ্টি করেন। ইহার উদ্দেশ্য পৃথিবীতে যত দিয়াশলাইয়ের কোম্পানী আছে তাহাদের, বিশেষতঃ সুইডিস্ ট্রাষ্টের, অধিকাংশ শেয়ার ক্রয় করা। হোল্ডিং কোম্পানী মাত্রেরই কর্ম্মপ্রণালী এইরূপ। ১৯১৯ সনে এই কোম্পানী উত্তর আমেরিকায় "আমেরিকান্ ক্রয়গার এবং টোল কর্পোরেশ্যন" নামে দিয়াশলাই, বিশেষতঃ সুইডিস্ দিয়াশলাই বিক্রয়ের একটী অর্গ্যানিজেশান করেছে। এই দ্বিতীয় হোল্ডিং কোম্পানীর সাহায্যে "সুইডিস্ দিয়াশলাই ট্রাষ্ট" নিজেদের কাজের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে বৃটিশ এবং আমেরিকান মূলধন লাভ করতে সমর্থ হয়েছে। তা না হলে এমন বিরাট কোম্পানীর মূলধন জোগানো সুইডেনের পক্ষে অসম্ভব ছিল।

ক্রয়গার আর একটা নতুন কোম্পানী খাড়া করেছেন। তাহার নাম "ইন্টার্ণ্যাশ্যনাল ম্যাচ কর্পোরেশ্যন"। যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, দক্ষিণ আমেরিকা, জাপান, চীন এবং (ইংল্যাণ্ড ও সুইডেন বাদে) গোটা ইয়োরোপের বাজার তদবির করা এই ইন্টার্ণ্যাশ্যন্যালের কর্ম্ম। এই কোম্পানীর লড়াই চলিতেছে এশিয়ায় জাপানী কোম্পানীর সঙ্গে। চীন, জাভা, সুমাত্রা, বর্ম্মা এবং ভারত ইত্যাদি দেশের বাজারে জাপানে আর এই ইন্টার্ণ্যাশ্যন্যালে টক্কর চলে। ইন্টার্ণ্যাশ্যন্যালটাকে খাঁটি নতুন কোম্পানী বিবেচনা না করে সুইডেনের "স্‌ভেনস্কা টেন্ডষ্টিক" কোম্পানীরই আন্তর্জ্জাতিক বিভাগ বিবেচনা করা সঙ্গত। এই "স্‌ভেনস্কা"র খাস অধীনে রয়েছে সুইডেন, ইংল্যাণ্ড এবং ভারত।

এশিয়ায় লড়াই চল্‌ছে জাপানের সঙ্গে। আর ইয়োরোপে স্‌ভেনস্কাকে লড়তে হয় প্রথমতঃ এক মার্কিণ কোম্পানীর সঙ্গে। দ্বিতীয়তঃ, জার্ম্মাণ কোম্পানীর সঙ্গে। সুইডেনের সকল দিয়াশলাই কোম্পানীই স্‌ভেনস্কার অন্তর্গত নয়। যেগুলা অন্তর্গত নয় সেইগুলাকে কিনে ফেলবার মতলবে কোনো কোনো মার্কিণ কোম্পানী সুইডেনে টাকা হাতে করে ঘুরছে। সুইডেনের "স্কাণ্ডিনাভিয়া দিয়াশলাই কোং"টাকে মার্কিণ কোম্পানীর হাতে পড়তে না দেওয়া স্‌ভেনস্কার মতলব। তাহার উপর আছে জার্ম্মাণ প্রতিযোগিতা। এই সকল টক্করে জয়লাভ করবার জন্য কতকগুলা মার্কিণ ধনীর সঙ্গে মিশে স্‌ভেন্‌স্কা আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে। "সুইডিস আমেরিকান ইনভেষ্টমেণ্ট কর্পোরেশ্যন" নামক কোম্পানী খাড়া করা হয়েছে। এই গেল ১৯২৫ সনের শেষাশেষির কথা।

১৯২১ সন পর্য্যন্ত জাপান এশিয়ার পূর্ব্বদেশগুলিতে এই ব্যবসায়ে খুব আধিপত্য লাভ করেছিল; কিন্তু ১৯২২ সন থেকে সুইডেন আবার তার পুরাতন স্থান দখল করতে আরম্ভ করেছে। ১৯২৩ সনে ভারতবর্ষে যত দিয়াশলাইয়ের আমদানি হয়েছিল তার ২৩ °/₀ সুইডেন থেকে আসে এবং ১৯২৪ সনে ৪৬ °/₀ দাঁড়ায়। ১৯২৬ সনে বর্ম্মায় সমস্ত দিয়াশলাই আমদানির ৬০ °/₀ সুইডেনের। জাভা, সুমাত্রা ইত্যাদি দ্বীপে ১৯২৩ সনে ৬৮৭০০০ ক্রোন্ ও ১৯২৪ সনে ২৫,৪৬,০০০ ক্রোন্ মূল্যের দিয়াশলাই আমদানি হয়েছিল। চীনদেশে ১৯২৩ সনে ৬৮৪০০০ ক্রোন্ এবং ১৯২৪ সনে ৯৫৬০০০ ক্রোন্, ইত্যাদি ইত্যাদি।

মোটের উপর দেখা যাচ্ছে যে, এশিয়াতে দিয়াশলাই ব্যবসায়ের যুদ্ধে জাপান ক্রমশই সুইডেনের নিকট পরাস্ত হচ্ছে। খবরের কাগজের সংবাদ পড়ে মনে হয় ১৯২৫ সনে বর্ম্মা, পারশ্য, ইজিপ্ট, বৃটিশ পশ্চিম আফ্রিকা, নিউজীল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে সুইডেনের দিয়াশলাইয়ের আমদানি পূর্ব্বের যে-কোনো বৎসর থেকে বেশী হয়েছিল। এতদ্ভিন্ন লেটল্যাণ্ড, পেরু, পোল্যাণ্ড, ও পর্ত্তুগালে সুইডিস-ট্রাষ্ট ভিন্ন অন্য কেউ দিয়াশলাই পাঠাইতে পারিবে না। ট্রাষ্ট এই সব দেশে দিয়াশলাই বিক্রয়ের একচেটিয়া অধিকার পেয়েছে এবং গ্রীস্ আর অষ্ট্রিয়ায়ও এইরকম অধিকার পাওয়ার চেষ্টা করছে; কিন্তু ফ্রান্সে দিয়াশালাইয়ের সরকারী একচেটিয়া ব্যবসায় ভাঙ্গবার চেষ্টা করে কৃতকার্য্য হয় নাই।

গত দশ বৎসরের হিসাব করে দেখা যায় যে, সুইডেনে যত দিয়াশলাই প্রস্তুত হয় তার ৮৭% রপ্তানি হয়। ১৯১৩ সনে দিয়াশলাইয়ের যা দর ছিল এখন (১৯২৪ সনের নভেম্বর থেকে ১৯২৫ সনের নভেম্বর) তার প্রায় তিন গুণ হয়েছে।

সুইডিস্ রেলওয়ে দিয়াশলাই রপ্তানির সুবিধার জন্য দিয়াশলাই বহনের ভাড়া ২৫°/₀—৪০°/₀ কমিয়ে দিয়েছে।

১৯২৫ সনের শেষভাগে মার্কিণ মূলধন নিয়ে ষ্টক্‌হল্‌মে এক নূতন দিয়াশলাই কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য "সুইডিস্ ট্রাষ্টে"র চেয়ে কম দরে দিয়াশলাই বিক্রয় করা। সুইডেনে কারখানা খোলার কারণ এই যে, অনেকের মতে সেখানেই সব চেয়ে উপযুক্ত লোকজন এবং মালমশলা পাওয়া যেতে পারে। ভবিষ্যতে কোন্ কোম্পানী জয় লাভ করবে তা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে মূলধনের বলের উপর। "সুইডিস ট্রাষ্টের" মূলধন আঠার কোটি ক্রোন্ (প্রায় ১৩½ কোটি টাকা) এবং নূতন কোম্পনীর মূলধন ত্রিশ লক্ষ ডলার (প্রায় ৯০ লাখ টাকা)।

লণ্ডন থেকে ট্রাষ্টের যে রিপোর্ট বের হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, ১৯২৪ সনে মূলধন দ্বিগুণ করায় মোট লাভ এক

কোটি একানব্বই লক্ষ থেকে দুই কোটি পঁচাশী লক্ষ ক্রোনে দাঁড়িয়েছে। ১ ক্রোনে সহজে বার আনা ধরা যায়। সুইডেনের কারখানাগুলি থেকে ১৯২৪ সনে ১০% বেশী দিয়াশলাই রপ্তানি হয়েছে। সেইখানকার কারখানাগুলিতে তো পুরোদমে কাজ চল্‌ছেই, বিদেশে প্রতিষ্ঠিত কারখানাগুলিতে তৈয়ারী মালের পরিমাণও ক্রমশই বেড়ে চলছে। ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত কারখানাগুলিতে ডবল শিফ্‌টে কাজ চলছে। জাপান এবং চীনের কারখানাগুলিও বেশ ভাল চলছে। ট্রাষ্টের বিদেশের (অর্থাৎ সুইডেনের বাইরের কারখানাগুলির মূল্য দুই কোটি একান্ন লক্ষ ক্রোন্ থেকে আট কোটি চল্লিশ লক্ষ ক্রোনে দাঁড়িয়েছে।

সোভিয়েট রুশিয়া

রুশিয়ার নূতন রাজনৈতিক এবং অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা অনুসারে দিয়াশলাইয়ের কারবারও সরকারী একচেটিয়া অধিকারের মধ্যে এসে পড়েছে। প্রস্তুত করবার খরচ, রপ্তানি এবং বিক্রয়ের মূল্য সমস্ত সরকারী বিশেষ বিভাগের নিয়ম অনুসারে স্পষ্ট স্থিরীকৃত হয়। যে সব কারখানা এখনও সর্ব্ববিষয়ে সরকারের অধীনে আসে নি, তাদেরও এই সমস্ত বিধি-ব্যবস্থা মেনে চলতে হয়। বর্ত্তমানে এই রকম বে-সরকারী কারখানায় প্রস্তুত দিয়াশলাইয়ের পরিমাণ সমস্তের এক-দ্বাদশাংশ মাত্র। বে-সরকারী কারখানাগুলির সংখ্যা ক্রমশই কমে যাচ্ছে। ১৯২৫ সনের শেষভাগে প্রবর্ত্তিত আইনে প্রত্যেক দিয়াশলাইয়ের বাক্সের আকারপ্রকার সম্বন্ধে কতকগুলি মাপকাঠি ধার্য্য করে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক বাক্সে ৫৫-৬০টী কাঠি থাকা চাই এবং প্রত্যেকটী কাঠি ৪৩-৪৫ মিলিমিটার লম্বা এবং ১½-২ মিলিমিটার পুরু হওয়া চাই। দিয়াশলাইয়ের রাসায়নিক সংগঠন প্রত্যেক কোম্পানী নিজের ইচ্ছামত পরিবর্ত্তন করতে পারে; কিন্তু গন্ধক-ব্যবহার নিষিদ্ধ এবং প্রত্যেক কাঠি প্যারাফিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

এই রকম বাঁধাবাঁধি নিয়মের জন্য বিভিন্ন কারখানায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি অনেকটা সহজ এবং এক রকম হয়েছে এবং ভাল ভাল যন্ত্র ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে। সমস্ত কারখানাই এখন আধুনিক প্রথায় চলছে। সুইডেনে যেসব যন্ত্রপাতিতে কাজ হয়, এই সব কারখানায়ও সেই সব ক্রমশঃ আমদানি করা হচ্ছে।

সোভিয়েট রুশিয়ার নূতন ব্যবস্থায় যে সমস্ত ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রগ্রাম্ হয়েছিল তার অনেক সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত হয় নি। কিন্তু দিয়াশলাই ব্যাপারে রুশিয়া সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হয়েছে।

দিয়াশলাইয়ের কাঠ সম্বন্ধে রুশিয়া খুব ভাগ্যবান। ১৯২৫ সনে সুইডিস ট্রাষ্ট্‌কে আবার বিশেষ বিশেষ কাঠ বিক্রয়ের চুক্তি করেছে। "গ্লু" ("আঠা") রুশিয়াতেই তৈয়ারী হয়। দিয়াশলাইয়ের জন্য দরকারী রাসায়নিক কাঁচা মাল এখনও বিদেশ থেকেই আমদানি করতে হচ্ছে। কারণ দেশী মাল ব্যবহার করলে দিয়াশলাই তেমন ভাল হয় না এবং তা হলে গ্রীস্, ইজিপ্ট, তুরস্ক, পারস্য, আফগানিস্থান প্রভৃতি যে সব দেশে রুশিয়ান্ দিয়াশলাই রপ্তানি হয়, সেখানে প্রতিযোগিতায় হারতে হবে। নিজের দেশে ব্যবহারের জন্য সমস্ত দিয়াশলাই-ই রুশিয়ায় প্রস্তুত হয়। চীনের বাজার আরও ভাল রকম দখল করবার জন্য পূর্ব্বদিকে নূতন নূতন কারখানা খোলবার চেষ্টা হচ্ছে।

সস্তা মাল, শ্রমিকদের কম বেতন, ভাল এবং শক্ত অর্গানিজেশান্, আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার—এইসব কারণে রুশিয়াতে দিয়াশলাই প্রস্তুতের খরচ এবং বিক্রয়ের মূল্য দুই-ই কিরূপ কমেছে তাহা নিম্ন তালিকায় দেখা যাইবে।

বৎসর	১০০০ বাক্সের এক পেটী তৈয়ারী করতে দরকারী কার্য্যদিন	এক পেটী তৈয়ারী করবার খরচ (রুবল্)	এক পেটীর বিক্রয়-মূল্য মাশুল সমেত (রুবল্)
১৯১৩-১৪	১·৩১		
১৯২২-২৩	১·৬২	৬·৯০	—
১৯২৩-২৪	১·৩৩	৬·০৩-৬·৩৬	১২·২০
১৯২৪-২৫	০·৯৯	৪·৫০-৪·৯১	১১·৮৫
১৯২৫-২৬	—	৪·২৯-৪·৩৩	১০·২৯

রুশিয়ান্ শ্রমিকের মাসিক বেতন গড়ে ৫০৲-৫৫৲ টাকা।

হিসাব করে দেখা যায় যে, বিদেশী বাজারে রুশিয়ান্ এবং সুইডিস্ দিয়াশলাইয়ের দর প্রায় সমান।

দিয়াশলাই রপ্তানির পরিমাণ :—

১৯১৩-১৪—৩০০০০০ পেটী
১৯২৩-২৪—১২৫০০০ ”
১৯২৪-২৫—৩২৩০০০ ”

অনেকের মতে রুশিয়ান্ দিয়াশলাইয়ের এখনও অনেক দোষ আছে। রুশিয়ান্‌রাও তা অস্বীকার করে না। এইসব দোষ দূর করবার জন্যই গভর্মেণ্ট উপরে বর্ণিত আইন জারী করেছে, বিদেশ থেকে এঞ্জিনিয়ার ও রাসায়নিক আনাচ্ছে এবং নিজের দেশে সমস্ত রাসায়নিক মাল মশলা ভাল ভাবে তৈয়ারী করার চেষ্টা করছে। বিদেশের বাজারে রুশিয়ান্ দিয়াশলাই চালাবার সুবিধার জন্য যে সব দিয়াশলাই বিদেশে রপ্তানি হয় তাতে ব্যবহৃত বিদেশ হতে আমদানি রাসায়নিক দ্রব্যের উপর যে শুল্ক নেওয়া হয় তা পরে ফেরত দেওয়া হয়।

জাপান

পূর্ব্ব এশিয়ার অনেক দেশেই জাপানী দিয়াশলাইয়ের খুব আধিপত্য ছিল। কিন্তু গত কয়েক বৎসর যাবৎ ভারতবর্ষে, চীনে এবং জাভা, সুমাত্রা ইত্যাদি দ্বীপে সুইডিস্ ট্রাষ্টের প্রতিযোগিতায় এই প্রভুত্ব কমে যাচ্ছে। “ইণ্টার্ণ্যাশ্ন্যাল ম্যাচ কর্পোরেশ্যন,” ‘‘সুইডিস্ ট্রাষ্ট’’ এবং উত্তর আমেরিকার ‘‘রকাফেলার-সঙ্ঘ’’ স্থাপনের পর জাপানী দিয়াশলাই কারবারে গৃহবিদ্রোহ আরম্ভ হয়েছে। কতকগুলা জাপানী ধনী বিদেশীদের সঙ্গে মিলে গেছে। ১৯২৪ সনে স্থাপিত সুইডিস্-আমেরিকান্-জাপানী দিয়াশলাই ট্রাষ্ট্ নিম্নলিখিত দিয়াশলাই কোম্পানীগুলিকে হস্তগত করেছে : (১) নিপন্ ম্যাচ্ কোম্পানী (দ্বিতীয় বৃহত্তম জাপানী দিয়াশলাই কোম্পানী), (২) ওসাকার কোয়েকিসা কারখানা, (৩) কোবের কোবায়াসি ম্যাচ রপ্তানি কোম্পানী, (৪) কোবের স্কিবিরিন কারখানা, (৫) মাঞ্চুরিয়ার কিরিনের দিয়াশলাইয়ের কারখানা। এই কয়েকটী কারখানায় সমগ্র জাপানের চতুর্থ বা তৃতীয় অংশ দিয়াশলাই তৈয়ারী হয়। এই ট্রাষ্টের বিরুদ্ধে এখন বিখ্যাত তোয়ো ম্যাচ্ কোম্পানী (সমগ্র জাপানের ½ দিয়াশলাই প্রস্তুতকারী) এবং সত্তরটী ছোট ছোট কারখানা যুদ্ধ করছে। সুইডিস্-আমেরিকান্-জাপানী ট্রাষ্ট্ চেষ্টা করছে যাতে এইসব বিদ্রোহী কোম্পানীগুলি এদের সঙ্গে একত্র হয়ে ভারতবর্ষ চীন এবং জাভা সুমাত্রা ইত্যাদি দ্বীপের দর এবং প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে একটা রফায় আসতে পারে। জাপানে অনেকগুলা ছোট-খাটো কোম্পানী আছে। ইহারা উক্ত ট্রাষ্টের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করবার জন্য চেষ্টিত। কিন্তু ইহারা অন্যান্য বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ নয়। কাজেই সুইডিস্-আমেরিকান-জাপানী ট্রাষ্ট এই সকল জাপানী কোম্পানীকে সহজেই ঘাল করতে পারবে এইরূপ আশা করছে।

ট্রাষ্ট্ আশা করছে এইসব ছোট ছোট কোম্পানীগুলিকে হাত করে জাপানের আধাআধি অংশ দিয়াশলাই প্রস্তুতের কারখানা নিজেদের কর্ত্তৃত্বাধীনে আনবে—তখন মাত্র তোয়ো ম্যাচ্ কোম্পানী এই ট্রাষ্টের বাইরে থাকবে।

ছোট ছোট কোম্পানীগুলির স্বাধীনতা-রক্ষার প্রধান অন্তরায় জাপানে লাল ফস্ফরাস্ এবং অন্যান্য কাঁচা মালের অভাব। ১৯২৩ সন হতে শ্বেত-হরিৎ ফস্ফরাস্ ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়েছে। মিৎসুবুসান কোম্পানী জাপানে লাল ফস্ফরাস্ আমদানি করে এবং এই কোম্পানী আবার একটা ইণ্টার্ণ্যাশ্ন্যাল ট্রাষ্টের কর্ত্তৃত্বাধীন। একমাত্র জাপানী কোম্পানী যা জাপানে ফস্ফরাস তৈয়ারী করে, তার নাম “নিহন কাচাকা”। এই কোম্পানী আমেরিকান ওরিয়েণ্টাল্ ফস্ফর কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত। আবার আমেরিকান্ ওরিয়েণ্টাল ফস্ফর কোম্পানীর সঙ্গে ইণ্টার্ণ্যাশ্ন্যাল ম্যাচ কর্পোরেশ্যনের সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ আছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ঘুরেফিরে আবার সেই সুইডিস্-আমেরিকান্-জাপানী ট্রাষ্টের কাছে গিয়েই হাজির্ হতে হয়। লাল ফস্ফরাস্ তৈয়ারী করার সকল কারখানাগুলি একটী ইণ্টার্ণ্যাশ্ন্যাল ট্রাষ্টের হাতে আসে এই চেষ্টা যদি সফল হয় তবে জাপানের ছোট ছোট কোম্পানীগুলির স্বাধীনতা বজায় রাখা অসম্ভব হবে।

জাপানে প্রথমতঃ যে সমস্ত "আধুনিক" শিল্পের প্রতিষ্ঠা হয়, দিয়াশলাই তার মধ্যে অন্যতম। সস্তা মজুর পাওয়াতে এবং কুটীর-শিল্প সম্ভব হওয়ায় জাপানে এত ছোট দিয়াশলাইয়ের কারখানার জন্ম হয়েছিল। এশিয়ার অন্যান্য দেশ শিল্পে অনুন্নত থাকায় জাপান অতি শীঘ্র এই ব্যবসায়ে প্রতিপত্তি লাভ করেছিল। কিন্তু চীন ও অন্যান্য দেশে দিয়াশলাই প্রস্তুত আরম্ভ হওয়া থেকে ১৯১৩ সন হইতে জাপানী দিয়াশলাই রপ্তানি পূর্ব্বানুপাতে কমে আস্‌ছে। ১৯১৯ সনে ৯,০০,০০০ পেটী দিয়াশলাই প্রস্তুত হয়েছিল; ১৯২৫ সনে ৫,০০,০০০ পেটী হয়েছে।

জাপানী দিয়াশলাই ব্যবসায়ের অবনতির আরও কয়েটী কারণ আছে। সাইবেরিয়াতে অশান্তি হওয়ায় রুশিয়া থেকে উপযুক্ত কাঠ আমদানি হতে পারছে না। এই কাঠ জাপান কেবল নিজের দেশে দিয়াশলাই তৈয়ারী করার জন্য আনত না, এই কাঠ থেকে কাঠি করে তারা আবার চীনা দিয়াশলাই কারখানাগুলির নিকট বিক্রী করত। সুইডেনের সঙ্গে তুলনায় তাদের দিয়াশলাই খারাপ। এখন তাদের ভাল রাসায়নিক মাল মশলা কিন্‌তে হচ্ছে এবং তারা নূতন নূতন উন্নত যন্ত্রপাতির ব্যবহার আরম্ভ করছে। প্রতিযোগিতার চাপে সুইডিস্-আমেরিকান্-জাপানী ট্রাষ্টের বহির্ভূত সাবেকী প্রথায় পরিচালিত কারখানাগুলি তৈয়ারী করার খরচের চেয়ে কম দরে বিদেশে দিয়াশলাই বিক্রী করছে।

নিম্নলিখিত তালিকা দেখলে সহজেই বুঝতে পারা যাবে কি রকম ভাবে জাপানী দিয়াশলাইয়ের দর কমে যাচ্ছে:—

বৎসর	দিয়াশলাইয়ের মার্কা		৫০ গ্রোসের দাম (ইয়েন)
১৯২১ (১ম ভাগ)	১ক	কোবে	৭০
১৯২১ (মধ্য ভাগ)	১ক	"	৫০
	২ক	"	৪৮
১৯২৪ (এপ্রিল)	১ক	কোবে	২৬-৩৭
১৯২৬ (১ম ভাগ)	১ক	"	৩২ (শিঙ্গাপুরে)
	১ক	"	২৪ (হংকং)

দর এত কমা সত্ত্বেও বিক্রয়াভাবে গুদামে মাল জমছে।

১৯২৫ সনে সর্ব্বসমেত ৫০০০০০ পেটী (১ পেটী=৫০ গ্রোস) দিয়াশলাই তৈয়ারী হয়েছিল। তার মধ্যে ১৫০০০০—২০০০০০ পেটী দেশে খরচ হয়েছে। বাকী ৩০০০০০—৩৫০০০০ পেটী বিদেশে রপ্তানি হয়েছে। সুইডিস্-আমেরিকান্-জাপানী ট্রাষ্টের প্রতিযোগিতার ফলে স্বদেশে ব্যবহৃত দিয়াশলাই প্রায় সমস্তই ট্রাষ্ট-বহির্ভূত কোম্পানীগুলি জোগায় এবং বিদেশে রপ্তানিতে দুই দলই প্রায় সমান অংশ পাচ্ছে।

১৯২০ সনে জাপান অন্য যে কোনো বৎসরের চেয়ে বেশী দিয়াশলাই রপ্তানি করেছিল। তারপর থেকে রপ্তানি কিরূপ কমতে আরম্ভ করেছে নিম্ন তালিকা হতে তা বুঝা যাবে।

দেশ	১৯২৫ (৯ মাস)	১৯২৪	১৯২৩	১৯২২	
চীন	২৯০	৩৬১	৩৫২	৭৭৭	হাজার গ্রোস
কোয়াংটুং	১১১	৭৮	১০৮	২৩৩	
হংকং	৩২৩২	৪৯২৬	২৪৯২	৩৭৪৪	
ভারতবর্ষ	২২৪১	৩৩৬৩	৭০৪৬	৮৬৪৬	
ষ্ট্রেট্‌স সেটল্‌মেণ্ট	১২৮১	১৭৭৭	১৪৪৪	১৪৮৫	
জাভা, সুমাত্রা ইং	৭৯৫	৯৯৩	১৫৩৫	৩২৭৮	
ফিলিপাইনস্	৫৬১	৭২৯	৭৪০	৮৯৭	
মার্কিণ দেশ	১২০	৫১৮	৩৯১	৬৯৮	
আফ্রিকা	২৫৮	৩৫০	৩২৯	৬৪০	
অন্যান্য দেশ	২৩৫	৩৪২	৮১৩	৪৩৯	
	৯১২৪	১৩৪৩৭	১৫২৫০	২০৮৩৭ হাজার গ্রোস	

বিদেশী আমদানির, বিশেষতঃ সুইডেনের প্রতিযোগিতার হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য আমদানি দিয়াশলাইয়ের মূল্যের ৩০°/。 রক্ষণ-শুল্ক বসান হয়েছে।

ক্যানাডা

ক্যানাডাতে দিয়াশলাইয়ের কাঠ প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান। গত তিন বৎসরের হিসাব নিলে দেখা যায় যে, বাৎসরিক প্রায় সওয়া তিন লক্ষ ডলারের (অর্থাৎ এককোটী টাকার) দিয়াশলাইয়ের কাঠ ক্যানাডা থেকে ইংল্যাণ্ড ও আয়ার্ল্যাণ্ডে রপ্তানি হয়। কাঠে এত লাভ বলেই ক্যানাডায় দিয়াশলাই কারখানার প্রাচুর্য্য নাই।

আমদানি-রপ্তানির তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

	১৯২৫	১৯২৪	১৯২৩
আমদানি (ডলার)	১৩৯৯১	৬১১৪	৪৫১৪ (সুইডেনই প্রধান)
রপ্তানি "	২৫২৯৯	২৯০০৫	৯৯১৭৮ (আমেরিকার বিভিন্ন দেশ)

বেলজিয়াম

বেলজিয়াম দেশ ছোট হলেও দিয়াশলাই ব্যবসায়ে তার প্রতিপত্তি বেশ আছে। যুদ্ধের পর থেকে বেলজিয়ামের দিয়াশলাইয়ের আদর বেড়েছে। এই দেশের দিয়াশলাইয়ের কারখানাগুলি এখন মাত্র দুইটী কোম্পানীর অধীনে। সুতরাং প্রতিযোগিতা অনেক কমেছে এবং নূতন নূতন যন্ত্রপাতি এনে কারখানাগুলির কার্য্যকরী ক্ষমতাও বাড়ান হয়েছে। সমস্ত কাঁচা মাল এবং কাঠ বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়।

১৯২৫—১৯২৪—১৯২৩—১৯২১

মোটরপ্তানি (টন্) ১৫৩৩৭—১০৫২৬—৫৩৮৫—৪৮০০

বাজার—ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, মার্কিণদেশ, তুরস্ক, হল্যাণ্ড, ইজিপ্ট্ ইত্যাদি।

ডেনমার্ক

বিদেশে দিয়াশলাই রপ্তানি না করতে পারলেও কারখানার উন্নতি করে ক্রমশই নিজেদের প্রয়োজনোপযোগী দিয়াশলাই তৈয়ারী করার ব্যবস্থা হচ্ছে।

এস্থোনিয়া

এদেশে দিয়াশলাইয়ের কাঠের বেশ সুবিধা থাকায় ক্রমশই এই শিল্পের উন্নতি হচ্ছে। আধুনিক যন্ত্রপাতি খাটিয়ে বড় বড় কারখানাগুলি মজুর প্রতি দৈনিক প্রস্তুত দিয়াশলাইয়ের সংখ্যা ২০০০ বাক্স পর্য্যন্ত বাড়িয়েছে। ১৯২৫ সনে ছয়টী কারখানায় ৮০০—৯০০ লোক কাজ করেছে। গড়ে প্রত্যেক মজুর দৈনিক ১৪০০ দিয়াশলাইয়ের বাক্স তৈয়ারী করেছে—সবচেয়ে ভাল কারখানায় ২০০০, সবচেয়ে খারাপ কারখানায় ৫০০ বাক্স। প্রস্তুত দিয়াশলাইয়ের উপর ট্যাক্স বসিয়ে গভর্ণমেণ্ট বার্ষিক সাড়ে ত্রিশ লক্ষ মার্ক লাভ করেছে; কিন্তু রপ্তানির সুবিধা করার জন্য ১৯২৫ সনের নভেম্বরের আইনানুসারে রপ্তানি মালের উপর ট্যাক্স মাপ করার ব্যবস্থা হয়েছে। নীচের তালিকা দেখলেই বুঝা যাবে যে, রপ্তানির পরিমাণ কি রকম বাড়ছে।

সন ১৯২২—১৯২৩—১৯২৪—১৯২৫

মূল্য ১০৪— ২৯৪— ৬৯৬—১১১৬ লক্ষ মার্ক

সুইডিস্ ট্রাষ্ট্ এবং ইণ্টার্ণাশান্যাল্ ম্যাচ্ কর্পোরেশান্ অনেক চেষ্টা করেও এদেশে দিয়াশলাই ব্যবসায়ের একচেটিয়া অধিকার পায় নাই।

ফিন্ল্যাণ্ড

এই শিল্পের জন্য ফিন্ল্যাণ্ডেরও কাঠ এবং কাগজের কোনো অভাব নাই। রাসায়নিক মালমশলাও সহজেই জার্ম্মাণি থেকে আনীত হয়। দিয়াশলাই রপ্তানির সুবিধার জন্য এস্থোনিয়ার ন্যায় এদেশেও রপ্তানি দিয়াশলাইয়ের উপর ট্যাক্স নেই। উপরন্তু আমদানি দিয়াশলাইয়ের উপর রক্ষণ-শুল্ক বসান হয়েছে। ১৯১৪ সন হতে সুইডিস ট্রাষ্ট্ সমস্ত দিয়াশলাইয়ের কারখানা কিনে নিচ্ছে। এখন এদেশে ট্রাষ্ট-বহির্ভূত মাত্র পাঁচটী কারখানা আছে। যুদ্ধের পর থেকে কারখানার সংখ্যা কমে গেছে। কিন্তু আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে দিয়াশলাই-নির্ম্মাণের পরিমাণ বেড়েছে।

ফ্রান্স

১৯২৪ সনের আইনানুসারে দিয়াশলাইয়ের ব্যবসায় গভর্ণমেন্টের একচেটিয়া হয়েছে; কিন্তু এতে গভর্ণমেন্টের কিছুমাত্র লাভ হচ্ছে না। গভর্ণমেন্ট-পরিচালিত কারখানাগুলিতে প্রস্তুত করার খরচ বেড়েছে। দিয়াশলাই প্রস্তুত এবং বিক্রয় করার অধিকার গভর্ণমেন্টের নিজের কারখানার বা অধীনস্থ কারখানারই মাত্র আছে। বিদেশ থেকে যে দিয়াশলাই আমদানি হয় তাও গভর্ণমেন্ট নিজে কিনে, পরে দেশে প্রস্তুত দিয়াশলাইয়ের চেয়ে বেশী দরে বিক্রয় করে। দেশে দিয়াশলাই প্রস্তুত করার খরচ বেশী হওয়ার কারণ এই যে, সমস্ত ব্যবস্থা অত্যন্ত বুরোক্রাটিক্ এবং ব্যবসায়-নীতি-বিরুদ্ধ। ফ্রান্সের দিয়াশলাই-শিল্পের এই প্রকার অ-ব্যবস্থা বা দুর্ব্যবস্থা থাকায় বিদেশে ফরাসী দিয়াশলাই বিক্রয় হয় না। তবে ফরাসী আফ্রিকায় চালান দিয়ে কিছু লাভ হয়। গভর্ণমেন্ট চেষ্টা করছে যাতে নূতন বন্দোবস্ত করে এই শিল্পের উন্নতি করা যায়।

গ্রীস্

১৯২৪ সন পর্য্যন্ত সুইডেনই প্রধানতঃ গ্রীসে দিয়াশলাই বিক্রয় করত। কিন্তু তার পরে রুশিয়াও বিক্রয় করতে আরম্ভ করে। ১৯২৬ সনের ১লা জানুয়ারী থেকে দিয়াশলাই-আমদানি আইন দ্বারা বন্ধ করা হয়েছে। খুব সম্ভব গভর্ণমেন্ট এতে একটা একচেটিয়া ব্যবসায়ের সৃষ্টি করবে।

ইংল্যাণ্ড

নিজেদের প্রয়োজনীয় সমস্ত দিয়াশলাই দেশে প্রস্তুত হয় না বলে বিদেশ থেকে আমদানি করতেই হয়। দিয়াশলাইয়ের উপযোগী কাঠ দেশে নাই, সুতরাং বিদেশ থেকে কাঠ আমদানি করতে হয় এবং তার বেশীর ভাগই (৮৫%) ক্যানাডা থেকে আসে। ইংল্যাণ্ডে সুইডিস্ দিয়াশলাই ক্রমশই জাপানী দিয়াশলাইয়ের স্থান অধিকার করছে।

ইতালি

১৯২২ সনের আইন অনুসারে আপাততঃ ইতালিতে দিয়াশলাই তৈয়ারী, আমদানি ও বিক্রয় গভর্ণমেন্টের একচেটিয়া হয়েছে। গভর্ণমেন্ট-নিয়ন্ত্রিত কারখানাগুলি চেষ্টা করছে যাতে ক্রমশঃ এই ব্যবসা লাভজনক হয়। গভর্ণমেন্টের একচেটিয়া অধিকারের কাল শেষ হয়ে গেলে তার বদলে দিয়াশলাই তৈয়ারীর উপর একটা ট্যাক্স বসানো হবে। গভর্ণমেন্ট এ থেকে বার্ষিক নয় কোটী লিয়ার লাভ করবে আশা করছে। ইতালিতে প্রস্তুত দিয়াশলাই দ্বারা স্থানীয় প্রয়োজন সাধন ত হয়ই উপরন্তু সিরিয়া, লেবানন্, সুইট্‌সারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশেও কিছু কিছু রপ্তানি হয়।

লেট্‌ল্যাণ্ড

এ দেশে দিয়াশলাইয়ের উপযোগী এত কাঠ আছে যে, নিজেদের কারখানাগুলির জন্য কাঠ সরবরাহ করার পর বিদেশেও অনেক রপ্তানি করা হয়। মহাযুদ্ধের পূর্ব্বেই এদেশে দিয়াশলাই-শিল্প এত উন্নতি লাভ করেছিল যে, এরা রুশিয়ান্ দিয়াশলাই সিণ্ডিকেটকে অধিকাংশ দিয়াশলাই বিক্রী করত। ফরাসী মূলধন দ্বারাই এই কারখানাগুলি বেশীর ভাগ পরিচালিত হত এবং লেট্‌ল্যাণ্ড স্বাধীন হওয়ার পরে ফরাসীরা এই শিল্পের একচেটিয়া অধিকার পাওয়ার চেষ্টা করেছিল; কিন্তু বিফল হয়েছে। ১৯২৪ সন থেকে সুইডিস্ ট্রাষ্ট্ লেট্‌ল্যাণ্ডের কারখানাগুলির উপর আধিপত্য-স্থাপনের চেষ্টা করছে। সম্প্রতি খবর পাওয়া গেছে যে, ট্রাষ্ট কতকটা কৃতকার্য্যও হয়েছে। লেট্‌ল্যাণ্ডে সুইডিস্ ট্রাষ্ট একটী শাখা-সিণ্ডিকেট স্থাপন করেছে। গভর্ণমেন্ট দিয়াশলাইয়ের নির্ম্মাণ বিক্রী এবং রপ্তানির উপর ট্যাক্স্ বসিয়ে বেশ লাভ করছে। তেমনি এই শিল্পের উন্নতির জন্য দিয়াশলাইয়ের যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক মালমশলা আমদানির এবং দিয়াশলাইয়ের কাঠ রপ্তানির উপর সমস্ত ট্যাক্স্ রেহাই দিয়েছে।

লিথুয়ানিয়া

এখানে দিয়াশলাই-শিল্পের বিশেষ উন্নতি হয় নাই। দেশের প্রয়োজন মিটাবার জন্য বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। ১৯২৬ সনের ৬ই মার্চ্চের "অয়েল এণ্ড কলার-ট্রেড" পত্রিকায় জানা যায় যে, গভর্ণমেন্ট দিয়াশলাই নির্ম্মাণ এবং বিক্রয়ের একচেটিয়া অধিকার গ্রহণ করতে চায়। আবার অন্য দিক্ থেকে সংবাদ পাওয়া যায় যে, সুইডিস্ ট্রাষ্ট্ লিথুয়ানিয়ার সমস্ত দিয়াশলাইয়ের কারখানাগুলিকে একত্র করেছে। (ক্রমশঃ)

তর্ক-প্রশ্ন

জোড়হাটের বিদ্যুৎ-কারবার
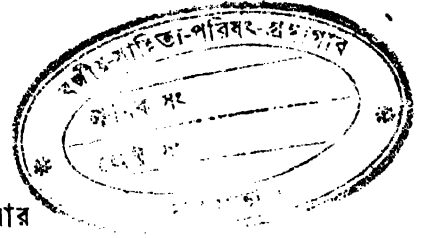
শ্রীযুত সুধাকান্ত দে মহাশয় "আর্থিক উন্নতি"তে মরিয়াণী হইতে যে "আসামের চিঠি" লিখিতেছেন তাহা মনোরম হইলেও সম্পূর্ণ ভ্রমহীন হয় না। আমার বোধ হয় দে মহাশয়ের মরিয়াণী ব্যতীত আসামের অন্যান্য স্থানের অভিজ্ঞতা কম। মরিয়াণী আসামের মধ্যে একটা অনুন্নত স্থান। এইরূপ সামান্য স্থান হইতে তিনি যেরূপ মনোজ্ঞ ভাবে আসামের চিঠি লিখিতেছেন তাহাতে বোধহয় ডিব্রুগড়, গৌহাটী, তেজপুর হইতে লিখিলে চিঠিগুলি আরও ভাল হইত। সে যাহা হউক, তিনি জোড়হাটের বিদ্যুৎ-কারবার সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া দুই একটী ভুল খবর দিয়াছেন।

কাগজের কল আসামে কেন স্থাপিত হইল না তাহার উত্তর আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বিশেষ করিয়া দিতে পারেন। আমার যতদূর জানা আছে এই কাগজ কলের কোম্পানী শশীবাবুকে জাপানে পাঠায় নাই। তাহার পূর্ব্বে তিনি তথায় গিয়াছিলেন। শশীবাবুকে কাগজ কল কোম্পানী কাগজ নির্ম্মাণের যন্ত্রপাতি ক্রয় করিবার জন্য জার্ম্মাণিতে পাঠাইয়াছিল, বিদ্যুতের বিষয় আয়ত্ত করিবার জন্য নয়। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়াই তিনি জোড়হাটের বিদ্যুৎ-সরবরাহের কারবারে হাত দেন নাই। কাগজের কলের মোসাবিদা খাড়া করিতে না পারিয়া তিনি এই কার্য্যে হাত দেন। অবশ্য টাকা ও "লাইসেন্স" তিনি যোগাড় করিয়াছিলেন। কিন্তু নিজের বৈদ্যুতিক এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা জানা না থাকায় তাঁহাকে বেশী খরচায় কর্ম্মদক্ষ ওস্তাদ বাহাল করিয়া কার্য্য করাইতে হইতেছে। জোড়হাট যেরূপ ক্ষুদ্র স্থান তাহার অনুপাতে বিজলী সরবরাহের জন্য অনেক মূলধন লাগিয়াছে। সেই জন্য আজ পর্য্যন্ত শশীবাবুর অর্থের অনাটনে বিশেষ অসুবিধা হইতেছে। আমার যতদূর জানা আছে জোড়হাটের বিখ্যাত চা-বাগানের মালিক ও ধনকুবের রায় বাহাদুর শিবপ্রসাদ বড়ুয়া মহাশয়ের নিকট এই কোম্পানী বিশেষ ঋণী। মাড়োয়ারীদের নিকট তিনি কতটা ঋণী তাহা আমার বিশেষ জানা নাই। তাহার উপর মাঝে মাঝে বিদ্যুতের কল দিনের পর দিন অচল হইয়া জনসাধারণকে মুস্কিলে ফেলে।

এই ত গেল জোড়হাটের বিজলী সরবরাহের কথা। কিন্তু দে মহাশয় বোধ হয় জানেন না যে, আসামের সার্ব্বজনিক বিজলী-সরবরাহের পথ-প্রদর্শক হইতেছেন জনৈক প্রবাসী বাঙ্গালী—তেজপুরের রায় বাহাদুর মনোমোহন লাহিড়ী। গত মহাযুদ্ধের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে হউক বা পরে হউক তিনি তাঁহার পুত্র এঞ্জিনিয়ার বাবু দেবেন্দ্রমোহন লাহিড়ীর সাহায্যে তেজপুর ইলেকট্রিক লাইট কোম্পানী স্থাপিত করেন। এই কোম্পানী আজ ১৩।১৪ বৎসর তেজপুর সহরে অতি কৃতকার্য্যতা সহকারে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতেছে। ইঁহারাই প্রকৃতপক্ষে পথ-প্রদর্শক। এই কোম্পানী যদি কৃতকার্য্য না হইত তাহা হইলে আসামের ক্ষুদ্র সহরগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রস্তাব কোনো কালে কার্য্যে পরিণত হইত কিনা সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। এখন আসাম প্রদেশে শিলং সহরে, তেজপুরে ও জোড়হাটে বিদ্যুৎ-সরবরাহের বন্দোবস্ত হইয়াছে। গৌহাটী ও ডিব্রুগড়ে শীঘ্রই বন্দোবস্ত হইবে শুনা যাইতেছে।

জনৈক আসাম-প্রবাসী বাঙ্গালী

১০৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে শ্রীরঘুনাথ শীল, বি, এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১ম বর্ষ—৯ম সংখ্যা পৌষ—১৩৩৩

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি॥

অথর্ব্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জন্ম আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

কলিকাতায় চামড়ার গুদাম

কলিকাতার চামড়ার ব্যবসাদার-সমিতি কর্পোরেশ্যনের নিকট এক আপীল রুজু করিয়াছেন। ৮নং ওয়ার্ড হইতে চামড়ার গুদাম প্রস্তাবিত স্থানে স্থানান্তরিত হইলে তাহাদের ব্যবসায়ের নাকি ক্ষতি হইবে।

চামড়া-শুল্কে আয় প্রায় ৩২ লাখ

১৯২৫-২৬ সনে ৪,৯১,৫৯৲ টাকায় ৩১,৬২৫ টন চামড়া কলিকাতা হইতে রপ্তানি হয়। সেই সময় সমস্ত বন্দর হইতে শুল্ক-বিভাগের আয় হয় ৩১,৭৫,০০০৲ টাকা। কলিকাতা ঐ ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র। ব্যবসায়টি শতাব্দীর উপর হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং এযাবৎকাল বর্ত্তমান স্থান সমূহেই ইহার গুদামগুলির অবস্থিতি। প্রতিপক্ষ বলেন, ইহার একটা বাজার খাড়া করিতে হইলে কোন বিশেষ স্থানে গুদামগুলির সংবদ্ধ হওয়া আবশ্যক।

৫০,০০০ মুসলমানের জীবিকা

এই ব্যবসায়ে মুসলমানদের স্বার্থই বিশেষ পরিদৃষ্ট। সারা ভারতে তাহাদের প্রায় ৫০ লাখ লোক ইহাদ্বারা প্রতিপালিত। এক কলিকাতা সহরেই ৫০,০০০ মুসলমান এই ব্যবসায় দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে।

ধাপায় চামড়ার ব্যবসায়ের অসুবিধা

এই ব্যবসায় বিরক্তিকর ও স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতিকূল বলিয়া কর্পোরেশ্যান ইহাকে ধাপার মাঠে স্থানান্তরিত করিতে চাহিয়াছেন। সেখানে ড্রেন নাই। অন্য কোন সুবিধা নাই। সে স্থান বাসের অযোগ্য। চামড়া-সমিতি বলেন, এ ব্যবসায় বিরক্তিকর নহে। ইহাদ্বারা স্বাস্থ্যহানিও হয় না। সহরের আবর্জ্জনারাশি ধাপায় ফেলা হয়। সেখানে এ ব্যবসায় চালাইবার কোন সুবিধাই নাই।

হাওড়ার আয় বৃদ্ধি

হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির আর্থিক অবস্থা ভাল বলিয়া প্রকাশ। ১৯২৪-২৫ সনের ক্লোজিং ব্যালান্স ৮,৯২,৮০৮৲ টাকা; লোন ফণ্ড ১,৩৫,২০৬৲ টাকা; রেভিনিউ ফণ্ড ৭,৫৭,৬০২৲ টাকা। আদায় বাড়িয়াছে। অনাদায় ৫,৩৩৭০০৲ টাকা হইতে ১,৮৭,১২৫৲ টাকায় নামিয়াছে। চল্‌তি আদায়ের শতকরা হারও বাড়িয়াছে। পূর্ব্বে ছিল ৭৭·২, এখন দাঁড়াইয়াছে ৮৮·৩। ট্যাক্স আদায় আরো শতকরা ১০ ভাগ বাড়াইবার কথা।

জলের ট্যাঙ্ক বাড়াইবার প্রস্তাব

সহরে জলের নল বদলাইবার কাজ দ্রুত চলিতেছে এবং মাস কয়েকের মধ্যেই তাহা সম্পূর্ণ হইবে। উপস্থিত ট্যাঙ্কের সংখ্যা এখন বাড়াইবার দরকার। তাহা না হইলে, যে সব স্থলে জলের অভাব, সে সব স্থলে প্রচুর পরিমাণে পরিষ্কৃত জল সরবরাহ করা যাইবে না। অঙ্গীকৃত কর্জ্জের অবশিষ্ট টাকার (৪,৭০,০০০৲) জন্য দরখাস্ত করা হইয়াছে।

রাস্তা ও গাড়ীর উপর কর

শালিমারে মোটর লরি, বাস্, মহিষের গাড়ী ও রেলওয়ে বাণিজ্য বাড়িয়া যাওয়ায় রাস্তা যথাযথভাবে রাখা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। এ বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে সমস্ত রাস্তা পাথর দিয়া গাঁথিতে হয়। কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটির সে সাধ্য নাই। লরির মালিকদের নিকট হইতে একটা বিশেষ ট্যাক্স আদায় করার কথা আলোচিত হইতেছে।

পাকা নর্দ্দমা

আলোচ্য বর্ষে এখানকার ২৪টি রাস্তা ও গলিতে পাকা ড্রেন হইয়াছে। অনেক জায়গা নীচু হওয়ায় এবং সে সব স্থানে ঝিল, খানা, ডোবা ও অস্বাস্থ্যকর পুকুর থাকায় খারাপ ড্রেনই ছিল সনাতন প্রথা।

মিউনিসিপ্যালিটির সঙ্গে গবর্মেণ্টের খোঁচাখুঁচি

গবর্মেণ্ট অঙ্গীকার করেন এখানে ইম্‌প্রুভ্‌মেণ্ট ট্রাষ্ট প্রচলিত করিবেন। কিন্তু তাহাতে বিলম্ব হওয়ায় ব্যাপারটা জটিল হইয়া দাঁড়ায়। সহরের কেন্দ্রীয় জল-নির্গম প্রণালীর জন্য একটা প্রধান জল-নির্গম ক্যানালের স্কীম ১৯১৩ সনের জুনে গবর্মেণ্ট-কর্তৃক মঞ্জুর হয়। ঐ স্কীমকে কার্য্যে পরিণত করিবার ব্যয় ধরা হয় ৬,৪৭,৪৩২ টাকা। ১৯১৪ সনের অক্টোবরে গবর্মেণ্টের নিকট হইতে ধার করা হয় ৫,৫০,০০০৲ টাকা। তাহা হইতে ৩,৭৩,০০০৲ টাকা জমি সংগ্রহ করিতেই খরচ হইয়া যায়। খাল কাটার কাজ হাতে লওয়া হয় নাই। কর্জ্জের অবশিষ্ট টাকা দিয়া ওয়াটার ওয়ার্কস ইম্‌প্রুভমেণ্ট স্কীম কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। গবর্মেণ্টের সম্মতিও যেন সেইরূপ ছিল। ইতিমধ্যে স্কীমের কাজ সুরু হইয়া গিয়াছে। গবর্মেণ্ট এখন ওয়াটার ওয়ার্কস উদ্দেশ্যে টাকা ধার দিতে নারাজ। তাহার জন্য বার বার অনুরোধ করিয়াও ফল হয় নাই। অথচ এই ধারের আশায় যে কাজটুকু করা হইয়াছে, তাহার খরচ নির্ব্বাহ করিতে হইবে। আগামী বৎসরের বজেটে খালের স্কীমের জন্য ফণ্ড বরাদ্দ করা সম্ভব।

৫০০ ছাত্রের অবৈতনিক শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারকার্য্যে দ্রুত উন্নতি হইয়াছে। মিউনিসিপ্যাল অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫০০ ছাত্রেরও অধিক পাঠ করিতেছে।

বঙ্গে যৌথ কারবার

গত মে মাসে বঙ্গদেশের ১২টা যৌথ কারবার বন্ধ হইয়াছে। উহার মূলধন ২৯৮৫০০০টাকা ছিল। বঙ্গ, বিহার ও আসামে যে সকল যৌথ কারবার বন্ধ হইয়াছে তাহার তালিকা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

পুত্তর্স গভর্ণমেণ্ট সোসাইটী; পাটনা প্রিণ্টিং এণ্ড পাব-লিসিং হাউস; বেঙ্গল ফাউনড্রি ওয়ার্কস; এ, বি, ডুইগেনান; ক্যালকাটা নার্সিং হোম; ওমনিবাস সার্ভিস; মডেল

লাইব্রেরী ; রেলওয়েস ভিলিয়ার্স এঞ্জিনিয়ারিং ; রাধারাণী মিল্স্ ; ছোটনাগপুর মাইকা সিণ্ডিকেট ; বিচউড এষ্টেট কোং ; ই, মায়ার এণ্ড কোং।

গত জুন মাসে বঙ্গদেশে ২২টা নূতন যৌথ কারবার স্থাপিত হইয়াছে। উহার সম্মিলিত মূলধন ২২লক্ষ টাকা। উহার ২টা ব্যাঙ্ক, ১১টা ঋণ দানের ব্যবসায়, ১টা যান-বাহন, ১টা এঞ্জিনিয়ারিং কার্য্য, ৫টা চা-চাষ এবং ২টা অন্যান্য।

মোটর, মিউনিসিপ্যালিটি ও স্বাস্থ্য

খুলনা-যশোহর রাস্তা কিছু দিন হইল মামুলি প্রথা মত মেরামত হইয়াছিল। ডিঃ বোর্ড মোটর-চালকদিগের নিকট হইতে কিছু দর্শনী লইয়া তাহাদিগকে মোটর চালাইবার অনুমতি দিয়া দেশের যাহা কিছু সর্ব্বনাশ করিতেছেন তাহার তুলনায় সামান্য টাকা অতি তুচ্ছ। আজ কাল মোটর বাসের জন্য রাস্তায় চলা দায় হইয়াছে। একেত সমস্ত রাস্তায় খোয়া উঠিয়া যাহাদের পায়ে জুতা নাই তাহাদের পা ক্ষত-বিক্ষত করিতেছে। তাতে ধূলায় মানুষের নাক কান বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। আমরা বলি ডিঃ বোর্ড যদি এই লাভ চান তবে তাহার দ্বারা রাস্তায় জল দিবার ব্যবস্থা করুন। নচেৎ লোকের স্বাস্থ্য নষ্ট হইবে। কি মহেন্দ্র ক্ষণে মোটর বাস খুলনার প্রদর্শনীতে আসিয়াছিল তাহা ভগবানই জানেন। বিষয়টির প্রতি ডিঃ বোর্ডের ও ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ("খুলনাবাসী")

বাঙ্গালায় বেশ্যা ভোটার

বেশ্যারা এবার ভোটাররূপে গৃহীত হওয়ায় দেশের আর এক সর্ব্বনাশ হইয়াছে। ক্যানভাসিংয়ের আবরণে বহু ভদ্র-সন্তান আজ বেশ্যালয়ে অবাধে যাতায়াত করিতেছেন। মোটর-যোগে বেশ্যাদের লইয়া স্থানে স্থানে ভদ্রলোকের বৈঠকখানায় গানবাজনা চলিয়াছে—এমন কথাও শুনিতে হইতেছে। মোটের উপর, এই নির্ব্বাচন-কাণ্ডে দেশের নৈতিক স্বাস্থ্য যে একেবারে ভাঙিয়া পড়িতেছে, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেছি। কলিকাতার অতিকায় সহযোগী হইতে মফঃস্বলের ক্ষুদ্র সহযোগী পর্য্যন্ত এই দলাদলিতে অল্পবিস্তর ঢলিয়া পড়িয়াছেন। প্রতিদিন বেঙের ছাতার মত এখানে সেখানে খবরের কাগজ গজাইয়া উঠিতেছে। আর সম্পাদক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্বতঃসিদ্ধ দেশপ্রেমিক নেতা সাজিয়া একপক্ষে না একপক্ষে ফতোয়া জারি করিতেছেন। কলিকতার অগাধ জলের রুই কাৎলা হইতে মফঃস্বলের অল্পজলের চুণো পুঁটি পর্য্যন্ত কোথায় কাহার টোপ গিলিয়া যে ঘাই মারিতেছে—লোকচক্ষে তাহা একরূপ উলঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। ফলে এই নির্ব্বাচন-কলঙ্কে দেশের আবহাওয়া নিতান্তই দূষিত হইয়া উঠিল।

("পল্লীবাসী")

জুয়ার জোয়ার

কুষ্টিয়ার বাজারে তিন মাস হইতে অবাধ জুয়াখেলা চলিতেছে। জুয়াড়ী নাকি স্থানীয় কয়েকটী সাধারণ প্রতিষ্ঠানে কিছু অর্থ-সাহায্য করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সনন্দ পাইয়াছে! কাজটা যদি মন্দ হয় তবে দানের বিনিময়ে তাহা করিতে দেওয়া কখনই যুক্তিযুক্ত নয়। জুয়াখেলায় যাহাতে বহু লোক সমাগম হয় তজ্জন্য জুয়াড়ী বাজারে বহু দালাল নিযুক্ত করিয়াছে। নানা প্রকার প্রলোভন দেখাইয়া তাহারা অজ্ঞ জন-সাধারণকে লুব্ধ করিয়া জুয়া খেলায় ; ফলে সর্ব্বস্ব হারাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বহু লোক চলিয়া যায়। সহরের বুকে এরূপ অভিনয় অনেক দিন চলিতেছে। কিন্তু সকলেই নীরব এবং নির্ব্বাক। এ বিষয়ে আমরা কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ("জাগরণ")

ফরিদপুরে নতুন রেল

পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ে লাইনের রাজবাড়ী ষ্টেশন হইতে কামারখালী হইয়া যশোহর পর্য্যন্ত একটী প্রশস্ত রেলওয়ে লাইন বিস্তারের প্রস্তাব চলিতেছে এবং উক্ত কার্য্যের জন্য শীঘ্রই সার্ভে আরম্ভ হইবে। উক্ত লাইন ফরিদপুর জেলার বানিবহ, বালিয়াকান্দী, ডুমাইন, বগিয়া, জামালপুর এবং কামারখালী গ্রামের এবং যশোহর জেলার মাগুরা, তিলা, রামকৃষ্ণপুর এবং নারিবোন বাড়িয়া গ্রামের মধ্য দিয়া যাইবে। এই লাইন প্রস্তুত হইলে ফরিদপুর

হইতে কলিকাতার দূরত্ব প্রায় ৫০ মাইল কমিয়া যাইবে এবং বালিয়াকান্দি প্রভৃতি গ্রামের লোকের বিশেষ সুবিধা হইবে।

খুলনায় চামড়া পাইট করার ব্যবস্থা

ভারত হইতে প্রতি বৎসর বিদেশে যে কত লক্ষ লক্ষ মণ চামড়া চালান যায় তাহার সীমা-সংখ্যা নাই। এই সব চামড়া বিদেশ হইতে পাইট হইয়া আসে, আর ভারতবাসী তাহাই অধিক মূল্যে খরিদ করিয়া থাকে। এই রীতিই বরাবর চলিয়া আসিতেছিল; এখনও প্রায় তাহাই চলিতেছে। তবে কয়েক বৎসর হইতে এদেশে কয়েকটা "ট্যানারি" অর্থাৎ চামড়া পাইটের কারখানা হইয়াছে এবং সেই সব কারখানায় পাইট করা চামড়া দিয়া বেশ জুতাও তৈয়ারী হইতেছে। কিন্তু এখনও এ দেশের প্রয়োজন মত যথেষ্টসংখ্যক কারখানা হয় নাই। কাজেই চামড়া রপ্তানিও বন্ধ হয় নাই। বঙ্গের শিল্পবিভাগের ডিরেক্টর পল্লীগ্রামে চামড়া পাইট শিক্ষা বিধানের জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন; ইহা আনন্দের কথা। "খুলনাবাসী" বলিতেছেন,—খুলনা জেলার রাড়ুলী গ্রামে চামারদিগকে পাইট করা এবং জুতা তৈয়ারী শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। আমাদের দেশে মুচিকুল নির্ম্মূল হইতেছে, তাহাদের স্থান পশ্চিমা চামার অধিকার করিয়াছে; তাহাদের এইরূপ আধুনিক চামড়া পাইট শিক্ষা দিলে তাহারা বাঁচিয়া যায়।

জলপাইগুড়িতে গৃহ-সমস্যা

ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই সহরের জন-সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। এই হেতু গৃহ-সমস্যা কিরূপ প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। একখানা বাসা ভাড়া করিতে হইলে কাহাকে পনর দিন, কাহাকে একমাস, কাহাকেও বা ২।৩ মাস গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হয়। নূতন বাসা করিবারও স্থানাভাব। মোটের উপরে সহরের সীমানা আরও না বাড়াইলে এখন আর কিছুতেই চলিতেছে'না।

দিনবাজারের উত্তর দিক্ হইতে বেশ্যাদিগকে স্থানান্তরিত করিয়া এদিকে বাজার, ওদিকে রাজগঞ্জের রাস্তা হইতে রাস্তা আনিলে বাজারের উত্তর হইতে জলপাইগুড়ি ইণ্ডাষ্ট্রীজ কোম্পানীর গৃহ পর্য্যন্ত বহু বাসা নির্ম্মিত হইতে পারে। অপর দিকে মেসার্স ল্যাণ্ডেল এণ্ড ক্লার্কের গুদামের উত্তর-পশ্চিম দিক্ দিয়া যে একটা রাস্তা আছে উহাকে রীতিমত রাস্তা করিয়া তেঁতুলিয়া ও রাজগঞ্জ রাস্তার সঙ্গে যোগ করিলে ও উকীলপাড়া রাস্তা হইতে একটা রাস্তা উক্ত রাস্তায় মিশাইলে সেখানেও একটা নূতন পাড়া গড়িয়া উঠিবে। সহর-পঞ্চায়েতের (মিউনিসিপ্যালিটীর) এ বিষয় সত্বর অবহিত হওয়া আবশ্যক। কারণ জলপাইগুড়ি উন্নতিশীল সহর। এখানে একটী মেডিক্যাল স্কুল স্থাপন করা স্থির হইয়াছে এবং শীঘ্রই একটী কলেজ খুলিবার জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। এতদুভয়ের সংস্থাপন হইলে সহরের জন-সংখ্যা যে আরও বহুগুণ বৃদ্ধি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

দেশলাই কারখানা

শ্রীমান কুমুদিনীকান্ত চক্রবর্ত্তীর উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত দেশলাইয়ের কারখানার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। অতি সত্বর দেশলাই বাজারে বাহির হইবে।

দেশলাই বাক্সের বাহিরে ও ভিতরে কাগজাদি লাগাইবার নিমিত্ত লোক আবশ্যক। ইহা ব্যতীত ভদ্র গৃহস্থগণের অতিরিক্ত রোজগারের সাহায্যকল্পে গৃহস্থগণের গৃহে বসিয়া বাক্সের কাগজাদি লাগাইবার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। পারিশ্রমিক বাক্স প্রস্তুতের অনুপাতে দেওয়া হইবে। কর্ম্মেচ্ছুকগণ পুরাতন শিল্পসমিতিতে কারখানা গৃহে শ্রীমান কুমুদিনী অথবা তাঁহার কর্ম্মচারিগণের সহিত দেখা করিবেন। ("ত্রিস্রোতা", জলপাইগুড়ি)

ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের ভবিষ্যৎ কার্য্যক্রম

(১)

আগামী ৩।৪ বছরের জন্য বোর্ড এই সকল কাজে আগে হাত দিবে:—

(১) সেণ্ট্রাল এভিনিউ (বিডন ষ্ট্রীট-শ্যামবাজার),

(২) বড়বাজারে একটি উত্তর-দক্ষিণ শড়ক,

(৩) ৩ ও ৪ নম্বরের এলাইনমেণ্ট (মানিকতলা),

(৪) ষ্ট্রাণ্ড রোডের বিস্তার (জগন্নাথঘাট রোড—হ্যারিসন রোড),

(৫) ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটের বিস্তার (ব্রিজ রোড পর্য্যন্ত) ।

(২)

১৩ বছর আগে প্রথম ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের কাজের একটা খসড়া তৈয়ারী হয়। কথা ছিল ৪২ মাইল নূতন ও বিস্তৃততর শড়ক নির্ম্মিত হইবে। আর অধিকাংশই ৬০ ফুট বা ততোঽধিক চওড়া হইবে। তাতে খরচ পড়িবে ৫½ কোটি টাকা বলিয়া ধরা হইয়াছিল।

কিন্তু কার্য্যকালে দেখা যাইতেছে, গত বছরের শেষে ট্রাষ্ট ৩৭ মাইল সম্পন্ন করিয়াছেন। সবই নয়া শড়ক। খরচ হইয়া গিয়াছে ৬ কোটি টাকারও বেশী। আর অধিকাংশ শড়ক বিস্তারেও দাঁড়াইয়াছে ৪০ ফুট মাত্র।

সুতরাং বুঝা যাইতেছে, মূল খসড়াটা বাতিল করিতে হইবে। আরো অনেক বেশী টাকার প্রয়োজন হইবে।

ট্রাষ্টের কতকগুলি উল্লেখযোগ্য কার্য্য হইতেছে—

(১) রসা রোডের সম্প্রসারণ,

(২) সেণ্ট্রাল এভিনিউর সৃষ্টি,

(৩) উত্তর কলিকাতায় বিশাল পার্কের নির্ম্মাণ,

(৪) পার্ক সার্কাসের উৎঘাটন, ইত্যাদি।

সম্প্রতি ট্রাষ্ট স্থির করিয়াছে যে, শড়কগুলিকে ৮০ ফুট চওড়া করিতে হইবে। কাজে কাজেই ট্রাষ্টের কাজ শেষ হইলে সঙ্কলিত কলিকাতা হইতে বৃহত্তর কলিকাতা গড়িয়া উঠিবে। কিন্তু ইহা সময়-সাপেক্ষ। অনেক টাকার ব্যাপারও বটে।

কারিগরদের ক্ষতি-পূরণ আইন

এই আইন অনুসারে কতকগুলি মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। নিম্নলিখিত মোকদ্দমাটি বাঙ্গালার কারিগরদের ক্ষতিপূরণ কমিশনার শ্রীযুক্ত এম, এইচ, বি লেচব্রিজ সাহেবের নিকট রাইটারস্ বিল্ডিংএ হইয়া গিয়াছে।

দাবীর মোকদ্দমা নং ৩১, ১৯২৬ সন, আমিনা খাতুন বাদী বনাম এ, সি, রায় এণ্ড কোং প্রতিবাদী। বাদীর স্বামী আব্দার রহিম প্রতিবাদীর জাহাজ "আরোন্দা"র কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। সেই হেতু ঐ জাহাজের বোঝা নামাইতে গিয়া নাকি ৪ঠা জুন তার মৃত্যু হয়। হেতু দুর্ঘটনাজনিত আঘাত।

জজ মোকদ্দমা ডিস্মিস্ করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "যে সব লোক মাঝ দরিয়ায় জাহাজ হইতে নৌকায় বোঝা উঠানামা করিতেছে, তাদের কথা বলা এই আইনের উদ্দেশ্য নহে। তারা ইহা হইতে কোন উপকার পাইবে না।"
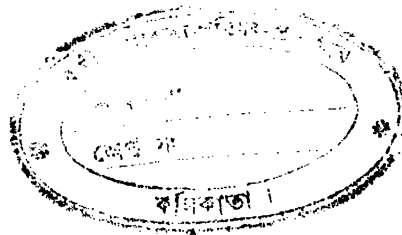
বোম্বাইয়ের ফ্যাক্টরি ১৪৬১

আমাদের দেশে কল কারখানার প্রচলনে বোম্বাই প্রদেশই অগ্রণী। বর্ত্তমানে তথায় ১৪৬০টি ফ্যাক্টরি চলিতেছে। ভারতবর্ষে যত ফ্যাক্টরি আছে, তার এক-চতুর্থাংশই বোম্বাইয়ে। ১৯২৪-২৫ সনের মধ্যে এই প্রদেশে ১১৫টী ফ্যাক্টরি নূতন করিয়া রেজিষ্টারী করা হইয়াছে। কারখানার সঙ্গে সঙ্গে মজুরদলও কিছু কম বৃদ্ধি পায় নাই। তাহাদের সংখ্যা ১বৎসরে প্রায় ১৫,০০০ হাজার বৃদ্ধি পাইয়া বর্ত্তমানে ৩,৭০,৪৬০ দাঁড়াইয়াছে। কারখানারই অনুরূপ। বোম্বাইয়ের মজুর-সংখ্যাও ভারতের প্রায় এক-চতুর্থাংশ।

৭৭,৬২৪ স্ত্রীমজুর

পুরুষের অনুপাতে স্ত্রীমজুরের সংখ্যা বোম্বাই প্রদেশে বাড়িয়াই চলিয়াছে। ১৯২৪ সনে সংখ্যায় ছিল ইহারা মোট ৭২,৬৭৯ জন; মোট মজুর-সংখ্যার শতকরা ২০·৫ মাত্র। পরবর্ত্তী বৎসরে হইয়াছে ৭৭,৬২৪ জন অর্থাৎ শতকরা ২১ জন।

৮৪৬০ বালক মজুর

বালক-মজুরের সংখ্যা ১ বৎসরের মধ্যে ৯,৭৭৯ হইতে ১৯২৫ সনে ৮৪৬০ পর্য্যন্ত কমিয়াছে; যদিও এই প্রকার মজুর-উমেদারের সংখ্যা কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই। সরকারী কর্ম্মচারিগণের চেষ্টা সত্ত্বেও বালক-মজুর নিয়োগে নানা প্রকার দুর্নীতি এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। একই বালক একই দিন একাধিক কারখানায় কাজ করিত। এই কুপ্রথা অনেকটা কমিয়াছে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয় নাই। গ্রাম্য বালকগণের সংগে শুধু খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের উপার্জ্জিত মজুরী আত্মসাৎ করিবার প্রথাও পূর্ব্বে যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। কিন্তু অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে, এই "সাথী" প্রথা খুবই কমিয়া গিয়াছে।

৩১১৫ দুর্ঘটনা

মজুর-জীবনের উন্নতিকল্পে চেষ্টা সত্ত্বেও কারখানার দুর্ঘটনার সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে। ১৯১৭ সনে ৯২২টী হইতে দুর্ঘটনার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯২৫ সনে ৩১১৫ দাঁড়াইয়াছে। আকস্মিক মৃত্যুর সংখ্যা যদিও ১বৎসরে ৮২ হইতে ১৯২৫ সনে ৫০এ নামিয়াছে।

ভারতের আকাশ-পথ

লণ্ডনের ২৮শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ,—সাম্রাজ্য সম্মিলনে আর্ল উইণ্টারটন্ বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন, "ভারতবর্ষ ও সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের মধ্যে বিমান-পথে সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থার যে কত প্রয়োজনীয়তা তাহা বিশেষ ভাবে বলিবার আবশ্যক করে না।

"সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের সমস্ত লোক-সংখ্যা একত্র করিলেও ভারতের লোক-সংখ্যার সমান হয় না। এবং ভারত গ্রেট-বৃটেনের একটি মস্ত গ্রাহক। পৃথিবীর বর্ত্তমান আইনকানুন অনুযায়ী ভারত ও গ্রেট-বৃটেনের মধ্যে একটি সোজাসুজি রেলপথ নির্ম্মাণ সম্ভব নহে। সুতরাং আকাশ-পথই একমাত্র সহজ উপায়। সাম্রাজ্যের অন্যান্য দেশসমূহের মধ্যে আকাশপথে চলাচলের উন্নতিতে ভারত যে প্রধান অংশ গ্রহণ করিবে ইহাতে সন্দেহ নাই।

চীন ও অষ্ট্রেলিয়ার পথে ভারত

"অষ্ট্রেলিয়া কিংবা সুদূর প্রাচ্যের সহিত ইয়োরোপের সঙ্গে আকাশ-পথে চলাচলের ব্যবস্থা করিতে হইলে ভারত অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। ভারতকে কোন ক্রমেই এড়ান যাইবে না। সুতরাং এই দুইটি আকাশ-পথের সঙ্গম স্থল ভারতেই হইবে এবং সাম্রাজ্যের মধ্যে ইহা একটি প্রধান জংসনে পরিণত হইবে।

"ভারতে যে এই প্রথম বিমানপোত চলিবার ব্যবস্থা হইতেছে এমন নহে। রয়েল এয়ার ফোর্সের একটি শক্তিশালী বিমানবিভাগ তথায় রহিয়াছে। কলিকাতায় ও এলাহাবাদে অ-সামরিক কার্য্যের জন্য আকাশযানসমূহ নির্ম্মিত হইত এবং অন্যান্য স্থানে অবতরণ করিবার স্থানসমূহ প্রস্তুত হইয়াছিল। মিশর ও করাচীর মধ্যে বিমানপোত চলিবার নূতন ব্যবস্থা হওয়ায় ভারতের এই প্রস্তাবিত আকাশমার্গের যে সমূহ উন্নতি হইবে ইহা একান্ত সুনিশ্চিত।"

ভারতীয় বায়ু-বিভাগ

এই প্রস্তাব সম্পর্কে ভারতে যে বন্দোবস্ত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে তিনি বলেন, "করাচীতে আকাশযানসমূহ ৬ মাসের মধ্যেই কার্য্যক্ষম হইবে বলিয়া আশা করা যায় এবং সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের আভ্যন্তরীণ আকাশপথেও একটা সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান এয়ার বোর্ড (ভারতীয় বায়ু-বিভাগ) তদন্ত করিয়া সম্প্রতি ভারত সরকারের নিকট একটি প্রয়োজনীয় রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। ঐ বিবরণের মধ্যেই ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এয়ার বোর্ড যে মন্তব্য ও অভিমত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা ভারতে অনেকে সমর্থন করিয়াছেন।"

আকাশপথের জন্য ভারতীয় খরচ

এয়ার বোর্ড ভারতে প্রথমতঃ কলিকাতা ও রেঙ্গুনের মধ্যে বিমানপোত চলার জন্য উপদেশ দিয়াছেন এবং সাময়িকভাবে কলিকাতা, বোম্বাই, রেঙ্গুনে ষ্টেসন করিতে বলিয়াছেন। করাচি ও মিশরের মধ্যে বিমানপোত চলাচল স্থিরীকৃত হইয়া গেলে ভারতের আভ্যন্তরীণ পথসমূহের উন্নতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বেগ পাইতে হইবে না। উহা শুধু সময় সাপেক্ষ। আকাশপথের এই বিরাট আয়োজনের সুবন্দোবস্তের জন্য একজন ডিরেক্টর নিয়োগ করিবার কথা হইয়াছে। ইনি শীঘ্রই ইঁহার পদগ্রহণ করিবেন। এই বিষয়ের জন্য প্রচুর অর্থ আবশ্যক এবং ভারতের রাজস্ব হইতেই ইহার ব্যয় বহন করা হইবে। তবে আর্থিক সচ্ছলতা অনুসারে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা হইবে। তাঁহার একান্ত বিশ্বাস এই যে, এই সম্পর্কে প্রকৃত কার্য্যের জন্য অবশ্যই প্রচুর অর্থ পাওয়া যাইবে।

স্বাধীন রাজ্যে চষা হয় আধাআধি

ভারতীয় স্বাধীনরাজ্যসমূহের সমগ্র ক্ষেত্রের শতকরা প্রায় ১২·৮ অংশ বনভূমি, ১৭·৯ অংশ জমি কৃষিকার্য্যের জন্য প্রাপ্তব্য নহে, ১১·৩ অংশ কৃষি-যোগ্য অনাবাদী (অনুর্ব্বর নহে) জমি, ১০·২ অংশ জমি লাঙ্গল দিয়া ফেলিয়া রাখা হইয়াছে। যে জমিতে ফসল উপ্ত হইয়াছে, তাহার খাঁটি পরিমাণ সমগ্র ক্ষেত্রের শতকরা ৪৭·৮ অংশ। অর্থাৎ আধাআধির কিছু কম চষা হইয়াছে।

জলসেচের ব্যবস্থা

১৯২৩-২৪ সনে জলসিঞ্চিত ক্ষেত্রের মোট পরিমাণ ৮,৫৩৭,০০০ একর। পূর্ব্ব বৎসর ছিল ৮,২৪০,০০০ একর। ইহার মধ্যে ২,৩২৯,০০০ একর জমি গবর্মেণ্টের খাল দ্বারা, ৯,৩৯,০০০ একর বে-সরকারী খাল দ্বারা, ১,৩২৪,০০০ একর পুষ্করিণী দ্বারা, ২,০৩৩,০০০ একর কূপের দ্বারা এবং অবশিষ্ট ১,৯১২,০০০ একর অন্যবিধ উপায়ে জল পায়।

রকমারি ফসল

আলোচ্য বর্ষে যে জমিতে ফসল হইয়াছে তাহার মোটামুটি পরিমাণ ৬৭ মিলিয়ন একর। তন্মধ্যে খাদ্য ফসল শতকরা ৭৫·৩ অংশ। খাদ্য ফসলের মধ্যে ধান্য, যব, ছোলা

অড়হরাদি ৭০·৬ অংশ; মসলা, ইক্ষু, ফল ও তরিতরকারী ৪.৭ অংশ, তিল সর্ষপাদি শস্য ৭·৭, তুলা, পাট প্রভৃতি ১০.৬ এবং পশু-খাদ্য ৪·৩ অংশ। খাদ্য ব্যতীত অন্য ফসল যথা, রং, ট্যানিং দ্রব্য, গাছ গাছড়া, তামাক, চা, কফি, আফিং প্রভৃতি এবং অন্যান্য বিবিধ ফসল মোট পরিমাণের শতকরা ২.১ অংশ অধিকার করিয়াছে।

সিন্ধুপ্রদেশের পয়ঃপ্রণালী

১৯২৪-২৫ সনের সিন্ধুপ্রদেশের পয়ঃপ্রণালী সংক্রান্ত রাজস্ব রিপোর্টে দেখা যায়, পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা সময়টা বেশী অনুকূল গিয়াছে। বন্যা ভালই হইয়াছিল। জুনের মধ্য হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯শে জুলাই তারিখে সিন্ধুনদ ধীরে ধীরে বাড়িয়া কৃত্রিম পয়ঃপ্রণালীর সহিত সমতল হইয়াছিল। মোটের উপর বৃষ্টিপাত বেশী হওয়ায় বৎসরের প্রথমে উপ্ত ফসলের কিছু ক্ষতি হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে জলসিঞ্চিত ক্ষেত্রের পরিমাণ ৩,৩১১,৬৫৪ একর। ১৯২৩-২৪ সন হইতে ইহা শতকরা ৮ ভাগ বেশী। পূর্ব্ব পাঁচ বৎসরের ফল তুলনা করিলে যে অঙ্ক দাঁড়ায় তাহা নিম্নে দেওয়া গেল:—

১৯১৯-২০—৩,১৫৫,০৭১ একর
১৯২০-২১—২,৭৬৩,০৭৫ "
১৯২১-২২—২,৯৩৯,৩৩১ "
১৯২২-২৩—৩,২২৫,৩৯৬ "
১৯২৩-২৪—৩,০৫৯,৫০২ "

আলোচ্য বর্ষে মোটামুটি রাজস্ব উঠিয়াছে ৯৫,০৩,৬৭২৲ টাকা এবং কাজে খরচ হইয়াছে ৬৫,৩৯,০৩০৲ টাকা। খরচ খরচাবাদ রাজস্ব দাঁড়াইয়াছে ২৯,৬৪,৬১২৲ টাকা।

ভারতে চীনাবাদামের চাষ

১৯২৫-২৬ সনে সমগ্র ভারতে ৩৮,৮৬,০০০ একর জমিতে চীনা বাদামের চাষ হইয়াছে। তাহার পূর্ব্ব বৎসর ২৮,৮৫,০০০ একর জমিতে চীনাবাদামের চাষ হইয়াছিল, অর্থাৎ এই বৎসর শতকরা প্রায় ৩৫ ভাগ অধিক স্থানে চীনা বাদামের চাষ হইয়াছে। এই বৎসর যে চীনাবাদাম হইয়াছে তাহার খোসা সহ ওজন প্রায় ১৯,০৮,০০০ টন, পূর্ব্ব বৎসর তাহার ওজন ছিল ১৪,৮৫,০০০ টন।

বোম্বাইয়ে জাপানী ফ্যাক্টরি

ভারতের বস্ত্রশিল্পে এইবার জাপানের পুরা প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইল। এদেশের বিবিধ ব্যবসায়-ক্ষেত্রেই জাপানের প্রতিযোগিতা অনেক দিন হইতেই রহিয়াছে; তবে, সে প্রতিযোগিতা প্রত্যক্ষভাবে ভারতীয়দের সহিত নহে, বিলাতী ব্যবসায়ীদের সহিত। ভারতের বাজারে যেমন বিলাতী কাপড় অবাধে বিক্রয় হয়, তেমনি জাপানী কাপড়ও অবাধে বিক্রয় হইয়া থাকে। দর লইয়া জাপানী কাপড়ের বা জাপানী অন্য পণ্যসমূহের যে প্রতিযোগিতা, তাহাও অনেক পরিমাণে বিলাতী কাপড়ের বা ইয়োরোপের অন্য কোন দেশের শিল্পজাত দ্রব্যের সহিত। নানা রকমের কাপড় হইতে আরম্ভ করিয়া, কাচের জিনিষ, সৌখীন দ্রব্য এবং দিয়াশলাই প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যেই এই প্রতিযোগিতা বিদ্যমান। এই সব জিনিষ জাপানে তৈয়ারী হইয়াই ভারতে চালান আসিয়া থাকে। কিন্তু এবার কাপড়ের ব্যবসায়ে পাকা রকমের প্রতিযোগিতা চালাইবার জন্য এদেশে জাপানীদের কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা হইতেছে। বোম্বাইয়ের এক সংবাদে প্রকাশ,—সেখানকার 'ডায়মণ্ড মিল" নামে এক কাপড়ের কল কিছুকাল পূর্ব্বে এক জাপানী ব্যবসায়ী কোম্পানীর নিকট বিক্রীত হইয়াছিল; সম্প্রতি 'তোরোপোদার মিল' নামে ইহা চালাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। জাপানীদের তত্ত্বাবধানেই এই কল পরিচালিত হইবে। এই কলের নূতন মালিক জাপানী কোম্পানী কলটিকে আধুনিক ভাবে সংস্কার করাইয়া এদেশে পুরা দস্তুর ব্যবসায় চালাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। এদেশে এদেশী মালিকদের মূলধনে প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত কাপড়ের কলের সংখ্যা কম নহে; তবে, ইয়োরোপীয় মালিকদের মূলধনে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত কলও অনেক আছে। তাহার উপর এইবার জাপানী কলও চলিল।

সোভিয়েট রুশিয়ার ব্যাঙ্ক

রুশিয়ার বোল্‌শেভিকরা যে সব ব্যাঙ্ক চালাইতেছে তাহাতে কোনো বে-সরকারী লেনাদেনা একপ্রকার চলেই না। সরকারী কারবারই এই সকল ব্যাঙ্কের প্রধান এবং প্রায় একমাত্র ব্যবসা-ক্ষেত্র। ব্যাঙ্কগুলাকে সরকারী প্রতিষ্ঠান বলিলেই হয়। দেশের ভিতর টাকা-কড়ির চলাচল সম্বন্ধে সোভিয়েট গবর্মেন্ট একমাত্র কর্ত্তা।

ইতালিতে মুদ্রা-সংস্কার

ইতালির শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি-সম্পদ্, রেল, জাহাজ, মজুর-জীবন, বাজারদর ইত্যাদি সবই মুসোলিনির আমলে দিন দিন উন্নতিলাভ করিয়াছে। টাকার বাজারে মুসোলিনি আজ পর্য্যন্ত একটা কাজের মতন কাজ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু ১৯২৬ সনের ৩১ আগষ্ট তারিখে মুসোলিনি-রাজ এই মহলেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ করিয়াছে। তাহার ফলে ইতালি মুদ্রা-সংস্কারের পথে অনেকদূর অগ্রসর হইতে পারিবে।

নোট, ব্যাঙ্ক এবং রাজস্ব

কাগজের টাকার (নোটের) পরিমাণ কমানো,—এই হইতেছে মুসোলিনির নবীনতম কীর্ত্তি। মুদ্রা-সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্ক-সংস্কার এবং রাজস্ব-সংস্কারও কিছু কিছু সাধিত হইয়া গেল। ভারতে আজকাল আমরা কারেন্সী কমিশনের আবহাওয়ায় বসবাস করিতেছি। নোট, ব্যাঙ্ক আর খাজনা এই তিন দিকে ইতালিয়ানরা কি কি করিয়া বসিল তাহা আমাদের পক্ষে চিত্তাকর্ষক এবং শিক্ষাপ্রদ হইবে সন্দেহ নাই।

মর্গ্যানের নিকট ইতালির কর্জ্জ ৯ কোটি ডলার

১৯২৫ সনের নবেম্বর মাসে ইতালিয়ান গবর্মেণ্ট নিউ-ইয়র্কের মর্গ্যান ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ৯ কোটি ডলার (প্রায় ২৮ ক্রোর টাকা) কর্জ্জ লইয়াছিল। ১৯২৬ সনের সেপ্টেম্বর মাসে এই টাকার সমস্তটাই গবর্মেণ্ট "বাঙ্কা দিতালিয়া" নামক সরকারী নোট-ব্যাঙ্কের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছে।

এই "সোনার" টাকা পাইবামাত্র "বাঙ্কা দিতালিয়া" ২,৫০০,০০০,০০০ লিয়ারের কাগজী মুদ্রা বাজার হইতে তুলিয়া লইয়াছে। বুঝিতে হইবে যে, ৯ কোটি ডলারের (বা ২৮ ক্রোর টাকার) বর্ত্তমান দর ২৫০ কোটি কাগজের লিয়ার। ইতালিয়ান গবর্মেণ্টের নানা খরচের জন্য বাঙ্কা দিতালিয়া ১৯২৬ সনের ৩১ জুলাই পর্য্যন্ত ৬,৭২৯,৫০০,০০০ (৬৭২ কোটি ৯৫ লাখ) কাগজের লিয়ার ছাপিয়া বাজারে চালাইয়াছিল। ইহার ভিতর হইতে ২৫০ কোটি কাগজের লিয়ার তুলিয়া লওয়া হইল। কাজেই গবর্মেণ্টের নামে এখনো ৪,২২৯,৫০০,০০০ (৪২২ কোটি ৫ লাখ) কাগজের লিয়ার কর্জ্জ লেখা থাকিল।

বাঙ্কা দিতালিয়ার সিন্দুকে ৪৫॥০ কোটি নূতন সোনার লিয়ার

অপর দিকে "বাঙ্কা দিতালিয়া"র আর্থিক অবস্থাও উন্নত হইল। অল্পমাত্র সোনার তাল বা সোনার টাকা সিন্দুকের ভিতর রাখিয়াই এই ব্যাঙ্ক এযাবৎ পাঁচ সাত শ'

কোটি কাগজের লিয়ার বাজারে ছাড়িতেছিল। এক্ষণে ৯ কোটি ডলার তাহার সোনার পুঁজিতে আসিয়া জুটিল। প্রাক-যুদ্ধ সোনার লিয়ারের দরে এই ৯ কোটি ডলারের দাম ৪৫৫,০০০,০০০ লিয়ার। দেখা যাইতেছে যে, আজকালকার কাগজের লিয়ারে যে টাকার দাম ২৫০ কোটি লিয়ার, সেই টাকার আসল দাম সোনায় ৪৫½ কোটি লিয়ার মাত্র। যাহা হউক এই ৪৫½ কোটি সোনার লিয়ার "বাঙ্কা"র সিন্দুকে নতুন মজুদ হইয়াছে। ফলে "বাঙ্কা"র তাঁবে এখন ২,৪০০,০০০,০০০ (২৪০ কোটি) সোনার লিয়ার থাকিল। আমেরিকার নিকট হইতে কর্জ্জ লইয়া ইতালিয়ান গবর্মেণ্ট সরকারী নোট-প্রতিষ্ঠানের কোমর খুব শক্ত করিয়া দিয়াছে।

ফী বৎসর ৫০ কোটি কাগজের লিয়ার কর্জ্জ শোধ

এই গেল কাগজের নোট সম্বন্ধে সংস্কার। ইতালিয়ান গবর্মেণ্ট নিজ খরচপত্র সম্বন্ধেও একটা বড় সংস্কার চালাইয়াছে। প্রতি বৎসর অন্ততঃ পক্ষে ৫০ কোটি কাগজের লিয়ার পরিমাণ কর্জ্জ শুধিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। "বাঙ্কা দিতালিয়া" সরকারী খাজাঞ্চীখানা হইতে ফী বৎসর এই পরিমাণ টাকা পাইতে থাকিবে। তাহা হইলে "বাঙ্কা" প্রতি বৎসরই বাজার হইতে এই পরিমাণ কাগজের টাকা তুলিয়া লইতে পারিবে। আট বৎসর ধরিয়া গবর্মেণ্ট কর্জ্জ শুধিবে। কাজেই আট বৎসরের শেষে সরকারী কর্জ্জ হিসাবে "বাঙ্কা"র ঘরে আর কোনো কাগজের লিয়ার থাকিবে না। বলা বাহুল্য, ইহার দ্বারাও ইতালিতে নোট-সংস্কার সাধিত হইতে চলিল।

২৫ লিয়ারওয়ালা কাগজের নোট নাকচ

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ইতালিয়ান গবর্মেণ্ট নিজেই নানা সময়ে অনেক নোট ছাড়িয়াছে। ১৯২৬ সনের ৩১ জুলাই পর্য্যন্ত তাহার পরিমাণ ছিল ২,১০০,০০০,০০০ কাগজের লিয়ার। তাহার ভিতর ২৫ লিয়ারওয়ালা নোট ছিল ৪০০,০০০,০০০ লিয়ার। বিগত অক্টোবর মাসে গবর্মেণ্ট এইগুলা সবই তুলিয়া লইয়াছে। ২৫ লিয়ার-ওয়ালা নোটগুলা নাকচ। এই পরিমাণ কাগজের লিয়ারের পরিবর্ত্তে কোনো প্রকার মুদ্রা বাজারে ছাড়া হয় নাই। গুনতিতে মুদ্রার সংখ্যা কমানো হইল। "ডিফ্লেশ্যন" বা মুদ্রার পরিমাণ-হ্রাস সম্বন্ধে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা সোজা কর্ম্ম-প্রণালী।

কাগজী মুদ্রার ঠাঁইয়ে ৫ ও ১০ লিয়ারের রূপার টাকা

অবশিষ্ট ১,৭০০,০০০,০০০ কাগজের লিয়ারও বাজার হইতে টানিয়া লওয়া হইয়াছে। তবে এই সমুদয়ের পরিবর্ত্তে অন্যান্য মুদ্রা বাজারে ছাড়া হইয়াছে। এইগুলা সবই ছিল ৫ লিয়ার এবং ১০ লিয়ারওয়ালা নোট। ১৯২৬ সনের অক্টোবর মাস হইতে এই পরিমাণ কাগজের টাকার পরিবর্ত্তে ইতালিতে রূপার মুদ্রা চলিতেছে ৫ এবং ১০ লিয়ারের মাপে।

বাণিজ্য-নোটের উপর কড়া নজর

যত উপায়ে সম্ভব কাগজের মুদ্রা কমানো হইয়াছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য কাগজের মুদ্রা চলে আজকাল সকল দেশেই। ইতালিতেও চলিতেছিল প্রচুর। তবে "ইন্‌ফ্লেশ্যন" বা মুদ্রার পরিমাণ-বৃদ্ধির যুগে ব্যাঙ্কগুলা অনেক সময়েই বেহুঁস ভাবে ব্যবসায়ীদিগকে কাগজের নোট ছাপিয়া টাকা দিয়াছে। এই রীতির উপর কড়াক্কড় নজর দেওয়া হইল। এই জন্য একটা স্বতন্ত্র আইনই জারি হইয়াছে।

ফেলমারা ব্যাঙ্কের পঙ্কোদ্ধারে সরকারী গচ্চা ৫০ কোটি লিয়ার

"বাঙ্কা ইতালিয়ানা দি স্কন্ত" এবং "বাঙ্ক দি রোমা" নামক দুইটা ব্যাঙ্ক ফেল মারিয়াছিল। ইতালিয়ান গবর্মেণ্ট এই দুই প্রতিষ্ঠানের "পঙ্কোদ্ধার" করিবার ঝুঁকি লয়। এই ঝুঁকি সামলাইতে গিয়া গচ্চা লাগিয়াছে অনেক। এখনো তাহার শেষ নিষ্পত্তি হয় নাই। সম্প্রতি যে মুদ্রা-সংস্কার সাধিত হইল তাহাতে ব্যাঙ্ক দুইটার শেষ নিষ্পত্তি করিবার ভার "বাঙ্কা দিতালিয়া" নামক সরকারী নোট-ব্যাঙ্কের হাতে দেওয়া হইল। তবে লোকসানের ঝুঁকি আর এই "বাঙ্কা"কে

বহিতে হইবে না। নানা স্থানে ব্যাঙ্ক দুইটার যে সকল পাওনা আছে সেইগুলা উসুল করাই থাকিবে "বাঙ্কা"র কাজ। "পঙ্কোদ্ধারের" কাজ হইতে বিদায় লইবার সময় গবর্মেণ্ট নগদ ৫০০,০০০,০০০ কাগজের লিয়ার দিয়া ব্যাঙ্ক দুইটার দেনা শুধিয়াছে। তাহার ফলে এই পরিমাণ কাগজের নোট বাজার হইতে উঠিয়া আসিয়াছে।

অন্যান্য ব্যাঙ্কের উপর সরকারী "বাঙ্কা"র একতিয়ার

ব্যাঙ্কের কর্জ্জ লওয়া-দেওয়া সম্বন্ধে একটা আইন জারি হইয়াছে। ইতালির রাজস্ব-সচিব সকল প্রকার কর্জ্জ-প্রতিষ্ঠানের কর্ম্ম-প্রণালীর উপর শাসন কায়েম করিয়াছেন। এই শাসনের ভার পড়িল প্রধানতঃ সরকারী নোট-ব্যাঙ্ক "বাঙ্কা দিতালিয়া"র উপর। জনসাধারণের নিকট হইতে টাকা জমা লওয়া সম্বন্ধেও ব্যাঙ্কগুলাকে অনেকটা শাসনের অধীনে থাকিতে হইবে। কোথায়ও নতুন ব্যাঙ্ক কায়েম করিতে হইলে অথবা এমন কি কোনো পুরাণা ব্যাঙ্কের নতুন শাখা কায়েম করিতে হইলেও সরকারী মঞ্জুরি দরকার হইবে। এই বিষয়ে তিন স্বতন্ত্র সরকারী বিভাগের একতিয়ার কায়েম হইয়াছে। "বাঙ্কা দিতালিয়া" ত আছেই। তাহার উপর আছে গবর্মেণ্টের রাজস্ব-বিভাগ। অধিকন্তু "মিনিস্তের দেল্‌লেকনমিয়া নাৎস্যনালে" নামক আর্থিক ব্যবস্থার সচিব (বা আর্থিক উন্নতির সরকারী দপ্তর) ব্যাঙ্ক-শাসনে হাত পাইল। ইচ্ছা করিলে এই তিন দপ্তর নতুন ব্যাঙ্ক-সৃষ্টি অথবা নতুন শাখা-সৃষ্টি বন্ধ করিয়া দিতে পারে।

ব্যাঙ্কে রিজার্ভ ও পুঁজির অনুপাত

জনসাধারণের নিকট হইতে টাকা জমা লওয়া যে সকল কর্জ্জ-প্রতিষ্ঠানের কারবার তাহাদিগকে ফী বৎসর লভ্যাংশের অন্ততঃ পক্ষে দশভাগের এক ভাগ "রিজার্ভ" ভাণ্ডারে মজুত রাখিতে বাধ্য করা হইয়াছে। এই ভাণ্ডারের পরিমাণ মূলধনের শতকরা ৪০ অংশ না হওয়া পর্য্যন্ত ইতালিয়ান আইন ব্যাঙ্কগুলাকে রেহাই দিবে না। "বাঙ্কা দিতালিয়া" সকল ব্যাঙ্কের "রিজার্ভ" এবং পুঁজির অনুপাত পরীক্ষা করিয়া বেড়াইতে অধিকারী। এই সূত্রে প্রত্যেক ব্যাঙ্কের নানাপ্রকার কারবার এবং লেনা-দেনাও "বাঙ্কা"র নজরে পড়িতেছে।

ইতালিয়ান আইনে পুঁজি ও আমানতের অনুপাত

"বাঙ্কা"র নিকট প্রত্যেক ব্যাঙ্কের মাসিক ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক হিসাবপত্র আসিবে। এইখানেই পরীক্ষা ও তদবিরের কাজ খতম নয়। কত টাকা পুঁজি থাকিলে কোন্ ব্যাঙ্ক জনসাধারণের নিকট হইতে কত টাকা আমানত লইতে অধিকারী তাহাও শাসনের অধীন। রাজস্ব-দপ্তর এবং আর্থিক উন্নতির দপ্তর পুঁজির সঙ্গে আমানতের অনুপাত কষিয়া স্থির করিতে অধিকারী। যে সকল ব্যাঙ্ক ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য কাগজের টাকা ছাড়াছাড়ি কম, সেই সমুদয় প্রতিষ্ঠানকেও মাঝে মাঝে এই সকল নিয়ম কানুনের বশবর্ত্তী করা সম্ভব হইয়াছে।

"বাঙ্কা"র অন্যান্য একতিয়ার

"বাঙ্কা দিতালিয়া" দেশের টাকাকড়ির পরিমাণ-শাসন সম্বন্ধে অন্যান্য একতিয়ারও পাইয়াছে। দেশী-বিদেশী যত প্রকার কাগজের টাকা গবর্মেণ্টের হাতে আসিয়া পৌছে সবই "বাঙ্কা"র তদবিরে রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। "বাঙ্কা"টা এতদিনে ইতালির যথার্থ নোট-কেন্দ্রে পরিণত হইল। খাঁটি কেন্দ্র-ব্যাঙ্কও এখন হইতে "বাঙ্কা"র প্রকৃতি হইবে।

ইতালিতে কর-রেহাইয়ের ধুম

রাজস্ব-সংস্কারের কাণ্ডটাও খুব বড়। লড়াইয়ের যুগে আর লড়াইয়ের পরে অন্যান্য দেশের মতন ইতালিতেও নানা প্রকার কর বসানো হইয়াছিল। এইগুলার কোনো কোনোটা একদম তুলিয়া দেওয়া হইল। কোনো কোনো-টার হার কথঞ্চিৎ কমাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা হইল। মোটের উপর জনসাধারণ কর-রেহাইয়ের ধুমে আনন্দিত।

বাইসাইকেলের উপর কর

বাইসাইকেলের উপর কর উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। দেশের লোকের ভিতর এই গাড়ী যাহাতে সুপ্রচলিত হয় এই উদ্দেশ্য নজরে রাখিয়া ইতালিয়ান গবর্মেণ্ট কর উঠাইয়া

দিল। কিন্তু মোটর-চালিত পা-গাড়ীর উপর কর "যথা পূর্ব্বং তথা পরং"ই থাকিল।

স্নান-কর

ইতালির কোনো কোনো স্বাস্থ্যকর জনপদে প্রাকৃতিক ধাতুমিশ্রিত জলের ঝরণা বা ফোয়ারা আছে। কোথাও কোথাও গরম জলের ঝরণাও আছে। নানাপ্রকার রোগ সারিবার পক্ষে এই সব জলে স্নান করা বিশেষ কার্য্যকর। যথাস্থানে স্নানাগার কায়েমও হইয়াছে। কয়েক বৎসর ধরিয়া এই সকল স্নানাগার-বিশিষ্ট স্বাস্থ্য-নিকেতনে স্নানার্থীদের নিকট হইতে কিছু কিছু কর আদায় করা হইত। এই স্নান-কর বা স্বাস্থ্য-কর বর্ত্তমান রাজস্ব-সংস্কারে উঠিয়া গেল। বাইসাইকেলের করের মতন এই করটাও লোকজনের অপ্রিয় ছিল, বলাই বাহুল্য।

দানলাভের উপর কর

অন্যান্য দেশের মতন ইতালিতেও শিক্ষা-বিষয়ক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা অন্যান্য সার্ব্বজনিক সভাসমিতি জনগণের নিকট হইতে চাঁদা পাইয়া নিজ নিজ কাজ চালায়। এই সকল দান-খয়রাত-প্রাপ্তির উপর একটা কর ছিল। উইলের ফলে কিছু পাওনা ঘটিলেও সভাসমিতি গবর্মেণ্টকে কর দিতে বাধ্য থাকিত। এই করটা আর দিতে হইবে না। ইহাতে সার্ব্বজনিক দেশসেবা এবং উৎকর্ষ-সাধনের প্রচেষ্টার বাধাটা উঠিয়া গেল।

খানাপিনার উপর কর

হোটেলে, রেষ্টরাণ্টে, কাফেতে দু'এক পয়সার খানা খাইতে হইলেও "অতিথি"রা সরকারকে একটা কর দিতে বাধ্য হইত। হোটেল-সরাইওয়ালারাই নিজ নিজ বিলের সঙ্গে এই করের পয়সা আদায় করিয়া লইত। কোনো বাড়ীওয়ালীর বাড়ীতে কাহাকেও ঘর ভাড়া করিয়া থাকিতে হইলে গবর্মেণ্টকে কিঞ্চিৎ-কিছু না দিয়া তাহার উপায়ান্তর ছিল না। রাজস্ব-সংস্কারকেরা এই করটাও রেহাই দিলেন।

দৌড়-কর

ঘোড়-দৌড়, সাইকেল-দৌড়, অটোমোবিল-দৌড় ইত্যাদি খেলা-ধূলায় যাহারা যোগ দিত বা যাহারা উহা দেখিতে শুনিতে যাইত তাহাদের নিকট হইতে গবর্মেণ্টের একটা আদায় ছিল। তাহাও এই রেহাইয়ের হিড়িকে উঠিয়া গেল।

কর-রেহাইয়ের অন্যান্য আট দফা

কর সম্বন্ধে অন্যান্য রেহাইয়ের আকার-প্রকারও যার পর নাই লোক-প্রিয়। (১) জমিজমার খাজনা "অতি-বৃদ্ধির" পূর্ব্বে যেরূপ ছিল এখন হইতে আবার সেইরূপ হইবে। অর্থাৎ লড়াইয়ের যুগের চড়া হার কমিয়া আসিল। (২) কার-খানা, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সম্পর্কিত কারবারের লাভের উপর কর বসাইবার সময় এক হাজার লিয়ার পর্য্যন্ত রেহাই দেওয়া হইবে। ১৯২৭-২৮ সনে এই নিয়ম খাটিবে। ১৯২৮ সন হইতে দুই হাজার লিয়ার পর্য্যন্ত লভ্যাংশের উপর কোনো কর বসানো হইবে না। (৩) "দৈব"-বীমার জন্য যে সকল সমবায়-নিয়ন্ত্রিত সমিতি আছে, তাহাদের লাভের উপর যে কর ছিল, তাহা উঠিয়া গেল। (৪) গবর্মেণ্ট, মিউনিসি-প্যালিটি ইত্যাদি সরকারী, নিম-সরকারী ধনভাণ্ডার হইতে যে সকল সাহায্য, চাঁদা বা দান আসে, তাহার উপর কোনো কর উসুল করা হইবে না। (৫) সরকারী, নিম-সরকারী, বে-সরকারী সকল প্রকার অটোমোবিল-কোম্পানীর নিকট হইতে যে হারে কর লওয়া হইত তাহা কমাইয়া দেওয়া হইল। এখনকার হার শতকরা ৪৲। (৬) প্রাদেশিক, নাগরিক বা অন্য কোনো সার্ব্বজনিক ব্যবসা-কোম্পানীর কর্জ্জ কিনিয়া জনসাধারণ তাহার উপর যে সুদ পায় সেই সুদের উপর কোনো কর বসানো হইবে না। যেটা ছিল তাহা উঠিয়া গেল। ভূমি-ব্যাঙ্কের ঋণ-পত্র হইতে পাওয়া সুদের বেলায়ও এই রেহাইয়ের নিয়ম খাটিবে। (৭) ব্যবসা-সঙ্ঘ এবং কৃষি-বিভাগের পর্য্যটক কর্ম্মচারীদের উপর যে কর ছিল তাহার হার কমিয়া আসিল। (৮) বন্ধক রাখিবার সময় যে ষ্ট্যাম্প খরচ লাগিত তাহা আর লাগিবে না। কৃষি-ব্যাঙ্ক, ভূমি-ব্যাঙ্ক, সেভিংস্ ব্যাঙ্ক, "সমাজ-বীমা"-বিষয়ক

সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য বীমা-বিষয়ক সরকারী প্রতিষ্ঠান এই চার ধন-কেন্দ্র হইতে বন্ধক রাখিয়া টাকাকড়ি লইবার সময়ই এই রেহাইয়ের নিয়ম খাটিবে।

দুনিয়ার মোটর গাড়ী ২ কোটি ৪৫ লাখ

১৯২৬ সনের ১লা জানুয়ারীর হিসাবে দেখা যায়, গোটা দুনিয়ায় ২৪,৫৮৯,২৪৯ খানি মোটর গাড়ী চলিতেছে অর্থাৎ গড়ে ৭১ জন লোকের একখানি করিয়া গাড়ী আছে। ইহার মধ্যে ২০,৮৩৭,১৪৬ খানি যাত্রী গাড়ী ১৭২,৬১৭ খানি বাস এবং ৩,৪৬৩,৮৬৬ খানি মাল-গাড়ী আছে। ইহার উপর আবার ১,৪৩৫,১৪৭ খানি মোটর সাইকেল দুনিয়ার পথে ঘাটে চলা-ফেরা করিতেছে।

মোটর-মাপে উঁচু নীচু দেশ

যুক্তরাষ্ট্রে দুনিয়ার আর সকল দেশের চেয়ে বেশী মোটর গাড়ী আছে। অধিকন্তু অন্যান্য দেশের অপেক্ষা এখানকার মোটর-মালিকের হারও বেশী। এ দেশের প্রত্যেক ছয় জনের একখানি করিয়া মোটর। ইহার পরেই আমেরিকার অধীন হাওয়াই দ্বীপের স্থান নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এখানে প্রত্যেক এগার জনের একখানা করিয়া মোটর। কানাডার স্থান তৃতীয়। কানাডার প্রত্যেক ১৩ জনের একখানি করিয়া গাড়ী আছে। তার পরেই নিউজীল্যাণ্ডের স্থান। এখানে ১৪ জন অধিবাসী পিছু একখানা। তারপর দেখিতে পাই অষ্ট্রেলিয়াকে। এখানকার ২০ জন পিছু একখানা। ষষ্ঠ স্থানে ডেন্‌মার্ক। এখানে ৫১ জন পিছু একখানা। প্রত্যেক ৫৩ জন ফরাসীর একখানা করিয়া মোটর আছে। আফগানিস্থান একেবারে "লাষ্ট বয়"। এগার লক্ষ আফগানের মাত্র একখানা করিয়া মোটর গাড়ী আছে। চীনের ৪৩৬,০০০,০০০ লোকের মধ্যে প্রত্যেক ৩১,৮৭১ জনের একখানি করিয়া মোটর।

দেশহিসাবে মোটর-সংখ্যা

দেশের নাম	মোটরের সংখ্যা	প্রত্যেক মোটর পিছু লোক-সংখ্যা
যুক্তরাষ্ট্র	১৯,৯৫৪,৩৪৭	৬
ইংলণ্ড	৮১৫,৯৫৭	৫৫
ফ্রান্স	৭৩৫,০০০	৫৩
জার্ম্মাণি	৩২৩,০০০	১৯৩
ইতালি	১১৪,৭০০	৩৪৬
জাপান	৩২,৬৯৮	১৮০৯
রুশিয়া	১৮,৫৮০	৭৫০২
বৃটিশ উপনিবেশসমূহ,—		
কানাডা	৭১৫,৯৬২	১৩
অষ্ট্রেলিয়া	২৯১,২১২	২০
নিউজীল্যাণ্ড	৯৯,৪৪৩	১৪
দক্ষিণ আফ্রিকা	৬৯,৩৫০	১০৫

মোটর-মাপে রুশিয়া ও ভারত

বৃটিশ ভারতে মোটর-সংখ্যা দিন দিনই বাড়িতেছে। আজকাল আছে ৬৯,১২৭। লোক-সংখ্যা যখন ২৪,৭০,০০,০০০ তখন ৩,৫৭৩ জন প্রতি এক এক খানা দেখা যাইতেছে। রুশিয়ার চেয়ে ভারত এই হিসাবে অনেক উঁচু ধাপে অবস্থিত; কেননা রুশিয়ায় ফী ৭,৫০২ জনের একখানা মাত্র মোটর। আর গোটা রুশিয়ার মোটর-সংখ্যাও খুব কম, ১৮,৫০০ খানা। অর্থাৎ কি মোটর-সংখ্যায় কি জনপ্রতি গড়পড়তায় ভারতসন্তান রুশ নরনারীর চেয়ে বেশী "আধুনিক"।

জাপানী মাপে মোটর-ভারত

মোটরের সংখ্যা হিসাবে ভারতবর্ষ জাপানের চেয়েও বড়। জাপানে মাত্র ৩২,৬৯৮ খানা মোটর। দুনিয়ার অন্যান্য ক্ষুদ্রাকৃতি সভ্য দেশের তুলনায় জাপান এই হিসাবে নেহাৎ নগণ্য। কেননা ইতালিতে মোটর-সংখ্যা ১১৪,৭০০। এমন কি, দক্ষিণ আফ্রিকায়ও ৬৯,৩৫০টা মোটর চলে। ভারত আর দক্ষিণ আফ্রিকা এক ধাপেই রহিয়াছে।

তবে জাপানের সঙ্গে ভারতের তুলনায় আর একটা কথা লক্ষ করিতে হইবে। জাপানে ফী ১,৮০৯ জনের এক এক-

খানা করিয়া মোটর আর ভারতে এক একখানা মোটরের "মালিক" ৩,৫৭৩। কাজেই শেষ পর্য্যন্ত ভারত জাপানকে হটাইতে পারে না। কিন্তু ভারতবর্ষ যে দুনিয়ার সুপ্রসিদ্ধ "মহাজন"-সেবিত মোটর-পথে বেশ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

৭৪ জন মার্কিণের "আয়" ৩০ লাখ টাকা

মার্কিণ সরকারের খাজাঞ্চিখানার (ট্রেজারি ডিপার্টমেণ্টের) কর্ত্তা জোসেফ, এস, ম্যাকয় বলেন "আমেরিকান ব্যাঙ্কার্স অ্যাসোসিয়েশ্যন জার্ণালে" প্রকাশিত আভ্যন্তরীণ কর-আদায়ের হিসাবে দেখা যায়, ১৯২৪ সনে ৭৪ জন আমেরিকাবাসীর আয় ছিল ১০ লক্ষ ডলারের উপর অর্থাৎ আমাদের দেশের টাকায় ৩০ লক্ষের উপর।

সঙ্ঘ-ব্যবসা বনাম ব্যক্তিগত ব্যবসা

এই ৭৪ জন ইঁহাদের সমগ্র বার্ষিক আয়ের অর্দ্ধেক বিরাট বিরাট কর্পোরেশ্যন বা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান হইতে পান। শতকরা এক ভাগেরও কম ব্যক্তিগত ব্যবসা হইতে আসে এবং মাত্র শতকরা ৬ ভাগ কোম্পানীর পার্টনার বা ভাগী রূপে পান। ইহার দ্বারা প্রমাণ হয় যে, আমেরিকায় ব্যক্তিগত ছোট-খাট ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান উঠিয়া গিয়া বড় বড় কর্পোরেশ্যন বা যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে।

১১,০০০এর "সম্পত্তি" ৩০ লাখ টাকা

১৯১৪ সনে মার্কিণ দেশে ৪,৫০০ মিলিয়নেয়ার ছিলেন। ১৯১৫ সনে এই সংখ্যা হয় ৬,৬০০। ১৯১৬ সনে বৃদ্ধি পাইয়া ১০,৯০০ দাঁড়ায়। ১৯১৭ সনে ঐ সংখ্যা ছিল ১১,৮০০। এই দুই বৎসরে এরূপ অসম্ভব রকম মার্কিণ ধনকুবেরের সংখ্যা-বৃদ্ধি হওয়ার একমাত্র কারণ এই যে, বিগত মহাযুদ্ধের সময় আমেরিকা খুব একচোট লাভ করিয়া লইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে আমেরিকার ১১ হাজার মিলিয়নেয়ার আছেন। ইঁহাদের প্রত্যেকের সম্পত্তি অন্যূন ১ মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ৩০ লক্ষ টাকার উপর।

কয়েকজন মার্কিণ বিলিয়নেয়ারের সম্পত্তি

তিনজন মার্কিণের সমগ্র ষ্টক ও বণ্ড (জমা এবং ঋণ-পত্র) ধরিয়া ৮০০,০০০,০০০ ডলার দাঁড়ায় এবং ইহা হইতে সুদ ও লভ্যাংশ বাবদ তাঁহারা বাৎসরিক ৩৪,৫০০,০০০ ডলার পান। ইহার সঙ্গে যদি ইঁহাদের যাবতীয় ধনদৌলত মায় আসবাবপত্র বহু মূল্য হীরা জহরত প্রভৃতি ধনরাজি একত্র করা হয়, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, ইঁহাদের ধনসম্পদের মূল্য ২০০০,০০০,০০০ ডলার ছাড়াইয়া যায় অর্থাৎ আমাদের দেশের টাকায় ইঁহাদের ধনদৌলতের মূল্য ছয় শত কোটি টাকার উপর।

ম্যাকয় বলেন, রকাফেলার, ফোর্ড, জর্জ্জ এফ, বেকার, সেক্রেটারী মেলন ইঁহাদের প্রত্যেককে এই বিলিয়নেয়ারদের শ্রেণীতে ধরা যাইতে পারে।

সোভিয়েট-বৃটিশ আর্থিক সম্বন্ধ

পররাষ্ট্র সচিব স্যার অষ্টীন চেম্বারলেন বলেন যে, বৃটিশের নিকট রুশিয়ার যে সমস্ত সরকারী ও বে-সরকারী ঋণ আছে, তাহা পরিশোধ করা সম্পর্কে কোনো সন্তোষজনক সিদ্ধান্ত হয় নাই।

কতকগুলি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, সোভিয়েট-দিগের নিকট হইতে তিনি এরূপ অভিমত পাইয়াছেন যে, রুশিয়া ও বৃটিশের মধ্যে যাহাতে অধিকতর প্রীতিকর সম্পর্ক স্থাপিত হয়, সোভিয়েটগণ সেরূপ আন্দোলন করিতে সম্মত আছেন। চেম্বারলেন বলেন যে, এরূপ আন্দোলন সফল হইতে পারে বলিয়া তাঁহার ধারণা ও আশা আছে।

বাস্তবিক রুশিয়ার সঙ্গে যদি কোনো বাণিজ্য-সন্ধি স্থির হয় তবে তাহার সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান সর্ত্ত হইবে এই যে, রুশিয়ার সীমানার বাহিরে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সরকারী ভাবে প্রচার-কার্য্য বন্ধ করিতে হইবে।

কৃত্রিম দুধ

কৃত্রিম রং ছিল সেকালের এক বড় আবিষ্কার। একালে কৃত্রিম রেশম দেখা দিয়াছে। কৃত্রিম ঘীও ভারতে জয়জয়-

কার চালাইতেছে। ইয়োরামেরিকায় ইহার রেওয়াজ অনেক দিন ধরিয়াই আছে। কৃত্রিম পাটের কথাও শুনা যায়। এখন শুনিতেছি ডেনমার্কে একটী নকল দুগ্ধের কারখানা হইয়াছে। শাকসব্জীর চর্ব্বিদ্বারা দুগ্ধ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে উপযুক্তরূপ ভাইটামিন মিশাইয়া ঠিক খাঁটি দুগ্ধের ন্যায় করা হইতেছে। শীঘ্রই ভারতের বাজারে এই দুগ্ধের আমদানি হইবে।

মিশরে তুলার আবাদ

বঙ্গদেশে যেরূপ প্রচুর পরিমাণে পাট উৎপন্ন হয়, মিশর দেশে সেইরূপ প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট তুলা উৎপন্ন হয়। তুলার চাষে যথেষ্ট লাভ হয় বলিয়া মিশরের কৃষকগণ ক্রমশঃ অন্যান্য শস্যের আবাদ হ্রাস করিয়া কার্পাসের আবাদ বৃদ্ধি করিতেছিল। সেই জন্য সম্প্রতি মিশর গবর্ণমেণ্ট এক ঘোষণাদ্বারা সকলকে জানাইয়াছেন যে, যাহার যত কৃষি-কার্য্যোপযোগী জমি থাকুক না কেন, কেহই তাহার জমির তৃতীয়াংশের অধিক ভূমিতে কার্পাসের আবাদ করিতে পারিবে না। অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশ ভূমিতে খাদ্যশস্যের আবাদ করিতে হইবে। মিশরে যে-কেহ কৃষিকার্য্য করিবে, তা সে স্থানীয় লোকই হউক বা বিদেশীই হউক, সকলকেই এই আদেশ পালন করিতে হইবে।

জাভা চিনির বাজার

সেপ্টেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত জাভার ১৯২৭ সনের চিনির ফসলের সাদা জাভা চিনি ৫,১৯,০০০ টন, ও লাল জাভা ৫,৫৮,০০০ টন বিক্রয় হইবে বলিয়া অনুমান করা যায়। বর্ত্তমান জাভা চিনির ফসল ১,৯১৫,০০০ টন হইবে বলিয়া অনুমান করা যায়। ইহার পূর্ব্বের মরশুমে ২,২৮০,০০০ টন চিনি উৎপন্ন হয়।

সেপ্টেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত ৯ মাসে কলিকাতায় মোট ২,৪২,০০০ টন জাভা চিনি আমদানি করা হয়। বিগত বৎসরে ঐ সময়ের আমদানির পরিমাণ ছিল ২,১৮,০০০ টন। এ বৎসরের আমদানির মধ্যে ১,৯৬,০০০ টন সাদা চিনি ও ৩৮,০০০ টন লাল চিনি ছিল। বিগত বৎসরে ঐ সংখ্যা যথাক্রমে ১,৭১,০০০ ও ৩৩,০০০ টন ছিল।

ভারতে মরিশাস চিনির আমদানি

মরিশাস দ্বীপ হইতে ভারতে ১৯২৫-২৬ সনে ৬,৮৬০ টন, ১৯২৪-২৫ সনে ১,৬৮,২১৭ টন ও ১৯২৩-২৪ সনে ২,৪৬৭ টন চিনি আমদানি করা হয়।

কিউবার চিনি

কিউবা এ বৎসরে ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত তিন হাজার টন চিনি ভারতে রপ্তানি করিয়াছে। কিউবার প্রেসিডেণ্টের স্বাক্ষরিত এক আইনের বলে কিউবার ১৯২৬-২৭ ইক্ষু ফসল ১৯২৭ সনের ১লা জানুয়ারীর পূর্ব্বে ভাঙ্গান নিষিদ্ধ হইয়াছে।

১৮ই অক্টোবর কলিকাতার গুদামে ৩৩,৪০০ টন চিনি জমা ছিল। ১১ই অক্টোবর ছিল ৩৫,০০০ টন।

সুইট্‌সারল্যাণ্ডের শিল্প-কারখানা

১৯২৪ সনে সুইট্‌সারল্যাণ্ডে কারখানার সংখ্যা ছিল ৮,২৪৩, মজুরের সংখ্যা ৩৫৭,৫০৭। ১৯২৫ সনে কারখানার সংখ্যা হয় ৮,২৫৩, মজুরের সংখ্যা ৩৬৩,৭৩০।

ব্যবসার নাম	কারখানা	কারিগর-সংখ্যা
তূলা	৩৫০	৩৬,১৪৯
রেশম	১৯২	২৭,৩২৬
পশম	৬৮	৬.৯৬১
লিনেন	২৯	১,৫৭০
এম্‌ব্রয়ডারি	৭৬৬	১২,৪৫৩
অন্যান্য তাঁতের কাজ	১৫৫	৬,৯২৭
বস্ত্র-বয়ন ইত্যাদি	৯০৬	৩৫,৩৪৭
খাদ্য ইত্যাদি	৬১২	২৪,৬৫৮
কেমিক্যাল	২৩৫	১৫,১৩৪
জল-শক্তি, বিজলী ও গ্যাস	২৯৫	৪,০০৫
কাগজ, চামড়া, রবার	২৯৮	১২,০৬৩
ছাপার কাজ	৪৮৮	১২,০৫১
কাঠের কাজ	১,০৭৪	২০,৭০২
লোহা, ইস্পাত ও ধাতু	৬১২	২৮,৪২২
যন্ত্রপাতি	৭২৩	৬৩,৭৫০
ঘড়ি তৈয়ারী	১,১৩১	৪৩,৫৫৭
খনির কাজ	৫২০	১২,৬৫৫

দেশী

শিক্ষিত বাঙ্গালীর বেকার-সমস্যা

বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজের সম্বন্ধে আলোচনার জন্য কলিকাতার ওভারটুন হলে একটি সভার অধিবেশন হয়। সার নীলরতন সরকার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল।

সভাপতি তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, "বেকার-সমস্যাই দেশের বর্ত্তমানে সর্ব্বপ্রধান সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান বাঙ্গালাকে করিতে হইবে। এই সমস্যার সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য এবং শিক্ষিত যুবকদের অন্তরে উৎসাহ-উদ্যম সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে এই সভা আহূত হইয়াছে। বাঙ্গালীকে দুনিয়ায় বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। কেবল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না; সমস্যা জটিল হইলেও ইহার সমাধানের একটা কার্য্যকর পন্থা নিরূপণ করিতে হইবে। বাঙ্গালীর বুদ্ধিবৃত্তি জগতের অন্য কোন দেশের কোন জাতির অপেক্ষাই ন্যূন নহে; কিন্তু তথাপি বাঙ্গালী আজ অর্দ্ধাশনে অনশনে কাল কাটাইতেছে। দেশের সম্মুখে ইহাই প্রধান সমস্যা।"

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার বলেন, "বিদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আমি দেখিতেছি, বাঙ্গালাদেশের অনেক বি, এ বি, এল, এম, এস্‌সি, এম, এ ইত্যাদি উপাধিধারী যুবা বেকার অবস্থায় দিন কাটাইতেছে। ইহা ছাড়া বিদেশ হইতে যে সব যুবক শিক্ষালাভ করিয়া আসিতেছে, তাহারাও অনেকে ভাল কাজ পাইতেছে না। অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিয়াছি, এই বেকার-সমস্যা প্রধানতঃ দুইটি আকার ধারণ করিয়াছে। একটি হইল কাজের অভাব অপরটি হইল কাজ জুটিলেও সেই সব কাজে উপযুক্ত জীবিকার অভাব। বিশিষ্ট কতকগুলি ব্যক্তির এই সমস্যা-সমাধানে আন্তরিকভাবে চেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য এবং এই সব বিষয়ে তদন্ত করিবার জন্য একটি আফিস খোলা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তব্য এই দিকে খুব বেশী আছে। কর্ত্তৃপক্ষ একটা "এমপ্লয়মেণ্ট বিউরো" খুলিয়া কর্ম্মপ্রার্থীদের নাম-ধাম, কর্ম্মদক্ষতা ইত্যাদির তালিকা করুন। অপর দিকে দেশী-বিদেশী সকল প্রকার ব্যাঙ্ক, ফ্যাক্টরি, আমদানি-রপ্তানির আফিসের সঙ্গে পত্রব্যবহার সুরু করুন। তাহা হইলে যাঁহারা লোক বাহাল করিতে সমর্থ তাঁহাদের সঙ্গে কর্ম্মপ্রার্থীদের যোগাযোগ কায়েম হইতে পারিবে।

শ্রীযুক্ত অশোক চাটার্জ্জী, শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ এবং অপর কয়েকজনের বক্তৃতার পর দেশের বেকার-সমস্যা সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। অতঃপর সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদানানন্তর সভা ভঙ্গ হয়।

("আনন্দ বাজার পত্রিকা")

কৃষি-বিভাগের নামে খান বাহাদুর মোমেনের নালিশ

বাঙ্গালার ল্যাণ্ড রেকর্ড ও সার্ভে ডিরেক্টর খান বাহাদুর এম, এ, মোমেন কৃষি-কমিশনের সমক্ষে সাক্ষ্যদান-প্রসঙ্গে বাঙ্গালা সরকারের কৃষিবিভাগের নামে গুরুতর অভিযোগ আনয়ন করেন। ইনি বলেন, এই বিভাগের কাজ অনেক বেশী, এই বিভাগে আরও অনেক কর্ম্মচারী নিয়োগ করা দরকার এবং আরও অনেক টাকা এজন্য ব্যয় করা দরকার।

কৃষি-বিভাগকে দেশের লোকে সাধারণতঃ ভাল চক্ষে দেখে না। আবার এমন অনেক লোক আছে যাহারা মনে করে, গবর্ণমেণ্ট এজন্য যে অর্থব্যয় করেন, তাহা অপব্যয় ছাড়া আর কিছুই নহে। জেলা কৃষি-কর্ম্মচারিদের কোন নির্দ্দিষ্ট কার্য্য না থাকায় লোকে মনে করে উঁহারা কিছুই করেন না। সাক্ষী বলেন, ডেপুটি ডিরেক্টরেরা কৃষকদিগের সহিত খুব কমই দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন। ইঁহারা কখন আসেন, কখন যান কেহই তাহা জানিতে পারে না। অনেক কর্ম্মচারী পরিদর্শন কার্য্যের জন্য জেলায় আসিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা রেল ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া কোথাও যান না। কৃষি-প্রতিষ্ঠানগুলিতেও প্রায়ই লোকসান দিতে হয়। সাক্ষী বলেন, কৃষকদিগের অবস্থার উন্নতি জেলার কালেক্টরদের দ্বারা সাধিত না হইয়া ইউনিয়ন বোর্ডগুলির মারফতেই ভালভাবে হইতে পারে। কালেক্টরদিগের ঐ বিষয়ে আরও বেশী যত্নশীল হওয়া দরকার। সমবায় বিভাগকে সরকারের আরও অধিকতর সুবিধা দেওয়া দরকার। সাক্ষী বলেন, খুব অল্প জেলা কর্ম্মচারীকেই তাঁহাদের কার্য্যে যতটা যত্ন লওয়া দরকার, ততটা যত্ন লইতে দেখা যায়। সাক্ষী বলেন, কতিপয় উৎসাহশীল কর্ম্মীকে কিছু জমি ও যথোপযুক্ত অর্থসাহায্য দান করিয়া কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত করিলে খুব ভাল ফল হইবে বলিয়া মনে হয়। গ্রামের কৃষি ও স্বাস্থ্যোন্নতি-বিধায়ক কার্য্যে বাধাদানকারী ব্যক্তিদিগকে নিবৃত্ত করিবার জন্য সাক্ষী আইন প্রণয়নের আবশ্যকতা বোধ করেন। সাধারণের হিতকার্য্যে যাহাতে কেহ বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে না পারে, এজন্য একটা আইনের কড়াকড়ি থাকা ভাল।

প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন, বে-সরকারী চেয়ারম্যানদের অমনোযোগিতার জন্য জেলা বোর্ডের রাস্তাগুলির ঐরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে। একজন চেয়ারম্যান বছরের মধ্যে বড় জোর একবার সফরে বাহির হন। ভাইস চেয়ারম্যানগণও কার্য্যদক্ষ নহেন। কৃষি-বিভাগের প্রতি দোষারোপ সম্পর্কে সাক্ষী বলেন, সাধারণতঃ জেলা কৃষি কর্ম্মচারীদের সম্পর্কেই ঐ অভিযোগ করা হইয়াছে, অবশ্য ইহার মধ্যে কয়েকজন বাদ আছেন। রায় কুমুদনাথ মল্লিক বলেন, একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের অধীনে সমস্ত ভারতের গবেষণামূলক কার্য্যসমূহ চালান দরকার। বাঙ্গালার যুবকগণ উচ্চ অথবা নিম্ন প্রাথমিক কৃষিশিক্ষায় উৎসাহের সহিত অগ্রসর হইবে সেদিন এখনো বাঙ্গালায় আসে নাই। সাক্ষী বলেন, আমার মতে বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানে পূর্ণ সাজ-সরঞ্জাম-সমন্বিত কৃষি-উপনিবেশসমূহ স্থাপন করিয়া কৃষি-শিক্ষাকামী ছাত্রদিগকে তথায় বসবাস করিবার সুবিধা দান করিলে খুব ভাল ফল হইতে পারে।

মফঃস্বলে মোটর গাড়ী

সহরে ও মফঃস্বলে ভাড়াটীয়া মোটরগাড়ীর সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার ফলে অনেক ঘোড়ার গাড়ীর মালিক ব্যবসা চালান সম্ভবপর হইবে কিনা সেই ভাবনায় পড়িয়াছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে ঘোড়া মরার পর মালিক নূতন ঘোড়া খরিদ করেন নাই এরূপও আমরা জানি। ঘোড়ার গাড়ীর স্থান মোটরগাড়ী অধিকার করিলে সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সুবিধা হইবে কিনা তাহা এখনও ঠিক বলা যায় না এবং পরিণামে এ দরিদ্র দেশে মোটরগাড়ীর সংখ্যাধিক্য হইলে এ ব্যবসাও স্থায়ী হইবে কিনা এখনও বুঝা যাইতেছে না।

নূতন প্রচেষ্টার মুখ্য ও গৌণ পরিণাম যাহাই হউক, দরিদ্র জনসাধারণ এখন পর্য্যন্ত মোটরগাড়ীর আমদানিতে সস্তায় দীর্ঘ পথ নিয়মিতরূপে চলাচলের সুবিধা ভোগ করিতে পারিতেছে না। ঘোড়ার গাড়ীর সংখ্যা কোন কোন স্থানে ইতিমধ্যেই কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু নিয়মিতরূপে মোটর সার্ভিস চলিবার ব্যবস্থা না হওয়ায়, অনেক স্থলে দেশবাসিগণ বিশেষ অসুবিধায় পতিত হইয়াছে। অনেকে সপরিবারে চলাচলের জন্য যে ক্ষেত্রে ২।৷০-৩৲ টাকায় ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া পাইত, মোটর হওয়ায় ঘোড়ার গাড়ীর অভাব হেতু বাধ্য হইয়া সেই কার্য্যের জন্য ৮৲-১০৲ টাকা দিয়া মোটরগাড়ী নিতে হইতেছে। চলাচলের খরচ ঈদৃশ বৃদ্ধি হওয়ায় সাধারণের মধ্যে একটু চঞ্চলতা দেখা দিয়াছে। কিন্তু, এ চঞ্চলতার বিশেষ সার্থকতা আমরা দেখি না। কারণ, এদেশে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কোন কার্য্য করা যখন সম্ভবপর নহে, তখন এ সম্বন্ধে প্রতিকারও অসম্ভব।

জনসাধারণের পক্ষে অসুবিধা দূর করা অসম্ভব হইলেও আমাদের জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়, মিউনিসিপ্যালিটী ও ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড ইচ্ছা করিলে বহুল পরিমাণে তাহা দূর করিতে পারেন। যখনই কোনও ব্যক্তি ব্যবসায়ের জন্য মোটর চালনার অনুমতি প্রার্থনা করিবে, তখনই দূরত্ব হিসাবে ভাড়ার একটা নির্দ্দিষ্ট হার ধার্য্য করিয়া এবং প্রত্যেক ব্যবসায়ী নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে কোনও নির্দ্দিষ্ট রেল বা জাহাজ ষ্টেশন পর্য্যন্ত নিয়মিতরূপে যাত্রি-সংখ্যার সম্ভাবনা অনুসারে কার অথবা বাস্ সার্ভিস চালাইবে এরূপ প্রতিশ্রুতি লইয়া অনুমতি দেওয়া উচিত। এ বিষয়ে আমরা এ জেলার প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটী, ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড ও আমাদের সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মোটরগাড়ীর আমদানির সংস্রবে ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের ও কোনও কোনও মিউনিসিপ্যালিটীর রাস্তা অপরিসর ও দীর্ঘকাল সঙ্গতরূপে মেরামত না হওয়ার ফলে রাস্তার দুরবস্থার প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আমরা আকর্ষণ করিতেছি। মোটর গাড়ীর সুবিধাও কতক কতক আছে বটে, কিন্তু রাস্তার কদর্য্যতাহেতু আকস্মিক বিপদ ঘটার আতঙ্ক ততোঽধিক আছে। যদি দেশে মোটরগাড়ী চলাচলের আবশ্যকতা প্রকৃতই হইয়া থাকে, তবে বিশেষভাবে ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের রাস্তাগুলির দুরবস্থা দূর হওয়ার একান্ত প্রয়োজন।

হুসেনপুর হইতে কিশোরগঞ্জ পর্য্যন্ত ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের যে সড়ক আছে, তাহাতে প্রত্যহ বহু গরুর গাড়ী ও মোটর চলাচল করিয়া থাকে। হুসেনপুর হইতে রামপুর পর্য্যন্ত রাস্তা ইষ্টক-নির্ম্মিত ও বেশ প্রশস্ত। কিন্তু রামপুর হইতে কিশোরগঞ্জ রেল ষ্টেশন পর্য্যন্ত যে অংশ, তাহাতে মোটর চলাচলে প্রতি মুহূর্ত্তেই দুর্ঘটনার আশঙ্কা হয়। রাস্তা নিতান্তই অল্পপরিসর এবং স্থানে স্থানে বন্ধুর। সড়কের একদিকে নদী ও অপর দিকে উচ্চস্থান কিংবা গভীর খাত। হুসেনপুর এ জেলার একটী প্রসিদ্ধ বন্দর। হুসেনপুর—কিশোরগঞ্জ সড়কের এই অংশের দুরবস্থার প্রতি আমরা বহুবার ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াও এই পর্য্যন্ত কোন ফল পাই নাই। ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের কোনও সভ্য প্রত্যহ শত শত যাত্রীর বিপদের আশঙ্কা দূরীকরণে চেষ্টিত হইয়া বিষয়টী লইয়া বোর্ডে আন্দোলন করিবেন কি ?

("ময়মনসিংহ-সমাচার")

বোম্বাইয়ের তাঁত-মজুরদের মত

শ্রমশিল্পের বহু গলদ দূর করিতে হইলে শ্রমের অবস্থা ও কল-শাসন-পদ্ধতির সম্পূর্ণ সংশোধনই একমাত্র উপায়। বোম্বাইয়ের তন্তুবায়-শ্রম-ইউনিয়নের এইরূপ ধারণা। তাঁহারা এই সম্বন্ধে বয়ন-শুল্ক-বোর্ডে (টেক্সটাইল টারিফ বোর্ড) এক লিখিত পত্র দাখিল করিয়াছেন।

বার্ণেট হার্ষ্ট ও অন্যান্য গ্রন্থকার হইতে বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করিয়া ইউনিয়ন শ্রম-অবস্থার তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা দেখাইতে চাহেন,—(১) বীভৎস বাস-ভবনের দরুণ জীবন নিরাপদ নহে, (২) বিনা বিচারে ও যখন তখন বরখাস্ত করায় চাকুরী বিপজ্জনক এবং (৩) বহু স্থলে মজুরী হ্রাস করায় মজুরীর অবস্থাও ভীতি-সঙ্কুল।

শ্রমশিল্পের আধুনিক অবস্থার জন্যই এইরূপ হইতেছে, ইহাই ইউনিয়নের দৃঢ় ধারণা। এই অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইলে জাপান ও অন্যান্য দেশের সহিত প্রতিযোগিতা করা সম্ভব হইবে না।

ফ্যাক্টরি-মালিকদের দোষ

ভারতীয় শ্রমের স্কন্ধে অক্ষমতার অপরাধ চাপান হইয়া থাকে। তদুত্তরে ইউনিয়ন পরলোকগত ডাক্তার টি, এম, নায়ারের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ১৯০৮ সনের ফ্যাক্টরি লেবার কমিশনের সভ্যরূপে নায়ার বলিয়াছেন, একই টাকায় ভারতীয় কলের মালিকেরা ইংরেজ মালিকদের অপেক্ষা দ্বিগুণ কাজ পাইয়া থাকেন। ইউনিয়ন বলেন, কলের বন্দোবস্ত নির্দ্দোষ নহে—ঘুষের চলন আছে। বোর্ড যেন এই সব বিষয়ে তদন্ত না করিয়া কোনরূপ প্রতীকারের ব্যবস্থা না করেন।

ইউনিয়ন আরো বলেন, ওয়াশিংটন মজলিশের নিয়ম-পত্র (ওয়াশিংটন কন্‌ভেন্‌শন) অনুমোদন করিয়া ভারত

তাহার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছে। কিন্তু জাপান ঐ মজলিশের নিয়মপত্র মানে না বলিয়া কোনো কোনো কলের মালিকেরা উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষে দেশীয় রাজ্যের মধ্যে অনেকগুলি কল সম্প্রতি স্থাপিত হইয়াছে। তাহার কোনো কোনোটি বোম্বাইয়ের কলের মালিকদের অধীন। ইউনিয়ন জানিতে চাহেন, দেশীয় রাজ্যের এই কলগুলিতে ঐ নিয়মপত্র মানা হয় কিনা তাহা দেখিবার জন্য উক্ত চীৎকারকারীরা কি চেষ্টা করিয়াছেন।

মজুরেরা কোন্ রকমের সংরক্ষণ চায়

ইউনিয়ন "সংরক্ষণের" বিরোধী নহেন, তবে যে রকম পদ্ধতিতে ঐ "সংরক্ষণ" আদায় করিবার চেষ্টা হয়, তাহার বিরোধী। তাঁহারা সরলভাবে বিশ্বাস করেন, ঐ পদ্ধতি দ্বারা কাজ হইবে না। তাঁহারা মনে করেন, শতকরা ১০ ভাগ আমদানি-শুল্ক বসানো হইলে বিদেশী ইস্পাতের ন্যায় বিদেশী সস্তা কাপড়ও ভারতবর্ষে আমদানি হইতে থাকিবে। জাপানের শ্রম-অবস্থা আরো খারাপ হইয়া পড়িবে এবং ভারতবর্ষে কাপড়ের দাম এত চড়িয়া যাইবে যে, তাহাতে চাহিদা কমিতে বাধ্য। ইউনিয়ন প্রস্তাব করেন, যদি জাপানী প্রতিযোগিতা অসৎ বলিয়াই মনে হয়, তবে জাপানী মাল আসা বন্ধ করা হউক, অথবা অর্থ দ্বারা কিংবা বিনা সুদে টাকা ধার দিয়া ভারতীয় শিল্পকে সাহায্য করা হউক।

বিশ্বরাষ্ট্র-পরিষৎ সম্বন্ধে রামানন্দ বাবুর মতামত

জেনেহ্বা হইতে "মডার্ণ রিভিউ"-সম্পাদক রামানন্দবাবু ফিরিয়া আসিয়াছেন। সেদিন প্রবাসী-সঙ্গতে বসিয়া তিনি সাংবাদিক এবং অন্যান্য বন্ধুবর্গকে বলিয়াছেন,—"বিশ্ব রাষ্ট্র-পরিষদের সাহায্যে ভারতের রাষ্ট্রীয় উন্নতি ঘটিয়া উঠিবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু এই পরিষদের কার্য্য-পরিচালনার জন্য ভারত হইতে খরচপত্র পাওয়া যায় বিস্তর। অথচ ঐ কর্ম্মকেন্দ্রে ভারত-সন্তান মাত্র দুই তিন জন কর্ম্মচারীরূপে বহাল আছেন। কাজেই জেনেহ্বার এই আন্তর্জ্জাতিক সঙ্ঘকে ভুলিয়া থাকা ভারতবাসীর পক্ষে উচিত নয়। অধিকন্তু, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আন্তর্জ্জাতিক অভিজ্ঞতা ইত্যাদি নানা দিক্ হইতেই ভারতসন্তান এই লীগের সংস্পর্শে আসিলে লাভবান হইতে পারিবেন।

নিখিল ভারত কৃষি-শিল্প-প্রদর্শনী

নিখিল ভারত কৃষি-শিল্প-প্রদর্শনী কমিটির সম্পাদক নিম্নলিখিতরূপ সংবাদ জানাইতেছেন :—

অনেকে হয়ত সংবাদপত্রের সংবাদের মধ্যে লক্ষ করেন নাই যে,—এই প্রদর্শনীতে মিলের সূতার বস্ত্রের ষ্টল খুলিতে দেওয়া হইবে না বলিয়া জানান হইয়াছিল। যাঁহারা ষ্টল লইবার জন্য আবেদন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে জানান হইতেছে যে,—হাতে কাটা রেশম বা পশমের বস্ত্রাদি ব্যতীত অন্য প্রকার রেশমী বা পশমী বস্ত্র এই প্রদর্শনীর ষ্টলে আনিতে দেওয়া হইবে না। যাঁহারা খাদির ষ্টল খুলিবেন, তাঁহাদিগের নিকট ভাড়া নেওয়া হইবে না। —এ, পি

ভারতের বাণিজ্য-জাহাজ

সিন্ধিয়া নেভিগেশনের বার্ষিক সভার সভাপতিত্ব কালে মিঃ নরোত্তম মোরারজী স্যর চার্লস ইন্নেসের নীতির তীব্র সমালোচনা করিয়া বলেন, ভারতের সমুদ্রোপকূলের নৌচালন সম্পর্কিত ব্যবসা-বাণিজ্য ভারতীয়দের হস্তে রাখিবার জন্য ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে যে প্রস্তাব আনয়ন করা হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে তিনি যে মতিগতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা কিছুতেই সমর্থন করা যাইতে পারে না। তিনি বলেন, আগামী বর্ষে ভারতের উপকূলে যেসব জাহাজ চলাফেরা করে, তাহার কর্ম্মচারীদের শতকরা অন্ততঃ ৫০ জন ভারতীয় নিযুক্ত করিতে সরকারকে বাধ্য করা উচিত। মিঃ নরোত্তম মোরারজী বলেন, ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদে স্যর চার্লস ইন্নেস এ সম্বন্ধে যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন তাহাতে বিদেশী জাহাজ-ব্যবসায়ীদের একচেটিয়া ব্যবসায় সমর্থন করা হইয়াছে। ইহা অত্যন্তই দুঃখের বিষয় যে, ভারত-বাসীরা যাহাতে তাহাদের নিজেদের বাণিজ্য-বহর গড়িয়া তুলিতে পারে, স্যর চার্লস ইন্নেসের বক্তৃতার কোথায়ও তৎপক্ষে সাহায্য করিবার আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশিত হয় নাই।

মিঃ মোরারজী বলেন, ভারতীয় বাণিজ্য-বহরের সম্পর্কে সরকারের মতিগতি যে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ঐ বক্তৃতা হইতেই তাহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। এতদিন সরকার এবিষয়ে সম্পূর্ণই উদাসীন ছিলেন। এখন তাঁহাদের উদাসীনতা পরিবর্ত্তিত হইয়া তৎস্থলে ভারতবাসীদের স্বার্থের বিরুদ্ধতা দেখা দিয়াছে। ভারতবাসীদের কর্ত্তব্য ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের ভিতরে এবং বাহিরে এই বিষয় লইয়া ক্রমাগত সংগ্রাম চালানো। তাঁহাদের কর্ত্তব্য এই জাতীয় ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া বাণিজ্য-নৌবহর-গঠনে সাহায্য করা। যে জাতি নিজের স্বাধীনতা লাভ করিতে চায়, তাহার নিজের বাণিজ্য-নৌবহর থাকা উচিত।

নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস

শীত ঋতুতে কলিকাতায় নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সপ্তম বার্ষিক অধিবেশন হইবে। ঠিক তারিখ পরে বিজ্ঞাপিত হইবে। খুব সম্ভবতঃ জানুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহেই অধিবেশন হইবে, কারণ তাহা হইলে বিভিন্ন স্থান হইতে কর্ম্মীদের প্রতিনিধিবর্গ যোগদান করিতে পারিবেন। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে সভাপতি করিয়া একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে।

আজমীরের রায় সাহেব চন্দ্রিকাপ্রসাদ সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। এই বৎসরে অধিবেশন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; কারণ, মজুরদের সাধারণ হিতসাধন-সমস্যা, ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীর মজুরদের শ্রমের সর্ত্ত সম্বন্ধে একটি আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা এবং আগামী বৎসরের জন্য একটি সুনির্দ্দিষ্ট কার্য্য-পদ্ধতি স্থির করা ইত্যাদি বিষয় এই অধিবেশনে আলোচিত হইবে। সুতরাং এই কংগ্রেসের অঙ্গীভূত সমস্ত ইউনিয়নের কর্ত্তব্য এই অধিবেশনে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া ইহাকে সাফল্যমণ্ডিত করা।

ভারতবর্ষে এমন বহু ট্রেড ইউনিয়ন আছে, যাহারা এখনো নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অঙ্গীভূত হয় নাই। কংগ্রেসকে প্রতিনিধিমূলক করিবার জন্য, সকলের উন্নতিকল্পে সম্মিলিতভাবে কাজ করিতে সমস্ত ইউনিয়নের কর্ত্তব্য সহকর্ম্মিরূপে একই কংগ্রেসমঞ্চে সমবেত হওয়া।

অভ্যর্থনা সমিতি যাহাতে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সমক্ষে সমস্ত প্রস্তাব সুবিন্যস্তভাবে উপস্থিত করিতে পারেন তজ্জন্য অঙ্গীভূত ইউনিয়নসমূহকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন তাঁহাদের প্রস্তাবের খসড়া এবং প্রতিনিধি-দের নাম ও ঠিকানা অভ্যর্থনা সমিতির সেক্রেটারীর নামে, কলিকাতা ১২নং ডালহৌসী স্কোয়ারের ঠিকানায় পাঠাইয়া দেন। প্রতিনিধিদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হইতেছে। প্রতিনিধিবর্গকে জানান যাইতেছে যে, এই বৎসর প্রতিনিধিদের নিকট হইতে কোন দক্ষিণা লওয়া হইবে না।

কারেন্সী চর্চ্চায় বাঙ্গালী

আজকাল ভারতে ১৮ পেন্সের রূপেয়া সম্বন্ধে যে আন্দোলন চলিতেছে তাহাতে বাঙালীরা এক প্রকার যোগ দিতেছে না বলিলেই চলে। বস্তুতঃ, কারেন্সী কমিশনের প্রস্তাবগুলার বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা এবং সমালোচনা যেন বাঙালীর মাথায় কোনো প্রকার প্রশ্নই তুলে নাই। বাঙালীর লেখা ইংরেজি বা বাংলা রচনায় এই সকল বিষয়ের কোনো একটা লইয়া সুবিস্তৃত ও স্বাধীন আলোচনা দেখিতে পাওয়া গেল না। পাঞ্জাবী, গুজরাটী, মারাঠা আর যুক্তপ্রদেশবাসী পণ্ডিতেরা ছোট বড় মাঝারি স্বচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। কিন্তু বাঙালীরা একদম ফেল মারিল। তবে দেখিতেছি যে, স্যার পুরুষোত্তমদাসের বক্তৃতাগুলা তর্জ্জমা করিবার লোক দু'একজন বাংলা দেশে আছেন। তাঁহারাই দৈনিক সাপ্তাহিকে বাংলাদেশের কারেন্সী চর্চ্চা জোগাইতেছেন। ভবিষ্যতের জন্য বাঙালীর পক্ষে একটা সমস্যা উপস্থিত বুঝিয়া রাখা উচিত।

বাঙালী সমাজের সকলেই "নানা কাজে ব্যস্ত" একথা বলা বোধ হয় ঠিক হইবে না। বোধ হয় বাঙালীর মাথারই কিছু দোষ আছে। কারেন্সী-চর্চ্চাটাও যে একটা বড় কাজ এই কথা বোধ হয় বাঙালীরা এখনো জানে না। আর যাহারাও বা জানে তাহাদেরও বোধ হয় বিদ্যার অভাব আছে। সময়ের অভাব সকল ক্ষেত্রেই ধরিয়া লইলে গোঁজা-মিল চালানো হইবে মাত্র।

বিদেশী

"নিউইয়র্ক টাইমস" ও আন্তর্জ্জাতিক ইস্পাত-সঙ্ঘ

আন্তর্জ্জাতিক ইস্পাত-সঙ্ঘের বৃত্তান্ত আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি। এই সম্বন্ধে "নিউইয়র্ক টাইম্‌সের" প্যারিসস্থ সংবাদদাতা শ্রীযুক্ত এডুইন্ এল, ডেমেস ফ্রান্স, জর্ম্মাণি, বেলজিয়াম ও লুক্‌সেম্বুর্গ এই চার দেশের ইস্পাত-সঙ্ঘ স্থাপন সম্বন্ধে লিখিতেছেন,—

এই নয়া ব্যবস্থায় বাৎসরিক ইস্পাত-উৎপাদন সীমাবদ্ধ করা হইবে এবং মূল্যের হার নির্দ্দিষ্ট করা হইবে। বিগত ১লা অক্টোবর হইতে ষ্টীল ট্রাষ্টের কাজ চলিতেছে।

ইহার প্রধান আড্ডা ব্রুসেলস্ ও লুক্‌সেম্বুর্গ সহরে। দক্ষিণ আমেরিকা হইতে সুদূর চীন পর্য্যন্ত দুনিয়ার যেখানে যে হাট বাজার আছে, সেগুলি দখল করিয়া বসা এই ইয়োরোপীয় ষ্টীল ট্রাষ্টের এক নম্বর মতলব। আমেরিকাকে দেখিতেছি এবার জবরদস্ত প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইবে। এই সঙ্ঘের গোড়ায় রহিয়াছে ফরাসী লোরেণের অফুরন্ত লোহার খনি আর জার্ম্মাণ রুরের কোক কয়লার ভাঁটি। এই নয়া ব্যবস্থায় ফ্রান্স জার্ম্মাণিকে "ওর" বা আকরিক ধাতু ও জার্ম্মাণি ফ্রান্সকে কোক কয়লা সরবরাহ করিবে। গ্রেট্ বৃটেনকে এই ষ্টীল ট্রাষ্টের মধ্যে লইবার ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে।

আপাততঃ সরকারী হিসাবপত্র পাওয়া যাইতেছে না। তবে নিম্নলিখিত সর্ত্তে এই সকল ইয়োরোপীয় দেশসমূহ ইস্পাত-সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিয়াছে।

ইয়োরোপের তৈয়ারী ইস্পাতের শতকরা ৪৩·৫০ ভাগ অর্থাৎ ১২,০০০,০০০ টন জর্ম্মাণি উৎপন্ন করিতে পারিবে। ফ্রান্স শতকরা ৩১·১৯ বা ৮,৬০৪,০০০ টন ইস্পাত উৎপন্ন করিবার অধিকারী। বেলজিয়ামকে শতকরা ১১·৫৬ ভাগ বা ৩,১৮৯,০০০ টন ইস্পাত উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। লুক্সেম্বুর্গ তৈয়ারী করিতে পারিবে ৮·৫৫ ভাগ বা ২,৩৫৯,০৫০,টন। সার উপত্যকা ৫·২০ ভাগ বা ১,৪৩৫,০০০ টন। সরকারী হিসাবে মোট বাৎসরিক ২৭,৫৮৭০০০ টন ইস্পাত ইয়োরোপের মাটিতে ফলিবে বলিয়া আশা করা যায়। অদূর ভবিষ্যতে ইহা ৩০,৬৬০,০০০ টন করা হইবে।

ইস্পাত-সঙ্ঘের উৎপাদন-বীমা

একটা আন্তর্জ্জাতিক উৎপাদন-বীমা তহবিল (ইণ্টার ন্যাশন্যাল প্রডাকশ্যন ইনসিওর্যান্স ফণ্ড) খোলা হইয়াছে। ইহাতে প্রত্যেক উৎপাদনকারীকে উৎপন্ন ইস্পাতের টন প্রতি এক ডলার করিয়া দিতে হইবে। ঐ তহবিল ২৭৫,০০০,০০০, হইতে ৩০৫,০০০,০০০ ডলারে দাঁড়াইবে। যাঁহাদের উৎপাদনের হার উল্লিখিত ব্যবস্থার কম হইবে তাঁহাদিগকে ভাণ্ডার হইতে টন প্রতি দুই ডলার "বোনাস" বা অর্থ-সাহায্য দেওয়া যাইবে। তাহা হইলে দেখা যায়, এই ফণ্ডের দৌলতে ভবিষ্যতে ষ্ট্রাইক, ধর্ম্মঘট বা ব্যবসার মন্দা ভাবকে বেপরোআ করিয়া চলা যাইবে। টন প্রতি যে ডলার তহবিলের প্রাপ্য বলিয়া ধরা হইয়াছে তাহা ক্রেতাদের নিকট হইতে আদায় করা হইবে। ফলে দেশে ও বিদেশে ইস্পাতের দাম চড়িবার সম্ভাবনা আছে। এই বোনাস অবশ্যই উৎপাদনকারীদিগকে ইংরেজ ও মার্কিণের সহিত প্রতিযোগিতায় লড়িবার যথেষ্ট সাহায্য করিবে।

ফরাসী-জার্ম্মাণ দোস্তী

নিউইয়র্ক "টাইম্‌সে"র বিশ্বাস, ইয়োরোপের এই ইস্পাত-সঙ্ঘ স্থাপনের ফলে ফ্রান্স ও জার্ম্মাণ দুইটি দেশের বংশ-পরম্পরাগত শত্রুতার অবসান ঘটিতে চলিল। ইহার রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী। জেনেহ্বায় ফরাসী ব্রিয়াঁ ও জার্ম্মাণ ষ্ট্রেজেমনের চেষ্টাতেই এরূপ অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে।

আমেরিকার সংবাদপত্রগুলি ইয়োরোপীয় ষ্টীলট্রাষ্ট মার্কিণ ইস্পাত কারবারের সমূহ ক্ষতিজনক হইবে এরূপ আশঙ্কা করিতেছেন।

অন্যান্য মার্কিণ মত

"আয়রণ এজ" বলিতেছেন,—"আমাদের দেশের ইস্পাত-ব্যবসায়ীদের কারবারের উপর এই নয়া ইস্পাত-সঙ্ঘের প্রভাব খুব বেশী পড়িবে।"

যুক্তরাষ্ট্রের ষ্টীল কর্পোরেশুনের চেয়ারম্যান গ্রে সাহেব বলেন,—"এই প্রচেষ্টা খুবই সাফল্যমণ্ডিত হইবে বলিয়া আশা করা যায় এবং ইহার মাতব্বররা আমেরিকাকে নেকনজরে দেখিবেন বলিয়া মনে হয়।"

"নিউইয়র্ক ওয়ার্ল্ড" বলিতেছেন, "আমেরিকা তার ইস্পাত-কারবারের লাভ-লোকসানের কোনো ভয় করে না। আমাদের ইস্পাত-কারবার আমাদের দেশের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দেশের লোকই ইহার ক্রেতা। বাহিরের জগতের ও-সব সঙ্ঘকে আমরা পরোআ করি না।"

নিউ ইয়র্কের "লিটারারী ডাইজেষ্টে"র মতে, ফ্রান্স ও জার্ম্মাণি এবং ইহাদের সহিত বেলজিয়াম ও লুকসেম্বুর্গের ইস্পাত কারবার সমূহের সঙ্ঘ কায়েম করিবার প্রচেষ্টা আর্মিষ্টিসের (যুদ্ধ-বিরতি) পরের বৃহত্তম ঘটনাসমূহের অন্যতম। বাজারের চাহিদার অনুপাতে উৎপাদনের সমতা নিয়ন্ত্রিত করা আর প্রতিযোগিতায় বিক্রয়ের ক্ষতিনিবারণ করা এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য।

ইস্পাত-সঙ্ঘ ও বৃটিশ স্বার্থ

ইংলণ্ড এখনও ঘরোয়া কয়লা-সমস্যা লইয়াই হাবুডুবু খাইতেছে। এই ইয়োরোপীয় ইস্পাত-সঙ্ঘে সে এখনও নাম লিখাইবার সুযোগ ও সুবিধা দেখিতেছে না।

বিলাতের বিখ্যাত ব্যবসা সাপ্তাহিক "ইকনমিষ্ট" কাগজখানি প্রবীণের মত উপদেশ দিতেছেন,—

"ওহে তোমরা তো জান গ্রুপ স্কীমে বৃটিশ রেলসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করিবার প্রচেষ্টায় বৃটিশ ব্যবসায়ীদের মন ওঠে নাই। কয়লার ব্যবসায়ে একতাস্থাপনের চেষ্টা একেবারেই ব্যর্থ হইয়াছে। অর্ণবপোতসমূহের সঙ্ঘ-স্থাপনও বিরাটভাবে ফেল মারিয়াছে। কত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল স্কীম ফাঁসিয়া গিয়াছে। আর এ ষ্টীল ট্রাষ্ট তো কচি খোকা। দেখা যাক এর আয়ু কত দিন।"

মার্কিণ ধনকুবের সম্বন্ধে পাবলিক লেজার

ফিলাডেলফিয়ার "পাব্লিক লেজার" বলেন,—আমেরিকায় আজকাল রেল-সড়কের কোটিপতি, কয়লার কোটিপতি, তেলের কোটিপতি, বিদ্যুতের কোটিপতি, গ্যাসের কোটিপতি, চাষবাসের যন্ত্রপাতির কোটিপতি, এবং মাংস-রুটীওয়ালা, লোহা-ইস্পাত-ব্যবসায়ী কোটিপতি দেখা যাইতেছে। আমাদের মার্কিণ মুল্লুকে প্রকৃতির অফুরন্ত ধনভাণ্ডার পড়িয়া আছে। লক্ষ্মীর দুয়ার এখানে উন্মুক্ত। আর আমাদের দেশের লোক-সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির জন্যও এত সব কোটিপতির উদ্ভব সম্ভবপর হইতেছে। কারণ ধনসম্পত্তির দাম লোক-বৃদ্ধির অনুপাতে দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। এই তো আমাদের জন জ্যাকব অ্যাষ্টর সেদিন (১৮১৫ সনে) ছিল ১৫০,০০০ ডলারের মালিক। লোকটা ১৮৫৫ সনে মৃত্যুকালীন তার ছেলেকে ৬,০০০,০০০ ডলারের উত্তরাধিকারী করিয়া রাখিয়া যায়! ১৮১৫ সনে অ্যাষ্টরের সময় আমেরিকায় মাত্র ৪ জন লোক ছিল, যাহাদের সম্পত্তির দাম ২০০,০০০ ডলার বা তার বেশী ছিল। ১৮৫৫ সনে ২৭ জন মিলিয়নেয়ার ছিল। আর আজকাল তো নিউইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া, শিকাগোতে এমন সব ধনী আছেন, যাঁহারা বৎসরে আয় করেন মিলিয়ন ডলার, (ত্রিশ লক্ষ টাকার উপর)।

আমেরিকার লোক প্রতিবৎসর নতুন নতুন উপায়ে ধনার্জ্জন করিতেছে। সে সকল উপায়ের কথা তাহাদের ঠাকুর দাদারা জানিত না। আজকাল রেডিও মিলিয়নেয়ার পর্য্যন্ত হইতেছে—যেমন পূর্ব্বে অটোমবিল মিলিয়নেয়ার, টেলিফোন মিলিয়নেয়ার ছিল। ক্রমে ক্রমে পুস্তক-ক্রেতা জনসাধারণের সংখ্যা-বৃদ্ধি হইলে আমরা নভেলিষ্ট মিলিয়নেয়ার বা ঔপন্যাসিক ক্রোরপতি দেখিতে পাইব। এই যেমন চলন্ত ছায়াবাজির নটনটীরা মস্ত মস্ত ধনকুবের বনিয়া যাইতেছেন।

সমাজ ও ধনকুবের

সেণ্ট লুই সহরের "ষ্টার" কাগজখানি কিন্তু মার্কিণ মুল্লুকের এই ধনকুবের-বৃদ্ধি দেশের ভাল অবস্থার পরিচায়ক বলে মনে করে না। এই কাগজের মতে দেশের ধন-সম্পদ্ মাত্র কতকগুলি মুষ্টিমেয় ধনকুবেরদের হাতে জমা হইতেছে। মার্কিণ দেশে এই প্রকার ধনকুবের-সৃষ্টির কাজ বেশী দিন চালাইলে দেশ অধঃপাতে যাইবে। দেশের আপামর জনসাধারণকে বঞ্চিত করিয়া ধনকুবের সম্প্রদায় বৃদ্ধি বেশীদিন চলিবে না। প্রতিক্রিয়া শীঘ্রই দেখা দিবে।

বাস্ বনাম ট্রেন

"মিউনিসিপ্যাল এঞ্জিনিয়ারিং" আশঙ্কা করিতেছে, ট্রেনের চলাফেরা একে একে বাস্ দখল করিয়া লইবে। কিছুদিন ধরিয়া লণ্ডন হইতে ব্রিষ্টল অবধি বাস চলিতেছে। গত সেপ্টেম্বর হইতে লিড্স থেকে লণ্ডন পর্য্যন্ত নূতন লাইন খোলা হইয়াছে। কাজটা সাউথ ইয়র্কসায়ার মোটর কোম্পানীর। লিড্স হইতে লণ্ডন ১৯৫ মাইল। এই পথে সেলুন বাসে যাইতে বড়ই আরাম।

দোতলা অমনিবাস

কলিকাতায় "ওয়ালফোর্ড ট্র্যান্সপোর্ট কোম্পানী" দোতলা বাস্ চালাইতেছে। ইহা জনপ্রিয়ও বটে। কিন্তু লণ্ডনের লোক এই রকম বাস্ পছন্দ করে না। খোলা-মেলা যদি না হইল ত বাস্ কি? এই সব বাস্ চালাইতে গিয়া মালিকদের কটুকাটব্য সহিতে হইতেছে। "মোটর ট্র্যান্সপোর্ট" বলিতেছে, "বেশীর ভাগ লোকই ত কর্ম্মোপলক্ষে যাওয়া-আসা করে। হাওয়া-খানেওয়ালা লোকদের কথা না ভাবিয়া তাদের স্বার্থ ই আগে দেখিতে হইবে।"

বাণিজ্য সমঝৌতা

(১) অষ্ট্রীয়া ও ইতালি

২০শে অক্টোবরের "বুণ্ডেস্ গেসেট্জ্‌ব্লাটে" প্রকাশ—প্রতি ১০০ কিলোগ্রাম সালফেট অব্ এমোনিয়ার জন্য অষ্ট্রীয়া পূর্ব্বে ইতালিকে মাত্র ১ স্বর্ণলিয়ার শুল্ক দিত। ইহা সাধারণ শুল্কের নীচে। ১৬ই অক্টোবর হইতে অষ্ট্রীয়া এই সুবিধা ত্যাগ করিয়াছে। হেতু এই যে, ইতালি অষ্ট্রীয়াতে বিনা মাশুলে সুপারফস্ফেট্স পাঠাইবার অধিকার ত্যাগ করিয়াছে।

(২) গ্রীস ও ইতালি

শীঘ্রই একটা গ্রীক্-ইতালীয় বাণিজ্য-সন্ধি কায়েম হইবে। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় উভয় দেশই কতকগুলি বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুবিধা ভোগ করিতেছে। যেমন জমি হইতে উৎপন্ন ফসল, এক দেশে অন্য-কর্ত্তৃক কোম্পানী ইত্যাদি স্থাপন, বাণিজ্যিক ও আর্থিক লেনদেন ইত্যাদি।

(৩) ইতালি ও জার্ম্মাণি

জেনেহ্বার খবরে প্রকাশ ইতালি ও জার্ম্মাণিতে এক সালিশী ও বোঝাপড়ার সন্ধি হইয়া গিয়াছে। "টাইমস" বলিতেছে, "জার্ম্মাণি এযাবৎ পোল্যাণ্ড, ইস্থোনিয়া ও সুইট্‌সারল্যাণ্ডের সহিত সন্ধি কায়েম করিয়াছে। কিন্তু এই নূতন সন্ধিটা তাহা হইতে একটু ভিন্ন ধরণের।"

ফিজি-প্রবাসী ভারত-সন্তান

ফিজিতে ৬৫ হাজার ভারতবাসী ঠিক কুলীর ন্যায় অবস্থান করিতেছে। তাহাদিগকে ভারত হইতে এই উপনিবেশে কুলীর মত আমদানি করা হইয়াছিল বলিয়া এখানকার লোকেরা ভারতবর্ষকে কুলীর দেশ বলিয়াই জানে।

এক্ষেত্রে আমাদের নেতাদের উচিত, শিক্ষিত ভারতবাসিগনকে মাসে মাসে এদেশে পাঠানো। তাঁহারা এদেশে আসিয়া দেখিয়া যাউন, তাঁহাদেরই দেশীয় লোকেরা এখানে কি চরম দুর্দ্দশায় অবস্থান করিতেছেন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী একবার এদেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে এখানকার ইয়োরোপীয় ও অন্যান্য লোকদিগের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ধারণার কতক পরিমাণে পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। তখন তাহারা বুঝিতে চেষ্টা করিল যে, ভারতবর্ষ খালি কুলীর দেশ নয়।

শ্রীযুক্ত শাস্ত্রীর পর পণ্ডিত গোবিন্দ সহায় শর্ম্মা এদেশ পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন। তাঁহার পর ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে আসিয়াছিলেম ডাঃ এস, কে, দত্ত।

পণ্ডিত বেনারসীদাস চতুর্ব্বেদীর উদ্যোগে ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভার একটি বৈদেশিক বিভাগ খোলা হইয়াছে; কিন্তু এপর্য্যন্ত তাহা হইতে এখানে কোন সাহায্যই প্রেরিত হয় নাই। এখানে ভারতীয়দিগের হইয়া কথা বলিবার উপযুক্ত লোক কেহই নাই।

যখন শুনি যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারত হইতে প্রতিনিধি দল প্রেরিত হইতেছেন, তখন আশা হয় যে, এখানেও বুঝি ভারতীয় নেতৃবৃন্দ আসিয়া ভারতীয়দিগের দুর্দ্দশা কথঞ্চিৎ মোচনকল্পে কিছু করিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতের নেতৃবৃন্দ আমাদিগের দিকে তাকাইতেছেন না।

এখানকার প্রতি দশজন ভারতবাসীর মধ্যে ৯ জনই কোনও রকমে তাহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হয় না।

রাজনীতি-ক্ষেত্রেও আমাদের কোন স্থান নাই। আমরা সকল রকম টেক্সই দিয়া থাকি, তবু কি ব্যবস্থাপক সভা, কি মিউনিসিপ্যাল সভা কোন প্রতিষ্ঠানেই আমাদের প্রতিনিধি লওয়া হয় না। এমন কি সরকার কর্ত্তৃক উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে আমাদের কাহাকেও মনোনীত করা হয় না। হয়ত ইহাই বৃটিশের বিচার ও অপক্ষপাতের একটি উদাহরণ।

একচত্বারিংশৎতম ভারত-রাষ্ট্রীয় মহাসভার নিকট আমাদের আবেদন, তাঁহারা আমাদের এইরূপ শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক দুর্দ্দশার হাত হইতে রক্ষা করুন।

এখানকার দৈনিক জীবিকানির্ব্বাহের খরচ অত্যন্ত বেশী, অথচ ভারতীয়দিগের আয় অত্যন্ত সামান্য। এই জন্য গত ১৯২১ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে এখানকার শ্রমিকদিগের একটি ধর্ম্মঘট হইয়াছিল; ঐ ধর্ম্মঘট ৬ মাস চলিয়াছিল। ফিজির ইতিহাসে ইহাই দ্বিতীয় ধর্ম্মঘট। কি ভাবে ঐ ধর্ম্মঘট বন্ধ করিয়া শ্রমিকদিগকে জোর করিয়া আবার কাজে লাগান হইয়াছিল, সে-প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া কোন লাভ নাই। শ্রমিকগণ ধর্ম্মঘটের পর পূর্ব্বাপেক্ষা কম পারিশ্রমিক পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। শ্রমিকদিগের নেতার নির্ব্বাসন, ভারতবর্ষ হইতে আগত কমিশনের অবমাননা, সি, এস, আর কোম্পানী ও গমর্ণমেণ্টের নানা অকার্য্য প্রভৃতি কদর্য্য ব্যাপারের বর্ণনা আর কি করিব!

ভারতীয়দিগকে ফিজি হইতে আবার ভারবর্ষে চালান দেওয়া এবং ফিজিকে শ্বেতকায়দিগের উপনিবেশরূপে পরিণত করা সম্পর্কে এখানে একটি আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে।

ফিজিতে ভারতীয়গণ প্রায় ৪৭ বৎসর ধরিয়া বাস করিতেছে। এই ভারতীয়েরাই ফিজিকে বসবাসের যোগ্য করিয়া তুলিয়াছে এবং এই উপনিবেশের রাজস্বের অধিকাংশ ভাগ ভারতীয়দিগের নিকট হইতে আদায় হয়। ভারতীয়েরাই বেশী ট্যাক্স দেয়, অথচ শাসন-ব্যাপারে তাহাদের কোন মতাধিকার নাই। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া কোন ভারতীয় শ্রমিককেই যেন ভারত ত্যাগ করিয়া আর ফিজিতে আসিতে দেওয়া না হয়; কারণ এখানে তাহাদের দুঃখের অবধি নাই।

("প্রবাসী")

কৃষিব্যবস্থা ও পল্লীসমাজের আর্থিক জীবন

অধ্যাপক বাণেশ্বর দাসের মতামত

শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর দাস রাসায়ণিক এঞ্জিনিয়ার। ইনি কলিকাতার বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউটে অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। এডিসন ইত্যাদি শিল্পপতি-প্রতিষ্ঠিত আমেরিকার বড় বড় কারবারে বাণেশ্বর বাবু অনেক বৎসর ধরিয়া উচ্চপদের কর্ম্মচারী ছিলেন। জার্ম্মাণিতেও ইনি মার্কিণ গবর্ণমেন্টের মাল জোগাইবার কাজে রাসায়ণিক বিশেষজ্ঞরূপে কর্ম্ম করিয়াছেন। ইনি প্রায় ১৫ বৎসর বিদেশে ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে কৃষিকর্ম্ম এবং পল্লীজীবন সম্বন্ধে আমাদের যে কথাবার্ত্তা হইয়াছে তাহার শর্টহ্যাণ্ড বৃত্তান্ত নিম্নরূপ।

প্রশ্ন—পল্লীগ্রামের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে আপনার অভিজ্ঞতা কিরূপ ?

উত্তর—প্রায় আড়াই বৎসর হল আমি বিদেশ থেকে ফিরে এসেছি। ফিরে আসার পর হইতে আমি আমাদের দেশের পল্লীগ্রামের অবস্থা সম্বন্ধে খোজখবর নিচ্ছি। আর নিজেও গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে অবস্থাটা বুঝতে চেষ্টা করছি। গত পূজার সময় যখন বাড়ী যাই তখনও পল্লী গ্রামের অবস্থা খুব ভাল করে আলোচনা করবার অবসর পেয়েছি।

প্রঃ—বাংলাদেশের কোন্ কোন্ জেলার খবর জানা আছে ?

উঃ—মালদহ ও পূর্ণিয়া জেলার খবর আমি বিশেষ ভাবে জানি।

প্রঃ—পূর্ণিয়া জেলার কোনো পল্লীর না সহরের কথা জানা আছে ?

উঃ—পল্লীর।

প্রঃ—কয়েকটী পল্লীর নাম শুনতে চাই।

উঃ—বালিয়া, শালমারি, সেকর্ণা, বার্ষই ইত্যাদি।

প্রঃ—এ সব পল্লী রেল লাইনের কত দূরে ?

উঃ—৮।১০ মাইল। আরো কাছেও আছে।

প্রঃ—মালদহ জেলার কোন্ কোন্ পল্লীর খবর জানা আছে ?

উঃ—পরাণপুর, আড়াইডাঙ্গা, মথুরাপুর, মালতীপুর, কলিগ্রাম, সামসী ইত্যাদি।

প্রঃ—এর ভিতর রেলপথের কাছে কোন্‌গুলি ?

উঃ—সামসী রেলের ধারে, মালতীপুর তার কিছু দূরে, অন্যান্য গ্রাম ৮ মাইলের মধ্যে। দূরে এক পরাণপুর—১০।১২ মাইল হবে।

প্রঃ—পূর্ণিয়া জেলার পল্লীর রাস্তাঘাটের অবস্থা কিরূপ ?

উঃ—মালদহের রাস্তাঘাট আমাদের বাংলাদেশের রাস্তাঘাটেরই মতন। পূর্ণিয়ার রাস্তাঘাট তার চেয়ে একটু খারাপ। গরুর গাড়ী ঘোড়ার গাড়ী চলে, অটোমবিল চলে না। অন্ততঃ আমি পূর্ণিয়ার যে পল্লী দেখেছি তাতে অটোমবিল চলে না। মালদহ জেলার যে পল্লীর কথা বল্লাম তাতে অটোমবিল চল্‌ছে।

প্রঃ—মালদহ জেলার পল্লীতে রাস্তায় রাস্তায় প্রতিদিন অটোমবিল যায় না কালে ভদ্রে যায় ?

উঃ—ততটা হয় নি, কালে হবে বিশ্বাস করি। মথুরাপুর—মালদহ সদর রাস্তায় প্রায় সর্ব্বদা অটোমবিল যাতায়াত করে, এখন মালদহে ১২ খানি অটোমবিল আছে।

মালিকেরা ভাড়া দিয়ে টাকা রোজগার করে থাকে। শীঘ্রই ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের সমস্ত রাস্তায় অটোমবিল চলবে।

প্রঃ—পূর্ণিয়া জেলার ঐ সকল পল্লীগ্রামে কোন্ জাতের লোকের বাস?

উঃ—সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য ছাড়া অন্যান্য জাতের সংখ্যা বেশী।

প্রঃ—এ সব জায়গা মুসলমান-প্রধান না হিন্দু-প্রধান?

উঃ—হিন্দু মুসলমান প্রায় আধাআধি হবে।

প্রঃ—মালদহ জেলার পল্লীগুলিতে?

উঃ—তার ভিতর সব রকম জাতের হিন্দুর বাস আছে, ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও অন্যান্য জাতের লোক আছে। বৈদ্য নাই। মোটের উপর মুসলমানের সংখ্যা বেশী।

প্রঃ—পূর্ণিয়া জেলার পল্লীগুলিতে কোন্ চাষ বেশী হয়?

উঃ—সাধারণতঃ ধানের চাষ বেশী। তা ছাড়া রবি শস্যও কিছু কিছু হয়, কিন্তু মালদহ জেলার মতন নহে। পূর্ণিয়ার যে অঞ্চলের কথা বলছি তার চাইতে মালদহে ফলানি (ফসল) কম হয়; কিন্তু রবি শস্য খুব বেশী হয়। তবে জমির উর্ব্বরতা শক্তি পূর্ণিয়া অঞ্চলে বেশী একথা বল যেতে পারে।

প্রঃ—মালদহ আর পূর্ণিয়ার যে যে পল্লীর কথা বলা হল তার আশে পাশে কোনো নদী আছে?

উঃ—আছে, কালিন্দী ও মহানন্দা। কালিন্দী মালদহে, পূর্ণিয়ায় মহানন্দা।

প্রঃ—এই দুইটী নদীর অবস্থা কিরূপ?

উঃ—এক সময় খুব ভাল ছিল, কিন্তু আজকাল কালিন্দী দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। গঙ্গা থেকে বের হয়ে কালিন্দী মহানন্দায় গিয়ে পড়েছে। যে জায়গায় গঙ্গা থেকে বেরিয়েছে সে জায়গা বালিতে ভরাট হয়ে পড়েছে। সেই জন্য কালিন্দী দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে এবং যাতায়াতেরও অসুবিধা। জলাভাবহেতু পার্শবর্ত্তী লোকের মধ্যে ম্যালেরিয়ার প্রভাব দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। নদীটীর উন্নতি হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়, স্বাস্থ্য ও ব্যবসা—দুদিক্ হতেই।

প্রঃ—কোন্ কোন্ মাসে কালিন্দীর অবস্থা খুব খারাপ হয়?

উঃ—বিশেষভাবে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে। তখন অনেক জায়গায় জল থাকে না, কিন্তু পূর্ণিয়া জেলার নদীতে সব সময় জল থাকে। গ্রীষ্মকালে জল কমতে থাকে কিন্তু মালদহের নদীর মত অতটা শুকায় না।

প্রঃ—পূর্ণিয়া জেলার এক একজন চাষী কতখানি জমি চাষ করে?

উঃ—পূর্ণিয়া জেলায় ছোট এবং বড় দুই রকম কৃষক আছে। এমন কৃষকও আছে যার জমির পরিমাণ ২ হাজার বিঘার বেশী কিন্তু নিজে চাষবাস কিছু করে না, সমস্ত জমি অন্যান্য কৃষককে আধি দিয়ে থাকে। আবার ছোট ছোট কৃষকও আছে যাদের জমির পরিমাণ ২০।২৫।৩০ বিঘা মাত্র। পূর্ণিয়া অঞ্চলে একটা হালে ২০ থেকে ২৫ বিঘা জমির চাষ-আবাদ চলে। মালদহের জমি একটু শক্ত এবং কৃষকের মধ্যেও বড় ছোট আছে; কিন্তু বড় কৃষক কম। তবে ২০০।২৫০ বিঘা জমিওয়ালা কৃষক একাধিক। কম যাদের তাদেরও ৫।১০।১৫ বিঘা পর্য্যন্ত আছে।

প্রঃ—মোটের উপর চাষের জমির পরিমাণ চাষী প্রতি কতখানি?

উঃ—আমার বোধ হয় গড়ে ১৫ বিঘার বেশী নয়। মালদহ অঞ্চলে ১৫ বিঘা, পূর্ণিয়া অঞ্চলে ২০ থেকে ২৫ বিঘা।

প্রঃ—পূর্ণিয়া অঞ্চলের যে সব পল্লীর কথা বলা হচ্ছে সেখানকার লোকেরা কি বাংলা ভাষায় প্রধানতঃ কথা বলে, না বিহারী ভাষায়?

উঃ—তাদের ভাষাকে সাধারণতঃ বলা হয় পলিয়া ভাষা, তাতে বাংলা ও হিন্দী দুইই মিশ্রিত। মালদহ অঞ্চলে অনেকটা বিহারী বা মৈথিলী ভাষা। তবে সেখানকার লোক বাংলা ভাষাই বেশী ব্যবহার করে। মালদহ অঞ্চলের সকল কাজ বাংলা ভাষায় হয় আর পূর্ণিয়া অঞ্চলে হিন্দীতে।

প্রঃ—শাকসব্জী তরিতরকারীর চাষ কিংবা বাগান এ সব পূর্ণিয়ার পল্লীতে পল্লীতে কিরূপ?

উঃ—কিছু কিছু হয়ে থাকে.। এই রকম ড্রাই ফারমিং পূর্ণিয়া অপেক্ষা আজকাল মালদহ অঞ্চলে বেশী। মালদহের জমি —অন্ততঃ গ্রামের আশে পাশের জমিগুলি—এইরূপ

ফসলের পক্ষে (ড্রাই ফারমিংএর পক্ষে) পূর্ণিয়ার জমি অপেক্ষা অধিকতর উপযুক্ত। পূর্ব্বে মালদহের জমি ফসলের জন্য ব্যবহার করত। আজকাল আদা, হলুদ, সাধারণ মরিচ, পেঁয়াজ, আলু, পটল—এই সমস্তের চাষবাস বেশী হয়, কারণ এতে লাভ থাকে বেশী।

প্রঃ—পূর্ণিয়াতে কোন্ কোন্ শাকসব্জীর চাষ হয় ?

উঃ—তাদের শাকসব্জীও ঐগুলি কিন্তু পরিমাণে কম।

প্রঃ—ফলের বাগান সম্বন্ধে পূর্ণিয়া ও মালদহে কিছু তফাৎ আছে কি ?

উঃ—পূর্ণিয়া অপেক্ষা মালদহে বেশী। বিশেষতঃ আমের বাগান। অন্যান্য বাগান বিশেষ কিছু নাই। কুলের বাগান, পেয়ারার বাগান হতে পারে কিন্তু আমের বাগানে লাভ বেশী। এই বাগান মালদহের লোকের যতটা আছে পূর্ণিয়ার লোকের ততটা নাই।

প্রঃ—টমেটো ও সালাড এই দুই জিনিষ মালদহ ও পূর্ণিয়ার পল্লীতে পল্লীতে আবাদ হয় কি ?

উঃ—সালাড হয় না। কিন্তু টমেটো আজকাল ২।১টা বাড়ীতে ঢুকেছে,—মালদহ ও পূর্ণিয়া উভয় অঞ্চলেই ঢুকেছে।

প্রঃ—পল্লীগ্রামের বাজারে বাজারে ওঠে ?

উঃ—খুব সম্ভব না, আমি বিদেশে যাওয়ার আগে অর্থাৎ প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ব্বে টমেটো দেখিনি। এখন দেখছি তারা ইহা ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছে। বিদেশে ইহার যেমন ব্যবহার হয় এরা তেমন ব্যবহার করতে জানে না, খারাপ ভাবে ব্যবহার করে।

প্রঃ—আমের বাগানের অবস্থা কি রকম ?

উঃ—আমের বাগানের অবস্থা অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল। কোন কোন বৎসর খুব ফসল হয়। গত বৎসর খুব হয়েছে, তার পূর্ব্বের ৩ বৎসর কিন্তু কিছুই হয় নি। মালদহে আমের বাগান আয়ের একটা প্রধান উপায়। কিন্তু দেখলাম তার জন্য লোকেরা কোন যত্ন নেয় না। কেবল গাছ লাগান হয়। প্রতি বৎসর গাছ যে ফসল দেয়, তাই তারা গ্রহণ করে। কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করবার ব্যবস্থা কিছুই করা হয় না।

প্রঃ—আমের বাগানের উন্নতি করা যেতে পারে কি উপায়ে ?

উঃ—অনেক উপায় আছে। আমের বাগানে জঙ্গল এত ঘন ঘন হয়ে ওঠে যে আম গাছ বর্দ্ধিত হতে পারে না। যদি এই জঙ্গল কেটে দেওয়া যায় তা হলে ফসল ভাল হয়। নূতন বাগান আজকাল যা হচ্ছে তার মালিকরা এবিষয়ে মনোযোগ দিতে আরম্ভ করেছে। জঙ্গল যাতে কম থাকে তার ব্যবস্থা করা উচিত। অনেক সময় অন্যান্য গাছ গাছড়া উঁচু হয়ে আমগাছের সঙ্গে টক্কর দেয় এবং মাটী হতে রস টেনে নেয়। কেবল জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে আম যখন ফলে তখন সেগুলি কেটে দেওয়া হয়, আমের ফসল হয়ে গেলে জঙ্গল আবার বাড়তে থাকে।

প্রঃ—আমেরিকার ফলের বাগান সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতা আছে কি ?

উঃ—আমি প্রত্যেক বৎসর গ্রীষ্মাবকাশ আমেরিকার বাগানে কাটাতাম। সে জন্য আমেরিকার নিউইয়র্ক নিউজার্সি, ডেলাওয়ার এবং পেনসিলভেনিয়া এই কয়টা ষ্টেটের কৃষিকার্য্যের অবস্থা সম্বন্ধে অনেকটা খবর রাখি। সেখানে আমি আমগাছের মত বাগান দেখিনি। তবে আপেল ও পিচ্ এই দুইটী বাগানই বেশী দেখতে পেয়েছি। তারা এই গাছের খুব যত্ন নেয়, তার তুলনায় আমরা যত্ন নিই না বল্লেই চলে। তারা গাছের গোড়ার মাটী আল্‌গা করে দেয় এবং জল ও রান্নাঘরের উচ্ছিষ্ট জিনিষ গোড়ায় ফেলে থাকে। তাহা সার হয়ে গাছের উন্নতির সুবিধা করে দেয়। প্রতি বৎসর তারা ঐরূপ করে। তা ছাড়া বাজারের সারও প্রয়োগ করে। আমের উন্নতির জন্য আমরা সেরূপ কিছু করি না। আমি শুনতে পেয়েছি এগ্রিকালচারেল পুসা ফারম আমের ফসল বাড়াবার জন্য কতকগুলি এক্‌সপেরিমেন্ট (পরীক্ষা) আরম্ভ করেছে। কতটা কি কাজ হয়েছে তার বিশেষ বিবরণ অবগত নই। সার দিলে আমের ফসল ও স্বাদ উভয়ই উন্নত হয়। আজকাল তেমন সুস্বাদু আম প্রায় হয় না। গাছে

পোকা লাগালে ক্যালসিয়াম আর্সেনাইটের স্প্রে দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। এইরূপ অনেক রকম ইন্‌সেক্‌টি-সাইডের (পোকা মাকড় মারবার ওষুধের) ব্যবস্থা আছে।

প্রঃ—সাধারণ ক্ষেতের চাষে কোনো নূতন প্রণালী অবলম্বিত হচ্ছে কি?

উঃ—এ সম্বন্ধেও অনেক পরিবর্ত্তন হচ্ছে। তবে বেশী উন্নতি না হওয়ার কতকগুলি কারণ আছে, প্রথমতঃ মজুরের অভাব। আগে যে মাহিনায় চাকর পাওয়া যেত, আজ-কাল তাতে পাওয়া যায় না। মাসিক ১৫ টাকার কমে পাইট পাওয়া যায় না। অনেক জায়গায় ১৫ টাকায়ও পাওয়া যায় না। এই রকম মাহিনা দিয়ে কৃষিকার্য্যে লাভ করা সম্ভব নয়। সেই জন্য কৃষিরও উন্নতি হয় না। অনেক গৃহস্থ নিজেরা চাষবাস না করে আধিদারকে জমি দেয় অর্থাৎ আধাআধি ভাগে পত্তন করে। তারা এটাকে অধিকতর লাভজনক মনে করে থাকে। এতে কৃষকদের, বিশেষতঃ মালদহ অঞ্চলের, জমির থেকে আয় অনেক কমে গিয়েছে। তার পর ড্রাই ফারমিং অর্থাৎ শাকসব্জী তরিতরকারী ফসলের দিকে ঝোঁক একটু বেশী পড়েছে। সেইজন্য সাধারণ চাষের কোন উন্নতি দেখা যায় না।

প্রঃ—আচ্ছা মজুর পাওয়া যায় না কেন?

উঃ—অনুসন্ধান করে জানলাম অনেক মজুর আজকাল কৃষক হয়ে পড়েছে। কাজেই তারা চাকুরী করতে রাজী নয়। তারপর হিন্দু মজুরের সংখ্যা দিন দিন কমে আসছে। সেই জন্য চাষের মজুরের অভাব হয়ে পড়েছে। তৃতীয়তঃ আজকাল অনেক মুসলমান জমি জায়গা আবাদ করে বড় বড় কৃষক হয়ে পড়েছে। তাদেরও পাইটের দরকার মোটের উপর পাইটের চাহিদা অনেক বেড়ে গেছে; কিন্তু জোগান সমানই আছে, বরং কমছে বলা যেতে পারে।

প্রঃ—পল্লীর মজুরেরা আশে পাশের চাষআবাদ ছাড়া অন্য কোন লাভজনক কাজ পাচ্ছে কি?

উঃ—আমার বোধ হয় পাচ্ছে। জীবনযাত্রার খরচ বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে অনেকে অনেক দিকে গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন পথে বেশী উপার্জ্জনের চেষ্টা করছে।

প্রঃ—কোথায় চাকুরী পাচ্ছে?

উঃ—অনেকে গ্রাম ছেড়ে সহরে গিয়ে কাজকর্ম্মের যোগাড় করেছে। কেহ কেহ রেল ষ্টীমারে কাজকর্ম্ম করে অর্থ উপার্জ্জন করছে। এই দুটী লাইন আমাদের অঞ্চলে সাধারণতঃ দেখা যাচ্ছে।

প্রঃ—আচ্ছা, এখন আমি মুসলমান চাষীদের অবস্থা জানতে চাই।

উঃ—মুসলমান চাষীর সংখ্যা, মালদহ ও পূর্ণিয়া দুই অঞ্চলেই হিন্দু অপেক্ষা বেশী এবং কাজকর্ম্মেও তারা খুব পরিশ্রমী। হিন্দুরা তাদের সমান পরিশ্রম করতে পারে না। মুসলমানদের সংখ্যা বেশী বেশী বৃদ্ধি হচ্ছে, কাজেই তারা মজুরের অভাব ততটা অনুভব করে না এবং সাধারণতঃ দেখতে পাওয়া যায় মুসলমানেরা যে সমস্ত জমি চাষআবাদ করে তাতে ফসলও হিন্দুদের জমির চেয়ে বেশী হয়ে থাকে, হিন্দুদের সামাজিক আইন কানুনের ফলে লাঙ্গল ধরা তাহাদের পক্ষে সম্ভব-পর নয়। ফলে তাহাদের অবস্থা দিন দিন হীনতর হচ্ছে এবং মুসলমানদের অবস্থা দিন দিন উন্নততর হচ্ছে।

প্রঃ—এখানে আমি আর একটী প্রশ্ন করতে চাই। চাষের কাজে পাইট নিযুক্ত করবার সময় হিন্দুরা কি একমাত্র হিন্দুদেরকে খোঁজে, আর মুসলমানরা কি একমাত্র মুসলমানদেরকে খোঁজে?

উঃ—মুসলমানরা সাধারণতঃ মুসলমান পেলেই নেয়। হিন্দুরা সে রকম তারতম্য করে না। যে সমস্ত মুসলমান নিজেদের জমি চাষবাস করে অন্যের চাকুরী করতে যাওয়া তাদের আবশ্যক হয় না, তারা তাতে রাজীও হয় না।

প্রঃ—তাহলে কি বুঝতে হবে যে মুসলমান-মজুর চাষের কাজে পাওয়া যায় না?

উঃ—হিন্দুদের চাইতে অনেক কম?

প্রঃ—তাহলে পল্লীগ্রামের প্রায় প্রত্যেক মুসলমানই কি স্বাধীনভাবে নিজ নিজ জমি চাষ করে?

উঃ—অধিকাংশ।

প্রঃ—মজুরী তাহলে করে কে ?

উঃ—অধিকাংশ হিন্দুকেই দেখতে পাওয়া যায়। তবে পূর্ণিয়া অঞ্চলে মুসলমানকেও দেখতে পাওয়া যায়।

প্রঃ—এবার আমি দেশের লোকের জীবনযাত্রা-প্রণালী সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করব। পল্লীগ্রামের চাষী, মজুর এবং মধ্যবিত্ত গৃহস্থ এই ৩ শ্রেণীর জীবনযাত্রা সম্বন্ধে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্রভাবে জানতে চাই। প্রথমতঃ খাওয়া-দাওয়ার জিনিষপত্র সম্বন্ধে। ১৫ বৎসরের ভিতর কোনো উঠা-নামা দেখতে পাওয়া গেছে কি ?

উঃ—আমি হিন্দুদের কথা বলছি। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের মধ্যে খাওয়া-দাওয়ার পরিবর্ত্তন অনেক হয়েছে। আগে যেমন খেতো তার চাইতে বেশী খাওয়া-পরার দিকে ঝোঁক হয়েছে। "বেশী" শব্দে "রকমারি" বুঝতে হবে। নানা জিনিষের দিকে ঝোঁক পড়েছে। আগে যত রকম খাবার খেতো আজ কালকার নমুনা তার চাইতে বেশী। "সহুরে" ভাবটা পাড়াগাঁয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভিতর ঢুকেছে। আগে যেমন ভাত ডাল খেয়ে সন্তুষ্ট হত, এখন তা নাই। এখন ভাত, ডাল, ও ২।৩টী তরকারী না হলে চলে না। সকলেই একটু মাছের ঝোল ও ২।৩ রকম তরকারী পেতে চেষ্টা করে। কিন্তু দুধ ঘীর অভাব পাড়াগাঁয়ে খুব বেশী, যদিও সহরের মত নয়। সেইজন্য দুধ ঘীর ব্যবহার আগের সমান অথবা কিছু কম হওয়া সম্ভব।

প্রঃ—আগেকার দিনে পল্লীগ্রামের সব লোক বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণী দুধ ঘী খেতো কি ? আর এখনই বা খায় না কেন ?

উঃ—সকলে খেতো এটা বলা ঠিক নয়, অন্ততঃ মজুরেরা সাধারণতঃ দুধ ঘী পেত না। আজকাল গরুর অবস্থা খারাপ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুধ ঘী পাওয়াও দুষ্কর হয়ে উঠেছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থা এখন আর আগের মত নাই। কিন্তু মজুরদের আর্থিক অবস্থা ভাল হওয়ায় তারা মধ্যে মধ্যে দুধ ঘী কিনে খেয়ে থাকে। মধ্যবিত্তের ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব্ লিভিং" বেড়েছে আয় কমেছে। তাদের অবস্থা শোচনীয়। সেই হিসাবে মজুরের অবস্থা আগের চাইতে অনেক ভাল। তারা আগের চাইতে ভাল ঘরে থাকে, ভাল কাপড়চোপড় পরে, বেশী খায়, কম খাটে। তাদেরকে জোর করে কাজ করান কি মারধর করা এক রকম উঠে গিয়েছে।

প্রঃ—আচ্ছা, পল্লীগ্রামে লোকজনের কাপড় চোপড় ব্যবহার সম্বন্ধে ১৫ বৎসরের ভিতর কোন পরিবর্ত্তন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কি ?

উঃ—এদিকেও পরিবর্ত্তন বেশ লক্ষ করেছি। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেয়েদের মধ্যে সহরের মেয়েদের মত সেমিজ পরবার ঝোঁক দেখতে পাচ্ছি। ছেলেদের মধ্যে নূতন নূতন ধরণের শার্ট কোট পরবার ঝোঁক দেখা যায়। কায়দা করা, কুচি করে কাপড় পরা, পাড়ের বাহার দেখান—এ সকল দিকে খেয়াল খুব বেশী। মজুর-চাষীদের স্ত্রীলোকেরাও আগে যে কাপড় পরত তার চাইতে ভাল কাপড় পরে, এমন দেখতে পাচ্ছি, যে সমস্ত মজুর অবস্থাপন্ন হয়েছে তাদের মেয়েদের মধ্যে সাড়ীর ব্যবহার পর্য্যন্ত আরম্ভ হয়েছে।

প্রঃ—শীতকালের পোষাক সম্বন্ধে মজুর ও চাষীদের অবস্থা কি রকম ?

উঃ—মজুরদের মধ্যে শীতবস্ত্র অনেক বেড়েছে। অনেকে বেশী দামের কম্বল প্রভৃতি ব্যবহার করছে। আগে তা জুটত না। জুতা মোজার ব্যবহার আজকাল পাড়াগাঁয়ে অনেক বেশী। আগে লোকেরা খালি পায়ে পায়খানায় যেত, এখন জুতা পরে যায়। বর্ষাকালে ছাতার ব্যবহার খুব বেড়েছে। লণ্ঠনের চলন বেড়েছে, আগে লোকে অন্ধকারে চলতে ভয় পেতনা। এখন জার্ম্মাণ ডীট্‌স্ ও আমেরিকার লণ্ঠন ঘরে ঘরে দেখতে পাবেন। সাবানের ব্যবহার অনেক বেশী হয়েছে। আগে গৃহস্থেরা সাজী মাটী ব্যবহার করত। এখন তার পরিবর্ত্তে সাবান ব্যবহার করে।

প্রঃ—চাষী এবং মধ্যবিত্ত মহলে কাপড় ধোলাই করবার রেওয়াজ বেড়েছে কি ?

উঃ—আগে যারা কোন দিন ধোবাবাড়ী কাপড় পাঠাত না,

এখন তারা পাঠাচ্ছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের আবার ইস্ত্রি করা কাপড় না হলে চলে না। সেজন্য গ্রামের ধোবারা আজকাল ইস্ত্রি করতে আরম্ভ করেছে।

প্রঃ—এইবার ঘরবাড়ী সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই।

উঃ—ঘর বাড়ীর অবস্থা আগের চাইতে অনেকটা ভাল বোধ হয়। ১৫ বৎসর পূর্ব্বে আমাদেরগ্রামে আমি টিনের ঘর দেখি নি। আজকাল অনেক হয়েছে। তার কারণ—(১) চাষাবাদ-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঘাসের অভাব ঘটেছে; সেইজন্য ঘাসের দাম অনেক স্থলে আগের চাইতে প্রায় ১০ গুণ বেশী হয়েছে। বেশী দাম দিয়ে ঘাস কিনে খড়ের ঘর করার চাইতে টিনের ঘর করা অনেক ভাল বলে তাহারা মনে করে, (২) খড়ের ঘরে অনেক ভয় আছে—পুড়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়, বৎসর বৎসর চালা বদলাতে হয়। টিনের ঘরে সেরূপ ভয় নাই।

প্রঃ—এই যে নূতন নূতন টিনের ঘর হচ্ছে, একি কেবল মধ্যবিত্ত শ্রেণীই করছে ?

উঃ—না, অনেক কৃষকও করছে, হিন্দু মুসলমান দুইয়েই করছে। বোধ হয় মুসলমান কৃষকই বেশী করছে।

প্রঃ—মেঝেগুলি কিসের হয় ?

উঃ—মাটীর।

প্রঃ—দেওয়াল ?

উঃ—আগে মাটীর ছিল, এখনো অনেক জায়গায় তাই আছে। বাঁশের ব্যবহারও চলছে। কাঠের ব্যবহার এখনও হয় নি। শীঘ্রই হবে। পূর্ণিয়ার অবস্থা মালদহের মত। সেখানেও টিনের ব্যবহার বাড়ছে। মোটের উপর হিন্দু মধ্যবিত্তের অবস্থা আগের চাইতে অনেক খারাপ।

প্রঃ—গরু চরাবার ব্যবস্থা পল্লীগ্রামে কি রকম ?

উঃ—খুব ভাল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন। আমার মনে হয়, মাঠের অভাবই গরু লোপ পাওয়ার একটী প্রধান কারণ। আগে অনেক মাঠ পতিত থাকত। গরু চরাবার কোন অসুবিধা ছিল না। এখন সমস্ত মাঠ আবাদ হয়েছে আমেরিকার কৃষকদের মত এদেশের লোক গরু-পালনের নিয়ম জানে না। আমেরিকায় যার ১৮০ বিঘা জমি থাকে সে অন্ততঃ ২০ বিঘা জমি গরু চরাবার জন্য অথবা গরুর খাদ্য উৎপাদন করবার জন্য রাখে। আমাদের কৃষকেরা কিছুই করে না। আজকাল মাঠে নিয়ে গরু পোষা কষ্টকর। অনেক গোআলা, যাদের আগে ১০০টী গরু ছিল নিজ চক্ষে দেখেছি, তাদের বাড়ীতে এখন ২৫টী গরুও নাই। গরুর এবং হালের বলদের দাম বিশেষভাবে বাড়ছে। আগে যে জায়গায় ১৫।২০ টাকায় একটী বলদ পাওয়া যেত, এখন সে জায়গায় ৭৫ টাকার কমে পাওয়া যায় না। এই সকল কারণে এবং বাংলাদেশে মজুরের অভাব হেতু আজকাল যন্ত্রপাতির দিকে লোকের ঝোঁক পড়েছে।

প্রঃ—পল্লীতে পাখী, ডিম, মাছ, এবং মধু এই ৪ জিনিসের ব্যবসা কি রকম চলে ?

উঃ—মধুর চাষবাস কিছু হয় না; তবে মাছের দিকে ঝোঁক দেখা যায়। জলাভাব হেতু মাছের অভাব আগের চাইতে বেশী। পুকুরে পুকুরে মাছের চাষ যাতে বাড়ান যায় তার দিকে শিক্ষিত যুবকদের দৃষ্টি পড়েছে। তাতে লাভও আছে। পাখী এবং ডিমের চাষ মালদহের একটা গ্রামে দেখেছি। হিন্দুর বাড়ীতে মুর্গীর চাষ সামাজিক নিয়মের বিরোধী; তবু কেহ কেহ তা করছে। সমাজ তাদের বিশেষ কিছু করতে পারে নি। কিন্তু ব্যবসাটা লাভজনক হয় নি, কারণ বেয়ারাম হওয়ায় অনেক পাখী মরে গিয়েছে। শেষ পর্য্যন্ত লাভ হয় নি। আমার বোধ হয় দক্ষতার সহিত চালাতে পারলে এই ব্যবসায়ে লাভের সম্ভাবনা আছে। পাখীর ও ডিমের ব্যবসা—যেমন হাঁস ও মুর্গীর ডিম—মুসলমানদের মধ্যে বহুকাল থেকে চলে আসছে। বিদেশ থেকে ফিরে এসে আমি শুনতে পেলাম, আমাদের অঞ্চলের হিন্দু যুবকেরা একটা পৌলট্রি ফারম পর্য্যন্ত আরম্ভ করেছে। এটা অবশ্য সমাজের বিধি-বহির্ভূত কাজ। তারপর গ্রামে গ্রামে অনেক পুকুর আছে, জল থাকে না, সেজন্য জায়গায় জায়গায় টিউব ওয়েল (নলকূপ) করালে মন্দ হয় না। অনেকে তা করতেও রাজী আছে। এ ছাড়া অল্প একটু খনন করলে পুকুরও ভাল হতে পারে।

প্রঃ—জমির চাষের জন্য জল সাধারণতঃ আসে কোথা থেকে ?

উঃ—মালদহ ও পূর্ণিয়া অঞ্চলের কৃষকেরা জমির চাষের জন্য সম্পূর্ণরূপে বৃষ্টির উপর নির্ভর করে। সেই জন্য বৃষ্টির অভাব হলে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণও কমে যায়। আমি এমনও দেখেছি, জমির দু'ধারে জল রয়েছে অথচ জলের অভাবে ফসল হয় না। আমার মনে হয় অল্প দামের "পাম্প" ব্যবহার করলে অবাধে জমিতে জল সরবরাহ হতে পারে। মালদহ অঞ্চলে বৃষ্টির অভাবে ভাদই ফসল—যেমন ধান প্রভৃতি; অনেক বিলম্বে আবাদ হয়ে থাকে। সেই জন্য কাটবার সময় বন্যা এসে ফসল নষ্ট করে দেয়। এই রকম বন্যায় আমাদের মালদহ অঞ্চলে বছরে লক্ষ টাকার বেশী ফসল নষ্ট হয়ে থাকে। উপর্য্যুপরি ৩ বৎসর বন্যা হলে কৃষকের অবস্থা ভয়ানক খারাপ হয়। এটা দূর করবার পন্থা কৃত্রিম উপায়ে জল সেচন করা, এবং কিছু আগে ফসল উৎপাদনের চেষ্টা করা অর্থাৎ চৈত্র মাসে যদি জমি আবাদ হয় তাহলে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে ফসল কাটা হতে পারে। সাধারণতঃ বন্যা আষাঢ় অথবা শ্রাবণের পূর্ব্বে আসে না। আবার, বৃষ্টির অভাবে জমিতে এক রকম পোকা দেখা যায়। সময় মত জল পেলে এই পোকা বাঁচতে পারে না। কাজেই জলাভাব মোচন করা আমাদের একটী প্রধান কাজ।

প্রঃ– পাম্প ও টিউব ওয়েলের ব্যবহার বাড়াবার উপায় কি ?

উঃ—খরচের দিক্ থেকে দেখতে গেলে বাড়াবার অন্তরায় কিছু দেখতে পাই না। কারণ গ্রামে অনেক মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন লোক বাড়ীতে বাড়ীতে ইন্দারা দিয়া থাকে। এক একটা ইন্দারার খরচ ১০০০৲ টাকা। টিউব ওয়েল ৫০০ টাকায় হতে পারে অর্থাৎ একটী ইন্দারার খরচে ২টী টিউব ওয়েল হতে পারে। পাম্প ৪০।৫০ টাকায় পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে পাম্প ব্যবহার করলে জলাভাব মোচন করা যেতে পারে। এইরূপ এবং তদপেক্ষা কিছু বেশী দামের পাম্পের ব্যবহার দিন দিন বেশী প্রবর্ত্তন করলে কৃষকের উপকার হবে।

প্রঃ—এইবার পল্লীগ্রামের লোক-সংখ্যা সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন করতে চাই। প্রথমে বুঝা গেল হিন্দু এবং মুসলমান মজুর চাষী ও মধ্যবিত্ত, সকলেরই খাওয়া-পরা, বাড়ীঘর সবদিকে উন্নতি হচ্ছে; অথচ দেখা যাচ্ছে কোন কোন চাষী খাটাবার জন্য পাইট পায় না। তাহলে কি বুঝতে হবে যে এই সকল পল্লীতে লোকের অভাব আছে অর্থাৎ আরো বেশী লোক যদি থাকত তাহলে সুখেস্বচ্ছন্দে তারা কাজ পেত ?

উঃ—হাঁ, আমার বিশ্বাস তাই। আমি যে পল্লীর কথা বলেছি তাতে বেশী লোক যদি মনোযোগ দিয়ে কাজ করে তবে তারা বেশী রোজগার করতে পারবে এবং সুখে স্বচ্ছন্দেও থাকবে, আর কৃষকেরাও বেশী ফসল উৎপাদন করতে পারবে। তাতে দেশেরও ধনবৃদ্ধি হবে। যে সব জায়গায় বেশী মজুর পাওয়া যায় সে সব জায়গা থেকে মজুর আন্‌লে ভাল হয়।

প্রঃ—তাহলে আমাদের দেশের লোক-সংখ্যা বেশী এ কথা বলা চলে কি ?

উঃ—এ সম্বন্ধে আমি চিন্তা করেছি। কিছু বুঝতে পারছি না। কোন কোন জায়গায় লোকের অভাব। আবার শুনতে পাই কোন কোন জায়গায় কাজ পায় না এবং কষ্টে সৃষ্টে চালাচ্ছে। আমি যে কয়টা পল্লী দেখেছি তাতে লোকের খুব অভাব অর্থাৎ সে সকল জায়গায় আরো বেশী লোক অন্নবস্ত্র পেতে পারে। বাইরের থেকে লোক এই সকল জায়গায় গিয়ে চাষের দ্বারা পতিত জমিকে উর্ব্বর ভূমিতে পরিণত করতে পারে। তাতে অর্থাগমও হবে বিস্তর।

প্রঃ—এমন অবস্থা কখনও দেখা যায় কি যে,—২০।২৫।৫০ মাইল দূর থেকে মজুরেরা বৎসরে কয়েক মাস এসে কোনো জায়গায় খেটে আবার অন্য জায়গায় চলে যায় ?

উঃ—এই অবস্থা অনেক দিন ধরে মালদহ অঞ্চলে আছে। মালদহের যে অঞ্চলের কথা আমি বলছি, সেখান হতে ধানের দেশ বরিন্দ্ ভূমি বেশী দূরে নয়। প্রত্যেক বৎসর ধান কাটার সময় অনেক দূর থেকে হাজার হাজার মজুর বরিন্দ্ অঞ্চলে যায় এবং ধান কেটে ভাল

রকম মজুরী লয়ে দেশে ফিরে আসে। তাতে অনেকের এমন লাভ হয় যে, প্রায় বৎসরের খরচ ২ মাসের খাটুনিতে প্রাপ্তি হয়ে থাকে। এই সমস্ত লোক বরিন্দ্ অঞ্চলে না গেলে সেখানকার ধান কাটা হত না। এতেও বেশ বুঝা যায়, কোন কোন অঞ্চলে মজুরের খুব অভাব আছে এবং অন্য কোন কোন অঞ্চলে মজুরের সংখ্যা বেশী। আমি যে সব জায়গায় ঘুরেছি কোথাও মজুরের সংখ্যা বেশী দেখতে পাই নি, বরং অভাবই দেখেছি।

প্রঃ—আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করবার রেওয়াজ মালদহ কিংবা পূর্ণিয়া অঞ্চলে দেখা যায় কি ?

উঃ—এ সব দিকে চিন্তা অনেকেই করছে এবং কার্য্যতঃ এক জায়গায় মেশিন ট্র্যাক্টরের ব্যবহার ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। আমি যে জায়গার কথা বলছি, পরাণপুর হতে উহা মাত্র ৪ মাইল দূরে। এক জন ইংরেজ এখানকার জমিদার। প্রায় ৩০০ বিঘা জমি তাঁহার চাষের মধ্যে আছে। ২০ খানি লাঙ্গল ও তাহার আবশ্যক সরঞ্জাম অর্থাৎ ৪০টি বলদ, ২০ জন লোক ইত্যাদি ইত্যাদি ছিল। এই ভাবে তিনি কৃষিকার্য্য করতেন। কিন্তু কোন দিন লাভ করতে পারেন নি। গত ২ বৎসর যাবৎ তিনি কৃষিকার্য্যের দিকে বিশেষ ভাবে ঝুঁকেছেন।

প্রঃ—৩০০ বিঘা জমি চষতে তাঁহার খরচ কত হত ?

উঃ—৪০টী বলদের দাম কমসে কম ৩০০০ টাকা, ২০ জন লোকের মাসিক বেতন প্রায় ৩০০ টাকা, তা ছাড়া ইহাদের খোরাক খরচ আছে। মেশিন ট্র্যাক্টরের দ্বারা অনেক কম খরচে এখন চাষাবাদ করতে আরম্ভ করেছে।

প্রঃ—এই ট্র্যাক্টর চালাতে কত লোক এবং কত টাকা খরচ হচ্ছে ?

উঃ—আমি যদ্দূর শুনেছি ট্র্যাক্টরের দাম ১৯০০ টাকা, "হ্যারো" বা কলের মইয়ের দাম ১৭০০ টাকা, "সোয়ার" বা ফসল বুনবার যন্ত্রের দাম প্রায় ১৩০০ টাকা, একজন ড্রাইভারের মাহিনা ৬০ টাকা। মোটের উপর ৫ হাজার টাকায় গিয়ে পড়ে। এই যন্ত্র দ্বারা ঘণ্টায় প্রায় দুই বিঘা জমির চাষ সম্পূর্ণরূপে হতে পারে। এবং বিঘা প্রতি ৫।৬ টাকার বেশী খরচ পড়ে না। হাঙ্গামা অনেক কমে গেছে, কাজ ভাল হচ্ছে, চাষ অতি সুন্দর হয়, যা আমাদের দেশী হালের দ্বারা কিছুতেই হতে পারত না।

প্রঃ—আসল যারা চাষী তারা ট্র্যাক্টর দেখে এর উপকারিতা বা সু-কু সম্বন্ধে কি মত প্রকাশ করে ?

উঃ—আপনি যে প্রশ্ন করেছেন সে জিনিষ বুঝবার জন্য আমি নিজে ট্র্যাক্টরের কাজ দেখতে মথুরাপুর গমন করি। সঙ্গে আমার গ্রাম থেকে প্রায় ১৪ জন কৃষক, মজুর ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোককে নিয়ে গিয়েছিলাম। তাদের সামনে সেখানকার সাহেব নিজে ট্র্যাক্টর চালিয়ে দেখিয়েছিলেন। সাহেবের সঙ্গে ঘণ্টাখানেক আলাপ হয়। তিনি ট্র্যাক্টরের ব্যবহার সকলকে দেখিয়ে দেন। দেখে সকলেই স্বীকার করল, এই রকম কলের হালে আমাদের হালের চাইতে কম খরচে ভাল চাষ হইবে।

প্রঃ—মামুলি হালে চাষের অসুবিধা কি কি ?

উঃ—তাতে ৬ কি ৮ ইঞ্চির বেশী গভীর চাষ করা যায় না। এবং জমির সার চারি দিকে ভাল ভাবে বিস্তৃত হয় না, ট্র্যাক্টর দ্বারা ১২ ইঞ্চির বেশী গভীর চাষ হয়ে থাকে এবং জমিতে যদি জঙ্গল থাকে সে সব আলগা ভাবে কাটার আবশ্যকতা হয় না কারণ; ট্র্যাক্টর সেগুলি তুলে ফেলে দেয়। তার পর কলে মই দেবার সময় জঙ্গলগুলি এবং আগাছা প্রভৃতি এত কুচি কুচি করে কাটা হয়ে যায় যে তাদের আবার বর্দ্ধিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না; কিন্তু আমাদের দেশী মইয়ে তা হয় না। সেই জন্য নিড়ানের সময় বিঘা প্রতি ৫ টাকা পর্য্যন্ত নিড়ানীর খরচ পড়ে। চাষের পূর্ব্বে জঙ্গল কাটার খরচ ২ টাকা থেকে ৩ টাকা পর্য্যন্ত কিন্তু ট্র্যাক্টরে সব খরচ মিলিয়ে বিঘা প্রতি ৬ টাকার বেশী পড়ে না। এই অবস্থায় ট্র্যাক্টরের সুবিধা সম্বন্ধে বেশী বলা অনাবশ্যক।

প্রঃ—এত গভীর যেখানে জমির চাষ সেখানকার জমির প্রাকৃতিক উর্ব্বরতা শীঘ্রই লোপ পায় না কি ?

উঃ—যে উর্ব্বরতা আছে তাতে ২।৩টী ফসল অক্লেশে পাওয়া যায়। গোবর, ছাই প্রভৃতি সার ব্যবহার করলে কিছু বেশী ফসল পাওয়া যেত। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে আমরা কলের যন্ত্র ব্যবহার করব সেই মুহূর্ত্তে রাসায়নিক ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তবে পূর্ণিয়া মালদহ প্রভৃতি অঞ্চলের যে সমস্ত জমি বন্যায় ডুবে যায়, তাতে কৃত্রিম সার প্রয়োগ না করলেও চলে। মান্ধাতার আমল থেকে আমাদের দেশের কৃষকদের কি বদ অভ্যাস হয়ে গেছে তারা বিনা সারে ফসল উৎপাদন করতে যায়। সে ভাবে কৃষিকার্য্য করা আর চলবে না। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকার্য্য চালাবার বন্দোবস্ত করতে হবে।

প্রঃ—বড় ট্র্যাক্টর যন্ত্রে ৩০০ বিঘা জমি চষতে কতদিন লাগে?

উঃ—আমি আলাপ করে জানলাম গড়ে ঘণ্টায় প্রায় ২ বিঘা জমির চাষ আবাদ অনায়াসে করা যায়। কাজেই ৩০০ বিঘা জমি চাষ করতে ২০।২৫ দিনের বেশী লাগা উচিত নয়।

প্রঃ—যন্ত্র তা হলে পরে পড়ে থাকে?

উঃ—যন্ত্র ভাড়া দিতে পারা যায়। যে সাহেবের কথা বল্লাম তিনি ভাড়া দিতে প্রস্তুত আছেন। বিঘা প্রতি ৫।৬ টাকা রেট করতে চান। অনেক কৃষক এই ভাবে কল ভাড়া নিয়ে যদি জমি চাষ করে তবে কম খরচে হবে এবং পাইটের তোষামোদ করতে হবে না। বিশেষতঃ যে সকল হিন্দু গৃহস্থ নিজে হাল ধরতে প্রস্তুত নয় তাদের পক্ষে এটা খুবই লাভজনক।

প্রঃ—কলের লাঙ্গল সুরু হওয়া মাত্র মজুরেরা বেকার হয়ে পড়বে না কি?

উঃ—খুব সম্ভব পড়বে। অনেকে তাই মনে করেন। আমার বোধ হয় পরে আপনা আপনি একটা ওলটপালট্ ও সামঞ্জস্য হয়ে যাবে। মজুর বেশী হলে যে সমস্ত জায়গায় মজুরের অভাব তাহারা তথায় গিয়ে বসবাস করবে। এতে মনে হয় কাহারো ক্ষতি হবে না। জমি থেকে বেশী ফসল হলে কৃষকের জীবনযাত্রা-প্রণালী বেড়ে যাবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হবে। কাজেই মজুরের চাহিদা বেড়ে যাবে—যা অন্যান্য দেশে হয়েছে। ট্র্যাক্টর সম্বন্ধে যে সমস্ত সুবিধার কথা বল্লাম তা ছাড়া আরো সুবিধা আছে, যে ট্র্যাক্টর দিয়ে চাষ করা হয় তাকে অন্যান্য অনেক কাজে লাগান যেতে পারে। ফসল তৈয়ারী করবার সময় সেই ট্র্যাক্টর ব্যবহার করা চলবে। গরুর দরকার হবে না। এই ট্র্যাক্টর দিয়ে আমাদের দেশে জায়গায় জায়গায় আখের আবাদ আরম্ভ হয়েছে। এতে যথেষ্ট লাভ আছে। কমসে কম বিঘা প্রতি একশ' টাকা লাভ থাকে। আখ পাকলে কলে প্রেস করে রস বাহির করতে হয়। এই জন্য আমাদের দেশের কৃষককে অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হয়। গরু দিয়ে প্রেস করাতে হয়। তাতে কাজ ভাল হয় না—যথেষ্ট রস বাহির হয় না, হাঙ্গামাও আছে বিস্তর। "মেশিন ক্রাশার" ব্যবহার করলে সহজেই বেশী রস বাহির করতে পারা যায়, লাভও বেশী হয়। ট্র্যাক্টর দ্বারা তেলের কল, চাউলের কল ইত্যাদি চলতে পারে। বিজলীবাতির জন্যও ইহা ব্যবহৃত হতে পারে। অর্থাৎ এই ট্র্যাক্টর একটা শক্তি-কেন্দ্রবিশেষ। যেখানেই যন্ত্রশক্তি দরকার সেখানেই এটা ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রঃ—ট্র্যাক্টর বল্লে সাধারণতঃ আমরা হাল বুঝি। কিন্তু হাল চালাবার শক্তিটাও তার ভিতর বুঝতে হবে কি?

উঃ—ট্র্যাক্টর বলতে আমরা মনে করি হাল এবং হালকে টানবার এঞ্জিন। নানান রকম ট্র্যাক্টর বাজারে পাওয়া যায়। কোন্ জমিতে কোন্‌টা ভাল হবে সেটা দেখে কৃষকের ট্র্যাক্টর কেনা উচিত।

প্রঃ—বিগত ১০।১৫ বৎসরের ভিতর নূতন নূতন জমি, কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে কি?

উঃ—অনেক নূতন জমি আবাদ হয়েছে এবং আরো হবার ব্যবস্থা হচ্ছে।

প্রঃ—কি রকম ব্যবস্থা আজকাল হচ্ছে?

উঃ—একটা বিষয় বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে পারি। আমি মালদহে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার জে, পেডীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কয়েকটা খবর পেয়েছি। সে সব

বাস্তবিকই আনন্দদায়ক। মালদহের একটা অঞ্চলে প্রায় ২০ হাজার বিঘা জমি বন্যার সময় জলে ডুবে যায়। জল কমে গেলে তাতে চাষ আবাদ করে ফসল ফলান যেতে পারে। কিন্তু হিন্দু কৃষক যারা তার আশে পাশে বহুকাল ধরে বাস করছে, তারা এবিষয়ে কিছুই করে নি। কিন্তু নূতন কতকগুলি মুসলমান চাষবাস আরম্ভ করেছে। মালদহের ইরিগেশন সার্ভেয়ার, যাঁকে পেডী সাহেব গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে লেখালেখি করে এনেছেন, তাঁর কাছে অবগত হলাম মুচিয়া অঞ্চলে অনেক ছোট ছোট "দাঁড়া", নর্দমা বা খাল আছে। ঐ ২০ হাজার বিঘার মধ্যে এই সকল খাল, দাঁড়া প্রভৃতি রয়েছে, যাতে জল বসে থাকে। এই জল যখন ক্রমশঃ কমতে আরম্ভ হয় তখন জমি দুই পাশে জাগতে থাকে। সেই সময় জমিতে এক রকম ধান হয় যাকে বোরো ধান বলে। এই ফসলের জন্য অনেক জলের দরকার হয়। পাশেই জল রয়েছে, কাজেই জলের অভাব হয় না। এই জল যেমন যেমন কমতে থাকে বেশী বেশী জমি চাষ হতে থাকে। কিন্তু ফসল যখন কাটবার মত হয় তখন সব জল শুকিয়ে নদীতে গিয়ে পড়ে। কাজেই তখন আর জল দিবার উপায় থাকে না। ফসল নষ্ট হয়ে যায়। পেডী সাহেব এই দাঁড়ার মুখ বন্ধ করে দেবার চেষ্টা করছেন। এতে ৮।১০ হাজার বিঘা জমিতে চাষ আবাদের আর কোন ক্ষতি হবে না। এই রকম আর একটা প্রস্তাব মালদহের পরাণপুর আড়াইডাঙ্গা অঞ্চলে চলছে যা খুব প্রশংসনীয়। এই অঞ্চলের যে সমস্ত জায়গা বন্যায় ডুবে যায়, তার পরিমাণ ৮ থেকে ১০ হাজার বিঘা হবে। এই জায়গার জল মহানন্দা থেকে ২।৩টী নালার ভিতর দিয়ে আসে। এই নালার মুখ যদি বন্ধ করে দেওয়া যায় তা হলে এই ৮।১০ হাজার বিঘার ফসল সহজেই বাঁচান যায়। ফসল কাটার পর মুখ ভেঙ্গে দিলেই জল আসবে; মাছের আমদানি হবে। এইভাবে শেষ পর্য্যন্ত যে জলের দরকার তা পাওয়া যেতে পারে।

প্রঃ—দেখা যাচ্ছে মুচিয়া অঞ্চলে জল থাকে না বলে ফসল নষ্ট হয় আর ওখানে জল অতিমাত্রায় আসে বলে ফসল নষ্ট হয়। ব্যবস্থা দুইয়েরই এক ?

উঃ—পরাণপুর অঞ্চলের "দাঁড়া"গুলি নিজের চক্ষে দেখবার জন্য কয়েকজন জমিদারের কর্ম্মচারী ও চাষীর সঙ্গে ঐ অঞ্চলে একদিন যাই। দেখে বেশ বুঝেছি যে কয়েকটী নালার মুখ বন্ধ করে দিলে ফসল রক্ষা করা যেতে পারে। খরচ দুই-এক হাজার টাকার বেশী হবে না।

প্রঃ—এইবার ট্র্যাক্টরের সঙ্গে জমির খাপ খাওয়া সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন আছে। ট্র্যাক্টর কি সব মাটীতে চলতে পারে ?

উঃ—না, যে জমির ৫।৬ ইঞ্চি নীচে এটেল মাটী বা বালি আছে, যেমন বারিন্দের জমি—তাতে ট্র্যাক্টর চলতে পারে না। চালালে জমি নষ্ট হবে। কাজেই এই সমস্ত জায়গার জন্য ট্র্যাক্টর নয়। বারিন্দের জমি চাষ করতে আমাদের লাঙ্গলই বেশ। চাষের বেশী দরকার হয় না। ফসল জন্মাতে যথেষ্ট জলের দরকার হয়। পূর্ব্বে খুব বৃষ্টি হত ফসলও ভাল হত, আজকাল বৃষ্টি না হওয়ায় ফসলের অবস্থা খুব খারাপ হয়েছে। মালদহ কেন, অন্যান্য অঞ্চলের অবস্থাও তাই। আমার মনে হয় বৃষ্টি-নিরপেক্ষ হয়ে বেশী ফসল ফলাতে হলে পাম্প ও টিউব ওয়েলের সহায়তা গ্রহণ করতে হবে।*

* শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার চৌধুরী কর্ত্তৃক শর্টহাণ্ডে লিখিত।
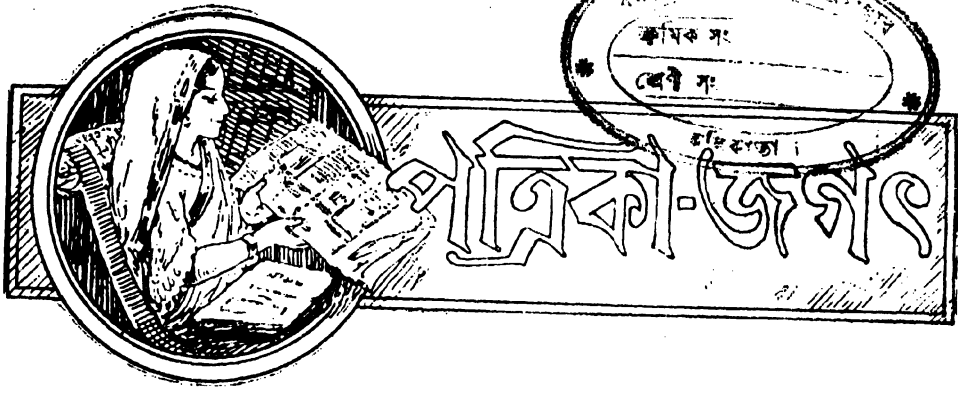
চাই ভারতে বিদেশী মাথার ঘী

এই অধ্যায়ে যে সকল দেশী-বিদেশী দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক বা ত্রৈমাসিক বিবৃত হয় সেই সবই "আর্থিক উন্নতি"র অন্যান্য অধ্যায়ের খোরাক জোগাইয়া থাকে। "পত্রিকাজগৎ" অধ্যায়টা আমাদের আধ্যাত্মিক মেরুদণ্ড। সংবাদকে সংবাদ, ইতিহাসকে ইতিহাস, দর্শনকে দর্শন, কর্ম্ম-কৌশলকে কর্ম্ম-কৌশল সব-কিছুই আমরা প্রধানতঃ বিভিন্ন পত্রিকা ঘাঁটিয়া সংগ্রহ করি। লোকজনের সঙ্গে গা ঘেঁসাঘেঁসি করিয়াও কিছু কিছু তথ্য লাভ হয় এবং তত্ত্বজ্ঞান জন্মে। কিন্তু বইয়ের নাম, ধাম, বিবরণ, সমালোচনাও অনেক সময়ে পত্রিকার সূত্রেই আমাদের হস্তগত হয়। "বই কেনা" "রূপচাঁদের" খেলা,—বলাই বাহুল্য।

আমাদের মফঃস্বলের সাপ্তাহিক পত্রিকাসমূহ মাঝে মাঝে বিশেষ কাজে লাগে। একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পাঠকেরা নিজেই তাহা লক্ষ্য করিয়াও থাকিবেন।

বিদেশী কাগজপত্রগুলা আমাদের বাংলাদেশের প্রত্যেক জেলায় অন্ততঃ আটদশখানা করিয়া মজুদ হইতে থাকিলে আমরা যারপর নাই সুখী হইব। মফঃস্বলের কেন্দ্রে কেন্দ্রে, বড় লোকের বাড়ীতে অথবা সার্ব্বজনিক গ্রন্থশালায় কিংবা স্কুল-কলেজে এই সকল পত্রিকা ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা হইতে কিনিয়া আনিয়া রাখিবার ভাবুকতা চাই। ফ্রান্স, জার্ম্মাণি ইত্যাদি দেশ পর্য্যন্ত ধাওয়া করা সম্প্রতি বোধ হয় সম্ভব নয়।

এখনো বহুকাল পর্য্যন্ত যুবক ভারতকে বিজ্ঞানের রাজ্যে বিদেশী মাথার উপরেই,—পুরাপুরি না হইলেও অনেক পরিমাণে—নির্ভর করিতে হইবে। বিদেশী মগজে যে ঘী আছে তাহা শুষিয়া আত্মপুষ্টি করিতে পারিলেই সম্প্রতি আমরা আমাদের চলনসই কর্ত্তব্য-পালন করিতে পারিব। অন্যান্য বিদ্যার মতন, আর্থিক উন্নতি-বিষয়ক বিদ্যায়ও ইয়োরামেরিকার পণ্ডিতেরাই আমাদের গুরু। স্বাধীন চিন্তা, গবেষণা এবং আবিষ্কারের দৌড় বেশী নয়। সুতরাং বিদেশী লোকজনের চিন্তা এবং কর্ম্মরাশি যত বেশী বাংলার পল্লীতে পল্লীতে ছাত্রবৃত্তি-পাশকরা আর বি, এ-ফেলকরা অর্থাৎ "শিক্ষিত" নরনারীর রপ্ত হয় ততই দেশোন্নতির পক্ষে মঙ্গলকর। আজ "সজ্ঞানে" বিদেশের নিকট আধ্যাত্মিক গোলামি করিতে প্রস্তুত না থাকিলে যুবক ভারত কোনো দিন জ্ঞান-বিজ্ঞানের দুনিয়ায় স্বরাজ দখল করিয়া সাম্রাজ্য গড়িতে পারিবে না।

এইখানে মনে রাখা আবশ্যক যে, ভারতের—আর সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশের—বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে বি,এ, এম,এ শ্রেণীর ছাত্রেরা ধনবিজ্ঞান সম্বন্ধে যাহা-কিছু শিখিয়া থাকে সে সবই,—ষোল আনাই,—ইয়োরামেরিকান পণ্ডিতদের রচনার চুম্বকমাত্র। আমাদের মাষ্টার মহাশয়েরা ছাত্রদিগকে বিদেশীদের বই অথবা বইয়ের সংক্ষিপ্তসার মুখস্থ করাইতেই অভ্যস্ত। কাজেই দেশের যে-সকল নরনারী কলেজের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সিঁড়ি মাড়াইতে অধিকারী নয় তাহাদিগের জন্য জেলায় জেলায় বিদেশী গ্রন্থ-পত্রিকার আড়ৎ কায়েম করিতে থাকিলে অথবা সমাজের নানা ঘাটিতে এই সমুদয়ের ছোট-বড়-মাঝারি চুম্বক প্রচার করিবার ব্যবস্থা করিলে আমাদের স্বদেশ-সেবকগণ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-জাতীয় কাজই করিতেছেন,—দেশের লোক এইরূপ বিবেচনা করিতে শিখিবে।

কিঞ্চিৎ-কিছু মৌলিক গবেষণা, স্বাতন্ত্র্যবিশিষ্ট অনুসন্ধান, ব্যক্তিত্বপূর্ণ রিসার্চ ইত্যাদি যে জোরজবরদস্তি করিয়া বাংলা-দেশের চৌহদ্দি হইতে খেদাইয়া দিতেই হইবে এমন কোনো কথা বলা হইতেছে না। "স্বাধীনতার" সঙ্গে অসহযোগ প্রচার করা আমাদের মতলব নয়। বলিতেছি মাত্র এই যে,—ধনবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান আর রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি বিদ্যার এবং বিদ্যাঘটিত কলার মুল্লুকে যুবক ভারত আজ, কাল এবং পরশু যে সকল গবেষণাই করুক না কেন তাহার ভিতর বিদেশ-চর্চ্চা, "বিদেশী আন্দোলন", বিদেশী সাহিত্যের বিশ্লেষণ, তর্জ্জমা, সমালোচনা ও প্রচার ইত্যাদি কাজই প্রধান ঠাঁই অধিকার করিতে বাধ্য।

আর্থিক ভারতের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান সম্বন্ধে গবেষণা করিতে বসিলেও,—বস্তুতঃ, বসিবামাত্রই আগে দরকার পড়িবে পাশ্চাত্য দুনিয়া সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্তের ধারা আর তর্কশাস্ত্র বা আলোচনা-প্রণালী। ভারত-সন্তানের ভিতর যাঁহারা এইসকল পশ্চিমা মালের বড় বেপারী তাঁহারাই ভারতীয় তথ্যের সুবিশ্লেষণ এবং ভবিষ্য-ভারতের গোড়াপত্তন করিতে অধিকারী।

ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, আমেরিকা ইত্যাদি দেশেও এইরূপ "বিদেশী-আন্দোলনের" ঠাঁই যথোচিত পরিমাণেই রক্ষিত হয়। এরা বিদেশকে বয়কট করে না। তবে এই সকল দেশের লোকেরা যে পরিমাণ এবং যে দরের স্বাধীন মাথার "ঘী" দেখাইতেছে সেই পরিমাণ এবং সেই দরের স্বাধীন মাথার "ঘী" দেখানো বর্ত্তমানে যুবক ভারতের পক্ষে এক প্রকার অসাধ্য। তাহার কারণ ঢুঁড়িতে বসা সম্প্রতি চলিবে না। "বিদেশী আন্দোলন" বা "পর-চর্চ্চা" করা ভারত-বাসীর পক্ষে এখনো কিছু কাল যত দরকারী ইয়োরামেরি-কার বড় বড় জাতির লোকের পক্ষে তত দরকারী কিনা সন্দেহ। এই কথাটা খোলাখুলি বুঝিয়া বিদেশী মগজের ঘী শোষণ করিবার আয়োজন করিতে পারিলেই আমরা ভারতে দেশোন্নতির একটা বড় ধাপ ডিঙাইতে পারিব।

"আর্থিক উন্নতি"র ক্ষমতা অতি সামান্য। "নমো নমঃ" করিয়া "সংক্ষেপে কাজ সারা" যাইতেছে মাত্র। চাই বহুলোকের সমবেত কর্ম্ম-প্রয়াস। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ডিহিতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আলোচনার জন্য "বিশেষজ্ঞ"দের আখড়া কায়েম না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস অথবা এই জাতীয় অন্যান্য পত্রিকা নিজ নিজ আদর্শ-মাফিক কর্ত্তব্য পালন করিতে অসমর্থ থাকিবে।

প্রত্যেক বিষয়েই সুবিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক। তাহার জন্য আবশ্যক ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন লোকের একনিষ্ঠ মনোযোগ। তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য বাঙালী জাতিকে অনেক দিন ধরিয়াই ডাকিতেছি। কিন্তু এখনো কোনো সাড়া পাওয়া যাইতেছে না।

বুল্‌তাঁ দু মিনিস্তেয়ার দু ত্রাভ্বাই এ দ' লিজিন

মজুর ও স্বাস্থ্য দপ্তরের পত্রিকা। প্যারিসের অন্যতম সরকারী সচিবের আফিস হইতে প্রকাশিত। (১) ১৯২৫ সনের অক্টোবর-ডিসেম্বর এবং ১৯২৬ সনের জানুয়ারি-মার্চ এই দুই সংখ্যায় পোষাকের কারখানায় ফরাসী নারী-মজুরদের অবস্থা কিরূপ তাহার বৃত্তান্ত আছে। প্রাক্-যুদ্ধ অবস্থার সঙ্গে বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করা হইয়াছে। (২) সরকারী, ও নিম-সরকারী কর্ম্মকেন্দ্রে মজুরদিগকে "পারিবারিক ভাতা" দিবার আইন জারি করা হইয়াছে ১৯২২ সনে। এই আইন অনুসারে কোথায় কিরূপ কাজ হইয়াছে তাহার বৃত্তান্ত ১৯২৬ সনের জানুয়ারি-মার্চ সংখ্যার অন্যতম প্রবন্ধ।

লে দোকুমাঁ দু ত্রাভ্বাই

"মজুর, মজুরি ও মেহনতের দলিল", ফরাসী মাসিক, প্যারিস। জানুয়ারি ১৯২৬,—(১) জার্ম্মাণিতে মজুর-সঙ্ঘের বর্ত্তমান কাজকর্ম্ম। ১৯২৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ব্রেসলাও শহরে এই সঙ্ঘের যে কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহার বৃত্তান্ত। (২) আঁতনেলি এক প্রবন্ধে ১৯২২ হইতে ১৯২৫ পর্য্যন্ত চার বৎসরের জার্ম্মাণ মজুরির হার বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন,—"জার্ম্মাণ মুদ্রা কাগজের নোটে যে পরিমাণে বাড়িতেছিল সেই পরিমাণে মজুরির হার বাড়ে নাই। কাজেই মজুরেরা ধর্ম্মঘট চালাইল।" ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় (১) এক প্রবন্ধে বিলাতে সমাজ-বীমার ক্রমবিকাশ আলো-চিত হইয়াছে। বিধবা এবং অনাথ বালক-বালিকাদের

ভাতার হার ও পরিমাণ বাড়িতেছে। (২) দ্বিতীয় প্রবন্ধে দেখিতেছি যে, নরওয়ে দেশের আইনে কোনো কোনো কারবারে মজুরে মালিকে ঝগড়া সালিশী দ্বারা মীমাংসা হইতে বাধ্য। মার্চ সংখ্যায় মার্কিণ শিল্প-কারখানায় এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে যে সকল উপায়ে মজুরির হার বাড়ানো হইয়াছে তাহার আলোচনা আছে। আমেরিকার আর্থিক জীবনে যুগান্তর আসিয়াছে। যন্ত্রপাতির ব্যবহার, কর্ম্ম-কেন্দ্রের পুনর্গঠন, রদ্দি বা বরবাতি মালের চরম সদ্‌গতি করা ইত্যাদি কৌশল নবীন মার্কিণ শিল্পের প্রাণ। জিনিষ-পত্রও সস্তা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে মজুরিও বাড়িয়াছে আর কর্ম্মকেন্দ্রের আবহাওয়ার উন্নতি ঘটিয়াছে।

লেকোনোমী নুহ্বেল

"নবীন আর্থিক ব্যবস্থা", ফরাসী মাসিক, প্যারিস, মার্চ ১৯২৬, লেখক পেসি মধ্য-ইয়োরোপ সম্বন্ধে ১৯২৫ সনের আর্থিক খতিয়ান করিয়া বলিতেছেন যে, এই বৎসর মোটের উপর সর্ব্বত্রই সুফলের বৎসর। অষ্ট্রীয়ায় টাকাকড়ি পূরা-পূরি স্থির-প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। হাঙ্গারিতে রাজস্বের আয়-ব্যয়ে সমতা দাঁড়াইয়াছে। রুমেনিয়ায় টাকার টানা-টানি খুব বেশী বলিয়া বেশী উন্নতি ঘটিতে পারে নাই। বল্কান জনপদে যুগোস্লাভিয়া আজ অন্যান্য সকল দেশের চেয়ে বেশী সমৃদ্ধিশালী।

লা গ্রাঁদ্ রেহ্বিয়ু

প্যারিসের ফরাসী মাসিক,—নাম "মহা-পত্রিকা"। মার্চ ১৯২৬। মুফ্‌লে এক প্রবন্ধে আজকালকার ফরাসী রাষ্ট্রদার্শনিকদের মতামত আলোচনা করিয়াছেন। বার্থে, লেমি, ওরিয়ু, এবং দুগুই এই তিন জনের সিদ্ধান্ত প্রধানভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে। দুগুই বলিতেছেন,—"দেশের সার্ব্বজনিক স্বার্থ আবিষ্কার করা রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য। কিন্তু সার্ব্বজনিক স্বার্থ-'লোকহিত' ইত্যাদি বস্তু কি? তাহা বুঝিবার জন্য দেশের ভিতরকার বিভিন্ন দল, সঙ্ঘ, গোষ্ঠী ইত্যাদি বাস্তব জীবন-কেন্দ্রের তথ্যসমূহ ঘাঁটাঘাঁটি করা কর্ত্তব্য।" রাষ্ট্র-বিজ্ঞানে ইহার নাম বস্তু-নিষ্ঠা।

আমেরিকান ইকনমিক রিহ্বিউ

ত্রৈমাসিক, ডিসেম্বর ১৯২৫। কাগজী টাকার পরিমাণ বাড়াইয়া জার্ম্মাণরা সস্তায় বিদেশী সোনার টাকা কিনিতে-ছিল। এই সময়ে জার্ম্মাণিতে বাজারদরও যার পর নাই নামিয়া গিয়াছিল। তাহার ফলে বিদেশীরা জার্ম্মাণ মাল খরিদ করিত বিস্তর। অর্থাৎ বিদেশে জার্ম্মাণ মালের রপ্তানি ফুলিয়া উঠিতেছিল। এই সম্বন্ধে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যা-লয়ের অধ্যাপক টাওসিগ বলেন,—"এই ব্যবস্থায় জার্ম্মাণরা বিদেশে বেচিত বেশী আর কিনিত কম। তাহাতে জার্ম্মাণদের লাভ ছাড়া লোকসান হয় নাই।" কিন্তু অধ্যাপক মোণ্টন এই মতের বিরুদ্ধে রায় দিয়া বলিতেছেন, —"কিন্তু জার্ম্মাণরা যাহা কিছু আমদানি করিতেছিল তাহার দাম দিবার ক্ষমতা তাহাদের ছিল না। অর্থাৎ রপ্তানি বাড়িয়া গিয়াছিল বলিয়াই জার্ম্মাণির ক্রয়-ক্ষমতা বাড়িয়াছিল একথা স্বীকার করা সম্ভব নয়। মার্কের দাম তখন এত কম যে বিদেশী মাল কিনিবার যোগ্যতা জার্ম্মাণিতে যার পর নাই কমিয়া গিয়াছিল।" বুঝিতে হইবে যে, মাল বেচিয়া জার্ম্মাণি যে টাকা পাইতেছিল সেই টাকা দিয়া বিদেশী মাল কেনা সম্ভবপর হইত না।

হ্বেল্ট্‌হ্বির্টশাফ্‌ট্ লিখেস্ আর্খিহ্ব্
সাড়ে পাঁচ শ' পৃষ্ঠার কাগজ

"আর্থিক দুনিয়ার গ্রন্থালয়" জার্ম্মাণির য়েনা শহরে গুষ্টাভ্ ফিশার কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কীল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বার্ণার্ড হার্ম্‌স্ সম্পাদক। ত্রৈমাসিক, ১৯২৬, জুলাই।

প্রথম ১৬৪ পৃষ্ঠায় আছে নিম্নলিখিত ৬ প্রবন্ধ:—(১) আর্থিক কারবারের প্রকৃতি ও লক্ষ্য (ৎসিগুলার), (২) আফ্রিকার আর্থিক ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা (অধ্যাপক মেণ্ডেলসোন), (৩) অশুল্ক বাণিজ্য ও সংরক্ষণ-নীতি,—এই দুই বাণিজ্য ব্যবস্থার সঙ্গে মুদ্রা-বিজ্ঞান ও মুদ্রা-নীতির সম্বন্ধ, (৪) ঐতি-হাসিক প্রণালীর ধনবিজ্ঞানবিদ্যার ভুলচুক এবং অসম্পূর্ণতা (অধ্যাপক হ্বিলব্রাণ্ট্), (৫) ধনবিজ্ঞান বিদ্যার অন্যতম

জন্মদাতা ফরাসী চিকিৎসক কেনে "তাব্‌ল্য একনমিক" (দুনিয়ার আর্থিক চিত্র) গ্রন্থে "ফিজিঅক্র্যাট-তত্ত্ব (প্রকৃতি-তত্ত্ব) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই "চিত্রে" সামাজিক শ্রেণী-বিভাগ সম্বন্ধে যে সকল তথ্য ও তত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছে, তাহার ঐতিহাসিক এবং সমাজবিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠিত সমালোচনা দেখিতেছি এক প্রবন্ধে। লেখক হইতেছেন অধ্যাপক প্লেঙ্গে। (৬) আমেরিকার আর্থিক শ্রেষ্ঠতা আর তাহার সঙ্গে জার্ম্মাণির টক্কর দিবার সুযোগ-সম্ভাবনা (অধ্যাপক হির্শ)।

পত্রিকার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ত্তমান জগতের আর্থিক ইতিহাস বিবৃত হয়। এইজন্য গিয়াছে ২৫৭ পৃষ্ঠা। ১৩টা রচনা এই ঐতিহাসিক অংশের অন্তর্গত। (১) ধনোৎপাদনের বিভিন্ন প্রণালী (অধ্যাপক সম্বার্ট) (২) রুশিয়া, পোল্যাণ্ড, লিথুয়ানিয়া এবং লাটুভিয়া এই চার দেশের ইহুদি সমাজের আর্থিক জীবন (লেস্‌চিন্‌স্কি), (৩) লোক-সংখ্যার রাষ্ট্রনীতি (অধ্যাপক গ্যিন্টার), (৪) দুনিয়ার অর্ণব-বাণিজ্যে জাহাজের অতি-জোগান (অধ্যাপক হেলাণ্ডার), (৫) তুরস্কে জার্ম্মাণ রেল। ১৮৮৮-১৯১৪ সনের কর্ম্মবৃত্তান্ত (মিলমান) (৬) জার্ম্মাণির আকাশযান সম্বন্ধে নতুন বিধিব্যবস্থা (হাস্‌লিঙ্গার), (৭) ডাক ও রেলের আন্তর্জ্জাতিক বিধান (রোশার), (৮) হাঙ্গারির সঙ্গে দেশবিদেশের আর্থিক লেনদেনের হিসাব—১৯২৩-২৪ সনের তথ্য সমালোচনা (হাদ্রিক), (৯) সোনা, রূপা, তামা, সীসা দস্তা ও টিন, এই ছয় ধাতুর উৎপত্তি এবং আমদানি-রপ্তানি ১৯২৪-২৫ সনের বাজার-বিশ্লেষণ (আর্ৎসেট), (১০) দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনায় আর্থিক উন্নতি ও বিদেশী পুঁজির সদ্ব্যবহার, (১১) ফ্রান্সে রাজস্ব-সমস্যা (অধ্যাপক লাণ্ডমান), (১২) খোলা দুয়ারের দেশ। পারস্য, চীন হইতে সুরু করিয়া দুনিয়ার সর্ব্বত্র যেখানে যেখানে নিম-স্বাধীন দেশ আছে তাহাদের সঙ্গে ১৯২৫ সনে স্বাধীন দেশ সমূহের লেন-দেন কিরূপ চলিয়াছে তাহার বৃত্তান্ত। আইনের তরফ হইতেই এই বৃত্তান্ত প্রধানতঃ সঙ্কলিত হইয়াছে (অধ্যাপক শিল্ডার)। (১৩) মজুর, মজুরি, বেকার-সমস্যা, সমাজ-বীমা ইত্যাদি "সামাজিক" জীবন সম্বন্ধে ১৯২১ সন হইতে যাহা-কিছু আন্তর্জ্জাতিক বিধি-ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহার বৃত্তান্ত (ফেলিঙ্গার)।

"বাঘা" "বাঘা" গবেষকদের ধরণ-ধারণ

এই তেরটা রচনার প্রত্যেকটাই হয় এক একখানা বিপুল গ্রন্থবিশেষ, না হয় কোনো গ্রন্থের এক অতি বৃহৎ অধ্যায়। লেখকেরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ আলোচ্য বিষয়ে বহুকাল ধরিয়া অনুসন্ধান চালাইতেছেন। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস তাঁহারা এখান ওখান সেখান হইতে "আর্থিক সংবাদ" সংগ্রহ করিতে অভ্যস্ত। এই সকল সংবাদ লইয়া মাঝে মাঝে দৈনিকে, সাপ্তাহিকে মাসিকে লিখিবার রেওয়াজও তাঁহাদের আছে। 'বিদেশী ভাষা হইতে তর্জ্জমায় এবং সঙ্কলনেও তাঁহারা পশ্চাৎপদ নন। তাহা ছাড়া মাল যখন বহরে বেশ পুরু হইয়া উঠে তখন তাঁহারা বিশ্বকোষ-সদৃশ ঢাউস ত্রৈমাসিকের শরণাপন্ন হন। তাহার পরেই "কপালে যদি থাকে" ত গ্রন্থ-প্রকাশের ব্যবস্থা। "বাঘা" "বাঘা" সকল পণ্ডিতের দস্তুরই এইরূপ।

এই ধরণের নিয়মিত আর্থিক গবেষণার দৃষ্টান্ত গোটা ভারতে আমাদের নজরে একপ্রকার পড়ে না বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে কি না সন্দেহ। এখানে কি স্বদেশী তথ্য ও তত্ত্ব, কি বিদেশী তথ্য ও তত্ত্ব দুই তরফের কথাই বলিতেছি। এইরূপ নিয়মিত গবেষণায় বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক দৃঢ়তা এবং চরিত্রবত্তা আর কর্ত্তব্য-বোধও লাগে। দুনিয়ার অন্যান্য দেশের সঙ্গে যুবক ভারতের আমরা টক্কর দিতে ছুটিয়াছি। এই জন্য দুনিয়ার মাপকাঠিটা,—দুনিয়ার পণ্ডিতদের পরিশ্রম-প্রিয়তা, কর্ম্মদক্ষতা এবং বিজ্ঞাননিষ্ঠা সর্ব্বদাই আমাদের স্বদেশ-সেবকদের চোখের সম্মুখে রাখা আবশ্যক।

উচ্চতর কর্ম্মপ্রণালীর এবং চিন্তাপ্রণালীর সংস্পর্শে না আসিলে ভারতের পণ্ডিতেরা যখন তখন যেখানে সেখানে "আঙুল ফুলে কলাগাছ" হইয়া পড়িতে পারেন, এইরূপ সন্দেহ করিবার কারণ যে নাই তা নয়। আর তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্যও দেশের "সমঝ্‌দারেরা" হয়ত "ধন্য ধন্য" করিতে থাকিবেন। ধনবিজ্ঞান-বিদ্যার মহলে দেশকে এইরূপ লজ্জাকর দুরবস্থা হইতে আত্মরক্ষা করিতে

হইবে,—এইটুকু মাত্র বলা ছাড়া সম্প্রতি "আর্থিক উন্নতি"র সুযোগ এবং শক্তি আর বেশী নাই।

তবে একথাও বলা আবশ্যক যে, আমাদের এই দুরবস্থা সম্বন্ধে সজ্ঞান হইবার চেষ্টা এখন পর্য্যন্ত বাঙালী সমাজে, এবং উচ্চতম শিক্ষিত মহলেও বড় একটা দেখিতে পাইতেছি না। বিদ্যাচর্চ্চায় আমাদের যথার্থ উন্নতি সাধন এখনও দূর ভবিষ্যতের কথা। পুরাপুরি এইরূপ বুঝিয়াই ধীর ও সহিষ্ণুভাবে কাজে লাগিয়া থাকিতে হইবে।

"আর্থিহেব"র তৃতীয় অধ্যায় হইতেছে সমালোচনা। তাহার জন্য বর্ত্তমান সংখ্যায় আছে ১৩০ পৃষ্ঠা। ৩৮ খানা গ্রন্থ সম্বন্ধে সুবিস্তৃত বিবরণ ছাপা হইয়াছে। আর ছোট খাটো গ্রন্থ-পরিচয় গুন্‌তিতে ১০০০ হইবে। এই পরিচয়ের ভিতর দেশী-বিদেশী ধনবিজ্ঞানবিদ্যার বিভিন্ন বিভাগ-বিষয়ক পত্রিকার সূচীও বিবৃত আছে। এই অধ্যায়ের বড় বড় সমালোচনার লেখক ৩৮ জন। তাঁহারা প্রত্যেকেই "বাঘা" "বাঘা" ধনবিজ্ঞান-পণ্ডিত। বড় বড় সমালোচনা বলিলে রয়্যাল অক্‌টেভো আকারের এক, দেড়, দুই, আড়াই পৃষ্ঠা বুঝিতে হইবে। ক্বচিৎ কখনো তিন চার পৃষ্ঠায়ও গিয়া ঠেকে। অন্যান্য সমালোচকের সংখ্যা শ'দেড়েকের কম নয়। তাঁহারা সকলেই অধ্যাপক শ্রেণীরই লোক। তাঁহাদের মধ্যে আবার অনেকে "বাঘা" "বাঘা"ও বটে। ঐ সকল দেশে নামজাদা পণ্ডিতেরাও দেশী-বিদেশী বই বা কাগজপত্রের রচনা সম্বন্ধে দুই-চার লাইনের সমালোচনা লিখিতে লজ্জা বোধ করেন না।

আক্‌সিওঁ নাশ্যনাল

ফরাসী মাসিক, প্যারিস ফেব্রুয়ারি-মার্চ্চ ১৯২৬,—

(১) রারেতি বলিতেছেন :—"ফরাসী মুদ্রার মূল্য তাড়াতাড়ি স্থির প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে দেশের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে। স্থিরীকরণকে আর্থিক ব্যবস্থার ফলস্বরূপ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। ইহাকে কারণ সমঝিলে গোলে পড়িতে হইবে। আগে রাজস্ব-সংস্কার কর, আর বিদেশী কর্জ্জ শোধার ব্যবস্থা কর। তাহার পর মুদ্রানীতির পুনর্গঠনে মাথা খাটানো চলিতে পারে—পূর্ব্বে নয়।

(২) ফ্রাঁ কিরূপে স্থিরীকৃত করা সম্ভব? এই প্রশ্নের জবাব দিতে যাইয়া নোগারো "গোল্ড এক্‌স্‌চেঞ্জ ষ্ট্যাণ্ডার্ড" বা স্বর্ণ-বিনিময় মানের কথা পাড়িয়াছেন। তাঁহার মতে এই মানই আজকালকার আর্থিক ফ্রান্সের পক্ষে প্রশস্ত। "রেহ্বি দেকেনোমী পোলিটিক" নামক মাসিকের "পত্রিকা-জগৎ"-অধ্যায়ে এইটুকু সংক্ষিপ্ত বিবরণ বাহির হইয়াছে। কাজেই ভারতবাসীর সুপরিচিত স্বর্ণ-বিনিময় মানের স্বপক্ষে ফরাসীরা নতুন কি যুক্তি আবিষ্কার করিল তাহা দেখিবার কৌতূহল থাকা সত্ত্বেও বেশী দূর যাওয়া গেল না।

বুলতাঁ দ' লা শাঁবর দ' কমার্স দ' পারি

প্যারিসের "চেম্বার অব কমার্স" (ব্যবসায়ি-সঙ্ঘ) কর্ত্তৃক প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা। এক সংখ্যায় (১) বাণিজ্য জাহাজ সম্বন্ধে লেখক সুরি গঠন-শুল্ক বা নির্ম্মাণের জন্য সরকারী অর্থ-সাহায্য চাহিতেছেন। (২) বিদেশী টাকা কড়ির কেনা বেচা "বাঁক দ ফ্রাঁস" নামক নোট-ব্যাঙ্কের একচেটিয়া কারবার হউক এইরূপ এক আইনের প্রস্তাব হইয়াছিল। ব্রিজ বলিতেছেন :—"এইরূপ একতিয়ার দেওয়া যাইতে পারে না। জনসাধারণের হাতেই এই ক্ষমতা যেমন আছে তেমন থাকুক।

অন্য এক সংখ্যায় দৈববীমা-বিষয়ক আইন সংস্কার আলোচিত হইয়াছে। গোদার এবং গোনিও এই দুইজনে পার্ল্যামেণ্টে ১৮৯৮ সনের আইনটা সংস্কার করিবার প্রস্তাব তুলিয়াছেন। ফ্যাক্‌টরিতে কাজ করিতে করিতে মজুর বা কর্ম্মচারীদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যদি মারাত্মকরূপে জখম হয়, অর্থাৎ ভবিষ্যতের কর্ম্মক্ষমতা পুরাপুরি হারাইয়া বসে, তাহা হইলে মালিকেরা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য আছে। আইনটার সংস্কার সাধিত হইলে ক্ষতিপূরণের হার বাড়িয়া যাইবে। কিন্তু "শাঁবর" অর্থাৎ ব্যবসায়ীর দল এই হার বৃদ্ধির বিরোধী।

ইকনমিক জার্ণ্যাল

"অর্থনৈতিক পত্রিকা" লণ্ডনের ত্রৈমাসিক। ১৯২৫ সনের মার্চ্চ সংখ্যায় গমের "পুল" ("ভাণ্ডার" বা ধর্ম্মগোলা)" সম্বন্ধে দুইটা প্রবন্ধ আছে। একটায় অধ্যাপক বয়েল মার্কিণ

যুক্তরাষ্ট্রের তথ্য বিবৃত করিয়াছেন। আর একটায় ক্যানাডার তথ্য পাইতেছি অধ্যাপক ফের রচনায়। লড়াইয়ের সময় ক্যানাডায় গমের বাজার নবরূপ ধারণ করে। এই সময়ে "বাজার" নামক কোনো বস্তু ছিল না বলিলেই চলে। বৃটিশ গবর্মেণ্ট ছিল প্রায় একমাত্র খরিদ্দার। যুদ্ধের পর ক্যানাডার চাষীরা "বাজার" গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে। সরকারের তাঁব হইতে উদ্ধার পাওয়া একটা প্রধান লক্ষ্য দেখা যাইতেছে। তিনটা বিপুল সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিয়াছে। ১৯২৪ সনের কথা। সঙ্ঘ তিনটার মধ্যে পরস্পর যোগ আছে। গোটা দেশের গম এই তিন ব্যবসা কোম্পানীর "ভাণ্ডারে' কেন্দ্রীকৃত। ইহারাই বাজারের রাজা। অষ্ট্রেলিয়ায়ও এইরূপ "পুল" আছে। যুক্তরাষ্ট্রেও আছে। মার্কিণরা এখন দেশের সকল "পুল"গুলাকে একটা জাতীয় ভাণ্ডারের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করিতে প্রয়াসী। তাহার সঙ্গে সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়া ক্যানাডা এবং দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন "পুলের" সঙ্গে একটা আন্তর্জ্জাতিক সমঝৌতা কায়েম করিবার প্রস্তাব চলিতেছে। লোহা এবং ইস্পাতের দুনিয়ায় যেমন জার্ম্মাণি ও ফ্রান্সের নেতৃত্বে ইয়োরোপীয়ানরা একটা ট্রাষ্ট খাড়া করিয়াছে, যুক্তরাষ্টের নেতৃত্বে আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়া সেইরূপ একটা গম ট্রাষ্ট খাড়া করিতে চলিল।

জুর্ণ্যাল দেজ্ একনমিস্ত্

"ধনবিজ্ঞান-সেবীদের পত্রিকা," প্যারিসের মাসিক। নবেম্বর ১৯২৫। এই সংখ্যার এক প্রবন্ধে জার্ম্মাণির আর্থিক ক্রমবিকাশ বিবৃত করিয়া দ' গিশে বলিতেছেন, "১৯২২ সনের পর হইতে জার্ম্মাণির শিল্প-কারবার দিন দিন ফুলিয়া উঠিয়াছে। এদিকে জার্ম্মাণিতে চষা জমির এবং চাষযোগ্য জমির পরিমাণ যারপর নাই কম। অথচ লোক-সংখ্যা বেশ বাড়িতেছে আর মৃত্যুর হারও খুব নামিয়া আসিয়াছে। কাজেই পূর্ব্বদিকে পোল্যাণ্ডের সঙ্গে এবং পশ্চিম প্রান্তে ফ্রান্সের সঙ্গে জার্ম্মাণির লড়াই একপ্রকার অবশ্যম্ভাবী।"

ডিসেম্বর ১৯২৫। বিলাতের বেকার-সমস্যা আলোচিত হইয়াছে এক প্রবন্ধে। লেখক রিফ বলিতেছেন,—"১৯২০ সনের আগষ্ট মাসে ১২০,০০০ ছিল বেকার-সংখ্যা। বিশ-লাখের এপার ওপার পর্য্যন্ত এই সংখ্যা আসিয়া মাঝে মাঝে ঠেকিয়াছে। ১৯২০ হইতে ৯৯২৫ সনের বাজার দর আর মজুরির হার তুলনা করিলে দেখা যায় যে, এই দুইয়ের পরস্পর সম্বন্ধের উপরই বেকার-সংখ্যা নির্ভর করিয়াছে। বাজার দরের সঙ্গে মজুরির হারের সমতা না থাকিলেই বেকার-সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে—এইরূপ বলা চলে। দরের উঠানামা চলিয়াছে আগে আগে আর পিছু পিছু,—যদিও কিছু বিলম্বে,—চলিয়াছে মজুরির হার। এমন এক সময় উপস্থিত হইল যখন বাজার-দর স্থির প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। বস্তুতঃ, মুদ্রা-সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে টাকা-কড়ির দাম বাড়িয়া যাওয়ায় বাজার-দর কমিয়াই গেল। কিন্তু তখন মজুরেরা মজুরির হার কমাইতে আর রাজি হইল না। এখন বেকার-সমস্যা মীমাংসার উপায় হইতেছে নিম্নলিখিত দুইয়ের এক। হয় বাজার-দর চড়াইতে হইবে,—কিন্তু মজুরির হার বাড়াইতে হইবে না—না হয় বাজার-দর যেরূপ আছে সেরূপই থাকুক,—কিন্তু মজুরির হার নামাইতে হইবে।

হ্বির্ট্ শাফ্‌ট্‌স্ ডীন্‌ষ্ট্

"আর্থিক জীবন বিষয়ক সংবাদ-সেবা",—জার্ম্মাণ সাপ্তাহিক। হাম্বুর্গ, ২৭ নবেম্বর ১৯২৫। ক্রেমার জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"দেশের ভিতরকার আর্থিক চলাচল বা লেনদেনসমূহের পূরাপূরি খতিয়ান করিতে হইলে কোন্ কোন্ তথ্যের হিসাব করা আবশ্যক ? জবাব,—(১) রাইখ্‌স বাঙ্ক নামক নোট-ব্যাঙ্কের নোট এবং টাকাকড়ির চলাচল, (২) ডাকঘরের টাকাকড়ির লেনাদেনা, (৩) হুণ্ডি এবং অন্যান্য বাণিজ্য-পত্রের ঘুরা-ফিরা, (৪) মজুরি বিতরণ, (৫) কারবারের সংখ্যা, (৬) রেল-জাহাজে মালের গতিবিধি।

রিহ্বিউ অব্-রিহ্বিউজ

বিলাতী মাসিক, নবেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যা ১৯২৬।

(১) বিরাট তৈল কেলেঙ্কারী,—ইংরেজের অধীন তৈল খনির কথা (অর্থনীতি-বিশারদ)।

(২) জীবনবীমা মনোনয়ন (ডি, ক্যামেরুণ ফরেষ্টার)।
(৩) ১৯২৭ সনের মোটর গাড়ীর বহর (জন প্রিয়েল্)।
(৪) ডাক শিক্ষা (মর্লে ডেনো)।

ইণ্ডিয়ান রিভিউ

নবেম্বর, ১৯২৬। ভারতে জীবন-বীমা (এস, সি, চৌধুরী, বি, এ)।

এডিনবরা রিভিউ

লংম্যান গ্রিন কোম্পানী প্রকাশিত বিলাতী ত্রৈমাসিক, জুলাই ১৯২৬।

(১) কৃষি-সমস্যা, (রেজিনাল্ড লেনার্ড)।
(২) ভারতীয় কৃষি, (ডি, এন, ব্যানার্জ্জি)।
(৩) মুদ্রা ও প্রাচীন রোমান গণতন্ত্রের যুদ্ধ-ঋণ (হ্যারল্ড ম্যাটিংলি)।
(৪) পারিবারিক ভাতা (সার চার্লস হ্যারিস)।
(৫) শিল্প, রাজনীতি ও জনমত (আর্ণেষ্ট জে, পি, বেন)।

বৃটিশ চেম্বার অব কমার্স ফর স্পেন

স্পেনে ইংরেজ সওদাগর-সঙ্ঘের পত্রিকা। মাসিক। সেপ্টেম্বর, ১৯২৬।

পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১২। তন্মধ্যে ৬পৃষ্ঠা ইংরেজী, ৬পৃষ্ঠা স্পেনিশ।

ইংরেজী অংশে আছে :—(১) ৯ই জুলাই "স্পেনিশ রাজকীয় আইন জারি"র বার্ত্তা ১৪ই জুলাইয়ের মাদ্রিদ্ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাতে বিলাতে অত্যন্ত চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। বিলাতের কাগজগুলিতেও এ বিষয়ে বহু লেখালেখি হইয়াছে। এমন কি, ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর ইংল্যণ্ড ও স্পেনে যে বাণিজ্য-সন্ধি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল তাহা নাকচ করিবার কথা উঠিয়াছে। (২) স্পেনে বিলাতী কয়লা আমদানির অন্তরায় কি ? (৩) যে মোকদ্দমার ফলে ৯ই জুলাইয়ের আইন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও শেফিল্ডের প্রতিবাদ। (৪) স্পেনের বহির্ব্বাণিজ্য, জানুয়ারী-মার্চ্চ, ১৯২৬। (৫)স্পেনের সহিত ইস্পাত-বাণিজ্য, ৯ই জুলাইয়ের রাজকীয় আইন-জারির কি কমবেশ ঘটিয়াছে। (৬) স্পেনের কাগজের বাজার। (৭) স্পেন হইতে প্রাচীন সংগ্রহের রপ্তানি।

মান্থলী ট্রেড জার্ণেল অব্ বৃটিশ চেম্বার অব্ কমার্স অব্ টার্কি

ইহাও ইংরেজের বাণিজ্য-বিষয়ক পত্র। মাসিক। কনস্তান্তিনোপল। ১লা নবেম্বর, ১৯২৬।

মোট পত্রসংখ্যা ৩০। এ সংখ্যায় প্রকাশিত বিষয়গুলি (১) কনস্তান্তিনোপলে বাজারের অবস্থা, (২) তুরস্কে মিত্র-প্রজাদের দাবী, (৩) বৃটিশ রবারে তৈয়ারী মাল, (৪) সস্তা তুলা, (৫) ম্যাঞ্চেষ্টার নাগরিক সপ্তাহ, (৬) তুরস্কের পাইপ তামাক, (৭) কাষ্টম্‌স আদায়, (৮) স্বদেশের বাণিজ্য-কথা, (৯) বৃটিশ ব্যবসা-মেলা, (১০) তুরস্কের জাতীয় ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, (১১) এক্স্‌চেঞ্জের হার, (১২) তুরস্ক ও বল্কান রাষ্ট্রগুলির সহিত ইংল্যণ্ডের বাণিজ্য, (১৩) স্মার্ণার ফলের বাজার-দর ইত্যাদি।

"তুরস্কের জাতীয় ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে" স্থরীয় পাশার ঐ বিষয়ে কয়েকটি প্রস্তাব উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তুরস্কের এই ব্যবসাগুলির কি করিয়া বৃদ্ধি হইতে পারে তদ্বিষয়ে তিনি বলিতেছেন :—

১ম দরকার একটা নূতন আইন প্রণয়ন।

২য়। অর্থসচিব কর্ত্তৃক এই সব ব্যবসায়ের সংরক্ষণ।

৩য়। ২½% ভোগ-কর উঠাইয়া দেওয়া।

বৃটিশ চেম্বার অব্ কমার্স অব ঈজিপ্ট

মাসিক, আলেকজেন্দ্রিয়া, নবেম্বর, ১৯২৬। পত্র-সংখ্যা ২২। আলোচ্য বিষয়গুলি হইতেছে :—(১) ঈজিপ্টের ডাকবিভাগের বাৎসরিক রিপোর্ট, ১৯২৫, (২) বৃটিশ টায়ার বাজার, (৩) গ্রেট বৃটেনে ফিল্ম-ব্যবসায়, (৪) বাণিজ্যে একতার শক্তি, (৫) ঈজিপ্টের বহির্ব্বাণিজ্য।

এটাকে তৃতীয় শ্রেণীর জার্ণ্যাল বলিলে বেশী দোষ হইবে না। পড়িবার মত বিষয়ের অভাব আছে।

মজুরি-তত্ত্বের আধুনিক সাহিত্য

ধনবিজ্ঞানের রাজ্যে "তত্ত্ব-কথা" আজকাল খুব কমই শুনা যায়। এই মুল্লুকের যা-কিছু আধুনিক সাহিত্য তাহার অনেকটাই ইতিহাস। বলা বাহুল্য অর্থ-নৈতিক "তত্ত্ব" জিনিষটা যত কঠিন আর্থিক জীবনের (অথবা এমন কি আর্থিক তত্ত্বের) ইতিহাসবস্তুটা তত কঠিন নয়। বুঝিতে হইবে যে, আজকালকার দিনে জগতের নানা দেশে ধন-বিজ্ঞানবিদ্যার এই সোজা অংশ সম্বন্ধেই আলোচনা-গবেষণা বেশী হইতেছে।

এইখানে একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল। আমাদের ভারতে আজ পর্য্যন্ত কোনো ভারত-সন্তান ধনবিজ্ঞানের তত্ত্বাংশ লইয়া আধ কাঁচ্চাও মাথার জোর দেখাইতে পারেন নাই। আমরা এই বিদ্যার ঐতিহাসিক কোঠায়ই যা-কিছু চলা-ফেরা করিতেছি। অর্থাৎ আসল ধনবিজ্ঞান শাস্ত্রে আজ পর্য্যন্ত যুবক ভারতের প্রবেশ-লাভ ঘটে নাই।

ইংরেজ পণ্ডিত ফিশার বিলাতের মজুরি ও মজুর-সমস্যা সম্বন্ধে একখানা বই লিখিয়াছেন। ২৭৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। প্রকাশক লণ্ডনের কিং কোম্পানী, ১৯২৬, ১২ শি ৬ পে। ইহাতে ১৯১৮ সনের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত ৭।৮ বৎসরের বৃত্তান্ত আছে।

বৃত্তান্তটা দ্বিবিধ। প্রথমতঃ, মহাযুদ্ধের পর বিলাতী সমাজে যে সকল মজুরি-সমস্যা উঠিয়াছে তাহার ঐতিহাসিক বিবরণ। দ্বিতীয়তঃ আছে মজুরির সঙ্গে জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের খরচের যোগাযোগ আলোচনা। এই দ্বিতীয় অংশে খানিকটা দার্শনিক গবেষণা অর্থাৎ তত্ত্ব-কথা পাওয়া যায়।

লেখক যুদ্ধের সময়কার অবস্থাও ঘাঁটাঘাঁটি করিয়াছেন। তখনকার দিনে মজুর-মহলে "তঙ্খা" সম্বন্ধে যেসকল ঘোঁটমঙ্গল চলিত তাহার বৃত্তান্ত আছে। সেকালে ছিল সরকারী "উৎপাদন-কমিটি"। এই কমিটির হাতে ছিল মালিকে-মজুরে মামলা নিষ্পত্তি করিবার অধিকার। এই কমিটি পরে সালিশী-আদালত নামে পরিচিত হয়। এক্ষণে তাহার নাম হইয়াছে "ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কোর্ট"। বিলাতী সমাজে আন্তর্জ্জাতিক মজুর ও মজুরি বিষয়ক আইন-কানুনের প্রভাব দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। বিগত আট-দশ বৎসরের ইতিহাসে এই কথা বেশ বুঝা যায়। আট দশ বৎসরের ধারাবাহিক আর্থিক ইতিহাস লেখা এমন হাতী-ঘোড়া কিছু নয়। কিন্তু এইখানেই যুবক ভারতের দুর্ব্বলতাও হাতে হাতে ধরা পড়ে। আমরা তিনশ' বা তিন হাজার বৎসরের পুরাণা মাল না পাইলে ঐতিহাসিক পাণ্ডিত্যের আসড়ে তাতিয়া উঠিতে অভ্যস্ত নই। হয় চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য না হয় মোগল-মারাঠা, না হয় মোতাক্ষরীণ ইত্যাদি বস্তু আমাদেরকে মাত করিয়া রাখে। আজ-কাল-পরশু-তরশুর অর্থ-কথা আর অর্থশাস্ত্রটাও যে ইতিহাসেরই মাল এবং সঙ্গে সঙ্গে জীবন-বেদেরই জ্যান্ত অংশ একথা এখনো যুবক ভারতে যথোচিতরূপে প্রচারিত হয় নাই। এই উদ্দেশ্যে চাই দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিকের "আর্থিক সংবাদ"-বিভাগ। "আর্থিক উন্নতি"র প্রথম তিন-চার অধ্যায়ে আমরা যতটুকু মাল গুঁজিতে পারিতেছি তাহা দেশের পক্ষে যথেষ্ট নয়। চাই আরও লেখক এবং আরও কাগজ।

ধনোৎপাদনের তত্ত্বকথা

য়েনার গুষ্টাভ ফিশার কোম্পানী "গেশিষ্টে ড্যার প্রোডু

কৃটি ভট্যেট্রস্-টেওরী" (ধনোৎপাদন-তত্ত্বের ইতিহাস) নামে ১৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ একখানা বই প্রকাশ করিয়াছে (১৯২৬)। লেখক ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বাকৃসা।

ধনোৎপাদন কাহাকে বলে? সমাজের কোন্ কোন্ ব্যক্তি বা কোন্ কোন্ শ্রেণীর লোক ধন-স্রষ্টারূপে বিবৃত হইবার যোগ্য? প্রশ্নগুলা নেহাৎ ছেলেখেলা মনে হইতেছে। কিন্তু এই সমুদয়ের জবাব লইয়াও লড়াই চলিয়া আসিতেছে।

দার্শনিকদের ভিতর এমন অনেক পণ্ডিত ছিলেন যাঁহারা বলিতেন যে, চাষ-আবাদই ধনসৃষ্টির একমাত্র উপায়। তাঁহাদের মতে চাষীরাই একমাত্র ধন-স্রষ্টা। ফ্রান্সের "ফিজিওক্রাৎ" বা প্রকৃতিপন্থী দল এই মতের প্রচারক ছিলেন।

আর এক প্রকার পণ্ডিতের মতে সোনা-রূপাই হইতেছে একমাত্র ধন। তাঁহারা বিবেচনা করিতেন যে, ধনোৎপাদন বলিলে বুঝিতে হইবে সেই সকল মেহনত, যার ফলে বিদেশে মাল পাঠাইয়া সোনা-রূপা আমদানি করা সম্ভব। আর্থিক দর্শনের ইতিহাসে তাঁহারা "মার্ক্যান্টিলিষ্ট" নামে পরিচিত। এই সকল পণ্ডিতকে সহজে "বাণিজ্য-পন্থী" বা "বাণিজ্য-বাদী" বলা যাইতে পারে।

বর্ত্তমান যুগে এই দুই শ্রেণীর পণ্ডিতকেই আহাম্মুক বিবেচনা করা হইয়া থাকে। এমন কি বিলাতী,—এবং অনেকটা গোটা দুনিয়ারই,—ধনবিজ্ঞানশাস্ত্রের জন্মদাতা অ্যাডাম স্মিথকেও আজকালকার দিনে বেকুব বলিবার রেওয়াজ দেখা যায়। কেননা তিনিও নরনারীর বহুসংখ্যক কাজকর্ম্মকে ধনোৎপাদনের কোঠার বাহিরে রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি চরমপন্থী প্রকৃতিবাদীদের ধনোৎপাদন-তত্ত্বটা পুরাপুরি হজম করেন নাই। তবে তাঁহাদের মতটাই প্রকারান্তরে বাজারে চালাইয়া যাওয়া অ্যাডাম স্মিথের অন্যতম কীর্ত্তি। শিল্প-কর্ম্ম, কারিগরি, তেজারতি-ব্যবসাবাণিজ্য ইত্যাদির সঙ্গে অসহযোগ প্রচার করা তাঁহার মতলব ছিল না। কিন্তু চাষ-আবাদকেই তিনি বেশীমাত্রায় ধনোৎপাদক সমঝিতেন।

এই দার্শনিক আলোচনার গর্ত্তে অনেক পণ্ডিতই পড়িয়াছেন। কোনো নির্দ্দিষ্ট এক বা দুই প্রকার শ্রমকে ধনোৎপাদক রূপে জাহির করিতে গিয়া কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, পুরুতগিরি ধনোৎপাদক নয়। এইরূপে সন্তানের জন্য জননীর মেহনতও ধনোৎপাদনের বাহিরে গিয়া পড়িয়াছে। কোনো কোনো পণ্ডিত উকিল-ডাক্তার-ফৌজ-সরকারী, চাকুর্য্যে-কেরাণী ইত্যাদি নানা শ্রেণীর লোককেই "অকর্ম্মণ্য" "কুঁড়ে" বলিয়া ধনোৎপাদকের দলে ঠাঁই দেন নাই। আর ইস্কুলমাষ্টার বেচারারা ত,—কি একালে কি সেকালে,—সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে গরু বটেই।

বর্ত্তমান জগতের পণ্ডিতরা আর এরূপ আহাম্মুকি চালাইতে প্রস্তুত নন। তাঁহারা, কে ধনস্রষ্টা আর কে ধনস্রষ্টা নয় এই বিষয় লইয়া অতিমাত্রায় মাতামাতি করেন না। বাণিজ্যকে বাণিজ্য, শিল্পকে শিল্প, চাষকে চাষ, চাকরীকে চাকরী,—সবই ধনোৎপাদন, সবই ধনসৃষ্টির সহায়। এই হইতেছে মোটের উপর সকলেরই ধারণা।

জার্ম্মাণ পণ্ডিত বাকৃসা সেকালের "বাণিজ্যবাদী," "প্রকৃতিবাদী" হইতে সুরু করিয়া ইংরেজ অ্যাডাম স্মিথ, ফরাসী সে, আর মার্কিণ কেরী পর্য্যন্ত সকলেরই মত উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। আমাদের দেশে এই নামগুলা অপরিচিত নয়। কিন্তু জার্ম্মাণ বইয়ে জার্ম্মাণ পণ্ডিতদের নামই বেশী। ফিখ্‌টে, সোডেন, ম্যিলার, য়াকোব, হেগেল, টুর্থ, হার্মাণ, লিষ্ট, রাও, রশার এবং মার্ক্‌স্—এই সকল নামের দু'একটা মাত্র ভারতে জানা আছে। আর এই সব সম্বন্ধেও জ্ঞান আমাদের যার পর নাই ভাসাভাসা।

সোডেন এবং ম্যিলারকে বাকৃসা অনেক উঁচুতে তুলিয়াছেন। কিন্তু এই দুই জনের নাম বিলাতী-মার্কিণ আর ইতালিয়ান-ফরাসী সমাজেও বিশেষ পরিচিত নয়। ম্যিলার জার্ম্মাণির রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং ধনবিজ্ঞান বিদ্যার এক প্রকার আদিগুরু। তাহার মতামত সম্বন্ধে "আর্থিক উন্নতি" সম্পাদকের কোনো কোনো ইংরেজি রচনায় আলোচনা আছে। কিন্তু সোডেন একপ্রকার অজ্ঞাত। বাকৃসা বলিতেছেন,—"ধনবিজ্ঞান বিদ্যার পণ্ডিতেরা ধন-দৌলত জিনিষটাকে সাধারণতঃ অতিমাত্র ভৌতিক বা জড়

বস্তু সমঝিয়াছেন। কিন্তু ইহার ভিতর অ-ভৌতিক অর্থাৎ আত্মিক অংশও আছে। একথা প্রধানতঃ জার্ম্মাণ চিন্তায় ধরা পড়িয়াছে। এই তরফের বিশ্লেষণে সোডেন এবং ম্যিলার বিশেষত্ব দেখাইয়াছেন।”

ইংরেজি ধনবিজ্ঞান-পত্রিকায় বাকসার বই সমালোচনা করিতে গিয়া একজন ইংরেজ লেখক বলিতেছেন,—“বাকসা বিদেশী পণ্ডিতদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন বটে। কিন্তু জার্ম্মাণ তর্জ্জমা ছাড়া তিনি মূলের খবর রাখেন না। জন ষ্টুয়ার্ট মিল আর ম্যাককালক সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানের সীমা একটা আলটপকা নজিরমাত্রে আবদ্ধ। আর ইংরেজ ধন-দর্শনের ধারা সম্বন্ধে তাঁহার বিদ্যা রিকার্ডো পর্য্যন্ত আসিয়া ঠেকিয়াছে।”

এই সমালোচনার মাপকাঠিতে যুবক ভারতের পাণ্ডিত্য কতখানি ?

“সোনার টাকা” কাহাকে বলে ?

রকমারি সোনার টাকা

ভারতে আজকাল যে মুদ্রানীতি চলিতেছে তাহাতে পাই আমরা “গোল্ড একসচেঞ্জ ষ্ট্যাণ্ডার্ড” (স্বর্ণ-বিনিময় মান)। সরকারী কারেন্সী কমিশনের প্রস্তাবে যে মুদ্রানীতি কায়েম হইবে বলিয়া কথা উঠিয়াছে তাহার ফলে দেখা দিবে “গোল্ড বুলিয়ন ষ্ট্যাণ্ডার্ড” (স্বর্ণ-তাল-মান)। আর যে মুদ্রানীতি ভারতের নরনারী চাহিতেছে এবং যে সম্বন্ধে গবর্মেণ্টের আপত্তিও একপ্রকার নাই, তাহার নিয়মানুযায়ী মানকে বলা হয় “গোল্ড ষ্ট্যাণ্ডার্ড” (স্বর্ণ-মান)। দেখা যাইতেছে যে, এই তিন প্রকার মানেই সোনার দাগ বা গন্ধ আছে। কিন্তু এই সকল মান অনুসারে যে সব টাকা জারি হয় তাহার সকল গুলাকেই “সোনার টাকা” বলা চলে কি ?

জার্ম্মাণ লেখক মাখলুপ বলিতেছেন,—“চলে”। এই কথা বলিবার জন্যই তিনি ১৫+২০৩ পৃষ্ঠায় একখানা গ্রন্থ লিখিয়াছেন (১৯২৫)। তাহাতে আছে মুদ্রানীতির ইতিহাস আর মুদ্রা-তত্ত্ব। বইয়ের নাম ডী “গোল্ড-ক্যার্ণ-হ্বেয়ারুং”। প্রকাশক হালবার-ষ্টাটের মায়ার কোং।

“সোনার টাকা” কাহাকে বলে এই প্রশ্নের জবাব মাখলুপ দিয়াছেন অতি সোজা। সোনার সঙ্গে টাকার (মুদ্রার) বিনিময়-সম্বন্ধটা স্থির-নির্দ্দিষ্ট থাকিলেই সোনার টাকা জারি আছে মাখলুপ এইরূপ সমঝিয়া থাকেন। সোনার তৈয়ারী ধাতু-মুদ্রা বাজারে আদৌ চলিতেছে কিনা দেখিবার দরকার নাই। এই হিসাবে ভারতে আজকাল যে টাকা চলিতেছে তাহা “সোনার টাকা।”

চোদ্দ দেশে “ভারতীয়” “সোনার টাকা”

এই মুদ্রা-নীতি ভারতে কায়েম হয় ১৮৯৩-৯৮ সনে। সেই সময়ের ভিতর হার্শেল সাহেব ছিলেন এক কারেন্সী-তদন্তের কর্ত্তা, আর এক তদন্ত চলে ফাউলার সাহেবের নেতৃত্বে। ভারতবর্ষের দেখাদেখি এই ধরণের “সোনার টাকা” মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র চালাইয়াছে তাহার অধীন ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জে (১৯০৩)। মধ্য আমেরিকার মেক্সিকো এবং পানামা এই দুই দেশেও ভারতবাসীর সুপরিচিত মুদ্রানীতি চলিতেছে। এই বিষয়ে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সুপারিসই কার্য্যকর হইয়াছে। মার্কিণের প্রভাব এই দুই দেশে জবর।

অপরদিকে এশিয়ার নানা দেশে ভারতীয় মুদ্রানীতির দিগ্বিজয় দেখা যাইতেছে। শ্যামদেশ এই প্রণালী গ্রহণ করিয়াছে। ইন্দোচীনের মালিক হইতেছেন ফরাসী জাত। তাঁহারা তাঁহাদের এই “কলনি”তে “(উপনিবেশ)” ভারতীয় ছাঁচে “সোনার টাকা” প্রচলন করিয়াছেন। বৃটিশরাজ ভারতের অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করিয়াছেন ষ্ট্রেট্‌স্ সেটল্‌-মেণ্টস্ জনপদে (সিঙাপুরে)।

সুমাত্রা, জাভা ইত্যাদি দ্বীপের মালিক ওলন্দাজেরা। ওলন্দাজেরা স্বদেশেই একবার এই নীতি চালাইয়াছিল (১৮৭৭)। কাজেই তাহাদের “কলনি”তে অনেক দিন ধরিয়াই “ভারতীয় রীতি” চলিতেছে। তবে এই সকল দ্বীপে ভারতের দৃষ্টান্ত অনুসারে কাজ করা হইতেছে এইরূপ বলা চলিবে না। কেন না কাল হিসাবে ভারতের রীতি

ওলন্দাজ রীতির পরবর্ত্তী,—যদিও "মাল" হিসাবে দুই-ই অনেকটা একরূপ।

দেখা যাইতেছে যে, গোটা দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া এই "গোল্ড-ক্যার্ণ হেবোরুং" রীতির "সোনার টাকা" চালাইতেছে। চীনে মুদ্রা-সংস্কার এখনো ঘটে নাই। ইয়াঙ্কিস্থানের ওস্তাদেরা চীনে এইরূপ সোনার টাকাই চালাইতে চাহেন। ইংরেজ ওস্তাদ কেইনসের মতে জাপানীরা মুদ্রা-প্রথাটাকে মূলতঃ এই মান মাফিকই গড়িয়া তুলিয়াছে। বলা যাইতে পারে যে,—এই মানটা যেন এক প্রকার এশিয়ার জন্যই আবিষ্কৃত হইয়াছে।

কিন্তু একথাটা ঠিক নয়। কেননা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, আমেরিকা মহাদেশের দুই মুল্লুকেও এই মানের রেওয়াজ আছে। তাহা ছাড়া, পশ্চিম আফ্রিকার কোনো কোনো "উপনিবেশে" ইংরেজ প্রভুরা এই রীতি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

কেবল তাহাই নয়। মায় ইয়োরোপেও এই ভারতীয় ছাঁচের "স্বর্ণ-তাল-মান" বেশ পরিচিতই বটে। বস্তুতঃ ভারতে এই প্রণালী কায়েম হইবার পূর্ব্বে,—ঠিক এক বৎসর পূর্ব্বে, ১৮৯২ সনে,—সেকালের অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গারি নামক বিপুল-বিস্তৃত সাম্রাজ্যে এই মান জারি করা হয়। আর প্রায় সেই সময়েই রুশ বাদশারা নিজ সাম্রাজ্যে এই প্রথা কায়েম করেন। ইয়োরোপে,—এবং সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ায়—এই পথের প্রদর্শক হইতেছেন হল্যাণ্ড। ১৮৭৭ সনে এই দেশে "ভারতীয় প্রথা" সুরু করা হয়।

মুদ্রানীতি বনাম জাতীয়তা

অতএব "দেশ" বা "জাতি" হিসাবে "গোল্ড ক্যার্ণ হেবোরুং"কে একঘরো করিয়া রাখা অসম্ভব। কি এশিয়া, কি ইয়োরোপ, কি আফ্রিকা, কি আমেরিকা,—জগতের সকল জনপদেই এই প্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত। আবার এই প্রথাটাকে রাষ্ট্রীয় হিসাবে স্বাধীনতাহীন দেশের অথবা নিম-স্বাধীন মুল্লুকের এবং "কলনি"-জাতীয় জনপদের পক্ষে স্বাভাবিক প্রথা বিবেচনা করাও চলিবে না। গোলাম জাতের উপর প্রভু জাতিরা এই প্রথাটা বসাইয়া পরাধীন নরনারীর রক্তশোষণ করিতেছে এইরূপ সমঝিয়া রাখা যুক্তিবিরোধী। কেন না যে ১৪টা দেশের নাম করা হইল তাহার ভিতর আসল গোলাম মাত্র ছয় দেশ,—ভারত, ইন্দোচীন, ষ্ট্রেটস্ সেটেল্‌মেণ্টস্, জাভা-সুমাত্রা, ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জ, এবং পশ্চিম আফ্রিকা। অন্যান্য ৮ দেশ প্রত্যেকেই পুরাস্বাধীন। তাহার ভিতর আবার জাপান হইতেছেন ফার্ষ্টক্লাশ পাওয়ার (প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্র-শক্তি)। আর রুশিয়া এবং অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গারি ১৯১৮ সনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কেবল ফার্ষ্টক্লাশ পাওয়ার মাত্র নয় "দুঁদে", প্রবলপ্রতাপ, নামডাক-ওয়ালা সাম্রাজ্যই বিবেচিত হইত।

এই চোদ্দটা দেশে যে ধরণের "সোনার টাকা" চলিতেছে তাহার "দর্শন"টা তাহা হইলে ঢুঁড়িতে হইবে কোথায়? ঢুঁড়িতে হইবে দেশের আর্থিক অবস্থা-ব্যবস্থার ভিতর। নরনারীর রক্তহিসাবে, দেশের শাসন-প্রণালী হিসাবে, জগতের মানচিত্রে এই সকল জনপদের অবস্থান হিসাবে, আর "প্রাচ্য"-"পাশ্চাত্য" হিসাবে দেশগুলার ভিতর এক-প্রকার কোনো ঐক্য বা সাম্য নাই। কিন্তু সাম্য আছে অনেকটা আর্থিক মাপজোকে। তবে আর্থিক তরফ হইতেও এই দেশগুলা আকারে-প্রকারে বিলকুল একরূপ এইরূপও সমঝিতে হইবে না। এই হিসাবেও নানা পার্থক্য আর উনিশ-বিশ আছেই আছে। বস্তুতঃ, মুদ্রানীতিটাও মাত্র কাঠাম-হিসাবে এই সকল দেশের ভিতর একরূপ। কিন্তু প্রত্যেক দেশেই কিছু না কিছু বিশেষত্ব ঢুঁড়িয়া পাওয়া কঠিন নয়। এই চোদ্দ দেশে মুদ্রানীতির "গোত্র"টা এক,—মাত্র এইরূপই সমঝিয়া রাখা কর্ত্তব্য। অন্যান্য যত গোত্রের "সোনার টাকা" থাকিতে পারে এই চোদ্দ দেশে সেই গোত্রের সোনার টাকা নাই। এই সকল মুল্লুকে যে ধরণের সোনার টাকা চলিতেছে তাহা হইতে অন্যান্য গোত্রের সোনার টাকা পৃথক।

"গোল্ড-ক্যার্ণ-হেবরুং"য়ের গোত্র-লক্ষণ

"গোল্ড-ক্যার্ণ-হেবরুং" নামক বিচিত্র "সোনার টাকার" গোত্র-লক্ষণ কি কি? প্রথমতঃ,—সোনায় তৈয়ারী টাকা বাজারে চলে না। চলিলেও তাহা পরিমাণ হিসাবে ধর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য নয়। দ্বিতীয়তঃ,—যে টাকাটা বাজারে চলে তাহা ভাঙাইয়া তাহার বদলে গবর্মেণ্ট সোনায় তৈয়ারী টাকা অথবা সোনার তাল দিতে বাধ্য

নয়। তৃতীয়তঃ, বিদেশে টাকা পাঠাইতে হইলে লোকেরা দেশী টাকাটা সোনার টাকায় ভাঙাইয়া লয়। বিনিময়ের হারটা নির্দ্দিষ্ট থাকে। হারটা নির্দ্দিষ্ট করিবার সময় উচ্চতম সীমানার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। টাকা ভাঙাইবার কাজটা সামলানো হয় সরকারী বা নিম-সরকারী "সেণ্ট্র্যাল ব্যাঙ্ক" নামক কেন্দ্র-প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে। যে সকল দেশে এইরূপ ব্যাঙ্ক নাই সেই সকল দেশে বিনিময়ের ব্যবস্থা থাকে খোদ গবর্মেণ্টের হাতে। চতুর্থতঃ, দেশী টাকা সোনার টাকায় পরিণত করিবার জন্য যে পরিমাণ সোনা আবশ্যক তাহা স্বদেশের ভিতর একপ্রকার রাখা হয় না—রাখা হয় প্রধানতঃ বিদেশে। মাত্র অল্প পরিমাণ "তাল" বা "সোনার কাগজ" স্বদেশে রাখা হয়।

এই চার-লক্ষণওয়ালা "স্বর্ণ-তাল-মানে"র প্রকৃতি আরও সংক্ষেপে বিবৃত করা সম্ভব। প্রথম কথাই হইতেছে বহির্ব্বাণিজ্যের দেনা শুধিবার জন্য সোনার রেওয়াজ। আর ঘরোআ কাজে সোনার সঙ্গে অসহযোগ।

মাখ্লুপ তাঁহার গ্রন্থের পরিশিষ্টে এই বিচিত্র সোনার টাকার দার্শনিক জন্মস্থানটা দেখাইয়া দিয়াছেন। "রিকার্ডোজ্ হেব্রুংসপ্লান আউস ডেম ইয়ারে ১৮১৬" অর্থাৎ "১৮১৬ সনে রিকার্ডো-প্রচারিত মুদ্রানীতি" নামে সেকালের ইংরেজ মুদ্রা-দক্ষ রিকার্ডোর মত অনূদিত হইয়াছে। অন্যান্য অনেক অর্থনৈতিক দর্শনের মতন এই মুদ্রা-দর্শনেও রিকার্ডো একজন জবরদস্ত পণ্ডিত। তাঁহার "প্রোপোজ্যাল্‌স্ ফর অ্যান্ ইকনমিক্যাল অ্যাণ্ড সিকিওর কারেন্সী" (কম-খরচওয়ালা নিরাপদ মুদ্রানীতি-বিষয়ক প্রস্তাব) ১৮১৬ সনে প্রকাশিত হয়। সেই প্রস্তাবটাই হইতেছে পূর্ব্বোক্ত চোদ্দ দেশের,—সঙ্গে সঙ্গে ভারতেরও-বর্ত্তমান মুদ্রা-ব্যবস্থার জন্মদাতা।

রিকার্ডো ও যুবক ভারত

রিকার্ডোর এই মুদ্রা-দর্শন ভারতের পণ্ডিতমহলে সুপরিচিত থাকিবারই কথা। কেন না জার্ম্মাণ পণ্ডিত মাখ্লুপ আজ যে প্রস্তাবটার জার্ম্মাণ তর্জ্জমা জারি করিতেছেন তাহা লইয়া ভারতবর্ষে তুমুল আন্দোলন ঘটিয়া গিয়াছে। তবে তখনকার দিনে ভারতীয়,—বিশেষতঃ বাঙালী,—পণ্ডিতেরা মুদ্রাতত্ত্বে মাথার ঘী খরচ করিতেন কিনা জানি না। এই সম্বন্ধে ভবিষ্যতে যুবক ভারতের পক্ষে আলোচনা করিয়া দেখা মন্দ নয়।

সে হইতেছে যুবক বাংলার জন্মকালের (১৯০৫) বহু পূর্ব্বে। ১৮৭৫-১৮৯২ আর ১৮৯৩-১৮৯৮ সনের যুগে আর্থিক ভারত সম্বন্ধে মুদ্রা-দক্ষেরা যে সকল আন্দোলন চালাইয়াছেন তাহার সঙ্গে বাঙালী মাথার যোগাযোগ কতটা ছিল তাহা আজ একটা প্রত্নতত্ত্ব-গবেষণার বিষয়। যাহা হউক, সেই যুগের এক ইংরেজ ওস্তাদ "রিকার্ডো রিকার্ডো" করিয়া ক্ষেপিয়াছিলেন। আর কষ্টে স্বষ্টে তাহার জয়জয়কারও ঘটিয়াছিল। তিনি রিকার্ডো কর্ত্তৃক ১৮১৬ সনে বিলাতের জন্য প্রচারিত দাওয়াইটাই ভারতের জন্য কায়েম করিতে লাগিয়া যান। এই জন্য তাঁহাকে প্রায় ২০।২৫ বৎসর গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হয়। ১৮৯২ সনে তিনি "রিকার্ডোজ এক্‌স্‌চেঞ্জ রেমিডি" (অর্থাৎ রিকার্ডো-সৃষ্ট বিনিময়-দাওয়াই) পুস্তিকাকারে প্রচার করেন। এই ব্যক্তির নাম লিণ্ড্‌সে। তিনি ছিলেন সেকালের "বেঙ্গল ব্যাঙ্কে"র একজন বড় চাকুর্‌য়ে।

লিণ্ড্‌সের রিকার্ডো-বিষয়ক "প্রপাগাণ্ডা" চলিয়াছিল বিশ পঁচিশ বৎসর ধরিয়া। এই প্রপাগাণ্ডার যুগে বিলাতী অধ্যাপক মার্শ্যালও রিকার্ডোর মতের স্বপক্ষেই রায় দিয়াছিলেন। ১৮৮৭ সনের "কন্‌টেম্পোরারি রিভিউ" পত্রিকায় মার্শ্যালের পাতি প্রচারিত হয়। এইখানে আনুষঙ্গিক ভাবে বলিয়া রাখা চলে যে, ধন-বিজ্ঞান-বিদ্যার অন্যান্য বিভাগের মতন মুদ্রা-দর্শন সম্বন্ধেও একালের মার্শ্যাল সেকালের রিকার্ডোকেই অনেক অংশে গুরু সম্‌ঝিয়া চলিয়াছেন। এই বিদ্যার দুনিয়ায় রিকার্ডো একপ্রকার অমর রূপে পূজা পাইয়া আসিতেছেন।

রিকার্ডো যে দর্শনের প্রবর্ত্তক তাহার মোটা কথা নিম্নরূপ। প্রথমতঃ, সস্তায় যে টাকা তৈয়ারী করা যায় সেই টাকাই চালানো উচিত দেশের ভিতর। দ্বিতীয়তঃ, এই টাকাটার দাম হওয়া উচিত—ঠিক তাহার পরিবর্ত্তে বাজারে যতটা সোনা পাওয়া যায় তাহার সমান। তৃতীয়তঃ বহির্ব্বাণিজ্যের জন্য সোনা চাই-ই চাই, কিন্তু সোনাটা "বার"

অর্থাৎ "তাল" হিসাবে দেওয়া উচিত,—"মুদ্রা" হিসাবে নয়। চতুর্থতঃ, দেশের বাজারে বাজারে সোনার টাকা চলিতে দেওয়া গবর্মেণ্টের পক্ষে উচিত নয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে রিকার্ডো নিজ মাতৃভূমি ইংল্যাণ্ডের জন্যই এই ব্যবস্থা প্রচার করিয়াছিলেন। ইহাই ছিল তাঁহার মতে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুদ্রানীতি।

লিণ্ডসের পুস্তিকা ১৮৯২ সনে ছাপা হয়। কিন্তু ১৮৭৬ সন হইতেই তাঁহার মতগুলা প্রচারিত হইতে থাকে। হার্শেল সাহেব যখন ভারতীয় মুদ্রানীতির তদন্ত করিতে বসেন (১৮৯২) তখন এই মতের স্বপক্ষে বেশী লোকের রায় পাওয়া যায় নাই। ১৮৯৮ সনে ফাউলার সাহেব যখন তদন্তের কর্ণধার তখন লিণ্ডসে নিজেই এই বিষয়ে তদন্ত-কমিটির সম্মুখে নিজ বক্তব্য খুলিয়া বলেন। কিন্তু তাঁহার মত তখন ভারত-গবর্মেণ্ট-কর্ত্তৃক গৃহীত হয় নাই। অথচ ফাউলার-কমিটি যে সকল মত অনুসারে কাজ করিবার জন্য গবর্মেণ্টকে পরামর্শ দেন সেই সকল মতও গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক অনুসৃত হয় নাই। প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে, ঘটনাচক্রে লিণ্ডসে-প্রচারিত মতই ভারতে চলিতেছে। ১৮৯৮ সন হইতে আজ পর্য্যন্ত রিকার্ডো-দর্শনই ভারতীয় মুদ্রানীতির তাত্ত্বিক ভিত্তি এইরূপ বলা চলে।

অবশ্য রিকার্ডো এই বিচিত্র "সোনার টাকার" একমাত্র জন্মদাতা অথবা সর্ব্ব-প্রাচীন প্রচারক একথা ধনবিজ্ঞান-বিদ্যার ইতিহাসে প্রমাণ করা সহজ নয়। সাধারণতঃ লোকেরা রিকার্ডোকেই মনে আনে। কিন্তু জার্ম্মাণ অধ্যাপক হেরো ম্যেলার বলিতেছেন,—"সেকালের ফরাসী পণ্ডিত ল এবং বার্ব এই মতের প্রচারক ছিলেন। ঐতিহাসিকের পক্ষে এই তথ্য জাহির করা সম্ভব।"

আন্তর্জ্জাতিক দেনা-পাওনা ও মুদ্রা-তত্ত্ব

মাথ্লুপের আলোচনায় টাকা বস্তুটার সংজ্ঞাই নতুন আকারে দেখা দিতেছে। বস্তুতঃ ভারতীয় ছাঁচের "সোনার টাকা"য় টাকা বস্তুর প্রকৃতি বিচিত্র। বিনিময়-হারই যখন টাকা-কড়ির আসল কথা তখন মামুলি অর্থে টাকা শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে না। এই ব্যবস্থায় প্রথমেই বর্জ্জন করা দরকার টাকা গড়িবার মাল মসলা, ধাতু, কাগজ ইত্যাদি লইয়া আলোচনা-গবেষণা। তাহার পর বর্জ্জন করা আবশ্যক টাকাকড়ি দিয়া কর্জ্জ শুধিবার উপায় বিষয়ক তর্কপ্রশ্ন। অধিকন্তু খোলা টাকশালে লোকেরা ধাতু দিয়া টাকা গড়িয়া লইতে পারে কিনা তাহার আলোচনাও অনাবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু এই সকল প্রশ্নের জবাব দেওয়া সুপ্রচলিত টাকা-বিজ্ঞানের প্রধান সমস্যা। অধিকন্তু কাগজী টাকার সঙ্গে সোনার সম্বন্ধ লইয়াও বেশী মাথা না ঘামাইলেও চলে।

এই নয়া টাকা-বিজ্ঞানের প্রধান আলোচ্য বিষয় হইতেছে আন্তর্জ্জাতিক লেনদেন। দেশে দেশে দেনা পাওনা শোধ,—"ৎসালুংস্ বিলান্ৎস্" ("ব্যাল্যান্স্ অব অ্যাকাউণ্ট্স"),—হইতেছে মুদ্রা-শাস্ত্রের গোড়ার কথা। মাল আমদানি বাবদ এবং অন্যান্য শ্রেণীর দেনা বাবদ এক দেশ অন্য দেশকে যতকিছু টাকা দিতে বাধ্য, তাহার সঙ্গে রপ্তানি বাবদ এবং অন্যান্য শ্রেণীর পাওনার খাতে যাহা কিছু পাওয়া যাইবে তাহার মিল বা সাম্য থাকিলেই হইল। এই সমতা যেখানে যখন আছে তখন সেখানে মুদ্রা-বিভ্রাট অসম্ভব। টাকা সেই সকল ক্ষেত্রে নিরাপদ।

কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক দেনা-পাওনার সমতা অনেক সময়েই থাকে না। মালের আমদানি-রপ্তানি ছাড়া অন্যান্য অনেক কারণেও এক দেশের নিকট অন্য দেশের দেনা-পাওনা বাড়ে কমে। "হিসাবটা" কখনো বা দেশের পক্ষে যায়, কখনো বা "বিপক্ষে"। জার্ম্মাণ পারিভাষিকে, হিসাবটা বিপক্ষে গেলে তাহার নাম হয় "পাসিভ" (ইংরেজিতে "আন্-ফেভারেব্‌ল্"), তার উল্টা হইতেছে "আক্টিভ্" ("ফেভারেব্‌ল")। যে-যে ক্ষেত্রে হিসাব-নিকাশের "পাসিভ্" মূর্ত্তি, সেই সকল ক্ষেত্রে রিকার্ডো-পন্থী "সোনার টাকা"ওয়ালা দেশের "সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক" অথবা গবর্মেণ্ট টাকার মূল্য নিরাপদ রাখিবার জন্য বিশেষ যত্ন লইতে বাধ্য।

বলা বাহুল্য, এই জন্যই ভারতে গবর্মেণ্টকে টাকার ইজ্জৎ বাঁচাইতে গিয়া বাজারে কখনো টাকা ছাড়িতে হয় কখনও বা বাজার হইতে টাকা সরাইয়া লইতে হয়। টাকা-বিজ্ঞানের সনাতন নিয়মানুসারেই ভারতের গবর্মেণ্ট

বাজার "ম্যানিপিউলেট" (শাসন) করিতে অভ্যস্ত। তবে কখনো কখনো এই টাকা-শাসন-কাণ্ডে ভুল-চুক করিয়া বসা অসম্ভব-কিছু নয়।

স্বর্ণ-"বিনিময়" বনাম স্বর্ণ-"তাল"

এইখানে একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। মাথ্লুপ "গোল্ড-ক্যার্ণ" শব্দ কায়েম করিয়া খাঁটি রিকার্ডো-পন্থী "স্বর্ণ-তাল"ই বুঝিয়াছেন। কিন্তু ১৮৯৩-৯৮ সন হইতে ভারতে যে মান চলিতেছে তাহাকে "গোল্ড একস্‌চেঞ্জ" (স্বর্ণ-বিনিময়) মান বলা হয়। তাহাতে রিকার্ডোর আত্মাকে যোল কলায় পাওয়া যায় না। এই বস্তুটা লিণ্ড্‌সের প্রচারিত মাল। কিন্তু এটাকে "গোল্ড ক্যার্ণ" বলা চলিবে না। ১৯২৬ সনে হিল্টন ইয়ং মুদ্রা-কমিশন ভারতে যে প্রণালী প্রবর্ত্তন করিতে চাহেন তাহার নাম "গোল্ড বুলিয়ন ষ্ট্যাণ্ডার্ড" (স্বর্ণ-তাল-মান)। ইহাই খাঁটি রিকার্ডো-পন্থী বস্তু। মাথ্লুপের জার্ম্মাণ শব্দে এই বস্তুটাই বুঝিতে হইবে।

রিকার্ডো এতদিনে পুরাপুরি ভারত দখল করিতে চলিল। কিন্তু মাথ্লুপ আজকালকার চোদ্দ দেশে প্রচলিত গোল্ড একস্‌চেঞ্জ মানে আর রিকার্ডো-বাঞ্ছিত গোল্ড "বার" (বুলিয়ন) মানের যে সূক্ষ্ম প্রভেদ আছে তাহা ধরিতে পারেন নাই। না পারিয়াই অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গারি, ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য রূপার টাকাওয়ালা দেশগুলাকে সোজাসুজি রিকার্ডো-পন্থী স্বর্ণ-"তাল"-মানের দেশ ধরিয়া লইয়াছেন। বস্তুতঃ, যথার্থ স্বর্ণ "তালের" মান জগতে এখনো কায়েম হয় নাই। ১৯২৭ সনের ভারতে তাহা লইয়া ঘোঁটমঙ্গল সুরু হইতে চলিল মাত্র।
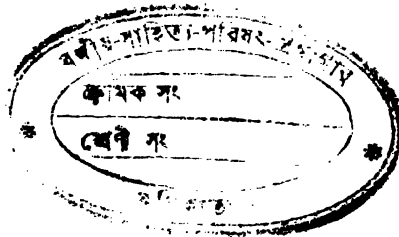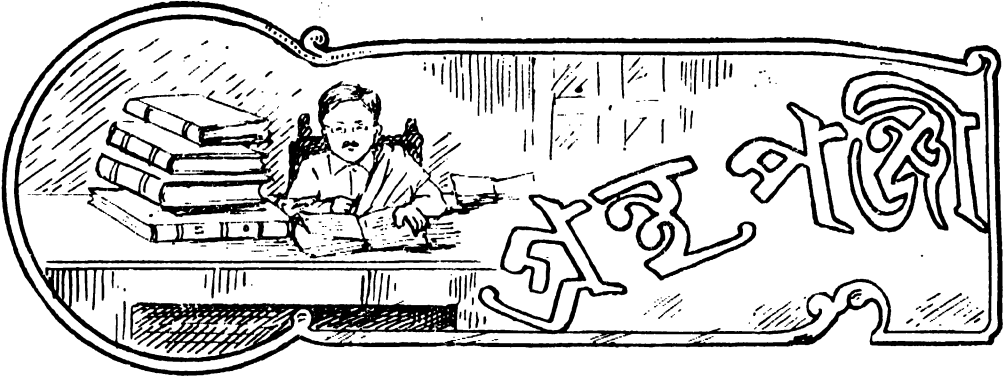
"এ শর্ট হিষ্টরি অব্ দি বৃটিশ হুর্কার্স" (ইংরেজ মজুর-আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস),—রেমণ্ড পোষ্টগেট, প্লেবস্ লীগ্, লণ্ডন ১২০ পৃষ্ঠা, ১৯২৬।

"দি টাউন লেবারার (১৭৬০-১৮৩২)" (শহরের মজুর ১৭৬০-১৮৩২), জে, এল এবং বার্বারা হামণ্ড,—লেবার রিসার্চ ডিপার্টমেণ্ট, লণ্ডন, ৭+৩৪২ পৃ, ১৯২০।

"ওস্কার ফোন মিল্লার" (টেক্‌নিক্যাল শিল্পোন্নতির এবং এঞ্জিনিয়ারিং-বিদ্যার জার্ম্মাণ প্রবর্ত্তক) কাল্‌কৃশ্মিট, ডীক কোং লাইপৎসিগ, ৮৫ পৃষ্ঠা, ১৯২৪।

দি এথিক্‌স্ অব বিজনেস" (কারবারের নীতিশাস্ত্র), এডগার হেয়ার মাস্, হার্পার কোং, নিউইয়র্ক, ১৯২৬, ১০+২৪৪ পৃষ্ঠা, ২ ডলার।

"দি আগ্রারিয়ান রেহ্বোলিউশ্যন ইন রুমাণিয়া" (রুমাণিয়ায় ভূমি-বিপ্লব), এহ্বান্স্, ইউনিভার্সিটি প্রেস, কেম্ব্রিজ, ১৯২৪, ১২সি ৬ পে।

"লে কারাক্তেরিস্তিকে ফন্দামেন্তালি দেল্লে এস্‌পর্ত্তাৎ-সিয়নি" (রপ্তানি-বাণিজ্যের মূল-বিশেষত্ব), কর্সানি,—রস্‌সি কোং, হ্বিচেন্‌ৎসা, ১৯২৫, ২৪ লিয়ার।

"লা প্রেভিজিঅঁ আঁ মাতিয়ার দ' ক্রিজ্ একনমিক" (আর্থিক সঙ্কট-বিষয়ক ভবিষ্যদৃষ্টি), লাকৰ্ম্ব, রিহ্বিয়ার কোং, প্যারিস, ১৯২৬৭

"ফিনান্‌সিং অ্যান্ এণ্টারপ্রাইজ" (কারবারের জন্য টাকা সংগ্রহ করা),—কনিংটন, রোনাল্ড প্রেস, নিউইয়র্ক, ১৯২৩, ২৩+৭+৭+৬৬৭ পৃষ্ঠা, ৭ ডলার।

"এলিমেণ্টস অব্ বিজনেস ফিনান্স" (শিল্প-বাণিজ্যের পুঁজি-তত্ত্ব), বন্‌ভিল, প্রেণ্টিস-হল কোং, নিউইয়র্ক, ১৯২৫, ১৩+৪১২ পৃষ্ঠা, ৫ ডলার।

"প্রিন্‌সিপলস্ অব্ কর্পোরেশ্যন ফিনান্স" (বিপুল সঙ্ঘ চালাইবার টাকাকড়ি-বিষয়ক বিজ্ঞান), রীড, হটন মিফ্‌লিন কোং, বষ্টন, ১৯২৫, ৮+৪১২ পৃ, ২.৫০ ডলার।

"বাংলার বর্ত্তমান অর্থ-সমস্যা ও জাতীয় ব্যবসায়" শ্রীরজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স্, কলিকাতা, ৪+১১৪ পৃষ্ঠা, ১৯২৬।

"বাংলার পল্লী-সমস্যা" শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র দাসগুপ্ত,—সরস্বতী লাইব্রেরী, কলিকাতা, ৬+৬৭+২৮ পৃষ্ঠা, ১৯২৬, মূল্য ৸০ আনা।

"ড্যর লাটাইনিশে মিন্‌ৎসবুণ্ড জাইট ডেম হ্বেল্ট-ক্রীগে" (ল্যাটিন মুদ্রা-সঙ্ঘ,—ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইতালি ও সুইট-সার্ল্যাণ্ডের মুদ্রা-সমঝৌতা, মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী অবস্থা), এগ্‌নার,—আকাডেমিশেস ফার্লাগ কোং, লাইপৎসিগ, ১৯২৫, ৫.৬০ মার্ক।

"ইকনমিক লাইফ ইন এ মালাবার হ্বিলেজ" (এক মালাবার পল্লীর আর্থিক জীবন), শ্রীসুব্বারাম আয়ার, বাঙ্গালোর প্রিণ্টিং অ্যাণ্ড পাবলিশিং কোং, বাঙ্গালোর, ১৲।

"ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কন্‌ডিশ্যন্স্ অ্যাণ্ড লেবার লেজিস্‌লেশ্যন ইন জাপান" (জাপানের শিল্প-কারখানা ও মজুর-আইন), ইহ্বাস আয়ুসাওয়া, জেনেহ্বার বিশ্বরাষ্ট্র পরিষৎ-কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ২ শিলিঙ।

দিয়াশলাইয়ের কারবারে বিশ্বপ্রতিযোগিতা

অধ্যাপক শ্রীহীরালাল রায়, এ, বি (হার্ভার্ড), ডক্‌টর,-ইঙ্‌ (বার্লিন)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নরওয়ে

মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নরওয়ের দিয়াশলাই কারখানাগুলি বেশ স্বাধীন ব্যবসায় করছিল। তার পর থেকে ক্রমশই সুইডিস্-আমেরিকান ট্রাষ্টের হাতে এসে পড়ছে। ট্রাষ্ট-বহির্ভূত কোম্পানীগুলির অবস্থা এখন খুব খারাপ। ১৯১৫ সনে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৫৭০০টন এবং ১৯২৫ সনে ২০০০-৩০০০ টন। যুদ্ধের সময় নরওয়ে ফ্রান্সে দিয়াশলাই খুব রপ্তানি করত। কিন্তু ফ্রান্সে গভর্ণমেণ্টের একচেটিয়া ব্যবসায় হওয়ার পর সেখানকার রপ্তানি ক্রমশই কমে যাচ্ছে।

হল্যাণ্ড

এদেশে দিয়াশলাই রপ্তানির চেয়ে আমদানিই বেশী।

অষ্ট্রীয়া

অষ্ট্রীয়াতে দিয়াশলাইয়ের কারখানাগুলি বেশ ভালই চল্‌ছিল। কিন্তু যুদ্ধের পর কতকগুলি প্রদেশ স্বাধীন হয়ে যাওয়ায় বিক্রয়ের বাজার কমে গেছে এবং কিছু কিছু প্রয়োজনাতিরিক্ত মাল তৈয়ারী হচ্ছে। এর ফলে বড় বড় কোম্পানীগুলি একমত হয়ে দিয়াশলাইয়ের দর বাড়িয়েছে এবং বিক্রয়ের বাজার সম্বন্ধেও নিজেদের মধ্যে একটা রফায় এসেছে। ইজিপ্ট, সিরিয়া, লেবানন্ এবং উত্তর আফ্রিকায় অষ্ট্রীয়ান্ দিয়াশলাই রপ্তানির পরিমাণ বেড়েছে। মার্কিণ দেশেও কতকটা স্থান পেয়েছে; কিন্তু তেমনি রুমাণিয়া, হাঙ্গেরিয়া, ইতালি, তুরস্ক এবং চেকো-শ্লোভাকিয়াতে স্থানীয় কারখানা হওয়ায় সে সব দেশে রপ্তানি কমেছে। পোল্যাণ্ডে সুইডিস্ ট্রাষ্ট একচেটিয়া ব্যবসায় পাওয়ায় সেখানে রপ্তানি একেবারে বন্ধ হয়েছে। তবু গত কয়েক বৎসরে মোটের উপর অষ্ট্রীয়ান্ দিয়াশলাইয়ের রপ্তানি আগের দ্বিগুণ হয়েছে। ১৯২৪ সনে দেশী দিয়াশলাইয়ের উপর ট্যাক্স ৪০% বেড়েছে। তেমনি আমদানি দিয়াশলাইয়ের উপর শুল্ক ১৭% থেকে ৩০% হয়েছে। সুইডিস্ ট্রাষ্ট এদেশে দিয়াশলাইয়ের একচেটিয়া ব্যবসায়ের চেষ্টা করায় অষ্ট্রীয়ান্, হাঙ্গেরিয়ান্ এবং চেকো-শ্লোভাকিয়ার দিয়াশলাই ব্যবসায়ীরা একত্র হয়ে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে।

পোল্যাণ্ড

পোল্যাণ্ডে দিয়াশলাইয়ের কারবার যুদ্ধের পূর্ব্বে ভাল ছিল না। বিদেশ থেকে আমদানি করে দেশের প্রয়োজন মিটাতে হত। যুদ্ধের পর রাশিয়ান্ কারবার মধ্য এবং পশ্চিম ইউরোপে বন্ধ হওয়ায় খুব তাড়াতাড়ি এই ব্যবসায়ে পোল্যাণ্ড জেগে উঠে। রুমাণিয়া, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া সমস্ত দেশে দিয়াশলাই রপ্তানি আরম্ভ হয়; কিন্তু তৈয়ারী করবার খরচ বেড়ে যাওয়ায় এবং ফ্র্যান্সে গভর্ণমেণ্টের একচেটিয়া ব্যবসায় হওয়ায় কিছুদিন পরেই বিদেশী বাজারের প্রতিযোগিতায় পরাজয় আরম্ভ হয়, এমন কি নিজের দেশেও বিদেশী দিয়াশলাই প্রতিপত্তি লাভ করতে থাকে; অনেক কারখানা একেবারে বন্ধ করে ফেলতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন কারখানা একত্র করে, দিয়াশলাইয়ের কাঠ রপ্তানি কমিয়ে দিয়েও এই পতন স্থগিত রাখা সম্ভব হল না। তার উপর পোল্যাণ্ডের মুদ্রার দর কমে যাওয়ায় দিয়াশলাইয়ের জন্য রাসায়নিক মালমশলা বিদেশ থেকে কেনা শক্ত হয়ে উঠল। পোলিশ গভর্ণমেণ্ট দেখল কারখানাগুলি যদি বন্ধ হয়ে যায় তবে বেকারের সংখ্যা আরও বাড়বে। এই রকম অবস্থায় পড়ে গভর্ণমেণ্ট ১৯২৫ সনের জুলাই মাসে ইণ্টারন্যাশন্যাল ম্যাচ্ কর্পোরেশানের (সুইডিস্-আমেরিকান্ ট্রাষ্টের শাখা) সঙ্গে কতকগুলি সর্ত্তে চুক্তিতে আবদ্ধ হ'ল। কর্পোরেশান্ গভর্ণমেণ্টকে কিছু টাকা ধার দিল এবং লাভের কিয়দংশ দিতে স্বীকৃত হ'ল। কুড়ি বৎসরের জন্য গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে একযোগে কর্পোরেশান্ পোল্যাণ্ডে দিয়াশলাই প্রস্তুত, বিক্রয়, আমদানি-রপ্তানির একচেটিয়া ব্যবসায়ের অধিকার লাভ করল। এখন পোল্যাণ্ডের দিয়া-

শালাইয়ের সমস্ত (১৮টী) কারখানাগুলিই কর্পোরেশানের অধীনে চলবে। চুক্তি অনুসারে দেশের প্রয়োজনীয় সমস্ত দিয়াশলাই এই কারখানাগুলিতে তৈয়ারী করিয়ে তার উপর ৩০% বিদেশে রপ্তানি করতে হবে।

পর্ত্তুগাল

১৯২৫ সনের এপ্রিল পর্য্যন্ত একটী বেসরকারী কোম্পানীর পর্ত্তুগালে দিয়াশলাইয়ের কারবারের একচেটিয়া অধিকার ছিল। কিন্তু এর ফলে দেশে দিয়াশলাইয়ের দর অত্যন্ত বেড়ে যাওয়ায় গভর্ণমেণ্ট এই অধিকার তুলে দেয়। তখন থেকে যে-কেউ দিয়াশলাই তৈয়ারী করতে পারত; গভর্ণমেণ্টকে লাভের ৮% দিতে হত; কিন্তু লোকসানের ভাগী গভর্ণমেণ্ট ছিল না। তা ছাড়া প্রত্যেক দিয়াশলাইয়ের বাক্সের উপর ট্যাক্স ছিল এবং আমদানি দিয়াশলাইয়ের উপর একটা শুল্ক ছিল। দিয়াশলাইয়ের দর অত্যন্ত বেড়ে গেল, এবং তার উপর শ্রমিকরা ধর্ম্ম-ঘট করল। গভর্ণমেণ্ট তখন নিরুপায় হয়ে ১৯২৬ সনের প্রথমভাগে একটী নূতন কোম্পানী স্থাপন করতে দিল। কর্ত্তা হলেন সুইডিস্, ফরাসী এবং পর্ত্তুগিজ্ কয়েকজন লোক। যদিও এই কোম্পানীকে লিখে পড়ে একচেটিয়া ব্যবসায়ের অধিকার দেওয়া হয়নি, তবু প্রকৃত প্রস্তাবে এই কোম্পানীই এখন দেশের সমস্ত দিয়াশলাই কারখানার মালিক এবং বিদেশী দিয়াশলাই আমদানির কর্ত্তা। এই কোম্পানীতে সুইডিস্ ট্রাষ্টের অংশই বেশী এবং এই জন্যই সুইডিস্ দিয়াশলাই-ই এদেশে বেশী আমদানি হচ্ছে।

রুমাণিয়া

বহুকাল পর্য্যন্ত বেশীর ভাগ দিয়াশলাই-ই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হ'ত। কিন্তু এখন দেশেই দিয়াশলাই নির্ম্মাণের বিশেষ চেষ্টা চল্‌ছে। কাঠের এবং কাগজের প্রাচুর্য্য থাকায় এই শিল্পের উন্নতিও খুব সম্ভবপর। ক্রমশই আমদানি দিয়াশলাইয়ের পরিমাণ কমতে আরম্ভ করেছে।

সুইট্‌সারল্যাণ্ড্

সুইট্‌সারল্যাণ্ড্ নিজের প্রয়োজনাতিরিক্ত দিয়াশলাই প্রায় সমস্তই ১৯২৪ সন পর্য্যন্ত ফ্রান্সে রপ্তানি করত। কিন্তু সেখানে গভর্ণমেণ্ট্ এই ব্যবসায় একচেটে করে ফেলার পর সুইট্‌সারল্যাণ্ডের কারখানাগুলির দুরবস্থা উপস্থিত হয়। দুইটী বড় কোম্পানী ফেল পড়ে এবং অন্যান্যগুলি প্রস্তুত করার খরচের চেয়ে কম দামে দিয়াশলাই বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। এ অবস্থায় গভর্ণমেণ্ট্ ১৯২৬ সনে জানুয়ারীতে এই শিল্পের রক্ষার জন্য দিয়াশলাই আমদানির উপর কতকগুলি বিশেষ কড়া নিয়ম করেন। তারপর আবার উন্নতি আরম্ভ হয়েছে। যে সব কারখানায় আধুনিক যন্ত্রপাতিতে কাজ চালিয়ে তৈয়ারীর খরচ কমাতে পেরেছে তারাই লাভ করতে পারছে।

স্পেন্

স্পেন দেশের লোকেরা বরাবরই মোমের দিয়াশলাই পছন্দ করত। সম্প্রতি মাত্র কাঠের দিয়াশলাইয়ের চলন আরম্ভ হয়েছে। এই ব্যবসায়ে গভর্ণমেণ্টের একচেটিয়া অধিকার এক কোম্পানীকে দেওয়া হয়েছে। ১৯২৫ সনের আগষ্ট মাসের আইন অনুসারে এই কোম্পানী দিয়াশলাই প্রস্তুত করার বাধ্যতা থেকে মুক্তি পেয়েছে। বিদেশ থেকে দিয়াশলাই আমদানি করে বিক্রয় করার অধিকার লাভ করেছে। কিন্তু আমদানির পরিমাণ এবং খুচ্‌রা বিক্রীর দর গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে একত্রে পরামর্শ করে ঠিক করতে হবে। ১৯২৬ সনের ফেব্রুয়ারীর আইন অনুসারে বার্ষিক আমদানির পরিমাণ ৩৮,০০০,০০০ বাক্স (৪০টী কাঠিওয়ালা) এবং প্রত্যেক বাক্সের দাম ১০ পেষ্ট্রা ধার্য্য হয়েছে।

চেকো-শ্লোভাকিয়া

পুরাতন অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গারি রাজ্য মহাযুদ্ধের পরে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হওয়ায় চেকো-শ্লোভাকিয়া তার দিয়াশলাই বিদেশে চালান করতে বাধ্য হয়। প্রতিযোগিতার আঘাত এড়াবার জন্য এবং প্রস্তুত করার দাম কমাবার জন্য কতকগুলি কোম্পানী একত্র হয়। তাতে খরচ খুব কমে যায় এবং যে সব কারখানাগুলিতে লাভ হচ্ছিল না, সেগুলি বন্ধ করে বাকীগুলি আধুনিক প্রথায় চালাতে আরম্ভ করে এবং রাশিয়া থেকে কাঠ না এনে দেশী কাঠ ব্যবহার সুরু করল। যুদ্ধবিরামের কিছুদিন পরেই পোল্যাণ্ড, জুগোশ্লাভিয়া ও ফ্রান্সে দিয়াশলাই বিক্রয় করে বেশ

লাভ করতে থাকে। কিন্তু ভাগ্যচক্র আবার পরিবর্ত্তিত হল। পোল্যাণ্ডে রপ্তানি বন্ধ হল, ফ্রান্সে সরকারী একচেটিয়া ব্যবসার জন্য রপ্তানি কমল এবং সঙ্গে সঙ্গে সুইডিস্ ট্রাষ্টের বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতায় মার্কিণ দেশে বাজার হারাতে লাগ্‌ল। এ সমস্ত বিপদের মধ্যেও রপ্তানি কমে নাই, কারণ রুমাণিয়া ইংল্যাণ্ড্, ভারতবর্ষ এবং আলজিরিয়ায় রপ্তানি বেড়েছে। এখন একমাত্র বিপদ সুইডিস্ ট্রাষ্ট্। তার আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য অষ্ট্রীয়া ও হাঙ্গারির কোম্পানীগুলির সঙ্গে একত্র হয়েছে। ইতিমধ্যে সুইডিস্ ট্রাষ্ট্ চেকো-শ্লোভাকিয়ার একটী দিয়াশলাই কোম্পানীর বেশীর ভাগ অংশ কিনেছে।

হাঙ্গারি

হাঙ্গেরিয়ার দিয়াশলাইয়ের কারখানাগুলি দেশের সমস্ত প্রয়োজনই মিটাতে পারে উপরন্তু বিদেশে রপ্তানিও করে। যুদ্ধের পর সমস্ত কারখানাগুলি একত্র হয়ে দেশে এবং বিদেশে নিজেদের দিয়াশলাই বিক্রয়ের দর সম্বন্ধে একমত হয়েছে। ফলে দেশে দিয়াশলাইয়ের দর বেড়েছে এবং বিদেশে রপ্তানির দর কমেছে। হাঙ্গেরিয়ান্ দিয়াশলাই রুমাণিয়ায়, ফ্রান্সে, দক্ষিণ আমেরিকায়, দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং অষ্ট্রেলিয়ায় রপ্তানি হয়। এখানেও সুইডিস্ ট্রাষ্টের বিভীষিকা উপস্থিত হয়েছে। কোনো কোনো কারখানাকে কিংবা গভর্ণমেণ্টকে টাকা ধার দিয়ে ট্রাষ্ট এই দেশের দিয়াশলাইয়ের কারবার হস্তগত করবার চেষ্টায় আছে। সুতরাং বলা যায় না আর কতদিন হাঙ্গেরিয়ার দিয়াশলাইয়ের কারখানাগুলি স্বাধীনতা বজায় রাখতে পারবে।

কলিকাতার সড়কে ফুটপাথ

যে কয়টা দিক্ দিয়া প্রধানতঃ ফুটপাথের আলোচনা চলিতে পারে তাহা হইতেছে :—

(১) উপযোগিতা,
(২) নির্ম্মাণ ও রক্ষার খরচ,
(৩) স্বাস্থ্য,
(৪) সৌন্দর্য্য।

কলিকাতার ফুটপাথগুলি ন্যায়তঃ কর্পোরেশ্যনের শাসনাধীন। কিন্তু একতরফা ইহার স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হওয়া দূরে থাকুক, রক্ষিতও হয় না। ফুটপাথ নির্ম্মাণ একটা খাপছাড়া বস্তু নহে। ইহার সহিত অন্য বহু বিজ্ঞান জড়িত আছে, যাহা কর্পোরেশ্যনের অবহেলা করা উচিত নহে। যেমন :—

(১) এঞ্জিনিয়ারিং ও সার্ভেয়িং বিদ্যা,
(২) স্বাস্থ্যতত্ত্ব-ঘটিত ডাক্তারী জ্ঞান,
(৩) পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণ জ্ঞান,
(৪) পুলিশ,
(৫) আইন জ্ঞান,
(৬) ব্যবসায় জ্ঞান।

অন্য দিকে, অধিবাসিবৃন্দেরও স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে যথেষ্ট শিক্ষা থাকা দরকার। তবেই সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে কর্পোরেশ্যনের যোগাযোগ থাকার দরুণ ফুটপাথগুলি দেশের গৌরবের ও ঐশ্বর্য্যের বস্তু হইয়া দাঁড়াতে পারে।

সড়ক বনাম ফুটপাথ

ফুটপাথের অস্তিত্ব অথবা বিস্তারের পরিমাণ কি সড়কের বিস্তারের পরিমাণের উপর নির্ভর করে? কলিকাতায় তার কোন পরিচয় পাইতে বিলম্ব হয় না। অপ্রশস্ত সড়কে চওড়া ফুটপাথের কল্পনা করিতে পারি না। তাতে সড়কের সড়কত্ব ঘুচিয়া যায়।

সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয় সড়কের চরিত্রের উপর তার

বিস্তার ও ফুটপাথের বিস্তার নির্ভর করে। অর্থাৎ যে সড়কে যত বেশী ব্যবসা-বাণিজ্য তথা লোকজন ও যান-বাহনের যাতায়াত আছে, সে সড়ক ও সঙ্গে সঙ্গে ফুটপাথ তত চওড়া হওয়া আবশ্যক। কারণ চওড়া ফুটপাথ না থাকিলে যাতায়াতকারী ব্যক্তিদের জীবন সর্ব্বদা বেশী বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা।

কিন্তু কলিকাতা সহরে এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমটাই সর্ব্বদা চোখে পড়িবে। শিয়ালদহ ও হাওড়া কলিকাতার এই দুই ষ্টেশনকে বরাবর যোগ করিয়াছে হ্যারিসন রোড। কলিকাতার বড়বাজার অঞ্চল, হাওড়া পুলের দুই দিকের অনেকখানি স্থান দেশী বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। সারাদিনে এইখান দিয়া অসংখ্য মাল-বোঝাই গো-মহিষের গাড়ী, মোটর-লরী, মোটর-বাস্, ট্রাম, যাত্রীর গাড়ী, মোটর ও লোকজন চলাফেরা করিতেছে। অন্য সড়কের মত ২।১ টা পুলিশই এই সড়ক-ভাগের পক্ষে যথেষ্ট নহে। সড়কের শান্তি, সুশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ও দুর্ঘটনা নিবারণের জন্য বহু পুলিশ কর্ম্মচারী সর্ব্বদা মোতায়েন আছে। তারা এক মুহূর্ত্তও অন্যমনস্ক থাকিতে পারে না। এই সড়কের ও তার ফুটপাথের কথা বিচার করিলে মনে হয়, হ্যারিসন রোড ও ষ্ট্রাণ্ড রোডের এই অংশ অন্ততঃ সেণ্ট্রাল এভিনিউর চেয়েও চওড়া হওয়া দরকার। তার ফুটপাথও সেই অনুপাতে হওয়া দরকার।

চিৎপুর রোড, বৌবাজার ষ্ট্রীট, মাণিকতলা ষ্ট্রীট প্রভৃতি ও তাদের ফুটপাথগুলি সম্বন্ধেও এ মন্তব্য অল্পবিস্তর খাটে। অথচ ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির কথা বিবেচনা করিলে সেণ্ট্রাল এভিনিউ ও তার ফুটপাথ প্রয়োজনের অতিরিক্ত চওড়া বলিয়া মনে হয়।

সুতরাং এই কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে, "কলিকাতা সহরে সড়ক বনাম ফুটপাথ সমস্যা আজিও দেখা দেয় নাই।" অর্থাৎ ২।১টা নয়া সড়ক ভিন্ন অন্য সব সড়ক তত বড় নয়, যতটা হওয়া দরকার ছিল। কলিকাতার প্রায় সব ফুটপাথই লোক-চলাচল ও অন্যান্য প্রয়োজনের পক্ষে যত বড় অর্থাৎ চওড়া হওয়া দরকার ছিল, তত চওড়া নহে।

ভবিষ্যৎ কলিকাতা গড়িয়া তুলিবার জন্য দরকার—

(১) বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে বহু প্রশস্ত সড়ক-নির্ম্মাণ,

(২) সেই সড়কের উপযোগী ফুটপাথের ব্যবস্থা।

সম্প্রতি যে সব সড়কে ফুটপাথ নাই, সেখানে ফুটপাথের বন্দোবস্ত করা প্রথম কর্ত্তব্য। বিশেষ করিয়া কলিকাতার মত সহরের সড়কে ফুটপাথের দরকার। কারণ,

(১) লোকজন ও যান-বাহনের চলাচলে সুবিধা হইবে,

(২) দুর্ঘটনা ও তজ্জন্য মৃত্যু অথবা আহতের সংখ্যা কমিয়া যাইবে,

(৩) গাড়ীঘোড়া ও লোকের ভীড় নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য কম পুলিশের দরকার হইবে। তাহাতে দেশের ধনের অপচয় কিছু পরিমাণে নিবারিত হইবে।

ফুটপাথ নির্ম্মাণ ও রক্ষা

ফুটপাথ-নির্ম্মাণও বিজ্ঞান-বিশেষ। মনে হইতে পারে যেমন তেমন করিয়া ফুটপাথ তৈয়ারী করিয়া দিলেই কর্পোরেশ্যনের কর্ত্তব্য শেষ হইল। কিন্তু তাহা সত্য নহে।

প্রথমতঃ, ফুটপাথগুলি এমন ভাবে নির্ম্মাণ করিতে হইবে যে সেগুলি যেন—

(১) শক্ত ও টেঁকসই হয়,

(২) লোকের অনিষ্টকারক না হয়,

(৩) সড়ক হইতে পরিমাণমত উঁচুতে অবস্থিত হয়,

(৪) ড্রেন-সংলগ্ন হয়,

(৫) সহজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে।

দ্বিতীয়তঃ ফুটপাথ-নির্ম্মাণেই কর্পোরেশ্যনের কর্ত্তব্য শেষ হইয়া যায় না। উপরোক্ত পাঁচ দফার প্রত্যেকটারই প্রতিদিন দস্তুরমত তদ্বির আবশ্যক। সেই তদ্বিরও সুপ্রণালী মতে না হইলে তার কোন মূল্য নাই। তদ্বির করিবে উপযুক্ত লোক অর্থাৎ যে লোক যে বিষয়ে শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ সে সেই বিষয়ের তত্ত্বাবধানের ভার লইবে। যেমন, ফুটপাথ সংলগ্ন ড্রেন কিরূপ হওয়া দরকার ও কি করিলে তার কার্য্যকারিতা বাড়ে, তার বিচার করিবে ডাক্তার নয়, এঞ্জিনিয়ার ও সার্ভেয়ার। ডাক্তার পরীক্ষা করিবে ড্রেনের অবস্থানে ফুটপাথ-চলা লোকজনের স্বাস্থ্য কিরূপ রহিয়াছে ইত্যাদি।

আর তত্ত্বাবধানের অর্থ এই যে, নিয়োগকর্ত্তা নিজের কাজে গাফিলি করিবেন না এবং দেখিবেন যেন আর কোথাও কেহ তার কাজে ফাঁকি না দেয়।

ফুটপাথের নির্ম্মাণ ও রক্ষা পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সুতরাং ফুটপাথ নির্ম্মাণ করিয়া তার রক্ষার দিকে খর দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

ফুটপাথের স্থায়িত্ব

কলিকাতার ফুটপাথগুলি কি সবই এক উপাদানে গঠিত? এই উপাদান কি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান? অর্থাৎ খরচের দিক্ দিয়া ইহাই কি সর্ব্বাপেক্ষা কম ব্যয়সাপেক্ষ অথচ সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকর? অথবা ব্যয়সাপেক্ষ হইলেও অপেক্ষাকৃত অধিক স্থায়িত্ববিশিষ্ট বলিয়া শেষ পর্য্যন্ত সস্তা দাঁড়ায়? এগুলি দরকারী প্রশ্ন।

তারপর, সব ফুটপাথে সমান লোকজন হাঁটে না, যারা হাঁটে তারাও এক শ্রেণীর নহে। সেজন্য ফুটপাথগুলির ক্ষয়-ব্যয় সমান হইতে পারে না। সুতরাং বলিতে হইবে, ফুটপাথের ক্ষয়-ব্যয় অনুসারে তার গড়ন, বিস্তার ও মসৃণতা হওয়া দরকার।

ফুটপাথের উচ্চতা

ফুটপাথের স্থায়িত্ব ও উচ্চতায় নিকট সম্বন্ধ। উঁচু ফুটপাথ ক্ষয় হইতে যত সময় লাগে নীচু ফুটপাথ ক্ষয় হইতে তার চেয়ে কম সময় লাগা সম্ভব। সম্ভব বলিতেছি এইজন্য যে, এমনও হইতে পারে, দুই ফুটপাথ দুই উপাদানে নির্ম্মিত বলিয়া উঁচু ফুটপাথ বেশী তাড়াতাড়ি ক্ষয় হইতেছে।

ইহা জোর করিয়া বলা চলে না যে, সকল ফুটপাথের উচ্চতা তার সড়ক হইতে সমান হইবে। এই মাত্র বলা চলে যে, সড়ক হইতে ফুটপাথের উচ্চতার একটা নিম্নতম ও উচ্চতম সীমা আছে অর্থাৎ কোনো ফুটপাথেরই সড়ক হইতে একটা নির্দ্দিষ্ট সীমার উপরে বা নীচে হওয়া উচিত নহে। এই পরিমাণটা কলিকাতায় আজ পর্য্যন্ত স্থিরীকৃত হয় নাই। অ-লিখিত একটা নিয়ম মানিয়া চলা হইতেছে মাত্র। ইহা স্থিরীকৃত হওয়া দরকার।

ড্রেনের বন্দোবস্ত

ফুটপাথ-সংলগ্ন ড্রেন একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ। সড়কের নিম্নস্থিত ড্রেনের কথা বলিতেছি না। বহু সড়কের ধার দিয়া যে ঢালু ড্রেন চলিয়া গিয়াছে, তার কথা বলিতেছি।

নিম্নতম সীমার নীচে ফুটপাথ হইলে তাহা ড্রেনের জলে প্লাবিত হইয়া যাইতে পারে। ইহা অপরিষ্কার ও অস্বাস্থ্যকর। তা ছাড়া, ড্রেনের গড়ন এমন হওয়া দরকার যে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি যেন জলনিঃসরণ হয়। এই ড্রেনকে আরও বহু কাজে লাগান যাইতে পারে। তার আলোচনা পরে করা যাইবে।

জলমগ্ন কলিকাতা

অত্যন্ত বেশী বৃষ্টি অনবরত হইলে কলিকাতা সহর প্রায়ই জলমগ্ন হইয়া যায়। তাতে কলিকাতা সহরের ফুটপাথগুলির উপর দিয়া ময়লার স্রোত প্রবাহিত হয়। বলা বাহুল্য, এইরূপ জলপ্লাবনে সহরের অনেক আবর্জ্জনা ধুইয়া সাফ্ হইয়া যায়।

কিন্তু ফুটপাথগুলি সম্বন্ধে একটু সতর্কতা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়। দেখা উচিত যেন জল-প্লাবনের পর তলানী-স্বরূপ ময়লা ইত্যাদি কোন স্থানে জমিতে না পায়।

ফুটপাথের পরিচ্ছন্নতা

থুথু, গোবর, নানাপ্রকার জঞ্জাল ইত্যাদি জমিয়া ফুটপাথ সর্ব্বদা অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন হইয়া থাকে। ইহাতে লোকের চলাফেরার সুগমতা কমিয়া যায়, স্বাস্থ্যেরও অপকার ঘটে।

কর্পোরেশ্যন হইতে সড়ক পরিষ্কার করিবার জন্য মেথর ও জল দিবার জন্য নল-ভিস্তিওয়ালা আছে। প্রতি সড়কের ফুটপাথে অনেকগুলি করিয়া মুখখোলা আস্তাকুঁড় আছে। সেখানে সড়কের মেথররা ফুটপাথ ও ড্রেন ঝাট দিয়া সব জঞ্জাল জড় করিয়া রাখে।

এই প্রণালীর বিরুদ্ধে কতকগুলি অভিযোগ আছে :—

(১) কলিকাতা সহরের সড়ক ও বিশেষ করিয়া

ফুটপাথগুলিতে প্রতিমুহূর্ত্তে অজস্র জঞ্জাল জড় হইতেছে, থুথু ও গোবরে ভরিয়া যাইতেছে। এ সব পরিষ্কার করা বা দাঁগ উঠান প্রতিদিন শত শত মেথরেরও কর্ম্ম নহে।

(২) ফলে লোকজন পদে পদে বহুপ্রকার রোগের বীজ জুতা ও কাপড়ের সঙ্গে লইয়া যাইতেছে।

(৩) লোকের পোষাক-পরিচ্ছদ বেশী ময়লা হইতেছে। জুতার তলা অযথা বেশী ক্ষয় হইতেছে। তাহাতে তাদের আর্থিক ক্ষতি ঘটিতেছে।

(৪) সকালে ও বিকালে উত্তর কলিকাতার অধিকাংশ ফুটপাথই ভিজা থাকায় লোকের পায় পায় কাদা আসিয়া জমে। ফুটপাথ পিচ্ছিল হইয়া থাকে। তাতে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা বেশী হয়, পথ-চলার অসুবিধা হয় এবং মানুষের কাপড় চোপড় বেশী নষ্ট হয়।

বস্তুতঃ, কলিকাতার মত সহরে ফুটপাথের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা সহজ সমস্যা নহে। এজন্য দেখা উচিত যে, কলিকাতার ফুটপাথগুলিতে ধূলা বা কাদা, ময়লা, জঞ্জাল, থুথু, গোবর ইত্যাদি একটুও না থাকে। তাহা হইলে ফুটপাথগুলির স্থায়িত্বও বৃদ্ধি পাইবে চলাফেরার সৌকর্য্যও সাধিত হইবে।

জনপ্রিয় ফুটপাথ

দেখা যায় কোন কোন ফুটপাথ নগরবাসিদের অত্যন্ত প্রিয়। তারা সেখান দিয়া চলাফেরা করিতে ভালবাসে। কর্ম্মোপলক্ষ্যে মানুষকে বাধ্য হইয়া কোন কোন ফুটপাথ দিয়া চলিতে হয়। কিন্তু তদ্ব্যতীত চলাফেরার কথা বলা হইতেছে।

ফুটপাথের জনপ্রিয়তা আকস্মিক জিনিষ নহে। যে ফুটপাথে লোকে (১) বেশী আরাম, (২) বেশী সাহায্য পায় এবং যাহা (৩) বেশী নিরাপদ, সে ফুটপাথই অধিক লোক-চলাচলের কেন্দ্র হইতে পারে। অবশ্য ব্যবসা-বাণিজ্যের দাবী সর্ব্বাগ্রে। কারণ "গরজ বড় বালাই।"

বেশী আরাম বলিলে বুঝিতে হইবে:—

(ক) ফুটপাথ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রহিয়াছে,

(খ) এব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো ফুটপাথ নয়,

(গ) যথেষ্ট প্রশস্ত বলিয়া লোকের ভীড় অনুভূত হয় না,

(ঘ) আলো বাতাস যথেষ্ট আছে।

বেশী নিরাপদ ও বেশী সাহায্যের অর্থ:—

(ক) লোকে নিরাপদে ধনপ্রাণ লইয়া যাতায়াত করিতে পারে অর্থাৎ চোর-ডাকাতের উপদ্রব নাই। গাড়ী-ঘোড়াও ফুটপাথের উপর উঠিয়া আসে না।

(খ) ফুটপাথের উপরে যে সব বাড়ী দাঁড়াইয়া আছে তার আধিবাসীরা থুথু, জল, জঞ্জাল অথবা ইটপাট্‌কেল ইত্যাদি ফেলিয়া লোকজনের জীবন বিপন্ন করে না।

(গ) অট্টালিকাগুলি দৃঢ় ভিত্তিতে নির্ম্মিত। ভাঙ্গিয়া পড়িবার সম্ভাবনা নাই।

(ঘ) অত্যন্ত সহজে পুলিশ ইত্যাদির সাহায্য দরকারের সময় পাওয়া যায়।

বলা বাহুল্য লোকচরিত্র ও লোক-বাসস্থানের ভাবের উপরও ফুটপাথের জনপ্রিয়তা অনেকটা নির্ভর করে। যে সর্ব্বদা ময়লা লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করে সে আতরের মূল্য বুঝিতে পারে না। একপ্রকারের আব্‌হাওয়ায় প্রতিপালিত হওয়ার দরুণ একশ্রেণীর লোকের কাছে ময়লা, আলোবাতাসহীন বড়বাজারের ফুটপাথই ভাল লাগিতে পারে।

কিন্তু অপর দিকে মানুষের ভাল লাগাও পরিবর্ত্তন-সাধ্য। শিক্ষা ও সংসর্গে তার মানসিক দৃষ্টির প্রসার ঘটে। সে সর্ব্বপ্রকার উন্নতির পক্ষপাতী হইয়া দাঁড়ায়। ফুটপাথ সম্বন্ধেও একথা খাটে।

বিলাতে অর্থশাস্ত্রের পঠন-পাঠন

"টাইম্‌স" বিলাতের বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্র। ঐ পত্রে স্যর আরনেষ্ট বেন্ গ্রেট ব্রিটেনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপনা সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ইনি বিলাতের কোন নামজাদা পুস্তক-প্রকাশক কোম্পানীর কর্ত্তা।

তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন যে, "অর্থশাস্ত্রে অত্যধিক রাজনৈতিক মতামত প্রবেশ করায় উহার অবনতি ঘটিয়াছে। উৎপাদন-সমস্যা একটা বড় সমস্যা। জগতের মোট উৎপন্নের পরিমাণ জগতের লোকবলের পুষ্টি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পক্ষে যথেষ্ট নহে। কি করিয়া জগতের উৎপন্ন-সম্ভার বাড়ানো যাইতে পারে ? এ প্রশ্ন অর্থশাস্ত্রবিদের মনে সর্ব্বদা জাগ্রত থাকা দরকার। অ্যাডাম স্মিথও এই লইয়াই মাথা ঘামাইয়াছেন। অথচ কেম্ব্রিজে ইষ্টার টার্ম ১৯২৬ ইকনমিক ট্রাইপোসের প্রশ্নগুলি ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া মনে হয়, প্রশ্নকর্ত্তারা ও তাঁদের ছাত্রেরা সে দিকে মনোযোগ দেওয়া দরকার মনে করেন না। তাঁদের যত দরদ বণ্টন, বিভাগ, কর-আদায় ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ইত্যাদির প্রতি।

"প্রশ্ন-পত্রগুলিতে সব চেয়ে বড় স্থান পাইয়াছে মজুরি, ঘণ্টা ও শ্রমের অবস্থা। মনে হয় সোশ্যালিষ্টরা যেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইতেছে। মজুরিটাই বড় হইয়া উঠিয়াছে। মজুরির পরিবর্ত্তে কি পাওয়া যায়, সেই দরকারী কথাটা চাপা পড়িয়া গিয়াছে।

"বর্ত্তমান রাজনৈতিক আন্দোলন-সম্পর্কিত কতকগুলি প্রশ্ন এই কাগজগুলিতে ঠাঁই পাইয়াছে। যথা, সাবসিডি, টারিফ, জুয়ার উপর কর। কিন্তু উৎপাদন-হ্রাস-সমস্যা, ডিমারকেশন অথবা উৎপাদন কমাইবার ও মজুরি বাড়াইবার অন্যান্য উপায় সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র অনুসন্ধান কোথাও লক্ষিত হয় না। কেম্ব্রিজে যে অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপনা হইতেছে তাহা যেন আজকের ব্যবসায়ি-জগতের সর্ব্বপ্রধান কথাটাকে—অভাবের মধ্যেই সম্পদ্ সৃষ্টি করা অথবা 'উৎপাদন কমাও' এই সকলকার মুখের বাণীটাকে—আমল দিতে চায় না। আমার মত হাটের মানুষের পক্ষে ধন-বৃদ্ধির কথা আলোচনা করিবার সময় এই উৎপাদন-হ্রাসের কথাই সকলের আগের কথা। অথচ কেম্ব্রিজের বিদ্যা-ধুরন্ধরেরা ১৫৪টা প্রশ্নের মধ্যে একবারও অবকাশ পাইলেন না সাধারণের মনে এই প্রশ্নটা কিরূপ তীব্র তাহার আভাষ মাত্র দিতে।

"ধর, ইটের মিস্ত্রী, খনির মজুর ও ডক-শ্রমিকের মজুরির কথা মনে হয় "মজুরি" বলিবামাত্র। কিন্তু ডাক্তারের কথা মনে হয় না। ইহা দ্বারাই প্রমাণ হয় সোশ্যালিষ্ট অথবা ট্রেড-ইউনিয়নের হুম্‌কি কতখানি কাজ করিতেছে। ডাক্তারের আর্থিক তথ্যও বিবেচনার বিষয়। সে আমার নিকট চাইতেছে ২ পা, ২ শি, কিন্তু চাষীর নিকট লয় মাত্র ৩ শি, ৬ পে। এটা কি আর্থিক আইনকানুনের বাইরে ?

অক্সফোর্ডের একটা প্রশ্ন ছিল এই :—

"পারিবারিক অভাব-অভিযোগের সঙ্গে সঙ্গে মজুরির হ্রাসবৃদ্ধি করা দরকার এই প্রস্তাব বিবেচনা কর ও বিশদ আলোচনা কর।" ইহাকে বদ্‌লাইয়া অনায়াসে নিম্নরূপ করা যাইতে পারে :---

"পারিবারিক অভাব-অভিযোগের সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের ফী হ্রাসবৃদ্ধি করিবে এই প্রস্তাব বিবেচনা কর ও বিশদ আলোচনা কর।"

হিমালয়ের আর্থিক কথা

শ্রীসুধাকান্ত দে, এম-এ, বি-এল

(১৩)

কারসিয়াঙে সপ্তাহে একদিন হাট বসে—রবিবার দিন ভোরে। বেলা ১২টা ১টার মধ্যে সে হাট ভাঙিয়া যায়। সুতরাং ঐ সময়ের মধ্যে সপ্তাহের রসদ কিনিয়া রাখিতে হয়। অন্য দিন যে কোনো দ্রব্য পাওয়া যায় না তা নয়, পাওয়া না যাইবার সম্ভাবনা আছে; তা ছাড়া দাম চড়ে এবং টাটকা পাওয়া যায় না।

মিউনিসিপ্যালিটির নির্দ্দিষ্ট জায়গায় হাট বসে। এই হাটে চাউল হইতে আরম্ভ করিয়া আলু পটল পেঁয়াজ কপি নানাপ্রকার তরিতরকারী বিকায়। মাছ ও মাংসের বাজার আলাদা।

স্কোয়াস্, টমেটো প্রভৃতি ২।১টা স্থানীয় উৎপন্ন আছে। বাহির হইতে আনীত তরিতরকারী ও চাউল ডাল ইত্যাদি অধিকাংশই কলিকাতা হইতে আসে। কিন্তু এই আমদানি-গুলি সোজাসুজি কারসিয়াঙে আসে না, দারজিলীঙ্ চলিয়া যায় এবং সেখান হইতে হাটের বেপারীরা (এখানে সব স্ত্রীলোক) সওদা করিয়া শনিবার রাতারাতি লইয়া আসে ও রবিবার দিন বেচিতে বসে। বলা বাহুল্য এই সব দ্রব্য দারজিলীঙ্ হইতে সাধারণতঃ কিঞ্চিৎ চড়া দরে বিকায়।

এরা কেন কলিকাতার সঙ্গে সোজা কারবার চালায় না বলিতে পারি না। সম্ভবতঃ অধিক পুঁজিপাটা কাহারো নাই। নেপালী স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত কাজের। তার একটা পরিচয় এই হাট-বাজারেও দেখিতে পাই। বিক্রেতা রূপে হাটের সর্ব্বত্র কর্ত্তৃত্ব করিতেছে নেপালী রমণী। পুরুষদের খুঁজিয়া পাই না।

বস্তুতঃ, বিদেশীর চোখে কারসিয়াঙ বা দারজিলীঙ্ রমণীর রাজ্য বলিয়া ঠেকা বিচিত্র নহে। ষ্টেশন হইতে ছোট বড় হাল্কা ভারি মাল উঠাইয়া লইয়া পৌছাইয়া দিতেছে নেপালী রমণী। রাস্তা সমান করিতে রোলার টানিতেছে, পাথর ভাঙিতেছে নেপালী রমণী। ঘরের ভৃত্যের কাজ করিতেছে নেপালী রমণী। নেপালী রমণী কোন্ কাজ যে করিতে পারে না ভাবিয়া পাই না। শক্ত সমর্থ জোয়ান চেহারা। সারাদিন কাজ করে আর গান গায়। অথচ ক্লান্তি নাই।

মাছের বাজারের অবস্থা তরকারীর বাজারের অনুরূপ। অর্থাৎ মাছও বিদেশ হইতে আমদানি হয়। কারসিয়াঙ্ দারজিলীঙে অজস্র ঝরণা। দিনরাত ঝর্ঝর করিয়া জল পড়িতেছে। এই ঝরণাগুলির মধ্যে নিহিত জল-শক্তিকে আজ পর্য্যন্ত কোন কাজে লাগান হয় নাই। সম্ভবতঃ সে প্রকার মতলবও কারো মাথায় আসে নাই।

কিন্তু এ সব অঞ্চলে নদী নাই। কাঞ্চন-জঙ্ঘার কথা বলিতে পারি না। মনুষ্য-অধ্যুষিত হিমাচল-দেশে কোন নদী নাই।

কারসিয়াঙ্ ষ্টেশন হইতে সরিয়া আসিয়া দক্ষিণে কার্ট-রোডের উপর দাঁড়াইলে পরিষ্কার দিনে দেখা যায়, সমতল ভূমির উপর দিয়া অনেকগুলি নদী আঁকিয়া বাঁকিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। তার মধ্যে বালাশোণ ও মহানদী হিমালয়ের সহিত সম্পর্কিত রহিয়াছে। দারজিলীঙ্ কারসিয়াঙ্ আসিতে হইলে বালাশোণের উপরে পুল পার হইয়া আসিতে হয়। এই বালাশোণ নদীতে মাছ ধরিয়া নেপালীরা বেচিতে বেচিতে কারসিয়াঙ্ পর্য্যন্ত হাঁটিয়া আসে। ছোট মাছ। সের ॥০, ॥৵০, ৸০ অথবা ৸৵০। এগুলি হাট-বাজারের বাইরে বিক্রী হইয়া যায়।

গরু, ভেড়া ও ছাগলের মাংস বেশ বিকায়। সপ্তাহে দুইদিন—বুধবার ও শনিবার—রাত্রি ৯টার পর দেখা যাইবে মশাল হাতে হুটহুট্ করিয়া রোগা-মরা গরুর পাল তাড়াইয়া লোক চলিয়াছে। এই গো-বলদগুলি শিলিগুড়ি হইতে কার্টরোডের হাঁটা-পথে দারজিলীঙ্ পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়া হয়।

কারসিয়াঙের কসাইরাও কিনিয়া রাখে এবং জবাই করিয়া মাংস বিক্রী করে।

ভেড়ার মাংস এখানকার সর্ব্বোৎকৃষ্ট মাংস। দারজিলীঙের ভেড়ার মাংসের আস্বাদ সহজে ভুলিতে পারি না। দামও চড়া—১৲, ১॥০ অথবা ততোঽধিক।

এক ছাগ-মাংস-ব্যবসায়ী বলিতেছে, "বাবু সাহেব, আমার দেশ ছাপরা জেলায়। আজ ৩২ বৎসর যাবৎ আমি এই মাংসের ব্যবসায় চালাইতেছি। আমি মাংস বেচি। আমার পাহাড়ী স্ত্রী-কন্যারা হাটের দিন তরিতরকারী বেচিয়া দু' পয়সা ঘরে আনে।"

বস্তুতঃ এদেশে মাংসাহার খুব প্রচলিত বটে। ভেড়া ও ছাগলের মাংস সকলেই খায়। সাধারণ নেপালীরা গরু খায় না, কিন্তু আর সব মাংস খায়। নেপালীদের মধ্যে মাঙ্গাররা গরু খায়।

শীতকালে ঠিক দুর্গাপূজা ও কালীপূজার পূর্ব্বে তিব্বতীরা হাঁটা পথে তিব্বত হইতে রাশি রাশি ভেড়া ও ছাগল কারসিয়াঙে বেচিতে লইয়া আসে। তিব্বতী ছাগলকে চেংড়া বলে। চেংড়ার মাংস ভেড়ার মাংস হইতেও সুস্বাদু। এক একজন তিব্বতী ২০।৩০।৫০টা চেংড়া ও ভেড়া লইয়া আসে এবং পাহাড় ও পর্ব্বতে যেখানে সেখানে সেগুলিকে দিনে চরিতে দিয়া রাত্রিতে কাছাকাছি শুইয়া চৌকি দেয়।

এই সব চেংড়া ও ভেড়া এক একটা ৫।১০ টাকায়, কখনো ১৫।১৬ টাকায়ও বিকায়। তিব্বতীরা সপ্তাহ-খানেকের মধ্যে সমস্ত বেচিয়া নিঃশেষ করিয়া চলিয়া যায়। কেহ কেহ নূতন দল লইয়া পুনরায় আসে।

(১৪)

দুই রকম বাজার দর নীচে তুলিয়া দিতেছি :—

(ক) পটল ⁄১ সের ।০
বেগুন ⁄১ সের ৶০
আলু ⁄১ সের ৵১০
পেঁয়াজ ⁄১ সের ৵০
স্কোয়াস ⁄১ সের ৲৫
ফরাস বীণ ⁄১ সের ৲১০
টমেটো ⁄১ সের ৶০
উচ্ছে ⁄১ সের ⁄০
লেবু ১ ডজন ⁄০
হাঁসের ডিম ১ ডজন ॥০
মুরগীর ডিম ১ ডজন ৸০
পাঁটার মাংস ⁄১ সের ৸০
ভেড়ার মাংস ⁄১ সের ৸০
মাছ ⁄১ সের ১৲

(খ) পটল ⁄১ সের ॥০
বেগুন ⁄১ ।৵০
আলু ⁄১ সের ।⁄০
পেঁয়াজ ⁄১ সের ।০
স্কোয়াস ⁄১ সের ৶০
ফরাস বীণ ⁄১ সের ।০
টমেটো ⁄১ সের ॥০
উচ্ছে ⁄১ সের ।০
লেবু ১ ডজন ৵০
হাঁসের ডিম ১ ডজন ৸০
মুরগীর ডিম ১ ডজন ১॥০
পাঁটার মাংস ⁄১ ৸৵০
ভেড়ার মাংস ⁄১ সের ১॥০
মাছ ⁄১ সের ৩৲

একই বাজারের এই দুই প্রকার দর। মনে রাখিতে হইবে এই দুই রকম দর কোন দুই দিনের দর নহে ; কিন্তু এই দ্রব্যগুলির দরের নিম্নতম ও উর্দ্ধতম সীমা। অর্থাৎ কারসিয়াঙের বাজার-দর সাধারণ অবস্থায় দরের এই দুই প্রান্তের মধ্যে উঠা-নামা করে। কিন্তু তা বলিয়া সকলগুলি এক সঙ্গেই উঠে না বা নামে না। গ্রীষ্মের পর সাধারণতঃ দর চড়িতে থাকে ও পূজার পর নামিতে থাকে এইমাত্র বলা যায়।

ভারতসন্তান বিশেষতঃ বাঙালীর ছেলে বাজার-দর লইয়া মাথা ঘামাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অথচ স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি ও লোকজনের ধন-ঐশ্বর্য্যের পরিমাণ করিতে গেলে বাঙালীর ছেলেকে হাট-বাজারের অলি-গলিতে ঢুঁড়িয়া

দেখিতে হইবে। যে বাজার-দরের অর্থ বুঝিতে পারে না, তার অর্থশাস্ত্রে হাতে খড়ি হয় নাই।

অন্যান্য ক্ষেত্রের মত এ ক্ষেত্রেও প্রধান সম্বল হইতেছে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করা ও নিজে নিজে সেই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া বাহির করা। তাহাতে স্থানীয় আর্থিক ইতিহাসের অনেক তথ্য বাহির হইয়া পড়িবে।

ধর, হাটে গিয়া দেখা গেল, হাটের অন্য সমস্ত দ্রব্যের দাম বাড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু ফরাস বীণ পয়সা পয়সা সের ও স্কোয়াস অর্দ্ধ পয়সা সের দরে বিকাইতেছে। কারণ কি? খোঁজ লইয়া জানা গেল, রেলে ধস্ হইয়াছে। অন্যত্র এসব স্থানীয় জিনিষের চালান যাইতেছে না। অথচ বেশীদিন ঘরে রাখা যায় না। কাজেই অত্যন্ত সস্তায় ছাড়িতে হইতেছে।

অথবা গাড়ী গাড়ী ডিম আসিতেছে, অথচ ডজন বিকাইতেছে ৸০ আনায় ও ১৷৷০ টাকায়। কারণ, সাহেবদের ছেলেমেয়েদের স্কুলগুলা পূরাদমে ডিম চাহিয়া পাঠাইতেছে। তারা অনেক ডিম একসঙ্গে লয়। আর তাদের ডিম চাই-ই। সুতরাং বেপারীরা যেখানে অনায়াসে তাদের নিকট হইতে ডজনে ১৲ বা ৷৷৵০ আনা লয়, সেখানে অন্যের নিকট ১৷৷০ বা ৸০ আনা হাঁকিয়া বসে।

কোন্ দ্রব্য কখন্ কে চাহিতেছে? কতখানি চাহিতেছে? বাজারে কতখানি করিয়া দ্রব্য আসিতেছে? রেলের ভাড়া কত? কোন্ সময়ে রেল কোম্পানীর কত লাভ হয়? কোন্ কোন্ পথে দ্রব্য আমদানি-রপ্তানি চলিতেছে? যারা জিনিষ কিনিতেছে তাদের মধ্যে কোন্ শ্রেণীর আর্থিক অবস্থা কিরূপ সচ্ছল? কোন্ শ্রেণীর লোকের কোন্ কোন্ অভাব পূরণ হইতেছে? হাটুরেরা ও বেপারীরা কে কতখানি লাভ করিতেছে? মহাজন কতখানি লাভ করিতেছে? এই লাভের কোন্ অংশ তারা নিজেরা পায়? কোন্ অংশ মহাজন বা অন্যেরা পায়? কোন্ শ্রেণীর লোকের ঋণের পরিমাণ কত? কোন্ শ্রেণীর লোক কতখানি আহারের জন্য, কতখানি পরিধানের জন্য, কতখানি আশ্রয়-স্থানের জন্য আর কতখানি বা মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় করিতে সমর্থ?—ইত্যাদি ইত্যাদি বহু প্রশ্নের গোটা অথবা আংশিক উত্তর মিলিবে এই বাজার দরের আলোচনা দ্বারা।

বলা বাহুল্য ইহা একদিনের কর্ম্ম নহে। বহুদিন ধরিয়া বহু পর্য্যবেক্ষণের পর যে সব তথ্য সংগৃহীত হইবে তাহার মূল্য অনেক। বাঙ্গালীর ছেলে কি এদিকে নজর দিবে না?

(১৫)

বাঙ্গালা দেশে এই একটি স্থান দেখিতেছি যেখানে ভৃত্য-সমস্যা প্রবল নহে। বিহার অঞ্চলের ন্যায় এখানেও ঘরের কাজ করিবার জন্য দাই পাওয়া যায়। তাদের "নানী" বলা হয়। নানীগুলি খুব কাজের হয়; উপরন্তু বিহারের দাইদের মত চোর নয়। নেপালী ছোকরাও মিলে।

নানী বা কেটা (নেপালী ছোকরা) সস্তাও বটে। আপ-খোরাকী ৬৲৭ টাকা। এরা বুদ্ধিমান। একটু যত্ন লইলে সহজেই রান্নাবান্না পর্য্যন্ত শিখিয়া ফেলে।

নেপালী মজুর অথবা মজুরাণী (কারণ এদেশে মেয়ে মজুরই বেশী) কোনপ্রকার পরিশ্রমের কাজকে ভয় করে না। ইহারা অলস নয়। সারাদিন টানা খাটিয়া যাইতে পারে। চা-বাগানসমূহে বহু নেপালী পুরুষ ও স্ত্রীলোক নিযুক্ত রহিয়াছে। এরা যেরূপ বোঝা বহিয়া লইয়া যায় তা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। কারসীয়াঙে দেখিলাম ৩ মণ একটা আলমারি পীঠে করিয়া খাড়া তিন মাইল অবধি উপরে উঠিয়া চলিয়াছে। কেটাকেটীগুলি ত অনায়াসে ১মণ বোঝা তুলিয়া লয়।

মজুরি সস্তা। ষ্টেশন হইতে মাল লইয়া আসিলে ⁄০ আনা ⁄১০ পয়সা দিলেই যথেষ্ট। বাজার করিয়া মোট লইয়া আসিলে তাকে দুই তিন পয়সা দিলেই চুকিয়া গেল। চা-বাগানগুলিতে খাটিয়া স্ত্রী-পুরুষে বড় জোর ।০ আনা, ৷৵০ আনা পায়। সাধারণতঃ ⁄০ আনা, ৵০ আনায় সন্তুষ্ট থাকে। অথচ সমভূমিতে ৷৷০ আনা ৷৷৵০ আনার কমে কোন মজুর পাওয়া যায় না। পাহাড়ের চা-বাগানগুলিতে কাজ করা কিন্তু অনেক বেশী কঠিন ও পরিশ্রমসাপেক্ষ।

যে প্রকার ভারই হউক নেপালীরা মাথায় তুলিয়া লয় না। ভারটা পীঠের উপর রাখে। মাথার উপর দড়ি ফেলিয়া সেই ভারটাকে পীঠের উপর ছাড়িয়া দেয়। সম্ভবতঃ

বন্ধুর দেশে বন্ধুর পথে মাথায় কোন-কিছু রাখিয়া পথ-চলা সোজা না বলিয়া এই নিয়ম উদ্ভাবিত হইয়াছে।

এক নেপালী ভদ্রলোক বলিতেছেন, "মহাশয়! জলপাইগুড়িতে বাঙ্গালীর চা-বাগানের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া আপনারা পুলকিত হইয়া উঠিতেছেন। কিন্তু মনে রাখিবেন মোটা হইয়া উঠিতেছে মাত্র জন কয়েক লোক—তারা বিদেশী। কারণ পরের রক্ত-শোষণ করিতে তারা ওস্তাদ।

"আপনারা ইংরেজদের গাল দেন। কিন্তু তাদের দিকে একবার চাহিয়া দেখুন। তারা স্বজাতীয় লোকদের কখনো ভাতে মারিতে চায় না, নিজেদের মুনাফা বেশী না হউক তাতেও প্রস্তুত।

"ইংরেজরা যে মোটা মোটা মাহিনা দিয়া ম্যানেজার, সহকারী ম্যানেজার ও অনেক সাজসরঞ্জাম পুষিয়া থাকে তা নিরর্থক বিবেচনা করিবেন না। তারা ডিভিডেন্ট হয়ত ১২৲ টাকা পাইল কিন্তু নিজেদের কতকগুলি লোককে পালন করিল ত।

"এক্ষেত্রে আপনারা বাঙ্গালীরা কি করেন? যত কমে পারেন একজন বাঙ্গালী ম্যানেজার মাত্র রাখিয়া কাজ সারেন। বাঙ্গালী চা-বাগানের কোন ম্যানেজার আশা করিতে পারে না যে কোনকালে সে ৫০০৲ টাকা মাসে পাইবে, তা ডিভিডেন্ট ১২৲ টাকাই হোক আর ৩০০৲ টাকাতেই দাঁড়াক।

"এ ত গেল নিজে নিজে মারামারি। চা-বাগানগুলি একদিক্ দিয়া নেপালীদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। কি আশায় এরা চা-বাগানের কুলীর কাজে ছুটিয়া গিয়াছিল বলিতে পারি না। এরা অত্যন্ত গরিব। অধিকাংশের ঘরে যথেষ্ট খাওয়া পরার সংস্থান নাই। সেই সুযোগ লইয়া চা-কররা ইহাদের এমন অবস্থা করিয়াছে। খাটুনি হাড়ভাঙ্গা; কিন্তু মজুরি এত কম যে দিন দিন এদের অবস্থা হীন হইতে হীনতর হইতেছে। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যা উপার্জ্জন করে তাতে স্ত্রীপুত্রের কথা ত দূরে, নিজেদেরই চলে না। ঠিক সেই সময় আপনারা বড় মুনাফাগুলি মারিয়া বসিতেছেন; কিন্তু ইহাদের জন্য একটি পয়সাও খরচ করিতেছেন না।"

(১৬)

ঐ ভদ্রলোক পুনরায় বলিতেছেন, "মহাশয় দেখিতেছি আপনি লক্ষ করিয়াছেন এখানকার প্রত্যেক স্ত্রীপুরুষ,—বালক-বৃদ্ধ-যুবা সিগারেট খায়। এরা যেন মায়ের পেট হইতে পড়িয়াই সিগারেট খাইতে শিখে!

"কিন্তু নেপালীদের ইহাই চিরন্তন দস্তুর একথা মনে করিয়া আপনি ভুল করিতেছেন। নেপালে সকলে সিগারেট খায় না। শুনিয়াছি, সেখানে আইন করিয়া সিগারেট খাওয়া বন্ধ করা হইতেছে।

"১৯১২ সনের আগে কারসিয়াঙ দারজিলীঙে এত সিগারেটের চলন ছিল না। তখন ক্বচিৎ কাহারো মুখে হয়ত একটা সিগারেট দেখা যাইত। তখনকার সিগারেট কোম্পানীগুলির কীর্ত্তির কথা কি আপনারা ভুলিয়া গেলেন? নেপালীদের এমন করিয়া সিগারেট খাওয়াইতে কে শিখাইল? সে কি সিগারেট-বিতরণের ধুম! বিন পয়সায় নেপালীরা সিগারেটের ধুঁয়া উড়াইয়া চলিল। সেই চালের ফল ফলিয়াছে। আজ মুখে সিগারেট নাই এমন নেপালী দুর্লভ। প্রতি বৎসর কত লক্ষ টাকা যে বাহির হইয়া যাইতেছে ঠিক নাই। সরকারেরও দু'পয়সা জুটিতেছে। অথচ এই নেপালীদের পেটে অন্ন নাই।"

(১৭)

এখানকার এক বিশেষত্ব দেখিতেছি, শীতের প্রকোপে ভারতবাসীরা আসিয়া স্ত্রীপুরুষ-নির্ব্বিশেষে জুতা মোজা ত পায়ে দিতেছেই, নেপালী ভুটিয়া লেপচারাও দেয়। এদের স্ত্রীলোকেরা জুতা পরিতে লজ্জা বোধ করে না।

এখানে জুতা ও চামড়ার চাহিদা বেশ প্রবল বটে। শত শত নেপালী জুতা পায়ে দিতেছে। তা ছাড়া দু'টা ছেলেদের ও দু'টা মেয়েদের স্কুলের জন্য নিয়মিত কয়েক শত জুতার দরকার। জুতা-মেরামতও কম হয় না। সুতরাং কয়েকটা জুতার দোকান খুব জোর চলিতেছে।

জুতার কারবারটা বলিতে গেলে প্রধানতঃ চীনাদের হাতে রহিয়াছে। একটা ভাল হিন্দুস্থানী জুতার দোকান আছে। মেরামতের কাজ এই লোকটা খুব পায়। কিন্তু জুতা তৈয়ারীর ওস্তাদ চীনা ডেট্‌লী কোম্পানী। এদের জুতা

ব্যবহার করিয়া দেখিতেছি। বাস্তবিক শ্রেষ্ঠ কারিগরদের হাতের কাজের সমান।

ডেট্‌লী বেশ বাঙ্গালা বলিতে শিখিতেছে। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীও বলিতে পারে। এত দূরে থাকিয়াও সে নিজের দেশের খবর যথাসাধ্য রাখে। চীনদেশের কথা বলিতে বলিতে তার স্বদেশ-প্রেম জাগিয়া উঠে। সে বলিতেছে, "তোমরা কিছুমাত্র চিন্তিত হইও না। দেখিও চীন তার সকল জঞ্জাল সাফ করিয়া আবার মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইবে। চীনকে কেহ শৃঙ্খলিত করিতে পারিবে না।

"আমাদের দেশে কেহ পরিশ্রম করাকে ঘৃণা করে না। তোমার মনোমত কাজ নাও করিতে পারি, কিন্তু পারত পক্ষে তোমায় ফাঁকি দিব না এবং কথা দিলে কথা রাখিতে চেষ্টা করিব।"

এই বর্ষার সময়টা নেপালীরা বেয়ারাম-পীড়ায় খুব ভোগে। "দারজিলীঙ্ টাইম্‌স" দারজিলীঙ্ হইতে প্রকাশিত একখানা সাপ্তাহিক। তার এক খণ্ড হাতে লইয়া দেখিতেছি সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিত হইয়াছে, "এই বৃষ্টির সময় সাধারণ লোক, বিশেষতঃ নেপালীরা পেটের অসুখে বড় ভোগে। নেপালীরা প্রায় সকলেই জুতা পায়ে দেয়। কিন্তু এরা গরিব বলিয়া একজোড়ার বেশী জুতা বড় কারো নাই। অথচ এদের হরদম বাহিরে কাজ করিতে হয় ও বৃষ্টিতে ভিজিতে হয়। তাতে জুতা সর্ব্বদাই ভিজা থাকে। তারা উহা ছাড়িবার অবসর পায় না। অধিকাংশ পেটের পীড়া এই প্রকারে পায়ে ঠাণ্ডা লাগিয়া হয়। সুতরাং যারা পারে তাদের এক জোড়ার বেশী জুতা রাখা উচিত। অথবা খালি পায়ে চলাফেরা ও কাজকর্ম্ম করিলে ভিজা জুতার হাত হইতে ত্রাণ পাইতে পারে, শরীরেও জল শুকাইতে পারে না। এরূপ করিলে নেপালীদের পেটের অসুখ কমিয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়।"

(১৮)

কারসিয়াঙের আর একটা বিশেষত্ব দেখিতেছি, দারজিলীঙের সাহেবী পোষাকের দোকানগুলি এখানে একটাও নাই। সাহেবদের ছেলেমেয়েদের পোষাক দারজিলীঙ্ হইতে তৈয়ারী হইয়া আসে। সাধারণ নেপালীরা অত দাম দিয়া পোষাক তৈয়ারী করিতে পারে না। তাই এখানে কতকগুলি দেশী দরজী প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

নেপালী পুরুষ ও বিশেষ করিয়া স্ত্রীলোক ভাল পোষাক পরিতে, সাজিতে গুজিতে ভালবাসে। এরা আহারের জন্য নিজেদের আয়ের যতটা ব্যয় করে পোষাকের জন্য তদপেক্ষা বহুগুণ বেশী ব্যয় করিয়া থাকে। যে দুইবেলা ভাল করিয়া খাইতে পায় না সেই নেপালী স্ত্রীলোকও হয়ত সোণার গয়না অন্ততঃ রূপার গয়না পরিতেছে, এরূপ দৃশ্য বিরল নহে।

নেপালীরা পছন্দ করিয়া পোষাক কিনে বটে, কিন্তু তার মধ্যে কোন প্রণালীবদ্ধ কাটছাঁটের পরিচয় পাই না।

স্থানীয় এক বাঙালী যুবক এক দরজীর কাছে কাজ শিখিতেছে। সহকারীরূপে সে তার নিকট ২০৲ টাকা ভাতা পায়। সে বলিতেছে, মহাশয়, "এই নেপালীরা বছর বছর অনেক টাকার জামা-কাপড় খরিদ করে। এদের পছন্দমত কাজ করিতেও বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। দরকারী কাজ শিখিয়া কেন না কতকগুলি টাকা ঘরে আনিব?

"আমি ত বাড়ীতে বেকার অবস্থায় বসিয়া আছি। যা বিদ্যা-বুদ্ধি আছে তাতে কোনদিন মাসে ২০।৩০ টাকার বেশী উপার্জ্জন করিতে পারিব এমন ভরসা করি না।

"অথচ এই দরজীর কাজ করিয়া আমার চোখের সামনে একজন বড় মানুষ হইয়া উঠিল দেখিতেছি। গজ্জু মিঞাকে আমরাই এস্থানে আনিয়াছিলাম। তখন সে নিঃসম্বল ছিল। আর আজ সে এক এক দফা জামা-পোষাক বেচিয়া ২০০।৩০০ টাকা উপার্জ্জন করিতেছে। লোকটা চতুর। নেপালের সীমার কাছাকাছি মিরিক বলিয়া একটা জায়গায় প্রতি বৎসর মেলা বসে। যখনি মেলা বসে সেখানে হাজার হাজার নেপালী নরনারী আসিয়া মিলিত হয়। গজ্জুও তার হাতের কাজ বেচিয়া কাঁচা টাকা ঘরে লইয়া আসে।

"আরো ২।৪ জন বাঙ্গালীর ছেলে দরজী-বিজ্ঞান শিখিয়া আসিয়া যে নিজের পেট চালাইতে পারিবে না এ আমি বিশ্বাস করি না। বিশেষ আমার মত অল্প লেখাপড়া জানা ছেলেরা চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারে।"

সাহেবী দোকানের মধ্যে আছে দু'টা ওষুধের দোকান-মুনরো ও স্পেন্সার কোম্পানী। ষ্টেশনের কাছে। এরা ওষুধ ছাড়া অন্ত ২।৪টী সমজাতীয় সাধারণ জিনিষও বেচিয়া থাকে। মুনরোর সোডা লেমনেড তৈয়ারী করিবার কল আছে। খুব কাট্‌তি। আর এরা সোডা লেমনেড খুবই সস্তায় বেচিয়া থাকে। ৩।৪ পয়সায়। মুনরোর সহিত সোরাব্‌জীর যোগাযোগ আছে। স্পেন্সারও পার্শী-সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ এ দুটী দোকানও খাঁটি সাহেবী নহে।

(১৯)

সমগ্র সহরে রুটি খরচ হয় দেদার। এ বিষয়ে স্কুলগুলি সব চেয়ে বড় খরিদ্দার। গ্রীষ্ম ও পূজায় হোটেলগুলি ভর্ত্তি থাকে। তখন রুটির চাহিদা আরো বাড়িয়া যায়। সুতরাং লাভের আশায় কয়েকটা দোকানই রুটি গড়িতেছে।

একটা বাঙ্গালী দোকান পূর্ব্বে রুটির যোগান দিত। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন রুটির বেলায়ও ইহা হটিয়া যাইতেছে। অ-বাঙ্গালী দোকানগুলি প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। তার একটা কারণ বুঝিতেছি স্পষ্ট। এক মুসলমান ভদ্রলোক এই দোকানের ঠিক উল্টাদিকে আপনার দোকান খুলিয়াছেন। ইনি সকলের সঙ্গে এমন মিষ্ট ব্যবহার করেন যে পুনঃ পুনঃ তাঁর দোকানে যাইতে ইচ্ছা হয়। বাঙ্গালী দোকানে যদি বলি "পাঁউরুটিগুলি প্রত্যহ আমার বাড়ীতে পৌছাইয়া দিবেন, কিছু বেশী পয়সা দিব", তবে ম্যানেজারটি চোখ ঘুরাইয়া বলেন, "আমরা কি কুলীর ব্যবসা করি? ইচ্ছা হইলে আপনি আসিয়া প্রতিদিন কিনিয়া লইয়া যাইবেন।" মুসলমান লোকটিকে বলিবামাত্র বাড়ী পৌছাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করেন। কুলীর ভাড়া আমাকে একটী পয়সাও দিতে হয় না। শুধু তাই নয়। তিনি রুটি বেচেন প্রত্যেকটা ৵০ আনা করিয়া; কিন্তু সারা মাস ধরিয়া লইলে টাকায় ৯টা করিয়া রুটি ধরেন। আর যখনি যে কোন নালিশ করি তাতে মনোযোগ দেন।

এ সব হয়ত তুচ্ছ ব্যাপার। বঙ্গসন্তান অনেক সময় এ সকল দিকে মনোযোগ দেওয়া দরকার মনে করেন না। কিন্তু ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠালাভের পক্ষে এগুলিকে মানিয়া না চলা মূর্খতা।

এই ভদ্রলোকের নিজের পাঁউরুটির কারখানা আছে। তিনি বলিতেছেন, "মহাশয়, আমি দোকান নূতন ফাঁদিয়া বসিয়াছি। আমাকে অনেক অসুবিধার সহিত লড়াই করিতে হইতেছে। আমার পূর্ব্বে কয়েকজন এ ব্যবসাটা প্রায় একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছে। তারা আমাকে প্রীতির চোখে দেখিতেছে না। তা ছাড়া আমি চাকরের অসুবিধাও ভোগ করিতেছি। বুদ্ধিমান অথচ বিশ্বস্ত লোক পাই না।

"তবে আমার নিজের কারখানা থাকায় বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। মতলব আছে বটে কারসিয়াঙের রুটির বাজার দখল করিব। আমাকে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইতেছে। সম্প্রতি স্কুলগুলি যদি হাতে পাই তবে বাঁচিয়া যাই।"

এঁর দোকানে পাঁউরুটি ছাড়া বিস্কুট, কেক্, চকোলেট, জ্যাম জেলি ইত্যাদি জিনিষও বিক্রয়ের জন্য মজুত আছে। কেক্ ও জ্যাম ইনি নিজেই তৈয়ারী করিতেছেন।

(২০)

কয়েকটা মনোহারী দোকান বেশ চলিতেছে। মনোহারী দোকান চালাইবারও একটা বিশেষ বিজ্ঞান আছে। তা সহজ বটে, কিন্তু আয়ত্ত করা দরকার। মনোহারী দোকানের প্রধান দুই সম্পদ্ হইতেছে—(১) খরিদ্দারের মনের অবস্থা বিচার করিবার ক্ষমতা, (২) উপযুক্ত স্থান বাছিয়া লইবার ক্ষমতা।

ভদ্র ও মিষ্ট ব্যবহার, সর্ব্বপ্রকারে খরিদ্দারের সেবা করিবার জন্য সজাগ দৃষ্টি ও মনোযোগ, সদা হাস্যময় মুখ ও কখনও ক্রুদ্ধ না হওয়া, ক্রেতার নিকট সকল দ্রব্যের ঠিক ও যথার্থ পরিচয়-দান, লাভের চেষ্টার কথা স্বীকার করা অথচ খরিদ্দারকে ফাঁকি দিবার মতলব না রাখা প্রভৃতি কতকগুলি গুণ দ্বারা খরিদ্দারমাত্রকেই বশীভূত করা যায়। তাড়াতাড়ি অনেকগুলি জিনিষ বেচিয়া ফেলাই বেপারীর একমাত্র লক্ষ্য হইলে সে বেপারী ঠকিতে বাধ্য। জিনিষ বেচা তার পক্ষে যত না প্রয়োজন তার চেয়ে ঢের বেশী প্রয়োজন প্রত্যেক ক্রেতার মনে একটা বিশ্বাস ও সন্তোষ জন্মাইয়া দেওয়া। আমার মতে ইহাই ব্যবসার প্রধান অঙ্গ। আর তার প্রমাণ হাটে মাঠে ঘাটে যত্রতত্র পাইতেছি।

কিন্তু উপযুক্ত স্থানের মহিমাও কম নহে। অর্থাৎ এমন হইতে পারে, এক দোকান অন্য দোকান হইতে প্রথমোক্ত বিষয়ে নিকৃষ্ট, কিন্তু তার এমন কতকগুলি সুবিধা আছে যে জন্য তার দ্রব্যের কাট্‌তি বেশী। এই সুবিধাগুলির কয়েকটা হইতেছে—যেখানে খরিদ্দারজাতীয় লোকেরা বাস করে-বা বেশী চলাফেরা করে সেই স্থান, ষ্টেশনের অথবা চৌমাথার অথবা গাড়ী ও মোটর থামিবার জায়গার নিকটবর্ত্তী স্থান, ইত্যাদি।

এই দুই সম্পদের মধ্যে একটা অর্জ্জন করা যায়, অন্যটা অনেক সময় আকস্মিক। অল্প সময়ের জন্য বিচার করিতে হইলে সহসা বলা কঠিন কোন্‌টা বেশী প্রয়োজনীয়।

স্পেন্সার কোম্পানীতে দশ টাকার নোট ভাঙ্গাইতে গিয়া শুনিলাম, "মহাশয়, আপনাকে ভাঙ্গা টাকা দিতে না পারিয়া দুঃখিত হইতেছি। আপনি ঐ বিপরীত দিকের মুসলমান মনোহারী দোকান হইতে ভাঙ্গাইয়া লউন।

"আমি কারসিয়াঙের বড় বড় দোকানের নাম না করিয়া উহার নাম করিতেছি বলিয়া বিস্মিত হইতেছেন? কিন্তু আপনি কি জানেন ঐ লোক প্রতিদিন কত শত শত টাকার কারবার করে? ওর তুলনায় আমাদের কারবার ত নগণ্য। আপনি এই চৌমাথার গোড়ায় একটা দিন দাঁড়াইয়া দেখুন হরদম ওর দোকানের জিনিষ কেমন বিক্রী হইতেছে।

"লোকটা যাদু জানে না। মেম সাহেবদের হুজুর হুজুর করে কিন্তু স্বজাতীয়দের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে না। তবু ওর দ্রব্যের এত কাট্‌তি কেন শুনিবেন? ওর দোকানটা এমন সুন্দর জায়গায় অবস্থিত যে না চাহিতেই দিনরাত খরিদ্দার পাইতেছে। ওর দোকানের সাম্‌নে দিয়া সব রাস্তাগুলি গিয়াছে, ষ্টেশন কাছে, মোটরগুলি দাঁড়াইবার জায়গা ওর বিপরীত রাস্তার উপর। ওর জিনিষের কাট্‌তি হইবে না ত কার হইবে? এত সুবিধা আর কোনো দোকানের নাই।

"বড়লোকেরা মোটর করিয়া হয়ত এখানে নামিল কিংবা দারজিলীঙ যাইবার পথে কিছুক্ষণের জন্য ট্রেন হইতে এইখানে নামিয়া পায়চারি করিল। সাম্‌নেই দোকান। সেখানে চা চুরুট, চকোলেট হইতে আরম্ভ করিয়া জুতার ফিতা পর্য্যন্ত আছে। সুতরাং তাড়াতাড়ি যার যা খুসী কিনিয়া লয়। দরের কথা বিবেচনা করে না।"

বস্তুতঃ, আজিজল হক্ প্রভৃতি ভদ্র বেপারীরা নেহারুদ্দীনের সহিত সম্প্রতি টক্কর দিয়া পারিয়া উঠিতেছে না। কিন্তু এ অবস্থা কি চিরকাল থাকিবে? চোখের সাম্‌নেই অনেক বেপারীর উত্থান-পতনের ইতিহাস দেখিতে পাইতেছি। দেখা যাক্, এই ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় কে কে টিঁকে।

তবে যে কোন স্থানেই হোক্, একের অধিক দোকান থাকা খরিদ্দারের পক্ষে কখন কখন মঙ্গলজনক হইতে পারে। জিনিষ সস্তা হয় বলিয়া নহে, বিক্রেতারা প্রধান দুই সম্পদের উৎকর্ষ সাধন করিতে সমর্থ হয় বলিয়া।

(২১)

এখানে লোকে কয়লা ও কাঠ উভয়ই পুড়িয়া থাকে। গাড়ী করিয়া কাঠ আনিলে হয়ত কিছু সস্তা পড়ে। কিন্তু সাধারণতঃ কয়লার ব্যবহার আছে।

কয়লা সস্তা নয়। কোক্ মণপ্রতি ১॥০ সিকার কমে ও চারকোল ১।/০-১৷৵০। এর কমে প্রায় পাওয়া যায় না। রেলের অত্যধিক ভাড়া এই প্রকার দামের কারণ।

॥০-॥৵০ আনায় কাঠের মণ পাওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু কাঠ অনেক বেশী লাগে। সুতরাং হরে-দরে প্রায় সমান দাঁড়ায়।

গিল্যাণ্ডার কোম্পানী ধীরে ধীরে এ অঞ্চলের কয়লার ব্যবসাটা গ্রাস করিয়া লইতেছে। এক বাঙ্গালী কয়লার ব্যবসায়ীর দোকানে গিয়া শুনিলাম, আজকাল এই ব্যবসার পক্ষে দিনকাল বড় মন্দ পড়িয়াছে। গিল্যাণ্ডার কোম্পানী রেলকে কয়লা যোগায়। আশে-পাশের চা-বাগানগুলি বিস্তর কয়লা পুড়ে। তাদের ম্যানেজারদের বিলাত থাকিতেই উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল তারা যেন গিল্যাণ্ডার কোম্পানীর কাছ ছাড়া এক ছটাক কয়লাও অন্যত্র কিনে না। ম্যানেজাররা সেই কথার দোহাই দিয়া বলে, "কি করিব মহাশয়, আমাদের হাত-পা বাঁধা।

আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও গিল্যাণ্ডার কোম্পানীকে আদেশপত্র পাঠাইতে হয়।

সুতরাং দেশীয়দের কিরূপ দুর্দ্দশা হইতেছে বোঝা সহজ। দেশীয়দের দোকানগুলি একে একে উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

দেখিতেছি কয়লার ব্যবসায় বড় দোকানগুলির চেয়ে ছোট খুচরা দোকানগুলি কম অসুবিধা ভোগ করিতেছে। তারা তবু ভাতে মরিতেছে না।

(২২)

গবর্ণমেণ্টের একটা রেশম-কৃষি-আগার এখানে রহিয়াছে। সেজন্য একজন কর্ম্মচারী সর্ব্বদা মোতায়েন রহিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, "বহরমপুর আমাদের কর্ম্মকেন্দ্র। মালদহ রেশম-চাষের জন্য বিখ্যাত। বাস্তবিক পক্ষে অত ভাল রেশম আর কোথাও উৎপন্ন হয় কি না সন্দেহ। আমের সহিত রেশম-কীটের কোন সম্বন্ধ আছে কি না বলিতে পারি না।

"কারসিয়াঙের রেশম-আবাদও মন্দ নহে। মাকাই বাড়ী এখান হইতে মাইল দেড়েক নীচে পাংখাবাড়ী রোডে অবস্থিত। সেখানেই গবর্ণমেণ্ট জমি লইয়া চাষ করিতেছে। আপনি কি তা দেখেন নাই?

"রেশম আবাদ দুই প্রকারের (১) ঝোপ চাষ (২) বৃক্ষ চাষ। গাছে গুটপোকা পালন সময়সাপেক্ষ। ৪।৫ বছরের আগে কোন ফলের আশা করা যায় না। উহা ব্যয়-সাপেক্ষও বটে। ঝোপ-চাষে যত জমির দরকার বৃক্ষ-চাষে তার চেয়ে বেশী জমি না হইলে চলে না। সাজসরঞ্জামও বেশী চাই। সুতরাং টাকার দরকার।

"ঝোপ-চাষ অপেক্ষাকৃত সহজ। তাড়াতাড়ি ফল পাওয়া যায়। আমরা এখানে ঝোপ চাষ করিতেছি। আমরা শুধু নিজেরাই চাষ করি না। অন্য যে কোন ব্যক্তি এই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন তাঁদেরকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিতে আমরা প্রস্তুত আছি। এই সম্প্রতি আমরা শ্রীযুক্ত সুশান্ত হালদারকে তাঁর রেশম-চাষে সাহায্য করিতেছি। তাঁর ক্ষেত্রটা আমাদের ক্ষেত্রের ঠিক বিপরীত পার্শ্বে অবস্থিত।

"এই একটা প্রাচীন ব্যবসা দেশ হইতে লোপ পাইতে বসিয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় ইহা যদি রক্ষা পায় ত মন্দ কি? আমরা আমাদের বিভাগ হইতে মাঝে মাঝে চাষ সম্বন্ধে, সার সম্বন্ধে, গো-পালন সম্বন্ধে পুস্তিকা মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করি। পোকার হাত হইতে কি করিয়া গাছ রক্ষা পায় তাও বর্ণনা করি। এই সব পুস্তক চাষীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

"লাভালাভের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? তা মহাশয় ব্যবসাটাকে বাঁচানই এ বিভাগের প্রধান উদ্দেশ্য। লাভের কথা পরে। মালদহে গবর্ণমেণ্টের লাভ হয় বলিতে পারি। এখানকার খরচও সম্ভবতঃ পোষাইয়া যায়।

"তবে কেহ এ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলে আমরা তাকে ভরসা দিতে পারি যে লাগিয়া থাকিলে ভবিষ্যতে নিশ্চিত লাভ রহিয়াছে।"

জনৈক ভদ্রলোক পূর্ব্বে রেশম-কৃষি-আগারে কাজ করিতেন। সম্প্রতি সে কাজ ছাড়িয়া তিনি রেলে কাজ করিতেছেন। তিনি বলিলেন, "মহাশয় এই সকল আশ্বাসের বাণী কখনো যেন শুনিবেন না। আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি, এ ব্যবসায়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে লাভের ঘরে শূন্য।

"প্রথমতঃ, অল্প পুঁজিপাটা লইয়া এ ব্যবসা চলে না। অন্ততঃ ৫০০৲ টাকার দরকার। তারপর কত যত্ন, পরিশ্রম ও খাটুনির যে দরকার তা কি বলিব। আপনি হয়ত পরিশ্রম করিয়া সুন্দর ক্ষেত করিলেন। কিন্তু উত্তাপ দেওয়ার এক মিনিট এদিক্-ওদিক্ হওয়াতে হাজার দু'হাজার টাকার আপনার ক্ষেত খানা নষ্ট হইয়া গেল। কিংবা হয়ত পোকাতে ক্ষেতের সর্ব্বনাশ করিয়া দিল।

"এসব দুর্দ্দৈবের কথা পূর্ব্ব হইতে কেহ কিছু বলিতে পারে না। সুতরাং সাবধান হইবার কথা বলিয়া কোন ফল নাই।"

তারপর ধরুন, ৫।৬ হাজার টাকা খরচ করিয়া আপনি অক্লান্ত পরিশ্রমে একটা ক্ষেতে ভাল ফসল দাঁড় করাইলেন। আপনি কোন মতেই তাহা হইতে শ' খানেক টাকার বেশী লাভ করিতে পারিবেন না। তাও আবার যদি সর্ব্ব

প্রকার গবর্ণমেণ্টের বৈধ ও অবৈধ সাহায্য লাভ করেন, তবে।"

"বাঙ্গালীর ছেলে কি এত অনিশ্চয়তার ঝুঁকি সামলাইতে পারে?

"আপনারা সর্ব্বদাই হয়ত শুনিয়া থাকেন অমুক লোক রেশমের চাষ করিয়া অত টাকা লাভ করিতেছে। রেশমের স্বর্গ মালদহের কথা আমি জানি। সেখানে বড় ২।১ জন বেপারী কয়েক হাজার টাকা কয়েক বার লাভ করিয়াছেন। কিন্তু তার কত বেশী হাজার টাকা তাঁরা ক্ষতিস্বরূপ দিয়াছেন, সে খবর কেহ রাখে কি? ক্ষতিগুলি চাপিয়া গিয়া শুধু বড় বড় মুনাফা দেখাইতে পারিলে কি বাহাদুরি হয়?"

(২৩)

কারসিয়াঙ্ ছোট সহর বটে। কিন্তু তবু ইহার হাট-বাজার ছোট নহে। বাহিরের লোক আসিয়া সহসা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া যাইবে যে, এখানে এত জুতার দোকান, রুটির দোকান এবং এত মাংস ও ডিম বিকাইতেছে, এতগুলি দোকান চলিতেছে ও প্রতিদিন এত টাকার কারবার চলে।

কিন্তু ইহার অধিবাসিবৃন্দের ও তাদের পকেটের বহরের যখন খোঁজ লইতে আরম্ভ করি তখন দেখি এখানে প্রতিদিন বহুশত টাকার কেনাবেচা চলিতেছে, বহুলোক ঐশ্বর্য্যবান্ হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখানকার আদিম বাসিন্দা নেপালী চির-তিমিরে ডুবিয়া রহিয়াছে। সবটা টাকা লুটিয়া লইতেছে বাহিরের লোক। সে জ্ঞানও ইহাদের এতদিন ছিল না। আশ্চর্য্যের বিষয় সে জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের বাঙ্গালী-বিদ্বেষ জন্মিতেছে। অথচ কারসিয়াঙ বা দারজিলীঙে অ-বাঙ্গালীরাই পরের ধনে পোদ্দারী করিতেছে।

এদের মধ্যে লেখাপড়াজানা লোকেরা অদ্ভুত চীজ্ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাধারণ নেপালীরা তাদের প্রীতির চোখে দেখে না। তারাও বিশেষ করিয়া বাঙ্গালীকে সহিতে পারে না।

বঙ্গসন্তানের এ বিষয়ে যথেষ্ট দোষ রহিয়াছে বলিয়া মনে করি। আমরা চিরকাল ইহাদিগকে মূর্খ, অসভ্য বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছি। ইহাদের সহিত বন্ধু ও পরামর্শ-দাতা ভাবে মিশি নাই। ইহাদের সভ্যতার, আদর্শের ও মুখে মুখে প্রচারিত সাহিত্য বা সাধনার কোন পরিচয় লই নাই। অথচ আমাদেরই পাশে নিঃশব্দে খ্রীষ্টিয়ান পাদ্রীরা দিনরাত ইহাদের মঙ্গলের জন্য খাটিয়াছে, সর্ব্বপ্রকারে ইহাদের বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছে ও ভালবাসিয়াছে। তার ফলে শত শত লোক খ্রীষ্টিয়ান হইয়াছে ও তাদের মত মিত্র আর কেহ হয় নাই। বাঙ্গালীর এই আত্মগরিমার ও ঔদাস্যের ভাব দূর না হইলে এ জগতে কোথাও তার স্থান নাই।

(২৪)

এখানকার প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ব্যবসাগুলি অধিকাংশই মুসলমানদের হাতে। মুসলমানরা সংখ্যায় নিতান্ত নগণ্য। কিন্তু যেদিকে চাই দেখি মুসলমান ব্যবসায়ী সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। কি রুটির দোকানে, কি কয়লার আড়তে কি মনোহারী দোকানে, মুসলমানের সঙ্গে টক্কর দিয়া কেহ পারিতেছে না। এদের মধ্যে বাঙ্গালীও আছে।

জনৈক অধিবাসী ঠাট্টা করিয়া বলিতেছিলেন, "মহাশয়! এই একটা জায়গায় হিন্দু-মুসলমানে কখনো দাঙ্গা হইবে না। হইলে মুসলমানদের সমূহ ক্ষতি। সমস্ত বাঙ্গালা দেশে যদি মুসলমানদের এইরূপ প্রচেষ্টা দেখিতাম!"

চাউল-ডালের দোকানে অবশ্য মাড়োয়ারী চিরস্থায়ী আধিপত্য বজায় রাখিয়াছে। সেখানে তাকে হটাইবার কেহ নাই। কিন্তু মাড়োয়ারীর মনোহারী দোকান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নহে। এ সহরে মাড়োয়ারী ব্যাঙ্কার রহিয়াছে।

(২৫)

কারসিয়াঙের লেপ চা নাম খরসান্ অর্থাৎ অর্কিডের উপত্যকা। এ যেন ফুলের দেশ। অজস্র ফুল ফুটিয়া ঝরিয়া পড়ে। অথচ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ফুলের চাষ করিয়া এখানে কোন ব্যক্তি অনায়াসে অনেক হাজার উপার্জ্জন করিতে পারে। সেদিকে কারো খেয়াল হয় না।

শীতনিবারণে খাদি

মোটা বলিয়া খাদির একটা দুর্নাম আছে। নিজের দেশের জিনিষের এ দুর্নাম দেশবাসীর মুখে কেমন শোভা পায় তাহার বিচার করিতেছি না; কিন্তু খাদির এই স্থূলত্ব-দোষই যে তাহাকে আবার আর এক দিক্ দিয়া কি অপরিসীম সার্থকতা প্রদান করিয়াছে—ধনী-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে সমগ্র দেশবাসীর সম্মুখে খাদির সেই চেহারাটাই আজ আমরা ধরিতে চাই। খাদি মোটা, এবং মোটা বলিয়াই শীত-নিবারণের দিক্ দিয়া এক বিরাট যোগ্যতা সে অর্জ্জন করিয়াছে এবং এই যোগ্যতা সম্বন্ধে খাদির পরম শত্রুরাও সন্দেহ করিবার কিছু খুঁজিয়া পান না। খদ্দরের জামা ও খদ্দরের চাদরে দেহ আচ্ছাদন করিয়া যাঁহারা শীতের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছেন, খাদির এ যোগ্যতা সম্বন্ধে তাঁহারাই সাক্ষ্য দিবেন।

কাজেই খাদি সম্বন্ধে অন্য দিক্ দিয়া যাহার যাহাই মনোভাব থাকুক, শীতের বস্ত্রের জন্য খাদি ক্রয় করিতে কেহই যে ইতস্ততঃ করিবেন না, অন্ততঃ ইতস্ততঃ করা যে উচিত নহে—সে কথা নিঃসঙ্কোচেই বলা যায়। শুধু এই শীত-নিবারণের যোগ্যতার দিক্ দিয়াই নহে—দামের দিক্ দিয়াও তাহা বিদেশী শীতবস্ত্রের তুলনায় অনেক সুলভ হইয়াছে এবং খাদি সম্বন্ধে যাঁহারা কিছুমাত্র আগ্রহ পোষণ করেন এবং তাহা পরখ করিয়া দেখিয়াছেন তাঁহা-দিগকে সে কথা বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। দরিদ্র দেশের পক্ষে শীতের দিনে খাদির এই সুলভতা দেবতার আশী-র্ব্বাদের মতই নামিয়া আসিয়াছে।

শীত-নিবারণের যোগ্যতা এবং মূল্যের সুলভতা ছাড়া আরো একটা গুণ খাদি অর্জ্জন করিয়াছে, যাহা দেশবাসী মাত্রেরই নয়ন ও মন সমভাবে আকর্ষণ করিবে। রংয়ের ও পাড়ের বিচিত্রতায়, নানা কারুকার্য্যে খাদি আজ আধুনিক যুগের রুচি ও সৌন্দর্য্য-পিপাসা মিটাইবার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে। খাদির বস্ত্রের বিচিত্রতার অভাবে যাঁহারা খাদির প্রতি সুপ্রসন্ন ছিলেন না, খাদিপ্রতিষ্ঠানের ভাণ্ডারে আসিয়া আমরা তাঁহাদিগকে খাদির এই শীতবস্ত্র-গুলি একবার দেখিয়া যাইতে অনুরোধ করিতেছি।

দেশবাসীকে খাদি কেন কিনিতে হইবে সে কথা আমরা বহুবার বলিয়াছি। দেশের নিরন্ন ভাই-ভগ্নীগণ সূতা কাটিয়া খাদি তৈয়ারী করিয়া নিজেদের দুঃখ-মোচনের আশায় দেশ-বাসীর মুখের দিকে চাহিয়া আছে। দেশবাসী খাদি কিনিলে তাহারা অন্ন পাইবে—দুর্দ্দিনে শীতের রাত্রে দেহ-আচ্ছাদনের জন্য বস্ত্রখণ্ড পাইবে। এই নিরন্নদের অন্ন দেওয়া, দরিদ্র দেশের কোটি কোটি টাকার বহির্গমন বন্ধ করা, ভারতের এই নবজাগ্রত বস্ত্রশিল্পটির বাঁচিবার পথ খুলিয়া দেওয়া দেশবাসীরই কর্ত্তব্য এবং এ সমস্তই নির্ভর করিতেছে তাঁহাদের সহানুভূতির উপর। হাজার ছুতায় অন্য সময়ে যাঁহারা খাদি ক্রয় করেন নাই, শীতের খাদি ক্রয় করিতে আজ তাঁহাদের কোন আপত্তিরই কারণ দেখা যায় না এবং তাঁহারা যে তাহা ক্রয় করিয়া দেশের প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করিবেন দেশবাসীর নিকট এ আশা আমরা সহজে করিতে পারি।

খাদিপ্রতিষ্ঠান, ১৭০, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
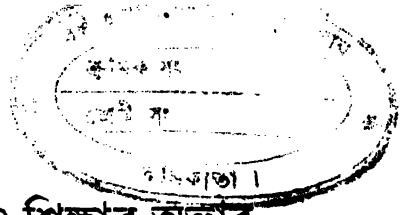
বেকার-সমস্যায় মূলধন ও শিক্ষার অভাব

শ্রীযোগেশচন্দ্র পাল, দিঘাঘাট, পাটনা

আজকাল অনেকেই বাঙ্গালী যুবকগণের স্কন্ধে দোষের বোঝা চাপাইয়া বলেন, "কেন তাহারা ব্যবসা-বাণিজ্যে যোগদান করে না? কেন তাহারা চাকরী চাকরী করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় আর অন্যের তোষামোদ করিয়া থাকে?" যাঁহারা এইরূপ একটা কথা বলিতে পারেন, অন্ততঃ তাঁহাদের ভাবিয়া দেখা আবশ্যক যে, কেন বাঙ্গালী যুবক ব্যবসা-বাণিজ্য-ক্ষেত্রে আপনাদের ভাগ্য-পরীক্ষার জন্য ঝাপাইয়া পড়ে না। তাঁহারা যদি ঝাপাইয়া না পড়ার কারণগুলি অনুসন্ধান করিতেন, তাহা হইলে ওরূপ কথা বলিতে সাহস করিতেন না। যদি ব্যবসা ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইবার ক্ষমতা তাহাদের বাস্তবিকই থাকিত তবে আর তাহারা এত অভাব-অনাটনে, অন্নাভাবে উৎপীড়িত হইয়া ঘরে বসিয়া মহাশয়দের গালাগালি শুনিত না। যাঁহারা এত বড় বড় কথা বলিয়া নাম কিনিতে চান, তাঁহারা যদি ব্যবসা ক্ষেত্রে নামিয়া আসিবার জন্য উপদেশ না দিয়া যুবকগণের বব্যাসাক্ষেত্রের মাঝে ঝাপাইয়া পড়িবার রাস্তা তৈয়ারী করিয়া দিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কথার অনেকটা সার্থকতা ছিল।

বাঙ্গালার অতীত ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, বাঙ্গালার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বাঙ্গালীর ব্যবসা-বাণিজ্য-দক্ষতার কথা আছে! ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন বাঙ্গালা দেশে বাণিজ্য করিতেছিল তখন ইংরেজগণ ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা করিতে গিয়া কি ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্তই না হইয়াছে। তারপর যখন তারা দেওয়ানি লাভ করিল তখন দেশীয় লোকদিগকে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিবার জন্য কত কি করিয়াছে। দুইশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী ব্যবসা-বাণিজ্য-ক্ষেত্রে যে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল আজকালকার বাঙ্গালী তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পড়িয়াও বিশ্বাস করিবে না। মোগল রাজত্বকালে বাঙ্গালীরা কি সুন্দরভাবে ব্যবসা চালাইত! আড়াইশত কি তিনশত বৎসর পূর্ব্বে যে বাঙ্গালী ব্যবসা ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া সমস্ত জগতে কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছিল, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তাহার দুরবস্থার কথা ভাবিতেই পারা যায় না।

বাঙ্গালার এই ব্যবসা ধ্বংস হইল কি প্রকারে? সে কথা বলিতে গেলে প্রকাণ্ড একখানা বই হইয়া দাঁড়াইবে। অন্যান্য কারণের মধ্যে অত্যাচারমূলক প্রতিযোগিতা ও পক্ষপাতমূলক কর-নির্দ্ধারণের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এদেশে ইংরেজের রাজত্ব-স্থাপনের পর যখন প্রথম যুগ আরম্ভ হইল, তখন তাহারা দেশীয় লোকদিগকে একটা নূতন মোহজালে আবদ্ধ করিল—তাহা চাকরী। একটু লেখাপড়া ও ইংরেজী জানিলেই সরকারের চাকরী লাভ করা যাইতে পারে, সুতরাং সকলেই গোলামি করিবার জন্য ইংরেজী শিখিতে লাগিল। আস্তে আস্তে চাকরী করাই বাঙ্গালীর মূল উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল।

এখন এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, সন্তান জন্মগ্রহণ করিবার পর হইতেই মাতাপিতা তাহাকে চাকরী করিবার জন্য তৈয়ারী করিতে থাকেন। কে কোন্ চাকরী করিবে, কে কত বড় মাহিনায় চাকরী করিবে ইতাদি জল্পনা-কল্পনা চলিতে থাকে। দেশে চাকরীর এত অভাব হইয়াছে যে, ১৫৲।১৬৲ মাহিনায় ম্যাট্রিকুলেশন-পাশ-করা লোক পাওয়া যায়। ইহা জানিয়া শুনিয়াও লোকে ছেলেকে কেরাণীগিরি বিদ্যা শিখিবার জন্য বিদ্যালয়ে পাঠায়। আবার কায়স্থ-ব্রাহ্মণ-বৈদ্য শ্রেণীর ছেলেদের মাতাপিতারা বলেন ছেলে লেখা-পড়া না জানিলে চাকরী করিতে পারিবে না, চাকরী না করিলে সংসার চলিবে না। এইরূপ ভাবিয়া তাঁহারা ছেলে-দিগকে স্কুলে পাঠান। অনেকে স্কুলে আসিয়া মাতাপিতার বহুকষ্টে উপার্জ্জিত টাকা ব্যয় করিয়া ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে। তারপর যখন তাহারা স্কুল হইতে বাহির হয় তখন

দেখিতে পায় তাহাদের মূল্য বিশ টাকার অধিক নহে—একজন কুলিও তাহার চেয়ে অধিক উপার্জ্জনক্ষম। অনেকে আবার বিশ টাকার নকরীও পায় না। এই তো চাকরীর অবস্থা।

প্রতি বৎসর ১৫।১৬ হাজার ছাত্র ম্যাট্রিকুলেশন্ পাশ করে। তাহাদের মধ্যে ৪।৫ হাজার ছেলে মাত্র কলেজে যায়; অবশিষ্ট দশ হাজার ছাত্রের অধিকাংশই অর্থাভাবে কলেজে যাইতে পারে না। কলেজে যাইতে না পারিয়া তাহারা নকরীর চেষ্টা করে; কিন্তু প্রতিবৎসর এত লোকের নকরী হওয়া অসম্ভব। অসম্ভব বলিয়াই দিন দিন বেকার-সমস্যা বৃদ্ধি পাইতে চলিয়াছে। অনেকে বলেন, এই সকল বেকার যুবক ব্যবসা-ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়ায় না কেন? কিন্তু তাহারা যে ব্যবসা ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইবে সে সুযোগ তাহাদের কোথায়? তাহারা যে গরিবের সন্তান। তাহাদের অর্থ নাই। মূলধন তাহারা পাইবে কোথায়?

স্বীকার করিলাম যথেষ্ট মূলধন না হইলেও অনেক ছোট ছোট ব্যবসা আরম্ভ করা যাইতে পারে এবং তাহা দ্বারা লাভ করিয়া পরে বড় ব্যবসা চালান যাইতে পারে। কিন্তু এরূপ ব্যবসায় নামিবার মত তাহাদের সাহস কোথায়? ব্যবসা কিরূপে করিতে হয় তাহা তাহারা মোটেই জানে না। তাহাদের দুইতিন পুরুষের মধ্যে কেহ ব্যবসায় যোগ দেয় নাই। তবে তাহারা কিরূপে ব্যবসা শিখিবে? অনেকে অর্থ বা মূলধন থাকা সত্ত্বেও ব্যবসায় নামিতে পারে না। তাহারা ব্যবসা জানে না। বহু টাকা লইয়া ব্যবসায় নামিয়া অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, এরূপ সংবাদ আমরা অনেক জানি।

মোটের উপর কথা হইল ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিতে হইবে। তাহা না হইলে যুবক বঙ্গের মুক্তি নাই। যাহাতে বাঙ্গালী যুবকগণ অল্প মূলধনে ব্যবসা করিতে পারে এবং অধিক মূলধন লইয়া কারবার করিলে যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তদনুরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিরূপে এই শিক্ষার বন্দোবস্ত করা যায় তাহা নির্দ্ধারিত করিবার জন্য দেশের জননায়ক ও সুধীগণের মধ্যে আলোচনা আবশ্যক। এইরূপ শিক্ষার জন্য কয়েকটী বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

১। অল্পমূলধনে ব্যবসা আরম্ভ।
২। তথাকথিত ভদ্রতা পরিহার করা।
৩। বিলাসিতা দূর করা।
৪। শারীরিক পরিশ্রম স্বীকার করা।
৫। মিষ্টভাষী হওয়া।
৬। মিতব্যয়ী হওয়া।
৭। খাঁটি হিসাব রাখা।
৮। বাজার-দর রীতিমত জানা।
৯। নানাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের সংবাদ রাখা।
১০। লোক খাটাইতে পারদর্শী হওয়া।

বাঙ্গালীর ভয়ানক দোষ বিলাসিতা। বিলাসিতা পরিত্যাগ না করিলে ব্যবসা চালান অসম্ভব। বিলাসিতার জন্য অনেক ব্যবসা নষ্ট হইয়াছে।

ভারতীয় কৃষি-কমিশনের প্রশ্ন-পত্র

ভারতবর্ষে কৃষিকার্য্যের ও পল্লীগ্রামের অর্থ-সম্পত্তির বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ তাহার অনুসন্ধান করিয়া তৎসম্বন্ধে বিবরণ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত, এবং কৃষির উন্নতি ও পল্লীগ্রামের অধিবাসিগণের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করা যায় তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিবার উদ্দেশ্যে ভারতীয় কৃষি-কমিশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

যাঁহারা কৃষি-কার্য্য ও পল্লী গ্রামের সম্বন্ধে নানাবিধ জ্ঞানের অধিকারী তাঁহারা যাহাতে এই কৃষি-পরিষদের

সম্মুখে তাঁহাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অভিমত প্রকাশ করিতে পারেন, তদুদ্দেশ্যে এক প্রশ্নাবলী পত্রিকা রচিত হইয়াছে। সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কাহারও আবশ্যক নাই। যিনি যে বিষয়ে বিশেষরূপে জানেন, তিনি কেবল সেই বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর দিবেন। কেহ ইচ্ছা করিলে সকল প্রশ্নের উত্তরও প্রদান করিতে পারেন। বাচনিক সাক্ষ্য অথবা প্রশ্নসমূহের উত্তর গ্রহণ করা কৃষি-পরিষদের অভিরুচিসাপেক্ষ।

প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর এক একখানি পৃথক কাগজে পরিষ্কাররূপে লিখিয়া দিতে হইবে। উত্তরগুলি এরূপ হওয়া চাই যেন তাহা বুঝিতে গবর্ণমেণ্টের প্রকাশিত কোন পুস্তকাদি ব্যতীত অপর কিছুর সাহায্য লইতে না হয়। কোন উত্তরের বিবৃতির জন্য দলিল-পত্রের প্রয়োজন হইলে তাহা ঐ উত্তরের সঙ্গেই পাঠাইতে হইবে।

প্রশ্নাবলী

নিম্নে প্রশ্নাবলী প্রকাশিত হইল। ইহা চারি ভাগে বিভক্ত। যথা,—(১) গবেষণা, কৃষি-শিক্ষা, প্রমাণ প্রয়োগ ও প্রচার, শাসন ব্যবস্থা, অর্থ সাহায্য, ঋণদান, ভূমির অংশ বিভাগ,। (২) জল-সেচন, মৃত্তিকা, সার, ফসল, চাষ, ফসল রক্ষা, যন্ত্রপাতি। (৩) পশু-চিকিৎসা পশু-পালন। (৪) কৃষিজাত শিল্প, কৃষি ও শ্রম, বন, বাজার, মাল চালানী সমবায়, সাধারণ শিক্ষা, মূলধন, গ্রামবাসীর উন্নতি, হিসাবপত্র।

প্রথম ভাগ

গবেষণা

(১) নিম্নলিখিত বিষয়ের সংগঠনে, সংরক্ষণ ব্যবস্থায় ও অর্থ সাহায্যে উন্নতি করিবার জন্য আপনি কোন উপায় নির্দ্দেশ করিতে পারেন কি না? (ক) প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত কৃষি-কার্য্যের পন্থা ও দেশীয় প্রণালীর বৈজ্ঞানিক মূল্য সম্বন্ধে কৃষকের উন্নতিমূলক সর্ব্বপ্রকার গবেষণা, (খ) পশু-চিকিৎসার গবেষণা।

(২) আপনার জ্ঞাতসারে যদি সুনিপুণ কর্ম্মী, কিংবা উপযুক্ত ক্ষেত্র অথবা পরীক্ষাগারের অভাবে কোন স্থলে ইহার বাধা উৎপন্ন হইয়া থাকে, তৎসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ দিবেন।

(৩) এমন কোন নূতন বিশেষ বিষয়ের উল্লেখ করিতে পারেন কি না, যাহার সম্বন্ধে বর্ত্তমান সময়ে কোন গবেষণা করা হইতেছে না, অথচ যে গবেষণা ফলদায়ক হইতে পারে?

কৃষি-শিক্ষা

যে কোন প্রকারের কৃষিশিক্ষা বিষয়ে আপনার অভিজ্ঞতা হইতে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদান করুন। (১) শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের সংখ্যা কি প্রচুর? (২) আপনার পরিচিত কোন জেলায় কৃষিশিক্ষা-বিস্তারের এখনই কোন প্রয়োজন আছে কি? (৩) পল্লীগ্রামে কৃষকদের মধ্য হইতেই শিক্ষক নির্ব্বাচন করা উচিত কি? (৪) যে সকল কৃষি-বিদ্যালয় এখন আছে তাহাতে ছাত্রদের উপস্থিতি আপনার আশানুরূপ হইয়াছে কি? কি উপায় অবলম্বন, করিলে শিক্ষার জন্য লোকের আগ্রহ বৃদ্ধি পাইবে? (৫) কি কি প্রধান কারণে বালকগণকে কৃষিশিক্ষায় প্রবৃত্ত করে? (৬) কৃষকের ছেলেরাই কি বেশীর ভাগ কৃষি-বিদ্যালয়ে পাঠ করে? (৭) বর্ত্তমান কৃষি-শিক্ষার পদ্ধতির কোন পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা আছে কি? যদি থাকে তবে কোন কোন বিষয়ে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে? (৮) নিম্নলিখিত বিষয়ে আপনার মন্তব্য কি?—(ক) প্রাকৃতিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা শিক্ষালাভ, (খ) বিদ্যালয়ের অবস্থান-ভূমি, (গ) বিদ্যালয়ের অন্তর্গত কৃষিক্ষেত্র। (৯) যাহারা কৃষি বিষয়ের অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়াছে, তাহারা কিরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে? (১০) মধ্যবিত্ত অবস্থার যুবকদিগকে কৃষিকার্য্যে কিরূপে আকৃষ্ট করা যায়? (১১) যে সকল ছাত্র কৃষি-বিদ্যায় শিক্ষালাভ করিয়াছে, তাহাদের ব্যবহারিক জ্ঞান বৃদ্ধি করিবার কোন আয়োজন বর্ত্তমান সময়ে আছে কি? (১২) পল্লীগ্রামে প্রাপ্তবয়স্ক যুবকদের জন্য শিক্ষা-প্রচারের কি ব্যবস্থা করা যায়? (১৩) পল্লী-গ্রামে কৃষি শিক্ষার উন্নতিকল্পে আপনার যদি কোন প্রস্তাব থাকে তবে তাহাতে এই দুইটী বিষয়ের উল্লেখ করিবেন (ক) পরিচালন-ব্যবস্থা, (খ) অর্থ-সমস্যা।

প্রমাণ-প্রদর্শন ও শিক্ষা-প্রচার

(ক) কৃষকেরা বরাবর যে ভাবে চাষ করিয়া আসিতেছে, তাহার উন্নতি করিবার জন্য আপনার মতে কোন্ কোন্ ব্যবস্থা ফলপ্রদ হইয়াছে? (খ) ক্ষেত্রে যাইয়া প্রমাণ প্রদর্শন করিবার সুফল যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহার কোন উপায় বলিতে পারেন কি? (গ) কৃষকেরা যাহাতে কৃষি-বিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের উপদেশ গ্রহণ করে, তাহার উপায় কি? (ঘ) যদি আপনার জ্ঞাতসারে কোন স্থলে প্রমাণ-প্রদর্শন ও শিক্ষা-প্রচারের চেষ্টা সফল অথবা বিফল হইয়া থাকে, তবে তাহার বিশেষ বিবরণ দিবেন ও সেই বিফলতার অথবা সফলতার কারণও উল্লেখ করিবেন।

শাসন-ব্যবস্থা

(ক) যাহাতে ভারত গবর্ণমেন্টের কৃষি-বিভাগীয় কর্ম্ম-ক্ষমতা অধিকতর সংযত হয়, এবং ভারত গবর্ণমেন্ট যাহাতে প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের কার্য্যের অসম্পূর্ণতা পরিপূরণ করিয়া সফলতা লাভ করিতে পারেন, তৎসম্বন্ধে আপনি কোন উপায় নির্দ্দেশ করিতে পারেন কি না? (খ) কৃষিকার্য্যের উন্নতি-কল্পে অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের উপদেশ পাইবার জন্য ভারত গবর্ণমেন্টের অধীন বৈজ্ঞানিক কর্ম্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রয়োজন আপনি মনে করেন কি? যদি তাহাই হয়, তবে অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপদেশের সাহায্যে কি প্রকারের কার্য্যে উপকার পাওয়া যাইবে ও তাহা কিরূপে নিয়ন্ত্রিত হইবে? (গ) কৃষি-সম্পর্কে নিম্নলিখিত কর্ম্মচারীদের কার্য্যে আপনি সন্তুষ্ট কি না?—(১) কৃষি ও পশুচিকিৎসার কর্ম্মচারী, (২) রেল ও জাহাজের কর্ম্মচারী, (৩) রাস্তার কর্ম্মচারী, (৪) ডাক ও তার বিভাগের (বে-তার-বার্ত্তা বিভাগ সহিত) কর্ম্মচারী। যদি আপনি ইহাদের কার্য্যে সন্তুষ্ট না থাকেন, তবে কি ভাবে তাহাদের কার্য্যের উৎকর্ষ হইতে পারে?

অর্থ-সাহায্য

(ক) কৃষি-কার্য্যের জন্য ও কৃষকদিগকে অল্পদিনের অথবা বেশী দিনের মেয়াদে টাকা কর্জ্জ দিবার জন্য অর্থ-সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে কি কি উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য? (খ) গবর্ণমেন্টের প্রবর্ত্তিত 'তাগাবী' ঋণ-প্রথার সুবিধা কৃষকেরা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করুক এরূপ আপনি ইচ্ছা করেন কি না?

কৃষি সম্বন্ধীয় ঋণ-গ্রস্ততা

(ক) নিম্নলিখিত বিষয়ে আপনার মতামত প্রকাশ করুন (১) কৃষকের ঋণগ্রহণ করিবার কারণ (২) ঋণ পাইবার উপায় (৩) ঋণ শোধ না করিবার কারণ। (খ) কি উপায়ে কৃষকের ঋণভার লঘু করা যাইতে পারে?—চাষী দেউলিয়া সম্বন্ধে বিশেষ বিধি প্রচলিত করা প্রয়োজনীয় কি না,—অতিরিক্ত সুদ বিষয়ক আইন প্রবর্ত্তন করা হইবে কিনা,—অথবা রেহানে বন্ধকী জমি উদ্ধারের সাহায্য করা হইবে কি না? (গ) জমি বিক্রয় অথবা রেহানে আবদ্ধ রাখিবার অধিকার খর্ব্ব করিয়া কৃষকদের ঋণগ্রহণ-প্রবৃত্তিকে দমন করিবার উপায় অবলম্বন করা উচিত কি না? অফুরন্ত মেয়াদী রেহান দেওয়ার নিয়ম বন্ধ করা হইবে কি না?

জমির অংশ বিভাগ

(ক) অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে জমি বিভক্ত হওয়ায় কৃষি-কার্য্যের যে ক্ষতি হইতেছে, তাহা কমাইবার জন্য আপনি কোন উপায় নির্দ্দেশ করিতে ইচ্ছা করেন কি? (খ) জমিকে অখণ্ড রাখিবার কি কি বাধা আছে ও তাহা প্রতি-কারের উপায় কি? (গ) নাবালক, বিধবা, আইনতঃ অক্ষম ব্যক্তি, সম্পত্তি হস্তান্তর, ও আপত্তিদায়ক—এই সকল বিষয়ে আইন করা প্রয়োজন কি না এবং মামলা-মোকদ্দমা যাহাতে আদালতে না আসে এরূপ ব্যবস্থা করা উচিত কি না?

দ্বিতীয় ভাগ

জল-সেচন

(ক) এমন একটি জেলা বা জেলাসমূহের নাম করুন যাহাতে আপনি নূতন প্রকারের জল সেচন ব্যবস্থা প্রচলনের পক্ষপাতী, অথবা যাহাতে আপনি বর্ত্তমান জলসেচন প্রণালীর উন্নতি বিস্তার করিতে চাহেন, অথবা নিম্ন-লিখিত ভাবে জলসেচন করিতে ইচ্ছা করেন, (১) অল্পদিন স্থায়ী অথবা চিরকাল স্থায়ী খালের দ্বারা (২) জলদ্বারা বা পুষ্করিণীর দ্বারা (৩) কূপের দ্বারা। আপনার জেলাতে অথবা

প্রদেশে উপরি উক্ত প্রণালীতে জল সেচন করিবার কি কি বাধা আছে? (খ) খালের জল চাষীদের মধ্যে বিতরণ করার বর্ত্তমান ব্যবস্থায় আপনি সন্তুষ্ট আছেন কি? রৌদ্রে শুকাইয়া ও মাটিতে শুষিয়া জলের যে অপচয় হয় তাহা নিবারণের যে উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে তাহা বর্ণনা করুন। একেবারে শেষ সীমায় যে সকল চাষীর জমি আছে তাহাতে কি প্রণালীতে জল বিতরণ করা আপনি সুবিধা-জনক মনে করেন? এই সকল উপায় ও কৌশল সফল হইয়াছে কি? না হইলে আপনি ইহাদের উন্নতির জন্য কি প্রস্তাব করিতে চাহেন? [বিশেষ দ্রষ্টব্য—জল-সেচনের ব্যয় কমিশনের অনুসন্ধানের বিষয় নহে। সুতরাং তৎসম্বন্ধে কেহ কোন মন্তব্য প্রকাশ করিবেন না]

ভূমি

(ক) নিম্নলিখিত বিষয়ে আপনি কোন পরামর্শ দিতে পারেন কি?—(১) অন্য কোন উপায়ে (যাহা এই প্রশ্নাবলী পত্রের অন্য কোন স্থানে বলা হয় নাই) ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি, (২) অনুর্ব্বর ও চাষের অযোগ্য ভূমির উৎকর্ষ-সাধন। (৩) বন্যায় ভূমির উপরিভাগের ক্ষয় নিবারণ। (খ) আপনি এমন কোন ভূমিখণ্ডের নাম উল্লেখ করিতে পারেন কি না যাহা আপনার স্মরণকালের মধ্যে (১) বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে, (২) বিশেষ অবনত হইয়াছে? যদি এইরূপ কোন জমি থাকে তবে তৎসম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ দিবেন। (গ) যে সকল চাষের যোগ্য ভূমিতে এখন চাষ হইতেছে না, তাহাতে পুনরায় কৃষিকার্য্যের প্রচলন করিতে গবর্ণমেণ্ট কিরূপ উপায় অবলম্বন করিবেন?

সার

(ক) আপনার মতে স্বাভাবিক সার-ব্যবহার অধিক লাভজনক, না কৃত্রিম সার-ব্যবহার অধিক লাভজনক? কি উপায়ে সার ব্যবহার প্রণালীর উন্নতি করা যাইতে পারে? (খ) সারের সহিত দুষ্ট ব্যবসায়ীরা যে ভেজাল দিয়া থাকে তাহা নিবারণের উপায় কি? (গ) নূতন ও উন্নত রকমের সার প্রচলন করিতে কিরূপ উপায় অবলম্বন করা যায়? (ঘ) আপনার পরিচিত এমন কোন স্থান উল্লেখ করুন যেখানে চাষীরা সম্প্রতি অধিক পরিমাণে সারের ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। (ঙ) ফস্ফেট্, নাইট্রেট্, এবং পটাশ এই সকল সার ব্যবহারের ফল ভালরূপ অনু-সন্ধান করা হইয়াছে কি? যদি হইয়া থাকে, তবে তাহা কিরূপ উল্লেখ করুন। (চ) গোবরের ঘুঁটে যে জ্বালানী রূপে ব্যবহার হয়, তাহা বন্ধ করিবার জন্য আপনি কি উপায় অবলম্বন করিতে বলেন?

ফসল

(ক) নিম্নলিখিত বিষয়ে আপনার মত প্রকাশ করুন—(১) বর্ত্তমান ফসলের উন্নতি, (২) নূতন ফসলের প্রচলন (গবাদি পশুর খাদ্যের ফসল সহ), (৩) বীজ-বিতরণ, (৪) বন্য জন্তুর উৎপাত হইতে ফসল-রক্ষা, (খ) খাদ্যদ্রব্যের বর্ত্তমান ফসলের পরিবর্ত্তে আপনি এমন কোন ফসলের নাম করিতে পারেন কি না যাহা খুব প্রচুর রূপে উৎপন্ন হয়? (গ) ফসলের উন্নতির জন্য অথবা অন্য কোন লাভজনক ফসল প্রবর্ত্তনের জন্য যদি কোন চেষ্টা কোথাও হইয়া থাকে আপনি জানিলে তাহার উল্লেখ করুন।

চাষ

নিম্নলিখিত বিষয়ের উন্নতির জন্য আপনি কি উপায় অবলম্বন করিতে বলেন?—(১) বর্ত্তমান চাষের প্রণালী, (২) আবর্ত্ত প্রণালীতে অথবা প্রধান ফসল মিশ্রণ প্রণালীতে চাষ করিবার প্রথা।

ফসল রক্ষা,—বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক

নিম্নলিখিত বিষয়ে আপনার মত প্রকাশ করুন,—(১) ফসলের বাহ্য সংক্রামক ব্যাধি, কীটাদির আক্রমণ-জনিত মড়ক ও অপরাপর পীড়া হইতে ফসলকে রক্ষা করিবার বর্ত্তমানে প্রচলিত উপায়গুলি প্রচুর ও ফলপ্রদ কি না? (২) সংক্রামক ব্যাধির নিবারণকল্পে আভ্যন্তরিক কোন ব্যবস্থা করা যাইতে পারে কি না?

কৃষিকার্য্যের যন্ত্রাদি

(ক) বর্ত্তমানে প্রচলিত যন্ত্রাদির উন্নতিসাধন ও নূতন যন্ত্রাদির প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে আপনার কিছু বলিবার আছে কি না? (খ) চাষীরা যাহাতে শীঘ্র উন্নত ধরণের যন্ত্রাদির ব্যবহার করে তাহার জন্য কি উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য? (গ) কৃষিকার্য্যের উপযোগী যন্ত্রাদি প্রস্তুত ও

সেইগুলি দেশের মধ্যে বিক্রয় করিবার পক্ষে যন্ত্রনির্ম্মাণকারকদের কোন বাধা আছে কি না? যদি থাকে তবে তাহা দূর করিবার উপায় কি?

তৃতীয় ভাগ

পশু-চিকিৎসা

(ক) পশুচিকিৎসা-বিভাগ কৃষিবিভাগের ডাইরেক্টরের অধীন থাকিবে,—না উহা স্বাধীন থাকিবে? (খ)—(১) ডিস্পেনসারীগুলি কি জেলা বোর্ড অথবা লোকাল বোর্ডের অধীন? ইহাতে কি ভালরূপ কার্য্য হইতেছে? (২) ডিস্পেন্সারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন সিদ্ধ হইতেছে কি না? (৩) প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের উপর ইহার ভার দেওয়া আপনি কি সঙ্গত মনে করেন? (গ) কৃষকেরা পশুচিকিৎসা-বিভাগের ঔষধালয়গুলি হইতে তাহাদের গো-মহিষাদির জন্য ঔষধাদি নেয় কি না? যদি না নেয়, তবে ইহার কি প্রতিকার করা যায়? (২) যে সকল ঔষধালয় এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যায়, কৃষকেরা তাহা হইতে ঔষধাদি নেয় কি না? (ঘ) সংক্রামক ব্যাধি নিবারণের কি কি বাধা উৎপন্ন হইতেছে? পীড়িত জন্তুদিগকে পৃথক করিয়া রাখা নোটীশ জারি করা, জন্তুর মৃতদেহ স্থানান্তরিত করা, জন্তুদিগকে টীকা দেওয়াইতে বাধ্য করা, যে সকল জন্তুর সংক্রামক পীড়া হওয়ার আশঙ্কা আছে তাহাদিগকে চলাফেরা করান ইত্যাদি বিষয়ে আইন করা উচিত কি না? আইন করা না হইলে অপর কি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে? (ঙ) টীকা দিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে বীজ-সংগ্রহ করিবার বাধা আছে কি না? (চ) রোগ-বাধক টীকা দিবার নিয়ম প্রচলিত করিবার কি বাধা আছে? টীকা দিবার জন্য কোন ফিস্ লওয়া হয় কি না? হইলে তাহাতে টীকা প্রচলনের বাধা হয় কি না? (ছ) পশুদের পীড়া সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য আরও বিস্তৃত ভাবে ব্যবস্থা করা প্রয়োজন কি না? যদি প্রয়োজন হয় তবে তাহা নিম্নলিখিতরূপে করা হইবে কি না?—(১) মুক্তেশ্বর ইনষ্টিটিউটের সম্প্রসারণ, (২) প্রাদেশিক পশুচিকিৎসা-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা অথবা প্রসার। (জ) আপনি কি মনে করেন নিম্নলিখিত কর্ম্মচারীদের বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করা উচিত?—(১) মুক্তেশ্বর ইনষ্টিটিউটের কর্ম্মচারী, (২) প্রদেশসমূহের গবেষণাকারী কর্ম্মচারী। (ঝ) ভারত-গবর্ণমেণ্টের অধীনে একজন প্রধান পশুচিকিৎসক কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা আপনি সঙ্গত মনে করেন কি? এরূপ নিয়োগের দ্বারা কি সুবিধা হইবে?

পশুপালন

(ক) নিম্নলিখিত বিষয়ে আপনার মত কি?—(১) জন্তুদের বংশ উন্নত করা, (২) দুগ্ধ-ব্যবসায়ের উন্নতি, (৩) পশুপালনের বর্ত্তমান ব্যবস্থার উন্নতি। (খ) আপনার জেলাতে নিম্নলিখিত কারণে গবাদি পশুর যে ক্ষতি হইয়াছে তৎসম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করুন—(১) সাধারণ চারণভূমির চাষ, (২) জমির চারি ধারে যে ঘাসের আল থাকে তাহার অভাব, (৩) খড়, ডালের ডাঁটা প্রভৃতি শুষ্ক খাদ্যের অভাব (৪) শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে সবুজ ঘাসের অভাব, (৫) পশুর খাদ্যে খনিজ দ্রব্যের অভাব। (গ) আপনার জেলাতে বৎসরের কোন্ সময়ে গবাদি পশুর খাদ্যের অভাব, বিশেষ ভাবে দৃষ্ট হয়? কত দিন পর্য্যন্ত এই অভাব সাধারণতঃ থাকে? এই অভাবের দিন চলিয়া গেলে কত সপ্তাহ পরে গবাদি পশুর শাবকগুলি পুনরায় হৃষ্টপুষ্ট হইতে আরম্ভ করে? (ঘ) পশুর খাদ্য সরবরাহের এমন কোন সুবিধা-জনক উপায় বলিতে পারেন কি না, যাহা আপনার জেলায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে? (ঙ) এই বিষয়ে জমির মালিকগণের আগ্রহ কিরূপে জাগ্রত করা যায়?

চতুর্থ ভাগ

কৃষি সম্বন্ধীয় শিল্প

(ক) সমগ্র বৎসরে একজন সাধারণ কৃষক তাহার জমিতে গড়ে কতদিন খাটে তাহা আপনি বলিতে পারেন কি? যে সময়ে কাজ বেশী থাকে না, তখন সে কি করে? (খ) কৃষকের পক্ষে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত অন্য শিল্প গ্রহণ করার কি উপায় আছে? এমন কোন শিল্পের নাম করুন, যাহা কৃষকেরা তাহাদের অবসর সময়ে অবলম্বন করিতে পারে এবং যাহা গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

(গ) মৌমাছি পোষা, হাঁস, মুরগী, পায়রা প্রভৃতি পাখী পোষা, ফলের চাষ, রেশম-কীটের চাষ, মৎস্যের চাষ, লাক্ষা কীটের চাষ, দড়ি তৈয়ারী, ঝুড়ি নির্ম্মাণ প্রভৃতি শিল্প-কার্য্য-প্রসারে বাধা কি ? (ঘ) আপনি কি মনে করেন গবর্ণমেণ্ট কৃষিজাত দ্রব্যাদি সংস্পৃষ্ট নিম্নলিখিত শিল্পব্যবসার প্রতিষ্ঠায় অধিকতর সাহায্য করিবেন, যথা—তৈল-প্রস্তুত, চিনি প্রস্তুত, তুলার বীজ ছাড়ান, ধান হইতে চাউল প্রস্তুত, গমের খড়ে কার্ডবোর্ড তৈয়ারী, তুলার বীজ হইতে তৈল, পশুর খাদ্য প্রভৃতি প্রস্তুত, ধানের তুষে কাগজ প্রস্তুত প্রভৃতি। (ঙ) শিল্পের কলকারখানাগুলিকে গ্রামের দিকে লইয়া গেলে কৃষকদের জন্য কাজের বন্দোবস্ত হয় কি না ?—হইলে কি প্রণালীতে হইতে পারে বলুন। (চ) উন্নত ও নূতন ধরণের যন্ত্রাদি প্রচলনের জন্য প্রত্যেক গ্রামের শিল্প সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন আছে কিনা ? (ছ) গ্রাম্য লোকেরা যাহাতে আরও অধিক কাজ করিতে পারে তাহার আর কোন উপায় বলিতে পারেন কি ? (জ) পল্লীগ্রামের লোকেরা যাহাতে তাহাদের অবসর সময়ে চতুঃপার্শ্বের স্বাস্থ্যের উন্নতিতে মনোযোগ দেয়, তাহার উপায় কি ?

কৃষিকার্য্যের শ্রমিক

(ক) কি উপায়ে যেখানে অধিকসংখ্যক লোকের বাস তথা হইতে (১) যেখানে বহু বিস্তৃত চাষের যোগ্য ভূমি পড়িয়া রহিয়াছে তথায় কৃষি-শ্রমিকগণকে লইয়া যাওয়া যায় ? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় সাময়িক ভাবে কৃষকদিগকে কর্ম্ম দেওয়ার জন্য লইয়া যাওয়া ও স্থায়ী ভাবে তাহাদিগকে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করিবেন। (খ) আপনার প্রদেশে যদি চাষী মজুরের সংখ্যা কমিয়া গিয়া থাকে, তবে তাহার কারণ কি ও তাহা দূর করিবার উপায় কি ? (গ) যে সকল জমি এখনও চাষ করা নাই, অতিরিক্ত চাষী মজুরের দ্বারা তাহাতে চাষের কার্য্য করার কি উপায় আছে ?

বনসমূহ

(ক) আপনি কি মনে করেন এখন যে সকল বন-ভূমি আছে, তাহা কৃষির প্রয়োজনে সম্পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হইতেছে ? দৃষ্টান্তস্বরূপ যথা,—যে পরিমাণ সংরক্ষিত বনভূমি আছে তদনুপাতে পশুদের চারণ-ভূমি প্রচুর আছে কি না ? যদি না থাকে তবে বর্ত্তমান ব্যবহারের কিরূপ পরিবর্ত্তন করা আপনি সঙ্গত মনে করেন ? (খ) কি উপায়ে পল্লীগ্রামে জ্বালানী কাষ্ঠ ও পশুদের খাদ্য বৃদ্ধি করা যাইতে পারে ? (গ) বনের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ভূমিও ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে কি না ? বনের ও ভূমির ক্ষয়ের প্রতিকার কি ? (ঘ) কৃষির উন্নতিকল্পে ভূমিতে জলীয়-ভাগের, বৃষ্টিপাতের ও খালের জলের বৃদ্ধি করিবার জন্য বন-সৃষ্টি অথবা বন-রক্ষার প্রণালী কিরূপে অবলম্বন করা যাইতে পারে ? তাহাতে কি ভূভাগের ক্ষয় নিবারিত হইবে ? (ঙ) গ্রামের সন্নিকটে বনভূমি তৈয়ারী করিবার কোন মতলব আপনি দিতে পারেন কি না ? (চ) পশুদের চারণভূমিরূপে অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হওয়ার দরুণ বন নষ্ট হইতেছে কি না ? তাহাতে জমিও কি ক্ষয় পাইয়া নষ্ট হইতেছে ? প্রতিকারের উপায় নির্দ্দেশ করুন।

হাট-বাজার ও বেচা-কেনা

(ক) বর্ত্তমানে হাট-বাজার ও বেচা-কেনার যে সকল সুবিধা রহিয়াছে তাহা কি আপনি সন্তোষজনক মনে করেন ? আপনি যে বাজার সম্বন্ধে বলিতে চাহেন, তাহাদের নাম উল্লেখ করুন; বিস্তৃতরূপে সমালোচনা করিয়া তাহাদের উন্নতি কিরূপ করা যাইতে পারে তাহা বলুন। (খ) বর্ত্তমান সময়ে কৃষিজাত দ্রব্যাদি বাজারে উপস্থিত করিবার ও বিভিন্ন-স্থানে চালান দিবার যে ব্যবস্থা আছে তাহা সন্তোষজনক মনে করেন কি না ? যদি না করেন তবে কোন্ কোন্ দ্রব্য সম্বন্ধে আপনার অসন্তোষের কারণ আছে তাহা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করুন। যদি কোন দ্রব্য ভারতের বাহিরে রপ্তানি হয় তবে তাহারও উল্লেখ করিবেন। উৎপন্নকারী কৃষক ও ব্যবহারকারী গৃহস্থ এই উভয়ের মধ্যে যে মধ্যবর্ত্তী ব্যক্তি রহিয়াছে তাহারা কি ব্যবসায়ী না কমিশন এজেণ্ট ? তাহারা কিরূপভাবে কার্য্য করে, তাহাদের উপকারিতা ও ক্ষমতা কতদূর ইত্যাদি বিষয় বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিবেন। কি প্রণালীতে বেচা-কেনা হয়, টাকাকড়ির লেনদেন

কিরূপে হয় তাহাও উল্লেখ করিবেন। (গ) কৃষিজাত দ্রব্যের গুণ, বিশুদ্ধতা, রকম, বস্তাবাঁধা প্রভৃতির উন্নতি করিবার জন্য আপনি কোন উপায় নির্দ্দেশ করিতে চাহেন কি না? এই প্রশ্নের উত্তরে (১) ভারতীয় বাজারের জন্য ও (২) বিদেশের বাজারের জন্য—এই দুই প্রকারের বাণিজ্য দ্রব্য পৃথকভাবে বুঝাইয়া উল্লেখ করিবেন। (ঘ) ভারতীয় অথবা বিদেশীয় বাজারের অবস্থা, ফসলের হিসাব, কৃষিজাত দ্রব্যের ও সাধারণতঃ কৃষি-সম্বন্ধীয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য-বিষয়ক সকল প্রকার সংবাদ কৃষক ও ব্যবসায়ীদিগকে জানাইবার জন্য আরও ফলদায়ক উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে এইরূপ কি আপনি মনে করেন?

মালের ভাড়া ও শুল্ক

(ক) আমদানি ও রপ্তানি মালের উপরে যে কাষ্টম শুল্ক এখন আছে ও (খ) ভারতের বাহিরে জাহাজের চালানী মালের ভাড়া—এই দুইটির সহিত ভারতীয় কৃষকের অবস্থার কোন সম্বন্ধ আছে কি না? যদি থাকে তবে তদ্বিষয়ে আপনি কি বলিতে ইচ্ছা করেন?

সহযোগিতা ও সমবায়

(ক) সমবায়-সমিতি বিষয়ক আন্দোলনের প্রসারের জন্য (১) গবর্ণমেণ্ট ও (২) দেশীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ কি উপায় অবলম্বন করিলে ভাল হয়? (খ) নিম্নলিখিত বিষয়ে আপনার কোন মন্তব্য আছে কি?—(১) ঋণ-দান সমিতি (২) ক্রয়কারী সমিতি (৩) উৎপন্ন দ্রব্য অথবা মজুত মাল বিক্রয়কারী সমিতি (৪) উন্নতি-বিধায়িনী সমিতি, যথা—কূপ-খনন, বাঁধ-নির্ম্মাণ, বেড়া ও দেওয়াল তৈয়ারী, ঝোপের গাছ রোপণ ইত্যাদি (৫) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমির খণ্ড একত্রীভূত করিয়া পুনরায় সুবিধাজনক ও অপেক্ষাকৃত বৃহৎ খণ্ডে তাহা বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য সমিতি (৬) কৃষি-কার্য্যের যন্ত্রাদি সমবায় নিয়মে ব্যবহার করিবার সমিতি (৭) এজমালি অর্থাৎ সহযোগে কৃষি-কার্য্য করিবার সমিতি (৮) গবাদি পশু প্রজনন সমিতি (৯) কৃষির ও পল্লীজীবনের উৎকর্ষ-সাধনের জন্য অপর যে কোন সমিতি। (গ) যে স্থলে জল-সেচন, জমি-বিভাগ, কৃষি-কার্য্যের অপরাপর উন্নতি-বিধায়ক ব্যবহার নীতি অবলম্বন করিতে লোক অনিচ্ছুক, সেখানে কি গবর্ণমেণ্টের আইনের সাহায্য গ্রহণ করা আপনি যুক্তি-সঙ্গত মনে করেন? (ঘ) আপনি যে সকল সমিতি জানেন তাহাদের উদ্দেশ্য কি আপনার বিবেচনায় সফল হইয়াছে?

সাধারণ শিক্ষা

(ক) বর্ত্তমানে যে শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত আছে তাহাতে কৃষিকার্য্যের কতদূর সহায়তা হয়? ইহার উপর লক্ষ্য রাখিয়া আপনি শিক্ষা-সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন কিনা? যদি কোন পন্থা নির্দ্দেশ করিতে চান তবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে যথাসম্ভব পার্থক্য রক্ষা করিবেন (১) উচ্চ অথবা কলেজিয়েট শিক্ষা (২) মধ্য স্কুলের শিক্ষা (৩) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা (খ)—(১) আপনি এমন কোন উপায় নির্দ্দেশ করিতে পারেন, কি না যাহাতে পল্লীগ্রামের শিক্ষা সকল কৃষকের দৈহিক ও মানসিক উন্নতি করিবে অথচ তাহার ফলে তাহারা কৃষিকার্য্যও পরিত্যাগ করিবে না? (২) পল্লীগ্রামে বাধ্যতামূলক শিক্ষা সম্বন্ধে আপনার অভিজ্ঞতা কিরূপ? (৩) গ্রাম্য প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ছাত্র-সংখ্যা এত অল্প কেন?

মূলধন-সংগ্রহ

(ক) মূলধনশালী ও ব্যবসায়ে সাহসী ব্যক্তিদিগকে কৃষিকার্য্যে নিয়োগ করিবার উপায় কি? (খ) জমির মালিকেরা জমির উন্নতি-সাধনে মনোযোগী হয় না কেন?

পল্লীমঙ্গল

(ক) উপরি উক্ত প্রস্তাবগুলি ব্যতীত গ্রাম্য জন-সাধারণের স্বাস্থ্য ও অপরাপর কল্যাণ-সাধনের নিমিত্ত আপনি আর কোন প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারেন কি না? (খ) কৃষকগণের আর্থিক অবস্থা নিরূপণের জন্য গবর্ণমেণ্ট গ্রামে গ্রামে অনুসন্ধান করুক, আপনার এইরূপ ইচ্ছা আছে কি? যদি থাকে তবে কি ভাবে সেই অনুসন্ধান-কার্য্য করিতে হইবে তাহা বলুন। (গ) আপনি যদি এইরূপ কোন অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, তবে তাহার ফল কি হইয়াছে তাহা প্রকাশ করুন।

হিসাবপত্র

(ক) নিম্নলিখিত বিষয়ের উন্নতি ও প্রসারের জন্য

কোন উপায় নির্দ্দেশ করিতে ইচ্ছা করেন কি ? (১) কি পরিমাণ জমিতে চাষ ও ফসল হয় তাহা নিরূপণ (২) কৃষি-জাত দ্রব্যের পরিমাণ-নির্দ্ধারণ (৩) গো-মহিষাদি ও যন্ত্রাদির সংখ্যা-নির্দ্দেশ (৪) জমির স্বত্ব, রাজস্ব ও কৃষকের সংখ্যা সম্বন্ধে তথ্য-সংগ্রহ (৫) কৃষি সম্বন্ধীয় হিসাব-পত্র প্রকাশ। (খ) এই বিষয়ে আপনার অপর কোন মন্তব্য আছে কি ?

মধ্যবিত্তের চাষ-ব্যবসা

শ্রীকেদারেশ্বর গুহ, বি, এ, (ওহায়ো, আমেরিকা)

আজকাল বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবন-ধারণ-সমস্যা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিয়া থাকে—কি ভাবে চাকুরীজীবী বাঙ্গালীর জীবন-ধারণের একটী প্রকৃষ্ট পন্থা বাহির হইতে পারে ? পূর্ব্বকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২।১টা পরীক্ষা পাশ করিয়া স্কুল বা কলেজ হইতে বাহির হইতে পারিলেই একটা না একটা চাকুরী জুটিয়া যাইত। বি, এ, এম, এ পাশ করিতে পারিলে ত আর ভাবনার কোন বিষয় থাকিত না। চাকুরীতে কোন মূলধনের দরকার হইত না এবং এখনও অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয় না। কোন একটা পদের খোঁজ মিলিলেই অনায়াসে ২।১টা সুপারিশের জোরে সে পদটী সহজে লাভ করা যাইত। কাজেই তখনকার প্রকৃষ্ট পন্থা ছিল বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডিগ্রী লাভ করিয়া বাহির হওয়া। সেজন্য গরিব পিতামাতারা অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া পুত্রের শিক্ষার জন্য অকাতরে অজস্র অর্থ ব্যয় করিতেন। এখনও প্রায় সেইরূপই করিয়া থাকেন, যদিও এখন আর বি-এ, এম-এ পূর্ব্বের ন্যায় তেমন দরে বিকায় না।

বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে প্রতি বৎসর যত গ্রাজুয়েট ও আণ্ডার গ্রাজুয়েট বাহির হইতেছে তদনুপাতে চাকুরীর সংখ্যা কম ও দুষ্প্রাপ্য হইতেছে। চাকুরী পাইতে গেলে বা তজ্জন্য চেষ্টা করিতে গেলে অনেক টাকা খরচ করিতে হয়, সুপারিশের ত কথাই নাই। আজকাল অনেক চাকুরীতে ক্যাশ্ সিকিউরিটি দরকার হয়। ৫০৲ টাকার চাকুরীর জন্য ২৫০৲, ৩০০৲, ৫০০৲ টাকা, এবং ১০০৲ টাকার চাকুরীর জন্য ১০০০৲, ১৫০০৲ টাকার পর্য্যন্ত সিকিউরিটী দরকার হয়। কাজেই দেখা যায় অনেক সময়ে চাকুরী পাইতে গেলে মূলধন আবশ্যক হয়। গভর্ণমেণ্টের বড় বড় ২।৪টা চাকুরীর খবর যাহা বিজ্ঞাপনের স্তম্ভে প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহার অতি অল্প সংখ্যাই বাঙ্গালীর ভাগ্যে জুটিয়া থাকে। বিদেশে শিক্ষিত হইলেও চাকুরী জুটে না। বিজ্ঞাপনের স্তম্ভ খুঁজিলে দেখা যায়, ২।৪টা ডাক্তারের পদ ও মাষ্টারের পদ খালি আছে। যে পরিমাণ বেকারের সংখ্যা এদেশে আছে তাহার তুলনায় বিজ্ঞাপন-স্তম্ভের ২।৪টা পদ-খালির খবর অতি নগণ্য মাত্র।

যে কারণেই হউক দেশমধ্যে একটা সুলক্ষণ দেখা যাইতেছে। কিছু মূলধন যোগাড় করিতে পারিলেই উক্ত টাকা খাটাইয়া কোন স্থানে ব্যবসা গড়িয়া তোলা যায় কিনা এখন সে জন্য কিছু কিছু চেষ্টা-উদ্যোগ হয়। আগেকার দিনে লোকের টাকা থাকিলেও সেরূপ হইত না। কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছেলেরা, বি-এ, এম-এ পাশ করিয়া ৪০।৫০ টাকার কোন চাকুরী পাইলেই তাহাতে অমনি ঝুঁকিয়া পড়ে। আর উৎকৃষ্ট পন্থা তাহাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। অনেক সময় ঐরূপ চাকুরীর জন্যও বসিয়া থাকিতে হয়। অনেকে সামান্য কিছু পুঁজি থাকিলেও তাহা খাটাইতে ভয় পায়। মনে করে যাহা আছে ঐরূপ করিলে তাহাও হারাইবে। কাজেই চিরকাল ঐ ৪০।৫০ টাকার মোহে ডুবিয়া থাকিতে হয় এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ রুদ্ধ

হইয়া যায়। আজকালকার দিনে ৪০।৫০৲ টাকা বেতনের চাকুরীতে একটী পরিবার প্রতিপালন করা কঠিন। ঐ টাকার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতে গেলে সে পরিবারকে বিপদগ্রস্ত হইতে ও কষ্ট পাইতে হয়। ৪০।৫০ টাকা বেতনের কথাই বারে বারে আলোচনা করিতেছি এইজন্য যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রাধারী ছেলেদের আজকাল সাধারণতঃ ঐ পরিমাণ টাকাই জুটিয়া থাকে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, কি পন্থা অবলম্বন করিলে সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছেলেদের জীবন-ধারণ-সমস্যার সমাধান হইতে পারে? যখন চাকুরী পাওয়া দিন দিনই কঠিন হইতেছে এবং পাওয়া গেলেও আয় সেরূপ আশাজনক নহে এবং চাকুরীতে প্রবেশ করিলে আত্মবিকাশের পথ নষ্ট হইতে থাকে, তখন এরূপ একটা পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে যাহা ধরিলে স্বাধীন উপজীবিকার সন্ধান পাওয়া যাইবে এবং প্রথমতঃ আয় কম হইলেও অধ্যবসায়ের সহিত কার্য্য করিলে আর্থিক উন্নতির পথ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, সঙ্গে সঙ্গে আত্মবিকাশের পথ উন্মুক্ত ও সুগম হইবে, নিজের পায়ে দাঁড়াইবার ক্ষমতা জন্মিবে এবং স্বকীয় জীবনের উন্নতির সঙ্গে পারিবারিক উন্নতি হইতে থাকিবে। পুরাতন জীবন যদি অসহ্য বোধ হইয়া থাকে তবে আসুন নূতনের সন্ধানে ধাবিত হই, নবভাবে জীবনের পথ অধিকার করি। নূতন যাহাই হউক না কেন তাহাই আনন্দকর হইবে। সেদিকে আমরা আমাদের সমস্ত উৎসাহ চেষ্টা ও অধ্যবসায় নিয়া কাজে প্রবৃত্ত হইলে, নিশ্চয় সফলকাম হইব। ভাবিয়া দেখিলে অনেক পন্থাই বাহির হইবে এবং অনেক বাহির হইয়াছে। অবশ্য যাহার মন যে দিকে আকৃষ্ট হয়, তাহার সে দিকেই যাওয়া উচিত। আমাদের কোন প্রকার ব্যবসাই খুঁজিতে হইবে। চাকুরীতে না গেলে ব্যবসাই খুঁজিতে হয়। ব্যবসা ত নানা প্রকারেরই আছে। রুচি অনুযায়ী বাছিয়া লইতে হইবে।

আমি যে ব্যবসা ভালরূপে জানি ও যাহাতে আমার ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতা আছে তাহার কথাই আমি বলিব। বৈজ্ঞানিক কৃষিজীবনই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্নসংস্থানের প্রকৃষ্ট পন্থা। এ পন্থা অবলম্বন করিলে জীবনধারণের সমস্যা মিটিয়া যায়। বৈজ্ঞানিকভাবে কাজ করিলে জীবনে আনন্দ পাওয়া যায়, মান-সম্মানাদি বজায় থাকে, স্বাধীনভাবে জীবিকা-অর্জ্জনের পন্থা পাওয়া যায়। আমি নিজের অভিজ্ঞতার ফলে জোর করিয়া বলিতে পারি, জীবন-ধারণের প্রকৃষ্ট পন্থাই কৃষি। ইহাকে ভিত্তি করিয়া আমরা সব দিকে অগ্রসর হইতে পারি। কৃষি ধনী ও নির্ধন উভয়ের মা-বাপ ও আশ্রয়স্থল। এ ব্যবসা ১০০৲, ২০০৲, ৩০০৲, ৪০০৲, ৫০০৲ টাকা মূলধন নিয়া আরম্ভ করা যায়, আবার পাঁচ হাজার—পাঁচ লক্ষ নিয়াও আরম্ভ করা যায়। ইহা ক্ষুদ্র আকারে আরম্ভ করিয়া বৃহদাকারে পরিণত করা যায়। পাঠকের অবগতির জন্য নিম্নে একটী কৃষির আয়-ব্যয়ের হিসাবের খসড়া দিতেছি।

অনেক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের পাড়াগাঁয়ে বা সহরের প্রান্তদেশে বা উপকণ্ঠে ২।৪।১০ বিঘা জমি আছে। তাঁহারা অনায়াসে এই পরিমাণ জমি নিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারেন। যাঁহাদের নাই তাঁহারা অল্পপরিমাণ জমি, সহরের নিকটে বা গ্রামের মধ্যে সংগ্রহ করিতে পারিবেন। অবশ্য হাট-বাজারের যত নিকটে হয় ততই ভাল। ১০ বিঘা জমি ও ১০০০৲ টাকা মূলধন নিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলে একজন যুবক প্রথম বৎসরের বিক্রয়-লব্ধ পণ্যদ্রব্য দ্বারা বৎসরের শেষে কত টাকা সঞ্চয় করিতে পারেন, তাহা নিম্নলিখিত কারবারের হিসাবের তালিকা হইতেই জানা যাইবে। এ সব টাকার অঙ্ক খাঁটি ও কার্য্যকর, আনুমানিক নহে। এ সব অঙ্ক পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে। পাঠক, এই হিসাবটী ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া ত্রুটী বাহির করিতে ছাড়িবেন না। পশুর ঘর ইত্যাদি প্রথম বৎসর অতি অল্প ব্যয়ে করিতে হইবে। নিজে মজুরদের সহিত হাতে হাতে কাজ করিলে এইরূপ ব্যয়ে অনায়াসে ঘর তৈয়ারী করা যায়। এ কাজে নিজকে হাত দিতে হইবে; কেবল পরিদর্শনের কাজ করিলে যথেষ্ট হইবে না। খুব সরল ভাবে মজুরদের সহিত মিশিয়া তাহাদিগকে আপনার করিতে হইবে। বন্ধু ও আশ্রয়দাতা বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস জন্মাইতে হইবে। তাহারা যেমন কাজ করিতেছে নিজেকেও সেরূপভাবে কাজ করিবার জন্য প্রস্তুত রাখিতে হইবে। তাহাদের কাজের দিকে নজর

থাকিবে, তাহাদের নিকট হইতে ষোল আনা কাজ আদায় করিতে হইবে। মিষ্টিভাবে ব্যবহার করিলে উহা সম্ভব হয়। অবশ্য প্রথমতঃ যতদূর সম্ভব জানিয়া শুনিয়া খাঁটি লোককে কাজে নিযুক্ত করিতে হইবে। সব দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করিতে হইবে। তাহারা বিশ্বাসভাজন হইলেও তাহাদিগকে অতিমাত্রায় বিশ্বাস করা অনুচিত।

হিসাব

জমি—১০বিঘা

মূলধন—১০০০৲ টাকা

স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির ব্যয় (ক্যাপিট্যাল এক্সপেনডিচার)

গব্যাদি পশু ও যন্ত্রাদি খরিদ

২টী দুগ্ধবতী গাই	৮০৲টাকা হিঃ	১৬০৲
২ জোড়া বলদ	৫০৲টাকা হিঃ	১০০৲
২টী মোরগ	২৲টাকা হিঃ	৪৲
১৬টী মুরগী	১৲টাকা হিঃ	১৬৲
১টী ছাগ	৬৲টাকা হিঃ	৬৲
৪টী ছাগী	৪৲টাকা হিঃ	১৬৲
		৩০২৲
দেশী লাঙ্গল	২৲	
কুড়াল, হাত-দা, কোদাল, খন্তি ইত্যাদি যন্ত্র	১০৲	
	১২৲	১২৲

ঘর প্রস্তুত

১টী গোশালা	৩০৲	
১টী ছাগশালা	১৫৲	
১টী মুরগীর ঘর	২০৲	
তিন জন মজুরের ঘর	২০৲	
	৮৫৲	৮৫৲
		৩৯৯৲

জমির নিকটে মালিকের নিজের বাড়ী না থাকিলে তাহাকে গ্রামের ভিতর কোন গৃহস্থের বাড়ীতে প্রথম বৎসর একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকিতে হইবে।

বাৎসরিক পৌনঃপুনিক খরচ

দুইজন মজুরের মাসিক বেতন ১৫৲টাকা হিঃ বৎসরে	৩৬০৲
১টী ছেলে মজুরের মাসিক ১০৲টাকা হিঃ বৎসরে	১২০৲
বীজ ও জমির সার ফাঁস ইত্যাদি	১০০৲
	৫৮০৲

বাৎসরিক লাভ

দু'টী গাইয়ের এক বৎসরে ৮ মাসের দুগ্ধের পরিমাণ দৈনিক /৭ সের হিঃ একমাসে ৫।০ সের বা ২১০ সের, ৮ মাসে ১৬৮০ সের বা ৪২/ প্রতি টাকায় /৪ সের হিঃ বা প্রতিমণ ১০৲ টাকায় বিক্রয় করিলে দুগ্ধ হইতে আয় ৪২০৲

৪টী ছাগী হইতে বৎসরে ৪ টা হিঃ ১৬টি শাবক পাওয়া যায়। উহা বিক্রয় করিলে ৪৲ হিঃ ৬৪৲

প্রতিটা মুরগী হইতে এক বৎসরে অন্ততঃ ৮০০ শত ডিম পাওয়া যাইবে। তন্মধ্যে নিকৃষ্ট (ফুটাবার উপযুক্ত নহে) ৪০০ শত ৻১০ পয়সা হিঃ বিক্রয় করিলে ১২৲

/৩ বিঘা ইক্ষুর জমি হইতে বিঘাপ্রতি ১৫/ মণ গুড় হিঃ ৪৫/ মণ গুড় পাওয়া যায়। তাহা অনায়াসে ৮৲ টাকা মণ হিঃ বিক্রয় হইবে ৩৬০৲

সবজীর ক্ষেত /॥ বিঘায় ২ হাত অন্তর ৪০০ শত ফুলকপি বা বাঁধা কপি জন্মান যায়। তাহা ৵০ আনা হিঃ বিক্রয় করিলে ৫০৲

/॥ বিঘা জমিতে ৬ হাত অন্তর কুমড়া গাছ লাগাইলে ৩৬টা লাগান যায়। প্রতি গাছ হইতে গড়ে ৬টা কুমড়া ধরিলে মোট ২১৬টা পাওয়া যাইবে। /০ আনা হিঃ বিক্রয় করিলে ১৩৲ টাকার বেশী পাওয়া যায় ১৩৲

/২ বিঘা আলুর জমি হইতে অন্ততঃ ৪০/মণ আলু পাওয়া যাইবে। ৫৲ টাকা মণ হিঃ ২০০৲

বক্রী ৪০০ শত ডিম ফুটাইয়া বাচ্চা করিয়া এক বৎসরে গড়ে ॥০ আনা হিঃ বিক্রয় করিলে ২০০৲

মোট— ১৩১৯৲

বাদ খরচ— ৫৮০৲

৭৩৯৲

উক্ত টাকা হইতে মালিকের খোরাক-পোষাকের জন্য মাসিক ২৫৲ টাকা হিঃ বাদ দিলে শেষ লভ্য ৪৩৯৲ টাকা দাঁড়ায়।

দ্রষ্টব্য ১০ বিঘা জমির ভিতর ৬ বিঘা জমিতে কৃষি-জাত দ্রব্য উৎপন্ন করা গিয়াছে। বাকী ৴৪ বিঘা চারণ ভূমি এবং গবাদি পশুর খাদ্য উৎপাদনের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কখন কখন ৴২ বিঘা জমিতে খাদ্য শস্য মজুর দ্বারা উৎপন্ন করা যাইবে। তা ছাড়া গোবর ও মূত্র রক্ষা করা দরকার হইবে। কেহ অন্ততঃ কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়াও একবৎসর চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন।

অভয় আশ্রমের খদ্দর-বিভাগ

শ্রীঅন্নদা প্রসাদ চৌধুরী, অভয় আশ্রম, কুমিল্লা

অভয় আশ্রম প্রতিষ্ঠার সময়ে ১৯২০ সনের শেষভাগে একদিন মহাত্মা গান্ধী বলিলেন, "আমার ইচ্ছা যে তোমরা সকলে একটা গ্রামে গিয়া বাস কর আর রোজ আট ঘণ্টা করিয়া সূতা কাটো। তাহাতে সমগ্র বাংলা দেশে একটা সাড়া পড়িয়া যাইবে।"

১৯২১ সনের প্রথম হইতে আশ্রমের খদ্দরের কাজ আরম্ভ করা হয়। প্রথম কয়েক মাস চরকায় সূতা-কাটা এবং চরকা তৈয়ারী করা শিখিতেই কাটে। তখন পর্য্যন্ত কি ভাবে যে কাজ আরম্ভ করা হইবে তাহা স্থিরীকৃত হয় নাই। সেই বৎসর মার্চ্চ মাসে আশ্রমের প্রায় সকলেই মালিকান্দায় শ্রীযুক্ত প্রফুল্লদার (ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ) বাড়ীতে এক উৎসব উপলক্ষ্যে যান। তখন হইতেই মালিকান্দাকে কেন্দ্র করিয়া দোহার থানায় কংগ্রেসের কাজ (যথা—কংগ্রেসের সভ্য বৃদ্ধি করা, চরকা-প্রচলন করা, এবং তিলক-স্বরাজ্য ভাণ্ডারের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা) আরম্ভ হয়। কয়েক মাসের মধ্যে ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে নিম্নলিখিত কয়েকটি কেন্দ্র গড়িয়া উঠে,—(১) মালিকান্দা, (২) নবাবগঞ্জ, (৩) সেখর নগর, (৪) রুজ্‌দি।

ঐ সময়ে একদিকে কয়েকজন গ্রামে গ্রামে কংগ্রেসের কাজে নিযুক্ত ছিলেন এবং অন্যদিকে অপর কয়েকজন ঢাকা সহরের ভাড়াটিয়া বাসায় তাঁত ও চরকার কাজ করিতেন। সেই বৎসরের (১৯২১) শেষ ভাগে স্বর্গীয় দেশবন্ধু ঢাকায় আসিয়া ধনী কাঠের ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নিকট হইতে ৮০০০৲ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া শ্রীযুক্ত প্রফুল্লদার উপর কংগ্রেসের খদ্দরের কাজের ভার সম্পূর্ণ অর্পণ করিয়া যান। তখন হইতে আশ্রমের কর্ম্মীদের দ্বারা একদিকে যেমন গ্রামে গ্রামে চরকার বহুল প্রচলনের চেষ্টা চলিতে লাগিল। অপরদিকে অন্য কয়েকজন ঢাকা সহরে শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাগানে কয়েকটি টাইলের ঘর নির্ম্মাণ করাইয়া শুদ্ধ খদ্দর তৈয়ারী করাইবার জন্য "জয়চন্দ্র বয়নাগার" নামে একটি কারখানা স্থাপন করিলেন। বাংলাদেশে বড় আকারের শুদ্ধ খদ্দর তৈয়ারী করাইবার এই বোধ হয় প্রথম অনুষ্ঠান। সেখানে ২৪টি তাঁত, রং ও ছাপ দিবার বন্দোবস্ত ছিল। প্রথম বৎসরে (১৯২২) প্রায় ৭।৮ হাজার টাকার খদ্দর প্রস্তুত করা হইয়াছিল। তখন সূতা এত খারাপ ছিল যে তাঁতীরা সাধারণতঃ বুনিতে রাজি হইত না। এখন যে ধুতির জোড়া ৮—১৲ বানীতে বুনান যায়, তখন তাহা ২৮—৩৲ বানীর কমে বুনান যাইত না। ৮ × ৪৪" এক জোড়া ধুতি (যাহার এখনকার দাম—৩।৶০) ৬।০ টাকা দামে বিক্রী করিয়া এক বৎসরে প্রায় ১০০০৲ টাকা লোকসান দিতে হইয়াছিল। যে সব কংগ্রেসের কেন্দ্র হইতে "জয়চন্দ্র বয়নাগারে" সূতা আসিত, সেই সব কেন্দ্রেই যখন কর্ম্মিগণ খদ্দর বুনাইতে সমর্থ হইলেন তখন জয়চন্দ্র বয়নাগারকে একটি কারখানারূপে আর পরিচালিত না করিয়া একটি বয়ন-বিদ্যালয়ে পরিণত করা হয়। বেঙ্গল রিলীফ কমিটি ও কয়েকটি কংগ্রেস কমিটি হইতে প্রথম দলে

প্রায় ১০।১২টি ছাত্র শুদ্ধ খদ্দর বুনা এবং রং ও ছাপের কাজ শিখিবার জন্য আসে। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন এখনও খদ্দরের কাজ করিতেছে। অন্য যে কয়জন কর্ম্মী এই সময় পর্য্যন্ত ঢাকার আশ্রমে তাঁত বুনার কাজে নিয়োজিত ছিলেন, তাঁহাদের কর্ম্মস্পৃহা যেন উহাতে আর তৃপ্তিলাভ করিল না। একটী স্থায়ী বাসস্থান ঠিক করিয়া সেইখানে অন্যান্য কাজকর্ম্ম করিবার আকাঙ্ক্ষা ক্রমশই যেন প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। ১৯২৩ সনের প্রথম ভাগে কুমিল্লায় আশ্রমের স্থায়ী বাসস্থান ঠিক করা হয়। সেই বৎসর জুন মাসেই ঢাকা হইতে আশ্রম কুমিল্লায় স্থানান্তরিত হইল।

আশ্রম ১৯২৩ সনের জুন মাসে কুমিল্লায় স্থানান্তরিত হইলেও খদ্দরের কাজ আরম্ভ করিতে আরও প্রায় তিনমাস দেরী হয়। তিন জন কর্ম্মীও ৪০৲।৫০৲ টাকা মূল্যের কার্পাস লইয়াই আশ্রমের নিজ তত্ত্বাবধানে কুমিল্লায় খদ্দরের কাজের সূচনা। শ্রীরমেশ মজুমদার, শ্রীচন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য্য ও বর্ত্তমান লেখক—এই তিনজনে প্রথম গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া কার্পাসের বীজ বিতরণ করিত এবং কোন্ গ্রামে কয়টি চরকা আছে তাহার খোঁজ লইত। কার্পাসের বীজ গ্রামে কেহই রাখিতে চাহিত না। বাড়ীতে কার্পাসের গাছ হওয়া কুলক্ষণ এই বিশ্বাসে গাছ হইলেও তাহা তুলিয়া ফেলিত। এখনও সেই কারণে গ্রামবাসীদের বাড়ী বাড়ী কার্পাসের গাছ লাগানো সম্ভব হয় নাই। দেখা গেল, আশ্রমের চারিদিকে মুরাদপুর, বারপাড়া, বালুতোপা, কুচাই-তলী, চুলিপাড়া, নেলরা, দিশাবন্দ, রাজাপাড়া, শাকতলা, আশ্রাবপুর, রামসাগর ও কচুয়া এই গ্রাম কয়টিতে প্রায় ১৫০ চরকা আছে। কার্পাস সরবরাহ করিয়া সূতা সংগ্রহ করিলে এবং উপযুক্ত বানী দিলে সকলেই সূতা কাটিতে সম্মত হইল। মাসে ১৴০ মণ ১৷৷০ মণ সূতা সংগ্রহ করা হইত। তখন তাহাতেই আনন্দের সীমা থাকিত না। এক দিকে সূতা কাটুনীর খোঁজ ও সূতা কাটাইবার চেষ্টা চলিতে লাগিল এবং অন্যদিকে খদ্দর বুনাইবার জন্য তাঁতীরও খোঁজ লওয়া হইতে লাগিল। দিশাবন্দ গ্রামের গিরীশ নাথই আমাদের সর্ব্বপ্রথম এক জোড়া ৮×৪৪" শুদ্ধ খদ্দরের ধুতি বুনিয়া দেয়। ধুতি জোড়া এত সুন্দর বুনিয়াছিল এবং ঢাকার অনুপাতে এত কম বানী লইয়াছিল যে, তাহা দেখিয়া এই অঞ্চলে খদ্দরের কাজের সুবিধার কথা আমরা খুব স্পষ্ট করিয়াই বুঝিয়াছিলাম।

বাজারের ব্যবসায়ীদের নিকট চরকার সূতা কিনিয়া প্রচুর পরিমাণে খদ্দর বুনাইবার জন্য তাঁতীদিগকে দেওয়া হইল। প্রথমতঃ, অনেক চেষ্টা করিয়া ২।৩ জন তাঁতীকে খদ্দর বুনিবার জন্য রাজী করান গেল। কিন্তু ক্রমশই যেন বেশী সংখ্যায় তাঁতীরা আমাদের নিকট খদ্দর বুনিতে আসিতে লাগিল। ১৯২৩ সনের পূজার সময়ে কাজ আরম্ভ হওয়ায় সেই বৎসরের শীতকালেই আমাদের খদ্দরের কাজ অনেকটা প্রসার লাভ করে। সাধারণতঃ শীতকালেই খদ্দর অধিক পরিমাণে বিক্রী হইয়া থাকে। যাঁহারা আমাদের নিকট হইতে রং করা সূতা লইতেন, তাঁহারা প্রচুর পরিমাণে রঙীণ সূতার অর্ডার দিতে লাগিলেন এবং নিজে নিজেই যেন আশ্রমের "রঞ্জন-বিভাগটি" গড়িয়া উঠিল। দিশাবন্দের তাঁতীরা টুইল কোটের কাপড় খুব ভালই বুনিতে পারে। রংকরা চরকার সূতা পাওয়া যাইত না বলিয়া চৌসূতী কোটীংয়ের তিনটি রঙীণ সূতা মিলের ও একটি সাদা সূতা চরকার দিয়া, শুদ্ধ বা অর্দ্ধ-খদ্দর নামে প্রচুর পরিমাণে কোটের কাপড় বিক্রী হইত। রীতিমত রঙীণ সূতা সরবরাহ করিতে পারায় এবং মিলের সূতা বুনিয়া তাহারা যে বানী পাইত, তাহা অপেক্ষা কিছু বেশী বানী দিতে স্বীকৃত হওয়ায় অনেকেই শুদ্ধ খদ্দরের টুইল কোটিং ও টুইল শীতের চাদর বুনিতে রাজী হইল। শুদ্ধ খদ্দরের জিনিষ তখন বাজারে বেশী মিলিতেছিল না। তৈয়ারী করাইয়া দিতে পারিলে উহা যে বেশী বিক্রী হয় তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না। প্রচুর পরিমাণে শুদ্ধ খদ্দর তৈয়ারী করিবার জন্য ছটফট করিতে লাগিলাম। কিন্তু এই কাজ করিবার মূলধন কোথায়? আমরা অনেকেই তখন এখানে নূতন। কাহারও টাকা তুলিবার ক্ষমতা ছিল না। টাকা না হইলে কাজ হইবে না তাহাও নিশ্চিত; অথচ এই কাজ করিতেই হইবে। ব্যাকুলতায় প্রাণ অধীর হইয়া উঠিল। একদিন শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাসায় তাঁহার

স্ত্রীর নিকট এই অভাবের কথা বলি। কেহ দান করুক, ধার দিক, সুদ লইয়া ধার দিক, যে ভাবেই হউক ২০০৲।৩০০৲ টাকা তখন সংগ্রহ করিতে পারিলেই যেন আমাদের মনস্কাম পূর্ণ হয়। ভগবান সহায় হইলেন। অখিল বাবুর স্ত্রী তাঁহার নিজ দায়িত্বে কুমিল্লা ব্যাঙ্ক কর্পোরেশন হইতে ২০০৲ টাকা যাহাতে সুদ দিয়া ধার পাইতে পারি, তাহার চেষ্টা করিবেন বলিলেন। অখিল বাবুর জামিনে ব্যাঙ্ক হইতে মাসিক ১।০ পাঁচসিকা হারে সুদে ২০০৲ টাকা ধার করা হইল, (তবে, সেই টাকা আমাদিগকে আর শোধ দিতে হয় নাই—অখিল বাবু আশ্রমে তাহা পরে দান করেন।) ইহাই আশ্রমের খদ্দর-যজ্ঞের প্রথম ঘৃতাহুতি। আশা আর মিটিল না। ১৯২৩ সনের শেষ পর্য্যন্ত (ডিসেম্বর) হিসাব করিয়া দেখা গেল, কিছু লাভ হইয়াছে। ইহাতে যেন এই কাজে ঝোঁক আরও বাড়িয়া উঠিল এবং ১৯২৪ সনেই ব্যাপক ভাবে আশ্রমের খদ্দরের কাজের পত্তন করা হইল।

তর্ক-প্রশ্ন

বক্তৃতায় বেকার-সমস্যার মীমাংসা

সে দিন ওভারটুন হলে বেকার-সমস্যা সম্বন্ধে অনেক বক্তৃতা শুনিলাম। বেকার-সমস্যা যে আমাদের দেশে কত প্রবল তাহা আমি নিজে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছি। গত পাঁচ বৎসর অসাধারণ চেষ্টা এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াও কায়ক্লেশে ভরণ-পোষণ-নির্ব্বাহের উপযোগী নিতান্ত প্রয়োজনীয় সামান্য অর্থও উপার্জ্জন করিতে পারি নাই। অসহযোগ আন্দোলনের সময় বিদেশী বণিকের অধীন গোলামী ত্যাগ করিয়া খদ্দরের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলাম। পরে স্বাধীনভাবে জীবিকা-অর্জ্জনের জন্য অনেক-কিছু করিয়াছি; কিন্তু কিছুতেই নিতান্ত প্রয়োজনীয় অর্থও উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হই নাই। গোলামী যদি মিলিত, তাহা হইলে এতদিনে হয়ত তাহা গ্রহণ করিতাম; কিন্তু গত দুই বৎসর কলিকাতা সহরে চাকুরীর জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছি,—পাই নাই।

সেদিনকার সভায় যাহা দেখিলাম তাহাতে মনে হয়, রোগের কারণ ও ঔষধ নির্ণয় করিতেই এখন বহুদিন কাটিয়া যাইবে। ইতিমধ্যে অনেক রোগীকে হয়ত ভবলীলা সাঙ্গ করিতে হইবে। যাঁহারা কাজের অভাবে বসিয়া আছেন, এরূপ লোকের সংখ্যা কলিকাতা সহরে নিতান্ত কম নহে। ইঁহাদের পক্ষে আপাততঃ অবলম্বনযোগ্য কোন উপযুক্ত পথ কেহই দেখাইতেছেন না, বা হাতে কলমে ইঁহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্যও কেহ অগ্রসর হইতেছেন না। শুধু বক্তৃতা শুনিলে পেট ভরে না। যাঁহারা বেকার, তাঁহারা বেকার-সমস্যা সম্বন্ধে সভা-সমিতির নাম শুনিলে আশা করিয়া তথায় যান এবং সভাশেষে একটী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসেন।

আমিও বেকার দলের একজন এবং বেকারদিগের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের সহানুভূতি প্রার্থনা করি।

বিনীত "বেকার"

বাংলা শর্টহ্যাণ্ড গ্রন্থ

"আর্থিক উন্নতি"র কয়েক সংখ্যায় বাংলা শর্টহ্যাণ্ড সম্বন্ধে যে আলোচনা বাহির হইয়াছে তাহা দেখিয়া কোন কোন পাঠক বাংলাভাষায় শর্টহ্যাণ্ড সম্বন্ধে কোন পুস্তক আছে কিনা তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া পত্র দিয়াছেন। তাঁহাদের অবগতির জন্য নিম্নোক্ত গ্রন্থখানির নাম করা যাইতেছে।—সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ প্রণীত "রেখাশব্দাভিজ্ঞান", মূল্য ৪৲, প্রাপ্তিস্থান ৬, মনোমোহন বসুর লেন (গ্রে ষ্ট্রীটের নিকটে)।
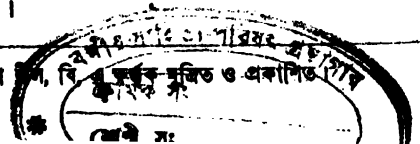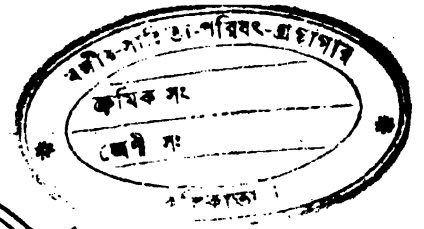
১০৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে শ্রীরঘুনাথ [illegible], বি, এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১ম বর্ষ—১০ম সংখ্যা

মাঘ—১৩৩৩

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি।

অথর্ব্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জন্ম আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।
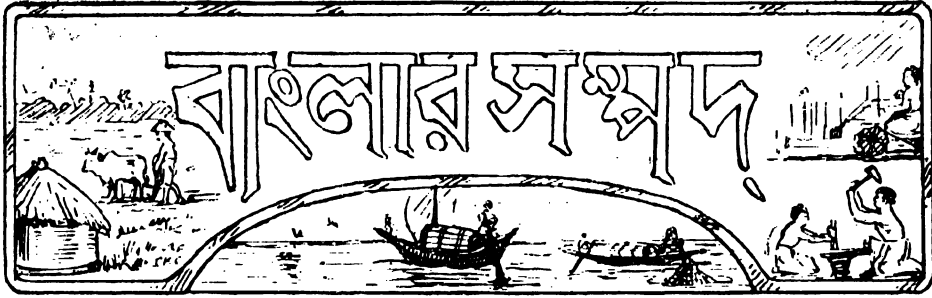
চায়ের ব্যবসায় ভাল-মন্দ

১৯২৩-২৪ কি ১৯২৪-২৫ সনের মত না হইলেও ১৯২৫-২৬ সনকেও ভারতীয় চা-ব্যবসার পক্ষে শুভই বলিতে হইবে। প্রারম্ভে জলবায়ুর অবস্থা অনুকূল থাকায় বৎসরের প্রথম ভাগে স্বচ্ছন্দে পাতি টীপাই হইয়াছিল। ফলে নিকৃষ্ট শ্রেণীর চা বাজারে উপস্থিত হইতেছিল এবং পূর্ব্ব বৎসরের অপেক্ষা আলোচ্য বর্ষে ২২,০০০,০০০ পাউণ্ড বেশী হইয়াছিল। কাজেই চায়ের দর পড়িয়া গেল এবং চা-করগণ কম পরিমাণে চা প্রস্তুত করা সাব্যস্ত করিলেন। ইহাতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চা প্রস্তুত হইতে লাগিল এবং দামও আবার কিছু বাড়িল। এই বৎসরে যে চা প্রস্তুত হইয়াছে তাহা মোটের উপর গত ৫ বৎসরের অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর। প্রথম প্রথম যে সমস্ত চা বাজারে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে অত্যধিক পরিমাণে ডাঁটি পাওয়া গিয়াছে এবং বর্ষার মধ্যভাগে যে সকল চা প্রেরিত হইয়াছে তাহা অতিশয় নিকৃষ্ট শ্রেণীর। কিন্তু পরবর্ত্তী চা—বিশেষতঃ কাছার ও সিলেট অঞ্চলের চা—উচ্চ শ্রেণীর প্রতিপন্ন হইয়াছে। বরাবরই ভাল চায়ের দাম ভালই পাওয়া গিয়াছে।

(ত্রিস্রোতা)

৮৭৫,০০০ বাক্স চা নিলাম

১৯২৫-২৬ সনে কলিকাতায় ৩৫টী নিলাম হইয়াছে। তৎপূর্ব্ব বৎসরে ১টী বেশী হইয়াছিল। এই বৎসরে ৭২২,৯৬৬ বাক্স কিন্তু ১৯২৪-২৫ সনে ৭৭৮,৫৪১ বাক্স চা বিক্রী হইয়াছে। গড়ে প্রতি পাউণ্ড ৵৫ পাই দরে বিক্রী হইয়াছে, সেই স্থলে পূর্ব্ব বৎসর পাউণ্ড প্রতি ৵/১১ পাই দর পাওয়া গিয়াছিল। ধূলি চায়ের বিক্রী পূর্ব্ব বৎসরের ১১০,৬৫৩ বাক্স হইতে ১৫২,০০৩ বাক্সে উঠিয়াছে, কিন্তু গড়পড়তা দর পূর্ব্ব সনের ॥৵১০ পাই স্থলে ॥৵৭ পাইতে নামিয়াছে।

৭২৯,০০০ একর জমিতে চায়ের চাষ

১৯২৫ সনে ভারতে মোটের উপর ৩৬ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছিল। ১৯২৩ ও ২৪ সনে হিসাব ধরা হইয়াছিল ৩৭ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড চায়ের। আসাম দিয়াছে শতকরা ৬২, আসাম বাদে উত্তর ভারতবর্ষ দিয়াছে ২৫, এবং দক্ষিণ ভারত ১৩। পূর্ব্ববর্ত্তী সনে এই সকল স্থান হইতে যথাক্রমে শতকরা ৬৩, ২৪ ও ১৩ পাওয়া গিয়াছিল। ১৯২৫ সনে মোট ৭২৯,০০০ একর জমিতে চা আবাদ হইয়াছে, ১৯২৪ সনে চা আবাদ হইয়াছিল ৭১৫,০০০ একর জমির উপর।

২৭ কোটি টাকার চা রপ্তানি

আলোচ্য বৎসরে উৎপন্ন চায়ের শতকরা ৯০ ভাগ রপ্তানি হইয়াছে।

১৯২৫-২৬ সনে মোট ৩২ কোটি ৫০½ লক্ষ পাউণ্ড চা ২৭ কোটি টাকা দামে রপ্তানি হইয়াছে। ১৯২৪-২৫ সনে সেই স্থলে ৩৪ কোটি পাউণ্ড চা ৩৩½ কোটি টাকা দামে রপ্তানি হইয়াছে। মোট রপ্তানি পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা পরিমাণে ৪ শতাংশ এবং মূল্যে ১৯ শতাংশ কম হইয়াছে।

ভারতীয় চায়ের বিদেশী বাজার

ভারতীয় চা কোথায় কত রপ্তানি হইয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া গেল :—

ইউনাইটেড্ কিংডম— (১৯২৫—২৬) ২৭ কোটি ৯০ লক্ষ পাউণ্ড; দাম ২৩½ কোটি টাকা। (১৯২৪—২৫) ২৯ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড; দাম ২৯½ কোটি টাকা।

	১৯২৫-২৬	১৯২৪-২৫
ইউনাইটেড ষ্টেট্স	৮০ লক্ষ পাঃ	৬০ লক্ষ পাঃ
ক্যানাডা	৯০ „	৮০ „
অষ্ট্রেলিয়া	৬০ „	৪০½ „
মেসোপোটেমিয়া	৩০ „	২০½ „
মিশর দেশ	৩০½ „	২০½ „
পার্শিয়া	৫০ লক্ষ পাঃ	৩০ লক্ষ পাঃ
চীন	২০ „	১৮৯০০০০
রুশিয়া	২০ „	১০½ „

ভারত হইতে যে চা বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল তাহার অনুপাতের তারতম্য নিম্নে দেওয়া হইল।

	১৯২৫	১৯২৪	যুদ্ধের পূর্ব্বে
ইউনাইটেড কিংডম	৫৯·৩	৫৭·৬	৫৪·২
ফরাসী দেশ	১১·৭	১০·৩	১৬
ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স	৩৯·২	১০·৩	৭

ভারতে বিদেশী চা

অন্যান্য দেশ হইতে ভারতে ৭৮৩৩,০০০ পাউণ্ড চা (মূল্য ৬০ লক্ষ টাকা) আমদানি হইয়াছিল। তন্মধ্যে চীন দেশ হইতেই ৫০ লক্ষ পাউণ্ড আসিয়াছিল। সিংহল ও জাভা দ্বীপ হইতে যথাক্রমে ১০ লক্ষ পাউণ্ড এবং ৮১৬০০০ পাউণ্ড চা ভারতে আমদানি হইয়াছিল। (ত্রিস্রোতা)

ফরিদপুরে নূতন রেল

আমরা অবগত হইলাম রাজবাড়ী হইতে বাণীবহ, বালিয়াকান্দী, ড়ুমুন, বাঘিয়া, জামালপুর, কামারখালী ইত্যাদি স্থান হইয়া যশোহর পর্য্যন্ত একটী রেল লাইন হইবার কথা হইয়াছে। তজ্জন্য ল্যাণ্ড একুইজিশন অ্যাক্টের ৪ ধারানুসারে প্রাথমিক জরিপের জন্য কলিকাতা গেজেটে নোটীস প্রচারার্থ জিলা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট উপদেশ আসিয়াছে।

(রাজবাড়ী-পত্রিকা)

সড়কের নাম-লেখা প্লেট

সড়কের মোড়ে মোড়ে প্লেটের উপর নামগুলি লিখিয়া রাখা হয়। বিলাতের এক সাপ্তাহিক এই অভিযোগ করিয়াছে যে, এই নামগুলি যথেষ্ট বড় ও স্পষ্ট করিয়া লেখা হয় না। তাতে পথিকদের ও মোটর ইত্যাদির চালকদের অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।

কলিকাতার সড়কগুলি সম্বন্ধেও একথা খাটে। ইহাদের

নাম লেখা সম্বন্ধে কোন বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীর অনুসরণ করা হয় নাই। এ বিষয়টাও বহু দিক্ হইতে বিচার করিবার মত বটে। যথা,—সড়কের কোনখানে প্লেট লাগাইলে সকলের চোখে পড়িতে পারে, প্লেটের রং কিরূপ হইবে, তার বর্ডার কিরূপ হইবে, তার উপর লেখা কত বড় হইবে, কোন্ দিকে হেলান থাকিবে, লেখা লম্বা কি চেপ্টা হইবে, প্লেট সম্পর্কে বাতির কিরূপ ব্যবস্থা থাকিবে, কিসে কম টাকায় সব চেয়ে উপযোগী প্লেট তৈয়ারী হইতে পারে ইত্যাদি।

বাঙ্গালার স্ত্রী-কয়েদী

সরকার-কর্ত্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, ১৯২৪ সনে বাঙ্গালার মোট মেয়ে কয়েদীর সংখ্যা ছিল ৩৫৬; ১৯২৫ সনে তাহা হইয়াছে ৩৮৫। তন্মধ্যে ১৯২৪ সনে হিন্দু ২৩১ মুসলমান ১২৫। আর ১৯২৫ সনে হিন্দু ২৫৫, মুসলমান ১৩০। বৃদ্ধির সংখ্যা হইয়াছে হিন্দু ১০·৪ %, মুসলমান ৪%। সেই অনুসারে খরচাও বাড়িয়াছে।

কৃষি লইয়া পরীক্ষা

বাংলা দেশে সরকার-পরিচালিত কৃষি-বিদ্যালয় একমাত্র ঢাকায়। সাধারণের পক্ষ হইতে চুঁচুড়াতেও একটি স্থাপিত হইয়াছে। ডিঃ বোর্ডের সহায়তায় অমরপুর ও ইটাচোনার বিদ্যালয় দু'টি বাঁচিয়া আছে। বঙ্গীয় হিতসাধন-মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে তিলৌড়িতে (বাঁকুড়া জেলায়), কুরীয়ানা হাইস্কুলে (বরিশাল), নলদি স্কুলে (যশোহর) কৃষি ও ক্ষেত্রের কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। কৃষিক্ষেত্র—

(১) শিবনগর গ্রাম। ইহা বর্দ্ধমান জেলায় পাটুলী ষ্টেশন হইতে ৫ মাইল দূরে। কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্ণী বাবু সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ২৫০ বিঘা জমি প্রস্তুত করিয়াছেন।

(২) ইটাচোনা ষ্টেশন। জেলা হুগলী। মিঃ কুণ্ডু ১০০ বিঘা জমিতে কৃষিকার্য্য করিতেছেন।

(৩) সোণারপুর। ২৪ পরগণা। ডাঃ কার্ত্তিক চন্দ্র বসু কৃষিক্ষেত্র ও গোশালা স্থাপন করিয়াছেন ও একদল যুবককে কৃষিকার্য্য সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্য হাতে কলমে শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

(৪) যশোহর জেলায় সিঙ্গা ষ্টেশন হইতে ১৷৷০ মাইল দূরে বাবু সুরেন্দ্রনাথ ভাট্টাচার্য্য বি, এস-সি নিজ হস্তে ৫০ বিঘা জমিতে উন্নত প্রকারে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য্য করিতেছেন।

(৫) নদীয়া জেলার রাণাঘাট নিবাসী বাবু কুমুদনাথ মল্লিকের কৃষিক্ষেত্রের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(৬) নাটোর ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল ব্যাঙ্কের তরফ হইতে বাবু সুরেন্দ্রনাথ সরকার ৫০০ বিঘা জমি লইয়া "টাইটন ট্রাক্টরের সাহায্যে কৃষিকার্য্য করিতেছেন।

(৭) এই সঙ্গে সুরুল—শান্তিনিকেতনের প্রচেষ্টাও উল্লেখযোগ্য।

ইষ্টবেঙ্গল রেলওয়ে

ইষ্টবেঙ্গল রেলওয়ে ১৮৫৭ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮৭ সনে অন্যান্য রেলওয়ের সহিত সম্মিলিত হইয়া ইহা বর্ত্তমান ষ্টেট রেলওয়েতে পরিণত হইয়াছে। বাংলার উন্নতিকল্পে ইহার কার্য্য বড় কম হয় নাই। বহুতর নদী পারাপারের দরুণ ইহার লাইনের কাজ সর্ব্বদাই খুব জটিল হইয়া আছে। বাংলা দেশের যে কোন নদী তট ভাঙ্গিয়া গতি পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। সেই জন্য এই সব নদী পারাপারের ব্যবস্থা রক্ষা করা কঠিন। তাহার পর লাইন-ভাঙ্গা আছে। সুতরাং সহজেই বুঝা যায় অন্যান্য বিভাগ অপেক্ষা রেলওয়ে বিভাগের সমস্যা অধিকতর ব্যয়সঙ্কুল। হার্ডিঞ্জ ব্রিজ তৈয়ারী হওয়ায় এবং শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত ব্রডগেজ বিস্তৃত হওয়ায় অবস্থাটা অনেক পরিমাণে ভাল হইয়াছে। এখন উত্তর বঙ্গ ও কলিকাতার মধ্যে সরাসরি যাতায়াতের পথ হইয়াছে।

রেলে চালানি মাল

পাট বাংলার প্রধান কৃষিসম্পদ্। কাজে কাজেই ইহা রেলেরও প্রধান পণ্য দ্রব্য। যে সব জেলায় রেল গিয়াছে তাহাদের প্রত্যেকটিতেই ইহা উৎপন্ন হয়। বৎসরের যে

চারি পাঁচ মাসে ইহার চালান হইয়া থাকে, সে কয়মাস রেলকর্ত্তৃপক্ষকে যথাসাধ্য সুবিধা করিয়া দিতে হয়। পর্ব্বত-মালার পাদদেশস্থিত যে সমস্ত জেলায় চা জন্মে, তথায় উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব্ব রেলপথ গিয়াছে। সেখানে চা প্রভূত পরিমাণে হইয়া থাকে। সাধারণতঃ অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য অপেক্ষা চা ও পাটের মূল্য ঢের বেশী। ইহাদের চালানের সময় যেখানে যেখানে যত্ন লওয়া বিশেষ দরকার, সেখানে সেখানেই তাহা লইতে হয়।

বঙ্গে রেলপথের ক্রমবিকাশ

নিম্নলিখিত অঙ্কগুলি হইতে রেলপথের বিকাশ বুঝা যাইবে:—

সন	রাস্তার দূরত্ব (মাইলে)	মোট খাটান মূলধন	মোট আয়	যাত্রী	মাল (টন্)
১৮৮৭	৭৮৮	২৬,৮৬,১৯০৲	৯৪,৩০,৩৯৯৯৲	৬,৭৩৩,৩০৪	....
১৮৯৭	১,১৫১	১১,৫১,৯৩,৬৮৯৲	১,৪৭,৬২,২৩৩৲	১০,৭৭৭,০০০	১,৫৩৬,৯৩৯
১৯০৭	১,৮৮৩	২১,৭৮,৫৫,৪৭০৲	২,৬৯,০০,২৪২৲	২৪,২২৫,০০০	৪,১০১,০০০
১৯১৭ সনের মার্চ্চে যে বৎসর শেষ হইয়াছে	২,৪৮০	৩৭,৩৫,৫৯,৬৮৫৲	৩,৭৪,৯৪,৫৫১৲	৩৭,২৯২,৮০০	৫,৩৬৮,০০০
১৯২৬ সনের মার্চ্চে যে বৎসর শেষ হইয়াছে	২,৭১৩	৪২,৭৯,৯১,১৬৭৲	৬,৪৯,৫৪,৫৭১৲	৪৬,৫২৬,৬৫৯	৬,৮৬৭,৭৫০

১৯২৬ সনের ৩১শে মার্চ্চ যে বৎসর শেষ হইয়াছে, সে বৎসরে রেলে প্রায় এক মিলিয়ন টন পাট, ¼র্থ মিলিয়ন টন চাউল এবং পঞ্চাশ হাজার টন চা বহন করিয়াছে। যে প্রদেশের মধ্যে এই রেলপথ বিস্তৃত, তাহার আর্থিক জীবন ইহা কর্ত্তৃক বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত। অঙ্কগুলি হইতেই বুঝা যাইবে রেলের কাজের পরিমাণ কি বিপুল।

রেলপথ ও আর্থিক উন্নতি

যাত্রী ও মাল বহনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুবিধা করিয়া দেওয়া এবং যেখানে যেখানে কোন স্থান বা শিল্পের উন্নতি হইতে পারে সেখানে সেখানে কার্য্যক্ষেত্র বিস্তার করাই ই, বি, রেলের উদ্দেশ্য। এই রেলওয়ে তাহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে ধীরে ধীরে চলিতেছে। পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যে ইহা আবদ্ধ থাকিলেও (নামে পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথ বটে, কিন্তু বস্তুতঃ পূর্ব্ব বঙ্গের সবটা ইহার মধ্যে পড়ে না) ইহার কার্য্য গোটা ভারতের উন্নতি ও বিকাশকল্পে নগণ্য নহে।

সমবায় সমিতি

বিশ্বনাথপুর হইতে শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন পাল চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন,—কিছুদিন হইল বলাগেড়িয়ার প্রসিদ্ধ সৎকার্য্যানুরাগী জমিদার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ নন্দ মহাশয়ের উদ্যোগে বলাগেড়িয়ায় একটী সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই ব্যাঙ্কের অধীন চন্দনপুর, বাঁধ গোবিন্দপুর ও বিশ্বনাথপুর প্রভৃতি গ্রামে কয়েকটি সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া সুপরিচালিত হওয়ায় বন্যা-পীড়িত গরিব প্রজাসাধারণের বিশেষ উপকার হইতেছে। গত ৫ই ডিসেম্বর অপরাহ্নে চন্দনপুর নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে চন্দনপুর ও বাঁধগোবিন্দপুর সমবায় সমিতির প্রথম বার্ষিক অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়াছে। সভায় অনেক গণ্যমান্য ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমাদের নবাগত সুযোগ্য মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র ঘোষ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণপূর্ব্বক অতি সুন্দরভাবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি-বাণিজ্যাদি সম্বন্ধে সদুপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ব্যাঙ্কের ভূতপূর্ব্ব ইন্সপেক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমার সান্ন্যাল মহাশয় ব্যাঙ্ক ও সমবায় সমিতি সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সকলকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। (নীহার)

মাদ্রাজে জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী

১৯২৫-২৬ সনের বৎসরের শেষতক মাদ্রাজে ৭৫৯টি কোম্পানী ছিল। তন্মধ্যে ৬৭৯টির অংশমূলক মূলধন (শেয়ার ক্যাপিট্যাল) ছিল এবং ৮০টির তাহা ছিল না। আলোচ্য বর্ষে অংশমূলক মূলধনওয়ালা ৭২টি কোম্পানী বন্ধ হইয়া গিয়াছে অথবা তালিকা হইতে তাহাদের নাম খারিজ করা হইয়াছে। ১৯১৭ সন হইতে কতকগুলি কর্ম্মপটু কোম্পানী ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছিল। এবার তাহাদের অবস্থা খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। টাকার বাজারে খাঁকৃতি, কো-অপারেটিভ ব্যবসায়ে মন্দা, দক্ষিণ ও পশ্চিমদিগবর্ত্তী জেলাসমূহে জলপ্লাবন-জনিত অনিষ্ট এবং মোপলা বিদ্রোহ ইত্যাদি তাহার কারণ। পূর্ব্ব বৎসরে ৭৬টি কোম্পানী রেজেষ্টারী করা হয়। আলোচ্য বর্ষে হইয়াছে কেবল ৭০টি। গত বৎসর রেজেষ্টারীকৃত কোম্পানীর মোট মূলধন ছিল ১,৮৩ ক্রোর। এ বৎসর হইয়াছে ১,২০ ক্রোর। শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ রেজেষ্টারীকৃত কোম্পানীর প্রত্যেকটার এক লক্ষ অথবা তাহার কম "ক্ষমতাপ্রাপ্ত মূলধন" আছে। প্রভিডেণ্ট ইনসিওরেন্স সমিতির সংখ্যা ১১ হইতে ১৩ পর্য্যন্ত এবং জীবনবীমা কোম্পানীর সংখ্যা ৭ হইতে ৮ পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে।

ব্রহ্মদেশের বন-সম্পত্তি

ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ অপেক্ষা বর্ম্মার বনভূমি পরিমাণে অধিক বিস্তৃত। এমন কি ভারত সাম্রাজ্যের সমস্ত বন একত্র করিলেও তাহার সমান হয় না। বর্ম্মার বনকে আমরা দুই শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি। যথা, (১) রিজার্ভ বন—৩০,০০০ বর্গ মাইলেরও উপর এবং (২) অ-রিজার্ভ বন—১১৭,০০০ বর্গ মাইলেরও উপর। দুই রকম বনই সরকারের সম্পত্তি। বনরক্ষা এবং তাহা হইতে রাজস্ব আদায়ের জন্য রিজার্ভ বনগুলি সরকার কর্ত্তৃক চালিত। সেগুলি সাধারণের নিকট অল্পাধিক পরিমাণে বন্ধ। কিন্তু স্থানীয় অনুসন্ধান দ্বারা যদি যোগ্য কর্ত্তৃপক্ষগণ সঙ্গত মনে করেন, তবে পারিবারিক ব্যবহারের জন্য নির্য্যাস গ্রহণ অথবা কোন কোন স্থলে চাষ-পরিবর্ত্তনের অধিকার সাধারণকে দেওয়া হয়। অন্য কোনরূপ অধিকার দেওয়া হয় না। অ-রিজার্ভ বন স্থানীয় অধিবাসীদের কর্ত্তৃত্বাধীন। তবে তাহার মধ্যে কোন কোন গাছের নির্য্যাস এবং বাণিজ্য উদ্দেশ্যে কাঠ কাটা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের নিষেধ আছে। বর্ম্মা বনের উৎপাদন ভারত সাম্রাজ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। তাহাতে বৎসরে এক কোটি টাকা ব্যয় করিয়া প্রায় দুই কোটি টাকা রাজস্ব উঠে। অধিকাংশ রাজস্ব কাঠ-বিক্রয়ে পাওয়া যায়। বাঁশ, জ্বালানী কাঠ, লাক্ষা প্রভৃতি বিক্রয়েও কিছু কিছু আসে।

সেগুণ কাঠের রপ্তানি

রপ্তানির জন্য সেগুণ কাঠের চাহিদাই প্রধান। বন-রাজস্বের শতকরা ৭০ ভাগ সেগুণ হইতে পাওয়া যায়। গৃহ এবং জাহাজ-নির্ম্মাণ ব্যাপারে ঐ কাঠই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অন্য কাঠ অপেক্ষা ইহা গুণহিসাবে ভাল, পাকে ভাল এবং কীট-দংশন নিবারণ করিতে সমর্থ বলিয়া বেশী দিন যায়। পৃথিবীর সেগুণের যোগান বর্ম্মা হইতেই বেশী হয়। উৎকৃষ্ট সমতল ভূমিতে ধানের চাষ হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে অধিকাংশ সেগুণ বন পাহাড়েই দেখা যায়। অন্য জাতীয় গাছের সহিত একসঙ্গে সেগুণ জন্মে এবং অনেক জায়গা দখল করিয়া থাকে। এগাছ যদি সুবিধামত কাছাকাছি

জন্মাইত তাহা হইলে বন-বিভাগের কার্য্য সুবিধায় ও সস্তায় হইতে পারিত। গাছগুলি সেরূপভাবে জন্মায় না, জন্মে অনেকটা দূরে দূরে। অনেক সময় এক একরেও একটি থাকে না। এক একরে তিনটা গাছ থাকা নিয়মের ব্যভিচার। অনেক সময় তাহাদের জন্ম হয় দুর্গম স্থানে। সেখান হইতে কাটিয়া টানিয়া বাহির করা বহু কষ্টসাধ্য। সেগুণকাঠ এত ভারি যে, রস বাহির করিয়া না লইলে জলে ভাসে না। রস বাহির করিবার উদ্দেশ্যে বড় বড় গাছগুলাকে দাগিয়া দেওয়া হয়। শুষ্ক জঙ্গলে ৬½ ফুটের এবং স্যাঁতা জঙ্গলে ৭½ ফুটের উর্দ্ধ গুঁড়ির পরিধিই দাগিবার মান। গুঁড়ির গোড়া ঘেঁষিয়া চারিদিকে প্রায় ৩ ইঞ্চি গভীর করিয়া বৃত্ত কাটা হয়। তাহাতে ভিতরকার কাঠের ৩ ইঞ্চি বাহিরে খোলা থাকে। এরূপ কাটায় গুঁড়ির মধ্যে রস যাইতে পারে না। তাহাতে কাঠ স্বাভাবিক ভাবেই শুষ্ক হইয়া যায়। তিন বৎসর ধরিয়া এইরূপ কাটার পর ইহাতে রস থাকে না। তখন ইহা কাটা হয়। হাতী বা মহিষে ইহাকে টানিয়া বাহির করিয়া নিকটস্থ কোন নদীতে লইয়া যায়। তথা হইতে বর্ষাকালে ইরাবতী, সালুইন বা অন্য কোন বড় নদীতে ইহাকে ভাসাইয়া লওয়া হয়। সেখানে অন্য কাঠের সঙ্গে জুড়িয়া এক রকম ভেলা বানানো হইয়া থাকে। লোকে সেই ভেলা বাহিয়া কাঠের ডিপোতে লইয়া হাজির করে। বর্ম্মার নদীতে এইরূপ কাঠের ভেলা একটা সুপরিচিত দৃশ্য। কখন কখন সঙ্কীর্ণ বা চটান জলে কাঠগুলা 'জ্যাম' ধরিয়া যায়। তখন হাতী বা মহিষের দ্বারা সেইগুলা ছাড়াইয়া ঠেলিয়া লইতে হয়। কাঠের ডিপোতে পৌঁছিতে একটি সেগুণ কাঠের সর্ব্বসমেত প্রায় পাঁচ বৎসর লাগিতে পারে। এই সব করিতে অনেক পয়সা ব্যয় করিতে হয়। সর্ব্বদা তদবিরের দরকার। উপযুক্ত দৈর্ঘ্য রাখিয়া প্রত্যেকটি কাঠ কাটা চাই। শিকল লাগাইয়া টানিবার জন্য কাঠের মধ্যে একটা ছিদ্র কাটিতে হয়। এই সব কাজের অনেক রকম ভার বড় বড় ফার্ম্মের হাতে দেওয়া বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হইয়াছে। যে কাঠ তাহারা কাটে, তাহার জন্য গবর্মেণ্টকে সেলামী দিয়া থাকে। এখন খুব অল্প পরিমাণ জায়গায় কাঠ কাটার ব্যাজ গবর্মেণ্টের হাতে আছে।

শক্ত কাঠ

সেগুণ ছাড়া অন্য রকম শক্ত কাঠ বিক্রয়ের চেষ্টা অনেক দিন হইতেই চলিতেছে। কিন্তু বর্ম্মা ছাড়া অন্যত্র সেগুলার চাহিদা কম। বর্ম্মার মধ্যে শক্ত কাঠের কারবার সেগুণের মতই বড়। তাহার অনেকগুলিই অ-রিজার্ভ বন হইতে গৃহনির্ম্মাণের জন্য কাটা হয়, বাজারে বিক্রয়ের জন্য আসে না। অনেক শক্ত কাঠ আবার হাল্কাও নয় যে ভাসিতে পারে। তাই তাহাদিগকে টানিয়া আনা সব সময়ই কষ্টকর। অথচ বিক্রয়যোগ্য গাছগুলি ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কাটিবার পর এই শক্ত কাঠকে পাকাইবার জন্য বেশী দিন ধরিয়া মজুত রাখা হয় না। কৃত্রিম উপায়ে এই শক্ত কাঠকে পাকান যায় কিনা রেঙ্গুনের বন-ডিপোতে তাহার পরীক্ষা চলিতেছে। কিন্তু বাণিজ্য-উদ্দেশ্যে বেশী পরিমাণ মজুত রাখিয়া ইহাকে পাকান চাই।

সার্ভের কাজ

সার্ভে করা বন-বিভাগের একটা প্রধান কর্ত্তব্য। তাহাতে কাঠ-কাটা, গাছের পুনঃ রোপণ, রক্ষণ এবং কয়েক বৎসর ধরিয়া বিভিন্ন বনভূমি খুলিয়া দিবার বৈজ্ঞানিক প্রণালী কার্য্যে পরিণত হইতে পারিবে। এইগুলিকে কাজের প্ল্যান বা নক্সা বলে। কিন্তু ভারতের সার্ভে-বিভাগ ম্যাপ না দিলে এইগুলি হইতে পারে না। সম্প্রতি আকাশ-যান হইতে বেশ দক্ষতার সহিত কতকগুলি সার্ভে করা হইয়াছে। এ বিষয়ে বর্ম্মাই অগ্রণী। কাজের প্ল্যান তৈয়ারী করিবার পূর্ব্বে বনভূমির নির্দ্দিষ্ট অংশে যে সমস্ত গাছের বেড় ৩ ফুটের উপর, তাহাদের সংখ্যা গণনা করা চাই এবং বিভিন্ন জাতীয় গাছ কোথায় কোথায় পাওয়া যায়, তাহা দেখাইয়া 'ষ্টক ম্যাপ' নামে একটা ম্যাপ প্রস্তত করা দরকার। কিছুদিন আগে আকাশযান হইতে টেনাসিরিমে একটা ষ্টক ম্যাপ তৈয়ারীর কাজ সফল হইয়াছে। থারাওয়াডির জঙ্গল হইতে মিয়েমাকা নদী পর্য্যন্ত কাঠগুলি জলে ভাসাইয়া লইবার পথ বাহির করিতে গিয়া নদী সম্বন্ধীয় শিক্ষার বেশ একটা কার্য্যোপযোগী প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে।

এই সব নদীর পলি জমিতে দিয়া অনেক জমি পুনরুদ্ধার করা হইয়াছে। বনবিভাগকে তাহার কর্ম্মচারীদের জন্য গৃহনির্ম্মাণ, তাহাদের চলাচল ও কাঠ স্থানান্তরিত করিবার উদ্দেশ্যে রাস্তা তৈয়ারী করিতে হইয়াছে। বড় বড় কোম্পানীগুলিকে এই সব কাজের ভার লইতে হয়।

ভবিষ্যতের জন্য বন-ব্যবস্থা

ইতিমধ্যে গাছের পুনঃ রোপণ অথবা নবজীবন প্রদানের কাজ ধীরে ধীরে চলিতেছে এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদিগের জন্য মূল্যবান্ সম্পত্তির সৃষ্টি হইতেছে। কার্য্যের গতি মন্থর, বিশেষতঃ সেগুণ সম্বন্ধে। অযত্নপ্রসূতভাবে পঞ্চাশ বৎসরে সেগুণের গুঁড়ির বেড় হয় ৩ ফুট, ১০০ বৎসরে ৫ ফুট এবং ১৫০ বৎসরে ৭ ফুট। ১২ ফুট বেড় হইতে প্রায় ২৫০ বৎসর লাগে। কৃত্রিম উপায়ে রোপণকার্য্যে যত্ন লওয়া হয় বলিয়া আশা করা যায়, ৮০ হইতে ২০০ বৎসরেই গাছগুলা কাটিবার মত বড় হইবে। যদি বাঁশ বা অন্য গাছ সেগুণের বৃদ্ধিতে বাধা দেয়, তবে তাহাদিগকেও কাটিয়া ফেলিতে হইবে। অযত্নপ্রসূত হলে প্রতি ৩০ বৎসরে এক একরে তিনটা গাছ কাটার মত হয় অর্থাৎ এক শতাব্দীতে প্রায় দশটা গাছ। ৩০ বৎসরই এখন কাটার কাল। তাহাতেই বন বিশ্রাম পাইবার যথেষ্ট সময় পায়। রোপণ-কার্য্যে মাটি ও আবহাওয়া অনুকূল হইলে আশা করা যায়, এক একরে এক শতাব্দীতে ৫০টি গাছ কাটার মত বড় হইবে। তা ছাড়া অনেক লগি ও খুঁটি হইতে পারিবে। এই রোপণ-কার্য্য সুগম স্থানে আরব্ধ হইয়াছে। ১৮৫৬ সনে ইহার প্রথম অনুষ্ঠান। এখন ১০০,০০০ একরের অধিক পরিমাণ ভূমিতে ঐ কার্য্য চলিতেছে।

যুবক বর্ম্মায় বন-বিজ্ঞান

আরণ্য বিজ্ঞান এখনও শিশু অবস্থায়। বনবিভাগের কর্ম্মচারীরা প্রকৃতির রহস্য নিংড়াইয়া বাহির করিতেছেন। তাহার প্রণালীগুলি এবং সেগুলি কি ভাবে উন্নত করা যায়, তাহা শিক্ষা করিতেছেন। প্রকৃতি, প্রকৃতির সংগ্রাম, বিকাশ ও শান্তি, তাহার গাম্ভীর্য্য ও তাহার নীরবতা এবং উদ্ভিদ ও পশুজগৎ নীরবে আমাদের উপর যে বিশ্বাস স্থাপন করিতেছে—এই সব বনবিভাগে যেমন অতি নিকট সম্পর্কে জানা যায় অন্য বিভাগে তেমন নহে। আবার এই বিভাগের কর্ম্মচারীদিগকে কর্ম্মময় জগতের সম্পর্কেও থাকিতে হয়।

যুবক বর্ম্মার কাছে বনবিভাগীয় কাজ এখনও প্রিয় হইয়া উঠে নাই। কিন্তু প্রিয় হইলে, তাহাদের জীবনধারা উচ্চ, সম্মানার্হ এবং দেশের পক্ষে কল্যাণকর হইয়া উঠিবে।

ভারতের জয়েণ্ট-ষ্টক কোম্পানী

১৯২৩-২৪ সনের রিপোর্ট অনুসারে বৃটিশভারত এবং মহীশূর, বড়োদা, গোয়ালিয়র, হায়দ্রাবাদ, ইন্দোর ও ত্রিবাঙ্কুর দেশীয় রাজ্যে জয়েণ্টষ্টক কোম্পানীর সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় শতকরা ১৩ ভাগ কমিয়া গিয়াছে।

নূতন রেজেষ্টারীকৃত কোম্পানীর "অনুজ্ঞাত" (অথরাইজ্ড্) মূলধন শতকরা ২৪ ভাগ এবং অংশ-আদায়ী (পেড্আপ্) মূলধন ৫৪ ভাগ কমিয়াছে। এই বৎসর রেজেষ্টারীকৃত প্রাইভেট কোম্পানীর সংখ্যা ১৯০ কিন্তু ১৯২২-২৩ সনে ছিল ২১৭।

৫২১১ কোম্পানী

কোম্পানী রেজেষ্টারী করিবার আইন-অনুসারে ১৯২৩-২৪ সন পর্য্যন্ত যে-সব অংশদ্বারা সীমাবদ্ধ কোম্পানী ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে তাহাদের মোট সংখ্যা ১১,৭৪৫। ইহাদের মধ্যে ৫,২১১টি কোম্পানী অর্থাৎ রেজেষ্টারীকৃত কোম্পানীর মোট সমষ্টির শতকরা ৪৪ ভাগ ১৯২৩-২৪ সনের শেষ পর্য্যন্ত কাজ করিয়াছে। অবশিষ্টগুলি হয় গুটান হইয়াছে, নয় চলে নাই অথবা আদৌ কাজ আরম্ভ করে নাই। ভারতের সমস্ত রেজেষ্টারীকৃত কোম্পানীরই মূলধন টাকায় পরিমিত হয়।

কার্য্যশীল কোম্পানীগুলির সংখ্যা এবং তাহাদের লাগান মূলধন পূর্ব্ব তিন বৎসরের প্রত্যেকটির শেষে নিম্নলিখিত ভাবে দাঁড়াইয়াছিল :—

	১৯২১-২২	১৯২২-২৩	১৯২৩-২৪
কোম্পানীর সংখ্যা	৫,১৮৯	৫,১৯০	৫,২১১
অনুজ্ঞাত মূলধন	৭,৫৪,৫৪,৮২ হাজার টাকা	৭,১৫,১৪,৫৮ হাজার টাকা	৬,৯০,৫৬,৪৫ হাজার টাকা
অংশ-আদায়ী মূলধন	২,৩০,৫৪,৮৯ হাজার টাকা	২,৫৯,৭৮,৫২ হাজার টাকা	২,৬৫,৩৩,৪২ হাজার টাকা

এইরূপে পূর্ব্ব বৎসরের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায়। আলোচ্য বর্ষে কোম্পানীর সংখ্যা ২১টা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ৬ কোটি অর্থাৎ শতকরা ২ ভাগ অংশ-আদায়ী মূলধন বাড়িয়াছে ও প্রায় ২৫ কোটি অর্থাৎ শতকরা ৩ ভাগ অনুজ্ঞাত মূলধনের হ্রাস হইয়াছে। উহার কারণ নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তনগুলি।

৪৩০ নূতন কোম্পানী

২৬,৫০ লক্ষ অনুজ্ঞাত মূলধন এবং ৬৭ লক্ষ অংশ-আদায়ী মূলধন-বিশিষ্ট ৪৩০টি নূতন কোম্পানী বৃটিশ ভারত এবং মহীশূর, বড়োদা, গোয়ালিয়র, হায়দ্রাবাদ, ইন্দোর ও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে রেজেষ্টারী করা হইয়াছে। ১৩ লক্ষ অনুজ্ঞাত মূলধনবিশিষ্ট দুইটি কোম্পানী আদালতের আদেশ-অনুসারে পুনর্ব্বার কাজে নামিয়াছে।

৪১১ কোম্পানীর কাজ-বন্ধ

বৃটিশভারত এবং মহীশূর, বড়োদা, গোয়ালিয়র, হায়দ্রাবাদ, ইন্দোর ও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে ৫২,৯০ লক্ষ টাকার অনুজ্ঞাত মূলধন এবং ১৪,১৬ লক্ষ টাকার অংশ-আদায়ী মূলধন-বিশিষ্ট ৪১১টি কোম্পানী কাজ বন্ধ করিয়াছে।

মূলধনের বাড়া-কমা

৬৯টি কোম্পানীর অনুজ্ঞাত মূলধন ৫,৯৬ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে এবং ১৩টি কোম্পানীর ৪,৩০ লক্ষ টাকা কমিয়াছে। ১,৩৮২টি কোম্পানীর অংশ-আদায়ী মূলধন ১৯,৫৬ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি এবং ১৩৪টি কোম্পানীর ৫৪ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে।

অংশ-আদায়ী মূলধনের খরচখরচাবাদে বৃদ্ধির মোট সংখ্যা ৫,৫৬ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে বাংলার ৮৫ লক্ষ, বোম্বাইয়ের ২,৩৩ লক্ষ এবং মাদ্রাজের ২৯ লক্ষ। সমগ্র অংশ-আদায়ী মূলধনের শতকরা ৭৫ ভাগ বাংলা ও বোম্বাইয়ের মধ্যে বিভক্ত।

বিভিন্ন ব্যবসার ধরণ-ধারণ

ব্যাঙ্কিং, লোন, ইনভেষ্টমেণ্ট ও ট্রাষ্ট, এবং বীমা কোম্পানীগুলিতে খাটানো অংশ-আদায়ী মূলধনের সমষ্টি ১৯ কোটি টাকা। তন্মধ্যে শতকরা ১৬ ভাগ মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির রেজেষ্টারীকৃত কোম্পানীতে এবং ১৩ ভাগ বাংলায়। বীমা কোম্পানীগুলির অনুজ্ঞাত মূলধন ও অংশ-আদায়ী মূলধনের মধ্যে আশ্চর্য্য রকম বৈসাদৃশ্য।

ট্র্যানজিট ও ট্র্যান্স্পোর্ট কোম্পানীগুলির অংশ-আদায়ী মূলধন ২২ কোটি টাকার উপর। তন্মধ্যে ১৫ কোটি অর্থাৎ শতকরা ৬৬ ভাগ রেলওয়ে ও ট্রামওয়েতে খাটে। শেষোক্তগুলিতে যে মূলধন খাটিয়াছে তাহার সমষ্টির মধ্যে বোম্বাই দিয়াছে প্রায় ৮,৩৫ লক্ষ টাকা অর্থাৎ শতকরা ৫৬ ভাগ এবং বাংলা দিয়াছে ৬,৩৯ লক্ষ টাকা অর্থাৎ শতকরা ৪৩ ভাগ।

ট্রেডিং ও ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীগুলির অংশ-আদায়ী মূলধন ৭৮ কোটি টাকা। তন্মধ্যে ৯,৮৩ লক্ষ টাকা অর্থাৎ শতভাগ ১৩ ভাগ পাবলিক সার্ভিস কোম্পানীতে খাটান হইয়াছে। ৬০৭ লক্ষ টাকা তামাকে, ৫,৭৪ লক্ষ টাকা লৌহ, ইস্পাত ও জাহাজ-নির্ম্মাণে, ৭,০৬ লক্ষ টাকা মাটি সিমেণ্ট ও বাটী-নির্ম্মাণের অন্যান্য মশলায় এবং ৪,০৬ লক্ষ টাকা এঞ্জিনিয়ারিংএ খাটিয়াছে।

ফ্যাকটরীর কাজে ৭৫ কোটি টাকা

সমগ্র অংশ-আদায়ী মূলধনের এক-চতুর্থ (৭৪, ৬৬ টাকা) খাটিয়াছে মিল ও প্রেসে, তুলা, পাট, পশম ও রেশম চাপ দেওয়ার কাজ। বোম্বাইয়ের অনেকগুলি মিল ও

প্রেস রেজেষ্টারী করা হইয়াছে। তাহাদের মূলধন সমগ্রের প্রায় শতকরা ৪৫ ভাগ (৩৩,৭৬ লক্ষ টাকা)। এই টাকার অধিকাংশ কাপড়ের কল, রেশম ও পশমের কল এবং প্রেসে খাটিয়াছে। বাংলার রেজেষ্টারীকৃত কল ও প্রেসের (প্রধানতঃ পাটের) মূলধন বোম্বাইয়ের প্রেস ও কলে খাটান মূলধনের শতকরা প্রায় ৭২ ভাগ (২৪, ৩৭ লক্ষ টাকা)।

১০ কোটি টাকা খাটে চা-কাফির ব্যবসায়

চা, কাফি ও অন্যান্য চাষবাসে ১০,০৬ লক্ষ টাকা অংশ-আদায়ী মূলধন খাটে। ইহার মধ্যে ৭,৩৪ লক্ষ টাকা বাংলার। উত্তর-পূর্ব্ব ভারতবর্ষে যে সব চায়ের বাগান আছে, তাহাদের স্বত্বাধিকারী কোম্পানীগুলির অধিকাংশই কলিকাতায় রেজেষ্টারী করা হইয়াছে।

অন্যান্য কারবার

পাথর ও কয়লা প্রভৃতি খনির কোম্পানীগুলির অংশ-আদায়ী মূলধন ৪১,৭৭ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে শতকরা ২৭ ভাগ (১১,৪২ লক্ষ টাকা) বাংলায় রেজেষ্টারীকৃত কোম্পানীগুলিতে খাটান হইয়াছে। তাহার অধিকাংশ খাটিয়াছে কয়লার খনিতে। ১০,৭২ লক্ষ টাকার অংশ-আদায়ী মূলধন খাটিয়াছে লোহার খনিতে এবং ৩,৫১ লক্ষ টাকা পেট্রোলিয়াম কোম্পানীতে। শেষোক্তগুলি প্রধানতঃ বর্ম্মাতেই কাজ করে।

জিব্রাল্টর রেলওয়ে সুড়ঙ্গ
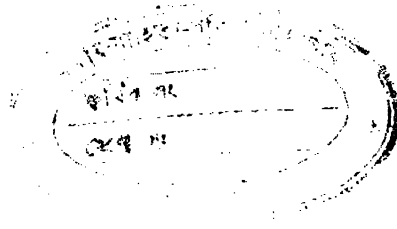
জিব্রাল্টর প্রণালীর নীচে ১৬ মাইল লম্বা এক রেলওয়ে সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করাইয়া স্পেন তাহার আফ্রিকার সম্পত্তির সঙ্গে সরাসরি সম্বন্ধস্থাপনের চেষ্টা চালাইতেছে। ১৯১৮ সনে এই ধরণের একটা প্রস্তাব করা হয় এবং মাদ্রিদ সরকার প্রস্তাবের বিভিন্ন খসড়া পরীক্ষা করিয়া দেখেন। কিন্তু তখন ইহার কোনটাই কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই।

স্পেনের বর্ত্তমান হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা জেনারেল প্রিম দ রিভেরা এবারে খুব উদ্যোগী হইয়া পড়িয়াছেন। এটা নির্ম্মিত হইলে মরোক্কোর বন্দরগুলি স্পেনের মধ্যে আসিবে। এবং ইহাতে কেবলমাত্র স্পেনেরই স্বার্থ নয় পরন্তু কালে কালে ইয়োরোপের ক্যালে বন্দর হইতে আফ্রিকার কেপ টাউন পর্য্যন্ত রেল সড়ক প্রস্তুত হইতে পারে।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের জাহাজ-বিধি

সাম্রাজ্যের মধ্যে জাহাজে মাল-বহন সম্বন্ধে একই রকম নিয়মকানুন থাকা বাঞ্ছনীয়। ইম্পীরিয়্যাল কন্‌ফারেন্সে এই কথাটা আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য বহুতর সমিতি বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন। লণ্ডন চেম্বার অব কমার্স তাহাদের অন্যতম।

ঐ কথাটার সমর্থনকারীরা বলেন, বাণিজ্য-বিষয়ে সাম্রাজ্যের মধ্যে যদি একটা সাধারণ আইন সম্ভবপর হয়, তবে অনেক জটিলতার মীমাংসা হইয়া যাইবে।

কিন্তু ইহার বাধা এই যে, সাম্রাজ্যের মধ্যে বহু স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আইন আছে। মীমাংসিত মোকদ্দমার দিক্ দিয়া দেখিলে তাহাদের মধ্যে পার্থক্য অনেক। বাণিজ্যের আচরণ কিরূপ হইলে আইনসঙ্গত হয় এবং কিরূপ হইলে মধ্যে মধ্যে বস্তুতই বে-আইনী হইয়া যায়, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার প্রধান উপকরণ মোকদ্দমার রায়। সেইজন্য আইনের কথাগুলা ঠিক একভাবে থাকিলেও, সব সময়ে তাহাদের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ একরকম হয় না।

এই বিষয়ে ভারতবর্ষ কি মতামত প্রকাশ করে, দেখা যাক।

চিনির কোষ্ঠী গণনা

পৃথিবীর প্রধান প্রধান ইক্ষু-উৎপাদক দেশে ১৯২৫ সনে ইক্ষুর ভবিষ্যৎ গণনা করা হইয়াছে। "কিউবা রিভিউ" কতকগুলি তথ্য উল্লেখ করিয়াছেন। সেই সব হইতে একটা আনুমানিক হিসাব তৈয়ারী করা যাইতে পারে।

বর্ত্তমানে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া বলা যায়, ১৯২৫-২৬ সনের ফসল (ইক্ষু যেন উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ মনে করিয়া লইলে) দাঁড়াইবে ২৪,৮৪৬,০০০ টন। পৃথিবীর ইতিহাসে ইহাই হইবে বৃহত্তম উৎপাদন। ১৯২৪-২৫ সনের ফসল অপেক্ষা ইহা ৯০০,০০০ টন অর্থাৎ শতকরা ৩·৪ ভাগ বেশী।

রুশিয়া ও জাভার সঙ্গে ভারতের টক্কর

পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ১৯২৫-২৬ সনে রুশিয়া তুলিতেছে ৫০০,০০০ টন, ভারতবর্ষ ৪০০,০০০ টন এবং জাভা ৩০০,০০০ টন। রুশিয়া ও ভারতবর্ষের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলেও তাহাতে পৃথিবীর বাজারে মুখ্য কোন ফল হয় নাই। জগৎব্যাপী যুদ্ধের সময় হইতে রুশিয়ায় ইক্ষু-উৎপাদন খুব কম হইয়া আসিতেছে। সেখানে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলেও তাহা

সেই দেশের মধ্যেই খরচ হইয়া যাইবে। তাহাতে তথায় ইক্ষুর আমদানিও কম হইয়া পড়িবে। গত বৎসর এইরূপ আমদানির পরিমাণ হইয়াছিল ২০০,০০০ টন।

১৯২৪-২৫ সন অপেক্ষা আলোচ্য বর্ষে ভারতের ফসল হইয়াছে ৪০০,০০০ টন বেশী। কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ ফসলের তুলনায় ইহা ৪০০,০০০ টন কম। ভারতের লোক নিম্নশ্রেণীর চিনি খাইয়া থাকে। তাই পৃথিবীর অন্যান্য অংশের চিনি এখান হইতে বরখাস্ত হয় না এবং রিফাইন করিবার জন্য এখানে চিনি আসাও বন্ধ হয় না।

জাভার চিনি

বর্ত্তমান বর্ষে জাভার চিনিই পৃথিবীর রপ্তানি বাজারে টেক্কা দিয়াছে। জাভায় যে চিনি গত বৎসরের উৎপাদনের উপর বাঁচিয়াছিল, তাহা ইতিমধ্যেই জাহাজে চালান হইয়া গিয়াছে। (কমার্শ্যাল ইণ্ডিয়া)

নবীন তুর্কীর বিবাহ-বিধি

নব্য তুর্কীরা আইন করিয়াছেন যে, তুরস্কে কেহ বিবাহ করিতে চাহিলে বর-কনেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ডাক্তারদের দ্বারা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাইতে হয়। বর-কনে বিবাহের উপযুক্ত স্বাস্থ্যবান বিবেচিত হইলে ডাক্তার তাহার বাহুমূলে চিঠির ছাপের মত সরকারী ছাপ মারেন এবং একখানা সার্টিফিকেট দেন। বর-কনে ঐ ছাপ দেখাইয়া অনুষ্ঠানের পুরোহিত যোগাড় করে। বিবাহ হইয়া গেলে ঐ সার্টিফিকেটে বর, কনে, পুরোহিত ও ৩ জন সাক্ষীর নাম সই করিয়া তাহা পুরোহিতকে সরকারী দপ্তরে পাঠাইতে হয়।

বিলাতে ভারতীয় ছাত্র

বিলাতে কোথায় কত ছাত্র এক্ষণে অধ্যয়ন করিতেছে তার তালিকা এইরূপ :—

লণ্ডন	২৮০ জন
কেম্ব্রিজ	১১৭ ”
অক্সফোর্ড	৮৭ জন
এডিনবরা	৬৬ ”
গ্লাসগো	৬২ ”
ম্যাঞ্চেষ্টার	৫১ ”
বৃষ্টল	২৪ ”
শেফিল্ড	২১ ”
লীড্‌স	১৭ ”
বেলফাষ্ট	১৩ ”
এবারডীন	৪ ”
মোট	৭৪১
ব্যারিষ্টারী পড়িতেছে	৫৮৩
সর্ব্ব মোট	১৩২৪ ”

ফ্রান্সে খড়ের ঘর

ফরাসীরা একপ্রকার নূতন রকম খড়ের ঘরের উদ্ভাবন করিয়াছে। ইহা সস্তা, লঘু, টেঁকসই, অথচ আগুনের ভয় নাই এবং বাহিরের গোলমাল ভিতরে আসিতে পারে না। গরমকালে ইহা অত্যন্ত আরাম-প্রদ।

ইউনাইটেড্‌ ষ্টেট্‌সে বাড়ীভাড়া কমিতেছে

ইউনাইটেড্‌ ষ্টেট্‌সে বাড়ীভাড়ার গতি কোন্ দিকে? ইহা লইয়া কিছু আঁকজোক হইয়া গিয়াছে। মজুর ও মধ্যবিত্ত পরিবারের সাধারণ লোকেরা যে রকম ঘর বা ফ্ল্যাট ভাড়া লইতে পারে তারই হিসাব লওয়া হইয়াছে। ফলে দেখা গিয়াছে যে, গত দুই বৎসর যাবৎ তথাকার বাড়ীভাড়া ক্রমান্বয়ে নামিয়া যাইতেছে। ১৯২৬ সনের আগষ্ট মাসে বাড়ী-ভাড়া ১৯২৪ সনের আগষ্টের বাড়ী-ভাড়া হইতে ৬% কম। ১৯২৪-২৫ সনের মধ্যে খাজনা কমিয়াছে ৪% আর ১৯২৫-২৬ (আগষ্ট) সনে কমিয়াছে ২%। যুদ্ধের পূর্ব্বের বাড়ীভাড়া হইতে বর্ত্তমান বাড়ী-ভাড়া ৭৫% বেশী। ১৯২৪ সনের জুলাই মাসে ইহা ১৯১৪ সনের জুলাই হইতে ৮৬% বেশী ছিল। উহাই ঊর্দ্ধতম সীমা।

জগতের সর্ব্ববৃহৎ রেলওয়ে প্ল্যাটফরম

"রেলওয়ে গেজেট" জগতের সব চেয়ে বড় কয়েকটী রেলওয়ে প্ল্যাটফরমের নাম করিয়াছে। তন্মধ্যে ১ম হইয়াছে ভারতের সোণপুর, (বি, এন্, ডব্লিউ, আর)। ইহার দৈর্ঘ্য ২,৪৫০ ফুট। তারপর,—

ম্যাঞ্চেষ্টার	২,১৭৫ ফুট
গোরখপুর	২,১১২ "
মেল্‌বোর্ণ	২,০০৯ "
বারাউণি	২,০০৫ "
গোন্ডা	২,০০০ "
ইয়র্ক	১,৬৯২ "
পার্থ	১,৬৯১ "
এডিনবার্গ (ওয়েভারলী)	১,৬৮০ "
এবারডীন্	১,৫৯৬ "
ক্	১,৫০৯ "
ভিক্টোরিয়া (লণ্ডন)	১,৫০০০ "

সুইট্‌সারল্যাণ্ড সমবায়-সমিতি

সুইট্‌সারল্যাণ্ডের কো-অপারেটিভ সমিতিগুলির আংশিক তালিকা দিলে, তাহাতে নিম্নলিখিতগুলি থাকিবে :—

সমিতি	সংখ্যা (১৯২৪ সনের ৩১শে ডিসেম্বর)
শ্রমিক সমিতি	৫২
গ্রাহক সমিতি	৬৬৮
কৃষি সম্বন্ধীয় গ্রাহক ও ক্রেতা সমিতি	১৯১
কো-অপারেটিভ রেস্তরাঁ সমিতি	১১৯
গৃহাদি নির্ম্মাণকারক সমিতি	২৩৭
জল-সরবরাহ সমিতি	৪০৭
তড়িৎ ও গ্যাস সরবরাহ সমিতি	৩৯৩
কৃষিজাত দ্রব্য ক্রয় সমিতি	৭৭২
ব্যবসাদার ও শিল্পীর ক্রয় সমিতি	১৫৬
পনীর ডেয়ারি	২,৭৩৬
অন্যবিধ কৃষিদ্রব্য ক্রয় সমিতি	২০৩
ব্যবসাদার ও শিল্পীর বিক্রয়-সমিতি	১৪১
কৃষি-উন্নতি সমিতি	১১২
গোমহিষ-প্রজনন সমিতি	১,৫৩৯
কৃষি সম্বন্ধীয় যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সমিতি	৩৫৩
গোচারণ সমিতি (গোচর ভূমি)	৮৬
ক্রয়-বিক্রয়-সমিতি	৬
রাইফেইসেন ব্যাঙ্ক	৩৬৫
অন্যান্য লোন সমিতি	১৭
সেভিংস সমিতি	৬১
সেভিংস ব্যাঙ্ক	১০৮
জীবন বীমা ও পেন্‌শন্ ব্যাঙ্ক	১০২
ব্যাধি ও মৃত্যুবীমা সমিতি	৫৯৮
গো-বীমা সমিতি	৮১
অন্যান্য অস্থাবর ও স্থাবর সম্পত্তি-সংলগ্ন অস্থাবর বস্তুর বীমা সমিতি	১০
সম্পত্তি বীমা সমিতি	৪৮
অন্যবিধ কো-অপারেটিভ সমিতি	১,৭২৬
মোট	১১,৪৪৩

৪০ লাখের দেশে ১১॥০ হাজার সমিতি

এই তালিকা পূর্ণ নহে। ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য দেশে ৮,৮০,০০০টি পরিবারের মধ্যে ৩,৬০,০০০টি সমবায়-সূত্রে সংবদ্ধ। কার্য্যতঃ বিংশাধিক অধিবাসি-সমন্বিত প্রত্যেক গ্রামেই কো-অপারেটিভ আছে। সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের লোক-সংখ্যা ৪০ লাখের কম। অর্থাৎ বাংলাদেশের যে-কোনো তিন জেলার চেয়ে সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড আকারে-প্রকারে বড় নয়। এই কথাটা মনে রাখিয়া সাড়ে ১১ হাজার সমবায়-সমিতির অঙ্কটা বুঝিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

কংগ্রেসের কারেন্সী-নীতি

গৌহাটির কংগ্রেসে কারেন্সী কমিশনের রিপোর্ট-সংক্রান্ত প্রস্তাবটি বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতিতে আলোচিত হয়।

শ্রীযুক্ত রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার প্রস্তাব করেন :—

এই কংগ্রেস ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেসসেবীদিগকে আদেশ দিতেছেন যে, কারেন্সী সম্বন্ধে তাঁহারা দেশের স্বার্থ বজায় রাখিয়া কাজ করিবেন এবং ওয়ার্কিং কমিটিকে ক্ষমতা দিতেছেন যে, তাঁহারা কারেন্সী-সংক্রান্ত বিষয়টি ভাল করিয়া পর্য্যালোচনা করিয়া একটা কার্য্যপদ্ধতি স্থির করিয়া দিবেন।

প্রস্তাবক বলেন যে, বর্ত্তমানে যে প্রশ্নটি দেশকে আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছে সেই প্রশ্ন সম্বন্ধেই এই প্রস্তাব। কংগ্রেসের পক্ষে ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যদিগকে কোন বিশেষ নিয়মে আবদ্ধ রাখা ঠিক নহে। বিষয়টির প্রতি যে কংগ্রেসের নজর আছে, তাহা দেখাইবার জন্যই এই প্রস্তাব।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বলেন যে, দেড় শিলিং হারে কোন প্রদেশের লাভ-ক্ষতি হইবে কিনা, তাহা বলা এখনো দুঃসাধ্য। কাজেই এ বিষয়ে একটা স্থির কার্য্যপদ্ধতি বাঁধিয়া দেওয়া ঠিক নহে। সুতরাং কংগ্রেস কোন পক্ষেই কোন কথা না বলিয়া, কংগ্রেসের যে এবিষয়ে দৃষ্টি আছে তাহা দেখাইবার জন্যই এই প্রস্তাব করিতেছেন।

হরি সর্ব্বোত্তম দাও বলেন, ব্যবস্থাপরিষদের অ-কংগ্রেসী সদস্যদের ঘাড়ে কংগ্রেস তার মুদ্রানীতি সম্বন্ধে কোন বিশেষ ব্যবস্থা চাপাইয়া দিতে পারেন না। বর্ত্তমানে এমন কি ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণও ঐ বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করেন নাই। কাজেই নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসমিতির সভ্যগণের দ্বারা ঐ বিষয় সম্যক আলোচিত হওয়া আগে দরকার। তারপর কংগ্রেস ঐ বিষয়ে কোন বিশেষ নীতির নির্দ্দেশ করিতে পারেন। অন্যথায় এরূপ একটা বাজে প্রস্তাব গ্রহণ করার আবশ্যকতা কি ?

প্রেসিডেণ্ট এই সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় ব্যাখ্যা করিতে উঠিয়া বলেন, যমুনাদাস মেতা মুদ্রানীতি-সমস্যা সম্পর্কে একটি প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু এবং অন্যান্য সকলের বিবেচনানুসারে ঐ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার উপযুক্ত সময় কংগ্রেসের আসে নাই বলিয়া সাব্যস্ত হওয়ায় আলোচনা না করিয়াই শুধু মুদ্রানীতির প্রতি কংগ্রেসের মনোভাব জানাইবার জন্যই এই প্রস্তাব উত্থাপন করা হইয়াছে। এই বিষয় সম্পর্কে কংগ্রেস কোন স্বতন্ত্র নির্দ্দেশ দিতে পারেন না। মুদ্রানীতি বিশেষজ্ঞগণই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিতে অধিকারী। কংগ্রেস এরূপ কোন বিশেষজ্ঞের প্রতিষ্ঠান নহে। কাজেই বর্ত্তমান অবস্থায় কংগ্রেসের পক্ষ হইতে কোন নির্দ্দিষ্ট প্রস্তাব গৃহীত হইতে পারে না। কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির পক্ষ হইতে মিঃ রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন তাহা বাতিল হইয়া যায়।

ম্যালেরিয়া ও রোণাল্ড রস্

ম্যালেরিয়ার আবিষ্কারক ইংরেজ ডাক্তার স্যার রোণাল্ড রসকে কলিকাতা কর্পোরেশন নিম্নলিখিত অভিনন্দন দিয়াছেন।

আমরা কলিকাতা কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান এবং কাউন্সিলরগণ আপনার কলিকাতা আগমন উপলক্ষ্যে আপনাকে সর্ব্বান্তঃকরণে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিতেছি।

আপনার জীবনব্যাপী গবেষণা এবং যুগান্তকারী

আবিষ্কারের ফলে বৈজ্ঞানিক জগতে প্রতি ঘরে ঘরে আজ আপনার নাম উচ্চারিত হইতেছে। বাঙ্গালা দেশে প্রতি বছর দশ সহস্রাধিক লোক ম্যালেরিয়ায় প্রাণত্যাগ করে, আপনি এই ভীষণ ম্যালেরিয়া বিতাড়নের উপায় প্রদর্শন করিয়া বাঙ্গালাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

আজ আমাদের মনে পড়ে, আপনি বলিয়াছিলেন যে, অতি ভয়ঙ্কর বৈজ্ঞানিক সমস্যা সমাধানের উপায় নির্দ্ধারণের সহায়তার জন্য আপনার সম্বল ছিল, একটি ক্ষুদ্র সামরিক হাঁসপাতাল, একটি ভাঙ্গা অণুবীক্ষণ এবং কয়েক শিশি ঔষধ। এই দুরতিক্রমণীয় অসুবিধার মধ্যেও যে আপনি শেষে জয় লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাহা বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ থাকিবে।

আপনি জানিয়া নিশ্চয়ই সন্তোষ লাভ করিবেন যে, এই নগরের স্বাস্থ্য-রক্ষার ভার গণতান্ত্রিক কর্পোরেশ্যানের হস্তে ন্যস্ত আছে। কর্পোরেশ্যান সম্পূর্ণ ভাবে স্বীয় কর্ত্তব্যে অবহিত আছে। নাগরিকদের মধ্যে স্বাস্থ্য-রক্ষার উপযোগিতাবোধ জাগ্রত করিবার উদ্দেশ্যে কর্পোরেশ্যান সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিতেছে। ম্যালেরিয়া কালাজ্বর এবং অন্যান্য ব্যাধির নিবারণকল্পে কর্পোরেশ্যান চেষ্টা করিতেছে।

মানবহিতে উৎসর্গীকৃত আপনার জীবন দীর্ঘকাল স্থায়ী হউক, যেন আপনার ব্রতের সিদ্ধি লাভ হয়।

লাহোরে পেথিক লরেন্স

পার্ল্যামেণ্টের শ্রমিক সদস্য মিঃ পেথিক লরেন্স ভারতে আসিয়াছেন। লাহোরে লালা লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে এক জনসভার অধিবেশন হইয়াছিল (১২ ডিসেম্বর ১৯২৬)। এই সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন,—আমি এখানে বক্তৃতা দিতে আসি নাই; আমি শিখিবার জন্যই আসিয়াছি। শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস-প্রসঙ্গে বক্তা বলেন, শ্রমিক-সমস্যার দিক্ হইতে দেখিতে গেলে ইহা জাতীয়তারই অনুকূল। শ্রমিক আন্দোলন সম্প্রদায়গত শোষণ-নীতির পরিপন্থী। আর এই জন্যই ধনিক-শ্রমিক সংঘর্ষে শ্রমিকদল শ্রমিকদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন; আমি ভারতীয় রাজনীতি সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি না। ভারতীয়গণই তাহাদের মুক্তির পথ খুঁজিয়া লইবে। তবে আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, শ্রমিকদল ভারতের জাতীয়তাকামীদের প্রতি চিরদিনই সহানুভূতিসম্পন্ন থাকিবে। আমরা সরকারীভাবে ভারতের জন্য ততটা করিতে পারি নাই, যতটা করিবার ইচ্ছা আমাদের ছিল। আমাদের করিবার ইচ্ছা নাই বলিয়া করি নাই এমন নহে, করিতে পারি নাই বলিয়াই করি নাই। কেন না উদারনৈতিকদিগের উপর আমাদিগকে অনেকাংশে নির্ভর করিতে হইত।

ডক্‌টর ভুপেন দত্ত

গৌহাটিতে অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক লাঞ্ছিত সম্মিলনীর সভাপতির আসন হইতে ডক্‌টর ভুপেন্দ্র নাথ দত্ত বলিয়াছেন,—ভারতের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের গোড়ার দিকে উহা অতি অল্পসংখ্যক ধনী ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের দ্বারাই পরিচালিত হইত। তাঁহারা সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের অথবা জনসাধারণের প্রাণের বেদনা, তাহাদের অভাব-অভিযোগের কথা বিশেষ ভাবে বুঝিতেন না। ফলে তাহাদের আন্দোলনে দেশের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে একতা সংঘঠিত হয় নাই। স্বাধীনতা আন্দোলনও শক্তিশালী হয় নাই। কিছুদিন হইতে প্রধানতঃ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা এই আন্দোলনের পরিচালক হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারাও অজ্ঞ, দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত লক্ষ লক্ষ জনসাধারণের অভাব-অভিযোগকে নিজস্ব করিয়া তাহার প্রতিকারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন না।

মহীশূরে মহিলা-সভা

মহীশূর রাজ্যের দেওয়ান-পত্নী শ্রীমতী মির্জ্জা ইস্মাইল মহাশয়ার সভানেত্রীত্বে বাঙ্গালোরের বাণীবিলাস ইন্‌ষ্টিটিউটে নারী-শিক্ষা, সমাজ-সংস্কার ও নারী-স্বাস্থ্য ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনার্থ এক বিরাট নারী-সভা হইয়া গিয়াছে। এই সভায় হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতি সমাজের প্রায় ৮ শত শিক্ষিতা রমণী সমবেত হইয়াছিলেন। সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে নারী-শিক্ষার প্রসার-সাধন, নারী জাতির দৈহিক ও মানসিক উন্নতির প্রধান অন্তরায় অবরোধ-প্রথার

বিলোপ-সাধন, বালিকাদের বিবাহের বয়ঃক্রম ১৬ বৎসর নির্দ্ধারণ এবং নারীজাতির জন্য চিকিৎসা-বিদ্যা, সমাজতত্ত্ব ও পারিবারিক বিজ্ঞান শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করা ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্য-কংগ্রেস

গত ৩১শে ডিসেম্বর শুক্রবার কলিকাতার ডালহৌসী ইনষ্টিটিউট হলে ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্য কংগ্রেসের চতুর্থ অধিবেশন আরম্ভ হয়। বোম্বাইয়ের সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী স্যার দিনশা পেটিট সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত ঘনশ্যামদাস বিড়লা। এই কংগ্রেসে বহু প্রতিনিধি ও দর্শকের সমাগম হইয়াছিল। নিম্নলিখিত বণিক-সভাসমূহ তাঁহাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিলেন,—ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স, প্যাডি আড়তদার এসোসিয়েশন, সাউথ ইণ্ডিয়া স্কীন ও হাইড মার্চ্চেণ্ট এসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান ম্যাচ ম্যানুফ্যাক্‌চারার্স এসোসিয়েশন, বর্ম্মা ইণ্ডিয়ান টি প্ল্যাণ্টার্স এসোসিয়েশন, মহীশূর চেম্বার অব কমার্স, কলিকাতা কেমিষ্ট ও ড্রাগিষ্ট এসোসিয়েশন, বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স ইত্যাদি।

বেলা ১২টার সময় কার্য্যারম্ভ হয়। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত ঘনশ্যামদাস বিড়লা তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন।

স্যার দিনশা পেটিট

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি-নির্ব্বাচনের প্রস্তাব-প্রসঙ্গে স্যার দিনশা পেটিটের নাম উল্লেখ করেন এবং স্যার লালুভাই শ্যামলদাস সেই প্রস্তাব সমর্থন করেন। শ্রীযুক্ত সিদ্ধ, গান্ধী ও নারায়ণদাস গিরিধারিদাস উক্ত প্রস্তাবের পক্ষেই মত দেন। অতঃপর পেটিট সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তাঁহাকে সভাপতি বরণ করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া তিনি তাঁহার অভিভাষণ-প্রসঙ্গে সরকারের বাণিজ্য-নীতির প্রভাবে ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের কিরূপ অবনতি ঘটিয়াছে সেই সকল বিষয় বিবৃত করেন।

দেড় ঘণ্টাকাল অধিবেশনের পর সভাপতি মহাশয় ঘোষণা করেন যে, সকল প্রতিনিধিকে লইয়া বিষয়-নির্ব্বাচনের কার্য্য আরম্ভ হইবে। এদিন অতঃপর সভার অবসান হয়।

ভারতের ব্যাঙ্ক ও চেক

বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতি ৩২টী প্রস্তাব স্থির করিয়া দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কারেন্সীসম্বন্ধীয় প্রস্তাবটী বিশেষ প্রয়োজনীয়। স্যার দিনশা পেটিট দুইটী প্রস্তাব উপস্থিত করেন। প্রথমটী—ভারতের ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে তদন্ত ও তাহার উন্নতির পথ-নির্দ্ধারণের জন্য একটী কমিশন নিযুক্ত করা হউক। দ্বিতীয়টী—কারেন্সী কমিশনারের রিপোর্টের ১১৬ প্যারা অনুযায়ী চেক ও এক্সচেঞ্জ বিলের ষ্ট্যাম্প-শুল্ক উঠাইয়া দেওয়া হউক। দুইটী প্রস্তাবই গৃহীত হইয়াছে।

নিখিল ভারত বণিক-সঙ্ঘ

স্যার পুরুষোত্তমদাস বলেন,—ভারতীয় বণিক-সভাগুলির সম্মিলনের জন্য যে গঠনপদ্ধতি ও নিয়মাবলী প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহা কংগ্রেস সমর্থন করেন। এক্ষণে সম্মিলনীর কার্য্য পরিচালনার জন্য স্থায়ী কমিটী গঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত একটী কমিটী গঠিত হউক। এই কমিটীর সভাপতি হইবেন দিনশা পেটিট। সদস্য হইবেন ঘনশ্যামদাস বিড়লা, স্যার পুরুষোত্তমদাস, বিদ্যাসাগর পাণ্ডা, জামাল মহম্মদ, লালা হরকিষণ লাল প্রভৃতি ১২ জন।

প্রফেসর শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার দুঃখ করিয়া বলেন—পাশ্চাত্য দেশসমূহ বণিক-সমিতির মূল্য বুঝেন, এ বিষয়ে আমাদের দেশ পশ্চাৎপদ। যাহা হউক, বর্ত্তমানে যে চেষ্টা চলিতেছে, তাহাতে ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ বলিয়া মনে হয়।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বলেন—শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধে ব্যবস্থাপক সভায় যে সকল প্রস্তাব হয়, অনেক সময় গবর্মেণ্ট তাহাতে উপযুক্তরূপ মনোযোগ দেন না। একটী সম্মিলনী গঠিত হইলে তাহা গবর্মেণ্টকে উপস্থাপিত প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে বাধ্য করিবে। স্যার পুরুষোত্তমদাসের প্রস্তাব পরিগৃহীত হয়।

১৮ পেন্সের রূপেয়া সম্বন্ধে মতভেদ

শ্রীযুক্ত ঘনশ্যামদাস বিড়লা কারেন্সী সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত করেন। উক্ত প্রস্তাবের মর্ম্ম এই,—রাজকীয় কৃষি-কমিশন টাকার বিনিময় হার ১৮ পেন্স নির্দ্ধারণের অনুকূলে অভিমত দিয়াছেন। কিন্তু টাকার বিনিময় হার ১৮ পেন্স ধার্য্য হইলে কৃষি-শিল্পের সমূহ ক্ষতি হইবে এবং কৃষককুল ঋণে জড়িত হইয়া পড়িবে। সুতরাং টাকার বিনিময় হার ১৬ পেন্স করাই উচিত।

শ্রীযুক্ত বি, এফ, ম্যাডান ইহার সমর্থন করিয়া বলেন, টাকার বিনিময় হার ১৮ পেন্স করা হইতে পারে না, কারণ এদেশের কৃষকদের ৮ শত কোটি টাকা ঋণ আছে, টাকার বিনিময় হার ১৬ পেন্সের স্থলে ১৮ পেন্স করিলে ১২ কোটি টাকা ঋণ বৃদ্ধি পাইবে।

করাচীর শ্রীযুক্ত আর কে সিদ্ধ ও দক্ষিণ ভারত চামড়া ব্যবসায় সমিতির মহম্মদ ইস্মাইল উপস্থাপিত প্রস্তাব সমর্থন করেন। শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায় প্রমুখ তিনজন মাত্র উক্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন, ফলে শ্রীযুক্ত বিড়লার প্রস্তাবটী গৃহীত হইয়াছে।

ভারতের বীমা কোম্পানী

ভারতীয় বণিক-সমিতির ব্রহ্মদেশীয় প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত আর, এইচ, গান্ধী প্রস্তাব করেন,—ভারতে বীমা কোম্পানীর সম্যক্ পরিচালনার জন্য নূতন আইনপ্রণয়ন বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহাতে বীমাকারীদের খুবই সুবিধা হইবে। শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ খৈতান উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করেন। প্রস্তাবটী কংগ্রেসে গৃহীত হইয়াছে।

ইনকম ট্যাক্স

কলিকাতা মাড়োয়ারী সমিতির রায় বাহাদুর বদ্রীদাস গোয়েঙ্কা একটী প্রস্তাব উপস্থিত করেন। উক্ত প্রস্তাবের মর্ম্ম,—সরকার যখন ইনকম ট্যাক্স আদায় করেন, সে সময়ে ব্যবসায়ীদের ক্ষতির পরিমাণও যেন ঐ সঙ্গে বিবেচনা করিয়া দেখেন। বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বারের শ্রীযুক্ত অমূল্যধন আঢ্য প্রস্তাবটী সমর্থন করিলে পর প্রস্তাবটী গৃহীত হইয়াছে।

কয়লা, রেল, দিয়াশলাই ও চামড়া বিষয়ক প্রস্তাব

নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি কংগ্রেসে পরিগৃহীত হইয়াছে :—(১) রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়ার কয়লাখনিতে পথকর, জলকর প্রভৃতির চাপ বড় বেশী। গবর্মেণ্টের উচিত; উক্ত করের হার হ্রাস করিয়া দেওয়া; (২) এদেশের দিয়াশলাই-শিল্পের উন্নতিকল্পে সুব্যবস্থা করা হউক; (৩) চামড়ার উপর যে রপ্তানি-শুল্ক আছে, তাহা ত রক্ষা করিতেই হইবে, পরন্তু এই শুল্কের হার পূর্ব্বের মত শতকরা ১৫৲ টাকা নির্দ্ধারিত করিতে হইবে; (৪) পাথুরিয়া কয়লার কারবারের সুবিধার জন্য বিদেশী কয়লার সহিত প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা করা উচিত ভারত গবর্মেণ্টে টারিফ বোর্ডকে তাহার মীমাংসার ভার দিন; (৫) যাহাতে কাঁচা মাল কারখানায় আনীত হয় এবং প্রস্তুত দ্রব্য রপ্তানির সুব্যবস্থা হয়, এইরূপ রেলের বন্দোবস্ত যেন সরকার করিয়া দেন; (৬) ভারতের সর্ব্বত্র পাথুরিয়া কয়লা প্রেরণে রেলের মাশুল সরকার যেন অন্ততঃ শতকরা ২৫৲ টাকা হ্রাস করিয়া দেন; (৭) রেলের তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া হ্রাস হওয়া উচিত। রেল কর্ত্তৃপক্ষ তাহার সুবন্দোবস্ত করুন।

দিল্লীতে মুসলমান শিক্ষা-সম্মিলন

দিল্লীতে এবার অল-ইণ্ডিয়া মহমেডান এডুকেশনাল কনফারেন্সের অধিবেশন হইয়াছিল। গত ২৬শে ডিসেম্বর সেখানে ইহার প্রথম বৈঠক বসে। মিঃ আবদুল রহমান অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। মূল কন্ফারেন্সের সভাপতি হইয়াছিলেন স্যার আবদুর রহিম। মিঃ আবদুল রহমান তাঁহার অভিভাষণে প্রস্তাব করেন যে, বর্ত্তমান কন্ফারেন্সের স্থানে শিক্ষা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞগণকে লইয়া একটি সেনট্রাল বোর্ড গঠন করিতে হইবে। স্যার আবদুর রহিম তাঁহার সভাপতির অভিভাষণেও একটা নূতন কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশের মূল মর্ম্ম এই যে,—মুসলমান ছাত্রদিগকে পাঠশালা, স্কুল বা কলেজ হইতে বাহির হইবার পর কোন

এক রকম শিল্প-কার্য্য, কারুকার্য্য বা ব্যবসায়-কার্য্য শিক্ষা করিতে হইবে; প্রত্যেক মুসলমান ছাত্রকেই শারীরিক উন্নতি-সাধনের জন্য ব্যায়ামাদিতে বিশেষরূপেই মনোনিবেশ করিতে হইবে। তাহার জন্য যদি পরীক্ষা-গৃহে প্রতিযোগিতায় তাহারা কম কৃতকার্য্যতা লাভ করে, তাহাও ভাল। আমি লক্ষ্য করিতেছি, ভারতের সর্ব্বত্রই—বিশেষতঃ বঙ্গদেশে—মুসলমান ছাত্রেরা শারীরিক উৎকর্ষ-সাধনে বিলক্ষণ পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িতেছে।" স্যার আব্দুর জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-প্রচার সম্বন্ধে বলেন যে, কেবল বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা-পদ্ধতির প্রবর্ত্তনেই ইহার মীমাংসা সম্ভব। গভর্মেণ্ট শিক্ষার জন্য অতি সামান্য পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেন বলিয়া তিনি গভর্মেণ্টের নিন্দা করিয়াছিলেন। উর্দ্দুকেই তিনি সাধারণ ভাষা করিতে চাহেন এবং মুসলমানদের মধ্যেও স্ত্রী শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিতে বলেন।

যুক্তপ্রদেশে পাটের চাষ

যুক্তপ্রদেশের কৃষি-বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর বাহাদুরের মত এই যে, সেখানে পাটের চাষ সম্বন্ধে আর পরীক্ষার প্রয়োজন নাই। দুই জেলায় "খরিফ" ফসলের পরিবর্ত্তে চাষীরা পাট আবাদ করিবে, এইরূপ আশা করা যাইতেছে। খরিফ ফসল তথায় লাভজনক হয় নাই। অবশ্য বাংলা, বেহার ও উড়িষ্যা এবং আসামের তুলনায় যুক্তপ্রদেশ যে পাট উৎপাদন করিবে তাহা নগণ্য। সরকারী রিপোর্টে পাটের পূর্ব্বাভাষ দিয়া যে তালিকা বাহির হয়, তাহার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় যুক্তপ্রদেশে উৎপন্ন পাটের পক্ষে এখনও অনেক দেরী। পাটের চাষ সম্বন্ধে কোন্ দেশে পাট হইতে পারে বা না পারে, তাহা একটা সমস্যা নয়। কিন্তু সমস্যা এই যে, তদ্দেশের চাষীরা বাংলার চাষীর মত 'উভচর' রূপে জীবন যাপন করিতে রাজী কিনা। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পরীক্ষায় দেখা গিয়াছিল, সুদানের কোন কোন অংশে বাণিজ্যের উপযোগী পরিমাণে পাট উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু দিনের পর দিন মাসের পর মাস কোমর পর্য্যন্ত জলে দাঁড়াইয়া পরিশ্রম করিয়া তাহার পুরস্কারস্বরূপ এই "স্বর্ণ সূত্র" লাভের আশায় সে দেশের কোন কৃষকই মুগ্ধ হইতে পারে নাই।

পাটের চাষ বাংলাদেশের একচেটিয়া। তাহার কারণ কেবলমাত্র তাহার জলবায়ু নহে। তাহার কারণ পাট-উৎপাদনে যেরূপ উদ্যমশীল জীবনের প্রয়োজন, বাংলার কৃষকদের সেইরূপ জীবন লাভের স্বাভাবিক যোগ্যতা। বাংলায় যেরূপ ব্যাপকভাবে পাটের চাষ হয় এবং এতদর্থে যত অধিক কৃষক লিপ্ত থাকে, তাহা ভাবিলে ইহা পরিষ্কার বুঝা যাইবে, বাংলার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে অন্য দেশের বা ভারতের অন্য প্রদেশের এখনও বহু বিলম্ব। পাটের অনুরূপ অন্য কোন ফসলের আবিষ্কার হইলেও বাংলাদেশের কোন ভয় নাই। তবে ভয় আছে যদি যৌগিক (সিন্থেটিক) পাট আবিষ্কৃত হয়। কৃতকার্য্যতার সহিত পাটের স্থান অধিকার করিতে পারে এমন কোন পদার্থের সম্ভাবনা বৈজ্ঞানিকদের মাথায় যে খেলে নাই তাহা নহে। গত বৎসর জার্ম্মাণি ও যুক্তরাষ্ট্রে পাটের দর চড়া হওয়ায় এই দিকে গবেষণাকার্য্য সুরু হইয়াছে। ফলে পাটের ন্যায় অন্য কোন আঁশযুক্ত উদ্ভিদ চলিবে না, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। তথাপি পাটের সূতার ন্যায় অন্য কোন সূতা কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদন করিবার আশা একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাই। সে সূতা হয়ত প্রসারণ-গুণে পাটের সূতার মতই হইবে।

(ইংলিশম্যান)

বেগম তাবেইজির বক্তৃতা

আহমদাবাদের ২৩শে নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ গুজরাটে প্রাদেশিক নারী-শিক্ষা-সম্মিলনের এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। প্রায় ৩০০ মহিলা সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী বেগম তাবেইজি সমবেত মহিলাবৃন্দকে সম্বর্দ্ধনা করিতে গিয়া নারীজাতির শিক্ষা সম্বন্ধেও অনেক গুরুতর কথার আলোচনা করেন। মুসলমান নারীদের শিক্ষা সম্বন্ধেও তিনি অনেক আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, মুসলমান নারীসমাজ মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য আন্দোলন করা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এই শিক্ষা সম্বন্ধে বহুসংখ্যক

সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে। এই সমস্যার সমাধানের জন্য তিনি সকলের সাহায্যপ্রার্থনা করেন।

সভানেত্রী তাঁহার বক্তৃতাপ্রসঙ্গে নারী-জাতির শিক্ষার অবস্থার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং পুরুষদিগের সমান সমান সুযোগ-সুবিধা নারীদিগের জন্য দাবী করেন। উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবের কথাও তিনি বক্তৃতাপ্রসঙ্গে উল্লেখ করেন এবং শিক্ষাদান জন্য নারীদিগকে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করেন। নারীদিগের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রবর্ত্তন এবং স্বতন্ত্র কলেজ-স্থাপনের উপর জোর দেন। নারী জাতির মধ্যে শরীর-চর্চ্চার প্রবর্ত্তনের আবশ্যকতাও সভানেত্রী সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দেন। কতিপয় প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়। একটি প্রস্তাবে বালিকাদিগের বিবাহের বয়স ১৬ বৎসর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় এবং স্কুলসমূহের বালিকাদিগের শরীর-চর্চ্চা বাধ্যতামূলক করিবার অনুরোধ করা হয়। অন্য একটি প্রস্তাবে নারী-শিক্ষার প্রতি অনুকূল জনমত সৃষ্টি করিবার জন্য এবং উক্ত প্রদেশে বাধ্যতামূলক নারী-শিক্ষার প্রবর্ত্তনের জন্যও অনুরোধ করা হয়।

কলিকাতায় ভারতীয় আর্থিক কন্‌ফারেন্স

৩রা জানুয়ারী কলিকাতা সিনেট হলে ভারতীয় আর্থিক সম্মিলনীর দশম অধিবেশন বেলা ১১টার সময় আরম্ভ হয়। সভাস্থলে বহু গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে স্যার লালুভাই শ্যামলদাস, স্যার আলেকজাণ্ডার মারে, লালা হরকিষণ লাল, বি, এফ, ম্যাডান ইত্যাদি অ-বাঙ্গালীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিনিধিগণকে অভিবাদন করেন।

স্যার রাজেন্দ্রনাথের অভিভাষণ

স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্মেলনের প্রতিনিধিবর্গকে সম্বর্দ্ধনাকালীন বলেন,—"কলিকাতার ন্যায় সমৃদ্ধিশালী নগরী, অর্থনীতির ছাত্রদের অর্থনীতি-শাস্ত্র সম্বন্ধে গবেষণা করিবার একটী উপযুক্ত ক্ষেত্র। এই সম্মিলনীতে ভারতের সর্ব্বত্র হইতে প্রতিনিধি আগমন করিয়াছেন ও তন্মধ্যে অনেকের বোধ হয় বাঙ্গালাদেশে এই প্রথম আগমন। কাজেই যদি আমি এই সহরের অর্থ-নৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করি, তাহা হইলে আপনারা আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। কলিকাতা নগরীর উন্নতির ও সমৃদ্ধির একমাত্র কারণ ইহাই যে, এই নগরী একটি বৃহৎ নদীর তীরে অবস্থিত, যাহার জন্য সমুদ্রগামী জাহাজসমূহ পর্য্যন্ত বিনা আয়াসে একেবারে সহরের বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে। কলিকাতার এই প্রকার অবস্থিতির জন্যই আজ কলিকাতা প্রাচ্যদেশে একটি বৃহৎ বন্দর ও ব্যবসাকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে।

"এই আলোচনাপ্রসঙ্গে আমি বিশেষভাবে এই প্রদেশের জলপথে মালপত্রাদি চালান সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বাঙ্গালা একটী বন্যাপীড়িত প্রদেশ ও বাঙ্গালার আভ্যন্তরিক অনেক স্থানে নৌকাযোগে ব্যতীত গতায়াত করা এক প্রকার অসম্ভব। জলপথসমূহ প্রায়শঃ নদীতে পলি পড়ার জন্য বন্ধ হইয়া যায়, যাহার জন্য দেশে প্রবল বন্যা হইয়া থাকে ও জলপথে মালপত্রাদি প্রেরণ করা অসুবিধাজনক হইয়া উঠে। অথচ আমরা বাঙ্গালার জলপথের উন্নতি-সাধন সম্বন্ধে একেবারেই উদাসীন। তজ্জন্য বাঙ্গালার জনসমূহকে নৌপথের উন্নতিসাধনে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে আহ্বান করা বাঙ্গালার যুবক অর্থনীতিবিদগণের একান্ত কর্ত্তব্য।"

বাঙ্গালার ধন-সম্পত্তি

বাঙ্গালার স্বাভাবিক ধনসম্পত্তি সম্বন্ধে স্যার রাজেন্দ্রনাথ বলেন যে, ভারতে পাট ও চায়ের ব্যবসায় বাঙ্গালার একচেটিয়া অধিকার বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ঐ দুইটি জিনিষের চাহিদাও জগতের বাজারে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু একচেটিয়া অধিকার আছে বলিয়াই ঐ সকল ব্যবসার উন্নতি-বিধানের জন্য অমনোযোগী থাকা সুবিবেচনার কার্য্য নহে। কারণ সম্প্রতি দেখা গিয়াছে যে, বর্ত্তমানে একচেটিয়া অধিকার বজায় রাখা সম্ভবপর নহে। কাজেই ঐ দুইটী ব্যবসা যাহাতে সমৃদ্ধিশালী হয় তাহার জন্য সকলেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। লৌহ ও ইস্পাতের ব্যবসারও বাঙ্গালা অন্যতম কেন্দ্র। আমাদের দেশীয় লৌহকারখানাও

কলিকাতার অনতিদূরে অবস্থিত। এতদ্ভিন্ন বিহার, উড়িষ্যা ও বাঙ্গালার কয়লার ব্যবসার ভবিষ্যৎ কলিকাতার উপর অনেকটা নির্ভর করিতেছে। ভারতের খনিজ পদার্থাদি দেশের উন্নতি-বিধানার্থ যাহা-কিছু ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা একমাত্র কলিকাতার দ্বারাই হইয়াছে।

কারেন্সী সমস্যা

বর্ত্তমান কারেন্সী সমস্যা সম্বন্ধে স্যার রাজেন্দ্রনাথ বলেন যে, তিনিও হিল্টন ইয়ং কারেন্সী কমিশনের অন্যতম সদস্য ছিলেন। সম্প্রতি মুদ্রা-বিনিময় হার সম্বন্ধে দেশের মধ্যে যে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা বিশেষ একটি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব নহে। ১৮ পেন্স হার সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, দেশের মঙ্গলার্থই কমিশনের অধিকাংশ সদস্য ঐ হার সমর্থন করিয়াছেন। কারণ, এ হারের দ্বারা দেশে জিনিষ-পত্রের দাম মাশুলাদি ও কর প্রভৃতি হ্রাস হইবে। তিনি ব্যক্তিগত ভাবে ব্যবসায়ী হিসাবে ১৬ পেন্স হার সুবিধাজনক মনে করেন। কারণ, তাহা হইলে মূল্যাদি বৃদ্ধি পাইবে; কিন্তু ভারতের দারিদ্র্য স্মরণ করিয়া ১৮ পেন্স হার গ্রহণ করাই উচিত মনে করেন। তিনি এরূপ কথা বলিতেছেন না যে, জিনিষপত্রাদির মূল্যাদি নির্দ্ধারণকল্পে কারেন্সী ইচ্ছামত ব্যবহৃত হইবে; তবে তাঁহার মতে যখন মূল্যাদি সমতাপ্রাপ্ত হইয়াছে তখন পুনরায় জিনিষপত্রের মূল্যমধ্যে ইচ্ছাপূর্ব্বক বিশৃঙ্খলা আনার প্রয়োজন নাই। যে মুদ্রাবিনিময় হার (১৬ পেন্স) জিনিষপত্রের মূল্য বৃদ্ধি করিবে, তাহার সমর্থনকারীরা তাঁহার নিকট দরিদ্রের স্বার্থরক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী বলিয়া মনে হয়। তিনি উপস্থিত প্রতিনিধিগণকে কারেন্সী কমিশনের অন্যান্য প্রস্তাবগুলির দিকে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করেন।

পরিশেষে স্যার রাজেন্দ্রনাথ বলেন যে, বর্ত্তমান যুগে রাজনৈতিক স্বাধীনতার সহিত অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বিশেষ সংশ্লিষ্ট এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জ্জন করা সম্ভবপর নহে। কাজেই অর্থনৈতিক স্বাধীনতার দিকে প্রত্যেকের দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। তাহার ফলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আপনা হইতেই আসিবে। অতঃপর স্যার রাজেন্দ্রনাথ প্রতিনিধিগণকে বসুবিজ্ঞান-মন্দির পরিদর্শন করিতে অনুরোধ করেন।

অধ্যাপক ট্যানান

স্যার রাজেন্দ্রনাথের অভিভাষণের পর স্যার লালুভাই শ্যামলদাস বোম্বাইয়ের সিডেনহাম কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ এম, এল, ট্যানানকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী উক্ত প্রস্তাবটি সমর্থন করিলে মিঃ ট্যানান সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

তিনি ভারতে অর্থনীতি-শাস্ত্রের আলোচনা সম্বন্ধে বলেন, কিছুদিন পূর্ব্বে এমন কি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পর্য্যন্ত এই শাস্ত্রের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি না করায় ঐ শাস্ত্রের আলোচনা ও উন্নতির প্রতি কোনরূপ মনোযোগ প্রদান করেন নাই। সর্ব্বপ্রথম ভারতের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই এই অর্থনীতি-শাস্ত্রের আলোচনার প্রথম আয়োজন করেন। তাহার জন্য ভারতবাসী ও বিশেষভাবে অর্থনীতির ছাত্রেরা উক্ত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নিকট ঋণী।

অর্থশাস্ত্রের আলোচনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মিঃ ট্যানান বলেন যে, এই শাস্ত্র আলোচনার সহিত প্রত্যেক মানুষের স্বার্থ বিজড়িত আছে ও এই শাস্ত্রের ভিত্তি মানবের দৈনন্দিন জীবন ও স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তির ও বিশেষভাবে যাঁহারা রাজনৈতিক, সামাজিক বা যে-কোন সাধারণ ব্যাপারে যোগদান করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই এই শাস্ত্র আলোচনা করা উচিত।

ট্যানান বলেন যে, বর্ত্তমান সম্মিলনীতে তিনি কারেন্সী ও ব্যাঙ্কিং এই দুই বিষয়ের আলোচনা করিবেন; কারণ এই দুইটী বিষয়ই বর্ত্তমানে ভারতীয় রাজস্ব-ব্যাপারের বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়। ঐ সকল বিষয়ে তিনি যে মত প্রকাশ করিবেন সে সম্বন্ধে তিনি বলেন—"আমি এ স্থলে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় মনে করি যে, যদিও আমি সরকারের অধীনে চাকুরী করি তথাপি ঐ দুইটি বিষয় সম্বন্ধে আমি যে মত প্রকাশ করিব তাহা আমার স্বাধীন মত ও তাহার সহিত গবর্ণমেণ্টের মতের কোন সম্বন্ধ নাই। দ্বিতীয়তঃ, আমি আশা করি যে, ঐ দুইটী বিষয় সম্বন্ধে

সকলে স্বাধীনভাবে আলোচনা করিবেন; কারণ আমাদের এই সকল অর্থনৈতিক বিষয়ের আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য —দেশের যাহাতে মঙ্গল সাধিত হয় তাহা করা।*

ধনতাত্ত্বিকদের কারেন্সী-লড়াই

বেলা ২॥০ ঘটিকার সময় আর্থিক সম্মিলনীর অধিবেশন আরম্ভ হয়। ঐ সময় অর্থনীতি-বিষয়ক কয়েকটী রচনা পঠিত হয়। তন্মধ্যে কারেন্সী একটী। তৎপর কারেন্সী সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হয়। প্রফেসর ফিনলে সিরাজ, প্রফেসার জ্ঞান চাঁদ, সার আলেকজাণ্ডার মারে, কারেন্সী কমিশনের অন্যতম সদস্য প্রফেসর জে, সি, কয়াজী, মিঃ বি, এফ, ম্যাডান, শ্রীযুক্ত বিনয় কুমার সরকার, মিঃ জে, চৌধুরী ইত্যাদি উক্ত আলোচনায় যোগদান করেন। প্রফেসর কয়াজী বলেন যে, ১৮ পেন্স হারের ফলে কৃষকেরা কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে না। কারণ কো-অপারেটিভ সোসাইটীর রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায় যে, কৃষকদের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নতই হইয়াছে। ইহার উত্তরে শ্রীযুক্ত ম্যাডান বলেন যে, সকলেই ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন এবং গবর্ণমেন্টও ইহা স্বীকার করিতেছেন যে, এই আঠার পেন্স হারের ফলে তাঁহাদের ৪।৫ কোটি টাকার সাশ্রয় হইবে। নতুবা তাঁহাদিগকে নূতন ট্যাক্স বসাইতে হইবে। ম্যাডান জিজ্ঞাসা করেন—গবর্ণমেন্টের কিরূপে ঐ ৪।৫ কোটী টাকার সাশ্রয় হইতেছে? ঐ টাকা কি আকাশ হইতে পড়িতেছে? এবং ১৬ পেন্স হইলে কেনই বা গবর্ণমেন্টের নূতন ট্যাক্স বসাইতে হইবে? সুতরাং পরোক্ষভাবে এই হারের দ্বারা গবর্ণমেন্ট কৃষকদিগের নিকট হইতে ৪।৫ কোটি টাকা আদায় করিতেছেন।

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার বলেন যে, মুদ্রাবিনিময়-হারের সহিত রপ্তানির কোনই সম্বন্ধ নাই; কারণ দেখা যাইতেছে যদিও মুদ্রাবিনিময় হার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি আমাদের রপ্তানির হ্রাস না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হইতেছে। মিঃ ভারুচা বলেন যে, ভারতবর্ষকে উৎপন্ন মাল রপ্তানি করিতেই হইবে, এখন রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য যাহাই পাওয়া যাউক না কেন। কাজেই মুদ্রা বিনিময় হারের ফলে যদিও কৃষক অল্প টাকা পাইতেছে, তথাপি তাহাকে বাধ্য হইয়া বিক্রয় করিতে হইবে। মিঃ ভারুচা জিজ্ঞাসা করেন—এবৎসর ভারতে ভাল তুলা উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও কেন ভারতবর্ষে ৪।৫ কোটি টাকার তুলা আমেরিকা হইতে আমদানি হইয়াছে? ইহার কারণ কি একমাত্র ১৮ পেন্স হার নহে?*

স্যার আলেকজাণ্ডার মারে বলেন যে, প্রায়ই বলা হইয়া থাকে ১৮ পেন্স হারের ফলে ইয়োরোপীয় বণিকগণের সুবিধা হইবে, কারণ তাহারা তাহাদের লাভ দেশে প্রেরণ করিলে বেশী পাউণ্ড পাইবে। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, যদি ১৮ পেন্স হারের ফলে ভারতের মধ্যে ব্যবসায় ক্ষতি হয় ও যদি ভারতীয় লোকদের ক্রয়ের ক্ষমতা কমিয়া যায়, তাহা হইলে ইয়োরোপীয় বণিকদের লভ্যাংশ কমিয়া যাইবে। ফলে তাহারা অল্প টাকা লাভ করিবে এবং তাহার দ্বারা তাহারা পূর্ব্বে যে মোট পাউণ্ড পাইত এখনও সেইরূপ বা তাহার কম পাউণ্ড পাইবে।

(আনন্দবাজার)

কৃষি-আয়ের কর

ভারতীয় আর্থিক সম্মিলনের এক সভায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রপ্রসাদ নিয়োগী "বাঙ্গালার কৃষি-আয়ের উপর কর ধার্য্য করা" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটীতে অধ্যাপক নিয়োগী বৃটিশ ভারতে ও বিশেষভাবে বাঙ্গালায় ১৮৬০—৬৫ ও ১৮৬৯—৭৩ সনের মধ্যে যে দুইবার কৃষি-আয়ের উপর কর ধার্য্য করার চেষ্টা হয়, তাহার ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। উক্ত প্রবন্ধে অধ্যাপক নিয়োগী নানাপ্রকার তথ্য ও ১৮৬০ সনের ৩রা যে তারিখে সুপ্রীম কাউন্সিলের সদস্যের

* সংবাদদাতার বৃত্তান্তে কিছু ভুল আছে। ঐ সভায় "আর্থিক উন্নতি"র সম্পাদকের বক্তব্য নিম্নরূপ:—রপ্তানিটা পরিমাণে বাড়িয়াছে ত বটেই। অধিকন্তু টাকা অর্থাৎ রূপেয়া হিসাবেও রপ্তানির দাম উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। কাজেই টাকার দাম বাড়িয়া যাওয়ায় রপ্তানিওয়ালাদের অর্থাৎ চাষী-কিষাণ-সমাজের কোন ক্ষতি হয় নাই। কাজেই এই মতের প্রতিবাদে ভারুচা যাহা বলিয়াছেন তাহা অপ্রাসঙ্গিক।—সম্পাদক।

নিকট বৰ্দ্ধমানের মহারাজার লিখিত পত্রের দ্বারা দেখান যে,—

(১) ১৮৬০—৬৫ ও ১৮৬৯—৭৩ সনে দুইবার গবর্ণমেন্ট আয়কর নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তাহা বাঙ্গালার জমীদারদের স্বার্থের বিরুদ্ধে।

(২) ১৮৭০ সনের ১২ই মে তারিখে ভারত-সচিব তাঁহার ডেস্‌প্যাচে যাহা লিখেন, তাহা জমীদারদিগের স্বার্থের বিরুদ্ধে।

(৩) ১৮৬০—৬৫ সন—এই পাঁচ বৎসরে কৃষক ও জমির মালিকেরা বাঙ্গালার অৰ্দ্ধেক আয়-কর বহন করিয়াছে।

(৪) ১৮৬৯—৭৩ সন—এই কয় বৎসরে রায়ত ও জমীদারেরা, (যাহাদের আয় ৫০০৲ টাকার বেশী) মোট আয়-কর ৩৩ লক্ষ টাকার ১১ লক্ষ টাকা বহন করিয়াছে।

রাজস্ব-বিষয়ক আলোচনা

এলাহাবাদ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অর্থনীতির প্রফেসার সি, ভি, টমশন ভারতে জমির দামের উপর নির্ভর করিয়া ট্যাক্স ধার্য্য করা সম্বন্ধে একটি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক এম, ডি, আয়ার ট্যাক্সেশন এনকোয়ারী কমিটির রিপোর্ট তীব্রভাবে সমালোচনা করেন।

অধ্যাপক জ্ঞানচাঁদ এবং দুরাইস্বামী আয়ার করের মাত্রা কমাইয়া দরিদ্র শ্রেণীকে রেহাই দিবার পক্ষে মত প্রচার করেন। অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার বলেন,—"দেশের কোনো শ্রেণীকে কর হইতে রেহাই দেওয়ার নীতি অবলম্বিত হওয়া উচিত নয়। তাহা হইলে দেশের অনেক লোক গবর্মেণ্টের উপর সমালোচনা ও কর্তৃত্ব চালাইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে। দেশে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে চাই প্রচুর পরিমাণে কর। বড় লোকের উপরই চাপ উত্তরোত্তর বাড়াইয়া দিতে হইবে সন্দেহ নাই।"

সম্মিলনে ব্যাঙ্ক-কথা

ভারতীয় আর্থিক সম্মেলনের এক সভায় পঞ্জাবের শ্রীযুক্ত বি, টি, ঠাকুর 'ভারতে ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠা' সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে ইনি ভারতীয় ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠা আন্দোলনকে শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্যে নোট বাহির করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন একটী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিবার উপর খুব জোর দেন।

ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কের অনুসৃত নীতির সমালোচনা করিয়া ইনি বলেন, ইহা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ছায়া হিসাবেই শুধু দাঁড়াইয়া আছে; এত বড় একটা কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের এত দায়িত্বজ্ঞানহীনতা বাঞ্ছনীয় নহে। বোম্বাইয়ের সিডেনহাম কলেজের প্রফেসর এটি মিঃ ঠাকুরের অভিযোগের উত্তরে বলেন, ইম্পারিয়াল ব্যাঙ্কের বেশী লাভ খাওয়া উদ্দেশ্য নহে; দেশে ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠা-পদ্ধতি প্রচার করাই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্যেই বহু শাখা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। অনেক স্থলে ক্ষতি আশঙ্কাতেও ইহারা পশ্চাৎপদ হয় নাই।

মিঃ সি, এস, রঙ্গস্বামী কারেন্সী কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার উপর খুব জোর দিয়া বক্তৃতা করেন। ইনি বলেন, এই বিষয়টার উপর জনসাধারণ কোনই মনোযোগ দিতেছে না, অথচ ইহাদ্বারাই ভারতের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইতে পারে।

আলোচনায় যোগ দিতে গিয়া শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার বলেন,—"স্বদেশী ব্যাঙ্ক গড়িয়া তোলা যুবক ভারতের সম্মুখে এক বিপুল কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই। কিন্তু বিদেশী ব্যাঙ্কের সাহায্যেও ভারতের আর্থিক উন্নতি অনেক পরিমাণে সাধিত হইয়াছে এবং হইতেছে। ভবিষ্যতেও,—কিছুকাল পর্য্যন্ত ভারতে বিদেশী পুঁজি এবং বিদেশী ব্যাঙ্ক আমাদের পক্ষে মঙ্গলকর।"

শিশু-স্বাস্থ্য ও সহর-সংস্কার

ভারতীয় আর্থিক সম্মেলনের তৃতীয় দিনের অধিবেশনে প্রতিনিধি ও দর্শকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর রাধাকমল মুখার্জ্জী "শ্রমিক উন্নতি ও নগর-সংস্কার" নামক একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন।

ভারতের শ্রমিকদের অবস্থা সম্বন্ধে রাধাকমল বাবু বলেন

যে, আমাদের কলকারখানায় মানুষের জীবনই সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ এবং উত্তম খাদ্যদ্রব্য ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাই সর্ব্বাপেক্ষা দুর্লভ। আমাদের দেশের শিল্পস্থানসমূহ যে কিরূপ অস্বাস্থ্যকর তাহা এ সকল স্থানের শিশুমৃত্যুর হার হইতে জানা যায়। পক্ষান্তরে যে স্থান যত বেশী স্বাস্থ্যকর সেই স্থানের শিশুমৃত্যুর হার ততই অল্প। বোম্বাই ও কানপুর অঞ্চলে অর্দ্ধেকের উপর শিশু এবং কলিকাতা, আহম্মদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে প্রতি তিনটি শিশুর একটি জন্মিবার একবৎসর মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

প্রত্যেক কুঠরীতে পাঁচ জন করিয়া মজুর বাস করে। করাচী ও বোম্বাই সহরে এমন কি প্রত্যেক কুঠরীতে ৯।১০ জন পর্য্যন্ত মজুর বাস করিয়া থাকে। তাহার ফলে শিশুমৃত্যুর হার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। কাজেই শিল্পের উন্নতির পূর্ব্বে বাসস্থানের সুবন্দোবস্ত করা বর্ত্তমানে বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

বর্ত্তমানে প্রত্যেক সহরে আবর্জ্জনা ও পঙ্কিল জল বাহির করিয়া দিবার জন্ম ড্রেন ইত্যাদির সুবন্দোবস্ত করার দরকার।

ডাঃ মুখার্জ্জীর প্রবন্ধ আলোচনাকালীন বাঙ্গালার শ্রমিক সদস্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী বাঙ্গালার শ্রমিকদিগের ও চটকলের মজুরদের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি

গতকল্য বুধবার সন্ধ্যাকালে ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট হলে সরোজনলিনী নারী-মঙ্গল সমিতির বার্ষিক অধিবেশন হয়। মিসেস জে, এন, গুপ্ত সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন বহুসংখ্যক ভারতীয় এবং শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

বরিশাল, মেদিনীপুর, বাগেরহাট, মহেশপুর, হুগলী, বালীগঞ্জ, টালা, টাঙ্গাইল, চাঁদপুর প্রভৃতি বাঙ্গালাদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে সমিতির প্রতিনিধিগণ এবং কর্ম্মিগণ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সন্তোষের রাজা, নবাব বাহাদুর নবাব আলী চৌধুরী, রায় বাহাদুর ডাক্তার চুনীলাল বসু, শ্রীযুত কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার সরকার, শ্রীযুত সত্যানন্দ বসু, বাবু পীযুষকান্তি ঘোষ, শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত, মিঃ বি, দে, মিঃ কে, সি, রায়চৌধুরী, শ্রীযুত তড়িৎভূষণ রায়, শ্রীযুত মৃণালকান্তি বসু, শ্রীযুত নৃপেন্দ্রনাথ বসু, রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার, ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রলাল মৈত্র অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, শ্রীযুত শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, শ্রীযুত গিরীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী, মিঃ জি, এন, রায়চৌধুরী, শ্রীযুত রাধিকাপ্রসাদ ব্যানার্জ্জী, মিঃ রফিদ্দিন আমেদ, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস, মিসেস ষ্ট্যানলী, মিসেস বেণ্টলী, শ্রীমতী কাদম্বিনী বসু, শ্রীযুক্তা বাসন্তী চক্রবর্ত্তী, মিসেস লিণ্ডসে, শ্রীমতী লতিকা বসু এবং শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বুঝিতে হইবে যে, আন্দোলনটার দিকে দেশের লোকের নজর পড়িয়াছে। সমিতির শ্রেষ্ঠ কর্ম্মিদিগকে এবং ছাত্রীদিগকে টাকা, পুরস্কার এবং সার্টিফিকেট বিতরণ করিবার পর শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকারকে বক্তৃতা করিবার জন্ম ডাকা হয়। তিনি বলেন,—"আদর্শ এবং জীবনের লক্ষ্য হিসাবে ভারতীয় নারীতে আর পাশ্চাত্য নারীতে কোনো প্রভেদ নাই। আইনের চোখে, আর্থিক তরফ হইতে এবং রাষ্ট্রীয় মাপকাঠিতে ইয়োরামেরিকার মেয়েরা এশিয়ার মেয়েদের মতনই 'গোলাম' ছিল। মাত্র ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর ধরিয়া নারী-স্বাধীনতার আন্দোলন পশ্চিমা জগতে চলিতেছে। অর্থাৎ পুরুষের সঙ্গে মেয়ের সাম্য কায়েম করিবার চেষ্টা পশ্চিম মুল্লুকে বেশী পুরানো চিজ নয়।

এই দিকে পশ্চিমা মেয়েরা কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে ও। কিন্তু যুগের পর যুগ ধরিয়া ভারতের নারী আর খ্রীষ্টিয়ান পশ্চিমা নারী প্রায় এক গোত্রের জীবই ছিল। গোটা জগৎ একই পথে, একই মতে, একই আদর্শে চলিয়াছে। ভারতের নারী খ্রীষ্টিয়ান নারী অপেক্ষা উন্নত ছিল না। আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া ইয়োরামেরিকার নারী মানব সভ্যতার নতুন এক অধ্যায় খুলিয়া দিতে সুরু করিয়াছে। এই পথ তাহাদের আবিষ্কৃত চিজ। ভারতীয় নারীও সেই পথেই চলিতেছে এবং চলিবে। পূর্ব্বে পশ্চিমে এখন টক্কর চলিতেছে ঠিক যেন ঘোড়দৌড়,—পশ্চিমারা আগে আগে ছুটিতেছে, কিন্তু উহাদের, কানটা মাত্র সম্প্রতি আগে আছে। ভারতীয় নারীকে বর্ত্তমান জগৎমাফিক কর্ম্মদক্ষতা,

জীবনবত্তা ও ভাবুকতা অর্জ্জন করিবার জন্য এখনও কিছু কাল পশ্চিমা মেয়েদের পেছন পেছনই ছুটিতে হইবে। ইহাই যুবক বঙ্গের—যুবক ভারতের—যুবক এশিয়ার নারী-সমস্যা।

শ্রীযুক্ত মৃণাল কান্তি বসু সভায় বক্তৃতাকালে বলেন, বঙ্গনারীদের জন্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়িয়া তোলাই এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য নহে, এদেশে আদর্শ জাতীয়তা গঠনও ইহার উদ্দেশ্য। দেশের পুরুষদিগকে জাগ্রত করিলেই চলিবে না, নারীদিগকেও জাগ্রত করিতে হইবে।

মিসেস ষ্টানলী তাঁহার বক্তৃতায় সমিতির কল্যাণ কামনা করিয়া বলেন, তিনি সম্প্রতি পূর্ব্ববঙ্গের কয়েকটি পল্লী পরিদর্শন করিয়া তথাকার শিশুদের যে দুরবস্থা দেখিয়াছেন, তাহাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছেন। তিনি মনে করিয়াছেন যে, এই সমিতির সাহায্যে ঐ সব শিশুদিগকে রক্ষা করিবার কাজ তিনি গ্রহণ করিবেন।

শ্রীযুক্ত পীযুষকান্তি ঘোষ তাঁহার বক্তৃতাতে বলেন, এই সমিতি দেশের নারী-সমাজের উন্নয়নকল্পে যথেষ্ট ভাল কাজ করিতেছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু সম্পূর্ণ হিন্দু আদর্শে পরিচালিত হইলে ইঁহারা আরও ভাল কাজ করিতে পারিবেন।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী সভায় ঘোষণা করেন যে, সমিতির জন্য দুইলক্ষ টাকা চাঁদা সংগ্রহের জন্য যে ভাণ্ডার খোলা হইয়াছে, সেই ভাণ্ডারে রায় বাহাদুর শশীভূষণ দে ৫০০০৲, বাবু গোকুলচন্দ্র নন্দী ১০০০৲ এবং দার্জ্জিলিঙের রায় সাহেব মথুরাপ্রসাদ ১০০০৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

বিড়লা ব্রাদার্সের বিভিন্ন ব্যবসা

শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ খৈতানের মতামত

কলিকাতার বিড়লা ব্রাদ্রার্স কোং আজকালকার ভাবতে অন্যতম প্রসিদ্ধ কারবারী। শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ খৈতান তাঁহাদের একজন প্রধান কর্ম্মচারী। তাঁহার সঙ্গে বিড়লা ব্রাদ্রার্সের বিভিন্ন কারবার সম্বন্ধে আমাদের যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহার শর্টহ্যাণ্ড বৃত্তান্ত নিম্নে দেওয়া গেল।

প্রঃ—আপনাকে বিড়লা ব্রাদ্রার্সের ব্যবসা সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাই। কোন্ কোন্ লাইনে আপনাদের কারবার চলে?

উঃ—আমদানি, রপ্তানি ও শিল্প-কারখানা।

প্রঃ—রপ্তানি হয় কোন্ কোন্ জিনিষের?

উঃ—কলিকাতা হইতে পাটের তৈয়ারী মাল ও তিসির এবং বোম্বাই হইতে তুলার।

প্রঃ—চালান হয় কোন্ কোন্ দেশে?

উঃ—পাট যায় আমেরিকায়, স্কটল্যাণ্ডে, জার্ম্মাণিতে। অল্পভাগ যায় ইতালীতে, ফ্রান্সে, জাপানে, স্পেনে। অষ্ট্রেলিয়ায়ও কিছু যায়।

প্রঃ—পাটের তৈয়ারী মাল বল্লে কি বুঝায়?

উঃ—পাট ম্যানুফ্যাকচারের দুই রকম শ্রেণী আছে, একটাকে বলে "হেসিয়ান"। এর হিন্দুস্থানী নাম কি জানি না। আর একটার নাম "স্যাকিং"। সূক্ষ্ম কাপড়কে বলে হেসিয়ান, আর মোটা থান "স্যাকিং" নামে পরিচিত। মার্কিণে আর খদ্দরে যে প্রভেদ হেসিয়ান আর স্যাকিংএ প্রায় সেইরূপ প্রভেদ ধরিয়া লওয়া চলে।

প্রঃ—এসব কি থান হিসাবে যায়, না কোনো-কিছু তৈয়ারী হয়ে যায়?

উঃ—থান হিসাবেও যায়, ব্যাগ তৈয়ারী হয়েও যায়। থান হিসাবে যা যায় তাকে হেসিয়ান একস্‌পোর্ট বলে। ব্যাগ হিসাবে স্যাকিং ক্লথ যায়। হেসিয়ান বেশীর ভাগই কাপড়। কাপড় হিসাবে স্যাকিং যায় কম। আমেরিকায় ব্যাগ তৈয়ারী করবার কারবার আছে। সেখানে বিক্রীও হয়।

প্রঃ—তিসি কোন্ কোন্ দেশে চালান হয়?

উঃ—তিসির কাজ লণ্ডনের মারফৎ হয়। বেশীর ভাগ ইয়োরোপে যায়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা ও অন্যান্য জায়গায় খুব অল্প যায়।

প্রঃ—তুলা কোন্ কোন্ দেশে যায়?

উঃ—সকলের চেয়ে বেশী যায় জাপানে, তার চেয়ে কম যায় ইয়োরোপে, তার চেয়ে কম চীনে, অন্য দেশে খুব কম।

প্রঃ—আমদানি কোন্ লাইনে হয়?

উঃ—আগে আমাদের আমদানি হত পিস্ গুড্‌স্—কাপড় চোপড়, আর চিনি। এখন এই দুটী বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। হার্ডওয়্যারের (লোহালক্কড়ের) আমদানিও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এখন খুব বেশী আমদানি হয় সোনারূপার।

প্রঃ—কোন্ কোন্ দেশ থেকে হয়?

উঃ—লণ্ডনের মারফৎ কিনতে হয়। সোনারূপার বাজার

কেন্দ্রীভূত হয়েছে লণ্ডনে। এখানে ৪ জন "দালাল" আছে চারটা সিণ্ডিকেট বা সঙ্ঘের মত। সোনারূপার যত কারবার তাদের মারফৎ চলে।

প্রঃ—সিণ্ডিকেটের কি নাম?

উঃ—কোন নাম নাই, ৪ জন ব্রোকার। একজনের নাম পিক্‌স্‌লী, আর একজনের নাম গোল্ডস্মিথ, আরও ২ জন আছে। আগে পুরাপুরি সকল কারবারই লণ্ডনের মারফৎ হত। মাঝে আমেরিকা থেকে কিছু সোজাসুজি এসেছিল। আফ্রিকা থেকেও আনবার চেষ্টা হয়েছে; কিন্তু ইংলণ্ড সেটা পারমিট করে নাই।

প্রঃ—সোনারূপার কারবার গভর্ণমেণ্টের হাতে আছে কতটা? এই কারবারটা অন্যান্য কারবারের মত স্বাধীন কি?

উঃ—যুদ্ধের সময় গভর্ণমেণ্ট এখানকার আমদানি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন কোন বাঁধাবাঁধি নাই। তবে এই কারবারে গভর্ণমেণ্টের প্রতাপ বেশী। আজকাল রূপার দাম যে রকম কমেছে তাতেই বুঝা যায় গভর্ণমেণ্টের হাত কত। গভর্ণমেণ্ট যদি খরিদ করেন তবে দাম বেড়ে যায়, কিনব না বল্লে দাম কমে যায়।

প্রঃ—ভারতবাসীর সঙ্গে বিলাতী বেপারীর সোনারূপার যে কারবার চলে তাহাতে গভর্ণমেণ্টের কোন এক্‌তিয়ার আছে কি?

উঃ—না।

প্রঃ—লণ্ডনের ৪ জন ব্রোকার কি এই কারবারটা একচেটিয়া করে ফেলেছে?

উঃ—হাঁ।

প্রঃ—তা হলে অন্যান্য দেশের লোকেরা—যেমন চীন, জাপান, ইয়োরোপ প্রভৃতি দেশের লোকেরা—যখন লণ্ডনের বাজারে সোনারূপা কিনে তাহাদিগকেও কি এই ৪ জনের মারফৎ যেতে হয়?

উঃ—হাঁ।

প্রঃ—আচ্ছা, এরা এই ব্যবসাটাকে একচেটিয়া করে ফেল্লে কি করে?

উঃ—এর একটা পুরানো ইতিহাস আছে, তার খুঁটিনাটি আমি বলতে পারব না। কতদিন এরা এটা চালাবে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। আমেরিকার চোখ খুলেছে। আমেরিকা নানা দেশের সঙ্গে সোজাসুজি কারবার চালাবার জন্য চেষ্টা করছে।

প্রঃ—তা হলে পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের লোকেরা কি লণ্ডনের বাজারে সোনা কিনতে বাধ্য?

উঃ—আমি যতদূর জানি ঐ রকমই বটে। ভারতবর্ষের জন্য ত নিশ্চয়ই। জার্ম্মাণি এখন সোজা আমেরিকা থেকে সোনা পায় কিনা বলতে পারি না। আগে তাদের ঐ রকম করতে হত।

প্রঃ—ভারত গভর্ণমেণ্টকেও এই ৪ জনের কাছ থেকে সোনারূপা কিনতে হয়?

উঃ—এটা সত্য যে ইণ্ডিয়ান গভর্ণমেণ্ট এদের মারফতেই কিনে থাকেন; কিনতে বাধ্য এটা বলা যায় না।

প্রঃ—আজকাল সোনা সব চেয়ে বেশী উৎপন্ন হয় কোথায়?

উঃ—সকলের চাইতে বেশী তৈয়ারী হয় ইউনাইটেড্‌ ষ্টেটস্‌, তার চেয়ে কম ক্যানাডায়, তার চেয়ে কম মেক্সীকোতে, নর্থ আমেরিকার চেয়ে কম সাউথ আমেরিকায়, ইয়োরোপের বেশীর ভাগ রুশিয়াতে তৈয়ারী হয়, ভারতবর্ষে রুশিয়ার চেয়ে বেশী তৈয়ারী হয়, জাপান রুশিয়ার সমান তৈয়ারী করে, অষ্ট্রেলিয়ায় গোটা ইউরোপের চেয়ে বেশী তৈয়ারী হয়, দক্ষিণ আমেরিকার চেয়ে রুশিয়াতে বেশী হয়, গোটা ইয়োরোপের চেয়ে ভারতে বেশী হয়।

প্রঃ—তাহলে কি অষ্ট্রেলিয়ায় ভারতের সমান তৈয়ারী হয়?

উঃ—না, অষ্ট্রেলিয়াতে বেশী হয়। কিন্তু ভারত ও অষ্ট্রেলিয়ার চেয়ে বেশী হয় আফ্রিকাতে। দক্ষিণ আমেরিকা ও ইয়োরোপ মিলিয়ে যত হয় এক আফ্রিকাতেই তত হয়। গোটা দুনিয়ায় ১৯২৪ সনে ১৮৮ লক্ষ আউন্স সোনা তৈয়ারী হয়েছে, তাহার দাম ৩৯ কোটি ডলার অর্থাৎ প্রায় ১২০ কোটি টাকা। রূপা তৈয়ারী হয়েছে ২৪ কোটি আউন্স,

তাহার দাম প্রায় ১৮ কোটি ডলার অর্থাৎ প্রায় ৫৪ কোটি টাকা।

প্রঃ—আমাদের দেশে যে সোনা হয়, সেটা কি একেবারে বিলাতে চলে যায় ও সেখান থেকে বিক্রী হয়?

উঃ—দর-দস্তুর, কথাবার্ত্তা সেখানে হয়, বিক্রী এখানে হয়।

প্রঃ—আপনাদের কি রকম?

উঃ—এখানে খরিদ হয়?

প্রঃ—বিদেশ থেকে আমদানি হয়?

উঃ—রূপা বৃটিশ ইণ্ডিয়াতে খুব কম হয়, আমেরিকা থেকে বেশী আসে, দক্ষিণ আমেরিকাতে রূপা তৈয়ারী হয় ১৭ কোটী আউন্স, ভারতবর্ষে হয় মোট ৫৩ লক্ষ আউন্স। রূপা আর সোনা বেশীর ভাগ বাহির থেকে আমদানি হয়।

প্রঃ—আপনাদের কি কি শিল্প-কারখানা আছে?

উঃ—একটা জুটমিল ও ৩টা কটন মিল।

প্রঃ—জুটমিল কোথায়?

উঃ—বজবজের কাছে শ্যামগঞ্জ, নাম বিড়লা জুট ম্যানুফ্যাক্চারিং কোম্পানী।

প্রঃ—কটনমিল কোথায়?

উঃ—একটা কলিকাতায় নাম কেশোরাম কটনমিল, একটা দিল্লীতে ও একটা গোয়ালিয়রে।

প্রঃ—কত লোক খাটে?

উঃ—আন্দাজ ৪ হাজার।

প্রঃ—এর ভিতর এঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি উচ্চদরের টেক্‌নিক্যাল কাজ জানা লোক কত, আর কেরাণী কত?

উঃ—প্রায় ১২ জন খুব উঁচুদরের টেক্‌নিক্যাল কাজ জানা লোক আছে, কেরাণী হবে প্রায় ৬০।৭০ জন। তাদের অনেক রকম শ্রেণী আছে। হেড জবার, লাইন জবার মিস্ত্রি ইত্যাদি টেক্‌নিক্যাল কাজ জানা লোক আছে যারা হাতে কলমে কাজ করে।

প্রঃ—শ্যামগঞ্জে মজুরদের ভিতর সব চেয়ে বেশী মাহিনা পায় কারা?

উঃ—হেড জবার। তারা মাসে প্রায় ১৫০৲।২০০৲ পায়।

প্রঃ—কটনমিলে কি কি তৈয়ারী হয়?

উঃ—সূতী কাপড় তৈয়ারী হয় অর্থাৎ ষ্ট্রাইপ ধুতি, মার্কিণ ধুতি, সার্টিং রঙ্গীন কাপড়, গামছা, লুঙ্গী, রঙ্গীন সুত, গজ ক্লথ, হস্‌পিটেল সাপ্লাই অ্যাব্‌জরবেন্ট ড্রেসিং কটন, বেল্টিং অর্থাৎ কেমেল হেয়ার বেল্ট্‌স্‌ ইত্যাদি।

প্রঃ—৩টী কটন মিলের ভিতর প্রত্যেকটিতেই সব কয়টা জিনিষ তৈয়ারী হয়, না ভাগাভাগি করে হয়?

উঃ—কলিকাতায় যেটা আছে তাতে বাংলার উপযুক্ত মাল তৈয়ারী হয়। গোয়ালিয়রে যেটা আছে তাতে শতকরা প্রায় ৬০ অংশ গোয়ালিয়র ষ্টেটের উপযোগী মাল তৈয়ারী হয়। বাকী ইউ, পি ও পাঞ্জাবের মার্কেটের জন্য তৈয়ারী হয়। দিল্লীর মিলে যে-সব জিনিষ তৈয়ারী হয় তাহা পঞ্জাবের মার্কেটের জন্য হয়। প্রদেশ হিসাবে চাহিদা বিভিন্ন হয়।

প্রঃ—৩টী কটনমিলে মোটের উপর কত লোক খাটে?

উঃ—কেশোরাম কটনমিলে ৩,৫০০, গোয়ালিয়রে ২,৫০০ ও দিল্লীতে ১,৫০০, মোট প্রায় সাড়ে সাত হাজার হবে।

প্রঃ—এর ভিতর টেক্‌নিক্যাল বিদ্যাওয়ালা লোক কত জন আছে?

উঃ—একটা মিলের কথা বল্লেই বুঝতে পারবেন। কটন মিলে হেড্‌ জবারের ষ্টাফ ছাড়া সকলের উপরে এক জন রাখতে হয়, তাকে কোন সময় সেক্রেটারী, কোন সময় ম্যানেজার বলা হয়, তার নীচে আর এক জন থাকে, তাকে অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী বা অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজার বলা যায়। তারপর অন্যান্য ডিপার্টমেণ্টে টেক্‌নিক্যাল বিদ্যাওয়ালা লোক বিভক্ত হয়ে যায়, এক দিক্‌ যায় তুলা কেনার কারবারে, কেহ স্পিনিং কেহ উইভিং, কেহ ডাইং, কেহ ব্লিচিং, কেহ ইঞ্জিন এসব ভিন্ন ভিন্ন লাইনে বিভক্ত হইয়া যায়। ঋতু অনুসারে তুলা কেনার কারবারে লোক রাখতে হয়, তাতে প্রায় ৪।৫ জন থাকে। এদের খুব হুসিয়ার ও সৎলোক হওয়া দরকার। প্রত্যেকটিতে এই রকম রাখতে হয়—তারপর আমরা মিলিয়ে মিশিয়ে কাজ করি। যদি আমাদের মিল একটা থাকত তা হলে খরচ বেশী পড়ত। স্পিনিংএ একজন স্পিনিং মাষ্টার

থাকে। তার নীচে আবশ্যকমত অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট মাষ্টারস্ থাকে। এই ধরণের লোক কেশরামে বেশী এবং গোয়ালিয়র ও দিল্লীতে কম আছে।

প্রঃ—হেড জবার কাকে বলে?

উঃ—অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট মাষ্টারস্‌দের নীচে হেড জবার এক একটা সাব ডিপার্টমেণ্টে থাকে। তারা মজুর ক্লাশ থেকে উঠেছে। যারা সাব ডিপার্টমেণ্টে কাজ করে, তারা হেড জবারের নীচে থাকে। তার অধীনে লাইন জবার থাকে। লাইন জবারের অধীনে যারা কাজ করে তারা মামুলী টেক্‌নিক্যাল কাজ জানা মজুর।

প্রঃ—লাইন জবার বলতে কি বুঝব?

উঃ—এক একটা লাইনে যত জন মজুর আছে লাইন জবারেরা তাহাদের সুপারভাইজ করে ও কাজ আদায় করে নেয়।

প্রঃ—তারা কি ইন্‌স্পেক্টরের মত?

উঃ—কাজে যদি কেহ ভুল করে লাইন জবারেরা ঠিক করে দেয়। লাইন জবারেরা যা করে হেড জবার তা তদবির করে। হেড জবারেরা যা করে অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট মাষ্টার তা দেখে, এবং অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট মাষ্টারদের ভুলচুক হেড মাষ্টাররা দেখে।

প্রঃ—হেড জবারকে কোন মেসিন্ দিয়া কাজ করতে হয়, লাইন জবারকে কোন্ মেশিন দিয়া কাজ করতে হয়?

উঃ—এরা প্রধানতঃ পরিদর্শক ও শিক্ষক। নীচে যারা কাজ করে তাদেরকে এরা শিখিয়ে দেয় ও ভুল হলে শুধ্‌রিয়ে দেয়।

প্রঃ—তাহলে স্পিনিং ডিপার্টমেণ্টে হেডজবার একজন ও লাইন জবার একজন।

উঃ—হেডজবার একজন নয়, বেশী আছে। এক একটা সাবডিপার্টমেণ্টে এক একজন। ব্লীচিং ডিপার্টমেণ্ট ড্রাইং ডিপার্টমেণ্ট ও অন্যান্য ডিপার্টমেণ্টে এক একজন হেড জবার আছে।

প্রঃ—হেড জবার ও লাইন জবারের মাহিনার কত পার্থক্য হয়?

উঃ—ভাল রকম কাজ করতে পারলে হেড জবারেরা প্রায় ১৫০৲ টাকা পায়, আর লাইন জবারেরা ৮০৲।১০০৲ টাকা পায়।

প্রঃ—এরা কি লেখাপড়া-জানা লোক?

উঃ—লেখাপড়া-জানা লোক হলে ভাল হয়, লেখাপড়া-জানা লোক তৈয়ারী করবার জন্য আমরা অনেক চেষ্টা করেছি। অনেক বন্ধু-বান্ধবদেরও বলেছি। কতকগুলি লোককে এই ভাবে শিক্ষিত করা হয়েছে পাশ করিয়ে কাজ শিখিয়ে দিয়ে লাইন জবার হেড জবার অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট মাষ্টার পর্য্যন্ত নিয়ে গিয়েছি। কিন্তু যত লোক চাই তত পাই না। আগে যন্ত্রপাতির ভিতর কাজ না করলে কেহ শিখতে পারে না। অথচ যন্ত্রপাতির কাজে অভ্যাসওয়ালা শিক্ষিত লোক পাওয়া যায় না। জুট মিলে ঐ রকম করে আমরা কাজ শিখিয়ে নিয়েছি, স্পিনিং মাষ্টার, উইভিং মাষ্টার সব দেশী লোক তৈয়ারী করে নিয়েছি।

প্রঃ—হেড জবার ও লাইন জবারের ভিতর হিন্দু বেশী না মুসলমান বেশী?

উঃ—এই ভাবে কিছু বলা যায় না—২ রকম লোকই আছে। স্পিনিং ডিপার্টমেণ্টে হিন্দুরা ভাল কাজ করতে পারে, উইভিং ডিপার্টমেণ্টে মুসলমানেরা ভাল কাজ করতে পারে।

প্রঃ—তাহলে এক একটা কটন মিলে সাড়ে তিন হাজার লোকের মধ্যে টেক্‌নিক্যাল বিদ্যাওয়ালা উঁচু দরের লোক কত জন?

উঃ—কেশোরাম কটন মিলে একজন ইঞ্জিনিয়ার, ২ জন স্পিনিং মাষ্টার, ২ জন উইভিং মাষ্টার, ২ জন ডাইং মাষ্টার, ২ জন ব্লিচিং মাষ্টার আছে। তার নীচে অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট মাষ্টারস্ আছে।

প্রঃ—অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট মাষ্টারস্ কত জন?

উঃ—১০।১২ জন।

প্রঃ—সব ডিপার্টমেণ্ট ধরে হেড জবার ও লাইন জবার কত জন?

উঃ—হেড জবার হবে প্রায় ১২, লাইন জবার অনেক।

প্রঃ—আমি জানতে চাই কেশরাম ফ্যাক্টরিতে উচ্চ শ্রেণীর

কর্ম্মচারীরা সকলে মিলে মাসে মোট কত মাহিনা পায় ?

উঃ—প্রায় ৬০০০৲ টাকা হবে।

প্রঃ—হেড জবার ও লাইন জবার ?

উঃ—২টী মিলে মাসে ৬।৭ হাজার টাকা হবে।

প্রঃ—মজুরের মাহিনা ?

উঃ—কেশোরাম মিলে মাসিক আন্দাজ ১,২৫,০০০৲ টাকা হবে।

প্রঃ—৩৫০০ লোকের মধ্যে যারা খাঁটি মজুর, যারা মেশিন দিয়ে কাজ করে, তাদের ভিতর সব চেয়ে বেশী মজুরী কত পড়ে ?

উঃ—উইভারেরা বেশী রোজগার করে। কত পায় তাহা নিজের খাটুনীর উপর নির্ভর করে। এমন লোক আছে যারা মাসে ৬০ টাকা রোজগার করে। ৫০ টাকা রোজগার করে এমন লোক অনেক আছে।

প্রঃ—এই বেতন কোন্ রীতি অনুসারে দেওয়া হয় ?

উঃ—উইভিংএ "পিস্ওয়ার্ক,"—যে যত সের কাপড় তৈয়ারী করে সেই অনুসারে পায়।

প্রঃ—সপ্তাহে সপ্তাহে দেওয়া হয় না মাসের শেষে ?

উঃ—যেমন দরকার হয় দিয়ে দেওয়া হয়, হিসাব করা হয় মাসে একবার।

প্রঃ—কিন্তু দেওয়া হয় মাসে কয়বার ?

উঃ—চাইলেই দিয়ে দিই। আমাদের হিসাবে তাদের রোজগার লেখা থাকে, যেমন চায় দিয়ে দিই। কিন্তু চুক্তি হিসাবে মাসে একবার দেওয়ার নিয়ম।

প্রঃ—কেশোরামে সমস্ত যন্ত্রপাতি ও ঘরবাড়ীর দাম কত ?

উঃ—যুদ্ধের সময় যখন মেশিনারীর দাম খুব বেড়ে গিয়েছিল তখন ফী স্পিণ্ড্‌ল্ টাকু প্রতি একশ' টাকার চেয়ে বেশী পড়েছে। এখন কমে গিয়েছে। নূতন মিল তৈয়ারী করতে হলে এখন প্রায় ৫০ টাকায় দাঁড়াবে। ৩,৫০০ লোক কাজ করবার মিল্ তৈয়ারী করতে হলে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা খরচ হবে। কিন্তু কটন মিলের দাম এত কমে গেছে যে, নূতন মিল করা অপেক্ষা পুরানো মিল্ যদি কেনা যায় তবে সস্তায় হয়।

প্রঃ—তাহলে কি আপনি বলবেন, যদি কোন বড় কারবার করতে হয় তাহা হইলে প্ল্যাণ্ট ও মেশিনারীর জন্য ৪০ লক্ষ টাকা ফেলতে হবে।

উঃ—বড় কারবারের দরকার নাই—৪,৫০০ হাজার লোক খাটাতে হলেই ৪০ লক্ষের কমে হয় না।

প্রঃ—তাতে বৎসরে কুদরতী মাল কত দরকার হয় ?

উঃ—মাসে ২০০০ গাঁট তুলা খরচ হয়।

প্রঃ—তার দাম কত ?

উঃ—আজকালকার হিসাবে ১০ হাজার মণ। তার দাম ৩,৫০,০০০৲ টাকা।

প্রঃ—আপনাদের লোকজনের ভিতর বিদেশী অর্থাৎ অ-ভারতীয় কোনো কর্ম্মচারী আছে ?

প্রঃ—৩ জন আছে, ২ জন ইঞ্জিনিয়ার একজন ডাইং মাষ্টার। শুধু কেশোরামে তাই আছে গোয়ালিয়র ও দিল্লীতে নাই। জুট মিলে একজন ইঞ্জিনিয়ার ও উপরের দিকে আর একজন আছে। বাকী সব ইণ্ডিয়ান। আমাদের বেশী অসুবিধা হয়েছে জুট মিলে। কটনমিলে চেষ্টা করলে ইণ্ডিয়ান পাওয়া যায়, জুট মিলে তৈয়ারী করতে হয়েছে।

প্রঃ—কেন ?

উঃ—জুট মিল কলিকাতায় ছাড়া আর নাই। সাহেবদের আছে, তারা ইণ্ডিয়ানদের তৈয়ারী করে না। উঁচু দরের ভারতবাসী জুট মিলে নাই। আমরা তৈয়ারী করছি।

প্রঃ—কত জন তৈয়ারী করেছেন ?

উঃ—প্রায় ১০।১২ জন।

প্রঃ—আচ্ছা, এবার আমি বিড়লা ব্রাদার্সের সমস্ত কারবার সম্বন্ধে মোটামুটী ২।১টী কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। আপনাদের আমদানি, রপ্তানি ও শিল্প-কারখানা এই ৩ লাইনের ভিতর টাকার হিসাবে সব চেয়ে বড় কারবার কোনটা ?

উঃ—টাকা খাটানো হিসাবে শিল্প কারখানা সব চেয়ে বড়।

প্রঃ—আমদানি ও রপ্তানির ভিতর কোন্‌টা বেশী, কোন্‌টা কম ?

উঃ—আমদানি বেশী।

প্রঃ—আমদানিতে বৎসরে গড়পড়তা কত টাকার কারবার চলে?

উঃ—তার কোন ঠিক নাই।

প্রঃ—৪ মিলে যন্ত্রপাতি বাড়ীঘরের কিম্মৎ কত?

উঃ—কিনবার সময়ে আমাদের লেগেছে বেশী, আজকালকার বাজার-দর হিসাবে যন্ত্রপাতি ঘর-বাড়ীর দাম কম। জুটমিলে প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা লেগেছে। কেশোরাম কটন মিলেও সেইরূপ। গোয়ালিয়র কটন মিলে ৬০ লাখ, দিল্লী মিলে প্রায় ২০ লাখ লেগেছে।

প্রঃ—আচ্ছা, আজকালকার বাজারে বড় বাড়ী তৈয়ারী করতে যন্ত্রপাতি আসবাবপত্র খরচ কম হয় কেন?

উঃ—আজকাল লোহার জিনিষপত্রের দাম কমে গেছে। যন্ত্রপাতি সস্তায় পাওয়া যায়। বাড়ীঘর তৈয়ারী করবার অন্যান্য জিনিষপত্রের বাজারদরও আজকাল কম।

প্রঃ—৪টী ফ্যাক্টরীর কুদরতী মালে বৎসরে কত টাকা খরচ হবে কি রকম ভাবে আপনারা তাহা স্থির করেন?

উঃ—সেটা আমাদের জানা আছে। মরশুম জানা আছে সেই হিসাবে বাড়ানো-কমানো হয়।

প্রঃ—মজুরী ও বেতন ৪ মিলে কত?

উঃ—মাসে প্রায় ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।

প্রঃ—কুদরতী মাল?

উঃ—৩টী কটন মিলে গড়পড়তা ১৮ হাজার মণ তুলায় মণ প্রতি ৩০ টাকা করে প্রায় ৫ লাখ টাকা মাসে লাগে। তা ছাড়া জুটমিলে মাসে ৩৪ লাখ টাকা যায়।

প্রঃ—তা হলে মোটের উপর বৎসরে আপনাদিগকে কত খরচের দায়িত্ব নিতে হয়?

উঃ—৮৷১০ কোটি টাকা।

প্রঃ—এই ৪টী মিল কি বিড়লা ব্রাদার্সের নিজ সম্পত্তি?

উঃ—জুটমিল নিজ সম্পত্তি, কেশোরামে বাইয়ের অনেক অংশীদার আছে, দিল্লী ও গোয়ালিয়র মিলেও বাইরের অংশ আছে।

প্রঃ—তাহলে কেশোরামের সঙ্গে বিড়লা ব্রাদার্সের সম্বন্ধ কি?

উঃ—বিড়লা ব্রাদার্স ম্যানেজিং এজেণ্ট।

প্রঃ—খরচপত্র ছাপা হয় কি?

উঃ—হয়। গত বৎসরের হিসাবপত্র দেখতে পারেন।

প্রঃ—কেশোরাম মিলে যে সব খরচপত্র হয় তাহা বিড়লা ব্রাদার্সের মারফৎ হয়?

উঃ—আলাদা আলাদা নামে বিড়লা ব্রাদার্সকে ব্যবস্থা করতে হয়।

প্রঃ—শিক্ষিত ভারত-সন্তানের কাজ পাওয়ার মত কোন সুযোগ আপনাদের ওখানে আছে কি?

উঃ—নিশ্চয়ই আছে। আমরা সেজন্য অনেক চেষ্টাও করে থাকি। শিক্ষিত লোক যদি মেসিনে কাজ করতে আরম্ভ করে তবে তার খুব ভাল ভবিষ্যৎ আছে।

প্রঃ—শিক্ষিত লোক বলতে কি রকম ধরণের লোক বুঝব?

উঃ—ধরুন আমি বি, এ, বি, এস-সি পাশ করেছি কিন্তু চাকুরী পাচ্ছি না কিংবা যে চাকুরী পাচ্ছি তাতে আমার ভাল রকম চলছে না এই রকম অবস্থায় যদি আমি যন্ত্রপাতি ঘেঁটে অন্যান্য মজুরদের সঙ্গে কাজ করতে আরম্ভ করি তাহা হইলে অল্প সময়েই কেরাণীগিরি করে আমি যতটাকা পেতাম, তার দ্বিগুণ, তিনগুণ এমন কি তারও ঢের বেশী পেতে পারি। শিক্ষিত লোক যদি কাজ শিখে তবে তারা উঁচুতে উঠতে পারে। কদ্দূর উঠতে পারবে সেটা নিজের যোগ্যতার উপর নির্ভর করে।

প্রঃ—আপনার কাছে কি প্রায়ই শিক্ষিত লোকেরা চাকুরীর উমেদারী করতে আসে ?

উঃ—হাঁ, আমার কাছে অনেকে আসে। আমি তাদেরকে যন্ত্রপাতির বিভাগে শিক্ষানবীশ মত কাজ দিয়ে দেখেছি, প্রায়ই তারা এই সব কাজে লেগে থাকে না। অল্প দিন পরে ছেড়ে চলে যায়। যারা লেগেছিল তারা অনেক উঁচুতে উঠেছে।

প্রঃ—আপনি সাধারণভাবে দুই এক কথা বলতে চান কি ?

উঃ—হাঁ, আমার ইচ্ছা যে শিক্ষিত লোকেরা কলকব্জার কাজে হাত দুরস্ত করতে শিখুক। নিরক্ষর মিস্ত্রিরা যন্ত্রপাতি ঘেঁটে যতটা ফল দেখাতে পারে শিক্ষিত লোকেরা কলকব্জায় ওস্তাদ হয়ে উঠলে তার চেয়ে বেশী ফল দেখাতে পারবে। নিরক্ষর মজুব মিস্ত্রিদেরকে শিক্ষিত করে তোলা যেমন আমাদের দেশের একটা সমস্যা, তেমনি শিক্ষিত লোকদেরকে মজুর-মিস্ত্রির কাজে—যন্ত্রপাতি ব্যবহারে মজবুত করে তোলাও আমাদের দেশের পক্ষে একটা দরকারী জিনিষ। আমার ইচ্ছা যে, আমাদের দেশে বি, এ, বি, এস-সি পাশ ও ফেল করা লোকেরা দেশের নানা জায়গায় ফ্যাকটরী কারখানাতে ঢুকে অন্নসংস্থান করতে সুরু করুক। প্রথম প্রথম অবশ্য এদেরকে মজুর-মিস্ত্রিদের সঙ্গে একই আবহাওয়ায় থেকে কাজ করতে ও কাজ শিখতে হবে। কিন্তু অল্পকাল মধ্যে এরা রোজগার হিসাবে উন্নতি করতে পারবে। এবং সঙ্গে সঙ্গে, আমার বিশ্বাস, ফ্যাক্টরীর আবহাওয়াও এরা অনেকটা বদলে দিতে পারবে।
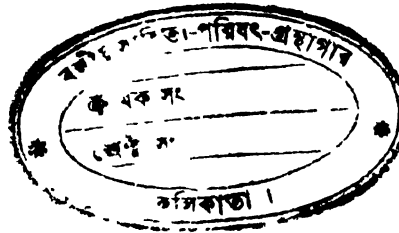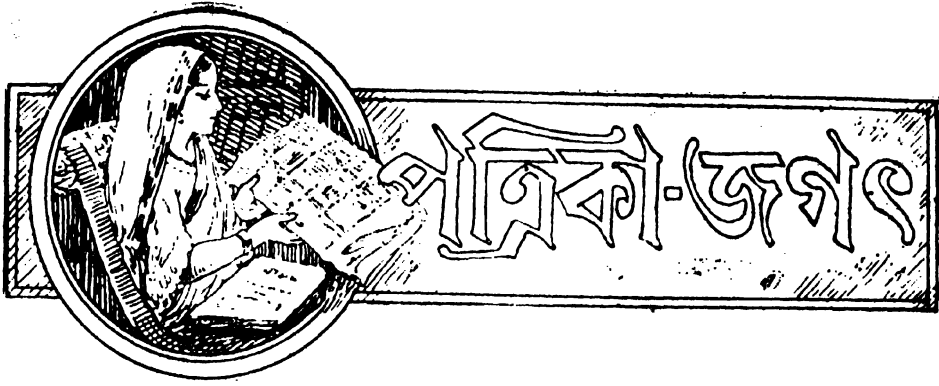
টাইম্‌স ইম্পীরিয়্যাল অ্যাণ্ড ফরেন ট্রেড অ্যাণ্ড এঞ্জিনিয়ারিং সাপ্লিমেণ্ট :—পোল্যাণ্ড এবং ডানৎসিগ স্বাধীন শহর

শিল্প-সংখ্যা। লণ্ডন। শনিবার, ২০ নবেম্বর, ১৯২৬। ৩ পেন্স। পত্র-সংখ্যা ৪৭৬৪।

এই ৬৪ পৃষ্ঠার মধ্যে ৩২।৩৩ পৃষ্ঠা আছে প্রবন্ধাদি। আর বাকী পৃষ্ঠাগুলি গিয়াছে বিজ্ঞাপনের জন্য। লেখ-সূচী এইরূপ :—(১) পোল্যাণ্ডের আর্থিক অবস্থা (এইচ, কৌৎসিক) (২) কৃষি (ডাক্তার মারসেলি রোৎসান্‌স্‌কি) (৩) চাষের টাকাকড়ি (ওয়াম্ন বোরোহ্ব্‌স্‌কি) (৪) কৃষি-জাত দ্রব্যের রপ্তানি (জেরৎসী গোস্‌সিস্‌কি) (৫) আলু হইতে প্রস্তুত দ্রব্যের ব্যবসাসমূহ (এম, পোরোহ্ব্‌স্‌কি) (৬) পুঁজি-বৃদ্ধি। (ক্রোলিকোহ্বস্‌কি) (৭) বীট চিনির ব্যবসা (জান্‌ৎসা গ্নেনিস্‌ৎস্‌নি) (৮) কৃষি-'সংগঠন'। ৎসবিগনিউ (ৎসাণ্টো-হ্ব্‌স্‌কি) (৯) বন-সম্পদ্ (হ্বলাড্‌ঈস্‌লাহ্ব বারানস্‌কি) (১০) আমদানি রপ্তানির নিয়মাবলী (১১) পোল্যাণ্ডের কয়লা (জে, সী-বুলস্কি) (১২) ইয়োরোপের কয়লা কন্‌ভেনশন (এন্, ডোবিস্) (১৩) আপার সাইলেশিয়ার ব্যবসা-সমূহ (১৪) লোহা ও ইস্পাতের উৎপাদন (হ্ব্‌লাড্‌ ঈসলাহ্ব ফুস্‌ৎসেহ্ব্‌স্‌কি) (১৫) পোল্যাণ্ডে পেট্রোলিয়াম (ডাক্তার ষ্টেফান বার্‌টোস্‌ৎসেহ্বিস্‌ৎস) (১৬) ব্রিটেন ও পোল্যাণ্ড (ফ্রান্সিস্ বৌয়ের সৎসারনোম্‌স্‌কি) (১৭) পোল্যাণ্ডের বাজার (১৮) পোল্যাণ্ডের বহির্ব্বাণিজ্য-নীতি (এস, সাভোহ্বস্‌কি) (১৯) পোল্যাণ্ডের আর্থিক উন্নতি (লাডিস্লাস্ ই, এ, গিয়েঈস্‌ৎষ্টোর) (২০) এঞ্জিনিয়ারিং (অধ্যাপক এস, জে, ওকোলস্কি) (২১) জিঙ্ক গলান (এস্, ডহ্বোরৎসান্‌স্‌ৎসীক) (২২) তাঁত ও বুনন (ডাক্তার এম্, বার সিন্‌স্কি) (২৩) পোল্যাণ্ডে ব্যাঙ্কিং (ডাক্তার ফেলিক্স ম্লিনার্‌স্কি) (২৪) সিমেণ্ট ব্যবসায় (আণ্টোনি এইগের) (২৫) নয়া নয়া সরকারী কোঠাবাড়ী (পিটুর দ্রুৎসেহ্বিস্‌কি) (২৬) সর্ব্বসাধারণের লবণের উৎস (কে, বুরোহ্বস্‌কি) (২৭) পোটাসিয়াম্ সল্ট (ই, লারহ্বিন্ স্‌ৎসীমানোহ্বস্‌কি) (২৮) রসায়ন-শিল্প (টাডয়স্‌ৎস ৎসাসোয়িস্কি) (২৯) জুতা ও চামড়ার কারবার (ষ্টানিস্‌লাস্ সৎসীপোহ্বস্‌কি) (৩০) কাগজের কল (এডওয়ার্ড নাটানসোন) (৩১) পোল্যাণ্ডের ব্যাঙ্ক (হ্বাই-লাহ্ব স্‌ৎস্বরিগ্) (৩২) প্যোলাণ্ডের ব্যোমপথ (ডাক্তার ই, হ্বিগার্ড) (৩৩) পোল্যাণ্ডের আর্থিক বৃদ্ধি (সি, ম্লারনের) (৩৪) স্থলযান (টি, এবেরহার্ড) (৩৫) গিদিনিয়া বন্দর (জে, রাসেল) (৩৬) পোল্যাণ্ডের সামুদ্রিক বাণিজ্য (আলফ্রেড সিবেনইচেন) (৩৭) ডান্‌ৎসিগের বাণিজ্য (এন্, নাগোর্‌স্‌কি) (৩৮) বন্দরের লটবহর (৩৯) ডান্‌ৎ-সিগের ব্যবসাসমূহ।

এই তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যাইবে কত ভিন্ন ভিন্ন লোক কত ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে মাথা ঘামাইয়া থাকে। পোল্যাণ্ডের লোকেরা লিখিতেছে পোল্যাণ্ডের তত্ত্ব ইংরেজীতে—একটা বিদেশী ভাষায়।

কৌৎসিক পোল্যাণ্ডের বাজেট লইয়া আলোচনা করিতেছেন। ১লা এপ্রিল ১৯২৭ হইতে ৩১শে মার্চ্চ ১৯২৮ পর্য্যন্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব ধরা হইয়াছে।

লক্ষ ৎস্লোটিশ

(১) শাসন ১২,১১২ (রাজস্ব) ১৮,৯৭৯ (ব্যয়)

(২) রাষ্ট্র কর্ত্তৃক ব্যবসা চালানো যায় কিনা কোন কোন বিষয়ে সেই পরীক্ষা বাবদ ৯২৫ (রাজস্ব) ৮ (ব্যয়)

(৩) সরকারী

একচেটিয়া ৫,৯৫৫ (রাজস্ব) ...

মোট ১৮,৯৯২ (রাজস্ব) ১৮,৪৯৮৭ (ব্যয়)

সমগ্র বৎসর ধরিয়া প্রাণপণে ব্যয়-হ্রাসের ফলস্বরূপ এই বাজেট তৈয়ারী হইয়াছে।

রোৎসান্স্কি বলিতেছেন, "পোল্যাণ্ডের সমগ্র উৎপাদনের দর যত তার ৭৫% হইতেছে চাষ-আবাদের ফল। দেশের ৬৫% জন হইল চাষা। ডেনমার্কে চাষা ৪৮ জন, জার্ম্মাণিতে ৩৫ জন এবং ইংল্যাণ্ডে ৮ জন। পোল্যাণ্ডের চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ৪৯%। ডেনমার্কের কিছু উর্দ্ধে। ইংল্যাণ্ডের ২৭.৩%। বেলজিয়ামের ৪৫·৯%। জার্ম্মাণির ৪৫.৮%। ইতালির ৪৪.৯%।

পোল্যাণ্ডের ফসলী জমি—১,৮৩,০৭,৮০০ (৪৮.৬%) হেক্টার
খড় ঘাসের মাঠ— ৩৮,৩৮,০০০ (১০.২ ,,) হেক্টার
গোচারণ-ভূমি— ২৫,২৮,৬০০ (৬.৭ ,,) হেক্টার
বন-জঙ্গল— ৯০,৬২.১০০ (২৪.১ ,,) হেক্টার
বিবিধ ও পতিত জমি— ৩৯,২৪,৮০০ (১০.৪ ,,) হেক্টার

সম্পত্তিগুলি টুক্‌রা হইয়া যাইতেছিল। যুদ্ধের দরুণ তাহা কতক বন্ধ হয়। বড় বড় সম্পত্তির আয়তন এইরূপ কমিয়াছে :—

ওয়ার্‌স ১১,৩৪,০০০ হেক্টার (১৯০৯) ৮,৪৬,২০০ হেঃ (১৯২১)
কিল্‌সি ৭,৪৭,৭০০ হেঃ (১৯০৯) ৪,৯৩,৮০০ হেঃ („)
লোড্‌ৎস ৬,৫৮,৯০০ হেঃ („) ৪,৪৫,৯০০ হেঃ („)
লুব্‌লীন ১০,৪৭,৭০০ হেঃ („) ৭,৪২,৪০০ হেঃ („)
বিয়ালিষ্টোক ১,৬৯,১০০ হেঃ („) ১,২৫,০০০ হেঃ („)

কোন কোন দিকে পোল্যাণ্ড তার কৃষি-উৎপন্ন দ্রব্যের রপ্তানি করিতে পারিবে তা এখনও স্থির হয় নাই।

জমির শস্য-উৎপাদন সন্তোষজনক নহে। অর্থাৎ আরো ভাল করিয়া চাষ করিলে আরো বেশী ফসল পাওয়া যাইতে পারে। হর্টিকালচারের উন্নতির জন্য অনুকূল অবস্থা রহিয়াছে। তরিতরকারী ও ফুলফলের বাগানের উন্নতি হইয়াছে। যুদ্ধের পর হইতে হাঁস মুরগী গরু ঘোড়া ইত্যাদির বংশবৃদ্ধির চেষ্টা হয় নাই।

পোল্যাণ্ডে	১৯১০	সনে	ঘোড়া	ছিল	৩৪,০২,৬০০ ;	১৯২১ সনে হইয়াছিল		৩২,৯৪,৭৬৪
„	„		গরু	„	৮৩,৭১,৮০০ ;	„	„	৮১,৩১,৭৮৩
„	„		ভেড়া	„	৪২,৭৭,১০০ ;	„	„	২৩,০৫,৫১০
„	„		শূকর	„	৫২,৩১,১০০ ;	„	„	৫৪,২৪,৯৮৮
„	„		মৌমাছি	„	...	„	„	৭,৩৪,০০০
„	„		হাঁস মুরগী	„	...	„	„	৪,০০,০০,০০০

এই হিসাবের উপর নির্ভর করিয়া পাওয়া যাইতেছে,—

মাংস ...	...	৭,৯৮,৪৮৬	টন
পাখীর পালক	...	২,৭০০	„
দুধ ...	...	৪৩,৬১,৭৬৬	„
কাঁচা উল ...	...	২,৬৪৫	„
সাগর-দরিয়ার মাছ	...	৪,০০০	„
হ্রদের মাছ	...	১৬,০০০	„
ডিম ...	...	৯৩,০০০	টন
মোম ...	...	১৪৬	„
চর্ব্বি ...	...	৫০,০০০	„
ষাঁড়ের চামড়া	...	৭,৭০,০০০	খানা
ঘোড়ার চামড়া	...	২,৭০,০০০	„
বাছুরের চামড়া	...	৩৪,০০,০০০	„
ভেড়ার চামড়া	...	৮,৭০,০০০	„

চাষের উন্নতির জন্য টাকাকড়ি বেশী সময়ের জন্য ধার লইতে না পাইলে গরিব চাষীরা কিছু করিয়া উঠিতে পারিবে না। সেই সূত্রে জেরোহ্ব্‌স্কি বলিতেছেন, "(১) সরকারই একমাত্র ধনদাতা (২) সুদের হার অত্যন্ত চড়া—কোথাও ১০°/ₒ পর্য্যন্ত চাওয়া হয়। (৩) কতকগুলি প্রতিকূলতা বশতঃ "ল্যাণ্ড ক্রেডিট এসোসিয়েশন"গুলি লম্বা সময়ের জন্য টাকা ধার দিতে পারে না।"

ভূতপূর্ব্ব কৃষি-সচিব গোস্‌সিস্‌কি দেখাইতেছেন, পোল্যাণ্ডের কৃষিজাত দ্রব্যাদির বাণিজ্য ধীরে ধীরে কিরূপে প্রসার লাভ করিতেছে। গোস্‌সিস্‌কি বলেন "আমরা বিদেশে ক্রমাগত খাদ্যদ্রব্য—বিশেষ করিয়া জান্তব দ্রব্যাদি চালান দিতেছি। কিন্তু পশ্চিম ইয়োরোপের বাজারগুলি আমাদের দখল করা চাই-ই।"

পোরোহ্ব্‌স্কি দেখাইতে চাহেন আলু হইতে যে ব্যবসা-গুলির উৎপত্তি, তারা বেশ চলিতেছে, যদিও এগুলি যুদ্ধের পূর্ব্বের অবস্থা ফিরাইয়া পায় নাই। ডিষ্টিলিং (চুঁয়াইবার) শিল্প, আলুর ময়দা, ফ্লেক ও সিরাপ হইল এই ব্যবসার অন্তর্গত। যুদ্ধের পর ডিষ্টিলিং কমিয়া যাওয়ায় "ডিষ্টিলারস্‌ ওয়াশ্‌" ব্যবসার ক্ষতি হইয়াছে। উহা একপ্রকার উৎকৃষ্ট সার ছিল। গড়ে পোল্যাণ্ডে বৎসরে ৪৫,০০০ টন আলুর ময়দা তৈয়ারী হয়। ইহার ১৫.০০০ টন মাত্র নিজ ব্যবহারের জন্য লাগে। বাকীটা বিদেশে বেচিতে পাঠাইতে হইবেই।

ক্রোলিকোহ্ব্‌স্কি বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে পোল্যাণ্ডের পশু-পক্ষীর পুঁজি বাড়াইতে চাহেন। সেজন্য দরকার সঙ্ঘবদ্ধ ব্যবসার। এ বিষয়ে পোল্যাণ্ডের জমিজমা এবং জলবায়ু অনুকূলও বটে। ১৯২৪ সনে পোল্যাণ্ডে ঘোড়া ছিল ৪০ লক্ষ, গাই-বলদ ৮৮ লক্ষ, শূকর ৫৫ লক্ষ, ভেড়া ২৫ লক্ষ এবং মুরগী ইত্যাদি ৫ কোটি। বৎসরে ১২ লক্ষ গাই-বলদ, ২৭ লক্ষ বাছুর, ৫৫ লক্ষ শূকর ও ৮ লক্ষ ভেড়া 'জবাই' করা হয়। এই সব মাংসের দাম অন্যান্য বাজারের তুলনায় পোল্যাণ্ডের বাজারে বড় কম। বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই "পুঁজিটা" বাড়ানোও এইগুলিকে রপ্তানি করিবার সুবন্দোবস্ত করা পোল্যাণ্ডের আশু প্রয়োজন।

জান্‌ ৎসাগ্নেনিসৎস্কি পোল্যাণ্ডের চিনির ব্যবসার "প্রধান আড্ডা বা সভার" সহকারী সভাপতি। তিনি বলিতেছেন, "বীট ও বীটের বীজ চাষের পক্ষে পোল্যাণ্ডের জলবাতাস সকল দেশের সেরা। এখানে খুব বেশী পরিমাণ কাঁচা চিনিওয়ালা বীট পাওয়া যায়। কয়লা, কোক, চুণা, তেল ও সস্তা মজুরের কম্‌তি নাই। দেশের মধ্যেই প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও তৈয়ারী হইতেছে। সুতরাং পোল্যাণ্ডের চিনির ব্যবসার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, সন্দেহ মাত্র নাই।" তারপর পোল্যাণ্ডের চিনির ব্যবসার ইতিহাস একটু আলোচনা করা হইয়াছে। বীট-চাষ ও চিনি উৎপাদনের কিছু হিসাব দেওয়া যাইতেছে :—

বৎসর	মোট আয়তন (হেক্টার)	মোট ফসল (টন)	চিনি পরিষ্কারের কল	মোট উৎপাদন (টন)	দেশের খরচ (টন)
১৯১৩-১৪	১৭২,৯৯৪	৪০,৭৯,১৬০	৮৭	৫,৫৬,৬০০	৩,০০,০০০
১৯২০-২১	৬৯,৩১৩	১০,৫৩,৮৬৪	৬৫	১,৫৬,১০০	১,১৬,২০০
১৯২১-২২	৮১,৮৮০	১০,৩২,৭২৬	৬৮	১,৬০,১০০	১;২৯,০০০
১৯২২-২৩	১,০৭,৬৭৩	১৯,২৬,১৯৭	৭০	২,৭৩,৬০০	১,৭৮,০০০
১৯২৩-২৪	১,৪০,৪৮২	২৫,৫২,১৫৯	৭৪	৩,৪৪,৮০০	১,৮৩,০০০
১৯২৪-২৫	১,৬৮,১৬৭	৩১,৪৬,২৪৬	৭৫	৪,৪০,০০০	২,৫০,০০০
১৯২৫-২৬	১,৭৩,৯৪৬	৩৬,৭৭,০৮৪	৭২	৫,২০,০০০	২,৬৭,০০০
১৯২৬-২৭	১,৮৪,৫৭০				

পোল্যাণ্ড হইতে চিনির চালান যায় সব দেশেই; কিন্তু সব চেয়ে বেশী যায় ইংলণ্ডে ও হল্যাণ্ডে। বিলাতের সহিত কারবারের হিসাব এইরূপ :—

বছর	মোট রপ্তানির পরিমাণ (টন)	ইংলণ্ডে রপ্তানি (টন)
১৯২১-২২	৪০,০০০	—
১৯২২-২৩	৯৩,০০০	২৭,১৫০
১৯২৩-২৪	১৫৩,০০০	৬৭,৮৫০
১৯২৪-২৫	১,৮৬,০০০	৯৪,৯০০
১৯২৫-২৬	২,৫৩,০০০	১,৩৫,০০০

পোল্যাণ্ডে "ইউনিয়ন অব্ পোলিশ্ এগ্রিকালচারাল অরগ্যানিজেশন" (পোল্যাণ্ড কৃষি সংগঠন ইউনিয়ন) মোতায়েন রহিয়াছে। তার শাসন-পরিষদের জনৈক সভ্য ৎস্‌ন্টোহ্বস্কি পোল্যাণ্ডের কৃষি-সংগঠনগুলির পরিচয় দিতেছেন। তিনি বলেন, "এই সংগঠনের কাজ জোর চলিতেছে। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ হয় নাই। একটা নিখিল পোল্যাণ্ড ইউনিয়নেরও দরকার রহিয়াছে।"

বারানৃস্কি পোল্যাণ্ডের বন-সম্পদ্ দফায় দফায় আলোচনা করিয়া বলিতেছেন, "এটা একটা বিপুল জাতীয় সম্পত্তি।" দফাগুলি এই :—(১) অতি বিস্তৃত বনভূমি। পোল্যাণ্ডের বনভূমির আয়তন ৮৯,৪৩,৭৬২ হেক্টার অর্থাৎ সমগ্র দেশের ২৩% অংশ। রুশিয়া, সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড, জার্ম্মাণি ও ফ্রান্সের বন আয়তনে এর চেয়েও বড় বটে, কিন্তু দেশের লোকবলের তুলনায় নয়। (২) বনের জাতিভেদ (৩) রাষ্ট্রের এক্তিয়ারে বন। সরকারী বন-বিভাগ কিভাবে পরিচালিত হয়, তার একটু বিবরণ। (৪) জমীদারের সম্পত্তি। (৫) কাঠের যোগান। পোল্যাণ্ডের জলবাতাসে যত কাঠ উৎপন্ন হওয়া দরকার তত হয় না। কি করিলে তা হইতে পারে? (৬) করাত কল। পোল্যাণ্ডে ৮০০টা "স-মিল" করাত কল চলিতেছে। মজুর খাটিতেছে, ৫০,০০০। ছোট-বড় সব মিল মিলাইলে সংখ্যাটা হইবে ১৪০০। (৭) বর্ত্তমানের খুঁত কি। এক কথায়, সংগঠনের অভাব, রেল-জাহাজের বন্দোবস্ত এবং আসবাবপত্রের অ-প্রচুর রপ্তানি। (৮) কাঠ ডিষ্টিলিং। বারানৃস্কি আশা করেন, জগতের কাঠ-যোগান কমিয়া যাইতেছে, কিন্তু পোল্যাণ্ড এখনও অনেকদিন তার ব্যবসা চালাইতে পারিবে।

আমদানি-রপ্তানির নিয়মাবলীতে জনৈক পত্রপ্রেরক (১) "বাণিজ্য-লড়াই" (২) আমদানি লাইসেন্স ও (৩) গ্রেট বৃটেনের সহিত বোঝাপড়ার কথা তুলিয়াছেন।

কয়লা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন দুইজন। তন্মধ্যে সীবুল্‌স্কি "আপার সাইলেশিয়া মাইনিং ইউনিয়নের" অন্যতম সভ্য। তিনি পোল্যাণ্ডের কয়লার পরিমাণ, তার দোষগুণ ও তাগাদার পরিচয় দিয়াছেন। (১) উৎপাদন (২) কোক কয়লা (৩) রপ্তানির বাড়্‌তি (৪) বাণিজ্য-সংগঠন, তাঁর আলোচ্য বিষয়। পোল্যাণ্ডের কয়লার খনির মোট আয়তন ৫,১০০ বর্গ কিলোমিটার। তন্মধ্যে পূর্ব্বে জার্ম্মাণির হাতে ছিল ২,৩০০ বর্গ কিলোমিটার। ডোবিস ইয়োরোপের কয়লা কনভেন্‌শন ও পোল্যাণ্ডের কয়লার অবস্থা জ্ঞাপন করিতে গিয়া এক জার্ম্মাণ বিশেষজ্ঞের কথা ও ইংরেজ বিশেষজ্ঞের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ডোবিস্ ইংলণ্ড ও জার্ম্মাণির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া খননকার্য্য পরিচালিত করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ইহাদের মর্জ্জিমাফিক চলিতে না পারিলে কয়লার বাজার সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। পোল্যাণ্ড বাল্টিকের বাজারগুলি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি দখল করিয়া ফেলিয়াছে। কয়লা কনভেন্‌শনে যোগ দিলে পোল্যাণ্ড কি কি সুবিধা লাভ করিতে পারে দেখান হইয়াছে।

"লোহা ও ইস্পাতের উৎপাদন" এবং "পোল্যাণ্ডের পেট্রোলিয়াম" দুইটাই তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ। কুস্‌ৎসেহ্বস্কি লোহা ও ইস্পাতের ব্যবসার আর্থিক ভিত্তির শক্তিটা পরীক্ষা করিয়া ছাড়িয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে উহার বর্ত্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎও বিবৃত হইয়াছে। যুদ্ধে কত ক্ষতি হইয়াছিল, স্থানীয় খনি-গুলি কি প্রকৃতির, লৌহ খননের হিসাব ও বর্ণনা আপার সাইলেশিয়ার লোহা, রেলের ভাড়া কি ভাবে লোহা ও ইস্পাতের উপর কাজ করে ইত্যাদি আলোচনা ও বহু আঁক-জোক্ প্রকাশিত হইয়াছে।

পোলাণ্ডকে ৪টা পেট্রোলিয়াম তেলের জিলায় ভাগ করা হইয়াছে। তেল-শোধনের যন্ত্র আছে ৩৪টা বার্‌টোস্‌ৎ-সেহ্বিস্‌ৎ ৫টা টেব্‌ল প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথমটায়

১৮৮৪-১৯০৫ পর্য্যন্ত ঐ তেলের উৎপাদনের পরিমাণ দেখান হইয়াছে। দ্বিতীয়টায় ৪টা জেলার কোন্ স্থানে কত তেল ১৯২৪ ও ১৯২৫ সনে উঠিয়াছিল তার হিসাব দেখিতেছি। তৃতীয়টায় ও চতুর্থটায় ১৯২০-১৯২৫ পাচ বৎসরে কোন্ জিলা কত গ্যাস উৎপাদন করিয়াছে তার অঙ্ক। পঞ্চমটায় শোধিত তেলের হিসাব ১৯২৪-২৬ পর্য্যন্ত ও তেল হইতে উৎপন্ন দ্রব্যাদির পরিমাণ।

"পোলিশ বাণ্ডবুকের" সম্পাদক ব্রিটেনের সঙ্গে পোল্যাণ্ডের কি কি বাণিজ্যিক লেনদেন চলিতে পারে তার মোসাবিদা খাড়া করিয়াছেন। "পোল্যাণ্ডের বাজার" লেখক বলিতে চাহেন, "ইংরেজের সঙ্গে আমাদের মিতালি দৃঢ় হয় অমুক অমুক উপায়ে। দরকার রহিয়াছে দালালের ও রাসায়নিক "উৎপন্নের"।

ব্যবসা-বাণিজ্য-সচিব সাডোহ্বস্কি পোল্যাণ্ডের বহির্বাণিজ্য-নীতি ও কতকগুলি বাণিজ্যিক সমঝৌতার কথা আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, "পোল্যাণ্ডের অবস্থানটা বড় খারাপ। ঠিক মাঝখানে বলিয়া সকলেই একবার লোলুপ দৃষ্টি দেয়।" রুশিয়ার বাজার এখনো বন্ধ। জার্ম্মাণির সঙ্গে লেনদেন এখন ক্রমেই বাড়িতেছে। ১৯২৫ জুন হইতে জার্ম্মাণি ও পোল্যাণ্ডে বাণিজ্যিক লড়াইয়ের দরুণ ব্যবসা কিছু কাবু হইয়াছে। কুড়িটারও উপর কনভেনশন পোল্যাণ্ডকে করিতে হইয়াছে। সাধারণ নীতি হইয়াছে "সব চেয়ে সুবিধা পাইবে আমাদের জাত"। ১৯২২ সনে ফ্রান্সের সহিত একটু ভিন্ন প্রকারের একটা সন্ধি হইয়া গিয়াছে। পোল্যাণ্ড অবাধ-বাণিজ্য নীতির পক্ষে বটে।

"পোলিশ ইকনমিক্স" সম্পাদক লাডিস্নাস্ পোল্যাণ্ডের ভবিষ্যৎ আর্থিক উন্নতি কোন্ পথে হইতে পারে নির্দ্দেশ করিতেছেন। তিনি বিশেষ করিয়া কৃষির উপর জোর দিয়াছেন।

পোল্যাণ্ড ব্যাঙ্কের সহকারী সভাপতি ম্লীনার্স্কি পোল্যাণ্ডের টাকার বাজারের (ব্যাঙ্কিং ও ক্রেডিট) কয়টা তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। এবং স্‌ৎস্থরিগ্ পোল্যাণ্ডের ব্যাঙ্কের কাগজের মুদ্রা প্রচার করিবার ক্ষমতার ইতিহাস ও স্বরূপ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

পোল্যাণ্ডের "বাড়ের" জন্য বিদেশী পুঁজিপাটা অনেক চাই। বিদেশীরা যাতে পোল্যাণ্ডকে পুঁজিপাটা দেয় তার জন্য দরকার এই কথা প্রমাণ করা যে, পোল্যাণ্ডের আর্থিক বৃদ্ধিতে ইয়োরোপের লাভ আছে।

৩২।৩৩ পৃষ্ঠার মধ্যে পোল্যাণ্ড সম্বন্ধে যত কথা প্রকাশিত হইয়াছে তার সবগুলির পরিচয় দেওয়া সম্ভব নহে। উপরের বর্ণনা হইতে বোধ করি একটা আন্দাজ পাওয়া যাইতে পারে। এর প্রত্যেকটা প্রবন্ধই যে প্রথম শ্রেণীর বা খুব গবেষণাপূর্ণ সে কথা বলিতেছি না। কিন্তু একটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করিবার আছে যে, একটা লেখাও আনাড়ির হাত দিয়া বাহির হইয়া আসে নাই। অর্থাৎ যে যে বিষয় জানে, আলোচনা করে অথবা যে কার্য্যে নিযুক্ত আছে, সে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছে। মনে করা যাক যেন বাঙ্গালা দেশে এইরূপ একটা শিল্প সাপ্তাহিক চলিতেছে। তাতে কোন সপ্তাহে ৩০।৪০ জন ইংরেজ বিশেষজ্ঞ লেখক ইংলণ্ডের ঐশ্বর্য্যের কথা বাঙ্গালায় আলোচনা করিলেন। কোন সপ্তাহে ফরাসী বিশেষজ্ঞ লেখকগণ ফ্রান্সের কথা আলোচনা করিলেন ইত্যাদি। তবে ব্যাপারটা কিরূপ হয়? বাঙ্গালার আর্থিক সাহিত্য তাড়াতাড়ি কতখানি পুষ্ট হইয়া উঠে? জগতের কোন্ খানে বাঙ্গালীর শ্রম, পুঁজিপাটা ও বুদ্ধি সার্থক হইতে পারে, তা জানিতে বাকী থাকে কি?

এই ত গেল লেখার কথা। কিন্তু এই পত্রের বিজ্ঞাপন-সাহিত্যটাও কম দেখিবার বস্তু নহে। বিজ্ঞাপনদাতাদের নিকট হইতে অনেক টাকা পাওয়া গিয়াছে সে কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। কিন্তু এই বিপুলকায় ১ হাত লম্বা আধ হাত চওড়া কাগজগুলির পৃষ্ঠাব্যাপী বিজ্ঞাপনগুলি বলিয়া দেয় কিরূপে পোল্যাণ্ড ব্যবসাক্ষেত্রে নানাদিকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে, তার আর্থিক উন্নতির মূলে কতখানি তার নিজের কীর্ত্তি আর কতখানি অপরের, অর্থাৎ কোন দেশ কি পরিমাণে তার বাণিজ্যের সহায়তা করিতেছে। ব্যাঙ্ক, কয়লার খনি, জিঙ্ক খনি, লিনেনের কারখানা, কাগজের কল, ডাকঘর সেভিংস ব্যাঙ্ক, আমদানি রপ্তানি, কারখানা, কলা, শিল্প ও রসায়নাগার, নুন, তেল, স্পিরিট, তামাক ইত্যাদির ভিন্ন ভিন্ন আড়ৎ, বন্দর, জাহাজ কোম্পানী, চিনির কারখানা,

কো-অপারেটিভ সোসাইটি, খাদক-সঙ্ঘ, তুলার ইউনিয়ান ইত্যাদি ইত্যাদি বহু বিষয়ের ছবি ও স্পষ্ট ধারণা মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে এই বিজ্ঞাপন-সাহিত্য হইতে। বস্তুতঃ এই বিজ্ঞাপনের পাতাগুলি সরস ও সুপাঠ্য। আনন্দ ও শিক্ষার খোরাক ইহাতে প্রচুর দেখিতে পাইতেছি।

জুর্ণাল দেজ্ একনমিস্ত

প্যারিস হইতে প্রকাশিত "ধনবিজ্ঞান-সেবীদের মাসিক পত্র।" ১৯২৬ নবেম্বরের কাগজে আছে (১) জার্ম্মাণির ব্যক্তি-গত ও সরকারী দেনার মূল্যনির্দ্ধারণ (ঈভ-গীয়ো), (২) জীবন-বীমায় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা (সুহ্বিক্স), (৩) মধ্য-ইয়োরোপের নানা দেশের ভিতর আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক সমঝৌতা ও সমবায় (হান্তস্), (৪) বিলাতের বিধবা, পিতৃমাতৃ-হীন বালকবালিকা এবং বৃদ্ধদের পেন্শ্যান ব্যবস্থা (বার্কার) (৫) কৃষিকর্ম্মে দৈববীমার আইন (লেফর), (৬) ১৯২৭ সনের ফরাসী বাজেট (৭) অশুল্ক বাণিজ্যনীতি-বিষয়ক আন্ত-র্জ্জাতিক সঙ্ঘ। এই সকল প্রবন্ধে যে সব মাল আছে তাহার তর্জ্জমা বাংলায় প্রচার করা খুবই বাঞ্ছনীয়। আমাদের দেশের উচ্চতম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই সব শিখিবার ও শিখাইবার ব্যবস্থা নাই। অথচ এই সকল বিষয়ে অজ্ঞ থাকিলে যুবক ভারতের পক্ষে স্বদেশসেবক হওয়া সুকঠিন।

প্রবন্ধাংশ ছাড়া ঐতিহাসিক এবং সমালোচনা বিভাগও আছে। পত্রিকাটা "সোসিয়েতে দেকোনোমী পোলিটিক" নামক ফরাসী ধনবিজ্ঞান-পরিষদের মুখপত্রস্বরূপ ব্যবহৃত হয়। এই পরিষদের এক সভায় ফ্রান্সের আয়ব্যয় সম্বন্ধে বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহার সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে।

দি বোর্ড অব্ ট্রেড্ জার্ণ্যাল অ্যাণ্ড কমার্শ্যাল গেজেট

গ্রেট জর্জ ষ্ট্রীটে গবর্ণমেণ্ট বিল্ডিং হইতে প্রকাশিত বাণিজ্য-পত্রিকা। সাপ্তাহিক, ৬ পে, লণ্ডন। ৪ নবেম্বর, ১৯২৬।

এ সংখ্যায় সর্ব্বসমেত ২৪ পৃষ্ঠা রহিয়াছে। উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ :—(১) "চীনে রাষ্ট্রীয় গোলযোগ ও বাণিজ্য-রক্ষা।" লেখক শ্রীযুক্ত এ, এইচ্ জর্জ্জ শাংহাইয়ের অস্থায়ী বৃটিশ বাণিজ্য-সচিব। তিনি বলিতেছেন "১৯২৫ সনকে মনে রাখিতে হইবে শুধু সব চেয়ে বড় "হরতালে"র জন্মদাতা বলিয়া নহে, প্রণালীবদ্ধ মজুর-সঙ্ঘের জন্মদাতা বলিয়াও বটে। চীনের ইতিহাসে এ এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। ১৯২৫ সন বৃটেনের দুঃসময় বটে। বয়কটের ফলে বৃটেনের বাণিজ্য ১৯২৪ সনের ৩৮·৭১ হইতে ১৯২৫ সনে ২৮·১৪তে নামিয়া গেল। কিন্তু মনে হয় ইহাই সর্ব্বনিম্ন সীমা। এর নীচে আর নামিবে না। আমাদের বণিকদের একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। ক্রেতার মর্জ্জি অনুসারে জিনিষ বিক্রয়ের রীতি। জোর করিয়া ভাল জিনিষও গিলাইতে যাওয়া বাতুলতামাত্র।" (২) "অক্টোবরে ফরেন এক্সচেঞ্জে"র অবস্থা বিবৃত হইয়াছে। বেলজিয়াম বেলগাকে মানমুদ্রারূপে গ্রহণ করায় ফ্রাঁর উত্থান ঘটিয়াছে। ফরাসী ফ্রাঁও চড়িয়াছে। ইতালির লিয়ার পূর্ব্ববৎ। নরওয়ের ক্রোন খুব নামিয়া গিয়াছে। মাসের শেষদিকে নিউইয়র্ক পাউণ্ডের দাম কমিয়াছে। (৩) "বৃটিশ ইণ্ডিয়া—আগষ্ট মাসের বহির্ব্বাণিজ্য।" জুলাই মাসে যত টাকার আমদানি হইয়াছিল, আগষ্ট মাসের আমদানি তার চেয়ে কম টাকার। কিন্তু রপ্তানি ও পুনঃরপ্তানি বিস্তৃততর হইয়াছে। আমদানিতে ইংরেজের ভাগ ৫০ অর্থাৎ ১৯২৫ সনের তুল্যপ্রায়। কিন্তু রপ্তানি ২৭ % হইতে ২৪ % হইয়াছে। (৪) "ষ্ট্রেট সেটেল্মেণ্টে" ১৯২৫ সনের বাণিজ্য অভূতপূর্ব্ব সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে। মোট হইয়াছে ২৯ কোটি ৫৫লক্ষ পাউণ্ড (৪৪৩ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা) অর্থাৎ ১৯২৪ সন হইতে ৫৭ % বেশী। এর পূর্ব্বে সবচেয়ে বেশী যখন বাড়িয়া-ছিল তখন মুদ্রার পরিমাণ ছিল ৬ কোটি ৯০ লক্ষ পাউণ্ড কম। সে ১৯২০ সনে। (৫) "ফরাসী বাণিজ্যের গতি"তে দেখানো হইয়াছে যে গত নয় মাসে ফ্রান্স ইংলণ্ডে, বেল-জিয়ামে, জার্ম্মাণিতে ও আমেরিকাতে তার রপ্তানি গত বছরের তুলনায় অনেক বাড়াইয়াছে। (৬) ষ্ট্রাইকের ফলে বৃটিশ নৌ-বাণিজ্যের হ্রাসবৃদ্ধির বিবরণ এই সংখ্যায়ও প্রদত্ত হইয়াছে।

বৃটিশ চেম্বার অব্ কমার্স জার্ণ্যাল

চীন ও হংকঙে এসোসিয়েটেড্ চেম্বার অব্ কমার্সের মুখপত্র বাণিজ্য-পত্রিকা। মাসিক, ৫০ সেণ্ট। শাংহাই, অক্টোবর, ১৯২৬। মোট পৃষ্ঠার সংখ্যা ২৮।

ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ই, এম, গাল, "অতীত ও ভবিষ্যৎ" আলোচনা করিতে গিয়া পত্রিকার উদ্দেশ্য বলিতেছেন, (১) বৃটিশ পুঁজিপাটার নিয়োগের জন্য (ক) কোথায় কি করা হইয়াছে (খ) কি কি প্ল্যান আঁটা হইতেছে (গ) কোথায় কি রকম সুবিধা রহিয়াছে। (২) কোন মাসে কোন্ দ্রব্যের কোন্ দিক্‌টা বিশ্ব-সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোন্ কোন্ দিকে চিন্তা দেওয়া প্রয়োজনীয়—এই সব বিষয় সর্ব্বদা পাঠকদের সম্মুখে উপস্থিত করা।

দুই সংবাদদাতার দুই প্রবন্ধ ছাপা হইয়াছে। তন্মধ্যে একজন "সাম্রাজ্য-বৈঠকের" সমস্যাগুলি তথা "সাম্রাজ্য বাণিজ্যের গতি, বিস্তার ও ভবিষ্যৎ" লইয়া মাথা ঘামাইয়াছেন। "চীনে ল্যাঙ্কাশায়ারের সম্পদের" লেখক বলিতেছেন, "ল্যাঙ্কাশায়ারের উৎপন্ন মালের ৪°/ₒ চীন গ্রাস করে। আর কল, স্পিণ্ডল ও লুমের হিসাব এইরূপ :—

	মিল	স্পিণ্ডল	লুম
চীনাদের তাঁবে	৭৩	১,৮৮১,৮২২	১৬,৩৮১
জাপানীদের তাঁবে	৪৫	১,৩২৬,৯২০	৭,২০৫
ইংরেজদের তাঁবে	৪	২০৫,৩২০	২,৩৪৮
	১২২	৩,৪১৪,০৬২	২৫,৯৩৪

"বৃটিশ ইঞ্জিনিয়ারিং নোট্‌সে" "ইঞ্জিনিয়ার" পত্রের সম্পাদক সংক্ষেপে কয়েকটা বিষয়ের একটু আলোচনা করিয়াছেন। "তেল—ইঞ্জিনের প্রতিদ্বন্দ্বী"তে ইঞ্জিন চালাইবার পক্ষে তেল বনাম বাষ্পের উপযোগিতা আলোচিত হইয়াছে। সম্প্রতি "রাজা পঞ্চম জর্জ্জের" নির্ম্মাতারা প্রমাণ করিয়াছে বাসের আবদারটা নেহাৎ অসঙ্গত নহে। তবে এই পরীক্ষার এখনো শৈশব অবস্থা। অনেক উন্নতির অবকাশ রহিয়াছে। অন্য বিষয়গুলি "ট্রেন ফেরী", "আকাশ যানের ডিজাইন", "ষ্টীম টারবিন ফেল মারিল"। চীনের "মিশ্র আদালতের প্রত্যাহার" ও "বিশ্ব নৌ-বাণিজ্য" দুই মূল প্রবন্ধ। এ সংখ্যায় ১০।১১ পৃষ্ঠা গিয়াছে নিরেট আঁক-জোক।

বুলেটিন অব্ দি ব্রিটিশ চেম্বার অব্ কমার্স ফর ইতালি

মিলান হইতে প্রকাশিত বৃটিশ বাণিজ্য-স্বার্থ-সংরক্ষক পত্রিকা। দ্বৈমাসিক ৫ লিয়ার। মিলান। জুলাই-আগষ্ট, ১৯২৬।

পঠিতব্য ব্যাপার রহিয়াছে মোট ২৯ পৃষ্ঠা। বাকীগুলি বিজ্ঞাপন। ইতালি-ব্রিটানিকা ব্যাঙ্ক হইতে জনৈক সংবাদ দাতা (১) "ইতালিতে ব্যবসার বাজার" সম্বন্ধে লিখিতেছেন, "লিয়ারকে উঠাইবার জন্য মুসোলিনির দৃঢ় পণের সুফল ফলিয়াছে। টাকাকড়ির লেনদেন ও ব্যাঙ্কিং ব্যাপারে সারামাস ধরিয়া ইতালিতে পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। গ্রামদেশ-গুলির খবর হইতে জানা যাইতেছে, ফসল ভালই হইয়াছে।" (২) "ইতালির বহির্ব্বাণিজ্যে" ইতালির অর্থসচিব কর্ত্তৃক প্রকাশিত ১৯২৬ সনের প্রথম ৬ মাসের বাণিজ্যের পরিমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা নিম্নরূপ :—

মাস	আমদানি			রপ্তানি		
জানুয়ারী	১,৯৫৩.৫	মিলিয়ন	লিঃ	১,১১৮,৬	মিলিয়ন	লিঃ
ফেব্রুয়ারী	২,২৪৯·৪	"	"	১,৩৫৬·২	"	"
মার্চ্চ	২,৪১৭·১	"	"	১,৪৫৬·৯	"	"
এপ্রিল	২,৪৭৪·৬	"	"	১,৪০১·৮	"	"
মে	২,৪৮৪·৯	"	"	১,৩০২·৫	"	"
জুন	২,৬৮৫·৪	"	"	১,৬৮৪·৯	"	"

ইতালীর বিরুদ্ধে বাণিজ্যের পরিমাণ দাঁড়াইতেছে ৫,৯৪০·৩ মিলিয়ন লিঃ। গত বৎসর এই সময় উহা ছিল ৫,৮২৬·৭ মিলিয়ন লিঃ।

আমদানি-বৃদ্ধি বন্ধ করিবার জন্য ও রপ্তানি বাড়াইবার জন্য ইতালী প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। গত জুন মাসের আমদানির সঙ্গে তার আগের ৫ মাসের আমদানির তুলনা করিলে তার পরিচয় সর্ব্বত্র মিলে। গত পাঁচ মাসে ইতালী হইতে কৃত্রিম রেশম গিয়াছে ২৭, ৭২, ২৯৫ কিলোগ্রাম। ১৯২৫ সনের প্রথম ৫ মাসে ৩,২১১,৪৭৬। ১৯২৪ সনের প্রথম ৫ মাসে ১,৭৮৯,৮৬৩।

(৩) জাতীয় ব্যবসা-প্রচেষ্টার মূলে রহিয়াছে পরদেশ হইতে উত্তরোত্তর কাঁচা মালের আমদানি-বৃদ্ধি। "ইতালীতে কাঁচা মালের আমদানি"তে দেখান হইয়াছে ইতালীর এ বিষয়ে শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে।

(৪) ইতালীর পক্ষে এবৎসরটা ব্যবসার দিক্ হইতে সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে সেই কথা "ইতালী"তে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বৎসরের গোড়ার দিকে চাঁদা করিয়া অনেক নূতন পুঁজিপাটা সংগৃহীত হইয়াছিল—যেমন বিজলীর ব্যবসায়ে। ফলে ষ্টক এক্সচেঞ্জে "বুম্" হওয়ায় শেয়ারগুলির দাম খুব চড়িয়াছিল ও বাজারে ওলট্-পালট্ দেখা দিয়াছিল। ইতালীর বহির্ব্বাণিজ্য-আমদানি ও রপ্তানি অনেকগুণ বাড়িয়াছে। ইংরেজের স্বার্থ কয়লায়। ইতালী ইংরেজের কাছে পূর্ব্বের চেয়ে বেশী কয়লা কিনিতেছে কিন্তু অন্য জিনিষ কিনিতেছে কম। যে সব দেশের সঙ্গে ইতালীর বাণিজ্য, তাদের মধ্যে অধুনা ইংলণ্ডের স্থান চতুর্থ। আগে দ্বিতীয় ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য পূর্ণবেগে চলিয়াছে। সেইজন্য, মালগাড়ী ও যাত্রীগাড়ী (রেল) বেশী যাতায়াত করিয়াছে, বন্দরগুলিতেও জাহাজের গতিবিধি বেশী হইয়াছে। চাষবাসের পক্ষে গত বৎসর অত্যন্ত সুবৎসর গিয়াছে। গম অত্যন্ত চমৎকার হইয়াছিল। আলু, চাল, ভুট্টা ইত্যাদিও মন্দ হয় নাই। ইতালীর সামনে সম্প্রতি সব চেয়ে বড় সমস্যা হইতেছে লোক-সমস্যা। ইতালী যে তার বাড়্তি লোক লইয়া কি করিবে তা ভাবিয়া পাইতেছে না।

গত ৬ মাসে ইতালীর জাতীয় রাজস্বের পরিমাণ ৯, ২৭৪ মিলিয়ন লিঃ আর ব্যয়ের পরিমাণ ৯,০৪৬ মিলিয়ন লিঃ। অতএব উদ্বৃত্ত রহিয়াছে ২২৮ মিলিয়ন লিঃ। ইতালীর জাতীয় আয় যদি গড়ে ১২০ মিলিয়ন লিঃ বলিয়া ধরা যায়, তবে ইতালীর করের পরিমাণ দাঁড়ায় উহার ১৬%।

ইংরেজেরা ইতালীর বাণিজ্যে দুইটা গুরুতর অসুবিধা ভোগ করিতেছে। (১) টাকার বাজারে গোলমাল, যা নাকি যুদ্ধের পর সব দেশেই হইয়াছে। (২) বাজারে কতকগুলি দায়িত্বহীন জুয়ারীর আগমন।

যুদ্ধের পর সব ইতালীর পক্ষে সব চেয়ে সুবৎসর হইতেছে ১৯২৫ সন।

(৫) "ইতালীর রেশম-কেনা ব্যবসা"র লেখক ঐ ব্যবসার ইতিহাস লিখিয়াছেন।

(৬) "ইতালীর লোহা ও ইস্পাতের ব্যবসা" ও "আর্থিক লড়াই"। ইহাতে নিজের দেশে এই সব জিনিষের জন্য আরো বেশী মনোযোগ দিতে হইবে এই কথা বলা হইয়াছে।

ব্যবসা ও বাণিজ্য

কলিকাতা। মাসিক। অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩। ৷৷০ আনা। পত্র-সংখ্যা ৯৬। বিবিধ প্রসঙ্গে আলোচিত বিষয়গুলির মধ্যে কয়েকটি হইতেছে:—কয়লা হইতে তৈল প্রস্তুত; মাড়োয়ারীর পণ—মাড়োয়ারীরা নাকি আর বিলাতী বস্ত্রের অগ্রিম কন্ট্রাক্ট করিবেন না, কারণ তাতে টাকার ক্ষতি সহ্য করিতে হয়; বাংলা দেশে চাষের জমি; ইট্লীতে নূতন স্বাস্থ্যনিবাস—৫২ জন রোগীর থাকিবার ব্যবস্থা থাকিবে। এককালীন ৫,৯৮,৫৩৬, টাকা ও বাৎসরিক ৪৫,৫৩৬ টাকা খরচার বরাদ্দ হইয়াছে। ৫০০৲ টাকার একজন ডাক্তার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও ২৫০৲ টাকা করিয়া দুইজন নার্স থাকিবে। বিলাত-ভারত বিমান পথ—মিশরের কাইরো হইতে ভারতের করাচী বন্দর পর্য্যন্ত ২৷৷০ হাজার মাইলের ভাড়া ৮৮০৲ টাকা। কাবুলীর জুলুম—এক ভদ্রলোকের উপর কাবুলী জুলুম প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ইহার কি প্রতীকার? সমবায় নয় কি?

শিল্প-প্রসঙ্গে আছে—(১) কাপড় কাচিবার কল। ধোবা বনাম কল সমস্যায় কলের পক্ষে রায় দেওয়া হইয়াছে।

কারণ কলে কাপড় পরিষ্কার হয়, ছিঁড়ে কম, জীবানুগুলি মরিয়া যায়। আর কাপড় কাচা কলের সাহায্যে সকলেই সহজে অল্প সময়ে নিজ নিজ কাপড় কাচিয়া লইতে পারে)। (২) ছোট ইলেক্ট্রিক মোটর (ইউরোপে ডেয়ারি, ধোপার কারখানা, হোটেল ও ছোট ছোট কারখানায় ব্যাপকভাবে জার্ম্মাণিতে নির্ম্মিত ছোট ছোট মোটর কল সব ব্যবহৃত হইতেছে। তাতে নানাপ্রকারে কষ্টের লাঘব হইতেছে ও কাজ ভাল হইতেছে। আমাদের দেশেও তা সম্ভব নয় কি?) (৩) পরিশোধন-যন্ত্র অর্থাৎ নানাপ্রকার ফিল্টারের আকৃতি ও সুখ-সুবিধা বুঝান হইয়াছে (৪) "নূতন শিল্প সৃষ্টি"তে শ্রীযুক্ত শান্তি মুখোপাধ্যায় তিনটি নূতন পথ বাৎলাইতে চাহিয়াছেন (ক) আজকাল ছেলেরা নিজে ষ্টোভ জ্বালিয়া চা খাইতে ভাল বাসে। সঙ্গে সঙ্গে জলযোগের জন্য অন্য কিছুও তৈয়ারী করিয়া লয়। একটা ষ্টোভ, একটা প্যান, তিনখানা প্লেট পেয়ালা, চাম্চে দুটো তিনটে ছোট বোতল (চিনি, সুজি, ঘী প্রভৃতির জন্য) একটা ছোট শিশি (স্পিরিটের জন্য), একটা দেশলাই রাখিবার টীনের কৌটা, আরো দু'একটা আনুষঙ্গিক দ্রব্য একসঙ্গে টীন, এলুমিনিয়াম্, গ্যালভানাইজ্ড্ সীট্ অথবা বক্স-উডের বাক্সে সাজাইয়া অল্প জায়গায় প্যাক করিয়া, তালা-চাবি সমেত বাজারে পাঠাইতে পারিলে বিক্রয় হইবেই।" (খ) যদি বাজারের টয়টুল সেটের মত, হাতা খুন্তি ও ঝাঁঝরির তিনটা আলাদা মাথা তৈয়ারী করিয়া নীচে স্ক্রু দেওয়া যায় তবে জিনিষটা কাটিবে ভাল। (গ) যদি, উপর হইতে ৪।৫ টা দাঁত আসে, সুপারি কাটিতে কম সময় লাগে, টুক্‌রাগুলিও-সমান হয়—এইরূপ সংস্কৃত জাতি সবাই চাহিবে। কচ্ছপ খোলার টুকরা, শিংএর গুঁড়া ইত্যাদি হইতে ছাতার হাতল, ছুরির বাঁট ইত্যাদি হয়। লেবুর খোসা, ভাঙ্গা কাচ ইত্যাদি কাজে লাগান যায় না কি?

স্বাস্থ্য প্রসঙ্গে আছে:—(১) স্বাস্থ্যরক্ষা (কবিরাজ শৈলজামোহন সেন), (২) শিশু-মৃত্যুর প্রতিকার। প্রতি হাজারে এক বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের শিশুর মৃত্যুহার কোন্ দেশে কত তার তালিকা এইরূপ:—

নিউজীল্যাণ্ড ৪৮; নেদারল্যাণ্ড ৫০; নরওয়ে ৫৪; অষ্ট্রেলিয়া ৬৫; সুইডেন ৭৬; সুইজারল্যাণ্ড ৯২; গ্রেট ব্রিটেন ৮৩; মার্কিণদেশ ৮০; ডেনমার্ক ৯৫; ইতালি১৪০; জাপান ১৮৯; স্পেন ১৯২; ভারতবর্ষ ২৬১।

(৩) হিন্দুর শারীরিক গঠন। বিভিন্ন জাতির গড়পড়তা উচ্চতার তালিকা:—

স্কটলণ্ডবাসী ৫ ফুট ৮$\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি; আয়ারলণ্ডবাসী ৫ ফু ৮ ই; ইংলণ্ডবাসী ৫ ফু ৭ ই; ওয়েল্সবাসী ৫ ফু ৬$\frac{১}{২}$ ই; পাঞ্জাবী হিন্দু ৫ ফু ৬ ই; ভারতীয় খৃষ্টান ৫ ফু ৬ ই; মুসলমান ৫ ফু ৫$\frac{৩}{৪}$ ই; বাঙ্গালী হিন্দু ৫ ফু ৫$\frac{১}{২}$ ই; যুক্ত ও মধ্য প্রদেশের হিন্দু ৫ ফু ৫$\frac{১}{১৬}$ ই; মান্দ্রাজী হিন্দু ৫ ফু ৫ ই;

(৪) স্বাস্থ্য-সংবাদ।

১৯২৪ সনের হাজারকরা সংখ্যা

প্রদেশ	জন্মের হার	মৃত্যু	শিশু-মৃত্যু
মধ্যপ্রদেশ	৪৪·২	৩২·৬	২৩৪·৯
পঞ্জাব	৪০·২	৪৩·৩	২১২·৬
বিহার উড়িষ্যা	৩৫·৭	২৯·১	১৫৮·৬
বোম্বাই	৩৫·৬	২৭·৬	১৯১·২
মান্দ্রাজ	৩৪·৯	২৪·৫	১৭৯·২
আগ্রা অযোধ্যা	৩৩·৭	২৮·৩	১৯১·৯
আসাম	৩১·০	২৭·৩	১৮৪·২
বাঙ্গালা	২৯·৫	২৫·৯	২৮৪·২
ব্রহ্মদেশ	২৭·৪	২১·৫	১৯৭·৯
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	২৭·০	৩১·০	১৬১·৪

(৫) বাংলার স্বাস্থ্যকথা। বিশেষ বিশেষ রোগে লোক মরিয়াছে:—

কলেরা ৪১, ৪৮৩ (১৯২৩), ৪৮, ৫১৪ (১৯২৪); বসন্ত ৪,২৫৬ (১৯২৩), ৫,৫৬৭ (১৯২৪); জ্বর ৯,০৯,৭৯৫ ও ৯,১২,৪০৮; প্লেগ ০ ও ৩৫; ইনফ্লুয়েঞ্জা ১৯০৬ ও ও ১৬৭৬; নিউমোনিয়া ১০,৭৬৭ ও ১১,৪৯০; যক্ষ্মা ৪,৯৪২ ও ৫,৫৭৭; আমাশয় ও উদরাময় ২১,০১৯ ও ২২,৪৭০; জলাতঙ্ক ২৪৪ ও ৩৪৩; সর্পাঘাত ৫,১১০ (১৯২৪)। (৬) রোগের দ্বারা জীবন।

"পশু-সম্পদে" তুলনামূলক আলোচনা আছে। ইহার

বিষয়গুলি :—দুধের অল্পতা, গৃহপালিত পশু, অস্বাস্থ্যকর দুগ্ধ (দুগ্ধের পরিমাণ বাড়াইতে হইবে এবং অল্প খরচে যাতে অধিক দুগ্ধ পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করিতে হইবে)। সস্তা দুধ (ডেয়ারি স্থাপনের পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। এ বিষয়ে মিউনিসিপালিটি ও গবর্ণমেন্টের কর্ত্তব্য বিবেচিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য আজকালকার নাগরিক জীবনে ও পল্লীগ্রামে দুগ্ধসমস্যা একটা বড় সমস্যা বটে। ইহার বিস্তৃততর আলোচনা হইলে দেশের কল্যাণের পথ বাহির হইবে বলিয়া মনে করি।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ :—(১) মাছের ব্যবসায় (২০০০৲।৪০০০৲ টাকা মূলধনে ব্যবসা চলিতে পারে ও প্রতিবৎসর পুকুরে পোনা ছাড়িলে প্রতি পুকুর হইতে ২৫৲ টাকা হইতে ৫০০৲ টাকা আশা করা যায়)। (২) অল্প মূলধনে ব্যবসায় (বাঙ্গালীর অব্যবসায়ী হইবার কারণ টাকার অভাব নয়, মনের অভাব।" আকমাড়াই কল লইয়া ছোট ছোট ব্যবসা চলিতে পারে)। (৩) মুরগীর ব্যবসায় (৪) টাকা খাটাইবার উপায় (৫) কাঠের পালিশের ব্যবসায় (৬) ভারতের কৃষক ও কৃষি (দুর্গাচরণ সিংহ) (জোত জমির ক্ষুদ্রতা ও ছিন্ন-বিচ্ছিন্নতার কারণ ভারতবর্ষে লোক-সংখ্যার আধিক্য, শিল্প-বাণিজ্যের অভাব, উত্তরাধিকার-সূত্রে সম্পত্তি-বিভাগ, ভারতবাসীর দারিদ্র্য। এই প্রবন্ধে তথ্য-নিষ্ঠা দেখিতে পাইতেছি। (৭) ব্যবসায়ে জুয়াচুরি (ট্যাবলয়েড কুইনাইন, স্যান্টোনাইন, কলিকাতার দোকানের তৈয়ারী চা) (৮) রবারের ইতিহাস।

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ঘোষ ২৬ নবেম্বর, ১৯২৬ সনের ধান-চাউলের বাজার-দর তুলিয়া দিয়াছেন। বাঙ্গালীর ছেলেরা কিছুকাল ধরিয়া বাজার-দর জানিতে চেষ্টা করিলে আর্থিক ইতিহাসের অনেক মশলা সংগৃহীত হইবে বলিয়া মনে করি।

স্যুড্ ড্যয়চে মোনাটস্ হেফ্‌টে

"দক্ষিণ জার্ম্মাণ মাসিক পত্র।" ব্যাভেরিয়া প্রদেশের মিউনিক নগর হইতে প্রকাশিত। কাগজটা ২৪ বৎসর ধরিয়া চলিতেছে। ১৯২৬ সনের নবেম্বর সংখ্যা "আর্থিক উন্নতির" বিনিময়ে পাওয়া গিয়াছে। এই সংখ্যা" ডাস আরহ্বাখেণ্ডে আজিয়েন" (জেগে উঠছে এশিয়া) নামে পরিচিত। সংখ্যাটা মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক ভূগোল-বিদ্যার অধ্যাপক কার্ল হাউসহোফার কর্তৃক সম্পাদিত।

যুবক এশিয়ার আর্থিক আন্দোলন এই সম্পাদনের অন্যতম লক্ষণ। চীন, ভারত আর জাপান, এই তিন মুল্লুকের আর্থিক ও আন্তর্জ্জাতিক তথ্য আলোচনার জন্যই বর্ত্তমান সংখ্যার আবির্ভাব। এই তিন দেশ সম্বন্ধে চীনা, ভারতীয় ও জাপানী লেখকেরা বিগত ৫।৭ বৎসরের ভিতর যাহা-কিছু লিখিয়াছেন তাহার প্রায় প্রত্যেকটার সঙ্গেই হাউসহোফারের পরিচয় আছে। অধিকন্তু জার্ম্মাণ, ফরাসী, ইংরেজ ও মার্কিণ লেখকেরা এই সকল বিষয়ে যে সব গ্রন্থ-প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন তাহার খবরাখবরও হাউসহোফার রাখেন। প্রত্যেক প্যারাগ্রাফেই গ্রন্থ-পঞ্জীর চাপ ধরা পড়িতেছে। নানা লোকের নানা তথ্য ও তত্ত্ব হজম করিয়া সম্পাদক মহাশয় দুনিয়ায় যুবক এশিয়ার ঠাঁই নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে এই নবীন বিশ্বে জার্ম্মাণির ঠাঁই কোথায় তাহাও নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

মতামতগুলার বিশ্লেষণ বা সমালোচনা সুরু করিতে বসিলে যুবক এশিয়া বিষয়ক বিশ্বকোষ সঙ্কলন করা দরকার হইবে। সেদিকে নজর না দিয়া মাত্র এইটুকু জিজ্ঞাসা করিব যে,—পশ্চিমা পণ্ডিতেরা নবীন এশিয়ার ভূতভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য যে পরিমাণ যোগ্যতা রাখেন সেই পরিমাণ যোগ্যতা কোনো ভারতীয় পণ্ডিত ভারত সম্বন্ধে, এশিয়ার অন্য কোনো দেশ সম্বন্ধে অথবা ইয়োরামেরিকার কোনো দেশ সম্বন্ধে দেখাইতে পারেন কি? ভারতের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম সকল কোণে নজর ফেলিয়া বুঝিতেছি যে, এই ধরণের যোগ্যতা ভারতের কোথায়ও কেহ আজ পর্য্যন্ত দেখাইতে পারেন নাই। দেখাইতে চেষ্টা করা যে কর্ত্তব্য তাহাও বোধ হয় আমাদের মাথায় প্রবেশ করিতেছে না। কিন্তু এ জাতীয় পরচর্চ্চা হইতে দূরে থাকা রাষ্ট্রনৈতিক মুমুক্ষুত্বের পরিচায়ক নহে।

কৃষক

"ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েশনের" মুখপত্র, "কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান এবং বাণিজ্য বিষয়ক" মাসিক। কলিকাতা। অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩। পত্র-সংখ্যা ৪৮।

ভারতে রাজকীয় কৃষি কমিশন সম্বন্ধে দুইটা প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। দ্বিতীয়টাতে অনুসন্ধান ও সাক্ষ্যদান-প্রণালীর সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রথমটাতে "কৃষি-জীবনের পক্ষে আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিবার কি কি প্রধান বিঘ্ন এবং তাহা মোচনার্থ কি কি বিশেষ উপায় ও ব্যবস্থা গবর্ণমেণ্ট ও দেশবাসীর পক্ষে করণীয় ও অবলম্বনীয়" তৎসম্বন্ধে কতকগুলি বক্তব্য লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। দুইটি প্রবন্ধই সুচিন্তিত বটে।

কৃষি কমিশনের কর্ম্মপ্রণালীর সমালোচনায় প্রধান কথা এই, যে (১) ভারতবর্ষের কৃষকের পুঁথিগত বিদ্যা না থাকিতে পারে, তার চাষ-আবাদের প্রণালী অবৈজ্ঞানিক হইতে পারে, কিন্তু চাষ-বিষয়ে তাদের বহু পুরুষ-পরম্পরাগত অভিজ্ঞতাও ফেলিয়া দিবার বস্তু নহে। তাহা সযত্নে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার বিষয়। এসম্বন্ধে একটা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর অনুসন্ধান হইয়া যাওয়ার পর কৃষককে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষিত করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগা উচিত। কিন্তু এই শিক্ষা সরল সহজ করিয়া তাকে কে দিবে? শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রসন্তানদিগকে গবর্ণমেণ্ট অর্থাদি দিয়া সাহায্য করিলে একাজ সহজ হইবে। তারপর চাষী লইয়াই যখন কারবার, তখন কমিশনের উচিত চাষীদের "দোর গোড়ায়" যাইয়া তাদের মুখ হইতে শোনা তারা-কি ভাবে অর্থ-সাহায্য, বীজ-সাহায্য, সার-সাহায্য ইত্যাদি চায়। তাদের সম্বন্ধে পরের মুখে ঝাল খাইয়া লাভ নাই। (২) কৃষি-কমিশন সাক্ষ্য নিতেছেন ইংরাজীতে, প্রশ্ন করিয়াছিলেন ইংরাজীতে, তাঁহাদের রিপোর্ট বাহির হইবে ইংরাজীতে। অথচ যাদের উন্নতির জন্য এই প্রচেষ্টা তারা ইংরাজীর এক বর্ণও বুঝিবে না? তবে এই পণ্ডশ্রম করিয়া লাভ কি? এই শ্রমকে সফল করিতে হইলে দরকার (ক) প্রশ্নগুলি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় ভাষায় ছাপানো, (খ) প্রশ্নোত্তরগুলি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক সংবাদপত্রে যাতে দেশী ভাষায় ছাপা হয় তার ব্যবস্থা (গ) এইগুলি চাষীদের "কানের ভিতর দিয়া মরমে" লাগানো। (৩) কৃষি কমিশনের সাক্ষ্য-গ্রহণের ক্ষমতার পরিধি আরো বড় হওয়া উচিত ছিল (৪) এই কমিশনে বেশী পরিমাণে ভারতীয় বিশেষজ্ঞদের থাকা উচিত ছিল (৫) এই কমিশনের সদস্য বা সহযোগী সদস্যরূপে ব্যাঙ্কিং-জানা লোকের সংযোগের খুব প্রয়োজন ছিল। কারণ চাষীদের ঋণ-সমস্যা একটা বড় জিনিষ। তাতে মাথাওয়ালা লোক চাই। (৬) "বেকার শিক্ষিত সম্প্রদায়কে গবর্ণমেণ্ট ভূমি ও মূলধন দ্বারা সাহায্য করিলে একটী নূতন পথ খুলিবে। মূলধন কতিপয় বৎসরের মধ্যে ফসলের একাংশ দ্বারা শোধ হইতে থাকিবে।"

প্রথম প্রবন্ধের বক্তব্যগুলির সার মর্ম্ম এইরূপ :—(১) ২০ কোটি টাকা খরচ করিয়া কৃষকদিগকে বৈজ্ঞানিক কৃষিযন্ত্র যোগান যায় ও তাহাদিগকে অন্য সকল প্রকার বৈজ্ঞানিক উন্নতির পথ বাৎলাইয়া দেওয়া যায়। গবর্ণমেণ্ট এই টাকাটা ঋণ দিউন। ফলে ফসলের পরিমাণ দ্বিগুণ, তিনগুণ বা তারও অধিক হইবে। তখন ২০ কোটি টাকা সুদশুদ্ধ শোধ হইতে দেরী লাগিবে না। এ বিষয়ে সমবায় ভাণ্ডারগুলি সাহায্য করিতে পারে। (২) কৃষককুলের অজ্ঞতা-নিবারণের জন্য প্রতি গ্রামে নৈশ সভা স্থাপনপূর্ব্বক আলোকচিত্র ইত্যাদির সাহায্যে প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত। (৩) যে যে উপায়ে দেশে পয়ঃপ্রণালী প্রবর্ত্তিত বা সংস্কৃত হইতে পারে এবং চাষের সাহায্য হইতে পারে তদ্বিষয়ে ইঞ্জিনিয়ারদের উপদেশ লইয়া তাহা সর্ব্বত্র বিতরণ করা দরকার। (৪) কৃষকগণের ও কৃষি-মজুরদের স্বাস্থ্যের উপর কৃষিজাত দ্রব্যের উৎকর্ষ, উৎপাদন ও সময়মত আহরণ নির্ভর করিতেছে। গ্রামে স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতি হইতেছে। ফলে বিঘাপ্রতি ফসলের পরিমাণ ক্রমে কমিতেছে। (৫) "কৃষকদিগকে তাহাদের বর্ত্তমান ঋণের দায়িত্ব হইতে ও মহাজনের কবল হইতে মুক্তি দিবার ব্যবস্থা করা আবশ্যক।" উৎপন্ন শস্যের একাংশ বা ভাবী ফসলের একাংশ বন্ধক রাখিয়া, স্বল্পসুদে কৃষকগণকে ধার দেওয়ার যথোচিত ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

(৬) গো-মহিষ ভারতীয় শস্য-উৎপাদনের প্রধান সহায়ক। তাদের "সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি-সাধন, বংশবৃদ্ধি-সাধন, আহার্য্য-বৃদ্ধি, চারণ মাঠের সংখ্যা ও পরিসর-বৃদ্ধি আদি বিষয়ে" এবং "কৃষিসার কোন্ শস্যে, কোন্ সময়ে কি পরিমাণে ও কি প্রণালীতে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, এবং শস্য-বৃদ্ধির জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা কৃষকদিগের কর্ত্তব্য" এ বিষয়ে "সহজ বাঙ্গালা হিন্দী ইত্যাদি ভাষায় পুস্তিকা প্রচার করা প্রয়োজনীয়। (৭) "কৃষকদের জীবনকে আরো প্রফুল্ল, আনন্দযুক্ত করা আবশ্যক।"

অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ঃ—ভারতবর্ষে গো, মেষ ও লাঙ্গল (২) বিলাতী বেগুন (৩) সরল কৃষি-কথা (শ্রীযাগিনীরঞ্জন মজুমদার) (৪) চা বাগান (১৯২৫ সনের ভারতের চা চাষের খবর)।

দি ষ্টেটিষ্ট

"হাতে-কলমে" হিসাব-নিকাশ ও বাণিজ্য সম্বন্ধে পত্র। সাপ্তাহিক। লণ্ডন। ২০ নবেম্বর, ১৯২৬।

আলোচ্য বিষয়গুলিকে কয়েকটা প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। সেগুলি এইঃ—(১) মুদ্রার বাজার (ইহাতে বেলজিয়ামের ঋণের গোলক ধাঁধাঁ, ফরেন এক্সচেঞ্জ বা বহির্ব্বিনিময়, ইংল্যাণ্ডের ব্যাঙ্ক, আইরিশ ফ্রীষ্টেটের আর্থিক হিসাব ইত্যাদি আছে) (২) ষ্টক এক্সচেঞ্জ (কোলিয়ারি শেয়ার ও কতকগুলি টেব্‌লে অনেক আঁকজোক দেওয়া আছে। বিষয়ঃ—ব্যাঙ্ক রিটার্ণ, ডিসকাউণ্টের বর্ত্তমান ব্যাঙ্ক হার, বহির্ব্বিনিময় ও ব্যাঙ্কসমূহ, ব্যাঙ্কারদের ক্লিয়ারিং হাউস্ রিটার্ণ, দ্রব্যাদির পাইকারি দর, রেলওয়ে ও ট্রামওয়ে ট্রাফিক রিসীট্)। বলা বাহুল্য সপ্তাহে সপ্তাহে এই অঙ্কগুলি লইয়া আলোচনা করিলে বঙ্গ-সন্তানের ভাবিবার অনেক খোরাক জুটিবে। (৩) মৌলিক প্রবন্ধাদিঃ—ফরাসী ফ্রাঁ— কেমন করিয়া তার হারটাকে "স্থিত" ফেলান যায়; জার্ম্মাণিতে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলির একাকার (অধ্যাপক হারম্যান লেভী) ভারতীয় কারেন্সি রিপোর্ট (চারজন বিখ্যাত ব্যক্তি স্যার চার্লস এভিস, স্যার ফেলিক্স সুশুষ্টার, স্যার জেম্‌স ব্রুণিয়েট ও মিষ্টার আর, জি, হট্রে ঐ রিপোর্টের যে সমালোচনা করিয়াছিলেন তারই চুম্বক) ; চিনি "কাজের লোক" হইয়াছে। এই বিভাগে ফ্রান্স (ফ্রাঁ ক্রমাগতই চড়িতেছে। অক্টোবরের বহির্ব্বাণিজ্যে ও রাজস্বে আদায় আগের সব আদায়ের উপর টেক্কা দিয়াছে। ঘরে ও বাইরে নব নব ঋণ লইবার বন্দোবস্ত) রুশিয়া (প্রিমিয়াম লোনের চাঁদা উঠিল। আবার কন্‌সেসন), জার্ম্মাণি ("মিলিয়া মিশিয়া যাইবার" প্রচেষ্টা। বৃটিশ উৎপাদকদের সহিত স্বার্থের সম্পর্ক), আয়ারল্যাণ্ড (খাওয়া-পরার খরচ পেটেণ্ট বিল। কৃষির অবস্থা) সম্বন্ধে সংবাদদাতাদের খবরগুলি স্থান পাইয়াছে। (৪) আর্থিক হিসাবতত্ত্ব (ষ্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্ কথা ; খনির মজুরদের প্রতিকূল ভোট ; চীনের ব্যাপার ; জার্ম্মাণির কারেন্সী সম্বন্ধে এ্যাবারনন্ ; অষ্ট্রেলিয়ান হিসাবের সমর্থন ; অক্টোবরে কাজে নিয়োগ ও খাই-খরচা ; মিউনিসিপ্যাল সেভিংস ব্যাঙ্কস্, (৫) আমেরিকার খবর (যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাঙ্ক ক্রেডিটের প্রতিপত্তি) (৬) ইন্‌শিওরেন্সের খবর (৭) খনির খবর (ইংরেজ-আমেরিকানের লাভ ; হীরার উৎপাদনের কর্ত্তৃত্ব ও দুইটা হীরক খনির ব্যবসার অবস্থা) (৮) রবার ও চায়ের খবর (৯) ব্যবসা সম্পর্কে (জার্ম্মাণির কয়লার বাণিজ্য) (১০) শিল্প কোম্পানী (কয়েকটা কোম্পানীর বিবরণ দেখিতেছি)। (১১) নয়া ইস্যু।

ইকনমিক রিভিউ

বিদেশী আর্থিক খবরের সমালোচনামূলক রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি পত্র। সাপ্তাহিক। লণ্ডন। নবেম্বর ২৬, ১৯১৬। ১শি।

একটিমাত্র মৌলিক প্রবন্ধ আছে—ফ্রাঁর ষ্টেবিলিজেশন অথবা রিভ্যালুয়েশন ? (ফ্রাঁকে "স্থিত" করান হইবে অথবা তার নয়া দাম দিতে হইবে ?)। দুই পৃষ্ঠাব্যাপী সম্পাদকীয় মন্তব্য আছে।

এই তিন পৃষ্ঠা ব্যতীত বাকী প্রায় সব পৃষ্ঠাগুলি গিয়াছে ভিন্ন ভিন্ন দেশের আর্থিক অবস্থার খবরাখবর লইতে। ফিন্‌ল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, পোল্যাণ্ড, রুশিয়া, তুরস্ক, মধ্য আমেরিকা এই কয়টা দেশের তত্ত্ব লওয়া হইয়াছে। তত্ত্বের

কয়েকটা বিষয়ের নমুনা:—ফিন্‌ল্যাণ্ডের কাষ্ঠ-উৎপাদন বন্ধ করিবার সমস্যা, দিয়াশলাই-শিল্প, ফ্রান্সের টেক্‌স্‌টাইল বাণিজ্য ও এক্সচেঞ্জের হার, জার্ম্মাণির কৃষি সম্পর্কে অবাধ বাণিজ্য বিষয়ক ঘোষণাপত্র, পোল্যাণ্ডের তেলের খনি, তুরস্কের কাজের জাতীয় প্রোগ্রাম, মেক্সিকোর পেট্রোলিয়ামের ব্যবসায় ইত্যাদি।

ইকনমিক জার্ণ্যাল

"দি রয়েল ইকনমিক সোসাইটি" কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং কেইন্‌স্ ও ম্যাকগ্রেগর কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ত্রৈমাসিক। লণ্ডন। সেপ্টেম্বর, ১৯২৬।

পত্র-সংখ্যা ১৯৫। তন্মধ্যে মৌলিক প্রবন্ধে ১০৩ ও পুস্তক-সমালোচনায় ৬১ পৃষ্ঠা গিয়াছে।

প্রবন্ধগুলির নাম:—(১) আর্থিক তত্ত্বে "সম্পত্তি"র স্থাননির্ণয় (জোশিয়া ষ্ট্যাম্প্)। পৈতৃক ধন অর্থে এখানে সম্পত্তি কথাটার ব্যবহার করিতেছি। এই যুগে চারিদিকে একটা ধন-সাম্যের রব উঠিয়াছে। রাম ও শ্যাম সর্ব্বপ্রকারে এক রকম গুণবিশিষ্ট ব্যক্তি হইলেও সংসারে দেখা যায়, রাম পিতার ধনের জোরে জীবনের পথে ধাপে ধাপে উঠিয়া চলিয়াছে আর শ্যাম কোনো উন্নতি করিতে পারিতেছে না। বড় লোকের পুত্র হওয়া একটা দৈব ঘটনামাত্র। কিন্তু সেই দৈব ঘটনার বলে একজন কত না সুবিধা ভোগ করিতেছে, অন্য জন বিনা দোষে শাস্তি ভোগ করিতেছে। সে জন্য সাম্যবাদীরা একবাক্যে বলিয়াছেন "এই পৈতৃক ধন-প্রাপ্তির প্রথাটা উঠাইয়া দাও, পৈতৃক ধনগুলিকে জাতীয় ধনে পরিণত কর। দেখিবে কত তাড়াতাড়ি দেশের আর্থিক উন্নতি হইবে।" লেখক সকল দিক্ হইতে এই প্রশ্নটাকে নাড়াচাড়া করিয়া একটা উত্তর দিতে চাহিয়াছেন। তাঁর মোট কথাটা সংক্ষেপে এই দাঁড়ায় যে, "ধনের উৎপাদন এবং বণ্টন পৈতৃক ধন-প্রাপ্তির প্রথা দ্বারা বাধা পাইতেছে না; বর্ত্তমান মানব পৈতৃক ধন যত পাইতেছে তার বহুগুণ নিজে ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা উপার্জন করিতেছে; সম্পত্তি-সমর্পণের নিয়মগুলিও ধীরে ধীরে বদ্‌লাইতেছে। "লেখক আরো একটা কথা বলিতে পারিতেন। সেটা হইতেছে এই,—জগতের সব দেশে অতি অল্পসংখক লোকই অসম্ভবরকম ধনী। যদি সোজাসুজি ধন-সাম্যের ব্যবস্থা করা যায় তবে গড়ে প্রতি ব্যক্তির আয় নামমাত্র বাড়িবে, কিন্তু জাতীয় আর্থিক অনুষ্ঠানসমূহ বাধা পাইবে। সে ক্ষতি অপরিমেয়।"

(২) "১৯২৫ সনের বিশ্বজনীন ধর্ম্মঘটের বিবরণ" (ডি, এইচ্, রবার্টসন)

(৩) "বৃটিশরা যে প্রণালীতে শস্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করে তদ্বিষয়ে একটা অনুসন্ধান"।

(৪) "ব্যাঙ্কিং নীতি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রবার্টসন" (আর, জি, হট্রে)। রবার্টসন একখানা বহি লিখিয়াছেন "ব্যাঙ্কিং পলিসী অ্যাণ্ড দি প্রাইস্ লেভেল" (ব্যাঙ্কিং নীতি ও দরের গতি)। সেই পুস্তকে "ক্রেডিট" শাসন করিয়া দরের "স্থিত" ফেলানো নীতির প্রতিবাদ আছে। এই প্রবন্ধ আবার সেই পুস্তকের সমালোচনা।

রবার্টসনের ১নং উক্তি এই:—শিল্পি-শ্রেণীর উৎপাদন-ক্ষমতার অথবা টানের সর্ত্তগুলির সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। সুতরাং সব "ইকুলিব্রিয়াম্" বা "সমীকরণ" এক চীজ্ নহে। টান যোগানে কাটাকাটি গেলেও উপরের কল্পিত অবস্থায় ধনের উৎপত্তি ও ক্ষয় বেশী হইতেছে। এই ব্যাপারটাকে অদৃশ্যভাবে বিনা গোলমালে সমাধা করা যায় যদি বাণিজ্য "সন্ধি"কালে মুদ্রার যোগান বাড়াইয়া দেওয়া যায় অর্থাৎ দর চড়াইতে পারা যায়।

হট্রে বলিতেছেন, "ইহা কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে? অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি বাধা এই যে, অত্যন্ত বিশুদ্ধরূপে অর্থতত্ত্ববিদ্ মানুষ হাজারে ৫।১০টাও মিলে না।...তারপর, পরিবর্ত্তনটা টানে ঘটিতে পারে কিন্তু যোগানে নাও ঘটিতে পারে।...কোনো ব্যাঙ্ক এইরূপ ঝুঁকি ঘাড় পাতিয়া লইবে না।...রবার্টসন শুধু উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণের তারতম্যের দিকে তাকাইতেছেন, উৎপাদন-শক্তির তারতম্যের দিকে তাকাইতেছেন না।"

রবার্টসনের উক্তি নং ২:—পৌনঃপুনিক পুঁজিপাটার যোগানকে শাসনে রাখিবার উপায় হইতেছে মুদ্রাশক্তির ইতরবিশেষ।

হব্‌সের সমালোচনা :—"রবার্টসন দুইটা কাল্পনিক সিদ্ধান্তের উপর ভর করিতেছেন। তিনি ধরিয়া লইতেছেন যেন উৎপাদনে বৃদ্ধি ঘটিয়াছে (১) হয় যে সব লোক নিযুক্ত রহিয়াছে তাদের বর্দ্ধিত উৎপাদন-শক্তির বলে (২) নয় ত ঐ কাজে লোকবলের পরিমাণ-বৃদ্ধি ঘটিয়াছে বলিয়া।" রবার্টসন পৌনঃপুনিক পুঁজিপাটার অভাবকালে "ইনফ্লেশন"কে দাওয়াই বলিয়া বাৎলাইয়াছেন। কিন্তু তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন ইন্‌ফ্লেশন স্বয়ংই অনেক সময় এই অভাবের জন্য দায়ী।" "বাণিজ্য যখন খুব জোরে চলে তখনি পৌনঃপুনিক পুঁজিপাটার অভাব ঘটে, মন্দার সময় নয়।"

(৫) "দি এণ্ড অব্‌ লেসেসে ফেয়ার" (সিড্‌নী ওয়েব্‌)। এই নামে জন মেনার্ড কেইন্‌স একখানা বই লিখিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধ তারই সমালোচনা। সমালোচকের প্রধান বক্তব্য এইরূপ :—"কেইন্‌সের মাথায় একটা বাতিক ঢুকিয়াছে। সেই বাতিকের বশে তিনি এই পুস্তকে অনেকগুলি কল্পনাকে সত্যের ঠাঁই দিয়াছেন।" "সংরক্ষণ-নীতি ও কার্ল মার্কসের সোশ্যালিজ্‌ম উভয়ই তাঁর চক্ষুশূল।" "ব্রিটিশ লেবার পার্টিকে তিনি কেন যে মার্কসের সোশ্যালিজ্‌ম মনে করিয়াছেন তার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মার্কসের তত্ত্ব যদি "মজুর দল"কে কিছু কিছু পথ বাৎলাইয়া থাকে ত "লিবারেল পার্টি"র হাড়ে মাসে সে তত্ত্বগুলি কম মিশিয়া যায় নাই।" "কেইন্‌স 'রাষ্ট্রের মধ্যে স্বস্বপ্রধান প্রতিষ্ঠানসমূহ" দেশের ভবিষ্যৎস্বরূপ বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় উদাহরণ দিয়াছেন পার্ল্যামেণ্টের, মিউনিসিপাল সোশ্যালিজ্‌মের নয়; বিশ্ববিদ্যালয়ের, ব্যাঙ্ক অব্‌ ইংলণ্ডের কিন্তু "কনজিউমারস্‌ কো-অপারেটিভ্‌ মুভমেণ্টের "নয়।"... "ডিমোক্রাটিক গবর্ণমেণ্ট বা "ভোকেশন্যাল অরগ্যানিজেশন" এই উভয়ই কেইন্‌স সহিতে পারেন না।"

২৮টা দেশী বিদেশী পুস্তকের সমালোচনা বাহির হইয়াছে

মিনার্ভা-ৎসাইট্‌শ্রিফ্‌ট্‌

এই নামে বার্লিন হইতে একখানা পাক্ষিক পত্র চলিতেছে। গ্রুইটার কোং প্রকাশক। দুনিয়ার সকল দেশের ইস্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রন্থশালা, বিজ্ঞান-মন্দির, টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট ইত্যাদি সকল প্রকার বিজ্ঞান, শিক্ষা ও সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে তথ্য প্রচার করা এই কাগজের উদ্দেশ্য। একসংখ্যার সূচীপত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি,—(১) চেকো-শ্লোভাকিয়ার প্রাগ্‌ নগরে অনুষ্ঠিত চতুর্থ আন্তর্জ্জাতিক গ্রন্থশালা-কংগ্রেস, (২) ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত সর্ব্বজার্ম্মাণ গ্রন্থশালা-কংগ্রেস, (৩) আলসাস-লোরেণ বিষয়ক জার্ম্মাণ বিজ্ঞান-পরিষৎ, (৪) ইতালির নেপ্‌লস-নগরের জীবতত্ত্ব-প্রতিষ্ঠান, (৫) স্পেনের ম্যাড্রিড নগরের বিজ্ঞান-পরিষৎ, (৬) আমেরিকার "আর্থিক সঙ্কট"-প্রতিষ্ঠান, (৭) মেক্‌সিকোর প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস ও নৃতত্ত্ব বিষয়ক পরিষৎ, (৮) উক্রেনিয়া দেশের পোভোলিয়নে জনপদ বিষয়ক গবেষণা। এই সব গেল প্রবন্ধ। তাহার পর আছে সংবাদ, যথা (১) মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের গ্রন্থশালা-সম্মিলন, (২) ভিয়েনার ধর্ম্মবিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা-ভবন, (৩) সুইডেনের হেলসিফর্থ নগরে এক ঐতিহাসিক পরিষৎ প্রতিষ্ঠার খবর, (৪) সোভিয়েট রুশিয়ার কাজান জনপদে বিজ্ঞানালোচনার ব্যবস্থা, (৫) মেক্‌সিকোর সরকারী প্রত্নতত্ত্বাভিযান। তাহার পর আছে গ্রন্থ-সমালোচনা। মাসে দুইবার করিয়া নিয়মিতরূপে এই সব প্রবন্ধ সংবাদ-সংগ্রহ এবং সমালোচনা পণ্ডিত-মহলে বাঁটা হইতেছে।

বিলাতী বণিক-সঙ্ঘের পত্রিকাসমূহ

(ক) "মান্থলী জার্ণ্যাল অব্‌ দি হাডারসফীল্ট চেম্বার অব্‌ কমার্স। ১৯২৬, নবেম্বরে আছে—

(১) ইম্পীরিয়াল কনফারেন্স ডিলার (২) উল-টেক্‌সটাইল কেন্দ্রগুলির বেকার-সংখ্যা।

(খ) "দি গ্লাসগো চেম্বার অব্‌ কমার্স মান্থলি জার্ণ্যাল। নবেম্বর, ১৯২৬ এর প্রবন্ধের নমুনা :—

(১) সম্পাদকীয়—কয়লা ধর্ম্মঘটে আমরা কি শিখিতে পারি?

(২) পার্ল্যামেণ্টে বাণিজ্য-প্রস্তাব (৩) বাণিজ্য-

বিষয়ক আইন (৪) আর্থিক হিসাব-নিকাশ ও খবর (৫) মাল তুলিবার বা পাঠাইবার খরচ।

(গ) "মান্থলী জার্ণ্যাল অব্ দি ব্রাড্‌ফোর্ড চেম্বার অব্ কমার্স" নবেম্বরের দু'একটি লেখা :—

(১) চড়া মজুরি সম্বন্ধে ব্যাঙ্কারের মতামত (২) ইম্পীরিয়াল কনফারেন্স (সাম্রাজ্য বৈঠক) (৩) বাণিজ্যের খবর (৪) উল-টেক্সটাইল বাণিজ্যের কয়টি বিশেষত্ব। অষ্ট্রেলিয়াতে অপেক্ষাকৃত সস্তা মেবিনো উল—ব্রাডফোর্ড বাজারে মন্দার সময় দো-আঁশলা টক্করে জিতিতেছে। বিদেশী প্রতিযোগিতা—কয়লায় বিপত্তি) (৫) ল্যাঙ্কাশিয়ারের তূলার ব্যবসায়। তূলা ও কাপড়ের ভবিষ্যৎ আলোচিত হইয়াছে। (৬) ইমারত-গঠনের কাজে ইস্পাতের বাহাদুরি (নিজ ব্রাড্‌ফোর্ডের ইঞ্জিনিয়ারিং নীতি)।

(ঘ) লীড্‌স চেম্বার অব্ কমার্স জার্ণাল। মাসিক। ১৯২৬, নবেম্বর। পত্রিকাখানিতে দেখিতেছি—

(১) সম্পাদকীয় আলোচনা আছে ইম্পীরিয়েল কনফারেন্স সম্বন্ধে, কয়লা বন্ধ ও হরতালের প্রতিকার এবং কারখানা আইন সম্বন্ধে।

(২) ইলেক্‌ট্রিসিটী বা বিদ্যুৎ সরবরাহ বিল উপলক্ষ্যে চেম্বার অব্ কমার্সের মতামতসম্বলিত চিঠির মোসাবিদা। "এই বিল পাশ হইলে সাম্যবাদীর দলের হাতে গিয়া পড়িতে হইবে" এই আশঙ্কায় এই পত্র।

(৩) অ্যাংলো-স্পেনিশ সন্ধি (৪) ভারতের সহিত বাণিজ্য (টি, এম, আইন্‌সকাফের মতামত) (৫) লিড্‌সের শিক্ষা-সপ্তাহ।

(ঙ) মান্থলী জার্ণ্যাল অব্ দি লিভারপুল ইন্‌করপোরেটেড্ চেম্বার অব্ কমার্স।

নবেম্বর, ১৯২৬ সংখ্যায় আছে :—

(১) সম্পাদকী মন্তব্য (২) চেম্বারের বাৎসরিক খানা (রাইট্ অনারেবল ওয়াল্টার রান্‌সিম্যানের বক্তৃতা) (৩) জাহাজ চালানো বন্দর (কর্ণেল টি, এইচ্, হকিন্‌স) (৪) আমাদের ব্যবসায়-প্রথার সমালোচকগণ।

(চ) ম্যাঞ্চেষ্টার চেম্বার অব্ কমার্স মান্থলী রেকর্ড।

৩০শে নবেম্বর, ১৯২৬ সংখ্যার কতকগুলি বিষয় :—

(১) ডেক "সাফ্"করিয়া কাজে লাগিয়া যাও (২) বাণিজ্যের অবস্থা (৩) ঐশ্বর্য্যের বৃদ্ধি কিসে কিসে নিশ্চয় হয় (৪) বিংশ শতাব্দীতে এঞ্জিনিয়ারিং বিস্তার উন্নতি (আগামী বৎসরের জন্য স্যার বেঞ্জামিন লংবটম্ ম্যাঞ্চেষ্টার এসোশিয়েশন অব্ চেম্বারসের সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন। তাঁর বক্তৃতার সারাংশ)। (৫) ভারতবর্ষ (বাণিজ্যের সাধারণ অবস্থা)। (৬) ইয়োরোপে ফ্রান্সের আর্থিক অবস্থা (৭) ১৯২৫ সনে সুইস্ তূলার ব্যবসা।

(ছ) জার্ণ্যাল অব্ দি ব্রিটিশ এমপায়ার চেম্বার অব্ কমার্স ইন্ দি ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স। নিউ ইয়র্ক। অক্টোবর ১৯২৬। কয়েকটি বিষয় :—

(১) রেডিওর ভবিষ্যৎ (২) বাণিজ্যিক ও আর্থিক অবস্থা—ভারতবর্ষ।

চেম্বার অব্ কমার্স জার্ণ্যালগুলি অধিকাংশই উচ্চ শ্রেণীর প্রবন্ধাদিতে পূর্ণ থাকে না। ইহাদের উদ্ভব এবং প্রয়োজন ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার হইতে। বঙ্গ-সন্তানের এই জার্ণ্যালগুলি ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। ফলে এই সত্যটা হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, "পৃথিবীর কত বিভিন্ন স্থানে ইংরেজ তার বাজার বসাইয়া রাখিয়াছে। প্রায় সকল স্থানেই ইংরেজের অতুল প্রতিষ্ঠা। কিন্তু তবু ইংরেজ চোখ বুজিয়া নাই। সর্ব্বদা আপনার স্বার্থের প্রতি খর দৃষ্টি রাখিয়াছে।" সেই স্বার্থেরই এক আকার এই জার্ণ্যালগুলি। অন্য দেশে বা নিজের দেশে ইংরেজের সকলপ্রকার অভাব-অভিযোগের খবর ও স্বরূপ ত জানিতে পারিই। উপরন্তু জগতের কোন্‌খানে কখন ইংরেজী পুঁজিপাটা ও শ্রম লাগাইবার ক্ষেত্র রহিয়াছে, প্রতি ইংল্যণ্ডবাসী ঘরে বসিয়া সে খবর পাইতেছে। অবিরত চেষ্টা, অন্বেষণ, সংগ্রাম, অবিরত লোকচরিত্র বুঝিয়া দেশ-দেশান্তরের বাজারগুলি ঢুঁড়িয়া ঢুঁড়িয়া বাহির করা বা নয়া নয়া বাজারের সৃষ্টি করা ইংরেজের জাতীয় চরিত্রের একটা দিক্। সে দিক্ এই জার্ণ্যালগুলিতে রূপ লইয়া উঠিয়াছে।

[এই আট-দশ মাসের ভিতর আমরা বাংলা ভাষায় লেখা আর্থিক বা অর্থনৈতিক বই দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। এইবার একসঙ্গে তিনখানা ছোট বই আসিয়া জুটিয়াছে। এইগুলার মাল পরখ্‌ করিয়া দেখিলেন শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে।]

বাংলার বর্ত্তমান অর্থসমস্যা ও জাতীয় ব্যবসায়

শ্রীরজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য প্রণীত। মূল্য ৫০ আনা। চট্টগ্রাম। পৃষ্ঠা ৵+১১৪।

এ পুস্তকের নামকরণ অনায়াসে "বাঙ্গালার যৌথ-কারবারের ভবিষ্যৎ" হইতে পারিত।

এই কেতাবের পাঠ্য অংশকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায় (১) সূচনা (২) যৌথ-কারবার (ক) গঠন (খ) ব্যবসা-নির্ব্বাচন (৩) শিক্ষা-সমস্যা।

সূচনা (পৃঃ ১-৩৯) অত্যন্ত সংক্ষেপে ইংল্যাণ্ড ও ভারতের যৌথকারবারের সম্বন্ধে ২।১ টি কথা বলা হইয়াছে এবং আমরা কি কি কারণে যৌথ-নীতি অবলম্বন করি না ও করিলে কি ফল হইতে পারে, তাহা দেখান হইয়াছে। আমরা চাকুরীকেই একমাত্র অর্থ-উপার্জ্জনের নিরাপদ অবলম্বন মনে করি। "আমরা ব্যবসা বাণিজ্যে আদর্শ-বিহীন" অর্থাৎ এদিকে আমাদের কাণ্ডজ্ঞানটা কিছু কম। (২) আমরা অতিমাত্রায় রক্ষণশীল বলিয়া পরস্পর বিশ্বাসহীন, বর্ত্তমান অর্থনীতিতে অজ্ঞ ও দরিদ্র রহিয়া গিয়াছি। (৩) আমাদের সামাজিক অভ্যাসও প্রতিকূল। অর্থাৎ আমরা সর্ব্বদাই পরিবার-ভারাক্রান্ত। (পৃঃ ১২-১৭)

"হেতুবাদ" (অর্থাৎ কি কারণে আমরা যৌথ কারবারে অগ্রসর হই না) একটা অধ্যায়। লেখক ৫টী কারণের উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের মতে তাঁর দ্বিতীয় কারণটাই একমাত্র বড় কারণ। অন্যগুলি অবান্তর। অর্থাৎ ১৯০৬ সনে ও তৎপূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত প্রায় সকল যৌথ কারবারগুলিই একে একে ফেল মারিয়াছে। আমরা মনে করি কারবার ফেল হওয়া বা কারবারে "অসাধুতা" একমাত্র আমাদেরই জাতীয় দোষ। কিন্তু পাশ্চাত্য বিভিন্ন দেশের যৌথকারবারের ইতিহাস ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া দেখিলে আমাদের এই ভ্রম দূর হইবে। "জার্ম্মাণিতে এই নীতি কার্য্যকরী হইতে ১০০ বৎসর লাগিয়াছিল।" আর এই ভারতবর্ষেই কি এলায়েন্স ব্যাঙ্ক অব্‌ সিম্‌লা লিমিটেড্‌, মান্দ্রাজ ব্যাঙ্ক, মারকেন্টাইল ব্যাঙ্ক, ইন্টারন্যাশনাল ট্রান্‌সপোর্টেশন অ্যাণ্ড ডেভেলপ্‌মেণ্ট কোম্পানী লিমিটেড, ওয়ার্লড্‌ ড্রাগ অ্যাণ্ড কেমিকেল কোম্পানী, ঈলিয়ট ঈভান্স ইত্যাদি বহু ইয়োরোপীয় প্রতিষ্ঠান "লাল বাত্তি" জ্বালায় নাই? (পৃঃ ৩৬)

দ্বিতীয় ভাগটাই পুস্তকের বেশীরভাগ কলেবর লইয়াছে। (পৃঃ৩৯-১০১)। যৌগ-কারবার গঠন ও কার্য্যনির্ব্বাহ-পদ্ধতির যে ১৫ টী নিয়মের খসড়া উপস্থিত করা হইয়াছে (পৃঃ ৩৮-৪৩) তার কতকগুলি খুবই দরকারী বলিয়া মনে করি।

লেখক "ব্যবসা-নির্ব্বাচন" অধ্যায়ে বঙ্গ-সন্তানকে কতকগুলি ব্যবসার দিকে যৌথ-কারবার-নীতি চালাইতে ইঙ্গিত করিতেছেন। শিল্প-অনুষ্ঠান বা ম্যানুফাকচারীং অনুষ্ঠানের কথা তিনি ইচ্ছা করিয়া বাদ দিয়াছেন। কৃষি-সম্পদও কয়েকটা মাত্র লইয়া আলোচনা করিয়াছেন।

কিন্তু এই ছোট পুস্তকেও তথ্যনিষ্ঠার পরিচয় যত্র তত্র পাইতেছি। পর্য্যবেক্ষণেরও শক্তি দেখিতেছি। আশা করি লেখক ভবিষ্যতে এই দুই গুণ আরো বেশী লাভ করিয়া

কাজে খাটাইবেন। তাতে আমাদের অর্থতত্ত্ব-সাহিত্যের একটা দিক্ পুষ্ট হইবে।

চাউল, পাট (চটকল, প্রেস শুদ্ধ) কার্পাস (তুলা, তুলার রপ্তানি, বস্ত্রশিল্পে ভারতের স্থান, খদ্দর) রাজনীতি ও অর্থনীতি, চা (কলিকাতার নীলামে গড়পড়তা দর, মূলধন) চাষ (ধান, ইক্ষুর চাষ, তুলার চাষ) সেগুণকাঠ, কয়লা, জাহাজাদি চালাইবার ব্যবসায় লইয়া ছোটবড় আলোচনা হইয়াছে। চায়ের কারবারে বাঙ্গালীর সফলতাকে লেখক বড় করিয়া দেখিয়াছেন। ইহা সঙ্গত মনে করি। কোনো একদিকে জীবনসংগ্রামে বাঙ্গালী জয়লাভ করিয়াছে এ বার্তা বারবার বাঙ্গালীর কানে গেলে তার উৎসাহ ও আকাঙ্ক্ষা বাড়িবে বলিয়া আশা করি।

"ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে অর্থনীতি"তে ব্যাঙ্কিং, বিলাতী ব্যাঙ্ক ও দেশীয় ব্যবসায়, বাঙ্গালীর ব্যাঙ্ক, হুণ্ডি ও ডিম্যাণ্ড ড্রাফ্‌ট, সময় নির্দ্দেশক লগ্নী, ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট বা টাকা খাটানো, স্পেকুলেশন ইত্যাদির একটু একটু পরিচয় দেওয়া আছে। জাতীয় জীবনে ব্যবসা-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা-লাভের পক্ষে ব্যাঙ্ক একটা বড় অস্ত্র। এ অস্ত্রের ব্যবহার ও প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিচয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণতর আলোচনা আবশ্যক।

১৯১৫—২৪ সনের দেশী বিদেশী কতকগুলি পাটকল, কাপড়ের কল, চা কোম্পানী ও অন্য যৌথ-কারবারের লাভালাভের ৫টী চার্ট দেওয়া হইয়াছে।

বাংলার পল্লীসমস্যা

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র দাসগুপ্ত প্রণীত। মূল্য ৺০ আনা। কলিকাতা। সরস্বতী লাইব্রারী। পৃষ্ঠা ৬৭+পরিশিষ্ট ২৮।

কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইলেও এ কেতাবকে চট্টগ্রামের বলিতে পারি। লেখক "স্বদেশী আন্দোলনের যুগে কলিকাতা ছাড়েন এবং ১৯০৮ সন হইতে শিক্ষা-প্রচারের ব্রত লইয়া আছেন।" তিনি তাঁর গ্রাম দুর্গাপুরের এক্সপেরিমেণ্টাল এগ্রিকালচারাল ফার্ম্মে পরীক্ষাদি করিতেছেন।

ইঁহার পুস্তকের প্রধান আলোচ্য বিষয় এই কয়টি :—
(১) দরিদ্র চাষীর অন্নের ব্যবস্থা (২) বাঙ্গালার জলাধার-সমূহের দুরবস্থা (৩) অরণ্য-সম্পদ্ (৪) সমবায় (৫) শিক্ষা-সমস্যা।

শিল্প বনাম কৃষি

ভট্টাচার্য্য ও দাসগুপ্ত উভয়েই দেশের আর্থিক উন্নতি চান। কিন্তু উভয়ের দৃষ্টি আলাদা রকমের। ভট্টাচার্য্য ইয়োরোপীয় কল-কারখানাকে আমাদের দেশে ডাকিয়া আনিতে ভীত নহেন। কিন্তু দাসগুপ্ত কুটির-শিল্পের প্রশ্রয় দিলেও কলকারখানা দেশের সর্ব্বনাশ করিবে বলিয়া মনে করেন। তাঁর এই মতবাদের স্বপক্ষের ও বিপক্ষের তথ্যগুলির সামান্যমাত্র বিচারও তাঁর পুস্তকে পাই না।

পরন্তু তিনি জমীদারদিগকে কৃষককুলের সর্ব্বনাশকারী বলিয়া গালি দিয়াছেন। ভট্টাচার্য্য জমীদারদের দেশের একটা প্রকাণ্ড আর্থিক শক্তি বলিয়া মনে করিয়াছেন। তাঁর দুঃখ ইহা চলন্ত নয়। এ শক্তিকে কাজে লাগাইতে পারিলে বঙ্গদেশ নূতন করিয়া গড়া যায় বলিয়া তাঁর বিশ্বাস।

পল্লী বনাম শহর

"ব্যাক্ টু ভিলেজ" ইত্যাদি বুলিগুলি শুনিতে বেশ ভাল; কিন্তু দেশের শিক্ষিত লোকেরা দেশে ফিরিলেই কি গ্রামগুলির অবস্থা ফিরিবে? ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

প্রথমতঃ, যাঁরা বিদ্যায় বা ধনে অগ্রণী তাঁরা গ্রামে গিয়া বসিলে তাঁদের নিজেদের ক্ষতি হইবে। তাতে দেশেরই ক্ষতি। তাঁরা গ্রামে গিয়া আপনাদের যোগ্য কাজ খুঁজিয়া পাইবেন না, সৃষ্টি করিতেও বহু বিলম্ব হইবে। এমনও হইতে পারে, তাঁদের আদর্শ অনুযায়ী কর্ম্মক্ষেত্র গ্রামে সৃষ্ট হওয়া সম্ভবপর নয়।

দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেকটি গ্রাম স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিলে অর্থাৎ বাহিরের বিশ্বসংসারের (বিশেষ করিয়া শহরের কি ?) সঙ্গে তার আর কোন সম্পর্ক না রাখিবার অবস্থা হইলে গ্রামটা ৫০০ বছর ধরিয়া শুধু আপনার চারিদিকে ঘুরপাক খাইয়া মরিবে, কিন্তু এক পাও অগ্রসর হইবে না। কারণ নব আশা, আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ, নব নব উদ্ভাবনী শক্তি ও বিজয়লাভ, নবীন প্রেরণা শহরে জন্মলাভ করে ও পুষ্ট হয়, গ্রামে নয়। এ সত্য সকল দেশের ইতিহাস হইতে

প্রমাণ করা যায়। তবে দাসগুপ্ত যদি বলেন-গ্রামগুলিকেই শহর করিয়া তোলা হোক্, তবে বলি, তা একদিনের কর্ম্ম নয়, সকল ক্ষেত্রে সুবিধাজনক নয়, আবশ্যকও নয়। আর তজ্জন্য কল-কারখানাকে ভয় করিলেও চলিবে না।

বস্তুতঃ, দেশের জমি অনন্ত নহে, সীমাবদ্ধ। তারপর ফসল ফলাইবার নিয়মে মোট আদায়ের পরিমাণটা সর্ব্বদাই সংকীর্ণ হয়। অথচ সীমাবদ্ধ জায়গার মধ্যে কলকারখানার সৃষ্টিদ্বারা বিপুল অর্থ ও ঐশ্বর্য্য লাভ সম্ভব। আর্থিক উন্নতির পক্ষে কল-কারখানাকে যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার না করিলে পৃথিবীব্যাপী প্রতিযোগিতায় আমরা সর্ব্বত্র ঠকিয়া যাইব।

লেখক পল্লীশিল্প-রক্ষার ও চাষীকে একটা অবান্তর কর্ম্ম জোটাইয়া দিবার একসঙ্গে যে উপায় বাৎলাইয়াছেন তার প্রশংসা করি। কিন্তু একথা বলিতে বাধ্য, দাসগুপ্ত মহাশয় একটা সমস্যারও সুসম্বদ্ধ আলোচনা করেন নাই, সমাধান ত দূরের কথা। এর চেয়ে তিনি যদি তাঁর এগ্রিকালচারাল ফার্ম্মের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কিছু লিখিতেন তবে অনেক ভাল হইত। আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁর ৬৭ পৃষ্ঠার বইখানা কারো পাতে দেওয়া যায় না, কিন্তু পরিশিষ্ট ২৮ পৃষ্ঠার মূল্য কিছু আছে। উহাকেই পুস্তক করিয়া প্রথমকার ৬৭ পৃষ্ঠাকে পরিশিষ্ট করিলে ক্ষতি হইত না। ভবিষ্যতে আমরা নগেন বাবুর আরও লেখা পড়িবার জন্য উৎসুক রহিলাম।

পল্লী-পরীক্ষণ বল্লভপুর

শ্রীকালীমোহন ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পল্লীসেবা বিভাগ শ্রীনিকেতন। বিশ্বভারতী। মূল্য ।৶০ আনা। পৃষ্ঠা ৶০+৫৬।

"পল্লী-সমস্যা ও তথ্য-সংগ্রহ"। মূল্য ৶০ আনা। শান্তিনিকেতন, বীরভূম। পৃষ্ঠা ২৯।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীতে আহ্বান করিয়াছিলেন, "দেশের সেবা সত্যভাবে কর্‌তে হবে" "দুর্গতির কারণগুলি সম্পূর্ণভাবে ও যথাযথভাবে জান্‌তে হবে" "উদ্যোগ পর্ব্বের আরম্ভে সন্ধানের কাজ"।

এই সন্ধানের কাজে প্রথমে ডক্‌টর রজনীকান্ত দাস নিযুক্ত হন। তিনি বিদেশে চলিয়া যাওয়ার পর শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ মহাশয় ইহা করিতেছেন। কাজে সুবিধা ও শৃঙ্খলা বিধানের জন্য শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গু[illegible] কতকগুলি প্রশ্ন প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাহাই পরিবর্ত্তি[illegible] হইয়া "পল্লী-সমস্যা ও তথ্য-সংগ্রহ" নামে প্রকাশি[illegible] হইয়াছে।

মোট ২৭২টি প্রশ্ন দেখিতে পাইতেছি। এই প্রশ্ন গুলিকে স্পষ্টতা দিবার জন্য কয়েকটা বিভাগ করা হইয়াছে যথা:—(১) ভূমিকা (২) ভৌগলিক তথ্য (৩) লোক-সংখ্যা (৪) জমি (৫) জমি বিলি (৬) খাজনা (৭) কৃষি (৮) কৃ[illegible] প্রণালী (৯) গৃহপালিত পশু (১০) হাঁস ও মুরগী (১১) গ্রামে[illegible] ব্যবসা (১২) অন্নবস্ত্র-সমস্যা (১৩) পারিবারিক খর[illegible] (১৪) শিল্প (১৫) আর্থিক অবস্থা (১৬) ঋ[illegible] (১৭) গ্রামের স্বাস্থ্য (১৮) শিক্ষা (১৯) সামাজিক তথ[illegible] (২০) ধর্ম্ম (২১) আমোদ-প্রমোদ (২২) কলা (২৩) কাল্‌চা[illegible] (২৪) শাসন-ব্যবস্থা (২৫) ঐতিহাসিক।

সম্ভবতঃ এই বিভাগগুলিকে কোনো মূলনীতি অনুসর[illegible] করিয়া আরও ভাল করিয়া করা যাইত। অর্থাৎ বড় ভাগগুলি এইরূপ হইতে পারিত (ক) ভৌগলিক অবস্থান ও বৃত্তান্ত (খ) ঐতিহাসিক বিবরণ (ইহারই মধ্যে ধর্ম্ম, কালচার, শাসন-ব্যবস্থা ইত্যাদির ইতিহাস দেওয়া যাইতে পারে (গ) আর্থিক অবস্থা (গ্রামের ঐশ্বর্য্য যথা কৃষি, শিল্প বাণিজ্য, পশু পক্ষী এবং মৎস্য সম্পদ্ ইত্যাদি; লোকসংখ্যা ও তার শ্রেণীবিভাগ যথা চাষী, মজুর ইত্যাদি। প্রত্যেকের আয়ব্যয়ের হিসাব, অন্ন বস্ত্র ও আশ্রয় সমস্যা, এবং ঋণ গ্রহণ ইত্যাদি) (ঘ) সামাজিক অবস্থা (স্বাস্থ্য কলা শিক্ষা, খেলা, আমোদ ইত্যাদি ইহার অন্তর্গত (ঙ) নৃতত্ত্ব (চ) আইন (জমিজমা ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সংক্রান্ত)।

তথাপি কাজ আরম্ভ করিবার পক্ষে এই প্রশ্নগুলির দাম আছে। কাজ করিতে করিতে এই প্রশ্নগুলির মধ্যেও শৃঙ্খলা এবং সামঞ্জস্য গড়িয়া উঠিবে আশা করি। কয়েকটি প্রশ্নের নমুনা:—মোট লোকসংখ্যা কত? পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে কত লোক ছিল? চাষের উপর কতজন লোক নির্ভর করে? কলে মজুরি করে কতজন? খাজনার

বদলে বেগার দেওয়া হয় কিনা? গড়ে বিঘাপ্রতি কত শস্য উৎপন্ন হয়? কি ধরণের লাঙ্গল? অন্যান্য যন্ত্র? মোট হালের পশু কত? মহিষ কত? কি কি সার ব্যবহৃত হয়? লাঙ্গল বলদ ও হালের ভাড়া কত? সার ও বীজের মূল্য, ফসল কাটার ব্যয়, তোলার ব্যয়, বেচার ব্যয় ও অন্যান্য ব্যয় কত? মোট ব্যয় কত? গৃহপালিত পশুর মোট সংখ্যা কত? কোন্ শ্রেণীর পশু কত? গাইগরু গড়ে কত দুধ দেয়? গোচারণের কত জমি আছে? কত খড় গ্রাম হইতে বাহিরে চলে যায়? মুরগী হাঁস কবুতর ইত্যাদি বছরে কত ডিম দেয়? শতকরা কত ডিমে কত ছানা হয়? নিত্য ব্যবহার্য্য তৈজসপত্র কোথা থেকে গ্রামবাসীরা কিনে? গত পাঁচ বৎসরের তুলনায় মজুরি কত বৃদ্ধি হইয়াছে? মজুরের সংখ্যা কত? প্রত্যেক মজুর রোজ কয় ঘণ্টা কাজ করে? সপ্তাহে কোনো ছুটী নেয় কিনা? মুসলমান ও সাঁওতাল গ্রাম থেকে হিন্দু গ্রামের লোকের বিশেষত্ব কি?

এইরকম সব প্রশ্ন সাম্‌নে রাখিয়া শ্রীনিকেতন হইতে বোলপুরের কাছে বল্লভপুর নামক স্থানে অনুসন্ধান হইয়াছিল। এটি একটি ছোট গ্রাম। জন-সংখ্যা মাত্র ৮৪।

তার ফলে "পল্লী পরীক্ষণ বল্লভপুর" এই পুস্তিকা বাহির হইয়াছে। একটা ইমারতের একটা একটা করিয়া সকল ইটগুলি খুলিয়া বলিতে পারি না "এই ইমারত"। মানব দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে স্পষ্টরূপে কাটিয়া কাটিয়া বলিতে পারি না "এই মানব শরীর"।

প্রত্যেক সমগ্র পদার্থের অনেক ভাগ ও উপবিভাগ অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ আছে। সমগ্রতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে কোনো একটা ভাগ বা অঙ্গের কোনো অর্থ বা সার্থকতা থাকে না। কিন্তু অপর পক্ষে প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রত্যেক খুঁটিনাটির সহিত পরিচিত না হইলে সমগ্রের জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না এবং সমগ্রকে কোনো একটা লক্ষ্যের দিকে জ্ঞানতঃ চালানও যায় না।

সেইদিক্ হইতে শ্রীনিকেতনের এই পল্লীসেবা-বিভাগের চেষ্টা উল্লেখযোগ্য।

আমরা অনেক দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি যে, পল্লীগুলি শ্রীহীন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কেন শ্রীহীন, এর কোথায় কোন্ গলদ রহিয়াছে, কেমন করিয়া জানিব যদি এর প্রত্যেক অংশের তন্ন তন্ন পরীক্ষা না করি?

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সমগ্রতার আদর্শ অর্থাৎ "পল্লী পরীক্ষাও অন্য একটা বড় পরীক্ষার অন্তর্গত" একথা ভুলিয়া গেলে বিপদ ঘটিতে পারে।

ধান, আলু ও আখের প্রত্যেকটা চাষের আয়ব্যয়ের এক একটা হিসাবের খসড়া দেওয়া হইয়াছে। এরূপ অনেক খসড়ার প্রয়োজন আছে। মাটির গুণাগুণ পরীক্ষার পর একের অধিক অন্য কোন্ ফসল প্রবর্ত্তন করা যায় তার মীমাংসা সহজ হইবে।

গ্রামের ২৪টী পরিবারের মধ্যে মাত্র দু'টির (একটি সম্পন্ন ও অন্যটি ঋণগ্রস্ত এবং অন্য ২২টিও তাই) ছবি আমরা পাইতেছি (পৃঃ২৭-৩৪)। কিন্তু এই পারিবারিক আয়ব্যয়ের কথাটাই সব চেয়ে বড় কথা। সুতরাং গ্রামের প্রত্যেক পরিবারের আয়ব্যয়ের সম্পূর্ণ হিসাবই নিখুঁতভাবে প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। কাকেও বাদ দিলে চলিবে না। ২৩ পরিবার ঋণগ্রস্ত বা ৭৭ জনই চাষী বলিয়া তাদের পারিবারিক আয়ব্যয়ের হিসাব একপ্রকার হইবে কে বলিল? দুইজনকে দেখিয়া গ্রাম সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইলেও ভুল করা হইবে। এই ২৪টি পরিবারেরই সম্পূর্ণ হিসাব দেখিতে পাইলে আর্থিক অবস্থা যথার্থরূপে বুঝিতে পারিব।

সম্পূর্ণ হিসাব বলিতে এই বুঝিতে হইবে:—(১) যে মাসে কাজ আরম্ভ হইয়াছে তার পূর্ব্ববর্ত্তী মাসের প্রতিদিনের হিসাব (২) গত বৎসরের প্রতিমাসের পূরা হিসাব (৩) তার পূর্ব্ব ১০।১২ বা ততোহধিক বৎসরের প্রত্যেকটার হিসাব।

বলা বাহুল্য এইরূপ প্রথায় এক একটা গ্রামের সম্বন্ধে প্রচুর আর্থিক, সামাজিক ইত্যাদি তথ্য বাহির হইয়া পড়িবে। তার উপরে ভর করিয়া ঐ ঐ বিজ্ঞানগুলি গড়িয়া উঠিবে।

পরিশিষ্টে লিখিত লাঙ্গলের নানা অঙ্গের পরিভাষাগুলি প্রণিধানযোগ্য। এইরূপে অতি সহজেই প্রত্যেক গ্রাম হইতে এবিষয়ে ও অন্যান্য বিষয়ে বহু পরিভাষা সংগ্রহ করিলে "বাছাই" বা "যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন" আপনি ঘটিবে।

"হিষ্টরি অব্ ইণ্ডিয়ান টারিফ" (ভারতীয় শুল্কের ইতিহাস); এন, সা, বি, এ, পি-এইচ, ডি (লণ্ডন); থ্যাকার অ্যাণ্ড কোং; বোম্বাই; মূল্য ৭॥০।

"আর্লি ইয়োরোপীয়ান ব্যাঙ্কিং ইন্ ইণ্ডিয়া" (ভারতে ইয়োরোপীয় ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানের আদিম অবস্থা) শ্রীহরিশচন্দ্র সিংহ; লণ্ডন, ম্যাকমিলান কোং, কলিকাতা; ১৯২৭; ১২ শিলিং ৬ পেন্স।

"ইকনমিক অ্যানাল্স্ অব্ বেঙ্গল" (বাংলার আর্থিক কথা); শ্রীযোগীশচন্দ্র সিংহ, ম্যাকমিলান কোং, কলিকাতা; ১৯২৭; ১২ শিলিং ৬ পেন্স।

"গ্লিম্পসেস্ অব্ হ্বিলেজ লাইফ ইন্ নর্দার্ণ ইণ্ডিয়া" (উত্তর ভারতে গ্রাম্য জীবন) অনারেবল ঠাকুর রাজেন্দ্র সিংহ, থ্যাকার স্পিঙ্ক কোং, কলিকাতা; ১৩২ পৃষ্ঠা, ১৯২৬; ৩৲ টাকা।

সাইড লাইট্‌স অব্ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এভলিউশ্যন, (শিল্প-বিপ্লবের আনুষঙ্গিক কথা); হ্ব্যাথান হ্বিলকিন্স; ১৯২৫।

ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল অ্যাণ্ড কমার্শ্যাল এভলিউশ্যন ইন্ গ্রেট ব্রিটেন ডিউরিং দি নাইণ্টিন্থ সেঞ্চুরি (বিলাতের আর্থিক ও বাণিজ্যিক ক্রমবিকাশ, উনবিংশ শতাব্দীর কথা) এল্ নোএলস্; ৪র্থ সংস্করণ; রুটলেজ; ১৯২৬।

নর্থস্কটল্যাণ্ড কলেজ অব্ অ্যাগ্রিকালচার, ১৯২৬-২৭ পঞ্জিকা, ৮+১২৪ পৃষ্ঠা; অ্যাবারডিন।

উইগান অ্যাণ্ড ডিষ্ট্রিক্ট মাইনিং এণ্ড টেকনিক্যাল কলেজ, সপ্তদশ বর্ষ পঞ্জিকা ১৯২৬-২৭, ১৬+১৪৫ পৃষ্ঠা; উইগান।

ইষ্ট অ্যাংগ্লিকান ইনষ্টিটিউট্ অব্ অ্যাগ্রিকালচার, এসেক্স অ্যাগ্রিকালচারাল কমিটি, ১৯২৬-২৭ পঞ্জিকা, ৮০+৩২ পৃষ্ঠা।

এডিনবরা অ্যাণ্ড ইষ্ট অব্ স্কটল্যাণ্ড কলেজ অব অ্যাগ্রিক্যালচার, ১৯১৬-২৭ পঞ্জিকা, ৯১ পৃঃ; এডিনবরা।

মেমোয়ার্স অব্ দি ডিপার্টমেণ্ট অব্ অ্যাগ্রিকালচার ইন্ ইণ্ডিয়া, কেমিক্যাল সিরিজ্। ২১১—২৩৩ পৃষ্ঠা, তিন আনা কলিকাতা।

দি ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট রেকর্ড, সিলভি কালচার সিরিজ, ৫+৩৭ পৃষ্ঠা ও ১০খানি প্লেট; ১৵০; ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় প্রকাশ-বিভাগ।

ফেডারেটেড্ ষ্টেট (কৃষি-দপ্তরের ১৯২৫ সনের বার্ষিক বিবরণী) ২+১২ (কুয়ালা, লামপুর, এফ, এম, এস)

মাদ্রাজ ফিসারী ডিপার্টমেণ্ট (১৯২৪-২৫ সনের মৎস্য-বিবরণী) ৩+৩৮ পৃঃ+৭ প্লেট; ৸৵০; মাদ্রাজসরকার।

সোনার বাংলা

সৈয়দ আবুল হায়াত, ঠেঙ্গাপাড়া, বৰ্দ্ধমান

বাংলার নাম 'সোনার বাংলা' অথচ বাংলার মত গরিব দেশ দুনিয়ায় আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এসে শত শত বিদেশী বণিক তাদের শূন্য থলে সোনায় পূর্ণ করে নিজেদের দেশের কত উন্নতি করছে, নিজেদের ছেলে মেয়ে পরিবার নিয়ে কত সুখে দিন গুজরান করছে আমরা তাহা ভেবেও ঠিক করতে পারি না। বিদেশী বণিকদের কথা ছেড়ে দিলেও আমাদের পড়সী নানা ভারতীয় জাতি এই বাংলার বুকে বসে কত টাকা রোজগার করে নিয়ে তাদের ভাণ্ডার বোঝাই করছে ক'জন বাঙ্গালী সে কথা ভাবে? ইহারা যে শুধু বাংলার সহরেই টাকা কুড়াবার জাল পেতে বসে আছে তা নয়। পাড়াগাঁয়ের অলি-গলিতেও তাদের নজর পড়েছে। বাংলার সুদূর পাড়াগাঁয়ে আজকাল মাড়োয়ারী, পাঞ্জাবী, খোট্টা, কাবুলী এবং আরও নয়া নয়া অনেক বিদেশী লোককে টহল দিতে দেখা যায়।

এই সব লোক বেশ ভাল করে জানে বাঙ্গালীকে কেমন করে নিঃস্ব করতে হয়। বর্ষা পড়বার কিছু আগে বা সম সম কালে এরা টাকার থলে নিয়ে গরিব বাঙ্গালী চাষীদের দুয়ারে গিয়ে দেখা দেয় এবং আয়েন্দা ফসলের উপর টাকা দাদন করে। পাট, ধান, আলু, গম কোন রকম ফসল তারা বাদ দেয় না। যে-কোন ফসলের উপর একটা মামুলিমত সুবিধা রকম দাম ধরে টাকা ছড়াতে তাদের কিছুমাত্র ভয় হয় না। কারণ তারা জানে বাংলার মাটিতে অজন্মা হবে না, পাট না হয় ধান হবে, ধান না জন্মায় গম ফলবে। অধিকন্তু বাঙ্গালী নিরীহ জাতি সুতরাং টাকা মারা যাবার ভয় নাই।

বাঙ্গালী জাতটা কি ছাঁচে গড়া তা এক ভগবান ছাড়া কেউ বলতে পারে না। আমরা ঘরের পয়সা হতে সুরু করে, জমির ফসল, শরীরের পরিশ্রম, গায়ের রক্ত, স্থল বিশেষে পৈতৃক প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়ে বিদেশীর অর্থ-সমাগমের সাহায্য করছি। আর তার বদলে পাচ্ছি "সর্ব্বনাশ"।

যেসব বিদেশী বণিক নিজের মূলধনে কারবার করে, তা'দিকে ছেড়ে দিলেও বাংলায় এমন অনেক বড় বড় যৌথ কারবার আছে, যার পুঁজির বেশীর ভাগ টাকাই এই বাঙ্গালী জাতির। বাংলার চাষা সেই সব কারবারের কাঁচা মাল-মশলা জোগায়; বাংলার শ্রমিক—যদিও বাংলার বাহিরের মজুর-সংখ্যাই অধিক—তাতে রক্ত-জল-করা হাড়-ভাঙ্গা মেহনৎ করে। তথাপি সত্য কথা বলতে গেলে বলতে হবে এইসব কারবারের হর্ত্তাকর্ত্তা বিদেশী বণিকের দল। লাভের শাঁস তারাই খায় বাঙ্গালী পায় শুধু খোসা।

আমরা বাঙ্গালী। দুনিয়া জুড়ে আমাদের নাম আছে—আমরা খুব বুদ্ধিতে মোড়ল। কিন্তু সত্য কথা বলতে গেলে আমাদের এম-এ, বি-এ'র চেয়ে নিরক্ষর পশ্চিমার দল অনেক বেশী বুদ্ধিমান। কারণ এই সব লোক বাংলার বাহির হতে "লোটা কম্বল" সম্বল করে বাংলায় এসে "চানাচুর বাদাম ভাজা" বেচতে আরম্ভ করে, ও দু'দিন পরে ছোট বড় ব্যবসা ফেঁদে বসে। আর আমরা বাঙ্গালী ঘরের ধন পরকে বিলিয়ে দিয়ে নিজেদের বিদ্যা বুদ্ধি ও পরিশ্রম দ্বারা তাদের ব্যবসা বাড়িয়ে তুলি।

এমন যে বাঙ্গালী জাতি দুনিয়ায় তাদিগকে বাঁচতে হলে চাষা হতে সুরু করে কলেজের পড়ুয়া পর্য্যন্ত সবাইকে নূতন ছাঁচে গড়ে তুলতে হবে। জুলুমদার জমীদার, সুদখোর মহাজন ও বিদেশী স্বার্থপর বণিকদের হাত হতে নিরীহ গরিব চাষীদিগকে বাঁচাতে হবে। কি উপায় অবলম্বন করলে এই সব নিরীহ প্রজাগণ রক্ষা পায় তা খুঁজে বা'র করতে হবে। জমিতে যাহাতে ভাল ফসল জন্মে সে বিষয়ে তাহাদিগকে তালিম দিতে হবে। কোন্ জমিতে কি ফসল ভাল জন্মায়, কোন্ ফসলে কি

সার দিলে বেশী উপকার হয়, সে বিষয়ে তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্ত গাঁয়ে গাঁয়ে রীতিমত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। দরকার হলে বিদেশ হতে ভাল বীজ আমদানি করবার ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকগণ যাহাতে গোলামীর মোহ ছাড়তে পারে তার জন্ত দরকার মত সভা-সমিতি গড়তে হবে। শিক্ষিত যুবকদিগকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, সারা মাস হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি খেটে মাসের শেষে যে মজুরি মেলে স্বাধীন ব্যবসায়ী নাপিত ধোপা তাহার চেয়ে অনেক বেশী রোজগার করে। শিক্ষিত যুবকগণ যাহাতে ব্যবসায় এবং শিল্প-শিক্ষার দিকে নজর দেন সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করতে হবে। তাঁহাদিগকে বুঝিয়ে দিতে হবে, যে সাধারণ সাহিত্য-মূলক শিক্ষার পরিণাম গোলামী, তাহা অপেক্ষা শিল্প-মূলক বিদ্যার পরিণাম শতগুণে শ্রেষ্ঠ। আমাদের স্কুল-কলেজের ছাত্রগণ চাকুরীর মোহে কেবল সাহিত্য শিক্ষায় মজগুল থাকেন, ব্যবসার বা শিল্পমূলক বিদ্যার দিকে তাদের মন চলে না। বাঙ্গালী ভুলে গেছে যে একদিন তাদের বাপ-দাদারা ব্যবসার ও শিল্পকলার ভিতর দিয়ে সোনার বাংলার মুখ উজ্জ্বল করে নিজে খেয়ে এবং পরকে খাইয়ে রাজার হালে দিন গুজরান করে গেছেন। বাঙ্গালী যদি আবার তার বাপদাদাদের মত ব্যবসা, শিল্প ও কৃষিকার্য্যের উন্নতি করতে পারে তবে তাদের অবস্থা যে নয়া জাপানের মত একদিন উজ্জ্বল হয়ে উঠবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা

শ্রীজগজ্জ্যোতি পাল, কেমিষ্ট, রাখামাইনস, সিংভূম

অগ্রহায়ণ সংখ্যার "আর্থিক উন্নতি"তে ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে লেখক ও সম্পাদক উভয়েই আরও আলোচনা চাহিয়াছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক যে-সকল শব্দগুলির অবতারণা করিয়াছেন আমি তাহার কতকগুলির সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিব।

পরিভাষা তৈয়ারী হইলে অনেক বিভিন্ন শব্দের সন্নিবেশ হইবে এবং এক এক লেখক নিজ নিজ খেয়াল মত তাহা ব্যবহার করিবেন। তবে যিনি আপন বক্তব্য সম্যকরূপে পরিস্ফুট করিতে পারিবেন তাঁহারই পরিভাষা সমাদৃত হইবে। আর পরিভাষা সৃষ্টি করিতে হইলে, আমার মনে হয়, সংস্কৃত সাহিত্যের সাহায্য নেওয়া সমীচীন হইবে। যাহা হউক সুধাকান্তবাবুর কয়েকটী কথার প্রতিশব্দ আমি বলিতেছি। সুধাকান্ত বাবু থিওরেটিক্যাল ও প্রাকৃটীক্যালের প্রতিশব্দ জানিতে চাহিয়াছেন। তদুত্তরে আমি বলিতেছি—

থিওরেটিক্যাল—তথ্যগত, পুঁথিগত।

প্রাকৃটিক্যাল—বস্তুতঃ, কার্য্যতঃ, ফলিত।

'প্রোপোর্‌শান' যে 'অনুপাত' তাহা আমরা পাটীগণিতেই পড়িয়াছি। সুতরাং ইহা যে সুধাকান্তবাবুকে কেন জ্বালাইয়াছে তাহা বুঝিলাম না। তবে, ভেরিয়েশান কথাটী জ্বালাইবার মতই জিনিষ এবং উনি যে উহার প্রতিশব্দ লিখিয়াছেন তাহা মন্দ হয় নাই। আমি ভেরিয়েশানের প্রতিশব্দের জন্য 'বর্ত্তনশীলতা' কথাটীর অবতারণা করিতে চাহি।

কারিগরেরা তাঁহাদের টুলস্‌কে' হাতোয়ার বলিয়া থাকেন। সুতরাং টুলসের প্রতিশব্দ হাতকল না বলিয়া 'হাতোয়ার' বলাই উচিত হইবে।

লেখক 'মানির' প্রতিশব্দ মুদ্রা ও 'কয়েনের' প্রতিশব্দ ধাতুমুদ্রা লিখিয়াছেন। কিন্তু আমি মানির প্রতিশব্দ 'অর্থ' ও কয়েনের প্রতিশব্দ মুদ্রা বলিতে চাহি।

লেখক ইন্‌ডাষ্ট্রি, ম্যানুফ্যাকচার ও ম্যানুফ্যাকচারারের প্রতিশব্দ যথাক্রমে ব্যবসা, কারবার ও কারবারী কেন লিখিলেন বুঝিতে পারিলাম না। আমরা'ত ইন্‌ডাষ্ট্রি মানে শিল্প, ম্যানুফ্যাকচার মানে উৎপাদন ও ম্যানুফ্যাকচারার মানে উৎপাদক বা উৎপন্নকারী পড়িয়াছি।

সার্কুলেটিং ক্যাপিটালের প্রতিশব্দ পৌনঃপুনিক পুঁজি-পাটা লিখিয়াছেন কিন্তু এ জায়গায় চল্‌তি পুঁজিপাটা লিখিলে সরল ও সহজভাবে অর্থটী বোধগম্য হয়। ওয়ার্কম্যানের প্রতিশব্দ কারিগরের পরিবর্ত্তে শ্রমিক, মজুর ও কর্ম্মী এ তিনই ব্যবহার করা যাইতে পারে। জেনারেল মানে সাধারণ। উনি আবার 'সামান্য' ও কোন্ হিসাবে যোগ করিলেন ?

বিল্ডিংস মানে আমরা পাকাবাড়ী, কোঠাবাড়ী বুঝি। উনি উপরন্তু কারখানা বলিয়াছেন। আমরা কিন্তু কারখানা মানিযা লইতে রাজী নই। মেজাবের প্রতিশব্দ মানদণ্ড ও মান লিখিয়াছেন। আমি এতদ্‌সঙ্গে পরিমাণও যোগ করিতে চাহি। আর ষ্ট্যাণ্ডার্ড সম্বন্ধে আমি কার্ত্তিক মাসের আর্থিক উন্নতিতে যাহা লিখিয়াছিলাম এখনও সেই মত পোষণ করি। মীন শব্দের প্রতিশব্দ মাঝারি লিখিয়াছেন আমি তা ছাড়া "গড়পড়তা' কথাটীরও অবতারণা করিতে চাহি।

লেখক নমিন্যালের প্রতিশব্দ 'আপাত' লিখিয়াছেন, কিন্তু 'নামমাত্র' বলিতে আপত্তি কি ? প্রডিউসের প্রতিশব্দ 'ফসল' লিখিয়াছেন কিন্তু যখন মিল প্রডিউসের কথা উঠিবে তখন ফসল কিরূপে ব্যবহৃত হইতে পারিবে ? আমি প্রডিউসের প্রতিশব্দ উৎপন্ন দ্রব্য লিখিব।

বিজয়বাবু ওয়েজেস্ শব্দের বাঙলা 'তলব' লিখিয়া একটু আধুনিকতার পরিচয় দিয়াছেন। আমরা সেকেলে ধরণের লোক। আমরা ওয়েজেসকে পারিশ্রমিক, মজুরি, মাহিনা, বেতন ইত্যাদি শব্দ দ্বারা অভিহিত করিব।

র মেটিরিয়ালের প্রতিশব্দ আমাদের সম্পাদক মহাশয় 'কুদরতী মাল' লিখিতেছেন এবং এই কয়েক মাসে আমরা এই কথাটীকে অনেকটা হজম করিয়া ফেলিয়াছি। তবে শিল্পে র মেটিরিয়াল যে ভাবে ব্যবহৃত হয় তাহাতে আমরা র মেটিরিয়ালকে শিল্পের গোড়ার মাল বুঝি সুতরাং আমরা র মেটিরিয়ালকে আমাদের ভাষায 'গোড়ার মাল' বলিয়া চালাইতে পারি।

আমার কোন বন্ধু বলিতেছেন তিনি পাটীগণিতে ভেরিয়েশানের বাঙলা 'সমানুপাত' পড়িয়াছেন। আমিও 'সমানুপাত' শব্দটীব খুব সমর্থন করিতেছি; কারণ সমান ভাবে অনুপাত সমানুপাত।

মফঃস্বলের পাট-সাহিত্য

ঘরে ঘরে থলে' তৈয়ারী

(১)

পাট বাঙ্গালার নিজস্ব সম্পত্তি। আর এদেশের কৃষিজ সম্পদের মধ্যে ইহা অতি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। বাঙ্গালার তথা ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যে পাট একটী প্রধান পণ্য। এদেশের কৃষক পাটের পয়সা পাইয়াই কয়েক দিন সচ্ছলতার মুখ দেখিতে পায, মাছ দুধ খায়, কাপড় জুতা কেনে, নূতন ঘর তোলে, আবার মামলা মোকর্দ্দমা করিয়া উকিল মোক্তারের পকেট ভর্ত্তি করে। কিন্তু এই পাট সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ পরমুখাপেক্ষী। কদাচিৎ দুই এক বৎসর ভিন্ন প্রায়ই কৃষকদিগকে যৎসামান্য মূল্যে পাট বিক্রয় করিতে হয়। পাট যাহা উৎপন্ন হয় তাহার অতি সামান্য অংশই আমরা কাজে খাটাইতে পারি। সুতরাং উহা বিক্রয় করিবার জন্য আমাদিগকে পরের দ্বারস্থ হইতে হইবেই। আমাদের নিঃস্বতা ও অসঙ্ঘবদ্ধতার সুযোগ লইয়া বিদেশী কলওয়ালা ও মহাজনগণ ইচ্ছামত মূল্যে পাট খরিদ করিয়া প্রভূত পরিমাণে লাভবান হইতেছে। আমরা যদি ঘরে ঘরে থলে' প্রভৃতি তৈয়ারী করিয়া উৎপন্ন পাটের অর্দ্ধেকটাও কাজে খাটাইতে পারিতাম তবে দায়ে পড়িয়াই কলওয়ালাগণ বেশী দাম দিয়া পাট কিনিতে বাধ্য হইতেন। অন্যদিকে থলে' তৈয়ারীর মজুরী হইতেও

যে আয় হইত তাহা আমাদের মত দরিদ্র দেশের পক্ষে উপেক্ষণীয় নহে। খদ্দর অপেক্ষা চট, থলে' প্রভৃতির নির্ম্মাণে সুবিধা এই যে, খদ্দরে যে পরিমাণ মনোযোগ ও ধৈর্য্যের প্রয়োজন ইহাতে ততটা লাগে না।

জলপাইগুড়ি জেলায় এখনও চট ও থলে' তৈয়ারী গৃহ-শিল্পরূপে বর্ত্তমান আছে এবং মিলের তৈয়ারী চট ও থলে' হইতে এ জেলাবাসীদের ঘরে তৈয়ারী জিনিষ কোন অংশে নিকৃষ্ট হয় না। কিন্তু যে প্রণালীতে ইহারা চট প্রভৃতি তৈয়ারী করে তাহা অতি সময়সাপেক্ষ। এদেশের চট নির্ম্মাতৃগণ যদি হাতে চট বুনিবার পরিবর্ত্তে ঠকঠকি তাঁত ব্যবহার করেন তবে বর্ত্তমান অপেক্ষা বহুগুণ অধিক মাল উৎপন্ন করিয়া লাভবান হইতে পারেন। জেলাবাসীর দরদীরা যদি ভোট-সংগ্রামের ডাক-খরচটাও এই উদ্দেশ্যে ব্যয় করিতেন !

(২)

উৎপন্ন পাটের অন্ততঃ কিয়দংশ এদেশেই কাজে খাটান যে কিরূপ আবশ্যক তাহা ইতিপূর্ব্বে দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছি। বস্তুতঃ ইহাই যে এবিষয়ে আমাদের একান্ত নিঃসহায় অবস্থার প্রধান প্রতিকার তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কৃষকগণ যৌথ প্রণালীতে কাজ করিলে, গ্রামে গ্রামে ধর্ম্ম-গোলা প্রভৃতি স্থাপিত হইলে, আমরা বিদেশীয় মহাজনের নিকট হইতে বেশী দাম আদায় করিতে সমর্থ হইতে পারি। কিন্তু মাত্র সমবায় দ্বারাই যে আমরা আশানুরূপ ফল লাভ করিব এরূপ বোধ হয় না। জিনিষের মূল্য পরিমাণ ও চাহিদার উপর নির্ভর করে। যে পরিমাণ জিনিষের দরকার তাহা অপেক্ষা বেশী জিনিষ বাজারে থাকিলেই মূল্য কমিবে আর তাহা অপেক্ষা কম থাকিলেই মূল্য বাড়িবে। এবার প্রয়োজনাতিরিক্ত পাট উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়াই পাটের দাম অত্যন্ত কম। আবার গত বৎসর পাটের খুব বেশী দাম পাইয়া সকলেই পাট আবাদ করিতে আগ্রহান্বিত হওয়ায় পাটের বুনন, নিড়ান, ধোয়া প্রভৃতির মজুরী অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছিল। অনেকে বলেন, আমরা যদি পাট বিক্রয় না করি তবে খরিদ্দারগণ অবশেষে বাধ্য হইয়া আমাদের নির্দ্দেশ মত মূল্য দিয়া পাট কিনিতে বাধ্য হইবে। ম্যাগজন নামক এক ব্যক্তি কিছুকাল পূর্ব্বে খবরের কাগজ মারফৎ একটি কর্ম্ম-প্রণালীও দিয়াছিলেন (দুঃখের বিষয় তাঁহার নিকট পত্র দিয়া আর কোন উত্তর পাইলাম না)। কিন্তু বলিতে গেলে পাট প্রভৃতি গুটীকয়েক কৃষিজাত দ্রব্যই এদেশের ধনাগমের একমাত্র পন্থা। পর্ণকুটীরবাসী কৃষক হইতে হাকিম পর্য্যন্ত, ফরিয়া হইতে গুদিয়ান পর্য্যন্ত সকলেই ঐ পয়সা দ্বারাই মানুষ। সুতরাং আমাদের ন্যায় নিঃস্ব দেশের পক্ষে উপায়ের একমাত্র পন্থাকে অন্ততঃ কিছু কালের জন্যও বর্জ্জন করা কতটা সম্ভবপর তাহাই বিবেচ্য। তাহার উপরে উপরি উক্ত উপায় অবলম্বন করিলে যাহাদের সহিত আমাদের সম্মুখ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, তাহারা এতই শক্তিশালী যে, আমাদের দেশে বিশেষ লব্ধপ্রতিষ্ঠ সঙ্ঘসকল প্রতিষ্ঠিত না হইলে সে সংগ্রামে আমাদের শোচনীয় পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। আবার সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য্য করায় আমরা সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত। একথা বলা হইতেছে না যে, কৃষি-সঙ্ঘ গড়িয়া উঠা অন্যায় বা অনাবশ্যক; পরন্তু ভারতে যদি শক্তিশালী কৃষি-সঙ্ঘ গড়িয়া উঠে তবে এদেশের কেন সমগ্র পৃথিবীর চেহারা বদলাইয়া যাইবে। এই মাত্র বলিতে চাই যে, যদি আমরা পাট হইতে আশানুরূপ লাভবান হইতে চাই, যদি আমরা পাট উৎপন্ন করিয়া পরের হাতধরা হইয়া থাকিতে না চাই, তবে নিজ হাতে পাটের তৈয়ারী চট, থলে' ইত্যাদি করিবার বন্দোবস্ত করাই প্রকৃষ্ট পন্থা। ইহার আবার দুইটী উপায় (১) পাটকল স্থাপন (২) উক্ত শিল্পকে গৃহ-শিল্পরূপে গ্রহণ। সুতরাং তাহার পুনরুক্তি বাহুল্যমাত্র। চট, থলে' প্রভৃতি আজও এ জেলায় একটী প্রধান গৃহ-শিল্প। এদেশের মেয়েরা এমন চট তৈয়ারী করে যে, তাহা একটু রং করিয়া লইলে আলোয়ান ও কোটের থান রূপে অনায়াসে ব্যবহার করা চলে। অবসর সময় একটু পরিশ্রম করিলে এই বঙ্গদেশের ঘরে ঘরেই এইরূপ মূল্যবান জিনিষ তৈয়ারী হইতে পারে। কলের চট ও থলে'র সহিত প্রতিযোগিতায় হয়ত আমাদের এই গৃহজাত চট, থলে' ইত্যাদি বাজারে না দাঁড়াইতে পারে, হয়ত আমাদের উৎপন্ন চট ইত্যাদির দামে তৈয়ারীর মজুরী পোষাইতে না পারে; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে উক্ত মাল আমাদের

অবসরকালে তৈয়ারী। ঐ সময়টা আমাদের অনর্থক কাটে। কলের দারুণ প্রতিযোগিতার মুখে এখনও যে এ শিল্প টিঁকিয়া আছে তাহার কারণই এই। খদ্দর সম্বন্ধেও উপরি উক্ত কথা সম্পূর্ণ খাটে। কিন্তু খদ্দর-শিল্প সূক্ষ্ম শিল্প। সূতা পাকান হইতে আরম্ভ করিয়া কাপড় বুনান পর্য্যন্ত উহার প্রত্যেক কাজেই, অসীম ধৈর্য্য, অখণ্ড মনোযোগ ও কঠোর পরিশ্রমের দরকার। কিন্তু চট প্রভৃতির নির্ম্মাণে তেমন যত্ন আবশ্যক হয় না। প্রায়ই দেখা যায় বাজারের মধ্যে মাছ বিক্রী করিতে করিতে জেলে কিংবা মাঠে গরু চরাইতে চরাইতে রাখাল পাট বা শণের সূতা পাকাইতেছে। বয়নও অতি সহজ, সূতা ছিঁড়িয়া যাইবার মোটেই ভয় নাই। এই সমস্ত সুবিধার জন্যই বোধ হয় দেশের বস্ত্রশিল্প লোপ পাইলেও চট প্রভৃতির নির্ম্মাণ লোপ পায় নাই। এখন চাই এই নির্জ্জীব শিল্পকে সজীব করিয়া তোলা। আমরা একটু গা-নাড়া দিলে যেমন কাপড়ের বাবদ ৬৪ কোটি টাকা বিদেশে যাওয়া বন্ধ করিতে পারি, তেমনই চট, থলে' ত্রিপল প্রভৃতি বাবদ যে টাকা বিদেশীর পকেটস্থ হয় তাহাও অন্ততঃ আংশিকভাবে বন্ধ করিতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে পাটের চাহিদা বৃদ্ধি করিয়া তাহার মূল্যস্বরূপ অধিক অর্থ ঘরে আনিতে পারি। বস্তুতঃ, আচার্য্য রায়ের ন্যায় কোন অক্লান্তকর্ম্মীর দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইলে যে এই শিল্প একটী লাভজনক শিল্প হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীনরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ("জনমত")

আমেরিকায় পাটের চাষ

বাঙ্গালার উর্ব্বর জমিতে পাট যে প্রকার প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, ভারতে আর কুত্রাপি সেরূপ হয় না। এ নিমিত্ত পাটের ব্যবসা বাঙ্গালী কৃষকদের একচেটিয়া ছিল। ইহার কারণ এই যে, অন্য কোন দেশের মৃত্তিকা পাট-আবাদের পক্ষে তেমন উপযোগী নহে। বিজ্ঞানবিৎ বৈদেশিকেরা পাট-আবাদের জন্য অনেক চেষ্টাচরিত্র করিয়াছেন বটে, কিন্তু আশানুযায়ী ফল লাভ করিতে পারেন নাই। তাই বলিয়া কি তাঁহারা নিশ্চেষ্ট রহিয়াছেন? তাহা কখনই নহে।

আমেরিকা নিত্য নূতন আবিষ্কারের জন্য সতত সচেষ্ট। ইহাই তাহাদের ঋদ্ধির একমাত্র কারণ। বিশেষতঃ পরাধীন বাঙ্গালী জাতি যে কেবলই কোন বিষয়ে একচেটিয়া সুখ ভোগ করিবে, ইহা তাহাদের চক্ষে সহিবে কেন? সুতরাং যেরূপেই হউক তাহাদের দেশে পাট উৎপাদন করিতেই হইবে। সেজন্য তাহারা চেষ্টায় ত্রুটি করিবে না।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, তাহারা পরীক্ষাস্বরূপ দুই তিনটী জেলায় পাটের আবাদ করিয়াছিল। তাহাতে তাহারা আশানুরূপ সফলতালাভ করিয়াছে। কাজেই তাহারা আগামী বৎসর হইতে অধিক পরিমাণে পাটের চাষ করিবার আয়োজন করিতেছে। ইহাদ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বাঙ্গালী কৃষকের সুখের কপাল ভাঙ্গিয়াছে। আর তাহারা একচেটিয়া ভাবে পাটের ব্যবসায় বা চাষাবাদ করিতে সমর্থ হইবে না। কারণ যদি আমেরিকা উপযুক্তরূপ পাট উৎপাদন করিতে পারে, তবে আর তাহাদের বাঙ্গালার পাটের কোন দরকার থাকিবে না।

("নোয়াখালী হিতৈষী")

বাঙ্গালীর আর্থিক উন্নতি

শ্রীরমেশ চন্দ্র বসু

বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও দৈহিক কর্ম্মশক্তি, বাঙ্গালার ভূমি, বাঙ্গালার জীবজন্তু ও বাঙ্গালার অর্থ এই কয়েকটী হইল বাঙ্গালার সম্পদ্। এইগুলিকে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে যত উৎকৃষ্টভাবে কাজে লাগান যাইবে, ততই বাঙ্গালী জাতি আর্থিক উন্নতির দিকে অগ্রসর হইবে।

কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যই অর্থ-উপার্জ্জনের প্রকৃষ্ট পন্থা;

পরের দাসত্ব করা টাকা রোজগারের নিকৃষ্ট পথ। বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও দৈহিক কর্ম্মশক্তি প্রকৃষ্ট পন্থায় যত অধিক পরিমাণে নিয়োজিত হইবে, ততই বাঙ্গালীর আর্থিক মঙ্গল হইবে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মাঝে টাকা রোজগার করিবার জন্য নিকৃষ্ট পথের প্রতি প্রবল আকর্ষণের জন্য আর্থিক উন্নতি সাধনোপযোগী বাঙ্গালীর প্রধান সম্পদের যথেষ্ট অপব্যয় হইতেছে। অবশ্য কেহই চাকুরী বা মজুরী করিবে না ইহা অসম্ভব। পরের দাসত্ব যাহাদিগকে নিতান্তই করিতে হইবে তাহাদিগের পশ্চাতেও একটী কৃষি, শিল্প বা বাণিজ্যের অবলম্বন থাকা একান্ত আবশ্যক। তাহারা অর্থ-সাহায্য করিয়া অথবা দৈহিক শ্রম করিয়া ধীরে ধীরে আয়ের একটী স্বাধীন উপায় গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিবেন এবং যখন সম্ভব হইবে তখনই অর্থ উপার্জ্জনের প্রকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন করিবেন।

সামান্যকে ঘৃণা করিলে চলিবে না; সামান্য ব্যবসা-বাণিজ্য অবলম্বন করিয়া বহুলোক ধনী হইয়াছেন। অতি ক্ষুদ্র বীজ হইতে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ উৎপন্ন হয়। আমেরিকার বিখ্যাত ধনকুবের মিঃ লিউপোওসেপ সাত আনা পুঁজি লইয়া রাস্তায় দিয়াশলাই বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ কার্ণেগী যিনি ৯০ কোটি টাকা মূল্যে তাঁহার লোহার কারখানা বিক্রয় করিয়াছিলেন, তিনিও প্রথমে রাস্তায় খবরের কাগজ বিক্রয় করিতেন। আমেরিকার "কিংঅব্ টোবাকো" বা তাম্রকূট-নরেশের জীবনকাহিনীও অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। সামান্যভাবে কার্য্য আরম্ভ করিয়া এদেশেও অনেকে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন।

কথায় বলে, "সময়ই অর্থ"। প্রত্যেক মুহূর্ত্তকে অর্থ-নৈতিক উদ্দেশ্যে কাজে লাগাইতে হইবে। তাসপাশা খেলিয়া বা বৃথা গল্প করিয়া যে সময় নষ্ট হয়, ইচ্ছা করিলে ঐ সময়ে আমরা কিছু না কিছু উপার্জ্জন করিতে পারি। হউক সামান্য প্রত্যহ এক আনা উপার্জ্জন করিলেও বৎসরে প্রায় ২৩৲ টাকা আয় হয়। পরিবারস্থ স্ত্রীলোক ও বালক দিগেরও অবসর সময়ে অর্থ-উপার্জ্জন হইতে পারে এমন কিছু কাজ করা কর্ত্তব্য। অর্থ-উপার্জ্জনের বিভিন্ন পন্থা সম্বন্ধে দৈনিক সন্ধ্যায় অনেক কথা লিখিয়াছি। এ বিষয়ে আরও আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

বাঙ্গালার ভূমি সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা। বাঙ্গালার ক্ষেতে বিবিধ শস্য, তরিতরকারী, বাগানে ফলফুল, বনে বৃক্ষলতা, নদী পুকুরে মৎস্য, ভূগর্ভে স্বর্ণ রৌপ্যাদি মূল্যবান ধাতু ও কয়লা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় পদার্থ বহু পরিমাণে পাওয়া যায়। বিবিধ উন্নত প্রণালীর সাহায্যে এই সকল উৎপন্ন দ্রব্যের সংখ্যা ও পরিমাণ বর্দ্ধিত করিলেই বাঙ্গালীর আর্থিক উন্নতি যথেষ্ট পরিমাণে সাধিত হইবে। অধিকন্তু এই সকল কাঁচা মালকে দেশেই পাকা মালে পরিণত করিতে পারিলে দেশের ধন-শক্তি অসাধারণরূপে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইবে।

অর্থনৈতিক হিসাবে প্রয়োজনীয় পশুপক্ষীর সংখ্যা ও তাহাদের দ্বারা উৎপন্ন প্রয়োজনীয় পদার্থের পরিমাণ উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সাহায্যে বৃদ্ধি করিতে পারিলেও আর্থিক উন্নতির সহায়তা হইবে।

বাঙ্গালীর অর্থ-সম্পদ্ যত অধিক কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে প্রযুক্ত হইবে দেশের আর্থিক অবস্থা ততই উন্নতির দিকে অগ্রসর হইবে। অর্থ-ই অর্থ আনয়ন করে। মূলধন ব্যতীত বিশেষ ভাবে অর্থ উপার্জ্জন হইতে পারে না। কাজেই দেশীয় কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যে যত অধিক মূলধন নিয়োজিত হইবে দেশের আর্থিক উন্নতিও তত অধিক পরিমাণে সাধিত হইবে।

আমাদের দেশে অনেক ধনী আছেন যাঁহারা ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে না যাইয়া ব্যাঙ্কে রাখিয়া অথবা কোম্পানীর কাগজ কিনিয়া নামমাত্র লাভে টাকা খাটাইতেছেন। দেশের লোকের যে টাকা সেভিংস ব্যাঙ্কে আছে, তাহার পরিমাণও নিতান্ত কম নহে। ইহা ভিন্ন প্রয়োজনের অতিরিক্ত অলঙ্কার আসবাব-পত্রাদিতেও দেশের যথেষ্ট টাকা আবদ্ধ রহিয়াছে। এই বিরাট অর্থ যদি দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের মূলধন বৃদ্ধি করে তবে দেশের আর্থিক উন্নতি বহুল পরিমাণে সাধিত হয়।

বর্ত্তমানে বাঙ্গালা দেশের অধিকাংশ লোকই অর্থাভাবে বিশেষ কষ্ট পাইতেছে। বহু শিক্ষিত ভদ্রলোকও কায়ক্লেশে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। অগ্রে এই সকল লোককে তুলিয়া ধরিতে হইবে। ইহাদিগকে তুলিয়া ধরিতে

হইলে প্রথমে চাই মূলধন। এইজন্য কতকগুলি মূলধনওয়ালা ধনীকে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। সাধারণ লোকেরাও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া স্থানে স্থানে যৌথ কারবার খুলিয়া মূলধন সংগ্রহ করিবেন। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের পথে কর্ম্মীদিগকে এই সকল মূলধনের সহায়তা প্রদান করিতে হইবে। যে সকল উপযুক্ত লোক অর্থাভাবে কার্য্য করিতে পারিতেছেন না, ধনীদিগের কর্ত্তব্য তাহাদিগকে অংশীদার করিয়া নূতন নূতন কাজ আরম্ভ করা। ধনীরা বাহির হইতে মাল আনাইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি দোকানদারকে বণ্টন করিয়া দিয়া তাহাদিগের সহিত ভাগে অনেকগুলি দোকান খুলিতে পারেন। ইহাতে ধনী ও মূলধন-বিহীন দোকানদার উভয়েরই পরস্পরের সহায়তায় অর্থলাভ হয়। যাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহশিল্প ইত্যাদি অবলম্বন করিবে তাহাদিগের প্রস্তুত বা সংগৃহীত মাল খরিদ করিবার জন্য প্রতি গ্রামে অন্ততঃ একজন ধনী অথবা একটী যৌথ কারবার থাকা আবশ্যক। কোন পল্লীগ্রামে কেহ পাঁচ সের গুলঞ্চ সংগ্রহ করিয়া অথবা কেহ দশ সের আমসত্ব প্রস্তুত করিয়া অবশ্য তাহা কলিকাতায় চালান দিতে পারে না। ইহাদিগের মাল অবিলম্বে উপযুক্ত মূল্যে খরিদ করিবার জন্য ধনী আবশ্যক। যৌথ কারবারও এইরূপে গ্রামের বিবিধ প্রকারের মাল সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় বা অন্যত্র বিক্রয় করিবেন। সহরেও এই প্রকারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প-বাণিজ্যকে মূলধনের সহায়তা প্রদান করা আবশ্যক।

এইরূপে দেশব্যাপী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষক, শিল্পী ও ব্যবসায়ীর সৃষ্টি হইলে দেশের আর্থিক অবস্থা অনেকাংশে উন্নীত হইবে।

বড় মূলধন লইয়া বড় বড় কারবারও খুলিতে হইবে। দেশে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষক, শিল্পী ও ব্যবসায়ীর সৃষ্টি হইলে তাহাদের সাহায্যে বড় বড় কারবারের প্রতিষ্ঠাও সহজ হইবে। এইরূপে দেশে বহু ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কারবার প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার সাহায্যে দেশের অর্থ, ভূমি, কর্ম্মশক্তি প্রভৃতি সম্পদকে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে যত উৎকৃষ্টতর ভাবে কার্য্যে প্রযোগ করা যাইবে, দেশের আর্থিক উন্নতিও তত অধিকতর অগ্রসর হইবে।

দিয়াশলাইয়ের কারবারে বিশ্ব-প্রতিযোগিতা

শ্রীহীরালাল রায়, এ, বি (হার্ভার্ড), ডক্‌টর,-ইঙ (বার্লিন)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

জার্ম্মাণি

১৯১২-১৩ সনে জার্ম্মাণির দিয়াশলাইয়ের কারখানা-ওয়ালারা এই ব্যবসায়ে জার্ম্মাণির ভিতরে জার্ম্মাণদের একচেটিয়া অধিকার দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিল ; কিন্তু গভর্ণমেণ্ট সমস্ত ব্যাপারটি পরীক্ষা করে তাতে রাজী হয় নি। ১৯১৯ সনে হ্বাইমারে জাতীয় সম্মেলনে এই শিল্পটীকে গভর্ণমেণ্টের একচেটিয়া ব্যবসায়ে পরিণত করার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু সরকারী কর্ম্মচারীরা হিসাব করে দেখলে যে তাতে গভর্ণমেণ্টের আয় বেশী-কিছু বাড়বে না। ফ্রান্সের অভিজ্ঞতায় তা আরও সুস্পষ্ট হ'ল। উপরন্তু তখন গভর্ণমেণ্টের হাতে এত টাকা ছিল না যাতে সমস্ত দিয়াশলাইয়ের কারখানা কিনে নিতে পারে। তার উপর দিয়াশলাইয়ের একচেটিয়া ব্যবসায় হাতে নিতে হলে দিয়াশলাইয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী অগ্ন্যুৎপাদক যন্ত্রপাতির ব্যবসায়ের একচেটিয়া অধিকার নিতে হয়। এই সব অসুবিধা দেখে ১৯২১ সনের জুলাই মাসে সমস্ত কারবারী একত্র হয়ে একটী নূতন লিমিটেড কোম্পানী স্থাপন করল। এই কোম্পানী দিয়াশলাই প্রস্তুত করার এবং বিদেশ হতে আমদানি করার ভার নিল। গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে পরামর্শ করে কখন কত পরিমাণ দিয়াশলাই আমদানি করতে হবে তাও ধার্য্য করে দিত।

১৯২৩ সনে আবার দিয়াশলাই প্রস্তুত করার একচেটিয়া অধিকার নেওয়ার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়; কিন্তু তখন মার্কের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। উপযুক্ত মূলধন যোগানো অসম্ভব বিবেচিত হওয়ায় সে প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যাত হয়।

মহাযুদ্ধের সময়ে এবং তার পরে দিয়াশলাইয়ের কারবারে অনুকূল এবং প্রতিকূল অনেক অবস্থা উপস্থিত হয়। দিয়াশলাইয়ের কাঠ বাল্টিক সাগরের প্রান্তবর্ত্তী দেশগুলি থেকে আমদানি হ'ত। প্রথমতঃ তার অভাব ঘটে। তার পরিবর্ত্তে অপেক্ষাকৃত নীরস দেশী কাঠ ব্যবহৃত হতে থাকে। যুদ্ধের জন্য পটাশিয়াম ক্লোরেট অন্য কাজে এত বেশী দরকার হয়েছিল, যে দিয়াশলাইয়ের জন্য তাহা পাওয়া দুষ্প্রাপ্য হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকেরা খুব বেশী দিয়াশলাই ব্যবহার করতে থাকে, কারণ অগ্ন্যুৎপাদক অন্য জিনিষে ধাতুর এবং বেঞ্জিনের দরকার, কিন্তু তখন দুইই এই জিনিষে খরচ করা শক্ত হয়ে উঠেছিল। জার্ম্মাণি যে সব দেশ অধিকার করেছিল তাদের জন্যও দিয়াশলাই যোগাতে হ'ত। প্রস্তুত করার ক্ষমতা কমে গেল, কিন্তু প্রয়োজন বৃদ্ধি হল। এই সব নানা কারণে বিদেশ (প্রধানতঃ সুইডেন) থেকে অনেক দিয়াশলাই আমদানি করতে হ'ত।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দিয়াশলাইয়ের পরিবর্ত্তে অগ্ন্যুৎপাদক যন্ত্রের ব্যবহার আরম্ভ হ'ল। এই যন্ত্রের উপর ট্যাক্স ছিল না। কিন্তু দিয়াশলাইয়ের উপর ট্যাক্স আছে। প্রতিযোগিতায় দিয়াশলাইয়ের হার আরম্ভ হ'ল। দিয়াশলাই রেলওয়ে ষ্টীমারে চালান দেওয়ার খরচও বেশী, এবং সেই সময়ে কারখানা চালাবার টাকার সুদও যথেষ্ট ছিল। দিয়াশলাইয়ের আমদানি কম্‌ল, এবং দেশে প্রয়োজনের অতিরিক্ত দিয়াশলাই প্রস্তুত হতে লাগল। বিদেশে প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা ছিল না। কারণ বাল্টিক সাগরের তীর থেকে যে কাঠ আসত তা সুইডিস্ ট্রাষ্টের অধীন। তারা ইচ্ছা এবং অবস্থা মত দর বেশী অথবা কম করতে পারে। মার্কের পতনের সময় গুদামভরা দিয়াশলাই অনেকে কিনে ফেলে' বাজার আরও খারাপ করে দিল। ১৯২৩ সনের শেষভাগে মার্ক যখন পূর্ব্বাবস্থায় ফিরে এল তখন অর্থাভাবে দিয়াশলাই-নির্ম্মাণের পরিমাণ ৩০ % কমে গিয়েছিল। কিন্তু ১৯২৪ সনে দিয়াশলাই আবার প্রয়োজনের অতিরিক্ত তৈয়ারী হতে থাকে। এর ফলে দিয়াশলাইয়ের দর কমে গেছে। ১৯১৪ সনে প্রতি পেটীর দাম ছিল ২৩০ মার্ক, ১৯২৪-২৫ সনে দাঁড়িয়েছে ১৩০-১৭০ মার্ক।

জার্ম্মাণির দিয়াশলাইয়ের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলা শক্ত। কারণ ভিতরকার খবর পাওয়া যায় না।

তুরস্ক

১৯২৪ সনে দিয়াশলাই তৈয়ারী, আমদানি এবং বিক্রয়ের একচেটিয়া অধিকার গভর্ণমেণ্ট নিয়েছিল। পরে ১৯২৫ সনের ১লা এপ্রিল থেকে ২৫ বৎসরের জন্য এই অধিকার একটি বেলজিয়ান কোম্পানীকে দেওয়া হয়েছে। কোম্পানী এর জন্য গভর্ণমেণ্টকে বার্ষিক ১,৭৫০,০০০ তুর্কী পাউণ্ড খাজনা দেয়। এই চুক্তি-অনুসারে দিয়াশলাইয়ের দর ধার্য্য করা আছে এবং তুরস্কে কারখানাও খোলা হয়েছে। এই কারখানায় বার্ষিক ১২ কোটি ৫০ লক্ষ বাক্স তৈয়ারী হয়। দেশের প্রয়োজন মিটাবার জন্য বেশীর ভাগ আমদানি রুশিয়া থেকে করা হয়। দিয়াশলাই কারখানার দরকারী রাসায়নিক মাল-মশলা বিনা শুল্কে আমদানি করতে দেওয়া হয়।

মার্কিণ দেশ

এদেশের বেশীর ভাগ দিয়াশলাই-ই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। ১৯১৯ সনে পূর্ব্বোল্লিখিত "আমেরিকান্ ক্রয়গার্ ও টোল কোম্পানী" এবং পরে "ইণ্টারন্যাশন্যাল ম্যাচ কর্পোরেশ্যন" স্থাপিত হওয়ায় মার্কিণ বাজারে সুইডেনের দিয়াশলাইয়ের আধিপত্য খুব বেড়েছে এবং বাড়ছে।

একে একে ইয়োরোপের, উত্তর আমেরিকার প্রায় সমস্ত দেশের এবং জাপানের দিয়াশলাই কারবারের অবস্থা আমরা দেখলাম। অন্যান্য সমস্ত কারবারের ন্যায় এতেও এই সব দেশেরই প্রাধান্য। দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা এবং এশিয়া শিল্প-জগতে এখনও অনুন্নত। কিন্তু এশিয়ার ভবিষ্যৎ এখন থেকেই সকলকে ভাবতে হচ্ছে এবং এই ভবিষ্যৎ শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির উপরেই নির্ভর করে। দিয়াশলাইয়ের কারবারে পারস্য, চীন এবং ভারত-

বর্ষের বর্ত্তমান অবস্থার আলোচনা করেই এই প্রবন্ধ শেষ করতে চাই।

পারস্য

১৯২৪ সনে প্রথম এই দেশে দিয়াশলাইয়ের কারখানা কয়েকটী স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই কারখানাগুলির উন্নতির জন্য গভর্ণমেণ্ট বিনাশুল্কে যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক মাল-মশলা এবং কাঠ আমদানি করতে দিচ্ছে এবং দশ বৎসরের জন্য সর্ব্বপ্রকার ট্যাক্স মাপ করেছে। এই দশ বৎসরের পরে লাভের এক-দশমাংশ গভর্ণমেণ্টকে দিতে হবে। এখন বেশীর ভাগ দিয়াশলাই সুইডেন, বেলজিয়াম এবং (১৯২৪ সন হতে) রুশিয়া থেকে আমদানি হয়।

চীন

উপযুক্ত কাঠের অভাবে যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চীনদেশের প্রায় সমস্ত দিয়াশলাই-ই জাপান থেকে আমদানি হ'ত। যুদ্ধের সময়ে চীনে দিয়াশলাইয়ের কারখানা স্থাপিত হতে থাকে। ১৯২৪ সনের গুন্‌তিতে দেখা যায়, সেখানে একশ'টী বড় এবং প্রায় আশীটী ছোট কারখানা স্থাপিত হয়েছে। চীনারা বেশী দাম দিয়ে দিয়াশলাই কিনতে চায় না বলে অনেকগুলি কারখানা এখন উঠে গেছে। সান্‌টুং প্রদেশে এখনও কুড়িটী কারখানায় কাজ চলছে। মূলধন অধিকাংশই চীনা। জাপানীও কিছু কিছু আছে। কারখানাগুলির স্থাপনের পর প্রস্তুত দিয়াশলাইয়ের আমদানি কমেছে, কিন্তু দিয়াশলাইয়ের কাঠের (রুশিয়া এবং জাপান থেকে) এবং রাসায়নিক মাল-মশলার (জাপান এবং ইয়োরোপের) আমদানির পরিমাণ বেড়েছে। যুদ্ধের পরে চীনের বাজারে জাপানী এবং ইণ্টারন্যাশন্যাল ম্যাচ্ কর্পোরেশ্যনের দিয়াশলাইয়ের প্রতিযোগিতা চলছে। ইণ্টার-ন্যাশন্যাল ম্যাচ কর্পোরেশ্যন কতকগুলি চীনা কারখানা কিনে নিয়েছে। এই প্রতিযোগিতার ফল পূর্ব্বেই বর্ণিত হয়েছে।

মার্কিণ পল্লীর আর্থিক জীবন

তাহেরুদ্দিন আহ্‌মদ

ডাক্তার সি, লুথার ফ্রাই তাঁহার "আমেরিকান ভিলেজার্স" বা "পল্লীবাসী মার্কিণ" গ্রন্থে বলিতেছেন,—যুক্ত-রাষ্ট্রে আঠার হাজার গ্রাম আছে এবং তাহাতে প্রায় ১৩০ লক্ষ লোক বাস করে। ফেডারেল সেন্‌সাস বা সরকারী আদমসুমারী যাহাকে রুরাল পপুলেশ্যন (পল্লী-জন-সংখ্যা) বলিয়া থাকেন, তাহার সিকি এবং গোটা দেশের অধিবাসীর আটভাগের এক ভাগ পল্লীতে বাস করেন। আবার কতকগুলি রাষ্ট্রে পল্লীবাসীর সংখ্যা আরও বেশী।

১৯০০ সন হইতে ১৯২০ সনের মধ্যে আমেরিকার পল্লী প্রায় শতকরা ৪৫ ভাগ বৃদ্ধি পায় এবং পল্লীর নরনারীর সংখ্যা শতকরা ৪৮ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ঐ সময় কিন্তু সমগ্র মার্কিণ জাতিটার জন-সংখ্যা ৩৯ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ইহা হইতে দেখা যায়, ১৯২০ সনে কেবল যে অধিক সংখ্যায় লোক পল্লীতে বাস করিতে থাকে তাহা নহে, পরন্তু জাতির বেশীর ভাগ লোকই পল্লীতে বাস করে।

সকল রাষ্ট্রেই এই বৃদ্ধি দেখা যায় না। মধ্য আটলাণ্টিক রাষ্ট্রগুলিতে পল্লী-জন-সংখ্যা কিন্তু ঐ অনুপাতে বৃদ্ধি পায় নাই। আবার দক্ষিণ রাষ্ট্রগুলিতে সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নগর ও পল্লী গড়িয়া উঠিয়াছে। তবে সকল রাষ্ট্রেই গ্রামগুলি লুপ্ত হইয়া যাওয়া দূরে থাকুক অন্যান্য জনপদের চাইতে ইহাদের জন-সংখ্যা আড়াইগুণ বাড়িয়া গিয়াছে।

এইরূপ পল্লীর সমৃদ্ধ অবস্থার দ্বারা মনে করিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, আমেরিকায় কৃষির এক নবযুগ আসিয়াছে। এই ভূখণ্ডের কৃষকরা পল্লীতে একত্র ভাবে বসবাস করিয়া

সামাজিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধা ভোগ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

যুক্ত-রাষ্ট্রের মধ্য পশ্চিম জনপদগুলি খুব সমৃদ্ধিশালী। এখানে অন্যান্য জায়গার তুলনায় বাড়ী ও সম্পত্তিওয়ালা গৃহস্থের সংখ্যা বেশী। আবার এখানকার বিদ্যালয়ে প্রাপ্ত-বয়স্ক পড়ুয়া বালক-বালিকার সংখ্যাও খুব বেশী। এখানকার অধিবাসীর আর্থিক অবস্থা যে বেশ সচ্ছল এবং ইহাদের জীবন-ধারণ-প্রণালী যে অনেকটা উন্নত, তাহা ইহাদ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

দূর পশ্চিম সীমান্তের গ্রামগুলির একটা বিশেষত্ব আছে। এখানে পুরুষের চাইতে মেয়ে বেশী। এখানে স্বামি-স্ত্রীর বিবাহ-বন্ধন ছেদ বা তালাকের রেওয়াজ খুব বেশী।

পল্লীবাসীদের প্রায় অর্দ্ধেকে চাষবাস, বয়ন প্রভৃতি শিল্প দ্বারা অর্থাগম করে। শিল্পের পরেই ব্যবসাকে স্থান দেওয়া হইয়াছে। তারপর ট্রান্সপোর্টেশ্যন বা যান-বাহনের স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

পল্লীবাসীরা সহরবাসীদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠ ভাবে সমাজ-বদ্ধ বা সমভাবাপন্ন। পল্লীতে বাড়ী ও জমির মালিক গৃহস্থের সংখ্যা সহরের চাইতে বেশী। সেই জন্য সহরবাসীর মত বাসাবাড়ীর জন্য ইহাদের এখানে সেখানে দৌড়াদৌড়ি করিতে হয় না। এইজন্য স্বভাবতই গ্রামের সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হয়। গ্রামের বিদ্যালয়সমূহে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা সহরের চাইতে বেশী। কারণ গ্রামে সহরের মত পয়সা রোজগারের অত শিল্প-প্রতিষ্ঠান নাই। সমাজ ও গোষ্ঠীর মধ্যে বসবাস করিয়া পল্লীবাসীদের পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য সৃষ্টি হয়। ইহারা রক্ষণশীলও বটে।

গ্রামে যে কোন সাধারণ লোক প্রভু বনিয়া যাইতে পারে। গ্রামে ছোট খাট ভাবে প্রভু হইবার যতটা সুযোগ-সুবিধা আছে, সহরে ততটা নাই। গ্রামের অধিকাংশ গৃহস্থই স্বাধীন—কেউ কাহার পরোআ করে না। মার্কিণ পল্লীর প্রায় শতকরা ৭০ জন অধিবাসী নিজেই নিজের প্রভু। অনেক স্থানেই মেয়েলোক ভূস্বামী দেখিতে পাওয়া যায়। প্রফেশন্যাল বা ব্যবসায়ী লোক সহরের চাইতে গ্রামে বেশী। কিন্তু সহরের মত অত মসিজীবী কেরাণীর ঠাঁই এখানে নাই।

সহরের মত গ্রামের শিল্প-জীবন-ধারা এত জটিল নয়। গ্রাম্য জীবনকে নগরের বর্ত্তমান বৃহৎ ব্যবসায়-প্রচেষ্টা—শিল্প-কারখানা এখনও পর্য্যুদস্ত করিয়া ফেলে নাই। গ্রামে সহরের মত অত বড় বড় ফ্যাক্টরী ষ্টোর দেখা যায় না। এখানে দোকানদার ও শিল্পীরা ছোট-খাট ভাবে শিল্প ব্যবসা চালায়। মোটের উপর সহর ও গ্রামের আর্থিক জীবনে ঢের তফাৎ দেখা যায়।

লঙ্কার রবার ও চা

এক রকম রবার গাছ আছে, যাহাদের ক্ষীর কোটর-গত থাকে, গাছের সকল শরীরে প্রবাহমান্ হয় না। তাহাদিগকে ল্যাটেক্স জাতীয় গাছ বলে। সেই সব গাছের উপযুক্ত মনোনয়ন ও উন্নয়ন করিয়া রবারের উৎপাদন ভাল করিবার জন্য সিংহল ও মলয়স্থ রবার-চাষীরা সাত-বৎসর ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছেন। ১৯১৯ সনে ওলন্দাজ ইণ্ডিসে এই লাইনে কার্য্য হইতেছে বলিয়া আমরা প্রথম শুনিয়াছিলাম। সেই সময় কালুটারা কৃষকসমিতির চেয়ারম্যান্ শ্রীযুক্ত রয় বার্টর‍্যাণ্ড ওলন্দাজ-নির্দ্দিষ্ট উপায়ে কুঁড়ির কলম করা যায় কি না তদুদ্দেশ্যে গবেষণা চালাইবার জন্য আন্দোলন উপস্থিত করেন। কিন্তু বৃটিশ চাষীরা ঐরূপ কলমে কিছুই ফয়দা হইবে না এইরূপই যেন মনে করিয়াছিলেন। তাঁহাদের যেন ধারণা ছিল, ওলন্দাজেরা অযথা সময়, পয়সা ও পরিশ্রম ব্যয় করিতেছে।

শ্রীযুক্ত রয় বার্টর‍্যাণ্ড ও সি, ই, এ ডাইয়াস (সিংহলের একজন সুপরিচিত প্ল্যান্টার) উভয়ে সম্প্রতি ওলন্দাজ ইণ্ডিস

হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা সেখানকার অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে, কুঁড়ির কলমে ও বীজ-মনোনয়নে অত্যাশ্চর্য্য ফল পাওয়া যাইতেছে। মনোনয়ন যতই পূর্ণতা লাভ করিবে, ততই উন্নতি অগ্রসর হইবে। এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

তাঁহাদের কথায় সিংহলের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সিংহলের কর্তৃপক্ষগণ আশাহীন নহেন। যদিও গত পাঁচ বৎসরে সিংহলে রবার রোপণ বড় বেশী হয় নাই, সুতরাং বাণিজ্য-উপযোগী পরিমাণে মুকুলিত রবার রোপণের সুবিধাও তত হয় নাই। তবু ইহা স্বীকার করা যায় যে, এই ক্ষেত্রের অনুসন্ধান-কার্য্য ওলন্দাজদের হাতে সম্পূর্ণ রূপে ফেলিয়া না রাখিয়া নিজেরা করিলেই ভাল হইত। যাহা হউক ভবিষ্যতে মুকুলিত রবার এবং মনোনীত বীজ লইয়া রোপণ কার্য্য চলিবে। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত।

সুমাত্রায় অল্পপরিমাণ ক্ষেত্রে প্রতি একরে ১,০০০ পাউণ্ডের উপর রবার উৎপন্ন হইয়াছে। এই ঘটনায় সিংহলের কৃষকেরা ভীত হয় নাই। কারণ তাহারা জানে বাণিজ্য-উপযোগী পরিমাণে মুকুলিত রবার রোপিত হইলেও তাহা হইতে সাধারণত ৬০০ পাউণ্ডের অধিক রবার পাওয়া যায় না। গবেষণার ফল হইতে বাণিজ্য-উপযোগী লাভ করিতে ওলন্দাজদের এখনও অনেক বৎসর দেরী। তাহাদের পদ্ধতি অনুসরণ ও গ্রহণ করিয়া সিংহল বাজারে তাহার নিজের প্রাধান্য রাখিতে পারিবে। যাহা হউক, ওলন্দাজ গবেষণার ফল হইতে উপকার লাভ করিতে হইলে সিংহলকে অচিরেই তৎপর হইতে হইবে।

রবার রিসার্চ্চ স্কীম

সম্প্রতি একটি রবার রিসার্চ্চ স্কীম গঠিত হইয়াছে। সেটা কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় অনুপযোগী বলিয়া সাধারণের ধারণা। কৃষকবর্গ স্বেচ্ছায় যে চাঁদা দিবেন তাহা হইতে এবং গবর্মেণ্টের সামান্য কিছু বাৎসরিক সাহায্য হইতে ঐ স্কীম চলিবে। চা-রিসার্চ্চ স্কীম কিন্তু চলে বাধ্যকর করের দ্বারা। ঐরূপ হওয়াই আবশ্যক। গবেষণার্থ চা-কর আদায় করা খুব কষ্টকর হইয়াছিল। কিন্তু চায়ের নজীর যখন আছে, তখন রবার রিসার্চ্চ স্কীম উপযুক্ত অবস্থায় দাঁড় করাইতে বেশী বেগ পাইতে হইবে না। এই কার্য্যের জন্য জমিসংগ্রহ করিতে কোম্পানীগুলিকে খুব বেগ পাইতে হইয়াছে। গবর্মেণ্টের নিকট হইতে খুব কম জমিই পাওয়া যাইতেছে। যৎসামান্য যাহা বিক্রয়ের জন্য আছে, তাহাও কার্য্যের উপযোগী বলিয়া কোম্পানীরা মনে করেন না। বড় বড় কোম্পানীদের ক্রয়োপযোগী জমি ছাড়িয়া দিবার রীতি গবর্মেণ্টের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এতদুদ্দেশ্যে বড় বড় জঙ্গল পাওয়া যাইতে পারে। সেগুলি কোম্পানীর কাছে বিক্রয় করিলে ছোট ছোট জমির বিকাশ বাধা পাইবে না। দেশীয় লোকদিগকে জমির কাজে ফিরাইয়া আনা গবর্মেণ্টের সুস্পষ্ট ইচ্ছা। তাহাও ইহাতে পূর্ণ হইবে।

চা-পরীক্ষা

চা-রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউট বোর্ড এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে, কিছুদিন ধরিয়া আয় মজুত না হওয়া পর্য্যন্ত চা-কর হইতে পরীক্ষা উদ্দেশ্যে চায়ের জন্য এষ্টেট ক্রয় করা হইবে না। চা-কর আদায় হয় প্রায় ২০০,০০০৲ টাকা। যথাসম্ভব শীঘ্রই স্কীমটা কাজে পরিণত করা বোর্ডের ইচ্ছা। সেজন্য কোম্পানী ও স্বত্বাধিকারী কৃষকগণের মধ্যে ঋণ-স্বীকার-পত্র (ডিবেঞ্চার) বাহির করিয়া চা-এষ্টেটের জন্য টাকা তুলিবার প্রস্তাব বিষয়ে বোর্ড খুব গভীর ভাবে চিন্তা করিতেছেন। লণ্ডনস্থ সিংহল-সমিতি এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন।

যাহা হউক, চা-রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউটের জন্য চা-এষ্টেট খরিদ করা এখনও সম্পূর্ণভাবে স্থিরীকৃত হয় নাই। ১০০ হইতে ২০০ একর পর্য্যন্ত উপযুক্ত জমি পৃথক সম্পত্তি অথবা কোন এষ্টেটের অংশ-বিশেষ হিসাবে ইজারা লওয়া সম্ভবপর কি না সেই বিষয়ে অনুসন্ধান চলিতেছে। যদি বোর্ড দেখেন, তাঁহারা উপযুক্ত এষ্টেট কিনিতে অসমর্থ, তাহা হইলে তাঁহারা কোন এষ্টেটের অংশ-বিশেষ ইজারা লইতে প্রস্তুত। কিন্তু গবেষণা ও শিল্প-বিষয়ক পরীক্ষার উদ্দেশ্যে এবং শ্রমের দরুণ ইনষ্টিটিউটের নিজের এষ্টেট থাকা

দরকার। চা-রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউটের জন্য এষ্টেট কেনাই হোক বা ইজারা লওয়াই হোক, বোর্ড মনে করেন তাহাতে একটা ফ্যাক্টরী রাখিতেই হইবে। কারণ শিল্পসম্বন্ধীয় পরীক্ষা রিসার্চ্চের একটা প্রধানতম কার্য্য।

শেয়ারের বাজার একই অবস্থায় আছে। তাহাতে কোন কার্য্যতৎপরতা নাই। শেয়ারের চলিত দর-প্রচারও (কোটেশন) একরূপ স্থিরভাবেই রহিয়াছে। কোনরূপ উঠা-নামা দেখা যাইতেছে না।

মধ্যবিত্তের আর্থিক ও সামাজিক জীবন-যাত্রা

জাতীয় শিক্ষাপরিষদের অধীন নানা বিদ্যালয়ে শিক্ষা-লাভ করিয়া যাঁহারা এক্ষণে সংসারের বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে চলাফেরা করিতেছেন, তাঁহাদের জীবন-বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিবার আয়োজন হইয়াছে। "জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ ছাত্র-সঙ্ঘ" নামে কলিকাতার বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটে যে প্রতিষ্ঠান আছে, এই সংগ্রহ তাহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতেছে। এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ শেঠ এবং সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর দাস ও সত্যরঞ্জন রায়। তাঁহারা এই সংগ্রহের উদ্দেশ্য বুঝাইবার জন্য নিম্নলিখিত নিবেদনপত্র জারি করিয়াছেন :—

ছাত্রসঙ্ঘের সভ্যগণের এবং সম্ভব হইলে শিক্ষাপরিষদের সমস্ত ভূতপূর্ব্ব ছাত্রের জীবনেতিহাস সংগ্রহ করা ও তাহা সভ্যগণের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করা ছাত্রসঙ্ঘের একটি কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ছাত্রাবস্থা উত্তীর্ণ হইবার পর কার্য্যব্যপদেশে আমাদিগকে বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়িতে হয় এবং পরিষদের সূত্রে যে ঘনিষ্ঠতা জন্মে তাহা ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া আসে। তথাপি পরস্পরের কথা জানিবার কৌতূহল বরাবরই থাকিয়া যায়। কথঞ্চিৎ পরিমাণে সেই কৌতূহল মিটাইবার জন্য ছাত্রসঙ্ঘ এই আয়োজন করিয়াছেন। তদনুসারে আপনার জীবনের কথা লিখিবার জন্য এক প্রশ্নপত্রী আপনার নিকট এতৎসঙ্গে প্রেরিত হইল। আশা করি আপনি ইহা পাওয়ার এক পক্ষের মধ্যেই যথাসম্ভব উত্তর লিখিয়া উপরোক্ত ঠিকানায় ছাত্রসঙ্ঘের কার্য্যালয়ে পাঠাইবেন, এবং কোনরূপ তাগিদের অপেক্ষায় অবহেলা করিয়া ফেলিয়া রাখিবেন না। আপনাকে আপনার বন্ধুবর্গ ও সতীর্থবর্গের নিকট যথার্থরূপে পরিচিত করাইবার ও রাখিবার জন্যই এই আয়োজন; তথাপি যদি কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে আপনার বিশেষ আপত্তি থাকে, তবে অবশ্য তাহা বাদ দিবেন। প্রত্যেকের নিকট হইতে বিবরণ সংগৃহীত হওয়ার পর উহা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইবে এবং আপনি তাহার একখণ্ড পাইবেন। কয়েক বৎসর পরে যাহাতে এই পুস্তিকা সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। আপনার নিকট হইতে জীবনেতিহাস না পাওয়ার জন্য পুস্তিকা-প্রকাশের বিলম্ব যাহাতে না ঘটে আপনি তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন। ইহাই আমাদের একান্ত অনুরোধ।

এইরূপ জীবনী সংগ্রহ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে আমাদের দেশের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা অনেকটা বস্তুনিষ্ঠরূপে ধরিতে পারা যাইবে বলিয়া বিশ্বাস করি। যাঁহারা মনোবিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিদ্যার সেবক তাঁহাদের পক্ষে এই রূপ তথ্যের সঙ্কলন ও বিশ্লেষণ বিশেষ উপকারী। বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণীর জীবনযাত্রা সম্বন্ধে নিরেট জ্ঞান লাভের সাহায্য হইবে মনে করিয়া "আর্থিক উন্নতির" পাঠকগণকে এই ধরণের অন্যান্য তথ্য সংগ্রহে উদ্বুদ্ধ করিতেছি। যে সব তথ্য সংগৃহীত হইতেছে তাহার তালিকা নিম্নরূপ :—

জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ-ছাত্র-সঙ্ঘ

সভ্যের জীবনেতিহাস

নাম..................... পিতার নাম.....................

পৈতৃক ভিটা·············স্থায়ী ঠিকানা·················
বর্ত্তমান ঠিকানা···························· ···············
বয়স·················বৎসর, জন্ম তারিখ··················
ছাত্র-জীবন : (ক) জাতীয় শিক্ষা-পরিষদে·········বিভাগে
············সাল হইতে············সাল পর্য্যন্ত ;············
············সালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। পাঠাবস্থার উল্লেখযোগ্য
ঘটনা··· ·········

(খ) পরিষদের পর অন্য কোথাও অধ্যয়ন করিয়া থাকিলে তাহার বিবরণ····· ························· ···

কর্ম্মজীবন : বর্ত্তমান জীবিকা·······························
আর্থিক অবস্থা··
ইতিপূর্ব্বে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কিভাবে কাজ করিয়াছেন···
··········স্বাস্থ্য কিরূপ················কোন স্থায়ী রোগ আছে
·········ব্যায়াম-চর্চ্চা ও খেলাধূলা করেন·················
আহারে আচার-বিচার মানেন··············ধূমপান করেন
·······················দেশভ্রমণ·····························
অবসরকালের কর্ম্ম············তাস পাশা দাবা ইত্যাদি······
·········গান, বাজনা, অভিনয় চিত্রাঙ্কন····················

পড়াশুনা··············কোন্ বিষয়ে··················· ··
লেখা··· ···············পত্রিকাদিতে······ ··············গ্রন্থ
··· ······ধর্ম্মমত···············মন্ত্র বা দীক্ষাগ্রহণ···········
প্রাত্যাহিক অনুষ্ঠান······ ········ ·····················
গার্হস্থ্য জীবন : বিবাহ, কাহাকে·························
·····················কবে······তাঁহার তৎকালীন বয়স···
············পর্দ্দা মানিয়া চলেন···········সন্তান ·········
তাহাদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন·········
···············জীবনবীমা করিয়াছেন·······················

সামাজিক জীবন : জন-সেবার কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত ······ অপর কোন্ কোন্ সভা সমিতির সভ্য ······ ·· ·····রাজনৈতিক ব্যাপারে উৎসাহী········ ······ কি ভাবে যোগ দেন···
জীবনে মোটের উপরে সুখী হইয়াছেন মনে করেন কিনা···
·········হাঁ বা না এর প্রধান কারণ কি মনে হয়···········
জীবনের অপর কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা······················
তারিখ··· · ·················স্বাক্ষর··················

☞ এই সঙ্গে আপনার একটি ছোট ফটো পাঠাইবেন।

ধনোৎপাদনের বিদ্যাপীঠ

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

(বক্তৃতার সারাংশ)

নানা শক্তির সমাবেশ

আজকে ধনোৎপাদনের বিদ্যাপীঠের কথা বলব। আর্থিক বনিয়াদের অনেকগুলা খুঁটা। পৃথিবীটা কোনো এক, দুই বা তিন শক্তিতে চলে না। এক সঙ্গে সমভাবে নানা শক্তি নানা কাজ করে। নানা আন্দোলন একত্রে দুনিয়াটাকে চালাচ্ছে। অনেকে কেবল একটা দিক্ আলোচনা করেন, আর মনে করেন, পৃথিবীটা চলছে কেবল এক শক্তির জোরে। আমি ঐরূপ অদ্বৈতবাদী নই। কোনো একটা শক্তি জগৎকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, একথা আমি বিশ্বাস করি না।

আর্থিক বনিয়াদের এক কেন্দ্র ব্যাঙ্কের কথা বলেছি। প্রত্যেক লোকের পকেটের টাকা, প্রত্যেক লোকের নিজ নিজ হাঁড়ির টাকা এই সব কেন্দ্রে সঙ্ঘবদ্ধ হয়। দ্বিতীয় কথা ছিল প্রত্যেক মানুষকে করিতকর্ম্মা, কাজের লোক-রূপে গড়ে তুলবার কথা। প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে

কর্ম্মদক্ষরূপে স্বাধীন এবং নিরুদ্বেগ জীবন যাপন করতে পারে কি করে' সেই উপায় আলোচনা করেছি। তৃতীয়তঃ, জমি-জমার আইন পৃথিবীতে বদলে যাচ্ছে একথা বলেছি। রুশিয়ায় যা ঘটেছে তা এমন কিছু হাতী-ঘোড়া নয়। ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জার্ম্মাণি প্রত্যেক দেশেই জমি-জমার আইন বদলে যাচ্ছে আগাগোড়া। ইহাতেও আর্থিক উন্নতির বনিয়াদ অনেকটা প্রভাবান্বিত হচ্ছে। চতুর্থতঃ, শিল্প-কারখানায় মজুর-রাজ সম্বন্ধে বলেছি যে,—কি ব্যাঙ্ক, কি ডাকঘর, কি হোটেল—প্রত্যেক কর্ম্মকেন্দ্রে যত লোক কাজ করুক,—সে বাবু শ্রমজীবীই হোক বা কুলী শ্রমজীবীই হোক,—প্রত্যেকে এই সকল কেন্দ্রে স্বাধীনতা এবং কর্ম্মকেন্দ্র শাসন করবার অধিকার ভোগ করছে। তাই দেখতে পাচ্ছি যে, সকল দিক্ দিয়েই এই পৃথিবীর ধন-দৌলত নূতন নূতন উপায়ে নব নব প্রণালীতে বেড়ে যাচ্ছে।

বিদ্যামাত্রই অর্থকরী

ধনোৎপাদনের বিদ্যাপীঠও একটা জবর শক্তি। আর্থিক উন্নতি করার পশ্চাতে একটা বিপুল শক্তি আছে। সেটা হচ্ছে বিদ্যা। ধনোৎপাদনের জন্য বিদ্যাপীঠ আছে, ছেলে পিটবার আখড়া আছে। টাকা রোজগার করা, টাকা পয়দা করা, ধনদৌলত সৃষ্টি করা—আর্থিক উন্নতির যত-কিছু কর্ম্ম থাকতে পারে, এ সবের একটা মস্তবড় বনিয়াদ হচ্ছে কলেজ বা স্কুল।

দুনিয়ায় এমন কোন স্কুল নাই, যেখানে ধনোৎপাদন হয় না। যে দিন থেকে পাঠশালায় ধারাপাত পড়া সুরু করেছি, সেইদিন থেকে ধনোৎপাদনের কাজে অনেক দূর অগ্রসর হওয়া গেছে। পুরুতগিরির পাঠশালাও ধনোৎপাদনের বিদ্যাপীঠ। মন্তর পড়াও ব্যবসা। পুরুত হোক, মোল্লা হোক, আর খ্রীষ্টিয়ান পাদ্রীই হোক,—এরা সবাই ধনোৎপাদনের জন্য তুকমুখ একটা কিছু শিখে নেয়। ওকালতী, মোটর চালানো, ডাক্তারী, পাটের দালালী যেমন ব্যবসা, পুরুতগিরি তেমনি ঠিক খাঁটি ব্যবসা। এই ব্যবসার জন্য যারা শিক্ষাদীক্ষা নেয় এবং তার জন্য যে সব কর্ম্মকেন্দ্রে যায়, সে টোল হোক, মাদ্রাসা মক্তব হোক, বা থিয়লজিক্যাল ডিভিনিটি কলেজ হোক,—এসবই ধনোৎপাদনের বিদ্যা-কেন্দ্র বটে।

খ্রীষ্টিয়ান জগতের পুরুত-বিদ্যালয়

এদেশে যাঁরা মোল্লা বা পণ্ডিত—অনেকেই মন্ত্রতন্ত্র বেশী জানেন কিনা বল্‌তে পারি না। বাঙ্গালা শব্দের পেছনে যদি 'ং', 'ঃ' লাগান যায় তাহলেই সংস্কৃত হ'ল, আর সেটা দাঁড়াল শাস্ত্রের বচন! তেম্নি মুসলমানদের মোল্লা, যাঁদের প্রভাব পাড়াগাঁয়ে খুব বেশী, তাঁদের অনেকেই ঐ আরবী-পার্শী কোরাণ-দর্শন কতটা বোঝেন স্বয়ং আল্লাই জানেন। হয় ত কেউ কেউ বুঝতে পারেন। এখন ভেতরকার কথা হচ্ছে,—পণ্ডিতী, মোল্লাগিরি, পাদ্রীগিরি এ সবই অর্থকরী বিদ্যা। এদেরকে গৃহস্থরা খেতে পরতে দেয়, তঙ্কা দক্ষিণা দেয়।

আমরা ভারতে ইয়োরোপের এই খ্রীষ্টিয়ান জাতটাকে মহা অধার্ম্মিক বলে থাকি। কিন্তু ওসব দেশে রামা-শ্যামা পুরুত হতে পারে না। হতে হলে আলমারি আলমারি বই পড়তে হয়, গণ্ডা গণ্ডা পাশ করতে হয়। এই আমাদের দেশে এম, এ, বি এল, এম, এল, ডি, এল পড়তে কত সময় লাগে? এনট্রান্স পাশের পর অন্ততঃ ৮ বছর পড়লে পরে যে ধরণের বিদ্যা হয়, খ্রীষ্টিয়ান দেশে পাদ্রীগিরি বিদ্যা দখল করতে তত সময় ও মেহনৎ লাগে। কত কি ল্যাবোরেটরী চার্চ্চ-কলেজ পাশ করার পর আবার যে সার্টিফিকেটটা জোটে তার দ্বারাও পুরুতগিরি করা চলে না, পুরুত উপাধিটা পাওয়া যায় মাত্র। প্রথমে অনেকদিন অ্যাপ্রেন্টিস হতে হয়। ৫।৭ বছর পরে তবে পুরুতগিরি জোটে। ৩০।৩২ বছর বয়সের আগে কোনো মিঞা ওসব দেশে গির্জ্জায় কর্ত্তামি করতে পায় না। এদেশে কোনোদিন পুরুতগিরির সংস্কার সাধন করতে হলে আবার ঐ ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জার্ম্মাণির নজির মাঝে মাঝে এনে দেখলে মন্দ হবে না।

যাক,—ধারাপাত পড়া যেমন ধনোৎপাদনের বিদ্যা পুরুতগিরিও তেমনি। দুনিয়ায় এমন কোনো বিদ্যা নাই, যা অর্থকরী নয়। ঋগ্বেদের যুগে, হোমারের আমলে, মৌর্য্য-ভারতে বা মোগল-ভারতে যে সব পাঠশালা ছিল, সেগুলি কি ধনোৎপাদনের পাঠশালা নয়? এই যে

পলটন বা ফৌজ ইহাও সেই ধনোৎপাদনের জন্য। কি প্রাচীন কাল কি মধ্যযুগ, কি এশিয়া কি ইয়োরোপ এসবের সকল পাঠশালাই ধনোৎপাদনের আখড়া।

"ভোকেশন্যাল স্কুল" জগতের নবীন আবিষ্কার

বিদেশে থাক্‌বার সময় একটা কথা ভারতীয় মহলে বার বার শুনতে পাওয়া যেত। কথাটা "ভোকেশন্যাল স্কুল।" ভোকেশন মানে তো ব্যবসা। মানুষ যা-কিছু করে সবই তো "ভোকেশন"। আমাদের জননায়ক ও ইউনিভার্সিটী পরিচালকরা সকলেই বলছেন, "ভোকেশন্যাল স্কুল কর"। আমি বলি, "ভোকেশন্যাল স্কুল তো রয়েছে। দুনিয়ায় যত-কিছু কারবার আছে বা হচ্ছে, লাগাৎ পুরুতগিরি—এ সবই তো ভোকেশন্যাল স্কুলে শেখা হচ্ছে।"

আসল কথা, জননায়কগণ কেবল কথাটাই ব্যবহার করতে শিখেছেন, কিন্তু বস্তুটা বোঝেন না। আপনারা বলবেন, "এর আর বুঝাবুঝি কি?" আমার জবাব এই যে, যে ধরণের ভোকেশন্যাল স্কুল দুনিয়াতে চলছে, সে বিষয়ে ভারতবাসী সজাগ নয়। আপনারা হয়ত টুঁটি চেপে ধরে বলবেন, "ল কলেজ ভোকেশন্যাল স্কুল নয়? ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারী, কেরাণীগিরি এ সব যে সব স্কুলে শেখান হয় সে সব ভোকেশন্যাল নয়?" আমি ত প্রথমেই বলে চুকেছি, নিশ্চয়ই, এ সব আলবৎ ভোকেশন্যাল। কিন্তু আমি বলব আপনারা মাত্র শব্দটি বোঝেন, আসল জিনিষটা বোঝেন না। "ভোকেশন" একটা আধুনিক পারিভাষিক শব্দ। ১৯১৮ সনের এদিকে ওদিকে "ভোকেশন্যাল স্কুল" বলে যে জিনিষটা দাঁড়িয়েছে, সেটা একেবারে নতুন আবিষ্কার। এই হিসাবে, এটা ১৯১৮ সনের দুনিয়ায় একদম নতুন বস্তু। ১৯১৮ সনের দুনিয়াটাকে আমরা কেমন করে বুঝব? আমরা যে আজও বর্ত্তমান জগতের মাপকাঠিতে বোধ হয় ১৮৪৮ সনেই রয়েছি।

ভারতের কেউ কেউ হয়ত ১৯১৮–২৬ সনের দুনিয়াটা কিছু-কিছু বোঝেন, কিন্তু আমার বিবেচনায় অনেকেই বোঝেন না। এই "ভোকেশন্যাল স্কুল" চাইবার সত্যিকার কথাটা কি? ইয়োরামেরিকায় এই বস্তু দশ বিশ বৎসর পূর্ব্বে জানাই ছিল না।

জার্ম্মাণিতে একটা আইন জারী করা হয়েছে ১৯১৮ সনে। ফ্রান্সে আইনটা প্রায় একই রকমের। যে-কোন লোক যেখানে সেখানে যে-কোন কাজই করুক না কেন—টাকা রোজগারই করুক বা বিনা পয়সায় কাজই করুক—প্রত্যেকে কি স্ত্রী কি পুরুষ,—১৮ বছর বয়স পর্য্যন্ত স্কুলে লেখাপড়া শিখিতে বাধ্য। ১৮ বছর পর্য্যন্ত ফ্রান্সের বা জার্ম্মাণির লেড়কা লেড়কী যে যে-কাজই করুক না কেন, তাকে স্কুলে পড়তেই হবে। দশ বছরের বাঙ্গালী ছেলেকে যদি এরূপ হুকুম করা হয়, তা' হলে ক'টা বাপ এ কথা শুনবে? আর আঠার বছর বয়স, এটি যে সে জিনিষ নয়! আমাদের সে যুগে,—১৯০৫ সনের যুগে—এ বয়সে বি, এ পর্য্যন্ত পাশ করা যেত। এই বয়সে আজকাল প্রত্যেক জার্ম্মাণ ও ফরাসী নরনারীকে বিনা পয়সায় স্কুলে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। এই সব স্কুল স্থাপন করে কে বা কাহারা? জার্ম্মাণি বা ফ্রান্সের নরনারী যেখানে নকরি করে সেখানকার মনিব এই সব বিদ্যালয় গড়ে তুলতে বাধ্য। মনিব না করলে পল্লী করবে। পল্লী না করলে জেলা এটা করবে। জেলাও যদি না করে সরকার এই সব স্কুল গড়ে তুলতে বাধ্য।

১৯১৮ সনের জার্ম্মাণ-ফরাসী আইন

এই চিজটা ভারত-সন্তান বুঝতে পারবে কি? তাই বলছি যে,—"ভোকেশন্যাল স্কুল' আমাদের জননায়কগণের মাথায় আছে এ আমি বিশ্বাস করি না। মামুলি টেক্‌নিক্যাল স্কুল ভোকেশন্যাল স্কুল নয়। রেল আফিসে বাপ কাজ করে, তার ছেলেকে সাধারণ শিক্ষা দিবার জন্য সেই আফিসের মনিব স্কুল করে দিতে বাধ্য। ১৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ১৮৭০ সনের আইনে কি স্ত্রী কি পুরুষ বিনা পয়সায় সর্ব্বত্র সাধারণ শিক্ষা পেতে অধিকারী। "ভোকেশন্যাল স্কুল" অর্থে বুঝব সার্ব্বজনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার কেন্দ্র। এখন দেখুন ক'জন এ দেশে ভোকেশন্যাল স্কুল বোঝে।

ভারত কোথায়

আমাদের দেশ এখন কোথায়? আমি ফ্রান্স জার্ম্মাণি ইতালী ইংলণ্ড এদের কথা প্রায়ই বলি; এতে আমার স্বদেশী ভায়ারা অনেকে খুব অসন্তুষ্ট। আপনারা ভাবেন, "লোকটা বলে কি? আমরা কি কিছুই নই?" আমার এটা ভয়ানক পাপ। কেন এই সব দেশের লোকের সঙ্গে আমার দেশের তুলনা করি? এই তুলনা করাটা আমার ব্যবসা। এই যে তুলনা করছি, তার দ্বারা বুঝাতে চাই পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ বলে কোন বস্তু পৃথিবীতে নাই। পৃথিবীটা এক কাঠির মাপে চলছে। তাতেই দেখতে পাচ্ছি কোন্ দেশ ১ম, ২য়, ৩য়, ৭ম, ১০ম ধাপে রয়েছে। এই পরিমাপে ঐ সব দেশ যদি হিমালয়ের ২৯০০২ ফুট উপরে থাকে, তা হলে আমরা আছি একেবারে বঙ্গোপসাগরের অতলতলে। ছুনিয়া এক পথে চলেছে, এক আদর্শে। এর কোন তফাৎ নাই। ওদের ১৮১৫-৩২ সনে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে উঠেছিল। আমাদের প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন আইন কায়েম হয়েছে ১৯২৫ সনে। ওদের দেশেও এক সময় যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত শিল্প-কারখানা ছিল না। মজুর-আন্দোলন তার পরের ধাপ, ইত্যাদি। আমরা ঠিক ওদের পিছু পিছুই চলেছি—একই পথে একই জীবন-সাধনায়।

১৯১৮সনের কোঠায় পৌছাতে ওদের প্রায় ১০০,৯০,৮০ বছর লেগেছিল। আমাদেরও ঠিক ৭০।৮০ বছর, কি তারও বেশী বা কম সময় লাগবে, সম্প্রতি তার আলোচনা করতে চাই না। বলছি মাত্র এই, আমরা কোনো কোনো বিষয়ে ১৮৪০-৭০ সনের ধাপে রয়েছি, কোনো কোনো কর্ম্ম-ক্ষেত্রে ১৮৭৫—৮৬ সনের কোঠায় আছি, ইত্যাদি। গুরু আমাদের ওরা। আধ্যাত্মিক জীবনে ওদের সাক্রেতি করা আমাদের বর্ত্তমান স্বধর্ম্ম। এই হচ্ছে বর্ত্তমান ভারতের কেঠো নীরস চরম সত্য।

চাই নতুন নতুন আয়ের পথ

আমরা ভোকেশন্তাল-স্কুল শব্দটা মাত্র ব্যবহার করি, না বুঝি এর মামুলী অর্থ না বুঝি পারিভাষিক অর্থ। যাক, শব্দটা ছেড়ে দিই, ও বিষয়ে আর আলোচনা করব না।

আমাদের দেশের লোক ধনোৎপাদনের নতুন নতুন উপায় চায়—এইটাই হচ্ছে সকলের প্রাণের কথা।

শেষ পর্য্যন্ত কথাটা এই দাঁড়ায় যে, যে সব স্কুলে নতুন নতুন ধনোৎপাদনের উপায় হয়, তাহাই আমরা চাই। ডাক্তারী উকিলী ছাড়া আরও অন্যান্য পন্থার দরকার। বুঝতে হবে, যে যে পথে এতদিন ধনোৎপাদন হচ্ছিল, কেবলমাত্র সেই সেই পথে চলে ধনোৎপাদন বড় বেশী হবে না। পৃথিবীতে ধনোৎ-পাদনের রূপান্তর ঘটেছে ও ঘটবে। ধনোৎপাদনের নতুন নতুন পথ চাই। নতুন নতুন পাঠশালা স্কুল কলেজ হওয়া চাই। বলে রাখি যে, আমি উকিলী, ডাক্তারী, স্কুল মাষ্টারী, কেরাণীগিরি বা ঐ জাতীয় অন্যান্য সুপরিচিত ব্যবসাকে নিন্দনীয় মনে করি না। এই সব কাজও ষোল আনাই ধনোৎপাদনের সহায় অর্থাৎ পুরামাত্রায় 'ভোকেশন্তাল'।

ছুনিয়ায় ফ্রান্সের ঠাঁই

ইতালী, জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, আমেরিকা, ইংলণ্ড সকলের কথাই বলেছি। আজকে প্রধানতঃ ফ্রান্সের কথা বলব। ফ্রান্স দেশটাকে চুমরে নেওয়া সোজা। ফ্রান্সের মাত্র ৩॥ কোটি লোক। আপনারা হয়ত জিজ্ঞাসা করবেন, তা হলে ইতালীর কথা বলি না কেন? জবাব,—ইতালী বর্ত্তমান জগতের মাপ কাঠিতে অনেক ছোট—একেবারে আমাদের বাড়ীর কাছে ঘেঁসা। ফ্রান্স বেশ উপরে, এতটা উপরে যে, অনেক বিষয়ে সে প্রায় জার্ম্মাণি পর্য্যন্ত এগিয়ে যায়। আমার বিবেচনায়, জার্ম্মাণি, ইংলণ্ড, আমেরিকা এই তিনটা হল পৃথিবীর সেরা দেশ। আজ কাল সভ্যতা-শিক্ষা-শিল্পের মাঠে যে ঘোড়দৌড় চলেছে, তাতে ইংরেজ, জার্ম্মাণ আর মার্কিণ প্রায় সমানে সমানে নং ১ অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর প্রথম।

ফ্রান্সকে প্রথম শ্রেণীর দ্বিতীয় ধরে নেওয়া আমার দস্তুর। ফ্রান্সে ৩॥ কোটি লোকের বাস। এর যেখানেই যান না কেন ময়লা-পচা দুর্গন্ধ কিছু-না-কিছু সর্ব্বত্রই পাবেন। ওদের রেনাসাঁসের ঘরবাড়ী অট্টালিকা খুবই

মনোরম সন্দেহ নাই, কিন্তু সহরে হাঁটতে গেলে এখানে ময়লা, ওখানে পচা। মেরামতের অভাব সহরে পল্লীতে যথেষ্ট। এ দর্শকের চোখ এড়াতে পারে না। ঠিক যেন আমাদের দেশেরই মত। তবে আমরা অবশ্য এ বিষয়ে ফ্রান্সের অনেক নীচে। কিন্তু জার্ম্মাণিতে আমেরিকায় ওসব হবার যোটি নেই। ওসব দেশে একেবারে সবই চকচকে, ঝকঝকে। আমেরিকা ও জার্ম্মাণির স্কুল, টাউনহল, গবর্ণমেণ্টের বিপুল-কায় প্রাসাদ, রাজপথ, সড়ক—সর্ব্বত্রই দেখবেন কেবল ঋটখটে নিটোল দৃশ্য। সবই মাজাঘসা পালিশ। আমাদের দেশের ঘরের মেজেতে শুতে অনেকের আপত্তি আছে; কিন্তু এই সব দেশের যে-কোনো সড়কে খালি গায়ে শুয়ে থাকতে আমি রাজি আছি। স্বাস্থ্যরক্ষা, সৌন্দর্য্য, পারিপাট্য, মানুষের শরীরকে সুখী করবার যত-কিছু উপায় ও কৌশল তা এরা করেছে। ফ্রান্স এই সব বিষয়ে এই দুই দেশের অনেক পেছনে পড়ে আছে। যাক,—তবুও ফ্রান্সকে আদর্শ করে চল্‌লে বাঙ্গালীর এখনো এক যুগ চল্‌তে পারে।

৩॥ কোটির দেশে একলাখ এঞ্জিনিয়ার

এই ফ্রান্সে,—৩॥ কোটি নরনারীর ফ্রান্সে,—প্রায় ১ লাখ এঞ্জিনিয়ার আছে। ঘরবাড়ী তৈয়ারী মেরামতের এঞ্জিনিয়ার, শিল্প-কারখানার এঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক বৈদ্যুতিক এঞ্জিনিয়ার—এই সব ধরে ৮৫—৯৫ হাজার ঠিক দাঁড়াবে। এই একলাখ এঞ্জিনিয়ারের মধ্যে ১০ হাজার পয়লা নম্বরের শিল্প-সেনাপতি।

এই সকল শিল্প-সেনাপতি বা শিল্পনায়কের অধীন প্রায় ৫০ লাখ কর্ম্মী, ৫০ লাখ মজুর-ফৌজ আছে। গড়ে তা হলে প্রত্যেক ৫০ জনের এক একজন সেনাপতি।

২৫-৩০ বছর বয়সে এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যাপীঠ থেকে কত এঞ্জিনিয়ার বেরোচ্ছে তার হিসাব করা যাক। মোটের উপর আজকাল গড়ে প্রতি বৎসর ২২—২৫ বছরের শিল্পপতি ২॥ হাজার বেরোয়। ৩॥ কোটি নরনারীর দেশে ২॥ হাজার লোক শিল্প-কারখানার দায়িত্ব নিবার জন্য প্রস্তুত হয়। এই ২॥ হাজারের মধ্যে ইউনিভার্সিটির টেক্‌নিক্যাল কলেজ থেকে বেরোয় মাত্র গড়ে ৩০০। আর বাকী ইউনিভার্সিটির বাইরের টেক্‌নিক্যাল স্কুল থেকে বেরোয়। কারখানায় কাজ করতে করতে ছোট পদ থেকে ধাপে ধাপে বড় পদে উঠ্‌তে উঠ্‌তে কেহ কেহ শিল্প-নায়ক হয়ে পড়ে। একদিন একটা লোক সামান্য কুলি মজুর ছিল, সময়ে সে-ই—এঞ্জিনিয়ার-শিল্পপতি দাঁড়িয়ে যায়। ফ্রান্সের কারখানা থেকে গড়ে এইরূপ ৪০০ এঞ্জিনিয়ার বেরোয়।

ফ্রান্সে ১৩টা বিশ্ববিদ্যালয়

ফ্রান্সের ইউনিভার্সিটিগুলিতে কি রকম ধনোৎপাদনের শিক্ষা দেওয়া হয়? ফ্রান্স বাঙ্গালা প্রদেশের মত কতকগুলি জেলায় বিভক্ত। এগুলিকে দেপার্ৎমাঁ বলা হয়। এরূপ ৮০।৯০ দেপার্ৎমাঁয় গোটা ফ্রান্স বিভক্ত। এ হ'ল শাসন-কেন্দ্রের বিভাগ। কিন্তু শিক্ষা-বিভাগ স্বতন্ত্র। সে বিভাগকে বলে "আকাদেমী" বা পরিষৎ। এইরূপ শিক্ষার ১২ কি ১৩ পরিষদে ফ্রান্স বিভক্ত। এর প্রত্যেক বিভাগে একটা ইউনিভার্সিটি আছে। এইরূপ ১৩টা শিক্ষাকেন্দ্র আছে। বাঙ্গালায় ৪৪ কোটি লোকের বাস। ফরাসী মাপে এখানে ১৮টা আকাদেমী বা পরিষৎ এবং ততগুলা ইউনিভার্সিটি থাকা উচিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্প-বিভাগ

শ' চার পাঁচেক এঞ্জিনিয়ার ফী বৎসর ফ্রান্সের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হতে বাহির হয়। অষ্ট্রীয়া, জার্ম্মাণি, সুইট্‌-সারল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশের অনুকরণে ফরাসীরাও নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে টেক্‌নিক্যাল ফ্যাকাল্টি কায়েম করেছে। প্রত্যেক বিশ্ব-বিদ্যালয়ে জনপদ হিসাবে বিশেষ বিশেষ টেক্‌নিক্যাল জিনিষ শিখানো হয়। কোথাও বিদ্যুতের কারবার প্রধান স্থান অধিকার করে। "আঁস্তিতিউ শিনিক" বা রসায়ন-বিদ্যালয় কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষত্ব।

সকল ফরাসী বিশ্ব বিদ্যালয়ের নাম করবার দরকার নাই। তবে বলে' রাখা উচিত যে, শিল্পশিক্ষা হিসাবে ফ্রান্সের সেরা কেন্দ্র প্যারিস নয়।

টেক্‌নিক্যাল তরফ হতে ফ্রান্সের নামজাদা শিক্ষাকেন্দ্র

তিনটি। আল্পস জেলার গ্রেণোব সহর এক বড় কেন্দ্র। উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলের নাঁসি সহর এই হিসাবে নামজাদা। আর পশ্চিম জনপদের তুলুজও সুপ্রসিদ্ধ।

এখন দেখা যাক অন্যান্য হাজার দেড়েক এঞ্জিনিয়ার পয়দা হয় কোত্থেকে? সে আলাদা স্কুল। ঐ ধরণের স্কুল ফ্রান্সে আছে ৯২।৯৩টি। এইগুলাকে জনপদগত শিক্ষালয় বলা যেতে পারে। আর্থিক হিসাবে ফরাসী ধন-বিজ্ঞানের পণ্ডিতেরা ফ্রান্সকে ১১ বিভাগে ("রেজ্যঁ")ভাগ করেছেন। শাসনের তরফ হতে ৮০।৯০টি "দেপার্ৎমাঁ"য় (জেলায়) ফ্রান্সকে ভাগ করা হয়ে থাকে। ধনবিজ্ঞানবিদেরা বিজ্ঞানসম্মত ভাবে ফ্রান্সকে ১১ "রেজ্যঁ" বা আর্থিক জনপদে বিভক্ত করেছেন।

আর্থিক জনপদ

এই ধরুন বর্দ্ধমান বিভাগ। হুগলী ও মেদিনীপুর তো আর এক হতে পারে না। সব জেলার আর্থিক এবং ভৌগোলিক প্রকৃতি এক বলা মস্ত ভুল। উত্তর বঙ্গের পাবনা বগুড়া কাছাকাছি হলেও এক নয়। তেমনি পূর্ব্ববঙ্গের কুমিল্লা ও বরিশাল প্রকৃতিতে এক নয়। কোথাও হয়ত পাট বেশী হয়, কোথাও কয়লার খাদ রয়েছে, কোথাও তেলের চাষ, কোথাও লোহালক্কড়ের কারখানা, কোথাও বা মাছ। এইরূপ এক একটা জায়গা এক একটা বিশেষ জিনিষের জন্য স্বাভাবিক কারণেই প্রসিদ্ধ। গোয়ালন্দ একটা বড় আড্ডা। একে কেন্দ্র করে কয়েকটা জেলা নিয়ে একটা আর্থিক জনপদ গড়ে তোলা যেতে পারে। বাংলাদেশে একদিন না একদিন এরূপ করতেই হবে। গোটা বাংলাদেশকে এরূপভাবে অনেকগুলি আর্থিক জনপদে ভাগ করা যেতে পারে। এইরূপ ১৫টা কি ১৮টা আর্থিক জনপদ গড়ে উঠতে পারে। ফ্রান্সের ১১টি রেজ্যঁর প্রত্যেকটিতে ৮।১০টি করে টেক্‌নিক্যাল স্কুল আছে। বাংলায় এরূপ ১৫টি আর্থিক জনপদে অন্ততঃ দেড়শ'টা টেক্‌নিক্যাল স্কুল থাকা উচিত। এইসব স্কুলে ফ্যাক্টরির মজুর থেকে যে সামান্য জুতা সেলাই করে সেও আসতে অধিকারী।

ফ্রান্সের এগার জনপদ

উত্তর ফ্রান্স প্যারিস থেকে ৩ ঘণ্টার পথ। ৩ ঘণ্টাও নয় ১।।০-২ ঘণ্টার রাস্তা। আমেদাবাদ বললে আমরা যা বুঝি এ মুল্লুকটা সেইরূপ বয়ন-শিল্পের কেন্দ্র। তুর্কোআঁ উত্তর জনপদের কেন্দ্র। এখানে তুলা পশমের কারবার। এইরূপ লোহা লক্কড়ের কারবারের একটি কেন্দ্র হচ্ছে নাঁসি। জামশেদপুরে যেমন কেবল লোহা ইস্পাতের কারবার চলে, এই নাঁসিতেও ঠিক তেম্নি। আল্পসের মাথায় গ্রেণোব বলে একটা জায়গায় বিদ্যুৎ-উৎপাদনের কারবার চলে। এখানকার বিজলী-কেন্দ্রে যে শক্তি উৎপন্ন হয়, তার দ্বারা সমস্ত ফ্রান্সে গাড়ী চালাবার আন্দোলন চলছে। ক্রোর ক্রোর টাকা ঢেলে ফরাসীরা পল্লীর রূপ একেবারে বদলে ফেলবে। এর বাজেট পর্য্যন্ত হয়ে আছে।

আর একটি জায়গা মঁপেইয়ে। সেখানে আঙ্গুরের চাস-আবাদ হয়। সেই আঙ্গুরে "হ্বঁ্যা" নামক একপ্রকার মদ তৈয়ারী হয়। কিন্তু "হ্বঁ্যা" বস্তুটা আসলে মদ নয়, আমাদের দেশে যেমন ডাবের রস, আকের রস ফ্রান্সে "হ্বঁ্যা"ও প্রায় সেইরূপ। ফ্রান্সে এটা জলের মাফিক ব্যবহৃত হয়। আমাদের তো ধারণা ফ্রান্সের মত মাতাল জাত আর দুনিয়ায় নাই। কিন্তু এদের দেশে যে মদ তৈয়ারী হয় তাতে কত পার্সেণ্ট অ্যালকহল থাকে জানেন? ৫ পার্সেণ্ট—শতকরা ৫ ভাগ। অসহযোগের যুগে আমাদের দেশের কতকগুলি লোক ফ্রান্সে গিয়ে হাজির। মতলব ফ্রান্সের মদ ভারতে আমদানি করা। মদের আড্ডায় এদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দেওয়া গেল। কিন্তু 'আধ্যাত্মিক' ভারতে যে মদের দরকার হয়, তা ফান্সের কারখানায় প্রস্তুত করিবার আইনই নাই। অতিমাত্রায় চড়া পরিমাণ অ্যালকহল আধ্যাত্মিক ভারতের জন্য আবশ্যক! এই 'হ্বঁ্যা'-র দশ গ্লাস ৭ বছরের শিশুকে খাওয়ালেও তার একটুও নেশা হবে না। কিন্তু আমাদের ভারতীয় ব্যবসায়ীদের দরকার হচ্ছে ৭৫ পার্সেণ্ট অ্যালকহল। ফরাসী আইনে যে চরম মদ চলতে পারে তাও এদের কাছে ফেল মারলে। ভারতীয় পাণ্ডারা বললেন, 'এ সব চলবে না।' অতঃপর তাদের বিলাতে যাওয়াই সাব্যস্ত হল।

গোটা শ'য়েক টেক্‌নিক্যাল স্কুল

ফ্রান্সে ১১টি আর্থিক জনপদ। ভিন্ন ভিন্ন জনপদে ভিন্ন ভিন্ন কারবার। মঁপেইয়ে—কৃষি, দুধ, গোপালন, মৌচাক, বন, বনের কাঠ ইত্যাদির কেন্দ্র। তুর্কোআঁ এঞ্জিনিয়ারিং ঘটিত লোহালক্কড় ইস্পাত ইত্যাদিবিদ্যার কেন্দ্র। নাঁসিতে খনিঘটিত বিদ্যার স্কুল। আল্পসের গ্রেণোবে দস্তানা তৈয়ারীর ব্যবসা ও বিদ্যালয়। গোটা দুনিয়ায় ঐ দস্তানা রপ্তানি হইয়া থাকে।

মধ্যফ্রান্সে এক রকম, উত্তর ফ্রান্সে অন্য রকম, আবার দক্ষিণ ফ্রান্সে আর এক রকম—এইরূপ ১১টা বিভিন্ন মুল্লুকে বিভিন্ন রকমের ধনোৎপাদন শিখানো হয়ে থাকে। স্যাঁৎএতিয়েন রেজ্যঁ ঠিক মধ্য ফ্রান্সে অবস্থিত। আমাদের দেশ যেমন ধনধান্য পুষ্পে ভরা, এটিও ঠিক সেই রকম। এখানকার স্কুলে ছাত্রসংখ্যা প্রায় শ'ছয়েক।

এই যে-সব স্কুলের নাম করা যাচ্ছে বিদেশীরাও এই সব স্কুলে ঢুকতে পারে। কোনো বাধা নাই। "এ-কল প্রাতিক দ'কম্যার্স এ দ্যাঁদুস্ত্রী" (শিল্প-বাণিজ্যের কার্য্যকরী পাঠশালা) এই সব স্কুলের সাধারণ নাম। এই ধরণের স্কুল থেকে, প্রায় ১০০ টা কর্ম্মকেন্দ্র থেকে, বছরে ১৫০০ লোক প্রতিবৎসর বেরিয়ে আসছে।

ফ্রান্সে এই শিল্পশিক্ষা ও ব্যবসাশিক্ষা দুইটা তাঁবে চলে। এক নম্বর হচ্ছে এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট (শিক্ষাবিভাগ), এটা চলে শিক্ষা-সচিবের তদবিরে। অপর বিভাগ কৃষি-সংক্রান্ত। তাহার সঙ্গে শিক্ষাসচিবের এবং শিক্ষা-বিভাগের কোনো সংস্রব নাই। সেটা আগাগোড়া কৃষিসচিবের এবং কৃষিবিভাগের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

একমাত্র মেয়েদের জন্যও কতকগুলা কৃষি-বিদ্যালয় আছে। তা ছাড়া, প্রত্যেক আর্থিক জনপদেই একটা দু'টা করে স্বতন্ত্র স্কুল মেয়েদের জন্য রয়েছে। এই সব স্কুলে ছোট ছোট শিল্প কাজ থেকে আরম্ভ করে গৃহস্থালী শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা, শিশুপালন প্রভৃতি সবই শিক্ষা দেওয়া হয়। ফরাসী জাত এই রকম ২০টা ধনোৎপাদনের বিদ্যালয় মেয়েদের জন্য আলগা করে রেখেছে।

ফ্রান্সে কৃষি-শিক্ষা

কৃষি-কলেজ বা কৃষি-বিদ্যালয় বল্লে পরে যা-কিছু বোঝা যায়, ফ্রান্সে ঐ ধরণের মাত্র ৩টি প্রতিষ্ঠান আছে। গ্রিণো, মঁপেইয়ে আর রান্‌,—উত্তর, মধ্য ও পশ্চিম ফ্রান্সে,—এই ৩টি জায়গায় এই সকল শিক্ষাকেন্দ্র অবস্থিত। আড়াই বছর এই সব বিদ্যালয়ে থাকতে হয়। যাঁরা হাতে কলমে কাজ করেন কেবল মাত্র তাঁদেরকেই ঐ সব স্কুলে ঢুকতে দেওয়া হয়। চাষী, কৃষাণ জমিজমার কাজের জন্য অথবা সরকারী কৃষিকার্য্যের ইন্‌স্পেক্টারী ইত্যাদির কাজেরজন্যও শিক্ষা লওয়া যায়। আমাদের দেশে এম, এ, এম, এস-সি লাইনে যে রকম বিদ্যা হয়, এই সব বিদ্যালয়ে আড়াই বছরে ঠিক ততখানি বিদ্যা হয়। এই সব বিদ্যালয় সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথমতঃ, দুনিয়ার সকল প্রকার পদার্থ-বিদ্যা ও প্রকৃতি-বিজ্ঞান। দ্বিতীয়তঃ, চাষ-আবাদ, গোপালন, ইত্যাদি সংক্রান্ত, বিদ্যা। তৃতীয়তঃ, ধনবিজ্ঞান, পল্লীসভ্যতা, আর্থিক আইন-কানুন, স্বাস্থ্যরক্ষা ইত্যাদি পাঠ চর্চ্চা।

ফ্রান্সের শিল্প-কারখানার আর একটি বিশেষত্ব—সেখানে সাধারণতঃ কোনো বিদেশী নাই। ফ্রান্সে কোনো বিদেশী কোনো রকমের চাকরী পাবে না। আইনেই আটক। বিদেশী সেখানে একটি পয়সা রোজগার করে নেবে এ হবার যোটি নেই, ডাক্তারী ওকালতী করেও নয়। একমাত্র ছাত্র হিসাবে ফ্রান্সে বিদেশীরা থাকতে পারে। অবশ্য নিজের পয়সা খাটিয়ে তেজারতি করতে বাধা নাই। বিদেশীরা ফ্রান্সে নিজ নিজ পরিষদ্‌ও স্থাপন করতে সমর্থ। প্যারিসের আকাদেমী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তিনি বললেন, "তোমরাতো ভারি আহাম্মক লোক। এই প্যারিসে ১০ হাজার ছাত্র অধ্যয়ন করে। গোটা দুনিয়াকে প্যারিস অনুপ্রেরণা দিচ্ছে। ফ্রান্স তোমাদিগকেও ত ডাকছে। তোমাদের নেমন্তন্ন করে পাঠাচ্ছে। তোমরা এখানে একটা পরিষদ্‌ প্রতিষ্ঠা কর। তুমি দেশে গিয়ে তোমার দেশের লোককে বল—তারা কিছু টাকা তুলে ভারত-পরিষদ্‌, ভারতীয় অ্যাঁস্তিতিউ বলে একটা-কিছু খাড়া করুক। তাতে তোমাদের দেশ থেকে কয়েকজন

অধ্যাপক, বক্তা, ছবি-আঁকনেওয়ালা, লিখনেওয়ালা এই সব কতকগুলি পাঠিয়ে দিও। এই পরিষদকে আমরা ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়ের সামিল করে নেব।"

জার্ম্মাণি বনাম ফ্রান্স

শিল্প-শিক্ষার মুল্লুকে আমেরিকা ও জার্ম্মাণি ফ্রান্সের চেয়ে সেরা। জার্ম্মাণি একটা বিপুল মুল্লুক। বিশেষতঃ জার্ম্মাণির বিধি-ব্যবস্থা এত জটিল যে তাতে থৈ পাওয়া মুস্কিল। সেখানকার বড় বড় পণ্ডিত আমাকে বলেছেন, "তুমি এই জার্ম্মাণিতে ১২ বা ৩।৪ বছর থেকেই আমাদেরকে জরীপ করে, বগলদেবে দেশে নিয়ে যাবে ভেবেছ! আমরা এই মন্ত্রিগিরি করতে করতে চুল দাড়ি পাকিয়ে ফেলেছি। বয়স হল ৬০।৬৫ বছর। আমরা সেরূপ কল্পনা করতে পারি না। জার্ম্মাণিতে কতগুলা টেক্‌নিক্যাল স্কুল আছে—এমন একটা জার্ম্মাণ নেই যে সে অঙ্ক কষে এক নিমিষে বলে দিতে পারে যে ঠিক এতগুলো।" আকাশের তারা গুনে যেমন শেষ করা যায় না (শেষ করা যায় না বলতে পারি না। হয়ত এমন কোন জ্যোতির্ব্বিদ আছেন যিনি পারেন) ঠিক সেইরূপ কতগুলো টেক্‌নিক্যাল স্কুল জার্ম্মাণিতে রয়েছে তার ঠিক খবর কেউ বলে দিতে পারে না।

চাই ফ্রান্সে বাঙ্গালীর অভিযান

এহেন জার্ম্মাণির পাত্তা পাওয়া আমাদের মুস্কিল হবে। তাই ফ্রান্সের কথা বলা গেল। ভারতে ঐ "ভোকেশন্যাল স্কুল" যে যে অর্থেই ব্যবহার করুন না কেন, যদি তাহাদ্বারা আমরা কিছু করে উঠতে চাই, তা হলে সম্প্রতি ঐ ফ্রান্সের পথে দুর্গা বলে যাত্রা করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। ফ্রান্সের যে সব জনপদে কৃষিশিল্প ব্যাঙ্ক স্থাপিত, যদি আমাদের বাঙ্গালাদেশের প্রত্যেক জিলা থেকে দু'জন করে এই সব কেন্দ্রে কিছু দিন কাটিয়ে আসেন, তা হলে ধনোৎপাদন জিনিষটা আর তার বিদ্যাটা কিছু কিছু তাঁদের পেটে পড়তে পারে। শুধু একটা ডিগ্রী নেওয়ার উদ্দেশ্যে ৩।৪ বছর থেকে আসলে বেশী ফল দাঁড়াবে না। বাস্তবিক শিখবার, বুঝবার আর তা নিজের দেশে খাটাবার মতলব নিয়ে যেতে হবে। তার জন্য করিতকর্ম্মা, বাস্তব অভিজ্ঞতাওয়ালা লোকেদের যেতে হবে। আপনারা যাঁরা মফঃস্বল থেকে কলকাতায় ডিগ্রী নিতে এসেছেন, তাঁরা কলকাতার কতটুকু বোঝেন বা জানেন? হয়ত ইউনিভার্সিটি, গোলদীঘি বা বিল্ডিংটা চেনেন। এর বেশী নয়। দেড়শ' থেকে দু'শ' ঘারভাঙ্গা টাকা মাস মাস খরচ করে' কেউ যদি বার্লিন প্যারিস বা নিউ ইয়র্কে আদা-মুণ খেয়ে ডিগ্রী নেবার প্রতিজ্ঞা করে বসে যায়, তা হলে সে সেখানকার দেশ বা সমাজের চরিত্র কতটুকু বুঝে উঠতে পারে? এ বুঝে উঠা সোজা কথা নয়।

আমেরিকা এবং জার্ম্মাণি সম্বন্ধে যত আলোচনা করতে পারি, ততই ভাল। এ সব দেশ সম্বন্ধে যত জানি, ততই ভাল; কিন্তু এঁটে ধরতে পারি কোনটাকে? যদি এঁটে ধরতে হয় তা হলে ঐ ফ্রান্সকে। ফ্রান্সের মফঃস্বলে মফঃস্বলে, পল্লীতে পল্লীতে বাঙ্গালী চাষী, শিল্পী, কারিগরদের শিখবার অনেক চিজ আছে। এই সকল কেন্দ্রে ৩।৪ বছর বাস করে' সেখানকার গণ্ডা গণ্ডা এঞ্জিনিয়ার আর শত শত মিস্ত্রি, আড়তদার ইত্যাদির সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে,—এদের সঙ্গে মিশে, এদের প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে কিছু আমল করে, তবে নিজের দেশে ধনোৎপাদন-বিষয়ক বিদ্যাপীঠের প্রাথমিক ভিত্তিগড়ে তুলতে পারব—এইরূপই আমার বিশ্বাস।

বৃহত্তর বঙ্গ

ইংরেজ গবর্মেণ্ট যখনই কোন প্রস্তাব আমাদের সামনে উপস্থিত করেন, তখনই হয়ত আমরা ধারণা করে ফেলি, এটা স্বরাজের পরিপন্থী—স্বরাজের বিরুদ্ধে যাচ্ছে,—কেননা, প্রস্তাবটা সাদা মুখ থেকে বেরিয়েছে! যুবক ভারতে এই ধরণের চিন্তাপ্রণালী সকল ক্ষেত্রে চালানো উচিত নয়। এ হচ্ছে একদম কাণার মত ভাল মন্দ সব জিনিষকেই বিশ্রী বলার সামিল। নিজের চোখে একবার ফ্রান্স ইতালী, জার্ম্মাণির অবস্থাটা হাতে কলমে জরীপ করে আসি না কেন? দরকার হলে এক গ্লাস "হ্বাঁ্যা" পর্য্যন্ত খেয়ে ধনোৎপাদনের গণ্ডা গণ্ডা বিশেষজ্ঞের সঙ্গে দহরম মহরম করে' দেশে ফিরে আসবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে না

কেন? বিদেশের নিবিড় অভিজ্ঞতাওয়ালা বাঙ্গালীই বাঙ্গালার পাকা সমালোচক এবং স্বদেশসেবক হবার উপযুক্ত। এযুগে বিদেশে বাঙ্গালীর প্রবাসই আমাদের দেশোন্নতির আধ্যাত্মিক শক্তি। ফ্রান্সে একটা "বৃহত্তর বঙ্গ" গড়ে উঠুক।

ফুটপাথ ও নগর জীবন

শ্রীসুধাকান্ত দে, এম, এ, বি, এল

ফুটপাথে কত লোক হাটে

কলিকাতা বড় শহর। ১৩ লক্ষ লোকের বাসস্থল। ক্রমাগতই প্রসারে বাড়িতেছে। তার একটা কারণ ইহার বিপুল বাণিজ্য। সুতরাং দিনরাত এর সড়কগুলির উপর দিয়া যান-বাহন ছুটিতেছে এবং বহু লোককেও চলাফেরা করিতে হয়। কিন্তু সড়কের উপর দিয়া চলাফেরা করা বিপদসঙ্কুল। সেইজন্ত ফুটপাথের প্রয়োজন।

কলিকাতায় প্রতিদিন ফুটপাথগুলি দিয়া কত লোক হাঁটিতেছে? প্রতি মাস? প্রতি বৎসর? সেই হিসাব লইবার চেষ্টা বোধ হয় কোনো দিন করা হয় নাই। কোন্ প্রণালীতে এই লোক-সংখ্যা নির্ণয় করা হইবে? ইহা কি নির্ণয় করা যায়?

নির্ণয় বোধ হয় করা যায। অঙ্কটা গড়পড়্তা হইবে। আর গড়পড়্তা লইয়াই আমাদের কারবার।

প্রথমে ধরা যাক্ ১৩ লক্ষ লোক কলিকাতায় থাকে বটে; কিন্তু ইহাদের ⅙ অংশ সেই বয়সের শিশু, যাদের ফুটপাথের উপর দিয়া চলাফেরা করার দরকার হয় না। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, কলিকাতার বাহির হইতে প্রতিদিন গড়ে ৪।৫ লক্ষ লোক ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্য কর্ম্ম-উপলক্ষ্যে আসিয়া ফুটপাথগুলিতে হাঁটাহাঁটি করে। সুতরাং মোট লোক ১৩ লক্ষই রহিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্ত্রীলোকরা পথে হাঁটে না বটে; কিন্তু সমগ্র জনবলের তুলনায় তারা নগণ্য।

"সব ফুটপাথে সমান লোক হাঁটে না।" কোন্ ফুটপাথে কত লোক হাঁটে তা কতকগুলি বিশেষ কারণের উপর নির্ভর করে। এই কারণগুলি যেমন বাহির হইয়াছে, কোন্ ফুটপাথে কত লোক হাঁটে তাও তেম্নি বাহির করা যায়। আর "সকল শ্রেণীর লোক সব ফুটপাথে সমান ভাবে হাঁটে না।" কলেজ ষ্ট্রীটের দিকে স্কুল-কলেজের যত ছাত্র হাঁটে বড়বাজারের দিকে তত হাঁটে না। আবার মাড়োয়ারী ও অন্য ব্যবসায়ীরা যত বড়বাজারে হাঁটে, কলেজ ষ্ট্রীটে তত হাঁটে না। এইরূপ সর্ব্বত্র কোন্ শ্রেণীর কত লোক প্রতিদিন হাঁটাহাঁটি করে তা বাহির করা অসম্ভব নহে।

কলিকাতার ফুটপাথে প্রতিদিনকার লোক-চলাচল গণনা করিতে গিয়া আমাদের উপরের দুইটি সত্য মনে রাখিতে হইবে। কলেজের ছাত্র হয়ত যেখানে সারাদিনে ৫।৬ বারের বেশী হাঁটে না, সেখানে একজন মাড়োয়ারী ১০।১২ বার হাঁটিবে, একজন ডাক্তার ১৫।১৬ বার হাঁটিবে, এবং একজন মুটে ২০।২২ বার হাঁটিবে। আবার ঐ ছাত্র বা মাড়োয়ারী বা ডাক্তার যদি বড়লোক হয় অর্থাৎ তার যদি জুড়ীগাড়ী বা মোটর থাকে তবে সে কোনো ফুটপাথেই একবারও হাঁটিবে না। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক নূতন সড়কে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নূতন একটা ফুটপাথে হাঁটা হইতেছে বলিয়া ধরিতে হইবে।

এই পরীক্ষাটা অনেকগুলি লোককে লইয়া করিলে তার একটা গড় কষিয়া জানা যায় কলিকাতার ফুটপাথে গড়ে প্রতি লোক কতবার করিয়া যাওয়া আসা করে।

মনে কর এই গড় হইল ১০। অতএব বলা যাইতে পারে প্রতিদিন কলিকাতার ফুটপাথগুলিতে গড়ে প্রায় ১½ কোটি বা ঐরূপ লোক হাঁটাহাঁটি করে। সেটা বড় সহজ ব্যাপার নয়। পথ চলিবার রকমের কথা এখন ছাড়িয়া দেওয়া যাউক।

অন্যান্য দিকে এই বিপুল লোক-সংখ্যা ফুটপাথে অনেকগুলি সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। সে সমস্যাগুলির প্রত্যেকটির সুন্দর সমাধান করাই বর্ত্তমান যুগের মানবের এক প্রধান কর্ত্তব্য ও কীর্ত্তি। কিন্তু তৎপূর্ব্বে সমস্যাগুলির প্রকৃতি জানা দরকার।

সমস্যাগুলির প্রকৃতি

ফুটপাথের কথা বিবেচনা করিতে গিয়া সমস্যাগুলিকে দুই দিক্ হইতে দেখা যাইতে পারে—অস্তি ও নাস্তি। অর্থাৎ বলা চলে—ফুটপাথের এইগুলি অভাব, ইহা থাকিলে ভাল হইত, ইত্যাদি এবং এইগুলি না থাকিলে ভাল হইত, সুন্দর হইত ইত্যাদি।

এই দুই রকম দৃষ্টিকেই আরও একটু বিশ্লেষণ করিলে এইরূপ বলা চলে :—

(১) এই এই জিনিষ ফুটপাথের সম্পত্তি। এদের সহ্য করিতে হইবে। এদের উপর কোনো হাত নাই। তবে দেখিতে হইবে এরা বাস্তবিক কোনো অহিতের জনক কি না। সেরূপ হইলে তার প্রতিবিধানের উপায় কি?

(২) এই এই জিনিষ ফুটপাথে তৈয়ারী বা সৃষ্টি করা বা রাখা হইয়াছে। এরা সম্পূর্ণ কর্পোরেশনের ইচ্ছার অধীন। দেখিতে হইবে :—

(ক) এরা বর্ত্তমানে যে অবস্থায় রহিয়াছে তাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কি? কোন্ কোন্ দিকে এদের কি কি উন্নতি করা যাইতে পারে? সে উন্নতির পক্ষে বাধা কি?

(খ) এরা অনিষ্টকর কি না? যদি এদের অনিষ্টকর না হইয়া উপায় না থাকে অর্থাৎ ইহা অত্যন্ত দরকারী অথচ এর পরিবর্ত্তে যাই বসান যাক্ এর চেয়েও বেশী অনিষ্টকর হইবে, তবে এর অনিষ্টকারিতা আরো কমাইবার উপায় উদ্ভাবন করা যায় কি না?

(৩) যে জিনিষ অনিষ্টকরও নয় উপকারীও নয়, শুধু সৌন্দর্য্য বাড়াইতেছে বা ঐরকম অন্য কোনো কাজ করিতেছে, শেষ পর্য্যন্ত তাতে জনগণের পয়সা খরচ করিয়া কোনো ফল পাওয়া যায় কি না?

(৪) এই এই জিনিষ অনিষ্টকর। যেমন করিয়া হউক এগুলিকে হয় ফুটপাথ হইতে সরাইতে হইবে অথবা এদের অনিষ্টকারিতা বহুগুণে কমাইয়া দিতে হইবে।

ফুটপাথের সম্পত্তি

বাস্তবিকপক্ষে ফুটপাথের সম্পত্তি একটা ব্যাপক পদার্থ। তার পরিমাপ করিতে গেলে সকলের আগে যে ১২½ কোটি লোক ফুটপাথগুলিতে চলাফেরা করে তাদের মূল্য বাহির করিতে হয়।

এই মূল্য অনেকগুলি উপাদানে গঠিত। তার কতকগুলি নিম্নরূপ :—

(১) গড়ে প্রতিলোক কত টাকার জামা কাপড় পরিয়া পথ হাঁটাহাঁটি করিতেছে?

(২) গড়ে পকেটে কি পরিমাণ মুদ্রা রহিয়াছে?

(৩) গড়ে দৈনিক আয় কত?

জামা কাপড়ের মধ্যে মোজা, জুতা, ছাতি মায় লাঠি ও মাথার তেল পর্য্যন্ত ধরিতে হইবে। এই তিনটি ঘর যোগ করিলে গড়ে প্রত্যেক মানুষের দাম বাহির হইল।

তারপর ফুটপাথের উপর দিয়া চলাফেরা করিতেছে গরু, মহিষ, ছাগল, কুকুর ইত্যাদি জানোয়ার। তাদের উপযোগিতা অনুযায়ী বর্ত্তমান দর ধরিতে হইবে।

ইহাই সব নয়। এর উপর ফুটপাথ-সংলগ্ন বাতি, গাড়ীবারান্দা, গাছ ইত্যাদির কথা মনে রাখিতে হইবে।

বলা বাহুল্য এই গড় বাহির করিবার নিয়ম হইতেছে একসঙ্গে বহুসংখ্যক সাদৃশ্যহীন ব্যক্তিকে যোগ করিয়া সেই যোগফলকে ব্যক্তির সংখ্যা দিয়া ভাগ করা। এইরূপে ইচ্ছামত কলিকাতার যে কোন ফুটপাথের অথবা সমগ্র ফুটপাথগুলির পরিমাণ বাহির হইবে। আমি বলিতেছি না এই সম্পত্তি নির্দ্ধারণ করিবার দরকার নাই। বরং বলিতেছি প্রতি বৎসর এই সম্পত্তির মূল্যটা নির্দ্ধারিত হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক।

কিন্তু এখানে আমি সম্পত্তি বা সম্পদটা একটু অপ্রশস্ততর অর্থে ব্যবহার করিতে চাই। সম্পত্তি বা সম্পদ্ অর্থে বুঝিব :—

(১) ট্রামের ও টেলিফোনের থাম,

(২) নব-নির্ম্মিত শেল-থাম,
(৩) চিঠির বাক্স,
(৪) ফায়ার ব্রিগেডের এলার্ম বাক্স,
(৫) জলের কল ও চৌবাচ্চা,
(৬) সড়কের নাম-লেখা প্লেট ও খুঁটি,
(৭) অটোমবাইল এসোসিয়েশনের নামলেখা খুঁটি,
(৮) গ্যাসের বাতি,
(৯) গাড়ী বারান্দা,
(১০) বৃক্ষ,
(১১) আঁস্তাকুড় ইত্যাদি।

উপরের ১১ দফায় ফুটপাথের যে সম্পদের নির্দ্দেশ করিয়াছি তাতে দুই রকম পদার্থ রহিয়াছে :—

(১) কতকগুলিতে কর্পোরেশন হাত দিতে পারে না। যেমন, ফায়ার ব্রিগেডের এলার্ম বাক্স।

(২) কতকগুলি সম্পূর্ণরূপে কর্পোরেশনের কর্তৃত্বাধীন। এরা আবার দুই শ্রেণীর :—

(ক) কতকগুলি কর্পোরেশন সৃষ্টি করিয়াছে। যথা, জলের কল, গ্যাসের বাতি, আঁস্তাকুড়।

(খ) কতকগুলি অন্যে সৃষ্টি করিয়াছে। যথা, চিঠির বাক্স, গাড়ীবারান্দা।

এত বড় শহরে লোকজন যাতে সহজে তাড়াতাড়ি দূর হইতে দূরতর স্থানে অল্প খরচে যাইতে পারে সেজন্য ট্রাম ও বাসের দরকার। আগে ট্রাম ছিল। তার জন্য বহু থাম ট্রামের সঙ্গে সঙ্গে ফুটপাথে পোঁতা রহিয়াছে। আজকাল বাস্ চলিতেছে। বাস্ চালাইতে পেট্রোল লাগে। তাই ফুটপাথে ফুটপাথে শেল-থামগুলি দেখা দিয়াছে।

কলিকাতায় ডাকঘরের সংখ্যা অনেক। কিন্তু তাহাও এই লক্ষ লক্ষ লোকের পক্ষে যথেষ্ট নয়। কলিকাতায় ১½ কোটি লোক রাস্তায় হাঁটে হিসাবে ধরিয়াছি। কিন্তু প্রতিদিন গড়ে কত কোটি টাকার চিঠিপত্র, টাকাকড়ি ইত্যাদির লেনদেন চলিতেছে, তার হিসাব ক'জন রাখিতেছে? কলিকাতার ঐশ্বর্য্যের খবর লইতে গেলে ডাকঘরের এই তথ্যের মূল্য কম নহে। আর ঐশ্বর্য্যের হাত-ফেরতার সাহায্য করিতেছে ফুটপাথের উপরকার ছোট ছোট চিঠির বাক্সগুলি।

চিঠিপত্র যথেষ্ট তাড়াতাড়ি সংবাদ বহন করিয়া লইয়া যায় না। টেলিগ্রাম খুব দ্রুত বাহন বটে। কিন্তু কলিকাতার মত শহরে টেলিগ্রামের কোন কাজ নাই। টেলিফোনের সৃষ্টি হওয়া অবধি মানুষে মানুষে দূরত্ব কমিয়া গিয়াছে (ফুটপাথে হাঁটে এমন মানুষের সংখ্যাও কিছু কমিয়াছে), সময় ও খরচের বহু সংক্ষেপ হইয়াছে। কারণ আগে যেখানে দূরতর স্থানে যাইতে অনেক সময় লাগিত, সেখানে এক মুহূর্ত্তেই সে স্থানের লোকের সহিত আলাপ করা যায়। আগে তাড়াতাড়ি যাইবার জন্য যান-বাহনের বাবদ খরচ না করিয়া উপায় ছিল না। এখন সে খরচ করিতে হয় না। ফুটপাথের উপরে মানুষের এই সব সুবিধার সাক্ষীরূপে টেলিফোনের থামগুলি দাঁড়াইয়া আছে।

কলিকাতার বাণিজ্য বিপুল। কোটি কোটি টাকার। তারই জন্য মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে পাটের গুদাম, চালের গুদাম ইত্যাদি। অগ্নিভয় আছে। আগুন নিবাইবার কাজে ফায়ার ব্রিগেডও মোতায়েন আছে। তাতে মানুষের ধন ও প্রাণ অগ্নিকাণ্ড হইতে অল্পবিস্তর রক্ষা পাইতেছে। ফায়ার ব্রিগেডে সংবাদ দিবার জন্য ফুটপাথে ফুটপাথে অসংখ্য এলার্ম বাক্স রাখিতে হইয়াছে। এগুলি না থাকিলে ব্রিগেড্‌কে তাড়াতাড়ি সংবাদ দেওয়া যাইত না।

সুতরাং বুঝা যাইতেছে, এই ধরণের জিনিষগুলি শুধু সাক্ষী গোপালের মত কলিকাতার ফুটপাথের শোভা বাড়াইবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে মনে করিলে অত্যন্ত ভুল করা হইবে। নাগরিক জীবনের সঙ্গে ইহাদের অত্যন্ত নিকট যোগ। ইহাদের কাজ :—

(১) সময়-সংক্ষেপ করা,
(২) শ্রম-সংক্ষেপ করা,
(৩) খরচ-সংক্ষেপ করা,
(৪) প্রাণ নিরাপদ ও রক্ষা করা,
(৫) ধন নিরাপদ ও রক্ষা করা,

(৬) ঐশ্বর্য্যের হাত-ফেরতার সাহায্য করা,

(৭) জনবল বৃদ্ধি করা ইত্যাদি।

এই মূক সাক্ষীগুলিও নাগরিক জীবনের বিচিত্র ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতেছে। আজ ১৯২৭ সনে ট্রামহীন, বাসহীন, ডাকবাক্স-শূন্য, টেলিফোন শূন্য, ফায়ার ব্রিগেডের এলার্মবাক্সশূন্য কলিকাতা সহরের কথা ভাবিতে গেলে মনে মনেও শিহরিয়া উঠিতে হয়।

এগুলিকে ফুটপাথের সম্পদ্ ব্যতীত আর কি বলিব? কর্পোরেশন এই ধরণের জিনিষগুলিতে হাত দিতে পারে না। অর্থাৎ বলিতে পারে না, এগুলি ফুটপাথের উপর থাকিতে পাইবে না।

অর্থশাস্ত্রের ছাত্রকে মনে রাখিতে হইবে যে, কলিকাতার ফুটপাথের ঐশ্বর্য্য মাপিবার সময় এই ধরণের জিনিষগুলিকে এইরূপে নূতন চোখে দেখিতে হইবে। তাতে জাতীয় সম্পদ্ ও আপদের কথাও অনেকখানি পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে।

চাই একটা বিশিষ্ট নীতি

এই প্রকার পদার্থগুলিকে কর্পোরেশন শাসন না-ই করিল। কিন্তু তবু যে সব জিনিষের উপর কর্পোরেশনের পরিপূর্ণ এক্তিয়ার আর যে সবের উপর নামমাত্র এক্তিয়ার এই উভয়েরই জন্য দরকার কর্পোরেশনের একটা বিশিষ্ট নীতি। অর্থাৎ আমি বলিতে চাই এই কথা, ডালের কল, গ্যাসের বাতিই হোক্ আর ট্রামের থাম, চিঠির বাক্সই হোক্ সকলের থাকিবে—

(১) একটা প্রণালী,

(২) একটা শৃঙ্খলা,

(৩) একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি।

সর্ব্বাপেক্ষা অল্প উপাদান ব্যবহার করিয়া বা অল্প খরচ করিয়া বা অল্প সময়ে, সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কাজ আদায় করাই জগতের সকল মানবের মূলমন্ত্র, তা সে মানব একাই থাক আর সমাজ-বদ্ধ ভাবেই বাস করুক। যে যে পরিমাণে এই তিন গুণকে আয়ত্ত করিয়াছে, সে সেই পরিমাণে সফলতা লাভ করিয়াছে।

কলিকাতা শহরের ফুটপাথগুলি যত সামান্য বস্তুই হোক্ না কেন (এরা নিশ্চয়ই সামান্য নয়) এদেরও একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি থাকিবে। লক্ষ্য কি, উদ্দেশ্য কি অর্থাৎ আমরা কি চাই তার স্পষ্ট ধারণা থাকিবে। এবং সেই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের দিকে শৃঙ্খলার সহিত একটা সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপ্রণালীকে চালনা করিতে হইবে। তবেই ভরাডুবি হইবে না।

এমন হইতে পারে, আমরা যা চাই, তা আমাদের সাধ্যের অতিরিক্ত। কারণ যাই হোক্ না। সে ক্ষেত্রেও আদর্শকে ছোট করিবার প্রয়োজন নাই। আদর্শ যদি সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় তবে তার যতখানি সম্ভব করিয়া তোলা যায় ততখানিই করিতে হইবে।

একটা সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপ্রণালীর কথা বলিতেছি বলিয়া এইরূপ মনে যেন না করা হয়, একমাত্র কর্ম্মপ্রণালীকেই মরণ-কামড়ে কাম্ড়াইয়া থাকিতে হইবে। তাতে কখন মঙ্গল হইতে পারে না। মানুষ একটা মোসাবিদা খাড়া করে যে, সে এই ভাবে কাজ করিবে। কিন্তু সে কাজ করিতে গিয়া দেখে নূতন নূতন অভিজ্ঞতার সহিত মিলাইয়া তার কাজের ধারা ক্রমাগতই বদ্লাইতে হইতেছে। ইহাতে লজ্জিত বা দুঃখিত হইবার কিছুই নাই। ইহাই জগতের নিয়ম। কেহই বলিতে পারে না, "আমি একটা মাত্র কর্ম্মপ্রণালীর অনুসরণ করিব। ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—এর চেয়ে ভাল কিছু হইতে পারে না।" কিন্তু সকলেরই এই কথা বলা কর্ত্তব্য, "আমি সর্ব্বদাই কোন একটা কর্ম্মপ্রণালীর অনুসরণ করিব। চিন্তাহীন ভাবে যখন যা খুসী করিয়া বসিব না। যা করিব তার একটা যুক্তিতর্ক থাকিবে।"

শৃঙ্খলা মানিয়া চলিলে প্রণালী সম্বন্ধে ভুল হইবার সম্ভাবনা থাকে না। কারণ কাজের পারম্পার্য্য রক্ষা করিলে প্রণালী আপনিই গড়িয়া উঠে।

নীতি বনাম রীতি

বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন রীতি থাকা স্বাভাবিক। বাস্তু-নির্ম্মাণ-রীতি ও কূপখনন-রীতি এক জিনিষ নহে। প্রত্যেক বিষয়ের নিজ নিজ স্বভাবের উপর তার রীতি নির্ভর করে। পরন্তু নব নব অভিজ্ঞতার বলে এই রীতিগুলির

পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন ঘটা এমন কিছু অসম্ভব নহে, বরং অনেক স্থলে বাঞ্ছনীয়।

কোন প্রচলিত বা ভবিষ্যৎ রীতির দোষ-গুণ বিচার করিবার সময় প্রথমে দেখিতে হইবে ইহা অনিষ্টকর কিনা। যদি অনিষ্টকর হয় তবে তৎক্ষণাৎ রায় দিলেই চলিবে না যে, "ইহাকে উঠাইয়া দাও"। সঙ্গে সঙ্গে জানিতে হইবে সেই অনিষ্ট বা ক্ষতির পরিমাণ কি। সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিলে এই ক্ষতির পরিমাণ প্রায়ই টাকা আনা পাই পর্য্যন্ত কষিয়া দেওয়া যায়।

ক্ষতিকে দূর করিবার চেষ্টা করা নিশ্চয় উচিত। কিন্তু এমন হইতে পারে, ক্ষতির কারণটাকে দূর করা যায় না অথবা বর্ত্তমান অবস্থায় দূর করা যায় না। অর্থাৎ উহার পরিবর্ত্তে যাহাই করিতে যাই তাতে সমান অথবা বেশী ক্ষতি ঘটে। এরূপ ক্ষেত্রে হয় ইহাকে সহ্য করিতে হয়, নয় সর্ব্বপ্রকারে ইহার অনিষ্টকারী ক্ষমতা কমাইবার চেষ্টা করিতে হয়।

আঁস্তাকুড় উঠাইয়া দাও

কলিকাতার, বিশেষ করিয়া উত্তর কলিকাতার, আঁস্তাকুড়গুলির সঙ্গে সকলেরই অল্পবিস্তর পরিচয় আছে। এই আঁস্তাকুড়কে একটা উদাহরণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কলিকাতার আঁস্তাকুড়গুলি যেন ফুটপাথের সম্পদ্ ও আপদ্ এই দুই সীমারেখার মধ্যে ঝুলিতেছে। এক হিসাবে ইহারা সম্পদ্, অন্য হিসাবে আপদ্।

যত রাজ্যের পচা ভাঙ্গা গলা জিনিস, ধূলা, ময়লা, আবর্জ্জনা, খড়কুটা, গোবর, ভাত-ডাল, ছেঁড়া নেকড়া, ছেঁড়া কাগজ, ফলের ও তরকারীর খোসা, মরা ইন্দুর ও বিড়ালের বা কুকুরের বাচ্চা ইত্যাদি ইত্যাদিতে হইল আঁস্তাকুড়ের গঠন। এগুলিকে একটা টীনের ঘেরটোপের মধ্যে রাখা হয়। সারাদিন কর্পোরেশনের ময়লা-টানা গাড়ী আসিয়া উঠাইয়া লইয়া যায়। তারপর আবার ঘেরটোপ ভরিয়া উঠিতেও বেশী বিলম্ব হয় না।

এই আঁস্তাকুড়গুলিকে সম্পদ্ এইজন্য বিবেচনা করিতেছি যে, ইহার জঠরে ধৃত দ্রব্যগুলি যদি ফুটপাথের উপর বা সড়কের মধ্যে যত্রতত্র ছড়ান থাকিত, তবে মানুষের চলা-ফেরা বেশী অসুবিধাজনক হইত, স্বাস্থ্যেরও বেশী অনিষ্ট হইত। প্রত্যেকের কিছু সময়, কিছু স্বাস্থ্য, কিছু সুগমতা ইত্যাদি রক্ষা পাইতেছে। তিল তিল করিয়া বহু লোকের পক্ষে এগুলি যোগ করিলে লাভের একটা বড় অঙ্ক মিলিতে পারে।

এগুলিকে আপদ্ বলিতেছি এইজন্য যে, ইহারা পথচারীদের কিছু স্বাস্থ্য, কিছু আনন্দ ও অল্প-কিছু সময় হরণ করিয়া লয়। আঁস্তাকুড়গুলির পাশ দিয়া যাইতে কে না নিরানন্দ ও বিরক্তি অনুভব করে? অনেকের "গা ঘিন্ ঘিন্" করে। যত রকম রোগের বীজাণু, সময় সময় উৎকট দুর্গন্ধ এবং দৃশ্য পাওয়া যাইবে এগুলি ঘাঁটিলে।

কলিকাতার আঁস্তাকুড় লইয়া বেশী আলোচনা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু ভোট লইলে শিক্ষিত কলিকাতার অধিকাংশ লোক বলিয়া উঠিবে, "আঁস্তাকুড় উঠাইয়া দাও। ওগুলি আমাদের স্বাস্থ্য খারাপ করিতেছে, কলিকাতার বাতাসকে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে।"

ভাল, আঁস্তাকুড়গুলি যেন উঠাইয়া দেওয়া গেল। কিন্তু তারপর রাশি রাশি ময়লা-জঞ্জালের কি ব্যবস্থা হইবে? তাহা পরিষ্কার করিবার জন্য লোক আছে বটে; কিন্তু জমিয়া উঠিবামাত্র পরিষ্কার করিয়া লইবার মত লোক নাই। তাতে বহু লোকের দরকার ও বহু খরচ পড়ে। বর্ত্তমানে তা সম্ভব নয়। সুতরাং আঁস্তাকুড়গুলিকে সহ্য করিয়া যাওয়া ভিন্ন গতি কি? বলিতে হইবে, আঁস্তাকুড়গুলি মন্দের ভাল। অল্প পরিমাণ লোকের উপকার এরা করিতেছে।

আঁস্তাকুড়গুলির তথা কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করিবার নাই, একথা বলিতেছি না। সেই অভিযোগগুলিকেই স্পষ্ট করিয়া বলা যাইতেছে :—

(১) আঁস্তাকুড়গুলি নিয়মমত পরিষ্কৃত হয় না। অর্থাৎ যে সব লোকের উপর জঞ্জাল সাফ করিবার ও যে সব লোকের উপর সে কাজ তদারক করিবার ভার রহিয়াছে, এরা উভয়েই শিথিলপ্রকৃতির। সেজন্য যে সময়ের যে কাজ তা হয় না। কখনো কখনো জঞ্জাল স্তূপীকৃত হইয়া আঁস্তাকুড়ের বাইরে পড়িয়া থাকে। কারণ, আঁস্তাকুড়গুলি ভরিয়া যায়।

(২) যে মেথর সড়ক ঝাঁট দিয়া জঞ্জালগুলি আঁস্তা-

কুড়ের মধ্যে ফেলে, সে মনোযোগ বা নিষ্ঠার সহিত কাজ করে না। আঁস্তাকুড়গুলিতে ময়লা ফেলিবার সময় কতক হয়ত ফুটপাথের উপর পড়িয়া গেল। তাতে সে লজ্জিত হয় না। কারণ,

(ক) তার কর্ত্তব্যবোধ প্রবল নহে।

(খ) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে তার হয়ত কোন জ্ঞান নাই।

(গ) তাকে তার কর্ত্তব্য ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে কখনো কোনো কথা বুঝাইয়া বলা হয় নাই।

(ঘ) সে যে দর্ম্মাহা পায়, তা তার পরিবার-পোষণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। সেজন্য সে তার কাজে সবটুকু মনোযোগ দিতে পারে না।

(ঙ) সর্ব্বোপরি কলিকাতার প্রায় সমস্ত সাধারণ গৃহস্থ এ বিষয়ে উদাসীন। অর্থাৎ তারা ঠিকমত তাদের বাড়ীর সব জঞ্জাল নিকটস্থ আঁস্তাকুড়গুলিতে ফেলিবার সুবন্দোবস্ত করা দরকার মনে করে না। ফলে, মেথর প্রভৃতি তাদের নিকট হইতে কার্য্যের অবহেলায় উৎসাহিত হয়।

(৩) আঁস্তাকুড়গুলি সম্পূর্ণ পরিষ্কার করা হয় না। প্রায়ই অর্দ্ধেক ময়লা জঞ্জাল পড়িয়া থাকে। ময়লা-টানা গাড়ীগুলিও ঠিক সময়মত হাজিরা দেয় না ও কাজে ফাঁকি দেয়।

(৪) পথচারী ব্যক্তি সাধারণতঃ নাকে কাপড় না দিয়া কোন আঁস্তাকুড়ের পাশ দিয়া যাইতে পারে না। এত পচা দুর্গন্ধ! রোগের ভয় ত আছেই।

(৫) গৃহস্থের গরু অথবা কুকুর আসিয়া এই আঁস্তাকুড়-গুলিতে মুখ ডুবাইয়া তাদের খাদ্য অন্বেষণ করিয়া থাকে। তাতে গরু ও কুকুরের বেয়ারাম-পীড়া বৃদ্ধি পাইবার কথা। গরুর দুধও বিগড়াইয়া যাইতে পারে। অধিকন্তু গরু ও কুকুর নানা প্রকার পীড়ার বীজ গৃহস্থের বাড়ীতে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে। এগুলি সমূহ ক্ষতি।

সম্ভবতঃ আঁস্তাকুড়গুলির বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগগুলির স্বরূপ এই। এ অভিযোগগুলি মিথ্যা নহে। কিন্তু এই অভিযোগগুলির কারণ দূর করা বা অন্ততঃ কমানো অসম্ভব নহে।

আঁস্তাকুড়গুলি যাতে প্রতিদিন সময়মত ভাল করিয়া পরিষ্কার করা হয়, কর্পোরেশন তার যথোচিত ব্যবস্থা করিতে পারে। আজকাল কর্পোরেশন অনেকগুলি স্কুল চালাইতেছে। তাতে মেথর প্রভৃতির ছেলেরাও শিক্ষা পায়। তাদের ব্যবসা তারা যাতে ভাল করিয়া চালাইতে পারে সেজন্য সেখানে তাহাদিগকে তাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে, পরিষ্কার-পরি-চ্ছন্নতা সম্বন্ধে সহজভাবে অনেক কথা বলা যায়। অন্য ব্যবসার কথা পরে আলোচনা করা যাইবে। তাদের দর্ম্মাহা বাড়াইয়া দিয়া তাদের নিকট হইতে অধিকতর কাজ আদায় করিয়া লওয়া যায়।

সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখিতে হয়, কি করিলে কলিকাতার সাধারণ গৃহস্থ ব্যক্তিরা আঁস্তাকুড়গুলির সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বন করে এবং তাদের ময়লা আবর্জ্জনা ফুটপাথে বা সড়কে না পড়িয়া থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখে।

পথচারী ব্যক্তিদের যাতে পচা দুর্গন্ধ ভোগ না করিতে হয় এবং গৃহস্থের গরু-কুকুর যাতে আসিয়া আঁস্তাকুড়গুলিতে মুখ দিতে না পারে সেজন্য দরকার প্রত্যেক আঁস্তাকুড় ঢাকিয়া রাখিবার এক একটি আচ্ছাদন।

এই গেল সরাসরি বিচার। অর্থাৎ আমি স্বীকার করিয়া লইতেছি আঁস্তাকুড়গুলি ভাল জিনিষ নয়, সুন্দর নয়, স্বাস্থ্য-কর নয়, এমন কি কিছু অনিষ্টকরও বটে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহার প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা স্বীকার করিতেছি। আমি বলিতে চাই, "আঁস্তাকুড়গুলি থাকুক, উঠাইয়া কাজ নাই; কিন্তু এই এই উপায়ে ইহার অনিষ্টকারিতা ও লোকের বিরক্তিভাজনতা কমাইয়া দেওয়া যাউক। তাতে লোকজনের স্বাস্থ্য, সময় ও খরচ আরো বেশী বাঁচিবে।

বলা বাহুল্য আঁস্তাকুড়গুলিকে আরো বহু প্রকারে উন্নত করা যায়। টীনের ঘেরটোপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কিনা, ঘেরটোপ গোল হইবে না চৌকোণ হইবে, কত উচু হইবে, ফুটপাথের উপর কোন্‌দিকে থাকিবে ও থাকিবে না, পরস্পরের দূরত্ব কতখানি হইলে কার্য্যকারিতা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হয়, কি করিয়া দুর্গন্ধ ইত্যাদি নিবারণ করা যায়, আঁস্তাকুড়গুলিকে কতকগুলি সুন্দর দৃশ্যে পরিণত করা যায় কিনা ইত্যাদি বহু প্রশ্নের উত্তরের উপর এই উন্নতি নির্ভর করিতেছে।

আঁস্তাকুড়গুলিকে বর্ত্তমানে জঞ্জাল-সমষ্টি ভিন্ন কিছু মনে করা হয় না। এই জঞ্জাল দ্বারা কোনো কাজ সাধিত হয় বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু এই আবর্জনাও ফেলিয়া দিবার বস্তু নয়। ইহা হইতে অতি উৎকৃষ্ট সার তৈয়ারী হয়। কর্পোরেশন যদি সেই সার তৈয়ারী করিবার ভার লইয়া বিক্রয় করে তবে কর্পোরেশনের আয় বাড়িয়া যাইবে নিশ্চয়। অধিকন্তু সেই সার কর্পোরেশন নিজে অথবা দেশের লোক ফসলের উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করিলে জাতীয় সম্পদ্ বৃদ্ধি পায় আর প্রতিদিন সহস্র সহস্র টাকার অপচয় নিবারিত হয়।

ম্যাঙ্গানিজ

শ্রীজগজ্জ্যোতি পাল, কেমিষ্ট, রাখা মাইন্স্, বীরভূম

ম্যাঙ্গানিজের সঙ্গে আমাদের সাধারণতঃ পরিচয় ঘটে না। ডাক্তারেরা যখন 'ঘা' ধুইবার জন্য পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ব্যবহার করেন তখন আমরা ম্যাঙ্গানিজকে এড়াইতে পারি না। রসায়নশাস্ত্র-পাঠার্থীদের নিকট অধ্যাপকেরা প্রথমেই ম্যাঙ্গানিজ-ডাইঅক্সাইড আনিয়া হাজির করেন। অধ্যাপকেরা ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড ও পটাশিয়াম ক্লোরেটকে উত্তপ্ত করিয়া অক্সিজেন বাহির করেন। আমাদের সংসারের লৌহ ও ইস্পাতে কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে ম্যাঙ্গানিজ বিরাজ করে।

ম্যাঙ্গানিজকে আমরা ধাতব অবস্থাতে কদাচিৎ পাই। পৃথিবীতে যত ম্যাঙ্গানিজ প্রস্তরের কারবার হয়, তার শতকরা ৯০ ভাগ লৌহ ও ইস্পাত তৈয়ারী করিতে ব্যবহৃত হয়। ম্যাঙ্গানিজ সংযুক্ত ইস্পাত আমাদের আধুনিক শিল্পজগতে অপরিহার্য্য জিনিষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার রবার্ট হ্যাড্ফিল্ডের আবিষ্কৃত ম্যাঙ্গানিজ-ইস্পাত প্রস্তর গুঁড়া করিবার কলে অদ্বিতীয় হইয়াছে। ম্যাঙ্গানিজ-ইস্পাতে শতকরা ৭ হইতে ১০ ভাগ ম্যাঙ্গানিজ থাকে। আর লৌহম্যাঙ্গানিজে (ফেরোম্যাঙ্গানিজ) শতকরা ৩০ হইতে ৮৫ ভাগ পর্য্যন্ত ম্যাঙ্গানিজ থাকে। সাধারণ ইস্পাতে ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ শতকরা ০·৩ হইতে ১·০ ভাগ।

পৃথিবীতে বাৎসরিক গড়ে ১২ লক্ষ টন ম্যাঙ্গানিজ প্রস্তরের কারবার হইয়া থাকে। এর অর্দ্ধেক অর্থাৎ প্রায় ৬ লক্ষ টন ম্যাঙ্গানিজ প্রস্তরের আনুমানিক ৩০ হাজার টন আমাদের দেশে ব্যবহৃত হয় আর বাকী ৫ লক্ষ ৭০ হাজার টন বিদেশে রপ্তানি হয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ ম্যাঙ্গানিজ প্রস্তর মধ্যপ্রদেশ হইতে উত্থিত হয়।

যে ম্যাঙ্গানিজ প্রস্তর (পাইরোলুসাইট্) আমরা সাধারণতঃ পাই, তার রং একেবারে লণ্ঠনের কালির মত। পাইরোলুসাইটের আপেক্ষিক গুরুত্ব ৪.৮–৫। ইহার দার্ঢ্যের কোনো স্থিরতা নাই। কিন্তু ম্যাঙ্গানিজকে যখন আমরা বালুযুক্ত এক অবস্থায় পাই তখন ইহার রং মনোহর রক্তবর্ণ। রোডোনাইটের ব্যবহার অঙ্গভূষণের জন্য এবং রোডোনাইটের অবস্থিতি ইউরাল পর্ব্বতে।

ম্যাঙ্গানিজযুক্ত জিনিষকে চিনিবার উপায়—(১) ম্যাঙ্গানিজে নাইট্রিক অ্যাসিড্ দিয়া তাহাতে লেড্ পেরোক্সাইড্ কিংবা পটাশিয়াম পারসালফেট্ সংযোগ করিয়া উত্তাপ দিলেই পারম্যাঙ্গানেটের ভায়লেট রং দেখা যাইবে। (২) ম্যাঙ্গানিজকে সোডা সহযোগে উত্তাপ দিয়া গলাইলে সবুজ রং দেখা যাইবে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি ম্যাঙ্গানিজ প্রস্তরের প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে ব্যবহৃত হয়। আর বাকী ১০ ভাগ ক্লোরিণ ও পারম্যাঙ্গানেট তৈয়ারীর জন্য ব্যবহৃত হয়। ব্লিচিং পাউডার তৈয়ারী করিতে ক্লোরিণের দরকার এবং ক্লোরিণ তৈয়ারী করিতে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড্ ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড্ লাগে।

ম্যাঙ্গানিজ প্রস্তরের দর টন প্রতি পায় ৫০৲ টাকা। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি বাৎসরিক ৬ লক্ষ টন ম্যাঙ্গানিজ প্রস্তর আমাদের দেশ হইতে উৎপন্ন হয়। ইহার মূল্য প্রায় তিন কোটি টাকা। এই তিন কোটি টাকার প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ বিদেশীদের হাতে যায়। আর বাকী দশ ভাগ আমাদের দেশের লোকেরা পায়। মধ্যপ্রদেশের সবচেয়ে বৃহত্তম ম্যাঙ্গানিজ কোম্পানী হচ্ছে সেন্‌ট্রাল প্রভিন্‌সেস ম্যাঙ্গানিজ ওর কোং লিমিটেড্‌। ইহার নাম আগে ছিল সেন্‌ট্রাল প্রভিন্সেস প্রসপেক্‌টিং সিণ্ডিকেট্‌ লিমিটেড। এই কোম্পানীর একজন প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা হচ্ছেন মধ্য-প্রদেশের ও তৎপরে ব্রহ্মদেশের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর স্যার রেজিনল্ড্‌ ক্র্যাডক্‌।

পৃথিবীর ম্যাঙ্গানিজ প্রস্তর সরবরাহে আমাদের দেশ শুধু যে পরিমাণ-হিসাবে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে তাহাই নহে, আমাদের দেশের প্রস্তর উৎকর্ষতা হিসাবেও খ্যাতি লাভ করিয়াছে। আমাদের দেশের প্রস্তরে ধাতব ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ অনেক বেশী। কিন্তু আমাদের দেশের প্রস্তর উৎকর্ষতা হিসাবে একেবারে নিখুঁত নহে। ইহাতে ফসফরাসের কিঞ্চিৎ আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। ফসফরাস্‌ লৌহম্যাঙ্গানিজ ও ইস্পাত শিল্পে বিপত্তিজনক। এ সত্ত্বেও আমরা ইয়োরোপের বাজারে বিজ্ঞাপন দেখিতে পাই, "আমরা উচ্চশ্রেণীর ভারতীয় প্রস্তর বিক্রয় করি।"

আমাদের দেশের কয়লাতেও ফসফরাসের কিছু আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। সে জন্য আমাদের দেশের কয়লা ও ম্যাঙ্গানিজ প্রস্তর দিয়া লৌহম্যাঙ্গানিজ করিবার সময় একটু মাল বাছাই করিতে হয়। ইংল্যাণ্ডে আমাদের দেশের চেয়ে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা আছে। ইংরেজরা আমাদের দেশের ম্যাঙ্গানিজ প্রস্তর ও তাঁদের দেশের কয়লা দিয়া খুব লৌহম্যাঙ্গানিজ তৈয়ারী করিতেছেন। সম্প্রতি তিনটী বিভিন্ন কোম্পানী একত্র হইয়া ফেরোম্যাঙ্গানিজ কম্‌বাইন্‌ নাম দিয়া এক বৃহৎ কোম্পানী খুলিয়াছেন। আর এই কোম্পানীর সমস্ত ম্যাঙ্গানিজ প্রস্তর সরবরাহ করিবার চুক্তি হইয়াছে আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিত সেন্‌ট্রাল প্রভিন্‌সেস ম্যাঙ্গানিজ ওর কোম্পানীর সঙ্গে।

আমরা ব্রোঞ্জের যে সব মূর্ত্তি দেখিতে পাই, সেই ব্রোঞ্জ তামা ও ম্যাঙ্গানিজ ধাতু সংমিশ্রণে নির্ম্মিত হয়।

দিনাজপুর জেলায় মজুরীর হার

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়, বি, এ, তত্ত্বনিধি

গত একবৎসর (১৯২৬) দিনাজপুর জেলার সকল থানার এলাকায় প্রধান প্রধান গ্রামগুলি ঘুরিয়া নিম্নলিখিত কয়প্রকার মজুরীর হারের চলন দেখিতে পাইলাম। এগুলি জনপ্রতি দৈনিক হার।

১।	৵৫ আনা	ও দুইবার খোরাক।	
২।	৷৵০	" " "	
৩।	৷৷০ "	আপখোরাকী।	
৪।	৷৴১০ "	আপখোরাকী	(স্ত্রীলোকদিগের)
	৷৷৴১০ "	"	(পুরুষদিগের)
৫।	৷৷৴ "	"	(স্ত্রীলোকদিগের)
	৸০ "	"	(পুরুষদিগের)

১, ২, ও ৩নং মজুরীর হারই কতকটা স্থায়ী এবং জেলার প্রায় ৩ ভাগ জায়গায় উহাদের চলন আছে। ৪ নং হারের চলন প্রায় ২০।২৫ টা গ্রামে দেখিয়াছি। চালের কলেই ৫নং মজুরীর হার চলে। ইহা ছাড়া ধান ও পাট কাটিবার সময় মজুরীর হার জেলার সর্ব্বত্রই বাড়িয়া ১৲।৷০ পর্য্যন্ত উঠে। তখন সাধারণতঃ উহা ৸০আনার নীচে নামে না।

এই জেলায় ধান ও পাট কাটিবার সময় বেহারী এবং পাবনা ও ময়মনসিংহের মজুররা আসে। স্থানীয় লোক বর্ষার জলে কষ্ট করিয়া জমিতে চাষ দিবে, শস্য রোপণ করিবে, কিন্তু ফসল কাটিবার সময় তারা বিদেশী মজুরের সাহায্য লইয়া থাকে।

কোনো কৃষক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "আমাদের দেশের লোকেরা একটু আরামপ্রিয়। পাট বেচার টাকা হাতে আসিলে আর পরিশ্রম করিতে ইচ্ছা হয় না। তাই বিদেশী মজুর নিযুক্ত করিয়া ধান কাটানো হয়। বিদেশী মজুর নিযুক্ত করিবার আর একটা কারণও আছে। যখন ধান পাকিতে আরম্ভ করে, তখন তাড়াতাড়ি অনেক বিঘা জমির ধান কাটিতে হয় বলিয়া বিদেশী মজুরের সাহায্য লইতে হয়।" জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনাদের সমাজে পল্লীর সকলে বা অনেকে মিলিয়া এক একজনের জমির শস্য কাটিয়া দিবার রীতি আছে কি?" তিনি বলিলেন" ইহার রেওয়াজ বড় একটা নাই। কচিৎ কোথাও দেখিতে পাইবেন।"

এই জেলার শ্রমিকরা দেখিতে খুব শক্ত ও যোয়ান হইলেও সাধারণতঃ শ্রমবিমুখ বলিয়া মনে হইল। এদেশের সমাজে মেয়েরাও বাহিরের কাজে যথেষ্ট খাটে। পর্দ্দার চলন নাই।

মাদুর কাঠির চাষ

শ্রীহরিচরণ মাইতি

মাদুর কাঠির চাষ একটী বিশেষ লাভজনক কৃষি। আমাদের এই মেদিনীপুর জেলার নানা স্থানে প্রচুর পরিমাণে ইহা জন্মাইয়া থাকে। চেষ্টা করিলে বাংলা দেশের সর্ব্বত্রই ইহার চাষ চলিতে পারে। বাড়ীর বালক-বালিকারা ও মেয়েরা সুন্দর ভাবে মাদুর বুনিয়া বেশ অর্থোপার্জ্জন করিতে পারে। এই জেলার নানা স্থানের গৃহস্থ বাড়ীর মেয়েরা অতি পরিপাটীরূপে মাদুর ও মছলনন্দী বুনিয়া বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন করিয়া থাকে।

মূলা, সরিষা প্রভৃতি রবিশস্য জন্মিবার পর চৈত্র বৈশাখ মাসে ক্ষেত্রকে এক কি দেড় ফুট গভীর করিয়া উত্তমরূপে কোপাইয়া ফেলিতে হয়। তদনন্তর কিছুদিন সেই কোপানো ক্ষেত্রে বাতাস লাগিলে তাহাতে পুষ্করিণীর পুরাতন পাঁক ছড়াইয়া দিতে হয়। এই পাঁকই উহার পক্ষে উৎকৃষ্ট সার।

ক্ষেত্রটী চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী জমি হইতে অপেক্ষাকৃত একটু গভীর হইলেই ভাল হয়। দো-আঁশযুক্ত বালুকাময় কিংবা এঁটেল মাটীই এই চাষের পক্ষে প্রশস্ত। ছায়াপূর্ণ স্থলে কিংবা পুষ্করিণীর পাড়ের নিম্নদিকেও উহা ভালরূপ জন্মিতে পারে। চারা রোপণ করিবার পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত কোপানো ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিক্ এমন ভাবে বাঁধিতে হয়, যেন বৃষ্টি হইলে জল উহার কোন দিকে গড়াইয়া যাইতে না পারে ও কয়েক দিবস ক্ষেত্রেই জমিয়া থাকিতে পারে।

প্রথমতঃ, বৃষ্টি আরম্ভ হইলেই জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে ঐ কোপানো ক্ষেত্রে হলুদ কিংবা কচুর সারির মত এক একটী পাটী প্রস্তুত করিয়া তাহাতে পুরাতন গাছের মূল হইতে বহির্গত ছোট ছোট চারা সকল আনিয়া রোপণ করিতে হয়। রোপণের পর যদি বৃষ্টি হয় কিংবা ক্ষেত্রে রস থাকে, তাহা হইলে আর জল দিবার আবশ্যক নাই। ২।১ মাসের মধ্যে ঐ রোপিত চারাগুলি কথঞ্চিৎ বড় হইলে, যদি উহার মধ্যে ঘাস জন্মিয়া থাকে তবে সেগুলিকে পরিষ্কার করিয়া দিয়া ঐ পাটীর মৃত্তিকার দ্বারা গাছের গোড়াগুলি পূরণ করিয়া দিতে হয়। এর পর আর বিশেষ-কিছু যত্ন করিতে হয় না।

আশ্বিন কার্ত্তিক মাসের মধ্যে ঐ গাছগুলি ৪।৫ হাত লম্বা হইয়া কাটিবার উপযুক্ত হইলে তখন ঐগুলিকে কাটিয়া ফেলিতে হয়। তারপর পুনরায় ঐ ক্ষেত্রের আগাছা পরিষ্কার করিয়া অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে একবার পাঁক মিশ্রিত জল সেচিয়া দিলে ঐ কর্ত্তিত পুরাতন গাছের চতুর্দ্দিক্ হইতে বহু পরিমাণে চারা জন্মিয়া থাকে। ঐ চারাগুলি বড় হইলে মাঘ মাসের মধ্যে ক্ষেত্রে একবার তরল পাঁক সেচিয়া দিতে হয়। ঐ পাঁকই বিশেষ সারের কার্য্য করে। তখন

চারাগুলি খুব তেজাল ও মোটা হইয়া চৈত্র মাসের মধ্যে পুনরায় কাটিবার উপযুক্ত হয়। তখন ঐগুলিকে কাটিয়া ক্ষেত্র কোপাইতে হয় এবং মূলগুলিকে কোন ছায়াযুক্ত সরস স্থানে লাগাইয়া চারার জন্য রাখিয়া দিতে হয়। তারপর পুনরায় নূতন করিয়া ঐ ক্ষেত্রে পাঁক সার দিয়া চারা লাগাইতে হয়। একই ক্ষেত্রে একাদিক্রমে প্রতি বৎসর উহার চাষ করিলে কাঠি উত্তমরূপ জন্মে না। এজন্য দুই তিন বৎসর অন্তর ক্ষেত্র পরিবর্ত্তন করিয়া উহার চারা রোপণ করিলে খুব ভাল হয়।

এই চাষে বিশেষ কোন পরিশ্রম করিতে হয় না। বৎসরের মধ্যে গড়ে দুই মাসের বেশী পরিশ্রম করিতে হয় কিনা সন্দেহ। প্রতি বিঘা জমিতে প্রত্যেক বারে খরচ বাদে খুব কম পক্ষেও একশত টাকার কাঠি জন্মিয়া থাকে। এঁটেল মাটীর কাঠি খুব শক্ত, মোটা ও লম্বা হয় এবং ইহাতে প্রায়ই বৎসরে মাত্র একবার উৎকৃষ্ট কাঠি হইয়া থাকে। এই কাঠি ৫৲।৬৲ টাকা মণ দরে বিক্রয় হয়। এইরূপ এক বিঘা জমিতে অন্ততঃ চল্লিশ মণ কাঠি জন্মে। বেলে মাটীর কাঠি বৎসরে দুই বার জন্মে। ইহার ফসল কম শক্ত হয় বলিয়া তার দর ও একটু কম পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা অপেক্ষাকৃত প্রচুর জন্মে বলিয়া উভয় প্রকারের জমিতেই প্রায় সমান লাভ দাঁড়ায়। পূর্ব্বে উৎকৃষ্ট মাদুর কাঠির দর ছিল ১০৲ টাকা। এখন এতদঞ্চলে বহু লোকে ইহার চাষ করে বলিয়া প্রতিমণ ৫৲।৬৲ টাকার বেশী দর উঠে না। ("সম্মিলনী")

১০৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে শ্রীরঘুনাথ শীল, বি, এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
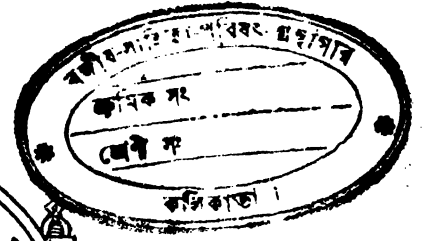
১ম বর্ষ—১১শ সংখ্যা ফাল্গুন—১৩৩৩

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি॥

অথর্ব্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জন্ম আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

বঙ্গের গৃহশিল্প

প্রেসিডেন্সি বিভাগে যে সকল গৃহ-শিল্প আছে সমবায়ের ভিতর দিয়া তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া অধিকতর কার্য্যকর করা যায় কি না অনুসন্ধান করিবার জন্য রাণাঘাট সম্মিলনীতে একটী কমিটি গঠিত হয়। কমিটি সত্বরই বোধ হয় তাঁহাদের রিপোর্ট প্রদান করিবেন। "ভাণ্ডার" পত্রিকায় প্রেসিডেন্সি বিভাগের কুটীর-শিল্পের একটী তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইতে তথ্য উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

কার্পাসজাত বস্ত্র-শিল্প

এই বিভাগের সরু ও মোটা সূতা হইতে কাপড় বুনিবার জন্য তাঁতীরা দুই প্রকারের তাঁত ব্যবহার করে।

(ক) প্রাচীন তাঁত। ইহাতে হস্তদ্বারা মাকু চালানো হয়।

(খ) ফ্লাই শাট্‌ল্ বা শ্রীরামপুরী তাঁত। ইহাতে স্প্রিং ও দড়ির সাহায্যে মাকু পরিচালিত হয়।

"স্বদেশী আন্দোলনের" পূর্ব্বে কেবল হাতের তাঁতই ব্যবহৃত হইত। উক্ত আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে, শ্রীরামপুরে দিনেমারগণ যে ঠক্‌ঠকি তাঁত প্রচলিত করিয়াছিলেন, তাঁতীরা তাহাই ব্যবহার করিতে শিখে। ঐ তাঁতের সাহায্যে একই সময়ে হাতের তুলনায় তিনগুণ বেশী কাপড় প্রস্তুত হয়। তদবধি ঐ তাঁতের প্রচলন খুব বাড়িয়া গিয়াছে এবং "অসহযোগ আন্দোলনের" সময় উৎসাহ পাইয়া এখন প্রায় প্রত্যেক তাঁতীই ঐ ঠক্‌ঠকি তাঁত অবলম্বন করিয়াছে।

বিভাগীয় বয়ন-কেন্দ্র

কলিকাতা—শিমলা, গোয়াবাগান।
হাওড়া—আন্দুল, উলুবেড়িয়া।
২৪ পরগণা—পুরা, বাদুরিয়া।

যশোহর—কোটচাঁদপুর, যশোহর, মধ্যকুল, কেশবপুর ও রাজারহাট।

খুলনা—ফুলতলা, বর্দ্দাল, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট।

হাওড়া জেলার মধ্যে যে বয়ন-কেন্দ্রগুলি আছে, ঐগুলি শ্রীরামপুরের এলাকার বিস্তৃত অংশ বলিয়াই ধরা যাইতে পারে। এগুলি প্রধানতঃ ডোমজুর, জগদ্বল্লভপুর, আমতা ও বাগনান থানার অন্তর্গত। এই প্রসঙ্গে ডোমজুর থানার অধীন বেগরী, বাণিয়াপাড়া ও খাটোড়া, আমতা থানার অধীন খালনা, এবং বাগনান থানার অন্তর্গত খাজুরতী, কল্যাণপুর ও কড়েয়া গ্রামের বয়ন-কেন্দ্রগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্বদেশী বস্ত্রের প্রতি স্থানীয় লোকের যথেষ্ট আদর থাকায়, এসকল গ্রামে মাঝারি ও মোটা সূতার কাপড় যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। সাতক্ষীরা মহকুমার মিহি কাপড়ের ব্যবসা এখন ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। খুলনা জেলাতে বঙ্কা ও নারায়ণপুরই প্রধান বয়ন-কেন্দ্র। যশোহর জেলাতে সিদ্ধিপাশা, লক্ষ্মীপাশা, মধ্যকুল, ধানদিয়া, শালবাড়িয়া, বিদ্যানন্দকাটী, রাজারহাট, নীলগঞ্জ ও কেশবপুরে বয়ন-কেন্দ্র আছে। এর মধ্যে সিদ্ধিপাশার প্রায় ১৩০ ঘর তাঁতী কেবল মিহি চাদর, মশারীর থান, রঙ্গীন ছিট (চলতি নাম "রেলে ডুরে"), তৈয়ারী করে। বারাসত, বাগনান ও আরও ২।১টী প্রধান কেন্দ্রে মশারীর থান প্রস্তুত হয়। উপরোক্ত জিলাগুলির আরও কয়েকটী গ্রামে ভাল সূতার কাপড় প্রস্তুত হয় এবং তাহা ঐ ঐ স্থানে এবং হাওড়ার হাটে বিক্রী হয়।

মোটা কাপড় বুনিবার জন্য দেশীয় কলের মাঝারি ও মোটা সূতা ব্যবহৃত হয়। আর মিহি কাপড়ের জন্য ৪০ হইতে ১৫০নং বিলাতী সূতা ব্যবহৃত হয়।

তাঁতীর সংখ্যা

হাওড়া	...	২৫৯২
কলিকাতা	...	৫১৬
যশোহর	...	৭৩৬১
খুলনা	...	৪৯৬৮
২৪ পরগণা	...	৬৮৫১

কলিকাতায় আমদানি বিদেশী কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বর্ত্তমানে বয়ন-শিল্পের অবস্থা বিশেষ সুবিধাজনক নহে।

রামকৃষ্ণপুর ও মধ্যকুলের হাট

দক্ষিণ বঙ্গে যত তাঁতের কাপড় উৎপন্ন হয় তাহার সমস্তই প্রতি মঙ্গলবারে হাওড়ার সন্নিকটবর্ত্তী রামকৃষ্ণপুরের হাটে আমদানি হয়। এই বিভাগের সকল জেলা হইতেই মহাজন ও তাঁতী এই হাটে উপস্থিত হয়। প্রতি হাটে লক্ষ টাকার উপরে নগদ কেনা-বেচা হয়। হাটে তাঁতীরা যে টাকা পায় তাহার অধিকাংশই পুনরায় সূতা কিনিতে ব্যয় করে।

এই প্রসঙ্গে যশোহর জেলার মধ্যকুলে যে হাট প্রতি শুক্রবারে বসে তাহার উল্লেখ আবশ্যক। যশোহর হইতে ১৮ মাইল দূরে কেশবপুর যাইবার পথে এই হাট অবস্থিত। মহাজনগণ নগদ টাকায় ও সূতার বিনিময়ে তাঁতীদের নিকট হইতে এই হাটে কাপড় ক্রয় করে। উহাদের দ্বারাই এই হাট পরিচালিত হয়। তাহারা এখান হইতে রামকৃষ্ণপুরের হাটে মাল চালান দেয়। যশোহরের তাঁতীদের উৎপন্ন বস্ত্র রপ্তানি করিবার ইহাই প্রধান কেন্দ্র। অবশিষ্ট মাল ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ ও অন্যান্য জেলার বেপারীরা নদীপথে চালান দেয়।

চিকণ ও বুটিদার কাজ

প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে কয়েকজন মুসলমান ব্যবসায়ীর উদ্যোগে নিউইয়র্ক শহরে দোকান খুলিয়া আমেরিকার বাজারে এদেশীয় বুটিদারী জিনিষ প্রচলিত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল।

প্রথম কিছুদিন আমেরিকায় কাটতি বেশ ছিল; ফলে হুগলী ও হাওড়া জেলায় এই ব্যবসায়ের বেশ উন্নতি হইয়াছিল। মুসলমান স্ত্রীলোকেরা আয় বাড়াইবার গৌণপথ রূপে এই কাজটি অবলম্বন করে এবং কারবারীরাও লাভবান হইতে থাকে। আমেরিকার পরিবর্ত্তনশীল ফ্যাসানের তালে অশিক্ষিত ব্যবসায়ীরা চলিতে না পারায়,

ভারতীয় বুটিদারী জিনিষের চাহিদা খুব কমিয়া যায়। বর্ত্তমানে উহার অবস্থা ভাল নয়।

বারাসত ও হালিসহরের চিকণের কাজ চুঁচুড়ার দত্তব্রাদার্স কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে। ইহাদের ৩৯নং পার্কষ্ট্রীটে একটী দোকান আছে। ইহারা পানামা প্রদর্শনীতে মাল পাঠাইয়াছিলেন এবং তদবধি ইংলণ্ড, আমেরিকা, বিশেষতঃ অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে মাসিক প্রায় ২০০০৲ টাকার কারবার চালাইতেছে। উক্ত ফার্মের তত্ত্বাবধানে এই কার্য্যে প্রায় দুইশত পরিবার নিযুক্ত আছে। কারিগরদের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান স্ত্রীলোক ও পুরুষ।

প্রত্যেক গ্রামে একজন করিয়া সর্দ্দার আছে। তাহার হাত দিয়াই ব্যবসায়িগণ কারিগরদের মধ্যে কাজ বন্টন করিয়া দেয়। বুটি তুলিবার নক্সার সঙ্গে কাপড়ও ব্যবসায়ীরাই যোগাইয়া থাকে।

বলা আবশ্যক কারিগরদের প্রধান জীবনোপায় চাষআবাদ। অবসর সময়ে উহারা এই কাজ করে। সুতরাং উৎপন্ন দ্রব্যের কোন স্থিরতা নাই, এবং তজ্জন্য রপ্তানি ব্যবসায়ের খুব অসুবিধা।

ফিতা ও নেয়াড়ের কাজ

যুদ্ধের সময় যখন বৈদেশিক আমদানি বন্ধ ছিল পক্ষান্তরে নেয়াড় ও ফিতার জোর চাহিদা ছিল। সেই সময় হাওড়া-শিয়াখালা লাইনের পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটী গ্রামে এই শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পর্দ্দানশিন মুসলমান স্ত্রীলোকেরা খুব সহজ প্রাচীন ধরণের তাঁতের সাহায্যে ফিতা প্রস্তুত করেন। ঐ তাঁত বেশ কার্য্যকর, উহার দামও তিন টাকার বেশী পড়ে না। যুদ্ধের সময় এই শিল্পে প্রায় তিন হাজার কারিগর খাটিত।

মৎস্য ধরিবার জাল

যশোহরে মাছধরা একটী প্রধান ব্যবসা। মাছ ধরিবার জাল জেলেরা নিজেই প্রস্তুত করে। শণ অথবা কার্পাস সূতা দ্বারা টেকোর সাহায্যে এই জাল বুনা হয়। তার পর গাবের কষ ও তৈলে জাল ভিজাইয়া রাখা হয়। ইহাতে জলে পচিবার ভয় থাকে না। যশোহর জেলার ত্রিমোহনী ও পাওহাটীতে হাটের দিবস এরূপ জাল কিনিতে পাওয়া যায়।

হোসিয়ারি বা মোজার ব্যবসা

গৃহে ব্যবহারের জন্য কয়েকটী মোজার কল প্রায় ১৮ বৎসর পূর্ব্বে মেসার্স জে, সি, দে অ্যাণ্ড সন্স এদেশে প্রথম আমদানি করেন। প্রথমে এগুলির তেমন আদর হয় নাই; কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের সময় কয়েকশত কল বিক্রয় হয়; এবং যুদ্ধের সময় এই ব্যবসার খুবই উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

সমগ্র বঙ্গদেশে প্রায় ৭।৮ শত মোজার কল ও একশত গেঞ্জীর কল বর্ত্তমানে চলিতেছে। অয়েল ইঞ্জিন্ বা ইলেক্ট্রিক মোটর যুক্ত কয়েকটী কারখানাও কলিকাতায় স্থাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রধান কয়েকটী এই :—

১। আর, সি, সোমের কারখানা, ২৪নং ঝামাপুকুর লেন।

২। ইকনমিক হোসিয়ারি মিলস্, ৫০নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট্।

৩। শিয়ালদহ হোসিয়ারি মিলস্, ১২৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্।

৪। শিমলা হোসিয়ারি, ৬নং রামতনু বসুর লেন।

কল খারাপ হইয়া গেলে মেরামত করার অসুবিধা এবং কলকব্জার অংশাদি সহজে না পাওয়া কারখানাবৃদ্ধির অন্তরায় হইয়াছে। বৈদেশিক ও দেশীয় সকল সূতাই হোসিয়ারি কাজে ব্যবহৃত হয়। কারখানা ও কুটীরে উৎপন্ন সমস্ত মালই কলিকাতার বাজারে স্থান পায়। জাপানের প্রতিযোগিতাই এই শিল্পোন্নতির প্রধান অন্তরায়। কিছু দিন হইল ইকনমিক্ হোসিয়ারি মিল এই শিল্প শিক্ষা দিবার জন্য একটী বিদ্যালয় খুলিয়াছে।

দরজীর কাজ

কলিকাতার সর্ব্বত্রই দরজীর দোকান আছে। কিন্তু মেটেবুরুজেই এই শিল্পের প্রধান আড্ডা। দরজীরা সকলেই মুসলমান। বড় বড় পোষাক-বিক্রেতা ফার্ম্‌গুলি বাহিরের দরজীর নিকট অর্ডার দিয়া থাকে। দরজীরা প্রতিদিনই

অর্ডার লইতে আসে। ফরমাইসি জামার মাপ ও কার্য্য হিসাবে মজুরি স্থির হয়। কিন্তু এক মাপের অধিকসংখ্যক জামা সাধারণতঃ তৈয়ারী করান হয়। সে ক্ষেত্রে মজুরি শতকরা হিসাবে দেওয়া হয়। আবার কখন কখন—যেমন পূজার ও শীতের সময়ে—দরজীরা এই কাজগুলি অন্য দরজীকে চুক্তি হিসাবে দিয়া থাকে। সাধারণতঃ সিঙ্গারের কলই ব্যবহৃত হয়; কিন্তু ভাল কাজে হাতের সেলাই করিতে হয়। প্রত্যেক বালিকা-বিদ্যালয়ে এবং কনভেন্টে (কুমারীদের আশ্রমে) সাধারণ ছুঁচের কাজ, দরজীর কাজ ও জামা তৈয়ারী বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয়।

বস্ত্র ধোলাই ও রঞ্জন কার্য্য

কলিকাতার ধোবীগণ সংখ্যায় বহু এবং বেশ জোরের সহিত কাজ চালাইতেছে। কিন্তু ইহাদিগের দ্বারা যে-সকল দামী কাপড় ধোলাই ও রং করা সম্ভবপর নহে তাহা ধোলাই ও পুনঃ রঞ্জিত করিবার জন্য প্রায় ২০০ শত কারখানা কলিকাতা ও সহরতলীতে স্থাপিত হইয়াছে। ভাল কারিগরের অভাবে কারখানাগুলি রং করার কার্য্য সুন্দররূপে করিতে পারে না; তথাপি এ ব্যবসায়ে লাভ বেশ আছে। প্রসিদ্ধ কারখানাগুলির নাম :—

১। বম্বে ডাইং অ্যাণ্ড ক্লিনিং কোং।
২। কলিকাতা ডাইং অ্যাণ্ড ক্লিনিং কোং।
৩। ফ্রেণ্ড ডাইং অ্যাণ্ড ক্লিনিং কোং।
৪। বেঙ্গল লণ্ড্রি।

ধোলাই—এই কার্য্য সাধারণতঃ পশ্চিমদেশীয় ধোবীদের দ্বারা সম্পন্ন হয়। যাহা হউক, কলিকাতায় কয়েকটী ধোলাইয়ের কল স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু যে কারণেই হউক তাহাদের অবস্থা ভাল নহে।

রঞ্জন কার্য্য—কাপড়ে ও সূতায় রং করিবার জন্য কোন যন্ত্রচালিত কারখানা কলিকাতায় নাই। কেশোরাম কটন্‌মিল্ এবং হাওড়া ও বেলগাছিয়ার নিকটে মাড়োয়ারীরা যে ২।১টী ছোট কারখানা খুলিয়াছেন, তাহাতে রঞ্জনকার্য্য যন্ত্র-সাহায্যে হইয়া থাকে। ধনিগণ বেশ জানেন যে, একটী কি দুইটী যন্ত্রচালিত সূতা ও কাপড় রং করিবার কারখানা এদেশে সুন্দর ভাবে চলিতে পারে। তথাপি তাঁহারা এবিষয়ে টাকা ফেলিতে নারাজ। রঞ্জিত সূতার ও বস্ত্রের চাহিদা বেশ আছে; এবং এই সকল দ্রব্য ইয়োরোপ, জাপান, বোম্বে ও মাদ্রাজ হইতে আমদানি হইয়া থাকে।

কাপড় ছাপানো

আজকাল হাতে ছাপানো কাপড় (রেশমী বা সূতার), শাড়ী, ধুতি, রুমাল প্রভৃতির বেশ কাটতি দেখা যায়। ফরাক্কাবাদ, মোরাদাবাদ ও অন্যান্য স্থানে কাঠের ছাঁচের সাহায্যে কাপড় ছাপাই শিল্প বহুদিন যাবৎ প্রতিষ্ঠিত আছে। ঐ অঞ্চলের কারিগরগণ কলিকাতায় আসিয়া উক্ত ছাপাই কাজ চালাইতেছে। এই কাজে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই নিযুক্ত আছে। ছাপাইবার কালির উপাদান ও মিশ্রণ-প্রণালী কারিগরগণ কখনও প্রকাশ করে না।

দড়ি প্রভৃতির কাজ

পাট, শণ ও নারিকেলের ছোবড়া হইতে দড়ি প্রস্তুত করিবার নয়টী কারখানা শালিমার, শালকিয়া, ঘুশারি এবং উল্টাডিঙ্গি প্রভৃতি স্থানে স্থাপিত আছে। দড়ি পাকাইবার জন্য ৩০০ গজ লম্বা একটী চালা থাকে। পাক দেওয়া, গুলি পাকানো ও ছোবড়া ছাড়ানোর হস্ত-পরিচালিত কলগুলি স্থানীয় কারখানাতেই প্রস্তুত হয়। শালিমারের হনুমান ফ্যাক্টরী জব্বলপুরী শণ হইতে দড়ি প্রস্তুত করে। ইহাদের কারবারই সবচেয়ে বড়। ক্রেতার ইচ্ছানুসারে অন্যবিধ উপাদানেও দড়ি প্রস্তুত হইয়া থাকে। সময় সময় স্ত্রী-মজুরও একাজে খাটে। ভাল কারখানায় হস্ত-পরিচালিত কলের সাহায্যে প্রস্তুত দড়িগুলি নৌবিভাগে ব্যবহার করিবার উপযুক্ত।

ওয়াটার প্রুফ্ প্রভৃতি

কলিকাতায় কারবালা ট্যাঙ্ক লেনের ডাক্তার নাগ মহাশয় মোমজামা (ট্রেসিং ক্লথ) কাপড়ের কারখানা খুলিয়াছেন। সার্ভে ডিপার্টমেন্ট তাঁহার ঐ কাপড় ব্যবহার করিতেছে; বাজারেও উহার কাটতি বেশ। কালি-

ফর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত মিঃ এস্, এম্, বসু "ডাক্ ব্যাক্" নাম দিয়া এক প্রকার ওয়াটারপ্রুফ কাপড় বাহির করিয়াছেন এবং গবর্মেণ্ট হইতে অর্ডারও পাইতেছেন।

যুদ্ধের সময় কলের সাহায্যে ত্রিপল তৈয়ারীর চেষ্টা চলিয়াছিল। তৎপর ছোট-খাট ভাবে উহা প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হইলেও ফল তেমন হয় নাই।

চামড়া নির্ম্মাণ

ইহার প্রধান কেন্দ্র কলিকাতার দক্ষিণে তিলজলায়। তথায় ১৭০টী ট্যানারী আছে। টালিগঞ্জের নিকটবর্ত্তী মোল্লাহাট, শাহপুর, দুর্গাপুর ও ট্যাংরাতে চামড়া ট্যান করার কাজ আছে। মোট ২৪০টী ট্যানারীতে প্রতিদিন গো-চর্ম্ম ১০০০, মহিষ-চর্ম্ম ২০০, মেষ-চর্ম্ম ৪৫০, বাছুরের চর্ম্ম ১০০ খানা ট্যান করা হয়। এই কার্য্যে প্রায় পনের শত লোক খাটে। ট্যানারীগুলি সাধারণতঃ খড় বা খোলার ঘরে অবস্থিত। প্রত্যেক ট্যানারীতেই গোটা বার করিয়া টব্ (চামড়া ভিজাইবার পাত্র) এবং লোম উৎপাটন এবং চামড়া নরম করিবার জন্য ২।১টি করিয়া কড়ি থাকে। অধিকাংশ কারিগরই মুসলমান।

কষানো গো-চর্ম্মের মধ্যে যেগুলি ভাল সেগুলিকে রং করিয়া জুতা, সুট্কেস্, পোর্টম্যেণ্ট প্রভৃতি তৈয়ারীর জন্য ব্যবহার করা হয়। বালকদের জুতার ভিতরকার লাইনিং করিতে মেষচর্ম্ম ব্যবহৃত হয়। জুতার তলার জন্য মহিষ-চর্ম্ম ব্যবহৃত হয়। উহার পাত্‌লা অংশ দ্বারা ঘোড়ার সরঞ্জাম প্রস্তুত হয়। চীনাদের কয়েকটী ক্রোম ট্যানারী আছে। তথায় গো-চর্ম্ম ও মেষ-চর্ম্ম হইতে অল্পবিস্তর ক্রোম লেদার তৈয়ারী হয়। তথায় কোন কলকব্জা ব্যবহৃত হয় না এবং চামড়াগুলি সাধারণতঃ বার্ণিস করা নহে। চীনা জুতার ব্যবসায়িগণ সস্তাদরে উহা কিনিয়া থাকে।

চামড়ার দ্রব্যাদি

কলিকাতার কয়েকটী বস্তিতে যথা রাজাবাজার, মেছুয়াবাজার, ঠনঠনিয়া, গোয়াবাগান প্রভৃতি স্থানে মুচিদের বাস আছে। উহারা সাধারণতঃ চটী ও অন্য জুতা প্রস্তুত করে। সুট্কেস্, হ্যাণ্ড্ব্যাগ, জিন প্রভৃতি ঘোড়ার সাজও ইহারা তৈয়ারী করে। বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের চীনাগণ ঐ রাস্তায় জুতা প্রস্তুত করে। ইহাদের আসবাবের মধ্যে অতি সামান্য যন্ত্রপাতি ও একটী সিঙ্গারের সেলাই কল। ভারতীয়দের নিকট ইহাদের নির্ম্মিত জুতার বেশ আদর দেখা যায়। ইহাদের সঙ্গে সস্তা জুতার প্রতিযোগিতায় কেহ আঁটিয়া উঠিতে পারে না।

চীনা মুচি প্রায় ১০০০ হাজার আছে। ট্যানারীগুলির নিকটেই—মোল্লাহাট, খিদিরপুর প্রভৃতি স্থানে সাধারণতঃ হ্যাণ্ডব্যাগ, সুটকেস প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। লালবাজার, চাঁদনি ও লোয়ার চিৎপুর রোডে জিন্ তৈয়ারীর কাজ চলে। খোল, পাখোয়াজ, বাঁয়া, তবলা প্রভৃতি চিৎপুর রোড, গোয়াবাগান, কাশীপুর, বরাহনগর ও সঁাথিতে বহুল পরিমাণে প্রস্তুত হয়। সরকার লেনে লৌহকারের ব্যবহারের উপযোগী চামড়ার হাপর তৈয়ারী হয়।

মফঃস্বলের মুচিদের তৈয়ারী জিনিষ সাধারণতই নিকৃষ্ট। কিন্তু বর্ত্তমানে উলুবেড়িয়া, আমতা ও বাগনান্ থানার মুচিরা যে সব জিনিষ হাতে প্রস্তুত করিতেছে, তাহা কলিকাতার জিনিষের অপেক্ষা খারাপ নহে, দামেও সস্তা।

কলিকাতায় ধাতব বস্তুর কারখানা

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে প্রায় দুইশত লোক আসিয়া উল্টাডিঙ্গি ও মাণিকতলাতে ২০টী লোহার সিন্দুকের কারখানা স্থাপিত করিয়াছে। সিন্দুকগুলির কাটতিও খুব আছে। ষ্টীলট্রাঙ্ক, ক্যাস বাক্স ও টীনের বাক্স তৈয়ারীর কার্য্যে প্রায় ৫০০ শত লোক নিযুক্ত আছে। বৈদেশিক ষ্টীলের পাত ও টিন দিয়া হাতের সাহায্যেই জিনিষগুলি প্রস্তুত হয়। ব্যবসাটী বেশ দাঁড়াইয়াছে। বিদেশী ট্রাঙ্কের আমদানিও কমিয়াছে।

পি, এন্, দত্ত কোংর অনুকরণে কর্ম্মকারেরাও বাল্‌তি তৈয়ারী করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু প্রথম ইস্পাত দ্বারা বাল্‌তিটী তৈয়ারী করিয়া পরে উহাতে দস্তা লাগানোর পরিবর্ত্তে ইহারা একেবারে গ্যালভ্যানাইজ্‌ড্ পাত হইতেই

বাল্‌তি তৈয়ারী করিতেছে। জিনিষ তত সুন্দর না হইলেও কাটতি মন্দ হয় না। স্নানের জলের টব্‌, জলের ট্যাঙ্ক, প্রভৃতি এই শেষোক্ত প্রণালীতেই প্রস্তুত হইতেছে। গোয়াবাগান ও সাকু‌র্লার রোড অঞ্চলের তেলের কলগুলির কেনেস্তারা যোগাইতে হালসিবাগানে প্রায় কুড়িখানা টীন কেনেস্তারার দোকান স্থাপিত হইয়াছে। কেনেস্তারা তৈয়ারী সম্পূর্ণ হাতের দ্বারা হয়। ইহাতে প্রায় ৪০০ শত মজুর খাটিতেছে। শালকিয়া ও শাহপুরে তেলের কল থাকার দরুণ তথাকার কেনেস্তারার দোকানের উন্নতি হইতেছে। ছুরি, কাঁচি ও অস্ত্রোপচারের ডাক্তারী যন্ত্রগুলি হাতে তৈয়ারী হয়। কিন্তু শান এবং পালিশের জন্য কখন কখন বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহৃত হয়। ঘোড়া ও বলদের পায়ের নাল প্রায় সকল কর্ম্মকারই তৈয়ারী করিয়া থাকে। নালের পেরেক তৈয়ারী করিতে সুবিধা হয় না সুতরাং সুইডেন্ হইতে আনীত কলে প্রস্তুত পেরেকই ব্যবহৃত হয়। মাণিকতলা ও নারিকেলডাঙ্গায় তারের জাল বুনিবার জন্য কয়েকটী ছোট কারখানা ও তাঁত আছে। এ কাজে ৫০ জন লোক নিযুক্ত আছে।

তালা, কব্জা, টুপি রাখিবার হ্যাট্‌পেগ প্রভৃতি পিতলের জিনিষ তৈয়ারী করিবার বহু ছোট কারখানা কলিকাতা ও শহরতলীতে আছে। প্রায় ১১০০ শত লোক এ কাজে খাটে। জিনিসগুলি খুব উৎকৃষ্ট না হইলেও, বাজারে বেশ বিকায়। যুদ্ধের সময় তালাওয়ালারা খুব লাভবান হইয়া থাকিলেও, বর্ত্তমানে বিদেশী ষ্টীলের পাত হইতে কলে প্রস্তুত তালার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কতদূর সুবিধা করিতে পারিবে বলা যায় না; কারণ ঐ কলের তালার দাম দেশীয় জিনিষের প্রায় অর্দ্ধেক মাত্র। ২৪ পরগণার নাটাগরের বিখ্যাত পিতলের তালার কারখানা বৈদেশিক প্রতিযোগিতায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কিন্তু হাওড়া জেলার ডোমজোর থানায় যে সস্তাদরের লোহার তালা তৈয়ারী হয় তাহার কাটতি পূর্ব্ববৎই আছে। মাকড়দা ও বারিপাসে প্রায় দেড় শত পরিবার এই কাজে নিযুক্ত আছে। কামারের সাধারণ যন্ত্রপাতির সাহায্যেই এগুলি প্রস্তুত হয় এবং কলিকাতাই ইহাদের বিক্রয়ের স্থান।

লোহার কাজ

ইংলণ্ড ও বেলজিয়ম হইতে আনীত ইস্পাত ও লৌহই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। আজকাল টাটা কোম্পানীর লৌহও ব্যবহৃত হইতেছে। একজন দক্ষ কর্ম্মকারের দিন মজুরি ১৲ টাকা হইতে ১।৹ টাকা। প্রতিগ্রামেই লৌহকার আছে। ইহারা দা, কাস্তে, লাঙ্গলের ফাল প্রভৃতি তৈয়ারী করিয়া থাকে। যশোহর ও খুলনা জিলার কালীগঞ্জের প্রস্তুত দা, কাঁচি, জাতি, খড়্গ প্রভৃতি বিখ্যাত।

খোদাই (এন্‌গ্রেভ্) ছাঁচের (ডাইসের) কাজ কলিকাতায় সামান্য রকম আছে। ৩।৪ শত লোক এ কাজে নিযুক্ত আছে। বড় বড় এন্‌গ্রেভিং ও ছাপার কারখানা হইতে ইহারা অর্ডার পাইয়া থাকে। ইহাদের কাজ প্রায়ই উত্তম; কোনো কোনো ক্ষেত্রে অতি উৎকৃষ্ট ও প্রশংসার যোগ্য।

কলিকাতায় ছাতার কারখানা

কলিকাতার নেবুতলা ও চোরবাগান অঞ্চলে প্রায় ১০টী ছাতার কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কলকব্জা ও কাপড় বিদেশ হইতে আমদানি করা হয়। চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা ও সিলেট্ জেলার "তুলকা" জাতীয় বাঁশ হইতে বাঁট প্রস্তুত হয়। বাঁটের মাথা বাঁকাইবার জন্য উহাতে বালি পূরিয়া হাতলের অনুরূপ বক্র একখণ্ড উত্তপ্ত লোহার গায়ে অল্প অল্প চাপ দিয়া ধরা হয়; ইহাতেই বালি পূর্ণ বাঁশটি বাঁকিয়া যায়, ফাটে না। বাঁকানোর পর প্রায় সপ্তাহ কাল উহাকে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখা হয়। তখন আর উহার আকৃতির পরিবর্ত্তন হইবার আশঙ্কা থাকে না। তারপর বালি ফেলিয়া দিয়া হাতলের ভিতরে একখণ্ড বেত ভরিয়া দেওয়া হয়। পরিশেষে শিরিষ কাগজদ্বারা ঘসিয়া ছাতার বাঁটে রং করা হয়।

মেরামতি কাজ

ঘড়ি মেরামতের কাজে কলিকাতায় প্রায় ৪০০ শত কারিগর খাটে। ইহাদের অধিকাংশই ইয়োরোপীয়

দোকানে শিক্ষানবিশী করিয়া কাজ শিখিয়াছে। বৈদ্যুতিক পাখা, মোটরগাড়ী, কলিকাতার সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। যদিও প্রতিযোগিতা খুব আছে, তথাপি এদের লাভ কম নহে। এখানকার কারিগরগুলি প্রায়ই বড় বড় কারখানায় কাজ শিখিয়া থাকে। এক জন মিস্ত্রির মাসিক আয় ৩৫৲ টাকা হইতে ৮০৲ টাকা পর্য্যন্ত। এই কারবারে প্রায় ২০০০ লোক খাটে। হস্ত-সাহায্যে, কদাচ বৈদ্যুতিক মোটরযোগে কাজকর্ম্ম চালানো হয়।

মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের নিকট কয়েকটী গিল্টির কারখানা আছে। সাধারণতঃ নিকেল প্লেট্ করার পরিবর্ত্তে রূপার গিল্টি প্রচলিত আছে; কারণ উহা সহজসাধ্য। এই কাজে ১৫০০ লোক খাটে।

টীনের কাজ

কলিকাতার সর্ব্বত্রই টীন মিস্ত্রি বহু বিদ্যমান। ইহারা পুরাণো বাসনপত্র ঝালাই করে এবং টীনের মগ, কেনেস্তারা, লণ্ঠন, ল্যাম্প প্রভৃতি তৈয়ারী করে। প্রত্যেকের গড়ে আয় মাসিক ৩০৲ হইতে ৫০৲ টাকা।

পিতলের কাজ

কলিকাতার শিমলা কাঁসারিপাড়াই পিতলের কাজের প্রধান কেন্দ্র। এখানে ১২টী বৃহৎ ও ২৮টী ছোট পিতলের কারাখানা আছে। তাহাতে ৮০০ শত লোক খাটে। সাধারণতঃ গৃহে ব্যবহার্য্য ডেক্‌চি, গাম্‌লা, হাঁড়ি, ঘড়া, থালা, বদ্‌না, প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। পিতল ও তামার পাত বিদেশ হইতেই আমদানি হয়। হাতেই সব কাজ হয়। রান্নার বাসনগুলির ভিতর দিক্‌টায় সাধারণতঃ টীনের কলাই করা হয়। এ কাজটী কলাইওয়ালারা করে। নূতন বাজার ও বড়বাজারই কলাইয়ের প্রধান কেন্দ্র।

যশোহরের মধ্যে কেশবপুর, ২৪ পরগণায় বসিরহাট ও বাদুড়িয়া এবং হাওড়া জেলায় কল্যাণপুরে স্থানীয় চাহিদার উপযোগী পিতলের জিনিষ অল্পবিস্তর তৈয়ারী হয়।

স্বর্ণকার ও মণিকারের কাজ

সোনারূপার গহনা তৈয়ারী করিবার কয়েকটী কারখানা কলিকাতায় আছে; কিন্তু স্বর্ণকারগণ তাহাদের নিজ দোকানেই সাধারণতঃ এই কাজ করিয়া থাকে।

সোনা সাধারণতঃ বড় বাজার হইতে ক্রীত হয়; আর জহরত পার্শী ও মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে পাওয়া যায়। প্রাচীন কালের ভারি ও মোটা ধরণের গহনার পরিবর্ত্তে আজকাল হালকা ও সাদাসিধা রকমের গহনারই চলতি হইয়াছে। ভবানীপুর ও কাঁসারীপাড়ার স্বর্ণকারগণ সোনারূপার বাসনপত্র, বাক্স, কাপ প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া থাকে। এরূপ প্রায় ত্রিশটী কারখানা আছে। ইহাদের তৈয়ারী জিনিষের কারুকার্য্য ও সৌন্দর্য্য বিখ্যাত। কলকব্জা সবই প্রাচীন ধরণের। কোন ২।১টী বড় কারখানায় তার প্রস্তুত (টানা) ও পালিশের কাজের জন্য যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। এক শ্রেণীর কারিগরগণ জহরত (পাথর) ঘষিবার কার্য্যে বিশেষ নিপুণ হইয়াছে। স্বর্ণকারগণই গহনায় পাথর বসাইয়া থাকে। ইহারা বংশ পরম্পরাক্রমে এ কাজে বেশ দক্ষ হইয়াছে।

হাতীর দাঁতের কাজ

কলিকাতার সর্ব্বত্রই হাতীর দাঁতের কাজ অল্প অল্প আছে। ইহারা বোতাম, বালা, চিরুণী ও নানাবিধ সুন্দর নক্সা হাতীর দাঁতের সাহায্যে প্রস্তুত করে। এদের কারুকার্য্য উঁচুদরের নহে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, মান্দ্রাজ, বর্ম্মা ও চীন-জাপানের সস্তা জিনিষের প্রতিযোগিতাই ইহার কারণ বলা যাইতে পারে।

ধাতব বস্তুর অর্থকথা

কয়লা, লোহা, ইস্পাত, মাঙ্গানিজ ইত্যাদি ধাতব বস্তুর আকরিক, যান্ত্রিক, রাসায়নিক ও আর্থিক তথ্য সাধারণতঃ বাঙ্গালীর পেটে পড়ে না। কিন্তু এই সব তথ্য কিছু কিছু করিয়া হজম করিতে থাকিলে আমাদের রক্ত পরিষ্কার হইয়া আসিবে। ধনবিজ্ঞানের তত্ত্বাংশ আর কার্য্যাংশ দুইয়ের জন্মই এই সমুদয় ধাতব তথ্য যার পর নাই আবশ্যক।

৮৫৯ সরকারী মঞ্জুর

ভারতবর্ষে ধাতব কারবার বাড়িতেছে মন্দ নয়। ১৯২৫ সনে ভারতগবর্মেণ্টের দপ্তর হইতে ৮৫৯টা "কন্‌সেশ্যন"-মঞ্জুর জারি করা হইয়াছে। ১৯২৪ সনে সরকারী মঞ্জুরের সংখ্যা ছিল ৭৬৯। ১৯২৫ সনে ৭৩৭ জন দরখাস্তকারী খনি-বহুল জনপদ "প্রস্‌পেক্‌ট্‌" (বা পরখ) করিবার "লাইসেন্স" (অধিকার বা অনুমতি) পাইয়াছে। ১১১ জন খনিতে খোদাই কাজ সুরু করিবার "লীজ" (স্বত্ব) লাভ করিয়াছে।

২৫৩,৮৫৭ নরনারী খনি-শিল্পে

আড়াই লাখের উপর ভারতীয় নরনারী নানা খনিতে বিভিন্ন শ্রেণীর মেহনৎ করিয়া অন্ন-সংস্থান করিয়া থাকে। ১৯২৪ সনে এই সংখ্যা ছিল ২৫৮,২১৭। ১৯২৫ সনে সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ২৫৩,৮৫৭। এই সংখ্যার ভিতর ১৬৯,৫৫৪ জন আন্তর্ভৌম কাজ করে। ৮৪,৩০৩ জন খোলা হাওয়ায় খনির উপরে এবং আশে পাশে নিযুক্ত। খনিতে মেয়ে এবং ছেলে মজুরদের সংখ্যাও কম নয়। ৮৪২৪৩ জন নারী এবং ৪,১৩৫ বালকবালিকা এই আড়াই লাখের অন্তর্গত।

প্রায় ১৩ কোটি টাকার কয়লা

১৯২৫ সনে ভারতে যত কয়লা উঠিয়াছিল তাহার দাম ১২,৬৪,০০,৯০৮ টাকা। ১৯২৪ সনে আরও বেশী ছিল (১৪,৯৬,৫৩,৪১৯)। ১৯২৫ সনে ১৯২৪ সন অপেক্ষা ২৭০,০০০ টন কম কয়লা উঠিয়াছিল।

ফেব্রুয়ারি মাসে ২০ লাখ টনের চেয়েও বেশী কয়লা উৎপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু বর্ষাকালে মাসিক গড় ছিল প্রায় ১৫ লাখ টনের কাছাকাছি। মোটের উপর ১৭,৪৯৫,৯১২ টন কয়লা খনি হইতে নানা স্থানে রপ্তানি হইয়াছিল। খনিতেই নানা কাজে খরচ হইয়াছিল ১,৯৪৯,৩৭৮ টন। যত কয়লা উঠে তাহার প্রায় দশ ভাগের এক ভাগ খাদেরই নানা কাজে খরচ হয়।

কয়লার খাদে যন্ত্রপাতি

১৯২৪ সনে ৯৯টা কয়লার খাদে বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহৃত হইত। ১৯২৫ সনে তাহাদের সংখ্যা হইয়াছে ১০৮। অশ্ব-শক্তি ৪৩,৫০২ হইতে ৫২,৩৩৬ এ আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কয়লা কাটিবার যন্ত্র-সংখ্যা পূর্ব্বে ছিল ১১৪টা, ১৯২৫ সনে ১২৫টা যন্ত্র দেখা গিয়াছে। এইগুলার ভিতর ১০৪টা চলে বিদ্যুতের জোরে, আর ২১টার জন্ম চাপা হাওয়ার শক্তি ব্যবহার করা হয়। এই সকল যন্ত্রের সাহায্যে প্রায় ৩০ লাখ টন কয়লা কাটা হইয়াছে। অর্থাৎ যত কয়লা উৎপন্ন হইয়াছিল তাহার প্রায় সাত ভাগের এক ভাগই যন্ত্রের দান।

কয়লার আমদানি-রপ্তানি

১৯২৫ সনে ২১৬,৩৭০ টন কয়লা বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। ১৯২৪ সনের তুলনায় এই পরিমাণ ১০,০০০ টন বেশী। কয়লা রপ্তানি হইয়াছিল লঙ্কায়।

অপর দিকে ভারতে কয়লার আমদানিও হয় বিস্তর। ১৯২৪ সনে আমদানি হইয়াছিল ৪৬৩,৭১৬ টন। ১৯২৫ সনে আমদানির পরিমাণ ছিল ১৯,৪০০ টন বেশী। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে সব চেয়ে বেশী আসিয়াছিল। পর্ত্তুগীজ পূর্ব্ব-আফ্রিকা আর গ্রেট বৃটেন এই দুই দেশ দক্ষিণ আফ্রিকার পরেই ভারতে প্রচুর পরিমাণে কয়লা যোগাইয়া থাকে।

কয়লার কুলীর ব্যক্তিত্ব

১৯২৪ সনে জনপ্রতি কয়লা উঠিয়াছিল ১০৩.৭ টন। ১৯২৫ সনে খাদে লোক খাটিয়াছিল কম। ফলে দেখা যায় যে, কুলী প্রতি ১১০.৫ টন কয়লা উঠিয়াছে। এই হিসাবে চরম বৎসর ছিল ১৯১৯ সন। সেই বৎসর জন প্রতি ১১১·০৫ টন উঠিয়াছিল।

১৯২৫ সনে খাদে দৈব-ঘটিত মৃত্যুর সংখ্যা ২০২। এই বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছে বলিতে হইবে। কেন না ১৯১৯-২৩ এই পাঁচ বৎসরের গড়পড়তা দৈব-মৃত্যুর হার ২৭৪।

সাধারণ মৃত্যু-সংখ্যায়ও উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। ১৯২৩ সনে ফী হাজার মজুরে মরিয়াছিল ১·৮৩। ১৯২৪ সনে সংখ্যা হাজারকরা ১·৩৪। ১৯২৫ সনে ১·০৭ জনের মৃত্যু ঘটিয়াছে।

কাঁচা লোহা প্রায় ১৪৷৷০ লাখ টন

ভারতের তিন কেন্দ্রে "আয়রণ ওর" অর্থাৎ ধাতব লোহা বা কাঁচা লোহা খনি হইতে তোলা হয়। ১৯২৫ সনে ১৪ লক্ষ ৩৪ হাজার ৮৫৫ টন "ওর" উঠিয়াছিল। তাহার ভিতর টাটা আয়রণ অ্যাণ্ড ষ্টীল হ্বার্কস্ তুলিয়াছিল ৯৫৭,২৭৫ টন। ২২৭,৭২২ টন উঠে ইণ্ডিয়ান আয়রণ অ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর তাঁবে। অবশিষ্ট ২৪৬,৮৫৮ টন তোলে বেঙ্গল আয়রণ কোম্পানী।

রকমারি পাকা লোহা

ধাতব লোহাকে কারখানায় পোড়াইয়া "শোধন" করিলে তিনি "পিগ্ আয়রণ" রূপে পরিচিত হন। সাধারণতঃ লোহা বলিলে এই "পিগ" বা পাকা লোহাই বুঝা হয়। অবশ্য ষ্টীল বা ইস্পাত পিগ্ হইতেও স্বতন্ত্র। পিগ্‌কে ষ্টীল অবতারে পরিণত করিতে হইলে অনেক "কাঠখড়" খরচ হয়। কারখানায় আর এক প্রকার পাকা লোহা তৈয়ারী হয়, তাহার নাম "ফেরো-মাঙ্গানিজ।" নামেই প্রকাশ—এই বস্তুর ভিতর মাঙ্গানিজ মাথা গুঁজিয়া থাকে।

৮৮০,০৭৫ পিগ

১৯২৫ সনে এই তিন ধরণের পাকা লোহা ভারতের কোথায় কত উৎপন্ন হইয়াছে নিম্নের তালিকায় তাহা দেখানো হইতেছে।

	পিগ্	ষ্টীল	ফেরো-মাঙ্গান
টাটা	৫৬৩,১৬০ টন	৩০৯,৯৩৮ টন	৬,৫২৭ টন
ইণ্ডিয়ান	২৪৭,৫০০ টন		
বেঙ্গল	৫২,৬৭৪ টন	২৯,৩২৭ টন	
মাইসোর	১৬,৭৪১ টন		
	৮৮০,০৭৫ টন	৩৩৯,২৬৫ টন	৬,৫২৭ টন

ভারতের পিগ লোহা বিদেশে যায় বিস্তর। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, জার্ম্মাণি এবং চীন এই তিন দেশ আমাদের খরিদ্দার। ৩৮১,৯৮৯ টন বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে (১৯২৫)।

লোহার দুনিয়ায় ভারত

এই খানে লোহার মাপে ভারতবর্ষকে জরীপ করিয়া দেখা মন্দ নয়। ৮ লাখ ৮০ হাজার টন পিগ্ যে-দেশের দৌড়, তাহার সঙ্গে ইয়োরোপের আন্তর্জ্জাতিক লৌহ-সঙ্ঘের তুলনা করা যাউক। এই সঙ্ঘে আছে পাঁচ জনপদ,—

(১) বেলজিয়াম, (২) সার (৩) লুক্সেমবুর্গ, (৪) ফ্রান্স, (৫) জার্ম্মাণি। সঙ্ঘের যে সমঝোতা কায়েম হইয়াছে তাহার বিধানে বেলজিয়াম একা ২৯৫,০০০ টন পাকা লোহা ফী বৎসর তৈয়ারী করিতে অধিকারী। জার্ম্মাণি তৈয়ারী করিবে বার্ষিক ৯ কোটি ২৫ লাখ টন। আর গোটা সঙ্ঘের সমবেত বার্ষিক উৎপাদন হইবে ২ কোটি ৭৫ লাখ টন। অর্থাৎ সঙ্ঘের ৩০ ভাগের এক ভাগ লোহা সমগ্র ভারত তৈয়ারী করিতেছে।

৭১০,৩৪৭ টন মাঙ্গানিজ

মাঙ্গানিজের উৎপত্তি বাড়িয়াছে। ১৯২৪ সনে খনি হইতে উঠিয়াছিল ৬৬৮,৩৩১ টন। ১৯২৫ সনে উৎপত্তির পরিমাণ ৭১০,৩৪৭ টন। যে সকল দেশে ইস্পাত তৈয়ারী হয়, সেই সকল দেশে ভারতীয় মাঙ্গানিজের বাজার। মাঙ্গানিজ প্রধানতঃ রপ্তানির জন্যই উৎপন্ন হয়।

ভারতে মার্কিণ তুলার চাষ

মার্কিণ তুলার তুলনায় ভারতীয় তুলা নিকৃষ্ট শ্রেণীর চিজ। মার্কিণ মাপে ভারতীয় তুলা উন্নত করিবার চেষ্টা কয়েক বৎসর ধরিয়া চলিতেছে। এই জন্য "ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল কটন কমিটি" পাঁচ বৎসর হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পাঞ্জাবে আজকাল ১০ লাখ একর জমিতে মার্কিণ তুলা জন্মানো হইতেছে। সিন্ধুদেশে মার্কিণ তুলার জমিন পাওয়া গিয়াছে। সাক্কার খাল সম্পূর্ণ হইলে চাষ সুবিস্তৃতরূপে কায়েম হইতে পারিবে। মাদ্রাজ অঞ্চলেও মার্কিণ তুলার চাষ সুরু হইয়াছে।

ইস্পাতে বিদেশী বনাম বিলাতী

১৯২৪ সনে ইস্পাত-সংরক্ষণ আইন জারি হইয়াছিল। সেই আইনের মেয়াদ ছিল এই বৎসরের মার্চ মাস পর্য্যন্ত। এপ্রিল মাস হইতে আগামী সাত বৎসরের জন্য একটা নূতন আইন কায়েম হইতে চলিল। তাহার বিধানে "বিদেশী" ইস্পাতের উপর আমদানি-শুল্ক এখনকার মতনই জারি থাকিবে।

কিন্তু "বিদেশী"কে দুই ভাগে বিভক্ত করিবার কথা উঠিয়াছে,—(১) বিলাতী, (২) অন্যান্য বিদেশী,—যথা মার্কিণ, ফরাসী, বেলজিয়ান, জার্ম্মাণ ইত্যাদি। ১৯২৭ সনের আইন মঞ্জুর হইলে বিলাতী ইস্পাতের উপর যে হারে শুল্ক বসানো যাইবে "অন্যান্য বিদেশী"র উপর তাহার চেয়ে বেশী হারে চাপানো হইবে।

ভারতে বিলাতী বাঁচানো

দেখা যাইতেছে যে, ভারতীয় বাজারে "অন্যান্য বিদেশী"র আক্রমণ হইতে বিলাতীকে বাঁচাইবার জন্য ব্যবস্থা করা হইবে। অন্যান্য বিদেশী ইস্পাতের সঙ্গে স্বাধীন ভাবে টক্কর চালাইয়া বিলাতী ইস্পাত ভারতের বাজারে আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ। কাজেই প্রস্তাবিত আইনটাকে একমাত্র ভারতীয় ইস্পাত-শিল্পের সংরক্ষক বলা চলিবে না। বিলাতী ইস্পাতশিল্পের সংরক্ষণই এই আইনের একটা বড় উদ্দেশ্য।

পক্ষপাতমূলক ইস্পাত-সংরক্ষণ

বিলাতী ইস্পাতের স্বপক্ষে এইরূপ হামদর্দ্দি দেখানো ভারতীয় ক্রেতা ও জনসাধারণের পক্ষে বাঞ্ছনীয় কি? আমাদের বিবেচনায় বাঞ্ছনীয় নয়। পক্ষপাতমূলক সংরক্ষণ-শুল্কের ফলে ভারতবাসী অত্যধিক মূল্যে বিদেশী ইস্পাত কিনিতে বাধ্য হইবে। তাহাতে বিলাতের ইস্পাত-ব্যবসায়ীদের লাভ আছে যথেষ্ট, কিন্তু ভারতীয় নরনারীর লাভ আধ কাঁচ্চাও নাই। বরং আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি ইত্যাদি বড় বড় দেশের শত্রুতা অর্জ্জন করা হইবে মাত্র। তাহাতে রাষ্ট্রীয় এবং আর্থিক দুই প্রকার ক্ষতিই ভারতের কপালে জুটিতে পারে।

জামশেদপুর ও কলিকাতার মধ্যে টেলিফোন

জামশেদপুর ও কলিকাতার মধ্যে টেলিফোন-সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। আপাততঃ কমপক্ষে প্রতি পাঁচ মিনিট কথোপকথনের জন্য ২৸০ করিয়া মাশুল ধার্য্য করা হইয়াছে।

বিহারে টেক্‌নিক্যাল শিক্ষার ক্রমিক উন্নতি

১৯২৫-২৬ সনের আঁকজোক হইতে বুঝা যায়, "বিহার কলেজ অব্ এঞ্জিনিয়ারিং" ও "ওড়িষ্যা স্কুল অব্ এঞ্জিনিয়ারিং" এই উভয় প্রতিষ্ঠানই ভাল ফল দেখাইয়াছে। "বিহার কলেজে"র এই দ্বিতীয় বছর চলিতেছে। আর ইহার ছাত্রেরা এই প্রথমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিল।

মেকানিক্যাল অ্যাপ্রেন্টিস ক্লাসগুলি মাত্র গত বছর খোলা হইয়াছে। ৭২ জন ছাত্র আসিয়াছিল; কিন্তু অধিকাংশই অনুপযুক্ত বিবেচিত হইয়াছিল।

"ওড়িষ্যা স্কুল অব্ এঞ্জিনিয়ারিং"এর প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ছাত্র লওয়া হয় ৩৫। এই দ্বিতীয় বার তারা সাব্ ওভারসিয়ারি পরীক্ষা দিয়াছে। এর কারু-বিভাগটা বেশ চলিতেছে। মিস্ত্রির কাজ, কামারের কাজ, রং দিবার কাজ, পালিশের কাজ ও এঞ্জিন-চালকের কাজ অনেকগুলি বালককে শিখান হইতেছে।

"জামশেদপুর টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট" বেশ চলিতেছে। এর তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর লোকদের জন্য চারিদিক্ হইতে ডাক আসিতেছে। ১৫ জন ছাত্র তাদের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছে। তন্মধ্যে ১৩ জনকে টাটা আয়রণ অ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানী কন্ট্রাক্ট দিয়াছে।

"জামশেদপুর টেক্‌নিক্যাল স্কুল" ও "ত্রিহুৎ টেক্‌নিক্যাল স্কুল" দু'টারই উন্নতি হইতেছে।

ইডেন গার্ডেনে পাখীর মেলা

এই বৎসরের প্রথমভাগে কলিকাতা শহরের ইডেন গার্ডেনে এক পাখীর মেলা বসিয়াছিল। ইহাকে "অল ইণ্ডিয়া পোল্‌ট্রি-শো" বা নিখিল ভারত পাখী প্রদর্শনী নামে অভিহিত করা হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে পয়লা নম্বরের বাছা বাছা পাখী এখানে জমায়েৎ করা হইয়াছিল। লাট বেলাট রাজা মহারাজাও প্রদর্শনীতে পাখী পাঠাইয়াছিলেন। যুক্ত প্রদেশই এই পাখী পালন ব্যবসায় অগ্রণী। সেখানকার সরকার এদিকে সাধারণকে খুব উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। লক্ষ্ণৌ শহরের "ইউ, পি, পোল্‌ট্রি অ্যাসোসিয়েশ্যন," "এটা মিশন" ও দেরাদুনের নিকটস্থ "ডুম পোল্‌ট্রিজ লিমিটেড্" ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে মুর্গী ও অন্যান্য পাখীর "চাষ" লাভজনক ব্যবসা আকারে চালানো হইতেছে। এই সকল পাখীশালা এবং ভাগলপুর, নাগপুর ইত্যাদি শহরের ফার্ম্ম হইতে প্রদর্শনীতে রকম-বেরকম মোটা তাজা চিড়িয়া আসিয়াছিল। বাংলার অনেক গ্রামবাসীও এই প্রদর্শনীতে মুর্গী ও অন্যান্য পাখী পাঠাইয়াছিল।

প্রদর্শনীতে কম সে কম দেড় হাজার টাকার পাখী বিক্রী হইয়াছে। ইহার মধ্যে একটা মাত্র বিরাটকায় মোরগ সাত শত টাকায় বিকায়।

যুক্ত প্রদেশের এটা জেলার ৪ জন গ্রামবাসীর প্রেরিত ১৪টি জিনিষের সকলগুলিই মোট ১৮০৲ মূল্যে বিক্রয় হয়। জনৈক গ্রামবাসী একাই ৮১৲ টাকা পায়। এই প্রকার প্রদর্শনীর ফলে লোকের মনে খুব উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে। এদিকে দেশবাসীর আগ্রহ দেখিয়া খুবই আশা হয়। "ইণ্ডিয়ান পোল্‌ট্রি ক্লাব" অনুসন্ধান দ্বারা উন্নত উপায়ে পাখী পালনের যে সকল সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন, সেগুলি কাজে খাটাইবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমাদের বেকার সমস্যার কিছু সমাধান এই পথে ঘটিবার সম্ভাবনা।

লিআঁর বণিক-সঙ্ঘ
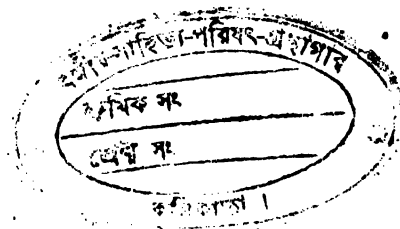
খালের ইজ্জৎ ফ্রান্সের বেপারী-মহলে খুব বেশী। লিআঁ শহরের "শাঁবর্ দ' কম্যার্স" (বণিক-সঙ্ঘ) রোণ আর রাইণ দরিয়ার খালটাকে উন্নত করিবার জন্য দশ লাখ ফ্রাঁ (প্রায় ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা) দান করিয়াছে।

রেশমের ব্যবসা লইয়া ফ্রান্সের সঙ্গে ইতালির বচসা চলিতেছিল। এই বচসার প্রধান ইন্ধন যোগাইয়াছে লিআঁর বণিক-সঙ্ঘ।

চীনে এবং বুলগেরিয়ায় ফরাসী রেশমের উপর চড়া হারে শুল্ক বসানো হইবার কথা উঠিয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার জন্য লিআঁর বণিক-সঙ্ঘ ফরাসী পররাষ্ট্র-সচিবকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে।

হল্যাণ্ডের বহির্ব্বাণিজ্য

ভারতবর্ষ বিদেশে বেচে বেশী কিনে কম। হল্যাণ্ডের বহির্ব্বাণিজ্য ঠিক উল্টা প্রকৃতির। সে দেশের লোকেরা বিদেশে কিনে বেশী, বেচে কম। ১৯২০ সনে হল্যাণ্ডের রপ্তানি ছিল মাত্র ১,৭০০ মিলিয়ন ফ্লোরিণ; আর আমদানি ছিল ৩,৩৭৫ মিলিয়ন ফ্লো। ১৯২৫ সনে ১,৮০০ মিলিয়ন ফ্লো বিদেশে বেচা হইয়াছে; আর কেনা হইয়াছে ২,৪০০ মিলিয়ন ফ্লোরিণ মূল্যের মাল। হল্যাণ্ডের লোকেরা বিদেশে রপ্তানি বাড়াইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। জার্ম্মাণি তাহাদের এক বড় বাজার। ১৯২৫ সনে জার্ম্মাণ গবর্মেণ্ট নয়া শুল্ক-ব্যবস্থা কায়েম করিয়াছে। জার্ম্মাণিতে বাজার সৃষ্টি করা হল্যাণ্ডের পক্ষে এখন কঠিন।

ইতালির বিভিন্ন বাণিজ্য-সমঝৌতা

বিগত কয়েক বৎসরের ভিতর ইতালির সঙ্গে বিভিন্ন দেশের কতকগুলা বাণিজ্য-সমঝৌতা কায়েম হইয়াছে। এই সকল সমঝৌতার ফলে ইতালি জগতের নানা কেন্দ্রে তাহার বাজার বসাইতে পারিতেছে। নানা স্থান হইতে ইতালিয়ান শিল্প-পতিরা প্রয়োজনীয় কুদরতী মালও কথঞ্চিৎ সহজে সংগ্রহ করিতেছে।

সমঝৌতাগুলা নিম্নরূপ:—(১) ১৩ নবেম্বর ১৯২২, ফ্রান্সের সঙ্গে (সাধারণ), (২) ২১ ডিসেম্বর ১৯২২, চেকো-শ্লোভাকিয়ার সঙ্গে, (৩) ৪ জানুয়ারি ১৯২৩, কানাডার সঙ্গে, (৪) ২৭ জানুয়ারি ১৯২৩, সুইটসার্ল্যাণ্ডের সঙ্গে, (৫) ২৮ এপ্রিল ১৯২৩, অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে, (৬) ২৪ জুলাই ১৯২৩, তুর্কীর সঙ্গে, (৭) ২৮ জুলাই ১৯২৩, ফ্রান্সের সঙ্গে (রেশম-সমঝৌতা), (৮) ১৫ নবেম্বর ১৯২৩ স্পেনের সঙ্গে, (৯) ৩ ডিসেম্বর ১৯২৩, সুইটসার্ল্যাণ্ডের সঙ্গে (মদ্য-সমঝৌতা) (১০) ২০ জানুয়ারি ১৯২৪ আলবানিয়ার সঙ্গে, (১১) ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২৪ রুশিয়ার সঙ্গে, (১২) ঐ তারিখে রুশিয়ার সঙ্গে (শুল্ক সম্বন্ধে একটা বিশেষ সমঝৌতা), (১৩) ১ মার্চ ১৯২৪ চেকো-শ্লোভাকিয়ার সঙ্গে আর একটা, (১৪) ১ এপ্রিল ১৯২৪ ফ্রান্সের সঙ্গে (রেশমের গুটপোকা সম্বন্ধে), (১৫) ১৪ জুলাই ১৯২৪ জুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে, (১৬) ২২ অক্টোবর ১৯২৪, ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে, (১৭) ২০ জুলাই ১৯২৫, হাঙ্গারির সঙ্গে, (১৮) ২৬ জুলাই ১৯২৫ লিথুয়েনিয়ার সঙ্গে, (১৯) ২৭ অক্টোবর ১৯২৫ বুলগেরিয়ার সঙ্গে, (২০) ৩০ অক্টোবর ১৯২৫, জার্ম্মাণির সঙ্গে, (২১) ১১ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ গ্রীসের সঙ্গে, (২২) ১৫ সেপ্টেম্বর

১৯২৬, গোয়াতেমালার সঙ্গে, (২৩) ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯২৬, রুমাণিয়ার সঙ্গে।

বর্ত্তমান জগৎ সমঝৌতার দুনিয়া। এই সকল সমঝৌতার ফলে জগতের আর্থিক এবং রাষ্ট্রীয় দুই ভাগ্যই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে।

আন্তর্জ্জাতিক তূলা-ফ্যাক্টরি পরিষৎ

বেলজিয়ামের ব্রুসেল্‌স্ শহরে আন্তর্জ্জাতিক তূলা ফ্যাকটরি-পরিষদের বৈঠক বসিয়া গিয়াছে। বিশ পঁচিশ বৎসর ধরিয়া এই পরিষদের কাজ চলিতেছে। ১৯০৪ সনে সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের জুরিখ নগরে পরিষদের প্রথম বৈঠক বসে। তাহাতে নয় দেশের লোক যোগদান করে। আজকালকার পরিষদে ২৫ দেশের লোক প্রতিনিধি। ১৯২৬ সনে বৈঠক বসিয়াছিল অষ্ট্রিয়ার ভিয়েনা শহরে। তূলার ফ্যাক্টরিগুলায় কাঁচা তূলা যোগানো সম্বন্ধে মাথা ঘামানো এই পরিষদের ধান্ধা। ভারতে কঙ্গো দেশে এবং অন্যত্র যাহাতে প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট তূলা জন্মে তাহার জন্য আন্দোলন চালানো এই পরিষদের প্রধান কাজ।

প্রুশিয়ায় সরকারী বিদ্যুৎ

জার্ম্মাণির প্রুশিয়া প্রদেশে সরকারী তাঁবে বিদ্যুৎ-কারখানা চলে অনেক। সম্প্রতি এক আইন জারি হইয়াছে। তাহার ব্যবস্থায় ৫৪ মিলিয়ন মার্ক (প্রায় ৪ কোটি ২০ লাখ টাকা) গবর্মেণ্টের হাতে দেওয়া হইবে। নয়া এবং পুরাণো বিদ্যুৎ-কারখানায় এই সমস্ত টাকা খরচ হইতে পারিবে।

লোহালক্কড়ে ইতালির ঠাঁই

লোহালক্কড়ের কারবারে ইতালিকে বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। ১৯২৫ সনে ৫০০ মিলিয়ন লিয়ারের ভাঙ্গাচুরা লোহার জিনিষ,—রদ্দি মাল যাহাকে বলে,—বিদেশে কিনিতে হইয়াছিল। ইতালিতে সকল প্রকার লোহা-ইস্পাতের মাল আমদানি হইয়াছিল প্রায় ১৬ কোটি টাকার। তাহার শতকরা ৪৫ অংশই ছিল "রদ্দি মাল", এই "রদ্দি মাল" ইতালির কারখানায় কারখানায় কুদরতী মালরূপে ব্যবহৃত হয়।

আন্তর্জ্জাতিক ইস্পাত-সঙ্ঘ ও ইতালি

রদ্দি মাল সংগ্রহ করিবার জন্য ইতালিয়ান গবর্মেণ্ট ফ্রান্সের সঙ্গে একটা চুক্তি পাতাইয়াছে। যাহাতে কম সে কম ২০০,০০০ টন ফ্রান্স হইতে আমদানি হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিদেশের উপর যাহাতে ইতালিকে বেশী নির্ভর করিতে না হয় তাহার ব্যবস্থাও মুসোলিনি করিয়াছেন। এল্‌বা দ্বীপের খাস মহাল হইতে ধাতব বস্তু তুলিবার আয়োজন হইতেছে। কিন্তু "স্বদেশী" আন্দোলন বড় সহজে সফলতা লাভ করিতে পারিবে না। কাজেই ইয়োরোপের আন্তর্জ্জাতিক ইস্পাত-সঙ্ঘের কাণ্ড-কারখানা দেখিয়া ইতালিয়ান শিল্প-পতিরা বিশেষ সন্ত্রস্ত। বিদেশী লোহালক্কড় যাহাতে সহজে এবং সস্তায় ইতালিতে প্রবেশ করিতে পারে তাহার জন্য মাথা ঘামানো ইতালিয়ান স্বদেশ-সেবকদের এক বড় কাজ।

কাঁচা লোহার উৎপাদনে জার্ম্মাণ গবর্মেণ্ট

জার্ম্মাণ গবর্মেণ্ট লোহার খনিওয়ালাদিগকে চড়া হারে অর্থ-সাহায্য করিতেছে। টন প্রতি ২ মার্ক দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বিগত জুন মাস হইতে এই ব্যবস্থা চলিতেছে। খনিওয়ালারা দাম কমাইতে সমর্থ হইয়াছে। যে যে খনির কাজ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল সেগুলা আবার কাজ সুরু করিতে পারিয়াছে।

পোল্যাণ্ডের কয়লা-সঙ্ঘ

সঙ্ঘ কায়েম করা যত সহজ তাহা টিঁকানো তত সহজ নয়। পোল্যাণ্ডের কয়লার বেপারীরা একটা "কার্টেল" বা সঙ্ঘ কায়েম করিয়াছিল। পরস্পর পরস্পরের মত না লইয়া কয়লার দাম কমানো হইবে না, এইরূপ স্থির হয়। কিন্তু কয়েকটা কোম্পানী সঙ্ঘের পাতি না লইয়াই কয়লার দাম কমাইয়া বসিয়াছে। 'কার্টেলের আয়ু আর বেশী দিন নয়।

রুশিয়ায় জার্ম্মাণ যন্ত্রপাতি

গত বৎসর রুশ গবর্মেণ্ট জার্ম্মাণিতে ৩০০ মিলিয়ন মার্কের (২২॥০ কোটি টাকার) সওদা করিবার ব্যবস্থা করে। কিন্তু চার বৎসরের পূর্ব্বে টাকা শুধিবার সম্ভাবনা নাই। একথা প্রথমেই খোলাখুলি বলা হয়। জার্ম্মাণির সওদাগরেরা রুশিয়াকে মাল যোগাইতে রাজি হইয়াছে। কিন্তু এজন্য জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য শতকরা ৩৫ টাকা পর্য্যন্ত ঝুঁকি লইয়াছে। আর বিভিন্ন প্রাদেশিক রাষ্ট্র ঝুঁকি লইয়াছে শতকরা ২৫ টাকা পর্য্যন্ত। অর্থাৎ খোদ সওদাগরদের ঝুঁকি মাত্র ৪০ টাকা পর্য্যন্ত। জার্ম্মাণি হইতে শিল্পকারখানার জন্য যন্ত্রপাতি খরিদ করাই রুশিয়ার উদ্দেশ্যে।

রাঁস নগরের ক্রমিকবৃদ্ধি

ফ্রান্সের রাঁস নগরের ১৮০৮ সনে লোক-সংখ্যা ছিল ২০,২৯৫ জন মাত্র। ১৮৭২ সনে সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৯,১৩৭। ১৯১১ সনে ১১৫,১৭৮ জন নরনারী এই নগরে বাস করিত। মহাযুদ্ধের সময়ে নগর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, আর লোকজন বাস্তভিটা ছাড়িয়া পলায়ন করে। ১৯২১ সনে দেখা যায় মাত্র ১৬,৬৪৬ জন লোক বসবাস করিতেছে। এই সংখ্যারও এক-তৃতীয়াংশ "বিদেশী" অর্থাৎ ঘরামী, কারিগর ইত্যাদি লোক,—পুনর্গঠনে বাহাল। এক্ষণে পুনর্গঠন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। লোক-সংখ্যা আবার লাখ পার হইয়াছে। তবে ১৯১১ সনের সংখ্যায় এখনো পৌছে নাই। রাঁসের ৩০,০০০ পুরাণা অধিবাসী রাঁস ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহারা আর "স্বদেশে" ফিরিবে না। অপর দিকে নানা "বিদেশী" লোক রাঁসে আসিয়া বাস্তভিটা গাড়িয়াছে। তাহারা বড় শীঘ্র রাঁস ছাড়িবে না। কাজেই এই শহরের লোক-চরিত্র আগাগোড়া বদলাইয়া যাইবার কথা।

তেলের কারবারে মার্কিণ সঙ্ঘ

নিউ ইয়র্কের ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর মূলধন ছিল ৩৭ কোটি ৫০ লাখ ডলার। এই কোম্পানীর সঙ্গে সংযুক্ত হইল জেনারল পেট্রলিয়ম কর্পরেশুন। তাহার মূলধন প্রায় ৪ কোটি ৬৭ লাখ ডলার। ক্যালিফর্ণিয়া, ওয়াইমিঙ এবং মেক্‌সিকো ইত্যাদি জনপদে এই কোম্পানীর খাদ আছে।

ইতালিয়ান ক্ষুদ্র শিল্পে সরকারী সাহায্য

বিগত অক্টোবর মাসে (১৯২৬) ইতালিতে "এন্তে নাৎসিঅনালে প্যর লে পিক্‌কলে ইন্দুস্ত্রিয়ে" (জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প পরিষৎ) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইতালিয়ান গবর্মেণ্টের আর্থিক উন্নতি বিষয়ক সচিবের দপ্তর হইতে ১৯২৬-২৭ সনের জন্য এই "এন্তে"কে ২২ লাখ লিয়ার (প্রায় ৩ লাখ টাকা) সাহায্য দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

এই "এন্তে" অন্যান্য সমিতির সঙ্গে একত্র যোগে কাজ করিয়া ইতালির ক্ষুদ্র শিল্পগুলাকে খাড়া করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। ভেনিসের এক কুটির-শিল্প সমিতি "এন্তের" কাজে সহায়ক হইয়াছেন।

একটা "ইস্তিতুত কমার্চিয়ালে ইতালিয়ান" গড়িয়া তুলিবার কথা উঠিয়াছে। এই ইতালিয়ান ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান কুটির-শিল্পের বাজার বাড়াইবার ব্যবস্থা করিবে। সঙ্গে সঙ্গে শিল্পটাও যাহাতে টেক্‌নিক্যাল তরফ হইতে উন্নতি লাভ করিতে পারে তাহার জন্য যত্ন লওয়া হইবে। ৬০ লাখ লিয়ার দিয়া গবর্মেণ্ট এই ইস্তিতুত'র মূলধন পুষ্ট করিবার ভার লইবেন।

আর একটা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার কথাও উঠিয়াছে। সমগ্র ইতালির জন্য একটা "জাতীয় ব্যাঙ্ক" কায়েম করা হইবে। কুটির-শিল্পকে সাহায্য করা থাকিবে তাহার একমাত্র কাজ। এই ব্যাঙ্কের মূলধন পুষ্ট করিবার জন্য গবর্মেণ্ট নিজ তহবিল হইতে ৪৮ লাখ লিয়ার খরচ করিতে রাজি আছেন।

৪০০ মার্ক মাহিয়ানার জার্ম্মাণ মধ্যবিত্ত

জার্ম্মাণির ৪০০ মার্ক আমাদের ৩০০৲ টাকার সমান। এই বেতনের একজন জার্ম্মাণ কেরাণী তাহার গৃহস্থালী কিরূপ চালায় তাহার এক বৃত্তান্ত বাহির হইয়াছে লাইপৎসিগ হইতে প্রকাশিত "ফ্যির্‌স হাউস" (ঘরকন্না) নামক সাপ্তাহিকে। বড় শহরে বসবাস। বাড়ীতে বাগান নাই।

পরিবারে তিনটি লোক,—নিজে, স্ত্রী ও শাশুড়ী। ধুবী আসে বাড়ীতে সপ্তাহে একদিন কাপড় কাচিতে। তাহাকে দিতে হয় ৪ মার্ক (৩৲)। "কাঁথা সেলাই", মেরামত, রিফু কর্ম্ম ইত্যাদির জন্য এক মেয়ে আসে বাড়ীতে সপ্তাহে একবার। তাহার বেতন ২ মার্ক (১৷৷৹)। একজন এক বেলার ঝী,—তাহাকে দিতে হয় মাসিক ১৮ মার্ক (১৩৷৷৹)। সকাল বেলার আধ-পেটা খাওয়াটা সে পায়। কাপড় চোপড় পোষাক ইত্যাদি কিনিবার জন্য মাস মাস স্ত্রীর হাতে দেওয়া হয় ২০ মার্ক (১৫৲)। বাড়ী-ভাড়া লাগে মাসে ৬০ মার্ক (৪৫৲)। বাড়ীতে পাঁচ খানা ঘর। শীতকালে ৩।৪টা ঘর গরম করিতে হয়, এই জন্য কয়লা আবশ্যক। তাহা ছাড়া গ্যাস এবং বিদ্যুতের আলো আছে। এই তিন দফায় মাসিক লাগে ১০ মার্ক (৭৷৷৹)। ঘরে অতিথি-সেবা অথবা বাহিরে বেড়াইতে যাওয়া এবং "বনভোজন" বা ঐ জাতীয় খরচ মাস ২০।৩০ মার্ক (১৫৲।২২৲)। ইহার ভিতর খবরের কাগজ ইত্যাদি আছে। তাহা ছাড়া মাসে ১২৫ মার্ক (৯৪৲) "খাই খরচ"। বড় বড় দামী পোষাকের জন্য আলাদা ব্যবস্থা। বড় দিনের সময়, একটা ভাল কিছু কিনিবার জন্য ৪০।৫০ মার্ক স্বতন্ত্র রাখা হয়। খাই খরচ, গ্যাস, আলো, কয়লা আর ধুবী এই পাঁচ দফার এক-তৃতীয়াংশ শাশুড়ীর নিকট হইতে পাওয়া যায়। শাশুড়ী বিধবা,—গবর্মেন্টের নিকট হইতে মোটা হারে পেন্‌শ্যন পাইয়া থাকেন। অর্থাৎ দেখা যাইতেছে যে, প্রায় ২৩০ মার্কে স্বামী ও স্ত্রীর মাস চলিয়া যায়। মাসে ১৭০ মার্ক বাঁচে। মনে রাখিতে হইবে যে, সকল পরিবারেই একটা করিয়া পেন্‌শ্যন-ওয়ালা শাশুড়ী থাকে না, আর জার্ম্মাণির অধিকাংশ পরিবারেই মা ষষ্ঠীর কৃপা জবর।

কর্পূরের দুনিয়া

ইতালির রিহ্বিয়েরা প্রদেশে কর্পূরের গাছ জন্মে অনেক। বহুদিন ধরিয়া ইতালিয়ান অধ্যাপকেরা ইতালিতে কর্পূরের ব্যবসা পাকাইয়া তুলিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। আজকাল অধ্যাপক পাহ্বারি এই শিল্পে ব্রতবদ্ধ। কিন্তু ক্রমশঃ দেখা যাইতেছে যে, জাপানে আর ফর্মোসায় কর্পূরের চাষ স্বাভাবিক কারণে উন্নত হইতে বাধ্য। ইতালির জলবায়ু কর্পূরের গাছের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক নয়। কর্পূরের জন্য চাই কিছু গরম এবং ভিজে হাওয়া। ইতালির চেয়ে জাপান আর ফর্মোসা এই বিষয়ে বেশী ভাগ্যবান। কাজেই ইতালির কর্পূর-শিল্প মাথা খাড়া করিতে পারিতেছে না। তাহার উপর জুটিয়াছে আর এক আপদ। জার্ম্মাণরা কৃত্রিম উপায়ে কর্পূর বানাইতে সুরু করিয়াছে। প্রাকৃতিক কর্পূরের ইজ্জৎ আর টিঁকে কৈ? এই সঙ্গে মনে রাখা আবশ্যক যে, আমাদের ভারতে আর যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লরিডা প্রদেশে কর্পূরের চাষ হয়। কিন্তু শিল্প যার পর নাই অবনত।

মরিস্ মোটরস্ কোম্পানী

মরিস্ মোটরস বিলাতের একটা বড় মোটরকারের কারখানা। এই কারখানা সম্প্রতি উপনিবেশ হইতে সর্ব্ববৃহৎ কণ্ট্রাক্ট পাইয়াছে।

আগামী বৎসরে ইহাদিগকে ১০,০০০ মোটরকার ও মোটর লরী যোগাইতে হইবে। এদের দাম ৩০ লক্ষ পাউণ্ড।

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ব্যাঙ্ক একাকার

আমেরিকার দুইটা বড় ব্যাঙ্ক মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। আগে এ দু'টার নাম ছিল "আমেরিকান এক্সচেঞ্জ প্যাসিফিক ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক" ও "আরভিং ব্যাঙ্ক অ্যাণ্ড ট্রাষ্ট কোম্পানী।" এখন নাম হইয়াছে "আমেরিকান এক্সচেঞ্জ আরভিং ট্রাষ্ট কোম্পানী।" বর্ত্তমানে মোট সম্পত্তি হইল ৬০ কোটি ডলার।

এই ব্যাঙ্কের ২৭টি অফিস এখন নিউ-ইয়র্কে রহিয়াছে। আগেকার সকল কর্ম্মচারী ও কেরাণীকেই বাহাল রাখা হইয়াছে।

ক্রুপ কোম্পানীর বিস্তার

বিখ্যাত ক্রুপ কোম্পানী ৬০,০০০,০০০ মার্ক ধার লইবে বলিয়া স্থির করিয়াছে। ইহার ১৫,০০০,০০০ দ্বারা হল্যাণ্ডে ও বাকী অংশ দ্বারা বার্লিনে নূতন কোম্পানী খাড়া করা হইবে।

তুরস্কে তামার খনি

নব্য তুর্কীতে নতুন নতুন রেল সড়ক নির্ম্মিত হইতেছে। বিভিন্ন ফ্যাক্টরী স্থাপন করা হইতেছে। গোটা দেশের উপযোগী উড়ো জাহাজের আয়োজন চলিতেছে। সুলতানদের আমলে মাত্র হেজাজ রেলওয়ে ও বাগ্দাদ রেলওয়ে স্থাপিত হয়। প্রথমোক্ত রেলওয়েটি দুনিয়ার মুসলমানদের, প্রধানতঃ ভারতীয় মুসলমানদের, অর্থে স্থাপিত হয় এবং শেষোক্তটি জার্ম্মাণ অর্থে নির্ম্মিত হয়।

তুরস্কের গবর্মেণ্ট আরঘানার তামার খনিকে কাজে খাটাইবার চেষ্টায় আছেন। আরঘানার এই খনি নাকি দুনিয়ার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ঐশ্বর্য্যশালী। আরঘানা শহরের নিকটে এই খনিগুলি অবস্থিত। বাগ্দাদ রেলওয়ের শাখা লাইনের মার্ডিন ষ্টেশন হইতে ইহার দূরত্ব দেড়শত মাইল। তুর্কী সরকার ও জার্ম্মাণ ব্যবসায়ীরা এই খনিজ সম্পদ্ উদ্ধারের কার্য্যে সাহায্য করিতেছেন। মূলধনের ⅙ অংশ সরকারী তহবিল হইতে, কতকটা অংশ টার্কিশ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক ও বাকীটা জার্ম্মাণ ব্যবসায়িগণের নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

প্রতি বৎসর পনর হাজার টন খাঁটি তামা ঐ খনি হইতে পাওয়া যাইবে। মূলধনের সুদ ও অন্যান্য দেয় হিস্যা বাদে যাহা নেট আয় দাঁড়াইবে তাহার শতকরা ৬৫ ভাগ তুর্কী সরকার পাইবেন।

এই কার্য্যের জন্য বৃহৎ বৃহৎ কলকারখানা খনির মুখে সংস্থাপনের জন্য অগ্রে রেল সড়ক নির্ম্মাণ প্রয়োজনীয়। তুর্কী সরকার এজন্য একটা বেলজিয়ান কোম্পানীর হাতে রেল নির্ম্মাণের ভার ন্যস্ত করিয়াছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার লৌহ ও ইস্পাত শিল্প

দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারী ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক লোহা-ইস্পাতের কারবার বিস্তারের জন্য এক প্রস্তাব আইনে পরিণত হইতে যাইতেছে। ইহার ফলে "সাউথ আফ্রিকান আয়রণ অ্যাণ্ড ষ্টীল কর্পোরেশন" নামক একটি কোম্পানী ৩,৫০০,০০০ পাউণ্ড মূলধনে খোলা হইবে। ইহাতে ৯ জন ডিরেক্টর থাকিবেন। তাঁহাদের মধ্যে ৫ জন সরকার-কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন। ১ পাউণ্ড মূল্যের ২০ লক্ষ শেয়ারে মূলধন বিভক্ত করা হইবে। সরকার নিজে ৫ লক্ষ শেয়ার খরিদ করিবেন। বাকী পনর লক্ষ জনসাধারণ ক্রয় করিতে অধিকারী। আরও ২৫০,০০০ পাউণ্ড মূলধন বাড়ান যাইতে পারিবে এবং ১,৫০০,০০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত ধার করার ক্ষমতা এই কোম্পানীর থাকিবে।

শিক্ষার পরিণতি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত বৎসর শতকরা ৫৫ জনকে ম্যাট্রিকুলেশনে পাশ করা হইয়াছে; এবৎসর নাকি করা হইবে ৪৫ জনকে। এদিকে হেডমাষ্টারগণ-সমীপে নাকি পত্র আসিয়াছে শতকরা ৫০ জন ছাত্র পাশ না হইলে তাঁহাদের কৈফিয়ৎ তলব হইবে; এমন কি মাহিয়ানা কাটিয়াও দেওয়া যাইতে পারে। ফলে এবৎসর অনেক কম পরীক্ষার্থী প্রেরিত হইয়াছে। কোনও কোনও স্কুল হইতে শতকরা ২৫ জনের অধিক ছাত্র প্রেরিত হয় নাই। কম ছাত্র প্রেরণের সদ্য ফল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের হেড মাষ্টারের ঘরে আগুন। পাশের সংখ্যা কমাইয়া দিলে ছাত্রসংখ্যা কমিয়া যাইবে। তাহা হইলেই অনেক স্কুল উঠিয়া যাইবে এবং কলেজের বিরাট বপুও সঙ্কুচিত হইবে। দেশ সুশিক্ষা চাহে, শিক্ষা-সঙ্কোচ চাহে না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা-সঙ্কোচেরই চেষ্টায় আছেন। নিম্নশ্রেণীর যে সব লোক একটু আধটু আলোক পাইতেছিল তাহারা নিরক্ষর থাকিবে। সর্ব্বোপরি বস্ত্রের বাজারে আগুন লাগিবে। তবে বর্ত্তমান শিক্ষার হ্রাস করায় আমরা দুঃখিত হইব না। "বরিশাল হিতৈষী"

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা

সেণ্ট জেভিয়ার কলেজের প্রাইজ্ বিতরণের দিন ডিরেক্টর অব্ পাবলিক ইনষ্ট্রাক্‌শন ওটেন সাহেব সভাপতি-রূপে নিম্নলিখিত মর্ম্মে বলিয়াছেন:—

"আমি আমার কাজের জন্য যথোচিত মাহিয়ানা পাইতেছি। কিন্তু এই একই ধরণের কাজে পাদ্রীরা এদেশে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন। তাঁরা শুধু নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনের খরচটা পাইতেছেন। তাতেই তাঁরা সন্তুষ্ট। তাহাদের স্বার্থত্যাগ বাঙ্গালাদেশ বুঝিতে পারে। তার প্রমাণ এই যে, এই প্রতিষ্ঠানে ১৫০০ জন বালক ও যুবক রহিয়াছে।

"উদার শিক্ষানীতি যদি কোথাও অনুসৃত হয়, তবে তা সম্পূর্ণরূপে এইখানেই হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা দশ বছর আগে যেমন ছিল আজও তেমনি আছে। কোন উন্নতি হয় নাই। স্যাড্‌লার কমিশনের একটি প্রস্তাব ছিল যে, অনার্স ছেলেরা তিনবছর ধরিয়া উচ্চতর ও গভীরতর শিক্ষা পাইবে। দুঃখের বিষয় কাজে তার কিছুই হয় নাই। বেশী ছেলেই প্রতিভাহীন। তাদের জন্য ভাল ছেলেদের শক্তির অপচয় ঘটিতেছে। এক প্রতিষ্ঠানে দেখিলাম তিনজন শিক্ষক ১৪০০ ছেলেকে এক বিষয়ে শিক্ষা দিতেছেন। অর্থাৎ গড়ে প্রত্যেকের ভাগে ৪০০ জনেরও বেশী পড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে আশা করা অসম্ভব যে, শিক্ষক প্রত্যেকের জন্য বিশেষ যত্ন লইবেন। আমাদের অনার্স শিক্ষা-প্রণালীর ধারা বদ্‌লাইতে হইবে। বর্ত্তমানে যে ভাবে বক্তৃতা গিলাইবার বা হাজিরা মাত্র রাখিবার ব্যবস্থা আছে, তৃতীয় বৎসর হইতে ৬ষ্ঠ বা ৭ম বৎসর পর্য্যন্ত সেই নীতিকে পরিমার্জ্জিত করিতে হইবে।

"নীতিধর্ম্মের যাই হোক্, শারীরিক ধর্ম্ম অর্থাৎ স্বাস্থ্য-রক্ষা সর্ব্বাগ্রে দরকার। এই স্বাস্থ্য-রক্ষা নির্ভর করে কতকগুলি অভ্যাসের উপর—নিয়মিত ব্যায়াম, নিজের শরীর সম্বন্ধে সব নিয়ম জানা ও পালন করা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েলফেয়ার কমিটির রিপোর্ট হইতে জানা যায়, আপনাদের কলেজে ৪২% জন কুব্জদেহ; ২০% জন চোখ খারাপ রাখিয়াছে; ১৩% জন আংশিকভাবে চোখের চিকিৎসা করিয়াছে; ৩৬% জন ছাত্রের দাঁত খারাপ; ২৯% জন

অন্তপ্রকার শারীরিক দোষ-বিশিষ্ট; ৬৯% জন কোন না কোন শারীরিক দোষযুক্ত। এই তালিকা অবহেলার যোগ্য নহে। সমগ্র বাঙ্গালা জুড়িয়াই এই অবস্থা।

"এখানকার ছাত্রগণ, তোমরা অল্প খরচে যতদূর ভাল শিক্ষা পাইতে হয় পাইতেছ। তোমাদিগকে একটা কথা স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি। তোমাদের নিজেদের অবস্থার সঙ্গে গ্রামবাসীদের অবস্থার তুলনা কর। তোমরা কোথায়, তারা কোথায়! চাষবাসের উন্নতির জন্য রয়েল কমিশন বসিয়াছে। কিন্তু চাষারা যেখানে প্রায় সম্পূর্ণ নিরক্ষর সেখানে কিরূপে তাদের উন্নতি সাধিত হইবে? সমগ্র গ্রামগুলি অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। সেখানে শিক্ষার জন্য টাকা দরকার। টাকা খরচ করিতে হইলে সেখানেই আগে করা উচিত।"

হরিদ্বারে ঋষিকুল

ঋষিকুল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। ইহার প্রধান অঙ্গ হইতেছে:—

(১) ধর্ম্ম-শিক্ষা।

(২) পার্থিব শিক্ষা।

(৩) শিল্প বা ব্যবসায়-শিক্ষা।

ধর্ম্মশিক্ষার জন্য এই আশ্রমে ব্রহ্মচর্য্য-পালনের বিধি রহিয়াছে।

পার্থিব শিক্ষা-বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষ বহু অসুবিধা ভোগ করিতেছেন। পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয়কে মিলাইয়া একটা-কিছু গড়িয়া তোলা লক্ষ্য। উহাকে কাজে খাটাইতে গিয়া বেগ পাইতে হইতেছে। পড়ানো হইতেছে শাস্ত্র, সংস্কৃত সাহিত্য, ইংরেজী, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, চিত্রাঙ্কন, আয়ুর্ব্বেদ ইত্যাদি।

শিল্প-শিক্ষা বিভাগে মিস্ত্রিগিরি, তাঁত, বাগান করা ও কৃষি আছে।

এইরূপে নিম্নলিখিত বিভাগগুলি ভালরকম গড়িয়া উঠিয়াছে:—

(১) ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা। বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, কর্ম্মকাণ্ড এবং জ্যোতিষ ইহার অন্তর্গত।

(২) কলেজী বিষয়। সংস্কৃত, ইংরাজী ইত্যাদি।

(৩) আয়ুর্ব্বেদ ও অ্যালোপ্যাথী।

(৪) শিক্ষকের শিক্ষা।

(৫) বক্তা তৈয়ারী।

(৬) শিল্প-বিজ্ঞান।

মায়লাপুরে রামকৃষ্ণ মিশন

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় গত ৩০শে নবেম্বর ১৯২৬ মায়লাপুর রামকৃষ্ণ মিশন হোম পরিদর্শন করিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষ্যে তিনি নিম্নরূপ বলিয়াছেন:—

"আমি ভারতের বহু বিভিন্ন স্থানে সরকারী ও বে-সরকারী বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান দেখিয়াছি। কিন্তু এরকম একটা সুন্দর প্রতিষ্ঠান থাকিতে পারে, ইহা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। যেদিকে আমি যাই, যে কোনো বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত করি, আমি তারই নির্দ্দোষ শুভ্রতা, পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া অবাক হইয়া যাই। আ! আপনারা এস্থান হইতে উচ্চ-নীচের প্রভেদ ঘুচাইয়া দিয়াছেন দেখিয়া আমার অত্যন্ত আনন্দ হইতেছে। আপনাদের এক বিশেষত্ব দেখিতেছি নিজের পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা। সেই উদ্দেশ্যে এখানে আপনাদিগকে মিস্ত্রিগিরি তাঁত-বোনা, কারপেট তৈয়ারী, কামারের কাজ ইত্যাদি শিখানো হইতেছে। আমি দেখিতেছি, এখানে প্রত্যেকেই নিজের কাপড়-চোপড় ও থালাবাটি নিজে ধোয়। আমিও আমার কাপড় নিজেই ধুই। নিজের উপর নির্ভর করার মত সুখ আর নাই। আমাদের ছেলেরা প্রাসাদ-তুল্য হোষ্টেল ও হোমে বাস করিয়া নিজেদের পাড়াগেঁয়ে জিনিষগুলিকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করে, শরীর খাটাইয়া কাজ করাকে হীন চক্ষে দেখে। আপনারা এখানে তা হইতে দেন নাই।

"আপনাদিগকে দেখিয়া আমার বুকার ওয়াশিংটনের জীবনী মনে পড়িতেছে। তাঁর আত্মজীবনীখানি আপনাদের প্রত্যেকের পড়া উচিত।

"জাপানে দেশপ্রীতিই ধর্ম্ম। তথায় এক পরিবারে বিভিন্ন বিশ্বাসী লোক থাকিতে পারে। কিন্তু তাদের ধর্ম্ম এক দেশ-প্রীতি। আশা করি আপনারা সে দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবেন।

"আমি ধর্ম্ম সম্বন্ধে আপনাদের উদারতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। সকল ধর্ম্মের গোড়ার কথা এক, একথা আপনারা বুঝিয়াছেন।"

কৃষি-শিক্ষার পরীক্ষা

কিছুদিন আগে বাঙ্গালা দেশের কৃষি-সমস্যাগুলির আলোচনা করিবার জন্য গবর্মেণ্ট এক কমিটি বসাইয়াছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপাল ষ্টেপ্‌লটন সাহেব, বাঙ্গালার কৃষিবিভাগের সহকারী ডিরেক্টর প্রভৃতি সেই কমিটির সভ্য ছিলেন। এই কমিটি পঞ্জাবের জেলায় জেলায় ঘুরিয়াছিল। কারণ সেখানে কৃষি স্কুল-পাঠ্য বিষয়।

সেই কমিটির নির্দ্দেশ-অনুযায়ী গবর্মেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কতকগুলি মধ্য ইংরেজী স্কুল বাছিয়া লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে, কৃষি-বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে কি না। প্রত্যেক স্কুলের খামারের জন্য কয়েক একর জমি থাকিবে। ছেলেরা যাতে লাঙ্গল ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির সাহায্যে কাজ করিতে পারে সেজন্য তাদের টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া জমি দেওয়া হইবে। সেখানে তারা হাতে হাতিয়ারে কাজ করিবার শিক্ষা পাইবে। গবর্মেণ্ট দুইটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়েও এই পরীক্ষায় কি ফল হয় দেখিতে মনস্থ করিয়াছেন।

প্রথমতঃ শিক্ষক গড়িয়া তোলাই কার্য্য হইবে। চাষীদের সহিত যাদের অল্পবিস্তর সম্পর্ক আছে, অথবা যারা নিজে চাষী তাদের দাবীই আগে। তারা ঢাকা অ্যাগ্রিকালচার ফার্ম্মে শিক্ষা পাইবে।

ভারতীয় মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক কার্ভে পুণা শহরে স্থাপিত ভারতীয় মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা।

তিনি বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়টি তিনটি মূল সূত্রের উপর স্থাপিত। (১) মাতৃভাষা এখানকার শিক্ষার বাহন, (২) শিক্ষাপদ্ধতি ভারতীয় মহিলার উপযোগী, (৩) আত্ম-নির্ভর ও আত্মসম্মান-বোধ এ শিক্ষার মধ্যে পুরাপুরি আছে।

বিখ্যাত ধনকুবের স্যার বিঠলদাস ঠাকুর্সে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে ১৬ লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করিয়াছেন। ইহার বর্ত্তমান মূল্য সাড়ে এগার লক্ষ টাকা। বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় মাত্র ইহার সুদ ভোগ করিবার অধিকারী; কারণ স্যার বিঠলদাসের খয়রাতের একটি সর্ত্ত এই যে, সম পরিমাণ টাকা সাধারণের নিকট হইতে তোলা চাই। অধ্যাপক কার্ভে ও অন্যান্য কর্ম্মীদের চেষ্টায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ইতিমধ্যেই সংগৃহীত হইয়াছে। এখনও আট লক্ষ টাকা তুলিতে হইবে।

কলিকাতা, নিউইয়র্ক ও লণ্ডন শহরে জমির দাম

সম্প্রতি লণ্ডনের রয়াল সোসাইটি অব্ আর্টস গৃহে কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের কার্য্যাবলী-সম্পর্কিত এক আলোচনা সভায় কলিকাতা কর্পোরেশ্যনের ভূতপূর্ব্ব প্রধান কর্ত্তা শ্রীযুক্ত চার্লস পাইন কলিকাতা, লণ্ডন ও নিউইয়র্ক শহরের এবং শহরতলীর জমির দাম সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বোম্পাস তাঁহার প্রবন্ধে যুদ্ধের পূর্ব্বে বড়বাজার অঞ্চলের জমির দাম গড়ে বিশ হাজার পাউণ্ড স্থির করেন। শ্রীযুক্ত পাইন ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন, তিনি তাঁহার চোখের সামনে প্রতি কাঠা নব্বই হাজার টাকায় বা প্রতি একর চারি লক্ষ পাউণ্ড মূল্যে বড় বাজার অঞ্চলের জমি বিক্রয় হইতে দেখিয়াছেন।

লণ্ডন শহর ও অন্যান্য পাশ্চাত্য শহরের তুলনায় কলিকাতার জমির দর অসম্ভব রকম বেশী বলা চলে না। লণ্ডনের জমির দাম এখন একটু চড়িতে পারে কিন্তু সাধারণতও প্রতি বর্গফুট ২০ হইতে ৩৫ পাউণ্ড দরে অর্থাৎ প্রতি একর ৮৫০,০০০ ও ১,৫০০,০০০ পাউণ্ডের মধ্যে বিকায়। নিউইয়র্কের ওয়াল ষ্ট্রীট, ব্রডওয়ে প্রভৃতি বিখ্যাত অঞ্চলে প্রতি বর্গফুট ১৬০ পাউণ্ডে অর্থাৎ প্রতি একর ৭০ লক্ষ পাউণ্ডে বিক্রী হয়। শ্রীযুক্ত পাইন বলেন, কলিকাতার সেরা অঞ্চলের জায়গার দাম লণ্ডনের সেরা অঞ্চলের তুলনায় দশ ভাগের এক ভাগ।

শহরতলীর জমির দাম

শ্রীযুক্ত পাইনের মতে কলিকাতার মধ্যস্থলের জমির দাম লণ্ডনের মধ্যস্থলের জমির দামের চাইতে ঢের কম হইলেও কলিকাতার শহরতলীর জমির দাম লণ্ডনের শহরতলীর চাইতে বেশী।

উইম্‌বল্ডন প্রভৃতি পাড়ায়, যেখানে ভাল ভাল রাস্তা, জল-চলাচলের পয়ঃপ্রণালী ও অন্যান্য সুবিধা আছে, সেখানকার প্রতি একর জমির দাম এক হাজার থেকে দেড় হাজার, এমন কি দুই হাজার পাউণ্ড পর্য্যন্ত। অনুন্নত সুবার্ব্বণ প্রদেশের এক একর জমির দাম দু'শ' থেকে তিনশ' পাউণ্ড পর্য্যন্ত। কলিকাতার শহরতলীর এ রকম পাড়ায় জমির দাম শ্রীযুক্ত পাইন ও শ্রীযুক্ত বোম্পাসের মতে একর প্রতি পাঁচ হাজার পাউণ্ড।

পাইন সাহেব ১৯২২ সনে কলিকাতা ত্যাগ করেন। ঐ সময় জঙ্গল ছাড়া কলিকাতার সুবার্ব্বণ অঞ্চলের এক কাঠা জমি হাজার টাকায় পাওয়া এক প্রকার দুঃসাধ্য ছিল।

পাইন সাহেব বলেন ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট কায়েম হইবার পূর্ব্বে শহরতলীতে দশ বিশ একর জমি একরূপ দুষ্প্রাপ্যই ছিল। ট্রাষ্টের কল্যাণে এখন শত শত একর জমি পাওয়া যায়।

কলিকাতা হইতে কয়লা রপ্তানি

ইণ্ডিয়ান মাইনিং অ্যাসোসিয়েশ্যনের এক সভায় প্রকাশ :—

"পোর্ট কমিশনারগণের সভাপতি-কর্ত্তৃক নাকি জানান হইতেছে যে, ১৯২৬ সনের ২১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত খিদিরপুর ডক হইতে ১,৫৭২,০০০ টন ও গার্ডেন রীচ হইতে ৩৫৫০০০ টন কয়লা বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। কিন্তু ১৯২৭-২৮ সনে এরূপ রপ্তানির আশা করা যায় না। কারণ, বিলাতে কয়লার খনিতে ধর্ম্মঘট বন্ধ হওয়ায়, দক্ষিণ আফ্রিকার কয়লার সহিত প্রতিযোগিতা ইতিমধ্যেই টের পাওয়া যাইতেছে।"

বৃটিশ রপ্তানি কমিতেছে

"নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরি"তে অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী ষ্টানলী এম, ব্রুস লিখিতেছেন,—"বৈদেশিক প্রতিযোগিতাই যে বিলাতের আর্থিক সঙ্কটের একমাত্র কারণ সে সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। ১৯১৩ সন থেকে মূল্যের তরফ হইতে আমেরিকার শিল্পজাত দ্রব্য শতকরা ৬০ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীরা নিজেই এই মাল সম্পূর্ণ ভোগ করিতে সমর্থ নয়। দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে যুক্তরাষ্ট্রের মাল ইহার মধ্যেই প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। ইয়োরোপে বৃটিশ মাল-পত্রের চাহিদা কমিবার সঙ্গে সঙ্গে দেশী মালের উৎপাদন ও কাটতি হুহু করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে। জার্ম্মাণির ইস্পাত-উৎপাদন এই সময়ের মধ্যে ডবল দাঁড়াইয়া গিয়াছে এবং ইহার রপ্তানি শতকরা ৩৬·৫ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফরাসী বস্ত্র-শিল্পও ফাঁপিয়া উঠিতেছে এবং গত তিন বৎসর ধরিয়া ফ্রান্সের আমদানির চাইতে রপ্তানি বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। ইতালি কৃত্রিম রেশম নির্ম্মাণে পয়লা নম্বর বলিয়া দাবী করিতে অধিকারী। তা ছাড়া, ১৯২৫ সনে তার বস্ত্র-শিল্পজাত মাল চরমে আসিয়া ঠেকিয়াছে। এই সকল মালের রপ্তানি ১৯২৩ সনের চাইতে শতকরা ৪০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিগত তিন বৎসরে চীন মুল্লুকে বৃটিশ রপ্তানি অনেক কমিয়া গিয়াছে। বৃটিশ পণ্যদ্রব্য চীনে ½ ভাগ ও জাপানের হাট-বাজারে অর্দ্ধেক হ্রাস পাইয়াছে।

ল্যাঙ্কাশিয়ারের বস্ত্র-শিল্প

নেশ্যন পত্রিকার ১৩ই নবেম্বরের সংখ্যায় শ্রীযুক্ত জে, এম, বেইন্‌স্ "ল্যাঙ্কাশিয়ারের বস্ত্র-শিল্পের অবস্থা" নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে, ১৯১৩ সনের তুলনায় জাপান তুলা-শিল্পে তাহার ব্যবসার বহর শতকরা ৮০ ভাগ বাড়াইয়াছে। পক্ষান্তরে গ্রেটবৃটেনকে বাধ্য হইয়া তুলা-শিল্পের কাজ শতকরা ৩০ ভাগ কমাইতে হইয়াছে।" বিভিন্ন দেশের তুলার চাহিদা আলোচনা করিয়া যুদ্ধের পর হইতে ল্যাঙ্কাশিয়ারের বস্ত্র-শিল্পের কি ভয়ানক ক্ষতি সাধিত হইয়াছে

তাহা তিনি ঐ প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন। তাঁহার মতে ইহার কারণ এই যে, বৃটিশ মালের ভূতপূর্ব্ব খরিদ্দারেরা স্বদেশী মাল দ্বারা নিজেদের চাহিদা মিটাইতে উদ্যোগী হইয়াছে। অন্যদিকে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী জাপান বস্ত্র-শিল্পের বাজার দখল করিয়া বসিতেছে।

"ষ্টেট্‌স্‌ম্যান" ও ভারতীয় বেকার

ষ্টেট্‌স্‌ম্যান সংবাদপত্রের "ভারতীয় বেকার-সমস্যা" নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধের লেখক "অর্থকরী বিদ্যা" সম্বন্ধে লিখিতেছেন, "ইহা খুবই সত্য যে, ব্যবসা-প্রচেষ্টার চাহিদা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অর্থকরী শিক্ষাও প্রসার লাভ করিবে। ভারতের বিভিন্ন কৃষি-কলেজ, শিল্প-শিক্ষালয় ও বাণিজ্য-বিদ্যালয়ের নজির হইতে দেখা যায় যে, ঐ সমস্ত বিদ্যা-পীঠের অনেক ছাত্রকে কর্ম্মাভাবে বেকার বসিয়া থাকিতে হয়। একদিকে পুঁজির অব্যবহার, পরস্পরের মধ্যে আস্থার অভাব, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও উদ্যমের অভাব এবং অন্যদিকে দেশের লোকের ক্রয়-ক্ষমতার দৈন্য ও বিদেশে ভারতীয় জিনিষের সীমাবদ্ধ কাটতি দেশের আর্থিক উন্নতির প্রধান অন্তরায়। তবে দেশে বিরাট ভাবে চাষ-আবাদের কাজ আরম্ভ করিবার আয়োজন চলিতেছে দেখিয়া অনেকটা আশা হয়। এবারকার রাজকীয় কৃষি-কমিশনের সাক্ষ্য-বিবরণীতে দেখা যায় যে, ভারতীয় কৃষি-কলেজের যুবক-গণকে কৃষি-দপ্তরের কর্ম্মচারিরূপে গড়িয়া তোলাই এই সকল কৃষি-বিদ্যাপীঠের মুখ্য উদ্দেশ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটগণও কেবলমাত্র কলেজে ধনবিজ্ঞান শিক্ষা দিবার উপযুক্ত হইবার জন্যই ঐ বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া থাকেন।

বর্ত্তমান বেকার-সমস্যার মূল কারণ হইতেছে যুবকদের সরকারী বা অন্যান্য বিদেশী ফার্ম্মে চাকুরী অন্বেষণের মনোবৃত্তি। কোনো নূতন ব্যবসা আরম্ভ করিবার চেষ্টা ও ক্ষমতা তাঁহাদের নাই। এবং কেহই এমন শিক্ষা লাভ করেন নাই, যাহা দ্বারা আর্থিক উন্নতি করার চিন্তা তাঁহাদের মনে জাগিতে পারে। বর্ত্তমানে ছাত্র-সমাজকে এই দিক্ দিয়া উপযুক্ত করিয়া তোলা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তব্য। ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে তাঁহাদের বেশী রকম ঝোঁক জন্মাইবার জন্য ও এদিকে তাঁহাদের কর্ম্মকুশলতা বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

অর্থকরী বিদ্যার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের আর্থিক উন্নতির আন্দোলন বর্দ্ধিত না হইলে বর্ত্তমান বেকার-সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা অর্জ্জন বাস্তব কর্ম্মক্ষেত্রেই ঘটে। দেশের আর্থিক প্রচেষ্টার বহর আগে বাড়াইতে হইবে। আর্থিক উন্নতির জন্য নব নব প্রতিষ্ঠান খুলিতে হইবে। টেক্‌নিক্যাল এবং কমার্শ্যাল এডুকেশন বা শিল্প ও বাণিজ্য শিক্ষা পরের কথা।

জগতের সমস্ত মজুর একত্র হও

"ইন্টারন্যাশ্যনাল টেক্সটাইল ওয়ার্কস ডেলিগেশন" মান্দ্রাজ পৌঁছিলে ১৪ই ডিসেম্বর সন্ধ্যাকালে পেরাম্বুর ব্যারাকে এক মহাসভা হয়। সেই উপলক্ষ্যে ১৫০০০ হাজার মজুর একত্র হইয়াছিল।

ডেলিগেশনের দলপতি রাইট অনারেব্‌ল টম্‌শ বলিলেন, "আমি পৃথিবীর সঙ্ঘবদ্ধ মজুরদের অভিবাদন আপনাদিগকে জানাইতেছি। জগতের সকল মজুরের আশা এই, তারা নিজ নিজ ইউনিয়ানগুলিকে আপনার মনে করিবে, সেগুলিকে প্রাণপণে রক্ষা করিবে, সেগুলিকে শৃঙ্খলা ও প্রণালী মত চালাইবার এবং একত্র করিবার ভার লইবে। ইউনিয়ানে ইউনিয়ানে ঝগড়াঝাটি শোভন নহে। আশা করি মান্দ্রাজের বর্ত্তমান ঝগড়া মিটিয়া যাইবে। ভারতের নিরক্ষরতার পরিমাণ দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যাইতে হয়।

"আমাদের বিশ্বাস সৃষ্টির সব চেয়ে উৎকৃষ্ট জীব হইতেছে মজুর। আমরা চাই যে, প্রত্যেক মজুর (পুরুষ এবং স্ত্রীলোক) কাজ করিতে পারে বলিয়া গৌরব অনুভব করিবে। কারণ উৎপাদকেরা না থাকিলে এ জগৎ টিঁকিয়া থাকিতে পারিত না।"

শ্রীযুক্ত হিণ্ড্‌লে বলেন,—"২৫ বছর আগে কেহ কল্পনাও করে নাই যে, মজুরগণ রাষ্ট্রের শাসন-যন্ত্র চালাইবে। এত

অল্প সময়ের মধ্যে যদি ইংরেজ মজুর এরূপ শক্তিশালী হইতে পারে, তবে ভারতের মজুরই বা কেন না পারিবে? প্রত্যেক মজুর তার নিজ ইউনিয়ানকে সুদৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকুক।

শ্রীযুক্ত ফ্রয়েড হেবগলের,—"টেক্সটাইল ডেলিগেশনের এই মোলাকাৎ ইয়োরোপ ও ভারত উভয়কেই সাহায্য করিবে। আমার আশা আছে একদা মজুরদের মধ্য হইতেই এখানে জাতীয় নেতার উদ্ভব হইবে। ভারতবর্ষে মজুরদের একত্র ও সঙ্ঘবদ্ধ করিবার কাজ সবে আরম্ভ হইয়াছে। তা যেন কোনদিন না থামে। শিক্ষা চাই। কাজ করিবার সর্ত্ত-গুলিকে আরো ভাল করা চাই। এর জন্য লড়িতে হইবে।"

সভাপতি শ্রীযুক্ত শিবরাও,—"মান্দ্রাজের মজুর ইউনিয়ান জগতের অন্য সব মজুরদের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে। বিজয়লাভের পথ আত্মনির্ভর ও সঙ্ঘবদ্ধতা।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সচ্ছলতা

শ্রীযুক্ত হুভার আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের একজন সচিব। তিনি বাণিজ্যিক দপ্তরখানার কাগজপত্রগুলি ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া পরম সন্তোষের সহিত মন্তব্য করিতেছেন, "আর্থিক হিসাবে ১৯২৫-২৬ সনটা কি সুবৎসরই গেল! আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে এত প্রচুর উৎপাদন ও ভোগ, এতটা আমদানি-রপ্তানি এবং এত উঁচু মজুরির হার আর কোনদিন হয় নাই।

"ধরিতে গেলে বেকার-সমস্যা এখানে আদৌ বর্ত্তমান নাই। যুক্তরাষ্ট্রের বর্ত্তমান জীবন-যাত্রার মাপকাঠি অন্য সব দেশের চেয়ে উঁচু। নিজ যুক্তরাষ্ট্রে জীবন-যাত্রার ধারা কোনদিন এত উঁচু ছিল না।"

বৃটিশ ব্যবসার সঙ্ঘ-গঠন

অধুনা বিলাতী বড় ব্যবসাগুলির একটা বিশেষত্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। দুই বা বহু ব্যবসা একত্র মিলিয়া একটা কারবারে পরিণত হইতেছে। বর্ত্তমানের এইরূপ ঘটনা হইতেছে "কেমিকেল কম্‌বাইন।" ইহার পুঁজিপাটার পরিমাণ ৫ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড।

ভূতপূর্ব্ব অর্থব্যবস্থা-সচিব ফিলিপ স্নোডন সাহেব এই প্রবণতার প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন,—

"এই মিলনগুলি জাতীয় না হইয়া ক্রমে বিশ্বজনীন হইয়া দাঁড়াইবে। আন্তর্জ্জাতিক ট্রাষ্ট যদি গড়িয়া উঠিতে পায় তবে "জগৎ-জোড়া শান্তি"র পথ অনেকটা পরিষ্কার হইবে।

"আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইল ট্রাষ্টের দেশ। সেখানে আমি এই সমস্যাটা ভাল করিয়া আলোচনার পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি যে, যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাষ্টের দরুণ দর চড়িয়া যায় নাই।"

রুশিয়ায় কয়লার খাঁকতি

সোভিয়েট রুশিয়া কয়লা সম্বন্ধে বিদেশের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য। বিদেশে কয়লা রপ্তানি করা তাহার পক্ষে কঠিন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও রুশিয়ার বাণিজ্য-সচিব এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন,—"বিলাতে যে ধর্ম্মঘট চলিয়াছে তাহার সুযোগ লইয়া আমরা সেদেশে কয়লা পাঠাইতে চাই।" আসল কথা রুশিয়াকে বিদেশে কয়লা কিনিতে হয়। প্যারিসের "জুর্ণে অ্যাঁদুস্ত্রিয়েল" দৈনিক বলিতেছেন,—"রুশিয়ার যত বড় মুখ না তত বড় কথা!"

বার্লিনে টেক্‌নিক্যাল বক্তৃতা

সম্প্রতি বার্লিনের শিল্প-পরিষদে বাস্তুশিল্পী পাউলসেন "আমেরিকার ঘরবাড়ী" সম্বন্ধে একটা বক্তৃতা করিয়াছেন। টেক্‌নিক্যাল কলেজে এঞ্জিনিয়ার বুফ্‌সের বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হইয়াছে তুর্কীস্থানের ধনসম্পদ্ সম্বন্ধে। বার্লিনের রেল-ট্রাম ও রাস্তাঘাট সম্বন্ধে এঞ্জিনিয়ার আড্‌লার বক্তৃতা দিয়াছেন। পেরুদেশের টেক্‌নিক্যাল উন্নতি সম্বন্ধে এক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বক্তা ছিলেন ফোন হাস্‌সেল।

আর্থিক জার্ম্মাণির নানা তথ্য

যেনার অধ্যাপক আবেল লণ্ডনে কতকগুলি বক্তৃতা দিয়াছেন। সেই উপলক্ষ্যে ইংলণ্ড ও জার্ম্মাণির জাতীয় স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা করা হইয়াছে।

শিল্প-বিপ্লব ইংলণ্ডে জার্ম্মাণির পূর্ব্বে হইয়াছে। আজ-কালকার উন্নত প্রণালীতে স্বাস্থ্যতত্ত্বের প্রচারও ইংলণ্ডে আগে হইয়াছে।

অধুনা জার্ম্মাণিতে ৬ কোটি ৭০ লক্ষ লোক বাস করিতেছে। ইহা অপেক্ষা কিছু বেশী আয়তনের জমিতে ভরণপোষণ চলিতেছে ফ্রান্সের মাত্র ৪ কোটি লোকের।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণির শহরগুলিতে বাস করিত শতকরা ৩২ জন। আজ বাস করিতেছে শতকরা ৬৪·৩৫ জন।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণির মৃত্যু-হার ইংলণ্ডের চেয়ে বেশী ছিল। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ইহা কম হইয়াছে।

জার্ম্মাণির সব দিকেই দেশ রহিয়াছে। তবু তথায় বসন্তের ভয় নাই। ১২ বৎসর বয়সে পুনর্ব্বার টীকা লওয়া বাধ্যতামূলক। গত তিন বৎসরে জার্ম্মাণিতে বসন্ত হইয়াছিল ৫৭ জনের। তার অধিকাংশই বিদেশী। ঠিক ঐ সময়ে ইংলণ্ডের বসন্ত-রোগীর সংখ্যা ছিল ১১,৬৩০।

জার্ম্মাণিতে যক্ষ্মারোগী মরিয়াছে প্রতি ৭ জনের মধ্যে ১ জন।

জার্ম্মাণিতে মদ্যপান যুদ্ধের পর কমিয়াছে।

আমেরিকার ঐশ্বর্য্য

প্রেসিডেণ্ট কুলিজ কংগ্রেসে তাঁর যে "বাণী" পাঠাইয়াছিলেন, তার মধ্যে বলিতেছেন, "আরো ব্যয়-সংক্ষেপ কর। এবারে ধরা হইয়াছে যে, বাজেটে উদ্বৃত্ত থাকিবে ৩৮ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার। এর কিছুটা যাওয়া উচিত কর-ভার কমাইবার জন্য।

"এই আর্থিক বৎসরে কাষ্টম্‌স্ আদায় ধরা হইয়াছে ৬১ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার। এত আয় কোন দিন হয় নাই।

"আমদানির ৬৫% হইল মাশুল-শূন্য। বৃটেন ব্যতীত আর কোনো দেশে যুক্তরাষ্ট্রের মত এরূপ অধিক পরিমাণ শুল্কহীন আমদানি আসিতে দেওয়া হয় না। সুতরাং আরও মাশুল মাপ করা হইবে এরূপ আশা করা অসঙ্গত।

"৪০ লক্ষ বস্তা তুলা মজুত রাখিবার জন্য ও চলাচাল করিরার জন্য যথেষ্ট টাকা পৃথক্ করিয়া রাখা হইয়াছে। কিন্তু আগামী বৎসর তুলা-চাষের জমির আয়তন যদি ⅓ অংশ কমাইয়া দেওয়া না হয়, তবে তুলা-সমস্যা প্রবল হইয়া দাঁড়াইবে।"
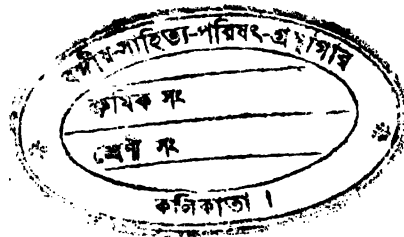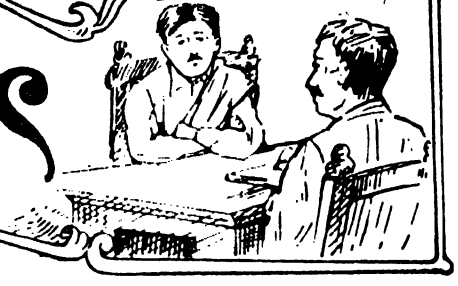
মেথরের জীবন-যাত্রা

[কলিকাতার এক মেথরের সঙ্গে শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে মহাশয়ের যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল নিম্নে তাহার সার প্রদত্ত হইতেছে।]

প্রশ্ন—তুমি কি মিউনিসিপ্যালিটির মেথর ?

উত্তর—আজ্ঞে হাঁ।

প্রঃ—তোমার বাড়ী কোথায় ?

উঃ—পশ্চিমে, গণ্ডা জেলায়।

প্রঃ—তুমি কতদিন এই কলিকাতা শহরে আসিয়াছ ?

উঃ—ত্রিশ বৎসর।

প্রঃ—তুমি কি এই ত্রিশ বৎসর ধরিয়া মিউনিসিপ্যালিটির কাজ করিতেছ ?

উঃ—আজ্ঞে হাঁ।

প্রঃ—তুমি কত টাকা মাহিয়ানা পাও ?

উঃ—আমাকে এখন ১২৲ টাকা করিয়া দেয়।

প্রঃ—তা ছাড়া এই রকম বাড়ী বাড়ী কাজ করিয়া কিছু পাও ?

উঃ—আজ্ঞে হাঁ।

প্রঃ—ফী বাড়ীতে কত পাও ?

উঃ—তার কোনো ঠিক নাই, কেহ ॥৹ আনা, কেহ ৸৹ আনা, কেহ ১৲ টাকাও দেন। আবার ।৹ আনাও আছে।

প্রঃ—তোমার কোনো একটা নির্দ্দিষ্ট হার বাঁধা নাই ?

উঃ—আজ্ঞে না।

প্রঃ—এই রকম বাড়ী বাড়ী কাজ করিয়া মাসে কত উপার্জ্জন কর ?

উঃ—সাধারণতঃ ১০৲ হইতে ১২৲ পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিয়া থাকি।

প্রঃ—দেশে তোমার কোনো জায়গা-জমি আছে কি ?

উঃ—আজ্ঞে না।

প্রঃ—প্রতিমাসে তোমার কত টাকা করিয়া দেশে পাঠাইতে হয় ?

উঃ—মহাশয়, দেশে আমার কেহই নাই। বাপ মা মরিয়া গিয়াছে। সুতরাং দেশে কোনো টাকাই পাঠাইতে হয় না।

প্রঃ—তোমার পরিবারে তোমরা কতজন লোক ?

উঃ—আমি, আমার স্ত্রী ও দুইটি মেয়ে। তার মধ্যে বড় মেয়েটির বিবাহ দিয়া চুকাইয়াছি। ছোটটি মাত্র ৫ বছরের।

প্রঃ—তোমার স্ত্রীও কি কাজ করে ?

উঃ—আজ্ঞে হাঁ, সেও মিউনিসিপ্যালিটির কাজ করে—সড়ক ঝাট দেয়।

প্রঃ—সে মাসে কত পায় ?

উঃ—১০৲ টাকা।

প্রঃ—এখন বল দেখি তোমাদের মাসিক আয় কত দাঁড়ায় ?

উঃ—এই ৩০।৩২ টাকা।

প্রঃ—ইহার বাহিরে তোমাদের কোনো আয় নাই ?

উঃ—আজ্ঞে না।

প্রঃ—তোমার কাজের সময় কখন ?

উঃ—সকাল ৮টা পর্য্যন্ত আমাকে মিউনিসিপ্যালিটির কাজে

থাকিতে হয়। পরে বাড়ী বাড়ী ঘুরিতে আমার বেলা ১২টা ১টা বাজিয়া যায়। তারপর সারাদিন আমি খালাস।

প্রঃ—তাহা হইলে বেলা ১২টা ১টার পর আর তুমি কোনো কাজ কর না?

উঃ—আজ্ঞে না।

প্রঃ—কেন কর না? কোনো সহজ কাজ তো করিতে পার। তাতে আরো দু'পয়সা তোমার ঘরে আসিতে পারে। এই সময়টা তো মিথ্যা নষ্ট হইতেছে।

উঃ—না বাবুসাহেব, এই বয়সে এর বেশী আর খাটিতে পারি না।

প্রঃ—জামাই কি করে?

উঃ—পোর্ট কমিশনারের ওখানে কাজ করে।

প্রঃ—মাসে কত টাকা মাহিয়ানা পায়?

উঃ—১৪৲ টাকা।

প্রঃ—সে কি তোমাদের সাহায্য করে?

উঃ—তার সাহায্য আমি কেন লইতে যাইব? আমিই বরং মাঝে মাঝে আমার মেয়েকে এটা সেটা পাঠাইয়া থাকি।

প্রঃ—তোমার মেয়ে-জামাই তোমার সঙ্গে থাকে না?

উঃ—আজ্ঞে না। তারা আলাদা থাকে। তবে মেয়ে কখনো কখনো আসিয়া আমাদের সঙ্গে থাকে। তখন খরচ আছে।

প্রঃ—তুমি মিউনিসিপ্যালিটির কোন শড়ক ঝাট দাও?

উঃ—শোভাবাজার।

প্রঃ—থাক কোথায়?

উঃ—জানবাজার।

প্রঃ—তোমাকে নিশ্চয় ঘর ভাড়া করিয়া থাকিতে হয়। কত করিয়া ভাড়া দাও?

উঃ—মাসে ৫৲ টাকা।

প্রঃ—তোমরা কি অন্য দশজন মেথরের সঙ্গে থাক, না একা থাক?

উঃ—এক ব্যবসায়ী আর দশজনও সেখানে থাকে।

প্রঃ—তোমরা কি রকম ঘরে থাক?

উঃ—আমরা একটা বাড়ীর একতলার কুঠ্‌রীগুলিতে থাকি। এক এক জন এক একটা কুঠরী লইয়া থাকি।

প্রঃ—ঘরভাড়ায় যায় ৫৲ টাকা। বাকী টাকার কত কি বাবদ খরচ কর? খাওয়ার জন্য প্রতিমাসে কত করিয়া খরচ কর?

উঃ—১২৲।১৪৲ টাকা।

প্রঃ—গরমের জন্য অর্থাৎ জামা-কাপড় কিনিতে কত দাও?

উঃ—মহাশয়, আপনার আশীর্ব্বাদে আমাকে জামা-কাপড়ের জন্য এক পয়সাও খরচ করিতে হয় না। অনেক বাড়ীতে কাজ করি। কেহ একটা ধুতি দিলেন, কেহ একটা কোট দিলেন, কেহ বা একটা গামছা দিলেন। পূজা-পার্ব্বণ তো আছেই। সুতরাং জামা-কাপড় কিনিবার কথা আমাকে কোন দিন ভাবিতে হয় না।

প্রঃ—বটে! তবে ত তোমার প্রতিমাসে টাকা বার তের বাঁচিয়া যায়। এই টাকা দিয়া তুমি কি কর? কোথায় জমা রাখ?

উঃ—হায় বাবুসাহেব! আমার কি এক পয়সাও জমা রাখিবার উপায় আছে? প্রত্যেক মাসে আমাকে ১৪।১৫ টাকা গণিয়া দিতে হইতেছে সুদ বাবদ।

প্রঃ—কিসের সুদ?

উঃ—যে টাকা ধার লইয়াছিলাম তার সুদ।

প্রঃ—কত টাকা ধার রহিয়াছে?

উঃ—শ' চারেক হইবে।

প্রঃ—কি হারে সুদ দিতেছ?

উঃ—সব সে চড়া হার হইতেছে টাকায় /০ আনা। তবে কাকেও ৫ পয়সা, কাকেও ১০ পয়সা, আর কাকেও বা ১৫ পয়সা দিয়া থাকি।

প্রঃ—সমস্ত টাকাটা কি তুমি একজনের নিকট হইতে ধার লও নাই?

উঃ—আজ্ঞে না, দরকারমত যখন যেখানে সুবিধা

পাইয়াছি ধার করিয়াছি। একজনে অত টাকা ধার দিতেও চায় না।

প্রঃ—কাবুলীদের কাছে টাকা ধার লইয়াছ কি ?

উঃ—আজ্ঞে না। কাবুলীর নিকট হইতে এক পয়সাও ধার লই নাই।

প্রঃ—কাবুলীর কাছে ধার লও না কেন ?

উঃ—কাবুলীরা বড় খারাপ। টাকায় ৵০ আনা সুদের কমে ধার দেয় না। তা ছাড়া তাগাদায় প্রাণান্ত করে।

প্রঃ—তুমি তো বলিলে সুদের জন্যই তোমাকে মাসে মাসে ১৪।১৫ টাকা দিতে হয়। তবে আসলের তুমি কি করিতেছ ? আসলের কত টাকা দাও ?

উঃ—আসলের টাকা আর দিতে পারি কিরূপে ? সুদের টাকা শোধ করিয়া হাতে তো কিছু থাকে না। তারপর অসুখ-বিসুখ আছে।

প্রঃ—এইরূপ ঋণ কি তুমি একাই করিয়াছ, না সব মেথরই তোমার মত ঋণগ্রস্ত ?

উঃ—সকলেরই এক অবস্থা মহাশয়! বাজারে প্রত্যেকেরই দু'শ' পাঁচশ' দেনা আছে।

প্রঃ—এই দেনাটা তুমি কি বাবদ করিয়াছিলে ?

উঃ—অসুখ-বিসুখের জন্য এই দেনা হইয়াছে। আমি যা উপার্জন করি, তা আমার খাই-খরচের পক্ষেই যথেষ্ট নহে। মেয়ের বিবাহে খরচ করিয়াছিলাম, তাতে ঋণ হইয়াছিল। তারপর অসুখ-বিসুখে ঋণ করায় আজ দেনার পরিমাণ এত বাড়িয়া গিয়াছে।

প্রঃ—তুমি কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বে নিজ দেশে কি কাজ করিতে ?

উঃ—আমি বাঁশী বাজাইতাম ও বেতের কাজ করিতাম।

প্রঃ—বাঁশী বাজাইয়া কিছু পয়সা পাইতে কি ?

উঃ—পাইতাম বৈ কি মহাশয়! লোকের বিয়া সাদীতে গিয়া বাঁশী বাজাইয়া আসিতাম। তাতে মাসে ৭।৮ টাকা উপায় হইত। বেতের কাজেও ৮।১০ টাকা মিলিত।

প্রঃ—তুমি ত সেখানে বেতের কাজ করিতে। এখানে আসিয়া তা ছাড়িয়া দিলে কেন ? ১২টা ১টার পর প্রতিদিন তোমার প্রচুর অবসর থাকে। তখন যদি বেতের জিনিষপত্র তৈয়ারী কর তবে আরও দু'পয়সা ঘরে আসে।

উঃ—আমি সেখানে বেতের পেটরা বুনিতাম। অন্য কিছু জানি না। এখানে ধামার চলন। পেটরা বুনিলে কেহ কিনে না। সে কাজে লাভ নাই। তাই আমাকে বাধ্য হইয়া বেতের কাজ ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। মেথরের কাজ তার চেয়ে বেশী সুবিধাজনক বলিয়া মনে হইয়াছে।

প্রঃ—তোমাদের কোন সভা বা আড্ডা বা কোনো রকম দলটল আছে কি ?

উঃ—আজ্ঞে না, আমাদের সে সব কিছু নাই।

প্রঃ—তবে তোমাদের অভাব-অভিযোগ উপরওয়ালারা না শুনিলে কি কর ? তাঁরা যাতে শুনেন তার কি ব্যবস্থা তোমাদের হাতে আছে ?

উঃ—আমাদের এক একজন সর্দ্দার আছে।

প্রঃ—তার কাজ কি ? সে কত টাকা "দর্ম্মাহা" পায় ?

উঃ—তার "দর্ম্মাহা" ১৩৲ টাকা। সে আমাদের শাসন করে—চালায়। আমাদের কোনো-কিছু বলিবার থাকিলে তাহাও তাকে গিয়া বলি।

প্রঃ—আর কিছু উপায় নাই ?

উঃ—একটা খুব বড় অস্ত্র আমাদের হাতে আছে—ধর্ম্মঘট বা হরতাল। ইহাই আমাদের একমাত্র অস্ত্র।

প্রঃ—শুনিয়াছি তোমরা কিছুদিন আগে সকলে মিলিয়া ধর্ম্মঘট করিয়া কাজ বন্ধ রাখিয়াছিলে। আমাদের অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। এরূপ কেন করিয়াছিলে ?

উঃ—আমাদের দর্ম্মাহা বাড়াইবার জন্য।

প্রঃ—আগে কত পাইতে।

উঃ—৮৲ টাকা।

প্রঃ—তোমরা কি করিয়া সকল মেথরকে এক সঙ্গে কাজ ছাড়াইলে ও ধর্ম্মঘট করিয়া কি ফল পাইলে তাহা বল।

উঃ—মহাশয়, আমাদের জন্য মিউনিসিপ্যালিটির কোনো দরদ নাই, বাবুরা আমাদের বিষয় চিন্তা করে না। দেখিতেছেন তো যুদ্ধের পর হইতে অন্নবস্ত্র কিরূপ দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে। কর্ত্তারা তবু চোখ বুজিয়া ছিলেন। আমরা বারবার তাগিদ দিয়াও কোনো ফল পাই নাই। তখন আমরা স্থির করিলাম ধর্ম্মঘট করিব। রাতারাতি সকল মানুষকে জানাইয়া একদিনে একসঙ্গে আমরা কাজ বন্ধ করিয়া দিলাম। আমরা কাজ বন্ধ করিলে কলিকাতা শহরের কি অবস্থা হয় তা জানেন। কাজেই ফলে আমাদের মাহিয়ানা বাড়িয়া ১২৲ টাকা হইল। মাহিয়ানা তো বাড়িল। কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটি আমাদের সহিত সুবিচার করিল না। কথা ছিল, আমাদিগকে কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে ১২৲ টাকা হিসাবে দেওয়া হইবে। অর্থাৎ জিনিষপত্রের দর বাড়ার দরুণ আমরা এই বেশী ৪৲ টাকা যখন হইতে দর বাড়িয়াছে তখন হইতে পাইব। তাহা হইলে আমাদের প্রত্যেকেই হাতে অনেকগুলি করিয়া টাকা পাইতাম। কিন্তু সে টাকা আর আমরা পাইলাম না। আমাদের বিস্তর ক্ষতি হইল।

প্রঃ—তোমাদের ছেলেমেয়েদের পড়াও না?

উঃ—আজ্ঞে হাঁ, একটু একটু পড়াই।

প্রঃ—কি পড়াও?

উঃ—একটু একটু হিন্দী। কেহ বাঙ্গালাও পড়ে।

প্রঃ—কার কাছে পড়ে?

উঃ—মাষ্টার আসিয়া পড়াইয়া যায়।

প্রঃ—মাষ্টারকে পয়সা দিতে হয় কি? কত করিয়া দাও?

উঃ—আমার ছোট মেয়ের পড়া চুকিয়া গিয়াছে। তাকে অল্পস্বল্প হিন্দী লেখাপড়া শিখাইয়াছি। তার আর পড়িবার প্রয়োজন নাই। তাকে ঘরে বসাইয়া রাখিয়াছি।

প্রঃ—কেন?

উঃ—তাকে ২।৩ বছরের মধ্যেই সাদী দিতে হইবে।

প্রঃ—সে কি! এখন তার বয়স মোটে ৫ বছর বলিলে। ৭।৮ বছরেই তার বিবাহ দিতে চাও!

উঃ—আজ্ঞে হাঁ মহাশয়! সেই আমাদের দস্তুর।

প্রঃ—মাষ্টারকে কত করিয়া দিতে হয়?

উঃ—কোনো বাঁধা হার নাই। ‖০, ‖৵০, ৸০, ১৲ যার যেমন খুসী বা সামর্থ্য।

প্রঃ—তোমাদের জন্য কোনো স্কুল তোমাদের পাড়ায় নাই?

উঃ—স্বদেশী বাবুরা একটা স্কুল খুলিয়াছিলেন।

প্রঃ—আর?

উঃ—একটা স্কুল আছে। সেখানে মেথর, মুচি, মুদ্দফরাস ও ডোমের ছেলেরা গিয়া পড়িতে বসে।

প্রঃ—কখন সে স্কুল বসে?

উঃ—রাতে।

প্রঃ—স্কুলের মাহিয়ানা কত করিয়া দিতে হয়?

উঃ—বোধ হয় মাহিয়ানা লাগে না।

প্রঃ—এ স্কুল কার প্রতিষ্ঠিত বলিতে পার?

উঃ—ঠিক বলিতে পারিব না। মনে হয় মিউনিসিপ্যালিটির।

লা জুর্নে অ্যাঁদুস্ত্রিয়েল

প্যারিসের দৈনিক শিল্প-পত্রিকা। জানুয়ারি, ১৯২৭।

দুই লাখ ঘরবাড়ীর ফরমায়েস

ফ্রান্সের গৃহ-সমস্যা স্যাকরার "ঠুকুর ঠকুরে" মীমাংসিত হইবার নয়। এ জন্য চাই "কামারের এক ঘা"। অর্থাৎ দেশব্যাপী সরকারী সাহায্য কয়েক বৎসর ধরিয়া সমাজে নিয়মিতরূপে বর্ষিত না হইলে ফরাসীরা হাঘরে থাকিতে বাধ্য। "কঁসেই ন্যাশন্যাল একনমিক" নামক "জাতীয় আর্থিক পরিষৎ" ফরাসী গবর্মেণ্টকে এইরূপ পরামর্শ দিয়াছেন। একমাত্র পরামর্শ দিয়াই এই "কঁসেই" খালাস নন, উপায়-উদ্ভাবনের পথ বাৎলাইতেও ইহারা কশুর করেন নাই।

ফ্রান্সে বর্ত্তমানে ২,০০,০০০ বাড়ী ঘর নতুন তৈয়ারী করা দরকার। প্রথম পাঁচ বৎসরে এক লাখ তৈয়ারী করা যাইতে পারে। দ্বিতীয় পাঁচ বৎসরে অবশিষ্ট এক লাখ তৈয়ারী হইতে পারে। মোটের উপর ১০ বৎসরের বরাদ্দ। গড়পড়তা বৎসরে ২০,০০০ মোকাম বানাইবার ফরমায়েস।

এক একটা মোকাম তৈয়ারী করিতে লাগে প্রায় ৪০,০০০ ফ্রাঁ (প্রায় ৬,০০০৲)। তাহা হইলে প্রথম লাখ তৈয়ারী করিতে ৪ মিলিয়ার্ড ফ্রাঁ (৬০ ক্রোর টাকা) লাগিবার কথা। শতকরা ৩ হিসাবে সুদ ধরিলে ৪ মিলিয়ার্ড ফ্রাঁর জন্য বৎসরে সুদ গুণিতে হইবে ১২০ মিলিয়ন ফ্রাঁ (অর্থাৎ ১ কোটি ৮০ লাখ টাকা)। সুদের টাকা আসিবে কোথা হইতে?

১ কোটি ৮০ লাখ টাকা সুদ তুলিবার উপায়

এই সমস্যায় সমবায়-সমিতিসমূহের অন্যতম প্রতিনিধি পোআর্স জাতীয় আর্থিক পরিষৎকে কয়েকটা ফন্দি দেখাইয়া দিয়াছেন। পোআর্স দুই প্রণালীতে টাকা তুলিবার কল্পনা করিতেছেন,—প্রথমতঃ নিয়মিত বার্ষিক আদায় অর্থাৎ ট্যাক্‌স; দ্বিতীয়তঃ, এককালীন আদায় পুঁজিভাণ্ডারের জন্য।

ট্যাক্‌সটা হইবে নরম হারের,—কিন্তু যথাসম্ভব সার্ব্বজনিক। আজকাল ফ্রান্সে বাড়ীভাড়া যার পর নাই কম। আইনের সাহায্যে ভাড়াটিয়ারা অল্প ভাড়ায় ঘরবাড়ী পাইতেছে। প্রত্যেক ভাড়ার উপর একটা ট্যাক্‌স বসাইলে ভাড়াটিয়ার গায়ে লাগিবে না। পোআর্স এইরূপে কিছু টাকা তুলিবার পক্ষপাতী। অন্যান্য ট্যাক্‌সও আছে। চড়া হারে ভাড়া দিয়া যে-সকল লোক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে থাকে তাহাদের উপর একটা কর ধার্য্য করা যাইতে পারে। প্রত্যেক শহরে জমিজমার দাম বাড়িয়া যাইতেছে। এই মূল্যবৃদ্ধির উপর একটা ট্যাক্‌স চাপানো অন্যায় নয়। বাগ-বাগিচা, পার্ক ইত্যাদি আরাম-নিকেতনের উপর ট্যাক্‌স চলিতে পারে। বিলাস-হোটেল, বাবুগিরির রেস্তরাঁ, কাফে ইত্যাদিকে ট্যাক্‌স দিতে বাধ্য করিলে লোকের আপত্তি না হইবার কথা। বিশেষতঃ, যে সকল হোটেল-রেস্তরাঁয় বিদেশীরা অতিথি হয়, সেই সকল ঠাঁইয়ের উপর তীক্ষ্ণ নজর সকল কর-সংগ্রাহকেরই আছে। অধিকন্তু আছে সিনেমা, ঘোড়দৌড়ের মাঠ, নাচগানের ঘর ইত্যাদি। এই সমুদয়কে জবাই করিবার স্বপক্ষে মত দিবে না এমন লোক বিরল।

এই গেল নিয়মিত বার্ষিক আদায় বা ট্যাক্‌স। পুঁজি বা মূলধনের ভাণ্ডারকে এককালীন আদায়ের সাহায্যে পুষ্ট

করিবার মতলবে পোআঁস নানা ফিকির ঢুঁড়িয়া পাইয়াছেন। প্রথমতঃ, ভিক্ষা বা চাঁদা। ফরাসীরা ভিক্ষা জিনিষটাকে রাজস্ব ব্যবস্থা হইতে কোনো দিনই বয়কট করে নাই। যখনই একটা "জাতীয়" গোছের সমস্যা উপস্থিত হয়, তখনই ভিক্ষার ঝুলি লইয়া বাহির হওয়া সনাতন ফরাসী রীতি। এই ক্ষেত্রেও দেখিতেছি তাই। বীমা-কোম্পানীগুলার নিকট হইতে ভিক্ষা আদায় করিবার ঝোঁক পোআঁস'র খুব বেশী। সস্তায় ঘরবাড়ী তৈয়ারী করিবার জন্য একটা সরকারী 'ক্যাস' (তহবিল) অনেকদিন ধরিয়া আছে। তাহাতে ৩০০ মিলিয়ন ফ্রাঁ মজুত আছে। সেই টাকাটা সবই এই নয়া পুঁজিতে আসিয়া জমিতে পারে। দেশের ভিতর সেভিংস্‌ব্যাঙ্ক, হাসপাতাল, আরোগ্যশালা ইত্যাদি সার্ব্বজনিক প্রতিষ্ঠানে যে সকল টাকা "ফালতো" পড়িয়া থাকে, সেই সব টাকা এই নূতন ধন-ভাণ্ডারে গচ্ছিত রাখিতে হইবে, এই মর্ম্মে বাধ্যতামূলক আইন জারি করা যাইতে পারে। বীমা-কোম্পানীগুলাকেও তাহাদের রিজার্ভ টাকার কিয়দংশ এই ভাণ্ডারে গচ্ছিত রাখিতে আইনতঃ বাধ্য করা যাইতে পারে। ব্যাঙ্ক এবং শিল্প-কারখানার রিজার্ভ টাকার কিয়দংশও এইরূপে তাঁবে আনা সম্ভব।

মজুরদের মতামত

মজুর-সঙ্ঘের প্রতিনিধিরা এই সকল প্রস্তাবের কোনো কোনোটার স্বপক্ষে রায় দিতে রাজী নন। বাড়ী-ভাড়ার উপর ট্যাক্‌স সম্বন্ধে তাঁহারা পূরাপূরি নারাজ। তাঁহারা বলিতেছেন,—"ট্যাক্‌স দিব কিসের জন্য? এই টাকা দিয়া পুঁজিপতিদের সুদ খাওয়ানো হইবে বৈ ত নয়। গরিবের রক্ত শুষিয়া বড় লোকদের পেট মোটা হইতে দেওয়া আমাদের স্বধর্ম্ম নয়।" মজুরদের অন্যান্য যুক্তিও আছে। আইবুড়ো পয়সাওয়ালা লোকেরা বড় বাড়ী ভাড়া লইয়া সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকিলে তাহাদের বাড়ীভাড়ার উপর কর বসানো অন্যায় নয়। অথবা যে-সকল ধনী লোক সন্তানপালনের দায়িত্ব না লইয়া স্বামি-স্ত্রীতে বিলাস ভোগ করিতেছেন, তাহাদের উপরও বাড়ীভাড়ার কর চাপানো যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণ মধ্যবিত্ত দরিদ্র গৃহস্থকে বাড়ী-ভাড়ার উপর ট্যাক্‌স দিতে হইলে জুলুম চালানো হইবে মাত্র। এইরূপ হইতেছে মজুর-প্রতিনিধিদের সার্ব্বজনীন মত। কিন্তু মোটের উপর তাহারা পোআঁস'র অন্যান্য প্রস্তাবের বিরোধী নন। অর্থাৎ বড় বড় ব্যাঙ্ক, বীমা-কোম্পানী, শিল্প-কারখানা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানকে বাধ্য করিয়া তাহাদের টাকা-কড়ির কিয়দংশ গৃহ-ভাণ্ডারে মজুত করানো বাঞ্ছনীয়। এই মতে তাঁহারা রায় দিতে রাজী।

পুঁজিপতিদের পরামর্শ

অপরদিকে পুঁজিপতিদের মতও আছে। তাঁহারা বলিতেছেন,—"বড় বড় কারবারের টাকাকড়ি এই নূতন ধনভাণ্ডারে গচ্ছিত রাখা সম্ভবপর কিনা সন্দেহ। বীমা-কোম্পানী, ব্যাঙ্ক অথবা শিল্প-প্রতিষ্ঠানের রিজার্ভ টাকা এমন ঠাঁইয়ে গচ্ছিত রাখা উচিত যে, দরকার পড়িবামাত্র টাকাটা কাজে লাগানো যাইতে পারে। তাহা না হইলে যেখানে-সেখানে টাকা আটক হইয়া থাকিলে তাহাকে আর রিজার্ভ বলা চলে না। সেই অবস্থায় ব্যাঙ্ক বা অন্যান্য কারবার ফেল মারিতে পর্য্যন্ত পারে। কাজেই বড় বড় প্রতিষ্ঠানের রিজার্ভ টাকার দিকে লোভ রাখা বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়। এই পথে ঢাকী সুদ্ধ বিসর্জ্জনের বিপদ আছে।"

পুঁজিপতিদের কার্য্যকরী যুক্তি অন্যবিধ। তাঁহারা জার্ম্মাণি এবং ইতালির দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলিতেছেন, "এই দুই দেশে ট্যাক্‌সের চাপ কমানো হইতেছে বটে। কিন্তু বাড়ী-ভাড়ার উপর ট্যাক্‌স বসাইয়া এই দুই দেশে গৃহ-সমস্যা মীমাংসা করা হইতেছে। ঘরবাড়ী তৈয়ারী করিবার জন্য যে সরকারী অর্থ-সাহায্য দরকার, তাহা এই ট্যাক্‌স হইতে অতি সহজে তোলা সম্ভব। জার্ম্মাণিতে মুদ্রা-সংস্কার সাধিত হইবার পর হইতেই প্রত্যেক ভাড়ার উপর শতকরা ১০ হিসাবে কর উঠানো হয়। অর্থটা আলগা করিয়া স্বতন্ত্রভাবে রাখিয়া দেওয়া হয়। এই ভাণ্ডার হইতে ঘর তৈয়ারীর কাজে সাহায্য করা হইতেছে। এই উপায়ে ১৯২৫ সনে ৫৪,৮৫০টা মোকাম নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহার ভিতর ৪১,৮৮৯টা বসত-বাড়ী। ট্যাক্‌সের আইন জারি হইবার পূর্ব্বকার অবস্থা দেখা যায় ১৯২৩ সনে। সেই বৎসর মাত্র ৯,০২২টা বাড়ী তৈয়ারী হইয়াছিল। তাহার মাত্র ৫,৯৬০টা ছিল বসত-বাড়ী।"

বাড়ী-ভাড়ার উপর ট্যাক্স

এক প্যারিসেই ভাড়ার বাড়ার উপর ৩% হারে ট্যাক্স আদায় করিলে ৪০ মিলিয়ন ফ্রাঁ উঠিতে পারে। এই হিসাবে প্যারিস ফ্রান্সের তিন ভাগের এক ভাগ। কাজেই গোটা দেশ হইতে ১০০ মিলিয়ন ফ্রাঁ তোলা অতি-কিছু বিবেচিত হইতেছে না। অধিকন্তু ব্যাঙ্ক, বীমা এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠান হইতে ২০ মিলিয়ন তোলা হইবে। তবে এই সকল কারবারের ভিতর যাহারা নিজেই বসত-বাড়ী তৈয়ারী করিবার জন্য টাকা খরচ করিবে, তাহাদের নিকট হইতে ট্যাক্স আদায় করা হইবে না।

ট্যাক্সটা দিবে কে? বাড়ীওয়ালা না ভাড়াটিয়া? "কঁসেই" চেষ্টা করিয়াছেন শ্যাম ও কুল দুই-ই বাঁচাইতে। সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ,—বাড়ীওয়ালার নিকট হইতেই ট্যাক্সটা আদায় করিতে হইবে; তবে সে ভাড়া বাড়াইয়া ভাড়াটিয়ার নিকট হইতে ট্যাক্সটা উশুল করিয়া লইতে অধিকারী। কিন্তু যে পরিমাণ ট্যাক্স তাহাকে দিতে হইবে, সে তাহার চেয়ে বেশী ভাড়াটিয়ার নিকট হইতে ভাড়াহিসাবে আদায় করিতে পারিবে না।

বরিশাল হিতৈষী

মানুষ ও গরুর খাদ্যনাশ

"যদি পড়ে পৌষে কড়ি হয় তুষে"—এই প্রবাদ বাক্য এবার সত্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে। এবার শীত তেমন নাই অথচ প্রত্যহ আকাশে মেঘ এবং মধ্যে মধ্যে একক্রমে ৩।৪ দিন বৃষ্টি হইতেছে। ধান্যক্ষেত্রসমূহ জলে ডুবিয়া গিয়াছে। তাহাতে ধান আধ আনা পরিমাণ নষ্ট হইয়াছে। যে "নাড়া" (বীচালি) গরুর একমাত্র খাদ্য তাহা জলে পচিয়া গিয়াছে। পাটের দাম না পাইয়া কৃষক দুর্ব্বল হইয়াছে। তদুপরি সুপারির বাজার মন্দা হইয়াছে। সর্ব্বোপরি ধানের দুরবস্থা সর্ব্বনাশের সূচনা করিতেছে। চাউলের বাজার অগ্নিমূল্যে উঠিতেছে। গত বৎসর গো-মড়কে কৃষক সর্ব্বনাশ পাইয়াছে। এ বৎসর তাহার "আথাল" (গোয়াল) শূন্য হইবে। এই ভয়াবহ অবস্থার প্রতীকার থাকিলে অবশ্য পূর্ব্বাহ্নে প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। দেখা যাক ঢক্কা-নিনাদে প্রচারিত কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলি কি উপায় অবলম্বন করে। বাঙ্গালী সঞ্চয়শীল হইলে এত দীর্ঘকাল সুজন্মার ফলে তাহাদের এই দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হইবার শক্তি সঞ্চিত হওয়া উচিত ছিল—পাটের টাকা, সুপারির টাকা রাখা উচিত ছিল। তাহা কেহ রাখে নাই। এখন ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সকলে অন্ধকার দেখিতেছে।

রুরাল ইণ্ডিয়া

গ্রামে অবসর-প্রাপ্ত শিক্ষিত লোকদের কর্ম্মজীবন

শ্রীযুক্ত ডব্লিউ, সামিয়া লিখিতেছেন,—বিগত ৫০ বৎসর বা তাহারও পূর্ব্ব হইতে গ্রামের শিক্ষিত ও ধনী সমাজ শহরের দিকে অভিযান করিতেছেন। প্রধানতঃ ইঁহারা শহরে উচ্চ শিক্ষালাভ করিবার জন্য আগমন করেন এবং বিদ্যার্জ্জনের পর সরকারী চাকুরী, ওকালতী, ডাক্তারী, ব্যারিষ্টারী অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে থাকেন। পরে তাঁহারা সরকারী ভাতায় বা নিজ নিজ অর্জ্জিত অর্থ দ্বারা স্থায়িভাবে শহরে বসবাস করিতে থাকেন এবং সুযোগ-সুবিধা উপস্থিত হইলে জমীদারি, মঠ মন্দির বা ফার্ম্মের উচ্চ কার্য্য গ্রহণ করিয়া অধিকতর অর্থোপার্জ্জনে মনোনিবেশ করেন। এইরূপ স্থায়িভাবে শহরে বসবাস করার ফলে তাঁহারা তাঁহাদের স্ব স্ব দেশ ও গ্রামের কথা একেবারে ভুলিয়া যাইতে শিখেন। কালে-ভদ্রে তাঁহাদিগকে গ্রামের পথে পা বাড়াইতে দেখা যায়—তাহাও কেবল জমীদারি বা অন্যান্য আয়কর বিভাগ হইতে নিজেদের পাওনা-গণ্ডা বুঝিয়া লইবার জন্য। কর্ম্মজীবনের অধিকাংশ সময় শহরে কাটাইয়া জীবনের শেষভাগে তাঁহারা গ্রামে ফিরিতে মোটেই রাজী নন। কারণ শহরের জীবন-ধারাই তাঁহাদের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। ইহাতেই তাঁহারা অভ্যস্ত। পল্লীগ্রামের আবহাওয়া তাঁহাদের ধাতে মোটেই সহ্য হয় না। গ্রামের লোকের কাছে এই সকল শহরবাসীরা কতটা ঋণী তাহা তাঁহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত। তাঁহাদের শিক্ষা-দীক্ষার, তাঁহাদের এত বড়টি হইবার গোড়ায় দেখিতে পাই ঐ গ্রাম্য রায়তের কষ্টোপার্জ্জিত ধন। এই ঋণ শোধ দিবার সব চাইতে প্রকৃষ্ট উপায় হইতেছে শেষ জীবনে গ্রামে ফিরিয়া

নিজেদের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা-দীক্ষাদ্বারা গ্রামবাসীর কল্যাণসাধনে প্রবৃত্ত হওয়া। জীবনের শেষভাগে এই সকল অবসরপ্রাপ্ত ভদ্রলোকগণ গ্রামে ফিরিয়া গ্রামোন্নতির বহুবিধ সদনুষ্ঠানে যোগদানপূর্ব্বক গ্রামবাসীকে নানাদিক্ দিয়া উন্নত করিয়া তুলিতে পারেন। তাঁহারা যদি একবার গ্রামে আসিয়া এই সকল কাজগুলি আরম্ভ করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, শহর জীবনের চাইতে গ্রামের জীবন কত সুখকর। এই ধরণের শিক্ষিত অবসরপ্রাপ্ত লোক যে গ্রামে আছে, সে গ্রাম বাস্তবিকই অনেকখানি উন্নত।

অবসরপ্রাপ্ত লোক গ্রামোন্নতির কি কি কাজ করিতে পারেন? (১) অবসরপ্রাপ্ত বিচারবিভাগীয় কর্ম্মচারিগণ স্থানীয় বিবাদ-বিসংবাদ আপোষে মিটাইয়া গ্রামবাসিগণকে মোকদ্দমার অযথা অপব্যয় হইতে রক্ষা করিতে পারেন। (২) রাজস্ব-বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণ গ্রামে ফিরিয়া রাজস্ব-সংক্রান্ত বিষয়ে গ্রামবাসীকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারেন। (৩) অবসরপ্রাপ্ত ডাক্তারগণ গ্রামে ঔষধালয় খুলিয়া গ্রাম্য স্বাস্থ্যের অশেষ উন্নতিসাধন করিতে পারেন। (৪) অবসরপ্রাপ্ত এঞ্জিনিয়ারগণ গ্রামে পুষ্করিণীখনন, খাল ও পয়ঃপ্রণালী প্রস্তুত, রাস্তা, পথঘাট ও গৃহনির্ম্মাণ-কার্য্যে সহায়তা করিতে পারেন। (৫) শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মচারিগণ গ্রামের লোককে প্রাথমিক শিক্ষায় উন্নত করিয়া তুলিতে পারেন। (৬) বন-বিভাগের কর্ম্মচারিগণ গ্রামের বাগ-বাগিচা তৈয়ারীর কার্য্যে সাহায্য করিতে পারেন। (৭) তেমনি অবসরপ্রাপ্ত উকিলগণ স্বভাবতই গ্রামের নেতা বনিয়া যাইতে পারেন এবং রাষ্ট্র-পরিষদে পল্লী রাণীর ইজ্জৎ বাড়াইতে পারেন। এই ধরণের সকল প্রকার অবসরপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণ শহরের ভোগ-বিলাসিতার মোহ ত্যাগ করিয়া গ্রামে ফিরিয়া বসবাস করিলে, গ্রামের বহুবিধ উন্নতি সাধিত হইতে পারে। বর্ত্তমানে ইউনিয়ন বোর্ড, পঞ্চায়েৎ কোর্ট, লোকাল বোর্ড, ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, কো-অপারেটিভ সোসাইটি প্রভৃতি দেশোন্নতিকর প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া গ্রামের লোকের হাতে অনেকখানি ক্ষমতা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু অনেক স্থলেই উপযুক্ত কর্ম্মক্ষম লোকের অভাবে এই সকল সুযোগ-সুবিধার অপব্যবহার হইতেছে। এরূপ অবস্থায় গ্রামের শিক্ষিত অবসরপ্রাপ্ত লোক গ্রামে ফিরিয়া আসিলে বাস্তবিকই যে গ্রামের চেহারা ফিরিয়া যাইবে তাহা বলাই বাহুল্য।

পীপ্‌ল

বিলাতে মিউনিসিপ্যাল প্রচেষ্টা

শ্রীযুক্ত উইলফ্রেড ওয়েলক্ লাহোরের "পীপ্‌ল" পত্রিকায় লিখিতেছেন,—

১লা নবেম্বর বৃটিশ নাগরিক জীবনের এক বিশেষ দিন। ঐ দিনে নগর-সভাসমূহের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা হয়। আজকালকার দিনে সোশ্যালিজ্‌ম বা সমাজতন্ত্রবাদের টিকেটে এই সকল নির্ব্বাচন-যুদ্ধ হইয়া থাকে। বিলাতের লিবারেল, টোরি প্রভৃতি রাজনৈতিক দলগুলির নামে কোন সদস্যই নির্ব্বাচন-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন না। লেবার বা মজুর ও অ-মজুর সদস্যদের মধ্যেই নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্ব চলিয়া থাকে। স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যাপারে ঐ সকল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের একতিয়ার একরূপ নাই বলিলেই চলে। সকল অ-মজুর সদস্যই "স্বতন্ত্র" নামে দাঁড়ান। এই সকল "স্বতন্ত্র"-নামধারী সদস্য-উমেদারগণ সোশ্যালিজ্‌মের বিরোধী হইলেও সমাজতন্ত্রবাদিগণ-কর্ত্তৃক পরিচালিত নগর-শাসন-প্রতিষ্ঠান আক্রমণ করিতে সাহস করেন না। এমন কি, ঘোর সমাজতন্ত্র-বিরোধী হইলেও ইঁহারা মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনের সময় সমাজতন্ত্রবাদের পাকা চেলা সাজিয়া বসেন এবং সমাজতন্ত্রবাদের খোলস পরিয়া নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে কোমর বাঁধেন। অন্য সময় ইহার বিরুদ্ধে গলাবাজি ও লেখনী চালাইলেও এই নির্ব্বাচনের সময় ইঁহারা সমাজতন্ত্রবাদের প্রশংসাই করিয়া থাকেন।

বিশ বৎসরের মধ্যে মিউনিসিপ্যাল প্রচেষ্টা ঢের ঢের বাড়িয়া গিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠান কি অভাবনীয় কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছে জনসাধারণ তাহা সম্পূর্ণ অবগত নহে। লিবারেল ও টোরি (রাজনৈতিক দল) কর্ত্তৃক সামান্য ভাবে স্থাপিত এই প্রতিষ্ঠান লেবার বা শ্রমিক প্রতিনিধিদের হাতে আজ বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে। ইহার মজুররাজ-

বিরোধী প্রতিষ্ঠাতৃগণ আজ ইহার কর্ম্মশক্তি খর্ব্ব করিবার চেষ্টায় আছেন।

১৯১৪ সনে যদি কেহ বলিতেন যে, বিলাতের সমগ্র শ্রমিকদের বাসোপযোগী ঘরবাড়ী এই সকল মিউনিসিপ্যাল প্রতিষ্ঠান হইতে নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া হইবে, তাহা হইলে তিনি হাস্যাস্পদই হইতেন। আজ কিন্তু তাহাই কার্য্যতঃ দেখা যাইতেছে। উপরন্তু, নগর-সভা নাগরিকদের জল, গ্যাস, বিদ্যুৎ ঘরবাড়ী, বাস্, ট্রাম প্রভৃতি যানবাহন সরবরাহ করিয়াও নগরের স্বাস্থ্য প্রভৃতির দিকে মনোনিবেশ করিতে পারেন। তাহা ছাড়া দুধ, কয়লা প্রভৃতি নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও এই মিউনিসিপ্যাল প্রতিষ্ঠানগুলি সরবরাহ করিয়া থাকেন। ব্যক্তিবিশেষের ফার্ম্ম হইতে অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়ে মিউনিসিপ্যালিটি এসব সরবরাহ করিতে পারেন। জনসাধারণ মিউনিসিপ্যালিটির দেওয়া এই সুবিধা যত বেশী গ্রহণ করিতেছে, ফার্ম্মগুলি তত অধিক আতঙ্কিত হইতেছে।

গোটা বৃটেনে মিউনিসিপ্যাল প্রচেষ্টার ফলে নগরের যাবতীয় প্রয়োজনীয় কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াও নগর-সভার হাতে প্রতি বৎসর ৯০ লক্ষ পাউণ্ড জমা হয়। ঐ টাকা স্থানীয় করদাতৃগণের কর-ভার-লাঘবার্থ ব্যয়িত হয়।

ইলেকট্রিসিটি কমিশনার স্যার হ্যারি হাওয়ার্ড সাউথ পোর্টের "ইন্ষ্টিটিউট অব্ মিউনিসিপ্যাল ট্রেজারার্স অ্যাণ্ড একাউন্টেন্টস" নামক সভায় মিউনিসিপ্যাল প্রচেষ্টার এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন,"বৈদ্যুতিক বিভাগে আমরা দেখিতে পাই মিউনিসিপ্যাল প্রতিষ্ঠানগুলি ১৯২৪-২৫ সনে ৪৪,০০৬,৮৯০ পাউণ্ড অর্থাৎ শতকরা ৩৮৫ ভাগ ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন।

মিউনিসিপ্যাল কর্ম্মকর্ত্তারা আলো ও গৃহস্থালীর কার্য্যে গড়ে প্রতি ইউনিটে ৩·৬৭ পেন্স হারে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিয়া থাকেন। অন্যদিকে ফার্ম্মগুলি গড়ে প্রতি ইউনিটে ৫·২৪ পেন্স দাবী করিয়া থাকেন।

জার্ণ্যাল অব্ পলিটিক্যাল ইকনমি

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত দ্বৈমাসিক আর্থিক পত্রিকা। ৩৪ বৎসর চলিতেছে। ১৯২৬ সনের ডিসেম্বর সংখ্যার ১৩০ পৃষ্ঠায় আছে—(১) ব্রান্সউইকে গ্রাম্যকর। (২) আমাদের ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্প্রসারণ-সম্ভাবনা (জে, ভার্জ্জিল হাফম্যান)। (৩) ধনবিজ্ঞানের বনিয়াদ (রুডলফ পিটারসন)।

মান্থলী লেবার রিভিউ

যুক্তরাষ্ট্রের মজুর-দপ্তরের সরকারী পত্রিকা। প্রায় ২৫০ পৃষ্ঠার বহুতথ্যপূর্ণ মাসিক। ইহার কতকগুলি অধ্যায় পর পর ভাগ করা আছে। গত ১৯২৬ সনের আগষ্ট সংখ্যায় আছে,—

১। বিশেষ রচনা

(ক) বৃটিশ কয়লা-শিল্পের উন্নতি-চেষ্টা। (খ) ১৯২৬ সনের আমেরিকান ট্রেড-ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠান ও তাহার সভ্য। (গ) যুক্তরাষ্ট্রে সমবায়-কারখানা।

২। শিল্প ও শ্রম।

(ক) যুক্তরাষ্ট্রে গ্রামবাসিগণের জীবন আলোচনা। (খ) সরকারী শ্রমিক বিভাগের কর্ম্মচারিগণের আন্তর্জ্জাতিক সম্মিলনের অধিবেশন। (গ) চীন-ন্যানচাঙয়ের বস্ত্রবয়ন-শিল্প। (ঘ) ১৯২৪ সনে আফ্রিকার কারখানার অবস্থা।

৩। শিল্প-কারখানায় স্ত্রী ও বালক মজুর

(ক) মেরিল্যাণ্ডে ১৯২৫ সনে স্ত্রী-মজুরদের খাটুনীর ঘণ্টা। (খ) মেরিল্যাণ্ডে ১৯২৫ সনে বালক-মজুর।

(৪) শিল্পকারখানার দুর্ঘটনা ও স্বাস্থ্য-রক্ষা

(ক) কারখানায় দুর্ঘটনা-নিবারক সম্মিলনী। (খ) দুর্ঘটনা কি বৃদ্ধি পাইতেছে? (গ) কয়লার খনিতে বিস্ফোরক পদার্থ। (ঙ) আমেরিকার এঞ্জিনিয়ারিং.কাউন্সিলে সতর্কতা ও উৎপাদন-গবেষণা। (চ) পোর্টল্যাণ্ড সিমেন্ট কারখানায় ১৯১৯-১৯২৫ সনের দুর্ঘটনা। (ছ) বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসায়ে ক্যানসার রোগ। (জ) রবার-শিল্পের বিষাক্ত সফেদা নিবারণের চেষ্টা। (ঝ) ইডাহো খনি দুর্ঘটনা, ১৯২৫।

(৫) ক্ষতিপূরণ এবং ব্যাধি, বার্দ্ধক্য ও দৈব বীমা

(ক) ম্যাসাচুসেটস্ ক্ষতিপূরণ আইন-বিধির অস্বাভাবিক নজির। (খ) নিজ নিজ মঙ্গল-উদ্দেশ্য-সাধনে রত শ্রমিক-

গণের ক্ষতিপূরণে অধিকার। (গ) জর্জ্জিয়া, ইলিনয় ও ম্যাসাচুসেটে নূতন ক্ষতিপূরণ-বিধি। (ঘ) জার্ম্মাণিতে ব্যাধি ও বার্দ্ধক্যগ্রস্ত শ্রমিকগণের ভাতার ব্যবস্থা ও ১৯১৩-১৯২৫ সনের বীমা-প্রতিষ্ঠান। (ঙ) সুইডেনে ব্যাধি-বার্দ্ধক্য তহবিল।

(৬) সমবায়

(ক) কো-অপারেটিভ আন্দোলনের বর্ত্তমান অবস্থা।

(৭) মজুর-প্রতিষ্ঠান ও কংগ্রেস

(ক) আমেরিকার নাবিক-সঙ্ঘের ১৯২৬ সনের অধিবেশন। (খ) অষ্ট্রীয়ার স্বতন্ত্র ইউনিয়ন, ১৯২৫। (গ) নিউজীল্যাণ্ডে ট্রেড-ইউনিয়নের বিস্তৃতি।

(৮) মজুরগণের সাধারণ ও শিল্প-শিক্ষা

(ক) মজুর-সম্মিলনীর শিক্ষা-অধিবেশন। (খ) ফিন্‌ল্যাণ্ডের মজুর-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। (গ) ফ্রান্সে শিল্প-ব্যবসা-শিক্ষার উপর কর-নীতি।

(৯) মজুর-আইন ও আদালতের রায়

(ক) মজুরী দিবার বিধি-ব্যবস্থা। (খ) সাধারণ কাজের চলতি মজুরী। (গ) বোহেমিয়ার মজুর-আইন। (ঘ) ভারতবর্ষের নূতন ট্রেড-ইউনিয়ন অ্যাক্ট। (ঙ) পেরুর শিল্প-ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের মজুর-বিষয়ক আইন-কানুন।

(১০) শিল্প-বিরোধ

(ক) ১৯২৬ সনের জানুয়ারী হইতে মার্চ্চ পর্য্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প-বিরোধের কাহিনী। (খ) যুক্তরাষ্ট্রের মজুর-দপ্তর কর্ত্তৃক মিটমাট চেষ্টা। (গ) গ্রেটবৃটেনের ধর্ম্মঘট, ১৯২৫।

(১১) মজুরী ও কাজের ঘণ্টা

(ক) মোটর ভেহিক্যাল শিল্পে মেহনতের ঘণ্টা ও মজুরী (১৯২২ ও ১৯২৫)। (খ) খনির মজুরী ১৯২৫। (গ) অষ্ট্রেলিয়া, সিডনী ও মেলবোর্ণ শহরে মেহনতের ঘণ্টা ও মজুরী (১৯২৫)। (ঘ) গ্রেটবৃটেনের বস্ত্র-শিল্পের মজুরী ও খাটুনীর ঘণ্টা।

(১২) মজুর-সংগঠন

ব্রিষ্টলের ডাক-মজুরদের জোট কায়েম করা।

(১৩) মজুরীর গতি

(ক) নির্দ্দিষ্ট শিল্পসমূহে লোক খাটানোর ব্যবস্থা ১৯২৫। (খ) রেল-সড়ক, মজুর ও মজুরীর তুলনামূলক হিসাব।

(১৪) বাজার-দর ও জীবনযাত্রা-প্রণালী

যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন দ্রব্যের বাজার-দর ও গৃহস্থালীর খরচ।

মজুর-চুক্তিপত্র, ও মজুর-বিষয়ক মন্তব্য, ইমিগ্রেশুন, ফ্যাক্টরী তদন্ত, মজুর-দপ্তরের প্রয়োজনীয়তা, মজুরগ্রন্থ ও অন্যান্য পত্রিকার পরিচয় প্রভৃতি জ্ঞাতব্য অধ্যায় এই পত্রিকায় আছে।

ইণ্টারন্যাশন্যাল লেবার রিভিউ

বিশ্বজাতিসঙ্ঘ-কর্ত্তৃক প্রকাশিত ১৫০ পৃষ্ঠার মজুর মাসিক। ডিসেম্বর ১৯২৬। (১) যুক্তরাষ্ট্রের নিয়মতন্ত্র-সম্মত মজুর-আইনকানুন। (২) বিভিন্ন দেশের মজুরদের বাৎসরিক ছুটী ও সম্মিলিত চুক্তি। (৩) শিল্প-কারখানার বিরোধের নিষ্পত্তি। (৪) জাপানে স্বাস্থ্য-বীমার নূতন আইন। (৫) জাপানে কারখানা-তদন্ত, ১৯২৪। (৬) জার্ম্মাণির ভোকেশুনাল গাইড, ১৯২৪-২৫। (৭) বিভিন্ন দেশের শহরের বাজার-দর, মজুরী ও জীবন-যাত্রার বহর।

আনন্দবাজার পত্রিকা

সেকালের ভোজ

আমার এক আত্মীয় সে দিন পরলোকগত হইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বাক্সে যে-সকল দলিল-দস্তাবেজ কাগজপত্র, খাজনার দাখিলা প্রভৃতি ছিল, সেগুলি দেখিয়া শুনিয়া গোছাইতে যাওয়ায় একখানি অনেক দিনের পুরাতন ফর্দ্দ আমার হাতে পড়িয়াছিল। সে ফর্দ্দখানি সেকেলে তুলট কাগজে লেখা। ফর্দ্দের সাল ঠিক করিতে আমার বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হয় নাই, যদিও ফর্দ্দে সন তারিখ কিছুই ছিল না। এই যে ফর্দ্দ বা তালিকা তাহার উপরে লেখা আছে—"শ্রীযুক্ত অগ্রজ মহাশয়ের প্রথম নবকুমারের শুভ অন্নপ্রাসনের আন্দাজি তালিকা।" যিনি এই তালিকা লিখিয়াছেন, তাঁহার হস্তাক্ষরের সহিত আমার পরিচয় আছে, কারণ ঐ হাতের লেখা দশ পনর খানা পত্র, যে কারণেই হউক, আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। সুতরাং, এই নবকুমারটি যে কে, এবং শুভ অন্নপ্রাশন

যে কবে অর্থাৎ কোন বৎসরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। মাস বা তারিখ বলিবার উপায় নাই। কারণ সে সময়ের কেহই বাঁচিয়া নাই। এই নবকুমার আর কেহই নহেন, আমার এই অল্পদিন পূর্ব্বে পরলোকগত আত্মীয়টী। তিনি এই সেদিন ৮২ বৎসর বয়সে পরলোকগত হইয়াছেন। তাহা হইলে, তাঁহার শুভ অন্নপ্রাশন যদি জন্মের পর ছয়মাসে হইয়া থাকে (যখন প্রথম নবকুমার তখন ছয়মাস বয়সে অন্নপ্রাশন হওয়াই খুব সম্ভব, তাহা হইলে এই ব্যাপার ৮২ বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল (আমার আত্মীয় ছয়মাস পূর্ব্বে পরলোক গত হইয়াছেন)। আমার এই আত্মীয় তাঁহার পিতৃব্য বা পিতার কাগজপত্র অনুসন্ধানের সময় এই ফর্দ্দখানি পাইয়াছিলেন এবং ইহা তাঁহারই অন্নারম্ভের ফর্দ্দ দেখিয়া অতি যত্নের সহিত মূল্যবান দলিলপত্রের মধ্যে রাখিয়াছিলেন। অথচ কথাপ্রসঙ্গে কোনো দিন ৮২ বৎসর পূর্ব্বে একটা ভোজে কি কি দ্রব্য লাগিত, সে সম্বন্ধে কোনো কথাই বলেন নাই এবং ফর্দ্দের অস্তিত্বের কথাও জ্ঞাপন করেন নাই।

নিম্নোক্ত ফর্দ্দখানি আমি আজ 'আনন্দবাজার পত্রিকার' পাঠক-পাঠিকাবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। ইহা হইতে তাঁহারা অনায়াসে অবগত হইতে পারিবেন, ৮২ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশের একটী গণ্ডগ্রামে খাদ্য-দ্রব্যাদির কিরূপ মূল্য ছিল এবং সে সময়ে কোন বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারের প্রথম নবকুমারের অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে কি প্রকার ভোজের আয়োজন হইত এবং উক্ত ভোজে ব্যয়ই বা কি পরিমাণ হইত।

এই ফর্দ্দের মধ্যে একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে পাঠকগণকে অনুরোধ করি। ইহাতে অন্নপ্রাশন-ব্যাপারে যে ক্রিয়া-কাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়, তাহার বিবরণ নাই, অর্থাৎ কি কি দ্রব্য উক্ত ব্যাপারে প্রয়োজন হইত তাহা এই ফর্দ্দ দেখিয়া জানা যাইবে না। ইহা শুধু সাধু-সেবার ফর্দ্দ। তাহা হইলেও এই ফর্দ্দ হইতে অনেক কথা জানিতে পারা যাইবে বলিয়াই আমি এইখানি এবার 'পূজার উপহার' দিলাম।

শ্রীশ্রীদুর্গা
সহায়

শ্রীজুৎ অগ্রজ মহাশয়ের প্রথম নবকুমারের শুভ অন্নপ্রাসনের আন্দাজি তালিকা—

চাউল ৫৲	৮৶০
ডাউল তিন রকম	১॥০
তৈল	৩॥০
লবণ	॥০
পান মসলা মায় সুপারি ১ দফা	১।০
পাক মসলা ১ দফা	৸০
তরকারী ১ দফা	২৲
মৎস্য	৬৲
পান	১॥০
তামাকের লওয়াজিমা	॥০
ঘৃত	২।০
মিষ্টিকা দ্রব্য	১॥০
চিড়ার ধান	২।০
খৈয়ের ধান	২।০
নারিকেল ১০০	৯৲
গুড়	৫৲
চিনি	৩৲
দধি	৬৲
দুগ্ধ ৫৲	৭৲
	৬৩৸৶০
ও গয়েরহ	৬৶০
মোট	৭০৲

এই ফর্দ্দে মাত্র তিনটী দ্রব্যের পরিমাণ দেওয়া আছে;— চাউল, নারিকেল ও দুগ্ধ। অন্য দ্রব্যের পরিমাণ দেওয়া না থাকিলেও ব্যাপার-বিধানে যাঁহারা অভিজ্ঞ, তাঁহারা চাউলের পরিমাণ দেখিয়াই অন্যান্য দ্রব্যের পরিমাণ এবং তাহার মণকরা বা সেরকরা মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন। যে ভোজে পাঁচ মণ চাউলের অন্নের আয়োজন

করিতে হয়, তাহাতে তৈল, লবণ, মৎস্য, তরকারী, ডাইল প্রভৃতির পরিমাণ কত তাহা ঠিক করা সহজসাধ্য; সুতরাং আমরা আর সে হিসাব দিলাম না। এই তালিকা হইতেই ৮২ বৎসর পূর্ব্বে কোন্ দ্রব্যের কি মূল্য ছিল, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে।

দুইটী বিষয়ে পাঠক-পাঠিকাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। এত বড় ভোজের ব্যাপারে সন্দেশ, রসগোল্লা প্রভৃতির নামও নাই। এমন কি সে সকল প্রস্তুত করিবার উপকরণেরও উল্লেখ নাই; উল্লেখ আছে শুধু সাত শত নারিকেল ও পাঁচ টাকার গুড় এবং তিন টাকার চিনির; আর আছে পাঁচ মণ দুগ্ধের। আমার মনে হয়, তখন হয়ত ছানার সন্দেশের তেমন প্রচলন ছিল না; নারিকেল ও চিনি দিয়া নারিকেল সন্দেশই উক্ত ভোজে ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং এত বেশী যখন নারিকেল গুড় ও চিনির আয়োজন, তখন নানাবিধ পিষ্টক যে প্রস্তুত হইয়াছিল, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। আর একটি কথা আছে। পিষ্টক এবং পরমান্নে কি পাঁচ মণ দুগ্ধ খরচ হইতে পারে? তবে, সে সময় দেশে ম্যালেরিয়া ছিল না এবং সুভোক্তা অনেক ছিলেন, সেই যা কথা। আমরাই ছেলেবেলায় দেখিয়াছি, এক একজন ভোক্তা ভোজন-শেষে বাহাদুরী দেখাইবার জন্য আড়াই সের তিন সের পরমান্ন অনায়াসে আহার করিতেন। এ ব্যাপার তো আমার জন্মেরও পনর ষোল বৎসর পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

গুটি কয়েক হিসাবও স্পষ্টই পাওয়া যাইতেছে। আশী বৎসর পূর্ব্বে ভদ্রলোকের ভোজনের উপযুক্ত চাউলের মূল্য ছিল এক টাকা দশ আনা মণ। আর এখন? খাঁটি দুগ্ধের মূল্য ছিল একটাকায় সওয়া ছয় মণ। এখন ঐ মূল্যে চারি সের দুগ্ধও মিলে না। পাড়াগাঁয়ে না হয় ঐ মূল্যে বড় বেশী হয় ত আট সের দুগ্ধ মিলিতে পারে। তাহার পর মৎস্যের কথা। পাঁচ মণ চাউলের বরাদ্দ। সুতরাং সে সময়ের ভোক্তার কথা বিবেচনা করিলেও ছোট-বড় দিয়া পাঁচমণ চাউলে ছয়শত লোকের আহারের ব্যবস্থা হইয়াছিল মনে করা যাইতে পারে। এই ছয় শত লোকের আহারের জন্য ছয় টাকার মৎস্য ধরা হইয়াছিল। এখন ছয় টাকার মৎস্যে পঞ্চাশ জনের অধিক লোকেরও আহার হয় না; আর তখন ছয় টাকার মৎস্যে ছয়শত লোকের আহারের ব্যবস্থা হইয়াছিল; বিশেষতঃ যে গ্রামের কথা বলিতেছি, সেখানকার লোকে এখন এই দুর্ম্মূল্যের দিনেও বিশেষ মৎস্যপ্রিয়। আর একটি বিষয় প্রণিধান করিবেন। এই ব্যাপার উপলক্ষ্যে দুঃখী কাঙ্গালীর কথাও বাদ যায় নাই, নতুবা অত চিড়ের ধান, খৈয়ের ধানের প্রয়োজন হইত না; কাঙ্গালীরা বোধ হয় দুই একটা নারিকেল সন্দেশও পাইয়াছিল।

এখন ভাবি, সে কি দিনই গিয়াছে! একালে সব বিষয়ে উন্নতি হইয়াছে স্বীকার করি, কিন্তু ভোজন-ব্যাপারে এমন অল্পব্যয়ে বিপুল ভোজ এখন স্বপ্নাতীত। এক টাকা দশ আনা মণ চাউলও আর ফিরিবে না, দেড় টাকা মণ দুগ্ধও আর মিলিবে না। অথচ শুনি, আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নাকি খুব বাড়িয়াছে! অর্দ্ধাহার, অনাহার, দ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতা, ভেজালের আতিশয্য—এটা যদি সুখের বিষয় হয়, তাহা হইলে আমরা পরম সুখী।

পূজার সময় বিরাশী বৎসর পূর্ব্বের ভোজের ফর্দ্দ দেখিয়া যদি কেহ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করেন, তাহা হইলেই আমার এই ফর্দ্দ-দাখিল সার্থক হইবে।

শ্রীজলধর সেন

ড্যয়চে আল্‌গেমাইনেৎ মাইটিঙ

বার্লিনের দৈনিক পত্রিকা,—১৮ ডিসেম্বর ১৯২৬।

শহরের তাঁবে সরকারী শিল্প

জার্ম্মাণির আর্থিক ক্রমবিকাশের একটা নূতন লক্ষণ প্রায় প্রতি সপ্তাহেই লক্ষ্য করা যায়। শহরগুলা প্রত্যেকেই নূতন নূতন কারবারের মালিক হইতেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বে-সরকারী কারবারগুলাকে অর্থ-সাহায্য করা অথবা তাহাদের জন্য জিম্মাদারি লওয়া শহর নিজের কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেছে। এই ধরণের শিল্প-বাণিজ্য-বিষয়ক দায়িত্বের পরিমাণ খুব বেশী। মোটের উপর বুঝা যাইতেছে যে, শহরের ধনসম্পত্তি বেশ প্রচুর।

১। জার্ম্মাণির উত্তর অঞ্চলে একটা শিল্প-বাণিজ্যের

মেলা বসে। নাম তাহার "নর্ডিশে মেস্‌সে" (উত্তরের মেলা)। কীল শহরে এই মেলার আড্ডা। মেলাটার খরচ-পত্র, লাভলোকসান সবই ছিল এতদিন এক বেপারী-সঙ্ঘের ধান্ধায়। কীল শহর দরকার পড়িলে কিছু কিছু অর্থ-সাহায্য করিত মাত্র। কিন্তু ১৯২৬ সনে মেলার কর্ম্ম-কর্ত্তারা ৭০০,০০০ মার্ক (৫½ লাখ টাকা) দিয়া এক বিপুল প্রদর্শনী-ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বেপারী-সঙ্ঘ মেলার সাধারণ কাজ চালাইতে এখন একদম অসমর্থ। কাজেই কীল শহর এইবার "মেস্‌সে"র সকল আর্থিক ঝুঁকি লইতে রাজি হইয়াছে। বেপারী-সঙ্ঘের যা-কিছু দেনা-পাওনা, পুঁজিপাটা সবই শহরের জিম্মায় আসিল। এখন হইতে কীল শহর স্বয়ংই মেস্‌সের স্বত্বাধিকারী। কীল জার্ম্মাণির অন্যতম প্রসিদ্ধ বন্দর। জাহাজ-তৈয়ারীর শিল্প এই কেন্দ্রে বিপুল আকার ধারণ করিয়াছে। এই বন্দরকে প্রকারান্তরে দ্বিতীয় হাম্বুর্গের ইজ্জৎ দেওয়া চলে।

২। হাইডেলব্যর্গ শহরের কান কোম্পানী যন্ত্রপাতি তৈয়ারী করিবার কারবারে জার্ম্মাণ সমাজে নামজাদা। ১৯২৫ সনে এই কোম্পানীর অবস্থা সঙ্গীন হইয়া পড়ে। কোম্পানীকে বাঁচাইবার জন্য হাইডেলব্যর্গ শহর নিজ তহবিল হইতে টাকা ধার দিতে রাজি হইয়াছে। নিজ তহবিলের টাকায় না কুলাইলে বিভিন্ন সেভিংস ব্যাঙ্কের টাকা হইতে কান কোম্পানীকে ধার দিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

৩। ল্যিনেব্যর্গ শহরের সালিনে কোম্পানী ১৯২৫ সনে ৩২৮,০০০ মার্ক লোকসান দিয়াছে। কোম্পানী বলিতেছে, ট্যাক্‌সের চাপ এত বেশী ছিল যে, লোকসান না হইয়া যায় না। বাস্তবিক পক্ষে ট্যাক্‌স ছিল পরিমাণে ৩০০,০০০ মার্ক। সালিনে কোংকে বাঁচানো ল্যিনেব্যর্গ শহর নিজ কর্ত্তব্য সমঝিয়াছে। হাম্বুর্গ শহরের কোনো ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ৫২০,০০০ মার্ক কর্জ্জ লইয়া শহর এই কোম্পানীর সুহৃৎ দাঁড়াইয়া গেল। শহর কোম্পানীকে কর্জ্জ দিল না। কোম্পানীর শেয়ার-মূলধনের অধিকাংশই শহর কিনিয়া রাখিল। এখন হইতে এই ধার-করা টাকার সাহায্যে শহর একটা ব্যবসার প্রধান অংশীদার।

৪। হান্নোফার শহর ৮৫০,০০০ মার্ক দিয়া একটা কোম্পানীর জমিজমা সব খরিদ করিয়া ফেলিল। কোম্পানী গাড়ী তৈয়ারী করিত। গাড়ী তৈয়ারীর ব্যবসায় সর্ব্বত্রই মন্দা চলিতেছে। তাহা ছাড়া, অন্যান্য কারণেও কোম্পানী কাত হইয়া পড়িয়াছিল। শহরের নিকট ট্যাক্‌স হিসাবে কোম্পানী ১৫০,০০০ মার্ক ঋণী। সকল দিক্ হইতেই কোম্পানীটী কোম্পানীলীলা সংবরণ করিতে প্রস্তুত। এই অবস্থায় শহর আসিয়া তাহার সম্পত্তি কিনিতে রাজি হইল। শহর ব্যবসা-বাণিজ্যের মা-বাপ আর কি!

৫। গোর্লিট্‌স্ শহরের প্রকাণ্ড গাড়ী-কোম্পানী ১৯২৪-২৫ সনে ১৫ লাখ মার্ক লোকসান দিয়াছে। কোম্পানীর অবস্থা টলমল। কিন্তু গোর্লিট্‌স্ শহর এই কোম্পানীকে বাঁচাইবার জন্য ৪০ লাখ মার্ক কর্জ্জ তুলিয়া দিয়াছে। অথবা এই পরিমাণ টাকার জন্য শহর জিম্মাদারি লইয়াছে।

৬। বাডেন প্রদেশের গবর্মেণ্ট প্রাদেশিক পার্ল্যামেণ্টে একটা প্রস্তাব রুজু করিয়াছেন। মতলব ৪ কোটি ৬২ লাখ মার্ক সরকারী কর্জ্জ তোলা। এই কর্জ্জ দিয়া গবর্মেণ্ট কতকগুলা সরকারী শিল্প-কারখানা চালাইবেন। বিদ্যুতের কারবারে টাকা ঢালা অন্যতম উদ্দেশ্য।

৭। স্যাকসনি প্রদেশের গবর্মেণ্ট বহু দিন হইতে "জেক্‌জিশে হ্বের্কে" নামক একটা বিপুল কারবার চালাই-তেছেন। এই কারবার আস্তে আস্তে জনগণের বহুবিধ কারবার গ্রাস করিয়াছে। সম্প্রতি ৎস্বিকাও শহরের একটা বিদ্যুৎ-কারখানাকে গ্রাস করিবার আয়োজন হইয়াছে। বে-সরকারী কারবারগুলা ক্রমশঃ সরকারী সম্পত্তিতে পরিণত হইতেছে।

৮। হাইলব্রোণ শহরের একটা গাড়ী তৈয়ারী করিবার কোম্পানী কিছুদিন ধরিয়া সপ্তাহে মাত্র তিন দিন করিয়া কাজ চালাইতেছিল। যাহাতে সপ্তাহে চার দিন করিয়া কাজ চালাইবার ক্ষমতা জন্মে এই উদ্দেশ্যে হাইলব্রোণ শহর এই কোম্পানীকে একটা মোটা কর্জ্জ দিয়াছে।

শহরের এই সকল সরকারী শিল্প-বাণিজ্যের বিরুদ্ধে আজকালকার দিনে লোকমত বেশী প্রবল নয়। একটা

কথা মনে রাখিলেই বিষয়টা স্পষ্ট হইবে। বেকার-সমস্যা সর্ব্বত্রই কঠিন আকার ধারণ করিয়াছে। যে যে শহরে মজুরেরা বেকার বসিয়া থাকে, সেই সকল শহরে বেকার-ভাণ্ডারে শহরের তহবিল হইতে টাকা খরচ করিতে হয়। বস্তুতঃ, বেকার-ভাণ্ডারের শতকরা প্রায় ১৫ অংশ আসে শহরের তহবিল হইতে।

বেকার-ভাণ্ডারে সাহায্য করিবার জন্য শহরগুলা সাম্রাজ্যের তহবিল হইতে গত বৎসর ৬ কোটি মার্ক দানস্বরূপ পাইয়াছে। কাজেই বেকার-সমস্যায় শহরের দায়িত্ব খুব গুরু।

এই অবস্থায় শিল্প-বাণিজ্যগুলার কোনো কোনোটা নিজ হাতে লইয়া মজুরদের কর্ম্ম যোগানো শহরের পক্ষে অবিবেচকের কার্য্য নয়। কিন্তু তথাপি এত টাকা খরচ করার স্বপক্ষে জনগণের মত পাকিয়া উঠে নাই। কেন না, সরকারী তাঁবে শিল্প-কারখানা চালাইয়া লাভবান হওয়ার চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনাই বেশী।

আনন্দময়ী পত্রিকা (সাতক্ষীরা)

সম্প্রতি কতিপয় উচ্চশিক্ষিত কর্ম্মীর সমবেত চেষ্টায় "হাসনাবাদ লোন অ্যাণ্ড ট্রেডিং কোম্পানী লিমিটেড" নামে একটী কোম্পানী খোলা হইয়াছে।

আবাদী জমি বন্ধক রাখিয়া অল্প সুদে কৃষকদের টাকা ধার দেওয়াই এই কোম্পানীর মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। এতদ্দেশে নিরক্ষর কৃষকগণকে শুধু টাকা ধার দিলেই হবে না। কি উপায়ে জমিতে অধিক ফসল উৎপাদন করিতে পারা যায় তাহাও দেখাইয়া দেওয়া দরকার। এতদুদ্দেশ্যে ইঁহারা সর্ব্বপ্রকার বিধি-ব্যবস্থা করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইতেছেন। উন্নতজাতীয় সার ও বীজ সরবরাহ করা, জমি পতিত না রাখিয়া একই জমিতে বৎসরে একাধিক ফসলের চাষের ব্যবস্থা করা, তদুদ্দেশ্যে কল বসাইয়া জমিতে জল সেচনের বন্দোবস্ত করা, এবং পতিত জমিতে নূতন আয়কর ফসল প্রবর্ত্তন করা ইত্যাদি বিষয়ে এই কোম্পানী মনোযোগ প্রদান করিবেন। যাহাতে এই সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতে পারে তজ্জন্য ইঁহারা সুপ্রসিদ্ধ কৃষি-শিল্পবিদ্ শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জ বিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস, মহাশয়ের সহযোগিতার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

রাজকীয় কৃষি-কমিশন ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন এবং তাঁহাদের পরিশ্রমের ফলে আমাদের দেশের কৃষির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইবে ইহা বিশেষ ভাবে আশা করিতে পারা যায়। সার অভাবে শস্যের অবনতি, জল অভাবে জমি পতিত অবস্থায় রাখা, মজুরের অভাব, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে জমিবিভাগ এবং অর্থাভাব ইত্যাদি নানাকারণেই আজকাল কৃষিকার্য্য আর লাভজনক বলিয়া বিবেচিত হয় না। এই অন্তরায়গুলি অতিক্রম করিয়া কৃষিকার্য্য সাফল্য-মণ্ডিত করিতে হইলে জমীদার এবং আবাদের মালিকগণের অগ্রসর হইয়া এই কোম্পানীর সহায়তা এবং সহযোগিতা করা একান্ত আবশ্যক। যে পন্থা অবলম্বন করিলে এই বিষয়গুলির সহজে সমাধান হইতে পারে কোম্পানী তাহা বিশদরূপে সকলকে বুঝাইয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। মালিকগণের কোনরূপ ব্যয়বাহুল্য করার আবশ্যক হইবে না। সে ভার কোম্পানীই গ্রহণ করিবেন। মালিকগণ শুধু প্রজাদিগকে উক্ত পন্থা-অবলম্বনের সার্থকতা বুঝাইয়া দিবেন এবং তদনুসারে তাহাদিগকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইয়া দিবেন। ইহাতে প্রজা ও মালিকের অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হইবে সন্দেহ নাই।

গুজরাট প্রভৃতি প্রদেশে উল্লিখিত প্রথা অবলম্বন করিয়া মালিক ও প্রজাগণ সমধিক লাভবান হইতেছেন। পঞ্জাব, গুজরাট, বোম্বাই এবং বেরার প্রভৃতি প্রদেশে এইরূপ একাধিক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হইয়াছে। সর্ব্বসাধারণের এবং মালিক ও প্রজাগণের উল্লিখিতরূপ সহযোগিতার ফলে সকল প্রতিষ্ঠানগুলিই সাফল্য-মণ্ডিত হইতেছে। মাদ্রাজ প্রদেশও সম্প্রতি এই পথ অনুসরণ করিতে অগ্রসর হইয়াছে। আমাদের এই কৃষি-প্রধান দেশেও এই কোম্পানীর উদ্যম সফল হইবে সন্দেহ নাই।

কর্ম্ম-পরিচালনার বিজ্ঞান-কথা

আজকালকার দিনে কর্ম্ম-পরিচালনা একটা স্বতন্ত্র বিজ্ঞানে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ষ্টুটগার্টের জ্যেশেল কোং একখানা কর্ম্ম-পরিচালনা-বিজ্ঞানের বিশ্বকোষ প্রকাশ করিয়াছেন। ২৩১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ২৩ মার্ক। ব্যাঙ্ক-পরিচালনা, কারখানা-পরিচালনা, বিশ্ব-বাণিজ্য, রেল-জাহাজ, কৃষিকর্ম্ম, বনসম্পদ, হস্ত-শিল্প, বীমা, সমবায়-সমিতি, খাজনা, আফিস-পরিচালনা ইত্যাদি সকল বিষয়েই শৃঙ্খলীকৃত তথ্য আছে। ধনবিজ্ঞান-বিদ্যার প্রাথমিক ভিত্তিস্বরূপ এই "আর্থিক্ব ড্যর ফোর্টশ্রিট্টে বেটী্ব্স্-হ্বিস্সেনশাফ্টলিখার ফোর্শুঙ্ উণ্ড লেরে" (কর্ম্ম-পরিচালনাবিজ্ঞানের গবেষণা এবং পঠনপাঠন-বিষয়ক উন্নতির গ্রন্থশালা) ঘাঁটিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

শিল্প-কারখানায় চিত্ত-পরীক্ষা

চিত্ত-বিজ্ঞান ক্রমশঃ ফলিত বিদ্যায় পরিণত হইতেছে। টাকাকড়ির কারবারে, শিল্প-কারখানার কর্ম্মকেন্দ্রে, আর্থিক জীবনের সকল বিভাগেই নরনারীর কর্ম্মদক্ষতা পরীক্ষা করা চলে। আর সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিমাত্রেরই ব্যক্তিত্ব, জীবনবত্তা, চরিত্রের বিশেষত্ব মাপিয়া জুকিয়া নির্দ্ধারিত করা চলে। এই সকল দিকে আমেরিকায় নানা ল্যাবরেটরিতে অনুসন্ধান-গবেষণা চলিতেছে। সম্প্রতি জার্ম্মাণির এঞ্জিনিয়ার সাক্সেনব্যর্গ এই বিষয়ে একখানা বই লিখিয়াছেন। ড্রেস্ডেনের টেক্নিক্যাল কলেজে সাক্সেনব্যর্গ অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। গ্রন্থের প্রকাশক বার্লিনের স্পিঙ্গার কোং। কয়েক[illegible]স্ত্রী-মজুরের কর্ম্মক্ষমতা পরীক্ষা করা হইয়াছে। কোন শক্তির প্রভাবে কর্ম্মের পরিমাণ বাড়িয়া যায় আর কিরূপ অবস্থায় পরিমাণ কমিতে থাকে তাহার আকজোক আছে। তাল, মান, সুর, তাপ, ইত্যাদি নানা শক্তির ফলাফল মাপিয়া দেখা হইয়াছে। লাইপৎসিগের অধ্যাপক ব্যিশর এই বিদ্যার অন্যতম প্রবর্ত্তক।

বিলাতী মজুর-সচিবের দপ্তর

বিলাতের মজুর-সচিব স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আট শাখায় কাজকর্ম্ম চালাইয়া থাকেন। ১৯২৫ সনে এই সকল শাখার কাজকর্ম্ম কোন্ দিকে কতখানি হইয়াছে তাহার বৃত্তান্ত প্রকাশ করিবার জন্য সরকারী ইস্তাহার জারি করা হইয়াছে। নাম "রিপোর্ট অব্ দি মিনিষ্ট্রি অব্ লেবার ফর দি ইয়ার ১৯২৫" (লণ্ডন, ১৬৪ পৃষ্ঠা, ৩ শিলিঙ্)। সচিবের নিকট ২৫৭টা মজুরে-মালিকে মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার ভিতর ১৬৫টার বিচার নবগঠিত "ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কোর্ট" বা শিল্প-আদালতে হইয়াছে। "লেবার এক্সচেঞ্জ" অর্থাৎ মজুর-বিনিময় নামক প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে ১৩,০০০,০০০ নরনারীর লেনদেন সামলানো হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠান ১৫,০০০,০০০ কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছিল। প্রায় ১৩,০০০,০০০ কর্ম্মপ্রার্থীকে নকরি জুটাইয়া দেওয়া মজুর-বিনিময়ের এক বড় কীর্ত্তি। বেকার-ভাণ্ডার হইতে প্রায় ৫৩,০০০০০০ পাউণ্ড খরচ করা হয়। ঘণ্টায় সর্ব্বনিম্ন মজুরি ছিল পুরুষদের জন্য ১০ পেন্স হইতে ১৬ পেন্স। মেয়েদের বেলায় এই হার ৬ হইতে ১০।১১ পেন্স।

লোকসংখ্যার আর্থিক আলোচনা

আজকালকার ধনবিজ্ঞান-সেবীরা দুনিয়ার লোক-সংখ্যা সম্বন্ধে প্রচুর পরিমাণে মাথা ঘামাইতেছেন। "আর্থিক উন্নতির" নানা অধ্যায়ে তাঁহার কিছু কিছু পরিচয় দিয়াছি।

সম্প্রতি বিলাতের অন্যতম নামজাদা ধনবিজ্ঞান-পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বোনার তিনখানা ইংরেজি বইয়ের খতিয়ান করিয়াছেন। লণ্ডনের "ইকনমিক জার্ণ্যাল" ত্রৈমাসিকে এই প্রবীণ পণ্ডিতের মতামত বাহির হইয়াছে। ইয়োরামেরিকার পণ্ডিতেরা বুড়া হইলেও ছোকরাদের বইয়ের সমালোচনা করিতে লজ্জা বোধ করেন না। কথাটা বাঙ্গালীর জানিয়া রাখা ভাল।

একখানা বইয়ের প্রকাশক (বষ্টন ও নিউইয়র্কের হটন-মিফ্লিন কোং। বইয়ের নাম "পপিউলেশ্যন প্রব্লেম্স্ ইন্ দি ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স অ্যাণ্ড ক্যানাডা "(মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আর ক্যানাডার লোক-সমস্যা)। বইটা কতকগুলা বিভিন্ন লেখকের রচনার সমষ্টি। সম্পাদকের নাম লুইস ডাব্লিন। ১৯টা প্রবন্ধ আছে। সম্পাদক লিখিয়াছেন ভূমিকা। আর প্রথম প্রবন্ধটাও তাহারই লেখা।

১৯২৪ সনে "আমেরিকান ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল অ্যাসোসিয়েশ্যনের" (মার্কিণ সংখ্যা-বিজ্ঞান-পরিষদের) উদ্যোগে লোকসংখ্যা সম্বন্ধে একটা সম্মিলন বসে। বর্ত্তমান গ্রন্থ সেই সম্মিলনে অনুষ্ঠিত বক্তৃতাবলীর সংগ্রহ।

লোকসংখ্যা সম্বন্ধে বিজ্ঞান আলোচনা করিবার পক্ষে মার্কিণ মুল্লুক এক বিপুল পরীক্ষাক্ষেত্র-বিশেষ। এই দেশে লোক বাড়িয়াছে বিস্তর। নানা জাতির মিশ্রণ ঘটিয়াছে নিবিড় ভাবে। প্রাকৃতিক সম্পদ্ বড় শীঘ্র নিঃশেষ হইয়া আসিতেছে। নগরে নগরে নরনারীর সন্তান-জন্ম ঘটিতেছে কমকম। পাড়াগাঁয়ের লোক শহরমুখো হইতেছে। ইয়োরোপ আর এশিয়া হইতে লোক আমদানির স্রোতও আইনে খানিকটা চাপিয়া রাখা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই ধরণের ঘটনা দুনিয়ার অন্যান্য দেশেও অল্পবিস্তর দেখা যায়। কাজেই জগতের প্রায় যে-কোনো দেশকেই লোক-সংখ্যার বিজ্ঞান-বিষয়ক ল্যাবরেটরী বিবেচনা করা চলে। তবে মার্কিণ মুল্লুক নেহাৎ কচি। এই দেশে অল্প সময়ের ভিতর অনেক-কিছু ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। কাজেই এখানকার বিশেষত্ব কিছু না কিছু আছেই।

এই গ্রন্থে ক্যানাডা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন কোট্স্। এই ব্যক্তি ক্যানাডার সরকারী ষ্ট্যাটিষ্টিশিয়ান। ক্যানাডায় আর যুক্তরাষ্ট্রে যে-সকল প্রভেদ আছে সেই সব দেখানো তাঁহার মতলব। অধিকন্তু এই দুয়ের পরস্পর সাহায্যের নজিরও তিনি দিয়াছেন। ক্যানাডাদেশের আর এক পণ্ডিত ম্যাক্-ইন্নর এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে ভবিষ্যতের পানে লোকসংখ্যা কোন্ প্রণালীতে অগ্রসর হইতেছে তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

এইখানে একটা কথা উল্লেখযোগ্য। বিলাতের সেন্সাস রিপোর্ট লোক-সংখ্যার বিজ্ঞান সম্বন্ধে যার পর নাই মূল্যবান। ১৯১১ সনের সেন্সাস-বিবরণীর ১৩ খণ্ডে "বিবাহের ফলাফল" সম্বন্ধে অনুসন্ধানমূলক বস্তুনিষ্ঠ বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। তাহাতে ইংরেজ সমাজকে আট-টা স্বতন্ত্র শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। শ্রেণীগুলা আর্থিক কাজকর্ম্ম-মাফিক। প্রথম শ্রেণীতে পড়ে পুঁজিজীবী, কর্ম্মপরিচালক, বিদ্যাসেবক ইত্যাদি শ্রেণী। সপ্তম শ্রেণীর লোক হইতেছে খনির কুলী। চাষীরা পড়ে অষ্টম শ্রেণীতে। প্রত্যেক শ্রেণীর লোকের বিবাহ-ঘটনা আর সন্তান-জন্ম এবং পারিবারিক হ্রাসবৃদ্ধি স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিয়া বিলাতী সেন্সাস এই বিজ্ঞানের অন্যতম পথপ্রদর্শক হইয়াছে।

মার্কিণ গ্রন্থে অধ্যাপক রয়টার যুক্তরাষ্ট্রের লোকবৃদ্ধির আলোচনা করিয়া বলিতেছেন,—"১৮৬০ সন পর্য্যন্ত লোক-সংখ্যা ডবল হইত প্রত্যেক ২৫ বৎসরে, কিন্তু তাহার পর লোক-বৃদ্ধির হার কমিয়াছে। ১৯০০ হইতে ১৯১০ পর্য্যন্ত যে হারে লোক বাড়িয়াছিল, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী দশ বৎসরের তুলনায় শতকরা মাত্র ৩৫·৬ জন বেশী। আর ১৯১০ হইতে ১৯২০ পর্য্যন্ত যে পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটিয়াছে, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী দশকের তুলনায় মাত্র শতকরা ১৪·৯ জন বেশী।"

টম্প্সন্ বলিতেছেন,—"লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির হার কমিয়াছে বটে। কিন্তু এই কমা দেখা যায় একমাত্র শহরে। খাঁটি শ্বেতাঙ্গ মার্কিণ জাতি শহরে বেশী বাড়িতেছে না একথা ঠিক।"

অন্য দুইখানা বই বিলাতী। একটার লেখক ফ্লোরেন্স। তাঁহার বইয়ের নাম "ওভার পপিউলেশ্যন থিয়োরি অ্যাণ্ড ষ্ট্যাটিষ্টিক্স্" (লোকসংখ্যার অতিবৃদ্ধি-বিষয়ক তত্ত্ব ও তথ্য-

তালিকা)। প্রকাশক লণ্ডনের কেগান পল কোং। অপর গ্রন্থের নাব "পপিউলেশ্যন প্রব্লেমস্ অব্ দি এজ অব্ ম্যালথাস" (ম্যাল্থাসের সময়কার লোক-সংখ্যা-সমস্যা)। লেখক গ্রিফিথ। প্রকাশক কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস।

ফ্লোরেন্সের মতে "ম্যাল্থাসের বাণী আজও লোক-সংখ্যা-বিষয়ক বিজ্ঞানের ভিত্তি। লোক বাড়িতেছে। লোকের আহার্য্যও বাড়িতেছে। কিন্তু আহার্য্য যে পরিমাণে বাড়িতেছে তাহার চেয়ে বেশী পরিমাণে বাড়িতেছে লোক। আজকালকার বেকার-সমস্যায়ও এই তত্ত্বই খাটিবে।"

গ্রিফিথ অষ্টাদশ শতাব্দীর বিলাতে লোক-সংখ্যা ঠিক কত ছিল তাহার অনুসন্ধানে মেহনৎ খাটাইয়াছেন। ১৮০১ সনের পূর্ব্বে বিলাতে আদমসুমারির ব্যবস্থা ছিল না। কাজেই তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের লোক-গণনা করিতে গিয়া আজকালকার দিনে নানা মুনি নানা মত চালাইয়াছেন। গ্রিফিথের সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ:—"১৭০০ সনে ছিল ৫,৮৩৫,২৭৯। সংখ্যাটা দাঁড়ায় ১৮০১ সনে ৯,১৬৮,০০০।"

লোকসংখ্যা বাড়িবার এক উপায় হইতেছে জন্ম-সংখ্যার বৃদ্ধি। আর এক উপায় হইতেছে মৃত্যু-সংখ্যার হ্রাস। ম্যাল্থাস প্রথম কথাটার উপর জোর দিয়াছিলেন। দ্বিতীয় কথাটার দিকে তাঁহার নজর ছিল না। আজ-কালকার বিজ্ঞানে এই দ্বিতীয় দফার উপর নজর পড়িতেছে বেশী।

কৃষিকর্ম্মের যন্ত্রপাতি

বর্ত্তমান যুগের চাষবাসকে মামুলি কৃষি-কর্ম্ম বলা চলে না। সেকেলে ডাক-খনার বচন একালের দুনিয়া হইতে একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে। একালের ডাক-খনারা যন্ত্র-পাতির ওস্তাদ, কল-কব্জায় সুদক্ষ। আজকালকার চাষ একটা শিল্প-বিশেষ। এই সকল কথা বুঝাইবার জন্য রুডল্ফ আরেন্স "ডী ডয়চে লাণ্ড মাশিনেন-ইণ্ডুষ্ট্রী" (জার্ম্মাণ কৃষি-যন্ত্রের শিল্প-কারখানা) নামে একখানা বই লিখিয়াছেন। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৭৩। চাষ-বাসের জন্য যে-সকল যন্ত্রপাতি কাজে লাগে সেইসব তৈয়ারী করিবার কারখানা জার্ম্মাণিতে প্রথম কায়েম হয় কখন,—এবং তাহার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত এই সকল কারখানার ক্রমবিকাশ কিরূপ সাধিত হইয়াছে, তাহার বৃত্তান্ত এই গ্রন্থের মাল। গ্রাইফ্সহ্বাল্ড নগরের ব্যাম্ব্যর্গ কোং প্রকাশক (১৯২৬)। আরেন্স তথ্যগুলা ধনবিজ্ঞানের খোরাকস্বরূপ সাজাইয়াছেন। টেক্নিক্যাল কটমট বাত কম আছে।

জাপানের শিল্প-ব্যবসা

পাশ্চাত্য দেশের সংস্পর্শে আসার ফলে এবং ফিউডালি-জ্ম বা মধ্যযুগ-মাফিক জমীদারি ব্যবস্থার ভিতরকার গলদ উপলব্ধি করিয়া জাপান সাম্রাজ্যতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক "ক্যাপিটালিজ্ম" (পুঁজি-তন্ত্র) জাপানে খুঁটা গাড়িয়া বসে। দেখিতে দেখিতে দেশটায় রাষ্ট্রীয়, সামাজিক এবং আর্থিক উন্নতির সাড়া পড়িয়া যায়। কারবারে সকল প্রকার একচেটিয়া ভাব উঠাইয়া দেওয়া হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যে স্বাধীন নীতি অবলম্বন করা হয়। রুশিয়া এবং চীনের বিরুদ্ধে জাপানের দুই-দুইটি লড়াইয়ে বড় রকমের জয়-লাভের ফলে তাহার শিল্পজাত মাল ও বৈদেশিক বাণিজ্য হু হু করিয়া বাড়িয়া যায়। জাপান দেশটার অদৃষ্ট খুব ভাল। বিগত বিশ্ব-লড়াই জাপানের নিকট এক সুবর্ণ সুযোগ রূপে উপস্থিত হয়। চতুর জাপান দেখিতে পাইল গোটা ইয়োরোপ মারামারি কাটাকাটিতে হয়রান পরেসান। এইবার তার বড় রকমের দাঁও মারিবার সময় হাজির।

এই সুযোগে সে এক বিরাট ব্যবসা ফাঁদিয়া বসিল। মহাযুদ্ধের রসদ যোগাইয়াছে জাপান। কেবল যুদ্ধের মাল সরবরাহ করিয়াই সে ক্ষান্ত হয় নাই। ইংরেজ যখন তার ম্যানচেষ্টার লিভারপুলের শিল্প-কারখানা গুটাইয়া লড়াইয়ের মাঠে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছে, জাপান সেই সুযোগে ইংরেজের প্রাচ্য হাট-বাজার দখল করিবার চেষ্টা করিয়াছে। যুদ্ধের সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত ভারতে জাপানী মালের দিগ্বিজয় চলিতেছে।

যুদ্ধের পরবর্ত্তী ব্যবসা-বাণিজ্যের মন্দাভাব আর পর পর

ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় জাপানকে কাবু করিয়া ফেলিতে পারে নাই। জাপানের আর্থিক উন্নতির প্রচেষ্টা সমভাবেই চলিতেছে। অতগুলি ভূমিকম্পে কোটি কোটি টাকার ধ্বংস, ব্যবসা-বাণিজ্যের দারুণ ক্ষতি কিছুতেই জাপান টলিতেছে না। জাপান এসবকেই অগ্রাহ্য করিয়া অগ্রসর হইতেছে। তবে কতকগুলি সমস্যা অন্যান্য দেশের মতন জাপানের সামনেও উপস্থিত। জাপানের লোকসংখ্যা খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে বেকার লোকের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। লোকের জীবন-যাত্রার মাপকাঠি বাড়িয়া গিয়াছে। কাজে কাজেই মজুরী ও অনেকটা বাড়িয়া গিয়াছে। মজুরদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়াছে। কাঁচা মালের রসদে ঘাট্‌তি পড়িয়াছে। শিল্প-ব্যবসার চাহিদা-মাফিক কাঁচা মাল মিলিতেছে না। জাপানের রাষ্ট্রিকেরা এই সকল সমস্যার সমাধানের জন্য মাথা ঘামাইতেছেন।

কাগজপত্রে দেখা যায়, বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ধারা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ও যুদ্ধের সময় ইয়োরোপীয় দেশসমূহে জাপানী মালের কাটতি খুব বৃদ্ধি পায়। বর্ত্তমানে আমেরিকা, চীন ও ভারতবর্ষে জাপানের ব্যবসা-বাণিজ্য অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত এস, য়ুয়েহারা তাঁহার নবপ্রকাশিত "দি ইণ্ডাষ্ট্রি অ্যাণ্ড ট্রেড্ অব্ জাপান" (জাপানের শিল্প-বাণিজ্য) গ্রন্থে (লণ্ডনের পি, এস, কিং প্রকাশিত মূল্য ১৫ শিলিঙ) জাপানের শিল্প-ব্যবসায়ে দ্রুত উন্নতির কতকগুলি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

তিনি বলেন,—

(১) বস্ত্র-শিল্পে যে ধরণের কর্ম্মকৌশল দরকার তাহা জাপানী মজুরদের সম্পূর্ণ উপযোগী।

(২) মজুরীর হার কম। প্রধানতঃ অল্প মাহিয়ানার স্ত্রী-মজুরদ্বারা নিম্নশ্রেণীর কাজ করান হয়। তাহাতে উৎপাদনের খরচা কম পড়ে।

(৩) জাপান দেশটা চীন, ভারতবর্ষ প্রভৃতি বড় বড় খরিদ্দার দেশের নিকট অবস্থিত।

(৪) জাপানের শুল্ক-ব্যবস্থায় সংরক্ষণ-নীতি বিদেশী শস্যের বিরুদ্ধে বেশ কার্য্যকরী। তাহা ছাড়া রপ্তানি মালের দর পড়িয়া গেলে আভ্যন্তরীণ দর চড়াইয়া জাপানী শুল্কনীতি স্বদেশী শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করে।

(৫) জাপানের বিরাট সঙ্ঘবদ্ধ ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলি রপ্তানি-বাণিজ্যের বিস্তার-সাধনের সহায়ক।

এই সকল কারণে জাপান ল্যাঙ্কাশিয়ারে প্রস্তুত দ্রব্যাদি প্রাচ্যের হাট্-বাজার হইতে বিতাড়িত করিয়া নিজে সেগুলি দখল করিয়া বসিতে সমর্থ হইতেছে এবং জাপানী মিলগুলি অংশীদারগণকে মোটা হারে লভ্যাংশ দিতে পারিতেছে। বিদেশী রপ্তানি মালের দর পড়িয়া গেলেও তাহারা ঘোট করিয়া ও সরকারী সাহায্যে আভ্যন্তরীণ দর চড়াইয়া বস্ত্র-শিল্পের ক্ষতিপূরণ করিয়া থাকে।

জাপানের লৌহ-শিল্পের অবস্থা ততটা সুবিধাজনক নয়। কাঁচা মালের যোগান চলিতেছে না। জ্বালানি মাল-মশলার অভাব। ওদিকে চীন, ভারতবর্ষ ও যুক্তরাষ্ট্রের লৌহ-শিল্প দ্রুত উন্নতির পথে চলিয়াছে। এসকল দেশের সঙ্গে জাপানকে ভীষণ প্রতিযোগিতায় সম্মুখীন হইতে হইয়াছে।

বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর গড়া নবীন জাপানের উন্নতি সম্বন্ধে লেখক নিম্নলিখিত কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(১) জাপান সরকার পাশ্চাত্য প্রণালীতে স্বদেশের আর্থিক ব্যবস্থা নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন।

(২) দুই দুইটি লড়াইয়ে জয়লাভ।

(৩) শুল্ক-ব্যবস্থায় সুদৃঢ় সংরক্ষণ-নীতি প্রবর্ত্তন।

(৪) বিগত মহাযুদ্ধে জাপানের শিল্প-ব্যবসা বাড়াইবার মহা সুযোগ।

(৫) জাপানে অল্প পারিশ্রমিকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মজুর পাওয়া যায়।

বর্ত্তমানে য়ুয়েহারার মতে জাপানের শিল্প-মহলে কিছু মন্দাভাব যাইতেছে। কলকারখানার আর্থিক সচ্ছলতা নাই। হাল ফ্যাশানের কলকব্জার জাপানী শিল্প-কারখানায় আরও বেশী ব্যবহার হওয়া আবশ্যক। মজুরদের শিল্প-শিক্ষার সুযোগ বাড়ানো দরকার। তিনি আরও বলেন যে, ব্যবসা-বাণিজ্যে বর্ত্তমান সংরক্ষণ-নীতি কিছু শিথিল

করিয়া দেওয়া উচিত। কাঁচা মাল ও খাদ্য-শস্যের উপর নির্দ্ধারিত কর উঠাইয়া দেওয়া চাই।

বংশোন্নতি ও বিবাহ-সংস্কার

লোক-সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা বিদ্যার চর্চ্চা ধনবিজ্ঞানের আখড়ায় আজকাল খুব প্রবল। সে হইতেছে সুপ্রজনন—বংশোন্নতি (ইউজেনিক্‌স্)।

এই বিষয়ে ইংরেজ-মহলের অন্যতম নামজাদা লেখক হইতেছেন ক্রমবিকাশবাদের প্রবর্ত্তক জগদ্বিখ্যাত চার্লস ডারুইনের পুত্র লেনার্ড ডারুইন। বংশোন্নতি-বিদ্যার প্রবর্ত্তক ফ্র্যান্সিস গ্যাণ্টনও ডারুইন গুষ্টিরই আত্মীয় ছিলেন। দেখা যাইতেছে যে, বিদ্যাটা বংশানুক্রমিক রূপেই কিছু কিছু চলিতেছে।

লেনার্ড ডারুইনের বইয়ের নাম "দি নীড ফর ইউজেনিক রিফর্ম" (বংশ-সংস্কারের আবশ্যকতা)। লণ্ডনের জন মারে কোং প্রকাশক। ৫৩২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ১২ শিলিঙ।

গ্রন্থকার বিজ্ঞানের মূলমন্ত্রগুলি সম্বন্ধে বেশী মনোযোগ দেন নাই। বংশোন্নতি-সাধন করিতে হইলে সমাজে কোন্ কোন্ নতুন নিয়ম কায়েম করা দরকার তাহার আলোচনাই ডারুইনের উদ্দেশ্য।

বংশোন্নতি বিদ্যাটায় দুই স্বতন্ত্র বিভাগ লক্ষ্য করিতে হইবে। প্রথমতঃ প্রাণিবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তমাফিক জন্মগত দোষগুণের আলোচনা। দ্বিতীয় ভাগ হইতেছে মানব-সমাজে এই সকল দোষগুণ কোন্ শ্রেণীতে কিরূপভাবে বিস্তৃত তাহার বিশ্লেষণ। বস্তুতঃ, এই দ্বিতীয় অংশকেই খাঁটি বংশোন্নতি-বিদ্যা বলা চলে।

কিন্তু আসল কথা,—আজ পর্য্যন্ত ইউজেনিক্‌স সাহিত্য বলিলে যে সকল রচনা আমাদের চোখের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহার অধিকাংশেই এই দ্বিতীয় দফায় টিকি দেখিতে পাওয়া যায় না। লেনার্ড ডারুইনও একমাত্র প্রথম দফার উপরই নির্ভর করিয়াছেন। তিনি জানোআর-মহলে জন্মগত দোষগুণ-লাভের চর্চ্চাটাকেই একপ্রকার নিজ বিদ্যার ভিত্তি করিয়া লইয়াছেন।

ডারুইনের গ্রন্থের আর একটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করা আবশ্যক। তিনি বংশোন্নতি সম্বন্ধে খাঁটি বিজ্ঞান রচনা করিবার মতলবে কলম ধরেন নাই। বিদ্যাটা আজকাল বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে কোন্ ঠাঁই অধিকার করিতেছে তাহা দেখিবার চেষ্টা করা তাঁহার উদ্দেশ্য নয়। তিনি এই বিদ্যাটাকে কাজে লাগাইবার কৌশলই ঢুঁড়িতেছেন। যাহাকে "অ্যাপ্লায়েড সায়েন্স" বা কার্য্যকরী বিদ্যা বলে, ইউজেনিক্‌স ডারুইনের গ্রন্থে সেই মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছে। তিনি সমাজ-সংস্কারক, বংশ-সংস্কারক, বিবাহ-সংস্কারক রূপে সাহিত্যক্ষেত্রে দেখা দিয়াছেন।

গ্রন্থের দুর্ব্বলতা এইখানেই ধরা পড়িতেছে। প্রথমতঃ, ডারুইনের গ্রন্থে যতখানি "থিয়োরেটিক্যাল" বা তাত্ত্বিক বিজ্ঞান আছে তাহা একতরফা, আংশিক। দ্বিতীয়তঃ, এই আংশিক বিজ্ঞানটাকেই তিনি কাজে লাগাইয়া সমাজ-সংস্কার করিবার প্রয়াসী। কাজেই তাঁহার কর্ম্মনীতি এবং সংস্কার-কৌশলের অসম্পূর্ণতা কম নয়।

একটা প্রশ্ন তোলা যাউক। আজকাল যাহারা গরিব বা সামাজিক ও আর্থিক হিসাবে অনুন্নত, তাহাদের তুলনায় পয়সাওয়ালা লোকেরা কি ব্যক্তিত্বের পরীক্ষায় উৎকৃষ্ট জীব? তাহারা কি "রক্তের" দোষে, "জন্মের" দোষে, "বংশের" দোষে অনুন্নত হইয়াছে? ধনী আর নির্ধন এই দুই শ্রেণীর গোড়ায় কি কোনো রক্ত-গত, বংশ-গত প্রভেদ আছে? আর সেই প্রভেদের দরুণ চরিত্রে এবং বিদ্যাবুদ্ধিতে নানা প্রভেদ সৃষ্ট হইয়াছে কি?

যাহারা বিষয়টা খাঁটি বিজ্ঞানের বস্তুনিষ্ঠ প্রণালীতে আলোচনা করিতে প্রয়াসী,—অর্থাৎ যাহারা সমাজ-সংস্কারের "প্রপাগাণ্ডায়" (আন্দোলন) মস্‌গুল নন, তাঁহারা বড় লোকে গরিব লোকে ব্যক্তিত্বের আসরে, স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তা, চরিত্র-বত্তা ইত্যাদির আগড়ায় বড় বেশী জন্মগত বা রক্তগত প্রভেদ ঢুঁড়িয়া পান না। কিন্তু লেনার্ড ডারুইন এই দুই শ্রেণীর ভিতর বিস্তর প্রভেদ আছে এইরূপ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তারপর টাকা রোজগার করিতে পারাটা ডারুইন একটা রক্তের গুণ, বংশের গুণ, জন্মগত উত্তরাধিকারের প্রভাব ধরিয়া লইতে রাজী। আজকালকার সামাজিক ব্যবস্থাই যে অনেক লোককে আর্থিক হিসাবে

দাবিয়া রাখিয়াছে আবার অপরাপর লোককে অন্যায় ভাবে মাথায় তুলিয়া রাখিয়াছে একথা ডারুইনের মাথায় প্রবেশ করে নাই।

কাজেই ডারুইনের বাণী হইতেছে নিম্নরূপ :—"গরিব লোকগুলা অকাল কুষ্মাণ্ড। তাহারা অকর্ম্মণ্য, অপদার্থ, আহাম্মক বলিয়াই গরিব। মানব-সমাজের দুর্ব্বহ ভার হিসাবে তাহারা দুনিয়াকে অবনতির পথে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে। পয়সাওয়ালা লোকদের নিকট হইতে গবর্মেণ্ট মোটা হারে ট্যাক্স আদায় করিয়া গরিবের জন্য বিনা পয়সায় স্কুল কায়েম করিতেছে, হাঁসপাতাল কায়েম করিতেছে, স্বাস্থ্যনিবাস গড়িয়া তুলিতেছে, শহর-পল্লীতে আরাম-বাগান রচনা করিতেছে। গবর্মেণ্টের এই শ্রেণীর কাজগুলা সবই কুঁড়ে ও নির্গুণ লোককে লাই দেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। করিতকর্ম্মা, বুদ্ধিমান, চরিত্রবান্ ধনশালী লোকদের রক্ত শুষিয়া গবর্মেণ্ট অলসচরিত্র নির্গুণ নরনারীকে বাঁচাইয়া রাখিতেছে, আর এই সকল বদরক্তওয়ালা নরনারীর সংখ্যা-বৃদ্ধিতে উৎসাহ দিতেছে।"

বংশ-সংস্কার আর সমাজ-সংস্কার চালাইতে হইলে ডারুইনের মতে গবর্মেণ্টকে উল্টা পথে চলিতে হইবে। গরিব লোকেরা যাহাতে বিবাহ করিবার দিকে না ঝুঁকে তাহার ব্যবস্থা করা দরকার। সার্ব্বজনীন অবৈতনিক স্কুল রাখা উচিত নয়। যাহারা মরিতে বসিয়াছে তাহা-দিগকে বাঁচাইবার জন্য সস্তায় অথবা বিনা পয়সায় আরোগ্য-শালা কায়েম করা অনাবশ্যক। ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইয়োরামেরিকায় আজকাল ইউজেনিক্স্ বলিলে সাধারণতঃ এই ধরণের কার্য্যকরী বিদ্যা এবং এইরূপ সমাজ-সংস্কারের ম্রোসাবিদাই বুঝা যায়। এই সকল চিন্তা ও কর্ম্ম-প্রণালীকে ভারতীয় কট্টর বর্ণাশ্রমবাদী এবং ভেদপন্থী গোঁড়া হিন্দুয়ানির মাসতুত ভাই বিবেচনা করা চলে।

কিন্তু ইউজেনিক্সের খাঁটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রচার করিবার জন্য অন্যান্য লেখকও আছেন। তাঁহাদের সংখ্যাও কম নয়। আর তাঁহারা নামজাদা পাকা-মাথাওয়ালা লোকও বটেন। অধিকন্তু এই সকল খাঁটি থিয়োরেটিক্যাল বা তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের ফলিত বা "অ্যাপলায়েড" বিভাগ সম্বন্ধেও অনেক লেখক আছেন। আর তাঁহাদের কলম চলেও সংযত ভাবে। তাঁহাদের মোটা কথা এই :—"আরে বাপু, মানব সমাজে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক দোষগুণগুলা ঠিক কিরূপভাবে চলাফেরা করে তাহা খাঁটি বিজ্ঞান এখনো বলিয়া দিতে অসমর্থ। বংশের দান আর রক্তের দান ঠিক কোন্ কোন্ আকৃতি-প্রকৃতির তাহা আমরা এখনো জানি না। কাজেই কোন্ কোন্ নরনারীর বিবাহ করা উচিত সে সম্বন্ধে লম্বা গলা করিয়া প্রপাগাণ্ডা চালানো বর্ত্তমান অবস্থায় আহাম্মুকি।"

এই ধরণের সংযত লেখকের দলে ইংরেজ পণ্ডিত কার সণ্ডার্স অন্যতম। ইনি লোকসংখ্যা-বিষয়ক বিদ্যার সেবক। "ইউজেনিক্স্" নাম দিয়া তিনি সম্প্রতি একখানা বই ছাপিয়াছেন। ছোট বই। লণ্ডনের হোম ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি প্রকাশক। বইটায় সমাজ-সংস্কারের ঝাণ্ডা খাড়া করা হয় নাই। তিনি মানবজীবনের ক্রমবিকাশে রক্তের দান আর সমাজের দান সম্বন্ধে বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ চালাইয়াছেন। বর্ত্তমান সমাজে দোষগুণগুলা কোন্ শ্রেণীতে কিরূপ ভাবে বিস্তৃত তাহার মাপজোক-সাধনের জন্য কার সণ্ডার্স একটা "আত্মিক আদমসুমারি" কায়েম করিবার প্রস্তাব তুলিয়াছেন।

"লা রেস্তরাৎসিয়নে ফিনান্‌ৎসিয়ারিয়া" (রাজস্বের পুনর্গঠন),—দে স্তেফানি, বলঞা (ইতালি), ৎসানিকেল্লি কোং, ১৯২৬, ২৪ লিয়ার।

"লাস্‌স্যিরাঁস সোসিয়াল স্থির লা হ্বী" (জীবন বিষয়ক সমাজ-বীমা),—গবেয়ার, প্যারিস আলকাঁ কোং, ১৯২৬, ৩০ ফ্রাঁ (ফরাসী)।

"কষ্ট্ অ্যাকাউন্টিং" (ফ্যাকটরিতে উৎপন্ন মালের খরচ হিসাব করা),—লরেন্স নিউইয়র্ক, প্রেন্টিস হল কোম্পানী ১৯২৫, ৫ ডলার।

"ডাস্ ষ্টয়ার-সিষ্টেম সোহ্বিয়েট-রুসলাণ্ড্‌স্" (সোহ্বিয়েট রুশিয়ার করাদায়-নীতি), হেন্‌জেল,—বার্লিন, হান্স্ প্রাইস কোং, ১৯২৬।

"আন্-এম্প্লয়মেণ্ট অ্যাজ অ্যান ইণ্টার্ণ্যাশন্যাল প্রব্‌লেম"(বেকার-সমস্যার বিশ্বরূপ), রীস, লণ্ডন, কিং কোং, ১৯২৬, ১০ শি ৬ পেন্স।

"গবর্মেণ্টাল মেথড্‌স্ অব্ অ্যাড্‌জাষ্টিং লেবার ডিস্‌পিউটস্ ইন নর্থ আমেরিকা অ্যাণ্ড অষ্ট্রেলেসিয়া" (সরকারী শিল্প-বিবাদ মীমাংসা,—উত্তর আমেরিকার আর অষ্ট্রেলেসিয়ার নজির),—কো (চীনা গ্রন্থকার), নিউইয়র্ক, লংম্যানস কোং, ১৯২৬।

"রিপোর্ট অব্ দি কমিটি অব্ দি বোর্ড অব্ ট্রেড অন্ দি সেফগার্ডিং অব্ ইণ্ডাষ্ট্রীজ অ্যাক্‌ট ১৯২১" (১৯২১ সনের শিল্প-সংরক্ষণ আইনের কার্য্যফল সম্বন্ধে সরকারী বাণিজ্য-কমিটির মতামত, লণ্ডন, সরকারী ছাপাখানা, ১৯২৬, ৯ পেন্স।

অর্থনৈতিক পুস্তিকা

শ্রীবিনয়কুমার সরকার প্রণীত

১। শিপিং অ্যাণ্ড রেলওয়ে পলিসীজ্ ইন্ ইকনমিক লেজিস্‌লেশ্যন (বাণিজ্য-তরণী আর রেলপথ-বিষয়ক শাসন সম্বন্ধে আর্থিক আইন-কানুন), কলিকাতা, ওরিয়েণ্টাল প্রেস, ১০৭ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, রয়াল অক্টেভো, ১৬ পৃষ্ঠা, ১৯২৬, চার আনা।

২। "দি ব্যাঙ্ক-নোট্‌স্ অ্যাণ্ড নোট-ব্যাঙ্কস্ অব্ জার্ম্মাণি (জার্ম্মাণির কাগজী মুদ্রা ও মুদ্রা-প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্কসমূহ), প্রকাশক ঐ, ১৬ পৃষ্ঠা, ১৯২৬, চার আনা।

৩। দি ল অ্যাণ্ড দি কাল্টিভেটর: দি এক্‌জাম্প্‌ল্ অব্ ফ্রান্স" (আইন ও কিষাণ,—ফ্রান্সের দৃষ্টান্ত) প্রকাশক ঐ, ১৮ পৃষ্ঠা, চার আনা।

৪। ব্যাঙ্ক-ব্যবসার গোড়ার কথা,—প্রকাশক ঐ ২৩ পৃষ্ঠা" ১৯২০, এক আনা।

সারের ব্যবসা

শ্রীজগজ্জ্যোতি পাল, কেমিষ্ট, রাখামাইন্‌স্‌, সিংভূম

আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান। আমাদের দেশে সারের ব্যবসা কিরূপ চলিতেছে তাহা আমরা এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব। সারকে আমরা উৎপত্তিগত হিসাবে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিব। (১) খনিজ, (২) জৈব, (৩) রাসায়নিক। আবার এই প্রত্যেক শ্রেণীর সারকে রাসায়নিক বিশ্লেষণ হিসাবে তিন ভাগে ভাগ করা যায়; যথা (ক) নাইট্রোজেন-প্রধান, (খ) ফস্‌ফরাসপ্রধান, (গ) পটাশিয়ামপ্রধান।

জার্ম্মাণির উত্তর প্রদেশে প্রচুর পরিমাণ পটাশিয়াম, দক্ষিণ আমেরিকার চিলিতে নাইট্রেট ও পৃথিবীর অনেকানেক জায়গাতে ফসফেটকে আমরা খনিজ অবস্থাতে পাই। সকল দেশের পক্ষে এই খনিজ সারের সুবিধা নাই ও এই সব খনিজ সার বহুদিন ধরিয়া লুণ্ঠিত হইতেছে। আর জৈব সার প্রত্যেক দেশের জীব-সংখ্যার উপর নির্ভর করে। মনুষ্য-পশ্বাদির মল, মূত্র, অস্থি ইত্যাদি জমির উত্তম সার। সভ্য মানুষের এই দুই শ্রেণীর সারে কুলাইতেছে না। তাই তাহারা রাসায়নিক উপায়ে সার তৈয়ারী করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে ও করিতেছে। জার্ম্মাণি ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্র এই রাসায়নিক সার নির্ম্মাণের কারবারে অগ্রণী হইয়াছে।

আর আমাদের দেশে নাইট্রেট, পটাশিয়াম বা ফস্‌ফেট্‌ এই তিন জাতীয় জিনিষের কোনোটীর যে উল্লেখযোগ্য কোনো খনি আছে তাহা নয়, এবং আমাদের জৈব সার-সমূহকে যে আমরা সম্যকরূপে সার হিসাবে কাজে লাগাই বা কাজে লাগাইবার সুবিধা আছে তাহাও নয়; কিন্তু এ সত্বেও আমরা আমাদের কোক্‌ওভেন্‌স্‌ হইতে উৎপন্ন অ্যামোনিয়াম সালফেটের অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানি করি। যে জাভা হইতে আমরা প্রচুরপরিমাণ চিনি ক্রয় করি, সেই জাভাকেই আমরা অ্যামোনিয়াম সালফেট সরবরাহ করি।

আমাদের দেশে উল্লেখযোগ্য কোনো খনিজ সার না থাকিলেও আমাদের দেশে প্রতি বৎসর মৃত জীব-জন্তুর এত হাড় পাওয়া যায় যে, তাহা কাজে লাগাইতে পারিলে আমাদের কৃষির অনেক উন্নতি হয়। হাড়কে জমির সার-রূপে কাজে লাগাইবার পক্ষে আমাদের একটা বৃহৎ অন্তরায় আছে। সালফিউরিক অ্যাসিডের দুর্ম্মূল্যতাই এর কারণ। হাড়কে সালফিউরিক অ্যাসিড সহযোগে দ্রবীভূত করিলে জমির ব্যবহারোপযোগী হয়। সালফিউরিক অ্যাসিডের দুর্ম্মূল্যতাহেতু আমরা বহুলপরিমাণে হাড়গুঁড়া ও বোন্‌মিল বিদেশে রপ্তানি করিয়া থাকি। হাড় ছাড়াও আমাদের দেশে মালাবার অঞ্চলে যে শুক্‌না মাছের কারবার হয়, সেই শুক্‌না মাছও একটী উৎকৃষ্ট সার। শুক্‌না মাছও আমরা বিদেশে রপ্তানি করি। আমাদের দেশের সমস্ত অ্যামোনিয়াম সালফেট্‌ ও শুক্‌না মাছ যে আমরা বিদেশে রপ্তানি করি এমন নয়, কফি-আবাদে ও চা-বাগানে ইহার কতক পরিমাণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমরা বাৎসরিক এক কোটি টাকার উপর সার বিদেশে রপ্তানি করিয়া থাকি। আর আমাদের দেশের এমন ব্যবস্থা যে, আমরা পাঞ্জাবে গম ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য পয়ঃপ্রণালীর সৃষ্টি করিয়াছি। নিম্নে আমাদের সার-রপ্তানির একটী তালিকা দিতেছি।

	১৯২০ সন		১৯২১ সন	
	টন	টাকা	টন	টাকা
হাড়, হাড়গুঁড়া	১০৭,৮৪৩	১,১০,২৩,৫১০	৮৩,১০০	৮২,০৮,৭১৩
মৎস্যসার	২৯,৮০১	৪২,৫৩,৫৪০	৬,৭৯২	১০,১৮,৯৭৭
অ্যামোনিয়াম সালফেট	৩,৮৯০	৮,২৭,৫৭০	৩,২৫৬	৮,৬৪,৪২২
অন্যান্য জাতীয় সার	২,৯৪৫	৪,৮৮,৩৭০	৩,৬০১	৩,৭৮,৯৭৫
সর্ব্বসমেত	১৪৪৪৭৯	১,৬৫,৮৯,৯৯০	৯৬৭৪৯	১,০৪৭১০৮৭

আমাদের দেশে যাঁহারা রাসায়নিক সারের প্রয়োজন বোঝেন, তাঁহারা কিছু টাকার সার আমদানি করেন। নিম্নে আমাদের আমদানি সারের তালিকা দিতেছি।

	১৯২০ সন		১৯২১ সন	
	টন	টাকা	টন	টাকা
রাসায়নিক সার	৬,৫৯০	১৫,২২,০৮০	৮,৩৪	২,৩৪,০৫৩

পাশ্চাত্যের কোনো কোনো দেশ সারের ব্যবসায় এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে, গবর্মেণ্ট কৃষকদিগকে সার-ব্যবসায়ীদের জুয়াচুরির কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য সার আইন প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। ১৯০৬ সনেই আমরা ইংল্যণ্ডে এই আইন (ফার্টিলাইজার অ্যাক্ট) পাশ হইতে দেখিয়াছি। এই আইন অনুসারে সার-বিক্রেতারা উপযুক্ত গুণসম্পন্ন সার রাখিতে বাধ্য।

আমরা পূর্ব্বে নাইট্রোজেন ফস্‌ফরাস ও পটাশিয়াম এই তিন জিনিসযুক্ত সারের কথা বলিয়াছি। এই তিন প্রকার সার ছাড়াও জমিতে আর এক শ্রেণীর জিনিষ দেওয় হয়, যাহা জমির হজমী (ষ্টিমিউল্যাণ্ট)। এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে চুণ, লবণ, জিপসাম ইত্যাদি। এই সকল জিনিষ জমিতে প্রয়োগ করিলে পূর্ব্বোক্ত সারগুলি শীঘ্র জমিতে কার্য্যকর হইতে পারে।

আমরা ১ম তালিকাতে যে সার রপ্তানি দেখাইয়াছি, তা ছাড়া আমরা সোরাও বিদেশে রপ্তানি করি। সোরা একটী নাইট্রোজেনপ্রধান সার। নিম্নে সোরা রপ্তানির একটী তালিকা দিলাম।

১৯২০ সন		১৯২১ সন	
হন্দর	টাকা	হন্দর	টাকা
৪৪২,৬৫৪	৭৫,২৭,৪০০	২৫৭,৮৭৩	৪৭৯৩,৪৭২

দেশনায়কদের সারবিষয়ে মনোযোগ দিবার সময় আসিয়াছে। রয়াল কৃষি-কমিশন আমাদিগকে এ বিষয়ে কি উপদেশ দেন তাহা দেখিবার বিষয়।

ভারতের লোহা ও ইস্পাত

ভারতে লৌহের এবং ইস্পাতের কারবার ক্রমেই পুষ্টিলাভ করিতেছে। ১৯২৪ সনে ভারত গবর্মেণ্ট এই শিল্পের রক্ষার জন্য সাহায্যদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সেই সরকারী সাহায্যই ভারতীয় লৌহ-শিল্পের এই পুষ্টি-সাধনের অন্যতম কারণ। যুদ্ধের সময় লোহার ও ইস্পাতের বাজার বড়ই চড়িয়াছিল। তাহার পর এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, অনেকে মনে করিয়াছিলেন, আর বুঝি চলে না। টাটার কারখানাই ভারতের একমাত্র বৃহৎ লোহার কারখানা। এত বড় বিরাট কারখানা এদেশে আর নাই। কিন্তু টানের মুখে এই কারখানাও টলমল। ভারত গবর্মেণ্ট সেই সময়েই বাউণ্টি দিতে সম্মত হন। তাহা ছাড়া, রক্ষা-শুল্কও নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। তাই আবার এই কারবার বেশ গুছাইয়া উঠে। এখন গবর্মেণ্ট লৌহ-কারখানাকে আর সাহায্য করিবেন কিনা এইরূপ কথা উঠিয়াছিল। তাই কারবারের অবস্থার সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান টারিফ-বোর্ড বা ভারতীয় শুল্ক-সভা তদন্তে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বোর্ডের রিপোর্ট বাহির হইয়াছে।

তাহার মোট কথা এই যে,—লৌহ ও ইস্পাতের কারখানাগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য গবর্মেণ্ট গত ১৯২৪ সন হইতে যে রক্ষা-শুল্ক প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা আরও সাত বৎসর কাল বাহাল রাখিতে হইবে; অর্থাৎ আগামী ১৯৩৪ সনের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এই রক্ষা-শুল্ক বাহাল রাখা হউক,—ইহাই শুল্ক-বোর্ডের সুপারিশ। কিন্তু বোর্ড "বাউণ্টি" অর্থাৎ সরকারী দান বন্ধ করিয়া দিতে বলিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, এই সাত বৎসরের পরে, ভারতের লোহার কারখানার অবস্থা এতই ভাল হইবে যে, তখন আর সরকারী সাহায্যের প্রয়োজন হইবে না। তাঁহারা হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন,—টাটার কারখানার ইস্পাতের

জিনিষের কাটতি ক্রমেই বাড়িতেছে। ১৯২৩-২৪ সনে ১ লক্ষ ৬৩ হাজার টন ইস্পাতের জিনিষ জামসেদপুরে টাটার কারখানায় তৈয়ারী হইয়াছিল; ১৯২৬-২৭ সনে সম্ভবতঃ ৩ লক্ষ ৮০ হাজার টন জিনিষ তৈয়ারী হইবে। বোর্ডের মতে আগামী সাত বৎসরে এই কারখানার কাজ আরও বাড়িবে; ১৯৩৩-৩৪ সনে সম্ভবতঃ ৩ লক্ষ টন মাল তৈয়ারী হইতে পারিবে। ফলে, ভারতে ইস্পাতে তৈয়ারী জিনিষের দরও অনেক কমিয়া যাইবে। আপনা হইতেই কারবার চলিবে ভাল; সরকারী রক্ষা-শুল্ক পর্য্যন্ত প্রয়োজন হইবে না। বোর্ড বাউন্টি একেবারেই বন্ধ করিয়া দিতে বলিয়াছেন এবং রক্ষা-শুল্ক ৩৪ টাকার স্থানে ১৩ টাকা করিতে বলিয়াছেন। শুল্ক-বোর্ডের সুপারিশগুলি অবশ্য এখনও গবর্মেণ্ট মঞ্জুর করেন নাই। তবে, এ সম্বন্ধে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক বিল পেশ করা হইয়াছে।

সাপুরজি সাক্‌লাতোবালার সামাজিক ও আর্থিক বাণী*

(১) টাউনহলে

সম্প্রতি কলিকাতা টাউনহলে কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত সাপুরজি সাক্‌লাতোবালাকে এক মানপত্র প্রদান করা হয়। তিনি সভায় উপস্থিত হইলে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করেন এবং তিনি অর্পণকারীর গলে সেই মালা অর্পণ করেন। টাউনহলে জনতা খুব বেশী হইয়াছিল—কিন্তু একজন ইউরোপীয়ানও যোগদান করেন নাই। এমন কি শ্বেতাঙ্গ কাউন্সিলরগণ পর্য্যন্ত উপস্থিত হন নাই। প্রায় এক হাজার নিমন্ত্রণ-পত্র দেওয়া হইয়াছিল—কিন্তু নিমন্ত্রিতদের মধ্যেও অনেকে উপস্থিত হন নাই।

তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, "আপনাদের সঙ্গে মিলিত হইবার এই যে সুযোগ আপনারা আমাকে দিয়াছেন, তজ্জন্য অন্তরের সহিত আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নাম প্রত্যেকের মনে চিরজাগ্রত থাকিবে। আমার পরমবন্ধু বিশ্ববিখ্যাত শ্রীমান সুভাষচন্দ্র বসুর তুল্য লোক ইংলণ্ডে কখনও জন্মাইবে না। এই দুই মহাপুরুষের নাম ও স্মৃতি ভারতের মধ্যে যে প্রধান কর্পোরেশনের সহিত বিজড়িত, সেই কর্পোরেশনের মারফৎ ভারতের সকল কর্পোরেশনকে জানাইতেছি যে, কলিকাতার অধিবাসিবৃন্দ যে কম্যুনিষ্ট পরিবর্জ্জন করিবার ফাঁদে পা দেন নাই, ইহাতে আমি আনন্দের সহিত তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি।"

(২) প্রেস-কর্ম্মচারীদের নিকট

প্রেস কর্ম্মচারী সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত সাকলাতোবালাকে সংবর্দ্ধনা করিবার জন্য ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এক বিরাট সভা হয়। সভাপতি হইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু। এই সভার সংবর্দ্ধনার জবাবে প্রসঙ্গক্রমে সাম্যবাদের অর্থ ও আদর্শ সম্বন্ধে সাকলাতোবালা মহাশয় এক বক্তৃতা দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :—

সাম্যবাদ মুষ্টিমেয় সুখসুবিধাপ্রাপ্ত নরনারী, যাহারা সমাজের পরিচালক, তাহাদিগকে এই কথাটা বলিতে চাহে যে, যত দিন সমগ্র মানবজাতির অর্থনৈতিক স্বাধীনতা-লাভ না ঘটিবে ততদিন মানব-সমাজের উন্নতির জন্য যত কিছু চেষ্টা সবই ব্যর্থ।

বর্ত্তমান মানব-সমাজ সভ্যতার পথে এক পদও অগ্রসর হয় নাই এখনো তাহা পুরাদস্তুর বর্ব্বর সমাজই রহিয়া গিয়াছে। সাম্যবাদ সেই সমাজকে গড়িয়া তুলিতে এবং শক্তিশালী করিতেই চাহে। মানুষের সকল কর্ম্ম-প্রচেষ্টা সর্ব্বমানবের কল্যাণে নিয়োজিত হইবে এবং সর্ব্বমানব-সমাজের বিধানকে সকলেই নতমস্তকে মানিয়া লইবে।

* বিভিন্ন পত্রিকা হইতে সঙ্কলিত

সাম্যবাদ চায় যে, মানবজীবনের প্রয়োজন ও আবশ্যক অনুযায়ী অর্থ বণ্টন করিতে হইবে। নীচ কাজ করে বলিয়াই কাহাকেও হেয় করা চলিবে না।

কঠোরতম পরিশ্রম করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা কম উপার্জ্জন—ইহাই বর্ত্তমান মানবজাতির সর্ব্বাপেক্ষা হীন বর্ব্বরতা। ইহা সভ্যতা নহে। বেশী পরিশ্রম যাহারা করিবে, জীবনধারণের সুখ-সুবিধাগুলিও তাহারাই বেশী পরিমাণে ভোগ করিবে।

সাম্যবাদ ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরোধী। অর্থসঞ্চয় গুণ নহে, মহা অপরাধ। ব্যক্তির স্বাধীনতা না হওয়া পর্য্যন্ত জাতির মুক্তির দাবী নিছক—অর্থহীন। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা তাহাই, যাহা একজনকে আর একজনের নিকট মাথা নিচু করিতে বাধ্য করে না।

"জাতির স্বাধীনতা" এই শব্দের দ্বারাই এক জাতি হইতে অপর জাতির পার্থক্য সূচিত হয়। তাহা হইতে বিরোধ, লড়াই, বিদ্বেষ হত্যা ইত্যাদির জন্ম এবং তাহাই মানুষকে জঘন্য কার্য্য করিতে উৎসাহ দিয়া থাকে। যতদিন না এদেশের হতভাগ্য শ্রমিক ও কৃষকগণ স্বাধীনতা লাভ করে ততদিন ভারতের স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব। শ্রমিকের ঐক্য ও কৃষকদের ঐক্যের দ্বারাই জাতীয় মুক্তি করতলগত হইবে।

(৩) কৃষক ও শ্রমিক সভায়

বাঙ্গালার কৃষক ও শ্রমিক সভার বার্ষিক অধিবেশনের সঙ্গে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে সাকলাতোবালাকে একখানা মানপত্র প্রদান করা হয়। সাকলাতোবালা মানপত্রের জবাবে এক দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন,—

দেশের রাষ্ট্রীয় আন্দোলন ও আর্থিক কষ্ট দূর হইতে পারে একমাত্র কৃষক ও শ্রমিকসঙ্ঘের মারফতেই। কংগ্রেস নিরর্থক নয়। তবে তাহা যতদিন না কৃষক ও শ্রমিকদলের সঙ্গে একযোগে কাজ করিবে ততদিন তাহার উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হইবে না। কোন জাতির জনগণকে অত্যাচার উৎপীড়ন করিবার কোনো অধিকারই সেই জাতির মুষ্টিমেয় লোকের নাই।

সাম্যবাদই অদূর-ভবিষ্যতে প্রাধান্য স্থাপন করিবে—বর্ত্তমান সমাজের সমস্ত অত্যাচার অবিচার দমন করিয়া পৃথিবীকে এক শান্ত, সংযত সুখের নীড় করিয়া গড়িয়া তুলিবে। ভারতের শ্রমিক ও কৃষকদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এদেশে বণিকগণ ঢের বেশী স্বৈরাচারী, স্বেচ্ছাচারী। সাম্যবাদের শত্রুপক্ষের কথায় না ভুলিয়া নিজেরা অবস্থাটা বুঝিতে চেষ্টা করুন। শ্রমিকগণ, আপনারা সকলে সঙ্ঘবদ্ধ হউন এবং হিংসাবিদ্বেষ ভুলিয়া জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সঙ্ঘের সেবা করুন। দেখিবেন আপনাদের শক্তি কত অসীম।

অতঃপর বক্তা শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগের মর্ম্মস্পর্শী বর্ণনা করিয়া বলেন, এই সমস্ত নির্য্যাতনের হাত হইতে শ্রমিক সম্প্রদায়কে উদ্ধার করিবার, মুক্তি দিবার একমাত্র উপায় হইল শাসক-সম্প্রদায় যে অস্ত্র দ্বারা মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা বিনষ্ট করিয়া থাকেন, তাহার শক্তি খর্ব্ব করিয়া দেওয়া। এই নিষ্পেষণী যন্ত্র আমাদিগকে সরাইয়া দিতে হইবে। যে যন্ত্রদ্বারা আজ অল্পসংখ্যক সম্প্রদায় অধিকসংখ্যক সম্প্রদায়কে দাবাইয়া রাখিতেছেন, তাহা আমাদিগকে দূর করিতে হইবে। কিন্তু কিরূপে তাহা সম্ভব? শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে বাধাদানের ব্যবস্থা করিয়া।

শ্রমিকদের কর্ত্তব্য

শ্রমিক-সঙ্ঘের নীতি অতি সরল। ইহারা কাজ করিবে, সুসভ্য নীতিজ্ঞানসম্পন্ন হইবে এবং সুখ, শান্তি ও ক্ষমতা উৎপাদন করিবে—অল্পসংখ্যকের জন্য নহে—সকলের জন্য। তাহারা সকলেই মনে রাখিবে যে, তাহারা সকলেই এক ভারতমাতার সন্তান। হিন্দু, মুসলমান, বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, প্রশ্ন এখানে উঠিতে পারে না। আমাদের সম্মুখে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা গুরুতর হইয়া দেখা দিয়াছে, সাম্প্রদায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ও পরস্পরের স্বার্থ-সংঘর্ষ ভীষণ মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে। আজ একটা পরিবর্ত্তন সকলেই চাহিবেন, প্রাচীনকে বিদায় দিয়া নূতনকে সংবর্দ্ধনা করিয়া লইতে হইবে। ইংরেজের স্বার্থের কথা এই প্রসঙ্গে উঠিলে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, তাদের স্বার্থ তারা বুঝিবে। বোলশেভিক ভারত যেদিন বোলশেভিক ইংল্যণ্ডকে আপনার সত্যিকারের সহযোগী বলিয়া মনে করিতে পারিবে সেইদিন গ্রেটব্রিটেনের শুভদিন সন্দেহ নাই।

অগৌণে আমাদের কৃষক-শ্রমিক-সঙ্ঘ গঠন করিয়া বিচার ও নির্য্যাতনের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইবে।

(৪) যুবক বঙ্গের মারফৎ

নিখিল বঙ্গীয় যুবক সমিতির পক্ষ হইতে মিঃ সাক্‌লাতোবালাকে একখানি মানপত্র দেওয়ার জন্য আলবার্ট হলে এক বিরাট সভা হইয়া গিয়াছে। ডাঃ এস, সি, ব্যানার্জ্জি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় বহুসংখ্যক যুবক উপস্থিত ছিলেন। বিরাট হলের মধ্যে কোথাও একটু স্থান ছিল না।

সভাপতি মহাশয় যথারীতি যুবক সমিতির অভিনন্দন পাঠ করেন। তাহাতে মিঃ সাক্‌লাতোবালার কর্ম্মাবলীর প্রশংসা করিয়া বলা হইয়াছে যে, দলিত জাতির উদ্ধারকল্পে এবং নির্য্যাতিত শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার-প্রতিষ্ঠার্থ যে মুষ্টিমেয় লোক অগ্রসর হইয়াছেন, মিঃ সাক্‌লাতোবালা তাঁহাদের অন্যতম। একার্য্যে যথেষ্ট সাহসের প্রয়োজন। সাক্‌লাতোবালা সেই সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন।

সাক্‌লাতোবালা উত্তর দিতে দণ্ডায়মান হইলে সমবেত যুবকবৃন্দ ঘন ঘন করতালি দ্বারা তাঁহাকে সংবর্দ্ধিত করেন। প্রথমেই তিনি বলেন,—"আমি আপনাদের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ করিতে আসি নাই। আমি আসিয়াছি যুবকগণের নিকট হইতে প্রেরণা গ্রহণ করিতে।"

বিশাল জনতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া সাক্‌লাতোবালা বলেন,—"আপনারা সকলেই রাজনীতি, সমাজনীতি এবং ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে আপনাদের পূর্ব্বপুরুষগণের আচরিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবেন। কিন্তু আমি বলিতে চাই যে, উক্ত প্রাচীন পদ্ধতির ফলেই অনেক দুঃখ-কষ্ট আমাদের লাগিয়াই আছে। সকলেই আবার সেই পন্থায় জীবন গঠিত করুন, এমন কথা বলা আমার পক্ষে শক্ত। পুরাতন অভিজ্ঞতা যে মোটেই দরকারী নয়, তাহা আমি বলিব না। সেই অভিজ্ঞতার উপর নূতন আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। একটা নূতন-কিছু করিতে হইবে। যুবকগণের আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্যই তাই। এ কার্য্যে সাহায্যের প্রয়োজন। আমি শুনিয়াছি—অনেক যুবক বলেন, প্রাচীনতার জ্বালায় আর বাঁচি না। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়াই ইহারা বলেন, পাছে ভুল করিয়া বসি সেই ভয়ে কোন কার্য্যে হাত দিতে পারি না। ইহা তো যুবকের কথা নয়। যে যুবক এরূপ বলেন, তিনি এই ৬৫ বৎসরের বৃদ্ধ হইতেও নিকৃষ্ট। পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তিগাথা, তাঁহাদের অভিজ্ঞতার কথা তোমরা ভুলিয়া যাও,—আমি যুবকদিগকে একথা বলিব না। কিন্তু 'তাঁহারা যেরূপ ছিলেন, যাহা করিয়াছেন তোমরাও তাহা কর' এই আদর্শ কখনও বর্ত্তমান যুগের উপযুক্ত নহে।"

সমস্ত দেশের যুবকগণ যে ঠিক একই ভাবে চিন্তা করেন, সে কথা বিবৃত করিতে গিয়া বক্তা বলেন,—"আমি ভারতে আসিবার পূর্ব্বে সেফিল্ডের এক যুবক-সভায় যোগদান করিয়াছিলাম। তথায় ১২ বৎসরের ছেলেরা বক্তৃতা করিয়াছিল। এই বিষয় নিয়া কোনও সংবাদপত্র বিদ্রূপ করিতে ছাড়েন নাই। কিন্তু ভগবানের এমনই নিয়ম যে, ঠিক সেই সময়েই চীনের ক্যান্টনী ছাত্রদের হ্যাঙ্কো প্রবেশের সংবাদ আসে। সংবাদপ্রেরক জানান যে, ১২ বৎসরের ছেলেরা একার্য্যে যোগ দিয়াছে। ইহা হইতেই দেখা যায় যে, ঠিক একই সময়ে একই ভাবে চীনের এবং বৃটেনের বালকগণ পর্য্যন্ত চিন্তা করিতেছে। সেফিল্ডে সভা করিয়া ইংরেজ বালকগণ যে সাম্রাজ্যবাদের প্রতিবাদ করিতেছে, চীনের বালকগণও সেই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছে।

"প্রত্যেক দেশের যুবকদিগের আন্দোলনের মধ্যে এরূপ একটা সামঞ্জস্য আছে। আমি ফ্রান্স, আমেরিকা, জার্ম্মাণি ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের যুবক-আন্দোলন প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং ভারতের যুবক-আন্দোলনও দেখিলাম। অধিকাংশ বিষয়েই প্রাচ্য ও প্বাশ্চাত্যের আন্দোলন একরূপ। তবে একটি বিষয়ে বৈষম্য আছে।

"পাশ্চাত্যদেশে এই আন্দোলনটি ব্যাপকভাবে চলে। কিন্তু ভারতবর্ষে উহা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় চলিতেছে। বোম্বাই সহরে ষ্টুডেণ্টস-ব্রাদারহুড আছে এবং কলিকাতায় "ইয়ংম্যান এসোসিয়েশ্যন আছে। ইহাদের উদ্দেশ্য এক হইলেও ইহারা বিচ্ছিন্ন, ইহাদিগকে বিভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে। আমি

প্রস্তাব করি যে, 'ইয়ং কমরেড লীগ' নাম দিয়া এই যুবক সমিতিগুলিকে একটি নিখিল ভারতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা উচিত। তাহা হইলে ইহা দ্বারা জাতীয় আন্দোলনের কাজ হইবে। একই নামের অধীনে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সমিতি থাকিবে এবং ইহাদের মুখপত্রের মারফতে পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান চলিবে। আমার মনে হয়, তাহা হইলে কাজ হইবে অনেক বেশী।"

পরিশেষে তিনি যুবকদিগকে বলেন,—"তোমাদের সম্মুখে মহান্ কর্ত্তব্য। সমাজের নিম্ন স্তর হইতে কার্য্য আরম্ভ কর। একপদও বিপথগামী হইও না। এই কার্য্যে বিঘ্ন বিস্তর। তবে ঠিক লক্ষ্য স্থির করিতে পারিলে আর ভয় নাই,—তখন তোমরা সমস্ত মানব-জাতির কল্যাণকারী হইতে পারিবে।

(৫) ধর্ম্মঘট উপলক্ষ্যে আলবার্ট হলে

খড়গপুরের ধর্ম্মঘটে রেল-কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্যের নিন্দা করিবার জন্য এবং ধর্ম্মঘটকারীদের পরিবারবর্গের সাহায্যের জন্য কলিকাতার আলবার্ট হলে মেয়র মিঃ জে, এম, সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে একটি বিরাট সভার অধিবেশন হয়। ছাত্র এবং সহরের সর্ব্বশ্রেণীর যুবক-সম্প্রদায়ের সমাবেশে হলটি পূর্ণ হইয়াছিল; তিল ধারণের স্থানও অবশিষ্ট ছিল না।

মিঃ সাক্লাতোবালা বক্তৃতা করিতে উঠিয়া বলেন, "ইহাকে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রই বল, অর্থনৈতিক ষড়যন্ত্রই বল, আর যাহাই বল না কেন, মনিবেরা কর্ম্মচারীদিগকে দুঃখ-দুর্দ্দশায় ফেলিয়া যাহা খুসী নিজেদের স্বার্থের জন্য করিবে, এযুগে ইহা কেহ আর বরদাস্ত করিতেছে না। মনিবেরা ভুঁড়ি ভাসাইয়া বেড়াইবেন, অতিরিক্ত আহার-জনিত পাকস্থলীর ভার কমাইবার জন্য টেনিস খেলিতে যাইবেন, আর গরিবেরা অনাহারে শুকাইবে ও তাঁহাদেরই সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও আরামের জন্য নিজেদের জীবন বিসর্জ্জন দিবে! ভারতীয় আই, সি, এস-গণের মত বি,এন, রেলওয়ের এজেন্টের নীতিও হইল উহাই। আমাদিগকে যদি এইরূপ ঘৃণিত ভাবেই জীবনযাপন করিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের বাঁচিয়া লাভ কি? আমাদের এমন জীবনে কি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকিতে পারে? কি অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য এমন জীবনের আছে? সাম্রাজ্যবাদীরা তাহাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য গরিব শ্রমিকদের উপর অত্যাচার করিতেছে, অথচ গরিব ভারতীয় শ্রমিকেরা যখন ১০৲ টাকা ১৫৲ টাকা মাসিক বেতনে কাজ করিতে রাজী হইতেছে না, তখন তাঁহারা তাহাদের উপর রাজনৈতিক চক্রান্তের অভিযোগ আরোপ করিতেছেন। গবর্ণমেণ্টের উপর কু-শাসন এবং রাজনৈতিক জবরদস্তির অভিযোগ কি এই সব কার্য্যের জন্যই আনা হয় না? আমাদের শাসকেরা সদাসর্ব্বদাই এই কৈফিয়ৎ দিয়া থাকেন যে, অধিকাংশ শ্রমিকেরই কোন রাজনৈতিক বোধ নাই। কিন্তু এই সব শ্রমিকেরাই আবার যখন ইংরেজ ব্যবসাদারের নিকট হইতে অধিক টাকা দাবী করে, তখন হঠাৎ তাহাদের রাজনৈতিক বোধ জাগিয়া উঠে, এবং তাহাদের উপর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ আনয়ন করা হয়। ধাপ্পাবাজীরও একটা মাত্রা আছে।

বি, এন, রেলওয়ের অধিকাংশ শ্রমিককেই ৯৲ করিয়া বেতন দেওয়া হয়। এই সামান্য বেতনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে তাহারা বেয়াড়ামি, বিদ্রোহ প্রভৃতি অপরাধে অপরাধী হয়। আমি সার টমাস ওয়াইনীকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, কোনো ইংরেজ ৯৲ টাকায় দুই তিনদিনও থাকিতে পারে কি? ভণ্ড সাম্রাজ্যবাদীরা বলিবে যে, ভারতে জিনিষপত্রের দাম বড় সস্তা। বেশ, যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে সিভিলিয়ানেরা দুই শত টাকা করিয়া বেতন লয় না কেন? শ্রমিকেরা কোন সভা সমিতি করিতে পারিবে না, কিন্তু শ্রমিকদের ন্যায্য দাবীর বিরুদ্ধতা করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ যত খুসী সভা-সমিতি করিতে পারিবেন! বৃটিশ শাসনের নিরপেক্ষতা এবং গণতান্ত্রিকতার কি চমৎকার নমুনা!

আর্থিক উন্নতির নানা উপায় *

বাঙ্গালার পাট-সমস্যা

পাট বাঙ্গালার প্রধান পণ্য। ইহা বাঙ্গালীর একচেটিয়া সম্পত্তি। জগতে আর কোথাও পাট উৎপন্ন হয় না। সুতরাং বাঙ্গালীরাই ইহার মালিক। বর্ত্তমান জগতে পাটের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে এবং ইহার চাহিদাও বৃদ্ধি পাইতেছে। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের বিস্তারের সহিত পাটের চাহিদা সর্ব্বত্র বাড়িয়া যাইতেছে। মালপত্র রপ্তানি এবং প্যাক করার জন্ম ইহা হইতে সুলভ আর কোন জিনিষ নাই। এই জন্মই ইহার এত আদর। অন্যান্য দেশে উৎপাদনকারিগণ তাহাদের উৎপাদিত পণ্যের মূল্যের নিয়ামক। কিন্তু এ হতভাগ্য দেশে সমস্তই বিপরীত। দেশের কৃষকদের বাঁচতে হইলে এ প্রহেলিকার মূলতত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিয়া তাহার সমাধান আমাদিগকে অবিলম্বে করিতে হইবে। সমগ্র বঙ্গদেশে (বিহার আসাম সহ) প্রতি বৎসর ৩০ লক্ষ একর অর্থাৎ প্রায় এক কোটি বিঘা জমিতে পাটের চাষ হয় এবং প্রায় ৫ কোটি মণ পাট উৎপন্ন হয়। গত বৎসর পাটের দর বৃদ্ধি হওয়াতে এবৎসর ৩৬ লক্ষ একর অর্থাৎ ১ কোটি ২০ লক্ষ বিঘা ভূমিতে পাট দেওয়া হইয়াছে। গত বৎসর মাত্র এক কোটি বিঘাতে পাট দেওয়া হইয়াছিল। গত বৎসর ৯০ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছিল। এবার গবর্ণমেণ্টের বরাদ্দ প্রায় ১ কোটি ৮ লক্ষ বেল। অর্থাৎ প্রায় ৫ ভাগ পাট গত বৎসর হইতে এবার বেশী উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। জগতে প্রতি বৎসর মাত্র ৯৫ লক্ষ হইতে ১ কোটি বেলের প্রয়োজন। সুতরাং প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক মাল উৎপন্ন হওয়াতে দর এবার কমিয়া গিয়াছে। ত্রিপুরা জিলায় গত সন ৩২ হাজার একর ভূমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল এবার তৎস্থলে ৩৩ হাজার একর জমিতে চাষ হইয়াছে। গত বৎসর প্রতি বেল (৫/ মণ) পাট ১৪০৲ টাকা পর্য্যন্ত বিক্রী হইয়াছিল। এবার ৫০৲।৬০৲ টাকাও হইতেছে না। প্রতি মণ ২০৲।২৫৲ বিক্রী হইয়াছিল এবার মাত্র ৮৲।১০৲ বিক্রী হইতেছে। চাহিদা অপেক্ষা অধিক উৎপন্ন করায় কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অন্যান্য স্বাধীন দেশের ন্যায় সমবায়নীতি-অবলম্বনে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করা আবশ্যক হইবে। প্রতি মণ পাট উৎপাদন করার খরচও প্রায় ৮৲।১০৲ টাকা। সুতরাং কৃষকগণ এবার বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। টাকার সুদ, খাজানা, অন্ন-বস্ত্র-সংস্থানের খরচ সবই কৃষকগণ এবার কর্জ্জ করিয়া নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হইবে।

এবার কলওয়ালারা যথেষ্ট লাভ করিবে। কারণ তাহারা পাটের দরের হ্রাস-বৃদ্ধি করার প্রধান কর্ত্তা। তাহারা যে দর দিবেন, কৃষকগণ সেই দরই গ্রহণ করিতে বাধ্য।

যাহাতে পাটের দর এরূপ অস্বাভাবিকরূপে কমিয়া না যাইতে পারে তাহার প্রতিকার করিতে হইবে। বাঙ্গালীকে পাটের সর্ব্বপ্রকার ব্যবসা নিজের হস্তগত করিতে হইবে। পাটের সম্পূর্ণ লভ্য বাঙ্গালীর হস্তগত না হইলে বাঙ্গালার দুর্দ্দশা ঘুচিবে না। এ জন্ম সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে হইবে। সমবায়-নীতি অবলম্বন করিয়া পাট বিক্রীর বন্দোবস্ত এবং পাট দ্বারা চট বস্তা প্রস্তুত করার কল-কারখানা স্থাপন করিতে হইবে।

পাটের কলের মালিকগণ কিরূপ লাভ করিয়া থাকেন তাহার আভাষ নিম্নে দেওয়া গেল।

বর্ত্তমানে পাটের দর ৮৲।৯৲ টাকা। তিন মণ পাটে ১০০ বস্তা তৈয়ারী হয়। সুতরাং ১০০ বস্তা তৈয়ারী করিতে ২৫৲ টাকার পাটের প্রয়োজন। প্রস্তুত করার খরচ ১০৲ টাকা ধরিলে ৩৫৲ টাকা মোট খরচ হয়। এই ১০০ বস্তার বর্ত্তমান বাজার-দর প্রায় ৫০৲টাকা। সুতরাং প্রতি মণ পাটে কলওয়ালারা ৫৲ টাকা করিয়া লাভ করিবে দেখা যাইতেছে।

---

* চুণ্টা লাইব্রেরীর বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণের কিয়দংশ ("ত্রিপুরা হিতৈষী" হইতে উদ্ধৃত)।

ন্যূনাধিক ৩৬ কোটি টাকা বিদেশী বণিকগণ এবার পাটের ব্যবসা হইতে নিট লাভ করিবে। কিন্তু বাঙ্গালার কৃষকের পেটের ভাত জুটিবে না। এই বৈষম্য দূর করিতে হইলে সমবায়-নীতি প্রচার করিতে ও দেশের বিভিন্ন স্থানে মিল স্থাপন করিয়া চট বস্তা উৎপন্ন করিয়া পাটের সম্পূর্ণ লাভ বাঙ্গালীর হস্তগত করিতে হইবে। সমবায়-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া সমস্ত পাট বিক্রীর বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এজন্য দেশের ধনী এবং কৰ্ম্মিগণ সম্মিলিত হইয়া একযোগে কার্য্য আরম্ভ করিলে বাঙ্গালার দুর্দ্দশা ঘুচিবে এবং বাঙ্গালার পল্লীর শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

কুটীর-শিল্প রক্ষায় পল্লী ব্যাঙ্ক

শিল্প-বাণিজ্য গ্রামে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন। দেশে অর্থের অভাবও নাই। সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া এই অর্থ নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টার অভাব। বহু অর্থ গ্রামে গ্রামে অকর্ম্মণ্য অবস্থায় পড়িয়া আছে। এসব অর্থ কেন্দ্রীভূত করিয়া পল্লীর শিল্প ও বাণিজ্যের সহায়তা-কল্পে নিযুক্ত করার দরকার। এজন্য গ্রামে গ্রামে ব্যাঙ্ক-স্থাপন আবশ্যক। অর্থের সুবন্দোবস্ত হইলে বহু শিল্প-প্রতিষ্ঠান গ্রামে জাগিয়া উঠিবে। অর্থের অভাবেই অনেক কুটীর-শিল্প মৃত-প্রায়। এ অঞ্চলের বাঁশ এবং বেতের বাস্কেট, ব্যাগ ইত্যাদির কারবারগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে না। পার্ব্বত্য ত্রিপুরার বনজ পদার্থ দ্বারা বহু কুটীর-শিল্প এ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। ছাতার বাঁটের ব্যবসাটিও একটী বিশেষ লাভজনক ব্যবসা। ইহার উন্নতি-বিধান করিলে বহুলোক ইহাতে প্রতিপালিত হইবে।

উন্নত প্রণালীতে মৎস্য-পালন ও মৎস্যের ব্যবসা

মৎস্য আমাদের একটী প্রধান খাদ্য। সর্ব্বত্রই আজকাল মৎস্য দুর্ম্মূল্য। মৎস্যের যেরূপ দর বাড়িতেছে তাহাতে ৮।১০ বৎসর পরে মৎস্য একটী দুষ্প্রাপ্য জিনিষ হইবে। মৎস্যের ব্যবসা এ অঞ্চলে একটী প্রধান ব্যবসা। আশুগঞ্জ হইতে বহু লক্ষ টাকার মৎস্য প্রতি বৎসর স্থানান্তরে রপ্তানি করার সুবন্দোবস্ত করিলে এই ব্যবসা আরও প্রসার লাভ করিতে পারে। মৎস্যের ব্যবসায় রপ্তানির বন্দোবস্তের প্রধান অভাব। রপ্তানির সুবন্দোবস্ত করিতে পারিলে বহু লক্ষ টাকার মৎস্য প্রতি বৎসর এ স্থান হইতে স্থানান্তরে রপ্তানি করা যাইবে। তজ্জন্য মোটর বোট সার্ভিস করিয়া অথবা ছোট ছোট ষ্টীমলঞ্চ চালাইয়া মৎস্য ব্যবসায়িগণকে সাহায্য করিলে এদেশবাসীর বহু লক্ষ টাকা লাভ হইবে।

গো-জাতির উন্নতি

দুগ্ধ-সমস্যাও আজকাল একটী প্রধান বিষয়। দুধ যেরূপ দুর্ম্মূল্য এবং তাহাতে যে ভেজাল চলিতেছে, তাহাতে বাঙ্গালী শিশুর বাঁচিবার উপায় নাই। দুগ্ধ মনুষ্যের একটী প্রধান খাদ্য। গোচারণ ভূমির অভাবে এবং জাতির অবনতির সঙ্গে সঙ্গে গোজাতিও প্রায় ধ্বংস হইয়াছে। যে কয়েকটী অবশিষ্ট আছে তাহাও খাদ্যাভাবে কঙ্কালসার। সুতরাং গোজাতির উন্নতি এবং সংখ্যা-বৃদ্ধি করা জাতীয় সমস্যা। এজন্য সকলকে সমবেত ভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। উৎকৃষ্ট জাতির সহিত মিশ্রণ না করিলে এবং গোচারণ ভূমির বন্দোবস্ত না করিলে বাঙ্গালার চাষ-আবাদ পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া যাইবে। গোজাতি যেমন দুগ্ধ যোগায়, তেমন শস্য উৎপাদনেও প্রধান সহায়। দুর্ব্বল এবং নিকৃষ্ট বলদ দ্বারা কৃষি-কার্য্য চালান অসম্ভব। উৎকৃষ্ট বলদ দ্বারা চাষ-আবাদের বিশেষ উন্নতির জন্য চেষ্টার দরকার। এতদ্ব্যতীত যে-সমস্ত লাভজনক শিল্প এই অঞ্চলে প্রচলিত হইতে পারে তৎপ্রতি আপনারা যত্নবান হইয়া দেশের ও দশের কল্যাণ করিতে থাকেন এবং আপনাদের এই প্রতিষ্ঠান পল্লী-জীবনের ও তৎসঙ্গে জাতীয় জীবনের সর্ব্ববিধ কল্যাণের পীঠস্থান হউক।

সমবায় শক্তি

পল্লীর সর্ব্ববিধ কার্য্যে ক্রমশঃ সমবায়-নীতির প্রবর্ত্তনে বিশেষ সুফল পাইবার আশা করা যায়। ইহাতে পরস্পর সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিবার শক্তি অর্জ্জিত হইবে এবং সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি বিশেষ কার্য্যকরী হইবে।

পাশ্চাত্য দেশে এই নীতির প্রচলনে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। সমবায়নীতি প্রবর্ত্তিত করিয়া কৃষক ও শিল্পিগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারিলে তাহারা কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্য উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করিতে সমর্থ হইতে পারিবে এবং মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ি-কর্ত্তৃক প্রতারিত হইবার আশঙ্কা হইতে মুক্তি পাইবে। এই কার্য্যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিশেষভাবে সহায়তা করিতে পারেন। সমবেত ভাবে কার্য্য করিলে গ্রামের স্বাস্থ্যের উন্নতি-বিধান, গোজাতির ও কৃষিকার্য্যের এবং কুটীর-শিল্পের নানাবিধ উন্নতি-বিধান করা ও তজ্জন্য আধুনিক উন্নত প্রণালীসমূহের প্রচলন করা সম্ভবপর হইবে। ইহার বিস্তৃত আলোচনা অদ্যকার এই সভায় করা সম্ভব নহে।

শ্রীকামিনীকুমার দত্ত

শিল্প-বাণিজ্যের "কার্টেল" ও "ট্রাষ্ট" মূর্ত্তি

আজকালকার ইয়োরামেরিকায় "ট্রাষ্ট" বা "কার্টেল"-জাতীয় শিল্প-সংগঠন এবং বাণিজ্য-সংগঠনের জয়-জয়কার চলিতেছে। শিল্প-বাণিজ্যের যে গড়ন বা আকৃতিকে "ট্রাষ্ট" বা "কার্টেল" বলা হয়, তাহাকে আমরা সহজে "সঙ্ঘ" রূপে চালাইতেছি। মামুলি "সমিতি", "পরিষৎ" "সংসদ" ইত্যাদি অর্থে "সঙ্ঘ" শব্দ চালাইতেছি না। "সঙ্ঘ" এখানে খাঁটি পারিভাষিক শব্দ।

সঙ্ঘ-শক্তির দিগ্বিজয়ে এমন কতকগুলা ঘটনা বুঝিতে হইবে যাহা ইয়োরামেরিকায় বিশপঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে এক প্রকার ছিল না বলিলেই চলে। শিল্প-বাণিজ্যের দুনিয়ায় এক নবীন শাসন বা পরিচালনের মূর্ত্তি দেখা দিয়াছে। সেই মূর্ত্তি বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে অতিমাত্রায় পুষ্টিলাভ করিয়াছে।

বলা বাহুল্য এই মূর্ত্তি প্রাচীন বা মধ্যযুগের ভারতে ছিলই না। বর্ত্তমান ভারতেও তাহার চিহ্ন আজ পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে না। সঙ্ঘ বোলটা ভারতীয় ভাষায় পুরাণা বটে। কিন্তু সঙ্ঘ নামক মালটা ভারতে এবং ভারতের বাহিরেও অতি নবীন।

জার্ম্মাণ সমাজে সঙ্ঘ-ভক্তি

সঙ্ঘ-গঠনের প্রাণ হইতেছে কেন্দ্রীকরণ। এই কেন্দ্রীকরণ চলিতেছে আমেরিকায় আর ইংলণ্ডে বেশ প্রবলভাবে; কিন্তু জার্ম্মাণির শিল্প-বাণিজ্য মুল্লুক যে পরিমাণে কেন্দ্রবদ্ধতার দিকে অগ্রসর হইতেছে তাহা বিশ্ববাসীর বিশেষ দৃষ্টি টানিয়া লইতেছে। জার্ম্মাণির আর্থিক জীবনে প্রতিদিনই একটা না একটা নতুন ঐক্য গড়িয়া উঠিতেছে। বড় বড় কারবারগুলা ভাঙিয়া বিপুলায়তন কারবার কায়েম করা হইতেছে। আজ লোহা-লক্কড়ের শিল্পে কেন্দ্রীকরণ সাধিত হইতেছে। কাল শুনিতেছি কতকগুলা রাসায়নিক কারখানা কোনো ঐক্যগ্রথিত শাসনের তাঁবে আসিল। পরশু খবর পাওয়া গেল যে হোটেলওয়ালারা নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যে জলাঞ্জলি দিয়া কোনো বিপুল সঙ্ঘের কুক্ষিগত হইবার আয়োজন করিয়াছে।

যুদ্ধের পূর্ব্বে এইরূপ কেন্দ্রীকরণ বা ঐক্য-বন্ধন দু'চারটা যে না ঘটিত এমন নয়। কিন্তু তখনকার দিনে "কার্টেল" বা "ট্রাষ্ট" অনেকটা নতুন-কিছু বিবেচিত হইত। ধনবিজ্ঞান-বিদ্যার সেবকরা, আর্থিক আন্দোলনের পাণ্ডারা, রাজস্ব-সচিবেরা, শিল্প-পতিরা, বণিক-সঙ্ঘের মাতব্বরেরা "কেন্দ্রীকৃত" বিপুলায়তন কারবারকে সন্দেহের চোখে দেখিত। কিম্ভূতকিমাকার চিজ রূপে "সঙ্ঘ"গুলা নরনারীর বিস্ময় ও কৌতূহলের সামগ্রী ছিল। আজ আর সেই নতুন-কিছুর যুগ নাই। সঙ্ঘগুলা মুড়ী-মুড়কীর মতন জার্ম্মাণ এবং ইংরেজ-মার্কিণ আর্থিক জীবনে আটপৌরে জিনিষে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। দু'চার দশটা সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিল শুনিলে লোকেরা আজকাল আর আঁতকাইয়া উঠে না।

"সেকালে" সঙ্ঘ ছিল ব্যতিরেক মাত্র। একালে আর্থিক ব্যবস্থার স্বাভাবিক রূপই হইতেছে সঙ্ঘ। কারবারগুলা আপ্-সে আপ স্বাধীনভাবে গড়িয়া উঠিতেছে দেখিলেই লোকেরা সেকালে সমঝিত যে, দুনিয়া বেশ প্রাকৃতিক নিয়মেই অগ্রসর হইতেছে। আর একালে স্বতন্ত্রতা-বিশিষ্ট আপ্‌সে আপ স্বাধীন কারবারগুলাকে সেকেলে মান্ধাতার আমলের চিজ মনে করাই হইতেছে লোকের দস্তর। কারবার-গুলা নিজ স্বাধীনতা, নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব নিজ নিজ ক্ষুদ্রত্ব বিসর্জ্জন দিবে, আর তাহার ঠাঁইয়ে দেখা দিবে কারবারে কারবারে সমঝৌতা, যোগাযোগ, মেলমেশ ও ঐক্যবন্ধন। এইরূপ চিন্তাই বর্ত্তমানের কর্ম্ম ও সাহিত্য-জগতে মাথা তুলিতেছে। শিল্প-বাণিজ্যের দুনিয়ায় সঙ্ঘমূর্ত্তি জীবনীশক্তির চরম এবং আধুনিকতম অভিব্যক্তি, আর জীবনের সেকেলে গড়নগুলা একে একে দুনিয়া হইতে লুপ্ত হইয়া যাইবে,—এইরূপ চিন্তা হইতেছে আজকালকার বিজ্ঞানজগতে স্বাভাবিক।

সঙ্ঘগঠনের স্বপক্ষে জার্ম্মাণ-সমাজের প্রত্যেক স্তরের লোককেই দেখা যায়। ষ্টক একস্‌চেঞ্জের দালালেরা এইরূপ কেন্দ্রীকরণের সাহায্য করিয়া থাকে। শেয়ারের বাজারে কোম্পানীগুলার দর চড়াইয়া দিয়া তাহারা সঙ্ঘগঠনের সুহৃৎ হয়। ব্যবসা-ধুরন্ধরেরা নিশ্চিন্তভাবে নিরুদ্বেগে কারবারে কারবারে ঐক্যবন্ধনের দায়িত্ব লয়। বিপুলায়তন কারবার চালাইতে যে ধরণের মস্তিষ্ক এবং কর্ম্মদক্ষতা দরকার, তাহা সমাজে পাওয়া যাইবে কিনা অনেক সময়ে সেই দিকে নজর দিবার প্রবৃত্তিও তাহাদের দেখা যায় না। মজুরেরা সঙ্ঘগঠনের স্বপক্ষেই সাধারণতঃ রায় দিয়া থাকে। পাঁচ সাতটা বড় বড় কারবার সংযুক্ত হইলে কোথাও কোথাও মজুরদিগকে বরখাস্ত করিতে হইতেও পারে এইরূপ সন্দেহমূলক চিন্তা তাহাদের মগজে ঠাঁই একপ্রকার পায়ই না। সকল শ্রেণীর লোকই সঙ্ঘগঠনকে আর্থিক জীবনের নিত্যকর্ম্মপদ্ধতির অন্তর্গত বিবেচনা করিতেছে। সকলেরই চিত্তে অজ্ঞাতসারে একটা বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছে যে, সঙ্ঘগঠনে সমাজের উপকারই হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে ;—কাজেই এই সম্বন্ধে ভাববার কথা বেশী কিছু নাই।

শিল্প-জগতে যুক্তি-যোগ

দেশসুদ্ধ লোক জার্ম্মাণিতে "ট্রাষ্টের" গুণ গাহিতেছে কেন? সঙ্ঘ-শাসনের উপকারিতা "হাতের পাঁচ" বা প্রাথমিক স্বীকার্য্য বিবেচিত হইতেছে কেন? বিপুলায়তন কারবারের স্বপক্ষে বলিবার কথা অনেক আছে। রাস্তার লোকও যুক্তিগুলা সহজেই ধরিতে পারে। বস্তুতঃ, যুক্তির কোনো দরকারই হয় না। সঙ্ঘের সুফল যে-কোনো লোকই স্বচক্ষে দেখিতে পায়।

জার্ম্মাণিতে শিল্পকারখানার মুল্লুকে একটা নয়া শব্দ আজকাল বেশী শুনিতে পাওয়া যায়। সে হইতেছে "রাট্‌সিও-নালিজিরুঙ্"। সহজে ইহাকে বলিব "মাল উৎপাদনের কর্ম্মে যুক্তি-যোগ।" জার্ম্মাণ কারবারী, বেপারী, পণ্ডিত, রাষ্ট্রিক সকলেই বলিতেছে,—"চাই এখন যুক্তি-যোগ। যুক্তি-সঙ্গত উপায়ে, বিচারসহ প্রণালীতে, বিজ্ঞানসম্মত কৌশলে কারখানাগুলা চালাইতে হইবে। কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রের সর্ব্বত্রই দরকার যুক্তিযুক্তভাবে কারবারের বিভিন্ন অঙ্গগুলাকে শাসন করা। কর্ম্ম-পরিচালনার সকল ভাগেই চাই মাথা খাটাইয়া বরবাত কমানো আর অল্প রসদে বেশী ফল দেখানো।"

এই যুক্তি-যোগের ভিত্তি কোথায়? জার্ম্মাণির আপামর জনসাধারণের চিন্তায়,—এই ভিত্তি হইতেছে সঙ্ঘে, ঐক্য-বন্ধনে, কার্টেল-গঠনে। পরস্পর-বিচ্ছিন্ন স্বস্ব-প্রধান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারবারগুলা যতদিন পর্য্যন্ত না ঐক্যগ্রথিত হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত কম রসদে বেশী ফলানো, অথবা যেখানকার যা সেখানে তা বসানো অতি কঠিন। মাথা খাটাইয়া যুক্তি খেলাইয়া কোনো কারবারের বিভিন্ন অংশকে দস্তুর-মাফিক শাসন করিতে যদি চাও, তাহা হইলে আগে মুণ্ডপাত কর ক্ষুদ্রত্বের, বহুত্বের, অনৈক্যের।

কারবারগুলা যদি পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য না করে তবে মাথা খাটাইয়া ধনোৎপাদনের ব্যবস্থা করিবার সুযোগই দেখা দিতে পারে না। পরস্পর পরস্পরকে যদি সাহায্য করিতে প্রস্তুত থাকে, তাহা হইলে কারবার-সঙ্ঘের ধুরন্ধর রামাকে বলিতে অধিকারী,—"তুই ঐ মালটা তৈয়ারী

কর, আমার তাঁবে থাকুক অপর কোনো মাল-সৃষ্টি।' এইরূপ বিভিন্ন কারবারকে বিভিন্ন মালের দায়িত্ব বাঁটিয়া দেওয়া সম্ভব কেবল তখনই, যখন কারবারগুলা প্রত্যেকে একটা বড় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শাখারূপে চলিতে রাজি। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, ঐক্যবন্ধন যুক্তিযোগের গোড়ার কথা।

কারবারগুলা যখন স্বস্ব-প্রধান থাকে তখন প্রত্যেকেই চেষ্টা করে এক সঙ্গে নানা রকম মাল সৃষ্টি করিতে। অথচ ছোট ছোট কারবারের পক্ষে রকমারি ছাঁচের দ্রব্য প্রস্তুত করা সহজ নয়। অনেক মেহনৎ লাগে, অনেক অপব্যয় হয়। কিন্তু বাজারে ইজ্জৎ রাখিবার জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়া ও ছোট ছোট কারবারগুলা বহুবিধ ছাঁচের সামগ্রী তৈয়ারী করিতে অগ্রসর হয়। ইহা নেহাৎ যুক্তি-বিরোধী বলাই বাহুল্য। কিন্তু যুক্তির খেলা চলিতে পারে কখন? যখন অসংখ্য রকমারি ছাঁচের দায়িত্ব ছোট ছোট কারবারের ঘাড় হইতে চলিয়া যায়। ছোট কারবারগুলা যেই কোনো ঐক্যগ্রথিত বড় কারবারের বিভিন্ন শাখায় পরিণত হয়, তখন অসংখ্য ছাঁচের অত্যাচার হইতে প্রত্যেকেই মুক্তি পায়। শ্রমবিভাগের নিয়মে কারবার-সঙ্ঘ 'যার পক্ষে যা সাজে' এই প্রণালীতে ছাঁচগুলা বাঁটিয়া দিতে অধিকারী। কাজেই শক্তির বরবাত, রসদের বরবাত, মেহনতের বরবাত আর্থিক দুনিয়া হইতে লুপ্ত হয়। মামুলি অবস্থায় কারবারে কারবারে টক্কর চালাইয়া রকম রকম মাল বাজারে ফেলা হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন ছাঁচে তফাৎ এক প্রকার দেখাই যায় না। কিন্তু ঐক্য-বন্ধনের আমলে এই সকল প্রভেদ-বিহীন বিভিন্নতা লোপ পাইতে পারে। সমাজের অনেক বাজে খরচ বাঁচিয়া যায়।

যুক্তি-যোগ ও বাণিজ্য-সঙ্কট

তার পর বর্ত্তমান যুগের আর একটা মস্ত সমস্যা হইতেছে "সঙ্কট"। ইংরেজি-মার্কিণ পরিভাষায় তাহার নাম "ক্রাইসিস্"। এই আর্থিক সঙ্কট চক্রের মতন পাঁচ সাত দশ বৎসর পর পর দুনিয়ায় দেখা দেয়। এই শিল্প-বাণিজ্যিক ধূমকেতুর হাত এড়ানো এখনো এক প্রকার অসম্ভব বিবেচিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার কুফল হইতে সমাজকে খানিকটা রক্ষা করা নেহাৎ অসাধ্য নয়। এইরূপ রক্ষার কাজে কার্টেল, ট্রাষ্ট বা সঙ্ঘের সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে।

অল্প রসদে বেশী ফলানো, আর কম খরচে বাজারে মাল ঢালা হইতেছে সঙ্ঘের প্রধান উদ্দেশ্য। আর তাহার প্রণালী হইতেছে কারখানার প্রত্যেক বিভাগে খরচপত্র যথাসম্ভব কমানো। বিদেশী পারিভাষিকে যাহার নাম "ইকনমি" বা ব্যয়সংক্ষেপ তাহা শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সকল অঙ্গে কায়েম করিবার জন্যই কার্টেলের উদ্ভব।

শিল্প-বাণিজ্য-জগতের ধূমকেতুটা যখন হাজির হয়, তখন সঙ্ঘ-গড়নের এই ব্যয়-সংক্ষেপের ব্যবস্থা যার পর নাই কার্য্যকরী হইতে পারে। ক্ষুদ্রত্ব আর স্বাধীনতার আমলে একই মাল বিভিন্ন কারখানায় প্রস্তুত হয়। "সঙ্কট" দেখা দিবা মাত্র প্রত্যেক কারখানায়ই মন্দা দেখা দেয়। প্রত্যেকেরই অবস্থা "কষ্টাৎ কষ্টতরাং গতা" হইতে থাকে। প্রত্যেকেই শতকরা ৫০।৬০।৭০ অংশ কাজ কমাইতে বাধ্য হয়। কিন্তু কারবারগুলা যদি ঐক্যবদ্ধ এবং সঙ্ঘ-গ্রথিত থাকে তাহা হইলে ধূমকেতুটার দিনক্ষণ আগত-প্রায় সমঝিবা মাত্র সঙ্ঘের ধুরন্ধরেরা দু'টা চারটা কারখানা কিছু কালের জন্য একদম বন্ধ করিয়া অপরগুলাকে পূরাপুরি খাটাইতে পারে। পুঁজিপাটা, যন্ত্রপাতি, লোহা-লক্কড়, মজুর-কেরাণী-এঞ্জিনিয়ার, বাজারে মাল কেনাবেচা সবই যখন এক তাঁবে শাসিত হয়, তখন কারবারের কোনো কোনো অংশকে কিছুদিনের জন্য ঘুম পাড়াইয়া রাখিলে সমাজের কর্ম্মশক্তি এবং ধনশক্তি সুনিয়ন্ত্রিত হইবারই সম্ভাবনা। ক্ষতিটা কেন্দ্রীকৃত হইতে পারে। তাহাতে লোকসানের চাপটা সমাজের সকল অঙ্গে ছড়াইয়া পড়িতে পায় না। লোকসানটাকে যথাসম্ভব দু'চারটা নির্দ্দিষ্ট বাঁধা জায়গায় আটক রাখা সম্ভব।

এই গেল বাণিজ্য-সঙ্কটের এক দিক্—ভাটার দিক্, বিসর্জ্জনের দিক্। অপর দিক্ হইতেছে জোয়ারের দিক্। যখন লোকেরা দিক্‌বিদিক্ শূন্য হইয়া ব্যবসায় টাকা ঢালিতে থাকে, তখন চলিতে থাকে সর্ব্বত্র লাভের আশা, দেদার

দাঁ মারা,—এক কথায় "বুম"। এঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক, পুঁজিপতি, দোকানদার সকলেই শিল্প-বাণিজ্যের নানা পথে ছুটিতে থাকে। রোজই এক একটা নতুন কোম্পানী খোলা হয়, নতুন কারখানা মাথা তুলে। কর্ম্মশক্তি, ধনশক্তি, বিদ্যাশক্তি সবই যেন প্রয়োগের জন্য অফুরন্ত ক্ষেত্র পাইবে—এইরূপ হয় তখন আর্থিক সমাজের সকল স্তরেরই স্বাভাবিক ধারণা। পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে স্বাধীনভাবে টক্কর দিতে থাকে। এক বেপারী কত টাকা ঢালিবার মতলব আঁটিতেছে অপর বেপারীর তাহা পুরাপুরি জানা থাকে না। ফলে দাঁড়ায় অতি-উৎপাদন, চাহিদার চেয়ে বেশী যোগান। বাজার যত পরিমাণ মাল শুষিতে সমর্থ তার চেয়ে পাঁচ গুণ ছয় গুণ বেশী মাল সৃষ্ট হইয়া পড়ে। বরবাত, অপব্যয়, বাজে খরচ ইত্যাদি ঘটনা তখন সমাজের সকল অঙ্গে আত্মপ্রকাশ করে। বাণিজ্য-সঙ্কটের এই অতি-সৃষ্টির তরফটা ইয়োরামেরিকার নানা দেশে একাধিক বার দেখা গিয়াছে। আজ অটোমোবিল ব্যবসায়, কাল সিগারেটের উৎপাদনে, পরশু পটাশ-শিল্পে আর্থিক ধূম-কেতুর জোয়ার-দৃশ্য অতি পরিচিত ঘটনা।

এই ধরণের আহাম্মুকি হইতে সমাজকে একদম যে বাঁচানো যায় না তা নয়। কিন্তু বাঁচাইতে হইলে গোড়ার কথা হইতেছে ব্যবসায় কেন্দ্রী-করণ, ঐক্য-বন্ধন, সঙ্ঘগঠন। এক একটা মাল তৈয়ারীর কাজে যতগুলা কারখানা বা বেপারী লাগিয়া আছে, তাহাদের প্রত্যেকের টেক্‌নিক্যাল ক্ষমতা, ফ্যাক্‌টরির চৌহদ্দি, পুঁজির দৌড়, মজুর-সংখ্যা সবই যদি এক মস্তিষ্ক-সঙ্ঘের শাসনে পরিচালিক হয়, তাহা হইলে দাঁ মারিবার মসুরুম আসিবামাত্র ঘোড়ার লাগামটায় সংযত ভাবে ও "যুক্তিসঙ্গত" ভাবে ঢিল দেওয়া সম্ভব। তখন একদম বে-আক্কেলের মতন দেদার মজা লুটিবার লোভে আহাম্মুকি করিয়া বসা না ঘটিতেও পারে। যা-কিছু আহাম্মুকি ঘটিতে বাধ্য, সঙ্ঘের ব্যবস্থায় তাহার আকার-প্রকার অনেকটা নরম সুরেরই হইবার কথা।

যুক্তি-যোগ ও মজুর-সমাজ

সঙ্ঘ-ভক্তির পশ্চাতে দেখিতেছি যুক্তি-যোগ। বিপুল সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিলে মাথা খেলাইয়া যুক্তি খাটাইয়া বাজারে সস্তায় মাল যোগানো সম্ভব। এই হইতেছে সঙ্ঘ-গড়নের আসল দর্শন।

মাথা-খাটাইয়া কাজ চালাইবার সুযোগ যত বাড়িতে থাকিবে মজুরদের আর্থিক জীবনও তত উন্নত হইতে থাকিবে। মজুর-সমাজে এই ধারণা বদ্ধমূল হইতেছে। এই কারণেই তাহারা সঙ্ঘের সুহৃৎ। সোশ্যালিষ্ট বা সমাজ-তন্ত্রীদের মতে সঙ্ঘের গড়ন আর্থিক জীবনের ক্রম-বিকাশে একদিন্ না একদিন অবশ্যম্ভাবী। সেই অবশ্যম্ভাবী স্তর বর্ত্তমান কালে আসিয়া হাজির হইয়াছে। কাজেই সোশ্যালিজ্‌মের ভক্তেরা সঙ্ঘকে মানবজাতির ইতিহাসের এক অতি স্বাভাবিক ঘটনারূপেই স্বীকার করিয়া লইতেছে। দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবে সঙ্ঘ-নীতি মজুরসমাজের চিত্তে কোনো খট্‌কা উপস্থিত করিতেছে না।

তাহার উপর আছে বাস্তব জগতের কথা। সঙ্ঘের তাঁবে "রাট্‌সিওনালিজিরুঙ" বা যুক্তিযোগ যদি শিল্প-বাণিজ্যে স্থিরপ্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে নরনারীর মেহনৎ আর মেহনতের কিস্মৎ সম্বন্ধেও মাথা খাটাইয়া একটা সার্ব্বজনীন সুব্যবস্থা কায়েম করা সম্ভব হইবে। যে মজুরের যেখান ঠাঁই আর যে ঠাঁইয়ের যে দর্মাহা শিল্প-বাণিজ্যের পক্ষে ন্যায্য, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া ঠিক করা সম্ভব কেবল তখন, যখন দেশের প্রত্যেক মাল-সৃষ্টির কাজে লিপ্ত প্রত্যেক মজুর-কেরাণী-এঞ্জিনিয়ারের কর্ম্মশক্তি কোনো কেন্দ্রীকৃত পরিচালক-দপ্তরের সমবেত মগজে আলোচিত হয়। মজুর-দের বিবেচনায় সঙ্ঘ-গড়নের প্রথম অবস্থায় কিছু কিছু মজুরি-বিষয়ক ক্ষতি হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু বন্দোবস্তটা পাকাপাকি হইয়া যাইবার পর এই সাময়িক লোকসান আর থাকিবে না। মজুরি-বৃদ্ধি আর কর্ম্মক্ষেত্রের আব-হাওয়ার উন্নতিসাধন এই দুই-ই মজুরেরা সঙ্ঘের আমলে আশা করিতেছে।

দারিদ্র্যের গুঁতোয় সঙ্ঘ-গঠন

সঙ্ঘের যুগ সম্বন্ধে সোশ্যালিজ্‌মের দর্শন অনেক দিন পূর্ব্বেই ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করিয়া রাখিয়াছে। আর্থিক

যুগ-পরম্পরা যাঁহারা বিজ্ঞানসম্মতরূপে আলোচনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে একটা নূতন-কিছু ঘটিতেছে না। তবে যাঁহারা দর্শন-বিজ্ঞানের ধার ধারেন না তাঁহারা বর্ত্তমানের আর্থিক ঘটনাপুঞ্জের ভিতর এমন কতকগুলা লক্ষণ দেখিয়াছেন, যাহার প্রভাবে বিপুলায়তন সঙ্ঘ গঠন অবশ্যম্ভাবী।

এক হিসাবে সমাজ-শক্তি নেহাৎ দায়ে পড়িয়া,—বাধ্য হইয়াই সঙ্ঘ গড়িবার দিকে অগ্রসর হইয়াছে। সঙ্ঘগুলা "দারিদ্র্যের তাড়নায়" জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কথাটা হেঁয়ালির মতন বোধ হইতেছে বটে। কিন্তু এক্ষেত্রে দারিদ্র্য বস্তুটা ভারতীয় মাপজোকে সমঝিতে হইবে না। এ হইতেছে ঐশ্বর্য্যশালী নরনারীর দারিদ্র্য। সে চিজ আলাদা।

ব্যাপারটা এই। যে বেপারীর বা কোম্পানীর কারবারটা ভাল চলিতেছে, তার খরচ-মোতাবেক মুনাফা মাস মাস বা বৎসর বৎসর বেশ আসিতেছে। হাল-খাতার সময়ে ট্যাঁকে তার দু'পয়সা মজুত হয়। এই অবস্থায় সাধারণতঃ সে নিজ ব্যবসার চৌহদ্দি বাড়াইবার বা মুনাফার পরিমাণ ফুলাইয়া তুলিবার দিকে বেশী প্রলুব্ধ হয় না। সে অনেকটা ধীরে সুস্থে নিজ কারবারের ক্রমোন্নতির কর্ম্মকৌশল চিন্তা করিতে পারে।

অপর পক্ষে যে বেপারী সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস কেবল লোকসান গুনিতেছে, তাহার 'দর্শন' অন্য ধরণের। সে প্রতি মুহূর্ত্তেই তার জুড়িদার অন্যান্য বেপারীর কথা ভাবিতে বাধ্য হয়। অন্যান্য কারবারীরা হয়ত তাহারই মতন দৈব দুর্ব্বিপাকে পড়িয়াছে। যাদের সঙ্গে তার রসদ কেনার আর মাল বেচার বাজারে হামেশা টক্কর, তাহারাও হয়ত এক্ষণে "ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি" বলিয়া অপরাপর সতীর্থ-সুহৃদের সহযোগিতা এবং সহানুভূতি মাগিতেই সচেষ্ট। কাজেই যেখানে চলিতেছিল আড়াআড়ি আর পাল্লা-কষাকষি, সেখানে দেখা দিল বন্ধুত্ব, পরস্পর-সাহচর্য্য, ঐক্য-বন্ধন। অর্থাৎ দারিদ্র্য নামক "গুঁতোর চোটে" বেপারীরা পরস্পর পরস্পরকে "বাবা" বলিয়া প্রথমতঃ দেয় স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি, তারপর কেন্দ্রীকৃত সঙ্ঘ-গড়নের অধীনতা স্বীকার করিতে ঝুঁকিয়া থাকে।

এইরূপ "দারিদ্র্যের" গুঁতো জার্ম্মাণির নানা কারবারে একসঙ্গে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। রুর প্রদেশের "ফারাইনিগ্‌টে ষ্টাল-হ্বের্কে" নামক সংযুক্ত ইস্পাত কারখানার পশ্চাতে ছিল এই দারিদ্র্যের দর্শন। উর্দ্ধ সিলেশিয়া প্রদেশের খনি-কারখানাগুলাকেও দারিদ্র্যই সঙ্ঘ-ভক্তির পথে ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছে। ফটোগ্রাফি ব্যবসায় যে ঐক্য গড়িয়া উঠিয়াছে, সেই ঐক্যের যুক্তিও মাতব্বরেরা দারিদ্র্যের তাড়নায়ই দেখিতে পাইয়াছে। ছোট ছোট রাসায়নিক কারখানাসমূহ পঞ্চত্ব পাইতে বসিয়াছিল। তাহাদিগকে যমালয়ে পাঠাইবার জন্য খাড়া ছিল রঞ্জনশিল্পের এক বিপুল সঙ্ঘ। এই দুস্মনি হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য "ভাই ভাই এক ঠাঁই" হইয়া ক্ষুদ্র কারখানাগুলা একটা বড় সঙ্ঘ কায়েম করিয়াছে। গাড়ী তৈয়ারীর কারবারে অনেক দিন হইতে মন্দা চলিতেছিল। এই ক্ষেত্রেও দায়ে পড়িয়া বেপারীরা ঐক্য-বদ্ধ সঙ্ঘ-গড়নের যুক্তিযোগে ধ্যান দিয়াছে।

এই খানে মনে রাখা আবশ্যক যে, আধা-আধি রকমের কার্টেল,—নিম-সঙ্ঘ,—জার্ম্মাণির বহু কারবারেই অনেকদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। এই সকল আধা-আধি কার্টেল বা নিম-সঙ্ঘের নানা মূর্ত্তি। দুইটা কোম্পানী পরস্পর পরস্পরের শেয়ার কিনিল। প্রত্যেকেই নিজের স্বতন্ত্রতা বাঁচাইয়া ব্যবসা চালাইতেছে। কিন্তু পরস্পর অংশ-কেনার ফলে দু'য়ের মধ্যে একটা সাহচর্য্য এবং সহযোগিতা দাঁড়াইয়া যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যন্ত্রপাতি-ঘটিত অথবা ফ্যাক্টরি-পরিচালনা-সংক্রান্ত কাজ কর্ম্মে দুই কোম্পানী পরস্পর পরস্পরের ঘরের কথা জানে। এই সকল স্থলেও স্বাধীনতা প্রত্যেকেরই থাকে; কিন্তু কোনো কোনো বিষয়ে মাখামাখি বেশ নিবিড়। আবার দেখা যায় যে, কোম্পানীগুলা সকল বিষয়েই নিজ স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়া চলিতেছে। কিন্তু বাজারে মাল বেচা সম্বন্ধে একটা সমঝৌতা হয় ত কায়েম করা হইল। এই ধরণে একটা স্বার্থ-সাম্য (ইণ্টারেস্‌সেন-গেমাইন্‌শাফ্‌ট্‌) গড়িয়া উঠে।

এইরূপ নানা আকারে নিম্-সঙ্ঘ বর্ত্তমান জগতের আর্থিক সংসারে,—কেবল জার্ম্মাণিতে নয়, আমেরিকায়,

ইংল্যাণ্ডে, ফ্রান্সেও,—গজিয়া উঠিয়াছে। আজকালকার অভাবের চাপে পড়িয়া এই সকল নিম-সঙ্ঘ ষোল আনা সঙ্ঘে পরিণত হইবার ব্যবস্থা করিবে,—ইহা জীবন-তত্ত্বের অতি সোজা সিদ্ধান্ত। বাস্তবিক পক্ষে, আজকালকার অনেক সঙ্ঘই এইরূপ আধা-আধি সঙ্ঘের চরম পরিণতি। আনিলিন ফ্যাকটরিগুলার সঙ্ঘ-গঠন এই পরিণতিরই দৃষ্টান্ত। লিনো-লিয়ুম-ফ্যাকটরিগুলা আধা-আধি সঙ্ঘের যুগ ছাড়াইয়া পুরা সঙ্ঘের যুগে দেখা দিতে বাধ্য হইয়াছে।

পুঁজিসংগ্রহ ও সঙ্ঘ-গঠন

কেন্দ্রী-করণের অন্যান্য কারণও বেশ পরিস্ফুট। জার্ম্মাণিতে কারবারীরা আজকাল অনেক পরিমাণে বিদেশী পুঁজির উপর নির্ভর করে। বিদেশের পুঁজিপতিরা জার্ম্মাণির শিল্প-বাণিজ্যের ধুরন্ধরদিগকে টাকা দিতে প্রস্তুত আছে এবং দিতেছেও। এই ঘটনার প্রভাব জার্ম্মাণির আর্থিক দুনিয়ায় খুব বেশী। জার্ম্মাণ বেপারীরা এক্ষণে একমাত্র স্বদেশী পুঁজির দিকে তাকাইয়া থাকিতে বাধ্য নয়। এক সঙ্গে দুনিয়ার সকল দেশ হইতে তাহারা নিজ নিজ দরকার মত মূলধন টানিয়া আনিতে সমর্থ।

কিন্তু বিদেশে টাকা ধার করার একটা বিশেষত্ব আছে। দু'চার দশ হাজার টাকার জন্য কোনো বেপারী বিদেশের ক্রোরপতিদের নিকট হাত পাতিতে পারে না। লাখ লাখ কোটি কোটি টাকার চাহিদা যাহাদের, একমাত্র তাহাদের পক্ষেই বিদেশী ব্যাঙ্কের নিকট যাওয়া-আসা, কথাবার্ত্তা, মোসাবিদা দেখানো সাজে। বিদেশ বলিলে সম্প্রতি ইংল্যণ্ড,—বিশেষ করিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র—বুঝিতে হইবে। মার্কিণ ক্রোরপতিরা বিদেশকে,—বিশেষতঃ জার্ম্মাণিকে—টাকা ধার দিতে রাজী বটে। কিন্তু তাহারা কর্জ্জের পরিমাণটা দেখিয়া ঋণ-গ্রহীতার দৌড় বুঝিতে চায়। রামা-শ্যামাকে দু'চার লাখ টাকা ধার দিয়া তাহারা ইজ্জৎ খোয়াইতে প্রস্তুত নয়। অধমর্ণের "রাশ"টা বুঝিয়া তবে উত্তমর্ণ তাহার সঙ্গে কথা পাড়িতে ঝুঁকে।

কাজেই জার্ম্মাণ বেপারীদের পক্ষে পুঁজিসংগ্রহ সম্বন্ধে প্রধান সমস্যাই হইতেছে বেশী বেশী কর্জ্জের জন্য হাত পাতিবার আয়োজন করা। বেশী বেশী টাকা কর্জ্জ করিতে যাওয়ার অর্থ আর কিছু নয়,—কারবাটা হওয়া চাই বিপুল। ফলতঃ বিদেশে টাকা কর্জ্জ লওয়ার অপর পিঠ দেখা যাইতেছে স্বদেশে ক্ষুদ্রের পরিবর্ত্তে বৃহতের কায়েম, স্বাধীনতার পরিবর্ত্তে সঙ্ঘাধীনতা, বহুত্বের পরিবর্ত্তে ঐক্যগঠন, কেন্দ্রীকরণ। ছোটগুলাকে ভাঙিয়া একটা বড়-কিছু খাড়া করিতে না পারিলে মার্কিণ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে সন্তোষজনক জবাব পাওয়া জার্ম্মাণদের পক্ষে অসম্ভব।

স্বদেশী টাকার বাজারে টাকা কর্জ্জ লইবার কারবার সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে। বড় বড় কারবার না দেখিলে জার্ম্মাণ ব্যাঙ্ক কোনো বেপারীকে টাকা ধার দিতে ঝুঁকে না। ঐক্য-গ্রথিত কেন্দ্রীকৃত সঙ্ঘ সৃষ্ট হইবামাত্র দেশের পুঁজিপতিরা তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হয়। তাহার পুষ্টিবিধানের জন্য নানা ঠাঁই হইতে টাকা আসিয়া জুটিতে থাকে। ছোট ছোট কারবার ভাঙিয়া বড় কারবার গড়িয়া তুলিতে পারিলে পুঁজির পরিমাণ বাড়িয়া ত যায়ই। সঙ্গে সঙ্গে দেনা-পাওনার বাজারেও নানা সুবিধা পাওয়া যায়। কিস্তীবন্দি করিয়া পাওনাদারকে টাকা সমঝিয়া দিবার পক্ষে বিশেষ সুযোগ জুটে।

ষ্টকের বাজারেও লাভ কম নয়। নতুন নতুন শেয়ার বেচিয়া টাকা তুলিতে হইলে কোম্পানীকে অত্যধিক গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হয় না। ডিভিডেণ্ড বা লভ্যাংশের পরিমাণ বা আশা বেশীই হউক বা কমই হউক মোটা-পুঁজিওয়ালা কোম্পানীর কাগজ সহজেই বিকাইয়া যায়। বেশ উঁচু দরেই কাগজগুলা বিক্রী হয়। কাগজগুলা বাজারে চালিবার জন্য অধিক পরিমাণে বাটা দিতে হয় না। এই সকল নানা কারণে পুঁজি-সংগ্রহের তরফ হইতে জার্ম্মাণ বেপারীরা সঙ্ঘবদ্ধ হইতে বাধ্য হইয়াছে।

সঙ্ঘ-ব্যবস্থায় আর্থিক বিপদ

"ট্রাষ্ট"-কারবারে আপদ-বিপদও কম নয়। স্বাভাবিক কারণে,—ঐতিহাসিক ঘটনা-পরম্পরার দরুণ—সঙ্ঘগুলা গড়িয়া উঠিতেছে বটে। এই সমুদয় আর্থিক গড়ন হইতে

সমাজের নানা শক্তির সদ্ব্যবহারও সম্ভবপর হইতেছে সত্য। কিন্তু "প্রদীপের নীচেই অন্ধকার"। সঙ্ঘ-শক্তির দুর্ব্বলতাও জবর। সঙ্ঘ-ব্যবস্থার প্রথম কথাই হইতেছে লড়াই-টক্করের লোপ-সাধন। বাজার হইতে প্রতিযোগিতা উঠাইয়া দিবার জন্যই সঙ্ঘের আবির্ভাব। আর্থিক সংসার হইতে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা সমূলে উৎপাটন করা মানব-সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর কিনা এই বিষয়ে সন্দেহ আছে প্রচুর। এই সম্বন্ধে ধনবিজ্ঞানের দুনিয়ায় তর্কপ্রশ্ন এবং লড়া-লড়ি অনেক চলিয়াছে এবং চলিতেছে।

সহজেই বুঝা যায় যে,—"একাতপত্রং জগতঃ প্রভুত্বং" বা একচ্ছত্র রাজ্যভোগ বস্তুটা নানা বিপদের সহচর। যে ব্যবস্থায় একজন অপর কোনো লোকের সমালোচনা করিতে সুযোগ পায় না, সেই ব্যবস্থায় কাজকর্ম্ম স্বভাবতই শিথিল, বিশৃঙ্খল এবং নীচুদরের হইবার সম্ভাবনা। টক্কর-বিহীন দায়িত্ব-শূন্য নিরঙ্কুশ সমাজে লোকেরা যা খুসী তা করিতে প্রলুব্ধ হয়। যথেচ্ছাচার আর অত্যাচার সমাজে দেখা দেয় সুপ্রচলিত রূপে।

আর্থিক জগতে টক্কর-শূন্যতার কুফল রাষ্ট্রীয় জগতের চেয়ে কম নয়। এই মহলে প্রথমতঃ দেখা যায় মালের দাম সম্বন্ধে যা খুসী তা। সঙ্ঘের বেপারীরা নিরঙ্কুশ। তাহাদিগকে ঢিট্ করিবার জন্য বাজারে অন্য কোনো স্বাধীন বেপারী নাই। কাজেই মূল্যবিষয়ক যথেচ্ছাচার ও অত্যাচার দেশের লোকের ভাগ্যে জুটিতে পারে অহরহ। দ্বিতীয়তঃ সঙ্ঘের ব্যবস্থায় বেপারীরা প্রতিযোগিতার অভাবে অনেক সময়ে নাকে তেল দিয়া ঘুমাইতে লাগিয়া যায়। গোটা বাজার যাহাদের তাঁবে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহারা বাদসাহী চালে আর্থিক ধরাখানাকে সরার মতন দেখিতে অভ্যস্ত হয়। "কত রবি জ্বলে ? কেবা আঁখি মেলে"—নীতি মাফিক তাহারা নতুন দিকে কর্ম্মদক্ষতা আর জীবনবত্তা দেখাইতে চেষ্টা করে না। শিল্প-কারখানার পরিচালনায়, যন্ত্রপাতির উদ্ভাবনে,—সকল ক্ষেত্রেই মাথা খাটাইয়া উন্নতি-বিধানের প্রবৃত্তি এরূপ অবস্থায় তাহাদের অন্তর হইতে ক্রমশঃ কমিতে এমন কি একেবারে লোপ পাইতে পারে।

বাজার দরে "ট্রাষ্ট" বনাম "কার্টেল"

মূল্য-নির্দ্ধারণ ব্যাপারটা কিছু তলাইয়া দেখা আবশ্যক। আমরা এতক্ষণ পর্য্যন্ত "ট্রাষ্ট" নামক গড়নকে "কার্টেল" গড়নের প্রতিশব্দ সমঝিয়া চলিয়াছি। আর দুই প্রকার আর্থিক ব্যবস্থাকেই এক "সঙ্ঘ" শব্দে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। বস্তুতঃ কার্টেল আর ট্রাষ্ট এক চিজ নয়। দু'য়ে প্রভেদ আছে। সহজে প্রভেদটা বুঝিতে পারি যদি কার্টেলকে নিম-ট্রাষ্ট বা অসম্পূর্ণ ট্রাষ্ট বিবেচনা করি। কার্টেলের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলার স্বাধীনতা অনেকটা থাকে। কিন্তু ট্রাষ্ট বলিলে বুঝিতে হইবে যে, বিভিন্ন কারবারগুলা নিজ নিজ স্বতন্ত্রতা একদম হারাইয়া ফেলিয়াছে। সকলে মিলিয়া কারবারের প্রত্যেক বিষয়ে এক বিপুল প্রতিষ্ঠানের অধীন। এইরূপ ষোল আনা যোগাযোগ বা মিলনকে পারিভাষিক হিসাবে ট্রাষ্ট বলা হয়।

ট্রাষ্ট নামক পূরা-সঙ্ঘে আর কার্টেল নামক নিম-সঙ্ঘে বাজার-দর বিষয়ে কিছু প্রভেদ লক্ষ্য করা সম্ভব। কার্টে-লের ব্যবস্থায় উন্নত শ্রেণীর কয়েকটা কারবারের সঙ্গে অনুন্নত শ্রেণীর কয়েকটা কারবারের স্বার্থ-সাম্য (ইণ্টারেস্-সেন গেমাইনশাফ্ট), মেলমেশ বা যোগাযোগ কায়েম থাকিতে পারে। অনুন্নত কারবারগুলার মাল তৈয়ারী হইতে থাকে "সেকেলে" প্রণালীতে এবং নিকৃষ্ট শ্রেণীর যন্ত্র-পাতির সাহায্যে। কাজেই বাজারে মাল ফেলিবার সময় এই সকল কারবারের কথঞ্চিৎ চড়া হারে দর ঠিক করিতে হয়। অপর দিকে কার্টেলের উন্নত কারবারগুলার অবস্থা ঠিক বিপরীত। তাহাদের পক্ষে সস্তা দরে মাল বাজারে ঢালা সম্ভব। কিন্তু উন্নত এবং অনুন্নত দুই শ্রেণীর কারবারই যখন এক কার্টেলের অধীন তখন কার্টেলের মাতব্বরদিগকে অনুন্নত কারবারগুলার মাপেই বাজার-দর নির্দ্ধারণ করিতে বাধ্য হইতে হয়। অর্থাৎ বাজারে চড়া দর ভিন্ন মাল হাজির করা কার্টেলের পক্ষে সম্ভব নয়।

কার্টেল যদি তাহার উন্নত কারবারগুলার মাপে,—অর্থাৎ সস্তায়—মাল ফেলিতে চায় তাহা হইলে অনুন্নত কারবারগুলার অবস্থা সঙ্গীন হয়। তখন হয় কার্টেলকে তাহার

কার্টেলত্ব নষ্ট করিয়া অনুন্নত কারবারগুলাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে, আর না হয় কার্টেলকে অনুন্নতের মাপেই তাহার উন্নত ও অনুন্নত দুই শ্রেণীর কারবারেরই মাল বাজারে ফেলিতে হইবে। কাজেই কার্টেল নামক নিম-সঙ্ঘের ব্যবস্থায় "ন্যায্য" দরের চেয়ে বেশী দাম বাজারে থাকা অসম্ভব নয়।

কিন্তু ট্রাষ্ট বা পুরা-সঙ্ঘের মূল্য-নীতি অন্য ধরণের। এই ব্যবস্থায় কারবারগুলা উত্তম, মধ্যম, অধম ইত্যাদি নানা শ্রেণীর থাকিতেই পারে না। কোনো কারবারের স্বতন্ত্র স্বার্থ বা স্বাধীনতা একদম থাকে না। এক মাত্র উত্তম কারবারগুলাকেই রাখিয়া দেওয়া হয়। মধ্যম ও অধম শ্রেণীর কারবারগুলাকে ভাঙ্গিয়া ফেলাই ট্রাষ্ট-ব্যবস্থার দস্তুর। কাজেই বাজারে মাল ফেলিবার সময় ট্রাষ্টের মাতব্বরেরা পাঁচ আঙ্গুল সমান দেখিতে সমর্থ হয়। উনিশ-বিশ করার দরকার হয় না। গোটা কারবারের সকল মালই ঐক্য-বদ্ধ মূল্যে বাজারে হাজির করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব। আর মালগুলা উত্তম শ্রেণীর যন্ত্রপাতি এবং কর্ম্ম চালনার সন্তান বলিয়া দরটা যথাসম্ভব নরমই হওয়া স্বাভাবিক।

এই গেল টেক্‌নিক্যাল যুক্তি অনুসারে কার্টেলে ট্রাষ্টে মূল্যনীতির প্রভেদ। কার্টেলের দর স্বাভাবিক কারণে কিছু চড়া হইতে বাধ্য। আর ট্রাষ্টের দর স্বভাবতই নরম থাকিবার কথা। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ট্রাষ্ট জোরজবরদস্তি করিয়া দর চড়াইয়া রাখিতে পারে। বাজারের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা ট্রাষ্ট-মাতব্বরদের যখন তখন মেজাজ বিগড়াইয়া যাওয়া অসম্ভব নয়। তখন সস্তায় মাল ছাড়িবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাহারা মূল্য-বৃদ্ধির কারণ হইতে পারে। নিরঙ্কুশ টক্করবিহীন অবস্থার এই এক মহা দোষ,—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

সঙ্ঘ-ব্যবস্থায় মগজের ক্ষতি

নাকে তেল দিয়া ঘুমাইবার প্রবৃত্তি সঙ্ঘের আমলে বেপারী-মহলে বেশ জাগিয়া উঠিতে পারে। এই সন্দেহ জার্ম্মাণিতে এবং ইয়োরামেরিকার অন্যান্য দেশেও খুব প্রবল ভাবে দেখা যায়। আমরা ভারতে যাকে "কুড়ের বাদসা" বলি, ব্যাপারটা অবশ্য ততদূর গড়াইবার সম্ভাবনা নাই। কেন না কুড়েমি সম্বন্ধে ভারত-সন্তান আজ পর্য্যন্ত সাধারণতঃ যে মাপকাঠি দেখাইয়া চলিতেছে সেই মাপকাঠিতে ইয়োরামেরিকার নরনারী ফেল মারিতে বাধ্য। কাজেই ইংরেজ-মার্কিণ-জার্ম্মাণরা যখন কুড়েমির ভয় করে তখন কুড়েমি শব্দটা একটা কর্ম্ম-তৎপর উন্নতি-প্রবণ সজীব জাতির মাপকাঠিতে বুঝিতে হইবে।

জার্ম্মাণদের ভয় পাছে তাহাদের মগজের ঘী শুকাইয়া যায়, পাছে জার্ম্মাণ এঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক আর ব্যাঙ্কার-গণ নিত্যনূতন আবিষ্কারের দায়িত্ব ভুলিতে থাকে। এই বিপদটা মূল্যবৃদ্ধির মতন বা মূল্যবিষয়ক যথেচ্ছাচারের মতন একদম আধিভৌতিক বস্তু নয়। এ চরম মাত্রায় আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিপদ। এই বিপদটাকে ভয় করা জার্ম্মাণ স্বদেশ-সেবকদের পক্ষে অন্যায় নয়।

বর্ত্তমানে অবশ্য সেই বিপদের সম্ভাবনা খুবই কম। কেন না সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিবার জন্যই এখন হাজার হাজার পাকা মাথা কর্ম্মদক্ষ ভাবে নিজ নিজ মগজের ঘী খরচ করিতেছে। আজকাল চলিতেছে সর্ব্বত্র নতুন নতুন কর্ম্মকৌশলের উদ্ভাবন, নতুন নতুন রাট্‌সিওনালিজিরুঙ বা যুক্তিযোগের প্রণালী আবিষ্কারের চেষ্টা। শিল্পবিষয়ক অনুসন্ধান, কর্ম্ম-পরিচালনা-বিষয়ক গবেষণা,—ইত্যাদি আধ্যাত্মিক কর্ম্মে জার্ম্মাণির বেপারীরা হামেশা মোতায়েন আছে। এখন তাহাদের "মরবার ও ফুরসুৎ" নাই। সঙ্ঘের আন্দোলন লোকের মস্তিষ্কগুলাকে তাজা ও কর্ম্মঠ করিয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু ভাবনা হইতেছে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। আজকাল যাহারা এই বিপুল সঙ্ঘ গড়িয়া যাইতেছে তাহাদের বংশ-ধরেরা মেজাজ ঠিক রাখিয়া কর্ম্মতৎপরতা দেখাইতে সমর্থ হইবে কি? ইহারা ত ক্রমশঃ নেহাৎ "কেরাণী" মাত্ররূপে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাজ করিতে অভ্যস্ত হইবে। স্বাধীন ভাবে ছোট বড় মাঝারি কারবারের প্রতিষ্ঠাতা হইবার সুযোগ তাহাদের কপালে একপ্রকার জুটিবেই না। যুবক জার্ম্মাণির আধ্যাত্মিক জীবনে এক বিষম সঙ্কটাপন্ন অবস্থা উপস্থিত হইবার কথা।

জার্ম্মাণির লাভালাভের কথায় ভারতবাসীর মাথা ব্যথা করিবার কোনো প্রয়োজন নাই। এইটুকু মাত্র বুঝিয়া

রাখিলেই চলিবে যে,—আর্থিক দুনিয়ায় দায়িত্বপূর্ণ স্বাধীনতাময় কর্ম্মক্ষেত্রের অভাব ঘটাইয়া সঙ্ঘ-ব্যবস্থা এক একটা জাতিকে অবনতির পথে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে পারে। সঙ্ঘ-নামক নবীনতম আর্থিক গড়নের সু-কু আলোচনা করিবার সময় এই কথাটা মনে রাখা আবশ্যক।

অবশ্য এই ব্যাধির "যেমন কুকুর তেমন মুগুর" দাওয়াইও আছে। ব্যাধি প্রকট হইবামাত্র আর্থিক দুনিয়ার ডাক্তারেরা দাওয়াই আবিষ্কারের ধান্ধায় লাগিয়া যাইবে। ইতিমধ্যেই তাহার চিহ্নৎও দেখিতে পাইতেছি। সে কথা এবার থাক।

প্রেম মহাবিদ্যালয়

শ্রীযোগেশচন্দ্র পাল

ভারতবর্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য, কারিগরি, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা করিবার মত কলেজ খুব কমই আছে। দিন দিন বেকার-সমস্যা যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে যে এরূপ শিক্ষার বিশেষ আবশ্যকতা আছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। তারপর দুই চারিটি স্কুল বা কলেজ যাহা আছে, তাহাতে ব্যয়-বাহুল্য এত যে, সাধারণ লোকের সন্তানগণ তাহাতে শিক্ষালাভ করিতে পারে না। দেশের এই ভীষণ অবস্থা রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের হৃদয়ে বড় ব্যথা দিয়াছিল। তাই তিনি এই অভাব-মোচনের জন্য নিজের অর্দ্ধেক সম্পত্তি দান করিয়া একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সেই বিদ্যালয়ই আজ প্রেম মহাবিদ্যালয় নামে বিখ্যাত। রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ যে মহান উদ্দেশ্য লইয়া এই বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন আজ তাহা সফল হইতে চলিয়াছে। ভারতের নানা প্রদেশের যুবকগণ এখানে বিনা বেতনে অধ্যয়ন করিতেছে। বাঙ্গালী ছাত্রও অনেক আছে। আমরা আজ এই প্রেম মহাবিদ্যালয়ের সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া "আর্থিক উন্নতির" পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব এবং বাঙ্গালার বেকার যুবকগণকে নূতন পথের কথা বলিব।

বৃন্দাবন হিন্দুগণের, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালীগণের, অন্যতম প্রধান তীর্থস্থান। বৃন্দাবনে বাঙ্গালীর সংখ্যাই অধিক। অধিকাংশ প্রধান প্রধান মন্দিরের মহান্তও বাঙ্গালী। বাঙ্গালী শ্রীগৌরাঙ্গের প্রভাবই বৃন্দাবনের বাঙ্গালী-বাহুল্য ও বাঙ্গালী-প্রভাবের মূলে বর্ত্তমান। বৃন্দাবনের এক সুন্দর অংশে যমুনার তীরে প্রেম মহাবিদ্যালয় অবস্থিত।

প্রেম মহাবিদ্যালয় সম্বন্ধে বলিতে গেলেই দেশত্যাগী নির্য্যাতিত রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের কথা মনে পড়ে ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হয় এবং তাঁহার সম্বন্ধে লিখিবার প্রবৃত্তি প্রবল হয়। কিন্তু আজ এই প্রবন্ধে তাঁহার বিষয়ে কিছু না লিখিয়া শুধু তাঁহার প্রেম মহাবিদ্যালয়ের কথাই লিখিব।

প্রেম মহাবিদ্যালয় কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন নহে। ইহা একটি জাতীয় অনুষ্ঠান। ভারতের নানা প্রদেশের যে-কোনো জাতির লোক এখানে অধ্যয়ন করিতে পারে। নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য লইয়া এই কলেজ স্থাপিত :—

(ক) সাধারণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার।

(খ) উচ্চ টেকনিক্যাল, কমার্শ্যাল এবং সাধারণ শিক্ষাবিস্তার।

(গ) জীবন-যাপনের একটা নির্দ্দিষ্ট পথ প্রদর্শন করা এবং বর্ত্তমান সামাজিক কুসংস্কার দূর করা।

(ঘ) সাধারণ লোককে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া।

(ঙ) ভারতের লুপ্ত এবং লুপ্তপ্রায় শিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা; এবং বর্ত্তমান নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শিল্পের উন্নতি চেষ্টা করা।

(চ) পাশ্চাত্য সভ্যতার সত্য গ্রহণ করিয়া প্রাচ্য প্রথা অবলম্বনে ভারতবাসীকে একটি বিরাট জাতিতে পরিণত করা

(ছ) উপরের সত্যগুলি পালন করিয়া কোনো মনোরম স্থানে একটি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, কমার্শ্যাল, এগ্রিকালচারেল এবং আর্ট কলেজ স্থাপন করা।

এই উদ্দেশ্য লইয়া বৃন্দাবনে প্রেম মহাবিদ্যালয়ের জন্ম হয়। এই বিদ্যালয় একটি কমিটি দ্বারা চালিত। নানাপ্রকার বিভাগে ছাত্রগণ নানা বিদ্যা শিক্ষা করে।

প্রেম মহাবিদ্যালয় যাহাতে ইহার সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারে তাহার জন্য রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ তাহার অর্দ্ধেক সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। ঐ সম্পত্তির মূল্য প্রায় দশ লক্ষ টাকা হইবে এবং উহার বার্ষিক আয় ৪০ হাজার টাকা। উহা হইতেই কলেজের এবং স্কুলের যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ হয়।

বৃন্দাবন ছোট সহর। এখানে অধিক লোক বসবাস করে না। তীর্থ করিতে লোক আসে, আবার দু'দিন পরে চলিয়া যায়। যাহারা বাস করে তাহাদের মধ্যে বিধবার সংখ্যাই অধিক,—বিশেষতঃ বাঙ্গালী বিধবার। কলেজে এবং স্কুলে যাহারা অধ্যয়ন করে তাহাদের অধিকাংশই নানা প্রদেশের লোক। বাঙ্গালী, আসামী, বিহারী, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, মাড়োয়ারী, প্রভৃতি অনেক ছাত্রই আছে। অধিকাংশ ছাত্রই কলেজসংলগ্ন বোর্ডিং হাউসে থাকে। বোর্ডিংয়ের খাই-খরচ আট হইতে দশ টাকার মধ্যে। বিনা ব্যয়ে ছাত্রগণ বোর্ডিং হাউসে থাকিতে পারে। ছাত্রগণ একখানা খাট, একটি টেবিল এবং একটি চেয়ার কলেজ হইতে বিনা ব্যয়ে পাইয়া থাকে।

স্কুলে এবং কলেজে প্রায় ২৫০ জন ছাত্র আছে। কিছুদিন হইল শ্রীযুক্ত এ,টি, গিদয়ানী কলেজের ভার নিজ হস্তে লইয়াছেন। তাঁহার হাতে আসিয়া কলেজের দ্রুত উন্নতি হইতেছে। খদ্দর বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। ২৫০ জন ছাত্রের মধ্যে কেহই বেতন দেয় না। সকলেই বিনা বেতনে অধ্যয়ন করিয়া থাকে। ইহা ভিন্ন গরিব ছেলেদিগকে কিছু-কিছু সাহায্য করিবার ব্যবস্থাও আছে। অনেক ছাত্র কারখানায় কাজ করিয়া প্রতি মাসে কিছু-কিছু আয় করে। আমার মনে হয়, ভারতে ইহাই একমাত্র অনুষ্ঠান, যথায় ছাত্রগণ কারখানায় কাজ করিয়া নিজেদের ভরণ-পোষণ সংগ্রহ করিয়া অধ্যয়ন করিতে পারে। কলেজে, স্কুলে, প্রেসে কারখানায় প্রায় ৫০ জন লোক কাজ করেন এবং অধ্যাপনা করেন। সকলেই উচ্চশিক্ষিত। কলেজ হইতে "প্রেম" নামক একখানা হিন্দী মাসিক পত্রিকা বাহির হয়। কলেজের লাইব্রেরীও বেশ সজ্জিত। ব্যবসা-বাণিজ্য, ইঞ্জিনিয়ারিং সাহিত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে হিন্দী এবং ইংরেজী, দেশী ও বিদেশী অনেক পত্রিকা আসিয়া থাকে। অনেক পত্রিকাই প্রকাশকগণ বিনা মূল্যে দিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় এখানে অনেক বাঙ্গালী ছাত্র থাকা সত্ত্বেও কোন বাঙ্গালা পত্রিকা আসে না এবং কোন প্রকাশক তাহা বিনামূল্যে পাঠান না। কলেজ হইতে ক্রয় করিবারও তেমন সুযোগ নাই।

আমরা এখন বিদ্যালয়ের বিভাগ সম্বন্ধে কিছু বলিব। বিদ্যালয়কে আমরা সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারি। সাধারণ বিভাগ ও বিশেষ বিভাগ। সাধারণ বিভাগে কেবল সাধারণ জ্ঞানের জন্য পড়ান হয়। প্রত্যেক ছাত্রকে ম্যাট্রিকুলেশন শ্রেণীর উপযোগী শিক্ষা দেওয়া হয়। তদুপরি প্রাথমিক বিজ্ঞান, সাধারণ অর্থনীতি এবং সাধারণ রাজনীতি পড়ান হয়। ইহা ভিন্ন স্কুলের প্রত্যেক ছাত্রকে কোন একটি কারিগরি বিভাগে কাজ শিখিতে হয়। চরকা বাধ্যতামূলক। ছেলেরা সাধারণ বিভাগ হইতে পাশ করিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং বা কমার্স বিভাগে ভর্ত্তি হয়।

বিশেষ বিভাগ বলিতে সাধারণ বিভাগ ভিন্ন সমস্ত বিভাগকেই বুঝায়। বিশেষ বিভাগের নিম্নলিখিত উপ-বিভাগ আছে:—

১। ইঞ্জিনিয়ারিং।

২। কমার্স (টাইপ রাইটিং, শর্টহ্যাণ্ড এবং বুক কিপিং)।

৩। ছুতারের কাজ।

৪। লোহার কাজ।

৫। বয়ন।

৬। দরজীর কাজ।

৭। কার্পেট তৈয়ারী।

৮। কুম্ভকারের কাজ।

৯। চিনামাটির কাজ।

১০। স্ত্রীলোকদিগের বয়ন বিভাগ।

১১। মাদুর তৈয়ারী (শীঘ্রই আরম্ভ করা হইবে)।

আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে কেবল দুই চারিটি কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। পরবর্ত্তী প্রবন্ধে উহা বিশেষ ভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে তিন বৎসর অধ্যয়ন করিতে হয়। কমার্স বিভাগে ১২-১৮ মাস। কারপেণ্টারী বিভাগে চারি বৎসর পড়িতে হয়। যে-কোন বালক কার্য্যক্ষম হইলেই এই বিভাগে ভর্ত্তি হইতে পারে। কিন্তু তাহাকে ইহার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কেতাবী জ্ঞান শিখান হয়। বর্ত্তমান ভারতের হালচাল সম্বন্ধেও উপদেশ দেওয়া হয়। কারপেণ্টারীর মত স্মিথি বিভাগ চলিয়া থাকে। উইভিং বিভাগেও যে- কোন ছাত্র ভর্ত্তি হইতে পারে এবং এক বৎসর কাজ শিখিতে হয়। দরজী বিভাগেও এক বৎসর কাজ শিখিতে হয়। কার্পেট মেকিং বিভাগে একবৎসর ও পটারী বিভাগে তিন বৎসর কাজ শিখিতে হয়। চিনামাটির কাজও তিন বৎসর শিখিতে হয়। কারপেণ্টারী বিভাগের মত এই দুই বিভাগের ছাত্রগণকে স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা এবং দেশের বর্ত্তমান হালচাল সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়।

স্ত্রীলোকগণ এখানে শিক্ষালাভ করিতে আসিলে তাহাদিগের প্রতি বিশেষ যত্ন লওয়া হয়। প্রিন্সিপাল গিদয়ানীর স্ত্রীও বেশ উচ্চশিক্ষিতা। তিনি প্রত্যহ বিদ্যালয়ে আসেন এবং ছেলেদের অভাব-অভিযোগের কথা শুনেন। স্ত্রীলোকদিগের প্রতি তিনি বিশেষ দৃষ্টি দিয়া থাকেন।

এখানে যে-কোন ছেলে আসিয়া শিক্ষালাভ করিতে পারে।— হিন্দীতে পড়ান হয়। যাহারা ভাল ইংরেজী এবং হিন্দী না জানে, তাহাদের একটু মুস্কিলে পড়িতে হয়। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই সাধারণ হিন্দী শিক্ষা করিয়া কাজ চালান যায়। যাহারা কমার্স ক্লাসে পড়িতে আসে, তাহাদিগের ভাল ইংরেজী জানা আবশ্যক। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ না করিলে কোন ছাত্রকে কমার্স ক্লাসে ভর্ত্তি করা হয় না। ইহা ভিন্ন অতিরিক্ত ইংরেজী শিখাইবার বন্দোবস্ত আছে।

আজকাল ভারতে বেকার-সমস্যা ভয়ানক প্রবল হইয়া দেখা দিয়াছে। দেশের এই দুর্দ্দিনে এই প্রেম মহাবিদ্যালয় যে অনেকখানি কাজ করিবে তাহা বলাই বাহুল্য। যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এ, আই এ, পাশ করিয়া বসিয়া আছে, তাহারা এখানে আসিয়া কিছুদিন কাজ শিখিলে সহজেই মাসে ৪০৲।৫০৲ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে। তবে যাহারা আই এ, বি এ, পাশ করিয়াছে, কাজ শিখিবার মত তাহাদের সামর্থ্য কোথায়? তাহা যে তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর তরে বিসর্জ্জন দিয়াছে। আর তাহাদের সময়ই বা কোথায়? সকলের ঘরেই যে নবপরিণীতা পত্নী—তাহাকে ভরণপোষণ করিতে হইবে; পিতা মাতা বৃদ্ধ; ইহা ভিন্ন কাহারও হয়ত স্ত্রীর কোল জুড়িয়া দুই তিনটি শিশু বসিয়া আছে। আমাদের মনে হয় দেশের এই দুর্দ্দিনে যাহাদের অর্থ-উপার্জ্জন প্রধান উদ্দেশ্য, তাহারা আই এ, বি এ, পাশ করিতে সময় না দিয়া, এরূপ কলেজে অধ্যয়ন করিলে বি এ, পাশকরা লোকের চেয়ে অধিক অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে।

এখান হইতে যাহারা কাজ শিখিয়া বাহির হইয়াছে তাহাদের কেহই বসিয়া নাই। কেহ কেহ নিজেরাই ব্যবসা করিতেছে। অনেকে ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত মাসে মাহিয়ানা পাইতেছে। যাহারা এখানে কাজ শিক্ষা করিয়া ব্যবসা করিতেছে, তাহাদের কেহ কেহ মাসে ২০০৲।২৫০৲ টাকা উপার্জ্জন করিতেছে। বাঙ্গালার যুবকদের দৃষ্টি এদিকে পড়িবে কি?
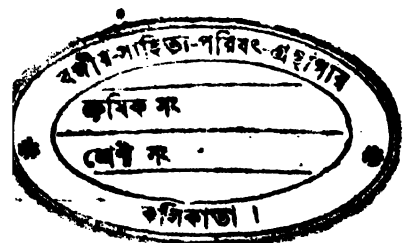
ক্রোমাইট

শ্রীজগজ্জ্যোতি পাল, কেমিষ্ট, রাখামাইন্‌স, সিংভূম

আমরা আজকাল সকলেই ক্রোম চামড়ার জুতা পরিয়া থাকি। এই ক্রোম চামড়া প্রস্তুত করিবার জন্য যে ডাইক্রোমেট (কেহ কেহ বাইক্রোমেটও বলেন) বা ক্রোম অ্যালাম ব্যবহৃত হয়, তাহা প্রস্তুত করিবার জন্য আমাদের মূল খনিজ পদার্থ হচ্ছে ক্রোমাইট। ক্রোমাইট পাথরের রং কাল এবং ম্যাগ্‌নেটাইট নামক যে লৌহ প্রস্তর আছে, তাহার রঙের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। ইহার রং কাল হইলেও ইহা হইতে প্রস্তুত দ্রব্যসমূহ রঙের জন্যই খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। বাজারের ক্রোমগ্রীন্‌, গিগ্‌নেট-গ্রীন্‌ প্রভৃতি সবুজ রংই ক্রোমিয়াম-যুক্ত পদার্থের জন্য। এমন কি, যে সমস্ত মূল্যবান সবুজ প্রস্তর—যথা, এমারেল্ড সেফায়ার- যাহা আমরা সাদরে অঙ্গে ধারণ করি, তাহাদের রংও ক্রোমিয়াম সংযোগ হেতু। আবার এই ক্রোমাইট পাথর হইতে ক্রোমেট্‌ নামক যে সব পদার্থ প্রস্তুত হয় তাহাদের রং হলদে ও ডাইক্রোমেট্‌ নামক যে সব পদার্থ প্রস্তুত হয় তাহাদের রং রজতমুক্তার ন্যায়। (ক্রোমেট্‌ ও ডাইক্রোমেট্‌ নানাবিধ আছে যথা, সোডিয়াম ক্রোমেট্‌, পটাশিয়াম্‌ ডাইক্রোমেট্‌ ইত্যাদি)। পাঠকেরা কেহ যেন মনে না করেন যে, ক্রোমিয়াম ধাতুর জন্য এই রং। বাস্তবিক পক্ষে আমরা যখন ক্রোমিয়ামকে ধাতব অবস্থায় পাই তখন তাহার রং প্রায় লৌহের রঙের মত।

ভূতত্ত্ববিদেরা বলেন, ক্রোমাইট পাথরের উৎপত্তি আগ্নেয় প্রস্তরের মধ্যে। ইহার দার্ঢ্য ৫'৫ এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব ৪'৫। গ্রীস, এসিয়া-মাইনর রোডেশিয়া ও আমেরিকার কোনো কোনো জায়গাতে ইহার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষে সিংভূম জেলায় চাঁইবাশার নিকট ও মহীশূর রাজ্যে বাঙ্গালোরের নিকট ক্রোমাইট খনির কাজ হইতেছে। ভারতবর্ষের নিকটবর্ত্তী বেলুচিস্থানে উৎকৃষ্ট প্রকারের ক্রোমাইটের অনুসন্ধান পাওয়া গিয়াছে। বিশেষজ্ঞগণ বলেন, ক্রোমাইট-সংঘটিত শিল্পের জন্য ভারতবর্ষ দরকার হইলে বেলুচিস্থানের নিকট হইতে ক্রোমাইট লইতে পারে। ভারতবর্ষে কত টাকার ক্রোমাইট্‌-সম্পর্কিত জিনিষের আদান-প্রদান হইয়াছিল, নিম্নে আমরা তাহার একটী তালিকা দিলাম।

[১]

সোডিয়াম ক্রোমেট্‌ ও সোডিয়াম ডাইক্রোমেট্‌ এবং পটাশিয়াম ক্রোমেট্‌ ও ডাইক্রোমেট্‌—ভারতবর্ষ যাহা আমদানি করিয়াছে।

সন	পরিমাণ	মূল্য
	হন্দর (১মণ ১৪ সের)	পাউণ্ড (১৩৲ টাকা)
১৯১৬	১১,০০৯	৪৯,৮৮৫
১৯১৭	২০,৫৩৯	৮১,৭৮৮
১৯১৮	৮,১০৫	৩৯,২৫৪

[২]

ভারতবর্ষের ক্রোমাইট পাথরের রপ্তানি

সন	পরিমাণ	মূল্য
	টন (২৭ মণ)	পাউণ্ড (১৩৲ টাকা)
১৯১৬	১,৮৪৬	৪,৯২২
১৯১৭	৬,১৯০	১০,৪৭৩
১৯১৮	১৪,৯৭৫	৩২,৭১৭

[৩]

ভারতবর্ষের খনি হইতে উৎপন্ন ক্রোমাইট

সন	পরিমাণ (টন হিসাবে)	মূল্য (পাউণ্ড হিসাবে)
১৯১৬	২০,১৫৯	১৬,৪০১
১৯১৭	২৭,০৬১	২৬,২১৬
১৯১৮	৫৭,৭৬৯	৫২,০৩২

এই ক্রোমাইট পাথর লৌহ-ইস্পাতের কারবারেও অনেক পরিমাণে দরকার। অবশ্য সম্প্রতি এক টাটার

লৌহ-কারখানা ছাড়া ভারতবর্ষের অন্য কোনো জায়গায় ইহার ব্যবহার হয় না। লৌহ ও ইস্পাতে ক্রোমাইটের, তিন রকমের ব্যবহার আছে। (১) লৌহ ও ইস্পাতে সংযোগ। ক্রোমিয়াম লৌহ ও ইস্পাত সহ সংযুক্ত হইলে উন্নত শ্রেণীর কার্য্য করিবার উপযুক্ত হয়। রেল গাড়ীর চাকার ও স্প্রীংএর ইস্পাতে ক্রোমিয়াম দরকার। মিউসিট্ ইস্পাতে (যাহা মেসিন টুল্‌সের জন্য দরকার) ক্রোমিয়াম ও টাংষ্টেন আছে। (২) ইস্পাত চুল্লীর প্রলেপের (লাইনিং) জন্য। (৩) ইস্পাত চুল্লী গঠনের ইষ্টকের জন্য। এইখানে বলি ইস্পাত চুল্লী গঠনের জন্য একমাত্র ক্রোমাইট ইষ্টকেরই দরকার হয় না, ইহাতে আরও অনেক শ্রেণীর ইষ্টক লাগে।

টাটার কারখানাতে প্রথমোক্ত কারণে ক্রোমাইটের ব্যবহার নাই। দ্বিতীয় ও তৃতীয়োক্ত কারণেই ব্যবহার হয়। উপরের তালিকা হইতে বুঝিতে পারি, আমরা ক্রোমাইট পাথর রপ্তানি করি ও ক্রোমাইট-ঘটিত জিনিষ আমদানি করি। এখন প্রশ্ন হইতে পারে এই যে, এই রসায়ন-জাত শিল্প কি আমাদের দেশে হইতে পারে না? বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের শিল্প-রসায়নবিদ্ ডাঃ শ্রীযুক্ত রসিকলাল দত্ত তাঁহার এই চাকরী গ্রহণের পূর্ব্বে পট ডাইক্রোমেট করিবার জন্য কারখানা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তিনি ইহাতে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিয়া যে আর ইহা হইতে পারে না এমন নয়। আবার যদি দেশের শিল্প-বিশারদগণ এই কার্য্যে মনোনিবেশ করেন, তাহা হইলে ইহা শিল্পরূপে দাঁড়াইতে পারে।

ডাইক্রোমেটের অধিকাংশ পরিমাণ চর্ম্মশিল্পে ব্যবহৃত হয়। তা ছাড়া অন্যান্য শিল্পেও ইহার কিছু-কিছু দরকার হয়। যথা, দিয়াশলাই শিল্পে, চীনামাটী ও কাচের জিনিষে রং করিবার জন্য, কাপড়ে রং লাগাইবার জন্য, আলোকচিত্রে, ইলেক্‌ট্রিক ব্যাটারীতে ও রাসায়নিক বিশ্লেষণে।

বর্দ্ধমানের বিভিন্ন জাত

(আর্থিক নৃতত্ত্ব)

শ্রীহরিদাস পালিত

কোঁড়া, বাউড়ী ও ধাওয়া জাতির আর্থিক জীবন

মাটি কাটা ইহাদের জাতীয় কর্ম্ম। ইহারা শ্রমজীবী। পাল্কী ও ডুলী বহন করে। বাঁকে করিয়া ভারবহনে ইহারা বিশেষ দক্ষ। কৃষিকাজ করে ও কয়লার খাদে মজুরী করে। এই জাতিসমূহ খুব কর্ম্মী। ইহাদের নারীরা কামিন্ নামে পরিচিত। কামিন্‌রা কয়লা কাটে ও অধিকাংশ স্থলে কয়লা বহন করে। ইহারা বর্দ্ধমানের বিভিন্ন পল্লীতে বাস করে। বণ্ডজাতি—ভাগে কৃষিকার্য্য করে। সাধারণের কৃষাণ রূপে কর্ম্ম করে। স্ত্রীলোকেরা খেজুর পাতার চাটাই বুনিয়া বিক্রয় করে। রেলের রাস্তা ও সাধারণ রাস্তায় মাটির কার্য্য করে। সাঁওতালরা এই সকল কর্ম্ম একচেটিয়া করিবার উপক্রম করিয়াছে।

সাধারণের পুষ্করিণী-কর্ত্তনে অনুরাগ না থাকায়, এই জাতিরা চাষ করে ও দিন-মজুরি করে। কয়লার খাদের সন্নিহিত স্থানে ইহারা খাদের কার্য্য করিয়া কোন প্রকারে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে। বর্দ্ধমান জেলার পল্লীসমূহে যাহারা বিচ্ছিন্নরূপে বাস করিতেছে, তাহাদের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়াছে। পাল্কী ও ডুলীর ব্যবহার সমাজে হ্রাস হওয়ায় ইহাদের অর্থাগমের উপায় সঙ্কীর্ণ হইয়াছে। ইহারা লোপ পাইতেছে। বর্দ্ধমান জেলার বিভিন্ন পল্লীবাসী কোঁড়া প্রভৃতি জাতি অতি দরিদ্র ও সংখ্যায় নগণ্য হইতেছে।

ইহারা নিরক্ষর। এই সব জাতির উন্নতি নাই। বরং দ্রুত অবনতিই ঘটিতেছে। এই সব জাতির প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী একমাত্র সাঁওতাল। সাঁওতালের প্রভাবে ইহারা ক্রমশঃ কর্ম্মহীন হইতেছে। মজুরী-হ্রাসের কারণ সাঁওতালী প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

বেদে ও কোল জাতির ব্যবসা

ইহারা অনেকটা যাযাবর জাতির ন্যায়। বাজারের নিকট ক্ষুদ্র পর্ণশালা প্রস্তুত করিয়া বাস করে। ঝুড়ি, পেতে, কুলা, ধুচনী চাল্‌নী, ডোল প্রস্তুত করে। ফাঁদ পাতিয়া এবং "সাতনলা"র সাহায্যে মাছরাঙ্গা পাখী ও বক প্রভৃতি শীকার করে। মাছরাঙ্গার এবং বকের সুন্দর পালক সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করে। সংখ্যায় নগণ্য। বংশ-বিস্তার নাই বলিলেই হয়। অন্য কোন প্রকার ব্যবসা করে না। সময়ে সময়ে খাদ্যাভাব হইলে ভিক্ষা করে। সম্পূর্ণ অশিক্ষিত। প্রধান ব্যবসা ঝুড়ি, কুলা ইত্যাদি প্রস্তুত করা ডোমগণ গ্রহণ করিয়া ইহাদিগকে নিঃস্ব করিয়াছে। কৃষিকার্য্য বা মাটির কার্য্য করে না। এই জাতি অতি দরিদ্র ও মৃতপ্রায়।

সাঁওতাল জাতির জয়জয়কার

এই বীর জাতি কয়লার খাদে সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম করে। ইহারা কোঁড়া ও বাউড়ীর প্রতিদ্বন্দ্বী। ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া, খাদের কার্য্য ধীরে ধীরে কোঁড়া ও বাউড়ীর হাত হইতে গ্রহণ করিতেছে। পল্লীবাসী শ্রমজীবিগণের অধিকাংশ কর্ম্ম ইহারা হস্তগত করিয়া লইয়াছে। ইহারা "আধিতে" কৃষিও আরম্ভ করিয়াছে

ইহারা প্রথমে দিন-মজুর রূপে কর্ম্ম করিয়া ক্রমে পল্লীর কৃষকরূপে গণ্য হইতেছে। ইহাদের বালকেরা রাখাল। পল্লীর নিম্নশ্রেণীর নারীরা ধান ভানিত (গৃহস্থদের প্রদত্ত ধান লইয়া চাউল প্রস্তুত করিত)। এই প্রকার ধান লইয়া চাউল দিবার কার্য্য কুট্টির বা ভাচা নামে খ্যাত)। পল্লী-নারীর এই প্রকার 'ভাচা' বা ধানভানার কার্য্য সাঁওতাল নারীরা প্রায় একচেটিয়া করিয়া লইবার উপক্রম করিয়াছে। ইহারা অবসর কালে খেজুর-পাতার চাটাই বুনিয়া বিক্রয় করে। এই কর্ম্মটী কোঁড়া ও বাউড়ী নারীর ছিল। ডোম ও হাড়ী রমণীরাও চাটাই বুনিয়া যৎকিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করিত। এই বন্য কর্ম্মঠ সাঁওতাল রমণীরা ক্রমশঃ তাহাদের কর্ম্মগুলি হস্তগত করিয়া লইতেছে।

সাঁওতাল পুরুষ ও রমণীরা কৃষকগণের সকলপ্রকার কৃষি-কার্য্যে মজুরী করে। দেশী মজুরের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে। সাঁওতালদের প্রতিযোগিতায় ক্রমশঃ পরাজিত হইয়া তাহারা বিভিন্ন কর্ম্মকেন্দ্রে মজুরী করিতে ছুটিয়াছে। পল্লীর পূর্ব্বকার বাসিন্দার সংখ্যা একদিকে যেমন হ্রাস হইতেছে, অন্যদিকে তেমনি সাঁওতাল-সংখ্যা বাড়িতেছে।

বর্দ্ধমানের পল্লীগুলিতে পূর্ব্বকার শ্রমজীবী পল্লীবাসিগণের লোপ এবং সাঁওতালের ক্রমশই বৃদ্ধি হইতেছে। কোঁড়াপাড়া, বাউড়ীপাড়া, বাগদীপাড়ার অবস্থা শোচনীয় ও ধ্বংসোন্মুখ। তাহার পার্শ্বে সাঁওতাল-পল্লী প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

সাঁওতালগণ কেবল যে ধান্য ও সব্জীর চাষ করে তাহা নহে, তাহাদের মধ্যে লোহার-সাঁওতাল পল্লীতে পল্লীতে কামারের কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কৃষি-যন্ত্রাদি প্রস্তুত ও মেরামত করিয়া হিন্দু কামারের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইতেছে।

ইহারা ছুতার-মিস্ত্রীর কার্য্য করিতেছে—হাল, জোয়াল, গাড়ীর চাকা ইত্যাদি প্রস্তুত করিতেছে। প্রাচীন হিন্দু সূত্রধরগণের অপেক্ষা কম মজুরীতে কর্ম্ম করিয়া কাঠের স্থূল কার্য্যগুলি অধিকার করিতেছে।

সাঁওতালদের মধ্যে জোতদার দেখা দিয়াছে। তাহারা মহাজনীও আরম্ভ করিয়াছে। ভদ্র সাঁওতালদের বেশভূষা হিন্দু কৃষকগণের প্রায় সমতুল্য হইয়া উঠিয়াছে। লেংটী-পরা সাঁওতালদের মধ্যে হিন্দুপল্লী-প্রচলিত সভ্যতা দেখা দিয়াছে। হাটে বাজারে সাঁওতাল নর-নারীরা বিবিধ তরিতরকারী বিক্রয় করিয়া দেশী কৃষকদিগকে ঘোর প্রতিযোগিতায় পরাজিত করিতেছে। বৎসর বৎসর দেশী কৃষকও শ্রমজীবী হ্রাস পাইতেছে এবং সেই স্থল পূর্ণ করিতেছে কর্ম্মঠ সাঁওতাল।

উড়িয়া বাউড়ী ও তদনুরূপ জাতির ক্রমোন্নতি

ইহারা বৈদেশিক। বাগানের মালীর কার্য্যে ইহারা প্রায় একচেটিয়া করিয়া লইতেছে। ধনী পল্লীবাসীদের মধ্যে

বাগান প্রস্তুত করিবার জন্য দেশীয় শ্রমজীবীর অভাব-নিবন্ধন উড়িয়া মালী দ্বারা সেই কার্য্য সম্পাদনের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহারা বাগান প্রস্তুত করিয়া দিবার জন্য 'তলি-ফসল' ঠিকা লইয়া কর্ম্মে নিযুক্ত হয়। শাকসব্জী উৎপাদনে ইহারা দক্ষ। কলা বাগান প্রস্তুত করিয়া প্রচুর লাভ করিতেছে। হাটে বাজারে হাটুরিয়া রূপে দেখা দিয়াছে এবং হাটে হাটে ক্রমশই এই মালী-চাষার প্রাধান্য বর্দ্ধিত হইতেছে। সাঁওতাল ও মালীর প্রভাবে পল্লীর প্রাচীন চাষার প্রতিপত্তি-লোপের উপক্রম হইয়াছে।

ধ্বংসোন্মুখ ডোম

এই জাতি বর্দ্ধমান জেলায় বাঁশডোম নামে খ্যাত। ইহারা পূর্ব্বে যোদ্ধা জাতি ছিল। পরে ইহারা জমীদার ও মহাজনগণের 'পাইক' বা দরোয়ান রূপে কর্ম্ম করিত। বর্ত্তমানে পল্লীর বাস-ভবন নির্ম্মাণের ইহারা প্রধান শ্রমিক। বংশ-নির্ম্মিত গৃহ ইহারাই করিয়া থাকে। ঝুড়ি, পেতে, কুলা, ধুচনী, ডোল ইহারা প্রস্তুত করে। সামান্য কৃষিকার্য্য এবং দিন-মজুরীও করে। চাষের কার্য্যে সময়ে সময়ে মজুরী খাটে।

বংশ-নির্ম্মিত ঝুড়ি ইত্যাদির কার্য্য বেদে ও কোলেরা দখল করায় পূর্ব্বে ইহাদের যে আয় হইত, তাহা আর হয় না। নারীরা প্রায় কর্ম্মহীন হইয়া গিয়াছে। তাল পাতার চাটাই বুনিয়া রমণীরা কিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করিত। কোঁড়া, বাউড়ী, ধাওয়া, বেদে, কোল এবং সাঁওতালি কামিন্‌রা ঐ প্রকারের শিল্প গ্রহণ করিয়া ডোম নারীদিগকে একেবারে কর্ম্মহীন করিয়া দিয়াছে।

শূকর-পালন ডোমদের একটী লাভজনক ব্যবসা। এই ব্যবসা দ্বারাই ডোম ও হাড়ীরা বাঁচিয়া আছে। কিন্তু সাঁওতাল জাতিও শূকর পালন করে। সাঁওতালদের ইহা একটী গৌণ ব্যবসা। ডোম ও হাড়ীরা ক্রমশঃ দরিদ্রেরও অধম হইয়া পড়িয়াছে। একমাত্র বংশ-গৃহ নির্ম্মাণ ডোমের মুখ্য ব্যবসা—ইহাও ধীরে ধীরে সাঁওতালরা করায়ত্ত করিতেছে।

সাধারণতঃ ডোম বা হাড়ীর সংখ্যা কোনো পল্লীতেই অধিক নাই। প্রতি পল্লীতে এই জাতির ক্ষুদ্র 'পাড়া' বিদ্যমান। সংখ্যায় ইহারা অতি সামান্য। তদুপরি ইহাদের জীবিকা-উপার্জ্জনের কর্ম্মগুলি অন্য জাতি-কর্ত্তৃক অধিকৃত হওয়ায় ইহারা ধ্বংসোন্মুখ জাতিতে পরিণত হইয়াছে এবং জীবন-সংগ্রামে পরাজিত হইয়া, বিদায় গ্রহণ করিতেছে। পূর্ব্বে এই জাতি রাঢ় দেশের প্রবল কর্ম্মঠ জাতি ছিল। বর্ত্তমানে দুর্ব্বল, হীন এবং মৃতপ্রায়।

হাড়ীদের ভাগ্য-পরিবর্ত্তন

হাড়ী ডোমের সমতুল্য জাতি। প্রথমে ইহারাই ডোমদের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে দেখা দিয়া ডোমদের কর্ম্মের অংশীদার হইয়াছিল। ইহারা শূকর পালন করে। পাইকের কর্ম্মে ইহারা সুদক্ষ। ইহারা প্রথমে গৃহ-নির্ম্মাণ কার্য্য করিত না। ক্রমে ডোমদের অনুকরণে সেই কর্ম্ম গ্রহণ করে। নারীরা পল্লীবাসীদের সূতিকাগৃহে দাইয়ের (ধাত্রীর) কর্ম্ম করে। এই কর্ম্মটী ইহাদের ব্যবসা। এই জাতির রমণীরা পাণিফল, পদ্মচাকা, কেশুর প্রভৃতি বিক্রয় করে। ডোমদের ন্যায় তাল কাটিয়া 'তালশাঁস' বিক্রয় করে এবং জমা লইয়া আম তেঁতুল, জাম ইত্যাদির ব্যবসা করে। এই প্রকার কর্ম্মদ্বারা হাড়ী সমাজ উন্নত ও গৃহস্থ হইয়াছিল।

শূকর-পালন মুখ্য ব্যবসা। সাঁওতালরা ইহা গ্রহণ করিয়া ইহাদের প্রধান উপার্জ্জনের পথে বাধা উপস্থিত করিয়াছে। ফলকর জমা লইয়া ইহারা সংসার প্রতিপালন করিত। 'নিকারী' নামক মোসলমান জাতি বর্ত্তমানে ফলকর জমা লইয়া হাড়ীদিগকে পরাজিত করিয়াছে। এই জাতি অধিক মূল্যে ফলকর জমা লইতেছে। সুতরাং হাড়ীরা এই আয় হইতে পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইয়াছে। নিকারীরা শুটকী মাছ এবং লোনা ইলিস বিক্রয় করে। এ ব্যবসা পূর্ব্বে হাড়ীরা করিত, এক্ষণে তাহারা নিকারীদের সঙ্গে প্রতি-যোগিতায় পরাস্ত হইয়া ইহা ত্যাগ করিয়াছে। ডোমদের অপেক্ষাও ইহারা হীন হইয়াছে এবং ধ্বংস-প্রাপ্ত হইতেছে। সংখ্যায় নিতান্ত হীন হইয়া পড়িয়াছে।

পশ্চিম দেশীয় ডোম ও হাড়ী বর্দ্ধমানে প্রবেশ করিয়া অভিনব দেশীয় জাতিতে পরিণত হইতেছে। ইহাদের প্রাধান্য প্রথমে সহর অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

কাঁড়াল

এই জাতি শীকারী। ইহাদের সন্ধান পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। ইহারা মাছ ধরিত, জালবুনিত, ভাচা ভানিত।

মুচীদের বিভিন্ন ব্যবসা

বর্দ্ধমানে এই জাতি সাধারণতঃ প্রাচীন জাতি। ইহারা 'ভাগাড় কামাই' করিত [ভাগাড়ে মৃত পশুর চর্ম্মোত্তোলন করিয়া সেই চামড়ায় জুতা, মশক (কুপা) প্রস্তুত করিত]। এই ব্যবসাটী পূর্ব্বে যথেষ্ট লাভজনক ছিল। পূর্ব্বে বলদের দ্বারা তৈল, চিটাগুড় বহন করিয়া দেশ-বিদেশে বা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে অথবা সহরে সহরে বিক্রয় করিত। এই কারণে তৈল বা গুড়-ব্যবসায়ীরা সকলেই চর্ম্মনির্ম্মিত মশক (কুপা) ব্যবহার করিত। ক্রমে টিনের কানেস্তা এবং কাঠের পিপার প্রচলন হওয়ায়, চামড়ার মশকের আবশ্যকতা রহিল না। এখন আর কেহই মুচীদের কাছে কুঁপো ক্রয় করিতে যায় না। মুচীর প্রধান ব্যবসা লুপ্ত হইয়াছে। পশ্চিমা চামারদের আবির্ভাবে তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় দেশীয় মুচীরা জুতা নির্ম্মাণের ব্যবসায় পরাজিত হইয়া গেল। অনেকেই দেখিয়াছেন কলিকাতার ঠনঠনিয়ায় দেশী মুচীরা জুতা প্রস্তুত করিত। ক্রমে সেই স্থান অধিকার করিয়াছিল বিদেশী চামারগণ। বর্ত্তমানে সেই স্থল অধিকার করিয়াছে মোসলমান জুতা-ব্যবসায়ীরা। বর্দ্ধমান সহরে যে সকল দেশী মুচী ছিল, তাহারাও ঐ প্রকার পরিবর্ত্তনের ফলে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে।

মুচী-তাঁতী

মুচীরা বর্ত্তমান খদ্দরের মত সুন্দর 'খাদি' বয়ন করিত। প্রতি পল্লীতে কার্পাস-ক্ষেত্র ছিল। পল্লীর সকল জাতিই চরকার সাহায্যে সূতা প্রস্তুত করিয়া সাধারণ ব্যবহারোপযোগী বস্ত্র মুচীদের দ্বারা প্রস্তুত করাইয়া লইত। স্ত্রী-পুরুষ মুচীরা এই প্রকার বস্ত্রবয়ন-কার্য্য দ্বারা গৃহে বসিয়া উপার্জ্জন করিত। পল্লীর ভদ্র-পরিবারস্থ গৃহিণীদের নিকট তাঁহাদের স্বহস্ত-প্রস্তুত সূতা ওজন করিয়া লইয়া 'বানি' হিসাবে বস্ত্র বয়ন করিয়া দিত। বাল্যকালে লেখক স্বয়ং মুচী বাড়ীতে 'বানি' দিয়া কাপড় আনিয়াছিল।

মুচীরা গামছা, লেপ ও বালিসের খোলের উপযোগী ঠেটী অর্থাৎ কম বহরের মোটা এবং খাপী কাপড় বুনিত। তৎকালে মুচী-তাঁতীর প্রতিযোগী অন্য কোনো জাতি বর্দ্ধমানে ছিল না। তাঁতীরা ইহাদের প্রতিযোগী নহে। কারণ মুচীরা মোটা খাদি বয়ন করিত। ইহা ছিল তদানীন্তন সভ্যতার 'আটপৌরে' বস্ত্র। তাঁতীরা সূক্ষ্ম সূত্রের তোলা ধুতী, শাড়ী, চাদর বয়ন করিত। মুচী-তাঁতীরা মশক-শিল্প হারাইবার পর বস্ত্র-বয়ন-শিল্প দ্বারা সে অভাব পূরণে সমর্থ হইয়াছিল।

বৈদেশিক বস্ত্রের প্রচুর আমদানি হওয়ায় মুচীর তাঁতে বোনা মোটা কাপড়ের আদর হ্রাস হইল। মুচীরা কিছুদিন কলের মোটা সূতায় বস্ত্রাদি বয়ন করিল; কিন্তু বোম্বের মোটা কাপড় বাজারে আসিলে মুচীর তাঁত অচল হইয়া পড়িল। মুচী জাতির জীবনোপায় একে একে লুপ্ত হইতে আরম্ভ করিল।

মুচী-বাদ্যকর

মুচীরা 'ভাগাড় কামান' চামড়া দ্বারা ঢাক, ঢোল, কাড়া, দগড় প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের ছাউনির কার্য্য করিত ও ঢাক-ঢোল বাজাইত। ক্রমে ঢাক, ঢোল, দগড়, কাড়া, জগঝম্প প্রভৃতি বাজাইবার দল গঠন করিয়া তাহারা সংসার-নির্ব্বাহের পথ সুগম করিতে প্রয়াস পাইল। কিন্তু এই উপার্জ্জনের পথটী তাহাদের একচেটিয়া রহিল না।

'বাইতি' নামক এক হিন্দু জাতি মাদুর বুনিত। বিবিধ প্রকার মাদুর-শিল্পে এমন কি 'মছলন্দ' মাদুর বয়নেও এই জাতি সুদক্ষ ছিল। মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চল হইতে মাদুর, শপ, মছলন্দ প্রচুর আমদানি হওয়ায় বাইতিরা এই কাজ হারাইল।

মুচী বনাম বাইতি

বাইতিরা মাদুর-কাঠীর চাষ করিত। স্ত্রীলোকেরা মাদুর-কাঠীর ছেদন-ভেদন কর্ম্ম এবং মাদুর-বয়নের সুতলী (দড়ি)

প্রস্তুত করিত। হাতে কাটা দড়ি দ্বারা স্ত্রী-পুরুষে মাদুর ছলন্দ বুনিত। ইহাই ছিল বাইতির প্রধান জীবনোপায়। এই শিল্পের চরম উন্নতি বর্দ্ধমান জেলার বাইতি জাতিই করিয়াছিল।

এই জাতীয় পুরুষগণ খোল, মাদল ছাইত। ঢোল ও খোলের বাদ্যে ইহাদের সমকক্ষ পূর্ব্বে কেহই ছিল না। ঢাক বাজান, ঢাক 'ছাওয়া' প্রভৃতি কার্য্যে এই জাতি ওস্তাদ ছিল। বাইতি ওস্তাদগণের নিকটেই মুচীরা এই সব শিক্ষা করিয়াছিল।

বাইতিরা মাদুর-বয়ন কর্ম্ম হারাইয়া ঢাক-ঢোল বাজাইবার দল গঠন করিল। তাহারা শাঁনাইও বাজাইত। এ দল ওস্তাদের দল। এই কর্ম্মদ্বারা বাইতি পরিবার-বর্গের সংসার-যাত্রার সাহায্য হইল। মাদুর-বয়নও কিছু কিছু ছিল। খোল-ঢোল ছাওয়া ও 'গাব' দেওয়াতেও কিছু আয় হইত।

বাইতির ওস্তাদি দলের বায়না ও পারিশ্রমিক মুচীগণের দলের তুলনায় অধিক ছিল। মুচীরা যৎসামান্য পারিশ্রমিক লইয়া বাজনা বাজাইত। ক্রমে মুচীরা ওস্তাদ হইয়া উঠিয়া পূর্ব্ব ওস্তাদ বাইতি বাদ্যকর-সঙ্ঘকে পরাজিত করিল। মুচীর সংখ্যাধিক্য-নিবন্ধন, সামান্যসংখ্যক বাইতি পরাজিত হইল। বাইতি জাতির সন্ধান বর্ত্তমানে সচরাচর প্রাপ্ত হাওয়া যায় না।

চাষ-আবাদে মুচীর হাত

মুচীরা চাষ-কার্য্যে মনোযোগ দিয়া ক্রমশঃ উন্নত হইল। মূল বাদ্য-কর্ম্মে প্রতিযোগী দেখা দিল। বৈদেশিক পশ্চিমা চামারগণ সহরে ও রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটে আড্ডা করিয়া জুতার কর্ম্ম আরম্ভ করিল এবং বাদ্যসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিল। ইহারা ব্যাণ্ডের অনুকরণে বাদ্যের দল গঠন করিয়া নূতন বাদ্যের প্রতিষ্ঠা করিলে দেশীয় মুচীর অনাদর দেখা দিল। শোভাযাত্রায় বিদেশী চামারের আদর বর্দ্ধিত হইল। মুচীরা কৃষি-কার্য্যে মনোযোগী হইল।

এই সময়ে ভদ্রপরিবারের মধ্যে উচ্চশিক্ষা এবং চাকরী আদৃত হইলে কৃষিকার্য্যে তাহাদের আগ্রহ হ্রাসপ্রাপ্ত হইল। অনেক ভদ্র-পরিবারের চাষের জমি পতিত রহিল। কেহ বা জমীদারি সেরেস্তায় জমি ইস্তাফা দিল। এই সুযোগে মুচী, বাগ্‌দী প্রভৃতি জমিজমা-হীন জাতিরা ভদ্রলোকের জমি ভাগে গ্রহণ করিল। ইস্তাফা দেওয়া জমি বিনা নজরানায় জমীদারের নিকট হইতে বন্দোবস্ত লইয়া কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিল।

মুচী, বাগদী প্রভৃতির উন্নতি আরম্ভ হইল। ক্রমে ইহাদের এত বংশ-বৃদ্ধি দেখা দিল যে, যে সামান্য জমি-জমা মুচী-বাগ্‌দীর অধিকারে গিয়াছিল, তাহাতে তাহাদের বৃহৎ পরিবারের অন্নসংস্থান হইত না। ঋণ গ্রহণ করিয়া ক্রমশঃ তাহারা জমিজমা মহাজনগণকে দিতে বাধ্য হইল। কৃষি তাহাদের মুখ্য ব্যবসা হওয়ায় এবং অন্য কোন ব্যবসা না থাকায় তাহাদের মধ্যে অন্নাভাব অতীব প্রবল হইল। বর্ত্তমানে এই জাতি দরিদ্র। সংখ্যায় ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া ধ্বংসের পথে দ্রুত ধাবিত হইতেছে। প্রায় সকলেই অশিক্ষিত। নীচজাতি বলিয়া ভদ্র সমাজের সংস্পর্শে আসিতে পারে না। ইহাদের দুগ্ধ-ঘৃতাদি ভদ্রসমাজের কেহ সহজে ক্রয় করে না। এই কর্ম্মঠ জাতি এখন নিতান্ত হীন, দরিদ্র এবং মৃতকল্প হইয়াছে।

লেট্‌ ও বাগ্‌দী জাতি

এই দুই জাতি অনেকটা এক। প্রাচীনকালে (মোসলমান আমলের পূর্ব্বে) ইহারা পদাতিক সেনার মধ্যে গণ্য ছিল। মোসলমান আমলে হিন্দু সেনার কার্য্য করিত। পাইক, আটপ্রহরীর কার্য্য করিয়াও ইহারা প্রতিপালিত হইত। বাগদিনীরা ছাঁকনী জালে মাছ ধরে, গুগ্‌লী, শামুক, ঝিনুক ধরে এবং উহার মাংস বিক্রয় করে। বাগ্‌দীরা পলুই, চাবিজাল দ্বারা মাছ ধরে। খেপলা জাল দ্বারা মাছ ধরা ইহাদের জাতীয় ব্যবসা নহে।

ইহারা ভাগে অপর সাধারণের জমি চষে। কাহারও কাহারও জোত জম্মাও আছে। গড়পড়তায় এ জাতি ধনী নহে। অনেকেই পল্লীর ভদ্র লোকের বাটীতে বার্ষিক বেতনে কৃষাণ, রাখাল এবং নাগাড়ে রূপে কার্য্য করে। নাগাড়ে অর্থে কৃষাণ। কিন্তু ইহারা মনিবের হাল-বলদে নির্দ্দিষ্ট কয়েক বিঘা জমি চাষ করার খরচ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বাগদিনীরা ভদ্র লোকের ঝির কার্য্য করে, ভাচা ভানে কেহ বা হাট বাজার বা চাষা-বাড়ী হইতে, তরিতরকারী ক্রয় করিয়া গ্রামে গ্রামে ফেরী করিয়া বিক্রয় করে এবং শুটকী ও লোনা ইলিস বিক্রয় করে।

এই জাতির জীবনোপায়গুলি কোঁড়া, বাউড়ী, ডোম প্রভৃতি জাতি কিছু কিছু গ্রহণ করিয়া বাগদীকে হীন-বল করিয়াছিল। কিন্তু সাঁওতালগণ পূর্ণমাত্রায় এ জাতির কর্ম্মগুলি দখল করিয়াছে।

ডোমেরা চৌকিদার রূপে পুলিশের কর্ম্ম করে। বাগদীরাও চৌকিদারি করিতেছে। স্থূলতঃ এই জাতি অশিক্ষিত এবং একরোখা। দিন-মজুরী অবলম্বন করিয়া পাট-কলের চাকরী ও রেলের রাস্তায় মজুরী করে। অনেকে পল্লী হইতে কর্ম্ম-কেন্দ্রে গিয়া বাস করিতেছে। কল এবং রেলের নিকট ইহাদের, সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে এবং নূতন পল্লী প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। কিন্তু এই প্রকার নবপ্রতিষ্ঠিত পল্লী মিশ্রজাতীয় পল্লী।

কর্ম্মকেন্দ্র হইতে সুদূরস্থিত পল্লীবাসী বাগদীদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। সংখ্যায় ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া কোন কোন পল্লী হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। এ জাতি ধ্বংসোন্মুখ। বর্দ্ধমানের পল্লী-ভ্রমণে, কদাচ এ জাতির উন্নতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। যাহারা অভিনব কর্ম্মকেন্দ্রে গিয়া বিভিন্ন শ্রমিক জাতির সহিত কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছে, বর্ত্তমানে তাহাদের অবস্থা ধীরে ধীরে উন্নত হইতেছে।

কোন কোন স্থানে, বাগদী জাতি মুদির দোকান করিয়াছে এবং আবগারী বিভাগ হইতে মদের দোকান ডাকিয়া লইয়া চালাইতেছে।

চুণারী

এ জাতি কেবলমাত্র চুণ প্রস্তুত ও বিক্রয় করিয়া থাকে। সকল পল্লীগ্রামে ইহাদের বাস নাই। এ জাতির সংখ্যা অতি নগণ্য। ঝিনুক, শামুক, গুগ্‌লির খোলা ভাটিতে দগ্ধ করিয়া সচরাচর ইহারা চুণ প্রস্তুত করে। ঘোটিম্ হইতেও ইহারা চুণ প্রস্তুত করিয়া থাকে। পূর্ব্বে একমাত্র চুণের ব্যবসা করিয়াই এই ক্ষুদ্র জাতি জমিজমা করিয়াছিল। চুণাপাথর হইতে চুণ প্রস্তুত হইবার পর, এই পাথুরিয়া চুণের ব্যবহার অতিমাত্রায় বৃদ্ধি হওয়ায়, চুণারীদের প্রধান অর্থাগমের পথটী বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তথাপি কলি ও পঙ্কের কার্য্যে ঝিনুকের চুণের আদর বিদ্যমান থাকায়, চুণারীদের ব্যবসা একেবারে পরহস্তে পতিত হয় নাই। ইহারা কৃষিকার্য্য করে। ভদ্র ও সভ্য জাতিতে পরিণত হইয়াছে। শিক্ষায় মনোযোগ দিয়াছে। সংখ্যায় নিতান্ত কম।

কলুদের প্রতিদ্বন্দ্বী

কলের তেল চলিত এবং আদৃত হওয়ায় কলুরা নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি জাতির ন্যায় এ জাতি সংখ্যায় অধিক নহে। কোন পল্লীগ্রামে ইহাদের সংখ্যা খুব বেশী নাই। ইহারা জাতীয় ব্যবসা করে এবং মুদীখানা, কাপড়ের দোকান, মনোহারী দোকান করে। তেল-খৈলের ব্যবসা ইহারা পরিত্যাগ করে নাই। এ জাতির এই ব্যবসা একচেটিয়া ছিল। কিন্তু মাড়োয়ারী ও অন্যান্য ভদ্র হিন্দুগণ তেলের কলের সাহায্যে কলুদের কার্য্য গ্রহণ করিয়া পল্লীগ্রামের কলুর অবস্থা হীন করিয়া দিয়াছে। এ জাতি নিতান্ত দরিদ্র নহে, কিন্তু সংখ্যায় কম। পল্লীগ্রাম অপেক্ষা সহরের নিকটবর্ত্তী বা রেলওয়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে কলুদের অবস্থা ভাল। ক্রমে এ জাতি তেলের ব্যবসা করিয়া উন্নত হইতেছে। মাড়োয়ারী প্রভৃতি তেলকলওয়ালারা ইহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী। ইহারা তেলের কল হইতে তেল আনিয়া ব্যবসা করে। কেহ কেহ ক্ষুদ্র ফ্যাকটরী হিসাবেও কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। পূর্ব্বে তেলের ব্যবসা ইহাদের একচেটিয়া ছিল। বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণাদি প্রায় সকল জাতিই তেল বিক্রয় করিতেছে। কিন্তু ইহা কলুর ঘানিতে প্রস্তুত তেল নহে। এই কারণে কলুদের আয় বড়ই কমিয়া গিয়াছে। পল্লীগ্রামের কলুরা কলের তেলের ব্যবসা চালাইয়াও লাভ করিতে পারিতেছে না। কারণ এ ব্যবসা আর তাহাদের একচেটিয়া নাই।

কলুরা আর নারিকেল তেল প্রস্তুত করে না। বিদেশ-

জাত নারিকেল তেলের সহিত প্রতিযোগিতায় তাহাদের নারিকেল তেল পরাস্ত হইয়াছে। জ্বালানির জন্য কেরোসিন তেল ব্যবহৃত হইতেছে। পূর্ব্বে রেড়ির তেল ব্যবহৃত হইত। পল্লীবাসী কলুদের অবস্থা এই সব কারণে খারাপ হইয়াছে।

ধোপা

এই জাতি কোনো পল্লীতে প্রাধান্য লাভে সমর্থ হয় নাই। অনেক পল্লীতেই ধোপার অভাব। অনেক পল্লীতে ধোপার আবশ্যকতাই নাই। দেশী ধোপার সংখ্যা নিতান্ত কম। সহর বাজারে গিয়া ইহারা কর্ম্মক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। পল্লীগ্রামের ধোপারা কৃষক। কাপড় ধোলাই প্রায় গৌণ কর্ম্মে পরিণত হইয়াছে। পশ্চিমা ও উড়িয়া ধোপার আবির্ভাবে দেশীয় ধোপার কর্ম্ম তাহাদের হস্তগত হইয়াছে। পল্লীগ্রামের ধোপার সংখ্যা নিতান্ত হীন এবং অবস্থাও শোচনীয়। দেশী ধোপার ক্রমশঃ অভাব হইয়া উঠিতেছে।

কামারদের প্রতিদ্বন্দ্বী

বর্দ্ধিষ্ণু পল্লীগ্রামে লৌহ-কর্ম্মকারের সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। গ্রামে 'কামার পাড়া,' নামে কর্ম্মকার গোষ্ঠীর বাসস্থান ছিল। কামার-শালে নিয়ত লৌহ-শিল্পের কর্ম্ম হইত। কড়া, চাটু, কলসী, ফাল, কোদাল, কুড়াল ইত্যাদি নিত্য-ব্যবহার্য্য লৌহ-দ্রব্যের নির্ম্মাণে ও বিক্রয়ে যথেষ্ট অর্থাগম হইত। পূর্ব্বে সাঁওতাল লোহারগণ একপ্রকার "কাষ্ট্-আয়রণ" প্রস্তুত করিয়া কামারদের কাছে বিক্রয় করিত। উক্ত পিণ্ডাকৃতি লৌহ সাঁওতালদের নিকট কিনিয়া, দেশী কামারগণ বিবিধ কর্ম্মে ব্যবহার করিত। ক্রমে লোহার পাত ও গরাদে, বাতী বা বাতা এবং বিবিধ তারের আমদানি হওয়ায়, পিণ্ড-লোহার ব্যবসা বন্ধ হইল। পূর্ব্বে কামারেরা স্বয়ং ইস্পাত প্রস্তুত করিয়া লইত। ষ্টিল্ লোহার আমদানির সঙ্গে উক্ত শিল্প বর্দ্ধমান হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। কর্ম্মকারগণ অনেকেই ইস্পাত প্রস্তুত করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিত। কড়া-চাটু-তাওয়া প্রস্তুত এ দেশে প্রচুর পরিমাণেই হইত। ক্রমে কলিকাতা প্রভৃতি বাণিজ্য-কেন্দ্রে ঢালাই শিল্পের উন্নতি-নিবন্ধন দেশী কামারদের পেটা কড়া, চাটু ইত্যাদি অনাদৃত হইয়া গেল। তাহাদের অর্থাগমের পথ রুদ্ধ হইতে আরম্ভ হইল।

বহু কর্ম্মকার তালাচাবি, কুলুপ, শিকল, হাঁসকল হুম্‌নী, সুর্‌সা, রিং প্রস্তুত করিত। বৈদেশিক শিল্প-জাত দ্রব্যের বিপুল আমদানি হওয়ায় কর্ম্মকারগণের হস্ত হইতে এই প্রকারের যাবতীয় শিল্প পরহস্তে প্রস্থান করিল।

বিদেশ হইতে ছুরি, কাঁচি, খুর, আসিয়া দেশী কামারগণের আয়ের পথ একেবারে রুদ্ধ করিয়া দিল। করাত, বাটালী, বাস্, কুড়াল, কোদাল প্রস্তুত করা বন্ধ হইল। তখন তাহাদের হাতা, খুন্তি, বেড়ী, লাঙ্গলের ফাল, পেরেক, গজাল, চুপি কাটা প্রস্তুত করিয়া আর লাভের পথ রহিল না। এইরূপে কর্ম্মকারগণ প্রায় কর্ম্মহীন হইয়া পড়িল। এই সময়ে আবার পশ্চিম দেশীয় লোহারগণ এদেশে আসিয়া দেশী কর্ম্মকারগণের প্রতিদ্বন্দ্বী হইল। যে কর্ম্ম করিয়া কামারগণ জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছিল, তাহাও লোহারেরা অধিকার করিল। পল্লীবাসী কর্ম্মকারগণ কেবল ফাল, কোদাল, কাস্তে, বঁটী প্রভৃতি 'পাজান' বা মেরামত করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হইল। এই সময়ে কর্ম্মকারেরা কেহ কেহ সূত্র-ধরের কর্ম্ম গ্রহণ করিল এবং কৃষি-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিল। কেহ বা কর্ম্ম-কেন্দ্রে গিয়া মজুরী করিতে আরম্ভ করিল।

পল্লীর কর্ম্মকার-সঙ্ঘ ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। অনেকেই লেখাপড়া-শিক্ষায় মনোযোগী হইয়া চাকরীর দ্বারা ভবিষ্যৎ জীবন সুখময় করিবার প্রয়াস পাইল। এই সময়ে সাঁওতালগণ আসিয়া কামার-শালা প্রতিষ্ঠা করিল। দেশী কামারগণ তাহাদের পৈতৃক ব্যবসা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। কৃষিদ্বারাও তাহাদের সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হইল না। প্রত্যেক পল্লীগ্রামে কামারদের পতন আরম্ভ হইল। যে গ্রামে বিশ ঘর কামারের বাস ছিল তথায় দুই এক ঘর মাত্র বিদ্যমান রহিল। কতক সহরস্থ কর্ম্মকেন্দ্রে প্রস্থান করিল, কতক বিভিন্ন ব্যবসা অবলম্বন করিল, কতক নির্ম্মূল হইয়া গেল।

বর্দ্ধমানের বনপাশ, কামারপাড়া এবং কাঞ্চননগরের

কর্ম্মকারগণ ছুরি, কাঁচি এবং সার্জ্জিক্যাল যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিয়া থাকে। প্রতিযোগিতায় তাহারা এখনও দণ্ডায়মান রহিয়াছে। গড়ে কামার-বংশ এখন ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে। এ জাতির উন্নতি নাই বলিলেই হয়। সংখ্যায়ও ক্রমশঃ হীন হইতেছে। প্রতি পল্লীতে কর্ম্মকার পাড়া জনশূন্য হইতেছে।

কুমার জাতির অধঃপতন

এই জাতি সংখ্যায় অল্প। ইহারা হাঁড়ী, সরা, মালসা, প্রদীপ, ডাবা (গামলা) নাইদ (জালা) প্রভৃতি প্রস্তুত করিত, কূপের 'পাট' ও কূপখনন করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিত।

লোহার কড়া, বালতীর আদর ও প্রচার বৃদ্ধি পাওয়ায় হাঁড়ীর আদর কমিয়া গিয়াছে। এনামেলকরা লোহার বাসন, চিনা বাসন, এলুমিনিয়ামের হাঁড়ী, কড়া, সরা প্রভৃতির যথেষ্ট আমদানি হওয়ায় লোকে আগ্রহে ঐ সকল দ্রব্য ক্রয় করিয়া ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল। কুমারদের হাঁড়ী, সরা প্রভৃতির আদর ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। পাথুরিয়া কয়লার ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় লৌহ পাক-পাত্রের এবং পিতল, এলুমিনিয়ামের প্রসার বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং কুম্ভকারদের মাটীর পাকপাত্রাদির ব্যবহার যথেষ্ট কমিয়া গিয়াছে।

ইহারা মাটীর পুতুল, খেলনা প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিত। বৈদেশিক খেলনা ও পুতুলে বাজার পরিপূর্ণ হওয়ায় কুমারদের পুতুল আর বড় আদৃত হয় না।

দেবদেবীর মূর্ত্তি কুম্ভকারদের হাত হইতে সূত্রধর-পটুয়ারা গ্রহণ করিয়াছে। অপরাপর জাতিরাও দেবদেবীর প্রতিমা-নির্ম্মাণে দক্ষ হইয়া প্রতিযোগিতায় কুম্ভকারদিগকে পরাজিত করিয়াছে। কেঁড়ে, কুপি, তেলের ভাঁড়, রুক্ষ ও চিত্র-বিচিত্র ভাঁড়, হাঁড়ী প্রভৃতি যথেষ্ট আদরের বস্তু ছিল। বৈদেশিক বার্ণ কোম্পানী দুর্গাপুর অঞ্চলে মাটির কলসী, ভাঁড় গ্যালিপট, জার প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া বাজার দখল করিতেছে। কুমারেরা প্রতিযোগিতায় পরাজিত হইতেছে। সহর অঞ্চলে খোলার ঘরের জন্য ইহারা মাটির 'খাপরা' প্রস্তুত করিয়া কিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করিত। এই কর্ম্মে তাহাদের প্রথম প্রতিযোগিরূপে দেখা দিয়াছিল পশ্চিমদেশীয় কুমার। খাপরার কর্ম্ম তাহারা প্রায় একচেটিয়া করিয়া লইয়াছে। তদুপরি বার্ণ কোম্পানীর মাটির টাইল দেশী খাপরাকে পরাজিত করিয়া প্রবল বেগে আত্ম-অধিকার বিস্তার করিতেছে।

দেশী কুম্ভকারগণ পশ্চিমা কুমারদের নিকট এবং বার্ণ কোম্পানীর নিকট পরাজিত হইয়া প্রায় কর্ম্মহীন জাতিতে পরিণত হইতেছে। মজুরী ও চাকরীর জন্য পল্লীত্যাগ করিতেছে। এখন বিদ্যাশিক্ষাদ্বারা উন্নত হইতে প্রয়াস পাইতেছে। উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া কেহ কেহ চাকরী অবলম্বন করিয়াছে। বর্দ্ধমান জেলার কুম্ভকার জাতির উন্নতি প্রতিহত হইয়াছে। সংখ্যায় ক্ষীণ হইয়াছে। কৃষি অবলম্বন করা সত্ত্বেও তাহাদের সংসার চলিতেছে না।

তাঁতী

তাঁতী বর্দ্ধমান জেলার একটী প্রবল জাতি। সূত্র-নির্ম্মাণে ও সূক্ষ্মবস্ত্র-বয়নে ইহারা কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। রাধাকান্তপুর ও মেমারির তাঁতীরা রেশম ও তসরের বস্ত্র-বয়নে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল। কার্পাস-বস্ত্র নির্ম্মাণেও বর্দ্ধমান নিতান্ত হীন ছিল না। কুচুট গ্রামের তাঁতীরা ফ্লাইসাটেল লুমে বহুদিন হইতে সুন্দর সুন্দর বস্ত্র প্রস্তুত করিত। বর্দ্ধমানে প্রত্যেক ধনী গ্রামে, যথেষ্ট তন্তুবায় বাস করিত। দেশের তাঁতীদের কৃত বস্ত্রে বর্দ্ধমানবাসীর লজ্জা নিবারিত হইত। সুতরাং তাঁতীমাত্রেই গৃহে বসিয়া, বালক ও নারীদের সাহায্যে সূত্র প্রস্তুত ও বস্ত্র-বয়ন করিয়া যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিত।

তাঁতীদের নিকৃষ্ট প্রতিযোগী ছিল মুচী-তাঁতী, জোলা এবং যুগী জাতি। কিন্তু এই তিন শ্রেণীর তাঁতী নিম্নস্তরের বলিয়া, সুদক্ষ তন্তুবায়গণের অর্থাগমের পথ আদৌ রুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় নাই।

মাঞ্চেষ্টারের তাঁতীরা যখন বিদেশ হইতে বিবিধ প্রকার বস্ত্রে দেশের হাট-বাজার প্লাবিত করিল, তখন হইতে কর্ম্মত্যাগে বাধ্য হইয়া তন্তুবায়গণ বৈদেশিক বস্ত্রের ব্যবসা আরম্ভ করিয়া অর্থ-উপার্জ্জনের নূতন পথ ধরিল।

ক্রমে ধুরন্ধর মাড়োয়ারী বণিক-সম্প্রদায় বৈদেশিক

বস্ত্রের বাণিজ্য একচেটিয়া করিয়া লইলে তাঁতীরা কেবল জাতিতে তন্তুবায় রহিল। তাহাদের জাতীয় শিল্প প্রায় লুপ্ত হইল।

মাড়োয়ারীদের কল্যাণে ব্রাহ্মণাদি হিন্দু ও মোসলমানগণ সকলেই বস্ত্র ব্যবসায়ী হইয়া তাঁতীদিগের বৃত্তি অবলম্বন করিল। সাধারণ তাঁতীরা শিল্পহীন হইয়া অন্য ব্যবসা অবলম্বন করিল। পল্লীবাসী তাঁতীরা কেহ মুদী, কেহ কাপুড়িয়া, কেহ বা কৃষক হইল।

মালী জাতির দুর্গতি

ইহারাই সূত্রধর বা ছুতার মিস্ত্রি। ফুল-বিক্রয় ইহাদের প্রধান কর্ম্ম। পটুয়া বা চিত্রকরের কর্ম্ম দ্বিতীয়, সূত্রধরের কর্ম্ম তৃতীয়। সোলার শিল্প মালাকরের জাতীয় ব্যবসা। রমণীরা চিঁড়া মুড়ি প্রস্তুত করে। মালাকর মহিলাদের অপেক্ষা মালা-নির্ম্মাণ-কার্য্যে কোনো জাতির নারীরা শ্রেষ্ঠ ছিল না। এই সকল শিল্পকর্ম্ম দ্বারা মালাকরগণ সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিত। দেব-দেবী-প্রতিমার সাজ-নির্ম্মাণ মালাকরের একচেটিয়া ব্যবসা ছিল।

দেবদেবীর প্রতিমা-নির্ম্মাণ, বর্ণরাগের সমাবেশ এবং 'সলমার' সাজসজ্জাদি সকলি মালাকর দ্বারা সম্পাদিত হইত। ডাকের গহনার সাজ ও সোলার সাজে জরি ও চুম্‌কীর কার্য্য করিতে এই জাতিই দক্ষ। এই সকল সাজের উপকরণও ইহারাই প্রস্তুত করিত। এই প্রকারের দেবকার্য্যে মালাকরদের প্রচুর লাভ হইত। প্রতিমাদির নির্ম্মাণ-কার্য্যে একমাত্র কুম্ভকারগণই প্রথমে প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে দেখা দিয়াছিল।

কুম্ভকারগণ প্রতিমা নির্ম্মাণ করিত এবং মৃত্তিকা-নির্ম্মিত সাজ দ্বারা প্রতিমা সাজাইত। সল্‌মা, ডাকের কার্য্য এবং সোলার কার্য্য মালাকর দ্বারা সম্পাদিত হইত। কুম্ভকারগণ মাটির কার্য্যটী গ্রহণ করিলেও মালাকরদের বিশেষ আর্থিক ক্ষতি হয় নাই। সল্‌মার ও ডাকের কার্য্যে তাহারা ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়াছিল।

সোনালী, রূপালী, ঝগ্‌ঝগা, এবং সীসার পাত হইতে প্রস্তুত প্রতিমার সাজ ইহারাই করিত। ক্রমে সোনালী তবক 'ঝগ্‌ঝগা' এবং চুম্‌কী ও জরির কার্য্য বৈষ্ণব, যোগী ও স্বর্ণকার বা অন্যান্য দেশীয় শিল্পীরা করিতে আরম্ভ করিল। উপাদানগুলি পরের হস্তগত হইলেও সোলা এবং সল্‌মার কার্য্য মালাকরগণই করিত। পূর্ব্বে সাজের উপাদানগুলি প্রস্তুত করিতে ইহাদিগকে 'কারিগর' রাখিতে হইত। উপাদান ক্রয় করিয়া কেবল সাজ প্রস্তুত করা মালাকরদের হাতে রহিল। মধ্যে মধ্যে উপাদানও প্রস্তুত করিত। এদেশ হইতে সাজের সরঞ্জাম-গুলির নমুনা লইয়া জার্ম্মাণির শিল্পীরা এদেশের বাজারে ঐসব মাল রপ্তানি করিল। জরির কাটিম্, সোনালী ও রূপালী তবক্, বিবিধ ঝগ্‌ঝগা, এবং নানা প্রকারের চুম্‌কীতে বাজার পূর্ণ হইয়া গেল। সুতরাং প্রতিমার সাজোপকরণ-গুলি, বৈদেশিক শিল্পীদের হস্তগত হইল। ঐ সকল কর্ম্ম করিয়া যাহারা এদেশে জীবিকা উপার্জ্জন করিত, চক্ষুর পলকে তাহারা কর্ম্মহীন হইয়া গেল। এদেশীয় শিল্পীর হাতে থাকিল সীসার পাতে (রাংতার সাজ) প্রস্তুত সল্‌মার শিল্প। এ কার্য্য তখন মালাকরগণ করিত না। সোলার শিল্প মালাকরের হাতে রহিল এবং বৈদেশিক উপকরণের দ্বারা প্রতিমার সাজ নির্ম্মাণ ইহারাই করিত।

এই প্রকারে সল্‌মার কাজের উপাদানগুলি হস্তচ্যুত হইলে, ইহাদের অর্থাগমের বিশিষ্ট পন্থাটী নষ্ট হইল। ক্রমে বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি মালাকরগণের সাক্রেদগণ সোলার কার্য্য ও সল্‌মার কার্য্য শিক্ষা করিয়া পৃথক ব্যবসা অবলম্বন করিল। মালাকর ব্যতীত ঐ সকল জাতি সল্‌মার সাজ প্রস্তুত করিয়া এবং সোলার শিল্পাবলম্বনে মালাকরগণের একচেটিয়া শিল্পের অবসান করিল। মালাকরগণের অর্থাগমের বিশিষ্ট পথটী রুদ্ধ হইয়া গেল।

পূর্ব্বে দেশে প্রতিদিন পুষ্প ও পুষ্পমালার প্রচুর ব্যবহার হইত। প্রতি হিন্দু পরিবারে ফুল ও পুষ্পমাল্য মালীরা 'রোজান' দিত। ইহার মূল্যস্বরূপ ভদ্র গৃহস্থগণ মালাকরদিগকে নিষ্কর জমি দিয়াছিলেন। সেই জমির ফসল হইতে মালাকরগণের অন্ন-সংস্থান হইত। বংশ-বৃদ্ধি-নিবন্ধন 'মালীয়ান' জমি হইতে তাহাদের ব্যয়-নির্ব্বাহ হইত না। নিজেরাও কিছু কিছু জমিজমা ক্রয় করিয়াছিল। মূল

উপার্জ্জনের পথ রুদ্ধ হওয়ায় ক্রমশঃ এই জাতি সূত্রধরের শিল্পকর্ম্মে মনোনিবেশ করিল। ইহারা চিত্রশিল্পের উন্নতির জন্য প্রয়াস পাইল এবং কাষ্ঠের খেলনা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল।

হাটে বাজারে বিবিধ প্রকার আলেখ্য এবং চিত্রিত পট যথেষ্ট বিক্রয় হইত। পটুয়ারা অভ্রের উপর লাক্ষার দ্বারা বিবিধ বর্ণরাগযুক্ত সুন্দর তৈল-চিত্রবৎ চিত্রাঙ্কন করিত। এই লাক্ষা-পটের সমাদর বাজারে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এ শিল্প তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিল না। বৈদেশিক আর্ট চিত্র বাজারে দেখাদিল। তখন পেষ্ট্ বোর্ডের ফ্রেমের উপর বিবিধ দেবদেবীর চিত্রপটে বাজার ছাইয়া ফেলিল। কলিকাতার আর্ট স্কুলের পট, রবিবর্ম্মার ছবি এবং জার্ম্মাণির বিচিত্র পটে পটুয়াদের প্রাচীন চিত্রকলার অবসান করিল। পটুয়া বা মালাকরগণ চিত্র-অঙ্কনের তুলিকা ত্যাগ করিয়া সূত্রধরের কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিল।

বৈদেশিক বিবিধ 'খেলনা' বাজারে প্লাবন উপস্থিত করায়, কাঠের পুতুল, আর 'তালপাতার সেপাই' বাজারে বিক্রয় হইল না। সল্মার শিল্প, সোলার শিল্প, কাষ্ঠ পুত্তলিকা-শিল্প, চিত্র শিল্প একে একে বিদায় গ্রহণ করায় মালাকর জাতি দরিদ্র হইয়া পড়িল।

কর্ম্মকারগণ লৌহ-শিল্প ত্যাগ করিয়া কাষ্ঠশিল্প অবলম্বন করিয়াছে। সূত্রধরের শিল্প বৈষ্ণব, নবশাখ প্রভৃতি গ্রহণ করায়, বাজারে বিবিধ জাতীয় সূত্রধরের আবির্ভাব হইয়াছে। বহু ভদ্রজাতি সূত্রধর হইয়া সূত্রধর জাতির ব্যবসার অংশীদার হইয়াছে। মাদ্রাজী, মোসলমান, চীনা কারিগরে বাজার পূর্ণ হইয়াছে। সুতরাং মালাকরদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের সংখ্যাধিক্য-নিবন্ধন প্রকৃত সূত্রধর-জাতির আয়ের পথ প্রায় রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এই প্রকারে সূত্রধর-সঙ্ঘ বিচ্ছিন্ন হইয়া অভিনব আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহারা উচ্চশিক্ষায় মনোযোগী হইয়া উকিল, মোক্তার, ডাক্তার কেরাণী ও দোকানদার হইয়া জীবিকার্জ্জন করিতেছে। জাতীয় ব্যবসা ত্যাগে যাহারা সময়োপযোগী কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহারাই উদ্বর্ত্তিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে এ জাতির সংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে।

মজুর-সংগঠনের ফরাসী ঋষি লুই ব্লাঁ

তাহেরুদ্দিন আহ্‌মদ

আর্থিক দুনিয়ার পুনর্গঠন

ছাপার হরফে আজ পর্য্যন্ত দুনিয়ার মহামানবদের তাজা মগজের যত চিন্তাধারা লাইব্রেরীর থাকে থাকে সাজান গ্রন্থরাজিতে রয়েছে, তার প্রত্যেকটিতে দেখা যায়, মানুষ বর্ত্তমানকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে চায় নি। বর্ত্তমানের চাইতে আরও কি উন্নততর অবস্থা সৃষ্টি করা যেতে পারে, তার সন্ধানে সে ঘুরেছে। মানুষ সব সময় একটা অ-সোয়াস্তি বোধ করেছে। "এরূপ জীবন আমি যাপন করতে চাই না। এর চাইতে আরও সুন্দর ও আকাঙ্ক্ষিত জীবনের পরশ আমি পেয়েছি। সেই অজানা সুন্দরের দিকে আমার অভিযান।" অনেকে এইরূপ স্বর্গরাজ্যের কল্পনা তাঁদের চিন্তাধারায় ফুটিয়ে তুলেছেন। বর্ত্তমানকে ভেঙ্গে-চুরে নতুন করে সমাজ গড়ার কাজে যদিও মহামানবদের চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে সাফল্য-মণ্ডিত হয় নি; তা হলেও এঁদের এই সব আয়োজন-উপকরণ ভবিষ্যৎ মানব-সমাজের জন্য সেই "সব পেয়েছির দেশে" যাত্রার পথ পরিষ্কার করে যাচ্ছে।

নয়া মানব-সমাজ গড়ে তোলবার কাজে "অ্যাসোসি-য়েটিভ সোশ্যালিষ্ট" বা সঙ্ঘপন্থী সমাজতন্ত্র-বাদীরা তাঁদের চিন্তাধারা ও কাজকর্ম্মে যে সব মাল-মশলা রেখে গেছেন, তা বাস্তবিকই বর্ত্তমান যুগের সমাজ-বিপ্লবকারীদের কাজে যথেষ্ট সাহায্য করবে বলে মনে হয়।

অ্যাসোসিয়েটিভ সোশ্যালিষ্ট" তাঁদেরকেই বলা হয়,

যারা সঙ্ঘ কায়েম করে সেখানে নয়া আবহাওয়া সৃষ্টি করে সমাজের চেহারাখানা বদলে ফেলতে চান—এবং ঐ নয়া সঙ্ঘ ও নয়া আবহাওয়া সৃষ্টির ফলে সমাজের বহুবিধ ব্যাধি আরোগ্য হইবে এরূপ বিশ্বাস করেন। এঁদের সকলেরই উদ্দেশ্য জগতে "রামরাজ্য" প্রতিষ্ঠা করা। এখন পন্থাটা কি তাই নিয়ে যত বিরোধ।

গতবারে এই দলের অন্যতম ধুরন্ধর মজুর-যুগাবতার ইংরেজ-সন্তান রবার্ট ওয়েনের কথা বলা হয়েছে। তিনি চেয়েছিলেন নয়া ধরণের শিল্পউপনিবেশ কায়েম করে সেখানে নয়া আবহাওয়া সৃষ্টি করে সমাজ সংস্কার করতে। আর এক সঙ্ঘপন্থী সমাজতন্ত্রবাদী ফুরিয়ে। এই ফরাসী সমাজসংস্কারক একটু মাথা-পাগলা গোছের ছিলেন। ইনি চেয়েছিলেন গ্রাণ্ড হোটেলের মত মস্তবড় এক ভোজনালয় খুলে সেখানে সমাজের সকল স্তরের লোকের আহারাদির ও থাকবার ব্যবস্থা করে তাদের মধ্যে সৌহার্দ্দ বৃদ্ধি ক'রে সমাজের সংস্কার সাধন করতে। এঁর মতলবখানা মোটামুটি ছিল গোটা মানব-সমাজকে এক গোষ্ঠীর এক পরিবারের আওতায় আনয়ন করা। হোটেল-সমাজের মধ্যেই তিনি এই আদর্শ মানব-সমাজের স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু ফুরিয়ে একশ' বছর আগে যে কথা বলে গেছেন, বর্ত্তমান যুগের বড় বড় সহর নগরের জীবনধারায় আজ তার প্রকাশ কতকটা দেখতে পাই। তাঁর এই হোটেল-গোষ্ঠী সভ্য-জগতে বিস্তর গড়ে উঠ্‌ছে। কিন্তু এতেই কি সমাজের সমস্যার সমাধান হয়েছে ?

ব্লাঁর কেতাব ও জীবন-কাহিনী

এই দলের অন্যতম মহারথী হচ্ছেন আর একজন ফরাসী,—নাম লুই ব্লাঁ। ইনি অনেকটা বিষয়-বুদ্ধির লোক ছিলেন। বাস্তবের সঙ্গে এঁর সম্বন্ধ ছিল বেশী। বর্ত্তমানে সমাজের কাছে যতটুকু সংস্কার টিঁকবে, ঠিক ততখানিই তিনি করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। তিনি খুব বড় বড় আদর্শ নিয়ে ওয়েন বা ফুরিয়ের মত মশগুল থাকতেন না। এই লুই ব্লাঁর সম্বন্ধে যতটুকু আমাদের জানা দরকার ঠিক ততটুকুর পরিচয় এখানে দেব।

ব্লাঁর মধ্যে নতুন কি আমরা দেখতে পাই ? কোন্ খেয়ালটা তাঁর মগজে খেলেছিল, যা আর কারু মগজে খেলে নাই ? আর তাঁর সেই চিন্তার দামই বা কতখানি—যার জন্য তাঁর নাম ইতিহাসের পাতায় স্থান পেতে অধিকারী ?

১৮১৩ থেকে ১৮৮২ পর্য্যন্ত লুই ব্লাঁর জীবনকাল। ওয়েন, ফুরিয়ে ও ব্লাঁ তিনজন একই সময়ের লোক ছিলেন।

লুই ব্লাঁ "ওর্গানিজাসি অঁদ্য ত্রাভ্যাই". মজুর-সংগঠন কেতাবখানা লিখেই নাকি মস্তবড় নাম কিনে ফেলেছেন। অথচ অধ্যাপক রিষ্ট "ধনবিজ্ঞান-চিন্তাধারার ইতিহাস" গ্রন্থে বল্‌ছেন যে, এর মধ্যে মৌলিক চিন্তার নাম-গন্ধ নাই। ধার-করা জিনিস এর মাল। স্যাঁ সিমঁ (সঙ্ঘবিরোধী সমাজতন্ত্রবাদী) ও ফুরিয়ে প্রভৃতি আগেকার ধনবিজ্ঞান-সেবীদের লেখা থেকে এর মাল-মশলা জোগার করা হয়েছে।

কেতাবখানা ১৮৪১ সনে ছাপা হয়। এবং ছাপার সঙ্গে সঙ্গে এটা পড়ার জন্য ফরাসী-সমাজে একটা হুড়াহুড়ি প'ড়ে যায়। সাধারণের চাহিদা মিটাবার জন্য সংস্করণের পর সংস্করণ ছাপিয়ে বইখানা বাজারে বের করতে হয়েছিল। গ্রন্থখানা পড়বার এই আগ্রহ থেকে এটা স্বীকার করতেই হবে যে, এতে মৌলিক গবেষণার ততটা পরিচয় না থাকলেও আর অন্য সব দিক্ থেকে এর দাম খুবই বেশী ছিল। ব্লাঁর কেতাবখানার মোদ্দাকথা হচ্ছে—প্রত্যেক ব্যক্তি-বিশেষের শক্তি ও কার্য্যকারিতার সম্পূর্ণ বিকাশ হওয়া চাই। সমাজের প্রত্যেক লোককে উপযুক্ত কর্ম্মক্ষম করা আবশ্যক।

বইখানা সেকালের মজুর-সাধারণের অভিযোগের দিকে লক্ষ্য রেখেই বিশেষ করে লেখা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে এখানি মজুর-সমাজের স্বার্থের একখানা উৎকৃষ্ট দলীল বলে বিবেচিত হয়।

অনেকে বলেন, ফরাসী দেশের তদানীন্তন রাজনৈতিক অবস্থা গ্রন্থখানির বহুল প্রচারের অনেকটা কারণ। তা ছাড়া, ১৮৪৮ সনে অস্থায়িভাবে স্থাপিত ফরাসী গণতন্ত্রের অন্যতম কর্ম্মকর্ত্তারূপে দেশে তাঁর একটা নামডাকও ছিল। এবং সেকালে ফ্রান্সের স্বরাজীদের অন্যতম পাণ্ডারূপে সংবাদপত্রের স্তম্ভে আন্দোলন চালিয়ে এবং সাধারণ সভাগৃহে

গলাবাজি ক'রে তিনি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। একখানা ইতিহাস লিখে ঐতিহাসিক বলেও তিনি সুপরিচিত ছিলেন। অনেকের মতে তাঁর "মজুর সংগঠন" একটা চটি বই। কেবলমাত্র উল্লিখিত কারণগুলির জন্য বইটার পদবী বেড়ে গেছে। আসলে তাঁর নিজস্ব কিছু ঐ কেতাবটার মধ্যে পাওয়া যায় না।

সরকারী সাহায্যে প্রতিযোগিতা নিবারণ

উক্ত মত কতদুর সত্য তা বলা কঠিন। তবে লুই ব্লাঁর চিন্তাধারার মধ্যে মৌলিক গবেষণার পরিচয় না থাকলেও তিনিই প্রথম বলে গেছেন যে, সমাজ-সংস্কারের কাজে পুরাদস্তুর সরকারী সাহায্য চাই। তিনিই প্রথম জোর গলায় সমাজ-সংস্কারের কাজে সরকারী সাহায্যের অবশ্য প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যুদ্ধ করে গেছেন এবং এইভাবে সরকার ও সমাজ-সংস্কারকদের মধ্যে তিনিই প্রথম যোগাযোগ কায়েম করতে প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর পূর্ব্বের সমাজ-তন্ত্রবাদীরা শিক্ষার উপর বেশী জোর দিয়ে গেছেন। আর তাঁরা বলতেন, সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠানগুলি আপনা থেকে বিনা সরকারী সাহায্যে একেবারে স্বতন্ত্রভাবে গজিয়ে উঠবে। লুই ব্লাঁ বল্লেন, "না গো, সরকারকে বাদ দিলে চলবে না। সরকারকে এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার ভার নিতে হইবে। এটা একটা নতুন ধরণের জিনিস। সরকার প্রথমে এটাকে ভাল রকম আরম্ভ করে দেবে।" ব্লাঁর মতে এ প্রচেষ্টায় সরকারী সাহায্য অত্যাবশ্যক এবং এর স্বপক্ষে তাঁর নিম্নরূপ যুক্তি দেখতে পাই। "মজুর সমাজের জাগরণ খুবই জটিল ব্যাপার। এর সঙ্গে সমাজের অন্যান্য বিভাগের এরূপ ঘনীভূত সম্বন্ধ আছে যে, এটা কার্য্যে পরিণত করতে হ'লে সমাজে একটা বড় রকমের ওলট-পালট আসতে বাধ্য। এটা কাজে ফলাতে হলে বর্ত্তমান আচার-ব্যবহার বিধি-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বদলে ফেলতে হবে। কারণ সমাজের বহুবিধ স্বার্থের সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে একে আসতেই হবে। স্বতন্ত্রভাবে ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টায় স্থাপিত প্রতিষ্ঠান তখন মোটেই টিঁকে থাকতে পারিবে না। এটা গড়ে তোলবার জন্য, এটা সাফল্য-মণ্ডিত করবার জন্য, রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ শক্তির যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। মজুর-সমাজে পুঁজির অভাব। পুঁজি না হ'লে তাদের শত চেষ্টা কোনই কাজে আসবে না। রাষ্ট্রের এটা দেখা দরকার যে, তাদের প্রতিষ্ঠানটি তার উদ্দেশ্য-সাধনে সফলকাম হয়। আমাকে যদি কেউ রাষ্ট্রের ব্যাখ্যা করতে বলেন, আমি বলব এটা দরিদ্রের ব্যাঙ্ক।"

এই দিক্ থেকে লুই ব্লাঁকে ষ্টেট সোশ্যালিজ্‌মের (রাষ্ট্রীয় সমাজ-তন্ত্রবাদের) আদি পুরোহিতদের অন্যতম বলে স্বীকার করে নিতেই হবে। লুই ব্লাঁর সমাজ-সংস্কারের ধারাটা কি দেখা যাক। ব্লাঁ প্রতিযোগিতার উপর হাড়ে হাড়ে চটা ছিলেন। তিনি দুনিয়ার যত-কিছু অনিষ্টের মূল ঐ প্রতিযোগিতার মধ্যে দেখতে পেতেন। এই প্রতিযোগিতা থাকার দরুণ দারিদ্র্য, সামাজিক অধঃপতন, পাপ, অনাচার, শিল্প-সঙ্কট, আন্তর্জ্জাতিক কলহ-বিবাদ প্রভৃতিতে মানব সমাজ পঙ্কিল করেছে। লুই ব্লাঁর পূর্ব্বের আর কোন লেখকের গ্রন্থে প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে অত তীব্র কষাঘাত করা হয় নি। কেমন করে এক দিকে সমাজের নীচ ও মধ্যবিত্ত এবং অন্যদিকে উচ্চ শ্রেণীর লোকের এটা সর্ব্বনাশ-সাধন করছে, তা তিনি সংবাদপত্রের লেখা, সরকারী দপ্তরের দলিল-দস্তাবেজ ও নিজের বহুদিনের গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা দ্বারা হাতে কলমে প্রমাণ করে গেছেন। প্রতিযোগিতার উপর তাঁর দারুণ অভিসম্পাতের স্বপক্ষে তিনি সকল রকম যুক্তি-তর্কের সমাবেশ করে গেছেন ঐ কেতাবখানায়। কিন্তু এই ঘোর অনিষ্টজনক প্রতিযোগিতার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ব্লাঁ কি দাওয়াইয়ের ব্যবস্থা করে গেছেন? তিনি বলেন যদি এই সর্ব্বনাশী প্রতিযোগিতার হাত থেকে বাঁচতে চাও, যদি একে সমূলে উপড়ে ফেলতে চাও, এটা বাদ দিয়ে যদি সমাজকে নতুন ভাবে গড়ে তুলতে চাও তবে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা কর।

জাতীয় কর্ম্মশালা

এখন তাঁর এই সঙ্ঘের চেহারাখানা কেমন? তিনি কিন্তু ওয়েনের "নিউহার্ম্মনির" নয়া শিল্প-উপনিবেশ চান না। অথবা ফুরিয়ের হোটেল-গোষ্ঠী সমাজও গড়ে তোলার

পক্ষপাতী তিনি নন, যদিও ইনি এঁদের মতই একটা বড়-কিছু করতে চেয়েছিলেন। এঁর মতলব ছিল একটা বিরাট "সোশ্যাল ওয়ার্কশপ" (সমাজতান্ত্রিক কর্ম্মশালা বা কারখানা) কায়েম করা। তাঁর সমালোচকরা কেউ কেউ বলছেন, ওয়েন বা ফুরিয়ের মত অতটা ব্যাপক এর চৌহদ্দি ছিল না। এটাকে একটা নেহাৎ সাধারণ ধরণের সমবায়-সমিতি-মাফিক বলা যেতে পারে। সাধারণ সমবায়-ভাণ্ডারের মত একই শিল্পের সব কারিগর এখানে মিলিত হয়ে কাজ-কর্ম্ম করবে। আর লুই ব্লাঁর মাথায়ও এ চিন্তাটা নতুন খেলে নি। বুসেজ বলে একজন সাঁসিমঁ-পন্থী (এঁরা অ্যাসোসিয়েশুন বা সঙ্ঘ স্থাপনের বিরোধী সমাজ-তন্ত্রবাদী) এমনিতর একটা প্রস্তাব করেছিলেন বটে। তিনি বলে গেছেন,—ছুতার কামার, রাজমিস্ত্রি, চামার, জোলা কারিগর, সমাজের সব রকমের লোককে এক গোষ্ঠীর মধ্যে এনে ফেলতে হবে। সবার নছিব এক সূত্রে বাঁধা হবে। একই পরিবার বা প্রতিষ্ঠান হতে তারা সম্মিলিত ভাবে উৎপাদন করতে থাকবে। মধ্যবিত্ত কোন ফড়ে' বা দালাল থাকবে না। সরাসরি কাজকর্ম্মের লেনা দেনা চলবে।

লাভ-লোকসানের ভাগী সবাইকে সমানভাবে হতে হবে। যেটা লাভ দাঁড়াবে তার পাঁচ ভাগের একভাগ দিয়ে একটা চিরস্থায়ী পুঁজি-তহবিল পত্তন করা হবে। এবং এটা প্রত্যেক বছর বেড়ে চলবে। বুসেজ ভবিষ্যতের প্রতি নজর রেখেই বলে গেছেন যে, ঐ প্রকার স্থায়ী তহবিলের ব্যবস্থা না রাখলে এই ধরণের কারখানার সঙ্গে সাধারণ কারখানার কোনই তফাৎ থাকবেনা, এবং এটা কেবল গোড়ার কয়েকজন আদি সভ্যেরই সুবিধা ও ভোগে আসবে। কারণ এটা স্থাপন করবার সময় যাঁরা এতে পুঁজি ঢালবেন ও যাঁদের অংশ এতে থাকবে, তাঁরাই বাস্তবিক পক্ষে ভবিষ্যতে মনিব ব'নে যাবেন। পরে যাঁরা ঐ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আসবেন তাঁদের সাথে এঁরা সামান্য মাইনের মজুরের মত ব্যবহার করবেন। শেষটায় মনিব-চাকর সম্বন্ধ দাঁড়াবে।

বুসেজের সঙ্গে ব্লাঁর যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। বুসেজ সরকারী সাহায্যের কথা বলে যান নি। তা ছাড়া, তিনি ছোট ছোট শিল্পের যোট কায়েম করতে চেয়েছিলেন। ব্লাঁ সেইটা খুব বড় আকারে করবার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর "সোশ্যাল ওয়ার্কশপে" তিনি রাষ্ট্রের সব রকম শিল্পের সম্মিলন করতে চেয়েছিলেন। বুসেজের লেখার ফলে ১৮৩৪ সনে সামান্য একটা সোনার কামারদের সঙ্ঘ খাড়া হয়। আর এই সোশ্যাল ওয়ার্কশপকেই ব্লাঁ চরম বলে স্বীকার করেন নি। সমাজের এটা একটা সামান্য কোঠা মাত্র—মৌমাছির চাকের একটা ছিদ্র। মৌমাছির গোটা চাকের মত ভবিষ্যতে এইটা থেকে এক বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে এই ছিল তাঁহার আশা।

ধন-সাম্যের দর্শন

ব্লাঁ চিরপ্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দিক্-বিদিক্ ভাবে খড়্গ ধরতে সাহসী হন নি। তিনি একটা প্রচণ্ড সামাজিক বিপ্লব আনতে সাহস করেন নি। তিনি বাস্তবের দিকে লক্ষ্য রেখেই সমাজ-সংস্কারে মন দেন। বর্ত্তমানের ভিতর থেকেই, সনাতন ব্যবস্থাকে একেবারে ওলট-পালট না করে, যাতে করে একটা নয়া সমাজ গড়ে তোলা যায় তাই ছিল তাঁর ইচ্ছা।

লুই ব্লাঁর কাজের ফর্দ্দ খুব সহজ সরল ছিল। তিনি সোজাসুজি ভাবে বল্‌তে পেরেছিলেন যে, তিনি অমুক কাজটা করতে চান। তাঁর মতলবখানা প্রত্যেকেই ভালরকম বুঝতে পারত এবং তাঁর কাজের ফর্দ্দটাও ওয়েন বা ফুরিয়ের মত অতটা লম্বা চওড়া ছিল না। সেকালের পক্ষে তাঁর প্রস্তাবমত সমাজ-সংস্কার করা খুবই সম্ভবপর ছিল।

লুই ব্লাঁর কাজের খসড়া নিম্নরূপ:—একটা "জাতীয় কারখানা" কায়েম করতে হবে। সেই কারখানায় সমাজের সকল ধরণের ধনস্রষ্টা বা উৎপাদনকারী লোক থাকবে। প্রাথমিক প্রয়োজনীয় মূলধন সরকার সরবরাহ করবে। সরকার এজন্য এমন কি টাকা ধার করবে। যে কারিগর সভ্য 'তার সাধুতার প্রতিশ্রুতি দেবে, তাকেই ঐ প্রতিষ্ঠানে গ্রহণ করা হবে। আর মেহনতের

মূল্য সকলের বেলাতেই এক সমান হবে। আজকালকার তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের কাছে এ মতটা একেবারেই বাজে কথা। সাম্য, প্রীতি ও মানুষের ভ্রাতৃভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখেই তিনি একটা লোকের কাজের মেহনতের মজুরী তার প্রয়োজন বা অভাবের অনুপাতে দিবার পক্ষপাতী ছিলেন। সে লোকটা কতটা সময় কাজ করল বা তার কাজে কতটা জিনিষ উৎপন্ন হল, আর তার দামই বা কতখানি, তাঁর মতে এ সব দেখবার দরকার করে না। লোকটার অভাব কতটা আর সেই অভাব মিটানোর জন্য তার কি পরিমাণ পারিশ্রমিক চাই, তাই দেখতে হবে। সমাজের প্রত্যেকটা লোক তার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা চায়। তাদের প্রত্যেকের খাওয়া-পরার সংস্থান করে দিতে হবে। এদের জন্য বেশী-কিছু না করলেও সমাজের প্রত্যেক পরিবারের লোক যাতে করে খেয়ে পরে ধরার বুকে বেঁচে থাকতে পারে, তা দেখা প্রত্যেক মানুষের কর্ত্তব্য। লেখা-পড়া শিখে, উকিল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার হয়েছে বলেই তারা প্রয়োজনের হাজারগুণ বেশী পেতে অধিকারী, আর একজন দিন-মজুর সামান্য অন্নও পাবে না, এ রকম অ-ব্যবস্থা চাই না। এদের সংস্থান ছিল বলেই এরা আজ এত বড় হয়েছে। পুঁজি ছিল বলেই এরা বড় বড় ব্যবসায়ী সেজে লাখপতি কোটিপতি হয়েছে। বাপের পয়সায় পড়তে পেয়েছে বলেই তারা আজ বড় বড় চাক্‌রো হতে পেরেছে। এদের বড়লোক হবার সুযোগ-সুবিধা না থাকলেও এরাও তো মানুষ। মানুষের মত এদের খাওয়া-পরার বন্দোবস্ত করে দেওয়া চাই। ব্লাঁ বল্লেন, এ আমাদের করতেই হবে। ফরাসী বিপ্লবের গোড়াতে এই যে মজুর-সম্প্রদায়ের অসন্তোষ অভিযোগ এ মিটাতেই হবে। নইলে সমাজ থাকবে না, ভেঙ্গে পড়বে। এই হিসাবে ব্লাঁকে কম্যুনিষ্ট (সাম্যবাদী) বলা চলে। তিনি সাম্যের সত্যিকার প্রকাশ সেখানেই দেখতে পেতেন, যেখানে "প্রত্যেকে তার মুরদ মত উৎপন্ন করে ও অভাব-অনুপাতে ভোগ করে"।

একাকারের ভাব এখানে সম্পূর্ণ আমরা দেখতে পাই। বোলশেভিক মতবাদের ধূয়া এখানে যথেষ্টই রয়েছে। আমি বেশী শিক্ষালাভের সুযোগ ও সুবিধা ভাগ্যক্রমে পেয়েছি বলেই রাস্তার কুলির চাইতে বেশী মজুরী পেতে অধিকারী, এ অব্যবস্থা ব্লাঁর অসহ্য। তিনি সবাইকে এক নিক্তির ওজনে মাপ করে গেছেন। পয়লা, দোসরা, তেসরা—সমাজের গায়ে এই সব নম্বর এঁটে দেওয়া তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। এ সব উঠিয়ে দেওয়া ছিল তাঁর মতলব। তাঁর এই "সোশ্যাল ওয়ার্কশপ" গড়বার মতলবখানা যে কতবড় ভীষণ জিনিষ তা হয়ত তিনি তখন ততটা বুঝে উঠতে পারেন নি। সরকার তাঁর এই সাধু উদ্দেশ্যে সায় দেবে এটা চিন্তা করতে তিনি কেমন করে পেরেছিলেন তা বুঝে ওঠা দায়। তাঁর মতলবখানা কার্য্যে পরিণত হলে দুনিয়ায় একটা মহা প্রলয় আসবে এবং দুনিয়ার চেহারাটা বেমালুম বদলে যাবে। এটা একেবারে স্বতঃসিদ্ধ। সেই সোশ্যালিজ্‌মের ঝড়ের বেগে সমাজের বড় বড় বটগাছ,—রাজা, জমীদার, কুলীনগণের ঘাড় ভাঙ্গা যাবে। সবাইকে এক গোয়ালে ঢুকতে হবে, এটা হয়ত তিনি তলিয়ে দেখেন নি। কারণ ভবিষ্যতের এরূপ চিত্র তাঁর লেখার মধ্যে দেখতে পাই না। মানুষের চিন্তাধারা এতে একেবারে বদলে যাবে। ছোট-বড়'র ভুল ধারণা তাদের ঘুচে যাবে। সমাজ-বিজ্ঞানটা একেবারে ঢেলে সাজা হবে। এর আবার নতুন করে বর্ণপরিচয় করতে হবে।

জাতীয় কর্ম্মশালার খরচপত্র ও লাভালাভ

এই সোশ্যাল ওয়ার্কশপটা কেমন করে গড়ে তোলা হবে? এই প্রতিষ্ঠানটির মাতব্বর বির্ব্বাচন করবার ক্ষমতা থাকবে কারিগরদের হাতে। তবে প্রথম বৎসরটা সরকার নিজের হাতে সব-কিছু করবার ভার নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি ভালভাবে পরিচালনা করবার পথ দেখিয়ে দেবে।

এই কর্ম্মশালার যেটা "নেট" আয় দাঁড়াবে, তা তিনভাগে ভাগ করা হবে। প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের সভ্যদের মধ্যে একভাগ সমান ভাবে বেঁটে দেওয়া হবে। এটা কিন্তু তাঁদের উপরি আয়। দুই নম্বর হিস্যাটা প্রতিষ্ঠানের বৃদ্ধ, পীড়িত, স্থবির, অপারগ, অক্ষম লোকদের পেনশ্যন বা ভাতাস্বরূপ ও অন্যান্য শিল্পের উন্নতি-কল্পে ব্যয় করা

হবে। তিন নম্বর বখরাটা যে-সকল নতুন সভ্য এই আখড়ায় যোগ দেবেন, তাঁদের যন্ত্রপাতি-ক্রয়ে খরচ করা হবে। বুসেজের স্থায়ী পুঁজির কথা এইখানে আমাদের মনে পড়ে।

ব্লাঁ কিন্তু ওয়েনের মত শিল্প-প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত পুঁজির ইণ্টারেষ্ট বা সুদ তুলে দেবার স্বপক্ষে ছিলেন না। তিনি ফুরিয়ের মত ইণ্টারেষ্টের ন্যায্যতা সম্বন্ধে আস্থাবান ছিলেন। এইখানে প্রচণ্ড সাম্যবাদীদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য আমরা দেখতে পাই। তবে তিনি বলে গেছেন—"সময় আসবে যখন এর কোন কদর থাকবে না। তবে আপাততঃ এর ব্যবস্থা রাখতেই হবে। এটা তুলে দেবার জন্য আমাদের অতটা অসহিষ্ণু হওয়া উচিত নয়, যদিও আমরা এই অতীতের জঞ্জালের উপর প্রতিষ্ঠিত বিধিব্যবস্থা তুলে দিতে সকলেই খুব আগ্রহান্বিত"।

ব্লাঁ বলেন পুঁজির সুদ আর শ্রমিকের মসাহরা এই দুইটাই জিনিষ উৎপাদনের খরচার মধ্যে ধরা হবে। গতর খাটিয়ে ধনোৎপাদনে সাহায্য না করলে পুঁজিপতিদের লাভের বখরায় কোনো অংশ থাকবে না। কেবলমাত্র শ্রমিকদের তাতে ন্যায্য অধিকার থাকবে।

এখন এই কারখানার সুবিধা-অসুবিধা লাভালাভ সম্বন্ধে একবার খতিয়ান করে দেখা যাক। অন্যান্য ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা পরিচালিত কারখানার চাইতে সম্মিলিত ভাবে রাষ্ট্র-কর্তৃক সাহায্যপ্রাপ্ত এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান অপেক্ষাকৃত কম খরচে ভাল মাল তৈয়ারী করবে, এটা সকলেই আশা করতে পারেন। তা ছাড়া এখানকার নিযুক্ত মজুর-কারিগরদের লাভের বখরার অধিকার থাকার ব্যবস্থা থাকায় তাঁরা স্বভাবতই কাজটা আপনার কাজ মনে করে খুব আগ্রহ ও তৎপরতার সঙ্গে করবেন বলে আশা করা যায়।

এই সোশ্যাল ওয়ার্কশপ হলে প্রত্যেক ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের আতঙ্কিত হবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। এই সোশ্যাল ওয়ার্কশপের মধ্যে পুঁজিপতিদের পুঁজির সুদ দেবার ব্যবস্থা ও মজুরের সমান মজুরী এবং তার উপর লাভের একটা অংশ দেবার ব্যবস্থা থাকার দরুণ পুঁজিপতি ও মজুর উভয়েই এই দিকে আকৃষ্ট হবে। এই প্রকার সমাজের সকল স্তরের ধনোৎপাদন-কারীরা এই সোশ্যাল ওয়ার্কশপের মধ্যে এসে যাবে। এক একটা বিশিষ্ট শিল্পকে এক একটা কেন্দ্রীয় শিল্প-আড্ডার মধ্যে আনা হবে। এই ধরণের বিভিন্ন শিল্প ভবনগুলি সঙ্ঘবদ্ধ করা হবে। এবং এগুলি পরস্পর প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে না দাঁড়িয়ে একে অন্যের কার্য্যের সাহায্য করবে। শিল্প-সঙ্কটের সময় এরূপ সাহায্য খুবই উপকারে আসবে। আর বিভিন্ন শিল্প-কারখানাগুলির পরস্পরের মধ্যে এরূপ একটা সমঝোতা থাকার দরুণ শিল্প-সঙ্কট একেবারেই ঘটবে না এরূপও আশা করা যায়। কারণ প্রতিযোগিতা এই নয়া ব্যবস্থার ফলে একেবারে উঠে যাবে। প্রতিযোগিতার ফলেই এক শিল্প অন্য শিল্পের ধ্বংস-সাধনে কৃতকার্য্য হয়।

প্রতিযোগিতা উঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক ও সামাজিক জীবনধারা বর্ত্তমানের তুলনায় পবিত্র হয়ে উঠবে।

রাষ্ট্রশক্তি ও সমাজ মেরামত

ব্লাঁ বলতেন সমাজে এই বিপুল পরিবর্ত্তন আনবার জন্য বেশী কিছু করবার দরকার নাই। সরকার এদিকে সামান্য একটু জোর দিলেই এটা কৃতকার্য্য হবে বলে আশা করা যায়। সরকার পুঁজি দেবে, আর এর পক্ষে কতকগুলি সুবিধাজনক আইনকানুন করে দেবে মাত্র।

দেশের সরকারের সদিচ্ছার উপর যে রাষ্ট্রীয় শুভাশুভ নির্ভর করে একথা কাউকে বলে দিতে হবে না। যতদিন দেশের লোক সরকারের উপর আস্থা হারিয়ে না বসে, ততদিন সরকারের কথা তারা বেদবাক্য বলে বিশ্বাস করে, সরকারী প্রতিষ্ঠান অক্ষয় অব্যয় বলে মেনে চলে এবং সরকার যে কাজে হাত দেয়, সেটা ফেল মারতে পারে না তাদের এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস থাকে।

অন্যান্য দেশের মত ভারতে সরকারই কো-অপারেটিভ সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি চালানোর প্রাথমিক ভার নিয়েছে। সরকার একাজে আছে বলেই এ দেশে কো-অপারেটিভ প্রতিষ্ঠানগুলি অত দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে। কালে এই কো-অপারেটিভ সোসাইটি এক বিরাট জিনিষ হয়ে বসবে। হয়ত এইগুলিই এদেশে ওয়েন বা ব্লাঁর স্বপ্ন

বাস্তবে পরিণত করবে। জগতের অন্যান্য মনীষী ও সমাজ এবং ধর্ম্মসংস্কারকগণের মত লুই ব্লাঁও নিজের জীবনে তাঁর আদর্শের পূর্ণ সফলতা দেখে যেতে পারেন নি।

১৮৪৮ সনের বিপ্লব

এইখানে ফরাসী দেশের ১৮৪৭-৪৮ সনের সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। ১৮৪৭ সনে ফ্রান্সে একটা বড় রকমের আর্থিক সঙ্কট উপস্থিত হয়। তার ফলে একটা সাধারণ বিপ্লব ঘটে। ১৮৪৮ সনের ফেব্রুয়ারী থেকে জুন পর্য্যন্ত ফরাসী দেশে একটা অস্থায়ী গণতন্ত্র স্থাপিত হয়। ব্লাঁ ঐ গণতন্ত্রের অন্যতম কর্ণধার ছিলেন। এই বিপ্লবের দিনে হাজার হাজার লোক বেকার হয়ে বসে। তারা কাজের জন্য অন্ন-বস্ত্রের জন্য রাজবাড়ীর দিকে ছোটে।

এই অস্থায়ী সরকারকে এদের অসন্তোষ মিটানোর জন্য প্যারিসে এক ন্যাশনাল ওয়ার্কশপ কায়েম করতে হয়। এটার সঙ্গে লুই ব্লাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না। এটা গড়ে তোলবার ভার দেওয়া হয় এমিল টমাস বলে একজন ইঞ্জিনিয়ারের হাতে। সে লোকটা এই "জাতীয় প্রতিষ্ঠানের" ঘোর বিরোধী ছিল। যা হোক এটা স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজধানীর দিকে লোক ছুটতে আরম্ভ করে। এতে দশ হাজার লোকের কাজ দেবার বন্দোবস্ত ছিল। কিন্তু একমাসের মধ্যেই ২১ হাজার লোক ইহার খাতায় নাম লেখায়। এপ্রিলের শেষে দাঁড়ায় প্রায় এক লক্ষ। সরকারকে খুব মুস্কিলে পড়তে হয়। এদের প্রত্যেককে কাজের সময় দিনে দুই ফ্রাঁ করে ও কাজ না থাকলে এক ফ্রাঁ করে দেবার ব্যবস্থা করা হয়। শেষে অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, কাজের অভাবে তাদেরকে সামান্য মাটি কোপাতে দেওয়া হয়। যাক এমনিতর অবস্থা বেশী দিন চলতে পারে না। ২১শে জুন ২টা হুকুমজারি করা হয় যে, সতর থেকে পঁচিশ বৎসর বয়সের সবাইকে হয় সৈন্যদলে যোগ দিতে হবে, নয় দেশ ছেড়ে যেতে হবে। এতে একটা বড় রকমের বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হয়। শ্রমিকরা রীতিমত বিদ্রোহী হয়ে দাঁড়ায় এবং তার ফলে শত শত মজুরের অকাল-মৃত্যু ঘটে।

মন্ত্রীর পদে লুই ব্লাঁ

জুলাই মাসে আবার অল্পদিনের জন্য রাজাকে তক্তে বসান হয়। ঘটনাচক্রে লুই ব্লাঁ এই সময় দেশোন্নতি, মজুর গড়ন প্রভৃতি বিভাগের মন্ত্রী হন। ইনি তাঁর সরকারী অন্যান্য রাজপুরুষদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর কেতাবে লিখিত সোশ্যাল ওয়ার্কশপ স্থাপনের চেষ্টা করিতে প্রয়াস পান।

অনেক চেষ্টা চরিত্রের ফলে এক মজুর তদন্ত কমিশন বসান হয়। এর সভাপতি করা হয় লুই ব্লাঁকে। মজুরদের অভাব-অভিযোগ তদন্ত করে কি সংস্কার করতে হবে তার একটা খসড়া করে এরা ন্যাশনাল অ্যাসেম্ব্লির (ফ্রান্সের রাষ্ট্র সভা) কাছে পেশ করবেন। লুক্সঁবর এই কমিশন বসে। এই কমিশনের প্রতিনিধি মজুর মনিব উভয়েই মনোনয়ন করেন।

কমিশন খুব লম্বা-চওড়া রিপোর্টে ষ্টেট সোশ্যালিজমের (রাষ্ট্র-সমাজতন্ত্র) এক খসড়া উপস্থিত করেন। এতে ওয়ার্কশপ, কৃষি উপনিবেশ সরকারী সমবায় ভাণ্ডার ও বাজার স্থাপন করবার কথা থাকে। ব্যাঙ্ক অব্ ফ্রান্সকে ষ্টেট ব্যাঙ্কে পরিণত করবার কথা উঠে। এই ব্যাঙ্ক থেকে এইসব কাজ চলবে।

ন্যাশনাল অ্যাসেম্ব্লির (ফ্রান্সের রাষ্ট্র-সভা) কিন্তু এগুলার একটারও আলোচনা করে দেখতে প্রবৃত্তি হয় নি।

লুই ব্লাঁর এই কমিশনের একটা কাজ আমরা দেখতে পাই। সেটা যদিও মজুরদের গুঁতোর চোটে সরকারকে বাধ্য হয়ে করতে হয়েছিল। ঐ অস্থায়ী গণতন্ত্রের ২রা মার্চ্চের এক হুকুমনামায় দেখতে পাই—"পিস-ওয়েজেস্" বা কাজের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ-অনুসারে মজুরী দিবার ব্যবস্থা একদম উঠিয়ে দেওয়া হয়। আর কারখানাসমূহে কাজের ঘণ্টা কমিয়ে প্যারিসে ১০ ঘণ্টা ও মফঃস্বলে ১১ ঘণ্টা স্থির করা হয়।

লুই ব্লাঁ অবশেষে কতকটা ভগ্নমনোরথ হয়ে সমাজ-সংস্কার ও রাজনৈতিক জীবন হতে অবসর গ্রহণ করেন।
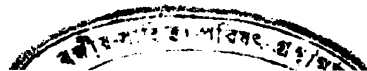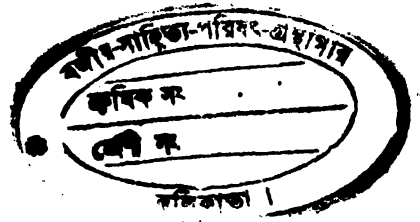
১০৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে শ্রীরঘুনাথ শীল, বি, এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১ম বর্ষ—১২শ সংখ্যা

চৈত্র—১৩৩৩

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি।

অথর্ব্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জন্ম আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।
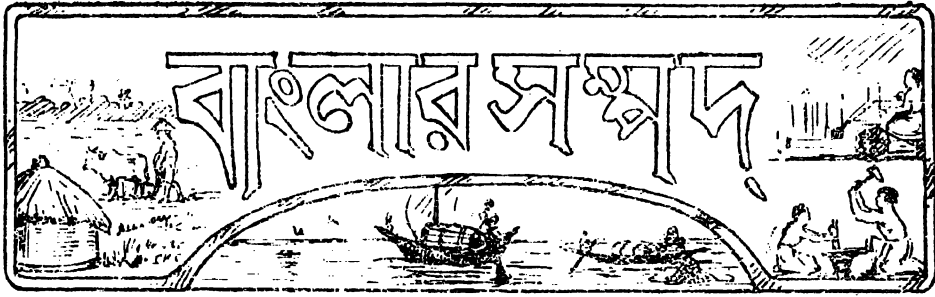
বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটে কলিকাতা কর্পোরেশ্যনের দান

কলিকাতা কর্পোরেশ্যন এক সভায় নিম্নলিখিত সর্ত্তে যাদবপুর বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিটিউটে বাৎসরিক ৩০,০০০৲ ত্রিশ হাজার টাকা সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন।

(১) ইনষ্টিটিউট হইতে প্রতি বৎসর উহার কার্য্য-পদ্ধতির সন্তোষজনক রিপোর্ট দাখিল করিতে হইবে।

(২) সাবান প্রস্তুত, চিনি প্রস্তুত, আলকাতরা এবং তেলের কার্য্যের জন্য ক্লাশ খুলিতে হইবে এবং সাহায্যের এক-তৃতীয়াংশ তাহার পরিচালনার জন্য ব্যয়িত হইবে।

(৩) বর্ত্তমান কর্পোরেশ্যন ওয়ার্ক-শপে যে ৫০ জন শিক্ষানবিশ আছে, তাহাদের জন্য কেতাবী শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৪) ইনষ্টিটিউটের ম্যানেজিং কমিটিতে কর্পোরেশ্যনের প্রতিনিধির জন্য অন্ততঃ ৫টি স্থান রাখিতে হইবে।

যশোহরে রেল-প্রদর্শনী

রেলপ্রদর্শনীর ট্রেনখানি যশোহর ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিল।

প্রদর্শনী দেখিবার জন্য ষ্টেশনে বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল। ১টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত মহিলাদের জন্য পৃথক্ বন্দোবস্ত ছিল। প্রায় ২ সহস্র মহিলা প্রদর্শনী দেখিতে আসিয়াছিলেন।

সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ৯॥টা পর্য্যন্ত বায়স্কোপযোগে বক্তৃতা হয় এবং সাধারণকে স্বাস্থ্যতত্ত্ব বুঝাইয়া দেওয়া হয়। ভিড়ের জন্য বহুলোক প্রবেশ করিতে না পারিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। প্রদর্শনীর জিনিষসমূহের মধ্যে রেশমকীট, পাটের শত্রু, গো-জাতির উন্নতি, চর্ম্মশিল্প, স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও

সমবায়-পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিস্তারিত ব্যবস্থা ছিল।

কলিকাতায় খাবারের দোকান

কলিকাতায় খাবারের দোকানের সংখ্যা ৯৬৭। শহরের বিভিন্ন অংশে মিঠাইয়ের দোকানের সংখ্যা এইরূপ :—

১নং ডিষ্ট্রীক্ট	...	৩৪৫
২নং ডিষ্ট্রীক্ট	...	১৯২
৩নং ডিষ্ট্রীক্ট	...	৭৬
৪নং ডিষ্ট্রীক্ট	...	১৬২
কাশীপুর	...	৬২
গার্ডেনরীচ	...	৭৯
মাণিকতলা	...	৫১

পাটের কলে ধর্ম্মঘট

শিবপুরের "গ্যাঞ্জেস জুট মিলের" সমস্ত শ্রমিকগণ কিছুদিন হইল ধর্ম্মঘট করিয়া কার্য্য বন্ধ করিয়াছে। ইহাদের সংখ্যা প্রায় নয় হাজার।

প্রকাশ যে, ইতিপূর্ব্বে এই মিলে সপ্তাহে চারিদিন করিয়া কাজ হইত। সম্প্রতি কর্ত্তৃপক্ষ পাচ দিন করিয়া কাজ করাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। শ্রমিকগণ এই অতিরিক্ত একদিনের জন্য বর্দ্ধিত হারে মাহিযানা চাহিয়াছিল। কর্ত্তৃপক্ষ তাহাতে অসম্মত হন। ইহার ফলেই শ্রমিকগণ ধর্ম্মঘট করিয়াছে।

ধর্ম্মঘটকারীরা শান্ত আছে। পাছে কোনো গোলযোগ ঘটে, এই জন্য পুলিশ বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিযাছে। স্থানে স্থানে কন্‌ষ্টেব্‌ল্ মোতায়েন করা হইয়াছে।

বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলী

বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলী যে শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহাতে দরজীর কাজ, বোনা, ফটো তোলা, বই বাঁধা প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। যে কোনো লোক অবসর মত ঐ সকল বিদ্যা শিখিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারেন। জানুয়ারী মাস হইতে শিক্ষাদান আরম্ভ হয়। যাঁহারা শিক্ষালাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে কলিকাতা ৭০নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে শিল্পবিদ্যালয়ের নিকট আবেদন করিতে হইবে। বই-বাঁধা শিক্ষা দেওয়ার জন্য বেতন গ্রহণ করা হয় না। এযাবৎ মোট ৯ শত ৫৭ জন ছাত্র ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়ায়াছেন। তাঁহারা প্রায় সকলেই ঐ শিল্প-বিদ্যাদ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া সংসার প্রতিপালন করিতেছেন।

জেলা-বোর্ড

১৯২৫-২৬ সনে জেলাবোর্ডের সভ্যগণের সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসরের মতই ৬৭৬ জন আছে। বৎসরে ৪২৯টী সভার অধিবেশন হইযাছিল। ত্রিপুরা, দার্জ্জিলিং এবং হুগলী ব্যতীত সমস্ত জেলাবোর্ডগুলিই মাসে একবার করিয়া সভা করিযাছেন।

পূর্ব্ব বর্ষের মত এই বর্ষেও লোকাল বোর্ডের সংখ্যা ৮২টি ছিল। বোর্ডসমূহের সভার অধিবেশনের সংখ্যা—৮৯৩।

ইউনিয়ন বোর্ড

আলোচ্য বর্ষে অনেকগুলি নূতন ইউনিযন বোর্ডের সৃষ্টি হইযাছে। পূর্ব্ব বৎসর উহাদের সংখ্যা ছিল ১৫০০ শত; কিন্তু আলোচ্য বর্ষে উহাদের সংখ্যা হইয়াছে ২২১৭। বিশেষভাবে মযমনসিংহ, নদীযা এবং চট্টগ্রাম জেলাযহ ইউনিয়ন বোর্ডের সংখ্যা বাড়িয়াছে; কিন্তু ইউনিয়ন বোর্ডসমূহ দলাদলির জন্য উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। তবে এই প্রতিষ্ঠানসমূহে আত্মনির্ভরের ভাব বেশ সজীব আছে।

জেলাবোর্ডের আয়-ব্যয়

জেলাবোর্ডসমূহের ১ কোটি ৩৫ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা আয় হইয়াছিল এবং খরচ হইয়াছে ১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা।

সমগ্র প্রেসিডেন্সিতে বাৎসরিক মাথা পিছু ২ আনা

৯ পাই কর ধার্য্য ছিল। কোনও কোনও জেলায় ১ আনা ৭ পাই হইতে ৮ আনা ১১ পাই পর্য্যন্ত করের তারতম্য হইয়াছিল।

জলসরবরাহ ও নলকূপ

জল-সরবরাহের খরচ ৯ লক্ষ ৯০ হাজার হইতে কমিয়া ৯ লক্ষ ১০ হাজারে দাঁড়াইয়াছে। মেদিনীপুর, হুগলী এবং হাওড়ার জেলাবোর্ডগুলি জল-সরবরাহের জন্য যথেষ্ট টাকা খরচ করিয়াছেন। মফঃস্বলে জল-সরবরাহ বিষয়ে নলকূপসমূহ যথোপযুক্ত হইলেও বর্ত্তমানে এইগুলির সম্পর্কে কয়েকটি অসুবিধা দেখা দিয়াছে।

শিক্ষায় ও স্বাস্থ্যে খরচ

শিক্ষা-ব্যাপারে খরচ ৩০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকায় দাঁড়াইয়াছে। ইহার মধ্যে সরকার ১৮ লক্ষ টাকা দিয়াছেন। জেলাবোর্ডের সাহায্যে পরিচালিত উচ্চ ও নিম্নপ্রাথমিক স্কুলসমূহের সংখ্যা ৪১৪৯০ হইতে ৪১৯৯৮এ দাঁড়াইয়াছে। ইহার মধ্যে বালক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩১৪৯৩ ও বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১০৫০৫। এই সমস্ত স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা ১৭৪৫৭ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরে সাঁওতালদিগের শিক্ষার জন্য একটি নূতন বোর্ড গঠিত হইয়াছে।

চিকিৎসা ও জনসাধারণের স্বাস্থ্যবিষয়ে ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এই বৎসরে ২২টি নূতন ডিস্‌পেন্সারী খোলা হইয়াছে। জেলাবোর্ডের অধীন ডিস্‌পেন্সারীর সংখ্যা ৪৮৫ এবং সাহায্য-প্রাপ্ত ডিস্‌পেন্সারীর সংখ্যা ৩১৯।

মোটর ও সড়ক

সমস্ত প্রদেশ হইতেই এইরূপ অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে যে, মোটর ও বাস্ গাড়ীর চলাচল বৃদ্ধি পাওয়ায় রাস্তাগুলি শীঘ্র নষ্ট হইয়া যাইতেছে এবং জেলাবোর্ডসমূহ উহাদের রক্ষার জন্য টাকার সংস্থান করিতে পারেন না।

কলিকাতার ঘরবাড়ী ও প্রিভি কাউন্সিল

কলিকাতার বাড়ীভাড়া সম্পর্কে বিলাতের প্রিভিকাউন্সিল এক অতি প্রয়োজনীয় রায় দিয়াছেন। নন্দলাল মল্লিক বাড়ীওয়ালা কেশোরাম পোদ্দার ভাড়াটিয়ার নিকট মাসিক ৪,৫০০্ ভাড়া দাবী করেন। ভাড়াটিয়া ইহা অন্যায্য বলিয়া ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টকে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ করেন। ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট তাহাদের অক্ষমতা জ্ঞাপন করায় হাইকোর্টে মামলা করা হয়। এই মামলা প্রিভিকাউন্সিল পর্য্যন্ত গড়ায়। প্রিভিকাউন্সিলের বিচারপতিরা রায়ে বলিয়াছেন যে, হাইকোর্টের উচিত ছিল এ বিষয়টীর বিচারের ভার ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের হাতে দেওয়া। ব্যাপারটী পুনরায় ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের নিকট বিচারার্থ আসিয়াছে।

পুরুলিয়া মেলা

গত ১৪ই জানুয়ারী সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় মিসেস্ টপলিস্ প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন। প্রদর্শনীতে তিনটী বিভাগ আছে :—(১) কৃষি, (২) শিল্প ও (৩) মহিলা-বিভাগ।

কৃষি-বিভাগ—এই বিভাগে সরকারী কৃষি-বিভাগের কয়েকটী জিনিষ ব্যতীত খুব বেশী কিছু আসে নাই।

শিল্প-বিভাগে নিম্নলিখিত স্থান ও ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে জিনিষ পত্রাদি আসিয়াছে—(১) গবর্মেণ্ট সিল্ক ফ্যাক্টরী—ভাগলপুর, (২) স্বদেশী শিল্প ফ্যাক্টরী—গহনা পত্রাদি (৩) কৃষ্ণনগরের আর,এন, পাল—মাটীর পুতুল (৪) চাণ্ডিলের পাথরের বাসন (৫) বিনোদিনী শিল্প মন্দির (৬) বেঙ্গল ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এণ্ড কোং (৭) সুর ব্রাদার্স (৮) ইম্পীরিয়াল জুয়েলারী ওয়ার্কস্—আইভরি ও স্বর্ণ-নির্ম্মিত নানা প্রকারের গহনা (৯) গয়ার কার্পেট (১০) মানভূম জেলখানার আসন ও বস্ত্র (১১) ত্রিহুত মুন বাটন ফ্যাক্টরী—বোতাম (১২) পণ্ডিত লাল মোহন ত্রিবেদীর বহু পুরাকালের মুদ্রাসমূহ (১৩) পুরুলিয়ার যুগলকিশোর কর্ম্মকারের ও বেণীমাধব কর্ম্মকারের এবং ঝালিদার জগন্নাথ লোহারের গুপ্তি ছড়ি ইত্যাদি (১৪) পুরুলিয়া

এঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসের্ কয়েকটী চেয়ার, আলমারী ইত্যাদি।

বারুইপাড়া ধাত্রী-বিদ্যালয়

গত ১৩৩৩ সালের ভাদ্র মাস হইতে মাগুরা ইউনিয়নের অধীন বারুইপাড়া গ্রামে চেরিটেবল্ ডিস্পেন্সারীর সুযোগ্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ পাল মহাশয়ের তত্বাবধানে মাগুরা ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বর শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একান্ত চেষ্টায় ও উদ্যোগে খুলনা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের অধীনে একটী ধাত্রী-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ফণীন্দ্রবাবু বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া বারুইপাড়া হইতে ৮টী, চরগ্রামের ১টী ও ধলগুা গ্রামের ১টী, একুনে দশ জন ধাত্রী-বিদ্যা-শিক্ষার্থিনী সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। ইহাদের শিক্ষার কার্য্যও বেশ চলিতেছে। গত ৫।১২।২৬ তারিখে খুলনার হেল্থ্ অফিসার মহোদয় উক্ত ধাত্রীবিদ্যালয় নিজে আসিয়া দেখিয়া গিয়াছেন। এযাবৎ শিক্ষাবিষয়ক ১০টী লেক্চার হইয়াছে। শুনিতেছি যে, আর দুইটী মাত্র লেক্চার হইবে। আমাদিগের মতে লেক্চার আরও ২।৪টী অধিক হইলে ভাল হয়। বর্ত্তমানে এরূপ শিক্ষার খুবই প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়। তবে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা স্ত্রীলোক-দ্বারা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড এজন্য যথেষ্ট অর্থ-ব্যয় করিতেছেন সন্দেহ নাই। সেই টাকার উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারে এরূপ মেয়ে ডাক্তার বা ধাত্রী রাখিয়া ২।৩টী ইউনিয়নে ৫।৭টি কেন্দ্র খুলিয়া শিখাইলে ভাল হয় না কি ?

(খুলনাবাসী)

সুরুল পক্ষি-শালা

বাংলাদেশে বীরভূম জেলায় সুরুলগ্রামে একটী পক্ষিশালা আছে। বিশ্বভারতীর কর্ত্তৃপক্ষগণ ইহার পরিচালনা করেন। ইহা তাঁহাদের পল্লীসংগঠন-বিভাগের অন্তর্গত। দেশীয় হাঁস, মুরগী প্রভৃতির বংশের উৎকর্ষ-সাধন করাই ইহার উদ্দেশ্য। তাঁহারা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে কৃষকদিগকে উন্নত বংশের মোরগ দিয়াছেন। তাহার ফলাফল এখনও জানা যায় নাই। প্রথমতঃ গ্রামবাসীরা উহা লইতে সম্মত হইয়াছিল না। তারপর কোন কোন স্থলে সুফল দেখিয়া তাহারা উৎসাহিত হইয়াছে।

বাংলার মধ্যে এই একটী মাত্র পক্ষিশালা আছে। ইহা যাহাতে ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিতে পারে তজ্জন্য সকলের চেষ্টা করা উচিত। তাঁহারা চট্টগ্রামের মোরগের দ্বারা দেশী মোরগের বংশের উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করিতেছেন। রোডস্ দ্বীপের মোরগ লইয়াও তথায় বর্ত্তমানে পরীক্ষা চলিতেছে। এখন তাঁহারা গ্রামবাসীদের মধ্যে বিনামূল্যে মোরগ বিতরণ করিতে পারিতেছেন না। যাঁহারা পক্ষীর ব্যবসায়ে আগ্রহান্বিত, তাঁহারা অর্থসাহায্যদ্বারা সুরুলের পক্ষিশালাকে সাহায্য করিবেন।

তাঁহারা এখন কলের (ইন্কিউবেটার) দ্বারা ডিম ফুটাইয়া থাকেন। গ্রামবাসীরা প্রথমতঃ এই কলের ব্যবহার করিতে রাজী হয় নাই। কিন্তু এখন তাহারা সুবিধা বুঝিয়া কলের ব্যবহার করিতেছে। সুরুল পক্ষিশালাতে তাঁহারা এপ্রেন্টীসরূপে ছাত্র গ্রহণ করেন। যাঁহারা পক্ষিপালন-কার্য্য শিক্ষা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা তথায় যাইয়া এই ব্যবসায় শিক্ষা করিতে পারেন। বোলপুর শান্তিনিকেতন হইতে মাত্র দুই মাইল দূরে সুরুল অবস্থিত।

(সঞ্জীবনী)

কলিকাতার বাড়ীভাড়া

আগামী ৩১শে মার্চ্চ কলিকাতার বাড়ীওয়ালাদের উপর কর্পোরেশনের এক্তিয়ার শেষ হইবে। ইতিমধ্যেই বাড়ীওয়ালারা ভাড়া বাড়াইবার মতলব আঁটিতেছেন।

শ্রীযুক্ত জে, ক্যাম্পবেল ফরেষ্টার ব্যবস্থাপক সভায় ক্যালকাটা রেন্ট অ্যাক্টের মিয়াদ আরও তিন বৎসর কালের জন্য বাড়াইয়া দিবার জন্য শীঘ্রই এক প্রস্তাব আনিবেন।

কলিকাতায় বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে অনেক দালান-কোঠা প্রস্তুত হইলেও বাড়ীভাড়া-সমস্যা এখনও যেমন তেমনই রহিয়াছে। ৬০০৲ টাকার উপর যাঁহারা বাড়ীভাড়া দিতে সমর্থ, তাঁহাদেরই শুধু ব্যবস্থা হইয়াছে। উত্তর কলিকাতায় মধ্যবিত্তগণের বাড়ীভাড়া-সমস্যা হৃদয়-বিদারক। কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের কল্যাণে যে

সকল নূতন বাড়ী-ঘর নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতে একশ' দেড়শ' টাকার ভাড়াটিয়াদের স্থান পাওয়া সুকঠিন।

বর্ত্তমানে যে আইন অনুসারে কার্য্য চলিতেছে, উহা ১৯১৮ সনের ১লা নবেম্বর পাশ করা হয়। ঐ আইন ২৫০৲ টাকার উর্দ্ধতন ভাড়ার বাড়ীর উপর খাটে। সেইজন্য ১৯২৪ সনে ঐ আইনের কার্য্যক্ষেত্র বাড়াইয়া দিবার জল্পনা-কল্পনা চলে। কারণ ঐ বৎসর বাড়ীভাড়ার আদালতে ৭১৭৮টি মোকদ্দমা রুজু হয়। ১৯২৫ সনে বাড়ীভাড়া-সম্পর্কিত ৬২১৯টি মোকদ্দমা হয়। ১৯২৬ সনে ঐ সংখ্যা ছিল ৪৬২৪।

এই বৎসরের কর্পোরেশ্যনের বাজেটে প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ৩ লক্ষ টাকার ঘাট্‌তি দেখাইয়াছেন। ঘাট্‌তির জন্য বাড়ী খালি পড়িয়া থাকাই দায়ী।

দক্ষিণ কলিকাতায় বাড়ীওয়ালাদের অত্যধিক ভাড়ার দাবীর জন্য বৎসরাধিক কালও বাড়ী খালি পড়িয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে।

এটা খুবই আশার কথা যে, কর্পোরেশ্যন বাড়ীভাড়ার সমস্যা-সমাধানের দিকে নজর দিয়াছেন। কর্পোরেশ্যন গরিব লোকদের জন্য স্বাস্থ্যকর বাসগৃহ-নির্ম্মাণের দিকেও মনোযোগ দিবেন বলিয়া প্রকাশ।

বিজ্ঞাপনী চিত্রকলা

আমাদের দেশে চিত্রবিদ্যা সাধারণতঃ অর্থকরী বিদ্যা না হইলেও, আজকাল একটা বিষয়ে চিত্রশিল্পীদিগের একটু আদর দেখা যাইতেছে। অনেক ব্যবসায়ী আপনার ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপন প্রচার করিবার জন্য নানাপ্রকার চিত্রের সাহায্য লইয়া থাকেন। বলা বাহুল্য যে, সচিত্র বিজ্ঞাপনও পাশ্চাত্যদেশ হইতেই এদেশে আসিয়াছে। কলিকাতা আর্ট স্কুলের বহু ছাত্র এক্ষণে সচিত্র বিজ্ঞাপনের কল্যাণে কোনওরূপে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। কিন্তু বিজ্ঞাপনী চিত্রকলার অধ্যাপনার জন্য পূর্ব্বে কলিকাতার সরকারী কলাবিদ্যালয়ে কোনরূপ ব্যবস্থা ছিল না। শ্রীযুক্ত কুশলকুমার মুখোপাধ্যায় নামক একজন প্রতিভাশালী বাঙ্গালী চিত্রকর ইংলণ্ডে সাত বৎসর বিজ্ঞাপনী চিত্রকলা শিক্ষা করেন এবং দুই বৎসর লিভারপুলের কলাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি রাজপুরুষগণকে বিজ্ঞাপনী চিত্রকলার আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিয়া গভর্ণমেণ্টের আর্টস্কুলে আজ দুই বৎসর হইল একটি বিজ্ঞাপনী চিত্রকলা-বিভাগ স্থাপন করেন। তিনি সেই বিভাগের ভার গ্রহণ পূর্ব্বক ছাত্রগণকে বিজ্ঞাপনী চিত্রকলা সম্বন্ধে অধ্যাপনা করিতেছেন। এক্ষণে প্রায় ত্রিশজন ছাত্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকটে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছে। আমরা আশা করি, অতঃপর যে-সকল বাঙ্গালী যুবা সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য কলাবিদ্যা শিক্ষা করিবেন, তাঁহারা অগ্রে এই অর্থকরী বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া পরে সাধারণ কলাচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিবেন। তাহা হইলে স্কুল হইতে বাহির হইয়াই ত্রিভুবন অন্ধকার দেখিতে হইবে না।

(শান্তিবার্ত্তা)

ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান লাইফ ইন্‌শিউর্যান্স কোং লিঃ

১৯০৮ সনে মার্টিন কোম্পানীকে ম্যানেজিং ডিরেক্টরস্ এবং স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জিকে চেয়ারম্যান করিয়া এই কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৫ সনের ৩১শে ডিসেম্বরের রিপোর্টে দেখা যায় কোম্পানী ৪১,৩৫,৮৫০৲ টাকার ২৬০১টা বীমার প্রস্তাব পাইয়াছিল। ইহার মধ্যে ২৬,৫৬,৩৫০ টাকার ১৬৯২টা বীমা কার্য্যে পরিণত হয়। এই সকল নূতন বীমার প্রিমিয়াম ১,৫৪,৮৭৭ টাকা দাঁড়ায়। উক্ত বৎসরে মোট আয় হয়—৭,৯৬,৬১০ টাকা।

হিন্দু মিউচুয়্যাল লাইফ অ্যাশ্যিউর্যান্স লিঃ

বাংলার বীমাকোম্পানীগুলির মধ্যে এটী বয়োজ্যেষ্ঠ ও একমাত্র হিন্দুর উদ্যোগে এবং পুঁজিতে ১৮৯১ সনে প্রতিষ্ঠিত। এই বীমা-প্রতিষ্ঠানের হাতে বীমা-ফণ্ডে ৩,৭৫,০০০৲ টাকা আছে। সর্ব্বসাকল্যে ১৮,০০,০০০৲ টাকার বীমা কোম্পানীতে করা হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত ৫,০০,০০০৲ টাকার দাবী কোম্পানী পরিশোধ করিয়াছে।

নূতন দিল্লী নির্ম্মাণের ব্যয়

নূতন দিল্লীতে ভারতের রাজধানীর উপযোগী প্রাসাদাদির নির্ম্মাণে চৌদ্দ কোটি টাকা খরচ হইয়াছে। কাউন্সিল-গৃহ-নির্ম্মাণে পঁচাত্তর লক্ষ টাকা খরচ হইবে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সরকারী দপ্তরখানা-নির্ম্মাণে এক কোটি পঁচাত্তর লক্ষ টাকা, বড়লাটের নূতন প্রাসাদের জন্য এক কোটী পঁচিশ লক্ষ টাকা, আর জঙ্গীলাট ও অন্যান্য সামরিক কর্ম্মচারীদের আবাস গৃহের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা, ভারত-সরকারের সচিবদের বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে এক একখানা বাড়ীর জন্য একলক্ষ টাকা খরচ হইবে। গেজেটেড্ অফিসারদের জন্য বাড়ী করিতে মোট পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা, আর কেরাণীগণের জন্য বাড়ী নির্ম্মাণে পঁয়ষট্টি লক্ষ টাকা, মোটমাট বাসস্থাননির্ম্মাণের খাতে দেড় কোটি টাকা খরচের বরাদ্দ হইয়াছে। পার্ক, বাগান ও অন্যান্য সুদৃশ্য স্থানের খাতে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা, বিজলীখাতে সাতান্ন লক্ষ টাকা, জলসরবরাহ খাতে ছত্রিশ লক্ষ, স্বাস্থ্যখাতে সওয়া কোটি টাকা, কাঠ আর যন্ত্রপাতিতে নব্বই লক্ষ টাকা, এই পর্য্যন্ত সাড়ে বার কোটি টাকা নূতন দিল্লীর কুক্ষিগত হইয়াছে এবং আরও দেড় কোটি টাকা দিতে হইবে।

দিয়াশলাই-শিল্প

দিয়াশলাই প্রস্তুত করিবার মাল-মশলা ক্রমশঃ অন্যান্য দেশ হইতে এদেশে সুলভে পাওয়া যায়। তথাপি আমাদিগকে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়েও বিদেশীগণের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। ফলে এক দিয়াশলাইয়ের জন্যই প্রতিবৎসর কোটি কোটি টাকা এদেশ হইতে জাপান, সুইডেনপ্রভৃতি দেশে চলিয়া যাইতেছে। সুখের বিষয় এই যে, গত কয়েক বৎসরের চেষ্টায় এ দেশে অনেকগুলি দিয়াশলাইয়ের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু উপযুক্ত-রূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত কারিগরের অভাবে প্রতিযোগিতায় দেশীয় দিয়াশলাই বিদেশাগত দিয়াশলাইয়ের সমকক্ষ হইতে পারে নাই। কাজেই এই সকল কারখানার স্থায়িত্ব ও উন্নতি-বিধান-কল্পে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য অত্যাবশ্যক। দেশের দারিদ্র্য-সমস্যা যেরূপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, তাহার সমাধান করিতে হইলে দেশের এই প্রকারের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি-সাধন একান্ত আবশ্যক। ভারতীয় দিয়াশলাই-কারখানাওয়ালারা সরকারের নিকট সংরক্ষণ ও ব্যবস্থার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট সে জন্যই তদন্ত নিমিত্ত টারিফ বোর্ডকে অনুরোধ করিয়াছেন। যাঁহারা সংরক্ষণ প্রার্থনা করেন, তাঁহারা টারিফবোর্ডের নিকট তাঁহাদের আবেদন উপস্থিত করিয়াছেন।

বিদেশ হইতে আমদানি

দিয়াশলাইয়ের উপর বর্ত্তমানে গ্রোস প্রতি দেড় টাকা শুল্ক ধার্য্য আছে। উহা মূল্যের উপর শতকরা একশত টাকা হারের চেয়েও বেশী। সরকার রাজস্ব-হিসাবে এই শুল্ক ধার্য্য করিয়াছেন। তাহার ফলেই দেশীয় কারখানাগুলি টিঁকিয়া আছে। বিদেশী দিয়াশলাইয়ের আমদানি গত কয়েক বৎসর কম হওয়ায় তদ্দরুণ প্রাপ্ত সরকারী রাজস্ব ১৫৪ লক্ষ হইতে ১১৮ লক্ষ টাকায় নামিয়া আসিয়াছে। এই ক্ষতি পূরণ করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে আবশ্যক। টারিফবোর্ড অনুসন্ধানান্তে যদি সরকার বাহাদুরকর্ত্তৃক দেশীয় দিয়াশলাই-শিল্পের সংরক্ষণ আবশ্যক বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন,

তবে বিদেশী দিয়াশলাইয়ের উপর বর্ত্তমান শুল্ক বজায় রাখিয়া অন্য উপায়ে সরকার বাহাদুরকে নিজ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আর যদি টারিফবোর্ড বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করেন, তাহা হইলে দেশীয় দিয়াশলাই-কারখানার বিপদের দিন ঘনাইয়া আসিবে সন্দেহ নাই।

রেলপথে আয়

রেলওয়ে-বোর্ড সম্প্রতি ভারতীয় রেলপথসমূহের ১৯২৫—২৬ সনের বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন। উহাতে দেখা যায়, ১৯২৫—২৬ সনে সর্ব্বপ্রকার ব্যয় বাদ দিয়া ভারতীয় রেলপথসমূহ হইতে গভর্ণমেণ্টের ৯ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। ১৯২৪—২৫ সনে রেলপথ হইতে গভর্ণমেণ্টের আয় দাঁড়াইয়াছিল ১৩ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা। ১৯২৫-২৬ সনের আয় ৯ কোটি ২৮ লক্ষ টাকার মধ্যে ৫ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা গভর্ণমেণ্টের রাজস্বভুক্ত হইয়াছে, এবং বাকী ৩ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা মজুত তহবিলে জমা হইয়াছে। এ বৎসর ভারতের সমস্ত রেলপথে মোট আয় হইয়াছিল ১১৩ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা; উহার মধ্যে মালের ভাড়া বাবদ আদায় হইয়াছে ৬৪ কোটি ৮৩ লক্ষ এবং যাত্রিগণের ভাড়ায় পাওয়া গিয়াছে ৩৯ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা। প্রথম শ্রেণী ব্যতীত আর সকল শ্রেণীর যাত্রীদিগের ভাড়ায়ই আদায়ী টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইণ্টারমিডিয়েট ও তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রিগণ হইতেই এবার ৭৬ লক্ষ টাকা বেশী আদায় হইয়াছে। মালের ভাড়াতে এবার প্রায় ২ কোটি টাকা কম পাওয়া গিয়াছে।

পাঞ্জাবে কাগজের কল

সম্প্রতি 'পাঞ্জাব পাল্প্ অ্যাণ্ড পেপার মিলস্ লিমিটেড' নামে পাঞ্জাবে একটী সুবৃহৎ কাগজের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। কাগজ-শিল্প সম্বন্ধে যাঁহাদের কোনও প্রকার অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা জানেন যে, পাঞ্জাবে কাগজ-নির্ম্মাণের প্রধান উপকরণ সাবয় (ভাব্বর) ঘাস যথেষ্ট পরিমাণ বিদ্যমান থাকায় ভারতবর্ষের মধ্যে উক্ত প্রদেশই কাগজনির্ম্মাণের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী এবং তজ্জন্য সেখানে সর্ব্বাপেক্ষা সস্তায় কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে। একথা ১৯২৫ সনের টারিফ বোর্ডের রিপোর্টেও বিস্তৃত-ভাবে বলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট, এবং সিরমুররাজ ও কালসিয়ারাজ এই কোম্পানীকে তাঁহাদের অধিকৃত স্থানে অবাধে সাবয় ঘাস সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। 'পশ্চিম যমুনা' খালের তীরে অবস্থিত 'জগদ্ধ'তে এই কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবে। এজন্য কাগজ নির্ম্মাণোপযোগী পরিষ্কার জল যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাইবে এবং নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের সাহারাণপুর ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী স্থানে কারখানা হওয়াতে কাঁচা মাল সংগ্রহ ও কাগজ রপ্তানির জন্য রেল লাইনের সুবিধাও খুব পাওয়া যাইবে। এখানে কুলী-মজুর সুলভ। উক্ত সুবিধাগুলি ভারতবর্ষের আর কোনও প্রদেশে নাই। এজন্য আশা করা যায় যে, এই কল যত সস্তায় মাল উৎপন্ন করিতে পারিবে, ভারতের আর কোনও কাগজের কল সেইরূপ সস্তায় পারিবে না।

বিলাতের এক সুপ্রসিদ্ধ এঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর (দি ফাউণ্ডেশ্যান কোম্পানী লিমিটেড, লণ্ডন) কলকারখানা, গুদামবাড়ী ইত্যাদি ইংরেজী ১৯২৭ সনের মধ্যে অথবা ১৯২৮ সনের প্রথমেই আধুনিকতম বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রস্তুত করিয়া দিবেন, এই প্রকার চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন। আধুনিকতম বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে প্রস্তুত হইলে এই কারখানা অতি অল্প সময়ের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ভাল কাগজ তৈয়ারী করিবে সন্দেহ নাই।

সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী স্যার উইলোবি কেরি এই কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান মনোনীত হইয়াছেন। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য কাগজশিল্প, রসায়ন, যন্ত্রশিল্প, এঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ ইয়োরোপীয় এবং দেশীয় কৃতী ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করা হইবে। কাগজশিল্প ও ব্যবসায়ে উপযুক্ত পরামর্শ দিবার জন্য বিলাতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞগণকে লইয়া একটি পরামর্শসভা গঠিত হইবে। এই প্রকার পরামর্শসভার কল্পনা ইতিপূর্ব্বে আর কোনও কোম্পানী করেন নাই। যদিও ইহা একটি অভিনব ব্যাপার, তথাপি আশা করা যায় যে, এই প্রকার

পরামর্শ-সভা কোম্পানীর পক্ষে বিশেষ হিতকর হইবে, কারণ বিশেষজ্ঞগণের পরামর্শ পাইবার সম্ভাবনা না থাকায়ই ভারতীয় কাগজ-শিল্প সময়ে সময়ে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

পাঞ্জাব গবর্ণমেন্ট এই স্বদেশী শিল্পের উন্নতির জন্য বিশেষ সাহায্য করিবেন। উক্ত গবর্ণমেন্ট এই কোম্পানীর জন্য বিনামূল্যে উপযুক্ত স্থান দিবেন, এবং পথ-ঘাট ও জল সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন এবং গবর্ণমেন্টের সর্ব্ববিধ কাজের জন্য এই কোম্পানীর কাগজ অন্ততঃ সমান মূল্যে পাইতে অন্য কাগজ ক্রয় করিবেন না, এই প্রকার প্রতি-শ্রুতি দিয়াছেন। এ অবস্থায় এই কোম্পানী যে প্রথম হইতেই লাভজনক কারবারে পরিণত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা জানিতে পারিলাম যে, অধিকাংশ অংশ ইতিমধ্যেই ঘরোয়া ভাবে বিক্রী হইয়া গিয়াছে। বাকী অংশগুলি সম্ভবতঃ কোম্পানী রেজিষ্ট্রী হইবার পর ২।৪ দিন মধ্যেই বিক্রী হইয়া যাইবে।

দিল্লী আয়ুর্ব্বেদ কলেজ

ভূপালের বেগমমাতার সভানেত্রীত্বে ১৭ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় দিল্লীতে আয়ুর্ব্বেদিক ও ইউনানী কলেজের বার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। বহু গণ্যমান্য হিন্দু ও মুসলমান সভাতে উপস্থিত ছিলেন। হাকিম আজমল খাঁর চেষ্টায় কলেজটির অনেক উন্নতি হইয়াছে। কলেজ হইতে গবেষণার জন্য একটি ছাত্রকে জার্ম্মাণিতে পাঠান হইয়াছে। কলেজের মহিলা-বিভাগে ৪১টি বালিকা চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকে।

বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ইনশিউর‍্যান্স কোম্পানী

১৯১৪ সনে এই বীমা-কোম্পানীটি লাহোরের কতিপয় ইয়োরোপীয় ও ভারতীয়গণের চেষ্টায় ঐ শহরে স্থাপিত হয়। বর্ত্তমানে ইহাতে ভারতীয় পুঁজি ও ভারতীয়গণের একতৃতীয়ার বেশী। কংগ্রেসের অনেক নেতা ইহার "বোর্ড অব ডিরেক্টরস্" মধ্যে আছেন। বর্ত্তমান কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর হইতেছেন লাহোরের বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও কর্ম্মী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গিরিধারী লাল। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু এই বীমা কোম্পানীর চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইবেন। কোম্পানীর স্থায়ী তহবিলে (রিজার্ভ ইনসিওর‍্যান্স ফণ্ডে) ৪৮,১৭৫/৪ মজুত আছে। ইহা ছাড়া লগ্নীর তহবিলে (ইনভেষ্টমেণ্ট রিজার্ভ ফণ্ডে) ৫৪,২১২॥০ আছে। এ পর্য্যন্ত কোন বৎসরেই কোম্পানীকে লোকসান দিতে হয় নাই। কোম্পানী কেবলমাত্র বীমাকারিগণের দাবী মিটাইতেই সমর্থ হইয়াছে। দেড় লক্ষ টাকা গভর্ণমেণ্টের নিকট গচ্ছিত রাখা হইয়াছে।

ওরিয়েণ্টাল লাইফ অ্যাশ্যিউর‍্যান্স কোং

বোম্বাইয়ের এই বীমা-কোম্পানীটি ভারতের মধ্যে সব চাইতে বড় বীমা-প্রতিষ্ঠান। ভারতে বর্ত্তমানে সর্ব্বসমেত ৪৩টি বীমা-প্রতিষ্ঠান আছে। ওরিয়েণ্টালের স্থান সকলের উপরে। আর সকল বীমা-কোম্পানীর সমবেত মূলধনের চাইতেও ওরিয়েণ্টালের মূলধন বেশী। ইহার বীমার সংখ্যাও আর সকল কোম্পানীর সমবেত সংখ্যার সমান দাঁড়াইবে।

১৮৭৪ সনে এই কোম্পানীটি বোম্বাই নগরে প্রতিষ্ঠিত হয়। আজ গোটা ভারতে ইহার শাখাসমিতি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই কোম্পানীর অধীনে তিন হাজার এজেন্সি আছে।

এই সকল এজেন্সির উদ্যোগে গত ১৯২৫ সনে কোম্পানীর নিকট বীমা করিবার জন্য ৪,৩৭,৯৯,০০০৲ টাকার ১৯৮২৪ টি প্রস্তাব আসে।

ইহার মধ্যে ২,৯৬,৪২,৭০০৲ টাকার ১৩,৫৪৫টি বীমার কার্য্য সম্পন্ন হয়। ঐ বৎসর সর্ব্বসমেত ১,৩০,৫০,৪৪২৲ টাকা কোম্পানীর আয় হয়। বীমাকারিগণের দাবী-দাওয়া ৫৩,৯২,৮৪৩৲ টাকা সমেত মোট ব্যয় হয় ৮৩,১৪,৫৩০৲ টাকা। কোম্পানীর হাতে থাকে ৪৭,৩৫,৯১২৲ টাকা।

বিগত ১৯২৫ সনের ৩১শে ডিসেম্বরের হিসাবপত্রে দেখা যায়, কোম্পানীর হাতে আদায়ী মূলধন আছে ৩,০০,০০০৲ টাকা। লাইফ অ্যাশ্যিউর‍্যান্স ফণ্ডে আছে

৬,৬৯,৫৪,৬৭৩৲ টাকা। কন্টিনজেন্সি রিজার্ভ ফণ্ডে ২,৬৯,০৮৪৲ টাকা আছে। ইনভেষ্টমেন্ট রিজার্ভ ফণ্ডে ২০,৫০,০০০৲ টাকা আছে। বিল্ডিং ফণ্ডে ১,০৩,৬৬০৲ ও টোটাল অ্যাসেট ৭,২৯,৮৩,৮৯৯৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে। চল্‌তি বীমা তহবিলে ২১,৩৬,২৭,৪৮৭৲ টাকা আছে।

ভারত ইনশিউর‍্যান্স কোম্পানী লিঃ

১৮৯৬ সনে এই বীমা কোম্পানীটি লাহোরে খাস ভারতীয় চেষ্টা ও পুঁজিদ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৫ সনে এই কোম্পানী ৯০,৩৩,০১২৲ টাকার ৩৭৫২টি বীমার প্রস্তাব পাইয়াছিল। ইহার মধ্যে ৭৩,১৫,৮৬৩৲ টাকার ৩১১৮টি প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল। ১৯২৫ সনে ঐ কোম্পানীতে ২,৬৬,৭৯,৭৮০৲ টাকার কারবার হইয়াছিল। ১৯২৪ সনের চাইতে ৪৬ লক্ষ টাকার কাজ বেশী হয়।

ইষ্ট অ্যাণ্ড ওয়েষ্ট ইনশিউর‍্যান্স কোং লিঃ

১৯১৩ সনে বোম্বাই নগরে প্রতিষ্ঠিত। ১৯২৫ সনের ৩১শে ডিসেম্বরের রিপোর্টে দেখা যায়, কোম্পানীর হাতে ১২,৪৮,৫০০৲ টাকার প্রস্তাব আসিয়াছিল। ইহার মধ্যে ১০,০৭,৫০০৲ টাকার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল। কোম্পানীর প্রিমিয়ামের আয় পূর্ব্ব বৎসরের চাইতে শতকরা ৪৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আহম্মদাবাদ বস্ত্র-শিল্প মজুর সঙ্ঘ

আহম্মদাবাদ টেক্‌স্‌টাইল্‌ লেবার ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট শ্রীমতী অনসূয়া সারাভাইয়ের সঙ্গে "আর্থিক উন্নতি"র সম্পাদকের 'মোলাকাৎ' ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। এই ইউনিয়ন কি কি কল্যাণকর কাজে নিযুক্ত আছেন তাহাই এখানে বলা হইবে। ইউনিয়নের অধীনে দুইটি দাতব্য চিকিৎসালয় ও একটি হাঁসপাতাল আছে। নয়টি দিবা বিদ্যালয় ও পনরটি নৈশ বিদ্যালয় এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে চলিতেছে। কারখানার কাজে অপারগ মেয়েদের জন্য গৃহ-শিল্পের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সাধারণ মজুরদের জন্য লাইব্রেরী ও পাঠাগার চলিতেছে। ইহা ছাড়া মজুরদের মধ্যে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার বিস্তারকল্পে একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকার ৫½ হাজার খণ্ড বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

ইউনিয়ন-কর্ত্তৃক দৈবদুর্ঘটনাপীড়িত ও ব্যাধিগ্রস্ত মজুরদিগকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়। তাহাদিগকে মামলা-মোকদ্দমার জন্যও অর্থসাহায্য করা হয়। এবং এজন্য অল্প সুদে টাকা ধার দেওয়া হয়। ঐ সুদের হার কাবুলীওয়ালাপ্রভৃতির সুদের প্রায় ⅛ ভাগ। গত বৎসর এরূপভাবে ৭৭টি ব্যাপারে ১০,০০০৲ টাকা সাহায্য করা হইয়াছে।

ভারতে পাবলিক স্কুল

একটা নিখিল ভারত "পাবলিক" বিদ্যাপীঠ খুলিবার আয়োজন চলিতেছে। এজন্য লাট-বেলাট, রাজা-মহারাজা ও নেতৃস্থানীয় লোকেরা এক ইস্তাহার জারি করিয়াছেন। ইংলণ্ডের আদর্শে গোটা ভারতে "পাবলিক" স্কুল স্থাপনের অভিনব প্রচেষ্টায় অনুমান ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

পাঞ্জাবে সমবায়-আন্দোলন

পাঞ্জাব সরকারের ১৯২৫-২৬ সনের রিপোর্টে দেখা যায় যে, ১৯২৫ সনে সমবায়-সমিতি দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়া ১৫,০০০ দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বে ছিল ৩,৩০০। ইহাদের মূলধন বর্ত্তমানে ৯ কোটি টাকা এবং সভ্যসংখ্যা ৪,৫০,০০০। ঐ বৎসর "মর্টগেজ" বা "বন্ধকি" ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হয়। ঐ প্রতিষ্ঠান ৪৷৷০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩৩৭২ একর পতিত জমি আবাদ করিয়াছে।

১৯২৫ সনের আর্থিক ছুনিয়া

লিগ্ অব্ নেশন্স্ আগামী আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক বৈঠকের (ইণ্টার-ন্যাশনাল ইকনমিক কনফারেন্সের) জন্য ছুনিয়ার ধনোৎপাদন ও শিল্প-ব্যবসায় সম্বন্ধে এক ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে যুদ্ধের পূর্ব্বের তুলনায় বর্ত্তমান সময়ের লোকসংখ্যার পরিবর্ত্তন, কাঁচা মাল ও খাদ্যশস্যের বিভিন্ন পরিবর্ত্তন এবং ছুনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্যের আমদানি-রপ্তানির উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, ১৯১৩ সনের চেয়ে ১৯২৫ সনের লোক-সংখ্যা ও ব্যবসা-বাণিজ্য শতকরা পাঁচ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

চীন দেশ ছাড়া অন্যান্য দেশে খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচা মালের উৎপাদন লোকসংখ্যার চাইতে দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯১৩ সনের চাইতে ১৯২৫ সনে এই দিকে শতকরা ১৬ হইতে ১৮ ভাগ বেশী বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়।

ইয়োরোপ বনাম অন্যান্য মহাদেশ

ছুনিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় ইয়োরোপে বৃদ্ধির পরিমাণ অনেকটা কম। পূর্ব্ব ও মধ্য ইয়োরোপের অবস্থা এখনও আশানুরূপ নয়। যদিও ১৯২৫ সনে ঐ অঞ্চলের উন্নতি ইয়োরোপের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা, এমন কি ছুনিয়ার অনেক দেশের তুলনায়, অপেক্ষাকৃত ভাল।

পশ্চিম ইয়োরোপের বণিকজাতিদের খাদ্যশস্য প্রভৃতি উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ ১৯২৫ সনে যুদ্ধের পূর্ব্ব অবস্থার চাইতে শতকরা ৭ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। লোকসংখ্যা কিন্তু সে অনুপাতে বৃদ্ধি পায় নাই।

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা (স্বর্ণ ছাড়া) এশিয়া ও ওশেনিয়া মহাদেশে যুদ্ধের পূর্ব্ব অবস্থার তুলনায় শতকরা ২০ হইতে ৪০ ভাগ উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু একমাত্র পেট্রোলিয়াম থাকার দরুণ মধ্য আমেরিকার উৎপাদন শতকরা ৭০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। মোটের উপর উত্তর ও মধ্য আমেরিকা, এশিয়া এবং ওশেনিয়া ভূখণ্ডের উৎপাদন ১৯১৩ সনের উপর গড়ে শতকরা ৩৩½ ভাগ বাড়িয়াছে।

১৯২৫ সনে ইয়োরোপের উৎপাদন-বিভাগে দ্রুত উন্নতির একমাত্র কারণ শস্যের মসুর্গ। খাদ্য ও কাঁচা মাল বাদ দিলে ইয়োরোপের উৎপাদন ১৯২৫ সনে ১৯১৩ সনের চাইতে শতকরা ১ হইতে ৩ ভাগ কম দেখা যায়। তবে রুশিয়ায় উল্লিখিত কাঁচা মাল উৎপাদনের পরিমাণ যুদ্ধপূর্ব্ব অবস্থার চাইতে এখনও কম আছে।

মোটের উপর অন্যান্য দেশের তুলনায় ইয়োরোপ যে তাহার ব্যবসা-বাণিজ্য অনেকটা হারাইয়াছে একথা বলা চলে। ইয়োরোপের আমদানি ও রপ্তানি শতকরা ১৫ ভাগ কমিয়াছে এবং অন্যদিকে উত্তর আমেরিকা, এশিয়া ও ওশেনিয়ার আমদানি-রপ্তানি শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯১৩ সনের তুলনায় ১৯২৫সনের ইয়োরোপের রপ্তানি প্রায় শতকরা ২০ ভাগ কম।

আমেরিকা ও এশিয়ার বৃদ্ধি

বিশ্ব-ব্যবসা-বাণিজ্যে উত্তর আমেরিকার হিস্যা ১৯১৩ সনে শতকরা ১৪ ভাগ ছিল। ১৯২৫ সনে ঐ সংখ্যা শতকরা ১৯·৩ ভাগে দাঁড়াইয়াছে। এশিয়ার হিস্যা ১২·৩ হইতে ১৬·০ উঠিয়াছে। কিন্তু ইয়োরোপের হিস্যা

রুশিয়াকে ধরিলে শতকরা ৫৮·৫ থেকে ৫০·০ আর রুশিয়াকে বাদ দিলে ৫৪·৬ থেকে ৪৮·৯ দাঁড়ায়।

উত্তর আমেরিকা ও জাপানে শিল্পবাণিজ্যের বহর অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র, ভারতবর্ষ, ক্যানাডা, জাপান, চীন, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, আর্জ্জেন্টাইন প্রভৃতি দেশের রপ্তানি ১৯২৫ সনে ১৯১৩ সনের চাইতে শতকরা ২১৪·৯ ভাগ অর্থাৎ ৬২,৪৪০ লক্ষ ডলার বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে গোটা ইয়োরোপের মাত্র শতকরা ৩২ ভাগ অর্থাৎ ৩৪,১০০ লক্ষ ডলার বৃদ্ধি পায়।

রুশিয়ার সচ্ছলতা

বোলশেভিক রুশিয়ায় আবার সুদিন ফিরিয়া আসিয়াছে। ঘরোয়া রাষ্ট্রবিপ্লব ও বিবাদ বিসংবাদের অনেকটা অবসান ঘটিয়াছে। দেশের লোক আর্থিক প্রচেষ্টার দিকে মনোযোগ দিতেছে। বড় বড় ইংরেজগণ বলিতেছেন—অদূর ভবিষ্যতে সোভিয়েট রুশিয়া 'সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা' হইয়া দাঁড়াইবে। রুশ রাষ্ট্রনায়কগণের মতে বিদেশী পুঁজি রুশিয়ার স্বদেশী শিল্প-ব্যবসায়ে ও আর্থিক জীবনে উন্নতির প্রবল সহায়। তাঁহারা সর্ব্বদাই বিদেশী পুঁজি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত।

কম্যুনিজ্‌মের ধাক্কায় যে সকল শিল্পী গ্রামে ফিরিতে বাধ্য হইয়াছিল, তাঁহারা গত দুই বৎসরে আবার শহরের শিল্প-কারখানায় ফিরিয়া আসিতেছে। শিল্পকারখানার কাজকর্ম্ম আবার অনেকটা পূর্ব্বের মত চলিতেছে। শিল্প-কারখানার কারিগরগণ বর্ত্তমানে সপ্তাহে ৯০ রুবল (২ পাউণ্ড ১০ শিলিং) করিয়া পাইতেছে। মজুরীর হার যুদ্ধের পূর্ব্বাবস্থার চাইতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রমিকদের সুবিধার জন্য সরকারী ব্যয়ে নূতন নূতন বাসগৃহ, আলোক ও যানবাহনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

অনেক গ্রামে বৈদ্যুতিক আলোর চলন হইয়াছে। গ্রামের কিষাণদের কর্ম্মপটুতা অনেকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সমবায় আন্দোলন জোর চলিতেছে। সাইবেরিয়ার মোট ২১০ লক্ষ লোকের অর্দ্ধাংশই সমবায়-সমিতির সভ্য। সমবায় আন্দোলন দ্রুত অগ্রসর হইতেছে এবং ইহাদ্বারা কিষাণ ও মজুরদের আর্থিক জীবনে এক পরিবর্ত্তন আসিয়াছে।

নেপালের সর্ব্বপ্রথম রেল লাইন

বিগত ১৬ই ফেব্রুয়ারী নেপালের আমলেখগঞ্জে সর্ব্ব-প্রথম মার্টিন কোম্পানীকর্ত্তৃক স্থাপিত ২৪ মাইল রেলের রাস্তা-নির্ম্মাণের উৎসব হইয়া গিয়াছে। বৃটিশ সীমান্তের রাক্সুল শহর হইতে নেপালের আমলেখগঞ্জ পর্য্যন্ত ২৪ মাইল রেলের রাস্তার উপর বর্ত্তমানে দস্তুরমত গাড়ী চলাচল করিতেছে। বৃটিশ-সীমান্ত হইতে নেপালের রাজধানী কাটা-মুণ্ড যাইতে পূর্ব্বে ঝাড়া তিন দিন লাগিত, আর সে খুব কষ্ট-সাধ্য ছিল। বর্ত্তমানে মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রেল, মোটর ও অন্যান্য আরামদায়ক যানবাহনে রাজধানী কাটামুণ্ডতে যাওয়া চলিবে।

চীন ও ভারত

উইক্‌লি ডেস্‌প্যাচের প্যারিসস্থিত সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, যতদিন সোভিয়েটদিগের প্রাবল্য থাকিবে, ততদিন বৃটেনই তাহাদের আক্রমণের প্রধান বস্তু হইবে। "ইকো ডি প্যারিসের" ষ্টক্‌হলমস্থিত সংবাদদাতা বলিতেছেন, সোভিয়েটদিগের ষড়যন্ত্রের সহিত পরিচিত একব্যক্তির মতে, সোভিয়েটদিগের প্রথম উদ্দেশ্য হইতেছে ভারতে বিবাদ ও বিদ্রোহের বীজ বপন করা।

এই উদ্দেশ্যে তাহারা কম্যুনিষ্টদিগকে টাকা দিয়া পোষণ করিয়া আসিতেছে এবং সমস্ত বিদ্রোহ-আন্দোলনকে সমর্থন করিবার জন্য তাহাদের প্রতি হুকুম হইয়াছে। মান্দ্রাজে একটি প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে এবং ভারতের সর্ব্বত্র বিশেষভাবে কারখানা এবং রেলওয়েসমূহে শাখাকেন্দ্র গঠিত হইয়াছে। কান্দাহার ও ব্রহ্মে অপর দুইটি প্রধান আড্ডা আছে। এই দুইটি আড্ডা আফগানিস্থানের সোভিয়েট সামরিক রাজদূতের কর্ত্তৃত্বাধীনে গঠিত হইয়াছে। এই শোভিয়েট রাজদূতের অধীনে বহুলোক আছে এবং তাঁহার প্রভূত অর্থবল আছে। শত শত ভারতীয় প্রচারক-দিগকে সোভিয়েট কলেজসমূহে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাদিগকে ভারতে পাঠান হইয়াছে। সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইয়া অসন্তোষ-প্রচারের জন্য তাহাদের প্রতি উপদেশ দেওয়া

হইয়াছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সোভিয়েট সরকার আশানুরূপ ফল পান নাই। তাঁহারা যত টাকা ব্যয় করিয়াছেন, ভাল বন্দোবস্তের অভাবে ততটা কার্য্য করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের আর এক অসুবিধা টাকা-প্রেরণ। এই জন্য প্রথমতঃ তাঁহারা তেহরাণ ব্যাঙ্কসমূহের সাহায্য লইয়াছিলেন; কিন্তু পরে এই সম্পর্কে রাজনৈতিক অসুবিধা ঘটে। অতঃপর তাঁহারা জহরতাদি প্রেরণ করেন। ইহাতে তাঁহাদের প্রভূত লোকসান হয়।

সোভিয়েট সরকার স্থির করিয়াছেন যে, চীনের মারফতে তাঁহারা ভারতে হস্তক্ষেপ করিবেন। এজন্য তাঁহারা ভারতের প্রধান কেন্দ্রকে চীনের ক্যান্টন শহরে স্থানান্তরিত করিয়াছেন এবং বরোদিনের উপর নেতৃত্বভার দিয়াছেন। চীনের প্রদীপে ভারতে আগুন জ্বালাইবার জন্যও তাঁহারা বরোদীনকে পরামর্শ দিয়াছেন।

স্যার অষ্টিন চেম্বারলেন জেনেভা যাত্রার পথে মস্কো সম্পর্কে ব্রিঁয়ার সহিত বিশেষভাবে আলাপ করিয়াছেন।

লণ্ডন শহরে বাড়ীভাড়া

লণ্ডনের নিউ কোর্টে মেসার্স রথচাইল্ড কোম্পানীর আফিসবাড়ীর ভাড়া আগে ছিল বাৎসরিক এক হাজার পাউণ্ড। মিয়াদ ফুরাইয়া যাওয়ায় এখন নূতন বন্দোবস্তে ছয় সাত গুণ অধিক ভাড়ায় অর্থাৎ বাৎসরিক সাত হাজার পাউণ্ড দিয়া কোম্পানীকে ঐ বাড়ী রাখিতে হইয়াছে।

১৬৬৮ সনে লম্বার্ড ষ্ট্রীটে যে জমির বার্ষিক খাজনা ছিল ২৫ পাউণ্ড, দুই শতাব্দীর মধ্যে অর্থাৎ ১৮৭৭ সনে ঐ জমির বার্ষিক খাজনা ২৬০০ পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছিল। এখন ঐ জমির জন্য বাৎসরিক ৭০০০ পাউণ্ড দিতে হয়।

ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ডের সন্নিকটস্থ স্থানের জমি প্রতি বর্গ ফুট ৭০ হইতে ৮০ পাউণ্ড মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে।

লণ্ডন শহর অপেক্ষা অনেক সময়ে শহরতলীর ভাড়া অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। দুই শত বৎসরের মিয়াদে ওয়েষ্টমিনিষ্টারে একটী বাড়ী প্রস্তুত হইয়াছিল। ঐ জমির বার্ষিক খাজনা ছিল ১০০ পাউণ্ড। সম্প্রতি মিয়াদ ফুরাইয়া যাওয়ায় ৫০,০০০ পাউণ্ড সেলামি এবং বার্ষিক ৪০০০ পাউণ্ড কর ধার্য্য করিয়া জমিতে নূতন বাড়ী প্রস্তুত হইতেছে। সাবেক বাড়ীর চেয়ে এই নূতন বাড়ীতে আরও চারিখানি দোকানঘর বাড়ান হইতেছে বলিয়া জমির মালিক আরও ১২০০০ পাউণ্ড অতিরিক্ত বার্ষিক কর ধার্য্য করিয়াছেন।

রিজেণ্ট ষ্ট্রীটে কয়েকখানা পুরানো বাড়ী ভাঙ্গিয়া নূতন করা হইয়াছে। আগে যে ঘরের ভাড়া ছিল বার্ষিক ২৮ পাউণ্ড, এখন নূতন বন্দোবস্তে উহা ২০০০ পাউণ্ড বাৎসরিক ভাড়ায় বিলি হইয়া গিয়াছে। কোন রাস্তার মোড়ের অতি ক্ষুদ্র একখানি দোকানের ভাড়া এখন বার্ষিক ৪৫০০ পাউণ্ড।

পিকাডিলির ডিভনসায়ার বিল্ডিং নামক বাড়ীটি জমি ও ইমারত সুদ্ধ ৭,৫০,০০০ পাউণ্ডে কেনা হইয়াছিল। এখন ঐ বাড়ীর বার্ষিক আয় ৩৭,০০০ পাউণ্ড।

লণ্ডন শহরে এখন কোন নূতন বাড়ী হইলে দোকান, আফিস ও বাসের জন্য অতি ভয়ঙ্কর রকমের কাড়াকাড়ি হয়। পিকাডিলির বড় রাস্তার ধারে একখানি সাধারণ দোকানের বার্ষিক ভাড়া এখন ৩৫০০০ পাউণ্ড। বার্ষিক ২৫০০০ পাউণ্ডের কমে তথায় কোন দোতলার ফ্লাট পাওয়া যায় না।

গত মহাসমরের পর লণ্ডন শহরের মধ্যাংশের ভাড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ষ্ট্র্যাণ্ডে ঠিক ডবল দাঁড়াইয়াছে। একখানি সামান্য দোকানকে এখন বার্ষিক ১০০০ পাউণ্ড ভাড়া দিতে হয়।

আগে লণ্ডন শহরের উত্তরাংশে লোকে দোকান করার খুব আগ্রহ প্রকাশ করিত এবং তজ্জন্য ঐদিকের ভাড়াও অপেক্ষাকৃত অধিক ছিল। কিন্তু এখন দক্ষিণাংশের উপর দোকানদারদিগের ঝোঁক পড়ায় উভয় অংশের ভাড়া প্রায় সমান দাঁড়াইয়াছে। লিসিষ্টার-স্কোয়ারে এক আফিসকে বার্ষিক ৯৯,০০০ পাউণ্ড ভাড়া দিতে হয়। ইহা ছাড়া জমির খাজনা টেক্স ও বীমার প্রিমিয়ামও ঐ আফিসকে বহন করিতে হয়।

দুনিয়ার লোক-সংখ্যা

১৯২৪ সনে দুনিয়ার লোক-সংখ্যা ১৮,৫৯০ লক্ষ অনুমান করা হয়। ঐ অঙ্ক আজ ১৯২৭ সনে প্রতি বৎসর ২ কোটি

হারে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯,৫৭০ লক্ষে পৌঁছিয়াছে। তুষার ও মরু প্রদেশ বাদ দিলে লোকের বসবাস প্রতি বর্গ-মাইলে ৩৮ জন হিসাবে দাঁড়ায়। লোকের বসতি সকল দেশে সমান নয়। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে (এক কিলোমিটার এক মাইলের ⅝ ভাগ) ইংল্যাণ্ড ও ওয়েল্‌স্‌ প্রদেশে ২৫১ জন, বেলজিয়ামে ২৪৫, ইতালীতে ১৩০, জার্ম্মাণিতে ১২৭, ফ্রান্সে ৭১, স্কটল্যাণ্ডে ৬৩, আইরিস ফ্রি ষ্টেটে ৪৬, স্পেনে ৪২, রুশিয়ায় ২৪ এবং নরওয়েতে মাত্র ৮ জন বসবাস করে।

আমেরিকায় মাদকনিবারণী প্রচেষ্টার সাফল্য

ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ধনবিজ্ঞানের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আর, ভি, ফিসার বলিয়াছেন যে, আমেরিকায় মাদক দ্রব্যের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ফলে দেশের স্বাস্থ্যবিষয়ক এবং সামাজিক ও আর্থিক যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ১৯১৪ সনে প্রতি দশ হাজারে ২৪ জন আমেরিকাবাসী চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি অসৎকার্য্যে লিপ্ত ছিল। ১৯২৫ সনে ঐ সংখ্যা হ্রাস পাইয়া মাত্র ছয় জনে দাঁড়াইয়াছে।

শাংহাইয়ের আর্থিক বিকাশ

শাংহাই ইংরেজের ব্যবসা-বাণিজ্যের এক বিরাট বন্দরে পরিণত হইয়াছে। আজ দুনিয়ার সঙ্গে চীনের ব্যবসা-বাণিজ্যের অর্দ্ধেক কারবার এই শাংহাই কেন্দ্রদ্বারা সম্পন্ন হয়।

১৮৪৩ সনের ১৭ই নবেম্বর এই শহরের আধুনিক জীবন আরম্ভ হয়। ঐ সময়ে প্রথম ২৮১ টনের ৭খানি বাণিজ্য-পোত ঐ বন্দরে প্রবেশ করে। তাহাদের আমদানি রপ্তানি পণ্যসম্ভারের মূল্য যথাক্রমে ৪,৩৩,৭২৯ ও ১,৪৬,০৭২ ডলার ছিল। বৃটিশ উপনিবেশিকের সংখ্যা ঐ সময়ে মাত্র ২৫ জন ছিল। ১৮৪৭ সনে ঐ সংখ্যা ১০৮ হয়। এবং ১৮৫৫ সনে হয় ২৫৪৩। আজকাল "আন্তর্জ্জাতিক উপনিবেশে" এবং শাংহাইয়ের আশে পাশে অর্থাৎ যাহাকে আজকাল 'কনসেশ্যন' বলা হয় সেখানে ৭,০০০ বৃটিশ, ১৩,০০০ জাপানী, ২,০০০ আমেরিকান, প্রায় ৩০০ ফরাসী, ৩,০০০ রুশ এবং অন্যান্য রাষ্ট্রশক্তির ৫,০০০ অধিবাসী বসতি স্থাপন করিয়াছে। ঐ অঞ্চলে চীনার সংখ্যা ৮,১০,০০০। ইহার মধ্যে ৫০,০০০ ক্যান্টন অঞ্চলের লোক।

শাংহাইতে বাড়ীঘর, জমাজমি ও অন্যান্য প্রকারের বৃটিশ মূলধন আছে ৬৩,০০০,০০০ পাউণ্ড। ঐ বন্দরে সরাসরি ৭৫০,০০০,০০০ চীনা টাকার কারবার হইয়া থাকে।

বৃটিশ রপ্তানির বৃদ্ধি

বোর্ড অব্ ট্রেডের ইস্তাহারে দেখা যায়, বিগত জানুয়ারী মাসে ১,১৩৬,০০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের মাল আমদানি ও ৫৫,৪২২,০০০ পাউণ্ড মূল্যের মাল রপ্তানি হইয়াছে।

গত ডিসেম্বর মাসের তুলনায় আমদানি ও রপ্তানি বিভাগে যথাক্রমে ২৮৮,০০০ ও ৫,৭১৪,৫০০ পাউণ্ড বৃদ্ধি পাইয়াছে।

স্পেন ও আকাশ পথ

১৯২৬ সনে স্পেন এই বিভাগে অনেকটা উন্নতি দেখাইয়াছে। স্পেন ও মরোক্কোর মধ্যে নিয়মিতভাবে আকাশযান যাতায়াত করিতেছে। এগুলি সৈন্য প্রেরণ ও আনয়নের কাজে ব্যবহৃত হইতেছে। যাত্রী-এরোপ্লেনের চলন এখনও হয় নাই। স্পেনে ডাক আনা-নেওয়ার কাজে অনেকস্থলে এরোপ্লেন ব্যবহৃত হইতেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের দশলক্ষ পাউণ্ডের চুক্তি

ইংরেজ যুক্তরাষ্ট্রকে পিট্‌স্‌বুর্গের গাল্‌ফ্ রিফাইনিং কোম্পানীর জন্য ৬ খানি তৈল-জাহাজ (অয়েল ট্যাঙ্ক ভেসেল) তৈয়ারী করিতে দিয়াছে। ১০ লক্ষ পাউণ্ডে এই চুক্তি হইয়াছে।

অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতিসাধন সমিতি

যশোহরের এই সমিতির বিষয় হয়ত অনেকেই কোনো খবর রাখেন না। ১৯০৯ সনে ইহা লর্ড সিংহ, আচার্য্য রায়, চিত্তরঞ্জন দাশ, কৃষ্ণকুমার মিত্র, সত্যানন্দ বসু, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, এস, আর, দাশ, নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র ইত্যাদি মহোদয়গণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময় হইতেই এই সমিতি বাঙ্গালাদেশের নিম্নতম স্তরের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। নমঃশূদ্র ইত্যাদি জাতির লোকেরাও ইহাদের নিকট অনেক-কিছু লাভ করিয়াছেন। বাঙ্গালাদেশের ২০৪ লক্ষ হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং বৈদ্য মাত্র ২৭ লক্ষ। বাকী সব শূদ্র বা তথাকথিত পতিত জাতি। অর্থাৎ বাঙ্গালার হিন্দুর শতকরা ৮৭ জন লোকই সমাজের নিম্নতম স্তরের। উচ্চশ্রেণীর লোকদের পা ছুঁইবারও তাহাদের অধিকার নাই। ইহাদের উদ্ধার করিতে না পারিলে আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ ভরসা কোন দিকেই নাই।

অর্থের অভাবের জন্য এই সমিতি ভাল করিয়া কার্য্য করিতে পারিতেছেন না। বাঙ্গালাদেশের গ্রামে ১০ টাকা হইলে একজন শিক্ষক দ্বারা একটি স্কুল চালানো সম্ভব হয়। ৪৲ টাকা হইলে একটি সাধারণ প্রাথমিক স্কুল চালানো যায়। সমিতি সাধারণের কাছে অর্থ-সাহায্য ভিক্ষা করিতেছেন। সমিতি বর্ত্তমানে সমগ্র বাঙ্গালাদেশে ৩৬২টি বিদ্যালয় চালাইতেছেন। বর্ত্তমানে সমিতির যে পরিমাণ টাকার দরকার, তাহা অপেক্ষা ৬৫০৲ টাকা কম আয় হইতেছে। এই ঘাটতি মিটাইয়া যদি সমিতিকে আরো ভালভাবে কাজ করিতে হয়, তবে সর্ব্বসাধারণের সাহায্য আবশ্যক। বাঙ্গালাদেশের সমর্থ লোকেরা যদি এই সমিতিকে প্রত্যেকে মাসে দুই আনা করিয়াও ভিক্ষা দেন তবে সমিতির এই কষ্টসাধ্য কার্য্য বহুলপরিমাণে সহজ হইয়া আসিবে। সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা—শ্রীরাজমোহন দাস, অবৈতনিক সেক্রেটারী, ১৪নং বাদুড় বাগান রো, কলিকাতা।

বঙ্গীয় সূত্রধর সম্মিলনী

বিগত ৮ই ফাল্গুন রবিবার ৩৮।৪ নং সাউথ রোড ইটালী, কলিকাতায় বিশ্বকর্ম্মাবংশীয় বঙ্গীয় সূত্রধরদের সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। কাঁচড়াপাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ভূষণচন্দ্র থৈ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুত শশিভূষণ দাস মহাশয়ের নেতৃত্বে সভার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

উদ্দেশ্য:—বঙ্গীয় সূত্রধর জাতি সমাজের নিম্নস্তরে পতিত হইয়া আছে। বৈদিক যুগের অবসানকালে ব্রাহ্মণযুগের প্রাধান্যসময় হইতে এই জাতি অনাচরণীয় ও অস্পৃশ্য। কিন্তু সূত্রধরের জাতিতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় যে, এই জাতি কোনক্রমে অন্যান্য উচ্চ জাতি হইতে হীন নহে। কারণ এই সূত্রধরজাতি দেবশিল্পী পরমপিতা বিশ্বকর্ম্মার বংশসম্ভূত। এই তথ্য পুরাণাদি গ্রন্থের প্রমাণসহ এই জাতির মধ্যে প্রচার, দ্বিজাতীয় সংস্কার গ্রহণ, শিক্ষাবিস্তার, জাতীয় একতা, পরস্পর প্রীতি ইত্যাদি সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য। শ্রীযুক্ত বনোয়ারিলাল খাঁ সভায় প্রস্তাব করেন যে, সূত্রধরদিগের আদিপুরুষ শ্রীশ্রী৺বিশ্বকর্ম্মা দেবের যথাবিহিত সেবাপূজা সম্পাদনার্থ একটী মঠ প্রস্তুত ও তন্মধ্যে বিশ্বকর্ম্মা দেবের পাষাণমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। এই প্রস্তাব এবং আরও কয়েকটি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব সভায় গৃহীত হইয়াছে।

বরিশালে বক্তৃতা

বাবু কালীমোহন ঘোষ গত সোমবার রাত্রিতে শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায়ের বাসায় ল্যাণ্টার্ণ সাহায্যে বক্তৃতা করেন। তাহাতে তিনি বোলপুর শান্তিনিকেতনের ছাত্রগণ কিভাবে বীরভূম জিলায় শ্মশান ও মরুভূমিকে শস্যশ্যামলা জনপদে পরিণত করিতেছেন তাহা প্রদর্শন করেন। কোথাও একটি গ্রামে ভীষণ জঙ্গল ছিল, ছাত্রগণ দলে দলে যাইয়া সে জঙ্গল আবাদ করিয়াছে, মশকপূর্ণ নালাগুলিকে পূর্ণ করিয়াছে, কলেরা বীজাণু ধ্বংস করিয়াছে, অনুর্ব্বর ভূমিসমূহ সার দিয়া উর্ব্বর করিয়াছে। তথাকার পেঁপে, ইক্ষু গাছ প্রদর্শন করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন, এখন সেখানকার জমি কেমন সুফলা। স্ত্রীলোক, পুরুষ, পিতৃমাতৃহীন ১১।১২ বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকাকে তাঁত-বয়ন, ফিতা-নির্ম্মাণ, কম্বল-বয়ন প্রভৃতি শিক্ষা দিয়া তাহাদের অর্থাগম-পন্থা সুগম করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তথায় দাতব্যচিকিৎসালয় করিয়া রোগীর চিকিৎসা ও সেবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সাহায্যকৃত পাঠশালাসমূহে ও অসাহায্যকৃত উচ্চইংরেজী বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকগণ ঐ বোলপুরের সাহায্যে শিক্ষিত হইয়া ক্রমে সকল অর্থকরী বিদ্যা জিলাময় বিস্তার করিয়াছেন। বক্তৃতাটী অত্যন্ত মনোরম হইয়াছিল।

ময়মনসিংহে বয় স্কাউট

বিগত ২৫শে ফেব্রুয়ারী স্থানীয় বয় স্কাউট এসোসিয়েশনের ডিষ্ট্রীক্ট কমিশনার শ্রীযুক্ত হেমন্তচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে মৃত্যুঞ্জয় স্কুলের ছাত্রগঠিত দ্বিতীয় ময়মনসিংহ বয়স্কাউট ট্রুপের উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে। ট্রুপ যথারীতি পরিদর্শন করিয়া কমিশনার মহোদয় স্কাউটদিগকে স্কাউট-মন্ত্রে দীক্ষাদান করিয়া স্বহস্তে 'ব্যাজ' প্রদান করেন। শহরের বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ নিমন্ত্রিত হইয়া স্কুলপ্রাঙ্গণে সমবেত হইয়াছিলেন ; স্কাউটদের অভিভাবকেরাও তথায় উপস্থিত ছিলেন।

স্থানীয় জিলাস্কুলের ট্রুপও উক্ত কার্য্যে যোগদান করিয়া উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। উক্ত স্কুলের ট্রুপ গত বৎসরেই গঠিত হইয়া ইতিমধ্যে কয়েকটী সদনুষ্ঠান করিয়াছে। ছাত্রগণের শারীরিক ও নৈতিক উন্নতি-বিধান এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃভাব বর্দ্ধিত করিয়া তাহাদিগকে নিজ নিজ পরিবারের, ক্রমে দশের ও দেশের প্রকৃত হিতসাধক তৈয়ারী করাই স্কাউটিংয়ের মূল উদ্দেশ্য।

শিল্প-শিক্ষায় সরকারী বৃত্তি

আমরা জানিতে পারিলাম যে, বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট এবার "কার্পাস-বস্ত্র-রঞ্জন ও সাবান-নির্ম্মাণের প্রণালী" শিক্ষা করিবার জন্য দুইজন ছাত্রকে বৃত্তি প্রদান করিয়া ইংলণ্ডে প্রেরণ করিবার আয়োজন করিতেছেন। যদিও ইহার খাঁটি সংবাদ প্রকাশিত হয় নাই, তথাপি যদি তাহা যথার্থই কার্য্যে পরিণত করা হয়, তবে এসম্পর্কে বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের পক্ষ হইতে আমরা সরকার বাহাদুরকে কিছু বলিয়া রাখিবার আবশ্যকতা অনুভব করিতেছি। বস্ত্রশিল্প বাঙ্গালার মুসলমানসম্প্রদায়বিশেষের জাতীয় পেশা-স্বরূপ এবং জীবিকার্জ্জনের একমাত্র পন্থা। অতীত যুগে এশিয়া মহাদেশে বস্ত্র-শিল্প মুসলমানদিগের হাতেই উৎকর্ষ ও উন্নতি লাভ করিয়াছিল। বর্ত্তমানে বস্ত্র-শিল্পের যাহা কিছু অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে, তাহা মুসলমানদিগের জন্যই আছে। যদি মুসলমানেরা উৎসাহ ও সাহায্য প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে এই বিলুপ্ত-প্রায় শিল্পের পুনরুন্নতি সাধিত হইতে পারে।

সাবান-নির্ম্মাণ-প্রণালী সম্পর্কেও স্থান-বিশেষের মুসলমানগণ এখনও লিপ্ত আছে। ঢাকা ও কলিকাতায় এখনও মুসলমানেরা সাবান প্রস্তুত করিয়া আসিতেছে। এক-কালে মুসলমানদের দ্বারা এই শিল্পেরও অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। নানা কারণে, বিশেষতঃ অভাবের দারুণ নিষ্পেষণে, তাহাও ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছে। যদি তাহারা সাহায্য ও সহানুভূতি প্রাপ্ত হয়, তবে যাহা বিদ্যমান আছে তাহারও উন্নতি হইতে পারে।

আমরা সরকার বাহাদুরকে বিশেষভাবে অনুরোধ করি, যদি দুইজন ছাত্রকে এই দুইটী আবশ্যক শিল্পের উন্নত প্রণালী শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে বৃত্তি-দানপূর্ব্বক ইংলণ্ডে প্রেরণ করা নিশ্চিতরূপে সাব্যস্ত হয়, তবে অন্ততঃ পক্ষে

একজন মুসলমান ছাত্র যেন সে বৃত্তি পাইতে পারে। আশা করি, বৃত্তি প্রদান বা প্রার্থি-নির্ব্বাচন-কালে কর্ত্তৃপক্ষ মুসলমান-সম্প্রদায়ের ন্যায্য দাবী সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবেন।

(নোয়াখালী হিতৈষী)

কৃষি ও বর্ত্তমান শিক্ষা

কৃষি-কমিশনের নিকট বঙ্গের শিক্ষাধ্যক্ষ মিঃ ওটেন্ যে জবানবন্দী করিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায়, বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতিই কৃষিকার্য্যের উন্নতির অন্তরায়স্বরূপ। তিনি স্পষ্টবাক্যেই বলিয়াছেন, পল্লীর অর্থনীতির সহিত বর্ত্তমান উচ্চ শিক্ষার সম্বন্ধ অতি অল্পই আছে। বিদ্যার্থিগণকে শহরে পরিচালিত ব্যবসায়ের উপযোগী করিবার নিমিত্তই এ দেশে উচ্চশিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। উচ্চশিক্ষা-প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের দিকে দৃষ্টি করিলেই শিক্ষাধ্যক্ষ বাহাদুরের উক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং শিক্ষিত-সম্প্রদায় যে পল্লী পরিত্যাগ করিয়া শহরে বাস করাই সুবিধাজনক মনে করিবেন, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। যে কৃষির উপর দেশবাসীর জীবন-মরণ নির্ভর করে, তাহার দিকে দৃষ্টি করার সুবিধাও শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের নাই। সম্ভবতঃ অনেকেই উহার আবশ্যকতাও অনুভব করেন না। ফলে এদেশে কৃষিকার্য্য উন্নতির পথে অগ্রসর না হইয়া অবনতির দিকেই দ্রুতগতিতে গড়াইয়া চলিয়াছে। ইহার প্রতিকারের জন্য বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন যে একান্ত আবশ্যক, মিঃ ওটেনও সে কথা স্বীকার করিয়াছেন। আমরা আশা করি, এদিকে গভর্ণমেণ্টের বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে এবং যাহাতে শিক্ষিতসম্প্রদায়ের প্রাণে পুনরায় পল্লীপ্রীতি জাগিয়া উঠে শিক্ষাপদ্ধতির তদ্রূপ পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া গবর্ণমেণ্ট দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন। (ঢাকা প্রকাশ)

ডুয়ার্স প্ল্যানটার্স এসোসিয়েশনের বাৎসরিক সভা

মিঃ সি, বেটম্যানের সভাপতিত্বে ডুয়ার্স প্ল্যানটার্স এসোসিয়েশনের বাৎসরিক সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। স্যর রোণাল্ড রস, ডাঃ বেণ্টলী, ডাঃ ষ্ট্রীকল্যাণ্ড, মিঃ ক্রফোর্ড (চেয়ারম্যান, ইণ্ডিয়ান টী এসোসিয়েশন), মিঃ ইঞ্চ (চেয়ারম্যান, দার্জ্জিলিং ডুয়ার্স টী এসোসিয়েশন), ডাঃ কার্পেণ্টার, মিঃ হার্লার, মিঃ টাউনএণ্ড, মিঃ সালিভ্যান, রায় বাহাদুর শরৎকুমার রাহা (আবগারী বিভাগের কমিশনার), বাবু জয় গোবিন্দ গুহ, বাবু বিপুলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু যোগেশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতি মিঃ বেটম্যান বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন যে, তিস্তার ভাঙ্গনে চা-ব্যবসায়ের যে অসুবিধা হয়, তাহা স্থায়িভাবে দূর করিবার চেষ্টা করা আবশ্যক। ফুলবাড়ী, শিভক বা মাদারীহাটের নিকট পুল তৈয়ারী করিয়া ই, বি, রেল কোম্পানীর সহিত বি, ডি, রেলওয়ের সংযোগের বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। দোমোহনীর স্থায়িত্বও অনিশ্চিত। এই বিষয়ে রেলবোর্ডকে জানান হইয়াছে। ডুয়ার্সে নূতন চা-বাগান খোলা খুব অন্যায় ও ভ্রমাত্মক। শ্রমিকের অসুবিধাই প্রধান অসুবিধা। এতদ্ব্যতীত চাষোপযোগী জমির অল্পতা-হেতু স্থানীয় বাসিন্দাদের জীবন-ধারণে কষ্ট হয়। এই বিষয়ে সরকারকে জানান হইয়াছে, সরকারের মতামত জানা যায় নাই। ফ্যাক্টরী আইন কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা উচিত বলিয়া মনে হয়। তৎপর হাটের উপর মদের দোকান স্থাপনে সভাপতি মহাশয় আপত্তি জানান। কুলিগণ হাটে অনবরত যাতায়াত করে বলিয়া লোভ সংবরণ করা সম্ভবপর হয় না। কিন্তু ঐ দোকানগুলি হাট হইতে দূরে স্থাপিত হইলে কুলিদের কম অনিষ্ট হয়। বেশী উগ্র মদ বিক্রী হওয়ায় কুলিদের স্বাস্থ্য অতি খারাপ হয়। এ বিষয়ে সরকারের লক্ষ্য করা উচিত।

তৎপর স্যর রোণাল্ড রস বক্তৃতায় বলেন যে, তিনি ২৮ বৎসর পূর্ব্বে জলপাইগুড়ি জেলার যে অবস্থা দেখিয়াছেন বর্ত্তমানে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অতি সুখের কথা চা-ব্যবসায়ের বিশেষ সমৃদ্ধি-লাভ হইয়াছে। ব্যবসায়ের সমৃদ্ধির সহিত স্বাস্থ্যের উন্নতিও তিনি আশা করেন। মালয়া প্রদেশে মশকপূর্ণ স্থান যে ভাবে নষ্ট করা হইতেছে, এ

জেলায়ও সেই ভাবে কার্য্য করা যাইতে পারে। সেজন্য যে খরচ প্রয়োজন তাহা সমৃদ্ধিশালী ব্যবসায়িগণ বহন করিতে পারিবেন। পানীয় জল অনেক রোগের জন্য দায়ী এবং কালাজ্বর প্রভৃতি ম্যালেরিয়ারই রূপান্তর।

তৎপর ডাঃ ষ্ট্রীক্‌ল্যাণ্ড বলেন যে, বঙ্গদেশের শতকরা ৭৫ জন ব্যক্তির প্লীহার অবস্থা অস্বাভাবিক। শিশুগণের প্লীহার অবস্থা আরও খারাপ।

ডাঃ বেণ্টলী বলেন, ১৯০৬ সনে তিনি ও কর্ণেল ক্রিস-টোফার ম্যালেরিয়া দূরীকরণোদ্দেশ্যে এই জেলায় আসেন। জঙ্গল পরিষ্কার করিলে ম্যালেরিয়া দূর হইবে, তখন সরকারের এই ধারণা ছিল। সরকার ঐ সময় বাৎসরিক ৫০ হাজার টাকা এই কার্য্যে ব্যয় করিতেন। তিনি ও কর্ণেল ক্রিস-টোফার মিনগ্লাস চা-বাগানের নিকট মশক-প্রধান স্থান পরিষ্কার করেন। কিন্তু বেশী পরিমাণ জায়গা পরিষ্কার করিতে না পারায় ঐ সময় ওখানকার স্বাস্থ্য ভাল করিতে পারেন নাই। ডাঃ বেণ্টলীই আসানসোলের ন্যায় ডুয়ার্সে পাবলিক হেলথ বিল প্রবর্ত্তনের জন্য মত প্রকাশ করেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় উহা এখনও আইনে পরিণত হয় নাই।

তৎপর মিঃ কার্পেণ্টার ও হার্লে চা-বিষয়ে বিশেষজ্ঞের মত প্রকাশ করেন।

আগামী বৎসরের জন্য মিঃ জি, ই, লুয়ার্ড, ডুয়ার্স প্ল্যাণ্টার্স এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

(ত্রিস্রোতা)

ভারতীয় নারী ও আর্থিক প্রচেষ্টা

দেশের আর্থিক উন্নতিতে ভারতীয় নারীর দান কতটা, সেই প্রসঙ্গে শ্রীমতী এস, ভি, রাও ইণ্ডিয়ান রিভিউতে লিখিয়াছেন, 'কৃষক পত্নী ও কৃষক পরিবারের অন্যান্য মেয়ে-লোক চাষ-আবাদ, শস্য কাটা, মলা প্রভৃতি মাঠের কাজে কৃষকের যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকেন। গো, মহিষ প্রভৃতি গৃহপালিত পশু-পালন ও তাহাদের দুগ্ধ-দ্বারা ছানা, মাখন, ঘী প্রভৃতি প্রস্তুত করা ও পরিবারের অন্যান্য আর্থিক উন্নতির ব্যবস্থা করা মেয়েদের অন্যতম কাজ। মেয়েরা চরকা ও তাঁতের কাজ করিয়া থাকেন। এছাড়া অন্যান্য শিল্প-কর্ম্মও তাঁহারা করেন।

শিল্প-কারখানায় ভারতীয় মহিলা-শ্রমিক অনেক কম। ৬২০ লক্ষ মেয়ে-মজুরের মধ্যে ৪০০ লক্ষ (১৫ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্ক) কারখানার কাজ করেন। বাংলায় শতকরা ১১·৮ ভাগ মেয়ে-মজুর আছে। বোম্বাইতে আছে ১৮·৩ ভাগ। মাদ্রাজে ১৫·৯, পাঞ্জাবে ১০·৭ ও যুক্ত প্রদেশে ৮·৩ ভাগ।

মেয়েদের আয়ের পথ

বেঙ্গল এডুকেশনাল কনফারেন্সে শ্রীমতী হকিন্স বলিয়াছেন, "ভারতে শিক্ষিতা মেয়েদের রোজগারের পথ খুব অপ্রশস্ত। শিক্ষকতা ও সেবার কাজ (নার্সিং) মেয়েরা করিয়া থাকেন; কিন্তু এই দুই বিভাগের বেতন যারপর নাই সামান্য। স্কুল ও হাঁসপাতালের চাইতে শিল্প-কারখানায় বেশী মাহিয়ানার সম্ভাবনা থাকিলে সম্ভবতঃ তাঁহারা শিল্প-কারখানায় ঢুকিতে প্রস্তুত আছেন। তবে এ দেশের মেয়েরা শিল্প-কারখানার কাজ পছন্দ করেন না। হাঁস-পাতাল ও স্কুলের কাজই মেয়েদের পক্ষে শোভন বলিয়া তাঁহাদের ধারণা।

আমেরিকার ঐশ্বর্য্য

প্লিমাউথ শহরের এক প্রীতিভোজে আমেরিকান রাজ-দূত শ্রীযুক্ত অ্যালানসন্ বি, হাফটন এক বক্তৃতায় বলেন, "আমরা যখন আমেরিকা ও বৃটেনের পরস্পর সম্বন্ধের বিষয়ে আলোচনা করিতে বসি তখন ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়াও অন্যান্য কথা আমাদের মনে পড়ে। আমাদের ভাষা, গোত্র, ধরণ-ধারণ এবং জীবন ধারণের মাপকাঠি ও উদ্দেশ্য যে এক একথা বলাই বাহুল্য। এরকম দুইটি প্রবল জাতির সৌহার্দ্দ মানুষের ইতিহাসে এক অভিনব জিনিষ। ইহা হইতে ভবিষ্যতে অনেক আশা করা যায়।

"আমেরিকার আর্থিক সম্পদের জন্য বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। ঠিক আপনাদের ইংল্যাণ্ড যেমন কৃষি-প্রধান দেশ হইতে শিল্প-প্রধান দেশে পরিণত হইয়াছে, আমরাও

তেমনি চাষ-আবাদ ছাড়িয়া শিল্প-ব্যবসার দিকে বেশী ঝুঁকিয়া পড়িয়াছি। আজ আমেরিকাবাসিগণ যাহা সম্পন্ন করিতেছেন তাহা ক্ষণস্থায়ী বা গলদপূর্ণ একথা বলা চলে না। বর্ত্তমানে দুনিয়ার জনসংখ্যার শতকরা ৬ ভাগ মাত্র আমেরিকাবাসী এবং জগতের শতকরা ছয় ভাগ জমাজমি মাত্র আমেরিকা-বাসীর তাঁবে। এখন ব্যাপার দেখুন! এই শতকরা ছয় ভাগ লোক কিন্তু দুনিয়ার গমের শতকরা ২৫ ভাগ অর্থাৎ সিকি চাহিদা মিটাইতেছে এবং গম ছাড়া অন্যান্য খাদ্য-শস্যের শতকরা ৫০ ভাগ সরবরাহ করিতেছে। দুনিয়ার চাহিদার শতকরা ৩৮ ভাগ কয়লা আমেরিকার খনি হইতে উঠে। দুনিয়ার ৭০ ভাগ পেট্রোলিয়াম (তেল) উৎপন্ন করে আমেরিকা। এ ছাড়া, শতকরা ৫৪ ভাগ তামা এবং শতকরা ৫০ ভাগ লোহা অর্থাৎ দুনিয়ার মোট উৎপন্ন লোহার অর্দ্ধেক আমেরিকার মাটিতে ফলে। দুনিয়ার ৬০ ভাগ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন, দুনিয়ার ⅓ অংশ রেল সড়ক এবং ৫ ভাগের ৪ ভাগ মোটর গাড়ী এই আমেরিকা ভূখণ্ডে আমাদের বিভিন্ন প্রদেশের দূরত্ব হ্রাস করিতেছে, ইহাতেও আশ্চর্য্যের কিছু নাই। বরং ইহাই স্বাভাবিক।

আপনারা আমেরিকার ঐশ্বর্য্যের সম্বন্ধে আজকাল ঢের বক্তৃতা শুনিয়া থাকিবেন। এই ঐশ্বর্য্যের একটা ফিরিস্তি দিবার মত স্পর্দ্ধা আমার নাই। কিন্তু আপনারা এইটুকু জানিয়া রাখিতে পারেন যে, আমরা এমন অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছি, যেখানে শিল্প-কারখানার প্রত্যেক কারিগরের গড়ে ১,২০০ পাউণ্ড মূলধন বিভিন্ন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে খাটিতেছে। কাজে কাজেই ঐ ব্যক্তি ৪টি অশ্ব-শক্তির মালিক। এক অশ্বশক্তি ১০ জনের সমবেত শক্তির সমান বলিয়া ধরা হয়। ইহা হইতে দেখা যায় যে, একজন শিল্পী তাঁহার উৎপাদনের কাজে কলকারখানার সাহায্য গ্রহণ করায় তাহার উৎপাদিকা-শক্তি ৪০ গুণ বৃদ্ধি করিয়াছেন। আমাদের শিল্প-কারখানার ২ কোটি কারিগর বস্তুতঃ ৮০ কোটি লোকের কাজ করিতেছেন।

আমাদের দেশের ধনোৎপাদনের কাজ কি ভাবে চলিতেছে তাহা এইবার বলিব। উৎপাদন-বিভাগে পুঁজি, পরিচালনা এবং শ্রম এই তিনের সাহায্যে কাজকর্ম্ম চলিতেছে। পুঁজিপতি, পরিচালক এবং শ্রমিক এই তিন শ্রেণীর লোকই যখন পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষ্যা পোষণ করিয়া বিবাদ-বিসংবাদ জাগাইয়া রাখাই স্ব স্ব স্বার্থ-সিদ্ধির উপায় বলিয়া মনে করিতেন, সে দিন চলিয়া গিয়াছে। প্রত্যেকেই যখন অনির্দ্দিষ্ট মুনাফা পাইয়া সন্তুষ্ট থাকিত তখনই এইরূপ ধারণার সার্থকতা ছিল। আজকাল লোকে বুঝিতে পারিয়াছে যে, ধনোৎপাদনের কাজে এই বিভিন্ন শক্তির সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাকৃত সাহায্যের প্রয়োজন। শিল্প-ব্যবসায়ে আজকাল সদিচ্ছা ও সাম্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আজকালকার শিল্প-প্রতিষ্ঠানে প্রত্যেক লোক তার শক্তি ও অর্থ যেরূপ খাটাইয়া থাকেন, তার প্রতিদানও উপযুক্তরূপে তাহাকে দেওয়া হয়। ইহার ফলে আমেরিকায় সামান্য শ্রমিকও পুঁজিপতি হইতেছেন। এটা খুবই আশার কথা যে, শিল্প-জগতে এক নয়া বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে।

জাহাজে বিশ্ববিদ্যালয়

বোম্বাইয়ের এক সংবাদে প্রকাশ গত ২রা জানুয়ারী আমেরিকা হইতে এস, এস রিণ্ডাম নামক একখানা জাহাজ আসিয়া বোম্বাই পৌছিয়াছে, ইহা আয়তনে এত বড় যে, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সমুদয় আসবাবই ইহাতে আছে। ইহাতে ১৫ হইতে ২৪ বৎসর বয়স্ক ছাত্র ও ছাত্রী ৪৮৮ জন আছে। তন্মধ্যে বালিকা ৫৩ জন, প্রফেসর ৬৬ জন এবং ২৫৪ নাবিক আছে। কলেজ-গৃহ, লেবরে-টরী, খেলার মাঠ, হষ্টেল প্রভৃতি সমস্তই রহিয়াছে। ইহারা বোম্বাইএ ছয় দিন থাকিয়া পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ দর্শন করিবে। বোম্বাইএ আসিবার পূর্ব্বে ইহারা চীন, শ্যাম, সিঙ্গাপুর, লঙ্কা প্রভৃতি স্থানও ঘুরিয়া আসিয়াছে। ক্যানস্যাসের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর মিঃ এইচ, এলেনও এই জাহাজে আছেন। গত ১৮ই সেপ্টেম্বর এই জাহাজখানি নিউইয়র্ক শহর হইতে যাত্রা করিয়াছে। ১২৫ দিনে ইহার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করার কথা। প্রাতে ও সন্ধ্যায় রীতিমত ক্লাস বসিয়া থাকে।

রিক্‌সওয়ালার ব্যবসা

[কলিকাতার এক রিক্‌সওয়ালার সঙ্গে শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে'র যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল নিম্নে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে। স্মৃতি হইতে লিখিত।]

প্রশ্নঃ—রিক্‌সওয়ালা, তুমি আজ বেশী ভাড়া চাহিতেছ কেন? যাওয়া-আসায় ॥० আনা বেশী মনে হইতেছে। এই সেদিন হ্যারিসন রোড হইতে জোড়াবাগান অবধি আসিলাম মাত্র দশ পয়সায়।

উত্তর—আপনি সেদিন দিনের বেলায় আসিয়াছিলেন। এখন যে রাত্রি।

প্রঃ—তাতে কি?

উঃ—দিনের চেয়ে রাতে পথচলা বেশী কঠিন।

প্রঃ—কঠিন কেন তা বুঝিতেছি না। বরং মনে হইতেছে, বিকাল বেলা অত্যন্ত ভীড়ের মধ্যে রিক্‌স লইয়া ছুটার চেয়ে রাতে চলা কম কষ্টসাধ্য।

উঃ—তবে আপনাকে আসল কথা খুলিয়া বলিতেছি। দেখিতেছেন ত আজ রিক্‌স কিরূপ দুষ্প্রাপ্য?

প্রঃ—তা দেখিতেছি বটে। কিন্তু কারণটা কি বলত।

উঃ—আজ বহু রিক্‌সওয়ালাকে পুলিশে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

প্রঃ—তাদের অপরাধ?

উঃ—আপনি জানেন না বোধ হয়, আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে একটা করিয়া 'ফুটুক্‌" রাখিতে হয়। পুলিশ দেখিতে চাহিলেই এই "ফুটুক্‌" খুলিয়া দেখাইতে হয়। না দেখাইতে পারিলেই পুলিশ ধরিয়া থানায় লইয়া যাইবে।

প্রঃ—ফুটুক্‌ কি?

উঃ—চেহারা। আপনাকে আপনার বাড়ীর গোড়ায় নামাইয়া দিয়া দেখাইব এখন।

প্রঃ—আজ তুমি কত উপার্জ্জন করিয়াছ?

উঃ—সন্ধ্যা হইতে খাটিয়া ১৲ টাকা পাইয়াছি। আপনার নিকট ॥० আনা পাইলে ১॥० হইবে।

প্রঃ—'সন্ধ্যা হইতে খাটিয়া' কেন বলিতেছ? তুমি কি আজ দিনের বেলা একদম রিক্‌স চালাও নাই?

উঃ—আপনি দেখিতেছি আমাদের দস্তুর জানেন না। এই রিক্‌সখানা দিনের বেলা অন্য লোকে চালায় ও রাতে আমি চালাই।

প্রঃ—কত রাত অবধি চালাও?

উঃ—রাত দুটা অবধি।

প্রঃ—এই রিক্‌সখানি কি তবে তোমার নয়?

উঃ—আমার মত গরিব লোকের সাধ্য কি এমন একখানা রিক্‌স কিনিবে?

প্রঃ—এই রিক্‌সখানির কত দাম হইবে বলিয়া মনে কর?

উঃ—এখানি ১৭৫৲ টাকায় কেনা।

প্রঃ—কত পর্য্যন্ত দামী রিক্‌স কলিকাতার সড়কের উপর চলিতেছে, বলিতে পার?

উঃ—সাধারণতঃ ১৫০।১৭৫।২০০ টাকার রিক্‌সই দেখিতে পাইবেন। খুব ভাল জাপানী রিক্‌স কিনিতে শুনিয়াছি ২২৫।২৫০ টাকা লাগে।

প্রঃ—তুমি যে রিক্‌সখানা চালাইতেছ তা কতদিন চলিবে মনে কর?

উঃ—সাধারণতঃ খুব কম দামের না হইলে বছরখানেকের পূর্ব্বে কোনো রিক্স সারাইবার দরকার হয় না। সারাইয়া লইলে আরও বছরখানেক চলিতে পারে।

প্রঃ—তোমার এই রিক্সখানি যার, সেই মহাজনের আরো রিক্স আছে?

উঃ—হাঁ, তিনি বড় লোক। তাঁর আরো অনেক রিক্স ভাড়া খাটিতেছে।

প্রঃ—মহাজনের সঙ্গে তোমার কিরূপ বন্দোবস্ত আছে? তোমার প্রতিদিনের উপার্জ্জনের কত অংশ তুমি তাঁকে দাও।

উঃ—আমাদের অংশ-হিসাবে মহাজনকে দিতে হয় না।

প্রঃ—তবে কি হিসাবে দেও?

উঃ—সকলে সমান দেয় না। ।/০ হইতে ॥৵০ পর্য্যন্ত রেট।

প্রঃ—তোমরা এই পয়সাটা কি খেয়াল-মাফিক দিয়া থাক, না খরচপত্র, লাভ-লোকসান ইত্যাদি হিসাব করিয়া ভাড়া ঠিক কর?

উঃ—হিসাব আছে। প্রথম শ্রেণীর রিক্সগুলির জন্য দিনে ॥০, ॥/০ ॥৵০ দিতে হয়। খুব ভাল জাপানী রিক্স হইলে ॥৵০ আনাও দিতে হয়। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর রিক্স ৵০, ।৵০, ।৵০ দিলেই পাওয়া যায়।

প্রঃ—প্রথম শ্রেণীর কোন্‌গুলি আর দ্বিতীয় শ্রেণীরই বা কোন্‌গুলি?

উঃ—গাড়ীর ভাল-মন্দ অনুসারে শ্রেণী হয়। বুঝিতেই পারিতেছেন গাড়ী যত ভাল চলিবে ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইবে তত তার সোয়ারি বেশী মিলিবে।

প্রঃ—তোমার এই রিক্সখানির জন্য তুমি কত দিয়া থাক?

উঃ—॥৵০ আনা।

প্রঃ—প্রতিদিন তুমি কত করিয়া উপার্জ্জন কর?

উঃ—তার কোনো ঠিকানা নাই। এক একদিন এক এক রকম উপার্জ্জন করিয়া থাকি—১॥০, ২৲, ২॥০।

প্রঃ—অন্য সকলে?

উঃ—সকলেরই প্রায় এক রকম।

প্রঃ—২॥০ টাকার বেশী কেহ পায় না?

উঃ—এখন দিনকাল খারাপ পড়িয়াছে। সাধারণতঃ ১॥০ টাকা বা ২৲ টাকার বেশীই কেহ পাই না। ২॥০ টাকা কচিৎ মিলে।

প্রঃ—দিনকাল খারাপ পড়িয়াছে কেন বলিতেছ?

উঃ—আগে আমরা যত বেশী সংখ্যায় সোয়ারি পাইতাম আজকাল তা পাই না। রিক্স গাড়ীর সংখ্যা এত বাড়িয়া গিয়াছে ও ক্রমাগত বাড়িতেছে যে আমাদের আয় কমিয়া যাইতেছে।

প্রঃ—আগে তবে এর চেয়ে বেশী পাইতে? খুব বেশী যখন পাইতে তখন কত পাইতে?

উঃ—৩৲ টাকা—কখনো ৩॥০, ৪৲ টাকাও পাইতাম।

প্রঃ—আয় কমিবার আর কোনো কারণ আছে কি?

উঃ—আগে ট্রাম ছিল। কিন্তু ট্রাম দ্রুতগামী নয়। আজকাল দ্রুত বাসের চলন হওয়ায় আমাদের অসুবিধা ঘটিয়াছে। মোটর গাড়ীর ॥০ আনা রেট করায়ও আমাদের ক্ষতি হইবে। তা ছাড়া, এই "লড়াই"য়ের জন্য আমাদের ভয়ানক ক্ষতি হইয়াছে।

প্রঃ—কোন্ "লড়াই"?

উঃ—কলিকাতার বুকের উপর এই যে হিন্দু-মুসলমানের লড়াই হইয়া গেল।

প্রঃ—তুমি সেই সময় কলিকাতার সড়কের উপর রিক্স চালাইতে পার নাই বুঝি?

উঃ—রিক্স চালানো দূরে থাকুক, তখন প্রাণ লইয়া পলাইতে পারিলে বাঁচি। ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ রাখিয়া তখন আমরা সব ঘর-মুখে ছুটিয়াছিলাম। আমি ত পায়ে হাঁটিয়া আমার দেশে গিয়া উপস্থিত হইলাম। বহু দিন একটা পয়সাও উপার্জ্জন করা হয় নাই।

প্রঃ—আচ্ছা রিক্স-ওয়ালা, তুমি বলিতেছিলে এই রিক্স-খানা তুমি রাতে চালাও। সারাদিন তুমি কি কর?

উঃ—বসিয়া থাকি।

প্রঃ—বসিয়া কেন থাক? অন্য কোনো কাজ-কর্ম্ম কেন কর না? করিলে ত তোমার আয় কিছু বাড়িয়া যায়।

উঃ—দিনের বেলা যদি অন্য কোনো কাজ করিতে যাই ত আমার পক্ষে সারা রাত রিক্‌স লইয়া ছুট্ ছুট্ করিয়া ছুটা সম্ভব হয় না। আমাকে খাইয়া দাইয়া, শুইয়া ঘুমাইয়া রাতের কাজের জন্য প্রস্তুত হইতে হয়।

প্রঃ—তোমাদের রাত ও দিনের ভাগটা কিরূপ?

উঃ—দিনের বেলা ভোর ৫টা হইতে বিকাল ৪টা পর্য্যন্ত একজনে টানে, আবার ৪টা হইতে রাত ৪টা পর্য্যন্ত অন্য একজন টানে।

প্রঃ—আচ্ছা তুমি নিজের খাওয়ার জন্য কত করিয়া খরচ কর?

উঃ—সারাদিনে খাওয়ার জন্য খরচ করি মোট ⅟৹ আনা।

প্রঃ—প্রত্যেক রিক্‌সওয়ালাই কি প্রতিদিন এইরূপ খরচ করে?

উঃ—আমাদের প্রতিদিনের খাই-খরচ সাধারণতঃ ।৹, ।⅟৹, ।৵৹র মধ্যে। সম্ভবতঃ ।৵৹ আনার বেশী কেহ খরচ করে না।

প্রঃ—পুলিশের নিকট হইতে তোমাকে লাইসেন্স লইতে হইয়াছিল?

উঃ—হাঁ।

প্রঃ—তোমার কত খরচ পড়িয়াছিল?

উঃ—এই যে আপনার বাড়ীর দোর-গোড়ায় আসিয়া পৌছিয়াছি। আপনাকে "ফুটুক" দেখাইব বলিয়াছিলাম। এই দেখুন। ইহা আমার চেহারা। এটা পাশ বই। এই বইয়ের মধ্যে আমার চেহারাটা আঁটা রহিয়াছে। আর ইহার একটা নকল পুলিশের কাছে আছে। পুলিশকে ইহা দেখাইতে না পারিলে পুলিশ ধরিয়া লইয়া যাইবে।

প্রঃ—পুলিশ ধরিয়া চালান দিলে তোমাদের বুঝি জরিমানা হয়?

উঃ—হাঁ।

প্রঃ—কত জরিমানা হয়?

উঃ—তার কোনো ঠিক নাই। ।৹, ॥৹ আনা হইতে ১৲, ২৲, ৫৲ টাকাও হইতে পারে। এই "ফুটুকের" জন্য আমার ॥৹ আনা খরচ হইয়াছে, লাইসেন্সের জন্য ।৹ আনা, আর আবেদন পত্রে গিয়াছে ৵৹ আনা। এইরূপে আমি আগামী অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত হইয়াছি।

প্রঃ—তোমাকে এ পর্য্যন্ত জরিমানা দিতে হয় নাই?

উঃ—বেশী জরিমানা দিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। একবার দিয়াছিলাম। লাইসেন্সের মিয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরেও রিক্‌স চালাইয়াছিলাম বলিয়া ॥৹ আনা জরিমানা দিতে হইয়াছিল।

প্রঃ—তোমাকে আর একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব, তারপর বিদায়। তোমাদের রিক্‌সওয়ালাদের কোনো "ইউনিয়ন" সভা আছে কি?

উঃ—আপনি কি "কমিটি"র কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন?

প্রঃ—কাকে তুমি 'কমিটি' বলিতেছ?

উঃ—যেখানে সময়-বিশেষে অনেক রিক্‌সওয়ালা একত্র হইয়া গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করে।

প্রঃ—কি রকম গুরুতর বিষয়?

উঃ—যেমন, গত লড়াইয়ে আমাদের ভীষণ ক্ষতি হইয়াছিল। আমরা "কমিটি"তে সেই বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছিলাম ও নিজ নিজ মহাজনের কাছে নিজেদের দুঃখ-ধান্ধার কথা নিবেদন করিব ঠিক হইয়াছিল।

প্রঃ—তোমাদের এই কমিটি কি প্রতি মাসে বসে?

উঃ—না, ইহার বসিবার কোনো দিনক্ষণ নাই। ৯ মাসে ৬ মাসে হয়ত বসে।

প্রঃ—বাবুভায়ারা কি কখনো তোমাদের এই সব কমিটিতে আসেন?

উঃ—কচিৎ কখনো হয়ত আসেন।

প্রঃ—তোমাদের এই কমিটির আড্ডা কোন্‌খানে?

উঃ—মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে।
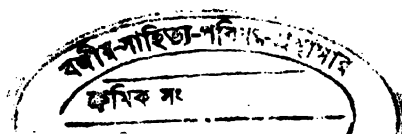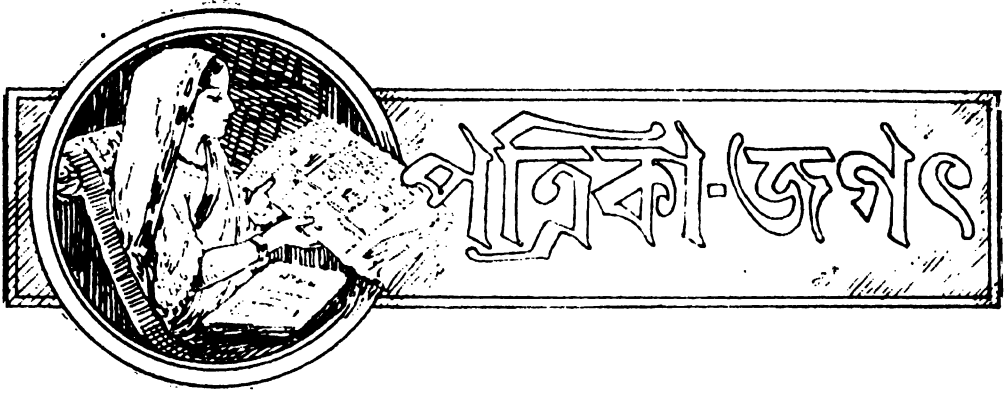
১। করিয়েরে দেল্লা সেরা

(ইতালিয়ান সান্ধ্য পত্রিকা, মিলান)

বিদেশে ইতালিয়ান মজুর

বহির্গমন বা লোক-রপ্তানি-বিষয়ক ইতালির সরকারী দপ্তর হইতে দেশবিদেশের মজুর ও মজুরি-বাজার সম্বন্ধে নানা তথ্য বাহির হইয়াছে। বিভিন্ন দেশে ইতালিয়ান নর-নারীর কর্ম্ম-সুযোগ কতটা, সেই বিষয়ে বিশদ বিবরণ দেওয়া আছে। "বৃহত্তর ইতালির" কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। কোন্ দেশে ইতালিয়ান মজুর কিরূপ কর্ম্মক্ষেত্রে বাহাল আছে তাহার বৃত্তান্ত ও সঙ্কলন করা হইয়াছে। দেশগুলার নাম বর্ণমালা অনুসারে সাজাইবার রীতি দেখা যায়।

"বৃহত্তর ইতালি"র অর্থ-কথা

বিদেশী বর্ণমালার ক্রমহিসাবে আলবানিয়া নামক ছোট দেশের খবর প্রথমেই পড়িয়াছে। আল্বানিয়া হইতেছে আড্রিয়াতিক সাগরের পূব কিনারায়,—ইতালির অপর পারে। এই দেশে ইতালিয়ান খাটিতেছে মাত্র ২৫০ জন। এই সংখ্যার ভিতর ৪০ জন করে পুরুতগিরি। একটা বড় সাঁকোর পুনর্গঠন চলিতেছে। তাহাতে ইতালিয়ান মজুরেরা কাজ পাইয়াছে।

তারপর অষ্ট্রীয়ার খবর। এই দেশে ইতালিয়ানরা ইট তৈয়ারী করিবার কারখানায় মজুরি করে। তাহা ছাড়া মাটি খুঁড়ার কাজেও ইতালিয়ান মজুরদিগকে দেখা যায়। "জেলাতি" নামক কুল্পী বরফ তৈয়ারী করিয়া ফিরি করা ইতালিয়ানদের অন্ত. এক ব্যবসা। মিঠাইয়ের দোকান চালাইয়া ইতালিয়ানরা কিছু-কিছু পয়সা রোজগার করিতেছে।

বেলজিয়ামে খাটিতেছে ৮,০০০ ইতালিয়ান মজুর। বুলগেরিয়া দেশে ইতালিয়ান নরনারীর সংখ্যা ১৫০০। ইহাদের ভিতর ৫০ জন মাত্র খাটি মজুর। অধিকাংশই বণিক, কেরাণী অথবা অন্যান্য "ভদ্রলোক" শ্রেণীর অন্তর্গত।

সাইপ্রাস দ্বীপে ১৫০ ইতালিয়ান বসবাস করে। ইহারা কেহই বোধ হয় মজুর-শ্রেণীর লোক নয়। সকলেই ব্যবসায়ীর দোকানের কেরাণী অথবা স্বাধীন ব্যবসার লোক। ২৫০ জন ডেন্মার্কে বসবাস ও কাজকর্ম্ম করে। ফিন্ল্যাণ্ড দেশে ইতালিয়ান মজুরের কোনো ঠাঁই নাই। মাত্র ১২ জন সেখানে বসবাস করিতেছে এক জেলায়। হেলসিং ফর্স অঞ্চলে ১৩০ জন ইতালিয়ান রহিয়াছে।

ফ্রান্সই হইতেছে ইতালিয়ান মজুরদের স্বর্গবিশেষ। এই দেশে বিস্তর ইতালিয়ানের ভাত-কাপড় জুটে। ফরাসী গবর্মেন্টের প্রকাশিত তথ্যতালিকায় দেখা যায় যে, কম সে কম ৮,০০,০০০ ইতালিয়ান নরনারী ফরাসী কারখানায় ও মাঠে অন্নবস্ত্র সংগ্রহ করিতেছে।

১৯২৬ সনের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত এই সকল অঙ্ক বুঝিতে হইবে। সেই সময় জার্ম্মাণিতে বেকার-সমস্যা চলিতেছিল। কাজেই ইতালিয়ানদের পক্ষে কর্ম্ম পাওয়া সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু কোনো অঞ্চলে ১৩০০ ইতালিয়ান বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে মজুরি করিতেছিল তাহার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

বিলাতেও জার্ম্মাণির মতনই বেকার-সমস্যা প্রবল। তাহার উপর বিদেশী মজুর আমদানি করার বিরুদ্ধে বিলাতী

আইনের কড়াকড়ি খুব বেশী। কাজেই সে দেশে ইতালিয়ান মজুরদের দন্তস্ফুট করা অসম্ভব।

যুগোশ্লাভাকিয়ায় ইতালিয়ান মজুরদের কর্ম্মসুযোগ অল্প। বেশী লোক এখনো সেদেশে যাইতে পারে নাই। মাত্র ১৫০ জন বেলগ্রেড্ শহরে ও তাহার আশেপাশে কাজ করিতেছে।

অপর পক্ষে লুক্সেমবুর্গ দেশের লোহার কারখানায় ও খনিতে ১১,০০০ ইতালিয়ান কাজ করিতেছে। মাল্টা দ্বীপে ১০০০ ইতালিয়ান মজুরি করে।

নরওয়ে আর হল্যাণ্ড দেশে ইতালিয়ান মজুরদের কর্ম্ম-সুযোগ একদম নাই। পোল্যাণ্ডের অবস্থাও সেইরূপ। অধিকন্তু এই দেশে এখন বেকার-সমস্যা চলিতেছে।

কিন্তু রুমেণিয়া ইতালিয়ান নরনারীদের পক্ষে এক মস্ত মজুরির বাজার। এদেশে ৮,০০০ লোক কর্ম্ম পাইয়াছে।

রুশিয়ায় ইতালিয়ানদের সংখ্যা ১,১০০। জর্জিয়া প্রদেশের তিফ্লিস অঞ্চলে ১০০ ইতালিয়ান পরিবার বস-বাস করিতেছে।

স্পেন দেশের বার্সেলোনা অঞ্চলে ৩,০০০ ইতালিয়ান মজুরি ও কেরাণীগিরি করে। কেহ কেহ স্বাধীন ব্যবসায়ীও বটে। আর এক অঞ্চলে ৩০০ ইতালিয়ানের অন্নবস্ত্র জুটিতেছে।

সুইডেনে ইতালিয়ানরা স্থপতির কাজ করে। হোটেলের খানসামাগিরির কাজে কেহ কেহ বাহাল আছে।

সুইট্জার্ল্যাণ্ডের নানা মহলে ইতালিয়ানদের কাজ জুটিয়াছে। লোজান অঞ্চলে ২০,০০০, লুগানোয় ৩০,০০০ সাঁগালে ৯,০০০, এবং জুরিখে ২৫,০০০ ইতালিয়ান খাটিয়া খাইতেছে। নগর শাসকদের অধীনে পরিচালিত নানা কাজে তাহাদের ডাক পড়ে। ফিতা তৈয়ারী করার কারখানায় তাহাদের কাজ জুটে। তাঁতকারখানার বিভিন্ন বিভাগে কাজ করিয়াও ইতালিয়ানরা পয়সা রোজগার করে।

তুর্কীতে ১০,০০০ ইতালিয়ানের ঠাঁই আছে এক কন্‌ষ্টান্টিনোপ্‌লেই। তাহা ছাড়া আদালিয়া অঞ্চলে ১০০, মেসিনায় ২৫০, আর স্মীর্ণায় ৫০০০।

প্রবাসী ভারত-সন্তানের ভাত-কাপড়

মোটের উপর প্রায় ৯৷৷০ লাখের হিসাব। আমেরিকার উত্তরও দক্ষিণ ভূখণ্ডে কত ইতালিয়ান পয়সা রোজগার করিতেছে তাহার হিসাব এখানে নাই।

ইতালির লোক-সংখ্যা-হিসাবে যত ইতালিয়ান আজকাল বিদেশে গিয়া টাকা রোজগার করিতেছে তাহার তুলনায় প্রবাসী ভারতসন্তানের সংখ্যা নেহাৎ কম। সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যে প্রায় ২০ লাখ ভারতীয়ের ঠাঁই। তাহার ভিতর এক লঙ্কায়ই ৭৷৷০ লাখ। বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে মাত্র লাখখানেক ভারত-সন্তানের অন্ন জুটিয়া থাকে।

পৃথিবীর সকল দেশেই বিদেশে লোক-রপ্তানি করিবার দিকে সরকারী নজর খুব বেশী। স্বদেশ-সেবকরাও দেশের আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় উন্নতির জন্য লোক-রপ্তানি কাণ্ডকে ভাল চোখেই দেখে। ভারতের ধনবিজ্ঞানসেবীরা এই দিকে এখনো বেশী নজর দেন নাই। দুনিয়ায় "বৃহত্তর ভারত" কায়েম করা আমাদের আর্থিক উন্নতির এক বড় খুঁটা।

২। করিয়েরে দেল্লা সেরা

(ইতালিয়ান সান্ধ্য পত্রিকা, মিলান)

জার্ম্মাণির জমি-ব্যাঙ্ক

ইতালিতে কৃষি-কর্ম্মের জন্য কর্জ্জ দেওয়াটা এক অতি-মাত্রায় অনুগ্রহের দানস্বরূপ বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু জার্ম্মাণিতে কৃষি-কর্জ্জ কেন্দ্র-গবর্মেণ্টের মামুলি কাজ-কর্ম্মের তালিকার অন্যতম বড় দফা। ইতালিতে চাষীরা কর্জ্জ পায় যদি বিশেষ কোনো দৈবদুর্য্যোগ-ইত্যাদি ঘটে। ফসলের দাম যদি নেহাৎ কমিয়া যায় তাহা হইলেও গবর্মেণ্ট যেন "দয়া-পরবশ" হইয়া চাষীদের বাঁচাইতে অগ্রসর হয়। অপর দিকে জার্ম্মাণ গবর্মেণ্ট দৈবদুর্ব্বিপাকের জন্য বসিয়া থাকে না। ফসলের দাম কমিয়া যাওয়ায় চাষীদের কষ্ট ঘটিয়াছে, অতএব তাহাদের জন্য কিছু করা দরকার,—এইরূপ চিন্তা করা জার্ম্মাণ সরকারের দস্তুর নয়। স্বাভাবিক চাষ-আবাদের জন্য চাষীরা কর্জ্জ পাইতে অধিকারী,—আর তাহাদের কাজে গবর্মেণ্টের টাকা খরচ করা উচিত—এইরূপ চিন্তাই জার্ম্মাণির সরকারী মগজের ঘী সৃষ্টি করিয়া

থাকে। টাকার বাজার যখন খুব গরম,—আর সুদের হার যখন চড়া,—সেই সময়েও জার্ম্মাণিতে কৃষি-কর্জ্জের পরিপুষ্টি বেশ সাধিত হইয়াছে দেখা যায়।

লাণ্ড্‌শাফ্‌ট্

"লাণ্ডশাফ্‌ট্" নামক ভূমিসমিতিগুলা সমবায়ের নিয়মে গঠিত। এই সকল সমিতি উপরওয়ালা বড় সমিতির নিকট হইতে কর্জ্জ পায়। "লাণ্ড্‌শাফ্‌ট্" সমূহ এই বড় সমিতির সভ্য। লড়াইয়ের পূর্ব্বে গোটা জার্ম্মাণি মুল্লুক এই সকল ছোট ও বড় সমিতির জালে ছাওয়া হইয়া গিয়াছিল। বিগত বিশপঁচিশ বৎসরের ভিতর জার্ম্মাণরা চাষ-আবাদে যে অপূর্ব্ব উন্নতি দেখাইতে পারিয়াছে তাহার প্রধান কারণই হইতেছে এই সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত সমবায়-নিয়ন্ত্রিত কর্জ্জ-ব্যবস্থা।

জমি বন্ধক রাখিবার সুযোগ জার্ম্মাণ আইনে বিস্তর। বন্ধকির রসিদটাকে ভূমি-কাগজ বলা চলে। বাণিজ্য-কাগজের মতন ভূমি-কাগজও জার্ম্মাণির টাকার বাজারে ষ্টক এক্‌সচেঞ্জে কেনা-বেচা চলে। কাজেই আমদানি-রপ্তানি করা সচল মালপত্রের মতন অচল জমিজমাও এক বেপারীর হাত হইতে আর এক বেপারীর হাতে চলাফেরা করিতে পারে। জমির স্বত্বটা অবশ্য একদম চলিয়া যায় না। এই স্বত্ব বন্ধক রাখিয়া যে টাকা কর্জ্জ লওয়া হইয়াছে সেই টাকার উপর এক্তিয়ারই ষ্টক এক্‌সচেঞ্জের আব-হাওয়ায় হাতে হাতে ঘুরিতে থাকে। বলা যাইতে পারে যে, অচল ভূমিটাই যেন সচল হইয়া গিয়াছে।

টাকার বাজারে ভূমি-কাগজ

লড়াইয়ের পূর্ব্বের অবস্থায় জার্ম্মাণিতে বার্ষিক প্রায় ১২ মিলিয়ার্ড মার্ক (অর্থাৎ ১২০০ ক্রোর টাকা) পরিমাণ "ভূমি-কাগজে"র ব্যবসা চলিত। অর্থাৎ এই মূল্যের জমি সম্বন্ধে বন্ধকি কাগজ বাজারে চলাফেরা করিত। মনে রাখা আবশ্যক যে, এই সমস্ত টাকা অথবা ইহার অধিকাংশই চাষ-আবাদের কাজে লাগিত। কিষাণদিগকে টাকা ধার দিবার জন্যই এই সব কাগজ জারি করা হইত।

লড়াইয়ের পর জার্ম্মাণ মুদ্রাপতনের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল ভূমি-কাগজের দাম নামিয়া যায়। শেষ পর্য্যন্ত কাগজগুলা একপ্রকার মূল্যহীন হইয়া পড়ে। অর্থাৎ চাষীরা এক প্রকার বিনা পয়সায়ই নিজ নিজ বন্ধক খালাশ করিতে সমর্থ হয়। টাকার দাম কমিয়া যাওয়ায় জার্ম্মাণ চাষীরা দেনাদার হিসাবে যারপর নাই লাভবান হইতে পারিয়াছে। কিন্তু কাগজগুলাকে আবার জাতে তোলা হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে এক একটার দাম যত ছিল এক্ষণে তাহার সিকি মাত্র দাম ধার্য্য করা হইয়াছে। যাহা হউক তাহাতেও চাষীদের লাভ থাকিতেছে কম নয়। মজার কথা—পাওনাদারেরা ত মাত্র ন্যায্য প্রাপ্যের চার ভাগের একভাগ পাইবে; কিন্তু তাহাও কিষাণদের নিকট হইতে আদায় করা সহজ নয়। আইনের মারপ্যাঁচ এমন যে চাষীরা পাওনাদারগণকে টাকা সমঝিয়া না দিয়াও বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতেছে।

আজকালকার দিনে ভূমি-কাগজের ব্যবসাটা বিশেষ লাভজনক না হইবারই কথা। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বিস্তর টাকার কর্জ্জ ফী বৎসর বাজারে চলিতেছে। ১৯২৫ সনে ৩ মিলিয়ার্ড মার্ক (৩০০ ক্রোর টাকা) মূল্যের বন্ধকি কাগজ চলাফেরা করিয়াছে। অর্থাৎ প্রাক্‌-যুদ্ধ যুগের চার ভাগের এক ভাগ ব্যবসা এই লাইনে চলিতেছে।

এই সকল ভূমি-কাগজের উপর সুদ শতকরা ১০৲। এই চড়া হারে সুদ থাকা সত্ত্বেও কাগজগুলার চলা-ফেরা স্থগিত থাকে না। ইতালিয়ানরা জার্ম্মাণির ভূমি-কাগজের এই অদ্ভুত গতিশীলতা ও সফলতা দেখিয়া বিশেষরূপে বিস্মিত। তাহাদের বিশ্বাস,—যে-সকল কাগজের উপর সুদ এত উঁচু সেই সব কাগজ বাজারে সহজে না বিকাইবারই কথা। কিন্তু ঘটিতেছে উল্টা। অতএব সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ :—"সুদের হারের উপর কাগজের চলা-ফেরা নির্ভর করে না," করে টাকার-বাজারটাকে সুনিয়ন্ত্রিত করার উপর।"

৩। করিয়েরে দেল্লা সেরা

(ইতালিয়ান সান্ধ্য দৈনিক, মিলান)

ডেন্‌মার্কের সেণ্ট্র্যাল ব্যাঙ্ক

বিগত তিন বৎসর ধরিয়া দুনিয়ার মুদ্রা-দক্ষেরা ডেন্‌মার্কের সেণ্ট্র্যাল ব্যাঙ্কের কর্ম্ম-কৌশলের দিকে বিশেষ দৃষ্টি

রাখিয়া চলিতেছেন। এই কর্ম্ম-কৌশলটা অন্যান্য সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের পক্ষে আদর্শস্বরূপ এবং অনুকরণীয়,—এই মত ব্যাঙ্কার-মহলে আজকাল সুপ্রচলিত।

ভেনিশ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের তারিফ এত কেন? বিনিময়ের হারটাকে এই ব্যাঙ্ক ব্যবসা-বাণিজ্যের এবং শিল্প-কারখানার ওঠা-নামার সঙ্গে সমান রাখিতে পারিয়াছে বলিয়া। দুই তিন বৎসর যাবৎ ভেনিশ মুদ্রা অনবরত ওঠা-নামা করিতেছিল। কিন্তু সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের কর্ম্ম-কৌশলে এই ওঠা-নামার খামখেয়ালি বন্ধ হইয়াছে। অথচ আর্থিক জীবনের গতি-ভঙ্গীর সঙ্গে মুদ্রা-বিনিময়ের হারের সমতা রক্ষিত হইয়াছে।

১৯২৩ সনে ভেনিশ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের ঘাড়ে এই সমস্যা প্রথম উপস্থিত হয়। বাঁধাবাঁধির ভিতর বিদেশে ক্রাউনের ওঠানামা আটক রাখা ছিল এই ব্যাঙ্কের দায়িত্ব। এই উদ্দেশ্যে বিদেশে টাকা কর্জ্জ লওয়া হয়। বাজারে টাকা কর্জ্জ দিবার নিয়মে কড়াক্কড়ি লাগানো হয়। গবর্মেণ্টকে প্রত্যেক দেনা-পাওনার সম্বন্ধে ব্যাঙ্কের নিকট প্রথম হইতেই সংবাদ দিতে বাধ্য করা হয়। বিদেশে মাল-রপ্তানির ব্যবসায় অর্থ-সাহায্যের জন্য সহজ ব্যবস্থা করা হয়। এই জন্য বিদেশে নগদ টাকার তহবিলও রাখা হয়।

কিন্তু মোটের উপর এই জন্য ১ কোটি ক্রাউন (১ পাউণ্ডে প্রায় ১৮ ক্রাউন) গচ্চা দিতে হইয়াছে। এতটা গচ্চা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই ব্যাঙ্ক কাজে নামিয়াছিল। কিন্তু ব্যাঙ্কের অংশীদারদিগকে শতকরা ৮ টাকা হিসাবে মুনাফা দেওয়া হইয়াছে। সরকারী তহবিল হইতে এই টাকা আসিয়াছে। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে আর গবর্মেণ্টে লেন-দেন খুব নিবিড়।

৪। করিয়েরে দেল্লা সেরা

(ইতালিয়ান সান্ধ্য দৈনিক, মিলান)

হল্যাণ্ডের ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান

হল্যাণ্ডের ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান-বিষয়ক আইনকানুনগুলা ইতালিয়ান টাকার বাজারেও প্রভাব বিস্তার করিতেছে। কেননা বিদেশী ব্যাঙ্কের শাখাসমূহের সঙ্গে স্বদেশী ব্যাঙ্কগুলার কারবার কোন্ প্রণালীতে চলিবে তাহার ব্যবস্থা করা এইসকল আইনকানুনের উদ্দেশ্য।

বিদেশী মূলধনের তত্ত্বকথা

ওলন্দাজ সমাজে বিদেশী ব্যাঙ্ক বলিলে বুঝিতে হইবে প্রধানতঃ মার্কিণ ও জার্ম্মাণ প্রতিষ্ঠান। মহাযুদ্ধের সময় এবং তাহার পরে আমেরিকা ও জার্ম্মাণির পুঁজিপতিরা হল্যাণ্ডে একাধিক ব্যাঙ্ক গড়িয়া তুলিয়াছে অথবা ব্যাঙ্কের শাখা কায়েম করিয়াছে। এই সকল বিদেশী পুঁজির সঙ্গে স্বদেশী পুঁজিওয়ালাদের লেনদেন বর্ত্তমানে কিরূপ চলিলে দেশের পক্ষে ভাল হয় তাহার বিচার চলিতেছে। এইসকল বিশ্লেষণের ভিতর ইতালিয়ানদের স্বার্থও কিছু কিছু জড়িত আছে।

প্রশ্নটা একমাত্র আমেরিকা, বা জার্ম্মাণি বা হল্যাণ্ড-বিষয়ক নয়। আসল কথা হইতেছে বিদেশী মূলধনের আমদানি-রপ্তানি-বিষয়ক মোসাবিদা। সকল দেশেই স্বদেশী পুঁজির জোরে দেশোন্নতি-বিধায়ক কাজ-কর্ম্ম চালানো সম্ভব নয়। বিদেশী পুঁজি আমদানি করিয়া তাহার সাহায্যে স্বদেশী পুঁজি পুষ্ট করা অনেক দেশের পক্ষেই একটা বড় সমস্যা।

বিদেশের পুঁজি স্বদেশে আমদানি করা হয় কোন্ মূর্ত্তিতে? এই টাকায় আসে বিদেশ হইতে স্বদেশের কারখানা ফ্যাক্টরিগুলার জন্য যন্ত্রপাতি, লোহালক্কড় বা রসদ-সরঞ্জাম। কিন্তু হল্যাণ্ড দেশের অবস্থা ত এরূপ নয়। বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি আমদানি না করিলেও স্বদেশে কারখানা কায়েম করা ওলন্দাজদের পক্ষে সম্ভব। কাজেই হল্যাণ্ডের বিদেশী পুঁজি (অর্থাৎ ব্যাঙ্ক)-বিষয়ক সমস্যা কিছু স্বতন্ত্র ধরণের। এখানে ব্যাঙ্কের টাকা-পয়সাগুলা খাটানো হইতেছে শিল্প-কারখানার যন্ত্রপাতিতে নয়, মামুলি তেজারতিতে—ব্যবসা-বাণিজ্যে।

লড়াইয়ে হল্যাণ্ডের স্বর্ণসুযোগ

লড়াইয়ের সময় হল্যাণ্ডের বেপারীরা জার্ম্মাণির প্রায় সকল প্রকার আমদানি-রপ্তানির কাজে মোতায়েন ছিল। কেন না তখন জার্ম্মাণির প্রায় অন্যান্য সকল সীমানায়ই ছিল শত্রুর দেশ। সুইট্সার্ল্যাণ্ড দক্ষিণে, আর হল্যাণ্ড উত্তরে,

এই দুই দেশ ছাড়া "উদাসীন" দেশ জার্ম্মাণির সংলগ্ন আর একটাও ছিল না। কাজেই জার্ম্মাণির কারবারে হল্যাণ্ডের ঠাঁই ছিল খুব বড়।

জার্ম্মাণির আমদানি-রপ্তানি বস্তুটা আরও তলাইয়া বুঝা দরকার। জার্ম্মাণরা যে-সকল মুল্লুক হইতে মাল আমদানি করিত, আর যে-সকল মুল্লুকে জার্ম্মাণ মাল রপ্তানি করিত, তাহাদের সকলেরই মিলনকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল হল্যাণ্ড। দুনিয়ার এক মস্ত আন্তর্জ্জাতিক হাট হিসাবে হল্যাণ্ড বিপুল ব্যবসা-ক্ষেত্রের আকার ধারণ করে। কাজেই টাকা-চলাচলের কারবারও হল্যাণ্ডের বুকের উপর দিয়া চলিতে থাকে বিস্তর। কেনা-বেচা, দেনা-পাওনা, কর্জ্জ লওয়া, কর্জ্জ দেওয়া "শোধ-বোধ" ইত্যাদি টাকাকড়ি-বিষয়ক বিনিময়-কাণ্ড হল্যাণ্ডের হাটে বাজারে প্রবল মূর্ত্তিতে দেখা দেয়। "বাণিজ্য-বিষয়ক কাগজপত্রে"র আনাগোনায় আমষ্টার্ডাম শহর ফুলিয়া উঠিয়াছিল।

ব্যাপারটা সহজ নয়। জার্ম্মাণির সঙ্গে দুনিয়ার মাল-চলাচল আর টাকা-চলাচল সামলানো গুরুতর কথা। লড়াইয়ের পূর্ব্বে এই ধরণের আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যে লণ্ডনের ব্যাঙ্কগুলা প্রধান ঠাঁই অধিকার করিত। কিন্তু যুদ্ধের সময় লণ্ডন দুনিয়াকে,—বিশেষতঃ জার্ম্মাণ বাণিজ্য-সংক্রান্ত আমষ্টার্ডামকে "জবাব" দিয়া বসিল। তাহাতে আমষ্টার্ডামের ক্ষতি কিছুই হইল না। বরং সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমষ্টার্ডামের পুঁজিপতিরা ইয়োরোপের বাণিজ্য-বাজারে যে ঠাঁই অধিকার করিত, তাহার পক্ষে আবার সেই ঠাঁই দখল করিবার সুযোগ আসিয়া জুটিল। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে আমষ্টার্ডামকে কলা দেখাইয়া লণ্ডন ফাঁপিয়া উঠিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম কুরুক্ষেত্রের সুযোগে আমষ্টার্ডাম তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী লণ্ডনকে কায়দায় পাইয়া আর একবার আন্তর্জ্জাতিক টাকার কেন্দ্রে পরিণত হইতে থাকে।

আন্তর্জ্জাতিক বিনিময় ও বাণিজ্য-কাগজ

আন্তর্জ্জাতিক মাল-চলাচলের কারবারে ব্যাঙ্কগুলা বেপারীদিগকে টাকা-পয়সার সম্বন্ধে যথেষ্ট সাহায্য করে। মালের রসিদ দেখিয়া টাকা আগাম দেওয়া, অথবা পাওনাদারের নিকট দেনাদারের জন্য জিম্মাদারি লওয়া ইত্যাদি কাজ উল্লেখযোগ্য। এই সকল কাজের ফলে আমষ্টার্ডামের ব্যাঙ্কগুলা দুনিয়ার বেপারী আর দালালদের নিকট আবার সুপরিচিত হইয়া উঠিল। বলা বাহুল্য, একমাত্র ওলন্দাজ-জাতীয় পুঁজিপতিদের টাকাই আমষ্টার্ডামে খাটিত এরূপ বুঝিতে হইবে না। আমদানি-রপ্তানির কাজে যে-সকল জাতের হিস্যা বেশী—যথা জার্ম্মাণ, ইংরেজ, আমেরিকান,—সেই সকল জাতের ব্যাঙ্কারগণই আমষ্টার্ডামে আসিয়া আড্ডা গাড়িতে লাগিয়া যায়। ফলতঃ, জার্ম্মাণ, ইংরেজ, মার্কিণ ব্যাঙ্কের শাখা ওলন্দাজ মুল্লুকে মাথা খাড়া করিতে থাকে। এই গেল লড়াইয়ের যুগের কথা। তাহার পর "দাঁও" মারিবার সুযোগ আর নাই। কেন না জার্ম্মাণির সঙ্গে অন্যান্য দেশের লেন-দেন সাক্ষাৎভাবেই চলিতেছে। কিন্তু আমষ্টার্ডামের ব্যাঙ্কগুলার তহবিলে নগদ টাকা রহিয়া গিয়াছে বিস্তর। এই সকল কর্জ্জ-প্রতিষ্ঠান প্রত্যেকেই এক একটা "টাকার আণ্ডিলবিশেষ"।

এক ইয়োরোপের কথাই ধরা যাউক। যুদ্ধের পর হইতে এই ভূখণ্ডের প্রত্যেক দেশেরই বহির্ব্বাণিজ্য ক্রমে বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯২৪ সন হইতে এই বিস্তারের পরিচয় বেশ পাওয়া যায়। ইয়োরোপ যে অনেকটা পুনর্গঠিত হইয়াছে তাহা ধরিতে পারি। পুরাণা দেশের ঠাঁইয়ে নতুন নতুন দেশের সৃষ্টি আর্থিক আদান-প্রদানের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। লোকজনের চাহিদার আকার-প্রকারও অনেকটা রূপান্তরিত হইয়াছে। লোকেরা জিনিষপত্র খরিদ করিতেছে বেশী বেশী। অধিকন্তু নতুন নতুন মালের কেনা-বেচাও দেখা যাইতেছে।

আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য ফুলিয়া উঠার অর্থ আর কিছুই নয়, ব্যাঙ্কগুলার উপর চাপ খুব বেশী পড়িতেছে। ব্যাঙ্কের কর্ত্তারা বেপারীদিগের "বাণিজ্য-কাগজ" লইয়া মালের বন্ধকিতে টাকা আগাম ছাড়িতেছে। এইসকল কাগজ "কিনিয়া" (ডিস্কাউণ্ট করিয়া) ব্যাঙ্কগুলা ত আর বসিয়া থাকিতে পারে না। তাহারা টাকা সংগ্রহ করিবার জন্য বাণিজ্য-কাগজগুলা "আবার বেচিবার" (রী ডিস্কাউণ্ট করিবার) ব্যবস্থা করিতেছে। এইরূপ "আবার বেচিবার"

শেষ আড্ডা হইতেছে "সেন্ট্র্যাল ব্যাঙ্ক"। কাজেই হল্যাণ্ডের সেন্ট্র্যাল ব্যাঙ্ককে এই কয় বৎসর ধরিয়া খোলা হাতে বাণিজ্য-বাজারে টাকা ঢালিতে হইতেছে।

সেন্ট্র্যাল ব্যাঙ্কের ডিস্কাউন্ট-নীতি

এই খানেই স্বদেশী ও বিদেশী দুই প্রকার ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানের লেন-দেন শাসন করা হল্যাণ্ডের পক্ষে একটা সমস্যা দাঁড়াইয়াছে। ওলন্দাজ সেন্ট্র্যাল ব্যাঙ্কের শাসনকর্ত্তা হইতেছেন ডক্টর হ্বিস্‌সেরিং। তাঁহার বিবেচনায় বিদেশী ব্যাঙ্কে আর স্বদেশী ব্যাঙ্কে কোনো প্রভেদ করা উচিত নয়। বাণিজ্য-কাগজের কেনা-বেচার সম্বন্ধে দুই প্রকার ব্যাঙ্কেরই এক প্রকার দায়িত্ব। বিদেশী ব্যাঙ্কের কোনো বিশেষত্বপূর্ণ অধিকার অথবা দায়িত্ব থাকা উচিত নয়।

এদিকে সেন্ট্র্যাল ব্যাঙ্কেরও টাকা ঢালার সীমানা আছে। বিদেশী ব্যাঙ্কগুলা যে-সব "বাণিজ্য-কাগজ" আনে তাহার পশ্চাতে বন্ধক থাকে বিদেশী মাল। সেই মাল খালাসের জন্য টাকাও খাটে বিদেশী। কাজেই বিদেশী বাণিজ্য-কাগজের জন্য টাকা ঢালিতে বসা হল্যাণ্ডের পক্ষে অতিমাত্রায় মুদ্রা-চালানোর সমান হইয়া পড়িতে পারে। এই ভয়ে সেন্ট্র্যাল ব্যাঙ্ক হাত গুটাইয়া "রী-ডিস্কাউন্ট" করিতেছে। অর্থাৎ স্বদেশী এবং বিদেশী সকল প্রকার ব্যাঙ্ককেই যখন-তখন টাকা দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে। কাজেই কি স্বদেশী, কি বিদেশী উভয় প্রকার ব্যাঙ্কই এখন অনেক আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বাণিজ্য-কাগজ কিনিতেছে।

সেন্ট্র্যাল ব্যাঙ্কের "ডিস্কাউন্ট-নীতির" এই গেল এক দিক্। অপর কথা হইতেছে স্বদেশী ব্যাঙ্ক বনাম বিদেশী ব্যাঙ্ক। যদি দুই প্রকার ব্যাঙ্ককেই বাণিজ্য-কাগজের পরিবর্ত্তে টাকা দিবার ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে বিদেশী ব্যাঙ্কগুলা সহজেই স্বদশী ব্যাঙ্কগুলার কারবার গ্রাস করিয়া বসিবে। কাজেই হ্বিস্‌সেরিং প্রথম হইতেই নিয়ম করিয়া বসিয়াছেন যে, মুক্ত হস্তে টাকা ঢালিয়া বাণিজ্য-কাগজ রী-ডিস্কাউন্ট করা বর্ত্তমানে সেন্ট্র্যাল ব্যাঙ্কের পক্ষে কর্ত্তব্য নয়। স্বদেশী ব্যাঙ্কগুলার বাঁচোআ সেন্ট্র্যাল ব্যাঙ্কের "হাত-গুটানো" নীতির উপর নির্ভর করিতেছে।

বিদেশী ব্যাঙ্কগুলাকে ভয় করিয়া চলা স্বদেশী ব্যাঙ্কগুলার পক্ষে অন্যায় নয়। বিদেশীদের মূলধন প্রচুর। একটার পুঁজি ১ কোটি ৪০ লাখ ফ্লোরিণ (১ পাউণ্ডে প্রায় ১২ ফ্লোরিণ)। এই প্রতিষ্ঠানে জার্ম্মাণ, সুইস, সুইডিস, বৃটিশ এবং ওলন্দাজ এই পাঁচ জাতীয় পুঁজি-পতিদের টাকা খাটিতেছে। আর একটা আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের মূলধন ১ কোটি ১০ লাখ ডলার (১ ডলার ৩ টাকার উপর) এই ব্যাঙ্কের আসল মালিক হইতেছে জার্ম্মাণরা। তবে সুইডিস এবং সুইস টাকাও খাটিতেছে।

বিদেশী বা আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের মুনাফা ছিল ১৯২৫ সনে শতকরা ২০ টাকা পর্য্যন্ত। এই সকল ব্যাঙ্কের একটা বড় কারবার হইতেছে জার্ম্মাণির বিভিন্ন শিল্প-কারখানায় টাকা কর্জ্জ দেওয়া। ১৯২৫ সনের ১০ই জানুয়ারি হইতে ১৯২৬ সনের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত ১৯ মাসে জার্ম্মাণির শিল্প-পতিরা হল্যাণ্ডের নিকট হইতে কারখানার জন্য ২৬ কোটি ৩০ লাখ মার্ক অর্থাৎ প্রায় ২০ কোটি টাকা কর্জ্জ পাইয়াছে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কগুলাকে সহজে বাণিজ্য-কাগজের বদলে টাকা দিয়া দিলে তাহাদিগকে মোটা হারে লাভবান হইবার সুযোগ দেওয়া হয়। অধিকন্তু তাহাদের তহবিলে যে সব টাকাকড়ি আসিয়া মজুত হয় তাহার সদ্ব্যবহার স্বদেশে বেশী হয় না, হয় বিদেশে।

ডক্টর হ্বিস্‌সেরিংয়ের সেন্ট্র্যাল ব্যাঙ্ক পরিচালনা নীতি ইতালির ব্যাঙ্কারমহলে বেশ আলোচিত হইতেছে। ইতালিয়ানরাও বিদেশী ব্যাঙ্কের আওতা হইতে স্বদেশী ব্যাঙ্কগুলাকে বাঁচাইবার জন্য ওলন্দাজ ফিকির কায়েম করিবার পক্ষপাতী। রিজার্ভ-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ভারতে এই সব কৌশলের চর্চ্চা চলিতে থাকিবে।

৫। জুর্ণে অ্যাঁদুস্ত্রিয়েল

(ফরাসী শিল্প-দৈনিক, প্যারিস)

রপ্তানি-বাণিজ্যের ব্যাঙ্ক-ব্যবসা

বহির্ব্বাণিজ্যের নানা কাজ চালাইবার জন্য বিশেষ এক প্রকার কর্জ্জ-প্রতিষ্ঠান বা ব্যাঙ্ক আবশ্যক। সম্প্রতি বিদেশে

মাল রপ্তানি করিবার ব্যবসা আলোচনা করিতেছি। এই সকল ক্ষেত্রে সমস্যাটা দ্বিবিধ। প্রথমতঃ, দরকার মাল পাঠাইবার জন্য নগদ টাকা। বিদেশী খরিদ্দারেরা কয়েক মাস পরে টাকা সমঝাইয়া দিবে। কিন্তু রপ্তানি-কারকেরা অতদিন বসিয়া থাকিতে পারে না। তাহারা ফ্যাক্টরি, বা আড়ৎ বা বন্দর হইতে মাল ছাড়িবামাত্রই কাঁচা টাকা হাতে হাতে চায়। এই টাকা তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে দিবার জন্য দেশী ব্যাঙ্কের সাহস থাকা আবশ্যক। রপ্তানি-কারকেরা যদি হাতে হাতে টাকা না পায় তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে ফ্যাক্টরি চালানো সুকঠিন।

দ্বিতীয় সমস্যা হইতেছে এই কর্জ্জটার জন্য জামিন। ব্যাঙ্ক না হয় রপ্তানি-কারককে নগদ টাকা কর্জ্জ দিয়া সাহায্য করিল। কিন্তু ব্যাঙ্ককে টাকা সমঝাইয়া দিবে কে? বলা বাহুল্য,—বিদেশী খরিদ্দার। কিন্তু এই বিদেশী লোক যে কর্জ্জটা শুধিতে সমর্থ অথবা সত্যসত্যই শুধিয়া দিবে তাহার স্থিরতা কোথায়? কে তাহার জন্য দায়ী? এই সমস্যার মীমাংসায় এক নতুন ব্যবস্থা কায়েম করা যাইতে পারে। তাহার নাম "কর্জ্জ-বীমা"।

ফ্রান্সের বেপারীরা কিছু দিন ধরিয়া বিদেশে বেশী বেশী মাল রপ্তানি করিতেছে। তাহার প্রধান কারণ, ফরাসী মুদ্রার মূল্য-হ্রাস। বিদেশী টাকা-কড়ির তুলনায় ফরাসী টাকা দামে নীচু। কাজেই বিদেশী টাকা দিয়া ফরাসী মাল খরিদ করিতে গেলে বিদেশীদের পক্ষে ফরাসী মাল সস্তা মালুম হয়। কিন্তু ফরাসী মুদ্রার এই অবস্থা ত চিরকাল থাকিবে না। মুদ্রার মূল্য-বৃদ্ধি আজ না হয় কাল অবশ্যম্ভাবী। তখন ত আর বিদেশী-চিন্তায় ফরাসী মাল সস্তা মালুম হইবে না। সেই অবস্থায় বিদেশে ফরাসী মাল রপ্তানি করা যাইবে কি করিয়া? তাহার জন্যই "কর্জ্জ-বীমা" (আস্যিরাঁস-ক্রেদি) কায়েম করা আবশ্যক।

কর্জ্জ-বীমা

মামুলি জীবন-বীমা, গরু-বীমা, আগুন-বীমা, চুরি-ডাকাতি-বীমা ইত্যাদি বীমা-ব্যবস্থার চেয়ে কর্জ্জ-বীমা কাণ্ডটা বেশী কঠিন ও জটিলতাপূর্ণ। এই কাণ্ডে ঝুঁকি, লোকসানের ভয়, টাকা উশুল না হওয়ার সম্ভাবনা স্বভাবতই অনেক। কাজেই কর্জ্জ-বীমার ব্যবসায় গবর্মেণ্টের সাহায্য আবশ্যক। যে-সকল ব্যাঙ্ক রপ্তানি-বাণিজ্যে সাহায্য করিবার জন্য বেপারীদিগকে টাকা কর্জ্জ দিতেছে, তাহাদের টাকাটা যাহাতে মারা না পড়ে তাহা দেখিবার জন্য গবর্মেণ্টকে দায়িত্ব লইতে হইবে। অন্যান্য দেশে গবর্মেণ্ট কর্জ্জ-প্রতিষ্ঠানগুলাকে কর্জ্জ-বীমার ব্যবসায় সাহায্য করিতেছে। ফরাসী গবর্মেণ্টকেও বিদেশী গবর্মেণ্টের কার্য্য-প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে।

সরকারী সাহায্য ত দরকার। কিন্তু কর্জ্জ-কারবারে সরকারের হস্তক্ষেপ কোন্ প্রণালীতে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত? প্রথমেই বলিয়া রাখি যে, গবর্মেণ্টের কোনো দপ্তরকে এই কাজের জন্য কর্ত্তা করিলে চলিবে না। সরকারী আফিস কখনই কোনো কাজ অল্প সময়ে বিনা ভজকটতে শেষ করিতে পারে না। আর্থিক জীবনের কাজকর্ম্ম তাড়াতাড়ি আর সুশৃঙ্খলার সহিত হাসিল করিবার উপায় হইতেছে বে-সরকারী ভাবে কাজগুলা চালানো। তবে নানা প্রকার বে-সরকারী কাজকে ঐক্যবদ্ধ আর কেন্দ্রীকৃত করিবার জন্য সরকারের তত্ত্বাবধান বাঞ্ছনীয়। কর্জ্জ-বীমার ব্যবসাটা বে-সরকারী ব্যক্তিবর্গের ভাবেই থাকিবে। গবর্মেণ্টের হাতে থাকিবে মাত্র ব্যবসাটার তদবিরের ভার।

সরকারী সাহায্য

বে-সরকারীদের কাজ তদবির করা, তত্ত্বাবধান করা, ইত্যাদি কথার অর্থ কি? বুঝিতে হইবে যে, গবর্মেণ্ট দেশ-বিদেশে ফরাসী রপ্তানি বাড়াইবার জন্য নানা প্রকার প্রচার-কার্য্যে সাহায্য করিবেন। বিদেশের বেপারীদের আর্থিক অবস্থা, লেনদেনের নিয়ম, টাকাকড়ির সচ্ছলতা, ধাঁকৃতি ইত্যাদি সম্বন্ধে তথ্য ফরাসী-সমাজে প্রচার করাও গবর্মেণ্টের একটা বড় ধান্ধা থাকিবে। এই দুই ধরণের প্রচারকার্য্যই গবর্মেণ্টের পক্ষে বিদেশে রপ্তানি-ব্যবসা-প্রসারের প্রাথমিক বনিয়াদ।

সরকারী সাহায্য কি এই খানেই খতম? অন্যান্য দেশে গবর্মেণ্ট প্রচার-কার্য্যটুকুমাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হয় না। সরকারী তহবিল হইতে কর্জ্জ-বীমার ব্যবসায় নগদ টাকা সাহায্য করাও নানা দেশের গবর্মেণ্ট নিজ কর্ত্তব্য সমঝিয়া

চলিতেছে। ফরাসী গবর্মেণ্টও কি নগদ টাকা ঢালিয়া এই কাজে নামিবে? কেহ কেহ হয় ত বলিবেন,—হাঁ, নিশ্চয়।

আমাদের মতে গবর্মেণ্টের অতদূর যাইবার অর্থাৎ কাঁচা টাকা ধার দিবার দরকার নাই। একটা জামিন দিলেই হইল। অর্থাৎ গবর্মেণ্ট যদি বলে,—"অমুক দেশের অমুক বেপারীর জন্য কর্জ্জটা দিতে পার। যদি সে যথাসময়ে টাকা সম্‌ঝিয়া দিতে না পারে তাহা হইলে সরকারী তহবিল হইতে তোমার ক্ষতিপূরণ করিয়া দেওয়া যাইবে", তাহা হইলেই চলিতে পারে। বীমা-প্রতিষ্ঠান গবর্মেণ্টের এই প্রতিজ্ঞা-পত্র পাইলেই সাহসের সহিত কাজ চালাইতে পারিবে বলিয়া বিশ্বাস।

অন্যান্য বীমার ব্যবসায় তথ্য-তালিকা এবং অঙ্কের হিসাব অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু কর্জ্জ-বীমার ব্যবসা নতুন। এই মুল্লুকের ষ্টাটিষ্টিক্‌স্‌ এখনো গড়িয়া উঠে নাই। কাজেই বৎসরে কতগুলা কর্জ্জ উশুল হইবে না, সুতরাং বীমা-কোম্পানীর ফী বৎসর কতটা গচ্চা দিতে হইবে তাহা প্রথম হইতেই আন্দাজ করিয়া কাজে নামা অসম্ভব। অতএব মামুলি বীমা-কোম্পানীর পক্ষে কর্জ্জ-বীমার কাজ লওয়া বড় শীঘ্র লাভজনক ব্যবসা বিবেচিত হইবে কিনা সন্দেহ।

কিন্তু গবর্মেণ্ট যদি জামিন হয় তাহা হইলে বীমা-কোম্পানীর ভয় অনেকটা ঘুচিবে। এইখানে মনে রাখা দরকার যে, কর্জ্জটার জন্য আসল দায়ী হইতেছে বিদেশী খরিদ্দারেরা। অর্থাৎ বিদেশের বেপারীদের চরিত্র, বিদেশী ব্যবসাদারদের সাধুতা-অসাধুতা এই কারবারের গোড়ার কথা। কর্জ্জটা উশুল করিবার জন্য হয়ত মামলা মোকদ্দমা করিতে হইতে পারে। এই জন্য দরকার পড়িবে বিদেশী আইন-আদালতের আশ্রয়-গ্রহণের। বিদেশে এই-সকল কাজ তদবির করা গবর্মেণ্টের পক্ষে যত সহজ, কোনো বে-সরকারী বেপারীর পক্ষে তত সহজ নয়। সুতরাং গবর্মেণ্ট যদি বীমার জন্য জামিন হয় তাহা হইলে কর্জ্জটা সহজসাধ্যও হইবে, আর সঙ্গে সঙ্গে সহজ-শোধ্যও বিবেচিত হইবার কথা।

বিদেশে ফরাসী মালের রপ্তানি বাড়াইতেই হইবে। লোহা-লক্কড়ের বাজার নানা দেশে সৃষ্টি না করিতে পারিলে ফ্রান্সের আর্থিক অবস্থা উন্নত হইবে না। এই সকল বুঝিয়া শুনিয়া গবর্মেণ্টের পক্ষে কর্জ্জ-বীমা-জামিন সম্বন্ধে একটা আইন কায়েম করা আবশ্যক।

কেন্দ্র-কর্ম্মবীমা-প্রতিষ্ঠান

সরকারী জামিনের কর্ম্ম-প্রণালীটা বিস্তৃতরূপে আলোচনা করা যাউক। যে-সে কর্জ্জ-বীমা-সমিতির নিকট গবর্মেণ্ট জামিন হইতে পারে না। এই জন্য দরকার একটা ফ্রান্স-ব্যাপী কেন্দ্রীকৃত বীমা-প্রতিষ্ঠান। দেশের ভিতরকার অন্যান্য ছোট-বড় প্রত্যেক কর্জ্জ-বীমা-প্রতিষ্ঠানই এই কেন্দ্র-প্রতিষ্ঠানের সভ্য হইতে বাধ্য। এই গেল এক তরফের কথা। অপর কথা হইতেছে,—"বহির্ব্বাণিজ্য-বিষয়ক ফরাসী কেন্দ্র-ব্যাঙ্কের" সঙ্গে এই কেন্দ্র-বীমা-প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ। ব্যাঙ্কের সঙ্গে বীমা-সমিতির নিবিড় সম্বন্ধ কায়েম না হইলে কর্জ্জ-বীমার কারবার সহজ-সাধ্য হইতে পারে না।

ব্যাঙ্কের কাজ হইতেছে কর্জ্জের ঝুঁকি বিশ্লেষণ করা। বহির্ব্বাণিজ্য-বিষয়ক কেন্দ্র-ব্যাঙ্ক বিদেশী কর্জ্জ-ব্যবসার অবস্থা খতাইয়া আলোচনা করিতে অভ্যস্ত। এই কাজে সে বিশেষজ্ঞ। সুতরাং কর্জ্জ-বীমার ব্যবসা যে-সকল প্রতিষ্ঠানের হাতে তাহারা ব্যাঙ্কের মতামত ছাড়া একমুহূর্ত্তও টিঁকিতে পারে না। বিগত ছয় সাত বৎসর ধরিয়া বহির্ব্বাণিজ্য-ব্যাঙ্ক দেশ-বিদেশের নানা বেপারী ও ব্যাঙ্কের কারবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আছে। তাহার অভিজ্ঞতা ফ্রান্সের এক আন্তর্জ্জাতিক সম্পদ্‌। এই অভিজ্ঞতার সাহায্য পাইলে বীমা-প্রতিষ্ঠানকে বেশী বিব্রত হইতে হইবে না।

৬। জুর্ণে অ্যাঁদুস্ত্রিয়েল

(ফরাসী শিল্প-দৈনিক, প্যারিস)

ধাতু-মজুরদের পারিবারিক ভাতা

অন্যান্য বৎসরের মতন এই বৎসরও লিল নগরের ধাতু-কারখানার মজুরেরা পারিবারিক ভাতা পাইয়াছে। প্রত্যেক পরিবারে সন্তান-সংখ্যা বাড়ানো হইতেছে এই ভাতার উদ্দেশ্য।

প্রত্যেক সন্তানের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মজুরেরা একটা করিয়া পেন্‌শুন পায়। চতুর্থ সন্তানের বেলায় একটা অতিরিক্ত পেন্‌শুনের ব্যবস্থা আছে। এই পেন্‌শুনটা নগদ টাকায় পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় সন্তানের জন্য দুধ, কাপড়-চোপড়, জুতা ইত্যাদি। এই সব মালের দাম ২০০ হইতে ১০০০ ফ্রাঁ (অর্থাৎ প্রায় ২০ হইতে ১০০৲ টাকা)। পঞ্চম, ষষ্ঠ ইত্যাদি পরবর্ত্তী শিশুর বেলায়ও এই ব্যবস্থা। ১৩ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুদের জন্য জনকজননীরা ভাতা পায়। শিশুদের সংখ্যা বেশী হইলে ১০০০ ফ্রাঁর কাছাকাছি দামের মাল পাওয়া যায়।

এই ব্যবস্থায় মজুর-সমাজের জননীমাত্রেই সুখী। ধাতু-কারখানার কর্ত্তৃপক্ষ একটা স্বাস্থ্য-পরীক্ষালয় আর আরোগ্যশালা চালাইতেছে। সন্তানপ্রসবের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থায় মেয়েরা এখানে বিনা পয়সায় পরামর্শ পায়। এই প্রতিষ্ঠানের কার্য্যকারিতা দিনদিনই বাড়িয়া যাইতেছে।

অধ্যাপক পোসো এই আরোগ্যশালার চিকিৎসাধ্যক্ষ। তাঁহার প্রকাশিত তথ্য-তালিকায় জানা যায় যে, ফ্রান্সে শিশুরা জন্মিবার পূর্ব্বেই অথবা জন্মমুহূর্ত্তে মারা যায় বিস্তর। শতকরা ৬ হইতে ৮টা শিশুর এই অবস্থা। কিন্তু "ভাতা"-নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্য-পরীক্ষালয়ের বিধানে এই সংখ্যা নামিয়া গিয়াছে প্রচুর পরিমাণে। শতকরা ২॥০ জন মাত্র জন্মিবার পূর্ব্বে অথবা জন্মমুহূর্ত্তে মারা পড়ে।

মাসে কয়জন মরে ?

গোটা ফ্রান্সের সাধারণ গড় হইতেছে শতকরা ৪·২। কিন্তু ভাতার ব্যবস্থায় গড় ১·৫ মাত্র।

৭। জুর্ণে অঁ্যাদুস্ত্রিয়েল

(ফরাসী শিল্প-দৈনিক, প্যারিস)

ইয়োরোপের এঞ্জিনিয়ার

জেনেভার বিশ্ব-রাষ্ট্র-পরিষদের অন্তর্গত আন্তর্জ্জাতিক মজুর-দপ্তর ইয়োরামেরিকার এঞ্জিনিয়ার ও রাসায়নিকদের অবস্থা সম্বন্ধে একটা তদন্ত-কমিটী বসাইয়াছিল। এই কমিটি ২৫ দেশে প্রশ্নাবলী পাঠাইয়া কতকগুলা জবাব পাইয়াছে। তাহা হইতে ইয়োরোপের এঞ্জিনিয়ার-বিষয়ক তথ্যগুলা সংক্ষেপে প্রকাশ করা যাইতেছে।

প্রথম প্রশ্নই হইতেছে "এঞ্জিনিয়ার" শব্দ লইয়া মার-কাট। নানা দেশের নানা রীতি (অধিকন্তু প্রায় প্রত্যেক দেশেই এঞ্জিনিয়ার শব্দে কোনো "উপাধি" বুঝা যায় না, বুঝা যায় একটা ব্যবসা বা অন্নসংস্থানের উপায়মাত্র। অর্থাৎ কোন্ বা কতটা বিদ্যার জোরে ব্যক্তিবিশেষ এঞ্জিনিয়ার নামে পরিচিত তাহা জানিতে পারা একপ্রকার অসম্ভব। অবশ্য যে-সকল লিখিয়ে-পড়িয়ে লোক বিদ্যার জোরে এঞ্জিনিয়ার পদবী দাবী করিয়াছেন তাঁহারা এই "গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল"-নীতির বিরোধী। তাঁহারা এঞ্জিনিয়ারিং ব্যবসার লোকমাত্রকে এঞ্জিনিয়াররূপে বিবৃত হইতে দিবার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইয়া থাকেন। ফ্রান্সেও এই আন্দোলন চলিতেছে।

এঞ্জিনিয়ার "উপাধি"টা জুটে অবশ্য একমাত্র ইস্কুল-কলেজের সার্টিফিকেটের কল্যাণে। কিন্তু এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার ব্যবস্থা এক এক দেশে এক এক রকম। নিম্ন আর উচ্চ এই দুই বিভাগ ত আছেই। তাহার উপর বিদ্যাপীঠ-গুলার ইজ্জৎও প্রত্যেক দেশেই নানা শ্রেণীর অন্তর্গত। কোনো ইস্কুলকে বলা হয় "পলিটেক্‌নিক।" কোনো পাঠশালার নাম টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট। এইগুলার ভিতর কোনো কোনোটা সরকারী আবার কোনো কোনোটা বে-সরকারী। কোনো কোনোটা হয়ত বা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক একটা বিভাগমাত্র। আবার কোথাও হয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে টেক্‌নিক্যাল ইস্কুল-কলেজের কোনো যোগ নাই। আবার কোথাও বিশ্ববিদ্যালয় স্বয়ংই কোনো তথাকথিত টেক্‌নিক্যাল ইস্কুল কায়েম না করিয়া এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা দিতেছে এবং এঞ্জিনিয়ার উপাধি বিতরণ করিতেছে। অতএব বুঝিতে হইবে যে এঞ্জিনিয়ার নামক উপাধি-বিশিষ্ট জীব হরেক রকমের।

জার্ম্মাণির দস্তুর

জার্ম্মাণ মুল্লুকে সরকারী টেক্‌নিক্যাল ইস্কুল-কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া আর কোনো প্রতিষ্ঠান এঞ্জিনিয়ার-উপাধি বিতরণ করিতে অধিকারী নয়। রাসায়নিক উপাধি

সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। বে-সরকারী ইস্কুলের ছাত্রেরা সরকারী প্রতিষ্ঠানের অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্যও প্রস্তুত হইতে পারে। এই পরীক্ষায় পাশ হইলে অবশ্য তাহারা এঞ্জিনিয়ার উপাধিরও অধিকারী হয়। এই সকল পরীক্ষায় ছাত্রদের লাভ অনেক। কেন না একমাত্র এই পরীক্ষায় পাশ-করা লোকেরাই সরকারী চাকরী পায়। ছাত্রদিগকে সাধারণতঃ ৪ বৎসর লেখাপড়া করিতে হয়। তাহার উপর এক বৎসর লাগে ফ্যাকটরিতে কাজ-কর্ম্ম শিখিবার জন্য। বস্তুতঃ, ইস্কুলে ভর্ত্তি হইবার পূর্ব্বে ছয় মাস কারখানায় কাজ করা একপ্রকার বাধ্যতামূলক। অপর ছয় মাসের কারখানার কাজ সারা হয় শেষ পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে।

অষ্ট্রিয়ার এঞ্জিনিয়ারিং ইস্কুল

অষ্ট্রিয়ায় পলিটেক্‌নিক ইস্কুল মাত্র দুইটা। একটা ভিয়েনায়, অপরটা গ্রাট্‌স শহরে। ভিয়েনার বিদ্যাপীঠে ৪,০০০ এর চেয়ে বেশী ছাত্র লেখাপড়া শিখে। চার বিভাগ (১) মেক্যানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং (৪ বৎসরের পাঠক্রম) (২) রসায়ন (৪ বৎসর), (৩) কর্ম্ম-পরিচালনা (৫ বৎসর) (৪) সিবিল এঞ্জিনিয়ারিং (৫ বৎসর)। বন-বিদ্যালয়ের ছাত্রেরাও এঞ্জিনিয়ার উপাধি পায়। তাহা ছাড়া আরও কতকগুলা উচ্চশ্রেণীর টেক্‌নিক্যাল কলেজ আছে। তাহাদের ছাত্রেরাও এঞ্জিনিয়ার উপাধি পাইতে পারে। কিন্তু এই-জন্য তাহাদিগকে দুইটা সরকারী পরীক্ষায় পাশ হইতে হয়।

বেলজিয়ামের এঞ্জিনিয়ার

টেক্‌নিক্যাল ইস্কুলের মধ্যে বেল্‌জিয়ামে দুইটা সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত আর দুইটা বে-সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত। সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা গাঁ শহরে আর একটা লিয়েজ নগরে অবস্থিত। রাজধানী ব্রুসেল্‌সের বিশ্ববিদ্যালয়টা বে-সরকারী। লুভ্যঁ নগরের বিশ্ববিদ্যালয়ও বে-সরকারী। তাহা ছাড়া মঁ শহরে একটা উচ্চশ্রেণীর আকর-বিদ্যালয় আছে। এই পাঁচ প্রতিষ্ঠানই এঞ্জিনিয়ার উপাধি বিতরণের কেন্দ্র।

এই সকল টেক্‌নিক্যাল ইস্কুলে ভর্ত্তি হইতে হইলে মাধ্যমিক ইস্কুলের (ভারতীয় ইণ্টারমিডিয়েট্) শেষ পরীক্ষায় পাশ হওয়া আবশ্যক। এই পরীক্ষায় সকল প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানেরই কিছু কিছু চাই। অঙ্কের দিকে জোর থাকে বেশী। টেক্‌নিক্যাল ইস্কুলে ৪।৫ বৎসর পড়িতে হয়। সরকারী চাকরীর জন্য এই সকল পাশ খুবই দরকারী।

ব্রুসেল্‌সের বিশ্ববিদ্যালয় বে-সরকারী। এখানকার লেখাপড়ায় খাঁটি সরকারী নিয়ম মানিয়া চলা হয় না। সিবিল এঞ্জিনিয়ার, বৈদ্যুতিক এঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক এঞ্জিনিয়ার আর রেলওয়ে জাহাজ এঞ্জিনিয়ার এই চার প্রকার এঞ্জিনিয়ার তৈয়ারী করা হয়।

বেলজিয়ামের সমর-বিদ্যালয়ের পাশকরা ছাত্রেরা অনেক সময়ে শিল্প-কারখানার কাজে মোতায়েন হয়। তাহাদিগকেও এঞ্জিনিয়ার বলা হইয়া থাকে।

স্পেনের এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যালয়

স্পেনদেশের এঞ্জিনিয়ারেরা সরকারী ইস্কুলের ছাত্র। একটা ইস্কুলের নাম 'পুল ও পথের টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট'। এটাকে সিবিল এঞ্জিনিয়ারিং ইস্কুল বলা চলে। মাদ্রিদে, বার্সেলোনায় এবং বিল্‌বাও নগরে তিনটা ইস্কুল আছে। এগুলা ফ্যাক্টরি-এঞ্জিনিয়ারিং (মেক্যানিক্যাল ও বৈদ্যুতিক) ইস্কুল। মাদ্রিদের খনিবিদ্যালয়টা স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখযোগ্য। মাদ্রিদে কৃষিবিদ্যালয় এবং বন-বিদ্যালয়ও আছে। দুইটা সমর বিদ্যালয়েও এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ আছে। তাহার একটায় স্থল-সেনার এঞ্জিনিয়ার আর একটায় জল-সেনার এঞ্জিনিয়ার তৈয়ারী হয়। এইসব ইস্কুলের প্রত্যেকটারই এঞ্জিনিয়ার উপাধি দিবার এক্তিয়ার আছে। তাহাছাড়া আরও কতক-গুলা সরকারী ইস্কুল হইতে বৈদ্যুতিক, রাসায়নিক ইত্যাদি এঞ্জিনিয়ারিং-বিষয়ক ডিপ্লোমা (সার্টিফিকেট) ঝাড়া হয়। এই ডিপ্লোমা-প্রাপ্ত লোকেরা অনেক সময় খাঁটি এঞ্জিনিয়ারের ইজ্জৎই পাইয়া থাকে। মাদ্রিদে একটা ক্যাথলিক পাদ্রীদের পরিচালিত টেক্‌নিক্যাল ইস্কুল আছে। তাহার ছাত্রেরাও এঞ্জিনিয়ার উপাধি পায়। কিন্তু গবর্মেণ্টের চোখে এই উপাধির ইজ্জৎ নাই।

গ্রীসের এঞ্জিনিয়ার

গ্রীসে আথেন্স নগরের পলিটেক্‌নিক বিদ্যালয় প্রসিদ্ধ। পাঁচ বিভাগ:—(১) সিবিল, (৪ বৎসর), (২) মেকানি-

ক্যাল ও বৈদ্যুতিক (৪ বৎসর), (৩) সার্ভে (২ বৎসর), (৪) বাস্তু (৪ বৎসর), (৫) রাসায়নিক (৪ বৎসর)। এই কয় বৎসর ইস্কুলে পড়িবার পূর্ব্বে প্রত্যেক ছাত্রকে কিছুকাল ধরিয়া একটা প্রবেশিকা পাঠ-চর্চ্চা চালাইতে হয়।

আথেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের রাসায়নিক বিভাগ হইতেও ডিপ্লোমা দেওয়া হয়। এই ডিপ্লোমার কিম্মৎ আর পলিটেক্‌নিকের ডিপ্লোমার কিম্মৎ একরূপ।

৮। ফাস্ত-ডে-ঈ লাখরিখ্‌টেন

(জার্ম্মাণির এঞ্জিনিয়ারিং পরিষদের সংবাদপত্র, সাপ্তাহিক, বার্লিন)।

আর্থিক তদন্তে ইংরেজ ও জার্ম্মাণ

ভারতে বিগত আটদশ বৎসরের ভিতর কমিশন বা কমিটির তদবিরে কতকগুলা আর্থিক তদন্ত ঘটিয়া গিয়াছে। এই সে-দিন মুদ্রা-তদন্ত শেষ হইয়াছে। এখনো কৃষি-তদন্ত চলিতেছে। শীঘ্রই হয়ত ব্যাঙ্ক-তদন্ত শুরু হইবে।

তদন্ত কারবারটা বর্ত্তমান জগতের একটা বড় জিনিষ। কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের তথ্য ও অঙ্ক সংগ্রহ করা পঁচিশ ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে দুনিয়ায় এক প্রকার জানাই ছিল না বলা চলে। ক্রমে ক্রমে এই সব অনুসন্ধান-গবেষণা আর্থিক মুলুকে অতি প্রধান ঠাঁই অধিকার করিয়া বসিয়াছে। তদন্ত না করিয়া আজকালকার গবর্মেণ্ট কোনো প্রকার আর্থিক আইন কায়েম করিতে প্রস্তুত নয়। এই বিষয়ে ইংরেজ আর মার্কিণ সরকার অতি ওস্তাদ। ইংরেজি ভাষায় সরকারী তদন্তের দলিল যত পাওয়া যায় অন্যান্য ভাষায় তত পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।

জার্ম্মাণির এঞ্জিনিয়ারিং পরিষদের সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্রে একজন লিখিতেছেন যে,—তদন্ত বস্তুটা জার্ম্মাণিতে এখনও অতি কচি জিনিষ। ইংরেজরা এই বিষয়ে ঝুনো। ইংরেজ-সমাজের আপামর জনসাধারণ আজকাল তদন্তে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। "খোঁজ" লওয়ার ঝোঁক আর খোঁজের বিবরণ বাহির হইলে তাহা লইয়া মাতামাতি করা ইংল্যাণ্ডে মুড়িমুড়কির মতন আটপৌরে চিজ। কিন্তু জার্ম্মাণ হাড়ে তদন্ত—"এঙ্কোয়েটে"—এখনও ভাল করিয়া রপ্ত হয় নাই।

কিছুদিন হইল বিলাতের অন্যতম তদন্ত-দক্ষ স্যার আর্থার বালফোর জার্ম্মাণিতে আসিয়া জার্ম্মাণ তদন্তীদিগকে তদন্ত-বিজ্ঞান-সম্বন্ধে একটা বক্তৃতা শুনাইয়া গিয়াছেন। বালফোর হইতেছেন বিলাতী কমিটি অব্ ইণ্ডাষ্ট্রী (শিল্প-কমিটির) প্রেসিডেণ্ট। তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন জার্ম্মাণির এঙ্কোয়েটে কমিটির প্রেসিডেণ্ট লাম্মার।

বালফোর যে তদন্ত-কমিটির কর্ত্তা তাহার জন্ম ১৯২৪ সনে। রামজে-ম্যাকডোন্থাল্ড তখন ইংল্যাণ্ডের মন্ত্রি-প্রধান। তদন্তের উদ্দেশ্য ছিল ইংল্যাণ্ডের শিল্প-বাণিজ্যের বর্ত্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করা আর ভবিষ্যৎ উন্নতির উপায় আলোচনা করা। প্রধানতঃ রপ্তানি-বাণিজ্য বাড়াইবার কৌশল আবিষ্কার করাই ছিল এই তদন্তের মর্ম্ম-কথা। কিন্তু জার্ম্মাণিতে সম্প্রতি যে অনুসন্ধান (এঙ্কোয়েটে) চলিতেছে, তাহাতে কৃষি-বিষয়ক তদন্তও বাদ যাইতেছে না। বিলাতী তদন্তে কৃষিটা বাদ গিয়াছিল। তবে জার্ম্মাণ এঞ্জিনিয়ার মহাশয় জানেন না যে, কৃষি-সম্বন্ধে রামজে-ম্যাকডোন্থাল্ডই আর একটা স্বতন্ত্র কমিশন—"ট্রিবিউন্থাল"—বসাইয়াছিলেন।

বালফোর-কমিটিতে ১৮ জন লোক। প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিভাগে বিশেষজ্ঞ। কমিটি পাঁচ বিভাগে বিভক্ত :—
(১) তথ্য-তালিকা, (ষ্টাটিষ্টিকস্), (২) বহির্ব্বাণিজ্য, (৩) শিল্প-কারখানার জন্য রসদ, (৪) আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের বিধি-ব্যবস্থা, (৫) মজুর ও মজুরি।

সরকারী দপ্তরের যেখানে যতটুকু সম্ভব প্রত্যেক ঠাঁই হইতেই বালফোর কমিটি সকল প্রকার আর্থিক তথ্য সঙ্কলন করিয়া কাজে প্রবৃত্ত হয়। তাহার পর শুরু হয় প্রত্যেক বিভাগের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র খোঁজ। এই খোঁজগুলা সাক্ষীর জবানবন্দী ও শুনানিবিশেষ। দেশের সকল প্রকার বিশেষজ্ঞের লিখিত মতামত গ্রহণ করা হয়। তাহার পর দরকার বোধ হইলে তাঁহাদিগকে ডাকিয়া জেরা করিবার দস্তুরও আছে। এই জেরার সাহায্যে অনেক বাদানুবাদ তর্ক-প্রশ্ন এবং কমিটির সঙ্গে সাক্ষীর ভাববিনিময় চলিতে পারে। ভারতবাসীর নিকট এই সব চিজ আজকাল সুপরিচিত।

১৯২৪ সনের মাঝামাঝি হইতে আজ পর্য্যন্ত বিলাতী তদন্ত চলিতেছে। এখনো শেষ রিপোর্ট বাহির হয় নাই (ফেব্রুয়ারি ১৯২৭)। অবশ্য কার্য্য-বিবরণী সবই তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কমিটি এখন দেশের নানা সরকারী দপ্তরের নিকট কাগজগুলা পাঠাইয়া পরখ করিয়া লইতেছে। ভুলচুক যদি কেহ কিছু ধরিতে পারে তাহা এই প্রণালীতে শোধরানো হইয়া যাইবে। তাহার পরে বাজারে ছাড়া হইবে।

১৯২৫ সনে বাহির হইয়াছে বহির্ব্বাণিজ্য (বিদেশী বাজার) বিষয়ক রিপোর্ট। ১৯২৬ সনে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে আছে ইংল্যাণ্ডের শিল্প-কারখানা-বিষয়ক তথ্য ও মন্তব্য। এইবার তৃতীয় খণ্ড বাহির হইবে। তাহাতে বিলাতী শিল্প-বাণিজ্যের কর্ম্মক্ষমতা সম্বন্ধে মতামত থাকিবে। এই বৎসরই গ্রীষ্মকালে তদন্ত-কমিটির শেষ-সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা।

ধনোৎপাদনের কর্ম্মকৌশল, কারখানা-পরিচালনার রীতি, বাজারে মাল প্রচার করিবার কায়দা ইত্যাদি সকল বিষয়েই আলোচনা থাকিবে। তাহা ছাড়া শিল্প-বাণিজ্যে সঙ্ঘ-গঠন (কার্টেল ও ট্রাষ্ট) সম্বন্ধেও অনেক কথা আলোচিত হইবে।

ইংরেজ তদন্তীরা গবেষণাটা করিয়াই খালাস হয় না। বস্তুনিষ্ঠভাবে তথ্যগুলা সংগ্রহ করা তাহাদের একটা বড় কাজ বটে। কিন্তু প্রত্যেক তদন্তের সঙ্গেই তদন্তীরা গবর্মেণ্টের কর্ত্তব্য, জনসাধারণের কর্ত্তব্য ইত্যাদি সম্বন্ধে মত ঝাড়িতে অধিকারী। বস্তুতঃ, এইসব কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ঠাওরাইবার জন্যই ইংরেজ গবর্মেণ্ট তদন্ত বসাইতে অভ্যস্ত। তবে সকল ক্ষেত্রেই তদন্তীদের প্রত্যেক মত কড়ায় ক্রান্তিতে পালন করিবার প্রতিজ্ঞা গবর্মেণ্ট করে না। কিন্তু জার্ম্মাণ তদন্তের উদ্দেশ্য অন্যরূপ। জার্ম্মাণির তদন্তীরা গবর্মেণ্টকে অথবা জনসাধারণকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে কোনো প্রকার পরামর্শ দিবার জন্য বাধ্য নয়। দেশের আর্থিক অবস্থাটা কি তাহা খুঁটিয়া খুঁটিয়া বিবৃত করিতে পারিলেই 'এঙ্কোয়েটে"-কমিটির কার্য্য সিদ্ধ হয়।

লাম্মার বলিতেছেন,—"জার্ম্মাণির আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থায় কোনো প্রকার শৃঙ্খলা আজও গজিয়া উঠে নাই। এখনো কোনো প্রকার ঐক্য-গ্রথিত মতামত বা কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য-প্রচারের সময় দেখিতে পাইতেছি না।

জার্ম্মাণ তদন্তের আরও কিছু বিশেষত্ব আছে। জার্ম্মাণিতে তদন্তীরা হলপ করাইয়া লোকজনের নিকট হইতে সংবাদ বাহির করিতে অধিকারী। কিন্তু বিলাতের তদন্ত-ব্যবস্থায় হলপ বা অন্য কোনো প্রকার জোর-জবরদস্তি নাই। যাহার যতটুকু খুসী সে ততটুকু বলিতে অধিকারী। কেহ যদি কোনো খবর দিতে রাজী না থাকে তাহার কথা কাগজে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ইহাতেই তাহার ইজ্জৎ যাইবার সম্ভাবনা। এইরূপ বুঝিয়া ইংল্যণ্ডে তদন্ত-কমিটির হাতে অতিরিক্ত কোনো প্রকার ক্ষমতা দেওয়া হয় না।

৯। ইকনমিক জার্ণ্যাল

(বিলাতী রয়্যাল ইকনমিক সোসাইটির ত্রৈমাসিক মুখ-পত্র, লণ্ডন)।

১৯২৬ ডিসেম্বরের সংখ্যায় তিন পৃষ্ঠা আছে পত্রিকা-জগতের বিবরণের জন্য। পত্রিকাগুলার নাম নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। কয়েকটা প্রবন্ধের সূচীও দেওয়া গেল।

ক। জার্ণ্যাল অব্ দি রয়্যাল ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল সোসাইটি (বিলাতী তথ্যতালিকা-পরিষদের পত্রিকা),—জুলাই ১৯২৬ :—(১) বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ এবং মূল্যাদি পূর্ব্ব হইতে গুনিবার প্রণালী, (২) শিল্প-বাণিজ্যের স্বাভাবিক ব্যাধি, (৩) আধুনিক তথ্যতালিকা-বিজ্ঞানে ইতালির দান।

খ। সোসিঅলজিক্যাল রিভিউ (সমাজ-বিজ্ঞান পত্রিকা, অক্‌টোবর ১৯২৬ :—(১) সুপ্রজনন-বিদ্যার স্বপক্ষে যুক্তি, (২) সমাজ সম্বন্ধে প্রাণবিজ্ঞানের মতামত।

গ। কোআর্টার্লি জার্ণ্যাল অব্ ইক্‌নমিক্‌স্ (হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের (ত্রৈমাসিক ধনবিজ্ঞান-পত্রিকা) :—(১) ফেডার্যাল বাণিজ্য-তদন্ত, (২) ইতালিয়ান পণ্ডিত পান্তালেয়নি-প্রবর্ত্তিত মূল্য-ওঠানামার দিগ্‌দর্শন, (৩) স্বর্ণ মুদ্রাশীল দেশের সঙ্গে রৌপ্যমুদ্রাশীল দেশের আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য,—চীনের কথা, (৪) তিমি মাছ ধরিবার ব্যবসায় মজুরি, ঝুঁকি ও মুনাফা।

ঘ। আমেরিকান ইকনমিক রিভিউ, সেপ্টেম্বর ১৯২৬:—(১) অঙ্কের সাহায্যে পরিমাণ-বিশ্লেষণ আর ধনবিজ্ঞানবিদ্যায় তাহার প্রভাব, (২) যন্ত্রপাতির সঙ্গে মজুরির হারের যোগাযোগ-নির্ণয়।

ঙ। পোলিটিক্যাল সায়েন্স কোআর্টার্লি (নিউ ইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত রাষ্ট্র-বিজ্ঞান ত্রৈমাসিক):—(১) লড়াইয়ের ক্ষতিপূরণ-সমস্যা,—নগদ টাকা দিবার সু-কু, (২) রাজস্ববিজ্ঞানের সমাজ-কথা।

চ। জার্ণ্যাল অব্ পোলিটিক্যাল ইকনমি (শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত ধনবিজ্ঞান-পত্রিকা), আগষ্ট, ১৯২৬:—

(১) যুদ্ধের পরবর্ত্তী কালে আমেরিকার ঋণ, (২) মাশুল ও ভাড়া—রেলওয়ে-শাসনের বনিয়াদ, (৩) শুল্ক-ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য গড়-পড়তা খরচ আলোচনা করা কর্ত্তব্য না সীমান্ত-খরচের খতিয়ান করা আবশ্যক? (৪) মজুরি-নির্দ্ধারণ-সমস্যায় "খাই খরচের" ঠাঁই। অক্টোবর ১৯২৬:—(১) জার্ম্মাণিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের শিক্ষা-ব্যবস্থা, (২) চাষ-আবাদের আর্থিক কথা, (৩) মার্কিণ বাণিজ্য-তরণীতে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য, (৪) এঞ্জেল-প্রচারিত আন্তর্জ্জাতিক মূল্যতত্ত্ব।

ছ। অ্যান্যাল্স্ অব্ দি আমেরিকান অ্যাক্যাডেমি (মার্কিণ ধনবিজ্ঞান-পরিষদের ত্রৈমাসিক, ফিলাডেল-ফিয়া),—সেপ্টেম্বর ১৯২৬:—যুক্তরাষ্ট্রের হাটবাজার। এই অধ্যায় তিন ভাগে বিভক্ত (১) বিদেশী বাজারের আকার-প্রকার, (২) আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের বর্ত্তমান গতি, (৩) মাল-হিসাবে আমদানি-রপ্তানির আলোচনা।

জ। মান্থ্লি লেবার রিভিউ (যুক্ত রাষ্ট্রের ফেডার‍্যাল দরবার হইতে প্রকাশিত মাসিক মজুর-পত্রিকা, ওয়াশিংটন), জুলাই ১৯২৬:—(১) ইস্পাত, অটোমোবিল এবং কাগজের কারখানায় মেহনতের ফলাফল। আগষ্ট ১৯২৬:—(১) বিলাতের কয়লা-শিল্পে লোকহিত-বিধায়ক কর্ম্ম, (২) মার্কিণ মজুরসমিতিসমূহের সভ্যসংখ্যা, (৩) যুক্তরাষ্ট্রে সমবায়-নিয়ন্ত্রিত-কারখানা, (৪) যুক্তরাষ্ট্রে "খাই খরচ"। ১৯১৩ হইতে ১৯২৬ পর্য্যন্ত খাইখরচের ইতিহাস।

ঝ। রেভ্যিু দেকোনোমী পোলিটিক্। অধ্যাপক জিদ সম্পাদিত ধনবিজ্ঞান-পত্রিকা, প্যারিস। মে-জুন ১৯২৬:—(১) বিনিময়-সম্বন্ধে আজকালকার মতামত, (২) মুদ্রা সম্বন্ধে ইংল্যাণ্ডের আধুনিক মতামত, (৩) ইংল্যাণ্ডের আর্থিক দুরবস্থার কারণ,—ইংরেজ ব্যাঙ্কারদের মতামত, (৪) শুল্ক-ব্যবস্থায় কৃষি-শিল্পের ক্ষতিবৃদ্ধি। জুলাই-আগষ্ট ১৯২৬:—(১) বিনিময়-সম্বন্ধে চিত্তবিজ্ঞানের কথা, (২) মুদ্রার দ্রব্য-ক্রয়ক্ষমতা সম্বন্ধে কাসেলের মত গ্রহণীয় কিনা, (৩) ফরাসী মজুর-ঋষি ফুরিয়ে।

ঞ। জুর্ণ্যাল দেজ্ একনমিস্ত্ (ফরাসী ধনবিজ্ঞান পরিষৎ-পত্রিকা, প্যারিস, অক্টোবর ১৯২৬, (১) বিংশ শতাব্দীর আর্থিক মানব, (৫) ঘরবাড়ীর সমস্যা।

ট। শ্মোল্লার্স যারবুখ্ (জার্ম্মাণ ধনবিজ্ঞান-পণ্ডিত শ্মোল্লার-প্রবর্ত্তিত ধনবিজ্ঞান বার্ষিক। বৎসরে ছয়বার বাহির হয়, মিউনিখ ও লাইপৎশিগ হইতে),—আগষ্ট ১৯২৬:—(১) কোন্ পথে অষ্ট্রিয়া? (২) সোভিয়েট রুশিয়ার কৃষি-সমস্যা, (৩) শিল্প-জগতের আমলাতন্ত্র, (৪) লড়াইয়ের সময়ে নদীপথে যাতায়াত, (৫) হান্স্ কেলসেন প্রচারিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানে কর্ত্তৃত্ব ও সাম্য-বিষয়ক মতামত, (৬) বর্ত্তমান জগতের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা, (৭) বীমা-ব্যবস্থার নবীনরূপ, (৮) দুনিয়ার ইতিহাস সম্বন্ধে নৃতত্ত্বের বাণী। অক্টোবর ১৯২৬ (১) ফ্রেড্রিক লিষ্ট-প্রণীত একখানা অজানা গ্রন্থ, (২) পুঁজিপতি-নিয়ন্ত্রিত বর্ত্তমান জগতে চাষীর আর্থিক জীবন, (৩) সোভিয়েট রুশিয়ার মজুর-সমস্যা।

ঠ। যারবুখ্ ফ্যির নাট্সিওনাল-য়োকোনোমী উণ্ড ষ্টাটিষ্টিক্ (জার্ম্মাণির য়েনা হইতে প্রকাশিত ধনবিজ্ঞান ও সংখ্যাবিজ্ঞান-বিষয়ক পত্রিকা),—আগষ্ট ১৯২৬:—(১) সুদ-সমস্যা, (২) জীবনবীমা কোম্পানী—মুদ্রার পতন-উত্থানে তাহাদের আর্থিক অবস্থার রূপান্তর, (৩) রাইখস্-বাঙ্ক নামক জার্ম্মাণির নোট-ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে নয়া আইনকানুন।

ড। আর্খিভ ফ্যির সোৎসিয়াল ভিসসেন্শাফ্ট্ উণ্ড সোৎসিয়াল পোলিটিক (ট্যিবিঙ্গেন হইতে প্রকাশিত সমাজ-বিজ্ঞান পত্রিকা),—আগষ্ট ১৯২৬:—(১) ধনবিজ্ঞানের কেন্দ্র-

কথা হইতেছে ধনসম্পদের চলাচল, (২) মজুর ও মজুরি-বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ, (৩) ফ্রান্সে মজুর-আমদানি, (৪) মেহনতের মূল্য-নিরূপণ, (৫) বিলাতে সমাজ-বীমা।

ঢ। হেবেল্ট্ হ্বির্টশাফ্ট্লিখেস্ আর্খিহ্ব (আর্থিক জীবনের বিশ্ব-ব্যবস্থা, য়েনা), অক্টোবর ১৯২৬,—(১) বাণিজ্য-জগতে মাঝে মাঝে সঙ্কট উপস্থিত হয় এই কথা বলা চলে কিনা? (২) কৃষি-সমবায়ের আর্থিক উপকারিতা, (৩) পুঁজি ও মুদ্রা।

ণ। ৎসাইট্শ্রিফ্ট্ ফ্যির ডী গেজাম্টে ষ্টাট্স্-হ্বিস্‌সেন শাফ্ট (সমগ্র রাষ্ট্রবিজ্ঞান-বিষয়ক পত্রিকা, ট্যিবিঙ্গেন):—(১) সমাজ-চিন্তায় উদারপন্থিতা, (২) রাজস্ববিজ্ঞান-বিষয়ক নয়া নয়া কেতাব।

ত। ফীর্টেল-য়ার্স্‌হেফ্টে ৎসুর কোন্‌যুক্‌টুর-ফোর্শুঙ্ (বাণিজ্য-সঙ্কট সম্বন্ধে গবেষণা-বিষয়ক ত্রৈমাসিক, বার্লিন), ১৯২৬:—(১) ঋতু-মাফিক আর্থিক পরিবর্ত্তনগুলাকে এই "সঙ্কটে"র বিশ্লেষণে ঠাঁই দেওয়া উচিত কি? (২) যুদ্ধের পূর্ব্বে ও পরে দুনিয়ার মাল-উৎপাদন, (৩) "সঙ্কটে"র পূর্ণ মূর্ত্তি, (৪) মুদ্রা-সংস্কারের পরবর্ত্তী কালে জার্ম্মাণির আন্তর্জ্জাতিক দেনাপাওনা।

থ। জ্যর্ণালে দেলি একনমিস্তি (মিলান হইতে প্রকাশিত ধনবিজ্ঞান-পত্রিকা),—আগষ্ট ১৯২৬:—(১) হীন-মূল্য মুদ্রার আমলে আন্তর্জ্জাতিক দেনাপাওনা এবং টাকার বিনিময়-হার কিরূপ চলে? সেপ্টেম্বর ১৯২৬:—(১) সংখ্যা-গণনায় যন্ত্রপাতির ব্যবহার।

দ। সিয়েন্‌তিয়া (বিজ্ঞান, মিলান), অক্টোবর ১৯২৬:—কৃষি-ব্যবস্থার ভবিষ্যগতি।

ধ। লা রিফর্মা সোসিয়ালে (সমাজ-সংস্কার নামক ইতালিয়ান পত্রিকা, তুরিণ হইতে প্রকাশিত), জুলাই-আগষ্ট ১৯২৬:—(১) বলজ্ঞা নগরে সমবায়-ব্যাঙ্ক, (২) ইতালিতে মাগ্‌গি জীবন, (৩) বহির্ব্বাণিজ্যের সরকারী প্রতিষ্ঠান, (৪) বিলাতে বেকার-বীমার পাঁচ বৎসর। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯২৬:—(১) সংরক্ষণ নীতির সার কথা।

ন। লেকনমিস্ত্ রুমাঁ (রুমেণিয়ার আর্থিক পত্র, বুখারেষ্ট হইতে ফরাসী ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত),—জুলাই-আগষ্ট ১৯২৬:—(১) ১৯২৫ সনের মূল্য, (২) রুমেণিয়ার কৃষি-সম্পদ্।

প। রিহ্বিস্তা ন্যাশনাল দি একনমিয়া (স্পেনের আর্থিক পত্রিকা, মাদ্রিদ হইতে প্রকাশিত),—জুলাই-আগষ্ট ১৯২৬:—(১) পুনর্গঠনের আর্থিক সমস্যা।

ফ। ইণ্টার্ণ্যাশন্যাল লেবার রিহ্বিউ (জেনেহ্বা হইতে প্রকাশিত আন্তর্জ্জাতিক মজুর ও মজুরি-পত্রিকা),—জুলাই ১৯২৬,—(১) ফ্রান্সে মজুর-বিধির উৎপত্তিস্থল ও ব্যাখ্যা-প্রণালী, (২) অতি-উৎপাদন ও স্বল্প-ভোগ, (৩) শিল্প-ব্যবসা-বিষয়ক চিত্তের বিশ্লেষণ। আগষ্ট ১৯২৬:—(১) আট ঘণ্টার রোজ, (২) ১৯২৫ সনের বেকার, (৩) ফ্রান্সে ঘরোয়া মেয়ে-মজুরদের জন্য নিম্নতম মজুরি-বিধি। সেপ্টেম্বর ১৯২৬:—(১) জার্ম্মাণিতে কর্ম্মদাতাদের সমিতি, (২) ইতালিতে মজুর-সমিতি-বিষয়ক আইন-সংস্কার, (৩) বল্কান জনপদে মজুর-সমিতির ক্রমবিকাশ। অক্টোবর ১৯২৬:—(১) মজুর ও মজুরি বিষয়ক সংখ্যা-বিজ্ঞানের আকার-প্রকার, (২) সুইডেনের পারিবারিক আয়ব্যয় সম্বন্ধে ১৯২৩ সনের তদন্ত।
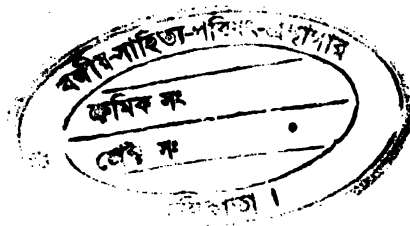
রুশিয়ার বিজ্ঞান ও চাষ-ব্যবস্থা

রুশ ভাষায় প্রকাশিত দুইখানা গ্রন্থের জার্মাণ সমালোচনা বাহির হইয়াছে য়েনা হইতে প্রকাশিত হেবেল্ট্-হ্বির্টশাফ্ট্ লিখেন আর্খিহ্ব পত্রিকায়। গ্রন্থকারের নাম ষ্টুডেন্‌স্‌কি। প্রকাশক মস্কোর সেন্ট্রোসোয়ুস্ কোং। প্রথম বইটার জার্মাণ নামের অর্থ কৃষি-ব্যবস্থার বিজ্ঞান-কথা (১৯২৫, ৩৮৩ পৃষ্ঠা)। দ্বিতীয় বইয়ের নাম চাষ-ব্যবসায় খরচপত্র ও মুনাফা (১৯২৫, ১১৩ পৃষ্ঠা)। সমালোচক হইতেছেন একজন রুশ পণ্ডিত,—লেনিনগ্রাড শহরের হ্বাসিলি লেওনতীফ্।

গ্রন্থ দুইটার একটায় "থিয়োরি" বা তত্ত্বাংশ বেশী। অপরটায় বর্ত্তমান অবস্থার বৃত্তান্ত প্রধান ঠাঁই অধিকার করে। তবে এই অবস্থার আলোচনা ও হিসাবপত্র আঁকজোকের প্রভাব বেশী।

তত্ত্বাংশটা ধনবিজ্ঞানের আসরে, বিশেষতঃ ভারতে,—কথঞ্চিৎ নতুন মালুম হইবার কথা। বিষয়টা "মূল্যতত্ত্বের" অন্তর্গত। চাষ-আবাদের কথাগুলাকে মূল্য-বিজ্ঞানের কাঠামে ফেলিবার জন্য ষ্টুডেন্‌স্‌কি কলম ধরিয়াছেন।

বিষয়টার ভিতর হাতীঘোড়া কিছু আছে বলিয়া সাধারণের পক্ষে সন্দেহ করাই কঠিন। কিন্তু এই সামান্য কথার ভিতরও গোলমেলে চিজ আছে। এই লইয়া পণ্ডিতে পণ্ডিতে লড়াইও চলে।

"প্রাকৃত" ও "সংস্কৃত কৃষিকর্ম্ম

গোড়ায়ই জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, বর্ত্তমান জগতে চাষ-আবাদ বলিলে দুই শ্রেণীর কাজ বুঝিতে হইবে; প্রথমতঃ, আধুনিক বা নব্য কৃষি-ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থাকে "পুঁজিনীতি-শাসিত রূপে বিবৃত করা হইয়া থাকে। আজকাল-কার ফ্যাক্টরিতে, ব্যাঙ্কে, আমদানি-রপ্তানিতে যে ধরণের পুঁজিশাহী বা পুঁজি-তন্ত্র চলে, চাষ-আবাদের কাজেও সেই ধরণেরই মূলধন-মাহাত্ম্য, মজুর-মালিক সম্বন্ধ, বাজারে কেনা-বেচার রীতি দেখা যায়। এই কথাটা ভারতে বুঝা সহজ নয়। কেন না এই শ্রেণীর চাষ-ব্যবসা,—যাকে "ক্যাপিটালিষ্টিক" ব্যবস্থা বলিতে পারি,—আমাদের দেশে এখনো মাথা খাড়া করে নাই।

বর্ত্তমান জগতের অন্য প্রকার চাষ-ব্যবস্থা হইতেছে প্রাক-পুঁজিশাহীর অন্তর্গত। অর্থাৎ এই ব্যবস্থায় মূলধন মাহাত্ম্য, মজুর-সমস্যা, বাজার-প্রভাব ইত্যাদি বস্তু প্রকট নয়। পুঁজিনীতি দুনিয়ায় দেখা দিবার পূর্ব্বে,—অর্থাৎ অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্য্যন্ত মানবসমাজের আর্থিক ব্যবস্থা ও ধরণ যেরূপ ছিল কৃষিকর্ম্ম সেইরূপই চলিতেছে। এই ব্যবস্থাকে সহজে "সেকেলে"—আদিম বা মান্ধাতার আমলের কৃষিকর্ম্ম বলা চলে। এই ধরণের আদিম বা "প্রাকৃতিক" কৃষি বর্ত্তমান জগতের অনেক মুল্লুকেই চলিতেছে। রুশিয়া, ভারত, চীন ইত্যাদি দেশ তাহাদের অন্তর্গত। ইয়োরোপের বল্কান অঞ্চলে, ইতালিতে এবং স্পেনও "প্রাকৃত" কৃষির ঠাঁইয়ে "সংস্কৃত" কৃষি প্রবল আকারে দেখা দেয় নাই। যে-যে দেশে বা জনপদে "প্রাকৃত" কৃষিই বিংশ শতাব্দীতেও চলিতেছে, বুঝিতে হইবে যে, সেই সকল অঞ্চলে বর্ত্তমান জগৎ আত্মপ্রকাশ করে নাই। এই হিসাবে ভারত, চীন, রুশিয়া ইত্যাদি দেশ "সংস্কৃত" ("সভ্য"?) দুনিয়ার বাহিরে।

ষ্টুডেন্‌স্‌কি বনাম চায়ানোফ্

যাক,—চাষ-ব্যবস্থার "প্রাকৃত" ও "সংস্কৃত" শ্রেণী অর্থাৎ সেকেলে আর আধুনিক গোত্রটা বুঝিয়া রাখা গেল। এখন মূল্য-বিজ্ঞানের মামলা। কোনো কোনো বিজ্ঞানসেবী

বলেন যে,—প্রাকৃত বা সেকেলে চাষ-আবাদে যে ধরণের ধন-সূত্র খাটে একালের অর্থাৎ সভ্যভব্য, যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত, পুঁজি-শাসিত কৃষিকর্ম্মে সেই নিয়ম খাটে না। বর্ত্তমান যুগের ধনবিজ্ঞান শাস্ত্র এই নবীনতম কৃষিব্যবস্থার তথ্যসমূহেরই দর্শন-স্বরূপ। কাজেই এই বিজ্ঞানের সূত্রগুলা সেকেলে চাষ-আবাদের তথ্যসমূহের উপর খাটাইতে গেলে ভুল হইবে। ষ্টুডেন্‌স্‌কি এই মতের বিপক্ষে মত দিয়াছেন। তাঁহার মতে কি "সভ্য" কি "অসভ্য," অর্থাৎ সকল প্রকার চাষেই একই বিনিময়-নীতি, একই মুদ্রানীতি. একই মূল্য-নীতি খাটে। তিনি অদ্বৈতবাদী পুঁজিতন্ত্রের প্রচারক।

এই মতটা রুশ সাহিত্যে প্রচলিত মতবাদের ডাহা উল্টা। যে মতবাদ রুশিয়ার পণ্ডিতমহলে চলিতেছে তাহার অন্যতম প্রতিনিধি হইতেছেন অধ্যাপক চায়ানোফ্‌। তাঁহার গ্রন্থ জার্ম্মাণ ভাষায় অনূদিত হইতেছে "ডী লেরে ফোন ডার ব্যায়ার্লিখেন হ্বির্টশাফ্‌ট" (সেকেলে চাষ-ব্যবস্থার তত্ত্বকথা) নামে। চায়ানোফ্‌ "প্রাকৃত" কৃষি-কর্ম্মকে একদম বিশেষত্বপূর্ণ বস্তু বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত। এই চাষ-আবাদের নিয়মকানুন সবই স্বতন্ত্র রকমের। বর্ত্তমান জগৎসুলভ পুঁজি-যন্ত্রপাতি-নিয়ন্ত্রিত কৃষি-ব্যবস্থার মাপকাঠিতে মামুলি "অসভ্য" চাষীদের আবাদকার্য্য নেহাৎ যুক্তিহীন এবং অবিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে চলিয়া থাকে। সেকেলে ব্যবস্থার মজুরির নিয়ম, দামের নিয়ম খরচপত্রের নিয়ম এ কালের নিয়ম দেখিয়া বুঝা যায় না।

চায়ানোফের সঙ্গে ষ্টুডেন্‌স্‌কির তাত্ত্বিক লড়াইটা বাস্তবিক পক্ষে প্রাচীনে নবীনে প্রভেদ-বিষয়ক তথ্যবিশ্লেষণ। কাজেই বিষয়টা ধনবিজ্ঞানের কোঠা ছাড়াইয়া সমাজ-বিজ্ঞান বা দর্শনের মুল্লুকেও দেখা দিয়াছে। বস্তুতঃ, এই প্রভেদ সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক পণ্ডিতের আখড়ায় নতুন-কিছু নয়।

আর্থিক অদ্বৈতবাদ

ষ্টুডেন্‌স্‌কি বলিতেছেন,—"রবিন্‌সন ক্রুসো যে ধরণের দুনিয়ায় চতুঃসীমার ভিতর গণ্ডীবদ্ধ সমাজে বসবাস করিয়াছে, সেই দুনিয়ার নিয়মকানুন স্বতন্ত্র। একথা অস্বীকার করি না। সেই দুনিয়ার সঙ্গে অন্যান্য দুনিয়ার কোনো যোগাযোগ নাই। সেই ক্ষেত্রে সাধারণ্যে প্রচলিত মুদ্রানীতি, মূল্য-নীতি খাটিতে পারে না। দুয়ার-বন্ধ-করা দুনিয়ার ধরণ-ধারণ আর দুয়ার-খোলা, হাওয়া-চলাফেরা-করা দুনিয়ার ধরণ-ধারণ একরূপ নয়। একথা সহজেই বুঝা যাইতে পারে"।

কিন্তু মামুলি, "অসভ্য", সেকেলে চাষ-আবাদকে দুয়ার-বন্ধ-করা রবিন্‌সন ক্রুসোর পরিচিত দুনিয়ার আর্থিক ব্যবস্থার সামিল করা চলিতে পারে না। যখনই দেখা যাইতেছে যে, কোনো জগৎকে ঘিরিয়া কোনো দেওয়াল খাড়া করা হয় নাই, অথবা যে দেওয়ালটা ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে তখন আর সেই দুনিয়াকে নিয়মকানুন হিসাবে "স্বতন্ত্র" বিশেষত্বপূর্ণ জগৎ বিবেচনা করা উচিত নয়। সেই দুনিয়ায় বিশ্বশক্তির খেলা চলিতেছে। গোটা মানব-সংসারের যা-কিছু আর্থিক নিয়মকানুন সবই এই দেওয়াল ভাঙা দুনিয়ায় কাজ করিতে বাধ্য। এই ব্যবস্থায় "প্রাকৃত" নিয়ম-গুলা "সংস্কৃত" ব্যবস্থার প্রভাবে রূপান্তরিত হইতেছে। অর্থাৎ পুঁজি-শাসিত চাষ-আবাদের মূলসূত্রগুলা এই তথা-কথিত প্রাকৃত বা সে-কেলে ব্যবস্থায়ও পুরামাত্রায়ই খাটে। কাজেই বর্ত্তমান জগতের কোনো কোনো জনপদে আধুনিক নিয়ম খাটিতেছে আর কোথাও কোথাও সেকেলে নিয়ম খাটিতেছে এইরূপ প্রভেদ স্বীকার করা অসম্ভব। সর্ব্বত্রই পুঁজিনীতির প্রভাব লক্ষ্য করা দরকার।

চাষ-আবাদের বাজার-তত্ত্ব

ষ্টুডেন্‌স্‌কির এই আলোচনা-প্রণালীর মর্ম্মকথা হইতেছে বাজার-বিজ্ঞান-বিষয়ক তথ্য ও তত্ত্ব। রবিনসন ক্রুসোর দুনিয়ায় বাজারটা প্রতিদ্বন্দিতা-বিহীন। এখানে কোনো ক্রেতার সঙ্গে অপর কোনো ক্রেতার টক্কর নাই। খরিদ্দারে খরিদ্দারেও প্রতিযোগিতা চলে না। লেনদেন, বিনিময় ইত্যাদি কাণ্ড অতি সহজ-সরল। কিন্তু যেই এই আর্থিক দ্বীপটার ভিতর বিশ্বশক্তির আনাগোনা সুরু হইল, তখনই প্রতি-যোগিতা, টক্কর ইত্যাদি বস্তু দেখা দেয়। বাজারের দর-কষাকষি মজুরির হার বাড়ানো-নামানো ইত্যাদি সামাজিক লক্ষণ হাজির হয়। চায়ানোফ্‌ "সেকেলে" ব্যবস্থায় বাজার-বস্তুর প্রভাব দেখিতে পান না। কিন্তু ষ্টুডেন্‌স্‌কি এই বাজার-তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়া "সেকেলে" ব্যবস্থায়ও একালেরই মোটা লক্ষণগুলা পাকড়াও করিয়াছেন।

কিন্তু আসল প্রশ্নটা হইতেছে সম্প্রতি অন্যরূপ। ধরিয়া লওয়া গেল যে, বর্ত্তমান জগতের "সেকেলে" চাষ-আবাদটা বাস্তবিকই আর্থিক দ্বীপমাত্র নয়। তাহাতেও "একাল" বিরাজ করিতেছে। কিন্তু একালের "কতটা" তাহার ভিতর দেখা যায়? ষ্টুডেন্‌স্‌কির জবাব, 'পুরাপুরি'। পুঁজি-শাসিত চাষ-আবাদের খরচপত্র, লাভালাভ যে-যে প্রণালীতে নিয়ন্ত্রিত হয়, মামুলি অসভ্য রকমের চাষ-আবাদেও কড়ায় ক্রান্তিতে ঠিক সেই সকল নিয়মই ষোল আনা খাটিতেছে।

প্রকৃতি বনাম বিনিময়

ষ্টুডেন্‌স্‌কির এই মত পূরাপূরি টেঁক্‌সই নয়। কেন না,—চাষ-আবাদটা সেকেলেই হউক বা একেলেই হউক, তাহার ধরণ-ধারণ একমাত্র বিনিময়-বস্তুর উপর নির্ভর করে না। ইহার সঙ্গে প্রকৃতির সম্বন্ধ অতি নিবিড়। কি "প্রাকৃত" কি "সংস্কৃত" উভয় কৃষিকর্ম্মেই প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাব আলোচ্য। এই প্রাকৃতিক তরফ বাদ দিয়া ষ্টুডেনস্‌কি বিনিময়-বাজার, প্রতিযোগিতা দর-কষাকষি ইত্যাদি শক্তির তরফ বিশেষ করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই দিক্‌টা ফুটাইয়া তুলিবার দরুণই সকল প্রকার চাষে তিনি পুঁজিনীতির জয়জয়কার দেখিয়াছেন।

বাস্তবিক পক্ষে চরম মতের অদ্বৈতবাদ চলিতে পারে না। পুঁজিনীতি ছাড়াও অন্যান্য শক্তি—প্রকৃতির প্রভাব,—বর্ত্তমান জগতের প্রাকৃত এবং সংস্কৃত দুই প্রকার শ্রেণীর চাষে লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। তবে ঠিক কোন্ ক্ষেত্রে প্রকৃতির প্রভাব কতটা আর বিনিময়-বাজার-প্রতিযোগিতার প্রভাব কতটা তাহা ষ্টাটিষ্টিক্‌সের সাহায্যে বস্তুনিষ্ঠরূপে খতাইয়া দেখা আবশ্যক হইবে।

পল্লী সমাজে ভোগ বনাম কেনা-বেচা

কৃষিতত্ত্ব সম্বন্ধে দার্শনিক হিসাবে ষ্টুডেন্‌স্‌কি চরমপন্থী। অদ্বৈতবাদের প্রভাবে তাঁহার চিন্তায় একদেশদর্শিতা আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ তথ্য-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাঁহার গ্রন্থ আর্থিক সাহিত্যে বিশেষ মূল্যবান্। প্রাক্-যুদ্ধ যুগের শেষ কয়েক- বৎসর ধরিয়া রুশ কিষাণদের আয়ের পরিমাণ কিরূপ ছিল তাহার অঙ্কগুলা লইয়া গণনা করিতে এই লেখক সিদ্ধহস্ত। সেকালের রুশ সাম্রাজ্য ৫০টা প্রদেশে বিভক্ত ছিল। ষ্টুডেন্‌স্‌কি প্রত্যেক প্রদেশের চাষীদের মোট আয় কষিয়া বাহির করিয়াছেন। চাষের ফসলগুলার প্রত্যেকটা সম্বন্ধেই উৎপাদনের পরিমাণ ও হার মাপিয়া জুকিয়া দেখা হইয়াছে। কোন্ ফসলের কতটা,—উৎপাদনের তুলনায়,—বাজারে বিক্রী হইয়াছে তাহার হিসাবও বাদ পড়ে নাই। এই ধরণের আলোচনা যে-কোনো দেশ সম্বন্ধেই চালানো যাইতে পারে। তাহাতে গবেষকের মেহনৎ লাগে প্রচুর। কৃষি-বিজ্ঞান বিদ্যাটাও নিরেট বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

একটা মস্ত সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ষ্টুডেন্‌সকির গবেষণায় দেখা যাইতেছে যে, রুশ কিষাণরা উৎপন্ন ফসলের কিয়দংশ বাজারে বেচিত। নিজ পরিবারের ভরণ-পোষণই তাহাদের কৃষিকর্ম্মের একমাত্র লক্ষ্য থাকিত না। যে-সকল ধনতাত্ত্বিক দুনিয়ায় প্রচার করিয়াছেন যে, রুশ চাষীরা বাজারের তোআক্কা রাখেনা,—আর্থিক হিসাবে তাহারা ষোল আনা "স্বরাজী জীব", তাঁহারা এই বস্তুনিষ্ঠ, অঙ্ক-প্রতিষ্ঠিত ষ্টাটিষ্টিক্যাল ও ঐতিহাসিক আলোচনার আওতায় আসিয়া দাঁড়াইতে অসমর্থ প্রমাণিত হইতেছেন। মজার কথা,—আমাদের ভারতেও যে-সব পণ্ডিত ভারতীয় চাষীদিগকে পল্লীপ্রেমিক, কুটিরশিল্পী, পরিবারসেবী রূপে বিবৃত করেন, আর তাহাদিগকে শহুরে নরনারীর আর্থিক চরিত্র হইতে অন্য কোনো বিশেষত্বপূর্ণ চরিত্রের অধিকারি-রূপে বিবৃত করিতে ওস্তাদ, তাঁহারাও ষ্টুডেন্‌স্‌কি-প্রবর্ত্তিত আলোচনা-প্রণালীর সামান্য ধাক্কা খাইলে একেবারেই চিৎপাত হইয়া পড়িবেন।

"সেকেলে" চাষের আয়ে অ-সাম্য কেন?

চায়ানোফের পথে চলিলে বলিতে হয় যে, "অ-সভ্য চাষীরা পারিবারিক ভোগের জন্য যেটুকু দরকার তার বেশী ফসল উৎপাদন করে না। কিন্তু তাহা হইলে প্রত্যেক পল্লীর প্রত্যেক চাষীরই মাসিক বা বার্ষিক আয় ফসলের মাপে সমান হওয়া উচিত। কেন না খাওয়া-পরার জন্য প্রায় প্রত্যেক পরিবারেই সমান মাল দরকার। আয়ের সমতা 'প্রাকৃত' চাষী সমাজের একটা বিশেষত্ব বিবেচিত

হওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে, "সেকেলে" কৃষি-ব্যবস্থায় আয়-সাম্য দেখা যায় কি ?

যায় না। বরং উল্টাই দেখা গিয়াছে। আয়ের অসাম্য হইতেই বুঝা যায় যে, একমাত্র ভোগ-তত্ত্বের দ্বারা চাষ-আবাদের পরিমাণ বা কৃষি-সম্পদের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে যাওয়া চলে না।

"সেকেলে" বা "প্রাকৃত" চাষীদের সমাজে আয়-বিষয়ক অসাম্য খুব জবর। ষ্টুডেন্‌স্‌কির গবেষণায় দেখা যায় যে, কোনো ব্যক্তির আয় হয়ত মাত্র ২১ রুব্‌ল। আবার কোনো কোনো ব্যক্তির আয় ১০০ রুব্‌ল। পল্লীগ্রামের আনাড়ি চাষীরা বাজার বুঝে না, দর-দস্তুর বুঝে না, কেনা-বেচা বুঝেনা, আমদানি-রপ্তানি বুঝে না। তাহারা খুব সাদাসিধা লোক। নিজ গৃহস্থালীর জন্য জিনিষ তৈয়ারী হইয়া গেলেই তাহারা স্বর্গসুখ অনুভব করে,—ইত্যাদি যুক্তির পশ্চাতে কোনো নিরেট তথ্য নাই। থাকিলে ১০০ রুব্‌লের চাষী আর ২১ রুব্‌লের চাষীর মতন ধনগত অসাম্য "সেকেলে" চাষী-পল্লীতে দেখা দিত না।

অসাম্য যখন দেখা দিয়াছে তখন চায়ানোফের দর্শনকে বাতিল বিবেচনা করাই সঙ্গত। পুঁজিনীতি-শাসিত আর্থিক ব্যবস্থায় বিনিময়, লেনদেন, কেনা-বেচা ইত্যাদির যে প্রভাব এই "সেকেলে" চাষী-মণ্ডলেও সেই সব লক্ষ্য করা দরকার। বর্ত্তমান জগতের শিল্প-বাণিজ্য-বিষয়ক কর্ম্মক্ষেত্রে আদান-প্রদান, মূল্য-নির্দ্ধারণ, খরচপত্র ইত্যাদির যে নিয়ম "সেকেলে" চাষীর ফসল-উৎপাদনেও সেই নিয়মই কাজ করিতেছে এইরূপ বুঝিলে বিষয়টা স্পষ্ট হইতে পারে।

"সেকেলে" চাষীও মেহনতের মজুরি বুঝে

চায়ানোফ-পন্থীরা বলেন,—"সেকেলে চাষীরা নিজ মেহনতের কিম্মৎ উৎপন্ন ফসলের কিম্মতের ভিতর গণ্য করে না। অথবা যদিই বা করে তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়।" মেহনৎটা ঠিক যেন পরিবার-প্রীতি আর কি। তাহার জন্য কি আবার দাম ধরা চলে? ষ্টুডেন্‌স্‌কির গবেষণায় দেখিতেছি,—"সেকেলে" চাষীরাও নিজ নিজ মেহনৎকে পারিবারিক প্রেমের ডাক বিবেচনা করে না। তাহার দাম কষিয়া দেখিতে তাহারা বেশ পটু।

দেখা যায় যে,—প্রাকযুদ্ধ কালের কোনো বৎসর "সেকেলে" চাষীরা ৫৩৪৯৩ মিলিয়ন রুব্‌ল মুনাফা পাইয়াছিল। এই মুনাফাটার ভিতর চাষীদের মজুরি কতটা? চায়ানোফের যুক্তি অনুসারে কিছুই নয়। কিন্তু ষ্টুডেন্‌স্‌কি বলিতেছেন,—"তাহা ঠাওরানো সোজা। ধরা যাউক যেন মূলধনের উপর সুদ দিতে হইয়াছে শতকরা ৫ রুব্‌ল। তাহাতে দাঁড়ায় ৬২১·৯ মিলিয়ন রুব্‌ল। তার উপর জমির খাজনা বাবদ যাহা-কিছু চাষী জমিদারকে দেয় তাহাও মুনাফা হইতে কাটিয়া রাখা উচিত। তাহার পরিমাণ ১৪১৪·৯ মিলিয়ন। এই দুই দফা বাদ দিলে খাঁটি মুনাফা দাঁড়ায় ৩৩১২·৫ মিলিয়ন রুব্‌ল। এইটাই হইতেছে চাষীদের মজুরি।"

একবৎসরে যদি চাষীদের আয় এইরূপ হয়, তাহা হইলে গড়পড়তা রোজ হিসাবে চাষী প্রতি দাঁড়ায় ৮৯·৩ কপ্‌। এই অঙ্কটা পাইবামাত্র ষ্টুডেন্‌স্‌কি বলিতেছেন, "১৯১১ হইতে ১৯১৫ পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসর ধরিয়া রুশিয়ায় চাষ-আবাদের কাজে মজুর বাহাল করিতে হইলে তাহাকে রোজ গড়পড়তা দিতে হইত ৯২ কপ্‌। অর্থাৎ কৃষিকর্ম্মের মামুলি মজুরের বেতনে আর চাষীর মেহনতের মূল্যে আশ্চর্য্য রকমের মিল আছে।"

কাজেই বলিতে হয় যে,—"সেকেলে" চাষীরা ১৯১১-১৫ সনে নিজ নিজ উৎপন্ন ফসলের দাম ঠিক করিবার সময় নিজ মেহনতের কিম্মৎ ধরিত, পুঁজিব্যবহারের জন্য সুদ গুনিত আর খাজনাও ধরিত। অর্থাৎ নেহাৎ রবিন্‌সন ক্রুসোর মতন তাহারা দুনিয়ার বিশ্বশক্তি হইতে বিচ্ছিন্নভাবে জীবন-যাত্রা চালাইত না। পুঁজিনীতির সকল ধর্ম্মই তাহাদের রপ্ত ছিল। হিসাবপত্রে তাহারা দস্তুরমত ওস্তাদ।

মাথাটা পুঁজিনিষ্ঠ,—অভাব কেবল পুঁজির

এই সঙ্গে ষ্টুডেন্‌স্‌কি স্বদেশভক্তির পরিচয় দিয়া বলিতেছেন,—"রুশ চাষীকে বে-আক্কেল বা আহাম্মক বিবেচনা করা হইতেছে বিশ্ববাসীর দস্তুর। এইরূপ নিন্দা করা চলিতে পারে না। আমাদের চাষীরা আঁক কষিতে কম পারে একথা বলা ঠিক নয়। জমিজমার যেখান হইতে যতটুক নিংড়াইয়া বাহির করা সম্ভব,—অন্যান্য দেশের সভ্যভব্য যত্নশীল পুঁজিশীল চাষীদের মতনই রুশ কিষাণও

সেখান হইতে তাহা নিংড়াইয়া বাহির করিতে অভ্যস্ত ছিল। মগজে তাহাদের পুঁজিশাহী ঘী-টী যে গিজগিজ করিত তাহা সন্দেহ করা চলে না। মাথাটা তাহার পুঁজিনিষ্ঠদেরই মতন। অভাব কেবল পুঁজির। পুঁজি হাতে পাইলে রুশ কিষাণও দুনিয়ায় চরম পুঁজিনীতির চাষ দেখাইয়া ছাড়িবে। সহজ কথায় ইহারই নাম,—"কাশীমিত্তিরও জানি আর নিমতলাও জানি, কেবল মরে আছি তাই!" চাই রুশিয়ায় মূলধন। ভারতেরও অবস্থা তদ্রূপ।

"ঘোরতর স্বদেশী" বনাম "পশ্চিমমুখো"

জমিজমাবিষয়ক আর্থিক গবেষণা আর চাষীর চরিত্র-বিশ্লেষণ বিগত পঞ্চাশ বৎসরের রুশ সাহিত্য ও দর্শনে এক প্রকাণ্ড কারবার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রুশ চাষীরা "পশ্চিমা" অর্থাৎ পশ্চিম ইয়োরোপীয় চাষীদের মতন নর-নারী নয়, তাহাদের স্বভাব স্বধর্ম্ম সব আলাদা, এই মতের দার্শনিক ছিলেন এবং আছেন অনেকে। আবার ঠিক তার উল্টা মতের প্রচারক ছিলেন আর আছেন অনেকে। (শ্লাভো-ফিল শ্লাভ-প্রেমিক) অর্থাৎ "ঘোরতর স্বদেশী" রুশ পণ্ডিতের সংখ্যা কম নয়। আবার "পশ্চিম-মুখো" রুশ পণ্ডিতের দলেও "বাঘা" "বাঘা" হোমরা-চোমরাদের সংখ্যা বিপুল। নারফ্‌নির দল "স্বদেশী", আর কার্ল মার্ক্‌স্-পন্থীরা বিশ্বশক্তির উপাসক। এই দার্শনিক বা আধ্যাত্মিক দ্বন্দ্ব ভারতেও খুবই সুপরিচিত।

মুদ্রা-ব্যবস্থায় স্থিরতা-প্রতিষ্ঠা

বেকার-সমস্যা বর্ত্তমান দুনিয়ার একটা বড় তথ্য। এই তথ্যের বিশ্লেষণে নানা পণ্ডিত মাথা ঘামাইতেছেন। অবশ্য সকলেই এক পথের পথিক নন। শ্রীযুক্ত বেলার্বি বেকার সমস্যা ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে মজুরির মুল্লুকে আসিয়া পড়িয়াছেন। সেই পথেই জিনিষপত্রের বাজার-দরের সঙ্গে মোলাকাৎ। যাঁহা বাজার তাঁহা মুদ্রা-সমস্যা। বেলার্বি বলিতেছেন, "যদি বেকার কমাতে চাও তবে মুদ্রাটাকে চঞ্চল হইতে দিও না।" গবেষণাটা "মানিটারি ষ্টেবিলিটি" (নিউইয়র্ক ও লণ্ডন, ম্যাক্‌মিলান্‌, ১৯২৫, ২৬+১৭৪) নামে বাহির হইয়াছে।

বাজার-দরের ওঠা-নামাই হইতেছে সকল দোষের গোড়া। এইটাকে কাবু করিতে পারাই আর্থিক সমতা-সাধনের উপায়। কিন্তু তাহা করা যায় কি করিয়া? তাহার জন্য চাই বাণিজ্যের ওলট-পালট বন্ধ করা। বাণিজ্য বস্তুটা অর্থাৎ লেন-দেন, কেনা-বেচা, আমদানি-রপ্তানি নির্ভর করে ব্যাঙ্কের উপর। কেন না ব্যাঙ্কগুলা কার-বারকে যেরূপ কর্জ্জ দেয় তাহার উপরই অনেকটা নির্ভর করে মাল কেনাবেচার আকার-প্রকার। ব্যাঙ্ক যদি বেপারীকে অতি সহজে মালের রসিদ দেখিবামাত্র টাকা ছাড়িতে প্রস্তুত থাকে, তাহা হইলে বেপারীরা আহ্লাদে আটখানা হইয়া পড়ে। আর তখন তাহারা একেবারে দিক্‌বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়া বাজারে মাল চালাইতে লাগিয়া যায়।

এখন দেখা যাউক, ব্যাঙ্কগুলা সহজে টাকা ছাড়িতে রাজী হয় কেন? তাহাদের তহবিলে কাঁচা টাকা অনেক মজুত হয় বলিয়া। কিন্তু কাঁচা টাকা মজুতই বা হয় কেন? দেশের গবর্মেণ্ট অথবা নোট-ব্যাঙ্ক যদি অনেক পরিমাণ সোনার মালিক হইয়া পড়ে, আর সোনা পাইবামাত্র তাহার সমান দামের টাকা ছাড়িতে সুরু করে, তাহা হইলে ব্যাঙ্কগুলাও টাকার সমুদ্রে সাঁতার কাটিতে থাকিবে। এই গেল সোজা কথা।

প্রধান সমস্যা হইতেছে ব্যাঙ্কগুলাকে টাকার সমুদ্রে সাঁতার কাটিতে না দেওয়া। অর্থাৎ বেপারীদিগকে কর্জ্জ দিবার ক্ষমতা ব্যাঙ্কগুলার হাতে কম থাকিলেই অথবা উচিত পরিমাণের মাত্রা ছাড়াইয়া না গেলেই 'আপদঃ শান্তি'। তাহা হইলে কর্জ্জ-নীতিকে শাসন ও সংযত করা দাঁড়াইতেছে বর্ত্তমান দুনিয়ার আসল রাষ্ট্রনীতি ও অর্থ-শাস্ত্র।

বাণিজ্য-সঙ্কট ও মজুর-সমিতি

মজুর-সমিতি বা ট্রেড্‌-ইউনিয়ানের কর্ম্মনীতি সুপরিচিত। দুনিয়ার ও দেশের আর্থিক অবস্থা যখন শান্তিময় মামুলি গোছের, তখন তাহারা কোন্‌ উদ্দেশ্যে কোন্‌ প্রণালী অবলম্বন করে তাহার কিছু-কিছু ভারতেও জানা আছে। কিন্তু "আপৎকালে দুপস্থিতে" তাহাদের ধরণ-ধারণ কিরূপ

তাহা বিশ্লেষণ করা দরকার। এইরূপ বিবেচনা করিয়া মার্কিণ পণ্ডিত হ্বিকফ একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। নাম "হ্বেজ পলিসীজ অব্ লেবার অর্গ্যানিজেশুন্স্ ইন্ এ পীরিয়ড্ অব্ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডিপ্রেশুন্" (কারখানা-সঙ্কটের কালে মজুর-সমিতির মজুরি-নীতি)। বাল্টিমোরের জন্স্ হপ্কিন্স্ বিশ্ববিদ্যালয় এই গ্রন্থের প্রকাশক।

১৯২০ হইতে ১৯২২ সন পর্য্যন্ত দুই আড়াই বৎসর ধরিয়া যুক্ত রাষ্ট্রে "ডিপ্রেশুন" অর্থাৎ শিল্প-কারখানায় মন্দা বা দুর্গতি চলিয়াছিল। বর্ত্তমান রচনায় এই কয় বৎসরের মজুর ও মজুরি সম্বন্ধে আলোচনা আছে। এই ধরণের গবেষণায় ভারত-সন্তান এখনো হাত মক্স করিতে শিখেন নাই। কেন না, সাধারণতঃ আমাদের পণ্ডিতেরা ৭৫।১০০।৫০০।১০০০।১৫০০ বৎসর পূর্ব্বেকার অবস্থা লইয়া মাতামাতি করেন। তাহা ছাড়া সেই প্রাচীন, অতি-প্রাচীন কালের তথ্যসমূহও শত শত বর্ষব্যাপী যুগের কাঠামে ফেলিয়া সু-কু বিশ্লেষণ করি। কোনো সময়কার ২।৩।৫।৭ বৎসরের ভিতর কোনো একটা প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলনের আকার-প্রকার কিরূপ ছিল তাহা বুঝিবার বা জানিবার প্রবৃত্তি ভারতীয় পণ্ডিত-সংসারে বড় একটা দেখা যায় না।

অল্প সময়ের ভিতরকার কোনো দুই একটা প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলনের জীবন-বৃত্তান্ত বিশ্লেষণ করিবার প্রণালীকে এক কথায় "ইন্টেন্সিহ্ব আলোচনা-প্রণালী বলে। সেই সূক্ষ্ম চুল-চেরা, গভীরতর গবেষণার প্রত্যেকটা দফাই খুঁটিয়া খুঁটিয়া, ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বিচার করা সম্ভব। হ্বিকফ সেই মতলবেই কেতাব লিখিয়াছেন। এই কেতাবে তিনি (১) রেল-মজুর, (২) জামা তৈয়ারী করিবার কারখানার মজুর, (৩) ধাতু গালাইবার ফ্যাক্টরির মজুর, (৪) কাচের কারখানার মজুর, (৫) চীনা মাটির কারখানার মজুর এবং (৬) খনির মজুর—এই ছয় প্রকার মজুরদের "ন্যাশন্যাল ইউনিয়নের" অর্থাৎ সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রব্যাপী সঙ্ঘের অভিজ্ঞতা বিবৃত করিয়াছেন। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১১৯ (১৯২৬)।

দুর্দ্দৈবের সময় মজুরে মালিকে সম্বন্ধ কিরূপ ছিল? মালিকেরা মজুরির হার কমাইতে বাধ্য হইয়াছিল। মজুরেরা তাহাতে আপত্তি করে নাই। দুই দলে পরামর্শের ফলেই এই নীতি কায়েম হইয়াছিল। কিন্তু আর একটা বিশেষ কথা লক্ষ্য করা যায়। সে হইতেছে কারখানা-শাসন সম্বন্ধে মজুরদের ক্ষমতা-বিষয়ক। মজুরেরা দরমাহা কিছু ছাড়িয়া দিতেও রাজী। কিন্তু ফ্যাক্টরির পরিচালনায় হাত ছাড়িতে রাজী নয়। বস্তুতঃ, এই দুই আড়াই বৎসরের ভিতর তাহারা কারখানার শাসন-ব্যাপারে অনেকটা স্বরাজ লাভ করিয়া বসিয়াছে। আর্থিক হিসাবে যে যুগটা তাহাদের পক্ষে লোকসানের সময় গিয়াছে, সেই যুগটাই তাহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে একটা মাহেন্দ্র ক্ষণ।

চেকের চলন ও ব্যাঙ্ক-ব্যবসা

চেক-বস্তুটা কি আর তার চলাচল কিরূপে সাধিত হয় এই বিষয়ে সুবিস্তৃত বই ইংরেজি ভাষায় বেশী নাই। ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে যে সকল টেক্স্ট বুক বাজারে বিক্রী হয় তাহার কোনো কোনোটায় ৮।১০ পৃষ্ঠা মাত্র এই বিষয়ে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশে আজকাল আর ঐ ৮।১০ পৃষ্ঠায় পেট ভরিতেছে না। আমরা ব্যাঙ্কের ভিতর বাহির তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিবার জন্য খানিকটা উদ্‌গ্রীব হইয়াছি।

এই ক্ষুধা মিটাইবার পক্ষে একখানা মার্কিণ বই বিশেষ কাজে লাগিবে। গ্রন্থকারের নাম স্পার। "দি ক্লীয়ারিং অ্যাণ্ড কলেক্‌শুন অব্ চেক্স্" (চেক-খালাস ও সংগ্রহ) নামে ৫৯৭+২৪ পৃষ্ঠায় তিনি একখানা সুবিস্তৃত বই লিখিয়াছেন (১৯২৬, নিউইয়র্কের ব্যাঙ্কার্স পাবলিসিং কোং প্রকাশক) মূল্য ৭॥০ ডলার অর্থাৎ প্রায় ২৪৲টাকা)। যাঁহারা ব্যাঙ্ক চালাইতেছেন তাঁহাদের পক্ষে এই বই বিশেষ দরকারী। মার্কিণ পণ্ডিত ক্যানন-প্রণীত ক্লীয়ারিং হাউসেজ" (চেক খালাসের প্রতিষ্ঠান) নামক বইটা ছোট বটে, কিন্তু অনেক কাজের কথায় পূর্ণ। সেই বইটায় বিগত ১০।১৫ বৎসরের তথ্য নাই। কিন্তু বাংলাদেশের এখন যে অবস্থা তাহাতে ক্যাননের বইটা পড়িলেই অনেকটা চলিবে।

স্পার যুক্তরাষ্ট্রের "ফেডার্যাল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক" নামক সরকারী বা নিম-সরকারী নোট-ব্যাঙ্কের আইন-মাফিক ব্যাঙ্ক-শাসন এবং চেক-চলাচলের বিশদ বৃত্তান্ত দিয়াছেন। এই দিকে যাঁহারা মাথা ঘামাইতে অ-রাজী তাঁহারা ভারতের "রিজার্ভ ব্যাঙ্ক"-সমস্যা পুরাপুরি বুঝিবেন না।
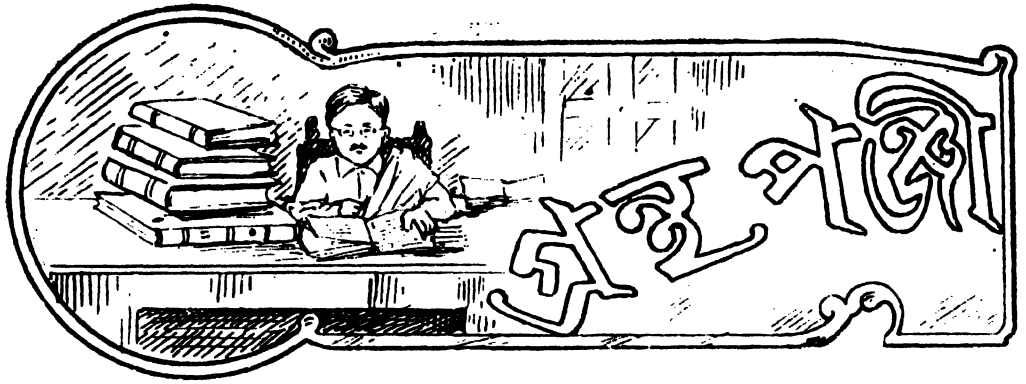
"ষ্টেট ক্যাপিট্যালিজ্‌ম্ ইন রুশিয়া" (রুশিয়ায় সরকার-নিয়ন্ত্রিত পুঁজিনীতি), জিমাণ্ড,—নিউইয়র্ক, ফরেন পলিসি অ্যাসোসিয়েশ্যন। ১৯২৬,৭৭ পৃষ্ঠা, ৫০ সেণ্ট।

"ডী নয়েরে এন্‌টহ্বিকলুণ্ড ডেস ডয়েচেন আউসলাণ্ডস্‌-বাঙ্ক-হ্বেজেন্‌স্" (বিদেশে জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান অবস্থা ১৯১৪-১৯২৫),—বেনফে,—বার্লিন, স্প্যেট, ২৫২ পৃষ্ঠা, ৪·৫০ মার্ক।

"বার্থ-কন্‌ট্রোল" (জন্ম-শাসন),—আডোলফ মায়ার,—বাল্টিমোর, হ্বিল্‌কিন্‌স্ কোং; ১৯২৫, 14+১৫৭ পৃষ্ঠা, তিন ডলার। "শাঁজ এ মোনে" (বিনিময় ও মুদ্রা),—পমেরি,—প্যারিস, গিয়ার কোং, ১৯২৬, ৬০০ পৃষ্ঠা ৩০ ফ্রা।

"প্রব্‌লেম্‌স্ ইন বিজ্‌নেস ইকনমিক্‌স্" (ব্যবসা-বিজ্ঞানের আলোচ্য সমস্যা),—ভাণ্ডার,—শিকাগো, শ' কোম্পানী, ১৯২৪, ১৯+৬৩১ পৃষ্ঠা ৫ ডলার।

"ইকনমিক ডেহ্বেলপ্‌মেণ্ট অব্ রাশিয়া" (রুশিয়ার আর্থিক উন্নতি ১৯০৫-১৯১৪),—মিলার, লণ্ডন, কিং কোং, ১৮+৩১১ পৃষ্ঠা, ১২ শি ৬ পে।

"হ্যাণ্ডবুক অন্ কমার্শ্যাল জিওগ্রাফী" (দশম সংস্করণ) [বাণিজ্যের ভুগোল]; জর্জ্জ জি, চিসহোল্ম, লংম্যানস্, গ্রীন অ্যাণ্ড কোং; নিউ ইয়র্ক; ১৯২৫; ৮২৫ পৃষ্ঠা।

"ক্রুড রবার, কফি এট্‌সেট্‌রা হিয়ারিংস বিফোর দি কমিটি অন্ ইন্‌টারষ্টেট অ্যাণ্ড ফরেন্ কমার্স" (কাঁচা রবার, কফি ইত্যাদি, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে এবং বহির্ব্বাণিজ্য সম্বন্ধে তদন্ত-সমিতির সম্মুখে সাক্ষ্যাবলী) "প্রতিনিধি গৃহ" ৬৯ তম কংগ্রেস প্রথম অধিবেশন, ঐ গৃহের প্রস্তাব নং ৫৯; ১৯২৬।

"দি অয়েল ট্রাষ্টস অ্যাণ্ড অ্যাংলো আমেরিকান্ রিলেশ্যন্‌স্" (তেল-সঙ্ঘ এবং ইংরেজ-আমেরিকানের সম্বন্ধ); ই, এইচ ড্যাভেনপোর্ট ও এস্‌, আর কুক; ম্যাকমিলান কোম্পানী; নিউইয়র্ক, ১৯২৪।

দি ইকনমিক ইউনিয়ন অব্ ইয়োরোপ (ইয়োরোপের অর্থনৈতিক সঙ্ঘ) ১০ম ভাগ, নং ৭ ও ৮, যুদ্ধের আর্থিক কারণসমূহ দূর করিবার জন্য সভার মাসিক বুলেটিন: ওয়েলেস্‌লি মাসাচুসেটস্; সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর, ১৯২৬।

"অয়েল ইম্‌পিরিয়্যালিজ্‌ম্ (তেল-সাম্রাজ্য) লুইস্ ফিশার; ইণ্টারন্যাশন্যাল পাবলিশার্স্ নিউ ইয়র্ক, ১৯২৬।

"ফরেন ট্রেড অ্যাণ্ড ওয়ার্ল্ড পলিটিক্‌স" (বহির্ব্বাণিজ্য ও বিশ্বের রাষ্ট্রনীতি); হারবার্ট এফ্‌, ফ্রেজার; আলফ্রেড এক্লফ্; ১৯২৬; ৩৪৬ পৃষ্ঠা।

"ষ্টেটমেণ্ট অন্ র ম্যাটিরিয়্যাল্‌স, ট্রেড ইন্‌ফরমেশন বুলেটিন" (কাঁচা মালের বিবরণ, বাণিজ্য-প্রকাশ বুলেটিন); হারবার্ট সি হুভার; নং ৩৮৫; বাণিজ্য-বিভাগ, ওয়াশিংটন ডি, সি; জানুয়ারী, ১৯২৬।

"ডিপেন্‌ডেণ্ট আমেরিকা (পর-বশ আমেরিকা); উইলিয়াম রেডফীল্ড; হাউটন মিফ্লিয়ান কোম্পানী; বোষ্টন; ১৯২৬; ২৭৮ পৃষ্ঠা।

"জার্ম্মাণ কলোনিজেশন পাষ্ট অ্যাণ্ড ফিউচার" (জার্ম্মাণ উপনিবেশের অতীত ও ভবিষ্যৎ); এইচ স্নী; লণ্ডন ১৯২৬।

বর্দ্ধমানের বিভিন্ন জাত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীহরিদাস পালিত

ময়রা (মোদক)

সাধারণতঃ পল্লীগ্রামগুলিতে এই সম্প্রদায়ের সংখ্যা নিতান্ত হীন। কোনো কোনো গণ্ডগ্রামে ময়রার সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক। সহরের কথা পৃথক। 'ভিয়ানের' কর্ম্ম এই জাতির মুখ্য ব্যবসা হইলেও সকলেই কৃষি-কার্য্য করিয়া থাকে।

পূর্ব্বে এই জাতি চিনি ও দোবরা চিনি প্রস্তুত করিত। চিনি বিক্রয় করিয়া প্রচুর লাভ করিত। বিদেশী চিনির আবির্ভাবে উক্ত শিল্প বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। বর্দ্ধমানের মিছরী, কদ্‌মা, ওলা, চাঁদসই খাজা বিখ্যাত; কিন্তু সময়ে এই খ্যাতির অবসান হইয়াছে। সীতাভোগ মিহি-দানারও আর পূর্ব্ববৎ আদর নাই।

ময়রার ব্যবসা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নবশাখ এবং উগ্র-ক্ষত্রিয়াদি জাতি গ্রহণ করিয়া ইহাদের জাতীয় ব্যবসার একচেটীয়া অধিকার লোপ করিয়া দিয়াছে।

মোদকগণ উচ্চশিক্ষালাভ করিয়া উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, চাকুর‍্যে হইয়াছে। দোকান ও বিবিধ ব্যবসা অবলম্বন করিতেছে। গড়ে এ জাতির অবস্থা নিতান্ত মন্দ না হইলেও, ইহারা হীনাবস্থার অভিমুখেই চলিয়াছে।

বারুই

এ জাতি সংখ্যায় হীন। প্রত্যেক পল্লীতে এ জাতি দৃষ্ট হয় না। অন্যান্য জাতির ন্যায় প্রতি পল্লীতে ইহারা বিক্ষিপ্ত ভাবে বাস করে না। যথায় বাস করে তথায় সঙ্ঘবদ্ধ ভাবেই বাস করে। আমাদপুর, সাঁকোমোহন প্রভৃতি কতিপয় গণ্ডগ্রামে ইহাদের সমাজ দৃষ্ট হয়। পানের বরজ প্রস্তুত করিয়া পান-চাষ করিয়া বিক্রয় করে। পানের বরজ এবং পান বিক্রয় এই জাতির মুখ্য ব্যবসা। ইহা প্রায় একচেটিয়া ব্যবসা। স্বজাতি ব্যতীত অন্য কোনো জাতিকে ইহারা বীজ পান-লতা দেয় না। তথাপি কোনো কোনো স্থলে অন্য জাতিও বরজ-কৃষি অবলম্বন করিয়াছে।

বারুইরা সঙ্ঘবদ্ধরূপে বাস করে। সুতরাং ইহাদের বিবরণ অবগত হইতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। এই জাতি উন্নতিশীল। সংখ্যায় নিতান্ত হীন হইলেও ইহাদের মধ্যে প্রায় অন্নবস্ত্রের অভাব নাই। অনেকেই উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া উকিল মোক্তার, ডাক্তার হইয়াছে। বিবিধ ব্যবসা অবলম্বন করিয়া জীবন-সমস্যার সমাধানে বদ্ধপরিকর হইয়াছে।

গোপ

গোয়াল প্রায় প্রতি পল্লীতেই দৃষ্ট হয়। দুধ, দই, ছানা, মাখন ঘী এই জাতির প্রধান অবলম্বন। সকলেই কৃষিজীবী। কেহ কেহ উচ্চশিক্ষিত। বিবিধ ব্যবসা অবলম্বন করিয়া আত্মরক্ষার উপায় নির্দ্ধারণে সচেষ্ট হইয়াছে। বর্দ্ধমান ক্রমশঃ গো-হীন হইতেছে। লেখক বাল্যকালে এবং যৌবনের প্রারম্ভে বর্দ্ধমানের বহু গোপ-পল্লীতে সংখ্যায় যত গো দেখিয়াছিল, বর্ত্তমানে তাহার সিকিও দৃষ্ট হয় না। দুগ্ধের ব্যবসার আশা ত্যাগ করিয়া গোপগণ পৃথক ব্যবসার অনুসন্ধান করিতেছে। গড়পড়তায় গোপ-সম্প্রদায়ের অবস্থা অসচ্ছল এবং ক্রমে অবনত হইয়াই চলিয়াছে। শিক্ষিতের সংখ্যা অতীব সামান্য। এ জাতির উন্নতি নাই। ধ্বংসের মুখে দ্রুত ধাবিত।

চাষী কৈবর্ত্ত

ইহাদের মূল ব্যবসা কৃষি। এই জাতির অনেকেই শিক্ষিত। উচ্চশিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অধিকাংশ কৃষিজীবী। কেহ কেহ বিবিধ ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছে। গড়পড়তায় এই জাতির অবস্থা নিতান্ত হীন নহে। সংখ্যায়ও নিতান্ত ক্ষীণ নহে।

সুবর্ণবণিক-গন্ধবণিক

উন্নত জাতি। সংখ্যায় হীন। বর্দ্ধমানের প্রতি-পল্লীতে দৃষ্ট হয় না। কোনো কোনো গ্রামে সঙ্ঘবদ্ধভাবে বাস করিতে দেখা যায়। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে বর্ণিত গন্ধবণিকের প্রাধান্য আর নাই। এই উভয় সম্প্রদায়ের ব্যবসা আর একচেটীয়া নাই—বহু জাতিতে গ্রহণ করিয়াছে। এই জাতিদ্বয়ের মধ্যে ধনীও যেমন আছে দরিদ্রের সংখ্যাও তদনুরূপ দৃষ্ট হয়।

তিলি তাম্বুলী

বর্দ্ধমানের অধিকাংশ পল্লীতে তিলি সম্প্রদায়ের বাস দৃষ্ট হয়। বিবিধ ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে। কৃষিজীবী জাতি। গড়ে এ জাতির অবস্থা তাদৃশ উন্নত নহে। সংখ্যায় নিতান্ত হীন না হইলেও অধিক নহে। কোনো কোনো গণ্ডগ্রামে তিলি মহাজন, তিলি জমিদার দৃষ্ট হয়। অধিকাংশ শিক্ষিত। ক্রমশঃ এই জাতির মধ্যে উচ্চশিক্ষা বিস্তৃত হইতেছে। তাম্বুলী জাতির সন্ধান পাওয়া যায় না। এই তাম্বুল-বিক্রয়কারী জাতি বারুই বা বারজীবীর মধ্যে বিলীন হইয়াছে। ইহা ঐ জাতিরই একটী শাখা মাত্র।

তামলী, কাঁসারী, শাঁখারী

এই সকল জাতি ব্যবসায়ী ও শিল্পী। কিন্তু ইহাদের ব্যবসা একচেটীয়া নাই। বহু জাতি এই ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে। এলুমিনিয়াম, এনামেল, চিনে বাসন এবং বৈদেশিক পিতল, তামা প্রভৃতির দ্রব্যাদি বাজারে প্রচুর পরিমাণে আমদানি হওয়ায় এই সকল জাতির শিল্প স্তিমিত হইয়া গিয়াছে। বৈদেশিক বাসনের ব্যবসা অবলম্বন করায় এখন এক প্রকারে জীবিকার্জ্জন হইতেছে। তামলী ও কাঁসারীগণের শিল্পপ্রধান পল্লীগুলি দর্শন করিলে সহজেই বোধ হয়, এ শিল্প লুপ্ত হইতেছে। শিল্পীর হ্রাস হইতেছে। উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহ দেখা দিয়াছে। বর্দ্ধমানের উক্ত শিল্প-পল্লীগুলি ধ্বংসের পথে ধাবিত। ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি জাতি কাঁসারী, কর্ম্মকার ও ব্যবসাদার হইয়াছে।

নাপিত

প্রায় প্রতি পল্লীতেই নাপিতের বাস আছে। সংখ্যায় ইহারা অধিক নহে। এ সম্প্রদায় বিচ্ছিন্নভাবে গ্রামে গ্রামে বাস করে। ক্ষৌরকর্ম্ম প্রধান ব্যবসা। গৌণ ব্যবসা কৃষি। পশ্চিমা লাউয়া বা হাজাম, এই জাতির প্রবল প্রতিদ্বন্দী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তথাপি এই জাতির অন্নবস্ত্রের কষ্ট নাই। সামান্যজাতি। কেহ কেহ উচ্চশিক্ষালাভ করিয়া জাতীয় ব্যবসা ত্যাগ করিতেছে। বর্দ্ধনশীল জাতি নহে। বাঙ্গালী নাপিতের সংখ্যা পল্লীতে হ্রাস হইতেছে। ধ্বংসোন্মুখ জাতির মধ্যে গণ্য হইয়াছে।

জেলে কৈবর্ত্ত

ইহাদের জাতীয় ব্যবসা মৎস্যের চাষ এবং বিক্রয়। কেবল জাল দ্বারা মৎস্য ধরে। পলই, টাপা, জাকই চাবিজাল, ঘাটজাল, ঘুণী, ভাঁড়, অন্‌তা প্রভৃতি দ্বারা ইহারা মাছ ধরে না, ফাঁস জালও ব্যবহার করে না। খেপ্‌লা জাল, বেড়জাল ব্যবহার করে। অধিকাংশই কৃষিজীবী। বর্দ্ধমানের পল্লীগুলিতে মৎস্যের চাষ ক্রমশঃ কমিতেছে। কৈবর্ত্ত জালিকের সংখ্যাও হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। অধিকাংশ জলাশয় ভরাট এবং দল, দাম ইত্যাদিতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। বর্দ্ধমানে মৎস্যের অভাব যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। মৎস্যের মূল্য তিনগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে, অথচ এই জাতির উন্নতি দৃষ্ট হয় না। বাগ্‌দী, দুলে প্রভৃতি জাতিরা মৎস্যের ব্যবসা অবলম্বন করায় কৈবর্ত্তগণের আয়ের পথ রুদ্ধ হইয়াছে। বরফ-রক্ষিত মৎস্যের

প্রচুর আমদানিতে জালিকদের ব্যবসায় মন্দা পড়িয়াছে। এজাতি ধ্বংসের অভিমুখে চলিতেছে।

বৈষ্ণব, বাউল, কর্ত্তাভজা

হিন্দুজাতিবাচক উপাধিহীন পৃথক জাতির মধ্যে বৈষ্ণব একটী সম্মিলিত হিন্দু জাতি। ভেকাশ্রিত বৈষ্ণব হিন্দু সমাজের বহিরঙ্গ। এজাতি কর্ম্মজ নহে—ধর্ম্মজ। ভিক্ষাই ইহাদের জীবিকা; কিন্তু গৃহী বৈষ্ণবগণ একমাত্র ভিক্ষাদ্বারা জীবনধারণে অসমর্থ হইয়া বিবিধ কর্ম্ম-অবলম্বন করিয়াছে।

ইহারা কৃষি, শিল্প, ব্যবসা, চাকরী প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া উন্নতিলাভ করিতেছে। অনেকে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া উকিল, মোক্তার, ডাক্তার এবং চাকুরিয়া হইয়াছে। কেহ কেহ মনোহারী দোকান, বাসনের, কাপড়ের দোকান ও ময়রার দোকান করিয়াছে। কেহ বা স্বর্ণকার ও সূত্রধরের কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। মৎস্য-মাংসের ব্যবসাভিন্ন অপর বিবিধ কর্ম্ম দ্বারা উন্নতির চেষ্টা করিতেছে। এই সঙ্ঘ ক্রমেই উন্নত হইতেছে এবং ভিক্ষা ত্যাগপূর্ব্বক শিল্প-ব্যবসায়ে মনোযোগী হইতেছে।

যুগী (যোগী)

এই জাতি পূর্ব্বে বস্ত্র-শিল্প দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিত, ক্রমে মনোহারী দোকান অবলম্বন করিয়াছে এবং বিভিন্ন ব্যবসা ও শিল্প অবলম্বনে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। অনেকে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া চাকরী, ডাক্তারী, ওকালতী ইত্যাদি অবলম্বন পূর্ব্বক জাতীয় জীবনের নূতন পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। সংখ্যায় ইহারা হীন হইলেও ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে।

মাড়োয়ারী ও তদনুরূপ জাতি

ইহারা তেজারতি করিতেছে, কাপড়ের ব্যবসা অবলম্বনে গণ্ডগ্রামে অবস্থান করিতেছে। ধান, চাল, ইত্যাদির মহাজন হইয়াছে এবং তেলের কল, চাউলের কল প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ক্রমে ক্রমে শিল্প ও বাণিজ্য এই জাতির একচেটিয়া হইয়া পড়িতেছে। ইহারা রোকড়ের দোকানদার হইয়াছে। ডাল, ময়দা, ঘৃত, তেলের দোকানদার ও আড়তদার হইয়াছে। সংখ্যায় ইহারা অতীব হীন হইলেও শিল্প ও ব্যবসার কেন্দ্রগুলি একে একে এই জাতির দখলে আসিতেছে। ইহারা ক্রমেই ধনবলে ও জনবলে অধিকতর বলীয়ান হইতেছে।

ব্রাহ্মণ

বর্দ্ধমানের প্রায় সকল পল্লীতেই এই সম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। সকলেই প্রায় কৃষিজীবী। কৃষিই ইহাদের প্রধান অবলম্বন। জমি-জমা ভাগে বিলি করিয়া বা কৃষাণ রাখিয়া চাষ করাইয়া থাকে। উচ্চশিক্ষিত জাতি। অবস্থার পরিবর্ত্তনে প্রায় সকল রকম ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকরী অবলম্বন করিয়াছে।

পতিত ব্রাহ্মণ

কলুর ব্রাহ্মণ, বাগ্দীর ব্রাহ্মণ, মুচীর ব্রাহ্মণ, কাঁড়ালের ব্রাহ্মণ, পুড়ার ব্রাহ্মণ, অগ্রদানী, মড়ুইপোড়, ভাট, ভট্ট ইত্যাদি বর্ণজ দ্বিজগণ সমাজে পতিত।

ইহাদের পাতিত্যের অন্য আনুষঙ্গিক কারণ যাহাই থাকুক না কেন, মূল কারণ জীবন-যাত্রার অনুকূল পথাবলম্বনে আত্মরক্ষার প্রয়াস। বর্ত্তমানে এইসকল বর্ণজ দ্বিজগণ বিবিধ ব্যবসা, শিল্প-বাণিজ্যাদি গ্রহণে কর্ম্মজীবনে উন্নত হইয়া বর্ণজদ্বিজত্ব পরিহারে সমর্থ হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ বর্দ্ধিষ্ণু সম্প্রদায়। জমীদার, মহাজন, প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ স্তরে এ জাতি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং নিম্নেতর স্তরগুলিও এই জাতির অধিকৃত। পল্লীবাসী কৃষিজীবী দ্বিজগণের অবস্থা গড়ে সচ্ছল নহে। ইহাদের উন্নতির গতি স্তিমিত হইয়াছে। যাহারা পল্লীত্যাগ করিয়া কর্ম্মকেন্দ্রসমূহে গিয়া কর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে, তাহারাই উন্নত হইতেছে। সাধারণ কৌলিক ব্যবসাবলম্বীদের অবস্থা অতীব শোচনীয়। সংখ্যাধিক্য হইলেও অবস্থা সচ্ছল নহে।

ক্ষত্রিয়

বর্দ্ধমান জেলায় এ জাতি নগণ্য। পল্লীবাসী ক্ষত্রিয় গোষ্ঠী প্রায় কর্ম্মহীন, দরিদ্র এবং ধ্বংসোন্মুখ।

বৈদ্য ও বেদী

সংখ্যায় অল্প কিন্তু শিক্ষিত। ইহারা জাতীয় ব্যবসা ডাক্তারি অধ্যাপকতা ইত্যাদি কর্ম্মে নিযুক্ত। কর্ম্মের পরিবর্ত্তনদ্বারা আত্ম-রক্ষায় সচেষ্ট। কৌলিক ব্যবসা-ত্যাগে এবং বিবিধ কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া ক্রমশঃ উদ্বর্ত্তিত হইতেছে।

কায়স্থ

এই জাতির অধিকাংশ কৃষিজীবী। কর্ম্মের পরিবর্ত্তন দ্বারা আত্মরক্ষা করিতেছে। শিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যে গণ্য। জাতীয় ব্যবসা অবলম্বনে—নায়েব, গমস্তা, আদালতের পিয়ন হইতে মোক্তার, উকীল, হাকিম হইয়াছে। জাতীয় ব্যবসার পরিবর্ত্তনে ডাক্তার, বৈদ্য, মুদী, শিল্পী, হইতে ফেরিওয়ালা এবং সামান্য ভৃত্যের কার্য্যও করিয়া থাকে। জমীদার, মহাজনও দেখা যায়। সংখ্যায় প্রচুর। অবস্থা বৈচিত্রময়। ব্রাহ্মণের ন্যায় এ জাতি গড়ে দরিদ্র।

ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের মধ্যে বর্ত্তমান যুগোপযোগী শিক্ষা, দীক্ষা প্রবল বেগে প্রসারিত হইতেছে। কালোপযোগী কর্ম্ম দ্বারা উন্নত হইবার প্রয়াস তীব্র। প্রাচীন সংস্কার ত্যাগ করিয়া শিল্প-বাণিজ্য অবলম্বন করিতেছে।

উগ্র ক্ষত্রিয়

বর্দ্ধমানে ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থের পরবর্ত্তী সোপানেই এই সম্প্রদায়ের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। সংখ্যায় উক্ত উভয় জাতির পরেই ইহার স্থান। এই জাতির মুখ্য জীবনোপায় কৃষি। কৃষি-কার্য্যে ইহাদের ন্যায় সুদক্ষ জাতি বর্দ্ধমান জেলায় আর দ্বিতীয় নাই। কর্ম্মঠ, কষ্টসহিষ্ণু, পরিশ্রমী বীরজাতি। ইহারা ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ জাতির প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে অবস্থিত। এ জাতির কর্ম্ম-জীবন অতীব বৈচিত্রময়। কিছুকাল পূর্ব্বে ইহারা স্বহস্তে কৃষিকার্য্য করিত। বংশবৃদ্ধির জন্য এই জাতি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল যে, একমাত্র কৃষি দ্বারা জাতীয় জীবন উন্নত হইতে পারে না। কৃষিক্ষেত্রের অভাব সুনিশ্চিত। ইহারা কৃষি কর্ম্মের মুখ্যত্ব স্বীকার না করিয়া কৃষিকে গৌণ কর্ম্মরূপে গ্রহণ করিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিল।

ইহাদের নর ও নারীগণ সমান কর্ম্মী, দৃঢ়কায় ও সবল। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতির ন্যায় শ্রমকাতর নহে। এ জাতি সঙ্ঘবদ্ধ ও প্রবল একতামূলে আবদ্ধ। ইহাদিগকে বর্দ্ধমানের দেশী মাড়োয়ারী বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ-কায়স্থাদি জাতির ন্যায়, শিক্ষায় ইহাদের আগ্রহ ছিল না। সুতরাং প্রতিযোগিতায় এই স্থানেই পরাজিত হইতেছিল। ক্রমে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার আন্দোলন চলে। ফলে উগ্রক্ষত্রিয়-প্রধান পল্লীর মধ্যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। ক্রমে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া কেহ ডাক্তার, কেহ মোক্তার, কেহ উকীল কেহ কেরাণী হইল। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটও হইল। শিক্ষার দ্রুত উন্নতি হইতেছে।

ব্যবসা-ক্ষেত্রে এ জাতি ব্রাহ্মণাদি জাতির প্রবল প্রতি-দ্বন্দ্বী। মুদীখানা, ময়রার দোকান, ধানের ও চাউলের আড়ৎ, কয়লা ও কাঠের গোলা, কেরোসিন ও বিবিধ তৈলের দোকান ও গোলদারী দোকান করিয়াছে। বর্দ্ধমানের ধানের ও চাউলের ব্যবসা প্রায় এই জাতির একচেটিয়া হইয়া উঠিয়াছে। দেখিতে দেখিতে ধান-কল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। কাপড়, লোহালক্কড়, মশলা, ঘৃত ইত্যাদির ব্যবসা এই জাতির হস্তগত হইতেছে।

বর্দ্ধমান জেলার ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি জাতির জীবন-যাত্রার পথগুলি এই কর্ম্মঠ জাতি একে একে গ্রহণ করিয়া এক প্রবল জাতিতে পরিণত হইতেছে। মহাজন, জমীদার, জোতদাররূপে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক আখ্যা এখনও ঐ জাতির কেহ পায় নাই। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এ জাতির কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। উগ্রক্ষত্রিয় উদীয়মান হিন্দু। জাতীয় উন্নতির সহিত সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতিকে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত করিবার জন্য ধাবিত হইয়াছে। কিন্তু প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মাড়োয়ারী এ জাতির সহিত বুঝাপড়ায় অগ্রসর।

মোসলমান

সম্ভ্রান্তবংশীয় দেশী মোসলমানের অবস্থা সাধারণ ভদ্রবংশীয় হিন্দুগণের অনুরূপ। মধ্যবিত্তগণের পক্ষে চাষ বা কৃষি জীবন-ধারণের মুখ্য উপায় হইলেও বিবিধ শিল্প-ব্যবসা দ্বারাও ইহারা উন্নত রহিয়াছে। কিন্তু বৈদেশিক মোসলমানগণই প্রতিদ্বন্দ্বী। পল্লীগ্রামে ক্রমে ক্রমে পশ্চিমদেশীয় মোসলমানগণ বিবিধ ব্যবসা ও কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া দেশীয় মোসলমানগণকে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত করিতেছে।

সাধারণ কৃষক-শ্রেণীর মোসলমানগণ কেবল কৃষির উপর নির্ভর করিয়া অবস্থান করে। এই শ্রেণীর অবস্থা ভাল নহে। অনেকেই পল্লী ত্যাগ করিয়া কর্ম্মকেন্দ্রে অবস্থান করিতেছে। জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহার্থে ইহারা চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইতেছে। চামড়ার ব্যবসা এবং পক্ষীর পালকের ব্যবসা করিয়া কেহ কেহ ধনী হইয়াছে। বহু মোসলমান পল্লীর অবস্থা অতীব শোচনীয়। সংখ্যায় অধিক হইলেও অবস্থায় ইহারা অতি দরিদ্র। দরিদ্রের সংখ্যা হিন্দু অপেক্ষা অধিক। বৰ্দ্ধমানে মোসলমান অপেক্ষা হিন্দুর সংখ্যা অধিক।

মাল

এই সম্প্রদায় সাধারণতঃ সর্প-ব্যবসায়ী। ইহারা সর্পের বিষ বিক্রয় করে, সর্প লইয়া ক্রীড়া করে, পল্লীবাসীদের গৃহ হইতে সর্প ধরিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে। ঝাপী করিয়া সাপ লইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করে। ইহাই ইহাদের সাধারণ জীবিকা। সামান্য কৃষিকার্য্যও করে। হিন্দু মালদের সহিত মনসার ঝাপানে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। নগণ্য জাতি। ক্রমশঃ বংশগত কর্ম্মত্যাগপূর্ব্বক বিভিন্ন কর্ম্ম অবলম্বনে বন্যভাব ত্যাগ করিয়া ভদ্র মোসলমান হইতেছে।

জোলা

অশিক্ষিত, স্থূল-বস্ত্র-বয়নকারী। শিল্পহীন হইয়া সামান্য কৃষি অবলম্বন করিয়াছে। কেহ বা পৃথক ব্যবসা অবলম্বন করিয়া ভদ্র মোসলমানে পরিণত হইয়াছে। সাধারণ জোলা, রঞ্জনকার—রেজা, বিদেশী জোলা ও রেজার প্রতিযোগিতায় পরাজিত হইয়া স্বতন্ত্র কর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে।

ধুণারী

এই শ্রেণীর মোসলমান পল্লীতে পল্লীতে তুলা বিক্রয় ও লেপ, বালিস, তোষক প্রস্তুত করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। ইহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী পশ্চিমাগত ধুণারী। ইহাদের নিকট দেশীয় ধুণারীগণ, পরাজিত হইয়া পৃথক ব্যবসাবলম্বনে ধুণারী সংজ্ঞা ত্যাগ করিয়া ভদ্রগোষ্ঠীতে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং দেশীয় ধুণারী বৰ্দ্ধমানের পল্লীতে সচরাচর দৃষ্ট হয় না। এই কারণে এই জাতি লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করিয়া থাকে। বাস্তবিক পক্ষে সংজ্ঞাবাচক কর্ম্মের ত্যাগেই কর্ম্মগত সংজ্ঞা লুপ্ত হয়, সম্প্রদায় লোপ পায় না।

হিন্দুর সম্প্রদায়গুলি কর্ম্মগত সংজ্ঞায় আবদ্ধ। সুতরাং কর্ম্মত্যাগী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কর্ম্মহীনতায় বা কর্ম্মত্যাগে অথবা কর্ম্মের পরিবর্ত্তনেও পূর্ব্ব কর্ম্মজ উপাধির লোপ হয় না। মোসলমান সমাজে উহার লোপ হয়। চর্ম্মকার মোসলমান মণিকর হইলে তাহার চামার সংজ্ঞার লোপ হয়।

শিউলী

ইহাদের পৈতৃক ব্যবসা খেজুর গাছ চাঁচিয়া বা কামাইয়া খেজুরের রস উৎপাদন করা, এবং সেই রস জাল দিয়া, গুড় প্রস্তুত করা। বৈদেশিক চিনির প্রচুর আমদানি হওয়ায় এই জাতি বংশগত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পৃথক ব্যবসা অবলম্বন করিতেছে। শিউলীর বংশ লুপ্ত হয় নাই—কেবল শিউলীর কর্ম্ম লুপ্ত হইতেছে। অধিকাংশ স্থলে বৈদেশিক লাল চিনির সহিত সামান্য খেজুর গুড় মিশ্রিত করিয়া খেজুর গুড়, নালী বা নলিন গুড় অথবা পাটালী রূপে বিক্রয় করিয়া খেজুর গুড় বিক্রয় অপেক্ষা অধিক লাভ করিয়া থাকে। শিউলীর ব্যবসা বৎসর বৎসর ক্ষীণ হইতেছে।

পাশী

তাল ও খেজুর রস হইতে 'তাড়ি' নামক মাদক দ্রব্য উৎপাদনকারী। দেশীয় পাশীরা বৈদেশিক পশ্চিমা পাশীদের

নিকট পরাজিত হইয়া বংশগত কর্ম্মত্যাগ করিয়াছে। কেহ কৃষক হইয়াছে কেহ বা কর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে।

নিকারী

এই সম্প্রদায় ফলকর জমা লইয়া জীবনধারণ করিত। পূর্ব্বদেশীয় নিকারী এবং পশ্চিমদেশীয় মোসলমান এই কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। দেশী নিকারীরা শুটকী মাছ, নোনামাছের ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে।

নারায়ণী ও সত্যপীরান

ইহারা ভিক্ষোপজীবী। চাষের সময় সামান্য সামান্য কৃষিকার্য্য করে, অন্য সময় ভিক্ষা করে। অবস্থা অসচ্ছল এবং দরিদ্র। ইহারা হিন্দুভাবাপন্ন মুসলমান।

গয়শাল, বেরুণী ও দোসাদ

ইহারা অসভ্য বন্যভাবাপন্ন শ্রমজীবী জাতি। মাটীর কার্য্য করে। বাউড়ী, কোঁড়া, সাঁওতাল কর্তৃক পরাজিত হইয়া মৃতপ্রায় জাতিতে পরিণত হইয়াছে। দোসাদগণ পূর্ব্বে চৌকীদারি করিত। ইহারা বাগ্দী ও ডোম কর্তৃক পরাজিত হইয়া বর্দ্ধমান ত্যাগ করিয়াছে। কোন কোন গোষ্ঠী কৃষি-কার্য্যাদি অবলম্বনে সাধারণ মোসলমান হইয়া ভিন্ন নামে অবস্থান করিতেছে। অতি নগণ্য সম্প্রদায়। ইহারাও হিন্দুভাবাপন্ন।

দরবেশ, আউলিয়া, সাঞ ইত্যাদি

ভিক্ষোপজীবী জাতি। এই জাতি প্রথমে বাউল সম্প্রদায়ে উন্নীত হইয়া পরবর্ত্তী কালে হিন্দু বৈষ্ণবে পরিণত হইয়াছে। অনেকেই গৃহস্থ এবং ব্যবসায়ী হইয়া ভাবান্তর গ্রহণ করিয়াছে অথচ লুপ্ত হয় নাই। বৈষ্ণব সংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়া উন্নত হইতেছে। ইহারা মুসলমান ভাবাপন্ন হিন্দু।

দেশী খ্রীষ্টিয়ান সম্প্রদায়

বহু সাঁওতাল খ্রীষ্টিয়ান হইয়াছে এবং অপরাপর হিন্দুও খ্রীষ্টিয়ান হইয়াছে। অবস্থা সচ্ছল নহে। প্রায়ই দরিদ্র।

কলিকাতা ফুটপাথের সম্পদ্ ও আপদ্

শ্রীসুধাকান্ত দে, এম্, এ, বি, এল

সম্পদ্ ও আপদের রকমফের

কলিকাতা ফুটপাথের সম্পদ্ ও আপদ্ লইয়া যে সব সমস্যা জাগিয়াছে তাহাকে প্রকৃতি অনুসারে দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করিতে পারি—

(১) নাগরিক। অর্থাৎ এমন কতকগুলি সমস্যা আছে যেগুলিকে সমস্ত নগরীর সমস্যা বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। তাদের সুষ্ঠু সমাধানে সমগ্র নগরীর স্বার্থ (ইষ্ট, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য ইত্যাদি) পুষ্ট ও রক্ষিত হইবে। ফুটপাথের কথা আর আলাদা করিয়া বিবেচনা করিবার দরকার হইবে না। এমন কি, অনেক সময় প্রয়োজনও নাই। যেহেতু ফুটপাথ নগরীর অঙ্গবিশেষ। সেইজন্য আনুষঙ্গিকভাবে সাধারণ হিত বা অহিতের ভাগও ইহাতে বর্ত্তে।

উদাহরণ,—ট্রামের ও টেলিফোনের থাম, গ্যাসের বাতি, ভিক্ষুক-সমস্যা ইত্যাদি।

(২) অ-নাগরিক। অর্থাৎ যে সমস্যাগুলি শুধু ফুটপাথের সৃষ্টি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ফুটপাথ না থাকিলে এ সবের উদয় হইত না। সে জন্য এদের সমাধানের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সমগ্র নগরীর কোন সম্বন্ধ নাই। সম্বন্ধটা নগরীর স্থানবিশেষের সঙ্গে মাত্র।

উদাহরণ—গাড়ীবারান্দা, ফুটপাথের উপরকার আবর্জ্জনা ইত্যাদি।

ফুটপাথের সম্পদ্‌সম্বন্ধীয় সমস্যাগুলি প্রায়ই নাগরিক জাতীয়। আর আপদ্‌সম্বন্ধীয় অধিকাংশ সমস্যা অ-নাগরিক।

বলা বাহুল্য, নাগরিক ও অ-নাগরিক সমস্যার মধ্যে সীমা-রেখা টানা সহজ নহে। আজ যাহা অ-নাগরিক সমস্যা, কাল তাহা নাগরিক হইয়া উঠিতে পারে। কারণ, নগরের বক্ষে নিত্য নূতন অভাব ও প্রয়োজনের সৃষ্টি হইতেছে। তবু এই সীমা-রেখা টানার একটা সার্থকতা আছে।

কার দায়িত্ব কতখানি ?

ফুটপাথের সমস্যাগুলির সুষ্ঠু সমাধানের ভার কে লইবে ? কে সেগুলির দিকে চোখ রাখিবে ও সে জন্য দায়ী থাকিবে ?

প্রশ্নটা সহজ মনে হইতে পারে। অনেকে তৎক্ষণাৎ জবাব দিবেন, "কেন ? কলিকাতা কর্পোরেশন ত এই ভার ও দায়িত্ব বহন করিতেছে।" এই জবাবটাকেই একটু বিশ্লেষণ করিয়া হয়ত পাওয়া যাইবে, "কলিকাতার অধিবাসীরাই নিজে নিজে এই সমাধানের ভার লইয়াছে। তারাই এই দায়িত্ব বহন করিয়া চলিবে।" বস্তুতঃ বর্ত্তমান কলিকাতা কর্পোরেশন সম্বন্ধে অন্ততঃ এই কথা কতকটা সত্য। কলিকাতাবাসীরা কর্পোরেশনে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া নগর-শাসন করিতেছে।

কিন্তু এই সোজা প্রশ্ন হইতেই বহু জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে। বহু দেশে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি এই জটিলতার অবসান করিবার জন্য বিস্তর মাথা ঘামাইয়াছেন এবং বিস্তর যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়াছেন।

কলিকাতা কর্পোরেশনের আয় প্রায় ২ কোটি টাকা। অর্থাৎ কলিকাতাবাসীরা নানাপ্রকার কর ইত্যাদি বাবদে প্রতি বছর তাদের প্রতিনিধিদের হাতে এই পরিমাণ টাকা তুলিয়া দিতেছে। এর পরিবর্ত্তে তারা চায়—

(১) শিক্ষা,
(২) স্বাস্থ্য,
(৩) আলো-বাতাস-যুক্ত আশ্রয়স্থান,
(৪) খাদ্যদ্রব্য,
(৫) পরিচ্ছদ,
(৬) সভ্য মানবের উপযোগী সকল প্রকার সুবিধা ও সুযোগ, ইত্যাদি ইত্যাদি।

কলিকাতাবাসী যেন বলিতেছে, "দেখ এই টাকাটা তোমায় দিলাম। কিন্তু কেমন করিয়া খরচ করিবে জান ? বাঙ্গালা দেশে গড়ে ৬% মাত্র শিক্ষিত। অন্ততঃ এই কলিকাতা সহরে এমন ব্যবস্থা করিয়া দাও যেন ৫।৭ বছরের মধ্যে একটিও অশিক্ষিত লোক না থাকে। হাজার হাজার লোক বেয়ারাম পীড়ায় মরিতেছে। তাদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দাও। হাঁসপাতাল ইত্যাদি বানাইয়া দাও। আর যারা দুর্ব্বল ও মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছে তাদের স্বাস্থ্যের জন্য ভেজালশূন্য পুষ্টিকর সব খাদ্যের বন্দোবস্ত করিয়া দাও। আলো-বাতাসপূর্ণ ঘরবাড়ী তৈয়ারী করিয়া দাও। দীঘি, পার্ক, ইত্যাদির সৃষ্টি কর। সড়ক ও ফুটপাথগুলিকে সর্ব্বপ্রকারে উন্নত করিয়া তোল।"

দাবীগুলি পরিমাণে নেহাৎ কম নয়। কর্পোরেশন বলিতে পারে, "তা বাপু, আমি ধীরে ধীরে সব বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছি। কিন্তু তোমাকে পয়সা খরচ করিতে হইবে। তুমি যদি যথেষ্ট পয়সা খরচ করিতে রাজী থাক, তবে মনের মত সব জিনিষগুলিই পাইবে।"

কিন্তু সকল বিবাদের গোড়া ঐখানে। নগরবাসী পয়সা খরচ করিতে চাহে না। সে বলে, "আমি গরিব। আমার সামর্থ্য নাই। আমি একা কিছু করিতে পারি না বলিয়াই সমগ্র নগরবাসীর হাতে আমার ভার তুলিয়া দিয়াছি।"

অর্থাৎ প্রত্যেক নাগরিক জীবন-ধারণের সকল প্রকার সুখ-সুবিধা, স্বাচ্ছন্দ্য, আনন্দ ইত্যাদি চাহে। কিন্তু সব চাই সস্তায়, অল্প আয়াসে, আর সর্ব্বদা। এই হইল সমস্যা নং ১।

সমস্যা নং ২ হইতেছে, নগরবাসীর টাকার কতখানি কোন্ বিষয়ে ব্যয় করা হইবে ? সকল দফার প্রয়োজন বা উপকারিতা সমান হইতে পারে না। সুতরাং আগে নির্ণয় করা দরকার কোন্ কোন্ বাবদে কতখানি খরচ করা উচিত, কেন করা উচিত, কি ভাবে করা উচিত অর্থাৎ কি ভাবে করিলে সব চেয়ে বেশী ফল পাইব।

এই নির্ণয় করার কাজটা সোজা নয়। শুধু বর্ত্তমানের

দিকে চাহিয়া খরচটা হইবে কিংবা ভাবীকালকেও গণনার মধ্যে ধরা হইবে? কোন্ বিশিষ্ট-নীতি অবলম্বন করিয়া বিষয়-গুলির বিভাগ হইবে? খসড়া হিসাবের সহিত শেষ অবধি যদি প্রকৃত হিসাবের মিল না ঘটে ত কি করিতে হইবে? ঋণ করা হইবে কি না? করিলে কি প্রণালীতে করিতে হইবে? এইরূপ বহু প্রশ্নের মীমাংসা ভিন্ন তা সম্ভব নয়।

কোন্ বিভাগ বাবদ কত টাকা বরাদ্দ করা হইবে তা যেন ঠিক করা হইল। সমগ্র কলিকাতা সহরের তুলনায় ফুটপাথগুলি একটা ছোট অংশমাত্র। সেজন্য বাৎসরিক খরচের পরিমাণটাও ধরিয়া দেওয়া যাইতে পারে। মনে করা যাক্ যেন বছর বছর কিছু পরিমাণ টাকা ফুটপাথের জন্য পাওয়া যাইতেছে।

প্রশ্ন এই:—"কলিকাতা সহরে ৩২টা ওয়ার্ড আছে। সকল ওয়ার্ডের অভাব অথবা প্রয়োজন একপ্রকারের নহে। ভিন্ন ভিন্ন ওয়ার্ডের নিজ নিজ অভাব ও প্রয়োজনের স্বভাবটা ভাল করিয়া বুঝিবার সার্থকতা আছে। প্রথমতঃ, তাতে মনোযোগের সহিত তাড়াতাড়ি সেই অভাব ও প্রয়োজন মিটান যায়। দ্বিতীয়তঃ, সমগ্র কলিকাতা সহর বিপুল জনপদ। লোক-সংখ্যা অপরিমেয়। এই বিশাল জনস্রোতকে তাদের কর্ত্তব্যবোধ ও দায়িত্ব সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ করা অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু ওয়ার্ডের লোকেরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন। সেখানে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করা দুঃসাধ্য নহে। রাষ্ট্রীয় অধিকার ও দায়িত্বজ্ঞান সহজে পরিস্ফুট হইতে পারে।

"সুতরাং ওয়ার্ডের জন্য কার ঘাড়ে দায়িত্বের বোঝা চাপাইয়া দেওয়া বেশী যুক্তি-সঙ্গত? সহরের না ওয়ার্ডের? যে ব্যবস্থায় শুধু ওয়ার্ডের উন্নতি হয় ও স্বার্থ পুষ্ট হয় সেখানে ওয়ার্ড কি বলিতে পারে সমগ্র সহরই আমার জন্য পয়সা খরচ করুক?" ইহাই ৩ নং সমস্যা।

সহর বনাম ওয়ার্ড

সম্ভবতঃ এই নগরীতে ব্যয় লইয়া অধিকারের পার্থক্য ওয়ার্ডের মধ্যে প্রকট হয় নাই। দায়িত্বটাকে ভাগাভাগি করিয়া লইবার প্রশ্নও এখন পর্য্যন্ত মনে জাগে নাই।

অনেকে বলিবেন, "সহর ও ওয়ার্ডের মধ্যে ভেদ-রেখা টানাটা সংকীর্ণতার পরিচায়ক। তাতে অনাবশ্যক ঝগড়ার সৃষ্টি হইতে পারে।" গোড়াতে ভুল বুঝিয়া মন-কষাকষি চলিতে পারে, সে কথা অস্বীকার করি না। নাও চলিতে পারে। কিন্তু চলুক বা না চলুক, একথা বলিতে বাধ্য, ঐ মনোভাব উন্নতির পরিপন্থী।

বস্তুতঃ, বর্ত্তমান কলিকাতার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলে এই সত্য কথাটা পরিষ্কার হইবে যে, এস্থানে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডের যে পার্থক্য ও বৈষম্য রহিয়াছে তা স্মরণ করিলে আমাদের নাগরিক বুদ্ধি লজ্জিত হয়। ক্লাইভ ষ্ট্রীটের সাহেব ব্যবসায়ীদের পাড়ার সহিত হ্যারিসন রোডের মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের পাড়া অথবা খোদ ক্লাইভ্ ষ্ট্রীটের দেশী আস্তানার দিক্‌টা তুলনা করিয়া দেখুন। চৌরঙ্গীর সঙ্গে উত্তর কলিকাতার সার্কুলার রোড বা কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট বা চীৎপুরের তুলনা করুন। কিবা ঘরবাড়ীর গঠন ও শ্রীছাঁদ, কিবা সড়ক-ফুট-পাথের কার্য্যক্ষমতা সকলদিকেই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আকাশ-পাতাল! এই উত্তর কলিকাতার বুকের উপরেই মরুভূমির মধ্যে জলাশয়ের মত মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীটের মত ২।১টা সড়ক বিরাজ করিতেছে। চারিদিকে দৈন্য, অপরি-চ্ছন্নতা ও অসংস্কৃত অবস্থা, তার মধ্যে মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীটটি দিব্য ফিট্‌ফাট্, পিচ-ঢালা। অথচ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট বড় সড়ক বা রাজপথ নয়, গলি-বিশেষ। এর সঙ্গে অন্য যে সব গলি যুক্ত হইয়াছে তারা এখনও অসংস্কৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে। আর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট্ ব্যবসা-বাণিজ্যের একটা আড্ডাও নয়। হাটখোলার নিকট বহু গলি বা সড়কের কোনটা যদি এরূপ সুসংস্কৃত হইত তবে না হয় বুঝিতাম অনবরত যান-বাহনের চলাচল হয় বলিয়া এই সাবধানতা।

শুধু মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীটের উল্লেখ করিলাম। এরূপ আরও আছে। তবে ভবানীপুর অঞ্চলকে কতকটা ব্যতি-ক্রম রূপে গণ্য করা যাইতে পারে।

এইরূপ বৈসাদৃশ্য ও বৈষম্যের অর্থ কি? এক কথায় বলা যাইতে পারে, ব্যক্তি-প্রাধান্য-হেতু কলিকাতার এক অঞ্চলের সহিত অন্য অঞ্চলের এতখানি পার্থক্য ঘটিয়াছে।

কোন এক বা অধিক ব্যক্তি বিগত কর্পোরেশনগুলিতে আধিপত্য করিয়াছে। সেজন্য তারা ইচ্ছামত যেখানে খুসী টাকা খরচ করিয়াছে, সুন্দর সড়ক বানাইয়াছে, নয়া নয়া ফুটপাথের সৃষ্টি করিয়াছে, ফুটপাথের সম্পদ্‌বৃদ্ধি ও আপদ্ দূর করিবার জন্য সচেষ্ট রহিয়াছে। অবশ্য ২।১ জন সদাশয় ব্যক্তি ঘরের পয়সা খরচ করিয়া সড়ক বা ফুটপাথ নির্ম্মাণ ইত্যাদি করিয়াছেন, তা ভুলিয়া যাইতেছি না। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়।

ব্যক্তি-প্রাধান্য দূর করিয়া দাও

ব্যক্তি যত বড়ই হোক্, শুধু একা তার হাতে ক্ষমতা জমিলে অপব্যবহার ঘটিবে। রাম হয়ত সজ্জন। রাম নিজের পদের সুযোগ লইয়া কোন কাজ না করিতে পারে। প্রতি কাজে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে অন্য ৯৯ জনের তাতে কতটা সুখ-সুবিধা হইবে তা বিচার করিয়া দেখিতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক লোক আর কিছু রাম নয়। তারপর যারা আসিবে—শ্যাম, মধু, যদু—তারা অন্য ৯৯ জনের জন্য একটুও মাথা না ঘামাইতে পারে। চাই কি ৯৯ জনের অনিষ্ট করিয়া নিজের স্বার্থ-সাধন করিতেও পারে।

প্রতীকারের উপায় কি? একমাত্র উপায় হইতেছে কোনো এক ব্যক্তি বা দলের হাতে বহুকাল ধরিয়া ক্ষমতা জমিতে না দেওয়া।' দরকারমত সেই ক্ষমতাকে নিজ ইচ্ছামত চালাইবার শক্তি নগরবাসীদের হাতে রাখা।

বর্ত্তমান কর্পোরেশন বলিতে পারে বটে, "শ্যাম, মধু, যদুর স্বেচ্ছাচার চিরকালের জন্য দূর হইয়া গিয়াছে। আমরা নগরবাসী লোকদের আশা-আকাঙ্ক্ষার খবর সর্ব্বদা রাখি। তাদের অনুশাসন মাথা পাতিয়া গ্রহণ করি।"

কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নয়। শুধু সৎ-ইচ্ছা দ্বারা কোনো কাজ সম্পন্ন হয় না। তার সঙ্গে সঙ্গে দরকার—

(১) সাহসের সঙ্গে সত্য সত্য কাজে প্রবৃত্ত হওয়া।

(২) কাজের ফলে যেন সর্ব্বদা অধিকতম লোকের প্রভূততম মঙ্গল্ সাধিত হয় সেইদিকে দৃষ্টি রাখা।

কিন্তু কাজে প্রবৃত্তি দিবে কে? উদ্বোধিত করিবে কে? অভাব-অভিযোগ, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা কে বুঝাইয়া দিবে? কলিকাতা কর্পোরেশন প্রতিনিধি-সভা। প্রতিনিধি প্রত্যেক নগরবাসীর মন জানিতে চাহে। প্রতি নগরবাসীর কাছে জানিতে চায় "কি চাই? কেমন করিয়া চাই?"

নগরবাসীরও খোঁজ লওয়া উচিত—

(১) প্রতিনিধিরা কাজে ফাঁকি দিতেছে কিনা।

(২) নিজেদের স্বার্থের কথা না ভাবিয়া সমগ্র নগরের কথা অবহিত চিত্তে ভাবিতেছে কি না।

(৩) নিজেদের শাসন-ক্ষমতার অপব্যবহার করিতেছে কি না।

(৪) টাকা-পয়সার অপব্যয় নিবারিত হইতেছে কিনা। হিসাব-পত্র রাখা হইতেছে কি না।

(৫) আয় বাড়াইবার চেষ্টা হইতেছে কি না।

(৬) শিক্ষা, স্বাস্থ্য আলো, বাতাস, পথ, ঘাট, ঘরবাড়ী ইত্যাদি সকল বিষয়ে নগরবাসীর সর্ব্বপ্রকার অবস্থার উন্নতি ঘটিতেছে কি না।

বুঝা যাইতেছে, প্রতিনিধি ও নগরবাসীর একে অন্যের উপর চোখ রাখা দরকার। উভয়ের যোগ ঘনিষ্ট হইলে, উভয়ে উভয়কে ভাল করিয়া জানিলে, তবেই না উভয়ের কাজের সুবিধা ও স্বার্থ রক্ষা হয়?

ওয়ার্ডের প্রতিনিধি

কিন্তু কত বড় কলিকাতা সহর! ১৩।১৪ লক্ষ লোকের বাস-স্থান কলিকাতা। কর্পোরেশনের ৬০।৭০ জন প্রতিনিধি কেমন করিয়া এই বিপুল জন-প্রবাহের মন জানিবে? ইহাদের সুখ-দুঃখের, আশা-আকাঙ্ক্ষার খবর লওয়া কি সম্ভব?

মন জানাজানিটা এমন-কিছু অসম্ভব নাও হইতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে কলিকাতা সহর প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করে না। সমগ্র নগরীকে যে ৩২টা ওয়ার্ডে ভাগ করা হইয়াছে তারাই প্রত্যেকে প্রতিনিধি পাঠায়। কেহ এক, কেহ দুই, কেহ তিন, কেহ বা চার জন।

সমগ্র নগরীর খোঁজ-খবর লওয়া যত কঠিন, এক বা ততোধিক নির্দ্দিষ্ট প্রতিনিধির পক্ষে ওয়ার্ডের সহিত যোগ রাখা তার চেয়ে ঢের সহজ। সাধারণতঃ ওয়ার্ডের প্রতিনিধি

ওয়ার্ডের বাসিন্দা হইয়া থাকেন। সেটা মস্ত সুবিধা। তা ছাড়া পুনরায় নির্ব্বাচিত হইবার ইচ্ছা থাকিলে ওয়ার্ডের মন যোগাইয়া চলিবার স্পৃহা আপনা হইতেই থাকিবে। প্রতিনিধি সর্ব্বপ্রকারে স্থানীয় অধিবাসিগণের সহিত যোগস্থাপনা করিয়া যথাসাধ্য তাদের সেবা করিবেন, আশা করা যায়।

এই নীতি হইতে একটা প্রশ্নের উদয় হইতেছে—কর্পোরেশনের প্রতিনিধি কার স্বার্থ আগে দেখিবে? সমগ্র নগরীর অথবা তার নিজ ওয়ার্ডের? কখনো এমন হইতে পারে যে, তার ওয়ার্ডের স্বার্থ সমগ্র নগরীর স্বার্থের প্রতিকূল। সেখানে সে কি করিবে? ওয়ার্ডের প্রতিনিধি হিসাবে সে কি ওয়ার্ডের স্বার্থই বড় করিয়া দেখিতে বাধ্য নয়? নগরীর স্বার্থ রাখিতে গেলে সে কি তার নিজ ওয়ার্ডের কাছে দায়ী হইবে না?

যাঁরা বলেন, "সহর ও ওয়ার্ডের মধ্যে ভেদ-রেখা টানাটা সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক" তাঁদের কারো কারো মনে হয়ত এই সব প্রশ্ন জাগিয়াছে। তাঁরা আশঙ্কা করেন, "জোরটা সমগ্র নগরীর উপরে দেওয়া হইবে না। ওয়ার্ডের শ্রীবৃদ্ধিতে সমগ্র নগরীর ক্ষতি বর্দ্ধিত হইবে। বিশেষ, যেখানে নগরীর স্বার্থ ওয়ার্ডের স্বার্থের বিপরীত, সেখানে ক্ষতিটা অপরিমেয় হইবে।

উত্তরস্বরূপ বলা যাইতে পারে—

(১) নগরীর সহিত ওয়ার্ডের স্বার্থের সংঘর্ষ সর্ব্বদা ঘটে না, কালে ভদ্রে কচিৎ ঘটে। অধিকাংশ সময়ই উভয়ের স্বার্থ একপ্রকার।

(২) সকল ওয়ার্ডের যুগপৎ শ্রীবৃদ্ধিতে নগরের শ্রীবৃদ্ধি হইতে বাধ্য। ক্ষতি কোনপ্রকারেই হইতে পারে না। কারণ নগরীটা ত আর কিছু ওয়ার্ড ছাড়া জিনিষ নয়। কতকগুলি ওয়ার্ড একত্র হইয়াই না একটা নগরীর সৃষ্টি করিয়াছে? ওয়ার্ডগুলির উন্নতি করা মানেই ত নগরীর উন্নতি করা। বরং প্রত্যেক প্রতিনিধি তাঁর নিজস্থানের খবরাখবর ভাল করিয়া রাখেন বলিয়া নগরীর উন্নতি-বিধানের প্রচেষ্টাটা বিশৃঙ্খল ও প্রণালী-শূন্যভাবে হইতে পায় না। অর্থাৎ ওয়ার্ডের সৃষ্টির দ্বারা মোট কাজের পরিমাণ বেশী হইতেছে, কম নয়।

(৩) ওয়ার্ড-বিশেষের শ্রীবৃদ্ধিতে নগরীর ক্ষতি হইতে পারে বটে। কারণ সেবা, মনোযোগ, যত্ন ও পরিশ্রম এক স্থানে আবদ্ধ হইলে অন্য স্থানগুলি অনুন্নত থাকিয়া যায়। কিন্তু এই রোগের ঔষধ ব্যক্তি-প্রাধান্য উঠাইয়া দেওয়া। ওয়ার্ডের সৃষ্টি সেদিকেও অনেকখানি সাহায্য করিতেছে।

সঙ্কীর্ণতার আশঙ্কাটা ভুয়া বটে। কিন্তু সহর বনাম ওয়ার্ড মামলাটার নিষ্পত্তি হয় নাই। ইহা লইয়া বহুতর যুক্তি ও তর্কজালের সৃষ্টি হইয়াছে। উত্তরদাতার রুচি অনুসারে উত্তরটাও বিভিন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ কেহ বলিয়াছেন নগরীর গোটা স্বার্থটাকেই সকলকে দেখিতে হইবে। অন্য কেহ বলিয়াছেন, প্রতিনিধি গোটা স্বার্থ দেখিতে বাধ্য নয়। সে তার ওয়ার্ডের জন্য দায়ী।

এই সব যুক্তিতর্কের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া মোটামুটি এই কথা বলা যাইতে পারে যে—

(১) যেখানে নগরীর স্বার্থ ওয়ার্ডের স্বার্থের প্রতিকূল নয় সেখানে—

(ক) যে সমস্যা সমগ্র নগরীর সমস্যা সে সমস্যার সমাধান শুধু ওয়ার্ডের মধ্যে করিলে চলিবে না। ফুটপাথের উপর ভিক্ষুক সমস্যাটা একটা বড় সমস্যা। ইহা শুধু ফুটপাথের সমস্যা নয় অথবা কোনো বিশেষ ওয়ার্ডের সমস্যা নয়। সমগ্র কলিকাতা, চাই কি, সমগ্র বঙ্গ তথা ভারতের সমস্যা। এর সমাধানের জন্য কোনো বিশেষ ওয়ার্ডের টাকা পয়সা ব্যয় করা বা সময়, পরিশ্রম, যত্ন ইত্যাদির নিয়োগ অন্যায় হইবে।

(খ) যে সমস্যা মাত্র ওয়ার্ডের সমস্যা, সেটার জন্য তার প্রতিনিধির সম্পূর্ণ দায়িত্ব রহিয়াছে। অর্থাৎ ওয়ার্ডের অধিবাসীরা দেখিতে চাহিবে তাদের নির্ব্বাচিত ব্যক্তি কাজটা সুসম্পন্ন করাইয়াছে। যেমন, প্রস্রাব-স্থানের নির্ম্মাণ, পার্ক ইত্যাদির সৃষ্টি, দীঘি-খনন, আঁস্তাকুড়-স্থাপন ইত্যাদি।

(গ) কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো বিষয়ে বিশেষ একটা পরীক্ষা যে-কোনো এক ওয়ার্ডে আরম্ভ হইতে পারে। উদ্দেশ্য—ছোট ক্ষেত্রে সফল হইলে, তাকে বিস্তৃত করিয়া কাজে লাগান যাইবে। যেমন কর্পোরেশন-কর্ত্তৃক দুধ, মাছ ইত্যাদির বন্দোবস্তের ভার-গ্রহণ।

(২) যেখানে নগরীর ও ওয়ার্ডের স্বার্থ পরস্পর প্রতিকূল সেখানে প্রতিনিধিকে সর্ব্বদা নগরীর স্বার্থ-রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে।

বলা বাহুল্য, ফুটপাথের সম্পদ্‌ ও আপদ্‌ সম্বন্ধে সমস্যাগুলিকে যে নাগরিক ও অনাগরিক ভাগে ভাগ করা হইয়াছে তাতে এই নীতির অনুসরণ সহজসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে।

ফুটপাথের আপদের প্রকৃতি

ফুটপাথের সম্পদ্‌ ও আপদ্‌ লইয়া যে সব সমস্যার উদয় হইয়াছে, সেগুলি লইয়া বহু আলোচনা হওয়া দরকার। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাদের প্রকৃতি বুঝিবার কোনো চেষ্টা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

কতকগুলি আপদের কথা বিবেচনা করা যাক্‌। এদের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিবার সময় মনে রাখা দরকার—

(১) এদের অবস্থানহেতু ক্ষতির পরিমাণটা কতখানি? এই ক্ষতিটাকে টাকা আনা পাইয়ে রূপান্তরিত করিয়া দেখান যায় কি না।

(২) এই আপদ্‌গুলিকে দূর করিতে অথবা আংশিক ভাবে তাহার প্রতিকার করিতে পারা যায় কি না।

(৩) একেবারে দূর করিয়া দেওয়ায় বা আংশিক প্রতিকারে কত খরচ পড়িবে?

(৪) ঐ আপদ্‌গুলিকে এমন কিছুতে পরিবর্ত্তিত করা যায় কি না, যাতে কর্পোরেশনের আয়, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদির কোনটা বৃদ্ধি পায়।

সব আপদের উৎপত্তি একরূপে হয় না, স্বরূপও বিভিন্ন। দুইটার উপরেই সমান নজর রাখা দরকার।

ফুটপাথে জল কেন?

কলিকাতার ফুটপাথে হাঁটিতে হাঁটিতে কে না কতকগুলি সাধারণ আপদ্‌কে সর্ব্বদা লক্ষ্য করিয়াছে? কতকগুলির নাম—

(১) জল,

(২) থুথু,

(৩) ময়লা ও আবর্জ্জনা,

(৪) গোবর,

ফুটপাথে যে জল চোখে পড়ে তার কারণ অনেক-কিছু হইতে পারে। কয়েকটি নিম্নরূপ :—

(১) বৃষ্টি,

(২) সড়কের ধূলানিবারণের জন্য কর্পোরেশন কর্ত্তৃক জল ছিটাইবার ব্যবস্থা,

(৩) ড্রেনের প্লাবন,

(৪) বাড়ীর দেয়াল ফাটিয়া 'ফ্লাশের' বে-বন্দোবস্ত হেতু জল চুঁয়াইয়া পড়া,

(৫) পানের দোকান,

(৬) মিঠাইয়ের দোকান,

(৭) কাপড় রঙ্গীন করিবার দোকান,

(৮) মোটর গ্যারেজ।

বৃষ্টি ও জল ছিটাইবার ব্যবস্থায় ফুটপাথের উপর যে জল দাঁড়ায় তা ঋতু অনুসারে কম বা বেশী হয়, এবং কম বা বেশী সময় থাকে। গ্রীষ্মকালে, বিশেষতঃ হাওয়া থাকিলে, সকালে ও সন্ধ্যায় জলটা তাড়াতাড়ি শুকায়। আবার বর্ষাকালে কখনো কখনো সমগ্র কলিকাতা সহর ঘণ্টার পর ঘণ্টা জলমগ্ন থাকিয়া যায়। জলমগ্ন কলিকাতাকে উদ্ধার করিবার জন্য সর্ব্বদাই বন্দোবস্ত করিয়া রাখিতে হয়। কিন্তু এমন কোনো উপায় উদ্ভাবনের এখনও প্রয়োজন আছে যাতে বৃষ্টির জল ও ছিটানো জল তাড়াতাড়ি শুকাইয়া যায়, কাদা না হয়।

বাড়ী ফাটিয়া জল চুঁয়াইয়া পড়িলে সে দোষ বাটী নির্ম্মাণকারীর, বাটীর কর্ত্তার ও বাটী-নির্ম্মাণ-পরিদর্শন-কারীর। বলা বাহুল্য, পথচারী পথিকেরও দায়িত্ব- কিছু আছে। তার উচিত এই ত্রুটির কথা ঐ সব ব্যক্তির গোচর করা এবং যাতে তাড়াতাড়ি প্রতীকার হয় সে দিকে মনোযোগ রাখা।

মিঠাইয়ের দোকানের সম্মুখে, রঙ্গীন কাপড়ের দোকানের সম্মুখে এবং মোটর গ্যারেজের সম্মুখে ফুটপাথের উপর যে জল জমিতে দেখা যায়, তার জন্য দায়ী ও দোষী দোকানী, ও মোটরের অধিকারী। মোটর ধুইয়া যে জল ফেলা

হয় তা অনায়াসে তখনি পরিষ্কার করা যাইতে পারে। রঙ্গীন কাপড় ধুইবার দোকানের সম্মুখে অবশ্য কাপড় সর্ব্বদাই ধুইয়া টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইতেছে। মিঠাইয়ের দোকানের সামনের জলের জন্য খরিদ্দারকেও কিছু পরিমাণ দায়ী করা যায়।

কিন্তু মিঠাইয়ের দোকান ও পানের দোকান একটু আলাদা রকমের। তাদের সম্মুখে জল ছাড়া থুথু, ভাঙ্গা খুড়ি ইত্যাদিও ফুটপাথের উপর ফেলা হয়।

ফুটপাথে জল কখন কখন প্রস্রাবের স্থান সম্পর্কেও দেখা যায়। কারণ—দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করা, কিংবা ফ্লাশ না চলা। দুর্গন্ধত আছেই।

বলা বাহুল্য, কাহাকেও চোর-দায়ে দায়ী করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু ফুটপাথে জল পথচারী ব্যক্তির অনেক প্রকারে অনিষ্ট ও বিঘ্ন ঘটায়। ফুটপাথেরও স্থায়িত্ব, সৌন্দর্য্য ইত্যাদি নষ্ট করে। সেজন্য দোষের পরিমাণ এবং দোষীর দোষ করিবার প্রণালীর খবর লওয়া দরকার।

তারপর প্রতীকারের কথা। আংশিক প্রতীকার সবগুলির সম্ভব। কোন কোনটা একেবারেও দূর করা যায়। দরকার হইলে নব নব আইন প্রণয়ন করাও চলিতে পারে।

এই আপদগুলি থাকার জন্য প্রতিদিন সমগ্র কলিকাতার তথা কলিকাতাবাসীর কত টাকা কত আনা কত পাই ক্ষতি হইতেছে তার একটা হিসাব রাখার খুব প্রয়োজন আছে। এই আর্থিক ক্ষতির হিসাবের পরিমাণ কতকটা এইরূপ হইবে :—

(১) ফুটপাথগুলি তাড়াতাড়ি ক্ষয় হওয়ার জন্য কত টাকার অপচয় হইল?

(২) সহরবাসীর স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ার জন্য ও রোগের বীজাণু দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ায় ডাক্তার, ঔষধ প্রতিষেধক ইত্যাদি বাবদে কত টাকা খরচ হইল?

(৩) উক্ত কারণে ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরী ইত্যাদিতে কত টাকা ক্ষতি হইল?

(৪) অমনোযোগহেতু অর্থাৎ যথাসময়ে আপদ্‌গুলির প্রতীকারের চেষ্টা না করায় তারা নগরবাসীর কি পরিমাণ ক্ষতি কোন্ কোন্ দিকে করিল?

(৫) জুতার তলা বেশী ক্ষয় হওয়ায় ও জামা কাপড় তাড়াতাড়ি ময়লা হওয়ায় কত টাকার ক্ষতি হইল?

এই ঘরগুলি একে একে যোগ করিলে যোগফল বেশ একটা মোটা অঙ্ক পাওয়া যাইবে সন্দেহ নাই। মনে রাখিতে হইবে, এই কয়টা আপদ্‌ই সব আপদ নহে। আরো ঢের আপদ্ রহিয়াছে। এবং প্রত্যেকটার ঐ উপরের পাঁচ বা ততোঽধিক দফায় ক্ষতির পরিমাণ কষিয়া বাহির করা যায়।

কলিকাতা ফুটপাথের সব আপদ্‌গুলি লইয়া যদি কখনো অনেক অঙ্কপাতের পর এইরূপ একটা হিসাব বাহির করা যায়, তার মূল্য অনেক হইবে। এই হিসাবটা আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিবে, প্রতিদিন আমাদের ক্ষতির পরিমাণ বহু কোটি টাকা। অথচ এই ক্ষতিটা বহু পরিমাণে নিবারণযোগ্য এবং নিবারণসাধ্য।

বস্তুতঃ, এই হিসাবের অন্য একটা বড় সার্থকতাও আছে। যদি বলা যায়, "আপদ্‌গুলি থাকাতে প্রতিদিন আমাদের অনেক ক্ষতি হইতেছে", তবে সে কথাটার গুরুত্ব আমরা টের পাই না। "অনেক" একটা অনির্দ্দিষ্ট কথা। তাহা কোন-কিছুর পরিষ্কার দ্যোতক নয়। কিন্তু এই "অনেক"কে যখন আকার দেওয়া হয়, যখন বুঝাইয়া দেওয়া হয় "ক্ষতির পরিমাণ এত কোটি টাকা" তখন আমাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। আমরা চমকিয়া উঠি। বলি, "ও বাবা, এত!" তখন আমাদের মনে সহজেই একটা প্রতীকার করিবার প্রবৃত্তি জাগে।

তবে এই আপদ্‌গুলির হিসাবের সময় এদের প্রকৃতির ৪র্থ দফাটা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। জলসম্বন্ধীয় আপদ্‌গুলি আর কোন কাজে লাগে না। কিন্তু কতকগুলি আপদ্‌কে পরিবর্ত্তিত করিয়া কাজে লাগান যায়। তারা অসংখ্য প্রকারে মানবের কল্যাণ সাধন করিতে পারে। যেমন, আঁস্তাকুড়ের আবর্জ্জনা পোড়াইয়া খুব উৎকৃষ্ট সার তৈয়ারী করা যায়। তখন আপদ্ আর আপদ্ থাকে না সম্পদ্‌রূপে গণ্য হয়। আর এই সম্পদ্‌টাও টাকা আনা পাইয়ে হিসাব করা যায়। অর্থাৎ বলিতে পারি, "যা ছিল আপদ্, যা ছিল এই পরিমাণ টাকার অপচয় বা ক্ষতি, তাই দাঁড়াইয়াছে এত টাকা এত আনা এত পাই লাভে।"
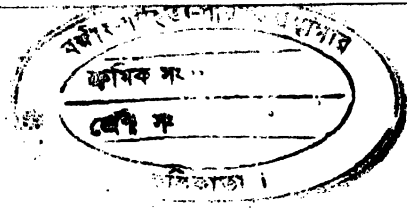
যুক্ত প্রদেশের কৃষি-বিভাগ

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র রায়

ভারতের সকল প্রাদেশিক কৃষি-বিভাগের মধ্যে যুক্ত প্রদেশের কৃষি-বিভাগ সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত ও অন্যান্য সকল প্রদেশের তুলনায় এই প্রদেশের কৃষিবিভাগের খরচ অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী। গত ১৯২৩-২৪ সনের কৃষি-বিভাগীয় রিপোর্টে দেখা যায় যে, সকল প্রদেশের তুলনায় বোম্বে দ্বিতীয়, মান্দ্রাজ তৃতীয়, পাঞ্জাব চতুর্থ, মধ্যপ্রদেশ পঞ্চম, ও বাংলা ষষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। গত ১৯২৩ সনের ৫ই জুলাই হইতে ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত বাংলা দেশের কৃষি-বিভাগ ৮৸৹ লক্ষ টাকা খরচ করিয়াছেন কিন্তু এই আলোচ্য বর্ষে যুক্তপ্রদেশ বাংলার দ্বিগুণ অপেক্ষা অধিক টাকা অর্থাৎ ১৭৸৹ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। ১৯২৫-২৬ সনে এই প্রদেশে ২০ লক্ষ টাকা খরচ করা হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে এই প্রদেশের কৃষি-বিভাগ যেরূপ বৃহৎভাবে কার্য্যের বিস্তার সাধন করিয়াছে তাহাতে বোধ হয় ২৫৷৹ লক্ষ টাকার কমে এ বৎসর কার্য্য সমাধা হইবে না।

এই প্রদেশটী ছয়টী কৃষিকেন্দ্রে বিভক্ত হইয়াছে :—

(১) প্রতাপগড়—পূর্ব্ব বিভাগ।

(২) গোরক্ষপুর—উত্তরপূর্ব্ব বিভাগ।

(৩) কানপুর—মধ্য বিভাগ।

(৪) সাজাহানপুর—রোহিলখণ্ড বিভাগ।

(৫) আলিগড়—পশ্চিম বিভাগ।

(৬) ঝান্সি—বুন্দেলখণ্ড বিভাগ।

কৃষিবিভাগের অধীনে নিম্নলিখিত উপ-বিভাগসকল পরিচালিত হইতেছে :—

(১) প্রত্যেক বিভাগের প্রধান সহরে একটি পরীক্ষাগার স্থাপিত রহিয়াছে।

(২) মোজাফরপুর, আগ্রা, মথুরা, বেরিলি, নয়নিতাল, বান্দা, মাইনপুরী, হরদই, বেনারস ও লক্ষ্ণৌ এইসকল জেলায় কৃষি-প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে।

(৩) বুলান্দসর, হামিরপুর, বালিয়া, রায়বেরিলি ও বারইচ প্রভৃতি কয়েকটী জেলায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষি-প্রদর্শনীর জন্য জমি রহিয়াছে। তাহাতে চাষের নূতন নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া সাধারণের উৎসাহবর্দ্ধন করা হইয়া থাকে।

(৪) সীড-ফার্ম্ম অর্থাৎ নানাবিধ উত্তম বীজ প্রস্তুত করিবার স্থান। আলিগড়, সুলতানপুর, ও ফয়জাবাদ প্রভৃতি প্রত্যেক জেলায় এক একটী সীড্-ফার্ম্ম রহিয়াছে।

(৫) কানপুর ও আলিগড় কলেজ-ই কৃষি-বিষয়ের প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র।

(৬) অনুসন্ধান-কেন্দ্র। দুইটি অনুসন্ধান কেন্দ্রের মধ্যে একটী মথুরাতে অবস্থিত। ইহাতে কেবলমাত্র তুলা সম্বন্ধীয় গবেষণাই হইয়া থাকে। দ্বিতীয়টী কানপুরে অবস্থিত। ইহাতে অন্যান্য সকল প্রকার কৃষি বিষয়ের গবেষণাই হইয়া থাকে।

(৭) উত্তম গাভী উৎপাদন ফার্ম্ম। এই ফার্ম্মে উত্তম গাভী প্রস্তুত করিবার জন্য যথোচিত চেষ্টা করা হইয়া থাকে। এইরূপ "মাধুরী কুণ্ড" নামে মথুরায় ও "মাঞ্জরা ফার্ম্ম বেরিলি জেলায় অবস্থিত।

এই প্রদেশের কৃষি-বিভাগ প্রতি বৎসর তাহাদের কার্য্য-পদ্ধতির বিশেষ বিবরণ সাধারণ্যে প্রকাশিত করিয়া থাকেন। এই সকল বিবরণী হইতে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হওয়া যায়। প্রত্যেক বিভিন্ন কেন্দ্র হইতেও এইরূপ রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়া থাকে। প্রতাপগড় হইতে প্রতিমাসে দুইখানা মাসিক পত্র হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষায় প্রকাশিত ও গ্রামবাসীদিগের মধ্যে বিতরিত হইয়া থাকে। যাহারা ইংরেজী জানে না এই দুইখানা কাগজ তাহাদের বিশেষ উপকারে লাগে। প্রত্যেক মাসে এক হাজার সংখ্যারও অধিক কাগজ সাধারণ্যে বিতরণ করা হইয়া থাকে। যদিও গভর্ণমেন্টের এইসকল ফার্ম্ম এখনও লাভজনক হইয়া দাঁড়াইতে

পারে নাই, তথাপি ইহা নিশ্চিত যে, শীঘ্রই এই সকল ফার্ম্ম যথেষ্ট লাভজনক হইবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদর্শনীসকল ইতিমধ্যেই বহু সাধারণ কোম্পানীকে তাহাদের এই ব্যবসায় আরম্ভ করিবার জন্য উৎসাহ দান করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ করাইয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ সাধারণ কোম্পানীর সংখ্যা প্রায় পাঁচ শতাধিক হইবে সন্দেহ নাই।

যুক্তপ্রদেশের অর্দ্ধেকের অধিক জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে এবং ফসলও অতি উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। সাজাহানপুরে যে উৎকৃষ্ট চিনি প্রস্তুত হয় কৃষি-বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ ক্লার্ক তাহার নামকরণ করিয়াছেন, সাজাহানপুর ৪৮। বেহার ও উড়িষ্যায় যেমন কোইম্বাটোর ২১৩ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যুক্তপ্রদেশেও সেইরূপ সাজাহানপুর ৪৮ বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে। পুষা কৃষি-বিদ্যালয়ের চেষ্টায় গমের চাষ অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। ইহার জন্য পুষার কৃষি-বিদ্যালয়ই সুনাম পাওয়ার উপযুক্ত। মান্দ্রাজ কৃষিবিভাগ কোইম্বাটোর ইক্ষু চাষের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া থাকেন। বাংলার ইন্দ্রশাইল ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট ধান ও পাটের চাষ বিশেষ প্রসিদ্ধ।

উৎকৃষ্ট বীজ সরবরাহ করিবার ফলে এই প্রদেশের উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ আশানুরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু ইহাতে কৃষি-বিভাগের বার্ষিক খরচের পরিমাণ চার পাঁচগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। একমাত্র সাজাহানপুর ৪৮এর বার্ষিক উৎপন্ন ফসলের প্রতি লক্ষ্য করিলে ইহার সত্যতা নির্দ্ধারিত হইবে। পূর্ব্বে এই প্রদেশে উৎকৃষ্ট ইক্ষুর চাষ প্রতি বিঘায় ১১৫ মণ হইত; কিন্তু বর্ত্তমানে এই সাজাহানপুর ৪৮ প্রতি বিঘায় ৩০০ মণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। জাভার উৎকৃষ্ট উৎপন্ন শস্যের সহিত এই সাজাহানপুর ৪৮ অনায়াসে তুলিত হইতে পারে। জাভায় প্রতি বিঘায় ৩৫৮ মণ ইক্ষু উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখানকার ইক্ষুর চাষ সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

একটী বিস্তীর্ণ প্রদেশের সকল জমিতে এক প্রকার শস্য উৎকৃষ্টরূপে উৎপন্ন হওয়া সম্ভবপর নয়। কারণ সকল জমি ঠিক একরূপ গুণবিশিষ্ট হয় না। যুক্তপ্রদেশে মোটের উপর তিন প্রকার ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে। এক প্রকার ইক্ষুর ফসল সকল জমিতে সমানভাবে উৎপন্ন হয় না। সাজাহানপুর ৪৮ একমাত্র অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ডের বিস্তীর্ণ জমিতেই উৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে। জমিপ্রস্তুতকরণ-প্রণালী সর্ব্বদা বিশেষ যত্নের সহিত লক্ষ্য করিয়া শস্য রোপণ করা সঙ্গত। কোইম্বাটোর বীজের চাষ বিস্তীর্ণ কোনো বিশেষ নিরূপিত জমিতেই উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে। এই প্রদেশের বহুস্থানে কোইম্বাটোর ২১৩ নং অতি উৎকৃষ্টরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সামান্য ঝড়ঝাপটায় ইহার বিশেষ-কিছু ক্ষতি হয় না। সম্পূর্ণরূপে বৃদ্ধির জন্য একটি বিশেষ সময় প্রয়োজন হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু ইহা অন্যান্য ইক্ষু অপেক্ষা অতিরিক্ত পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভারতের চিনি প্রাচীন কালে যেরূপ উন্নত ও প্রসিদ্ধ ছিল বর্ত্তমানে ততোঽধিক অধঃপতিত হইয়াছে। আবার যদি সেইরূপ ইক্ষুর চাষ প্রচুর পরিমাণে ও উৎকৃষ্টতর পদ্ধতিতে প্রবর্ত্তিত হয় তাহা হইলে যদি এই শিল্পের কিঞ্চিৎ উন্নতি হয়। আজকাল ভারতে প্রচুর পরিমাণে জাভা প্রদেশের চিনির আমদানি হইয়া থাকে। ইক্ষুর চাষে জমিতে প্রচুর পরিমাণে সার দেওয়া ও বিশেষ নিপুনতার সহিত জমি প্রস্তুত করা প্রয়োজনীয়। তাহা না হইলে উত্তম ফসল উৎপন্ন হইবে না।

অন্যান্য দেশের ইক্ষু-চাষের প্রতি লক্ষ্য করা বিশেষভাবে কর্ত্তব্য এবং যদি উৎকৃষ্ট পদ্ধতি অবলম্বিত হয়, তাহার অনুকরণ করাও বিধেয়। আমেরিকার অন্তর্গত হাওয়াই দ্বীপে প্রচুর পরিমাণে ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে এবং উৎপন্ন শস্যের পরিমাণও সকল প্রদেশ অপেক্ষা অধিক। এখানকার চাষের রীতিনীতিও বিশেষ উন্নত প্রণালীর; তাই আশানুরূপ ফল-লাভও হইয়া থাকে। উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ-বৃদ্ধির জন্য এখানে প্রচুর রাসায়নিক সার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ এখানে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন ও নাইট্রেট অব্ সোডা ব্যবহার করা হইয়া থাকে। প্রতি বিঘা জমিতে প্রায় ৯ মণ নাইট্রেট অব্ সোডা ব্যবহৃত হইতে দেখা গিয়াছে। তাহাতে অতি উত্তম শস্য উৎপন্ন হইয়াছে। সচরাচর ২॥০ হইতে ৩॥০ মণ পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতিরিক্ত সার-ব্যবহারে শস্য উত্তমই হইয়া

থাকে। ভারতীয় শর্করা-কমিটীর রিপোর্টে দেখা যায়, ভারতীয় শর্করা প্রতি বিঘায় কিউবা দেশের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ অপেক্ষাও অল্প, জাভার তুলনায় এক-সপ্তমাংশ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এই প্রদেশের পল্লীগ্রামের ক্ষুদ্রক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডসকল জলাভাববশতঃ একরূপ পতিত অবস্থায় ছিল। এখানকার কৃষি-বিভাগ সেইসকল স্থানে টিউবওয়েল বা নলকূপ প্রস্তুত করাইয়া প্রদর্শনীর ন্যায় ছোট ছোট শস্যক্ষেত্র প্রস্তুত করাইয়া কৃষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এইরূপে গোরক্ষপুরে অতি সুন্দর সুফল পাওয়া গিয়াছে। সেই পতিত জমিসকল এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় অনুর্ব্বর অবস্থায় পড়িয়া নাই। তাহাতে এখন প্রচুর ইক্ষুর চাষ হইতেছে। এই সকল টিউবওয়েল হইতে প্রচুর জল উঠিয়া থাকে; কারণ সেখানকার ভূ-গর্ভস্থ প্রস্রবণের জলের উচ্চতা জমি হইতে ১২-১৫ ফুটের মধ্যে। এই সকল স্থানে বহু চিনির কারখানা রহিয়াছে। তাহারা উত্তম ইক্ষু পাইবার জন্য সতত উদগ্রীব হইয়া রহিয়াছে। এই প্রদেশের সীতাপুর জেলায় ইতিপূর্ব্বে পাটের চাষ করিয়া বিশেষ সুফল পাওয়া গিয়াছে। গত ১৯২৪-২৫ সনে দুই হাজার বিঘার অধিক জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল। এই প্রদেশে উত্তম পাট উৎপাদনের সহিত কানপুরের পাটকলের মালিকগণের স্বার্থ বিজড়িত রহিয়াছে। তাই তাহারা ইহাতে বিশেষ মনোযোগ দিতেছেন। এখানে গবাদি পশুর খাদ্যশস্যের অতিরিক্ত মাত্রায় চাষ হওয়ার দরুণ অবশেষে জমির অপ্রাচুর্য্য হইয়া পড়ে। এইসকল পশুখাদ্যের অপেক্ষাকৃত অল্প চাষ করা কর্ত্তব্য। এখানে গমের চাষ অতিশয় প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ইক্ষু অপেক্ষা গমের চাষ অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। গম প্রতি বিঘায় ৯।১০ মণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু পুষার উন্নত প্রণালীতে ইহা অপেক্ষাও অধিক শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে।

যদিও যুক্ত প্রদেশের কৃষি-বিভাগ বিশেষ যত্ন সহকারে দেশের বহু মঙ্গল সাধন করিতেছে, তথাপি এখনও দেশের সর্ব্বসাধারণ রক্ষণশীল অধিবাসীদের এবিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করিতে বহুদিন লাগিবে। এই বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি বলিয়াছেন, "আমরা এখনও শতকরা একজন গ্রাম্য গৃহস্থের মনও আকৃষ্ট করিতে পারি নাই। আমরা শুধু জমির উপর দাগ কাটিতেছি মাত্র।" (সঞ্জীবনী)

চীনে ভারতে বাণিজ্যিক লেনদেন

শ্রীদুর্গাচরণ সিংহ

বর্ত্তমানে চীনের অশান্তির ফলে ভারতবর্ষের বাণিজ্যের কতদূর সুবিধা অথবা হানি হইতে পারে তাহার আলোচনা করিবার পূর্ব্বে ভাবতবর্ষের সহিত চীনের বাণিজ্যিক সম্বন্ধ কিরূপ তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক। চীনও ভারতবর্ষের ন্যায় কৃষিপ্রধান দেশ। ইহার কয়েকটী বিশিষ্ট বন্দর যথা—শাংহাই, টিয়েণ্টসিন, হাংকাও, ক্যাণ্টন, নিউ চ্যাং, স্তাটাও, চি-ফু, চ্যাং কিং, অ্যাময় এবং ফু-চাউ ভিন্ন চীনের আর কোথাও শিল্প কিংবা বাণিজ্যের ততদূর প্রসারলাভ হয় নাই। এই বন্দরগুলা সন্ধিসূত্রে বিদেশীদের নিকট "খোলা" হইয়াছে।

ভারতের মোট রপ্তানির মাত্র শতকরা ১·২অংশ চীনে যায় এবং চীন হইতে ভারতের মোট আমদানির মাত্র শতকরা ৪ ভাগ আইসে।

ভারতবর্ষ হইতে চীনে যে যে পণ্যদব্য রপ্তানি হয়,

তাহাদের মধ্যে তুলা ও চাউলই প্রধান। এই দুই সামগ্রীর চাহিদা চীনে পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়া উঠিয়াছে। ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ভারত হইতে চীনে তুলা এবং তুলার সুতা উভয়ই রপ্তানি হইত। কিন্তু গত দশ বৎসরের মধ্যে চীনের শাংহাই প্রভৃতি দুই চারিটী "খোলা" বন্দরে কতকগুলি বস্ত্র-শিল্পের প্রতিষ্ঠান হওয়ায় চীন এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় তুলার সুতা বড় একটা ভারত হইতে আমদানি করে না। তাহারা নিজেরাই তুলা হইতে সুতা প্রস্তুত করিতেছে। তবে তুলা ভারতবর্ষ হইতে আমদানি করে। জাপান, ভারতের তুলার প্রধান খরিদ্দার এবং তাহার পরেই চীন। ভারত হইতে যে পরিমাণ তুলা মোট রপ্তানি হয় তাহার প্রায় অষ্টমাংশ চীন গ্রহণ করে। নিম্নলিখিত বাণিজ্যসংবাদ হইতে কোন্ বৎসর কি পরিমাণ ভারতীয় তুলা চীনে রপ্তানি হইয়াছিল বুঝা যাইবে।

বৎসর	হন্দর
১৯১৩-১৪	৮৪৭০৭
১৯১৯-২০	২৭৫৯৮০
১৯২০-২১	৬৩৫৩৬০
১৯২১-২২	১৫২৮৩৪০
১৯২২-২৩	১৭৬৫৯০০
১৯২৪-২৫	১১৯৪০০০
১৯২৫-২৬	১৯২২০০০

এখন যদি চীনে যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হয় তাহা হইলে চীনের বস্ত্রশিল্পের যথেষ্ট হানি হইবার সম্ভাবনা। কারণ অধিকাংশ বস্ত্র-শিল্পই ট্রিটিপোর্টগুলিতে প্রতিষ্ঠিত আর অশান্তি ট্রিটিপোর্ট লইয়াই আরম্ভ হইয়াছে। তবে চীনে অশান্তিপ্রযুক্ত বস্ত্রশিল্পের দুরবস্থা হইলেই তাহার প্রতিবেশী জাপান এই সুযোগে নিজ বস্ত্রশিল্পের উন্নতির জন্য আরও উঠিয়া পড়িয়া লাগিবে আশা করা যায়। সুতরাং চীনে অশান্তিপ্রযুক্ত বস্ত্রশিল্প বন্ধ অথবা দুরবস্থাপ্রাপ্ত হইলেও, ভারত হইতে চীনের যেটুকু তুলার রপ্তানি কমিয়া যাইবার আশঙ্কা, জাপান তখন সেই রপ্তানিটুকুর অধিকাংশ গ্রহণ করিবে আশা করা যায়। অতএব তুলার রপ্তানি কম হইবার আশঙ্কা বিশেষ কিছু নাই।

তারপর চাউলের কথা ধরা যাউক। ইং ১৯২৪-২৫ এবং ইং ১৯২৫-২৬ সনে ভারত হইতে চীনে চাউল রপ্তানি হইয়াছিল যথাক্রমে ৪৭৭০০ ও ১৪৯৭০০ টন। সুতরাং পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ১৯২৫-২৬ সনে চীনে ভারত হইতে চাউলের রপ্তানি প্রায় ৩ গুণ বাড়িয়া গিয়াছে দেখা যায়। যদি চীনে প্রকৃত বিদ্রোহ উপস্থিত হয় তাহা হইলে, ব্যবসা ও বাণিজ্যের ব্যাঘাত বশতঃ চীনে চাউলের রপ্তানি কমিয়া যাইতে পারে। তবে সৈন্য-সামন্তগণের রসদের জন্য চাউলের রপ্তানি না কমিয়া বরং বাড়িয়া যাইবে আশা করা যায়। আর একটা কথা এই যে, মোট চাউলের রপ্তানির পরিমাণে ইহার পরিমাণ খুবই কম এবং খরিদ্দারেরও অভাব নাই।

গভর্ণমেণ্ট একাউণ্টে হংকংএ ভারত হইতে আফিম প্রেরিত হয়। চীন যদি আফিমের মহিমা বুঝিয়া থাকে তাহা হইলে আফিমের রপ্তানি কমিয়া যাইবে আশা করা যায়।

চীনে রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন আছে, সেই জন্য চীন জগতের অপরাপর দেশ হইতে প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণে রৌপ্য ক্রয় করে। বিশেষতঃ রাজ্যে কোন-কিছু অশান্তি উপস্থিত হইলেই, চীনের লোকেরা সর্ব্বাগ্রে যাহার যেমন অবস্থা রৌপ্য সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করে। সুতরাং দেশে রৌপ্যের মূল্য বাড়িয়া যায়। তখন জগতের অপরাপর দেশ হইতে চীনে রৌপ্য রপ্তানি হইতে আরম্ভ হয়। ফলে সেইসকল দেশেও রৌপ্যের মূল্য বাড়িয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত যুদ্ধ আরম্ভ হইলে চীনের সহিত বাণিজ্য বন্ধ হইয়া যাইবে, ফলে জগতের রৌপ্যের এত বড় খরিদ্দার আর রৌপ্য কিনিবে না। তাহাতে সর্ব্বত্রই রৌপ্যের দর কমিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। সুতরাং ভারতের বাজারে উপস্থিত রৌপ্যের মূল্য কিছু বৃদ্ধি হইলেও যুদ্ধ আরম্ভ হইলে দর কমিয়া যাইবে আশা করা যায়।

ভারতে যে পরিমাণে রেশম এবং রেশমের বস্ত্র রপ্তানি হয় তাহার শতকরা ৩৬ ভাগ আন্দাজ পাঠায় চীন। অবশিষ্ট ৬৪ ভাগের অধিকাংশ জাপান এবং ফ্রান্স পাঠায়। যদি চীনে অশান্তিপ্রযুক্ত চীন ভারতে শিল্প পাঠাইতে অপারগ হয়, তাহা হইলে জাপান ও ফ্রান্স এই সুযোগে ভারতের

বাজার একচেটিয়া করিতে সমর্থ হইবে আশা করা যায়। শিল্ক বিলাসিতার সামগ্রী। ভারতে বিলাসিতার সামগ্রী যত প্রবেশ না করে ততই ভাল।

তারপর চীনের একটা প্রধান রপ্তানি সামগ্রী হইতেছে চা। জগতের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চা উৎপন্ন হয় চীনে। তারপর ভারতে ও সিংহল দ্বীপে। চীনে যুদ্ধ-বিদ্রোহ হইলে চীন হইতে চাএর রপ্তানি কমিয়া যাইবে এবং এই সুযোগে ভারতীয় ও সিংহল দ্বীপের চাএর কাট্‌তি বেশী হইবে এবং মূল্যও বাড়িয়া যাইবে সুতরাং ইহাতে ভারতের লাভ ব্যতীত লোকসান নাই।

চীনের সহিত ভারতের বাণিজ্য উক্ত কয়েক প্রধান পণ্যদ্রব্য লইয়া। ইহা ছাড়া আর যদি কিছু পণ্যদ্রব্য লইয়া সম্বন্ধ থাকে তাহা মোট বাণিজ্যের তুলনায় নগণ্য। সুতরাং তাহাদের আমদানির অথবা রপ্তানির অল্পাধিক্যে ভারতের বাণিজ্যের বিশেষ-কিছু এদিক্ ওদিক্ হইবার সম্ভাবনা নাই। (আত্মশক্তি)

বিশ্বশান্তির আর্থিক ভিত্

আন্তর্জ্জাতিক শান্তি-প্রতিষ্ঠার জন্য "কার্ণেগি এনডাউমেন্টের" উদ্যোগে প্রকাশিত পুস্তিকা। মাসিক। ৫ সেন্ট। নিউইয়র্ক শহর।

দাতাকর্ণ কার্ণেগির অর্থে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠান এক বিরাট বস্তু। এর ট্রাষ্টিদের নাম :—

১৯২৬ সনে

রবার্ট এস্ ব্রূকিংস্	আলফ্রেড হলম্যান
নিকোলাস মারে বাটলার	উইলিয়াম্ এম্ হাউয়ার্ড
জন্ ডব্লিউ ডেভিস	রবার্ট ল্যানসিঙ
ফ্রেডারিক এ ডেলানো	ফ্র্যাঙ্ক ও লাওডেন
অষ্টেন জি ফক্স	এণ্ড্রু জে মণ্টেগু
রবার্ট এ ফ্র্যাঙ্কস্	ডুইট্ ডব্লিউ মরো
চার্লস্ এস্ হ্যামলিন	রবার্ট ই ওল্ডস্
ডেভিড্ পেইন্ হিল	লিরয় পার্সি

১৯২৭ সনে এই কয়েকটি নূতন নাম পাই—

লটন বি ইভান্স্	হেনরী এস্ প্রিচেট্
হাউয়ার্ড হিন্জ	এলিহু রুট্
এড্উইন্ বি পার্কার	জেম্স্ ব্রাউন স্কট
উইলিয়াম এ পিটার্স্	জেম্স্ আর শেফিল্ড
মরিস্ এস্ শেরমান্	জেম্স্ টি শট্‌ওয়েল
সাইলাস এ ষ্ট্রন	ওস্কার এস্ ষ্ট্রোস্

১৯২৬-২৭ সনের কর্ম্মচারিগণ :—

সভাপতি—নিকোলাস্ মারে বাট্‌লার

সহকারী সভাপতি—রবার্ট ল্যানসিঙ

সম্পাদক—জেম্‌স ব্রাউন স্কট

সহকারী সম্পাদক—জর্জ্জ এ ফিনচ

কোষাধ্যক্ষ—এণ্ড্রু জে মণ্টেগু

সহকারী কোষাধ্যক্ষ—ফ্রেডারিক এ ডেলানো

কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি (১৯২৬-২৭)

নিকোলাস মারে বাটলার—চেয়ারম্যান

জেম্স্ ব্রাউন স্কট্—সম্পাদক

অষ্টেন ডি ফক্স

এণ্ড্রু জে মণ্টেগু

হেনরি এস্ প্রিচেট্

এলিহু রুট

জেম্‌স আর শেফিল্ড

এই নামগুলি মনে রাখিলে কাজে লাগিতে পারে। কারণ কেহ কেহ ইউনাইটেড ষ্টেটসের রাজনৈতিক গগনের জ্যোতিষ্কস্বরূপ। অন্য কেহ বা শিক্ষায় কেহ বা ব্যবসা-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

এইত গেল ব্যক্তির কথা। এই এনডাউমেন্টখানি তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে :—

(১) লেনদেন ও শিক্ষা বিভাগ,
পরিচালক—নিকোলাস মারে বাট্‌লার

(২) আন্তর্জ্জাতিক আইন বিভাগ,
পরিচালক—জেম্‌স ব্রাউনস্কট

(৩) অর্থশাস্ত্র ও ইতিহাস বিভাগ,
পরিচালক-জেম্‌স টি শট্‌ওয়েল

বলা বাহুল্য এক এক বিভাগে কার্য্য পরিচালনার জন্য পরিচালক ভিন্ন আরও অনেক ব্যক্তি মোতায়েন রহিয়াছে। পরিচালকের সহকারী, বিভাগীয় সহকারী, আমেরিকা বিভাগের পরিচালক ত আছেই। তা ছাড়া আছে, ইংলাণ্ড ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, জাপান, ইতালী ইত্যাদি স্থানের বিশেষ সংবাদ-দাতাগণ, মধ্য ইয়োরোপের জন্য এক শাসন-পরিষৎ (১০।১২ জন লোক বিভিন্ন দেশ হইতে লইয়া) এবং ৩।৪ জন কর্ম্মচারী।

প্রতিমাসে একখানি করিয়া পুস্তিকা বাহির হয়। শুধু জুলাই ও আগষ্ট আজকাল বাদ যাইতেছে। এই পুস্তক প্রকাশের উদ্দেশ্য এই শান্তি আন্দোলনের কথা যাতে সকলে জানিতে পারে ও সর্ব্বপ্রকারে ইহার সাহায্য করে তার চেষ্টা করা। বিভিন্ন ব্যক্তি, খবরের কাগজ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ অত্যন্ত সহজে হাতের কাছে এ বিষয়ে সকল প্রকার কাগজপত্র যাতে পায় তার উপায় করা।

এক একটা পুস্তিকাতে একের অধিক বিষয়ও কখনো কখনো আলোচিত হয়। পত্রসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট নাই। ১০০।১৫০ও হইতে পারে। আবার ১২।১৪ পাতাতেও শেষ হইতে পারে।

১৯২৭, জানুয়ারী সংখ্যার নাম—

র মেটিরিয়েল্‌স্‌ অ্যাণ্ড দেয়ার এফেক্ট আপন ইন্টার-ন্যাশনাল রিলেশনস্‌।

আন্তর্জ্জাতিক সম্পর্কগুলির উপর কাঁচা মালের প্রভাব। সংখ্যার নম্বর দেখিতেছি ২২৬। অর্থাৎ লেনদেন ও শিক্ষা বিভাগ হইতে এর পূর্ব্বে ২২৫ খানা পুস্তিকা বাহির হইয়াছে। পত্র-সংখ্যা ৬৪।

এই পুস্তিকাগুলি প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয় ১৯০৭ সনের এপ্রিল মাস হইতে। বহুবিধ জটিল বিষয়ে নানা দেশের বিখ্যাত বিখ্যাত মতামতসমূহ ও অনেক দরকারী দলিল দস্তাবেজ এইগুলিতে ঠাঁই পাইয়াছে।

জানুয়ারীতে ৫ জন লেখকের ৬ টা প্রবন্ধ ঠাঁই পাইয়াছে। (১) স্বদেশে যাহাতে কাঁচা মাল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয় তদ্বিষয়ক তত্ত্ব ও সাধনা (জর্জ্জ ওটিস্‌ স্মিথ) (২) অর্থনীতির দিক্‌ হইতে কাঁচা মাল, দর ও জীবন-যাত্রার ধারা পরস্পরের সম্বন্ধ, তাদের আন্তর্জ্জাতিক প্রভাব (এল, এল, সামারস্‌) (৩) কাঁচামালের অবাধ আন্তর্জ্জাতিক লেনদেনে সরকার বাধা দিলে কি কি অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক ফলাফল হয় (ডাক্তার ই, দানা ডুরান্ত) (৪) কাঁচামাল ও সাম্রাজ্যবাদ (পার্কার টি, মুন) (৫) কাঁচামালের আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক শাসন (এডওয়ার্ড মিড্‌ আর্ল) (৬) যুদ্ধ ও শান্তির সময় কাঁচামালের রাষ্ট্রীয় শাসন (এল, এল, পামার্স)

প্রতি সংখ্যায় নিকোলাস্‌ মারে বাট্‌লার একটি করিয়া ছোট ভূমিকা লিখিয়া দিতেছেন। এটাতেও লিখিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

"১৯২৬ সনের মে মাসে আন্তর্জ্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কার্ণেগি এন্‌ডাউমেন্টের উদ্যোগে ও রাষ্ট্র-বিজ্ঞান-পরিষদের সহযোগিতায় নিউ ইয়র্কের ব্রিয়ার ক্লিফ নামক স্থানে আন্তর্জ্জাতিক সমস্যা ও সম্বন্ধের বিচারার্থ এক বৈঠক বসে। সেখানে অনেক বিশেষজ্ঞ, কোনো কোনো বিদেশের প্রতিনিধি এবং কতকগুলি আমেরিকান্‌ কাগজপত্রের সম্পাদক ইত্যাদি উপস্থিত ছিলেন।

"১৯২৬ সনের ১৯শে অক্টোবর ১৬ টা রাষ্ট্রের ব্যাঙ্কার ও ব্যবসায়ীরা এক ঘোষণাপত্র জারি করেন। ইয়োরোপে টারিফ্‌ দেয়াল নামাইয়া দেওয়া হউক্‌—এই তাঁদের আরজি। এই ঘোষণাপত্র লইয়া অনেক আলোচনা আন্দোলন চলিতেছে। ব্রিয়ার ক্লিফের এই কয়টা বক্তৃতা সেই সমস্যাটাকে বুঝিতে সাহায্য করিবে।

"ভার্সাই সন্ধিতে কতকগুলি প্রধান ব্যবসায়ের সহিত সম্পর্কিত কাঁচা মালের শাসনের প্রস্তাব আছে। ব্যাপারটা পরিষ্কাররূপে বুঝিতে না পারায় অনেক গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে। বস্তুতঃ, বাণিজ্যের দিক্‌ হইতে উপনিবেশের

চেয়ে "ম্যাণ্ডেট" বেশী সুবিধাজনক। কারণ ম্যাণ্ডেটে যে খুসী গিয়া বানিজ্য করিতে পারে। কাঁচা মালের কথা ধরিলে, ভার্সাই সন্ধিতে যুক্তরাষ্ট্র বরং লাভবান হইতেছে, ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই।

"অন্যপক্ষে ম্যাণ্ডেটের প্রভুরা তাদের নব-রাজ্যে যে পরিমাণ টাকা ঢালিয়া দিয়াছে, লাভের ঘর তদনুপাতে সামান্য মাত্র।"

জর্জ ওটিস্ স্মিথ হইতেছেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিক্যাল সার্ভে ডিরেক্টার। তাঁর বক্তৃতাটা রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিষদের পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছিল। যুদ্ধের সময় "ব্লকেড্" জিনিষটা এক একটা রাষ্ট্রকে কিরূপ কাবু করিয়াছিল, কেহই ভুলিয়া যায় নাই। ভবিষ্যতে সংগ্রাম-পরায়ণ জাতিগুলি যে এই ব্লকেডকে বেশী করিয়া অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিবে তাহা নিঃসন্দেহ। সেই জন্য ইয়োরা-মেরিকায় একটা চিন্তার ধারা বহিতেছে, "জাতির পক্ষে দরকারী সমগ্র কাঁচা মালই কি দেশের মধ্যে উৎপন্ন করা যায় না? কি করিলে করা যায়? করা কিন্তু আশু প্রয়োজনীয়। তা হইলে যুদ্ধের সময় আর ভাতে মরিতে হয় না।"

স্মিথ বলিতেছেন, জলবাতাস, জমি, অরণ্য জল-শক্তি, এবং খনিজ দ্রব্যে উত্তর আমেরিকা এরূপ পরিপূর্ণ যে ইহাকে অনায়াসে মহাদেশের সহিত তুলনা করিতে পারি। সেই জন্য আমেরিকাবাসীরা নিশ্চিন্ত হইয়া ভাবিতেছে, "আমাদের যা দরকার সব ঘরে বসিয়া পাওয়া যায়। অন্যত্র যাইতে হয় না।" সরকার যদি এ বিষয়ে কোনো প্রচেষ্টায় হাত দিতে যায় অমনি সকলে লাঠালাঠি করিতে উঠে।

এ ধারণা যে ভুল তার প্রথম প্রমাণ এই যে বর্ত্তমানে জগতের সকল দেশের বাণিজ্য আন্তর্জ্জাতিক। অর্থাৎ "প্রত্যেক দেশেরই কোনো না কোনো দ্রব্যের অভাব আছে। আর তাকে তা পরদেশের নিকট কিনিতে হয়।" যুক্তরাষ্ট্রও বহু পরিমাণে বাহিরে কিনে। তবে কেমন করিয়া বলা যায় যুক্তরাষ্ট্র আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত?

স্মিথ এই সম্পর্কে খনিজ দ্রব্যের আলোচনা করিয়াছেন দুই কারণে—(১) সরকারী কাজে এই সব লইয়া নাড়াচাড়া করেন (২) খনিজ দ্রব্য একবার ফুরাইয়া গেলে আর তৈয়ারীও করা যায় না, ভর্ত্তিও করা যায় না। যোগান নিঃশেষ হইয়া যায়।

"সুতরাং খনিজ কাঁচা মালে বিশেষ করিয়া প্রত্যেক দেশের আর্থিক স্বাধীনতা নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

"তত্ত্ব ও বাস্তব উভয় দিক্ হইতেই সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচুর্য্যের মাপকাঠি বদলাইতে থাকে। সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানব-জীবন ও তার অভাব-অভিযোগ জটিলতর ও বিস্তৃততর হইতে থাকে। আজিকার দিনে একদিনের জন্যও যদি মাল-চলাচল বন্ধ হইয়া যায়, তবে আমাদিগকে অত্যাবশ্যক জিনিষ হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। অথচ আমাদের ঔপনিবেশিক পূর্ব্ব-পুরুষগণ নিজেদের উৎপাদনই যথেষ্ট মনে করিত। তাদের বাইরের আমদানির উপর নির্ভর করিতে হইত না।

"মজুত যোগান বা ভবিষ্যৎ টানের একটা ধরাবাঁধা হিসাব দেওয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ধর পেট্রো-লিয়াম্। গত ২০ বছরে যোগান উঠানামা করিয়াছে ৭৫%। কিন্তু ঠিক ঐ সময়ে টান বাড়িয়াছে ৬ গুণ।

"বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ মজুতের মোসাবিদা খাড়া করিবার সময় যোগান-স্থান হইতে টানস্থানের দূরত্ব এবং ভৌগোলিক অবস্থানের কথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। খনি ও বাজারের পরস্পরের ব্যবধান হয়ত হাজার হাজার মাইল। মাল-চলাচলের খরচের কথা একটা বড় ব্যাপার।

"নিজ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পরস্পর যে বাণিজ্যিক কারবার হয় তা অনেকটা ইয়োরোপ মহাদেশের আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের মত। মিন্নে মোটা লোহাকে পেন্‌সেলভেনিয়ার চুল্লীতে লইয়া যাওয়া যা, সুইডেনের লোহাকে জার্ম্মাণ রুরে লইয়া যাওয়াও তাই। জলে ও স্থলে প্রায় হাজার মাইল। যুক্তরাষ্ট্রের একটা বিশেষত্ব এই যে, এই সব লোহা, কয়লা, ধাতুদ্রব্য দূর-দূরান্তরে চলাচল করিবার বেলা এক রাষ্ট্র কোনো প্রকারে অন্য রাষ্ট্রের বাণিজ্যকে বাধা দিতে পারিবে না।

"দেশের খনিজ কাঁচা মাল কতখানি মজুত আছে তা মাপা হয় টনে। কিন্তু দরটা ডলারে। আর এই ডলারের

দাম সর্ব্বদাই উঠানামা করিতেছে। সুতরাং অনেক ভুলচুক্ ধরা পড়ে না।

"মজুতের আসল অবস্থা জানিতে হইলে ব্যবহার বা খরচের হার জানিতে হইবে। এই হার দরের উপর কার্য্য করে। নূতন আবিষ্কারে ইহা বাড়ে। আর কোনো প্রতিনিধি পাওয়া গেলে ইহা নামে।

"জাতির খনিজ সম্পদ্ কতখানি? এই প্রশ্নের উত্তরে মনে রাখিতে হইবে যে, খনিজ পদার্থ দুই রকমের। (১) কতকগুলি ব্যবহার কালেই নাশ পায়। যেমন, জ্বালানি দ্রব্য। (২) কতকগুলি ভবিষ্যতের পুঁজিপাটারূপে জমিতে থাকে। যেমন, লোহা ও তামা।

"এক সঙ্গে অনেক বছরের হিসাব না করিয়া বলা যায় না যোগান পর্য্যাপ্ত রহিয়াছে কি না। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের দিক্ হইতে যত না কেন মোটামুটি কাঁচা খনিজ মালের হিসাব করা যাক্, পুনঃ পুনঃ সংশোধনের দরকার হইবে।

"এই মোটামুটি হিসাবে আছে প্রাকৃতিক শক্তি ও ব্যবসায়ের কাঁচা মাল। যুক্তরাষ্ট্র এ বিষয়ে অদ্বিতীয়। এখানকার লোকেরা সব চেয়ে বেশী প্রাকৃতিক শক্তি কাজে খাটায়। আর ভবিষ্যতের জন্য খুব বেশী প্রাকৃতিক শক্তিও মজুত রহিয়াছে। ফলে, কাঁচা মালের জন্য টান ও ধাতুদ্রব্যের যোগান (খনির কার্য্যের উন্নতি হওয়াতে) উভয়ই বাড়িতেছে। সুতরাং মনে হয় যেন জলশক্তি, কয়লার মজুত, তেল ও গ্যাসের যোগান অনন্ত। আমেরিকাবাসীর ভয় কি?

"কিন্তু এই অত্যধিক আশা ও উৎসাহের বিপদ আছে। প্রথমতঃ যুক্তরাষ্ট্র অন্য দেশের বাজার সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারে না। তাকে উৎপন্ন দ্রব্য বিভিন্ন বাজারে বেচিতে হইবে। সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত অবাধ বাণিজ্য নীতি তার পক্ষে বেশী লাভজনক। কারণ যুক্তরাষ্ট্র অন্যের বাণিজ্যে বাধা দিলে তার নিজের উৎপন্ন মাল অন্যদেশে বাধা পাইবে। তাতে সমূহ ক্ষতি। অন্যদিকে অবাধ বাণিজ্যনীতিতে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে মৈত্রী বর্দ্ধিত হয়।

"বিগত যুদ্ধে নামার দরুণ যুক্তরাষ্ট্রের আত্ম-প্রাচুর্য্যের স্বপ্ন টুটিয়া গিয়াছে। কাঁচা মালের অপরিহার্য্য ও পরিহার্য্য ব্যবহারের পার্থক্য স্পষ্ট হইয়াছে। শান্তির সময়ে কাঁচা মালে স্বাধীনতার চেয়ে বহির্ব্বাণিজ্যের সুবিধাগুলির দাম বেশী। কিন্তু যুদ্ধের সম্ভাবনামাত্র হইলেই কাঁচা মালে স্ব স্ব প্রাধান্য চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের আলোচ্য বিষয় হইতে বাধ্য।"

অধুনা সামার্স হইলেন নিউ ইয়র্কের কন্সাল্টিং এঞ্জিনিয়ার। পূর্ব্বে ছিলেন ওয়ার ইন্ডাষ্ট্রিস্ বোর্ডের টেকনিকাল অ্যাডভাইসার; ওয়ার ইন্ডাষ্ট্রিস্ বোর্ডের ইয়োরোপস্থ চেয়ারম্যান; সন্ধির প্রস্তাব পাড়িবার জন্য ও দৌত্য করিবার জন্য আমেরিকা কমিশনের টেক্নিক্যাল এ্যাড্ভাইসার্।

এই ভদ্রলোকের দুইটি প্রবন্ধ ধনবিজ্ঞান-পরিষদের পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ এই সংখ্যার সকল লেখাগুলিই পূর্ব্বে ঐ পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে।

সামার্স চরম "আন্তর্জ্জাতিক সহযোগ"-বাদী ও একা-চোরামির দুষ্‌মন্-বিশেষ। স্পষ্টবাদীও বটেন। ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব্ লিভিং বা জীবনযাত্রার মাপকাঠি অক্ষুণ্ণ রাখিবার অভিপ্রায়ে অন্য দেশের মজুরকে ঢুকিতে না দিবার যে ধুয়া উঠিয়াছে, তিনি বলেন তার গোড়ায় গলদ্ রহিয়াছে। প্রথম প্রবন্ধে তিনি অর্থশাস্ত্রবিদ্দের উল্টা কথা বলিয়াছেন। তাঁর মতে জীবন-যাত্রার মাত্রা জুলুম করিয়া বাড়ানো জাতির পক্ষে মঙ্গলজনক নাও হইতে পারে।

তাঁর প্রথম প্রবন্ধের সারমর্ম্ম এইরূপ। "জোর যার মুল্লুক তার" এই নীতি হাজার হাজার বছর ধরিয়া রাজ-নৈতিক জগতে প্রচলিত ছিল। আজ সর্ব্বত্র সেই নীতি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতার উদ্ভব হইতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় অর্থনৈতিক গগন আজও তিমিরাচ্ছন্ন। সেখানে "জোর যার মুল্লুক তার" নীতি পুরাদমে চলিতেছে। হাজার বছরের অভিজ্ঞতা কি ইয়োরোপের মনে একটুও দাগ লাগাইতে পারিল্ না? ইয়োরোপ কি ভুলিয়া গিয়াছে যে, একাচোরামি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, ফিউড্যাল ব্যারণরা দলিত হইয়াছে, ডিউক ও রাজার রাজ্য সাম্রাজ্য তলাইয়া গিয়াছে,-তারপর বর্ত্তমান ইয়োরোপ জন্মলাভ করিয়াছে?

"রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। যে কোন দেশ যেমন খুসী তার জাতীয় ব্যবসাগুলির শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারে। সেজন্য যেমন খুসী আইন তৈয়ারী করিতে পারে। তাতে কোন দেশের কি ক্ষতিবৃদ্ধি হইল সে বিষয়ে সে মাথা ঘামাইতে বাধ্য নয়। ফলে হয় বাণিজ্যিক লড়াই। অথচ তার জন্য দায়ী হয় না কেহ।

"কিন্তু মনে রাখিতে হইবে ইটটী মারিলেই পাট্‌কেলটী খাইতে হইবে। জগতের দ্রব্যসমূহের খাদন ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু সব দেশ আর কিছু সমানভাবে কাঁচা মাল উৎপাদন করিতে পারে না। অভাবগ্রস্ত কোন দেশ বাধা পাইলে বাণিজ্যিক লড়াই আসিতে বাধ্য। আন্তর্জ্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ইহাই অ আ ক খ। অথচ এই সহজ সত্যটা অধিকাংশ গবর্ণমেণ্ট দেখিতে পায় না এবং অবিবেচকের মত কাজ করে।

"গবর্ণমেণ্ট দায়িত্বহীন। ফিউড্যাল প্রথা আর কি। সেই একাচোরা ভাব। একাচোরাদের আবদারের সীমা নাই। একজন বলে আমদানি কমাইয়া দাও। অন্যজন বলে উৎপাদন-খরচ বাড়াও। অন্য আর একজন বলে, সাবসিডি চাই। এইরূপ।

"স্বজাতীয়েরা একাচোরাদের আবদার সহ্য করিতে পারে। তারা হয়ত তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে না, অথবা বুঝিতে পারিবার ক্ষমতা রাখে নাই। কিন্তু তা বলিয়া অন্য দেশ পারিবে না, এমন নয়। তারা কেন সহ্য করিবে ?

"আন্তর্জ্জাতিক বিনিময় ও বাণিজ্য সৃষ্টির প্রায় প্রথমাবধি প্রচলিত আছে। সেই সূত্রে আন্তর্জ্জাতিক ন্যায় ও নীতি মানা হইয়া আসিতেছে। মাঝখান হইতে সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রগুলি তাদের লোভ, মোহ, মাৎসর্য্য ও সর্ব্বোপরি তরবারি লইয়া আসরে অবতীর্ণ হইল। সমস্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল।

"এক্ষণে আমাদের দেশে প্রকাণ্ড এক পরীক্ষা চলিতেছে। আমরা একসঙ্গে লোক ও মালের আমদানি বন্ধ করিয়া দিয়াছি। উদ্দেশ্য মহৎ। কি না, জীবন যাত্রার মাত্রা বাড়াইতে চাহি। আমরা কি জগতের সর্ব্বত্র জীবন-যাত্রার মাত্রা বড় করিতে চাই ? না, তা নয়। আমাদের হিত-সাধনের দৌড় আমাদের বাড়ী অর্থাৎ দেশ পর্য্যন্ত।

"সাদা কথায়, আমরা ক্রমোন্নতি চাই না। আমরা হঠাৎ একেবারে এক ধাক্কায় জীবন-যাত্রার মাত্রাটাকে পাহাড়ের চূড়ায় উঠাইয়া দিতে চাই। ভাল, সকল রকম শ্রমীর জীবন যাত্রার মাত্রা উঠানো কি উদ্দেশ্য ? চাষীর ? মস্তিষ্ক-ব্যবসায়ীর ? জীবনযাত্রার মাত্রা উঠাইয়া দিলে ফলাফল কি হইবে ? আয় বাড়িবে, অথচ দর অপরিবর্ত্তিত থাকিবে ? অথবা আয়ের সঙ্গে সঙ্গে দরও বাড়িবে ? বিজ্ঞান এবং আবিষ্কারের বলে যেন গড়ে প্রতি মানুষের উৎপাদন শক্তি বাড়ান গেল ; কিন্তু সকল ব্যবসা আর কিছু তাদের উৎপাদন বাড়াইতে পারে না। তাদের খরচ বাড়িবে। মোট উৎপাদনের সঙ্গে বাজারের কোন সম্পর্ক আছে কি ? উৎপাদন যেন অনেক বাড়িয়া গেল। বাজার কি আপনা আপনি সমগ্রটা গ্রাস করিবার ক্ষমতা রাখে ? বাজারে গ্রাস হইবার পর যতখানি বাকী থাকে তার জন্য কি দেশ-বিদেশের বাজারগুলি ঢুঁড়িবার দরকার হয় না ?

"অর্থনৈতিক দিকে এই জীবন-যাত্রার মাত্রাবৃদ্ধিটা সার্ব্বজনীন নহে। দাসী চাকরের কাজ যারা করে তারা চড়া মজুরির ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবে। যারা থাকিবে তারা নিকৃষ্ট শ্রেণীর ও কর্ম্মে অপটু। চাষী যা-কিছু কিনিবে চড়া দরে কিনিতে হইবে। কিন্তু সে তার উৎপন্ন মাল সব সময়ে চড়া দরে বেচিতে পারিবে না।

"সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যায়, সকল শ্রেণীর লোকের জীবন-যাত্রার মাত্রা সমানভাবে উঠে না। অনুন্নত পরিবার ভাঙ্গিয়া যায়। ছেলেপিলের যত্ন হয় না। অনেকে ভবঘুরেয় জীবন যাপন করে।

"তারপর বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও আবিষ্কার কিছু এক দেশের একচেটিয়া সম্পত্তি নহে। অন্য দেশের লোকেরাও সেগুলির সুযোগ লইতে পারে। তখন অবস্থা দাঁড়ায়—কার্য্য-প্রণালী একরূপ কিন্তু মানুষের কর্ম্ম-শক্তির দর আলাদা আলাদা। আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতা ভিন্ন উপায় কি ?

"কিন্তু কতকগুলি চিন্তাশীল ব্যক্তি বলিতেছেন, বাঁচিয়া বর্ত্তিয়া বা টিঁকিয়া থাকার মূলে রহিয়াছে বিবর্ত্তনবাদে

বিশ্বাস। ঐ বিশ্বাস সত্য হইলে জীবনযাত্রার মাত্রা বড় করা একটা নৈতিক বিধানবিশেষ। কত ঘণ্টা কাজ করিল তা দিয়া নয়, কিন্তু ঐ সময়ে তার কাজের পরিমাণ ও উৎকর্ষ দিয়া বিচার হইবে পাওনা মজুরি কিরূপ হইবে। ধীরে ধীরে এই সত্য মজুররা নিজেরাও বুঝিতেছে। মানুষের দাম অনেক। তার কার্য্যশক্তি নষ্ট হইতে দেওয়া সমীচীন নয়। আন্তর্জ্জাতিক মৈত্রীর পথ উন্নতির পথ রোধ করিয়া নয়, উন্নতিকে আরো বাড়াইয়া। সফলতার পরিমাপ দেশশুদ্ধ লোককে উৎপাদনের কাজে লাগাইয়া দেওয়া নয়, কিন্তু বুদ্ধিপূর্ব্বক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলিকে কাজে খাটানো। লোক-সংখ্যা খুব বেশী হইলেও কোন দেশ পশ্চাৎপদ্ থাকিতে পারে। বুদ্ধিবলে জীবনযাত্রার মাত্রা উঁচু কর। যোগ্যতমেরই উদ্বর্ত্তন ঘটে। সব মানুষ সমান। কিন্তু বুদ্ধিতে নয়।

"তা যেন হইল। তারপর দুর্ব্বল, রুগ্ন ও অক্ষমরা কোথায় যাইবে? তাদের আর কিছু মারিয়া ফেলা যায় না। উঁচা জীবন যাত্রার মাত্রা পর্য্যন্ত পৌঁছিতে সামর্থ্য যাদের নাই, সমাজ তাদের ভার লইতে বাধ্য হইবে। অর্থাৎ তাদের অলসতার প্রশ্রয় দিবে। ফলে চুরি ডাকাতি জুয়া বাড়িবে।

"একাচোরা দেশ নিজের মাল নিজে ভোগ করিতেছে। কিন্তু সময় আসে, যখন এই মাল তার ভোগের পক্ষে যথেষ্ট হয় না। তখন অন্য দেশের উপর নির্ভর না করিয়া উপায় কি?

"যুক্তরাষ্ট্র জগতের সমগ্র উৎপন্ন রবারের ৭০% খরচ করে;

উৎপাদন করে প্রায় শূন্য;

বিদেশে নিজেদের তাঁবে আছে ৫% এর কম।

ছাপাখানার যন্ত্রাদি উৎপাদন করে ৫০%;

আমদানি করে ৫০%।

পেট্রোলিয়াম উৎপাদন করে ৭০%;

আমদানি করে ১০%।

"এই তালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যাইবে যে, যদি আমরা কাঁচা মাল যেমন খুসী ব্যবহার করিয়া যাই অথচ একাচোরা থাকি তবে বাণিজ্যিক লড়াই অবশ্যম্ভাবী হইয়া দাঁড়ায়।

["সম্ভাবিত তিনরকম অবস্থাজ্ঞাপক তিনটা জিনিষের উদাহরণ ইচ্ছাপূর্ব্বক লইয়াছি। কোন দ্রব্যের শতকরা কত অংশ দ্বারা তার দর নির্দ্ধারিত হয় এবং অপটু উৎপাদকের শ্রমের ফল এই ক্ষুদ্র অংশটাকে কিরূপে বশে আনিতে পারে সে কথা লইয়া যুদ্ধের সময় দর-নির্দ্ধারণ-সমিতি অনেক মাথা ঘামাইয়াছিল। শ্রীযুক্ত লুশর বলেন, উৎপাদিত ৩২ কোটি ৫০ লক্ষ বুশেল গমের উপর ফ্রান্স ৩ কোটি বুশেল গম বাহির হইতে আমদানি করিতে বাধ্য হয়। ফরাসী গমের দর নির্দ্দিষ্ট হয় এই বাহিরের ৩ কোটি বুশেল গম দ্বারা। এই ৩ কোটি বুশেল যায় কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র হইতে। কানাডায় বুশেল প্রতি গম জন্মাইবার খরচ ৮০ হইতে ৮৫ সেণ্ট। আমেরিকায় ১·৩০ হইতে ১·৩৫ ডলার। অথচ ঐ ৩ কোটি বুশেল গমের দর ঠিক করিয়া দিতেছে শিকাগো (আমেরিকা) এবং ফরাসী গমের দরও তাই দাঁড়াইতেছে।

"ফরাসী তার বাজেট মিলাইতে হিমসিম খাইয়া যাইতেছে। কিন্তু ফরাসী চাষীর তাতে শান্তির ব্যাঘাত হয় না। সে চড়া দরে (আমেরিকার দরে) ফসল বেচিয়া সম্পন্ন হইতেছে। অন্যদিকে ইংল্যাণ্ডে ধর্ম্মঘট চলিতেছে (মে, ১৯২৬)। খনির মজুরদিগকে ১৯১৪ সনের মজুরির উপরে ১৪%। ১৫% ধরিয়া দিতে চাহিতেছে অর্থাৎ ১১৪%। ১১৫% মজুরি দেওয়া হইতেছে। কিন্তু গ্রেট বৃটেনের দ্রব্য-নির্ঘণ্ট ১৬৫ হইতে ১৭০ পর্য্যন্ত। সুতরাং ঐ মজুরি পর্য্যাপ্ত নয়। পশুখাদ্যের দর চড়াতে মাংসের দর বাড়িয়াছে। আর মাংসের সঙ্গে সঙ্গে চামড়ার দরও বাড়িয়াছে।

"সুতরাং আমেরিকার সম্পদের ফলে ইয়োরোপকে চড়া দরে তার আবশ্যক জিনিষপত্র কিনিতে হইতেছে। কিন্তু ইয়োরোপের ব্যবসা-বাণিজ্য অথবা মজুরি এই সম্পদের কোন ভাগ পাইতেছে না।]

"আমাদের একাচোরামির ফলে আমাদের দুই বিসদৃশ দুর্ব্বলতা ধরা পড়িয়াছে। (১) অপরিহার্য্য কাঁচামালের জন্য দেশের বাহিরে গিয়া খোসামোদ করিতে হইতেছে। (২) ফালতু উৎপাদনের জন্য বাজার ঢুঁড়িতে গিয়া বাধ্য হইয়া দেশের সীমার বাহিরে যাইতে হইতেছে।

"উপায় কি? আমরা যদি নিজের দেশে চড়া মজুরির হার রক্ষা করিবার জন্য "বাণিজ্য-দেয়ালের" সৃষ্টি করি আর অন্য দেশ তার প্রতিশোধ লইবার জন্য তুল্যরূপ বা বড় দেয়াল তৈয়ারী করে, তাতে আমাদের বলিবার কি থাকিবে? সমান সমান আদান-প্রদানের অর্থ এই নয় যে, 'আমি যেমন খুসী বাধা দিব, তুমিও যেমন খুসী বাধা দাও'; তার অর্থ এই যে, 'নানাকারণে কোনো কোনো দেশ বিশেষ বিশেষ দ্রব্য উৎপাদনে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত। এই সব মালের স্বাধীন চলাচলের ব্যবস্থা থাকা দরকার।' তবেই প্রত্যেক দেশ লাভবান্ হইবে। আজ সকল সমুদ্রে সকল দেশের জাহাজ যাতায়াত করিতেছে। কোনো রাষ্ট্র বাধা দেয় না। জল-দস্যুর ভয়ও আর নাই। বাণিজ্যক্ষেত্রেও সে দিন দূরে নয় যখন জাতিতে জাতিতে হিংসার পরিবর্ত্তে মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হইবে।''

শ্রীযুক্ত সামার্স তাঁর লিখিত বক্তৃতা পড়িবার কালে মুখে মুখে উপরের ব্র্যাকেটে ধৃত অংশটুকু বলেন। তাতে কয়েকজন নামজাদা অর্থশাস্ত্রবিদ্ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলেন, "তিনি যা তা বকিতেছেন। অর্থশাস্ত্রের মূল নীতিগুলিকে অগ্রাহ্য করিতেছেন। ফ্রান্স ৩২ কোটি ৫০ লক্ষ বুশেল গম নিজে উৎপাদন করে অথবা ৫ কোটি বুশেল আমদানি করে, এর কোনটাই গমের দর নির্দ্ধারিত করে না। গমের দর নির্দ্ধারিত হয় জগতের মোট উৎপাদনের পরিমাণ ও মোট টানের পরিমাণ দ্বারা। আর আন্তর্জ্জাতিক বাজার শিকাগো নয়, লিভারপুল।"

এই লইয়া বেশ একটু তর্কাতর্কির সৃষ্টি হয়। সামার্স ঐ সময়েই বলেন, "কোনো বৎসরে জগতের মোট যোগানের বা মোট টানের স্বরূপ কি কেহই বলিতে পারে না। যে আঁকজোক সংগৃহীত হয় তা অসম্পূর্ণ। খরচ হইয়া যাইবার ১২ বা ২৪ মাস পরে তা সংগ্রহ করা হয়। অর্থশাস্ত্রবিদেরা সময় যে একটা বড় ব্যাপার তা ভুলিয়া গিয়াছেন।"

সামার্সের দ্বিতীয় প্রবন্ধ "যুদ্ধ ও শান্তির সময়ে কাঁচা মালের রাষ্ট্রীয় শাসন''কে কতকটা ঐ তর্কাবলীর উত্তরস্বরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে। তিনি বহু উদাহরণ দিয়া তাঁর তত্ত্বের যথার্থতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

তাঁর মোট কথাটা এই:—"শান্তির সময়ে যতখানি সুবিধামত কাজে লাগান যায়, তার চেয়ে বেশী উৎপাদন হয়। আর যুদ্ধের সময় সেই সব দ্রব্যেরই যত দরকার, তত পাওয়া যায় না।

"শান্তির সময়ে কাঁচা মাল চলাচলের কথা ধরা যাক্। যেমন তুলা কিংবা রবার।

"গল্‌ভেষ্টন হইতেছে জগতের বৃহৎ তুলার বন্দর। গত কয়েক বৎসর যাবৎ ৫০ হইতে ৬০ কোটি ডলারের তুলা প্রতিবৎসর এখান হইতে বিদেশে রপ্তানি হইতেছে। আর ম্যাঞ্চেষ্টার ও ব্রেমেন হইল যুদ্ধের পূর্ব্বেকার ক্রেতার দুই প্রধান বাজার-কেন্দ্র। লিভারপুল হইতে জগতের বাজারদর প্রকাশিত হয়। তুলার ফসলের পরিমাণ কত, কত জমিতে তুলার গাছ বোনা হইয়াছে, ফসলের অবস্থা কিরূপ এবং বৎসরে ফসলের যোগান কিরূপ হইবার সম্ভাবনা, তার একটা হিসাব করা হয়। কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক লেন-দেনের কারবারে তুলা জন্মিবার আগেই ম্যাঞ্চেষ্টার তা কিনিয়া বসিয়া আছে। জগতের টান-যোগানের হিসাব নিকাশ হইবার আগেই দরাদরি ঠিক হইয়া গিয়াছে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে টান-যোগানকেও নিয়মিত করিবার উপায় আছে।

রবারের যোগানের পরিমাণের কিছু নিশ্চয়তা ছিল না। ব্রাজিল হইতে রবার আসিত। আর যোগান নির্ভর করিত সেখানকার আদিম অধিবাসীদের চির-পরিবর্ত্তনশীল মর্জ্জির উপরে। ফলে রবারের পাউণ্ড ৪ ডলারেও বিকাইয়াছে।

"তারপর একটা বড় ব্যবসায়—অটোমবিল টায়ারের—হঠাৎ বাড়িয়া চলিল। কোটি ডলার নিযুক্ত হইল। কিন্তু যোগান কই? ব্রাজিলে ইংরেজ একাকী রবার ঢুঁড়িয়া ঢুঁড়িয়া বেড়াইল। মালয় উপদ্বীপে রবার গাছ দেদার জন্মিতে লাগিল। ব্যবসার ইজ্জৎ বাঁচিয়া গেল।

"১৯২১ সনে অটোমবিলের ব্যবসা হঠাৎ পড়িয়া গেল। সকলেই মনে করিল, দর নামিতেছে। আর

উঠিবে না।’ কিন্তু ২।৩ বৎসর পরে ঐ ব্যবসা অত্যন্ত দ্রুত উন্নতি করিতে লাগিল। রবারের টান ভয়ানক বাড়িয়া গেল। দরও চড়িতে থাকিল।

“এই উভয়ক্ষেত্রে সরকারের কোনো হাত ছিল না।

“যুদ্ধের সময় সরকার কাঁচা মালের চলাচল কতখানি নিয়মিত করিতে পারে? সুইডেনে ক্রমাগত সোনা আমদানি হওয়ার ফলে “ক্রেডিটে”র প্রসার হইল। ডলার সুইডেন, হল্যাণ্ড ও স্পেনে ৫০ সেণ্টে বিকাইতে লাগিল। সুইডেন সরকার সোনার আমদানি বন্ধ করিয়া দিল। ফাঁপরে পড়িয়া যুক্তরাষ্ট্র সরকার সুইডেনের নিকট ৫০ লক্ষ ডলার ধার চাহিল। সুইডেনের সোনা প্রয়োজনের অতিরিক্ত ছিল। সহজেই ধার পাওয়া গেল। কিন্তু ঐ সোনাটা আবার সুইডেনের ব্যাঙ্কেই জমা রাখা হইল। সুইডেনের চেক্ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিল।

“স্পেন হইতে খচ্চর আসে। পেশিংয়ের ৪০ হাজার খচ্চরের দরকার হইল। কিন্তু স্পেনের চাষী খচ্চর বেচিবে না। সরকার নাস্তানাবুদ হইয়া গেল। স্পেনের জলপাই বাগান শুকাইয়া যাইতেছিল। নাইট্রেট্ দরকার। যুক্তরাষ্ট্রের নাইট্রেট্ আছে প্রচুর। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্র হইতে নাইট্রেট্ চালান যাইতে লাগিল। স্পেনের চাষী খচ্চর ছাড়িয়া দিতেও দেরী করিল না।

“দক্ষিণ আমেরিকা খোকাখুকীর ঠেলাগাড়ী ও দোল্‌নায় ছাইয়া যাইতেছে। সব যায় যুক্তরাষ্ট্র হইতে। এ এক বিক্রয়াধ্যক্ষের কীর্ত্তি। সে এক সুরূপ ব্যক্তিকে বন্ধু বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত করিয়া দেয়। সে ব্যক্তি অতিথিরূপে ঘরে ঘরে বন্ধুর মত সকল অভাব-অভিযোগের খবর লয়। তারপর জিনিষের অর্ডার আসিতে কতক্ষণ লাগে?

“বিনিময়ের অস্ত্র শুধু সোনা নয়, লেনদেনের প্রণালীও বটে। গবর্ণমেণ্টের পক্ষে লেনদেন চালানো কম সহজ। যুদ্ধ ও শান্তি উভয় সময়েই ব্যবসায়-শাসনের মত সরকারী শাসনের কার্য্যপটুতা নাই।”

ডাক্তার ডুরাণ্ড ডি, সি, ওয়াশিংটনস্থ বহির্ব্বাণিজ্য ও অন্তর্ব্বাণিজ্য বুরোর হিসাবতাত্ত্বিক গবেষণা-বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী। তিনি তাঁর প্রবন্ধে বলিতেছেন, “রবার, কফি ও নাইট্রেটের কথা বিবেচনা করা যাক্। কারণ এই তিনটা দ্রব্যের বাণিজ্য-ব্যাপারে গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে অবাধ-নীতিতে বাধা দিতেছে।

“প্রধানতঃ অটোমবিলের অতিপ্রসারে জগতে রবারের জন্য টান অত্যধিক বাড়িয়াছে। ১৯১০ সনে জগতের মোট উৎপাদন ছিল ৮০,০০০ টন। ১৯২৫ সনে তা হইয়াছে ৫ লক্ষ টন। ১৯১০ সনে যুক্তরাষ্ট্র আমদানি করিয়াছিল ৪০,০০০ টন। ১৯২৫ সনে করিয়াছে ৩,৯৭,০০০ টন। সমগ্র জগতে যত রবার লাগে তার প্রায় ৭/১০ ভাগ একা যুক্তরাষ্ট্র ব্যয় করে। আগে প্রধানতঃ ব্রাজিলে ও আমেরিকার স্থানে স্থানে বন্য বৃক্ষ হইতে রবার পাওয়া যাইত। বিগত মহাযুদ্ধের ঠিক পূর্ব্বে দক্ষিণপূর্ব্ব এশিয়াতে প্রচুর পরিমাণে রবার উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হয়। এই রবারের চাষ-খরচ কম বলিয়া সম্প্রতি রবারের দামও অনেক কমিয়া গিয়াছে (১৯২৫ সনে শুধু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল)।

“জগতের রবারের মোটা ভাগটা এক্ষণে ইংরেজের অধিকৃত মালয় ও সিংহলে জন্মিতেছে। ১৯১৮ হইতে ১৯২০ পর্য্যন্ত জগতের মোট “চষা” রবারের ¾ ভাগ এখানে হইয়াছিল। ১৯২৫ সনে মোট উৎপাদিত রবারের ৯৩% ছিল “চষা” রবার। আর সে সময়ে ঐ দুই স্থানে “চষা” রবার জন্মিয়াছিল ৫৭%।

“যুদ্ধকালে ও তারপরের দুইবৎসর বড় বড় মুনাফা পাওয়া গিয়াছিল। মাত্র ১৯২১ সনে যুক্তরাষ্ট্রের রবার আমদানি ভয়ানক পড়িয়া গেল। আমদানির দাম পাউণ্ড প্রতি গড়ে ৪৩ সেণ্ট ছিল ১৯২০ সনে। ১৯২১ সনে হইল ১৮ সেণ্ট। এদিকে পুঁজির ঘর ক্রমাগতই বাড়িতেছিল। ফলে ১৯২২ সনে আমদানি অত্যধিক বৃদ্ধি পাইলেও দরটা তখনো অত্যন্ত নীচু ছিল। আর একটু অপেক্ষা করিলেই দরটা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিত। কারণ যুক্তরাষ্ট্র ক্রমাগতই রবার চাহিতেছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে রবার রপ্তানির এক আইন জারি হইল (১লা নবেম্বর, ১৯২২)। স্থির হইল রবারের দর পাউণ্ড প্রতি ৩৬ সেণ্টে স্থির থাকিবে (১৮ পেন্স, লণ্ডন)। প্রমাণ (ষ্ট্যাণ্ডার্ড) উৎপাদনও নির্দ্দিষ্ট করা হইল। কোন চাষী কতখানি উৎপাদন

করিবে তাও বাঁটিয়া দেওয়া হইল। রবারের দর ৩০ সেন্টের উপরে বা নীচে উঠানামা করিলে কে কতখানি রপ্তানি করিবে তাও ঠিক থাকিল।

"এই বিধি-নিষেধের ফলে লণ্ডনে মজুত পুঁজি তাড়াতাড়ি কমিয়া যাইতে লাগিল। ১৯২২ সনের শেষে হাতে ছিল ৭২,০০০ টন। ১৯২৪ সনের শেষে দাঁড়াইল ২৯,৫০০ টন। ১৯২৫ সনের শেষে দাঁড়াইয়াছে মাত্র ৬,০০০ টন। কারবারীদের মধ্যে রবারের জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। ফলে বিগত ৭ মাসে (১৯২৬) নিউইয়র্কের দর তিনগুণ বাড়িয়া গেল। জুলাইর গড় ১·০৩ ডলার। একদিন ১·২১ ডলার পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। ১৯২৫ সনের শেষে প্রমাণ উৎপাদন বাড়িয়া হইয়াছিল মাত্র ৮৫%। ১৯২৬ ফেব্রুয়ারীর আগে ১০০% হইতে পারে নাই।

"১৯২৫ সনের রবার আমদানির জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে ঘর হইতে গণিয়া দিতে হইয়াছে ৪৩ কোটি ডলার। অর্থাৎ ১৯২৪ সনের দর বাহাল থাকিলে যত দিতে হইত তার চেয়ে ২০ কোটি ডলার বেশী। ১৯২৫ সনের শেষার্দ্ধে যে দর চলিত ছিল, ১৯২৬ সনেও তা থাকিলে আরও কয়েক কোটি ডলার বেশী দিতে হইত। ফেব্রুয়ারীর (১৯২৬) রবার-আমদানির দাম ধরা হইয়াছে ৭ কোটি ডলার।

"এই অন্যায় আইনের বিরুদ্ধে এদেশে তুমুল আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। ফলে নূতন টায়ার কিনিবার পরিবর্ত্তে লোকে পুরাণো টায়ার মেরামত করিয়া ব্যবহার করিতেছে। রবারের আমদানি ও সঙ্গে সঙ্গে তার দর কমিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে পাউণ্ড প্রতি ৪০ হইতে ৫০ সেন্টের মধ্যে উঠানামা করিতেছে।

"ইংরেজ-অধিকৃত দেশগুলি যত রবার উৎপাদন করিতে সমর্থ প্রমাণ উৎপাদন তার চেয়ে ঢের কম। অথচ দরকে নির্দ্দিষ্ট রাখিবার জন্য আরও কড়া ব্যবস্থা হইয়াছে। (১লা মে ১৯২৬)। তদনুসারে রবারের লণ্ডন দর যদি ১ শি ৯ পে (প্রায় ৪২ সেন্ট) অপেক্ষা নীচে নামে তবে রপ্তানিযোগ্য ভাগটাকে ২% কমাইয়া দিতে হইবে। কিন্তু দর যত চড়াতেই উঠুক না, প্রমাণ উৎপাদন বাড়াইবার কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই।

"রবারের সঙ্গে কফির তফাৎ এই যে, কফির জন্য টান ধীরে ধীরে বাড়ে। জগতের মোট বাৎসরিক কফির উৎপাদন প্রায় ২৭০ কোটি পাউণ্ড। ব্রাজিল উৎপাদন করে ⅘। যুক্তরাষ্ট্র নিজের জন্য খরচ করে প্রায় আধাআধি। গত ৩ বছর যাবৎ যুক্তরাষ্ট্র ব্রাজিল কফির রপ্তানির গড়ে প্রায় ৫৫% গ্রাস করিয়াছে।

"প্রথমে ১৯০৮।১৯০৯ সনে, তারপর ১৯১৮ সনে এবং তারপর আবার ১৯২১ সনে, ব্রাজিল সরকার দ্বারা উৎসাহিত হইয়া সাও পৌলো রাষ্ট্র তিন তিনবার খুব নীচু দরের সময় সমুদয় কফি কিনিয়া বাজার হইতে সরাইয়া রাখিয়াছিল। গত চার বৎসর ধরিয়া প্রতি বছর যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি কফির দাম পাউণ্ড প্রতি গড়ে বাড়িয়াছে। ১৯২১ সনে দাম ছিল প্রায় ১০½ সেন্ট। ১৯২৫ সনে হইয়াছে ২২ সেন্টের উপর। ১৯০৬ হইতে ১৯১৫ সন পর্য্যন্ত আমদানি কফির গড়পড়তা দর ছিল পাউণ্ডে ১০ সেন্টের কম।

"নাইট্রেট চিলির একচেটিয়া পদার্থ। চিলির নিজের দরকার প্রায় শূন্য। যুক্তরাষ্ট্র চিলির নিকট হইতে প্রায় আধাআধি কিনিয়া লয়। বছরে সেজন্য দিতে হয় ৫ কোটি ডলারের কাছাকাছি। দুইটা কোম্পানী বাদে আর সকল-গুলিই যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিপাটাদ্বারা প্রতিপালিত। চিলি সরকার টন প্রতি ১২·৫০ ডলারের এক শুল্ক বসাইয়াছে। তাতে বিক্রয়-দরটা বাড়িয়াছে ⅙ বা ⅐। বাণিজ্য-বিভাগের (ডি, সি) অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইয়াছে যে, চিলি নাইট্রেটের বর্ত্তমান দর তার উৎপাদন-খরচার চেয়ে বড় বেশী নয়। তবে কর্ম্মপটু ও চতুর উৎপাদকেরা তাতেই বেশ মুনাফা পায়।

"মাত্র ৩টা পদার্থের একটু হিসাব লওয়া হইল। এরূপ দ্রব্য আরও অনেক আছে। এগুলির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ফলাফলের কথা আলোচনা করিবার সময় মনে রাখিতে হইবে—(১) রপ্তানির উপর সরকারী শাসন আর বেসরকারী জোটবাঁধা বা সমবেত ব্যবসায়ীদের রপ্তানি-নিয়মন এক কথা নয়। সরকারী শাসনে অনেক বেশী অবিচার ও অত্যাচার হইবার সম্ভাবনা আছে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান-গুলির ভয় আছে যে বাড়াবাড়ি করিলে সভ্যেরা ছাড়িয়া

যাইতে পারে কিংবা বাজারে নূতন প্রতিযোগী দেখা দিতে পারে। সরকারের সে ভয় নাই। সরকার বিশৃঙ্খলভাবে নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব করিয়া থাকে।

"(২) সরকারের অনেক সময় রাজস্বের দরকার হয়। সে রাজস্ব এই রপ্তানির শাসন দ্বারা আদায় হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকার তার ন্যায়-সীমা লঙ্ঘন করে। রাজস্বের পরিবর্ত্তে উৎপাদকদের মঙ্গলার্থে বা লাভার্থে দরটাকে অসম্ভবরকম চড়াইয়া দেয়।

"(৩) খনি বা বনজঙ্গল যদি তাড়াতাড়ি নিঃশেষ হইয়া যায় তবে দেশের সমূহ ক্ষতি হয়। এই ক্ষতি নিবারণের জন্য সরকারী প্রচেষ্টা আন্তর্জ্জাতিক ন্যায়ানুমোদিত না হইলেও দেশের লোকে ইহা দাবী করিতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সরকার সেই রকম জিনিষগুলিতে নজর দিবার জন্য নিন্দাভাজন হয় নাই। কৃষির উৎপন্ন নিঃশেষ হইবার সম্ভাবনা নাই। নাইট্রেট ইত্যাদির কোন প্রয়োজন উহার জন্মস্থানে নাই। অথচ সরকার এই সব কাঁচা মালের রপ্তানি বন্ধ করিতে চাহে।

"(৪) টারিফ প্রথা দেশবাসিগণের পক্ষে যতই আপত্তি-জনক হোক্ না, বিদেশী রাষ্ট্রের পক্ষে তাতে বলিবার কিছু নাই। কাঁচা মালের রপ্তানিতে বাধা দেওয়া ও তাদের দর বাঁধিয়া দেওয়া ঢের বেশী অনিষ্টকর। টারিফের ফলে এক একটা ব্যবসা গড়িয়া উঠিতে পারে। তাতে দেশের উন্নতি হয়। বাহিরের জগৎও সেই উন্নতির ভাগ পায়। কারণ অন্য সব জিনিষ এইস্থানে চড়া দরে বেচিতে পারে।

"এই সব বাধাপ্রদান-নীতি রপ্তানির উপর কিরূপ কার্য্য করে?

"(১) কাঁচামালকে সরকারী শাসনের তাঁবে আনিলে বিবিধ অন্যায় অবিচার ও অত্যাচার ঘটে। জোর করিয়া দর চড়াইয়া দেওয়ার ফলে অন্য দেশের ক্রেতারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নিজের দেশের মঙ্গল করিতে গিয়া অনিচ্ছাবশতঃ অন্য দেশের ক্ষতি করা এক কথা, আর ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্য দেশের শোষণের ব্যবস্থা করা অন্য কথা। শুধু তাই নয়। কোন দেশ "ক" তার কার্য্য দ্বারা যদি "খ" নামক দেশের ক্ষতি করে, তবে যেসকল দেশ "খ"র সহিত বাণিজ্য করে সেই সব দেশের অন্যান্য দ্রব্যের উৎপাদকেরা পরোক্ষ-ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জগতের সকল দেশ যদি এইরূপ পরস্পর মারামারি কামড়াকামড়ি করিয়া বেড়ায়, তবে আর শান্তি অথবা আর্থিক উন্নতির আশা কোথায়?

"(২) টান-যোগানের স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে কোন কোন সময় হয়ত "সমীকরণ" হইতে বিলম্ব হয়। ক্ষতি-নিবারণার্থে অথবা তাড়াতাড়ি টান যোগানের সমীকরণ করিবার জন্য অনেক সময় সরকার কাঁচা মাল রপ্তানিতে বাধা দিয়া থাকে। ইচ্ছা, কিছুকাল পরে আর দিবে না। কিন্তু একবার আরম্ভ করিলে এই বাধা-প্রদান-নীতি উত্তরোত্তর বাড়িয়া যায়।

"(৩) যোগানকে সরকারী শাসনে ছাড়িয়া দিলে দরে অত্যন্ত গুরুতর উঠা-নামা ঘটিয়া থাকে। কারণ কখন গবর্ণমেণ্টের কিরূপ মর্জ্জি হইবে তা পূর্ব্ব হইতে কেহই আন্দাজ করিতে পারে না। তার উপর স্বাভাবিক কারণে টান-যোগানের পরিবর্ত্তন ত আছেই।

"রপ্তানির চলাচলে বাধা দিলে পরদেশ ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়ই। অনেক সময় শেষ পর্য্যন্ত নিজদেশের ক্ষতির পরিমাণও সামান্য হয় না।

"(১) কিছুকালের জন্য এবং অনেক সময় চিরকালের জন্য ব্যবসার আয়তন কমিয়া যায়। জিনিষটা দেশের একচেটিয়া অধিকারে যদি না থাকে তবে অন্যান্য দেশও উহা উৎপাদন করিতে সচেষ্ট হয়। ফলে প্রথম উৎপাদক দেশ শেষ অবধি সমগ্র উৎপাদনের অতি অল্প অংশ নিজের হাতে রাখিতে পারে। উদাহরণ, বাধা দেওয়ার পর হইতে "চসা" রবার বৃটিশ-অধিকৃত দেশের বাইরে খুব তাড়াতাড়ি বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯২২ সনে মোট "চষা" রবারের ৭২°/০ ছিল ইংরেজের। ১৯২৫ সনে হইয়াছে ৫৭%। ঐ সময়ে ওলন্দাজ ইষ্ট্ ইণ্ডিসে উহা ৮৫°/০র বেশী বাড়িয়াছে। জগতে বহুস্থানে রবার জন্মিতে পারে। ইংরেজী রবারের চড়া দর বজায় থাকিলে সে সব স্থানে রবার চাষ আরম্ভ হইবে।

"(২) বিসদৃশ চড়া দর টানে ঘাটতি ঘটায়। এই টান যে কতদূর পর্য্যন্ত নামিতে পারে কেহ বলিতে পারে না।

বিশেষ, জাতীয় আত্মবোধ যদি উদ্বুদ্ধ হয়। উদাহরণ, অক্টোবর ১৯২৪ হইতে মার্চ্চ ১৯২৬ পর্য্যন্ত অটোমবিলের "খোল" বিক্রী হইয়াছে পূর্ব্ব বৎসর ঐ সময়ের মধ্যে যত হইয়াছে তার চেয়ে ২৫% কম। টায়ার মেরামতে যে সব দ্রব্যের প্রয়োজন তার জন্ত অ-চষা রবার লাগান হয়। ১৯২৪ সনে উহা ছিল ২,৯০৮ টন। ১৯২৫ সনে হইয়াছে ৪,৩১৯ টন। ১৯২৫ সনের শেষ ৩ মাসে ১৯২৪ সনের শেষ ৩ মাস অপেক্ষা ৭০% বেশী হইয়াছে। আর ১৯২৪ সনের চেয়ে ১৯২৫ সনে পুরাণো রবারের সংগ্রহ ৫৫% বেশী হইয়াছে। ১৯২৬ সনের প্রথম ৩ মাসে ১৯২৫ সনের প্রথম ৩ মাস অপেক্ষা ½ বেশী।

"(৩) বর্ত্তমানে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যার যে রকম উন্নতি হইয়াছে তাতে সর্ব্বদাই সমান কার্য্যকর নব নব দ্রব্যের উদ্ভব হইতেছে। কাঁচা মালের দর অত্যধিক চড়াইয়া দিলে অন্ত দেশ ঐ রকম কিছু উৎপন্ন করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করে।

"(৪) কাঁচা মালের অবাধ রপ্তানিতে বাধা দিলে সব চেয়ে বড় ক্ষতি এই হয় যে, উৎপাদনের উৎকর্ষ কমিয়া যায়। নব নব উল্লেখযোগ্য ব্যবসায়-বুদ্ধি ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাধা পায়। প্রতিযোগিতার এক প্রধান গুণ এই যে, তার ফলে অনুপযুক্তকে ব্যবসায়-ক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইতে হয়। শুধু উন্নতি হয় তা নয়, উন্নত করিতে বাধ্য করে।

"এই জগৎ আদর্শ জগৎ নয়। এখানে আর কোনদিন অশান্তি বা যুদ্ধ ঘটিবে না এমন আশা করা যায় না। কিন্তু রাষ্ট্রগুলির পরস্পর বিরোধের যে সব কারণ বর্ত্তমান আছে রাজনীতি-ধুরন্ধরেরা সেগুলিতে আর ইন্ধন না যোগাইলেও পারেন। মনে হয় কাঁচামালের সরকারী শাসনে স্বাভাবিক আর্থিক নিয়মসমূহ বাধা পায় ও বাণিজ্যিক লড়াইয়ের সৃষ্টি হয়।"

বাকী ৪ নং ও ৫ নং প্রবন্ধ দু'টি দুই অধ্যাপকের লেখা। "কাঁচামাল ও সাম্রাজ্যবাদ" লিখিয়াছেন শ্রীযুক্ত মুন। ইনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের "আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধে"র সহযোগী অধ্যাপক। আর "কাঁচামালের আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক শাসন" লিখিয়াছেন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েরই ইতিহাসের সহযোগী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আর্ল।

শ্রীযুক্ত মুন বলিতেছেন, "জার্ম্মাণির রাইশ্ ব্যাঙ্কের সভাপতি ডাক্তার স্শাক্ট্ বলেন, (নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স ২৬ মার্চ্চ, ১৯২৬) রাজনৈতিক জগতে কোন্ রাষ্ট্র কত বেশী কাঁচামাল গ্রাস করিবে তা লইয়া নিরন্তর টক্কর চলিতেছে। যুদ্ধের পর হইতে কাঁচামালের জন্য বিবাদ আরও বাড়িয়া গিয়াছে। উপনিবেশ লাভ না করিলে জার্ম্মাণির মুক্তি নাই। জার্ম্মাণ পূর্ব্ব আফ্রিকার পূর্ব্বতন গবর্ণর ডাক্তার হাইন্‌রিক্ স্নী জার্ম্মাণিকে তার উপনিবেশ ফিরাইয়া দিবার আন্দোলনে বিখ্যাত হইয়াছেন। তাঁর মতে কাঁচামালের যোগান দিবার জন্য বড় বড় ব্যবসায়ী রাষ্ট্রগুলির উপনিবেশের দরকার। মুসোলিনী ঘোষণা করিয়াছেন ইতালী বাড়িতে না পাইলে শ্বাস বন্ধ হইয়া মরিবে। ফরাসী নৌ-বহরের উদ্যোগে প্রকাশিত এক নব পুস্তক হইতে জানিতে পারি যে, ফরাসীর এই উন্নতি সম্ভব হইয়াছে উপনিবেশের জন্য। উপনিবেশগুলিই কাঁচামাল ও বাজার যোগাইয়াছে। সেক্রেটারি হুভার জগতকে সাবধান করিয়া দিতেছেন যে, একাচোরাভাবে কাঁচামাল ভোগ করিলে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে মনোমালিন্য হইতে বাধ্য।

"এই সব মনোভাবের ভিতরের কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝা যাক্। প্রধান প্রধান সমস্ত ব্যবসায়ী রাষ্ট্র উত্তরোত্তর আমদানি করা কাঁচামালের উপর নির্ভর করিতেছে। কোনো ক্ষেত্রে কাঁচামাল ঘরে উৎপাদন না করিয়া বাহির হইতে আমদানি করিলেই বেশী সস্তা পড়ে। সেই জন্য ইংল্যাণ্ড অষ্ট্রেলিয়া হইতে পশমের আমদানি করে। কোনো ক্ষেত্রে ঘরোয়া যোগান যথেষ্ট নয়। সেই জন্য ইতালীকে লোহা আমদানি করিতে হয়। অনেক সময় যেখানে কয়লা অথবা অন্য শক্তি, মজুর এবং পুঁজিপাটা পাওয়া যায় সেখানে ব্যবসায় গড়িয়া উঠে; সেখানে হয় ত কাঁচামালের অভাব। বৃটিশ তুলার ব্যবসার এই অবস্থা। অথবা সেখানে হয়ত প্রধান কাঁচামালগুলি আছে কিন্তু অপ্রধান অথচ অপরিহার্য্য মালগুলি নাই। যেমন যুক্তরাষ্ট্রের ইস্পাতের ব্যবসায়ে রোডেসিয়া ও কিউবা হইতে ক্রোমাইট আমদানি হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়গুলিতে আমদানি করা যে কাঁচামালের দরকার তার দর নিম্নরূপ:—

বৎসর			কাঁচা মাল আমদানি
১৮৫০	...	...	৪,০৭,১৪১ ডলার
১৮৭৫	...	...	৫,০৩,৮৭,০০৮ „
১৯০০	...	...	২১,০৩,৯১,৭৪৫ „
১৯২৫	...	...	১৪৩,০০, ১২,৭৬৩ „

গ্রেট্ বৃটেন্ ১৯০০ সনে যে বিদেশী কাঁচামাল ব্যবহার করিয়াছে তার দর ১৭ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড ষ্টার্লিং। আর ১৯২৪ সনের দর ৪০ কোটি পাউণ্ড (=২০০ কোটি ডলার)। ১৯২৫ সনে ফ্রান্স আমদানি করিয়াছে ২ কোটি ৯০ লক্ষ ফ্রাঁ মূল্যের মাল। ঐ সনে জার্ম্মাণি করিয়াছে ৬২৫ কোটি স্বর্ণ মার্ক মূল্যের মাল। এইরূপে বিভিন্ন দ্রব্যের অন্বেষণে কোটি কোটি মুদ্রা পৃথিবীর এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াত করিতেছে।

"অনুন্নত ও গরম দেশে কাঁচা মাল টুঁড়িতে টুঁড়িতে সাম্রাজ্যবাদের উদয় হইয়াছে। ইংরেজ সাম্রাজ্য-নির্ম্মাতা সার ফ্রেডারিক লুগার্ড বলেন, "গরম দেশগুলিতে এক শ্রেণীর কাঁচা মাল ও খাদ্যদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ঐগুলি আবার সভ্য মানবের পক্ষে অত্যাবশ্যক বস্তু। তারই ফলে ইউরোপীয় জাতিগুলি আফ্রিকা-শাসনের জন্য কামড়াকামড়ি করিতেছিল।' শুধু আফ্রিকা কেন? কাঁচা মালে শাসন চালাইবার ক্রিয়া সর্ব্বত্রই প্রসারিত হইতেছে। আমেরিকায়, এসিয়ায়, প্রশান্তসাগরের উপকূলে গরম দেশগুলি অধিকৃত হইয়াছে। উদাহরণ, কিউবার চিনি ও তামাক, মেক্সিকোর ম্যানিলা হেম্প, ভারতের তুলা, মালয়ের রবার। প্লান্টাররা চায় তাদের দখল ও নিজেদের নিরাপদতা রক্ষিত হউক; তৈলপতিদের "কনসেশনে"র বড়ই দরকার; তাদের ব্যাঙ্কাররা ধনপ্রাণ রক্ষার দাবী করিয়া বসে। সাম্রাজ্যবাদ ফুটিয়া উঠিতে কতক্ষণ লাগে?

"রাষ্ট্রনীতিবিদ্ ও সাধারণ সকলে মনে করে যে ঐ রকম সব দেশ "অধিকার" করিতে পারিলে জাতীয় সম্পদ্ বৃদ্ধি পায়। অনেক ফরাসী ফরাসী উত্তর আফ্রিকার ফস্‌ফেট্ খনিগুলি এই চোখে দেখে। যে উপনিবেশে হীরামাণিকের খনি আছে অথবা প্রচুর পেট্রোলিয়াম্ আছে তার অধিকারের জন্য কোন্ দেশ না ঝগড়া-বিবাদ বা যুদ্ধ করিবে?

"মিত্র-শক্তিবর্গের ঋণগ্রস্ত অবস্থা ও ইউরোপীয় এক্সচেঞ্জের দুরবস্থাহেতু শান্তি-বৈঠকের পর হইতে উপনিবেশ হইতেই যাতে কাঁচা মালের যোগানটা পাওয়া যায় তার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে। 'ফ্রান্স যদি নিজের উপনিবেশ হইতেই জিনিষ-পত্র কিনে, তবে ফ্রাঁর সমতা রক্ষা করা ও ঋণশোধ করা সহজ হয়, এই মত প্রচারিত হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী বল্ড্‌উইন সেদিন স্বয়ং বলিলেন, 'কাঁচামালের জন্য বৃটেন যত নিজ সাম্রাজ্যের উপর নির্ভর করিবে, তত মঙ্গল। আমেরিকার উপর ভর না করিলেই আমেরিকার 'ঋণ শোধ সহজ হয়।' ওয়েম্ব্লিতে বৃটিশ এম্পায়ার এক্সিবিশনের (বৃটিশ সাম্রাজ্য-প্রদর্শনী) মূল কথা হইল, "তোমার টাকাটা সাম্রাজ্যের বাহিরে যাইতে দিও না।" বলা বাহুল্য, 'এই মতবাদ সম্পূর্ণ ভুল। একমাত্র গ্রেটবৃটেন ছাড়া ইউরোপে এমন একটা দেশ নাই যা ভবিষ্যতে তার অধিকাংশ কাঁচা-মালের জন্য শুধু উপনিবেশের উপর ভর করিয়া টিঁকিয়া থাকিতে পারে। ইতালী, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স তাদের উপনিবেশগুলির জন্য আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী করিতেছে, বহু পুঁজিপাটা রেল ইত্যাদিতে খরচ করিতেছে। সাম্রাজ্যস্থ কাঁচা-মালও পয়সা দিয়া কিনিতে হয়, তা সে দেনাশোধটা যেরকমই হোক্ না।

"বিভিন্ন কারণে কাঁচা মাল সাম্রাজ্যবাদের প্রতি যুক্ত-রাষ্ট্রও উদাসীন নহে। সেক্রেটারী হুভার খোঁজ লইয়া দেখিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে ভিন্ন ভিন্ন সরকারের শাসনে ৯টী কাঁচা মাল রহিয়াছে (ঈজিপ্টের তুলা, কর্পূর, কফি, আইওডিন, নাইট্রেট্, পটাস্, পারদ্, রবার, শিশল)।' বর্ত্তমান দর অব্যাহত থাকিলে এদের জন্য ১৯২৬ সনে দিতে হইবে ১২০ কোটি ডলার। আর এ ছাড়া আরও ২০।৩০টা দ্রব্য আছে যা এক বা একের বেশী রাষ্ট্র সমবেত হইয়া শাসনে আনিতে পারে। এ অবস্থা বিপজ্জনক বটে। ইহাতে ক্রমাগত মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। সেজন্য বাণিজ্য-বিভাগ ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছে ঐগুলি যাতে নিজ দেশে উৎপন্ন হয়।'

"এইরূপ চেষ্টার ফল ইংরেজের রবার শাসনের ব্যাপারে দেখা গিয়াছে। ব্যবসার একটা মোটা অংশ এক্ষণে ওলন্দাজদের হাতে গিয়া পড়িয়াছে। বিভিন্ন মালের রপ্তানি-শুল্ক বসানোও এই ধরণের। উদ্দেশ্য, সাম্রাজ্যের অধিকারী রাষ্ট্রের কারবারীরা যেন অন্য দেশের কারবারীদের চেয়ে সুবিধা দরে কাঁচা মাল কিনিতে পারে। উদাহরণ, ফিলিপাইন দ্বীপ যখন যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে আসিল, তখন ম্যানিলার উপর রপ্তানি-শুল্ক প্রতি ১০০ কিলোগ্রামে ৩৭½% হইতে ৭৫% বাড়ান হইল। সেইজন্য ১৯০২ সনে যখন বিদেশী রাষ্ট্রগুলিকে ঐ চড়া হারে শুল্ক দিতে হইতেছিল, তখন যুক্তরাষ্ট্র জাহাজ বোঝাই ম্যানিলা আনিতেছিল বিনা শুল্কে। মালয় উপদ্বীপের টীনের উপর ইংরেজ রপ্তানি কর চালাইল। উদ্দেশ্য, পার্থ এম্বয় ও ব্রুকলিনের উপর কর্ণওয়াল যেন টেক্কা দিতে পারে।

"এই সব প্রচেষ্টার মূলে দেশের লোকের মনে এই একটা আশঙ্কা সর্ব্বদা জাগ্রত রহিয়াছে যে, যুদ্ধের সময় দরকারী যুদ্ধদ্রব্য ছাড়া থাকা বিপজ্জনক। এ জগতে যখন শান্তি চিরস্থায়ী পদার্থ নয়, তখন প্রতি দেশের উচিত যথেষ্ট দ্রব্য মজুত রাখার আয়োজন করা, যেন কোনকালে অভাব না ঘটে। যারা জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কাজ করে তারা এই কথা ভুলিয়া যায় যে, কোনো দেশের পক্ষে কোনো একটা দ্রব্যের সম্পূর্ণ শাসন লাভ করা অসম্ভব নাও হইতে পারে, কিন্তু এককালে সকল অপরিহার্য্য যুদ্ধ-দ্রব্যের যোগান সংগ্রহ করা অসম্ভব। সত্য সত্য যুদ্ধের সময় আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত থাকা স্বপ্নমাত্র।

"তারপর কোনো রাষ্ট্র যে তার সাম্রাজ্য মধ্যে উৎপন্ন কাঁচা মাল নিজেই ভোগ করিবে তা কে বলিল? নিউ-ক্যালিডোনিয়া ফরাসীর। সেখানে কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য খনিজ দ্রব্য, বিশেষ করিয়া কোবাল্ট ও নিকেল, পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ কোবাল্ট রপ্তানি হয় বেলজিয়ামে। আর নিকেলেরও ⅓ অংশ যায় বেলজিয়ামে। ইংরেজ-অধিকৃত মালয় দেশে জগতের অর্দ্ধেক কাঁচা রবার উৎপন্ন হয়। কিন্তু উহা প্রধানতঃ যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হয়। মাদাগাস্কারের গ্র্যাফাইট ইংল্যাণ্ডে যায়, ফ্রান্সে নয়। টুনিসের ফস-ফেটের অর্দ্ধেকেরও কমটা ফ্রান্সের লাগে।

"বস্তুতঃ কাঁচা মাল বর্ণচোরা। ইহা টান-যোগানের নিয়ম অনুসারে এবং দূরত্ব ও যানবাহনের খরচা অনুসারে গতিবিধি করে। কাঁচা মালের পক্ষে রাষ্ট্রীয় শাসনের চেয়ে অর্থ নৈতিক শাসনই অধিক কার্য্যকর। উৎপাদকেরাও মানুষ। সব চেয়ে বেশী দর যে দিবে তারা তার কাছেই জিনিষ বেচিবে। তা ক্রেতা যে দেশেরই হোক্ না। আজ যদি ফ্রান্স আইন করিয়া টুনিসের ফস্‌ফেট বিদেশে বেচা বন্ধ করিয়া দেয় তবে কালই ধনী ও প্রভাবশালী মহাজনেরা আন্দোলন আরম্ভ করিবে। ইংরেজ যদি বলে যুক্তরাষ্ট্রে রবারের সমস্ত আমদানি বন্ধ করিয়া দাও, তবে প্ল্যান্টাররা ব্রহ্মাণ্ড আলোড়ন করিয়া বেড়াইবে। ডাউনিং ষ্ট্রীট্ বাদ যাইবে না।

"কাঁচা মাল সব চেয়ে চড়া খরিদ্দারের কাছে যায়। কঙ্গোর উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য বেলজিয়ামবাসীকে, টুনিসের ফস্‌ফেটের জন্য ফরাসীকে, অষ্ট্রেলিয়ার পশমের জন্য ইংরেজকে ঠিক অন্য দশজন অ-বেলজিয়ান্, অ-ফরাসী অ-ইংরেজের মত পয়সা দিতে হইবে। তা যেন হইল, তবু বিদেশীদিগকে ঐ পয়সাটা দেওয়ার চেয়ে নিজ সাম্রাজ্যের অধিবাসীকে দেওয়া কি বেশী বাঞ্ছনীয় নয়? এই চিন্তা-ধারার গোড়ায় গলদ্ রহিয়াছে। সাম্রাজ্যের উৎপাদক যে নিশ্চয়ই দেশবাসী হইবে তার কি স্থিরতা আছে? বৃটিশ মালয়ের রবায় চাষের কতকটা অংশ যুক্তরাষ্ট্র রবার কোম্পানীর তাঁবে রহিয়াছে। আর ওলন্দাজ ইষ্ট ইণ্ডিজের বড় বড় রবার ক্ষেত্রগুলি বাস্তবিক পক্ষে বৃটিশ ও আমে-রিকান। ম্যাণ্ডেট্ ইরাকে টার্কিশ পেট্রোলিয়াম কোম্পানীর তেল-খনিগুলির মুনাফার অর্দ্ধেকেরও কম অংশ যায় ইংরেজ মহাজনদের কাছে। অধিকাংশটা ভাগ করিয়া লইতেছে, ফরাসী, আমেরিকান ও ওলন্দাজ প্রতিষ্ঠানসমূহ। বেলজিয়াম কঙ্গোর কাটাঙ্গা খনিগুলিতে ইংরেজ পুঁজি-পাটার মোটা অংশ আছে। আফ্রিকার হীরকে আমে-রিকার স্বার্থ আছে। পর্ত্তুগীজ উপনিবেশগুলিতে বৃটিশ ও বেলজিয়ান পুঁজিপাটা খাটিতেছে।

"সাম্রাজ্যবাদীদের প্রধান যুক্তি ও উদ্দেশ্য দেশের মধ্যেই যথেষ্ট পরিমাণে কাঁচা মাল উৎপাদন করা। তা কি সম্ভব না বাঞ্ছনীয়? ফ্রান্সের সাম্রাজ্য ত বিপুল। ফ্রান্সের দিকেই একবার চাহিয়া দেখা যাক্। ফ্রান্সের আমদানির ⅔ অংশ হইল কাঁচা মাল। কিন্তু ঐ কাঁচামালের মাত্র এক-দশমাংশ আসে তার উপনিবেশগুলি হইতে। বাকী ⁹⁄₁₀ ভাগ ফ্রান্সকে গ্রেট্ বৃটেন্, যুক্তরাষ্ট্র, জার্ম্মাণি, বেলজিয়াম ও দক্ষিণ আমেরিকা হইতে আমদানি করিতে হয়। ৫০ বছরের অবিশ্রান্ত সাম্রাজ্য-প্রসার চেষ্টার ফলে ত এই অবস্থা। ১০% প্রাচুর্য্যকে মোটেই প্রাচুর্য্য বলা চলে না। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীকে যদি বলা যায় অর্থনৈতিক দিক্ হইতে ফ্রান্সের সব চেয়ে বড় উপনিবেশ হইল যুক্তরাষ্ট্র, জার্ম্মাণি ও গ্রেট্ বৃটেন তবে সে তা বিশ্বাস করিতে চাহিবে না। কিন্তু কথাটা সত্য। ফরাসীর উপনিবেশ হইতে গাই বলদ, চাউল গ্যানিয়ক, মাছ আসে ৫০%; মদ, চামড়া, তামাক, রবার, মাংস, ফলমূল, জলপাইয়ের তেল ১০% হইতে ৫০%র মধ্যে; পশম, কাঠ, তুলা, কফি, শস্য, কোকো, তামা, চিনি ১% হইতে ১০%র মধ্যে। উপনিবেশের আরো শ্রীবৃদ্ধি ঘটিলে ফ্রান্স চামড়া, রবার, তরকারীর তেল, পশম, তুলা ও কোন কোন ধাতুদ্রব্য পাইতে পারে। কিন্তু তবু কয়লা, জিঙ্ক, টীন, সীসা, ম্যাঙ্গানিজ্, তেল, নাইট্রেট্, পারদ, প্ল্যাটিনাম্, গন্ধক ও অন্যান্য আবশ্যক পদার্থের জন্য ফ্রান্সকে বরাবর বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হইবে।

"যুক্তরাষ্ট্রের অধিকৃত দেশ হইতে অনেকখানি চিনি, ফলমূল, গাঁজা, তামাক এবং কিছু পরিমাণ সোনা, তামা নারিকেলের তেল ও অন্যান্য সামান্য দ্রব্য আসে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রসার তাহাকে মালয় রবার, ভারতীয় পাট, জাপানী রেশম, বৃটিশ টিন, ক্যানাডার নিকেল ও আস্‌বেষ্টোজ, অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার পশম, ভারতীয় ও রুশীয় ম্যাঙ্গানিজ, রোডেশিয়ার ক্রোমাইট্ ইত্যাদির সাহায্যনিরপেক্ষ করিতে সমর্থ হয় নাই।

"জাপানের দরকার কাঁচা তুলা, লোহা, রবার, চামড়া, পশম, ফ্ল্যাক্স ও গাঁজা, কাঠের মেদ (কাগজের জন্য) এবং তেল। উপনিবেশগুলি হইতে এগুলি অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়। তবে একদিন হয়ত কোড়িয়ার খনি হইতে কিছু কিছু তামা, লোহা ও কয়লা পাওয়া যাইবে। অধুনা ফর্ম্মোসা কর্পূর এবং কিছু পরিমাণ চা, চিনি ও কয়লা যোগায়। কোড়িয়া চাউল, গাইবলদ ও সোনা রপ্তানি করে। শাখালিনে নাকি দামী তেল ও খনিজ দ্রব্য আছে।

"হল্যাণ্ডে বিদেশ হইতে লোহা, কয়লা, তুলা এবং নানা ধাতুদ্রব্য আসে। উপনিবেশ হইতে আসে চিনি, কফি, চা, দারচিনি, তামাক, রবার, কোপ্রা, টিন ও তেল।

"ইতালীর চাই তুলা, কয়লা ও লোহা। আশা করা যাইতেছে, উপনিবেশে এগুলি পাওয়া যাইবে। কিন্তু এখনো পাওয়া যায় নাই।

"বেলজিয়ামের কঙ্গো সর্ব্বোপরি উৎপাদন করে তামা, তা ছাড়া তাল, সোনা, হস্তীদন্ত, তালের তেল, হীরা। কিন্তু কঙ্গো হইতে যে কয়লা, নানা খনিজ দ্রব্য, ফস্‌ফেট, তুলা ও অন্যান্য জিনিষ আসে তাতে বেলজিয়ামের অভাব দূর হয় না।

পর্ত্তুগালের চাই কয়লা, তুলা, ভূমির সার। কিন্তু উপনিবেশ হইতে আসে মাত্র কফি, রবার, চিনি, নারিকেল ও কোকো।

"কিন্তু বৃটেনের কি অবস্থা? বৃটিশ সাম্রাজ্য জগতের এক ডজন বা ততোধিক খনিজ দ্রব্যের যোগানের অর্দ্ধেকের বেশী উৎপাদন করিতেছে (আস্‌বেষ্টোজ্, ক্রোমাইট্, কোবাণ্ট, সোনা, ম্যাঙ্গানিজ এর অন্তর্গত); আর আরও এক ডজন বা ততোধিকের শতকরা বেশ একটা বড় অংশ। এর অনেকগুলি দফায় বৃটেন স্বাধীন হইতে পারে। কিন্তু তবু তাকে তুলা, তামা, সার, মার্কারি, প্ল্যাটিনাম্ ও গন্ধক ইত্যাদির জন্য পরদেশের উপর নির্ভর করিতেই হইবে। ইংরেজও বলিতে পারে না আমার অর্থ আমার সাম্রাজ্যেই থাকুক। অন্যে পরে কা কথা?

"বস্তুতঃ, রাষ্ট্রের আত্ম-প্রাচুর্য্যের কল্পনা ভিত্তিহীন। সমস্ত সমস্যাটার অন্য একটা দিক্ আছে। বর্ত্তমান যুগের গোড়ার দিকে মধ্যযুগের ফিউড্যাল রাষ্ট্র ও নগররাষ্ট্র অর্থনৈতিক তথ্যের পক্ষে নেহাৎ ছোট হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেগুলি পরস্পর যুক্ত হইয়া জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব করিল।

কাঁচা মাল এবং বাজারের জন্ত এই জাতীয় রাষ্ট্রগুলিও যথেষ্ট বড় রহিল না। আসিল জাতীয় সাম্রাজ্য। আজকার সকল বড় শক্তিই জাতীয় সাম্রাজ্য। শুধু জার্ম্মাণি নয়। কিন্তু এই জাতীয় সাম্রাজ্যেও আর কুলাইতেছে না। এখন দরকার জগদ্ব্যাপী আন্তর্জ্জাতিক সহযোগ, আদান-প্রদান ও বিধান-শাসন। মতবাদ আগে আগে চলে। তদনুযায়ী কাজের অনুষ্ঠান হইতে দেরী লাগে। সাম্রাজ্যবাদের বাণী প্রথমেই লোকে গ্রহণ করে নাই। কতকগুলি অধ্যাপক, ব্যবসায়ী ও পত্র-সম্পাদক বিগত শতাব্দীর ৭ম ও ৮ম দশকে প্রথম বলিতে আরম্ভ করিলেন যে, বর্ত্তমান আর্থিক সমস্যার মীমাংসার পথ এই।

"আর আজ ভিক্টোরীয় যুগ অনেককাল অতীত হইয়া গিয়াছে। তবু আমরা মধ্যভিক্টোরীয় প্রথা আঁকড়াইয়া বসিয়া আছি। আমাদের দৃষ্টি পরিষ্কার হইলে দুইটা কথা বুঝিতে পারিব। (১) মানবজাতির সুখসম্পদ্-বৃদ্ধির জন্ম কাঁচামালের পরিমাণ বাড়াইবার ও বৈচিত্র্য-বিধানের প্রয়োজন আছে। সেদিকে সাম্রাজ্যবাদ প্রভৃত মঙ্গলসাধন করিয়াছিল। (২) যখনি সাম্রাজ্যবাদ "একচেটিয়া"ত্ব অথবা আত্মপ্রাচুর্য্যের চেষ্টা করে তখনি অর্থনৈতিক নীতি লঙ্ঘন করিয়া যায় এবং আন্তর্জ্জাতিক মনোমালিন্তের সৃষ্টি করে।"

শ্রীযুক্ত আর্লের মতে "সারা উনবিংশ শতাব্দীতে গ্রেট বৃটেনের সমস্যাগুলিই নূতন করিয়া গত ২০ বৎসর যাবৎ যুক্তরাষ্ট্রে দেখা দিয়াছে। ১৮৫০ হইতে যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে কাঁচা মাল ও খাদ্যদ্রব্য রপ্তানিটা ক্রমাগতই কমিয়া যাইতেছে, আর কারবারে উৎপন্ন দ্রব্যের রপ্তানির অনুপাত ক্রমাগতই বাড়িতেছে। অন্তদিকে কারবারে উৎপন্ন দ্রব্যের আমদানি উত্তরোত্তর কমিতেছে কিন্তু কাঁচামাল আমদানির অনুপাত বাড়িতেছে। মনে রাখিতে হইবে যে, যুক্তরাষ্ট্রের কাঁচামাল সমস্যা ১৯১০ সনের পূর্ব্বে দেখা দেয় নাই। আর ঠিক সেই সময় হইতেই বিদেশের নানা স্থানে আমেরিকা প্রভূত পরিমাণে তার পুঁজিপাটা কাজে খাটাইতেছে।

"ল্যাঙ্কাশিয়ারের তুলার ব্যবসার সহিত ওহিওর রবার ব্যবসার বিলক্ষণ সাদৃশ্য দেখা যাইতেছে। ল্যাঙ্কাশিয়ারের তুলার ব্যবসা জগতের অনেকখানি তুলা গ্রাস করে। কিন্তু ল্যাঙ্কাশিয়ারে অথবা গ্রেটবৃটেনের অন্য কোথাও তুলা জন্মে না। সেইরূপ জগতের কাঁচা রবারের খুব বড় একটা ভাগ ওহিও গ্রাস করে। কিন্তু ওহিও অথবা আমেরিকান্ ইউনিয়নের কোন রাষ্ট্রেই রবার জন্মে না। আমেরিকার "আত্মযুদ্ধের" ফলে বৃটিশ তুলার কারবারীরা বুঝিয়াছিল কাঁচা তুলার উৎপত্তিস্থলকে ইংরেজের শাসনে আনা আবশ্যক। বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে আমেরিকা সরকার ও কারবারীরা কাঁচামালের স্বাধীন যোগান দখল করিতে চাহিতেছে। সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া ইংরেজ একাচোরামি করিয়াছিল। তারপর অর্থনৈতিক সুবিধার জন্য সে নীতি ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। যুক্তরাষ্ট্র যদিও একাচোরা প্রভুত্ব উপভোগ করিতেছে। তা কতদিন কে বলিবে?

"১৯১৪ সনের পূর্ব্বেই আমেরিকার পুঁজিপাটা কাঁচা মালের—বিশেষ করিয়া আমেরিকার খনিজ দ্রব্যের—উৎপত্তিস্থলগুলি চুঁড়িয়া বেড়াইতেছিল। খনিজের মধ্যে পেট্রোলিয়াম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। চিলি, মেক্সিকো ও অন্যান্য স্থানের খনিজও আছে। কিন্তু যুদ্ধের পর আরও দ্রুত ও গভীরভাবে আমেরিকার পুঁজিপাটা বাহিরে প্রসার লাভ করিয়াছে।

"যুদ্ধকালীন অস্বাভাবিক অবস্থা এই প্রসারের সহায়তা করিয়াছিল। জাতিতে জাতিতে দ্রব্য-সামগ্রীর সহজ চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ফট্‌কা জুয়াড়ীগণ কারবারীদের নাকাল করিতেছিল। যুক্তরাষ্ট্রের এক জন-প্রিয় চকোলেট্ বণিক্ দেখিল যে, চিনির ফট্‌কা জুয়াড়ীরা তার ব্যবসা মাটি করিতে বসিয়াছে। অগত্যা সে কিউবার বড় বড় চিনির চাষ-ভূমি কিনিয়া বসিল। এইরূপ দৃষ্টান্ত আরো আছে।

"সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকা সরকারের এই জ্ঞান জন্মিল যে, আর্থিক হিতসাধন ও দেশরক্ষা পরস্পরের সম্বন্ধ অতি নিকট। ফলে সরকার ক্রমাগত উৎসাহ দিতে লাগিল যেন আমেরিকার পুঁজিপাটা কাঁচামালের স্বাধীন উৎপত্তিস্থল-গুলিতে ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে কোন দলাদলির ঠাঁই ছিল না। সব দলই একমত। পেট্রোলিয়াম লইয়া ইংরেজ

ও আমেরিকানে মন-কষাকষি শ্রীযুক্ত উইলসনের শাসন কালেই চরম সীমায় উঠিয়াছিল। ১৯২০ সনের ডিমোক্রাটিক পার্টির একটা ঘোষণা এই ছিল, পেট্রোলিয়াম ও অন্যান্য খনিজের অতিরিক্ত যোগান-স্থানগুলিকে দখল করা যে আমেরিকার পক্ষে অত্যাবশ্যক, এই দল তা স্বীকার করিতেছে এবং ঘরে ও বাহিরে সকল প্রকার প্রচেষ্টাকে উৎসাহ ও সাহায্য দিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছে।" ১৯২০ সনে ঐ দল পরাজিত হয়। কিন্তু জেতা রিপাব্‌লিকান্ পার্টি অক্ষরে অক্ষরে ঐ ঘোষণা পালন করিয়াছে।

"বিদেশের কাঁচামালগুলিতে জোরসে আমেরিকার পুঁজিপাটা লাগাও—এই নীতির সহিত শ্রীযুক্ত হুভারের নাম বিশেষভাবে জড়িত। তিনি নাকি ১৯২১ সনে ওয়াশিংটনে তাঁর আফিসে বসিয়া কতকগুলি তৈলপতিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, বিদেশের পেট্রোলিয়ামের খনি যদি আমাদের তাঁবে আনিতে না পারি, তবে অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই আমাদিগকে অন্যান্য দেশের উপর নির্ভর করিতে হইবে। বস্তুতঃ, কতকগুলি চালাক দেশ পূর্ব্বাহ্নেই তাদের তেল জমা করিয়া রাখিয়াছে। তাই আমাদিগকে ভুগিতে হইতেছে। আমাদেরও বিদেশের খনিগুলি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। টাকার জন্য কুচ পরোয়া নেই। শ্রীযুক্ত হুভার ১৯২২ সনে এই উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের নিকট হইতে ৫০ কোটি ডলার আদায় করিয়া লইয়াছিলেন। ১৯২৪ সনে তিনি কংগ্রেসে আরজী করিলেন যে, বিদেশ হইতে কাঁচা মাল কিনিবার জন্য আমেরিকার কারবারীদের জোট বাঁধিতে দিবার অনুমতি দেওয়া হউক (বিরুদ্ধ আইন সত্ত্বেও)। তারপর ১৯২৫ সনে হুভারের বিখ্যাত রবার-আন্দোলন আসিল।

"শুধু হুভার নন। আরও অনেকে এই ভাবের ভাবুক। বিদেশে লাগানো হেতু আমেরিকান পুঁজিপাটা হইতে যে আয় পাওয়া যাইতেছে তাকে রেহাই দেওয়া হউক ১৯২৬ সনের ট্যাক্স বিলের সময় এইরূপ একটা চেষ্টা হইয়াছিল। আমেরিকার মহাজনরা যাতে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষক ব্যবসায়ে পুঁজিপাটা লাগায়, রাষ্ট্রবিভাগ সেই দিকে দৃষ্টি রাখিতেছে।

"কিন্তু বর্ত্তমানে আমেরিকার যে পুঁজিপাটা বিদেশে খাটিতেছে, তার অল্প পরিমাণ মাত্র আমেরিকা-শাসিত কাঁচা মালের জন্য ব্যয়িত হয়। কারণ নানা দিক্ হইতে আমেরিকার পুঁজিপাটার জন্য টান রহিয়াছে। আর অনেক সময় কাঁচা মালে না লাগাইয়া অন্যত্র লাগানই বেশী লাভজনক। যেমন ইউরোপে (সহর) পুনর্গঠন ঋণগুলি। তবে কতকগুলি সাংঘাতিক দরকারী কাঁচা মালে আমেরিকার অংশ ক্রমে বাড়িতেছে বটে। যুদ্ধের পূর্ব্বে চিনির নাইট্রেট যোগানের মাত্র ২% আমেরিকার হাতে ছিল। এখন আসিয়াছে ১৫% এবং আরও কেনা চলিতেছে। বোলিভিয়ার টিন, পেরুর ভ্যানাডিয়াম্ ও কিউবার চিনি সম্বন্ধেও ঐ কথা।

"ভবিষ্যতে কাঁচা মালের উৎপত্তিস্থলগুলি উত্তরোত্তর আমেরিকার পুঁজিপাটার অধীনে আসিতেও পারে, নাও পারে। কেহ কেহ বলে, ইউরোপে পুনর্গঠন ঋণগুলির জন্য টান পড়িতে আরম্ভ করিলেই, যুক্তরাষ্ট্রের হাতে বাড়্‌তি ধন সঞ্চিত হইবে। সেই ধন কাঁচা মালের উৎপত্তিস্থানে লাগান হইবে। সরকার সহায় থাকিলে ত কথাই নাই। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, আমেরিকার ব্যবসায়ী সর্ব্বত্র জাতীয় স্বার্থ ও নিজ স্বার্থ এক বিবেচনা করে না। তার পকেটে টাকাটা আসিলে সে খুসী হয়। তাতে জাতীয় স্বার্থ বর্দ্ধিত হইল কি না চাহিয়া দেখে না।

"কিন্তু একটা কথা সত্য। যদি কাঁচা মালের উৎপত্তিস্থলগুলির সবটা অথবা বেশীর ভাগ আমেরিকার শাসনে আসে ও আমেরিকার পুঁজিপাটা কাজে লাগে, তবে বিভিন্ন দিক্ হইতে তাতে বিষম বাধা পড়িবে। প্রথমতঃ মেক্সিকোর মত অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল রাষ্ট্রগুলি নিজ সীমানার মধ্যে আন্তর্জ্জাতিক জটিলতা সৃষ্টি হইবার ভয়ে বিরুদ্ধ আইন করিতে থাকিবে। বস্তুতঃ মেক্সিকো ইতিমধ্যেই বিমুখ হইয়া বসিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ক্যানাডার মত সম্পন্ন রাজনৈতিক জনপদসমূহ, পাছে আমেরিকার মহাজনেরা প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে নিঃশেষ করিয়া ফেলে, এই ভয়ে রপ্তানি-শুল্ক বসাইবে অথবা এই সব কাঁচামাল যাতে বাইরে না যায় তার চেষ্টা করিবে। ক্যানাডা ইতিমধ্যেই তা করিতেছে।

তৃতীয়তঃ, গ্রেট্‌বৃটেনের মত বাণিজ্য-প্রধান দেশগুলি তাদের সাম্রাজ্য হইতে যাতে কাঁচা মালের যোগান না যায় তাই চাহিবে। সাম্রাজ্যে উৎপন্ন পদার্থ তাদের নিজেদের ভোগের জন্ম দরকার। তা ছাড়া তারা বলিতে পারে, টারিফ দেয়াল তুলিয়া তোমরা যদি বৃটিশ দ্রব্য বাহিরে রাখিতে চাও, তবে আমরা বা কেন না আইন করিয়া তোমাদের পুঁজিপাটা আসা বন্ধ করিয়া দিব ?

"যে সকল স্থানে আমেরিকার রাষ্ট্রীয় এক্‌তিয়ার আছে সেখানেও যথেষ্ট বাধা পাইবার সম্ভাবনা। ফিলিপাইন দ্বীপে রবার উৎপাদন করিবার প্রস্তাবে তথাকার লোকেরা রাজী হয় নাই। তাদের ভয়, ঐরূপ করিলে তারা কোন দিন অর্থ নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় অধীনতা-পাশ হইতে মুক্তি পাইবে না। তা ছাড়া রবার-চাষ মানে (১) জমিজমার আইন ভাঙ্গিয়া দেওয়া (আইনে বলে কোন বিদেশী ফিলিপাইনের এক টুক্‌রা জমিও দখল করিতে পারিবে না), (২) মজুর আইন ভাঙ্গিয়া দেওয়া (আইনে বলে ফিলিপিনোকে কুলির কাজে লাগাইতে পারিবে না)। তাহা হইলে শুধু থাকে লিবেরিয়ার মত স্থান, যেখানে আমেরিকা জোর করিয়া নিজের কর্তৃত্ব ফলাইতে পারে। কিন্তু এত ডাহা সাম্রাজ্যবাদের সমস্যা।

"তবে কাঁচামাল-সমস্যার সমাধানের উপায় কি হইবে ? বাস্তবিক পক্ষে সমস্যাটা অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক নহে। যে পরিমাণে ইহাকে রাজনৈতিক করিয়া তোলা হয়, সেই পরিমাণে সমাধানটা ঘুলাইয়া যায় আর অনাবশ্যক ঝগড়াঝাটি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের সৃষ্টি হয়।

"একটা উপায় আছে। রাষ্ট্রগুলি একত্রে সকলে মিলিয়া যদি কাঁচামাল-শোষণে লাগে তবেই হয়। টার্কিশ পেট্রোলিয়াম কোম্পানী এইরূপ একটা আন্তর্জ্জাতিক অনুষ্ঠান। গোড়াতে এটা ছিল বৃটিশ করপোরেশন। কিন্তু এখন বৃটিশ, আমেরিকান, ফরাসী ও ওলন্দাজ পুঁজিপাটা ইহাতে খাটিতেছে। ২৫% থাকিবে অ্যাংলো-পার্শিয়ান অয়েল কোম্পানীর হাতে ; ২৫% রয়েল ডাচ্ অয়েল কমবাইনের হাতে ; ২৫% ৬৭টা ফরাসী কোম্পানীর তাঁবে ; আর বাকী ২৫% ৬টা বৃহৎ আমেরিকান্ করপোরেশনের তাঁবে। ইরাক্ হইতে তেল তুলিয়া ভূমধ্যসাগরের তীরে ঢালা হইবে। সেখান হইতে সকলে নিজ নিজ ভাগ লইয়া যথোচিত ব্যবস্থা করিবে। বলা বাহুল্য, এই আন্তর্জ্জাতিক ব্যবস্থার ফলে ইংরেজ, ফরাসী, আমেরিকার পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস দূর হইয়াছে ও ষড়যন্ত্র লোপ পাইয়াছে।

"কাঁচামালের সমস্যাটাকে কেবলমাত্র আন্তর্জ্জাতিক সমস্যারূপে বিবেচনা করিলে ভুল হইবে। ইহা গার্হস্থ্য সমস্যাও বটে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি কারবারীর স্বার্থ এই যে, সে যেন সস্তায় নিরন্তর একটা কাঁচামালের যোগান পায়। শ্রীযুক্ত ফোর্ডের ন্যায় কেহ কেহ একাই কাঁচামালের স্বাধীন উৎপত্তিস্থলকে দখল করিয়া এক একটা ব্যবসা গড়িয়া তুলিতে পারেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত ফোর্ড ব্যতিক্রমমাত্র।

"কাঁচামালের গার্হস্থ্য সমস্যা কখন আত্মকলহ-ঘটিত সমস্যায় দাঁড়াইতে পারে না। অন্যায় প্রতিযোগিতা দমন করিবার জন্য আইন আছে। সেই আইন যে অমান্য করিবে সে-ই শাস্তি পাইবে। কাঁচামালের গার্হস্থ্য ও আন্তর্জ্জাতিক সমস্যা অবশ্য একজাতীয় নয়। আন্তর্জ্জাতিক নীতির লঙ্ঘনকারীকে শাস্তি দিবার উপায় হইল অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক বর্ব্বরতা (ব্লকেড ও যুদ্ধ)।

"শ্রীযুক্ত কালবার্টসন তাঁর পুস্তক আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থাবলী'তে বলিয়াছেন যে, "আন্তর্জ্জাতিক লেনদেন সম্বন্ধীয় আইনের ধারা সৃষ্টি করা অসম্ভব নহে। সেই ধারাতে অন্যান্য প্রতিযোগিতার সংজ্ঞা দেওয়া হইবে। এক আন্তর্জ্জাতিক বিচারক-সভা থাকিবে ; প্রতি কারবারী সেখানে ব্যক্তিহিসাবে উপস্থিত হইয়া নালিশ ইত্যাদি করিতে পারিবে। তার অথবা তার প্রতিবাদীর বিচার হইবে কোনো বিশেষ দেশের প্রতিনিধিরূপে নয়, কিন্তু ব্যক্তিরূপে।

"এই যুক্তির বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, 'শান্তির সময়ে এই প্রথা বেশ চলিবে। কিন্তু যুদ্ধকালে সকল রকম নীতির বন্ধন ভাঙ্গিয়া যাইবে।' এই ধরণের আপত্তিতেই বুঝা যায় আন্তর্জ্জাতিক শান্তি ও উন্নতির কণ্টকটা কি। কাঁচামালের উৎপত্তিস্থলগুলিকে অধিকার করিবার

জন্য পরস্পরের প্রতিযোগিতা হইতেই যে অনেক সময় যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটে, তা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। সুতরাং প্রথমাবধি আমাদিগকে সাহসের সঙ্গে মানিয়া লইতে হইবে যে, যুদ্ধের স্থানে আইনের ধারা প্রচলন করা সম্ভবপর। অন্য পন্থা নাই।"

এবারকার ইণ্টারন্যাশনাল কনসিলিয়েশনের ৬টী প্রবন্ধের একটু বিস্তারিত পরিচয় দেওয়া গেল। ইহাতে আমেরিকার সুধীসমাজের চিন্তার ধারাও কতকটা বুঝা যাইবে।

প্রত্যেকটা প্রবন্ধ মূল্যবান্ তথ্যে পরিপূর্ণ। আমাদের দেশে সাধারণতঃ এই একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্বন্ধে ও অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশের নানা পণ্ডিত যুক্তিতর্কপূর্ণ কত বই লিখিয়াছেন। আমাদের শুধু দরকার সেগুলি গুছাইয়া লইয়া প্রকাশ করা। অর্থাৎ রাতারাতি অর্থশাস্ত্র বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান গড়িয়া তোলা এমন কিছু অসম্ভব ব্যাপার নহে।

আমি বলিতেছি না পশ্চিমের পণ্ডিতগণের পুস্তকাবলী পড়িবার দরকার নাই। বরং বলিতেছি পড়াটা আরো ব্যাপক এবং আরো গভীর করা আবশ্যক। আমাদিগকে এখনো বহুদিন পরের কাছে শিক্ষানবিশী করিতে হইবে। তাতে লজ্জা নাই। পরের কাছে পরের বিদ্যা ভাল করিয়া আয়ত্ত করাও একটা গুণ। সেই বিদ্যা আয়ত্ত করিবার অক্ষমতাই লজ্জার বিষয়।

কিন্তু একথা মনে রাখিতে হইবে, পশ্চিমে যে সকল বিদ্যা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা বহুদিন ধরিয়া বহু মাথাওয়ালা লোকের পরিশ্রমের ফল। আর এই পরিশ্রমেরও একটা প্রণালী রহিয়াছে। অর্থাৎ মোট ফলের পরিমাণটা যাতে সর্ব্বদাই বৃদ্ধি পায় সেদিকে দৃষ্টি রহিয়াছে।

তা ছাড়া, তথ্যনিষ্ঠা ও বস্তুনিষ্ঠা যত্রতত্র দেখিতে পাইব। অর্থাৎ এই পণ্ডিতেরা মনগড়া কল্পলোক লইয়া আলোচনা করেন না। জীবনের সঙ্গে, রক্তমাংসময় মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধবিচ্যুত হন না।

এই কয়টা আমেরিকান্ প্রবন্ধেও তার প্রমাণ যেখানে সেখানে পাওয়া যাইবে। দুইজন মাত্র অধ্যাপক। বাকী ৪ জন উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। কিন্তু প্রত্যেকেই নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে কাজে খাটাইতে ইতস্ততঃ করেন নাই। প্রচুর দৃষ্টান্ত ও তথ্য ঠাঁই পাইয়াছে।

এঁরা ভিন্ন ভিন্ন অর্থ নৈতিক নীতি বা নিয়মও তৈয়ারী করিয়াছেন। কিন্তু নিয়ম বা নীতির চেয়েও তাঁদের সংগৃহীত তথ্যগুলি ঢের বেশী মূল্যবান্। কারণ নিয়ম যে-কেহ করিতে পারে। কিন্তু ভিত্তিটা বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভর-যোগ্য হওয়া আবশ্যক।

একটা কথা বুঝা যাইতেছে। অর্থশাস্ত্র বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক বা ছাত্র না হইলেও লোকে তত্ত্ব বুঝিতে পারে ও নিয়মগুলি ধরিতে পারে। আমাদের সকল প্রকার ব্যবসায়ী, সরকারী বে-সরকারী চাকুরেরা এই কথা মনে রাখিলে উৎসাহিত হইবেন, আশা করি। তাঁরা নিজ নিজ বিভাগের তথ্যগুলি অন্ততঃ ভাল করিয়া সংগ্রহ করিতে পারেন।

বর্ত্তমানে আমেরিকায় "শান্তিপ্রতিষ্ঠা", "যুদ্ধ-নিবারণ", "নৌবহর হ্রাস" ইত্যাদির ধুয়া উঠিয়াছে। এই ধুয়াগুলির প্রধান পাণ্ডা অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি। বর্ত্তমান প্রবন্ধগুলিতে বুঝা যাইবে আমেরিকার ছোট বড় সকলের এ বিষয়ে মতিগতি কোন্ দিকে। সভাপতি জনমতে মত দিয়া মাত্র নিজের চাকরীটা বজায় রাখিয়াছেন। এই সব প্রচেষ্টা বাস্তবিক আন্তরিক কি না, সফল হইবে কিনা, দেশের লোকের আসল মতটা অন্যরকম কি না ইত্যাদি হইল আলাদা কথা।

চূণাপাথর ও ডলোমাইট

শ্রীজগজ্জ্যোতি পাল, রাখামাইনস্, সিংভূম

আমরা পানে চূণ খাই ও ঘর-বাড়ী তৈয়ারী করিতে চূণের ব্যবহার করি। সুতরাং চূণ আমাদের অপরিচিত নয়। চূণ প্রথমতঃ আমরা দুই রকম জিনিষ হইতে পাই— (১) পাথর, (২) শঙ্খ (শাঁখ, শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি)। তাহলে দেখতে পাই প্রথমটী অ-জৈব, দ্বিতীয়টী জৈব।

চূণাপাথর ও ডলোমাইট একই ধরণের জিনিষ। 'ঠেকা' পড়িলে আমরা একটীর পরিবর্ত্তে আর একটির ব্যবহার করিতে পারি। তাই চূণা পাথরের মাসতুতো ভাই ডলোমাইটকে আমরা একসঙ্গে টানিলাম। ধাতু গালাইয়ের কার্য্যে চূণাপাথর ও ডলোমাইট অপরিহার্য্য জিনিষ। কয়লার পরেই ইহাদের স্থান। ধাতু গালাইয়ের কারখানা করিবার সময় ধাতুপাথর হইতে কয়লা কতদূরে তাও ভাবিতে হয়। ধাতু গালাই ছাড়া, সিমেন্ট-নির্ম্মাণে চূণা-পাথরের আরও বিশেষ দরকার। আর সিমেন্ট-নির্ম্মাণে চূণাপাথরের জায়গায় ডলোমাইটের ব্যবহার চলে না। ঘর-বাড়ী তৈয়ারী করিতে চূণের দরকার সে কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। চূণাপাথর পাথরকয়লার সঙ্গে একত্র করিয়া পোড়াইলে চুণ হয়। চামড়া পাকাইবার কারখানাতে চূণের বিশেষ দরকার আছে। চামড়ার গায়ে যে সব লোম থাকে তা উঠাইবার জন্য চূণের দরকার। জমির হজমীরূপে চূণের দরকার। আমরা গ্যাসের আলোর জন্য যে কারবাইড ব্যবহার করি তাও প্রস্তুত করিতে চূণের দরকার। চুণ ও কয়লা বহু উত্তাপে দ্রবীভূত হইয়া মিলিলে কারবাইড প্রস্তুত হয়। এই উত্তাপের সৃষ্টি করিতে বৈদ্যুতিক শক্তির দরকার। কিন্তু আমাদের দেশে এখনও অন্যান্য দেশের মত বৈদ্যুতিক শক্তি সস্তা হয় নাই এবং কারবাইড আমাদের দেশে তৈয়ারী হয় না। আমাদের দেশে সিমেন্ট-শিল্প যথেষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছে।

চূণাপাথরকে, রাসায়নিকরা ক্যালসিয়াম কার্ব্বনেট ও ডলোমাইটকে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম কার্ব্বনেটস্ বলেন। চূণাপাথর ও ডলোমাইট্ দেখিতে প্রায় একরূপ। অনভ্যস্ত চোখে চূণাপাথর ও ডলোমাইটের রূপ দেখিয়া তফাৎ করিতে ভুল হইতে পারে। চূণাপাথরে ডাইলিউট্ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দিলে চূণাপাথর গলিতে আরম্ভ করে ও ফেনা উঠিতে থাকে। ডলোমাইটে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দিলে বিনা উত্তাপে এরূপ কোন কার্য্য হয় না। চূণা-পাথরে অ্যাসিড দিলে ফেনা উঠিতে থাকে এটা চূণা-পাথরের বিশেষত্ব। যাঁহারা পাথর পরখ করিতে বাহির হন তাঁহারা অ্যাসিড সহযোগে নির্ব্বিঘ্নে চূণাপাথর ধরিতে পারেন।

মাইনিং ও জিওলজিক্যাল ইনষ্টিটিউটের পত্রিকায় (২০শ ভলিয়ুম, ২য় খণ্ড) আমরা ধাতু গালাইয়ের ব্যবহারো-পযোগী চূণাপাথর ভারতবর্ষের পাঁচ জায়গায় দেখিতে পাই। (১) মধ্যপ্রদেশের কাটনীতে ক্যালসিয়াম কার্ব্বনেটের ভাগ শতকরা ৯৪·৬। (২) রেওয়া ষ্টেটের মইহারে— ক্যালসিয়াম কার্ব্বনেটের ভাগ শতকরা ৯৬·০৩। (৩) গাংপুর ষ্টেটের বিসরাতে—ক্যালসিয়াম কার্ব্বনেটের ভাগ শতকরা ৯৫·১৮। (৪) আসামের সীলেটে—ক্যালসিয়াম কার্ব্বনেটের ভাগ ৯৫·৪০। (৫) খাসিয়া পাহাড়ে—ক্যালসিয়াম কার্ব্বনেটের ভাগ ৯৮·৬। গাংপুর ষ্টেটের বিসরার চূণাপাথরই টাটার এবং ইণ্ডিয়ান্ আয়রণ ও ষ্টীল কোং'র কারখানাতে ব্যবহৃত হয়। বিসরা অন্যান্য জায়গা অপেক্ষা টাটা কারখানার নিকটবর্ত্তী। কলিকাতার বার্ড কোং বিসরা ষ্টোন্ লাইম কোং'র ম্যানেজিং এজেণ্টস্। মহীশূরে মহীশূর ষ্টেটের যে লৌহ কারখানা আছে তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে চূণাপাথর নাই। সেখানে ডলোমাইট আছে ও মহীশূরের কারখানায় চূণাপাথরের পরিবর্ত্তে ডলোমাইট ব্যবহৃত হয়।

বিসরাতে চূণাপাথর ও ডলোমাইট দুইই পাওয়া যায়। বিসরা ছাড়া গাংপুর ষ্টেটে কান্‌সবাহাল ও কুলাঙ্গাতে

চুণাপাথর ও ডলোমাইট পাওয়া যায়। এই দুই জায়গা হইতেও টাটার কারখানাতে ডলোমাইট সরবরাহ হয়।

চুণাপাথরে ও ডলোমাইটে সিলিকা (বালু) ও অ্যালুমিনার ভাগ যত কম হইবে ধাতুগালাই-কার্য্যে তত সুবিধা হইবে। চুণের জন্য জৈব জিনিষের উৎপত্তিও অল্প। শুনিতে পাই বাদসাহী ও নবাবী আমলে বাদসাহ ও নবাবেরা পানে মুক্তার চুণ খাইতেন। আমাদের কবিরাজীতে মুক্তা-ভস্মের ব্যবহার আছে। আর ছেলেদের পেট খারাপ হইলে আমরা চুণের জল (লাইম-ওয়াটার) খাওয়াই।

মার্ব্বেল পাথরের রাসায়নিক উপাদানও ক্যালসিয়াম কার্ব্বনেট। ক্যালসিয়াম কার্ব্বনেট ইহাতে প্রায় বিশুদ্ধ রূপেই অবস্থান করে। আমরা মার্ব্বেল পাথর ইমারত তৈয়ারীর জন্য ব্যবহার করিয়া থাকি। লিথোগ্রাফিক ষ্টোন তৈয়ারী করিতেও মার্ব্বেল পাথরের দরকার আছে।

শিক্ষা ও ব্যবসা—বিলাতের নজির

(১) সিটি-অব্ লণ্ডন চেয়ার

ইউনিভার্সিটি কলেজ, লণ্ডন তার শত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে পাঁচলক্ষ পাউণ্ড তুলিতে চেষ্টা করিতেছে। সহর লণ্ডনেই যাতে একলক্ষ পাউণ্ড উঠে তার জন্য এক বিশেষ আবেদন পত্র বাহির হইয়াছে। সমগ্র টাকাটায় ৫টা সিটি অব্ লণ্ডন চেয়ারের সৃষ্টি হইবে। তাদের সঙ্গে ব্যবসার ঘনিষ্ট যোগ আছে। লণ্ডনের লর্ড মেয়র এই আবেদনপত্র অনুমোদন করিয়াছেন।

এই চেয়ারগুলি নিম্নলিখিত ৫টা কলেজ ফ্যাকাল্‌টী লইয়া গঠিত :—

কলা	...	ফোনেটিক্সের চেয়ার
আইন	...	জুরিস্‌প্রুডেন্সের চেয়ার
বিজ্ঞান	...	ভূ-তত্ত্বের চেয়ার
এঞ্জিনিয়ারিং		সিভিল ও মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিংএর কেন্নেডি চেয়ার
ডাক্তারি বিজ্ঞান		ফার্ম্মাকোলজির চেয়ার

আবেদন পত্রে বলা হইয়াছে, "ফোনেটিক্স হইতেছে চলতি ভাষাগুলির সম্বন্ধে একটা বিজ্ঞানবিশেষ। ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকদের সহিত লেনদেন করিতে হয়। বিশেষ করিয়া এশিয়া ও আফ্রিকার বিস্তীর্ণ বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে বহুতর ভাষার প্রচলন রহিয়াছে। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এইসব ভাষার তত্ত্ব শিখাইলে বাণিজ্যের প্রসার ঘটিবার সম্ভাবনা আছে।

"বৃটিশ সাম্রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন আইন-কানুন বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাদের তুলনামূলক পঠন-পাঠন ও সমালোচনার দরকার আছে। তদর্থে জুরিস্‌প্রুডেন্সের চেয়ার।

"ব্যবসার বিভিন্ন বিভাগের সহিত ভূতত্ত্বের সম্বন্ধ অতি নিকট। যেমন ধর, তেলের খনি বা সোনার খনির উন্নতিতে কিংবা কৃষিতে অথবা নলকূপ ইত্যাদির ব্যবস্থাতে ভূ-বিদ্যাকে সর্ব্বদাই কাজে খাটাইতে হয়।

"এঞ্জিনিয়ারিং বিজ্ঞানবিভাগে স্যর আলেকজেণ্ডার বি, ডব্লিউ, কেন্নেডির কীর্ত্তি অতুলনীয়। তাঁর নাম চির-স্মরণীয় করিবার চেষ্টায় সিভিল ও মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং চেয়ার। তিনি ইউনিভার্সিটি কলেজে প্রথম এঞ্জিনিয়ারিং লেবরেটরীর প্রতিষ্ঠাতা।

"বৃটেনের বাজার বিদেশে পরীক্ষিত, শোধিত, ও প্রমাণিত ড্রাগে ছাইয়া গিয়াছে। ওষুধের জন্য নব নব ড্রাগের উৎপাদন ষ্ট্যাণ্ডার্ডাইজেশন এবং গুণাগুণ নির্ণয় হইবে ফার্ম্মাকোলজি-চেয়ারের অবশ্যকরণীয় কাজ। ড্রাগ-ব্যবসায়ী প্রত্যেক আড়তের স্বার্থের পক্ষে এই কাজের

প্রয়োজন গুরুতর। এবিষয়ে গ্রেট্‌বৃটেন্ জার্ম্মাণি এবং ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে।

"এই পাঁচটা বিষয়ের প্রত্যেকটাকেই সাম্রাজ্যের স্বার্থের পুষ্টিকারক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। সহর লণ্ডন হইল এই বিপুল সাম্রাজ্যের কেন্দ্র। সুতরাং লণ্ডন কখনও এবিষয়ে উদাসীন থাকিতে পারে না।

"এই বিষয়গুলির অধ্যয়ন অধ্যাপনা যে এখন চলিতেছে না, তা নয়। কিন্তু এই চেয়ারগুলি প্রতিষ্ঠিত হইলে তাদের জন্য যে টাকাটা খরচ হইতেছে তাহা কলেজের অন্যান্য কার্য্য বাবদ পাওয়া যাইবে।"

(২) লর্ড লণ্ডনডেরীর উক্তি

গত ২২শে জানুয়ারী ১৯২৭ লর্ড্ লণ্ডনডেরী লোবরো কলেজে ডিপ্লোমা বিতরণ করিয়াছেন। সেই উপলক্ষ্যে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "বর্ত্তমান সঙ্কটকালে আমাদের শিক্ষানীতি কি পরিমাণে আমাদের ব্যবসাগুলির সহায়তা করিতে পারে?"

তিনি বলেন, "শিক্ষারীতি ও ব্যবসার মধ্যে সর্ব্বদাই একটা গভীর ও অচ্ছেদ্য যোগ থাকা দরকার। একটাকে বাদ দিয়া অন্যটায় উন্নতি করিতে গেলে ফল ভাল হয় না।

"লোবরোর এই একটা গর্ব্বের বিষয় আছে যে, এখানে শিক্ষার কালটা ব্যর্থ হইতে দেওয়া হয় না। জ্ঞান, পটুতা, কার্য্যক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যাতে উপার্জ্জন-শক্তিও বিকশিত হয় সে দিকে নজর রাখা হইয়াছে। সবাই আর কিছু বিদ্যাবত্তার চরম সীমায় উপনীত হইতে পারে না। অল্প কয়েকজনের সে সৌভাগ্য ঘটে। 'জ্ঞানের জন্য জ্ঞানের অন্বেষণ' কখনও বহুলোকের জীবনের ব্রত হইতে পারে না। তাতে দেশেরও ক্ষতি ঘটে। কারণ দেশ সকল দিকে অগ্রসর হইবে ইহাই বাঞ্ছনীয়। তা ছাড়া খুব অল্প কয়েক জন উচ্চশিক্ষিত লোকেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিজেদের অন্ন-সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়।

"সুতরাং শিক্ষার ক্ষেত্রে রুটীর কথা ভাবা কিছুমাত্র লজ্জার বিষয় নয়। বরং তাতে এই একটা লাভ হয় যে, লোকে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান বা বিশুদ্ধ কলার তত্ত্বগুলিকে কাজে লাগাইবার সুযোগ পায়। অল্প কয়েকজন লোক অফিসের বাবু হয়। বাকী অধিকাংশ লোককে ব্যবসাবাণিজ্যে ব্যাপৃত হইতে হইবে। তা না হইলে তাদের অলস হইয়া থাকিতে হইবে। সেটা অপরিমেয় জাতীয় ক্ষতি।

"লজ্জার বিষয় তখনই ঘটে যখন শিক্ষাকে বস্তু অথবা তথ্য-নিষ্ঠা হইতে বিচ্ছিন্ন করা হয়। এ জগতে চোখ বুজিয়া চলিলে ঠকিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে ইংরেজের ব্যবসাক্ষেত্রে কর্ম্মপটু শিল্পীর যত দরকার আগে কোনো দিন তত ছিল না। এই সত্যটাকে আমাদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির অঙ্গীকার করিয়া লওয়া দরকার।

"সমর্থদের শিক্ষা-কমিটীর পরিশ্রমের ফলস্বরূপ প্রস্তাব হইয়াছে চৌদ্দ বৎসরের পরিবর্ত্তে পনর বৎসর পর্য্যন্ত পূর্ণ সময় স্কুলে যাইতে হইবে। ইহাতে দেশে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। একেই ত জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ যথেষ্ট নয়। তাতে এই ব্যবস্থা কাজে খাটাইলে তাহা আরও সঙ্কীর্ণ হইবে।

"অধুনা বাণিজ্য-জগতে তুমুল প্রতিযোগিতা চলিতেছে। বাণিজ্যিক লড়াই ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতেছে। এই প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে টিঁকিয়া থাকিতে হইলে উপযুক্ত অস্ত্র-শস্ত্রের দরকার। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে একটা বড় অস্ত্রে পরিণত করা যায়। তজ্জন্য কোনো নূতন আইন-কানুন প্রণয়নের প্রয়োজন নাই। বর্ত্তমান শিক্ষা এবং বাণিজ্য-ব্যবস্থার মধ্যেই তার যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে। দেশবিদেশের বাণিজ্যক্ষেত্রে আমাদের মান-ইজ্জত রক্ষা করিতেছে পটু শিল্পী। তাকেই সর্ব্বপ্রকারে শিক্ষাক্ষেত্রে উৎসাহ দেওয়া আবশ্যক। তারই জন্য দেশের ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহে সুযোগ ও সুবিধার সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক। দেশে যত শিক্ষিত পটু শিল্পীর সংখ্যা বাড়িবে, তত দেশের মঙ্গল।

"আনন্দের বিষয় লোবরোতে 'শিক্ষা বনাম ব্যবসায়' সমস্যার সমাধানের জন্য একটা চেষ্টা ও যত্ন দেখা যাইতেছে। এখানকার উদাহরণ অন্যত্র অনুসৃত হইবার যোগ্য।"
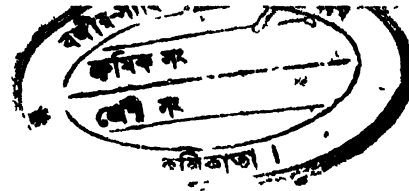
জলসেচ ও চাষবাস

শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ

পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গের কৃষকদের আর্থিক দুরবস্থার প্রধান ও আদি কারণ সেচের জলের অভাব। এই জলাভাবই ৩০ বৎসরের মধ্যে এ প্রদেশের উৎপন্ন ধান্যের গড়পড়তা পরিমাণ প্রতিবিঘা ৫॥• সাড়ে পাঁচ মণ হইতে ৩/০ মণে নামাইয়াছে। এই অভাবের আশু প্রতীকার না হইলে, অচিরে কৃষকের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

আগে আমাদের দেশে সেচের বেশ সুবন্দোবস্ত ছিল। গ্রামে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সেচের পুকুর ছিল। বর্ষার ধারাপাতে এই সকল পুকুর জলপূর্ণ হইলে আর "শুখা" হইবার কোনও ভয় থাকিত না। প্রতি গ্রামের বেলে মাঠ কার্পাস দেওয়ার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই সকল পুকুর হইতে সেচ হইয়া প্রচুর পরিমাণে "চৈতালী" কার্পাস হইত। এখন আর কার্পাস না হইলেও এই মাঠের নাম এখনও "কাপাসে মাঠ"ই আছে। অথচ বর্ত্তমানে কার্পাসের অভাবই দেশে চরকার প্রচলনে একটি প্রধান অন্তরায় হইল। ছোট ছোট সেচের পুকুরের কথা ছাড়িয়া দিলেও এক বর্দ্ধমান জেলাতেই ১৫।১৬ হাজার সেচের দীঘি ছিল।

আর সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই। এই সকল সেচের পুকুর মজিয়া গিয়াছে। অর্দ্ধেকের উপর পুকুর জমিতে পরিণত হইয়া তাহাতে প্রজাবিলি হইয়াছে। আর যে সকল পুকুর "মজা" অবস্থায় আপন অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে, সেগুলিও যে অচিরাৎ জমিতে পরিণত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

পল্লীর শ্রী ফিরাইতে হইলে, পল্লীবাসীর আর্থিক দুরবস্থা দূর করিতে হইলে অগ্রে এই সকল সেচের পুকুরের উদ্ধার-সাধন করিতে হইবে। এজন্য আইন প্রণয়নের বিশেষ আবশ্যক। এই আইন দ্বারা সরকার হইতে অনুসন্ধান করিয়া এই সকল পুকুরকে সেচের পুকুর বলিয়া সাব্যস্ত করিতে হইবে। এবং এই সকল পুকুরে যে স জমির সেচ আছে, সেই সব জমির মালিকেরা সেচের জ খনন আদি যাবতীয় কার্য্য করিতে পারিবে। ইচ্ছাম জল ধরাইতে ও বাহির করিয়া দিতে পারিবে। এ প্রকার সেচসংক্রান্ত যাবতায় আবশ্যক কার্য্য জমি মালিকগণ যাহাতে বিনা বাধায় করিতে পারে সে বিষে স্পষ্ট আইন থাকা আবশ্যক।

এইরূপে সেচের পুকুরগুলির স্বত্ব আইন দ্বারা খোলস করিয়া দিয়া কৃষি-বিভাগ হইতেই হউক বা সরকারী সে বিভাগ হইতেই হউক—সমবায়ের নিয়মে বা অন্য কোনও প্রণালীতে এই সকল সেচের পুকুরের সংস্কার করিলে পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গের অন্নসমস্যার অনেকটা সমাধান হইবে।

দামোদরের প্রভূত জলরাশি সেচের কাজে লাগাইবা প্রস্তাব বহুব্যয়সাপেক্ষ বলিয়া ছাড়িয়া দিলেও দেশের ছোট নদীগুলির জল সেচের কার্য্যে অনায়াসে লাগাইতে পারা যায়। দমকল বা কলের ইঞ্জিন স্থানে স্থানে বসাই ৪।৫ হাজার বিঘা জমির জল সরবরাহ করা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমাদের জানা দুইটী চাউল কলের দ্বারা দেশে কৃষি-কার্য্যের কিরূপ সাহায্য হইতেছে, তাহার বৃত্তান্ত নিম্নে বর্ণনা করিলাম। কাল্না মহকুমার ধান্যখেরুড় নিবাসী শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ দাস হাজরা মহাশয় বঙ্কেশরী নদী কিনারা প্রতি বিঘা ১৫।২৫ টাকা মূল্যে খরিদ তাঁহার ইঞ্জিন দ্বারা সেচ করায় প্রতিবিঘায় কম বৎসরে ৫০।৬০ টাকার ফসল কাটিতেছেন। নাদনঘাটের কলওয়ালা শ্রীযুক্ত নফর চন্দ্র আটা মহাশয় ঐখানে ধান্য কল খুলিয়া ৪।৫ হাজার বিঘাজমির চাষের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় প্রজাদের সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি ইহা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। (পল্লীবাসী)

১০৭নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টেল প্রেসে শ্রীরঘুনাথ শীল, দিং এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।